সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)

সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস

(১ম খণ্ড)

[হিজরী ১ম শতাব্দির মুজাদ্দিদ হযরত ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র) থেকে হিজরী ৮ম শতাব্দির মুজাদ্দিদ জালালুদ্দিন রূমী (র) পর্যন্ত ১১ জন মর্দে মু'মিন ও মর্দে মুজাহিদের সাধনা ও কর্মবহুল জীবন]

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (র)

অনূদিত

মুহাম্মদ ব্রাদার্স

৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা

সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (১ম খণ্ড)
মূল ঃ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.
অনুবাদ ঃ আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী রহ.

প্রকাশকাল
জানুয়ারী, ২০১৫ ঈসায়ী
মাঘ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ; রবিউস সানী ১৪৩৬ হিজরী

প্রকাশনায় মুহাম্মদ আবদুর রউফ
মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
সেলঃ 01822-806163; 01776-438110

মুদ্রণে ঃ মেসার্স তাওয়াক্কুল প্রেস
৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
সালসাবিল

ISBN: 984-622-001-4

মূল্য ঃ ৪০০.০০ (চারশত) টাকা মাত্র।

Shangrami Shadhakder Itihas: (History of the Soviours of Islamic Sprit) written by Allama Sayeed Abul Hasan Ali Nadvi (R) in Urdu and translated by A. S. M. Omr Ali (R) into Bengali and Published by Muhammad Abdur Rouf, Muhammad Brothers, 38, Bangla Bazar, Dhaka-1100. BANGLADESH. Cell Phone: 01776-438110

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে যাঁরা চরম আত্মত্যাগের সম্মুখীন হয়েও বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি, এ পথের সকল প্রতিকূলতাকে যাঁরা হাসিমুখে মুকাবিলা করেছেন,

অত্যাচারী জালিমের খড়গ-কৃপাণ ও বদ্ধ কারাপ্রাচীর যাঁদের বিশ্বাসের ভিত্‌কে এক বিন্দুও টলাতে পারেনি,

বিলাসী ও আয়েশী জীবন যাপনের শত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যাঁরা নির্লোভ ও নির্মোহ জীবন যাপন করে মানুষের সামনে অনুপম আদর্শ স্থাপন করেছেন,

পর্ণ কুটিরে বাস করে এবং অনাড়ম্বর পরিবেশে থেকেও যাঁরা রাজা-বাদশাহ্‌র ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতার সামনে নিজেদের শির সমুন্নত রেখেছেন, দুঃখী ও মজলুম মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের হতাশ অন্তরে আশা-ভারসার প্রদীপ জ্বালিয়েছেন,

তাদেরকে কাছে টেনেছেন,

আপন করেছেন,

রূহানিয়াতের প্রোজ্জ্বল আলোকধারায় যাঁরা পাপক্লিষ্ট ও পথভ্রষ্ট মানুষকে হিদায়াতের প্রশস্ত রাজপথে এনে দাঁড় করিয়েছেন, সেই সব জানা-অজানা মর্দে মু'মিন ও মর্দে মুজাহিদের পবিত্র রূহের উদ্দেশে—

— অনুবাদক

আমাদের কথা

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন জীবন-দর্শন। অবস্থা, পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশের প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার সুন্দর ও নিখুঁৎ সমাধান রয়েছে ইসলামে। জীবন প্রবাহের স্রোতধারায় ইসলামের অনুশাসনমালা এক কালজয়ী আদর্শরূপে স্বীকৃত। অভ্যুদয়ের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বহু মনীষী ও আল্লাহ্ওয়ালা এর প্রচার ও সংরক্ষণে দিয়েছেন সীমাহীন কুরবানী। আমরা তাঁদের জীবনের কতটুকুই বা জানি?

আমরা সমাজের মূল স্রোতধারার সংস্কারক শক্তির কথা বেমালুম ভুলে যাই। যে সব মানব হিতৈষীবর্গ তাঁদের প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে সমাজের হিত সাধন করে গেছেন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে দান করেছেন এক সুষ্ঠু অবকাঠামো, মানবতার উত্তরণ ঘটিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও পারস্পরিক সম্প্রীতির ডোরে আবদ্ধ করেছেন মানব সমাজকে– তাঁরা রয়েছেন ইতিহাসের পাতায় অনুল্লেখ্য। পক্ষান্তরে ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো ভরে আছে রাজ-রাজড়াদের কাহিনীতে।

আজ মানুষ সচেতন হয়েছে অনেকটা। রাজ-দণ্ডমুণ্ডের অধিকারীরা আজ দিশেহারা। জ্ঞানরাজ্যে বিচরণকারীদের সংস্পর্শে এসে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চায়। যুগধর্ম ও পরিবেশের এই জরুরী মুহূর্তে সংস্কারক ব্যক্তিত্বসমূহকে স্থায়ী আসনে সমাসীন করার জন্য যে সব মনীষী ও চিন্তাবিদ তাঁদের ক্ষুরধার লেখনী নিয়ে কলমী জিহাদের বিস্তীর্ণ ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন, উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক ও লেখক আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী তাঁদের অন্যতম।

লাখনৌ-এর 'জামা'আতে দা'ওয়াত-ই-ইসলাহ ও তাবলীগ' যুগ-জিজ্ঞাসার প্রেক্ষাপটে সপ্তাহব্যাপী এক সেমিনারের আয়োজন করেছিল ১৩৭২ হিজরীর মুহাররম মাসে। এর আলোচ্য বিষয়ের শিরোনাম ছিল, "সংস্কার ও পুনর্জাগরণের ইতিহাস এবং উক্ত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।" জনাব আল্লামা নদভী উক্ত বিষয়ের ওপর নিবন্ধ পেশ করে এক নতুন ধারায় লেখনী পরিচালনার প্রেরণা লাভ করেন। এরপর আল্লাহ্র রহমত ও প্রাণান্তকর সাধনাকে সম্বল করে 'তারীখে দা'ওয়াত ও 'আযীমত' নামে সিরিজ পুস্তক প্রণয়নে হাত দেন এবং হযরত ওমর

ইবনে 'আবদুল 'আযীয (র) থেকে তিনি এর সিলসিলা আরম্ভ করেন। এ পর্যায়ে তিনি পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেন। মুসলিম জাহানের স্বনামধন্য 'আলিম, মর্দে মু'মিন ও মুজাদ্দিদবর্গের তেজোদ্দীপ্ত জীবনী তুলে ধরেছেন তিনি এ সব গ্রন্থে। মুসলিম জাহানে তাঁর এই সিরিজটি সর্বজনস্বীকৃত ও প্রশংসিত। বিশ্বের কয়েকটি ভাষায় এগুলোর তরজমা হয়েছে। বাংলাদেশী মুসলিম সমাজের উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক 'ইসলামী রেঁনেসার অগ্রপথিক' নামে উক্ত সিরিজের তিনটি খণ্ডের অনুবাদ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় ও বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু সুদীর্ঘ এক যুগ যাবত প্রকাশিত এ সব খণ্ডের আর কোন সংস্করণ মুদ্রিত না হওয়ায় আগ্রহী পাঠকের ঐকান্তিক অনুরোধে আল্লামা নদভী লিখিত পুস্তকাদির তরজমা ও প্রকাশের অনুমতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান "মজলিস নাশরিয়াত-ই-ইসলাম"-এর সংগে আমরা যোগাযোগ করি। "মজলিস নাশরিয়াত-ই-ইসলাম" কর্তৃপক্ষ আমাদের আগ্রহে সাড়া দিয়ে শর্তসাপেক্ষে এ সিরিজটি এবং হযরতের অন্যান্য পুস্তকাদি প্রকাশের অনুমতি দেন। এক্ষণে সেই আগ্রহী পাঠকের স্বার্থ আমরা এই দূরুহ কাজে হাত দিয়েছি তাদের প্রয়োজন পূরণে এ প্রয়াস সফল হলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। আল্লাহপাক আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন এবং সেই কিয়ামতের কঠিন দিনে নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিন- এটাই আমাদের মুনাজাত।

– প্রকাশক

অনুবাদকের আরয
(প্রথম সংস্করণ)

আল-হা'মদু লিল্লাহ্! অবশেষে তাঁরই অপার রহমতে মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত 'আলিম, লেখক ও চিন্তাবিদ এবং রূহানী মার্গের অন্যতম জ্যোতিষ্ক হযরত মাওয়ানা সায়্যিদ আবু'ল-হাসান 'আলী নদভী (র.) রচিত "তারীখে দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমাত" সিরিজের ১ম খণ্ডের তরজমা প্রকাশিত হল। এজন্য মহান আল্লাহ্ রাব্বু'ল-'আলামীনের দরবারে জানাই অসংখ্য শোকর ও সজুদ।

উর্দূভাষী পাঠকের নিকট 'তারীখে দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমাত'-এর নতুন পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। সর্বপ্রথম ভারতে প্রকাশিত হলেও ইতোমধ্যেই তা 'আরবী ও ইংরেজী সহ পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাঠক মহলে সাড়া জাগিয়েছে। আমাদের জানা মতে এ পর্যন্ত কুয়েত ও বৈরূত থেকে 'আরবী ভাষায় দু'টি সংস্করণ, উর্দু ভাষায় লখ্নৌ থেকে এ সিরিজের কোন কোন খণ্ডের দুই ও ততোধিক সংস্করণ এবং পাকিস্তানের করাচী থেকে একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য সিরিজের তৃতীয় খণ্ডটি দীন অনুবাদক কর্তৃক বাংলা ভাষায় 'ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক' নামে অনুদিত হয়ে ১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, হযরত নদভী (র.)-র লিখিত 'যব ঈমান কি বাহার আঈ' ছিল ছিল প্রথম গ্রন্থ যা বর্তমানে অনুবাদক কর্তৃক অনূদিত হয়ে 'ঈমান যখন জাগলো' নামে সর্বপ্রথম বাঙলা ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৭৯ সালে এ সিরিজের তৃতীয় খণ্ডটি আমার হাতে এলেও ১৯৮০-এর শেষাংশের পূর্বে এর তরজমার কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয়নি। তারপর ১৯৮১ সালের মে মাসে তরজমা শেষ হলেও তা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতে ৮২-র ডিসেম্বর এসে যায়। প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আগ্রহী পাঠক সমাজ পুস্তকটি দু'হাতে লুফে নেন এবং সেই সঙ্গে এর পূর্ববর্তী দু'টি খণ্ডের তরজমা প্রকাশের প্রবল তাকীদ আসতে থাকে। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও খণ্ড দু'টি সংগ্রহে ব্যর্থ হওয়ায় স্বভাবতই এর তরজমা কর্মে বিলম্ব ঘটে। অবশেষে আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানীতে বাংলাদেশের অন্যতম খ্যাতনামা পুস্তক ব্যবসায়ী টিরধব অর্ভণরভর্টধমভটফ-এর স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর জনাব নাজমুল করিম সাহেবের সৌজন্যে উক্ত খণ্ড দু'টি

সংগ্রহে সমর্থ হই। এ জন্য তাঁর নিকট আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এ কাজের জন্য মহান আল্লাহ্র দরবারে যদি অধমের কিছুমাত্র পুরস্কারও প্রাপ্য হয়ে থাকে জনাব করিমকেও আমি তাতে শরীক করতে চাই।

তরজমা কর্মে হাত দেবার পরও নানা কারণে এর গতি আশানুরূপ ছিল না। অতিরিক্ত খাটুনিজনিত ক্লান্তি এবং মাঝে মধ্যেই শারীরিক নানা অসুস্থতা তরজমার স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করেছে। এরই মাঝে জেনারেল আকবর খান লিখিত 'সায়ফুল্লাহ্ খালিদ (রা)' ('খালিদ বিন ওয়ালীদ' নামে প্রকাশিত) অনুবাদ করতে হওয়ায় বর্তমান গ্রন্থের তরজমা আরো খানিকটা বিলম্বিত হয়ে পড়ে। অবশেষে অনেক দেরীতে হলেও মহান আল্লাহ্র ফযল ও করমে অনূদিত, সম্পাদিত ও মুদ্রিত হয়ে পাঠকের হাতে তা পৌঁছুতে যাচ্ছে দেখে গভীর তৃপ্তিতে মন আমার ভরে উঠছে। এক্ষণে যাঁদের কথা মনে রেখে আমি এর তরজমায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, যে আগ্রহী পাঠক সমাজের প্রবল তাকীদ ব্যক্তিগত শত অসুবিধা সত্ত্বেও আমাকে নিরন্তর পরিশ্রমে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁরা যদি এর থেকে কিছুমাত্রও উপকৃত হন তাহলে আমি আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব। সেই সঙ্গে যে মহান আল্লাহ্র রেযামন্দী লাভের নিয়তে এ কাজে ব্রতী হয়েছি তাঁর দরবারে গোনাগারের এ প্রচেষ্টা সামান্যতম কবুলিয়াত লাভ করলেও বান্দা নিজেকে সরফরায মনে করবে। আর তাঁর সন্তুষ্টিই হোক আমাদের সকল কর্ম-প্রেরণার মূল উৎস।

অনুবাদ সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। নিরন্তর কর্মব্যস্ততার মাঝে আমার পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব ছিল আমি তা করেছি। বাকিটুকু করেছেন এর সম্পাদক খ্যাতনামা অনুবাদক ও লেখক অগ্রজপ্রতিম মওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী। প্রশংসার মত কিছু থাকলে সেটা তাঁরই, ব্যর্থতা আমার। এর কাফফারা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখা ছাড়া উপায় কি!

নিতান্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, ইসলামী সাহিত্যে আরবী ভাষার পরে যে ভাষার দান সর্বাধিক-সেই ফারসী ভাষার চর্চা মুসলিম প্রধান বাংলাদেশ থেকে যে এভাবে উঠে যাবে তা কয়েক যুগ আগেও বোধ হয় কেউ ভাবে নি। পৃথিবীর তাবৎ ভাষার মধ্যে ফারসী ভাষার শ্রুতি-মাধুর্য সকলেই স্বীকার করেন। এহেন সমৃদ্ধ ও মিষ্টি একটি ভাষা থেকে এ ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আমরা বোধ হয় খুব বেশি লাভবান হই নি, ভবিষ্যতেও লাভবান হবার তেমন সম্ভাবনা নেই। অবশ্য আমি নিজেও এর ব্যতিক্রম নই। গরজ বড় বালাই; তাই ভবিষ্যতে আধুনিক শিক্ষা লাভের স্বার্থে ইংরেজীর দরকার পড়বে বিধায় আমি আমার মাদরাসা জীবনে ইচ্ছে থাকলেও ফারসী ভাষা শিখতে পারিনি। ফলে বর্তমান গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে

মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (র)-এর 'দীওয়ান' ও 'মছনবী' থেকে উদ্ধৃত কবিতাংশ অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাকে ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অবশেষে এদেশের অন্যতম খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত হাম-বায়'আত পরম সম্মানিত মাওলানা সুলতান যওক সাহেব এই সমস্যা নিরসনে সাগ্রহে এগিয়ে আসেন এবং উদ্ধৃত কবিতাংশ উর্দূতে তরজমা করে দেন। তাঁর এ মহানুভবতা কোন দিন ভুলবার নয়। আল্লাহ্ পাক তাঁকে জাযায়ে খায়ের দিন, এই আমার একান্ত মুনাজাত।

এ বই প্রকাশের পেছনে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের পরিচালক বন্ধুবর মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, সহকারী পরিচালক স্নেহভাজন মওলানা আবুল বাশার আখন্দ ও সহকারী পরিচালক বড় ভাই অধ্যাপক মওলানা মোশাররফ হোসাইনের অবদান সবচেয়ে বেশী। সে জন্য সাধারণ ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের অমর্যাদা করতে চাই না। স্নেহ-ভাজন মোহাম্মদ মোকসেদ প্রথম প্রুফ দেখে দিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন। নির্ঘন্ট তৈরীতে স্নেহভাজন জিল্লুর রহমান, আবদুল হান্নান, আশকার আলী, মোমতাজ উদ্দীন, কন্যা মরিয়ম জামিলা ও জামিলা কুলছুম যে সহযোতিা দেখিয়েছে তজ্জন্য আমি তাঁদের নিকটও কৃতজ্ঞ। এতদ্ভিন্ন তরজমার কাজে দরকারী সহযোগিতা যুগিয়ে ও অনেক স্বার্থ কুরবানী দিয়ে জীবনসঙ্গিনী বেগম জেবুন্নেছা যেভাবে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন সে জন্য আমি তাঁকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখছি। আল্লাহ্ পাক সবাইকে তাঁদের স্ব-স্ব খিদমতের পুরস্কার দিন।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশনকে এ বই-এর প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মুবারকবাদ জানাই।

৩০ শে শা'বান, বুধবার ১৪০৭ হি. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

লেখকের আরয

১৩৭২ মুহাররম মাসে লাখনৌয়ে 'জামা'আতে দা'ওয়াত-ই ইসলাহ্ ও তাবলীগ'-এর পক্ষ থেকে বন্ধু-বান্ধবদের সম্মুখে দরকারী বিষয়াবলীর ওপর বক্তৃতা ও আলোচনার ইন্তেজাম করা হয়। শ্রোতাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ানো এবং তাদের মানসিক প্রশিক্ষণের উপকরণ যোগান দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। এসব বক্তৃতা, আলোচনা এবং নিবন্ধ পাঠের সিলসিলা সপ্তাহব্যাপী চলে। এই প্রশিক্ষণ সপ্তাহের দীর্ঘ ও ধারাবাহিক আলোচ্য বিষয়ের শিরোনাম ছিল, "সংস্কার ও পুনর্জাগরণের ইতিহাস এবং উক্ত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।" উল্লিখিত বিষয়ে আলোচনার ভার পড়ে অধম গ্রন্থকারের ওপর এবং প্রায় সপ্তাহকাল এই বিষয়ের উপর আমি আলোচনা করি। স্রেফ একটি সংক্ষিপ্ত স্মারক চিহ্ন, কিছু শিরোনাম ও কিছু ইশারা-ইঙ্গিত সামনে রেখে আলোচনা অব্যাহত থাকে। শ্রোতাগণ তাদের নিজস্ব পন্থায় এই আলোচনার সংক্ষিপ্তসার সংরক্ষণ করতেন।

পরবর্তীকালে প্রচারের নিয়তে যখন এর ওপর নজর দিলাম তখন অনুভব করলাম যে, এ কাজ একান্ত মনোযোগ ও পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে করা দরকার। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিষয় যার ওপর (আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান মুতাবিক) বিস্তারিত ও পরিপূর্ণ কোন আলোচনা হয়নি। এটাই ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী সাহিত্যের একটি বড় শূন্যতা যা সত্বর পূরণ হওয়া দরকার। এই শূন্যতা থাকার কারণে কোন কোন চিন্তাশীল মহলে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, ইসলাম ও মুসলিম ইতিহাসে সংস্কার, রেনেসাঁ তথা পুনর্জাগরণ ও বিপ্লবের ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন কোন বিবরণী পাওয়া যায় না, বরং এতে বিরাট ও দীর্ঘ শূন্যতাই পরিদৃষ্ট হয় যা শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী বিস্তৃত। কয়েক শ' বছর পর কিছু কিছু ব্যক্তিত্বের উত্থান ঘটেছে যাঁরা প্রতিকূল অবস্থার সাথে লড়েছেন এবং এ কারণে চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য মর্যাদারও অধিকারী হয়েছেন। অন্যথায় সাধারণভাবে মধ্যম শ্রেণীরই কিছু লোকের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁরা চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে এবং জ্ঞানগত ও বাস্তব কর্মকাণ্ডে কোনরূপ নতুনত্ব কিংবা বিশেষত্বের অধিকারী ছিলেন না। স্রেফ জনা-কয়েক হাতে গোণা ব্যক্তিত্ব (যাঁদের

সংখ্যা ৭/৮ জনের বেশী হবে না) এই হিসাবের বাইরে।

বাহ্যত কথাটা খুবই মামুলী মনে হলেও এর ফলাফল কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। এটা ইসলামের অভ্যন্তরীণ শক্তি ও যোগ্যতা সম্পর্কে এক ধরনের খারাপ ও হতাশাব্যঞ্জক ধারণা। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম প্রতিটি যুগে প্রয়োজনীয় লোক এবং ইসলামী পুনর্জাগরণে যথার্থ ভূমিকা গ্রহণ করার মত উদ্যোগী পুরুষ সৃষ্টি করেছে যার তুলনা অন্য কোন ধর্মে কিংবা অপর কোন জাতির মধ্যে মেলে না। আসলে এটা এক ধরনের হীনমন্যতাবোধ ও পরাজিত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ, যার জ্ঞানগত কোন ভিত্তি নেই।

অবশ্য এর পেছনেও কারণ রয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, মুসলিম ইতিহাসের বিস্তৃত ভাণ্ডারে এ সম্পর্কিত এমন সব গ্রন্থেরই সন্ধান মেলে যেগুলোকে ঘটনাবলীর তালিকা-সূচী বলাই শ্রেয় এবং যেগুলোর কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছেন শুধুমাত্র রাজা-বাদশাহ অথবা কতিপয় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও মুসলমানদের ধারাবাহিক বুদ্ধিবৃত্তিক ও সংস্কারমূলক কর্ম-সাধনার এমন কোন ইতিহাস নেই যার ভেতর ঐসব ব্যক্তিত্বের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড তথা তাঁদের পরিচালিত আন্দোলনের পরিচিতি রয়েছে। ঐসব ব্যক্তিত্ব যাঁরা মুসলিম ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন, ইসলামকে সময়োচিত হেফাজত ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, ভুল প্রবণতার সংস্কার এবং অশান্তি ও বিপর্যয়ের উৎখাত করেছেন এবং ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক ও কার্যকর ভাণ্ডারে কোন না কোন উল্লেখযোগ্য অবদান বৃদ্ধি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের দা'ওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় কোন শূন্যতা নেই, শূন্যতা রয়েছে শুধু ইসলামের ইতিহাস রচনায় ও বিন্যস্তকরণের ক্ষেত্রে। এই শূন্যতা পূরণ যুগের একটি দাবি এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও ইসলামী খিদমতও বটে। এই দাবি পূরণের দ্বারা কেবল দা'ওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসই বিন্যস্ত হবে না বরং এ থেকে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানগত উত্থান-পতনের ইতিহাসও জন্ম নেবে। কিন্তু বিষয়টির ওপর যখন কলম ধরলাম তখনই বুঝতে পারলাম যে, এটি একটি কথিকা কিংবা নিবন্ধের বিষয় নয়; বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট কলেবরের গ্রন্থের বিষয়। আর এজন্যে আবার আমাকে ইতিহাস অধ্যয়ন করতে হবে এবং একে একটি বিশেষ মাপে বিন্যস্ত অথবা একটি বিশেষ আঙ্গিকে ও কাঠামোয় ঢেলে সাজাতে হবে। এজন্য সাধারণভাবে ইতিহাস

পাঠই যথেষ্ট নয়; বরং বিভিন্ন ধর্মমত, নানা জ্ঞান ও বিষয় শাস্ত্রের ইতিহাস অধ্যয়নের প্রয়োজন। বাস্তব সত্য এই যে, এই বিষয়টি যেরূপ প্রশান্তি, নিরাপত্তা ও অবকাশের দাবি জানায় তা এই অশান্ত ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনে মেলা খুবই দুষ্কর। তবুও বিষয়টি জরুরী বিধায় এই উপলব্ধিটুকুই আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করেছে।

এই বিষয়টিও সম্মানিত পাঠকবর্গের স্মরণে রাখতে হবে যে, এই পুস্তকে আমরা 'তাজদীদ' নামক পরিভাষা নিয়ে কোন আলোচনা করছি না কিংবা সে সব ব্যক্তি নিরূপণ করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয় যাঁরা মুজাদ্দিদ পদে আসীন হবার উপযুক্ত এবং যাঁদের একক সত্তা ধর্মীয় বিপ্লব সাধন করেছে এবং যাঁরা তাজদীদ-এর শর্তাদি পূরণ করেছেন। এখানে ইসলামের তেরশ বছরের ইতিহাসের 'ইসলাহ্' ও 'ইনকিলাব' তথা সংস্কার ও বিপ্লবায়ন প্রয়াসের ধারাবাহিকতা বর্ণনা এবং সে সব ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিত করা আমাদের উদ্দেশ্য, যাঁরা স্ব স্ব যুগে নিজ নিজ যোগ্যতা মুতাবিক দীন-এর পুনরুজ্জীবন ও পুনর্জাগরণ এবং ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাজতের কাজে অংশ নিয়েছেন এবং যাঁদের সমবেত প্রচেষ্টা দ্বারা ইসলাম জীবিত ও সংরক্ষিত আকারে এই মুহূর্তে বিদ্যমান এবং মুসলমানরা একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় (উম্মাহ্) হিসাবে পরিদৃশ্যমান। এই নিবন্ধে এমন কতিপয় ব্যক্তির আলোচনাও আসবে যাঁদেরকে স্বতন্ত্রভাবে যদিও মুজাদ্দিদ বলা যায় না, কিন্তু দীনের তাজদীদ ও পুনরুজ্জীবন এবং সংস্কার ও বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত-সারের মধ্যে তাঁদের হিস্যা অবশ্যই রয়েছে। মুসলিম জাতি তাঁদের উপকার ভুলতে পারে না।

এই গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে ঃ

১. কোন দা'ওয়াত কিংবা কোন ব্যক্তিত্বের অবস্থা ও লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য সাধারণত ঐ ব্যক্তির স্ব-রচিত গ্রন্থ, লিখিত নিবন্ধাদি এবং সংকলিত বাণীসমূহের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সফল না হতে পারলে অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে কোন শূন্যতা দেখা গেলে তাঁর বন্ধু-বান্ধব, ছাত্র ও সমসাময়িকদের লিখিত গ্রন্থের বর্ণনাসমূহ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে ভাষা ও যুগ নির্বিশেষে সকল মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানেই প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া গেছে, সেখান থেকেই তা গ্রহণ করা হয়েছে এবং হাওয়ালা দেওয়া হয়েছে।

২. ব্যক্তিত্বের জীবন-চরিত আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সে

যুগের চিন্তা-ভাবনা, জ্ঞানের মাত্রা ও কর্মক্ষেত্রের প্রশস্ততাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে করে ঐ সব ব্যক্তিত্বের সঠিক মর্যাদা ও সাফল্যের পরিমাপ সঠিকভাবে নিরূপিত হয় এবং সেই যুগ ও পরিবেশে তাঁদের সাফল্যের সম্ভাবনা কতটুকু ছিল তার পরিমাপ করে তাঁদেরকে ইতিহাসে যথাযথ মর্যাদা ও স্থান দেওয়া যায়। কোন ব্যক্তিত্বকে তাঁর পরিবেশ থেকে বের করে অন্য পরিবেশে নিয়ে এসে ভিন্ন যুগের পাল্লায় ও চাহিদায় মাপা, অতঃপর সেই মাপকাঠিতে তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরাকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে একটি সমালোচনামূলক কৃতিত্ব মনে করা হলেও জ্ঞানী ব্যক্তিরা এটাকে একটি বড় রকমের বেইনসাফী ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক বলেই মনে করেন। কারণ কোন মানুষকে তার যুগের প্রয়োজন ও চাহিদা এবং সে যুগের কর্মক্ষেত্রের সীমারেখার দিক দিয়েই কেবল সফল কিংবা অসফল বলা যেতে পারে। কেননা কোন ব্যক্তিত্বকেই, চাই তিনি ইসলামের ইতিহাস বা অন্য যে কোন ইতিহাসেরই অন্তর্ভুক্ত হোন, ভিন্ন যুগ ও পরিবেশের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ঐতিহাসিকের প্রবণতা ও ধ্যান-ধারণার মাপকাঠিতে ব্যর্থ প্রমাণ করাটাকে সত্যিকার বিচার বা ইনসাফ আখ্যা দেওয়া যায় না।

৩. কোন মুবাল্লিগ, গ্রন্থকার ও চিন্তাবিদের গ্রন্থ থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি। কেননা এ থেকে তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তাঁর জ্ঞানবত্তা ও মেধার পরীক্ষা সঠিকভাবে করা যায় না এবং পাঠক তাঁর সাহচর্যের স্বাদ ও সান্নিধ্য অনুভব করতে পারেন না। এই গ্রন্থে বিশিষ্ট মুবাল্লিগ, সংস্কারক, গ্রন্থকার এবং চিন্তাশীল ব্যক্তির লিখিত রচনা ও বক্তৃতামালার এত বিভিন্নমুখী ও বিস্তৃত উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে যে, পাঠক অনুভব করবেন, তাঁর কিছু সময় উল্লিখিত ব্যক্তিত্বের সাহচর্যেই কাটল এবং তাঁদের সংগে আলাপ বিনিময়ের মওকা মিলল। এজন্য স্বয়ং গ্রন্থকার তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ঐ সব মহান ব্যক্তির রচনা, ওয়া'জ-নসীহত এবং তাঁদের জ্ঞানগত ও চিন্তার প্রভাব বলয়ে ও পরিচয়ের পরিবেশে অতিবাহিত করেছেন এবং চেষ্টা করেছেন তাঁদের আলোচনা ও পরিচিতি পেশ করাকালে একটা নির্দিষ্ট সময় সেই পরিবেশে কাটাতে এবং সেই সব প্রভাব ও মানসিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে, যদ্দারা উক্ত মহাত্মাদের সমসাময়িক ও একই সংগে উপবেশনকারী বন্ধু-বান্ধব ও ভক্ত-অনুরক্তরা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। এরই ফলে পাঠক বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে গ্রন্থকারের

আন্তরিক টান পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারবেন। এই বিষয়টি যদি কোন সমলোচকের দৃষ্টিতে সমালোচনাযোগ্য এবং গ্রন্থকারের দুর্বলতা বলে বিবেচিত হয় তাহলে এই দুর্বলতা স্বীকার করে নিতে গ্রন্থকারের কোন দ্বিধা নেই এবং এজন্য তিনি কোন কৈফিয়ত প্রদানেরও প্রয়োজন বোধ করেন না।

৪. ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের স্রেফ 'ইলমী' কামালিয়াত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ এবং তাঁর রচিত গ্রন্থাদি থেকে উদ্ধৃতি পেশ করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি বরং তাঁর জীবনের আধ্যাত্মিক দিক, আল্লাহ্র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও উজ্জ্বলরূপে তুলে ধরা হয়েছে। কেননা এটা ইসলামী রেনেসাঁর প্রথম যুগের অগ্রপথিকদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য যে, নিজেদের 'ইলমী কামালিয়াত ও কর্মের মধ্যে নিবিষ্টতার সঙ্গে সঙ্গে 'ইবাদত-বন্দেগী ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের প্রতিও তাঁদের বিশেষ ঝোঁক থাকত। তাঁদের কামিয়াবী ও জনপ্রিয়তার পেছনে এরও একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এ সবের আলোচনা না করলে তাঁদের জীবনী আলোচনা অপূর্ণ থাকবে। উপরন্ত এই বিরাট গ্রন্থ এবং ইতিহাসের এরূপ বিস্তৃত ভাণ্ডার যাঁরা অধ্যয়ন করবেন তাঁদের এটা অধিকার এবং তাঁদের কষ্ট ও পরিশ্রমের এটা নীরব দাবি যে, তাঁরা এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তথ্যাদিই কেবল আহরণ করবেন না; বরং রূহ ও হৃদয়ের শ্যামলিমা এবং আমলের স্বাদও উপভোগ করবেন।

৫. কোন ব্যক্তিত্বের পরিচয় দানের ক্ষেত্রে কেবল তাঁর ফযীলত ও কামালিয়াত বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি; বরং যখন লক্ষ্য করা গেছে যে, ন্যায়পরায়ণ ও সংযত সমসাময়িক ব্যক্তিবৃন্দ এবং প্রজ্ঞাবান পরবর্তী পুরুষগণ তাঁর রচিত গ্রন্থাদি ও চিন্তা-ভাবনার ওপর সমালোচনা করেছেন, তখন সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। আর যদি তাঁর জওয়াব দেওয়া হয়ে থাকে এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিরোধ এসে থাকে তাহলে সেটিও পেশ করা হয়েছে, কিন্তু ইতিহাসকে সমালোচনামূলক প্রমাণ করার জন্য অনাবশ্যক সমালোচনার কোন অবকাশ রাখা হয়নি।

এটি এই সিরিজের প্রথম খণ্ড। প্রথমে ধারণা ছিল যে, খণ্ডটি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইব্ন্ তায়মিয়া (র)-এর ওপর সম্পূর্ণ হবে। এই প্রেক্ষিতে প্রথম খণ্ডে হিজরী ১ম শতাব্দী থেকে হিজরী ৮ম শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামী রেনেসাঁ ও সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসের রোয়েদাদ এসে যায়। কিন্তু ইব্ন তায়মিয়ার আলোচনা (তাঁর যুগের গুরুত্ব এবং তাঁর কর্মের বিস্তৃতির প্রেক্ষিতে) এত বেশী বিস্তৃত হয়ে

যায় যে, সেটাকেই এই গ্রন্থের স্থায়ী খণ্ডের রূপদান করতে হয় যা এই সিরিজের দ্বিতীয় খণ্ড হবে। গ্রন্থের তৃতীয় অংশটি (সম্ভবত চতুর্থ খণ্ডটিও) ভারতবর্ষের ইসলামী রেনেসাঁর ঐ সব অগ্রপথিকদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে যাঁরা গত শতাব্দীতে মুসলিম জাহানের সংস্কার ও রেনেসাঁ আন্দোলনের পতাকাবাহী এবং চিন্তা ও গবেষণার উৎস ছিলেন।

সবশেষে এ দীন গ্রন্থকার অসংকোচে স্বীকার করছে যে, এই গ্রন্থ রচনার জন্য যতটা সময়, যতখানি শান্ত ও নিরিবিলি পরিবেশ, বিস্তৃত ও গভীর অধ্যয়ন এবং বিস্তৃত ও সৃষ্টিশীল (متنوع) জ্ঞানের দরকার ছিল তা গ্রন্থকারের নেই। যা কিছু এই সময়ে এবং এরূপ অবস্থায় সম্ভব হয়েছে তা তাঁর বিব্রতকর অবস্থা, মানসিকতা ও জ্ঞানের দৈন্যের মুকাবিলায় কেবল আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থনেই হয়েছে। আর সাহায্যকারী তো একমাত্র আল্লাহ্ই।

৪ঠা রবীউ'ল-আউয়াল
১৩৭৪ হি.

আবুল হাসান আলী নদভী
দাইরা-ই শাহ্ 'আলামুল্লাহ
রায়বেরেলী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

"তারীখ-ই-দা'ওয়াত ও 'আযীমাত" (ইসলামী রেনেঁসার অগ্রপথিক), ১ম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করছি এবং তাঁর দরবারে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সুযোগ বেশ কয়েক বছর পর এল। এই বিলম্বের জন্য লিপিকরের অভাব, প্রকাশনার ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রতিকূলতা এবং গ্রন্থকারের বর্ধিত ব্যস্ততাই প্রধানত দায়ী। অন্যথায় এই গ্রন্থটি ভারতীয় উপমহাদেশের জ্ঞানী-গুণী ও ধর্মীয় মহলে যেভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, যেভাবে সুধী পণ্ডিতমণ্ডলী ও বিদগ্ধজনের ওপর এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে এবং প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর যে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে তাতে স্বাভাবিক দাবি অনুযায়ী এতদিনে এর কয়েকটি সংস্করণ বেরিয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি। কেননা উর্দূ গ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রে এখন যে সব অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় তা কোন গ্রন্থকারই কেবল উপলব্ধি করতে পারবেন। এ সব অসুবিধার কারণেই বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটেছে। এ জন্য গ্রন্থকার আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং সুধী পাঠকবৃন্দের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

এ গ্রন্থে নিবন্ধ, বিষয়বস্তু ও শিরোনামের দিক দিয়ে তেমন কোন বৃদ্ধি ঘটেনি। তবে যা হয়েছে তা খুবই মূল্যবান ও উল্লেখযোগ্য এবং এতে গ্রন্থের মূল্য ও উপকারিতা অবশ্যই বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে দু'টি বিষয় উল্লেখ করার মত। প্রথম বিষয়, "তাতারী ফিতনা ও ইসলামের নবতর পরীক্ষা" শিরোনামের অধীনে 'তাতারী হামলা ও এর কারণ' শীর্ষক একটি নিবন্ধ। এতে (গ্রন্থকারের জ্ঞান মুতাবিক) সে সময়কার মুসলিম বিশ্বের নৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অবস্থা প্রথমবারের মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং জগতের এই বিভীষিকা ও উন্মত্ত সয়লাবের অন্তর্নিহিত ও অদৃশ্য কার্যকারণ কুরআন মজীদের পেশকৃত পথ-নির্দেশনার উজ্জ্বল আলোকে এবং খোদায়ী কানুনের

রূপকের সাহায্যে খেলাখুলিভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এটা ছিল একটি প্রাথমিক প্রয়াস এবং ঈমানী চিন্তা ও চেতনার একটি নমুনা যাকে আরও সম্মুখে সতর্কীকরণ ও অগ্রসর করানো যেত, যদিও তা বর্তমান অবস্থায়ও অন্তর্দৃষ্টি, শিক্ষা ও উপদেশ থেকে মুক্ত নয়।

দ্বিতীয়ত, গ্রন্থের উপক্রমণিকায় 'অপরাপর ধর্মের ইতিহাসে সংস্কারকের স্বল্পতা' শিরোনামে খৃস্টবাদ ও হিন্দু ধর্মের সংস্কার ও পুনর্জাগরণের ব্যাপারে কিছু নতুন তথ্য যোগ করা হয়েছে। এই দু'টি পরিবর্ধন ভিন্ন এই সংস্করণে কেবল ১ম সংস্করণের ভুলক্রটিগুলোর ব্যাপক ও আংশিক সংশোধন করা হয়েছে।

মুনাজাত করি, আমার এই প্রচেষ্টা আল্লাহর দরবারে কবুল হোক এবং এই বিষয় বিন্যাসের পেছনে যে উদ্দেশ্য কাজ করেছে, যা আমি মুখবন্ধে উল্লেখ করেছি, তাও পূর্ণতা লাভ করুক।

৩রা সফর, ১৩৮৯
২১ এপ্রিল, ১৯৬৯ সোমবার

আবুল হাসান 'আলী নদভী
দাইরা-ই শাহ্ 'আলামুল্লাহ্
রায়বেরেলী

সূচী

-o-

সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস

(প্রথম খণ্ড)

ভূমিকা

রেনেসাঁ ও সংস্কার আন্দোলনের আবশ্যকতা এবং ইসলামের ইতিহাসে এর ধারাবাহিকতা

জীবন গতিময় ও পরিবর্তনশীল

ইসলাম আল্লাহ্ তা'আলার শেষ পয়গাম এবং তা সামগ্রিকভাবে ও পরিপূর্ণরূপে দুনিয়ায় এসেছে। ইসলাম সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلاَمَ دِيْنًا .

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসাবে মনোনীত করলাম।"

আল্লাহ্র দীন একদিকে যেমন পূর্ণাঙ্গ, অন্যদিকে এটাও বাস্তব সত্য যে, জীবন গতিময় ও পরিবর্তনশীল এবং এর যৌবন চিরনিত্য।

جاوداں پیہم دواں ، ہردم جواں ہے زندگی

"চিরন্তন, সদা ধাবমান, জীবন সর্বদাই যৌবন তরঙ্গে প্রবহমান।"

এই নিত্য প্রবহমান ও চিরযৌবনা জীবনের সঙ্গ দেবার এবং তাকে পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশেষ দীন পাঠিয়েছেন-- তার বুনিয়াদ যদিও "চিরন্তন 'আকীদা ও বাস্তব সত্যে"র ওপর, কিন্তু তথাপি তা জীবন রসে ভরপুর এবং গতিময়তা তার অস্থিমজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট। তার ভেতর আল্লাহ্ তা'আলা এই যোগ্যতাও প্রদান করেছেন, যেন সে সকল অবস্থায় দুনিয়াকে পথ দেখাতে পারে এবং প্রতিটি মনযিলে পরিবর্তনশীল মানবতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। সে বিশেষ কোন যুগের এমন কোন নির্মাণ-শাস্ত্র নয় যা সেই যুগের স্মৃতিচিহ্নের ভেতর সংরক্ষিত---বরং তা এমন একটি জীবন্ত দীন যা সর্বজ্ঞ, সর্বোত্তম ও ন্যায়-বিচারক শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্যের সর্বোত্তম নমুনা।

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ – الانعام : ١٢

"প্রবল পরাক্রমশালী জ্ঞানীর এটাই নির্ধারিত পরিমাপ।" – সূরা আন'আম ঃ ১২

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ – النمل : ٨٨

"সেই আল্লাহ্রই কারিগরি যিনি প্রতিটি বস্তুকে সুদৃঢ় করেছেন।"

– সূরা আন-নমল ঃ ৮৮

মুসলিম উম্মাহ্‌র যুগটি ছিল সর্বাধিক পরিবর্তনশীল

এই দীন যেহেতু শেষ ও বিশ্বজয়ী দীন এবং এই উম্মাহ্‌ যেহেতু শেষ ও বিশ্বজয়ী উম্মাহ্‌– সেজন্য এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষও বিভিন্ন যুগের সঙ্গে এই উম্মাহ্‌র সম্পর্ক থাকবে এবং তাকে এমন সব দ্বন্দ্ব ও সমস্যা-সঙ্কটের মুকাবিলা করতে হবে যা বিশ্বের ইতিহাসে অপর কোন জাতিকে করতে হয়নি। এই উম্মাহকে যে যুগ দেওয়া হয়েছে– সে যুগ সর্বাধিক পরিবর্তনশীল ও বিপ্লবপূর্ণ এবং তার অবস্থার মাঝে যতখানি নিত্য নতুন সৃষ্টিশীলতা রয়েছে (تنوع) তা অতীতের কোন যুগেই দৃষ্টিগোচর হয় না।

ইসলামের স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য গায়বী ব্যবস্থাপনা

পরিবেশের প্রভাবের মুকাবিলা ও স্থান-কালের পরিবর্তন থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার সুবিধার্থে আল্লাহ্‌ তা'আলা এই উম্মাহ্‌কে দু'টি বিশেষ দানে ভূষিত করেছেন। প্রথমত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এমন একটি পরিপূর্ণ ও জীবন্ত শিক্ষা দান করেছেন যা প্রতিটি দ্বন্দ্ব ও সঙ্কট এবং প্রতিটি পরিবর্তনকে অত্যন্ত সহজভাবে মুকাবিলা করতে পারে। তার ভেতর প্রতিটি যুগের সমস্যা সমাধানের পুরোপুরি যোগ্যতা বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, তিনি এও নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন যে, (এ যুগের ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেয়) তিনি এই জীবন্ত ধর্মকে রক্ষা বা উজ্জীবিত করতে প্রতিটি যুগে এমন সব জীবন্ত ব্যক্তিত্ব দান করবেন যাঁরা ঐসব রেখে যাওয়া শিক্ষামালাকে জীবনের মাঝে স্থানান্তর করতে থাকবেন এবং ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগতভাবে এই ধর্মকে জীবন্ত ও এই উম্মাহ্‌কে কর্মতৎপর রাখবেন। এই ধর্মে ব্যক্তি সৃষ্টি করার এই যে যোগ্যতা ও শক্তি– তা এর আগে অপর কোন ধর্মে পরিলক্ষিত হয়নি। এই উম্মাহ্‌ বিশ্ব-ইতিহাসে যেভাবে 'সন্তান-প্রসবিনী' প্রমাণিত হয়েছে, দুনিয়ার অন্য কোন উম্মাহ ও জাতিগোষ্ঠীর ভেতর তার নজীর মেলা ভার। এটা আকস্মিক কোন ব্যাপার নয়, বরং আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ অবদান যে, যে যুগে যেরূপ যোগ্যতা ও শক্তিসম্পন্ন লোকের দরকার ছিল এবং যে বিষের জন্য যে বিষহরের প্রয়োজন ছিল তা এ উম্মাহ্‌কে দান করা হয়েছে।

ইসলামের জীবনসত্তার ওপর হামলা

শুরু থেকেই ইসলামের জীবনসত্তা ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর এমন সব হামলা এসেছে যার ধকল সহ্য করা অন্য কোন মযহাবের পক্ষেই সম্ভব ছিল না।

পৃথিবীর অপরাপর ধর্ম, যে সব ধর্ম নিজ নিজ যুগে বিশ্ব জয় করেছিল– এর তুলনায় স্বল্পতর আঘাতও সহ্য করতে পারেনি এবং সে সব ধর্ম নিজের অস্তিত্বই আজ খুইয়ে বসেছে। কিন্তু ইসলাম তার সকল প্রতিপক্ষকেই পর্যুদস্ত করেছে এবং নিজ স্বরূপেই টিকে আছে। একদিকে বাতেনী ফেরকা ও তার শাখা-প্রশাখা ইসলামের মূল প্রাণসত্তা ও তার নেজামে 'আকীদার জন্য যেমন ছিল ভয়াবহ– তেমনি ভয়াবহ ছিল মুসলমানদের জড়ে-মূলে উৎখাত করবার জন্য ক্রুসেডারদের অভিযান ও তাতারীদের হামলা। দুনিয়ার অন্য কোন ধর্ম হলে এ পরিস্থিতিতে সে তার নিজস্ব সকল বৈশিষ্ট্যই খুইয়ে বসত এবং একটি কাহিনী হিসাবে ইতিহাসের পাতায় স্থান পেত। কিন্তু ইসলাম এসব অভ্যন্তরীণ ও বহিরাক্রমণ বরদাশত করেছে। সে কেবল তার নিজ অস্তিত্বই বজায় রাখেনি, বরং জীবনের ময়দানে নিত্য নতুন বিজয় লাভও করেছে। বিকৃতি ও মনগড়া ব্যাখ্যা, নতুন প্রথা-পদ্ধতির উদ্ভাবন, অনারবীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি, শিরকমূলক কর্মকাণ্ড ও প্রথা-পদ্ধতি, বস্তু-পূজা, আত্মপূজা, বিলাসপরায়ণতা, ইলহাদ ও ধর্মহীনতা, বুদ্ধিবৃত্তি পূজা প্রভৃতি ইসলামের ওপর বারবার হামলা করেছে, এমন কি কখনো কখনো মনে হয়েছে, আর বুঝি ইসলাম এইসব আক্রমণের মুখে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারল না, এই বুঝি সে আত্মসমর্পণ করে বসল! কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্‌র সচেতন বিবেক ও আত্মমর্যাদাবোধ আত্মসমর্পণের ধারে কাছে না গিয়েও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। ইসলামের প্রাণসত্তা কখনো বিলীন হয়ে যায়নি। প্রতিটি যুগেই এমন সব ব্যক্তির জন্ম হয়েছে যাঁরা সব রকমের বিকৃতি ও মনগড়া ব্যাখ্যার পর্দা উন্মোচন করেছেন এবং ইসলামের হাকীকত ও খালেস দীনকে উজ্জ্বলতর রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁরা বিদ'আত ও অনারবীয় প্রভাব-প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন, রসূল করীম (সা)-এর সুন্নাহ্ তথা বাস্তব জীবনাদর্শের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন ঘোষণা করেছেন, বাতিল ও ভ্রান্ত 'আকীদা-বিশ্বাস সাহসিকতার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন, শিরকমূলক কর্মকাণ্ড ও আচার-প্রথার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জিহাদ ঘোষণা করেছেন, বস্তুবাদ ও আত্মপূজার ওপর চরম আঘাত হেনেছেন, বিলাসপরায়ণতা ও স্বীয় যুগের 'মুতরাফীন' (مترفين)[১]-এর ভীষণ নিন্দাবাদ করেছেন, অত্যাচারী শাসকদের সামনে সত্যের কলেমাকে বুলন্দ করেছেন, বুদ্ধিবৃত্তির মায়াবী জাল ছিন্নভিন্ন করেছেন এবং ইসলামের ভেতর নতুন প্রাণশক্তি ও কর্মপ্রেরণা এবং নতুন ঈমান ও প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করেছেন। এ সমস্ত ব্যক্তি

১. গর্বিত ও উদ্ধত ধনী এবং প্রাচুর্যের অধিকারী বিত্ত-সম্পদের মালিকদের কুরআনের ভাষায় 'মুতরাফীন' বলা হয়। –অনুবাদক।

মেধা, জ্ঞান, চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে স্বীয় যুগের বিশিষ্টতম ব্যক্তি ছিলেন এবং শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। জাহিলিয়াত ও গোমরাহীর নিত্য নতুন অন্ধকারের জন্য তাঁদের নিকট কোন না কোন "শুভ্র সমুজ্জ্বল হাত" ছিল যদ্দ্বারা অন্ধকার অমানিশার ঘোর কালো পর্দা তাঁরা উন্মোচন করেছেন। ফলে সত্য প্রকাশ্য দিবালোকে উদ্ভাসিত হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলারই ইচ্ছা হ'ল এই দীনের হেফাজত করা এবং বিশ্ববাসীর পথ প্রদর্শনের সেই কাজ এই উম্মাহ্র মাধ্যমেই সম্পন্ন করা, যে কাজ তিনি অতীতে জীবন্ত নবুওয়াতের মাধ্যমে সম্পন্ন করতেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা অতীতে যে কাজ আম্বিয়ায়ে কিরামের দ্বারা নিতেন– এখন তা রসূল (সা)-এর প্রতিনিধিবর্গ এবং উম্মতের মুজাদ্দিদ ও সংস্কারকদের দ্বারাই নেবেন।

অন্যান্য ধর্মে মুজাদ্দিদ-এর স্বল্পতা

বিশ্বের অন্যান্য ধর্মে এমন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয় যাঁরা ঐসব ধর্মে নতুন প্রাণস্পন্দন এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যে নতুন জীবন সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁদের ইতিহাসে শত সহস্র বছরের এমনও শূন্যতা দৃষ্টিগোচর হয় যেখানে উক্ত ধর্মের এমন কোন সংস্কারকের আবির্ভাব হয়নি যিনি উক্ত ধর্মকে বিকৃতি ও বিদ'আতের (নবাবিষ্কৃত প্রথা-পদ্ধতির) বেড়াজাল থেকে মুক্ত করবেন, তার হাকীকত তথা বাস্তবতাকে প্রকাশ্যে তুলে ধরবেন, প্রকৃত দীন ও ঈমানী হাকীকতের দিকে পূর্ণ শক্তিতে দা'ওয়াত দেবেন, রসম ও রেওয়াজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করবেন, বস্তুবাদ ও আত্মপূজার বিরুদ্ধে জিহাদ করবার জন্য কোমর বেঁধে ময়দানে অবতরণ করবেন এবং স্বীয় য়াকীন, সত্য-সুন্দর আধ্যাত্মিকতা ও সীমাহীন কুরবানী দ্বারা উক্ত ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে নতুন প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করবেন।

এর সর্বাপেক্ষা বড় উদাহরণ হ'ল খৃস্ট ধর্ম। খৃস্ট ধর্ম স্বীয় যুগের সূচনায় অর্থাৎ খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধেই এমন বিকৃতির শিকার হ'ল যার নজীর সে যুগের কোন ধর্মের ইতিহাসে মেলে না। খৃস্ট ধর্ম পরিষ্কার ও নির্ভেজাল একটি তওহীদী ধর্ম থেকে এমন একটি মুশরিক ও পৌত্তলিকতাবাদী ধর্মে রূপান্তরিত হয় যাকে বর্তমানে গ্রীক-দর্শন ও বৌদ্ধ চিন্তাধারার সংমিশ্রণ বলাই ভাল। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হ'ল, এসব কিছু হয়েছে খৃস্ট ধর্মের সর্বাপেক্ষা বড় অনুসারী ও প্রচারক সেন্ট পল (১০-৬৫ 'ঈসায়ী)-এর হাতে। আর প্রকৃতপক্ষে এ পরিবর্তন ছিল এক আত্মা থেকে অপর আত্মায়, এক কাঠামো থেকে অপর কাঠামোয়, এক বিধি-ব্যবস্থা

থেকে অপর বিধি-ব্যবস্থার দিকে এমন একটি উল্লম্ফনের সমার্থক যার ভেতর প্রথম কাঠামো থেকে স্রেফ নাম এবং কতক প্রথা-পদ্ধতির সমন্বিত রূপই অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল। একজন খৃস্টান মনীষী (Eruset De Bunsen) এই বিপ্লব ও পরিবর্তনের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন :

> যে ধর্ম-বিশ্বাস ও বিধি-ব্যবস্থার বর্ণনা আমরা বাইবেলে পাই– তার দা'ওয়াত হযরত মসীহ ('আ) কখনোই তাঁর বাণী ও কর্মের দ্বারা দেননি। এই মুহূর্তে খৃস্টান, য়াহূদী ও মুসলমানদের মধ্যে যে মনোমালিন্য বিদ্যমান, এর যিম্মাদার হযরত 'ঈসা (আ) নন, বরং এজন্য খৃস্টান বেদীন পলই দায়ী। এসব কিছুই পবিত্র গ্রন্থের বিকৃতি ও কাঠামোগত পরিবর্তন-পরিবর্ধনের পন্থায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং পবিত্র গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী ও উপমা-উৎপ্রেক্ষা দ্বারা পূর্ণ করারই ফল। পল ঈসানীয় (Essenio) ধর্মের প্রচারক স্টিফেন (Stephen)-এর অন্ধ আনুগত্য করতে গিয়ে হযরত মসীহ ('আ)-এর ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের অনেক রসম-রেওয়াজ জুড়ে দেন। আজ ইঞ্জিলে যে পরস্পরবিরোধী গল্প-কাহিনী ও বিবিধ ঘটনা পরিদৃষ্ট হয় এবং যা হযরত 'ঈসা (আ)-কে তাঁর প্রকৃত মর্যাদা থেকে অনেক খাটো করে দেখিয়ে থাকে– তা সবই উক্ত পল-এরই সৃষ্টি। হযরত মসীহ (আ) নন, বরং পল ও তার পরবর্তীতে আগত পাদরী ও ধর্মযাজকগণ সেই সব ধর্ম-বিশ্বাস ও বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন যাকে গোড়া খৃস্টান জগত অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে নিজেদের ধর্ম-বিশ্বাসের বুনিয়াদ হিসাবে অভিহিত করে আসছে।[১]

খৃস্ট ধর্ম দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী যাবত এবং অদ্যাবধিও পলের এই উত্তরাধিকারত্বকে বুকে উঠিয়ে রেখেছে এবং এই সময়পর্বে খৃস্টান জগতে এমন কোন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেনি– যিনি খৃস্ট ধর্মকে বাইরের এই সব ধার করা ও অবাস্তব বিধি-বিধান থেকে মুক্ত করবেন এবং সেই বিন্দুর দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রয়াস চালাবেন যেই বিন্দুর ওপর হযরত মসীহ ('আ) এবং তাঁর একনিষ্ঠ খলীফা ও ভক্ত অনুসারীরা অবস্থান নিয়েছিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেল, অথচ এমন কোন ব্যক্তির আগমন ঘটল না যিনি খৃস্ট ধর্মের সেই সব নতুন ও বর্ধিত অংশকে মূল অংশ থেকে পৃথক করতে পারেন। শেষাবধি খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে জার্মানীতে মার্টিন লুথার (M. Luther)-এর জন্ম হল। তিনি কতক খুঁটিনাটি সমস্যার ক্ষেত্রে কিছুটা সীমিত ধরনের সংস্কার সাধন করেন। এটা এমন কিছু মূল্যবান ও ব্যাপক সংস্কার ছিল না কিংবা খৃস্ট ধর্মের ভুল গতি ও তার

---

1. Islam or true Christianity—— p. 128.

বিপথগামিতার বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহও ছিল না অর্থাৎ খৃস্ট ধর্মের প্রায় পনেরটি শতাব্দী বিপ্লবাত্মক বুনিয়াদী ও সকল ধর্ম-সংস্কারের আন্দোলন থেকে মুক্ত থাকল এবং এই সময়ে কোন সৎ প্রচেষ্টাই পুরোপুরি কার্যকর ও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হল না। খৃস্টান মনীষিগণও এ কথা স্বীকার করেছেন যে, এই দীর্ঘ সময়ে খৃস্টান জগতে যেমন কোন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়নি– তেমনি এমন কোন আন্দোলনেরও বিকাশ ঘটেনি যা খৃস্ট ধর্মের সংস্কার কিংবা পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার নিবন্ধকার Mr. J. Bass Mullinger লিখেছেনঃ

> আমরা যদি এর কারণ অনুসন্ধান করি যে, ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে ধর্ম সংস্কার (Reformation)-এর প্রয়াসে কেন আংশিক সাফল্যও অর্জিত হয়নি– তাহলে কোনরূপ কষ্ট-কল্পনা ছাড়াই বলে দেওয়া যায় যে, এর সর্বাপেক্ষা বড় কারণ হ'ল, মধ্যযুগে মেধা অতীতের দৃষ্টান্তের গোলামী থেকে মুক্ত হতে পারেনি।[১]

অন্যত্র বলেন ঃ

> চার্চ-সংস্কারের কোন সামগ্রিক প্রস্তাব কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের ধারাবাহিক প্রয়াসের ব্যর্থতা য়ূরোপীয় ইতিহাসের একটি বাস্তব ঘটনা।[২]

তিনি আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বলেন ঃ

> ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে ধর্ম-সংস্কারের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রকমের প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এর সবগুলোই কোনরূপ বাছবিচার ব্যতিরেকে গির্জার নিন্দা ও অভিশাপের শিকারে পরিণত হয়।[৩]

এরপর এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্ম হয়নি যিনি গির্জার কাল্পনিক ও মনগড়া মতবাদ ও ধ্যান-ধারণা এবং তাদের জোর-যবরদস্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারেন অথবা কমপক্ষে এতটুকু করতে পারেন, যতটুকু লুথার (তাঁর সীমিত কর্মক্ষেত্র ও দুর্বলতা সত্ত্বেও) করেছিলেন।

মোটকথা, এভাবে খৃস্ট ধর্ম তার মনোনীত পথ ধরেই ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে, বরং সঠিকভাবে বলতে গেলে, সেই পথ ধরেই চলতে থাকে যা তার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে গির্জার প্রভাব হ্রাস পায় এবং পরবর্তীকালে তার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। য়ূরোপে বস্তুবাদের রাজত্ব কায়েম হয় এবং তা ধর্মের স্থান দখল করে। পাশ্চাত্যের সকল ধর্মকেই বস্তুবাদ তার পশ্চাতে ঠেলে দেয়। খৃস্ট ধর্মে এমন কোন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেনি, যিনি

1. Enc. Britannica, Ed. ix. vol. xx. P. 320. 2. G, 321 kO.Ç ;3. G, 321 kO.Ç

এই বস্তুবাদের ধ্বংসকর শক্তিকে রুখে ধর্মকে তার প্রকৃত স্থানে ফিরিয়ে আনতে পারেন অথবা খৃস্টানদের ভেতর স্বধর্মে আস্থা পুনর্বহাল করে তাদের মধ্যে সেই রূহানী ও আখলাকী তথা আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক শক্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হন, যা তাদেরকে বস্তুবাদের এই ভীষণ চপেটাঘাত এবং ঈমানী উৎসাহ-উদ্দীপনার সামনে দৃঢ়পদ রাখতে পারে, তাদেরকে এমন একটি জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য করতে পারে যা জ্ঞান, নৈতিক চরিত্র ও বিশুদ্ধ খৃস্টীয় 'আকীদার ওপর স্থিতিশীল এবং যেখানে নতুন যুগের প্রশ্নাদি ও আধুনিক কালের সমস্যা-সংকটের সমাধান তারই আলোকে সম্ভব। কিন্তু তা না হয়ে হল এই যে, খৃস্টান চিন্তাবিদ ও মনীষীবৃন্দ খৃস্ট ধর্মের ভবিষ্যত সম্পর্কে নিজেরাই হতাশ হয়ে পড়লেন এবং ধর্মহীন বস্তুবাদের মুকাবিলায় তাদের ভেতর হীনমন্যতা এসে ভর করল।

এই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটে প্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্মের বেলায়ও। হিন্দু ধর্মও তার আসল রাস্তা থেকে সরে যায়। সে তার অনাড়ম্বরতা ও সহজ-সারল্য এবং বিশ্ব-স্রষ্টার সঙ্গে সরাসরি রূহানী সম্পর্ক একেবারে খুইয়ে বসে। নৈতিক শক্তিও সে হারিয়ে ফেলে এবং অত্যধিক জটিলতা ও ঘোর-প্যাঁচের কারণে কেবল একটি সূক্ষ্ম ও অবাস্তব দর্শনে পরিণত হয়। ক্রমান্বয়ে তা নির্ভেজাল তওহীদ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে সাম্য– এই দু'টো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হাতছাড়া করে ফেলে। এ দু'টোই হচ্ছে সেই গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ যার ওপর যে ধর্ম কায়েম হবে তার শেকড় হবে মাটির গভীরে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত এবং ডালপালা ও শাখা-প্রশাখা হবে উন্মুক্ত আকাশে বিস্তৃত।

উপনিষদের লেখকগণ বহু আয়াস স্বীকার করেছেন এই গণ্ডগোলের প্রতিবিধানে। অনন্তর তারা সেসব রসম-রেওয়াজ প্রত্যাখ্যান করেন যা হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলেছিল এবং সে স্থলে এমন একটি দার্শনিকতামণ্ডিত ও চিন্তাপ্রসূত ব্যবস্থা পেশ করেন যা বহুত্বের মধ্যেও একত্বের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই নতুন চিত্র হিন্দু ধর্মের পণ্ডিত মহলে গৃহীত হয়। কেননা তাঁদের প্রবণতা তো প্রথম থেকেই ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজূদ 'হামাউস্ত'-এর দিকে ছিল। কিন্তু জনসাধারণ, যাদের চিন্তাশক্তি অত উচ্চমার্গের ছিল না এবং যারা কার্যকর পন্থা ও বাস্তব শিক্ষার অভিলাষী ছিল, তা কবুল করেনি। এভাবে হিন্দু ধর্ম ক্রমান্বয়ে তার শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হারাতে থাকে এবং তাতে আস্থাহীনতা ও অনিশ্চয়তা দিন দিন বাড়তে থাকে। হিন্দু সমাজের এই অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বুদ্ধের ব্যক্তিত্বে প্রতিবিধানের পথ খোঁজে। এটা খৃস্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর ঘটনা।

বুদ্ধ একটি নবতর চিন্তা, একটি নতুনতর ধর্ম [যদি এ ক্ষেত্রে 'ধর্ম' শব্দটির প্রয়োগ যথার্থ হয়] পেশ করেন যা ঘর-সংসার ত্যাগ, আত্মার শুচি-শুভ্রতা, প্রবৃত্তির মুকাবিলা তথা ষড় রিপু দমন, দয়া-দাক্ষিণ্য ও মহানুভবতা, সেবা-কর্ম ও প্রথা-পদ্ধতি, আচার-অভ্যাস এবং শ্রেণী-সংঘাত ও শ্রেণী বৈষম্য প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলে এই ধর্ম [১] খুবই দ্রুততার সঙ্গে বিস্তার লাভ করে এবং এশিয়ার দক্ষিণ ও পূর্বাংশে এর একচ্ছত্র প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু কিছুকাল পরেই এই বিরাট ধর্মীয় আন্দোলনও স্বকীয়তা হারিয়ে বিকৃতির শিকারে পরিণত হয়। মূর্তিপূজা ও অন্যান্য রীতি-নীতি ও প্রথা-পদ্ধতি– যেগুলোর বিরুদ্ধে এই ধর্ম বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছিল– তারই প্রতি অনুগত হতে শুরু করে, এমন কি শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মও শির্ক ও মূর্তিপূজার সেই ধর্মে পরিণত হয় যা তার পূর্ববর্তী হিন্দু ধর্ম থেকে বিভিন্ন প্রকার মূর্তি ও তার সংখ্যা ব্যতীত অপর কোন ক্ষেত্রে ভিন্নতর ও উত্তম ছিল না। এর নৈতিকতারও অবনতি ঘটে এবং চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পায়। নতুন নতুন ফেরকা ও ধর্মীয় গ্রুপের সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক ঈশ্বর টোপা তাঁর "হিন্দুস্তানী তমদ্দুন" (ভারতীয় সংস্কৃতি) নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

> বৌদ্ধ ধর্মের ছত্রছায়ায় এমন রাজত্ব কায়েম হয় যার ভেতর অবতারের ছড়াছড়ি এবং মূর্তি পূজার অবাধ কর্তৃত্ব বিদ্যমান। সংঘসমূহের পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে তার ভেতর ধর্মের নামে নিত্য নতুন প্রথা-পদ্ধতি ও নবাবিষ্কৃত বস্তু একের পর এক দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।[২]

পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরু তাঁর "Discovery of India" নামক গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃতি ও ক্রমাবনতির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

> ব্রাহ্মণ্যবাদ বুদ্ধকে অবতার বানিয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মও তাই করে। সংঘ খুবই সম্পদশালী হয়ে ওঠে এবং একটি বিশেষ দলের স্বার্থ সিদ্ধির আখড়ায় পরিণত হয়। সংঘের ভেতর নিয়ম-শৃঙ্খলার কোন বালাই ছিল না। উপাসনা পদ্ধতির ভেতর যাদু ও নানারূপ কল্পনার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং সহস্র বছর এসব নিয়ম মাফিক চালু থাকার পর বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি শুরু হয়। এই যুগে তার যে রোগজীর্ণ অবস্থা ছিল Mrs. Rhys Dayis তার উল্লেখ করেছেন এভাবে ঃ

১. বৌদ্ধ মতের উল্লেখ করতে গিয়ে 'ধর্ম' শব্দের ব্যবহারে আমার আপত্তির কারণ হ'ল এই যে, এতে স্রষ্টার অস্তিত্ব, প্রারম্ভ ও প্রত্যাবর্তন'ল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন 'আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায় না। অধিকাংশ লেখক ও ঐতিহাসিকেরও একই মত। ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার 'বুদ্ধ' নিবন্ধ দেখুন।

২. হিন্দুস্তানী তমদ্দুন (উর্দু), ঈশ্বর টোপাকৃত।

এইসব রোগক্লিষ্ট ধ্যান-ধারণার গভীর ছায়াতলে এসে গৌতমের (বুদ্ধের) নৈতিক শিক্ষা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যায়। একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নেয় এবং তা ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। একের স্থান দখল করে অন্য এবং প্রতিটি পদক্ষেপে নব-সৃষ্টির খেলা চলতে থাকে। আর এই প্রতারণাপূর্ণ নিত্য নব-সৃষ্টির দ্বারা অন্ধকার ঘনীভূত হয় এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তকের সাদা-সিধা ও উন্নত নৈতিক শিক্ষা মনগড়া চাকচিক্যপূর্ণ বাক্যজালের নিচে চাপা পড়ে যায়।[১]

সামগ্রিক দিক দিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যবাদ– এই উভয়ের মধ্যেই ভেজালের সৃষ্টি হয় এবং উভয়ের ভেতর অধিকাংশ ইতর ও তুচ্ছ (مبتذل) প্রথা-পদ্ধতির অনুপ্রবেশ ঘটে। শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। বিস্তৃত বৌদ্ধ জগতে এবং তাঁদের সুদীর্ঘ শাসনামলে এমন কোন সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটেনি যিনি প্রকৃত বৌদ্ধ-মতের দিকে মানব জাতিকে আহ্বান জানাবেন এবং পূর্ণ শক্তিতে এই নবসৃষ্ট বিকৃত ধর্মের মুকাবিলা করে মূল ধর্মের অতীত যৌবন, সারল্য, অনাড়ম্বরতা ও শুচি-শুভ্রতা পুনরায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন।[২]

মোটকথা, বৌদ্ধমত শেষ পর্যন্ত প্রাচীন হিন্দু ধর্মের সাথেও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেনি, এমন কি খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য[৩] বৌদ্ধ মতের বিরোধিতা এবং প্রাচীন হিন্দু ধর্মের প্রচার ও প্রসারব্যপদেশে পতাকা উত্তোলন করেন এবং শেষাবধি বৌদ্ধমতকে ভারতের মাটি থেকে উৎখাত করে ছাড়েন। বড় জোর বলা যেতে পারে যে, বৌদ্ধমত ভারতবর্ষের অনেক ধর্মের ভেতর একটি প্রাচীন ক্রমাবনতিশীল ও সীমিত ধর্মের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকে। শঙ্করাচার্য তাঁর নিজস্ব মেধা, ধর্মীয় প্রেরণা ও কর্ম প্রচেষ্টা দ্বারা বৌদ্ধমতকে ভারতের চৌহদ্দী থেকে মোটামুটি বহিষ্কৃত করতে সক্ষম হন। অবশ্য তিনি প্রাচীন হিন্দু ধর্মকে তার আদি ও অকৃত্রিম রূপে ফিরিয়ে আনতে আদৌ সফলকাম হননি (সম্ভবত তিনি এ ধরনের কোন ইচ্ছাও পোষণ করেননি), সফলকাম হননি এতে তওহীদের 'আকীদা, মহান বিশ্ব-স্রষ্টার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন, আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাহ্র মধ্যবর্তী সকল মাধ্যমকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং সামাজিক ন্যায়-বিচার ও শ্রেণী-সাম্যের প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করতে। অনন্তর অদ্যাবধি এ দু'টি

---

১. তালাশ-ই-হিন্দ (Discovery of India), ২০১, ২০৩ পৃ.।
২. তালাশ-ই হিন্দ (Discovery of India), ২০১, ২০৩ পৃ.।
৩. শঙ্করাচার্য অষ্টম শতাব্দীর শেষ অর্ধের একজন ধর্ম-সংস্কারক। ৩২ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

ভারতীয় ধর্ম নিজেদের পরিবর্তিত কাঠামোর ওপরেই টিকে আছে এবং পতন যুগের উত্তরাধিকার, প্রথা-পদ্ধতি ও আচার-আচরণ এবং মূর্তিগুলোকে নিজেদের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে রেখেছে। Encyclopaedia of Religion and Ethics-এর নিবন্ধকার এলফিস্টন কলেজ, বোম্বাই-এর সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক V. S. Ghate– যিনি ভারতের প্রাচীন ধর্ম ও দর্শনের ওপর গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী– শংকরাচার্যের উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ

তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় ও মহৎ উদ্দেশ্য ছিল সেই ধর্ম ও দর্শনকে জীবিত করা, উপনিষদে যার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। তিনি কেবল ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজূদের 'আকীদাকে চালু করেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল এই প্রমাণ করা যে, উপনিষদ ও শ্রীমদ্ভগবত-গীতার মধ্যে কোন বিধিবদ্ধ আইন-কানুন পেশ করা হয়নি, বরং পরিপূর্ণ ওয়াহ'দাতু'ল-ওজূদ-এর শিক্ষাই পেশ করা হয়েছে। শঙ্করাচার্য মূর্তিপূজার যেমন বিরোধিতা করেননি, তেমনি একে আক্রমণও করেননি। তাঁর নিকট মূর্তি একটি রূপক বা ইঙ্গিতে স্রষ্টার প্রকাশ। শঙ্করাচার্য আনুষ্ঠানিক (Ritualism) আচার-আচরণের নিন্দা করেন, কিন্তু সাধারণ্যে প্রিয় দেবদেবীর পূজা অর্চনার পক্ষে ওকালতিও করেন। তাঁর মতে লালন-পালন ও বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে মূর্তিপূজা আমাদের প্রকৃতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যখন ধর্মীয় আত্মা (রূহ') পাকাপোক্ত ও সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয় তখন মূর্তিপূজার প্রয়োজন আর থাকে না। আর শুধু তখনই প্রতীক ও রূপক বা রহস্যপূর্ণ ইশারা-ইঙ্গিত (رموز) পরিত্যাগ করা উচিত যখন ধর্মীয় আত্মা পাকাপোক্ত ও সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়। শঙ্করাচার্য প্রতীক হিসাবে সে সব লোকের জন্য মূর্তিপূজার অনুমতি দেন যারা এমন ব্রাহ্মণের মর্যাদায় উপনীত হতে পারেনি যিনি যাবতীয় দোষ-গুণের ঊর্ধ্বে।[১]

যা হোক, সে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় যা শংকরাচার্য থেকে দয়ানন্দ সরস্বতী ও গান্ধীজি পর্যন্ত চলেছে এবং যেগুলোর উদ্দেশ্য ছিল এই ধর্মকে সেই সঠিক ও বিশুদ্ধ বুনিয়াদের ওপর পুনরুজ্জীবিত করা যা নবীদের দা'ওয়াত, মানুষের সুস্থ প্রকৃতি ও পরিবর্তনশীল যুগ– সব কিছুর সঙ্গেই সামঞ্জস্যশীল হবে। উল্লিখিত দু'টো ধর্মই শেষ পর্যন্ত বস্তুবাদ ও ধর্মহীনতার সম্মুখে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে একেবারে আত্মসমর্পণ করে বসে এবং জীবন থেকে নিজকে সরিয়ে নিয়ে উপাসনা গৃহ ও তীর্থকেন্দ্রে আশ্রয় নেয় এবং আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথা-পদ্ধতি এবং বাহ্যিক রূপ-কাঠামোর মধ্যে বন্দী হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে এমন কোন শক্তিশালী

১. তালাশ-ই-হিন্দ (Discovery of India) ৷২০১, ২০৩ পৃ.।

দা'ওয়াত নেই যার ধ্বনি ও ঘোষণা হবে এই, "পুনরায় ধর্মের পথে ফিরে এস"-এর বিপরীতে, বরং ঐ সব আন্দোলন খুবই সক্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে যার ধ্বনি ও মূলনীতি হ'ল, "নিজেদের পুরনো সভ্যতাকে বাঁচিয়ে তোল এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ও ঐতিহাসিক ভাষা সংস্কৃতকে পুনরায় চালু কর"।

ধর্মের জন্য জীবিত ব্যক্তির প্রয়োজন

প্রকৃতপক্ষে কোন ধর্মই সে পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে না, নিজের বৈশিষ্ট্য বেশি দিন ধরে রাখতে পারে না, পরিবর্তনশীল জীবনের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মাঝে মাঝে তার মধ্যে এমন সব ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে যাঁরা নিজেদের অসাধারণ বিশ্বাস, আধ্যাত্মিকতা, নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ ও উন্নত মানের মেধা ও আত্মিক যোগ্যতা দ্বারা তার অসাড় দেহে নবতর জীবনের সৃষ্টি করবেন, তার অনুসারীদের মাঝে নতুন আস্থা ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করবেন। জীবনের চাহিদা নিত্য নতুন এবং বস্তুবাদের বৃক্ষ বসন্তের সবুজ সমারোহে পল্লবিত। প্রবৃত্তি পূজার আন্দোলন ও প্রবৃত্তি পূজাভিত্তিক ধর্মের জন্য বস্তুতপক্ষে কোন রেনেসাঁর প্রয়োজন নেই। কেননা এর প্রেরণা ও উৎসাহদাতা বস্তুসমূহ পদে পদে বিদ্যমান। কবির ভাষায় ঃ

اگر چه پیر هے مؤمن جوان هیں لات ومنات

"যদিও ঈমানদার বৃদ্ধ- লাত ও মানাত কিন্তু যুবক।"

অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম একটি নতুন জীবন ও নতুন শক্তির সঙ্গে ময়দানে অবতরণ না করবে এবং মাঝে মাঝে এর সংস্কার না হতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবন্ত বস্তুবাদের মুকাবিলায় তার বেঁচে থাকাটা প্রায় অসম্ভব।

প্রতিটি নতুন ফিত্না ও বিপদের জন্য নতুন ব্যক্তিত্ব ও শক্তি

এই বাস্তবতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, ইসলামের এই দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল ইতিহাসে স্বল্প থেকে স্বল্পতম সময় পর্বও এমন পাওয়া যায় না- যেখানে ইসলামের প্রকৃত দা'ওয়াতের কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, ইসলামের প্রকৃত সত্য (হাকীকত) একেবারে অন্তরালে হারিয়ে গেছে, মুসলিম জাতির বিবেক একেবারে অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়েছে কিংবা সমগ্র মুসলিম জাহান অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা যে, যখনই ইসলামের সামনে কোন নতুন ফিত্না এসেছে, ইসলামকে বিকৃত ও কদাকার করার চেষ্টা করা হয়েছে কিংবা বস্তুবাদের কোন শক্ত হামলা এসেছে- তখনই এমন কোন শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব

অবশ্যই ময়দানে এসে গেছেন, যিনি পূর্ণ শক্তিতে সেই ফিত্‌নার মুকাবিলা করেছেন এবং তাকে ময়দান থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করেছেন। বহু দা'ওয়াত ও বিপ্লবী আন্দোলন এমনও আছে যেগুলো স্বীয় যুগে খুবই শক্তিশালী ছিল, কিন্তু আজ তার অস্তিত্ব কেবল কিতাবের পাতায় রয়েছে, এমন কি তার হাকীকত অনুধাবন করাও আজ মুশকিল। কাদরিয়া, জাহমিয়া, মু'তাযিলা মতবাদ, খাল্‌ক'-ই কু'রআন, ওয়াহ্'দাতু'ল-ওয়াজুদ ও আকবরের দীন-ই-ইলাহীর হাকীকত ও বিস্তারিত তথ্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল লোকের সংখ্যা আজ কতই বা হবে, অথচ স্ব স্ব যুগে এসব মতবাদ বিরাট গুরুত্বপূর্ণ 'আকীদা ও ধর্ম হিসাবে খ্যাত ছিল। এগুলোর ভেতর কতকগুলোর পৃষ্ঠপোষক তো বিরাট বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর এবং বিরাট মেধাসম্পন্ন, প্রতিভাধর ও সুযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইসলামের হাকীকত সে সব 'আকীদা ও ধর্মের ওপর বিজয়ী হয় এবং কিছুদিন পর সে সব জীবন্ত আন্দোলন ও সরকারী ধর্ম শুধু জ্ঞানগর্ভ আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয় এবং কেবল 'ইল্‌ম-ই-কালাম ও আকাইদশাস্ত্রের ইতিহাস গ্রন্থের পাতায় আশ্রয় নেয়। দীনের হেফাজতে এই চেষ্টা-সাধনা, রেনেসাঁ ও বিপ্লবী প্রয়াস এবং দা'ওয়াত ও সংস্কার-সংশোধনের এই ধারাবাহিকতা ততটাই প্রাচীন যতটা প্রাচীন ইসলামের ইতিহাস এবং ততটাই সূত্র- পরম্পরা যতটা সূত্র–পরম্পরা মুসলিম জীবন।

ইতিহাসের লুপ্তপ্রায় উৎস

এই গুরু দায়িত্ব কেবল ঐতিহাসিকের ওপর অর্পিত নয়, বরং এর যিম্মাদার সেই সব লোকও যাঁরা ইতিহাসের পারিভাষিক ও সরকারী মর্যাদা ভিন্ন আর কোন মর্যাদা মেনে নিতে প্রস্তুত নন এবং তারা এমন কোন পুস্তককেও নির্ভরযোগ্য মনে করেন না, যা কোন কুতবখানায় ইতিহাসের আলমারীতে স্থান পায়নি কিংবা ইতিহাসশাস্ত্রের আওতায় লিপিবদ্ধ হয়নি, অথচ এ ধরনেরই বহু গ্রন্থ নিজের মধ্যে ইতিহাসের বহু মূল্যবান সম্পদ ও গুরুত্বপূর্ণ উৎস ধরে রেখেছে। এগুলো সেই সব সাহিত্য ও ধর্মীয় গ্রন্থ যার ভেতর মুসলিম উম্মাহ্‌র স্বনামখ্যাত দাঈ ও সংস্কারকগণ নিজেদের অন্তরে অনুভূতি ও মন-মানসের পর্দা উন্মোচন করেছেন এবং নিজেদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। এগুলো সেই সব গ্রন্থ যার মধ্যে সংস্কারকদের শাগরিদ ও মুরীদবর্গ আপন আপন উস্তাদ ও শায়খগণের নসীহত, বাণীসমষ্টি ও হাকীকত ও মা'রিফত লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তাঁদের প্রভাবমণ্ডিত ও বরকতপূর্ণ মজলিসের রোয়েদাদ পেশ করেছেন। এসব

চিঠিপত্র ও ওয়াজ-নসীহতের সংকলন দ্বারা ঐ সমস্ত ব্যক্তির ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা ও আবেগ-অনুভূতির সঠিক পরিমাপ করা যায়। ঐ সব গ্রন্থে সামাজিক খতিয়ানের ওপর সমালোচনা এবং বিদ'আত ও গর্হিত কাজ-কর্ম রদ ও বাতিলের বিবরণী রয়েছে। আমাদের অধ্যয়ন যদি নির্ধারিত সীমা থেকে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ঐসব গুরুত্বপূর্ণ ও লুপ্ত ঐতিহাসিক উৎস পর্যন্ত প্রসারিত হয় এবং কোন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচক ও সাহসী বিজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিত এই বিষয়ের ওপর কায়মনে কাজ করেন তাহলে একটি সুসমন্বিত, সুসংবদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ রেনেসাঁ আন্দোলনের ইতিহাস অনায়াসে উদ্ধার করা যাবে। তখন আমাদের পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হবে যে, ইসলামী রেনেসাঁ ও পুনর্জাগরণের অস্তিত্ব এই মুসলিম উম্মার প্রতিটি যুগে এবং প্রতিটি পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ্র এই অবদান থেকে তারা কখনো মাহরূম বা বঞ্চিত থাকেনি।

ইসলামের উত্তরাধিকার

এই উত্তরাধিকার (মীরাছ) যা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে (এবং আমরা যার উত্তরাধিকারী) সেই অর্থে উত্তরাধিকার নয় যে অর্থে পাশ্চাত্যের লোকেরা বুঝেছে। এটা এজন্য যে, ইসলাম একটি জীবন্ত ও চিরন্তন জীবনবিধান (দীন)। আমরা উত্তরাধিকার বলতে সেই দৌলত ও মূল্যবান সম্পদ বুঝে থাকি যা আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে বংশ ও সূত্রপরম্পরায় আমাদের দিকে হস্তান্তরিত হয়ে চলে এসেছে। আর তা হ'ল বদ্ধমূল জ্ঞান, সংরক্ষিত ও সুদৃঢ় 'আকীদা, শক্তিশালী ঈমান, সুন্নত (আদর্শ), উন্নত ও মহান চরিত্র, ফিক'হ ও শরীয়ত এবং শানদার ইসলামী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। এই উত্তরাধিকারে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিরই পরিপূর্ণ অংশ রয়েছে, যিনি ইসলামের কোন একটি যুগে মিনহাজু'ন-নবুওয়াতের ওপর খিলাফত কায়েম করেছেন, জাহিলিয়াত ও বস্তুবাদের মুকাবিলা করেছেন, আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানিয়েছেন, ইসলামের যে বৈশিষ্ট্যসমূহ মিটে গিয়েছিল সেগুলোকে উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বল করেছেন, উম্মাহ্র মধ্যে ঈমানী রূহ সৃষ্টি করেছেন। এই অবিনশ্বর সম্পদে এমন প্রত্যেক লোকেরই অংশ রয়েছে যিনি এই দীনের ওপর তার উৎস ও টীকা ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরযোগ্যতার দিকটি নতুনভাবে ঢেলে সাজিয়েছেন, নবোদ্ভূত ও নতুনভাবে অবতীর্ণ দর্শনকে বাতিল করে ইসলামের প্রকৃত চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটিয়েছেন এবং এই উম্মাহ্কে কোন না কোন নবতর ফিতনার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবার হাত থেকে বিরত রেখেছেন। যিনি এই উম্মতের জন্য তার ধর্ম (দীন) এবং ধর্মের মূল উৎসসমূহের হেফাজত করেছেন, হাদীছ ও

ফিক'হশাস্ত্র নতুন করে সম্পাদনের দায়িত্ব আনজাম দিয়েছেন, ইজতিহাদের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন, উম্মাহ্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অফুরন্ত ভাণ্ডার এবং জীবন ও সামাজিকতার সুশৃঙ্খল বিধান দান করেছেন, সমাজে হিসাব-নিকাশ ও খতিয়ানের ফরয আদায় করেছেন, এর থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ও অবহেলাকে পরিষ্কারভাবে সমালোচনা করেছেন– সঠিক, বিশুদ্ধ ও প্রকৃত ইসলামের দিকে খোলাখুলি ও প্রকাশ্য দা'ওয়াত দিয়েছেন, যিনি সন্দেহ ও সংশয়ের যুগে এবং অস্বস্তিকর ও বিব্রত 'আকীদার যমানায় জ্ঞানগত যুক্তি ও প্রমাণ-পদ্ধতি অবলম্বন করত মস্তিষ্ককে তৃপ্ত করতে কোশেশ করেছেন এবং একটি নতুন 'ইলম-ই-কালাম (কালামশাস্ত্র)-এর ভিত্তি স্থাপন করেছেন, যিনি দা'ওয়াত ও যি'ক্র-আয'কার, ভীতি প্রদর্শন ও সুসংবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে আম্বিয়া-ই-কিরাম ('আ)-এর প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং ঈমানের চাপাপড়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে উত্তাপ ও গতিশীলতা দান করেছেন, যিনি বস্তু-পূজার চঞ্চল ও বেগবান গতিধারার সামনে খাড়া হয়ে তার গতিবেগকে কমিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্র মাখলূককে সেই ধারায় ভেসে যাবার কিংবা চাপা পড়ার হাত থেকে মাহ্ফুজ রেখেছেন, যিনি এই উম্মতের রাজনৈতিক শক্তির হিফাজত করেছেন এবং তাঁকে উপর্যুপরি বহিরাক্রমণ সইবার শক্তি দান করেছেন, যিনি বিজ্ঞ ও পাণ্ডিত্যসুলভ দা'ওয়াত ও স্বীয় মুহব্বতের জালে আবদ্ধ হয়ে সেই শত্রুকেও শিকার করেছেন, যার তলোয়ারের শক্তি ও খঞ্জরের অগ্রভাগ অবনমিত ও পর্যুদস্ত হয়নি, যিনি স্বীয় শক্তিশালী ঈমান ও রূহ'নী কূওয়তের দ্বারা এমন দুশমনকেও ইসলামের আওতায় টেনে এনেছেন এবং মুহাম্মদ (সা)-এর গোলামীতে নিয়োজিত করে তার জীবনকে ধন্য করেছেন যে তার শক্তিশালী সাহিত্য ও হৃদয়স্পর্শী অলঙ্কারপূর্ণ কাব্য-প্রতিভা দ্বারা অন্যের মস্তিষ্ককে আবিষ্ট ও বন্দী করতে সক্ষম হয়েছিল এবং যে ইসলামের জ্ঞানপূর্ণ ও বিজ্ঞ আলাপচারিতা ও ধর্মীয় দর্শন দ্বারা তৃপ্ত হবার ছিল না। এটি একটি ধারাবাহিক কার্যক্রম এবং এতে প্রতিটি ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ হিস্যা ও মরতবা রয়েছে। ইতিহাস আসলে আমানতের দায়িত্ব পালন এবং প্রকৃত সত্যকে স্বীকার করারই নাম। এর মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই ইসলামের কোন না কোন সীমান্তের মুহাফিজ (রক্ষক) ছিলেন। যদি তাঁরা ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের সাধনা ও কোশেশ অব্যাহত না রাখতেন যাকে আমরা ইতিহাসের দূরবীন দ্বারা দেখার প্রয়াস পাচ্ছি তাহলে আমাদের কাছে ঐ সব বিরাট সংকলন-ভাণ্ডার পৌঁছুতে পারত না– যার ভেতর আমাদের জন্য ইজ্জত, শিক্ষা ও দেশের প্রচুর উপকরণ ও সরঞ্জাম মওজুদ রয়েছে এবং যার কারণে আমরা বিশ্বের তাবৎ জাতিগোষ্ঠীর সামনে সগর্বে

মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি। এই পথ ও এই চিহ্নিত রেখা অবলম্বনে (যা গ্রন্থকারের নিকট ন্যায় ও সুবিচারসম্মত পথ) সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে সেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের চিত্র পেশ করার কোশেশ করা হবে যাঁরা ইসলামের রেনেসাঁ এবং সংস্কার ও সংশোধনের ক্ষেত্রে কোন-না-কোন উল্লেখযোগ্য খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

وبيد الله التوفيق

প্রথম অধ্যায়

হিজরীর প্রথম শতাব্দীর সংস্কার প্রয়াস এবং হযরত ওমর ইবনে 'আবদুল আযীয (র)

উমায়্যা যুগে জাহিলী প্রবণতা ও প্রভাব

খিলাফতে রাশেদার অবসান এবং বনী উমায়্যাদের রাজত্ব সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন ও সুসংহতকরণ (যা ইসলামী শাসনের পরিবর্তে 'আরবীয় শাসন বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত) রেনেসাঁ ও বিপ্লবের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে দেয়। প্রাচীন জাহিলী প্রবণতা– যা আঁ-হযরত (সা)-এর সাহচর্য ও প্রশিক্ষণ এবং খিলাফতে রাশেদার প্রভাবে চুপসে গিয়েছিল, অর্ধ ও নামমাত্র প্রশিক্ষিত মুসলমান এবং নতুন 'আরবীয় বংশধরদের মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। হুকুমতের মেরুদণ্ড কুরআন ও সুন্নাহ্র স্থান আরবীয় রাজনীতি ও 'রাষ্ট্রীয় সুবিধাবাদ' দখল করে নেয়। পারস্পরিক গর্ব ও অহমিকা এবং 'আরবীয় আভিজাত্য ও স্বাজাত্যবোধের কলঙ্ক, যা ইসলাম দূরে নিক্ষেপ করেছিল এবং যা আরবের মরুভূমিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, পুনরায় লোকালয়ে ফিরে আসে। গোত্রীয় অহমিকা, খান্দানী পক্ষপাতিত্ব, আত্মীয় তোষণ তথা স্বজন-প্রীতি– যা খিলাফতে রাশেদার আমলে ভীষণ দূষণীয় ও অন্যায় কর্ম বলে গণ্য হত– পুনরায় প্রশংসনীয় গুণে পরিণত হয়। 'আমল ও আখলাকের সক্রিয় শক্তিসমূহ (পুরস্কার ও সওয়াবের পরিবর্তে) জাহিলী নাম–ধাম, প্রশংসা ও স্তুতি এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের রূপ নেয়।[১] বায়তুল-

---

১. এই পর্যায়ে জাহিলী যুগের খ্যাতি ও সম্মান লাভের প্রতিযোগিতামূলক মনোবৃত্তি পুনরায় সজাগ ও জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই মানসিকতার পরিমাপ নিম্নোক্ত চিত্তাকর্ষক ঘটনা থেকে হতে পারে, যা আবুল ফারাজ ইস্পাহানী তাঁর "আগানী" নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। উমায়্যা যুগের হাওশাব ও 'ইকরিমা নামক দু'জন আরব সর্দারের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত প্রতিযোগিতা চলে আসছিল– কার ঘরে অধিক খাবার তৈরি হয় এবং মেহমান বেশি আসে– এই নিয়ে। এই ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় হাওশাবের পাল্লা ভারী হ'ত। বেশ কিছুকাল পর 'ইকরিমা তার প্রতিপক্ষকে পরাজিত ও হেয় করবার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করে। সে এক শ' ঝুড়ি আটা খরিদ করে নিজ গোত্রের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। নির্দেশ ছিল, পানি সহযোগে এই আটাকে আঠালো ময়দায় পরিণত করতে হবে এবং উক্ত ময়দা দিয়ে একটি বিরাট গর্ত ভর্তি করে ওপর থেকে ঘাস দিয়ে তা ঢেকে দিতে হবে। অতঃপর হাওশাবের ঘোড়া যাতে করে এই গর্তে পড়ে– সে ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়। শেষ পর্যন্ত হাওশাবের ঘোড়া ময়দার গর্তে গিয়ে পড়ে এবং সারা দেহে ময়দা লেগে গিয়ে এক কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধারণ করে। অতঃপর চতুর্দিকে রটে যায় যে, 'ইকরিমার এখানে এত বিরাট পরিমাণ আটা প্রস্তুত হয় যে, তাতে একটি আস্ত ঘোড়া নিক্ষিপ্ত হয়েছে। লোকজন কৌতূহলী হয়ে 'ইকরিমার বাড়িতে জমায়েত হয়ে দেখতে পায় যে, ঘোড়ার মাথা ও গর্দান কেবল বাইরে এবং বাকী সারা শরীর ময়দার মধ্যে ডুবে রয়েছে। রশি ও বলির সাহায্যে খুব কষ্ট করে ঘোড়াটিকে টেনে তোলা হয়। সাধারণভাবে এই ঘটনা খুবই খ্যাতি লাভ করে। এর ওপর কবিরা কাব্য-গাথাও তৈরি করে। এভাবে 'ইকরিমা তার প্রতিপক্ষের ওপর জয় লাভ করে এবং স্বীয় প্রাধান্যের স্বীকৃতি আদায় করে ছাড়ে। –(রান্নাতু'ছ'-ছ'ালিছ', ১ম খণ্ড, ১৩৯-৪০ পৃ)।

মাল (যা মুসলমানদের প্রতিটি পয়সা পাই পাই করে জমা করে গঠিত) খলীফার ব্যক্তিগত মালিকানা ও খান্দানী জায়গীরদারীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। পেশাদার কবি, চাটুকার সভাষদ, সম্ভ্রমখোর ও মোসাহেবদের একটি শ্রেণী সৃষ্টি হয়ে যায় যাদের ওপর মুসলমানদের ধন-সম্পদ বেদেরেগ ব্যয়িত হতে থাকে। এদের অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হ'তে থাকে।[১] গান শোনবার আগ্রহ এবং সঙ্গীতের প্রতি গভীর আত্মমগ্নতা সীমা ছাড়িয়ে যায়।[২] হুকুমতের ভুল পদক্ষেপ ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং হুকুমতের সদস্যদের ধর্মহীন জীবনধারা গোটা ইসলামী সমাজকে কলুষিত করতে থাকে এবং প্রাচুর্যের অধিকারী বিত্তবানদের (মুতরাফীন) একটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয় যাদের আচার-আচরণ (আখলাক)-এর সাথে প্রাচীন বুর্জোয়াদের আচার-আচরণের অদ্ভুত মিল ছিল। দেখে শুনে মনে হচ্ছিল যেন আহত জাহিলিয়াত স্বীয় বিজয়ী প্রতিপক্ষের নিকট থেকে প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে দৃঢ় সংকল্প হয়েছে এবং চল্লিশ বছরের প্রতিশোধ যেন সে এক বছরেই নিতে চায়।

উমায়্যা যুগের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের চারিত্রিক প্রভাব

বনী উমায়্যার এ বস্তুগত ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সত্ত্বেও সে যুগ পর্যন্ত ধর্মের মর্যাদা ও তার চারিত্রিক প্রভাব কিছুটা অন্তত মুসলিম জীবনে বাকি ছিল। ধর্মের এই মর্যাদা ও চারিত্রিক প্রভাব সেই সব ব্যক্তির বদৌলতে ছিল যাঁরা ধর্মীয় ও জ্ঞানগত অবস্থানের কারণে উন্নত স্থান অধিকার করেছিলেন এবং নিজেদের লিল্লাহিয়াত, ইখলাস, বিশুদ্ধচিত্ততা, 'ইল্‌ম ও ধর্মীয় বোধশক্তিতে মশহূর ছিলেন। হুকুমত ও ক্ষমতার মসনদের বাইরেও এসব মনীষীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার আসন বিস্তৃত ছিল। এঁদেরই প্রভাবে মুসলমানরা অনেক খারাবী ও গোমরাহী থেকে নিরাপদ ছিল এবং বস্তুবাদের সয়লাবে একেবারে ভেসে যাবার হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছিল। এই সব ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে

---

১. উমায়্যা যুগের মশহূর খৃস্টান কবি আখতাল (মৃত্যু ৯৫ হি.) খলীফা 'আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের মজলিসে এমন শান-শওকতের সঙ্গে আগমন করত যে, তার গলায় থাকত স্বর্ণ-নির্মিত ক্রস এবং শ্মশ্রু থেকে শরাবের ফোঁটা টপকে পড়ত। তাকে বাধা দেবার সাহস কারো ছিল না। —(আগানী, ৭ম খণ্ড, ১৭৮ পৃ.);

২. এর অনুমান আপনি এই ঘটনা থেকেও করতে পারবেন যে, একবার ইরাকের প্রখ্যাত গায়ক হুনায়ন তার স্ব-পেশার লোকদের দ্বারা আহূত হয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় এসেছিল। একটি ঘরে তার গানের জলসা বসে এবং তাতে শ্রোতাদের এত ভীড় হয় যে, ঘরটির ছাদ ধসে যায় এবং চাপা পড়ে স্বয়ং হুনায়নেরও মৃত্যু ঘটে। —আগানী, ২য় খণ্ড।

সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন হযরত 'আলী ইবনু'ল-হুসায়ন (রা)। তিনি 'ইবাদত ও তাক'ওয়া, যুহ্দ ও পরহেযগারীর ক্ষেত্রে ছিলেন অতুলনীয়। মুসলমানদের সাথে তাঁর কি ধরনের সম্পর্ক ছিল তা নিম্নের একটি ঘটনা থেকেই আঁচ করা যাবে।

একবার যুবরাজ (পরবর্তীকালে উমায়্যা খলীফা) হিশাম ইবনে 'আবদুল মালিক কা'বা শরীফ তাওয়াফের জন্য আগমন করেন। প্রচণ্ড ভীড়ের কারণে তিনি হজরে আসওয়াদ (পবিত্র প্রস্তরখণ্ড) পর্যন্ত পৌঁছুতে ব্যর্থ হন এবং ভীড়ের চাপ হ্রাস না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন যাতে তা চুম্বন করতে সক্ষম হন। এরই মধ্যে হযরত 'আলী ইবনু'ল-হুসায়ন (রা) আগমন করেন। তিনি বেশ সহজভাবেই তাওয়াফ ও হজরে আসওয়াদ চুম্বন শেষ করেন। তিনি যেদিক দিয়েই যাচ্ছিলেন–লোকজন শ্রদ্ধাবশত তাঁর পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াচ্ছিল। হিশাম অপরিচিতের ভান করে জিজ্ঞাসা করেন : লোকটি কে? উমায়্যা যুগের মশহূর কবি ফারাযদাক অবলীলায় কবিতার মাধ্যমে তাঁর সেই অনীহামূলক প্রশ্নের জবাব দেন এবং ইবনু'ল-হুসায়নের যথাযোগ্য পরিচিতি প্রদান করেন।[১]

এভাবেই আহ্লে বায়ত-এর অন্যান্য বুযুর্গ হযরত হাসান আল-মুছান্না, তৎপুত্র হযরত 'আবদুল্লাহ্ আল-মাহ্দ এবং তাবি'ঈগণের মধ্যে বুযুর্গ শ্রেষ্ঠ হযরত সালেম ইব্নে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওমর (রা), হযরত সা'ঈদ ইবনু'ল-মুসায়্যিব, হযরত ওরওয়া ইবনু'য-যুবায়র (রা)[২] প্রমুখ মুসলমানের ধর্মীয় আদর্শের বাস্তব নমুনাস্বরূপ ছিলেন। তাঁরা নিজেদের সত্তা সম্বন্ধে আত্মসচেতনতা, হুকূমতের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা, সত্য কথন, নির্ভীকতা, জ্ঞানমগ্নতা ও স্বার্থলেশহীনভাবে দীনের খেদমত দ্বারা নিজেদের চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের ছবি জনমনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হুকুমতের ব্যাপক প্রভাবের মুকাবিলায় এই চারিত্রিক প্রভাব যদিও যথেষ্ট ছিল না, কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তা একেবারে মূল্যহীন ও নিষ্ফলও ছিল না। এর দ্বারা মুসলমানদের জীবনে মোটামুটিভাবে সংযম, মিতাচার, ভারসাম্য ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগরূক ছিল এবং কখনো কখনো তাদের পার্থিব মগ্নতার মধ্যেও সংস্কারের আবেগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠত।

---

১. এই কবিতাংশটি আরবী সাহিত্যে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে যার প্রথম লাইনটি হচ্ছে هذا الذى تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرفه والحل والحرم। সমালোচকদের ধারণা পরবর্তীকালে কবিতাটিতে আরও পরিবর্ধন করা হয়েছে।

২. বিস্তারিত অবস্থা ও অনুবাদের জন্য দ্র. যাহাবীর তাযকিরাতু'ল-হুফ্ফাজ, ইব্নে জওযীর সাফওয়াতু'স-সাফওয়া ও তারীখ ইব্ন খাল্লিকান।

বিপ্লবী হুকুমতের প্রয়োজনীয়তা : তার বিপদরাজি

ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রভাবসমূহ বিস্তৃত ও গভীরতর হতে থাকে। ঐসব ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেও, যাঁরা ইসলামের আসল গুণাবলী ও নৈতিক চরিত্রের মুহাফিজ ও ইসলামের প্রথম তথা স্বর্ণযুগের স্মৃতিচহ্নস্বরূপ ছিলেন, দারুণ ঘাটতি পরিলক্ষিত হতে থাকে। তখন হুকুমতের প্রভাবাধীন এলাকাও বিস্তৃত ও সুদৃঢ় হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় নৈতিক, চারিত্রিক ও দীনী ইনকিলাব সংগঠন ও পরিচালনা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

উমায়্যা হুকুমত এমন একটি শক্ত ফৌজী বুনিয়াদের ওপর কায়েম ছিল যে, সেটাকে সহজে হেলানো ছিল প্রায় অসম্ভব। সে সময় কোন অভ্যন্তরীণ বা বহিঃশক্তি এমন ছিল না যা তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করতে পারে। নিকট অতীতের দু'টি বড় রকমের চেষ্টা- সাধনা– একটি সায়্যিদুনা হযরত হুসায়ন (রা)-এর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, অপরটি হযরত 'আবদল্লাহ্ ইবনু'য-যুবায়র (রা)-এর সাহসিকতাপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত মুকাবিলা ইতোমধ্যেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল এবং শীঘ্রই আর কোন সামরিক বিপ্লবের আশঙ্কা ছিল না। ব্যক্তিনির্ভর ও মৌরুসী হুকুমত সংস্কার-সংশোধন ও পরিবর্তনের সকল দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছিল। এমনও মনে হচ্ছিল যে, শতাব্দীকালের জন্য মুসলমানদের ভাগ্য বুঝি মোহরাংকিত হয়ে গেছে! সে সময় ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হওয়ার এবং অবস্থা বদলে দেবার জন্য একটি মু'জিযারই প্রয়োজন ছিল এবং সেই মু'জিযার আত্মপ্রকাশও ঘটেছিল।

হযরত ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র) খলীফা পদে অধিষ্ঠিত

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র) ছিলেন উমায়্যা বংশের প্রতিষ্ঠাতা মারওয়ান-এর পৌত্র এবং তাঁর মা (উম্মে 'আসিম) ছিলেন হযরত ফারূক-ই-আ'জম (রা)-এর পৌত্রী। ফারূকী ও উমায়্যা বংশের এই সংযোগ[১]

১. বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রা) ঘোষণা দিয়েছিলেন যেন দুধে পানি মেশানো না হয়। একদা রাত্রিবেলা টহল দেবার সময় হযরত ওমর (রা) শুনতে পান, জনৈক মহিলা তার মেয়েকে সম্বোধন করে বলছে, বেটী! ভোর হয়ে যাচ্ছে, দুধে পানি মিশিয়ে দাও। মেয়েটি তখন জবাব দিচ্ছে, মা! আপনি জানেন না, আমীরু'ল-মু'মিনীন দুধে পানি মেশাতে নিষেধ করেছেন? মহিলা বলল, এই সময় আমীরু'ল-মু'মিনীন কোথায়? তিনি কি করে জানবেন? বালিকা জওয়াব দেয়, আমীরু'ল-মু'মিনীন না জানলেও আল্লাহ তো দেখছেন। হযরত ওমর (রা) ঘরটা চিনে নিয়ে ফিরে এসে পুত্র 'আসিমকে বলেন, তুমি এই বালিকাকে বিয়ের পয়গাম পাঠাও। আমি আশা করছি, এর পেটে এমন সন্তানের জন্ম হবে, যে গোটা আরবের ওপর হুকুমত করবে। 'আসিম মেয়েটিকে বিয়ে করেন। ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র) এঁদেরই দৌহিত্র (সীরতে ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয, ১৭-১৮ পৃ.)।

স্থাপিত হয়েছিল সম্ভবত এজন্য যে, উমায়্যা বংশে এমন একজন খলীফা-ই-রাশেদ-এর জন্ম হোক যিনি অবস্থার বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনতে পারবেন।

ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র) ৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন খলীফা সুলায়মান ইব্ন 'আবদুল মালিক-এর চাচাতো ভাই ছিলেন এবং তাঁর পূর্ববর্তী খলীফা ওয়ালীদ ইব্ন 'আবদুল মালিক ও সুলায়মান-এর যমানায় মদীনা মুনাওয়ারার শাসনকর্তা (গভর্নর) ছিলেন। তাঁর যৌবন ও গভর্নর থাকাকালীন জীবনের সঙ্গে পরবর্তী জীবনের কোনই মিল নেই। যৌবনে তিনি ছিলেন গভীর রুচিসম্পন্ন আমীরানা মেযাজের ধোপদুরস্ত এক সৌখিন যুবক। তিনি যে রাস্তা অতিক্রম করতেন অনেকক্ষণ পর্যন্ত তা সুগন্ধে মোহিত থাকত। পরিবেশই বলে দিত যে, এ পথ দিয়ে ওমর গেছেন। তাঁর চাল-চলন ছিল মশহুর এবং যুবকদের জন্য ঈর্ষণীয়। শান্ত-স্বভাব, সত্যপ্রিয় (হক পছন্দীয়) এবং প্রকৃতিগতভাবে নেক মেযাজ হওয়া ছাড়া তিনি এমন কোন গুণের অধিকারী ছিলেন না– যদ্দারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ভবিষ্যতে ইসলামের কোন গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আনজাম দিতে যাচ্ছেন।

কিন্তু তাঁর জীবনের আপাদমস্তকই ছিল যেন ইসলামের জন্য একটি মু'জিযা! তিনি যেভাবে খিলাফতের আসনে সমাসীন হন সেটাও আল্লাহ্‌রই কুদরতের একটি নিশানী ছিল। মৌরুসী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় তাঁর খিলাফত লাভের কোনই সুযোগ ছিল না। যদি সকল অবস্থা স্বাভাবিক গতিতে চলতে থাকত তাহলে বড়জোর তিনি কোন একটি অঞ্চলের শাসনকর্তা হতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ! সুলায়মান ইব্ন 'আবদুল মালিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর ছেলেরা ছিল ছোট্ট শিশু। তিনি তাদেরকে লম্বা লম্বা ঝলমলে শাহী পোশাক পরতে দেন এবং কটি দেশে হাতিয়ারও বেঁধে দেন যাতে করে তাদেরকে একটু বড়সড় দেখায়। এতদসত্ত্বেও তারা তাঁর চোখে পড়বার মত হয়নি। তখন তিনি অত্যন্ত আফসোসের সঙ্গে তাদের থেকে দৃষ্টি ফেরান এবং বলেন : সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান যার সন্তান-সন্ততি বড় হয়ে গেছে। রাজা' ইবন হায়াত– যিনি এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, হযরত ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করার ব্যাপারে খলীফাকে পরামর্শ দেন এবং খলীফা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেন! রাজা'র 'এই কৃতিত্বপূর্ণ অবদান ছিল (যা একটি ধর্মীয় ইনকিলাব সৃষ্টির মাধ্যম হয়েছিল) বড় বড় মুজাহাদা ও শত শত বর্ষব্যাপী 'ইবাদত-বন্দেগীর চাইতেও অধিক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ।

খিলাফত লাভের পরবর্তী জীবন

ওমর ইব্‌ন 'আবদুল আযীয (র) হুকুমতের লাগাম হাতে নেওয়ার সাথে সাথে এতটুকু দেরী না করে সেই সব আমলাকে প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন যারা ছিল শক্ত রকমের জালেম এবং যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র কোন ভয় ছিল না। সিংহাসনে আরোহণকালে তাঁর সামনে শাহী জাঁক-জমক ও আড়ম্বরপূর্ণ যে সব মূল্যবান উপকরণ উপঢৌকন হিসাবে পেশ করা হয়েছিল, তিনি অবিলম্বে সেগুলো বায়তুল মালে পাঠিয়ে দেন। সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁর আচার-আচরণ ও জীবনধারা একদম পাল্টে যায়। মনে হচ্ছিল, তিনি খলীফা সুলায়মানের স্থলাভিষিক্ত নন, বরং আমীরু'ল-মু'মিনীন হযরত ওমর ইবনু'ল-খাত্তাব (রা)-এর স্থলাভিষিক্ত। গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে তিনি রাজপ্রাসাদের দাসী-বাঁদীদের তাদের নিজ নিজ খান্দান ও শহরগুলোতে পাঠিয়ে দেন। তিনি স্বীয় মজলিসকে যা ইরানের শাহানশাহ ও রোম সম্রাটের দরবারের রূপ নিয়েছিল, খিলাফতে রাশেদার নমুনা মাফিক সাদাসিধা ও সুন্নাহ্ মুতাবিক ঢেলে সাজান। তিনি তাঁর জায়গীরসমূহ মুসলমানদের ফিরিয়ে দেন, এমন কি স্ত্রীর গহনাপত্রও বায়তুলমালে জমা দিয়ে দেন। তিনি এরূপ যুহ্‌দসুলভ জীবন ইখ্‌তিয়ার করেন যার নজীর বাদশাহদের মধ্যে তো দূরের কথা, ফকীর-দরবেশদের মধ্যেও মেলা ভার। তিনি তাঁর পোশাক-আশাকের সংখ্যা এমনভাবে কমিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর একটি মাত্র কুর্তা ছিল এবং সেটি শুকানোর অপেক্ষায় থাকায় জুম'আর জামা'আতে শরীক হতে তাঁর কখনো কখনো বিলম্ব হত। বনূ উমায়্যা, যারা গোটা মুসলিম সাম্রাজ্যকে নিজেদের জায়গীর এবং বায়তুল-মালকে নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি বলে মনে করত, এখন তা থেকে শুধু মাপা-জোখা অংশ পেতে থাকে। তাঁর নিজের ঘরের অবস্থাও ছিল এই যে, একবার তিনি তাঁর শিশু-সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হতে গিয়ে দেখতে পান, যে বাচ্চাই তাঁর সঙ্গে কথা বলছে– সেই তার মুখের ওপর হাত চাপা দিচ্ছে। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে, আজ তারা সবাই কেবল ডাল ও পেঁয়াজ খেয়েছে। তিনি অশ্রু ভারাক্রান্ত চোখে বলেন, "তোমরা কি চাও যে, তোমরা রকমারি খানা খাও আর তোমাদের পিতা জাহান্নামে যাক।" এ কথা শোনার পর তারাও কেঁদে ফেলে।[১] এটা সেই সময়কার কথা যখন তিনি ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। তাঁর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তির পরিমাণ এই দাঁড়িয়েছিল যে, হজ্জ করবার প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তা সমাধা করবার মত প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহের সঙ্গতি তাঁর ছিল না। খাস

১. সীরাতে ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র), মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল হাকামকৃত, ৫৫ পৃ.।

নওকরকে (যে ছিল তাঁর আন্তরিক বন্ধু) জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার নিকট কিছু আছে কি? সে বলল ঃ দশ-বার দীনারের মত আছে। তিনি বললেন ঃ এতে কিভাবে হজ্জ সমাধা হতে পারে? অতঃপর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদের একটি বিরাট পরিমাণ তাঁর হাতে এসে পৌঁছে। তখন খাদেম খলীফাকে মুবারকবাদ জানিয়ে বলে, হজ্জের সামান তো এসে গেছে। খলীফা বললেন, "আমরা এই বিত্ত-সম্পদ থেকে বহুদিন পর্যন্ত উপকার লাভ করেছি। এখন এটা সাধারণ মুসলমানদের হক।" এই বলে তিনি ঐ সম্পদ বায়তুল-মালে জমা দিয়ে দেন।

খলীফা ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীযের দৈনিক খোরাকি খরচ দুই দিরহামের বেশি ছিল না। সতর্কতার অবস্থা এমন ছিল যে, যদি সরকারী বাতি জ্বলত এবং সে অবস্থায় কেউ তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতে থাকত অথবা কোন ব্যক্তিগত কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে যেত, তিনি তৎক্ষণাৎ বাতি নিভিয়ে দিতেন এবং আলোর জন্য ব্যক্তিগত বাতি চেয়ে আনতেন।

গোসলের সময় বায়তুল-মালের বাবুর্চিখানার গরম পানি ব্যবহার করা থেকে তিনি বিরত থাকতেন, এমন কি বায়তুল-মালের মেশ্‌ক-এর ঘ্রাণ নেওয়াও তিনি পছন্দ করতেন না।[১]

তাঁর সতর্কতা কেবল তাঁর নিজের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তিনি তাঁর হুকুমতের আমলাদেরকেও সব ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের শিক্ষা দিতেন। মদীনার শাসনকর্তা আবূ বকর ইব্ন হয্‌ম সুলায়মান ইব্ন 'আবদুল মালিকের কাছে দরখাস্ত পাঠিয়েছিল যেন পূর্ব নিয়ম মাফিক তাকে সরকারী মোমবাতি ও বাতি সরবরাহ করা হয়। সুলায়মানের ইনতিকালের পর এই চিঠি হযরত ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর হাতে পড়ে। তিনি উত্তরে লিখেন, "আবূ বকর! আমার স্মরণ আছে যে, এই পদে অধিষ্ঠিত হবার পূর্বে শীতের অন্ধকার রাত্রেও তুমি মোমবাতি এবং অন্য কোন বাতি ছাড়াই পথে বের হতে। তোমার সেই অবস্থা আজকের এই অবস্থা থেকে উত্তম ছিল। আমার ধারণায় তোমার ঘরের মোমবাতি ও বাতি দ্বারাই তোমার কাজ চালানো উচিত।"[২] এ ধরনেরই একটি দরখাস্তের ওপর যেখানে সরকারী কাজে কাগজ চেয়ে পাঠানো হয়েছিল, তিনি লিখেছিলেন ঃ

---

১. সীরতে ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয-৪৪ পৃ.।
২. ঐ, ৬৪ পৃ.; ৩. ঐ, ৬৪ পৃ.।

কলম চিকন করে এবং ছোট ছোট করে লিখ। একই পৃষ্ঠায় অনেক জরুরী বিষয় লিখে দাও। মুসলমানদের এমন লম্বা-চওড়া কথার প্রয়োজন নেই, যার কারণে অযথা বায়তুল-মালের ওপর বোঝা ভারী হয়।[১]

বিপ্লবাত্মক সংস্কার

হযরত ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র) তাঁর যুহদ-এর যিন্দেগী এবং তাকওয়া, সতর্কতা ও সংযমের দ্বারা হুকুমতের প্রাণসত্তাই বদলে দেন। তাঁর প্রথম ও মৌলিক বিপ্লব ছিল এই যে, তিনি হুকুমতের দৃষ্টিকোণই পাল্টে দেন। সে সময় হুকুমত কেবল ট্যাক্স ও রাজস্ব আদায় এবং তা ব্যয় করার একটি ব্যবস্থাপক সংস্থায় পরিণত হয়েছিল। সাধারণ মানুষের 'আকীদা-আখলাক ও তাদের গোমরাহী ও হিদায়াতের ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোন মাথা ব্যথা ছিল না। কিন্তু ওমরের গোটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা নিম্নলেখ প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে :

মুহাম্মদ (সা)-কে দুনিয়ার হাদী (পথ-প্রদর্শক) হিসাবে পাঠানো হয়েছিল, তহশীলদার হিসেবে নয়।[২]

অর্থাৎ হুকুমতের মেযাজ ও দৃষ্টিকোণই তিনি বদলে দেন এবং তাকে পার্থিব হুকুমতের পরিবর্তে "খিলাফাত 'আলাা মিনহাজু'ন-নুবুওয়াত" বানিয়ে দেন। তাঁর গোটা খিলাফত আমলটাই ছিল সেই একটি বাক্যের বাস্তব ব্যাখ্যা। তিনি রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ও স্বার্থের মুকাবিলায় সব সময় দীন, তার মূলনীতি ও আখলাককেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং পার্থিব লাভালাভের মুকাবিলায় হুকুমতের আর্থিক ক্ষতিকে কখনো তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি। তাঁর খিলাফত যুগে ইসলামী হুকুমতের অমুসলিম বাসিন্দারা (যিম্মী) বিরাট সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করে, যার ফলে জিযয়ার অর্থ– যা রাষ্ট্রীয় আমদানির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও উৎস ছিল, দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে এবং হুকুমতের আর্থিক ভারসাম্যের ওপর এর একটি বিরাট প্রভাব পড়ে। সাম্রাজ্যের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এই বিপদের প্রতি খলীফার মনোযোগ আকর্ষণ করলে তিনি জওয়াবে বলেন ঃ এটা তো আঁ-হযরত (সা)-এর নবী হিসাবে প্রেরিত হবার লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। একবার অন্য একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে তিনি লিখে পাঠান ঃ আমি খুব খুশি হব যদি সকল অমুসলিম মুসলিম হয়ে যায় এবং (জিযয়া খাতের আমদানি বন্ধ হয়ে যাবার কারণে) আমার ও তোমার দু'জনকেই হাল চালিয়ে নিজেদের পেট ভরাতে হয়।[৩]

১.মানাকিব ওমর ইব্ন আবদুল আযীয, ৬৪ পৃ.
২.সীরাতে ওমর ইব্ন আবদুল আযীয, ৬৪ পৃ.
৩. কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবূ ইউসুফকৃত, ৭৫ পৃ.

য়ামানে রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট হার নির্ধারিত ছিল– চাই কি ফসল ভাল হোক কিংবা খারাপ। সেখানকার শাসনকর্তা বিষয়টি খলীফাকে অবহিত করলে তিনি বলেন ঃ ফসল মাফিক অর্থ আদায় হওয়া উচিত। এর ফলে যদি সমগ্র য়ামান এলাকা থেকে এক মুষ্টি শস্য কিংবা একদানা খোরাকও না আসে– তবু আপত্তির কিছু নেই।[১] তিনি চুঙ্গি (নগর-শুল্ক) থেকে গোটা রাষ্ট্রকে অব্যাহতি দেন এবং আমলাদের লেখেন :

এটি অপবিত্র জিনিস। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ রয়েছে ঃ

وَلاَ تَبْخَسُوْا النَّاسَ اَشْيَائَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ -(هود ٨٥)

লোকদেরকে তাদের জিনিস কম দিও না এবং যমীনের বুকে অশান্তি ও ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না। – সূরা হূদ ৮৫

লোকেরা এর নাম বদল করে একে জায়েয বানিয়ে নিয়েছে।[২]

কতিপয় শর'ঈ বিধানসম্মত ট্যাক্স ভিন্ন সব ধরনের নাজায়েয রাজস্ব, এমন কি বিশ প্রকারের ট্যাক্স– যা সাবেক শাসক ও আমলারা উদ্ভাবন করেছিল, একেবারে চিরতরে মাফ করে দেন।[৩] তিনি স্থল ও সমুদ্র পথ খুলে দেবার নির্দেশ দেন এবং সকল ধরনের বাণিজ্যিক বাধ্যবাধকতা ও কঠোর বিধি-নিষেধ রহিত করেন।[৪]

তিনি গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে এমন সব সংস্কার সাধন করেন যার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। তিনি সমগ্র রাষ্ট্রে একই ধরনের মাপ নির্ধারণ করেন।[৫] প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও রাষ্ট্রের আমলাদের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন[৬] এবং বেগার শ্রমকে আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৭] রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট অংশকে আমীর-উমারা, শাহী খান্দানের লোক ও শাসনকর্তারা নিজেদের শিকার ক্ষেত্র অথবা চারণভূমিতে পরিণত করে পতিত রেখে দিয়েছিল। তিনি নির্দেশ দেন যে, সে সবই জনসাধারণের মালিকানাধীন সম্পত্তি।[৮] জনসাধারণের তোহফা (উপহার-উপঢৌকন) গ্রহণ করাকে আমলাদের জন্য তিনি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দেন এবং বলেন, এটা যদি কোন সময় তোহফাও হয়ে থাকে তবু এখন তা ঘুষ ছাড়া কিছু নয়।[৯] তিনি শাসনকর্তাদের প্রতি নির্দেশ পাঠান তারা যেন জনসাধারণকে তাদের সাথে সাক্ষাত করার এবং অভাব-অভিযোগ পেশ করার পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। হজ্জের সময়

১. সীরতে ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয–১২৬ পৃ.।
২. সীরতে ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয ৯৯ পৃ.।
৩. ঐ; ৪. ঐ, ৯৮ পৃ.; ৫. ঐ, ৯৯ পৃ.; ৬. ঐ।
৭. ঐ, ১০০ পৃ.; ৮. ঐ ৯৭ পৃ; ৯. ঐ, ১৬২ পৃ.;

ঘোষণা দেওয়া হ'ত ঃ কারো ওপর জুলুম করা হয়েছে- এমন কোন তথ্য কেউ প্রদান করলে এবং এ ব্যাপারে কোন সৎ পরামর্শ দিলে তাকে এক শ' থেকে তিন শ' দীনার পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হবে।[১]

আমল-আখলাকের প্রতি মনোনিবেশ

সে সময় পর্যন্ত খলীফা কেবল শাসকই ছিলেন, জনসাধারণের আমল-আখলাকের প্রতি মনঃসংযোগের যেমন ফুরসৎ তাঁর ছিল না- তেমনি এর কোন যোগ্যতাও তাঁর ছিল না, এমন কি তখন মনেই করা হ'ত না যে, খলীফা জনসাধারণকে ধর্মীয় পরামর্শ দান করবেন, তাদের আখলাক ও আচার-আচরণ দেখাশোনা করবেন এবং তাদেরকে ওয়া'জ-নসীহত করবেন। এ কাজ কেবল 'উলামায়ে কিরাম ও মুহাদ্দিছীন করবেন বলেই মনে করা হত। ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র) এই জাতীয় ধারণার অবসান ঘটান এবং নিজেকে প্রকৃত ও বাস্তব অর্থে খলীফা হিসাবে প্রমাণিত করেন। তিনি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করতেই হুকুমতের আমলা ও ফৌজী অফিসারদের কাছে যে সমস্ত দীর্ঘ চিঠি ও ফরমান পাঠান তা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত হবার তুলনায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছিল ধর্মীয়, নৈতিক ও চারিত্রিক বিষয় সম্পর্কিত। সে সব পত্রের মধ্যে হুকুমতের প্রাণসত্তার চাইতে পরামর্শ ও নসীহতের রূপই বেশি থাকত। কোন কোন পত্রে তিনি সাবেক ইসলামী যিন্দেগী (নবুওয়ত ও খিলাফতে রাশেদার যুগ) ও সে যুগের সমাজ চিত্র অংকন করেছেন এবং ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির বিশ্লেষণ করেছেন।[২] উক্ত পত্রসমূহে তিনি ফৌজী অফিসারদেরকে সময়মত সালাত কায়েম করতে, তা ঠিক মত কায়েম হচ্ছে কিনা তার বন্দোবস্ত করতে এবং জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তৎপর হতে তাকীদ করেছেন।[৩] আমলাদেরকে তিনি তাক'ওয়া ও শরীয়তের আনুগত্যের ওসিয়্যত করতেন,[৪] নিজ নিজ এলাকায়ই ইসলামের দা'ওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন এবং একেই রাসূল (সা)-এর রিসালাত ও ইসলামের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে উল্লেখ করতেন।[৫] জনসাধারণকে সৎকার্যের আদেশ দান এবং অসৎ কার্য থেকে বিরত রাখার জন্যও তিনি আমলাদেরকে তাকীদ দিতেন। এই অপরিহার্য দায়িত্ব পালনে অসতর্কতা দেখালে কি ক্ষতি হবে এবং এর কি নিদারুণ মূল্য দিতে হবে[৬] তা তিনি সকলকে বুঝিয়ে বলতেন। সাম্রাজ্যের আমলাদেরকে সাজা ও শিক্ষা

১. সীরতে ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয - ১৪১ পৃ.।
২ সীরতে ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (ইব্‌ন 'আবদুল হ'াকামকৃত) ৬৯।
৩. ঐ ৭৯ পৃ.; ৪ ঐ. ৯২ পৃ. ৫. ঐ, ১৩৭ পৃ.; ৬. ঐ ১৬৭ পৃ.।

প্রদানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতেও সতর্কতা অবলম্বনের ব্যাপারে তিনি তাকীদ করতেন এবং ইসলামের শাস্তি বিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করতেন।[১] অতঃপর তিনি সাম্রাজ্যের সাধারণ নাগরিকদের খারাপ ও অন্যায় কাজকর্ম এবং অসৎ চরিত্র সংশোধনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। নারীদের উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ, মাতম ও তাদের জানাযায় যোগদান নিষিদ্ধ করেন এবং পর্দার ব্যাপারে তাকীদ দেন।[২] তিনি গোত্রীয় পক্ষপাতিত্বের প্রতি নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।[৩] নাবীয ব্যবহারের ক্ষেত্রে দারুণ প্রবণতা দেখা দিয়েছিল এবং এর মাধ্যমে জনসাধারণ শরাব পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল যার ফলে সমাজে বিভিন্ন ধরনের নৈতিকতাবিরোধী ও চরিত্র বিধ্বংসী কার্যকলাপ শুরু হয়ে গয়েছিল। তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেন ও সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন।[৪]

'ইল্‌ম ও সুন্নাহ্ পুনর্জীবনে তাঁর ভূমিকা

তিনি দীনী 'ইল্‌ম সংরক্ষণ, সংকলন ও সুন্নাহ্‌র পুনর্জীবনের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি হাদীছ সংকলনের প্রতি আবূ বকর ইবন হয্‌ম নামক একজন প্রখ্যাত 'আলিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁকে লেখেন ঃ

انظر ما كان حديث رسول الله صـ فاكتبه فانى خفت دروس العلم وذهاب العلماء

আঁ-হযরত (সা)-এর যে কোন হাদীছ পাওয়া মাত্রই তা লিপিবদ্ধ করুন। কেননা আমি 'আলিমদের বিদায় এবং 'ইল্‌ম-এর অন্তর্ধানের আশঙ্কা করছি।

তিনি হাদীছ ভাণ্ডার সংগ্রহের প্রতি, বিশেষ করে 'উমরাহ্ বিনতে 'আবদুর রহ্মান আনসারিয়া ও কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর-এর মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং তাঁদেরকে তা লিপিবদ্ধ করতে বলেন। তিনি এই প্রয়োজনীয় বিষয়টির প্রতি সাম্রাজ্যের সকল আমলা ও খ্যাতনামা 'উলামায়ে কিরামেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং স্থায়ী নির্দেশ জারী করেন ঃ

انظروا الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه

রসূল (সা)-এর হাদীছ তন্ন তন্ন করে খোঁজ ও সংগ্রহ করো।[৫]

এই সঙ্গে তিনি 'উলামায়ে কিরাম-এর ভাতা[৬] নির্ধারণ করে দেন যাতে তাঁরা একাগ্রতা ও গভীর অভিনিবেশ সহকারে 'ইল্‌ম-এর প্রচার ও শিক্ষা দানে ব্রতী হতে পারেন।

---

১. সীরতে ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয, ৭০ পৃ.২. ঐ ১০৭ পৃ.; ৩. ঐ, ১০২ পৃ.; ৪ ঐ, ১০পৃ.;
৫. তারীখ-ই-ইস্পাহান (আবু ন'ঈম); ৬. সীরতে ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয, ১৬৭ পৃ.।

তিনি নিজেও একজন বড় 'আলিম ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবেও ফরয ও সুন্নতের বিশ্লেষণের দিকে মনোনিবেশ করেন। খিলাফত লাভের প্রাথমিক দিনগুলোতে তিনি নিম্নলিখিত নির্দেশটি জারী করেন ঃ

ইসলামের এমন কিছু বিধি-বিধান ও আইন-কানুন রয়েছে যেগুলোর ওপর আমল করলে ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয়। যে এগুলোর ওপর আমল করবে না তার ঈমান অপূর্ণ থেকে যাবে। যদি কিছুদিন বেঁচে থাকি তাহলে আমি সে শিক্ষাই দেব এবং তোমাদেরকে তার ওপর পরিচালিতও করব। যদি এর পূর্বেই আমার বিদায় মুহূর্ত এসে যায় তা হলেও আপত্তির কিছু নেই। কেননা আমি তোমাদের ভেতর বেঁচে থাকতেও খুব একটা আগ্রহী নই।[১]

কতিপয় পত্র ও ফরমান

সায়্যিদুনা ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর মধ্যে যে আন্তরিকতা, ইসলামী মানসিকতা ও প্রাণ-চাঞ্চল্য বিদ্যমান ছিল (এবং যা শেষাবধি তাঁর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায়ও উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়) তার সঠিক পরিমাপ তাঁর ঐ সমস্ত চিঠি-পত্র ও সরকারী ফরমান থেকেই করা যায় যা তিনি সময় সময় সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা ও পদাধিকারী ব্যক্তিদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ঐগুলো থেকে বোঝা যায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে কী খালিস ও নির্ভেজাল মন-মস্তিষ্ক ও মানসিকতার অধিকারী করেছিলেন। তাঁর ওপর জাহেলিয়াত ও বনী উমায়্যার রাজন্যবর্গের চরিত্র ও ধ্যান-ধারণার কোন প্রভাবই পড়েনি।

একবার তিনি অবগত হলেন যে, কোন কোন গোত্রীয় সর্দার ও উমায়্যা যুগের কিছু কিছু নব্য ধনিক জাহেলিয়া যুগে প্রচলিত পারস্পরিক মিত্রতা বন্ধনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হবার রীতি পুনরুজ্জীবিত করছে[২] এবং যুদ্ধ ও মুকাবিলার ক্ষেত্রে "يا بنى فلان ! يا لمضر!" (অর্থাৎ হে অমুক গোত্র অথবা হে মুদার গোত্র! তোমরা তোমাদের মিত্রদের সাহায্যে এগিয়ে এস) ইত্যকার জাহিলী যুগের সম্বোধনমূলক ধ্বনি উচ্চারণ করতে শুরু করেছে। এ ছিল ইসলামের সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার বিপক্ষে একটি জাহিলী ব্যবস্থাপনা ও জাহিল প্রথার পুনরুজ্জীবন। এতে ছিল বহু ফেতনার পূর্বাভাষ। সাবেক শাসকবৃন্দ সম্ভবত রাষ্ট্রীয় সুবিধা

১. সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ঈমান অধ্যায়।

২. জাহিলী যুগে এক গোত্র অপর গোত্রের এবং এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মিত্রে পরিণত হ'ত। অতঃপর সে বিভিন্নভাবে তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করত এবং ন্যায়-অন্যায় ও সত্যাসত্যে সবক্ষেত্রে তার সহায়তা করত।

হাসিলের কুমতলবে একে প্রশ্রয় দিত। কিন্তু ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয এর বিপদের দিকটি ভালভাবে উপলব্ধি করেন এবং এর প্রতিবিধানের ব্যাপারে স্থায়ী নির্দেশ জারী করেন। রাষ্ট্রের একজন বড় পদাধিকারী ব্যক্তি দাহাক ইব্‌ন 'আবদুর রহমানকে তিনি লিখেন ঃ

হা'ম্‌দ ও সালাত বাদ! তুমি অবগত হও যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা এই ইসলাম, যাকে তিনি নিজের জন্য ও স্বীয় বিশিষ্ট বান্দাগণের জন্য মনোনীত করেছেন– ভিন্ন অন্য কোন দীন (ধর্ম)-কে কবুল করেন না। আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে স্বীয় গ্রন্থ দ্বারা সম্মান দান করেছেন এবং এর মাধ্যমে ইসলাম ও গায়র-ইসলামের মধ্যে পার্থক্য রেখা টেনে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قَدْ جَائَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ - يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

-(المائدة : ١٦-١٥)

আল্লাহ্‌র নিকট থেকে তোমাদের নিকট এসেছে এক জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়– এর দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং ওদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।

– আল-মায়িদা, ১৫-১ আয়াত

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ط وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا -(اسراء : ١٠٠

আমি সত্যসহই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং তা সত্যসহই অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।

– সূরা ইসরা, ১০৫ আয়াত

আল্লাহ্ তা'আলা আঁ-হযরত (সা)-কে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর ওপর স্বীয় গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। সেই সময় (ওহে আরববাসী! তোমরা জান যে,) পথভ্রষ্টতা, মূর্খতা, পেরেশানি ও ভীষণ মানসিক অস্থিরতার মধ্যে মানবতা হাবুডুবু খাচ্ছিল। ফেতনা-ফাসাদ তোমাদের মধ্যে জেঁকে বসেছিল। লোকেরা তোমাদের দাবিয়ে রেখেছিল এবং সাধারণের নিকট দীনের যতটুক অবশিষ্ট ছিল তা থেকেও তোমরা মাহ্‌রূম ছিলে। এক কথায় বলতে গেলে, এমন কোন গোমরাহী ছিল না যার মধ্যে তোমরা লিপ্ত ছিলে না। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকত তারা মূর্খতা ও গোমরাহীর মধ্যেই বেঁচে থাকত; আর তোমাদের

মধ্যে যারা মারা যেত তাদের ঠিকানা হত জাহান্নাম। অবশেষে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে মূর্তিপূজা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রভৃতি মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করলেন। তোমাদের মধ্যে যারা অস্বীকারকারী তারা অস্বীকার করল। এদিকে আল্লাহ্‌র পয়গম্বর আল্লাহ্‌র কিতাব এবং ইসলামের দা'ওয়াত দিতে থাকলেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই তাঁর ওপর ঈমান আনল। অবশ্য এমন কিছু দুর্বল লোকও ঈমান আনল যারা সব সময় ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকত এই ভয়ে যে, লোকেরা তাদেরকে ছোঁ মেরে না নিয়ে যায়! আল্লাহ্ তাদেরকে আশ্রয় দিলেন, তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা দান করলেন এবং তাদেরকে সেই সব লোকও দান করলেন যাদের ইসলাম গ্রহণ তাঁর মর্জিতে ছিল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাঁর সেই ওয়াদা পূর্ণ করলেন যাকে স্বল্প সংখ্যক মুসলমান ব্যতিরেকে সাধারণ লোকেরা অসম্ভব মনে করেছিল। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَه بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَه عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ‎.

তিনিই (আল্লাহ্)– তাঁর রসূলকে হিদায়াত ও সত্য-সুন্দর জীবন-ব্যবস্থাসহ পাঠিয়েছেন তাকে অন্য সকল বাতিল জীবন-ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, যদিও তা মুশরিকদের নিকট অপছন্দনীয় হয়।

– সূরা সাফ, ৯ আয়াত

কতক আয়াতে আল্লাহ্ পাক স্বয়ং মুসলমানদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِىْ لَايُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط -(نور : ٥٥)

তোমাদের ভেতর যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেনই যেমন তিনি খিলাফত দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার 'ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না।

– সূরা নূর, ৫৫ আয়াত

যা-হোক আল্লাহ্ পাক তাঁর নবী ও মুসলমানদের সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূরণ করে দেখিয়েছেন। ওহে ইসলামের অনুসারীবৃন্দ! মনে রেখ যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন– তা এই ইসলামের মাধ্যমেই দিয়েছেন যার বদৌলতে তোমরা শত্রুর ওপর বিজয়ী হয়েছ এবং যার কারণে তোমরা কিয়ামতের দিনে সাক্ষ্যদাতা হবে। তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে এ ছাড়া কোন গতি নেই, নেই কোন দলীল-প্রমাণ, নেই কোন বাঁচার পথ, নেই আত্মরক্ষার কোন মাধ্যম; আর এ ছাড়া তোমাদের কোন শক্তিও নেই।

আমি তোমাদেরকে এই কুরআন এবং এর ওপর আমল না করার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। এর ওপর আমল না করার পরিণতিতে উম্মার মধ্যে যে রক্তপাত, গৃহযুদ্ধ ও বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা তো তোমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। অতএব, যে কাজ থেকে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক। আল্লাহ্র সাবধান বাণী অপেক্ষা অধিক ভীতিপ্রদ আর কিছু নেই। যে জিনিস আমাকে তোমাদের কাছে পত্র লিখতে বাধ্য করেছে তা এই যে, গ্রাম এলাকার অধিবাসীদের সম্পর্কে ও সেই সব লোক সম্পর্কে– যারা নতুন নতুন শাসনকর্তা ও পদাধিকারী হয়েছেন– আমি খোঁজ-খবর নিয়েছি। গ্রাম্য লোকেরা নিরক্ষর ও জাহেল ধরনের লোক। আল্লাহ্র বিধি-বিধান সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। আল্লাহ্র ব্যাপারে তারা ভীষণ ধোঁকায় নিপতিত। তাদের সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার যে ব্যাপার-স্যাপার রয়েছে তা তারা ভুলে গেছে। তারা আল্লাহ্ তা'আলার সে সব নে'মতের নাশোকরী ও অসম্মান করেছে যে পর্যন্ত পৌঁছুবার কোন যোগ্যতাই তাদের ছিল না। আমাকে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কিছু লোক যুদ্ধে মুদার গোত্র ও য়ামানবাসীদের সাহায্য ও আশ্রয় কামনা করে থাকে। তাদের ধারণা এই যে, অন্যদের মুকাবিলায় ওরাই তাদের একমাত্র সাহায্য ও সহায়তাদানকারী বন্ধু। আল্লাহ্র জন্যই সকল তাসবীহ্ ও হাম্দ! এটা অত্যন্ত জঘন্য ধরনের অকৃতজ্ঞতা ও নে'মতের কুফরী। ধ্বংস ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার দিকে কত দূর এগিয়ে গেছে তারা! তারা দেখছে না কী অনুপম শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে তারা নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে এবং এক দল দুর্ভাগ্যের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছে! এখন আমি ভালভাবে বুঝতে পেরেছি যে, যারা হতভাগা তারা নিজেদের ইচ্ছা-অভিলাষের কারণেই হতভাগা হয়ে থাকে। আর জাহান্নাম অযথা সৃষ্টি করা হয়নি। ঐ সব লোক কি আল্লাহ্র কালাম পাকে এ কথা শোনেনি ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

"মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। অতএব, তোমাদের ভাইদের পরস্পরের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা স্থাপন কর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর; এটা করলে তোমরা আল্লাহ্র করুণা লাভ করবে।"

আমাকে বলা হয়েছে যে, কিছু লোক জাহেলিয়া যুগের পারস্পরিক মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হবার দিকে ঝুঁকে পড়েছে, অথচ আঁ-হযরত (সা) শর্তহীনভাবে কাউকে সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থন প্রদানে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, لا حلف فى الاسلام (ইসলামে কোন অন্যায় মিত্রতা ও যূথবন্দী নেই)। জাহিলী যুগে প্রত্যেক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মিত্র অপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মিত্রের নিকট এই আশা-ভরসা রাখত যে, সে পারস্পরিক মিত্রতা চুক্তির হক আদায় করবে এবং তা পূরণ করবে– চাই কি তা জুলুমসর্বস্ব হোক, অন্যায় হোক অথবা তাতে আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর অবমাননাই হোক। আমি সেই সব লোককে ভীতি প্রদর্শন করছি যারা আমার এই আহ্বান শুনবে এবং যাদের নিকট এই পত্র পৌঁছুবে। তারা ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন আশ্রয় যেন না নেয় এবং আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (সা) ও মুমিনদের পরিত্যাগ করে অপর কাউকে যেন বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে। এই বিষয়ে আমি পরিষ্কার ভাষায় খোলাখুলিভাবে এবং বার বার সতর্ক ও সাবধান বাণী উচ্চারণ করছি এবং আমি এ সব লোকের ওপর এমন এক সত্তাকে সাক্ষী মানছি যাঁর কুদরত ও হিসাবের খাতায় সকল প্রাণী অন্তর্ভুক্ত এবং যিনি প্রত্যেক মানুষের জীবন-শিরার চাইতেও নিকটবর্তী।[১]

তিনি তাঁর এক ফৌজী অফিসারকে যুদ্ধে রওয়ানা হবার সময় যে হেদায়াতনামা লিখে দিয়েছিলেন তা থেকেই পরিমাপ করা যায় তাঁর মানসিকতা হুবহু কুরআনের ছাঁচে কিভাবে গড়ে উঠেছিল এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারা দুনিয়াদার বাদশাহ ও রাজনৈতিক শাসকদের থেকে কি পরিমাণ ভিন্নতর ছিল।

মনসূর ইবনে গালিবের কাছে প্রেরিত একটি ফরমানে তিনি লিখেছেন ঃ

আল্লাহ্র বান্দাহ্ আমীরু'ল-মু'মিনীন ওমর (র)-এর এই হিদায়াতনামা মনসূর ইবনে গালিবের নামে যখন আমীরু'ল-মু'মিনীন তাকে দারুল হারব-এর অধিবাসী এবং যাদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হওয়া গেছে– এমন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে যারাই মুকাবিলায় আসবে– যুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়েছেন। আমীরু'ল-মু'মিনীন তাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি সর্বাবস্থায় তাক্'ওয়া ইখতিয়ার

১. সীরতে ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (ইব্ন 'আবদুল হাকাম), ১০৪-৭ পৃ., আবুল 'ইরফান নদভী অনূদিত।

করবেন। কেননা আল্লাহ্র তাক'ওয়াই সর্বোত্তম সামগ্রী এবং প্রকৃত শক্তি। আমীরু'ল-মু'মিনীন তাকে হুকুম দিয়েছেন যে, তিনি নিজ সাথীদের ব্যাপারে দুশমন অপেক্ষা আল্লাহ্র অবাধ্যতাকেই বেশি ভয় করবেন। কেননা গুনাহ্ শত্রুর অপকৌশল ও অপপ্রয়াসের চেয়েও মানুষের জন্য অধিকতর ভয়াবহ ও বিপজ্জনক। আমরা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করি এবং তাদের গুনাহ্র কারণেই আমরা তাদের ওপর বিজয়ী হই। যদি এ কথা সত্যি না হয় তাহলে প্রকৃতপক্ষে তাদের সঙ্গে মুকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই। কেননা আমাদের সংখ্যা তাদের সংখ্যার সমান নয়, আমাদের সামানও তাদের সামানের সমকক্ষ নয়। অতএব, আমরা ও তারা যদি পাপের ক্ষেত্রে সমান সমান হয়ে যাই, তাহলে সংখ্যা ও শক্তির দিক দিয়ে তারা আমাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হবে। মনে রেখ, আমরা যদি তাদের ওপর হক (ন্যায় ও সত্য)-এর জন্য জয়ী হতে না পারি তাহলে কেবল নিজেদের শক্তির সাহায্যে তাদের ওপর কখনো জয়ী হতে পারব না। কারো শত্রুতাকে নিজের গুনাহ্ অপেক্ষা বেশি ভয় করার দরকার নেই। নিজের গুনাহ্রাজি সম্পর্কেই চিন্তা করবে। মনে রেখ, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর এমন কিছু মুহাফিজ নিযুক্ত করা হয়েছে যারা ঘরে-বাইরে ও দেশে-বিদেশে তোমাদের কার্যকলাপের ওপর লক্ষ্য রাখেন। অতএব, তাঁদেরকে লজ্জা কর এবং স্বীয় সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর। আল্লাহ্র নাফরমানী করে তাদেরকে কষ্ট দিও না– এমন অবস্থায় যখন তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় বেরিয়েছ। মনে ক'র না যে, তোমাদের দুশমন তোমাদের তুলনায় অকেজো ও নিষ্কর্মা– তাই যদিও তোমরা গুনাহগার তবু তারা তোমাদের ওপর জয়ী হতে পারবে না। কেননা এমন বহু জাতিগোষ্ঠী রয়েছে যাদের ওপর তাদের গুনাহ্র কারণে তাদের থেকেও নিকৃষ্টতর লোকদের চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব, আল্লাহ্র নিকট নিজেদের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা কর যেমন তোমরা নিজেদের শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করে থাক। আমিও নিজের জন্য এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট সাহায্য কামনা করে থাকি। আমীরু'ল- মু'মিনীন মনসুর ইবনে গালিবকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, সফরে নিজের সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করবে এবং তাদের এমন দূর পথ অতিক্রম করতে বাধ্য করবে না– যা তাদের কষ্টের মাঝে নিক্ষেপ করবে এবং সফরে এমন কোন মনযিলে ছাউনি ফেলতে ইতস্তত করবে না যেখানে তাদের আরাম মিলবে। শত্রুর মুখোমুখি হবে এমন অবস্থায় যে, সফরের ক্লান্তি তোমার সাথীদের শক্তিকে যেন খর্ব করে না দেয়। তোমরা

এমন দুশমনের নিকট যাচ্ছ যারা রয়েছে নিজেদের ঘর-বাড়িতে এবং তাদের সামান ও সওয়ারী বিশ্রামরত। অতএব, তোমরা যদি সফরে নিজেদের সঙ্গে এবং নিজ সওয়ারীর সঙ্গে কোমল ব্যবহার না কর তাহলে তোমাদের শত্রু তোমাদের কাবু করে ফেলতে পারে। আমীরু'ল-মু'মিনীন তাকে হুকুম দিচ্ছেন যে, প্রতি জুম'আয় একদিন এক রাত সফর করবে না, বরং বিশ্রাম নেবে এবং নিজেকে আরাম দেবে। পশুগুলোকেও বিশ্রামের সুযোগ দেবে। নিজেদের সাজ-সামান ও অস্ত্রশস্ত্রগুলোর প্রয়োজনীয় মেরামতের কাজও সেরে নেবে। আমীরু'ল- মু'মিনীন তাকে আরও নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হয়েছে– নিজেদের অবস্থান তাদের থেকে পৃথক রাখবে। নিভৃত নিরাপদ বস্তীগুলোতে তোমরা সঙ্গী-সাথীদের কেউ যেন না যায়। তাদের রাজার মজলিসেও যেন কেউ না যায়। হ্যাঁ, কেবল সেই ব্যক্তিই যেতে পারেন যাঁর স্বীয় আমানত ও দীনদারীর ওপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। ঐ সব বস্তিবাসীর ওপর জুলুম করবে না, তাদেরকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেবে না। হ্যাঁ, শরীয়তের কোন দাবি বা অনিবার্য হক থাকলে অন্য কথা। কেননা তাদের হক ও যিম্মাদারী পূরণ করার ব্যাপারে তুমি ততটুকু দায়ী, যতটুকু দায়ী ঐসব লোক শরীয়তের অধিকার (হক) ও অনিবার্য হক আদায়ের ব্যাপারে। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐসব লোক নিজেদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সুদৃঢ় থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও তাদের অধিকার আদায় করে যাবে। সন্ধি ও সমঝোতাকামী লোকের ওপর জুলুম করে যুদ্ধরত দেশের ওপর জয়ী হবার চেষ্টা ক'র না। আল্লাহ্র কসম! তোমাদের তাদের ধন-দৌলত থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশ[১] প্রথমেই দেওয়া হয়ে গেছে। অধিক দেওয়ার আর সুযোগ নেই, নেই এর প্রয়োজনও। আমরা তোমাদের সাজ-সামান প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ কার্পণ্য করিনি এবং তোমাদের শক্তি-সামর্থ্যে দুর্বলতাও থাকতে দেইনি। তোমাদের জন্য আবশ্যকীয় সাজ-সামান বেশ ভালভাবেই সংগৃহীত হয়েছে। তোমাকে একটি বাছাইকৃত সেনাবাহিনী দেওয়া হয়েছে এবং কাফির ও মুশরিক রাষ্ট্রের প্রতি তোমাদের ব্যস্ত রেখে সমঝোতাকামী রাষ্ট্রের দিক থেকে তোমাদের দৃষ্টি সরিয়ে রাখা হয়েছে। একজন মুজাহিদের জন্য আমি যতটা ব্যবস্থা করতে পারতাম তার থেকে উত্তম ব্যবস্থা তোমাদের জন্য করে দিয়েছি। আমরা তোমাদের শক্তি যোগান দিতে কোন সুযোগই হাতছাড়া করিনি। এবার আল্লাহ্র ওপর ভরসা; তিনিই সর্বশক্তির আধার।

১. জিযয়া, খারাজ ইত্যাদি।

আমীরু'ল-মু'মিনীনের নির্দেশ এই যে, আরব ও অনারবের মধ্যে সেই সব লোকই তাঁর গোয়েন্দা হবার যোগ্য যাদের ইখলাস ও সততার ওপর তিনি আস্থাশীল। কেননা যারা অসৎ ও মিথ্যাবাদী– তাদের প্রদত্ত তথ্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না, যদিও তার কোন কোন কথা সঠিকও হয়। প্রতারক ও ধোঁকাবাজ আসলে তোমাদের জন্য নয়[১], বরং তোমাদের শত্রুপক্ষের গুপ্তচর হিসাবেই কাজ করে থাকে।

একটি সাধারণ চিঠিতে সাম্রাজ্যের কর্মচারীদের লিখছেন :

আম্মা বা'দ! নিশ্চয় এই যিম্মাদারী– যা আল্লাহ্ তা'আলা আমার ওপর সোপর্দ করেছেন– খাবার, পোষাক-পরিচ্ছদ, সওয়ার, বিয়ে–শাদী, ধন-সম্পদ আহরণ প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত করতে পারি না। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই সব বস্তু পূর্বেই এত বেশি পরিমাণে দিয়েছিলেন যা অন্যরা সাধারণত কষ্টেই আহরণ করে। আমি এই যিম্মাদারী খুব-ভয়-ভীতির সঙ্গে কবুল করেছি। এই বাপারে আমার অনুভূতি খুবই সজাগ যে, এ এক বিরাট যিম্মাদারী। এ সম্পর্কে যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তাও খুব শক্ত। বিভিন্ন পক্ষ ও দাবিদার কেয়ামতের দিন যখন জমায়েত হবে, তখন তাদের ব্যাপারে আমাকে বড় শক্ত রকমের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাকে ক্ষমা করেন, আমার অন্যায়-বিপ্লব মার্জনা করেন এবং আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, তাহলে ভিন্ন কথা। আমি তোমাদের ওপর হুকুমতের যে কাজ সোপর্দ করেছি, তোমাদের যে ক্ষমতা ও ইখতিয়ার প্রদান করেছি এবং সেই সাথে খোদাভীতির হিদায়াত প্রদান করছি, নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন, আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর আনুগত্য এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বেঁচে থাকার জন্যই আমি তোমাদের তাকীদ করছি। যে সব বিষয় তাঁর ইচ্ছার পরিপন্থী সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। তোমাদের দৃষ্টি যেন নিজের ওপর এবং নিজ আমলের ওপর নিবদ্ধ থাকে এবং সে সব বিষয়ের ওপর নিবদ্ধ থাকে, যা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের সান্নিধ্যে নিয়ে পৌছায়। যে আচরণ তোমরা নিজেদের ও জন-সাধারণের মধ্যে করছ তা তোমাদের সামনেই রয়েছে। তোমরা ভালভাবেই জান যে, আল্লাহ্র শাস্তি থেকে নাজাত প্রাপ্তি এগুলোর ওপরই নির্ভর করছে। সেই প্রতিশ্রুত দিনের জন্য তোমরা সেই বস্তুই প্রস্তুত রাখ যা আল্লাহ্র সমীপে

---

১. সীরতে ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয–৮৪-৮৭ পৃ.; মওলভী আবুল 'ইরফান নদভী

তোমাদের কাজে আসবে। বিভিন্ন ঘটনার ভেতর তোমরা নিশ্চয়ই এমন শিক্ষাপ্রদ বিষয় লক্ষ্য করে থাকবে যা আমাদের ওয়া'জ-নসীহতের চাইতেও অধিক প্রভাবমণ্ডিত। —ওয়াস্‌সালাম।[১]

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের দিকে মনোনিবেশ

হযরত ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয কেবল মুসলমানদের ইসলাহ (সংস্কার) এবং রাষ্ট্রে ইসলামী শরীয়ত কার্যকর করাকেই যথেষ্ট মনে করেননি, অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ওপরও তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং তিনি তাঁর সত্তা, সততা, নিষ্ঠা ও আমল দ্বারা ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সফলকাম হন। বালাযুরী তাঁর 'ফুতুহুল বুলদান' নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> (হযরত) ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের নিকট সাতটি পত্র লিখেন এবং তাঁদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। তিনি তাঁদেরকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদি তাঁরা এই আহ্বানে সাড়া দেন তাহলে তাঁদের নিজ নিজ সাম্রাজ্যের ক্ষমতায় বহাল রাখা হবে এবং তাঁদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য তাই হবে যা একজন মুসলমানের হয়ে থাকে। হযরত ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীযের চরিত্র ও কার্যকলাপের সুখ্যাতি পূর্বেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। তাই তাঁরা ইসলাম কবুল করেন এবং আরবদের ন্যায় নিজেদের নামও রাখেন।[২]

ইসমা'ঈল ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবি'ল-মুজাহিরকে—যিনি বনী মাখযূমের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন, পশ্চিম আফ্রিকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। তিনি সেখানে স্বীয় কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের উত্তম প্রকাশ ঘটান এবং বার্বারদের ইসলামের দা'ওয়াত দেন। হযরত ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীযও সেখানকার লোকদের কাছে একটি পত্র পাঠান এবং তাদের ইসলামের দা'ওয়াত দেন। এই পত্র ইসমা'ঈল প্রকাশ্যে জনসমাবেশে পাঠ করে শোনান। শেষ পর্যন্ত সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩] স্বীয় খিলাফত লাভের পর তিনি মাউরাউন্নাহর-এর সুলতানদের ইসলামের দা'ওয়াতসম্বলিত পত্র লেখেন। খুরাসানের যেসব লোক ইসলাম কবুল করেছিল, জনকল্যাণার্থে সরাঈখানা নির্মাণ করেছিল তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করেন এবং তাদের ভাতা নির্ধারিত করেন।[৪]

---

১. সীরতে ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয– ৯২-৯৩ পৃ.; তরজমায় আবুল 'ইরফান সাহেব নদভ।
২. ফুতূহুল-বুলদান, ৪৪৬-৪৭ পৃ.; ৩. ফুতূহুল বুলদান, ৩৩৯ পৃ.; ৪. ঐ, ৪৩২ পৃ.।

হযরত ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর সংস্কারের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

হযরত ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর অর্থনৈতিক সংস্কার, পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাপ্রসূত শর'ঈ ও নৈতিক বাধা-নিষেধের ফলে রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি এবং নাগরিকদের অসুবিধার সম্মুখীন হবার পরিবর্তে দেশের সর্বত্র সুখ-শান্তি ও প্রাচুর্য ছড়িয়ে পড়ে। অবস্থা এমন হয় যে, যাকাত নেবার মত লোক তখন খুঁজে পাওয়া যেত না। ইয়াহইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ বলেন ঃ

> আমাকে ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র) আফ্রিকায় যাকাত আদায়ের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। আমি যাকাত আদায় করে এমন লোকের সন্ধান করলাম যাদের মধ্যে (যাকাতের) এই অর্থ বিতরণ করতে পারি। কিন্তু এমন একজন লোকেরও সাক্ষাত পেলাম না যাকে যাকাত দেওয়া যেতে পারে। হযরত ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র) সবাইকে ধনী বানিয়ে দিয়েছিলেন। শেষ অবধি আমি কিছু গোলাম ক্রয় করে আযাদ করি।[১]

অপর একজন কুরায়শী বলেন ঃ

> ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর সংক্ষিপ্ত খিলাফত আমলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, লোকে বিরাট বিরাট অংকের যাকাতের অর্থ নিয়ে আসত, কিন্তু যারা এ অর্থ পাবার হকদার তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না। ফলে বাধ্য হয়ে এ অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া হ'ত। মোট কথা, ওমরের যুগে সকল মুসলমান ধনী হয়ে গিয়েছিল। যাকাত নেবার মত কোন লোকই আর অবশিষ্ট ছিল না।[২]

এই প্রকাশ্য ও বাহ্যিক বরকত ছাড়াও (যা বিশুদ্ধ ইসলামী হুকুমতের দ্বিতীয় পর্যায়ের সুফল) একটি বড় বিপ্লব সংঘটিত হয়। আর তা ছিল এই যে, জনসাধারণের মন-মানসিকতা বদলাতে থাকে এবং জাতির মেযাজ ও রুচিতে পরিবর্তন দেখা দেয়। তাঁরই সমসাময়িক একজন বলেন ঃ

> আমরা যখন ওয়ালীদের যামানায় একত্র হতাম তখন ইমারত, তার নির্মাণ-পদ্ধতি ও কাঠামো সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতাম– এজন্য যে, ওয়ালীদের রুচি ও স্বাদ এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে গোটা রাজ্যে এরই প্রভাব পড়েছিল। সুলায়মান খানাপিনা ও নারী প্রসঙ্গে খুবই আগ্রহী ছিলেন। তার যুগের মজলিস এসব বিষয় নিয়েই সরগরম থাকত। কিন্তু ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর যমানায় নফল 'ইবাদত-বন্দেগী, আনুগত্যমূলক

---
১. সীরতে ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয, ১৬৯ পৃ.।

বিষয়াদি এবং যি'ক্র-আয'কার পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও মজলিসী বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। যেখানে চারজন লোক একত্র হ'ত সেখানে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করত, রাতে সাধারণত তোমার কি পড়ার অভ্যাস, তুমি কতখানি কুরআন মুখস্থ করেছ, তুমি কুরআন কবে খতম করেছিল, তুমি মাসে কতটি রোযা রাখ ইত্যাদি।[১]

তাঁর জীবনের মূল্যবান সম্পদ

ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর জীবনের মূল্যবান সম্পদ এবং তাঁর সমস্ত তৎপরতা ও চেষ্টা-সাধনার প্রাণসত্তা ও ক্রিয়াশীল শক্তি ছিল তাঁর সুদৃঢ় ঈমান, পারলৌকিক জীবনের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও জান্নাতের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ। তিনি যা কিছু করেছেন আল্লাহ্র ভয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনায়ই করেছেন। এটিই ছিল তাঁর সেই শক্তি যা তাঁর সময়ের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসককেও বিশ্ব-ভূখণ্ডের সর্বাপেক্ষা বিরাট সাম্রাজ্যের প্রেরণা, আকর্ষণ ও উপকরণের মুকাবিলায় দৃঢ়পদ রাখত। কেউ যদি তাঁর এই কর্ম-পদ্ধতির সমালোচনা করত এবং লোভ-লালসা ও পৃথিবীর স্বাদ ভোগের প্রতি তাঁকে উৎসাহিত করত তাহলে তিনি তাকে নিম্নলেখ আয়াতটি পড়ে শোনাতেন ঃ

اِنِّىْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ –(الانعام ١٥)

আমি যদি আমার প্রতিপালকের নাফরমানী করি, তাহলে আমি ভয় করি যে, মহাদিনের শাস্তি আমার ওপর আপতিত হবে। (৬ ঃ ১৫)

একবার তিনি তাঁর এক খাদেমকে একটি কথা বলেছিলেন এবং এটাই ছিল তাঁর সঠিক পরিচয়। তিনি বলেছিলেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে উচ্চাভিলাষী স্বভাব দান করেছেন। যে মর্যাদাই আমি লাভ করেছি তার থেকেও উচ্চতর মর্যাদার আশা করেছি। এখন আমি সেই স্থানে পৌঁছে গেছি যার পর আর কোন পার্থিব মর্যাদা নেই। এখন আমি শুধু জান্নাতের অভিলাষী।[২]

তাঁর রোদন ও আল্লাহ্ভীতির অবস্থা ছিল এই যে, এক ব্যক্তিকে তিনি নসীহত করার আবেদন জানালে সে বলেছিল, "আল্লাহ্ যদি তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ

১. তারীখ-ই-তাবারী, ৯৬ হি.-এর ঘটনাবলী
২. সীরতে ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয––৬১ পৃ.।

করেন এবং গোটা দুনিয়া যদি জান্নাতে চলে যায় তাহলে তোমার কি লাভ? আর যদি গোটা দুনিয়া জাহান্নামে চলে যায় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে জান্নাত নসীব করেন তাহলে তোমাদের কি ক্ষতি?" এতদশ্রবণে তিনি এত রোদন করলেন যে, তাঁর সামনে যে অঙ্গার-ধানিকা রাখা ছিল তা নিভে যায়।[১] ইয়াযীদ ইবন হাওশাব বলেন ঃ মনে হ'ত যে, জান্নাত ও জাহান্নাম কেবল ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র) ও হাসান বসরী (র)-এর জন্যই পয়দা করা হয়েছে।[২]

ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর ওফাত

আল্লাহ্র যদি মঞ্জুর হ'ত এবং ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র) আরও কিছুকাল খিলাফত চালাবার সুযোগ পেতেন তাহলে গোটা ইসলামী বিশ্বে এক সুদূরপ্রসারী ও স্থায়ী বিপ্লব সাধিত হ'ত এবং মুসলমানদের ইতিহাস আজ অন্যভাবে লেখা হ'ত। কিন্তু বনী উমায়্যা– যাদেরকে এই ব্যক্তিটির জন্য খিলাফতের ক্ষেত্রে তাদের বংশগত স্বার্থে এক বিরাট কুরবানী দিতে হচ্ছিল, এমন কি যারা নিজেদের মজলিসী আলোচনায় হযরত ওমর (র)-এর পরিবারে আত্মীয়তা করার কারণে ছিল মর্মাহত, বেশি দিন পর্যন্ত এই বিপ্লবী মুজাহিদকে বরদাশ্ত করতে পারেনি। তারা খুব সত্বর তাঁর হাত থেকে নিস্তার লাভ করে মুসলমানদের আল্লাহ্প্রদত্ত এই নে'মত থেকে মাহরূম করে দেয়। সায়্যিদুনা ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র) মোটের ওপর দু'বছর পাঁচ মাস খিলাফতের আসনে সমাসীন থেকে হিজরী ১০১ সনে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।[৩] এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, তাঁর খান্দান তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিল।

---

১. সীরতে ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয, ১০৮–৯ পৃ.।
২. সিফাতু'স-সাফওয়া–ইবন জওযী, তৃতীয় খণ্ড, ১৫৬ পৃ.।
৩. ইব্ন সা'দ, ইব্ন আছীর, ইবনে জওযী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় শতাব্দীর সংস্কার প্রচেষ্টা
ও
হযরত হাসান বসরী (র)

মুসলিম উম্মাহ্‌র নৈতিক ও চারিত্রিক অবনতি এবং তাদের ঈমানী দুর্বলতা

হযরত ওমর ইব্‌ন ‘আবদুল ‘আযীয (র)-এর ওফাতের পর হুকুমতের ধারা সেভাবেই বইতে থাকে যেভাবে এর পূর্বে বইছিল। জাহেলিয়াত কঠিনভাবে তার পাঞ্জাকে মযবুত করেছিল। তাঁর স্থলাভিষিক্তগণ তাঁর খিলাফতকালীন অপছন্দনীয় বিরতিটুকুর ক্ষতি পূরণ করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। তারা হুকুমতকে সেই নীতির ওপরই নিয়ে আসেন যে নীতির ওপর তা সুলায়মানের যমানা পর্যন্ত ছিল। অবস্থা এই দাঁড়িয়েছিল যে, ব্যক্তিগত ও মৌরুসী হুকুমতের ধারাবাহিকতা এবং সম্পদ ও সাফল্যের প্রাচুর্যের ফলে মুসলিম সমাজে ‘মুনাফিকীর বীজ এবং প্রাচীন যুগের বিত্তশালী ধনিক শ্রেণীর (مترفين سابقين) অতীত দিনের সেই রিপু তাড়িত বিলাসী আচার-আচরণ’ পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। সমাজের মধ্যে বিলাসিতার সাধারণ প্রবণতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। ঈমান ও সৎ কর্মময় জীবন, যা ছিল এই উম্মাহ্‌র মূল্যবান পুঁজি, সকল শক্তির গোপন রহস্য ও নবুওয়তের রেখে যাওয়া একটি মূল্যবান উত্তরাধিকার, ক্রমেই বিপন্ন হয়ে পড়ছিল। এই উম্মত নৈতিক ও চারিত্রিক দিক দিয়ে দেউলিয়া ও আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে ফোখলায় পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। মনমরা ও বিমর্ষ ভাব, ঈমানের কমযোরী এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিস্পৃহ ও উদাসীন মানসিকতা শক্তভাবে ডানা বিস্তার করছিল। হুকুমত এই মূল্যবান সম্পদের হেফাজত ও লালন-পালন থেকে কেবল গাফিল ও সম্পর্কহীনই ছিল না, স্বীয় ব্যক্তিগত চরিত্র ও কার্যকলাপ দ্বারা এই নৈতিক ও চারিত্রিক অবনতির সহায়ক ও আহ্বায়কেও পরিণত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এই উম্মতের মধ্যে ঈমান ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও দাসত্বের যে সম্পর্ক সৃষ্টি করেছিলেন (যা কেবল একজন নবীই করতে পারেন) তা অধঃপতনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। এটা ছিল এমন একটি ঘাটতি যা রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডের বিস্তৃতি এবং বিরাট থেকে বিরাটতর বিজয় দ্বারাও পূরণ করা যায় না। যা একবার অপসৃত হলে (বিগত জাতি ও সম্প্রদায়-

সমূহের ইতিহাস তার সাক্ষী) অনেক দুঃখ-কষ্ট ও সাধ্য-সাধনার পরই তা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।

যদি এই মূল্যবান পুঁজির হেফাজত না করা হ'ত, কালের প্রভাব ও নৈতিক, চারিত্রিক ও রাজনৈতিক উপসর্গসমূহকে স্বাধীনভাবে তার কাজ চালিয়ে যাবার স্বাধীনতা দেওয়া হ'ত তাহলে এই উম্মাহ্ও বিগত উম্মাহ্গুলোর ন্যায় একটি প্রবৃত্তিপূজক, আখিরাতবিস্মৃত ও বস্তুপূজারী জাতিতে পরিণত হ'ত। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর শেষ দিনগুলোতে এই বিপদ সম্পর্কেই সর্বাধিক আতংকিত ছিলেন। ওফাতের কয়েকদিন পূর্বে তিনি তাঁর এক খুতবায় পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন ঃ

ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط الدنيا كما بسطت من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم .

আমি তোমাদের দারিদ্র্যের ব্যাপারে ভীত ও শংকিত নই, বরং শংকিত এই ব্যাপারে যে, তোমাদের জন্য পার্থিব প্রাচুর্যের বিস্তৃতি ঘটবে যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের বেলায় ঘটেছিল। ফলে তোমরা দুনিয়া প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা শুরু করবে। পরিণতিতে তাই তোমাদের ধ্বংস করবে যেরূপ ধ্বংস করেছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের।

তাবি'ঈদের ঈমানী দা'ওয়াত

নবী করীম (সা) তাঁর ভাষায় যে বিপদাশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছিলেন তা সত্বরই প্রতিভাত হয়। কিন্তু এই বিপদের মুকাবিলা করবার জন্য আল্লাহ্র এমন কিছু একনিষ্ঠ ও উৎসর্গিত বান্দা ময়দানে অবতরণ করেন যাঁরা তাঁদের ঈমানী কুওয়তের প্রখরতা, যথাযথ প্রশিক্ষণ, ওয়া'জ-নসীহত এবং দা'ওয়াত ও তালকীন দ্বারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে বস্তুবাদের ভয়ঙ্কর তুফানে খড়কুটোর ন্যায় ভেসে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেন এবং ঐ প্লাবনের গতিকেও শ্লথ করে দেন। তাঁরা উম্মতের ঈমানী ও রূহানী ধারাবাহিকতা বহাল রাখেন, যা বংশগত ও রাজনৈতিক ধারাবাহিকতার চেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল। এই ফিতনা মুকাবিলা করবার জন্য শ্রদ্ধেয় ও মহান তাবি'ঈদের একটি নেতৃস্থানীয় জামা'আত সদাই প্রস্তুত ছিল যাঁদের মধ্যে সা'ঈদ ইবন জুবায়র (র), মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র), শা'বী (র) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাসান বসরী (র)

কিন্তু এই বিপদের কট্টর প্রতিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী ও ঈমানী দা'ওয়াতের প্রকৃত পতাকাবাহী ছিলেন হযরত হাসান বসরী (র) যিনি ২১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর পিতা য়াসার ছিলেন মশহূর সাহাবী হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম এবং তিনি নিজে উম্মু'ল-মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (র)-এর ঘরে প্রতিপালিত হয়ে ছিলেন।

হাসান বসরী (র)-এর ব্যক্তিত্ব ও দা'ঈ হিসাবে তাঁর যোগ্যতা

হযরত হাসান বসরী (র)-এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সেই সব যোগ্যতারই সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন যা সেই যুগের বিশেষ অবস্থায় দীন ও ধর্মের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং দীনী-দা'ওয়াতকে কার্যকর করার জন্য খুবই দরকারী ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে সামগ্রিকতা, হৃদয়গ্রাহিতা ও পরিপূর্ণতার সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি দীনের ক্ষেত্রে পূর্ণ পাণ্ডিত্য ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন, ছিলেন উন্নত মার্গের ও উচ্চস্তরের মুফাসসির ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ। তাঁকে বাদ দিয়ে সে যুগে ইজতিহাদ বা সংস্কার কার্য আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হ'ত না। সাহাবায়ে কিরাম (র)-এর উল্লেখযোগ্য যমানা তিনি পেয়েছিলেন এবং সে যমানাকে খুব ভালভাবেই অধ্যয়ন করেছিলেন। মুসলমানদের জীবনে ও ইসলামী সমাজে যে সব পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল তিনি সে সবের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তিনি তাঁর যুগের সমাজ ও সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর জীবন-যিন্দেগী সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। সমাজের বৈশিষ্ট্যাবলী ও তার রোগব্যাধি সম্পর্কেও একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় তিনি ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি বাগ্মী, বাকপটু ও মিষ্টভাষী ছিলেন। যখন কথা বলতেন তখন তাঁর মুখ থেকে যেন ফুল ঝরে পড়ত। যখন তিনি আখিরাতের বর্ণনা দিতেন কিংবা সাহাবায়ে কিরাম (র)-এর যুগের ছবি অংকন করতেন তখন চোখ দিয়ে তাঁর অশ্রুর নহর বইত। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের ন্যায় ভাষা ও বাকচাতুর্যে দক্ষ এমন একজন ব্যক্তি সে যুগে আর জন্মাননি। লোকেরা হাসান বসরী ও হাজ্জাজ ইবন ইউসুফকে বাকপটুতার দিক দিয়ে সমপর্যায়ের মনে করত। 'আরবী অভিধান ও ব্যাকরণশাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম আবূ 'আম্র ইব্ন আল-'আলা বলেন, "আমি হাসান বসরী ও হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের চাইতে বাকপটু অন্য কোন লোক দেখিনি এবং হাসান হাজ্জাজের চাইতেও বেশি বাকপটু ছিলেন।"[১] জ্ঞানের বিস্তৃতির ক্ষেত্রে তাঁর যে অবস্থা ছিল সে সম্পর্কে রবী' ইবন আনাস বলেন, "আমি দশ বছর যাবৎ হাসান বসরীর নিকট আসা-যাওয়া করেছি এবং প্রতিদিনই তাঁর কাছ থেকে এমন কিছু কথা শুনেছি, যা ইতোপূর্বে আর কখনো শুনিনি।"[২]

১. ঐ, ৭ম খণ্ড, ৪৪ পৃ.; ২. দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, বুস্তানীকৃত, ৭ম খণ্ড; ৪৪ পৃ.।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর যে ব্যাপকতা ছিল সে সম্পর্কে জনৈক বিজ্ঞজনের অভিমত লক্ষ্য করুন ঃ

كان من دراری النجوم علما وتقوى وزهدا وورا عا وعفة ورقة وفقها ومعرفة يجمع مجلسه ضروبا من الناس هذا ياخذ عنه الحديث، وهذا يلقن منه التاويل وهذا يسمع منه الحلال والحرام، وهذا يحكى له الفتيا وهذا يتعلم الحكم والقضا وهذا يسمع الوعظ وهو فى جميع ذلك كالبحر العجاج تدفقا وكالسراج الوهاج تالفا ولا تنس مواقفه ومشاهده فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر عند الامراء واشباه الامراء بالكلام الفصل واللفظ الجزل .

তিনি (হাসান বসরী) স্বীয় 'ইল্‌ম ও তাক্‌ওয়া, যুহ্‌দ ও পরহেযগারী, পরমুখাপেক্ষীহীনতা ও উন্নত মনোবল, সৌন্দর্য ও পবিত্রতা, অনুধাবন শক্তি ও মা'রিফতের দিক দিয়ে একটি উজ্জ্বল জোতিষ্ক ছিলেন। তাঁর মজলিসে বিভিন্ন কিসিমের লোক জমায়েত হ'ত এবং তাঁর উপদেশ থেকে সকলেই উপকৃত হ'ত। একই মজলিসে কেউ তাঁর কাছ থেকে হাদীছের জ্ঞান হাসিল করছেন, কেউ তাফসীরশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করছেন, কেউ 'ইল্‌মে ফিক্‌'হের দর্‌স গ্রহণ করছেন, কেউ ফতওয়া জিজ্ঞাসা করছেন এবং বিচার-আচারের নিয়ম-কানূন শিখছেন, কেউ ওয়া'জ শুনছেন। তিনি ছিলেন যেন এক লোনা সমুদ্র যাকে উত্তাল তরঙ্গ সর্বদা আন্দোলিত করছে। তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল প্রদীপ, যা মজলিসকে আলোকিত করছে। 'আমরু বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার' তথা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের ক্ষেত্রে তাঁর কার্যধারা, বাকপটুতা ও শাসকমণ্ডলী ও আমীর-উমারা সমীপে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ ভাষায় সত্য প্রকাশের ঘটনাবলী ভুলবার মত নয়।[১]

তিনি শুধু বাগ্মিতা ও কামালিয়াতের অধিকারীই ছিলেন না, হৃদয়বান ও সাহিব-ই-হালও ছিলেন। তিনি যা বলতেন তা তাঁর অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকেই নির্গত হ'ত। ফলে তা অন্যের দিলের ওপর গভীর প্রভাব ফেলত। যে সময় তিনি বক্তৃতা করতেন তখন শ্রোতার পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হ'ত। এরই ফলে বসরা থেকে কুফা পর্যন্ত বড় বড় 'আলিম ও শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও তাঁর দরস কক্ষ চুম্বকের ন্যায় মানুষকে আকর্ষণ করত। তাঁর ওয়া'জ ও বর্ণনাসমূহের বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সেগুলোর সঙ্গে 'কালামে নবুওয়ত'-এর গভীর মিল ছিল।

১. আবু হায়্যান তাওহীদী এটি ছাবিত ইবন কুরা থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম গাযালী 'ইহ্ য়াউ'ল-'উলূম' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, হাসান বসরীর বাচনভঙ্গি আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স- সালামের বাচন-ভঙ্গির সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যশীল ছিল। এরূপ সামঞ্জস্য অন্য কোন ওয়ায়েজের বেলায় দেখা যায়নি। ঠিক একইভাবে তাঁর জীবন-যাপন পদ্ধতিও সাহাবায়ে কিরামের জীবন-যাপন পদ্ধতির সাথে ছিল সাদৃশ্যপূর্ণ।[১]

তাঁর এসব বৈশিষ্ট্য ও ব্যাপকতার প্রভাব এমনই ছিল যে, লোকেরা তাঁর ব্যক্তিত্ব দ্বারা ছিল অভিভূত এবং তাঁকে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মধ্যে গণ্য করা হ'ত। তৃতীয় শতাব্দীর একজন অমুসলিম দার্শনিক (ছাবিত ইবন কুরাহ্)-এর উক্তি হচ্ছে, উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার যে কয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ওপর অন্যান্য্য উম্মার ঈর্ষা করা উচিত, তাঁদের মধ্যে হাসান বসরী (র) অন্যতম। মক্কা-মু'আজ্জমা সব সময়ই ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। সেখানে সকল শাস্ত্রের জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমাগম ঘটে, কিন্তু মক্কার অধিবাসীরাও হাসান বসরীর জ্ঞানবত্তা দৃষ্টে ও তাঁর বক্তৃতা শ্রবণে বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলেছে ঃ আমরা তাঁর মত কোন লোক আর দেখিনি।[২]

হাসান বসরী (র)-এর ওয়া'জ

হাসান বসরী (র)-এর ওয়া'জ ছিল সাহাবীদের ওয়া'জের ন্যায় সহজ সরল ও আকর্ষণীয়। তাতে দুনিয়ার অনিত্যতা, যিন্দেগীর অবিশ্বস্ততা, আখিরাতের গুরুত্ব, ঈমান ও 'আমলের তালকীন, তাক'ওয়া ও খোদাভীতির তা'লীম এবং নফসের ফেরেববাজির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকত। যে যুগে মানুষের ওপর বস্তুবাদ ও গাফিলতির শক্ত হামলা চলছিল এবং জনসাধারণ, এমন কি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও ধন-দৌলত, সুখ-সম্ভোগ ও ভোগ-বিলাসিতার বন্যায় খড়কুটোর মত ভেসে যাচ্ছিল, সে যুগে এরূপ ওয়া'জ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দরকারও ছিল। যেহেতু তিনি সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর যুগ নিজ চোখে দেখেছিলেন, তাঁদের সাহচর্যের ফয়েয লাভে ধন্য হয়েছিলেন, এরপর উমায়্যা হুকুমতের যৌবন দেখছিলেন, তাই তাঁর ওয়া'জে অধিকাংশ সময় বিরাট জোশ ও দরদের সঙ্গে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর ঈমানী অবস্থা এবং তাঁদের আমল ও আখলাকের বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা পাওয়া যেত। যখন তিনি তাঁর দেখা দু'টো যুগের তুলনা করতেন এবং সেই মহান

---

১. ইহ্ য়া-ই-'উলুমুদ্দীন—১ম খণ্ড, ১৬৮ পৃ.
২. আল-হাসান বসরী, ইব্ন জওযীকৃত, ৬৯-৭০ পৃ.

বিপ্লবের আলোচনা করতেন যা দেখতে দেখতে তাঁদের ঈমান ও আমল, আখলাক ও 'আদতের মধ্যে ফুটে উঠেছিল, তখন তাঁর দরদী জোশ খুব বেড়ে যেত এবং তাঁর বর্ণনা অব্যর্থ তীরে পরিণত হ'ত। তাঁর ওয়া'জসমূহ শুধু হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক ছিল না, বরং তা ছিল সে যুগের বাকপটুতা, অলঙ্কারিক ভাষা ও উন্নতমানের সাহিত্যেরও নমুনা। একবার তিনি সে যুগের অধিবাসীদের অবস্থার পর্যালোচনা ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর আদর্শ চরিত্রের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন :

هيهات هيهات اهلك الناس الامانى قول بلاعمل ، ومعرفة بغير صبر، وايمان بلايقين، مالى ارى رجالاً ولا ارى عقولا واسمع حسيسًا، ولا ارى انيسًا، دخل القوم والله ثم خرجوا، وعرفوا ثم انكروا وحرموا ثم استحلوا، انما دين احدكم لعقة على لسانه اذا سئل أمؤمن انت بيوم الحساب؟ قال نعم! كذب ومالك يوم الدين، ان من اخلاق المؤمنين قوة فى دين وايماناً فى يقين وعلماً فى حلم وحلم بعلم وكيسًا فى رفق وتحملا فى فاقة وقصداً فى غنى وشفقة فى نفقة ورحمة لمجهود، وعطاءا فى الحقوق، وانصافا فى استقامة لا يحيف على من يبغض ولا يأثم فى مساعدة من يحب ولا يمز ولا يغمز ولا يلمز ولا يلغو ولا يلهو ولا يلعب، ولا يمشي بالنميمة ولا يتبع ما ليس له ولا يجحد الحق الذى عليه، ويتجاوز فى العذر ولا يشمت بالفجيعة ان حلت بغيره ولا يسر بالمعصية اذا نزلت بسواه، المؤمن فى إلصلوة خاشع والى الركوع مسارع قوله شفاء وصبره تقي، وسكوته فكرة ونظرته عبرة يخالط العلماء ليعلم ويسكت بينهم ليسلم ويتكلم ليغنم ان احسن استبشر وان اساء استغفر، وان عتب استعتب، وان سفه عليه حلم، وان ظلم صبر وان جير عليه عدل ولا يتعوذ بغير الله ولا يستعين الا بالله قور فى الملاء، شكور فى الخلاء، قانع بالرزق، حامد على الرخاء، صابر على البلاء ان جلس مع الغافلين كتب من الذاكرين وان جلس مع الذاكرين كتب من المستغفرين، هكذا كان اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم، الاول فالاول حتى لحقوا بالله عز وجل وهكذا كان المسلمون من سلفكم الصالح وانما غيربكم لما غيرتم "اِنَّ اللّٰهَ لَايُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءً فَلاَ مَرَدَّ لَه وَمَا لَهُمْ مِنْ دُوْنِه مِنْ وَّالٍ .

হায় আফসোস! আশা-ভরসা ও কল্পনাবিলাসী পরিকল্পনা মানুষকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়েছে। মুখে কথার ফুলঝুরি আছে, কিন্তু কাজের কোন উদ্যোগ নেই। 'ইল্‌ম ও মা'রিফত আছে, কিন্তু (তার দাবি পূরণ করবার জন্য) ধৈর্য নেই। ঈমান আছে, কিন্তু য়াকীন নেই। মানুষের অবয়ব চোখে পড়ে, কিন্তু তাতে ঘিলু নেই। দর্শনার্থীদের ভিড় আছে, হৈ-হট্টগোলও আছে, কিন্তু এমন

একজন আল্লাহ্‌র বান্দা চোখে পড়ে না, যার অন্তর আছে, মন যার প্রতি আকৃষ্ট হয়। লোকজন আসে, অতঃপর চলে যায়। তারা সব কিছু জেনেছে, অতঃপর তা বেমালুম ভুলে গেছে। প্রথমে তারা একটি বস্তুকে হারাম করেছে, অতঃপর তাকেই আবার হালাল করে নিয়েছে। তোমাদের ধর্ম কি? মুখের একটি মিষ্টি শব্দোচ্চারণ। যদি প্রশ্ন করা হয়, "হিসাব-নিকাশের দিনে তুমি বিশ্বাসী?" জওয়াব পাওয়া যায়, "হাঁ!" প্রতিফল দিবসের মালিকের কসম! সে মিথ্যা বলেছে। মু'মিনের চরিত্র ও শান এই যে, সে কর্মফল দিবসে বিশ্বাস করবে এবং ঈমান ও ইয়াকীনের অধিকারী হবে। তার 'ইল্‌ম-এর সাথে হি'ল্‌ম (ধৈর্য) এবং হি'ল্‌ম-এর সাথে 'ইল্‌ম থাকবে। সে বুদ্ধিমান হবে, কিন্তু হবে নম্র প্রকৃতির এবং উত্তম ভূষণ ও সংযম তার দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনকে ঢেকে দেবে। ধনী হয়ে গেলেও মধ্যম পন্থা সে কখনো পরিত্যাগ করবে না। ব্যয়ের ক্ষেত্রে সে মিতাচারী, বিপর্যস্ত মানুষের ক্ষেত্রে দয়ালু ও দানশীল, অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে প্রসারিত হস্ত ও উন্মুক্ত মন এবং ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে হবে জোর তৎপর ও অনড়। কারো প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হলেও তার প্রতিকূলে বাড়াবাড়ি করে না। ভালবাসার ক্ষেত্রেও কারো সাথে শরীয়তের সীমারেখা অতিক্রম করে না। কারো ছিদ্রান্বেষণ করে না, কাউকে তিরস্কার কিংবা ভর্ৎসনা করে না। অর্থহীন বিষয়ের সঙ্গে যেমন তার সম্পর্ক থাকে না, তেমনি ক্রীড়াকৌতুক ও হাসি-তামাশার সঙ্গেও সে কোন সম্বন্ধ রাখে না। সে চোগলখুরী করে না, যে বিষয়ে তার অধিকার নেই, তার পেছনে ধাবিত হয় না, যা তার ওপরে ওয়াজিব– সে ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানায় না এবং ওযরখাহীর বেলায় সীমা অতিক্রম করে না। সে অপরের দুঃখ-কষ্টে উৎফুল্ল হয় না এবং অপরের অন্যায়কেও সমর্থন করে না। তার সালাতে ভয়-ভক্তিমিশ্রিত বিনয় থাকে। সে 'আলিম সমাজের সাহচর্য অবলম্বন করে। 'ইল্‌ম-এর খাতিরে সে চুপ থাকে, শুধু গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা এবং সওয়াব ও ফায়দা হাসিলের জন্য কথা বলে। পুণ্য লাভ ঘটলে সে খুশি ও আনন্দে উদ্বেলিত হয়, আর ক্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে আল্লাহ্‌র দরবারে তওবা-ইস্তিগফার (অনুশোচনার সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা) করে। কারো তরফ থেকে দিলে চোট পেলে ক্ষমার মধ্যেই তার উপশম খোঁজে। কেউ তার সঙ্গে মূর্খজনোচিত আচরণ করলে সে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় গ্রহণ করে। জুলুম করলে সে সবর করে, কেউ তার অধিকারের ক্ষেত্রে বেইনসাফী করলে সে ইনসাফের দণ্ড হস্তচ্যুত হতে দেয় না। আল্লাহ ভিন্ন কারো আশ্রয় ভিক্ষা করতে সে রাযী হয়

না এবং অন্য কারোর নিকট সে সাহায্যপ্রার্থীও হয় না। জনসমাবেশে সে মর্যাদাবান এবং নির্জনে শোকর-গুযার। আল্লাহ্প্রদত্ত রিযক্ লাভে সে তৃপ্ত, সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশের মধ্যে কৃতজ্ঞ, সংকট ও পরীক্ষার মুহূর্তে ধৈর্যশীল, গাফিলদের মধ্যে যি্করকারী এবং যি্করকারীদের মধ্যে ইস্তিগফারে লিপ্ত। এসবই ছিল আসহাব-ই-রাসূল (সা)-এর শান। নিজ দর্জা ও মর্তবা মাফিক যতদিন তাঁরা দুনিয়াতে ছিলেন এইরূপ শান-শওকতের সাথেই ছিলেন এবং যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন– এইরূপ শান-শওকতের সাথেই বিদায় নিয়েছেন। মুসলমনেরা! তোমাদের পূর্বপুরুষগণের এটাই ছিল নমুনা। যখন তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে তাঁর কায়-কারবার বদলে দিলে তখন আল্লাহ পাকও তোমাদের সঙ্গে তাঁর কায়-কারবার বদলে দিলেন।

"আল্লাহ্ পাক কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে। আর কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তা রদ করবার কেউ নেই এবং তিনি ছাড়া ওদের কোন অভিভাবক নেই।"

অপর এক ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে স্মরণ করতে যেয়ে এবং সূরা আল-ফুরক্বান-এর সেই আয়াতসমূহের তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে, যেখানে মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেন ঃ

ان المؤمنين لما جائتهم هذه الدعوة من الله صدقوا بها وافضى يقينها الى قلوبهم وابدانهم وابصارهم، كنت والله اذا رائيتهم رائيت قوما كانهم رأى عين، والله ما كانوا باهل جدل ولا باطل ولكنهم جاءهم امر عن الله فصدقوا به فنعتهم الله فى القران احسن نعت قال "وَعِبَادُ الرَّحْمنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلى الاَرْضِ هَوْنًا" – والهون فى كلام العرب اللين والسكينة والوقار "وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَمًا" حلماء لا يجهلون وان جهل عليهم حلموا يصاحبون عباد الله نهارهم بما يسمعون ثم ذكر ليلهم خير ليل فقال "وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا" ينتصبون لله على اقدامهم ويفترشون وجوههم سجداً لربهم تجرى دموعهم على خدودهم فرقا من ربهم لامر ماسهروا ليلهم ولامر ما خشعوا نهارهم قال "اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ – اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا"– وكل شئ يصيب ابن ادم ثم يزول عنه فليس بغرام، انما الغرام اللازم له، ما دامت السموت والارض – صدق القوم والله الذى لا اله الا هو فعملوا وانتم تتمنون، فاياكم وهذه الامانى رحمكم الله فان الله لم يعط عبدا بامنيته شيئا فى الدنيا والاخرة .

১. আল-হাসান বসরী—ইব্ন জওযীকৃত, ৬৯-০ পৃ.

(প্রথম যুগের) মু'মিনদের কানে যখনই আল্লাহ্‌র এই আহ্বান গিয়ে পৌঁছুল তখনই তাঁরা এর সত্যতার স্বীকৃতি জানালেন এবং এই ডাকে সাড়া দিলেন। তাঁদের অন্তর-মানস, তাঁদের দেহ ও চক্ষু আল্লাহ্‌র 'আজমত তথা শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরাটত্ব এবং আল্লাহ্‌র পরাক্রমের সামনে ঝুঁকে পড়ল। আল্লাহ্‌র কসম! আমি যখন তাঁদের দেখতাম– তখন পরিষ্কার মনে হ'ত যে, দীনের হাকীকত ও অদৃশ্য জগতের বিষয়াদি সব যেন তাঁদের চোখে দেখা। অন্যায় তর্ক-বিতর্ক ও অনর্থক কথাবার্তার সঙ্গে তাঁদের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না। তাঁদের নিকটে তো আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কেবল একটি জিনিসই পৌঁছেছিল এবং তাঁরা তা মেনে নিয়েছিলেন। আল্লাহ্ পাক কুরআন মজীদে তাঁদের সর্বোত্তম চরিত্র চিত্রণ করেছেন এবং প্রশংসা-গীতি গেয়েছেন। আল্লাহ্‌পাক বলেন ঃ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا .

"আর 'রাহ্‌মানের' বান্দাহ্ তারাই যারা যমীনের বুকে বিনম্রভাবে চলাফেরা করে।" 'আয়াতে "هونا" শব্দটি এসেছে। هون শব্দের অর্থ 'আরবী ভাষায়– নম্রতা, কোমলতা, শান্তি, তৃপ্তি ও মর্যাদা। অতঃপর আল্লাহ্‌পাক বলেন ঃ

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا ،

"আর জাহেল লোকেরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে, শান্তি, শান্তি!" অর্থাৎ তাঁরা সংযমী ও ধৈর্যশীল, তাঁরা মূর্খতার কাজ থেকে দূরে সরে থাকে। আর কেউ যদি তাঁদের সাথে মূর্খতার আচরণও করে তবু তাঁদের ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও মর্যাদায় কোন ফারাক আসে না। এসব লোক আল্লাহ্‌র বান্দাদের সঙ্গে কাজের কথা শোনবার জন্য গোটা দিন কাটিয়ে দিত আর রাত কাটাত আল্লাহর 'ইবাদত-বন্দেগী তে। স্বয়ং আল্লাহ্ পাক এঁদের প্রশংসা করে বলছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا .

"আর সে সব লোক স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে সিজদাবনত ও দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করে।" আসলেই এসব লোক স্বীয় পদযুগলের ওপর দাঁড়িয়ে যায়, মুখমণ্ডল মাটির ওপর স্থাপন করে এবং সিজদায় পতিত হয়। তাঁদের গণ্ডদেশে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হয়। আল্লাহ্‌র ভয় তাঁদের আঁখি-যুগলকে অশ্রুভারাক্রান্ত করে রাখে। নিশ্চয় তাঁদের সামনে এমন কিছু ছিল যার জন্য তাঁরা বিনিদ্র রাত্রি যাপন করতেন। এমন কিছু ছিল যার কারণে তাঁরা দিনের বেলা ভয়-ভীতির মাঝে কাটাতেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ - اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا .

"আর সেই সব লোক যারা বলে ঃ হে আমাদের রব! আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব দূরীভূত কর; নিশ্চয় তাঁর আযাব বিরাট জরিমানাস্বরূপ এবং জানের জন্য্য বিপদ।" আয়াতের মধ্যে غرام শব্দ এসেছে। যে বিপদ-মুসীবত মানুষের সামনে এসে দেখা দেয়– আবার চলেও যায় তাকে আরবের লোকেরা غرام বলে না। غرام হচ্ছে এমন দুঃসহ বিপদ যা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মাথার ওপর ঝুলে থাকে। সেই আল্লাহ্র কসম! যিনি ভিন্ন আর কোন ইলাহ নেই, এই আল্লাহ্র বান্দারা (স্বীয় উক্তি ও ধর্মে) সত্যবাদিতা ও দৃঢ়তার প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁরা যা মুখে বলেছেন তার ওপর আমল করেছেন। কিন্তু আফসোস! তোমরা কেবল কামনা-বাসনার মায়া-মরীচিকার পেছনে দৌড়াচ্ছ। লোক সকল! তোমরা ফাঁপা আশা থেকে বিরত হও! তা এইজন্য যে, আল্লাহ্ কখনো কোন বান্দাকে কেবল তার আশা করার কারণে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন বস্তু দান করেন না।[১]

তিনি এই বক্তৃতার শেষে বললেন (এবং অধিকাংশ ওয়া'জের পর বলতেন) ঃ এই ওয়া'জ ও নসীহতের ভেতরে তো কোন জিনিসের কমতি নেই, তবে দিলের মধ্যেও প্রাণের স্পন্দন থাকতে হবে।

তাঁর সত্যকথন ও নির্ভীকতা

হযরত হাসান বসরী (র) কেবল কামালিয়াত, বাগ্মিতা, ভাষার অলঙ্কার, গভীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও বক্তৃতায়ই নয়, বরং সত্য কথনে, নির্ভীকতায়, নৈতিক সাহসে ও বীরত্বেও আপন যুগে বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি তৎকালীন খলীফা ইয়াযীদ ইবন 'আবদুল মালিক-এর প্রকাশ্যে ও খোলাখুলিভাবে সমালোচনা করেন। একবার তিনি দরস প্রদানকালে এক ব্যক্তি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হন, "এই যমানার 'ফিতনা' (ইয়াযীদ ইবনু'ল-মুহাল্লাব ও ইবনু'ল-আশ'আছ-এর উপদ্রব) সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?" তিনি বললেন, "তাদের সঙ্গে থেকো না, তাঁদেরকে সহযোগিতা ক'র না।" একজন সিরীয় তখন বলল, "আর আমীরু'ল-মুমিনীন-এর সঙ্গে?" এতদ্শ্রবণে তিনি ভীষণ ক্রোধান্বিত হন এবং হস্ত উত্তোলন করে বললেন, "হাঁ, আমীরু'ল-মু'মিনীন-এর সঙ্গেও নয়; হাঁ, আমীরু'ল-মু'মিনীন-এর সঙ্গেও নয়।"[২] হাজ্জাজের তলোয়ার ও নৃশংসতার কাহিনী সবার জানা। কিন্তু হাসান বসরী (র) তাঁর যুগেও সত্য প্রকাশে বিরত হননি।

১. কি'য়ামুল্লায়ল, ১২ পৃ. মুহাদ্দিছ ইব্‌ন নসর মুরূযী, –ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল-এর ছাত্র।
২. তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ৭ম খণ্ড–১১৮-১৯।

ইসলামী হুকুমতে নিফাক'-এর চিহ্ন ও মুনাফিক

ইসলামের রাজনৈতিক ও বস্তুগত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা লাভের পর মুসলিম রাষ্ট্রে এমন একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়, যারা ইসলাম কবুল করেছিল বটে, কিন্তু তাদের আচার-আচরণ তথা আমল-আখলাক, পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্র ও তাদের মন-মগজ পুরোপুরি ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। তাঁদের ভেতর হাকীকী ঈমান এবং ادخلوا فى السلم كافة (ইসলামে তোমরা পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ কর)–এর প্রতিফলন ঘটেনি। খোদ মুসলমানদের নতুন বংশধরদের মধ্যেও (যাদের পুরোপুরি ইসলামী তরবিয়ত হয়নি) এমন লোক ছিল যারা জাহেলী প্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র হতে পারেনি এবং ইসলামের সঙ্গে তাদের গভীর সম্পর্কও সৃষ্টি হয়নি। তাদের জীবনে আহকামে ইলাহী তথা ঐশী বিধান ও নির্দেশাবলীর বাস্তবায়ন ঘটেনি এবং আনুগত্য স্বীকারের স্বভাব-প্রকৃতিও সৃষ্টি হয়নি, অথচ এদেরই একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে জড়িত ও সম্পর্কিত হয়ে পড়েছিল।

আমীর-উমারা ও ধনিক শ্রেণীর ভেতরও এমন লোক ছিল যাদের মধ্যে প্রাচীন মুনাফিকদের আমল-আখলাক ও তাদের মেযাজ-মস্তিষ্কের প্রভাব পরিলক্ষিত হত। সত্যি কথা বলতে গেলে, রাজদরবারে, হুকুমতে, নেতৃস্থানীয় জায়গাগুলোতে, ফৌজে, হাটে-বাজারে এরাই প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং এদের জীবন যাপন পদ্ধতি সামাজিক ফ্যাশন হিসাবেও পরিগণিত হতে শুরু করেছিল।

কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত এই যে, নিফাকে'র চিহ্ন একটি বিশেষ সময়ের ব্যাপার এবং এটি এমন একটি রোগ যা রিসালাতের যুগে মদীনা তায়্যিবার একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হয়েছিল। ইসলামের সুস্পষ্ট বিজয় এবং কুফরী শক্তির পরাজয়ের পর তা খতম হয়ে যায়। দুই বিপরীত শক্তির পরস্পর দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের পর কেবল ইসলামই অবশিষ্ট থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এমন কোন গ্রুপের জন্ম নেবার সুযোগ বাকি থাকেনি, যা ঐ দুই শক্তির মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে। কাজে কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে শুধু প্রকাশ্য কুফর অথবা প্রকাশ্য ইসলাম। তাফসীর ও তারীখ গ্রন্থগুলোতে এ মতের সমর্থন মেলে।

মূলত ঐ সমস্ত ব্যক্তি একটি বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে গিয়েছিলেন। আর তা হ'ল 'নিফাক'' (কপটতা) মানবীয় ফিতরতের একটি দুর্বলতা ও ব্যাধি যা মানবীয় প্রকৃতির মতই সাধারণ ও পুরাতন। এই রোগ সৃষ্টি হবার জন্য এটা একেবারেই জরুরী নয় যে, ইসলাম ও কুফর– এই দুই শক্তি সব সময় বহাল থাকবে এবং তাদের মধ্যে মুকাবিলাও অব্যাহত থাকবে, বরং নির্ভেজাল ও খালিস ইসলামের

বিজয় ও প্রাধান্যকালেও এমন একটি দল সৃষ্টি হয়ে যায় যারা যে কোন কারণেই হোক, ইসলামকে হযম করতে পারে না এবং তা তাদের মন-মগজে আসন গাড়তে পারে না। কিন্তু তাদের মধ্যে এতখানি নৈতিক সাহসও জন্মায় না যে, তারা এর অস্বীকৃতি এবং এর সাথে তাদের সম্পর্কহীনতার কথা প্রকাশ করবে অথবা ব্যক্তিস্বার্থও তাদেরকে এ অনুমতি দেয় না যে, তারা ঐ সব কল্যাণ ও উপকারিতা থেকে সরে দাঁড়াবে যা ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে মুসলিম রাষ্ট্রে অথবা মুসলিম সমাজে তারা লাভ করছে। ফলে তারা সারাটা জীবন এই দ্বিমুখী ও দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থার মধ্যেই কাটায়। তাদের প্রবৃত্তিগত অবস্থা, তাদের আমল-আখলাক, তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক দুর্বলতা, তাদের সুযোগ-সন্ধানী মানসিকতা, সুখ-সম্ভোগ ও সৌন্দর্য উপভোগের আবেগ-অনুভূতি, পার্থিব মগ্নতা, পরলোক বিস্মৃতি, ক্ষমতাসীনদের সামনে অবনত মেযাজ এবং গরীব, অসহায় ও দুর্বলের প্রতি অত্যাচার প্রথম যুগের মুনাফিকদের আচার-ব্যবহারের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

নিফাক ও মুনাফিকদের নিশানদিহি

হযরত হসান বসরী (র)-এর এটি একটি বিরাট ধর্মীয় প্রতিভার পরিচায়ক ছিল যে, তিনি এই সত্য বেশ ভালভাবেই অনুধাবন করেছিলেন যে, নিফাক স্থিতিশীল এবং এখনো বিদ্যমান। মুনাফিকরা কেবল ধর্মীয় ক্ষেত্রে নয়, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করে আছে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও তাদের অধিকার কায়েম করে রেখেছে। তাদেরই কারণে শহরগুলো জমজমাট ও কোলাহলমুখর হয়ে আছে। কেউ কেউ তাঁকে বলেছিল ঃ এ যুগেও কি 'নিফাক'-এর অস্তিত্ব আছে? তিনি বলেছিলেন ঃ لوخرجوا من ازقة البصرة لاستوحشتم فيها –"মুনাফিকরা যদি বসরার গলি-ঘুপচি থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে শহরে তোমাদের মন টেকানো মুশকিল হয়ে পড়বে।"[১] অর্থাৎ শহরের অধিবাসীদের ভেতর তাদের সংখ্যাই বেশি, ইসলামের সাথে যাদের নাম মাত্র সম্পর্ক এবং যারা তাদের আমল ও আখলাকের দিক দিয়ে ইসলামী চরিত্র দ্বারা ভূষিত ও সজ্জিত নয়। তিনি অন্য একবার বলেছিলেন :

ياسبحان الله مالقيت هذه الامة منافق قهرها واستاثر عليها

আল্লাহ্র কি শান দেখুন! এই উম্মতের মধ্যেও এমন সব মুনাফিক প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে যারা ধ্বংসাত্মক রকমের স্বার্থপর।[২]

---

১. সি ফাতু'ন-নিফাক ওয়ায যম্মু'ল-মুনাফিকীন, মুহাদ্দিছ আবূ বকর ফারয়াবীকৃত, ৬৮ পৃ.।
২. ঐ, ৫৭ পৃ.।

শেষ যুগের 'আলিমগণের মধ্যে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র)-ও এই মতের অনুসারী যে, 'নিফাক' সকল যুগেই বিদ্যমান আছে এবং মুনাফিকদের অস্তিত্ব বিশেষ কোন যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। তাঁর মতে নিফাক' দু'ধরনের ঃ 'আকীদাগত নিফাক' এবং আমলী ও আখলাকী নিফাক'। রিসালত যুগ অতিক্রান্ত হওয়ায় অর্থাৎ ওয়াহী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 'আকীদাগত নিফাকে'র অকাট্য জ্ঞান আমাদের নেই; তবে আমলী ও আখলাকী নিফাক' সর্বত্রই প্রচুর দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি তাঁর যুগ সম্পর্কে বলেন যে, এই মুহূর্তে নিফাকে'র আধিক্য বর্তমান।

হাসান বসরী (র)-এর দা'ওয়াত ও সংস্কারের শক্তি ও প্রভাবের মধ্যে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, তিনি জীবনের এক-একটি দিক পাকড়াও করেছেন এবং সমাজের আসল রোগ কোথায়, সে দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। তাঁর যুগেও বহু ওয়া'ইজ ও দা'ঈ ছিলেন, কিন্তু তৎকালীন সমাজ কারো দা'ওয়াত বা ধর্মোপদেশকে সেভাবে গ্রহণ করেনি, যেভাবে হযরত হাসান বসরী (র)-এর দাওয়াতকে গ্রহণ করেছিল এবং তা এজন্য যে, তাঁর বক্তৃতামালা ও দর্স থেকে সেই যুগের বিগড়ে যাওয়া সমাজের ওপর সরাসরি চপেটাঘাত পড়ত; তিনি নিফাকে'র প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করতেন। নিফাক' এমন একটি রোগ যা সেই সমাজে বিস্তার লাভ করেছিল। তিনি মুনাফিক'দের চরিত্র ও অভ্যাসসমূহ বর্ণনা করতেন এবং সে ধরনের অভ্যাস ও চরিত্র অনেক লোকের মধ্যেই পাওয়া যেত যারা হুকুমত, ফৌজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রগামী ছিল এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই যাদের অস্তিত্ব অনুভব করা যেত। তিনি আখিরাত বিস্মৃতি ও পার্থিব কামনা-বাসনা তথা জাগতিক লোভ-লালসার প্রাবল্যের নিন্দা করতেন। সে যুগের অনেক লোকই এই সংক্রামক ব্যাধির শিকার ছিল। তিনি মৃত্যু ও (মৃত্যু-পরবর্তী) পারলৌকিক জীবনের ছবি আঁকতেন এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে শ্রোতার চোখের সামনে তা তুলে ধরতেন। গাফিল, বিত্তশালী ও প্রাচুর্যের অধিকারী লোকদের এমন একটি শ্রেণীর সে সময় জন্ম হয়েছিল যারা এ সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

মোট কথা, তাঁর দা'ওয়াত, তাঁর ওয়া'জ-নসীহত, তাঁর সংস্কারমূলক দর্স সে যুগের মন-মানসিকতা ও অন্যান্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে এতই সংঘর্ষমুখর ছিল যে, সে যুগের সমাজের পক্ষে তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা কিংবা সম্পর্কচ্যুত হয়ে থাকা মুশকিল হয়ে পড়েছিল। তাই অধিক হারে লোক তাঁর বক্তৃতামালা শুনত এবং তাদের পাপক্লিষ্ট মনে চোট লাগত। ফলে বিগত জীবনের অন্যায় কৃতকর্ম ও পাপ থেকে তারা তওবা করত এবং নতুন জীবন ইখতিয়ার করত। তিনি তাঁর

বক্তৃতামালা ও মজলিস থেকে দীন ও ঈমানের দিকে লোকদেরকে আহ্বান জানাতেন এবং স্বীয় সাহচর্য ও আমল দ্বারা তাদের আত্মাকেও প্রশিক্ষণ দিতেন। ষাট বছরের দীর্ঘ মুদ্দত তিনি এই দাওয়াত ও সংস্কার কর্মেই কাটিয়ে দেন। কত লোক যে তাঁর কারণে ঈমানের মিষ্টতা ও ইসলামের অপরূপ সত্য লাভ করেছে তা কেউ পরিমাপ করতে পারবে না।

'আওয়াম ইব্‌ন হাওশাব বলেন ঃ হাসান (র) ষাট বছর পর্যন্ত স্বীয় কওমের ভেতর সেই কাজটি করেছেন যা আম্বিয়া-ই-কিরাম (খতমে নবুওতের পূর্বে) নিজ উম্মতের মধ্যে করতেন।[১]

হাসান বসরী (র)-এর ওফাত ও তাঁর জনপ্রিয়তা

তাঁর নিষ্ঠা, ধর্মীয় নিবিষ্টতা, 'ইলমী ও রূহানী তথা জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক কামালিয়াতের এরূপ আছর ছিল যে, সারা বসরা ছিল তাঁর ভক্ত ও অনুরক্ত। ১১০ হিজরীতে যখন তাঁর ইনতিকাল হয় তখন গোটা শহর[২] তাঁর জানাযায় অনুগমন করে। বসরার ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম ঘটনা যে, গোটা জনবসতি কবরস্থানে চলে যাবার কারণে শহরের জামে মসজিদে সেদিন 'আসরের জামা'আত হতে পারেনি।[৩]

হাসান বসরী (র)-এর রূহানী ও 'ইল্‌মী স্থলাভিষিক্তগণ এবং নিজ নিজ যমানার দা'ঈরা আল্লাহ্‌র দিকে দা'ওয়াত, পারলৌকিক জীবনের দিকে আহ্বান এবং ঈমান ও আমলের দিকে দা'ওয়াত প্রদানের সিলসিলা জারী রাখেন। এর মাঝখানে তাঁরা কোনরূপ শূন্যতা সৃষ্টি হতে দেননি। হাসান বসরী (র)-এর ওফাতের ২২ বছর পর উমায়্যা খিলাফতের অবসান ঘটে এবং 'আব্বাসীয় খিলাফতের সূচনা হয়। দামিশকের পরিবর্তে বাগদাদ রাজধানীতে রূপান্তরিত হয় এবং পরিণত হয় গোটা প্রাচ্যের মনোযোগ কেন্দ্রে।

হুকূমতে বিপ্লব সাধনের প্রয়াস

এ সব সংস্কারমূলক প্রয়াস ও প্রচেষ্টা এবং দা'ওয়াত ও যিক্‌র-আযকারের ধারাবাহিকতার সঙ্গে এই প্রয়াসও অব্যাহত থাকে যে, খিলাফতকে তার সঠিক ও বিশুদ্ধ মারকাযের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হোক এবং সেসব ইজারাদারী খতম করে

১. দাইরাতুল-মা'আরিফ—বুস্তানীকৃত, ৭ম খণ্ড, ৪৪ পৃ.।

২. বসরা ছিল সে সময় ইরাকের বৃহত্তম শহর ও খিলাফতের রাজধানী। দামিশকের পর মুসলিম সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় স্তরের শহর হিসাবে গণ্য হ'ত।

৩. ইব্‌ন খাল্লিকান (হাসান বসরী)।

দেওয়া হোক যা উমায়্যা ও তাদের পর 'আব্বাসীয়রা কায়েম করে রেখেছে। দুর্ভাগ্যবশত খিলাফত গোত্রীয় ও বংশীয় ভিত্তির ওপর এমনভাবে কায়েম হয়ে গিয়েছিল যে, তার বিরুদ্ধে কোন কার্যকর আন্দোলন গড়ে তোলা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব ছিল না যতক্ষণ না তার সাথে বংশীয় আভিজাত্য ও উচ্চ খান্দানের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, যে সব লোক উমায়্যা ও 'আব্বাসীয় খিলাফতের বিরুদ্ধে জিহাদী পতাকা উত্তোলন করেছিলেন তাঁদের সম্পর্ক ছিল আহলে-বায়তের সঙ্গে। কেননা তাঁদেরই সাফল্য লাভের সম্ভাবনা ছিল বেশি। তাঁরা মুসলিম উম্মার ধর্মীয় প্রবণতার প্রতিনিধি-স্থানীয়ও ছিলেন এবং তাঁদের প্রতি মুসলমানদের ধর্মীয় মহল ও সংস্কারপ্রিয় জামা'আতের সহানুভূতি ও সমর্থনও ছিল।

কারবালার ঘটনার পরও নবী-বংশের বিভিন্ন লোক বিপ্লব সংঘটনের প্রয়াস চালান। সায়্যিদুনা হুসায়ন (তাঁর ও তাঁর পিতার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক)-এর পর তাঁর পৌত্র যায়দ ইবন 'আলী আল-হুসায়ন (র) হিশাম ইবন 'আবদুল মালিকের মুকাবিলায় জিহাদী পতাকা উত্তোলন করেন এবং ১২২ হিজরীতে শূলবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। ইমাম আবূ হানীফা (র) তাঁকে দশ হাযার দিরহাম পাঠান এবং তাঁর খিদমতে হাযির না হতে পারার কারণে ওযরখাহী পেশ করেন। তাঁর পর ইমাম হাসান (রা) বংশের হযরত মুহাম্মদ যু'ন্নাফসু'য-যাকিয়্যা (ইবনে 'আব্দুল্লাহ্ আল-মাহ্দ ইবনু'ল-হাসান আল-মুছান্না ইবন সায়্যিদুনা হাসান ইবনে 'আলী) মদীনা তায়্যিবাতে এবং তাঁর পরামর্শে তাঁর ভাই ইবরাহীম ইবন 'আবদুল্লাহ্ কূফাতে খলীফা মনসূরের বিরুদ্ধে জিহাদী পতাকা উত্তোলন করেন। ইমাম আবূ হানীফা[১] এবং ইমাম মালিক (র)[২] তাঁদের সমর্থক ও সহযোগী ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা (র) প্রকাশ্যে ও খোলাখুলিভাবে তাঁকে সমর্থন দেন এবং কিছু অর্থও তাঁর খিদমতে প্রেরণ করেন। তিনি মনসূরের ফৌজী অফিসার হাসান ইবন কাহতাবাকে ইবরাহীমের মুকাবিলায় নিরস্ত রাখেন এবং খলীফার নিকট সুপারিশ করে তাঁর ক্ষমা লাভের সুযোগ করে দেন।[৩] প্রথম জন ১৪৫ হিজরীতে কূফায় শহীদ হন।

১. মানাকি 'বে আবূ হানীফা, বাযারীকৃত, ১ম খণ্ড, ৫৫ পৃ.।

২. ইমাম মালিক মাদীনাবাসীদেরকে মুহাম্মদ যু'ন্নাফসু'য-যাকিয়ার বন্ধুত্ব ও আনুগত্যের ফতওয়া দিয়েছিলেন, যদিও তিনি নিজে মনসূরের বায়'আত করেছিলেন। -তারীখু'ল-কামিল, ৫ম খণ্ড, ২১৪ পৃ.।

৩. ঐতিহাসিকদের ধারণা, ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে মনসূর যে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তার কারণ বিচারপতির পদ গ্রহণে তাঁর অস্বীকৃতি নয়, বরং মুহাম্মদ ও ইবরাহীমের প্রতি তাঁর সমর্থন। কেননা এ বিষয়টি মনসূরের অজ্ঞাত ছিল না। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে দ্র. "ইমাম আবু হানীফা কী সিয়াসী যিন্দেগী"- সায়্যিদ মানাজির আহসান গিলানীকৃত ("ইমাম আবূ হানীফা" নামে বইটি ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে)।

বনী উমায়্যা ও বনূ 'আব্বাসের হুকুমতের ব্যাপক ব্যবস্থাপনার কারণে এসব প্রয়াস ব্যর্থ হলেও তাঁরা মুসলিম উম্মাহ্‌র ভেতর ভ্রান্ত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সাধনা ও সত্যকে সরবে ঘোষণা করবার একটি নজীর কায়েম করে যান। যদিও কার্যত তাঁরা সফল হতে পারেননি, কিন্তু তাঁদের প্রয়াসের এই মানসিক প্রভাব, কুরবানী এবং সংগ্রাম ও সাধনার এই ধারাবাহিকতার মূল্য মোটেই কম নয়। ইসলামী ইতিহাসের 'ইযযত-আবরূ ঐ সব পুরুষ-সিংহের বদৌলতেই কায়েম রয়েছে– যাঁরা অন্যায় ও ভ্রান্ত কর্তৃত্বের কাছে এবং বস্তুগত প্রেরণা ও আকর্ষণের সামনে আত্মসমর্পণ করেননি এবং যাঁরা সঠিক উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যের জন্য দেহের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত দান করেছেন।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ .

"মু'মিনদের ভেতর কেউ কেউ আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে" (সূরা আহযব, ২৩ আয়াত)।

তৃতীয় অধ্যায়

'আব্বাসীয় খিলাফত এবং ধর্মীয় দা'ওয়াত ও আলোচনা

'আব্বাসীয় খিলাফত ও তার প্রভাব

'আব্বাসীয় খিলাফত উমায়্যা খিলাফতের পুরোপুরি স্থলাভিষিক্ত ছিল। সেই দুনিয়াদারীর রূহ, সেই ব্যক্তিতান্ত্রিক ও মৌরুসী সাম্রাজ্যের রীতিনীতি ও আইন-কানুন, বায়তুল মালের সেই বল্গাহীন অপব্যবহার, সেই আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতাপ্রবণতা; সর্বক্ষেত্রে ছিল এই দুই খিলাফতের মধ্যে অদ্ভুত মিল। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, উমায়্যাদের সাম্রাজ্যে ও তাদের কালের সমাজে আরবীয় রূহ কার্যকর ছিল; কিন্তু 'আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে অনারব রূহ তথা অনারব জাতিগোষ্ঠী ও সভ্যতার রোগ-ব্যাধি ও দোষ-ত্রুটিগুলো সমাজে ঢুকে পড়েছিল। 'আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের আয়তন এতটা বেড়ে যায় যে, খলীফা হারূনুর রশীদ একবার এক খণ্ড মেঘ দেখে অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে বলেছিলেন ঃ

امطری حیث شئت فسیأتی خراجك .

অর্থাৎ "তোমার যেখানে ইচ্ছা গিয়ে বারি বর্ষণ কর, কারণ তোমার উৎপাদিত ফসলের রাজস্ব শেষাবধি আমার কাছেই আসবে।"

ইব্ন খালদূনের পরিমাপ মুতাবিক 'আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের বার্ষিক আমদানী ছিল খলীফা হারূনুর-রশীদের যমানায় সাত হাজার পাঁচ শ' কিনতার (সাত কোটি দেড় লক্ষ দীনার অর্থাৎ একত্রিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ রুপিয়া)-এর অধিক[১]– যা সে যুগের হিসাবে একটি বিরাট অংকের অর্থ। খলীফা মামুনের যমানায় এ ক্ষেত্রে আরো সমৃদ্ধি ঘটে। বিরাট অংকের আমদানি রাজস্বের অধিকারী এবং তৎকালীন দুনিয়ার সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের রাজধানী হবার কারণে সারা দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ, গোটা দুনিয়ার জ্ঞানী-গুণী, শিল্পী-গায়ক, দাসদাসী, পারিষদ-মোসাহেব, কবি-সাহিত্যিক, সৎ ও অসৎ তথা সর্বশ্রেণীর মানুষের ঢল চতুর্দিক থেকে এসে নেমেছিল বাগদাদে। সম্পদের প্রাচুর্য ও অনারব লোকজনের অবাধ প্রবেশের ফলে সাংস্কৃতিক ভ্রষ্টতা তথা সাংস্কৃতিক বাড়াবাড়ি দারু'স-সালাম বা মুসলিম কেন্দ্রে শুরু হয়ে গিয়েছিল।[২] সম্পদের ছড়াছড়ি, অর্থের মূল্যহীনতা

১. মুকাদ্দিমা ইবন খালদূন, ১৫১ পৃ.।
২. বিস্তারিত জানতে দ্র. কিতাবুল-হ'ায়ওয়ান (জাহিজ), ৩য় খণ্ড, ৯১ পৃ.; ৫ম খণ্ড, ১১৫ পৃ.।

এবং সে যুগের তমদ্দুন ও বিলাসিতার পরিমাপ করবার জন্য ইতিহাসে মামূনের বিবাহের বর্ণনা পড়ে দেখাই যথেষ্ট হবে। ঐতিহাসিক লিখেন ঃ

> মামূন শাহী খান্দান, সাম্রাজ্যের সদস্যবর্গ, সমস্ত ফৌজ, রাষ্ট্রীয় কর্মচারী ও খাদেমকুলসহ উযীরে আজম হাসান ইবন সহল (যাঁর কন্যার সঙ্গে মামূনের বিয়ে হচ্ছিল)-এর মেহমান হন এবং একাধারে উনিশ দিন পর্যন্ত এই বিরাট বরযাত্রীদলকে এমন উন্নতমানের বদান্যতার সাথে মেহমানদারী করা হয় যে, দেশের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর মানুষটিও কয়েকদিনের জন্য আমীরানা জীবন যাপন করার সুযোগ পায়। হাশিমী খান্দান, ফৌজের অফিসারবৃন্দ ও সাম্রাজ্যের সকল পদাধিকারী ব্যক্তিবৃন্দের ওপর মিশ্‌ক ও আম্বরের হাযার হাযার গুলি ছিটান হয়। গুলিগুলো ছিল কাগজে লেপ্টানো এবং তাতে নগদ অর্থ, দাসদাসী, ভূ-সম্পত্তি, খেলাত, ঘোড়া, জায়গীর প্রভৃতির উপহারের পরিমাণ লিপিবদ্ধ ছিল। খোলাখুলি নির্দেশ ছিল যে, যার হিস্যায় যে গুলি পড়বে তাতে যা লেখা রয়েছে তা সেই মুহূর্তেই ভাণ্ডার-তত্ত্বাবধায়ক তাকে দিয়ে দেবে। সাধারণ লোকজনের ওপরও মিশক 'আম্বরের গুলি এবং দিরহাম ও দীনার ছিটানো হয়। মামূনের জন্য স্বর্ণ-সূত্রের তৈরী একটি দামী ও সুদৃশ্য ফরাশ বিছানো হয়; তাতে মুক্তা ও য়াকূত খচিত ছিল। মামূন যখন তার ওপর উপবেশন করেন তখন দামী ও মূল্যবান মোতি তাঁর পদদ্বয়ের ওপর ছিটানো হয় যা যরীন-ফরাশের ওপর বিক্ষিপ্ত হয়ে এক চিত্তাকর্ষক দৃশ্যের অবতারণা করে।[১]

বাগদাদে আল্লাহ্‌র দা'ঈ

কিন্তু বাগদাদে এই আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসিতার মাঝেও এমন কিছু মহান ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল যাঁরা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানে, তাযকিয়ায়ে নফস ও 'ইলমে দীনের প্রচার-প্রসারে এবং শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দানের মধ্যে সার্বক্ষণিক নিমগ্ন ছিলেন। তাঁরা শহরের হাঙ্গামা এবং জীবনের সকল চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর বিষয়াবলী থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে নিয়েছিলেন এবং এই উম্মতের রূহ ও আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কের পুঁজি এবং ইসলামী জীবন যিন্দেগীর উৎসের (কুরআন ও হাদীছ-এর) হেফাজতে ব্যস্ত ছিলেন। হুকুমত কোনমতেই তাঁদের চিনতে পারেনি এবং দুনিয়ার কোন আকর্ষণই তাঁদেরকে নিজ কাজ থেকে হটাতে পারেনি। বস্তুবাদের এই উত্তাল সমুদ্রে তাঁরা ছিলেন এমন মানবীয়

১. আল-মা'মূন, মাওলানা শিবলী নু'মানীকৃত, ১৫৭ পৃ.- ইবন খালদূন, আবুল-ফিদা, ইব্‌নু'ল-আছীর, ইবন খাল্লিকান-এর উদ্ধৃতিসহ।

ীপমালা যেখানে ডুবন্ত ব্যক্তি এসে আশ্রয় নিত। তাঁরা বাগদাদে বস্তুবাদী ও ভাগ-বিলাসপূর্ণ জীবনের পাশাপাশি একটি খালেস ঈমানী ও রূহানী জীবনও গয়েম করে রেখেছিলেন। তাঁরা তাঁদের শক্তি ও বিস্তৃতির ক্ষেত্রে বস্তুবাদী ও াজনৈতিক জীবনধারীদের পেছনে ছিলেন না। খলীফা, আমীর-উমারা ও ওযীরদের নিয়ন্ত্রণ সাধারণ মানুষের দেহের ওপর চললেও তাদের মন-মস্তিষ্কের ওপর চলত ঐ মহান ব্যক্তিদের শাসন। আর যখন ঐ দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ দখা দিত তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহান ব্যক্তিদের প্রাধান্য প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত 'ত। তৎকালীন খলীফা হারূনুর-রশীদ শাহী জাঁকজমক ও জৌলুসের সঙ্গে রুক্কা ামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় সেখানে হাদীছশাস্ত্রের মশহূর ইমাম র্দে সালিহ হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র)-এর আগমন ঘটে। শহরের গাটা অধিবাসী তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে পড়ে। ফলে খলীফা নিঃসঙ্গ হয়ে াড়েন। লোকের ভীড় এত প্রচণ্ড ছিল যে, ধাক্কাধাক্কিতে অনেকেরই পা থেকে ুতা ছিটকে যায়। খলীফা হারূনের একজন দাসী খলীফার বালাখানা থেকে শ্যেটি দেখছিল। সে এর কারণ কি তা জানতে চায়। লোকেরা বলে যে, ুরাসানের একজন 'আলিম এসেছেন; তাঁর নাম 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক। সে লে, "এটাই বাদশাহী, হারূনেরটা নয়। কেননা তাঁর বাদশাহী পুলিশ ও াইক-পেয়াদা ছাড়া মোটেই জমে না।"

এই ছিল বাগদাদে ঈমানী ও 'ইলমী যিন্দেগীর অবস্থা। সেখানে যেমন মারাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও ধন-দৌলতের ধুম পড়েছিল, তেমনি তা ইল্ম-আমল, তাকওয়া-পরহেযগারী এবং দা'ওয়াত ও ইসলাহেরও সর্ববৃহৎ ারকাযে (কেন্দ্র) পরিণত হয়েছিল। তাবাকাত ও অন্যান্য গ্রন্থ দৃষ্টে তো এটাই ানে হয় যে, বাগদাদে তখন 'আলিম ও সালিহ বান্দা ছাড়া আর কেউ বসবাস করত না এবং قال الله وقال الرسول ভিন্ন আর কোন আওয়াযই তখন উঠত না। এই ধর্মীয় রওনক এবং দীন ও ইসলাহের এই সমৃদ্ধি ঐসব মুজাহিদ বান্দার াাস-প্রশ্বাসের কারণেই ছিল যাঁরা এই কর্মটিকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন। এই সিলসিলায় সুফিয়ান ছওরী, ফুযায়ল ইবন 'আয়ায, জুনায়দ াগদাদী, মা'রূফ কারখী, বাশার হাফী প্রমুখের নাম সর্বাধিক খ্যাত ও মালোকোজ্জ্বল। ঐসব হযরতের আমল-আখলাক, সত্যিকার খোদাভীতি, নিঃস্বার্থ ুহ্দ ও যিন্দেগী, পার্থিব জগত থেকে মুখাপেক্ষীহীনতা, ত্যাগ ও উৎসর্গ এবং নিঃস্বার্থ খিদমতে খাল্ক ও ঈমানী অবস্থা মুসলিম জনপদের ওপরও প্রভাব ফলত। তাঁদের ব্যক্তিসত্তা দ্বারা ইসলামী সম্ভ্রম কায়েম ছিল। এর ফল হয়েছিল

এই যে, তাঁদের উপদেশ ও বক্তৃতা শ্রবণে এবং তাঁদের আমল ও আখলাক দৃষ্টে বিপুল সংখ্যক য়াহূদী, 'ঈসায়ী (খৃস্টান), অগ্নি-পূজারী ও সাবিঈ ইসলামে দীক্ষিত হয়।[১]

১. তারীখ-ই-বাগদাদ (খতীব বাগদাদী), হিলয়্যাতুল-আওলিয়া (আবু ন'ঈম) ও তারীখ-ই ইব্‌ন খাল্লিকান।

চতুর্থ অধ্যায়

হাদীছ ও ফিক্‌হ সংকলন

মুসলিম উম্মাহ্‌র দুটো তাৎক্ষণিক প্রয়োজন

মুসলিম উম্মার রূহ', তার চরিত্র ও আখলাকের হেফাজতের সঙ্গে (যার সিলসিলা বরাবর অব্যাহত ছিল) উম্মার সামাজিক জীবন ও সামাজিক রীতিনীতি, পারস্পরিক লেনদেন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতির হেফাজতেরও প্রয়োজন ছিল। এ ক্ষেত্রে নিশ্চয়তার প্রয়োজন ছিল যে, তা ভবিষ্যতেও ইসলামের মূলনীতি ও আইন-কানুন মুতাবিক হবে। যে সময় এশিয়া, আফ্রিকা ও য়ূরোপের একটি অংশ (স্পেন) ইসলামের তত্ত্বাবধান ও অভিভাবকত্বে ছিল, মুসলিম সাম্রাজ্য তৎকালীন বিশ্বে সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক আয়তনবিশিষ্ট ছিল যা বিশ্বের সুসংস্কৃত ও সভ্যতম রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। ফলে নিত্য-নতুন অবস্থা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছিল মুসলমানেরা। ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শাসিতদের নিকট থেকে জিযয়া ও রাজস্ব আদায়সহ নব-বিজিত রাষ্ট্রগুলোর নিত্য নতুন সমস্যাদি ক্রমেই সামনে এসে দেখা দিচ্ছিল। প্রাচীন অভ্যাস ও প্রচলিত রীতিনীতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ আরো অনেক নতুন বিষয় ইসলামী হুকুম-আহকামের ভিত্তিতে ফয়সালার অপেক্ষায় ছিল। এ সবের কোনটিরই আবশ্যকতা এড়িয়ে যাবার মত ছিল না কিংবা একটু নজর বুলিয়ে এগুলোকে পাশ কাটিয়ে যাবার মতও ছিল না। হুকুমত বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের প্রার্থী ছিল। হুকুমতের ব্যবস্থাপনা-মেশিনারী থামিয়ে রাখা যায় না। যদি ইসলামী আইন-কানুন বা বিধি-বিধান প্রণয়ন ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটত তাহলে রোমক কিংবা পারসিক আইন দিয়ে কাজ চালাতে হ'ত। ফলে অবস্থা তাই হ'ত যা এই সময়কার নামে মাত্র ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে 'উলামায়ে কিরামের সামান্যতম গাফিলতি, সুন্নাহ্‌র রক্ষকদের মেধাগত আলস্য ও আরামপ্রিয়তা এই উম্মাহ্‌কে হাযারো বছরের জন্য ইসলামী সমাজ ও তার সামাজিক আইন-কানুনের বরকত থেকে মাহরূম করে দিত।

یک لحظه غافل بودم صد ساله راهم دور شد .

সে সময় দু'টো বিষয়ের দিকে তাৎক্ষণিক মনোযোগ দেবার প্রয়োজন ছিল। একটি হ'ল, হাদীছ ও সুন্নাহর মূল্যবান পুঁজি সংকলন ও সংরক্ষণ করা,

বিভিন্নভাবে যা মুহাদ্দিছীন-ই-কিরামের বক্ষে এবং লিখিতভাবেও নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।[১] এটি নতুন সমস্যাবলী খুঁজে বের করার একটি বড় মাধ্যম এবং ইসলামী ফিক্'হশাস্ত্রের একটি বিরাট উৎস। এটি উম্মার ইসলামী মেযাজে এবং তার যিন্দেগীর ইসলামী ছাঁচের হেফাজতেরও মাধ্যম। হাদীছ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বাধিক বিস্তৃত, নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ চরিতমালা (سيرت)। এটি নবী যুগের তেইশ্‌টি বছরের এক ধরনের রোয-নামচা যা অপর কোন নবীর উম্মতের ভাগ্যে জোটেনি। এটি বিনষ্ট হয়ে যাওয়া জ্ঞান ও ধর্মের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু নয়। এতদ্ভিন্ন এর মধ্যে নিহিত রয়েছে উম্মতের নৈতিক ও চারিত্রিক সংস্কার, মিতাচার, বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা, যুহ্‌দ ও তাক'ওয়া এবং পরিবর্তন ও বিপ্লবে উৎসাহদানকারী বিরাট শক্তি। এরই প্রভাবে প্রতিটি যুগে ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিকগণ জন্ম নিতে থাকবেন এবং প্রতিটি যুগের মুসলিম সোসাইটির শর'ঈ ও আখলাকী হিসাব-নিকাশ হতে থাকবে। এরই মাধ্যমে প্রতিটি যুগ ও প্রতিটি স্তরের বিদ'আতের মুকাবিলা করা হবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হ'ল, ফিক্'হের একত্রীকরণ ও সম্পাদন এবং মসলা-মাসাইল তথা শর'ঈ সমস্যাসমূহ খুঁজে বের করা ও ইজতিহাদ করা। কুরআন হাদীছে জীবনের প্রতিটি শাখা ও প্রতিটি বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় মূলনীতি ও আদর্শ বিদ্যমান। এসব থাকতে অন্য কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই। জীবন পরিবর্তনশীল। মানুষের অবস্থা ও তার আবশ্যকীয় বিষয়াদি সীমাহীন বৈচিত্র্যে ভরা। উল্লিখিত মূলনীতি ও আদর্শের আলোকে জীবনের প্রতিটি নতুন অবস্থা ও পরিস্থিতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ইজতিহাদ ও ইসতিম্বাতের আবশ্যক ছিল।

হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলন

ইসলামের আবির্ভাবের ক্ষেত্র হিসাবে সেই দেশ ও সেই জাতিগোষ্ঠীকে নির্বাচন করা হয় যারা তাদের সত্য কথন, আমানতদারী ও স্মৃতিশক্তির জন্য সারা বিশ্বে বিখ্যাত ছিল। সাহাবায়ে কিরাম (রা) যা কিছু দেখেছেন, যা কিছু শুনেছেন,

১. হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ তাবি'ঈদের যুগ থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই সিলসিলায় হযরত ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর মনোযোগ ও আগ্রহের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় শতাব্দীতেই হাদীছের বিভিন্ন সংকলন তৈরি হয়ে গিয়েছিল যার মধ্যে ইব্‌ন শিহাব যুহরী (জন্ম ১২৪ হি.), ইব্‌ন জুরায়জ মক্কী (জন্ম ১৫০ হি.), ইব্‌ন ইসহাক (জন্ম ১৫১ হি.), সা'ঈদ ইব্‌ন 'আরূবা মাদানী (জন্ম ১৫৬ হি.), মা'মার য়ামানী (জন্ম ১৫৩ হি.), রবী' ইব্‌ন সবীহ (জন্ম ১৬০ হি.) প্রমুখের সংকলন বিশেষরূপে খ্যাত। একে অধিকতর 'ইল্‌মী ও উন্নতমানের আঙ্গিক ও কাঠামোয় আঞ্জাম দেওয়ার দরকার ছিল।

তা হৃদয়ে গেঁথে নিয়েছেন এবং এতটুকু কম-বেশি না করে তা পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। অপরাপর কওম ও জাতিগোষ্ঠী স্ব স্ব পয়গম্বরদের মূর্তি নির্মাণ করেছে এবং তাঁদের ছবি অংকন করেছে। ইসলামে মূর্তি নির্মাণ ও প্রাণীর ছবি অংকন হারাম। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম (রা) আঁ-হযরত (সা)-এর আকৃতি-প্রকৃতি (শামাইল) ও আচার-অভ্যাসের এমন সব জীবন্ত চিত্র তাঁদের বর্ণনায় ধরে রেখেছেন যার বর্তমানে কোন ছবি অংকনের আবশ্যক হয় না। তাঁদের বর্ণিত এই ছবি সকল প্রকার খারাপ ও অকল্যাণ থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

মুহাদ্দিছীনে কিরামের উন্নত মনোবল ও কঠোর পরিশ্রম

অতঃপর সেই সব বর্ণনার হেফাজত ও বর্ণনার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা উন্নত মনোবলের অধিকারী, প্রাণবন্ত, বিদ্যোৎসাহী এমন শত শত বিদ্যার্থী যুগিয়ে দিয়েছেন যাঁরা স্মৃতিশক্তি ও মেধার ক্ষেত্রে ছিলেন নজীরবিহীন। তাঁরা অনারব দেশগুলো থেকে দলে দলে ধেয়ে এসেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের দিলে হাদীছের এমনি 'ইশ্ক পয়দা করে দিয়েছিলেন যে, সে কারণে নিশ্চিন্তে আরামের সঙ্গে দু'দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকাটাও তাঁদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সকল জায়গা থেকে 'ইল্ম হাসিল করা এবং স্বীয় বক্ষ ও লেখনীতে তা রক্ষণাবেক্ষণ করার মধ্যেই তাঁরা মগ্ন ছিলেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে ও পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের ভেতর এই 'ইশ্ক ও নিবিষ্টতার এবং এই সতর্কতা ও আমানতদারীর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। হাদীছ সংগ্রহ করা এবং প্রতিটি রিওয়ায়াত তাঁর বর্ণনাকারী (রাবী) থেকে শোনবার জন্য তাঁরা ইসলামী বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ইমাম বুখারী চৌদ্দ বছর বয়সে এতদুদ্দেশ্যে ভ্রমণ শুরু করেন। বুখারা থেকে মিসর পর্যন্ত সকল রাষ্ট্র তিনি চিরুণীর ন্যায় আঁচড়ে ফেলেন। আবূ হাতিম রাযী বলেন, "আমি তিন হাযার ফারসাখের (নয় হাযার মাইল) বেশি দুরত্ব পদব্রজে অতিক্রম করি। এরপর আমি মাইলের হিসাব গণনা করা ছেড়ে দিই।" স্পেনের মুহাদ্দিছ ইব্ন হায়ওয়ান স্পেন, ইরাক, হিজায ও য়ামানের শায়খগণের থেকে হাদীছ গ্রহণ করেন। মোট কথা, তিনি তুঞ্জা থেকে সুয়েজ পর্যন্ত গোটা আফ্রিকা মহাদেশ, অতঃপর লোহিত সাগর পাড়ি দেন। মুহাদ্দিছীনে কিরামের সফরনামা তিনটি মহাদেশ– এশিয়া, আফ্রিকা, য়ূরোপ (স্পেন)-কে কেন্দ্র করে আবর্তিত।[১] সেই সময়কার সভ্য, সংস্কৃত ও

১. এসব উদাহরণ "উলামায়ে সলফ" (মওলনা হাবীবুর রহমন খান শেরওয়ানী মরহূম) থেকে গৃহীত। বিস্তারিত জানতে চাইলে দ্র. গ্রন্থের "সফর" শিরনামের নিবন্ধ।

পরিচিত বিশ্বের দূর-প্রতীচ্য (স্পেন) থেকে নিয়ে দূর-প্রাচ্য (খুরাসান) পর্যন্ত সফর করা এবং শহরে শহরে টহল দিয়ে বেড়ানো তাঁদের জন্য একটি মামুলী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আসমাউ'র-রিজাল শাস্ত্র

ঐ সব আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা কেবল হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলন করাকেই যথেষ্ট মনে করেননি, এর মধ্যবর্তী মাধ্যমগুলোও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা ঐ সমস্ত 'রাবী'র নাম-ধাম, জীবনেতিহাস, আমল- আখলাক ও আচার-অভ্যাসকেও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন যাঁদের মাধ্যমে এসব বর্ণনা তাঁদের কাছে পৌঁছেছে। এভাবে যে সব মহান ব্যক্তিদের সম্পর্কে ورفعنا لك ذكرك -এর ওয়াদা ও খোশখবর ছিল– তাঁদের বদৌলতে লাখো বান্দার জীবন দিবালোকে এসে যায়। আর উল্লিখিত ধারায় হাদীছ ও তার রিওয়ায়াতসমূহের সংকলন ও সম্পাদনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই একটি নতুন 'ইল্ম "আসমউ'র-রিজাল" তথা রিজালশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। জ্ঞানের এই শাখা মুহাদ্দিছীনে কিরামের বুলন্দ হিম্মত, জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিবিষ্টচিত্ততা, বিশ্লেষণী শক্তি ও যিম্মাদারীর অনুভূতির আলোকোজ্জ্বল উদাহরণ, এই উম্মার এটি একটি গৌরবজনক কৃতিত্ব। ড. স্প্রেঙ্গার তাঁর الاصابة فى احوال الصحابة। (হাফিজ ইবন হ'জার)-এর ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকায়[১] যথার্থই বলেছেন ঃ

> আজ পর্যন্ত দুনিয়ায় এমন কোন জাতিগোষ্ঠী দেখা যায়নি, এমন কি বর্তমানেও নেই যারা মুসলমানদের মত "আসমাউ'র-রিজাল"-এর ন্যায় একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন শাস্ত্রের আবিষ্কার করেছেন যার বদৌলতে আজ আমরা পাঁচ লক্ষ লোকের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারছি। ২

মুহাদ্দিছীনে কিরামের সতর্কতা ও আমানতদারী

মুহাদ্দিছগণ কেবল হাদীছ বর্ণনাকারী লোকদের (রাবীগণের) জীবন-বৃত্তান্ত একত্র ও সংরক্ষিতই করেননি, তাঁদের আচার-আচরণ (আখলাক), শক্তি ও দুর্বলতা, সাধুতা ও তাক'ওয়া এবং 'ইলম ও স্মৃতিশক্তি সম্পর্কেও তাঁদের সমসাময়িকদের বর্ণনা, বিবৃতি ও সর্বপ্রকার তথ্যাদি একত্র করে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে কারো ব্যাপারে কোনরূপ আনুকূল্য কিংবা দয়া প্রদর্শন করা হয়নি, চাই কি

---
১. কলিকাতায় মুদ্রিত–১৮৫৩-৬৪ ঈসায়ী।
২. খুতবাত-ই-মাদ্রাজ, মাওলনা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী।

তাঁরা তাঁদের যুগের শাসকই হোন অথবা সমসাময়িক কালের বড় যাহিদই হোন।

তাঁরা রাবীগণের যাচাই-বাছাই ও বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এতখানি সততা ও নির্ভীকতার সঙ্গে কাজ করেছেন যে, সে সব ঘটনা আজ ইসলামের গৌরবময় ঘটনা হিসাবে বিবেচিত। রাবীগণের মধ্যে বড় বড় খলীফা ও আমীর-উমারাও ছিলেন যাঁদের ক্ষমতার দাপট ছিল অপ্রতিহত। কিন্তু মুহাদ্দিছীন-ই-কিরাম এতটুকু ভীত না হয়ে সবারই বাহ্যিক দিকগুলো প্রকাশ্য দিবালোকে এনেছেন এবং গোপন ও প্রচ্ছন্ন দিকগুলোর নেকাব উন্মোচন করেছেন। তাঁরা তাঁদেরকে সে দর্জাই দিয়েছেন, যা প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রাপ্য। ইমাম ওকী' ছিলেন একজন বড় মুহাদ্দিছ, কিন্তু তাঁর পিতা ছিলেন একজন সরকারী খাজাঞ্চী। ফলে তিনি যখন স্বয়ং তাঁর পিতা থেকে কোন হাদীছ রিওয়ায়েত করতেন তখন তার সমর্থনে অপর কাউকে অবশ্যই তাঁর সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন অর্থাৎ এককভাবে তাঁর পিতার রিওয়ায়েতকে তিনি নির্ভরযোগ্য মনে করতেন না। এরূপ সতর্কতা ও সত্য-প্রীতির দৃষ্টান্ত সত্যি বিরল।[১]

ইমাম মু'আয ইব্‌ন মু'আয এমন একজন উঁচুদরের মুহাদ্দিছ ও বুযুর্গ ছিলেন যে, এক ব্যক্তি তাঁকে দশ হাযার দীনার– যার মূল্য আজ দশ হাযার গিনিরও অধিক– কেবল এ কথার বিনিময়ে পেশ করতে চান যে, 'আদল তথা ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে অমুক ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য কিংবা নির্ভরযোগ্য নয়– সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলবেন না অর্থাৎ তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকবেন। তিনি আশরফীর সেই থলি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন ঃ আমি কোন সত্যকে লুকাতে পারি না।[২] ইতিহাস কি এর চেয়ে অধিক সতর্কতা, সততা ও সাধুতার কোন দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারবে?[৩]

স্মৃতিশক্তি ও ধীশক্তি

মুহাদ্দিছীন-ই-কিরামের এই জামা'আত ছিল ইরান ও তুর্কিস্তানের সর্বোত্তম মেধা সম্পদ (دماغی جوهر)। তাঁরা বংশগতভাবে খুবই সুস্থ, সবল, পরিশ্রমী, উন্নত মনোবলসম্পন্ন, জ্ঞানতাপস ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। স্মৃতিশক্তির ওপর আস্থা ও স্মৃতিশক্তির ব্যাপক চর্চার ফলে (গোটা মানবীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় যা লালন-পালন ও অনুশীলনী দ্বারা অস্বাভাবিক রকম

---

১. তাহযীবু'ত-তাহযীব, ১১শ খণ্ড, ১৩০ পৃ।
২. ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৩১ পৃ.।
৩. খুতবাতে মাদ্রাজ, ৫৯-৬০ পৃ.।

শক্তিশালী হয়ে যায়) তা এমন আশ্চর্যজনক নমুনা পেশ করত যা দুর্বল ও কমযো স্মৃতির এই নির্ভেজাল কিতাবী যুগে কতক সময় বুদ্ধির অগম্য বলে মনে হয়। কি ইতিহাস এ ধরনের ঘটনাবলীর ক্রমিক ও ধারাবাহিক সাক্ষ্য প্রদান করে, অভিজ্ঞত এর অনুকূলে রায় দেয় এবং এর সম্ভাবনার সত্যতা স্বীকার করে। এসবের 'ইল্ম তাওযীহ' তথা জ্ঞানগত বর্ণনানুক্রমিক তালিকা পেশ করা কঠিন কিছু নয়। ব্যাপ চর্চা, অনুশীলন ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রেম ও আকর্ষণ এমন শক্তি সৃষ্টি করে এব মেধা স্থানান্তরের এমন সব নমুনা প্রকাশিত হতে থাকে যা এর সঙ্গে সম্পর্কহী ব্যক্তিবর্গের কাছে বিস্ময়কর ঠেকবে বৈকি!

ইমাম বুখারী যখন বাগদাদ আগমন করেন তখন বাগদাদের 'আলিমকু তাঁকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত উপায় উদ্ভাবন করেন : তারা এক শ হাদীছের সনদ ও মতন (মূল বর্ণনা) উল্টে-পাল্টে দেন, এক হাদীছের সনদ অপ হাদীছের মতনের সঙ্গে ও এক হাদীছের মতন অপর হাদীছের সনদের সঙ্গে জুড়ে দেন এবং তাঁকে (বুখারীকে) প্রশ্ন করবার জন্য দশ-দশটি হাদীছ একএকজ লোকের হাওয়ালা করেন। ইমাম বুখারী মজলিসে আগমন করলে এক একজ ব্যক্তি দশ-দশটি করে হাদীছ শোনান এবং এসব হাদীছ সম্পর্কে তাঁর মতাম জানতে চান। তিনি এগুলো শুনতেন এবং বলতেন, "আমি এসব হাদীছ সম্প ওয়াকিফহাল নই।" যাঁরা জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন তাঁরা এই রহস্য উপলব্ধি করে এবং অজ্ঞ লোকেরা তাঁর এই অজ্ঞতাদৃষ্টে মুচকি হাসে। যখন সকলেই নিজ নি অংশের হাদীছ শুনিয়ে শেষ করলেন তখন ইমাম বুখারী পালাক্রমে এক-একজনের প্রতি মনঃসংযোগ করেন এবং বলেন, "আপনি যে দশটি হাদীছ আমাকে শুনিয়েছিলেন তার মতন এই এবং তার সনদ এই।" তিনি সকলের পেশকৃত হাদীছই সহীহ করে দেন এবং যে সনদের যে মতন এবং যে মতনের যে সনদ তা সঠিকভাবে বর্ণনা করেন। লোকে তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি, উপস্থিত বুদ্ধি ও অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি দৃষ্টে থ হয়ে যায়।[১]

দর্স-এর মজলিসে লোকের ভীড়

উপরিউক্ত কারণেই জনগণের মধ্যে মুহাদ্দিছীন-ই-কিরামের দর্স ও রিওয়ায়াতের মজলিসে শরীক হবার উদগ্র আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এসব মজলিসে উপস্থিতির সংখ্যা হাযারের কোঠা অতিক্রম করত এবং বাদশাহদের দরবার থেকেও সে সব মজলিসে অধিক নীরবতা ও শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করত।

---

১. ফতহুল্‌'ল-বারী--মুকদ্দামা, পৃ. ৪৯২।

ইমাম 'আসিম ইব্‌ন আলী হাদীছের শ্রুতলিপি প্রদানের উদ্দেশ্যে বাগদাদের বাইরে নাখলিস্তানে (খর্জুর বৃক্ষপূর্ণ স্থান) একটি উচ্চ চবুতরার ওপর উপবেশন করতেন। খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ একবার তাঁর এক বিশ্বস্ত লোককে উক্ত মজলিসে শরীক লোকজনের পরিমাণ নির্ধারণ করবার জন্য পাঠান। সেখানে তখন প্রায় এক লক্ষ চব্বিশ হাযারের মত শ্রোতা ছিল। আহমদ ইব্‌ন জা'ফর বর্ণনা করেন যে, যখন আবূ মুসলিম বাগদাদে আসেন তখন রুহবা গাসসান নামীয় স্থানে তিনি হাদীছের শ্রুতলিপি দেন। সাত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে একে অপরকে শায়খ (র)-এর রিওয়ায়াত পৌঁছাতে থাকে এবং অন্যরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা লিখতে থাকে। দোয়াত গুণে বোঝা গেল, লেখকদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাযার। যারা লিখছিল না, শুধু শ্রোতা ছিল, তারা এই গণনার বাইরে। সে যুগের শায়খ ফারয়াবী বাগদাদে হাদীছের শ্রুতলিপি প্রদান করেন। তিনশ' ব্যক্তি এই শ্রুতলিপি সাধারণ লেখক ও শ্রোতা পর্যন্ত পৌঁছে দেবার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল। উপস্থিতির সংখ্যা ছিল তিরিশ হাযারের মত। ফারয়াবীর নিকট দশ হাযার লোক শিক্ষা গ্রহণ করতে আসত এবং তারা সকলেই দোয়াত কলম নিয়ে বসত।[১] ফ্রেবারি বর্ণনা করেন যে, ইমাম বুখারীর জামি' সহীহ তাঁর নিকট থেকেই নব্বই হাযার লোক শুনেছে।[২]

সিহাহ সিত্তা

এই উৎসাহ-উদ্দীপনা, এই মগ্নতা, এই প্রতিযোগিতা ও উদ্বেলিত প্রেরণা হিকমতশূন্য ছিল না। এর ফল এই দাঁড়ায় যে, হাদীছের এমন একটি নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পুঁজি জমা হয়ে যায় যা এই উম্মতের একটি বিরাট বড় সম্পদ, ইসলাহ ও তাজদীদ তথা সংশোধন ও সংস্কারের একটি বিরাট শক্তিশালী মাধ্যম। এই পুঁজির ভেতরে ইমাম বুখারীর সহীহ বুখারী ও ইমাম মুসলিমের সহীহ মুসলিম (যেগুলোকে অধিকাংশ সময় 'স'হ'হি'য়ন বা দু'টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ নামে স্মরণ করা হয়) আর যে সমস্ত হাদীছ উক্ত দু'জন ইমাম রিওয়ায়াত করেছেন সেগুলোকে বলা হয় "মুত্তাফাকু'ন 'আলায়হি" (এই হাদীছগুলো সর্বোত্তম মর্যাদাসম্পন্ন) সর্বাধিক বিশিষ্ট ও উন্নতমানের।[৩] এ দু'টির পর ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা', ইমাম

---

১. 'উলামায়ে সল্‌ফ, তাযকিরাতু'ল-হুফফাজ ও তা'রীখ-ই-ইব্‌ন খাল্লিকানের বরাতে।

২. ফতহুল বারীর মুকাদ্দিমা, ৪৯২ পৃ.।

৩. শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র) হু'জ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগ'ায় বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে বলেনঃ اما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وانهما متواتران الى مصنفيهما وانه كل من يهون امرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. মুহাদ্দিছীন কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, উক্ত (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন।)

তিরমিযীর জামি', ইমাম আবূ দাউদ সিজিস্তানীর সুনানে আবী দাউদ, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম ইব্ন মাজার সংকলনগুলো নিজস্ব অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের কারণে সবিশেষ মর্যাদার অধিকারী। পরবর্তীকালের সংশোধনমূলক প্রয়াস ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে মুহাদ্দিছীন-ই-কিরামের ঐসব প্রাথমিক মেহনতের বিরাট বড় হিস্যা রয়েছে। আজও কোন চিন্তাশীল ও শক্তিশালী সংস্কার আন্দোলন ও ধর্মীয় ইনকিলাব প্রচেষ্টা এই কার্যকর সম্পদ-ভাণ্ডারের দিকদর্শন ছাড়া পরিচালিত হতে পারে না এবং তা ফলপ্রসূও হতে পারে না।

ফিক্'হশাস্ত্র সংকলন

ফিক্'হশাস্ত্রের সংকলন, মসলা-মাসায়েলের সমাধান তথা ফতওয়ার বিন্যাস ইসলামের একটি বাস্তব প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল। ইসলাম জাযীরাতু'ল-'আরব (আরব উপদ্বীপ) থেকে বহির্গত হয়ে শাম, ইরাক, মিসর, ইরান ও অন্যান্য বিস্তৃত ও উর্বর ভূ-খণ্ডে পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে সামাজিকতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সব কিছুই বিস্তৃত ও জটিল আকার ধারণ করে। ঐসব নিত্য নতুন অবস্থা ও সমস্যার ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতির প্রয়োগ ও পথ প্রদর্শনের জন্য উন্নত প্রতিভা, যে কোন ব্যাপার উপলব্ধি করবার মত ক্ষমতা, সূক্ষ্মদর্শিতা, জীবন ও সমাজ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান, মানবীয় প্রবৃত্তি ও তার দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিতি, কওমের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণী এবং জীবনের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে জ্ঞান, ইসলাম পূর্বকালের ইতিহাস ও রিওয়ায়াত এবং শরীয়তের রূহ' সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, নবী যুগ ও সাহাবায়ে কিরামের যমানার অবস্থাদি সম্পর্কে পূর্ণ অবহিতি এবং ইসলামের মূল জ্ঞানভাণ্ডার (কুরআন, হাদীছ, অভিধান ও ব্যাকরণের নিয়মাবলী)-এর ওপর পূর্ণ দখল থাকার প্রয়োজন অবশ্যই ছিল।

ইমাম চতুষ্টয় ও তাঁদের বৈশিষ্ট্য

এটি আল্লাহ্র একটি বিরাট দান (ফযল) এবং এই উম্মতের জন্য এক বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল যে, এই বিরাট ও মহান কাজের জন্য এমন সব লোক ময়দানে অবতরণ করেন যাঁরা মেধা ও প্রতিভা, সাধুতা, ইখলাস ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইতিহাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য। এঁদের মধ্যে আবার চার ব্যক্তি— ইমাম

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর) দু'টি কিতাবে যতগুলো মুত্তাসিল, মরফু' রিওয়ায়াত আছে তা নিশ্চিতরূপেই সহীহ এবং উক্ত দু'টি কিতাবের নিসবত স্বীয় গ্রন্থকারদের ধারাবাহিকতা দ্বারা প্রমাণিত এবং যে ব্যক্তি এই দু'টি কিতাবকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে সে বিদ'আতী এবং মু'মিন দলভুক্ত নয়।

আবূ হানীফা (মৃত্যু ১৫০ হি.), ইমাম মালিক (মৃ. ১৬৯ হি.), ইমাম শাফি'ঈ (মৃ. ২০৪ হি.) ও ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (মৃ ২৪১ হি.) ফিক্'হশাস্ত্রের চারটি চিন্তামূলক স্কুলের ইমাম ছিলেন। এদের ফিক্'হ এই মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলিম জাহানে গৃহীত ও প্রচলিত। আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক, আল্লাহ্‌র জন্যই সব কিছু– এই মানসিকতা, আইনের উপলব্ধি, জ্ঞানের মধ্যে মগ্নতা, নিবিষ্টচিত্ততা ও খিদমত তথা সেবার প্রেরণায় ছিল এঁদের হৃদয় ভরপুর। এই মনীষিগণ তাঁদের গোটা জীবন ও সমস্ত যোগ্যতা এই মহান উদ্দেশ্য ও এই গুরুত্বপূর্ণ খিদমতের জন্য ওয়াক্'ফ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা পার্থিব মর্যাদা, জাঁকজমক, স্বাদ-আহ্লাদ, আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক রাখেননি। ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে দু'বার বিচারপতির পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান, এমন কি (এই অস্বীকৃতির ফলে) জেলখানায় তাঁর ইনতিকাল হয়। ইমাম মালিক (র) একটি মসলা[১] প্রকাশ করার দায়ে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইমাম শাফি'ঈ (র) জীবনের একটি বড় অংশ দুঃখ-কষ্ট ও সংকটের মাঝে অতিবাহিত করেন এবং নিজের স্বাস্থ্য কুরবান করে দেন। ইমাম আহমদ তৎকালীন হুকুমতের ভ্রান্ত প্রবণতা এবং সরকারী মত ও পথের মুকাবিলা করেন এবং স্বীয় মত ও পথ তথা আহলে সুন্নাহ্‌র তরীকার ওপর পাহাড়ের ন্যায় অটল থাকেন। এঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে ও বিষয়ে একাকী এত বেশি কাজ করেছেন এবং মসলা-মাসায়েল ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এমন বিরাট ভাণ্ডার সৃষ্টি করে গেছেন যা বড় বড় সুসংগঠিত জামা'আত ও শিক্ষা সংস্থার পক্ষেও সহজসাধ্য নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র) তিরাশি হাযার মসলা নিজ মুখে বর্ণনা করেন যেগুলোর ভেতর আটত্রিশ হাযার 'ইবাদতের সাথে এবং পঁয়তাল্লিশ হাযার পারস্পরিক লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত।[২]

শামসু'ল-আইম্মা কারদারী লিখেছেন : ইমাম আবূ হানীফা (র) যে পরিমাণ মসলা সংকলন করেছিলেন তার সংখ্যা হবে ছয় লাখ।[৩] 'আল-মুদাওওয়ানা' নামক ইমাম মালিক (র)-এর ফতওয়ার সংকলনগ্রন্থে ছত্রিশ হাযার মসলা ছিল। ইমাম

---

১. মসলা এই ছিল যে, যবরদস্তিমূলকভাবে বা মজবুর অব ায় প্রদত্ত তালাক নির্ভরযোগ্য নয়। এই মসলার রাজনৈতিক দিক ছিল এই যে, খলীফাদের জন্য যেই বায়'আত নেওয়া হ'ত তাতে বলা হ'ত ঃ যদি বায়'আত ভাঙা হয় তাহলে বিবি তালাক হয়ে যাবে। যদি মজবুর অব ায় প্রদত্ত তালাক কোন মূল্য বহন না করে– তাহলে বায়'আতের হলফনামারও কোন গুরুত্ব থাকে না, থাকে না কোন শক্তি ও প্রভাব। এরই ভিত্তিতে হুকুমত ইমাম মালিক (র)-এর ফতওয়ায় অ ির হয়ে ওঠে এবং তাঁর প্রতি রূঢ় আচরণ করে।

২. ফজরু'ল-ইসলাম (মক্কীর মানাকি বে আবী হ ানীফার হাওয়ালাসহ, পৃ. ৯৬), ২য় খণ্ড, ১৮৮পৃ.।

৩. সীরাতু'ন-নু'মান (মাওলানা শিবলীকৃত), "ক ালাইদ 'উকূ 'দু'ল 'ইক 'য়ান" গ্রন্থের বরাতে।

শাফি'ঈ (র)-এর 'কিতাবু'ল-উম্ম' সাতটি বিরাট খণ্ডে বিভক্ত ছিল। আবূ বকর খাল্লাল (মৃ. ৩১১ হি.) ইমাম আহ'মদ (র)-এর মসলা-মাসাইল চল্লিশ খণ্ডে সংকলিত করেন।১

ইমাম চতুষ্টয়ের শিষ্য-শাগরিদ ও খলীফাবৃন্দ

অতঃপর ইমাম চতুষ্টয় এমন বিশিষ্ট সব শিষ্য-শাগরিদ লাভ করেন যাঁরা এই ভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ করেন এবং সেগুলো বিন্যাস ও বিন্যস্তকরণের কাজ অব্যাহত রাখেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর শাগরিদগণের মধ্যে ইমাম আবূ য়ূসুফ (র)-এর মত আইন বিষয়ক প্রতিভা দৃষ্টিগোচর হয়– যিনি হারূনুর-রশীদের বিশাল সাম্রাজ্যের কাযীউ'ল-কুযাত (প্রধান বিচারপতি)-এর দায়িত্ব লাভ করেন এবং ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতির ওপর 'কিতাবু'ল-খারাজ'-এর মত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করেন। এভাবেই তাঁর শাগরিদ মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর ন্যায় ফকীহ ও গ্রন্থ প্রণেতা এবং ইমাম যুফার (রা)-এর ন্যায় সুক্ষদর্শী তার্কিকও ছিলেন, যাঁরা হানাফী ফিক্'হকে সমৃদ্ধ ও গৌরবোজ্জ্বল আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইমাম মালিক (র) 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহ্ব, 'আবদুর রহমান ইব্নু'ল-কাসিম, আশহাব ইব্ন 'আবদুল আযীয, 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদুল হিকাম, ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া আল-লায়ছীর ন্যায় বিশ্বস্ত শাগরিদ ও বিখ্যাত 'আলিম লাভ করেন, যাঁদের প্রচেষ্টায় মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় মালিকী ফিক্'হ বিস্তার লাভ করে। ইমাম শাফি'ঈ (র) বুওয়ায়তী, মুযানী ও রবী'র ন্যায় পরিশ্রমী ও প্রতিভাবান শাগরিদ লাভ করেন যাঁরা শাফি'ঈ ফিক্'হ প্রণয়ন ও বিন্যস্ত করেন। ইমাম আহমদ (র)-এর ফিক্'হ ইব্ন কু'দামার ন্যায় গ্রন্থকার ও মুহাক্কিক 'আলিম লাভ করে যিনি "আল-মুগ'নী"র মত 'আজীমুশ্বান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যা ইসলামী ফিক্'হের বিস্তৃত ভাণ্ডারে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে।

ফিক্'হ সংকলনের ফায়দা

ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে ফিক্'হশাস্ত্রের এই সব ইমাম ও মুজতাহিদ 'আলিম-'উলামার আবির্ভাব এই ধর্মের জীবনীশক্তি এবং উম্মতের কৃতিত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড ও যোগ্যতারই দলীল। তাঁদের প্রচেষ্টা ও মেধা দ্বারা মুসলিম উম্মার কর্মমুখর ও পারস্পরিক লেনদেন সম্পর্কিত জীবনে একটি শৃঙ্খলা ও ঐক্যের

---

১. এই গ্রন্থের নাম আল-জামি'উল-'উলূম লি ইমাম আহ'মদ। আবূ বকর খাল্লালের সম্পর্কে জানতে শায'রাতু'য'-য'াহাব ফী আখবার মিনা'য'-য'াহাব দ্র. ২য় খণ্ড, ৩৬১ পৃ.।

সৃষ্টি হয় এবং মানসিক বিক্ষিপ্ততা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যস্ত অবস্থার হাত থেকে এই উম্মাহ্ রক্ষা পায়। তাঁরা ফিক্'হশাস্ত্রের এমন মযবুত বুনিয়াদ কায়েম করেন এবং এমন মূলনীতি প্রণয়ন ও বিন্যস্ত করেন যেগুলোর মধ্যে পরবর্তীতে আগত মসলা-মাসাইল ও অসুবিধাদির সমাধান এবং সাধারণ ভারসাম্যপূর্ণ জীবনকে নিয়মিত ও শর'ঈ নেতৃত্বের নির্দেশনায় পরিচালনা করার পথ-নির্দেশ রয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

খাল্ক*-ই-কুরআনের ফিতনা এবং ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)

ঐশী-দর্শন, তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সংক্রান্ত বাহাছ

দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমেই গ্রীক দর্শনের সঙ্গে মুসলমানদের পরিচয় ঘটে। এই দর্শন কেবল কতিপয় অনুমান ও কষ্ট-কল্পনার একটা জগা-খিচুড়ি ও শব্দসমষ্টির একটি মোহনীয় ইন্দ্রজাল ছাড়া কিছুই ছিল না। না ছিল এর কোন হাকীকত ও আসলীয়ত, আর না ছিল এর কোন বাস্তব ও মৌলিক ভিত্তি। এমনি একটি দর্শনের পক্ষে একটি অসীম সত্তার বাস্তবতা ও গুণাবলীর বর্ণনা দেওয়া কি সম্ভব? আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর বিষয়টি কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মিশ্রণ ও যোগফল এবং কোন জ্ঞানগর্ভ সূক্ষ্ম আলোচনা ও কষ্ট-কল্পনার বিষয় নয়। এ ব্যাপারে মানুষের জ্ঞানের মাধ্যম কেবল আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের দেয়া তথ্য তথা আল্লাহ্‌র প্রেরিত ওয়াহী অর্থাৎ ওয়াহী দ্বারাই কেবল আল্লাহ্‌র সঠিক পরিচয় এবং তাঁর সিফাত বা গুণাবলীর হাকীকত জানা যেতে পারে। মুসলমানদের নিকট কুরআন ও হাদীছ আকারে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত জ্ঞান বর্তমান ছিল এবং তাদের এই অলাভজনক পেশার (ঐশী সংক্রান্ত বাহাছ-মুবাহাছার) আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না। সাহাবায়ে কিরাম, তাবি'ঈন, আইম্মায়ে দীন ও মুহাদ্দিছকুল এই পথ ও মতের ওপরই কায়েম ছিলেন এবং মুসলমানদের সমগ্র মনোযোগ ইসলামের দা'ওয়াত ও জিহাদ, কর্মজীবনের সমস্যাদির সমাধান, উপকারী ও কল্যাণকর জ্ঞানের উদ্ভাবন ও সংকলনকার্যে ব্যস্ত ছিল। যখন গ্রীক ও সুরিয়ানী গ্রন্থের তরজমা হ'ল এবং প্রাচীন ধর্ম ও রাষ্ট্রগুলোর জ্ঞানী-গুণী ও মুতাকাল্লিমদের সঙ্গে মুসলমানদের মেলামেশা শুরু হ'ল তখন মুসলিম উম্মার সেই অংশটি– যারা খুব তাড়াতাড়ি প্রভাবিত হবার মত, যাদের মেধা ও ধীশক্তির মধ্যে গভীরতা ও পরিপক্কতার স্থলে ছিল ভাসা-ভাসা জ্ঞান ও নতুনত্বের প্রতি আকর্ষণ– তারা উক্ত চিন্তাধারা, আলোচনা ও বিতর্ক পন্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর পরিণামে আল্লাহ তা'আলার যাত ও সিফাত তথা তাঁর সত্তা ও গুণাবলী, সেগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক, আল্লাহ্‌র কালাম, আল্লাহ্‌র দর্শন, ন্যায়বিচারের সমস্যা, তকদীর ও বাধ্যতামূলক ও ইচ্ছাধীন বিষয়াবলী সম্পর্কে এমন সব বিতর্ক ও মসলা-মাসাইলের

সৃষ্টি হয় যা না ধর্মের দিক দিয়ে জরুরী ছিল, আর না পার্থিব ও জাগতিক দিক দিয়েই উপকারী, বরং তা ছিল উম্মার ঐক্য ও সংহতি এবং মুসলমানদের কর্মশক্তির পক্ষে চরম ক্ষতিকর।

মু'তাযিলাদের উত্থান

ধর্মীয় দার্শনিকদের এই দলের নেতৃত্ব করছিলেন মু'তাযিলারা, যাঁরা তাঁদের যুগের 'প্রগতিশীল' জ্ঞানী ও আবেগোদ্দীপক মুতাকাল্লিম ছিলেন। তাঁরা জ্ঞানগত আলোচনা-সমালোচনাকে কুফ্র ও ঈমানের মানদণ্ডে পরিণত করেন এবং নিজেদের সমগ্র প্রতিভা ও মেধাকে ঐসব বাহাছ-মুবাহাছার মধ্যেই নিয়োজিত করেন। তাঁদের প্রতিপক্ষ ছিলেন মুহাদ্দিছ ও ফকীহগণ, যাঁরা এসব মসলার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বুযুর্গ ও মনীষীদের মতের সমর্থক ছিলেন। তাঁরা মুতাকাল্লিমদের বিতর্কমূলক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ বিষয়াবলীকে চরম ক্ষতিকর এবং তাদের টীকা-টিপ্পনীকে ভুল ও ভ্রান্ত মনে করতেন। খলীফা হারূনুর-রশীদের খিলাফত আমল পর্যন্ত মু'তাযিলাদের উত্থান ঘটেনি। খলীফা মা'মূনের যুগে, যিনি গ্রীক দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং বিশেষ রকমের প্রশিক্ষণ ও অবস্থার কারণে যাঁর মস্তিষ্কগত কাঠামোর সাথে মু'তাযিলাদের বেশ মিল ছিল– মু'তাযিলাদের উত্থান ঘটে। কাযী ইব্ন আবী দাউদের বদৌলতেও যিনি 'আব্বাসীয় সালতানাতের কাযীউ'ল-কুযাত (প্রধান বিচারপতি) ছিলেন এবং মু'তাযিলা মতবাদ ও চিন্তাধারার একজন উৎসাহী দা'ঈ ও মুবাল্লিগ ছিলেন– মু'তাযিলা মতবাদ হুকুমতের পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্য লাভ করে। মা'মূনের মধ্যে স্বয়ং দা'ওয়াতী রূহ', একজন দা'ঈর আবেগ-উদ্দীপনা ও তবলীগী জযবা বর্তমান ছিল। তাঁর ভেতর প্রতিভাবান ও ধীশক্তিসম্পন্ন যুবকের তাড়াহুড়ো স্বভাব[১] এবং স্বৈরাচারী একনায়কের জিদ– দু'টোরই সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁর দরবার ও মেযাজ-মর্জির ওপর মু'তাযিলা মতবাদ আসন গেড়ে বসেছিল।

খাল্ক'-ই-কুরআনের 'আকীদা[২] সে সময় মু'তাযিলাদের পরিচিতি এবং কুফ্র ও ঈমানের মাপকাঠিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। মুহাদ্দিছীন কিরাম এই মসলার

---

১. একবার তিনি হযরত 'আলী (রা)-এর ফযীলতের প্রকাশ্য ঘোষণা দেন যার জন্য বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। একবার তিনি মুত'আ বিয়ে জায়েয বলে এলান করেন। এরপর কাযীউ'ল-কুযাত ইয়াহয়া ইব্ন আকছাম তাঁকে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলে তিনি একে হারাম ঘোষণা করেন।

২. খালূক'-ই-কুরআন সংক্রান্ত আলোচনা ও বিতর্ক একটি বিশেষ জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক আলোচনা যার মস্তিষ্কজাত প্রভাবে (যেমন কতক মু'তাযিলাবাদী ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন) (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ক্ষেত্রে মু'তাযিলাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষ ছিলেন এবং তাঁদের পক্ষ থেকে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) এই মসলা-সংক্রান্ত যাবতীয় ঝুঁকি বুক পেতে নিয়েছিলেন।

ইমাম আহ্‌মদ ইবন হাম্বল (র)

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) ১৬৪ হিজরীর রবী'উ'ল-আওয়াল মাসে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নির্ভেজাল আরব বংশোদ্ভূত এবং শায়বানী গোত্রের লোক ছিলেন। ধৈর্য, মনোবল, সাহস, দৃঢ়তা ও অটুট সংকল্প ছিল এই গোত্রের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য।[১] তাঁর দাদা হাম্বল ইব্‌ন হেলাল বসরা থেকে খুরাসানে স্থানান্তরিত হন। উমায়্যা হুকুমতে তিনি সারাখ্‌স এলাকার শাসনকর্তাও ছিলেন। কিন্তু 'আব্বাসীয়রা যখন আহলে বায়ত ও বনী হাশিম-এর নামে খুরাসানে তাদের দা'ওয়াতের বিস্তার ঘটায় তখন তিনি এই দা'ওয়াতের প্রতি সহানুভূতিশীল হন। ইমাম আহমদের মাতা যখন মার্ভ থেকে বাগদাদ আগমন করেন তখন তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন। জন্মের পূর্বেই পিতা ইনতিকাল করেন। মাতা তাঁকে অত্যন্ত সাহসিকতা ও মনোবলের সঙ্গে লালন-পালন করেন। জীবিকা নির্বাহের জন্য নামকা-ওয়াস্তে সামান্য স্থাবর সম্পত্তি ছিল। এসব অবস্থা তাঁর ভেতর ধৈর্য, সহনশীলতা, অটুট মনোবল ও আত্মবিশ্বাসের ন্যায় অমূল্য গুণাবলীর সৃষ্টি করে। তিনি শৈশবেই কুরআন মজীদ হেফ্‌জ করেন এবং ভাষা শিক্ষা করেন। অতঃপর একটি দফতরে কাজ নেন। লেখা ও রচনার অনুশীলনীই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। মৌলিকত্ব ও যোগ্যতার 'আলামত শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে পরিস্ফুট ছিল। তাঁর চাচা বাগদাদের সংবাদলিপিকার ছিলেন। খলীফার অবর্তমানে তিনিই চিঠি-পত্রাদি লিখতেন এবং সংবাদাদি প্রেরণ করতেন। একবার তিনি একটি লিখিত লিপি তাঁর অল্প বয়সী ভাতিজার হাতে সোপর্দ করেন এবং নির্দিষ্ট এক ব্যক্তিকে তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বলেন। তিনি (ইমাম আহমদ) এই ধারণায় যে, এর ভেতর সম্ভবত

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর) কুরআন মজীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা এবং তাঁর শব্দগত ও অর্থগত দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র কালাম হবার 'আকীদা দুর্বল হয়ে যায়। মুহাদ্দিছীন কিরাম মু'তাযিলাদের সে সব ব্যাখ্যাকে গলদ এবং উম্মতের জন্য ক্ষতিকর মনে করতেন। এজন্য ইমাম আহমদ এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন। মু'তাযিলারা প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী এবং স্বাধীন মতামতের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন-কারী হিসাবে মশহূর ছিলেন। কিন্তু তাঁরা এ ব্যাপারে ভীষণ বাড়াবাড়ি, ধর্মীয় ক্ষেত্রে জোর-যবরদস্তি ও শক্তি প্রয়োগ করেন এবং নিজেদের অপরিণামদর্শিতা দ্বারা গোটা মুসলিম বিশ্বকে যুদ্ধক্ষেত্রে ও পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করেন। তাঁরা এই মসলার ব্যাপারে বিরোধীদের সঙ্গে সেই ব্যবহার করেন যা মধ্যযুগে গির্জার পাদরীকুল মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের সঙ্গে করেছিলেন। শেষাবধি এই শক্তি প্রয়োগ এবং তৎকালীন হুকুমতের পৃষ্ঠপোষকতাই মু'তাযিলা মতবাদ ও চিন্তাধারা খোদ মু'তাযিলাদের অধঃপতনের কারণ হয়।

১. সিদ্দিকী খিলাফতের প্রখ্যাত সিপাহসালার মুছান্না ইব্‌ন হারিছা (রা)-র সম্পর্ক এই গোত্রের সঙ্গেই ছিল।

বাগদাদবাসী সম্পর্কে অভিযোগ ও গোয়েন্দা রিপোর্ট রয়েছে, লিপিটি দজলা (টাইগ্রীস) নদীতে নিক্ষেপ করেন। যখন তিনি দফতরে চিঠি- পত্রাদি লেখার অনুশীলন করতেন তখন বহু মহিলা, যাদের স্বামী খলীফা হারূনুর রশীদের সঙ্গে ফৌজে বাইরে গিয়েছিল, তাঁকে দিয়ে চিঠি-পত্র পড়িয়ে নিত এবং জওয়াবও লিখিয়ে নিত। তিনি তাদের চিঠিপত্র লিখে দিতেন, কিন্তু যে সব চিঠির বিষয়বস্তুকে তিনি শরীয়তের কিংবা শালীনতার পরিপন্থী মনে করতেন– তা লিখতেন না। তাঁর তাক'ওয়া ও পবিত্রতা, যোগ্যতা ও মৌলকত্বের চিহ্ন দৃষ্টে সে যুগের একজন জ্ঞানী ব্যক্তি (হায়ছাম ইবন জামীল) বলেছিলেন যে, যদি এই যুবক বেঁচে থাকে তাহলে যুগের অধিবাসীদের জন্য স্বয়ং একটি দলীল হবে।[১]

ধর্মীয় 'ইল্‌ম-এর ভেতর তিনি হাদীছের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন। সর্বাগ্রে কাযী আবূ য়ূসুফ (র) থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন।[২] অতঃপর চার বছর পর্যন্ত বাগদাদে হাদীছের ইমাম হায়ছাম ইব্‌ন বশীর ইব্‌ন আবূ হাযিম আল-উস্তার নিকট (মৃত্যু ১৮২ হি.[৩]) শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময় হাদীছের মশহূর ইমাম 'আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী, আবূ বক্‌র ইব্‌ন 'আয়্যাশ (র) প্রমুখ থেকেও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। স্বীয় লক্ষ্যে তিনি কতখানি দৃঢ় ও তৎপর ছিলেন তা তাঁর মৌখিক উক্তি থেকেই পরিমাপ করা যায়। একদা তিনি বলেছিলেন ঃ আমি কোন কোনদিন হাদীছ শুনবার জন্য এত ভোরে শয্যা ত্যাগ করতাম যে, আমার মা আমার কাপড়ের প্রান্ত ধরে বলতেন ঃ কিছুটা অপেক্ষা কর, অন্তত আযান হয়ে যাক এবং চারদিক কিছুটা ফর্সা হয়ে উঠুক।

বাগদাদে শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি বসরা, হিজায, য়ামান, শাম ও জযীরা সফর করেন এবং এর প্রতিটি স্থান থেকেই হাদীছের সবক গ্রহণ করেন।

১৮৭ হি. তে হিজাযে ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর সঙ্গে তাঁর মোলাকাত হয়। এরপর বাগদাদে দ্বিতীয়বার মোলাকাত হয় যখন তিনি তাঁর উসূল (মূল নীতি) ও ফিক্‌'হসহ অনেক কিছুই সংকলন ও সম্পাদন করে ফেলেছিলেন। ইমাম আহমদ (র) তখন বেশ পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছিলেন। ইমাম শাফি'ঈ (র) হাদীছের সুস্থতা ও অসুস্থতার ব্যাপারে অধিকাংশ সময় তাঁর ওপর নির্ভর করতেন এবং বলতেন ঃ মুহাদ্দিছীনের নিকটে যে হাদীছটি বিশুদ্ধ ও সঠিক মনে হয় আমাকে সেটি বলে দেবেন, আমি তাই ইখতিয়ার করব।

---

১. তারীখ-ই-হাফিজ যাহাবী (তরজমা-ইমাম আহমদ আহমদ ইব্‌ন হাম্বল)।
২. মানাকিব লি ইব্‌ন আল-জাওযী, ২৩ পৃ.।
৩. ঐ, ২৩ পৃ.।

তিনি জরীর ইব্ন 'আবদুল হামীদ-এর নিকট থেকে হাদীছ শুনবার জন্য 'রে' (বর্তমান ইরানে) যাবার নিয়ত করেন। কিন্তু ব্যয় সংকুলানের মত অর্থ না থাকায় যেতে পারেননি। তিনি বলতেন, "আমার নিকট যদি ৯০টি দিরহামও থাকত তা হলেও আমি চলে যেতাম।" হাদীছ অনুসন্ধানের ব্যাপারে তাঁর উচ্চ মনোবলের পরিচয় এ থেকেও পাওয়া যাবে যে, ১৯৮ হি.-তে তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে হিজায গমন করেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর 'আবদুর রাযযাক ইব্ন হুমামের নিকট হাদীছ শুনবার জন্য য়ামানের সান'আ নামক স্থানে গমনের নিয়ত করেন এবং সহপাঠী ইয়াহয়া ইব্ন মা'ঈন-এর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনিও ঐ একই সংকল্প নেন। উভয়ে মক্কা গমন করেন। তাঁরা তাওয়াফে কদূম করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ 'আবদুর রাযযাক ইব্ন হুমাম তাঁদের দৃষ্টিপথে পতিত হন। ইব্ন মা'ঈন তাঁকে চিনতেন। তিনি সালাম পেশ করেন এবং ইমাম আহমদকে তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি তাঁর জন্য দু'আ' করেন এবং বলেন, "আমি তাঁর খুব তা'রীফ শুনেছি।" ইয়াহ্য়া ইব্ন মা'ঈন বলেন, "আমরা আগামীকাল আপনার খিদমতে হাযির হব এবং আপনার থেকে হাদীছ শুনব।" ইয়াহয়া চলে যাবার পর ইমাম আহমদ স্বীয় বন্ধুকে বলেন, "তুমি শায়খের সঙ্গে কেন ওয়াদাবদ্ধ হলে?" ইব্ন মা'ঈন বলেন, "হাদীছ শোনার এই সুযোগ পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় কর। কেননা তিনি তোমাকে গমনে এক মাসের দীর্ঘ সফর ও প্রত্যাবর্তনে আরো এক মাসের দীর্ঘ সফর এবং সেই সাথে বিরাট অংকের অর্থ ব্যয়ের হাত থেকে বাঁচালেন এবং শায়খকে এখানেই পৌঁছিয়ে দিলেন।" ইমাম আহমদ উত্তরে বলেন, "আল্লাহ্র নিকট আমি লজ্জাবোধ করছি এই ভেবে যে, হাদীছের জন্য সফরের নিয়ত করলাম, আবার তা ভেঙেও ফেললাম। আমরা নিশ্চয় য়ামান যাব এবং সেখানে গিয়েই হাদীছ শুনব।" অনন্তর তিনি হজ্জ উদ্‌যাপনের পর সান'আ গমন করেন এবং যুহরী ও ইবনু'ল-মুসায়্যিবের রিওয়ায়াতসমূহ (যা তিনি ইতোপূর্বে শোনেন নি) সেখানেই শ্রবণ করেন।[১]

উন্নত মনোবল, কঠোর পরিশ্রম, দীর্ঘ সফরের কষ্ট-সহিষ্ণুতা এবং অতুলনীয় স্মৃতিশক্তির ফলে তাঁর দশ লক্ষ হাদীছ মুখস্থ ছিল। বিস্তৃত জ্ঞান ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর ফিক্'হশাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান, মসলা ও তার সমাধান খুঁজে বের করবার পদ্ধতি ও অন্যান্য মেধা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি বলতেন ঃ ما رائيت عيناى مثله (আমার চোখ তাঁর মত আর

---

১. ইব্ন কাছীর ও ইব্ন জাওযী।

াউকে দেখেনি)। তিনি তাঁর (ইমাম শাফি'ঈর) কাছ থেকে ইজতিহাদের উসূল ়থা মূলনীতি আয়ত্ত করেন এবং এ ব্যাপারে যোগ্যতা ও পরিপক্কতা অর্জন রেন। শেষাবধি তিনি এই উম্মতের নামকরা সেই সব মুজতাহিদের মধ্যে রিগণিত হন যাঁদের ফিক্'হ্ আজও মুসলিম বিশ্বে জীবিত ও প্রচলিত। ইমাম ফি'ঈ (র)-ও তাঁর গুণের বড় কদর করতেন এবং স্বীকৃতি দিতেন। বাগদাদ থকে যাবার সময় তিনি বলেছিলেন ঃ

خرجت من بغداد وما خلفت بها اتقى وافقه من ابن حنبل .

অর্থাৎ "আমি এই অবস্থায় বাগদাদ পরিত্যাগ করছি যে, এখানে আহমদ ইব্ন হাম্বল অপেক্ষা অধিক মুত্তাকী ও ফকীহ্ আর কেউ নেই।"

চল্লিশ বছর বয়সে সম্ভবত ২০৪ হিজরীতে তিনি হাদীছের দর্স প্রদান রতে শুরু করেন। এটিও তাঁর সুন্নতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের পরিচায়ক ছিল যে, তনি চল্লিশ বছর বয়সে– যা নবুওত লাভের বয়স হিসাবে খ্যাত– প্রচার শুরু রেন।[১] প্রথম থেকেই তাঁর দর্স মাহফিলে ছাত্র ও শ্রোতৃবৃন্দের প্রচণ্ড ভীড় হ'ত। কতক বর্ণনাকারীর মতে তাঁর দর্স মাহফিলের শ্রোতার সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাযার ়'ত যাদের ভেতর লেখকের সংখ্যাই হ'ত পাঁচ শতের মত। তাঁর দর্স মাহফিল ুবই মর্যাদাপূর্ণ ও গম্ভীর হ'ত। কেউ সেখানে খেল-তামাশার কথা কিংবা হাল্কা ও টুল কাজ-কর্ম– যা হাদীছের মর্যাদার খেলাফ– কখনো করতে পারত না। তাঁর জলিসে আমীর-উমারা ও দুনিয়াদার লোকদের তুলনায় গরীব ও দীন-দরিদ্র লাকদের অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা ছিল। 'আল্লামা যাহাবী ইমাম আহমদের একজন বন্ধু ও সমসাময়িকের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

لم ار الفقير فى مجلس اعز منه فى مجلس الى عبد الله - كان مائا اليهم - مقصراً عن اهل الدنيا - وكان فيه حلم ولم يكن بالعجول - وكا كثير التواضع تعلوه السكينة والوقار اذا جلس فى مجلسه الفتيا بعد العصر لايتكلم حتى يسئال .

ইমাম আহমদের দর্সের মজলিসে গরীবের যে সম্মান ও মর্যাদা আমি দেখেছি– তা অন্য কোথাও দেখিনি। তিনি সর্বদা গরীবের প্রতি মনোযোগী থাকতেন এবং আমীর-উমারাকে উপেক্ষা করতেন। তিনি হিল্ম্ (ভদ্রতা, নম্রতা ও দয়া)-এর অধিকারী ছিলেন। তাঁর মেযাজে তাড়াহুড়ো ছিল না। অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র মেযাজের ছিলেন তিনি। তৃপ্তি ও মর্যাদা তাঁর চেহারায় পরিস্ফুট ছিল। 'আসরের পর যখন তিনি দর্স প্রদানের জন্য বসতেন–

. মুহাম্মদ আবূ যাহরাকৃত, ইব্ন হাম্বল, ৩৩-৩৪ পৃ.।

যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হ'ত— ততক্ষণ তিনি কোন আলোচনা করতে না।[১]

তাঁর জীবন ছিল পূর্ববর্তী বুযুর্গ ইমামদের ন্যায় দারিদ্র্য, যুহ্দ, আল্লাহ্র প্রতি তাওয়াক্কুল ও অল্পে তুষ্টির জীবন। তাঁর এই দারিদ্র্য ছিল ইচ্ছাকৃত। তিনি তৎকালীন কোন খলীফা কিংবা সুলতানের কোন দান গ্রহণ করেননি। তাঁর সন্তানেরা কখনও এই বিষয়টির ওপর আলাপ-আলোচনা করতে চাইলে তিনি বলতেন ঃ এই মাল হালাল, এর দ্বারা হজ্জ করাও দুরস্ত; একে আমি হারাম মনে করে নয়, বরং অধিকতর পরহেযগারী ও সতর্কতার কারণেই পরিত্যাগ করি। তিনি পরিশ্রম করে কিংবা পিতা ও পিতামহের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির আয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। এইরূপ দারিদ্র্য ও কষ্টেসৃষ্টের জীবন সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত দানশীল, মুক্তহস্ত ও উন্নত মনোবলের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলতেন ঃ যদি সারা দুনিয়া গুছিয়ে এসে একটি লুকমায় (গ্রাসে) পরিণত হয় এবং সেই লুকমাটি কোন মুসলমানের হাতে হয়, আর সেই মুসলমানটি উক্ত লুকমা অপর কোন মুসলমানের মুখে রেখে দেয়, তাহলে তা কোন মাত্রাধিক কাজ হবে না। তিনি কেবল সম্পদের বেলায়ই নয়— বরং নিজের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কেও খুবই উদার ও উন্নত মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। একবার এক লোক তাঁকে খুব বকা-ঝকা করে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে লজ্জিত হয় এবং তাঁর কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তখন তিনি বলেন ঃ যেখানে এই কথা হয়েছিল সেখান থেকে কদম ওঠাবার পূর্বেই আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি। খাল্ক'-ই কুরআনের ফিতনায় সকল দুশমনকে, এমন কি সে যুগের খলীফা, যার নির্দেশে তিনি কঠোরতম সাজা পেয়েছিলেন— তাকেও ক্ষমা করে দেন। তিনি বলতেন ঃ আমি বিদ'আতের দিকে আহ্বানকারী ছাড়া অন্য সবাইকে মাফ করি, এমন কি যারা আমাকে কষ্ট প্রদানের ক্ষেত্রে শরীক ছিল— তারাও আমার অভিযোগ থেকে মুক্ত। তিনি বলতেন ঃ "তোমাদের এতে কি লাভ যে, তোমাদের কারণে কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া হয়?"

এত সব কামালিয়াত ও গুণাবলীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কোনরূপ গর্বিত বাক্য তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হ'ত না। তাঁর সঙ্গী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন বলেন ঃ

ما رايت مثل احمد بن حنبل صحبته خمسين سنة ما افتخر علينا بشئ مما كان فيه من الصلاح والخير .

---

১. তরজমাতু'ল-ইমাম, ৩৫ পৃ.।

আমি আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের মত কোন লোক দেখিনি। আমি পঞ্চাশ বছর তাঁর সঙ্গী ছিলাম। তিনি কখনো আমাদের সামনে নিজের যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গর্ব করেন নি।[১]

তাঁর বিনয় ও নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখবার অবস্থা ছিল এই যে, যদিও তিনি উচ্চ বংশীয় আরব ছিলেন (এটা সে যুগে একটা বিরাট গর্বের বিষয় ছিল), তবু তিনি এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা মোটেই পছন্দ করতেন না। 'আল্লামা যাহাবী তাঁর একজন সমসাময়িক 'আলিম আবূ নু'মান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "আহমদ ইব্‌ন হাম্বল আমার নিকট তাঁর খরচের টাকা রেখে দিয়েছিলেন এবং আবশ্যক মত তিনি তা থেকে নিতেন। একদিন আমি তাঁকে বললাম ঃ আবূ 'আবদুল্লাহ! আমি জেনেছি যে, আপনি আরব। তিনি জওয়াব দিলেন ঃ يا ابا النعمان! نحن قوم مساكين ওহে আবূ নু'মান! আমরা বিত্তহীন গরীব মানুষ। আমি তাঁকে এ ব্যাপারে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলাম, কিন্তু তিনি বরাবরই উত্তর এড়িয়ে গেলেন, এমন কি কোন উত্তরই দিলেন না।"

খাল্‌ক'-ই-কুরআনের ফিতনায় তাঁর দৃঢ়-চিত্ততার কারণে গোটা মুসলিম জাহানে তাঁর ধর্মপরায়ণতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। লোকে তাঁর প্রশংসা করত এবং তাঁর দু'আ নিত। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি নিজ সত্তা সম্পর্কে সর্বদা ভীত থাকতেন। মুরূযী বলেন ঃ একদিন আমি তাঁকে বললাম যে, আপনাকে উপলক্ষ করে ব্যাপকভাবে দু'আ হচ্ছে। তিনি বললেন ঃ না জানি ইস্তিদরাজ[২] হয়, এই আমার আশঙ্কা। কেন, তুমি এটা কিভাবে বললে? আমি বললাম ঃ তরতাউস থেকে এক ব্যক্তির আগমন ঘটেছে। সে বলেছে, "আমরা রূম দেশে জিহাদ করছিলাম। রাত্রের নীরবতার মাঝে আহমদের জন্য দু'আর শব্দ ভেসে এল। কেউ যেন বলছে, আহমদের জন্য দু'আ কর। আমরা ইমাম আহমদের পক্ষ থেকে নিয়ত করে মিনজানীকও চালাতাম। একবার এমন হ'ল যে, শত্রুপক্ষীয় এক লোক কেল্লার দেওয়ালের ওপর দাঁড়িয়েছিল এবং তার ঢালকে আড়াল বানিয়ে রেখেছিল। আহমদের পক্ষ থেকে নিয়ত করে আমি মিনজানীক চালালাম। সঙ্গে সঙ্গে ঐ লোকটির মাথা ও ঢাল উড়ে গেল।" এই কথা শুনে ইমাম আহমদ (র)-এর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তিনি বলে ওঠেন ঃ আল্লাহ করুন, এ যেন ইস্তিদরাজ না হয়।

১. হি'লয়্যাতু'ল-আওলিয়া, ৯ম খণ্ড, ১৮১ পৃ.।
২. আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ঢিলা ও অবকাশপ্রাপ্ত কোন অপ্রিয় বদ 'আকীদাসম্পন্ন লোকের কারামত ও সৌন্দর্যের প্রকাশ।

তাঁকে দেখবার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে অমুসলিমরা পর্যন্ত ছুটে আসত একবার একজন 'ঈসায়ী (খৃস্টান) চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসার জন্য আসেন চিকিৎসক বললেন ঃ আমি কয়েক বছর যাবত আপনার যিয়ারত লাভের প্রত্যাশ ছিলাম। আপনার জীবন কেবল ইসলামের জন্য নয়, বরং গোটা সৃষ্টজগতের জন্য কল্যাণ ও বরকতের কারণ। আমাদের সকল বন্ধু-বান্ধব আপনার ওপর খুব খুশি মুরূযী বলেন যে, সে যখন চলে গেল তখন আমি আরয করলাম ঃ আমার ধারণা যে, গোটা ইসলামী বিশ্বে আপনার জন্য দু'আ হয়ে থাকে। তিনি বললেন, "ভাই মনুষের সামনে যখন তার নিজস্ব হাকীকত দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে যায়- তখন যে যা-ই বলুক- সে প্রতারিত হয় না।"[১]

আল্লাহ্ তা'আ লা তাঁকে বিনয় ও দারিদ্র্যের সাথে এই পরিমাণ প্রভাব ও মর্যাদা দান করেছিলেন যে, সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ ও সিপাহীরাও তাঁকে দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত এবং তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বাধ্য হ'ত। তাঁর এক সমসাময়িক বলেন ঃ আমি ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (নায়েব বাগদাদ) ও অমুক অমুক শাসকের নিকট গিয়েছি। কিন্তু আমি ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের চেয়ে অধিক প্রভাবশালী ও প্রতাপান্বিত আর কাউকে পাইনি। আমি একবার একটি মসলা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে যাই। আমার ওপর তাঁর ভয়াবহ ব্যক্তিত্বের এমনই প্রভাব পড়ে যে, আমি ভীত হয়ে পড়ি। তাঁর যুগের সকল নিষ্ঠাবান লোক তাঁর মর্যাদার স্বীকৃতি দিত এবং তাঁকে সমীহ করত। সে যুগের 'আলিম-'উলামা ও ইমামগণ তাঁর গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞানের কথা স্বীকার করতেন। মশহূর মুহাদ্দিছ ইবরাহীম আল-হারবী বলেন ঃ

رايت احمد بن حنبل فرأيت كان الله جمع له علم الاولين والاخرين من كل صنف يقول ماشاء ويمسك ماشاء .

আমি আহমদ ইব্ন হাম্বলকে দেখেছি। মনে হ'ত যেন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বক্ষে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল প্রকার জ্ঞান জমা করে দিয়েছেন। তিনি যা চাইতেন, প্রকাশ করতেন আর যা চাইতেন, বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখতেন।[২]

ইমাম আহমদের যুহ্দ ছিল প্রবাদবাক্যের মত। খলীফা মামূন, মু'তাসিম ও ওয়াছিকের যুগ তাঁর জন্য এই দিক দিয়ে পরীক্ষার ছিল যে, এই তিনজনই তাঁর জীবনের বৈরী ছিলেন। মুতাওয়াক্কিলের যুগও এই হিসাবে পরীক্ষার ছিল যে,

১. তরজমাতু'ল-ইমাম আহমদ (যাহাবী), ২১-২২ পৃ.।
২. মানাকি'ব ইবন জাওযী, মানাকি'ব হাফিজ যাহাবী, তাবাক'াত ইবনু'স- সুবকী।

খলীফা তাঁর ভক্ত ও নেহায়েত কদরদান ছিলেন। তাঁর নিকট এই যুগের পরীক্ষাটা ছিল আরও কঠিন ও শক্ত ধরনের এবং এর থেকে তিনি বেশি ভীত থাকতেন। কখনো কখনো বলতেন যে, ওদের দেয়া কষ্ট ও শাস্তি সত্ত্বেও আমার দীন ছিল নিরাপদ। এখন বৃদ্ধকালে এই দ্বিতীয় পরীক্ষার মাঝে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। কিন্তু যেভাবে খলীফা মু'তাসিমের কষাঘাত তাঁর সুন্নতকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরার মাঝে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারেনি, ঠিক তেমনি খলীফা মুতাওয়াক্কিলের ভক্তি-শ্রদ্ধাও তাঁর পার্থিব অনীহা ও আল্লাহ্র প্রতি তাওয়াক্কুলের ভেতর কোন পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি। একবার খলীফা মুতাওয়াক্কিল টাকা ভর্তি একটি বিরাট থলি খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন ঃ এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আনয়নকারী বলল যে, ফেরত দেওয়া ঠিক হবে না। কেননা অনেক কষ্টে খলীফার মনকে আপনার সম্পর্কে বিদ্বেষমুক্ত করা গেছে। অস্বীকৃতির ফলে পুনরায় তার মনে খারাপ ধারণা বাসা বাঁধতে পারে। তিনি থলি এক জায়গায় রেখে দেন। গভীর রাতে তিনি তাঁর চাচাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন ঃ এই থলির কারণে সারা রাত আমার ঘুম হয়নি। আমি ও নিয়ে খুব বিব্রত ও পেরেশানির মধ্যে আছি। তিনি আরও বলেন ঃ এখন রাত্রি অর্ধেক, লোকজন ঘুমে বিভোর; সকালে আপনার যা ভাল মনে হয় করবেন। সকালেই তাঁর চাচা কতক বিশ্বস্ত ও জানাশোনা লোককে ডেকে আনেন এবং নেককার ও দরিদ্র লোকদের একটি তালিকা তৈরি করে সমুদয় অর্থ-কড়ি তাদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। এমন কি থলিটিও একজন দুঃস্থ লোককে দান করেন।[১]

খলীফা মুতাওয়াক্কিলের নির্দেশ ও পীড়াপীড়িতে কিছুদিনের জন্য তিনি সেনা ছাউনিতে অবস্থান করেন। সে সময় তিনি শাহী মেহমান ছিলেন। দৈনিক তাঁর জন্য যে খাবার আসত তার মূল্য ছিল আনুমানিক এক শ' বিশ দিরহাম, অথচ কোনদিনই তিনি সে খাবার গ্রহণ করেননি। তিনি অব্যাহতভাবে রোযা রাখতে থাকেন। একাদিক্রমে তিনি আট দিন পর্যন্ত রোযা রাখেন। ফলে তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন। যদি সত্বর তিনি বিদায়ের অনুমতি না পেতেন তাহলে সে যাত্রা তাঁর জীবন বাঁচানোই কঠিন হয়ে পড়ত।[২] তাঁর পুত্র 'আবদুল্লাহ বলেন, "আমার পিতা ষোল দিন সেনা ছাউনিতে ছিলেন। তিনি এই সময়ে প্রয়োজনের এক-চতুর্থাংশ ছাতু খেয়ে থাকতেন। তাঁর চোখে কাল দাগ পড়ে গিয়েছিল।" মুতাওয়াক্কিলের

১. তরজমাতু'ল-ইমাম আহমদ, হাফিজ যাহাবীকৃত. ৬০ পৃ.;
২. প্রাগুক্ত ৬১ পৃ.।

পীড়াপাড়িতে তাঁর সন্তানদের জন্যও শাহী ভাতা নির্ধারিত হয়েছিল। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি দারুণ সতর্ক ছিলেন। তাঁর পুত্র বলেন ঃ প্রথমে তো আমার পিতা কখনো কখনো আমাদের এখান থেকে দরকারী জিনিস চেয়ে নিতেন। কিন্তু যখন থেকে শাহী অর্থ আমাদের ঘরে আসতে শুরু করল তখন তিনি আর কোন জিনিসই আমাদের কাছ থেকে চেয়ে নেননি। একবার ডাক্তার তাঁকে কচুর পানি খাওয়ার পরামর্শ দেন। লোকেরা বলেন, "এটি সালেহ্ (ইমাম আহমদের পুত্র)-এর চুলা থেকে পাকিয়ে নাও। চুলা এখনও গরম আছে।" তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানান।[১] অবশেষে শুধু নিজের সতর্কতাই তিনি যথেষ্ট মনে করেননি। সালেহ বলেন ঃ তিনি আমাকে একদিন বললেন, "সালেহ! আমার মন চায় যে, তোমরা এই শাহী উপঢৌকন নেওয়া একেবারে বন্ধ করে দাও। কেননা আমার কারণেই তোমরা এসব পাচ্ছ।"

৭৭ বছর বয়সে তিনি রোগাক্রান্ত হন। শুশ্রূষাকারী ও দর্শনার্থীদের ভীড় এত বেশি ছিল যে, তাদের দ্বারা ঘর সব সময় ভরে থাকত। একদল গেলে আর একদল আসত, এমন কি রাস্তা-ঘাটও থাকত জনাকীর্ণ। নয় দিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। ভীড় ক্রমাগত বাড়তে থকে। বিষয়টি সুলতানের কর্ণগোচর হলে তিনি দরজা ও গলিতে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করেন। তিনি যাতে প্রতিনিয়ত ইমামের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখতে পারেন সেজন্য একজন লোক নিয়োগ করেন। ঐ লোক তাঁকে সবকিছু লিখে জানাত। ভীড় প্রতি মুহূর্তে বেড়েই চলেছিল। শেষাবধি গলিও বন্ধ করে দিতে হ'ল। লোকজনে রাস্তা ও মসজিদ ভরে গেল, এমন কি বাজারে কেনা-বেচা করাও কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত ইমামের পেশাবে রক্তের চিহ্ন দেখা গেল। চিকিৎসককে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ শোক-দুঃখ ও চিন্তা-ভাবনা তাঁর পেট টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।[২] বৃহস্পতিবার তাঁর স্বাস্থ্যের আরও অবনতি ঘটে। তাঁর শাগরিদ মুরূযী বলেন ঃ আমি তাঁকে ওযু করালে তিনি কষ্টের অবস্থায়ও আমাকে হিদায়াত করলেন, "আঙ্গুলগুলো খেলাল করাও।" জুম'আর রাত্রিতে তাঁর অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে এবং ১২ই রবি'উল-আওয়াল[৩] জুমু'আর দিন তিনি ইনতিকাল করেন।[৪]

১. তরজমাতু'ল-ইমাম আহমদ, যাহাবীকৃত, ৬৪ পৃ.
২. ঐ, ৭৭ পৃ.
৩. বুখারী, তরীখে কবীর ও সগীর;
৪. জানাযা ও কাফনের বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে আসবে।

ফিতনা-ই-খাল্‌কে ' কু'রআন

খলীফা মামূন খাল্‌কস্থ-ই-কু'রআন মসলার ব্যাপারে তাঁর গোটা মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। ২১৮ হি.-তে তিনি বাগদাদের শাসনকর্তা ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম-এর নামে একটি বিস্তারিত ফরমান প্রেরণ করেন। এতে সাধারণ মুসলমানদেরকে, বিশেষ করে মুহাদ্দিছীন-ই-কিরামকে কঠোর নিন্দা ও অশ্রদ্ধাপূর্ণ সমালোচনা করা হয়। খাল্‌ক'-ই কুরআন 'আকীদার সঙ্গে বিরোধিতা করার কারণে তাঁদের তওহীদের 'আকীদা ত্রুটিপূর্ণ, সাক্ষ্য মরদূদ ও অনির্ভরযোগ্য বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁদেরকে 'উম্মতের দুষ্টচক্র' আখ্যা দেন। তিনি শাসনকর্তাকে হুকুম দেন, "যে সমস্ত লোক এই মসলার ব্যাপারে আমাদের অনুকূলে না আসবে তাদেরকে তাদের পদ থেকে অপসারণ করুন এবং এ ব্যাপারে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন।" [১]

এই ফরমান মামূনের মৃত্যুর চার মাস পূর্বের। এর কপি সমস্ত মুসলিম প্রদেশে পাঠানো হয় এবং সুবাদার (গভর্নর)-দের নির্দেশ দেওয়া হয় ঃ এই মসলার ব্যাপারে নিজ নিজ প্রদেশের কাযীদের পরীক্ষা নেওয়া হোক এবং যারা এই 'আকীদার সঙ্গে একমত না হবে তাদেরকে তাদের পদ থেকে অপসারণ করা হোক।

এই ফরমানের পর মামূন বাগদাদের শাসনকর্তাকে লেখেন ঃ এই 'আকীদার বিরোধীদের নেতৃস্থানীয় সাত জন বড় মুহাদ্দিছকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। মুহাদ্দিছগণ আগমন করলে মামূন তাঁদেরকে খাল্‌ক'-ই-কুরআন সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। সকলেই তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত হন। অতঃপর খলীফা তাঁদেরকে বাগদাদে ফেরত পাঠিয়ে দেন। সেখানে তারা 'উলামা ও মুহাদ্দিছদের একটি সমাবেশে নিজেদের এই 'আকীদার পক্ষে বিবৃতি দেন। এত কিছু সত্ত্বেও হাঙ্গামা অব্যাহত থাকে এবং সাধারণ মুসলমান ও সকল মুহাদ্দিছীন নিজস্ব 'আকীদায় কায়েম থাকেন।

ইনতিকালের পূর্বে মামূন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীমকে তৃতীয় ফরমান পাঠান। এতে একটু বিস্তারিতভাবে তিনি তাঁর প্রথম পত্রের বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছিলেন ও পরীক্ষা-বৃত্ত আরও বিস্তৃত করে সাম্রাজ্যের প্রশাসনের উচ্চস্তরের সদস্যবৃন্দ এবং জ্ঞানী-গুণী সকলকেই এর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। এই 'আকীদায় বিশ্বাস স্থাপন সবার জন্যই জরুরী বলে তিনি ঘোষণা করেছিলেন। ইসহাক মশহূর

১. এই পত্রের পূর্ণাঙ্গ বিষয়বস্তু 'তারীখে তাবারী' ও তায়ফুরের 'তারীখে বাগদাদ'-এ বর্তমান।

'উলামায়ে কিরামকে একত্র করে এই শাহী ফরমান সম্পর্কে তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন এবং তাঁদের জওয়াব ও পারস্পরিক কথাবার্তা বাদশাহকে লিখে জানান। মামূন এই চিঠি পেয়ে ভীষণ ক্রুদ্ধ হন এবং সেই সমস্ত 'উলামায়ে কিরামের মধ্য থেকে দু'জন (বাশার ইব্নু'ল-ওয়ালীদ ও ইবরাহীম ইবনু'ল-মাহ্দী)-কে হত্যার নির্দেশ দেন। উপরন্তু তিনি লিখেন ঃ অবশিষ্টদের মধ্য থেকে যেই নিজ মতে যিদ ধরে থাকবে তাকে পায়ে বেড়ি দিয়ে আমার নিকট পাঠিয়ে দেবে। এতদ্‌সত্ত্বেও বাকি ত্রিশজন 'উলামার মধ্য থেকে (যাঁরা প্রথমে স্বীকার করেন নি) চারজন নিজ মতে (কুরআন সৃষ্ট নয়– এই মতে) কায়েম থাকেন। এই চারজন ছিলেন ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, সাজ্জাদাহ্, ক'ওয়ারিরী ও মুহাম্মদ ইবন নূহ। দ্বিতীয় দিন সাজ্জাদাহ্ এবং তৃতীয় দিন ক'ওয়ারিরী স্বীয় মত পরিবর্তন করেন। স্রেফ ইমাম আহমদ ও মুহাম্মদ ইবন নূহ্ অবশিষ্ট থাকেন, যাঁদেরকে তরতাউসে খলীফা মামূনের নিকট হাতকড়ি ও পায়ে বেড়িসহ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের সঙ্গে অন্যান্য স্থানের উনিশজন 'উলামা ছিলেন, যাঁরা খাল্‌ক'-ই কুরআন মতবাদের অস্বীকারকারী এবং কুরআন সৃষ্ট বস্তু নয়, এই মতের অনুসারী ছিলেন। এই সমস্ত লোক কেবল রুক্কা পৌঁছেছিলেন– এমন সময় মামূনের ইনতিকালের খবর এসে পৌঁছে। অতএব, তাঁদেরকে বাগদাদের শাসনকর্তার নিকট ফেরত পাঠানো হয়। পথিমধ্যে মুহাম্মদ ইব্‌ন নূহ্ ইনতিকাল করেন। ইমাম ও তাঁর বন্ধু-বান্ধব বাগদাদে পৌঁছেন।

মামূন তাঁর স্থলাভিষিক্ত মু'তাসিম বিন রশীদকে ওসিয়ত করেছিলেন, যেন সে কুরআন সম্পর্কে তাঁর মত ও 'আকীদার ওপর কায়েম থাকে এবং তাঁর অনুসৃত নীতি যেন অনুসরণ করে (وخذ بسيرة اخيك فى القران)। উপরন্তু সে যেন কাযী ইব্‌ন আবী দাউদকে পূর্বের মতই পরামর্শদাতা ও উযীর পদে বহাল রাখে। মু'তাসিম এই দু'টি ওসিয়তের ওপর পুরোপুরি আমল করেন।

বিপদ-আপদ ও পরীক্ষার মাঝে ইমাম আহমদ (র)

এখন খাল্‌ক'-ই-কুরআনের বিরোধিতা, সহীহ ও বিশুদ্ধ 'আকীদার সমর্থন এবং তৎকালীন হুকুমতের সঙ্গে মুকাবিলার সম্পূর্ণ যিম্মাদারী একাকী ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের ওপর এসে বর্তায় যিনি সে যুগের মুহাদ্দিছগণের ইমাম এবং সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়তের আমানতদার ছিলেন।

ইমাম আহমদকে রুক্কা থেকে বাগদাদ আনা হয়। তাঁর পায়ে ছিল চার চারটি বেড়ি। তিনদিন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে এই মসলা নিয়ে বিতর্ক চলে। কিন্তু তিনি তাঁর

'আকীদা এতটুকু পরিবর্তন করেননি। চতুর্থ দিনে বাগদাদের শাসনকর্তা সমীপে তাঁকে পেশ করা হয়। শাসনকর্তা বলেন ঃ আহমদ ! তোমার জীবন অত্যন্ত বিপন্ন। খলীফা কসম খেয়েছেন যে, যদি তুমি তাঁর কথা না মান তাহলে তিনি তোমাকে তলোয়ার দ্বারা কতল করবেন না বটে, তবে তোমার ওপর মারের পর মার আসবে এবং তোমাকে এমন জায়গায় নিক্ষেপ করা হবে, যেখানে কখনো সূর্যের মুখ দেখতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত ইমামকে খলীফা মু'তাসিমের সম্মুখে পেশ করা হয়। তিনি তাঁর মতে অনড় থাকেন। খলীফা তাঁকে ২৮টি বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেন। একজন প্রাণবন্ত জল্লাদ কেবল দু'টো বেত মারত, এর পর অন্য জল্লাদ ডেকে আনা হ'ত। প্রতিটি বেত্রাঘাতের সঙ্গে ইমাম আহমদ (র) বলতেন :

اعطونى شيئاً من كتاب الله او سنة رسوله حتى اقول به .

আমার সামনে আল্লাহ্র কিতাব কিংবা রাসূলের সুন্নাহ পেশ কর; তাহলে আমি মেনে নেব।

ইমাম আহ্মদ (র)-এর মুখে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ

ইমাম আহমদ (র) উক্ত ঘটনা স্বয়ং বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

আমি যখন বাবু'ল-বুস্তান নামক স্থানে পৌঁছুলাম, তখন আমার জন্য সওয়ারী আনা হ'ল এবং আমাকে সওয়ার হবার হুকুম দেওয়া হ'ল। আমার পায়ে ছিল শিকলের ভারী বোঝা। অথচ এমন কেউ ছিল না যে, তাকে অবলম্বন করে সওয়ার হই। এই অবস্থায় আরোহণের চেষ্টা করতে গিয়ে কয়েকবার হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম। শেষ পর্যন্ত কোনমতে আরোহণ করলাম এবং মু'তাসিমের মহলে গিয়ে পৌঁছুলাম। আমাকে একটি কুঠরীতে ঢুকিয়ে দরওয়াজা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। অর্ধেক রাত্রে তায়াম্মুম করার উদ্দেশ্যে আমি অন্ধকারে হাত বাড়ালাম। সেখানে কোন প্রদীপ ছিল না, তবে পানির একটি পেয়ালা ও তশতরী রাখা ছিল। আমি ওযু করলাম এবং নামায পড়লাম। পরের দিন মু'তাসিমের দূত এল এবং আমাকে খলীফার দরবারে নিয়ে গেল। মু'তাসিম উপবিষ্ট ছিলেন। কাযীউ'ল-কুযাত ইব্ন আবী দাউদও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তার চিন্তাধারার অনুসারী একটি বিরাট জনসমষ্টিও ছিল। 'আবদুর রহমান আশ-শাফি'ঈও উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁকে বললামঃ ইমাম শাফি'ঈ থেকে মসেহ সম্পর্কে তোমার কিছু মনে পড়ে? ইব্ন আবী দাউদ বললেন ঃ লোকটাকে দেখ! এখনই যার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে

সে কিনা মসলা তাহ্‌'কীক' (পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ) করছে।

মু'তাসিম বললেন ঃ ওকে আমার নিকট নিয়ে এস। তিনি অনবরত আমাকে তার নিকট ডাকতে থাকলেন, এমন কি আমি তার খুব কাছে গিয়ে পৌঁছুলাম। তিনি আমাকে উপবেশন করতে বললেন। আমি পায়ের বেড়ির ভারে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। অল্পক্ষণ একটু জিড়িয়ে তাকে বললাম ঃ আমার কি কথা কইবার অনুমতি আছে? খলীফা বললেন ঃ বলো। আমি বললাম ঃ আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আল্লাহ্‌র রসূল কোন্ জিনিসের দা'ওয়াত দিয়েছিলেন? অল্পক্ষণ চুপ থেকে নিজে থেকেই বললাম, لا اله الا الله -এর সাক্ষ্য দেবার; তা আমি সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছি । এরপর বললাম ঃ আপনার মহান দাদা হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, যখন কবিলা 'আবদুল কায়সের প্রতিনিধিদল আঁ-হযরত (সা)-এর খিদমতে হাযির হয় তখন তারা ঈমান সম্পর্কে রসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ তোমরা কি জান ঈমান কি? তারা বলল ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ভিন্ন আর কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল, সালাত আদায়, যাকাত প্রদান এবং মালে গণীমতের এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারিত রাখা। তখন মু'তাসিম বললেন ঃ যদি আমার পূর্ববর্তীদের হাতে আগেই না পড়তে তাহলে আমি তোমার সঙ্গে সংঘর্ষে আসতাম না। এরপর 'আবদুর রহমান ইব্‌ন ইসহাকের দিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে আগেই হুকুম দেইনি যে, এই পরীক্ষা শেষ করে ফেল। তখন আমি বললাম ঃ আল্লাহু আকবার! এতে তো মুসলমানদের জন্য বিস্তৃতি ও ঔদার্য রয়েছে। খলীফা তখন উপস্থিত 'আলিমদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ তাঁর সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হও এবং আলোচনা কর। অতঃপর 'আবদুর রহমানকে বললেন, এর সঙ্গে আলোচনা কর।

আলোচনা আরম্ভ হ'ল। একজন কথা বলত, আমি জওয়াব দিতাম। অপরজন কথা বলত, আমি তারও জওয়াব দিতাম। মু'তাসিম তখন বলতেন ঃ আহমদ! তোমার ওপর খোদা রহম করুক! তুমি এ কী বলছ? আমি বলতাম ঃ আমীরু'ল মু'মিনীন! আমাকে আল্লাহ্‌র কিতাব কিংবা রাসূলের সুন্নত থেকে কোন প্রমাণ দেখান, আমিও আপনার সাথে একমত হব। মু'তাসিম তখন বললেন ঃ যদি এ আমার কথা কবুল করে নেয় তাহলে আমি নিজ হাতে তাঁকে আযাদ করে দেব, স্বীয় ফৌজ ও লশকরসহ তাঁর কাছে যাব এবং তাঁর

আস্তানায় গিয়ে হাযির হব। এরপর বললেন ঃ আহমদ! আমি তোমার ওপর খুবই স্নেহশীল এবং তোমার প্রতি আমার খেয়াল ও আকর্ষণ তেমনি যেমনি আমার সন্তান হারূনের প্রতি। তুমি একী বলছ! আমি সেই একই জওয়াব দিলাম ঃ আমাকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নত থেকে কোন প্রমাণ দেখাও, আমিও তোমাদের কথা স্বীকার করে নেব। এভাবে যখন খুব দেরী হয়ে গেল তখন খলীফা দারুণ বিরক্ত হলেন এবং আমাকে যেতে বললেন। এর পর আমাকে কয়েদ করা হ'ল এবং পূর্বের স্থানেই ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। পরের দিন পুনরায় আমাকে ডাকা হ'ল এবং বিতর্ক চলতে থাকল। আমি সকলের প্রশ্নের জবাব দিতে থাকলাম। এভাবে বেলা পড়ে গেল। তখন খলীফা বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ একে নিয়ে যাও! তৃতীয় রাত্রে আমি মনে করলাম যে, আজ কিছু একটা হবেই। আমি রশি চেয়ে নিয়ে তা দিয়ে আমার পায়ের বেড়ি কষে বাঁধলাম। ইযারবন্দের সাহায্যে আমি যে বেড়ি বেঁধে রেখেছিলাম– কোন কঠিন মুহূর্ত এসে পড়লে উলঙ্গ হয়ে পড়ি– এই ভয়ে তা খুলে পুনরায় পায়জামায় পরে নিলাম। তৃতীয় দিন আমাকে পুনরায় ডেকে পাঠানো হয়। আমি বিভিন্ন দেউড়ি ও আঙ্গিনা অতিক্রম করতে করতে অগ্রসর হলাম। কিছু লোক তলোয়ার নিয়ে, আবার কিছু লোক কোড়া হাতে দাঁড়িয়েছিল। ভরা দরবার। গত দু'দিনের অনেক লোকই আজ ছিল না। আমি যখন মু'তাসিমের নিকট পৌঁছুলাম তখন তিনি বললেন ঃ বসে পড়। এরপর বললেন ঃ এর সঙ্গে বিতর্কে অবতরণ কর এবং আলোচনা চালাও। লোকেরা বিতর্ক জুড়ে দিল। আমি একের জওয়াব দিতাম, তার পর অন্যের। তবে সকলের ওপরেই ছিল আমার কণ্ঠস্বর। এভাবে যখন দেরী হয়ে গেল তখন খলীফা আমাকে আলাদা করে নিয়ে একান্তে কিছু কথা বললেন। তিনি বললেন ঃ আহমদ! তোমার ওপর খোদা রহম করুন! আমার কথা মান্য কর। আমি তোমাকে নিজ হাতে মুক্ত করে দেব।[১] আমি পূর্বের ন্যায়ই জওয়াব দিলাম। এতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন ঃ একে পাকড়াও করে হিচড়াতে থাক এবং তার হাত উপড়ে ফেল। এই বলে তিনি সিংহাসনে গিয়ে বসলেন। তখন জল্লাদ পায়ে বেড়ি লাগাবার লোকগুলোকে ডাকল। খলীফা তখন জল্লাদদেরকে বললেন ঃ অগ্রসর হও। একজন অগ্রসর হ'ল এবং আমাকে দুটো কোড়া লাগাল। মু'তাসিম বললেন ঃ জোরে কোড়া লাগাও। এরপর প্রথম ব্যক্তি সরে

১. মু'তাসিম ইমাম আহমদের ব্যাপারে নরম হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আহমদ ইবন দাউদ বরাবর তাকে উত্তেজিত করে তুলছিলেন এই বলে যে, মু'তাসিম তাঁর ভাই মামূনের পথ থেকে সরে যাচ্ছেন।

গেল এবং আর একজন আসল। সেও দু'টো কোড়া মারল। উনিশ কোড়া মারার পর মু'তাসিম আমার নিকট এলেন এবং বললেন ঃ আহমদ! কেন নিজের জীবন নিয়ে এভাবে খেলছ? আল্লাহ্‌র কসম! তোমার জন্য আমার মমতা আছে। 'আজীফ নামীয় এক ব্যক্তি তখন আমাকে তলোয়ারের হাতল দিয়ে বিরক্ত ও উৎপীড়ন করছিল এবং বলছিল ঃ তুমি এদের সবার ওপর বিজয়ী হতে চাচ্ছ? অপরজন বলছিল ঃ আল্লাহর বান্দা! খলীফা তোমার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্য আর একজন বলছিল ঃ আমীরু'ল-মু'মিনীন! রোযা রেখে আপনি রৌদ্রে দাঁড়িয়ে? মু'তাসিম বারবার আমার সঙ্গে কথা বলতেন এবং আমি তাঁকে সেই একই জওয়াব দিতাম। পুনরায় তিনি জল্লাদকে হুকুম দিতেন ঃ পূর্ণ শক্তিতে কোড়া মারো। এমতাবস্থায় আমার হুঁশ-জ্ঞান লোপ পেত। শেষ পর্যন্ত হুঁশ ফিরে পেতেই দেখতে পেলাম, আমার পায়ের বেড়ি খুলে দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তখন বলল ঃ আমরা তোমাকে উল্টো মুখো করে মাটিতে ফেলেছি, তোমাকে মইডলা ডলেছি। আমি বললাম ঃ আমি কিছুই টের পাইনি।[১]

তুলনাহীন ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ়তা

এরপর আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-কে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়। গ্রেফতারী থেকে রেহাই মুহূর্ত পর্যন্ত আটাশ মাস তিনি বন্দী দশায় কাটান। তাঁকে ৩৩টি থেকে ৩৪টি কোড়া লাগান হয়। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুস'আব যিনি সিপাহীদের একজন ছিলেন, বলেন ঃ আমি আহমদের চেয়ে নির্ভীক ও সাহসী লোক আর দেখিনি। তাঁর দৃষ্টিতে আমাদের অস্তিত্ব ছিল একটি মাছির মত। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বলেন ঃ আমি শুনেছি, ইমাম আহমদকে এমন শক্তভাবে কোড়া মারা হয় যে, যদি এর একটিও কোন হাতীর পিঠে পড়ত তাহলে হাতীও চিৎকার করে পালাত। ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন ঃ ইমাম রোযাবস্থায় ছিলেন। আমি বললাম ঃ আপনি রোযাদার। অতএব জীবন বাঁচাবার জন্য এই 'আকীদা স্বীকার করে নেবার সুযোগ আপনার আছে। কিন্তু তিনি আমার কথার দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নি। একবার কঠিন পিপাসা লাগলে তিনি পানি চান। তাঁর সামনে বরফের পানির পেয়ালা রাখা হয়। তিনি তা হাতে নিলেন এবং কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখলেন। এরপর তা পান না করেই ফিরিয়ে দিলেন।[২]

১. যাহাবীর তারীখু'ল-ইসলাম, তরজমাতু'ল-ইমাম আহমদ, ৪১-৪২ পৃ. সংক্ষিপ্ত করে।
২. ঐ, ৪৯-৫০ পৃ.।

ইমাম তনয় বলেন ঃ ইনতিকালের সময়েও আমার পিতার শরীরে আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। আবুল 'আব্বাস আর-রাকী বলেন ঃ আহ্মদ যখন রুক্কাতে বন্দী ছিলেন তখন লোকেরা তাঁকে আত্মরক্ষার দিকটি বোঝাতে চেষ্টা করে এবং এ সম্পর্কে হাদীছও তাঁকে শোনায়। তিনি তখন বলেন ঃ খাব্বাবের হাদীছের কি জওয়াব আছে যেখানে বলা হয়েছে যে, প্রথম যুগে কতক লোক এমনও ছিল যাঁদের মাথার ওপরের দিক থেকে করাত চালিয়ে দেওয়া হ'ত; এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের দীন থেকে বিমুখ হ'ত না।

তাঁর এসব কথা শুনে লোকেরা নিরাশ হয়ে যায় এবং বুঝে নেয় যে, তিনি তাঁর পথ ও মত থেকে হটবেন না এবং সব কিছুই তিনি বরদাশত করতে প্রস্তুত রয়েছেন।

ইমাম আহ্মদ (র)-এর গৌরবময় কৃতিত্ব ও অবদান এবং তার বিনিময়

ইমাম আহ্মদ (র)-এর নজীরবিহীন অবিচলিত দৃঢ়তা প্রদর্শন ও ধৈর্যের ফলে এই ফিতনা চিরদিনের তরে খতম হয়ে যায় এবং মুসলমানরা একটি বিরাট ধর্মীয় বিপদ থেকে রক্ষা পায়। যে সমস্ত লোক এই ধর্মীয় পরীক্ষার মুহূর্তে তৎকালীন হুকুমতের সহযোগিতা করেছিল এবং সুযোগ-সন্ধানী ও স্বার্থ শিকারী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল তারা জনসাধারণের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হয়। তাদের ধর্মীয় ও জ্ঞানগত বিশ্বস্ততার কোন প্রভাবই বাকী থাকেনি। এর মুকাবিলায় ইমাম আহ্মদ (র)-এর শান-শওকত ও মর্যাদা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। সত্যপ্রিয়তা ও খোদাপ্রেম আহলে সুন্নত এবং বিশুদ্ধ 'আকীদাসম্পন্ন মুসলমানদের আলামতে পরিণত হয়। তাঁর একজন সমসাময়িক বুযুর্গ কুতায়বা বলেন ঃ

اذا رايت الرجل يحب احمد بن حنبل فاعلم انه صاحب السنة

যখন তুমি কোন লোককে আহ্মদ ইব্ন হাম্বলের প্রতি মুহব্বত পোষণ করতে দেখ তখন জেনো যে, সেই লোকটি সুন্নতের পাবন্দ।[১]

অপর একজন 'আলিম আহ্মদ ইব্ন ইবরাহীম আদ্দাওরাকীর উক্তি ঃ

من سمعتموه يذكر احمد بن حنبل بسوء فاتهموه على الاسلام

তুমি যদি কাউকে দেখতে পাও যে, সে আহ্মদ ইব্ন হাম্বল সম্পর্কে নিন্দাবাদ করছে, তাহলে তার ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে।[২]

১. যাহাবীর তারীখু'ল-ইসলাম, তরজমাতু'ল-ইমাম আহমদ, ৬১ পৃ.।
২. খতীবের তারীকে বাগদাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪২১।

ইমাম আহমদ তৎকালীন হাদীছশাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। 'মুসনাদ' গ্রন্থের রচন ও সংকলন তাঁর বিরাট কীর্তি। তিনি ছিলেন মাযহাবের একজন মুজতাহিদ ও চিরস্থায়ী ইমাম। তিনি 'আবিদ ও যাহিদ ছিলেন। তাঁর এসব ফযীলত বাস্তব ক্ষেত্রে স্বীকৃত। তাঁর বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা ও ইমামতের মূল রহস্য তাঁর অটুট সংকল্প ও দৃঢ়তা, বিশ্বব্যাপী ফিতনার যুগে দীনের হেফাজত এবং স্বীয় যুগের সর্বাপেক্ষা বিরাট বাদশাহীর একাকী মুকাবিলা করার দুঃসাহস। তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও চিরন্তন স্থায়িত্বের আসল কারণ এটাই।

اوازه خلیل زتعمیر کعبه نیست + مشهور شد ازان که در اتش نکونشت

তাঁর সমসাময়িকেরা যাঁরা সেই কোলাহলপূর্ণ যুগের ফিতনা দেখেছিলেন তাঁরা তাঁর এই কীর্তির মর্যাদা অত্যন্ত খোলা মনে স্বীকার করেছেন এবং এটিকে দীনের হেফাজত ও মকামে সিদ্দীক তথা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সম্মানিত স্থানের সঙ্গে তা'বীর করেছেন। তাঁর সমসাময়িক ও একই উস্তাদের ছাত্র সে যুগের মশ্‌হূর মুহাদ্দিছ 'আলী ইব্‌ন আল-মাদীনী [যিনি ইমাম বুখারী (র)-এর বিখ্যাত উস্তাদ ছিলেন] বলেন :

ان الله اعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث ابو بكر ن الصديق يوم الردة واحمد بن حنبل يوم المحنه .

আল্লাহ্ পাক এই দীনের বিজয় ও হেফাজতের কাজ দু'জন লোক দ্বারা নিয়েছেন যাঁদের আর তৃতীয় নেই– ইসলাম বিমুখতার চেতনার (রিদ্দার) সময় আবূ বকর সিদ্দীক (রা) দ্বারা এবং খাল্‌ক'-ই-কুরআনের ফিতনার সময় ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল দ্বারা।[১]

এই মর্যাদা ও জনপ্রিয়তার ফল ছিল এই যে, যখন ২৪১ হি.-তে ইমামু'স-সুন্নাহ ইনতিকাল করলেন তখন সারা শহর ভেঙে পড়েছিল। ইতোপূর্বে আর কারো জানাযায় এত প্রচুর লোক সমাগম হয়নি। জানাযা আদায়কারীর সংখ্যা ছিল আট লক্ষ পুরুষ ও ষাট হাযার মহিলার মত।[২]

১. খতীবের তারীখে বাগদাদ, ৪র্থ খণ্ড, ৪১৮ পৃ.।
২. যাহাবীর তরজমাতু'ল-ইমাম আহমদ ও তারীখ-ই-ইব্‌ন খাল্লিকান।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মু'তাযিলা ফিতনা
এবং
ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ

মু'তাযিলাদের পাণ্ডিত্যসুলভ ক্ষমতা ও তাদের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

খলীফা মু'তাসিম ও খলীফা ওয়াছিক-এর ইনতিকালে (যাঁরা মু'তাযিলা মতবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন) মু'তাযিলাদের দাপট চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। খলীফা ওয়াছিকের স্থলাভিষিক্ত খলীফা মুতাওয়াক্কিল মু'তাযিলা মতবাদ সম্পর্কে অসন্তুষ্ট এবং মু'তাযিলাদের দুশমন ছিলেন। তিনি খুঁজে খুঁজে মু'তাযিলাদের ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির চিহ্নসমূহ মুছে ফেলেন এবং তাদেরকে হুকুমত থেকে উৎখাত করেন। কিন্তু বিদগ্ধ জনসভায় ও জ্ঞানের কেন্দ্রগুলোতে তখনো মু'তাযিলাদের প্রভাব অবশিষ্ট ছিল। খাল্‌ক-ই-কুরআনের 'আকীদা তার শক্তি খুইয়েছিল বটে, তবে তার শাখা-প্রশাখা ও মসলা-মাসাইল তখনও তাজা ও জীবন্ত ছিল। মু'তাযিলারা তাঁদের মেধা, জ্ঞানগত যোগ্যতা ও নিজেদের কতক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের কারণে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন এবং বিচার ও ফতওয়া বিভাগ ছাড়াও হুকুমতের ভেতর কতক উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলেন। হি. তৃতীয় শতকের মাঝখানে তাঁদের বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণভাবে স্বীকার করা হয়ে থাকে যে, মু'তাযিলারা সূক্ষ্মদর্শী, ব্যাপক চিন্তাশীল ও বিশ্লেষক হয়ে থাকেন। বহু নব্য-বিদ্যার্থী ও খ্যাতিপ্রিয় যুবক মু'তাযিলা মতবাদকে ফ্যাশন হিসাবে গ্রহণ করেছিল। ইমাম আহমদ (র)-এর পর হাম্বলীদের ভেতর আর কোন শক্তিশালী জ্ঞানী ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের জন্ম হয় নি। মুহাদ্দিছীন ও তাঁদের সমমতাবলম্বী 'উলামায়ে কিরাম বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান তথা علوم عقلية (যুক্তিবিদ্যা), আলাপ-আলোচনা ও যুক্তিতর্কের নতুন পন্থার দিকে (যা মু'তাযিলা ও দার্শনিকদের প্রভাবে রেওয়াজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল) লক্ষ্য ও মনোযোগ দেন নি। ফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, বিতর্ক ও আলোচনা মজলিসে এবং দর্‌স মাহফিলগুলোতে মুহাদ্দিছীনে কিরামের এই জ্ঞানগত দুর্বলতা ও দর্শনের প্রাথমিক সূত্র সম্পর্কেও অজ্ঞতা অনুভূত হ'ত। এর মুকাবিলায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের

আলোচনা মাহফিলে মু'তাযিলাদের পাল্লা ভারী থাকত। যে সমস্ত লোক ধর্মের গভীর জ্ঞান রাখত না–তারা মু'তাযিলাদের উত্তম বাচনভঙ্গী, উপস্থিত বুদ্ধি তথা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও জ্ঞানের সূক্ষাতিসূক্ষ বিষয়ের আলোচনা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হ'ত। এর ফল হয়েছিল এই যে, জাহিরী শরীয়ত ও প্রাচীনদের পথ ও মতের জ্ঞানগত মর্যাদা হারাচ্ছিল ও তাদের ওপর মানুষের অনাস্থা সৃষ্টি হচ্ছিল। খোদ মুহাদ্দিছীন-ই-কিরাম এবং তাঁদের ছাত্রদের ভেতর বহু লোক হীনমন্যতার শিকারে পরিণত হচ্ছিল এবং মু'তাযিলাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও দার্শনিকতা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিল। এই অবস্থা ধর্মীয় মর্যাদা ও সুন্নাহ্‌র ক্ষমতা লাভের ক্ষেত্রে ছিল খুবই বিপজ্জনক। কুরআন মজীদের তাফসীর ও ইসলামের 'আকাইদ ঐ সব লোক দেখানো দার্শনিক তার্কিকদের কাছে ছেলেদের হাতের খেলনায় পরিণত হতে চলেছিল। মুসলমানদের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাসা ভাসা দর্শন গ্রহণীয় হতে চলছিল। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল বুদ্ধির চর্চা ও পরিভাষার লড়াই। এই অবস্থার মুকাবিলা ও ক্রমবর্ধমান সয়লাব প্রতিরোধ করবার জন্য কেবল মুহাদ্দিছ ও হাম্বলীদের ধর্মীয় তেজস্বিতা ও জোশ, 'আবিদ ও যাহিদের যুহ্‌দ ও 'ইবাদত এবং ফকীহদের ফতওয়া ও মসলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও উপস্থিত বুদ্ধি (استحضار) যথেষ্ট ছিল না।

সুন্নাহ্‌র মর্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য একজন মহান ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন

এজন্য এমন একজন ব্যক্তিত্বের দরকার ছিল যাঁর মেধাগত যোগ্যতা মু'তাযিলাদের তুলনায় অনেক উচ্চ স্তরের, যিনি বুদ্ধিবৃত্তির গলি-ঘুপচি সম্পর্কে কেবল ওয়াকিফহালই নন, দীর্ঘকাল যাবত এ পথের পথিকও, যাঁর উন্নত ব্যক্তিত্ব ও মুজতাহিদসুলভ মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি সে যুগের প্রচলিত দর্শনের পতাকাবাহীদের শুধু পরাভূত নয়, বরং বিস্মিতও করবে। যা-হোক, ইসলামের খিদমতের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে এমনি একজন ব্যক্তিসত্তার প্রয়োজন ছিল এবং শায়খ আবুল হাসান আশ'আরী ছিলেন সেই ব্যক্তিসত্তারই বাস্তব রূপ।

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (র)

নাম আবুল হাসান 'আলী, পিতার নাম ইসমা'ঈল, মশহূর সাহাবী হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর বংশধর। ২৬০ হিজরীতে বসরায় জন্ম হয়। পিতা ইসমা'ঈলের ইনতিকালের পর তাঁর মাতা আবূ 'আলী আল-জুব্বাঈকে বিবাহ করেন, যিনি ছিলেন সে সময়কার মু'তাযিলাদের ইমাম এবং মু'তাযিলা মতবাদের

মুখপাত্র। শায়খ আবুল হাসান তাঁর কোলে প্রশিক্ষণ পান এবং খুব সত্বর তাঁর নির্ভরযোগ্য বন্ধু ও সহযোগীতে পরিণত হন। আবূ 'আলী আল-জুব্বাঈ ভাল মুদাররিস ও লেখক ছিলেন। তবে বিতর্কে তাঁর খুব বেশি দক্ষতা ছিল না। এদিকে আবুল হাসান আশ'আরী শুরু থেকেই ভাষার ওপর দখল এবং উপস্থিত বুদ্ধির জন্য পরিচিত ছিলেন। এজন্য আবূ 'আলী বাহাছ ও বিতর্কমূলক আলোচনায় তাঁকেই সামনে এগিয়ে দিতেন। সত্বরই তিনি মাহফিলের মধ্যমণি এবং মজলিসের সভাপতির আসনে আসীন হন।[১] জনসাধারণের প্রকাশ্য জল্পনা-কল্পনা ও অন্যান্য কার্যকারণ সাক্ষ্য দিত যে, তিনি তাঁর মুরব্বী ও উস্তাদের স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং মু'তাযিলা মতবাদের সমর্থন, সহযোগিতা ও প্রচারে সম্ভবত তাঁকেও অতিক্রম করে যাবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও ব্যবস্থাপনাটা ছিল অন্য রকম। তিনি সুন্নাহ্‌র হেফাজত ও সাহায্যের জন্য সেই ব্যক্তিকেই নির্বাচিত করেন, যিনি তাঁর জীবন মু'তাযিলা মতবাদের সমর্থন ও পক্ষাবলম্বনে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন এবং যাঁর জন্য মু'তাযিলা মতবাদের নেতৃত্বের আসন প্রস্তুত ছিল। ঘটনাক্রমে শায়খ আবুল হাসানের প্রকৃতি ও স্বভাবে মু'তাযিলাদের মনগড়া ব্যাখ্যার গোঁজামিল, অলীক জল্পনা-কল্পনা ও অনুমান-চিন্তার প্রতি ঘৃণার সঞ্চার হতে থাকে। তিনি অনুভব করতে থাকেন যে, এ সব মেধা ও বুদ্ধিমত্তার কথা এবং এগুলোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও আনুকূল্য প্রদর্শনের পেছনে কোন যুক্তি নেই। প্রকৃত সত্য অন্য কিছু এবং তা হচ্ছে সাহাবায়ে কিরাম ও পূর্ববর্তীদের মত ও পথ। যা-হোক, চল্লিশ বছর পর্যন্ত মু'তাযিলা মতবাদ ও 'আকীদা-বিশ্বাসের সমর্থন এবং সেটা সুদৃঢ় করার কাজে নিয়োজিত থাকার পর তাঁর মন-মস্তিষ্কে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। পনের দিন তিনি ঘর থেকে বের হন নি। ষোল দিনের দিন ঘর থেকে সোজা জামে' মসজিদে গিয়ে পৌঁছেন। জুমু'আর দিন ছিল। জামে'মসজিদ ছিল লোক ভর্তি। তিনি মিম্বরে আরোহণ করে বুলন্দ আওয়াজে ঘোষণা দিলেন ঃ

> যিনি আমাকে জানেন তিনি তো জানেনই; আর যিনি জানেন না–তাকে বলছি যে, আমি আবুল হাসান আশ'আরী। আমি মু'তাযিলা ছিলাম। আমি অমুক অমুক 'আকীদায় বিশ্বাসী ছিলাম। এখন আমি তওবা করছি এবং আমার পূর্ব ধারণা থেকে বিরত হচ্ছি। আজ থেকে আমার কাজ হবে মু'তাযিলা মতবাদকে প্রতিরোধ করা এবং তার দুর্বলতা ও ভুল-ভ্রান্তিগুলো প্রকাশ করে দেওয়া।[১]

সেই দিন থেকেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর মেধা, প্রতিভা, জ্ঞানগত

---

১. তাবঈনু কিয্‌বু'ল-মুফতারা, ১১৭ পৃ., ইব্‌ন 'আসাকির দামিশকীকৃত।

অভিজ্ঞতা, বাকশক্তি, লেখনী ও যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষমতা মু'তাযিলা মতবাদের প্রতিরোধে ও প্রাচীন মনীষীদের পথ ও মত এবং আহলে সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আতের 'আকীদার সমর্থন ও প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হয়। যিনি প্রথম জীবনে ছিলেন মু'তাযিলাদের মুখপাত্র ও তাদের সর্বাপেক্ষা বড় উকীল, তিনিই শেষ জীবনে আহলে সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আতের ব্যাখ্যাতা এবং সবচেয়ে বড় সমর্থক ও মদদগারে পরিণত হন।

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (র)-এর তবলীগী প্রেরণা ও সত্য বিশ্লেষণ

তিনি এই দায়িত্ব ও কর্তব্যকে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের ওসীলা ও তাঁর পথে জিহাদ ও দা'ওয়াত মনে করে আঞ্জাম দিতেন এবং স্বয়ং মু'তাযিলাদের মজলিসে গিয়ে তাদেরকে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করাবার চেষ্টা করতেন। কেউ তাঁকে বলে, আপনি বিদ'আতীদের সঙ্গে কেন মেলামেশা করেন এবং তাদের কাছে যান? তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাই তো বাঞ্ছনীয়। তিনি জওয়াবে বলেন ঃ কি করি, তারা বড় বড় পদাধিকারী ব্যক্তি; তাদের কেউ শহরের শাসনকর্তা, কেউ কাযী। তারা তাদের পদ ও মর্যাদার কারণে আমার কাছে আসতে চায় না। এমতাবস্থায় আমিও যদি তাদের কাছে না যাই তাহলে সত্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তারা কিভাবে জানতে পারবে যে, আহলে সুন্নাতেরও উপযুক্ত মদদগার আছে এবং এমন সব অকাট্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে যদ্দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের মাযহাব সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।[২]

তাঁর মানসিক যোগ্যতা ও জ্ঞানের পরিপূর্ণতা

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (র)-এর মধ্যে বিতর্ক, বাহাছ ও যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শনের অপূর্ব শক্তি ও ক্ষমতা ছিল এবং এগুলো ছিল তাঁর প্রকৃতিগত ও খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতা। সত্য মযহাবের (তথা মযহাবে হকের) সমর্থন করবার প্রেরণা এবং আল্লাহ্র সাহায্য তাঁর সে শক্তিকে আরও উদ্ভাসিত করে তোলে। তিনি তাঁর যুগের গড় বুদ্ধিবৃত্তির মাপকাঠিতে অতি উন্নতমানের ছিলেন এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও 'ইলমে কালামে মুজতাহিদসুলভ মস্তিষ্ক ও মেধার অধিকারী ছিলেন। তিনি মু'তাযিলাদের যাবতীয় প্রশ্ন ও আপত্তির জওয়াব এত সহজে দিতেন, যেন কোন জ্ঞানবৃদ্ধ শিক্ষক ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রদের প্রশ্নের

---

১. ইব্‌ন খাল্লিকান-১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৭।
২. তাবঈনু কিয্ 'বু'ল-মুফতারা-১১৬ পৃ.।

সন্তোষজনক জওয়াব দিয়ে তাদেরকে নিশ্চুপ করে দিচ্ছেন। তাঁর একজন ছাত্র আবূ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন খফীফ তাঁর পয়লা সাক্ষাৎ এবং মজলিসের অবস্থা নিম্নভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

> আমি শীরায থেকে বসরা এলাম। আবুল হাসান আশ'আরীর দর্শন লাভে উৎসুক ছিলাম। লোকেরা আমাকে তাঁর ঠিকানা বাৎলে দিল। আমি এলাম। তিনি একটি বিতর্ক সভায় ছিলেন। সেখানে মু'তাযিলাদের একটি জামা'আত ছিল এবং তারা কথাবার্তা বলছিল। যখন তারা নিশ্চুপ হ'ল এবং নিজেদের কথা শেষ করল, তখন আবুল হাসান আশ'আরী আলোচনা শুরু করলেন। তিনি এক একজনকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তুমি এই বলেছিলে-আর তার জওয়াব এই; তুমি এই আপত্তি তুলেছিলে- আর তার জওয়াব এই। এভাবে প্রত্যেকের জওয়াব তিনি দিয়েছিলেন। যখন তিনি সভা থেকে উঠলেন, আমি তাঁর পিছু পিছু চললাম এবং তাঁকে আপাদমস্তক দেখতে লাগলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি কী দেখছ? আমি বললাম ঃ আমি দেখছি, আপনার কতটি মুখ, কতটি কান আর কতটি চোখ (অর্থাৎ আপনি সবার কথাই শোনেন, সব কিছুই বোঝেন এবং সকলেরই উত্তর দেন)। এই কথা শুনে তিনি হেসে ফেললেন।[১]

একটি বর্ণনায় আছে ঃ

> আমি তাঁকে বললাম ঃ আপনার সকল কথাই তো উপলব্ধিতে এল, কিন্তু এটা বুঝতে পারলাম না যে, আপনি প্রথম দিকে কেন চুপ করে থাকেন এবং কেন মু'তাযিলাদের কথা বলার সুযোগ দেন ? আপনার মর্যাদা তো এই যে, আপনিই কথা বলবেন, আলোচনা করবেন এবং আপত্তিগুলোকে নিজেই নিঃশেষ করে দেবেন। তিনি বললেন ঃ আমি সেই মসলা ও উক্তিগুলো আমার নিজ মুখে উচ্চারণ করাটাকে জায়েয মনে করি না। অবশ্য যখন এটি কারও মুখ দিয়ে বের হয়ে যায় তখন তার জওয়াব দেওয়া সত্যানুসারী হিসেবে আমার জন্য ফরয হয়ে যায়।[২]

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী শাস্ত্রের মুজতাহিদ ও 'ইলমে কালামের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পরের মুতাকাল্লিমগণ তাঁর আল্লাহ্প্রদত্ত প্রতিভা ও মেধা, তাঁর কালামের গভীরতা, তাঁর সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিপূর্ণতার কথা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। জনৈক ব্যক্তি কাযী আবূ বকর বাকিল্লানীকে, যিনি তাঁর সমসাময়িকদের কাছে সুন্দর বাকভঙ্গির বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখনী শক্তির কারণে 'লিসানু'ল-

১. তাবঈনু কিয'বু'ল-মুফতারা, ৯৫ পৃ.।

আইম্মাঃ' উপাধি পেয়েছিলেন– বলেছিল ঃ আপনার কালাম আবুল হাসান আশ'আরীর কালাম অপেক্ষা অধিকতর উন্নত ও স্পষ্ট মনে হচ্ছে। তিনি জবাবে বলেছিলেন ঃ আবুল হাসানের কালাম বুঝতে পারাটাই তো আমার পরম সৌভাগ্য।[১]

'আল্লামা আবূ ইসহাক ইস্ফারাঈনীর আসন 'ইলমে কালাম ও উসূলে-ফিক্'হ-এর ক্ষেত্রে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেন ঃ

> আমি শায়খ আবুল হাসান বাহেলী (ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীর শাগরিদ)-র সামনে এমন ছিলাম– যেমন সমুদ্রের ভেতর একবিন্দু পানি; আর শায়খ আবুল হাসান বাহেলী বলতেনঃ আমার অবস্থান ও মর্যাদা আবুল হাসান আশ'আরীর সামনে এমন ছিল যেমন সমুদ্রের পাশে এক কাতরা পানি।[২]

আবুল হাসান আশ'আরীর পথ ও মত এবং তাঁর খিদমত

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী মু'তাযিলা ও মুহাদ্দিছদের মধ্যে ভারসাম্যময় একটি পথ ও মত উদ্ভাবন করেন। তিনি মু'তাযিলাদের মত যুক্তি-বুদ্ধির সেই অসীম শক্তি ও ক্ষমতা– যা ঐশী তথা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়াবলীতেও অসংকোচে তার কাজ করতে পারে এবং যা আল্লাহ্ পাকের সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কেও ফয়সালা দিতে পারে–যেমন স্বীকার করতেন না, তেমনি কতক অত্যুৎসাহী মুহাদ্দিছীন ও হাম্বলী মযহাবের অনুসারীদের মত দীনের সাহায্য-সমর্থন (نصرت) ও ইসলামী 'আকাইদের হেফাজতের জন্য যুক্তি-বুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করাকেও জরুরী মনে করতেন না। তিনি মু'তাযিলা ও দার্শনিক 'আলিম-'উলামার সঙ্গে দার্শনিক ও জ্ঞানপূর্ণ ভাষায় কথাবার্তা বলতেন, যার ফলে তাঁর মাযহাব ও 'আকাইদ এবং আহলে সুন্নাহ্র মর্যাদা ও ওজন বৃদ্ধি পেত। كلموا الناس على قدر عقولهم ("লোকের সঙ্গে তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি মাফিক কথা বল") ছিল তাঁর নীতি। যেভাবে জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তির পরিমাপের দিকে খেয়াল রাখা জরুরী, ঠিক তেমনি জ্ঞান-গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিমাপের দিকে লক্ষ্য রাখাও অপরিহার্য।

আবুল হাসান আশ'তারী তাঁর সমগ্র শক্তি দিয়ে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে প্রমাণ করেন যে, মু'তাযিলারা ধর্মকে গ্রহণ ও তা উপলব্ধির ব্যাপারে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ ও নিজ ফের্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অন্ধ আনুগত্য (তাকলীদ) করেছে এবং ঐ সব ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাহ্কে মূল উৎস হিসাবে মেনে নেয় নি,

---

১. তাবঈনু কিয্‌বু'ল-মুফতারা, ১২৬ পৃ.।

বরং যে-ই কুরআনুল করীমের আয়াত ও তাদের 'আকীদার মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষ্য করেছে-অমনি অসংকোচে জটিল ব্যাখ্যা-বিবৃতির আশ্রয় নিয়েছে। كتاب الابانة عن اصول الديانة নামক গ্রন্থে– যা তিনি মু'তাযিলাদের থেকে আলাদা হবার পর প্রথম লিখেছিলেন– বলেন ঃ

اما بعد! فان من الزائغين عن الحق من المعتزلة واهل القدر مالت بهم اهوائهم الى تقليد رؤسائهم ومن مضى من اسلافهم فتاولو القران على ارائهم تاويلا لم ينزل الله به سلطانا ولا اوضح به برهانا ولا نقلوه عن رسول الله رب العلمين ولا عن السلف المتقدمين .

বা'দ হ'াম্‌দ ও সালাত (জেনে রেখ যে), মু'তাযিলা ও কাদরিয়া ফের্কা–যারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে–তারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণে স্বীয় ইমাম ও স্বীয় ফের্কার অগ্রবর্তী নেতাদের অন্ধ আনুগত্য (তাক'লীদ) করেছে এবং নিজেদের রায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কুরআন মজীদের এমন সব মনগড়া ও জটিল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছে যার সমর্থনে আল্লাহ্ প্রদত্ত সুস্পষ্ট কোন দলীল নেই এবং রসূল আকরাম (সা) ও প্রাচীন বুযুর্গগণ (সাহাবা-ই কিরাম ও তাবি'ঊন) থেকেও কোন বর্ণনা নেই।[১]

অতঃপর তিনি স্বীয় পথ ও মত সুস্পষ্ট করতে গিয়ে পরিষ্কার লিখেছেন ঃ

قولنا الذى نقول به وديانتنا التى ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا عليه السلام وما روى عن الصحابة والتابعين وائمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته واجزل مثوبته قائلون ولما خالف قوله مخالفون لانه الامام الفاضل والرئيس الكامل الذى ابان الله به الحق ورفع به الضلال و اوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من امام مقدم وخليل معظم مفخم .

আমাদের 'আকীদা, আমাদের পথ ও মত–যার ওপর আমরা কায়েম আছি– তা এই যে, আমাদেরকে কুরআন মজীদ ও সুন্নতে রাসূল (সা) আঁকড়ে ধরতে হবে; সাহাবায়ে কিরাম, তাবি'ঈন ও হাদীছশাস্ত্রের ইমামগণ দ্বারা যা বর্ণিত-তাকে অনুসরণ করতে হবে। আমরা এই মত ও পথের ওপর দৃঢ়ভাবে কায়েম আছি এবং ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-এর 'আকাইদ, মত ও পথ (আল্লাহ্ তাঁর মুখমণ্ডল জীবন্ত ও সজীব রাখুন, তাঁর দর্জা সমুন্নত রাখুন এবং

১. কিতাবু'ল-ইবানাতু 'আন উসূলিদ্দিয়ানাঃ, দাইরা ঃ-ই-মা'আরিফ, হায়দরাবাদ থেকে প্রকাশিত, ৫

তাঁকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করুন)-এর সমর্থক ও অনুসারী। যারা তাঁর পথ ও মত থেকে আলাদা—আমরাও তাদের থেকে আলাদা। কেননা তিনি এমন একজন বুযুর্গ ইমাম ছিলেন, যাঁর হাত দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সত্যকে উদ্ভাসিত করেছেন, গোমরাহী অপসৃত করেছেন, 'সিরাত-ই-মুস্তাকীম' তথা সোজা-সরল পথকে আলোকিত করেছেন, বিদ'আতীদের বিদ'আত, বক্র স্বভাবীদের বক্রতা ও সন্দেহবাদীদের সন্দেহ দূরীভূত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এমন একজন মহান ইমামের ওপর-যিনি ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন– তাঁর অফুরন্ত রহমত নাযিল করুন।[১]

কিন্তু তাঁর আসল কৃতিত্ব শুধু সুন্নাহ্র পথ ও মত এবং সাহাবা-ই-কিরাম ও তাবি'ঈনের 'আকীদার অনুসরণ ও এজমালী সমর্থনের মধ্যে নয়। কেননা এ কাজ তো মুহাদ্দিছীন-ই-কিরাম ও সাধারণ হাম্বলীরাও করছিলেন। তাঁর আসল কৃতিত্বপূর্ণ অবদান হ'ল, তিনি কিতাব ও সুন্নাহ্র হাকীকত ও আহলে সুন্নতের 'আকীদাকে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং মু'তাযিলা ও অন্যান্য ফের্কা কর্তৃক অনুসৃত এক-একটি মসলা ও এক-একটি 'আকীদাকে তাদেরই ভাষা ও পরিভাষায় আলোচনা করে আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের 'আকীদার সত্যতা তাদেরই বর্ণনা ও যুক্তি-বুদ্ধি মাফিক স্পষ্টতর করে তুলেছেন।

দীনের এই গুরুত্বপূর্ণ খেদমতের পূর্ণতা সাধন এবং যুগের এই বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে তিনি মু'তাযিলা ও অন্যান্য পরাঙ্মুখ ফের্কার ক্রোধের পাত্রে পরিণত হন। আর এমনটি হওয়া ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি সেই সাথে কট্টর মুহাদ্দিছ ও অনড় হাম্বলীদের আপত্তির শিকারেও পরিণত হন যাদের নিকট ঐসব আলোচনা ও বিতর্কে অংশ গ্রহণ, দার্শনিকদের পরিভাষা ব্যবহার ও ধর্মীয় মসলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে যুক্তি-প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করাটাই ছিল বক্রতা ও গোমরাহীর নামান্তর।

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী মু'তাযিলাদের প্রতিযোগী ও সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও এই ধারণার সঙ্গে একমত ছিলেন না যে, ইসলামী 'আকীদা সম্পর্কে যে সব সমস্যা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে—হাদীছে এসব মসলা-মাসায়েল, আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের অনুকূলে কোন শব্দ বা পরিভাষা নেই। মুহাদ্দিছদের মতে পরিভাষার এত খোঁজাখুঁজিতে সুন্নাহ ও শরীয়তের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এবং এতে সুন্নাহ্র পরাজয় ও কমযোরী প্রমাণিত হয়। কেননা 'আকাইদের উৎস হ'ল ওয়াহী ও নবূওতে মুহাম্মাদী (সা) এবং এর মাধ্যম হ'ল 'ইলমে কিতাব, সুন্নতে রাসূল

১. কিতাবু'ল-ইবানাতু 'আন উসূলিদ্দিয়ানাঃ, পৃ. ৮।

(সা) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর বর্ণনা ও বাণীসমষ্টি। অতএব, এই রাস্তা মু'তাযিলা ও দার্শনিকদের থেকে একেবারেই ভিন্ন। কিন্তু ইমাম আশ'আরী 'আকাইদের সাক্ষ্য-প্রমাণে সহায়তা করবার জন্য যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল-প্রমাণ, যুগ প্রচলিত শব্দ-সম্ভার ও পরিভাষাসমূহের দ্বারা কাজ নেওয়াকে কেবল জায়েয নয়, বরং সময়ের দাবির ভিত্তিতে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও জরুরী মনে করতেন। সেই আলোচনা ও বিতর্ক-যার সম্পর্ক যুক্তি-বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে এবং মু'তাযিলা ও দার্শনিকগণ যেটাকে (অযথা) 'আকাইদের আলোচনার অংশ বানিয়ে দিয়েছিল এবং নিজেদের মেধা, প্রতিভা ও বাকচাতুর্যের দ্বারা যেটাকে হক ও বাতিলের মানদণ্ড হিসাবে অভিহিত করেছিল, ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীর মতে, তা থেকে সরে আসা কিংবা তাকে এড়িয়ে চলা ঠিক নয় এবং শরীয়তের উকীল ও ব্যাখ্যাতার জন্য সেসব বৃত্তেও মু'তাযিলাদের মুকাবিলা করা এবং যৌক্তিক ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির দিক দিয়ে সত্যানুসারীদের মযহাব প্রমাণ করা ফরয। তাঁর মতে, এ বিষয়ে আঁ-হযরত (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের নিশ্চুপতার কারণ অজ্ঞতা ছিল না, বরং সে যুগে এ জাতীয় আলোচনা, দলীল-প্রমাণ ও যুক্তির জন্মই হয়নি। শরীয়তের মুহাফিজ ও আহলে সুন্নাহ্র মুতাকাল্লিমদের জন্য ফরয যে, 'আকীদা ও ঐশী দর্শনের বৃত্তের ভেতর যেসব নতুন প্রশ্নের জন্ম হচ্ছে অথবা নতুন আপত্তি ওঠানো হচ্ছে—সে সবের জওয়াব তারা দেবেন এবং যুগের যুক্তি-বুদ্ধি মাফিক সত্য-সঠিক 'আকীদাকে দলীল-প্রমাণ সহকারে প্রমাণিত করবেন। তিনি (ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী) এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে প্রমাণ করবার জন্যই استحسان الخوض فى الكلام নামে একটি পুস্তিকা লিখেন।

যা হোক, ইমাম আশ'আরী দু'টি দলের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিকে উপেক্ষা করে দীনের সাহায্য- এবং ঈমান ও 'আকীদার হেফাজতের জন্য যেসব কর্মপন্থা ও কর্মপদ্ধতিকে জরুরী মনে করেন, বিরাট সাহসিকতার সাথে সেটাই গ্রহণ করেন এবং আপন লেখনী ও বাকশক্তি তাতেই নিয়োজিত রাখেন। ফলে মু'তাযিলা দার্শনিকদের ক্রমবর্ধমান সয়লাবকে তিনি থামিয়ে দিতে সক্ষম হন এবং বহু স্খলিত পদকে সুদৃঢ় করেন। এভাবে আহলে সুন্নাহ্র 'আকাইদ ও সাহাবায়ে কিরামসহ প্রাচীন বুযুর্গ-মনীষীদের মতামতকে জোরালো ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় সমর্থন করবার কারণে আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের সমর্থকদের মধ্যে নতুন আশা ও নতুন আস্থার সঞ্চার হয়। হীনমন্যতাবোধ থেমে যায় যা ঘুণের ন্যায় মুসলিম উম্মার একটি বিরাট অংশকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। মু'তাযিলীরা তাঁর উপর্যুপরি হামলার ফলে পিছু হটতে থাকে এবং নিজেদের হেফাজত ও নিজেদের মযহাবের

অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আবূ বকর ইব্ন আস-সায়রাফী বলেন ঃ

> মু'তাযিলীদের বেশ বাড় বেড়েছিল। তাদের মুকাবিলার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরীকে সৃষ্টি করেন। তিনি স্বীয় মেধা ও যুক্তি-প্রমাণের সাহায্য মু'তাযিলীদের মুখ বন্ধ করে দেন। তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের কারণে তাঁকে মুজাদ্দিদ (ধর্ম-সংস্কারক তথা তাঁর পুনর্জীবন দানকারী) ও সুন্নাহ্র মুহাফিজের মধ্যে গণ্য করা হয়। আবূ বকর ইসমা'ঈলীর মত কতক মনীষী দীনের তাজদীদ তথা পুনর্জীবন দান ও শরীয়তের হেফাজতের সিলসিলায় ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের পরই তাঁকে স্থান দিয়েছেন।[১]

রচিত গ্রন্থাদি

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী কেবল বিতর্ক, আলোচনা ও মৌখিক বক্তৃতাকেই যথেষ্ট মনে করে নিশ্চেষ্ট বসে থাকেন নি, বরং বাতিল 'আকীদার প্রতিরোধকল্পে অনেক বিরাট পুস্তকও লিখেন। তিনি আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের 'আকীদা মুতাবিক কুরআন মজীদের যে তাফসীর রচনা করেন— ইমাম যাহাবীর মতে তা তিরিশটি[২] খণ্ডে বিভক্ত। কতক লেখক ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীর রচিত গ্রন্থাদির সংখ্যা ২৫০ থেকে তিন শ'[৩] পর্যন্ত হবে বলে মনে করেন! ঐ সব গ্রন্থের অধিকাংশই মু'তাযিলা মতবাদ প্রতিরোধকল্পে লিখিত; কিছু কিছু অপরাপর মযহাব ও ফেরকাসমূহের প্রত্যাখ্যানে লেখা হয়। এসব কিতাবের একটির নাম 'কিতাবু'ল-ফুস্'ল'। এতে তিনি প্রকৃতিবাদী, দাহরিয়া, হিন্দু, ইয়াহূদী, 'ঈসায়ী ও অগ্নি-উপাসক দার্শনিকদের মত ও পথের জোরালো সমালোচনা করেছেন। এটি একটি বিরাট গ্রন্থ এবং বারটি কিতাবের সংকলন।[৪] ইব্ন খাল্লিকান এ প্রসংগে কিতাবু'ল-লুমা', আল-মু'জিয, ঈযাহু'ল-বুরহান, আত-তাবঈনু 'আন-উসু'লিদ্দীন, আশ-শারহু' ওয়াত্তাফস'ীলু ফি'র-রাদ্দি 'আলা আহলি'ল-ইফ্ক ওয়াত্তাদ'লীল নামক গ্রন্থেরও উল্লেখ করেছেন। যৌক্তিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও 'ইলমে কালাম ছাড়াও 'ইলমে শরীয়ত সম্পর্কিত তাঁর আরো কিছু গ্রন্থ রয়েছে যেগুলোর মধ্যে 'কিতাবু'ল-কি'য়াস', 'কিতাবু'ল-ইজতিহাদ', 'খাবরু'ল-ওয়াহি'দ'

১. তাবঈনু কিয'বু'ল-মুফতারা, ৫৩ পৃ.।
২. আল-আশ'আরী, আবুল হাসান।
৩. তাবঈনু কিয'বু'ল-মুফতারা, ১৩৬ পৃ.।
৪. ঐ, ১২৮ পৃ.।

প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইব্ন রাওয়ান্দীর 'মুতাওয়াতির' তথা অনবরত ও ক্রমাগতের নীতি অস্বীকৃতির (انكار تواتر) প্রত্যাখ্যানেও তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কিতাব রয়েছে। তিনি তাঁর "আল-'আমাদ" নামক গ্রন্থে সে সব গ্রন্থের নাম লিখেছেন যা তিনি ৩২০ হি. পর্যন্ত ওফাতের চার বছর পূর্বে রচনা করেছিলেন, সংখ্যায় তা ৬৮টি হবে। এর ভেতর কয়েকটি কিতাব দশ-বারো খণ্ডে সমাপ্ত। জীবনের শেষ চারটি বছরের ভেতরও তিনি অনেক কিতাব প্রণয়ন করেন। مقالات الاسلامين নামক তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে, তিনি কেবল একজন মুতাকাল্লিমই ছিলেন না বরং 'ইলমে 'আকাইদের একজন শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত এবং সেই সাথে একজন সতর্ক ঐতিহাসিকও ছিলেন। তিনি এই গ্রন্থে মু'তাযিলা ও অন্যান্য ফেরকার কথিত উক্তি ও মযহাব যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে তাঁর অপরূপ সতর্কতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় মেলে।[১]

ইবাদত ও তাক্'ওয়া

ইমাম আবুল হাসান কেবল একজন জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান মানুষই ছিলেন না বরং জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে ইমামত ও ইজতিহাদের দর্জায় পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে 'ইবাদত, তাক'ওয়া ও মহান চরিত্রেও শীর্ষস্থানীয় ছিলেন এবং এটি হচ্ছে প্রাচীন ইমামগণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আহমদ ইব্ন আবী ফক'ীহ্ বলেন, "আমি ইমাম আবুল হাসানের বিশ বছর খেদমত করেছি। আমি তাঁর চেয়ে বেশী পরহেযগার, সতর্ক ও সংযমী, লজ্জাশীল, জাগতিক ব্যাপারে লাজুক ও পারলৌকিক ব্যাপারে অধিক দৃঢ় কাউকে দেখি নি।"[২] মুতাকাল্লিম আবুল হুসায়ন হারবী বলেন, "ইমাম আবুল হাসান বছরের পর বছর 'ইশার ওযূ দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেছেন।"[৩] তাঁর খাদেম বুন্দার ইব্ন আল-হুসায়ন বলেন, "ইমাম আবুল হাসান কেবল সেই একটি মাত্র স্থাবর সম্পত্তির ওপর জীবিকা নির্বাহ করতেন যা তাঁর পিতামহ বিলাল ইবন আবী বুরদাহ ইবন আবী মূসা আশ'আরী ওয়াক্'ফ করে গিয়েছিলেন যার দৈনিক আমদানী ছিল সতের দিরহাম।"[৪]

---

১. মশহূর প্রাচ্যবিদ ঘণভ্রধভডপ তাঁর ব্রফধব উরণণঢ নামক গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় এবং য়াহনার مقالات الاسلامين নামক গ্রন্থের ভূমিকায় এর বিরাট প্রশংসা করেছেন (আল-আশ'আরী, আবুল হাসান)।

২. তাবঈনু কিযবু'ল-মুফতারা, ১৪১ পৃ.।

৩. ঐ।

৪. ঐ, ১৪২ ও ইব্ন খাল্লিকান, ৪৬৫ পৃ. খতীবের হাওলাসহ।

ওফাত

৩২৪ তিজরীতে ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী ইনতিকাল করেন এবং বাগদাদের মহল্লা মাশরা'উ'য-যাওয়ায়াতে তাঁকে দাফন করা হয়।[১] তাঁর জানাযায় একটি ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, "আজ সুন্নতের সাহায্য ও সমর্থনকারীর ইনতিকাল হয়ে গেছে।"

ইমাম আবূ মনসূর মাতুরিদী

সেই যুগেই মুসলিম বিশ্বের অপর এক প্রান্তে "মাউরাউন্নাহ্র" নামক স্থানে অপর একজন 'আলিম ও মুতাকাল্লিম আবূ মনসূ'র মাতুরিদী (মৃ. ৩৩২ হি.) 'ইলমে কালাম ও 'আকাইদে ইসলামের খেদমতে মনোনিবেশ করেন।[২] তিনি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ মস্তিষ্কের অধিকারী ছিলেন। মু'তাযিলাদের সঙ্গে সদা-সর্বদা মুকাবিলারত থাকার কারণে ইমাম আবুল হাসানের 'ইলমে কালামে কতকগুলো চরমপন্থী কথাবার্তার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং পরবর্তীকালের আশ'আরীপন্থিগণ ব্যাপারটাকে আরও বাড়িয়ে দেন। ইমাম আবূ মনসূর সে সব অপ্রয়োজনীয় ও বাহুল্য কথাবার্তা, যা আশ'আরী 'ইলমে কালামের অংশে পরিণত হয়ে গিয়েছিল—বাদ দিয়ে দেন এবং আহ্‌লে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের 'ইলমে কালামকে আরও সংস্কৃত, পরিশীলিত ও ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলেন। ইমাম আবূ মনসূর ও তাঁর অনুসারীদের এই ইখতিলাফ ছিল আংশিক, খুঁটিনাটি বিষয়ে ও সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে। যে সব মসলা-মাসাইলে ইমাম মাতুরিদীর অনুসারিগণ আশ'আরীপন্থীদের সঙ্গে ইখতিলাফ করেছেন—তা তিরিশ-চল্লিশটির বেশি নয় এবং বেশির ভাগই শব্দগত।[৩]

ইমাম আবূ মনসূর মাতুরিদী ফিক'হী মসলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। শাফি'ঈপন্থী 'উলামায়ে কিরাম ও মুতাকাল্লিমীন 'আকীদাগত ও নীতিগতভাবে যেমন আশ'আরী মতের অনুসারী, তেমনি হানাফী 'উলামায়ে কিরাম ও মুতাকাল্লিমীন সাধারণত ইমাম মাতুরিদীর অনুসারী। ইমাম

---

১. ইব্‌ন খাল্লিকান–৪৬৪।

২. এই যুগ মু'তাযিলাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এবং সুন্নী 'ইলমে কালাম ও 'আকাইদের সংকলনের বিশেষ যুগ ছিল। ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী ছাড়াও সে যুগে মিসরে তাহাবী (মৃ. ৩১ হি.) এবং সমরকন্দে ইমাম আবূ মনসূর মাতুরিদী (মৃ. ৩৩ হি.) জন্ম নেন। প্রথমোল্লিখিত ব্যক্তি তাঁর দু'জন নামকরা সমসাময়িকের মুকাবিলায় 'ইলমে কালামে তেমন খ্যাতি লাভ করেননি এবং ইমাম আবূ মনসুর মাতুরিদীর ওডদমমফ মত´দমলথর্দ্র আশ'আরী ওডদমমফ-এর সঙ্গে মিশে যায়।

৩. 'আদু 'দিয়া তা'লীক 'াতে শায়খ মুহাম্মদ 'আবদুহু প্রমাণ করেছেন যে, এই সব মসলার সংখ্যা তিরিশের বেশি হবে না (ইবন তায়মিয়া, মুহাম্মদ আবূ যাহরাকৃত–১৮৪ পৃ.)।

আবূ মনসূর একজন বড় লেখকও ছিলেন। মু'তাযিলা, রাফেযী ও কারামেতা মতকে খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি বিরাট বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর تاويلات القرآن নামক গ্রন্থটি বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ যদ্দারা তাঁর বিরাট যোগ্যতা, বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান ও উন্নত মেধার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী যেহেতু মু'তাযিলা মতবাদ ও মু'তাযিলাপন্থীদের সঙ্গে সরাসরি মুকাবিলা করেছিলেন এবং তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-কেন্দ্র ইরাকে ছিলেন (যেখানে মু'তাযিলাদের বিরাট শক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল)—তাই সেখানকার বিদ্বজ্জন সভাকে তিনি অধিক প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন এবং 'ইলমে কালামের ইতিহাসে তাঁর নাম বিখ্যাত হয়ে আছে।

আশ'আরী অনুসারী 'উলামা ও তাঁদের জ্ঞানগত প্রভাব

ইমাম আশ'আরীর পর তাঁর সিলসিলায় ও চিন্তাধারায় জলীলু'ল-কদর 'উলামা, মুতাকাল্লিম ও উস্তাদের আবির্ভাব হয়। তাঁরা তামাম মুসলিম বিশ্বের ওপর নিজেদের উন্নত মেধা ও যোগ্যতার প্রভাব কায়েম করেন এবং তাঁদেরই কারণে মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানগত ও মেধাগত (ذهنى) নেতৃত্ব মু'তাযিলাদের কাছ থেকে 'উলামায়ে আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের হাতে চলে আসে। চতুর্থ শতাব্দীতে কাযী আবূ বকর বাকিল্লানী (মৃ. ৪০৩ হি.) ও শায়খ আবূ ইসহাক ইস্ফারাঈনী (মৃ. ৪১৮ হি.) অত্যন্ত নামকরা মুতাকাল্লিম ও মর্যাদাবান 'আলিম ছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে 'আল্লামা আবূ ইসহাক শীরাযী (মৃ. ৪৭৬ হি.) ও ইমামুল-হ'ারামায়ন আবুল মা'আলী 'আবদুল মালিক আল-জুওয়ায়নী (মৃ. ৪৬৮ হি.) তাঁদের 'ইল্‌ম ও বদান্যতার বদৌলতে সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

'আল্লামা আবূ ইসহাক শীরাযী নিজামিয়া মাদরাসার প্রধান অধ্যাপক (সদর মুদার্রিস) ছিলেন। খলীফা মুক'তাদী বিল্লাহ তাঁকে মালিক শাহ সালজুকীর নিকট দূত করে পাঠান। তিনি আড়ম্বরপুর্ণ মর্যাদার সঙ্গে বাগদাদ থেকে নিশাপুর পৌঁছেন। যে শহরের ওপর দিয়েই তিনি যেতেন, সেখানকার নাগরিকবৃন্দ তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানাত। ভক্তি ও শ্রদ্ধার আবেগাতিশয্যে তারা তাঁর পায়ের নীচের মাটি উঠিয়ে নিত। দোকানদাররা তাদের পণ্য-দ্রব্যাদি তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করত এবং মিঠাই, ফলমূল, মূল্যবান কাপড়-চোপড় বৃষ্টিধারার ন্যায় তাঁর দিকে নিক্ষেপ করত। তিনি নিশাপুর পৌঁছলে গোটা শহর তাঁর অভ্যর্থনায় ভেঙে পড়ে। ইমামু'ল-হ'ারামায়ন তাঁর অশ্বের জিনের ওপরকার আচ্ছাদনী স্বীয় স্কন্ধের

ওপর রেখে খাদেমের ন্যায় তাঁর আগে আগে অগ্রসর হন এবং বলেন, আমি এ জন্য গর্বিত।[১]

আল্‌প আরসালান সালজুকীর সাম্রাজ্যে ও নিজামু'ল-মুল্‌ক-এর মন্ত্রিত্বকালে সর্ববৃহৎ ইসলামী রাষ্ট্রে ইমামু'ল-হ'ারামায়নের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় পদমর্যাদা ছিল। তিনি নিশাপুরে খতীব, ইসলামী আওক'াফের নাজিম ও তত্ত্বাবধায়ক এবং নিজামিয়া মাদরাসার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ইব্‌ন খাল্লিকান লিখেন ঃ

وبقى على ذالك قريباً من ثلثين سنة غير مزاحم ولا مدافع مسلم له المحراب والمنبر والخطابة والتدريس ومجلس التذكير يوم الجمعة .

তিরিশ বছর পর্যন্ত তিনি এভাবে অবস্থান করেন যে, 'ইল্‌ম ও ধর্মীয় ময়দানে তাঁর কোন সমকক্ষ কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। মেহরাব ও মিম্বরের তিনি ছিলেন সৌন্দর্য। খুতবা, বক্তৃতা কিংবা দর্‌স প্রদানে, ওয়া'জ-নসীহত কিংবা আলোচনা বৈঠকে তাঁকেই সর্বাধিক যোগ্য মনে করা হ'ত।

তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও উচ্চ মরতবার অবস্থা ছিল এই যে, একবার মালিক শাহ সালজুকী 'ঈদের চাঁদ দেখার ঘোষণা দিয়ে দেন। ইমামু'ল-হ'ারামায়নের মতে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয় নি বিধায় তিনি প্রচার করে দেন, আগামীকাল পর্যন্ত রমযান মাস। যে আমার ফতওয়ার ওপর আমল করতে চায় তাকে আগামীকাল রোযা রাখতে হবে। মালিক শাহ এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, "সাম্রাজ্য বিষয়ক ফরমানের ক্ষেত্রে আপনার আনুগত্য ও অনুসরণ আমাদের ওপর বাধ্যতামূলক। তবে শরীয়তের নির্দেশের ক্ষেত্রে 'উলামায়ে কিরামের ফতওয়া সবার জন্যই পালনীয়। রোযা রাখা, 'ঈদ উদ্‌যাপন এসব ফতওয়ার বিষয় ; এ সবের ওপর বাদশাহ্‌র কোন কর্তৃত্ব নেই।" অনন্তর বাদশাহ ঘোষণা করেন, "আমার নির্দেশ ভুল ছিল, ইমামু'ল-হ'ারামায়নের হুকুমই সঠিক।'"[২]

তাঁর ইনতিকালে নিশাপুরের বাজার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, শোকের ছায়ায় ঢাকা পড়েছিল মুসলিম বিশ্ব। তাঁর শাগরিদের সংখ্যা ছিল চার শ'র মত। সকলেই শোকে-দুঃখে তাদের দোয়াত-কলম ভেঙে ফেলেছিল। লোকে একে অপরকে শোক জ্ঞাপন করত। সারা বৎসরই এই অবস্থা বিরাজমান ছিল।[৩]

নিজামু'ল-মুল্‌ক তূসীর মন্ত্রিত্বকালে– যিনি 'আকীদাগতভাবে আশ'আরী ছিলেন এবং সে যুগের সর্ববৃহৎ মুসলিম সাম্রাজ্যের (সালজূকী) দণ্ডমুণ্ডের কর্তা

---

১. তাবাকাতু'শ-শাফি'ঈয়াতু'ল-কুবরা, ৩য় খণ্ড, ৯১-৯২ পৃ.।
২. আখলাকে জালালী, ১১৯পৃ.।
৩, ইব্‌ন খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, ২৪৪ পৃ.।

ছিলেন– আশ'আরী মতবাদের বিরাট বিস্তার লাভ ঘটে এবং তা সরকারী সাহায্য-সমর্থনও লাভ করে। বাগদাদ ও নিশাপুরের নিজামিয়া মাদরাসাসমূহ– যেগুলো আশ'আরী 'উলামা ও শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে ছিল–আশ'আরী মতবাদকে জ্ঞানগত বিস্তৃতি ও দৃঢ়তা দান করে। বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসা ছিল তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান (দারু'ল-'উলূম) এবং বিরাট সম্মান ও শ্রদ্ধার বস্তু। এখানে পড়া ও পড়ানো ছিল এক বিরাট গর্বের বিষয়। অতএব, এর প্রভাবে ছাত্র ও জনসাধারণের আশ'আরী মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হওয়াটা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক।

সপ্তম অধ্যায়

'ইলমে কালামের অবনতি, দর্শন ও বাতেনী মতবাদের বিকাশ এবং একজন নতুন মুতাকাল্লিমের আবশ্যকতা

'ইলমে কালামের বিপথ গমন ও অধঃপতন

সে সময় যদিও আশ'আরী 'উলামায়ে কিরামের চিন্তাধারা গোটা মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা ও মাযহাবী জীবনের ওপর ছেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু খোদ সে চিন্তাধারার মধ্যেই দেখা দিয়েছিল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও দুর্বলতা। ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীর শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিবৃত্তি ও মুজতাহিদসুলভ মস্তিষ্ক মু'তাযিলাদের যাদুর মায়া জাল ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল এবং সুন্নত ও শরীয়তের ক্ষমতাকে নতুনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে শুধু তাঁর উসূল তথা মূলনীতি ও কায়দা-কানুনেরই ভূমিকা ছিল না, বরং তাঁর উন্নত মেধাগত যোগ্যতা, পাণ্ডিত্য-সুলভ ও যুক্তিসিদ্ধ ইজতিহাদী ক্ষমতারও বিরাট ভূমিকা ছিল। কিন্তু তাঁর অনুসারীরা ক্রমান্বয়ে মানসিক স্থবিরতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক নিঃস্বতার শিকারে পরিণত হয়। ফলে 'ইলমে কালামে এবং তাজদীদ ও ইজতিহাদে অনুকরণ ও তস্য অনুকরণের সিলসিলা শুরু হয়ে যায়। যে সমস্ত লোক যুগের পরিবর্তনকে অনুভব করতে সক্ষম হন তারা নতুনত্বের অনুসারী হন এবং 'ইলমে কালামে এমন সব যুক্তি ও প্রমাণ-পদ্ধতি ঢুকিয়ে দেন যা কুরআনুল করীমের যুক্তি ও প্রমাণ-পদ্ধতির মত প্রকৃতিসম্মত, সাধারণের বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক ছিল না।[১] এভাবে তার আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আত এবং সাহাবা-ই-কিরাম ও তাবি'ঈনের মত ও পথের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হন। অপরদিকে নির্ভেজাল দার্শনিক মহলেও তারা সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন নি।

দর্শনের রেওয়াজ

অপরদিকে খলীফা মামূনের আগ্রহাতিশয্যে ও অনুবাদকদের কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার ফলে সুরিয়ানী, গ্রীক ও ফারসী ভাষা থেকে গ্রীক দর্শনের বহু গ্রন্থ, বিশেষ করে এ্যারিস্টটলের রচনাবলী আরবীতে ভাষান্তরিত হয়ে গিয়েছিল এবং তা

১. যেমন ইবন তায়মিয়া (র) তাঁর কতক রচনায় বিশেষ করে "আর-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতি 'ক্বি'য়্যীন"-এ করেছেন।

দ্রুত মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তা-ভাবনার ওপর প্রভাব বিস্তার করছিল। অবশ্য এই ভাষান্তরে যুক্তিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, অংকশাস্ত্র ও আরো কিছু বিষয় ছিল যার ব্যবহারে ক্ষতির কোন আশংকা ছিল না। তবে যে সমস্ত বিষয় ছিল ঐশী ও ইন্দ্রিয়াতীত তা ছিল প্রকৃতপক্ষে গ্রীকদের সেই প্রতিমাবিদ্যা (দেবমালা) যাকে তারা বেশী চালাকি ও চাতুর্যের সঙ্গে দার্শনিকসুলভ ভাষা ও শাস্ত্রীয় (علمی) পরিভাষার পোষাকে আবৃত করে নিয়েছিল। এগুলো ছিল স্রেফ মনগড়া ও কাল্পনিক ইন্দ্রজাল যার কোন অস্তিত্ব বা বাস্তবতা ছিল না। এমন একটি উম্মত যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নবূওত-রূপ সম্পদ দ্বারা ধন্য করেছিলেন এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীর সঠিক পরিচয় এবং মানব জাতির ও বিশ্বজগতের আদি-অন্ত, সূচনা ও পরিণতির নিশ্চিত জ্ঞান দান করেছিলেন, তাদের এই সব মনগড়া কল্প-কাহিনী, রূপকথা ও ঐন্দ্রজালিক কায়কারবারে মগ্ন হবার কিংবা এই সব বিষয়ের গবেষণায় কালক্ষেপণ করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু যে সমস্ত লোক গ্রীকদের যুক্তিবিদ্যা, প্রকৃতিবিদ্যা তথা দর্শন ও অংকশাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত ছিল-তারা ঐশী সংক্রান্ত ঐ সমস্ত বিষয়কেও আসমানী কিতাবের মতই কবুল করে নেয় এবং এমন ভাব দেখায় যেন তাদের নিকট রসূল ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে কোন ঐশী জ্ঞানই আসেনি।

গ্রীক দর্শনের আরব অনুবাদক ও ভাষ্যকার

গ্রীক দর্শন মুসলমানদের মধ্য থেকে ইয়া'কূ'ব আল-কিন্দী (মৃ. ২৫০ হি.), আবূ নসর ফারাবী (মৃ. ৩৩৯ হি.) ও শায়খ আবূ 'আলী ইব্ন সীনা (মৃ. ৪২৮ হি.)-এর মত উৎসাহী উকীল ও সমর্থক পেয়ে যায়। স্বয়ং গ্রীসেও এঁদের মত প্রতিভার নজীর মেলা ছিল ভার। তাঁরা এ্যারিস্টটলকে পবিত্রতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন একটি মর্যাদায় (ওয়াজিবু'ল-ওজুদ) পৌঁছিয়েছেন যা সম্ভবত গ্রীক ধর্মতত্ত্বের সূচনা কালেও ঘটেনি। এটাও একটা দুর্ভাগ্য যে, মুসলমানদের ভাগে গ্রীসের জ্ঞান-ভাণ্ডারের যে অংশ পড়েছিল তার অধিকাংশই ছিল এ্যারিস্টটলের রচনাবলী ও চিন্তাধারা, যা পয়গম্বরদের শিক্ষা তথা ধর্মের (دین) রূহ ও মেযাজের সঙ্গে খুব কমই সম্পর্ক রাখত। আরেকটি দুর্ভাগ্য এই যে, আরব দার্শনিকদের ভেতর কেউই গ্রীক দর্শনের আসল উৎস ও তার মূল ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন না। তাঁদের সকল নির্ভরতা ছিল মূলত অনুবাদের ওপর। আর অনুবাদ থেকে মূল লেখকের অভিপ্রায় বুঝে ওঠা মোটেই সহজ নয়। উপরন্তু মুসলিম পণ্ডিতদের ওপর

এ্যারিস্টটলের জ্ঞানগত প্রভাব ও তাঁর ব্যক্তিত্বের যাদু এমনিভাবে ক্রিয়াশীল ছিল যে, তারা তাঁর চিন্তাধারা ও মতামতের ওপর আলোচনা-সমালোচনা করবার প্রয়োজনটুকুও বোধ করেন নি, বরং যুক্তিতর্কের বিষয়গুলোকেও ওয়াহীর মত অটল ও অভ্রান্ত বাণী বলে তারা ধরে নিয়েছিলেন।

জামা'আতে ইখওয়ানু'স-সাফা ও তাদের পুস্তিকাসমূহ

চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুসলিম বিশ্বের ওপর গ্রীক দর্শনের প্রভাব পড়ে। প্রত্যেক মেধাসম্পন্ন ও অনুভূতিপ্রবণ যুবক উক্ত দর্শনকে আগ্রহ ও মর্যাদার চোখে দেখত। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগেই বাগদাদে "ইখওয়ানু'স-সাফা" নামে 'ফ্রী ম্যাসন' ধরনের একটি গোপন সংগঠন গড়ে ওঠে, যার ভেতর গ্রীক দর্শনকে মানদণ্ড ধরে ধর্মীয় আলোচনা ও 'আকাইদের ওপর কথাবার্তা হ'ত এবং সেই নিরিখে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান বের করা হ'ত। এই সংগঠনের কর্মসূচী তাদের ভাষায়ই ছিল নিম্নরূপ ঃ

ان الشريعة الاسلامية قد تنجست بالجهالات واختلطت بالضلالات ولا سبيل الى غسلها وتطهيرها الا بالفلسفة لانها حادية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية وانه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة المحمدية صفقد حصل الكمال .

> ইসলামী শরীয়ত মূর্খতা ও গোমরাহীর সংমিশ্রণে দূষিত হয়ে গেছে। একে কেবল দর্শন দ্বারাই ধৌত ও পবিত্র করা যায়। কেননা দর্শন 'আকীদাগত জ্ঞান, হিকমত ও ইজতিহাদী উপযোগিতাকে পরিবেষ্টন করে আছে। এখন কেবল গ্রীক দর্শন ও শরীয়তে মুহাম্মদীর সংমিশ্রণের দ্বারা পরিপূর্ণরূপে বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করা যেতে পারে।[১]

তারা তাদের বিশিষ্ট সাথীদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছিল, তারা যেন বয়স্ক ও দৃঢ় বিশ্বাসী লোকদের ব্যাপারে বেশী সময় নষ্ট করার পরিবর্তে যুব ও অল্পবয়সী তরুণদের দিকে বিশেষভাবে নজর দেয় এবং তাদেরকে তাদেরই চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত করার চেষ্টা চালায়। কেননা বয়স্ক লোকদের ভেতর 'আকীদাগত দৃঢ়তা ও স্থবিরতা বিদ্যমান থাকায় তারা নতুন জিনিস গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কেবল যুবা ও তরুণরাই নতুন বস্তু কবুল করার মত যোগ্যতা রাখে।[২]

---

১. তারীখ ফালাসাফাতু'ল-ইসলামু ফি'ল-মাশরিক' ওয়া'ল-মাগ'রিব, মুহাম্মাদ লুত'ফী জুমু'আ, ২৫৩ পৃ.।
২. প্রাগুক্ত, ২৬০-৬১ পৃ.।

তারা এই আলোচনা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে ৫২টি পুস্তিকা প্রণয়ন করে। তাদের 'রাসাইল ইখওয়ানু'স-সাফা' নামক পুস্তক সাহিত্য ও ইতিহাসে মশহূর হয়ে আছে। এতে প্রকৃতি বিজ্ঞান, অংকশাস্ত্র ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনাও রয়েছে। মু'তাযিলা ও তাদের সমমনা ও সমমতাবলম্বী লোকেরা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে 'রাসাইল'কে লুফে নেয়। এগুলো তারা তাদের মজলিসে পড়ত এবং যেখানেই যেত সঙ্গে নিয়ে যেত। এমন কি এক শতাব্দীর মধ্যে তা স্পেন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে।[১]

মু'তাযিলা ও দার্শনিকদের মধ্যকার পার্থক্য

মু'তাযিলাদের দ্বারা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে শরীয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তারা জ্ঞান-বুদ্ধির শক্তিকে সীমাহীন মনে করে আল্লাহ্র যাত ও সিফাত (সত্তা ও গুণাবলী)-এর ন্যায় নাযুক ও বুদ্ধিবহির্ভূত (বুদ্ধির পরিপন্থী নয়) সমস্যাকে শিশুদের ক্রীড়া-কৌতুকে পরিণত করেছিল। কিন্তু তারা মূলত ধর্মীয় মানসিকতাপুষ্ট লোক ছিল, ওয়াহী ও নবূওতের ওপর ঈমান রাখত এবং সাধারণত মলিনতা (متقشف), অন্যায় ও পাপাচার থেকে সতর্ক থাকত। তারা 'ইবাদত-বন্দেগী ও দীনী দা'ওয়াতের ব্যাপারে উৎসুক ছিল এবং 'আম্‌র বি'ল-মা'রূফ ও নাহী 'আনি'ল-মুনকার' তথা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ–এই নীতির কঠোর পাবন্দ ছিল।[২] কেননা এগুলো ছিল তাদের নীতি, আদর্শ ও 'আকীদারই দাবী।[৩] এ কারণেই মু'তাযিলা মতবাদের বিস্তার এবং মু'তাযিলাদের শাসন ক্ষমতা লাভের ফলে মুসলিম বিশ্বে কুফর, ধর্মহীনতা, নবুওত অস্বীকার, পরজগত অস্বীকার, আমল ও ধর্ম প্রত্যাখ্যান করবার প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারেনি এবং মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা ও উপলব্ধি আহত কিংবা কমযোরও হয়নি।

কিন্তু দার্শনিকদের ব্যাপারটা ছিল এর থেকে একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। দর্শন নবুওয়াত-এর সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় চললেও তা ধর্মের মূলনীতি, বুনিয়াদী 'আকীদা ও মসলা-মাসাইলের সঙ্গে সংঘর্ষশীল। এজন্যে দর্শনের জনপ্রিয়তা ও মর্যাদা যে পরিমাণে বেড়েছে, ধর্মের গুরুত্ব, প্রভাব ও আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম-এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্যও সে পরিমাণে কমেছে এবং 'আকীদা থেকে শুরু করে 'আমল ও আখলাক পর্যন্ত এই মানসিক পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

১. তারীখ-ই-ফালাসাফাতু'ল-ইসলামু ফি'ল-মাশরিক' ওয়া'ল-মাগরিব, মুহাম্মাদ লুত'ফী জুম'আ. ২৫৪ পৃ.।

২. বিস্তারিত জানতে পড়ুন ضحى الاسلام–৩য় খণ্ড, ১ম অধ্যায়।

৩. তাদের মতে গোনাহ কবীরায় লিপ্ত হলে মানুষ চিরতরে জাহান্নামী হয় এবং আম্‌র বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার একজন মুসলমানের পক্ষে ফরয।

এতে করে মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি দল ও গ্রুপের সৃষ্টি হয় যারা প্রকাশ্যে ধর্মকে অবজ্ঞা করত এবং ইসলামের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কহীনতার কথা গর্বভরে ঘোষণা করত। তাদের এতখানি নৈতিক সাহস ছিল না যে, প্রকাশ্যত ধর্মীয় প্রথা-পদ্ধতি অস্বীকার করবে, কিন্তু আন্তরিকভাবে কোন অর্থেই তারা মুসলমান ছিল না।

বাতেনী মতবাদের ফেতনা

দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ও তার প্রভাবে একটি নতুন ফেতনা জন্ম লাভ করে যা ইসলাম ও নবুওতের শিক্ষামালার জন্য দর্শনের চেয়েও অধিক বিপজ্জনক ছিল ! এটা ছিল বাতেনীদের ফেতনা। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও আহ্বায়ক ছিল প্রধানত সেই সব জাতিগোষ্ঠীর লোক, যারা ইসলামের মুকাবিলায় নিজেদের সাম্রাজ্য ও শাসন ক্ষমতা খুইয়েছিল এবং প্রকাশ্য মুকাবিলা ও যুদ্ধ দ্বারা নিজেদের হৃত ক্ষমতা ফিরে পাবার আশা মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেলেছিল। তারা ছিল প্রবৃত্তি পূজারী, ভোগবাদী এবং ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের অভিলাষী। বিভিন্ন লক্ষ্যের অনুসারী ও অভিসারী এই সব লোক বাতেনী মতবাদের ঝাণ্ডাতলে একত্র হয়। তারা ভালভাবে বুঝে নিয়েছিল যে, সামরিক শক্তির মাধ্যমে তারা ইসলামকে পরাজিত করতে পারবে না কিংবা মুসলমানদেরকে খোলাখুলিভাবে কুফর ও ইলহাদের দিকেও দা'ওয়াত দিতে পারবে না। কেননা এরূপ করলে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি ও বাতিলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধস্পৃহা জেগে উঠবে। তাই তারা অনেক ভেবে-চিন্তেই একটি নতুন রাস্তা এখতিয়ার করে।

জাহির ও বাতেনের বিভ্রম

তারা দেখল যে, শরীয়তের উসূল-'আকাইদ, হুকুম-আহকাম ও মসলা-মাসাইলসমূহ শব্দমালার ভেতর দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে আর মানুষের উপলব্ধি সৃষ্টি ও আমলের দিক-দর্শনের জন্য এমনটি করার প্রয়োজনও ছিল।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ .

"আমি কোন নবীকে তাঁর সম্প্রদায়ের ভাষা ছাড়া পাঠাইনি, যাতে করে তিনি লোকদের সাথে পষ্টাপষ্টি ও খোলাখুলিভাবে তার বক্তব্য পেশ করতে পারেন।" –সূরা ইবরাহীম ঃ ৪ আয়াত;

এই সব শব্দসমষ্টির অর্থ ও মর্ম পরিষ্কার। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ মুখে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং নিজের আমল দ্বারা এর প্রমাণও দেখিয়েছেন। এই অর্থ ও

মর্ম মুসলিম উম্মাহ্‌র কর্মের মাধ্যমেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গোটা উম্মাহ্ তা জানে এবং মানে। নবুওত ও রিসালত, মালাইকা, আখিরাত তথা পারলৌকিক জীবন, জান্নাত, জাহান্নাম, শরীয়ত, ফরয ও ওয়াজিব, হালাল–হারাম, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ– এইগুলো সেই সব শব্দ যা বিশেষ ধর্মীয় হাকীকত বর্ণনা করে। যেভাবে এই সব ধর্মীয় হাকীকত নিরাপদ ও সংরক্ষিত অবস্থায় চলে আসছে, সেভাবে ধর্মীয় হাকীকত আদায়কারী এই শব্দসমষ্টিও নিরাপদ ও সংরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে।

যখন নবুওত ও রিসালত কিংবা নবী-রসূল অথবা সালাত ও যাকাত শব্দ উচ্চারণ করা হয় তখন সেই হাকীকতই উপলব্ধিতে ধরা পড়ে এবং সেই বাস্তব রূপই সামনে আসে যা রাসূলুল্লাহ (সা) বাতলে দিয়েছেন, যা সাহাবা-ই-কিরাম বুঝেছেন, আমল করেছেন এবং অন্যদের কাছেও পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এভাবেই বংশপরম্পরায় সে জিনিস মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে হস্তান্তরিত হয়ে আসছে। তারা তাদের মেধার সাহায্যে এ কথাটি বুঝে নিয়েছেন যে, শব্দ ও অর্থের এই সম্পর্ক মুসলিম উম্মাহ্‌র গোটা জীবনের ও ইসলামের চিন্তাগত ও বাস্তব নীতির ভিত্তি এবং এর দ্বারাই মুসলিম উম্মাহ্‌র অতীত ও ভবিষ্যৎ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যদি এই সম্পর্ক টুটে যায় এবং ধর্মীয় শব্দসমষ্টি ও পরিভাষাগুলোর মর্মার্থ নির্ধারিত না থাকে অথবা সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত হয়ে পড়ে তাহলে এই উম্মাহ যে কোন লোকের দা'ওয়াত ও আহ্বান এবং যে কোন দর্শন ও মতবাদের শিকারে পরিণত হতে পারে। আর এতে করে ইসলামের সঙ্গীন কেল্লায় শত শত চোরা দরজা ও হাযার হাযার ফাটলের সৃষ্টি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক।

এই নীতিটি হৃদয়ঙ্গম করার পর তারা (বাতেনীরা) তাদের সকল শক্তি এই প্রচারে নিয়োগ করে যে, প্রতিটি শব্দের একটি প্রকাশ্য অর্থ আছে, আর আছে একটি প্রকৃত ও গোপন অর্থ। এভাবেই কুরআন ও হাদীছের কিছু প্রকাশ্য ও কিছু প্রকৃত হাকীকত বা মূল সত্য রয়েছে। এসব হাকীকতের সঙ্গে ঐসব প্রকাশ্য বিষয়গুলোর সম্পর্ক ঠিক সেই রকম যে রকম সম্পর্ক মজ্জা ও মস্তিষ্কের সঙ্গে খোসা ও চামড়ার। মূর্খেরা কেবল প্রকাশ্যটার খবর রাখে ; তাই তাদের কাছে কেবল খোসা ও বাকলের ছড়াছড়ি। অপরদিকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীরা বিষয়বস্তুর হাকীকত সম্পর্কেও জ্ঞান রাখেন। তাই তাদের ভাগে পড়েছে মগজ। তারা জানেন যে, এই শব্দসমষ্টি প্রকৃতপক্ষে হাকীকতের গুপ্ত রহস্য ও প্রচ্ছন্ন ইশারা-ইঙ্গিত। এ সবের অর্থ তা নয় যা জনসাধারণ বোঝে ও আমল করে। এ সবের অর্থ আরও কিছু যার জ্ঞান কেবল রহস্যজ্ঞানী তথা গুপ্ত জ্ঞানের অধিকারীরাই রাখেন। তাদের কাছে

থেকেই অন্যরা এটা হাসিল করতে পারে। যারা সেই হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে নি এবং যারা প্রকাশ্য বিষয়াবলীর মধ্যে বন্দী রয়েছে তারা প্রকাশ্য বেড়ি ও শরীয়তের বাধ্যবাধকতার মধ্যেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। তারা অত্যন্ত নীচু স্তরেই অবস্থান করছে। যারা হাকীকত ও গুপ্ত রহস্যের উচ্চতম সোপানে পৌঁছেছেন তাদের গর্দান থেকে এই বেড়ি ও শৃঙ্খল নেমে যায় এবং তারা শরীয়তের পাবন্দী থেকে মুক্ত ও আযাদ হয়ে যায়।[১] এটাই এই আয়াতের মর্ম ঃ

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ .

"(নবী) তাদেরকে সেই বোঝা থেকে নাজাত দেবে যার নিচে তারা চাপা পড়ে আছে এবং সেই ফাঁদ থেকে বের করে আনবে যার ভেতর তারা বন্দী।" –সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৭ আয়াত

এই মূলনীতি যখন মেনে নেওয়া হ'ল এবং হাকীকত ও জাহিরী বিষয়ের এই দর্শন যখন কবুল করে নেওয়া হ'ল তখনই তারা নবী, ওয়াহী, নবূওত, ফিরিশতা, আখিরাত তথা পারলৌকিক জীবন ও শরীয়তের পরিভাষাগুলোর এমন সব মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করল যার কিছু দুর্লভ নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

নবী সেই সত্তার নাম যাঁর ওপর কুদসিয়া সাফিয়া শক্তির ফয়েয বর্ষিত হয়েছে। জিবরীল কোন সত্তার নাম নয়, শুধু ফয়েয-এর নাম। প্রত্যাবর্তনস্থল (معاد) বলতে বোঝায় প্রতিটি বস্তুর নিজ হাকীকতের দিকে ফিরে আসা। (جنابت) বলতে বোঝায় রহস্যের প্রকাশ। গোসল দ্বারা বোঝায় অঙ্গীকারের পুনরুজ্জীবন বা নবায়ন। যেনা (ব্যাভিচার) বলতে বোঝায় 'ইলমে বাতেনের বীজকে এমন কোন সত্তার দিকে স্থানান্তরিত করা যে অঙ্গীকারে শরীক নয়। তাহারাত তথা পবিত্রতা বলতে বোঝায় বাতেনিয়া মযহাব ভিন্ন প্রতিটি মযহাব থেকে মুক্তি লাভ। তায়াম্মুম অর্থ এজাযতপ্রাপ্ত ব্যক্তি থেকে 'ইল্ম হাসিল। সালাত দ্বারা বোঝায় যুগের ইমামের দিকে আহ্বান। যাকাত বলতে বোঝায় যোগ্য ব্যক্তি ও সূফীর ভেতর 'ইল্ম-এর প্রচার। সিয়াম (রোযা) বলতে বোঝায় গুপ্ত রহস্য প্রকাশ থেকে পরহেয করা ও সতর্কতা অবলম্বন করা।

---

১. শরীয়ত থেকে অব্যাহতি লাভের স্থায়ী 'আকীদাও তাদের ভেতর পাওয়া যায়। একজন বাতেনী ইমাম ও দা'ঈ "সায়্যিদুনা" ইদরীস লিখেন ঃ بعث الله محمد بن اسماعيل وهو نبى ناطق بنسخ شريعة محمد صـ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈলকে আল্লাহ তা'আলা নবীয়ে নাতি'ক' বা বাকসম্পন্ন নবী হিসাবে প্রেরণ করেন এবং তিনি মুহাম্মদ (স)- এর শরীয়ত মনসুখ করে দেন (عاصمة نفوس المهتدين وقاصمة ظهور المعتدين لسيدنا ادريس)। মু'ইয্ লেদীনিল্লাহ ফাতিমী থেকেও এ ধরনের উক্তি বর্ণিত আছে।

হজ্জ-এর অর্থ সেই জ্ঞান অন্বেষণ করা যা 'আকল বা বুদ্ধির কিবলা ও মনযিলে মকসুদ। জান্নাত বলতে 'ইলমে বাতেন ও জাহান্নাম বলতে 'ইলমে জাহিরকে বোঝায়। কা'বা বলতে খোদ নবীর সত্তা এবং বাবে কা'বা বলতে হযরত 'আলী (রা)-এর সত্তাকে বোঝায়। কুরআন মজীদে নূহ' (আ)-এর তুফান বলতে বোঝায় 'ইলমের তুফান যার ভেতর শাহাদাতের অধিকারীদেরকে (আহলে শাহাদাত) ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নমরূদের আগুন বলতে প্রকৃত আগুন নয়, বরং নমরূদের ক্রোধকে বোঝায়। যবাহ্ দ্বারা বোঝায় ইবরাহীম (আ) যার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন এবং সন্তান থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ। ইয়া'জুজ ও মা'জুজ বলতে জাহিরীপন্থী এবং মুসা (আ)-এর লাঠি বলতে তাঁর দলীল-প্রমাণ বোঝায়[১]—ইত্যাদি।

নবূওতে মুহাম্মাদীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শরীয়তের শব্দমালার অর্থ ও মর্মকে অস্বীকার এমন একটি সফল আঘাত যার সুযোগ ইসলামী নিজাম-ই-ই'তিকাদ ও নিজাম-ই ফিক্র তথা ইসলামের 'আকীদাগত ও চিন্তাগত নীতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা প্রতিটি যুগেই নিয়েছে। ইসলামের গোটা প্রাসাদ-সৌধকে এভাবে সহজেই ধ্বংস করা এবং ইসলামের প্রকাশ্য ও বাহ্যিক খোলসের অভ্যন্তরে আরও একটি সাম্রাজ্য গড়ে তোলা সম্ভব। আমরা দেখতে পাই যে, পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে যে সব বাতিল ফেরকা এবং মুনাফিকদের যেসব দল নবূওতে মুহাম্মাদীর বিরুদ্ধে অর্থগত বিদ্রোহ করতে চেয়েছে তারা বাতেনীদের এই অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছে এবং এই অর্থগত ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করে গোটা ইসলামী রীতিনীতি তথা ইসলামী নিজামকে সন্দেহযুক্ত করে তোলার প্রয়াস পেয়েছে। তারা নিজেদের জন্য ধর্মীয় নেতৃত্ব, এমন কি নতুন নবূওতের দরজাও খুলে দিয়েছে। ইরানের বাহাই মতবাদ ও ভারতবর্ষের কাদিয়ানী মতবাদ এর সর্বোত্তম উদাহরণ।[২]

---

১. কাওয়াইদ 'আকাইদ আলে-মুহাম্মাদ (বাতেনিয়া), মুহাম্মাদ ইবন হাসান দায়ালামী য়ামানী কর্তৃক হি. ৭০৭ সনে রচিত ; পৃ. ৮-১৬।

২. কাদিয়ানীরাও বাতেনীদের ন্যায় শব্দমালা বাকী রেখে সে সবের নতুন অর্থ বর্ণনা করেছে এবং অর্থগত উত্তরাধিকারিত্ব ও ধারাবাহিকতা কার্যত অস্বীকার করেছে। তারা খতমে নবূওত, মসীহ ও মসীহ্‌র অবতরণ, মু'জিযা, দাজ্জাল ইত্যাদি শব্দের ব্যাখ্যায় ও সামঞ্জস্য বিধানে বাতেনীদের মতই উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। মীর্জা সাহেবের গ্রন্থ ও মওলবী মুহাম্মাদ আলী লাহোরীর তফসীর এ ধরনের উদাহরণে ভরপুর। বাহাইরা একেবারে নতুন শরীয়ত আবিষ্কার (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন) (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর) করেছে। সে সবের কতকগুলো দফা এইরূপ ঃ রোযা বছরে এক মাসেরই কিন্তু মাস ১৯ দিনের ; রোযার প্রারম্ভ সুবহে সাদিকের পরিবর্তে সূর্যোদয় থেকে : মানুষ ১১ বছর বয়স

প্রকাশ থাকে যে, এই সব সমালোচনাকে (যার কতিপয় দৃষ্টান্ত ওপরে পেশ করা হ'ল) কোন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু 'ইলমে কালামের আলোচনা ও বিতর্ক মুসলিম বিশ্বে এক মানসিক অস্থিরতার সৃষ্টি করে এবং ঐ সমস্ত মানুষের ওপর বাতেনীদের প্রভাব যাদুর ন্যায় বিস্তার লাভ করে যারা প্রাচীন জ্যোতিষ্কবিদ্যা, প্রকৃতিবিদ্যা, গ্রীক দর্শনের সমস্যাবলী, গ্রীক পরিভাষা ইত্যাদিকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করেছিল। আর তাদের পাশে গিয়ে জড়ো হয় বিভিন্ন প্রভাব ও বিবিধ উদ্দেশ্যের লোক-কেউ প্রতিশোধ কামনায়, কেউ রহস্য ও সূক্ষ্ম ইশারা-ইঙ্গিতের আগ্রহে ও আকর্ষণে, কেউ ভ্রান্ত কিসিমের জাহিরীয়াত ও মালিন্যের (تقشف) প্রতিক্রিয়ায়, কেউ লোভ ও প্রবৃত্তির গোলামী এবং নফ্স পূজার অবাধ স্বাধীনতার লোভে, কেউ বা আহলে বায়তের নামে। এভাবে বাতেনীরা এমন সব গোপন সংগঠন কায়েম করে যার ফলে শক্তিশালী হুকুমতগুলো পর্যন্ত দীর্ঘদিন যাবত পেরেশানীর মাঝে কাল কাটায়। মুসলিম বিশ্বের যোগ্যতম কতিপয় ব্যক্তিত্ব (নিজামুল-মুল্ক, ফখরুল-মুল্ক প্রমুখ) তাদের শিকারে পরিণত হয়।[১] অনেক দিন পর্যন্ত কোন বড় 'আলিম ও মুসলিম বাদশাহ কিংবা উযীর এ ব্যাপারে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ছিলেন না যে, ভোর বেলা তিনি সহীহ্-সালামতে উঠতে পারবেন। ইব্নে জওযী লিখেছেন যে, ইস্ফাহানে কোন লোক যদি 'আসর পর্যন্ত ঘরে না ফিরত তাহলে ধরে নেওয়া হ'ত যে, সে কোন বাতেনী গুপ্ত ঘাতকের শিকারে পরিণত হয়েছে। এই অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা ছাড়াও তারা মন-মানস, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকেও কলুষিত করতে শুরু করে এবং ধর্মের মূলনীতি, নস ও অকাট্য বিষয়গুলোর মনগড়া ও বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে ব্যাপক ধর্মহীনতার দরজা উন্মুক্ত করে দেয়।

থেকে ২৪ বছর বয়স পর্যন্ত শরীয়তের হুকুম-আহকাম পালনে বাধ্য থাকে, এরপর বাধ্যবাধকতা উঠে যায়। ওযু ফরয নয়, মুস্তাহাব; মহিলাদের প্রতি দৃকপাত জায়েয; পর্দা-পুশিদা বলে কোন কিছু নেই। যে গৃহে মযহাবের প্রতিষ্ঠাতার (বাব মযহাব) জন্ম হয়েছে তা যিয়ারত করা ওয়াজিব। জানাযার ক্ষেত্রেই কেবল জামা'আতে সালাত শরীয়তের বিধান। ঈমান আনয়নের পর আর কোন বস্তুই অপবিত্র থাকে না, বরং কেবল বাবী ধর্মের আনুগত্য ও অনুসরণের দ্বারাই মানুষ পবিত্র হয়ে যায় এবং আর কখনও ময়লা ও পূতিগন্ধময় হয় না এবং যে জিনিসেই তার হাতের স্পর্শ লাগে তাও পবিত্র হয়ে যায়। পানি সর্বদাই পাক-পবিত্র থাকে। বাহাইদের উত্তরাধিকার আইন আলাদা (হাযির 'আলামু'ল-ইসলামী, ফ্রেঞ্চ ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামের বরাতে)। মসিও হুবার্ট তাঁর "বাবী মতবাদ" নামক নিবন্ধে যথার্থই লিখেছেন যে, বাব ইসলামের ভেতর সংস্কারের নামে একটি নতুন ধর্মের জন্ম দিয়েছে, যার 'আকীদা ও উসূল স্বতন্ত্র এবং তা নতুন একটি সমাজ ও সামাজিক কাঠামোর জন্ম দিয়েছে। একই অবস্থা কাদিয়ানী মতবাদেরও। দুই স্থানেই নতুন নবুওত এবং নতুন ধর্মীয় রীতিনীতির ভিত্তি রচনা করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে এসবই বাতেনী মতবাদের পুনরুচ্চারিত কণ্ঠস্বর।

১. বাতেনীদের হাতে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের বিস্তারিত তালিকা দেখতে চাইলে দ্র. "নিজামু'ল-মুল্ক তূসী", ৫৬০–৫৬৩ পৃ.।

একজন নতুন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা

দর্শন ও বাতেনী মতবাদের এই ইসলাম দুশমন প্রভাবের বিরুদ্ধে এমন একজন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল, যিনি ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞান-বুদ্ধি– এই উভয় দিকেই পুরোপুরি অভিজ্ঞ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির অধিকারী, যিনি সকল শাখায় মুজতাহিদসুলভ জ্ঞান ও প্রতিভায় স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় করেছেন– যিনি খোদাদাদ মেধা, প্রকৃতিগত উদ্ভাবন শক্তি ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে গ্রীক দার্শনিক এবং প্রাচীন নেতৃস্থানীয় চিন্তাবিদদের থেকে কম যান না, যিনি বহুবিধ জ্ঞান নতুন পন্থায় সংকলিত করবার যোগ্যতা রাখেন, যিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্ণ ও প্রশস্ত দৃষ্টির অধিকারী হবার সঙ্গে সঙ্গে ঈমান ও য়াকীনরূপ সম্পদেও ধন্য, যিনি স্বীয় ব্যক্তিগত চিন্তা–ভাবনা, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, 'ইবাদত ও রিয়াযত দ্বারা ধর্মের চিরন্তন হাকীকতের ওপর নতুন ঈমান লাভ করেছেন, যিনি নবতর আস্থা, জীবন্ত ও সজীব বিশ্বাসের সঙ্গে দূরদৃষ্টি সহকারে ধর্মের আনুগত্য ও রাসূলের অনুসরণের দিকে দা'ওয়াত দিতে এবং মুসলিম বিশ্বে ও জ্ঞানের জগতে স্বীয় 'ইল্ম ও ইয়াকীন এবং চিন্তা-ভাবনা ও স্বচ্ছ দৃষ্টির সাহায্যে একটি নতুন রূহ' ও যিন্দেগীর একটি নতুন প্রবাহ সৃষ্টি করতে সমর্থ। হি. পঞ্চম শতাব্দীর ঠিক মাঝখানে ইসলাম এমনই একজন ব্যক্তিত্ব লাভ করে, মুসলিম বিশ্বে যাঁর প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী। সন্দেহ নেই ইমাম গাযালী (র) ছিলেন সেই ব্যক্তিত্ব।

অষ্টম অধ্যায়

ইমাম গাযালী (র)

শিক্ষা লাভ ও জ্ঞানের উচ্চমার্গে আরোহণ

ইমাম গাযালী (র)-এর নাম মুহাম্মাদ, ডাকনাম আবূ হামেদ। পিতার নামও মুহাম্মাদ ছিল। তূস জেলায় ৪৫০ হিজরীতে তাহিরান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার ওসিয়ত মুতাবিক তাঁর এক বন্ধু–যিনি একজন একনিষ্ঠ 'ইল্‌ম-দোস্ত ও সূফী গরীব মুসলমান ছিলেন–তাঁর শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন এবং তাঁকে কোন মাদরাসায় ভর্তি হবার পরামর্শ দেন। অনন্তর তিনি একটি মাদরাসায় ভর্তি হয়ে শিক্ষা অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন।

ইমাম গাযালী (র) স্বদেশে শায়খ আহমাদ আর-রাযেকানীর নিকট থেকে শাফি'ঈ মযহাবের ফিক্'হশাস্ত্রে তা'লীম হাসিল করেন। এরপর জর্দানে ইমাম আবূ নসর ইসমা'ঈলীর নিকট পড়াশুনা করেন। এরপর নিশাপুর গিয়ে ইমামু'ল-হ'ারামায়নের মাদরাসায় ভর্তি হন এবং অতি অল্পদিনেই তিনি তাঁর ৪০০ সহপাঠীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট আসন লাভ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর খ্যাতিমান উস্তাদের সহযোগী (নায়েব)-তে পরিণত হন, এমন কি ইমামু'ল-হ'ারামায়ন তাঁর সম্পর্কে বলতেন, "গাযালী (র) গভীর সমুদ্র।" ইমামু'ল-হ'ারামায়ন-এর ইনতিকালের পর তিনি নিশাপুর থেকে বহির্গত হন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ২৮ বছর, অথচ তখনো তাঁকে বড় বড় বর্ষীয়ান 'উলামা'র চেয়ে অধিকতর বিশিষ্ট ও কামালিয়তের অধিকারী মনে করা হ'ত।

পঠন-পাঠন থেকে ফারিগ হবার পর ইমাম গাযালী (র) নিজামু'ল-মুলকের দরবারে যান। তাঁর খ্যাতি ও বিশেষ যোগ্যতার কারণে নিজামু'ল-মুল্‌ক তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে দরবারে গ্রহণ করেন। এখানে ছিল দুর্লভ রত্নসম জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশ। জ্ঞানের আলোচনা ও ধর্মীয় মুনাজারা (বিতর্ক) তখনকার দরবার, মজলিস, এমন কি বিবাহানুষ্ঠান ও শোক সভারও একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। ইমাম গাযালী (র) যাবতীয় বিতর্ক আলোচনায় সকলের ওপর জয়ী হতেন। তাঁর অতুলনীয় যোগ্যতাদৃষ্টে নিজামুল'-মুল্‌ক তাঁকে নিজামিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসাবে মনোনীত করেন, যা ছিল সে যুগে একজন 'আলিমের জন্য সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ সোপান। সে সময় গাযালীর বয়স ৩৪ বছরের বেশী ছিল না।

৪৮৪ হিজরীতে তিনি বিরাট শান-শওকতের সঙ্গে বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং নিজামিয়ায় পাঠ দান শুরু করেন। অল্পদিনেই তাঁর যোগ্য শিক্ষকতা, উত্তম আলোচনা ও জ্ঞানের গভীরতার কথা সারা বাগদাদে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র- শিক্ষক ও জ্ঞানী-গুণী তাঁর বিদ্যাবত্তা থেকে উপকৃত হবার জন্য চতুর্দিক থেকে নিজামিয়ায় এসে ভীড় জমাতে লাগল। তাঁর দর্‌স-মাহফিল গোটা মনুষ্যকুলের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়। তিন শ'র মত সমাপ্ত পর্যায়ের ছাত্র, শত শত আমীর-উমারা' ও রঈস এতে শরীক হতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর উন্নত মস্তিষ্ক ও মেধা, 'ইল্‌মী ফযীলত ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব বাগদাদে এমন প্রভাব-প্রতিপত্তি সৃষ্টি করে যে, তিনি সাম্রাজ্যের নেতৃস্থানীয় সদস্যবর্গের সমমর্যাদা লাভ করেন। তাঁর সম্পর্কে তাঁর সমসাময়িক শায়খ 'আবদুল গাফির ফারসী বলেন, "তাঁর জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সামনে আমীর-উমারা', উযীর, এমন কি স্বয়ং দরবারে খিলাফতের শান-শওকত পর্যন্ত নিষ্প্রভ হয়ে যায়।"[১] এমনি সময়ে ৪৮৫ হিজরীতে তাঁকে 'আব্বাসী খলীফা মুক্‌তাদী বিল্লাহ্ মালিক শাহ সালজুকীর বেগম তুর্কান খাতুনের নিকট (যিনি সে সময় সাম্রাজ্যের হর্তা-কর্তা ছিলেন) স্বীয় দূত বানিয়ে পাঠান। খলীফা মুক্‌তাদী বিল্লাহ্‌র স্থলাভিষিক্ত খলীফা মুস্তাজহির ইমাম গাযালী (র)-এর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখতেন এবং তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। তাঁরই নির্দেশে ইমাম গাযালী (র) বাতেনী মতবাদের বিরুদ্ধে কিতাব লিখেন এবং খলীফার সঙ্গে সম্পর্কিত করে এর নাম রাখেন 'মুস্তাজহিরী'।

এগার বছরের চলমান জীবন (رهنوردى) এবং এর অভিজ্ঞতা

এই চরম উন্নতি ও উত্থানের স্বাভাবিক দাবি ছিল যে, ইমাম গাযালী (র) এতে তৃপ্তি লাভ করবেন এবং এই বৃত্তের মাঝেই তিনি তাঁর গোটা জীবন কাটিয়ে দেবেন, যেমনটি তাঁর কতক উস্তাদ করেছেন এবং লোকেও সাধারণত তাই করে থাকে। কিন্তু তাঁর অস্থির স্বভাব ও প্রকৃতি, উন্নত মনোবল, দুরন্ত সাহসিকতা উন্নতির এই চরম পর্যায়েও তাঁকে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত রাখতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে এই উন্নত মনোবল ও হিম্মতই তাঁকে 'ইমাম' ও 'হু'জ্জাতু'ল–ইসলাম' বানিয়েছিল। দুনিয়াতে জাঁকজমক, আড়ম্বর, সম্মান ও পদবীর কুরবানী এবং স্বীয় উদ্দেশ্যের প্রতি একাগ্রতা ও সত্যের প্রতি আকর্ষণের এমন দৃষ্টান্ত বিরল। ইমাম গাযালী (র) স্বয়ং সেসব অবস্থা ও কার্যকারণ বর্ণনা করেছেন যা তাঁকে এমন পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং যা তাঁকে টেনে বের করেছিল শিক্ষা ও দর্‌স

১. তা'বাক'াতু'শ–শাফি'ঈয়্যাতু'ল-কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা।

প্রদানের কাজ থেকে। যা হোক, শেষ পর্যন্ত তিনি জ্ঞান রাজ্যের বাদশাহী ছেড়ে নিশ্চিত জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়াতীত (বাতেনী) সম্পদের তালাশে বেরিয়ে পড়েন এবং স্বীয় লক্ষ্যে কামিয়াবী লাভ করেন। المنقذ من الضلال। বা 'ভ্রান্তির অপনোদন' নামক গ্রন্থে তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন :

শৈশব থেকেই আমার স্বভাব ছিল সব কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা এবং যে কোন তথ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা। প্রতিটি ফের্কা ও দলের সঙ্গে আমি মিশতাম এবং তাদের 'আকীদা ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে অবহিত হবার চেষ্টা করতাম। এর ফলে ক্রমে ক্রমে আমা থেকে তাকলীদ তথা অন্ধ পরানুগত্যের বন্ধন ছুটে যায়। যে 'আকীদা-বিশ্বাস শৈশব থেকেই আমার মস্তিষ্কে দানা বেঁধেছিল তা নড়বড়ে ও শিথিল হয়ে পড়ে। আমি লক্ষ্য করলাম যে, একজন খৃস্টান ও একজন ইয়াহূদী তাদের নিজ নিজ 'আকীদা-বিশ্বাসের ওপর লালিত-পালিত হয়। প্রকৃত 'ইল্‌ম এই যে, তাতে কোন প্রকার সন্দেহের এতটুকু অবকাশ কিংবা আশংকা থাকবে না। উদাহরণত, আমার এ ব্যাপারে স্থির বিশ্বাস আছে যে, দশ সংখ্যাটি তিন-এর অধিক। এখন যদি কেউ বলে, "তিন সংখ্যাটিই অধিক এবং আমি আমার দাবির সপক্ষে আমার এই লাঠিটাকে সাপ বানাতে পারি", অতঃপর তিনি যদি তা বানিয়ে দেখিয়েও দেন তবুও তা আমার জ্ঞানের ক্ষেত্রে এতটুকু সন্দেহ কিংবা সংশয় সৃষ্টি করবে না। আমি বিস্মিত হব ঠিকই, কিন্তু তা আমার স্থির ও নিশ্চিত বিশ্বাসে এতটুকু চিড় ধরাতে পারবে না। আমার বিশ্বাস অটল ও অনড় থাকবে যে, তিনের চেয়ে দশ বেশী। আমি গভীরভাবে ভেবে দেখে বুঝতে পারলাম যে, এ ধরনের নিশ্চিত জ্ঞান কেবল অনুভূতিলব্ধ ও অপরিহার্য সত্য সম্পর্কিত বিষয়াবলীর গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ। কিন্তু যখন আরও বেশী সাধনা চালালাম তখন জানতে পারলাম, এতেও সন্দেহের অবকাশ পুরোপুরি বিদ্যমান। আমি দেখলাম যে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ইন্দ্রিয় হচ্ছে দৃষ্টিশক্তি, অথচ এতেও ভুল হয়। আমার এই সন্দেহ এত দূর বৃদ্ধি পেল যে, আমার ইন্দ্রিয়ানুভূতির নিশ্চিত হবার ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তাই থাকল না। পুনরায় আমি বুদ্ধিবৃত্তির ওপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলাম। কিন্তু তাকে ইন্দ্রিয়ানুভূতির চেয়েও বেশী সন্দেহযুক্ত ও কমযোর পেলাম। প্রায় দু'মাস অবধি আমার এই দোদুল্যমান অবস্থা চলতে থাকল এবং আমার ওপর সোফিস্ট মতবাদের প্রাধান্য বজায় রইল। অতঃপর আল্লাহ্ পাক আমাকে এই বিমারী থেকে আরোগ্য দান করলেন এবং আমার স্বভাবে সুস্থতা ও ভারসাম্য ফিরে এল এবং

বুদ্ধিবৃত্তিক ও যুক্তিনির্ভর অপরিহার্য সত্যের ওপর তৃপ্তি ফিরে পেলাম, বরং এটি ছিল আমার অন্তরাত্মায় আল্লাহ্‌প্রদত্ত নূরের আকস্মিক ঝলকানি। এই ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করবার পর এখন আমার সামনে চারটি দল রয়ে গেল–যাদের সত্য-সন্ধানী বলে মনে হচ্ছিল। মুতাকাল্লিমীন–যারা জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী বলে দাবি করত; বাতেনীদের দাবি ছিল যে, তাদের নিকট বিশেষ শিক্ষামালা গুপ্ত রহস্য আছে এবং তারা সরাসরি নিষ্পাপ ইমাম (ইমামে মা'সূ'ম) থেকে হাকীকতে 'ইল্‌ম তথা জ্ঞানের হাকীকত হাসিল করেছে; দার্শনিকদের বক্তব্য হ'ল, কেবল তাঁরাই যুক্তিবাদী এবং কেবল তাঁরাই দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলেন। সূফীগণ নিজেদেরকে কাশ্‌ফ ও শুহূদ তথা অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ জ্ঞানের অধিকারী মনে করেন। আমি প্রতিটি দলের কিতাবাদি ও চিন্তাধারা অধ্যয়ন করলাম। কিন্তু কারো ব্যাপারেই নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। 'ইলমে কালাম সম্পর্কে এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের (মুহাক্কিক) রচিত গ্রন্থাদি পড়ি এবং নিজেও এই বিষয়বস্তুর ওপর বই-পুস্তক লিখি। আমি দেখলাম যে, যদিও এটি এমন একটি বিষয় যা স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণ করে, কিন্তু তা আমাকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা তার ভেতর এমন সব প্রস্তাবনার ওপর ভিত্তি রাখা হয়েছে যা সম্মুখস্থ প্রতিপক্ষের পেশকৃত এবং মুতাকাল্লিমীন (ধর্মতাত্ত্বিক) যেগুলোকে কেবল অন্ধ আনুগত্যের কারণে মেনে নিয়েছেন অথবা তা ইজমা' কিংবা কুরআন ও হাদীছ-এর নস। এসব জিনিস সেই ব্যক্তির মুকাবিলায় খুব একটা কার্যকর নয়, যারা যুক্তিসঙ্গত অপরিহার্য সত্য ছাড়া আর কিছু স্বীকার করে না। দর্শন সম্পর্কে মতামত কায়েম করবার জন্য প্রথমে আমি গবেষণামূলক মনোভঙ্গী নিয়ে তা করাকে অত্যাবশ্যক মনে করলাম যদিও অধ্যাপনা ও পুস্তক রচনায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় ফুরসত মিলত খুব কম। আমার দরসের মাহফিলে বাগদাদের তিন-তিন শ' ছাত্র যোগদান করত। এতদ্‌সত্ত্বেও আমি এজন্য কিছুটা সময় বের করে নিলাম এবং দু' বছরের ভেতরই দর্শনের তাবৎ জ্ঞান-ভাণ্ডার অধ্যয়ন করে দেখলাম। অতঃপর এক বছর পর্যন্ত এর ওপর চিন্তা-ভাবনা করলাম। আমি দেখলাম, তাদের জ্ঞান ছয় প্রকারের ঃ যথা ঃ অংকশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, প্রকৃতিবিদ্যা বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, নীতিশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র। প্রথম পাঁচ প্রকারের জ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের হাঁ-না কোন সম্পর্কই নেই এবং ধর্মের ইতিবাচক দিক সপ্রমাণ করবার জন্য সে সবের অস্বীকৃতিরও কোন প্রয়োজন নেই। কতক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের টক্কর লাগে, কিন্তু তা কতিপয় জিনিসে মাত্র।

এই ব্যাপারে নীতিগতভাবে এই 'আকীদা পোষণ করতে হবে যে, প্রকৃতি বা স্বভাব আল্লাহ্র এখতিয়ারাধীন এবং বিজ্ঞান স্বয়ম্ভর ও স্বশাসিত নয়। অবশ্য যে সমস্ত লোক ঐ সমস্ত জ্ঞান ও নিবন্ধে দার্শনিকদের মেধা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি লক্ষ্য করে তারা সাধারণত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং মনে করে যে, জ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখায়ই বুঝি তাদের এরূপ অধিকার রয়েছে! অথচ এটা জরুরী নয় যে, কোন ব্যক্তির জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখায় অতুলনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা আছে বলে এর সব শাখাতেই তার দক্ষতা থাকবে। এরপর যখন তারা এই সমস্ত লোকের মধ্যে ধর্মহীনতা ও ধর্মকে অস্বীকার করবার মানসিক প্রবণতা লক্ষ্য করে তখন তারা এসব জ্ঞানী (?) ও বিজ্ঞানীদের প্রতি অন্ধ আনুগত্যবশত ধর্মকে অস্বীকার এবং ধর্মের ভূমিকাকে হাল্কা ও খাটো করে দেখবার প্রয়াস পায়। অপরদিকে ইসলামের কতক নাদান দোস্ত দার্শনিকদের প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত এবং তাদের প্রতিটি দাবিকেই প্রত্যাখ্যান করাকে তাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে গণ্য করেন এবং এটাকে তারা ইসলামের খিদমত বলে মনে করেন। এমন কি তারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের সকল অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণকেও অস্বীকার করতে এগিয়ে যান। এর একটি ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া এই যে, যে সব লোক তাদের বিজ্ঞান সম্পর্কীয় মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত এবং তাদের নিকট সে সব বস্ত প্রমাণিত সত্যের চূড়ায় উপনীত, উপরিউক্ত ধর্মান্ধতার কারণে তাদের ইসলাম সম্পর্কে' আকীদাই নড়বড়ে হয়ে যায় এবং দর্শনশাস্ত্র অস্বীকার করার পরিবর্তে তারা ইসলাম সম্পর্কেই বিরূপ ধারণা পোষণ করতে থাকেন। মোট কথা, আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, দর্শনশাস্ত্র দ্বারা আমার চিত্ত সান্ত্বনা পাবে না এবং বুদ্ধি একাকী সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আয়ত্ত করতে পারেও না বা সকল অসুবিধা দূর করবার ক্ষমতাও রাখে না। থাকল বাতেনীয়া সম্প্রদায়। এ সম্পর্কে আমার গ্রন্থ 'মুস্তাজহিরী' রচনা করতে গিয়ে তাদের মযহাব সম্পর্কে বেশ ভালভাবে অধ্যয়ন করার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি দেখতে পেলাম তাদের 'আকীদার ভিত্তি যুগের ইমামের শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু যুগের ইমামের অস্তিত্ব ও তার সত্যতা প্রমাণ সাপেক্ষ বস্তু এবং এ দু'টোই সীমাতিরিক্ত সন্দেহে ভরপুর। এখন রইল কেবল তাসাওউফ। সার্বক্ষণিকভাবে তাসাওউফের প্রতি আমি মনোনিবেশ করলাম। তাসাওউফ যেমন জ্ঞানগত বিষয়– তেমনি ব্যবহারিক বিষয়ও বটে। আমার কাছে জ্ঞানগত ব্যাপার অনেকটা সহজ ছিল। আমি আবূ তালিব মক্কীর 'কূ'তু'ল-কু'লূব', হারিছ মুহাসিবীর রচিত গ্রন্থাদি ও হযরত

জুনায়দ বাগদাদী, হযরত শিবলী,হযরত আবূ ইয়াযীদ বিস্তামী (র)-এর 'মালফূজাত' পড়লাম এবং 'ইল্ম-এর রাস্তা ধরে যা কিছু অর্জন করা যায় তা অর্জন করলাম। অতঃপর আমি বুঝতে পারলাম যে, মূল হাকীকত তথা আসল সত্য পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যমে নয়, বরং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, যওক বা স্বাদ, তন্ময় সাধনা ও অবস্থার পরিবর্তনের দ্বারা পৌঁছা যায়। যে জ্ঞান আমার পুঁজি ছিল, চাই তা শরীয়ত সম্পর্কিত হোক অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক, তদ্দ্বারা আমি আল্লাহ্র অস্তিত্ব, নবূওত ও আখিরাতের (পারলৌকিক জীবনের) ওপর সুদৃঢ় ঈমান লাভ করেছিলাম। অবশ্য তা কেবল দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতেই নয়, বরং ঐ সব কার্যকারণ, ঘটনাপরম্পরা ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লাভ করেছিলাম যার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া মুশকিল।

আমার কাছে এটা বেশ ভাল রকম পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, পারলৌকিক সৌভাগ্য লাভের পন্থা কেবল তাক'ওয়া তথা আল্লাহ্-ভীতি অবলম্বন করা এবং নফ্স তথা প্রবৃত্তিকে তার কামনা থেকে ফিরিয়ে রাখা। এজন্য যে কৌশল অবলম্বন করতে হবে তা হ'ল, এই নশ্বর পৃথিবীর মায়া ও আকর্ষণ ত্যাগ করে পারলৌকিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ বাড়ানো এবং পূর্ণ একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশের মাধ্যমে অন্তরের দুর্নিবার স্বাভাবিক আকর্ষণকে দুনিয়া থেকে ছিন্ন করা। আর তা একমাত্র পার্থিব শান-শওকত, ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা ও ভোগ-লালসার আকর্ষণ পরিত্যাগ করার মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে।

আমি আমার অবস্থা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলাম। বুঝতে পারলাম যে, আমার আপাদমস্তক পার্থিব আসক্তির কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ। আমার সর্বোত্তম আমল হিসাবে শিক্ষা দান ছিল উল্লেখ করার মত। কিন্তু গভীরভাবে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, আমার গোটা সাধনা ও মনঃসংযোগই ছিল সেই সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি যা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না এবং আখিরাতের স্বার্থের প্রতিও তা তেমন কল্যাণকর ছিল না। আমার অধ্যাপনার পেছনে যে নিয়ত ক্রিয়াশীল ছিল সে সম্পর্কে আমি ভেবে দেখলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, তা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং তার পেছনে পার্থিব শান-শওকত বৃদ্ধি, প্রভাব-প্রতিপত্তি কায়েম ও সুখ্যাতি অর্জনের মানসিক-তাটাই সর্বাধিক সক্রিয় ছিল। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হ'ল যে, আমি ধ্বংসোন্মুখ নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমি যদি আমার অবস্থার সংস্কার সাধনে প্রয়াসী না হই তা হলে আমার জন্য তা কঠিন বিপদের কারণ হবে।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত আমি এই সব ছেড়ে-ছুঁড়ে বাগদাদ পরিত্যাগ করার চিন্তা-ভাবনা করতে থাকি। কিন্তু চূড়ান্ত ফয়সালায় উপনীত হতে ব্যর্থ হই। ছ'মাস এরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝে কেটে যায়। কখনো পার্থিব কামনা-বাসনা আমাকে আকৃষ্ট করত, আবার কখনো আমার ঈমান আমাকে ডেকে বলত, "যাত্রার সময় নিকটবর্তী, জীবন বড় ক্ষণস্থায়ী, অথচ চলার পথ অনেক দীর্ঘ। এই সব 'ইল্‌ম ও আমল স্রেফ লোক দেখানো ভণ্ডামি ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।" কখনো আমার 'নফ্‌স' (শয়তানী প্রবৃত্তি) আমাকে বলত, "এসব সাময়িক চিত্তবৈকল্যমাত্র। আল্লাহ্‌ পাক তোমাকে যা কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মান-মর্যাদা দান করেছেন– বাগদাদ ছেড়ে দেবার পর যদি আবার কখনো ফিরে আস তাহলে এগুলো আবার ফিরে পাওয়া তোমার পক্ষে মুশকিল হবে।" মোট কথা, এই উভয়বিধ টানাপোড়েনের মাঝে আরও ছয়টি মাস কেটে গেল, এমন কি পরিস্থিতি আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আমার মুখের ভাষা হ'ল বন্ধ, যেন কেউ আমার মুখে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। আমি চেষ্টা করতাম আমার নিকট আগত ও নির্গত লোকদের (ছাত্র ও অতিথি-অভ্যাগত) মনস্তুষ্টির জন্য একই দিনে সব কিছু পড়িয়ে দিই। কিন্তু কি করব, আমার জিহ্‌বা আমার সহযোগিতা করছিল না এবং আমার মুখ দিয়ে একটি শব্দও উচ্চারিত হচ্ছিল না।

জিহ্‌বা ও মুখের এই আড়ষ্টতা আমার অন্তরে দুশ্চিন্তা ও বেদনার সৃষ্টি করল, যার ফলে আমার হযম শক্তিও লোপ পেতে লাগল, এমন কি এক চুমুক পানি পান ও এক লোকমা খাদ্য হযম করাও আমার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল। ক্রমান্বয়ে আমার শারীরিক শক্তিতেও ভাটা দেখা দিল। শেষাবধি চিকিৎসকেরা-ও আমার চিকিৎসার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়লেন এবং বললেন: আসলে অসুখ আপনার হৃদয়-অভ্যন্তরে এবং তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে আপনার সর্বশরীরে। যতদিন আপনার মন থেকে এ অসুখ না সারবে ততদিন পর্যন্ত কোন চিকিৎসাই ফলপ্রসূ হবে না।

অগত্যা আমি আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হলাম এবং নিতান্ত অসহায়ভাবে কাতর স্বরে তাঁকে ডাকতে লাগলাম। এর ফলে আমার পক্ষে এই প্রভাব-প্রতিপত্তি, পদ-মর্যাদা, ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন সব কিছু ছেড়ে দেওয়া সহজ মনে হতে লাগল। আমি মক্কা শরীফ গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলাম। আমার অন্তরের এই বাসনা ছিল যে, আমি শামও সফর করব। এরপর অত্যন্ত চমৎকারভাবে আমি বাগদাদ ত্যাগ করবার বন্দোবস্ত করে ফেললাম।

ইরাকবাসী যখন আমার অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত হ'ল তখন তারা চতুর্দিক থেকে আমাকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। কেননা কারোর ধারণায় এটা আসছিল না যে, এত সব কিছু ছেড়ে দেবার পেছনে কোন ধর্মীয় কারণ থাকতে পারে। কেননা তাদের ধারণায় আমি তো ধর্মীয় খিদমতের জন্য সর্বোচ্চ পদটিতে সমাসীন ছিলামই।

অতঃপর জনমনে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা শুরু হ'ল। যাঁরা রাজধানী থেকে দূরে অবস্থান করতেন তাঁরা মনে করলেন যে, এর ভেতর সরকারী কর্মকর্তাদের ইশারা-ইঙ্গিত রয়ে গেছে অর্থাৎ সরকারী কোপানলই আমার এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে কাজ করছে। কিন্তু যাঁরা সরকারী মহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত তাঁরা দেখছিলেন যে, সরকারী মহল আমাকে ধরে রাখবার জন্য কি প্রাণান্তকর কোশেশই না করছে! তাঁরা বলেছিলেন, ইসলামের এই রওনক ও জ্ঞানমার্গের এই উজ্জ্বল জোতিষ্কের ওপর কারো বদনজর পড়েছে, আর তাইতেই তিনি সব কিছু অবহেলায় ত্যাগ করে নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়িয়েছেন– এ ছাড়া তাদের আর কিই-বা বলার থাকতে পারে!

মোট কথা, আমি বাগদাদ ত্যাগ করলাম। আমার নিকট মাল-মাত্তা যা কিছু ছিল, চলার মত কিছু রেখে বাকী সব কিছুই বিলি-বণ্টন করে দিলাম। বাগদাদ থেকে আমি শামে এলাম এবং সেখানে দু'বছরের কাছাকাছি থাকলাম। সেখানে আমার কাজ রিয়াযত ও মুজাহাদা, নিঃসঙ্গ জীবন যাপন ও নির্জনতা অবলম্বন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। 'ইলমে তাসাওউফ থেকে আমি কিছু হাসিল করেছিলাম। সেই মুতাবিক তাযকিয়ায়ে নফ্‌স তথা আত্মশুদ্ধি, চারিত্রিক সংশোধন, পরিমার্জন ও আল্লাহ্‌র যিকিরের জন্য নিজ কলবকে পরিষ্কৃতকরণের কাজে মগ্ন থাকি। অনেক দিন পর্যন্ত আমি দামিশকের মসজিদেই ই'তিকাফরত ছিলাম। মসজিদের মিনারে আরোহণ করতাম এবং সমস্ত দিন দরজা বন্ধ করে সেখানেই বসে থাকতাম।

অবশেষে আমি দামিশ্‌ক থেকে বায়তু'ল-মুক'দ্দাসে আসি। সেখানেও আমি দৈনিক মসজিদে সাখরার অভ্যন্তরে চলে যেতাম এবং দরজা বন্ধ করে সময় কাটাতাম। অতঃপর সায়্যিদুনা হযরত ইবরাহীম ('আ)-এর রওয়া যিয়ারতের পর আমার মনে হজ্জে বায়তুল্লাহ্ ও যিয়ারতে রওযা পাক (সা)-এর প্রবল বাসনা জাগ্রত হ'ল এবং মক্কা মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়ারার বরকত লাভ করে উপকৃত হবার খেয়াল জাগল। অনন্তর আমি হজ্জে গমন করলাম। হজ্জ

করার পর পরিবার-পরিজনের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ ও সন্তান-সন্ততির ডাকে আমাকে দেশে ফিরতে হ'ল, অথচ একদিন দেশের নাম শুনলেই আমি কয়েক মাইল পালাতাম। সেখানে গিয়েও আমি একাকিত্বের মাঝেই কাটাবার ব্যবস্থা করলাম, আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে এতটুকু অলসতার প্রশ্রয় দিলাম না। কিন্তু নানান ঘটনা-প্রবাহ, পরিবার-পরিজনের চিন্তা ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন তথা জীবিকার তাগিদ আমার স্বভাব ও প্রকৃতিতে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করত এবং এতে মনের একাগ্রতা ও চিত্তের প্রশান্তি অখণ্ডভাবে জুটত না। কিন্তু তাতে আমি নিরাশ হতাম না; সময় সময় এ থেকে বরং লাভবানই হতাম।

এভাবে কাটিয়ে দিলাম দশটি বছর। এই নির্জন নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলোতে আমার নিকট যে সব রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং আমি যা লাভ করেছি তার বিস্তারিত বর্ণনা দান সম্ভব নয়। তবে পাঠকের উপকারের জন্য এতটুকু অবশ্যই বলব যে, আমি নিশ্চিতভাবেই অবহিত হয়েছি যে, কেবল সূফীরাই আল্লাহ্‌র পথের পথিক। তাঁদের সীরাত (জীবনচরিত)-ই সর্বোত্তম সীরাত, তাঁদের পথই সর্বাধিক সুদৃঢ়, তাঁদের আখলাক তথা নৈতিক চরিত্রই সর্বাধিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত, বিশুদ্ধ ও সঠিক। বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি, জ্ঞানীদের হিকমত ও শরীয়তের সূক্ষ্ম রহস্যবিদদের 'ইল্‌ম মিলেও যদি তাঁদের সীরাত ও নৈতিক চরিত্র থেকে উত্তম কিছু আনতে চায় তবে তা সম্ভব নয়। তাঁদের সকল প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য গতি ও স্থৈর্য নবূওতের প্রদীপালোক থেকে উৎসারিত এবং নবূওতের জ্যোতি থেকে বড় কোন আলো এ ধরার বুকে নেই যা থেকে আলো-কণা পাওয়া যেতে পারে।

জনসমাবেশের দিকে প্রত্যাবর্তন

সম্ভব ছিল ইমাম গাযালী (র) এই নিঃসঙ্গ জীবন ও নির্জনতার মাঝেই থেকে যেতেন এবং বাকী জীবনও রূহানী আনন্দ উপভোগ এবং একাগ্রতার আরাম ও পরিতৃপ্তির মাঝেই কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর থেকে যে বিরাট মহান খিদমত নিতে চাচ্ছিলেন তার জন্য অপরিহার্য ছিল যে, তিনি নির্জনবাস থেকে বেরিয়ে আসবেন এবং পঠন-পাঠন, রচনা সংকলন ও সামাজিক জীবন এখতিয়ার করবেন যাতে করে গোটা সৃষ্টিকুলের কল্যাণ সাধিত হয়, ধর্মদ্রোহী মতবাদ ও দর্শন প্রত্যাখ্যাত হয় এবং জ্ঞানগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্যতা প্রমাণিত হয়। বিশেষ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এমন নিশ্চিত জ্ঞান, বিশ্বাস ও পর্যবেক্ষণের স্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন যে, তৎকালীন

মুসলিম বিশ্বে তাঁর থেকে অধিক যথার্থ ও যোগ্য ব্যক্তিত্ব আর কেউ ছিলেন না। যেহেতু এই কর্মের পেছনে আল্লাহ্‌র মঞ্জুরী ছিল এবং ইসলামেরও এর ভীষণ প্রয়োজন ছিল, এজন্য স্বয়ং তাঁর নিজের মনেই এর অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হ'ল এবং এ ধারণাও প্রাধান্য পেল যে, এটি সাধনার ধন এবং এটি আম্বিয়া-ই-কিরাম ('আ)-এর প্রতিনিধিত্ব, যুগের দাবি ও সর্বোত্তম 'ইবাদত। তিনি তাঁর নিজ অনুভূতিকে খোদ নিজেই বর্ণনা করেছেন এবং নিঃসঙ্গ জীবন থেকে জনসমাবেশে ফিরে আসার কারণও লিপিবদ্ধ করেছেন।

আমি দেখতে পেলাম যে, দর্শনশাস্ত্রের প্রভাবে তাসাওউফের বহু দাবিদারের গোমরাহী, অনেক 'আলিম-'উলামা'র বে'আমল জীবন ও মুতাকাল্লিমদের ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল প্রতিনিধিত্বের কারণে অধিকাংশ শ্রেণীর ঈমান দোদুল্যমান ও নড়বড়ে হয়ে গেছে এবং 'আকীদা তথা ধর্মবিশ্বাসের ওপর এর খুবই খারাপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে। দর্শনশাস্ত্রজাত বহু লোক শরীয়তের প্রকাশ্য বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকামের পাবন্দও বটে, কিন্তু নবূওত ও দীনের হাকীকতের ওপর তাদের ঈমান নেই। কতক লোক কেবল শারীরিক ব্যায়ামের ধারণায় নামায পড়ে, কেউ পড়ে কেবল সোসাইটি ও নগরবাসীর অভ্যাসের অনুসরণ এবং নিজেদের হেফাজতের জন্য। কতক লোক শর'ঈ হুকুম-আহকামের বস্তুগত সুবিধা লাভ এবং সেগুলো পালন না করলে জাগতিক ক্ষতি হবে ধারণা করে তা পালন করে। আমি দেখছি যে, আমি সে সব সন্দেহ নিরসন করবার মত যোগ্যতা রাখি এবং সহজেই তা করতে পারি, এমন কি ঐ সব লোককে পর্দান্তরালে প্রেরণ আমার কাছে পানি পান করার চেয়েও অধিকতর সহজ বলে মনে হয়। এতদ্দৃষ্টে আমার মনে শক্তভাবে এই ধারণার সৃষ্টি হ'ল যে, আমার এই কাজই করা উচিত এবং এটাই সময়ের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমি আপন মনেই বললাম, "এই নিঃসঙ্গ ও জনমানবের সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন তোমার জন্য কবে এবং কখন জায়েয হ'ল? রোগ-ব্যাধি চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেছে। চিকিৎসক নিজেই আজ রোগী। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জগত আজ ধ্বংসের প্রান্তে এসে উপনীত।" অতঃপর আমি বললাম, "এই এতবড় বিরাট ও মহান দায়িত্ব তোমা দ্বারা কিভাবে পালিত হতে পারে! বর্তমান যুগ তো নবী যুগ থেকে বহু দূরে এসে গেছে। চারদিকে বাতিলেরই রাজত্ব। যদি তুমি আল্লাহ্‌র সৃষ্টিজগতকে তাদের প্রিয় ও পরিচিত বস্তুসমূহ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে চেষ্টা কর তাহলে গোটা যুগ-যমানা তোমার বিরোধী হয়ে যাবে। তুমি একাকী কিভাবে তাদের মুকাবিলা করবে এবং কীভাবে জীবন যাপন করবে? এটা তো

তখনই সম্ভব যখন যুগ-যমানা অনুকূল হয় এবং সমকালীন সুলতানও দীনদার হন।" আমি এই বলে আমার মনকে বুঝ দিলাম এবং নিজের জন্য নিঃসঙ্গ ও নির্জন জীবন যাপন জায়েয বলে অভিহিত করলাম। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার অন্য কিছু মঞ্জুর ছিল। তিনি তৎকালীন সুলতানের মনে নিজেই একটি বিপ্লাবত্মক পরিবর্তন এনে দিলেন।

তিনি (সুলতান) আমাকে এই ফেতনা মুকাবিলা করবার জন্য নিশাপুর পৌঁছবার জন্য জোর তাগিদসহ নির্দেশ দিলেন। সুলতানের এই নির্দেশ এই পর্যায়ের ছিল যে, আমি অনুভব করলাম, যদি আমি এই হুকুম তা'মিল না করি তাহলে এর পরিণতি সুলতানের অসন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছবে। আমি ভাবলাম যে, এবার আমার জন্য আর কোন ওযর অবশিষ্ট রইল না। এরপরও যদি আমি নির্জনতা অবলম্বন করি এবং নিঃসঙ্গ জীবনকেই বেছে নিই তা হবে আমার অলসতা, আরামপ্রিয়তা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা হাল্‌কা করবারই নামান্তর, তা হবে পরীক্ষা ও দুঃখকষ্টপূর্ণ অবস্থা থেকে গা বাঁচিয়ে চলবার স্বার্থেই, অথচ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

اَحْسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا امَنَّا وَهُمْ لاَيُفْتَنُوْنَ - وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلْيَعْلَمَنَّ الكٰذِبِيْنَ

"মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই ওদেরকে পরীক্ষা না করেই অব্যাহতি দেওয়া হবে! আমি তো এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী"। —সূরা 'আনকাবূত, ২-৩ আয়াত।

অধিকন্তু রসূল করীম (সা)-এর প্রতি, যিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ও মর্যাদাবান ছিলেন, ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَاكُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتَاهُمْ
نَصْرُنَا - وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ - وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَاِ الْمُرْسَلِيْنَ *

"তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল; কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেওয়া ও ক্লেশ দেওয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাদের নিকট এসেছে। আল্লাহ্‌র আদেশে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। রসূলদের কিছু সংবাদ তোমার নিকট অবশ্যই এসেছে।" —সূরা আন'আম, ৩৪ আয়াত।

আমি কতিপয় সূফী ও আধ্যাত্মিক পুরুষের সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলাম। তাঁরা সকলেই একমত হয়ে আমাকে নির্জনতা ছেড়ে বেরিয়ে আসবার পরামর্শ দিলেন। এর সমর্থনে আল্লাহ্‌র বহু সৎকর্মশীল বান্দা একাদিক্রমে স্বপ্ন দেখেন যা থেকে আমি অবহিত হই যে, আমার এ পদক্ষেপ বিরাট কল্যাণ ও বরকতের কারণ হবে এবং হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে যার এক মাস মাত্র বাকী– সম্ভবত কোন বিরাট ও মহান সংস্কারমূলক কাজ হবে। আর তা এজন্য যে, হাদীছ শরীফে এসেছে, "আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি শতাব্দীর মাথায় এমন একজন মানুষ পয়দা করেন যিনি এই উম্মতের দীনকে জীবন্ত করে তোলেন।" এই সব আলামত ও কার্যকারণদৃষ্টে আমার মনেও এরূপ আশা জাগরূক হ'ল। আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য নিশাপুরের সফরের আয়োজন করে দিলেন এবং আমি এই মহান খিদমতের জন্য নিয়ত করে ফেললাম। এটি ৪৯৯ হিজরীর যি'ল-কা'দা মাসের ঘটনা। ৪৮৮ হিজরীর যি'ল-কা'দাঃ মাসে বাগদাদ থেকে বহির্গত হয়েছিলাম। এই হিসাবে দেখা যায় আমি ১১ বছর নির্জন বাস করেছি। এসবই তকদীরে ইলাহীর পরিকল্পিত ব্যবস্থামাত্র। বাগদাদ থেকে বহির্গত হওয়া এবং সেখানকার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদাকে বিদায় সালাম জানানো আমার কল্পনায় আসত না, কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুমে তা সহজে হয়ে গেল। অনুরূপভাবে আমার এই নির্জনতা অবলম্বন কালীন যুগে নিঃসঙ্গ জীবন থেকে জনসমাবেশের মাঝে পুনর্বার ফিরে যাবার ধারণাও মনে উদয় হ'ত না, অথচ সময়ে তার আয়োজনও সম্পন্ন হয়ে গেল।

মোটকথা, ৪৯৯ হিজরীর যি'ল-কা'দা মাসে ইমাম সাহেব পুনরায় নিশাপুরের দিকে গতি ফেরালেন। তিনি নিজামিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনার কাজে যোগ দিলেন এবং পুনর্বার অধ্যাপনা ও কল্যাণধর্মী কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু ইমাম গাযালী (র)-এর এবারকার দরস ও তাদরীস তথা পঠন-পাঠন, সংস্কার ও সৎ পথ প্রদর্শন এবং পূর্বেকার পঠন-পাঠন কার্যক্রম, ওয়া'জ-নসীহত ও ইরশাদ-এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। অনন্তর বিষয়টি তিনি নিজেই পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন :

আমি অনুভব করি যে, যদিও 'ইল্‌ম-এর প্রচার ও প্রসারের দিকে পুনরায় আমি ফিরে এলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একে আমার প্রথম অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন বলা ঠিক হবে না। আমার পূর্বের ও পরের অবস্থার ভেতর আসমান-যমীন ফারাক। প্রথমে আমি সেই 'ইল্‌ম-এর প্রচার করতাম যা প্রভাব ও পদমর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম ছিল এবং আমি আমার কথা ও কর্ম দ্বারা তারই দা'ওয়াত দিতাম এবং এটাই ছিল আমার অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কিন্তু

এখন আমি সেই 'ইল্‌ম-এর দা'ওয়াত দিই যার কারণে পদমর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মায়া চিরদিনের তরে কাটাতে হয়। এখন আমি আমার নিজের ও অন্যের সংস্কার ও সংশোধন চাই। আমি জানি না, আমি আমার অভীষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছুতে পারব কিনা অথবা এর পূর্বেই আমাকে কর্মের জগত থেকে চিরবিদায় নিতে হবে। কিন্তু নিজস্ব য়াকীন ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আমার ঈমান এই যে, আসল শক্তি আল্লাহ্‌রই শক্তি। তাঁরই কারণে মানুষ গোমরাহী ও মন্দ থেকে বাঁচতে পারে এবং হিদায়াত ও আনুগত্যের শক্তি অর্জন করতে পারে। আসলে আমি নিজের তরফ থেকে সচল ও সক্রিয় হই নি, আল্লাহ্‌ই আমাকে সচল ও গতিশীল বানিয়েছেন। আমি নিজে থেকে কাজ শুরু করিনি, আল্লাহ পাকই আমাকে কাজে লাগিয়েছেন। আমার দু'আ, আল্লাহ পাক প্রথমে আমাকে সংশোধন করুন, অতঃপর আমা দ্বারা অন্যদের সংস্কার ও সংশোধন হোক; প্রথমে আমাকে পথে আনুন, এরপর আমা দ্বারা অন্যদের পথ প্রদর্শনের কাজ নিন। সত্য যেন আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় এবং ঠার বদৌলতে আমি যেন আনুগত্য করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারি; বাতিল যেন আমার চোখে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয় এবং আমি যেন তার অনুসরণ থেকে বাঁচি।[১]

ইমাম গাযালী (র)-এর সংস্কার ও ইসলামী পুনর্জাগরণমূলক কাজ

ইমাম গাযালী (র) এরপর যে সংস্কার ও ইসলামী পুনর্জাগরণমূলক কাজ আঞ্জাম দেন তাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১. দর্শন ও বাতেনী মতবাদের বর্ধিত প্লাবনের মুকাবিলা এবং ইসলামের পক্ষ থেকে সে সবের মূল ভিত্তির ওপর আঘাত হানা।

২. সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের ইসলামী ও নৈতিক পর্যালোচনা এবং সে সবের ওপর সমালোচনা ও সংস্কার।

দর্শনের ওপর কার্যকর অপারেশন

তাঁর প্রথম ও সর্ববৃহৎ কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ধর্মদ্রোহী মতবাদ ও বাতেনিয়াদের বিরুদ্ধে তখন পর্যন্ত যা কিছু করা হচ্ছিল তা ছিল আত্মরক্ষামূলক এবং প্রত্যুত্তর দেওয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। সে সময় পর্যন্ত দর্শন ইসলামের ওপর হামলারত ছিল এবং মুতাকাল্লিমগণ ইসলামের সমর্থনে সাফাই পেশ করছিলেন। দর্শনশাস্ত্র ইসলামের মূল বুনিয়াদের ওপর কুঠারঘাত

---

১. আল-মুনকি'য' মিনা'দ্দ'লাল, ২৮-৩০ পৃ. সংক্ষেপে।

করত এবং 'ইলমে কালাম ইসলামের ঢাল হবার কোশেশ করত। সেই সময় পর্যন্ত মুতাকাল্লিমগণ ও 'উলামায়ে ইসলামের ভেতর কেউই স্বয়ং দর্শনের ভিত্তির ওপর আঘাত হানবার সাহস করেন নি। 'দর্শন' যে সব 'কাল্পনিক ও মনগড়া' বিষয়ের ওপর দাঁড়িয়েছিল কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত সে সবের ওপর আঘাত হানা এবং সে সবের জ্ঞানগর্ভ সমালোচনা করার হিম্মত কারো হয়নি। ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীকে বাদ দিলে (দর্শনের সঙ্গে যাঁর সরাসরি টক্কর লাগে নি) গোটা 'ইল্‌মে কালামের কণ্ঠস্বর তথা উচ্চারণ ভঙ্গী ছিল ওযরখাহী ও আত্মরক্ষামূলক। ইমাম গাযালী (র)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি দর্শনকে বিস্তারিত ও সমলোচনার নিরিখে অধ্যয়ন করেন। এরপর مقاصد الفلاسفه বা দার্শনিকদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-এই নামে একটি বই লিখেন। এতে তিনি সহজ সরল ভাষায় বিশ্লেষণমূলক পন্থায় যুক্তিবিদ্যা, অধিবিদ্যা তথা Metaphysics ও প্রকৃতিবিদ্যার খোলাসা বা সারসংক্ষেপ পেশ করেন এবং পরিপূর্ণ নিরপেক্ষতার সঙ্গে দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আলোচনা লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি খোলাখুলিভাবে বলেছেন যে, গণিতশাস্ত্রে আলোচনা কিংবা তর্ক-বিতর্কের সুযোগ নেই এবং ধর্মের সঙ্গে এর 'হাঁ' বা 'না'-এর কোনরূপ সম্পর্ক নেই। কিন্তু ধর্মের আসল সংঘর্ষ অধিবিদ্যার সঙ্গে। যুক্তিবিদ্যায়ও খুব অল্পই ভুল আছে। যদি কিছু মতভেদ থাকে তা পরিভাষার ক্ষেত্রে। প্রকৃতিবিদ্যায় অবশ্যই সত্য-মিথ্যার তথা হক ও বাতিলের মিশ্রণ আছে। এজন্য তার আলোচ্য বিষয় প্রকৃতপক্ষে অধিবিদ্যা এবং কিছুটা পরিমাণ প্রকৃতিবিদ্যা। আর যুক্তিবিদ্যা কেবল ভূমিকাস্বরূপ ও পরিভাষার জন্য।

এই গ্রন্থ শেষ ক'রে, যা 'ইলমে কালামের শিবিরে খুবই দরকার ছিল, তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাহাফতু'ল-ফালাসিফা' (দার্শনিকদের ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি) লেখেন যার জন্যই তিনি 'মাক'সি'দু'ল-ফালাসিফা' লিখেছিলেন। এতে তিনি দর্শন, অধিবিদ্যা ও প্রকৃতিবিদ্যার ওপর ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করেন এবং তার জ্ঞানগত দুর্বলতা, তার যুক্তি-প্রমাণের অসারতা এবং দার্শনিকদের পারস্পরিক বৈপরীত্য ও মতভেদকে পরিপূর্ণ শক্তি ও সাহসিকতার সঙ্গে প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থে তাঁর কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণভঙ্গী আ'াপূর্ণ, তাঁর ভাষা শক্তিশালী ও প্রস্ফুটিত, কোথাও কোথাও তা বিদ্রূপাত্মক ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভঙ্গি অনুসরণ করে, যা কিনা দর্শনশাস্ত্রের ভয়ে ভীত ও অভিভূত মহলের জন্য দরকার ছিল। তা পাঠ করলে অনুভূত হয় যে, গ্রন্থের গ্রন্থকার দার্শনিকদের মুকাবিলায় হীনমন্যতাবোধের সামান্যতম মিশ্রণ থেকেও মুক্ত ও পবিত্র, আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাসে তিনি ভরপুর এবং দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে তিনি এতটুকু আতংকিত কিংবা অভিভূত নন। তিনি গ্রীক

দার্শনিকদেরকে তারই কাতারের মানুষ মনে করেন এবং তাঁদের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাষায় কথা বলেন। সে সময় এমন একজন লোকেরই দরকার ছিল, যিনি দর্শনশাস্ত্রের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারেন এবং আত্মরক্ষামূলক ও জবাবদিহির ভূমিকার পরিবর্তে দর্শনশাস্ত্রের ওপর পূর্ণ শক্তিতে আঘাত হানতে পারেন। ইমাম গাযালী (র) 'তাহাফতু'ল-ফালাসিফা' নামক গ্রন্থে এই খেদমতই আঞ্জাম দিয়েছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেনঃ

আমাদের যুগে এমন কিছু লোক জন্মেছে যাদের ধারণা এই যে, তাদের দিল ও দিমাগ তথা মন ও মস্তিষ্ক সাধারণ লোকের তুলনায় বিশিষ্ট। এ সমস্ত লোক ধর্মীয় বিধি-বিধান ও বাধ্যবাধকতাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। এর কারণ একমাত্র এই যে, তারা সক্রেটিস, হিপোক্রেট (Hippocrate- খৃ. পূ. ৪৬০-৩৭৭), প্লেটো ও এরিস্টটলের ভীতিপূর্ণ নাম শুনেছে এবং তাঁদের শানে তাদের অনুরাগী ভক্তবৃন্দের বিরাট স্তুতিপূর্ণ গালগল্প ও লম্বা-চওড়া ফিরিস্তি শুনেছে। তারা জানতে পেরেছে যে, অংকশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁরা (সক্রেটিস প্রমুখ দার্শনিক) বিরাট সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁদের বুদ্ধি ও মেধার সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের উন্নত মস্তিষ্ক ও মেধার সঙ্গে ধর্ম ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করত। তাদের নিকট তাদের ধর্মের মূলনীতি ও নিয়মবিধি ছিল মনগড়া ও কৃত্রিম। ব্যস, আর কথা নেই, তারাও তাদের গুরুদের অন্ধ আনুগত্যে বাদরামি অনুকরণ করতে গিয়ে ধর্ম অস্বীকার করাকে নিজেদের জন্য একটা ফ্যাশন বানিয়ে নিল। তারা শিক্ষিত ও প্রগতিশীল নামে অভিহিত হবার খাহেশ মেটাতে ধর্মকে অস্বীকার করতে থাকল যাতে করে তাদের মর্যাদা সাধারণের তুলনায় উন্নত মনে করা হয় এবং তারা যাতে জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিজীবীদের কাতারে শামিল হতে পারে। এরই ভিত্তিতে আমি ইচ্ছা করলাম যে, ঐসব জ্ঞানী দার্শনিকরা ঐশী বিদ্যা (অধিবিদ্যা)-র ওপর যা কিছু লিখেছেন সে সবের ভ্রান্তি আমি দেখিয়ে দিই এবং প্রমাণ করে দিই যে, তাদের সংকট, সমস্যাবলী ও মূলনীতিগুলো ছেলেমিপূর্ণ এবং তাদের অনেক উক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি সীমাহীন রকমের হাস্যকর।[১]

এই গ্রন্থের সম্মুখে গিয়ে তাঁর বর্ণনাশক্তি ও বিদ্রূপাত্মক লেখনী পদ্ধতি আরও শাণিত ও উদ্ধত হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে দার্শনিকদের অত্যাশ্চর্য বিষয়সমূহ, বুদ্ধিবৃত্তি ও আকাশমার্গের পুরো বংশতালিকা লেখেন যা দার্শনিকরা লিখেছেন ঃ

---

১. তাহাফতু'ল-ফালাসিফা, ২-৩ পৃষ্ঠা;

قلنا ما ذكرتموه تحكمات وهى على التحقيق ظلمات فوق ظلمات لو حكاه الانسان عن منام رأه لاستدل على سوء مزاجه .

তোমাদের এই যে বিস্তৃত বিবরণ, তা কেবল গালভরা দাবি ও স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়া আর কিছু নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে তা অন্ধকারের ওপর অন্ধকারের প্রলেপ মাত্র। যদি কোন ব্যক্তি তার নিজের দেখা এমন স্বপ্নও বর্ণনা করে তাহলেও তার মস্তিষ্ক বিকৃতির প্রমাণ হবে।

সামনে এগিয়ে তিনি লিখেন ঃ

لست ادرى كيف يقنع المجنون من نفسه بمثل هذه الاوضاع فضلا عن العقلاء الذين يشقون الشعر بزعم فى المعقولات .

আমার বিস্ময় জাগে যে, পাগলেও কিভাবে এ ধরনের স্বনির্মিত ও স্বকপোলকল্পিত কথার ওপর তুষ্ট হতে পারে! সেখানে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের কথা তো ভাবাই যায় না, যাঁরা তাঁদের নিজস্ব ধারণা মাফিক বোধগম্য বস্তুনিচয় ও সম্ভাবনার ভেতরও চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ছাড়েন।[১]

অন্যত্র লিখেন ঃ

انتهى بهم التعمق في التعظيم الى ان ابطلوا كل ما يفهم من العظمة وقربوا حاله الميت الذى لاخبر له بما يجرى فى العالم الا انه فارق الميت فى شعوره بنفسه فقط – وهكذا يفعل الله بالزائغين عن سبيله والناكبين عن طريق الهدى المنكرين لقوله تعالى مَا اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلاَ خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ الظانين بالله ظن السوء المعتقدين ان الامور الربوبية تستعلى كنهها القوى البشرية المغرورين بعقولهم زاعمين ان فيها مندوحة عن تقليد الرسل واتباعهم فلا جرم اضطروا الى الاعتراف بان لباب معقولاتهم رجع الى مالوحكى فى المنام لتعجب منه .

প্রথম স্বয়ম্ভূর সম্মানে উচ্ছ্বাস ও সীমাতিরিক্ততা প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁকে (স্বয়ম্ভু বা প্রথম স্রষ্টাকে) এমন সীমায় পৌঁছে দিয়েছে যে, তারা মর্যাদার সব শর্ত ও আবশ্যকীয় বিষয়াবলীকেও বাতিল আখ্যায়িত করেছে এবং আল্লাহ তা'আলাকে (নিজেদের দর্শনে) সেই মুর্দা লাশের ন্যায় বানিয়ে দিয়েছে যে জানেই না যে, বহির্জগতে কি হচ্ছে কিংবা ঘটছে। অবশ্য এই দিক দিয়ে তিনি (স্রষ্টা, স্বয়ম্ভু) মুর্দা অপেক্ষা ভাগ্যবান যে, তাঁর উপলব্ধি ও অনুভূতি শক্তি লোপ পায়নি, বরং তা আছে (আর মৃত লাশের উপলব্ধি, চেতনা কিংবা অনুভূতি থাকে না)। আল্লাহ পাক এ ধরনের লোকদেরকে এমন পরিণতির সম্মুখীন

১. তাহাফুতু'ল-ফালাসিফা-৩৩ পৃ.।

করেন যে, তারা আল্লাহ্র পথ থেকে দূরে সরে যায়, সৎ ও সত্য পরিত্যাগ করে এবং নিম্নোক্ত আয়াতকে অস্বীকার করে :

مَا أَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ۔

"আর আমি সেই সব কাফির ও মুশরিকদেরকে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করবার সময় সাক্ষী বানাই নি, এমন কি তাদের পয়দা করবার মুহূর্তেও না", যারা আল্লাহ্র প্রতি কুধারণা পোষণ করে এবং খারাপ 'আকীদা রাখে, যাদের ধারণা যে, আল্লাহ্র রবূবিয়তের (পালনবাদ-এর) হাকীকতের ওপর মানবীয় শক্তি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, যারা তাদের নিজেদের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে গর্বিত এবং মনে করে যে, তাদের উপস্থিতি ও বর্তমান থাকা অবস্থায় পয়গম্বরদের অনুকরণ ও আনুগত্যের প্রয়োজন নেই। নিশ্চিতরূপেই এর পরিণতি এই হয়েছে যে, তাদের মুখ দিয়ে (যুক্তিবুদ্ধির নামে) এমন সব হাস্যকর কথাবার্তার বেরোয়, যদি কেউ এ ধরনের স্বপ্নের বর্ণনাও দেয় তাহলে লোকে বিস্মিত হবে।[১]

তাহাফতু'ল-ফালাসিফার প্রভাব

দর্শনশাস্ত্রের ওপর এই সাহসিকতাপূর্ণ সমালোচনা এবং নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত তার প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন 'ইলম-ই-কালামের ইতিহাসে এমন একটি নতুন যুগের সৃষ্টি করে যার সার্বিক কৃতিত্ব ইমাম গাযালীর প্রাপ্য। পরে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইব্ন তায়মিয়া (র) এর পূর্ণতা দান করেন এবং দর্শনশাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যার মৃতদেহের "পোস্ট মর্টেম"-এর দায়িত্ব পালন করেন। দর্শনশাস্ত্রের অপারেশনের এই ধারার সূচনাও ইমাম গাযালী (র)-এর রচিত গ্রন্থাদি থেকেই।

'তাহাফতু'ল-ফালাসিফা' দর্শনশাস্ত্রের কাল্পনিক ভোজবাজির ওপর কার্যকর আঘাত হানে এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও মেধাগত পবিত্রতাকে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই গ্রন্থের রচনা দর্শনশাস্ত্রের জগতে একটি অস্থিরতা, চাঞ্চল্য ও ক্রোধের জন্ম দেয়। কিন্তু শত বছর পর্যন্ত এর প্রত্যুত্তরে কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রণীত হয়নি, এমন কি হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে দর্শনশাস্ত্রের প্রখ্যাত উৎসাহী প্রবক্তা ও এরিস্টটলের অনুসারী ইব্ন রুশ্দ (মৃত্যু ৫৯৫ হিজরী) "তাহাফতু'ত- তাহাফুত" নামের একটি বইয়ের মাধ্যমে এর জবাব লেখেন। পাশ্চাত্যের বিদ্বানমণ্ডলী বলেন, যে দর্শনশাস্ত্র গাযালী (র)-এর আক্রমণে প্রায় মরণদশায় পৌঁছে গিয়েছিল, ইব্ন রুশদের সমর্থন তাকে এক শ' বছরের জন্য পুনরায় জীবন দান করে।[২]

১. তাহাফতু'ল-ফালাসিফা, ৩১ পৃ.।
২. প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ইসলামী দর্শনের ইতিহাস-মুহাম্মদ লুৎফী জুম'আ, পৃ. ৭২।

বাতেনী মতবাদের ওপর হামলা

দর্শনশাস্ত্র ছাড়াও ইমাম গাযালী (র) বাতেনী মতবাদের ফেতনার দিকেও মনোযোগ দেন। তিনি বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনাকালে বাতেনীদের প্রত্যাখ্যানে তৎকালীন খলীফার ইঙ্গিতে 'আল-মুস্তাজহির' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন, যার উল্লেখ তিনি তাঁর আত্মজীবনীমূলক 'আল-মুনকি'য' মিনা'দ্দ'লাল' নামক গ্রন্থে করেছেন। এই গ্রন্থ ছাড়াও এই বিষয়ের ওপর তাঁর আরও তিনটি গ্রন্থ রয়েছে যা সম্ভবত তাঁর ভ্রমণকালীন সময়ের রচনাঃ হু'জ্জাতু'ল-হক, মুফাস'স'ালু'ল-খিলাফ ও ক'াসামু'ল-বাতেনিয়া'[১]। তাঁর গ্রন্থের তালিকায় এই বিষয়ের ওপর فضائح الاباحية ও مواهم الباطنية নামক আরও দু'টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। বাতেনিয়া মতবাদের প্রত্যাখ্যানের জন্য প্রকৃতপক্ষে আহলে সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আত মহলে তাঁর চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি মেলা মুশকিল ছিল। তিনি দর্শনশাস্ত্র, তাসাওউফ, জাহিরী 'ইল্‌ম ও হাকীকত ও মা'রিফতের উভয় দিককার গলি-ঘুপচি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং তিনি বাতেনী মতবাদের রহস্য ভেদ ও তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ষড়যন্ত্রের পর্দা সহজেই উন্মোচন করতে পারতেন। বাতেনী মতবাদের বড় অস্ত্র ছিল দর্শনশাস্ত্র ও তার পরিভাষাসমূহ। শুধু ইমাম গাযালী (র)-এর মতই কোন পরিপক্ক ব্যক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির পর্যালোচক সে সবের প্রত্যাখানের কাজটি করতে পারতেন। বাস্তবেও তিনি তাই করেন। তিনি জ্ঞানগত দিক দিয়ে দর্শনশাস্ত্রকে এক নিষ্প্রভ ও গুরুত্বহীন বস্তুতে পরিণত করেন।

জীবন ও সমাজের ইসলামী পর্যালোচনা

ইমাম গাযালী (র)-এর অপর সংস্কারমূলক কাজ ছিল জীবন ও সমাজের ইসলামী পর্যালোচনা এবং তার সংস্কার ও পুনর্জাগরণের প্রচেষ্টা। তাঁর এই প্রচেষ্টার একটি সফল পরিণতি তাঁর জীবন্ত ও চিরন্তন গ্রন্থ "ইহ'য়া' 'উলূমুদ্দীন"।

"ইহ'য়া' 'উলূমুদ্দীন"

ইসলামের ইতিহাসে যে কতিপয় গ্রন্থ মুসলমানদের দিল ও দিমাগ তথা মন ও মস্তিষ্ক এবং তাদের জীবনের ওপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছে তার ভেতর "ইহ'য়া 'উলূমুদ্দীন"-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'আলফিয়াহ' নামক গ্রন্থের লেখক হাফিজ যয়নুদ্দীন আল-'ইরাকী (মৃত্যু ৮০৬ হি.), যিনি 'ইহ'য়া'তে উল্লিখিত হাদীছগুলো খুঁজে বের করেছেন, বলেছেনঃ ইমাম গাযালী (র)-এর

---

১. এই তিনটি গ্রন্থের উল্লেখ ইমাম গাযালী (রা) 'জাওয়াহিরু'ল-কু'রআন' নামক গ্রন্থে করেছেন।

"ইহ্'য়াউ'ল-'উলূম" ইসলামের সর্বোত্তম গ্রন্থের একটি।[১] ইমাম গাযালী (র)-এর সমসাময়িক ও ইমামু'ল-হ'রামায়ন-এর শাগরিদ 'আবদুল গাফির ফারসী বলেন : ইহ্'য়াউ'ল-'উলূম-এর পূর্বে এ ধরনের কোন কিতাব রচিত হয়নি।[২] শায়খ মুহাম্মদ গাযারুনীর দাবি ছিল, "যদি দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয় তাহলে আমি "ইহ্'য়াউ'ল-'উলূম"-এর দ্বারা পুনরায় তা জীবিত করে দেব।"[৩] হাফিজ ইবন জওযী কতিপয় বিষয়ে মতভেদ সত্ত্বেও এই গ্রন্থের প্রভাব ও ব্যাপক জনপ্রিয়তার স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং "মিনহাজু'ল-ক'াসে'দীন" নামে এর সংক্ষিপ্তসার লিখেছেন।

এই গ্রন্থটি বিশেষ অবস্থা, মনোভঙ্গি ও বিশেষ প্রেরণা ও উৎসাহ নিয়ে লেখা হয়েছে। বাগদাদ থেকে সত্যের অন্বেষায় এবং সুদৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাসের সন্ধানে যে সফর ইমাম গাযালী (র) শুরু করেছিলেন যা সুদীর্ঘ দশটি বছরের কঠোর-কঠিন সাধনা, মুজাহাদা ও নির্জনবাসের পর সফলতা লাভের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল– 'ইহ্'য়াউ'ল-'উলূম' ছিল সেই সফরেরই বিশিষ্ট সওগাত, যা তিনি (গাযালী) স্বীয় দেশবাসীর জন্য বহন করে এনেছিলেন। এটি ছিল তাঁর হৃদয়ের অভিব্যক্তি ও প্রতিক্রিয়া, জ্ঞানগত অভিজ্ঞতা, সংস্কারমূলক ধ্যান-ধারণা এবং হৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত আবেগ ও মত্ততাবস্থারই দর্পণ।

মওলানা শিবলী নু'মানী তাঁর 'আল-গাযালী' (র) নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

> তাঁর মধ্যে সত্য অনুধাবনের প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। দুনিয়ার বুকে প্রচলিত সকল ধর্ম-বিশ্বাসই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি দেখেন। কিন্তু কোনটিই তাঁকে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারেনি, আশ্বস্ত করতে পারেনি। শেষাবধি তিনি তাসাওউফের দিকে ঝুঁকে পড়েন। কিন্তু তা মুখে বলে বোঝাবার বস্তু ছিল না, বরং ছিল আপাদমস্তক অনুভব করবার বিষয়, ছিল অনুশীলনের মাধ্যমে উপলব্ধি করবার বস্তু। আর তার পয়লা সৌন্দর্য (زينة) অভ্যন্তরীণ সংস্কার তথা ইসলাহে বাতেন ও তাযকিয়ায়ে নফ্স তথা আত্মার পরিশুদ্ধি। ইমাম সাহেবের কর্মব্যস্ততা ও পেশা ছিল এ পথের প্রতিবন্ধক। একদিকে জনপ্রিয়তা, নাম, খ্যাতি, পদমর্যাদা, সম্মান, প্রতিপত্তি, আলোচনা-বিতর্ক, আর অন্যদিকে আত্মার পরিশুদ্ধি। উভয়ের মাঝে সহস্র যোজনের ব্যবধান। این اه که می روی تو بمنزل نمی رود শেষ পর্যন্ত তিনি সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে একটি কম্বলমাত্র পরিধান করে বাগদাদ

---

১. ২ ও ৩ শায়খ আবদুল কাদির আল-হাসানীর – تعريف الاحياء افضائل الاحياء

থেকে বেরিয়ে পড়েন। তখন থেকেই তাঁর প্রান্তর-জীবনের শুরু। অতঃপর কঠোর রিয়াযত ও মুজাহাদার পর তিনি তাসাওউফের রহস্য উদ্যানে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। এখানে পৌঁছার পর স্বীয় অবস্থায় মত্ত হয়ে গোটা জীবন ও জগত থেকে তাঁর বেখবর হয়ে পড়ার আশংকা ছিল। কিন্তু এই অবস্থায়ও সাধারণের কল্যাণের দিকে ছিল তাঁর কড়া নজর। তিনি দেখতে পেলেন, ব্যাপক জনগণের অবস্থা বিগড়ে গেছে। ধনী-দরিদ্র, বিশিষ্ট-অবিশিষ্ট, জ্ঞানী-মূর্খ, চরিত্রবান-দুশ্চরিত্র সকলেরই নৈতিক চরিত্র হয় ধ্বংস হয়ে গেছে, নয়ত হতে যাচ্ছে। 'উলামা সম্প্রদায়, যারা সত্য পথের দলীলস্বরূপ হতে পারতেন, তারাই জাঁকজমক ও পদমর্যাদার কাঙাল। এসব দৃশ্য তাঁকে ব্যথিত করে তোলে। আর তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। ভূমিকায় তিনি নিজেই লিখেছেন, "আমি দেখতে পেলাম, রোগব্যাধি গোটা জগতটাকে ছেয়ে ফেলেছে এবং পারলৌকিক সৌভাগ্যর রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। 'উলামা, যাঁরা ছিলেন সত্য পথের দলীলস্বরূপ, ক্রমেই তাঁদের অস্তিত্ব লোপ পাচ্ছে। 'আলিম নামধারী যাঁরা এখনো আছেন, তাঁরা নামকা ওয়াস্তে 'আলিম, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উদ্দেশ্য তাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। তাঁদের মতে, 'ইল্‌ম স্রেফ তিনটি জিনিসের নাম, যথা : মুনাজারাহ বা পারস্পরিক বিতর্ক অনুষ্ঠান (যা গর্ব, অহমিকা ও যশ লাভের মাধ্যম); ওয়া'জ বা বক্তৃতা (যার ভেতর জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য রঙীন ও ছন্দোবদ্ধ ছড়া, কবিতা ও শ্লোক আবৃত্তি করা হয়) এবং ফতওয়া প্রদান (যা বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমার ফয়সালার মাধ্যম)। বাকী রইল আখিরাতের 'ইল্‌ম। এটা মূল লক্ষণীয় বিষয় হলেও অধিকাংশ 'আলিমই তা ভুলে গিয়েছে। এতদ্দৃষ্টে আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না। আমার নিস্তব্ধতা ভেঙে চুরে খান খান হয়ে গেল।"[১]

পর্যালোচনা ও হিসাব-নিকাশ

ইমাম গাযালী (র)-এর গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাহ ও তরবিয়ত তথা সংস্কার-সংশোধন ও প্রশিক্ষণ। আর এজন্য জরুরী ছিল সে সব দুর্বলতা ও খারাপ দিকগুলো চিহ্নিত করা যা শিক্ষা ও ধর্মীয় কেন্দ্রগুলোতে এবং সাধারণভাবে মুসলিম জনসমাজে বিদ্যমান ছিল। অধিকন্তু প্রয়োজন ছিল, নফ্‌স ও শয়তান কিভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে ধোঁকা দিয়ে রেখেছে, হাকীকতসমূহ কিভাবে বদলে গেছে, মানুষ কিভাবে হাকীকত থেকে সরে গিয়ে বাহ্যিক আবরণ, চাকচিক্য ও

১. আল-গাযালী, শিবলী নু'মানীকৃত।

রসম-রেওয়াজের মধ্যে নিজেদের বন্দী করে ফেলেছে অর্থাৎ জীবনের মূল লক্ষ্য তথা পারলৌকিক সৌভাগ্য, রিযা-ই-ইলাহী ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি থেকে কিভাবে তারা গাফিল হয়ে পড়েছে, তা জনসাধারণের গোচরীভূত করা। এজন্য তিনি স্বীয় যুগের জীবন-যাত্রা ও সমসাময়িক সমাজের কার্যকলাপের পূর্ণ পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং প্রতিটি শ্রেণীর রোগ-ব্যাধি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি তথা ভুল-ভ্রান্তিগুলো পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেন, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও উপায়-উপকরণাদির ভেতর পার্থক্য নির্ণয় করেন, 'ইল্ম-এর মধ্যে ধর্মীয় 'ইল্ম ও পার্থিব 'ইল্ম, অতঃপর প্রশংসিত 'ইল্ম ও নিন্দনীয় 'ইল্ম, অতঃপর ফরয-ই-আইন, ফরয-ই-কিফায়া ইত্যাদির শ্রেণী বিন্যাস করেন। তিনি সময়ের দাবি অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং মূল কর্মের দিকেও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ধনিক ও বিত্তশালীদের দায়িত্বহীনতা, গাফিলতি ও তাদের বিশেষ ও যথার্থ রোগ-ব্যাধিগুলো খোলাখুলি বর্ণনা করেন। সুলতান ও শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তিবর্গের নির্ভীক সমালোচনা করেন এবং তাদের জোর-জুলুম ও নির্যাতন, শরীয়তবিরুদ্ধ কার্যকলাপ ও আইন-কানুনের নিন্দা করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি জনসাধারণের ব্যাধিসমূহ, বিভিন্ন শ্রেণীর ও স্থানের গর্হিত আচরণসমূহ, নিন্দনীয় অভ্যাস এবং ইসলাম বিরোধী ধর্মীয় প্রথা-পদ্ধতি ও বিদ'আতমূলক কর্মের বিস্তারিত বিবরণ দেন। মোট কথা, এই গ্রন্থটি ইসলামের প্রথম বিস্তারিত ও যুক্তি-প্রমাণভিত্তিক গ্রন্থ যার মধ্যে গোটা জীবনের ও বিগড়ে যাওয়া ইসলামী সমাজব্যবস্থার পরিপূর্ণ খতিয়ান রয়েছে এবং নৈতিক চরিত্রের ব্যাধিগুলোর উৎস ও তার কারণ এবং এর চিকিৎসা-পদ্ধতির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

'উলামা ও ধার্মিক ব্যক্তিবর্গ

ইমাম গাযালী (র)-এর মতে, বিশ্বব্যাপী অশান্তি, বিপর্যয় ও ধর্মীয় ও চারিত্রিক অবনতির সর্বাপেক্ষা বড় যিম্মাদার 'উলামায়ে কিরাম যারা মুসলিম উম্মার জীবনে লবণস্বরূপ। যদি লবণই নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এমন কোন্ বস্তু আছে যা তাকে ভাল করতে পারে? কবির ভাষায় ঃ

يا معشر القراء يا ملح البلد + ما يصلح الملح اذ الملح فسد

ওহে 'উলামা সম্প্রদায়! তোমরা যারা শহরের লবণসদৃশ, আমাকে বলে দাও, যদি লবণই নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আর কি দিয়ে তা ভাল করা যায়?

অন্তরের ব্যাধির আধিক্য ও সাধারণ মানুষের গাফিলতির কারণ বর্ণনা করতে

গিয়ে এক স্থানে তিনি লিখেছেন ঃ

الثالثة وهو الداء العضال فقد الطبيب فان الا طباء هم العلماء وقد مرضوا فى هذه الاعصار مرضا شديداً وعجزوا عن علاجه .

তৃতীয় কারণ এবং সেটাই এমন ব্যাধি যার চিকিৎসা নেই আর তা এই যে, রোগী বর্তমান, কিন্তু চিকিৎসক লাপাত্তা। 'উলামায়ে কিরাম সমাজের চিকিৎসক আর তাঁরাই এ যুগে ব্যাধিতে সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত। সুতরাং চিকিৎসা করতে তারা অক্ষম।

তাঁর মতে, সুলতান ও শাসকবর্গের খারাপ হবার কারণ 'উলামায়ে কিরামের কমযোরী এবং স্বীয় দায়িত্ব পালনে তাঁদের গাফিলতি। এক স্থানে তিনি লিখেছেন:

وبالجملة انما فسدت الرعية بفساد الملوك وفساد الملوك بفساد العلماء فلولا القضاة السوء والعلماء السوء لقل خوفا من انكارهم .

সংক্ষিপ্তসার এই যে, প্রজাবর্গের খারাপ হবার কারণ রাজা-বাদশাহ্‌র তথা শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তিবর্গের খারাবী এবং 'উলামায়ে কিরামের খারাপ হওয়া বাদশাহ তথা শাসকবর্গের খারাপ হবার কারণ। যদি আল্লাহ্‌ভীতিহীন কাযী ও 'উলামায়ে 'সূ' (নীতি, আদর্শ ও চরিত্রহীন স্বার্থসর্বস্ব দুনিয়াদার 'আলিম) না থাকত তাহলে শাসককুল এভাবে বিগড়ে যেত না, বরং তারা 'আলিমদের সমালোচনাকে ভয় করেই চলত।

সে যুগের 'আলিমদের সম্পর্কে ইমাম গাযালী (র)-এর অভিযোগ যে, তারা পূর্ব যুগের আলিম-'উলামার ন্যায় 'আমর বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার' তথা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ এবং অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে হক-কথা বলার দায়িত্ব পালন করছেন না। তাঁর মতে, এর কারণ এই যে, 'আলিম-'উলামা দুনিয়াদার হয়ে গেছেন এবং পদমর্যাদার পেছনে ঘুরছেন। তিনি সে যুগের সুলতান ও শাসনকর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে সত্যপন্থী 'উলামায়ে কিরামের সাহসিকতা, নির্ভীকতা ও হিসাব গ্রহণ ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের প্রভাবমণ্ডিত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করবার পর বলেন ঃ

এই ছিল 'আলিমদের কর্মপদ্ধতি এবং 'আমর বি'ল-মা'রূফ ও নাহী 'আনি'ল-মুনকার'-এর অবস্থা। রাজা-বাদশাহ্‌র শান-শওকতের এতটুকু পরওয়া তাঁদের ছিল না। তাঁরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ওপর আস্থাশীল ছিলেন এবং নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত ছিলেন যে, আল্লাহতা'আলা তাঁদেরকে হেফাজত করবেন। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার সেই ফয়সালার ওপরও রাযী ছিলেন যে, তাঁদের ভাগ্যে

শাহাদত লাভ ঘটুক। যেহেতু তাঁদের নিয়ত ছিল খালেস, সেহেতু তাঁদের কথায় পাথরও মোমের মত গলে যেত এবং বিরাট থেকে বিরাটতর পাষাণ হৃদয়ও প্রভাবিত হ'ত। এখন তো অবস্থা এই যে, দুনিয়ার লোভ 'আলিমদের বোবা বানিয়ে দিয়েছে এবং তারা একেবারে নিশ্চুপ। আর যদি কখনও তারা মুখ খোলে তাহলে দেখা যায় তাদের কথা ও কাজের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। ফলে তাদের কথায়ও কোন আছর হয় না। যদি আজও তারা নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে কাজ করেন এবং 'ইল্ম-এর হক আদায় করার চেষ্টা করেন তাহলে অবশ্যই তারা কামিয়াব হবেন। কেননা প্রজাবৃন্দের খারাপ আচরণ শাসকবর্গের খারাপ আচরণের পরিণতিমাত্র। আর শাসকবর্গের আচরণের খারাপ দিকগুলো আলিম-'উলামার খারাপ আচরণের পরিণতি ছাড়া কিছু নয়। 'আলিমদের মন্দ হওয়ার কারণ পার্থিব সম্পদ ও উচ্চ পদমর্যাদা প্রীতি। কেননা যার ওপর দুনিয়ার ভালবাসা চেপে বসে সে উচ্চ পর্যায়ের লোক কিংবা রাজা-বাদশাহ্দের সমালোচনা করাতো দূরের কথা[১], নিম্নশ্রেণীর একটি লোকেরও হিসাব গ্রহণের এবং তার ভুল-ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দেবার সাহস রাখে না।

ইমাম গাযালী (র)-এর যুগে একজন 'আলিমের জগত ফিক্'াহের ছোটখাটো ও খুঁটিনাটি ইখতিলাফী মসলা-মাসাইলের ভেতরই সীমাবদ্ধ ছিল। আলোচনা-সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্কের মজলিস বসত ঘরে ঘরে, দেশের-আনাচে-কানাচে। বাদশাহ্দের দরবারগুলোর রওনকও ছিল এই সব মাযহাবী ও ফিক্'হী বাহাছ-মুবাহাছা ও বিতর্কমূলক অনুষ্ঠান। এ ব্যাপারে 'উলামা ও ছাত্রদের মগ্নতা ও বাড়াবাড়ি এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে, অন্যান্য সব জ্ঞান-বিজ্ঞান, পেশা ও দীনী খেদমতের বিভিন্ন বিভাগ উপেক্ষিত হ'তে চলেছিল। এর সীমা এত দূর বিস্তৃত হয়েছিল যে, ইসলাহে নফ্স তথা আত্মার সংস্কার, চারিত্রিক শালীনতা ও পারলৌকিক সৌভাগ্য যেই ইল্ম ও প্রয়াসের ওপর নির্ভরশীল (انحصار) তা থেকে সবার মনোযোগ সরে গিয়েছিল। ইমাম গাযালী (র) এই অবস্থা সম্পর্কে সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন :

"যদি কোন ফকীহ্কে সে সব বিষয়ের (সবর, শোক্র, আশা ও ভয় অথবা হিংসা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, অকৃতজ্ঞতা, প্রতারণা, ধোঁকা ইত্যাদির) কোন একটি সম্পর্কে অথবা ইখলাস, তাওয়াক্কুল ও রিয়া থেকে বেঁচে থাকবার পন্থা সম্পর্কে

১. ইহ্'য়া 'উলূমুদ্দীন, ৩য় খণ্ড, ৩১২ পৃ.।

জিজ্ঞাসা করা হয় যা জানা তার জন্য ফরযে 'আইন এবং এর প্রতি এতটুকু গাফিলতি প্রদর্শনের ভেতর আখিরাত বরবাদ হবার বিপদাশংকা বিদ্যমান, তাহলে তিনি জবাব দিতে পারবেন না। আর যদি (ক) লি'আন, (খ) জিহার সবক ও (গ) রমী সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে তিনি এর জবাবে এমন সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও খুঁটিনাটি বিষয়ের অবতারণা করবেন, বহুকাল ধরে যার কোন আবশ্যকতা দেখা দেয় নি এবং কখনো যদি দেখাও দেয় তাহলে শহরে এ সম্পর্কে ফতওয়া দেবার মত লোকের কোন অভাব নেই। অথচ দেখা যাচ্ছে, এই সব 'আলিম দিনরাত শুধু এই জাতীয় খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছেন এবং মুখস্থ করে এগুলোরই পাঠ দানে ব্যাপৃত রয়েছেন। অপরদিকে তারা সেই সব বিষয় থেকে পরাঙমুখ রয়েছেন যা ধর্মীয় দিক দিয়ে তাদের জন্য জরুরী। যদি কখনো তাদেরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় তাহলে তাঁরা বলেন : আমরা এই 'ইল্‌ম-এর ভেতর মশগুল রয়েছি এজন্য যে, এটা ধর্মীয় 'ইল্‌ম ও ফরযে কিফায়া। তাঁরা তাঁদের শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে নিজেদেরকেও ভুল পথে পরিচালিত করেন এবং অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করেন। অথচ বুদ্ধিমান ও সমঝদার মানুষ বেশ ভালভাবেই জানেন যে, যদি তাদের উদ্দেশ্য হয় ফরযে কিফায়ার হক আদায় করা এবং স্বীয় যিম্মাদারীর হাত থেকে মুক্ত হওয়া, তাহলে তারা সেই ফরযে কিফায়ার ওপর এই ফরযে 'আইনকে অগ্রাধিকার দিতেন। তাছাড়া আরো কিছু কিছু ফরযে কিফায়া আছে যেগুলোর ওপরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বহু শহর এমন রয়েছে যেখানে কেবল অমুসলিম চিকিৎসক রয়েছেন যাদের সাক্ষ্য ফিক্'হী বিধানে কবূল করা যায় না। অথচ আমরা দেখতে পাই না যে, কোন 'আলিম (এই কমতি ও যরুরত অনুভব করে) চিকিৎসাশাস্ত্রের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন, বরং দেখা যায় এর মুকাবিলায় ছাত্ররা 'ইল্‌মে ফিক্'হ্, বিশেষ করে বিরোধিতা ও বিতর্কমূলক বিষয়ের ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের 'আলিম দ্বারা শহর ভর্তি যাদের একমাত্র কাজ ফতওয়া প্রদান ও মসলা-মাসায়েল বাৎলে দেওয়া। আমার উপলব্ধিতে আসে না, 'উলামায়ে দীন শুধু এ ধরনের ফরযে কিফায়ার ভেতর মশগুল হওয়াকে কিভাবে সঠিক মনে করেন এবং এমন ফরযকে কিভাবে তারা পেছনে ফেলে রাখেন যার প্রতি এখনই মনোযোগ দেওয়া জরুরী। এর কারণ কি এই যে, চিকিৎসাশাস্ত্রের মাধ্যমে ওয়াক্'ফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী, য়াতীমের ধন-সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক

১. ইহ্'য়া 'উলূমুদ্দীন, পৃ. ১৯।

এবং কাযী বা মুফতী হওয়া যায় না কিংবা সমবয়সীদের ওপর প্রাধান্য অর্জন এবং দুশমন ও প্রতিপক্ষের ওপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ করা যায় না![১]

অন্য এক স্থানে লিখেছেন ঃ

এমন অনেক ফরযে কিফায়া আছে যেগুলোর দিকে দৃষ্টি দেবার কেউ নেই। 'আলিম-'উলামাদেরও সে দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। বেশি দূর যাবার দরকার নেই। চিকিৎসাশাস্ত্রের কথাই ধরুন। অধিকাংশ মুসলিম শহরে কোন মুসলিম চিকিৎসক নেই, অথচ একমাত্র তাদের সাক্ষ্যই শর'ঈ বিষয়াবলীতে নির্ভরযোগ্য। 'উলামায়ে কিরামের এই পেশার প্রতি এতটুকুও আকর্ষণ নেই। অনুরূপভাবে আম্‌র বি'ল-মা'রূফ ও নাহী 'আনি'ল-মুনকারও ফরযে কিফায়া (কিন্তু এটিও পরিত্যক্ত হচ্ছে)।[১]

তিনি এক স্থানে মূর্খতা, অলসতা ও দীন-ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক অজ্ঞতার এবং তাবলীগ ও সাধারণ তা'লীমের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ যে ব্যক্তির নিজের দীন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও উদ্বেগ আছে সে তাবলীগ ও তা'লীম ছেড়ে এমন সব বিষয় নিয়ে, যা কদাচিৎ ঘটে, কখনো ব্যস্ত থাকতে পারে না।[২]

কেন ইখতিলাফী মসলা-মাসাইল বিগত যুগগুলোতে অত্যধিক গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে? 'উলামায়ে কিরাম কেন একে নিজেদের মেধা ও পরিশ্রমের ক্ষেত্র বানিয়ে নিয়েছেন? ইমাম গাযালী (র)-এর মতে এর কিছু ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে এবং সে সবের ফলে এমনটি হওয়া বিলকুল স্বাভাবিক ছিল। তিনি লিখেছেন ঃ

মহানবী (সা)-এর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হযরত খুলাফায়ে রাশেদীন (রা) নিজেরা স্বয়ং বড় 'আলিম, ফকীহ্ ও ফতওয়া দানের অধিকারী ছিলেন। তাই তাঁদের কদাচিৎ কোন বিশেষ অবস্থায় অন্য কোন জ্ঞানী ও বিজ্ঞ সাহাবা (রা)-এর দ্বারস্থ হবার প্রয়োজন হ'ত। ফলে 'আলিম সাহাবীরা পারলৌকিক 'ইলম-এর মধ্যেই ডুবে ছিলেন। যদি কখনও কোন ফতওয়া এসে উপস্থিত হ'ত তাহলে তাঁরা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নিজেদের মধ্যে যোগ্যতর ব্যক্তিকেই অগ্রাধিকার দিতেন এবং নিজেরা সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ্র ধ্যানে নিবিষ্ট থাকতেন। যখন সে সব লোকের পালা আসল যাঁরা খিলাফতের হকদার বা যোগ্য ছিলেন না এবং যাদের ভেতর কোন বিষয়

১. ইহ্'য়া 'উলূমুদ্দীন, ৩৮ পৃ.; ২. ঐ, ৩৭-৩৮।

ফয়সালা করার বা ফতওয়া দেবার যোগ্যতা ছিল না তখন থেকেই 'উলামায়ে কিরামের প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন দেখা দেয়। অযোগ্য শাসকরা 'আলিমদের নিজেদের সঙ্গে রাখতে শুরু করে যাতে তাদের থেকে ফতওয়া লাভ করা যায়। তাবি'ঈ' আলিমদের ভেতর তখনও এমন লোক জীবিত ছিলেন যাঁরা প্রাচীন ভাবধারার অনুসারী ছিলেন এবং যাঁদের ভেতর দীনের হাকীকত ও প্রাচীন বুযুর্গদের শান জাগরূক ছিল। যখন তাঁদেরকে ডাকা হ'ত তখন তাঁরা শাসকদের এড়িয়ে চলতেন এবং তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। তাই খলীফারাই বাধ্য হয়ে (বনী উমায়্যা ও বনী 'আব্বাস) তাঁদেরকে খুঁজে বের করতেন। সে যুগের মানুষ যখন 'উলামাদের এই শান (প্রভাব ও মর্যাদা) প্রত্যক্ষ করল তখন তারা ধরে নিল যে, ফিক্হ্ (ইসলামী আইন ও বিধি-বিধান) সম্পর্কিত জ্ঞানই হচ্ছে সম্মান ও পদমর্যাদা লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। এর দ্বারা শাসকবর্গের নৈকট্য, ফতওয়া ও বিচার বিভাগীয় পদ লাভ করা যায়। ব্যস! তারা সকলেই শুধু ফিক্'হশাস্ত্রের দিকে মনোনিবেশ করল এবং উচ্চ পদের লোভে নিজেদের শাসকবর্গের সামনে পেশ করল। এ প্রচেষ্টায় কতক লোক সফল হ'ল, আবার কতক লোক কিছুই পেল না। যারা কিছুই পেল না তারা তো ইহলোক-পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। আর যারা কিছু পেল, সম্মান প্রার্থী হবার কারণে তারাও হীন হ'ল। ফল দাঁড়াল এই যে, যে 'উলামা' ছিলেন সকলের কাঙ্ক্ষিত, মুখাপেক্ষীহীনতার কারণে ছিলেন সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয়, দুনিয়াদারদের দিকে লক্ষ্য ও মনোযোগ দেবার কারণে হয়ে গেলেন হেয় ও লাঞ্ছিত। অবশ্য এই সামগ্রিক অবস্থার মধ্যেও প্রতিটি যুগেই আল্লাহ্র কিছু সংখ্যক বান্দার মধ্যে এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেছে।

সেই সমস্ত যুগে সর্বাধিক গুরুত্ব ও মনোযোগ ছিল ইসলামী বিধি-বিধান ও ফতওয়ার দিকে। অবশ্য রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনও ছিল। অতঃপর ইসলামী উসূল ও 'আকীদার প্রতিও কোন কোন শাসকের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। তাদের আগ্রহ জন্মে প্রতিটি পক্ষের দলীল-প্রমাণ ও পারস্পরিক আলোচনা শুনবার এবং তাদের বাহাছ-মুবাহাছার দৃশ্য দেখবার। মানুষ যখন শাসকদের এই রুচি ও স্বাদের ব্যাপারটা জানতে পারল তখন তারা 'ইলমে কালামের প্রতিও ঝুঁকে পড়ল। গ্রন্থকাররা এ বিষয়ের ওপর ভূরি ভূরি কিতাব লিখলেন এবং পারস্পরিক বিতর্ক প্রতিযোগিতার মূলনীতি ও নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করলেন, জন্ম দিলেন তারা যুক্তি-প্রমাণ রদকারী এবং প্রতিপক্ষের ওপর সমালোচনা বাণ নিক্ষেপকারী

একটি শাস্ত্রের। তাদের ভাষায়, এর দ্বারা তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, কর্মের অনুকূলে প্রতিরোধ সৃষ্টি, সুন্নাহ্র সাহায্য ও সমর্থন এবং বিদ'আতের বিরোধিতা ও মূলোৎপাটন। তাদের এ বক্তব্য তাদের পূর্বসূরীদের বক্তব্যেরই অনুরূপ। পূর্বসূরীরা বলত, ফতওয়ার ক্ষেত্রে তাদের লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্য কেবল দীন ও খাল্‌কে'র খিদমত তথা ধর্ম ও সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণ সাধন। অতঃপর দেখা গেল, কোন কোন শাসক 'ইল্‌মে কালাম ও বিতর্ক অনুষ্ঠান পসন্দ করছেন না। তাঁদের মতে এর দ্বারা পক্ষপাতিত্ব, ঝগড়া-বিবাদ এবং কোন কোন সময় রক্তারক্তির ন্যায় অনেক অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটে যায়। অবশ্য ফিক্'হী আলোচনা ও বিতর্কের প্রতি ঐ সব শাসকের অন্তরের টান ছিল, বিশেষ করে একটি ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহের মাত্রা বেশী ছিল যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মযহাবই অধিকতর সঠিক। এতদ্দৃষ্টে মানুষ কালাম ও 'আকাইদশাস্ত্রের মাধ্যমে ইখতিলাফী মসলা-মাসাইল, বিশেষ করে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতভেদমূলক বিষয়গুলোকে আলাপ-আলোচনার বিষয়ে পরিণত করল এবং ইমাম মালিক (র), ইমাম সুফিয়ান ছওরী ও ইমাম আহমদ (র) প্রমুখের মযহাব ও মতভেদগুলোকে উপেক্ষা করল এজন্য যে, এঁদের মতানৈক্যগুলোর প্রতি শাসকবর্গের কোন আকর্ষণ নেই। তাদের বক্তব্য ছিল, তাদের ভাষায় এ ক্ষেত্রেও তাদের উদ্দেশ্য শরীয়তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোর প্রকাশ, মযহাবের বিভিন্ন কার্যকারণ বর্ণনা এবং ফতওয়ার মূলনীতি প্রণয়ন ও সংকলন্। এ বিষয়ে তারা প্রচুর বই-পুস্তক লেখেন, মসলা-মাসাইল খুঁজে বের করেন এবং তর্কশাস্ত্র ও পুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করেন। এই ধারা এখনো অব্যাহত আছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, মতবাদমূলক মসলা-মাসাইল ও পারস্পরিক বিতর্ক অনুষ্ঠানের প্রতি 'আলিমদের আকর্ষণ এবং এর প্রতি নিমগ্নতার কারণ তাই ছিল যার বর্ণনা আমরা এই মাত্র দিলাম। যদি দুনিয়াবাসী ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ (ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফি'ঈ ভিন্ন) অন্য কোন ইমাম অথবা (ইখতিলাফী মসলা-মাসাইল ও বিতর্ক অনুষ্ঠান ভিন্ন) অন্য কোন বিদ্যার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে তা হলে আমার বিশ্বাস 'আলিমরাও সেদিকে ঝুঁকে পড়বে এবং পড়ার কারণ হিসাবে বলবে যে, তাদের উদ্দেশ্য 'ইল্‌মে দীন ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ ব্যতিরেকে অন্য কিছু নয়।[১]

---

১. ইহ্'য়া 'উলূমুদ্দীন, ৩৮ পৃ.।

অতঃপর ইমাম গাযালী (র) বিস্তারিতভাবে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা-সমালোচনার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষয়ক্ষতির দিকগুলো বর্ণনা করেন। তিনি দীর্ঘ দিন এই ক্ষেত্রে একজন কৃতবিদ্য পুরুষ ছিলেন। তাঁর বর্ণনা চাক্ষুষ সাক্ষ্যের মর্যাদা রাখে এবং তা ছিল প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত।[১]

অবশ্য এ ব্যাপারে একটি বড় ভ্রম পরিলক্ষিত হ'ত এবং তা ছিল শব্দ-সম্পর্কিত। ইমাম গাযালী (র)-এর যুগের প্রচলিত জ্ঞান– সেগুলোর বিকৃত রূপ ও কাঠামোর জন্য যে সব শব্দ শিরোনামের কাজ দিত সেগুলো ছিল ঐ সব প্রাচীন বুযুর্গদের জীবন-চরিতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইখতিলাফী মসলা-মাসাইল ও ফিক্'হের ক্ষেত্রে কদাচিৎ ঘটে এমন সব খুঁটিনাটি ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের জন্য বিনা দ্বিধায় "ফিক্'হ্" শব্দের ব্যবহার চলত আর সব ধরনের জ্ঞান সম্পর্কিত কায়কারবার এবং শরীয়তসম্মত ও শরীয়তবিরোধী 'ইল্‌মের জন্য ঢালাওভাবে ব্যবহৃত হত 'ইল্‌ম শব্দটি। 'ইল্‌মে কালাম ও দার্শনিকসুলভ আলোচনাকে "তাওহীদ" নামে অভিহিত করা হ'ত। আগা-মাথাহীন ভাসা ভাসা কথার ফুলঝুরি ছড়ানো বর্ণনাকে "তায'কীর" আখ্যা দেওয়া হ'ত। সব ধরনের ঠিকানা-পরিচয়হীন পেঁচালো রচনাভঙ্গিকে বলা হত "হিকমত"। অতঃপর ঐ সব স্বনির্মিত কার্যকলাপ ও কাজকারবারের ওপর সেই সব ফযীলতের ছাপ মারা হ'ত যা কুরআন ও হাদীছে ঐ সব শব্দ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণত, ফিক'হ্-এর এই বিকৃত রূপ ও কাঠামোর (কেবল মতভেদ ও খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর জন্য) ফযীলত বর্ণনায় কুরআন মজীদের আয়াত لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنَ এবং হাদীছ مَنْ يُّرِدِ اللّٰه بِه خَيْرً يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ-এর দর্শন ও পঞ্চম শতাব্দীর 'ইল্‌মে কালামের ফযীলত বর্ণনায় وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا-এর খোশ খবর, মূর্খ জাহিল ও আল্লাহভীতিহীন ওয়াইজ ও বক্তাদের সাধারণ ওয়া'জ-নসীহতের ফযীলত বর্ণনায় فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আয়াত কারীমা ও হাদীছে রাসূল (সা) উদ্ধৃত করা হ'ত। ইমাম গাযালী (র) এই বিভ্রান্তির পর্দা উন্মোচন করেন এবং বিস্তারিতভাবে বলেন যে, এই শব্দসমষ্টি তার আসল হাকীকত খুইয়েছে এবং তা প্রকৃত অর্থ ও মর্ম থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছে। ইসলামের প্রথম যুগে এ সবের যে অর্থ ও মর্ম ছিল তার সাথে 'আলিমদের বর্ণিত অর্থ ও মর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

সুলতান ও শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তিবর্গ

১. ঐ, দ্র. ইহ্'য়াউ'ল-'উলূম, ১ম খণ্ড, ৪০-৪৩ পৃ.।

দ্বিতীয় যে কারণটি ইমাম গাযালী (র) -এর মতে এই পৃথিবীব্যাপী ফিতনা-ফাসাদ, নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন এবং ধর্মীয় অধঃগতির যিম্মাদার ছিল তা হচ্ছে সরকারী কর্মচারী, সুলতান ও তাঁর আমীর-উমারার কার্যকলাপ। ইমাম গাযালী (র)-এর দু'শ' বছর আগে হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবন মুবারক (র) উল্লিখিত দু'টি শ্রেণী[২] ('আলিম-'উলামা তথা পণ্ডিতমণ্ডলী ও শাসকবর্গ)-কেই ধর্মের বিকৃতি সাধনকারী হিসাবে অভিহিত করেছিলেন।

وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها .

ইমাম গাযালী (র) এমন একটি যুগে উল্লিখিত দু'টি শ্রেণীকে পরিপূর্ণ সাহসের সঙ্গে স্বাধীনভাবে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেন যখন বাদশাহ ছিলেন একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী এবং সব ধরনের আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে। তখন বাদশাহর প্রতি সমালোচনা বাণ নিক্ষেপ করা ছিল মৃত্যুকে সাদর হাতছানি দেবারই নামান্তর। তাঁর যুগে বাদশাহের উপহার, দান ও পেশকৃত লোভনীয় প্রস্তাব কবূল করাই ছিল সাধারণ রেওয়াজ। ইমাম গাযালী (র) বাদশাহ ও শাসকবর্গের ধন-সম্পদকে নাজায়েয ও হারাম বলে ঘোষণা করেন। এক স্থানে তিনি লিখেছেন :

اغلب اموال السلاطين حرام فى هذه الاعصار والحلال فى ايديهم معدوم او عزيز .

বাদশাহদের ধন-সম্পদ এ যুগে সাধারণভাবে হারাম। হালাল ধন-সম্পদ তাদের নিকট হয়ই না আর হলেও পরিমাণে খুব কম।

তিনি অন্যত্র লিখেছেন :

ان اموال السلاطين فى عصرنا حرام كلها او اكثرها - وكيف لا والحلال هو الصدقات والفئ والغنيمة ولا وجود لها وليس يدخل منها فى يد السلطان ولم يبق الا الجزية وانها توخذ بانواع من الظلم لا يحل اخذها به فانهم يجاوزون حدود الشرع فى المأخوذ والماخوذ منه والوفاء له بالشرط ثم اذا نسب اليهم من الخراج المضروب علي المسلمين ومن المصادرات والرشاد صنوف الظلم لم يبلغ عشر معشار عشيرة .

সুলতান তথা শাসকদের ধন-সম্পদ আমাদের যুগে হয় সবটাই হারাম নতুবা এর বৃহত্তম অংশ। আর এর মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা তাদের হালাল মাল বলতে যাকাত, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (মালে গনীমত) অথবা বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদই বোঝাত, অথচ আজ কোথাও এর অস্তিত্ব নেই। এসবের কিছুই বাদশাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে না। এখন বাকি থাকল শুধু জিয্য়া। আর জিয্য়ার অবস্থা

এই যে, তা নানান অত্যাচার ও নির্যাতনের মাধ্যম আদায় করা হয় যা আদৌ জায়েয নয়। সরকারী কর্মচারীরা শরীয়তের নির্ধারিত সীমা লংঘন করে থাকে। মালের পরিমাণের ক্ষেত্রে যেমন শরীয়তের বিধান মেনে চলা হয় না, তেমনি যিম্মী, যাদের থেকে জিযয়া উসূল করা হয়, তাদের ক্ষেত্রেও শর'ঈ বিধানের তোয়াক্কা করা হয় না। মুসলমানদের ওপর নির্ধারিত রাজস্বও যবরদস্তিমূলকভাবে আদায় করা হয়।

ইমাম গাযালী (র) আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে লিখেছেন :

"যুগের সুলতান থেকে সেই অর্থ কবুল করাটাও সমীচীন নয়, যে অর্থ সম্পর্কে এই ধারণাই বেশী যে, তা সন্দেহমুক্ত ও জায়েয নয়। কেননা এর মধ্যে বহু ধর্মীয় বিপর্যয় (লুকিয়ে) রয়েছে।" অবশ্য এক্ষেত্রে অতীত যুগের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয় এবং বলা হয় যে, প্রাচীন বুযুর্গদের মধ্য থেকে কোন কোন 'আলিম ও সালিহ (জ্ঞানী, সৎ ও সত্যনিষ্ঠ) ব্যক্তি স্বীয় যুগের খলীফা ও সুলতানের পেশকৃত উপহার-উপঢৌকনের প্রস্তাব কোন কোন সময় কবূল করেছেন। তাই ইমাম গাযালী এ যুগ ও সে যুগের রাজা-বাদশাহ ও সুলতানদের অবস্থার পার্থক্য নিম্নভাবে বর্ণনা করেছেন :

প্রথম যুগের জালিম সুলতানদের অন্তরে খুলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফত যুগের নৈকট্যের কারণে জুলুম ও নির্যাতনমূলক আচরণের কিছুটা অনুভূতি ছিল। উপরন্তু তারা সাহাবায়ে কিরাম ও তাবি'ঈদের অন্তর জয় ও নিজেদের দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করত এবং এমন ধরনের ব্যবহার করত যাতে তাঁরা কোন না কোনভাবে তাদের উপহার-উপঢৌকন ও পুরস্কারাদি গ্রহণ করেন। তারা তাঁদের নিকট এসব অর্থ ও নযরানা না চাইতেই এবং তাঁদের শান ও মর্যাদার ওপর কোনরূপ কটাক্ষ না করেই পাঠাত। শুধু তাই নয়, তারা তাদের প্রদত্ত উপহারাদি গ্রহণ করার কারণে কৃতজ্ঞও থাকত এবং আনন্দ প্রকাশ করত। ঐ সব বুযুর্গও এসব উপহার গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গে তা সাধারণ্যে বণ্টন করে দিতেন। তাঁরা সুলতানদের নিয়ত ও লক্ষ্যের দিকে দৃকপাত করতেন না, তাঁদের সঙ্গে কোন অন্যায় কাজে সহযোগিতাও করতেন না এবং তাঁদের দরবারে মুলাকাতের উদ্দেশ্যে গমনও করতেন না। তাঁরা দীর্ঘায়ু হোন, প্রকাশ্যে তাঁরা এ ধরনের কোন কামনাও করতেন না, বরং তাঁরা জালিম শাসকদের ব্যাপারে প্রকাশ্যে বদ্‌দু'আ করতেন। তাঁদের সম্পর্কে স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করতেন এবং তাঁদের মুখের ওপর তাঁদের শরীয়তবিরুদ্ধ কাজের তাঁরা সমালোচনা করতেন।

তাই ঐ সব গ্রহণ তাঁদের জন্য অবৈধ ছিল না। অপর দিকে আজকের সুলতানগণ সেই সব লোককেই মুক্ত হস্তে দান করেন যাদের সম্পর্কে তাদের ধারণা যে, তাদের থেকে যে কোন ব্যাপারে সমর্থন আদায় করা যাবে, তাদের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যাবে, উপরন্তু তাদের দ্বারা দরবার ও মজলিসের রওনকও বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি তারা সব সময় তাদের জন্য দূ'আ করবে, প্রশংসা কীর্তন করবে এবং সাক্ষাতে-অসাক্ষাতে তাদের তা'রীফ ও গুণপনা বর্ণনায় মেতে থাকবে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে প্রথম স্তর শাসকদের কাছে নিজেদের মর্যাদাকে হেয় করা; দ্বিতীয়, তাদের খেদমতের জন্য আনাগোনা; তৃতীয়, তাদের প্রশংসা কীর্তন ও তাদের জন্য দু'আ প্রার্থনা; চতুর্থ, তাদের ন্যায়-অন্যায় উদ্দেশ্য হাসিলে সহায়তা করা; পঞ্চম, তাদের ভাড়ামি করা, তাদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর মুকাবিলায় তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা; ষষ্ঠ, তাদের জুলুম ও কুকর্ম ঢেকে রাখা। যদি কোন ব্যক্তি এগুলোর কোন একটি করতেও সম্মত না হন তাহলে তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর ন্যায় মরতবা ও মর্যাদার অধিকারী হলেও এই সব সুলতান তার জন্য একটি পয়সাও ব্যয় করতে রাযী হবে না। এজন্যই বর্তমান যুগে এই সব বাদশাহ্‌র থেকে কোন ধন-সম্পদ গ্রহণ করা জায়েয হবে না। কেননা এর পরণতি তাই হবে যার উল্লেখ ওপরে করা হয়েছে। এখন যদি কেউ ঐ সব সুলতানের অর্থ-সম্পদ সাহসিকতার সংগে কবুল করে এবং নিজের পক্ষে সাহাবী ও তাবি'ঈদের নজীর পেশ করে তাহলে আসলে সে ফেরেশতাদেরকে একজন কর্মকারের সঙ্গে তুলনা করল। কেননা এই অর্থ সম্পদ কবুল করার পর সুলতানদের সঙ্গে তার মেলামেশার এবং পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে, তাদেরকে তার সমীহ্ করে চলতে হবে, তাদের (নিয়োজিত) কর্মকর্তা ও শাসনকর্তৃত্বে আসীন কর্মচারীদের সেবা করতে হবে এবং তাদের সম্মুখে মস্তকাবনত হয়ে চলতে হবে। অতঃপর তাদের প্রশংসা কীর্তন এবং তাদের দরবারে হাযিরা দেওয়া ছাড়া তার কোন গত্যন্তর থাকবে না। আর এ সবই পাপ ও অন্যায়।

হ্যাঁ, যদি কেউ শাহী অর্থের ভেতর থেকে একটা অংশ কবুল করে যা হালাল এবং সে তার হকদার এবং ঐ অর্থ তার নিকট ঘরে বসে থাকা অবস্থায়ই আসে, কোন শাসক কিংবা অনুচরের সন্ধান ও খিদমত এবং ঐ সব সুলতান ও শাসকের প্রশংসা-কীর্তন ও সাক্ষ্য-প্রমাণেরও প্রয়োজনীয়তা দেখা না দেয়, তাদেরকে সাহায্য ও সমর্থন দিতে হবে-এমন শর্তাদিও না থাকে, তাহলে

১. ইহ্'য়া' 'উলূমুদ্দীন, ২য় খণ্ড, ১২৩ পৃ.।

(মাসআলার দিক দিয়ে) এমন অর্থ গ্রহণ হারাম নয়। তবে অন্যান্য মন্দ, সুদূরপ্রসারী পরিণতি ও ফলাফলের দিক চিন্তা করলে তা অবশ্যই মাকরূহ।[১]

অন্য এক স্থানে শাসক ও রাজন্যবর্গের সংস্পর্শ থেকে দূরে অবস্থানের প্রয়োনজীয়তা এবং তাদের প্রতি কি ধরনের আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

الحالة الثانية ان يعتزل عنهم فلا يراهم ولا يرونه وهو الواجب والسلامة فيه فعليه ان يعتقد بغضهم على ظلمهم ولا يحب بقائهم ولا يثنى عليهم فلا يستخبر عن احوالهم ولا يتقرب الى المصلين بهم .

দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, মানুষ সেই সব শাসক ও রাজন্যবর্গের সাহচর্য এমনভাবে এড়িয়ে চলবে যাতে তাদের সম্মুখেই পড়তে না হয়। এটা অবশ্যই কর্তব্য এবং এর ভেতরই নিরাপত্তা নিহিত। মানুষকে তারা জুলুম-নিপীড়ন করে বলে তাদের দীর্ঘায়ু যেমন কামনা করা যাবে না, তেমনি তাদের প্রশংসাও কীর্তন করা হবে না। তাদের অবস্থার যেমন খোঁজ-খবর রাখা যাবে না, তেমনি করা যাবে না বন্ধু-বান্ধব ও তাদের সভাসদদের সাথে মেলামেশা।

সেই যুগে যখন অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী রাজা-বাদশাহ্ এবং স্বেচ্ছাচারী উযীর ও শাসকবর্গের দয়ার ওপর গোটা কওমের জীবন ও যিন্দেগী ছিল নির্ভরশীল, যখন সামান্যতম সন্দেহেও ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালানো হ'ত, সেসময় ইমাম গাযালী (র)-এর স্পষ্ট ভাষণ ও সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও আয়-ব্যয়ের ওপর খোলাখুলি ও প্রকাশ্য সমালোচনা, সুলতান ও শাসকদের দান ও উপহার-উপঢৌকন কবুল না করার জন্য 'আলিমদের উৎসাহ প্রদান (যাকে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা ও অসন্তোষ প্রকাশ অথবা সম্পর্কহীনতার আলামত বলে গণ্য হ'ত) এমন একটি জিহাদ ছিল যা সংবাদপত্র ও বাক-স্বাধীনতার এই যুগেও অনেকটা অকল্পনীয়।

ইমাম গাযালী (র) কেবল লেখা ও গ্রন্থ রচনাকেই যথেষ্ট মনে করেন নি, বরং যখনই সে যুগের বাদশাহ্র সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছেন অমনি তার জনাকীর্ণ দরবারেও হক-কথা সমুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করতে দ্বিধা করেননি। মালিক শাহ্ সলজুকী তনয় সুলতান সঞ্জর গোটা খোরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন। ইমাম গাযালী (র) একবার এক সাক্ষাতে তাঁকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

---

১. মকতূবাতে ইমাম গাযালী, পৃ. ১৯।

দুঃখ হয় যে, মুসলমানদের গর্দান বিপদ-মুসীবত ও দুঃখ-কষ্টের ভারে ভেঙে পড়ছে, আর তোমার ঘোড়ার গর্দান ভেঙে পড়ছে সোনালী জিঞ্জিরের ভারে।[১]

তিনি মুহাম্মদ ইবন মালিক শাহকে (যিনি ছিলেন সুলতান সঞ্জরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং সে যুগের সর্বাপেক্ষা বড় বাদশাহ) একটি হেদায়াতনামা লিখে পাঠান যাতে দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় স্মরণ করিয়ে দেন।[১]

প্রাচ্যের সাম্রাজ্যগুলোতে যেহেতু রাষ্ট্রের আইন-শৃংখলা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা উযীরদের হাতেই ন্যস্ত থাকত এবং যেহেতু তারাই হুকুমতের যাবতীয় ভাল-মন্দের ব্যবস্থাপক ও যিম্মাদার হতেন, তাই তাদেরই সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে দেশের সংস্কার হতে পারত। ইমাম গাযালী (র) এই বাস্তবতা সম্পর্কে পুরাপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাই তিনি সলজূকী সুলতানদের তুলনায় অধিকতর মনোযোগ দেন তাদের উযীরদের প্রতি। তাঁদের কাছে তিনি বিস্তারিত চিঠি ও হেদায়াতনামা লিখে পাঠান এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে ও পরিষ্কার ভাষায় হুকুমতের অব্যবস্থাপনা ও বিশৃংখলাপূর্ণ অবস্থা, অধিকার লঙ্ঘন ও শাসকদের অপচয়ের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁদের অন্তরে খোদা-ভীতির উন্মেষ ঘটিয়ে তাঁদের অতীত উযীর ও সরকারী ক্ষমতাধিপতিদের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করেন। তাঁর এসব চিঠিপত্র ছিল ব্যক্তিগত সাহসকিতা এবং নির্বিঘ্নে সত্য প্রকাশের সর্বোত্তম নমুনা।

মুসলমানদের অন্যান্য শ্রেণী

‘উলামা শ্রেণী, সুলতান ও শাসকশ্রেণী ছাড়াও তিনি সাধারণ মানব শ্রেণীর আচার-আচরণেরও পর্যালোচনা করেছেন। তাতে যে পরিমাণ ধর্মহীনতা, বিদ‘আত, গর্হিত উপাদান, প্রতারণা ও আত্মপ্রবঞ্চনা প্রবেশ করেছে তিনি সে সবের সমালোচনা করেছেন। ‘ইহ্ য়াউ’ল-‘উলূম’ পাঠে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তিনি জ্ঞান জগতে গভীর মগ্ন এবং ‘আলিমসুলভ জীবন যাপন করা সত্ত্বেও সেই যুগের সমাজ ও সাধারণ জনজীবন সম্পর্কে তাঁর অধ্যয়ন ছিল অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। তিনি মুসলমানদের সাধারণ জীবন এবং মুসলিম উম্মার বিভিন্ন শ্রেণী,

১. এই হেদায়াতনামাটি ছিল একটি পুস্তিকাকারে লিখিত। নাম ছিল, "নসীহ'াতু'ল-মুলূক" (বাদশাহগণের প্রতি উপদেশ)। সুলতান মুহাম্মাদ শাহ্‌র মাতৃভাষা ছিল ফারসী বিধায় পুস্তিকাটিও ফারসী ভাষায় লিখিত হয়েছিল।

তাদের নানাবিধ রোগ-ব্যাধি ও দুর্বলতা যেভাবে চিহ্নিত করেছেন তা থেকে অনায়াসে তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও দূরদৃষ্টির পরিমাপ করা যায়। তিনি একটি পৃথক অধ্যায়ে সে সব গর্হিত কর্মের ফিরিস্তি বর্ণনা করেছেন যার অনুপ্রবেশ ঘটেছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আচার-আচরণে, অথচ এসব কাজ যে শরীয়ত ও নৈতিকতাবিরোধী তা মানুষ অনুভব করতে পারছে না। এই অধ্যায় তিনি গোটা নাগরিক জীবনের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপণ করেছেন এবং তাতে সংঘটিত যাবতীয় গর্হিত কর্মের ওপর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। মসজিদ থেকে শুরু করে বাজার, সড়ক, হাম্মামখানা, ওয়া'জ মাহফিল পর্যন্ত যেখানে যা ঘটেছে তার একটি পরিসংখ্যান তিনি এতে তুলে ধরেছেন।[১]

তিনি ইহ্'য়াউল-'উলূ'ম-এর একটি পৃথক অধ্যায় (كتاب ذم الغرور) সেই সব লোকের বর্ণনা দিয়েছেন যারা বিভিন্ন রকমের প্রতারণা ও আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত রয়েছে। এই সূত্রে তিনি প্রতিটি শ্রেণীর প্রতারিত ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের ভ্রান্ত উপলব্ধি ও আত্ম-প্রবঞ্চনার দিকটিও তুলে ধরেছেন এবং তাদের এমন কতক মানসিক ব্যাধি ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করেছেন যা কেবল একজন সূক্ষ্মদর্শী সংস্কারক ও একজন অভিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদের চোখেই ধরা পড়তে পারে। এই অধ্যায়ে তিনি 'উলামা, 'ইবাদত-গুযার 'আবিদ, যাহিদ, আমীর-উমারা, সূফী-দরবেশ সবারই পর্যালোচনা করেছেন এবং তাঁদের বিশেষ বিশেষ রোগ-ব্যাধি ও ভারসাম্যহীনতার পর্দা উন্মোচন করেছেন। এ থেকে তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও বাস্তবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর যুগের 'উলামায়ে কিরাম 'ইল্ম চর্চায়– যেমন ফিক্'হ্-এর খুঁটিনাটি মসলা-মাসায়েল ও বিতর্কিত বিষয়াদি, ইল্মে কালাম সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক, ওয়া'জ-নসীহত, যিক্র-আযকার, ইল্ম-ই হাদীছ ও তৎসম্পর্কিত নাহ্'ও, অভিধান, কাব্য ও ব্যাকরণের বিশ্লেষণ, সূফী-দরবেশের বাণীসমষ্টি ও অবস্থাদি হুবহু মুখস্থ রাখা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে সীমা লঙ্ঘন করেছিলেন তার যথাযথ বিশ্লেষণ করে বাস্তব অবস্থা সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন। অবশেষে এক্ষেত্রে নিজের যে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন তা হ'ল পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানে– যেমন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, অংক শাস্ত্র এবং শিল্প বিজ্ঞানে এতটা খোশ-কল্পনা ও আত্ম-প্রবঞ্চনা নেই যতটা আছে 'ইলমে শরী'য়তে। আর তা এজন্য যে, কারোরই এ ধারণা নেই যে, পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান নিজেই মাগফিরাতের মাধ্যম হতে পারে। কিন্তু 'ইলমে

১. ইহ্'য়া 'উলূমুদ্দীন, দ্র. ২য় খণ্ড, ২৯৪-৯৯ পৃ.।
২. ঐ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৩।

শরী'য়তের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। কেননা উদ্দেশ্য ও ফলাফলের দিকে না তাকিয়ে স্বয়ং 'ইল্‌মে শরী'য়তকেই মাগফিরাত ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করা হয়।[২] স্বীয় যুগের 'আবিদ, যাহিদ ও তাসাউফপন্থীদেরকেও তিনি বেশ গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছেন এবং তাঁদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ত্রুটি-বিচ্যুতি, খোশ-উপলব্ধি এবং আত্ম-প্রবঞ্চনার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। বহুবিধ জাহিরী 'আমল ও রসম-রেওয়াজের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা তাদের আত্মপূজা, পদমর্যাদা কামনা (جاه طلبى), লোক-দেখানো সৎকর্ম, বাহ্যিক অনুকরণ ও প্রাণহীন প্রথাগুলোও তাঁর চোখে পড়েছে এবং তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় তা প্রকাশ করে দিয়েছেন।[১]

বিত্ত-সম্পদের অধিকারী ধনিকগোষ্ঠীর ওপরও তিনি সমালোচনার কষাঘাত হেনেছেন। তাদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর লেখনী অত্যন্ত বাস্তব চিত্র অংকন করেছে। এক স্থানে তিনি বলেছেন :

> ঐসব ধনীর ভেতর অনেক লোকই হজ্জের ব্যাপারে টাকা-পয়সা দেদার খরচ করতে বেশ আগ্রহী। তারা বারবার হজ্জ পালন করে। কখনও এমন হয় যে, তারা তাদের প্রতিবেশীদের ভুখা-নাঙ্গা রেখে হজ্জ করতে যায়। হযরত 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) ঠিকই বলেছেন, "শেষ যুগে নিষ্প্রয়োজনে হজ্জ গমনকারীদের সংখ্যাই বেশী হবে। টাকা-পয়সার কমতি না থাকায় সফর করা তাদের কাছে খুব সহজ মনে হবে। কিন্তু তারা হজ্জ থেকে ফিরে আসবে বঞ্চিত ও নিঃস্ব অবস্থায়। তারা স্বয়ং বালি ও কংকরময় যমীনের মাঝ দিয়ে নির্বিঘ্নে সফর করবে, অথচ তাদের প্রতিবেশী তাদের পাশেই থাকবে বালা-মুসীবতে গ্রেফতার হয়ে। কেউ তাকে শোকে সান্ত্বনা দেবে না এবং তার সঙ্গে ভাল ব্যবহারও করবে না।"

আবু নসর তুমার বলেন, "এক ব্যক্তি বাশার ইব্‌ন আল-হারিছের নিকট এসে বলল ঃ আমি হজ্জ করতে ইচ্ছা করেছি। আপনার কোন কাজ আছে ? তিনি বললেন ঃ তুমি ব্যয় নির্বাহের জন্য কি রেখেছ ? লোকটি বলল ঃ দু'হাজার দিরহাম। বাশার বললেন ঃ হজ্জ করবার পেছনে তোমার উদ্দেশ্য কি! যুহ্‌দ প্রকাশ, কা'বার প্রতি আগ্রহ, না আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা ? সে বলল ঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা। তিনি বললেন ঃ আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে এমন কোন তদবীর বাৎলে দিই যাতে তুমি ঘরে বসেই আল্লাহ্‌র রেযামন্দী হাসিল করতে

---

১. ইহ'য়াউ'ল-'উলূমুদ্দীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৫-৫০।

পার তাহলে কি তুমি তাতে রাযী আছ? যদি তুমি এ দু'হাজার দির্‌হাম খরচ করে দাও আর নিশ্চিত হও যে, আল্লাহ্‌র রেযামন্দী হাসিল হয়ে গেছে, তাহলে কি তুমি তার জন্য তৈরি আছ? সে বলল ঃ হ্যাঁ, আনন্দের সঙ্গে। তিনি বললেন :

আচ্ছা যাও, এই অর্থ এমন দশজন লোককে দিয়ে এস যারা ঋণগ্রস্ত। তারা এই অর্থ দিয়ে ঋণ শোধ করুক, দারিদ্র্যাবস্থা পরিবর্তন করুক, নিঃস্ব পিতা তার সন্তান-সন্ততির জন্য দরকারী সামান সংগ্রহ করুক, য়াতীমের অভিভাবক য়াতীমের অন্তর-মানস আনন্দে ভরে তুলুক। আর তোমার মন যদি চায় তাহলে একজনকেই সবটা অর্থ দিয়ে এস এজন্য যে, মুসলমানের অন্তর-মনকে খুশী করা, উপায়হীন অসহায়কে সাহায্য করা, কারোর বিপদ দূর করা এবং দুর্বলের সাহায্য করা এক শত নফল হজ্জ অপেক্ষাও উত্তম। যাও, যেমনটি আমি বললাম তেমনটি করে এস। অন্যথায় তুমি তোমার মনের কথাটি আমাকে বলে ফেল। সে বলল ঃ হে শায়খ! সত্যি কথা এই যে, সফর করবার দিকেই আমার ঝোঁক বেশী। বাশার একথা শোনার পর মুচকি হাসলেন এবং বললেন : ধন-সম্পদ যখন পচা ও সন্দেহযুক্ত হয় তখনি প্রবৃত্তি এগুলোর দ্বারা কামনা-বাসনা পূরণের তাকীদ দিতে থাকে, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, "তিনি কেবল মুত্তাকীদের 'আমলই কবুল করবেন"।[১]

ধনিকদের আর একটি দল তাদের কার্পণ্যের কারণেই ধন-দৌলতের হেফাজতের ধান্দায় মশগুল থাকে এবং এমন সব শারীরিক ও দৈহিক 'ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি তারা আকৃষ্ট থাকে যার ভেতর সম্পদ ব্যয়ের কোন প্রয়োজন হয় না। যেমন দিনের বেলায় সিয়াম পালন, রাতের বেলা ইবাদত ও খতমে কুরআন। তারা প্রতারণা ও প্রবঞ্চনায় লিপ্ত এজন্য যে, ধ্বংসাত্মক কার্পণ্যই তাদের অন্তর-রাজ্যের অভিভাবক সেজেছে। এটি দূর করবার জন্য অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন, অথচ তারা এমন সব 'আমলে মশগুল রয়েছে যাতে অর্থ ব্যয়ের কোন প্রয়োজনই নেই। এর উদাহরণ হ'ল, এক ব্যক্তির কাপড়ের ভেতরে সাপ ঢুকে পড়েছে, যার ফলে তার জীবন বিপন্ন, অথচ সেদিকে তার লক্ষ্য নেই; সে সুকানজাবীন[২] তৈরীতে ব্যস্ত যা খেয়ে তার পিত্ত আরাম পেতে পারে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সাপের দংশনে সে মারা যেতে বসেছে,

---

১. ইহ্‌য়াউ'ল-'উলূমুদ্দীন, ৩৫১-৩৫২ পৃ.।

২. অম্লরসের সঙ্গে মধু বা চিনি সহযোগে প্রস্তুত রুচিকর উপকরণ বিশেষ।

এমতাবস্থায় সুকানজাবীনের তার কোন দরকারই নেই। সূফী বাশার হাফীকে কেউ বলেছিল, "অমুক ধনী ব্যক্তি খুব বেশী বেশী রোযা রাখে এবং নামায পড়ে।" তিনি বললেন ঃ বেচারা নিজের কাজ ছেড়ে অন্যের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তার পক্ষে এটাই সমীচীন ছিল যে, সে ক্ষুধার্তকে অন্ন দান করবে, নিঃস্ব মিস্কীনের জন্য ব্যয় করবে। বেশি বেশি (নফল) নামায পড়ার চেয়ে সেটাই ছিল উত্তম। তা না করে সে একদিকে দুনিয়ার সম্পদ লুণ্ঠনে ব্যস্ত রয়েছে, অন্যদিকে দরিদ্রকে তার প্রাপ্য হক থেকে বঞ্চিত করছে।[১]

সাধারণ লোকের ব্যাধি ও আত্মপ্রতারণার কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন ঃ

ধনিক ও সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীর ভেতর কিছু লোক এমন আছে যারা ওয়া'জ-নসীহতের মজলিস ও মাহফিলে যোগদানের ব্যাপারে ধোঁকায় রয়েছে। তাদের বিশ্বাস, কেবল ধর্মীয় মাহফিলে অংশ গ্রহণ করাটাই যথেষ্ট। এটাকে তারা রোজকার অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে। তারা মনে করে যে, 'আমল ও ধর্মীয় উপদেশ অনুসরণ ছাড়াই কেবল ওয়া'জ মাহ্ফিলে শরীক হয়েই ছওয়াব অর্জন করা যায়। অথচ ওয়া'জ-মাহ্ফিলের উদ্দেশ্য হ'ল, এ থেকে ভাল ও উত্তম কর্মের অনুপ্রেরণা লাভ। যদি এ থেকে ভাল ও উত্তম কর্মের অনুপ্রেরণা না পাওয়া যায় তাহলে এতে কোনই কল্যাণ নেই। উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার প্রয়োজন এজন্য যে, এটা কর্মের শক্তি যোগায়। যদি এটা কর্মের শক্তি না যোগায় তাহলে এর মধ্যেও কোন কল্যাণ নেই। কখনো কখনো তারা ওয়ায়েজীনের মুখে ওয়া'জ-মাহ্ফিল ও আল্লাহ্র দরবারে কান্নাকাটির ফযীলত শুনে প্রতারিত হয় এবং মেয়েদের মত অঝোরে কাঁদতে থাকে। তাদের চক্ষু থেকে অবিরাম অশ্রু বর্ষিত হতে থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যে সুদৃঢ় ইচ্ছা শক্তি ও মনোবল জাগ্রত হয় না। কখনো কখনো তারা ভয়াবহ ও ভীতিকর বর্ণনা শোনার পর বুক ফাটা বিলাপ করে বলতে থাকে ঃ ইলাহী, তওবা করছি। হে খোদা ! তোমার আশ্রয় ভিক্ষা চাচ্ছি। এসব করেই তারা ভাবে, এতেই বুঝি হক আদায় হয়ে গেছে! না, হক আদায় হয়নি, বরং তারা ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই অসুস্থ রোগীর ন্যায় যে কোন চিকিৎসকের চিকিৎসাকেন্দ্রে গিয়ে বসে থাকে এবং শুধু প্রেসক্রিপশনের (ব্যবস্থাপত্রের) কথা শোনে, কিন্তু ঔষধ খায় না। এই রোগী কখনো আরোগ্য লাভ করতে পারে না। যেমন একজন ক্ষুধার্ত মানুষ শুধু সুস্বাদু খাবারের তালিকাসূচী শ্রবণে তার

---

১. ইহ্'য়া, ৩য় খণ্ড, ৩৫২ পৃ.।

ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারে না, ঠিক তেমনি শুধু বিবিধ 'আমলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত বিবরণ শ্রবণ আল্লাহ্‌র দরবারে কোন কাজে আসবে না। যে ওয়া'জ তোমার ভেতর কোন পরিবর্তন আনতে পারে না এবং দুনিয়ার প্রতি তোমার অনাসক্তি ও নিস্পৃহতা সৃষ্টি করতে পারে না, সে ওয়া'জ তোমার জন্য বিপদ এবং এটা তোমার বিরুদ্ধে একটি দলীল হয়ে দাঁড়াবে। তোমরা যদি মিছামিছি কেবল ওয়া'জকেই নাজাতের ওসীলা ও ক্ষমা লাভের মাধ্যম মনে কর তাহলে তোমরা বিরাট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছ।[১]

একটি সংস্কার ও প্রশিক্ষণমূলক গ্রন্থ

ইহ্'য়াউ'ল-'উলূম কেবল একটি সমালোচনামূলক গ্রন্থই নয়, তা সংস্কার ও প্রশিক্ষণের একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থও বটে। গ্রন্থকার এটাকে এমনভাবে রচনা করেছেন, যা একজন সত্য সন্ধানীর জন্য তার নিজের সংস্কার ও প্রশিক্ষণ এবং অন্যদের তা'লীম ও তাবলীগের ক্ষেত্রে একাই যথেষ্ট। এটি একটি বিরাট ও বিস্তৃত গ্রন্থাগারের অভাব অনেকটা মেটাতে পারে এবং ধর্মীয় জীবনের কার্যকর সংবিধান হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারে। এটাকে 'আকাইদ[২] ও ফিক্'হ, তাযকিয়ায়ে নফ্‌স ও চারিত্রিক সভ্যতা ও তাসাওউফ– এই তিনটি শাখার পূর্ণাঙ্গ সংকলন বলা যেতে পারে। এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য ও সুস্পষ্ট গুণ হ'ল এর প্রভাব। মাওলানা শিবলী (র)-এর ব্যক্ত এই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে হাযার হাযার পাঠক একমত হবেন যে, "ইহয়াউ'ল'উলূম"-এর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হ'ল, তা পাঠকের অন্তর-মানসের ওপর অত্যাশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করে। এর প্রতিটি বাক্য ছবির মত অন্তরে গেঁথে যায়, প্রতিটি কথা যাদুর ন্যায় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং প্রতিটি শব্দেরই যেন এক একটি পৃথক কম্পন রয়েছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ হ'ল, এই গ্রন্থ যে যুগে লেখা হয়েছিল সে যুগে ইমাম নিজেই প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার নেশায় মত্ত ছিলেন।[৩] গ্রন্থকারের ঐ অবস্থার (যা সেই সফর ও গ্রন্থ প্রণয়নের যুগে তাঁর ওপর বিরাজ করছিল এবং যদ্দারা এই গ্রন্থ প্রভাবিত হয়েছে) প্রভাবেই পাঠক কোন কোন মুহূর্তে অনুভব করেন যে, তার অন্তর–মন দুনিয়া থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কোন কোন সময় যুহ্‌দ ও তাকাশুফ-এর একটি ভীষণ প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, তখন যেন ভয়-ভীতি ও ত্রাসের একটি দুর্গম প্রান্তর পাড়ি দিতে হয়, যা কখনো কখনো স্বাস্থ্য ও কাজকর্মের ওপরও প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি

---

১. ইহস্থ্য়া-ই'উলূমুদ্দীন, ৩য় খণ্ড, ৩৫২ পৃ. ;
২. ইমাম গাযালী শাফি'ঈ মযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং সে যুগে শাফি'ঈ ফিকস্থহ-এর জোর ছিল তুঙ্গে। এজন্য এই গ্রন্থে তিনি শাফি'ঈ ফিক্‌স্থহ এখতিয়ার করেছিলেন।; ৩. আল-গাযালী, ৩৩ পৃ. ;

করে। এটা তারই পরিণতি যে, স্বয়ং গ্রন্থকারের ওপর এই গ্রন্থ প্রণয়নের যুগে ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এজন্য বহু মাশায়েখ প্রাথমিক দীক্ষা গ্রহণকারীদের এই কিতাব অধ্যয়নের পরামর্শ দিতেন না। পরিপূর্ণ ভারসাম্য ও সঠিক মধ্যবর্তী অবস্থার সাক্ষাত তো কেবল রসূল আকরাম (সা)-এর সীরাত ও হাদীছ সংকলনের অধ্যয়ন এবং কোন পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ নমুনার সাহচর্য ও প্রশিক্ষণ দ্বারাই লাভ করা যেতে পারে।

ইহ্ইয়াউ'ল-'উলূম ও চরিত্র দর্শন

ইমাম গাযালী (র) একাধারে ছিলেন উঁচু দরের ফক'ীহ্, মুজতাহিদ, মুতাকাল্লিম, কামিল সূফী, ইসলামী আখলাক ও চরিত্র-দর্শনের নামকরা লেখক, সূক্ষ্মদর্শী ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ও মনস্তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ। ইসলামী আখলাক ও চরিত্র-দর্শনের কোন ইতিহাস তাঁর আলোচনা ব্যতিরেকে পরিপূর্ণ হতে পারে না।[১] ইহ্ইয়াউ'ল-'উলূম উল্লিখিত বিষয়ের ওপর তাঁর একটি কৃতিত্বপূর্ণ অবদান। অন্তরের ব্যাধি ও মানসিক অবস্থার ওপর তিনি যা কিছু লিখেছেন তা তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সুস্থ চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ। এখানে আরও একটি নমুনা পেশ করা হচ্ছে।

মর্যাদা প্রীতি

ইহ্ইয়াউ'ল-'উলূম গ্রন্থে بيان سبب كون الجاه محبوباً بالطبع حتى لايخلو عنه قلب الا بشديد المجاهدة ('উচ্চ পদমর্যাদা লাভের প্রতি মানুষ স্বভাবতই এত মোহাবিষ্ট যে, কঠোর সাধনা ব্যতিরেকে এ থেকে অন্তরকে মুক্ত ও পবিত্র রাখা যায় না) শীর্ষক শিরোনামে ইমাম গাযালী (র) লিখেছেন ঃ

> জানা দরকার যে, যে কারণে স্বর্ণ-রৌপ্য ও ধন-সম্পদ মানুষের নিকট প্রিয়, ঠিক সে কারণেই উচ্চ পদ-মর্যাদাও তার নিকট প্রিয়। এটা জানা কথা যে, স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য মুদ্রার নিজস্ব কোন আকর্ষণ বা মৌলিকত্ব নেই। এটাকে না খাওয়া যায়, আর না পান করা যায়। এটাকে যেমন বিয়ে-শাদী করা যায় না, তেমনি পরিধানও করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে নিজস্ব সত্তার দিক দিয়ে মুদ্রা একটি চাক্তি ছাড়া কিছু নয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রতি মানুষের আকর্ষণ শুধু

---

১. ড. মুহাম্মাদ ইউসুফ মুসা, উস্তায, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়-এর তারীখু'ল-আখলাক ও ফালসাফাতু'ল-আখলাক ওয়া সালাতুহা বি'ল-ফালসাফাতু'ল-আফরীকি'য়্যার লেখক।

এজন্য যে, এর দ্বারা কাম্য বস্তুসামগ্রী লাভ করা যায়। অন্য কথায়, এটা মনের বাসনা পূরণের একটি হাতিয়ার। ঠিক একই ব্যাপার উচ্চ পদমর্যাদার ক্ষেত্রেও। উচ্চ পদমর্যাদা মানুষের অন্তর-রাজ্য জয়ের অপর নাম। যেভাবে স্বর্ণ-রৌপ্যের মালিকানা এতখানি শক্তি প্রদান করে যদ্দারা মানুষ তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিল করতে পারে, ঠিক তেমনি উচ্চ পদমর্যাদা দ্বারা আল্লাহ্‌র বান্দাদের অন্তর-মন জয় করে মানুষ তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিল করতে পারে। এ কারণেই স্বর্ণ-রৌপ্য ও উচ্চ পদ মানুষের এত প্রিয়।

জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে সমতুল্য হওয়া সত্ত্বেও যে কয়েকটি কারণে ধন-সম্পদের ওপর উচ্চপদের অগ্রাধিকার রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ তিনটি ঃ প্রথম কারণ হ'ল, উচ্চপদের সাহায্যে ধন-সম্পদ পর্যন্ত পৌঁছুনো ধন-সম্পদের সাহায্যে উচ্চ পদ পর্যন্ত পৌঁছুনোর তুলনায় সহজ। এটা তো পরিষ্কার কথা যে, একজন 'আলিম কিংবা যাহিদ যিনি জনগণের অন্তরে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত, তিনি যদি সম্পদ লাভ করতে চান তাহলে তার জন্য সেটা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। কেননা টাকা-পয়সা ও ধন-দৌলত মানব মনের অধীনস্থ হয়ে থাকে। এখন মানব-মন যদি কারো অধীনস্থ্ হয়ে যায় তাহলে মানুষের ধন-সম্পদও তারই অধীনস্থ্ হয়ে পড়বে, মানুষ তাদের ধন-দৌলতও ঐ ব্যক্তির পায়ের ওপর ঢেলে দেবে। এর বিপরীতে একজন স্বল্প সম্মান ও স্বল্প মর্যাদার অধিকারী অথবা নীচ পর্যায়ের ব্যক্তি, যার মধ্যে পরিপূর্ণতার কোন গুণই নেই, হঠাৎ যদি কোন ধন-ভাণ্ডারের অধিকারী হয় এবং সে ধন-ভাণ্ডারের সাহায্যে উচ্চপদ পর্যন্ত পৌঁছুতে চায় তাহলে তার পক্ষে তা সম্ভব হবে না। কারণ উচ্চপদ বিত্ত-সম্পদের হাতিয়ার ও মাধ্যম। যে উচ্চপদের অধিকারী–সে অতি সহজে বিত্ত-সম্পদেরও মালিক হতে পারে, কিন্তু যে বিত্ত-সম্পদের মালিক সে সর্বাবস্থায় উচ্চপদের অধিকারী হতে পারে না। আর এজন্যই উচ্চপদ বিত্ত-সম্পদের চেয়েও প্রিয় বস্তু। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বিত্ত-সম্পদের জন্য সর্বদাই বিপদের আশংকা থাকে, না জানি কখন আবার তা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, চুরি অথবা ছিনতাই হয়ে যায়। বাদশাহ্ ও অত্যাচারী জালিমরা এর প্রতি শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বিত্ত-সম্পদের জন্য মুহাফিজ, পাহারাদার ও সুরক্ষিত সিন্দুকের প্রয়োজন। এরপরও তার জন্য হাযারো কিসিমের বিপদ রয়ে গেছে। অপরদিকে মানুষের অন্তর যখন কোন ব্যক্তির গোলামে পরিণত হয় তখন সে ব্যক্তির কোন বিপদ থাকে না। বস্তুত তখন সে নিরাপদ ও সুরক্ষিত ধন-ভাণ্ডারে পরিণত হয়। চোর, ডাকাত ও দুষ্কৃতিকারীদের

অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে সে মুক্ত। মালিকানাধীন বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ হচ্ছে জমি ও স্থাবর সম্পত্তি। কিন্তু এর ওপরও ছিনতাই তথা জোরপূর্বক দখল ও নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডের বিপদ রয়ে গেছে। তাই হেফাজত ও পাহারার ব্যবস্থা তার জন্য প্রয়োজন। কিন্তু অন্তরের সম্পদ আপনাআপনি নিরাপদ ও সুরক্ষিত, এটা কারো হাতে চুরি কিংবা ছিনতাই হবার ভয় নেই। হ্যাঁ, অন্তরের ওপর অল্প-বিস্তর জোর-যবরদস্তি করা যায়, যার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি রয়েছে–তার সম্পর্কে খারাপ ধারণার সৃষ্টি করা যায়। তবে এমনটি করা সবার জন্য মোটেই সহজসাধ্য নয়।

তৃতীয় কারণ এই যে, অন্তরের মালিকানার মধ্যে ক্রমশ পরিবর্ধন হতে থাকে। এজন্য কোনরূপ পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন নেই। বস্তুত যখন কেউ কোন ব্যক্তির 'ইল্ম কিংবা 'আমলের কারণে তার ভক্তে কিংবা অনুরক্তে পরিণত হয় তখন সে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। সে অন্যের নিকটও এ নিয়ে আলোচনা করে। ফলে নতুন নতুন অন্তর ঐ ব্যক্তির কাছে বন্দী হতে থাকে। এ কারণেই মানুষ স্বাভাবিকভাবে খ্যাতি ও যশের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। এর বিপরীতে যে যতটা সম্পদের মালিক সম্ভবত সে ততটারই মালিক থাকে। কঠোর মেহনত ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা ছাড়া ঐ সম্পদ বাড়ে না, কেউ বাড়াতে পারে না। কিন্তু উচ্চপদ নিজে নিজে এবং আপনাআপনি বাড়তে থাকে। আর এর কোন সীমা-সরহদও নেই। ধন-সম্পদ একই অবস্থায় থেমে থাকে। কিন্তু উচ্চ পদ-মর্যাদা ফলে-ফুলে বিকশিত ও সুশোভিত হতে থাকে! এজন্যেই উচ্চপদের ক্ষেত্রে যখন ব্যাপ্তি ঘটে এবং লোক যখন কোন ব্যক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে তখন ধন-সম্পদ তার দৃষ্টিতে মূল্যহীন প্রতিভাত হয়। সংক্ষেপে এগুলোই হ'ল অর্থ-বিত্তের ওপর উচ্চ পদের অগ্রাধিকার পাবার উল্লেখযোগ্য কারণ।

যদি কেউ বলে যে, এই বক্তৃতার ফল তো এই যে, মানুষের উচ্চপদ ও ধন-সম্পদের প্রতি ততটা আকর্ষণ থাকা দরকার যতটা তার আরাম-আয়েশ এনে দেবে এবং দুঃখ-কষ্ট দূর করবে। আর বিত্ত-সম্পদ ও উচ্চপদ হ'ল প্রিয়তম বস্তু লাভের মাধ্যম এবং প্রিয়তম বস্তু লাভের মাধ্যম বা উপায়ও প্রিয় হয়ে থাকে! কিন্তু এর কি কারণ যে, ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়ে যায় না। মানুষ বিত্ত-সম্পদ পুঞ্জীভূত করা, ধন-ভাণ্ডারের পর ধন-ভাণ্ডার এবং সঞ্চয়ের পাহাড় সৃষ্টিতে ব্যস্ত থাকে ! এমন কি সে প্রয়োজনের সীমারেখাও অতিক্রম করে যায়। শেষাবধি তার অবস্থা এমন হয় (যা হাদীছের ভাষায় বলা হয়েছে)

যে, যদি তার নিকট দু'টি স্বর্ণখনি থাকে তাহলে সে তৃতীয়টির আকাঙ্ক্ষী হয়। ঠিক তেমনি মানুষ উচ্চপদের বিস্তৃতি ও উন্নতির চিন্তায়ও মগ্ন থাকে এবং তার কামনা হয়, তার খ্যাতি সেই সব দূর-দূরান্তের দেশে ছড়িয়ে পড়ুক– যে সব দেশে কোনদিন তার পা ফেলারও সম্ভাবনা নেই ; সেখানকার অধিবাসীদের সাথে সাক্ষাতেরও কোন আশা নেই যে, তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা দৃষ্টে অন্তর-মন তৃপ্তিতে ভরে উঠবে অথবা তারা তাদের ধন-সম্পদ তার জন্য ব্যয় করবে কিংবা তার কোন উদ্দেশ্য পূরণ করবে। এত সব জেনেশুনেও তার অন্তর কামনা করে যে, তার আলোচনা সব দেশেই হোক এবং সর্বত্রই সে উচ্চপদ লাভ করুক। বাহ্যত এটিকে একটি বোকামি বলেই মনে হয়। কেননা এটি এমন একটি জিনিসের কামনা যার পারলৌকিক জীবনে কানাকড়ি মূল্যও নেই। তাহলে এর কারণ ? জওয়াব হ'ল, আসলেই উচ্চপদের প্রতি আকর্ষণ মানুষের অন্তরের এমন একটি সাধারণ অবস্থা যার মূলোৎপাটন সম্ভব নয়। এর দু'টো কারণ রয়েছে ঃ একটি প্রকাশ্য যা সকলেই বুঝতে পারেন। অপরটি সূক্ষ্ম যা বড় কারণ, কিন্তু এত নাযুক যে, হাবা-গোবা তো দূরের কথা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারীও তা বুঝে উঠতে হিমসিম খেয়ে যান। কেননা এর সম্পর্ক মানুষের প্রবৃত্তি ও স্বভাবের এমন একটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যার জ্ঞান খুবই সূক্ষ্ম এবং তা আয়ত্ত করতে পারেন তাঁরাই যাঁরা মানবীয় স্বভাব ও প্রকৃতির গভীরে ডুব মারতে পারেন।

প্রথম কারণটি হ'ল, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই তার প্রিয়জন বা প্রিয় বস্তু সম্পর্কে কাল্পনিক ভীতি অনুভব করে এবং তার বিপদাপদ দূর করতে চায়।

عشق است وهزار بد گمانی .

মানুষের সারা বছরের জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীও যদি মওজুদ থাকে, তথাপি তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনার ফিরিস্তি থাকে অনেক দীর্ঘ। তার মনে ঘুরে ফিরে এই আশংকার উদয় হয়, না জানি, যে সম্পদ আপাতত প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট, তা যদি হঠাৎ খুইয়ে বসি অথবা তা যদি নষ্ট হয়ে যায় এবং অতিরিক্ত সম্পদের প্রয়োজন হয় তখন আমার দশা কী হবে ? যখন তার মনে এ ধরনের ধারণা আসে তখন সে দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে ওঠে। তাঁর অন্তরের দুঃসহ যাতনা কেবল তখনই দূরীভূত হতে পারে, যখন অপরাপর মালামাল মিলে যাবার কারণে সে এই ভেবে আশ্বস্ত হয় যে, যদি এই পয়লা মাল-সামান নষ্ট হয়ে যায় কিংবা এর ওপর কোন বিপদ ও বিপর্যয় আসে তাহলে প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্য মালামাল তো মওজুদ

আছে। নিজ ব্যক্তিসত্তার প্রতি আকর্ষণ এবং জীবনের প্রতি ভালবাসার কারণে সে এই কাল্পনিক হিসাব কষে। নতুন নতুন সমস্যা ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে–এই কল্পিত আশংকায় সে শিহরিত হতে থাকে। কাজেই সে এই সব বিপদাশংকা দূরীভূত করবার উপায়-উপকরণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। আর তার দৃষ্টিতে এর সবচেয়ে বড় উপায়-উপকরণ হ'ল, ধন-সম্পদ এত বেশি হবে যে, যদি তার কোন অংশের ওপর ক্ষতির আশংকা দেখাও দেয় তবু অপরাংশ দ্বারা কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে। এই ভয় ও দুশ্চিন্তাই মানুষকে নির্দিষ্ট ধন-সম্পদের ওপর তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হতে দেয় না এবং তা কোন সীমারেখাও মানে না, এমন কি এভাবে সে সারা দুনিয়াকে স্বীয় মালিকানাধীনে নিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। এজন্যই রসূল (সা) বলেছেন, "দুটো লোভ এমন যে, তা কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। তার একটি জ্ঞানের প্রতি লোভ, আর অপরটি ধন-সম্পদের প্রতি লোভ।" ঠিক একই কারণ দূর-দূরান্তের শহর ও অপরিচিত লোকের হৃদয় কন্দরে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও প্রভাব-মাহাত্ম্য সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার মধ্যে লুক্কায়িত। উচ্চপদের ক্ষেত্রেও মানুষ এই সব কাল্পনিক বিপদাশংকা করতে থাকে যা অনাগত দিনে দেখা দিতে পারে। হতে পারে যে, তাকে হয়ত তার দেশ থেকেই চিরবিদায় নিতে হবে অথবা অন্য দেশের লোক তার শহরে আসতে পারে এবং কোন না কোন কাজে তাদের তার প্রয়োজন হ'তে পারে। এসব চিন্তা-ভাবনার পর তার মন খুশীতে ভরে ওঠে এই ভেবে যে, ঐ সব দূর-দূরান্তের লোকদের মনেও তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা কায়েম আছে যাদের দিয়ে কোনদিন তার পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিল হতেও পারে।

দ্বিতীয় কারণটি আরও শক্তিশালী আর তা হ'ল এই যে, রূহ হুক্‌মে রব্বানী বা আল্লাহ রাব্বু'ল-'আলামীনের একটি আদেশমাত্র। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ – قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ ط

হুকমে রব্বানী হবার অর্থ এই যে, তা কাশ্‌ফ জ্ঞানের রহস্য-ঘেরা বিষয়াবলীর একটি এবং তা প্রকাশ করবার অনুমতি নেই। স্বয়ং রসূল আকরাম (সা) ও এর হাকীকত প্রকাশ করেন নি। কিন্তু তার হাকীকতের জ্ঞান লাভ ব্যতিরেকেও তুমি এতটুকু জানতে পার যে, মানুষের অন্তরে পশুসুলভ গুণাবলীর (খানা-পিনা ও সঙ্গমের) প্রতি একটি ঝোঁক ও প্রবণতা আছে। একটি প্রবণতা (ইচ্ছা ও অভীপ্সা) আছে হিংস্র-পশুর গুণাবলীর–যেমন মারা, হত্যা ও কষ্ট দেওয়ার প্রতি; একটি শয়তানী গুণাবলীর–যেমন, ধোঁকা ও প্রতারণার প্রতি এবং অন্যটি রবূবিয়তের গুণাবলীর–যেমন শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও অহংকারের প্রতি।

মানব হৃদয় বিভিন্ন মূলনীতি ও মৌলিক উপাদানে সমৃদ্ধ। এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্র খুবই দীর্ঘ। হৃদয়ে হুকমে রব্বানীর যে অংশ রয়েছে তারই ভিত্তিতে মানুষের ভেতর রবূবিয়তের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়। রবূবিয়ত কি? পরিপূর্ণতা ও চরমোৎকর্ষের (কামালিয়াতের) এমন একটি রূপ যা অন্যের করুণাধন্য হ্তে লজ্জাবোধ করে। এজন্যই পরিপূর্ণতা ও চরমোৎকর্ষ আল্লাহ্‌র গুণাবলীর অন্যতম। অতএব, স্বাভাবিকভাবেই তা মানুষেরও প্রিয়। পরিপূর্ণতা ও চরমোৎকর্ষ এই যে, অস্তিত্বের ক্ষেত্রে তা একক হবে ! আর তা এজন্য যে, অস্তিত্বের ক্ষেত্রে অন্য কারোর শরীকানা নিশ্চিতই একটি ত্রুটি। সূর্যের পূর্ণতা এই যে, অস্তিত্বের ক্ষেত্রে সে একক। যদি অন্য কোন সূর্য থাকত তাহলে সেটি এই সূর্যের পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে একটি কলংকই হ'ত। কেননা সূর্য হিসাবে শান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সে আর একক হ'ত না। আর অস্তিত্বের এককত্ব কেবল আল্লাহ্‌রই রয়েছে এজন্য যে, তাঁর সম্মুখে কারোর (সত্যিকার) কোন অস্তিত্ব নেই। তিনি ভিন্ন যা কিছু আছে তা তাঁর কুদরতের অপার বিস্ময় ও চমৎকারিত্ব, যা নিজ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সেসব তাঁরই শক্তির আশ্রয়ে টিকে আছে। তাহলে বাস্তবপক্ষে তাঁর সম্মুখে কারোর অস্তিত্বই নেই এজন্য যে, সহগামী ও সঙ্গীত্বের জন্য সম্মান ও মরতবার ক্ষেত্রে সাম্য জরুরী এবং মরতবার সাম্য পরিপূর্ণতা ও চরমোৎকর্ষের জন্য একটি ত্রুটি। পূর্ণ সেই যার সমমর্যাদাসম্পন্ন কেউ হবে না। সূর্যের আলোর তাপ বিশ্বজাহানে প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্ব কুদরতের আলোকমালার উত্তাপের ফয়েয বা প্রভাব। এসবই অনুগত, কারোর আনুগত্য লাভের হকদার তারা নয়। অতএব, রবূবিয়তের শান ও মর্যাদা হ'ল অস্তিত্বের এককত্ব ও উপমাহীনতা। আর এরই নাম চরমোৎকর্ষ ও পূর্ণতা। প্রকৃতিগতভাবেও মানুষ এ ব্যাপারে খুবই আগ্রহী এবং মানুষ চায় যে, সেও পূর্ণতা ও চরমোৎকর্ষের ক্ষেত্রে উপমাহীন হোক। কতক সূফী বুযুর্গ বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে সেই কথাটিই লুক্কায়িত যা ফির'আওন সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় বলেছিল, انا ربكم الاعلى "আমি তোমাদের মহান প্রভু।" কিন্তু সবার তো আর এ ধরনের মওকা মেলে না।[১] নফসের গোলামী ও দাসত্ব এজন্যই নফসের ওপর কষ্টকর এবং রবূবিয়ত এজন্যই প্রকৃতিগতভাবে সহজ ও উৎসাহব্যঞ্জক। এটি সেই রব্বানী সম্পর্কের কারণে যার দিকে قل الروح من امر ربى এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে।

---

১. মওলানা রূম বর্ণনা করেছেন,

نفس ما راكمتر ازفرعون نيست + ليك او راعون ما راعون نيست

কিন্তু সে যখন পরিপূর্ণতার শীর্ষে উপনীত হতে ব্যর্থ হয় তখনও তার পরিপূর্ণতা লাভের খাহেশ একেবারে মিটে যায় না। তখনও সে পরিপূর্ণতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ও আশাবাদ পোষণ করে। এটা কামালিয়াত তথা পরিপূর্ণতা ব্যতিরেকে অন্য কোন উদ্দেশ্যের খাতিরে নয় (যা কামাল বা পূর্ণতার মাধ্যম), বরং নফসে কামাল-এর খাতিরে। দুনিয়ার বুকে যা বিদ্যমান তা তাঁর নিজ সত্তা ও সত্তার পরিপূর্ণতার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক রাখে। প্রত্যেকের কাছেই ধ্বংস ও বিলুপ্তি একেবারে না-পসন্দ (نا مرغوب)। এটা এজন্য যে, এতে স্বীয় সত্তা ও তার পরিপূর্ণ গুণাবলী ধ্বংস হবে বলে সে মনে করে। পরিপূর্ণ তো এটাই যা অস্তিত্বের ক্ষেত্রে একক এবং তামাম অস্তিত্বশীল জিনিসের ওপর যার প্রাধান্য ও শাসন-কর্তত্ব প্রতিষ্ঠিত। তোমার চরমতম পরিপূর্ণতা এই যে, অন্যের অস্তিত্ব তোমারই অবদান। যদি তা তোমার অবদান না হয়, তাহলে কমপক্ষে এতটা হবে যে, তুমি তার ওপর বিজয়ী হবে। এই প্রেক্ষিতে সকলের ওপর জয় লাভ করা মানুষের কাছে প্রকৃতিগতভাবেই প্রিয়। এটি পরিপূর্ণতা ও চরমোৎকর্ষের একটি রূপ। প্রতিটি অস্তিত্বশীল বস্তু যা স্বীয় সত্তার কাছে পরিচিত, তা স্বীয় সত্তার প্রেমিক এবং তার চরমোৎকর্ষেরও 'আশিক। এর অনুভূতির দ্বারা সে একটি মিষ্টি আমেজ লাভ করে। কোন বস্তুর ওপর জয় লাভের অর্থ এই যে, তুমি তার ওপর প্রভাব ফেলতে পারবে, স্বীয় বাসনা ও অভিপ্রায় মুতাবিক তার ভেতর পরিবর্তন ঘটাতে পারবে এবং আপন মর্জি মুতাবিক তা ব্যয় করতে পারবে। মানুষ তো এই চেয়েছিল যে, অস্তিত্বশীল সকল বস্তুর ওপর সে প্রাধান্য লাভ করবে। কিন্তু অস্তিত্বশীল বস্তুরাজির মধ্যে কিছু বস্তু এমন আছে যা কোন পরিবর্তন কবুল করে না ; যেমন আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী। আর কতক অস্তিত্বশীল বস্তু এমন আছে যা পরিবর্তন কবুল করে, কিন্তু সে সবের ওপর সৃষ্ট জগতের কোন ক্ষমতা নেই এবং তার ওপর তাদের কোন জোর-যবরদস্তিও চলে না; যেমন আকাশমণ্ডল, তারকারাজি, ফেরেশ্‌তাকুল, জ্যোতিষ্কমণ্ডল, আত্মাসমূহ, জিন্ন ও শয়তান, পাহাড় ও সমুদ্র এবং সে সবের অভ্যন্তরস্থ বস্তুসকল। তৃতীয় প্রকার সেই সব বস্তু যার ভেতর মানুষ স্বীয় শক্তিতে পরিবর্তন আনতে পারে। যেমন, যমীন ও তার অংশসমূহ, খনিজ দ্রব্য, উদ্ভিদ, জীবকুল ইত্যাদি। অন্য এক প্রকারের বস্তু আছে যার ওপর মানুষ শক্তি রাখে না; যেমন ঐশী সত্তা, ফেরেশ্‌তামণ্ডলী, আকাশমণ্ডল তথা বিশ্ব-জাহান। মানুষের ভেতর ইচ্ছা জাগল যে, সে কমসে-কম আকাশমণ্ডলী সম্পর্কে অধিক থেকে অধিকতর জ্ঞান লাভ

করবে, আর তা এজন্য যে, এটাও এক ধরনের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি লাভ। কেননা যার সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায় সে জ্ঞান লাভকারীর কিছুটা অধীনস্থ হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষিতেও বিদ্বান ব্যক্তি এক ধরনের বিজয়ীর মর্যাদা রাখে (সে তার জ্ঞান দ্বারা শাসন কর্তৃত্বের আবেগ, প্রশাসন ও উঁচু শ্রেণীতে উন্নীত হবার আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করে)। এরই ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র মা'রিফত, ফেরেশতামণ্ডলী, নভোমণ্ডল তথা বিশ্ব-জাহান, আকাশের তারকারাজি, অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ, সপ্তাকাশ, গ্রহরাজি, সমুদ্রের বিস্ময়কর বস্তু ইত্যাদির জ্ঞান হাসিলের আগ্রহ মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হয়। এজন্যই তোমরা দেখে থাকবে, যে ব্যক্তি কোন অত্যাশ্চর্য জিনিষ তৈরি করতে পারে না, সে অন্ততপক্ষে তার নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে জানতে আগ্রহী (এর দ্বারাই সে তার শিল্প সৃষ্টির খাহেশকে পূরণ করে)। যে ব্যক্তি দাবার ছক তৈরি করিতে অক্ষম, সে কমপক্ষে দাবা খেলার নিয়ম-পদ্ধতি শিখতে চায় এবং এটা জানতে চায় যে, দাবার ছক কিভাবে বানানো হয়েছে। ব্যক্তি কোন জ্যামিতি কিংবা কারিগরী কৌশল অথবা ক্রেন-এর যন্ত্রপাতি দেখে এবং যখন অনুভব করে যে, সে এ সব তৈরিতে অক্ষম তখন সে এসব যন্ত্র কিভাবে বানানো হয় অন্তত তাই জানতে চায়। সে স্বীয় অক্ষমতার কারণেই তাকলীদ্ ও জ্ঞানের চরমোৎকর্ষের বাহ্যিক জ্ঞান দ্বারা প্রকৃত জ্ঞানের তৃপ্তি মেটাতে চায়।

দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান যার ওপর মানুষ শক্তি ও সামর্থ্য (قدرت) লাভ করতে পারে তা হ'ল ভূমি সম্বন্ধীয় বিষয় প্রভৃতি। সে স্বভাবতই এসব বস্তুর ওপর এতটা প্রাধান্য এবং এতখানি শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করতে চায় যেন এগুলোর মধ্যে আপন ইচ্ছা মাফিক তাসার্রুফ (تصرف) করতে পারে। এ আবার দু'প্রকার– যথা : দৈহিক ও আত্মিক। দৈহিক বস্তু হ'ল টাকা-পয়সা ও অন্যান্য উপায়-উপকরণ। মানুষ চায় যেন এসবের ব্যবহারে তার পরিপূর্ণ এখতিয়ার থাকে। এগুলো সে যাকে চাইবে দেবে, যাকে চাইবে না–দেবে না। এটাই হ'ল শক্তি আর শক্তি পরিপূর্ণতা চায় এবং পরিপূর্ণতা লাভ রবূবিয়তের গুণাবলীরই অন্যতম। আর রবূবিয়ত প্রকৃতিগতভাবেই সকলের প্রিয়। কাজে কাজেই ধন-সম্পদও সকলের প্রিয়, চাই কি তা পরিধানের হোক অথবা আহার্যের, স্বীয় কামনা-বাসনা পূরণ করবার জন্য কোনদিন তার প্রয়োজন পড়ুক অথবা না-ই পড়ুক। অগণিত দাসদাসী রাখা, স্বাধীন ও শরীফ মানুষদেরকে গোলামে পরিণত করা, চাই কি জোর-যবরদস্তির মাধ্যমে হোক অথবা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হোক– তার নিকট সমান প্রিয়। ভীতিজনক প্রভাব-প্রতিপত্তিও

মানুষের নিকট প্রিয় যার ভিত্তি হ'ল জোর-যবরদস্তি– এজন্য যে, এর ভেতরও শক্তির প্রকাশ ঘটে থাকে। দ্বিতীয় প্রকারের মানুষ, যাদের ধড়ে প্রাণ আছে, আছে হৃদয় আর এটি সারা দুনিয়ার সর্বাধিক মূল্যবান ও পবিত্র বস্তু– চায় যে, তার সেই মনের ওপর শক্তি ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হোক যাতে করে সকল মানুষ তার (ব্যক্তিত্বের মোহজালে) বন্দী হয়ে পড়ে এবং তারা তার ইশারায় কাজ করে। কেননা এর ভেতর প্রাধান্যের পূর্ণতা পাওয়া যায় এবং তা রবূবিয়তের গুণাবলীর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ভালবাসা দিয়েই কেবল মানুষের মন জয় করা যায় এবং ভালবাসা পরিপূর্ণতা তথা কামালিয়াতের 'আকীদা-বিশ্বাস থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। সব কামালিয়াতই প্রিয় এবং পরিপূর্ণতা এজন্য প্রিয় যে, তা ঐশী গুণাবলীর অন্যতম। আর ঐশী গুণাবলী স্বভাবতই সকল মানুষের প্রিয়, আর তা এজন্য যে, মানুষের ভেতর একটি রব্বানী (ঐশী) সম্পর্ক পাওয়া যায়, আর এই সম্পর্ক অবিনশ্বর। মৃত্যু যেমন তাকে নিঃশেষ করতে পারে না, তেমনি মাটিও পারে না তাকে কাবু করতে। আর এই রব্বানী সম্পর্কই ঈমান ও মা'রিফতের রাজপ্রাসাদ। এটিই বাকা-ই ইলাহী পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে। অতএব, মানুষের মনের নিকট যে বস্তু স্বভাবতই প্রিয়–তাই পরিপূর্ণতা, চাই কি তা জ্ঞান ও বিদ্যার মাধ্যমেই হাসিল হোক, চাই কি স্বর্গীয় শক্তির সাহায্যে। মাল-মাত্তা ও উচ্চপদ প্রকৃতির উপকরণসমূহের প্রধান এজন্য যে, তা প্রেমাস্পদের ওসীলা ও প্রিয় হয়ে থাকে। জানার যেমন কোন শেষ নেই, তেমনি শক্তি-সামর্থ্যেরও কোন শেষ নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত এমন একটি বস্তুও পৃথিবীতে আছে যাকে জানা যেতে পারে এবং এমন একটি বস্তুও পৃথিবীতে আছে যার ওপর সর্বময় কর্তৃত্ব হাসিল করা যেতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের আগ্রহ বা লিপ্সার কোন পরিতৃপ্তি আসে না। এজন্যই মহানবী (সা) বলেছেন : দু'জন লোভী কখনো তৃপ্ত হয় না।[১]

আত্মজিজ্ঞাসা

উক্ত গ্রন্থের প্রভাবমণ্ডিত অংশ সেইটি যেখানে ইমাম গাযালী (র) নসীহত, উৎসাহ প্রদান ও সতর্কীকরণের ওপর কলম ধরেন এবং দুনিয়ার অনিত্যতা, আখিরাতের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য, ঈমান ও সৎ কর্মের আবশ্যকতা, সংস্কার-সংশোধন ও আত্মার শুচি-শুভ্রতার গুরুত্ব এবং অন্তরের ব্যাধি ও প্রবৃত্তির ক্ষতিকর বিষয়াবলীর প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি একই সঙ্গে এমন

---

১. ইহ্'য়া' 'উলূমুদ্দীন, ৩য় খণ্ড, ২৪১-৪৪ পৃ.।

বিজ্ঞান ও অলংকারশাস্ত্রেরও নমুনা বটে। প্রতিটি যুগে হাযার হাযার মানুষ তাঁর ওয়া'জ ও কথামালা দ্বারা উপকৃত হয়েছে। তিনি অসংখ্য মানুষের সংস্কার ও মনো-বিপ্লবের মাধ্যম হয়েছেন। গ্রন্থের শেষ চতুর্থাংশে এ ধরনের জ্ঞানের যে বিরাট ভাণ্ডার রয়েছে তার একটি উদ্ধৃতি পেশ করা গেল। এখানে তিনি নফ্‌সকে সতর্ক করেছেন এবং অধ্যয়নকারীদেরকে তা'লীম দিয়েছেন কিভাবে তারা তার সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন, কিভাবে বলা উচিৎ এবং মনযিলে আখিরাতের জন্য কিভাবে তাকে তৈরি করা দরকার। المرابطه السادسة فى توبيخ النفس ومعاتبتها শিরোনামের অধীনে নফ্‌সের সঙ্গে কথোপকথন করতে গিয়ে এক স্থানে তিনি লিখেছেন ঃ

হে নফ্‌স ! একটুখানি ইনসাফ কর, যদি একজন ইয়াহূদীও তোমাকে বলে যে, অমুক সুস্বাদু খাবার তোমার জন্য ক্ষতিকর তাহলে তুমি সবর কর, তা পরিত্যাগ কর এবং তার খাতিরে কষ্টও স্বীকার কর। আম্বিয়ায়ে কিরামের বাণী যা মু'জিযা দ্বারা সমর্থিত অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ফরমান ও আসমানী সহীফাসমূহের নিবন্ধও কি তোমাকে সেই পরিমাণ প্রভাবান্বিত করে না– যে পরিমাণ প্রভাবান্বিত করে তোমাকে সেই ইয়াহূদীর অনুমাননির্ভর উক্তি যার মধ্যে বুদ্ধির স্বল্পতা ও জ্ঞানের কমতি পরিস্ফুট? আশ্চর্য যে, যদি একটা বাচ্চাও বলে যে, তোমার কাপড়ের ভেতর একটা বৃশ্চিক আছে, তখন দলীল-প্রমাণ না চেয়েই এবং চিন্তা-ভাবনা না করেই তুমি নিজের কাপড় খুলে ছুঁড়ে ফেলে দাও। তাহলে কি আম্বিয়া-ই-কিরাম, 'আলিম-'উলামা, আউলিয়া-দরবেশ ও বিজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের সর্বসম্মত কথা তোমার কাছে ঐ শিশুটির কথার চেয়েও কম মর্যাদার দাবিদার ? তাহলে কি জাহান্নামের আগুন, তার শৃঙ্খলসমূহ, তার গুর্জ, তার শাস্তি, তার যক্কূম বৃক্ষ, তার জ্বলন্ত অঙ্গার, তার সাপ, বিচ্ছু ও বিষাক্ত সব জিনিস তোমার নিকট একটি বিচ্ছুর চেয়েও কম যন্ত্রণার, কম কষ্টের–যার কষ্ট বড় জোর একদিন কিংবা তার থেকেও কম সময় বিদ্যমান থাকে ? এটি বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। যদি কোথাও ও কখনো চতুষ্পদ জন্তুগুলো তোমার অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে তোমাকে নিয়ে হাসবে এবং তোমার বুদ্ধিমত্তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে। হে নফ্‌স ! যদি তোমার এসব জানা থাকে এবং এ সবের ওপর তোমার ঈমান থাকে, তাহলে কি কারণে তুমি কর্মের ভেতর অলসতা ও দোটানা অবস্থার আশ্রয় নিচ্ছ ? অথচ মৃত্যু ওঁৎ পেতে তোমার অপেক্ষায় রয়েছে। সে তোমাকে এতটুকু অবকাশ না দিয়েই ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। যদি এক শত বছরেরও অবকাশও মেলে তবু যাকে

একটি ঘাঁটি অতিক্রম করতে হবে সে যদি সেই ঘাঁটির উৎরাইয়ে নিশ্চিন্তে ও পরম আরামের সঙ্গে স্বীয় জানোয়ারগুলোকে ঘাস খাওয়ায় তাহলে কি সে কখনো সেই ঘাঁটি অতিক্রম করতে পারবে ? যদি তুমি এটা মনে কর তাহলে কি তুমি নাদান নও ? এরকম লোকের সম্পর্কে তোমার কী ধারণা—যে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণ করে, অথচ সেখানে বছরের পর বছর বেকার অবস্থায়ই কাটিয়ে দেয় এই ধারণায় যে, যে বছর দেশে ফিরবে, সব জ্ঞান ও বিদ্যা সে বছরই হাসিল করে নেবে ? তুমি নিশ্চয়ই তার বুদ্ধি দেখে হাসবে এবং তার এই ধারণার জন্য তাকে নিয়ে বিদ্রূপ করবে। কেননা জ্ঞান ও ধর্মোপলব্ধি এত স্বল্প সময়ে হাসিল হয় না। বিচারকের পদ জ্ঞান ও ধর্মোপলব্ধি ব্যতিরেকে কেবল তাওয়াক্কুলের বরকতেই পাকা আপেলের মত হাতে এসে পড়ে না। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি এটা মেনে নেওয়া যায় যে, শেষ বয়সের চেষ্টা-সাধনা ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর এবং তা বুলন্দ দর্জা পর্যন্ত মানুষকে পৌঁছিয়ে দেয়, তাহলে এটাও তো হতে পারে যে, এই আজকের দিনই তোমার জন্য শেষ দিন। অতএব, আজই তুমি কর্মে মশগুল হচ্ছ না কেন ? যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বাৎলেও দিয়ে থাকেন যে, তোমাকে অবকাশ দেওয়া হবে তাহলেও তো তাড়াতাড়ি করবার পথে তোমার জন্য কোন অন্তরায় থাকে না। আজ নয়—কাল, কাল নয়—পরশু করবারই বা কারণ কি ? এটাই কারণ হতে পারে যে, স্বীয় প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা তোমার নিকট কষ্টকর মনে হয়। কেননা এতে কঠোর মেহনত রয়েছে। তুমি কি এমন কোন দিনের অপেক্ষায় রয়েছ যেদিন প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে ? এমন দিন আল্লাহ্ তা'আলা আদৌ সৃষ্টিই করেন নি, আর করবেনও না। যে কাজ তুমি আজ আনজাম দিতে পারনি, কাল সে কাজ আনজাম দেওয়া তোমার জন্য আরও কঠিন হবে। আর তা এজন্য যে, কামনা-বাসনার দৃষ্টান্ত একটি কাঁটাযুক্ত গাছের ন্যায় যাকে উপড়ে ফেলা মানুষ ফরয মনে করে। যদি কেউ তা উপড়ে ফেলতে ব্যর্থ হয় এবং সে যদি তা কালকের জন্য রেখে দেয় তাহলে তার উদাহরণ হবে সেই যুবকের ন্যায়-যে আজ একটি গাছ উপড়ে ফেলতে পারেনি এবং সে সেই কাজটি পরবর্তী বছরের জন্য তুলে রাখল, অথচ সে জানে যে, যত সময় যাবে—গাছ তত সুদৃঢ় হবে এবং তার শেকড় আরো বেশী মযবুত ও বিস্তৃত হতে থাকবে, অপরদিকে উৎপাটনকারীর কমযোরী ও দুর্বলতা বাড়তে থাকবে। আর এটাতো পরিষ্কার কথা যে, যৌবনে যে গাছকে উপড়ে ফেলা গেল না, বার্ধক্যে তাকে কোনমতেই উপড়ানো যাবে

না। কেননা বৃদ্ধ বয়সের ব্যায়াম ও পরিশ্রম খুবই কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। সতেজ ও সবুজ শাখা-প্রশাখা নমনীয় হয়ে থাকে এবং তা অবনমিত করা যায়। যখন তা শুকিয়ে যায় এবং এই অবস্থায় কিছুকাল অতিবাহিত হয় তখন তাকে আর দুমড়ানো যায় না। অতএব, হে নফ্‌স ! তুমি যদি এই বাস্তবতা বিশ্বাস না কর তাহলে এর চেয়ে বড় বোকামি আর কি হতে পারে? তুমি এমন স্বাদ ও আনন্দ কেন তালাশ কর না যা সমস্ত ক্লেদ ও আবর্জনা থেকেও মুক্ত ও পবিত্র এবং যা চিরদিনের জন্য তোমার আনন্দ ডেকে আনবে ? কেবল ফুর্তি ও মজা লুটবে, এটাই যদি তোমার কাছে পসন্দীয় হয়ে থাকে তাহলে তার খাতিরেও তো তোমাকে তোমার নফসের সাময়িক ও আপাত কামনা-বাসনার বিরোধিতাই করা উচিৎ। আর তা এজন্য যে, অনেক সময় একটি মাত্র লুকমা কয়েকটি লুকমা থেকে মানুষকে মাহরূম করে দেয়। সেই রোগী সম্পর্কে তোমার কী ধারণা যাকে চিকিৎসক কেবল তিন দিনের জন্য ঠাণ্ডা পানি পান থেকে বিরত থাকতে বলেছে যাতে করে সে লুপ্ত স্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে সারা জীবন ঠাণ্ডা পানির স্বাদ ভোগ করার সুযোগ পায় ? চিকিৎসক তাকে এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছে যে, শরীরের এমত অবস্থায় ঠাণ্ডা পানি পান তার জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। কিন্তু সে যদি সতর্কবাণীতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে এবং পানি পান অব্যাহত রাখে তাহলে কি তাকে জীবন ভর ঠাণ্ডা পানি পানের আশা পরিত্যাগ করতে হবে না ? সত্যি করে বল, এক্ষেত্রে বুদ্ধির দাবি কি ? বুদ্ধির দাবি নিশ্চয়ই এই যে, তিন দিন সবর তাকে করাই উচিৎ যাতে করে সারাটা জীবন সে আরামে কাটাতে পারে। গোটা জীবনের মুকাবিলায় তিনদিনের যেমন কোন গুরুত্বই নেই—ঠিক তেমনি অনন্ত জীবনের তুলনায় তোমার গোটা জীবনেরও কোন হাকীকত নেই। তোমার জৈবিক প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা থেকে সংযত হবার কষ্ট কি জাহান্নামের অগ্নি-শাস্তি অপেক্ষা অধিক কষ্টকর ও দীর্ঘ ? যে ব্যক্তি মামুলী কষ্টও বরদাশ্‌ত করতে পারে না—সে আল্লাহ্‌র শাস্তি কিভাবে বরদাশ্‌ত করবে ? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি দু'টি কারণে স্বীয় সত্তাকে অবকাশ দাও। একটি কারণ (১) কুফ্‌রে খফী (প্রচ্ছন্ন ও পরোক্ষ কুফ্‌র), আর অপরটি (২) সুস্পষ্ট বোকামি। কুফ্‌রে খফী এই যে, হিসাব-নিকাশ দিবসের ওপর তোমার ঈমান কমযোর এবং পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে তুমি অনবহিত। আর সুস্পষ্ট বোকামি আল্লাহ্‌র গুপ্ত কর্মধারা ও তার গোপন রহস্য সম্পর্কে কোনরূপ ধারণা ব্যতিরেকেই তাঁর ক্ষমা ও বদান্যতার ওপর তোমার আস্থা। অপরদিকে তুমি রুটির একটি টুক্‌রা, গমের একটি দানা

এবং মুখ থেকে বহির্গত একটি বাক্যের জন্যে আল্লাহ্র ওপর ভরসা করবার জন্য তৈরি হও না, বরং তা লাভ করবার জন্য হাযারো যত্ন কর এবং এই মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে তুমি মহানবী (সা)-এর সেই বাণীর লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হও :

الكيس من دان نفسه لما بعد الموت والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانى .

"সতর্ক ও বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে স্বীয় নফ্সকে আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন করে এবং মৃত্যুপরবর্তী যিন্দেগীর জন্য 'আমল করে এবং আহম্মক সেই ব্যক্তি যে স্বীয় নফ্সকে আপন প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার পশ্চাদ্বর্তী করে এবং আল্লাহ্র ওপর আশায় বুক বাঁধে।"

আফসোস ! ওহে নফ্স, জীবনের ফাঁদ সম্পর্কে তোমার হুঁশিয়ার থাকা উচিৎ ছিল। শয়তানের প্রতারণা সম্পর্কে তোমার নিজের প্রতি তোমার করুণা দৃষ্টি রাখা উচিত। তোমাকে নিজের সম্পর্কেই চিন্তা-ভাবনা করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। দেখ, তুমি নিজের সময় নষ্ট কর না। তোমার কাছে হাতে গোণা শ্বাস-প্রশ্বাস রয়েছে। যদি তোমার একটি নিঃশ্বাসও বৃথা নষ্ট হয় তাহলে তোমার জীবনের মোট পুঁজির একটা অংশই নষ্ট হয়ে গেল। অতএব, রুগ্ন হবার আগে স্বাস্থ্যকে, ব্যস্ততার পূর্বে অবকাশকে, দারিদ্র্যের পূর্বে ধন-সম্পদকে, বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে মূল্যবান সম্পদ মনে কর। তুমি পারলৌকিক জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর এই ভেবে যে, তোমাকে সেখানে চিরদিন থাকতে হবে। ওহে নফ্স ! যখন শীতকাল মাথার ওপর এসে হাযির হয় তখন তুমি কি সেই গোটা মুদ্দতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর না ? প্রয়োজনীয় খাদ্য, পোশাক ও জ্বালানি কি সংগ্রহ কর না ? তুমি তো এই ভরসায় থাক না যে, কেবল সুতির আচ্কান গায়ে চাপিয়ে জ্বালানি ব্যতিরেকেই শীতকালটা কাটিয়ে দেবে। তোমাদের কি ধারণা যে, জাহান্নামের ভীষণ শীত পার্থিব শীতের চাইতে কম ভয়াবহ ? বাস্তব ঘটনা কিন্তু তা নয়। তীব্রতা ও ঠাণ্ডার দিক দিয়ে জাহান্নামের শীতের সাথে পার্থিব শীতের কোন তুলনাই হয় না। তুমি কি মনে কর যে, কোনরূপ চেষ্টা-তদবীর ছাড়াই তুমি তার হাত থেকে নাজাত পেয়ে যাবে ? যেমনি পশমী কাপড়, চাদর, আগুন ও এমনি ধরনের অন্যান্য জিনিস ব্যতিরেকে শীত যায় না, ঠিক তেমনি জাহান্নামের ঠাণ্ডাকেও তওহীদের দুর্গ ও (আল্লাহ্র) আনুগত্যের পরিখা ব্যতিরেকে প্রতিরোধ করা যায় না। আল্লাহ্ তা'আলার দান এই যে, তিনি

তোমাকে হেফাজতের পন্থা ও কৌশল সম্পর্কে অবহিত রেখেছেন এবং তার উপায়-উপকরণও সহজ করে দিয়েছেন। এই বিশ্বের বুকে আল্লাহ্‌র বিধানই হ'ল, তিনি শীত সৃষ্টি করেন, আবার তার জন্য আগুনও পয়দা করেন, আর চকমক পাথর ঠুকে আগুন বের করার তরীকাও বাৎলে দেন যাতে তুমি সেই পথে ফায়দা হাসিল কর এবং নিজেকে ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা করতে পার। লাকড়ি খরিদ করা, পশমী কাপড় সংগ্রহ করা যেমন আল্লাহ্‌র প্রয়োজন নয়, বরং মানুষেরই প্রয়োজন, ঠিক তেমনি মানুষের আনুগত্য ও 'ইবাদতেরও আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই। এটা তোমাদের কর্তব্য তার ওসীলায় নাজাত লাভ করা।

وَمَنْ اَحْسَنَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَاللّٰهُ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ .

"যে ভাল কাজ করল সে তার নিজের জন্যই করল, আর যে খারাপ কাজ করল তার বোঝা তার ওপরই পড়ল। আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টি জগত থেকে বেপরোয়া।"

ওহে নফ্‌স ! অজ্ঞতা ও মূর্খতার পর্দা ছিঁড়ে ফেল এবং পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর। مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ .

"তোমাদের সৃষ্টি, তোমাদের উত্থান একটি জীবনের মতই।"

كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ .

"যেমন আমি প্রথমবার পয়দা করেছিলাম, তেমনি আমি এর পুনরাবৃত্তি ঘটাই।" كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ "যেমন তিনি তোমাদেরকে প্রথমে পয়দা করেছিলেন– ঠিক তেমনি আবার তোমরা (তাঁর দরবারে) প্রত্যাবর্তন করবে।"[১]

ইহ্ইয়াউ'ল-'উলূমুদ্দীন-এর সমালোচনা

শায়খুল ইসলাম ইব্‌ন তায়মিয়া (র) সামগ্রিকভাবে ইহ্ইয়াউ'ল-'উলূম গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, كلامه فى الاحياء غالبه جيد ইহ্ইয়া গ্রন্থে তাঁর কালাম (বাণী) প্রধানত সুন্দর ও অর্থপূর্ণ।[২] তিনি চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে এই গ্রন্থের ওপর আলোচনা করেছেন। প্রথমত, দার্শনিকদের অনেক কথা-তওহীদ, নবূওত ও আখিরাত সম্পর্কে তাঁদের ধ্যান-ধারণা এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য

---

১. ইহইয়া' 'উলূমুদ্দীন, ৪র্থ খণ্ড, ৩৫৬–৩৫৮ পৃ.।

২. ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র)।

তাঁর মতে, ইমাম গাযালী (র) দার্শনিকদের প্রভাব থেকে কিছু না কিছু প্রভাবান্বিত হয়েছেন। তিনি যদিও তাঁদের বিরাট সমালোচক ও বিরোধী, কিন্তু তাঁর (গাযালীর) গ্রন্থগুলোতে তাদের ধ্যান-ধারণার (অজ্ঞাতসারে) ঝলক কোথাও কোথাও এসে গেছে। শায়খুল ইসলাম ইব্‌নে তায়মিয়া (র)-এর অনুভূতি দর্শনশাস্ত্র ও দার্শনিকদের সম্পর্কে যেহেতু খুবই তীক্ষ্ণ, তাই তাঁর মাপকাঠিতে ইমাম গাযালীর কতক জিনিস যদি দর্শনশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েই থাকে তবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। দ্বিতীয়ত, এতে এমন কতকগুলো কালাম সম্পর্কিত বাহাছ-মুবাহাছা রয়েছে যা ইব্‌ন তায়মিয়া (র)-এর নিকট আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ্‌র রূহ'-এর সঙ্গে পরিপূর্ণরূপে সামঞ্জস্যশীল ও সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং যা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মাপকাঠিতেও উৎরায় না। তৃতীয়ত, এর ভেতর তাসাওউফ-পন্থীদের কয়েকটি কঠোর ও বিভ্রান্তিপূর্ণ উক্তি রয়েছে। চতুর্থ, ইহ্‌'য়াউ'ল-'উলূমে বহু য'ঈফ (দুর্বল) হাদীছ রয়েছে। এতসব সত্ত্বেও শায়খুল ইসলাম লিখেছেন ঃ

وفيه مع ذالك من كلام المشائخ الصوفيه العارفين المستقيمين فى اعمال القلوب الموافق الكتاب والسنة ما هو اكثر مما يرد منه فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه .

এতদ্‌সত্ত্বেও 'ইহ্‌'য়া' গ্রন্থে সেই সব সূফী মাশাইখদের–যাঁরা ছিলেন 'ইলমে মা'রিফত ও দৃঢ় চিত্তের অধিকারী, কলবের আমল সম্পর্কে এমন বহু বাণী ও উক্তি রয়েছে যা কিতাব ও সুন্নাহ্‌র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ (موافق) এবং যার অধিকাংশই গ্রহণযোগ্য। এজন্যই 'উলামায়ে কিরাম এই গ্রন্থ সম্পর্কে কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করলেও সকলেই এর বিরোধী নন।[১]

'আল্লামা ইবনে জওযী (র) ও এর দুর্বল ও মওযূ' বর্ণনার[২] কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ইমাম গাযালী (র) হাদীছ সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী না হবার কারণেই এমনটি ঘটেছে।[৩] 'আলফিয়াহ' গ্রন্থের গ্রন্থকার হাফিজ যয়নুদ্দীন আল-'ইরাকী ইহ্‌'য়া'র অনুকূলে বিরাট খিদমত আনজাম দিয়েছেন। তিনি ইহ্‌'য়া'তে বর্ণিত হাদীছগুলো খুঁজে বের করেছেন এবং প্রতিটি রাবী (বর্ণনাকারী) ও হাদীছের শ্রেণী বিভাগ এবং তা কোন্ পর্যায় ও মর্যাদার হাদীছ তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

---

১. ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র), পৃ. ১৯৪ ও আত্তাজু'ল-মুকাল্লিল, নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, পৃ. ৩৮৮।
২. ঐ, ২য় খণ্ড, ১৯৪ পৃ.।
৩. আল-মুনতাজাম, ৯ম খণ্ড, ১৬৯-১৭০ পৃ.।

ইব্‌ন জওযী (র) ইমাম গাযালীর কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্য এড়িয়ে যাওয়া সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। এর দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, হাদীছের মতই ইতিহাস সম্পর্কে তেমন গভীর ব্যুৎপত্তি লাভের সুযোগ তিনি পান নি।[১]

তাঁর দ্বিতীয় আপত্তি এই বিষয়ের ওপর যে, কতক মানসিক ও আত্মিক ব্যাধির (লোক দেখানো 'ইবাদত, পদ মর্যাদার প্রতি মোহ ইত্যাদি) চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এবং আত্মবিলোপ (نفس كشى) ও আত্মসংশোধনের জন্য তিনি সূফীদের এমন কতকগুলো ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন যা অনুকরণযোগ্য নয়, এমন কি ফিক্'হ গ্রন্থ অনুযায়ী এগুলো জায়েয প্রমাণিত হওয়া কঠিন ব্যাপার।[২] এত সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তিনি ইহ্'য়াউ'ল-'উলূম-এর গুরুত্ব ও এর জনপ্রিয়তার স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং স্বয়ং মিনহাজু'ল-ক'াসিদীন' নামে এর একটি সংক্ষিপ্ত-সারও লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে তিনি আপত্তিকর বিষয়গুলো বাদ দিয়েছেন। কিন্তু এতে মূল গ্রন্থের প্রাণ ও প্রভাব খুব একটা অবশিষ্ট থাকে নি।

ইমাম গাযালী ও 'ইলমে কালাম

ইমাম গাযালী (র) যেই ইজতিহাদী মেধা শক্তির অধিকারী ছিলেন তাতে তাঁর জন্য খুবই কঠিন ছিল যে, তিনি কেবল তাঁর পূর্বসূর জ্ঞানী-গুণীদের আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের অনুকরণ করবেন, তাঁদের মুখপাত্র ও টীকাকার হিসাবে কাজ করবেন এবং কোথাও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটবে না। দুর্ভাগ্য যে, চতুর্থ শতাব্দীর 'ইলমে কালামের মাহফিলও স্থবির ও অন্ধ আনুগত্যের শিকারে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আশ'আরীপন্থী কালামশাস্ত্র গবেষণা ও বিশ্লেষণের ফলাফল এবং তাদের 'আকীদা প্রমাণ করবার জন্য ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী, 'আল্লামা আবু বকর বাকিল্লানী প্রমুখ যে সব মুকদ্দমা ও দলীল-প্রমাণাদি কায়েম করেছেন সেগুলো যেন হুবহু মেনে নেওয়া হয় এবং সেগুলো ভিন্ন অন্য কোন মুকদ্দমা ও দলীল-প্রমাণাদির সাহায্য যেন গ্রহণ না করা হয়। ইমাম গাযালী (র) স্বীয় রচনায় মুজতাহিদসুলভ ভঙ্গীতে ইসলামী উসূল ও 'আকাইদের ওপর আলোচনা করেছেন এবং তা প্রমাণ করবার জন্য এমন কতকগুলো নতুন মুকদ্দমা ও দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন যা তাঁর নিকট অধিকতর প্রভাবমণ্ডিত, কার্যকর, চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী ছিল। আল্লাহ্‌র গুণাবলী, নবুওত, মু'জিযা, শরীয়তের আরোপিত বিধানসমূহ, শাস্তি ও পূণ্য, বারযাখ ও কিয়ামত সম্পর্কে তিনি নবতর মুতাকাল্লিমসুলভ ভঙ্গীতে আলোচনা করেছেন এবং সে সব প্রমাণ

---

১. আল-মুনতাজাম, ৯ম খণ্ড, ১৬৯ পৃ.; ২. প্রাগুক্ত।

করবার জন্য তিনি অনেক মুতাকাল্লিমের ন্যায় সম্ভাবনা, সন্দেহ ও যৌক্তিক মুকদ্দমা ও ফলাফলের পরিবর্তে সাধারণের পক্ষে অধিক বোধগম্য ও তৃপ্তিদায়ক প্রমাণাদি সরবরাহ করেছেন। এই পর্যায়ে তিনি পূর্বসূরী মুতাকাল্লিমদের পেশকৃত দলীল-প্রমাণ, ভাষা, পরিভাষা ও তাদের বিন্যাসের হুবহু অনুসরণ করেন নি। এভাবে তিনি নবরূপে আশ'আরী 'ইলমে কালামের খিদমত আনজাম দেন যার জন্য আশ'আরীপন্থী মুতাকাল্লিমদের তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এবং তাঁর 'আজীমুশ্বান ধর্মীয় খিদমতের স্বীকৃতিও দেওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু কোথাও কোথাও তাঁর মতের সাথে ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী ও তাঁর নামকরা অনুসারীদের মতের কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় সেজন্য আশ'আরী চিন্তানুকারিগণ (যার সঙ্গে স্বয়ং ইমাম নিজেও সম্পর্কিত ছিলেন) তাঁর সেই 'ইলমে কালাম ও সেই সব মুকদ্দমা ও দলীলাদি সমর্থন করেন নি এবং সেটাকে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের মত ও পথ থেকে তাঁর বিচ্যুতি বলেই আখ্যায়িত করেছেন। ইহ্'য়াউ'ল-'উলূম রচনা ও তার অস্বাভাবিক প্রচার ও জনপ্রিয়তা লাভের পর এই মসআলার ব্যাপারে আশ'আরীপন্থী 'আলিমদের মধ্যে কানাঘুষা অনেক বেড়ে যায় এবং অনেক লোকেরই মনে ইমাম সাহেবের 'আকীদার ব্যাপারে নানা রকম সন্দেহ সৃষ্টি হতে থাকে। জনৈক নিষ্ঠাবান ভক্ত ইমাম সাহেবকে এ ব্যাপারে একটি চিঠি লেখেন এবং বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর নিজের মানসিক কষ্টের কথাও তুলে ধরেন। ইমাম সাহেব তাকে বিস্তারিত উত্তর দেন যা একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة (ইসলাম ও ইসলামবিরোধী মতবাদের মধ্যে পার্থক্যের বিধান) নামে বিদ্যমান। পুস্তিকার শুরুতে তিনি লিখেছেন ঃ

> স্নেহধন্য ভাই! হিংসুকদের একটি দল আমার কতক রচনার (দীনের অন্তর্নিহিত রহস্যসমূহ সম্পর্কিত) ব্যাপারে সমালোচনা করছে এবং তারা মনে করছে যে, এগুলো বোধ হয় ইসলামের প্রাচীন মনীষী ও কালামশাস্ত্রবিদদের স্বীকৃত মতের বিরোধী। তারা আরো মনে করছে যে, আশ'আরী 'আকীদা থেকে চুল পরিমাণ সরে আসাটাও বুঝি কুফরী! এতে যে তুমি কষ্ট পাচ্ছ এবং তোমার মধ্যে অন্তর্জালার সৃষ্টি হয়েছে সে ব্যাপারে আমি সম্যক অবহিত। কিন্তু প্রিয় ভাইটি আমার ! তোমার সবর করা উচিত। যেখানে রসূলুল্লাহ (সা) নিজে গালি-গালাজ ও নিন্দা-ভর্ৎসনা (مطاعن) থেকে বাঁচতে পারেন নি, সেখানে আমি আর কোন্ ছার ? যে ব্যক্তির ধারণা এই যে, আশ'আরী, মু'তাযিলা, হাম্বলী অথবা এই জাতীয় কোন ফির্কার বিরোধিতা করা পরিষ্কার কুফরী—তার সম্পর্কে তুমি জেনে নাও যে, সে একজন অন্ধ সমর্থক (মুকাল্লিদ) ছাড়া কিছু

নয়। তার সংস্কার ও সংশোধনে তুমি অনর্থক সময় নষ্ট করো না। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ধর্ম ও মযহাবের (কালামীদের) সাথে আশ'আরীদের মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। এখন যদি কেউ দাবি করে যে, বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি সকল বিষয়ে আশ'আরীদের অনুসরণ করা জরুরী এবং তাদের সামান্যতম বিরোধিতাও কুফরী, তবে তাকে জিজ্ঞেস কর, এটা কোথা থেকে প্রমাণিত হ'ল যে, সত্য শুধু আশ'আরীদের জন্যই নির্ধারিত এবং নাজাত শুধু তাদের অনুসরণের ওপরই নির্ভরশীল। যদি এমনটিই হয় তাহলে সম্ভবত তারা (ইমাম) বাকি 'ল্লানীকে কুফরীর ফতওয়া দেবে এজন্য যে, তিনি 'বাক 'া' গুণের ব্যাপারে আশ'আরীদের সঙ্গে মতভেদ করেছেন এবং তাঁর ধারণা যে, তা (অর্থাৎ 'বাক 'া' গুণ) আল্লাহ্‌র ঐশী সত্তার অতিরিক্ত কোন গুণ নয়। এরপরও প্রশ্ন থাকে, বাকি 'ল্লানীই কেন আশ'আরীর বিরোধিতা করবার জন্য কাফির হবেন আর বাকি 'ল্লানীর সঙ্গে মতবিরোধের জন্য আশ'আরী কাফির হবেন না? তাদের ভেতর কেবল একজনের ক্ষেত্রে কেন সত্য সীমাবদ্ধ থাকবে? যদি বলা হয় যে, আশ'আরী অগ্রবর্তী, তাহলে আশ'আরীর তুলনায় মু'তাযিলাপন্থীরা যে আরও অগ্রবর্তী ! তবে কি মু'তাযিলাদেরকেই সত্যপন্থী হিসাবে স্বীকার করে নিতে হবে ? যদি বাকি 'ল্লানীর ইমাম আশ'আরীর সঙ্গে মতভেদ করার অনুমতি থাকে তাহলে বাকি 'ল্লানীর পরবর্তীতে যারা এসেছেন তাঁরা কেন এই অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবেন এবং এক্ষেত্রে কোন একজনকেই কেন নির্দিষ্ট করা হবে ?[১]

'ইলমে কালামের ওপর মুজতাহিদসুলভ আলোচনা এবং এতে অনেক পরিবর্ধনের পর ইমাম গাযালী (র) স্বীয় সত্যপ্রিয়তা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'ইলমে কালামের ফায়দা খুবই সীমাবদ্ধ এবং কোন কোন মুহূর্তে এর ক্ষতি উপকারিতার চাইতেও বেশী। অধিকন্তু এটা এমন একটা ওষুধ– সুস্থ মন-মস্তিষ্ক ও শান্ত স্বভাববিশিষ্ট লোকের যার কোন প্রয়োজন নেই। অপরদিকে যে বস্তু থেকে কোন মানুষই বেপরোয়া থাকতে পারে না তা হ'ল কুরআন মজীদ ও তার প্রমাণ-পদ্ধতি। এ থেকে সবাই নিজ নিজ অংশ লাভ করে এবং কেউই এ থেকে বঞ্চিত হয় না। ইমাম গাযালীর ভাষায় ঃ

فادلة القران مثل الغذاء وينتفع به كل انسان وادلة المتكلمين مثل الدواء وينتفع به احاد الناس ويستضر به الاكثرون بل ادلة القران كالماء الذى ينتفع به الصبى الرضيع والرجل القوى وسائر الادلة كالاطعمة التى ينتفع بها الاقوايا ءمرة ويمرضون بها اخرى ولا ينتفع بها الصبيان اصلا .

---

১. فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة

কুরআনী প্রমাণ-পঞ্জী খাদ্যের ন্যায় ; মানুষ এ থেকে ফায়দা লাভ করে। আর মুতাকাল্লিমদের প্রমাণ-পঞ্জী ঔষধের ন্যায় ; এর দ্বারা কেউ কেউ উপকার পায় বটে, তবে অধিকাংশ মানুষই এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বরং বলা চলে, কুরআনী দলীল-প্রমাণের দৃষ্টান্ত পানির মত। দুধের শিশু থেকে শুরু করে শক্তিশালী লোকটি পর্যন্ত সবাই এ থেকে সমভাবে উপকৃত হয়। আর বাদ বাকী দলীল-প্রমাণ (কালামশাস্ত্রবিদদের) বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের ন্যায় যদ্দ্বারা কখনও শক্তিশালী মানুষ উপকার পায় ও কখনও অপকার এবং বাচ্চাদের তা আদৌ কোন কাজেই আসে না।[১]

'ইলমে কালাম দ্বারা যে ক্ষতি হয় তার উল্লেখ করে তিনি বলেন ঃ

والدليل على تضرر الخلق به المشاهدة والعيان والتجربة وما ثار من الشر منذ نبغ المتكلمون وفشت صناعة الكلام مع سلامة العصر الاول من الصحابة عن مثل ذالك .

'ইলমে কালামের মাধ্যমে লোকের যে ক্ষতি হয় তার প্রমাণ স্বয়ং তার পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক জানেন যে, যখন থেকে মুতাকাল্লিমের জন্ম হয়েছে এবং 'ইলমে কালামের চর্চা শুরু হয়েছে তখন থেকেই যেন চিন্তা জগতে সব মুসিবত এসে নাযিল হয়েছে এবং মন্দের বিস্তার ঘটেছে। সাহাবীদের যুগ এই মন্দ থেকে মুক্ত ছিল।[২]

অধ্যাপনার জন্য পুনরায় অনুরোধ এবং ইমাম গাযালী কর্তৃক অক্ষমতা জ্ঞাপন

৪৯৯ হি. যু'ল-ক'া'দাহ মাসে ইমাম গাযালী (র) নিশাপুরের নিজামিয়া মাদ্‌রাসায় পুনরায় অধ্যাপনা শুরু করেন। এটা ছিল সঞ্জর সালজুকীর (মালিক শাহ্‌র পুত্র) রাজত্বকাল ও ফখরু'ল-মুল্‌ক (নিজামু'ল্‌-মুল্‌কের পুত্র)-এর প্রধান মন্ত্রিত্বের যুগ। ফখরু'ল-মুল্‌ক ৫০০ হিজরীতে একজন বাতেনী কর্তৃক শাহাদত বরণ করেন। তাঁর ওফাতের অল্পদিন পরেই ইমাম নিজামিয়া মাদরাসার অধ্যাপনা থেকে সরে আসেন এবং স্বীয় বাসভবন তূসে বসবাস করতে থাকেন। তিনি তাঁর বাসভবন সংলগ্ন স্থানে একটি মাদরাসা ও একটি খানকাহ্‌র ভিত্তি রাখেন এবং সেখানেই তা'লীম ও তরবিয়তে আত্মনিয়োগ করেন।

৫০০ হিজরীতে সুলতান মুহাম্মদ ইবন মালিক শাহ নিজামু'ল-মুল্‌ক-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র আহমদকে উযীরে আ'জম নিযুক্ত করলে তিনি ইমাম সাহেবকে পুনরায় বাগ্‌দাদে ডেকে আনতে মনস্থ করেন। কেননা শূন্য পদ পূরণ করা হলেও

১. ইলযামু'ল-'আওয়াম 'আন 'ইলমি'ল-কালাম, ২০ পৃ.।
২. প্রাগুক্ত।

প্রকৃতপক্ষে নিজামিয়া মাদরাসায় ইমাম গাযালীর পদটি শূন্যই ছিল। কেননা ইমামের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন এমন লোক তৎকালীন মুসলিম জাহানে বলতে গেলে কেউ ছিলেনই না। মাদরাসা নিজামিয়া ছিল 'আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সৌন্দর্য এবং বাগদাদের সম্ভ্রম ও মর্যাদার প্রতীক। ইমামের শূন্যতাজনিত ক্ষতির অনুভূতি সকলেরই ছিল। খলীফার দরবারেও প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে, ইমাম গাযালী (র)-কে মাদরাসা নিজামিয়ায় পুনরায় ফিরিয়ে আনা হোক। উযীরে আ'জম ক'াওয়ামুদ্দীন নিজামু'ল-মুল্ক স্বয়ং পত্র লিখেন এবং তাতে দরবারে খিলাফতের সমস্ত সদস্যের দস্তখত ছিল। তাতে বলা হয়েছিল, "খিলাফতের ও সালতানাতের সদস্য ও অমাত্যবর্গ সকলেই ইমাম সাহেবের শুভ পদার্পণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।" আহমদ ইব্ন নিজামু'ল-মুল্ক স্বয়ং ইমাম সাহেবকে যে চিঠি লিখে ছিলেন তার মোদ্দা কথা ছিল ঃ

যদিও আপনি যেখানেই তশ্রীফ রাখবেন সেই স্থানই সাধারণের শিক্ষাগারে পরিণত হবে, কিন্তু আপনি যেরূপ 'মুক'তাদায়ে 'আওয়াম' তাতে আপনার অবস্থানস্থল সেই শহরই হওয়া উচিত যা ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্র ও কিবলাগাহ এবং যেখানে গোটা বিশ্বের প্রতিটি অংশের লোক খুব সহজে পৌছুতে পারে। আর এমন জায়গা হচ্ছে শুধু দারু'স-সালাম বাগদাদ।

ইমাম সাহেব ঐসব চিঠি-পত্র ও সরকারী ফরমানের জবাবে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন এবং বাগদাদে না আসবার পক্ষে অনেকগুলো ওযর পেশ করেন। সেগুলোর একটি হ'ল ঃ

এখানে (তূস নগরীতে) দেড় শ' কার্যক্ষম ছাত্র 'ইল্ম হাসিলে মগ্ন। তাদের পক্ষে বাগদাদ যাওয়া কঠিন। দ্বিতীয়ত, আমি যখন প্রথমে বাগদাদে ছিলাম তখন আমার পরিবার-পরিজন বলতে কেউ ছিল না। এখন আমার ছেলেমেয়ের কোলাহল-কোন্দল লেগেই আছে। তাদের পক্ষে দেশ ত্যাগের ধকল সহ্য করা কঠিন। তৃতীয়ত, আমি মকামে খলীল-এ প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমি আর কখনও তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা-সমালোচনায় যাব না, আর বাগদাদে আলোচনা-সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্কে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। এছাড়াও আমাকে খলীফার দরবারে সালাম দিতে হাযির হতে হবে। আর এ আমি সহ্য করতে পারব না। সব থেকে বড় কথা হ'ল, আমি কোন প্রকার বেতন কিংবা ভাতা গ্রহণ করতেও পারব না, অথচ বাগদাদে আমার খোরপোষ চলার মত স্থাবর-অস্থাবর কোন সম্পত্তিই নেই।

মোট কথা, খিলাফত ও সালতানাতের পক্ষ থেকে বহু আহ্বান-অনুরোধ

আসে, কিন্তু ইমাম সাহেব পরিষ্কার ভাষায় তা অস্বীকার করেন এবং নিরাপদ ও নিরিবিলি স্থান পরিত্যাগ করতে অসম্মতি জানান।[১]

বাকী জীবন ও মৃত্যু

ইমাম গাযালী (র) বাকী জীবন জ্ঞান ও ধর্ম সাধনায় কাটিয়ে দেন। তাঁর ভেতর তখনও ছাত্রসুলভ অনুপ্রেরণা বাকী ছিল। তিনি প্রথম জীবনে হাদীছের দিকে তেমন মনোনিবেশ করতে পারেন নি, যেমনটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও কতক ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে পেরেছিলেন। শেষ যুগে তিনি তাঁর এই ঘাটতি পূরণের দিকেই মনোনিবেশ করেন। তিনি হাফিজ ওমর ইব্‌ন আবি'ল-হাসান আর– রিওয়াসী নামক জনৈক মশহুর মুহাদ্দিছকে নিজের কাছে মেহমান হিসাবে রেখে তাঁর নিকটই সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম শরীফের দরস নেন এবং সনদ হাসিল করেন। মোট কথা, তাঁর শেষ জীবনটি হাদীছের গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণার ভেতরই কাটে। ইব্‌ন 'আসাকির বলেন ঃ

وكانت خاتمة امره اقباله على حديث المصطفى صـ ومجالسة اهله ومطالعة الصحيحين البخارى ومسلم الذين هما حجة الاسلام .

তাঁর জীবনের শেষ কর্ম ছিল এই যে, তিনি হাদীছে নববী (সা)-এর দিকে পরিপূর্ণরূপে মনোনিবেশ করেন, হাদীছশাস্ত্রের ইমামদের সান্নিধ্য অবলম্বন করেন এবং হাদীছের দু'টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম অধ্যয়ন করেন যা ইসলামের দলীলরূপে গৃহীত।[২]

ইন্তিকালের এক বছর পূর্বে ৫০৪ হিজরীতে তিনি 'আল-মুস্তাসফা' নামক একটি গ্রন্থ লেখেন, যাকে উসূলে ফিক্‌হ-এর তিনটি রুক্‌ন-এর অন্যতম মনে করা হয়।[৩] এই গ্রন্থের প্রতি 'উলামায়ে কিরামের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। এটিই ছিল তাঁর শেষ গ্রন্থ।

ইমাম গাযালী (র) তাহিরান নামক স্থানে ১৪ই জমাদিউ'ল-উখরা, ৫০৫ হিজরীতে ৫৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। ইব্‌নে জওযী (র) তাঁর ইনতিকালের ঘটনা তাঁরই ভাই আহমদ গাযালীর বরাতে

---

১. আল-গাযালী, ২১ পৃ.।

২. তাবঈন কিয'বু'ল-মুফতারা-২৯৬ পৃ.।

৩. এই তিনটি কিতাব যাকে উসুলে ফিক'হ-এর 'তিনটি স্তম্ভ' মনে করা হয়, তা হচ্ছে আবুল হুসায়ন বসরীর আল-মু'তামিদ, ইমামু'ল-হ'রামায়ন-এর-'আল-বুরহান' ও ইমাম গাযালীর 'আল-মুস্তাস'ফা'।

এভাবে বর্ণনা করেছেন :

সোমবার দিন তিনি ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠেন। ওযু করে সালাত আদায় করেন। এরপর কাফনের কাপড় চেয়ে পাঠান এবং তা চোখের সঙ্গে ঠেকিয়ে বলেন, "প্রভুর নির্দেশ অবনত মস্তকে মেনে নিচ্ছি।" এই বলে দু'পা ছড়িয়ে দেন। এর পর লোকেরা দেখতে পেল, তাঁর প্রাণ-পাখী দেহ পিঞ্জর ছেড়ে দূর নীলাকাশের পথে পাড়ি জমিয়েছে।[১]

ইমাম গাযালী (র)-এর দু'টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য

ইমাম গাযালী (র)-এর দু'টি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আর তা হচ্ছে ইখলাস (নিষ্ঠা) ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তাঁর ইখলাসের স্বীকৃতি শত্রু-মিত্র সবাই দিয়েছে এবং তাঁর রচনার প্রতিটি শব্দ থেকেই উদ্ভাসিত হয়েছে। শায়খু'ল-ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র), যদিও তাঁর অন্যতম সমালোচক এবং বহু বিষয়ে তাঁর সাথে দ্বি-মত পোষণ করেন, তাঁকে একজন মহান মুখলিস (নিষ্ঠাবান) হিসাবে গণ্য করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাদি জনপ্রিয় হবার মূল কারণও ছিল এই ইখলাস। এই ইখলাসই তাঁকে জ্ঞান জগতের শাহী মসনদ পরিত্যাগ, বছরের পর বছর মরু-ময়দান ও উন্মুক্ত বিয়াবান অতিক্রম, শাহী দরবারের উপর্যুপরি আহ্বান ও ঐকান্তিক অনুরোধ এবং সে যুগের সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা উপেক্ষা করার শক্তি যোগায় এবং পরমুখাপেক্ষীহীন করে রাখে। তিনি এক স্থানে লিখেছেন, "সিদ্দীকদের অন্তর থেকে সর্বশেষ যে জিনিসটি বের হয় তা হচ্ছে জাঁকজমক ও পদমর্যাদা-প্রীতি।" তাঁর শেষ জীবন সাক্ষ্য দেয়, তিনি নিশ্চিতভাবেই এই মকামে পৌঁছুতে পেরেছিলেন।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর জীবনের বিশেষ প্রতীক। তিনি ইল্‌ম ও 'আমলের গণ্ডীর মধ্যে স্বীয় যুগের মান এবং আপন সমসাময়িকদের কোন মার্গেই সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকেন নি। তিনি 'ইল্‌ম ও 'আমলের যেই উন্নত মার্গেই পৌঁছেছেন সেখানেই তাঁর কানে যেন এ আওয়াজ এসে গুঞ্জরিত হয়েছে, مسافر! یہ تیرا نشیمن نہیں "মুসাফির ! এ তোমরা বাসা (শেষ লক্ষ্যস্থল) নয়।"

বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তিনি স্বীয় যুগের ও আপন সমসাময়িকদের চাইতে অনেক উন্নতমানের ছিলেন। ফিক্'হ ও উসূলে ফিক্'হ-এর ক্ষেত্রে তিনি যা রচনা করেছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দীর ধরে 'উলামায়ে কিরাম তারই টীকা ও ভাষ্য রচনায় মশগুল ছিলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় যুগের প্রথা, রীতি ও ধর্ম জ্ঞানে

---

১. ইতহাফ আস-সাদাতু'ল-মুত্তাক'ীন–ইহ'য়াউ'ল-উলূম-এর শরাহ, ১১-১২ পৃ.।

সুপণ্ডিতদের নিয়মের বাইরে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের দিকেও মনোনিবেশ করেন এবং যুক্তিশাস্ত্র তথা দর্শন এমনভাবে অধ্যয়ন করেন, যা ছিল কাযী আবূ বকর ইবনু'ল-'আরাবীর মতে দর্শনের মর্মমূল ও দার্শনিকদের জন্য বিস্ময়। অতঃপর তিনি সে সবের আলোচনা ও প্রত্যাখ্যানে এমন সব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যদ্দারা শতাব্দীকাল পর্যন্ত জ্ঞান জগত প্রকম্পিত থাকে।

'আমলের ক্ষেত্রে বলা যায়, তিনি মেধা, জ্ঞান, চরিত্রগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পরিপূর্ণতার কোন একটি দিকও উপেক্ষা করেন নি। জ্ঞানের ক্ষেত্রে গভীরতা, ব্যাপকতা ও কামালিয়াত (পরিপূর্ণতা) লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সে যুগের একজন মুখলিস ও দৃষ্টিমান শায়খ-ই-তরীকত শায়খ আবূ 'আলী ফারমাদীর (মৃ. ৪৭৭ হি.) হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং 'ইলমে তাসাওউফও হাসিল করেন। এ পথে তিনি তাঁর সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে ঈপ্সিত লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছেন এবং পরম সন্তোষ ও তৃপ্তি লাভ করেন।

সংস্কার ও বিপ্লব (ইসলাহ্ ও ইনকিলাব)-এর ক্ষেত্রে তিনি কেবল গ্রন্থ রচনা ও পুস্তক প্রণয়নের মধ্যেই নিজের প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, বরং একটি নবতর ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। মাওলানা শিবলী লিখেন ঃ

> ইমাম-সাহেবের মনে সান্ত্বনা ছিল না। তিনি দেখেছিলেন, বর্তমান সাম্রাজ্যগুলোর গোড়াতেই গলদ রয়ে গেছে এবং এর মূল বিকৃত হয়ে গেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসলামের মূলনীতি মাফিক একটি নতুন সাম্রাজ্যের পত্তন করা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আসল লক্ষ্য হাসিল হবে না। কিন্তু রিয়াযত, মুজাহাদা ও মুরাকাবার কারণে তাঁর এতটা ফুরসত ও অবসর ছিল না যে, তিনি এই বিরাট কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ঘটনাক্রমে ইহ্'য়াউ'ল-'উলূম প্রকাশিত হওয়ার পর ৫০১ হিজরীতে তা স্পেনে পৌঁছুতেই স্পেনের বাদশাহ্ 'আলী ইবন ইউসুফ ইবন তাশফীন ঈর্ষাকাতর ও সংকীর্ণ মানসিকতার বশবর্তী হয়ে উক্ত গ্রন্থটি জ্বালিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন।[১] অত্যন্ত নির্মম ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এ আদেশ পালিত হয়। ইমাম সাহেব ব্যাপারটি জানতে পেরে খুবই মর্মাহত হন। সে সময়ই স্পেন থেকে মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ তূমার্ত নামক এক যুবক ইমাম সাহেবের খিদমতে 'ইল্‌ম হাসিলের জন্য আসেন। তিনি ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। তাঁর পিতা-পিতামহসহ সকল পূর্বপুরুষই স্বাধীনতা-প্রিয় ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ছিলেন। ইমাম সাহেবের খিদমতে

১. শরাহ ইহ্'য়াউ'ল-উলূম।

থেকে তিনি সর্বজ্ঞানে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন এবং স্বীয় ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খার কারণেই হোক কিংবা ইমাম সাহেবের সাহচর্যে থাকার বদৌলতেই হোক, স্পেনে 'আলী ইবন ইউসুফ ইবন তাশফীনের রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে একটি নতুন সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের সংকল্প গ্রহণ করেন। ইমাম সাহেবের সামনে তিনি এর পরিকল্পনা পেশ করেন। ইমাম সাহেব নিজেই একটি ন্যায় ও সুবিচারমূলক সাম্রাজ্যের অভিলাষী ছিলেন বিধায় এ পরিকল্পনা তিনি অনুমোদন করেন। কিন্তু প্রথমেই তিনি জানতে চান, এ ধরনের বিরাট দায়িত্ব আঞ্জাম দেবার মত উপকরণ তার আছে কিনা। মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ[1] ইমাম সাহেবকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করলে পর তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে তার পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। 'আল্লামা ইব্‌নে খলদুন এ ঘটনা সম্পর্কেই লিখেছেন ঃ

وبقى فيما زعموا ابا حامد الغزالى وفاوضه بذات صدره فاراده عليه لما كان فيه الاسلام يومئذ باقطار الارض من اختلال الدولة وتفويض اركان السلطان الجامع للامة المقيم للملة بعد ان سأله عمن له من العصابة

১. মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ এক বিরাট সাম্রাজ্য কায়েম করেন এবং ইমাম গাযালী (র) যে নীতি ও আদর্শ চাইতেন তিনি ঠিক তাই প্রতিষ্ঠিত করেন। আমরা তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইব্‌নু'স-সুবকীর 'ত'াবাক'াতু'শ–শাফি'ইয়্যা' থেকে উদ্ধৃত করছি, "মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ দূর পাশ্চাত্যের (মরক্কোর) অধিবাসী ছিলেন। প্রথমে নিজ জন্মভূমিতেই লালিত-পালিত ও বর্ধিত হন। অতঃপর প্রাচ্য ভূ-খণ্ড সফর করেন এবং ফিক্'হ ও 'ইলমে কালাম শিক্ষা করেন। তিনি খুবই পরহেযগার, 'আবেদ ও অল্পে তুষ্ট ছিলেন। অধ্যয়নের কাজ সমাপ্তির পর তিনি সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধের ক্ষেত্রে কোমর বেঁধে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রথমে মিসরে গিয়ে জনসাধারণকে বিভিন্ন অন্যায় ও গর্হিত কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টিত হন। এতে লোকজন তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং তাঁকে শহর থেকে বের করে দেয়। তিনি মিসর থেকে আলেকজান্দ্রিয়া যান এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর পশ্চিমে আফ্রিকার দিকে রওয়ানা হন। ৫০৫ হিজরীতে তিনি মাহদিয়া পৌঁছে স্বীয় মিশনে পুনরায় মগ্ন হয়ে পড়েন।

তিনি সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে বিজায়া ও বিজায়া থেকে মরক্কো যান। সেখানেও তিনি অত্যন্ত নির্ভীকভাবে আমরু বি'ল-মা'রূফ-এর খিদমত আনুজাম দেন, এমন কি খোদ শাহী খান্দানের সঙ্গেও এ ব্যাপারে তিনি মুখোমুখি হন। তখনকার বাদশাহ 'আলী ইবন ইউসুফ তাশফীন তাঁকে দরবার ডেকে পাঠান। দরবারের 'আলিমগণ তাঁকে বলেন, "এমন একজন ন্যায়-বিচারক ও ইনসাফকারী বাদশাহ্‌র হুকুমতের প্রতি আপনার অসন্তোষের কারণ কি?" মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দুল্লাহ অত্যন্ত জোশের সঙ্গে বলেন, "আপনারা কি অস্বীকার করতে পারেন, এ শহরের প্রকাশ্যে মদের ক্রয়-বিক্রয় হয় না? য়াতীমের সম্পদ কি জোরপূর্বক ও অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয় না?" তাঁর এই আবেগময় বক্তৃতায় উপস্থিত সকলে, এমন কি বাদশাহ্‌ও প্রভাবিত হন। তাঁর চোখেও অশ্রু দেখা দেয়। মুহাম্মাদ মরক্কো থেকে বেরিয়ে আগিম্মাতে যান এবং ক্রমান্বয়ে একটি বিরাট দল তাঁকে অনুসরণ করে। অতঃপর তায়মাল নামক স্থানে যান এবং মুসামিদা কবিলার সহযোগিতায় একটি নতুন সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা চালান ও তাতে সফলকাম হন।

والقبائل التى يكون بها الاعتزاز والمنعة .

লোকের ধারণা যে, তিনি (মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ তূমার্ত) ইমাম আবূ হামেদ আল-গাযালীর সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁর সঙ্গে স্বীয় অন্তরের অভিপ্রায় সম্পর্কে আলোচনা করেন। ইমাম সাহেব তাঁর সে অভিপ্রায় সমর্থন করেন। কেননা সে যুগে ইসলাম সারা বিশ্বে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে চলেছিল এবং এমন কোন সুলতান বর্তমান ছিলেন না যিনি গোটা মুসলিম উম্মাহ্‌কে একত্র করতে পারেন এবং দীন ও ইসলাম কায়েম রাখতে পারেন। কিন্তু প্রথমেই ইমাম সাহেব জানতে চান, তার কাছে এতটা সাজ-সরঞ্জাম ও জনশক্তি আছে কিনা যদ্দ্বারা প্রভাব-প্রতিপত্তি ও নিরাপত্তা লাভ করা যায়।

মোট কথা, মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ সৎ কাজে আদেশের প্রতীক হিসাবে একটি নতুন সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন যা দীর্ঘদিন কায়েম ছিল। এই শাসকদের 'মুওয়াহ্‌হিদীন' নামে অভিহিত করা হ'ত। 'আলী ইবন ইউসুফ-এর রাজ্যে শক্তি প্রয়োগ, সীমা লংঘন ও বাড়াবাড়ি খুবই বিস্তার লাভ করেছিল। ফৌজের সদস্যরা প্রকাশ্যে জনসাধারণের বাড়ী-ঘরে ঢুকে পড়ত এবং সতী-সাধ্বী রমণীদের সম্ভ্রম নষ্ট করত। 'আলী ইবন ইউসুফ-এর খান্দানে অনেক কাল ধরে এই উল্টো নিয়ম চলে আসছিল যে, পুরুষেরাই মুখে ওপর নেকাব পরত এবং মহিলারা মুখ খোলা অবস্থায়ই চলাফেরা করত। এসব লোককে 'মিলছামীন' (ملثمين) বলা হ'ত। মুহাম্মাদ ইব্‌ন তূমার্ত প্রথমে এ দু'টি বিদ'আত উচ্ছেদের জন্য বিরাট আন্দোলন শুরু করেন। এরই ফলশ্রুতিতে "মিলছামীন"-এর হুকুমত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় এক নতুন সাম্রাজ্য। মুহাম্মাদ ইবন তূমার্ত স্বয়ং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। তাই তিনি 'আবদুল মু'মিন নামক একজন যোগ্য লোককে সিংহাসনে বসান।

'আবদুল মু'মিন ও তাঁর খান্দান যে পদ্ধতি ও যেই কাঠামোতে রাজ্য শাসন করেন তা হুবহু সেই মূলনীতি মাফিক ছিল যা ইমাম গাযালী (র) চেয়েছিলেন। ইব্‌নে খলদুন তাঁর "আখবারে বারবার" নামক গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে 'আবদুল মু'মিন ও তাঁর সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে লিখেছেন :

তাঁর হুকুমতে 'আলিম-'উলামাকে সম্মান করা হ'ত, যাবতীয় ঘটনা ও পারস্পরিক ব্যাপারে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা হ'ত। ফরিয়াদীর ফরিয়াদ শোনা হ'ত। যদি কোন সরকারী কর্মচারী কোন প্রজার ওপর কখনো জুলুম করত তাহলে তাকে কঠিন সাজা দেওয়া হ'ত। অত্যাচারী জালিমের হাত যেন

ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। শাহী চত্বরেই মসজিদ নির্মাণ করা হয়। সকল য়ুরোপীয় সীমান্ত, যেখানে আক্রমণের আশংকা ছিল, সামরিক শক্তি দ্বারা মযবুত করা হয়। ক্রমেই যুদ্ধ এবং উপর্যুপরি বিজয়ের দিগন্ত প্রসারিত হতে থাকে।[১]

মুসলিম বিশ্বে ইমাম গাযালী (র)-এর প্রভাব

মুসলিম বিশ্বের ওপর তাঁর জ্ঞানগত ও 'আমলী কামালিয়াত এবং তাঁর শক্তিশালী ও সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের গভীর প্রভাব পড়ে। তাঁর যুগোত্তীর্ণ রচনাবলী ও আলোচনাসমূহ পণ্ডিত মহলে মানসিক বিপ্লব ও স্বাধীন চিন্তাধারার সৃষ্টি করে। ইসলামের যে কতিপয় ব্যক্তিত্ব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম বিশ্বের দিল্ ও দিমাগ (মন ও মস্তিষ্ক) এবং জ্ঞান ও চিন্তার জগতকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ইমাম গাযালী (র) তাঁদের অন্যতম। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব, জ্ঞানের উচ্চমান, রচনাবলীর গুরুত্ব শত্রুমিত্র সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। শত ইনকিলাবের পরও তাঁর 'নাম ও কাম' আজও জীবিত। তাঁর রচনাবলীর একটি বিরাট অংশ আজও জনপ্রিয়। পাঠকের মনকে এখনও তা নাড়া দেয়, প্রভাবিত করে।

সাধারণ দা'ওয়াত ও উপদেশ প্রদানের আবশ্যকতা এবং সাধারণ সংস্কার ও বাগদাদের দা'ঈ

ইমাম গাযালী (র)-এর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর জ্ঞানগত ও সংস্কারমূলক কার্যাবলীর প্রভাব নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এতদ্‌সত্ত্বেও সাধারণ দা'ওয়াত ও উপদেশ প্রদানের আবশ্যকতা বাকি ছিল। কেননা বিরাট সংখ্যক মুসলমান তখন জ্ঞানগত সন্দেহ, চারিত্রিক দুর্বলতা, 'আমলের ক্ষেত্রে উদাসীনতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও মূর্খতার শিকারে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সত্বর এর প্রতিকারের প্রয়োজন ছিল। এজন্য তাৎক্ষণিকভাবে এমন একজন যাদুকরী বক্তৃতা শক্তির অধিকারী খতীব (বক্তা, ধর্মোপদেশ প্রদানকারী) ও বুলন্দ রূহ'ানী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল, গণমানুষের সঙ্গে যাঁর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং যিনি স্বীয় দা'ওয়াত, ওয়া'জ-নসীহত, আত্মার পরিশুদ্ধি ও সংস্কার-সংশোধন (তাযকিয়া ও ইসলাহ) দ্বারা গোটা মুসলিম জনজীবনে ধর্মীয় রূহ' ও নতুন ঈমানী যিন্দেগী পয়দা করতে সক্ষম। স্বেচ্ছাচারী সরকারগুলো চার শ' বছর পর্যন্ত মুসলমানদের নৈতিক চরিত্র কলুষিত করে

১. আল-গাযালী, ১১৬–১৭ পৃ.।

ফেলেছিল এবং তাদের মধ্যে এমন একটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল যাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই ছিল সম্পদ, সম্মান ও পদমর্যাদা লাভ। 'আকীদার দিক দিয়ে যদিও তারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের অস্বীকারকারী ছিল না, কিন্তু কার্যত ছিল আল্লাহবিস্মৃত, পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে গাফিল এবং আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতায় মত্ত। অনারব তাহযীব-তমদ্দুন তখনকার মুসলিম সমাজ জীবনকে আচ্ছাদিত করে ফেলেছিল এবং অনারব আচার-অনুষ্ঠান ও জাহিলী রসম-রেওয়াজ মুসলিম জীবনের অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। বিজয়ী জাতি হিসাবে মুসলমানদের জীবন মান খুবই সমুন্নত হয়ে গিয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী আমীর-উমারাদের পদাংক অনুসরণ করে চলেছিল এবং জনসাধারণ ও শ্রমজীবী মানুষ মধ্যবিত্তের শ্রেণী-চরিত্র ও আচার-অভ্যাস দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিল। জীবিকার উপায়-উপকরণ যাদের হাতে ছিল তারা তা অন্যায় পথে খরচ করে আমোদ-ফুর্তিতে মত্ত ছিল। আমীরানা ঠাট থেকে যারা বঞ্চিত ছিল, তারা দারুন মনঃকষ্টে ভুগছিল এবং নিজেদের চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও ভাগ্যহীন ভাবছিল। সম্পদশালী লোকের থেকে আত্মত্যাগ, সহানুভূতিবোধ, সংবেদনশীলতা ও কৃতজ্ঞতাবোধের প্রেরণা দূরে সরে গিয়েছিল। দুর্দশাগ্রস্ত ও মেহনতী মানুষ ধৈর্য, আত্মতুষ্টি, য়াকীন ও আত্মবিশ্বাস থেকে বঞ্চিত হতে চলেছিল। এভাবে তাদের জীবন ছিল গভীর সঙ্কটে নিপতিত। সে মুহূর্তে অবশ্যই এমন একটি দা'ওয়াতের প্রয়োজন ছিল যা পার্থিব কামনা-বাসনার সংকট কমিয়ে দেবে, ঈমানকে পুনরুজ্জীবিত করবে, আখিরাতের প্রতি মানুষের বিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে, আল্লাহ্‌কে পাবার জন্য তাদের ভেতর আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করবে, আল্লাহ তা'আলার সতিকার পরিচয় (মা'রিফত), তাঁর বন্দেগী ও রিযামন্দীর ক্ষেত্রে উন্নত মনোবল ও দৃঢ় হিম্মতের সঙ্গে কাজ করার অনুপ্রেরণা যোগাবে, পরিপূর্ণ তওহীদ (তওহীদ-ই কামিল)-কে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করবে এবং দুনিয়াদার ও বিত্ত-সম্পদের অধিকারী লোকদের গুরুত্বহীনতা ও পার্থিব উপায়-উপকরণের অসারতাকে খোলাখুলিভাবে সর্বসমক্ষে তুলে ধরবে।

একজন দা'ঈ-র জ্ঞানগত যোগ্যতা

হিজরী পঞ্চম শতাব্দী ইসলামের ইতিহাসে জ্ঞন-বিজ্ঞান ও বিভিন্ন শাস্ত্রের উন্নতির ক্ষেত্রে একটি স্বর্ণ যুগ। এ যুগে ধর্মীয়, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে। এ শতাব্দীরই শেষভাগে 'আল্লামা আবূ ইসহাক শীরাযী (মৃ. ৪৭২ হি.) ও ইমাম গাযালী (মৃ. ৫০৫ হি.)-এর মত প্রতিভাধর বিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, আবুল ওয়াফা ইব্‌নে 'আকীল (মৃ. ৫১০

হি.)-এর ন্যায় ফকীহ ও মুহাক্কিক 'আলিম, 'আবদুল কাহির জুরজানী (মৃ. ৪৭১ হি.)-এর মত মুজতাহিদ, আবূ যাকারিয়া তাবরীযী (মৃ. ৫০২ হি.)-এর মত আভিধানিক ও বৈয়াকরণ, আবুল কাসিম হারীরী (৫১৬ হি.)-এর মত নবতর স্টাইলের লেখকের আবির্ভাব হয় যাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের মন-মেযাজ ও রুচির ওপর রাজত্ব করেছেন। প্রতিভাপূর্ণ এই যুগে বাগদাদের মত শস্য-শ্যামল উর্বর ভূমিখণ্ডে মর্যাদাপূর্ণ ধর্মীয় খিদমতের জন্য এবং মানুষের মন-মানসিকতা ও প্রকৃতির মোড় পরিবর্তনের জন্য উন্নত মানের জ্ঞানগত যোগ্যতা ও সামগ্রিক ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতার অধিকারী এমন এক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল, যিনি সে যুগের প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানেও অভিজ্ঞ ও পারদর্শী হবেন এবং যাঁর আধ্যাত্মিক মর্যাদা, 'ইল্‌ম ও ফযীলতকেও অবজ্ঞা করা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। উপরন্তু যিনি হবেন সে যুগের মান অনুযায়ী উন্নত ভাষা জ্ঞানের অধিকারী, যাঁর মজলিসে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক অংশ গ্রহণ করে উপকৃত হবে, কেউই তাঁকে "মূর্খ ও জাহিল দরবেশ" অথবা "নাদান বক্তা" বলে উপেক্ষা করার সাহস পাবে না এবং দুর্বল ঈমানের লোকেরাও যাঁর ওয়া'জ মজলিস ও দর্‌স মাহফিল থেকে ইয়াকীনের শক্তি, ঈমানের উত্তাপ, সংশয় ভঞ্জনের ওষুধ ও 'আমল করার অনুপেরণা লাভ করবে।

বাগদাদের দু'জন দা'ঈ

ঠিক এমনি যুগে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের মধ্যে আবার নতুন করে ঈমানের উত্তাপ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য দু'জন ব্যক্তিত্বের জন্ম দিলেন। তাঁদের একজনের নাম সায়্যিদুনা হযরত 'আবদুল কাদির জিলানী (র) এবং অপর জনের নাম 'আবদুর রহমান ইবনু'ল-জওযী। রুচি ও অভিরুচিতে ভিন্নতা থাকলেও তাঁরা উভয়েই নিজ নিজ যুগের মুসলিম গণজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের দ্বারা ইসলামের বিরাট খিদমত নিয়েছেন। আল্লাহ্র একটি বিরাট হিকমত এই যে, বাগদাদ ছিল তাঁদের উভয়েরই অবস্থান ও দীনী দা'ওয়াতের কেন্দ্রভূমি। আর সে যুগের বাগদাদ ছিল তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও রাজনীতির পীঠস্থান। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা দীনী খেদমতের জন্য তাঁদেরকে দীর্ঘ জীবন ও বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র দান করেছিলেন।

হাম্বলী মযহাবের একটি গৌরবোজ্জ্বল দিক এই যে, এই উভয় বুযুর্গই ছিলেন হাম্বলী মযহাবের উসূল ও ফিক্'হের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

নবম অধ্যায়

হযরত শায়খ 'আবদুল কাদির জিলানী (র)

শিক্ষা ও পরিপূর্ণতা লাভ

সায়্যিদুনা হযরত 'আবদুল কাদির জিলানী (র)-এর জন্ম হয় ৪৭০ হিজরীতে[১] গীলান[২] নগরে। তাঁর বংশ-তালিকা ঊর্ধ্বতন ১০ম পুরুষে সায়্যিদুনা হযরত ইমাম হাসান (রা)-এ গিয়ে ঠেকেছে। তিনি ১৮ বছর বয়সে সম্ভবত ৪৮৮ হিজরীতে বাগদাদে আগমন করেন। ঐ একই সনে ইমাম গাযালী (র) সত্যানুসন্ধান ও দৃঢ় প্রত্যয় লাভের উদ্দেশ্যে বাগদাদ ত্যাগ করেছিলেন। এটা কি একটা বিস্ময়কর ঘটনা নয় যে, একজন জলীলুল-কদর ইমাম থেকে যখন বাগদাদ বঞ্চিত হয়, ঠিক তখনই অপর একজন জলীলুল-কদর সংস্কারক ও আল্লাহ্র দীনের দা'ঈ-র সেখানে আগমন ঘটে![৩] যা হোক, হযরত জিলানী দৃঢ় মনোবল ও অটুট হিম্মত নিয়ে 'ইল্ম হাসিলে মশগুল হয়ে পড়েন। 'ইবাদত-বন্দেগী ও মুজাহাদার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তিনি 'ইল্ম হাসিলের ক্ষেত্রে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি, বরং কঠোর সাধনা দ্বারা নিজেকে জ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই অভিজ্ঞ ও পারদর্শী করে তোলেন। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে রয়েছেন আবুল-ওয়াফা ইবনে 'আকীল, মুহাম্মদ ইব্ন আল-হাসান আল-বাকি'ল্লানী ও আবূ যাকারিয়্যা তাবরীযীর মত নামকরা জ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। তিনি আবুল-খায়র হ'াম্মাদ ইব্ন মুসলিম[৪] আদ-দাব্বাস থেকে তরীকতের তা'লীম এবং কাজী আবূ সা'ঈদ[৫] মাখরামী থেকে এ ক্ষেত্রে কামালিয়াত ও এজাযত লাভ করেন।[৬]

---

১. জিলান কিংবা গীলানকে দায়লাম বলা হয়। এটি ইরানের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রদেশ। এর উত্তরে রুশীয় ভূখণ্ড তালীস অবস্থিত। দক্ষিণে বুর্য পর্বতশ্রেণী যা আযারবায়জান ও ইরাক-ই 'আজম-থেকে জিলানকে আলাদা করে দিয়েছে। দক্ষিণে মাযিন্দানের পূর্বাংশ এবং উত্তরে কুযভীন সাগরের পশ্চিমাংশ ইরানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এলাকার মধ্যে পরিগণিত (দা.মা)।

২. ইবনে কাছীর; ১২তম খণ্ড, ১৪৯ পৃ.।

৩. বুস্তানীকৃত আল-বিদায়া ওয়ান্নিহায়া, দ্বাদশ খণ্ড, ১৪৯ পৃ.।

৪. শা'রানী লিখেছেন যে, মুরীদদের তরবিয়তের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য। বাগদাদের অধিকাংশ শায়খ ও সূফী তাঁরই সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি ৫২৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। –তাবাক 'াতু'ল-কুবরা, ১৩৪ পৃ.।

৫. আসল নাম মুবারক ইবনে 'আলী ইবনে আল-হুসায়ন। ইবনে কাছীর লিখেছেন যে, তিনি হাদীছ শ্রবণ ও হাম্বলী মযহাবশাস্ত্রে কামালিয়াত হাসিল করেন। তাঁর বেশির ভাগ সময়ই বিতর্ক, দরস ও ফতওয়া প্রদানের কাজে অতিবাহিত হত। তিনি সদগুণসম্পন্ন, মতাদর্শের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থী এবং সঠিক রায়দানের অধিকারী ছিলেন। ৫১১ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়।

৬. বিস্তারিত জানতে ইবনে রজব হাম্বলী প্রণীত তাবাক 'াতু'ল-হ 'ানাবিলা দ্র.।

ইসলাহ্ ও ইরশাদ ঃ তাঁর প্রতি জনগণের আকর্ষণ

জাহিরী ও বাতেনী 'ইলমে পরিপূর্ণতা লাভের পর তিনি শিক্ষা, সংস্কার ও সংশোধনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। একই সময়ে তিনি দর্স প্রদান ও ধর্মোপদেশমূলক কাজের প্রতিও মনোযোগী হন এবং স্বীয় উস্তাদ শায়খ মাখরামীর মাদরাসায় শিক্ষকতা ও নিয়মিত ওয়া'জ শুরু করেন। (ছাত্রাধিক্যের কারণে) সত্বরই ঐ মাদরাসা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুরক্তবৃন্দ মাদরাসা গৃহটি সম্প্রসারিত করে তাঁর মজলিসের উপযোগী করে তোলেন। তাঁর মজলিসে লোকের ভীড় এমন পরিমাণে বাড়তে লাগল যে, অবশেষে মাদরাসায় তিল ধারণের স্থানও অবশিষ্ট থাকত না। তাঁর ওয়া'জ শুনতে গোটা বাগদাদ যেন ভেঙে পড়ত। আল্লাহপাক তাঁকে এমন প্রভাবমণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তা দান করেছিলেন যা বড় বড় রাজা-বাদশাহ্র ভাগ্যেও জোটেনি। 'মুগনী' প্রণেতা শায়খ মু'ফিক উদ্দীন ইব্নে কু'দামা বলেন, "কেবল ধর্মের কারণে তাঁর চেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী হতে আমি আর কাউকে দেখিনি। বাদশাহ ও উযীরবৃন্দ তাঁর মজলিসে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে হাযির হতেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে উপবেশন করতেন। উপস্থিত 'উলামা ও ফক'ীহ্দের সংখ্যা নিরূপণ করা ছিল একটি দুরূহ ব্যাপার। এক একটি মজলিসে চার-চার শ'র মত দোয়াতই দেখা যেত। এগুলো তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী লিপিবদ্ধ করবার জন্য লোকেরা নিয়ে আসত।

প্রশংসনীয় গুণাবলী ও চরিত্র

এত উন্নত ও উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সীমাতিরিক্ত বিনয়ী ছিলেন। একটি শিশু কিংবা একটি বালিকাও তাঁর সাথে কথা বললে তিনি দাঁড়িয়ে তা শুনতেন এবং তাঁর ফরমায়েশ মুতাবিক কাজ করে দিতেন। অভাবী ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের নিকট তিনি বসতেন এবং তাদের কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করে দিতেন। অপরদিকে তথাকথিত কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কিংবা সাম্রাজ্যের কোন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের সম্মানার্থেও তিনি দাঁড়াতেন না।[১] খলীফার আগমন ঘটলে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই আপন গৃহে চলে যেতেন এবং খলীফা এসে উপবেশন করলে পর সেখান থেকে বেরিয়ে আসতেন যাতে করে খলীফার সম্মানার্থে দাঁড়াতে না হয়।[২] তিনি কখনও কোন উযীর কিংবা সুলতানের দরজায় গিয়ে দাঁড়ান নি।[৩]

---

১. শা'রানীর তাবাক'াতু'ল-কুবরা, ১ম খণ্ড, ১২৭ পৃ.।
২. ঐ, ১২৮ পৃ.; ৩. ঐ, ১ম খণ্ড, ১২৭ পৃ.।

তাঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা এবং তাঁর সমসাময়িক লোকেরা হযরত জিলানী (র)-এর উত্তম চরিত্র, উচ্চ মনোবল, বিনয়, নম্রতা, দানশীলতা তথা উন্নত মানের চারিত্রিক গুণাবলীর প্রশংসায় ছিলেন মুখর। জনৈক বুযুর্গ (হ'ারাদাঃ)– যিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন, অনেক বুযুর্গ ও নামকরা ব্যক্তিকে দেখেছিলেন এবং তাঁদের সান্নিধ্যে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিলেন, বলেন :

ما رأت عيناى احسن خلقا ولا اوسع صدراً ولا اكرم نفساً ولا الطف قلباً ولا احفظ عهداً و وداً من سيدنا الشيخ عبد القادر ولقد كان مع جلالة قدره وعلو منزلته وسعة علمه يقف مع الصغير ويوقر الكبير ويبداء بالسلام ويجالس الضعفاء ويتواضع للفقراء وما قام لاحد من العظماء ولا الاعيان ولا الم بباب وزير ولا سلطان .

সায়্যিদুনা শায়খ 'আবদুল কদির জিলানী অপেক্ষা অধিক উত্তম চরিত্রবিশিষ্ট, উদার মানসিকতাসম্পন্ন, দয়ালু, নম্র হৃদয় ও আত্মীয়তা রক্ষাকারী ব্যক্তি আমি আর দেখিনি। উচ্চ মর্যাদা ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছোটদের প্রতি ছিলেন অনুগ্রহপরায়ণ ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনিই সর্বাগ্রে অন্যকে সালাম দিতেন। তিনি দুর্বল ও কমযোর লোকদের সঙ্গে ওঠা-বসা করতেন এবং তাদের সঙ্গে বিনয় ও নম্র ব্যবহার করতেন। অপর দিকে তিনি কখনও কোন নেতৃস্থানীয় কিংবা শাসন কর্তৃত্বে আসীন ব্যক্তির সম্মানার্থে দাঁড়াননি কিংবা কোন উযীর ও শাসকের দরজায় ধরনা দেন নি।[১]

ইমাম হাফিজ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আল-বারযালী আল-আশবেলী তাঁর প্রশংসায় বলেন ঃ

كان مجاب الدعوة سريع الدمعة دائم الذكر كثير الفكر رقيق القلب دائم البشر كريم النفس سخى اليد غزير العلم شريف الاخلاق طيب الاعراق مع قدم راسخ فى العبادة والاجتهاد .

তিনি যে দু'আ করতেন তা কবুল হ'ত অর্থাৎ তিনি মুস্তাজাবুদ্দা'ওয়াত ছিলেন। যার পরিণতি থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা যায় এমন কোন ঘটনার কথা উঠলে তাঁর চোখ সহসাই অশ্রুসজল হয়ে উঠত। তিনি আল্লাহ্র যিক্র ও ফিক্রে মগ্ন থাকতেন। তাঁর অন্তঃকরণ ছিল খুবই কোমল। তিনি ছিলেন উদার, দানশীল, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী, উচ্চ বংশজাত এবং 'ইবাদত-বন্দেগী ও রিয়াযত-মুজাহাদার ক্ষেত্রে অনন্য।[১]

১.শা'রানীর তাবাক'াতু'ল-কুবরা, ১ম খণ্ড, ১২৭ পৃ.; ২. ক'ালাইদু'ল-জাওয়াহির, ৯ পৃ.।

ইরাকের মুফতী মুহ্'য়িউদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হামেদ আল-বাগদাদী বলেন ঃ

ابعد الناس عن الفحش اقرب الناس الى الحق شديد البأس اذا انتهكت محارم الله عز وجل لايغضب لنفسه ولا ينتصر لغير ربه.

অসভ্য ও অশিষ্ট কথাবার্তা থেকে তিনি নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতেন এবং সব সময়ই যুক্তিসঙ্গত ও হক-কথা বলতেন। খোদায়ী বিধান ও আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও কারো ওপর জুলুম কিংবা বাড়াবাড়ি হতে দেখলে তাঁর মেযাজ বিগড়ে যেত। অপরদিকে নিজের ব্যাপারে তিনি কখনও ক্রোধান্বিত হতেন না। কোন প্রার্থীকে রিক্ত হস্তে ফিরিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, এজন্য যদি নিজের পরিহিত বস্ত্রটুকুও দেবার প্রয়োজন দেখা দিত তবে তিনি তাতেও পিছ পা হতেন না।

ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়াতে ও অভাবী লোকদের প্রয়োজন পূরণে তিনি দেদার অর্থ ব্যয় করতেন এবং এতে আনন্দ পেতেন। 'আল্লামা ইবনু'ন-নাজ্জার শায়খ জিলানী (র) থেকে বর্ণনা করেন :

গোটা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদই যদি আমার হাতে চলে আসে তাহলে আমি সবটাই ক্ষুধার্তদের মধ্যে বিলিয়ে দেব। তিনি আরও বলতেন : মনে হয় আমার হাতে কোন ছিদ্র আছে। তাই কিছুই আমার হাতে থাকে না। যদি হাযার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)-ও আমার হাতে আসে তবু দেখা যায়, রাত পোহাবার আগেই তা শেষ হয়ে গেছে।[১]

ক'লাইদু'ল-জাওয়াহির প্রণেতা লিখেন :

শায়খ (র)-এর নির্দেশ ছিল, রাতের বেলা প্রশস্ত দস্তরখানা বিছানো হবে। তিনি নিজে মেহমানদের সাথে বসে খানা খেতেন, গরীব ও দুর্বল লোকদের সঙ্গ দিতেন এবং ছাত্রদের জিজ্ঞাসাসমূহ ধৈর্য সহকারে শুনতেন। প্রত্যেকেই মনে করত, সেই শায়খের সব চেয়ে কাছের লোক এবং সে-ই তাঁর কাছে সব চেয়ে বেশি সম্মানিত। তাঁর সঙ্গী-সাথীদের কেউ অনুপস্থিত থাকলে তিনি তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন এবং তাঁর জন্য চিন্তান্বিত হয়ে পড়তেন। সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি সজাগ ও সচেষ্ট ছিলেন। ছোটখাটো দোষ-ত্রুটি ও ভুল-চুক তিনি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতেন। যদি কেউ কোন বিষয়ে কসম

---

১. ক'লাইদু'ল-জাওয়াহির, ৯ পৃ.।

খেয়ে বসত তাহলে তিনি তার আরযূ মেনে নিতেন এবং তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যা কিছু জানতেন— তা গোপন করতেন।[১]

মুর্দা দিল জীবিতকরণ

সায়্যিদুনা 'আবদুল কাদির জিলানী (র) থেকে প্রকাশিত কারামতের আধিক্য সম্পর্কে অধিকাংশ ঐতিহাসিকই একমত। শায়খুল ইসলাম 'ইয্‌যুদ্দীন ইব্‌ন 'আবদুস সালাম[২] ও ইমাম ইব্‌নে তায়মিয়ার উক্তি ঃ শায়খ (র)-এর কারামত সংখ্যার গণ্ডী ছড়িয়ে গিয়েছিল। তন্মধ্যে তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় কারামত হ'ল মুর্দা দিলকে জীবিতকরণ। আল্লাহ্‌তা'আলা তাঁর কলবের তাওয়াজ্জুহ ও মুখের তা'ছীরে লাখো মানুষকে ঈমানী যিন্দেগী দান করেছেন। তাঁর অস্তিত্ব ছিল ইসলামের জন্য বসন্ত সমীরণের ন্যায় যা মৃত দিলের মাঝে নবতর প্রাণ-স্পন্দন সৃষ্টি করেছে এবং মুসলিম জাহানে ঈমান ও আধ্যাত্মিকতার এক নতুন জোয়ার বইয়ে দিয়েছে।[৩] শায়খ 'উমর কিসানী বলেন ঃ শায়খের এমন কোন মজলিস বসত না যেখানে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের কেউ না কেউ ইসলাম গ্রহণ না করত। ডাকাত, খুনী ও নানাবিধ পাপে লিপ্ত লোকেরা তওবাহ্‌র সৌভাগ্য লাভ করত এবং ভ্রান্ত 'আকীদা-বিশ্বাসের লোক তাদের ভ্রান্ত 'আকীদা-বিশ্বাস থেকে তওবাহ করত।[৪]

জুব্বাঈ বর্ণনা করেছেন, আমাকে একবার হযরত শায়খ (রা) বললেন ঃ আমার মন চায় আগের যুগের মত মাঠে-ময়দানে ও জঙ্গলে গিয়ে অবস্থান করি, আল্লাহ্‌র কোন মখলূক যেন আমাকে না দেখে আর আমিও যেন কাউকে না দেখি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের কল্যাণ চান; আমার হাতে পাঁচ হাযারের বেশি ইয়াহূদী ও খৃস্টান মুসলমান হয়েছে। ধূর্ত, প্রতারক ও পেশাদার পাপীদের ভেতর থেকে এক লক্ষের অধিক লোক আমার হাতে তওবাহ করেছে। এও আল্লাহ্‌র এক বিরাট নিয়ামত।[৫]

ঐতিহাসিকদের মতে, বাগদাদে বসবাসকারীদের একটি বিরাট অংশ হযরত (র)-এর হাতে হাত রেখে তওবাহ করেছিল এবং বিরাট সংখ্যক ইয়াহূদী, খৃস্টান ও যিম্মী তাঁর হাতেই মুসলমান হয়েছিল।[৬]

শিক্ষা দান কার্যে কর্মব্যস্ততা ও অন্যান্য খিদমত

উচ্চ মরতবা ও বিলায়েতের মকামে অধিষ্ঠিত এবং সাধারণ মানুষ ও তাদের চরিত্রের সংস্কার, সংশোধন ও প্রশিক্ষণে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও তিনি পঠন-

---
১. ক'লাইদু'ল-জাওয়াহির, ৯ পৃ.; ২. তাবাক'াতু'ল-হ'ানাবিলা, ইবনে রজব।
৩. জিলাউ'ল-'আয়নায়ন, ১৩০, পৃ.; ৪, ৫,৬. ক'লাইদু'ল-জাওয়াহির।

পাঠন, ফতওয়া প্রদান, লোকের 'আকীদা শুদ্ধিকরণ ও আহলে-সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি এতটুকু গাফিল ছিলেন না। 'আকাইদ ও উসূলের ক্ষেত্রে তিনি ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) ও মুহাদ্দিছীনে কিরামের মতানুসারী ছিলেন। আহলে-সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের মযহাব ও প্রাচীন বুযুর্গদের অনুসৃত মত তাঁর সমর্থন ও সহযোগিতার ফলে আরও শক্তি লাভ করে। ফলে 'আকীদাগত ও কার্যকর বিদ'আতের বাজার হয়ে যায় নিস্তব্ধ। ইবনু'স-সাম'আনী বলেন : সুন্নাহ অনুসারীদের শান, মর্যাদা ও সংখ্যা তাঁরই কারণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

মাদরাসায় তিনি একটি পাঠ তফসীরের, একটি হাদীছের, একটি ফিক্'হের ও একটি ইমামদের মধ্যকার মতভেদ ও তাদের পেশকৃত প্রমাণাদি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। সকাল-সন্ধ্যা তফসীর, হাদীছ, ফিক্'হ, ইমামদের মযহাব, উসূলে ফিক্'হ, ও আরবী ব্যাকরণ বিষয়ে শিক্ষা দান চলত। জোহরের পর 'ইল্মে তাজবীদের তা'লীম হ'ত। এছাড়া ফতওয়া প্রদানের ব্যস্ততাও ছিল। সাধারণত তিনি শাফি'ঈ ও হাম্বলী মযহাব অনুসারে ফতওয়া দিতেন। ইরাকের 'আলিমরা তাঁর ফতওয়ায় খুবই বিস্মিত হতেন এবং তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করতেন।[১]

একবার এই মর্মে একটি ফত'ওয়া চেয়ে পাঠানো হয় যে, এক ব্যক্তি কসম খেয়েছে সে এমন কোন 'ইবাদত করবে, যা সম্পাদন করার সময় অপর কেউ শরীক থাকবে না। যদি সে এই কসম পূরণে ব্যর্থ হয় তাহলে তার স্ত্রী তিন তালাক হয়ে যাবে। অপরাপর 'উলামাকে এই ফতওয়া কিছুটা অপ্রস্তুত করে ফেলে। কেননা এমন কী 'ইবাদত থাকতে পারে যেখানে কেবল একটি লোকই থাকবে এবং তখন পৃথিবীর অন্য কোন লোকই তাতে শরীক থাকবে না। হযরত শায়খ (র)-এর নিকট এ ফতওয়া এলে তিনি কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে জওয়াব দিলেন : মাতাফ (বায়তুল্লাহ্র চতুষ্পার্শ্বস্থ তওয়াফ করবার উন্মুক্ত স্থান) তার জন্য খালি করে দাও আর সে একাকী খানা-ই-কা'বা সাতবার প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করুক। 'উলামা-ই-কিরাম এ জওয়াব শ্রবণে স্বতঃ-স্ফূর্তভাবে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মেতে ওঠেন এবং বলেন ঃ এটাই একমাত্র পথ যেখানে সে একাকী কারুর অংশদারিত্ব ব্যতিরেকেই 'ইবাদত করতে পারে। কেননা তওয়াফের জন্য বায়তুল্লাহ্ শর্ত ও মাতাফকে ঐ ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট করে দেবার পর সেখানে তার 'ইবাদতে অপর কারোর শরীক হবার কোন সম্ভাবনাই বাকি রইল না।[১]

---

১. শা'রানীর ত'াবাক'াতুল-কুবরা, ১ম খণ্ড,১২৬ পৃ. ও ত'াবাক'াতু'ল-হ'ানাবিলা, ইবনে রজবকৃত।

দৃঢ়তা প্রদর্শন ও পর্যবেক্ষণ

হযরত শায়খ (র) দৃঢ়তা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে পর্বতসম ছিলেন। পরিপূর্ণ আনুগত্য, গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য এবং গায়বী মদদ তাঁকে এমন এক স্থানে পৌঁছে দিয়েছিল যে, হক ও বাতিল, আলো ও আঁধার এবং সঠিক ইলহাম ও শয়তানী অপকৌশলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করবার মত শক্তির অধিকারী তিনি প্রকৃতই হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সামনে এ সত্য দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে গিয়েছিল যে, শরীয়তে মুহাম্মাদীর হুকুম-আহকাম (বিধি-বিধান) ও হালাল- হারামের মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের এতটুকু আশঙ্কাও নেই। যদি কেউ এর বিপরীত দাবি করে তবে সে শয়তান। তিনি বলেন ঃ একবার একটি বিরাট 'আজীমুশ্‌শান আলো প্রকাশিত হয়, যদ্দ্বারা আসমানের প্রান্তদেশ ভরে যায়। অতঃপর এর থেকে একটি আকৃতি প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত আকৃতি আমাকে সম্বোধন করে বলল ঃ হে 'আবদুল কাদির! আমি তোমার প্রভু– প্রতিপালক। আমি তোমার জন্য সকল হারাম ও অবৈধ বস্তু হালাল করে দিয়েছি। আমি বললাম : দূর হ' শয়তান মরদূদ! এই না বলতেই সে আলো অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল এবং ধোঁয়ায় রূপান্তরিত হ'ল। তখন গায়বী আওয়াজ ধ্বনিত হ'ল ঃ 'আবদুল কাদির! আল্লাহ্ তোমাকে তোমার জ্ঞান ও গভীর ধর্মোপলব্ধির কারণে বাঁচিয়ে দিলেন। নতুবা এভাবে আমি সত্তরজন সূফীকে পথভ্রষ্ট করেছি।[২] আমি বললাম : আল্লাহ্‌র মেহেরবানী। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল : হযরত! আপনি কি করে বুঝলেন যে, এ শয়তান? উত্তরে তিনি বললেন : তার ঐ কথা থেকে যে, আমি হারাম বস্তুকে তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি।

হযরত শায়খ (র) এও বলেছেন :

> যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সীমারেখার (শরীয়তের বিধানসমুহের) ভেতর থেকে কোন একটি সীমাও লংঘিত হয় তাহলে জেনে নাও, তুমি ফেতনার মধ্যে পড়ে গেছ এবং শয়তান তোমাকে নিয়ে খেলছে। এমতাবস্থায় তুমি তাৎক্ষণিকভাবে শর'ঈ বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার জওয়াব দাও। আর তা এজন্য যে, প্রতিটি হাকীকত– যার পেছনে শরীয়তের কোন সমর্থন নেই– তা বাতিল ও পরিত্যক্ত।[১]

১. শা'রানীর ত'াবাক'াতুল-কুবরা, ১ম খণ্ড, ১২৬ পৃ. ও ত'াবাক'াতুল-হ'ানাবিলা, ইবনে রজবকৃত।

তাফবীদ* ও তওহীদ

তসলীম (আল্লাহ্র প্রতি শর্তহীন আত্মসমর্পণ), তাফবীদ* (সোপর্দের স্তরভেদ) ও তওহীদ-ই-কামিল ছিল হযরত শায়খ (র)-এর বিশিষ্ট অবস্থা। কখনো কখনো তা'লীম দিতে গিয়ে তিনি এ অবস্থা ও অবস্থানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন। আর তা বস্তুতপক্ষে তাঁর নিজেরই অবস্থা ছিল।

خوشتراں باشد کہ سر دلبراں + گفتہ آید در حدیث دیگراں

একবার তিনি ইরশাদ করেন ঃ

যখন বান্দাকে কোন বিপদ ও কঠিন দুর্যোগের মাঝে নিক্ষেপ করা হয় তখন প্রথমে সে নিজেই তা থেকে বের হবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। যদি পরিত্রাণ না পায় তবে আল্লাহ্র সৃষ্ট জগতের কারোর নিকট, যেমন বাদশাহ কিংবা শাসকমণ্ডলী কিংবা দুনিয়াদার কোন ব্যক্তি বা কোন আমীরের সাহায্যপ্রার্থী হয়। আর রোগ, শোক ও ব্যথা-বেদনার ক্ষেত্রে সে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। যখন এদের কেউই তার কাজে আসে না তখনই সে দু'আ, কান্নাকাটি ও প্রশংসা-গীতিসহ পরওয়ারদিগার-ই-'আলমের দিকে ফিরে যায় অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের থেকেই সমস্যার সুরাহা হয়ে যায়, ততক্ষণ সে অন্যের নিকট প্রার্থী হবার কথা চিন্তা করে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কারোর নিকট থেকে মদদ লাভের সম্ভাবনা থাকে ততক্ষণ আল্লাহ্র দিকে ফিরেও তাকায় না। কিন্তু অন্য কারো নিকট থেকেও যখন কোন সাহায্য দৃষ্টিগোচর হয় না তখনই (অনন্যোপায় হয়ে) সে আল্লাহ্র হাতে গিয়ে ধরা দেয় এবং সর্বদাই দু'আ প্রার্থনা ও কান্নাকাটিতে মশগুল থাকে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দু'আরত অবস্থায় তার মধ্যে ক্লান্তি এনে দেন, কিন্তু তার দু'আ কবূল করেন না। শেষ পর্যন্ত যখন সমস্ত কার্যকারণ শেষ হয়ে যায় এবং সবার থেকে সে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা হয়ে পড়ে, তখনই আল্লাহ্র বিধানে তকদীর ও ফয়সালা কার্যকর হয় এবং তার ভেতর (আল্লাহ্ নিজের) কাজ সম্পাদন করেন। ঠিক তখনই বান্দা সমস্ত উপকরণ ও কার্যকারণ এবং সমগ্র ক্রিয়া-কর্ম থেকে বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং শুধু রূহ্'ই তার মধ্যে কার্যকর থাকে। তার চোখে সত্যের প্রকাশ ঘটে। সে তখন অতি অবশ্যই দৃঢ় বিশ্বাসী তওহীদবাদীতে পরিণত হয়। অকাট্যভাবে সে অবহিত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া আর কেউই কিছু করতে পারে না এবং আল্লাহ ছাড়া কর্মশক্তি ও আরাম প্রদানকারীও আর কেউ নেই। সেই মহান সত্তা ব্যতিরেকে আর

কারোর হাতে ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, দান-বঞ্চনা, জীবন-মরণ, 'ইয্যত-বেইয্যতী ও অভাব-প্রাচুর্য প্রদানের শক্তি নেই। সে সময় (তকদীর ও ফয়সালায়) বান্দাহ্র অবস্থা হয়, যেমন ধাত্রীর হাতে দুধের শিশু, গোসলকারীর হাতে মৃত ব্যক্তি, খেলোয়াড়ের হাতে পলো খেলার বল। দুধের শিশু, মৃত ব্যক্তি ও বলের যেমন নিজের নড়াচড়ার কোন ক্ষমতা যেমন নেই, সে নিজে নড়তে পারে না, অন্যকে নাড়াতেও পারে না, তেমনি এই বান্দারও নিজের করবার মত কিছুই থাকে না। সে স্বীয় মালিকের কর্মে নিজ সত্তার মধ্যে গায়েব হয়ে যায়। সে তার মালিক ও তার কর্ম ছাড়া আর কিছুই দেখে না, কিছুই শোনে না, কিছুই চিন্তা করে না, কিছুই বোঝে না। তখন বান্দা যদি কিছু দেখে তো তাঁর শিল্প, যদি কিছু শোনে তো তাঁরই কালাম (কথা ও বাণী)। তাঁরই জ্ঞানের সাহায্যে সে জ্ঞান লাভ করে এবং তাঁরই নিয়ামত সে আস্বাদন করে। তাঁর ওয়াদাতে সে খুশি হয়, তৃপ্তি পায় এবং সান্ত্বনা লাভ করে। তাঁর মহান সত্তা ভিন্ন অপরাপর সত্তার প্রতি সে ঘৃণা প্রকাশ করে। তাঁরই স্মরণে সে মস্তক অবনত করে এবং তাঁরই ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে একাত্ম করে নেয়। সে একমাত্র তাঁর মহান সত্তার ওপরই আস্থা ও ভরসা রাখে। সে তাঁর মা'রিফতের নূর দ্বারা হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং তাঁর কুদরতের রহস্য দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। সে তাঁর পবিত্র সত্তা থেকেই (প্রতিটি কথা) শোনে এবং তা স্মরণও রাখে। অতঃপর সে শুধু তাঁর নিয়ামতের ওপর হ'ামদ, ছানা, শুকরিয়া ও অভিনন্দন পেশ করে।[১]

আল্লাহ্র সৃষ্ট জগতের প্রতি স্নেহ

সাধারণভাবে সকল মানুষ, বিশেষ করে উম্মতে মুহাম্মাদিয়া (সা)-এর সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক, তাদের সম্পর্কে তাঁর যে চিন্তা-ভাবনা ও তাদের অবস্থার প্রতি তাঁর যে স্নেহদৃষ্টি ছিল তা একমাত্র নায়েবে রসূল (রসূলের প্রতিনিধি স্থানীয়) এবং আল্লাহ্র মকবুল বান্দাদেরই 'আলামত। এটা পরিষ্কার প্রতিভাত হয় তাঁর সেই বক্তৃতা থেকে যেখানে তিনি বাজারে গমনকারী লোকদের অবস্থা ও মরতবা বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি অন্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে প্রকৃতপক্ষে নিজেরই অবস্থার (হাল) বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন :

> এবং পঞ্চম ঐ ব্যক্তি যে বাজারে যখন প্রবেশ করে তখন আল্লাহ সম্পর্কে তার দিল ভরে যায়। বাজারের লোকদের ওপর তার দয়া হয়। সে প্রত্যক্ষ করে

১. ফতূহ 'ল-গায়ব, তরজমা মওলবী মুহ'াম্মাদ 'আল সাহেব কাকুরভী- (রমূযু'ল-গায়ব) ১১,১২,১৩ পৃ.।

আল্লাহ্‌র রহমত আর এই রহমতই তাকে দেখতে দেয় না, ঐ সমস্ত লোকের নিকট কি আছে। সে বাজারে প্রবেশের সময় থেকে বের হওয়া পর্যন্ত বাজারে সমবেত লোকদের জন্য দু'আ, ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) ও সুপারিশে মশগুল থাকে এবং তাদের প্রতি স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করে। তার দিল ঐ সব লোকের অবস্থাদৃষ্টে জ্বালা অনুভব করে। তার চোখে অশ্রু ঝরতে থাকে আর আল্লাহ্ পাক ঐ সব লোককে স্বীয় মহানুভবতা ও বদান্যতার কারণে যেসব নিয়ামত দান করেছেন তার জন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া, হ'াম্‌দ ও ছানায় মশগুল থাকে।[১]

হ্যরত শায়খ-এর যুগ ও পরিবেশ

হযরত শায়খ 'আবদুল কাদির জিলানী (র) ৭৩ বছর বাগদাদে অতিবাহিত করেন এবং এ সময়ের মধ্যে পাঁচজন 'আব্বাসী খলীফা তাঁর চোখের সামনেই একের পর এক খিলাফতের আসনে সমাসীন হন। যখন তিনি বাগদাদে আগমন করেন তখন ছিল খলীফা মুস্তাজহির বিল্লাহ আবুল 'আব্বাসের যুগ (৫১২ হি.)। তারপর মুস্তারশিদ, রাশেদ, আল-মুক'তাদী লি আমরিল্লাহ্ ও আল-মুস্তানজিদ বিল্লাহ যথাক্রমে খলীফার আসনে সমাসীন হন।

শায়খ (র)-এর এই যুগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে ভরপুর। সালজূক বংশীয় সুলতান ও 'আব্বাসী খলীফাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সে যুগে সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়ে পৌছে। সালজূকী সুলতানরা কখনো খলীফার সন্তুষ্টি ও রিযামন্দীসহ, আবার তাঁর বিরোধিতা ও অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও 'আব্বাসী হুকূমতের ওপর নিজেদের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জানে-প্রাণে সচেষ্ট ছিলেন। কখনো কখনো খলীফা ও সুলতানের সেনাবাহিনীর মধ্যে দস্তুরমত যুদ্ধ সংঘটিত হ'ত। পরিণামে মুসলমানদেরই পরস্পরের খুন ঝরত।

এ ধরনের ঘটনা মুস্তারশিদের খিলাফত আমলে কয়েকবারই সংঘটিত হয়। ইনি 'আব্বাসী যুগের সর্বাধিক শক্তিশালী ও যোগ্য খলীফা[২] ছিলেন। তিনি অধিকাংশ যুদ্ধেই জয় লাভ করতেন। কিন্তু ১০ই রমযান, ৫১৯ হিজরীতে সুলতান মাস'উদ্ ও খলীফার মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাতে খলীফার পরাজয় ঘটে। ইবনে কাছীর লিখেন :

---

১. ফতূহু'ল-গায়ব,—নিবন্ধ ৭১, পৃ. ১৭৫।

২. ইবনে কাছীর তাঁর প্রশংসায় লিখেছেন যে, মুস্তারশিদ বীর পুরুষ, দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন, বাগ্মী, মিষ্টভাষী ও খুবই 'ইবাদত-গুযার খলীফা ছিলেন। বিশিষ্ট-অবিশিষ্ট নির্বিশেষে সকলের নিকটই তিনি প্রিয় ছিলেন। তিনিই 'আব্বাসী শেষ খলীফা যিনি জুম'আর দিনে খুতবা দানের রসম অব্যাহত রাখেন। ৪৫ বছর তিন মাস বয়সে তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর খিলাফত কাল ছিল ১ বছর ২০ দিন (আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, দ্বাদশ খণ্ড, ২০৮ পৃ.)।

সুলতানের সেনাবাহিনী জয় লাভ করে। খলীফাকে বন্দী করা হয়। বাগদাদবাসীদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করা হয়। এ সংবাদ অন্য প্রদেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। বাগদাদ এই দুঃখজনক সংবাদে খুবই প্রভাবিত হয়। সেখানকার বাসিন্দাদের ভেতরও মানসিক বিপর্যয় দেখা দেয়। জনসাধারণ ক্ষোভে-দুঃখে মসজিদের মিম্বর পর্যন্ত ভেঙে ফেলে। তারা সালাতের জামা'আতে যোগদান থেকেই বিরত থাকে। মহিলারা তাদের মাথা থেকে দোপাট্টা খুলে ফেলে এবং শোক প্রকাশ করতে করতে বাইরে বেরিয়ে আসে। তারা খলীফার বন্দীদশা, তাঁর পেরেশানী ও বিপদ মুসীবতের জন্য মাতম করতে থাকে। অন্যান্য এলাকাও এ ব্যাপারে বাগদাদকে অনুসরণ করে। ফলে এ ফেতনা এতটা বেড়ে যায় যে, কম বেশি গোটা রাষ্ট্রই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। মালিক সন্‌জর স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই ঘটনার স্পর্শকাতর দিক সম্পর্কে অবহিত করেন এবং এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কেও সতর্ক করে দেন। তিনি তাকে নির্দেশ দেন, যেন খলীফাকে তাঁর স্বপদে বহাল করা হয়। মালিক মাস'ঊদ এ আদেশ পালন করেন, কিন্তু বাতেনীরা (মুসলিম সমাজের বিভ্রান্ত একটি গুপ্তঘাতক সম্প্রদায় –অনুবাদক) খলীফাকে বাগদাদে নিয়ে আসার পথে নির্মমভাবে হত্যা করে।

এসব মর্মান্তিক ও দুঃখজনক ঘটনা শায়খ 'আবদুল কাদির জিলানী (র)-এর চোখের সামনেই সংঘটিত হয়। মুসলমানদের এ পরস্পর বিচ্ছিন্নতা, গৃহযুদ্ধ ও শত্রুতাকে তিনি স্বচক্ষে অবলোকন করেন। তিনি এও অবলোকন করেন যে, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার খাতিরে এবং দেশ, সাম্রাজ্য, সম্মান ও পদমর্যাদা লাভের জন্য মানুষ সব কিছুই করতে পারে। তাদের অন্তরে কেবল রাজদরবারের শান-শওকতরে প্রতি মোহই অবশিষ্ট আছে। তারা ক্ষমতাসীন ও সাম্রাজ্যের বড় বড় পদাধিকারী ব্যক্তিকে সম্মানের চোখে দেখে। প্রদেশ ও শহরগুলোর ক্ষমতা ও শাসনদণ্ডের অধিকারী হওয়ার জন্য তারা নিজেদের মস্তক বন্ধক রাখতেও রাযী।

শায়খ 'আবদুল কাদির জিলানী (র) প্রত্যক্ষভাবে ঐ সব ঘটনা থেকে দূরে থাকলেও ঐগুলোর কারণেই স্বীয় বিবেকের দংশন অনুভূতির জ্বালায় ছিলেন জর্জরিত। ঐ জ্বালা ও উত্তাপই তাঁকে অফুরন্ত হিম্মত, শক্তি ও ইখলাসের সঙ্গে ওয়া'জ-নসীহত, দা'ওয়াত, তরবিয়ত, আত্মার পরিশুদ্ধি ও নফসের সংস্কারের কাজে অনুপ্রাণিত করে। তিনি দুনিয়ার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে ঈমানী চেতনার পুনরুজ্জীবন, পারলৌকিক জীবনের গুরুত্ব, অনুপম চরিত্র, নির্ভেজাল তওহীদ ও পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে দা'ওয়াত প্রদানের ওপর তাঁর সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেন।

ওয়া'জ ও খুতবা

হযরত শায়খ (র)-এর ওয়া'জ শ্রোতাদের অন্তরের বিদ্যুতের ন্যায় ক্রিয়া করত। তাঁর কথায় আজও এই তা'ছীর বিদ্যমান। 'ফতূহু'ল-গ'ায়ব' ও 'আল-ফাতহু'র-রাব্বানী'-এর নিবন্ধ এবং তাঁর মজলিসের ওয়া'জের শব্দরাজি আজও মানুষের অন্তরকে উত্তপ্ত করে। দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কথামালার সজীবতা ও প্রাণ স্পন্দন এখনো অটুট রয়েছে।

আম্বিয়া-ই-কিরাম ('আ)-এর প্রতিনিধিবৃন্দ ও কামিল 'আরিফদের বাণীর ন্যায় তাঁর এই সব বাণীও সমীচীন মুহূর্তে এবং শ্রোতার অবস্থা ও প্রয়োজন মুতাবিক উচ্চারিত হ'ত। মানুষ যে সব ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল এবং যে সব ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল সাধারণত সেগুলোর প্রতিবিধানের জন্যই তিনি ঐ সব বাণী প্রদান করতেন। সেজন্যই তাঁর খিদমতে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর ধর্মোপদেশ ও মুখনিঃসৃত বাণী থেকে নিজে নিজ ক্ষতস্থানের ওষুধ এবং নিজ নিজ প্রশ্ন ও সন্দেহের জওয়াব পেত। সাধারণের ওপর তাঁর ওয়া'জের প্রভাব পড়ার এবং জনগণের জন্য তা কল্যাণকর হবার এটিও ছিল একটি বড় কারণ। তাঁর যবান মুবারক থেকে যা কিছু বের হ'ত তা তার অন্তর থেকেই উৎসারিত হ'ত। আর এজন্যই তা শ্রোতার দিলের ওপর আছর করত। সিদ্দীকদের কথার এই তো শান!

নির্ভেজাল তওহীদ ও আল্লাহ্ ভিন্ন সকল শক্তির অস্তিত্বহীনতা

সে সময় জ্ঞানীদের জগত যেন ক্ষমতাসীন ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের আঁচলে বাঁধা ছিল। লোকেরা বিভিন্ন মানুষ ও বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে (هستى) তাদের লাভ-ক্ষতির মালিক ভাবতে শুরু করে দিল। যে সব উপকরণ মানুষের জন্য তৈরি করা হয়েছে সেগুলোকেই মানুষ নিজেদের প্রতিপালকের মর্যাদা দান করছিল। তকদীর ও ফয়সালাও মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে তারা ধরে নিয়েছিল। এমনি এক পরিবেশে হযরত শায়খ (র) বলেন :

> গোটা সৃষ্টি জগতকে এভাবে মনে কর, যেন এক মহাপরাক্রমশালী বাদশাহ, যাঁর দেশ বিরাট এবং আদেশ অত্যন্ত কঠোর, এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে তার গলদেশে বেড়ি এবং পায়ে শেকল পরিয়ে এক নদীর ধারে, যার ঢেউ ভয়াবহ, গভীরতা অপরিমেয় ও স্রোত তীব্র– এক দেবদারু জাতীয় বৃক্ষে ঝুলিয়ে রেখেছেন এবং নিজে সুন্দর ও উঁচু একটি চেয়ারে, যেখানে পৌঁছা মুশকিলের ব্যাপার, উপবেশন করেন। তাঁর পাশে তীর, ধনুক, নেযা,

কামানসহ সব ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের পাহাড় জমে আছে যার পরিমাণ ও পরিসংখ্যান একমাত্র বাদশাহ্ ভিন্ন আর কেউ জানে না। এরপর তিনি ঐসব অস্ত্রশস্ত্রের ভেতর যেটি তার ইচ্ছা– ঝুলন্ত বন্দীর দিকে নিক্ষেপ করছেন। তাহলে এই তামাশা দেখবার দর্শকের জন্য এটা কি সমীচীন হবে যে, তারা সুলতানের দিক থেকে তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে এবং তার থেকে ভয় ও আশা ছেড়ে দেবে এবং গাছে ঝোলানো কয়েদীর কাছেই আশা করবে এবং তার প্রতিই ভয়ভীতি রাখবে? যে ব্যক্তি এমনটি করবে সে কি বুদ্ধিহীন ও নিছক পাগল বলে বিবেচিত হবে না? অতএব, জেনে রেখো, দৃষ্টির পর অন্ধত্ব, মিলনের পর বিচ্ছিন্নতা, উন্নতির পর অবনতি, হিদায়াতের পর গোমরাহী এবং ঈমানের পর কুফর থেকে আল্লাহ্র আশ্রয়ই শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম অবলম্বন।[১]

অন্য এক মজলিসে তওহীদ ও আখলাক এবং আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য সমস্ত কিছুর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের তা'লীম তিনি এভাবে দেন ঃ

তাঁর ওপরই নজর রাখো যিনি তোমার ওপর নজর রাখেন। তাঁর সামনেই থাকো যিনি তোমার সামনে থাকেন। তাঁর সঙ্গে মুহব্বত করো যিনি তোমাকে মুহব্বত করেন। তাঁর কথা মেনে চলো যিনি তোমাকে ডাকেন। নিজের হাত তাঁকেই দাও যিনি তোমাকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করবেন, মূর্খতার অন্ধকার থেকে টেনে বের করবেন, ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবেন, ময়লা আবর্জনা ধুয়ে তোমাকে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করবেন। তিনিই তোমাকে পচা-আবর্জনা, হীনতা-দীনতা এবং বদকার নফ্স ও পথভ্রষ্ট সাথী-সঙ্গীদের থেকে নাজাত দেবেন, নাজাত দেবেন ঐ সব প্রবৃত্তিজাত শয়তান, জাহিল দোস্ত, আল্লাহ্র পথের লুটেরা এবং সুন্দর, পবিত্র, উত্তম ও পছন্দনীয় বস্তু থেকে, বঞ্চনাকারীদের হাত থেকে। অভ্যাস আর কতক্ষণ? স্বভাব ও প্রকৃতির এই বিকৃতি আর কতদিন? কামনা-বাসনা আর কত? গর্ব ও ঔদ্ধত্যই বা আর কতদিন? দুনিয়া আর কতক্ষণ? সামনেই তো আখিরাত। সত্য ব্যতিরেকে আর কতদিন থাকবে? কোথায় চলেছো তোমরা (সেই মহান আল্লাহ্কে ছেড়ে যিনি) সকল বস্তুর স্রষ্টা ও নির্মাণকারী? যিনি আদি ও অন্ত, যিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য হৃদয়ের ভালবাসা, আত্মার প্রশান্তি, অভাব থেকে মুক্তি, দয়া-দাক্ষিণ্য সব কিছুই সেই মহান সত্তার পক্ষ থেকে এবং তাঁরই দিকে সব কিছুর প্রত্যাবর্তন।[২]

---

১. রমুযু'ল-গায়ব তরজমা ফতূহু'ল-গায়ব, নিবন্ধ ১৭, পৃ. ৪৯।
২. রমুযু'ল-গায়ব–নিবন্ধ ৬২. ১৫৭ পৃ.।

অপর এক মজলিসে তওহীদ সম্পর্কে তিনি খোলাখুলিভাবে বলেন :

গোটা সৃষ্টি জগত অক্ষম ও দুর্বল। কেউ তোমাকে লাভবান করতে পারে না, ক্ষতিগ্রস্তও করতে পারে না। লাভ-ক্ষতি সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলা কোন না কোন সৃষ্টির হাত দিয়ে করিয়ে থাকেন। যা কিছু তোমার জন্য উপকারী অথবা অপকারী, আল্লাহ্র জ্ঞান মুতাবিক সে সব কিছুই তোমার ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে। এর অন্যথা হবার নয়। যারা তওহীদবাদী ও নেককার– তারা অবশিষ্ট সৃষ্টি জগতের ওপর আল্লাহ্র নিদর্শন। এঁদের ভেতর কেউ কেউ এমন আছেন যাঁরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় দিক দিয়েই দুনিয়া থেকে অনাবৃত উন্মুক্ত, যদিও তারা ধনাঢ্য। এই কলব যার পরিষ্কার, যে ব্যক্তি একে করায়ত্ত করতে পেরেছে, গোটা সৃষ্টি জগতের সে বাদশাহী পেয়ে গেছে। পাহলোয়ান সেই, বাহাদুর সেই, যে তার কলবকে আল্লাহ ভিন্ন অপর সব কিছু থেকে পাক রেখেছে এবং কলবের দরজার ওঁপর তওহীদের তলোয়ার ও শরীয়তের তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই সংকল্প নিয়ে যে, সৃষ্টি জগতের কাউকেই সে তার কলবের ভেতরে প্রবেশ করতে দেবে না। সে তার কলবকে– যিনি মুক 'াল্লিবা'ল-কু'লূব, (অন্তর-মনের গতিপথ পরিবর্তনকারী) তাঁর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। সে এমন ব্যক্তি যার বাহ্যিক দিককে শরীয়ত ভদ্রতা শেখায় এবং অভ্যন্তর ভাগকে তওহীদ ও মা'রিফত শালীন রাখে।[১]

তিনি বাতিল মা'বূদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন ঃ

আজ তুমি আস্থা স্থাপন করছ নিজের নফসের ওপর, সৃষ্টি জগতের ওপর, টাকা-পয়সার ওপর, ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর এবং নিজ শহরের শাসকের ওপর। প্রকৃতপক্ষে এমন প্রতিটি বস্তু যার ওপর তুমি আস্থা স্থাপন করবে সেই তোমার মা'বূদ। এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যাকে তুমি ভয় করবে কিংবা যার সম্পর্কে কিছু আশা পোষণ করবে, সেই তোমার মা'বূদ। এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যার সম্পর্কে তুমি মনে কর যে, আল্লাহ তা'আলাই তার হাতে তোমার ভাল-মন্দ কিংবা লাভ-ক্ষতির দায়িত্ব দিয়েছেন– সেই তোমার মা'বূদ।[২]

আল্লাহ্র মর্যাদাবোধ, (কল্পিত) অংশীদারদের প্রতি ঘৃণা পোষণ এবং মানুষের প্রিয় বস্তুগুলোর ছিনতাই ও নষ্ট হয়ে যাবার গূঢ় রহস্য সম্পর্কে তিনি বলেন :

---

১. ফুয়ূয-ই-য়াযদানী, তরজমা-আল ফাতহু 'র-রব্বানী, মজলিস ১৩, পৃ. ৮৯।

২. ফুয়ূয-ই-য়াযদানী, তরজমা আল-আল-ফাতহু 'র-রব্বানী-মজলিস ২০, ১৩৭ পৃ.।

তোমরা অনেক সময় বলে থাক, "আমি যাকে ভালবাসি তার সাথে আমার ভালবাসা থাকে না, সে ভালবাসায় ফাটল ধরে কিংবা বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয় অথবা যাকে ভালবাসি সে মারা যায় অথবা তার প্রতি বিরক্তি ও অসন্তুষ্টির কারণ ঘটে। যদি সম্পদ ভালবাসি তাহলে তা নষ্ট হয়ে যায় অথবা হস্তচ্যুত হয়।" তাহলে শোনো, হে আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন! হে আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রাপ্ত! হে আল্লাহ্র চোখের মণি! হে ঐ ব্যক্তি যার জন্য আল্লাহ্র মর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়! তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ্র মর্যাদাবোধ তীব্র! তিনি তোমাদেরকে তাঁর জন্যই পয়দা করেছেন, অথচ তোমরা অন্যের হয়ে থাকতে চাও। তোমরা কি আল্লাহ্র এ বাণী শোননি যে, আল্লাহ ঐ সমস্ত লোকের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট? তোমরা কি আল্লাহ্র এ বাণীও শোননি, "আমি জিন ও মানব জাতিকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমার 'ইবাদত করে!" তোমরা কি রসূল (সা)-এর এ বাণী শোননি, "আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাকে পরীক্ষার মাঝে নিক্ষেপ করেন? যদি সে সবর করে তাহলে তিনি তাকে একাকীত্বের মাঝে ছেড়ে দেন।" জিজ্ঞাসা করা হ'ল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! একাকীত্বের মাঝে ছেড়ে দেবার অর্থ কি?" বলা হ'ল, "তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অবশিষ্ট রাখা হয় না। এটা এজন্য যে, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি থাকলে স্বভাবতই সে ঐগুলোর প্রতি মোহাবিষ্ট থাকবে এবং আল্লাহ্র সঙ্গে তার যে মুহব্বত তা বিভিন্ন পর্যায়ে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে হক ও বে-হকের মধ্যে ভাগাভাগির সৃষ্টি হবে। আর আল্লাহ্ এই ভাগাভাগি বা অংশীদারিত্ব কবূল করেন না।" তিনি সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধসম্পন্ন। প্রতিটি বস্তুর ওপরই তিনি প্রবল ও শক্তিমান, এমন কি তখন তিনি তার শরীরকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দেন যাতে তাঁর বান্দাহ্র দিল খালেস ও নির্ভেজাল থাকে যে কোন শরীক হতে। সে মুহূর্তে তাঁর বাণী, "তিনি ঐ সমস্ত লোককে ভালবাসেন এবং তারাও ভালবাসে তাঁকে"—এর সত্যতা প্রকাশিত হয়, এমন কি দিল্ যখন (আল্লাহ্র ঐ সব কৃত্রিম) শরীক ও দাবিদার থেকে, পরিবার-পরিজন, স্বাদ, সম্পদ, বিলায়েত, রিয়াযত, কারামত, মর্যাদা, জান্নাত, নৈকট্য, এ সব কিছুর কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে যায়— তখন তার ভেতর কোন ইচ্ছা কিংবা আকাঙ্ক্ষাই আর অবশিষ্ট থাকে না। তখন তা ঐ ছিদ্রযুক্ত পাত্রের মত হয়ে যায় যার ভেতর কোন জিনিসই দাঁড়ায় না। যখন তার ভেতর কোন ইচ্ছা ও অভিপ্রায় জাগে তখন আল্লাহ্র কর্ম ও মর্যাদাবোধ তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়, তার দিলের চতুষ্পার্শ্বে মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও ভীতির পর্দা ফেলে দেওয়া হয় এবং

তার ধার ঘেঁষে অহঙ্কার ও প্রভাবের পরিখা খনন করা হয়। এতে তার দিলে কোন জিনিসের আকাঙ্ক্ষাই প্রবেশ করতে পারে না। তখন দিল, আসবাব অর্থাৎ সম্পদ, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, কারামত, হিকমত, বর্ণনাশক্তি কোন কিছুই তার জন্য ক্ষতির কারণ হয় না। কেননা ঐ সব তার দিলের বাইরে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তখন মর্যাদাবোধের ক্ষেত্রে এসবকে আর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেন না, বরং এসব জিনিসই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দার জন্য আনন্দের উপকরণ, কারামত, রিয্ক ও নিয়ামত হিসাবে প্রতিভাত হয়। তখন যে লোকই তার নিকট আসে তিনি তার উপকারার্থে কাজ করেন।[১]

পরাভূত ও পর্যুদস্ত দিলের সান্ত্বনা

হযরত শায়খ (র)-এর যমানায় একটি শ্রেণী এমন ছিল যারা নিজেদের 'আমল, আখলাক ও ঈমানী অবস্থার দিক দিয়ে দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ ছিল, কিন্তু পার্থিব ও জাগতিক দিক দিয়ে ছিল উন্নত ও সৌভাগ্যবান। এর বিপরীতে অপর শ্রেণী ছিল জীবিকার দিক দিয়ে দরিদ্র, পার্থিব ও জাগতিক দিক দিয়ে বঞ্চিত, অসহায় ও নিঃস্ব, কিন্তু 'আমল ও আখলাকের দিক দিয়ে উন্নত এবং ঈমানী অবস্থার দিক দিয়ে ভাগ্যবান ও ঐশ্বর্যশালী। তারা প্রথম শ্রেণীর কামিয়াবী, সাফল্য ও উন্নতিকে কতক সময় ঈর্ষার চোখে দেখত এবং নিজেদেরকে কোন কোন সময় বঞ্চিত ও ব্যর্থ মনে করত। হযরত শায়খ (র) মানসিক দিক দিয়ে সেই পরাজিত ও পর্যুদস্ত শ্রেণীর লোকদের মনকে প্রবোধ দেন, তাদের ওপর আল্লাহ্র যে সব দান ও অনুগ্রহ রয়েছে তার উল্লেখ করে সেই বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যের পেছনে যে গূঢ় কারণ তাও অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

ওহে শূন্য হস্তের অধিকারী ফকীর! ওহে সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে তামাম দুনিয়া বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে! ওহে নাম-নিশানাশূন্য অখ্যাত অজ্ঞাত ব্যক্তি! ওহে ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত, নগ্ন ও ভগ্ন হৃদয় মানব সন্তান! ওহে মসজিদ ও শুঁড়ীখানা থেকে বহিষ্কৃত ব্যক্তি! ওহে প্রতিটি দরওয়াজা থেকে বিতাড়িত বনী আদম! ওহে মনোরথ পূরণে বঞ্চিত, মাটির ওপর পতিত ব্যক্তি! ওহে সেই ব্যক্তি যার দিলে সমাহিত (দাফনকৃত) আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনার ঘর-বাড়ি পুরুষানুক্রমে আবাদ রয়েছে! .... তুমি এটা ব'ল না যে, 'আল্লাহ আমাকে পরমুখাপেক্ষী বানিয়েছেন, দুনিয়াকে আমার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন, আমাকে ধ্বংস ও পয়মাল করে দিয়েছেন, আমাকে পরিত্যাগ করেছেন, আমার

১. রমূযু'ল-গায়ব, ৩২নং নিবন্ধ, ৮৪-৮৬ পৃ.।

সঙ্গে শত্রুতা করেছেন, আমাকে পর্যুদস্ত করেছেন, আমার দিকে এতটুকু তাকান নি, আমাকে অবনমিত করেছেন, দুনিয়াতে আমাকে এতটুকু প্রাচুর্য দেননি, আমাকে নাম-নিশানাহীন ও অজ্ঞাত বানিয়ে রেখেছেন– সৃষ্টি জগতে ও আমার ভাইদের মাঝে, অথচ অন্যের ওপর তাঁর সমস্ত নিয়ামত বর্ষণ করেছেন। ঐ সমস্ত নেয়ামতের ভেতর সে রাত-দিন অতিবাহিত করে, তাকে আমার ও আমার দেশবাসীর ওপর ফযীলত ও মর্যাদা দিয়েছেন, অথচ সেও যেমন মুসলিম, আমিও তেমনি মুসলিম। একই পিতা মাতা–আদম ও হাওয়ার সন্তান আমরা উভয়েই।' (ওহে ফকীর)! আল্লাহ তোমার সঙ্গে এরূপ আচরণ তোমার উপকরার্থেই করেছেন। এই আচরণের ফলেই তোমার প্রকৃতি ও স্বভাব এটেল মাটির মত বালুশূন্য এবং রহমতের বারিধারা বর্ষিত হচ্ছে, তোমার ওপর অব্যাহত ধারায় ধৈর্য, তুষ্টি, আনুকূল্য ও ইয়াকীন,জ্ঞান ('ইল্‌ম), ঈমান ও তওহীদের মত মূল্যবান আলোকরশ্মি তোমার আশেপাশে প্রজ্জ্বলিত। তোমার ঈমানের বৃক্ষ স্বস্থানে সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তাতে কলি হচ্ছে, ফল হচ্ছে, বৃদ্ধি ঘটছে, ডালপালা বিস্তার লাভ করছে। বৃক্ষটি ছায়া দিচ্ছে এবং দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। তাকে বাড়বার, লালন-পালন করবার জন্য সার দেবার দরকার নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার হুকুম থেকে মুক্ত এজন্য যে, তিনি নিজেই তোমার প্রয়োজন সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন। তিনি ইহকালীন জীবনে তোমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং শান্তি-মঙ্গলের অধিকারী বানিয়েছেন। আর পরলোকে তোমার জন্য এত বেশি অনুগ্রহ রেখেছেন, যা কারো চোখ দেখেনি, কারো কান শোনেনি এবং কারো অন্তর তার কল্পনাও করতে পারেনি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় হিসাবে নয়ন প্রীতিকর কী পুরস্কার রক্ষিত আছে।"

অপরদিকে যে সমস্ত লোককে আল্লাহ পাক অনুগৃহীত করেছেন, দুনিয়ায় বিত্ত-সম্পদের অধিকারী করেছেন এবং জাগতিক ও পার্থিব নিয়ামত দান করেছেন, তাদের প্রতি এ আচরণ ও এ অনুগ্রহ করেছেন এজন্য যে, তাদের ঈমানের জায়গাটি এমন বালুকাময় ও প্রস্তর-সংকুল যে, সেখানে পানি আটকিয়ে রাখা এবং উদ্ভিদ, শস্য ও ফলবান বৃক্ষ জন্মানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে তেমন যমীনেও গোবর ও সার প্রয়োগ করে চারা ও বৃক্ষের প্রতিপালন সম্ভব। আর দুনিয়ার সার হচ্ছে ঐ সমস্ত পার্থিব সামান (সাজ-সরঞ্জাম ও উপকরণ), যা দ্বারা ঈমানী বৃক্ষ ও চারারূপী 'আমল যা ঐ ব্যক্তির ভূ-খণ্ডে

গজিয়েছে– তার রক্ষণাবেক্ষণ হতে পারে। যদি ঐ সব উপকরণ তার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় তাহলে চারা গাছ ও বৃক্ষ শুকিয়ে যাবে, তাতে ফল ধরবে না, গোটা সংসারটাই বিরান হয়ে যাবে, অথচ আল্লাহ তা টিকিয়ে রাখার ইচ্ছা রাখেন। অতএব, ওহে ফকীর! জেনে রেখ, ধনবান ব্যক্তির ঈমানী বৃক্ষের ভিত্তিমূল দুর্বল ও কমযোর, আর তোমার ঈমানী বৃক্ষ সজীব ও ফলে-ফুলে সুশোভিত। ধনবান ব্যক্তির ঈমানকে ঐসব জিনিস দ্বারা মযবুত রাখা হয়েছে যা তার আশেপাশে নানা নিয়ামতরূপে তোমার দৃষ্টিগোচর হয়। বৃক্ষের দুর্বলতার সুযোগে যদি এসব বস্তু তার থেকে পৃথক করে দেওয়া হয় তাহলে তার ঈমানী বৃক্ষ শুকিয়ে গিয়ে কুফর ও অস্বীকৃতির বৃক্ষে পরিণত হবে এবং সে মুনাফিক ও ধর্মত্যাগী (মুরতাদ)-দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এ পরিস্থিতিতে অবশ্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর খাস মেহেরবানীতে ধনবানদের প্রতিও সবর ও তুষ্টি, ইয়াকীন ও 'ইলম এবং বিভিন্ন রকমের সেনাবাহিনী পাঠান যার ফলে তার ঈমান শক্তিশালী হয়ে যায় এবং তার থেকে ধনাঢ্যতা ও নিয়ামত আলাদা হয়ে গেলেও সে ওসবের কোন পরওয়া করে না।[১]

দুনিয়ার সত্যিকার মর্যাদা ও অবস্থান

হযরত শায়খ (র) বৈরাগ্যবাদের শিক্ষা দিতেন না। দুনিয়ার ব্যবহার এবং তার থেকে প্রয়োজনানুপাতে উপকার ও কল্যাণ লাভ করতে তিনি কাউকে নিষেধ করতেন না। তিনি শুধু এর পূজা ও দাসত্ব এবং এর প্রতি আত্মিক ভালবাসার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে নিষেধ করতেন। তাঁর ওয়া'জ বস্তুতপক্ষে নবী করীম (সা)-এর হাদীছ– ان الدنيا خلقت لكم وانكم خلقتم للاخرة (তোমাদের জন্য দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে আর আখিরাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদেরকে) অর্থাৎ দুনিয়া তোমাদের জন্য বাঁদী– অনুযায়ী ছিল।

একবার তিনি বলেন :

দুনিয়ার মধ্য থেকে নিজ বণ্টিত দ্রব্য এমনভাবে খেয়ো না যাতে দুনিয়া বসে থাকে আর তুমি থাক দাঁড়িয়ে; বরং তুমি তার থেকে এমনভাবে খাও যাতে তুমি বসে থাক এবং সে পাত্র মাথায় তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। দুনিয়া তারই খিদমত করে যে আল্লাহ তা'আলার অপার রহমতের দরওয়াজায় গিয়ে

---

১. ফুতূহ-ই-য়াযদানী, ২১তম মজলিস, ১৪৫ পৃ.।

(হাত পেতে) দাঁড়ায়, আল্লাহ তাকে অবমানিত করেন। খাও, আল্লাহ্‌র সঙ্গে; সম্মান ও ধনাঢ্যতার কদমের ওপর।[১]

অন্য একবার বলেন :

দুনিয়া হাতে রাখা জায়েয, পকেটে রাখা জায়েয, ভাল কোন নিয়তে তাকে জমা রাখাও জায়েয; কিন্তু হৃদয়ে রাখা জায়েয নয় (যাতে করে অন্তর থেকে তুমি তাকে প্রিয় জ্ঞান করতে শুরু কর)।[২]

খলীফা ও সমসাময়িক শাসকদের সমালোচনা

হযরত শায়খ (র) কেবল ওয়া'জ-নসীহত ও ধর্মের প্রতি মৌখিক অনুপ্রেরণা দানকেই যথেষ্ট মনে করতেন না, বরং যেখানেই প্রয়োজন বোধ করতেন অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় নির্ভীকভাবে আমরু বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার তথা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করাকে অপরিহার্য মনে করতেন। শাসক, সুলতান ও তৎকালীন খলীফারও তিনি কঠোর সমালোচনা করতেন এবং তাঁদের অন্যায় কর্ম ও ভুল সিদ্ধান্তের নিন্দা জ্ঞাপন থেকে পরাঙমুখ থাকতেন না। এ ক্ষেত্রে তিনি কঠোর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ভীতিকর ব্যক্তিত্বেরও কোন পরওয়া করতেন না। হাফিজ 'ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন :

كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر للخلفاء والوزراء والسلاطين
والقضاة والخاصة والعامة يصدعهم بذالك على رؤس الاشهاد ورؤس المنابر
وفى المحافل وينكر على من يولى الظلمة ولا تاخذه فى الله لومة لائم .

তিনি খলীফা, উযীর, সুলতান, বিচারের দায়িত্বে সমাসীন ব্যক্তিবর্গ এবং বিশিষ্ট ও সর্বসাধারণ সবাইকেই আমরু বি'ল-মা'রুফ ওয়া নাহী 'আ-নি'ল মুনকার তথা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতেন এবং অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ও সাহসিকতার সঙ্গে প্রকাশ্য জনসমাবেশে ও মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে তাঁদের ত্রুটি ধরতেন। যিনি কোন জালিমকে শাসক হিসাবে নিযুক্তি দিতেন তিনি তাঁর নিযুক্তির ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করতেন এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দা বাক্যের পরওয়া করতেন না।[৩]

'ক'লাইদু'ল-জাওয়াহির' প্রণেতা লিখেছেন : খলীফা মুক'তাফী লি-আমরিল্লাহ কাযী আবু'ল-ওয়াফা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ ইবন ইয়াইইয়া ইবনু'ল-

১. ফুয়ূয-ই-য়াযদানী, ২১তম মজলিস. ১৪৫ পৃ.।
২. ফুয়ূয-ই-য়াযদানী, ১৫তম মজলিস, ৩৬৩ পৃ.।
৩. ক'লাইদু'ল-জাওয়াহির, পৃ. ৮।

মুজাফ্ফারকে, যিনি 'ইবনু'ল-মুরজাম আজ-জালিম' উপাধিতে কুখ্যাত ছিলেন, কাযী নিযুক্ত করলে হযরত শায়খ (র) প্রকাশ্য মিম্বরে দাঁড়িয়ে খলীফাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন :

وليت على المسلمين اظلم الظالمين ما جوابك غداً عند رب العلمين ارحم الراحمين

তুমি মুসলমানদের ওপর এমন এক ব্যক্তিকে শাসক নিযুক্ত করেছ যার চাইতে বড় জালিম আর নেই। কাল কিয়ামতের ময়দানে তুমি আল্লাহ্ রাব্বু'ল-'আলামীন, যিনি আরহ'ামু'র-রাহি'মীনও বটেন-এর সামনে এর কী জওয়াব দেবে?

উক্ত ঐতিহাসিক আরো বলেন, খলীফা একথা শুনে শিউরে উঠে কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং তখনই উক্ত কাযীকে তার পদ থেকে অপসারিত করেন।[১]

হযরত শায়খ (র) সেই সব "দরবারী ও সরকারী" 'আলিম-'উলামা ও মাশায়েখদের কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন এবং নির্ভীকভাবে তাদের স্বরূপও উদ্‌ঘাটন করতেন যারা তাক'ওয়া ও আল্লাহ-ভীতি ছেড়ে ক্ষমতাসীনদের মোসাহেবী অবলম্বন করেছিল এবং ওদের সুরে সুর মেলানো যাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল, যাদের কারণেই আল্লাহ্র অবাধ্যতার ক্ষেত্রে ঐ সব সুলতান ও শাসকদের দুঃসাহস আরো বেড়ে গিয়েছিল। একবার এই শ্রেণীর লোকদের সম্বোধন করতে গিয়ে বলেন :

ওহে 'ইল্ম ও 'আমলে খেয়ানতকারী ব্যক্তিগণ! তোমাদের সাথে তার কী সম্পর্ক? ওহে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দুশমন দল! ওহে আল্লাহ্র বান্দাদের লুণ্ঠনকারী দুর্বৃত্তের দল! তোমরা প্রকাশ্য জুলুম ও মুনাফিকীতে লিপ্ত রয়েছ। তোমাদের এই মুনাফিকী আর কতদিন থাকবে? ওহে 'আলিমগণ! ওহে বুযুর্গের দল! আর কত দিন তোমরা মুনাফিকী করে বাদশাহ ও সুলতানদের পার্থিব অর্থ-বিত্ত, ধন-সম্পদ এবং তাদের স্ফূর্তি ও কামনা-বাসনার সঙ্গী হয়ে থাকবে? তোমরা ও অধিকাংশ বাদশাহ এ যুগে আল্লাহ্র অবদান ও তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে জালিম ও খেয়ানতকারীতে পরিণত হয়েছ। হে আল্লাহ! এই মুনাফিকদের শান-শওকত তুমি ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও এবং তাদেরকে হেয় ও অপমানিত কর অথবা তাদের তুমি তওবাহ করবার তওফীক দাও। জালিমদের দুর্গ তুমি ধ্বসিয়ে দাও এবং তোমার যমীনকে তুমি তাদের থেকে পবিত্র কর অথবা তাদের সংশোধন কর।[২]

১. ক'লাইদু'ল-জাওয়াহির, পৃ. ৮।
২. ফুয়ূয-ই-য়াযদানী, মজলিস ৫১, পৃ. ৩৬৩।

অন্য একবার এ শ্রেণীরই লোকদের সম্বোধন করতে গিয়ে তিনি বলেন :

তোমাদের কি লজ্জা হয় না যে, তোমাদের লোভ-লালসাই জালিমের খেদমত ও হারামখোরীতে তোমাদের উৎসাহিত করছে! আর কতদিন তোমরা হারাম খাবে এবং কতদিন ঐ সব (জালিম) বাদশাহ্‌র খিদমতগার হিসাবে থাকবে? যাদের খিদমতে তোমরা নিয়োজিত রয়েছ তাদের বাদশাহী শীঘ্রই খতম হয়ে যাবে এবং তোমাদের শেষ পর্যন্ত সেই আল্লাহ্‌র খিদমতে হাযির হতে হবে, যাঁর সত্তা অবিনশ্বর, যিনি ধ্বংস ও পতনের হাত থেকে চির মুক্ত।[১]

দীন (ইসলাম)-এর জন্য অন্তর্জ্বালা ও উৎকন্ঠা

হযরত শায়খ (র) মুসলমানদের ধর্মীয়, নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন (যার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল তখনকার বাগদাদ) প্রত্যক্ষ করে দারুণ যাতনা অনুভব করতেন। তাঁর এই মানসিক অনুভূতি ও বেদনাকে তিনি কতক মুহূর্তে লুকিয়ে রাখতে পারতেন না, তাঁর প্রদত্ত খুতবা ও ওয়া'জে তা উদ্বেল হয়ে উঠত।

একবার তিনি বলেন :

জনাব রসূলুল্লাহ (সা)-এর (আনীত) ধর্মের প্রাচীর ক্রমে ক্রমে খসে পড়ছে এবং তার ভিত্তি ধ্বসে যাচ্ছে। ওহে যমীনের অধিবাসীবৃন্দ! এস, যা পড়ে গেছে আমরা তা মযবুত করে (টেনে) তুলি এবং যা ধ্বসে গেছে তাকে ঠিক-ঠাক করি। একের দ্বারা এ কাজ হবার নয়। আমাদের সবাইকে মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। ওহে চাঁদ ও সুরুজ! ওহে দিন! তোমরা সবাই এস।[২]

আর একবার তিনি বলেন ঃ

ইসলাম কাঁদছে এবং পরিত্রাণ চাচ্ছে ফাসিক, বিদ'আতী, গোমরাহ (পথভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট), ধোঁকাবাজ ও ষড়যন্ত্রের পোশাক পরিহিত মুনাফিকদের বাড়াবাড়ি থেকে। নিজেদের পূর্ববর্তী ও সম্মুখবর্তী লোকদের দিকে তাকিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখ, যারা সৎ কাজে আদেশ দিতেন, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতেন, যারা খানাপিনা করতেন এবং পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করতেন তারা আকস্মিকভাবে ইনতিকাল করে আজ এমনই হয়ে গেছেন যে, মনে হচ্ছে, পৃথিবীর বুকে কোনদিন তাদের অস্তিত্বই ছিল না। কী কঠিন তোমার অন্তর! কুকুরও শিকার করা, ক্ষেত-খামার ও পশুপালের পাহারা দেওয়া এবং সম্পদের হেফাজত করার ক্ষেত্রে আপন মালিকের অনুগত থাকে এবং তাকে দেখে

১. ফুয়ূয-ই-য়াযদানী, মজলিস ৫২, পৃ. ৩৭২; ২. মলফূজাত, ৬৪৯ পৃ.।

খুশীতে লেজ ও মাথা নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করে, অথচ মালিক তাকে সন্ধ্যা বেলা কেবল এক-দুই লুকমা (গ্রাস) খাবারই দেয়। আর তুমি সব সময় আল্লাহ্র দেয়া নানা ধরনের নেয়ামত দ্বারা পরিতৃপ্তি সহকারে উদর পূর্তি করছো। কিন্তু সে সব নেয়ামত দেবার পেছনে দানকারীর যে উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল-না তুমি তা পূরণ করছো, আর না তুমি তার হক আদায় করছো; (বরং এর বিপরীতে) তুমি তাঁর নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করছো এবং শরীয়তের নির্দেশিত সীমারেখার হেফাজত করছো না।[১]

বায়'আত ও তরবিয়ত

তাঁর এসব প্রভাবমণ্ডিত ও বিপ্লবাত্মক ওয়া'জ দ্বারা বাগদাদবাসীদের বিরাট আধ্যাত্মিক (রূহ'ানী), নৈতিক ও চারিত্রিক কল্যাণ সাধিত হয় এবং হাযার হাযার মানুষের জীবন ও যিন্দেগীতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে বটে, তবে জীবনের গভীর পরিবর্তন, সামগ্রিক সংস্কার-সংশোধন ও স্থায়ী প্রশিক্ষণের জন্য দা'ওয়াতের যিনি দা'ঈ-তাঁর সঙ্গে স্থায়ী ও গভীর সম্পর্ক এবং অব্যাহত ও পর্যায়ক্রমিক সংস্কার-সংশোধন ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন বাকী থেকে যায়। ধর্মোপদেশ ও দা'ওয়াতী মজলিস প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মাদ্‌রাসার মত সুশৃঙ্খল ও স্থায়ী হয় না। একমাত্র মাদ্‌রাসার ছাত্র ও শিষ্যদেরকেই ধারাবাহিক ও সুশৃঙ্খলভাবে তা'লীম ও তরবিয়ত দেওয়া এবং তাদের নিয়মিত দেখাশোনা করা সম্ভব। অপরদিকে মজলিসে অংশগ্রহণকারী শ্রোতৃবর্গ স্বাধীন হয়ে থাকেন। এমনও হয় যে, শ্রোতা একবার মাত্র মজলিসে আসেন, দ্বিতীয়বার আর আসেন না কিংবা সর্বদা আসেন, কিন্তু তার অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না, বরং তার জীবনে শূন্যতা এবং ধর্মীয় ও চারিত্রিক ফাটল বহালই থেকে যায়।

মুসলিম জনবসতির বিস্তার, জীবন যাপনের দায়িত্ব বৃদ্ধি এবং রুটি-রূযীর ভাবনা তখন এতখানি বেড়ে গিয়েছিল যে, মাদরাসার মাধ্যমে (যেগুলোকে অনেক রসম-রেওয়াজ ও বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়) সাধারণ ও ব্যাপক সংস্কার-সংশোধন ও প্রশিক্ষণের কাজ নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই বড় ধরনের কোন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিপ্লবও তখন আশা করা যেত না। এমতাবস্থায় মুসলমানদের বিরাট জনসংখ্যার ঈমানী পুনর্জাগরণের এমন কোন্ পথটি খোলা ছিল, যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ধর্মীয় বিধি-নিষেধগুলো পরিপূর্ণ উপলব্ধি ও দায়িত্বানুভূতির সঙ্গে মেনে চলার অনুপ্রেরণা পেতে পারে, তাদের মধ্যে পুনরায় ঈমানী চেতনা ও

১. ঐ, ৬৬১ পৃ. (ফুয়ূয-ই-য়াযদানী);

ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হতে পারে, তাদের মুর্দা দিল ও বিমর্ষ চিত্তে পুনরায় প্রেমের উত্তাপ সঞ্চারিত হতে পারে, তাদের নিঃশেষিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত গ্রন্থি ও অস্থিমজ্জায় আবার চলৎশক্তি ও যৌবনের আমেজ, নফসানী (প্রবৃত্তিজাত) ও রূহ'ানী (আধ্যাত্মিক) রোগ-বাধির চিকিৎসা, ধর্মের ক্ষেত্রে সঠিক আলো ও বিশুদ্ধ হিদায়াত লাভ করতে পারে? পাঠক ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, এই মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল খিলাফতের এবং এটা এজন্য যে, যে নবীর প্রতিনিধিত্ব ও নিসবতের (সম্পর্কের) ওপর এই খিলাফত কায়েম ছিল, সায়্যিদুনা হযরত ওমর ইবন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর ভাষায়: বিশ্ববাসীকে হিদায়াত করবার জন্যই তাঁকে পাঠানো হয়েছিল-রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে নয়; কিন্তু তখনকার খলীফারা এই দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে শুধু গাফিল ছিলেন বা দূরে সরে গিয়েছিলেন তাই নয়, বরং স্বীয় 'আমল ও কৃতকর্মের দিক দিয়েও তাঁরা এর জন্য ক্ষতিকর এবং এ পথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। উপরন্তু তারা এতখানি বদগুমান, কল্পনাপ্রবণ ও সন্দেহপরায়ণ ছিলেন যে, তাঁরা নতুন কোন সংগঠন ও দা'ওয়াতকে– যার ভেতর নেতৃত্ব ও রাজনীতির সামান্যতম গন্ধও পাওয়া যেত, বরাদাশ্‌ত করতে পারতেন না এবং সেটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে প্রয়াসী হতেন।

এমতাবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে নবতর ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টি ও নতুন নিয়ম-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য একটি মাত্র রাস্তাই খোলা ছিল এবং তা হ'ল, আল্লাহ্‌র কোন একনিষ্ঠ (মুখলিস) বান্দা মহানবী (সা)-এর প্রবর্তিত তরীকার ওপর ঈমান, 'আমল ও শরীয়তের আনুগত্যের জন্য বায়'আত নেবেন। মুসলমানগণ তাঁর হাতের ওপর স্বীয় সাবেক গাফিলতী ও জাহেলিয়াতী যিন্দেগী থেকে তওবা করবে এবং ঈমানের পুনরুজ্জীবন ঘটাবে। পয়গম্বরের সেই প্রতিনিধি তাঁদের ধর্মীয় তত্ত্বাবধান ও প্রশিক্ষণ দান করবেন, আপন সাহচর্যের মায়াবী প্রভাব, প্রেমের স্ফুলিঙ্গ ও নফসের উত্তাপ দ্বারা পুনরায় মুসলমানদের ঈমানের মধ্যে উত্তাপ, মুহব্বত, খুলূসিয়াত, আল্লাহ্‌র জন্য সবকিছু বিলিয়ে দেওয়ার মানসিকতা, সুন্নাহ অনুসরণের আবেগ-উৎসাহ এবং পারলৌকিক জীবনের মঙ্গল কামনার উদ্দীপনা সৃষ্টি করে দেবেন। তাঁর সাথে গড়ে ওঠা নতুন সম্পর্ক থেকে তারা অনুভব করবে যে, তারা একটি জীবন থেকে তওবাহ্‌ করে অপর একটি নতুন জীবনে পা রেখেছে এবং আল্লাহ্‌র সত্যিকার একজন বান্দাহ্‌র হাতে হাত দিয়ে দিয়েছে। আর ঐ আল্লাহ্‌র বান্দাও মনে করবেন যে, ঐ সব বায়'আতকারীর সংস্কার-সংশোধন ও প্রশিক্ষণ এবং তাদের দীনী ও ধর্মীয় খিদমত আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর ওপরই সোপর্দ করেছেন। অতঃপর স্বীয় অভিজ্ঞতা, ইজতিহাদ এবং আল্লাহ্‌র কিতাব ও

রসূল (সা)-এর সুন্নাহ্র মূলনীতি ও শিক্ষা মুতাবিক তিনি তাদের ভেতর সঠিক আধ্যাত্মিকতা, তাক'ওয়া, ঈমান, ইখলাস, ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাস, 'আমল ও 'ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে একটি নব জীবন সৃষ্টির কোশেশ করবেন। উল্লিখিত বায়'আত ও তরবিয়তের মাধ্যমেই দীন ধর্মের একনিষ্ঠ দা'ঈগণ স্ব স্ব যুগে ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্জাগরণ এবং মুসলমানদের সংস্কার-সংশোধনের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন এবং আল্লাহ্র লাখ-লাখ বান্দাকে ঈমানের হাকীকত ইহসানের দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এই সোনালী কর্মধারার মস্তিষ্ক ও মধ্যমণি ছিলেন হযরত শায়খ মুহ'য়ি উদ্দীন 'আবদুল কাদির জিলানী (র), যাঁর নাম ও কাম রূহ'ানী সংস্কারের ইতিহাসে সর্বাধিক আলোকোজ্জ্বল। শব্দ, পরিভাষা ও জ্ঞানগত বিতর্ক ছেড়ে দিয়ে যদি সংঘটিত ঘটনা ও প্রকৃত বাস্তবতার ওপর নির্ভর করা হয় তাহলে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, সেই বিশৃঙ্খল ও গোলযোগপূর্ণ যুগে (যা অদ্যাবধি বিরাজ করছে) সংস্কার, সংশোধন ও (ধর্মীয়) প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এর চাইতে অধিক সহজ, প্রভাবমণ্ডিত ও কার্যকর মাধ্যম আর কিছুই ছিল না।

হযরত শায়খ (র)-এর আগে দীন ও ধর্মের দা'ঈ ও একনিষ্ঠ সেবকগণ এ পথেই কাজ করেছেন এবং তাঁদের ইতিহাস এখনও সুরক্ষিত আছে। কিন্তু হযরত শায়খ (র) তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, আল্লাহ্প্রদত্ত রূহ'ানী কামালিয়াত, প্রকৃতিগত উন্নততর যোগ্যতা, দক্ষতা ও ইজতিহাদী শক্তি দ্বারা এ তরীকাকে নবজীবন দান করেছিলেন। তিনি সিলসিলার একজন নামকরা ইমাম ও একজন মশহূর প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতাই কেবল ছিলেন না, বরং এ শাস্ত্রের নতুনতর প্রয়োগ ও বিন্যস্তকরণের কৃতিত্বও তাঁরই। তাঁর পূর্বে এ শাস্ত্র এতটা বিন্যস্ত, সুশৃঙ্খল ও সুপ্রণীত ছিল না। আর এর ভেতর এতটা ব্যাপকতা ও বিস্তৃতিও সাধিত হয়নি যতটা তাঁর জনপ্রিয়তা ও বিরাট মর্যাদার কারণে হয়েছিল। তাঁর জীবনে লাখো মানুষ এ তরীকা থেকে ফায়দা পেয়ে ঈমানের মাধুর্যের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং ইসলামী জীবন ও চরিত্র দ্বারা নিজেদের সুসজ্জিত করে। তাঁর (ওফাতের) পরও তাঁর একনিষ্ঠ খলীফা ও তাঁর মর্যাদাবান তরীকার অনুসারীবৃন্দ গোটা মুসলিম জাহানে আল্লাহ্র প্রতি দা'ওয়াত এবং ঈমানী চেতনা ও পুনর্জাগরণের এই সিলসিলা জারী রাখেন যদ্দ্বারা উপকৃত ব্যক্তির সংখ্যা নিরূপণ করা একমাত্র আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁরই রূহ'ানী শিক্ষা য়ামন, হাদরামাউত ও ভারতবর্ষ, জাভা, সুমাত্রা ও আফ্রিকা মহাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের ঈমানের পরিপূর্ণতা এবং লক্ষ লক্ষ অমুসলিমের ইসলাম কবুলের মাধ্যমে পরিণত হয়।

رضى الله تعالى عنه وارضاه وجزاه عن الاسلام خير الجزاء .

যুগের ওপর প্রভাব

হযরত শায়খ (র)-এর অস্তিত্ব ছিল সেই বস্তুবাদী যুগে ইসলামের একটি জীবন্ত মু'জিযা এবং এক বিরাট গায়বী মদদ। তাঁর ব্যক্তিসত্তা, তাঁর কামালিয়াত, তাঁর প্রভাব, আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর মকবুল বান্দা হিসাবে গৃহীত হবার চিহ্নাদি, আল্লাহ্র মখলূকাতের মধ্যে তাঁর মাহাত্ম্য ও সম্মানজনক মর্যাদার স্বীকৃতি, তাঁর ছাত্র ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাথীদের নৈতিক চরিত্র এবং তাদের জীবন ও চরিত্র সবই ইসলামের সত্যতার দলীল ও তাঁর জীবন্ত কামালিয়াতের প্রমাণ। এটি সেই হাকীকত ও বাস্তব সত্যেরও প্রমাণ ছিল যে, তাঁর মধ্যে (ইসলামে) সত্যিকারের রূহানিয়ত তথা আধ্যাত্মিকতা, আত্মার পবিত্রতা ও আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টির সর্বাধিক যোগ্যতা রয়েছে এবং তার শাহী-ভাণ্ডার কখনো হীরা-জওয়াহেরাত ও দুর্লভ সামগ্রীশূন্য নয়।

ওফাত

দীর্ঘকালব্যাপী বিশ্বকে স্বীয় জাহিরী ও বাতেনী কামালিয়াত দ্বারা উপকৃত করে এবং মুসলিম জাহানে আধ্যাত্মিকতা ও আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাবার বিশ্বজয়ী আনন্দ, সুখ ও স্বাদ সৃষ্টি করে তিনি ৫৬১ হিজরীতে ৯০ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁর পুত্র হযরত শরফুদ্দীন 'ঈসা (র) তাঁর পিতা হযরত শায়খ (র)-এর ওফাতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

> যখন তিনি সেই রোগে আক্রান্ত হন যে রোগে শেষাবধি তাঁর ইনতিকাল হয়েছিল, তখন সাহেবযাদা শায়খ 'আবদুল ওয়াহহাব তাঁকে (শায়খকে) আরয করেন : আপনি আমাকে কিছু ওসিয়্যত করুন যা আপনার পরে আমি আমল করতে পারি। তিনি বললেন : আল্লাহ্কে সদা-সর্বদা ভয় করতে থাকবে এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। তিনি ভিন্ন আর কারো কাছে কোন কিছু প্রত্যাশা করবে না। নিজের যাবতীয় প্রয়োজন আল্লাহ্র হাতে সমর্পণ করবে, কেবল তাঁরই ওপর ভরসা রাখবে সব কিছু তাঁর নিকটই চাইবে, আল্লাহ্ ভিন্ন আর কারোর ওপর আস্থা রাখবে না। তওহীদকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং তাকেই প্রধান অবলম্বন করবে। কেননা তওহীদের বিষয় কারো কোন মতভেদ নেই, বরং এতে সবার ঐকমত্য রয়েছে। তিনি আরো বললেন: যখন মানুষের দিল আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় তখন কোন জিনিসই তার থেকে ছুটে যায় না। তিনি আরো বললেন : আমি আবরণহীন মগজ। স্বীয়

সন্তানদেরকে তিনি বললেন : আমার নিকট থেকে সরে যাও। আমি বাহ্যত তোমাদের সাথে থাকলেও অপ্রকাশ্যে অন্যের সাথে রয়েছি। আমার কাছে তোমরা ছাড়াও আরো বহু লোক (ফিরিশ্‌তা) রয়েছে। তাদের জন্য জায়গা খালি করে দাও এবং তাদের সঙ্গে আদব রক্ষা কর। এখানে বিরাট রহমত নাযিল হচ্ছে। তার জন্য জায়গা সংকীর্ণ করো না। তিনি বারবার বলছিলেন : তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র শান্তি, রহমত ও বরকত (নাযিল) হোক! আল্লাহ্ আমাকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমার ও তোমাদের তওবাহ্ কবূল করুন। বিস্‌মিল্লাহ! এস, ফিরে যেও না। এক রাত ও একদিন সমানভাবে তিনি একথা বলতে থাকেন এবং বলেন ঃ তোমাদের ওপর আফসোস! আমার কোন জিনিসের পরওয়া নেই, না ফিরিশতার, না মালাকু'ল-মওতের। ওহে মালাকু'ল-মওত! আমাদের মহাপ্রভু তোমার চেয়ে অনেক বেশী জিনিস আমাদেরকে দিয়ে রেখেছেন।

যেদিন রাত্রে তিনি ইনতিকাল করেন সেদিন ভীষণ এক চীৎকার দিয়ে উঠেছিলেন। তাঁর দুই পুত্র শায়খ 'আবদুর রাযযাক ও শায়খ মূসা বলেন : তিনি বারবার দু'হাত ঊর্ধ্ব দিকে প্রসারিত করছিলেন এবং বলছিলেন : তোমাদের ওপর সালাম এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত (নাযিল হোক)। মহাসত্যের দিকে ফিরে যাও এবং কাতারে শামিল হও। আমি এখনই তোমাদের কাছে আসছি। তিনি এও বলছিলেন : কোমল ও নম্র আচরণ করো। এরপর আবার মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ তাঁর মধ্যে ফুটে উঠল এবং তিনি বেহুঁশপ্রায় হলেন। তিনি বললেন : আমার ও তোমাদের এবং তামাম সৃষ্টিজগতের মধ্যে আসমান-যমীনের ফারাক রয়েছে। আমাকে অন্যের সঙ্গে ও অন্যকে আমার সঙ্গে তুলনা করো না। এরপর তাঁর সাহেবযাদা শায়খ 'আবদুল 'আযীয তাঁর কষ্ট-তকলীফ ও অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন : আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করো না, আমি আল্লাহ্‌র 'ইলম-এ আবর্তিত হচ্ছি। আমার রোগ কেউ জানে না, কেউ বোঝে না, -না মানুষ, না জিন, না ফিরিশতা। আল্লাহ যা চান পৃথিবীর বুক থেকে মিটিয়ে দেন এবং যা চান পৃথিবীতে বাকী রাখেন। যা কিছু তিনি করেন সে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসিত হতে হয় না, কিন্তু সৃষ্টিকে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হয়।

এরপর তাঁর সাহেবযাদা শায়খ 'আবদুল জাব্বার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : আপনার শরীরে কোথায় তকলীফ দিচ্ছে? তিনি বললেন : আমার শরীরের

প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমাকে তকলীফ দিচ্ছে। কিন্তু আমার দিলের কোন তকলীফ নেই এবং তা আল্লাহ্র সঙ্গে সহীহ্-শুদ্ধ আছে। এরপর তাঁর শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এলে তিনি বললেন : আমি সেই আল্লাহ্র সাহায্য ভিক্ষা করছি যিনি ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি পবিত্র, উচ্চতর ও জীবিত; তাঁর ধ্বংসের কোন আশংকা নেই। তিনি পবিত্র! তিনি স্বীয় অপার কুদরত থেকে 'ইযযতের ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্ ভিন্ন কোন মা'বূদ নেই; মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রসূল। শায়খ (র)-এর সাহেবযাদা শায়খ মূসা বলতেন যে, তিনি تعزز (তা'আয্যাযা) শব্দ উচ্চারণ করছিলেন। কিন্তু এ শব্দটি শুদ্ধ ও সুস্থভাবে তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়নি। তিনি বারবার তার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন, এমন কি তিনি সজোরে ও শক্তভাবে শব্দটি নিজের মুখ দিয়ে ঠিক ঠিকভাবে উচ্চারণ করেন। এরপর তিনবার আল্লাহ! আল্লাহ! আল্লাহ! বললেন। এরপর তাঁর আওয়াজ মিইয়ে যায়, জিহ্বা তালুর সঙ্গে লেগে যায় এবং তাঁর রূহ মুবারক মহালোকে যাত্রা করে। رضى الله عنه وارضاه .

হযরত শায়খ (র) এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, কিন্তু পশ্চাতে ছেড়ে যান দীন (ইসলাম)-এর বিরাট আহ্বায়ক (দা'ঈ) দল এবং নফ্স ও আখলাকের মুরুব্বীদের একটি সংঘবদ্ধ জামা'আত যারা তাঁর মিশনকে অব্যাহত রাখেন এবং অগ্রসরমান বস্তুবাদের মুকাবিলা করতে থাকেন।[১]

১. হযরত শায়খ (র)-এর পর যে সব 'আরিফ ও সংস্কারক দল দাওয়াত, উপদেশ প্রদান ও মানুষকে প্রশিক্ষণ দানের কাজ অত্যন্ত জোরেশোরে ও ব্যাপকভাবে জারী রাখেন এবং আলস্য ও পার্থিব মগ্নতার মুকাবিলা এবং চারিত্রিক ও প্রবৃত্তিজাত রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা করেন, তাঁদের মধ্যে শায়খ (র)-এর ফয়েযপ্রাপ্ত এবং বাগদাদের শায়খ আবু'ন-নজীব সুহরাওয়ার্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও খলীফা শায়খু'শ-শুয়ূখ আবূ হা'ফস শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী ছিলেন (৫৯৩-৬৩২ হি.) সর্বাধিক খ্যাতির অধিকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যিনি সুহরাওয়ার্দীয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা এবং তাসাওউফের জনপ্রিয় কিতাব 'আওয়ারিফু'ল-মা'আরিফ'-এর লেখক।

ইবনে খাল্লিকান লিখছেন : لم يكن فى اخر عمره فى عصوره مثله وكان شيخ شيوخ ببغداد –

শেষ বয়সে তাঁর যুগে তিনি ছিলেন নজীরবিহীন। তিনি ছিলেন বাগদাদের সর্বশ্রেষ্ঠ শায়খ।[১]

ইবনু'ন-নাজ্জার বলেন : انتهت اليه الرياسة فى تربية المريدين ودعاه الخلق الى الله .

(মুরীদদের তরবিয়ত ও আল্লাহ্র দিকে দা'ওয়াত জানাবার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সৃষ্টি জগতের লক্ষ্য ও প্রত্যাবর্তন-স্থল)।[২] ইবনে খাল্লিকান বলেন : তাঁর যুগের মাশায়েখগণ দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর দিকে ছুটে আসত এবং উপকার ও কল্যাণ লাভ করত।[৩] শায়খ (র)-এর ওয়া'জ থেকে আল্লাহ্র মখলূকাত খুবই কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। (পূর্ব পৃ. পর) ইবনে খাল্লিকানের ভাষায় : وكان له مجلس وعظ وعلى وعظه قبول كثير وله نفس

১. ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, ৩য় খণ্ড, ১১৯ পৃ. (আন্নাহ্দাতু'ল-মিসরিয়্যা)।
২. মির'আতু'ল-জিনান লি'ল-য়াফি'ঈ, ৪র্থ খণ্ড, ৮১ পৃ.।
৩. ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, ৩য় খণ্ড, ১২০ পৃ.।

দশম অধ্যায়

'আল্লামা ইব্ন জওযী (র)

'আবদুর রহমান ইবনে জওযী (র) ছিলেন ইসলামের দা'ওয়াত ও সংস্কার-সংশোধনের ক্ষেত্রে আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুফাস্সির, মুহাদ্দিছ, ঐতিহাসিক, সমালোচক, গ্রন্থকার ও বাগ্মী। উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ের ওপর তাঁর বিরাট বিরাট গ্রন্থ ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা রয়েছে।

প্রাথমিক অবস্থা ও 'ইল্ম হাসিল

তিনি ৫০৮ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। এ হিসাবে হযরত শায়খ[১] (র)-এর চেয়ে বয়সে তিনি ২৭ বছরের কনিষ্ঠ ছিলেন। শৈশবেই তিনি পিতার স্নেহছায়া থেকে বঞ্চিত হন। পড়াশোনার বয়স হতেই তাঁকে তাঁর মামা মশহূর মুহাদ্দিছ ইবনে নাসিরের মসজিদে রেখে আসেন। তাঁর কাছ থেকেই তিনি হাদীছের পাঠ গ্রহণ করেন, কুরআন মজীদ হিফ্জ করেন এবং তাজবীদশাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি হাদীছের শায়খগণ থেকে হাদীছ শ্রবণ ও তা লিপিবদ্ধ করেন এবং কঠোর পরিশ্রম, নিবিষ্টচিত্ততা ও সাধনার সাথে জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেন। স্বীয় পুত্রের কাছে আপন জীবনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন:

مبارك (তাঁর ওয়া'জের মজলিস বসত এবং আলাহ্তা'আলা তাঁর ওয়া'জের বিরাট ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা দান করেছিলেন। আর তাঁর ছিল একটি পবিত্র মঙ্গলময় সত্তা)।

তাসওউফকে বিদ'আতের হাত থেকে পবিত্রকরণ এবং কু'রআন ও সুন্নাহ্কে তাঁর উৎসে পরিণত করার ক্ষেত্রে হযরত শায়খ (র)-এর মুজাদ্দিদসুলভ ভূমিকা রয়েছে। তৎ প্রণীত "আওয়ারিফু'ল-মা'আরিফ" শীর্ষক গ্রন্থটিকে এ শাস্ত্রের প্রাচীন কিতাবগুলোর সাথে তুলনামুলকভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখলে তাঁর মুজাদ্দিদসুলভ কর্মের পরিমাপ করা যাবে।[১] আল্লাহ্ তা'আলা শায়খ শিহাবুদ্দীন (র)-কে উন্নতমানের ও উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিনিধি (খলীফা) দান করেছিলেন যাঁরা দা'ওয়াত ও তরবিয়তের কাজ অত্যন্ত জোরেশোরে ও ব্যাপকভাবে আঞ্জাম দেন। তাঁর একজন খলীফা শায়খু'ল-ইসলাম শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী (র) দ্বারা ভারতবর্ষে যে প্রচুর ফয়েয পৌঁছেছে এবং আল্লাহ্র মখলূকাত তাঁর থেকে যে ব্যাপক হেদায়েত ও বিরাট উপকার পেয়েছে তার দৃষ্টান্ত বিরল।

---

১. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান মরহুম লিখেছেন ঃ

---

১. হযরত 'আবদুল কাদির জিলানী (র)

আমার খুব মনে আছে যে, আমি ছ' বছর বয়সে মকতবে প্রবেশ করি। আমার চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সের ছাত্ররা ছিল আমার সহপাঠী। আমি রাস্তায় কখনো ছেলেপেলেদের সাথে খেলা করেছি কিংবা উচ্চৈঃস্বরে হেসেছি–এমন কথা আমার মনে পড়ে না। সাত বছর বয়সেই আমি জামে মসজিদের সামনের ময়দানে চলে যেতাম। সেখানে কোন বাজিকর কিংবা কলা-কৌশল প্রদর্শনকারীর কাছে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখবার পরিবর্তে আমি কোন মুহাদ্দিছের দরসে হাদীছের মহ্ফিলে শরীক হতাম এবং সেখানে হাদীছ ও সীরাত বিষয়ক যে সব কথাবার্তা শুনতাম তা মুখস্থ করতাম। এরপর ঘরে গিয়ে তা লিখে নিতাম। অন্যান্য ছেলে যখন দজলা (টাইগ্রীস) নদীর ধারে খেলা করত, তখন আমি একটি কিতাব নিয়ে অন্য কোন দিকে চলে যেতাম এবং সবার অগোচরে কোথাও বসে নিবিষ্ট মনে তা অধ্যয়ন করতাম। আমি উস্তাদ ও শায়খগণের মাহফিলে হাযিরা দেবার জন্য এতটা তাড়াহুড়া করতাম যে, দৌড়াবার কারণে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস ফুলে উঠত। সকাল-সন্ধ্যা এমনভাবে অতিবাহিত হ'ত যে, খাবারের কোন ব্যবস্থাই হ'ত না। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া যে, তিনি সৃষ্টিজগতের উপকারিতার প্রত্যুপকারের হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছেন।[১]

হাদীছ লিখবার ক্ষেত্রে গভীর আত্মনিবিষ্টতা

হাদীছ শ্রবণ ও লিপিবদ্ধকরণে তিনি এত আত্মনিবিষ্ট ছিলেন এবং নিজের হাত দিয়ে এত বেশি হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন যে, কতক ঐতিহাসিকের মতে, ইনতিকালের সময় তিনি ওসিয়্যত করে যান যে, তাঁর লাশ গোসল দেবার পানি যেন কাঠ পেন্সিলের সেই কর্তিত অংশ ও টুকরো দিয়ে গরম করা হয় যেগুলো হাদীছ লিখবার জন্য কলম বানাতে গিয়ে তাঁর কাছে স্তূপীকৃত হয়ে পড়েছিল। অনন্তর তার পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, পানি গরম করবার পরও তার কিছু অংশ বেঁচে যায়।[২]

অধ্যয়নের আগ্রহ

অধ্যয়নের প্রতি শৈশব থেকেই তাঁর সীমাহীন আগ্রহ ও লিপ্সা ছিল। বাগদাদের বিশাল বিস্তৃত কুতুবখানা (লাইব্রেরী) ছিল রাশি রাশি পুস্তক দ্বারা ভর্তি আর

---

১. লাফতাতু'ল-কাবাদ ফী নাস'হি'াতি'ল-ওয়ালাদ, ৮১-৮২ পৃ.।
২. ইবনে খাল্লিকান, ৩য় খণ্ড ৩২১ পৃ.।

কিতাব অধ্যয়ন ছিল ইবনে জওযী (র)-এর প্রিয় নেশা। তাঁর এই অধ্যয়ন বিশেষ কোন শাস্ত্র কিংবা বিষয়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট ছিল না। তিনি যে কোন বিষয়বস্তুর ওপর লিখিত কিতাবস পড়তেন। কিছুতেই যেন তাঁর তৃপ্তি আসত না। صيد الخاطر নামক গ্রন্থে যা তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিচ্ছবি, তিনি বলেন :

> আমি আমার নিজের অবস্থা বর্ণনা করছি। কিতাব অধ্যয়ন দ্বারা কিছুতেই আমার তৃষ্ণা মেটে না। যখনই নতুন কোন গ্রন্থের ওপর চোখ পড়ে তখনই আমার মনে হয় যেন আমি কোন গুপ্তধন পেয়ে গেছি। যদি আমি বলি যে, আমি বিশ সহস্র কিতাব অধ্যয়ন করেছি তাহলে এটা কারো কাছে খুব বেশি মনে হতে পারে। কিন্তু এটা প্রকৃতই আমার ছাত্রজীবনের ঘটনা। ঐসব কিতাব অধ্যয়ন করে আমি প্রাচীন বুযুর্গদের অবস্থা, তাঁদের উন্নত মনোবল, স্মৃতিশক্তি, 'ইবাদতের প্রতি আগ্রহ ও দুর্লভ জ্ঞানের এমন সব কথা জানতে পেরেছি যা ঐসব কিতাব অধ্যয়ন ব্যতিরেকে জানা সম্ভব ছিল না। এই অধ্যয়নের মধ্যে আমার কাছে আমার যুগের লোকদের সাধারণ মান এবং এ যুগের ছাত্রদের মানসিক দুর্বলতার দিকটি পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে।[১]

গ্রন্থ প্রণয়ন ও গভীর পাণ্ডিত্য

'আল্লাম ইবনে জওযী (র) জীবনের প্রথম থেকেই পুস্তক রচনা ও গ্রন্থ প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। দৈনিক চার জুয (১৬ পৃষ্ঠার একটি ফর্মা) লেখা ছিল তাঁর আজীবনের অভ্যাস। হাফিজ ইবনে তায়মিয়া বলেন, "আমি তাঁর রচনাসমূহের সংখ্যা নিরূপণের চেষ্টা করি এবং দেখতে পাই যে, তা হাযার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।" হাদীছ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান এত বিস্তৃত ছিল যে, তিনি দাবি করে বলতেন ঃ প্রতিটি হাদীছ সম্পর্কেই বলতে পারি তা সহীহ্ কিংবা আদৌ হাদীছই নয়.। সাহিত্য রচনা ও বাগ্মিতার দিক দিয়ে বাগদাদে তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

তাক্‌ওয়া ও 'ইবাদতের প্রতি আগ্রহ

এসব জ্ঞানগত পাণ্ডিত্যের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সততা, সাধুতা, আল্লাহ্-ভীতি ও 'ইবাদত প্রীতির ন্যায় মহামূল্য গুণাবলী দান করেছিলেন। তাঁর দৌহিত্র আবুল মুজাফফার বলেন ঃ ইবনে জওযী প্রতি সপ্তাহে একবার কুরআন শরীফ খতম করতেন এবং কখনো কারো সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করতেন না। শৈশবে

---

১. স'য়দু'ল-খাতি'র, ৩য় খণ্ড, ৬০৭-৮ পৃ.।

তিনি কোন শিশু কিংবা বালকের সঙ্গে খেলা করেননি। তিনি কখনো সন্দেহযুক্ত কোন জিনিস খাননি। জীবনভর তাঁর এই অভ্যাসই ছিল। ইবনু'ন-নাজ্জার বলেন : তিনি ছিলেন সুরুচির অধিকারী এবং মুনাজাতের মিষ্টতা ও দু'আর স্বাদ সম্পর্কে অবহিত। ইবনু'ল-হারিসী বলেন, "তিনি সারা রাত জেগে 'ইবাদত করতেন এবং কখনো আল্লাহ্র যিক্র (স্মরণ) হতে গাফিল হতেন না। তাঁর রচিত গ্রন্থ, অবস্থা ও হালচাল থেকে জানা যায় যে, তিনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চোখ ও জাগ্রত দিলের অধিকারী ছিলেন। তিনি গোটা সৃষ্টিকে ও আল্লাহ্র সংগে সম্পর্ককে জীবনের মহামূল্যবান পুঁজি মনে করতেন। এ ক্ষেত্রে এতটুকু কমতি পরিলক্ষিত হলেই তিনি অস্থির ও চঞ্চল হয়ে উঠতেন। صيد الخاطر নামক গ্রন্থে তিনি তাঁর একটি অবস্থার কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন :

জীবনের শুরুতেই আমার ভেতর 'যুহ্দ' (সাধনা) এখতিয়ার করবার একটা প্রেরণা ও অভ্যন্তরীণ দাবি ক্রিয়াশীল ছিল। সিয়াম পালন ও নফল 'আমল খুব যত্ন ও আন্তরিকতার সঙ্গেই করতাম। নিঃসঙ্গ ও একাকী থাকাই আমার কাছে বেশি পছন্দনীয় ছিল। তখন আমার দিলের অবস্থা ছিল খুব ভাল। আমি উজ্জ্বল দূরদৃষ্টি ও তীব্র অনুভূতির অধিকারী ছিলাম। দৈনন্দিন জীবনের কোন মুহূর্ত আল্লাহ্র আনুগত্যের বাইরে অতিবাহিত হলে সেজন্য আফসোস হ'ত। প্রতিটি সেকেন্ডই আমার কাছে মূল্যবান মনে হ'ত এবং তাতে অধিক থেকে অধিকতর 'আমল ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনার প্রেরণা জাগ্রত হ'ত। আল্লাহ্র সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক এবং দু'আর মধ্যে মিষ্টতা ও স্বাদ অনুভূত হ'ত। এরপর আমার মনে হ'ল যে, কতক শাসক ও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে সমাসীন ব্যক্তিবর্গ আমার ওয়া'জ ও বক্তৃতা-মাধুর্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং তাঁরা আমাকে তাঁদের দিকে আকৃষ্ট করছেন আর আমার প্রকৃতিও সেদিকে ঝুঁকে গেছে। ফল দাঁড়াল এই যে, দু'আ ও মুনাজাতে এককালে যে স্বাদ পেতাম তা আমা থেকে বিদায় নিতে থাকল। এরপর অপরাপর শাসকও আমাকে তাঁদের দিকে টানতে থাকে। আমি (সন্দেহযুক্ত জিনিসের ভয়ে) তাঁদের ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব এবং তাঁদের খানাপিনা থেকে গা বাঁচিয়ে চলতাম। আমার অবস্থা তখন মন্দ কিছু ছিল না। এরপর ক্রমান্বয়ে আমার ভেতর তা'বীল (ভিন্ন অর্থ ও ভিন্ন ব্যাখ্যা)-এ দ্বার উন্মুক্ত হতে লাগল। আমি মুবাহ বস্তুর ক্ষেত্রভূমিতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে শুরু করলাম। তখন আমা থেকে সেসব বিশেষ অবস্থা বিদায় নিতে থাকল। যতই আমি ঐসব শাসকের সঙ্গে মিশতাম এবং ওঠা-বসা করতাম আমার আত্মার (কলবের) অন্ধকার ততই বৃদ্ধি পেত, এমন কি আমি অনুভব

করলাম যে, আমার সেই আলো নিভে গেছে এবং কলব অন্ধকার ডুবে গেছে। এ রকম অবস্থায় পতিত হওয়ায় আমার স্বভাব ও প্রকৃতির মাঝে এক ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি হ'ল এবং এই অস্থিরতার প্রভাব ওয়া'জ-মাহফিলের শ্রোতৃবর্গের ওপর এমনভাবে পড়ল যে, তারাও অস্থির হয়ে উঠত। আর এই অস্থিরতার কারণে তাদের বেশির ভাগ লোকের তওবাহ্ করার ও সংশোধিত হবার তওফীক জুটত। কিন্তু আমি যে খালি হাত ছিলাম সেই খালি হাতই থেকে যেতাম। নিজের এই দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্য দৃষ্টে আমার অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল কিন্তু চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই চোখে পড়ল না। এরপর আমি সালিহীন (আল্লাহ্র সৎ বান্দাহ্)-দের কবর যিয়ারত শুরু করি এবং আল্লাহ্র নিকট আমার নিজের দিলের ইসলাহের জন্য দু'আ করতে থাকি। শেষাবধি আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানী আমাকে সহায়তা করল এবং আমাকে আস্তে আস্তে নির্জনতার দিকে টেনে নিল। সেই দিল্ যা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল তা পুনরায় আমার আয়ত্তে ফিরে এল। যে অবস্থা আমার খুব ভাল মনে হ'ত– তার দোষ-ত্রুটি আমার সামনে প্রকাশ পেল। আমি আলস্যের সেই নিদ্রা থেকে জাগরিত হলাম এবং আমি আমার মেহেরবান ও সদয় প্রভুর (আল্লাহ্র) দিল্ খুলে শুকরিয়া আদায় করলাম।[১]

বাহ্যিক সৌন্দর্য ও গুণাবলী

ইবনে জওযী এই অফুরন্ত ও অবিনশ্বর সম্পদ লাভের সাথে সাথে পার্থিব সম্পদ, স্বাস্থ্য সম্পদ ও সৌন্দর্য সম্পদেও ধনী ছিলেন। মুওফিক 'আবদুল লতীফ বলেন : তিনি খুবই উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ, উত্তম খাদ্য ও সুরুচিপ্রিয় ছিলেন। ইবনু'দ্দীনী বলেন : তিনি মধুর বাচনভঙ্গী, খোশ ইলহান (সুন্দর স্বর), মধ্যম আকৃতি ও সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সর্বদাই উদার হস্তের অধিকারী ও সম্মানিত করে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর স্বাস্থ্য ও মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে খুবই সচেষ্ট ছিলেন। তিনি এমন সব জিনিস ব্যবহার করতেন যা মেধা ও মেযাজের সূক্ষ্মতা রক্ষার্থে সহায়ক। صيد الخاطر এ স্থানে স্বাস্থ্য রক্ষা, মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখা এবং খারাপ ও মন্দের হাত থেকে বেঁচে থাকার বিষয়ে তিনি উপদেশ দিয়েছেন। 'তাল্বীসু'ল-ইবলীস' নামক গ্রন্থে যুহ্দ-এর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও কঠোর কঠিন অনারবীয় প্রবণতার তিনি সমালোচনা করেছেন।

---

১. صيد الخاطر -১ম খণ্ড, ১২১, ১২২।

উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হবার প্রতি আগ্রহ

তাঁর বিশেষ গুণ হ'ল, উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন, কামালিয়াত অর্জন ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হবার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল, যা তিনি তাঁর অবস্থাসমূহের ভেতর দিয়ে নানা স্থানে প্রকাশ করেছেন। আবার তিনি কখনো কখনো অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সমালোচনাও করেছেন যখন তাদের উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিজ আশা-আকাঙ্ক্ষার সামনে খাটো ও সীমাবদ্ধ দেখতে চেয়েছেন। 'সায়দু'ল-খাতির' গ্রন্থে এক স্থানে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন :

> মানুষের জন্য মহাপরীক্ষা তাঁর উচ্চাশা ও উন্নত আকাঙ্ক্ষা। কেননা যার আকাঙ্ক্ষা উঁচু হয় সে উচ্চ থেকে উচ্চতর মরতবাকে নির্বাচিত করে। এরপর কখনো যুগ প্রতিকূল হয়, কখনো উপায়-উপকরণ হারিয়ে যায়। ফলে এ সব লোক হামেশা দুঃখ-যন্ত্রণার মাঝে কাল কাটায়। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকেও উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা দান করেছেন। এর কারণে আমিও কষ্টের মাঝে আছি। কিন্তু আমি এও বলি না, হায়! আমাকে, যদি এই উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা না দান করা হ'ত। এর কারণ এই যে, জীবনের পূর্ণ স্বাদ ও আনন্দ লাভ চিন্তা-বুদ্ধি ও অনুভূতিশূন্য হওয়া ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। আর একজন বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী মানুষ এটা কখনো সইতে পারে না যে, তার বুদ্ধির পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হোক এবং জীবনের স্বাদ-আনন্দ বাড়িয়ে দেওয়া হোক। আমি কোন কোন ব্যক্তিকে এমন দেখেছি যারা নিজেদের উচ্চাশা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার আলোচনা বেশ গুরুত্বের সঙ্গে করছেন। কিন্ত গভীরভাবে লক্ষ করে আমি জানতে পারি যে, তাদের সমস্ত উচ্চাশা একই ধরনের এবং তা একটি মাত্র শাখাতেই সীমিত; অন্যান্য শাখায় (যা কতক মুহূর্তে তার মূল শাখা থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে) স্বল্পতা কিংবা ঘাটতির ব্যাপারে তাদের তেমন কোন আক্ষেপ নেই। শরীফ রাদী তাঁর কবিতায় বলেন : প্রতিটি শারীরিক কৃশতার পেছনে একটি কারণ রয়েছে। আমার শরীরের মুসীবত আমার উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আমি যখন তার অবস্থা পর্যালোচনা করলাম, দেখতে পেলাম হুকুমত ছাড়া তার অন্য কোন লক্ষ্য কিংবা কাম্য ছিল না। আবূ মুসলিম খুরাসানী তার যৌবনকালে বিছানায় শয়ন করত না। কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে উত্তরে বলেছিল ঃ আমার মস্তিষ্ক আলোকোজ্জ্বল। উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা, আত্মোন্নতির প্রতি লোভ ইত্যাদি থাকতে অবনত ও সীমাবদ্ধ যিন্দেগী তথা

বিছানায় শয়ন করা কি আমার পক্ষে সম্ভব? কেউ বলল, তোমার তৃপ্তি কী করে হতে পারে? উত্তর ছিলঃ কেবলা সাম্রাজ্য লাভের ভেতর দিয়ে। লোকেরা বলল ঃ তবে তুমি তার জন্য কোশেশ কর। সে বলল ঃ বিপদের মুখে নিজের প্রাণ নিক্ষেপ না করলে এবং জীবনের বাজি না ধরলে তা সম্ভব নয়। লোকে বলল ঃ এতে বাধা কোথায়? সে জানায় ঃ বুদ্ধি বাধা দেয়। জিজ্ঞেস করা হ'ল ঃ এরপর কি করতে চাও? বলল ঃ বুদ্ধির পরামর্শ কবুল করব না, নির্বুদ্ধিতার হাতে জীবনের বাগডোর ছেড়ে দেব, নাদানীর বিপদ খরিদ করব এবং যেখানে বুদ্ধি ব্যতিরেকে আর অগ্রসর হওয়া যায় না শুধু সেখানেই বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করব। আর তা এজন্য যে, নাম-নিশানাহীন জীবন ও দারিদ্র্যের জীবন– এ দু'টো জিনিস পরস্পরের সাথে ওঁৎপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। আমি এই প্রতারিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকের (আবূ মুসলিম) অবস্থার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জানতে পারলাম, সে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটিকে জড়ে মূলে উৎপাটন করে ফেলেছে– আর সে সমস্যা হ'ল পারলৌকিক জীবনের সমস্যা। সে হুকূমত লাভের জন্য পাগল ছিল। এর খাতিরে সে কত রক্তই না ঝরিয়েছে, কত নিরপরাধ আল্লাহর বান্দাকেই না সে হত্যা করেছে! এত কিছুর বিনিময়ে জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাদ-আনন্দের– যা সে চেয়েছিল, অল্পই সে লাভ করেছে। আট বছরের অধিককাল তার ভাগ্যে এই পার্থিব জগতের স্বাদ-আহ্লাদ উপভোগ করবার মওকা মেলেনি। তাকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা হয়। সে স্বীয় বুদ্ধির সাহায্যে নিজের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন বন্দোবস্তই করতে পারেনি, (সাফফাহ্‌র হাতে[১]) নিহত হয়ে দুনিয়া থেকে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় বিদায় নেয়। এমনিভাবে মুতানাব্বী তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাশার বিরাট গীত গেয়েছেন। কিন্তু আমি দেখেছি যে, কেবল জাগতিক স্বার্থ হাসিল ও দুনিয়া প্রাপ্তিই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য।

কিন্তু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার ব্যাপারটা আশ্চর্য ধরনের। আমি জ্ঞানের সেই উচ্চমার্গ হাসিল করতে চাই, যতদূর পর্যন্ত– আমার বিশ্বাস, আমি পৌঁছুতে পারব না। কেননা আমি সব জ্ঞান– চাই তা যে কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কিতই হোক– হাসিল করতে চাই। অতঃপর নিজেকে প্রতিটি জ্ঞানে পরিপূর্ণ তথা সেসব জ্ঞানকে নিজের আয়ত্তাধীন দেখতে চাই। আর এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের একটি অংশও হাসিল করা এই স্বল্পায়ু জীবনে সম্ভব নয়। অতঃপর আমার

---

১. ইতিহাস বলে, আবুল 'আব্বাস সাফফাহ নয়, খলীফা আবু জাফর মনসুরই আবূ মুসলিম খুরাসানীকে হত্যা করেন। –অনুবাদক।

অবস্থা এই যে, যদি কেউ একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে বা শাস্ত্রে কামালিয়াত হাসিল করে আর অন্য শাস্ত্রে তার জ্ঞান ত্রুটিপূর্ণ হয়, তাহলে সে ত্রুটি সহজেই আমার নজরে পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যে, মুহাদ্দিছ ফিক্‌হ্ সম্পর্কে অজ্ঞ আর ফক্বীহ্ হাদীছ সম্পর্কে বেখবর। আমার মতে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে ত্রুটি হীনবল হবার কারণেই হয়ে থাকে। অতঃপর 'ইল্‌ম দ্বারা আমি বুঝতে চাই পরিপূর্ণ 'আমল। আমার মন চায় যে, আমার ভেতর বাশার হাফীর সতর্কতা এবং মা'রূফ কারখীর যুহ্‌দ (এঁরা মুসলিম ইতিহাসের প্রখ্যাত দু'জন সূফী- অনুবাদক।) একত্র হোক। কিন্তু গ্রন্থ রচনার জন্য প্রয়োজনীয় অধ্যয়ন, সাধারণ গণ-মানুষ ও আল্লাহ্‌র বান্দাদের তা'লীম ও কল্যাণ সাধন এবং তাদের সঙ্গে অবস্থানজনিত কর্মব্যস্ততার কারণে তা সম্ভব নয়। এরপর আমি এটাও চাই যে, আমি যেন আল্লাহ্‌র সৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল না হই এবং তাদের থেকে উপকার ও কল্যাণ গ্রহণের পরিবর্তে আমিই যেন তাদের উপকার ও কল্যাণ সাধন করবার উপযুক্ত হই। অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, জীবিকার্জনের জন্য গৃহীত পেশা 'ইল্‌ম-এর প্রতিবন্ধক। অপরের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া এবং তাদের উপহার-উপঢৌকন কবূল করতে আমার মন চায় না। আমি সন্তান-সন্ততিও চাই, আবার উন্নতমানের পুস্তক রচনাও করতে চাই- যাতে করে এসব স্মৃতিচিহ্ন দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পর আমার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে গেলে আমার দিলের পছন্দনীয় ও প্রিয় পেশা একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে পার্থক্য ও স্বভাব-প্রকৃতিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অতঃপর পবিত্র উত্তম বস্ত্রসামগ্রী থেকে বৈধ আনন্দ ও স্বাদ-আহ্লাদ গ্রহণের প্রতিও আমার আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু অর্থবিত্তের স্বল্পতাও এ ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়। এমনিভাবে আমি ঐসব খাদ্যসামগ্রীর প্রতিও আগ্রহী যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, উপযোগী ও কল্যাণকর। এটা এজন্য যে, আমার শরীর পবিত্রতা-প্রিয় ও তৎপ্রতি আগ্রহী। কিন্তু বিত্ত-সম্পদের ঘাটতি এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দেয়। বস্তুতপক্ষে এ সবই পরস্পরবিরোধী দু'টি বস্তুকে একত্র করবার অপচেষ্টা মাত্র। ঐসব লোক আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার মুকাবিলা কী করে করতে পারে যারা কেবল দুনিয়ার প্রত্যাশী? অতঃপর আমি এও চাই যে, আমি যেন এভাবে দুনিয়া লাভ করি যাতে করে আমার দীনে এতটুকু আঁচও না লাগে, তা নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে এবং আমার 'ইল্‌ম ও 'আমলের ওপর কোন বিরূপ প্রভাব ফেলতে না পারে। আমার অস্থিরতার পরিমাপ অন্যে কিভাবে করবে? একদিকে রাত্রি জাগরণ, সতর্কতা ও তাক্‌ওয়া অবলম্বন আমার

প্রিয়, অন্যদিকে 'ইল্ম-এর প্রচার ও প্রসার, সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন, গ্রন্থ প্রণয়ন ও সংকলন এবং শরীর-স্বাস্থ্যের উপযোগী খাদ্য আমার কাম্য। আর এসব কলব (আত্মা)-এর ব্যস্ততা ছাড়া সম্ভব নয়। একদিকে লোকের সঙ্গে মেলামেশা ও তাদের শিক্ষা দান করা জরুরী, অপরদিকে নির্জনতা ও একাকিত্বের অবস্থায় দু'আ ও মুনাজাতের মিষ্টতার মাঝে যদি কমতি পরিলক্ষিত হয় তাহলে তার জন্যও অত্যন্ত দুঃখ ও আফসোস হয়। আমার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের জন্য যদি এমন শক্তি– যা মরে না– তার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে যুহ্দ ও সতর্কতার মানদণ্ডে পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু আমি ঐ সমস্ত তকলীফ ও দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করে নিয়েছি এবং সন্তুষ্ট চিত্তে তা মেনে নিয়েছি। সম্ভবত আমার সংস্কার-সংশোধন ও উন্নতি এই তকলীফ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাঝেই নিহিত। আর তা এ জন্য যে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাশা ঐ সব আমলের চিন্তা-ভাবনায় থাকে যা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের কারণ। আমি আমার নফসের হেফাজত করি এবং তার থেকে সতর্কতা অবলম্বন করি। এর থেকেও আমি সতর্কতা অবলম্বন করি যাতে আমার একটি নিঃশ্বাসও অনর্থক ও বেহুদা কাজে ব্যয়িত না হয়। যদি আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায় তাহলে সুবহা'নাল্লাহ্, অন্যথায় نية المؤمن خير من عمله (মু'মিনের নিয়ত তার কর্মের চেয়ে উত্তম)।[১]

ওয়া'জ-মাহ্ফিল ও তার প্রভাব

তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব তাঁর বিপ্লবাত্মক ওয়া'জ ও দরস মাহফিল। তাঁর এসব ওয়া'জ-মাহফিল গোটা বাগদাদকে অভিভূত ও মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। খলীফা, সুলতান, উযীর, বড় বড় 'আলিম সে সব ওয়া'জ-মাহফিলে অত্যন্ত উৎসাহ ও গভীর আগ্রহ সহকারে যোগদান করতেন। লোকের এত ভীড় হ'ত যে, এক একটি ওয়া'জ-মাহফিলে লক্ষ পর্যন্ত লোক হ'ত। দশ-পনের হাযার লোকের কম কোন মাহফিলেই দেখা যেত না।[২] বক্তৃতার প্রভাব এত গভীর ছিল যে, তা শুনে কোন কোন শ্রোতা বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেত, উন্মত্ত অবস্থায় পরিহিত জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলত, উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার দিয়ে উঠত এবং তাদের চোখ দিয়ে অশ্রুর প্লাবন বয়ে যেত। তওবাকারীদের কোন সীমা-সরহদ ছিল না। পরিমাপ করে দেখা গেছে, বিশ হাযার ইয়াহূদী ও খৃস্টান তাঁর হাতে মুসলমান হয়েছিল এবং এক লক্ষের মত লোক তওবাহ করেছিল।[৩]

১. স'য়দু'ল-খাতি'র—২য় খণ্ড, ৩৩৪-৩৭ পৃষ্ঠা।
২. স'য়দু'ল-খাতি'র—১ম খণ্ড, ২১ পৃ।
৩. প্রাগুক্ত।

ইবনে জওযী তাঁর ওয়া'জের মজলিসে বিদ'আত, নিষিদ্ধ ও গর্হিত বস্তুকে খোলাখুলিভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন এবং বিশুদ্ধ 'আকীদা ও সুন্নাহ্র প্রকাশ ঘটাতেন। তুলনাহীন বাগ্মিতা, জ্ঞানবত্তা ও তাঁর প্রতি জনতার আকর্ষণ দৃষ্টে বিদ'আতীরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবার মত সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি। ওয়া'জ ও দর্স মাহ্ফিল ও তৎপ্রণীত কিতাবাদির মাধ্যমে সুন্নাহ্র ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং সমসাময়িক খলীফা ও আমীর-উমারা ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর (যাঁকে সে যুগে প্রকৃত বুযুর্গ ও তরীকা-ই-সুন্নাহ্র প্রতীক হিসাবে মনে করা হ'ত) ভক্তে ও অনুরক্তে পরিণত হয় এবং তাঁর মাযহাবের প্রতি ঝুঁকে পড়ে।

তাঁর সমালোচনামূলক গ্রন্থ

ইবনে জওযী কেবল মৌখিক ওয়া'জ ও বক্তৃতার ভেতর দিয়েই তাঁর কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করেন নি, বরং তিনি এমন কিছু গ্রন্থও রচনা করেন যেগুলো শিক্ষিত ও পণ্ডিত মহলে প্রভাব ফেলে এবং অনেক ভুল প্রবণতার সংস্কার সাধন করে।

কিতাবু'ল-মাওযু'আত

এটা মাওযূ'আতে হাদীছের ওপর লেখা তাঁর একটি কিতাব। এতে তিনি সে সব হাদীছের হাকীকত (যথার্থতা, মূল তত্ত্ব) বর্ণনা করেছেন যে সব দ্বারা সে যুগের কল্পনাবিলাসী ও প্রবৃত্তি-পূজারীরা শত রকমের গোমরাহী ও ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব ঘটাত। এর দ্বারা তিনি সেই শাখার ওপরই কুঠারাঘাত করেন যার ওপর বিদ'আতীরা বাসা বেঁধেছিল। যদিও এ ক্ষেত্রে স্বয়ং তাঁর দ্বারা কোথাও কোথাও সীমা লঙ্ঘন হয়েছিল এবং কোথাও কোথাও তিনি কঠোর ফয়সালাও প্রদান করেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই কিতাব একটি উপকারী ও কল্যাণকর খিদমত আঞ্জাম দিয়েছিল।

তালবীসে ইবলীস

তাঁর দ্বিতীয় সমালোচনামূলক রচনা 'তালবীসে ইবলীস' যা তাঁর সমালোচক-সুলভ স্বভাব-প্রকৃতি ও প্রাচীন বুযুর্গ (সলফে সালেহীন)-সুলভ স্বাদের আসল নমুনা বহন করছে। উক্ত গ্রন্থে তিনি তাঁর যুগের গোটা মুসলিম সমাজের খতিয়ান টেনেছেন এবং মুসলমানদের প্রতিটি শ্রেণী ও জামা'আতকে সুন্নাহ ও শরীয়তের

মাপকাঠিতে বিচার করেছেন, তাদের দুর্বলতা, ভারসাম্যহীনতা ও ভ্রান্ত ধারণাসমূহ চিহ্নিত করেছেন এবং প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, শয়তান কিভাবে এই উম্মতকে ধোঁকা দিয়েছে এবং কোন্ কোন্ পথ দিয়ে তাদের 'আকীদা, 'আমল ও আখলাকের মধ্যে ছিদ্র ও ধাঁধার সৃষ্টি করেছে। তিনি এই গ্রন্থে কোন শ্রেণী বা কোন ব্যক্তিকেই খাতির করেন নি এবং কাউকে ক্ষমাও করেন নি। এতে তিনি 'উলামা-ই কিরাম, মুহাদ্দিছীন, ফুক'াহা, ওয়ায়েজীন, সাহিত্যিক, কবি, সুলতান, শাসকবৃন্দ, আহলে দীনের সুফিয়া-ই-কিরাম ও জনসাধারণের স্বতন্ত্র দুর্বলতা, ভ্রান্ত প্রথা-পদ্ধতি ও আচার-অভ্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এ গ্রন্থ তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি, জীবন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও দূরদর্শিতার সফল ও সার্থক নমুনা। এ থেকে পরিমাপ করা যায় যে, তিনি শয়তানের কামনা-বাসনা ও রাজনৈতিক কলাকৌশলাদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস ও ভ্রান্ত ফির্কাগুলোর 'আকীদা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন।

বিভিন্ন শ্রেণীর সমালোচনা

এই গ্রন্থে যদিও কোথাও কোথাও তাঁর সমালোচনা সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং ফয়সালা প্রদান করবার ক্ষেত্রে তিনি তাড়াহুড়া ও কঠোরতার আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, এই গ্রন্থে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়, মূল্যবান উদ্ধৃতি ও অনেকগুলো সঠিক ও যথার্থ সমালোচনা পাওয়া যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেনে নিতে হয় যে, তাঁর বজ্র কঠোর আঘাত সঠিক এবং তাঁর সমালোচনা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। এখানে তাঁর কতিপয় নমুনা পেশ করা গেল।

স্বীয় যুগের সে সব 'আলিম-'উলামার, যাঁরা ফিক'হী মসলা-মাসাইলের ছোটখাটো ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় নিয়েই মগ্ন থাকেন, সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

> ঐ ফক'ীহদের একটা দুর্বলতা হ'ল এই যে, তাঁদের গোটা মগ্নতা উল্লিখিত চিন্তা-ভাবনার মধ্যেই সীমিত। তাঁরা তাঁদের শাস্ত্রে সে সব বিষয়বস্তু শামিল করেননি, যদ্দ্বারা হৃদয়ে ভাবাবেগ ও বিনয়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয় স্নেহ-মমতা ও কোমল সহানুভূতির। যেমন– কুরআন মজীদ তিলাওয়াত, হাদীছ ও সীরাত সম্পর্কে আলোচনা শ্রবণ এবং সাহাবা-ই-কিরাম-এর অবস্থা সম্পর্কে অধ্যয়ন ও বর্ণনা। সবাই জানে যে, নাজাসাত ও নাপাকী অপসারণ ও পরিবর্তনশীল মসলার বারবার পুনরাবৃত্তি দ্বারা আত্মায় কোমলতা ও ভীতি সৃষ্টি হতে পারে না। আত্মার জন্য চাই যিক্র-আযকার ও ওয়া'জ-নসীহত, যাতে

পারলৌকিক জীবনের প্রতিও ভীতিহীন আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ইখতিলাফী মসলা-মাসাইল যদিও 'ইলমে শরীয়তবহির্ভূত নয়, কিন্তু তা মানব জীবনের উদ্দেশ্য হাসিল ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। যিনি প্রাচীন বুযুর্গদের অবস্থা এবং তাঁদের হাকীকত ও গোপন রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন, তাঁদের মাযহাব যারা অবলম্বন করেছেন তাঁদের অবস্থা সম্পর্কেও বেখবর রয়েছেন, তিনি তাঁদের রাস্তায় কিভাবে চলতে পারেন? যদি মুতাক'াদ্দিমীন (প্রথম যুগের লোক)-এর অবস্থা ও তরীকা সম্পর্কে অধ্যয়ন করা যায় তাহলে তাদের সঙ্গে চলার আগ্রহ সৃষ্টি হবে, তাদের রঙে রঞ্জিত ও আখলাক-চরিত্র গঠনের আগ্রহ সৃষ্টি হবে। প্রাচীন বুযুর্গদের মধ্যে জনৈক বুযুর্গের উক্তি এই যে, "একটি হাদীছ– যদ্দ্বারা আমার অন্তরে ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়, মন দ্রবীভূত হয়, কোমলতা ও স্নেহরসে সিক্ত হয়– তা কাযী শুরায়হ'-এর এক শত ফয়সালা অপেক্ষাও আমার কাছে বেশি প্রিয়।"[১]

ওয়ায়েজীনদের সম্পর্কে সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

তাদের (ওয়া'জকারীদের) ভেতর অধিকাংশ লোকই খুবই সাজানো-গোছানো এবং খুবই লৌকিকতাপূর্ণ ও আকর্ষণীয় বাক্য ব্যবহার করে, যার অধিকাংশই অর্থহীন। এ যুগে ওয়া'জ-নসীহতের বিরাট অংশই হযরত মূসা ('আ) ও তূর পর্বত এবং হযরত ইউসুফ ('আ) ও যুলায়খা সম্পর্কিত কিসসা-কাহিনী দ্বারা ভরপুর। এসব ওয়া'জ-নসীহতে ইসলামের অপরিহার্য বিধান (ফরয) সম্পর্কে আলোচনা খুব কমই থাকে। কি করে গোনাহ্র হাত থেকে বেঁচে থাকা যায়, সে সম্পর্কেও এতে কোন আলোচনা থাকে না। এমন ওয়া'জ-নসীহত দ্বারা একজন ব্যভিচারী, একজন সুদখোর ব্যক্তির তওবাহ করার উৎসাহ ও শক্তি কিভাবে সৃষ্টি হবে? স্বামীর হক আদায় ও পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে একজন মহিলার আগ্রহ অনুপ্রেরণা কিভাবে সৃষ্টি হবে? এটা এজন্য যে, এসব বিষয় ওয়া'জকারীদের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত থাকে না। ওয়া'জকারীরা শরীয়তকে পেছনে ঠেলে দিয়েছে বলেই তাদের আয়ের বাজার গরম হয়েছে। কেননা হক সর্বদাই মানবীয় প্রকৃতির ওপর বোঝাস্বরূপ এবং বাতিলকে হাল্কা ও মনোরম দেখায়।[২]

তিনি আরো বলেন ঃ

---

১. তালবীসে ইবলীস, ১১৯–২০ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত, ১২৫ পৃ.।

অবশ্য কখনো এমনও হয় যে, ওয়া'জকারী সাচ্চা পথের সৈনিক এবং আম মানুষের কল্যাণকামী হন, কিন্তু সম্মান, প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদার প্রতি আকর্ষণ তার অস্থি-মজ্জায় এমনভাবে প্রবাহিত হয় যে, তিনি মনেপ্রাণে কামনা করেন, লোকে তাকে ভক্তি-সম্মান করুক। এটা তখনই বোঝা যায় যখন দেখা যায় যে, অন্য কোন ওয়ায়েজ যদি তারই মত ওয়া'জ-নসীহতে এগিয়ে যেতে থাকেন কিংবা তারই মত ওয়া'জে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন অথবা মানুষের মন-মগজ ও 'আমল-আখলাক সংশোধনের ক্ষেত্রে কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন তাহলে তার কাছে তা অসহনীয় ও অপছন্দনীয় হয়ে ওঠে। যদি তিনি আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ হতেন তাহলে উল্লিখিত বিষয়াদি অপছন্দ করবার তার কোন কারণই থাকত না।[১]

তিনি বলেন ঃ

যদি ছাত্ররা কোন 'আলিম কিংবা মাদরাসার কোন মুদার্রিসের নিকট গমন করে যিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অগ্রবর্তী, তাহলে (দুনিয়াপূজারী) উক্ত 'আলিমের তা কষ্টকর বলে মনে হয়। আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাহ্র পরিচয় এ নয়। কেননা আল্লাহ্র মুখলিস (একনিষ্ঠ) 'আলিম ও মুদার্রিসের উদাহরণ তো সেই চিকিৎসকের মত যিনি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাঁরই সন্তুষ্টির খাতিরে সৃষ্টি জগতের চিকিৎসা করে থাকেন। কোন রোগীর যখন অপর কোন চিকিৎসকের হাতেও আরোগ্য লাভ ঘটে তখন এ ধরনের চিকিৎসক খুশিই হয়ে থাকেন।[২]

সুলতান ও শাসকবর্গের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেন ঃ

এঁরা শরীয়তের মুকাবিলায় নিজেদের রায় ও মতামত মাফিকই কাজ করেন। তাঁরা কখনো এমন ব্যক্তিরও হাত কেটে থাকেন, যার হাত কাটা জায়েয নয়। কখনো এমন ব্যক্তিকে হত্যা করেন, যাকে হত্যা করা বৈধ নয়। তারা এ ধরনের ধোঁকায় নিপতিত যে, এতো রাজনীতি (অর্থাৎ যেন রাজনীতিতে সব কিছুই বৈধ) যার অন্য অর্থ এই, "শরীয়ত অসম্পূর্ণ, তার পরিপূর্ণতা ও পরিশিষ্টের প্রয়োজন; আর আমরা (শাসকরা) আমাদের মতামত ও অভিমত দ্বারা সেই পরিপূর্ণতা দান করছি"।

শয়তানের এ একটা বিরাট ধোঁকা ও প্রতারণা। প্রকৃতপক্ষে শরীয়ত হ'ল একটি ঐশী রাষ্ট্রনীতি। আর ঐশী রাষ্ট্রনীতিতে এমন কোন বিচ্যুতি কিংবা ঘাটতি থাকতে পারে না, যার জন্য জাগতিক রাজনীতির প্রয়োজন দেখা

---

১. তালবীসে ইবলীস।

২. প্রাগুক্ত, ১৩১ পৃ. (نقد مسالك العلماء الكاملين)

দেবে। আল্লাহপাক বলেন : مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (আমরা কিতাবে কোন কিছুই কম বলি নি)। তিনি আরও বলেন : لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ (তাঁর হুকুম রদ করবার কেউ নেই)। অতএব, এ ধরনের (মানবীয়) রাজনীতির যিনি বা যারা দাবিদার তিনি বা তারা প্রকৃতপক্ষে শরীয়তে বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতার দাবিই করেন। আর এ জাতীয় দাবি কুফরীর শামিল।[১]

ঐ সব শাসক ও মুসলমানের আর একটি দুর্বলতা ও ভ্রান্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

পাপ ও অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপের ব্যাপারে জিদ করার সঙ্গে সঙ্গে নেককার লোকদের সঙ্গে মোলাকাতের আগ্রহও তাদের মধ্যে দেখা যায়। তারা তাঁদের থেকে নিজেদের জন্য দু'আ করিয়ে থাকেন। শয়তান তাদের বোঝায়, এর দ্বারা তোমার গুনাহ্র পাল্লা হাল্কা হয়ে যাবে। অথচ এই নেক কাজের দ্বারা ঐ মন্দ কাজের অপনোদন হতে পারে না।

একবার এক ব্যবসায়ী এক রাজস্ব আদায়কারীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাজস্ব আদায়কারী ব্যবসায়ীর নৌকা থামিয়ে দেয়। ব্যবসায়ী লোকটি সে যুগের বিখ্যাত বুযুর্গ মালিক ইবনে দীনারের নিকট গমন করেন এবং তাঁকে সকল ঘটনা খুলে বলেন। মালিক ইবনে দীনার রাজস্ব আদায়কারীর কাছে যান এবং ব্যবসায়ী লোকটির জন্য সুপারিশ করেন। লোকটি ইব্ন দীনারকে যথেষ্ট তা'জীম করেন এবং বলেন ঃ আপনি কেন কষ্ট করতে এলেন! আপনি তো সেখান থেকেই বলে দিতে পারতেন। আপনার নির্দেশ আমি পালন করতাম। এরপর লোকটি তার জন্য দু'আর দরখাস্ত পেশ করে। এতে তিনি লোকটিকে তার সেই পাত্রের দিকে ইশারা করে (যেখানে সে অবৈধভাবে সংগৃহীত রাজস্ব জমা রাখত) বলেন ঃ এই পাত্রকে বল, সে তোমার জন্য দু'আ করুক। এরপর তিনি বললেন ঃ আমি আর তোমার জন্য কি দু'আ করব যেখানে হাযার হাযার মানুষ তোমার জন্য বদ-দু'আ করছে। এখন তুমিই বল, একজন মানুষের দু'আ শোনা হবে– নাকি হাযার হাযার মানুষের বদ-দু'আ।[২]

এক জায়গায় তাদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

ঐ সব আমীর-উমারা ও দুনিয়াদার লোক 'আলিম-'উলামার ও ফকীহদের তুলনায় বেশরা (শরীয়তবিরোধী) পীর-ফকীর ও গান-বাদ্যরত সূফীদেররই

১. نقد مسالك الولاة والسلاطين ১৩২ পৃ.।
২. نقد مسالك الولاة والسلاطين ১৩৪ পৃ.।

অধিক ভক্ত ও অনুরক্ত। তাদের জন্য তারা উদার ও মুক্ত হস্তে খরচ করে থাকেন। পক্ষান্তরে প্রকৃত 'আলিম-'উলামা ও গুণী পণ্ডিতদের জন্য একটি পয়সা খরচ করাকেও তারা বোঝাস্বরূপ মনে করেন। তাঁদের জন্য খরচ করতে তাদের কষ্ট হয় এজন্যে যে, 'আলিম-'উলামা চিকিৎসকের ন্যায় আর চিকিৎসর জন্য খরচ করা মানুষের নিকট বিরাট বোঝা বলে মনে হয়। কিন্তু ঐ সব বেশরা পীর ও কাওয়ালদের জন্য টাকা-পয়সা খরচ করা গায়িকাদের জন্য খরচ করার ন্যায় আনন্দের বিষয় এবং এ ব্যয় তাদের কাছে গায়ক ও বাজীকরদের গানবাদ্য ও বাজির ন্যায় খেল-তামাশারূপ আনন্দদানকারী বস্তু এবং এগুলোকে পার্থিব সাম্রাজ্যের অপরিহার্য বিষয় বলেই তারা গণ্য করেন।[১]

এ কারণেই তারা এসব নকল সূফী ও ভণ্ড সংসারবিরাগী ফকীর-দরবেশের ভক্তে পরিণত হয় এবং তাদেরকে 'আলিম-'উলামার ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করে। এরা যদি নিরেট মূর্খ জাহিলের শরীরেও দরবেশী পোষাক দেখতে পায় তাহলে তক্ষুণি তার ভক্ত মুরীদে পরিণত হয়। আর উক্ত ভণ্ড পীর-দরবেশ যদি তাদের কাছে মাথা নুইয়ে দেয় এবং বিনয় ও ভীতিমিশ্রিত আবেগ প্রকাশ করে তাহলে তার জন্য উন্মাদ হতেও তাদের এতটুকু দেরী হয় না। তারা বলে, "এ দরবেশের সাথে অমুক 'আলিমের কি তুলনা চলে? ইনি একজন সংসারবিরাগী মানুষ আর উনি দুনিয়াদার, পার্থিব বিষয়সম্পন্ন মানুষ! একজন ভাল ভাল খাবার খান, বিয়ে-শাদী করে সংসার-ধর্ম পালন করেন, আর অপরজন সাধারণ আহার্য গ্রহণ করেন, চিরকুমার থাকেন।" অথচ এটা পরিষ্কার মূর্খতা এবং শরীয়তে মুহাম্মাদীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহ্‌র এ এক বিরাট অনুগ্রহ যে, এ সব লোক আঁ-হযরত (সা)-এর যুগে ছিল না। অন্যথায় এরা তাঁকে বিয়ে-শাদী করতে দেখে, পাক-পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করতে এবং মিষ্টি ও মধুর প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখে তাঁর প্রতিও সম্ভবত মন্দ ধারণা পোষণ করত।[২]

সাধারণ মানুষের সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেন :

শয়তান অনেক সাধারণ মানুষকে এই ধোঁকায় নিক্ষিপ্ত করে রেখেছে যে, ওয়া'জ-নসীহতের মাহফিল ও যিক্‌র-আযকারের মজলিসে শরীক হওয়া এবং এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কান্নাকাটি ও অশ্রু বর্ষণ করাই আসল কাজ। তারা মনে করে যে, নেক মাহফিলে অংশ গ্রহণ ও কান্নাকাটিই আসল উদ্দেশ্য। সে

---

১. نقد مسالك الولاة والسلاطين ৩৭৩ পৃ.।
২. تلبيس ابليس على العوام ৩৮৮-৮৯পৃ.।

জন্য তারা ওয়ায়েজীনের নিকট থেকে ফযীলতের ওয়া'জ শোনে। যদি তারা জানতে পারত যে, আসলে আমলই সব কিছুর লক্ষ্য, তাহলে তারা উপরিউক্ত মনোবৃত্তি নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করত। আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক লোককেই জানি– যারা বছরের পর বছর ধরে ওয়া'জ মাহফিলে শরীক হয়ে আসছে, কাঁদছে, প্রভাবিত হচ্ছে, তথাপি না তারা সূদ গ্রহণ পরিত্যাগ করছে, আর না ব্যবসা-বাণিজ্যে ধোঁকা দেওয়া থেকে বিরত হচ্ছে। সালাতের আরকান-আহকাম সম্পর্কে আগেও যেমন তারা অজ্ঞ ও বেখবর ছিল, আজও তেমন অজ্ঞ ও বেখবর রয়েছে। মুসলমানদের গীবত গাওয়া ও পিতামাতার অবাধ্য থাকার ব্যাপারে তারা আগেও যেমন বাড়াবাড়ি করত, এখনো তেমনি বাড়াবাড়ি করে। শয়তান তাদের এই প্রতারণা দিয়ে রেখেছে যে, ওয়া'জ মাহফিলে হাযির থেকে শুধু অশ্রু বর্ষণ করলেই সব গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। কিছু লোককে শয়তান এই ধারণারও বশবর্তী করে রেখেছে যে, 'আলিম-'উলামা ও নেককার লোকদের সাহচর্যই আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা লাভের (মাগফিরাত) মাধ্যম ও উপকরণ।[১]

ধনিকদের সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন :

তাদের ভেতর বহু লোক মসজিদ ও পুল নির্মাণে অনেক অর্থ ব্যয় করে। লোক দেখানো খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভই তাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তারা কামনা করে, এগুলোর মাধ্যমেই তাদের নাম ও স্মৃতি জাগরূক থাকুক। অনন্তর এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণের জন্য তারা তাদের নির্মিত মসজিদ, পুল প্রভৃতিতে নাম-ফলক স্থাপন করে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই যদি তাদের লক্ষ্য হ'ত তাহলে সে সবের ওপর তারা তাদের নাম উৎকীর্ণ করত না। আল্লাহ্ দেখছেন, তিনি সবই জানেন– এটাকেই তারা তাদের কাজের শ্রেষ্ঠ বিনিময় বলে মনে করত। এ ধরনের লোকদের যদি কেবল একটি দেওয়াল নির্মাণের জন্যই বলা হয় যার ওপর তাদের নাম খোদিত থাকবে না– তাহলে তারা তাতে রাযী হবে না।

এভাবে তারা খ্যাতি ও শোহরত লাভের জন্য মাহে রমযানু'ল-মুবারকে বিভিন্ন মসজিদ ও দরগায় মোমবাতি পাঠিয়ে থাকে, অথচ তার মহল্লার মসজিদ সারা বছরই অন্ধকারে ডুবে থাকে। এটা তারা এজন্য করে যে, দৈনিক অল্প অল্প করে সারা বছরব্যাপী মসজিদে তেল সরবরাহ করলেও সেই নাম ও খ্যাতি আসে না যা রমযানে একটি মাত্র মোমবাতি পাঠিয়ে দিলেই আসে।[১]

১. তালবীসে ইবলীস 'আলা'ল-'আওয়াম, ৩৯৩-৯৪ পৃ.।

সায়দু'ল-খাতির

সায়দু'ল-খাতির তাঁর একটি চয়িত ও সংকলিত গ্রন্থ। এতে গ্রন্থকার তাঁর অন্তর-মানসের প্রতিক্রিয়া, লৌকিকতামুক্ত ধ্যান-ধারণা, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে লব্ধ অভিজ্ঞতা, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চিন্তা-ভাবনা এবং আকস্মিক ঘটনা ও দুর্ঘটনাসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন। নিজের বহু দুর্বলতা ও ভুলের কথা অসংকোচে এবং কোনরূপ রাখ-ঢাক ছাড়াই তিনি স্বীকার করেছেন এ বইয়ে। নফসের সঙ্গে কথোপকথন, প্রশ্নোত্তর, মানসিক দ্বন্দ্বের রোয়েদাদ, সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা, নারী, চাকর-বাকর ও বন্ধু-বান্ধবদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, উপকারী ও কল্যাণকর পথ-নির্দেশনা, দৈনন্দিন ঘটনাবলী, প্রবৃত্তিজাত ব্যাধি, বিভন্ন শ্রেণীর মানুষের পর্যালোচনা, আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মবিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয়ের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন তিনি উক্ত বইয়ের জায়গায় জায়গায়। এ গ্রন্থের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল– এর সত্যতা, অনাড়ম্বরতা ও লৌকিকতামুক্ত বর্ণনাভঙ্গি। সে যুগের সাহিত্যিক ও লেখকদের অনুসৃত পন্থার বিরুদ্ধে সহজ সরল, প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় গোটা গ্রন্থটাই লেখা হয়েছে। কোন আরব 'আলিম ও লেখকের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল এটাই সম্ভবত প্রথম গ্রন্থ।

সাধারণ ঘটনা থেকে বিরাট ফলাফল

ইবনে জওযী এ গ্রন্থের ছোট ছোট ঘটনা ও দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ থেকে বিরাট অর্থ ও ফলাফল বের করেছেন, আর এখানেই একজন সাধারণ মানুষ ও একজন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষের মধ্যকার পার্থক্য ধরা পড়ে। এক স্থানে তিনি লিখেছেন :

> আমি দু'জন মজুরকে দেখলাম, একটি ভারী কড়িকাঠ উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দু'জনই কিছু একটা গাইছিল। তবে একজন গানের একটি পংক্তি গাইছে তো অপরজন গানের মাধ্যমেই সুর-মূর্ছনার সঙ্গে তার জওয়াব দিচ্ছে। একজন যখন কিছু একটা পড়ছে তো অপর জন কান লাগিয়ে তা শুনছে। অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করছে অথবা সে ধরনেরই গানের পংক্তি দ্বারা তার জওয়াব দিচ্ছে। আমার খেয়াল হ'ল যে, যদি তারা এমনটি না করে তাহলে তাদের পরিশ্রম ও বোঝার অনুভূতি বেশি হবে। কিন্তু এই পন্থায় তাদের কাজ সহজ হয়ে যাচ্ছে। আমি বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, এতে করে মস্তিষ্ককে কিছু সময় অন্য কাজে মগ্ন রেখে সেই

---

১. تلبيس ابليس على اصحاب الاموال ৩৯৫ পৃ.।

অবসরে তারা কিছু বিশ্রাম নিয়ে নেয়, কিছুটা আনন্দ লাভ করে এবং এভাবে তাদের মনে কিছু সজীবতার সৃষ্টি হয়। আর এমনি করে সহজেই তারা পথ অতিক্রম করে এবং বোঝার কষ্ট থেকে অন্যমনস্ক থাকার চেষ্টা করে। এই ঘটনা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, মানুষ শর'ঈ বাধ্যবাধকতা, ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিরাট বোঝা মাথায় উঠিয়ে রেখেছে এবং সবচেয়ে বড় বোঝা হ'ল তার নফসজাত বোঝা। এ ক্ষেত্রে বড় কাজ হ'ল, তাকে তার আনন্দদায়ক ও বাঞ্ছিত বিষয়াদি থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং যেসব জিনিসের প্রতি তার দেহমন ততটা আকৃষ্ট নয়, সেসবের ওপর তাকে ধরে রাখা। আমি এর থেকে যে ফলাফল বের করলাম তা হ'ল এই যে, সবরের (ধৈর্য) রাস্তাকে সান্ত্বনা দিয়ে এবং নফ্সকে অনুমোদিত প্রিয় বস্তুর সাহায্যে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। যেমন কোন কবি বলেছেন ঃ

"রাতভর চলার কারণে সওয়ারী যখন ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে এবং আর চলতে পারবে না বলে ফরিয়াদ জানায়, তখন ভোরের উজ্জ্বল আলোক-রেখা সত্বরই ফুটে উঠবে, এই আশার বাণী তাকে শোনাও। আর দিন হতেই তাকে আরামের প্রতিশ্রুতি দাও।"

এ ধরনেরই কাহিনী বাশার হাফী (র) থেকে বর্ণিত আছে। একবার তিনি ও তাঁর সঙ্গী কোথাও যাচ্ছিলেন। সঙ্গীর তেষ্টা পেল এবং বলল ঃ ক্ষণিক দাঁড়ান, আমি এই কুয়া থেকে পানি পান করে নিই। বাশার হাফী (র) তাকে বললেন ঃ একটু সবর কর, সামনের কুয়া থেকে পান করলেই হবে। এরপর যখন পরবর্তী কুয়া এসে গেল তখন তিনি এর পরবর্তী কুয়ার দিকে ইঙ্গিত করে তাকে পুনরায় সবর করতে বললেন। এভাবে বাশার হাফী (র) তার সঙ্গীকে সান্ত্বনা দান করতে করতে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে এলেন। এরপর তাকে বললেন ঃ এভাবেই দুনিয়ার সফর এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। প্রকৃত ঘটনা এই যে, যিনি এই রহস্যটি বুঝতে পারবেন তিনি তার নফসকে ভুলিয়ে রাখতে সক্ষম হবেন এবং নিজের মনকে প্রবোধ দেবেন, যাতে করে সে তার বোঝা সামলে নিতে পারে এবং এ ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করতে পারে। প্রাচীন যুগের কতক বুযুর্গ বলতেন, "হে আমার নফস! আমি যে বাঞ্ছিত সুখ-শান্তি ও আনন্দদায়ক বস্তু থেকে তোমাকে বাঁধা দিচ্ছি এবং ফিরিয়ে রাখছি সে তো কেবল স্নেহ-মমতা ও ভয়ের কারণে।" বায়েযীদ বিস্তামী (র)-এর উক্তি, "প্রথম দিকে আমি যখন আমার নফ্সকে আল্লাহ্র দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতাম

তখন সে বড় কান্নাকাটি করত। অতঃপর হাসি-খুশির মধ্য দিয়েই সে আল্লাহ্র দিকে অগসর হতে লাগল।" মনে রাখতে হবে, নফসকেও যত্ন-আত্তি করতে হবে, করতে হবে তার সাথেও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার। এটা একটা জরুরী বিষয়। এভাবেই এগিয়ে যেতে হয় এবং এভাবেই রাস্তা একদিন ফুরিয়ে যায়।[১]

অন্যত্র লিখেছেন :

আমি দেখেছি যে, শিকারী কুকুর যখন মহল্লার অ-শিকারী কুকুরের পাশ দিয়ে যায় তখন অ-শিকারী কুকুর ঘেউ ঘেউ চিৎকার জুড়ে দেয় এবং শিকারী কুকুরের পেছনে লাগে। কেননা সে দেখে যে, কৃশকায় হওয়া সত্ত্বেও শিকারী কুকুরের বেশ সম্মান। এ কারণেই সে তার ওপর ঈর্ষান্বিত হয়। অপর দিকে শিকারী কুকুর অকর্মণ্য অ-শিকারী কুকুরের দিকে ফিরেও তাকায় না। তাকে সে আদৌ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। তার ঘেউ ঘেউ চিৎকারের সে আদৌ পরওয়া করে না। এথেকে মনে হয়, শিকারী কুকুর যেন ভাবতে শিখেছে, সে তার জাতিগোষ্ঠীর কেউ নয়। কেননা স্থানীয় কুকুরগুলো মোটাসোটা হলেও তাদের হাত-পাগুলো কোন কাজের নয়, তাদের ভেতর বিশ্বস্ততাও নেই। কিন্তু শিকারী কুকুর কৃশকায় হলেও দারুণ ফুর্তিবাজ। তার দেহ হালকা-পাতলা, কিন্তু স্বভাব ও আচার-আচরণ শিষ্ট ও সভ্য-শান্ত। সে যখন শিকার করে তখন শিকারকৃত বস্তুতে মুখ লাগাবার কথা চিন্তাই করে না। মালিকের প্রতি অনুগত থাকার কারণে হোক কিংবা তার প্রতি মালিকের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করেই হোক, সে শিকারকে অক্ষত অবস্থায় মালিকের হাতে তুলে দেয়। এর থেকে একটি কথা তো আমি বুঝলাম যে, দেহ ও চরিত্রের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক আছে। শরীর যদি হয় সূক্ষ্ম তাহলে চরিত্রও হবে সূক্ষ্ম। দ্বিতীয় যেটি জানলাম তা হ'ল এই যে, মানুষ ঐ ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় না যাকে সে তার সমশ্রেণীর কিংবা সমপর্যায়ের মনে করে না। ঠিক তেমনি আল্লাহ্ যাকে ঈমান ও 'আক'ল (বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা) দান করেছেন সে এমন ঈর্ষাকারীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় না যে ঈমান ও 'আক'ল থেকে বঞ্চিত। তাকে সে ভ্রূক্ষেপের যোগ্যই মনে করে না। কেননা সে এক জগতের অধিবাসী, আর এ আর এক জগতের অধিবাসী। একজন দুনিয়ার কারণে ঈর্ষাপরায়ণ এবং অন্যজনের দৃষ্টি সুদূর আখিরাতের প্রতি নিবদ্ধ। আর এ দু'জনের মধ্যে আসমান-যমীনের পার্থক্য বিদ্যমান।[১]

---

১. সয়্যায়দু'ল-খাতিস্থর, ১ম খণ্ড, ১৪৬-৪৭ পৃ.।

জীবনের ঘটনাবলী ও নফ্সের সঙ্গে কথোপকথন

তিনি তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর ভেতর নিজের নফ্সের সঙ্গে বিস্তোচিত কথাবার্তা বলেন। একবার তিনি দু'আ করেন। অপর একজন নেককার বুযুর্গ ঐ দু'আর ভেতর শরীক ছিলেন। দু'আ কবূল হ'ল। কিন্তু কার দু'আ কবূল হল? এ ব্যাপারে নিজের নফসের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয় ঃ

একবার এমন একটি ব্যাপার দেখা দিল যে, তখন আল্লাহ্র নিকট আমার চাইবার ও দু'আ করবার প্রয়োজন অনুভূত হ'ল। আমি দু'আ করলাম এবং আল্লাহ্র নিকট চাইলাম। একজন নেককার বুযুর্গ এই দু'আয় আমার সঙ্গে শরীক হন। দু'আ কবূল হবার কিছু 'আলামত আমি দেখতে পেলাম। আমার নফ্স আমাকে বলল ঃ এটা এ বুযুর্গের দু'আর ফল, তোমার দু'আর ফল নয়। আমি বললাম : আমি আমার এমন অনেক গুনাহ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা জানি যার জন্য আসলেই আমার এ অধিকার নেই যে, আমার দু'আ কবূল হবে। কিন্তু আমার দু'আ কবূল হলেও তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা এই নেককার লোকটি সম্ভবত আমার সে সব গুনাহ ও দোষ-ক্রটি থেকে নিরাপদ আছেন যেগুলো সম্পর্কে আমি অবহিত। কিন্তু তাঁর ও আমার মাঝে একটি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে আর তা হ'ল, আমি আমার নিজের দোষ-ক্রটির জন্য লজ্জিত এবং এজন্য আমার অন্তর-মানসও ভীত-সন্ত্রস্ত। পক্ষান্তরে তিনি তাঁর নিজের ব্যাপারে প্রফুল্লচিত্ত ও আনন্দিত। আর দোষ-ক্রটি সম্পর্কে নিজের স্বীকৃতি এ ধরনের প্রয়োজনের মুহূর্তে অধিক কার্যকর ও প্রয়োজনীয় বস্তু হিসাবে প্রমাণিত হয়। অবশ্য একটি বিষয়ে আমি ও তিনি সমান আর তা হ'ল এই যে, আমাদের উভয়ের ভেতর কেউই স্বীয় আমলের ভিত্তিতে আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রার্থী নই। এখন আমি যদি আমার ভাঙা অন্তর নিয়ে লজ্জায় মাথা নুইয়ে আমার গুনাহর স্বীকৃতি জানিয়ে বলি, "ইয়া আল্লাহ্! তুমি কেবল তোমার অনুগ্রহে আমাকে দান কর, কেননা আমি একেবারে রিক্ত হস্ত", এমতাবস্থায় আমার আশা ও বিশ্বাস যে, আমার আবেদন গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে এও সম্ভব যে, তাঁর (নেককার ব্যক্তির) দৃষ্টি তাঁর উত্তম আমলের ও আখলাকের ওপর পড়বে এবং এটাই তাঁর দু'আ কবূল হবার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। অতএব, হে আমার নফ্স! আমার মন একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিও না। সে তো আগে থেকেই ভেঙে-চুরে একাকার হয়ে আছে। আমি আমার আচরণ সম্পর্কে জানি, আর তা হ'ল শিষ্টাচার (আদব), বিনয়, অতঃপর

১. সা'য়দু'ল-খাতি'র, ৩য় খণ্ড, ৬৩৯-৪০ পৃ.।

নিজের দোষ-ত্রুটির মৌখিক স্বীকৃতি। যে বস্তু আমি চেয়েছি আমি তার ভীষণ মুখাপেক্ষী এবং যাঁর কাছে চেয়েছি তাঁর অনুগ্রহ অপরিসীম। আর এসব বস্তু উক্ত বুযুর্গ সাধকের অর্জিত নয় যে, আল্লাহ্ তাঁর 'ইবাদতে বরকত দেবেন। আমার স্বীকৃতিটাই তো বিরাট কাজের জিনিস।[১]

তিনি অন্যত্র লিখছেন ঃ

একবার আমি একটি ব্যাপারে– যা ছিল শরীয়তের দৃষ্টিতে মাকরূহ– দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলাম। আমার নফ্স আমার সামনে এর ভিন্নতর ব্যাখ্যা পেশ করছিল এবং তার মাকরূহ হবার বিষয়টিকে আমার দৃষ্টি থেকে সরিয়ে দিচ্ছিল। আসলে ঐ ভিন্নতর ব্যাখ্যা ছিল বিকৃত ও ভ্রান্ত এবং জিনিসটি মাকরূহ হবার পেছনে প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট দলীল বর্তমান ছিল। আমি আল্লাহ্র দিকে রুজু করলাম এবং দু'আ করলাম, হে আল্লাহ্! আমার এই দ্বিধান্বিত মানসিকতা দূর করে দাও। আমি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত শুরু করলাম। তিলাওয়াতের ধারাবাহিকতায় সূরা ইউসূফ শুরু হতে যাচ্ছিল। আমি সেখান থেকেই শুরু করলাম। আমার মনের ওপর আগের ধারণাই বিরাজ করছিল। আমি জানতেই পারিনি যে, আমি কি পড়ছিলাম। যখন এই আয়াতে গিয়ে পৌঁছুলাম قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّىٓ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ, তখন আমি চমকে উঠলাম। আমার মনে হল, আমিই যেন এই আয়াতের লক্ষ্য। তৎক্ষণাৎই আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। চোখ থেকে অন্যমনস্কতার পর্দা দূরীভূত হ'ল। আমি আমার নফসকে বললাম, "তুমি কি লক্ষ্য করেছ, হযরত ইউসূফ ('আ) ছিলেন মুক্ত ও আযাদ। তাঁকে জোর-যবরদস্তি করে এবং অন্যায়ভাবে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করা হয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি সেই ব্যক্তির অধিকারের প্রতি যিনি তাঁকে কিনে নিয়েছিলেন, সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন এবং অকপটে তাঁর সদাচরণের স্বীকৃতিও দিয়েছিলেন। তিনি (হযরত ইউসুফ) তাকে 'প্রভু' সম্বোধন করেছিলেন, অথচ সেও ছিল গোলাম। আল্লাহ্ ছাড়া তাঁর কোন প্রভু ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রতি কৃত অনুগ্রহের কারণে কৃতজ্ঞতাস্বরূপই তিনি তাঁকে (মনিবকে) উপরিউক্ত সম্বোধন করেছিলেন এবং বলেছিলেন, اَحْسَنَ مَثْوَاىَ তিনি (ইউসূফের মনিব) আমাকে যত্নের সঙ্গে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এখন একটু নিজের সম্পর্কে ভেবে দেখ! তুমি প্রকৃতই এমন একজন প্রভুর গোলাম যিনি তোমাকে তোমার অস্তিত্বের সূচনা থেকে তোমার প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়ে আসছেন এবং এতবার তোমার গোপনীয়তা রক্ষা করেছেন যার কোন

১. সায়দু'ল-খাতি'র (صيد الخاطر), ১৫৭--৫৮, পৃ.।

সীমা-সংখ্যা নেই। তিনি তোমাকে প্রতিপালন করেছেন, শিখিয়েছেন, পড়িয়েছেন, রূযী দিয়েছেন, হেফাজত করেছেন, কল্যাণের উপকরণ সরবরাহ করেছেন,সর্বোত্তম পথে দাঁড় করিয়েছেন, প্রতিটি প্রতারণা ও শত্রুতার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, উত্তম বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রদানের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ মেধা ও স্বভাবজাত প্রতিভা দান করেছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা তোমার জন্য সহজ করে দিয়েছেন, এমন কি স্বল্পতম সময়ে তুমি সেই সব 'ইল্‌ম (জ্ঞান) লাভ করেছ, যা অন্যেরা দীর্ঘদিনেও লাভ করতে পারেনি। তিনি তোমার মুখে, তোমার ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সহজ ও সাবলীল করে দিয়েছেন এবং অলঙ্কার ও ছন্দ প্রকরণের সঙ্গে সে সবের ব্যাখ্যা করবার শক্তি দান করেছেন। তিনি গোটা সৃষ্টি জগতের কাছে তোমার দোষ-ত্রুটি প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। তোমার সঙ্গে তাঁর কায়-কারবার ভাল ধারণার ওপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কোনরূপ আড়ম্বরতা ও লৌকিকতা ব্যতিরেকেই তিনি তোমার রিয্‌ক তোমার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তোমাকে তিনি কারোর অনুগ্রহ-প্রত্যাশী বানান নি। আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, আমার উপলব্ধিতেই আসে না, তাঁর অনুগ্রহের কোন দিকটি নিয়ে আলোচনা করব ঃ আমাকে প্রদত্ত সুন্দর মুখাকৃতির, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, স্বাস্থ্যের, মস্তিষ্কের সুস্থতার, গঠন-বিন্যাসে ভারসাম্যের, স্বভাব-প্রকৃতির নমনীয়তা ও পবিত্রতার, হীনতা ও নীচতা থেকে মুক্ত থাকার, শৈশব থেকেই সোজা-সরল ও মধ্যম পথে চলার তওফীক দানের, নির্লজ্জতা ও পদস্খলন থেকে হেফাজতের, আল্লাহ্‌প্রদত্ত গ্রন্থ ও সুন্নাহ্ অনুসরণের শক্তিদানের, অন্ধ ও জড় অনুকরণ থেকে মুক্তির অথবা বিদ'আতী লোকের অনুসরণ থেকে রক্ষা পাবার? কোন্‌টা রেখে কোন্‌টার কথা বলব? কোন্ অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব? وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا (যদি তোমরা আল্লাহ্‌প্রদত্ত নে'মত গণনা করতে চাও--তাহলে তা গণনা করতে পারবে না)। কত দুশমন তোমাকে ধরবার জন্য জাল বিছিয়েছে, আল্লাহ্ পাক তার হাত থেকে তোমাকে বাঁচিয়েছেন। তোমার কত বিরোধী তোমাকে অবনমিত করতে চেয়েছে, আল্লাহ্ তোমার মস্তিষ্ক উন্নত রেখেছেন। কত নে'মত থেকে অন্যরা বঞ্চিত রয়েছে, অথচ তোমাকে সে সব নে'মত দ্বারা প্রাচুর্যমণ্ডিত করা হয়েছে। দুনিয়া থেকে কত মানুষই না ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে বিদায় নিয়েছে, অথচ তুমি এখানে সাফল্যের অধিকারী। এমনভাবে তোমার দিন অতিবাহিত হচ্ছে যে, তোমার শরীর সহি-সালামত, তোমাদের দীন ও ধর্ম নিরাপদ, তোমার জ্ঞান ('ইলম) ক্রমবর্ধমান এবং তোমার অন্তরের বাসনা পূর্ণতাপ্রাপ্ত। যদি কোন উদ্দেশ্য

বাস্তবায়িত না হয় তাহলে তাঁর পক্ষ থেকে তোমার ধৈর্য ধারণের উপায় করে দেওয়া হয়। ফলে তুমি জানতে পার, উক্ত উদ্দেশ্য পূরণ না হবার মধ্যে আল্লাহ্‌র কোন্ হিকমত নিহিত ছিল, এমন কি তোমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, এটাই তোমার পক্ষে ভাল ছিল। বিগত দিনগুলোতে আমি যে সব অনুগ্রহ পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম, সে সব যদি আমি গণনা করতে শুরু করি, তাহলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে শেষ করা যাবে না। আর তুমি জান যে, যেসব অনুগ্রহের কথা আমি উল্লেখ করিনি সেগুলো উল্লিখিত অনুগ্রহের চেয়ে অনেক বেশি। সেগুলোর দিকে আমি কেবল ইঙ্গিত করেছি। ঐ সবের সঙ্গে তোমার এমন কর্ম কি করে শোভা পায় যা তাঁর মর্জির খেলাফ? مَعَاذَ اللّٰه اِنَّهُ رَبِّىْ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ اِنَّه لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ (আমি আল্লাহ্‌র শরণ নিচ্ছি, তিনি আমার প্রভু, তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকতে দিয়েছেন; সীমা লঙ্ঘনকারিগণ সফলকাম হয় না)।[১]

অন্যত্র লিখেছেন ঃ

একবার আমি এমন একটি মসলার ওপর আমল করলাম, যা কতক মযহাবে অনুমোদিত থাকলেও অন্যান্য মযহাবে জায়েয ছিল না। এর ওপর আমল করবার কারণে আমি আমার অন্তরে বিরাট আঘাত অনুভব করলাম। মনে হ'ল, আমি যেন স্রষ্টার দরবার থেকে বিতাড়িত এবং তাঁর ক্রোধের পাত্রে পরিণত হলাম। আমি আমার ভেতর কিঞ্চিৎ বঞ্চনা ও গাঢ় অন্ধকার অনুভব করলাম। আমার নফ্‌স আমাকে বলল ঃ কী ব্যাপার! তুমি তো ফকীহদের গণ্ডী অতিক্রম কর নি। আমি বললাম ঃ হে আমার মন্দ নফ্‌স! তোমার প্রশ্নের উত্তর দু'ভাবে দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, তুমি তোমার নিজের 'আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ভিন্নতর ব্যাখ্যার আশ্রয় নিলে। যদি স্বয়ং তোমার নিকট এ বিষয়ে ফতওয়া চাওয়া হ'ত তাহলে তুমি কখনও এ ফতওয়া দিতে না। সে বলল : আমি যদি তা জায়েয বলে স্বীকারই না করতাম তাহলে তা করতামই বা কেন? আমি বললাম : তুমি তোমার এই ধারণা অন্যের জন্যও ফতওয়া হিসাবে পছন্দ করতে না। দ্বিতীয়ত, তোমার অন্ধকারের এই অনুভূতির ব্যাপারে খুশি হওয়ার দরকার এজন্য যে, যদি তোমার অন্তরে (সত্যের) নূর না থাকত তাহলে তোমার ওপর এর আছরই (প্রতিক্রিয়া) পড়ত না। সে বলল: সে যা-ই হোক, আমি সেই অন্ধকারের ভয়ে ভীত যা বারবার ঘুরে ফিরে

---

১. صيد الخاطر ২৮৩-৮৫ পৃ.।

আসে। আমি বললাম: এরপর তুমি সে কাজ ছেড়ে দেবার সংকল্প গ্রহণ কর এবং ধরে নাও যে, তুমি যা ছেড়ে দিয়েছ তা সর্বসম্মতভাবে জায়েয, এতদ্‌সত্ত্বেও তাক'ওয়া ও পরহেযগারীর কারণে তা ছেড়ে দেবার ওয়া'দা কর। অনন্তর এই পথ অবলম্বনের মাধ্যমে সে (নফ্‌স) মানসিক দ্বন্দ্বের হাত থেকে মুক্তি পেল।[১]

প্রাচীন বুযুর্গদের (সল্‌ফ-ই-সালিহীন) জীবনী অধ্যয়নের আবশ্যকতা

মুহাদ্দিছ ও ফক'ীহ্ হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই বাস্তব সত্য সম্পর্কে বেখবর ছিলেন না যে, আত্মার (কল্‌ব-এর) সংস্কার ও সংশোধন এবং (সত্যের প্রতি) প্রেরণা ও আগ্রহ সৃষ্টি করবার জন্য প্রভাবমণ্ডিত ঘটনা ও প্রাচীন বুযুর্গদের জীবনী অধ্যয়ন করা অপরিহার্য। 'তালবীসে ইবলীস' ও 'স'ায়দু'ল-খাতি'র' এই উভয় গ্রন্থেই তিনি ফক'ীহ, মুহাদ্দিছ, ছাত্র-ছাত্রী ও 'আলিম-'উলামাকে এই পরামর্শ দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। 'স'ায়দু'ল-খাতি'র'-এর এক স্থানে তিনি লিখেছেন :

> আমি দেখেছি যে, ফিক্'হ ও হাদীছ শ্রবণের ভেতর তন্ময়তা ও নিবিষ্ট-চিত্ততা আত্মার মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। ফিক্'হ ও হাদীছ শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবমণ্ডিত ঘটনাবলী ও সল্‌ফ-ই-সালিহীনের জীবনী গ্রন্থও অধ্যয়ন করতে হবে। কেবল হারাম-হালালের 'ইল্‌ম (জ্ঞান) মনের ভেতর স্নেহ-কোমল ও কান্না-ভারাক্রান্ত অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে না, তা পারে একমাত্র প্রভাবমণ্ডিত হাদীছ, কাহিনী ও প্রাচীন বুযুর্গদের জীবনী গ্রন্থ অধ্যয়ন। কেননা কুরআন, হাদীছ ও বর্ণিত কাহিনীর যে মূল উদ্দেশ্য তা প্রাচীন বুযুর্গগণ হাসিল করেছিলেন। আল্লাহ্‌প্রদত্ত বিধানের ওপর তাঁদের যে 'আমল তা কাঠামোগত ও বাহ্যিক ছিল না, বরং তাঁরা এসবের আসল স্বাদ ও সার-বস্তু হাসিল করেছিলেন। আর আমি তোমাদের এখন যা বলছি তাও বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান থেকেই বলছি। আমি দেখেছি যে, সাধারণ মুহাদ্দিছগণ ও হাদীছশাস্ত্রের ছাত্রবৃন্দের গোটা মনোযোগ হাদীছের ক্ষেত্রে উচ্চতর সনদ লাভ এবং অধিক সংখ্যক হাদীছ কণ্ঠস্থ করবার দিকেই নিবদ্ধ থাকে। ঠিক তেমনি সাধারণ ফক'ীহদের তামাম মনোনিবেশ তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা-সমালোচনা এবং প্রতিপক্ষকে কিভাবে ঘায়েল ও পরাভূত করা যাবে সে ধরনের 'ইল্‌ম-এর প্রতিই থাকে। অতএব, এ ধরনের আচরণ

১. স'ায়দু'ল-খাতি'র, ২৮৩-৮৫ পৃ.।

দ্বারা অন্তর মানসে কি করে কোমল ও কান্নাভারাক্রান্ত অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে? প্রাচীন বুযুর্গদের একটি দল নেক্কার ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের আচরণ ও কর্মপদ্ধতি দেখবার জন্যই তাঁদের সাথে সাক্ষাত করতেন, তাঁদের কাছ থেকে বাহ্যিক 'ইল্ম শিখবার জন্য নয়। কেননা তাঁদের আচার-আচরণ ও কর্মপদ্ধতিই তাঁদের জ্ঞানের প্রকৃত ফসল ছিল। এই রহস্যটি বেশ ভালভাবে অনুধাবনের চেষ্টা কর এবং হাদীছ শিক্ষার সাথে সাথে সল্ফ-ই-সালিহীন ও মুসলিম ফক'ীহ্ ও উম্মাহ্র যাহিদ (আধ্যাত্মিক সাধক)-দের জীবন-চরিতও অধ্যয়ন কর যাতে এর দ্বারা তোমার অন্তঃকরণে কোমল ও দ্রবীভূত অবস্থা সৃষ্টি হয়।[১]

মুসলিম উম্মার নেককার ও সালিহ্ লোকদের জীবন-চরিত

ইবনে জওযী (র) এ কারণেই সল্ফ-ই সালিহীন ও উম্মাহ্র নেককার লোকদের অনেকেরই জীবন-চরিত লিখে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ, হযরত হাসান বসরী, সায়্যিদুনা ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয, হযরত সুফিয়ান ছওরী, হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম, হযরত বাশার হাফী, ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল,হযরত মা'রূফ কারখী (র)-এর[২] নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদের ওপর স্থায়ী আলোচনা গ্রন্থ ছাড়াও একটি সামগ্রিক জীবনী-সংকলন "সিফাতু'স-সফওয়া" (صفة الصفوة)-ও তিনি লেখেন। চার খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থ আসলে আবূ ন'ঈম ইস্পাহানীর বিখ্যাত গ্রন্থ "হি'লয়াতু'ল-আওলিয়া"-র মার্জিত ও শোভন সংস্করণ যাকে ইবনে জওযী (র) প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন শেষে সংক্ষিপ্তাকারে মুহাদ্দিছসুলভ ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সংকলিত করেছেন। এই সব গ্রন্থে যে সব জীবনী ও ঘটনা এসেছে তা প্রভাবমণ্ডিত ও চিত্তদ্রবীভূতকারী হবার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের নিরিখে নির্ভরযোগ্য ও অতিরঞ্জন তথা বাহুল্য বর্ণনা থেকে মুক্ত।

ইতিহাসের গুরুত্ব

ইবনে জওযী (র) দীনী 'ইল্ম (ধর্মীয় জ্ঞান) তথা ফিক্'হ ও হাদীছশাস্ত্রে পণ্ডিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসশাস্ত্রেরও একজন বড় প্রবক্তা ও প্রচারক ছিলেন। তাঁর মতে, ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই 'উলামাই-কিরাম ও ফক'ীহগণ তাঁদের গ্রন্থে এমন কিছু দুঃখজনক ভুলত্রুটি করেছেন যা তাঁদের 'ইল্মে

---

১. সা'য়দু'ল-খাতি'র, ২য় খণ্ড, ৩০২–৩ পৃ.।

২. তিনি নিজে এ সম্পর্কে তাঁর সা'য়দু'ল-খাতি'র গ্রন্থে আলোচনা করেছেন, ১ম খণ্ড দ্র. ১৩৭, ১৪৪, ১৭৫ পৃ.; ২য় খণ্ড, ৩৬৩ পৃ.; ৩য় খণ্ড, ৫৬২ ও ৬০৬ পৃ.।

ও পদমর্যাদার অনুকূলে মোটেই যায়নি। এজন্য তিনি শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দিচ্ছেন, তারা যেন সকল বিষয়ে মোটামুটি অবহিত থাকে, বিশেষ করে ইতিহাসে যেন এতটা জ্ঞান অর্জন করে যাতে তারা এমন কোন বড় ধরনের ঐতিহাসিক ভুল না করে বসে যা তাদের অপমানের কারণ হয়। 'স'ায়দু'ল-খাতি'র'-এ তিনি লিখছেন :

ফক'ীহ্‌র উচিত প্রতিটি বিষয়ের প্রয়োজনীয় অংশ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা। ইতিহাস, হাদীছশাস্ত্র, অভিধান তথা যে কোন বিষয় সম্পর্কেই ফক'ীহ্‌র দরকারী জ্ঞান থাকতে হবে। আর তা এজন্য যে, ফিক্'হশাস্ত্র তার পরিপূর্ণতার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার মুখাপেক্ষী। কোন কোন ফক'ীহকে আমি বলতে শুনেছি, 'শায়খ শিবলী (র) ও কাযী শরীফ এক মজলিসে একত্র হয়েছেন'। এ কথা শুনে আমি অবাক হই এজন্য যে, উল্লিখিত দু'জন বুযুর্গের মধ্যকার ব্যবধানটুকু পর্যন্ত এ ফক'ীহদের জানা নেই। এ কথা জানা থাকলে তাঁরা বুঝতে পারতেন যে, এমতাবস্থায় উভয়ের পারস্পরিক সাক্ষাত লাভ আদৌ সম্ভব নয়। একবার একজন 'আলিম কোন এক বিতর্ক চলাকালে বলেন যে, হযরত 'আলী (রা) ও সায়্যিদা ফাতিমা (রা)-এর ভেতর (মৃত্যু পরবর্তীতেও) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই। কেননা হযরত 'আলী হযরত সায়্যিদা ফাতিমা (রা)-কে গোসল দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে বললাম ঃ আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন! (আপনি যা বললেন তা যদি সত্যি হয়) তাহলে হযরত 'আলী (রা) হযরত ফাতিমা (রা)-এর ইনতিকাল-পরবর্তীতে তাঁর বোন-ঝি উমামা বিনতে যয়নব (রা)-কে কিভাবে বিয়ে করলেন? ইমাম গাযালী (র)-এর ইহ্'য়াউ'ল-'উলূম গ্রন্থেও আমি এ ধরনের ঐতিহাসিক ভুলভ্রান্তি লক্ষ্য করেছি আমি বিস্মিত হয়েছি, তিনি কিভাবে বিভিন্ন ঘটনা ও ইতিহাসকে এক সঙ্গে মিশিয়ে ফেললেন! আমি সে সব ঐতিহাসিক ভ্রান্তিগুলোকে একটি গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। তিনি তাঁর গ্রন্থ "মুস্তাজহিরী"-তেও এ জাতীয় ভুল করেছেন। গ্রন্থটি তিনি খলীফা মুস্তাজহির বিল্লাহ্‌র খিদমতে পেশ করেছিলেন। এতে তিনি বলেছিলেন যে, খলীফা সুলায়মান ইবনে 'আবদুল মালিক সুফী আবূ হাযেমকে বলে পাঠান যে, তিনি যেন তাঁর নাশতার কিছু অংশ তাবাররুক হিসাবে পাঠিয়ে দেন। তিনি খলীফাকে কিছু গমের তপ্ত ভুসি পাঠান। সুলায়মান এর দ্বারা নাশতা করেন। অতঃপর তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হন এবং এই মিলনের ফসল হিসাবে 'আবদুল 'আযীয জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে 'আবদুল 'আযীযের ঘরেই ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয জন্মগ্রহণ করেন।

ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র)-কে সুলায়মান ইব্‌নে 'আবদুল মালিকের পৌত্র বানিয়েছেন, অথচ তিনি তাঁর পিতৃব্য-পুত্র ছিলেন। শায়খ আবুল মা'আলী জুওয়ায়নী তাঁর 'আশ-শামিল' নামক উসূলে ফিক্‌হের একটি গ্রন্থের শেষে লিখেছেন ঃ বাতেনী সূফীদের একটি দল বর্ণনা করেছেন যে, হাল্লাজ, জনাবী কারামতী ও ইবনু'ল-মিকনা' রাষ্ট্রবিরোধী ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে বিপ্লব সংগঠনের প্রয়াস চালায় এবং জনসাধারণকে তাদের দলে টানবার চেষ্টা করে। তারা এক একজন এক একটি দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করে। জনাবী ইহ্‌সাতে ও ইবনু'ল-মিকনা' তুর্কিস্তান সীমান্তে বসতি স্থাপন করে এবং হাল্লাজ বাগদাদকে তার বিপ্লবের ঘাঁটি হিসাবে বেছে নেয়। এতে প্রথমোক্ত দু'জন তাদের শেষোক্ত সাথী সম্পর্কে ফয়সালা শুনিয়ে দেয় যে, সে উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যর্থ হবে এবং শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হবে। কেননা বাগদাদের লোকেরা প্রতারিত হয় না। তারা বুদ্ধিমান এবং লোক সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খুবই প্রখর। আমি বলি, এটা উক্ত বর্ণনাকারীর একটি মারাত্মক ভুল। কেননা হাল্লাজ ইবনু'ল-মিকনা'র যুগই পাননি। ইবনু'ল-মিকনা'কে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন খলীফা মনসূর, আর এ ঘটনা ১৪৪ হিজরীর। আর আবূ সা'ঈদ আল-জনাবীর আবির্ভাব ঘটেছে ২৮৬ হিজরীতে এবং হাল্লাজ নিহত হয়েছেন ৩০৯ হিজরীতে। এতে দেখা যায় যে, কারামতী ও হাল্লাজের যুগ অনেকটা কাছাকাছি। ইবু'ল-মিকনা'র যুগ তো বহু পূর্বের। অতএব, তার পক্ষে বাকী দু'জনের সঙ্গে মিলিত হয়ে ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এর থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিরই উচিত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা সম্পর্কেও কিছু কিছু পড়াশুনা করা। কেননা জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কোন শাখাই অপর শাখার সঙ্গে ওঁতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। একজন মুহাদ্দিছের জন্য এটা কতখানি দোষের যে, কোন ঘটনা সম্পর্কে তাঁর নিকট ফতওয়া চাওয়া হলে তিনি তাঁর জওয়াব দিতে পারেন না! এর কারণ নিশ্চয়ই এই যে, তিনি طريق حديث জমা করতেই রাতদিন মশগুল, মসলা-মাসাইল ও খুঁটিনাটি 'ইল্‌মের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ফুরসৎই তাঁর নেই। ঠিক তেমনি একজ ফক'ীহ্‌র জন্য কতখানি অসমীচীন যে, তাঁর নিকট একটি হাদীছের মর্মার্থ জিজ্ঞাসা করা হবে আর তিনি সে সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ থাকবেন। আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করি, তিনি যেন আমাকে বুলন্দ হিম্মত দান করেন যাতে আমি হীনমন্যতা ও ভীরুতাকে বরদাশ্‌ত না করি।[১]

১. সা'য়দু'ল-খাতি'র, ৩য় খণ্ড, ৬০৪-৬ পৃ.।

ঐতিহাসিক রচনাবলী

তিনি কেবল এই সমালোচনা ও পরামর্শ দানের মধ্যেই নিজের প্রয়াসকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং المنتظم فى تاريخ الملوك والامم নামক দশ খণ্ডে সমাপ্ত একটি বিরাট জীবনী গ্রন্থও প্রণয়ন করেন যার বিস্তৃতি ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে ৫৭৪ হিজরী পর্যন্ত। গ্রন্থকার প্রথমে সন উল্লেখ করেছেন, এরপর উক্ত সনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ বর্ণনা করেছেন, অতঃপর উক্ত সনে যে সব বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির ইনতিকাল হয়েছে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেছেন। এভাবে এই গ্রন্থ জীবনী ও আলোচনার এক সামগ্রিক ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।[১]

তাঁর تلقيح فهوم اهل الاثر فى عيون التاريخ والسير নামক গ্রন্থটি একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক স্মারকলিপি হিসাবে খ্যাত। এর ভেতর ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে।[২]

সম্বোধন, সম্ভাষণ ও বাগ্মিতা

'আল্লামা ইবনে জওযী (রা)-এর বাকপটুতা, ভাষার অলংকরণ ও প্রখর বাগ্মিতার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন প্রকার দ্বিমত নেই। তাঁর ওয়াজ-মাহফিলের জনপ্রিয়তা এবং তাতে লোকের প্রচণ্ড ভীড় হবার এটা ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। صيد الخاطر নামক গ্রন্থে তিনি তাঁর মানসিক দ্বন্দ্বের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর নফ্স তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিল যেন তিনি শব্দের দিকে মোটেই মনোযোগ না দেন। তার মতে, ভাষার অলংকরণ, বাকপটুতা ও বাগ্মিতা সবই কৃত্রিম ও লৌকিক। কিন্তু তিনি জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে এ ধারণার নিরসন ঘটান এবং নফ্সকে এই বলে বোঝান যে, উত্তম বাক-নৈপুণ্য আল্লাহ্প্রদত্ত প্রতিভা, যোগ্যতা ও হাতিয়ার বিশেষ। ইসলামের দা'ওয়াত ও তবলীগের ক্ষেত্রে এর সাহায্য অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। একে অসম্মান করা ঠিক হবে না। এ ধারণাও তাঁর মনে কয়েকবার উদিত হয় যে, তিনি যেন বক্তৃতা দান এবং দা'ওয়াত ও তবলীগের কাজ ছেড়ে দিয়ে শুধু যুহ্দের জন্য লোক সংস্রববর্জিত ঝামেলামুক্ত জীবন অবলম্বন করেন। কিন্তু তিনি দলীল-প্রমাণ দ্বারা ও নফসের সঙ্গে বিস্তারিত-আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করে এ ধারণার

---

১. এই গ্রন্থের শেষ পাঁচ খণ্ড দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, হায়দরাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
২. ভারতে মওলভী সায়্যিদ মুহাম্মদ ইউসুফ টুংকী মরহুম-এর ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয়েছে।

অপনোদন ঘটান এবং নফ্‌সকে স্বীকার করতে বাধ্য করেন যে, এমত ধারণা শয়তান কর্তৃক নিক্ষিপ্ত। শয়তান এ দৃশ্য দেখতে পারে না যে, হাযার হাযার মানুষ তার ভ্রান্তিজাল ছিন্ন করে হিদায়াতের রাস্তা এখতিয়ার করুক। আম্বিয়ায়ে কিরাম ('আ)-এর রাস্তাই ছিল দা'ওয়াত ও তবলীগের রাস্তা, অথচ তাঁদের জীবনই ছিল সর্বাধিক জনসমাবেশপূর্ণ ও লোক সংস্রবযুক্ত। এ ক্ষেত্রে নফ্‌স যে চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় নিচ্ছে তা' হল এই যে, সে বেকার ও ঝঞ্ঝাটমুক্ত জীবন পছন্দ করে এবং সাধনামুখর ও সংগ্রামী জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ায়। দ্বিতীয়ত, তাঁর ভেতর পদমর্যাদার প্রতি লোভ ও জাঁকজমকপ্রিয়তা বাসা বেঁধে রয়েছে এবং এর মাধ্যমেই সে তা হাসিল করতে চায়। কেননা নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা অবলম্বন, যুহ্‌দ ও লোক সংস্রবমুক্ত জীবন জনসাধারণের নিকট অধিক আকর্ষণীয় এবং তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করবার উৎকৃষ্ট পন্থা।

মোট কথা, শয়তান তাঁকে জনকল্যাণ ও সাধারণ্যে দা'ওয়াতের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তিনি তাঁর গোটা মেধাগত যোগ্যতা ও আল্লাহ্‌প্রদত্ত শক্তিকে অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল ধরে পরিপূর্ণ নিবিষ্টচিত্ততা ও একাগ্রতার সাথে সংস্কার ও জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত রাখেন।

ওফাত

৫৯৭ হিজরীর জুমু'আর রাত্রে আল্লাহ্‌র এই দা'ঈ ইনতিকাল করেন। তাঁর ইন্‌তিকালের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে বিলাপ ও কান্নায় গোটা বাগদাদ ভেঙে পড়ে এবং দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যায়। জামে মনসূরাতে তাঁর সালাত-ই জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাপক ও বিপুল জনসমাগমের কারণে বিরাট বিস্তৃত মসজিদেও তিল ধারণের জায়গা ছিল না। ফলে স্থান সংকুলানের সমস্যা দেখা দেয়। বাগদাদের ইতিহাসে এ ছিল এক স্মরণীয় দিন। চতুর্দিক থেকেই স্পষ্ট বিলাপ ও কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছিল। সবাই ছিল শোকাভিভূত। তাঁর প্রতি মানুষের টান এত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ ছিল যে, তারা গোটা রমযান মাসব্যাপী রাত-দিনের সমস্ত সময়টাই তাঁর কবর পাশে কাটিয়ে দেয় এবং কুরআন খতম করে।

একাদশ অধ্যায়

নূরুদ্দীন যঙ্গী ও সালাহ্উদ্দীন আয়্যুবী

ক্রুসেড যুদ্ধ ঃ মুসলিম জাহানের ওপর নয়া দুর্যোগ

একদিকে মুসলিম রাষ্ট্রের রাজধানীতে পূর্ণ শক্তিতে গ্রন্থ রচনা ও শিক্ষা দানমূলক কাজ এগিয়ে চলছিল এবং কতক মহান ব্যক্তিত্ব সংস্কার ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন; অপরদিকে গোটা মুসলিম জাহানের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের কাল মেঘ ঘনীভূত হচ্ছিল। মুসলমানদের অস্তিত্বই শুধু নয়, ইসলামের অস্তিত্বও ছিল মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। খৃস্টান য়ূরোপ শতাব্দীকাল থেকে ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে আসছিল। কেননা মুসলমানরা তাদের গোটা প্রাচ্য সাম্রাজ্যের ওপর কব্জা জমিয়ে বসেছিল। তাদের পবিত্র স্থানগুলো, এমন কি স্বয়ং মসীহ ('আ)-এর জন্মস্থানও মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ ও অভিভাবকত্বে এসে গিয়েছিল। য়ূরোপকে উত্তেজিত করতে এবং তাদের প্রতিশোধস্পৃহা উদ্দীপ্ত করতে এগুলোই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্যের উপস্থিতিতে ও প্রতিবেশী খৃস্টান রাজ্যগুলোর ওপর উপর্যুপরি অগ্রাভিযানের কারণে তাদের এ সাহস হ'ত না যে, তারা সিরিয়া, ফিলিস্তীন কিংবা কোন মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে চোখ উঁচিয়ে চাইবে। সালজূক সাম্রাজ্যের পতন ও মুসলিম সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তের দুর্বলতার কারণে য়ূরোপবাসীদের মনে একবার নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষার খেয়াল জাগে। ঠিক সে মুহূর্তে সাধু পিটারের বেশে তারা এমন একজন বাগ্মী ও ধর্মীয় নেতা পেয়ে যায়, যেন তার অগ্নি উদ্‌গীরণকারী জ্বালাময়ী বক্তৃতা দ্বারা সারা খৃস্টান জগতে আগুন ধরিয়ে দেয়। য়ূরোপ মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ধর্মীয় উদ্দীপনার এক স্রোত বয়ে যায়। এ ছাড়া তখন আরও কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণ ছিল যা খৃস্টানদের মনে বিস্তৃত ও উর্বর মুসলিম বিশ্বের ওপর হামলা পরিচালনা এবং ক্রুসেড যুদ্ধের প্রতি ধর্মীয় ও পার্থিব আকর্ষণ ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে।[১]

যা-ই হোক, ৪৯০ হিজরীতে ক্রুসেডারদের প্রথম বাহিনী সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং দু'বছরের মধ্যেই তারা আর-রিহা (এডেসা), আন্তাকিয়া (এন্টিয়ক)-সহ বড় বড় শহর, বহু দুর্গ ও হলব (আলেপ্পো) দখল করে নেয়। ৪৯২ হিজরী মুতাবিক ১০৯৯ 'ঈসায়ীতে ক্রুসেডাররা জেরুযালেম (বায়তু'ল-মুকাদ্দাস)

---

১. বিস্তারিত জানতে দ্র. ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, (crusades)।

জয় করে। কয়েক বছরের মধ্যেই ফিলিস্তীনের বিরাট অংশ অর্থাৎ সিরিয়া উপকূলের এনতারতুস, এককা (একর), পূর্ব তারাবলিস (ত্রিপোলী) ও সায়দও তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক স্টানলি লেনপুল-এর মতে, ক্রুসেডাররা এসব দেশে এমন সহজে ঢুকে পড়েছিল যেমন সহজে পেরেক ঢুকানো হয় পুরনো কাষ্ঠখণ্ডের ভেতর। স্বল্পক্ষণের জন্য এরূপও মনে হচ্ছিল যে, তারা মুসলমানকে ধুনিত তুলার মত উড়িয়ে দেবে। ক্রুসেডাররা বায়তু'ল-মুকাদ্দাসে প্রবেশের সময় বিজয়ের নেশায় উন্মত্ত হয়ে অসহায় মুসলমানদের সঙ্গে যে আচরণ করেছিল তার উল্লেখ একজন দায়িত্বশীল খৃস্টান ঐতিহাসিক নিম্নোক্তভাবে করেছেন:

> বায়তু'ল-মুকাদ্দাসে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করার পর ক্রুসেড যোদ্ধারা এভাবে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল যে, যেসব ক্রুসেড যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়ে মসজিদ-ই-'ওমর (রা) গিয়েছিল তাদের ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত রক্তের বন্যায় ডুবে গিয়েছিল। বাচ্চা শিশুদেরকে ঠ্যাং ধরে দেওয়াল গাত্রে আছড়ে মারা হয় অথবা প্রাচীরের ওপর থেকে চক্রাকারে বাইরে নিক্ষেপ করা হয়। ইয়াহূদীদের তাদের উপাসনালয়ের ভেতরেই জীবন্ত দগ্ধ করা হয়।
>
> দ্বিতীয় দিন জ্ঞাতসারে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে এর চেয়েও ভয়াবহ ও হৃৎকম্প সৃষ্টিকারী নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়। ট্যাংকার্ড তিন শ' বন্দীর জীবনের নিরাপত্তা দানের জামানত দিয়েছিল। ক্রুসেডাররা চিৎকার করতে করতে অগ্রসর হয় এবং তাদের সবাইকে বাইরে টেনে বের করে নির্মমভাবে হত্যা করে। অতঃপর ব্যাপক গণহত্যা শুরু হয়। নারী-পুরুষ-শিশু সবাইকে হত্যা করার পর তাদের দেহ কেটে টুকরো টুকরো করা হয়। নিহত মানুষের লাশ এবং সে সব লাশের কর্তিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরাট স্তূপ জমে ওঠে এখানে সেখানে। অবশেষে এই নির্মম গণহত্যার পরিসমাপ্তি ঘটলে শহরের রক্তাপ্লুত সড়কগুলো আরব বন্দীদের দিয়েই ধৌত করা হয়।[১]

বায়তু'ল-মুকাদ্দাস বিজয় ছিল মুসলিম জাহানের দুর্বলতা ও পতন এবং খৃস্টান বিশ্বের উত্থান ও ক্রমবর্ধমান শক্তির পরিচায়ক। এ ছিল মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি মহাবিপদ। সিরিয়া ও ফিলিস্তীনে চারটি স্থায়ী খৃস্টান রাজ্য (কুদ্স, আন্তাকিয়া, ত্রিপোলী ও য়াফা) গড়ে উঠেছিল যা ছিল ইসলামের কেন্দ্রভূমি হিজাযের আযাদী ও সম্মান-সম্ভ্রমের প্রতি একটি স্থায়ী হুমকি। খৃস্টানদের দুঃসাহস

---
১. ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ৬ষ্ঠ খণ্ড (ক্রুসেড্স), ৬২৭ পৃ.।

ও ধৃষ্টতা এতখানি বেড়ে গিয়েছিল যে, কির্ক-এর শাসনকর্তা রেজিনাল্ড মক্কা মু'আজ্জমা ও মদীনা মুনাওয়ারার ওপর আক্রমণ পরিচালনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে।[১] রওযা মুবারক সম্পর্কেও সে ধৃষ্টতাপূর্ণ ও অবজ্ঞাসূচক উক্তি করে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, রিদ্দার ঘটনার পর ইসলামের ইতিহাসে এর চাইতে নাযুক মুহূর্ত ও বিপজ্জনক সময় আর আসেনি। ইসলামের অস্তিত্ব এই দ্বিতীয়বারের মত সঙ্গীনতরো অবস্থার মুখোমুখি হয়। একটি চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া মুসলিম জাহানের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রাথমিক যুগে মুসলিম জগতে বিরাট অরাজকতা ও বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। মালিক শাহ্ সাল্জূকীর উত্তরাধিকারীরা পরস্পর গৃহযুদ্ধে মত্ত ছিল। 'আব্বাসী খলীফাগণ অনেক আগে থেকেই তাদের ক্ষমতা তুর্কীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। মুসলিম জগতে এমন কোন শক্তিশালী সুলতান কিংবা নেতা ছিলেন না যিনি সাংগঠনিক যোগ্যতার অধিকারী এবং যিনি ক্রুসেডারদের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট শক্তিটুকু একটি পতাকাতলে সংঘবদ্ধ করে উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে অগ্রসরমান বিপদের মুকাবিলা করতে পারেন। স্টানলি লেনপুল যথার্থই বলেছেন, "এ যুগটা ছিল এত অনিশ্চয়তা ও জটিলতাপূর্ণ যে, এত বড় বিস্তৃত ও বিশাল (সালজূক) সাম্রাজ্যকে মৃত্যু যন্ত্রণায় হাত-পা ছুঁড়তে দেখে ব্যক্তিমাত্রই বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছিল। এই মধ্যবর্তী যুগে ততদিন পর্যন্ত অরাজকতা বিরাজ করছিল যতদিন পর্যন্ত না কোন নতুন শক্তি পরিপূর্ণরূপে একাত্ম ও সংঘবদ্ধ হয়ে একই লক্ষ্যের পানে ধাবিত হচ্ছিল। সংক্ষেপে বলা চলে, এটাই ছিল মোক্ষম মুহূর্ত যখন য়ুরোপীয়রা সৈন্য পরিচালনা করে মুসলমানদের ওপর নিজেদের জয়কে সুনিশ্চিত করতে পারত।"[২]

আতাবেক 'ইমাদুদ্দীন যঙ্গী

এমনি-ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও বর্ধিত হতাশার মাঝে মুসলিম জগতের ভাগ্যাকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে। মুসলিম বিশ্ব তাদের ঠিক জরুরী মুহূর্তে একজন নতুন নেতা ও প্রাণবন্ত মুজাহিদ পেয়ে যায়। যেখানে আশার ক্ষীণ আলোকরেখাও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না, সেখান থেকেই এমন এক নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটে যার কল্পনাও কারো মনে ঠাঁই পায়নি।

লেনপুল বলেন :

---

১. সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যূবী, স্টানলি লেনপুলকৃত, ১৮৮ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত (লেনপুল কৃত), ২১ পৃ.।

মুসলমানদের জিহাদ ঘোষণার প্রয়োজন দেখা দিল, প্রয়োজন দেখা দিল এমন একজন নেতার যাঁর বীরত্ব, সাহসিকতা ও সামরিক যোগ্যতার কথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবে। উপরন্তু তুর্কমেন সর্দার ও তাদের অধীনস্থ বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদের এমন একদল যুদ্ধবাজ দীনদার নওজোয়ান সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল যারা ক্রুসেডারদের কৃত জুলুম ও বাড়াবাড়ির হিসাব নেবে এবং তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে। যা হোক, 'ইমাদুদ্দীন যঙ্গীর ব্যক্তিসত্তার মধ্যেই মুসলমানদের উল্লিখিত নেতার আবির্ভাব ঘটে।[১]

'ইমাদুদ্দীন যঙ্গী ছিলেন সালজূকীদের অনুগ্রহে লালিত-পালিত ও তাদেরই আশ্রিত। তিনি ছিলেন সুলতান মাহমূদ সালজূকীর শাহযাদাদের 'আতালীক' (গৃহশিক্ষক) এবং সুলতানের পক্ষ থেকে মাওসিলের শাসনকর্তা। তিনি ইরাক ও সিরিয়ায় স্বীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় ও সুসংহত করবার পর আর-রিহা (এডেসা)-র ওপর হামলা করেন। এটি ছিল খৃস্টান রাজ্যগুলোর মধ্যে সর্বাধিক মযবুত ও সুদৃঢ়। এর সামরিক গুরুত্বও ছিল অত্যধিক। ৫৩৯ হিজরীর জুমাদিউ'ল-উখরা মুতাবিক ১১৪৪ 'ঈসায়ীর ২৩শে ডিসেম্বর তিনি আর-রিহা (এডেসা) দখল করেন। আরব ঐতিহাসিকদের ভাষায় এটি ছিল "ফতহু'ল-ফুতূহ" তথা সর্ববৃহৎ বিজয়। এ শহরটি ছিল ল্যাটিন সাম্রাজ্যের বিরাট আশা-ভরসার কেন্দ্রভূমি। এভাবে ফুরাত উপত্যকা ক্রুসেডারদের বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এই বিজয়ের কিছুকাল পর ৫৪১ হিজরী মুতাবিক ১১৪৬ 'ঈসায়ীতে তিনি তাঁর এক ক্রীতদাসের হাতে শাহাদত লাভ করেন। শাহাদতের আগে তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের এমন এক শানদার ধারার সূচনা করে দিয়েছিলেন যা তাঁর খ্যাতনামা পুত্র আল-মালিকু'ল-'আদিল নূরুদ্দীন যঙ্গী অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যান।

আল-মালিকু'ল-'আদিল নূরুদ্দীন যঙ্গী

নূরুদ্দীন মাহ্মূদ এখন সিরিয়ার সুলতান। গোটা মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে ক্রুসেডারদের বহিষ্কার এবং বায়তু'ল-মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত বলে মনে করতেন। এই মহান খিদমতকে তিনি সবচেয়ে বড় 'ইবাদত এবং আল্লাহ্র সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের বিরাট মাধ্যম বলে মনে করতেন। তিনি তাঁর আক্রমণ দ্বারা খৃস্টান রাজ্যগুলোর ওপর ভীতির সঞ্চার করেছিলেন। ৫৫৯ হি./১১৬৪ 'ঈসায়ীতে হারিম দুর্গ দখল করেন। এটি ছিল উত্তর সীমান্তবর্তী একটি মযবুত দুর্গ। আন্তাকিয়া ও ত্রিপোলীর রাজন্যদ্বয়সমেত

১. সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যুবী (লেনপুল কৃত), ২৯ পৃ.।

বহু বিখ্যাত নাইট এতে বন্দী হন। যুদ্ধে দশ হাযার খৃস্টান নিহত এবং অসংখ্য সৈনিক বন্দী হয়। হারিম দুর্গের পরই তিনি বানিয়াস দুর্গ জয় করেন।[১] ওদিকে মিসরও জয় করে তিনি খৃস্টানদের দু'দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলেন। লেনপুল বলেন ঃ

> সিরিয়ার সুলতান নূরুদ্দীন যঙ্গীর সেনাপতি (সালাহুদ্দীন) কর্তৃক নীলনদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অর্থই হ'ল, জেরুযালেমের খৃস্টান রাজ্য ইঁদুর কলে নিপতিত হয়েছে। দু'দিক থেকেই যাদের দ্বারা সে পিষ্ট হচ্ছিল তারা ছিল একই ব্যক্তি ও একই শক্তির দু'টি বাহিনী। সালাহুদ্দীন দিময়াত ও আলেকজান্দ্রিয়া নৌ-বন্দরের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের মাধ্যমে একটি নৌবহরেরও নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন। এর দ্বারাই তিনি য়ুরোপের সঙ্গে মিসরের ক্রুসেডারদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন।[২]

সুলতান নূরুদ্দীন ফিলিস্তীনের প্রায় পুরো এলাকাটাই ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্ত করে নেন। কিন্তু বায়তু'ল-মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের মহাসৌভাগ্য তাঁরই সেনাপতি সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যুবীর জন্য অপেক্ষা করছিল, যা স্বয়ং নূরুদ্দীন যঙ্গীর পুণ্যকর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য। হিজরী ৫৬৯ মুতাবিক ১১৭৪ 'ঈসায়ীতে ৫৬ বছর বয়সে কণ্ঠনালীর প্রদাহে (خناق) তিনি ইনতিকাল করেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকের ভাষায় সিরিয়ার সুলতান নূরুদ্দীন-এর মৃত্যু সংবাদ মুসলমানদের কাছে বজ্রাঘাততুল্য মনে হয়।[৩]

নূরুদ্দীন যঙ্গীর প্রশংসনীয় গুণাবলী

মুসলিম ঐতিহাসিক সুলতান নূরুদ্দীনের ন্যায়বিচার, বিশ্বস্ততা, আল্লাহ-ভীতি, উত্তম ব্যবস্থাপনা, সৌজন্য, জিহাদী প্রেরণা প্রভৃতি চারিত্রিক গুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি তাঁর নামের মতই (নূরুদ্দীন অর্থ ধর্মের জ্যোতি বা আলো) উদ্ভাসিত ও সর্বত্র প্রশংসিত।

সুলতানের সমসাময়িক ইবনে জওযী (র) তাঁর সুবিখ্যাত 'আল-মুনতাজাম' নামক ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

جاهد الثغور وانتزع من ايدى الكفار نيفا وخمسين مدينة. وكانت سيرته
اصلح من كثير من الولاة والطرق فى ايامه امنة والمحامد له كثيرة وكان

---

১. ইবনু'ল-আছীরকৃত 'আল-কামিল, ১১শ খণ্ড, ১২৪ পৃ.।
২. সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যুবী, ৮৯ পৃ.।
৩. সুলতান সালাহুদ্দীন, ১১৫ পৃ.।

يتدين بطاعة الخلافة وترك المكوس قبل موته وكان يميل الى التواضع ومحبة العلماء واهل الدين .

নূরুদ্দীন সীমান্তে জিহাদ করেন এবং কাফিরদের কব্জা থেকে পঞ্চাশটিরও বেশী শহর মুক্ত করেন। অধিকাংশ শাসক ও সুলতানের চেয়ে তাঁর জীবন ছিল উত্তম। তাঁর আমলে রাস্তাঘাট ছিল নিরাপদ। সর্বত্রই নিরাপত্তার আবহাওয়া বিরাজ করত। বাগদাদের খলীফার আনুগত্য ও অধীনতা স্বীকারকে তিনি নিজের জন্য বাধ্যতামূলক মনে করতেন। ইনতিকালের পূর্বে তিনি অবৈধ রাজস্ব ও ট্যাক্স মাফ করে দিয়েছিলেন। বিনয় ও অনাড়ম্বরতা ছিল তাঁর প্রকৃতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। 'উলামায়ে কিরাম ও দীনদার লোকদের তিনি ভালবাসতেন।[১]

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান–যিনি তাঁর ঐতিহাসিকসুলভ সতর্কতায়, শব্দের সতর্কতামূলক ব্যবহারে ও পরিমিত প্রশংসার ক্ষেত্রে মশহূর–লেখেন :

وكان ملكا عادلا زاهدا عابدا ورعا متمسكا بالشريعة مائلا الى الخير مجاهدا فى سبيل الله تعالى كثير الصدقات بنى المدارس بجميع بلاد الشام الكبار وله من المناقب والماثر والمفاخر ما يستغرق الوصف.

তিনি একজন সুবিচারক, যাহিদ, 'আবিদ, মুত্তাকী ও শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দ সুলতান ছিলেন। নেককার লোকদের প্রতি তিনি আকৃষ্ট ছিলেন। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র প্রতি ছিল তাঁর প্রবল ঝোঁক। অকাতরে তিনি দান-খয়রাত করতেন। সিরিয়ার সমস্ত বড় শহরেই তিনি মাদরাসা তৈরি করেছিলেন। তাঁর মর্যাদা, তাঁর স্মৃতি ও তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের পরিমাপ করা খুবই কঠিন।[২]

'তারীখু'ল-কামিল'-এর রচয়িতা খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ইবনু'ল-আছীর জাযারী তাঁর সম্পর্কে এত দূর পর্যন্ত বলেছেন :

وقد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم ار فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز رضـ احسن من سيرة ولا اكثر تحريا منه العدل .

আমি বিগত সুলতানদের জীবন ও সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে পড়াশুনা করেছি। খুলাফায়ে রাশিদীন ও ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীযের পরে নূরুদ্দীনের চাইতে অনুপম চরিত্রের অধিকারী এত বড় ন্যায়বিচারক সুলতান আমি আর দেখিনি।[৩]

---

১. আল-মুনতাজাম–১০ম খণ্ড, ২৪৮-৪৯. পৃ.।
২. ইব্‌নে খাল্লিকান, "মাহমূদ নূরুদ্দীন যঙ্গী", ৪র্থ খণ্ড, ২৭২ পৃ.; ৩. আল-কামিল, ৯ম খণ্ড, ১৬৩ পৃ.।

সুলতান নূরুদ্দীনের ইনতিকালের সময় ইবনু'ল-আছীরের বয়স ছিল ১৪ বছর। এজন্য তাঁর সাক্ষ্য ও বর্ণনা বিশেষ মর্যাদা পাবার দাবিদার। তিনি মরহুম সুলতানের জীবন-চরিত ও আখলাক-চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

তিনি কেবল তাঁর স্থাবর সম্পত্তির আয়-আমদানী দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে তিনি আপন অংশ হিসাবে যা পেয়েছিলেন তা বিক্রি করেই উক্ত স্থাবর সম্পত্তি খরিদ করেছিলেন। একবার তাঁর বেগম সংসারের টানাপোড়েনের অভিযোগ পেশ করেন। তখন তিনি তাঁর তিনটি দোকানের যাবতীয় আয় তার ব্যয় নির্বাহের জন্য দান করেন। দোকান তিনটি ছিল হিমসে তাঁর মালিকানাধীন। দোকান তিনটির বার্ষিক আয় ছিল বিশ দীনারের কাছাকাছি। সুলতানের বেগম যখন একেও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বলে মন্তব্য করলেন, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ এর বেশী আমার কাছে আর কিছুই নেই। আমার নিকট বাকি যা কিছু দেখছ তা আমার নয়, সাধারণ মুসলমানের। আমি এগুলোর খাজাঞ্চীমাত্র। তোমার খাতিরে আমি আমার কাছে রক্ষিত আমানতের খেয়ানত করে জাহান্নামে যেতে রাযী নই।

রাতের বেলা দীর্ঘ সময় 'ইবাদতে কাটাতেন। তাঁর ওজীফা ও যিক্র-আযকার ছিল নির্ধারিত। তিনি ছিলেন হানাফী ফিক্'হের একজন 'আলেম। কিন্তু তাঁর মধ্যে অন্য কোন মাযহাবের প্রতি বিদ্বেষ ছিল না কিংবা ছিল না কোন পক্ষপাতিত্ব। তিনি হাদীছ শিক্ষা করেছিলেন, ছওয়াব লাভের আশায়ই অন্যের কাছে হাদীছ বর্ণনা করতেন এবং অন্যকেও তা বর্ণনা করার এজাযত দিতেন।

ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থা ছিল এই যে, স্বীয় বিস্তৃত সাম্রাজ্যের কোথাও কোন শুল্ক কিংবা ট্যাক্স অবশিষ্ট রাখেন নি। মিসর, শাম, জযীরা, মাওসিল সর্বত্রই তিনি তা মওকুফ করে দেন। শরীয়ত তথা শর'ঈ বিধানকে তিনি খুবই সমীহ ও সম্মান করতেন। শরীয়তের হুকুম-আহকাম তিনি তামিল করতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বিবাদী করে আদালতে তলব করেছিল। তিনি আদালতে হাযির হন এবং কাযী সাহেবকে বলে পাঠান, "আমি আদালতে হাযির হচ্ছি। আমার প্রতি পক্ষপাতমূলক কোন আচরণ যেন না করা হয়।" শেষ পর্যন্ত মুকদ্দমায় তাঁরই জয় হয়। কিন্তু তিনি বাদীর ওপর তাঁর যে হক ছিল তা মাফ করে দেন এবং বলেন : প্রথম থেকেই আমার এমন ইচ্ছাই ছিল। কিন্তু আমার আশংকা ছিল, আদালতে হাযির না হলে সম্ভবত আমার অন্তরে গর্বের সঞ্চার হবে, তাই আমি হাযির হয়েছি। এক্ষণে আমি আমার হক মাফ

করে দিলাম। তিনি দারু'ল-'আদল (বিচার ভবন) নির্মাণ করেছিলেন। তিনি সব সময় নির্যাতিত মজলুমের পক্ষে থাকতেন, চাই সে তাঁর পুত্র হোক অথবা বিরাট অফিসার ও প্রশাসক। বীরত্ব প্রদর্শনে তিনি ছিলেন তুলনাহীন। যুদ্ধে তিনি দু'টি ধনুক ও দু'টি তূণীর সঙ্গে রাখতেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন, "আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, আপনি আপনার জীবনকে বিপদের মাঝে নিক্ষেপ করে ইসলামকে সংকটের মধ্যে ফেলবেন না।" উত্তরে তিনি বলেছিলেন : মাহ্‌মূদ এমন কি বস্তু যে, তার সম্পর্কে একথা বলা হবে? আমার পূর্বে এদেশকে ও ইসলামকে কে হেফাজত করেছেন? তিনি নিশ্চয়ই মা'বূদ-ই-বরহক যিনি ব্যতিরেকে আর কোন ইলাহ্ নেই।

'উলামায়ে কিরাম ও ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে তিনি তা'জীম করতেন। তাঁদের সম্মানার্থে তিনি উঠে দাঁড়াতেন, নিজের কাছে তাঁদের ডেকে বসাতেন, অসংকোচে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন এবং তাঁদের কোন আবেদনই অপূর্ণ রাখতেন না। তিনি নিজ হাতে তাঁদের কাছে চিঠি লিখতেন। এত বিনয় ও নম্রতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। জনসাধারণ মাত্রেই ছিল তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত। তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করার জন্য এই গ্রন্থ যথেষ্ট নয়, এর জন্য দরকার আরো বিরাট বিরাট গ্রন্থের।[১]

জিহাদের প্রতি আগ্রহ এবং তাঁর ঈমান ও ইয়াকীন

নূরুদ্দীনের সমস্ত মনোযোগ ও অন্তরের আকর্ষণ নিবদ্ধ ছিল জিহাদ এবং খৃস্টানদের মুকাবিলার প্রতি। এ ব্যাপারে তাঁর সংকল্প, আস্থা, নির্ভরতা, ঈমান ও ইয়াকীন ছিল অটুট।

খৃস্টানদের অতর্কিত হামলার কারণে ৫৮৮ হিজরীতে নূরুদ্দীন হিসনু'ল-আকরাদ যুদ্ধে (যা বাকী'আর যুদ্ধ নামে মশহূর) পরাজয় বরণ করেন।[২] শত্রুদের থেকে কয়েক মাইল দূরে হিম্‌স্-এর নিকট তিনি অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁকে এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, বিজয়ী দুশমনদের এত কাছে অবস্থান করা মুসলমানদের জন্য ঠিক হবে না। তখন তিনি ঐ ব্যক্তিকে থামিয়ে দিয়ে বলেন :

আমার নিকট স্রেফ এক হাযার অশ্বারোহী সৈনিক থাকলেও আমি শত্রুকে পরওয়া করি না। আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, যতক্ষণ না আমি আমার এবং ইসলামের এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত ছাদের তলায় আশ্রয় নেব না।

---

১. আল-কামিল, ১১শ খণ্ড, ১৬৩-৬৪ পৃ.;
২. বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য আল-কামিল. ১১শ খণ্ড, ১১৯ পৃ.।

নূরুদ্দীন অত্যন্ত উদার হস্তে সেনাবাহিনীকে উপহার-উপঢৌকন ও নগদ অর্থ প্রদান করেন। একবার কেউ তাঁকে এই পরামর্শ দেয় যে, ফকীহ্, ফকীর, সূফী ও কুরআনের ক'ারীদের জন্য যে পরিমাণ ভাতা ও অর্থ রাজকোষ থেকে নির্ধারিত করা হয়েছে তা দেশ ও জাতির এই সংকটজনক মুহূর্তে জিহাদের কাজে লাগানো হোক (অর্থাৎ এবারের জন্য উল্লিখিত ব্যক্তিদের ভাতা বন্ধ রেখে তা জাতীয় প্রয়োজনে ব্যয় করা হোক)। সুলতান নূরুদ্দীন তখন অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে জবাব দেন :

আমি তো এসব ফকীর ও দুর্বল লোকদের দু'আ ও সন্তুষ্টির মাধ্যমেই আল্লাহ্র সাহায্য প্রত্যাশা করি। হাদীছ পাকে বলা হয়েছে : আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে রিযিক ও সাহায্য আসে তা আসে আল্লাহ্র ঐসব দুর্বল ও অসহায় বান্দাদের বদৌলতেই। অতএব, আমি কীভাবে তাদের সাহায্য বন্ধ করে দেব যারা আমার পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যায় এমন সংকট সন্ধিক্ষণে যখন আমি বিছানায় ঘুমিয়ে থাকি। এতদ্সত্ত্বেও তাদের তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আর তোমরা যাদের পক্ষে কথা বলছ তারা তো কেবল তখনই যুদ্ধ করে যখন আমাকে তাদের পাশে দেখতে পায়। তাদের নিক্ষিপ্ত তীর কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, আবার কখনো ঠিক লক্ষ্যে গিয়ে আঘাত হানে। আর ওসব গরীবদের তো বায়তু'ল-মালে 'হক' রয়ে গেছে। আমি তাদের হক ছিনিয়ে নিয়ে অন্যদের কী করে তা দান করি?[১]

খৃস্টানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত সুলতান নূরুদ্দীন পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে তিনি প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত করেন, সীমান্তবর্তী শহর ও জনপদ ও মুসলিম রাজ্যগুলোর আমীর-উমারা ও প্রশাসকদের প্রভাবমণ্ডিত ভাষায় পত্র লেখেন এবং তাদেরকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্র জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। ঐসব স্থানের সূফী-দরবেশ, ফকীর ও নেককার লোকদের কাছেও তিনি চিঠি লেখেন। ঐসব চিঠিতে তিনি ফিরিঙ্গীদের বাড়াবাড়ি ও জুলুম-অত্যাচারের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেন এবং তাঁদের নিকট দু'আর দরখাস্ত করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ অভিলাষও ব্যক্ত করেন যে, তাঁরা যেন অন্য মুসলমানদেরকেও জিহাদে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করেন। তাঁর এ উদ্যোগ খুবই ফলপ্রসূ হয়। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ সাধারণ লোকদেরকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে ঐসব চিঠি পাঠ করে শোনান এবং সুলতানের জন্য দু'আ করেন। জনসাধারণের মধ্যে প্রবল জিহাদী জোশ পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন রাজ্যের শাসনকর্তাগণ নিজ নিজ সেনাবাহিনীসহ তাঁর আহ্বানে সাড়া দেন। অপরদিকে খৃস্টানেরাও তাদের পরিপূর্ণ

১. আল-কামিল, ১১শ খণ্ড, ১১৯ পৃ.।

শক্তি এবং চারদিককার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাহিনীকে মুসলমানদের মুকাবিলায় সংগঠিত করে। শেষ পর্যন্ত সুলতানেরই মানস পূর্ণ হয়। তিনি খৃস্টানদের সম্মিলিত শক্তির ওপর জয় লাভ করে হারিম দখল করেন।[১]

নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে নূরুদ্দীন যঙ্গীর ঈমান ও য়াকীন-এর মোটামুটি পরিমাপ করা যায়।

বানিয়াস-দুর্গ অবরোধকালে তাঁর ভ্রাতা নুসরাত উদ্দীন আমীর-ই আমীরান-এর একটি চক্ষু চিরতরে বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়। তখন নূরুদ্দীন আপন ভাইকে লক্ষ্য করে বলেন, "যদি তুমি সেই পুরস্কার ও ছওয়াব দেখতে পেতে যা আল্লাহ্ তোমার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তাহলে তুমি তোমার অপর চক্ষুটাও আল্লাহ্র পথে বিলিয়ে দেবার কামনা পোষণ করতে।"[২]

সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যূবী[৩]

সালাহুদ্দীন আয়্যুবীর ব্যক্তিসত্তা আঁ-হযরত (সা)-এর চিরন্তন মু'জিযা ও ইসলামে সত্যতার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

অভিজাত মধ্যবিত্ত কুর্দ পরিবারের সন্তান খান্দানী সৈনিক হিসাবে তিনি লালিত-পালিত হন।[৪] মিসর বিজয় ও ক্রুসেডারদের মুকাবিলায় ময়দানে অবতরণ করবার পূর্বে কেউই অনুমান করতে পারে নি যে, এই কুর্দী নওজোয়ানই বায়তু'ল-মুকাদ্দাস বিজয়ী বীর এবং মুসলিম জগতের রক্ষকরূপে প্রতিভাত হবেন এবং ইতিহাসের বুকে সেই কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন যার কথা কেউ কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি।

---

১. আল-কামিল, ১১শ খণ্ড, ১২২-১২৩ পৃ.।

২. আল-কামিল, ১১শ খণ্ড, ১২৩ পৃ.।

৩. সুলতান সালাহুদ্দীনের পিতার নাম ছিল আয়্যুব ; সেজন্যই তাঁকে আয়্যুবী বলা হয়। এর দ্বারা কেউ যেন মনে না করেন যে, হযরত আবূ আয়্যুব আনসারীর সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক আছে। সুলতান ও তাঁর গোটা খান্দান উত্তরাধিকারসূত্রেই কুর্দ। এই জাতিগোষ্ঠী আজও ইরাক, সিরিয়া, তুরস্ক ও ইরানে বসবাস করছে।

৪. সুলতান সালাহুদ্দীনের পিতা-মাতা গোটা খান্দান পূর্ব আযারবায়জান-এর দুওয়ায়ন নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কুর্দ কওমের অন্তর্গত 'হুযানিয়া' গোত্রের একটি বিরাট শাখাগোত্র রিওয়াদিয়ার সঙ্গে তিনি সম্পর্কিত। মনে হয় তাঁর দাদা শা'বী তাঁর দুই পুত্র নজমুদ্দীন আয়্যুব ও আসাদুদ্দীন শেরকুহকে নিয়ে বাগদাদে এসেছিলেন। অতঃপর তিনি তিকরীত গিয়ে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানেই ইনতিকাল করেন। কিছুদিন পর তাঁর দুই পুত্র মুজাহিদ উদ্দীন বাহরূয শহর কোতওয়ালের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন সুলতান মাস'উদ ইবনে গিয়াছউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মালিক শাহ্ সালজূকীর নিযুক্ত কর্মচারী। নজমুদ্দীন আয়্যুব এরপর 'ইমাদুদ্দীন যঙ্গীর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন।

লেনপুল বলেন :

> সালাহুদ্দীন থেকে এমন কোন 'আলামত জাহির হয়নি, যদ্দারা বোঝা যায় যে, তিনি ভবিষ্যতে একজন বিরাট ব্যক্তি হবেন, বরং তিনি সব সময়ই নিশ্চুপ ও শান্তিপ্রিয় ভাল মানুষের মত জীবন যাপন করতেন। তিনি ছিলেন শরীফ স্বভাবের এবং সমস্ত চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে দূরে।[১]

আল্লাহ্ পাক যখন এই নিরীহ শান্তিপ্রিয় লোকটির মাধ্যমে আপন কাজ করিয়ে নিতে চাইলেন তখন তাঁর জন্য গায়বী উপকরণেরও ব্যবস্থা করা হ'ল। তাঁকে তাঁর অনুগ্রহকর্তা নূরুদ্দীন যঙ্গী পীড়াপীড়ি করে এবং জরুরী নির্দেশের মাধ্যমে মিসর ভূমিতে পাঠিয়ে দেন। কাযী বাহাউদ্দীন ইবনে শাদ্দাদ ছিলেন সুলতান সালাহুদ্দীনের বিশেষ আস্থাভাজন ব্যক্তি। তিনি বলেন ঃ আমাকে সালাহুদ্দীন নিজেই বলেছেন, "নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কতকটা বাধ্য হয়েই আমি মিসর ভূমিতে আসি, আমার মর্জি মাফিক আমি মিসরে আসি নাই। আমার ব্যাপারটা ছিল ঠিক সেই-রকম যেমনটি কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ .

"সম্ভবত তোমরা এমন বস্তু অপসন্দ করবে যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।"[২]

জীবনের পট পরিবর্তন

মিসর পৌঁছার পর সুলতান সালাহুদ্দীনে জন্য যখন ময়দান পরিষ্কার হয়ে গেল এবং মিসরের ক্ষমতার চাবিকাঠি তাঁর হাতে এল তখন তাঁর জীবনের গতিধারাও একদম পাল্টে গেল। তাঁর অন্তরে এ ধারণা বদ্ধমূল হ'ল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দ্বারা বড় কোন কাজ করাতে চান। আর তা এমন কাজ যার সাথে আরাম-আয়েশের কোন সম্পর্ক নেই।

কাযী বাহাউদ্দীন ইব্‌ন শাদ্দাদ বলেন :

> দেশের (মিসরের) শাসন-ক্ষমতার বাগডোর হাতে আসার পর তাঁর দৃষ্টিতে এ দুনিয়া গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রেরণা তাঁর অন্তর-মানসে বদ্ধমূল হয়। মদ্য পান থেকে তিনি তওবা করেন এবং বিলাসী জীবন যাপন ও খেলাধূলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একজন সংযত ও পরিশ্রমী মানুষের জীবন এখতিয়ার করেন। এক্ষেত্রে তিনি দিন দিন তরক্কী করতে থাকেন।[৩]

---

১. সুলতান সালাহুদ্দীন, ৬৩ পৃ.।
২. আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া, পৃ.।
৩. আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া ও আল-মাহাসিনু'ল-য়ূসুফিয়া, ৩২-৩৩ পৃ.।

লেনপুলও লিখেছেন :

আপন সত্তার সাথে সুলতান সালাহুদ্দীনের এত নিবিড় সম্পর্ক ছিল যে, তিনি কায়মনে ত্যাগ ও কুরবানীর রুটিন কষে ধরেন। তিনি নিখুঁত তাক'ওয়া ও পরহেযগারী এখতিয়ার করেন এবং দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও স্বাদ-আহ্লাদের ইচ্ছা মন থেকে একেবারেই মুছে ফেলেন। তিনি নিজের কাজ-কর্মের ওপরও কঠিন বাধা-নিষেধ আরোপ করেন। এক্ষেত্রে সঙ্গী-সাথীদের জন্য তিনি একটি দৃষ্টান্তস্থলে পরিণত হন। তিনি তাঁর সামগ্রিক চেষ্টা-সাধনা এমন একটি ইসলামী সাম্রাজ্য কায়েমের পেছনে ব্যয় করেন, যে সাম্রাজ্য কাফিরদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে পুরোপুরি সক্ষম। একবার তিনি বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ যখন আমাকে মিসর ভূমি দান করেছেন তখন আমি মনে করি, ফিলিস্তীন ভূ-খণ্ডও তিনি আমাকে দান করবেন। সেদিন থেকে জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত সালাহুদ্দীনের লক্ষ্য ছিল ইসলামের সাহায্য ও সমর্থন। তিনি সারাটি জীবন কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে অতিবাহিত করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন।[১]

জিহাদের প্রতি অনুরাগ

জিহাদের প্রতি সুলতানের ছিল গভীর অনুরাগ। জিহাদই ছিল তাঁর 'ইবাদত, তাঁর বিলাস ও তাঁর আত্মার খোরাক।

কাযী ইব্ন শাদ্দাদ বলেন :

জিহাদের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা তাঁর শিরা-উপশিরা ও অস্থি-মজ্জায় মিশে গিয়েছিল, গেঁথে গিয়েছিল তাঁর মন-মস্তিষ্কে। এটাই ছিল তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু। তিনি জিহাদের সাজ-সামান তৈরিতে ব্যস্ত থাকতেন এবং এই সব উপায়-উপকরণ নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করতেন। জিহাদে কাজে লাগবে তিনি সর্বদা এ ধরনের লোকেরই তালাশে থাকতেন। যারা জিহাদ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করত এবং এ বিষয়ে তাঁকে উৎসাহ দিত তিনি তাদের দিকেই মনোযোগ দিতেন। এই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্র খাতিরেই তিনি আপন সন্তান-সন্ততি, বংশের লোকজন, পরিবার-পরিজন, দেশ ও দেশবাসীকে বিদায় সালাম জানান এবং সব ধরনের বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করেন। তিনি তাঁবু-জীবন যাপনেই তৃপ্ত থাকেন, প্রাসাদ-জীবনের আয়েশ-আরাম তাঁকে আকৃষ্ট করতে

১. সুলতান সালাহুদ্দীন, ৮৬ পৃ.।

পারেনি। তাঁর সান্নিধ্য লাভের একমাত্র কৌশল ছিল, সাক্ষাত হলেই তাঁকে জিহাদের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা। এভাবে অনেকেই তাঁর (সুলতানের) কাছে মর্যাদার অধিকারী হয়েছিল। একথা হলফ করে বলা যেতে পারে যে, জিহাদের সিলসিলা শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি একটি পয়সাও জিহাদ ও মুজাহিদদের কাজ ছাড়া অন্য কাজে ব্যয় করেন নি।[১]

সুলতানের এই প্রেমমত্ত অবস্থা ও বেদনাকাতর ছবি ইবনে শাদ্দাদ নিম্নোক্ত ভাষায় অংকন করেছেন :

যুদ্ধক্ষেত্রে সুলতানের অবস্থা হ'ত সেই শোকাহতা মায়ের মত যাকে তার একমাত্র সন্তানের মৃত্যু শোক সইতে হয়েছে। তিনি এক কাতার থেকে অন্য কাতারে ঘোড়া ছুটিয়ে নিয়ে যেতেন এবং সৈন্যদেরকে জিহাদের ব্যাপারে আহ্বান জানিয়ে বলতেন, يا للاسلام 'সৈন্যগণ! ইসলামের সাহায্যে এগিয়ে যাও।' এসময় তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকত।[২]

একবার যুদ্ধে তাঁর অবস্থা ছিল নিম্নরূপ :

সারা দিন তিনি (সুলতান) একবারও খাবার মুখে দেননি, এমন কি একটি দানাও না; কেবল চিকিৎসকের পরামর্শে ও অনুরোধ-উপরোধে সামান্য পানীয় গ্রহণ করেছিলেন।[৩] শাহী চিকিৎসকের বর্ণনানুযায়ী- একবার জুম'আর দিন থেকে রোববার পর্যন্ত সুলতান কয়েক লুকমা মাত্র খাবার গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া আর কোন দিকেই তাঁর মন ছিল না।[৪]

হিত্তীনের চূড়ান্ত যুদ্ধ

বিভিন্ন সামরিক কার্যক্রম ও মুখোমুখি সংঘর্ষের পর অবশেষে ইতিহাসের সেই বহু প্রতীক্ষিত হিত্তীন যুদ্ধ আসে যা পরিসমাপ্তি ঘটায় ফিলিস্তীনে খৃস্টান রাজত্বের এবং চূড়ান্ত ফয়সালা করে ক্রুসেডারদের ভাগ্যের। ৫৮৩ হিজরীর ২৪শে[৫] রবী'উ'ছ- ছানী মুতাবিক ১১৮৭ 'ঈসায়ী রোজ শনিবার তারিখে এই ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মুসলমানরা নিরংকুশ বিজয় (ফতহু'ম-মুবীন) লাভ করে। যুদ্ধক্ষেত্রের চিত্র অংকন করতে গিয়ে ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন :

---

১. আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া, ১৬ পৃ.।
২. ঐ।
৩. ঐ, ১৫৫ পৃ.।
৪. ঐ, ৯৭ পৃ.।
৫. ১১৮৭ সনের ৪ঠা জুলাই।

খৃস্টান সেনাবাহিনীর নির্বাচিত ও বাছাইকৃত জওয়ানেরা বন্দী হয়। জেরুযালেমের বাদশাহ্ গাঈ, তার ভাই চ্যাটিলোন (হুনায়ন)-এর রেজিনাল্ড, তেনিন-এর হামফ্রে, তাবাকাত দাবিয়া ও ইসবেতার-এর প্রধানদ্বয় এবং বড় বড় খৃস্টান নাইটকে গ্রেফতার করা হয়। খৃস্টান বাহিনীর অশ্বারোহী ও সাধারণ পদাতিক সৈন্য, যারা জীবিত ছিল, সকলেই মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে গিয়েছিল। সবাই অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করল যে, এক একজন মুসলিম সৈনিক ত্রিশ জনের মত খৃস্টান সৈন্যের প্লাটুনকে, যাদেরকে সে স্বহস্তে বন্দী করেছিল, তাঁবুর দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নিহত ক্রুসেডারদের লাশ ও তাদের কর্তিত হাত-পা এমনভাবে স্তূপাকারে পড়েছিল যেমনভাবে পাথরের পর পাথর স্তূপাকারে পড়ে থাকে। কর্তিত ও খণ্ড-বিখণ্ড লাশ এরূপ বিক্ষিপ্তভাবে মাটিতে পড়েছিল যেরূপ তরমুজের ক্ষেতে তরমুজ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকে।[1] দীর্ঘকাল যাবত যুদ্ধের এই ময়দানে, যেখানে এই রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং যেখানে তিরিশ হাযার লোক মারা গিয়েছিল বলে প্রকাশ—এক বছর পরেও সাদা সাদা হাড্ডির রাশিকৃত স্তূপ দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হ'ত। পশু-পক্ষীর ভক্ষণের পরও লাশের যে সব টুকরো অবশিষ্ট ছিল, অনেকদিন পর্যন্ত সেগুলো বিভিন্ন স্থানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে।[2]

সুলতানের ধর্মীয় আবেগ ও মর্যাদাবোধ

এই বিজয়ের সঙ্গে এ ঘটনাও ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে যা থেকে সুলতানের ধর্মীয় মর্যাদাবোধ ও ঈমানী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই ঘটনাও একজন ইংরেজ ঐতিহাসিকের মুখেই শুনুন ঃ

সুলতান সালাহুদ্দীন যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর তাঁবু স্থাপন করেন। যখন তাঁবু স্থাপিত হ'ল তখন তিনি হুকুম দিলেন সমস্ত যুদ্ধবন্দীকে তাঁর সামনে হাযির করতে। সম্রাট গাঈ ও তদীয় ভ্রাতা রেজিনাল্ড চ্যাটিলন (হুনায়ন)-কে ভেতরে নিয়ে আসা হ'ল। সুলতান জেরুযালেমের বাদশাহকে তাঁর পাশে বসান এবং তাঁকে পিপাসার্ত দেখে বরফ মিশ্রিত ঠাণ্ডা পানি ভরতি পাত্র তাঁর দিকে এগিয়ে দেন। সম্রাট গাঈ পানি পান করেন। অতঃপর পানির পাত্রটি কির্ক-এর শাসনকর্তা রেজিনাল্ডকে দেন। সুলতান এতদ্দৃষ্টে নাখোশ হন এবং দো-ভাষীকে বলেন ঃ বাদশাহকে বল, আমি ঐ ব্যক্তিকে পানি দেইনি, বাদশাহ্ গাঈ নিজে দিয়েছেন। লবণ ও রুটি যাকে দেওয়া হয় তাকে দাতার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ

১. সুলতান সালাহুদ্দীন, ১৮৭-৮৮।
২. প্রাগুক্ত, ১৮৯ পৃ.।

ভাবা হয়। কিন্তু এই ব্যক্তি আমার প্রতিশোধের জ্বলন্ত আগুন থেকে রেহাই পেতে পারে না। সালাহুদ্দীন এই বলেই রেজিনাল্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। রেজিনাল্ড তাঁবুতে প্রবেশ করবার পর থেকেই দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল। সুলতান তাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ শুনে রাখ, আমি তোকে হত্যা করবার জন্য দু'দু'বার কসম খেয়েছি। প্রথমবার কসম খেয়েছি, যখন তুই পবিত্র মক্কা ও মদীনা নগরীর ওপর হামলা করতে চেয়েছিলি। দ্বিতীয়বার কসম খেয়েছি যখন তুই ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে হাজীদের কাফেলার ওপর হামলা করেছিলি।[১] এবার দেখ, কিভাবে আমি তোর বেয়াদবী ও ঘৃণিত আচরণের প্রতিশোধ নিচ্ছি। –এই বলেই সালাহুদ্দীন খাপ থেকে তলোয়ার টেনে বের করেন এবং নিজের কৃত প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী স্বহস্তে রেজিনাল্ডকে হত্যা করেন।

সম্রাট গাঈ এই হত্যা দৃশ্য দেখে কেঁপে ওঠেন এবং ভাবতে থাকেন, এবার বুঝি তাঁরই পালা! কিন্তু সালাহুদ্দীন তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে, বাদশাহ্‌র রীতি নয় অপর বাদশাহ্‌কে হত্যা করা। ঐ লোকটি বার বার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিল বলে তার ব্যাপারে যা করার তাই করা হয়েছে (অর্থাৎ সে তার অপকর্মের উচিত শাস্তিই পেয়েছে)।[২]

ইবনে শাদ্দাদ লিখেছেন, সুলতান রেজিনাল্ডকে ডেকে পাঠান এবং বলেন ঃ ها انا انتصر لمحمد عليه الصلوة والسلام [এই দেখ, আমি মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষে প্রতিশোধ নিচ্ছি]। ইবনে শাদ্দাদ এও লিখেছেন যে, সুলতান তাকে ইসলামের দা'ওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু সে তা কবুল করেনি।[৩]

বায়তু'ল-মুকাদ্দাস জয়

হিত্তীন বিজয়ের পর সত্বর সেই পবিত্রতম মুহূর্তটিও এগিয়ে এল, সুলতান অধীর আগ্রহে যার অপেক্ষা করছিলেন এবং প্রাণপণে যা কামনা করছিলেন। সেই মুহূর্তটি হ'ল বায়তু'ল-মুকাদ্দাস বিজয়ের মুহূর্ত। কাযী ইবনে শাদ্দাদ লিখেছেন, "সুলতান বায়তু'ল-মুকাদ্দাসের ব্যাপারে খুবই চিন্তিত ছিলেন এবং তা তাঁর মনের ওপর এমন এক দুর্বহ বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যার ভার বহনে বোধ করি পাহাড়ও সক্ষম ছিল না।"[৪]

---

১. ক্বাযী ইব্‌নে শাদ্দাদের বর্ণনায় এতটুকু বেশী আছে যে, যখন ঐসব অসহায় হাজী মানবতা ও শরাফতীর নামে তাদের নিকট প্রাণ ভিক্ষার আবেদন জানিয়েছিল তখন সে ধৃষ্টতাপূর্ণ ভাষায় বলেছিল : তোদের মুহাম্মাদকে বল তোদের রেহাই দিতে। এই কথা সালাহুদ্দীনের কানে গিয়ে পৌছে। এতে তিনি মানত করেছিলেন, বেয়াদবটাকে হাতে পেলে তাকে স্বহস্তে হত্যা করবেন।

২. সুলতান সালাহুদ্দীন, ১৮৮ পৃ.।

৩. আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া, পৃ. ৬৪; ৪. প্রাগুক্ত।

এ বছরেই অর্থাৎ ৫৮৩ হিজরীর ২৭শে রজব/১১৮৭ খৃস্টাব্দে সুলতান বায়তু'ল-মুকাদ্দাসে প্রবেশ করলেন এবং দীর্ঘ ৯০ বছর পর ইসলামের এই প্রথম কিবলা মুসলমানদের অধিকারে এল। হুযুর আকরাম (সা)-মি'রাজের রাত্রিতে এই বায়তু'ল-মুকাদ্দাসেই আম্বিয়া-ই-কিরাম ('আ)-গণের ইমামতি করেছিলেন। আর এটি ছিল একটি বিস্ময়কর ও অভাবনীয় শুভ সংযোগ যে, সুলতান বায়তু'ল-মুকাদ্দাসে সেই তারিখেই প্রবেশ করেন যে তারিখে আঁ-হযরত (সা)-এর মি'রাজ হয়েছিল। কাযী ইবনে শাদ্দাদ বলেন ঃ

> এ ছিল এক বিরাট বিজয়। এই পবিত্র মুহূর্তে বায়তু'ল-মুকাদ্দাসে 'আলিম-'উলামা, কামিল-ফাযিল ও মুসাফির পর্যটকদের এক বিরাট সমাবেশ ঘটে। লোকেরা যখন জানতে পারল যে, সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকাসমূহ মুসলমানরা জয় করে ফেলেছে, তখন মিসর ও সিরিয়া থেকে 'উলামায়ে কিরাম দলে দলে বায়তু'ল-মুকাদ্দাস অভিমুখে রওয়ানা হন। তকবীর ও তাহলীল সজোরে ধ্বনিত হতে থাকে। অবশেষে বায়তু'ল-মুকাদ্দাসে প্রায় নব্বই বছর পর জুমু'আর সালাত আদায় করা হ'ল এবং কু'ব্বাতু'স'-স'খরার ওপর যে ক্রস-কাষ্ঠ স্থাপন করা হয়েছিল তা নামিয়ে দেওয়া হ'ল। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য! ইসলামের বিজয় ও আল্লাহ্‌র সাহায্য খোলা চোখে সবার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।[১]

মরহুম নূরুদ্দীন যঙ্গী বায়তু'ল-মুকাদ্দাসের জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে জাঁকজমকপূর্ণ একটি মিম্বর তৈরি করেছিলেন এই আশায় যে, আল্লাহ পাক যদি কখনো বায়তু'ল-মুকাদ্দাস মুসলমানদের হাতে ফিরিয়ে দেন তাহলে সেখানে তা স্থাপন করা হবে। সালাহুদ্দীন হলব (আলেপ্পো) থেকে মিম্বরটি নিয়ে আসেন এবং মসজিদে আকসায় তা স্থাপন করেন।[২]

ইসলামী চরিত্রের প্রদর্শনী

এ সময় সুলতান সালাহুদ্দীন সর্বসমক্ষে যে সদাশয়তা, উদারতা ও ইসলামী আখলাক-চরিত্র প্রদর্শন করেন তা একজন খৃস্টান ঐতিহাসিকের মুখেই শুনুন :

> সালাহুদ্দীন এর আগে আর কখনো এতটা উদারমনা ও উন্নত মনোবলসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে পেশ করেন নি, যতটা সেবার করেছিলেন। জেরুযালেম মুসলমানদের হাতে সোপর্দ করার মুহূর্তে সালাহুদ্দীনের অধীনস্থ

---

১. আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া, ৬৬ পৃ.।
২. তারীখ-ই-আবি'ল-ফিদা ইসমা'ঈল, ৩য় খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা।

সৈনিক ও দায়িত্বশীল অফিসারবর্গ শহরের অলি-গলির শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন যে কোন ধরনের জুলুম ও বাড়াবাড়ি প্রতিরোধে সংকল্পবদ্ধ। ফলে সে মুহূর্তে কোন খৃস্টানকেই কোনরূপ দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়নি। অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য একজন আমীরকে বাব-ই-দাউদ-এ মোতায়েন করা হয়েছিল। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন তিনি এমন প্রত্যেক নাগরিককে বাইরে যাবার অনুমতি দেন যে ফিদ্য়া (মুক্তিপণ) পরিশোধ করেছে।

অতঃপর সুলতানের ভাই আল-'আদিল, বাতরীক (প্যাট্রিয়র্ক) ও বালিয়ান কর্তৃক হাযার হাযার গোলাম আযাদ করার ঘটনা বিবৃত করে বলেছেন ঃ

অতঃপর সালাহুদ্দীন তাঁর আমীরদেরকে বললেন ঃ আমার ভাই তার নিজের পক্ষ থেকে এবং বালিয়ান ও প্যাট্রিয়র্ক (বাতরীক) তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট দান-খয়রাত করেছেন। এবার আমার বদান্যতা প্রদর্শনের পালা- এই বলে তিনি তাঁর সৈনিককে শহরের অলিগলিতে এই মর্মে ঘোষণা দিতে বলেন যে, যে সমস্ত বৃদ্ধের ফিদ্য়া (মুক্তিপণ) পরিশোধের সামর্থ্য নেই তারাও মুক্ত; তারা যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারে। এই ঘোষণার পর বাবু'ল-বা'যার হতে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আযাদকৃত লোকের দলে দলে বের হতে থাকে। এ ধরনের দয়া ও বদান্যতা প্রদর্শন একমাত্র সুলতান সালাহুদ্দীনের পক্ষেই ছিল সম্ভব।

মোট কথা, এভাবেই সুলতান সালাহুদ্দীন পরাজিত ও বিজিত শত্রুদের প্রতি ঐকান্তিক উদারতা ও বদান্যতা প্রদর্শন করেন। সুলতানের এই উদারতার বিপরীতে তাঁর শত্রুদের পশুসুলভ বর্বর আচরণের কথাও মনে পড়ে ক্রুসেডারগণের ১০৯৯ সালে জেরুসালেম বিজয়ের পর গডফ্রে ট্যাংকার্ড যখন সেখানকার গলি-ঘুপচিগুলো অতিক্রম করেছিল তখন মুসলমানদের ওপর তারা কী জুলুমই না করেছিল! চতুর্দিকে শত শত লাশ পড়ে ছিল এবং আহতদের কাতর আর্তনাদে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল আকাশ-বাতাস। এমতাবস্থায় ক্রুসেডারা ঐসব নিরাপরাধ অসহায় মুসলমানদের ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেছিল এবং জীবিত লোকদেরকে পুড়িয়ে মেরেছিল। কু'দ্স-এর ছাদে বুরুজে যে সব মুসলমান আশ্রয় নিয়েছিল ক্রুসেডাররা তাদের সেখানেই তীরের সাহায্যে এফোঁড়-ওফোঁড় করে নীচে নিক্ষেপ করেছিল। এই পাশবিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল ঠিক সেই জায়গায় যেখানে 'ঈসা মসীহ একা

দাঁড়িয়ে দয়া-মায়া ও প্রেমের ওয়া'জ শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ তারাই কল্যাণ ও প্রাচুর্যের অধিকারী এবং তাদের ওপরই আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয় যারা দয়া প্রদর্শন করে। খৃস্টানরা এই পাক ও পবিত্র শহর মুসলমানদের রক্তে হোলি খেলবার সময় একদম ভুলে গিয়েছিল তাদের রসূলের ঐ পবিত্র বাণী। ঐসব নির্দয় ও নির্মম খৃস্টানদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, তারা পরাজিত হয়ে সুলতান সালাহুদ্দীনের মত উদার হৃদয় সেনাপতির হাতে পড়েছিল যিনি অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে তাদের ভাগ্যের ফয়সালা করেছিলেন।

আল্লাহ্র যতগুলো গুণবাচক নাম আছে তাঁর ভেতর সবচেয়ে বড় নাম রাহ্'মান ও রাহ'ীম রহম (رحم) শব্দ থেকে উদ্ভূত। রহম (দয়া) ন্যায়বিচারের শিরোভূষণ এবং আল্লাহ্র জালালস্বরূপ। যেখানে 'আদল তথা ন্যায়-বিচার স্বীয় এখতিয়ার ও অধিকারের দাবিতে কাউকে হত্যার নির্দেশ দিতে পারে সেখানে একমাত্র রহমই তার প্রাণ বাঁচাতে পারে।

সুলতান সালাহুদ্দীনের সমস্ত গুণের ভেতর কেবল এই একটি গুণ সম্পর্কে যদি দুনিয়া অবহিত হ'ত, যদি জানতে পারত তিনি কিভাবে জেরুযালেমকে অনুগৃহীত করেছিলেন তাহলে তারা এক বাক্যে স্বীকার করত যে, সুলতান সালাহুদ্দীন কেবল তাঁর যুগেরই নন, বরং সর্বযুগের সর্বাপেক্ষা উন্নত মনোবলসম্পন্ন হৃদয়বান মানুষ এবং বীরত্ব ও ঔদার্যের জীবন্ত প্রতীক ছিলেন।[১]

ক্রুসেডারদের সয়লাব

মুসলমানদের হাতে বায়তু'ল-মুকাদ্দাস বিজয় এবং হিত্তীন রণক্ষেত্রে খৃস্টানদের অবমাননাকর পরাজয়ের কারণে গোটা য়ূরোপে পুনরায় ক্রোধানল জ্বলে ওঠে। তারা আছড়ে পড়ে সিরিয়ার (শামের) এই ছোট্ট দেশটির ওপর যেখানে য়ূরোপের প্রায় সকল নামকরা সেনাপতি ও বিখ্যাত সম্রাট যুদ্ধরত ছিলেন। রোম সম্রাট কায়সার ফ্রেডারিক, ইংল্যান্ডের সিংহহৃদয় রিচার্ড, ফ্রান্স, সিসিলী ও অস্ট্রিয়ার সম্রাটবর্গ, ফ্লান্ডার্স-এর ডিউক ও নাইটগণ তাঁদের লৌহবর্ম পরিহিত সেনাদল নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এদের সকলের মুকাবিলায় ছিলেন একাকী সুলতান সালাহুদ্দীন এবং তাঁর কতিপয় আত্মীয়-বান্ধব ও মিত্র শক্তি যারা গোটা মুসলিম বিশ্বের পক্ষ থেকে খৃস্টান শক্তিকে প্রতিহত করে যাচ্ছিলেন।

---

১. সুলতান সালাহুদ্দীন–২০২, ২০৫ পৃ.।

সন্ধি ও সুলতানের মিশনের পূর্ণতা সাধন

অবশেষে পাঁচ বছরের অব্যাহত রক্তাক্ত যুদ্ধের পর ১১৯২ ‘ঈসায়ীতে রমলা নামক স্থানে ক্লান্ত ও অবসন্ন উভয় পক্ষ সন্ধি স্থাপনে সম্মত হয়। বায়তু’ল-মুকাদ্দাসসহ মুসলমানদের বিজিত শহর ও দুর্গগুলো আগের মতই মুসলমানদের হাতে থাকে। সমুদ্রোপকূলবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্য একরের নিয়ন্ত্রণ খৃস্টানদের হাতে চলে যায়। বাদ বাকি গোট দেশই থাকে সুলতান সালাহুদ্দীনের অধিকারে। সুলতান সালাহুদ্দীন যে দায়িত্ব ও খিদমত নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং সত্যি বলতে কি, আল্লাহ্ পাক যে কর্মভার তাঁর কাঁধে ন্যস্ত করেছিলেন, তাঁর হাতে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। খৃস্টান ঐতিহাসিকের ভাষায় :

> পাঁচ বছরের অব্যাহত রক্তারক্তির পর পবিত্র যুদ্ধ (?) শেষ হ’ল। ১১৮৭ ‘ঈসায়ীর জুলাই মাসে হিত্তীনে মুসলমানদের বিজয়ের পূর্বে জর্দান নদীর পশ্চিমে তাদের অধিকারে এক ইঞ্চি জায়গাও ছিল না। ১১৯২ ‘ঈসায়ীর সেপ্টেম্বরে যখন রমলার সন্ধি স্থাপিত হয় তখন সূর থেকে শুরু করে য়াফা পর্যন্ত সমুদ্রোপকূল এলাকায় এক চিলতে ভূখণ্ড ছাড়া গোটা দেশটাই চলে গেল মুসলমানদের অধিকারে। এই সন্ধি স্থাপনের কারণে সালাহুদ্দীনের এতটুকু লজ্জিত হবার প্রয়োজন ছিল না। ক্রুসেডাররা যা কিছু জয় করেছিল তার বড় অংশটাই ছিল ফিরিঙ্গীদের দখলে। কিন্তু যদি কেবল জান ও মালের দিকটাই দেখা হয় তাহলে এ পরিণতি ও ফলাফল ছিল নিতান্তই নগণ্য। রোমের পোপের ফরিয়াদ শুনতেই গোটা খৃস্টান জগত অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও সিসিলীর সম্রাট, অস্ট্রিয়ার লিওপোল্ড, বার্গান্ডীর ডিউক, ফ্লান্ডার্স-এর কাউন্ট, শত শত খ্যাতনামা সুপরিচিত ব্যারন, সমগ্র খৃস্টান জাতিগোষ্ঠীর নাইটকুল, জেরুযালেমের খৃস্টান বাদশাহ এবং ফিলিস্তীনের অন্যান্য খৃস্টান রাজ্যপাল, দাবিয়া ও আল-বিতার শ্রেণীর বড় বড় অশ্বারোহী ব্যস্ত হয়ে পড়ে–কি করে বায়তু’ল-মুকাদ্দাস নিজেদের দখলে রাখা যায় এবং জেরুযালেমের নিবু নিবু খৃস্টান সাম্রাজ্যকে আবার সজীব ও তরতাজা করে তোলা যায়। কিন্তু তার পরিণতি কি হ’ল ? ইতোমধ্যেই জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক মৃত্যুমুখে যাত্রা করেন এবং তাদের স্বধর্মীয় অনেক বড় বড় অভিজাত ও সম্মানিত সাথী এশিয়া ভূ–খণ্ডেই চিরনিদ্রায় শায়িত থেকে যায়। পরিণামে জেরুযালেমের ওপর সুলতান সালাহুদ্দীনেরই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবল এককার সমুদ্রোপকূলবর্তী ছোট্ট ও সংক্ষিপ্ত একটি এলাকার ওপর নামেমাত্র খৃস্টান বাদশাহ্র কর্তৃত্ব বহাল

থাকে। তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধে গোটা খৃস্টান জগতের মিলিত শক্তি মুসলমানদের মুকাবিলায় অবতরণ করে। কিন্তু সালাহুদ্দীনের শক্তিতে তারা এতটুকু চিড় ধরাতে পারেনি। সালাহুদ্দীনের সৈন্যরা মাসের পর মাস ধরে কঠিন পরিশ্রম এবং বর্ষাকালব্যাপী সংশয়ান্বিত ও বিপজ্জনক খিদমতে নিয়োজিত থাকার কারণে ক্লান্তি ও অবসাদে ভেঙে পড়ছিল বটে, কিন্তু তাদের কারো মুখে অভিযোগের লেশমাত্র ছিল না। ডাকা মাত্রই যুদ্ধ শেষে হাযির হতে এবং একটি নেক কাজে নিজেদের জীবন কুরবানী দিতে তাদের কেউই পিছপা হয়নি। সুলতানের অধীনস্থ দজলা (টাইগ্রীস) নদীর দূর-দরাজ রাজ্যগুলোর শাসনকর্তাদের মনে এই সার্বক্ষণিক ডাকাডাকির কারণে কিছু না কিছু বিরক্তি বা দুর্বলতা আসাটা অসম্ভব কিছু ছিল না, এতদসত্ত্বেও তারা নিজ নিজ সেনাবাহিনী নিয়ে সুলতানের খিদমতে রীতিমত হাযিরা দিতে থাকেন বিরাট আত্মপ্রত্যয় ও কামনা সহকারে। জওয়ার-ই-সূফ নামক স্থানে শেষ যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে মাওসিল-এর সেনাবাহিনী অত্যন্ত বীরত্ব সহকারে লড়াই করে। এসব যুদ্ধে সুলতান সর্বদাই মিসর ও ইরাকের সৈন্যদের সাহায্যের আশা করেছিলেন। সিরিয়ার উত্তর ও কেন্দ্রীয় ফৌজের নিকট থেকেও একইরূপ সাহায্য-সমর্থনের আশা করেছিলেন এবং সে আশা পূর্ণও হয়েছিল। কূর্দ, তুর্কমেন, আরব, মিসরীয় সমস্ত মুসলমানই ছিল সুলতানের খাদেম, ডাকা মাত্রই তারা খাদেমের মতই সুলতানের খিদমতে এসে হাযির হ'ত। কে কোন্ বংশের কিংবা কে কোন্ জাতিগোষ্ঠীর–সেদিকে তাদের লক্ষ্য ছিল না। জাতিগত বৈপরীত্য সত্ত্বেও সুলতান তাদেরকে এমন একটি অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত করেছিলেন যে, গোটা বাহিনী যেন এক আত্মায় লীন হয়ে গিয়েছিল। মনে হ'ত সবাই যেন একই জাতিগোষ্ঠীর সদস্য। সন্দেহ নেই যে, দু' একবার তাদেরকে একতাবদ্ধ ও অখণ্ড রাখতে সুলতানকে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং কতক নাযুক মুহূর্ত এমনও গেছে, যখন তাদের স্বভাব-প্রকৃতিতে কিছুটা বিচ্ছিন্নতাও লক্ষ্য করা গেছে। এ সব ছোটখাটো ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, বিভিন্ন বংশ ও জাতিগোষ্ঠীর এই মুসলিম সৈন্যরা ১১৯২ ঈসায়ীর হেমন্ত কাল পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে সুলতানের নির্দেশাধীন থাকে এবং ১১৮৭ ঈসায়ীতে যে অনুপ্রেরণা নিয়ে তারা আল্লাহ্র পথে কাজ করবার জন্য সুলতানের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল– শেষাবধি তাদের সে অনুপ্রেরণা বহাল থাকে। এই গোটা সময়টাতে সুলতানের অধীনস্থ কোন প্রদেশ যেমন তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

যায়নি, তেমনি সুযোগ পায়নি কোন সর্দার কিংবা করদ রাজ্য তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার। তাঁর শুভ ইচ্ছা ও প্রাণান্তকর প্রয়াসের প্রতিচ্ছবি ছিল এই যে, তিনি মযবুত থেকে মযবুততরো প্রত্যয় ও নেতৃত্বের শক্তিকেও অনায়াসে পরীক্ষায় হারিয়ে দিতেন। কেবল ইরাকে সুলতানের একজন প্রিয়ভাজন বিদ্রোহ করেছিল। সুলতান তাকে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দিয়ে তার সংশোধনের ব্যবস্থা করেন। জনগণের ওপর সুলতানের যে অপরিসীম প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, তার প্রমাণ হ'ল, পাঁচ বছরব্যাপী রক্তাক্ত যুদ্ধের অবসানকালীন মুহূর্তেও সুলতান কূর্দিস্তানের পাহাড়ী এলাকা থেকে শুরু করে নওবা প্রান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার একক অধীশ্বর ছিলেন। শুধু তাই নয়, সুর্দর কূর্দিস্তানের বাদশাহ, আর্মেনিয়ার কাছেলীন (তৎকালীন শাসক), কাওনিয়ার সুলতান ও কনস্টান্টি-নোপলের সম্রাটও সুলতান সালাহুদ্দীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু সালাহুদ্দীন ঐ সব দোস্ত ও মিত্রবর্গের কোন বদান্যতা বা মহত্ত্বের কাছে বন্দী হননি। বিপদের দিনে ওদের কেউ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। অবশ্য সাফল্য লাভের পর অনেকেই তাঁকে মুবারকবাদ জানাতে এসেছিল। যুদ্ধ ঘোষণা, শত্রুর মুকাবিলা সব কিছুই সুলতান সালাহুদ্দীন নিজের একার দায়িত্বে করেছিলেন। সুলতানের ভাই আল-'আদিল ভিন্ন (তাঁর আবির্ভাবও হয়েছিল একেবারে শেষের দিকে) অন্য কোন লোক, কোন সিপাহসালার কিংবা পরামর্শদাতা সম্পর্কে কেউ বলতে পারবে না যে, তিনি সুলতানের পরামর্শদাতা কিংবা শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে তাঁকে আপন প্রভাববলয়ে বন্দী করতে পেরেছিলেন। একটি সামরিক উপদেষ্টা পরিষদ অবশ্য ছিল, তবে উক্ত পরিষদের কোন একজন সদস্যও সুলতানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলতে পারত না যে, তার মতই সুলতানকে অপর সদস্যের তুলনায় বেশি প্রভাবিত করেছে। ভাই, ভাতিজা, পুত্র, পুরনো বন্ধু-বান্ধব, অধীনস্থ নতুন কর্মচারী, সাবধানী কাযী, সতর্ক, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য উযীর, গোঁড়া ওয়ায়েজীন ও মোল্লা সবাই একটা বিষয়ে একমত ছিলেন যে, যুদ্ধ করতে হবে, করতে হবে জিহাদ। শুধু মুখের কথায় নয়, কাজে-কর্মেও তাঁরা এ জিহাদে শরীক ছিলেন। রক্তাক্ত যুদ্ধের সঙ্গীন ও নাযুক মুহূর্তেও সবাই ছিলেন একই কণ্ঠে উচ্চকিত, একই দেহ ও একই প্রাণে লীন। সুলতান সালাহুদ্দীনের মন-মানস ও তাঁর অভিপ্রায়ই এভাবে সকলকে একই লক্ষ্যাভিসারী করে তুলতে পেরেছিল।[১]

১. সুলতান সালাহুদ্দীন–৩১০-৩১২ পৃ.।

ওফাত

আপন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে এবং মুসলিম জাহানকে ক্রুসেডারদের গোলামীর ভয়াবহ বিপদ থেকে উদ্ধার করে ৫৮৯ হিজরীর ২৭শে সফর ইসলামের এই বিশ্বস্ত সন্তান দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৭ বছর।[১] কাযী বাহাউদ্দীন ইব্‌ন শাদ্দাদ সুলতানের ওফাতকালীন অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

> ২৭শে সফর ছিল সুলতানের রোগাক্রান্ত হবার দ্বাদশ দিবস। এ দিন তাঁর অসুস্থতা কঠিন আকার ধারণ করে, দেহের শক্তি হ্রাস পায়। ইমামু'ল-কিলাসা শায়খ আবূ জা'ফরকে, যিনি খুবই নেককার ও বুযুর্গ লোক ছিলেন, সুলতানের অবস্থাদৃষ্টে দুর্গের ভেতরেই রাত কাটাবার অনুরোধ জানানো হয়। না জানি, রাতের বেলা যদি সুলতানের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়েই আসে তাহলে তিনি যেন সুলতানকে শেষ তালকীন দিতে পারেন, সুলতান যেন অন্তিম মুহূর্তে আল্লাহ্‌র নাম নিতে পারেন। রাতের বেলার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, সুলতান তাঁর শেষ সফরে রওয়ানা হবার সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন। এমতাবস্থায় শায়খ আবূ জা'ফর তাঁর নিকট বসে কুরআন তিলাওয়াত ও যিকর-আযকারে মশগুল হয়ে পড়েন। তিন দিন আগে থেকেই সুলতানের মধ্যে এক ধরনের স্মৃতিবিভ্রম ও অসতর্কাবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। কখনো-সখনো তিনি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠছিলেন। শায়খ আবূ জা'ফর তিলাওয়াত করতে করতে যখন (সূরা হাশরের) هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ هُوَ - عٰلِمُ الْغَيْبِ তে গিয়ে পৌঁছেন তখন সুলতান শেষবারের মত হুঁশ ফিরে পান। তাঁর ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি ভেসে ওঠে। দু'চোখ মেলে ধরেন তিনি এবং বলেন ঃ ঠিক কথা। এই বলেই তিনি চিরতরে চোখ বন্ধ করে ফেলেন। সেদিন ছিল ২৭শে সফর বুধবার ফজরের ওয়াক্ত। মনে হচ্ছিল, খুলাফা-ই-রাশিদীনের ইনতিকালের পর এমন কঠিন দিন মুসলিম ইতিহাসে আর আসেনি। শহর দুর্গ সর্বত্র এক ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। গোটা পরিবেশটাই থম থমে হয়ে ওঠে। আমি আগে যখন শুনতাম যে, লোকে অপরের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে তখন মনে করতাম, এটা একটা কথার কথা। কিন্তু সেদিন বুঝতে পারলাম, খোদ আমি ও আমার মত আরও অনেকেই ছিলেন যারা সুলতানের জীবনের বিনিময়ে নিজেদের জীবনকে কুরবানী দিতে তৈরি ছিলেন যদি এ কুরবানী দিয়ে সুলতানকে বাঁচানো সম্ভব হ'ত।[১]

---

১. সুলতানের জন্ম ৫৩২ হিজরীতে (আবু'ল-ফিদা—৩য় খণ্ড, ৯০ পৃ.)।

কাযী ইবনে শাদ্দাদ বলেন ঃ সুলতান তাঁর ইনতিকালের সময় পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে একটি মাত্র দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) এবং ৪৭টি দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) রেখে গিয়েছিলেন। নিজের বলতে তাঁর কোন জায়গা-জমি, বাগ-বাগিচা, কৃষি ভূমি কিংবা বসতবাটি কিছু ছিল না। জানাযা ও দাফন-কাফনে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে একটি পয়সাও ব্যয়িত হয়নি, সব কিছুই ধার করে করা হয়েছিল, এমন কি কবরের ওপর বিছাবার জন্য দরকারী ঘাসটুকুও কর্জের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল। কাফনের কাপড়টুকুর ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর উযীর ও সচিব কাযী ফাযেল আপন বৈধ ও হালাল উপার্জন থেকে[১]।

দরবেশ চরিত্রের সুলতান

কাযী ইবনে শাদ্দাদ সুলতানের জীবন-চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে বলেছেন :

সুলতান খুবই কট্টর ও বিশুদ্ধ 'আকীদার মুসলমান ছিলেন। 'আকীদার দিক দিয়ে তিনি আহলে সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আতের পরিপূর্ণ অনুসারী ছিলেন। ফরয সালাত ও ওয়াজিব আদায়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন তিনি। একবার তিনি বলেছিলেন ঃ বছরের পর বছর গুজরে গেছে, এক ওয়াক্ত সালাতও বিনা জামা'আতে আমি আদায় করিনি। রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও তিনি ইমামকে ডেকে পাঠাতেন এবং স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে তার পেছনে সালাত আদায় করতেন। নির্ধারিত সুন্নতগুলো তিনি হামেশা পালন করতেন। রাতের বেলা যথাসম্ভব নফল পড়তেন, আর রাতের নফল যদি কোন দিন কাযা হয়ে যেত তাহলে (শাফি'ঈ মযহাব অনুযায়ী) [২] ফজরের সালাতের পূর্বেই তা আদায় করে নিতেন। দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও তাঁকে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে দেখা গেছে। বেহুঁশ থাকা অবস্থায় কেবল তিন দিন তিনি সালাত আদায় করতে পারেননি। সারা জীবনে তাঁর ওপর যাকাত ফরয হবার সুযোগ আসেনি। কারণ কোন সময়ই তাঁর নিকট এমত পরিমাণ সম্পদই জমা হয়নি যার ওপর যাকাত ফরয হতে পারে। তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ দান-খয়রাতে ব্যয় হয়েছে। মৃত্যুকালে তিনি কেবল ১টি দীনার ও ৪৭টি দিরহাম রেখে যান। এ ছাড়া আর কোন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি

---

১. আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া—২৪৯-৫০।

২. সুলতান শাফি'ঈ মযহাবের অনুসারী ছিলেন।

তিনি রেখে যাননি। রমযানে কঠোরতার সঙ্গে সিয়াম পালন করতেন; এ ক্ষেত্রে এতটুকু শৈথিল্যও তিনি দেখান নি। কয়েকটি রোযা তাঁর যিম্মায় বাকি ছিল এবং তা কাযী ফাযেলের ডাইরীতে লিপিবদ্ধ ছিল। ওফাতের আগে খুবই সুচারুরূপে তিনি সেগুলোর কাযা আদায় করেন। কঠিন রোগাক্রান্ত অবস্থায় চিকিৎসকেরা তাঁকে এ থেকে নিবৃত্ত রাখতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তিনি জওয়াবে বলেন ঃ আগামীকালের অবস্থা সম্পর্কে আমি আদৌ অবহিত নই। শেষ পর্যন্ত কাযা আদায়ের পর পরই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

হজ্জ করতে খুবই আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু একবারের তরেও সে সুযোগ তিনি পাননি। যে বছর সুলতানের ওফাত ঘটে, সে বছর এ আগ্রহ তাঁর প্রবল আকার ধারণ করেছিল; কিন্তু মৃত্যু তাঁকে সে সুযোগ দেয়নি। কুরআন মজীদ শোনার আগ্রহ ছিল তাঁর প্রবল। কখনো কখনো তিনি বুরুজে পাহারাদারদের থেকে দু'-তিন পারা কিংবা চার পারার মত তিলাওয়াত শুনে নিতেন। অত্যন্ত বিনম্র, ভীত ও দ্রবীভূত অন্তঃকরণের অধিকারী ছিলেন তিনি। কুরআন মজীদ-এর তিলাওয়াত শ্রবণে অধিকাংশ সময় তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠত। হাদীছ শ্রবণেও তিনি সমান আগ্রহী ছিলেন। হাদীছের পাঠ চলাকালে তিনি লোকদেরকে ভক্তিভরে উপবেশন করবার নির্দেশ দিতেন। হাদীছের ক্ষেত্রে উচ্চ মরতবার অধিকারী কোন শায়খের সন্ধান পেলে তিনি নিজেই তাঁর মজলিসে গিয়ে হাদীছ শ্রবণ করতেন। তিনি হাদীছের দর্স দিতেও আগ্রহী ছিলেন। কোন হাদীছ যদি উপদেশাত্মক ও শিক্ষামূলক হ'ত তাহলে তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠত। একেবারে যুদ্ধের ময়দানেও তিনি কয়েকবার দু'সারির মাঝে দাঁড়িয়ে হাদীছ শুনেছেন, কেননা এটি বিশেষ ফযীলতের মুহূর্ত। ধর্মীয় প্রথা-পদ্ধতি ও রীতিনীতিকে তিনি বেশ তা'জীম করতেন। মুলহিদ (ধর্মবিরোধী) সুহরাওয়ার্দী-কে তাঁর ইঙ্গিতে তৎপুত্র আল-মালিকু'জ-জাহির হত্যা করে। আল্লাহ্‌র ওপর ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। অত্যন্ত নাযুক মুহূর্তগুলোতে তিনি আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরে যেতেন এবং একমাত্র তাঁরই সাহায্য কামনা করতেন।

একবার বায়তু'ল-মুকাদ্দাসের নিরাপত্তা নিয়ে কঠিন বিপদ দেখা দেয়। বিপদটা এসেছিল নিকটেই অবস্থানরত ক্রুসেডারদের পক্ষ থেকে। বায়তু'ল-মুকাদ্দাস নিয়ে সুলতান গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। জুমু'আর রাত্রি। শীতের প্রকোপপূর্ণ রাতে আমি একা তাঁর খিদমতে হাযির। আমরা দু'জনে রাতভর যিক্‌র-আযকার ও দু'আর মধ্যেই কাটিয়ে দিলাম। সুলতানের মেযাজে

অধিকাংশ সময়ই অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। সারা রাত জেগে কাটাবার কারণে আমি আশঙ্কা করছিলাম, না জানি, সুলতান তাঁর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন! সুলতানকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার জন্য বললাম। সুলতান বললেন ঃ ঘুমের অভাব তোমাকে বেশ পীড়া দিচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, আর সে জন্যই তুমি আমাকে ঘুমোবার পরামর্শ দিচ্ছ? এই বলে তিনি উঠে পড়লেন। অল্পক্ষণ পরেই মুওয়াযযিন ভোরের আযান হাঁকল। সাধারণত ফজর আমরা এক সঙ্গেই পড়তাম। হাযির হয়ে দেখতে পেলাম, তিনি সেখানে ওযু করছেন। আমাকে দেখে বলে উঠলেন ঃ মুহূর্তের জন্যও আমি দু'চোখের পাতা এক করিনি। এরপর আমরা সালাতে মশগুল হয়ে গেলাম। হঠাৎ আমার মনে একটা ভাবের উদয় হ'ল। আমি আরয করলাম : আমার মস্তিষ্কে একটা কথার উদয় হয়েছে। আমার বিশ্বাস তা উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনি আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করুন এবং তাঁরই সমীপে কান্নাভেজা কণ্ঠে দু'আ করতে থাকুন। বিশ্বাস করুন, একমাত্র আল্লাহ্‌ই পারেন এই মুশকিল আসান করতে। "কি ভাবে তা সম্ভব?" সুলতান প্রশ্ন করলেন। আমি বললাম : আজ শুক্রবার, জুমুআর দিন। মসজিদে যাবার আগে গোসল সের নিন। মসজিদে আকসার সেই জায়গায় গিয়ে সালাত আদায় করুন যেখান থেকে হুযূর (সা) মি'রাজে তশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন, আর কোন বিশ্বস্ত লোকের মারফত এমনভাবে সাদকা করুন, যেন কেউ তা জানতে না পারে। এরপর আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তীতে দু' রাকাত সালাত আদায় করুন। হাদীছে এর বিরাট ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর সিজদায় গিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট আরয করুন : আল্লাহ রাব্বু'ল-'আলামীন! বস্তুগত সকল উপায়-উপকরণ ও পার্থিব সকল আশ্রয় আমার ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। তোমার দীনের সাহায্য ও বিজয়ের কেবল একটাই অবলম্বন রয়ে গেছে। আর তা হ'ল, আমি শুধু তোমারই আস্তানায় মাথা ঝুঁকাব এবং তোমারই আশ্রয়কে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরব। এখন কেবল তুমিই ভরসা, তুমিই আশ্রয়দাতা ও মদদগার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ্ পাক আপনার দু'আ কবুল করবেন।

সুলতান তাই করলেন। আমি আমার চিরদিনের অভ্যাস মাফিক তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম। আমি দেখতে পেলাম, তিনি সিজদায় পড়ে আছেন। চোখের পানিতে তাঁর দাঁড়ি ভিজে গেছে এবং জায়নামাযের ওপর টপটপ করে তা ঝরে পড়ছে। তিনি কি দু'আ করলেন আমি শুনিনি। কিন্তু সেদিনই তাঁর দু'আ কবুল হবার আলামত দেখতে পেলাম। ক্রুসেডারদের

মধ্যে অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার প্রকাশ ঘটতে দেখা গেল। উপর্যুপরি সান্ত্বনাদায়ক খবর পেতে লাগলাম আমরা। সোমবার ভোরবেলা পর্যন্ত ময়দান একেবারে সাফ হয়ে গেল। আক্রমণকারী ফৌজ বায়তু'ল-মুকাদ্দাস বিজয়ের খেয়াল ছেড়ে রমলার দিকে চলে যায়।[১]

সর্বোত্তম চরিত্র-আখলাক

'ইবাদত-বন্দেগী ও উত্তম আমলের সাথে তাঁর মধ্যে উত্তম শাসকসুলভ গুণ, ন্যায়বিচার, ক্ষমাশীলতা, সহিষ্ণুতা, দানশীলতা, মানবতাবোধ, আভিজাত্য, ধৈর্য, শৌর্য-বীর্য, ঔদার্য ও উন্নত মনোবলের ন্যায় মহান গুণাবলীও ছিল।

কাযী ইবনে শাদ্দাদ বলেন :

সপ্তাহে দু'বার—সোমবার ও বৃহস্পতিবার সুলতানের দরবারে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল। ফকীহ (আইনজ্ঞ ও ব্যবহারজীবী), কাযী (বিচারক), 'আলিম-'উলামা ও মোকদ্দমার বাদী-বিবাদীরা ঐ দিন তাঁর দরবারে হাযির হ'ত। ছোট-বড় ও আমীর-গরীবদেরও তাঁর দরবারে আসবার ঢালাও অনুমতি ছিল। দেশে অবস্থানকালে কিংবা সফরে কোন অবস্থাতেই এই সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটত না। রাত্রি দিনে অন্তত একবার তিনি মামলা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বসতেন এবং রাষ্ট্রীয় কার্যাদিও দেখাশোনা করতেন। রাষ্ট্রীয় ফরমান ও চিঠি-পত্রাদির ওপর স্বয়ং দস্তখত করতেন। অভাবী কিংবা বিপন্ন কোন লোককে তিনি তাঁর দরবার থেকে কখনই ব্যর্থ ও নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে দিতেন না। এত দায়িত্ব পালন সত্ত্বেও তিনি যিকর-আযকার ও কুরআন তিলাওয়াত থেকে গাফিল থাকতেন না।

কেউ কোন ফরিয়াদ কিংবা শেকায়েত (অভিযোগ) পেশ করলে তিনি নিজে দাঁড়িয়ে তা শুনতেন, ফরিয়াদীকে সান্ত্বনা দিতেন এবং তার মামলার ব্যাপারে পরিপূর্ণ আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদর্শন করতেন। একবার একজন সাধারণ গোছের লোক সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র তকীউদ্দীনের বিরুদ্ধে (যিনি সুলতানের খুবই প্রিয়ভাজন ছিলেন) মামলা দায়ের করে। সুলতান তক্ষুণি তাঁকে তলব করেন এবং নিজেই মামলার শুনানি নেন। একবার একটি লোক তো স্বয়ং সুলতানের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করে বসে। সুলতান নিজেই ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখেন। যদিও দাবিদারের হক তাতে প্রমাণিত হয়নি, কিন্তু তথাপিও সুলতান

১. আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া—৫, ১০ পৃ.।

তাকে একেবারে ব্যর্থ ফিরে যেতে দেননি। তাকে খেলাত ও অন্যান্য মালামাল দিয়ে বিদায় করেন।

তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু মেযাজের ছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান বলেন :

তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও খাদেমদের ছোটখাট দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করতেন। তিনি এমন কোন কথা যদি শুনতেন যা তাঁকে কষ্ট দিত তাহলে তক্ষুণি তা হযম করে ফেলতেন, অন্য কাউকে তা বুঝতেই দিতেন না। একবার তিনি পানি চাইলেন। পানি এল না। তিনি আবারও পানি চাইলেন। এবারও এল না। পরপর পাঁচবার এ ধরনের ঘটনা ঘটল। শেষাবধি তিনি বললেন ঃ বন্ধুরা! আমি তো পিপাসায় মারা যেতে চললাম। ইতোমধ্যেই পানি এল। তিনি পান করলেন। কিন্তু বিলম্বের কারণে কাউকেই কিছু বললেন না।[১] একবার তিনি কঠিন অসুখ থেকে ওঠেন। গোসল করে পরিপূর্ণ স্বস্তি লাভ করবেন– এই আশায় হাম্মামে গেলেন। পানি ছিল গরম। ঠাণ্ডা পানি চেয়ে পাঠালেন। খাদেম পানি এনে হাযির করল। ঢালতে গিয়ে কিছু পানি টল্‌কে সুলতানের শরীরে গিয়ে পড়ে। দুর্বলতা হেতু তিনি এতে বেশ কষ্ট পান। তিনি পুনরায় ঠাণ্ডা পানি চাইলেন। এবার ঠাণ্ডা পানির পুরো পাত্রটাই পড়ে যায় এবং সমস্ত পানি সুলতানের ওপর গিয়ে পড়ে। সুলতান মরতে মরতে বেঁচে যান। এত কিছুর পরও তিনি কেবল এতটুকু বললেন ঃ আমাকে যদি মেরে ফেলার ইচ্ছাই করে থাক তাহলে তা পরিষ্কার বলে ফেল। খাদেম তার এই অসাবধানতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। সুলতান নিশ্চুপ হয়ে যান। এজন্য তাকে আর কৈফিয়তের কাঠগড়ায় দাঁড় করান নি।[২]

কাযী ইবনে শাদ্দাদ ফৌজের সেনানায়কদের ভুল-ভ্রান্তি এবং সুলতানের ক্ষমাশীলতা ও সহিষ্ণুতার কতিপয় বাস্তব ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন।[৩]

সুলতানের বদান্যতার অবস্থা ছিল এমন যে, (ইবনে শাদ্দাদের ভাষায়) তা কোন সময় বিজিত প্রদেশ অন্যকে দান করে দেওয়া পর্যন্ত পৌঁছে যেত। তিনি আমেদ জয় করেন। ইবনে কুরা আরসালান নামক জনৈক সর্দার তা চেয়ে বসে। তিনি তাকে তা দিয়ে দেন। এমন মুহূর্তও দেখা গেছে যে, নিজের সামান-আসবাব বিক্রি করেও আগত প্রতিনিধি দলকে উপহার-উপঢৌকনাদি

১. তারীখ-ই-ইবন খাল্লিকান, তরজমা–সুলতান সালাহুদ্দীন।
২. তারীখ-ই-ইবনে খাল্লিকান, তরজমা–সুলতান সালাহুদ্দীন।
৩. আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া–২১, ২৪ পৃ.।

দিয়ে তিনি তুষ্ট করছেন। রাজকোষের কর্মচারীবৃন্দ তাঁর নাযুক মুহূর্তে যাতে কাজে আসে সেজন্য কিছু কিছু অর্থ লুকিয়ে রাখত। তাদের ভয় ছিল, সুলতান যদি জেনে ফেলেন যে, রাজকোষে অর্থ জমা আছে তাহলে তিনি তা অবিলম্বে খরচ করে ফেলবেন। একবার তিনি অন্যের উদাহরণ টেনে বলেছিলেন ঃ কিছু লোক এমনও হতে পারে যাদের কাছে অর্থ ও মাটির মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই; দুটোকেই তারা একই দৃষ্টিতে দেখে। আমি জানি, এ কথা বলে তিনি তাঁর নিজের অবস্থাই বুঝিয়েছেন।[১]

তাঁর মানবতা ও ভদ্রতাবোধ এতই প্রকট ছিল যে, কোন আগন্তুক ও দর্শনার্থীকেই তিনি রিক্ত হস্তে বিদায় করতেন না– চাই সে কাফির, মুশরিক অথবা য়াহূদী হোক। সায়দার শাসনকর্তা একবার তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি তাকে খুবই খাতির-যত্ন করেন, নিজরে সাথে বসিয়ে খানা খাওয়ান এবং সেই সাথে তাকে ইসলামের দা'ওয়াতও দেন। অন্য কোনভাবে নয়, বরং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য বর্ণনা করে তিনি তাকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর মনুষ্যত্ব ও শরাফতীর শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন এই যে, তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিপক্ষ রিচার্ড অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তাঁর জন্য পথ্যস্বরূপ বরফ ও ফল-ফলারি প্রেরণ করেন।[২]

সুলতান খুবই উদারহৃদয় ও দরদী চিত্তের মানুষ ছিলেন। জুলুম-অত্যাচার তিনি বরদাশ্‌ত করতে পারতেন না, বিশেষ করে দুর্দশাপীড়িত দুর্বল মানুষের কষ্ট তাঁর কাছে ছিল একেবারে অসহ্য। ইবনে শাদ্দাদ বলেন ঃ একবার এক বৃদ্ধা খৃস্টান মহিলা তাঁর নিকট এল। সে বুক চাপড়ে কাঁদছিল। সুলতান তার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করেন। জওয়াবে বৃদ্ধা জানায় ঃ আমার ছোট্ট বাচ্চাটিকে এক ডাকু এসে তাঁবু থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সারা রাত আমি কেঁদে কাটিয়েছি। সুলতানের জনৈক লোক আমাকে বলল ঃ সুলতান খুবই মেহেরবান ও স্নেহপরায়ণ। আমি তোমাকে তাঁর কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। তুমি গিয়ে ফরিয়াদ জানাও। সে-ই আমাকে আপনার খেদমতে পৌঁছে দিয়েছে। আমি আমার বাচ্চা আপনার কাছ থেকেই নিতে চাই। সুলতান তার এই অবস্থাদৃষ্টে খুবই ব্যথিত হন। তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি লোককে সৈনিকদের বাজারে পাঠিয়ে দেন, কে এই মহিলার বাচ্চাটিকে খরিদ করেছে তা খুঁজে বের করতে এবং যে কোন মূল্য দিয়ে

১. আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া, ১৩–১৪ পৃ.।
২. আল-ফাতহু'ল-কাসী ফি'ল-ফাৎহি'ল-কুদসী, ইমামুদ্দীন আল-কাতিব।

হোক বাচ্চাটিকে ফেরত নিয়ে আসতে। অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল, লোকটি অশ্বপৃষ্ঠে করে বাচ্চাটিকে কাঁধে বয়ে নিয়ে আসছে। বাচ্চাটিকে দেখা মাত্রই বৃদ্ধা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং কপাল ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন বিড়বিড় করে বলল। অতঃপর হৃষ্ট চিত্তে আপন বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে ফিরে গেল।[১]

কাযী ইবনে শাদ্দাদ বলেন ঃ সুলতান যখন কোন ইয়াতীম (পিতৃমাতৃহীন) শিশু দেখতেন অমনি তার সঙ্গে স্নেহ কোমল কণ্ঠে আলাপ জুড়ে দিতেন, তার অন্তর জয়ের চেষ্টা করতেন, তাকে কিছু উপহার-সামগ্রী দিতেন এবং তার লালন-পালনের কেউ না থাকলে নিজের পক্ষ থেকে তার লালন-পালনের ব্যবস্থা করতেন। বয়োবৃদ্ধ কোন লোক দেখলে তাকে তিনি খুব সমীহ করতেন এবং তার সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ করতেন।[২]

পুরুষোচিত গুণাবলী

সুলতানের ধৈর্য ও দৃঢ়তা ছিল অপরিসীম। কাযী ইবনে শাদ্দাদের বর্ণনা অনুযায়ী :

একবার তিনি কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত এত বেশী ঘা ও ফোঁড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন যে, ওঠাবসা করা তাঁর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এমন কি দস্তরখানে বসে তিনি খানাও গ্রহণ করতে পারছিলেন না। এতদসত্ত্বেও শত্রুর মুকাবিলায় তিনি ছিলেন বাঁধা কোমরে খাড়া। আমি তাঁকে সকাল থেকে মাগরিব অবধি অশ্বপৃষ্ঠে রণক্ষেত্রে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বরাবর চক্কর লাগিয়ে সেনাদলের সঠিক ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করতে দেখেছি। ফোঁড়ার কষ্ট তিনি ধৈর্য সহকারে সহ্য করছিলেন। আমি বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনি বলতেন ঃ অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হবার পর ব্যথা-বেদনার আর কোন অনুভূতি আমার থাকে না।[৩]

এক যুদ্ধে অসুস্থাবস্থায়ও তিনি শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রাখেন। এক রাত্রে আমি ও চিকিৎসক সুলতানের সেবায় নিয়োজিত ছিলাম এবং তাঁর মন প্রফুল্ল রাখতে চেষ্টা করছিলাম। সুলতান কখনো শয়ন করছিলেন, আবার কখনো জেগে উঠছিলেন। এভাবেই ভোর হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুলতান অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে বসলেন এবং আপন সন্তানদেরকে সর্বাগ্রে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের ময়দানে পাঠিয়ে দিলেন। একে একে তিনি বাকি সবাইকেও আল্লাহ্‌র নামে

১. আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া, ২৬ পৃ.; ২. প্রাগুক্ত, ২৮ পৃ.; ৩. প্রাগুক্ত, ১৮ পৃ.।

উৎসর্গ করে সমরক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন। কেবল আমি ও চিকিৎসক থেকে গেলাম। সন্ধ্যা অবধি সুলতান যুদ্ধের তত্ত্বাবধানেই ব্যস্ত রইলেন। রাত্রি বেলা সেনাবাহিনীকে সশস্ত্র সতর্কাবস্থায় অতিবাহিত করবার অনুমতি দেওয়া হ'ল। অতঃপর আমরা সুলতানসহ তাঁবুতে প্রত্যাবর্তন করলাম।[১]

সুলতানের বীরত্বও ছিল তুলনাহীন। কাযী ইবনে শাদ্দাদের বর্ণনা মতে :

সুলতান দিনে দু'একবার শত্রুর আশেপাশে টহল দিয়ে ফিরতেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলাকালে সুলতান একাকী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে সৈন্যব্যূহের মাঝখানে টহল দিয়ে বেড়াতেন। আরোহীশূন্য ও অস্ত্রসজ্জিত একটি অশ্ব সহিসের সঙ্গে থাকত। তিনি তাঁবু থেকে বের হয়ে বাম পার্শ্বের ব্যূহ পর্যন্ত সৈন্যদলের ভেতর ঢুকে পড়তেন, অতঃপর কাতার ভেদ করে বেরিয়ে যেতেন। বিভিন্ন ফৌজী প্লাটুনকে ডেকে তিনি তাদেরকে উপযুক্ত স্থানে অবস্থান নেবার কিংবা সম্মুখে অগ্রসর হবার নির্দেশ দিতেন। তিনি কতটা নিরুদ্বেগ, প্রশান্ত ও ভয়শূন্য ছিলেন তা নিম্নের ঘটনা থেকে অনায়াসে অনুমান করা যাবে। একবার আমি তাঁকে বললাম ঃ সুলতান বিভিন্ন সময় হাদীছ শুনেছেন, কিন্তু কখনো ঠিক যুদ্ধ চলাকালে সেনাকাতারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাদীছ শোনার সুযোগ তাঁর ঘটেনি। এ সৌভাগ্যও যদি হয়ে যায় তাহলে খুব ভাল হয়। অনন্তর সুলতান কাতারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাদীছ শ্রবণ করলেন।[২] শত্রুর সংখ্যাশক্তিকে কখনই তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না এবং এটা তাঁর মন-মানসেও কোন প্রভাব ফেলতে পারত না। কখনো কখনো পাঁচ-ছয় লক্ষের বিরাট শত্রু বাহিনীরও তিনি মুকাবিলা করেছেন, কিন্তু মোটেই ভীতিগ্রস্ত হননি, বরং আল্লাহ্র মেহেরবানীতে জয় লাভই করেছেন। তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনীর কাছে বিরাট শত্রুবাহিনী হতাহত হয়েছে, বন্দী হয়েছে।[৩]

একবার সত্তরেরও কিছু বেশী শত্রু জাহাজ এককায় (একরে) আগমন করে। আমি 'আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত জাহাজগুলো গণনা করলাম। কিন্তু সুলতানের চেহারায় উদ্বেগের কোন চিহ্নই ছিল না। একবার সবচেয়ে বড় যুদ্ধে মুসলমানদের পদস্খলন ঘটে। মধ্যবর্তী ব্যূহ পর্যন্ত তারা নিজেদের স্থান পরিত্যাগ করে। মুসলমানদের পতাকা পর্যন্ত ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। এত কিছুর পরেও সুলতান কতিপয় সঙ্গী-সাথীসহ স্বস্থানে অটল থাকেন। তিনি পাহাড়

---

১. আন-নাওদিরু'স-সুলতানিয়া, ১৯ পৃ.।
২. প্রগুক্ত, ১৫ পৃ.;
৩. ঐ;

পেছনে ফেলে দাঁড়িয়ে যান, মুসলমানদের চীৎকার দিয়ে ডাকেন, তাদের পৌরুষে আঘাত করেন, লজ্জা দেন। ফলে তারা পুনরায় রণক্ষেত্রে ফিরে আসে এবং ভীষণ বেগে হামলা চালায়। এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সাত হাজার সৈনিক মারা যায়। মুসলমানরা জয় লাভ করে।[১]

সুলতানের উচ্চ মনোবল ও উন্নত মানের নির্ভীকতার পরিমাপ নিম্নোক্ত উক্তি থেকেও করা যাবে। কাযী ইবনে শাদ্দাদ বলেন :

একবার সুলতান বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে আমার মনের কথা বলছি। আমার ইচ্ছা যে, সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকা ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্ত করি, এরপর গোটা রাজ্য মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেই। এরপর অন্তিম উপদেশ ও দরকারী নির্দেশ দিয়ে এখান থেকে বিদায় নিয়ে চলি এবং সমুদ্র পার হয়ে য়ূরোপের দ্বীপগুলোতে গিয়ে হাযির হই এবং অবিশ্বাসীদের পশ্চাদ্ধাবন করি যাতে করে দুনিয়ার বুকে আর একটি অবিশ্বাসীও অবশিষ্ট না থাকে। এ উদ্দেশে আমার জীবনপাত হলেও আপত্তির কিছু নেই।[২]

'ইলম ও ফযীলত

সুলতান নিজেই ছিলেন একজন 'আলিম ও ফাযেল (জ্ঞানী ও গুণী) ব্যক্তি। আরবের বিভিন্ন বংশ ও জাতিগোষ্ঠীর, এমন কি তাদের বিখ্যাত ঘোড়াগুলোর নসবনামা (বংশ-তালিকা)-ও তাঁর জানা ছিল। আরবদের বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থাসমূহ তিনি তাঁর স্মৃতিতে গেঁথে রেখেছিলেন। বিশ্বের যাদুঘরগুলো ও সেখানে রক্ষিত প্রাচীন চিহ্নাদি সম্পর্কেও তিনি ছিলেন ওয়াকিফহাল। তিনি বিভিন্নমুখী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁর থেকে অনেক নতুন কথা জানতে পারতেন।[৩] কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে প্রসিদ্ধ আরবী কাব্য-গ্রন্থ 'হ'মাসা' তাঁর সম্পূর্ণ মুখস্থ ছিল।[৪] ঐতিহাসিক লেনপুল তাঁর প্রথম জীবনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন :

তাঁর মূল প্রবণতা ছিল ধর্মের দিকে। তিনি 'আলিম-'উলামা থেকে হাদীছ শ্রবণ করতেন এবং তাদের পেশকৃত দলীল-প্রমাণ, হাদীছ বর্ণনাকারীদের বিশ্লেষণ-ধারা, ফিক"হী মসলা-মাসাইলের ওপর আলোচনা ও বিতর্ক, কুরআনের আয়াতসমূহের তফসীর ইত্যাদি নিয়ে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকতেন। সবচেয়ে বেশী আনন্দ ও তৃপ্তি পেতেন তিনি তখনই যখন কেউ তাঁর সামনে

---

১. আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া, ১৫ পৃ.; ২. ঐ, ১ পৃ.; ৩. ঐ, ২ পৃ.; ৪. ঐ।

আহলে সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আতের সমর্থনে শক্তিশালী দলীল-প্রমাণ পেশ করত।[১]

ফাতিমী হুকুমতের অবসান ঃ সুলতান সালাহুদ্দীনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব

সুলতান সালাহুদ্দীনের উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় কৃতিত্ব হ'ল, মিসরের ক্ষমতাসীন 'উবায়দী সালতানাতের[২] (সাধারণভাবে ফাতিমী রাজত্ব নামে খ্যাত) অবসান ঘটানো। ২৯৯ হিজরী থেকে শুরু করে ৫৬৭ হিজরী অবধি পুরো ২৬৮ বছর অত্যন্ত দোর্দণ্ড প্রতাপে ফাতিমীরা রাজত্ব করেছিল এবং মুসলিম জাহানের একটি বিরাট অংশের 'আকীদা, আমল, আখলাক ও সংস্কৃতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ঐ শাসনকালটা ছিল অদ্ভুত 'আকীদা, বিস্ময়কর নির্দেশ ও হাস্যকর বিধানাদি দ্বারা পূর্ণ। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মাকরিযীর 'আল-খিতাত ওয়া'ল-আছার' নামক গ্রন্থ থেকে এর কিছুটা নমুনা এখানে পেশ করা হচ্ছে ঃ

> ৩৬২ হিজরীতে উত্তরাধিকার আইনের সংস্কার করা হ'ল। আইন জারী করা হ'ল, মৃত ব্যক্তি যদি কন্যা রেখে মারা যায় তাহলে পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, চাচা প্রমুখ পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে না। এই আইনের লঙ্ঘনকে হযরত ফাতিমা (রা)-এর সঙ্গে শত্রুতার সমার্থক গণ্য করা হয়। গোটা মিসরব্যাপী চন্দ্র দর্শনকে স্থগিত ঘোষণা করা হয় এবং সিয়াম, 'ঈদ ইত্যাদির সময় অংক কষে নির্ধারণ করা হতে থাকে। ৩২ হিজরীতে সারা মিসরে রমযানের তারাবীহ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। মুওয়াত্তা-ই-ইমাম মালিক-এর একটি কপি জনৈক ব্যক্তির কাছে থাকার দরুন তাকে প্রকাশ্যে অপমানিত করা হয়।
>
> ৩৯৩ হিজরীতে ঐ একই অপরাধে তেরো ব্যক্তিকে মারধোর করা হয় এবং তাদেরকে এই বলে প্রকাশ্যে অপমানিত করা হয় যে, তারা সালাতু'য-যোহা (চাশতের নামায) আদায় করেছে। ৩৯৫ হিজরীতে 'মুলুখিয়া' (মিসরবাসীদের এক ধরনের প্রিয় তরকারি) এই অজুহাতে নিষিদ্ধ করা হয় যে, হযরত মু'আবিয়া (রা) এটা খুবই পসন্দ করতেন। ঐ একই বছরে মসজিদ, প্রাচীর,

---

১. সুলতান সালাহুদ্দীন।

২. বংশ-তালিকা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের প্রায় সবাই এ বিষয়ে একমত যে, বনী 'উবায়দ-এর নবী বংশের সঙ্গে দূরতম সম্পর্কও ছিল না। তাদের উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ 'উবায়দ অগ্নি-উপাসক কিংবা ইয়াহূদী ছিল। কাযী আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে খতীব তাঁর "আল-০কাশফ 'আন-আসরারি'ল-বাতনিয়্যা", কাযী 'আবদুল জাব্বার "তাছবীতুন'ন-নুবূওয়া" ও মাকদিসী তাঁর كشف ما كان عليه بنو عبيد নামক গ্রন্থে এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

কবরস্থান, মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তর সর্বত্রই প্রাচীন বুযুর্গদের উদ্দেশে গালিগালাজ ও অভিশাপ বাণী উৎকীর্ণ করা হয়। ৪১১ হিজরীতে 'আজ-জাহিরু লি ই'যায-দীনিল্লাহ' মদ্যপানের সাধারণ অনুমতি দান করেন। বিলাসী জীবন ও ক্রীড়া-কৌতুকের বাজার সরগরম করা হয়। ঐ যুগেই দেশে আকাল ও দুর্ভিক্ষ এবং রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে। জনগণ শাহী মহলের চতুষ্পার্শ্বে এসে সমবেত হ'ত এবং الجوع الجوع (ক্ষুধা, ক্ষুধা) শব্দে চতুর্দিকে প্রকম্পিত করে তুলত। সে সময় ব্যাপক লুটতরাজও চলে।

৪২৪ হিজরীতে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার ৪ বছরের এক যুবরাজের হাতে সোপর্দ করা হয় এবং তার সমর্থনে সুসজ্জিত মিছিল বের করা হলে লোকে অত্যাচারের ভয়ে আভূমি নত হয়ে তাকে অভিবাদন জানায়। ফাতিমী বংশের কিছু লোক খুবই অল্প বয়সে খলীফা নিযুক্ত হয়। মুসলমানদের জন্য তাদের আনুগত্য স্বীকারকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। মুস্তানসির বিল্লাহ্ যখন খলীফা হন তখন তাঁর বয়স ছিল সাত বছর। আমের বি-আহ্'কামিল্লাহ্ খিলাফতের আসনে যখন অধিষ্ঠিত হন তখন তাঁর বয়স ছিল পাঁচ বছর এক মাস কয়েক দিনমাত্র। আল-ফাইয বি-নাসরিল্লাহ্ মাত্র পাঁচ বছর বয়সে খলীফা হন। খিলাফত লাভের সময় 'আদিদ লে-দীনিল্লাহ্‌র বয়স ছিল ১১ বছর।[১]

সুলতান সালাহুদ্দীনের সালতানাত লাভের মাধ্যমে এ যুগের অবসান হয়ে নতুন যুগের সূচনা হয়। মিসর থেকে শী'আ ও রাফেযী মতবাদের চিহ্নাদি অবলুপ্ত হতে থাকে। কুরআন ও সুন্নাহর প্রসার লাভ ঘটে। স্থানে স্থানে মাদরাসা কায়েম হয়। এসব মাদরাসায় 'উলামায়ে কিরাম ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করতেন। ক্রমে ক্রমে 'উবায়দী হুকূমতের যাবতীয় আলামত একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর সঙ্গে ইসমা'ঈলীয় (কট্টর শী'আ) মতবাদ যা প্রায় তিন শতাব্দী যাবত মিসরের সরকারী ধর্ম ছিল-মিসর থেকে চিরতরে নির্বাসিত হয়। মিসরের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মাক'রিযী বলেন :

واختفى مذهب الشيعة والاسماعيليه والامامية حتى فقد من ارض مصر كلها

অর্থাৎ শী'আ, ইসমা'ঈলিয়া ও ইমামিয়া মতবাদের অস্তিত্ব মুছে যেতে থাকে, এমন কি শেষ পর্যন্ত মিসর ভূমির কোথাও এর অস্তিত্ব ছিল না।

কয়েক শ' বছরের 'উবায়দী হুকূমত ইসলামী হুকূমতের জন্য ছিল এক অগ্নি-পরীক্ষা। এই বছরগুলিতে ইসলামী শরীয়ত, সুন্নত, আখলাক ও 'আকাইদ নিয়ে

---

১. كتاب الخطط والاثار للمقريزى ৩৪০ ৩৫৫ পৃ.।

উপর্যুপরি হাসি-তামাশা করা হ'ত। আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আত ও 'আলিম্-'উলামা ছিলেন পরাজিত ও নিগৃহীত এবং শাসনদণ্ড ছিল নীচু চরিত্রের বদ স্বভাবের লোকদের হাতে। এ সম্পর্কে 'আল্লামা মাক'দিসী তাঁর অমর গ্রন্থ كتاب الروضتين فى اخبار الدولتي ও -এ বলেন :

> وبقى هذا البلاء على الاسلام من اول دولتهم الى اخرها وذلك من ذى الحجة سنة تسع وتسعين ومائتن الى سنة سبع وستين وخمس مائة وفى ايامهم كثرت الرافضة واستحكم امرهم و وضعت المكوس على الناس واقتدى بهم غيرهم وافسدت عقائد طوائف من اهل الجبال الساكنين بثغور الشام كالنصيرية والدروزية والحشيشية نوع منهم ومكن دعاتهم منهم لضعف عقولهم وجهلهم ما يتمكنوا من غيرهم واخذت الفرنج اكثر البلاد الشام والجزيرة الى ان من الله على المسلمين بظهور البيت لاتابكى وتقدمه مثل صلاح الدين فاستردو البلاد وازالوا هذه الدولة عن ارقاب العباد .

'উবায়দী হুকূমতের সূচনাকাল থেকে শেষ অবধি ইসলামের ওপর এই বিপদ অব্যাহত থাকে। এর সূচনা হয় ২৯৯ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে আর পরিসমাপ্তি ঘটে ৫৬৭ হিজরীতে। এই শাসনামলে রাফেযী (ধর্মবিরোধী ও বিকৃত চিন্তাধারার লোক)-দের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাদেরই রাজত্ব চলে। জনসাধারণের ওপর বিভিন্ন রকমের নিবর্তনমূলক ট্যাক্স ও কর আরোপ করা হয়। সিরীয় সীমান্তে বসবাসরত পার্বত্য এলাকার অধিবাসী নুসায়রী ও দ্রুযদের 'আকীদা (ধর্ম-বিশ্বাস) এদেরই কারণে খারাপ ও বিকৃত হয়ে পড়ে। হাশিশীন (ভাঙ ব্যবহারকারী) এদেরই ভেতরকার একটি ক্ষুদে সম্প্রদায়। ঐ সব পার্বত্য এলাকার অধিবাসীদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার সুযোগ নিয়েই ইসমা'ঈলী প্রচারক দল তাদের মধ্যে বিকৃত ও ধর্মবিরোধী চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়। এদেরই রাজত্বকালে ফিরিঙ্গীরা সিরিয়া ও জযীরার অধিকাংশ মুসলিম শহরের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে। আতাবেক খান্দানের ক্ষমতাসীন না হওয়া অবধি এ সিলসিলা অব্যাহত থাকে এবং সুলতান সালাহুদ্দীন-এর ন্যায় মর্দে মুজাহিদ ক্ষমতার বাগডোর হাতে গ্রহণ না করা পর্যন্ত এর পরোপুরি অবসান হয়নি। এই মর্দে মুজাহিদ ইসলামী দেশগলোকে পুনরায় স্বীয় অধিকারে আনয়ন (بازياب) করেন এবং আল্লাহ্র বান্দাদের তাদেরই সমগোত্রীয়দের গোলামী থেকে নাজাত দেন।[১]

---

১. كتاب الروضتين فى اخبار الدولتين ১ম খণ্ড, ২০১ পৃ.।

সাম্রাজ্যের এই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনে যা এক বিরাট ধর্মীয়, নৈতিক ও চারিত্রিক বিপ্লবের সূচনা করেছিল, সঠিক 'আকীদাসম্পন্ন ও সুন্নাহপ্রেমিক মুসলমানদের হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ওঠা ছিল একান্ত স্বাভাবিক। 'আল্লামা মাকদিসী, যাঁর জন্মের মাত্র ২৯ বছর পূর্বে এই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল এবং যিনি এই বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তন ও প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছিলেন, স্বীয় হরষের প্রকাশ ঘটিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে : - انقرضت تلك الدولة وزالت عن الإسلام بمصر بانقراضها الذلة

('উবায়দীদের) এই রাজত্বের অবসান হ'ল এবং তার সাথে পরিসমাপ্তি ঘটল মিসরের বুকে ইসলামের লাঞ্ছনা ও অবমাননার।[১]

হাফিজ ইবনে ক'য়্যিম তাঁর গ্রন্থে বাতেনী ফির্কার উত্থান, এর প্রভাব, অতঃপর নূরুদ্দীন ও সালাহুদ্দীনের হাতে সে সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে আলোচনা নিম্নরূপ উদ্দীপনাময়ী ভাষায় করেছেন :

ঐসব বাতেনীদের দা'ওয়াতের প্রভাব প্রাচ্য ভূ-খণ্ডে স্তিমিত হয়ে পাশ্চাত্য ভূ-খণ্ডে ক্রমশ বাড়তে লাগল, এমন কি তা এক বিরাট শক্তিশালী দা'ওয়াতে পরিণত হ'ল। সে তার শেকড় গভীরে প্রোথিত করল এবং তার পতাকাবাহীরা দূর পশ্চিমের অধিকাংশ শহরের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করল। তাদের আওতা আরও সম্প্রসারিত হয়ে মিসর অবধি পৌঁছে গেল, এমন কি মিসরের ওপরও তারা জাঁকিয়ে বসল। তারা কায়রো শহরের বুনিয়াদ পত্তন করল। তারা ও তাদের শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের সদস্যরা খোলাখুলিভাবে তাদের দা'ওয়াত অব্যাহত রাখল। এদের যুগেই 'রাসাইল-ই ইখওয়ানু'স-সাফা' প্রণীত হয় এবং ইবন সীনা তাঁর 'ইশারাত', 'শিফা' ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেন। খোদ ইবনে সীনা বলেন, "আমার পিতা হাকিম বিল্লাহ্‌র (ফাতিমী খলীফা ও দা'ঈ) একজন প্রচারক ছিলেন।" এই ফাতিমীয়দের যুগে সুন্নাহ্‌র প্রচলন মওকুফ হয়ে গিয়েছিল এবং সুন্নাহর গ্রন্থসমূহ তাকে উঠিয়ে রাখা হয়েছিল। লুকিয়ে চুপিয়ে হয়ত কেউ তা পড়ে থাকবে এবং তদনুযায়ী আমলও করে থাকবে। এই দা'ওয়াতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও বুনিয়াদী নীতি ছিল এই যে, 'আক'ল (বুদ্ধিবৃত্তি) আম্বিয়াই-কিরাম ('আ)- এর প্রতি অবতীর্ণ ওয়াহী ও শিক্ষামালার ওপর অগ্রাধিকার রাখে।

ক্রমান্বয়ে গোটা পশ্চিম ভূ-খণ্ড, মিসর, শাম (সিরিয়া) ও হেজাযের ওপর বাতেনীরা ক্ষমতা গেড়ে বসে। বছরব্যাপী ইরাকের ওপরও তাদের নিয়ন্ত্রণ

---

১. كتاب الروضتين فى اخبار الدولتين ১ম খণ্ড, ২০০ পৃ.।

প্রতিষ্ঠিত ছিল। আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আত তাদের শাসনাধীন এলাকা-গুলোতে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে জীবন যাপন করত। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রে একজন যিম্মী (আশ্রিত ব্যক্তি) নিরাপত্তা ও 'ইয্‌যত-আবরূর হেফাজতের ব্যাপারে যে সব অধিকার ভোগ করত— সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের অনুসারীদের ভাগ্যে তাও ছিল না। কত 'উলামায়ে কিরামকে এই বাতেনীদের হাতে নিহত হতে হয়েছে, আম্বিয়া-ই-কিরাম ('আ)-এর কত উত্তরাধিকারীকে কয়েদখানায় ধুকে ধুকে দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিতে হয়েছে— কে তার হিসাব রাখে!

শেষাবধি স্বীয় বান্দাদের এই দুরবস্থাদৃষ্টে বোধ করি আল্লাহ্‌র মর্যাদা ও সম্ভ্রমে আঘাত লাগল। তিনি নূরুদ্দীন ও সালাহুদ্দীনের মাধ্যমে মুসলমানদের বাতেনীদের জলুম-নির্যাতন থেকে মুক্তি দিলেন। বাতেনীদের শাসনাধীন এলাকায় যখন ইসলামের প্রাণবায়ু 'যাচ্ছি, যাই' করছিল তখন এ বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন তার মধ্যে নতুনভাবে প্রাণের সঞ্চার করল, রাহুমুক্ত হ'ল তার সৌভাগ্য-রবি। গোটা মুসলিম জাহান মনের আনন্দে নেচে উঠল। চতুর্দিকে কেবল একটি আওয়াজ গুঞ্জরিত হচ্ছিল, 'ইসলামের এই অগ্নি-পরীক্ষার মুহূর্তে কে আছে এর সাহায্যকারী, কে আছে এর মদদগার'? শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দা ও মুজাহিদ বাহিনী দ্বারা বায়তু'ল-মুকাদ্দাসকে ক্রস পূজারীদের হাত থেকে মুক্ত করান এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর সাহায্যকারীরা স্ব স্ব হিম্মত ও তওফীক মুতাবিক দীনে হক-কে সাহায্য করার দায়িত্ব সম্পাদন করেন।[১]

ইতিহাস থেকে এটাও জানা যায় যে, মুসলিম জাহান সাধারণভাবে এবং শাম (অধুনা সিরিয়া, লেবানন, জর্দান ও ফিলিস্তীন এলাকা) ও ইরাক বিশেষভাবে এই সংবাদকে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে স্বাগত জানায় এবং সর্বস্তরের জনগণ এতে উল্লাস প্রকাশ করে।[২]

এভাবে সালাহুদ্দীন ক্রুসেডারদের ছুটে আসা উত্তাল তরঙ্গের সামনে প্রতিরোধের পাহাড় সৃষ্টি করে মুসলিম জাহানকে একদিকে যেমন রাজনৈতিক গোলামী, নৈতিক, চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর জন্য রক্ষা করেন, অপর দিকে তেমনি 'উবায়দী (ফাতিমী নামে পরিচিত)

---

১. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ১ম খণ্ড, ২৩৩-৩৪ পৃ.।
২. كتاب الروضتين فى اخبار الدولتين ১ম খণ্ড, ১৯৮-৯৯ পৃ.।

হুকূমতের অবসান ঘটিয়ে এমন একটি ভয়ংকর ফিৎনার উৎস মুখ বন্ধ করে দেন, যা মিসর ভূমি থেকে বহির্গত হয়ে সমগ্র মুসলিম জাহানে বাতেনী ও ইসমা'ঈলী চিন্তাধারার কু-প্রভাব ছড়াবার পাঁয়তারা করছিল। ইসলামের ইতিহাসে সুলতান সালাহুদ্দীনের এই দু'টি স্মরণীয় কীর্তি কখনও বিস্মৃত হবার নয় এবং এই কুর্দী মুজাহিদের বীরত্ব ও আত্মদানের কথা বিশ্বের মুসলমানরা কখনো ভুলতে পারবে না।

দ্বাদশ অধ্যায়

শায়খু'ল-ইসলাম 'ইযযুদ্দীন ইব্ন 'আবদুস সালাম (র)

সুলতান সালাহুদ্দীনের মুজাহিদসুলভ প্রয়াস, ইসলাম ও ধর্মীয় জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা, স্থানে স্থানে দীনী মাদরাসা কায়েমের কারণে ও শী'আ মতবাদের প্রভাব হ্রাস ও সুন্নী 'আকীদার প্রভাব বিস্তারের ফলে মুসলমানদের জ্ঞান ও কর্মের জগতে এক অভূতপূর্ব প্রাণ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টির হয়। 'ইলমে শরীয়তের শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দান এবং এক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা হাসিলের দিকে নতুনভাবে মুসলিম জগতের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ফলে হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা নিজ নিজ সীমারেখায় দা'ওয়াত ও ইসলামের অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করেন এবং সে যুগের রাষ্ট্রীয় শক্তির ভুল প্রবণতারও মুকাবিলা করেন। এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন শায়খু'ল-ইসলাম 'ইযযুদ্দীন ইবনে 'আবদুস সালাম (মৃ. ৬৬০ হি.) যিনি তাঁর জ্ঞান, তাক'ওয়া, সত্য কথন ও নির্ভীকতার ক্ষেত্রে ছিলেন অনন্য। তাঁকে দেখলে ইসলামের প্রথম যুগের বুযুর্গ সাহাবা ও তাবি'ঈদের ছবি হৃদয়পটে ভেসে উঠত।

জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব

'ইযুদ্দীন ইবনে 'আবদুস সালাম ৫৭৮ হিজরীতে বর্তমান সিরিয়ার রাজধানী দামিশকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় প্রখ্যাত উস্তাদ মশহুর 'আলিম-'উলামার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ফখরুদ্দীন ইবনে 'আসাকির, সায়ফুদ্দীন আমেদী, হাফিজ আবু মুহাম্মদ আল-কাসিম ইবনে 'আসাকির-এর মত সে যুগের নামকরা 'আলিমগণ তাঁর উস্তাদ ছিলেন। কতক বর্ণনা অনুসারে তিনি যৌবনে পড়াশোনা আরম্ভ করেন এবং সত্বরই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর সমসাময়িক সকলেই তাঁর জ্ঞানবত্তা ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'আল্লামা ইবনে দাকীক আল-'ঈদ তাঁর কতক গ্রন্থে ইবনে সালামকে সুলতানু'ল-'উলামা' খেতাবে স্মরণ করেছেন। ৬৩৯ হিজরীতে তিনি যখন মিসর পৌঁছেন তখন 'আত-তারগীব ওয়া'ত-তারহীব' নামক গ্রন্থের প্রণেতা হাফিজ 'আবদুল 'আজীম মুনযিরী ফতওয়া প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করে বলেন : যে শহরে 'ইযযুদ্দীন ইবনে 'আবদুস সালাম থাকেন সেখানে অন্যদের ফতওয়া দেওয়া

সমীচীন নয়। শায়খ জামালুদ্দীন ইবনু'ল-হাজিব বলেন : ইমাম গাযালী (র) থেকে শায়খ 'ইযযুদ্দীন (র)-এর স্থান অনেক ওপরে।[১]

হাফিজ যাহবী তাঁর 'আল-'ইবার' নামক গ্রন্থে বলেন :

انتهت اليه معرفة المذهب مع الزهد والورع وبلغ رتبة الاجتهاد

তিনি ফিক্'হ বিষয়ক জ্ঞান, যুহ্দ ও আল্লাহ্-ভীতিতে ছিলেন শীর্ষস্থানীয় এবং মুজতাহিদের মর্যাদায় তিনি উপনীত হয়েছিলেন।[২]

শায়খ 'ইযযুদ্দীন ইবনে 'আবদুস সালাম দীর্ঘকাল যাবত দামিশকে 'যাবিয়া-ই-গাযালিয়া' নামক স্থানে দর্স প্রদান করেন। উমায়্যা মসজিদে খতীব ও ইমাম পদেও অনেক কাল যাবত তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। শায়খ শিহাবুদ্দীন আবু শামা বলেন ঃ তাঁর কারণে ঐ সব বিদ'আত দূরীভূত হয় যা সে যুগে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি সালাতু'র-রাগাইব ও শবে বরাত[৩] উদ্‌যাপনের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন এবং এগুলো যে বিদ'আত তা যথাযথভাবে প্রমাণ করেন। কতিপয় বিখ্যাত 'আলিমও এ ব্যাপারে নিশ্চুপ ও দ্বিধান্বিত ছিলেন। সুলতান আল-মালিকু'ল-কামিলও এ ব্যাপারে নিশ্চুপ ও দ্বিধান্বিত ছিলেন। সুলতান আল-মালিকু'ল-কামিল তাঁকে দামিশকে কাযীর পদ গ্রহণ করতে অনুরাধ জানান। শায়খ (র) অনেকগুলো শর্তের ভিত্তিতে সে অনুরোধে সাড়া দেন। ঐ সময় তিনি আল-মালিকু'ল-কামিলের পক্ষে দূত হিসাবে একবার বাগদাদে খলীফার দরবারে গিয়েছিলেন।

সুলতানদের সৎ পরামর্শ দান এবং ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ কামনা

সিরিয়ায় শায়খ ইয্‌যুদ্দীন-এর ব্যক্তিত্ব ছিল এক সেরা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। সে যুগের ক্ষমতাসীন সুলতানেরা পর্যন্ত এ ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। তিনি আত্মর্যাদাবোধে এত উদ্দীপ্ত ছিলেন যে, কোন বাদশাহের দরবারে

---

১. ত'াবাক'াতু'স-শাফি'ঈয়াতু'ল-কুবরা, ৫ম খণ্ড, ৮৩ পৃ.।

২. হু'সনু'ল-মুহ'াদ'ারা, সুয়ূতীকৃত, ১ম খণ্ড, ১৪১ পৃ.।

৩. সালাতু'র-রাগাইব, ১২ রাকা'আত নামায যা ২৭শে রজবের রাত্রিতে বিশেষ রীতিতে আদায় করা হয়। এর বিরাট ফযীলতও বর্ণনা করা হয়। ৪৪৮ হিজরীতে এই নামায প্রবর্তন করা হয় এবং অপরাপর বিদ'আতের ন্যায় তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শায়খ 'ইয্‌যুদ্দীন ইবনে 'আবদুস সালাম কিভাবে এর প্রকাশ ঘটেছিল তার পূর্ণ বিবরণ দান করেছেন। দ্র. ইত্তিহাফু'স-সা'আদাহ-শরাহ ইহ্'য়া, ৪৪৩ পৃষ্ঠা; অনুরূপভাবে শা'বানের ১৫ তারিখের রাত্রে এক শ' রাক'আত নামায বিশেষ রীতিতে পড়া হয়। আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আত এ দু'টোকেই বিদ'আত বলেন। ইবনু'স-সুবকী একে নিকৃষ্ট বিদ'আত বলেছেন। ইমাম নববী (র) একে মওযূ, মুনকির ও কবীহ' বলেছেন। -ইত্তিহ'াফ, ৩য় খণ্ড, ৪২৫-২৭ পৃ.।

হাযিরা দেওয়া কিংবা শাহী দরবারের লেজুড়বৃত্তি করাকে নিজের জন্য অবমাননাকর মনে করতেন। অবশ্য বাদশাহ নিজ থেকে তাঁকে দরবারে উপস্থিত হবার অনুরোধ জানালে তিনি সেখানে গিয়েছেন এবং বাদশাহকে সঠিক পরামর্শ দিয়েছেন। বাদশাহ্র এবং ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ কামনায় তিনি কখনো পরান্মুখ ছিলেন না।

সুলতান আল-মালিকু'ল-আশরাফ যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তিনি তাঁর রাজ্যের সর্বোচ্চ পদাধিকারী কর্মচারীকে শায়খ (র)-এর খিদমতে পাঠান এবং তাঁর মাধ্যমে বলেন : আপনার প্রিয়ভাজন মূসা ইব্ন আল-মালিকু'ল-'আদিল আবূ বকর আপনাকে সালাম পেশ করছে এবং আপনার সমীপে তাঁর জন্য শুশ্রূষা ও দু'আর আবেদন জানাচ্ছে। সঙ্গে তিনি এও চাইছেন, আপনি তাঁকে এমন কোন উপদেশ দান করুন যা আগামী কাল (কিয়ামতে) আল্লাহ্র দরবারে কাজে আসে। এতদ্শ্রবণে শায়খ বললেন : পীড়িতের সেবা-শুশ্রূষা তো শ্রেষ্ঠতম 'ইবাদত। অতঃপর তিনি সুলতানের দরবারে রওয়ানা হন। শায়খ (র)-এর আগমনে সুলতান অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁর হস্ত মুবারক চুম্বন করেন। এর পূর্বে সুলতান শায়খ (র)-এর ব্যাপারে কতকগুলো ভুল ধারণায় পতিত হয়েছিলেন এবং ঐ কারণে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্টও ছিলেন।[১]

সুলতান তাঁর ঐ ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং বলেন : আপনি আমাকে মা'ফ করুন, আমার জন্য দু'আ করুন এবং আমাকে কিছু উপদেশ দিন। এর প্রত্যুত্তরে শায়খ (র) বললেন : ক্ষমা সম্পর্কিত ব্যাপারে আমার বক্তব্য হ'ল, দৈনিক বিছানায় শোবার প্রাক্কালেই আমি আল্লাহ্র বান্দাদের যাবতীয় ভুলভ্রান্তি মা'ফ করে দিয়ে থাকি এবং আমি যখন শুতে যাই তখন আল্লাহ্র কোন বান্দাহ্র

১. মৌলিক ঐক্য সত্ত্বেও হি. ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে আশ'আরী মতবাদ ও হাম্বলী মাযহাবের ভেতর বিরাট মতভেদ দেখা যায় যেরূপ মতভেদ দেখা দিয়েছিল হি. চতুর্থ শতাব্দীতে আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আত ও মু'তাযিলাদের মধ্যে। আশ'আরীপন্থীরা (আল্লাহ্র) গুণাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিতেন এবং এর নিগূঢ় অর্থ খুঁজে বের করতেন। পক্ষান্তরে হাম্বলীরা এর হাকীকত ও শব্দের ওপরই জোর দিতেন। এদের প্রত্যেকেই তাদের খোশকল্পনার ভিত্তিতে একে একটি ধর্মীয় খিদমত এবং সুন্নাহ ও শরীয়তের কল্যাণ সাধন বলে মনে করতেন। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এর ওপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিরাট মতভেদের সৃষ্টি হয় এবং স্পর্শকাতরতা ও পারস্পরিক বিদ্বেষ চরমে গিয়ে পৌঁছে। শায়খ 'ইযযুদ্দীন (র)-এর যুগে এ বিতর্ক মারাত্মক আকার ধারণ করে। তিনি জ্ঞানত ও 'আকীদাগত দিক দিয়ে আশ'আরী মতাবলম্বী ছিলেন। অপরদিকে আল-মালিকু'ল-আশরাফ ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। ফলে সুলতানের মনে শায়খ (র) সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয় অভিযোগের। কিন্তু শায়খ (র)-এর এই সাক্ষাৎ এবং তাঁর থেকে বিস্তারিত অবগতি লাভের মাধ্যমে সকল সন্দেহের অপনোদন ঘটে (বিস্তারিত জানতে চাইলে ত'াবাক'াতু'স-শাফি'ইয়্যা, ৫ম খণ্ড, ৮৫৯৫ পৃষ্ঠা দেখুন)।

যিম্মায় আমার কোন হক, দাবি কিংবা অভিযোগ অবশিষ্ট থাকে না, আর আমার বিনিময় সৃষ্ট জীবের পরিবর্তে একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতেই ন্যস্ত থাকে فَمَنْ عَفَى وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللهِ। এরপর রইল দু'আ। সুলতানের জন্য আমি তো সব সময়ই দু'আ করি। কেননা ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ ও সাফল্য সুলতানের সৎ পরামর্শের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। আল্লাহ্ পাক সুলতানকে সে সব বিষয়ে অর্ন্তদৃষ্টি দান করুন যদ্দ্বারা তিনি আল্লাহ্‌র সামনে মাথা উঁচু রাখতে পারেন। সুলতানের আসক্তি ও আগ্রহের কারণে তাঁকে উপদেশ দান আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। আমি বলতে চাচ্ছি যে, একদিকে আপনার বিজয় এবং শত্রুর ওপর আপনার প্রাধান্যের উৎসব চলছে, অপর দিকে মুসলিম দেশগুলোতে একের পর এক তাতারীদের অনুপ্রবেশ ঘটছে। তারা জানতে পেরেছে যে, সুলতানের এ সময় আল্লাহ্‌র দুশমন এবং মুসলমানদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার ফুরসৎ নেই। কেননা এ মুহূর্তে আপনি আল-মালিকু'ল-কামিলের সঙ্গে যুদ্ধ করতেই বেশী আগ্রহী। তার মুকাবিলা করার জন্য আপনি ছাউনিও ফেলে রেখেছেন। আল-মালিকু'ল-কামিল আপনার ভাই এবং নিকটাত্মীয়ও বটে। আপনার কাছে আমি কেবল এতটুকুই আরয করতে চাই, আপনি আপনার গতিমুখ আপনার ভাইয়ের দিক থেকে সরিয়ে ইসলামের দুশমনদের দিকে ঘুরিয়ে দিন এবং এই অন্তিম সময়ে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা থেকে বিরত থাকুন। আপনি আল্লাহ্‌র দীনের সাহায্য করবেন এবং তার মস্তক সমুন্নত রাখবেন, এই নিয়ত করুন। যদি আল্লাহ্ সুলতানকে আরোগ্য দান করেন, দান করেন সুস্বাস্থ্য, তাহলে আমরা সুলতানের মাধ্যমে কাফির দুশমনের ওপর জয় লাভের আশায় বুক বাঁধব। এও আশা করব, আপনার আমলনামায় যেন এই সৌভাগ্যের কথা লেখা হয়। আর আল্লাহ্‌র ফয়সালা যদি অন্য কিছু হয় তবুও আশা করব সুলতান যেন তাঁর নেক নিয়তের বরকত নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার সুযোগ পান। সুলতান বললেন: আল্লাহ্ আপনাকে এই সময়োচিত সতর্কবাণী উচ্চারণ ও নিষ্ঠাপূর্ণ পরামর্শের জন্য কল্যাণকর প্রতিদান দিন। এরপর তিনি তখনই নির্দেশ দিলেন ফৌজের গতিমুখ মিসরের পরিবর্তে (যা ছিল আল-মালিকু'ল-কামিলের অভিমুখী) তাতারীদের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হোক এবং ফৌজ এ স্থান থেকে যাত্রা করে কুসায়রা নামক স্থানে ছাউনি ফেলুক। অনন্তর সেদিনই এ নির্দেশ পালিত হয়। লোকে জানতে পারে যে, তাতারীদের মুখোমুখি হওয়াই এখন সুলতানের ইচ্ছা।

আল-মালিকু'ল-আশরাফ শায়খ (র)-এর নিকট আরও কিছু উপদেশের জন্য আবেদন জানান। এ প্রেক্ষিতে শায়খ (র) জানান : বাদশাহ! তুমি তো এই

অবস্থায়, আর ওদিকে তোমার সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তারা আমোদ-প্রমোদে মত্ত। মদের রাজত্ব চলছে, মানুষ পাপে লিপ্ত হচ্ছে, নিত্য নতুন কর ভারে মুসলমানেরা ন্যুজ দেহ। আল্লাহ্‌র দরবারে সর্বোত্তম যে 'আমল আপনি পেশ করতে পারেন তা'হল এই যে, আপনি সর্বাগ্রে এসব ময়লা-আবর্জনা দূর করুন, নিত্য-নতুন ট্যাক্স ও করারোপ বন্ধ করুন এবং এখনই জুলুম ও নিপীড়নমূলক সব কর্মকাণ্ড থামিয়ে দিন। ফরিয়াদীকে সান্ত্বনা দিন, তার অভিযোগের প্রতিকার করুন। আল-মালিকু'ল-আশরাফ তক্ষুণি এসবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নির্দেশ জারী করেন এবং বলেন : আল্লাহতা'আলা আপনাকে এই দীনী খিদমত ও কল্যাণকর দায়িত্ব সম্পাদনের বিনিময়ে মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন এবং তাঁর অপার মহিমা ও করুণা দ্বারা আমাকে জান্নাতে আপনার সাহচর্য দান করুন। এ কথা বলার সঙ্গেই তিনি শায়খ (র)-কে এক হাজার মিসরীয় দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করেন। কিন্তু শায়খ (রা) উক্ত অর্থ গ্রহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং বলেন : আপনার সঙ্গে আমার এ সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ছিল। পার্থিব কোন বস্তুর বিনিময়ে একে আমি কলুষিত করতে চাই না।

সিরিয়ার বাদশাহ্‌র মুকাবিলায় নির্ভীকতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন

আল-মালিকু'ল-আশরাফের পরবর্তী সুলতান সালিহ ইসমা'ঈল (আবুল খারশ) মিসরের সুলতান আল-মালিকু'স-সালিহ নজমুদ্দীন আয়্যুবের মুকাবিলায় (যিনি সিরিয়ার ওপর হামলা করবেন বলে সুলতান আশংকা করেছিলেন) ফিরিঙ্গীদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন এবং সে সাহায্যের বিনিময়ে সায়দা ও ছাকীফ নামক দু'টি শহরসহ কতিপয় দুর্গের অধিকার সমর্পণের পরওয়ানা লিখে দেন। এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তিতে ফিরিঙ্গীরা এতখানি খোলামেলা ও দুঃসাহসী হয়ে গিয়েছিল যে, তারা দামিশ্‌ক থেকেই অস্ত্রশস্ত্র খরিদ করত। বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হয়ে শায়খ (র) অত্যন্ত মনঃকষ্ট পান যে, ফিরিঙ্গীরা মুসলমানদের শহরে এসে তাদেরই থেকে অস্ত্র খরিদ করবে এবং সেই অস্ত্র দিয়ে মুসলমানদের গর্দান ওড়াবে। অস্ত্র ব্যবসায়ীরা এক্ষেত্রে তাদের করণীয় কি জানতে চাইলে তিনি পরিষ্কার ভাষায় ফতওয়া প্রদান করেন যে, ফিরিঙ্গীদের কাছে অস্ত্র বিক্রি সম্পূর্ণ হারাম। কেননা তোমরা বেশ ভালভাবেই জান যে, এসব অস্ত্র তোমাদের মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হবে। সুলতানের এই কাপুরুষোচিত কর্ম এবং ইসলামের এই লাঞ্ছনা ও অসহায়ত্ব দৃষ্টে শায়খ (র) গভীরভাবে মর্মাহত হন। তিনি খুতবায় বাদশাহ্‌র জন্য দু'আ করা থেকে বিরত থাকেন। এর পরিবর্তে তিনি

উভয় খুতবা শেষ হবার পর অত্যন্ত উৎসাহ ও আবেগের সঙ্গে দু'আ করতে থাকেন, "ইলাহী! ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের তুমিই সাহায্য কর; মূলহিদ ও ধর্মের দুশমনদের তুমিই লাঞ্ছিত ও অপদস্থ কর।" শায়খ (র) এই মুনাজাত করছিলেন আর সব মুসলমান আবেগ ও অশ্রুসজল কণ্ঠে 'আমীন! আমীন!' বলছিল। সরকারের লোকেরা এ ঘটনাকে অনেক রঙ চড়িয়ে ফলাও করে সুলতানের নিকট বিবৃত করে। ফলে শায়খ (র)-কে গ্রেফতার করবার ফরমান জারী হয়। অনেক দিন তিনি বন্দী থাকেন। কিছু কাল পর তাঁকে দামিশ্‌ক থেকে বায়তু'ল-মুকাদ্দাসে স্থানান্তরিত করা হয়।

ইতোমধ্যে সুলতান সালিহ্ ইসমা'ঈল, হেম্‌স-এর শাসনকর্তা আল-মালিকু'ল মনসূর ও ফিরিঙ্গী সম্রাট স্ব স্ব ফৌজ ও সেনাবাহিনীসহ মিসরের উদ্দেশে বায়তু'ল-মুকাদ্দাস আগমন করেন। সালিহ্ ইসমা'ঈলের অন্তরে শায়খ 'ইয্‌যুদ্দীন (র)-এর অসন্তোষ কাঁটার মত বিঁধত এবং এ ব্যাপারে তিন বেশ চিন্তান্বিত ছিলেন। তিনি তাঁর এক বিশিষ্ট সভাসদকে স্বীয় রূমাল প্রদান করে বলেন : তুমি এই রুমাল শায়খ (র)-এর খিদমতে পেশ করবে এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে বলবে, তাঁকে তাঁর পূর্বের পদমর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যদি তিনি তা চান। যদি তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহলে তাঁকে আমার নিকট নিয়ে আসবে। আর তিনি যদি তা গ্রহণ না করেন তাহলে আমার পার্শ্ববর্তী অন্য তাঁবুতে তাঁকে বন্দী করে রাখবে। আমীর শায়খ (র)-এর সাথে অত্যন্ত বিনয় ও তোষামোদের সুরে কথা বলেন এবং নিজ সম্মান ও শ্রদ্ধা বজায় রাখতে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এত দূর বললেন যে, তিনি যদি কিছুটা বিনয় সহকারে অন্তত বাদশাহ্‌র সঙ্গে মিলিত হতে রাযী হন এবং তাঁর হস্ত চুম্বন করেন, তাহলেও ব্যাপারটার একটা সুরাহা হয়ে যেতে পারে এবং তিনি অনায়াসে তাঁর হৃত পদমর্যাদা ফিরে পেতে পারেন। শায়খ (র) এর উত্তরে যা বলেছিলেন, ইতিহাসের পাতায় তা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। তিনি বলেছিলেন :

والله يا مسكين ما ارضاه ان يقبل يدى فضلا ان يقبل يده - ياقوم انتم فى واد وانا فى

واد والحمد لله الذى عافانى مما ابتلاكم به -(طبقات الشافعية - ج ٥ ص ١٠١)

আরে মুর্খ! যে ক্ষেত্রে আমিই রাযী নই যে, বাদশাহ আমার হস্ত চুম্বন করুন, সেক্ষেত্রে আমি বাদশাহ্‌র হস্ত চুম্বন করব-এটা কি বাতুলতা নয়? লোক সকল! তোমরা এক জগতের অধিবাসী আর আমি অন্য জগতের। আল্লাহ্‌র যাবতীয় প্রশংসা যে, তোমরা যার হাতে বন্দী, আমি তা থেকে মুক্ত।

এ জওয়াব শ্রবণের পর আমীর বললেন ঃ তাহলে তো আপনাকে গ্রেফতার করতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শায়খ (র) বললেন ঃ আনন্দের সঙ্গে তুমি তোমার ওপর অর্পিত নির্দেশ পালন করতে পার। অতঃপর আমীর তাঁকে বাদশাহের তাঁবুর পাশে অন্য একটি তাঁবুতে নিয়ে রাখেন। শায়খ (র) তাঁর তাঁবুতে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতেন। আর ওদিকে বাদশাহ্ তার তাঁবুর ভেতরে বসে সে তিলাওয়াত শ্রবণ করতেন। একদিন বাদশাহ ফিরিঙ্গী রাজাকে বলেন : তুমি শায়খ (র)-এর কুরআন মজীদ তিলাওয়াত শুনতে পাচ্ছ কি? রাজা বললেন, "হাঁ, শুনতে পাচ্ছি।" বাদশাহ্ বললেন : তুমি কি এঁর পরিচয় জান? ইনি হচ্ছেন মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ পাদরী [illegible] । আমি তাঁকে এজন্যই বন্দী করেছি যে, তিনি তোমার কাছে দুর্গ সমর্পণের বিরোধী ছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর ভীষণ আপত্তি ছিল। এই অপরাধে আমি তাঁকে দামিশকের মসজিদের খতীব-এর পদসহ অন্যান্য সকল পদ থেকেও অপসারণ করেছি, এমন কি তাঁকে দামিশ্‌ক থেকে নির্বাসিতও করেছি। অতঃপর তোমার খাতিরেই আমি তাঁকে পুনরায় বন্দী করেছি। খৃস্টান রাজা বললেন, "ইনি যদি আমাদের পাদরী হতেন তাহলে আমরা তাঁর পা ধুয়ে সে পানি পান করতাম।"[১]

ইতিমধ্যে মিসরীয় ফৌজের আগমন ঘটে। যুদ্ধে সালিহ্ ইসমা'ঈলের পরাজয় হয়। ফিরিঙ্গী ফৌজ নিহত ও পর্যুদস্ত হয়। শায়খ (র) সহী-সালামতে মিসরের দিকে রওয়ানা হন।

পথিমধ্যে কির্ক রাজ্য অতিক্রমকালে কির্ক-এর শাসনকর্তা তাঁকে সেখানে বসবাস করার আবেদন জানালে তিনি বলেন : তোমাদের এই ছোট্ট শহর আমার জ্ঞানের ভার বইতে পারবে না।

মিসরে শায়খ 'ইয্‌যুদ্দীন (র)

মিসরের সুলতান আল-মালিকু'স-সালিহ্ নজমুদ্দীন আতি সমাদরের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করেন। 'আমর (র) ইবনু'ল-'আস মসজিদের খতীব নিযুক্ত করা হয় তাঁকে। তিনি মিসরের কাযীর পদ আল-ওয়াজহু'ল-কিবলা এবং বিরান প্রায় মসজিদের সংস্কার কর্মের দায়িত্বভারও তাঁর হাতে সোপর্দ করেন। মাদরাসা সালিহিয়া নির্মিত হলে সুলতান তাঁকে শাফি'ঈ মযহাবের শিক্ষক হিসাবে সেখানে

---

[১] তাবাক 'াতু'স-শাফি'ঈয়্যাতু'ল-কুবরা, ৫ম খণ্ড, ১০০-১ পৃ. শায়খ পুত্র শরফুদ্দীন 'আবদুল লতীফ বর্ণিত।

নিযুক্ত করেন। তিনি নিবিষ্ট চিত্তে শিক্ষা দান ও জ্ঞানের প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন।

শায়খ (র)-এর স্পষ্ট ভাষণ ও নির্ভীকতা প্রদর্শন

সে সময় একবার শাহী প্রাসাদের মুহতামিম ও কার্যত মিসর সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপক ফখরুদ্দীন 'উছমান মিসরের একটি মসজিদের ছাদের ওপর তবলখানা নির্মাণ করেন। সেখানে তবলা ও কাড়া-নাকাড়া বাজতে থাকে। শায়খ 'ইযযুদ্দীন (র) ঘটনাটি জানতে পেরে (কাযী ও মসজিদসমূহের মুহতামিম হিসাবে) উক্ত গৃহটি ধ্বসিয়ে দেবার নির্দেশ জারী করেন এবং এই অপরাধে ফখরুদ্দীনের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা দেন। অবশ্য এই সঙ্গে তিনি বিচার বিভাগীয় পদ থেকে ইস্তিফাও দেন। এই পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সুলতানের দৃষ্টিতে শায়খ (র)-এর মর্যাদা এতটুকু হ্রাস পায়নি। কিন্তু তিনি তাঁকে তাঁর পদে পুনরায় আর নিয়োগও করেননি। এদিকে শায়খ (র)-এর ফয়সালার ধর্মীয় প্রভাব এত বেশী পরিলক্ষিত হয় যে, সেই যুগেই মিসরের সুলতান আল-মালিকু'স-সালিহ বাগদাদের খলীফার দরবারে একজন দূত প্রেরণ করেন। দূত খলীফার দর্শন লাভ করেন এবং সুলতানের পয়গাম খলীফাকে হস্তান্তর করেন। তখন দূতকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এ পয়গাম কি সে স্বয়ং মিসরের সুলতানের মুখ থেকেই পেয়েছে, নাকি অন্য কোন মাধ্যম থেকে? প্রত্যুত্তরে দূত জানায় যে, এ পয়গাম সে শাহী প্রাসাদের মুহতামিম ফখরুদ্দীনের মুখ থেকেই পেয়েছে। তখন খলীফা এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করেন যে, ফখরুদ্দীনের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা শায়খ 'ইয্যুদ্দীন তার সাক্ষ্যকে গ্রহণের অযোগ্য বলেছেন। ফল দাঁড়াল এই যে, দূতকে ব্যর্থ হয়ে সে যাত্রা ফিরে আসতে হ'ল। অতঃপর সে সরাসরি সুলতান থেকে পয়গাম গ্রহণ করে পুনরায় বাগদাদে গিয়ে খলীফার কাছে তা পৌঁছিয়ে দিয়ে এল তাঁর সাহসিকতার এর থেকেও বিস্ময়কর ঘটনা ছিল নিম্নরূপ ঃ

> 'ঈদের দিন। দুর্গের ভেতর শাহী দরবার বসেছে। বাদশাহ্ অত্যন্ত জাঁকজমক ও জৌলুসের সঙ্গে সিংহাসনে সমাসীন। দু'সারি ফৌজ কোমর বেঁধে দণ্ডায়মান। আমীর-উমারা যিনি যাঁর মত হাযির হয়ে বাদশাহ্‌কে আদাব ও তসলীম জানাচ্ছেন এবং আ-ভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করছেন। এরূপ একটি ভরা দরবারে আকস্মিকভাবে শায়খ (র) বাদশাহ্র নাম ধরে সম্বোধন করলেন বললেন ঃ আয়্যুব! আল্লাহ্র নিকট কি জওয়াব দেবে যখন তোমাকে জিজ্ঞাস করা হবে, "আমি তোমাকে মিসরের সালতানাত কি এজন্যই দিয়েছিলাম যে

স্বাধীনভাবে মদ পান করা হবে?" বাদশাহ্ বললেন : আসলেই কি ঘটনাটা সত্যি? শায়খ (র) সজোরে বললেন : হাঁ, অমুক শরাবখানায় প্রকাশ্যে মদের ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে। এছাড়া এ ধরনের আরও বহু ঘটনা ঘটছে, অথচ তুমি এখানে বিলাসিতায় মত্ত রয়েছ। প্রত্যুত্তরে বাদশাহ্ জানালেন : জনাবে ওয়ালা! এ ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই। এ তো আমার পিতার আমল থেকেই চলে আসছে। জওয়াবে শায়খ (র) বললেন : তাহলে তুমিও সে সব লোকের অন্তর্ভুক্ত যারা এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলত : إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ (এ তো আমাদের বাপ-দাদার আমল থেকেই চলে আসছে)। অতঃপর সুলতান তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত শরাবখানা বন্ধের নির্দেশ দেন।

শায়খ (র)-এর একজন শাগরিদ বলেন : দরবার থেকে ফিরে আসার পর আমি আরয করলাম, "হযরত! ঘটনাটা কি?" শায়খ (র) বললেন : আমি বাদশাহকে যখন এরূপ শান-শওকতের সঙ্গে এজলাস করতে দেখলাম তখন আমার আশংকা হ'ল, না জানি বাদশাহ্ এ দৃশ্যে গর্বিত হন, শিকার হন অহমিকা ও দাম্ভিকতার। তাই তাঁর সংস্কার সাধন মানসেই আমি ঐ কথাগুলো বললাম। আমি আরয করলাম : ও কথা বলতে আপনার ভয় হ'ল না! তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র ভয় ও তাঁর মহিমান্বিত মর্যাদা আমার মানস জগতে এমনভাবে উদ্ভাসিত ছিল যে, তার মুকাবিলায় বাদশাহ্‌কে এক বাচ্চা বিড়ালের মতই মনে হচ্ছিল।[১]

ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে জিহাদ

সে সময় ফিরিঙ্গীদের সাথে সংঘর্ষ চলছিল। একবার ফিরিঙ্গী ফৌজ মনসূরা পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং মুকাবিলায় মুসলমানদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। এ জিহাদে শায়খ (র)-ও মুসলমানদের সঙ্গে শরীক ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষুদ্রজন্দ জক্ষৈন্নশহুদ্ধ হবার সৌভাগ্য দান করেছিলেন। ইবনু'স-সুবকী "ত'াবাক'াত" নামক গ্রন্থে বলেন : তাঁর দু'আয় শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা জয় লাভ করেন। বাতাসের গতি হঠাৎ পাল্টে যায় এবং ফিরিঙ্গীদের জাহাজগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে অধিকাংশ ফিরিঙ্গীরই সলিল সমাধি ঘটে।[২]

জিহাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য শায়খ (র)-এর ইন্তেজাম

সে সময় তাতারী ফৌজ সমগ্র মুসলিম জাহানের ওপর বন্যার বেগে আছড়ে পড়ছিল এবং একাদিক্রমে মুসলিম জনপদগুলো তছনছ করে যাচ্ছিল। এক পর্যায়ে

১. ত'াবাক'াতু'স-শাফি'ঈয়্যা, ৮২ পৃ.; ২. ঐ, ৮৪ পৃ.।

তারা মিসর অভিমুখে তাদের গতিমুখ পরিবর্তন করে। তখন তাতারীদের সম্পর্কে মুসলমানদের মনে যে ভীতি ও আতংকের সঞ্চার হয়েছিল তা ছিল অনেকটা প্রবাদ বাক্যের মত। মিসরবাসীরা এমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল যে, সে মুহূর্তে তাদের করণীয় কি তা যেন বুঝতেই পারছিল না, এমন কি মিসরের সুলতানও তাতারীদের মুকাবিলা করার সাহস হারিয়ে ফেলেছিলেন। সেই হতাশাজনক অবস্থায় একমাত্র শায়খু'ল-ইসলাম (র)-ই সকলের মনে সাহসের সঞ্চার করেন। তিনি বলেন : তোমরা আল্লাহ্র নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়; তোমাদের জয় লাভ সুনিশ্চিত। এ ব্যাপারে আমি কেবল আশ্বাস দিচ্ছি না, দায়িত্ব গ্রহণ করতেও রাযী আছি। বাদশাহ বললেনঃ আমার রাজকোষে টাকা-পয়সা এ মুহূর্তে কম। ব্যবসায়ীদের থেকে ধার নিতে চাই। শায়খ (র) বললে : বাদশাহ্র নিজের মহলে যে সব জওয়াহেরাত আছে, বেগমদের যে সব অলংহার আছে-আগে সেগুলো বের করুন। সাম্রাজ্যের সকল রাজকর্মচারী, আমীর-উমারা ও দরবারীদের বেগমদেরকে তাদের অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থের, অলংকারাদি হাযির করতে বলুন। অতঃপর সে সব ছাঁচে ঢেলে মুদ্রায় পরিণত করুন এবং তা সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করুন। এরপরও যদি আবশ্যক হয় তাহলে কর্জ গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু এর আগে কিছুতেই নয়। শায়খ (র)-এর ব্যক্তিত্বের প্রভাব এত বেশী ছিল যে, বাদশাহ ও সালতানাতের আমীর- উমারা কোনরূপ বাদ-প্রতিবাদ ছাড়াই সকল জওয়াহেরাত ও অলংকারাদি শায়খ (র)-এর সামনে এনে হাযির করেন এবং এর দ্বারাই যুদ্ধের যাবতীয় খরচ মেটানো সম্ভব হয়। যুদ্ধে মুসলমানরা জয় লাভ করে।

সালতানাতের আমীরদের নীলাম

শায়খ (র)-এর জীবনে সর্বাধিক বিস্ময়কর ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, তিনি সালতানাতের ঐ সব তুর্ক বংশীয় আমীরদের নীলামে চড়িয়েছিলেন যাঁরা ছিলেন, তাঁর মতে, মুসলমানদের সাধারণ ধনাগার বায়তু'ল-মালের সম্পত্তি। কেননা ওদেরকে শরীয়ত প্রদর্শিত পন্থায় আযাদ করা হয়নি। মিসর সালতানাতের ওপর এ সব আমীর-উমরারার ছিল বিরাট প্রভাব-প্রতিপত্তি। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন নায়েবে সালতানাত। শায়খ (র) ফতওয়া দেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত এসব আমীরকে শরীয়ত প্রদর্শিত পন্থায় মুক্ত করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এদের সঙ্গে কোনরূপ কায়-কারবারে লিপ্ত হওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে ঠিক হবে না; এরা ক্রীতদাস হিসাবেই বিবেচিত হবে। তাঁর এ ফতওয়ার এরূপ প্রতিক্রিয়া হয় যে, লোকেরা তুর্ক আমীরদের সাথে কায়-কারবারে লিপ্ত হতেও সতর্কতা অবলম্বন

করতে থাকে। ফলে আমীররা বিরাট বিপদের সম্মুখীন হন। তাদের মধ্যে উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। একদিন তারা একত্র হয়ে শায়খ (র)-কে ডেকে পাঠান এবং বলেন : আপনি কি চান? শায়খ (র) বললেন : আমি একটি মজলিস ডাকব এবং বায়তু'ল-মালের পক্ষ থেকে আপনাদের নীলামে চড়াব। শর'ঈ তরীকায় অতঃপর আপনাদেরকে আযাদীর পরওয়ানা প্রদান করা হবে। এতদ্শ্রবণে তারা সুলতানের নিকট আরয পেশ করেন : শায়খ আমাদেরকে অপদস্থ করতে চান এবং তারই জের হিসাবে আমাদের প্রকাশ্য নীলামে ওঠাতে বলছেন। বাদশাহ্ শায়খ (র)-কে কোন রকম মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শায়খ তাঁর অভিমত থেকে পিছু হটতে রাযী হননি। উভয়ের মধ্যে আলোচনাকালে বাদশাহ্র মুখ থেকে এমন কিছু কথা বেরিয়ে পড়ে যা ছিল শায়খ (র)-এর মর্যাদার পরিপন্থী। বাদশাহ্ বলেছিলেন : এসব ব্যাপারের সঙ্গে শায়খ (র)-এর কি সম্পর্ক? তিনি আমীর-উমারার ব্যাপারে নাক গলাতে যাচ্ছেন কেন? এতদ্শ্রবণে শায়খ (র) এত অসন্তুষ্ট হন যে, তখন তখনই তিনি মিসর থেকে হিজরত করতে মনস্থ করেন। তিনি তাঁর সব মাল-সামান পশুর পিঠে চাপান এবং পশুর সংখ্যা কম থাকায় ঘরের লোকদের পালাক্রমে সেগুলোর ওপর চড়িয়ে অজানার উদ্দেশে রওয়ানা হন।

তাঁর রওয়ানা হবার সংবাদ প্রচারিত হবার সাথে সাথে কায়রো শহরে যেন এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। উলামা, নেককার, বুযুর্গ, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ীসহ শহরের মুসলিম অধিবাসীদের এক বিরাট অংশ নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়ে তাঁর পিছু পিছু রওয়ানা হয়ে পড়ে। সুলতান বিষয়টি অবহিত হন। কেউ সুলতানকে গিয়ে বলেছিল : জেনে রাখুন,শায়খ 'ইয্যুদ্দীন চলে গেলে আপনার রাজত্বের পতন কালও ঘনিয়ে আসবে। অগত্যা সুলতান নিজেই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে শায়খ (র)-এর সমীপে গিয়ে পৌঁছেন এবং বুঝিয়ে-সমঝিয়ে তাঁকে শহরে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। সিদ্ধান্ত হয় যে, সালতানাতের আমীরদের তিনি নীলাম করবেন। এতদ্শ্রবণে সালতানাতের নায়েব (ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি) অত্যন্ত তোষামোদের সুরে তাঁকে এই কাজ থেকে নিবৃত্ত রাখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শায়খ (র) তাঁর মতে ছিলেন অটল। এতে নায়েব ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন : দেখি, শায়খ আমাদের কিভাবে নীলাম করেন? আমরা দেশের শাসক। আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছি, আমি এই তলোয়ার দিয়ে তাঁর গর্দান উড়িয়ে দেব। এই বলে তিনি তার আমলা-কর্মচারী সহযোগে সোজা শায়খ (র)-এর দরজায় গিয়ে হাযির হন। খোলা তলোয়ার ছিল তার হাতে। এমতাবস্থায় তিনি দরজায় করাঘাত করেন। শায়খ

(র)-এর পুত্র বাইরে এসে দেখতে পান, নায়েব-ই-সালতানাত খোলা তরবারি হাতে তাঁদের দরজা মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ভেতরে গিয়ে তাঁর পিতাকে এ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। শায়খ (র) বেপরোয়া ভঙ্গীতে জওয়াব দেন : বৎস, তোমার পিতার এত বড় সৌভাগ্য কোথায় যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হবেন, এই বলে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন। তিনি বেরিয়ে আসতেই নায়েবে সালতানাতের হাত থেকে তলোয়ার মাটিতে খসে পড়ে এবং তার দেহে কম্পন দেখা দেয়। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে শায়খ (র)-কে বলেন : প্রভু! আপনার অভিপ্রায় কি? "তোমাদের নীলামে চড়িয়ে বিক্রি করব"-এই ছিল শায়খ (র)-এর একমাত্র জওয়াব। নায়েব আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের মূল্য কি কাজে লাগাবেন?" তিনি বললেন, "মুসলমানদের কাজে।" "এর দাম কে দেবে?" নায়েবের জিজ্ঞাসা। "আমি নিজেই"-এই ছিল শায়খ (র)-এর উত্তর। নায়েব বললেন, "ঠিক আছে।" অতঃপর এক এক করে শায়খ (র) সমস্ত আমীরকেই নীলাম করেন। সবার ক্ষেত্রেই ডাক ওঠে। শায়খ (তাঁদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে) উঁচু দামই হেঁকেছিলেন। যা হোক, তিনি আমীরদের চড়া দামে বিক্রি করে সে অর্থ সৎ কাজে ব্যয় করেন। আমীররা সেদিন নিজ নিজ মূল্য পরিশোধ করেই তবে যে যার বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছিলেন।[১]

ইবনু'স-সুবকী বলেনঃ এ ধরনের ঘটনা আর কারো জীবনে ঘটেছে বলে শোনা যায়নি। একজন 'আলিমের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদার এ ছিল এক চূড়ান্ত উদাহরণ।

শায়খ 'ইয্‌যুদ্দীন ও মিসরের সুলতানকুল

শায়খ (র)-এর জীবদ্দশায়ই মিসরে বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তিনি যখন মিসরে এসেছিলেন তখন ছিল আয়্যুবী শাসনামল। সুলতান সালাহুদ্দীনের বংশধরগণ তখন রাজত্ব করছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায়ই এই বংশের পতন হয়। আল-মালিকু'স-সালিহ্ নজমুদ্দীন আয়্যুব-এর স্থলবর্তী আল-মালিকু'ল-মু'আজ্জাম তূরান শাহের পর তুর্কী বংশীয় আমীরদের শাসনামল শুরু হয়। তারা সবাই শায়খ (র)-এর গুণগ্রাহী এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, বিশেষত মিসরের খ্যাতিমান তুর্ক সুলতান আল-মালিকু'জ-জাহির বায়বার্স শায়খ (র)-কে অত্যন্ত ভক্তি করতেন এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব দ্বারা তিনি বেশ প্রভাবান্বিত ছিলেন। শায়খ (র)-এর পরামর্শেই তিনি বাগদাদের পতন এবং 'আব্বাসী খিলাফতের অবসানে বাগদাদের শেষ

১. ত'াবাক'াতু'স-শাফি'ঈয়্যাতু'ল-কুবরা, ৫ম খণ্ড, ৮৪-৮৫ পৃ.।

খলীফা মুস্তা'সিমের চাচা আবুল কাসিম আহমদকে (যাঁর উপাধি ছিল আল-মুস্তানসির) ৬৫৯ হি./১২৬১ খ্রিস্টাব্দে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে মিসরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। প্রথমে শায়খ 'ইয্‌যুদ্দীন তাঁর হাতে বায়'আত করেন। অতঃপর বায়'আত করেন আল-মালিকু'জ-জাহির বায়বার্স, কাযীউ'ল-কুযাত তাজুদ্দীন প্রমুখ।[১]

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

শায়খ (র) শুধু একজন বিরাট জ্ঞানী, মর্যাদাশীল বা পরাক্রমশালী ব্যক্তিই ছিলেন না, সেই সাথে ছিলেন যারপরনাই দয়ার্দ্রচিত্ত, দানশীল ও উদারহৃদয়। কাযীউ'ল-কুযাত বদরুদ্দীন ইব্‌ন জিমা'আ বলেন : দামিশকে অবস্থানকালে একবার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং বাগ-বাগিচা অত্যন্ত সস্তা দামে বিক্রি হতে থাকে। তখন শায়খ (র)-এর সহধর্মিণী তাঁকে একটি গহনা দিয়ে বলেন : এটি বিক্রি করে তা দিয়ে গ্রীষ্মকাল কাটাবার উপযোগী একটি বাগান খরিদ করুন। কিন্তু শায়খ উক্ত গহনা বিক্রি করে তার সমস্ত মূল্যটাই খয়রাত করে দেন। তিনি বাগান খরিদ করেছেন কিনা সে সম্পর্কে বেগম সাহেবা জানতে চাইলে তিনি প্রত্যুত্তরে জানান, "হ্যাঁ! তবে এখানে নয়, জান্নাতে। আমি দেখতে পেলাম লোকে অভাব-অনটনের কারণে খুবই কষ্টের মাঝে কাল কাটাচ্ছে। তাই আমি তোমার গহনার অর্থ তাদের মধ্যেই বিলি করে দিয়েছি।" "আল্লাহ আপনাকে এর উত্তম প্রতিদান দিন"-এ ছিল তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণীর জওয়াব।

শ্রদ্ধেয় কাযীউ'ল-কুযাত এও বর্ণনা করেছেন যে, শায়খ (র) অভাব-অনটন সত্ত্বেও অত্যন্ত মুক্তহস্ত ও উদার হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। এমনও দেখা গেছে যে, তাঁর নিকট দেবার মত কিছু না থাকলে তিনি আপন পাগড়ীটি টুকরো টুকরো করে অভাবীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন।

শায়খ 'ইযযুদ্দীন কেবল সুলতানদের মুকাবিলায়ই নয়, বরং নিজের ব্যাপারেও নির্ভীক ও স্পষ্টভাষী ছিলেন। ইবনু'স-সুবকী ও 'আল্লামা সুয়ূতী বর্ণনা করেন, "একবার মিসর অবস্থানকালে তাঁর দেয়া একটি ফতওয়ায় ভুল ধরা পড়ে। তিনি তক্ষুণি প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন : ইবনে 'আবদুস সালাম যাকে অমুক ফতওয়াটি দিয়েছেন তিনি যেন সেটার ওপর 'আমল না করেন। কেননা ফতওয়াটি ভুল ছিল।"

---

১. হু'সনু'ল-মুহ'দ'ারা, ২ খণ্ড, ৪৯ পৃ.।

ইবনু'স-সুবকীর বর্ণনায় জানা যায় যে, শায়খ শুধু 'ইলমে জাহিরীতে নয়, বরং 'ইলমে বাতেনীতেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।[১] তাঁর ঈমান, ইয়াকীন, আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা ও নির্ভরতা, নিঃশংকচিত্ততা, বীরত্ব, পার্থিব ক্ষমতায় ক্ষমতাবানদের প্রতি নিস্পৃহতা প্রভৃতি থেকেই এর পরিচয় মেলে। অধিকন্তু ইবনু'স-সুবকী তাঁর "ত'াবাক'াত" গ্রন্থে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন : তিনি (শায়খ) তরীকতের ইমাম শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহ্‌রাওয়ার্দী (র) থেকে 'ইল্‌মে মা'রিফতে সবক নিয়েছিলেন এবং হযরত সুহরাওয়ার্দী (র)-এর তরফ থেকে তিনি লোকদের হিদায়াত ও তরবিয়তের ব্যাপারে অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন।[২] সুয়ূতী শায়খ আবুল হাসান শাযিলী (র)-এর সঙ্গে তাঁর (ইবনে 'আবদুস সালামের)-সাক্ষাৎ ও তৎকর্তৃক উপকৃত হবার কথাও উল্লেখ করেছেন।[৩]

আমরু বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার সম্পর্কে শায়খ (র)-এর নীতি

শায়খ (র) তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে আমরু বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার তথা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ– এই নীতির ওপর অটল ছিলেন। তাঁর মতে, এ দায়িত্ব সম্পাদন করা 'উলামায়ে কিরামের ওপর ফরয। তিনি এও বলতেন, এই অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে বিপদ-আপদ আসবে, 'উলামায়ে কিরামকে তা বরদাশ্‌ত করতে হবে এবং সব ধরনের মুসীবত সইবার জন্য তাঁদেরকে তৈরী থাকতে হবে।

সুলতান আল-মালিকু'ল-আশরাফের নামে প্রেরিত এক পত্রে তিনি বলেন ঃ

وبعد ذلك فانا نزعم اننا من جملة حزب الله وانصار دينه وجنده وكل جندى لايخاطر بنفسه فليس بجندى –

আমাদের দাবি এই যে, আমরা আল্লাহ্‌র দল, তাঁর দীনের মদদগার ও তাঁরই সেনাদল। যে সেনাদল বিপদের মুখোমুখি হতে ভয় পায় তারা কোন সেনাদলই নয়।

তিনি বিশ্বাস করতেন, 'ইল্‌ম বা জ্ঞান এবং ভাষা ও সাহিত্য হ'ল একজন 'আলিম বা জ্ঞানীর হাতিয়ার। অতএব, তাঁদের জিহাদ হ'ল এ দুটো হাতিয়ারকে হক বা সত্যের সমর্থনে এবং বাতিল তথা মিথ্যা ও অসত্যের বিরোধিতায়

১. হু'সনু'ল-মুহ'দ'ারা, ১ম খণ্ড, ১৪২ পৃ.।
২ ত'াবাক'াত, ৫ম খণ্ড, ৮৩ পৃ.।
৩. হু'সনু'ল-মুহ'াদ'ারা, ১৪২ পৃ.।

নিয়োজিত করা। অপর এক চিঠিতে তিনি লেখেন ঃ

قد امرنا الله بالجهاد فى نصرة دينه الا ان سلاح العالم علمه ولسانه كما ان سلاح الملك سيفه وسنانه - فكما لا يجوز للملوك اغماد اسلحتهم عن الملحدين والمشركين لا يجوز للعلماء اغماد السنتهم عن الزائغين والمبتدعين .

আল্লাহতা'আলা আমাদেরকে দীনের সাহায্যের জন্য জিহাদ বা সংগ্রাম চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটা পরিষ্কার কথা যে, 'আলিমের হাতিয়ার হ'ল তাঁর জ্ঞান, তাঁর ভাষা ও সাহিত্য, যেমন একজন বাদশাহ্‌র হাতিয়ার হ'ল তাঁর তলোয়ার ও তীর-ধনুক। বাদশাহ্‌র পক্ষে তলোয়ার খাপে পুরো রাখা যেমন সমীচীন নয়, তেমনই 'আলিম-'উলামার পক্ষে বাতিল, গোমরাহ ও বিদ'আতীর বিরুদ্ধে নিশ্চুপ থাকা জায়েয নয়।[১]

তাঁর মতে, আম্‌র বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার তথা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ-এর ক্ষেত্রে একজন 'আলিম-ই-রব্বানীকে সর্বপ্রকারের বিপদ-আপদ বরদাশ্‌ত করবার জন্য তৈরী থাকতে হবে অর্থাৎ তিনি সে সব 'আলিম-'উলামার দলে ছিলেন না, যাঁরা বিপদ-আপদের মুখোমুখি হওয়াকে অনুচিত বলে মনে করেন, যাঁরা তাঁদের সমর্থনে দলীল হিসেবে কুরআনের আয়াত :

وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلى التَّهْلُكَةِ .

"তোমরা নিজেদের ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ ক'র না" পেশ করেন। তাঁদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য তিনি বলেছেন :

والمخاطرة بالنفوس مشروعة فى اعزاز الدين ولذلك يجوز للبطل من المسلمين ان ينغمر فى صفوف المشركين وكذلك الخاطرة بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر ونصرة قواعد الدين بالحجج والبراهين مشروعة فمن خشى على نفسه سقط عنه الوجوب وبقى الاستحباب ومن قال بان التعزيز بالنفوس لا يجوز فقد بعد عن الحق ونأى عن الصواب وعلى الجملة فمن اثر الله على نفسه أثره الله ومن طلب رضا الله بما يسخط الناس رضى الله عنه وارضى عنه الناس ومن طلب رضا الناس بما يسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس وفى رضا الله كفاية عن رضا كل احد -(طبقات ج ٥ صـ ٩١)

১. ত'াবাক'াতু'স-শাফি'ঈয়্যাতু'ল-কুবরা, ৫ম খণ্ড, ৯-১২ পৃ.।

দীনের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নিজের জীবনকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করা ধর্মের দৃষ্টিতে সিদ্ধ। মুসলিম যোদ্ধার পক্ষে (নিজের জীবন বিপন্ন করে হলেও) মুশরিক সেনা ব্যুহের মধ্যে প্রবেশ করা জায়েয। ঠিক তেমনি আম্‌র বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার এবং দলীল-প্রমাণ সহযোগে ধর্মীয় নিয়ম-নীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে নিজেকে বিপদের মাঝে নিক্ষেপ করা সিদ্ধ। অবশ্য এটা করতে গিয়ে কেউ যদি তার জীবন বিপন্ন মনে করে তবে সে এর অপরিহার্য বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত থাকবে। তবে মুস্তাহাব হিসাবে এ দায়িত্ব অবশিষ্ট থাকবে। যাদের ধারণা যে, জীবন বিপন্ন করা আদৌ জায়েয নয় তারা সত্য থেকে বহু দূরে সরে গেছে এবং তাদের এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। সারকথা এই যে, যে আল্লাহ্‌কে নিজের মুকাবিলায় অগ্রাধিকার দান করবে, আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করবে, আল্লাহ্ স্বয়ং তার ওপর সন্তুষ্ট হবেন এবং অন্য লোককেও তার প্রতি সন্তুষ্ট রাখবেন। যারা আল্লাহ্‌কে নারায করে মানুষকে রাযী রাখতে চেষ্টা করে, আল্লাহ তাদের ওপর অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তার প্রতি নারায করে দেন। আর সবার সন্তুষ্টির মুকাবিলায় শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই যথেষ্ট।-তাবাকাত, ৫ম খণ্ড, ৯১ পৃ.।

আরব কবি কত সুন্দরই না বলেছেন ঃ

فليتك تحلو والحياة مريرة + وليتك ترضى والانام غضاب

হায়! তোমার প্রেমের স্বাদ যদি আমি লাভ করতে পারতাম তাহলে জীবন যত তিক্তই হোক, আমি বিন্দুমাত্রও পরওয়া করতাম না। তোমার সন্তুষ্টির বিনিময়ে গোটা পৃথিবীর অসন্তুষ্টিও তুচ্ছ।

তাঁর জীবন সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি তাঁর সারাটা জীবন এই বিশ্বাসে অটল ছিলেন এবং এ পথেই তিনি চলতে চেষ্টা করেছেন। আম্‌র বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার-এর ক্ষেত্রে এবং তাঁর মতে ভুল ও শরীয়তবিরোধী কোন কিছু প্রত্যাখ্যান করতে জান-মাল, সহায়-সম্পদ, মান-সম্মান ও পদ মর্যাদা, এমন কি স্বদেশ পরিত্যাগ করতেও কোন আপত্তি নেই।

শায়খ (র)-এর রচনাবলী

শায়খ (র) যেমন একজন সফল মুদাররিস, সূক্ষ্ম দৃষ্টির অধিকারী ফকীহ ও গভীর পাণ্ডিত্যসম্পন্ন মুফতী ছিলেন, ঠিক তেমনি ছিলেন একজন প্রবীণ খ্যাতনামা লেখকও। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'আল-ক'ওয়াইদু'ল-কুবরা' ও 'কিতাবু মাজাযু'ল-

কু'রআন' বিশেষ মর্যাদার দাবিদার। ইবনু'স-সুবকী বলেন :

وهذان الكتابان شاهدان بامامته وعظيم منزلته فى علوم الشريعة .

এ দু'টি গ্রন্থ তাঁর রচনাশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও 'ইলমে শরীয়তে তাঁর পাণ্ডিত্য ও মর্যাদার সাক্ষ্য দেবে।[১]

এ দু'টি গ্রন্থের বক্তব্য তিনি দু'টি আলাদা পুস্তকে সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করেছেন। তাঁর আরও দু'টি কিতাব 'শাজারাতু'ল-মা'আরিফ' ও 'আদ্দালাইলু মুতা'আল্লাক'াতু বি'ল-মালাইকা ওয়া'ল-ইনসু 'আলায়হিম'-এরও তিনি বিশেষ তা'রীফ করেছেন। তাঁর 'মাক'াসি'দু'স-সা'লাত' নামক গ্রন্থটি তাঁরই জীবনদ্দশায় জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং লোকেরা তার হাযার হাযার কপি করিয়ে নেয়।[২] ছোট-বড় রচনা ছাড়াও তাঁর দেয়া ফতওয়ার একটি বিরাট সংকলন রয়েছে। শাফি'ঈ মাযহাবের এটি একটি মূল্যবান সম্পদ।

ইমাম গাযালী (র)-এর পরে শায়খ 'ইযযুদ্দীন সম্ভবত দ্বিতীয় 'আলিম ও গ্রন্থকার যিনি বিশেষভাবে শরীয়তের বিধি-বিধানের পেছনের উদ্দেশ্য ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং শরীয়তের রহস্য ও গুপ্তভেদগুলো বর্ণনা করেছেন। এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক তিনি হচ্ছেন শায়খু'ল-ইসলাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (র)। তিনি তাঁর হু'জ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগ'া' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর পূর্বসুরি তিনজন লেখক হু'জ্জাতু'ল-ইসলাম ইমাম গাযালী, আবূ সুলায়মান খাত্তাবী ও শায়খু'ল-ইসলাম 'ইযযুদ্দীন (ইবনে 'আবদুস সালাম)-এর নাম উল্লেখ করেছেন।[৩]

ওফাত

৬৬০ হিজরীর ৯ই জুমাদা আল-উলা. ৮৩ বছর বয়সে শায়খ ইবনে 'আবদুস সালামের ওফাত হয়। সময়টা ছিল সুলতান আল-মালিকু'জ-জাহির বায়বার্স-এর রাজত্বকাল। শায়খ (র)-এর ওফাতে তিনি খুবই ব্যথা পান। তিনি বলতেন, "আল্লাহ্‌র কী শান! শায়খ (র)-এর ওফাত আমার শাসনামলেই নির্ধারিত ছিল।" জানাযায় দরবারের আমীর-উমারা, সাম্রাজ্যের গণ্যমান্য সদস্যবর্গ ও শাহী ফৌজ শরীক ছিল। সুলতান নিজ কাঁধে খাটিয়া বহন করেছিলেন এবং দাফন কর্মে শরীক

---

১. ত'াবাক'াতু'স-শাফি'ঈয়্যাতু'ল-কুবরা, ৫ম খণ্ড, ১০৩ পৃ.।
২. ঐ, ৫ম খণ্ড, ৯৮ পৃ.।
৩. হু'জ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগ'া, ৪র্থ পৃষ্ঠা।

হয়েছিলেন।

শায়খ (র)-এর জানাযা যখন দুর্গের নিম্নেদেশ দিয়ে অতিক্রম করছিল, সুলতান তখন মানুষের ভীড় দেখছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর জনৈক ঘনিষ্ঠ জনকে বলেছিলেন : আজ বুঝতে পারছি, আমার রাজত্ব সুদৃঢ় ও সুসংহত হ'ল। কেননা এই ব্যক্তি ছিলেন মানুষের প্রত্যাবর্তনস্থল। তিনি ইঙ্গিত করলে আমার রাজত্বই চলে যেত। তাঁর ইনতিকালের পর আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেলাম।[১]

---

১. ত'াবাক'াতু'স-শাফি'ঈয়্যাতু'ল-কুবরা, ৫ম খণ্ড, ৮৪ পৃ.।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তাতারী ফিতনা ঃ নবতর সংকটের মুখে ইসলাম

তাতারী হামলা ও তার পটভূমি

হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে মুসলিম জাহানের ভাগ্যাকাশে এমন এক আকস্মিক দুর্যোগ দেখা দেয় যার নজীর দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল। তাতারী লুটেরা ও ফিতনাবাজদের দুর্বার আক্রমণরূপে প্রাদুর্ভাব হয়েছিল এ দুর্যোগের। তাতারীরা পিপীলিকা ও পঙ্গপালের ন্যায় প্রাচ্য ভূখণ্ড থেকে অগ্রসর হয়ে ছেয়ে ফেলেছিল গোটা মুসলিম জাহান।

বাহ্যত সুলতান 'আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিয্‌ম শাহ্‌র একটি ভুল ও বোকামির জন্যই মুসলমানদের ওপর এ দুর্যোগ নেমে এসেছিল। সুলতান বাণিজ্যোপলক্ষে আগত একদল তাতারী বণিককে (অজ্ঞাত কারণে) হত্যা করেন। চেঙ্গীয খান এর কারণ অবগত হবার উদ্দেশে দূত পাঠান। খাওয়ারিয্‌ম শাহ এ দূতকেও হত্যা করেন। এতে করে তাতার সম্রাট চেঙ্গীয খান ক্রোধান্বিত হয়ে প্রথমে খাওয়ারিয্‌ম শাহী সালতানাত, অতঃপর গোটা মুসলিম জাহানকেই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেন।

কিন্তু কুরআন মজীদে আচার-আচরণের যে পরিণতি এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর উত্থান-পতনের যে চিরন্তন ও বিশ্বজয়ী বিধান পেশ করা হয়েছে, বিশেষ করে সূরা বনী ইসরাঈলে বনী ইসরাইল জাতিগোষ্ঠীর ধ্বংস, গণহত্যা, লাঞ্ছনা ও অপমান এবং বায়তু'ল-মুকাদ্দাসের ধ্বংস ও মর্যাদাহানির যে উপদেশাত্মক কাহিনী বিবৃত হয়েছে[১] তার আলোকে এই বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ ও তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের ওপর আপতিত ছোট্ট এই কিয়ামতের মূল কারণ শুধু একজন বাদশাহ্‌র সংকীর্ণ মানসিকতা ও বোকামি ছিল বলে মনে হয় না। এটাও মনে হয় না যে, অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই মুসলিম জাহানের ওপর দুর্যোগ প্লাবনের বেগে আছড়ে পড়েছিল এবং একজনের ভুলের কারণে গোটা মুসলিম মিল্লাতকে সেই অশুভ দিনটিকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল যার জন্য তারা আদৌ প্রস্তুত ছিল না কিংবা ছিল না আদৌ এর জন্য দায়ী। কুরআন মজীদের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে যদি যে যুগের মুসলমানদের নৈতিক, চারিত্রিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক

---
১. সূরা বনী ইসরাঈল-এর ৪র্থ আয়াত থেকে ৭ আয়াত দ্র.।

অবস্থা গভীরভাবে অধ্যয়ন করা হয়, তাহলে এর অন্তরালবর্তী এই সত্য দিবালোকের ন্যায় ফুটে উঠবে যে, এই অশুভ ঘটনা আকস্মিকভাবে মুসলমানদের ওপর আপতিত হয়নি, বরং এর কারণ আরও গভীরে কোথাও রয়েছে। যতটা বুঝেছি এবং যতটা বলা হয়েছে, তার সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য আমাদের আরও কয়েক বছর পেছনে ফিরে যেতে হবে এবং সে যুগের মুসলিম সালতানাত ও ইসলামী সমাজের ওপর সংক্ষিপ্ত নজর বুলাতে হবে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যুবীর ওফাতের (হি. ৫৮৯) পর তাঁর বিস্তৃত সাম্রাজ্য তাঁর সন্তান-সন্ততি ও বংশধরদের মধ্যে বন্টিত হয়ে যায়। বিশ্বের অনেক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও দৃঢ়চেতা শাসকের মত তাঁর সন্তান-সন্ততিও যোগ্য উত্তরসুরি হিসেবে নিজেদের প্রমাণিত করতে পারেনি।[১] দীর্ঘকাল যাবত তারা নিজেদের মধ্যেই লড়াই-ঝগড়ায় লিপ্ত থাকে। এমনও দেখা গেছে যে, তাদের কেউ কেউ নিজেদেরই ভাই ও বংশের লোকদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড শাসক ও ফিরিঙ্গী প্রতিপক্ষের থেকেও সাহায্য নিতে এবং তাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে মিলিত হতে এতটুকু ইতস্তত করেনি। এ সম্পর্কে একটি নমুনা শায়খু'ল-ইসলাম 'ইযযুদ্দীন ইবনে 'আবদুস সালামের আলোচনায় পেশ করা হয়েছে। এই রাষ্ট্রীয় অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা খান্দানী দ্বন্দ্ব ও গৃহযুদ্ধের কারণে সাম্রাজ্যের অধীনস্থ প্রদেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। জনসাধারণ এক অনিশ্চয়তার মাঝে কাল কাটাচ্ছিল। ক্রুসেডার ও ফিরিঙ্গীরা বারবার ঐসব মুসলিম শহরগুলোর ওপর হামলা চালাচ্ছিল যেগুলো সুলতান সালাহুদ্দীন বিরাট কুরবানী ও সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন। ব্যবস্থাপনা ও চরিত্রগত বিচ্যুতি ও পথভ্রষ্টতা মহামারী ও দুর্ভিক্ষের করাল মূর্তি নিয়ে হাযির হয় এবং মিসরের মত উর্বর ও শস্য-শ্যামল ভূখণ্ডে যা অন্য দেশের জনগণেরও উদর পূর্তির ব্যবস্থা করত, ৫৯৭ হিজরীতে চাচা-ভাতিজা যথাক্রমে আল-মালিকু'ল-'আদিল ও আল-মালিকু'ল-আফযালের মধ্যকার গৃহযুদ্ধের কারণে পরিণত হয় এক মূর্তিমান ভাগাড়ে। সে বছর নীলনদে প্লাবন আসেনি। ফলে মিসরে এমন আকাল দেখা দেয় যে, মানুষ মানুষেরই গোশ্ত সিদ্ধ করে ভক্ষণ করে। মৃত্যু এমন সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয় যে, মৃতের কাফনের ব্যবস্থা করাও অসম্ভব হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক আবূ শামার বর্ণনা মুতাবিক কেবল আল-মালিকু'ল-'আদিল (মিসরের সুলতান) তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে একাই এক মাসে দু'লাখ বিশ হাযার মৃত্যের কাফন দিয়েছিলেন।

---

১. ভারতবর্ষে মহান 'আলমগীর এবং তাঁর 'লাভিষিক্তদের উদাহরণ আমাদের জন্য যথেষ্ট।

অবস্থার শোচনীয়তা এতদূর গিয়ে পৌঁছেছিল যে, মানুষ মৃতদেহ ও কুকুরের মাংস পর্যন্ত ভক্ষণ করতে শুরু করে; বিপুল সংখ্যক শিশু সন্তানকেও আগুনে ঝলসিয়ে ভক্ষণ করা হয়। এর কদর্যতা এত দূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে যে, নৈতিকতা বা সুরুচি বলে কোন জিনিসের অস্তিত্ব আর বাকি থাকে নি। ঐতিহাসিক ইবনে কাছীরের বর্ণনানুসারে যখন খাবার হিসাবে শিশু ও অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা দুর্লভ হয়ে উঠল তখন যে যাকে যেভাবে পেরেছে– ধরে ভুনা করে করে খেয়েছে।[১] আল্লাহ্র চিরন্তন রীতি মুতাবিক আসমানী সতর্কতা জ্ঞাপনের ধারাও ছিল অব্যাহত এবং এমন ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে চলেছিল যা তওবা ও সংস্কার-সংশোধনের প্রেরণা সৃষ্টির জন্য ছিল যথেষ্ট। অনন্তর ৫৯৭ হিজরীতেই এক বিরাট ভূমিকম্প দেখা দেয়। এর আওতায় পড়েছিল, বিশেষ করে শাম (আজকের সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তীন ও জর্দান), তুরস্ক ও ইরাক। এর ফলে ধ্বংসের এমন বিরাট তাণ্ডব ও বিভীষিকা দেখা দিয়েছিল যে, কেবল নাবলূস শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতেই বিশ হাযার মানুষ মাটি চাপা পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 'মিরআতু'য-যামান' গ্রন্থের লেখকের বর্ণনামতে (যা অতিশয়োক্তির হাত থেকে মুক্ত নয়) প্রায় এগারো লক্ষ মানুষ এ ভূমিকম্পের শিকার হয়েছিল।

একদিকে অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাতছানি যা মুসলমানদের তাদের অলস নিদ্রা থেকে জাগ্রত করবার জন্য ছিল যথেষ্ট, আর অন্য দিকে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অংশে গৃহযুদ্ধ ও ভ্রাতৃহত্যার ধারা ছিল অব্যাহত। ৬০১ হিজরীতে একই খান্দানের দুই ব্যক্তি মক্কার আমীর কাতাদাহ্ হুসায়নী ও মদীনার আমীর সালিম হুসায়নীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৬০৩ হিজরীতে যুদ্ধ শুরু হয় ঘুরী বংশ ও খাওয়ারিয্‌ম শাহীর মধ্যে। মুসলমানের হাত মুসলমানেরই রক্তে রঞ্জিত হতে থাকে। অপর দিকে ৬০৪ হিজরীতে ফিরিঙ্গীরা সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় হামলা শুরু করে। ৬০৭ হিজরীতে জযীরার[২] মুসলিম শাসনকর্তা ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত হয়[৩] এবং ৬১৬ হিজীতে ফিরিঙ্গীরা সামরিক ও প্রতিরক্ষাগত দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মিসরের দিময়াত শহর দখল করে নেয়।

১। বিস্তারিত জানবার জন্য দেখুন-'আল-বিদায়া 'ওয়া'ন-নিহায়া'-১৩শ খণ্ড, ২৬ পৃ. ৫৯৭ হিজরীর দুর্যোগ।

২. দজলা ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী এলাকা জযীরা নামে পরিচিত। একে بلاد ما بين النهرين ও বলা হয়। এর পশ্চিম-উত্তর অংশ জযীরা নামে খ্যাত এবং দক্ষিণ-পূর্ব অংশ ইরাক নামে মশহুর।

৩. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৩শ খণ্ড, ৫৯ পৃ.।

এদিকে মুসলিম খিলাফতের কেন্দ্রভূমি দারু'স্-সালাম বাগদাদ বাহ্যিক শান-শওকত, অনারবীয় আচার-অনুষ্ঠান ও অনৈসলামী সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। খলীফাদের অনুগ্রহভোজী মোসাহেব, চাটুকার, ফররাশ (যে ভৃত্য কার্পেট পাতে ও শয্য ইত্যাদি রচনা করে), সাকী (সুরাবাহী, পানি ও মদ যারা পান করায় কিংবা পরিবেশন করে) ও তোষকখানার মুহতামিম প্রভৃতি পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের (যারা ক্রীতদাস হিসাবে খিলাফতের সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল) সম্পদের কোন লেখা-জোখা ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, খলীফা আজ-জাহিরের ক্রীতদাস 'আলাউদ্দীন আত্-তাবরিসী আজ-জাহিরীর নিজস্ব সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত বার্ষিক আমদানী ছিল তিন লক্ষ দীনারের মত। বাগদাদে তার প্রাসাদের তুল্য প্রাসাদ আর দ্বিতীয়টি ছিল না। ঠিক একই অবস্থা ছিল মুজাহিদ উদ্দীন আয়বক আদ্দুওয়ায়দার আল-মুস্তানসিরীর সম্পদের। এসব লোক তাদের পুত্র-কন্যার বিবাহ উপলক্ষে যেভাবে উদার হস্তে যৌতুক দিয়েছিল বা উপহারসামগ্রী বন্টন করেছিল তাতে হতবাক হতে হয়। শেষোক্ত জনের জমিদারী থেকে প্রাপ্ত আমদানী ছিল বার্ষিক পাঁচ লক্ষ দীনার। একই অবস্থা ছিল আস-সালাহ্ 'আবদুল গনী ইবনে ফাখির ফররাশের। এ ব্যক্তি মূর্খ হওয়া সত্ত্বেও রাজসিক জীবন যাপন করত। তার মুকাবিলায় 'আব্বাসী সাম্রাজ্যের সর্ববৃহৎ মাদরাসা আল-মুস্তানসিরিয়ার একজন প্রবীণ উস্তায (অধ্যাপক)-এর আয় এত স্বল্প ছিল যে, তা বিশ্বাস করাও কষ্টকর। এঁদের ভেতর যিনি সবচে' বেশী বেতন পেতেন তিনিও মাসিক বারো দীনারের বেশী পেতেন না, অথচ 'আব্বাসী সাম্রাজ্যের একজন আমীর আশ-শারাবীর একজন খাদেমও অপর এক আমীরের শাদী উপলক্ষে চার হাযার দীনার ব্যয় করেছিল। স্বয়ং আমীর শারাবীর পক্ষে উপহার হিসাবে মাওসিল থেকে আনীত একটি পাখী উক্ত আমীরকে দান করা হয়েছিল যার মূল্য ছিল তিন হাযার দীনার।[১]

শান-শওকত প্রদর্শনের জন্য 'ঈদ ও খলীফার অভিষেক উপলক্ষে যে রাজকীয় মিছিল বের হ'ত তাতে গোটা বাগদাদ শরীক হ'ত। এসব উৎসব অনুষ্ঠানে অপরিহার্য ধর্মীয় কর্তব্যগুলো যেভাবে উপেক্ষিত হ'ত তার পরিমাপ করার জন্য কেবল এই একটি উদাহরণই যথেষ্ট যে, ৬৪০ হি. সনে 'ঈদ উপলক্ষে যে শাহী মিছিল বেরিয়েছিল তা রাত্রে গিয়ে শেষ হয়েছিল। লোক এ নিয়ে এত মত্ত হয়ে উঠেছিল যে, 'ঈদের নামায তারা কাযা করেছিল অর্ধ-রাত্রির কিছু পূর্বে।[২] ঠিক তেমনি ৬৪৪ হিজরীতে 'ঈদু'ল-আযহার দিনে বাগদাদের লোকেরা খলীফার

১. সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থ আল-হ'াওয়াদিছু'ল-জামি'আ এবং আল-মাসজিদু'ল-মাসবুক' দ্র.।

২. আল-হ'াওযাদিছু'ল-জামি'আ, ৬৪০ হিজরীর ঘটনাবলী।

রাজকীয় মিছিল দেখতে শহরের বাইরে বেরিয়েছিল এবং 'ঈদের সালাত তারা আদায় করেছিল ঠিক সূর্য অস্ত যাবার মুহূর্তে।

খলীফাকে অভিবাদন জানাতে ভুমি চুম্বনের সাধারণ রীতি তখন প্রচলিত ছিল। আস্তানা চুম্বন ও যমীনের ওপর নাক রেখে ষষ্ঠাঙ্গে প্রণিপাতের নিয়মও তখন চালু ছিল। সম্পত্তি ছিনিয়ে নেবার ঘটনা ছিল প্রচুর। ঘুষের বাজার ছিল গরম। বাতেনী, ঠগ ও জোচ্চোরদের তৎপরতা খুবই বেড়ে গিয়েছিল। নীতি ও নৈতিকতা-বিহীন কার্যকলাপ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। মন ভোলানো কার্যকলাপের ছিল বেজায় জোর। গান-বাজনার ছিল আধিক্য এবং সম্পদ আহরণ ও পুঞ্জীভূতকরণের প্রতি ছিল মানুষের মাত্রাতিরিক্ত ঝোঁক।[১]

এটা ছিল সেই যুগ যখন তাতারীরা ইরান ও তুর্কিস্তানকে তছনছ করে চলছিল, আর শিকারী পাখীর ন্যায় শ্যেন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল বাগদাদের দিকেও। ৬২৬ হিজরীর সূচনা সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনে কাছীর বলেন :

আয়্যূবী রাজবংশ (সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যূবীর বংশের সুলতানগণ) নিজেদের ভেতর গৃহযুদ্ধের সূচনা করে এই হিজরী সনকে স্বাগত জানায়। রাজধানী বাগদাদে বিশৃঙ্খল ও অরাজক অবস্থা এরূপ ছিল যে, ৬৪০ হি. পর্যন্ত প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী খলীফার পক্ষ থেকে হ'জ্জ-এর কোন ইন্তেজামই করা হয়নি; কা'বার গেলাফও বদলানো হয়নি। একুশ দিন পর্যন্ত বায়তুল্লাহ শরীফের দেওয়াল মাত্র একেবারে খোলামেলা ও নিরাবরণ থাকে। লোকেরা একে অশুভ 'আলামত হিসাবে ধরে নেয়।

৫৭৫ হিজরীতে আন-নাসির লি-দীনিল্লাহ খিলাফতের আসনে সমাসীন হন। তিনি ছেচল্লিশ বছরের অধিককাল একাদিক্রমে খিলাফত পরিচালনার সুযোগ পান। এত দীর্ঘকাল খিলাফত পরিচালনার সুযোগ অপর কোন 'আব্বাসী খলীফাই পাননি। কিন্তু তাঁর খেলাফত আমলই ছিল 'আব্বাসীয় খিলাফতের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক যুগ। ঐতিহাসিকগণ কঠোর ভাষায় তাঁর সমালোচনা করেছেন এবং তাঁর আমল-আখলাক তথা তাঁর কার্যকলাপ ও চরিত্রেরও নিন্দা করেছেন। ঐতিহাসিক ইবনে আছীর বলেন ঃ

জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল খুবই অত্যাচারমূলক। তাঁর যমানায় ইরাক একেবারে বিরান হয়ে যায়। রাষ্ট্রের অধিবাসীবৃন্দ বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন শহরে গিয়ে ভবঘুরে জীবন কাটাতে থাকে। তিনি তাদের সহায়-সম্পত্তি ছিনিয়ে নেন। তাঁর কার্যকলাপ ছিল পরস্পরবিরোধী। আজ এক কথা বলতেন

দ্র. 'আসরু'শ-শারাবী বি-বাগদাদ, নাজী মা'রূফ প্রণীত, আল-আক'লাম নামক রিসালা, বাগদাদ, মুহাররাম

তো কাল অন্য কথা। খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদের দিকেই ছিল তাঁর যত আকর্ষণ। তিনি যুবক ও সৈনিকদের জন্য এক বিশেষ ধরনের ইউনিফর্ম তৈরি করেছিলেন। কেবল এই ইউনিফর্মধারীদেরই পুরুষোচিত খেলাধূলা, সামরিক কুচকাওয়াজ ও যুদ্ধ মহড়ায় অংশ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হ'ত। এর ফলে পুরুষোচিত পারদর্শিতা ও সৈনিকবৃত্তি ইরাক থেকে বিদায় নেয়। খেলাধূলার প্রতি খলীফার অস্বাভাবিক আসক্তি সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়। ইরানীদের বর্ণনা এই যে, তিনিই সর্বাগ্রে তাতারীদেরকে মুসলিম রাজ্যগুলোর ওপর হামলা করবার প্ররোচনা দিয়েছিলেন[১] এবং এ ব্যাপারে তাদের নিকট পয়গাম পাঠিয়েছিলেন।[২]

৬২২ হিজরীতে আন-নাসির লি-দীনিল্লাহ্ মারা যান। মুস্তানসির বিল্লাহ (হি. ৬২৩-৬৪০) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।[৩] এই খলীফা ছিলেন বেশ দীনদার, পবিত্র স্বভাব, সৎ চরিত্র ও পরিচ্ছন্ন প্রকৃতির। এ ছাড়া আরও অনেক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী থাকায় তিনি ছিলেন একজন আদর্শ খলীফার প্রতিচ্ছবি। কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে, রাজ্যের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও সংস্কারের জন্য খুব বেশি সময় তিনি পাননি। ৬৪০ হিজরীতে তাঁর ইনতিকালের পর তৎপুত্র মুস্তা'সিম বিল্লাহ্ খলীফা হন। মুস্তা'সিম বিশুদ্ধ 'আকীদার অধিকারী, দীনদার ও সংযমী খলীফা ছিলেন। তিনি কখনো মদ কিংবা হারাম জাতীয় কোন কিছুর ধারে কাছেও যাননি। তিনি প্রতি মাসের সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং গোটা রজব মাসব্যাপী সিয়াম পালন করতেন। কুরআনের হাফেজ ছিলেন। সময়মত সালাত আদায়ের ব্যাপারে তিনি কঠোর নিয়ম মেনে চলতেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ইবনে আছীরের ভাষ্যানুযায়ী স্বভাবের দিক দিয়ে তিনি প্রয়োজনাতিরিক্ত কোমল ছিলেন এবং তাঁর মেধাও তত প্রখর ছিল না। ধন-সম্পদের বেলায়ও তিনি কিছুটা লোভী ও কৃপণ স্বভাবের ছিলেন।

৬৪২ হিজরীতে ইবনু'ল-'আলকামী 'আব্বাসী খিলাফতের উযীরে আজম নিযুক্ত হন।[৪] এ সময় থেকেই সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। ৬৫৫ হিজরীতে বাগদাদে শী'আ-সুন্নীর বিরাট দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ সময় শী'আদের বাড়ি-ঘর, এমন কি ইবনু'ল-'আলকামীর আত্মীয়-বান্ধবদের বাড়ি-ঘরও লুণ্ঠিত হয়।[৫] এসব ঘটনাদৃষ্টে তার মনে অশুভ কল্পনার ছায়াপাত ঘটা কিংবা প্রতিশো

১. খাওয়ারিয্ম সাম্রাজ্যের শক্তি গুঁড়িয়ে দেবার জন্য তিনিই তাতারীদের উস্কানি দিয়েছিলেন। খলীফার সঙ্গে সুলতানের সম্পর্কের অবনতিই এই উস্কানির কারণ।
২. কামিল, ১২শ খণ্ড, ১৮১ পৃ.।
৩. দ্র. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৩শ খণ্ড, ১৫৯ পৃ.।
৪. পূর্ণ নাম মুওয়ায়্যিদুদ্দীন আবূ তালিব মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন 'আলী মুহাম্মদ আল-'আলকামী।
৫. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৩শ খণ্ড, ১৯৬ পৃ.।

স্পৃহা জাগ্রত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। সে মুহূর্তে তাতারী বিপদ বাগদাদের প্রবেশ পথে তার আগমনী সংকেত দিচ্ছিল। একদিকে তাতারী সেনাবাহিনী বাগদাদ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল, অন্য দিকে উযীর ইবনু'ল- 'আলকামীর পরামর্শ ও নির্দেশে বাগদাদে সেনাবাহিনীর সংখ্যাশক্তি বিপুলভাবে হ্রাস করা হয়। এমন কি অশ্বারোহী বাহিনীর সদস্য সংখ্যাও দশ সহস্রে নামানো হয়। বাকী সৈন্যদেরকে বিদায় করে দেওয়া হয়। তাদের পদগুলো বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। ফলে ঐ সব সৈনিকের অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, তাদেরকে বাজারে ও মসজিদের দরজায় ভিক্ষা করে ফিরতে দেখা যায়। কবিগণ ইসলামের এই দুর্দশা-দৃষ্টে শোকগাথা রচনা করেন।[১] মুস্তা'সিম ব্যক্তিগতভাবে যদিও চরিত্রবান ও সৎ কল্পনার অধিকারী খলীফা ছিলেন এবং রাজ্যের ব্যাপক সংস্কার ও উন্নতির অভিলাষী ছিলেন, কিন্তু যুগের বিপর্যয়, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তিবর্গের নৈতিক অবক্ষয় ও বিকৃতি এতদূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল যে, তা রুখতে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে সংস্কার ও সংশোধনের নতুন প্রাণ-স্পন্দন সৃষ্টি করতে এমন একজন উৎসাহী মনোবলসম্পন্ন ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের দরকার ছিল যিনি সাধারণভাবে ইতিহাসে নতুন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও নবযুগের বিজেতা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছেন। ইতিহাসে এ জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা গেছে যে, অধিকাংশ রাজবংশের সর্বশেষ ব্যক্তি তথা পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যের শেষ শাসক ব্যক্তিসত্তার দিক দিয়ে কল্যাণের প্রতীক, সংস্কারপ্রিয় ও সৎ চরিত্রবানই ছিলেন, কিন্তু সে বংশের কিংবা সাম্রাজ্যের জীবনদায়িনী শক্তি এমনভাবে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল এবং বিপর্যয় ও অশান্তিকর অবস্থা বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, তখন আর সেটাকে তার স্বাভাবিক পরিণতি থেকে রক্ষা করার কোন পথই অবশিষ্ট ছিল না। তাই স্বাভাবিকভাবে কোন বংশ বা রাজত্বের পতনের ইতিহাসে সেই ব্যক্তির নামটাই লিখিত হয়েছে যিনি তাঁর অনেক পূর্বসূরীর চেয়ে উত্তম ছিলেন এবং যিনি প্রকৃতই সংস্কার ও সংশোধনের অভিলাষী ছিলেন।

বাগদাদে যদিও সংস্কারবাদীদের একটি দল জ্ঞান চর্চা, শিক্ষা দান ও 'ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল ছিলেন এবং কিছু আল্লাহ্‌র বান্দা মসজিদ ও খানকাহগুলোতে একাগ্র চিত্তে নির্জন বাস অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু শাসক ও বিত্তবানদের ভেতর অনাচার ও বিকৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল দারুণভাবে। সে যুগের একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক আবুল হাসান খাযরাজী তাঁর যুগে ইরাকের লোকদের যে অবস্থা ছিল

১. ঐ ৩০১ পৃ.;

তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

> জায়গীর জমিদারী ও সহায়-সম্পত্তি লাভের আগ্রহ প্রবলভাবে বেড়ে গেছে। সমাজ সংস্কার ও জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতি সৃষ্টি হয়েছে নিস্পৃহ ভাব। নাজায়েয ও অননুমোদিত পার্থিব বিষয়াদিতে লোকের মত্ততা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্রাজ্যের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জুলুম-নিপীড়নে বদ্ধপরিকর, সকলেই অধিকতর ধন-সম্পদ উপার্জনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

তিনি আরও বলেন :

> এ অবস্থা খুবই বিপজ্জনক। কেননা সাম্রাজ্য কুফরীর সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে, কিন্তু জুলুমের সঙ্গে নয়[১] অর্থাৎ জুলুম-নিপীড়ন সাম্রাজ্যের ত্বরিৎ পতন ডেকে আনে।

ওদিকে মুসলিম বিশ্বের পূর্বাংশে খাওয়ারিয্মশাহী নির্বিঘ্নে রাজত্ব করে চলছিল। সে সাম্রাজ্য ছিল খুবই প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী। হি. পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে সালজূকী সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর ঐ সাম্রাজ্যে গড়ে উঠেছিল। মিসর, শাম, ইরাক, হেজায ও উত্তর-পশ্চিমে এশিয়া মাইনরের সংক্ষিপ্ত সালজূকী এলাকা ও দক্ষিণ-পূর্বে ঘোরীদের নবোত্থিত সাম্রাজ্য বাদ দিলে প্রায় গোটা মুসলিম জগতই খাওয়ারিয্মশাহীর শাসনাধীন ছিল। এ বংশের সর্বাধিক উৎসাহী, মনোবলসম্পন্ন ও দিগ্‌বিজয়ী নৃপতি ছিলেন সুলতান 'আলাদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিয্ম শাহ (৫৯৪-৬১৭ হি.)। তিনি কেবল তাঁর যুগেরই সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম নৃপতি ছিলেন না, সম্ভবত সে যুগের সর্বাধিক শক্তিশালী সুলতানও ছিলেন। হ্যারল্ড ল্যাম্ব (ঔ.টিবঠ) তাঁর "চেঙ্গীয খান" নামক পুস্তকে ঠিকই লিখেছেন :

> মুসলিম বিশ্বের হৃৎপিণ্ডে সুলতান মুহাম্মদ খাওয়ারিয্ম শাহ্ আওরঙ্গশাহীর ওপর রণদেবতা সেজে বসেছিলেন। তাঁর রাজ্যসীমা ভারতবর্ষের সীমান্ত থেকে বাগদাদ এবং খাওয়ারিয্ম সমুদ্র (আরাল সাগর) থেকে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত ছিল বিস্তৃত। সালজূকী তুর্কী ভিন্ন, যারা ক্রুসেডারদের ওপর জয় লাভ করেছিল এবং মিসরের মামলূক সুলতানগণ ছাড়া– যারা উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির পথে ধাবিত হচ্ছিল, বাকি মুসলিম সাম্রাজ্যের ওপর সুলতান মুহাম্মদ খাওয়ারিয্ম শাহ পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মর্যাদার দিক দিয়ে সুলতান মুহাম্মদ ছিলেন রাজাধিরাজ (শাহানশাহ্)। 'আব্বাসী খলীফা নাসির লে-দীনিল্লাহ সুলতানের প্রতি নারায ছিলেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি তাঁর

---

১. বাগদাদের আল-আকলাম পত্রিকার হি. ১৩৮৬-র মুহাররাম সংখ্যার "আসরু'শ-শারাবী বি বাগদাদ' নিবন্ধ দ্র.।

শক্তির স্বীকৃতি দিতেন। বাগদাদের খলীফা পার্থিব সকল ক্ষমতা হারিয়ে রোমের পোপের ন্যায় কেবল ধর্মীয় নেতা হিসাবে কোনরূপে নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।[১]

আরব ঐতিহাসিকগণ 'আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিয্‌ম শাহ্‌র জীবন-চরিত্রে ও আচার-ব্যবহারে বড় রকমের কোন দুর্বলতা কিংবা ব্যক্তিগত দোষত্রুটি পাননি, বরং সকলেই তাঁর দীনদারী, সৎ নিয়ত, বীরত্ব ও দৃঢ়তার সাধারণ স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, তাঁর সকল যোগ্যতা ও শক্তিই সে সব ছোট-বড় সাম্রাজ্যকে নিঃশেষ করতে ব্যয়িত হয়েছে যেগুলো তাঁর বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্যের পূর্বাংশে ছিল। একদিকে উত্তর ও পশ্চিমে তিনি সালজূকীদেরকে তাদের শেষ সীমা পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য করেন, অপরদিকে পূর্ব ও দক্ষিণে তিনি ঘারীদের সঙ্গে নিরন্তর লড়াইয়ে ব্যাপৃত থাকেন এবং তাদেরকেও একটি সীমাবদ্ধ অংশে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করেন। ইরান ও তুর্কিস্তানের সামরিক কাঠামো এই অব্যাহত ও নিরন্তর যুদ্ধের কারণে ভেঙে পড়ে। প্রাকৃতিক ও মানবীয় সম্পদে সমৃদ্ধ ঐ রাষ্ট্রপুঞ্জের শহর ও পল্লীগুলোর ভাগ্যাকাশ অহরহ যুদ্ধের মেঘে ছেয়ে থাকত। বিজিত দেশের সম্পদ, উৎপাদিত দ্রব্য এবং সেই সাথে কারিগর ও শিল্পী এসে জড়ো হয়েছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের এই কেন্দ্রভূমিতে। তাই আধুনিক সংস্কৃতি তথা নগর সভ্যতার দ্রুত বিস্তৃতি ঘটেছিল এবং সেই সাথে সংগৃহীত হয়েছিল প্রাচুর্য, নেতৃত্ব ও বিজয়ের প্রয়োজনীয় উপাদান। সে যুগের সাংস্কৃতিক জীবনের নিষ্টকারিতার উল্লেখ সে সব ইতিহাসে পাওয়া দুষ্কর যে ইতিহাস কেবল রাজ-রাজড়া ও তাঁদের দরবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এসবের কিছু সন্ধান যদি পাওয়াও যায় তবে তা পাওয়া যাবে সূফী-দরবেশ, বুযুর্গ ও মহান সংস্কারকদের স্মারকলিপি (নোটবুক), বাণী সংকলন ও তাঁদের ওয়া'জ-নসীহতে যার বিরাট অংশই তাতারী প্লাবনে ভেসে গেছে। এ ক্ষেত্রে "চেঙ্গীয খান" গ্রন্থের লেখক খ্রিস্টান ঐতিহাসিক হ্যারল্ড ল্যাম্ব-এর বর্ণনা কেবল ধর্মীয় ঈর্ষাপ্রণোদিত ও অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

মুসলমানদের গোটা জগৎটাই ছিল লড়াই-সংঘর্ষের জগত, ছিল গান-বাজনা ও সুর সংযোজনার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। তারা এর ভাল সমঝদার ছিলেন। কিন্তু তাদের বাহ্যিক দিকের মত অভ্যন্তরীণ দিকেও এক উত্তেজনাকর অবস্থা সব সময় অনিবার্যভাবে বিরাজ করত। রাজা-বাদশাহদের স্থলে গোলাম ও মামলূক (মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস)-রাই রাজত্ব করত। ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের প্রতি তাদের

---

[১] চেঙ্গীয খান, ১৪৭ পৃ. মওলভী 'ইনায়েতুল্লাহ মরহুম কর্তৃক অনূদিত।

আগ্রহ ছিল প্রবল। নৈতিক ও চারিত্রিক বিচ্যুতি এবং রাষ্ট্রীয় মনোমুগ্ধকর বিষয়াবলীর কোন ঘাটতি ছিল না। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা এমন সব লোকের হাতে ছিল– প্রজাদের শোষণ ও লুণ্ঠনই ছিল যাদের একমাত্র কাজ। সম্ভ্রম-বিক্রেতার হাতে ছিল নারীর দেখাশোনার দায়িত্ব আর ঈমানের মালিক ছিলেন খোদা।[১]

এমতাবস্থায় খাওয়ারিয্‌ম শাহী সুলতানদের দ্বারাও সেই একই ধ্বংসাত্মক ভুল সংঘটিত হ'ল যে ভুল করেছিল স্পেনের আরব শাসকবৃন্দ এবং যে ভুল আল্লাহও ক্ষমা করেননি। সে ভুল হ'ল, তারা তাদের গোটা শক্তি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও সংহতকরণ এবং প্রতিপক্ষের দমনে ব্যয় করেছিল। যে সব মানব বসতি ছিল তাদের সীমান্ত সংলগ্ন এবং ছিল একট স্বয়ংসম্পূর্ণ জগত সেখানে ইসলামের প্রচার ও আল্লাহ্‌র এই শেষ পয়গাম পৌঁছুবার আদৌ কোন চিন্তাও তারা করেনি। ধর্মীয় আবেগ ও প্রেরণার কথা না হয় বাদই দিলাম, রাজনৈতিক কারণেও তো তারা এই বিস্তৃত মানব বসতিকে নিজেদের সমমনা ও একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী করে তুলতে পারত, যার ফলে তারা চিরদিনের তরে সেই বিপদের হাত থেকে নিরাপদ হয়ে যেত যা কেবল তাদের নয়, বরং গোটা মুসলিম সমাজের সামনে এসে দেখা দিয়েছিল।

এ রকম যুগ ও অবস্থার ভেতর তাতারীরা তাদের সর্দার ও নেতা চেঙ্গীয খানের[২] নেতৃত্বে খোদায়ী আযাব ও গযব হিসাবে মুসলিম জাহানের পূর্বাংশ ইরান ও তুর্কিস্তানের দিকে অগ্রসর হয়। এরপর বাগদাদের পালাও এসে যায় যার চিত্র ওপরের লাইনগুলোতে অংকিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ৬৫৬ হিজরীতে তারা এর প্রতিটি ইটও ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দেয়।

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّاتُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً - وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ *

তোমরা সেই বিপর্যয় ও দুর্যোগ থেকে সাবধান হও যা কেবল জালেমদেরই পাকড়াও করবে না; জেনে রেখ, আল্লাহ্ শাস্তি দানে বড় কঠোর।
–আল-কুরআন।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এর পেছনে যে কারণ ক্রিয়াশীল ছিল তা এই যে, চেঙ্গীয খান খাওয়ারিয্‌ম শাহকে বার্তা পাঠায়, আমিও বিস্তৃত এক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। এটাই

১. চেঙ্গীয খান– ১৪৩ পৃ. হ্যারল্ড ল্যাম্বকৃত ও মওলভী 'ইনায়েতুল্লাহ্ মরহুম অনূদিত।
২. চেঙ্গীয খানের রাজত্বের সূচনা হয় ৫৯৫ হি. থেকে। খাওয়ারিয্‌ম শাহ্‌র হুকুমতের ওপর প্রথম হামলা হয় ৬১৬ হিজরীতে। ৬২৪ হিজরীতে তার মৃত্যু হয়। অতঃপর তদীয় পুত্র ও পৌত্র তার উদ্দেশ্য পূরণ করে। তার পৌত্র হালাকু খানের নেতৃত্বে তাতারী ফৌজ ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদ আক্রমণ করে।

ভাল যে, আমরা উভয়ে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলি। আমাদের ব্যবসায়ী বণিককুল ভয়-ভীতিহীনভাবে ও নিঃশংক চিত্তে আপনার রাজ্যে যাবে এবং এখানকার উৎপন্নজাত বিশেষ দ্রব্যাদি ও মাল-সামান আপনার ওখানে বিক্রি করবে আর আপনার ব্যবসায়ীরাও পরম নিশ্চিন্তে আমাদের দেশে আসবে এবং ওখানকার মাল-সামান এখানে বিক্রি করবে। খাওয়ারিয্‌ম শাহ্ এ প্রস্তাব মঞ্জুর করেন এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য কাফেলা দ্বিধাহীনভাবে ও অসংকোচে একে অপরের দেশে যাতায়াত করতে থাকে। এরপর এমন কি ঘটল যার ফলে মুসলিম জগত আকস্মিকভাবে রক্তের সমুদ্রে নিমজ্জিত হ'ল? এর বিস্তারিত বিবরণ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের মুখ দিয়েই শোনা যাক– মুসলিম ঐতিহাসিকের বর্ণনায়ও এর সত্যতার সমর্থন মেলে।[১]

হ্যারল্‌ড ল্যাম্ব তাঁর "চেঙ্গীয খান" নামক গ্রন্থে বলেন :

কিন্তু যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক চেঙ্গীয খান কায়েম করেছিলেন তা অকস্মাৎ ছিন্ন হয়ে যায়। আর তা এভাবে যে, কারাকোরাম থেকে ব্যবসায়ীদের একটি কাফেলা পশ্চিমে আসছিল। পথিমধ্যে উত্‌রার শাসনকর্তা অনিলজুক কাফেলার সমস্ত লোক বন্দী করে এবং তার প্রভু খাওয়ারিয্‌ম শাহ্‌কে অবহিত করে যে, এই কাফেলার ভেতর গুপ্তচর রয়েছে। অনিলজুকের এ ধারণা ছিল একান্ত তারই বুদ্ধিপ্রসূত।

উতরার শাসকের কাছ থেকে এ সংবাদ আসতেই সুলতান মুহাম্মদ খাওয়ারিয্‌ম শাহ্ কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা না করেই কাফেলার সমস্ত বণিককেই হত্যার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ অনুসারে কারাকোরাম থেকে আগত সমস্ত বণিককেই হত্যা করা হয়। এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হতেই চেঙ্গীয খান এর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে একদল দূত পাঠান। সুলতান মুহাম্মদ এই দূতদলের সর্দারকেও হত্যা করেন এবং দলের অন্যান্য সদস্যের দাড়ি জ্বালিয়ে দেন। দূতদের মধ্যে যারা কোন রকমে জান বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল তারা চেঙ্গীয খানের নিকট ফিরে গিয়ে সকল ঘটনা বিবৃত করে। গোবি মরুভূমির অধিপতি অবস্থার এ বর্ণনা শ্রবণ মাত্রই একটি পাহাড়ে আরোহণ করেন যাতে একাকী গোটা বিষয়টির সকল দিক ভেবে দেখতে পারেন। মোগল দূত হত্যা ছিল এমন একটি অমার্জনীয় অপরাধ যা কোনরূপ শাস্তি দান ব্যতিরেকে এমনিতে ছেড়ে দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া– ১৩শ খণ্ড, ২০০-৪ পৃ; আল-কামিল, ইবনু'ল-আছীরকৃত, ১২শখণ্ড, ১৪৯ পৃ।

ছিল। এটি এমন একটি কর্ম ছিল যার বদলা নেওয়া মোগলদের অতীত ঐতিহ্য অনুসারেই অপরিহার্য ছিল।

চেঙ্গীয খান বলেন ঃ আসমানে যেমন দু'টো সূর্যের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, ঠিক তেমনি পৃথিবীর বুকে দু'জন খাকান (সম্রাট) থাকতে পারে না।[১]

তাতারী আক্রমণের আওতায় মুসলিম প্রাচ্য ভূখণ্ড

তাতারীরা প্রথমে বোখারাকে তাদের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করে এবং একে পরিণত করে ধ্বংসস্তূপে। শহরের একজন অধিবাসীও তাদের হাত থেকে জীবন বাঁচাতে পারেনি। এরপর সমরকন্দ শহরও মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয় এবং এর সমস্ত অধিবাসীকেই তলোয়ারের মুখে নিক্ষেপ করা হয়। মুসলিম বিশ্বের উল্লেখযোগ্য শহরগুলোর মধ্যে রে, হামদান, যুনজান, কুযভীন, মার্ভ, নিশাপুর ও খাওয়ারিয্‌ম একই ভাগ্য বরণ করে। ইসলামী বিশ্বের একমাত্র বাদশাহ ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সুলতান খাওয়ারিয্‌ম শাহ তাতারীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। তাতারীরাও তাঁর পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রাখে। শেষাবধি এক অজ্ঞাতনামা উপদ্বীপে তাঁর ইনতিকাল হয়।

খাওয়ারিয্‌ম শাহ ইরান ও তুর্কিস্তানের মুসলিম রাজ্য ও স্বায়ত্তশাসিত সরকারগুলোকে তাঁর বিশাল রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। অতএব, তাতারীদের মুকাবিলায় তিনি যখন পরাজিত হলেন তখন তাদের মুকাবিলা করবার মত প্রাচ্য ভূখণ্ডে আর কেউ রইল না। তাতারীদের ভয়ে মুসলমানরা এত বেশি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, একজন তাতারীও যে গলিতে ঢুকেছে, সেখানে এক শ' জন মুসলমান থাকলেও তাদের ভেতর একজনেরও সাহস হয়নি তার সম্মুখীন হবার। সে একে একে সবাইকে হত্যা করেছে। তার প্রতি কেউ হাত পর্যন্ত তোলেনি। কোন এক তাতারী মহিলা পুরুষের বেশে কোন ঘরে প্রবেশ করেছে এবং একাকী ঘরের সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেছে। এরপর তার সঙ্গী একজন কয়েদী টের পেয়েছে যে, লোকটি পুরুষবেশী একজন মহিলা, তখন সে তাকে হত্যা করেছে। এমনও দেখা গেছে যে, একজন তাতারী কোন মুসলমানকে গ্রেফতার করেছে। এরপর সে মুসলমান বন্দীকে বলেছে ঃ তোর মাথাটা পাথরের ওপর রাখ, আমার তলোয়ারটা আমি নিয়ে আসি, তারপর তোকে জবাই করব। মুসলমান বিবশ অবস্থায় পড়ে থেকেছে, পালাবার কথা একবারও তার মনে জাগেনি। তাতারী শহরে গিয়ে তার তলোয়ার নিয়ে এসেছে, তারপর মুসলমানকে

১. চেঙ্গীয খান, ১৪৩ পৃ. হ্যারল্ড ল্যাম্বকৃত।

জবাই করেছে।[১]

তাতারী আক্রমণ ছিল মুসলিম জগতের ওপর আল্লাহ্র গযব। এর ফলে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি লোমকূপ ফুলে উঠেছিল। মুসলমানরা ছিল হত-বিহ্বল। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্রই সন্ত্রাস ও হতাশা বিরাজ করছিল। তাতারীদেরকে মনে করা হ'ত এমন এক বিপদ যার থেকে কোন রেহাই নেই। তাদের মুকাবিলা করা যায় এবং তাদেরকে পরাজিত করা যায় এ ছিল এক অসম্ভব কল্পনা, এমন কি তাদের সম্পর্কে এ কথা প্রবাদ বাক্যের মত তখন ছড়িয়ে পড়েছিল, اذا قيل لك ان التترا انهزموا فلا تصدق অর্থাৎ "কেউ যদি তোমাকে বলে যে, তাতারীরা পরাজিত হয়েছে, তাহলে তুমি তা বিশ্বাস করবে না।" যে শহর কিংবা যে দেশের দিকেই তাদের গতি পরিবর্তিত হ'ত, ধরে নেওয়া হ'ত যে, ঐ শহর বা সেই দেশের দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এসেছে। জান-মাল, 'ইয্যত-আবরু, মসজিদ-মাদরাসা কোন কিছুই নিরাপদ ছিল না তাদের হাত থেকে। তাতারীদের বিশেষ কোন দিক কিংবা বিশেষ কোন অভিমুখে ধাবিত হবার অর্থই ছিল ধ্বংসযজ্ঞ, ব্যাঁপক হত্যাকাণ্ড, যিল্লতি ও সম্ভ্রম হানি। একবার প্রায় গোটা মুসলিম জগতই (বিশেষ করে তার পূর্বাংশ) এই বিশ্ব দহনকারী ফেতনার গ্রাসে পরিণত হয়েছিল। ঐতিহাসিক সব ধরনের ঘটনা অধ্যয়ন করেন এবং তা লিপিবদ্ধও করেন। পৃথিবীর জাতিগোষ্ঠীর ও রাষ্ট্রপুঞ্জের ধ্বংসের এত সব দৃশ্য তার চোখের সামনে দিয়ে গুযরে যায় যে, তা দেখার পর তার প্রকৃতি অনুভূতি শূন্য এবং তার লেখনী নির্মম ও নির্দয় হয়ে যায়। কিন্তু এ ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে ইবনে আছীরের মত ঐতিহাসিকও (যিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাস লিখেছেন) তাঁর মনের অবস্থা প্রচ্ছন্ন রাখতে পারেননি। তিনি লিখেছেন :

> এই দুযোর্গ ও দুর্বিপাক এত ভয়াবহ ও অসহনীয় ছিল যে, কয়েক বছর যাবত আমি দো-টানার মধ্যে ছিলাম এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করব কি না। এখনও যে করছি তাও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সাথে করছি। ইসলাম ও মুসলমানদের মৃত্যু খবর শোনানো কার পক্ষেই-বা সহজ, আর এতখানি বুকের পাটাই-বা কার আছে যে, তাদের যিল্লতী ও লাঞ্ছনার কাহিনী শোনাবে? হায়! আমি যদি জন্মগ্রহণ না করতাম। হায়! আমি যদি এর পূর্বেই মারা যেতাম, হারিয়ে যেতাম বিস্মৃতির অতলে। এতদ্‌সত্ত্বেও আমার কতক দোস্ত আমাকে এ ঘটনা লিখতে উদ্বুদ্ধ করেন। এরপরও আমি দ্বিধান্বিত ছিলাম। কিন্তু আমি দেখলাম

১. বিস্তারিত জানতে হলে দ্র. "আল-কামিল" (ইব্‌নে আছীরকৃত), ১২শ খণ্ড ও দাইরাতু'ল-মা'আরিফ (বুস্তানীকৃত), ৬ষ্ঠ খণ্ড, তাতার শিরো.।

এটা না লেখার মধ্যেও কোন ফায়দা নেই। এ এমনই এক দুর্ঘটনা এবং এমনই এক মুসীবত যে, দুনিয়ার ইতিহাসে এর কোন নজীর পাওয়া যাবে না। এ ঘটনার সম্পর্ক গোটা মানব সমাজের সঙ্গে। যদি কেউ দাবি করে যে, আদম (আ)-এর পর থেকে আজ অবধি দুনিয়ার বুকে এ ধরনের নির্দয় ঘটনা আর একটিও ঘটেনি তাহলে আর এ দাবি ভুল হবে না। আর তা এজন্য যে, ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনার সমপাল্লার কোন ঘটনার সন্ধানই পাওয়া যায় না। দুনিয়া কেয়ামত পর্যন্ত (ইয়াজূজ-মা'জূজ ভিন্ন) কখনো যেন এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ না করে। ঐসব বর্বর পশু কারোর প্রতি এতটুকু দয়া-মায়া কিংবা কৃপা দেখায় নি। তারা নারী-পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করেছে, মহিলাদের পেট চিরেছে এবং গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করেছে। লা হ'াওলা ওয়ালা কু'ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি'ল-'আলিয়্যি'ল-'আজ'ীম। এ দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা ছিল যেন বিশ্বগ্রাসী! মহাপ্লাবন আকারে এটি দেখা দেয় এবং দেখতে দেখতেই তা গোটা পৃথিবীটাই যেন ছেয়ে ফেলে।[১]

কেবল একা মুসলিম জাহানই নয়, সে যুগের গোটা সভ্য জগতই তাতারী হামলায় কেঁপে উঠেছিল। যেখানে তাদের পৌঁছুবার সম্ভাবনা কম ছিল সেখানেও ভীতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক গীবন তাঁর Decline and fall of the Roman empire নামক বিখ্যাত ইতিহাস-পুস্তকে লিখেছেন ঃ

সুইডেনের অধিবাসীরা রাশিয়ানদের মারফত তাতারী ঝঞ্ঝার খবর শুনে এতটাই ভীত হয়ে পড়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত তাতারীদের ভয়ে তারা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস পরিত্যাগ করে ইংল্যান্ডের সমুদ্রোপকূলে মৎস্য শিকার বন্ধ করে দিয়েছিল।

Cambridge History of Medieval Age নামক গ্রন্থের লেখকগণ মোগলদের এই ভীষণ সংঘর্ষকে– যার নেতা ছিলেন চেঙ্গীয খান– অত্যন্ত সুন্দররূপে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন :

মোগলদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা ছিল মনুষ্য-শক্তিবহির্ভূত। মরু প্রান্তরের সমস্ত বাধা-বিপত্তি তাদের কাছে হার মানে। পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সমুদ্র ও আবহাওয়াগত প্রতিবন্ধকতা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী কিছুই তাদের যাত্রা পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি। যে কোন ধরনের ভয়ভীতি থেকে তারা ছিল মুক্ত। কোন দুর্গই তাদের আক্রমণের মুখে টিকতে পারত না। নিপীড়িত ও মজলুম কোন আদম-সন্তানের ফরিয়াদই তাদের হৃদয়ে দাগ কাটত না। ... পৃথিবীর

১. আল-কামিল (ইবনে আছ'ীর, মৃত্যু ৬৩৮ হি.), ১২শ খণ্ড, ১৪৭-৪৮ পৃ.।

ইতিহাসে এই নবোদ্ভূত শক্তির আবির্ভাব অর্থাৎ এক ও একক ব্যক্তির এই প্রতিপত্তি যা সমগ্র জাতির সভ্যতাও সংস্কৃতিকেই বদলে দেয়– চেঙ্গীয খান থেকে শুরু হয় এবং তার পুত্র কুবলাই খানে গিয়ে শেষ হয়। কুবলাই খানের যুগেই মোগলদের সুরক্ষিত বিস্তৃত সাম্রাজ্য খণ্ডিত ও বিভক্ত হবার আলামত প্রকাশ পেতে শুরু করে।[১]

বাগদাদ ধ্বংস

শেষ পর্যন্ত এই বন্য ও বর্বর জাতিগোষ্ঠী মুসলিম জাহানকে পদানত করতে করতে, রক্তের বন্যা বহাতে বহাতে এবং সর্বত্র আগুন লাগাতে লাগাতে ৬৫৬ হিজরীতে চেঙ্গীয খানের পৌত্র হালাকূ খানের নেতৃত্বাধীনে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের রাজধানী এবং সে যুগের সর্ববৃহৎ শিক্ষা-সভ্যতার কেন্দ্র বাগদাদে প্রবেশ করে এবং তার অস্তিত্ব লণ্ডভণ্ড করে দেয়। বাগদাদের ধ্বংস ও মুসলমানদের ব্যাপক গণহত্যার বিবরণ অত্যন্ত হৃদয়বিদারক, খুবই করুণ ও বেদনাদায়ক। এর কিছুটা পরিমাপ করা যাবে ঐসব ঐতিহাসিকের বিবরণ থেকে যাঁরা এই দুর্যোগ ও দুর্ঘটনার আলামত নিজেদের চোখে দেখেছেন কিংবা যাঁরা এর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তাঁদের কাছ থেকে শুনেছেন। ঐতিহাসিক ইবনে কাছীর লিখেছেন :

> চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাগদাদে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসের রাজত্ব চলে। ফলে তৎকালীন বিশ্বের গৌরবোজ্জ্বল ও জমজমাট এই শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। মাত্র গুটি কয়েক লোকই সেখানে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। বাজার ও পথ-ঘাটগুলো ছিল মানুষের লাশে পূর্ণ। লাশের এক একটি স্তূপ ছোটখাটো একটি টিলার আকৃতি ধারণ করেছিল। এসব লাশের ওপর বৃষ্টিপাত হলে তা (ফুলে) আরও বীভৎস আকার ধারণ করে। গোটা শহর-ভর্তি গলিত শবের গন্ধে এলাকার আবহাওয়াই দূষিত হয়ে পড়ে। ফলে চতুর্দিকে মহামারী শুরু হয়। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সিরিয়া (শাম) পর্যন্ত পৌঁছে। মহামারীর কারণেও আরও বহু লোক মারা যায়। মোট কথা, বাগদাদে তখন দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ধ্বংস—এই তিনের রাজত্ব চলছিল।[২]

শায়খ তাজুদ্দীন সুবকী বলেন :

> হালাকূ খান একটি তাঁবুতে বাগদাদের খলীফা (মুস্তা'সিম)-কে তলব করেন এবং উযীর ইবনু'ল-'আলকামী, 'উলামা-ই-কিরাম ও শহরের গণ্যমান্য ও

১. "চেঙ্গীয খান" নামক পুস্তক থেকে উদ্ধৃত–২৬৬ পৃ.।
২. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া–১৩শ খণ্ড, ২০২-৩ পৃ.।

সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে দা'ওয়াত দেন যেন তারা খলীফা ও হালাকূ খানের মধ্যে সম্পাদিত সন্ধিতে সাক্ষী হন। কিন্তু সেখানে গিয়ে পৌঁছুতেই তাঁদের সবাইকে তলোয়ারের মুখে নিক্ষেপ করা হয়। এভাবে এক দলের পর অন্য দলকে ডেকে পাঠিয়ে পর্যায়ক্রমে হত্যা করা হয়। অতঃপর খলীফার বিশ্বস্ত সভাসদ ও নিকটস্থ লোকদের ডেকে পাঠানো হয় এবং তাদেরকেও হত্যা করা হয়। খলীফার সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রসিদ্ধি ছিল যে, তাঁর রক্ত মাটিতে ঝরলে বিরাট কোন বিপদ কিংবা দুর্যোগ দেখা দেবে। হালাকূ খান দ্বিধান্বিত ছিলেন। নাসীরুদ্দীন তূসী [১] এ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসে। সে বলে ঃ এ তেমন কঠিন কাজ নয়। খলীফার রক্তপাত না ঘটিয়েও তো অন্য কোনভাবে তাঁর জীবন ছিনিয়ে নেওয়া যায়। অনন্তর তাঁকে বিছানার ওপর শুইয়ে দেওয়া হয় এবং পদাঘাতে পদাঘাতে তাঁর জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়া হয়।

বাগদাদে মাসাধিক কাল ধরে নরহত্যা চলে। যে দু'-চারজন এদিক-সেদিক আত্মগোপন করেছিল কেবল তারাই জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়। কথিত আছে যে, হালাকূ খানের সংগৃহীত পরিসংখ্যান অনুযায়ী নিহতের সংখ্যা ছিল ১৮ লাখ। [২]

---

১. একজন ইরানী মনীষী কর্তৃক লিখিত ইতিহাস "আখবার ও আছার-ই-খাজা নাসীরুদ্দীন তূসী"—তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত—থেকেও এ সমর্থিত হয়। উক্ত লেখক খলীফা হত্যার ব্যাপারে নাসীরুদ্দীন তূসীকেই দায়ী করেছেন।

তূসীর সর্ববৃহৎ যে রাজনৈতিক চাল শেষাবধি সফল হয়েছিল তা ছিল, হালাকূ খানকে 'আব্বাসী সাম্রাজ্য উৎখাতের জন্য উস্কানি দেওয়া এবং খলীফার প্রাসাদ ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। হালাকূ নিজেও তদীয় ভ্রাতা মংকূ কা'আনের পক্ষ থেকে, বাতেনীদের নির্মূল করবার পর, 'আব্বাসী খেলাফত উৎসাদনের নিমিত্ত আদিষ্ট ছিলেন। বাগদাদের খলীফা মুস্তা'সিমকে হালাকূ খানের আনুগত্য স্বীকারের জন্য নির্দেশ পাঠানো হয়। পত্র বিনিময় চলতে থাকে। কিন্তু ফলাফল থাকে অনিশ্চিত। এরপর হালাকূ খা তার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে পরামর্শ বৈঠকে মিলিত হন। মোগলেরা নক্ষত্রের রাশিচক্রে খুবই বিশ্বাসী ছিল। দরবারে হুসসামুদ্দীন নামে একজন সুন্নী গণক অভিমত রাখেন, "বাগদাদ আক্রমণের জন্য এ মুহূর্তটি খুবই অশুভ। কেননা যখনই কোন বাদশাহ খেলাফতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে তখনই তাকে কোন না কোন বিপদে আক্রান্ত হতে হয়েছে। আপনি যদি হামলা করেন তাহলে বৃষ্টি বন্ধ হবে, তুফান ও ভূমিকম্প শুরু হবে এবং জগত বিরান হয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা, বাদশাহ (মংকূ কা'আন) মারা যাবেন।" এতদশ্রবণে হালাকূ চিন্তিত হয়ে পড়েন। হালাকূ এরপর তূসীর অভিমত জানতে চান اگر ببغداد حمله کنیم عاقبت چه خواهد شد। তূসী উত্তরে জানায় : چیزے نخواهد شد جزاینکه بجائے خلیفه خان خواهد بود হালাকূ উভয়ের মধ্যে বিতর্কের ব্যব'া করেন। তূসী বলে ঃ হাযার হাযার সাহাবা শহীদ হয়েছেন, কিন্তু কোন দুর্যোগ আসেনি। এ যদি 'আব্বাসীদেরই বৈশিষ্ট্য হয় তাহলে তাহিরের দিকে দেখ, সে মামূনের নির্দেশে তৎকালীন খলীফা আমীনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং তাঁকে হত্যা করে। খলীফা মুতাওয়াক্কিলকে তাঁরই সন্তান ও ক্রীতদাসেরা একজোট হয়ে হত্যা করে। মুনতাসির ও মু'তাদিদকে আমীর-উমারা ও ক্রীতদাসেরা খতম করে। কিন্তু কই, তুফান কিংবা ভূমিকম্প তো হয়নি (এরপর হুসসামুদ্দীন নিরুত্তর হয়ে যান)।

২. ২৫ লক্ষ অধিবাসীর ভেতর এ অতিরঞ্জিত কিছু নয়। কতক ঐতিহাসিক এ সংখ্যা আরও কম বলে উল্লেখ করেছেন।

খৃষ্টানদের প্রকাশ্যে মদ্য পান ও শুকরের মাংস ভক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও রমযান মাস ছিল তথাপি মুসলমানদেরকেও এতে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। মসজিদের ভেতর মদের পিপা উজাড় করা হয়। আযান নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এ ছিল সেই বাগদাদ যা আবাদ করার পর থেকে কখনো দারু'ল-কুফ্র (কাফিরদের আবাস'ল)-এ পরিণত হয়নি। এবার সেখানে এমন ঘটনা ঘটল যার নজীর কোন ইতিহাসে নেই। –তাবাক'াতু'স-শাফি'ঈয়্যাতু'ল-কুবরা, ৫ম খণ্ড, ১১৪-১৫ পৃষ্ঠা।

হাযারো খারাপ দিকে থাকলেও বাগদাদ ছিল তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ শহর, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতির পীঠস্থান, 'আলিম-'উলামা ও জ্ঞানী-গুণীদের আবাসস্থল এবং সর্বোপরি খেলাফতের রাজধানী। তাই সঙ্গত কারণেই এটা ছিল মুসলমানদের 'ইযযত-আবরূর রক্ষক, ছিল মান-সম্ভ্রমের বস্তু। তাই এর ধ্বংস মুসলমানদের অনুভূতিতে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। চতুর্দিকে নেমে আসে শোকের ছায়া। শায়খ সা'দী (র)–যিনি এককালে বাগদাদের ছাত্র ছিলেন এবং সেখানকার জাঁকজমক স্বচক্ষে দেখেছিলেন,এ উপলক্ষে একটি মর্মস্পর্শী মর্ছিয়া (শোকগাথা) রচনা করেন যা ছিল সে যুগের সমস্ত মুসলমানের অন্তরেরই প্রতিধ্বনি– এর কতিপয় পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল।

آسماں راحق بود گرخوں ببارد برزمین
برزوال ملك مستعصم امیر المؤمنین
اے محمد صـ گر قیامت می برآری سرزخاك
سر برآور دین قیامت درمیاں خلق بین
نازنینان حرم را خوں خلق نازنین
زاستان بگزشت وما را خون دل آراستیں
زینها راز دور گیتی وانقلاب روزگار
در خیال کس نگشتی کانچناں گردد چنیں
دیده بردارائے که دیدی شوکت بیت الحرام
قیصراں روم سر برخاك وخاقاں بر زمین
خون فرزندان عم مصطفی صـ شد ریخته
هم برآں خاکے که سلطاناں نهادندے جبیں
دجله خونا بست زیں پس گرنهد سر بر نشست
خاك نخلستان بطحا راکند باخون عجیں
روے دریا درهم آمد زیں حدیث هولناك

می تواں دانست بررویش زیرج افتادہ چیں
نوحه لائق نیست برخاك شهید اں زانکه هست
کمتریں دولت مر ایشاں رابهشت برتریں
لیکن ازروے مسلمانی وراہ مرحمت
مهربان را دل بسوزد در فراق نازنین

"আসমান এ অধিকার পেয়েছে যে, সে আমীরু'ল-মু'মিনীন মুস্তা'সিম বিল্লাহ্‌র হুকুমতের অবসানে যমীনের ওপর রক্ত বৃষ্টি ঝরাবে।

"হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি যখন কেয়ামতের দিন মাটি থেকে মস্তক ওঠাবেন তখন তা আর একটু উঠিয়ে– গোটা সৃষ্টি জগতে ইতিমধ্যে যে কেয়ামত ঘটে গেছে– তাও দেখবেন।

"প্রিয় সৃষ্টি জগতের পবিত্র রক্ত প্রিয় লোকদের আস্তান থেকে অতিক্রম করেছে আর এই ঘটনা আমাদের কলিজার তপ্ত খুনকে রঞ্জিত করেছে।

"যুগের এই বিপ্লব ও কালের এই বিবর্তন সম্পর্কে সাবধান! কারোর ধারণাও ঠাঁই পাইনি যে, ওরূপ জিনিষ এরূপ হয়ে যাবে।

"ওহে! যারা কখনো কখনো বায়তু'ল-হারামের শান-শওকত দেখেছ, একটু চোখ তুলে দেখ, রোম ও পারস্যের সুলতানদের মস্তক ধূলি-ধূসরিত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে।

"মোস্তফা (সা)-এর চাচার বংশধরদের রক্ত ঝরানো হয়েছে, এমন মাটিতে যার ওপর বড় বড় বাদশাহ্ তাদের মস্তক অবনমিত করত।

"দজলা (টাইগ্রীস) নদী রক্তে পরিপূর্ণ; এরপর যদি আবার মাথা ওঠায় তাহলে মক্কার খেজুর বাগানের মাটিকে রক্ত দ্বারা খামীর বানাবে।

"এই ভয়াবহ কথায় নদীর চেহারা বিগড়ে গেছে। সে জানতে পেরেছে যে, তার চেহারার ওপর আসমানী বিপদের কারণে ভাঁজ পড়ে গেছে।

"শহীদদের কবরের ওপর আমাদের গাওয়া শোকগাথা ও বিলাপ তাদের মর্যাদার উপযোগী নয়; কেননা বিরাট বড় বেহেশ্‌তও তাঁদের সম্পদের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।

"কিন্তু ঐসব প্রিয় শহীদের বিচ্ছেদের কারণে প্রত্যেক হৃদয়বানের দিলই ইসলামের সম্পর্ক, স্নেহ-মমতা ও করুণায় কাঁদতে থাকবে।"[১]

বাগদাদের পর তাতারীরা হলব (আলেপ্পো) অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং ইব্‌নে কাছীরের বর্ণনা অনুযায়ী সেখানেও বাগদাদের ন্যায় আচরণ করে। সেখান থেকে

---

১. কুল্লিয়াত-ই-সা'দী, ৫৬ পৃ.।

তারা দামিশকের দিকে অগ্রসর হয় এবং জুমাদাল-উলাতে (৬৫৮ হি.) তা দখল করে নেয়। শহরের খ্রিস্টান অধিবাসীরা শহরের বাইরে গিয়ে বিজয়ী তাতারীদের অভ্যর্থনা জানায় এবং তাদেরকে নানা রকম উপঢৌকন পেশ করে। তারা তাতারী শাসকদের কাছ থেকে ফরমান নিয়ে আসে এবং বিজয়ী বেশে শহরে প্রবেশ করে। ইব্‌নে কাছীর, যিনি নিজেই দামিশকের অধিবাসী ছিলেন– উক্ত ঘটনার ছবি আঁকতে গিয়ে যা বলেছেন তা থেকে মুসলমানদের অসহায় অবস্থা ও লাঞ্ছনার পরিমাপ করা যাবে :

> খৃস্টানরা তুমা দরজা দিয়ে প্রবেশ করে। তারা তাদের মাথার ওপর ক্রস কাষ্ঠ তুলে ধরে উচ্চৈঃস্বরে শ্লোগান দিচ্ছিল ঃ ঈসা মসীহ্‌র সত্য ধর্ম আজ বিজয়ী। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের পরিষ্কার ও খোলাখুলিভাবে নিন্দা করছিল। তাদের হাতে ছিল মদের পাত্র। তারা যে মসজিদের পাশ দিয়েই যাচ্ছিল তার আশপাশে মদ ছিটাচ্ছিল। কিছু বোতল থেকে তারা লোকের চোখ-মুখে ও পরিহিত কাপড়েও মদ ছিটিয়ে দিচ্ছিল। অলি-গলি কিংবা হাট-বাজার দিয়ে যে লোকই অতিক্রম করত, অমনি তাকে নির্দেশ দেওয়া হ'ত দাঁড়িয়ে ক্রস কাষ্ঠকে সম্মান জানাতে। মুসলমানরা এ অবস্থা দৃষ্টে একত্র হয় এবং তাদেরকে ধাক্কিয়ে মেরীর গির্জা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। সেখানে খ্রিস্টান বক্তারা দাঁড়িয়ে খ্রিস্ট ধর্মের প্রশংসায় বক্তৃতা দেয় এবং ইসলাম ও মুসলমানদের নিন্দা জ্ঞাপন করে।

ইবনে কাছীর সম্মুখে গিয়ে "যায়লু'ল-মির'আত" গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন ঃ

> খ্রিস্টানেরা মদের পাত্র হাতে দামিশকের জামে' মসজিদে প্রবেশ করে। তাদের অভিপ্রায় ছিল, তাতারীদের আধিক্য লক্ষ্য করা গেলে অনেকগুলো মসজিদ তারা এই সুযোগে ধ্বংস করে দেবে। শহরে এসব ঘটতে দেখে মুসলমানেরা কাযী, 'আলিম-'উলামা ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে একত্রে দুর্গে গিয়ে তাতারী শাসক ও দুর্গাধিপতি 'ঈল-সিয়ানে'র নিকট অভিযোগ দায়ের করে। মুসলমানদের এ অভিযোগের প্রতিকার করা তো দূরে থাক, অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়। অপরদিকে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে খ্রিস্টান নেতৃবর্গের বক্তব্য শ্রবণ করা হয়। –ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজি'উন।[১]

সিরিয়া (শাম) দখলের পর তাতারীদের লক্ষ্য স্বাভাবিকভাবেই মিসরের দিকেই ছিল। আর মিসরই ছিল একমাত্র দেশ যা তাতারীদের ধ্বংসযজ্ঞের হাত

---

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৩শ খণ্ড, ২১৯-২০ পৃ.।

থেকে রক্ষা পেয়েছিল। মিসরের সুলতান আল-মালিকু'ল-মুজাফফার সায়ফুদ্দীন কুতুয পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন যে, এবার নির্ঘাত মিসরের পালা। তাতারীরা যদি আগে-ভাগেই তার ওপর চড়াও হয়ে বসে তাহলে দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে এবং স্বাধীনতা রক্ষা কষ্টকর হবে। অতএব, মিসরের অভ্যন্তরে থেকে আত্মরক্ষার পরিবর্তে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শামে (সিরিয়ায়) তাতারীদের ওপর আক্রমণাত্মক হামলা পরিচালনা করাকেই তিনি সমীচীন মনে করেন। অনন্তর ৬৫৮ হিজরীর পবিত্র মাহে রমযানের ২৫ তারিখে 'আয়ন-ই জালূত নামক স্থানে তাতারীদের সঙ্গে মিসরের মুসলিম ফৌজের তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার বিপরীত এ যুদ্ধে তাতারীদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে। ফৌজ পলায়নরত তাতারীদের পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রাখে এবং ব্যাপকহারে তাদের কচু কাটা করে। বিরাট সংখ্যক তাতারী মুসলমানদের হাতে বন্দীও হয়।

সুয়ূতী "তারীখু'ল-খুলাফা" নামক গ্রন্থে বলেন :

তাতারীরা অপমানকর পরাজয় বরণ করে। আল্লাহ্‌র ফযল ও করমে মুসলমানরা তাদের ওপর জয়ী হয়, তাতারীরা ব্যাপকভাবে নিহত হয়। তাদের দিশেহারা হয়ে পালাতে দেখে মুসলমানদের মনোবল ফিরে আসে। তারা খুব সহজেই তাদেরকে পাকড়াও করে তাদের সর্বস্ব ছিনিয়ে নেয়।

'আয়ন-ই-জালূত যুদ্ধের পর সুলতান আল-মালিকু'জ-জাহির বায়বার্স তাতারীদের কয়েকবার উপর্যুপরি পরাজিত করেন এবং গোটা সিরিয়া (শাম) এলাকা থেকে তাদের উৎখাত ও বহিষ্কৃত করেন। এভাবে "তাতারীদের পরাজয় অসম্ভব"– এই প্রবাদ বাক্য মিথ্যায় পর্যবসিত হয়।১

তাতারীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার

সমগ্র মুসলিম জাহান ঐ প্রলয়ঙ্করী সয়লাবে ভেসে যাবে, এ ধরনের আশংকাই ব্যক্ত করেছিলেন তৎকালীন দূরদর্শী ও সংবেদনশীল মুসলিম লেখকবৃন্দ। ইসলামের নাম-নিশানাটুকুও মুছে যাবার উপক্রম হয়েছিল। ঠিক এমনি মুহূর্তে সহসা তাতারীদের মধ্যে ইসলামের প্রচার কার্য শুরু হয় এবং যে কাজ মুসলমানদের তলোয়ার ও মুসলিম বাদশাহদের পরাক্রম আনজাম দিতে পারেনি সে কাজটিই সম্পাদন করলেন ইসলামের দা'ঈ ও আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাগণ। দেখা গেল, ইসলাম তাঁর খুন-পিয়াসী তাতারীদের অন্তরেই বাসা বাঁধতে শুরু করেছে। এই অজেয় জাতিগোষ্ঠীর ও মুসলিম বিজয়ী শক্তির ইসলামের হাতে বন্দী

১. তারীখু'ল-খুলাফা, ১৯১ পৃ. মিসর থেকে প্রকাশিত।

হওয়া ও পরাজয় বরণ করাটা যতটা বিস্ময়কর, এক বছরের মধ্যে বিদ্যুত চমকের মত বিস্তৃত মুসলিম সাম্রাজ্যের ওপর তাদের ছেয়ে যাওয়া এবং মুসলিম জাহানকে তলোয়ারের শক্তিতে জয় করা মনে করি ততটা বিস্ময়কর নয়, এজন্য যে, হি. সপ্তম শতাব্দীর মুসলিম জাহান সে সব রোগ-ব্যাধি ও দুর্বলতার শিকার ছিল যা সাধারণত সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরম উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করবার পর পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভেতর জন্ম নেয় এবং সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীকে ভেতর থেকে ফোখলা করে ছাড়ে। অপরদিকে তাতারীরা ছিল প্রাণবন্ত, পরিশ্রমী, যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত, খুন-পিয়াসী ও রক্তলোলুপ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্বীয় উত্থানের চরম মার্গে অবস্থানকালে এই অর্ধ-বন্য জাতিগোষ্ঠী তাদেরই হাতে বিজিত ও অসহায় মুসলমানদের ধর্মে দীক্ষা নিল যারা সর্বপ্রকার বস্তুগত ও রাজনৈতিক শক্তি খুইয়ে বসেছিল এবং যাদেরকে তারা (তাতারীরা) খুবই অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখে দেখত। অধ্যাপক টি. ডব্লিউ. আর্নল্ড তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "Preaching of Islam"-এ এ সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন :

> কিন্তু ইসলাম তার অতীত শান-শওকতের ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে আবার মাথা তুলে দাঁড়াল এবং ইসলামের প্রচারক দল সেই বন্য মোগলদেরকে যারা মুসলমানদের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চালাতে চেষ্টার এতটুকু কসুর করেনি– মুসলমান বানিয়ে নিল। এটি এমন একটি কাজ ছিল যা করতে গিয়ে মুসলমানদের ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কেননা তৎকালে আরও দু'টো ধর্ম (বৌদ্ধ ও খ্রিস্ট) মোগল ও তাতারীদেরকে তাদের ভক্তে ও অনুরক্তে পরিণত করতে সচেষ্ট ছিল। আর সে অবস্থাটাও খুবই বিস্ময়কর যে, যে সময়ে বৌদ্ধ, খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্ম প্রতিটিই সম্ভবত এই অত্যাচারী ও বন্য মোগলদেরকে নিজ নিজ আনুগত্যাধীনে টেনে আনবার চেষ্টায় নিয়োজিত ছিল যারা এই তিন ধর্মের অনুসারীদেরকেই পাইকারীভাবে হত্যা করেছিল, ইসলাম আপন পক্ষপুটে টেনে নেবে।[১]

ইসলামের পক্ষে এমত মুহূর্তে বৌদ্ধ ও খ্রিস্ট ধর্মের মুকাবিলা করা এবং মোগলদের এই দুই ধর্মের হাত থেকে বাঁচিয়ে স্বীয় অনুসারীতে পরিণত করা এমন একটি কর্ম ছিল যাতে সাফল্য লাভ করা বাহ্যত অসম্ভব মনে হচ্ছিল। মোগলদের এই প্রলয়ংকরী তুফানে মুসলমানদের মত আর কাউকেই এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়নি। সে সব বিখ্যাত শহর ও জনপদ যা এককালে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাদপীঠ ছিল এবং যেখানে এশিয়ার জ্ঞানী-গুণী ও মনীষীবৃন্দের

১. দা'ওয়াতে ইসলাম– (Preaching of Islam), মওলবী 'ইনায়তুল্লাহ অনূদিত, ২৪০-৪১ পৃ.।

বসতি ছিল, তার অধিকাংশই জ্বলে-পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছিল। মুসলিম জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতবর্গকে হয় হত্যা করা হয়েছিল নতুবা ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছিল।[১] মোগল শাসকগণ ইসলাম ভিন্ন আর সকল ধর্মের প্রতিই সদয় ও সহানুভূতিশীল ছিল। কেবল ইসলামের প্রতিই তারা চরম ঘৃণা ও শত্রুতাভাব পোষণ করত। চেঙ্গীয খান নির্দেশ দিয়েছিলেন, "যে সব লোক শরীয়ত-নির্দেশিত পন্থায় পশু যবাহ্ করবে তাদেরকে হত্যা কর।" উক্ত নির্দেশই কুবলাঈ খান তার শাসনামলে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং তা ঠিকমত পালিত হচ্ছে কিনা– তা দেখবার জন্য সাম্রাজ্যের সর্বত্র গোয়েন্দা নিযুক্ত করেন। এভাবে সাত-সাতটি বছর ধরে মুসলমানদের ওপর নানারকম নির্যাতন ও উৎপীড়ন চালানো হয়। গরীব ও দরিদ্র লোকেরা এ সুযোগে ধন-সম্পদ জমা করে। ক্রীতদাসেরা স্বাধীনতা লাভের জন্য তাদের প্রভুদের নামে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে।[২] গুয়ূক খাকানের শাসনামলে (১২৪৬-৪৮ খৃ.) যিনি তার সাম্রাজ্যের গোটা ব্যবস্থাপনাই দু'জন খ্রিস্টান মন্ত্রীর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, মুসলমানদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির শিকারে পরিণত করা হয়।[৩] চতুর্থ শাসক আরগূন খানও (১২৮৪-৯১ খৃ.) মুসলমানদের ওপর অমানুষিক জুলুম-নিপীড়ন চালান এবং বিচারালয়ে ও রাজস্ব বিভাগে রক্ষিত সব খাতক প্রজার মূলধন কেড়ে নেন এবং দরবারে তাদের আগমন বন্ধ করে দেন।[৪]

এতসব সত্ত্বেও মোগল ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী যারা মোগলদের পরে এসেছিল, সেই মুসলমানদেরই ধর্ম গ্রহণ করে যাদেরকে একদা তারা নিজেদের পদতলে পিষ্ট করেছিল।[৫]

এ কাহিনী যতটা বিরাট ও হৃদয়বিদারক, ঠিক ততটাই আশ্চর্যজনকও যে, ইতিহাসে এর বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি কোন বিবরণ মেলে না এবং যে সব লোকের

---

১. মোগলেরা মুসলমানদের ওপর এমন জুলুম করেছিল যে, চীনা চিত্র প্রযোজকেরা যখন সিনেমার পর্দায় চিত্র প্রদর্শন করে সেখানে একটি ছবিতে দেখা যায়, শ্বেত শ্মশ্রুমণ্ডিত এক বৃদ্ধের আগমন ঘটছে যার গর্দান ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বাঁধা আর ঘোড়াটা তাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে ফিরছে। এ ছবি প্রকাশ করছে, মোগল অশ্বারোহীরা মুসলমানদের কিরূপ যন্ত্রণা দিয়েছিল (হাওয়ার্থ, ১ম খণ্ড, ১৫৯ পৃ.)।

২. হাওয়ার্থ, ১ম খণ্ড, ১১২, ৪৭৩ (যখন দেখা গেল যে, এই নির্দেশের ফলে মুসলিম বণিকদের দরবারে আগমন বন্ধ হয়ে গেছে এবং এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তখন এ নির্দেশ বাতিল করা হয়)।

৩. ঐ, ১ম খণ্ড, ১৬৫ পৃ.;

৪. দ্য গোয়েন, ৩য় খণ্ড, ২৬৫ পৃ.।

৫. দা'ওয়াতে ইসলাম, ২৪৫-৪৬ পৃ.।

হাতে এই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল ইতিহাসের পাতায় তাদেরও বিশেষ কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আল্লাহ্‌র যে সব একনিষ্ঠ বান্দা এই রক্তপায়ী তাতারী জাতিগোষ্ঠীকে ইসলামের ভক্ত অনুসারীতে পরিণত করেছিল তাঁদেরও খুব কম লোকের নাম দুনিয়াবাসী জানে। কিন্তু তাঁদের এই কর্ম কোন ইসলামী কর্মের চেয়ে আদৌ কম গৌরবজনক নয়। তাঁদের অনুগ্রহ কেবল মুসলমানদের ওপর নয়, বরং কেয়ামত অবধি গোটা মানবতার ওপরও বর্তাবে। কেননা তাঁরা বন্যতা ও বর্বরতার প্রতীক একটি জাতিগোষ্ঠীকে এমন একটি জাতিগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করেন যারা ছিলেন শান্তি ও কল্যাণের প্রতীক, একক আল্লাহ্‌র পূজারী এবং রাহমাতুল্লিল-'আলামীন (সা)-এর প্রচারিত দীনের পতাকাবাহী।

চেঙ্গীয খানের মৃত্যুতে তার বিশাল সাম্রাজ্য তার চার পুত্রের মধ্যে চার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রতিটি ভাগেই একযোগে ইসলামের প্রচার কার্য শুরু হয় এবং তাতারী খাকান (সম্রাট, রাজাধিরাজ) ও তাদের প্রচার ও প্রভাবের ফলে তাতারী জাতিগোষ্ঠী মুসলমান হতে শুরু করে, এমন কি এক শতাব্দীর ভেতর প্রায় সমগ্র তাতারী কওম মুসলমান হয়ে যায়। অধ্যাপক আর্নল্ড রেণটডদধভথ মত প্রফটব-এ এর অল্প-স্বল্প কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। চেঙ্গীয খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র জূজী খানের রাজ্যে (যিনি সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশ সীরা দাদরার শাসক ছিলেন) ইসলাম প্রচারের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আর্নল্ড লিখেছেন :

> মোগলদের ১ম বাদশাহ যিনি মুসলমান হয়েছিলেন তাঁর নাম ছিল বারাকা খান। ইনি ১২৫৬ খৃ. থেকে ১২৬৭ খৃ. পর্যন্ত সীরা দাদরার শাসক ছিলেন।[১] একদিন এই বাদশাহ এক কাফেলায় গিয়ে পৌঁছেন। ঐ কাফেলা বোখারা থেকে আসছিল। এর ভেতর দু'জন মুসলিম শ্রমিক ছিল। বারাকা খান তাদেরকে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে যান এবং ইসলাম সম্পর্কে তাঁদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন। মুসলমান দু'জন ইসলামের আরকান-আহকাম তথা ইসলামের শিক্ষা, নীতিমালা ও বিধি-বিধান তাঁর সামনে এত সুন্দরভাবে তুলে ধরেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন। বারাকা খান তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তাঁকেও ইসলাম কবুল করতে বলেন। এরপর বারাকা খান প্রকাশ্যে তাঁর মুসলমান হবার ঘোষণা দেন।[১] ইসলাম কবুল করবার পর বারাকা খান মিসরের সুলতান রুক্‌ন উদ্দীন

১. ১২৬০ খৃ.-এ নজমুদ্দীন মুখতার আয-যাহেদী বারাকা খানের জন্য একটি বই লিখেন যার ভেতর রিসালতকে দলীল হিসাবে প্রমাণ করেন এবং মুসলমান ও খ্রিস্ট ধর্মের ভেতরকার ধর্মীয় বিতর্কের বর্ণনা দেন।

২. আবু'ল-গাযী তুম, ১৮১-৮৭ পৃ.।

বায়বার্সের সঙ্গে সমঝোতা করেন। এই সমঝোতার ফলে স্বয়ং মিসর সুলতান সীরা দাদরার দু'শ' মোগলকে খুবই খাতির-যত্ন করেন। এই মোগলদের কাহিনী এই যে, সীরা দাদরার শাসনকর্তা ও বাগদাদ বিজয়ী হালাকূ খানের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি পেলে হালাকূ খানের সৈন্যদলের এই দু'শ' মোগল সেখান থেকে পালিয়ে শাম এলাকায় চলে আসে। সেখান থেকে তাদেরকে পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে কায়রোয় পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। মিসর দরবারের পক্ষ থেকে তাদেরকে ইসলাম কবুলের আহ্বান জানানো হয়।[১] সুলতান রুকনুদ্দীন ঐ সব মোগলের ভেতর দু'শ' লোকের সঙ্গে তাঁর কতিপয় দূত প্রেরণ করেন এবং তাদের মারফত বারাকা খানের কাছে একটি চিঠিও পাঠান। এরা সীরা দাদরা থেকে কায়রো ফিরে এসে সুলতানকে সংবাদ দেয় যে, বারাকা খানের আমীরদের নিকট ও শাহযাদীর কাছে একজন করে ইমাম ও মুয়াযযিন নিযুক্ত আছেন এবং বাচ্চাদের মকতবে কুরআন শরীফ পড়ানো হচ্ছে।[২] সুলতানকে তারা এও বলে, "আমরা যখন কায়রো থেকে রওয়ানা হয়েছিলাম তখন পথিমধ্যে বারাকা খানের দূতের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত হয়।[৩] দূত মিসরের সুলতান সমীপে এই সংবাদ দেবার জন্য হাযির হয়েছিল যে, বারাকা খান ও তাঁর প্রজাবর্গ মুসলমান হয়ে গেছেন।" মোট কথা, বারাকা খান ও সুলতান রুকনুদ্দীনের ভেতর ঐক্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হবার পর সীরা দাদরারও বহু মোগল মিসরে আগমন করে। এখানে তারা ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ পায় এবং আগ্রহের সাথে ইসলাম গ্রহণ করে।[৪]

তাতারী সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ ঈলখানিয়া শাসনাধীন এলাকায় ইসলাম প্রচার সম্পর্কে আর্নল্ড লিখেছেন :

ইরানে হালাকূ খান ঈলখানিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এ সময় তুর্কীদের ভেতর ক্রমান্বয়ে ইসলামের প্রচার শুরু হয়। হালাকূ খানের পুত্র তেকূদার[৫] তদীয় ভ্রাতা বাকা খানের স্থলাভিষিক্ত হন। ঈলখানিয়া রাজবংশের ইনিই প্রথম বাদশাহ যিনি ইসলাম কবুল করেন। সে যুগের একজন খ্রিস্টান লেখক লিখেছেন[৬] যে, তেকূদারের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ হয়েছিল খ্রিস্ট ধর্মের ওপর। শৈশবে তাঁকে ব্যাপ্টাইজড় করা হয়েছিল এবং তাঁর নাম রাখা হয়েছিল

১. মাকরিযী, ২১ তূম, ১৮০, ৮১, ৮৭ পৃ.।
২. ঐ, ২১৫ পৃ.।
৩. ঐ, ১১৮ পৃ.।
৪. ঐ, ২২২ পৃ.।
৫. ওয়াসসাফ এই বাদশাহ্র নাম মুসলমান হবার আগে তেকুদার এবং মুসলমান হবার পর আহমদ লিখেছেন।
৬. হায়হুম-(রামোসিভ তূম, ২য় খণ্ড, ৬০ পৃ.।

নিকোলাস। তেকুদার যৌবনে পদার্পণ করবার পর মুসলিম সাহচর্যের প্রভাবে খ্রিস্ট ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলামী নামকরণ করা হয় সুলতান মুহাম্মদ (আহমদ)। তিনি খুবই সচেষ্ট ছিলেন যাতে করে গোটা তাতারী জাতিগোষ্ঠী ইসলাম কবুল করে। এর জন্য তিনি লোকদেরকে পুরস্কার, সম্মানসূচক ডিগ্রী ও ক্ষমতা প্রদান করেন। তাঁর আমলে বহু তাতারী ইসলাম গ্রহণ করে। এই বাদশাহ্ মিসরের সুলতানকে নিম্নোক্ত পত্রের মাধ্যমে তাঁর মুসলমান হবার সংবাদটি জানিয়েছিলেন :

"আল্লাহ্র শক্তি ও কাআনের সৌভাগ্যে সুলতান আহমদের ফরমান মিসরের সুলতানের নামে প্রেরিত হচ্ছে। পর সমাচার এই যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর অসীম অনুগ্রহে ও হিদায়াতের আলোকে যৌবনের প্রারম্ভেই আমাদেরকে তাঁর সার্বভৌমত্ব ও ওয়াহ্দানিয়াত স্বীকার, মুহাম্মদ (সা)-এর নবূওতকে সত্য বলে বিশ্বাস এবং স্বীয় বন্ধু ও নেক বান্দাদের সম্পর্কে শুভ ধারণা পোষণ করবার তওফীক দিয়েছেন। তিনি যাকে হিদায়াতের উজ্জ্বল রাজপথে টেনে আনতে চান তার মন-মানসকে ইসলাম কবূল করবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আমরা সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি এবং ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের পারস্পরিক ব্যাপারগুলো সংশোধন করবার জন্য আগ্রহ পোষণ করে আসছি। আমার মহান পিতা ও শ্রদ্ধেয় ভ্রাতার পক্ষ থেকে আমাদের কাছে রাজ্য শাসনের সুযোগও এসে পৌঁছেছে এবং আল্লাহ্ তাঁর অসীম মেহেরবানীতে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন এবং রাজত্ব ও সাম্রাজ্য দান করেছেন। অতঃপর পবিত্র কুরবুলতাঈ (কুরেলতাই)-এর যদ্দারা আমি এমন একটি মজলিস বোঝাতে চাচ্ছি যেখানে সমস্ত স্বগোত্রীয় ও স্বধর্মীয় আত্মীয়-বান্ধব, বড় বড় আমীর ও ফৌজের অধিনায়কগণ পরামর্শের জন্য বৈঠকে মিলিত হন– সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছে যে, আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতার নির্দেশে সেনা অভিযান চালানো হবে এবং আমাদের ফৌজের ভেতর থেকে, যাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে বিস্তৃত ভূখণ্ডও সংকীর্ণ হয়ে গেছে এবং যাদের প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতায় সবার অন্তর কেঁপে উঠেছে, একটি বিরাট অংশকে চতুর্দিকে পাঠাতে হবে। এই সেনা অভিযান এমন সুদৃঢ় ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিয়ে পাঠাতে হবে যার সম্মুখে সুউচ্চ পাহাড়ও মাথা হেঁট করবে, কঠিন প্রস্তরও হয়ে পড়বে দ্রবীভূত। আমরা এ নিয়ে ভেবে দেখেছি। ইসলামের রীতিনীতি ও চাল-চলনের আমরা পুনরুজ্জীবন ঘটাতে চাই এবং আমাদের তরফ থেকে যে নির্দেশ ও বিধি-বিধান জারী হবে তার ফলে

রক্তপাত যেন থেমে যায়, মানুষের দুঃখ-কষ্টের যেন লাঘব হয়, পৃথিবীর চতুর্দিকে শান্তি ও নিরাপত্তার আবহাওয়া যেন বিরাজ করে এবং বিভিন্ন শহরের শাসকগণ আমাদের সদয় ও কোমল আচরণের কারণে যেন আরাম পায়। কেননা আমরা আল্লাহ্‌কে সম্মান করি, ভক্তি করি; আমরা তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি মেহেরবান। এজন্য আল্লাহ্‌পাক আমাদের অন্তর রাজ্যে এভাবের উদয় ঘটিয়েছেন যেন আমরা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নির্বাপিত করি এবং ফিতনা-ফাসাদ তথা পৃথিবীর অশান্তি ও বিপর্যয় দূর করি। যারা এ ব্যাপারে একমত আমরা যেন তাদেরকে আমাদের কর্মপন্থা সম্পর্কে অবহিত করি, যদ্দ্বারা বিশ্বের জ্বরা-ব্যাধি ও জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হবার আশা করা যায় এবং যা সর্বাগ্রে বাস্তবায়িত করতে আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ কারণেই আমরা তীরের ফলক সক্রিয় করে তুলতে এবং ধনুকে ছিলা সংযোজন করতে তাড়াহুড়ো করি না এবং যতক্ষণ না সত্য প্রকাশ পায়, দলীল-প্রমাণ সবল ও শক্তিশালী হয় আমরা কোন কিছুর অনুমতি দেই না। শায়খু'ল-ইসলাম কু'দওয়াতু'ল-'আরিফীনের উপদেশ আমাদের এই ইচ্ছা ও অভিপ্রায়কে সুদৃঢ় ও পাকাপোক্ত করে দিয়েছে। অনন্তর আমরা একটি ফরমান জারী করেছি যা মান্যকারীর জন্য আল্লাহ্‌র রহমত এবং অমান্যকারীর জন্য আল্লাহ্‌র আযাব হিসাবে বিবেচিত হবে। আমরা এই ফরমান মান্যকারীদের উদ্দেশ্যে কাযীউ'ল-কুযাত কুত্‌বুদ্দীন শীরাযী ও আতাবেক বাহাউদ্দীন, যিনি এই সালতানাতের একজন সম্মানিত সদস্য–কে পাঠিয়েছি যাতে তাঁরা লোকদেরকে নামাযের তরীকা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং সমগ্র মুসলমানদের ফায়দার জন্য যে কথা আমাদের মনে প্রচ্ছন্ন রয়েছে– সবাই যেন তা জানতে পারে। অধিকন্তু সবাইকে এও যেন জানিয়ে দেওয়া হয় যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে অন্তর্দৃষ্টি ও হিদায়াত দান করেছেন এবং ইসলাম সে সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছে যা মুসলমান হবার আগে আমরা করেছি। এখন তো আল্লাহ্ আমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন যেন আমরা সত্যের ও সত্য পথের পথিকদের অনুসরণ করি। অতএব, লোকের অন্তর-মানস যদি এমন দলীল-প্রমাণ চায় যদ্দ্বারা তারা আমাদের ওপর ভরসা করতে পারে এবং এমন প্রমাণপঞ্জীর দাবি জানায় যদ্দ্বারা সাফল্যের আশা করতে পারে তাহলে তারা যেন আমাদের সে সব শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার দিকে দৃকপাত করে যা পৃথিবীর বুকে সাধারণভাবে মশহূর হয়ে গেছে। কেননা আমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ধর্মের পতাকা সমুন্নত করেছি এবং প্রতিটি নির্দেশ জারী করতে উক্ত আদর্শের প্রতি

লক্ষ্য রেখেছি এবং শরীয়তে মুহাম্মদীর কানূনগুলো তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহামর্যাদার দাবি মাফিক ন্যায় ও সুবিচারের ভিত্তিতে জারী করেছি। আমরা আমাদের সমস্ত প্রজার অন্তর প্রসন্ন করেছি। যাদের থেকে ইতোপূর্বে কোন মন্দ ও অন্যায় আচরণ পরিদৃষ্ট হয়েছে তাদের সবাইকে আমরা মাফ করে দিয়েছি। আল্লাহ্ও তাদের অতীতের সব গোনাহ-খাতা মাফ করে দিন। আমরা মুসলমানদের ওয়াক্ফ সম্পত্তির, যার ভেতর মসজিদ, মাদরাসা ও কবরস্থান শামিল, সংস্কার করেছি এবং সমস্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠান, মেহমানখানা– যেগুলো একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, পুনরায় আবাদ করেছি। ওয়াক্'ফ সম্পত্তির-আয়-আমদানি আগের নিয়ম মাফিক ও ওয়াক্'ফকারীর শর্তমাফিক হকদারকে পৌঁছে দিয়েছি। আমরা নির্দেশ দিয়েছি যে, আমাদের প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ হাজীদের ব্যাপারটাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে, তাদের জন্য সফরের প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা করবে, যে সব রাস্তা দিয়ে তারা হজ্জ করতে যাবে সেগুলো আবাদ ও নিরাপদ রাখবে এবং হাজীদের কাফেলা পরিপূর্ণ আরামের সঙ্গে রওয়ানা করবার ব্যবস্থা করবে। আমরা সকল সওদাগরকে যারা আমাদের দেশে যাতায়াত করে থাকে, পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি যে, তারা যেভাবে খুশি সফর করবে। ফৌজ, কোতওয়াল ও সান্ত্রীদেরকে, যারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত, কঠোরভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে তারা যেন সওদাগরদের যাতায়াত ও চলাচলের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে। এসব কিছু এজন্য করা হয়েছে যাতে দেশ ও শহরগুলো সজীব হয়ে ওঠে, ফেতনা-ফাসাদ দূরীভূত হয়, তলোয়ার কোষবদ্ধ থাকে, রাষ্ট্রের অধিবাসীবৃন্দ আরাম-আয়েশের সঙ্গে কাল কাটায় এবং মুসলমানদের গর্দান লাঞ্ছনা-গঞ্জনার হাত থেকে রেহাই পায়।"[১]

মোগল ইতিহাসের পাঠক সে সব জুলুম ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা, যা মোগল ও তাতারীরা সৃষ্টি করেছিল, অধ্যয়ন করার পর যখন এই ফরমান অধ্যয়ন করবেন তখন খুবই আরাম অনুভব করবেন এবং সেই সঙ্গে বিস্মিতও হবেন এই দেখে যে, একজন মোগল শাসকের মুখ দিয়ে এ ধরনের বদান্যতা ও মানবীয় সহানুভূতির কথা প্রকাশ পাচ্ছে।[২]

---

১. ওয়াসসাফ–২৩১, ২৩৪ পৃ.।

২. দা'ওয়াতে ইসলাম–২৪৮, ২৫১ পৃ.।

১২৮৪ খ্রিস্টাব্দে তেকূদার আহমদের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এর নেতৃত্ব দিয়েছিল আরগুন খান। তেকূদারকে সে হত্যা করে এবং নিজেই রাজমুকুট ও শাহী তখতের মালিক হয়ে বসে। আরগুনের কয়েক বছরের শাসনামলে (১২৮৪-৯১ খৃ.) খ্রিস্টানদের ওপর পুনরায় সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ বর্ষণ শুরু হয়, আর মুসলমানদের ভাগ্যে নেমে আসে দুর্ভাগ্যের অমানিশা। সরকারী চাকুরি-বাকুরি ও বিভিন্ন পদ থেকে তাদের অপসারণ করা হয়।[১] ১২৯৫ খ্রি. পর্যন্ত তেকূদারের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ প্রাচীন শামান ধর্মেরই অনুসারী থাকে। অবশ্য তাদের ৭ম বাদশাহ গাযান ১২৯৫ সনে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন ঈলখানিয়া বংশের সর্বাধিক প্রভাবশালী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসক। তিনি ইসলামকে ইরানের শাহী ধর্ম বলে ঘোষণা করেন।

মুসলমান হবার আগে সুলতান গাযানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্মের ওপর। এই বাদশাহ খুরাসানে বৌদ্ধদের জন্য মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের জ্ঞানী-গুণী, পণ্ডিত ও ভিক্ষুদের সাহচর্যে তিনি খুবই আনন্দ পেতেন। মোগল শাসন যখন সৌভাগ্যের মধ্যাহ্ন গগনে– এসব লোক তখন বিরাট সংখ্যায় ইরানে চলে এসেছিল।[২] সুলতান গাযানের বিভিন্ন ধর্মের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের ব্যাপারে খুবই আগ্রহ ছিল এবং প্রতিটি ধর্মের জ্ঞানী-গুণী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতেন।[৩] গাযানের উযীর ও সে যুগের একজন ঐতিহাসিক হাকীম রশীদুদ্দীনের এ ধারণা অনেকটা সঠিক বলে মনে হয় যে, সুলতান গাযান খালেস নিয়ত ও সরল বিশ্বাসে মুসলমান হন এবং তিনি তাঁর গোটা রাজত্বকালে ইসলামের অত্যন্ত পাবন্দ থাকেন।[৪]

ঐতিহাসিক ইবনে কাছীরও ৬৯৪ হি. ঘটনাবলীর ভেতর গাযানের ইসলাম গ্রহণের আলোচনা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে করেছেন। তাঁর ও অপরাপর ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এর সার্বিক কৃতিত্ব সৎ অন্তঃকরণবিশিষ্ট মুসলিম তুর্ক আমীর তূযূন[৫]-এর যাঁর শিক্ষা ও প্রচেষ্টার ফলে তাতারী সুলতান

১. দ্য গীবন–৩য় খণ্ড–২৬৩, ২৬৫।
২. হাউসন–তৃম ৪. পৃ. ১৪৮।
৩. ঐ, ৩৬৫।
৪. দা'ওয়াতে ইসলাম, ২৫৩ পৃ.।
৫. আর্নল্ড ও অপরাপর ঐতিহাসিক তাঁকে নওরোয বেগ নামে স্মরণ করে থাকেন।

ইসলাম কবূল করেন। ইবনে কাছীর ৬৯৪ হিজরীর ঘটনাবলীর ভেতর লিখেছেনঃ

এ বছর চেঙ্গীয খানের প্রপৌত্র কাযান ইবন আরগূন ইবন ঈগা ইবন তূলী ইবন চেঙ্গীয খান তাতারীদের বাদশাহ্ হন এবং আমীর তূযূন (র)-এর হাতে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাতারীরা প্রায় সকলেই অথবা তাদের বেশির ভাগই ইসলামে প্রবেশ করে। যেদিন বাদশাহ্ ইসলাম কবূল করেন সেদিন স্বর্ণ-রৌপ্য ও মোতি মানুষের ওপর বর্ষণ করা হয়। বাদশাহ্ তাঁর নাম রাখেন মাহমূদ। জুমু'আ ও খুতবায় তিনি শরীক হন। বহু মন্দির ও গির্জা তিনি ধ্বসিয়ে দেন এবং অমুসলিমদের ওপর জিযিয়া ধার্য করেন। বাগদাদ ও অপরাপর শহর থেকে ছিনতাইকৃত জিনিসপত্র ফেরত দেওয়া হয়। লোকেরা তাতারীদের হাতে তসবীহমালা দেখে আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহ ও বদান্যতার জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করে।[১]

আর্নল্ড লিখেছেন :

১৩০৪ খৃস্টাব্দে বাদশাহ্ গাযানের ভাই সুলতান ইব্ন মুহাম্মাদ খোদা-বান্দাহ্র নামে ইরানের সিংহাসনে উপবেশন করেন। এই সুলতানের মা ছিলেন একজন খ্রিস্টান মহিলা এবং তাঁর শৈশবের শিক্ষা-দীক্ষাও হয়েছিল খ্রিস্টীয় পরিবেশে। নিকোলাস নামে তাঁকে ব্যাপ্টাইজ্ড করা হয়েছিল। কিন্তু মার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর স্ত্রীর কথামত মুসলমান হয়ে যান। ইবনে বতূতা বলেন যে, নিকোলাস খানের অর্থাৎ খোদা বান্দাহ্র মুসলমান হবার ফলে মোগলদের ভেতর বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।[২] মোট কথা, সেদিন থেকে ঈলখানিযা রাজবংশে ইসলাম অপরাপর সকল ধর্মের ওপর প্রাধান্য লাভ করে।[৩]

এ বংশের তৃতীয় শাখার মধ্যে, যারা মধ্যঅঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ জাঁকিয়ে বসেছিল এবং যাদের রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চুগতাঈ ইবনে চেঙ্গীয খান, ইসলাম প্রচারের অবস্থা সম্পর্কে আর্নল্ড লিখেছেন :

মধ্যভূখণ্ড চেঙ্গীয-পুত্র চুগতাঈ খান ও তার বংশধরদের ভাগে পড়েছিল। এখানে কিভাবে ইসলাম প্রচার লাভ করেছিল সে সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। ১ম বাদশাহ্ যিনি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাঁর নাম ছিল বুরাক খান। ইনি ছিলেন চুগতাঈ খানের প্র-পৌত্র। সিংহাসনে আরোহণ

---
১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া-১৩শ খণ্ড, ৩৪০ পৃ.।
২. ইবনে বতূতা, ২য় খণ্ড, ৫৭ পৃ.।
৩. দা'ওয়াতে ইসলাম-২৫৪ পৃ.।
৪. আবু'ল-গাযী তূম, ১৫৯।

করবার দু'বছর পর তিনি সুলতান গিয়াছুদ্দীন (১২৬৬-৭০ খৃ.) নাম ধারণ করে মুসলমান হন।[৪] প্রথম দিকে এখানে ইসলামের উন্নতি ও প্রসার খুব একটা হয়নি। কেননা বুরাক খানের মৃত্যুর পর যে সমস্ত মোগল মুসলমান হয়েছিল তারা পুনরায় তাদের প্রাচীন পৈত্রিক ধর্মে ফিরে গিয়েছিল এবং খৃস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থার উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অবশ্য তর মুশীরীন খান (রাজত্ব ১৩২২-৩০ খৃ.) যে সময় মুসলমান হন তখন চুগতাঈ মোগলেরা সাধারণভাবে ইসলাম কবূল করে। এরপর তারা যখন একবার তাদের বাদশাহ্র অনুকরণে ইসলাম কবুল করল তখন তারা দৃঢ় চিত্তে তাতে কায়েম থাকল। কিন্তু সে বছরও ইসলামের পক্ষে অপরাপর ধর্মের ওপর– যেগুলো ছিল সরাসরি ইসলামের প্রতিপক্ষ, প্রাধান্য লাভ করা নিশ্চিত ছিল না। তর মুশীরীন-এর স্থলাভিষিক্তগণ মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালাতে শুরু করে এবং যতদিন পর্যন্ত না কাশগরের বাদশাহ, যার সাম্রাজ্য চুগতাঈ সাম্রাজ্যের বিভক্তি ও দুর্বলতার কারণে স্বায়ত্তশাসিত হয়ে গিয়েছিল, ইসলামের সমর্থনে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ততদিন পর্যন্ত ইসলামের উন্নতি সম্ভব হয়নি। কাশগরের সুলতান তুগলক তায়মূর (১৩৪৭-৬৩)-এর মুসলমান হওয়া সম্পর্কে লিখিত আছে যে, বুখারা থেকে শায়খ জামালুদ্দীন নামক একজন বুযুর্গ কাশগর আগমন করেন এবং তিনিই তুগলক তায়মূরকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। শায়খ জামালুদ্দীন ও তাঁর সঙ্গী-সাথিগণ সফর করছিলেন। এমতাবস্থায় অজ্ঞাতসারে তাঁরা তুগলকের মৃগয়া শিকার ক্ষেত্রে ঢুকে পড়েন। এই অপরাধে তাদের সবাইকে দড়ি দিয়ে বেঁধে বাদশাহ্র সামনে হাযির করা হয়। বাদশাহ ক্রোধ-ভরে তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কেন বিনানুমতিতে আমার ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছ?" উত্তরে শায়খ (র) জানান, "আমরা এ দেশে অপরিচিত ভিন দেশী মুসাফির। আমরা আদৌ জানতে পারিনি যে, আমরা এমন এক ভূখণ্ডে এসে পড়েছি যার ওপর লোক চলাচল নিষিদ্ধ।" বাদশাহ যখন জানত পারলেন যে, লোকগুলো ইরানী, তখন তিনি বললেন, "ইরানীদের চেয়ে কুকুরও অনেক ভালো।" শায়খ (র)-এর ত্বরিৎ জওয়াব দেন : "বাদশাহ সত্য কথাই বলেছেন। আমাদের কাছে যদি সত্য-সঠিক একটি ধর্ম না থাকত তাহলে আসলেই আমরা কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট ছিলাম।" শায়খ (র)-এর জওয়াবে তুগলক তায়মূর অত্যন্ত হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন এবং নির্দেশ দেন, "আমরা যখন শিকার শেষে ফিরে আসব তখন এই ইরানীদেরকে যেন আমার সামনে হাযির করা হয়।" অনন্তর শায়খ

(র)-কে বাদশাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত করা হলে বাদশাহ শায়খ জামালুদ্দীনকে আলাদা ডেকে নিয়ে বলেন : তুমি সে সময় যা বলেছিলে, আমাকে তা এবার বুঝিয়ে বল। সত্য-সঠিক ধর্ম বলতে তুমি কি বোঝাতে চাও? এতদ্‌শ্রবণে শায়খ (র) ইসলামের আরকান-আহকাম এমন আবেগময় ভাষায় তুলে ধরেন যে, তুগলক তায়মূরের পাষাণ অন্তরও মোমের মত গলে যায়। শায়খ (র) কুফরী অবস্থার এমন ভয়াবহ ও ভীতিপ্রদ ছবি বাদশাহ্‌র সামনে অংকন করেন যে, বাদশাহ্ এতদিনে যে অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন তা পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি বলেন ঃ এখনই যদি আমি আমার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেই তাহলে আমি আমার প্রজাবৃন্দকে সত্য-সঠিক পথে নিয়ে আসতে সক্ষম হব না। এজন্য কিছুদিনের জন্য তুমি মৌনতা অবলম্বন কর। আমি যখন পিতৃ-সিংহাসনে উপবেশন করব এবং আমি যখন এ দেশের মালিক হব সে মুহূর্তে তুমি আমার সকাশে উপস্থিত হবে এবং আমার সঙ্গে দেখা করবে। চুগতাঈ সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। অনেকগুলো বছরের কঠিন চেষ্টা ও কঠোর সাধনার ফলে তুগলকে তায়মূর সেসব খণ্ড রাজ্যকে একই পতাকাতলে সমবেত করে পুনরায় বিশাল চুগতাঈ সাম্রাজ্যের ন্যায় একটি বিরাট সাম্রাজ্য কায়েম করতে সক্ষম হন। ইতোমধ্যে শায়খ জামালুদ্দীন স্বদেশে পাড়ি জমান এবং দেশে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইনতিকালের মুহূর্ত ঘনিয়ে এলে তিনি পুত্র রশীদুদ্দীনকে বলেন ঃ বৎস! তুগলক তায়মূর একদিন বিরাট বাদশাহ্ হবেন। সে সময় তুমি তাঁর কাছে যাবে এবং বাদশাহ্‌কে আমার সালাম জানিয়ে নির্ভয়ে ও নিঃশংক চিত্তে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবে, আমার সঙ্গে তিনি একদিন কি ওয়াদা করেছিলেন?

কয়েক বছর পর তায়মূর পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময় একদিন রশীদুদ্দীন বাদশাহ্‌র সেনাবাহিনীতে গিয়ে উপস্থিত হন। পিতার অন্তিম নির্দেশ পালনই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু বহু চেষ্টা-তদবীর সত্ত্বেও তিনি বাদশাহ্‌র দরবারে হাযিরা দিতে ও সাক্ষাৎ লাভে ব্যর্থ হন। শেষে ব্যর্থ হয়ে তিনি এক কৌশল অবলম্বন করেন। একদিন ভোরবেলা তিনি তুগলকের তাঁবুর কাছাকাছি গিয়ে সজোরে আযান দিতে শুরু করেন। এতে বাদশাহ্‌র ঘুম ভেঙে যায় এবং তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে রশীদুদ্দীনকে ডেকে পাঠান। রশীদুদ্দীন হাযির হয়ে স্বীয় পিতার পয়গাম তুগলক সমীপে পেশ করেন। তুগলক আগে থেকেই তাঁর প্রতিজ্ঞার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কলেমা পাঠান্তে মুসলমান

১. আর্নল্ডকৃত দা'ওয়াতে ইসলাম—২৫৬ পৃ.।

হন এবং এরপর তাঁর সাম্রাজ্যের প্রজাবর্গের মাঝে তিনি ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর আমলেই সেসব দেশে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা পায় যেসব দেশ চেঙ্গীযপুত্র চুগতাঈ-এর বংশধরদের অধীনে ছিল।[১]

কতক তুর্কী ঐতিহাসিকের ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে যে, তুগলক তায়মূর তাঁর শিকারী কুকুরের দিকে ইশারা করে অত্যন্ত ঘৃণাভরে শায়খ জামালুদ্দীন (র)-কে জিজ্ঞেস করেন, "এটা উত্তম না তুমি?" শায়খ (র) অত্যন্ত নির্বিকার প্রশান্তির সঙ্গে জওয়াব দেন, "যদি আমি দুনিয়ার বুক থেকে ঈমানের সঙ্গে চলে যেতে পারি তাহলে আমি উত্তম, অন্যথায় ঐ কুকুরটি।" তুগলক তায়মূরের গভীর অন্তর-মূলে এ কথা অনুপ্রবিষ্ট হয়। তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং জানতে চান, "ঈমান কাকে বলে?" শায়খ (র) এরপর ঈমানের হাকীকত বয়ান করেন। এরপর তুগলক তায়মূর এই মর্মে তার আগ্রহ ব্যক্ত করেন, তিনি যেন তার সিংহাসন আরোহণের পর তাঁকে সাক্ষাৎ দানে ধন্য করেন।

যা-ই হোক, এতটুকু সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, তুগলক তায়মূরের ইসলাম গ্রহণ এবং সরাসরি কাশগর ও চুগতাঈ সাম্রাজ্যে ইসলামের প্রচারের বাহ্যিক কারণ শায়খ জামালুদ্দীন– যাঁর অন্তরের গভীর কন্দর থেকে নিঃসৃত একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য, তাঁর ঈমানী কুওত, ইখলাস ও অন্তরের দরদ সেই কর্মটি সম্পাদন করেছে যা হাযারো বক্তৃতা ও লক্ষ উপদেশও করতে পারত না।

جزاه الله عن الاسلام ونبيه خير الجزاء .

চেঙ্গীয খানের চতুর্থ শাখা সম্পর্কে (যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ঊগতাঈ খান, যে শাখায় মঙ্গু খান ও কুবলাঈ খানের মত নামকরা শাসক জন্মেছেন এবং যারা বিশাল তাতারী সাম্রাজ্যের পূর্বাংশের দখলদার ছিলেন) আর্নল্ড লিখেছেন :

> গোটা মোগল সাম্রাজ্যের সবখানেই এমন সব মুসলমান বর্তমান ছিলেন যাঁরা বিধর্মীদেরকে গোপনে মুসলমান করে নিতেন। ঊগতাঈ খান (১২২৯-৪১ খৃ.)-এর শাসনামলে ইরানের শাসনকর্তা কিরঘিস প্রথমত বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[১] তায়মূর খানের আমলে (১২২৯-৪১ খৃ.) চীনের কানসুয়া প্রদেশের শাসনকর্তা কুবলাঈ খানের পৌত্র খানে আনন্দা ইসলাম কবুল করেন এবং তাঙ্গুত-এ বহু লোককে তিনি ইসলামে দীক্ষা দেন। যে সব ফৌজ তাঁর অধীনে ছিল তাদের অধিকাংশই মুসলমান হয়ে যায়। তায়মূর খান আনন্দা

১. হাউসেন–৩য় খণ্ড, ১২১ পৃ.।

খানকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠান এবং তিনি যাতে ইসলাম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্মে ফিরে আসেন তার চেষ্টা চালান। কিন্তু তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় তা অস্বীকার করেন। তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অল্পকাল পরেই আনন্দা খানকে মুক্তি দেওয়া হয়। কেননা তাঙ্গুতের প্রজাবৃন্দ তাদের জনপ্রিয় শাসকের বন্দীত্বের কারণে বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল।[১]

মোট কথা, এভাবেই গোটা তাতারী জাতিগোষ্ঠী, যারা এককালে সমগ্র মুসলিম জাহানকে ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং যাদের সামনে কোন মুসলিম শক্তিই তিষ্ঠাতে পারত না, মাত্র কয়েক বছরের ভেতরই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। এভাবে ইসলাম আর একবার প্রমাণ করল যে, সে তার শত্রুকে জয় করবার এবং তাকে প্রেমের জালে আবদ্ধ করবার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা রাখে। তাতারীরা কেবল নামে মাত্র মুসলমান হয়নি, তাদের ভেতর বিরাট বড় মুজাহিদ, খ্যাতনামা 'আলিম ও ফকীহ এবং বড় বড় আল্লাহ্ওয়ালা দরবেশও জন্ম লাভ করেছেন, যাঁরা বহু নাযুক মুহূর্তে ইসলামের মুহাফিজ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے

پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے

তাতারদের সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত যে, মন্দির থেকে কা'বা তাঁর রক্ষক খুঁজে পেয়েছে।

১. ঐ তৃম ২য়, ৫৩২-৩৩ পৃ.।

চতুর্দশ অধ্যায়

মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (র)

ইলমে কালাম ও বুদ্ধিবৃত্তির সংকট

হি.সপ্তম শতাব্দীতে গোটা মুসলিম জাহান 'ইলমে কালামের চর্চায় ও আলোচনা-সমালোচনায় গুঞ্জরিত হচ্ছিল। যে ব্যক্তি 'ইলমে কালামের পরিভাষ এবং মু'তাযিলা ও আশ'আরী, অতঃপর আশ'আরী ও হাম্বলীদের মধ্যকা বিতর্কমূলক বিষয়াবলী সম্পর্কে অবহিত না হতেন– তাকে লেখাপড়া জানা লো বলেই গণ্য করা হ'ত না। এ শতাব্দীরই প্রথম ভাগে (৬০৬ হিজরীতে) ইমাম রা ইনতিকাল করেন, যিনি 'ইলমে কালামের বাঁশী এত উচ্চ স্বরে ফুঁকেছিলেন যে এর সুমধুর সুর-লহরী ছাড়া আর কোন আওয়াজই শ্রুতিগোচর হ'ত না। মুসলি জাহানের পণ্ডিত ও চিন্তাশীল মহল প্রমাণপঞ্জী ও কল্পনা-কিয়াসে ছিলেন অভ্যস্ত কোন জিনিসের অস্তিত্ব, কোন বস্তুর হাকীকত ও ধর্মের কোন 'আকীদা-বিশ্বাসকে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বীকার্য বলে গণ্য করা হ'ত না, যতক্ষণ না তা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ- ী, তার্কিক বিন্যাস ও দার্শনিক সূত্র দ্বারা সপ্রমাণিত হ'ত।

আশ'আরীপন্থী মুতাকাল্লিমগণ সাধারণ জনজীবনে যদিও মু'তাযিল দার্শনিকদের ওপর জয়লাভ করেছিলেন এবং তাদের 'ইলমে কালামের মুকাবিলা মু'তাযিলা মতবাদ ও দর্শনের আওয়াজ স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মু'তাযিল মতবাদের রূহ ও বুদ্ধিবৃত্তি স্বয়ং তার বিজেতাকেই বিজিতে পরিণত ক ফেলেছিল। আশ'আরীদের 'ইলমে কালামে মু'তাযিলাদের বুদ্ধিপূজারী রূহ' আস জমিয়ে বসেছিল। তারাও বুদ্ধিকে এতখানি লাগামহীন স্বাধীনতা দিয়ে ফেলেছিলে যে, স্বয়ং আল্লাহ্‌র যাত (সত্তা) ও সিফাতের (গুণাবলীর) ন্যায় নাযুক ও বুদ্ধি অগম্য (বুদ্ধিবিরোধী নয়) বিষয়াবলীর আলোচনায়ও বুদ্ধির হস্তক্ষেপ চলত তারাও বাহ্যিকতা ও অনুভূতিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে চূড়ান্ত বলে ধরে নিয়েছিলেন এব ধর্মীয় মাসলা-মাসাইলের সমর্থন ও বস্তুর হাকীকতের অস্তিত্বের قائق اشياء كے (وجود) বুনিয়াদও যুক্তি-তর্ক, প্রমাণপঞ্জী ও অনুমানের ওপর স্থাপন করেছিলে

ফলে সারা মুসলিম জাহানে শব্দের কচকচানি ও যুক্তি-তর্কের জোয়ার ব যায়। কথায় কথায় সব কিছুর পেছনে দলীল-প্রমাণ খোঁজার একটা প্রবণতা দে

দেয়। তবে সাধারণভাবে 'ইলমে কালামের চর্বিত চর্বণই চলে। বহুকাল ধরে তাতে কোন নতুনত্ব সৃষ্টি করা হয়নি। মুতাকাল্লিমদের ভেতর অনেক দিন থেকেই ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী কিংবা হুজ্জাতু'ল-ইসলাম ইমাম গাযালী (র)-এর মত কোন মুজতাহিদ ও আল্লাহ-প্রদত্ত প্রতিভার অধিকারী মনীষীর জন্ম হয়নি। চিন্তার কর্ষণ ও যুক্তি-তর্কের দাপাদাপি মস্তিষ্ককে যতই উদ্দীপনা দান করুক, অন্তরের উত্তাপ, দাহ ও বিশ্বাসের আলোকমালাকে তা ক্ষতিগ্রস্তই করেছিল। মুতাকাল্লিমগণ তাদের যুক্তি-তর্কের জোরে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তা তাদের অন্তর-মানসকে ঈমান ও প্রশান্তি এবং সন্দেহবাদীদেরকে নিশ্চিত বিশ্বাস ও আস্থা দানে ব্যর্থ হয়। তাদের এ ধরনের যুক্তি-তর্ক ও আলোচনা পদ্ধতি মানুষের মন-মস্তিষ্কে শত রকমের জটা জাল বিস্তার করে যার গ্রন্থি উন্মোচনে 'ইলমে কালাম ছিল ব্যর্থ। সত্যানুভূতি যা ছিল 'ইল্ম ও ইয়াকীন লাভের বিরাট উৎস, তার দ্বার একেবারে রুদ্ধ হতে চলেছিল 'ইলমে কালামের প্রতি অব্যাহত অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের কারণে। বাহ্যিক পঞ্চেন্দ্রিয় ভিন্ন অপর কোন অনুভূতির অস্তিত্ব স্বীকার করা হত না। এজন্য এমন বহু বিষয় যা ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি ব্যতিরেকে অনুভব ও উপলব্ধি করা যায় না, সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত হয় এবং তা অস্বীকার করার প্রবণতাও সৃষ্টি হয়। মোট কথা, গোটা জাতিই কালামী সংকট তথা বুদ্ধিবৃত্তিক বাহ্যিকতায় নিমজ্জিত হয়। মুসলিম উম্মাহ্র কর্মশক্তি ও "প্রেমের উত্তাপ", যা ছিল তার পুঁজি ও শক্তির উৎস এবং নবূওতের বড় অবদান, শীতল হয়ে পড়ে। দার্শনিকসুলভ আলোচনা- সমালোচনা এবং ইলমে কালাম সংক্রান্ত বিতর্কের ঝড় মুসলিম জাহানকে এমন একটি শিক্ষাগারে পরিণত করে যেখানে কথামালা ছিল প্রচুর, কিন্তু 'জীবন, মুহব্বত, মা'রিফত ও চাহনী'র ছিল দারুণ অভাব। যাঁরা অন্তর্লোকের অধিকারী তাঁদের আধ্যাত্মিক দ্বীপ-উপদ্বীপগুলোতে প্রেমের আনন্দ ও ইয়াকীনের আলো অবশ্য পাওয়া যেত, অন্যথায় গোটা জগতটাই ছিল তখন কথামালার যাদুতে বন্দী এবং বাহ্যিক ও ইন্দ্রিয়ানুভূত শক্তির বশীভূত।

অন্তর-মানসের অধিকারী মুতাকাল্লিমের প্রয়োজন

এমতাবস্থায় মুসলিম জাহানের জন্য এমন একজন বুলন্দ ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল যিনি সহানুভূতিশীল অন্তর-মন ও সঠিক চিন্তা-ভাবনার অধিকারী, যাঁর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির সমুদ্র হেঁটে পার হবার যোগ্যতা রয়েছে, যাঁর

সম্মুখে শব্দ ও বাহ্যিক আড়ম্বরের উপকরণাদি ভেঙে খান খান হয়ে গেছে, যিনি তাঁর প্রেমের উত্তাপ ও হৃদয়ের দাহিকা শক্তি দ্বারা মরণোন্মুখ মুসলিম জাহানে নতুন জীবনের সঞ্চার করবেন, বুদ্ধির চিত্রশালায় 'ইশ্‌ক-এর শিঙ্গা ফুঁকবেন, যিনি এমন একটি নতুন 'ইলমে কালামের বুনিয়াদ রাখবেন যা মস্তিষ্ক থেকে শক্তির মহড়া প্রদর্শন এবং বিরুদ্ধবাদীদের যবান বন্দ করবার পরিবর্তে মস্তিষ্কের জড়তা দূর করে দেবে, অন্তরের গ্রন্থি উন্মোচন করবে এবং তাতে আনন্দ, তৃপ্তি, ঈমান ও ইয়াকীন ভরে দেবে। সত্যি কথা বলতে গেলে, তৎকালীন মওলানা জালালুদ্দীন রূমীই (মৃ. ৬৭২ হি.) ছিলেন সেই ব্যক্তিত্ব যাঁর মছনবী 'ইল্‌মে কালামের ভারসাম্যহীনতা ও বুদ্ধিবৃত্তি পূজার বিরুদ্ধে এক প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তিনি এমন এক 'ইলমে কালামের বুনিয়াদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা পরিবর্তিত মুসলিম জাহানের জন্য ছিল খুবই প্রয়োজনীয়।

সংক্ষিপ্ত অবস্থা

'মিরআতু'ল-মছনবী'র লেখক তাঁর অপ্রকাশিত রচনা 'সাহিবু'ল-মছনবী'তে মাওলানার জীবন-কথা অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে ও বিশ্লেষণ সহকারে লিখেছেন। এখানে তার সংক্ষিপ্তসার পেশ করা হচ্ছে।[১]

নাম ও পিতৃ পরিচয়

নাম মুহাম্মদ, উপাধি জালালুদ্দীন, মওলানা রূম বা রূমী ছিল জনপ্রিয় উপাধি। পিতার দিক দিয়ে তাঁর বংশ নবম ঊর্ধ্বতন পুরুষে গিয়ে হযরত আবূবকর সিদ্দীক (র)-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিনি মায়ের দিক দিয়ে হযরত 'আলী (রা)-র বংশের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন।

মওলানা রূমী (র)-র পিতা খুরাসানের[২] অন্তর্গত বলখের অধিবাসী ছিলেন। সেখানেই মওলানার জন্ম হয়। মওলানার পিতৃ ও মাতৃকুলে বড় বড় 'উলামায়ে

---

১. কাযী তালাম্মুয হুসায়ন গোরখপুরী মরহুম এই শেষ যুগে মছনবী ও তাঁর রচয়িতার বিরাট বড় ভক্ত ও একজন মুহাক্কিক 'আলিম ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ 'মিরআতু'ল-মছনবী' সংশ্লিষ্ট সাহিত্যে একটি তুলনাহীন সৃষ্টি। 'মিরআতু'ল-মছনবী' ছাড়াও (এটি প্রকাশিত হয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে) তাঁর আরো দু'টি বিশ্লেষণধর্মী রচনা রয়েছে যা অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঃ (১) সাহিবু'ল-মছনবী, (২) নকদু'ল-মছনবী। এ দুটি পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হলে মওলানা রূমী (র)-র ওপর সাহিত্য- চর্চার ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ অগ্রগতি সাধিত হবে এবং একটি মূল্যবান খিদমত হিসাবে বিবেচিত হবে। 'সাহিবু'ল-মছনবী' দারু'ল-মুসান্নিফীন থেকে প্রকাশের পথে। গ্রন্থকার তৎপুত্র তাওয়াক্কুল হুসায়ন-এর সৌজন্যে এই মূল্যবান কিতাব থেকে উপকৃত হবার এবং তাঁর থেকে উদ্ধৃত করবার সুযোগ পেয়েছেন। আল্লাহ পাক তাঁকে পুরস্কৃত করুন।

২. বর্তমানে আফগানিস্তানের অন্তর্গত। –নদভী

কিরাম ও শাসকের জন্ম হয়। মওলানার পিতামহী মালেকা-ই-জাহান ছিলেন খাওয়ারিয্‌ম শাহী বংশোদ্ভূতা।

মওলানার পিতার নামও ছিল মুহাম্মদ; উপাধি ছিল বাহাউদ্দীন ওয়ালাদ। তাঁর জন্ম সম্ভবত ৫৪৩ হিজরীতে। হযরত বাহাউদ্দীন ওয়ালাদ জীবনের নব প্রভাতেই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাঁর জ্ঞান ও মর্যাদার অবস্থা ছিল এই যে, খুরাসানের দূর-দূরান্তর এলাকা থেকে জটিল ও কঠিন ফতওয়াদি তাঁরই নিকট আসত। তাঁর মজলিস ছিল শাহী মজলিসেরই অনুরূপ। তাঁর উপাধিও ছিল সুলতানু'ল-'উলামা। তিনি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সাধারণ দর্‌স প্রদান করতেন। জুহ্‌রের পর তিনি তাঁর বিশিষ্ট সাথীদের মজলিসে হাকীকত ও মা'রিফত বর্ণনা করতেন। তিনি সোমবার ও জুমু'আর দিন সাধারণভাবে ওয়া'জ করতেন। তাঁকে সব সময় ভীতিগ্রস্ত ও চিন্তাযুক্ত দেখা যেত।

মওলানার জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষা

বাহাউদ্দীন ওয়ালাদের পুত্র মওলানা জালালুদ্দীন রূম ৬০৪ হিজরীর ৬ই রবি'উ'ল-আওয়াল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। সুলতানু'ল-'উলামার বিশিষ্ট মুরীদদের ভেতর একজন উন্নত স্তরের বুযুর্গ ছিলেন সায়্যিদ বুরহানুদ্দীন মুহাক্কিক তিরমিযী। সুলতানু'ল-'উলামা তাঁকেই মওলানার গৃহশিক্ষক (اتاليق) নিযুক্ত করেন। ৪-৫ বছর বয়স পর্যন্ত মওলানা তাঁরই প্রশিক্ষণাধীনে ছিলেন। মওলানা তাঁর বুযুর্গ পিতার ইনতিকালের পর এই গৃহশিক্ষকের অভিভাবকত্বে আধ্যাত্মিক সাধনার স্তরগুলো অতিক্রম করেন।

বল্‌খ থেকে পিতার হিজরত

মওলানার পিতা হযরত বাহাউদ্দীন ওয়ালাদের দা'ওয়াত ও নসীহত সীমাতিরিক্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং তাঁর মুরীদদের সংখ্যাও অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে তিনি সমসাময়িক কতক 'আলিম-উলামা'র ঈর্ষার শিকারে পরিণত হন। হযরত সুলতানু'ল-'উলামা তাঁর ওয়াজে গ্রীক দার্শনিকদের ধর্ম বিষয়ক ধ্যান-ধারণার নিন্দা করতেন। তিনি বলতেন, "কিছু লোক আসমানী গ্রন্থ পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছে এবং দার্শনিকদের অপূর্ণ ও কার্যানুপযোগী বাণীকে নিজেদের অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত করেছে। এসব লোক কি করে নাজাত লাভের আশা করতে পারে?" এরূপ খোলাখুলি নিন্দা জ্ঞাপনের ফলে বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন কিছু সংখ্যক 'আলিম তাঁর সম্পর্কে চরম আকারের বিদ্বেষ পোষণ

করতে থাকে। খাওয়ারিয্ম শাহ্ মওলানা ওয়ালাদের খুবই ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন বিধায় এরা তাঁর নিকট মওলানার পিতা সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ পেত না। আকস্মিকভাবে একদিন সুলতান মওলানা ওয়ালাদের যিয়ারতে আসেন এবং সেখানে আগন্তুকদের সাংঘাতিক ভীড় দেখতে পেয়ে তাঁর সফর-সঙ্গী একজন 'আলিম[১]কে বলেন ঃ দেখুন, মওলানার দরবারে লোকের কত ভীড়! ঐ আলিম এটাকে একটা মোক্ষম মুহূর্ত জ্ঞান করে বলে ওঠেন ঃ বাদশাহ যদি এর একটা ব্যবস্থা না নেন তাহলে সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেবার আশঙ্কা রয়েছে এবং ঐ অবস্থায় পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। কথাটা বাদশাহ্র মনে ধরে। তিনি জিজ্ঞেস করে জানতে চান, এমতাবস্থায় তিনি কোন্ পথ অবলম্বন করবেন? উল্লিখিত 'আলিম সংগে সংগে পরামর্শ দেন ঃ রাজকোষ ও দুর্গের চাবিগুলো মওলানা বাহাউদ্দীন ওয়ালাদ-এর খিদমতে পাঠিয়ে বলুন, "লোক সমাগম ও প্রয়োজনীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি সব কিছুই তো আপনার হাতে চলে গেছে। শাসন সংক্রান্ত বিষয়াবলীর মধ্যে আমার নিকট শুধু এই চাবিগুচ্ছই রয়েছে। অতএব, এগুলোও আপনার খিদমতে হাযির করা হ'ল।"[২]

এ কথা শোনার পর মওলানা বলেন : সুলতানকে গিয়ে আমার সালাম বলবে এবং এও বলবে, "ধ্বংসশীল এ পৃথিবীর সমস্ত ধনভাণ্ডার, গুপ্তধন, বিরাট দেশ ও তার বিশাল সেনাবাহিনী বাদশাহ্র পক্ষেই কেবল শোভা পায়। এ সবের সঙ্গে দরবেশের কি সম্পর্ক? আমি হৃষ্ট চিত্তে এখান থেকে চলে যাচ্ছি। বাদশাহ তাঁর লোকজন ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সুখের সঙ্গে রাজত্ব করুন। জুমু'আর দিন নির্ধারিত ওয়া'জ শেষে আমি চলে যাব।"

১. সাধারণ জীবনী গ্রন্থগুলোতে দেখা যায় যে, এ কথোপকথন ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর সঙ্গে হয়েছিল যিনি সুলতানের সফর-সঙ্গী ছিলেন। কিন্তু সাহিবু'ল-মছনবী প্রণেতার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে, এটি একটি ঐতিহাসিক ভ্রান্তি যা সাধারণ্যে প্রচলিত এজন্য যে, হযরত বাহাউদ্দীন ওয়ালাদ ৬০৯/৭১০ হিজরীতে বল্খ ত্যাগ করেছিলেন। পক্ষান্তরে ইমাম রাযী ৬০৬ হিজরীতে হেরাতে ইনতিকাল করেন, আর এখানেই তিনি মৃত্যুর কয়েক বছর আগে থেকে বসবাস করে আসছিলেন। মওলানা রূমের জীবনীকার বদী'উ'য-যামান ফ্রুযানফারেরও (যাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'যিন্দেগানী ও মওলানা জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ' সম্প্রতি ইরান থেকে প্রকাশিত হয়েছে) অভিমত হ'ল, এ বর্ণনা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য তাঁর এ অভিমতের পেছনে যুক্তি এই যে, বাহাউদ্দীন ওয়ালাদের হিজরত অধিকাংশের মতে ৬১০ হিজরীর ঘটনা, আর ইমাম ফখ্রুদ্দীন রাযী ৬০৬ হিজরীতে হেরাতে ইনতিকাল করেন (দ্র. ১৪ পৃ.) কাযী তালাম্মুয হুসায়ন মরহুম বলেন : সম্ভবত এই 'আলিমের নাম সায়্যিদ বাহাউদ্দীন রাযী হবে যিনি খাওয়ারিয্ম শাহীর নিকটজন ছিলেন এবং তাবাকাতে নাসিরী'র ৩৩৫ পৃষ্ঠায় তাঁর উল্লেখ রয়েছে —নদভী

২. বদী'উ'য-যামান ফ্রুযানফারের ধারণা এই যে, বাহাউদ্দীন ওয়ালাদের হিজরতের প্রকৃত কারণ খোরাসান ও ইরান অভিমুখে তাতারীদের অভিযান আশঙ্কা। এটা জানতে পেরে বড় বড় খান্দান, অভিজাত ব্যক্তি ও 'উলামায়ে কিরাম দেশত্যাগ করছিলেন এবং নিরাপদ স্থানের দিকে পাড়ি জমাচ্ছিলেন (দ্র. ১ পৃ.;)। —নদভী

বলখের অধিবাসীদের কানে এ খবর গিয়ে পৌঁছুতেই সারা শহরে বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এতে খাওয়ারিয্‌ম শাহ ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি দূত পাঠান। অতঃপর রাত্রিবেলা নিজেই উযীর সমভিব্যাহারে গিয়ে মওলানা বাহাউদ্দীন ওয়ালাদকে তাঁর বহির্গমন থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তাতে রাযী হননি। শেষাবধি তিনি তাঁকে অনুরোধ জানান, তিনি (মওলানা ওয়ালাদ) যেন এমনভাবে বেরিয়ে যান যাতে কেউ টের না পায়। অন্যথায় বিরাট গোলযোগ দেখা দিতে পারে। মওলানা এ অনুরোধে সম্মত হন। জুমু'আর দিন ওয়া'জ করেন এবং শনিবার দিন বল্‌খ থেকে বাগদাদের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। এ ওয়াজে তিনি খাওয়ারিয্‌ম শাহ্‌কে তাতার সেনাবাহিনীর আগমন সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

সুলতানু'ল-'উলামা বল্‌খ থেকে অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি যে শহরে গিয়েই উপস্থিত হন সেখানকার নেতৃস্থানীয় অভিজাত ব্যক্তিবর্গ ও 'আলিম-'উলামা শহরের বাইরে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে নিজ নিজ শহরে (ক্ষণকালের জন্য হলেও) নিয়ে আসেন। এভাবে বাগদাদ, মক্কা মু'আজ্জমা, দামিশ্‌কসহ বিভিন্ন স্থান ঘুরে অবশেষে তিনি মালাতিয়া গিয়ে পৌঁছেন। আকশিহর নামক স্থানে তিনি চার বছর অবস্থান করেন, পঠন-পাঠনে মগ্ন হয়ে পড়েন। অতঃপর আকশিহর থেকে লারিন্দা গমন করেন। এটি কাউনিয়ার অন্তর্গত একটি স্থান।

মওলানার কাউনিয়ায় উপস্থিতি

রূমের সুলতান 'আলাউদ্দীন কায়কোবাদের আগ্রহ ও অনুরোধে তিনি ৬২৬ হিজরীতে কাউনিয়ায় আগমন করেন। সুলতান নিজেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। মওলানা শাহীমহলের নিকট ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন এবং সুলতান অত্যন্ত বিনয় সহকারে তাঁকে গ্রহণ করেন। মওলানা কাউনিয়া মাদরাসায় অবস্থান করেন। সুলতান তাঁর অধিকাংশ অমাত্যসহ মওলানার মুরীদ হন।

হযরত বাহাউদ্দীন ওয়ালাদ দু'বছর কাউনিয়া অবস্থানের পর ৬২৮ হিজরীতে ইনতিকাল করেন।

এই গোটা সময়টাতেই মওলানা রূমী তাঁর পিতার সঙ্গী ছিলেন এবং জাহিরী ও বাতিনী 'ইল্‌ম তাঁরই নিকট থেকে হাসিল করতে থাকেন। বাইশ বছর বয়সে তিনি কাউনিয়া শহরে আগমন করেন এবং এ শহরই তাঁর আবাসস্থল ও দাফনগাহ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

সুলতানের গৃহ-শিক্ষক আমীর বদরুদ্দীন গহরতাশ তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও খোদাদাদ প্রতিভা লক্ষ্য করে তাঁর জন্য কাউনিয়ায় 'মাদরাসা-ই-খোদা-ওয়ান্দিগার' নামক একটি মাদরাসা নির্মাণ করেন এবং এজন্য বিরাট ভূ-সম্পত্তিও ওয়াক্‌ফ করেন।

সুলতান 'আলাউদ্দীন কায়কোবাদ মওলানাকে খুবই সম্মান করতেন এবং তাঁর সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। তিনি কাউনিয়ায় দুর্গ নির্মাণ করলে মওলানাকে সেখানে একদিনের জন্য হলেও বেড়িয়ে যাবার আবেদন জানান। মওলানা দুর্গ পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন :

"প্লাবন রোধ ও শত্রু প্রতিরোধে এ নিঃসন্দেহে একটি উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু মজলুম ও নিপীড়িত মানুষের তীররূপী কাতর ফরিয়াদ, যা হাজারো নয়, লাখো বুরূজ থেকে প্রতিদিন নির্গত হচ্ছে এবং বিশ্বকে ভারাক্রান্ত করে তুলছে, তার প্রতিকার সম্পর্কে কি আপনি কোন চিন্তা করেছেন? 'আদল ও ইনসাফের দুর্গ নির্মাণ করুন। এর ভেতরই বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা নিহিত।"

সুলতান মওলানার এ উপদেশে অত্যন্ত প্রভাবিত হন।

মওলানা বাহাউদ্দীন ওয়ালাদের ইনতিকালের পর তৎকালীন সুলতান, 'উলামায়ে কিরাম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ঐকমত্যে মওলানা রূমী স্বীয় পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি দর্‌স-তাদরীস তথা পঠন-পাঠন, তালকীন (ধর্মোপদেশ) ও ইরশাদের ধারা অব্যাহত রাখেন। তাঁর গৃহশিক্ষক সায়্যিদ বুরহানুদ্দীন মুহাক্কিক তিরমিযী তিরমিয চলে গিয়েছিলেন। মওলানা বাহাউদ্দীন ওয়ালাদের ইনতিকালের পর তিনিও কাউনিয়া আগমন করেন। মওলানা রূমী তাঁর মুরীদ হন এবং স্বীয় পিতার অবর্তমানে তাঁরই মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাধনার স্তরগুলো অতিক্রম করেন। নয় বছর তিনি তাঁর সাহচর্যে কাটান। ৬৩৭ হিজরীতে সায়্যিদ বুরহানুদ্দীন ইনতিকাল করেন।

মওলানার শিক্ষা সফর ও কর্মব্যস্ততা

৬৩০ হিজরীতে মওলানা অধিকতর শিক্ষা লাভ ও আধ্যাত্মিক ফয়েয হাসিলের জন্য সিরিয়া (শাম) সফর করেন এবং হলব (আলেপ্পো)-এ অবতরণ করেন। সুলতান সালাহুদ্দীন তনয় আল-মালিকু'জ-জাহির সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম কাযী বাহাউদ্দীন ইবনে শাদ্দাদের আন্দোলনের ফলে ৫৯১ হিজরীতে অনেকগুলো বড় মাদরাসা কায়েম করেছিলেন। এর ফলে হলবও দামিশ্‌কের মত জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

হলব-এ মওলানা মাদরাসা-ই-হালাবিয়ায় অবস্থান নেন এবং কামালুদ্দীন ইবনু'ল-'আদীম থেকে উপকৃত হন। মওলানা যদিও এখানে বিদ্যার্জনে ব্যাপৃত ছিলেন, তবু সিপাহসালারের ভাষায় যে সব জটিল সমস্যার সমাধান কেউ করতে পারত না, তার সমাধান তিনিই করে দিতেন এবং সে সবের এমন সব যুক্তি পেশ করতেন যা কোন কিতাবে লিপিবদ্ধ ছিল না।

হলব থেকে মওলানা দামিশক গমন করেন। সেখানে তিনি মাদরাসা-ই-মুকাদ্দাসিয়ায় অবস্থান করেন। দামিশকে সে সময় 'আলিম-'উলামার ভীড় লেগেই থাকত। সিপাহসালার লিখেছেন যে, দামিশকে শায়খ মুহ্‌য়িউদ্দীন ইব্‌নে 'আরাবী, শায়খ সা'দুদ্দীন হামুবী, শায়খ 'উছমান রূমী, শায়খ আওহাদুদ্দীন কিরমানী ও শায়খ সদরুদ্দীন কাওনবীর সাহচর্যে মওলানা তাঁর সময় অতিবাহিত করতেন। এখানে হাকীকত ও মা'রিফত বিষয়ে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হ'ত।

৬৩৪ কিংবা ৬৩৫ হিজরীতে তিনি দামিশ্‌ক থেকে ফিরে এসে কাউনিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সায়্যিদ বুরহানুদ্দীনের ইনতিকালের (৬৩৭ হি.) পর পাঁচ বছর পর্যন্ত তিনি বাহ্যত 'আলিম-'উলামার বেশ ধারণ করে সার্বক্ষণিকভাবে জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা দান কর্মে ব্যাপৃত থাকেন। ৬৩৮ হি'তে শায়খ মুহ্‌য়িউদ্দীন ইবনে 'আরাবী ইনতিকাল করেন। তাঁর চারপাশে জ্ঞান জগতের যে সব উজ্জ্বল নক্ষত্রের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁদের অধিকাংশই কাউনিয়ায় এসে সমবেত হয়েছিল। এঁদের মধ্যে শায়খ সদরুদ্দীনও অন্যতম। প্রাচ্য ভূখণ্ডের দিক থেকে যে সব 'আলিম-'উলামা ও বুযুর্গ সেখানকার ধ্বংসযজ্ঞের কারণে পেরেশান হয়ে রূমের দিকে রওয়ানা হতেন তাঁদের বেশির ভাগই পথিমধ্যে কাউনিয়াকেই তাঁদের আবাস ও আশ্রয়স্থল হিসাবে গ্রহণ করতেন। এভাবে কাউনিয়া সে যুগে 'মদীনাতু'ল-'উলামা'য় (জ্ঞানীদের শহর) পরিণত হয়। এসব 'আলিম-'উলামার মধ্যে মওলানার স্থান ছিল সবার উর্ধ্বে। সে যুগে মওলানা ঐ সব কাজই করতেন যা সাধারণত 'আলিম-'উলামা করে থাকেন অর্থাৎ পঠন-পাঠন, ওয়া'জ-নসীহত, ফতওয়া প্রদান ইত্যাদি। মওলানা বেশির ভাগ সময় শিক্ষা দান কার্যে ব্যাপৃত থাকতেন। তাঁর নিজের মাদরাসায়ই চার শ'র বেশি ছাত্র ছিল।

পঠন-পাঠন ছাড়াও মওলানা দ্বিতীয় যে কাজটি করতেন তা হ'ল ওয়া'জ বা বক্তৃতা দান। ফতওয়া দান ছিল তাঁর স্থায়ী কর্মের অন্তর্গত। বায়তু'ল-মাল থেকে মওলানার জন্য এক দীনার নির্ধারিত ছিল। একে তিনি সেই ফতওয়া প্রদানের পারিশ্রমিক হিসাবেই গণ্য করতেন। এ ব্যাপারে তিনি এতটা কঠোর ছিলেন যে,

যখন তিনি চরম অভাব-অনটনে পতিত হতেন এবং 'ইলমের মজলিসে গভীরভাবে ডুবে থাকতেন তখনও তাঁর নির্দেশ ছিল, যে মুহূর্তেই কোন ফতওয়া আসবে তাৎক্ষণিকভাবে যেন তাঁকে খবর দেয়া হয়। দোয়াত-কলম সব সময় তাঁর সাথেই থাকত।

অবস্থার বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন

৬৪২ হিজরী অবধি তাঁর ঐ একই অবস্থা ছিল। অতঃপর এমন সব ঘটনার সূত্রপাত হয় যার ফলে তাঁর জীবনে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আসে এবং তিনি মওলবী জালালুদ্দীন কাওনবী থেকে 'মওলানা-ই-রূমী'তে রূপান্তরিত হন। মওলানা শাম্‌স-ই-তাবরীয-এর মোলাকাত এবং তাঁর সত্তার সঙ্গে আসক্তি ও বিলুপ্তির ফলে মওলানার এই অবান্তর ঘটেছিল। তিনি স্বয়ং বলেছেন :

مولوی هرگزنه شدمولائے روم + تاغلام شمس تبریزی نه شد

(রূমের) মওলভী ততক্ষণ পর্যন্ত মওলানা রূম হতে পারেনি যতক্ষণ পর্যন্ত না সে শাম্‌স তাবরীযীর গোলামী কবুল করেছে।

শাম্‌স তাবরীয

শাম্‌স তাবরীয (মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মালিকদাদ)-এর দেশ ও বংশ পরিচয় কি? তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা অনেক অপবাদই তাঁর প্রতি আরোপ করেছিল। তন্মধ্যে একটি অপবাদ হ'ল তাঁর (শাম্‌স তাবরীযের) বংশ-পরিচয় অজ্ঞাত।[১]

نے در و اصل ونے نسب پیداست   می نه دانیم هم که اوزکجاست

না তাঁর আসল জানা যায়, না বংশ-পরিচয়; আমরা জানি না---তিনি কোথা থেকে এসেছেন।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, শৈশব থেকেই তিনি উন্নততর যোগ্যতা, প্রেমের আবেগ ও মুহব্বতের অধিকারী ছিলেন। 'মানাকি'বু'ল-'আরিফীন' নামক গ্রন্থে স্বয়ং তাঁর মুখেই বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন সাবালকত্বে উপনীত হননি, তখন থেকেই তিনি মহানবী (সা)-এর 'ইশ্‌ক-এ এমন মত্ত হয়ে থাকতেন যে, তিরিশ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাঁর আহার গ্রহণের ইচ্ছেটুকুও হ'ত না। জাহিরী বিদ্যা অর্জন সমাপ্তির পর

১. কতক ইতিহাসে আছে, তিনি হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ ইসমা'ঈলীর 'লাভিষিক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা জালালুদ্দীন হাসান যখন নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের পন্থা পরিত্যাগ করে সঠিক ইসলামী 'আকীদা অবলম্বন করেন এবং 'নও-মুসলিম' উপাধিতে মশহূর হন। কিন্তু এ বর্ণনা সন্দেহযুক্ত ও বিতর্কিত। দ্র. যিন্দেগানী মওলানা জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ-- পৃ. ৫৩-৫৪ (নদভী)।

তিনি শায়খ আবূ বকর সিল্লাবাফের নিকট মুরীদ হন। কতক বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি শায়খ 'ইয্যুদ্দীন সনজাসীর[২] মুরীদ ছিলেন। কতক বর্ণনায় অন্য নামের উল্লেখ আছে। হতে পারে যে, তিনি এঁদের সবার কাছ থেকেই ফয়েয লাভে ধন্য হয়েছিলেন।

এতসব সত্ত্বেও যখন তিনি তৃপ্ত হলেন না, তখন আল্লাহ্ওয়ালা মানুষের সন্ধানে চতুর্দিকে ঘুরতে শুরু করলেন। তিনি এরূপ সাধারণ বেশে সফর করতেন যে, স্বয়ং তাঁর বিলায়েত ও কামালিয়ত সম্পর্কে কেউ কিছু জানতেই পারত না। তিনি কালো পশমী কম্বল পরিধান করতেন এবং যেখানেই যেতেন সাধারণ সরাইখানায় অবস্থান করতেন এবং দরোজায় দামী তালা ঝুলিয়ে দিতেন, যাতে লোকে তাঁকে ধনী ব্যবসায়ী মনে করে। ঘরের ভেতর চাটাইয়ের বিছানা ছাড়া আর কিছুই থাকত না। সফরের আধিক্যের কারণে লোকে তাঁকে 'শাম্স পক্ষী' বলে ডাকত শুরু করেছিল। তিনি তাবরীয, বাগদাদ, জর্দান, রূম, কায়সারিয়া ও দামিশক সফর করেন। তিনি পায়জামার ফিতা বুনে বিক্রি করতেন এবং এটাই ছিল তাঁর জীবিকা অর্জনের মাধ্যম। খাদ্য গ্রহণের অবস্থা এ রকম ছিল যে, দামিশ্কে তিনি যে এক বছর অবস্থান করেন তখন সপ্তাহে এক পেয়ালা যবাইকৃত পশুর মাথার তৈরি শুরুয়া– তাও কোনরূপ তেল ছাড়া– পান করতেন। তাঁর সাহচর্যের বোঝা বহন করতে পারে এমন কাউকে তিনি পেতেন না। অধিকাংশ সময় তিনি দু'আ করতেন : প্রভু হে! আমাকে এমন কোন সঙ্গী জুটিয়ে দাও যে আমার সাহচর্যের ভার বইতে পারে।

মওলানার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বিরাট পরিবর্তন

মওলানা শাম্স তাবরীযীর শায়খ তাঁকে রূম যাবার নির্দেশ দেন এবং বলেন : সেখানে একটি দগ্ধ অন্তরের সাক্ষাৎ পাবে; তাঁকে আলোকিত করে এস। ৬৪২ হিজরীর ২৬শে জুমাদা আল-উখরার সোমবার তারিখে তিনি কাউনিয়া পৌঁছেন এবং সেখানে চিনি বিক্রেতাদের মহল্লায় অবস্থান করেন। একদিন দেখতে পেলেন, মওলানা পশুপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে আসছেন আর তাঁর চারপাশের লোকেরা তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে উপকৃত হয়ে চলেছে। শাম্স অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : রিয়াযত ও জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? মওলানা বললেন : আদব ও শরীয়ত সম্পর্কে

---

২. বদী'উ'য-যামান ফ্রুযানফার যয়নুদ্দীন সনজাসীর পরিবর্তে রুকনুদ্দীন সনজাসী লিখেছেন। তিনি লিখেছেন যে, সনজাস যুনজানের অধীনস্থ একটি জায়গা। পৃ. ৫৬; কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিতে তাঁর এই বর্ণনার বিশুদ্ধতা তর্কাতীত নয় (–নদভী)।

জ্ঞাত হওয়া। শাম্স বললেন : না, আসল লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া। এরপর তিনি হাকীম সানাঈ-এর নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন :

علم کزتو ترانه بستاند + جهل ازاں علم به بود بسیار

যে জ্ঞান তোমার অহংবোধকে তোমা থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না, সে জ্ঞানের চেয়ে মূর্খতাই উত্তম।

মওলানা এতে বিস্মিত হন। অপরদিকে শাম্সের তীর লক্ষ্যভেদে সক্ষম হয়।[১] মওলানা তাঁকে সংগে করে নিজের ঘরে নিয়ে আসেন এবং আফলাকীর ভাষায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে এক কামরায় থাকেন। ঐ সময় উক্ত কামরায় কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। সিপাহসালার বলেন ঃ ছয় মাস পর্যন্ত সালাহুদ্দীন যরকূবের কামরায় এ দু'জন বুযুর্গ একান্তে অতিবাহিত করেন। শায়খ সালাহুদ্দীন ব্যতিরেকে আর কারোরই উক্ত কামরায় প্রবেশাধিকার ছিল না।

শাম্স-এর সাক্ষাৎ মওলানাকে এক নতুন জীবন, নতুন চেতনা ও নতুন জগত দান করে। মওলানা নিজেই বলেন :

شمس تبریزی بما راه حقیقت بنمود + ماز فیض قدم اوست که ایمان داریم

শাম্স তাবরীযী আমাদেরকে হাকীকতের রাস্তা দেখিয়েছেন। এটা তাঁরই পদযুগলের ফয়েয যে, আমরাও আজ ঈমানের অধিকারী।

এতদিন পর্যন্ত মওলানা ছিলেন সে যুগের উস্তাদ ও শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গের আসনে আসীন। ছাত্র-শিক্ষক, জ্ঞানী-গুণী, সূফী-দরবেশ সবাই ছিল তাঁর অনগ্রহপ্রার্থী, তাঁর থেকে উপকৃত হতে আগ্রহী। কিন্তু আজ তিনি নিজেই অনুগ্রহপ্রার্থী আর শাম্স তাবরীয তাঁকে ইরশাদ ও ফয়েয প্রদানের মালিক। মওলানার সাহেবযাদা সুলতান ওয়ালাদ বলেন :

شیخ استاذ گشت نو آموز + درس خواندی بخدمتش هر روز

گرچه در علم فقر کامل بود + علم نو بود کو بوے به نمود

'আলিমদের শায়খ ও উস্তায নতুন করে শিক্ষার্থী সাজলেন; শাম্স-ই তাবরীযীর খেদমতে তিনি দৈনিক পাঠ গ্রহণ করতেন।

দরবেশীর 'ইলমে তিনি কামিল থাকা সত্ত্বেও তাঁকে একটি নতুনতর 'ইল্ম প্রত্যক্ষ করান।

---

১. সাহিবু'ল-মছনবীর বিভিন্ন বর্ণনা থেকে এ বর্ণনা বাছাই করা হয়েছে। এ বর্ণনা তাযকিরায়ে দওলত শাহ্‌র। পৃ. ১৯৬-৯৭; ফ্রুযানফার এ পর্যায়ে সমস্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করে এ ব্যাপারে তাঁর অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন এবং শাম্স-এর ব্যাপারে মওলানার প্রতিক্রিয়া ও উন্মত্ততার কারণ কোন একটি আকস্মিক ঘটনাকে অভিহিত করেননি, বরং আল্লাহ্‌ওয়ালা মানুষের অনুসন্ধান এবং 'ইশ্‌ক ও 'আশিকের সঙ্গে মওলানার প্রকৃতিগত সম্পর্ককেই উল্লেখ করেছেন।---দ্র. যিন্দেগানী মওলানা জালালুদ্দীন মুহ'াম্মাদ, ৬১ পৃ.।

খোদ মওলানা (র) তাঁর নিজের মুখেই এ সম্পর্কে বলেন :

زاهد بودم ترنه گویم کردی + سرفتنه بزم وباده جویم کردی

سجاده نشین باوقارے بودم + بازیچه کو دکاں کویم کردی

আমি ছিলাম দরবেশ, (তিনি) আমাকে গায়ক বানিয়ে দিলেন, বানিয়ে দিলেন মদ্যপায়ীদের সর্দার ও মদখোর মাতাল।

আমি ছিলাম মর্যাদাবান গদ্দীনশীন পীর; তিনি আমাকে অলি-গলিতে ক্রীড়ারত শিশুদের খেলনায় পরিণত করলেন।

ফল দাঁড়াল এই যে, শাম্‌স-ই-তাবরীযীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পর থেকে মওলানা শিক্ষা দান, ওয়া'জ-নসীহত সব কিছুই ছেড়ে দিলেন। তিনি বলেছেন :

عطار دوار دفتر پاره بودم + زدشت او زمانے می نشستم

چو دیدم نوح پیشانی ساقی + شدم مست وقلم هارا شکستم

আমি বুধ গ্রহের মত প্রতিটি মজলিসের আলোচ্য বিষয় ছিলাম। এবার অনেক কাল যাবত তার ময়দান থেকে বসে পড়েছি।

নূহ (আ)-এর মত ললাটধারী পানীয় পরিবেশনকারী (সাকী)-কে যখন দেখতে পেলাম তখন পাগল হয়ে গেলাম এবং কলমগুলো ভেঙে ফেললাম।

ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি

মওলানা যখন এভাবে অন্যান্য সব সম্পর্ক ছিন্ন করে প্রতিটি কথায় শাম্‌স তাবরীযীকে অনুসরণ ও অনুকরণ করতে লাগলেন, তখন বিষয়টি মওলানার শাগরিদ ও মুরীদদের নিকট ভীষণ পীড়াদায়ক ঠেকল। অতঃপর এ নিয়ে চারদিকেই আলোড়ন ও গুঞ্জরণের সৃষ্টি হ'ল। শাম্‌স-এর অবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণ তেমন ওয়াকিফহাল ছিল না। মুরীদদের ধারণা, "আমরা বছরের পর বছর ধরে মওলানার খেদমতে কাটিয়ে দিলাম, মওলানার কারামত দেখলাম, তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। অথচ আজ কোথা থেকে নাম-গোত্রহীন এক লোক এসে তাঁকে আমাদের মাঝ থেকে এমনভাবে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে গেল যে, তাঁর চেহারা দেখার সুযোগ থেকেও আমরা বঞ্চিত হয়ে গেলাম। তাঁর লেখাপড়া, শিক্ষা দান, ওয়া'জ-নসীহত সবই বন্ধ হয়ে গেল। এ লোক নিঃসন্দেহে কোন যাদুকর হবে, নয়ত প্রতারক। অন্যথায় তার কী সাধ্য যে, পর্বতসম এই ব্যক্তিত্বকে খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যায়!"

মোট কথা, সবাই শাম্‌স তাবরীযীর দুশমনে পরিণত হ'ল। তারা মাওলানার সামনে কিছু বলতে পারত না বটে, তবে তিনি একটু এদিক-সেদিক গেলেই তারা

শাম্‌সকে ভাল-মন্দ বলত এবং রাত-দিন এই ধান্ধায় ফিরত কখন ও কিভাবে হযরত শাম্‌স তাবরীযীকে সেখান থেকে বিতাড়িত করা যায় যাতে করে তারা পূর্বের মত মওলানার সাহচর্য লাভ করে ধন্য হতে পারে।

শাম্‌স-এর অন্তর্ধান

হযরত শাম্‌সুদ্দীন এসব লোকের গোস্তাখী নীরবে সইতে থাকেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মওলানার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণেই এসব লোক এভাবে মনঃক্ষুণ্ণ। কিন্তু তাদের আচরণ যখন সীমা লঙ্ঘন করল এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে, এবার গোলযোগ সৃষ্টির সমূহ আশংকা রয়েছে, তখন তিনি একদিন নীরবে নিঃশব্দে কাউনিয়া পরিত্যাগ করলেন। আফলাকী তাঁর এই প্রথম অন্তর্ধানের তারিখ ৬৪৩ হিজরীর ১লা শাওয়াল রোজ বৃহস্পতিবার বলে উল্লেখ করেছেন। সে হিসাবে প্রথমবার তিনি সোয়া বছরের মত কাউনিয়ায় অবস্থান করেন।

শাম্‌স-এর বিচ্ছেদ ছিল মওলানার কাছে অত্যন্ত কষ্টকর ও পীড়াদায়ক। মুরীদেরা যা ভেবেছিল– ঘটল তার উল্টোটি। শাম্‌স চলে যাবার পর মওলানা তাদের প্রতি কী মনোযোগ দেবেন, আগে যেটুকু দিতেন এখন তাও ছেড়ে দেবার উপক্রম হ'ল। কিছু সংখ্যক নাদানের কারণে সৎ ও বিশ্বস্ত লোকেরাও মওলানার সাহচর্য থেকে এভাবে বঞ্চিত হ'ল।

মওলানার অস্থিরতা এবং শাম্‌স-এর প্রত্যাবর্তন

সিপাহসালারের বর্ণনা মুতাবিক দামিশ্‌ক থেকে মওলানার নামে শাম্‌সুদ্দীনের পত্র না আসা অবধি এই বিচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্নতা বজায় ছিল। পত্র প্রাপ্তির পর মওলানার অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে এবং শাম্‌স-এর প্রতি আগ্রহ ও প্রেম তাঁকে 'সামা'র প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। তিনি সে সব লোকের প্রতি আগের মতই নেক নজর অব্যাহত রাখেন যারা শাম্‌স-এর বিরুদ্ধে কোনরূপ অসদাচরণ করেনি। ঐ সময় মওলানা হযরত শাম্‌স-এর খেদমতে পত্রাকারে চার লাইন কবিতা লিখে পাঠান। এতে তিনি নিজের অস্থিরতা এবং তাঁর প্রতি অপরিসীম আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন :

ایها النور فی الفواد تعال + غایة الوجد والمراد تعال

ایها السابق الذی سبقت + منك مصدوقة الوداد تعال

چوں بیائی زهے کشاد ومراد + چوں نیائی زهے کساد تعال

انت كالشمس اذ دنت ونات + يا قريبا على البعاد تعال

ওহে আলো! আমার হৃদয়ে এস; হে আমার প্রেম ও লক্ষ্যের শেষ গন্তব্যস্থল! এস।

এস, ওহে অগ্রগামী! তোমার দিক থেকে সত্যিকার প্রেম তো আগেই প্রকাশ পেয়েছে; অতএব আর দেরী নয়, এস।

যখন তুমি আসবে তখন তা হবে বিরাট বিজয় ও সাফল্য। যদি তুমি না আস, তাহলে সেটা হবে বিরাট ক্ষতি; অতএব তুমি এস।

তুমি তো সূর্যের মত দীপ্তিময়– চাই কাছে থাক আর দূরেই থাক। হে দূরবর্তী থেকেও নিকটবর্তী, এস।

ইতিমধ্যে গোলমাল কিছুটা স্তিমিত হয়ে যায়। অবকাশ ও প্রসন্নতা লাভের পর লোকেরা শাম্স-এর বিরোধিতা পরিত্যাগ করে। মওলানা শাম্সকে ফিরিয়ে আনবার উপায় খুঁজে বের করেন। পুত্র সুলতান ওয়ালাদকে ডেকে বলেন ঃ তুমি আমার পক্ষ থেকে শাহ্-ই-মকবুলের দিকে ছুটে যাও এবং এটা নিয়ে গিয়ে তাঁর পায়ের ওপর উৎসর্গ কর–আর আমার হয়ে বল, যে মুরীদেরা গোস্তাখী করেছিল তারা সকলেই খোলা মনে তওবা করেছে এবং আশা করছে, যেসব অন্যায় ও ত্রুটি হয়ে গেছে তা যেন মাফ করে দেওয়া হয়। এবার দয়া করে তিনি যেন এদিকে পা ফেলেন। তিনি তার হাত দিয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ :

كه ازاں دم كه تو سفر كردى + از حلاوت جدا شديم چو موم
همه شب چو شمع مے سوزيم + ز آتشش جفت و زا انگبين محروم
در فراق جمال تو مارا + جسم و يران و جان از و چوں بوم
هاں عنان رابديں طرف برتاب + زفت كن پيل عيش را خرطوم
بے حضورت سماع نيست حلال + همچو شيطان طرب شده مرجوم
يك غزل بے تو هيچ گفته نشد + تارسيدآں مشر فه مفهوم
پس بذوق سماع نامه تو + غزل پنج وشش بشد منظوم
شامم از تو چو صبح روشن باد + اے بتو فخر شام و ارمن وروم

যে মুহূর্তে তুমি এখান থেকে চলে গেছ, আমি মোমের মত গলে গেছি, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি জীবনের সকল স্বাদ ও আহলাদ থেকে।

সারা রাত আমি মোমবাতির মত জ্বলতে থাকি; আগুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলেও মধুর স্বাদ থেকে বঞ্চিত আমি।

তোমার সৌন্দর্য সুখ থেকে বঞ্চিত হবার কারণে আমার দেহ-মন পেঁচকের মত বিরান হয়ে গেছে।

একটু এদিকে তোমার অশ্বের গতি ফেরাও; আমার জীবনের হস্তীশুণ্ডকে একটু

মযবূত কর।

তোমার উপস্থিতি ব্যতিরেকে সামা'র মজলিস বৈধ নয়; আমার জীবন মালঞ্চের ওপর শয়তানসদৃশ বোঝা চেপে বসেছে।

তোমা ব্যতিরেকে কোন গযলই গীত হয়নি, এমতাবস্থায় মুবারক লিপি এসে পৌঁছল।

তোমার পবিত্র লিপি শোনার আনন্দে পাঁচ-ছ'টি কাব্য লিখে ফেলেছি।

তোমার সন্দর্শনে আমার সন্ধ্যাও যেন ভোরের ন্যায় আলোকিত হয়ে ওঠে।

ওহে! যাঁর সত্তার জন্য শাম, আরমান ও রোম গর্বিত।

সুলতান ওয়ালাদ হযরত শাম্‌সকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে কাউনিয়া নিয়ে আসেন।

শাম্‌স-এর দ্বিতীয় দফা অন্তর্ধান

হযরত শাম্‌স-এর কাউনিয়া প্রত্যাবর্তনে মওলানার খুশির সীমা ছিল না। যে সমস্ত লোক গোস্তাখী করেছিল তারা সবাই এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে। বেশ কিছুকাল উভয়ের এই নির্মল সাহচর্য অব্যাহত থাকে। ইতিমধ্যে হযরত শাম্‌স-এর সঙ্গে মওলানার ঐক্য ও ঘনিষ্ঠতা পূর্বের তুলনায় আরো বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সুখ ও সৌভাগ্য বেশি দিন টিকল না। আবার আবিলতা ও মালিন্যের উপকরণ জমে উঠতে লাগল। মওলানার কামরার নিকটই সুফফা দালানের একদিকে হযরত শাম্‌স অবস্থান করতেন। শাম্‌স সেখানে তাঁর স্ত্রীসহ বসবাস করতেন। কাউনিয়াতেই তিনি এ বিয়ে করেন। মওলানার মেজোপুত্র (চিল্পী 'আলাউদ্দীন) যখন মওলানার ঘরে যেতেন তখন এদিক দিয়েই যেতেন। কিন্তু এদিক হয়ে তাঁর এ যাওয়া-আসা মওলানা শাম্‌সুদ্দীন তাবরীযী পছন্দ করতেন না। তিনি কয়েকবার তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ-কোমল কণ্ঠে কথাটি বোঝাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তা উল্টো 'আলাউদ্দীনের মনঃকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হযরত শাম্‌সুদ্দীন সুলতান ওয়ালাদকে বেশি স্নেহ করেন– এটাও ছিল তাঁর মর্মপীড়ার অন্যতম কারণ। চিল্পী 'আলাউদ্দীন বিষয়টি নিয়ে অন্যদের সঙ্গেও আলোচনা করেন। যে সমস্ত লোক এ ধরনের একটি সুযোগের অপেক্ষা করছিল তারা এর ওপর আরো একটু রঙ চড়ায়। তারা বলতে থাকে : বেশ তো লোক! কোথাকার কে, জানা নেই– শোনা নেই,হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। মওলানার ঘর দখল করে তাঁর ছেলেকেই ঘরে আসতে দিচ্ছে না!

হযরত শামসুদ্দীন কেবল বিনয় ও সহিষ্ণুতার কারণে এতদিন এ বিষয়ে মওলানার সঙ্গে কোন আলাপ করেননি। কিন্তু পরিস্থিতি যখন সীমা অতিক্রম করল তখন তিনি সরাসরি সুলতান ওয়ালাদকে বললেন : ঐসব লোকের আচরণে এটা বুঝতে পারছি যে, এবার এমনভাবে অন্তর্ধান করতে হবে যাতে কেউ আর আমার খোঁজ না পায়। মওলানার কতক গযল থেকে পরিষ্কার প্রতিভাত হয় যে, তিনিও এ ব্যাপারে অবহিত ও আশংকিত ছিলেন এবং কবিতার মাধ্যমে এর থেকে বিরত হবার জন্য শায়খের কাছে অনুনয়-বিনয় করেছিলেন।

যা-ই হোক, হযরত শামসুদ্দীন-এর বিরুদ্ধে লোকের মন-মানসিকতা পুনরায় তুঙ্গে ওঠে। তিনি নিজেও অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন। একদিন দেখা গেল যে, তিনি অকস্মাৎ অন্তর্ধান করেছেন।[১]

نا گہاں گم شد از میان همه + تارو داز دل اندهان همه

অকস্মাৎ তিনি সবার মাঝ থেকে হারিয়ে গেলেন যাতে করে অন্তর-মন থেকে সর্বপ্রকার অস্থিরতা খতম হয়ে যায়।

মওলানার অস্থিরতা

সকাল বেলা মওলানা যখন মাদরাসায় এসে শাম্‌সকে ঘরে পেলেন না– তখনই চিৎকার করে ওঠেন এবং সুলতান ওয়ালাদের ঘরে গিয়ে তাঁকে ডেকে বলেন :

"بہاو الدین چه خفته؟ بر خیز وطلب شیخت کن که باز مشام جاں را از فوائح لطف او خالی می یا بیم"

আরে বাহাউদ্দীন! শুয়ে রয়েছ কেন? ওঠো, স্বীয় শায়খ-এর অনুসন্ধান কর। আমি আমার অন্তরের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে তাঁর মেহেরবানীর সুরভি থেকে বঞ্চিত পাচ্ছি।

দু'তিন দিন যাবত তিনি চতুর্দিকে অনুসন্ধান করতে থাকেন। কিন্তু কোথাও হযরত শাম্‌স-এর সন্ধান পাওয়া গেল না। এবারে মওলানা শাম্‌স-এর অন্তর্ধানে

১. কতক লোক বলেছেন, কাউনিয়াতে কিছু লোক হযরত শাম্‌সকে হত্যা করেছে। মওলানা বলেন ঃ يَفْعَلُ اللّٰه مَايَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ অর্থাৎ আল্লাহ যা চান তাই করেন এবং তিনি তাঁর ইচ্ছা মাফিক ফয়সালা দেন। কিন্তু ফ্রুয়ানফার তাঁর অন্তর্ধানের পশ্চাতে সেই কারণটিকেই অগ্রাধিকার দিয়ে বলেছেন যে, সুলতান ওয়ালাদই তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও নিকটজন ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তার বর্ণনাই সর্বাধিক বিশ্বাসযোগ্য। এজন্য শাম্‌স-এর হত্যা সম্পর্কিত বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এর থেকে এ প্রমাণও মেলে যে, যদি শাম্‌সকে হত্যাই করা হ'ত এবং মওলানা যদি তা জানতে পারতেন তাহলে তাঁর সন্ধানে তিনি এতটা চিন্তান্বিত হতেন না। (যিন্দেগানী–৮৩-৮৪ পৃ.–নদভী)।

মওলানা রূমীর অবস্থা আগের তুলনায় আরো বেশী পরিবর্তিত হয়ে যায়।

شیخ گشت از فراق او مجنون + بے سر وپاز عشق او چو ذو النون

শায়খ (মওলানা রূমী) তাঁর বিচ্ছেদে ব্যথায় পাগল হয়ে যান এবং তাঁর প্রেমে যু'ন-নূন মিসরীর মত দিশেহারা হয়ে পড়েন।

যে সমস্ত লোকের কারণে তাঁর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল মওলানা তাদের সবাইকেই তাঁর (মওলানা রূমীর) নিজের সাহচর্য থেকে বের করে দেন। এবার তিনি গযল গাওয়া ও সামা মাহফিলেই সময় ব্যয় করতে শুরু করেন। এ ঘটনা ৬৪৫ হিজরীর।

হযরত শাম্‌স (র) গায়েব হয়ে যাবার পর মওলানা দু'দিন চতুর্দিকে তাঁর তালাশ করেন। কোনভাবেই যখন তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল না– তখন তাঁর নিজের অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। সামা'র তরীকা (পন্থা-পদ্ধতি) তো তিনি প্রথমেই এখতিয়ার করেছিলেন। এখন তাঁর অবস্থা হ'ল, সামা' ভিন্ন তিনি একটি মুহূর্তেও অতিবাহিত করতে পারেন না। মাদ্‌রাসায় তিনি টহল দিয়ে ফিরতেন এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে শোরগোল করতেন, করতেন ফরিয়াদ। এ সময় তিনি হযরত শাম্‌স-এর বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় অনেকগুলো মর্মস্পর্শী গযল রচনা করেন। তাঁর বেদনা-বিধূর গযলগুলোর অধিকাংশই এ সময়ের রচনা।

এসব অস্থিরমনা ও চিত্ত-চাঞ্চল্য সত্ত্বেও মওলানার মন থেকে এ চিন্তা ও চেতনা কিন্তু একেবারে মুছে যায়নি যে, রোমকদের গৃহযুদ্ধ, মিসরীয়দের তুর্কতাযী এবং তাতারীদের ধ্বংসকর অভিযানের কারণে গোটা দেশই যেখানে তছনছ হয়ে যাচ্ছে, সে ক্ষেত্রে এই অশুভ ক্ষণে না জানি হযরত শাম্‌স-এর কি হয়েছে।

হযরত শাম্‌সুদ্দীনের গায়েব হয়ে যাবার পর তাঁকে পাবার আকাঙ্খায় মওলানার অবস্থা হয়েছিল এরূপ যে, যদি কোন লোক মিছেমিছিও বলত যে, সে হযরত শাম্‌সকে অমুক জায়গায় দেখেছে অমনি মওলানা নিজের পরিহিত পোশাক খুলে তাকে দিয়ে দিতেন এবং শুকরিয়া আদায় করতেন।

সিরিয়া সফর ও সান্ত্বনা লাভ

এরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনার মাঝে মওলানা একদিন সিরিয়া সফরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর সঙ্গী-সাথীরাও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। এভাবেই তিনি দামিশ্‌ক পৌঁছেন এবং সেখানকার মানুষের অন্তর-মানসে প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দেন। সকল লোকই বিস্ময়াপন্ন হ'ত, এরকম একজন 'আলিম ও ফাযেল ব্যক্তি

কেন এরূপ দেওয়ানাপ্রায় হচ্ছেন? শামস তাবরীয আসলে বস্তুটা কী যাঁর পেছনে এরূপ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মাথা কুটে মরছেন!

দামিশ্‌কে যখন শাম্‌স-এর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না তখন মওলানা বললেন : আমি আর শাম্‌স দু'জন নই। তিনি যদি হন সূর্য তাহলে আমি তার আলোক-বিন্দু; আর তিনি যদি হন সমুদ্র তাহলে আমি তার (পানির) ফোঁটা। আলোক-বিন্দুর অস্তিত্ব তো সূর্য থেকেই আর পানির ফোঁটার যে আর্দ্রতা তার উৎসও তো সমুদ্রই। তাহলে আর পার্থক্যটা রইল কি? কয়েকদিন পর সিরিয়া (শাম) থেকে তিনি রূমের দিকে রওয়ানা হন।

অতঃপর কয়েক বছর তিনি কাউনিয়া অবস্থান করেন। এখানে তাঁর প্রেমাবেগ পুনরায় উথলে ওঠে। কিছু লোক সাথে করে তিনি আবার সিরিয়া পানে রওয়ানা হন। এরপর কাউনিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। এবারে তিনি এই ধারণা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন, আমিই শাম্‌স তাবরীয। শাম্‌স তাবরীযীর অনুসন্ধান আর কিছুই ছিল না, বরং নিজেকেই খুঁজে ফিরছিলাম আমি। এবার তিনি এই ধারণা নিয়ে ফিরে আসেন যে, শাম্‌স-এর ভেতর যা কিছু ছিল, স্বয়ং আমার মধ্যেও তা বর্তমান।

এবার দামিশ্‌ক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মওলানা হযরত শাম্‌স-এর সঙ্গে মিলিত হবার ব্যাপারে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু যে অবস্থা তিনি শাম্‌স-এর মাঝে প্রত্যক্ষ করতেন– তা তিনি নিজের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করতে থাকেন।

শায়খ সালাহুদ্দীন যরকূব

দামিশ্‌ক থেকে দ্বিতীয় দফা প্রত্যাবর্তনের পর মওলানা কিছুদিন চুপচাপ থাকেন। এরপর তিনি শায়খ সালাহুদ্দীনকে তাঁর গুপ্তভেদের সঙ্গী ও খলীফা বানান। ৬৪৭ হিজরীতে তিনি তাঁকে স্বীয় বিশিষ্ট সহচর নিযুক্ত করেন এবং হযরত শাম্‌সুদ্দীনের পরিবর্তে তাঁকেই স্বীয় সহযোগী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেন।[১]

شه صلاح الدین زبعد شمس دین + گشت اور اندریں درزش معین
حال وقالش از وجودش می فزود + سر هائے نادر ازوے می شنود

---

১. ফ্রুযানফার বলেন : مولانا ار دیدار شمس نومید گشت بتمامی دل وهمگی همت روئے در صلاح آور داد راشیخی وخلیفتی – وسر لشکری جنود اللّه" منصوب فرمود دیاراں را باطاعت دے مامور ساخت . صہ ۹۲ (ندوی)

শাহ সালাহুদ্দীনই শাম্‌সুদ্দীন তাবরীযীর এ কাজে তাঁর সাহায্যকারী হন। তাঁর হাল-চাল, কাজ-কর্ম ও কথাবার্তায় তাঁর উন্নতি ঘটে; তাঁর থেকে অনেক বিস্ময়কর গুপ্ত কথা তিনি শোনেন।

শায়খ সালাহুদ্দীন কাউনিয়ার নিকটবর্তী একটি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। গরীব পিতামাতার সন্তান ছিলেন। তিনি ছিলেন মৎস্যজীবী। অবশ্য সালাহুদ্দীন নিজে স্বর্ণকারের পেশা গ্রহণ করেন। প্রথম থেকেই তিনি আমানতদারী, সততা ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে মশহূর ছিলেন। সায়্যিদ বুরহানুদ্দীন যখন কাউনিয়ায় আসেন, তখন তিনি তাঁর মুরীদ হন এবং তাঁর দরবারে বিশিষ্ট আসন লাভ করেন। সায়্যিদ বুরহান উদ্দীনের ইনতিকালের পর তিনি মওলানার হাতে নতুন করে বায়'আত হন। মৃত্যুর দশ বছর পূর্বে তিনি মওলানার এরূপ নৈকট্য লাভ করেন যে, এই দশ বছর তিনি তাঁর বিশিষ্ট খলীফা হিসাবেই কাটান। ৬৫৭ হিজরীতে ১লা মুহাররাম তারিখে শায়খ ইনতিকাল করেন।

শায়খ যরকূবের সান্নিধ্যের কারণে পুনরায় গোলযোগ দেখা দেয়। এবার লোকের অভিযোগ ছিল যে, এর চেয়ে শাম্‌স তাবরীযীই বরং ছিলেন ভাল। তিনি আর যা-ই হোন, একজন 'আলিম তো নিশ্চয়ই ছিলেন। আর এ লোক হচ্ছে এখানকারই অধিবাসী। সবাই তাকে একজন সাধারণ লোক হিসাবে জানে। জীবনভর গহনার নকশা খোদাই করেছে, আর এখন মওলানার বন্ধু হয়ে বসেছে। আশ্চর্য লাগে যে, মওলানা নিজে এত বড় সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এমন একজন লোককে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কেন এতটা বাড়াবাড়ি করেন! শায়খ এসব শোনার পর বলেন ঃ লোকের মনঃকষ্টের কারণ যে, মওলানা কেন আমাকে সবার মাঝে বৈশিষ্ট্য দান করলেন। কিন্তু তারা আসল কথা বুঝতে পারছে না যে, মওলানা নিজেই নিজের 'আশিক। আমি তো একটা বাহানামাত্র।[১]

দশ বছর পর্যন্ত মওলানাকে সাহচর্য প্রদানের পর শায়খ হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পহেলা মুহাররাম পরিপূর্ণ আত্মিক প্রশান্তির সাথে এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেন।

১. বদী'উ'য-যামান ফ্রুযানফার "যিন্দেগানী মওলানা জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ" নামক পুস্তকে লিখছেন : "مولانا بکوری چشم منکران حسود، دیده بر صلاح الدین گماشت وهمان عشق و دل باختگی که باشمس داشت بادے بنیاد نهاد و از انجا که صلاح الدین مردے و رام و نرم و جذب و ارشادش بنوع دیگر بود شورش وانقلاب مولانا آرام تر گردید و از بے قراری بقرار باز آمد و برائے شکستن خمار هجران شمس از پیمانه و جود وطلب هائے سبک می نو شید"
- صـ ۲ - ۱۵۲

চিল্পী হুসামুদ্দীন

শায়খ সালাহুদ্দীনের ইনতিকালের পর মওলানা চিল্পী[১] হুসামুদ্দীন ইবনে আখী তুর্ককে স্বীয় নায়েব ও খলীফা নিযুক্ত করেন। চিল্পী হুসামুদ্দীন ছিলেন মওলানার বিশিষ্ট মুরীদদের অন্যতম এবং মওলানার ইনতিকালের পর এগার বছর পর্যন্ত তিনি মওলানার খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মূলত তুর্ক ও দেশীয় হিসাবে আরামীয় ছিলেন। রূমের মশহূর ও প্রভাবশালী খান্দান "আখী"-র সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন তিনি।[২]

হযরত শাম্‌সুদ্দীন তাবরীযী ও শায়খ সালাহুদ্দীনেরও তিনি মুরীদ ছিলেন। তাঁদের থেকেও তিনি উপকৃত হয়েছিলেন।

হযরত হুসামুদ্দীন চিল্পী তাঁর সমস্ত গোলাম ও কর্মচারীকে প্রকাশ্যে বলে রেখেছিলেন, তারা যেন নিজেদের মর্জি মতই কাজ করে। আস্তে আস্তে তিনি তাঁর মালিকানাধীন সমস্ত সম্পত্তি মওলানার খিদমতে ব্যয় করে ফেলেন। শেষে তিনি গোলামদেরকেও আযাদ করে দেন। মওলানাকে তিনি এতটা সম্মান করতেন যে, কোনদিন তিনি মওলানার ওযূখানায় ওযূ করতেন না। তীব্র ঠাণ্ডা ও শীত, গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ পড়ছে, এতদসত্ত্বেও তিনি ঘরে গিয়ে ওযূ করে আসতেন। অপর দিকে তাঁর সঙ্গে মওলানার আচরণও ছিল এমনি যে, বহিরাগত কোন দর্শক তা দেখার পর খোদ মওলানাকেই মুরীদ ভেবে বসত।[৩]

মছনবী প্রণয়ন

মছনবী শরীফ প্রণয়ন এ যুগের একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এতে হযরত হুসামুদ্দীনের ক্রমাগত তাকীদ ও চাপের একটি বিরাট ভূমিকা ছিল। যদি বলা হয় যে, মছনবী শরীফের অস্তিত্ব লাভ ঘটেছিল তাঁরই কারণে তাহলে সম্ভবত বেশী বলা হবে না।[৪]

১. তুর্কী ভাষায় চিল্‌পী— আরবী সীদী শব্দের সমার্থক।
২. ফ্রুযানফার তাঁর জন্ম তারিখ ৬২২ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন।
৩. মওলানা যা কিছু পেতেন–সবই চিল্‌পীর নিকট পাঠিয়ে দিতেন। যে মজলিসে চিল্‌পী থাকতেন না সে মজলিসে মওলানার স্বভাবে জোশ ও উত্তাপ সঞ্চারিত হ'ত না। তাই তিনি সেখানে আধ্যাত্মিকতার গুপ্ত-রহস্য ও মা'রিফত সম্পর্কে কোন আলোচনাই করতেন না। যাঁরা এ সত্য সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন তাঁরা মজলিসে হযরত চিল্‌পীকে হাযির রাখতে অধিক যত্নবান হতেন যাতে করে আধ্যাত্মিক ফয়েযের স্রোত প্রবাহিত হয়। (দ্র. যিন্দেগানী–পৃ. ১০৫) –নদভী।
৪. ফ্রুযানফার লিখেছেন যে, চিল্পী হুসামুদ্দীনের আহবান ও ফরমায়েশ অনুসারেই মছনবী রচিত হয়। তিনি আরও লিখেছেন যে, চিল্পী দেখতে পেতেন যে, মওলানার বন্ধু-বান্ধব ও সম্পর্কিত জনেরা শায়খ 'আত্তার ও সানা'ঈর রচিত গ্রন্থ ও কথামালা অধ্যয়নে মগ্ন থাকেন। মওলানার গীত গযলের যদিও ভাণ্ডার ছিল, কিন্তু তাসাওউফের হাকীকত ও সুলূক (আধ্যাত্মিক পথ)-এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম (পরবর্তী পৃ. দ্র.)

সাথী নির্বাচনের কারণ

মওলানা কোন না কোন সাথী ব্যতিরেকে আরাম পেতেন না। শামসুদ্দীনের পর সালাহুদ্দীন এবং সালাহুদ্দীনের পর হুসামুদ্দীন তাঁর গুপ্ত-রহস্য সঙ্গী ও অন্তরঙ্গ সাথী ছিলেন, বরং এ সিলসিলা যদি আরো বাড়ানো যায় তাহলে পরিষ্কার দেখা যাবে যে, সায়্যিদ বাহাউদ্দীন তিরমিযীও এ দলে শামিল যদিও তিনি ভিন্ন অবস্থান থেকে এ দলে এসেছিলেন। সায়্যিদ বাহাউদ্দীন তিরমিযীর ইনতিকাল এবং হযরত শাম্‌স-এর আগমন মধ্যবর্তী পাঁচ বছর মওলানা এমনভাবে অতিবাহিত করতেন যাতে মনে হ'ত, এ সময় তিনি একটা কিছুর ঘাটতি অনুভব করছেন। এর থেকে যে ফলাফল বেরিয়ে আসে তা হ'ল এই যে, মওলানার ভেতর যে কামালিয়াত প্রচ্ছন্ন ছিল সে সবের প্রকাশের জন্য কোন না কোন আন্দোলক ও উৎসাহদাতার প্রয়োজন ছিল। তাঁর রচিত "দীওয়ান" ও "মছনবী" এসব প্রচ্ছন্ন আন্দোলনেরই সাক্ষী। কেবল হুসামুদ্দীনের অন্যমনস্কতার কারণে মছনবী শরীফের রচনা দু'বছর বন্ধ থাকে।

মওলানা কোন লোককে তাঁর কাশ্‌ফ ও কারামতের কারণে সাহচর্যের জন্য নির্বাচিত করেন নি। এ ক্ষেত্রে তাঁর অভিমত ছিল, মুহব্বতের কারণে সহজাতিত্ব। মওলানা নিজে তাঁর পুত্র সুলতান ওয়ালাদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "সম্পর্কের দিক দিয়ে এক জাতিত্বের কারণেই তাঁকে আমি বিশিষ্ট বন্ধু হিসাবে জানি।" তিনি আরও বলেছেন : যে প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টি হয় সম্পর্কের কারণে

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর) বিষয়ের তুলনায় তার বেশির ভাগই ছিল মওলানার উত্তপ্ত প্রকৃতি ও প্রেমের উচ্ছাসে ভরপুর। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। এক রাত্রে মওলানাকে একাকী পেয়ে হাদীকা, সানা'ঈ কিংবা মানতি'ক্‌'ত'-ত'ায়র-এর ঢঙে একটি কিতাব প্রণয়নে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন। এ কথ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর পাগড়ীর ভেতর থেকে একটি কাগজ বের করেন। এতে ১৮টি কবিতা লিখিত ছিল। এর প্রথম চরণটি ছিল তাই যদ্দারা মছনবীর সূচনা হয়েছে।

بشنواز نے چوں حکایت می کند + وزجدائی ها شکایت می کند

"বাঁশীর বিরহ সুর লক্ষ্য করে শোন সে কিরূপ (হৃদয়গ্রাহী) সুর (বিরহ জ্বালা) ব্যক্ত করে"-- (এখানে বাঁশী অর্থ মানুষের রূহ)। শেষ চরণ ছিল ঃ پس سخن کوتاه باید والسلام "ব্যস! কথা সংক্ষিপ্ত করাই উচিত।-- ওয়াসসালাম।"এটাই ছিল মছনবী রচনার সূচনা। মওলানা তাঁর মুখ দিয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে কবিতা আবৃত্তি করতেন আর মওলানা হুসামুদ্দীন তা লিখে যেতেন। লিখে নেবার পর হুসামুদ্দীন তা সজোরে মিষ্টি সুরে পাঠ করতেন। কখনো সারারাত এতে কাবার হয়ে যেত। মছনবী রচনার কাজ সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত চলত।

মছনবী ১ম খণ্ড সমাপ্ত হতেই হুসামুদ্দীনের স্ত্রী-বিয়োগ ঘটে এবং তাঁর ওপর এর গভীর প্রতিক্রিয়া পড়ে। শোকে তিনি পাগল-প্রায় হয়ে যান। তাঁর এই অপ্রকৃতিস্থ অব'াদৃষ্টে মওলানাও হঠাৎ বিমূঢ় হয়ে যান। ফলে দু' বছর মছনবীর কাজ বন্ধ থাকে। এরপর পুনরায় হুসামুদ্দীনের তাগাদা প্রদান ও চাপ সৃষ্টির ফলে মছনবীর কাজ শুরু হয় এবং মওলানার ওফাত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। ১৫ বছর এ কাজ চলেছিল (যিন্দেগানী মওলানা জালালুদ্দীন মুহাম্মদ -১১৬-১৮ পৃ.)-নদভী।

তার পরিণতিতে লজ্জিত হবার কিছু নেই। প্রকৃত ভালবাসা ও সম্পর্ক সৃষ্টির দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও লজ্জিত হতে হয় না। সেজন্যই কিয়ামতের ময়দানে হিসাব-নিকাশে আটকে পড়া লোকগুলো অভিলাষ জাহির করবে, يَالَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيْلاً "হায়! আমি যদি অমুককে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করতাম।"

মুত্তাকী প্রেমিকদের গুণাবলী হবে নিম্নরূপ ঃ

اَلْاَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلاَّ الْمُتَّقِيْنَ .

বন্ধুজনেরা পরস্পরের দুশমন হবে সেদিন; একমাত্র মুত্তাকীরাই হবে এর ব্যতিক্রম।

মওলানা নিজে বলেন :

موجب ایمان نه باشد معجزات + لیك جنسیت بود جذب صفات

মু'জিযা ঈমানের কারণ হয় না, বরং স্বজাতিত্বের মিল গুণাবলী আত্মস্থ করবার মাধ্যম হয় (অর্থাৎ পারস্পরিক সম্পর্ক একের গুণ অন্যের মাঝে সংক্রমিত করে)।

সিপাহসালার বলেন ঃ মওলানার ইনতিকালের চল্লিশ দিন পূর্ব থেকেই কাউনিয়ায় ভূমিকম্প হচ্ছিল। আফলাকীর বর্ণনা মুতাবিক মওলানা শয্যাগত থাকাকালে সাতদিন উপর্যুপরি ভূমিকম্প হয়। অত্যধিক ভূমিকম্পের কারণে লোকেরা হাঁপিয়ে ওঠে এবং মওলানার সাহায্যপ্রার্থী হয়। এতে মওলানা বলেন : যমীন ক্ষুধার্ত, সে এখন খাবার চায়। সত্বরই সে তা পাবে আর তোমাদের কষ্টেরও অবসান ঘটবে। সে সময় তিনি নিম্নোক্ত গযল গেয়েছিলেন :

بااین همه مهر و مهربانی + دل می دہدت که خشم رانی
دین جمله شیشه هائے جانرا + درهم شکنی به لن ترانی

তোমার সেই করুণা ও কৃপা সত্ত্বেও অন্তর-মন তোমাকে ক্রোধান্বিত হবার অনুমতি দিচ্ছে, আর অনুমতি দিচ্ছে 'লান তারানী' (তুমি আমাকে কখনো দেখতে পারবে না) বলে এই সব প্রাণের দর্পণ চূর্ণ করবার।

চিল্পী হুসামুদ্দীন বলেন ঃ একদিন শায়খ সদরুদ্দীন দরবেশ-শ্রেষ্ঠদের সমভিব্যাহারে রুগ্ন মওলানাকে দেখতে আসেন। মওলানার অবস্থাদৃষ্টে তাঁরা ব্যথিত হন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর রোগ মুক্তির জন্য দু'আ করেন। সেই সঙ্গে তাঁরা মওলানার পরিপূর্ণ সুস্থতা ফিরে পাবার ব্যাপারেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এতে মওলানা বলেন ঃ এখন আরোগ্য লাভ আপনার জন্যই বরকতময় হোক! প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মাঝে অন্তরায় হিসাবে চুলের ন্যায় সরু ও চিকন একটি

আবরণ রয়ে গেছে। আপনি কি চান না যে, সেটা উঠে যাক এবং নূর নূরের সাথে গিয়ে মিলিত হোক।

রোগাক্রান্ত অবস্থায় তিনি নিম্নোক্ত গযল শুরু করেন। হুসামুদ্দীন চিল্পী তা লিখছিলেন আর কাঁদছিলেন।

روسر بنه ببالین تنها مرا رها کن .... بادست اشارتم کرد که عزم سوئے ماکن

যাও, তুমি তাকিয়ায় গিয়ে মাথা রাখ! আমাকে একাকী ছেড়ে দাও; আমার মত বিপর্যস্ত, বিপন্ন এবং রাতে বিচরণকারী মুসাফিরকে ছেড়ে যাও।

আমি আছি আর আছে একরাশ চিন্তার উত্তাল তরঙ্গ; রাতদিন একাই থাকি। যদি চাও আস এবং বখশিশ কর অথবা চলে যাও এবং জুলুম কর।

আমার থেকে পালিয়ে যাও যাতে তুমিও বিপদে না পড়। শান্তির পথ ধর, বিপদের রাস্তা পরিত্যাগ কর।

আমি আছি আর সঙ্গে আছে চোখের পানি; পেরেশানির মধ্যে আটকে আছি। (এমতাবস্থায়) আমার অশ্রুমালার ওপর দিয়ে স্টীম রোলার চালাও।

বিনা কারণে আমাকে মারে এবং পাষাণের ন্যায় নির্মমভাবে টানাহেঁচড়া করে। এ কথা বলে না যে, প্রতিশোধ নেবার পথ বের কর।

মা'শূক (প্রেমাস্পদ)-দের সর্দারের ওপর বিশ্বস্ততা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক নয়; ওহে হলুদ চেহারার প্রেমিক! তুমিই ধৈর্য ধর এবং বিশ্বস্ততা প্রদর্শন কর।

আমি এমন এক আঘাত পেয়েছি মৃত্যু ভিন্ন যার কোন চিকিৎসা নেই; অতএব, আমি কেমন করে বলি যে, এ ব্যথার চিকিৎসা কর।

গত রাতে আমি স্বপ্নে এক বৃদ্ধকে দেখলাম। সে আমাকে হাতের ইশারায় বলছে, আমার দিকে চলে আসার সংকল্প কর।

ঠিক মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে তিনি বলেন :

گرمومنی وشیرین هم مونست مرگت + در کافری و تلخی هم کافریست مردن

যদি তুমি মু'মিন হও, মিষ্ট হও, তাহলে তোমার মৃত্যুও মু'মিন; আর তুমি যদি কাফির হও, তিক্ত ও বিস্বাদ হও, তাহলে তোমার মৃত্যুও কাফির।

৬৭২ হিজরীর জুমাদা আল-উখরার পাঁচ তারিখে সূর্যাস্তের সময় হাকীকত ও মা'রিফত বর্ণনারত অবস্থায় তিনি ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের সময় মওলানার বয়স ছিল ৬৮ বছর তিন মাস।

মওলানার জানাযা বাইরে আনতেই এক কিয়ামত-দৃশ্যের অবতারণা হয়। সকল ধর্মের ও সকল জাতিগোষ্ঠীর লোকই তাতে শরীক ছিল। সবাই কাঁদছিল। ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান তাদের স্ব স্ব ধর্মগ্রন্থ (তওরাত ও ইনজীল) পাঠ করছিল।

মুসলমানেরা তাদেরকে বাধা দিচ্ছিল, কিন্তু তারা বিরত হচ্ছিল না। শেষাবধি গোলযোগের আশঙ্কা দেখা দেয়। যখন এ সংবাদ কাউনিয়ার শাসনকর্তা মু'ঈনুদ্দীন পরওয়ানার নিকট পৌঁছুল তখন তিনি খ্রিস্টান ধর্মযাজক ও পাদরীদের জিজ্ঞেস করেন : (মওলানার জানাযায় শরীক হবার সঙ্গে) তোমাদের কী সম্পর্ক? তারা বলল : আমরা পূর্ববর্তী নবীদের হাকীকত এঁরই বর্ণনার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছি এবং কামিল দরবেশদের চলনভঙ্গী তাঁর চলনভঙ্গী থেকেই জেনেছি। যা হোক, ঐ সব লোক জানাযার অনুগমন করে। লোকের ভীড় এত বেশি হয়েছিল যে, মুর্দার খাটিয়া খুব ভোরে মাদরাসা থেকে রওয়ানা হয়েছিল এবং সন্ধ্যার সময় কবরস্থানে গিয়ে পৌঁছেছিল। রাতের বেলা তাসাওউফ ও ফকীরির এই সুমহান সূর্য লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়।

চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য

মওলানা শিবলী মরহুম "সওয়ানেহ'-ই-মওলানা রূম" নামক গ্রন্থে বলেন : মওলানা যতদিন পর্যন্ত তাসাওউফের বেস্টনীর মাঝে আসেন নি ততদিন পর্যন্ত তাঁর জীবন ছিল জ্ঞানীসুলভ জাঁকজমকের এক আশ্চর্য প্রতিমূর্তি। তাঁর সওয়ারী যখন রাস্তায় বের হত তখন 'আলিম-'উলামা কিংবা ছাত্রই শুধু নয়, আমীর-উমারার একটি দলও তাঁর অনুসরণ করত। আমীর-উমারা ও সুলতানদের দরবারের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সলূক (আধ্যাত্মিকতার পথ)-এ প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। পঠন-পাঠন (দরস ও তাদরীস), ফতওয়া প্রদান ও জনকল্যাণমূলক কাজের সাথে তাঁর কিছু যোগ ছিল বটে, তবে তা ছিল অতীত জীবনের প্রতীকস্বরূপ। অন্যথায় তিনি সব সময়ই আল্লাহ্ প্রেম ও তাঁর মা'রিফতের নেশায় ডুবে থাকতেন।

রিয়াযত ও মুজাহাদা

তাঁর রিয়াযত ও মুজাহাদা ছিল সীমাতিরিক্ত। সিপাহসালার তাঁর সাহচর্যে কাটিয়েছেন বছরের পর বছর। তিনি বলেন ঃ আমি কখনোই তাঁকে রাত্রিকালীন পোশাকে দেখিনি। বিছানা কিংবা তাকিয়া (বালিশ) একেবারেই থাকত না। ইচ্ছে করেই তিনি শয়ন করতেন না। ঘুম আসলে বসে বসেই একটু ঝিমিয়ে নিতেন। একটি গযলে তিনি বলেন : چه آساید بہر پہلو که خپد + کسے کز خار دار داد نہالین

> এমন লোক কি করে আরাম করতে পারে– তা সে যে পাশ ফিরেই শয়ন করুক না কেন–যার বিছানা কাঁটাভরা।

সামা' মাহফিলে তাঁর মুরীদদের যখন ঘুম পেত তখন তিনি তাদের খাতিরে দেওয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে জানুর ওপর মাথা রাখতেন যাতে তাঁর দেখাদেখি অন্যেরা নির্দ্বিধায় কিছুটা শুয়ে নেয়। তারা ঘুমিয়ে পড়তেই তিনি উঠে যেতেন এবং যিকর-আযকার ও তাসবীহ্-তাহলীলে মত্ত হয়ে পড়তেন। একটি গযলে এরই প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন :

همه خفتند و من دل شده را خواب نبرد
همه شب دیده من بر فلك استاره شمرد

خوابم از دیده چناں رفت که هرگز ناید

خواب من زهر فراق تو بنو شید و بمرد

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি হত হৃদয়ের ঘুম আসেনি। আমার আঁখিযুগল কেবল আসমানের তারকা গুণেই রাত কাটিয়েছে।

ঘুম আমার চোখ থেকে এমনভাবেই উধাও হয়েছে যে, আর কখনো ফিরে আসবে না। কেননা আমার চোখ তোমার বিচ্ছেদ বিষ পান করে মারা গেছে (আর মৃত তো পুনরায় ফিরে আসতে পারে না)।

অধিকাংশ সময় তিনি সিয়াম পালন করতেন এবং উপর্যুপরি কয়েক দিন পর্যন্ত কিছুই খেতেন না।

সালাতের অবস্থা

সালাতের ওয়াক্ত হতেই তিনি কিবলামুখী দাঁড়িয়ে যেতেন। এ সময় তাঁর চেহারার রং বদলে যেত। সালাতের মধ্যে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। সিপাহসালার বলেন : নিজের চোখেই আমি বহুবার দেখেছি যে, এশার আওয়াল ওয়াক্তে তিনি নিয়ত বেঁধেছেন এবং দু' রাকআত পড়তেই সুবেহ (ভোর) হয়ে গেছে। মওলানা তাঁর একটি গযলে স্বীয় সালাতের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন :

چو نماز شام هر کس نهد چراغ و خوانے

منم و خیال یارے غم و نوحه وفغانے

چو وضو زاشك سازم بود آتشیں نمازم

در مسجدم بسوزد چو در در سد اذانے

عجبا نماز مستان توبگو درست هست آں

که نداند او زمانے نه شناند او مکانے

عجبا دو رکعت ست ایں عجبا چهارم است ایں

عجبا چه سوره خواندم، چونداشتم زمانے

در حق چگونه کوبم؟ که نه دست ماندونے دل

دل دوست چوں توبردی بده اے خدا امانے

بخدا خبر نه دارم چو نمازی گزارم

که تمام شد رکوعے که امام شد فلانے

সবাই সন্ধ্যায় সালাত আদায় করেই দস্তরখানা বিছায় এবং প্রদীপ জ্বালায়; কিন্তু আমি তখন অন্য এক বন্ধুর কল্পনায় থাকি, থাকি পেরেশান। তাঁরই বিরহ গাঁথা গাই এবং তাঁরই কাছে ফরিয়াদ জানাই।

চোখের পানিতে যখন ওযূ করি তখন আমার সালাতও আগুনে পরিণত হয়; মসজিদেই আমাকে পুড়িয়ে ফেলে যখন সেখানে আযানের আওয়াজ পৌঁছে।

আরে! পাগলদের সালাতই অদ্ভুত ধরনের। তোমরাই বল,এটা কি জায়েয? (এমতাবস্থায় যে,) না তারা (সালাতের) ওয়াক্তের খবর রাখে আর না রাখে স্থানের!

বিস্ময়ের ব্যাপার, তারা জানে না এ সালাত দু' রাক'আতের, না চার রাক'আতের? আরো বিস্ময় এই যে, সালাতের সময় জ্ঞান যখন আমার নেই তখন কি করে বলি, আমি সালাতে কোন্ সূরা পড়েছি।

আল্লাহ্‌র দরজার কিভাবে কড়া নাড়ি, যখন আমার হাতও নেই, হৃদয়ও নেই। হে খোদা! তুমি যখন হৃদয়, হাত সব কিছুই নিয়ে গেছ– তখন আমাকে (অন্তত) নিরাপত্তা দাও।

আল্লাহ্‌র কসম! আমি যখন সালাত আদায় করি তখন কোন কিছুরই খবর রাখি না। কোন রুকূ' পুরা হ'ল কিনা, কে ইমামতি করল তাও জানি না।

একবার শীতের দিনে মওলানা সালাতে দাঁড়িয়ে এত বেশি কাঁদেন যে, তাঁর সমস্ত চেহারা ও দাড়ি চোখের পানিতে ভেসে যায় এবং শীতের তীব্রতায় সে পানি জমে বরফে পরিণত হয়। অবশ্য তিনি সেভাবেই সালাতে মশগুল থাকেন।

যুহ্‌দ ও অল্পে তুষ্টি

মেযাজের দিক দিয়ে তিনি সর্বোচ্চ মাত্রায় যুহ্‌দ-এ অভ্যস্ত এবং অল্পে তুষ্ট ছিলেন। সকল সুলতান ও আমীর-উমারাই নগদ অর্থ-কড়িসহ সর্বপ্রকার উপহার-উপঢৌকন তাঁর কাছে পাঠাতেন। কিন্তু তিনি সে সবের কিছুই নিজের কাছে রাখতেন না। যা কিছু আসত এবং যেভাবে আসত তিনি তা সালাহুদ্দীন যরকূব অথবা চিল্পী হুসামুদ্দীনের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। কখনো এমনও দেখা গেছে যে, ঘরে এক মুঠো খাবারও নেই, এমতাবস্থায় মওলানার সাহেবযাদা

সুলতান ওয়ালাদের পীড়াপীড়িতে ঐ সমস্ত জিনিস থেকে কিছুটা ঘরে রেখে দিতেন। যেদিন ঘরে খাবার কিছুই থাকত না–সেদিন মওলানা অত্যন্ত খুশি হয়ে বলতেন, "আজ আমাদের ঘরে দরবেশির গন্ধ অনুভূত হচ্ছে।" [১]

বদান্যতা ও কুরবানী

দানশীলতা ও বদান্যতার অবস্থা ছিল এই যে, সায়েল (প্রার্থী)-কে কিছু দিতে না পারলে দেহে আবা, কুর্তা যা-ই থাকুক না কেন, তাই খুলে দিয়ে দিতেন। পাছে খুলে দিতে দেরী হয় সেজন্য আবার মত কুর্তার সম্মুখ ভাগও সব সময় খোলা রাখতেন।

পরার্থপরতা ও অহংশূন্যতা

একবার মুরীদদের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সংকীর্ণ একটি গলিপথের ওপর একটি কুকুর শুয়েছিল। ফলে রাস্তা গিয়েছিল আটকে। মওলানা থেমে গেলেন এবং অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। বিপরীত দিক দিয়ে এক ব্যক্তি হেঁটে আসছিল। লোকটি কুকুরটাকে রাস্তা থেকে হটিয়ে দেয়। মওলানা এতে মনঃক্ষুণ্ন হন এবং বলেন : তুমি ওকে না-হক কষ্ট দিলে।

একবার দু'জন লোক রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ঝগড়া করছিল এবং একে অপরকে গালি দিচ্ছিল। তাদের ভেতর একজন অপরজনকে বলছিল ঃ অভিশপ্ত! তুমি আমাকে একটা বললে বিনিময়ে আমি দশটা শুনিয়ে দেব। আকস্মিকভাবে মওলানা এদিক হয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি ঐ লোকটিকে ডেকে বললেন : ভাই! তোমার যা কিছু বলার তা ওকে নয়, বরং আমাকে বল। কেননা তুমি আমাকে হাযারটা বললেও আমি প্রত্যুত্তরে একটিও বলব না। এ কথা শুনে লোক দু'টি মওলানার পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে নেয় এবং নিজেদের মধ্যে সন্ধি করে।

হালাল উপার্জন

আওক 'াফ বিভাগ থেকে মাসিক ১৫ দীনার ভাতা নির্ধারিত ছিল। এর দ্বারাই মওলানা জীবিকা নির্বাহ কতেন। বিনা শ্রমে প্রাপ্ত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করা তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। সেজন্য তিনি এর বিনিময়ে ফতওয়া লিখতেন। মুরীদদেরকে তাকীদ দিয়ে রেখেছিলেন, "যখনই কেউ ফতওয়া নিয়ে আসে, তখন যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, আমাকে অবশ্যই সংবাদ দেবে যাতে এর মাধ্যমে আমি হালাল উপার্জন করতে পারি।"

একবার কেউ বলেছিল, 'শায়খ সদরুদ্দীন মাসে হাযার রূপিয়া ভাতা পান, আর আপনি পান কেবল পনের দীনার মাসিক।'[১] মওলানা জওয়াবে বলেছিলেন : শায়খ-এর খরচের পরিমাণও খুব বেশি। আসলে আমি যে পনের দীনার পাই সেটাও তাঁরই পাওয়া উচিত।

দুনিয়াদারদের সংশ্রব বর্জন

মওলানা প্রকৃতিগতভাবেই আমীর-উমারা, সুলতান ও শাসকদের ঘৃণা করতেন এবং তাদের সংস্রব এড়িয়ে চলতেন। কেবল সদাচরণের খাতিরেই তিনি তাঁদের সঙ্গে কখনো কখনো মিলিত হতেন। একবার এক আমীর মওলানার নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠান, "অত্যধিক কাজের চাপে ফুরসৎ পাই না। তাই হযরতের দরবারে হাযির হবার মওকা জোটে খুবই কম। মেহেরবানী করে আমাকে ক্ষমা করবেন।" মওলানা তাঁকে বলে পাঠান :

"ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন নেই। আসার চেয়ে না আসলেই বরং আমি বেশি কৃতজ্ঞ থাকি।"[১]

মছনবী ঃ তার জ্ঞানগত ও সংস্কারমূলক অবস্থান ও পয়গাম

মছনবী

মওলানার অবস্থা থেকে বোঝা যায়, তিনি স্বভাবতই উৎসাহী ও আবেগপ্রবণ ছিলেন। 'ইশ্‌ক তথা প্রেম তাঁর প্রকৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল। জাহির 'ইল্‌ম ও বুদ্ধিবৃত্তির অনুক্ষণ ধ্যান তাঁর ও প্রেমের এই আগুনকে দাবিয়ে রেখেছিল। শাম্‌স তাবরীযের অগ্নিবৎ ধ্যান তাঁর এ প্রেমের এই আগুনকে দাবিয়ে রেখেছিল। শাম্‌স তাবরীযের অগ্নিবৎ সাহচর্য তাঁর প্রকৃতিকে উস্কে দিয়েছিল এবং প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ তাঁর ওপর যে আবরণ ফেলেছিল– অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই তা বিলীন হয়ে যায়। ফলে তিনি আপাদমস্তক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হন।

شعلها آخر زهر مويم دميد + از رگ انديشه ام آتش چكيد

আমার লোমকূপের গোড়া থেকে শেষাবধি অগ্নি-শিখা নির্গত হচ্ছে; আমার চিন্তার শিরা-উপশিরা থেকে আগুন ঝরে পড়ছে।[২]

এই মকামে পৌছার পর 'আরিফের প্রতিটি লোমকূপ থেকে আওয়াজ ধ্বনিত হয় :

---

১. সওয়ানেহ্ মওলানা রূম–সংক্ষেপিত ও ঈষৎ পরিবর্তিত।
২. ইকবাল দর মছনবী– আসরারে খূদী।

در جهاں یارب ندیم من کجاست + نخل سینایم کلیم من کجاست

হে প্রভু-প্রতিপালক ! দুনিয়াতে আমার সাথী (বন্ধু) কোথায়? আমি সিনাই পর্বতের খোরমা বৃক্ষ; আমার কলীম (হযরত মূসা) কোথায়?

আর এটাই একমাত্র কারণ যে, অন্তরঙ্গ বন্ধু ও রহস্য-সঙ্গী ব্যতিরেকে তাঁর পক্ষে জীবন ধারণ করা ছিল অসম্ভব। শাম্‌স তাবরীযের পর যতদিন পর্যন্ত না তিনি সালাহুদ্দীন যরকূব এবং সালাহুদ্দীন যরকূবের পর যতদিন পর্যন্ত হুসামুদ্দীন চিল্‌পীকে পেয়েছেন তাঁর অশান্ত ও অস্থির চিত্ত শান্ত হয়নি। شمع راتنہا طپیدن سہل نیست "মোমের পক্ষে একাকী ছটফট করা সহজ নয়।"

এই জ্বলন্ত অগ্নিই তাঁকে ক্রমান্বয়ে সামা'র দিকে টেনে নিয়ে যেত এবং তিনি এ থেকে শক্তি ও খোরাক সংগ্রহ করতেন। অনন্তর তিনি বলেন :

پس غذایے عاشقاں آمد سماع + که از وباشد خیال اجتماع
قوتے گیرد خیالات ضمیر + بلکه صورت گردد از بانگ صفیر
آتش عشق از نواها گرد تیز + آنچنانکه آتش آں جوز ریز

'আশিকের খাদ্যই হচ্ছে সামা'র মাহফিল; কেননা এর দ্বারাই একাগ্রতা ও মানসিক প্রশান্তি আসে।

অন্তরের কল্পনা একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শক্তি লাভ করে, বরং বাঁশীর আওয়াজে তার একটা ব্যবস্থা কিংবা সুরাহা হয়ে যায়।[১]

প্রেমের আগুন শব্দ দ্বারা আরো বেগবান হয়েছে, যেরূপ এই অগ্নিকুণ্ডে কয়লা নিক্ষেপকারীর আগুনের অবস্থা।[২]

এই তাপ ও জ্বালাই তাঁকে আরো উস্কে দিয়েছে এবং চুপচাপ থাকাকে তাঁর পক্ষে অসম্ভব করে তুলেছে। তাঁর ভাষায় :

جوش نطق از دل نشاں دو ستیست + بستگی نطق ازبے الفتی است
دل که دلبر دید کیے ماند ترش + بلبل گل دیده کے ماند خمش

হৃদয় থেকে উৎসারিত শব্দের বন্যা উছলে পড়া মুহব্বতের আলামত; আর শব্দ আটকে যাওয়া সম্পর্কহীনতা ও প্রেমশূন্যতার কারণ।

যে হৃদয় প্রেমাস্পদকে দেখতে পেয়েছে সে কি করে নিষ্প্রাণ ও স্বাদহীন থাকতে পারে; আর যে বুলবুল ফুল দেখেছে সে কি করে না গেয়ে থাকতে পারে।[৩]

---

১. মছনবী, ৩১৯ পৃ.; নওল কিশোর, ৯ম প্রকাশ।
২. ঐ।
৩. মছনবী, ৫৫১ পৃ.।

এই বাদ্যযন্ত্র থেকে যে গীত নির্গত হ'ল তার সংকলনই হ'ল মছনবী। এ তাঁর ধ্যান-ধারণা ও অবস্থা, ঘটনা ও প্রতিক্রিয়া,পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার দর্পণ। এটা গায়বের ব্যথা ও জ্বালা,জোশ ও মত্ততা এবং ঈমান ও ইয়াকীন দ্বারা পূর্ণ। মছনবীর বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা ও নজীরবিহীন প্রভাব সৃষ্টির এটাই আসল কারণ।

ہے رگ ساز میں رواصاحب ساز کا لہو.

বাদ্যযন্ত্রের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় এর নির্মাতার রক্ত প্রবাহিত।[১]

বুদ্ধিবৃত্তি ও জাহির পরস্তীর সমালোচনা

মওলানার শিক্ষা ও এর বিকাশ ঘটেছিল সর্বাংশেই আশ'আরীদের জ্ঞানগত পরিবেশ ও পরিমণ্ডলে। তিনি নিজেও একজন সফল শিক্ষক ও যুক্তিবাগীশ 'আলিম ছিলেন। আল্লাহ্র অনুগ্রহ যখন তাঁকে মা'রিফত (পরিচিতি) ও অবহিতির স্তর পর্যন্ত পৌঁছাল এবং বাণী থেকে অবস্থা, খবর থেকে নজর, শব্দ থেকে অর্থ এবং পরিভাষা ও সংজ্ঞার শাব্দিক ইন্দ্রজাল থেকে হয়ে যখন তিনি মূল সত্যে গিয়ে উপনীত হলেন, তখনই তিনি দর্শন ও 'ইলমে কালামের দুর্বলতা ও যুক্তি-প্রমাণ ও আনুমানিক সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি পরিমাপ করতে সক্ষম হলেন। দার্শনিক, মুতাকাল্লিম ও যুক্তি-বাগীশদের অসহায়ত্ব ও মূল সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার হাকীকত তাঁর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যেহেতু এ সবের প্রতিটি অলি-গলি সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন সেজন্য তিনি যা বলতেন তা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই হ'ত এবং এর বাস্তবতাও কেউ অস্বীকার করতে পারত না।

এ যুগে দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎস হিসাবে সর্বাধিক জোর দেওয়া হ'ত বাহ্য ইন্দ্রিয়ের উপর। বাহ্য-ইন্দ্রিয়কেই জ্ঞান লাভ ও নিশ্চিত বিশ্বাস উৎপাদনের সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম বলে মনে করা হ'ত। আর যে সব বস্তু এর আওতায় আসত না অর্থাৎ বুদ্ধির অগম্য ও ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়বস্তুকে অস্বীকার করবার প্রবণতা বেড়ে চলেছিল। মু'তাযিলাগণ এই 'ইন্দ্রিয়ানুভূতি পূজা'র সবচেয়ে বড় প্রবক্তা ছিল। এই ইন্দ্রিয়ানুভূতি পূজা ঈমান বি'ল-গায়ব তথা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপনকে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল এবং ইসলামী শরীয়ত ও আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ ওয়াহীর পেশকৃত হাকীকতের প্রতি এক ধরনের অনাস্থার ভাব সৃষ্টি করে দিয়েছিল। মওলানা এই পঞ্চেন্দ্রিয় পূজা এবং এর তুখোড় প্রবক্তাদের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন :

چشم حس راهست مذهب اعتزال + دیده عقل است سنی در وصال

---

১. ইকবাল, বালে জিবরীল।

سخره حس اند اهل اعتزال + خویش راسنی نمایند ازضلال
هرکه در حس ماندا ومعتزلی است + گرچه گوید سنیم از خامی است
هرکه بیرون شد زحسن سنی ویست + اهل بینش اهل عقل خویش بیست

জ্ঞান-বুদ্ধির চক্ষু সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

মু'তাযিলীগণ ইন্দ্রিয়পূজার খেলনামাত্র; বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর কারণে তারা নিজেদের সুন্নী হিসেবে দেখিয়ে থাকে।

যে কেউই ইন্দ্রিয়-পূজায় অতিবাহিত করল, সে মু'তাযিলী অর্থাৎ সত্যানুসারীদের দলবহির্ভূত; যদি সে সুন্নী হবার দাবি করে, তবে এ তার দুর্বলতা।

যে ইন্দ্রিয় পূজা থেকে বেরিয়ে এল সে সুন্নী ; জ্ঞানী ব্যক্তিরা কেবল তাদের বুদ্ধির ওপরই দাঁড়িয়ে থাকে।[১]

তিনি স্থানে স্থানে এটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, ঐসব বাহ্যেন্দ্রিয় ছাড়াও মানুষকে কিছু প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয় দান করা হয়েছে। আর এই প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয় বাহ্যেন্দ্রিয়ের তুলনায় অনেক বেশী বিস্তৃত ও গভীর। মওলানা বলেন :

پنج حسے هست جز ایں بنج حس + آں چوزر سرخ وایں حسها چومس
اندران بازار کا هل محشر اند + حس مس راچوں حس زرکے خرند
حس ابداں قوت ظلمت می خورد + حس جان از آفتابے می چرد

ঐ পাঁচটি ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) ছাড়াও আরও পাঁচটি ইন্দ্রিয় রয়েছে, যেগুলো স্বর্ণের ন্যায় লাল আর এই বাহ্যেন্দ্রিয় তামার মতই (মূল্যহীন)।

জনসমাবেশে পরিপূর্ণ এই বাজারে তামার ন্যায় মূল্যহীন ইন্দ্রিয়কে স্বর্ণের ন্যায় মূল্যবান ইন্দ্রিয়ের বিনিময়ে ক্রয় করবে?

শরীরের ইন্দ্রিয়াভূতির খোরাক হ'ল অন্ধকার; আর হৃদয়ের মাঝে যে অনুভূতি বিরাজমান তার খোরাক সূর্য-কিরণ।[২]

তাঁর মতে কোন বস্তু অস্বীকার কিংবা প্রত্যাখ্যানের জন্য এতটুকু প্রমাণ যথেষ্ট নয় যে, তা দেখা যায় না কিংবা তা ইন্দ্রিয় অনুভূতি অথবা উপলব্ধিতে ধরা পড়ে না। তাঁর মতে বাতেন (প্রচ্ছন্ন বস্তু কিংবা বিষয়) জাহির (বাহ্যিক কিংবা দৃশ্যমান বস্তু বা বিষয়)-এর পেছনে লুক্কায়িত এবং ঠিক সেইভাবে যেভাবে ঔষধের

---

১ মছনবী-১০১ পৃ.।
২ মছনবী-১০১ পৃ.।

অন্তরালে উপকারিতা ও কল্যাণ লুকিয়ে থাকে। যারা এই অদেখা বা প্রচ্ছন্ন বস্তু অস্বীকার করে তাদের সম্পর্কে তিনি বলেন :

حجت منکر همی آمد که من + غیر ازیں ظاهر نمی بینم وطن

هیچ نندیشد که هر جا ظاهراست + آں زحکمت هائے پنهاں فجرست

فائده هر ظاهرے خود باطنیت + همچو نفع اندر دواها مضمریست

(অদৃশ্য বস্তুর) অস্বীকারকারীদের যুক্তি হ'ল, "আমি এই দৃশ্যমান বস্তুজগত ছাড়া আর কোন জগতই দেখছি না।"

তারা এটা চিন্তা করে দেখে না যে, প্রতিটি দৃশ্যমান বস্তু একটি প্রচ্ছন্ন মৌলিক সত্যের হিকমত থেকেই প্রকাশ পেয়েছে।

প্রতিটি দৃশ্যমান বস্তুর কল্যাণ ও উপকারিতা তো একটি প্রচ্ছন্ন বিষয়; যেমন ঔষধ দৃশ্যমান বস্তু, কিন্তু তার অন্তর্বর্তী উপকারিতা প্রচ্ছন্ন।[১]

তাঁর বক্তব্য এই যে, অস্বীকারকারীরা নিজেদের এই বাহ্যদর্শিতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীজনিত অভ্যাসের কারণে ঐসব বাতেনী হাকীকতের দর্শন থেকে বঞ্চিত এবং আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে মাহরূম।

چونکه ظاهر هاگر فتند احمقاں + آں دقائق شد ازیشاں بس نهاں

لاجرم محجوب گشتند از غرض + که دقیقه فوت شد در مفترض

বেওকুফেরা যখন কেবল প্রকাশ্য ও দৃশ্যমান বস্তুকে গ্রহণ করল তখন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়বস্তুর হাকীকত তাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল।

এজন্যেই অসহায় এসব লোক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল; একটি কাল্পনিক ও কৃত্রিম বস্তুর জন্য তাদের হাকীকত তথা মূল সত্যই হারিয়ে গেল।[২]

পঞ্চেন্দ্রিয় থেকে অগ্রসর হয়ে তিনি যুক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর সমালোচনার ছুরি চালিয়েছেন এই বলে যে, 'আলম-ই-গায়ব বা অদৃশ্য জগতের হাকীকত ও আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের 'ইল্‌ম ও মা'রিফতের ব্যাপারে যুক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। তার নিকট অনুমানের কোন ভিত্তি নেই, এ জগতের কোন অভিজ্ঞতাও তার নেই। যে সমুদ্রের লবণাক্ত পানির অধিবাসী সে সুপেয় মিষ্টি পানির স্বাদ কি করে বুঝবে?

اے که اندر چشمه شور است جات

توچه دانی شط وجیحون وفرات

---

১. ঐ, ৩৬৮ পৃ.।
২. ঐ, ৪২২ পৃ.।

ওহে! লবণাক্ত ঝর্ণার মাঝে তোমার অধিবাস, জীহুন ও ফোরাতের মত সুপেয় নদীর পানির স্বাদ তুমি কী করে বুঝবে?[১]

তিনি সেই যুক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধিকে যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সূচনাপর্বের অধীন, আংশিক জ্ঞান নামে স্মরণ করে থাকেন। তাঁর মতে জল্পনা-কল্পনা ও সংশয় তার পরিণাম এবং অন্ধকার জগত তার স্বদেশভূমি। এই আংশিক জ্ঞানের চেয়ে পাগলামিও ভাল।

عقل جزوی آفتش وهم ست وظن ... دست در دیوانگی باید زدن

আংশিক জ্ঞানের বিপদ হ'ল অনুমান ও ধারণা ; কেননা অন্ধকারের মাঝেই তার অধিবাস।[২]

আংশিক বুদ্ধি বুদ্ধিকেই দুর্নামের ভাগী করেছে ; দুনিয়ার মতলব মানুষকে ব্যর্থতার শিকারে পরিণত করেছে।[৩]

এই জ্ঞান ও বুদ্ধি থেকে অমনোযোগী হওয়াই ভাল ; এর চেয়ে বরং পাগলামি আরও ভাল-অর্থাৎ এরূপ জ্ঞান-বুদ্ধি অপেক্ষা অজ্ঞানতার মাঝে বাস করাও ভাল।[৪]

তিনি বলেন ঃ আমি স্বয়ং এই দূরদর্শী জ্ঞান-বুদ্ধির অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, অতঃপর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

آز مودم عقل دور اندیش را
بعد ازیں دیوانه سازم خویش را

এই দূরদর্শী বিদ্যা-বুদ্ধিকে আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি এবং এই অভিজ্ঞতা লাভের পরই আমি নিজেকে পাগল বানিয়েছি।[৫]

অতঃপর মওলানা সোজা, সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বলেন, যদি 'আকল (জ্ঞান ও যুক্তি-বুদ্ধি) দীনের হাকীকত ও মা'রিফত বুঝবার জন্য যথেষ্ট হত তাহলে তার্কিক, দার্শনিক, পণ্ডিত ও মুতাকাল্লিমগণই সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্ওয়ালা ('আরিফ) এবং ধর্মের সূক্ষ্ম রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতেন।

اندریں بحث از خردره بیں بدے
فخر رازی راز دار دین بدے

---

১. মছনবী, ৯৬ পৃ.।
২. ঐ, ২২৪ পৃ.।
৩. ঐ, ৪০২ পৃ.।
৪. ঐ, ১৫২ পৃ.।
৫. ঐ, ১৫২ পৃ.।

এই তর্কালোচনায় যদি 'আকল দ্বারা কাজ হ'ত তাহলে ফখরুদ্দীন রাযীই ধর্মের গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী হতেন।[১]

তাঁর মতে ভাসা ভাসা বাহ্যিক জ্ঞান (দর্শন) 'ইলমে হাকীকীর পক্ষে অন্তরায় এবং আধ্যাত্মিক পথের পথিকের (সালিক) মানসিক অস্থিরতার জন্য দায়ী। অতএব, নিশ্চিত জ্ঞান (ইয়াকীন), স্থির বিশ্বাস ও আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করতে হলে বাহ্যিক জ্ঞানকে বিকশিত করার পরিবর্তে হ্রাস, এমন কি এর থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে হবে। তিনি বলেন :

گرتو خواهی کت شقاوت کم شود ... حکمت دینی برد فوق فلك

যদি তুমি চাও যে, তোমাদের দুর্ভাগ্যের পাল্লা হাল্কা হোক, তাহলে তুমি চেষ্টা কর যাতে তোমার মধ্যে দর্শন-চিন্তা কম হয়।

বাহ্যিক বিজ্ঞান, প্রকৃতি ও কষ্ট-কল্পনা থেকে যা আসে তা আল্লাহ্র (রহমতের) ফয়েযশূন্য হয়।

পার্থিব ও জাগতিক জ্ঞান তোমার মাঝে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা ও সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি করে আর দীনের জ্ঞান তোমাকে আসমানের ওপর আল্লাহ্র সান্নিধ্যে নিয়ে যায়।[২]

তাঁর ধারণায় যুক্তি-প্রমাণ যে কোন ঘটনার বিন্যাস এবং তা থেকে ফলাফল বের করবার এক কৃত্রিম পন্থা বটে এবং এ থেকে সীমাবদ্ধ ফল পাওয়াও যেতে পারে। তবে এর দ্বারা দীনের হাকীকত প্রমাণ করা এতই কঠিন যত কঠিন কাষ্ঠ নির্মিত পায়ের সাহায্য ইচ্ছে মাফিক যত্রযত্র চলাফেরা করা ও দূর দেশে ভ্রমণ করা। তাঁর এই উদাহরণ প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে এবং তা লোকের মুখে মুখে ফিরছে যে ঃ

پائے استد لالیان چوبیں بود + پائے چوبیں سخت بے تمکیں بود

যুক্তিবাদীদের পদযুগল কাষ্ঠনির্মিত; এগুলো শক্ত হয় বটে, তবে কোথাও ঠিক হয়ে বসে না।[৩]

তাঁর মতে 'ইলমে কালাম ও মুতাকাল্লিমসুলভ বাহাছ-মুবাহাছা ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও ঈমানের মিষ্টতা পাওয়া যায় না। কেননা মুতাকাল্লিম অন্ধ আনুগত্যের বশে কেবল তার পূর্বসুরিদের দলীল প্রমাণের উদ্ধৃতি দেন এবং তা চর্বিত চর্বণ করেন। ফলে তার আত্মা প্রকৃত জ্ঞান ও ইয়াকীনী অবস্থা থেকে বঞ্চিত থাকে।

---

১. মছনবী, ৪৮৯ পৃ.।
২. ঐ, ১৭১ পৃ.।
৩. ঐ, ৫৫ পৃ.।

آں مقلد صد دلیل وصد بیان + بر زبان آردندارد هیچ جان
چونکه گوینده ندارد جان وفر + گفت اوراکے بود برگ وثمر

অন্যের অন্ধ আনুগত্যকারী তার আনুগত্যের সমর্থনে শত কিসিমের যুক্তি-প্রমাণ ও বিবৃতি পেশ করে, তবে তাতে প্রাণ (রূহ) থাকে না। যখন স্বয়ং কথকের মধ্যেই প্রাণ-স্পন্দন নেই, নেই কোন মাহাত্ম্য, তখন তার কথা কেমন করে পত্র-পুষ্পে পল্লবিত ও ফলবতী হবে।[১]

আংশিক জ্ঞানের পরিবর্তে যা পঞ্চেন্দ্রিয়লব্ধ–তিনি সেই ঈমানী জ্ঞানের পক্ষপাতী যা স্বয়ং জ্ঞান ও বুদ্ধিকেই পথ দেখায় ও তার আলোকবর্তিকাস্বরূপ কাজ করে। এ প্রকারের জ্ঞানকে জ্ঞান-বুদ্ধির জ্ঞান বলতে পারেন। এ জ্ঞান সে সমস্ত লোকের উত্তরাধিকার যারা ঈমানী নূর ও ইয়াকীনী সম্পদ দ্বারা ধন্য।

بند معقولات آمد فلسفی + شهسوار عقل عقل آمد صفی

দার্শনিক বোধগম্য বস্তুনিচয়ে মধ্যেই বন্দী; আর পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ঈমানী নূরে আলোকিত।[২]

আংশিক জ্ঞানের কারণেই মানবতার ইতিহাস কালিমাময়; আর পরিপূর্ণ যে জ্ঞান তা দ্বারা পূর্ব দিগন্ত আলোক-উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

মওলানা রূমীর ভাষায় :

عقل دفترها کند یکسر سیاه + عقل عقل آفاق دارد پر زماه
از سیاهی وسپیدی فارغ است + نور ماهش بر دل وجان بازغ است

এই আংশিক জ্ঞান-বুদ্ধি দফতরের পর দফতর মসীলিপ্ত করে তোলে ; আর প্রকৃত জ্ঞান চন্দ্রালোকিত করে তোলে আসমানের প্রান্তদেশ।

এই জ্ঞান কৃষ্ণতা ও শুভ্রতা থেকে মুক্ত; এর চন্দ্র কিরণ উদিত হয় হৃদয়ের প্রাণে।[৩]

ঈমানী জ্ঞান শহররক্ষীর ন্যায়। আংশিক জ্ঞান ভয়, সন্ত্রাস ও জাগতিক সংশয়ের কারণে আর ঈমানী জ্ঞান তৃপ্তি, প্রশান্তি ও কামনা-বাসনার রক্ষক।

عقل ایمانی چوشحنه عادل است + پاسبان وحاکم شهر دل است
عقل درتن حاکم امان بود + که زبیمش نفس در زندان بود

ঈমানী জ্ঞান ন্যায়পরায়ণ কোতোয়ালের ন্যায়, হৃদয়রূপী শহরের সে রক্ষক ও শাসক।

---

১. মছনবী, ৪৪৯ পৃ.।
২. ঐ, ২৪৬ পৃ.।
৩. ঐ, ২৪৬ পৃ.।

জ্ঞান দেহাভ্যন্তরে ঈমানের শাসক হয়ে থাকে, যার ভয়ে নফ্স কয়েদখানায় বন্দী থাকে।[১]

মাওলানার মতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ওপর যেরূপ জ্ঞানের অধিকার রয়েছে তেমনি জ্ঞানের ওপরও আত্মার প্রাধান্য ও প্রশাসনিক ক্ষমতা রয়েছে। রূহ (আত্মা) একটি মাত্র ইঙ্গিতে জ্ঞান ও বুদ্ধির ('আকল) শত শত গ্রন্থি উন্মোচন করতে পারে এবং চোখের পলকে তার যে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে।

حس اسیر عقل باشد اے فلاں + عقل اسیر روح باشد ہم بداں

دست بستہ عقل راجاں باز کرد + کارہائے بستہ راہم سازکرد

লোক সকল! জেনে রেখ, বাহ্যিক অনুভূতি জ্ঞানের নিকট বন্দী আর জ্ঞান বন্দী রূহ্ (আত্ম)-এর নিকট।

জ্ঞানের বদ্ধ হাতকে জীবন খুলে দিয়েছে অর্থাৎ জীবন জ্ঞানের বন্দী জীবনের অবসান ঘটিয়েছে এবং যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে।[২]

দার্শনিক নিম্নতম বোধগম্য বস্তুনিচয় ও প্রাথমিক তথ্যাদির মনযিল থেকে খুব বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। তার জ্ঞান এখনও চৌকাঠের বাইরেই পা ফেলে নি।

فلسفی گوید زمعقولات دوں + عقل از دہلیز می ناید بروں

দার্শনিক খুবই নিম্ন মানের বোধগম্য বস্তুর কথা বলে; তার জ্ঞান এখনও দহলিজের বাইরে পা-ই রাখে নি।[৩]

দার্শনিক স্বয়ং তারই বুদ্ধি-জ্ঞান ও চিন্তার শিকার হয়েছে। সে এমন এক দুর্ভাগা মুসাফির যে তার পৃষ্ঠদেশ মনযিলের দিকে আর গতিমুখ প্রান্তর পানে। সেজন্য যে যত দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হয় সে ততই মনযিলে মকসুদ থেকে দূরে সরে যায়।

فلسفی خود را از اندیشه بکشت + کو بدو کورا سوئے گنج است پشت

کو بدو چنداں کہ افزوں می دود + از مراد دل جدا ترمی شود

"দার্শনিক দুনিয়ার যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, বিস্তৃত দৃষ্টির অধিকারী, শত রকমের জিনিস সম্পর্কে অবহিত।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে তার আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রেই অপরিচিতির বেড়াজালে আবদ্ধ, অথচ সবচেয়ে বড় জ্ঞানই হ'ল আত্মপরিচয় লাভ।"[৪]

১. মছনবী, ৩৪৭ পৃ.। ৪. ঐ, ৫৪৪ পৃ.।
২. ঐ, ২৩০ পৃ.।
৩. ঐ, ৮২ পৃ.।

রূমীর ভাষায় :

صد هزاراں فضل دارد از علوم + جان خود رامی نداند ایں ظلوم
داندا وخاصیت هر جوهرے + در بیان جوهر خود چوں خرے
قیمت هر کاله می دانی که چیست + قیمت خود را ندانی زاحمقیست
جان جمله علمها این ست ایں + که بدانی من کیم در یوم دین

দার্শনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে শতবিধ ফযীলত ও কামালিয়তের অধিকারী, কিন্তু এই জালেম তার নিজের সম্পর্কেই বে-খবর।

সে সব ধরনের মূল্যবান মণি-মুক্তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত; কিন্তু নিজের সম্পদের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় গাধার মত আহাম্মক।

তুমি সব ধরনের ধন-সম্পদ সম্পর্কেই জান কোন্‌টার কি মূল্য ; অথচ কী বিস্ময়কর মূর্খ যে, তুমি তোমার নিজের মূল্য জানা না?

সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল (রূহ) এটাই যে, তুমি নিজের সম্পর্কে জেনে নেবে যে, কাল কিয়ামতের দিন তোমার অবস্থান কোথায়।[১]

মওলানা রূমী তাঁর যুগের জ্ঞানী-গুণী ও মুতাকাল্লিমদের গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন ছেড়ে ঈমানী জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে মুখ ফেরাবার দা'ওয়াত জানান যা প্রকৃত 'ইল্‌ম (জ্ঞান) ও হিকমত (বিজ্ঞান ও দর্শন)।

چند چند از حکمت یونانیان + حکمت ایمانیاں راهم بخوان

গ্রীক দর্শন থেকে আর কত নেবে; ঈমানী বিজ্ঞান সম্পর্কেও একটু পড়াশোনা কর।[২]

মওলানা বলেন, তাযকিয়া-ই-নফ্‌স তথা আত্মিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমে সঠিক ও যথার্থ আত্মপরিচয় লাভ ঘটে। হৃদয়-পাতা যত পরিচ্ছন্ন হবে, হিকমতে ঈমানীর চিত্রও ততটা আলোকোজ্জ্বল হবে। ঠিক সেই মুহূর্তে কোন প্রকার কিতাবাদি ও উস্তাদ ছাড়াই আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের 'ইল্‌ম ও মা'রিফত হাসিল হবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের উৎস খুলে যাবে।

তাঁর ভাষায় :

خویش راصافی کن زاوصاف خود + تابه بینی ذات پاك وصاف خود
بینی اندر دل علوم انبیاء + بے کتاب وبے معید وبے اوستا

উত্তম চরিত্র ও গুণাবলী দ্বারা স্বীয় অভ্যন্তর ভাগ সাফ-সুতরো কর যাতে করে তুমি তোমার পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন সত্তাকে দেখতে পাও।

১. মছনবী, ৪৪৯ পৃ.।
২. ঐ, ৮৬।

হৃদয়াভ্যন্তরেই তুমি আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের 'ইল্‌ম দেখতে পাবে; কোন প্রকার কিতাব অথবা মুখস্থকারী কিংবা উস্তাদের সাহায্য ব্যতিরেকে আপনা থেকেই তোমার ভেতর জ্ঞানের আলোক বিকিরণ শুরু হবে, তোমার অভ্যন্তরভাগ হবে অসামান্য আলোকোজ্জ্বল।[১]

অন্যত্র বলেন :

آعدینه دل چوں شود صافر وپاك + نقشها بینی برون از آب وخاك

روزن دل گر کشادست وصفا + می رسد بے واسطه نور خدا

হৃদয়-দর্পণ যখন স্বচ্ছ, শুভ্র ও পবিত্র হবে তখন তাতে মৃত্তিকা ও পানি-বহির্ভূত অপর কিছুর চিত্র প্রতিভাত হবে।

হৃদয়-দুয়ার যদি উন্মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন থাকে তাহলে কোনরূপ বাধা-প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তাতে খোদায়ী নূর গিয়ে পৌঁছুবে।

ইশ্‌ক-এর দা'ওয়াত

সপ্তম শতাব্দীতে 'ইলমে কালাম ও বুদ্ধিবৃত্তির যে শীতল বায়ু মুসলিম জাহানের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছিল, তাতে হৃদয়ের অঙ্গার-ধানী উত্তাপবিহীন ঠাণ্ডা পাত্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কোথাও এক-আধটু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে থাকলেও তা ছাই-গাদায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। মুসলিম বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিমর্ষচিত্ততা ছেয়ে গিয়েছিল এবং কথক ঘোষণা দিচ্ছিল :

بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے + مسلمان نہی خاك کاڈھیر ہے

প্রেমের আগুন নিভে গেছে, চতুর্দিক অন্ধকার। কোথাও মুসলমান নেই, শুধু মাটির স্তূপ (দেখছি)।

এরূপ শীতল ও ঘুমন্ত পরিবেশে মওলানা প্রেমের ('ইশ্‌ক-এর) ডাক দিলেন এবং এত জোরে দিলেন যে, সে ডাকে মুসলিম জাহানের মরা দেহে বিদ্যুত প্রবাহের সৃষ্টি হ'ল।

মওলানা খোলাখুলিভাবে প্রেমের দা'ওয়াত জানান এবং মুহব্বতের অলৌকিকত্ব ও 'ইশ্‌ক-এর বিস্ময়কর চমৎকারিত্ব বর্ণনা করেন :

از محبت تلخها شیرین شود ..... وزمحبت شاه بنده می شود

প্রেমের কারণে তিক্ত ও বিস্বাদ বস্তুও সুখাদ্যে পরিণত হয়; আর প্রেমের দ্বারাই তামা স্বর্ণে পরিণত হয়।

প্রেম দ্বারা পাত্রের নীচে জমাট ময়লা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়; প্রেমের দ্বারা অনেক ব্যথার নিরাময় ঘটে।

প্রেম কারাগারকেও কুসুম কাননে পরিণত করে; আর প্রেমশূন্য কানন অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়।

প্রেমের বদৌলতে পাথরও তেলের মত নরম ও মসৃণ হয়; আর প্রেমহীন মোমও লোহায় পরিণত হয়।

প্রেম রোগীকেও সুস্থতা দান করে; আর প্রেমের কারণে ক্রোধও করুণায় পরিণত হয়।

প্রেমে মৃতও জীবিত হয়ে ওঠে; আর প্রেম বাদশাহকেও গোলামে পরিণত করে।[১]

তিনি প্রেমের শক্তি ও অনুগ্রহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

جسم خاك از عشق بر افلاك شد + كوه در رقص آمد وچلاك شد

عشق جان طور آمد عاشقا + طور مست وخر موسى صعقا

"মাটির দেহ প্রেমের বদৌলতে আসমানে আরোহণ করে (মি'রাজের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে); আর প্রেমের কারণে পর্বতও নেচে ওঠে, চেতনা পায় [উহুদ পর্বতের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যখন এতে আঁ-হযরত (সা) আরোহণের পর আনন্দে তা দুলে উঠেছিল]।

ওহে 'আশিক! প্রেম তূর পর্বতের প্রাণে পরিণত হ'ল; কোহে তূর নূরে ইলাহীর তাজাল্লীতে মত্ত হ'ল আর মূসা 'আলায়হি'স-সালাম জ্ঞান হারিয়ে মূর্ছা গেলেন।[২]

তিনি বলেন : 'ইশ্‌ক (প্রেম) সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত এবং আপন সত্তা সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন। সে সপ্ত মহাদেশের রাজত্ব প্রাপ্তিকেও গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। প্রেমের স্বাদ যে একবার আস্বাদন করেছে সে আর কোন কিছুর দিকেই ফিরে তাকায় না :

دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو + عجب چیز ہے لذت آشنائی

(প্রেম) অন্তর-মনকে উভয় জগতের প্রতি উদাস ও বিমুখ করে তোলে ; প্রেমের স্বাদ এক আশ্চর্য বস্তু।[৩]

মওলানা রূমীর ভাষায় :

بادو عالم عشق را بیگانگی + اندر وهفتاد دو دیوانگی

---

১. মছনবী-১৩৪ পৃ.। ৩. বাল-ই জিবরীল, ইকবাল মরহুম।

২. মছনবী-৫ম পৃ.।

প্রেম উভয় জগত থেকে উদাসীন;এর ভেতর বাহাত্তরটি উন্মত্ততা লুক্কায়িত।[১]

سخت پنهاں است وپیدا حیرتش + جان سلطانان جاں در حسرتش

غیر هفتاد دو ملت کیش او + تخت شاهان تخته بندے پیش او

প্রেমের বিস্ময় অনেকটা প্রচ্ছন্ন আর অনেকখানি প্রকাশ্য ; এর হা-হুতাশের ভেতর প্রাণ-সম্রাটের প্রাণ রয়েছে।

সর্বোত্তম ধর্ম ব্যতিরেকেও প্রেমের স্বতন্ত্র এক ধর্ম রয়েছে; সম্রাটের সিংহাসনও তার নিকট সমতল চত্বরের মত অর্থাৎ প্রেমের নিকট রাজসিংহাসনেরও কানাকড়ি মূল্য নেই।[২]

কোন ব্যক্তি যখন দুঃসাহসী দারিদ্র্য ও ঈর্ষাতুর প্রেমের চর্চা ও আলোচনা করতে থাকে তখন তার মধ্যে জোশ ও উন্মত্ততার এক অদ্ভুত অবস্থার অভ্যুদয় ঘটে এবং সে আত্মহারা হয়ে বলতে থাকে :

ملك دنيا تن پرستان را حلال + ما غلام ملك عشق بے ذوال

দুনিয়ার হুকুমত দেহপূজারীদের জন্য বৈধ ; কিন্তু আমরা (প্রেমিকরা) তো এক চিরন্তন প্রেমের রাজ্যের গোলাম যার ক্ষয় নেই, নেই লয়।[৩]

মওলানা বলেন যে, ইশ্‌ক (প্রেম) এমন এক রোগ যার হাত থেকে রোগী কখনো আরোগ্য কামনা করে না, বরং সে চায় এ রোগ তার মধ্যে দিনে দিনে আরও বৃদ্ধি পাক।

جمله رنجور اں شفا جویندواین + رنج افزون جوید ودر دو چنین

خوبتر زین سم ندیدم شربتے + زین مرض خوشتر نباشد صحتے

রোগ-ব্যাধিগ্রস্ত সব লোকই রোগ নিরাময়ের পন্থা অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে; (অথচ কি মজার ব্যাপার) প্রেম রোগে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি চায় তার এ রোগ ও দুঃখ-বেদনা আরও বৃদ্ধি পাক।

এই বিষের চেয়ে উৎকৃষ্ট পানীয় আমি আর দেখিনি; আর এ রোগের চেয়ে অধিক আরামও আমি আর পাইনি।[৪]

কিন্তু এ এমন এক রোগ, যা কাউকে একবার ধরলে অন্য কোন রোগই তাকে আর ধরে না।

মওলানার ভাষায় :

آن کلامت می رهاند از کلام + وان سقامت می جهاند از سقام

১. মছনবী, ২৪৭ পৃ.।
২. ঐ, ২৪৭ পৃ.।
৩. ঐ, ৫৯১ পৃ.।
৪. ঐ, ৫৯৫ পৃ.।

তার কথা এমন, যা তোমাকে অন্য সব কথা থেকে রেহাই দেবে ; এ রোগ এমন যা তোমাকে অন্য সব রোগ থেকে মুক্তি দেবে।[১]

প্রেম রোগ এমন যার ওপর লক্ষ স্বাস্থ্য কুরবান; এমন রোগ যার ওপর হাযারো আরাম-আয়েশ উৎসর্গীকৃত।

پس مقام عشق جان صحت است + رنجهایش حسرت هرواحت است

'ইশ্‌ক-এর মকাম সুস্থতার প্রাণ, তার ব্যথা প্রতিটি আরামের উৎসস্থল।[২]

এই পবিত্র (ঐশী) প্রেম যদি গোনাহ্ হয় তাহলে শত 'ইবাদত আনুগত্যও তার মুকাবিলায় নিষ্প্রভ।

زین گنه بهتر نباشد طاعتے + سالها نسبت بدین دم ساعتے

প্রেমের একটি মুহূর্তে যে (আধ্যাত্মিক) উন্নতি লাভ ঘটে, শত শত বছরের কঠোর রিয়াযত ও মুজাহাদায় তা সম্ভব হয় না।[৩]

প্রেমের পথে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তা যে কোন পানির চেয়ে কম পবিত্র নয়। প্রেমের রাস্তায় চলতে গিয়ে যে শহীদ হয়েছে আমাদের দেয়া ওযূ গোসলের তার কোন প্রয়োজন নেই।[৪]

মওলানার ভাষায় :

خون شهید ان را زآب اولی تراست + این خطا از صد صواب اولی تراست

শহীদের খুন পানির চেয়ে উত্তম; প্রেমের ভুল-ত্রুটি শত বিশুদ্ধতার চেয়ে উৎকৃষ্ট।[৫]

প্রজ্বলিত হৃদয় ও দগ্ধ অন্তরের 'আশিকের ওপর সাধারণ গণ-মানুষের জন্য প্রণীত আইন কার্যকরী হয় না। যে গ্রাম বিরান হয়ে গেছে তার আবার খাজনা কিসের?

মওলানার ভাষায় :

عاشقاں را هر نفس سوزید نیست + برده ویران را خراج وعشر نیست

'আশিক-এর প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের ভেতর রয়েছে শত যিন্দেগী; বিরান গ্রামের ওপর খাজনা কিংবা ওশর নেই অর্থাৎ সর্বসাধারণের জন্য প্রণীত বিধি-বিধান প্রেমিকের বেলায় প্রযোজ্য নয়।[৬]

১. মছনবী। ৪. ঐ, ১৩৯ পৃ.
২. ঐ। ৫. ঐ।
৩. ঐ। ৬. ঐ, ৩৩৪।

'ইশ্‌ক আদম ('আ)-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি অর্থাৎ মীরাছ; আর চালাকি ও চাতুরি ইবলীসের পুঁজি।

রূমীর ভাষায় :

داند آں کو نیک بخت ومحرم است + زیر کی زا بلیس وعشق از آدم است

যে ব্যক্তি ভাগ্যবান ও রহস্যভেদী, সে জানে, চালাকি হ'ল ইবলীসের কাজ আর 'ইশ্‌ক (প্রেম) হ'ল আদমের পরিত্যক্ত সম্পত্তি।[১]

চালাক-চতুরের দক্ষিণ হস্ত হ'ল তার বাহুদ্বয়। এর ওপরই তার সকল নির্ভরতা। আর প্রেমিক তার বাহুর ওপর নির্ভর করে না, বরং কোন বৃহত্তম শক্তির আঁচলতলে সে আশ্রয় খোঁজে। সে নিজেকে বিলিয়ে দেয় কিংবা সমর্পণ করে কারো কাছে। চালাকি ও চাতুর্য সাঁতারুর সাঁতার-কৌশল আর 'ইশ্‌ক হ'ল নূহ্ ('আ)-এর কিশতী।

زیرکی سباحی آمد در بحار + کم زهد غرق اسبت او پایان کار

عشق چوں کشتی شود بہر خواص + کم بود آفت بود اغلب خلاص

চালাকি চাতুরি সমুদ্রে সন্তরণতুল্য; যাহিদ ('আশিক)-এর পরিণাম পানিতে ডুবে মৃত্যু নয়।

'ইশ্‌ক হ'ল আল্লাহ্‌র বিশিষ্ট বান্দার জন্য নৌকা; আর নৌকার বিপন্ন হবার আশংকা কম এবং উদ্ধার পাবার আশা বেশী।[২]

জ্ঞান-বুদ্ধির সতর্কতাকে প্রেমের হয়রানির মধ্যে কুরবানী দেওয়াই সমীচীন। কেননা এই সতর্কতা কেবল ধারণা ও অনুমানমাত্র। আর এই হয়রানির মাধ্যমে প্রেমাস্পদের মুশাহাদা ও পরিচিতি লাভ সম্ভব।

زیرکی بفروش وحیرانی بجز + زیرکی ظنیست ، حیرانی نظر

চালাকি ও চাতুর্য বিক্রি করে ফেল এবং (প্রেমের) হয়রানি খরিদ কর; চালাকি ও সাবধানতা অনুমান ছাড়া কিছু নয়, প্রেমের হয়রানি মুশাহাদার নামান্তর অর্থাৎ প্রেমের রাস্তায় চলতে চলতে ক্লান্ত হবার পর আল্লাহ্‌র রহমতের মুশাহাদা সম্ভব হয়।[৩]

মওলানা 'ইশ্‌ক-এর সবক দিতে গিয়ে বলেন ঃ 'মাহবুব' (প্রেমাস্পদ) হওয়া সবার পক্ষে সম্ভব না হলেও 'আশিক' (প্রেমিক) হওয়া কিন্তু সম্ভব। আল্লাহ যদি তোমাকে মাহবুব না বানিয়ে থাকেন তবে তুমি 'আশিক হয়ে জীবনের স্বাদ ও আনন্দ হাসিল কর।

---

১. মছনবী।
২. ঐ, ৩৩৪ পৃ.।
৩. ঐ, ৪৯ পৃ.।

توکه یوسف نیستی ، یعقوب باش + همچو او باگریه وآشوب باش

توکه شیرین نیستی، فرهاد باش + چوں نیٔ لیلی مجنوں گرد باش

তুমি যদি য়ুসুফ হতে না পার তাহলে কমপক্ষে ইয়া'কুব তো হও; তাঁর (ইয়া'কূবের) মত রোদন ও ফরিয়াদে লেগে থাকে।

তুমি যখন শিরীন নও, নিদেনপক্ষে ফরহাদ তো হও; তুমি যখন লায়লা নও, তখন বাহ্যিক বেশ-ভূষায় মজনু তো হও।[১]

তিনি আরও এক কদম এগিয়ে গিয়ে বলছেন : 'আশিক হবার মাঝে যে স্বাদ, মজা ও উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে তা মাহবুব হবার মাঝে কোথায়? যদি পৃথিবীর প্রেমাস্পদরা এই স্থায়ী ও চিরন্তন সম্পদের সন্ধান পেত তাহলে প্রেমাস্পদের কাতার ছেড়ে তারা 'আশিকদের কাতারে গিয়ে শামিল হ'ত।

ترک کن معشوقی وکن عاشقی + اے گمان برده که خوب وفائقی

মাশুক হবার চিন্তা ছাড়, 'আশিকের পথ ধর; ওহে ঐ ব্যক্তি যে নিজেকে খুব ভাল ও সর্ববিষয়ে যোগ্য মনে করে, আমি তাকেই একথা বলছি।[২]

'ইশক-এর মত জাগ্রত সম্পদ কোন মৃত ও অস্থায়ী প্রেমাস্পদের জন্য শোভা পায় না। 'ইশ্ক স্বয়ং জীবিত; তাই তা একজন জীবিত ও চিরন্তন প্রেমাস্পদের জন্যই শোভা পায়।

عشق بر مرده نباشد پائدار + عشق را برحئے جان افزائے دار

কোন মৃতের ওপর প্রেম স্থায়ী হয় না; যিনি জীবন দানকারী, যিনি চিরন্তন ও চিরঞ্জীব, তাঁর সঙ্গেই প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন কর।[৩]

عشق آں زنده گزیں که باقیست + وزشراب جانفزایت ساقیست

عشق آں بگزیں که جمله انبیاء + یافتند از عشق اوکا ردکیا

সেই জীবিত সত্তার প্রেম এখতিয়ার কর যিনি চিরন্তন এবং যিনি তোমার জন্য জীবন-বর্ধক পানীয় (সাকী) পরিবেশনকারী।

সেই সত্তার 'ইশ্ক এখতিয়ার কর যাঁর প্রেম অবলম্বন করেই সমস্ত নবী-রসূল সফলকাম হয়েছেন।[৪]

সৌন্দর্যের এই মহান দরবারে প্রেমের অকৃতকার্যতার অভিযোগ সমীচীন নয়; কেননা সেই আদিকাল থেকেই সৌন্দর্য প্রেমের পূজারী ও বন্ধুত্ব পিয়াসী।

تو مگو ما رابداں شه باز نیست + باکریماں کارها دشوار نیست

১. মছনবী।
২. ঐ, ৪৬৬ পৃ.।
৩. ঐ, ৪৬৮।
৪. ঐ, ১০।

তুমি একথা বলো না যে, সেই বাদশাহ্র দরবার পর্যন্ত পৌঁছুবার প্রবেশাধিকার আমার নেই; কেননা মহৎ প্রাণদের জন্য কোন কাজই কঠিন নয়।[১]

প্রেম বাহ্যত এক ধরনের রোগ, অন্তরের ভঙ্গুরতা ও দুর্বলতা থেকে যার জন্ম। এই রোগ বড় কালান্তক। কিন্তু মানুষ যদি একে বরদাশত করে নিতে পারে তাহলে এর পরিণতিতে আল্লাহ্র মা'রিফত-ই হাকীকী ও চিরন্তন জীবন লাভ ঘটে।

عاشقی پیداست از زارئی دل + نیست بیماری چوں بیماری دل

علت عاشق زعلتها جداست + عشق اصطر لاب اسرار خداست

হৃদয়ের কান্না থেকে প্রেমের প্রকাশ ঘটে; অন্তরের রোগের মত রোগ আর নেই।

প্রেমিকের রোগ সকল রোগ-ব্যাধি থেকে স্বতন্ত্র; আর 'ইশ্ক আল্লাহ্র গোপন রহস্য জানবার হাতিয়ার বিশেষ।[২]

প্রেমরোগ সকল রোগের ঔষধ, সকল প্রকার প্রবৃত্তিজাত ও চারিত্রিক ব্যাধির নিরাময়কারী। চিকিৎসক যে সব আধ্যাত্মিক (রূহানী) রোগের চিকিৎসা থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে, যে সব রোগের ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থাপত্রই ফলদায়ক হয় না, একমাত্র 'ইশ্ক চোখের পলকে সে সব রোগ নিরাময় করতে পারে। শত বছরের রোগী যখন প্রেমের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জটিল রোগ থেকে মুক্তি পায় তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে আপন মনেই গেয়ে ওঠে :

شاد باش اے عشق خوش سودائے ما + اے طبیب جملہ علتہائے ما

اے دوائے نخوت وناموس ما + اے تو افلاطون وجالینوس ما

খুশীতে থাক, হে 'ইশ্ক! হে আমাদের উত্তম পেশা, হে আমাদের সকল রোগের চিকিৎসক!

হে আমাদের গর্ব, অহমিকা ও অহংকারের ঔষধ! তুমি আমাদের জন্য প্লেটো ও জালীনুসতুল্য।[৩]

'ইশক (প্রেম) একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। যখন তা উত্থিত হয় তখন সব আবর্জনা পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। একমাত্র তার মাহবুব (প্রেমাস্পদ) ছাড়া সে আর কাউকে তোয়াজ করে না। এক্ষেত্রে সে বড় বেপরোয়া, বড় আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন।

عشق آں شعلہ است کوچوں بر فروخت

ہرچہ جز معشوق باقی جملہ سوخت

تیغ لادر قتل غیر حق براند

---

১. মছনবী, ১০। ৩. ঐ, ৫ পৃ.।
২. ঐ, ৭ পৃ.।

در نگر زاں پس که بعد از لاچه ماند

ماند الا الله باقی جمله رفت

شاد باش اے عشق شرکت سوز رفت

প্রেম (ইশ্‌ক) এমন একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যখন তা জ্বলে ওঠে তখন একমাত্র মা'শুক (প্রেমাস্পদ) ছাড়া আর সব কিছুকেই পুড়িয়ে দেয়।

লা-ইলাহা-র তলোয়ার গায়রুল্লাহ্- (আল্লাহ্‌বহির্ভূত শক্তির) হত্যায় নিয়োজিত হয়েছে; এরপর দেখ 'লা'-এর পর আর কি বাকি আছে?

একমাত্র 'ইল্লাল্লাহ'-ই-বাকি আছে আর সব কিছুই অন্তর্হিত হয়েছে।

খুশী হও, হে শির্‌ক (অংশীবাদ) খতমকারী 'ইশ্‌ক![১]

'ইশ্‌ক'ই-ইলাহী এক অন্তহীন সমুদ্র। এর কাহিনী শেষ হবার নয়। যুগের বিস্তৃতি এর মুকাবিলায় সংকীর্ণ, পৃথিবীর বয়স এর কাহিনী বর্ণনার জন্য অপর্যাপ্ত। এটা সেই অন্তহীন ও চিরন্তন সৌন্দর্যের কিস্‌সা, যার না আছে আদি আর না আছে অন্ত। অতএব, এ ব্যাপারে চুপ থাকাই ভাল এবং নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে নেয়াই সমীচীন।

شرح عشق ارمن بگویم بردوام + صد قیامت بگزر دواں ناتمام

زانکه تاریخ قیامت راحد است + حد کجا آنجا که وصف ایزد است

আমি যদি প্রেমের ব্যাখ্যা দিতে যাই তাহলে শত কিয়ামত গুজরে যাবে কিন্তু আমার কাহিনী শেষ হবে না।

এটা এজন্য যে, কিয়ামতের তারিখের একটা সীমা আছে ; কিন্তু যেখানে আল্লাহ্ পাকের বর্ণনা রয়েছে সেখানে সীমা কোথায়?[২]

অন্তর-রাজ্য

কিন্তু এই 'ইশ্‌ক ও প্রেম, যার দা'ওয়াত মওলানা রূমী অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে দিয়েছিলেন, তা মনের সচেতনতা ও অন্তরের উষ্ণ উত্তাপ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। প্রতিটি যুগের ন্যায় মওলানার যুগেও মানসিক আলস্য ও অজ্ঞতা বেড়ে চলেছিল এবং মস্তিষ্কের শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাব অন্তরের ওপর গিয়ে পড়ছিল। মস্তিষ্ক উজ্জ্বল আর দিল নিস্তেজ ও ঠাণ্ডা হতে চলেছিল। মানুষের জীবনে পেটই কেন্দ্রীয় মর্যাদা পেতে চলেছিল, অর্থাৎ মানুষ নিজেকে আহারসর্বস্ব জীব ভিন্ন যখন আর কিছুই ভাবতে পারছিল না, ঠিক তখনই মওলানা দিলেন শ্রেষ্ঠত্ব ও

---

১. মছনবী-৪০৫ পৃ.।
২. ঐ, ৪৪২ পৃ.।

বিস্তৃতির প্রতি মনোযোগ দেন এবং এর বিস্ময়কর ক্ষমতা ও বিজয়সমূহ বর্ণনা করেন। তিনি বুঝিয়ে দেন যে, মানুষ তার এই মাটির দেহে বসন্তের এক চিরসবুজ বাগিচা লালন করছে, যার পার্শ্বদেশে বিরাজ করছে এমন এক বিস্ময়কর জগত যার ভেতর দেশের পর দেশ হারিয়ে যাবে। কিন্তু কারো দ্বারা সেখানে লুণ্ঠিত হবার আশংকা নেই।

این آباد است دل اے مردماں + حصن محکم موضع امن و امان
گلشن خرم بکام دوستاں + چشمہا و گلستاں در گلستان

লোক সকল! মানুষের দিল্ এমন আবাসভূমি যেখানে ভয় নেই, ভীতি নেই; এটি একটি নিরাপদ জায়গা ও মযবুত দুর্গ।

বন্ধুদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এটি একটি উত্তম বাগিচা; এখানে আছে পানির নহর আর আছে বাগানের পর বাগান।

তিনি বলেন যে, দুনিয়ার বাগান যত সুন্দর ও মনোহরই হোক না কেন, তার স্থায়িত্ব কয়েক দিনের মাত্র। কিন্তু অন্তররাজ্যের (প্রেমের) যে বাগান তা চির যৌবনা; সেখানে শীত-গ্রীষ্মহীন চিরবসন্ত বিরাজমান। দেহের বাগান আবাদ করতে লেগে যায় বছরের পর বছর এবং মুহূর্তেই তা বিরান হয়ে যায়। কিন্তু দিলের বাগান আবাদ করতে সময় লাগে না, অথচ তার সবুজ শ্যামল রূপ ও কমনীয়তা চিরস্থায়ী।[১]

گلشنے کز نقل روید یک دم است + گلشنے کز عقل روید خرم است
گلشنے کزتن دمد گردد تباہ + گلشنے کز دل دمد وافرحتاہ

কিতাবী জ্ঞান (পুঁথিগত বিদ্যা ও জ্ঞান) থেকে যে বাগানের উদ্ভব তার আয়ু মুহূর্ত মাত্র; যে বাগান 'আক্ল (জ্ঞান-বুদ্ধি) থেকে উদ্‌গত– তাই শ্রেষ্ঠ।

দেহ থেকে যে বাগান উদ্‌গত তা ধ্বংসশীল; আর অন্তর থেকে যে বাগান উদগত তা অত্যন্ত আনন্দের বস্তু।[২]

তিনি বলেন, দেহকে যৌবনবতী বানাবার চেষ্টা এক অর্থহীন উদ্যোগ এবং সিকান্দার (যু'ল-কারনায়ন) বাদশাহ্‌র "চশমা-ই-আবে হায়াত"[৩] তালাশের ন্যায় এক ব্যর্থ অনুসন্ধান। এর পরিবর্তে বরং 'ইশ্‌ক-এর আবে-হায়াত পান করে হৃদয় মনে সজীবতা আনয়নের প্রয়োজন যাতে করে সঠিক অর্থেই আত্মার আনন্দ লাভ ঘটে এবং জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে শক্তি-সামর্থ্য ও কমনীয়তা অনুভূত হয়।

১. মছনবী, ১৯৯ পৃ.।
২. ঐ, ৫৯৬ পৃ.।
৩. যে ঝর্নার পানি পান করলে চিরঞ্জীব হওয়া যায় বলে কথিত।–অনুবাদক।

دل بجز تا دائما باشی جوان + ازتجلی چہرہ ات چوں ارغوان
طالب دل شوکه تاباشی چومل + تاشوی شادان وخنداں همچو گل

হৃদয় খরিদ কর, যাতে করে সর্বদা তরুণ থাকতে পার এবং তোমার চেহারা থাকে তাজাল্লী-ই ইলাহীতে লালে লাল।

দিলের প্রার্থী হও, যাতে আঙ্গুরী শরাবের মত থাক (প্রেমমত্ত), যাতে থাক ফুলের মত প্রফুল্ল ও হাস্যমুখর।[১]

যে দিল্ কামনা-বাসনার বিচরণ ক্ষেত্র, যে দিল্ প্রেমের স্বাদ-আনন্দ ও নিশ্চিত বিশ্বাস (ইয়াকীন) থেকে বঞ্চিত, সে দিলে প্রেমের পুষ্পকলি কখনো ফোটে না; সে দিল্ দিল্ নয়, বরং একটি পাষাণ খণ্ড।

تنگ وتاریك است وچون جان یہود + مینوا از ذوق سلطان ودود
نیے دراں دل تاب نور آفتاب + نے کشاد عرصه نے فتح باب

য়াহূদীর দিল্ সংকীর্ণ, কৃষ্ণকায় এবং প্রেমময় আল্লাহ্র আনন্দ-আকর্ষণ থেকে শূন্য।

এই দিলে সূর্যের রৌশনীর দীপ্তি নেই; এখান থেকে কোন প্রশস্ত চত্বরের রাস্তাও বেরিয়ে আসেনি, এর কোন দ্বারও উন্মুক্ত নয়।[২]

এ দিল্ আপন কাঠামো, আকৃতি-প্রকৃতি ও স্থূলত্বের দিক দিয়ে হৃদয়বানের জাগ্রত ও প্রশান্ত দিলের মতই। কিন্তু হাকীকতের দিক দিয়ে কেবল শব্দগত মিল ও শারীরিক সাদৃশ্য ছাড়া উভয়ের মাঝে কোন সম্বন্ধই নেই। স্বচ্ছ ও নির্মল ঝর্ণার প্রবাহিত পানিও পানি, আবার কোন আবর্জনাপূর্ণ বদ্ধ জলাশয় কিংবা কর্দমাক্ত ডোবার পানিও পানি। কিন্তু এই উভয় পানির গুণগত মানের ক্ষেত্রে বিস্তর ফারাক বিদ্যমান। প্রথমোল্লিখিত পানি স্বচ্ছ, সুন্দর ও নির্মল। এর দ্বারা পিপাসার নিবৃত্তি ঘটানো যায়, হাত-পাও পরিষ্কার করা যায়। কিন্তু শেষোল্লিখিত পানিতে মাটির ভাগ এত বেশি যে, এর দ্বারা পানির কাজ নেওয়া চলে না। এক দিল্ থেকে আরেক দিলের পার্থক্যও অনুরূপ। এক দিল্ সাধারণ মানুষের, যা বস্তু-পূজারী, লোভী, অনুভূতিশূন্য ও মৃত। আরেকটি দিল্ আম্বিয়া-ই-কিরাম ও আল্লাহর ওলীগণের যার বুলন্দীর সম্মুখে আসমানের বুলন্দীও খর্ব, যার বিস্তৃতির সামনে গোটা জগতের বিস্তৃতিও সংক্ষিপ্ত।

توهمی گوئی مرا دل نیز هست ...... آں دل ابدال یا پیغمبر است

তুমি বল, আমার কাছেও দিল্ আছে; কিন্তু দিল্ তো 'আরশ-ই-মু'আল্লাহ্র মত উন্নত হয়, তা কখনো নিম্নমুখী হয় না।

১. মছনবী-১৫৪ পৃ.। ২. ঐ, ১৭০ পৃ.।

কাদার ভেতরও পানি আছে, তবে সে পানি তোমার হাতে আসবার নয় অর্থাৎ সে পানি তোমার কোন কাজেই আসবে না।

কেননা তাতে পানির তুলনায় কাদার ভাগ বেশী; অতএব তুমি তোমার দিল্ সম্পর্কে এ কথা বলো না যে, এটাও দিল্।

যে দিল্ আসমানের চেয়েও উচ্চ ও সমুন্নত, সেই দিল্ই ওলী-আবদাল ও আম্বিয়া-ই-কিরামের দিল্।[১]

এরপর তিনি সান্ত্বনার সুরে বলছেন, দিল্ আর যাই হোক দিল্ই, আর আল্লাহ্র কাছে কোন দিল্ই মরদূদ (বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত) নয়। কারণ তিনি প্রতিটি দিলেরই খরিদ্দার। উপরন্তু এই ক্রয়ের দ্বারা লাভবান হওয়ার কোন উদ্দেশ্যই তাঁর নেই।

کاله که هیچ خلقش ننگرید + ازخلافت آں کریم آں راخرید

هیچ قلبے پیش آو مردوۡد نیست + زانکه قصدش از خریدن سود نیست

যে বস্তুর দিকে কোন সৃষ্টিই চোখ তুলে চাইল না, মহানুভব ও সদাশয় সত্তা তাকেই স্বীয় খিলাফতের অনুপম মর্যাদা দিয়ে খরিদ করে নিলেন।

তাঁর দরবার থেকে কোন দিল্ই বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত নয়; কেননা এই ক্রয়ের দ্বারা লাভবান হওয়াটা তাঁর উদ্দেশ্য নয়।[২]

অতঃপর মওলানা রূমী আবার বলেছেন : পেটের স্বর্ণ-নির্মিত তালা পরিত্যাগ করে দিলের স্বাধীন লোকালয়ে পরিভ্রমণ কর এবং আল্লাহ্র অপার কুদরতের বিস্ময়কর তামাশা অবলোকন কর। তোমার এবং তোমার স্রষ্টার মাঝে এই পেট ও পেট পূজা সবচেয়ে বড় আবরণ। তুমি এই আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে পড় যাতে সেই মহান দরবার থেকে তোমার প্রতি সালাম বর্ষিত হয়।

معده را بگذار سوئے دل خرام + تاکه بے پرده زحق آید سلام

পেটকে তোমার লক্ষ্যে পরিণত কর না, তাকে পরিত্যাগ কর; দিলের দিকে যাত্রা শুরু কর যাতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমার ওপর অবাধে সালাম বর্ষিত হয়।[৩]

মানবতার স্থান

অত্যাচারী স্বৈরশাসনের প্রভাব, নিরন্তর জুলুম এবং অব্যাহত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে সাধারণ গণ-মানুষের ভেতর জীবন-বিমুখতা, ভবিষ্যত সম্পর্কে নৈরাশ্য ও

---
১. মছনবী, ২৩৯ পৃ.। ৩. ঐ, ৪৫০ পৃ.।
২. ঐ, ৫২১ পৃ.।

হীনমন্যতাবোধ এসে গিয়েছিল এবং মানুষ তার নিজের চোখেই ছোট হয়ে গিয়েছিল। অনারবীয় সূফী দর্শন, আত্মসত্তার অস্বীকৃতি ও আত্মহননের শিক্ষা এত জোরেশোরে শুরু হয়ে গিয়েছিল যে, আত্মসংযম ও আত্মপরিচয় লাভকে মানুষ নৈতিক অপরাধের পর্যায়ে ফেলে দিয়েছিল। মানবতা ও মনুষ্যত্বের মধ্যে নয়, বরং তা বর্জনের মধ্যেই তার সার্বিক উন্নতি নিহিত বলে সে ভাবতে শিখেছিল। সে সাধারণভাবে মানবতা ও মনুষ্যত্বের স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে নিস্পৃহ এবং মানুষের শরাফত সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। সে সময়কার কাব্য সাহিত্যেও মানবতার প্রতি অবজ্ঞার ভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে গণ-মানুষের মাঝে সাধারণভাবে আস্থাহীনতা, হতাশা, বিমর্ষতা ও পরাজিত মনসিকতা বিরাজ করছিল। ফলে তারা কখনো-সখনো জীব-জন্তু ও জড় জগতের প্রতিও ঈর্ষা পোষণ করত। মানবতা ও মনুষ্যত্ব যে কত বড় মূল্যবান সম্পদ সে সম্পর্কে তারা অজ্ঞ এবং নিজেদের মহামর্যাদা ও উন্নতির সম্ভাবনা সম্পর্কে ছিল বেখবর। মওলানা নিজস্ব বিশিষ্ট ভঙ্গিতে এ দিকটিও তুলে ধরেন এবং মানুষের মর্যাদার গান এত উৎসাহ ও আবেগের সঙ্গে গাইতে শুরু করেন যে, মানুষের মধ্যে ঘুমন্ত 'খুদী' (অহংবোধ) জেগে ওঠে এবং তারা নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হয়ে ওঠে। মওলানার এই রণসঙ্গীতের প্রভাব পড়ে গোটা ইসলামী সাহিত্যের ওপর। তাঁর কবিতা, কাব্য ও সূফী দর্শন একটি নতুন ভাবধারার জন্ম দেয়।

মওলানা মানুষের দৃষ্টি তার সেই সৃষ্টি-কৌশলের দিকে আকর্ষণ করেছেন যাকে কুরআন মজীদের স্থানে স্থানে احسن تقويم বা 'সর্বোত্তম গঠন' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

"احسن التقويم" در "والتين" بخواں
که گرامی گوهر اس اے دوست جاں
"احسن التقويم" ازفكرت برون
"احسن التقيم" از عرششِ فزون

তুমি সূরা "ওয়া-ত্তীন"-এ احسن قويم পাঠ কর; বন্ধু হে! এ প্রাণ একটি অতি মূল্যবান রত্ন।

احسن تقويم তথা সর্বোত্তম ও সুন্দরতম এই গঠন তোমার চিন্তা-ভাবনার বহু উর্ধ্বে; حسن تقويم-এর বুলন্দী 'আরশ-ই মু'আল্লারও ওপরে (অতএব, তুমি ছোট নও)।[১]

১. মছনবী, ৫১৫ পৃ.।

তিনি আরও বলেন, মানুষ ছাড়া আর কারও মস্তকে কি "কারামত"-এর তাজ পরানো হয়েছে? كرمنا এবং اعطينك। অর্থাৎ "আমি সম্মানিত করেছি" এবং "আমি তোমাকে দান করেছি"—মানুষ ছাড়া আর কাউকে কি এ সম্বোধন করা হয়েছে?[১]

هيچ كرمنا شنيد اين آسمان + كه شنيد اين آدمى پرغمان

تاج كرمناست بر فرق سرت + طوق اعطينك آويز برت

এই আসমান কি كرمنا (আমি তোমাকে সম্মানিত করেছি)-এর আওয়াজ শুনেছে (একমাত্র মানুষ ছাড়া)? দুঃখ জর্জরিত এই মানুষই কেবল এই আওয়াজ শুনেছে (শুধু তাকেই এই সম্মান দেওয়া হয়েছে)।

কার্রামনা'র টুপি তোমার শিরোপরি স্থাপন করা হয়েছে; 'আ'তস্থায়নাকা'-এর বেড়ি একমাত্র তোমার কাঁধেই ঝোলানো হয়েছে।[২]

তিনি বলেন, মানুষ তামাম সৃষ্টি জগতের সার-নির্যাস, সংমিশ্রণ ও সর্বগুণের আধার। ক্ষুদ্র মানুষের ভেতর এত বিরাট বৈচিত্র্যের সমাহার ঘটানো হয়েছে যে, এ যেন এক মহাসমুদ্রকে একটি কুঁজোয় বন্দী করা হয়েছে; একটি সংক্ষিপ্ত অস্তিত্বের মাঝে গোটা জগতটাই যেন লুকিয়ে আছে।

آفتابے دريكے ذره نهان ... درسه گزتن عالمے پنهان شده

নগণ্য এক কণিকার ভেতর বিশাল সূর্য লুকিয়ে রয়েছে; হঠাৎ করে একদিন এই কণিকাটি মুখ খুলবে।

সেই মহাসূর্য যখন তার আবাস থেকে বেরিয়ে পড়বে তখন প্রতিটি কণা আসমান-যমীনে রূপান্তরিত হবে।[৩]

ছোট এক জলাভূমির ভেতর জ্ঞানের এক মহাসমুদ্র লুকিয়ে রয়েছে; তিন হাতের এক দেহে লুকিয়ে রয়েছে একটি বিশ্ব।[৪]

মানুষই গোটা সৃষ্টি জগতের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং মানুষই তামাম কায়েনাত তথা বিশ্ব-জগতের ঈর্ষার বস্তু। এর থেকেই জগতের রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ ও জীবনের সম্ভ্রম রক্ষা হয়। এরই আনুগত্য সমস্ত অস্তিত্বশীল প্রাণী জগতের ওপর বাধ্যতামূলক।

هر شرابے بنده آں قد وخد ... جوهرے چوں عجز دارد باعرض

সব ধরনের নেশা (পানীয়) এই মানবীয় অবয়ব এবং এই গণ্ডদেশের গোলাম; সব ধরনের মস্তান (আত্মভোলা) তোমার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে।

---

১. মছনবী, ৪৯৫ পৃ.। ৩. ঐ, ৫৯৪ পৃ.।
২. ঐ, ৪৭৫ পৃ.। ৪. ঐ, ৪৭৫ পৃ.।

তুমি গোলাপী রঙের কোন পানীয়ের মুখাপেক্ষী নও; তুমি প্রেমিকা নও, অতএব, তুমি সুগন্ধি গুঁড়ো মাখা ছেড়ে দাও।

মানুষ একটি রত্ন, আর আসমান তার প্রস্থতা (অবস্থা); সমস্ত কায়েনাত তথা প্রাণী-জগত শাখা ও ছায়ার মত, আর তুমি হচ্ছ কায়েনাতের লক্ষ্য।

তুমি পুস্তকের পাতায় জ্ঞানের অনুসন্ধান করে বেড়াও; আফসোস! তোমার সকল উৎসাহ-উদ্দীপনা ক্ষুধার অন্নের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

তোমার খেদমত করা সকল জীব-জগতের ওপর ফরয। একটি রত্ন (সত্তা) কেমন করে (প্রস্থতার) অবস্থার মুকাবিলায় নিজেকে দুর্বল জ্ঞান করতে পারে।[১]

মানুষ ঐশী গুণাবলীর প্রকাশ এবং এমন এক দর্পণ যার ভেতর আল্লাহ্র তাজাল্লী ও নিদর্শনসমূহের ছায়াপাত হয়।

آدم اصطر لاب اوصاف علوست ... چوں ستارہ چراغ در آب رواں

আদম ('আ) উন্নত ও মহত্ত্বর গুণাবলী পরিমাপক যন্ত্র; আদমের গুণাবলী আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহেরই বহিঃপ্রকাশ।

আদম ('আ)-এর ভেতর যা কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, সব সেই মহান সত্তারই প্রতিবিম্ব; যেমন নদীর পানিতে চাঁদের প্রতিবিম্ব দৃষ্টিগোচর হয়, এও ঠিক তেমনিই।

গোটা সৃষ্টি জগতকে স্বচ্ছ– সুমিষ্ট পানির মত মনে কর; এর ভেতর আল্লাহ যু'ল-জালালের গুণাবলীর ঝলমলানি দৃষ্টিগোচর হয়।

তাঁর জ্ঞান, তাঁর ইনসাফ ও তাঁর মেহেরবানী এমনভাবে পরিদৃষ্ট হয় যেমন পরিদৃষ্ট হয় প্রবাহিত পানির ভেতর আসমানের তারকারাজি।[২]

এত সব বলার পর তিনি অনুভব করেন, মানুষের সংজ্ঞা, পরিচয় ও তার সম্মান ও মূল্যের বর্ণনা এখনও অসম্পূর্ণ–আর সত্যি বলতে কি, কারো মধ্যে তা শোনবার ধৈর্যটুকু পর্যন্ত নেই।

মওলানার ভাষায় :

گر بگویم قیمت آں ممتنع + من بسوزم، هم بسوزد مستمع

আমি যদি এই মানুষের মূল্য বলে দিই যার মূল্য নির্ধারণ করা যার তার পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে আমি নিজেও জ্বলে যাব এবং শ্রোতাও জ্বলে যাবে।[৩]

১. মছনবী–৫৬২ পৃ.। ৩. ঐ, ৫১৫ পৃ.।
২. ঐ, ৫৬২ পৃ.।

এই সম্মান ও উন্নত মর্যাদার পর একমাত্র আল্লাহ্ ভিন্ন মানুষের খরিদ্দার আর কে হতে পারে এবং কেই বা তার মূল্য নির্ধারণ করতে পারে? আফসোস ঐসব মানুষের জন্য যারা নিজেদের মূল্য জানে না আর আফসোস তাদের জন্যও যারা যে কোন মূল্যে যে কোন হাতে বিক্রি হবার জন্য তৈরি থাকে। তিনি অত্যন্ত মর্মবেদনার সঙ্গে বলেন :

اے غلامت عقل و تدبیرات وهوش + تو چرائی خویش را ارزاں فروش

হে মানুষ! জ্ঞান, হুশ-বুদ্ধি ও কৌশল সব তোমারই গোলাম; অতএব, তুমি কেন নিজেকে সস্তায় বিকিয়ে দাও।[১]

অতঃপর তিনি বলেন, মানুষের ক্রয়-বিক্রয় তো সমাধা হয়ে গেছে। স্বয়ং আল্লাহ্ মানুষের খরিদ্দার এবং একমাত্র তিনিই মানুষের মর্যাদা বোঝেন।

مشتری ماس الله اشتری + ازغم هر مش ری هین تبر ترآ

مشتری جوکه جویان تواست + عالم آغاز وپایان تواست

আমাদের ক্রেতা একমাত্র আল্লাহ্; অতএব তুমি নিজেকে অন্যান্য সব ক্রেতার ধারণার ঊর্ধ্বে স্থাপন কর যাতে সেই মহান সত্তা ভিন্ন অপর কেউ তোমাকে খরিদ করার কল্পনাও না করতে পারে।

(যদি একান্তই তুমি নিজেকে বিকোতে চাও তবে) এমন খরিদ্দার তালাশ কর যিনি স্বয়ং নিজেই তোমাকে চান; যিনি তোমার আদি-অন্ত তথা তোমার সকল নাড়ি-নক্ষত্রের খবর জানেন (আর এমন খরিদ্দার একমাত্র আল্লাহ্ ভিন্ন আর কে হতে পারেন)।[২]

এতক্ষণ সে সব মানুষ সম্পর্কেই আলোচনা করা হ'ল যাঁরা মানবতারূপ সম্পদে ধন্য এবং যাঁরা মানবতার হাকীকত তথা এর অন্তর্নিহিত সত্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এখানে সে সব মানুষের আলোচনা করা হয়নি[৩] যারা মানবতা-বোধশূন্য এবং যারা কেবল আকার-আকৃতিতেই মানুষ, যারা নিজের নফসের দাস এবং প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার শিকার। এরা মানুষ নয়; মানুষের নিষ্প্রাণ খোলস ও প্রতিকৃতিমাত্র।

این نه مرد ا ند اینها صورت اند + مرده نان اندو کشته شهوت اند

যারা নফসের পূজারী তারা মানুষ নয়, মানুষের প্রতিকৃতি; এরা প্রবৃত্তির তাড়নার শিকার এবং রুটির জন্য প্রাণ বিসর্জনকারী।[৪]

১. মছনবী, ৪৭৫ পৃ.।
২. ঐ, ৪৫৯ পৃ.।
৩. ঐ।
৪. ঐ, ৪৫৯ পৃ.।

প্রকৃত মানুষের অভাব সর্বযুগে। মওলানার যুগেও এর ব্যতিক্রম ছিল না বরং সে যুগে সাধারণভাবে সেই সব লোকেরই প্রাধান্য ছিল যারা চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র প্রাণীর স্বভাববিশিষ্ট। মওলানা ঐ ধরনের পশু স্বভাববিশিষ্ট মানুষের আচার-আচরণে বিষিয়ে উঠেছিলেন। তিনি প্রকৃত মানুষের খোঁজে ছিলেন। তিনি আপন সত্তারও অনুসন্ধান করছিলেন। এই আত্মানুসন্ধানের কাহিনী তিনি একটি চিত্তাকর্ষক পারস্পরিক কথোপকথনের ভেতর দিয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন :

دی شیخ باچراغ همی گشت گرد شهر
کزوام و دو ملولم وانسانم آرزوست
زیں همرهان سست عناصر ولم گرفت
شیر خدا و رستم و ستانم آرزوست
گفتم که یافت می نه شود جسته ایم ما
گف آں که یافت می نشود آنم آرزوست

গত রাতে এক বৃদ্ধকে দেখলাম, প্রদীপ হাতে শহরের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে। সে বলছিল, আমি পৃথিবীর এই মায়াবী জাল ও মানব দঙ্গলের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছি; আর তাই আমি আলো হাতে মানুষ খুঁজে ফিরছি।

এই ঢিলেঢালা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী সঙ্গীদের ওপর আমি আস্থা হারিয়ে ফেলেছি; আমি একজন শেরে খোদা (আল্লাহ্‌র বাঘ) ও বীরবাহু রুস্তমের আশা করছি।

তাকে আমি বললাম, আমিও এ ধরনের লোক খুঁজেছি, কিন্তু তা পাবার নয়। সে বলল, যা পাওয়া যায় না– আমি তাই খুঁজে ফিরি।[১]

আমলের দা'ওয়াত

মওলানার তাসাওউফ ও তালকীন (শিক্ষা ও উপদেশ) বেকার জীবন যাপন ও সন্ন্যাসব্রত পালনের শিক্ষা দেয় না, বরং তা শিক্ষা দেয় কর্মের, সংগ্রাম সাধনার ও আয়-উপার্জনের এবং আহ্বান জানায় সামাজিক জীবন যাপনের প্রতি। সন্ন্যাসব্রত পালন ও সংসার ধর্ম ত্যাগকে তিনি ইসলামের মূল লক্ষ্য এবং রাসূল আকরাম (সা)-এর শিক্ষার পরিপন্থী কাজ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে সামাজিক জীবন যাপন যদি আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত না হ'ত তাহলে তিনি জুমু'আ, জামা'আত এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের তাকীদ দিতেন না। তিনি বলেন :

---
১. দীওয়ান।

مرغ گفتش خواجه در خلوت ما یست ... سن احمد صـ مهل محکوم باش

মোরগ তাঁকে বলল, সাহেব! নির্জনে দাঁড়িয়ে থেকো না; আহমদ মুজতবা (সা)-এর ধর্মে সন্ন্যাসব্রতের কোন স্থান নেই।

রসূলে খোদা (সা) সন্ন্যাসব্রতকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। অতএব, হে বোকা! যা রসূলের শিক্ষা ও জীবনাদর্শে নেই, যা বিদ'আত, তুমি তা কেন ইখতিয়ার করলে?

সালাতে জুমু'আ ও জামা'আত শর্ত এবং আমর বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার তথা সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ ইসলামের নির্দেশ ও বিধান (অতএব, সন্ন্যাসব্রত পালন ও বেকার জীবন যাপনের শিক্ষা কোথায়?)।

আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত মানুষের দলে থাকো (জামা'আত থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন হয়ো না); আহমদ মুজতবা (সা)-এর সুন্নত পরিত্যাগ ক'র না এবং শরীয়তের বিধান মেনে চল।১

মওলানা রূমীর যুগে হাত-পা ছেড়ে নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকার বসে থাকাকেই তাওয়াক্কুল মনে করা হ'ত। যে কোন রকমের সতর্কতা কিংবা সাবধানতা অবলম্বন এবং যে কোন ধরনের ব্যবস্থাপনাকে মনে করা হ'ত তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। মওলানা তাওয়াক্কুল-এর শর'ঈ মর্মার্থ বর্ণনা করেন এবং শ্রম ও উপার্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে এর প্রকৃষ্টতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন। اعقلها و توكل على الله (উটটি বেঁধে রাখো এবং আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুল কর)–রসূলুল্লাহ্‌র এই বিখ্যাত হাদীছ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন :

گفت پیغمبر صـ باواز بلند ... در تو از جهدش بمانی ابلهی

ইসলামের মহান পয়গম্বর (সা) অতি উচ্চ কণ্ঠে বলেন, "আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করার সঙ্গে নিজের উটটিও বেঁধে রেখ" (রশি খুলে দিয়ে আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর ক'র না যেন)।

'উপার্জনকারী শ্রমিক আল্লাহ্‌র দোস্ত'– এর গোপন রহস্য অনুধাবন কর; তাওয়াক্কুলের বাহানায় উপার্জনের ক্ষেত্রে কখনো আলসেমি ক'র না।

বাবা! তুমি যাও, আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুল কর; কিন্তু সেই সঙ্গে উপার্জনও কর, প্রতিটি কাজে পরিশ্রম কর এবং নিজের হাতে উপার্জন কর।

মেহনত কর, চেষ্টা কর যাতে মুক্তি পাও (দুঃখ ও দারিদ্র্যের হাত থেকে); যদি মেহনত থেকে দূরে সরে থাক তাহলে তুমি একটা আস্ত বেওকুফ।২

---

১. দীওয়ান–২৭ পৃ.।

মওলানা দুর্বল পশুর মুখ দিয়ে তাওয়াক্কুল ও নিষ্ক্রিয় জীবনের পক্ষে সে সব প্রমাণ পেশ করেছেন যা সাধারণত দুর্বল ও ভীরু লোকেরা করে থাকে। এসব প্রমাণ অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও গুরুত্ববহ বলে মনে হয়। অতঃপর তিনি সে সবের বিস্তারিত জওয়াবও দিয়েছেন। সিংহের জওয়াব মওলানার নিজস্ব কল্পনারই অভিব্যক্তি।

সিংহের ভাষায় তিনি বলেন, মানুষকে যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যোগ্যতা ও শক্তি দেওয়া হয়েছে তা দেওয়া হয়েছে নিরন্তর চেষ্টা ও সংগ্রাম-সাধনার জন্য। যদি কোন ব্যক্তি তার গোলামের হাতে কোদাল কিংবা শাবল তুলে দেয় তাহলে বুঝতে হবে, এর দ্বারা সে তার গোলামের কাছ থেকে মাটি খোড়া কিংবা পাথর ভাঙার কাজ নিতে চায়। এ কথা তার মুখ ফুটে বলবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নেই। ঠিক তেমনি আমাদেরকে যখন হাত-পা ও কাজ করবার ক্ষমতা ও শক্তি দান করা হয়েছে তখন তার একমাত্র উদ্দেশ্য এটাই যে, আমরা আমাদের হাত-পা ও শারীরিক শক্তি দ্বারা কাজ-কর্ম করব এবং স্বীয় অভিপ্রায় ও এখতিয়ারকে বাস্তব রূপ দেব। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, দৌড়-ঝাঁপ, কাজ-কর্ম, আয়-উপার্জন, চেষ্টা-সাধনা সবই আল্লাহ্‌র মর্জি এবং আমাদের ফিতরতের ধর্ম। নিষ্ক্রিয় ও কর্মহীন জীবন যাপন আল্লাহ্‌র খেলাফ এবং তাঁর প্রদত্ত নে'মতের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনেরই শামিল। বিশুদ্ধ তাওয়াক্কুল হ'ল, অবিরাম চেষ্টা-তদবীর করতে হবে এবং ফলাফলের জন্য একমাত্র আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রাখতে হবে। কেননা সাফল্য একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে।

মওলানা বলেন :

گفت شیر آری دلے رب العباد ... کسب کن پس تکیہ بر جبار کن

সিংহ বলল, আরে! তুমি যা বলছ সে তো ঠিক (যে, আল্লাহই সব কিছু করেন, মানুষের কোন কিছু করবার ক্ষমতা নেই, মানুষ তাঁর ইচ্ছার হাতের পুতুলমাত্র); কিন্তু সেই সঙ্গে তোমাকে তো এ কথাটাও ভেবে দেখতে হবে যে, বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা আমাদের পা দু'টোর সামনে একটা সিঁড়িও দিয়েছেন (অতএব, তুমি ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে তাঁর সান্নিধ্যে উপনীত হও)।

ছাদ পানে যেতে চাইলে ধীরে ধীরে পা ফেলে এগুতে হবে; জাবরিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদ (যে, মানুষের কোন ক্ষমতাই নেই; সে জড় বস্তুর মত অসহায় ও চলৎশক্তিহীন) অনুসরণ একটা ভ্রান্ত কল্পনা-বিলাসমাত্র।

প্রভু যখন তার নওকরের হাতে একটা বলদ তুলে দিলেন– তখন না বলতেই প্রভুর উদ্দেশ্য বোঝা হয়ে গেল।

---

১. মছনবী, ২৬ পৃ.।

যখন তুমি তাঁর উদ্দেশ্যকে নিজের জীবনের ওপর স্থান দেবে, তাঁর ইঙ্গিত পূর্ণ করতে নিজের জীবন বিলিয়ে দেবে, তাঁর ইশারা ও ইঙ্গিতের ওপর সুদৃঢ় থাকবে; (তখন) তিনি তোমার মস্তকে ন্যস্ত বোঝা সরিয়ে ফেলবেন এবং তোমার আকাঙক্ষা পূর্ণ করে দেবেন। তোমাকে যে শক্তি-সামর্থ্যরূপ নে'মত (অনুগ্রহ) দান করা হয়েছে তার শুকরিয়া হ'ল চেষ্টা ও মেহনত; জাবারিয়াদের ন্যায় দাবি করা (যে, মানুষ বড় অসহায়– তার করবার কোন ক্ষমতাই নেই) আল্লাহ্র নে'মতের অস্বীকৃতির নামান্তর।

নে'মতের শুকরিয়া আদায় কর, তাহলে তিনি তোমার নে'মত আরও বাড়িয়ে দেবেন; আর নে'মতের প্রতি কুফরী করলে সে নে'মত তিনি ছিনিয়ে নেবেন।

সাবধান, ওহে আস্থাহীন ও অবিশ্বাসী জাবারিয়াবাদি! ফলবান বৃক্ষের ছায়াতলেই বিশ্রাম নাও (কর্মের স্বীকৃতি দিতে ও গুরুত্ব স্বীকার করতে যারা নারাজ–তারাই জাবারিয়াবাদী)....

যাতে প্রবল বাতাস বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ঝেড়ে বিশ্রামরত ব্যক্তিদের মস্তকের ওপর অনুগ্রহের দান (ফল) ঝরাতে পারে।

যদি তুমি ভরসা পাও তাহলে দুটো কাজ অন্তত কর; উপার্জন করতে থাক এবং সেই সাথে প্রবল পরাক্রমশালী আল্লাহ্র ওপর ভরসাও রাখ।[১]

অতঃপর সিংহের মুখ দিয়ে তিনি এ সত্যও তুলে ধরেছেন যে, চেষ্টা, তদবীর ও সংগ্রাম-সাধনা চালিয়ে যাওয়া এবং কর্মের জগতে ঝাঁপিয়ে পড়া আম্বিয়া-ই-কিরামেরই সুন্নত এবং আওলিয়া-ই 'ইজামের পন্থা।

شیر گفت آرے ولیکن هم ببین ... منکر اندر نفی جهدش جهد کرد

সিংহ বলল, হ্যাঁ, সত্য বটে যা তুমি বলেছ; কিন্তু এটাও তো দেখতে হবে যে, আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম কত কঠোর মেহনতই না করেছেন!

আল্লাহ তা'আলা অবর্ণনীয় জুলুম ও অসহনীয় নির্যাতন সইবার পরই তাঁদের নিরলস পরিশ্রমকে সফল ও জয়যুক্ত করেছেন।

অতএব, জনাব! যতটা পার, আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম প্রদর্শিত ও আওলিয়া-ই-কিরাম অনুসৃত পথে মেহনত চালিয়ে যাও।

দুনিয়া কোন্ বস্তুর নাম? ব্যস! আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফিল থাকা; এই পোষাক-পরিচ্ছদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও স্ত্রী-পুত্রের নাম দুনিয়া নয়।

---

১. দীওয়ান–২৭ পৃ.।

সম্পদ যদি "দীনের" খাতিরে উপার্জন কর তাহলে তা তোমার জন্য সৌভাগ্যের কারণ। কেননা রসূল (সা) বলেছেন ঃ সৎ ব্যক্তির জন্য সৎ পথে উপার্জিত সম্পদ নে'মতস্বরূপ।

মেহনতও সত্য, ঔষধও সত্য, ব্যথা-বেদনাও সত্য; মেহনত অস্বীকার করার অর্থ সত্যকেই অস্বীকার করা।[১]

তিনি কেবল তাঁর যুগের সাধারণ মানুষেরই সমালোচনা করেন নি কিংবা কেবল তাদেরই ভুল-ভ্রান্তিগুলোর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন নি– যাদের সম্পর্ক ছিল জ্ঞানী-গুণী ও ধর্মীয় মহলের সঙ্গে, বরং তিনি সেই শ্রেণীর লোকেরও সমালোচনা করেছেন যাঁদের হাতে ছিল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের রাজদণ্ড, যাঁরা ছিলেন সকল দণ্ডমুণ্ডের মালিক। তিনি খোলাখুলিভাবে এ সত্য তুলে ধরেছেন যে, অযোগ্য লোকদের হাতে আজ দেশের শাসনভার চলে গেছে এবং জনস্বার্থ এসব লোকের হাতের খেলনায় পরিণত হয়েছে। স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের যুগে এ ধরনের সমালোচনা অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিণতি ডেকে আনতে পারত। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও মওলানার সত্যভাষী যবান নীরব থাকেনি– তিনি ছিলেন সোচ্চার কণ্ঠ। তিনি বলেন :

حکم چوں بر دست رنداں اوف تاد + لاجرم ذوالنون بزندان اوفتاد
چوں قلم در دست غدارے بود + لاجرم منصور بردارے بود
چوں سفیہاں رابود کار وکیا + لازم آمد یقتلون الانبیاء

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যখন ধর্মহীন অসৎ ব্যক্তিদের হাতে গিয়ে পড়ে, যু'ন্নূন মিসরীর ন্যায় সাধু ও সজ্জন ব্যক্তিও তখন কারাগারে ঢোকেন।

বিশ্বাসঘাতক গাদ্দারদের হাতে যখন কলম ওঠে, তখন তার পরিণতিতে মনসূর হাল্লাজকে শূলে চড়ানো হয়।

আর শাসন ক্ষমতা যখন ঘিলুবিহীন বেআক্কলের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় তখন তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে আম্বিয়া-ই-কিরামকেও না-হক হত্যা করা হয়।[২]

দেশ শাসনের ভার যখন অপাত্রে ন্যস্ত হয়– তখন তার ফলাফল কি দাঁড়ায়? মওলানার ভাষায় শুনুন :

حکم چوں در دست گمراہے بود + جاہ پندارید ودر چاہے فتاد
احمقاں سرد رشد ستند وزبیم + عاقلاں سرہا کشیدہ در گلیم

রাষ্ট্র শাসনের অধিকার লাভ করে যখন গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তি তখন সে

১. দীওয়ান–২৮ পৃ.।
২. ঐ, ১৩১ পৃ.।

এটাকে সম্মান ও পদমর্যাদা জ্ঞান করে, অথচ বাস্তব অবস্থা এই যে, এরই (শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের) কারণে সে কূপে নিক্ষিপ্ত হয় (অর্থাৎ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বই তার অধিকারীকে ডুবিয়ে ছাড়ে)।

বেওকুফ ও আহম্মকেরা (সমাজ ও রাষ্ট্রের) নেতৃত্ব পেয়েছে আর ওদিকে বুদ্ধিমান লোকেরা (পরিণতির আশঙ্কায়) চাদরের তলায় মুখ লুকিয়েছে।[১]

'আকাইদ ও 'ইল্‌মে কালাম

মওলানা শুধু বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ানুভূত জ্ঞানের সমালোচনা, 'ইলমে কালামের ভারসাম্যহীনতা, জাহির পরস্তী এবং শব্দ ও কথার মারপ্যাঁচের আসল রহস্যই উদ্‌ঘাটন করেন নি, কেবল ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান, রূহ বা আত্মার সাহায্যে কর্ম গ্রহণ এবং 'ইশ্‌ক তথা প্রেমের পথে মানুষকে আহ্বান জানানোকেই যথেষ্ট মনে করেন নি, বরং কালামশাস্ত্র সংক্রান্ত সমস্যা ও অসুবিধাদি তার নিজস্ব ভঙ্গীতে সমাধান করার এবং নিজস্ব বিশেষ রীতিতে বর্ণনা করার ও হৃদয়পটে তা গেঁথে দেবারও চেষ্টা করেছেন অর্থাৎ মওলানার আহ্‌বান ও তাঁর দর্শন কেবল নেতিবাচক ও সমালোচনামূলকই ছিল না, বরং তা ইতিবাচক ও শিক্ষামূলকও ছিল। যেসব সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে 'ইলমে কালামও ব্যর্থ হয়েছে, যে সব গ্রন্থি উন্মোচন করতে গিয়ে আরও অসংখ্য গ্রন্থির সৃষ্টি হয়েছে, মওলানা সে সব সমস্যার সমাধান এবং সেসব গ্রন্থি উন্মোচন এমনভাবে করেছেন যে, সেগুলোর অস্তিত্ব যে পূর্বেও কখনও ছিল, তেমনটি মনেই হ'ত না; এ ছিল যেন তাঁর চোখে দেখা বাস্তব সত্য এবং দৈনন্দিন জীবনের গৎবাঁধা ঘটনা। মওলানা তাঁর প্রতিপক্ষকে লা-জওয়াব করবার প্রয়াসী ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন আপন কথা প্রতিপক্ষের মন-মানসে গেঁথে দেবার প্রয়াসী। তিনি এমনভাবে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতেন যাতে করে তাঁর প্রতিপক্ষ অনুভব করত যে, এ কথা তো তার নিজেরই অন্তরের কথা! মওলানার এ ধরনের বাক্যালাপের ফলশ্রুতি এই ছিল যে, তাঁর মছনবী দ্বারা ধর্মীয় মূলনীতি, 'আকাইদ ও 'ইলমে কালাম সংক্রান্ত বিষয়াদি এমনভাবে পরিষ্কার ও বোধগম্য হয়ে যায় যেমনটি হ'ত না 'ইলমে কালামের গোটা ভাণ্ডার গুলিয়ে খেলেও। এর দ্বারা এমন এক ধরনের স্বাদ ও মিষ্টি আমেজ সৃষ্টি হয় যা কেবল একজন গভীর আত্মপ্রত্যয়ী ও হৃদয়বান 'আশিকের কথাতেই সৃষ্টি হতে পারে।

মওলানা যদিও একজন আশ'আরী চিন্তাধারার অভিজ্ঞ উস্তাদ ও গভীর ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন 'আলিম ছিলেন, কিন্তু এ কথাও সত্য যে, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত

১. দীওয়ান–৩৩৫ পৃ.।

অভিজ্ঞতা ও আল্লাহ্‌র রবূবিয়তের বদান্যতায় 'আকাইদ ও 'ইলমে কালামের একজন মুজতাহিদও ছিলেন– ছিলেন একটি নতুন কালামশাস্ত্রের স্রষ্টাও। তাঁর ধরন-ধারণ সাধারণ মুতাকাল্লিম ও 'আকাইদশাস্ত্রের 'আলিমদের থেকে ছিল একেবারেই আলাদা। তাঁর কথা ছিল কুরআন মজীদের মূল প্রেরণা এবং সাধারণ জ্ঞানের অত্যন্ত নিকটবর্তী।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কিত সমস্যা 'ইলমে কালামসহ সব শাস্ত্রেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সমস্যা। প্রাচীন কালাম শাস্ত্র আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের সপক্ষে যেসব দলীল-প্রমাণ পেশ করেছে তা নিছক দর্শনসুলভ। এর দ্বারা মানুষের মনে তেমন কোন আস্থা কিংবা গভীর প্রত্যয় সৃষ্টি হয় না; এসব যুক্তি-প্রমাণে বড় জোর একজন মানুষ লা-জওয়াব হয়ে যেতে পারে। কুরআন মজীদের রীতি ও পদ্ধতি এই যে, সে এ ব্যাপারে মানুষের সুস্থ ফিতরতকে উস্কে দেয় এবং তার সুস্থ প্রকৃতির ওপর আস্থা রেখে তার ঘুমন্ত অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে। সে পয়গম্বরের মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে বলায় :

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

"সেই আল্লাহ সম্পর্কে কি কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা?" –(সূরা ইবরাহীম–১০ আয়াত)

এই স্বতঃস্ফূর্ত বর্ণনা ও বিস্ময় প্রকাশ দ্বারা মানুষের ফিতরত তথা প্রকৃতি চমকে ওঠে এবং সে তার যথার্থ কর্ম সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করে। অতঃপর দেখা যায়, যমীন ও আসমানের সৃষ্টি থেকে এর স্রষ্টা, শিল্প ও সৃষ্টিজাত বস্তু থেকে এর শিল্পী এবং ক্রিয়া ও ফলাফল থেকে এর ক্রিয়াশীল ও ফলোৎপাদনকারী শক্তির দিকে হঠাৎ করেই পথ-নির্দেশনা ঘটে গেছে। সমগ্র কুরআন মজীদে এই যুক্তি ও প্রমাণ পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়েছে। ঘন ঘন মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ অবলোকন কর এবং সৃষ্ট বস্তুরাজি (মখলুকাত) থেকে এর খালিক (স্রষ্টা) এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদি থেকে এর শিল্পী পর্যন্ত গিয়ে উপনীত হও। কুরআনের মতে আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভের এটাই নিশ্চিত, সংক্ষিপ্ত ও নিরাপদ পন্থা। কুরআন বলে :

سَنُرِيهِمْ اٰيَاتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ط أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۔

আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্বজগতে এবং ওদের

নিজেদের মধ্যে; ফলে ওদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, ওটাই (অর্থাৎ আল-কুরআন) সত্য। এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক সর্ববিষয়ে অবহিত? – সূরা হামীম আস-সজদাঃ, ৫৩ আয়াত।

মওলানা তাঁর মছনবীতেও ঐ একই যুক্তি-প্রমাণ পদ্ধতি এখতিয়ার করেছেন। তিনি তাতে সৃষ্টিজগত থেকে সৃষ্টি জগতের স্রষ্টাকে খুঁজে বের করার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, দুনিয়ার বুকে অনেক কিছুই ঘটতে আমরা দেখছি, অথচ এসবের কারক যিনি তাঁকে আমরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু যে সব কাজ হচ্ছে তাতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, পর্দার পেছনে কোন করনেওয়ালা নিশ্চয়ই আছেন। এখানে কর্ম প্রকাশ্য, কিন্তু কর্মী অন্তরালে।

دست پنهان و قلم بین خط گزار + اسپ در جولان و ناپیدا سوار
تیر پیدا بین ونا پیدا کمان + جانها پیدا و پنهاں جان جان

হাত দৃষ্টির অগোচরে, কিন্তু কলমকে লিখতে দেখা যাচ্ছে; অশ্ব চক্রাকারে ঘুরছে, কিন্তু আরোহী দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

তীরের দিকে দৃষ্টিপাত কর, পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, কিন্তু কোথাও ধনুক দেখা যাচ্ছে না; প্রাণ প্রকাশমান, কিন্তু প্রাণের প্রাণ অপ্রকাশ্য।[১]

গতি তথা আন্দোলন স্বয়ং আন্দোলনকারীর অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। যদি শনশন শব্দে বাতাস বয় তাহলে জেনে রেখ, এ বাতাসের প্রবাহকারী নিশ্চয়ই আছেন।

باد را دیدی که می جنبد بدان + باد جنبا نیست اینجا بادر ان
پس یقین در عقل هر داننده هست + این که با جنبـید جنبا ننده هست

বাতাসের দিকে দেখ, যখন তা প্রবাহিত হয় তখন তার আলামত দেখা যায়, অথচ যিনি এই বাতাস প্রবাহিত করেন, তিনি থাকেন দৃষ্টির আড়ালে।

সজাগ মস্তিষ্কের অধিকারী যিনি, তিনি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেন যে, এই প্রবহমান বাতাসের প্রবাহকারী নিশ্চয় কেউ আছেন।[২]

ফলোৎপাদনকারী শক্তি তোমার দৃষ্টিগোচর না হলেও ফল তো তুমি দেখতে পাচ্ছ। এর থেকেই তুমি বুঝতে চেষ্টা কর যে, ফল উৎপাদনকারী নিশ্চয়ই কেউ আছেন। দেহের ভেতর যে গতি ও শক্তি বিরাজ করছে, তা থেকেই বোঝা যায় যে, তোমার ভেতর জীবন্ত আত্মা (রূহ) রয়েছে। যদি রূহ দৃষ্টিগোচর না হয়, ক্ষতি কি! তোমার দেহের অঙ্গ সঞ্চালন তো প্রমাণ দিচ্ছে যে, তোমার মধ্যে রূহের অস্তিত্ব রয়েছে।

---

১. মছনবী, ৩০৫ পৃ.।
২. ঐ.।

کرتو اور امی نه بینی در نظر + فهم کن آں رابا ظهار آثر
تن بجان جنبد نمی بینی توجان + لیك از جنبیدن تن جان بدان

"যদিও সেই আসল সত্তা তোমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, কিন্তু তার নিদর্শনাদির প্রকাশ থেকে তুমি তাকে চিনে নিতে পার।

আত্মার (প্রাণের) কারণেই শরীর নড়াচড়া করে, কিন্তু আত্মার দেখা পাওয়া যায় না। তবে শরীরের অঙ্গ সঞ্চালন থেকে তুমি আত্মার সন্ধান পেত পার।[১]

ফলোৎপাদকের জন্য ফল থেকে এবং শিল্পীর জন্য শিল্প-কর্ম থেকে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? সূর্যের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য সূর্য-রশ্মির চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে?

خود نباشد آفتابے را دلیل + جزکه نور آفتاب مستطیل

সূর্যের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য তার বিচ্ছুরিত কিরণের চাইতে বড় প্রমাণ আর নেই।[২]

গোটা সৃষ্টিজগতই সগর্বে তার সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের ঘোষনা দিচ্ছে। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুই নিজস্ব চৌহদ্দির মধ্যে বৃত্তাবদ্ধ। গ্রহ-নক্ষত্রের চক্রাকারে পরিভ্রমণর একটা সুশৃঙ্খল নিয়ম-নীতি আছে, আছে চন্দ্র-সূর্যের জন্য একটা বিধিবদ্ধ মূলনীতি ও এক সুশৃঙ্খল কানুন। সঞ্চারণশীল মেঘমালাও বল্গাহীন নয় যে, যেদিকে চাইবে ছুটে চলবে। তার জন্যেও রয়েছে নির্ধারিত নিয়ম। এই সুশৃঙ্খল নিয়ম-বিধি ও বিন্যাস পরিষ্কার প্রমাণ দিচ্ছে যে, গোটা সৃষ্টি জগতের ওপর একজন মহাস্রষ্টা, মহাবিজ্ঞ নিয়ন্ত্রক আছেন। সৃষ্টি জগতের কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারে না, তাঁর নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারে না।

گر نمی بینی تو تدبیر قدر .... گوشمالش می دهد که گوش دار

যদি তুমি তকদীরে ইলাহীর সুশৃঙ্খল নিয়ম-নীতি দেখতে না পাও তাহলে সৃষ্টিজগতের মৌলিক উপাদানসমূহের ভেতর সক্রিয় ও গতিশীল শক্তি লক্ষ্য কর।

চন্দ্র-সূর্য একই যাতার দুটি পাতামাত্র যা একটি খুটাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে এবং পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করছে।

নক্ষত্ররাজিও তাদের গতিশীলতার কক্ষে বন্দী; এভাবে তারা ভালমন্দ ও সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের বোঝা বহন করে চলেছ।

---

১. মছনবী, ৩০৫ পৃ.।
২. ঐ.।

মেঘের ওপরও বিদ্যুতের কোড়া লাগানো হচ্ছে; (যেন কেউ বলছে) খবরদার! এভাবে চল, ওভাবে নয়।

(যেন আরও বলছে) অমুক উপত্যকায় মুষল ধারে বর্ষণ কর–এদিকে নয়; অবাধ্যতার ক্ষেত্রে তাকে কান মলে দিয়ে বলা হচ্ছে, শোন।[১]

মওলানা বলছেন, এই সৃষ্টিজগতকে এর মহাস্রষ্টা নিজের কল্যাণ কিংবা উপকারার্থে সৃষ্টি করেননি; বরং এসব তিনি মানুষের ফায়দা এবং তারই উন্নতির জন্য পয়দা করেছেন। এভাবে তিনি জগৎ সৃষ্টির যৌক্তিকতা, যাকে নিয়ে দার্শনিক ও মুতাকল্লিমীন পেরেশান, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন। এর ভেতরও তাঁর আনন্দময়তা ও প্রফুল্লচিত্ততার ছাপ সুস্পস্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

گفت پیغمبر صـ که حق فرمودست ... بلکه تا بر بندگاں جو دے کنم

পয়গম্বর 'আলায়হি'স-সালাতু ওয়া'স-সালাম বলেছেন ঃ আল্লাহু তা'আলা বলেন, 'গোটা বিশ্ব সৃষ্টির পেছনে আমার লক্ষ্য ইহ্'সান (অনুগ্রহ) ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।

'আমি এ জন্য সৃষ্টি করলাম যাতে তারা আমা থেকে উপকৃত হয়, যাতে তারা আমার (অনুগ্রহরূপী) মধু দ্বারা তাদের হাত পূর্ণ করে।

'সৃষ্টি থেকে আমি কল্যাণপ্রাপ্ত হই কিংবা কোন উপকার লাভ করি, এ জন্য আমি মখলূকাত সৃষ্টি করিনি; কিংবা আমার খোরপোশের ব্যবস্থা করবার জন্যও আমি এসব সৃষ্টি করিনি।[২]

'কোনরূপ ফায়দা লাভের উদ্দেশ্যে আমি মখলূকাত সৃষ্টি করিনি, বরং বান্দাহ্র ওপর আমার অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্তে আমি এ সব সৃষ্টি করেছি।'

নবূওত এবং আম্বিয়া-ই-কিরাম ('আ)

আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম-এর পরিচয় তিনি দিয়েছেন স্বয়ং তাঁদের মুখ দিয়েই এবং বলেছেন ঃ তাঁরা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত মানব সমাজের চিকিৎসক সম্প্রদায় এবং তাঁরা হৃদয়ঘটিত তথা আত্মিক রোগের ডাক্তার। একজন ডাক্তার রোগীর নাড়ী থেকে তার হৃদয় মূলে পৌঁছুবার চেষ্টা করেন। পক্ষান্তরে আম্বিয়া-ই কিরাম সরাসরি হৃদয়মূলে গিয়ে উপনীত হন। শারীরিক সুস্থতা রক্ষার জন্য একজন ডাক্তার জোর দেন, কিন্তু আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-স'ালাতু ওয়া'স- সালাম জোর দেন দিলের সুস্থতার ওপর, আমল-আখলাক তথা কর্ম ও চরিত্রের ওপর

১. মছনবী, ৫১৩ পৃ.; ২. ঐ ১৫৯ পৃ.।

এবং এর সংস্কার ও ভারসাম্য বজায় রাখার ওপর।

মছনবীর ভাষায় ঃ ما طبیبا نیم شاگردان حق ... ویں دلیل ما بود وحی جلیل

আমরা, আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম, দিলের চিকিৎসক এবং আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুর শাগরিদ; লোহিত সাগরও আমাদের দেখে ফুলে উঠেছে।

দেহের চিকিৎসকরা হচ্ছেন ভিন্ন লাইনের লোক; তাঁরা তো নাড়ী টিপে টিপে হৃদয়কে দেখেন (হৃদয়ের অবস্থা জানার চেষ্টা করেন)।

আর আমরা কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা কিংবা মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি হৃদয়কে দেখি; দূরদর্শিতার ক্ষেত্রে আমাদের স্থান অনেক ঊর্ধ্বে।

বস্তু জগতের চিকিৎসকরা ফলমূল ও খাদ্যাদির চিকিৎসক; তাদের দ্বারা পাশবিক আত্মা (প্রাণ) শক্তিশালী ও মযবুত হয়।

তারা কথা ও কর্মের চিকিৎসক; আর আমাদের ওপর সেই মহান সত্তার আলোক থেকে কথা নিক্ষিপ্ত হয় (অর্থাৎ নবীগণ আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন)।

(বলা হয়) তোমাদের জন্য এই কাজ উপকারী আর ঐ কাজ সত্যের আলোকোজ্জ্বল পথ থেকে তোমাদের বিচ্ছিন্নকারী।

এ ধরনের কথা তোমাদের সম্মুখে বাড়িয়ে দেবে আর ঐ ধরনের কথা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর।

এভাবে সব ভাল-মন্দ আমরা তোমাদের দেখিয়ে দিই এবং সে সবের সীমারেখাও নির্ধারণ করে দিই।

জাগতিক চিকিৎসকদের কাছে গন্ধ (সুগন্ধ অথবা দুর্গন্ধ) দলীল হিসাবে বিবেচিত হয় আর আমাদের (আম্বিয়া-ই-কিরামের) কাছে দলীল হ'ল, আল্লাহ্র ওয়াহী (প্রত্যাদেশ)।[১]

নবূওতের সপক্ষে দলীল-প্রমাণ পেশের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণ পেশের পরিবর্তে তিনি সাধারণত আনন্দ (ذوقی) ও প্রেমময় যুক্তির অবতারণা করেছেন। তিনি বলেন, পয়গম্বরদের প্রতিটি কমনীয় ভঙ্গী বলে দেয় যে, তিনি একজন নবী। তাঁদের আপাদমস্তক মু'জিযামণ্ডিত হয়ে থাকে। দর্শকের জন্য (তবে শর্ত এই যে, তাদেরকে হিংসা ও অহঙ্কার থেকে মুক্ত থাকতে হবে) তাঁরা নিজেরাই তাঁদের নবূওতের পক্ষে দলীল হয়ে থাকেন। এ কারণেই হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বিশ্ব সৌন্দর্যের আধার নবীয়ে আখির–ই'য-যামানের নিষ্পাপ ও কমনীয়

১. মছনবী, ২৫০ পৃ.।

মুখশ্রী দর্শনে স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন : والله هذا ليس بوجه كذاب আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, এ কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না।

در دل هر کس که دانش را مزه است + رود آواز پیمبره معجزه است

যার দিলে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির স্বাদ রয়েছে, তার জন্য পয়গম্বরীর আওয়াজের বাদ্য মু'জিযা বিশেষ (অর্থাৎ নবীর আওয়াজ কানে যেতেই সে নেচে ওঠে)।

তিনি (মওলানা রূমী)বলেন, পয়গম্বর এবং উম্মাহ্‌র সুস্থ বিবেক ও অন্তর-মানসের মধ্যে এমনই এক যোগসূত্র রয়েছে যে, পয়গম্বর যা কিছুই বলেন– উম্মাহ্‌র বিবেক তাতেই امنا و صدقنا (আমরা বিশ্বাস করলাম ও সত্য বলে মেনে নিলাম) বলে সায় দেয়। উম্মাহ্‌র বিবেক-বুদ্ধি ও অন্তর-মানস পয়গম্বরের প্রতিটি আওয়াজে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ওঠে– আর তা এ জন্য যে, সেই আওয়াজ এত চিত্তাকর্ষক, নিষ্কলুষ ও অসাধারণ হয় যে, এর ভেতর এবং অন্য আওয়াজ ও আহ্বানের ভেতর কোন সামঞ্জস্যই খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি বলেন :

چوں پیمبر از بروں بانگے زند + جان امت دردروں سجدہ کند

زانکه جنس بانگ او اندر جہاں + از کسے نشیندہ باشد گوش جان

آں غریب از ذوق آواز غریب + از زبان حق شنود انی قریب

পয়গম্বর যখন বাইরে থেকে আওয়াজ দেন তখন উম্মাহ্‌র প্রাণ ভেতরে সিজদায় পতিত হয়।

রূহ্' (আত্মা)-এর কান কখনো কারো থেকে এ ধরনের আওয়াজ আর ইতোপূর্বে শোনেনি, তাই

এই অসাধারণ উম্মাহ্ এই একক অশ্রুতপূর্ব আওয়াজে তন্ময় হয়ে আল্লাহ্‌র মুখে এই আওয়াজ শুনতে থাকে انی قریب –অর্থাৎ বান্দা, আমি তোমার নিকটেই অবস্থান করছি।[১]

তিনি বলেন, শ্রোতার পক্ষে পয়গম্বরের সত্যতার সপক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য বাইরের কোন দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই। তাঁর কথিত উক্তি কেবল উক্তিই নয়, দাবিও বটে, প্রমাণও বটে। গোটা বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনা এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত। পিপাসার্ত ব্যক্তিকে (যদি সে প্রকৃতই পিপাসার্ত হয়) যখন পানির জন্য ডাকা হয় তখন সে পানির জন্য প্রমাণ চায় না। শিশুকে মা যখন দুধ পান করাতে চায়, তখন সে প্রমাণের অপেক্ষায় হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে না। আস্থা স্থাপন এবং কদম বাড়াবার জন্য মিষ্টি ডাক ও ভালবাসাই যথেষ্ট।

تشنه راچوں بگوئی تو شتاب ... تاکه بشیرت بگیرم من قرار

---

১. মছনবী––১৮০ পৃ.।

কোন পিপাসার্ত লোককে যখন তুমি তাড়াহুড়ো করে বল যে, পাত্রে পানি আছে, যাও! তাড়াতাড়ি পান করে এস;

পিপাসার্ত ব্যক্তি কি তখন বলে, কৈ, কোথায় পানি? তোমার কথা তো কেবল মুখের। অতএব ওহে প্রতারক! যাও, আমার কাছ থেকে সরে যাও (অর্থাৎ পিপাসার্ত ব্যক্তি পানির জন্য সন্ধানদাতার নিকট প্রমাণ দাবি করে না)।

দুগ্ধপোষ্য শিশুকে তার মা যখন সোহাগ ভরে ডেকে বলে, বাছা আমার! এস, আমি তোমার মা ডাকছি;

শিশু কি তখন বলে যে, মাতা! তুমি যে আমার সত্যিই মা– আগে তার প্রমাণ দাও যাতে করে তোমার দুধ পান করে পূর্ণ তৃপ্তি পেতে পারি?[১]

মওলানার মতে, মু'জিযা দ্বারা ঈমান লাভ ঘটে না অর্থাৎ মু'জিযা ঈমান লাভের মাধ্যম নয়। এটা জরুরী নয় যে, কেউ মু'জিযা দেখে ঈমান আনবেই। আর বাস্তবে ঘটেছেও তাই। মু'জিযা দেখে ঈমান এনেছে এমন লোকের নাম সীরাত গ্রন্থসমূহে খুব কমই পাওয়া যাবে। প্রখ্যাত সাহাবীদের তালিকায় তাঁদের নামই পাওয়া যায় যাঁরা স্বয়ং হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দেখেই ঈমান এনেছিলেন, আর প্রকৃত ঈমান বলতে যা বোঝায় তা তো তাঁদেরই ছিল। মওলানা বলেন, মু'জিযা প্রদর্শন করা হয় প্রতিপক্ষকে পরাভূত করতে, লা-জওয়াব বানাতে। আর যারা পরাভূত হয় কিংবা হেরে যায়, যারা (তর্কে) নিরুত্তর হয়ে যায়– তারা কদাচিত মিত্র ও জীবন উৎসর্গকারী বন্ধুতে পরিণত হয়। আকৃষ্ট করবার এবং চিরতরে বন্দী করবার আসল বস্তু তো পারস্পরিক সম্বন্ধ ও সহজাতিত্ব। মওলানার ভাষায় :

موجب ایمان نباشد معجزات + بوئے جنسیت کند جذب صفات
معجزات از بہر قہر دشمن است + بوئے جنسیت دل بردن است
قہر گردد، دشمن اما دوست نے + دوست کہ گردد بہ بستہ گرد نے

মু'জিযা কখনো ঈমান লাভের কারণ হয় না; বরং রসূল ও উম্মাহ্র ভেতরকার সহজাতিত্ব ও শ্রেণীগত সম্পর্কের মিলই নবুওয়তের গুণাবলীকে আত্মস্থ করে।

মু'জিযা, সেতো দুশমনকে পরাভূত করবার জন্যে; বন্ধুর দিল্ হরণ করবার জন্য তা সম শ্রেণীর হওয়াই যথেষ্ট।

যুক্তি-প্রমাণের শাণিত অস্ত্রের সাহায্যে দুশমনকেই কেবল পরাভূত করা হয়, বন্ধুকে নয়; বন্ধুকে কে কবে গলায় দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যেতে দেখেছে (বন্ধুকে তো কেবল হৃদয়ের আকর্ষণের জোরেই টানা যায়)![২]

---

১. মছনবী।
২. ঐ, ১৮০ পৃ.।

আম্বিয়া-ই কিরামের আলোচনায় তিনি বলেন, তাঁরা প্রেম ও সম্মানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন (خود دار) হয়ে থাকেন। তাঁদের থেকে কিছু পেতে হলে শর্ত এই যে, আদব ও বিনয়ের সঙ্গে প্রার্থনা জানাতে হবে। তাঁরা শাহী মেযাজের অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁদের পদমর্যাদার অবস্থা এই যে, তাঁরা বলবেন, আর অন্যেরা শুনবে। এ ক্ষেত্রে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন কিংবা প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হওয়া বঞ্চনার পথ প্রশস্ত করারই নামান্তর।

মওলানার ভাষায় :

گر هزار اں طالب اندو يك ملول ... از رسالت شان، چگونه بر خوری

সত্যের হাজারো প্রার্থী হোক এবং একজন অনাগ্রহী, সেখানে রসূলের পয়গাম পৌঁছাতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবেই।[১]

এই দিলের পয়গাম্বররা, যাঁরা রহস্যের কথা বলেন, ঠিক সেরূপ মনোযোগী শ্রোতা চান যেমনটি ইসরাফীল শিঙ্গা নিয়ে অপেক্ষারত আছেন।

এঁরা রাজা- বাদশাহ্‌র মতই আত্মমর্যাদা ও আত্মগৌরবের অধিকারী; তাঁরা দুনিয়ার মানুষের (শুধুমাত্র) আনুগত্য প্রত্যাশা করেন।

যতদিন পর্যন্ত তুমি তাঁদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও আদব না দেখাবে, ততদিন কি করে তাঁদের রিসালত থেকে উপকৃত হবে?[২]

هر أدب شان کے همی أید پسند + کامد ندیشان زا ایوان بلند

যে সে লোকের আদব কি করে এই সব রসূলের পছন্দ হবে? তাঁরা তো এক মহাসচিবালয় (দফতরে ইলাহী) থেকে এসেছেন (তাঁরা তো কোন মা'মুলী লোকের দূত নন)।[৩]

পরকাল

মওলানার মতে, মৃত্যু প্রকৃত জীবনারম্ভের ভূমিকা এবং মানুষের উন্নতির সোপান। ধ্বংস ব্যতিরেকে লোকালয় গড়ে ওঠা সম্ভব নয়; মাটি খনন করলেই কেবল মহামূল্য খনিজ সম্পদ লাভ করা যায়। নির্মিত ঘরবাড়ি যখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে- তখন জেনে রাখ, পুনর্বার এগুলো আবাদ করবার উপায়-উপকরণ তৈরি হচ্ছে।

---

১. মছনবী।
২. ঐ, ২৭১ পৃ.।
৩. ঐ।

شاہ جان جسم را ویراں کند + بعد ویرانش آبادان کند

کرد ویران خانہ بہر گنج و زر + وزہمان گنجش کند معمور تر

প্রকৃত বাদশাহ্‌ই দেহের প্রাণকে ধ্বংস করেন; অতঃপর তা পুনরায় আবাদ (সজীব) করেন।

স্বর্ণ-রৌপ্য ও মূল্যবান খনিজ সম্পদ বের করবার জন্যই তিনি ঘরকে ধ্বংস করেছেন। অতঃপর এই সম্পদ দ্বারাই তিনি পূর্বের চাইতে অধিক সুন্দর করে সৃষ্টি করবেন।[১]

মাটির দেহের এই পরাজয় এক বিরাট নির্মাণ কাজেরই আলামত। ফুলের কলি ফুটলেই ধরে নিতে হবে যে, ফলও শিগগির আসছে।

چوں شگوفہ ریخت میوہ سر کند + چونکہ تن بشکست جان سر بر کند

যখন ফলের আবরণ খসিয়ে দেওয়া হয় তখন ফল মাথা বের করবেই; যখন মাটির দেহের পরাজয় ঘটে (অর্থাৎ দেহধারী মানুষের যখন মৃত্যু হয়) তখনই প্রাণের স্পন্দন জাগে।[২]

তিনি অসীম ক্ষমাশীল দাতা, প্রকৃত দানশীল। তিনি জীবনের ন্যায় মহামূল্যবান সম্পদ দান করে কি করে তা চিরতরে ছিনিয়ে নিতে পারেন! অতএব তোমাকে বুঝতে হবে, তিনি এই ক্ষীণ ও দুর্বল প্রাণ নিয়ে এক অনন্ত জীবন দান করতে চান। তিনি একে মাটির আধার থেকে বের করে সেই নে'মতই দান করতে চান যা মানুষের কল্পনারও অতীত।

ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر – الحديث

(জান্নাতের নে'মতরাজি এমন) যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন মানুষের কল্পনায়ও আসেনি। –আল হাদীছ;

آں کسے را کش کہ چنیں شاہے کشد + سوے تخت و بہترین جاہے کشد

نیم جان بستاند وصد جان دهد + انچه درد همت نیا یدآن دهد

যাকে এমন এক মহান বাদশাহ মেরে ফেলেন (জেনে রেখ), তাকে শাহী তখ্‌তে উপবেশন এবং সর্বোত্তম মর্যাদায় ভূষিত করবার জন্যই নিজের কাছে টেনে নেন (অর্থাৎ এই মৃত্যু উৎকৃষ্ট জীবনের সিড়ি মাত্র)।

সেই হাকীকী বাদশাহ অর্ধেক প্রাণ নেন এবং শত প্রাণ দান করেন এবং এমন নে'মত দান করেন যা তোমার কল্পনারও অতীত।[৩]

---

১. মছনবী, ১২শ পৃ.।
২. ঐ, ৭৪ পৃ.।
৩. ঐ, ১০ পৃ.।

উন্নতির সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণের জন্য ধ্বংস ও বিলুপ্তি অপরিহার্য। শ্লেটের পূর্বেকার লিখন বা অংকন না ধুয়ে, না মুছে কেউ কি তাতে নতুন লেখা লিখতে পারে? মাটি খুড়ে গর্ত করে সে গর্তের মাটি ভেতর থেকে সরানো ব্যতিরেকে কি পাতালের পানি বের করা যায়? লিখবার জন্য মানুষ সাদা কাগজ এবং বপন করবার জন্য ঘাস-জঙ্গলবিহীন আগাছামুক্ত পরিষ্কার জমিরই খোঁজ করে। لوح را اول بشوید بے وقوف ... تخم کارد موضعے که کشته نیست

আরে বেওকুফ! কেউ যখন লিখতে চায় তখন আগে ভাগে শ্লেটটা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে নেয়; এরপরই না তার ওপর নতুন অক্ষর লিখতে শুরু করে।

ধোয়া-মোছার সময় শ্লেটের ঘাবড়ানো উচিত নয়; বরং তার মনে করা দরকার যে, তাকে আর একটি নতুন দফতরে রূপায়িত করা হচ্ছে।

যখন তোমাদের ঘরের নতুন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় তখন আগেকার ভিত্তিকে তুলে দেওয়া হয়।

যমীনের বুক চিরে যদি সুপেয় পানি বের করতে হয় তাহলে প্রথমে ওপরকার কাদা উঠিয়ে ফেলতে হয়।[১]

কোন জরুরী কথা লিখতে গেলে এমন কাগজ তালাশ করা হয় যার ওপর কিছু লেখা হয়নি এবং যা সাদা শুভ্র; অনুরূপভাবে কোন জমিতে বীজ বপন করতে চাইলে আগাছামুক্ত জমিতেই তা করা হয়।

অস্তিত্বহীনতা ও শূন্যতাই অস্তিত্বের অধিকার জন্মায় এবং স্রষ্টার রহমতের দরিয়ায় উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করে। দানশীল দানের জন্য অনুগ্রহপ্রার্থী নিঃস্ব ফকীরকেই বাছাই করে।

هستی اندر نیستی بتواں نمود + مالداران بر فقیر آرند جود

অস্তিত্ববিহীনতা থেকেই অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটতে পারে; ধনবান লোকেরা নিঃস্ব-দরিদ্রের প্রতিই বদান্যতা প্রদর্শন করে।

তুমি স্বয়ং নিজের অবস্থার প্রতিই গভীরভাবে লক্ষ্য কর। তুমি বরাবরই ক্রমোন্নতির সোপানগুলো ধাপে ধাপে অতিক্রম করে এসেছ এবং ভাঙাগড়ার এই কার্যক্রম বরাবরের মতই অব্যাহত রয়েছে। তোমরা অস্তিত্বের একটি জামা (খোলস) খুলেছ এবং অপরটি পরিধান করেছ; একটি 'ফানা' (ধ্বংস) থেকে তোমরা 'বাকা' (স্থায়িত্ব) লাভ করেছ। যদি তোমরা প্রথম অবস্থায় থাকতে তাহলে

---
১. মছনবী–১০ পৃ.।

এই উন্নতি ও পরিপূর্ণতা কোথা থেকে লাভ করতে? তোমরা কাদা-পানির ভেতর বন্দী থাকতে; এখন তোমরা উন্নতির চূড়ান্ত ও শেষ সোপানে পৌঁছতে ঘাবড়াচ্ছ কেন? তোমাদের উড়ন্ত রূহ অস্থায়ী উপাদান সম্ভূত এই বন্দীশালা থেকে বের হতে ভয় পাচ্ছেই বা কেন?

تو ازاں روزے که در هست آمدی ... هر بقا چفیده آے بے نوا

যেদিন তুমি অস্তিত্বের মধ্যে এলে সেদিন নিশ্চয়ই আগুন, মাটি অথবা বাতাস ছিলে।

যদি তুমি এই অবস্থায়ই থাকতে তাহলে তোমার আজকের এ উন্নতি ও পরিপূর্ণতা লাভের সুযোগ কি করে আসত?

পরিবর্তিত অস্তিত্ব থেকে সেই প্রথম অস্তিত্ব চলে গেল; অতঃপর সে স্থলে নতুন অস্তিত্বের ভিত্তি স্থাপন করা হ'ল।

হে যুবক! সমগ্র অস্তিত্বের আবির্ভাব সে তো শূন্যতা থেকেই ('ফানা' থেকেই 'বাকা'র আবির্ভাব); অতএব তুমি এই 'ফানা' (মৃত্যু) থেকে কেন মুখ ফেরাতে চাও?

ওহে মিসকীন! এই সব ধ্বংস (যা তোমার দেহে ক্রমান্বয়ে প্রতিফলিত হয়েছে) তোমার জন্য কবে ক্ষতিকর হ'ল যে, এই ধংস (মৃত্যু) থেকে বেঁচে থাকার জন্য তুমি এত বেশি মনোযোগী হয়েছ?[১]

মৃত্যু আসলে মৃত্যু নয়, জীবনের সূচনা মাত্র। মৃত্যুর দিন মু'মিনের জন্য শোকের সন্ধ্যা নয়; বরং 'ঈদের সুবহে সাদিক।

آز مودم مرگ من در زندگی است + چون رهم زین زندگی پابند گیست

আমি বহু পরীক্ষা করে দেখেছি, জীবনের মাঝেই আমার মৃত্যু; এই জীবন থেকে যখন অবসর মিলবে তখনই আমি চিরস্থায়িত্ব লাভ করব।[২]

'আরিফের মৃত্যুকে সাধারণের মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করা ঠিক নয়। কেননা 'আরিফ এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে আদৌ দুঃখিত কিংবা চিন্তিত হন না; বরং মৃত্যু তাঁর জন্য এক সুসংবাদ এবং মৃত্যুর দমকা বাতাস তাঁর অনুকূলে এক বসন্ত সমীরণ। 'আদ জাতির ওপর যে ধ্বংসাত্মক বায়ু প্রবাহ চালনা করা হয়েছিল তা হযরত হুদ ('আ) ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য ছিল আরামদায়ক প্রভাত মলয়।

---

১. মছনবী, ৪১০ পৃ.।
২. ঐ, ২৭৬ পৃ.।

هود گرد مؤمناں خطے کشید + نرم می شد باد کا نجا می رسید

হূদ ('আ) ঈমানদারদের চারপাশে একটি সীমারেখা টেনে দিয়েছিলেন; 'আদ সম্প্রদায়ের উপর প্রবাহিত গযবী হাওয়ার গতি উক্ত সীমারেখায় পৌঁছে শ্লথ হয়ে গিয়েছিল।

همچنیں باد اجل باعار فاں + نرم و خوش همچو نسیم بوستاں

ঠিক তেমনি মৃত্যুর হাওয়া 'আরিফ (আল্লাহ প্রেমিক, পূণ্যবান ব্যক্তি)দের জন্য কুসুম কাননের প্রভাত সমীরণের ন্যায় কোমল ও আরামদায়ক হয়ে থাকে।[১]

জবর ও এখতিয়ার (বাধ্যতামূলক ও ইচ্ছামূলক)

জবর ও এখতিয়ার-সংক্রান্ত বাহাছ (আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক) কালাম শাস্ত্রের কঠিনতম বাহাছসমূহের অন্যতম। একদল এখতিয়ার (অর্থাৎ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে, আর এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি মানুষকে দেওয়া হয়েছে বলেই সে ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত এবং মন্দ কাজের জন্য তিরস্কৃত ও শাস্তিযোগ্য হয়)-কে অস্বীকার এবং জবর (অর্থাৎ মানুষ স্রষ্টার হাতের অসহায় পুতুল মাত্র, তার নিজস্ব সত্তা কিংবা ইচ্ছাশক্তি বলতে কিছু নেই)-কে সমর্থন করে। মুসলমানদের 'আকীদা ও ফেরকার ইতিহাসে এরাই জাবারিয়া ফেরকা নামে মশহূর। মওলানা রূমী বলেন, মানুষ যদি কেবল অসহায় হ'ত এবং স্বাধীন সত্তা ও ইচ্ছাশক্তি বলে কিছুই যদি তার না থাকত– তাহলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শর'ঈ বিধানের ক্ষেত্রে আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে সে সম্বোধিত হ'ত না এবং শরীয়তের নানা হুকুম-আহকামের প্রতি তার মনোনিবেশেরও প্রয়োজন পড়ত না। কেউ কি কখনো কোন পাথর খণ্ডকে আদেশ-নির্দেশ দেয়?

جبریش گوید که امر و نہی راست + اختیارے نیست دین جمله خطا است

جمله قرآں امر ونہی است و وعید + امر کردن سنگ مر مر راکه دید

জাবারিয়া মতবাদ বলে, শর'ঈ আদেশ-নিষেধ যথার্থ, কিন্তু বান্দার এ ব্যাপারে কোন এখতিয়ার নেই। তাদের এ কথা ভ্রান্ত।

সমগ্র কুরআন মজীদ আদেশ-নিষেধ এবং ভাল কাজের কঠোর তিরস্কার ও সতর্ক বাণীতে পূর্ণ; (মানুষ যদি প্রস্তুরবৎ নিশ্চল ও চলৎশক্তিহীন অসহায়

১. মছনবী, ২৫ পৃ.।

মাত্র হয় তবে) কে কবে মর্মর পাথরকে কোন কিছু করার নির্দেশ দিতে দেখেছে।[১]

মওলানা বলেন, এখতিয়ার-এর 'আকীদা মানুষের প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট এবং মানুষ তার দৈনন্দিন এই 'আকীদার প্রতি ইক'রার তথা স্বীকৃতি এবং জাবারিয় 'আকীদার প্রতি ইনকার তথা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে থাকে। কারো মাথার ওপর যদি ছাদের কড়ি কাঠ গিয়ে পড়ে তবে সে ছাদের ওপর রাগ দেখায় না, প্লাবন এসে ঘরের আসবাব ও তৈজসপত্র ভাসিয়ে নিয়ে গেলে এ জন্য কেউ কোনদিন প্লাবনের ওপর ক্রোধান্বিত হয় না; কারো পাগড়ী যদি বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায় তাহলে বাতাসের সঙ্গে সে বিবাদে লিপ্ত হয় না। সবাই জানে যে, এ সমস্ত জিনিস মজবুর ও বেকসুর। এ থেকে বোঝা যায় যে, একমাত্র মানুষই সাহিব-ই এখতিয়ার তথা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির মালিক।

گرز سقف خانہ چوبے بشکند ... تانہ گوئے جبریانہ اعتذار

যদি ঘরের ছাদ থেকে কোন কড়ি-কাঠ তোমার মাথায় খসে পড়ে এবং তোমাকে আহত করে তাহলে কি–

ঐ কড়িকাঠের ওপর তোমার কখনো রাগ হয়? তার সঙ্গে কি কেউ কখনো হিংসা কিংবা শত্রুতায় লিপ্ত হয়?

এই বলে যে, কেন ঐ কড়িকাঠটি আমাকে আঘাত করল এবং কেন আমার হাত ভাঙল কিংবা মাথা ফাটাল অথবা আমাকে চাপা দিল?

কিন্তু যে কেউই তোমার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করতে চায়, তার ওপর তোমার হাজারো ক্রোধ ঝরে পড়ে।

কিন্তু যদি প্লাবন এসে তোমার মালমাত্তা ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাহলে প্লাবনের ওপর কি তোমার ক্রোধ প্রকাশ কর?

অথবা হাওয়া যদি তোমার মাথার পাগড়ী উড়িয়ে নিয়ে যায় তাহলে কি তুমি হাওয়ার সাথে শত্রুতায় নেমে পড়?

তোমার ভেতরের ক্রোধই তোমার এখতিয়ার-এর প্রমাণ দেয় যাতে তুমি মজবুর কিংবা মা'যূর (অসহায় অথবা অক্ষম) হবার দাবি না কর।[২]

তিনি আরও এক কদম অগ্রসর হয়ে বলেন, জীব-জন্তু পর্যন্ত জবর ও কদর (ভাগ্য)-এর মসলা সম্পর্কে প্রকৃতিগতভাবেই ওয়াকিফহাল। তারাও বোঝে যে

১. মছনবী, ৪৬১-৬২। ২. মছনবী–৪৬৩ পৃ.।

বিবিধ যন্ত্রপাতি ও জড়-বস্তুর কোন দোষ নেই। একটা কুকুরকে যদি পাথর মারা হয় তাহলে সে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পাথরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না; বরং যে পাথর মেরেছে তারই পিছু ধাওয়া করে। উষ্ট্রচালক লাঠি দিয়ে উটকে মারে, এ জন্য উট সেই লাঠির ওপর রাগান্বিত হয় না; সে উষ্ট্রচালক থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চায়। পশু অবধি যখন এই সত্য সম্পর্কে অবহিত তখন মানুষের পক্ষে জাবারিয়াপন্থী হওয়া লজ্জাজনক বৈকি।

همچنیں گر بر سگے سنگے زنی ... روبه تاریکی کند که روز نیست

যদি তুমি কোন কুকুরের প্রতি পাথর নিক্ষেপ কর, তাহলে পাথর ছেড়ে সে তোমার ওপর ক্ষেপে যাবে এবং তোমাকেই তাড়া করবে।

যদি কোন উষ্ট্রচালক উটকে মারে তাহলে উট তার আঘাতকারীর প্রতিই মনোযোগী হয়।

উটের রাগ সেই কাষ্ঠখণ্ডটির ওপর নয় যা দিয়ে তাকে আঘাত করা হয়েছে (কেননা কাষ্ঠখণ্ডটির নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি নেই); অতএব উটের মত একটি পশুও বুঝতে পেরেছে যে, কে মালিক মুখতার আর কে মজবুর ও অসহায়!

পশু বুদ্ধিও যখন 'এখতিয়ার' সম্পর্কিত বক্তব্য বুঝতে পেরেছে, তখন ওহে মানব বুদ্ধি! শরম কর, তুমি আর এমন কথা বল না।

এ কথাতো একেবারেই পরিষ্কার। এতদসত্ত্বেও প্রভাতে সাহরী গ্রহণকারী পানাহারের বাহানায় সুবেহ সাদিকের আলোয় চারদিকে ফর্সা হয়ে গেছে দেখতে পেয়েও নিজের চোখ বন্ধ করে ফেলে।

এ সময় তার পরিপূর্ণ মনোযোগ তো নিবদ্ধ থাকে রুটির দিকে; (তাই) সে আঁধারের দিকে মুখ করে বলে, এখনও দিনের আলো ফুটে ওঠেনি।[১]

কারণ ও কার্যকারণ

কারণ ও কার্যকারণ সম্পর্কে মুসলিম ফের্কাগুলোর মধ্যে চরম মতবিরোধ বিদ্যমান। পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে, গোটা সৃষ্টিজগতে কারণ ও কার্যকারণের সিলসিলা কায়েম রয়েছে। আদি কারণ কখনো কারণ থেকে পেছনে অবস্থান করতে পারে না। মু'তাযিলারাও এ মতের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত। তাদের প্রবণতাও এদিকে যে, যে জিনিসের যে বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও পরিচয় স্বীকার করে নেওয়া

১. মছনবী– ৪৬৩ পৃ.।

হয়েছে তার ভেতর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সম্ভাবনা খুবই কম। এর ফলেই তারা খুবই অনীহা প্রকাশ করেন অস্বাভাবিক ও অত্যাশ্চর্য ঘটনার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে আর কোন জিনিসের বেলায় তার স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী কিছু ঘটতে দেখলে। অর্থাৎ কারণ ছাড়া কোন ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনা ঘটাকে তারা অসম্ভব বলে মনে করেন। আশ'আরীপন্থিগণ এর ঠিক বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, কোন বস্তুই কোন বস্তুর কারণ নয়। কোন বস্তুর মধ্যে বিশেষ কোন স্বভাব বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতা নেই। এ ধরনের ভারসাম্যহীন ও চরমপন্থী মতামতের ফলেই যে কোন লোকের যে কোন ধরনের কথা বলার এবং কার্যকারণকে সমূলে অস্বীকার করার একটা বাহানা মিলে গেছে। এর ফলেই মুসলিম বিশ্বাস জগতে এক ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ও শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

মওলানার মত এই দুই চরমপন্থী মতামতের মাঝামাঝি। তিনি স্বীকার করেন যে, কার্যকারণ কিংবা হেতুর একটি হাকীকত আছে এবং হেতু কিংবা কারণ ও আদি কারণগুলোর মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে যা অস্বীকার করা অসম্ভব ও অযৌক্তিক। আল্লাহ্র সাধারণ রীতি এটাই যে, আদি কারণসমূহ কার্যকারণের অধীন হবে এবং বস্তু থেকে তার বৈশিষ্ট্যসমূহ বেরিয়ে আসবে। অবশ্য অত্যাশ্চর্য ও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটাও সম্ভব এবং কখনো কখনো এ ধরনের (অত্যদ্ভূত) ঘটনা ঘটেও। তিনি বলেন :

بیشتر احوال بر سنت رود + گاه قدرت خارق سنت شود

سنت و عادت نهاده بامزه + باز کرده خرق عادت معجزه

بے سبب گر عز بما موصول نیست + قدرت از عزل سبب معزول نیست

অধিকাংশ অবস্থা স্বাভাবিক আইনানুযায়ী চলে; কখনো-সখনো কুদরত (আল্লাহ্র মহিমময় শক্তি) সে নিয়মের মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটান (ফলে সেগুলো অতি অদ্ভূত ও অস্বাভাবিক মনে হয়)।

তিনি আইন-কানুন এবং স্বাভাবিকতা নির্ধারণ করেছেন; অতঃপর ব্যতিক্রমী ও অত্যাশ্চর্য ঘটনাগুলোকে মু'জিযা আখ্যা দিয়েছেন।

যদি বিনা কারণে আমরা সম্মান লাভ করি (অর্থাৎ কারণের সঙ্গে আদি কারণসমূহের সম্পর্ক রয়েছে) তাহলে আল্লাহ্র মহিমময় শক্তি (কুদরত) কার্যকারণকে আদিকারণ থেকে পৃথক করতে পারেন।[১]

---

১. মছনবী ৪২৭ পৃ.।

সাধারণ মানুষ এসব কার্যকারণই দেখে থাকে এবং অন্য কিছু যে তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, সে জন্য তাদেরকে মা'যূর গণ্য করা চলে।

حاصل آنکه در سبب پیچیده + لیک معذوری همیں را دیده

সংক্ষিপ্ত-সার এই যে, তোমরা কার্যকারণের জটিলতার মাঝে নিক্ষিপ্ত হয়েছ; আর একেই তোমরা 'জবর' ও অসহায়ত্ব মনে করছ।[১]

তিনি বলেন, কার্যকারণকে অমূলক ভাবা সমীচীন নয়; কারণ বা হেতুরও একটি হাকীকত আছে। কিন্তু যিনি মুসাব্বিবু'ল-আসবাব বা সমস্ত কারণের আদি কারণ তথা মহাস্রষ্টা– তাঁর হাকীকত এর চেয়েও ঊর্ধ্বে। তিনি মুসাব্বিবু'ল-আসবাব, রাব্বু'ল-আসবাব (কারণসমূহের প্রভু-প্রতিপালক) এবং তিনি ক'াদির-ই মত'লক' (একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী)। এমন যেন না হয় যে, কারণের পেছনে ছুটতে ছুটতে শেষাবধি তোমরা একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিপতিকেই একেবারে ক্ষমতাহীন ও নিষ্ক্রিয় ভাবতে শুরু কর।

اے گرفتار سبب بروں مپر + لیك عزل آں مسبب ظن مبر

هرچه خواهد آں مسبب آورد + قدرت مطلق سببها بردرد

ওহে, কারণ ও হেতুর জটিলতার মাঝে বন্দী! সীমার বাইরে উড্ডয়ন ক'র না; সমস্ত কারণের আদি কারণ তথা সৃষ্টিকর্তার দূরে সরে থাকার কথা চিন্তা ক'র না (কখনো আদি কারণসমূহের সম্পর্ক সরাসরি কর্তার সঙ্গে হয়ে যায়)।

সমস্ত কারণের যিনি আদি কারণ অর্থাৎ মহাস্রষ্টা যাকে চান তাকেই অস্তিত্ব দান করেন; তাঁর অপার কুদরত কখনো-সখনো কার্যকারণের পর্দাও ছিন্ন করে দেয়।[২]

এও বুঝতে হবে যে, কারণ কিংবা হেতু কেবল তাই নয় যা আমাদের জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণের আওতায় রয়েছে; বরং সে সব প্রকাশ্য হেতুর ঊর্ধ্বে আরও কিছু হেতু রয়েছে যা আমাদের দৃষ্টি বহির্ভূত। প্রকৃত বা মূল কারণ প্রকাশ্য কারণ ও হেতুকে কখনো গতিশীল ও কার্যকর করে দেয়, আবার কখনো বা বেকার ও নিষ্ক্রিয় করে রাখে। সর্বোত্তম ও আসল হেতু হ'ল ঐশী ইচ্ছা, তাঁর অভিপ্রায় এবং আদেশ।

سنگ بر آهن زنی آتش جهد ... باز گاهے بے پرد عاطل کند

---

১. মছনবী ৪২৭ পৃ.।
২. মছনবী, ৪২, পৃ.।

তোমরা পাথর দিয়ে যখন লোহার ওপর আঘাত কর তখন আগুনের ফুলকী ছুটে বের হয়। এটা কারণ, কিন্তু আসল কারণ হ'ল হুক্‌মে খোদাওয়ান্দী তথা ঐশী হুকুম; তাঁরই হুকুমে আমরা বাইরে কদম ফেলি।

পাথর এবং লোহা হ'ল কারণ; কিন্তু ওহে সৎ লোক! তুমি একটু ওপরের দিকে তাকাও।

এই কারণ বা হেতুকে সেই মৌলিক বা প্রকৃত কারণই সচল করেছেন; বিনা কারণে কারণও কারণে পরিণত হয়নি।

এই প্রকাশ্য হেতুকে সেই হাকীকত বা প্রকৃত কারণই কার্যকর ও কর্মক্ষম করে। আবার কখনো কখনো এটাকে বেকার ও নিষ্ক্রিয় করে দেয়।[১]

আমরা প্রকাশ্য হেতু বা কারণকে বুঝি এবং আম্বিয়া-ই-কিরাম প্রকৃত ও আদি কারণকে বোঝেন।

وان سبب ها کانبیاء را راهبر است + آں سببها زیں سببها برتراست

ایں سبب را محرم آمد عقل ما + وان سببها راست محرم انبیاء

আসবাবে হাকীকী বা প্রকৃত ও যথার্থ কারণ যা কিনা আম্বিয়া-ই-কিরামের পথ-প্রদর্শক; তা এই প্রকাশ্য হেতু থেকে ঊর্ধ্বতর বস্তু।

এ সব হেতু সম্পর্কে ওয়াকি'ফহাল আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি; আর সেই হেতুর রহস্য সম্পর্কে ওয়াকি'ফহাল আম্বিয়া-ই-কিরাম।[২]

আসবাবে হাকীকী আসবাবে জাহিরীর হেতু এবং তার ওপর বিজয়ী।

هست بر اسباب اسباب دگر + در سبب منگر دراں افگن نظر

হেতুর ওপর আরও হেতু আছে, আছে কারণের ওপর অন্য কারণ; শুধু হেতুর দিকে তাকাইও না; তাঁকেও দেখ।[৩]

এই আসবাবে জাহিরী আসবাবে হাকীকীর সামনে খবই নগণ্য ও দুর্বল; গোটা ব্যাপারটাই হাকীকী আসবাবের সঙ্গেই জড়িত ও সম্পর্কিত।

ایں سبب همچو مریض است وعلیل + این سبب همچو چراغ است وفتیل

شب چراغت را فتیلے تو بتاب + پاك دان زینها چراغ آفتاب

---

১. মছনবী, ৪২, পৃ.।
২. মছনবী–২৫ পৃ.।
৩. ঐ, ২৪৬ পৃ.।

এই প্রকাশ্য ও বাহ্যিক কারণ ব্যাধির ন্যায়; এটা যেন প্রদীপ ও বাতি।

রাত্রি বেলা তুমি তোমার প্রদীপ ও বাতির সলতে (ধরাবার চেষ্টায়) ঘোরাতে থাক; কিন্তু সূর্যের প্রদীপ এসব থেকে পাক-পবিত্র ও বেপরোয়া।[১]

আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের আবির্ভাবকালে যেহেতু সমগ্র দুনিয়াই জাহিরী আসবাব তথা বাহ্যিক ও প্রকাশ্য হেতুর মাঝে ঘুরপাক খায় এবং আসবাব-পরস্তী তথা হেতু পূজা যেহেতু চরম উচ্চ মার্গে অবস্থান করে, হেতু বা কারণের যিনি স্রষ্টা তিনি এবং তাঁর অপার কুদরত যেহেতু একেবারেই দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যায়, হারিয়ে যায় মস্তিষ্ক থেকে, গোটা জগৎ সেখানে শিরক এবং প্রকাশ্য ও দর্শনীয় বিষয়ের পূজার মধ্যে বন্দী থাকে, তাই আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম হেতু বা কারণের ওপর আঘাত হেনে থাকেন এবং কারণ বা হেতুর পরিবর্তে আদি কারণ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দিকেই সকলের মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁদের হাত দিয়ে সিলসিলায় আসবাবের একেবারে বিপরীত ঘটনাও ঘটান এবং মু'জিযা প্রদর্শন করে আসবাব বা হেতুর গুরুত্বহীনতা ও কমযোরী প্রকাশ করে দেন।

انبیاء در قطع اسباب آمدند ... عز در ویش و هلاك و بولهب

আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম কারণ বা হেতু থেকে লোকদের দৃষ্টি লুপ্ত করে দিয়েছেন; তাঁরা হেতুর আসমানের ওপর মু'জিযার আঘাত হেনেছেন।

প্রকাশ্য ও বাহ্যিক হেতু ছাড়াই তাঁরা স্থল ও সমুদ্র অতিক্রম করেছেন; কৃষিকর্ম না করেই পরিষ্কার খাদ্য-শস্য পেয়েছেন।

তাঁদের প্রচেষ্টা ও সাধনায় বালিও আটায় পরিণত হয়েছে; রেশমী সূতা পশমী সূতা দ্বারা সজ্জিত হয়েছে।

সমগ্র কুরআনু'ল-করীম হেতু থেকে পরাঙ্মুখ থাকারই দরস দেয়; দরবেশের সম্মান লাভ এবং আবূ লাহাবের ধ্বংসপ্রাপ্তি তারই ইঙ্গিত বহন করে।[২]

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ রীতি এবং প্রচলিত নিয়মাদর্শ হ'ল হেতু থেকে আদি কারণসমূহের উদ্ভব ও অস্তিত্ব প্রাপ্তি। এ থেকেই আপন বান্দাদেরকে তিনি শ্রমের তা'লীম দিয়ে থাকেন।

---

১. মছনবী, ১৪১ পৃ.।
২. মছনবী–২৪৬ পৃ.।
১. মছনবী, ৪২ পৃ.।

لیك اغلب بر سبب را ند نفاذ + تا بداند طالبے جستن مراد

কিন্তু অধিকাংশ বিষয় হেতুর ওপর চলে যাতে করে প্রার্থী তার অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হবার শিক্ষা লাভ করে। [১]

এভাবেই মওলানা কালাম-সংক্রান্ত ঐসব সমস্যা এবং ধর্মীয় মূলনীতি ও 'আকীদাসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন যেগুলোকে মুতাকাল্লিমীন ও আশ'আরী-পন্থী দার্শনিকগণ দর্শনের ঐন্দ্রজালিক হেঁয়ালি সৃষ্টির মাধ্যমে অত্যন্ত শুষ্ক ও বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত করেছিলেন। মওলানা সে সব বিষয়ের হাকীকত 'ইলমে কালাম ও দর্শনের সংকীর্ণ গলি-ঘুপচি থেকে বের করে সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির প্রশস্ত অঙ্গনে নিয়ে আসেন এবং চিত্তাকর্ষক উদাহরণ, সহজবোধ্য দৃষ্টান্ত এবং কার্যকর ও প্রভাবমণ্ডিত বর্ণনাভঙ্গী দ্বারা সেগুলোকে দৈনন্দিন জীবনের সত্যে ও জীবন-কাহিনীতে পরিণত করেন।

মছনবীর প্রভাব

মছনবী তামাম মুসলিম বিশ্বের চিন্তাধারা ও সাহিত্যের ওপর গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। ইসলামী সাহিত্যের বিশালায়তন ভাণ্ডারে এমন পুস্তকের সংখ্যা খুব কমই আছে যা মুসলিম বিশ্বের বিস্তৃত পরিধিকে দীর্ঘকাল ধরে এমন গভীরভাবে প্রভাবিত করে রাখতে পারে। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে অব্যাহতভাবে মুসলিম বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক, জ্ঞানগত ও সাহিত্য জগত এর সঙ্গীত ও গীতবাদ্যে মূর্ছিত হয়ে আছে। এর সরস সহজ বাণীসমূহ মুসলিম বিশ্বের দিল্ ও দিমাগ তথা মন ও মস্তিষ্ককে নতুন আলোক ও নবতর উত্তাপ প্রদান করছে। এর মাধ্যমে প্রতিটি যুগেই কবিকুল নিত্যনতুন বিষয়, নবতর ভাষা এবং নয়া আঙ্গিক লাভ করেছেন এবং তাদের চিন্তাশক্তি ও সাহিত্যিক প্রতিভা বিকশিত হচ্ছে। জ্ঞানী পণ্ডিত ও কালামশাস্ত্রবিদগণ স্ব-স্ব যুগের জিজ্ঞাসা ও সন্দেহ নিরসনের জন্য এ থেকে নতুন নতুন দলীল-প্রমাণ, চিত্তাকর্ষক উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত, মনোমুগ্ধকর কাহিনী ও প্রশ্নোত্তরের নিত্য-নতুন রাস্তা পেয়েছেন। তাঁরা এর সাশ্রয়ে স্বীয় যুগের অস্থির প্রকৃতি প্রতিভাবান যুবকদের অশান্ত চিত্ত পরিতৃপ্ত করেছেন। তরীকত ও মা'রিফতপন্থিগণ এ থেকে সূফীসুলভ বিষয়াদি, সূক্ষ্ম ও গুঢ় জ্ঞানরাজি এবং সবচেয়ে বড় কথা, মুহব্বতের পয়গাম ও চিত্তজ্বালা এবং প্রেমোন্মত্ততার উপকরণ লাভ করেছেন। এর উদ্দীপনাময়ী কথাবার্তা দ্বারা তাঁরা তাঁদের নির্জন ও নিঃসঙ্গ

---

১. মছনবী, ৪২ পৃ.।

মুহূর্তগুলো ও জনাকীর্ণ মাহফিলসমূহকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্পন্দিত ও উত্তপ্ত রেখেছেন। এ জন্য প্রতিটি যুগের 'আশিক ও মা'রিফতপন্থিগণ একে তাঁদের মাহফিলের শামা'দান ও দিলের মুখপাত্র বানিয়ে রেখেছেন।

মছনবীর বিষয়বস্তুগুলো সবরকম সমালোচনার ঊর্ধ্বে এবং সকল প্রকার ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত– এ রকম ভাবার কোন কারণ নেই। বহু বদ 'আকীদাবিশিষ্ট সূফী ও প্রবৃত্তি-পূজারী এর থেকে কখনো কখনো অবৈধ ফায়দা লুটেছেন। ওয়াহ্'দাতু'ল-ওয়াজূদ মতবাদীরা আজও এ থেকে তাঁদের মতের সমর্থনে ও অনুকূলে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে থাকেন। মছনবী আর যাই হোক একজন মানুষের রচনা তো; আর তিনি মা'সূম কিংবা নিষ্পাপও ছিলেন না। এর বিষয়বস্তুতে তাঁর মানসিক বিপত্তি এবং বাইরের প্রভাবের একটা ভূমিকা ছিল। এতসব সত্ত্বেও এটা অস্বীকার করা যায় না যে, মছনবী সে যুগের এক উল্লেখযোগ্য জ্ঞান-কীর্তি, ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য এবং এর অবিনশ্বর জীবনের উজ্জ্বলতর প্রমাণ। তিনি মুসলিম বিশ্বের চিন্তার স্থবিরতা, জ্ঞানগত ও সাহিত্যিক জড়তা এবং অন্ধ আনুগত্যমূলক ও অনুকরণসর্বস্ব সাহিত্য ও 'ইলমে কালামের ওপর কার্যকর আঘাত হানেন এবং ইসলামের চিন্তা ও দর্শনের কাফেলাকে, যা সপ্তম শতাব্দীতে হাত-পা ছড়িয়ে আরামপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ও বসে বসে ঝিমুচ্ছিল, পুনর্বার সক্রিয় ও গতিশীল করে তোলেন।

মছনবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ খিদমত এই যে, খৃস্টীয় বিংশ শতাব্দীতে যখন মুসলিম বিশ্বের ওপর দ্বিতীয় বারের মত বস্তুবাদ ও অনুভূতিবাদের (حسيت) হামলা চলে এবং য়ূরোপের নব্য দর্শন ও বিজ্ঞান মানুষের মনে নানা ধরনের সন্দেহ ও সংশয়ের বীজ বপন করে, ফলে মানুষের ঈমান ও গায়বী বিশ্বাসে এক সাধারণ অনাস্থা ও অবিশ্বাসের ভাব সৃষ্টি হতে থাকে এবং সেই সঙ্গে এ প্রবণতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, এমন প্রতিটি বস্তু যা মানুষের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আওতায় আসে না এবং মানুষের বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিকট ধরা পড়ে না– তার অস্তিত্বই নেই, যখন 'আকাইদের প্রাচীন পুঁথি-পুস্তক ও প্রাচীন যুক্তিধারাও 'ইলমে কালামের মুকাবিলায় নামতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে তখন মছনবী এই বর্ধিত সয়লাবের (যা য়ূরোপের বস্তুগত ও রাজনৈতিক বিজয়ের চেয়ে কম বিপজ্জনক ছিল না) সফল ও সার্থক মুকাবিলা করে এবং মানুষের মন-মানসে পুনরায় ধর্মীয় ও গায়বী সত্যের প্রতি সম্মান ও মর্যাদাবোধ জাগ্রত করে এবং আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব, অদৃশ্য জগতের বিশালতা ও বিস্তৃতি এবং হৃদয় ও আত্মা, ঈমান ও

আত্যন্তিক প্রেমের (وجدان) গুরুত্বের পরিপূর্ণ ছবি এঁকে দেয়। দর্শন ও বস্তুবাদের শতবিধ আঘাতে আহত যেসব যুবক ও বুদ্ধিজীবী ইলহাদ (ধর্মদ্রোহিতা, নাস্তিকতা) ও কুফরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল অথবা ঈমান ও ইসলামের সীমান্ত যারা পাড়ি দিয়ে ওপারে চলে গিয়েছিল, মছনবী তাদের পুনরায় ঈমান ও ইয়াকীনী সম্পদে ধন্য করে। ভারত উপমহাদেশের জ্ঞানী-গুণী ও মনীষীদের একটি বিরাট সংখ্যা পরিষ্কার স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে, তাঁরা মছনবীর বদৌলতে পুনর্বার ইসলামের ন্যায় মহামূল্য সম্পদ লাভে সক্ষম হয়েছেন এবং তাঁরা এর ফয়েয-এর মাধ্যমেই মুসলমান ও স'াহি'ব-এ-য়াক'ীন হতে পেরেছেন। বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক ও চিন্তানায়ক ডঃ স্যার মুহাম্মদ ইকবাল (র) শায়খ রূমীর ফয়েয ও ইরশাদ লাভে ধন্য হবার এবং নিজেকে তাঁর ছাত্র হবার গৌরব লাভের স্বীকৃতি নানাভাবে দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে, মছনবী তাঁকে এক নতুন ও নবতর প্রেরণা দান করেছে। এক জায়গায় তিনি বলেন :

پیر رومی مرشد روشن ضمیر ... باز شورے در نہاد من فتاد

পীর মওলানা জালালুদ্দীন রূমী আলোকোজ্জ্বল দিলের অধিকারী মুরশিদ, 'ইশ্‌ক ও প্রেমোন্মত্ত কাফেলার অধিনায়ক;

মনযিল তাঁর চন্দ্র-সূর্যের চেয়েও উর্ধ্বে; নক্ষত্ররাজি দিয়ে তিনি তাঁর তাঁবুর রশি বানিয়ে থাকেন।

কুরআনের নূর তাঁর বক্ষে (গচ্ছিত); জাম-ই-জামশীদ (পারস্য-রাজ জামশীদের পান পাত্র। কথিত আছে যে, এতে সারা বিশ্ব প্রতিফলিত হ'ত)-ও তাঁর আয়নার সামনে লজ্জিত।

সেই পবিত্র বংশোদ্ভূত, রূহে'র ওপর অনুগ্রহ বর্ষণকারীর বাঁশরী দ্বারা আমার প্রকৃতির মাঝে এক অপূর্ব সুরের সৃষ্টি হয়েছে।[1]

অন্যত্র তিনি বলেন :

رومی آں عشق ومحبت را دلیل + تشنه کا مان را کلامش سلسبیل

রূমী 'ইশ্‌ক' ও মুহব্বতের পথ-প্রদর্শক; তৃষ্ণার্ত ঠোঁটের নিকট তাঁর বাণী জান্নাতী নহর সালসাবীলের ন্যায়।[2]

---

১. মছনবী, پس چه باید کرد اے اقوام مشرق পৃষ্ঠা ১।
২. জাবিদনামা, ২৪ পৃ.।

এই সঙ্গে তিনি এও অভিযোগ করেন এবং এই মর্মেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে, এক শ্রেণীর মানুষ তাদের দৃষ্টিকে এর শব্দ ও বাহ্যিক অর্থের ভেতর সীমাবদ্ধ করে রেখেছে এবং একে জীবনের কোমলতা ও হৃদয়ের উষ্ণতায় পরিণত করবার পরিবর্তে নর্তন-কুর্দনের ওসীলা বানিয়েছে।

شرح او کردند اورا کس ندید + معنی او چوں غزال از مار مید

رقص تن از حرف او آموختند + چشم را از رقص جان بر دوختند

লোকেরা তাঁর বাণীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছে, কিন্তু তাঁকে কেউ দেখেনি; তাঁর সে সব হাকীকত ও অর্থ আমাদের দৃষ্টি থেকে দ্রুতগামী হরিণের ন্যায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

লোকেরা এর অক্ষর থেকে নর্তন-কুর্দন শিখেছে; প্রাণের নৃত্য দ্বারা চক্ষুগুলোকে সেলাই করে দিয়েছে।[১]

কিন্তু এ ক্ষতি আমাদের, মছনবীর নয়। মছনবী এই বিপ্লবী যুগেও আমাদের পথের সাথী তথা চলার পথের বন্ধু হতে পারে। এই বস্তুপূজার যুগে সর্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য বস্তু হ'ল হৃদয়ের জ্বালা এবং পবিত্র প্রেম ও ভালবাসা।

دل سوز سے خالی ھے نگه پاك نہیں ھے

پهر اس میں عجب کیاکه تو بیباك نہیں ھے

وه آنکھ که ھے سرمه افرنگ سے روشن

پر کار و سخن ساز ھے نمناك نہیں ھے

এই জাগ্রত সম্পদ মছনবী থেকে লাভ করা যেতে পারে। বর্তমান যুগের যুবকদের ওসীয়ত (অন্তিম উপদেশ দান) করতে গিয়ে তিনি বলেন :

پیر رومی را رفیق راه ساز + تا خدا بخشد ترا سوز وگداز

زانکه رومی مغز را داند زپوست + پائے او محکم فتد در کوئے دوست

১. জাবিদনামা, , ২২৪।

মুর্শিদ রূমী (র)-কে তোমার পথের সঙ্গী বানাও; তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে হৃদয়ের উত্তাপ ও সজীবতা প্রদান করবেন।

যেহেতু মওলানা রূমী (র) মগজকে খোসা থেকে আলাদা করতে জানেন; (তিনি একজন 'আরিফ) সেহেতু তাঁর পদক্ষেপ বন্ধুর রাহে সুদৃঢ় প্রমাণিত হয়।[১]

---

২. বাল-ই জিবরীল।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (২য় খণ্ড)
মূল ঃ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী
অনুবাদ ঃ আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী ও হাফেজ আবূ তাহের মেছবাহ

প্রকাশক ঃ
মুহাম্মদ আবদুর রউফ
মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১২৫৪৮১

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৭ ; মুহররম ১৪১১ ; আগস্ট ১৯৯০ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ আগস্ট ২০০৩ ইং

অক্ষর বিন্যাস ঃ
জবা কম্পিউটার
বুকস্ এণ্ড কম্পিউটার মার্কেট (৪র্থ তলা)
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
মেসার্স তাওয়াক্কাল প্রেস
৮৭/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ ঃ
বশির মেছবাহ
সালসাবিল
মোবাইল : ০১৭১-২৬৬৮৪৫

ISBN : 984-622-002-2

মূল্য ঃ ১৬০.০০ টাকা মাত্র

Shangrami Shadhakder Itihash : (History of the Soviours of Islamic Spirit) written by Syed Abul Hasan Ali Nadvi in Urdu, translated by A. S. M. Omar Ali and Hafez Abu Taher Mesbah into Bengali and Published by Muhammad Abdur Rouf. Muhammad Brothers, 38, Bangla Bazar. Dhaka—1100. Phone—7125481 August, 2003. Price : Tk. 160.00 Only.

উৎসর্গ

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে যাঁরা চরম আত্মত্যাগের সম্মুখীন হয়েও বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি, এ পথের সকল প্রতিকূলতাকে যাঁরা হাসিমুখে মুকাবিলা করেছেন,

অত্যাচারী জালিমের খড়্গ-কৃপাণ ও বদ্ধ কারাপ্রাচীর যাঁদের বিশ্বাসের ভিত্‌কে এক বিন্দুও টলাতে পারেনি,

বিলাসী ও আয়েশী জীবন যাপনের শত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যাঁরা নির্লোভ ও নির্মোহ্ জীবন যাপন করে মানুষের সামনে অনুপম আদর্শ স্থাপন করেছেন,

পর্ণ কুটিরে বাস করে অনাড়ম্বর পরিবেশ থেকেও যাঁরা রাজা-বাদশাহ্‌র ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতার সামনে নিজেদের শির্ সমুন্নত রেখেছেন, দুঃখী ও মজলুম মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যাঁরা তাদের হতাশ অন্তরে আশা-ভরসার প্রদীপ জ্বালিয়েছেন,

তাদেরকে কাছে টেনেছেন,
আপন করেছেন,

রূহানিয়াতের প্রোজ্জ্বল আলোকধারায় যাঁরা পাপক্লিষ্ট ও পথভ্রষ্ট মানুষকে হিদায়াতের প্রশস্ত রাজপথে এনে দাঁড় করিয়েছেন, সেই সব জানা-অজানা মর্দে মু'মিন ও মর্দে মুজাহিদের পবিত্র রূহের উদ্দেশে।

আমাদের কথা

খুলাফায়ে রাশেদীনের পর মুসলিম ইতিহাসের আদর্শবাদী ধারা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়লেও পরবর্তী প্রতিটি যুগে এমন কিছু কিছু বিরল ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা পুনরায় ফিরে যেতে চেয়েছেন ইসলামের মূল আদর্শের দিকে এবং আজীবন সংগ্রাম ও সাধনা করেছেন ইসলামী আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। তাঁরা কেউ কেউ, যেমন ওমর ইবন 'আবদুল 'আযীয (র.), গাযী সালাহ্উদ্দীন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই সাধনা ও সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন, কেউ কেউ এই সাধনার কারণে তৎকালীন রাষ্ট্রশক্তির কোপদৃষ্টিতে পতিত হয়েছেন, আবার অনেকেই রাষ্ট্রীয় অঙ্গন থেকে দূরে অবস্থান করে ইসলামের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, দার্শনিক ও সামাজিক আদর্শকে সমুন্নত রাখার কঠোর সাধনায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস যতটা মুসলিম রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের ইতিহাস, তার চাইতেও অধিক এই সব সাধক ও সংগ্রামী পুরুষের ইতিহাস। আজকের বিশ্বব্যাপী ইসলামী নব জাগরণের পেছনে এসব অমর সাধকের শত-সহস্র বছরের নিঃস্বার্থ সাধনার অবদানকে অস্বীকার করা আর বাস্তবতাকে অস্বীকার করা একই কথা।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইসলামের ইতিহাসের এই স্বর্ণোজ্জ্বল ধারা আজও আমাদের কাছে প্রায় অজানাই রয়ে গেছে। ইসলামী আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকামী এই বিপ্লবী তাৎপর্যমণ্ডিত প্রবাহের চাপাপড়া ইতিহাস পুনরুদ্ধারকল্পে আত্মনিয়োগ করে উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) মুসলিম উম্মাহকে চিরকৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। উর্দু ভাষায় রচিত তাঁর এ সম্পর্কিত যুগান্তকারী গ্রন্থ 'তারীখ-ই দাওয়াত ও 'আযীমত' ছয় খণ্ডে সমাপ্ত এবং হযরত ওমর ইবন 'আবদুল আযীয (র.) থেকে শুরু করে বিপ্লবী অগ্নিপুরুষ সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.) পর্যন্ত সাধক সংগ্রামীদের আলেখ্য এতে স্থান লাভ করেছে। এই গ্রন্থমালা বাংলায় প্রকাশ করার কর্মসূচী মুহাম্মদ ব্রাদার্স ইতিপূর্বেই গ্রহণ করেছে এবং ইতোমধ্যেই এ সিরিজের ১ম খণ্ডটি সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস নামে মুহাম্মদ ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিতও হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থ উক্ত 'তারীখ-ই-দাওয়াত ও আযীমত' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ।

বর্তমান খণ্ডে ইসলামী রেনেসাঁর বিপ্লবী (একই সঙ্গে বিতর্কিতও) পুরুষ শায়খুল ইসলাম হাফিজ তকীয়্যুদ্দীন ইবনে তায়মিয়া (র.)-র সুবিস্তৃত ঘটনা ও কর্মবহুল জীবনালেখ্য স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য, ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র ওপর কয়েকটি বই

ইতিপূর্বেই বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তবে বর্তমান গ্রন্থে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র.) সম্পর্কে পাঠক ভিন্নতর স্বাদ পাবেন, তদুপরি এই বিতর্কিত (একই সঙ্গে মজলুমও বটেন) চরিত্রটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবেন এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার আশা করছি। পরিশেষে আমাদের মুনাজাত, আল্লাহ্ পাক আমাদের সামান্য খিদমতটুকু কবুল করুন। আমীন!

আগস্ট, ২০০৩ ইং —প্রকাশক
ঢাকা-১১০০

অনুবাদকদ্বয়ের আরয

আল্লাহ্ রাব্বু'ল-'আলামীনের অপার অনুগ্রহে মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত 'আলিম, লেখক, দার্শনিক ও রূহানী মার্গের অন্যতম জ্যোতিষ্ক 'আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান 'আলী নদভীর রচিত 'তারীখ দাওয়াত ও 'আযীমত' সিরিজের দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা তরজমা **"সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস"** (দ্বিতীয় খণ্ড) প্রকাশিত হ'ল। যাঁর অসীম রহমতে এটি বাংলাভাষী পাঠকের হাতে পৌঁছতে পারল সর্বপ্রথম সেই মহান আল্লাহ্র দরবারে জানাই লাখো-কোটি হাম্‌দ এবং অসংখ্য শোক্‌র ও সুজূদ।

উর্দূভাষী পাঠকের নিকট 'আরীখ-ই দাওয়াত ও 'আযীমত'-এর নতুন পরিচয়ের অবকাশ নেই। সর্বপ্রথম ভারতে প্রকাশিত হলেও ইতিমধ্যেই তা আরবী ও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাঠকমহলে সাড়া জাগিয়েছে এবং এর কোন কোন খণ্ডের একাধিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। অবশেষে বাংলাভাষী পাঠক সর্বপ্রথম ১৯৮৩ সালের প্রথম দিকে এ সিরিজের ৩য় খণ্ডটির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান যা 'ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক' নামে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। অতঃপর এর ১ম খণ্ডটি অনেক বিলম্বে হলেও যথানিয়মেই প্রকাশিত হয়। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, দু'টি খণ্ডই পাঠক মহলে বিপুল জনপ্রিয়তা পায় ও অল্প দিনের মধ্যেই ৩য় খণ্ডটির দু'টি সংস্করণ এবং ১ম খণ্ডটির ১ম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এই সঙ্গে সহৃদয় পাঠকমহলকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, সিরিজের অপরাপর খণ্ডগুলোও যথাসম্ভব সত্বর পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া হবে। অত্যন্ত আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয়, আল্লাহ্ পাক আমাদের সে আশ্বাস পূরণের ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবার তৌফিক দিলেন। সেই সাথে আগ্রহী পাঠকের কাছে বিনীত দু'আপ্রার্থী, রাহ্‌মানু'র-রাহীম আল্লাহ্ পাক তাঁর অসীম মেহেরবানীতে সিরিজের অপর দু'টিও খণ্ড (৪র্থ ও ৫ম) যেন আমাদের পাঠকবৃন্দের হাতে সত্বর তুলে দেবার তৌফিক দেন। আর তাঁর তৌফিকই হোক আমাদের একমাত্র ভরসা।

বর্তমান খণ্ডটি শায়খুল ইসলাম হাফিজ ইবনে তায়মিয়া (র.)-র বিস্তৃত ঘটনা ও কর্মবহুল জীবনালেখ্য। ইবনে তায়মিয়া (র.) কেবল এদেশেই নয়—সারা মুসলিম বিশ্বেই বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব হিসাবে সমধিক খ্যাত ও পরিচিত। তাঁকে নিয়ে এই বিতর্ক তাঁর জীবিতকালেই শুরু হয়েছিল এবং এজন্য তাঁকে কম ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয়নি। জেল, জুলুম, প্রলোভন—এমন কোন অস্ত্র নেই যা তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয় নি। কিন্তু কোন কিছুই তাঁকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একচুলও হটাতে সক্ষম হয়নি। বিশ্বত্রাস তাতারীদের অস্ত্র যেমন তাঁর সামনে ভোঁতা প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি মুসলিম স্বেচ্ছাচারী শাসকদের ভয়-ভীতি ও হুমকী প্রদর্শন, সর্বশেষ বন্ধ কারা-প্রাচীরও অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। তিনি একমাত্র তাঁর মহান স্রষ্টা ছাড়া আর কোন শক্তির সামনেই তাঁর উন্নত মস্তক অবনত করেন নি, কিংবা কোন জাগতিক প্রেরণা বা স্বার্থই তাঁর পবিত্র চরিত্র কলুষিত করতে পারে নি।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র.)-কে নিয়ে এই বিতর্কের কারণ কি? এ প্রশ্ন অন্যদের নয়-আমাদেরও। স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই বর্তমান গ্রন্থটি পাঠ করবার পূর্বে আমাদের সে প্রশ্ন থাকলেও এক্ষণে তা আর নেই। এই মহান ব্যক্তিত্বের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সকল মহলের কাছেই তাই আমাদের বিনীত আবেদন, আসুন-আমরা এই বিতর্কিত চরিত্রটি সম্পর্কে খোলা মন নিয়ে জানতে চেষ্টা করি, এরপর তাঁর সম্পর্কে কোন রায় কায়েম করি। কারণ তিনি শুধু বিতর্কিতই নন- একজন সর্বাধিক মজলুমও। একজন মজলুম মানুষ হিসাবে তিনি অবশ্যই আমাদের কাছে এতটুকু ইনসাফ আশা করতে পারেন, তাঁর সম্পর্কে কোন রায় কায়েমের পূর্বে তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ আমরা দেব এবং তাঁর সকল বক্তব্য আমরা ধৈর্যের সাথে শুনব। বর্তমান গ্রন্থ আমাদেরকে সেই সুযোগ এনে দিয়েছে যেজন্য এ গ্রন্থের মূল লেখক আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান নদভীর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

বাংলা ভাষায় এই মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ইতিপূর্বে তেমন কোন আলোচনা হয়নি। ফলে তিনি পূর্বোপর আমাদের কাছে অজানাই রয়ে গেছেন। মাত্র বছর খানেক আগে ড. সিরাজুল হক (প্রফেসর এমিরিটাস, ঢা. বি.)-কৃত ও ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত থিসিসটির বাংলা তরজমাটি প্রকাশিত হওয়ায় এ পথে এক ধাপ অগ্রসর হওয়া গেছে। তরজমা করেছেন ডঃ মুজিবর রহমান (অধ্যাপক, আরবী ও ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগ, রা. বি.)। পূর্বোক্ত গ্রন্থের সাথে বর্তমান গ্রন্থটি মিলিয়ে পড়লে আশা করা যায়, এই আপোসহীন মর্দে মু'মিন ও মর্দে মুজাহিদের বিপ্লবী চরিত্রটি উপলব্ধি করতে পাঠকের পক্ষে সহজ হবে। আল্লাহ্ পাক আমাদের সঠিক ও যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণে হিদায়াত দিন!

বলা দরকার, বর্তমান গ্রন্থের ১ম পৃষ্ঠা থেকে ২২১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তরজমা করেছেন জনাব আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী এবং ২২২ পৃষ্ঠা থেকে ৩৬৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অনুবাদ করেছেন জনাব হাফেজ আবু তাহের মেছবাহ। এ ব্যাপারে আমরা কতটুকু সফল হয়েছি সে বিচারের ভার পাঠকের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি। তবে তরজমা মূলানুগ রেখে যথাসম্ভব প্রা ল, সাবলীল ও সুখপাঠ্য করতে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার কোন কসুর করিনি, এটুকু বোধ হয় বলা যায়। অতঃপর বাকীটুকু করেছেন এর সম্পাদক অগ্রজপ্রতিম কবি আফজাল চৌধুরী। এরপরও কোনরূপ ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য আগামী সংস্করণ পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কী করতে পারি। নির্ঘণ্ট তৈরি করে দিয়ে মরিয়ম জামিলা ও জামিলা কুলছুম আমাদের মুবারকবাদ পাবার হকদার হয়েছেন। দু'আ করি, আল্লাহ পাক তাঁদেরকে উভয় জাহানে কামিয়াব করুন।

গ্রন্থের প্রকাশ ও মুদ্রণের বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের সকলকেই জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। প্রকাশের ভার নেবার জন্য মুহাম্মদ ব্রাদার্স কর্তৃপক্ষকে জানাই শুক্‌রিয়া। দীনের নগণ্য খাদেম হিসেবে আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলের শ্রম কবুল করুন এবং একে নাজাতের ওসীলা বানান-এই মুনাজাত করি।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
হাফেজ আবু তাহের মেছবাহ

ভূমিকা

আল্লাহ্ পাকের যাবতীয় প্রশংসা ও তাঁর মনোনীত বান্দাদের ওপর সালাম। আলহামদু লিল্লাহ্। পাঠকের সামনে 'তারীখে দাওয়াত ও 'আযীমত'-এর ২য় খণ্ড পেশ করার সৌভাগ্য ও আনন্দ লাভ করছি। গ্রন্থের ১ম খণ্ডে হিজরী ১ম শতাব্দী থেকে নিয়ে ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত দাওয়াত ও ইসলাহর রোয়েদাদ পেশ করা হয়েছিল। ব্যক্তিত্বের দিক থেকে সাইয়েদুনা ওমর ইবনে 'আবদুল আযীয (র.) থেকে নিয়ে মওলানা জালালুদ্দীন রূমী (র.) পর্যন্ত সাধকদের পরিচিতি, তাঁদের সংস্কার, সংশোধনমূলক কাজ ও তাঁদের অদম্য ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের বিস্তৃত বিবরণ এতে এসে গেছে।

বর্তমান খণ্ডে ওয়াদা মাফিক্ শায়খুল ইসলাম হাফিজ ইবনে তায়মিয়া (র.)-র জীবনী, তাঁর ছাত্র ও চিন্তা-চেতনানুসারী মনীষীবৃন্দের আলোচনা স্থান পেয়েছে। প্রাথমিক খসড়া মুতাবিক বর্তমান খণ্ডটি উল্লিখিত যুগ ও উপরিউক্ত চিন্তাধারার জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখেই লেখা শুরু করেছিলাম। অবশেষে কেবল শায়খুল ইসলাম (র)-র ওপর আলোচনার মুসাবিদাই দু'শ' পৃষ্ঠা হয়ে যায়। তখনও তাঁর সংস্কার, পুনর্জাগরণমূলক কর্মকাণ্ড ও এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা বাকী ছিল। ইতোমধ্যে ১ম খণ্ডের ওপর যাঁরা আলোচনা-পর্যালোচনা পেশ করেছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ আমাকে ঐকান্তিক পরামর্শ দেন, যেহেতু বর্তমান যুগে মানুষের অবকাশ কম, তারা সংক্ষিপ্ততা পসন্দ করেন বিধায় আলোচ্য গ্রন্থের কলেবর সংক্ষিপ্ত হলেই ভাল হবে। তাদের দাবী ছিল, শায়খুল ইসলামের ওপর আলোচনার পরিসর সংক্ষিপ্ত ও নির্বাচিত হলেই ভাল হবে যাতে এই খণ্ডেই সংগ্রামী সাধকদের অপরাপর ব্যক্তিবর্গের স্থান হয়ে যায়। গ্রন্থকার (যিনি এ যুগের মানসিক প্রবণতা সম্পর্কে অনবহিত নন)-ও এমনটি ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু যখন আলোচনার ওপর আবার দৃষ্টি বুলালাম, অনুভব করলাম, অনেক প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান উপকরণ সংগৃহীত হয়ে গেছে যা আপন স্থানে উপকারী ও অপরিহার্য বিবেচিত হবে। কেউ কেউ যেমন সংক্ষিপ্তের পরামর্শ দিয়েছেন, ঠিক তেমনি কোন কোন অন্তরঙ্গ শুভাকাঙ্ক্ষী বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনার দাবী জানান এবং পুনঃপুনঃ আবেদন জানিয়ে বলেন, আমি যেন কিছুতেই আলোচনা সংক্ষিপ্ত না করি। শেষাবধি আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, এই খণ্ডটি যেমন আছে তেমনি থাকুক এবং যা কিছু লিখেছি তা আর কাঁটছাট করব না। কারণ এ রকম জ্ঞানগর্ভ কাজ চাইলেই রোজ রোজ করা যায় না। তাছাড়া মনের আনন্দ-নিরানন্দ, অবকাশ মুহূর্ত ও কলমের বহমানতার ওপরও ভরসা নেই। গ্রন্থ রচনা সমাপ্তির পর মানুষ যে যার প্রয়োজনীয় স্বাদ ও রুচি মুতাবিক নিজেই বাছাই করে নিতে পারবে, সংক্ষেপ করতে চাইলেও পারবে।

মওলানা সাইয়েদ মানাযির আসান গীলানী ও মওলানা শাহ্ হালীম 'আতা আর ইহজগতে নেই যাঁরা এই সিলসিলার সর্বাধিক গুণগ্রাহী ছিলেন। ১ম খণ্ড প্রকাশের পর মওলানা গীলানী (র.)-ই সবচে' বেশি আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। বইয়ের প্রতিটি শব্দ গভীর আগ্রহে পড়েছিলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহ ও প্রভাবমণ্ডিত ভাষায় চিঠি লিখেছিলেন। আমাদের জানা মতে ভারত উপমহাদেশে মরহুমই ছিলেন শায়খ-ই আকবর-এর সমঝদার পাঠক ও বাহক। তদ্সত্ত্বেও তিনি ছিলেন শায়খুল ইসলাম (র.)-র ইমামত ও 'আজমত-এর সমর্থক, তাঁর গুণগ্রাহী ও তাঁর রচনার আগ্রহী পাঠক। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন তবে বর্তমান খণ্ড প্রকাশে খুবই আনন্দ পেতেন।

মওলানা শাহ্ হালীম 'আতা গোটা জীবনটাই নীরব নিভৃতে কাটিয়েছেন। জ্ঞানী মহলেও তাঁর পরিচিতি বড় একটা নেই। তাঁর সম্পর্কে তাঁরা কমই জানতে পেয়েছেন। কিন্তু আসলে এই উপমহাদেশে শায়খুল ইসলাম ও তাঁর ছাত্রদের জ্ঞান-ভাণ্ডার সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বেশী কেউ জানতেন না। তাঁদের রচনা ও গবেষণাকর্ম সম্পর্কে তিনি ছিলেন জীবন্ত বিশ্বকোষ। যদিও ১ম খণ্ড তাঁর সাহায্য ও দিক-নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হয় নি, কিন্তু ২য় খণ্ডেও তাঁর বিস্তৃত জ্ঞান, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও তাঁর মূল্যবান পাঠাগার লেখককে পরামর্শ ও সাহচর্য যুগিয়েছে এবং বর্তমান গ্রন্থের বিন্যাস ও সংকলনে তাঁর এতটা হিস্যা রয়েছে, কৃতজ্ঞতা ও স্বীকৃতির উন্নত থেকে উন্নততর শব্দ চয়নও তার জন্য যথেষ্ট হবে না। এই শেষ যুগেও এ দু'জন বুযুর্গ প্রথম যুগের 'উলামায়ে কিরামের 'ইল্ম, নিবিষ্টচিত্ততা, জ্ঞান নিমগ্নতা, বিস্তৃত দৃষ্টি ও গভীর অধ্যয়নের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহ্ পাক তাঁদের উভয়কে ক্ষমা করুন ও তাঁদের দর্জা বুলন্দ করে দিন!

প্রাচীন উৎস ছাড়াও বর্তমান গ্রন্থ রচনায় মিসরীয় মনীষী শায়খ মুহাম্মদ আবু যুহরাকৃত 'ইবনে তায়মিয়া' নামক গ্রন্থ থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। বিনয়ের সঙ্গে আমি এর স্বীকৃতি দিচ্ছি এবং এজন্য শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য মনে করছি।

আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রত্যাশা, ১ম খণ্ডের ন্যায় বর্তমান খণ্ডটিও ভারতবর্ষের শিক্ষিত ও ধর্মীয় মহলে জনপ্রিয় হবে এবং গভীর আগ্রহে পড়া হবে।

১৭ই মহররম, '৭৬ হিজরী

আবুল হাসান আলী

দাইরা-ই শাহ 'আলামুল্লাহ্ (র.)

রায়বেরেলী

সূচী

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

বাতিল ধর্ম ফেরকাগুলোর 'আকীদা-বিশ্বাসের মুকাবিলা খ্রিস্টধর্ম খণ্ডন ২৫৯-৩০৬ পৃষ্ঠা

নবম অধ্যায়

শরীয়তী 'ইলমসমূহের পুনরুজ্জীবন ৩০৮–৩১২

দশম অধ্যায়

ইসলামী চিন্তাধারার পুনরুজ্জীবন, আকাইদের উৎস কুরআন ও সুন্নাহ ৩১৪–৩২৬

একাদশ অধ্যায়

তাকলীদ-পূর্ব যুগে কুরআন, সুন্নাহ্ ও ফিক্হ শাস্ত্র ৩২৮–৩৩৬

দ্বাদশ অধ্যায়

ইবনে তায়মিয়ার সুযোগ্য ছাত্র ও উত্তরসূরী ৩৩৭–৩৬৬

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র.)

শায়খুল ইসলাম হাফিজ ইবন তায়মিয়া (র)

শরীয়তের মুখপাত্র ও সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী

একজন সংস্কারকের প্রয়োজনীয়তা

ঐশী দর্শন ও 'আকাইদের ক্ষেত্রে গ্রীক দর্শন ও মুতাকাল্লিম (কালাম-শাস্ত্রবিদ)-দের বুদ্ধিবৃত্তিক বাহ্যিকতার একটি অনিবার্য প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়। আর এর পতাকাবাহী ছিলেন মওলানা জালালুদ্দীন রূমী। ত্রুটিপূর্ণ ও ভাসা ভাসা বুদ্ধিবৃত্তির মুকাবিলায় উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি, সুদৃঢ় চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির এ ছিল এক স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ, ছিল নতুন এক 'ইলমে কালামের শুভ উদ্বোধন যার বুনিয়াদ রাখা হয়েছিল আত্মা ও দৃষ্টির সমুন্নতি, শুচি-শুভ্র পবিত্রতা ও মুতাকাল্লিমের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর। মওলানা রূমী (র) ছিলেন তাঁর যুগের একজন গভীর পাণ্ডিত্যসম্পন্ন 'আলিম ও একজন অভিজ্ঞ মুতাকাল্লিম যাঁকে আল্লাহ্ পাক 'আরিফের কলব (অন্তঃকরণ, আত্মা) ও 'আশিক প্রকৃতি দান করেছিলেন। দার্শনিকের বাক-রীতি ও মুতাকাল্লিমের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার প্রতি তাঁর প্রকৃতি ছিল শীতল, নিস্পৃহ ও অসন্তুষ্ট। একজন গভীর প্রত্যয়ী ও 'ইশকের অধিকারী মানুষের সাহচর্য, তাঁর রিয়াযত ও মুজাহাদা তাঁকে এই মকামে পৌছে দেয় যেখান থেকে তাঁর ইল্‌মে কালামের ঐ সব যুদ্ধে হাকীকত (সত্য, মূলতত্ত্ব ও যথার্থতা) কম এবং মেধা ও বাগ্মিতা অধিক দৃষ্টিগোচর হত। এই মকামে পৌছে তিনি ধর্মীয় মূল তত্ত্বগুলোকে নিজের ভাষায় বর্ণনা করেন এবং সে সবের প্রমাণ করবার জন্য সে সব রাস্তা এখতিয়ার করেন যা হাকীকতের অধিকতর নিকটবর্তী এবং জ্ঞাতব্য শক্তি ও অভিজ্ঞতার ওপর ছিল যার ভিত্তি।

কিন্তু দর্শনের এই বিদ্রোহ ও 'ইল্‌মে কালামের এই ভারসাম্যহীনতার বিরুদ্ধে আরও একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দেবার দরকার ছিল যা পূর্বোল্লিখিত প্রতিক্রিয়ার মুকাবিলায় সত্যের কিছুমাত্র কম অনুকূল ছিল না। দর্শন (ঐশী ও ধর্ম সংক্রান্ত) ও 'ইলমে কালামের আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল আল্লাহ্‌র যাত (সত্তা) ও সিফাত (গুণাবলী)-এর সমস্যা। ইসলামী শরীয়ত 'আকাইদের ব্যাপারে মানুষকে অন্ধকারে ছেড়ে দেয়নি, বরং যেহেতু এই শাখাটি মানুষের গোটা জীবন

ও যিন্দেগী, 'আমল ও আখলাক এবং বিশুদ্ধ তমদ্দুন ও সুস্থ সঠিক সমাজের বুনিয়াদ, সেজন্য সে (ইসলামী শরীয়ত) আগেকার সমস্ত ধর্ম ও মযহাব থেকে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে অনেক বেশী স্পষ্ট, সাধারণের বোধগম্য ও চূড়ান্ত শিক্ষা দান করে যারপর এক্ষেত্রে আর কোন পরিশ্রম, মাথা ব্যথা ও কোন রকম কষ্ট-কল্পনার প্রয়োজন ছিল না। এই 'ইল্‌ম ও য়াকীনের উৎসমূল একমাত্র আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের পেশকৃত শিক্ষা। তাঁরা (আম্বিয়া-ই-কিরাম) যা কিছু বলে দিয়েছেন এবং যতটা বলে দিয়েছেন সেটাই চূড়ান্ত ও শেষ কথা। কেননা একমাত্র তাঁরাই সেই মহান সত্তা, তাঁর কল্পনাতীত ও উপমাবিহীন গুণাবলীর পরিচিতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। এ বিষয়ে আলোচনা করবার এবং একটি পক্ষ হবার কোন অধিকার দর্শনের ছিল না। তার এ জ্ঞানের প্রাথমিক ধারণাটুকুও ছিল না, আর না এতটুকুই জানা ছিল যতটুকু সুবিন্যস্ত করে সে অজ্ঞাত তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছে থাকে, আর না এখানে কোন প্রকার অভিজ্ঞতা, পর্যালোচনা কিংবা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ ছিল, আর না দার্শনিকদের মধ্যে এর যোগ্যতাই আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দর্শন তার নিজ সীমারেখা অতিক্রম করে এবং এ বিষয়ে কেবল সে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপই করেনি, বরং এর সমস্যা ও খুঁটিনাটি বিষয়াদিতে এতখানি আস্থা ও দৃঢ়তা সহকারে এবং এতটা বিস্তারিত ও সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করে এবং এর পর্যালোচনা থেকে কাজ নিতে শুরু করে যা কেবল একটি রাসায়নিক পরীক্ষাগারেই আঞ্জাম দেওয়া যেতে পারে।

দর্শনের মুকাবিলা ও ধর্মের সাহায্য ও সমর্থনের জন্য 'ইলমে কালাম জন্মলাভ করে এবং এমনটি হবার প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল, ক্রমান্বয়ে খোদ দর্শনের প্রাণসত্তাই এতে অনুপ্রবেশ করেছে এবং তা একটি ধর্মীয় দর্শনে রূপ লাভ করেছে। সেই একই তার আলোচ্য বস্তু, সেই একই আলোচনা-সমালোচনা পদ্ধতি ও যুক্তি-প্রমাণ পন্থা এবং সেই একই মৌলিক ভ্রান্তি যে, আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী (যাত ও সিফাত) ও ইন্দ্রিয়াতীত ও বুদ্ধির অগম্য সমস্যাগুলোকে জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যেই প্রমাণ করা যায়। সেই একই রূপ আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ওপর অনাস্থা ও অতৃপ্তি, সেই সীমাবদ্ধ, ত্রুটিযুক্ত ও ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টিকারী গ্রীক পরিভাষার ব্যবহার। এর ফল হল, সমস্যার নিষ্পত্তি ও কথা সংক্ষিপ্ত হবার পরিবর্তে তা আরো বেশী জটিল ও দীর্ঘসূত্রিতা লাভ করল এবং আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীর মত নেহাৎ সাদাসিধে, কার্যকর ও মর্মস্পর্শী বর্ণনার সমান্তরাল, যার ভেতর অন্তর-রাজ্যে ঈমান ও সুদৃঢ় আস্থা সৃষ্টি করবার, সেই সাথে প্রতিটি যুগের মেধা, মস্তিষ্কের সন্তোষ বিধান ও সান্ত্বনা প্রদানের পরিপূর্ণ যোগ্যতা ছিল এবং যা ছিল আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ্‌র স্বতঃপ্রকাশিত অর্থের ওপর স্থাপিত একটি দীর্ঘ

পেঁচালো ঐশী দর্শন ও একটি মোটা 'আকাইদের শরাহ (ব্যাখ্যা, ভাষ্য) তৈরি হয়ে যায় যার ওপর গ্রীক দর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও এর চিন্তাধারার বেশ ভাল রকম প্রভাব এতে পড়েছিল। এ অবস্থার বিরুদ্ধে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র রূহ (প্রাণ, আত্মা) সর্বদাই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানাতে থাকে। মুসলিম উম্মাহ্‌র একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ঐসব বিস্তারিত দার্শনিক বর্ণনা ও মুতাকাল্লিমসুলভ জটিল ব্যাখ্যার বিরোধী হিসেবে বিরোধিতা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহ্‌র যথার্থ ও কার্যকর মুখপাত্র হিসেবে ভূমিকা পালনের জন্য এমন একজন শক্তিশালী ঈমান, সুবিস্তৃত জ্ঞান ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন 'আলিমের প্রয়োজন ছিল যিনি এ বিষয়ে সুদৃঢ় ঈমান রাখেন, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র স্বতঃপ্রকাশিত অর্থসমূহ, আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই যথেষ্ট, যিনি তাঁর মেধা, প্রতিভা ও গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে দর্শনের প্রতিটি নাড়ী-নক্ষত্র সম্পর্কে অবহিত, যিনি গ্রীক পণ্ডিতদের বাণী ও উক্তি, ধ্যান-ধারণা ও ধর্মীয় চিন্তাধারার জ্ঞানগর্ভ সমালোচনা করতে পারেন, সে সবের মৌলিক দুর্বলতা সম্পর্কে যিনি ওয়াকিফহাল এবং যিনি তাঁর গভীর চিন্তা ও গবেষণার সাহায্যে 'ইলমে কালামের তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন, বিভিন্ন মযহাব ও মুসলিম ফেরকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মতভেদগুলো সম্পর্কে যিনি অবগত, 'ইলমে কালামের গোটা ইতিহাস ও এর চূড়ার ওপর যাঁর দৃষ্টি রয়েছে, তাঁর পরিপূর্ণ অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা দ্বারা তার ভেতর কুরআন ও সুন্নাহর স্বতঃপ্রকাশিত অর্থসমূহ ও সাহাবায়ে কিরাম ও প্রথম যুগের 'উলামায়ে মুজতাহিদীনের ওপর গভীর আস্থা ও সুদৃঢ় বিশ্বাস ও তার সমর্থন তথা প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে প্রবল আবেগ ও অদম্য ইচ্ছা সৃষ্টি হয়েছে, যিনি বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়েও এর অগ্রাধিকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য অস্থির হবেন। অতঃপর এই নাযুক ও বিরাট কর্ম সম্পাদনের জন্য তাঁর নিকট সে সব উপকরণ ও যোগ্যতা থাকবে যা এত বড় বিরাট কর্ম সম্পাদনের জন্য দরকার, যিনি স্বীয় মেধা, যুক্তি-প্রমাণ ও বাকশক্তি, প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাপক অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী, সেই সঙ্গে যিনি তাঁর যুগের স্বাভাবিক মানের ঊর্ধ্বে হবেন এবং যে কোন বিচারে যিনি হবেন এই খেদমত আন্‌জাম দেবার সম্পূর্ণ যোগ্য।

অপর দিকে ইসলাম অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশক্তির হামলার শিকারে পরিণত হয়েছিল। খ্রিস্টানদের ভেতর নিজেদের ধর্মের সত্যতা ও অভ্রান্ততা প্রমাণ করবার এবং ইসলামের ওপর আপত্তি তুলবার নতুন আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল। ক্রুসেডারদের উপর্যুপরি হামলা এবং শাম (আজকের সিরিয়া, লেবানন ও জর্দান), ফিলিস্তীন ও সাইপ্রাসে পাশ্চাত্য বংশোদ্ভূত খ্রিস্টানদের এক বিরাট সংখ্যক উপস্থিতি তাদের ভেতর এমনই এক উৎসাহ-উদ্দীপনার জোয়ার সৃষ্টি করে

দিয়েছিল যে, তারা মুসলমানদেরকে তত্ত্বগতভাবে মুকাবিলা করবে, নবুওতে মুহাম্মদী (সা)-এর ওপর আপত্তি তুলবে এবং খ্রিস্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পুস্তক রচনা শুরু করবে। এর যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবার জন্য এমন একজন 'আলিম ও মুতাকাল্লিমের প্রয়োজন ছিল যিনি খ্রিস্টবাদ ও অপরাপর ধর্ম সম্পর্কে বিস্তৃত ও গভীর অধ্যয়ন করেছেন, আসমানী কিতাব ও সে সবের পরিবর্তন তথা বিকৃতি সম্পর্কে যিনি পুরোপুরি অবহিত, বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক তুলনা ও বিচারের কাজ যিনি অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারেন, যিনি ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে শক্তিশালী ও কার্যকরভাবে পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপায়ে তুলে ধরতে পারেন এবং বুদ্ধিদীপ্ত ও যৌক্তিক উপায়ে বা আস্থার সঙ্গে যিনি অপরাপর ধর্মের লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে সক্ষম।

ঐ সব খ্রিস্টান তার্কিক, সমালোচক ও লেখকদের হামলার চেয়েও অধিকতর বিপজ্জনক হামলা ছিল একটি নামমাত্র মুসলিম ফের্কার –যার নাম বাতেনিয়া ফেরকা—যাদের ধর্মবিশ্বাস ও শিক্ষা ছিল অগ্নিপূজকদের 'আকীদা-বিশ্বাস, প্লেটোনিক চিন্তাধারা ও বিপজ্জনক রাজনৈতিক লক্ষ্যের এক অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য জগা-খিচুড়ি। এরা ও এদের বিভিন্ন শাখা (ইসমাঈলী, হাশীশী, দুরূযী, নুসায়রী) মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমুসলিম শক্তির ও বাইরের হামলাকারীদের সব সময় সাহায্য করতে থাকে এবং অধিকাংশ সময় এদেরই আন্দোলন ও ষড়যন্ত্রের কারণে মুসলিম দেশগুলোর ওপর বাইরের হামলা হয়েছে। শাম ও ফিলিস্তীনের ওপর ক্রুসেড আক্রমণের সময় তারা ক্রুসেডারদের সহযোগিতা প্রদান করে। এর ফল দাঁড়াল এই যে, ক্রুসেডাররা যখন শামের ওপর অধিকার জমিয়ে বসে তখন বাতেনী ফের্কার লোকদেরকেই তারা তাদের আস্থাভাজন ও নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল এবং এভাবেই তারা তাদের সাহায্যের প্রতিদান দিয়েছিল। যঙ্গী ও আয়্যূবী শাসনামলে এরা সর্বদাই ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহে লিপ্ত থাকে। অষ্টম শতাব্দীতে তাতারীরা যখন শামের ওপর হামলা চালায় তখন তারা প্রকাশ্যভাবে ও খোলামেলা তাতারীদের সহযোগিতা দেয় এবং মুসলমানদের ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এছাড়া তারা মুসলমানদের মধ্যে সব সময় মানসিক বৈকল্য ও অস্থিরতা, ধর্মের প্রতি অনাস্থা ও বিদ্রোহ বিস্তার, ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহিতা প্রচারে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকত এবং মুসলমানদের ধর্মীয় দুর্গে পঞ্চম বাহিনীর সদস্য হিসাবে কাজ করত। এসবের স্বাভাবিক দাবী ছিল, এসব ফের্কার ওপর জ্ঞানগত ও কার্যকর আঘাত হানতে হবে, তাদের 'আকীদা-বিশ্বাস ও উদ্দেশ্যের পর্দা খুলে দিতে হবে, মুসলমানদেরকে এদের সম্পর্কে সতর্ক ও সাবধান করে দিতে হবে এবং ইসলামের প্রতি শত্রুতামূলক কার্যকলাপের জন্য তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। এ কাজও একমাত্র তিনিই আনজাম দিতে

পারতেন যিনি এ সব ফের্কার অন্তরালে নিহিত হাকীকত (মূলতত্ত্ব) ও গোপনীয় রহস্য, এদের অতীত ও বর্তমান, এদের সমস্ত শাখা-প্রশাখা ও এর সমস্ত উপ-ফের্কার 'আকাইদ ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবেন, হবেন সে সবের তত্ত্বগত সমালোচনা ও প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতাবান, যাঁর বুকে ইসলামী গায়রতের আবেগ ও ঐ সব ইসলাম দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদী জোশ ও জযবা ক্রিয়াশীল থাকবে।

এসব ছাড়াও অমুসলিমদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও মেলামেশা, অনারবীয় প্রভাব, 'আলিম-'উলামার অলসতা ও গাফিলতির কারণে জনসাধারণের ভেতর শেরেকী 'আমল-আকীদা ছড়িয়ে ছিল। তওহীদ ও নির্ভেজাল ধর্মের ওপর পর্দা পড়েই চলছিল। আল্লাহ্‌র ওলী ও সালেহ্ বান্দাদের সম্পর্কে য়াহূদী নাসারাদের ন্যায় অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়িমূলক ধারণা সৃষ্টি হয়ে চলেছিল। আল্লাহ্‌র ওলীদের নৈকট্যের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের ধারণা বদ্ধমূল হতে চলেছিল এবং مانعبدهم الاليقربونا الى الله زلفى (আমরা দেবদেবীর পূজা এজন্যই করি, এরাই আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট সান্নিধ্যে পৌছে দেবে) -এর ন্যায় জাহিলী ধ্যান-ধারণা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল। গায়রুল্লাহ্‌র দোহাই দেওয়া ও আল্লাহ ভিন্ন অপর কারুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার মত বিষয়ও অনেক আলিম-'উলামার নিকট খারাপ ও আপত্তিকর ছিল না। আম্বিয়া-ই-কিরাম ও আল্লাহ্‌র সালেহ্ বান্দাদের কবরের নিকট এমন সব কাজ-কর্ম হতে থাকে যে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স) পূর্বেই আশংকা ব্যক্ত করে গিয়েছেন এবং মুসলমানদেরকে যে সম্পর্কে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন; অমুসলিম ও যিম্মী (ইসলামী রাষ্ট্রের আশ্রিত অমুসলিম প্রজা)- দের রীতিনীতি, চালচলন ও তাদের সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসরণ করা, তাদের ধর্মীয় পালা-পর্ব ও মেলায় যোগদান এবং তাদের প্রথা ও আচার-অভ্যাস গ্রহণ করতে মুসলমানেরা কোনরূপ দ্বিধা করত না। এসব শির্‌কমূলক জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং খালেস ও নির্ভেজাল তওহীদের দিকে সমগ্র শক্তিসহযোগে ও খোলাখুলিভাবে দাওয়াত দেবার জন্য এমন একজন মুজাহিদ 'আলিমের প্রয়োজন ছিল যাঁর প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তা শিরক-এর পার্থক্য খুব ভাল রকম বুঝতে সক্ষম, যিনি জাহিলিয়াতকে তার যাবতীয় আবরণ ও বাহ্যিক বেশভূষায় আচ্ছাদিত অবস্থায়ও চিনতে পারেন, যিনি তওহীদের মূলতত্ত্ব (হাকীকত) শেষ যুগের কিতাবাদি, অজ্ঞ ও জাহিল মুসলমানদের পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ এবং যুগের রসম-রেওয়াজের পরিবর্তে সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ্ ও সাহাবায়ে কিরামের আমল থেকে শিখেছেন, বুঝেছেন, যিনি বিশুদ্ধ 'আকীদার ঘোষণা দিতে ও প্রকাশ করতে সরকারের বিরোধিতা, স্বীয় যমানার লোকদের শত্রুতা, 'উলামায়ে কিরামের

মতভেদ ও কোন নিন্দুকের নিন্দা বাক্যের পরওয়া করেন না, যিনি কুরআন সুন্নাহর ও ইসলামের নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ ও প্রাথমিক উৎস ও প্রাথমিক যুগের অবস্থার ওপর নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও পরিপূর্ণ অধিকার রাখেন, যিনি য়াহূদী ও খ্রিস্টানদের সত্য থেকে বিচ্যুতি, তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন ও বিকৃতির ইতিহাস এবং জাহিল কওমগুলোর মন-মানসিকতা ও বাসনাসমূহ সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল এবং যিনি মুসলমানদেরকে কুরআনুল করীমের শিক্ষা ও প্রথম শতাব্দীর 'আমল-আকীদায়' ফিরিয়ে আনতে এবং তাদেরকে সাহাবা-ই কিরাম ও তাঁদের স্থলবর্তীদের চাল-চলন, আচার-আচরণ ও পথ-মতের ওপর দেখতে প্রবল আগ্রহী।

তাসাওউফপন্থীদের ভেতর (নানা ঐতিহাসিক ও তত্ত্বগত কারণে) গ্রীক ও ভারতীয় দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং সে সব ইসলামী 'আকীদা ও ধ্যান-ধারণার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল, যে, তার হদিস পাওয়াও ছিল দুষ্কর। নিউ-প্লেটোনিক মতবাদের জ্যোতির্বিদ্যা কিংবা ভারতবর্ষের যোগ, অবতারবাদ ও সংঘের 'আকীদা-বিশ্বাস, ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজুদের পথ ও মত, জাহির ও বাতেনের সীমারেখা নির্ধারণ, গুপ্ত ভেদ ও রহস্যসমূহ ও "বক্ষ জ্ঞানের ফেতনা", কামিল ও আল্লাহ্‌র পাগলদের জন্য শরীয়তের বিধান মওকুফ ইত্যাকার 'আকীদা ও ধ্যান-ধারণা তাসাওউফপন্থীদের একটি বিরাট অংশের মধ্যে জনপ্রিয় ও স্বীকৃত বিষয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। যদিও প্রতিটি যুগের মুহাক্কিক ও গভীর তত্ত্বজ্ঞানী 'আলিমগণ এসব বিভ্রান্ত 'আকীদা প্রত্যাখ্যান ও ইনকার করতে থাকেন, কিন্তু তাসাওউফপন্থীদের একটি বিরাট অংশ এরপরও বিষয়টি আঁকড়ে ধরে থাকে। তাসাওউফের কতক শাখা-প্রশাখা ও সিলসিলা প্রতারণামূলক কলাকৌশল ও নজরবন্দীর নিম্নতম পর্যায়ে অবতরণ করেছিল। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে রিফাঈ তরীকা এ ব্যাপারে ছিল অগ্রগামী। সাধারণ লোকে তো বটেই, অনেক বিশিষ্ট লোকও এসব বিভ্রান্তির শিকার ছিলেন। এ বিপদ রুখতে ও শরীয়তের হেফাজতের জন্যও এমন এক জন দৃঢ় বিশ্বাসী ও সাহসী সংস্কারকের প্রয়োজন ছিল যিনি এদের শান-শওকত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দৃষ্টে এদের ভক্ত-অনুরক্তদের সংখ্যা-শক্তিতে ভীত না হয়ে বেপরোয়া, স্বাধীন ও সাহসিকতার সঙ্গে তাদেরকে সমালোচনা করতে পারেন এবং করতে পারেন তাদের ভুল-ত্রুটি ও বিভ্রান্তির পর্দা উন্মোচন।

জ্ঞানী ও পণ্ডিত মহলে কয়েক শতাব্দী থেকে এমন এক বন্ধ্যত্ব বিরাজ করছিল, নিজেদের দলীয় ফিকহী ও মযহাবী বৃত্তের বাইরে কদম রাখাকে গোনাহ্‌র কাজ বলে মনে করা হত,এমন কি কুরআন-হাদীসকেও ঐ সব ফিকহী দৃষ্টিকোণ ও দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবার সাধারণ রেওয়াজ

চলছিল। ফিকহী ইখতিলাফের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসকে ফয়সালাকারী বানাবার পরিবর্তে কুরআন-হাদীসকেই সকল অবস্থায় ফিকহী মসলায় ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করা হত। ফিকহী তরজীহ্ (অগ্রাধিকার) ও ইখতিয়ারের দরজা কার্যত বন্ধ ছিল। যুগ ও অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক নিত্য-নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটছিল যেসবের সমাধানে ফতওয়া প্রদানের জন্য ইসলামের সমগ্র ফিকহী ভাণ্ডারের ওপর বিস্তৃত দৃষ্টি, কুরআন ও সুন্নাহর ওপর পূর্ণ দখল, ইসলামের প্রাথমিক যুগগুলোর পারস্পরিক 'আমল সম্পর্কে অবহিতি এবং ফিকহ্-এর উসূল (মূলনীতি) সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞানের অধিকার দরকার ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবত মানুষের ভেতর থেকে জ্ঞান, দৃষ্টি ও অধ্যয়নের প্রতি প্রবল আগ্রহ স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল। মানুষের চিন্তাশক্তি ক্রমেই নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছিল এবং কোন 'আলিমই নতুন মাসায়েল খুঁজে বের করবার সাহস করছিলেন না। ইসলামী কানূন ও ফিক্হ স্বীয় খ্যাতি ও উত্থানের যোগ্যতা খুইয়ে বসেছিল এবং ফিক্হ -এর প্রাচীন ভাণ্ডারের সম্পদ বৃদ্ধি অসম্ভব মনে করা হচ্ছিল। এমত অবস্থার সংস্কার ও সংশোধনের জন্যও এমন একজন মুহাদ্দিস, ফকীহ ও উসূলীর (নীতিশাস্ত্রবিদের) আবশ্যক ছিল যিনি সমগ্র ইসলামী গ্রন্থাগার ও তার জ্ঞানভাণ্ডার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে দেখেছেন, কুরআন ও হাদীসে যাঁর গভীর পাণ্ডিত্য দেখে লোকে বিস্মিত হবে, হাদীসের শ্রেণী-বিভাগ, বিন্যাস ও তার সংকলনগুলোর ওপর যাঁর এমন প্রখর দৃষ্টি থাকতে হবে যেন লোকে বলে, এ ব্যক্তি যে হাদীস জানেন না সেটা হাদীসই নয়। ফকীহদের ইখতিলাফ (মতপার্থক্য) এবং সে সবের উৎস ও প্রমাণ-পঞ্জী সর্বদা যাঁর নখদপর্ণে থাকবে, আপন মযহাব ছাড়াও অপরাপর মযহাব ও সে সবের খুঁটিনাটি সম্পর্কেও যিনি স্বয়ং সেই মযহাবের শিক্ষক ও মুফতীর চেয়ে বেশী খবর রাখেন, মাসায়েল বের করবার শক্তি ও ব্যক্তিগতভাবে তাহকীক করবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগের বুযুর্গদের সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং মুজতাহিদ ইমামগণের মরতবা সম্পর্কে জ্ঞাত হবেন, অভিধানের ক্ষেত্রে মুহাক্কিক (উদাহরণ দ্বারা প্রমাণকারী দার্শনিক) এবং ভাষার ব্যাপারে একজন সমালোচক ও বিশেষজ্ঞ হবেন, ব্যাকরণের ক্ষেত্রে এতটা পাণ্ডিত্যের অধিকারী হবেন যাতে একজন বৈয়াকরণের ত্রুটিও তিনি অতি সহজেই বের করতে পারেন, যাঁর স্মৃতিশক্তি ইসলামের প্রথম যুগের মুহাদ্দিসগণের স্মরণকেই জাগিয়ে তোলে, যাঁর মেধা হবে আল্লাহর অসীম কুদরতের এক অপার নিদর্শন, তাঁর জ্ঞান চিরন্তন দাতার বদান্যতার একটি দলীল হবে, তাঁর সত্তা মুসলিম উম্মাহর মানুষ তৈরির ক্ষমতা, ইসলামবৃক্ষের সজীবতা, ইসলামী জ্ঞানের জীবন ও তারুণ্যের প্রমাণ দেবে এবং সেই হাদীসের সত্যতার পক্ষেও হবে জ্বলন্ত প্রমাণ ঃ

مثل امتى مثل المطر لايدرى اوله خير ام اخره ـ

আমার উম্মতের উপমা বৃষ্টিসদৃশ; একথা বলা যাবে না, এর প্রথমাংশই উত্তম ও বরকতযুক্ত অথবা এর শেষাংশ।[১]

এরই সঙ্গে তিনি জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে ও কর্মের জগতেও একজন মর্দে মুজাহিদ হবেন, শক্তিশালী লেখক ও যুদ্ধক্ষেত্রের একজন বীর যোদ্ধা হবেন। সুলতান কিংবা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী শাসকের সামনে কথা বলতে যিনি এতটুকু ভয় পান না, তাতারীদের ন্যায় রক্তপিপাসু শত্রুর বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে যাঁর এতটুকু ভয় থাকবে না, থাকবে না সংকোচ; দরস মাহফিলে, গ্রন্থাগারের কোণে, মসজিদের নির্জনতায়, বিতর্কের মাহফিল থেকে শুরু করে জেলখানার অন্ধকার কুঠরি ও যুদ্ধের ময়দান অবধি যাঁর গতি অবাধ, বিচরণ উন্মুক্ত, অশ্বপৃষ্ঠে বিজয়ী বেশে যিনি টগবগিয়ে ছোটেন, সর্বত্রই যিনি শ্রদ্ধেয় ও নেতৃত্ব যাঁর স্বীকৃত ।

অষ্টম শতাব্দীতে এমনই একজন মর্দে কামিলের প্রয়োজন ছিল যিনি জীবনের সকল ক্ষেত্রে হবেন মর্দে মুজাহিদ, যাঁর সংগ্রাম, সাধনা ও যাঁর সংস্কার কোন একটিমাত্র শাখাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। শায়খুল ইসলাম হাফিজ ইবনে তায়মিয়া (র) ছিলেন তেমনই এক ব্যক্তিত্ব, যিনি মুসলিম জাহানে জ্ঞান ও কর্মের এমন এক গতি-প্রবাহ ও প্রাণ-চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন যার প্রভাব কয়েক শতাব্দী গুজরে যাবার পর আজও অব্যাহত রয়েছে।

ইব্‌নে তায়মিয়া (র)-র যুগ

ইবনে তায়মিয়া (র)-র যুগটা ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল ও দুর্যোগপূর্ণ। রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও চারিত্রিক, তত্ত্বগত ও ধর্মীয় অবস্থার দিক দিয়ে এই আমলটা ছিল বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। ইবনে তায়মিয়া (র)-র সংস্কারমূলক চেষ্টা-সাধনা ও তাঁর তত্ত্বগত ও সংস্কারধর্মী মেযাজ অনুধাবন করবার জন্য সেই পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার পর্যালোচনা করা দরকার, যেই পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার মাঝে তিনি লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়েছিলেন এবং যার ভেতর তিনি তাঁর রেনেসাঁ তথা নবজাগরণ ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছিলেন।

ইবনে তায়মিয়া (র) বাগদাদ ধ্বংসের পাঁচ বছর পর এবং হলব (আলেপ্পো) ও দামিশকে তাতারীদের প্রবেশের তিন বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তিনি যখন কিছুটা বড় হয়েছেন সে সময় সে সব মুসলিম

১. তিরমিযী, আনাস ইব্‌নে মালিক থেকে বর্ণিত।

শহরের ধ্বংস, মুসলমানদের ব্যাপক গণহত্যার কাহিনী ও তাতারীদের লোমহর্ষক ও বর্বর জুলুম-নির্যাতনের ঘটনা লোকের মুখে মুখে ফিরত এবং সে সময় এমন লোকও বেঁচেছিলেন যারা এসব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি যখন সাত বছরের তখন তাঁর বাসভূমি হারান-এর ওপর [তাতারীদের অধিকৃত এলাকার (ইরাকের) উত্তর এবং দজলা ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত] তাতারীদের হামলা হয় এবং বহু পরিবার ও খান্দানের মত তাঁর খান্দানও তাতারীদের জুলুম-নির্যাতন ও নিষ্ঠুর নিপীড়নের হাত থেকে বাঁচবার জন্য দামিশ্‌ক অভিমুখে রওয়ানা হয়। গমন পথের প্রতিটি স্থানেই তাতারীদের ধ্বংসলীলা ও নিষ্ঠুর বর্বরতার চিহ্ন ইতস্তত ছড়িয়েছিল। এই ভয়াবহতা, পেরেশানী, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার স্মৃতি তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি থেকে হারিয়ে না যাওয়াই স্বাভাবিক। বড় হয়ে এই ধ্বংসের তাণ্ডবলীলার রেখে যাওয়া স্বাক্ষর তিনি স্বচক্ষে দেখে থাকবেন এবং নিজেও সে সমস্ত লোকের মুখে এসব ধ্বংসলীলার বেদনাদায়ক বিবরণ বিস্তারিত শুনে থাকবেন যাঁরা সে সব দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এজন্য স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সংবেদনশীল ও অনুভূতিপ্রবণ প্রকৃতি মুসলমানদের এই অসহায় অবস্থা ও লজ্জাকর পরিণাম ফলে প্রভাবিত হয়েছিল এবং ধ্বংসের এই তাণ্ডবলীলার বিরুদ্ধে তাঁর মন-মানসে তীব্র ঘৃণার সঞ্চার হয়েছিল।

এরই সাথে আয়ন-ই-জালূত নামক স্থানে মুসলমানদের শানদার বিজয়ের ঘটনা তাঁর জন্মের মাত্র তিন বছর পূর্বে সংঘটিত হয়। অধিকন্তু আল-মালিকু'জ-জাহির বায়বার্সের বিজয়ও তাঁর শৈশবকালীন ঘটনা। তৎকালীন অনুষ্ঠিত মজলিস ও বৈঠকাদি এসবের উত্তপ্ত আলোচনায় ভরপুর থাকত। এসব থেকে তাঁর আত্মা তৃপ্তি ও শক্তি লাভ করে এবং এসব ঘটনা থেকে তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনাও বৃদ্ধি পায়।

মিসরের মামলূক সুলতানগণ

ইবনে তায়মিয়া (র)-র জন্মের ১৩ বছর পূর্ব থেকে মিসর ও শামে মামলুক (দাস) বংশের শাসন চলছিল। এরা সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যূবীর বংশের শেষ সুলতান আল-মালিকু'স সালিহ নাজমুদ্দীন আয়্যূব (মৃ, ৬৪৭ হি.)-এর তুর্কী গোলাম ছিলেন। তাদের বিশ্বস্ততা, আনুগত্য ও বীরত্ব পরীক্ষা-অন্তে সুলতান তাদেরকে মিসরে আবাদ করেছিলেন এবং তারা বাহরিয়া[১] উপাধিতে খ্যাত হন এদের একজন 'ইয্‌যুদ্দীন আয়বক আত-তুর্কীমানী ৬৪৭ হিজরীতে

---

১. এদের বসতবাটি ছিল নীলনদের ধারে। ফলে তারা বাহরিয়া (নদী/সমুদ্রের অধিবাসী) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আজও নীলনদ 'বাহর-ই-নীল' নামে কথিত।

আল-মালিকু'স-সালিহ্-র স্থলাভিষিক্ত তুরান শাহকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন এবং আল-মালিকু'ল-মুইয্য উপাধি ধারণ করেন। ৬৫৫ হিজরীতে তিনিও নিহত হলে তার পুত্র নূরুদ্দীন আলী তার স্থলবর্তী হন। ৬৫৭ হিজরীতে 'ইয্‌যুদ্দীন আয়বকের গোলাম সায়ফুদ্দীন কুতুয সিংহাসন দখল করেন। ঐ সময় তিনি সাম্রাজ্যের নাজিম-ই-আ'লা ছিলেন। এই সুলতানই তাতারীদের সর্বপ্রথম পরাজিত করেন। এর পরের বছর (৬৫৮ হি.) আল-মালিকু'স-সালিহ নাজমুদ্দীন আয়্যুবের অপর ক্রীতদাস রুকনুদ্দীন বায়বার্স সায়ফুদ্দীন কুতুযকে হত্যা করে ক্ষমতার বাগডোর স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং আল-মালিকু'জ জাহির উপাধি ধারণ করেন। ১৮ বছর তিনি অত্যন্ত দোর্দণ্ড প্রতাপ ও শান-শওকতের সঙ্গে রাজ্য শাসন করেন এবং তাতার ও ক্রুসেডারদের উপর্যুপরি পরাজিত করে গৌরবদীপ্ত বিজয় লাভ করেন।

ইবনে তায়মিয়া যখন জন্ম গ্রহণ করেন, সে সময় মিসর ও শামে (আজকের সিরিয়া, লেবানন, জর্দান ছিল সেদিনের শামের অন্তর্গত। এখন থেকে আমরা শামকে সিরিয়া, নামেই উল্লেখ করব-অনুবাদক) রুকনুদ্দীন জাহির বায়বার্সের শাসনকাল চলছিল। তাঁর শাসনামলেই ইবনে তায়মিয়ার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। সুলতানের যখন ইনতিকাল হয় তখন তাঁর (ইবনে তায়মিয়ার) বয়স ১৫ বছর এবং তিনি ছিলেন তখন তরুণ। সুলতান সালাহুদ্দীন-এর পর আল-মালিকু'জ-জাহির বায়বার্সই ছিলেন প্রথম শক্তিশালী মুসলিম শাসক যিনি জিহাদের প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ প্রদান করেন এবং ইসলামের শত্রুদের উপর্যুপরি পরাজিত করেন। ঐতিহাসিক ইবনে কাছীর সুলতান সম্পর্কে অভিমত পেশ করতে গিয়ে বলেন ঃ বায়বার্স ছিলেন সজাগ মস্তিষ্ক, উন্নত মনোবল ও বীরত্বের অধিকারী বাদশাহ। শত্রু সম্পর্কে কখনোই তিনি অলস ও অসতর্ক থাকতেন না। তাদের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন। ইসলামের বিক্ষিপ্ত ও বিস্রস্ত অবস্থা তিনি দূর করেন এবং মুসলমানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন।

প্রকৃত ঘটনা এই, আল্লাহ্ পাক তাঁকে এই শেষ যুগে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সাহায্য করবার ও শক্তি যোগাবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। ফিরিঙ্গী, তাতারী ও পৌত্তলিক মুশরিকদের দৃষ্টিতে তিনি কাঁটার মত খচখচ করে বিঁধতেন। রাজ্যে মদ পান তিনি নিষিদ্ধ করেন। বদকার ও অপরাধী চরিত্রের লোকদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করেন। অনাসৃষ্টি ও খারাপ কাজ দেখামাত্রই তিনি তা দূর করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠতেন এবং যতক্ষণ না তা দূর করতে পারতেন তিনি শান্তি পেতেন না।[১]

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৬;

জাহির বায়বার্সের সাম্রাজ্য ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত ও সুশৃঙ্খল, ছিল সুসংহত। প্রাচ্যে ফোরাত নদী ও দক্ষিণে সুদানের শেষাংশ অবধি তাঁর রাজ্য-সীমা পৌঁছে গিয়েছিল। মিসর ছিল এই সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি এবং কায়রো ছিল এর রাজধানী। সুলতান ও আব্বাসী খলীফা[১]-র অবস্থানের কারণে কায়রো তখন তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বায়বার্স বহু মাদরাসা কায়েম করেন। দূর-দূরান্তর থেকে 'আলিম-'উলামা ও জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ ঘটে কায়রোয়।

বায়বার্স তাঁর ব্যক্তিগত যোগ্যতা, ইসলামী প্রেরণা ও জিহাদী জোশের সঙ্গে সঙ্গে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী একজন স্বৈরশাসকও ছিলেন। এজন্য স্বৈরশাসকদের ভেতর সাধারণত যে সব দুর্বলতা দেখা যায় তা তাঁর ভেতরও দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর ইতিহাস যেখানে মুজাহিদসুলভ কর্মকাণ্ড ও ইসলামের সেবায় আলোকোজ্জ্বল, সেখানে ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেমন জুলুম-নিপীড়ন, জিদ, হঠকারিতা ও পীড়াপীড়ির ন্যায় ঘটনাবলী দ্বারাও তা কলঙ্কিত। ইমাম নববী (র)-র সঙ্গে সংঘটিত দুঃখজনক ঘটনা এর একটি জ্বলন্ত নজীর।[২]

বায়বার্সের আঠার বছরের সুদৃঢ়, সুশৃংখল ও সুসংহত শাসনের পর মিসর ও সিরিয়ার শাসন ক্ষমতায় খুব দ্রুত বেশ কয়েকজন সুলতানের আগমন ও নিষ্ক্রমণ ঘটে। এ থেকেও এর পরিমাপ করা যাবে, ৬৭৬ হিজরী থেকে (যে বছর বায়বার্স ইনতিকাল করেন) ৭০৯ হিজরী পর্যন্ত তেত্রিশ বছরে মোট ন'জন সুলতান মিসরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই তেত্রিশ বছরের শাসনামলে মিসর, সিরিয়া ও হেজাযের মুসলিম হুকুমত কেবল একজন শক্তিশালী পরিচালক ও মুজাহিদ সুলতান লাভ করে। এই সুলতানের নাম ছিল আল-মালিকু'ল-মনসুর সায়ফুদ্দীন কালাউন। তিনি ৬৭৮ হিজরীতে তাতারীদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং তাদেরকে ভীষণভাবে পর্যুদস্ত করেন। যে ত্রিপোলী ১৮৫ বছর যাবত ক্রুসেডারদের দখলে ছিল, তিনি তা জয় করেন। ৬৭৮ হিজরী থেকে শুরু করে ৬৮৯ হিজরী পর্যন্ত ১২ বছর দোর্দণ্ড প্রতাপে সাম্রাজ্য শাসন করেন।

---

১. খলীফা মুস্তা'সিমের শাহাদতের পর মুসলিম জাহান তিন বছর পর্যন্ত কোন খলীফা ছাড়াই অতিবাহিত করে। ঐতিহাসিকগণ নতুন বছরের আলোচনা করতে গিয়ে লেখেনঃ دخلت سنه والمسلمون بلا خلفه অবশেষে সুলতান জাহির বায়বার্স ৬৫৯ হিজরীতে আব্বাসী বংশের এক ব্যক্তি আল-মুস্তানসির বিল্লাহ আবুল কাসিম আহমদ ইবন আমীরি'ল-মু'মিনীন আজ-জাহির-এর হাতে বায়'আত হন এবং মিসর খেলাফতের কেন্দ্র হিসাবে মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু এ খেলাফত নামে মাত্র ছিল এবং কেবল বরকত লাভই ছিল এ খেলাফতের উদ্দেশ্য। প্রকৃত শাসক ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন স্বয়ং সুলতান।

২. দ্র. তাবাকাতু'শ-শাফি'ঈয়্যাতু'ল-কুবরা।

মনসূর কালাউনের পর মিসরের সিংহাসন পুনরায় সুলতান ও হবু সুলতানদের ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হয়। শেষাবধি ৭০৯ হিজরীতে মনসুর কালাউনের পুত্র আল-মালিকু'ন-নাসির মুহাম্মদ ইব্ন কালাউন তৃতীয়বারের মত শাসন ক্ষমতা হাতে নেন এবং ৩২ বছর পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সংহতি বজায় থাকে। আল-মালিকু'ন -নাসিরই ছিলেন ইমাম ইবনে তায়মিয়ার সমসাময়িক যার সঙ্গে তাঁর সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক ইতিহাসের সম্পর্ক রয়েছে। এই সুলতান ছিলেন অনেকটা সুলতান জাহির বায়বার্স-এর স্থলাভিষিক্ত, অনেক গুণের ক্ষেত্রে তাঁর সাক্ষাত নমুনা এবং পিতা মনসুর কালাউনের জীবন্ত স্মৃতি। তাঁর শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্যে ঐক্য ও শক্তির সঞ্চার হয়। তিনি তাঁর খ্যাতিমান পূর্বসূরীদের ন্যায় তাতারীদের বিরুদ্ধে শানদার ও গৌরবোজ্জ্বল বিজয় লাভ করেন এবং মুসলিম রাষ্ট্রের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই গোটা সময়ে ইরাক, ইরান, ও খুরাসান বা-দস্তর তাতারীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে এবং বাগদাদ তখন পর্যন্ত মুসলমানরা ফিরে পায়নি যতদিন না এর শাসক তাতারীরা নিজেরাই মুসলমান হয়ে গেছে। মিসরের আব্বাসী খলীফা নিজে সৈন্য পরিচালনা করেছেন এবং সুলতান জাহির বায়বার্স অনেকবারই বাগদাদ পুনর্দখলের চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু তিনি সাফল্য লাভে সক্ষম হন নি। মামলুক সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় কেবল মিসর, সুদান, সিরিয়া ও হেজাযই ছিল অন্তর্ভুক্ত।

সাম্রাজ্যের রীতিনীতি

ইসলামই ছিল মামলুক সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম। সুলতান, সরকারী কর্মকর্তা ও রাষ্ট্রের সদস্যবৃন্দ ইসলামকে ভালবাসতেন। ধর্মের প্রতি তাঁরা ছিলেন সহানুভূতিশীল। কাযী, ইমাম, শায়খুল ইসলাম ও ধর্মীয় পদাধিকারী ব্যক্তিদেরকে যথানিয়মে নিযুক্ত করা হত। ন্যায়পাল বিভাগ (محكمه) প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাযীর ফয়সালাই ছিল চূড়ান্ত এবং তা মান্য করা ছিল বাধ্যতামূলক। মাদরাসাগুলোতে স্বাধীনভাবে ধর্মীয় শিক্ষা চলত। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও সাম্রাজের গোটা ব্যবস্থাপনার মূল চালিকা শক্তি ছিলেন সুলতান নিজে ও তাঁর আস্থাভাজন উযীর ও সাম্রাজ্যের সদস্যবৃন্দ ও তাদের নিয়োজিত কর্মকর্তা ও তাদের ইচ্ছা-অভিরুচি ও সিদ্ধান্তই ছিল সাম্রাজ্যের আইন ও কানূন। ইসলামী আইনের প্রচলন ও ঘোষণার পরিধি তাদের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের মোটের ওপর সীমাবদ্ধ ছিল। রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি ও ব্যবস্থাপনা আধা-ফৌজী তথা আধা-সামরিক ছিল, যার বিধিবদ্ধ ও বিন্যস্ত কোন সংবিধান ছিল না, ছিল না কোন নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট রীতিনীতি কিংবা ছিল না কোন পরামর্শ সভা (মজলিসে শূরা)।

অবশ্য জাহির বায়বার্স ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত সুলতানগণ এ ব্যাপারে চেষ্টা করতেন যাতে সাম্রাজ্যের আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও তাঁদের কার্যাবলী তৎকালীন 'উলামায়ে কিরামের দ্বারা সত্যায়িত ও সমর্থিত হয়। তাঁরা 'উলামায়ে কিরামের তুষ্টি ও পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা পেতেন। এমনও হয়েছে, 'উলামায়ে কিরাম সুলতানের নতুন কোন পদক্ষেপ কিংবা আইনের কঠোরভাবে বিরোধিতা করেছেন, তক্ষুনি সুলতান তা মুলতবী করে দিয়েছেন। একবার জাহির বায়বার্স মিসর ও সিরিয়ার সমস্ত জমিদারী ও জায়গীর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসতে চাইলেন। ইমাম নববী (র) এর প্রবল বিরোধিতা করেন। এতে বায়বার্স তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এজন্য ইমাম নববী (র)-কে দামিশ্ক ছেড়ে চলে যেতে হয়। তথাপিও এর এতটুকু প্রভাব পড়েছিল, ভূমি ব্যবস্থার সাবেক পদ্ধতিই বহাল থাকে এবং বায়বার্স কোনরূপ সংস্কার সাধনে ব্যর্থ হন।

সাম্রাজ্যের এই ব্যবস্থাপনা উত্তরাধিকার (মৌরসী) নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু কার্যত হচ্ছিল ঠিক তার উল্টো। যা হচ্ছিল তাও কোন ইসলামী ভিত্তির ওপর নয় এবং এ নীতির ভিত্তি এও নয় যে, ইসলামের রূহ তার নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ রীতির দাবী যে, আমীর (নেতা) ব্যক্তিগত যোগ্যতা দ্বারা অভিষিক্ত হবেন এবং তিনি মুসলিম উম্মাহর আস্থা অর্জন করবেন, বরং এজন্য যে, মামলুক (দাস) বংশের ভিত্তিই স্থাপিত হয়েছিল ব্যক্তিগত চেষ্টা ও সংগ্রাম-সাধনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতার ওপর এবং এ সাম্রাজ্যের এটাই মেযাজে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, যিনি সর্বাধিক শক্তিশালী ও সাহসী বীরপুরুষ হবেন তিনিই ক্ষমতার বাগডোর স্বহস্তে গ্রহণ করবেন। আয়্যুবী সাম্রাজ্যের ক্রীতদাসগণ নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়াস ও সাহস বলে স্বীয় প্রভুদের সাম্রাজ্য দখল করেছিলেন। এ ধারা শেষাবধি অব্যাহত ছিল। এদের সকলেই নিজ নিজ সন্তানদেরকে সাম্রাজ্যের পরবর্তী উত্তরাধিকার নিযুক্ত করে যাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাদের ক্রীতদাসদের ভেতর যিনি সবচেয়ে বেশী সাহসী ও উদ্যমী হতেন, তিনি তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই সিংহাসনে উপবেশন করতেন। সিংহাসন ও শাহী মুকুট লাভের এ সব সম্ভাবনা উৎসাহী ও উদ্যমী পুরুষদেরকে ভাগ্য পরীক্ষায় উৎসাহী করে তুলেছিল এবং সিংহাসন লাভের জন্য তাদের ভেতর অধিকাংশ সময় সংঘর্ষ ও শক্তি পরীক্ষা হতে থাকত। এ সময় তাতারী কিংবা ফিরিঙ্গীদের আক্রমণ দেখা দিতেই তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক হয়ে যেতেন।

দেশের সামাজিক, নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা

এই তুর্কী বংশোদ্ভূত শাসকশ্রেণী নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির ক্ষেত্রে পুরো সজাগ ছিলেন এবং প্রতিটি বিষয়ে সাধারণ নাগরিকদের চেয়ে একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করে থাকতে চাইতেন। তাদের ভাষা ছিল তুর্কী। কেবল 'ইবাদত-বন্দেগীর মুহূর্তে কিংবা 'উলামায়ে কিরামকে সম্বোধন করতে গেলে অথবা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় (যার সরাসরি সুযোগ খুব কমই আসত) তারা আরবী ভাষা ব্যবহার করতেন। তাদের ভেতর কেউ কেউ আরবী ভাষায় এতটা অভিজ্ঞ ছিলেন যে, তা আরবী ভাষাভাষীদের মনেও ঈর্ষার উদ্রেক করত। এরই সঙ্গে তারা 'আলিম-'উলামার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, ছিলেন তারা নেককার বুযর্গদের ভক্ত ও অনুরক্ত। মাদরাসা কায়েম ও মসজিদ নির্মাণেও তারা অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। রাষ্ট্রীয় পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন গোত্র, বংশ, শ্রেণী কিংবা গোষ্ঠীর তারতম্য কিংবা পক্ষপাতিত্ব করা হত না। এরপরও বড় বড় ব্যবস্থাপনা ও সামরিক পদে নিযুক্তির বেলায় স্বাভাবিকভাবেই তুর্কী বংশোদ্ভূত সর্দারদের প্রাধান্য থাকত। কর্মকর্তা ও বড় বড় জায়গীরদার হতেন তুর্ক ও তাতারীরাই, যারা কৃষক ও শ্রমিকের শ্রম থেকে লাভবান হতেন। ৬৯৭ হিজরীতে হুসসামুদ্দীন লাজিন তাঁর শাসনামলে ভূমি সংস্কার করতে চেষ্টা পান, যাতে কৃষকগোষ্ঠী উপকৃত হয়, তাদের অবস্থার পরবর্তন ঘটে এবং তাদের জীবনে স্বচ্ছলতা ফিরে আসে, অধিকন্তু এর ফলে কৃষি উৎপাদনের যেন উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু সরকারী কর্মকর্তারা তাঁর এই আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি পসন্দ করেন নি। ফলে তারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শহরের অধিবাসীদের একটা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল তাতারী। সায়ফুদ্দীন কুতুয, জাহির বায়বার্স ও নাসিরউদ্দীন কালাউনের তাতারীদের সঙ্গে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে অগণিত তাতারী বন্দী হয়। বন্দী অবস্থায় তারা মিসর ও সিরিয়ায় নীত হয় এবং সেখানেই বসবাস করতে শুরু করে। ঐতিহাসিক মাকরিযীর বর্ণনা মুতাবিক জাহির বায়বার্সের শাসন আমলে মিসর ও সিরিয়া এসব তাতারী যুদ্ধবন্দী দ্বারা ভর্তি হয়ে যায় এবং তাদের আচার-আচরণ ও রসম-রেওয়াজ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এরা যদিও ইসলাম কবুল করে নিয়েছিল, তথাপি তারা অনেকেই তাদের প্রাচীন প্রথা ও অভ্যাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাঁদের বহু জাতীয় বৈশিষ্ট্য তারা অক্ষুণ্ন রেখেছিল। নও-মুসলিমদের সামগ্রিকভাবে ইসলামের দিকে চলে আসা, নিজেদের সাবেক 'আকীদা, ধ্যান-ধারণা, সভ্যতাগত বৈশিষ্ট্য ও মানসিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থেকে একেবারেই মুক্ত ও একই লক্ষ্যাভিসারী হয়ে যাবার উদাহরণ ইতিহাসে খুব কমই মিলে। এটা একমাত্র সাহাবা-ই-কিরামের বৈশিষ্ট্য ও নবী করীম (সা)-এর মু'জিযা ছিল যে, তাঁদের জীবনে ইসলাম ও

জাহিলিয়াতের দ্বন্দ্ব একেবারে খতম হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁরা যেন ইসলামে পুনর্জন্ম লাভ করেছিলেন। এমন একটি যুগ ও সমাজে যেখানে ইসলামী তা'লীম ও তরবিয়তের পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা কায়েম নেই, যেখানে ইসলামী সমাজে নবাগতদের আকর্ষণ করে নেবার ও মিশিয়ে ফেলবার এবং একেবারে গোড়া থেকে ঢেলে সাজাবার যোগ্যতা থাকে না, সেখানে তাতারী ও তুর্কী বংশোদ্ভূত অনারবদের থেকে ইসলামী 'আকাইদ ও 'ইবাদত-বন্দেগীর ছাঁচে ঢালাই হবার এবং নিজেদের প্রাচীন অভ্যাস ও চরিত্র থেকে একেবারে মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যাবার আশা করা ঠিক নয়। অতএব, সঙ্গত কারণেই ঐসব তাতারী নও-মুসলিমদের জীবন ছিল ইসলামী ও জাহিলী প্রভাবের জগাখিচুড়ি মাত্র। মিসরের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মাকরিযী লেখেন ঃ

> ঐ সব তাতারীর প্রশিক্ষণ মুসলিম দেশেই হয়েছিল। কুরআনের শিক্ষা তারা বেশ ভালভাবেই লাভ করেছিল এবং ইসলামের হুকুম-আহকাম ও আইন-কানূনগুলো তারা শিখেছিল। কিন্তু তাদের জীবন ছিল হক ও বাতিলের সংমিশ্রণ। তাদের ভেতর ভাল জিনিস যেমন ছিল, তেমনি ছিল মন্দও। তারা তাদের ধর্মীয় ব্যাপারগুলো– সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত, ওয়াক্‌ফ, য়াতীমদের সমস্যা, স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ-বিসম্বাদ, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতি কাযীউ'ল-কুযাতকে সোপর্দ করে রেখেছিল। নিজেদের ব্যাপারগুলোতে চেঙ্গীযীসুলভ অভ্যাস ও রীতি-নীতির অনুসারী ও 'আস-সিয়াসা' (তাতারী আইন)-এর দৃঢ়তার সঙ্গে কার্যকর করবার পক্ষপাতী ছিল। তারা নিজেদের জন্য 'হাজিব' নামে একজন হাকিম নিযুক্ত করে রেখেছিল যিনি তাদের দৈনন্দিন জীবনের সংঘটিত ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে ফয়সালা করবেন, শক্তিশালীকে শাসন-শৃঙ্খলার অধীনে রাখবেন এবং 'আস-সিয়াসা' মুতাবিক দুর্বল ও কমযোরকে তার হক (অধিকার) ফিরিয়ে দেবেন। এভাবেই বড় বড় তাতারীর পারস্পরিক লেনদেন ইত্যাদি ব্যাপারগুলোর ফয়সালাও 'আস-সিয়াসা মুতাবিক হত এবং জমিদারী জায়গীরদারীসহ জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তি তাদের জাতীয় আইন মুতাবিক করা হত।[১]

এই তুর্কী বংশোদ্ভূত অনারব ও তাতারী নও-মুসলিমদের অভ্যাস ও চরিত্র, প্রথা-পদ্ধতি, সভ্যতা ও সামাজিকতা,এমন কি তাদের ধর্মবিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার প্রভাব প্রাচীন আরব ও মুসলিম জনবসতির ওপর পড়া অনিবার্য ছিল। ক্রুসেড যুদ্ধগুলোতে য়ূরোপ ও এশিয়ার যেভাবে সম্মিলন ঘটেছিল ঠিক সেভাবেই তাতারী আক্রমণ ও তাদের বিজেতা ও বিজিত হবার অবস্থায়ও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন

---

১. খুতাত-ই-মিসর।

ঘটেছিল। এই মিলন ও মিশ্রণ যুদ্ধক্ষেত্রের সংঘাত থেকে শুরু হয়েছিল, কিন্তু এর সমাপ্তি ঘটেছিল সভ্যতা, চিন্তাগত ও চারিত্রিক সংমিশ্রণের ভেতর দিয়ে। প্রত্যেকেই একে অপরকে প্রভাবিত করেছে এবং প্রত্যেকেই একে অপরের প্রভাব কবুল করেছে।

এই সম্মিলন ও সংমিশ্রণ বহুবিধ নতুন সমস্যার জন্ম দেয় এবং একটি নতুন সভ্যতা ও একটি নতুন সামাজিকতা অস্তিত্ব লাভ করে, যার সম্পর্কে একথা বলা কঠিন ছিল, সেটা ইসলামী সভ্যতা নাকি আরবীয় সামাজিকতা। এমত অবস্থায় এমন একজন সংস্কারক ও শিক্ষকের যিম্মাদারী অনেক বেশী বেড়ে যায় যিনি মুসলমানদের জীবনে অনৈসলামী প্রভাব ও জাহিলী যুগের আচার-অভ্যাস দেখাকে সইতে পারেন না এবং যিনি তাকে আপাদমস্তক কুরআন-সুন্নাহ্‌র অনুসারী প্রথম ও সর্বোত্তম শতাব্দীর (خير القرون) পদচিহ্নের ওপর এবং ادخلوا فى السلم كافة (তোমরা সর্বতোভাবে ও পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ কর)-এর তফসীর দেখতে চান।

শিক্ষা ও জ্ঞানগত অবস্থা

এ শতাব্দীর মধ্যবর্তীতে 'আল্লামা তকীয়্যুদ্দীন আবূ 'আম্‌র ইবনু'স-সালাহ (৫৭৭-৬৪৩ হি.), শায়খুল ইসলাম 'ইয্‌যুদ্দীন ইবনে 'আবদুস সালাম (৫৭৮-৬৬০ হি.) ও ইমাম মুহ্‌য়ি উদ্দীন আন-নববী (৬৩১-৬৭৬ হি.)-এর মত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যেমন বর্তমান ছিলেন, শতাব্দীর শেষভাগে শায়খুল ইসলাম তকীয়্যুদ্দীন ইব্‌ন দাকীকু'ল-'ঈদ (৬২৫-৭০২)-এর মত মুহাদ্দিছ ও 'আল্লামা 'আলাউদ্দীন আল-বাজী (৬৩১-৭১৪ হি.)-এর মত নীতিশাস্ত্রবিদ ও মুতাকাল্লিমও দৃষ্টিগোচর হন তেমনি। ইবনে তায়মিয়া (র)-র সমসাময়িকদের মধ্যে 'আল্লামা জামালুদ্দীন আবুল হুজ্জাজ আল-মিয্‌যী (৬৫৪-৭৪৬ হি.), আল-হাফিজ আলামুদ্দীন আল-বারযালী (৬৬৫-৭৩৯ হি.) ও 'আল্লামা শামসুদ্দীন আয-যাহবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.)-এর মত মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিকও বর্তমান ছিলেন যাঁরা তাঁদের যুগে হাদীস ও বর্ণনাশাস্ত্রের চতুর্স্তম্ভ হিসেবে পরিগণিত হন এবং যাঁদের প্রণীত গ্রন্থের ওপর শেষ যুগের 'আলিম-'উলামা' ছিলেন নির্ভরশীল।

এঁরা ছাড়াও কাযীউ'ল -কুযাত কামালুদ্দীন ইবনু'য-যামালকানী (৬৬৭-৭২৭ হি.), কাযীউ'ল-কুযাত জালালুদ্দীন আল-কাযভীনি (মৃ. ৭৩৯ হি.), কাযীউ'ল-কুযাত তকীয়্যুদ্দীন আস-সুবকী (৬৮৩-৭৫৬ হি.) ও 'আল্লামা আবূ হায়্যান আন-নাহ্‌ভী (৬৫৪-৭৪৮ হি.)-এর মত পরিপূর্ণ শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত, শিক্ষক

ও শক্তিশালী যোগ্য 'আলিমও বর্তমান ছিলেন যাঁদের নিকট শিক্ষা লাভের জন্য ছাত্ররা পতঙ্গের মত ছুটে আসত এবং যাঁদের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের গভীরতার খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

জ্ঞানের প্রচার ছিল বিকাশমুখী। মিসর ও সিরিয়ায় আয়্যূবী ও মামলূক সুলতানদের প্রতিষ্ঠিত বড় বড় মাদরাসা ছিল, ছিল দারু'ল-হাদীসও। এসব প্রতিষ্ঠানে চতুর্দিক থেকে আগত ছাত্রেরা ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষা লাভ করত। মাদরাসার সঙ্গে স্থায়ীভাবে বড় বড় কুতুবখানা (গ্রন্থাগার) ছিল। এসব গ্রন্থাগারে জ্ঞানের প্রতিটি শাখার দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য কিতাবাদি সুরক্ষিত ছিল যেখান থেকে প্রত্যেক ছাত্র উপকৃত হতে পারত। কেবল মাদরাসা কামিলিয়াতে (৬২১ সনে আল-কামিল মুহাম্মদ আয়্যূবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত) যে লাইব্রেরী ছিল তাতে এক লক্ষ কিতাব ছিল। এ শতাব্দীতে বেশ কতক মূল্যবান কিতাব রচিত হয়। এগুলো পরবর্তী যুগের লোকদের জন্য রেফারেন্স পুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'আল্লামা তকীয়্যুদ্দীন ইবনু'স-সালাহ্-র 'মুকাদ্দিমা', শায়খ 'ইযযুদ্দীন ইবনে 'আবদুস সালামের 'আল-কাওয়াইদু'ল-কুবরা', ইমাম নববী-র সংকলন 'শরাহ আল-মুহায্‌যাব' ও 'শরাহ মুসলিম', ইব্‌ন দাকীকু'ল-'ঈদ-এর কিতাব 'আল-ইমাম' ও 'আহকামু'ল-আহকাম শরাহ 'উমদাতু'ল -আহকাম', আবুল হুজ্জাজ আল-মিযযীর 'তাহযীবু'ল-কামাল' ও 'আল্লামা যাহবীর 'মীযানু'ল-ই'তিদাল' ও 'তা'রীখুল ইসলাম'-এর নাম উল্লেখ করা যায়।

কিন্তু কতিপয় ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা বাদ দিলে এই শতাব্দীর জ্ঞান চর্চা ও গ্রন্থ রচনার বিস্তৃতি ছিল অনেক বেশী, গভীরতা ছিল কম। চিন্তা-ভাবনা ও তার গভীরতার পরিবর্তে অনুলিপিকরণ ও উদ্ধৃতি প্রদানের প্রতি আগ্রহ ছিল বেশী। ফিকহী মযহাবের লৌহ-প্রাকার তখন নির্মিত হয়ে গেছে যার ভেতর নমনীয়তা ছিল না। এমনিতে তো বলার সময় সবাই বলত, সত্য চার মযহাবের মধ্যে বৃত্তাবদ্ধ, কিন্তু কার্যত দেখা যেত, প্রতিটি মযহাবের অনুসারীই 'সত্য কেবল তার অনুসৃত মযহাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ' বলে মনে করছে অর্থাৎ প্রত্যেকেই যার যার মযহাবকেই কেবল সত্য জানত। নমনীয়তার ক্ষেত্রে বড় জোর এতটুকু বলত—

رأى امامنا صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرنا خطأ يحتمل الصواب ـ

আমাদের ইমামের ইজতিহাদ সবই সঠিক, যদিও তার ভেতর ভুলের আশংকাও রয়েছে এবং অন্যান্য মযহাবের ইমামদের ইজতিহাদ ভুলে ভরা যদিও সেগুলোর সঠিক হবার সম্ভাবনাও রয়েছে

এমনি করে সকল মযহাবের অনুসারীরাই নিজেদের ফিকহী মতবাদ সমস্ত ফিকহী মযহাব থেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম এবং তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সমর্থিত ও গৃহীত বলে মনে করত। তাদের সমস্ত মেধা, রচনা ও বর্ণনা শক্তির সবটুকুই কেবল নিজেদের ইমামের ইজতিহাদকে অগ্রাধিকার প্রদান ও তার ফযীলত প্রমাণ করতে ব্যয়িত হত। মযহাব-অনুসারীরা নিজেদের মযহাবকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখত এবং কোন্ ধরনের মন-মানসিকতা মযহাবপন্থীদের ভেতর কাজ করত নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে তা কিছুটা আঁচ করা যাবে ঃ

> সুলতান আল-মালিকু'জ জাহির বায়বার্স বিগত দিনের সাংবিধানিক নীতির বিরুদ্ধে যখন শাফি'ঈ মযহাবের কাযীউ'ল-কুযাত ছাড়াও বাকী তিন মযহাবেরও আলাদা আলাদা কাযীউ'ল-কুযাত নিযুক্ত করেন তখন শাফি'ঈ মযহাবের ফকীহগণ একে অত্যন্ত অসন্তোষের দৃষ্টিতে দেখেন। কেননা তারা মিসরকে শাফি'ঈ মযহাবের কাযীউ'ল-কুযাতের অধীনে দেখতে চাচ্ছিলেন এবং মনে করছিলেন, প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা নিয়ম-রীতি ও ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর দাফনগাহ হিসাবে মিসরের ওপর একমাত্র শাফি'ঈ মযহাবের অধিকারই স্বীকৃত। বায়বার্সের শাসনাবসানে মিসরের শাসন ক্ষমতা যখন তার খান্দান থেকে অন্য হাতে হস্তান্তরিত হয় তখন কোন কোন শাফি'ঈপন্থী একে তার অপকর্মের শাস্তি ও প্রকৃতির তথা আল্লাহ্‌র বিচার বলে মনে করেন।[১]

এই ফিকহী ফের্কাবন্দীর সঙ্গে 'ইলমে কালামের অনুসারিগণের গোঁড়ামি চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছিল। মযহাব চতুষ্টয়ের অনুসারিগণ একে অপরকে মান্য করত এবং ছাত্র ও শিক্ষক হিসেবে একে অপরকে শিক্ষা দান ও একে অপরের থেকে শিক্ষা গ্রহণও করতেন। কিন্তু আশ'আরীপন্থী ও হাম্বলী মতাবলম্বীদের মধ্যে একতা ও মিলন ছিল প্রায় অসম্ভব। মযহাবী দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে প্রশ্ন ছিল কোন্ মযহাব শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য আর এখানে বিতর্ক ছিল ইসলাম ও কুফরের এবং এর ভিত্তিতে একজন আরেকজনকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট বলতেন এবং এ বক্তব্যে তারা অনড় থাকতেন। 'আকাইদ সংক্রান্ত বিতর্ক ও 'ইলমে কালামের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সমস্ত বিতর্ক ছাপিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। আর এতেই মানুষ মজা পেত বেশী। রাজন্যবর্গও এতে আকর্ষণ বোধ করতেন এবং সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলেই এই নেশায় ছিলেন মত্ত।

---

১. তাবাকাতু'শ-শাফি'ঈয়্যাতু'ল কুবরা।

অপরদিকে তাসাওউফও উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করেছিল। এর ভেতর বহু অনৈসলামী উপাদান ও ভাবধারা ঢুকে পড়েছিল এবং অনেক পেশাদার মূর্খ জাহিল ও বিদ'আতী এ দলে শামিল হয়ে সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট লোকদেরকে গোমরাহ ও শিরক-বিদ'আতের বাজার গরম করে তুলেছিল।

দার্শনিকদের একটি দল ধর্ম ও আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের পেশকৃত শিক্ষা থেকে স্বাধীন হয়ে প্রচার প্রসারে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে লিপ্ত ছিল। অপর দল দর্শনকেই সত্যের মূল ও মাপকাঠি অভিহিত করে ধর্মকে এর সঙ্গে জুড়ে দিতে চাইত এবং ঐশী বাণীকে তারা বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস চালাত। এই উভয় দল এ্যারিস্টোটল ও প্লেটোর অন্ধ অনুকারী, তাদের চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণার পবিত্রতা, তাদের জ্ঞানের বিশুদ্ধতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও অতি মানব হিসাবে তাঁদের মর্যাদার ব্যাপারে পুরোপুরি একমত ছিল। কোন কিছুতেই তাঁদের চিন্তার ফলাফল ও গবেষণা থেকে হটতে এবং তাঁদেরও যে ভুল হতে পারে, একথা স্বীকার করতে তারা আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

এরূপ রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, চারিত্রিক, মানসিক ও জ্ঞানগত পরিবেশে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র আবির্ভাব ঘটে এবং এরূপ পরিবেশেই তিনি সংস্কার ও পুনর্জাগরণের পতাকা উড্ডীন করেন।

ইবনে তায়মিয়া (র)-র পিতৃভূমি

দজলা ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ দু অংশে বিভক্ত ঃ (১) দক্ষিণ ভাগকে ইরাক-ই-আরব বলা হয়। বাগদাদ, বসরা প্রভৃতি এ অংশে অবস্থিত। (২) উত্তর ভূভাগ, প্রাচীন আরবী সাহিত্যে একে দিয়ার-ই-বকর, দিয়ার ই-রবী'আ ও দিয়ার ই-মুদার নামে স্মরণ করা হয়েছে। আরব ভৌগোলিকেরা সাধারণভাবে একে আল-জযীরা নামে স্মরণ করেন। এর উত্তরে আর্মেনিয়া, দক্ষিণে ইরাক-ই-আরব, পূর্বে কুর্দিস্তান ও পশ্চিমে এশিয়া মাইনর ও বাদিয়াতু'শ -শাম (সিরিয়া প্রান্তর) অবস্থিত। এ এলাকায় মাওসিল, আর-রুকা (আল-বায়দা), নাসীবায়ন ও আর-রিহা (এডেসা)[১] অবস্থিত। আর-রিহার দক্ষিণে আনুমানিক ৮ ঘন্টার দূরত্বে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শহর হাররান। ইবনে হাওকাল-এর বর্ণনা মুতাবিক এ শহর প্রাচীন কাল থেকেই সাবিঈন[২]দের ধর্মীয় ও

১. বর্তমানে একে আউরফা বলে। আধুনিক তুরস্কের অন্তর্গত।

২. 'সাবী' শব্দের বহুবচন; অর্থ ঃ যে নিজের দীন পরিত্যাগ করে অন্য দীন গ্রহণ করে (কুরতুবী)। তৎকালে প্রচলিত সকল দীন থেকে তাদের পছন্দমত কিছু কিছু বিষয় তারা গ্রহণ করে নিয়েছিল। তারা নক্ষত্র ও ফেরেশতা পূজা করত। হযরত ওমর (রা) তাদেরকে কিতাবী মনে করতেন (কুরআনুল করীম থেকে গৃহীত =অনুবাদক)।

শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। দর্শন ও প্রাচীন গ্রীক শাস্ত্রে এর একটি বিশিষ্ট স্থান, খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি ছিল। এই হাররানই ইবনে তায়মিয়া (র)-র পিতৃভূমি এবং এখানেই তাঁর খান্দান শতাব্দীকাল থেকে বসবাস করে আসছিল।

ইবনে তায়মিয়া (র)-র খান্দান

ইবনে তায়মিয়া (র)-র খান্দান পূর্ব থেকেই আসির্রাত-ই-ইবনে তায়মিয়া[১] (খান্দান-ই-ইবনে তায়মিয়া) নামে খ্যাত ছিল। এঁরাই ছিলেন হাররানের শিক্ষিত ও বিখ্যাত ধর্মীয় খান্দান। মযহাব ও 'আকীদার দিক দিয়ে এই খান্দান (যতদূর এঁদের ইতিহাস জানা গেছে) হাম্বলী মযহাবের অনুসারী ছিল। স্বীয় অঞ্চলে এঁরা হাম্বলী মযহাবের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এঁদের শিক্ষিত সদস্যরা সর্বদাই শিক্ষা দান, ফতওয়া প্রদান ও পুস্তকাদি রচনায় মশগুল থেকেছেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র পিতামহ আবুল বারাকাত মাজদুদ্দীন ইবনে তায়মিয়া (র) হাম্বলী মযহাবের অন্যতম ইমাম ও বুযুর্গ ছিলেন। কতক পণ্ডিত তাঁকে একজন মুজতাহিদ হিসেবে স্মরণ করেছেন।[২] রিজালশাস্ত্রের ইমাম হাফিজ যাহবী তাঁর 'আন-নুবালা' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

> মাজদুদ্দীন ইবনে তায়মিয়া (র) ৫৯০ হিজরীর কাছাকাছি সময় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি তাঁর চাচা বিখ্যাত খতীব ও ওয়াইজ ফখরুদ্দীন ইবনে তায়মিয়ার নিকট 'ইলম হাসিল করেন। অতঃপর হাররান ও বাগদাদের 'উলমায়ে কিরাম ও মুহাদ্দিছদের নিকট 'ইল্‌ম হাসিল করেন এবং এক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা লাভ করেন। ফিক্‌হশাস্ত্রেও তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। যাহ্‌বীর ভাষায় ঃ وانتهت اليه الامامة فى الفقه অর্থাৎ ফিকহশাস্ত্রে তিনি ইমাম হিসাবে বরিত হন।

৬৫১ হিজরীতে হজ্জ পালন উপলক্ষে বাগদাদে উপনীত হলে সেখানকার 'উলামায়ে কিরাম জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর মেধা ও প্রতিভা দেখে বিস্মিত হন। যাহবী বলেন ঃ শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র) স্বয়ং আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, যে, শায়খ ইবনে মালিক বলতেন ঃ আল্লাহ্ পাক 'ইলমে ফিক্‌হকে মাজদুদ্দীন ইবনে তায়মিয়ার জন্য এমন কোমল ও দ্রবীভূত করে দিয়েছেন যেমন মোমের মত নরম ও দ্রবীভূত করে দিয়েছিলেন হযরত দাঊদ (আ)-এর জন্য

---

১. ইমাম তায়মিয়া (র)-র চার পুরুষ আগের পূর্বপুরুষ মুহাম্মদ ইবন আল-খিযর-এর সময় থেকে ইবনে তায়মিয়া নিসবত শুরু হয়েছিল। এরূপ নামকরণের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একটি মত হল, মুহাম্মদ ইবন আল-খিযর-এর মাতার নাম ছিল তায়মিয়া। ইনি একজন ওয়াইজ ছিলেন। তাঁর নামে এই বংশের নামকরণ হয়।

২. তরজমা সাহিব -ই-মুনতাকীউ'ল-আখবার, নায়লুল আওতার প্রণেতা 'আল্লামা মুহাম্মদ ইবন আলী শাওকানী।

লোহাকে। তিনি এও বলতেন, আমাদের পিতামহ (মাজ্‌দুদ্দীন)-এর স্বভাব ও প্রকৃতিতে কিছুটা তেজী ভাব ও আবেগ ছিল। একবার এক 'আলিম তাঁকে শিক্ষা বিষয়ে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন ঃ এর উত্তর ষাটটি উপায়ে দেওয়া যায়। এরপর এক এক করে তাকে সব জওয়াবই হাতে গুণে দেন। শেষে বলেনঃ তোমাদের জন্য এই উত্তরগুলো নিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট। তারা তাঁর এই মেধা ও প্রতিভা দেখে বিস্মিত হন এবং নিশ্চুপ হয়ে যান। শায়খুল ইসলাম বলেনঃ বিভিন্ন 'মতন'-এর নকল ও মযহাব স্মৃতিতে গেঁথে রাখতে তিনি ছিলেন এক বিরল প্রতিভা। এজন্য তাঁকে তেমন কোন বেগ পেতে হয়নি কিংবা এর জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থাও অবলম্বন করতে হত না।[১] ৬৫২ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা ও তাঁর জ্ঞানবত্তার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হল 'মুনতাকীউ'ল -আখবার' নামক গ্রন্থটি। 'উলামায়ে কিরাম প্রতিটি যুগেই এর থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং এর প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। যেসব হাদীস মযহাব অনুসারীদের দলীল ও উৎস গ্রন্থকার এই গ্রন্থে ফিক্‌হী অধ্যায়ওয়ারী সে সব হাদীস একত্র করে দিয়েছেন। মুজতাহিদ 'আলিম ও খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ 'আল্লামা মুহাম্মদ ইবন আলী আশ-শাওকানী (মৃ. ১২৫৫ হি.) 'নায়লু'ল-আওতার' নামে আট খণ্ডে এর শরাহ (ভাষ্য) লিখেন। উত্তর বিন্যস্ত ও সংক্ষিপ্তকরণ, চূড়ান্ত আলোচনা-পর্যালোচনা ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত দৃষ্টি ও উদার হৃদয়ের কারণে এটি শিক্ষক, ছাত্র ও জ্ঞানী মহলে বিশেষ মর্যাদার দাবিদার।

শায়খুল ইসলামের পিতা শিহাবুদ্দীন 'আবদুল হালীম ইবনে তায়মিয়া ছিলেন একজন 'আলিম, মুহাদ্দিছ, হাম্বলী মযহাবের ফকীহ, শিক্ষক ও মুফতী। হাররান থেকে দামিশক স্থানান্তরিত হবার পর তিনি সেখানকার উমায়্যা মসজিদে দরস প্রদান করতে শুরু করেন। এ মসজিদটি ছিল তৎকালীন শ্রেষ্ঠ 'আলিম ও মুদাররিসদের কেন্দ্র এবং সেখানে সব 'আলিম ও মুদাররিসের পক্ষে দরস প্রদান সহজ কাজ ছিল না। তাঁর দরস প্রদানের বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি মুখে মুখে ও তাৎক্ষণিকভাবে অর্থাৎ কোনরূপ পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই দর্‌স প্রদান করতেন এবং দরস প্রদানের কালে কোন কিতাবের সাহায্য গ্রহণ করতেন না, গোটাটাই মুখস্থ ও স্মৃতিনির্ভর হত। জামে উমায়্যাতে দর্‌স ও ওয়াজের সঙ্গে তিনি দামিশকের দারু'ল-হাদীস আস-সুকরিয়ার শায়খুল হাদীসও ছিলেন এবং সেখানেই তাঁর বাসস্থান ছিল। ৬৮২ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন এবং আস-সুফিয়া নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[২]

---

১. এ সব বৈশিষ্ট্যই তাঁর পৌত্রের ভেতর গিয়ে আসন নেয়।

২. ইবনে কাছীরকৃত আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৩শ খণ্ড, ৩০৩ পৃ.

জন্ম ও আবাসভূমি পরিবর্তন

এরূপ নামকরা, একনিষ্ঠ, শিক্ষিত ও ধর্মীয় খান্দানে ৬৬১ হিজরীর ১০ই রবী'উ'ল-আওয়াল সোমবার তকীয়্যুদ্দীন ইবনে তায়মিয়ার জন্ম হয়। পিতা তাঁর নাম রাখেন আহমদ তকীয়্যুদ্দীন। বড় হয়ে তিনি আবুল 'আব্বাস ডাক নাম রাখেন। কিন্তু খান্দানী উপাধি 'ইবনে তায়মিয়া' সব কিছু ছাড়িয়ে যায় এবং এ নামেই তিনি মশহুর হন।

এ যুগটা ছিল তাতারী চক্রের,একথা আগে বলা হয়েছে। গোটা মুসলিম জাহান তাদের ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল, বিশেষ করে ইরাক ও জযীরা ভূখণ্ড ছিল তাদের ক্রীড়াক্ষেত্র। ইবনে তায়মিয়ার সাত বছর বয়ঃক্রমকালে তাঁর জন্মভূমি তাতারী হামলার শিকার হয়। তাতারী হামলার পর 'ইল্‌ম ও মর্যাদা, 'ইয্‌যত আব্রু ও জান-মালের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা ছিল না। শেষে নিতান্ত বাধ্য হয়ে তাঁর পরিবারও শত শত 'আলিম-'উলামা ও শরীফ খান্দানের মতই কোন মুসলিম রাষ্ট্রে আশ্রয় সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। ইরাকে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে নি। কাছাকাছি দেশগুলোর ভেতর একমাত্র সিরিয়াই তাতারী আক্রমণের হাত থেকে তখনো পর্যন্ত নিরাপদ ছিল। মিসরের শক্তিশালী মামলুক সুলতানগণ এখানে রাজত্ব করছিলেন। শেষাবধি এই খান্দান পশ্চিম অভিমুখে তার গতিপথ পরিবর্তন করে এবং দামিশকের দিকে রওয়ানা হয়।

এরূপ বিব্রতকর ও নিঃস্ব অবস্থাতেও এই বিদ্যোৎসাহী ও জ্ঞানের নিশানবরদার পরিবারটি তাঁদের মূল্যবান গ্রন্থাগারটিকে, যেটি কয়েক পুরুষের সঞ্চিত ও সংযোজিত একটি বিরাট জ্ঞানাগার ছিল, পেছনে ছেড়ে যাওয়াকে মেনে নিতে পারেনি। অনন্তর তাঁরা সমস্ত মালমাত্তা রেখে একটি গাড়ীতে কেবল কিতাব বোঝাই করে রওয়ানা হন। তাতারী আক্রমণের আশংকা ছিল সর্বত্র। সবখানেই ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করছিল। সাথে ছিল নারী ও শিশু। সবচেয়ে বেশী অসুবিধা ছিল, গাড়ী টানবার পশু সহজপ্রাপ্য না হওয়ায় কিতাব ভর্তি গাড়ী নিজেদেরই টানতে হচ্ছিল। কাফেলা অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে পথ চলছিল। এক জায়গায় তাতারীদের আক্রমণের মুখোমুখি গিয়ে পড়ে। আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল এরকম, কিতাবের গাড়ী চলতে চলতে থেমে গিয়েছিল। এ অবস্থার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পরিবারের লোকেরা আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আপ্রার্থী হয় এবং কান্নাকাটি করতে থাকে। ফলে আল্লাহ্‌র সাহায্য নেমে আসে। গাড়ীর চাকা আবার সচল হয়ে ওঠে এবং কাফেলা সম্মুখ পানে অগ্রসর হয়।[১]

---

১. কাওয়াকিবুদ্দুররিয়্যা

দামিশক

দামিশকে পৌছুতেই শিক্ষিত ও জ্ঞানের ধারক এই পরিবারটির আগমন সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষিত মহল পূর্ব থেকেই আবুল বারাকাত মাজদুদ্দীন ইবনে তায়মিয়ার সুনাম ও অবদান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। 'আবদুল হালীম ইবনে তায়মিয়ার 'ইল্‌ম ও ফযীলত ছিল খ্যাতির শীর্ষে। কয়েকদিনের মধ্যেই জামে উমায়্যা ও দারু'ল-হাদীস আস-সুকরিয়ায় তাঁর দরস প্রদান শুরু হয়ে যায়। ছাত্র ও হাম্বলী মযহাবের উলামায়ে কিরাম তাঁর নিকট ভিড় জমাতে থাকে। ফলে এ পরিবারকে নতুন একটি শহরে নবাগত হিসেবে একাকীত্ব ও অপরিচিতির কোন সমস্যারই সম্মুখীন হতে হয়নি।

অল্পবয়স্ক বালক আহমদ ইবনে তায়মিয়া সত্বর কুরআন মজীদ হেফজ শেষ করেন এবং হাদীস, ফিক্‌হ ও আরবী সাহিত্যে পারদর্শিতা লাভের সাধনায় মশগুল হয়ে পড়েন। অল্প বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর পিতার দরস মজলিসে ও ওয়াজ মাহফিলে যোগদান করতেন এবং 'উলামায়ে কিরামের বৈঠকে ও তাঁদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় শরীক হতেন। এর ফলে তাঁর অপরিমেয় মেধা সহজেই আলোচনার মণিমুক্তাসদৃশ বিষয়গুলো লুফে নিত এবং নিজেকে সমৃদ্ধ করত।

অসাধারণ স্মৃতিশক্তি

ইবনে তায়মিয়ার পরিবার ছিল স্মৃতিশক্তির জন্য বিখ্যাত। তাঁর পিতা ও পিতামহ দু'জনই বিরাট স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তকীয়্যুদ্দীন ইবনে তায়মিয়া আল্লাহ্‌প্রদত্ত এই নে'মতের ক্ষেত্রে গোটা পরিবারকে ছাড়িয়ে যান। শৈশবেই তাঁর অদ্ভুত ও অনন্যসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং দ্রুত মুখস্থ করবার ক্ষমতা 'উলামায়ে কিরাম ও তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীকে বিস্ময়ের মাঝে নিক্ষেপ করে এবং দামিশ্‌কে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। 'উকূদু'দ্দুর্রিয়ার লেখক বলেন ঃ

> একবার হলব (আলেপ্পো)-এর একজন বড় 'আলিম দামিশক আগমন করেন। আগমনের পর শুনতে পান, আহমদ ইবনে তায়মিয়া নামের এক শিশু অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির অধিকারী; একবার যা কিছু শোনে দ্রুত তার মুখস্থ হয়ে যায়। এই শিশুকে দেখবার ও তার স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা নেবার আগ্রহ সৃষ্টি হল তাঁর। যে রাস্তা দিয়ে ইবনে তায়মিয়া মকতবে যেতেন সেই রাস্তায় এক দর্জির দোকানে বসে তিনি তার অপেক্ষা করতে থাকেন। তাঁর অভিপ্রায়ের কথা জানতে পেরে দর্জি তাঁকে বলল ঃ আপনি এখানেই বসে অপেক্ষা করুন। সেই বাচ্চা এখনই এসে যাবে। কেননা এটাই তার মকতবে যাবার পথ। কিছুক্ষণ পর বেশ কিছু শিশুকে মকতবে যেতে দেখা গেল। দর্জী বলল ঃ ঐ যে দেখুন! যে বাচ্চাটির নিকট বড় স্লেট রয়েছে ওরই

নাম ইবনে তায়মিয়া। শায়খ বাচ্চাটিকে ডাকলেন। সে এলে তিনি তার থেকে স্লেটটি চেয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ বৎস! তোমার এই স্লেটে যা কিছু লেখা আছে সব মুছে ফেল। স্লেট পরিষ্কার হয়ে গেলে তিনি ১১ কিংবা ১৩টি হাদীস তাতে লেখেন এবং বলেন, "হাদীসগুলো একবার পড়ে ফেল।" বাচ্চা গভীর মনোযোগের সঙ্গে একবার পড়ল। এরপর শায়খ স্লেটটি হাতে তুলে নিয়ে হাদীসগুলো তাঁকে শোনাতে বললেন। ইবনে তায়মিয়া সব হাদীস অবলীলায় শুনিয়ে দিল। শায়খ পুনরায় স্লেটে লিখিত হাদীসগুলো মুছে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর শায়খ হাদীসের কতকগুলো সনদ লিখে সেগুলো তাকে পড়তে বললেন। বালক ইবনে তায়মিয়া একবার গভীর মনোযোগ সহকারে সেগুলো দেখল এবং সঙ্গে সঙ্গে তা শুনিয়েও দিল। শায়খ এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখে বলেন ঃ যদি এই শিশু বেঁচে থাকে তাহলে কালে সে এক অসাধারণ পুরুষে পরিণত হবে। কেননা এ যুগে এ ধরনের কোন শিশুর তুলনা মেলা ভার।[১]

ইসলামের প্রথম যুগের মুহাদ্দিছগণের স্মৃতিশক্তির যে সব ঘটনা বিশ্বস্ত ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত আছে এবং হাদীসের রাবী (বর্ণনাকারী) ও ইমামগণের আল্লাহপ্রদত্ত স্মৃতিশক্তির যে সব উদাহরণ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে সে সবের আলোকে ওপরের ঘটনা অসম্ভব মনে করার ও অবিশ্বাস করবার সঙ্গত কোন কারণ নেই। স্বয়ং ইবনে তায়মিয়া (র)-র পরবর্তী জীবন ও তাঁর মুখস্থ ও বর্ণনাশক্তির ঘটনাদৃষ্টেও এর সত্যতা সমর্থিত হয়। আসলেই তিনি ছিলেন অস্বাভাবিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

শিক্ষা লাভ ও পরিপূর্ণতা অর্জন

ইবনে তায়মিয়া (র) কঠোর পরিশ্রম, গভীর মনোযোগ ও নিবিষ্টচিত্ত সহকারে পড়াশোনা শুরু করেন। তাঁর সমসাময়িক লেখক ও ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন, বয়সের স্বল্পতা সত্ত্বেও খেলাধুলার প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না এবং তিনি এতটুকু সময় নষ্ট করতেন না। তদ্‌সত্ত্বেও জীবন, স্বীয় পারিপার্শ্বিক সমাজ ও পরিবেশ, নাগরিক জীবনের অবস্থা, মানুষের চরিত্র ও আচার-অভ্যাস সম্পর্কে তিনি সম্পর্কহীন ও বেখবর ছিলেন না। তাঁর লিখিত রচনা থেকে পরিষ্কার জানা যায়, জীবন সম্পর্কে তাঁর অধ্যয়ন ছিল বিস্তৃত ও গভীর এবং মানুষের থেকে দূরে নির্জন গৃহকোণে একাকী কেবল লেখাপড়ার মাঝেই তিনি জীবন কাটিয়ে দেন নি।

১. আবূ যুহরাকৃত 'ইবনে তায়মিয়া', উকুদুদ্দুর্রিয়ার হাওয়ালা যোগে, ২১ পৃ.।

ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর যুগের প্রচলিত সব ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তিনি বিশেষ মনোযোগ দেন এবং অভিধান ও ব্যাকরণে তিনি গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের ইমাম সীবাওয়ায়হ-এর গ্রন্থ 'আল-কিতাব' (আরবী ব্যাকরণের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় গ্রন্থ, এমন কি এতটা জনপ্রিয় যে, কেবল 'আল-কিতাব' বলা হলেও সীবাওয়ায়হ-এর কিতাবই ধরা হয়।) তিনি বিশেষ যত্ন ও মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করেন[১] এবং এর দুর্বল স্থান ও ভুল-ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করেন। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অভিধান ও ব্যাকরণের মুহাক্কিক ও সমালোচনাসুলভ দৃষ্টি এবং তাঁর নিজের এই সাহিত্যিক ও বৈয়াকরণিক ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য তিনি তাঁর জ্ঞানগত জীবন, গ্রন্থ রচনা ও আলোচনার ক্ষেত্রে কাজে লাগান। গদ্য ও পদ্যের একটি বিরাট অংশের তিনি হেফাজতের ব্যবস্থা করেন। প্রাথমিক ও জাহিলিয়া যুগের আরবের অবস্থা ও ঘটনাসমূহ তিনি বিস্তারিতভাবে দেখেন এবং ইসলামী যুগ ও মুসলিম হুকুমতগুলোর ইতিহাস ব্যাপক ও গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। এই গভীর ও বিস্তৃত অধ্যয়ন তাঁকে তাঁর পরবর্তীকালের বিচিত্র জ্ঞান চর্চার জীবনে খুবই কাজে এসেছিল। তাঁর সমসাময়িককালে কেউই বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাপকতর অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তাঁর মুকাবিলা করতে পারতেন না। জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার লাভের এও ছিল এক মস্ত কারণ।

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়াও লেখনী, সুন্দর হস্তাক্ষর, হিসাব ও অংকশাস্ত্রের দিকেও তিনি মনোযোগ দেন এবং এসব উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেন।[২]

ধর্মীয় 'ইলম-এর ক্ষেত্রে ফিক্‌হ, উসূল-ই ফিক্‌হ, ফারায়েয, হাদীস ও তফসীরের প্রতি মনোবিবেশ করেন। হাম্বলী ফিক্‌হ ছিল তাঁর পারিবারিক সম্পদ এবং এক্ষেত্রে স্বয়ং তাঁর পিতা ছিলেন স্নেহপরায়ণ উস্তাদ, অভিজ্ঞ 'আলিম, সর্বোত্তম পরামর্শদাতা ও পথ-প্রদর্শক। সে যুগে হাদীস লেখা, শ্রবণ ও মুখস্থ করার সাধারণ রেওয়াজ ছিল। ইবনে তায়মিয়া (র) সর্বপ্রথম ইমাম হুমায়দীর কিতাব الجمع بين الصحيحين কণ্ঠস্থ করেন। অতঃপর সে যুগের প্রখ্যাত উস্তাদ, 'উলামায়ে কিরাম ও সিরিয়ার বিদ্বানমণ্ডলী থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং লেখেন। ইবনে 'আবদুল হাদী বলেন, হাদীসের ক্ষেত্রে ইবনে তায়মিয়ার

---

১. আল-কাওয়াকিবুদ্দুরিয়্যা:

১. আল-কাওয়াকিবুদ্দুর্রিয়্যা, পৃষ্ঠা ২ :

শায়খ-এর সংখ্যা দুশ' ছাড়িয়ে যাবে।[১] হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্ট শায়খ ছিলেন ইবনে 'আবদুদ্দাইম আল-মাকদিসী ও তাঁর শ্রেণীর লোক। মুসনাদে ইমাম আহমদ তিনি কয়েকবার শ্রবণ করেন। ঠিক তেমনি সিহাহ্ সিত্তা শ্রবণের সুযোগও তিনি কয়েকবার লাভ করেছিলেন।[২]

তফসীর ছিল ইবনে তায়মিয়া (র)-র প্রিয় বিষয় এবং এর প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁর নিজেরই বর্ণনা, তিনি কুরআনুল করীমের ছোট বড় শতাধিক তফসীর গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন।[৩] তফসীরশাস্ত্রের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত সম্পর্ক ছিল। কুরআন মজীদের তেলাওয়াত, গভীর চিন্তা ও অনুধাবন ও অত্যধিক অধ্যয়নের ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর কুরআনের 'ইল্ম-এর খাস ফয়েয নাযিল করেছিলেন। কুরআন ছাড়াও তিনি স্বয়ং এর লেখক ও অবতরণকারীর (আল্লাহ্র) দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন এবং আল্লাহ্র নিকট কুরআনের অনুধাবন ও বক্ষ সম্প্রসারণরূপ সম্পদের প্রার্থনা জানাতেন। তাঁর ছাত্রাবস্থা ও কুরআন অনুধাবনের তরীকা (পন্থা) সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

ربما طالعت على الاية الواحدة نحو مائة تفسير ثم اسأل الله الفهم واقول يامعلم ادم وابراهيم علمنى وكنت اذهب الى المساجد المهجورة ونحوها وامرغ وجهى فى التراب واسأل الله تعالى واقول يامعلم ابن ابراهيم فهمنى -

> কোন কোন সময় একটি আয়াতের জন্য আমি শত শত তফসীর অধ্যয়ন করেছি। অধ্যয়ন করার পর আমি আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করতাম যেন ঐ আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করতে পারি, করতে পারি অনুধাবন।
>
> আমি মুনাজাত করতাম, "হে আদম ও ইবরাহীমের শিক্ষক! আমাকে তুমি শেখাও"। আমি নির্জন মসজিদ ও জনমানবহীন এলাকার দিকে চলে যেতাম এবং মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে বলতাম, "হে ইব্ন ইবরাহীমের শিক্ষক! আমাকে তুমি উপলব্ধি করবার ক্ষমতা ও বুঝবার শক্তি দান কর।"[৪]

---

১. আল-কাওয়াকিবুদ্দুরিয়্যা, পৃষ্ঠা ২ ;

২. আল-কাওয়াকিবুদ্দুর্রিয়্যা, পৃষ্ঠা ২ ;

৩. তফসীর সূরা নূর (ইবনে তায়মিয়া), পৃষ্ঠা ১৩৬ ;

৪. উকূদুদ্দুররিয়্যা, ১২৬ পৃষ্ঠা ;

সে সময় মিসর ও সিরিয়ায় আশ'আরী 'ইল্মে কালামের ছিল প্রাবল্য। সুলতান সালাহুদ্দীন স্বয়ং আশ'আরী 'আকীদা পোষণ করতেন। মিসরীয় ঐতিহাসিক মাকরিযী বলেন, সুলতান শৈশবেই কুত্বুদ্দীন আবুল মা'আলী আশ'আরীর মতন যা তিনি আকাইদ সম্পর্কে রচনা করেছিলেন, হেফজ করেছিলেন এবং পরে তিনি তাঁর বংশের শিশু-কিশোরদের তা হেফ্জ করাতেন। তিনি ও তাঁর স্থলাভিষিক্তগণ (বনূ আয়্যুব) লোকদেরকে আশ'আরী 'আকীদার অনুগত বানিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের রাজত্বে ও তৎপরবর্তী স্থলাভিষিক্তগণের (মিসরের মামলুক সুলতানগণের) যুগ পর্যন্ত আশ'আরী 'আকীদা রাষ্ট্রীয় সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল।

হাম্বলী মযহাবীদেরকে সঠিকভাবেই হোক কিংবা ভুল করেই হোক, আশ'আরীদের প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা হত। উভয় পক্ষই আলোচনা-সমালোচনা ও বিতর্কে লিপ্ত থাকত। আশ'আরীদের 'ইল্মে কালাম ও প্রমাণ-পদ্ধতি বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক দলীল-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অপর পক্ষে হাম্বলীগণ শরীয়তের 'নস', কুরআনী আয়াত ও হাদীসে রসূল (সা.)-এর বাহ্যিক অর্থের সাহায্যে আলোচনা করতেন। কালামশাস্ত্রে তেমন গভীর ব্যুৎপত্তি না থাকায় এবং যুক্তি ও দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কহীনতার কারণে কোন কোন সময় আলোচনা ও বিতর্কে হাম্বলীদের পাল্লা হাল্কা মনে হত। তাদের সম্পর্কে এই ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হত, তাঁরা বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ এবং কোন বিষয়ের কেবল বাহ্যিক ও ভাসাভাসা জ্ঞান রাখেন মাত্র। সম্ভবত এ ধরনের অনুভূতি ইবনে তায়মিয়া (র)-র মত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও তীক্ষ্ণ অনুভূতির অধিকারী একজন নওজোয়ান 'আলিমকে 'ইলমে কালামের বিস্তৃত ও গভীর অধ্যয়ন, বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার সঙ্গে সরাসরি অবহিতি লাভ করবার দিকে মনোনিবেশে বাধ্য করেছিল। তিনি জ্ঞানের এসব শাখা সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং এতটা ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, তিনি স্বয়ং সে সব শাস্ত্রের দুর্বলতা ও সে সবের লেখক ও নেতৃস্থানীয় পণ্ডিত, এমন কি গ্রীক দার্শনিকদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভ্রান্তিসমূহ সম্পর্কেও অবহিত হতে সক্ষম হন। সে সব শাস্ত্রের সমালোচনায় এমন সব যুক্তিপূর্ণ ও বিজ্ঞোচিত কিতাব লেখেন যার জওয়াব গোটা দার্শনিক মহল দিতে পারেনি।

মোটকথা, ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর যুগে কুরআন ও সুন্নাহর মুখপাত্র হিসাবে ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে এবং জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে বিরাজিত ভ্রান্তি ও গোমরাহী দূর করবার জন্য এমন বিস্তৃত ও পরিপূর্ণ 'ইল্মী প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, সেই উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে ও চিন্তা-চেতনা ও ধর্মীয় নৈরাজ্যের যমানায় যার প্রয়োজন ছিল। তিনি সে সমস্ত অস্ত্রের ব্যবহার শেখেন

যেসব অস্ত্রে তাঁর প্রতিপক্ষ ও ইসলাম বিরোধীরা (য়াহূদী, খ্রিস্টান, দার্শনিক ও বাতেনী সম্প্রদায়) সজ্জিত ছিল। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি এমন পাণ্ডিত্য অর্জন করেন যে, তাঁর সমসাময়িকেরা তা দেখে হতবাক হয়ে যান। তাঁর বিখ্যাত প্রতিপক্ষ আল্লামা কামালুদ্দীন আয-যামালকানী জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁর সামগ্রিকতা ও সর্বব্যাপকতার স্বীকৃতি দিয়েছেন ঃ

قدالان الله له العلوم كما الان لداؤد الحديد كان اذا سئل عن فن من العلم ظن الرائ والسامع انه لايعرف غير ذالك الفنوحكم ان احدا لا يعرفه مثله وكان الفقهاء من سائر الطوائف اذا جلسوامعه استفادوا فى مذاهبهم منه ما لم يكونواعرفوه قبل ذالك ولا يعرف انه ناظراحدا فانقطع منه ولاتكلم فى علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع او غيرها الافاق فيه اهله والمنسوبين اليه وكانت له اليد الطولى فى حسن التصنيف ـ

আল্লাহ্ পাক ইবনে তায়মিয়ার জন্য সকল প্রকার জ্ঞান সহজ ও কোমল করে দিয়েছিলেন যেরূপ সহজ ও কোমল বানিয়ে দিয়েছিলেন হযরত দাউদ 'আলায়হি'স-সালামের জন্য লোহাকে। জ্ঞানের যে শাখায়ই তাঁকে প্রশ্ন করা হতো তিনি তাঁর এমন সহজ ও সাবলীলভাবে উত্তর দিতেন যে, দর্শক শ্রোতা মনে করত যে, তিনি এই বিষয়টি ছাড়া আর কিছুই জানেন না। (অর্থাৎ তিনি কেবল এই একটি বিষয়েই বিশেষজ্ঞ) এবং তারা সিদ্ধান্তে পৌছতে যে, জ্ঞানের এই শাখায় তাঁর মত জ্ঞানী পণ্ডিত আর কেউ নেই। প্রতিটি মাযহাব ও ফিক্‌হ-এর 'আলিমগণ যখন তাঁর মজলিসে শরীক হতেন তখন কোন না কোন বিষয়ে এমন কিছু জিনিস জানতে পারতেন, যেগুলো তারা এর আগে জানতেন না। যুক্তি-তর্কে কিংবা বিতর্ক অনুষ্ঠানে কেউ তাঁকে পরাজিত করতে পারেন নি। কখনো যদি তিনি শর'ঈ কিংবা বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত জ্ঞানের ব্যাপারে কোন কথা বলেছেন তখন সেই শাস্ত্রের অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতকে তিনি অতিক্রম করে গেছেন। লেখনীর তথা গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রেও সর্বাগ্রগামী ছিলেন তিনি।

ইবনে তায়মিয়া (র)-র প্রথম দরস প্রদান

ইবনে তায়মিয়া (র)-র বয়স যখন বাইশ বছর (৬৮২ হি.) তখন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা 'আবদুল হালীম ইবনে তায়মিয়া ইনতিকাল করেন। ফলে দারু'ল হাদীস আস-সুকরিয়ায় তাঁর শিক্ষকতার আসন শূন্য হয়।

শিক্ষকতার এ আসন কিন্তু দীর্ঘদিন শূন্য থাকেনি। ৬৮৩ হিজরীর ২রা মুহাররাম তারিখে পিতার যোগ্য সন্তান আহমদ তকীয়্যুদ্দীন ইবনে তায়মিয়া এ আসন অলংকৃত করেন এবং প্রথম দর্‌স প্রদান করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল

বাইশ বছর। দরস প্রদানকালে দামিশকের মশহুর সুধী মনীষীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কাযীউ'ল-কুযাত বাহাউদ্দীন ইবনু'য-যাকী আশ-শাফি'ঈ স্বয়ং এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শাফি'ঈ 'আলিমগণের মধ্যে তিনি ছাড়াও শায়খু'শ-শাফি'ঈয়া শায়খ তাজুদ্দীন আল-ফিযারী, হাম্বলী মযহাবের 'আলিম-'উলামার মধ্যে যয়নুদ্দীন ইবনু'ল-মুনজী আল-হাম্বলীসহ অন্যান্য নেতৃস্থানীয় 'আলিম উপস্থিত ছিলেন। এই দরস-এ উপস্থিত সুধীবৃন্দ অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং এই যুবক ও তরুণ 'আলিমের জ্ঞানের গভীরতা, উপস্থিত বুদ্ধি, সাহসিকতা ও ভাষার আলংকারিকতার স্বীকৃতি দেন। তাঁর অন্যতম প্রখ্যাত ছাত্র হাফিজ ইবনে কাছীর ৬৮৩ হিজরীর ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে এই দরস অনুষ্ঠানের আলোচনায় বলেন ঃ

وكان درسا هائلا وقد كتبه الشيخ تاج الدين الفزارى بخطه لكثرة فوائده وكثرةما استحسنه الحاضرون وقد اطنب الحاضرون فى شكره على حداثة سنه وصغره فانه كان عمره اذ ذاك عشرين سنة وسنتين -

এটা ছিল বিস্ময়কর দর্‌স; এর ব্যাপক উপকারিতা ও সাধারণ জনগণের নিকট পছন্দনীয় হবার কারণে শায়খ তাজুদ্দীন আল-ফিযারী প্রদত্ত দর্‌স লিপিবদ্ধ করেন। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী ইবনে তায়মিয়াকে তাঁর স্বল্প বয়স ও তারুণ্য সত্ত্বেও এ ধরনের মূল্যবান দর্‌স প্রদানের জন্য অত্যন্ত প্রশংসা করেন এবং তাঁকে বাহবা দেন। কেননা এ সময় তাঁর বয়স ছিল বাইশ বছর মাত্র।[১]

পরবর্তী মাসের (সফর) দশ তারিখে জুমু'আর দিনে ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর পিতার স্থলে উমায়্যা মসজিদে তফসীরের দর্‌স প্রদান করেন। তাঁর জন্য বিশেষভাবে মিম্বর রাখা হয়েছিল। তিনি ধারাবাহিকভাবে তফসীর বয়ান করা শুরু করেন। দিন দিন লোক সমাগম বেড়ে চলে।

ইবনে কাছীর বলেন ঃ

তিনি তাঁর তফসীরের দর্‌স প্রদানকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও নতুন নতুন বিষয়বস্তু সম্পর্কে এত বেশী বর্ণনা দিতেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলে। এরই সঙ্গে তাঁর দীনদারী, যুহদ ও 'ইবাদত-বন্দেগীর কারণে লোকে তাঁর প্রতি আরও বেশী ঝুঁকে পড়ে এবং তাঁর খ্যাতি দূর-দূরান্তের শহর ও দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক বছর যাবত তাঁর এই রুটিন মাফিক অভ্যাসই বজায় থাকে।[২]

---

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৩শ খণ্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা;

২. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৩শ খণ্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা;

হজ্জ

৬৯২ হিজরীতে আমীন আল-বাসিতীর নেতৃত্বে একটি সিরীয় কাফেলার সঙ্গে হজ্জ সম্পাদন করেন। এই কাফেলা মা'আন নামক স্থানে পৌছুলে প্রবল এক ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হয়। এতে অনেক লোক মারা যায়। ঝঞ্ঝার তাড়নায় উটগুলি পর্যন্ত আপন জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। সবাই বেহুশ প্রায় হয়ে গিয়েছিল।[১]

রসূল (স)-এর প্রতি গালি বর্ষণকারীর শাস্তি

৬৯৩ হিজরীতে এমন একটি ঘটনা সংঘটিত হয় যদ্দ্বারা ইবনে তায়মিয়া (র)-র ধর্মীয় চেতনা, মর্যাদাবোধ ও ঈমানী জযবার বাস্তব প্রকাশ ঘটে। দামিশকে উস্‌সাফ নামক জনৈক খ্রিস্টান সম্পর্কে এক দল লোক এসে সাক্ষ্য দেয়, সে সরওয়ারে 'আলম হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর শানে গোস্তাখী করেছে। এই অন্যায় কর্মের পর সে জনৈক আরব সর্দারের নিকট আশ্রয় নিয়েছে। এতদ্‌শ্রবণে ইবনে তায়মিয়া (র) ও দারুল হাদীসের শায়খ যয়নুদ্দীন আল-ফারিকী একত্রে সাম্রাজ্যের নায়েব (প্রতিনিধি, স্থলাভিষিক্ত) 'ইযযুদ্দীন আয়বক আল-হামূমীর নিকট গমন করেন এবং ঘটনার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমীর বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেন এবং অপরাধীকে ডেকে পাঠান। শায়খদ্বয় আমীরের নিকট থেকে উঠে চলে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁদের দু'জনের সঙ্গে বহু লোক ছিল। এমন সময় তাঁরা উসসাফকে আসতে দেখেন। তার সঙ্গে একজন আরবও ছিল। আরবীয় লোকটিকে উসসাফের সঙ্গে দেখতে পেয়ে লোকজন তাকে গালি দিতে থাকে। এতে আরবটি বলে, এই খ্রিস্টান লোকটি তোমাদের চেয়ে ভাল। এতে করে জনতা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং উভয়ের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করতে শুরু করে। ফলে সেখানে হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। আমীর ইবনে তায়মিয়া ও ফারিকী দু'জন 'আলিমকেই ডেকে পাঠান এবং নিজের সামনে তাঁদেরকে হেনস্তা করেন। খিস্টান লোকটি অতঃপর মুসলমান হয় এবং তাকে নিরাপত্তার জামানত প্রদান করা হয়। পরে দু'জন 'আলিমকেই মুক্তি দেওয়া হয় এবং আমীর তার কৃতকর্মের জন্য উভয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এ সময়ই তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ الصارم المسلول على شاتم الرسول লিখেন।[২]

---

৩. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৩শ খণ্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা;

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৩শ খণ্ড, ৩৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা;

৪ঠা শা'বান, ৬৯৫ হিজরীতে হাম্বলীদের শায়খ 'আল্লামা যয়নুদ্দীন ইব্ন মুনজী, মাদরাসাতু'ল-হাম্বলিয়ার শায়খ, ইনতিকাল করলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত এবং হাম্বলিয়া মাদরাসার প্রধান মুদাররিসের পদেও ইব্নে তায়মিয়াকে অধিষ্ঠিত করা হয়।[১]

পয়লা বিরোধিতা

ইবনে তায়মিয়া (র) পঠন-পাঠনে মশগুল ছিলেন এবং বিশিষ্ট ও সাধারণ সকল মহলে তাঁর জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি নিত্যই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমনি মুহূর্তে ৬৯৮ হিজরীতে তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম বিক্ষোভ সংঘটিত হয় এবং তাঁর ব্যক্তিসত্তা ও 'আকীদা-বিশ্বাস বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়।

উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হল, ৬৯৮ হিজরীতে সিরিয়ার হেমা শহরের কতিপয় অধিবাসী তাঁর নিকট লিখিতভাবে ফতওয়া জানতে চায়, الرحمن على العرش استوى (রাহমান আরশের উপর অধিষ্ঠিত) ثم استوى الى السماء (অতঃপর তিনি আসমানে অধিষ্ঠান করলেন) ও অনুরূপ আয়াত ও ان قلوب بنى ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن [আদম বংশধরের হৃদয়গুলো রাহমানের (আল্লাহ্‌র) অঙ্গুলিসমূহের ভেতর দু'টি অঙ্গুলির মাঝে অবস্থিত) এবং يضع الجبار قدمه فى النار (প্রবল পরাক্রমশালী আল্লাহ জাহান্নামের মাঝে পা রাখলেন) ইত্যাদি হাদীস সম্পর্কে 'আলিমগণের গবেষণামূলক ব্যাখ্যা কি এবং আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে 'উলামায়ে আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের মত ও পথই বা কি?

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া এর বিস্তৃত ও পরিষ্কার ব্যাখ্যাসহকারে জওয়াব দেন।[২] আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম, তাবি'ঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, মুতাকাল্লিমীন, মুতাকাদ্দিমীন (ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী, কাযী আবূ বকর আল-বাকিল্লানী ও ইমামু'ল-হারামায়ন পর্যন্ত)-এর পথ ও মত, তাঁদের কথিত উক্তি, বাণী ও লিখিত রচনাসমূহ থেকে বর্ণনা করেন এবং তাঁদের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেন, উল্লিখিত হযরতগণ এ সমস্ত সিফাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাকে অপরিহার্য বিবেচনা করতেন। সে সবের সেই

---

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৩শ খণ্ড, ৩৩৫-৪৪ পৃষ্ঠা ;

২. এই জওয়াব العقيدة الحموية الكبرى নামে মশহূর। প্রায় ৫০ পৃষ্ঠার এ পুস্তিকা مجموعه الرسائل الكبرى-এর অন্তর্ভুক্ত। এটি ১৩২৩ হিজরীতে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

হাকীকত স্বীকার করতেন যেগুলো আল্লাহ্‌র শান ও মর্যাদা মাফিক ও তাঁর পবিত্র সত্তার (ليس كمثله شي) যোগ্য এবং তিনি সব রকমের সাদৃশ্য (তাশবীহ) ও দেহধারী হওয়া, অধিকন্তু অস্বীকৃতি বা নঞর্থক (نفى) ও অবকাশমূলক (تعطيل) ধারণা থেকেও তিনি মুক্ত ও পবিত্র অর্থাৎ তাঁরা ন্না এসব গুণকে আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট বস্তুর (মাখলূক) সঙ্গে কিয়াস করেন, না তার পবিত্রতা ও শুচিতা নিয়ে বাড়াবাড়ি ও আধিক্য আরোপ করতে গিয়ে সেগুলোকে একেবারে অস্বীকৃতির পর্যায়ে ঠেলে দেন। তাঁরা এর এমন জটিল ব্যাখ্যাও দেন না যদ্দারা তা হাকীকত তথা প্রকৃত সত্য থেকে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তা কেবল অস্পষ্ট ও ধূম্রজালে বন্দী হয়ে পড়ে; বরং তাঁরা যেভাবে স্বয়ং তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর (জীবন, জ্ঞান, কুদরত, শ্রবণ, দর্শন, কথা ও ইচ্ছা বা অভিপ্রায়) ওপর ঈমান আনেন এবং সে সবের সেই হাকীকত স্বীকার করেন যা আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তা ও তাঁর মর্যাদা তথা শানে খোদাওয়ান্দীর যোগ্য। ঠিক তেমনি আলফাজ-ই-মানসুস অর্থাৎ কুরআনুল করীমের এমন সব বাক্য বা শব্দসমষ্টি যার অর্থ স্বতঃপ্রকাশিত – যেমন, আল্লাহ্‌র চেহারা (وجه الله), হাত (يد الله), ক্রোধ (غضب), সন্তুষ্টি (رضاء), তিনি আসমানে (فى السماء), 'আরশের ওপর (على العرش), ওপর (فوق) . যেমন, আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের ওপর يدالله) (فوق ايديهم-কেও যথার্থ অর্থে কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকেই মেনে নেন এবং সে সবের এমন সব হাকীকত প্রমাণ করেন যা সেই পবিত্র সত্তা, নজীরবিহীন, উপমাবিহীন, দৃষ্টান্তবিহীন ও কল্পনাতীত সত্তার মর্যাদার যোগ্য। এই দুই প্রকারের গুণের ভেতর উল্লিখিত হযরতদের পথ, মত ও দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র ও পরস্পরবিরোধী নয় এবং যেভাবে জীবন, মৃত্যু 'ইল্‌ম, কুদরত প্রভৃতির ওপর ঈমান আনয়নের অর্থ অবধারিতভাবেই এটা নয় যে, সৃষ্টিকুল (মখলুকাত), নব সৃষ্ট বস্তু ও প্রাণীসমূহ (মুহদাছাত)-এর ন্যায় কমজোর জীবন এবং সে সবের সীমাবদ্ধ ও ঋণকৃত জ্ঞান ও অপূর্ণ কুদরতের মতই তাঁর জীবন, জ্ঞান ও কুদরত। কিংবা যারা এসব গুণের হাকীকতের ওপর ঈমান আনে তাদেরকে "মুজাস্‌সিমাঃ" (যারা স্রষ্টাকে দেহধারী বিশ্বাস করেন) বলাও ঠিক হবে না। ঠিক তেমনি يدالله فوق ايديهم (আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের ওপর), ويبقى وجه ربك (আর স্থায়ী থাকবে তোমার প্রতিপালকের চেহারা (সত্তা). الرحمن على العرش استوى প্রভু 'আরশে সমাসীন), أأمنتم

من فی السماء তোমরা কি ঈমান আনয়ন করছ সেই সত্তার ওপর যিনি আসমানে আছেন?) প্রভৃতি আয়াতের কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই আনয়ন থেকে এ অর্থ বের করা ঠিক হবে না যে, এখানে সৃষ্টি ও ধ্বংসশীল বস্তু কিংবা জীবের ন্যায় তাঁর চেহারা ও হাতকে বোঝানো হয়েছে। ঠিক তেমনি স্থান-কাল-পাত্রের দ্বারাও সীমাবদ্ধ কাল, গণ্ডী কিংবা স্থান বোঝা ঠিক হবে না। স্রষ্টার এসব গুণের হাকীকতে যারা বিশ্বাস করেন তাদেরকে দেহবাদী (تجسيم) ও সাদৃশ্যবাদী (تشبيه) বলে ভর্ৎসনা করাও ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে তাঁরা প্রথম যুগের মনীষী বুযুর্গ ও পূর্ববর্তী মুতাকাল্লিমগণের যে সমস্ত উক্তি ও বাণী উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে এই পথ ও মতেরই সমর্থন মেলে। তাঁরা বলেন, এর বিরুদ্ধে 'নস'গত কিংবা প্রকাশ্যত একটি শব্দও সাহাবা-ই-কিরাম, তাবি'ঈন ও প্রাচীন বুযুর্গদের থেকে প্রমাণিত হয়নি। তাঁদের ভেতর থেকে কেউ একথা বলেন নি, আল্লাহ আসমানের ওপর নন কিংবা তিনি 'আরশের ওপর নন অথবা তিনি সমস্ত জায়গায় আছেন এবং যে সমস্ত জায়গা তাঁর সম্বন্ধের দিক দিয়ে একই বরাবর এবং সেটা এই, না তিনি বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত, না তিনি এর বহির্ভূত; না সংযুক্ত, না বিযুক্ত এবং সেটা এই, তাঁর দিকে অঙ্গুলী দ্বারা সচেতনগতভাবে ইঙ্গিত করা জায়েয নয়। যদি নঞর্থকবাদীদের পথ ও মতই সঠিক হয় তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আল্লায়হি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা-ই-কিরাম এর বিরুদ্ধে কেন সর্বদা কথা বলতে থাকলেন আর কেনই-বা সারা জীবন সত্য প্রকাশ থেকে বিরত ও নিশ্চুপ রইলেন? শেষাবধি এই পারসিক, রোমক, ইয়াহূদী ও দার্শনিকদের দ্বারা যারা লালিত-পালিত, তারা আসবে এবং উম্মতে মুসলিমাকে বিশুদ্ধ 'আকীদার তা'লীম দেবে।

অতঃপর তিনি প্রমাণ করেছেন, মুতাআখখিরীন (শেষ যুগের মুতাকাল্লিমগণ) কেউ কেউ গ্রীক দর্শনের প্রভাবে আর কেউ কেউ আল্লাহ্‌র সত্তাকে পবিত্রকরণের উদ্দেশে অতি উৎসাহে ঐ সকল সিফতের এমন সব ব্যাখ্যা করতে লাগল যা আভিধানিক হাকীকত, সাহাব'-ই-কিরামের বোধ, সমঝ ও হাদীসের নস থেকে বহু দূর গিয়ে পড়ে এবং 'না' ও 'অবকাশ'-এর সীমান্ত ছুঁই ছুঁই করে। এই পারম্পর্যে তারা পূর্ববর্তী 'উলামা-ই-কিরাম, সুন্নাহর ইমাম ও খোদ প্রাচীন মুতাকাল্লিমদের পথ থেকে দূরে ছিটকে পড়ে, এমন কি তারা প্রাচীন বুযুর্গদের সম্পর্কে এমন সব শব্দ উচ্চারণ করতে লাগল যদ্দ্বারা তাঁদের জ্ঞানের অবমাননা হয় যাঁরা অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতার সঙ্গে কাজ করতেন। তারা বলে, প্রাচীন যুগের বুযুর্গ পণ্ডিতদের তরীকা অধিকতর নিরাপদ ও নির্ভয় ছিল, কিন্তু পরবর্তী

যুগের পণ্ডিতদের তরীকা ছিল অত্যধিক জ্ঞাননির্ভর ও বিজ্ঞোচিত। এ সবই প্রাচীন বুযুর্গদের হাকীকত ও মর্যাদাগত অবস্থা সম্পর্কে অনবহিতির পরিণতি এবং এটা তাদের অজ্ঞতার প্রমাণও বটে। যথার্থ ও মৌলিক জ্ঞান তো প্রাচীন বুযুর্গ ও মনীষীদেরই ছিল যাঁরা আম্বিয়া-ই-কিরাম ও রসূলগণের ওয়ারিছ ও প্রতিনিধি, যাঁরা আল্লাহ্র কিতাব ও সুন্নতে নববীর ধারক ও বাহক। আল্লাহ্র পরিচয় (মা'রিফাত) এবং তাঁর নাম ও গুণাবলী অনুধাবনের ক্ষেত্রে সেই সব লোক কী করে তাঁদের মুকাবিলা করতে পারে যারা দর্শনের দাবীদারদের পক্ষী-শাবকতুল্য এবং যারা ভারতীয় ও গ্রীকদের উচ্ছিষ্টভোজী মাত্র। দার্শনিক ও মুতাকাল্লিমদের শেষ বাণী ও দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তের অন্তিম উক্তি থেকে আমরা জানতে পারি, তারা তাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী ও অতীতের চুলচেরা বিশ্লেষণের ব্যাপারে লজ্জিত, বিস্ময়াবিষ্ট অবস্থায় অবনত মস্তক এবং নিজেদের ব্যর্থতা ও ভিত্তিহীনতায় মাতমরত ছিলেন। তাঁদের ভেতর কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের সারা জীবনের সঞ্চয় কথার তুবড়ি ছোটানো ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ বলেছেন, অসীম সমুদ্রের কূলে বসে কেবল হাত-পা ছুঁড়লাম, দাপাদাপি করলাম, মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ছেড়ে অন্ধকার বিয়াবান হাতড়ে ফিরলাম। এখন তো অবস্থা এই, যদি আল্লাহ্র অসীম করুণা-সিন্ধু থেকে একটি বিন্দুও না পাই তাহলে আমার কোথাও আর দাঁড়াবার স্থান থাকবে না। তোমরা সাক্ষী থেক, আমার মা যে সুগভীর বিশ্বাস ও সুদৃঢ় প্রতীতি নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, সেই বিশ্বাসের ওপর আমি আমার মৃত্যু কবুল করছি।

এই ফতওয়াটি একটি স্থায়ী জ্ঞানগর্ভ পুস্তিকা–যেখানে শায়খুল ইসলাম (ইবনে তায়মিয়া)-এর জ্ঞান, লেখনীগত বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বিদ্যমান। সাবলীলতা, প্রবল যুক্তি, বাগ্মিতা, কুরআন ও হাদীস থেকে সর্বোত্তম সাক্ষ্য পেশ, পন্থার নতুনত্ব, সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির নিকট আপীল, যথাযথ সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাভরণ বক্তব্য, ঐতিহাসিক তথ্য, মুতাকাল্লিম ও দার্শনিকদের ওপর নির্ভীক সমালোচনা–এগুলোই সে সব বৈশিষ্ট্য যা সে যুগের সাধারণ রচনাসমূহে বিশেষত ফতওয়া গ্রন্থে (সাধারণত যা ফিকহী ও পারিভাষিক যবানে লিখিত হত) মেলা ভার ছিল।

এই ফতওয়াতে প্রথমবারের মত তিনি এমন খোলাখুলি ও জোরালোভাবে এই আকীদার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করেছিলেন যা ছিল তাঁর নিকট প্রাচীন বুযুর্গদের আকীদা এবং আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের প্রত্যয়দীপ্ত বিশ্বাস এবং তাঁর বিরোধীদের নিকট ছিল তাজসীম তথা দেহবাদী-এর আকীদা এবং বিকৃত হাম্বলী মতবাত। এই ফতওয়া যে দৃপ্ত ভাষায় এবং যেরূপ চ্যালেঞ্জিং ভঙ্গিতে লেখা হয়েছিল এবং হাম্বলী মাযহাবী মহলে একে যেভাবে সাদর অভ্যর্থনা জানানো

হয়েছিল তার স্বাভাবিক পরিণতি ছিল এই যে, সর্বসাধারণ ও শাসক মহলের সমর্থনপুষ্ট আশ'আরী ও কালামশাস্ত্রবিদদের মহলে, যারা সরকারী বিচার ও ফতওয়া বিভাগ থেকে শুরু করে শিক্ষক ও লেখক মহল অবধি সকল পর্যায়ে শিক্ষিত মহলেই আসন গেড়ে বসেছিল, অসন্তোষের এক প্রবল স্রোত ও ব্যাপক বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। ইবনে কাছীর ৬৯৮ হিজরীর ঘটনাবলী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেন ঃ

আলিমদের একটি দল শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়ার বিরোধিতায় নেমে পড়ে। তারা এ ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করছিল যে, তিনি হানাফী কাযী শায়খ জালালুদ্দীনের মজলিসে হাযির হবেন এবং তাঁকে তাঁর ফতওয়া সম্পর্কে সেখানে সাফাই পেশ করতে হবে। ইবনে তায়মিয়া এতে সম্মত হন নি। এতে শহরে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, ইবনে তায়মিয়া প্রদত্ত ফতওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু আমীর সায়ফুদ্দীন জাগান ইবনে তায়মিয়াকে সমর্থন করেন এবং যে সব লোক হাঙ্গামা করেছিল তিনি তাদেরকে তলব করেন। ফলে তাদের অধিকাংশই আত্মগোপন করে। আমীর ঘোষণা প্রদানকারী এক দলকে শাস্তি দেন। এতে অবশিষ্ট লোকেরা নিশ্চুপ হয়ে যায়। জুমু'আর দিন শায়খ আপন অভ্যাস মাফিক জামি' মসজিদে যান এবং انك لعلى خلق عظيم। (নিশ্চয়ই আপনি এক মহান চরিত্রের অধিকারী)-এর তফসীর বর্ণনা করেন। পরদিন শনিবার তিনি কাযী ইমামুদ্দীন (শাফি'ঈ)-এর নিকট গমন করেন। একদল বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিরও সেখানে আগমন ঘটে। তারা সকলেই ফতওয়া হামূবিয়া সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং কয়েকটি জায়গার বিশ্লেষণ চান। তিনি সকলকে পরিতৃপ্ত করেন এবং নিশ্চুপ করে দেন। অতঃপর শায়খ প্রত্যাবর্তন করেন এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।[১]

এ কাহিনী আরও দীর্ঘ হবার সম্ভাবনা ছিল এবং এরপর আরও বিরোধিতা কিংবা হাঙ্গামা সৃষ্টির আশংকা দেখা দিতে পারত। কিন্তু এর পরপরই এমন অবস্থা দেখা দেয় যে, বহুকাল যাবত আর এ ধরনের 'ইল্‌মী (জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক) মতপার্থক্য ও আলোচনা-সমালোচনা ও বিতর্কের ফুরসৎ মেলেনি। আর এর কারণ ছিল তাতারীদের হামলা। তাতারীদের এই হামলার মুকাবিলায় শায়খুল ইসলাম প্রথমবারের মত একজন মহান মুজাহিদ ও জননেতা হিসাবে আবির্ভূত হন।

---

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৪শ খণ্ড, ৪র্থ পৃষ্ঠা;

দামিশ্ক অভিমুখে তাতারী বাহিনী

৬৯৯ হিজরীতে নতুন বছর শুরু হতেই চতুর্দিক থেকে উপর্যুপরি খবর আসতে লাগল যে, ইরান ও ইরাকের তাতারী শাসক কাযান[১] সিরিয়ার ওপর আক্রমণের অভিপ্রায় পোষণ করছেন এবং তার সেনাবাহিনীর গতি এখন দামিশ্ক অভিমুখে। তাতারী আক্রমণের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা মুসলিম দেশগুলোর হয়েছিল এবং তারা যে কিংবদন্তী কায়েম করেছিল তাতে করে এ সংবাদে সমগ্র সিরিয়াব্যাপী আতংকের ছায়া নেমে আসে এবং সর্বত্র ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। হলব (আলেপ্পো) ও হিমাত থেকে, যা রাজধানী থেকে বেশ দূরে অবস্থিত ছিল, লোকে বেরিয়ে পড়ে এবং রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হয়। লোকের চাপ এত বেশি ছিল যে, হিমাত থেকে দামিশ্ক পর্যন্ত ঘোড়ার ভাড়া দু 'শ' দিরহামে গিয়ে পৌঁছে। কিন্তু খুব শিগগির তারা এ সংবাদে আশ্বস্ত হয় যে, মিসরের সুলতান (আল-মালিকু'ন-নাসির মুহাম্মদ ইব্ন কালাউন) সিরিয়ার হেফাজত ও তাতারীদের মুকাবিলার উদ্দেশে সসৈন্য আগমন করছেন। ৬৯৯ হিজরীর ৮ই রবীউল আওয়াল তারিখে মিসরীয় বাহিনী দামিশ্ক প্রবেশ করে। প্রবল বৃষ্টিপাত ও কাদা-পানি সত্ত্বেও শহরের লোকেরা সুলতান ও তাঁর বাহিনীকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। শহর সাজানো হয়। স্থানে স্থানে সুলতানের জন্য ও মুসলমানদের বিজয় কামনায় দু'আ ও মুনাজাত করা হয়। ১৭ রবীউল আওয়াল তারিখ সুলতান তার বাহিনীসহ তাতারীদের মুকাবিলার উদ্দেশে বহির্গত হন। হানাফী কাযীউ'ল-কুযাত ও বড় বড় আলিম ও শহরের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ সুলতানের সঙ্গী হন। সমগ্র বাহিনীর সঙ্গে সেচ্ছাসেবক মুজাহিদ ও রিক্রুটদেরও একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা বর্তমান ছিল। মসজিদে মসজিদে কুনূতে নাযিলা ও দু'আ অনুষ্ঠানের বিশেষ্য ব্যবস্থা করা হয়।

মিসর সুলতানের পরাজয় ও দামিশ্কের অবস্থা

দামিশকের বাইরে ২৭শে রবী'উ'ল-আওয়াল তারিখে কাযান ও সুলতানের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানগণ দৃঢ়তা সহকারে লড়াই করে এবং বীরত্বের সঙ্গে তাতারী বাহিনীর মুকাবিলা করে। কিন্তু তদ্সত্ত্বেও মুসলমানদের পরাজয় ঘটে। সুলতানের বাহিনী মিসর অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং দামিশ্কবাসী শহর অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই পরাজয়, মিসরীয় ফৌজের প্রত্যাবর্তন ও

---

১. কাযানের মুসলিম নাম ছিল মাহমূদ। তিনি ছিলেন চেঙ্গীষ খানের প্রপৌত্র। ৬৯৪ হিজরীতে আমীর তূযূন (র)-এর প্রচার প্রেরণায় ইসলাম কবুল করলেও মাত্র পাঁচ বছরের সংক্ষিপ্ত মুদ্দতে তাঁর স্বভাব-চরিত্রের আমূল পরিবর্তন, সেই সঙ্গে তাঁর থেকে ইসলামী তা'লীম ও তরবিয়তের বেশি আশা করা যায় না। ফলে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাতারীদের নৃশংসতা ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতার মাঝে কোন ফারাক ছিল না।

তাতারীদের বিজয়ীবেশে দামিশক প্রবেশের আশংকায় শহরে অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছিল। বড় বড় 'উলামায়ে কিরাম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি শহর ছেড়ে মিসর অভিমুখে পাড়ি জমাবার চিন্তা করছিলেন। স্বয়ং শাফি'ঈ কাযী, মালিকী কাযী, অন্যান্য কতক খ্যাতনামা 'উলামা, শহরের হাকিম, পুলিশ প্রধান, বড় বড় ব্যবসায়ী বণিক ও জনসাধারণ ইতোমধ্যেই শহর পরিত্যাগ করেছিল। সরকারী আমলারা বিদায় নিয়েছিলেন। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেবল দুর্গের ব্যবস্থাপক তখনও দুর্গে অবস্থান করছিলেন। এ ছাড়া কোন দায়িত্বশীল প্রশাসনিক কর্মকর্তা কিংবা ব্যবস্থাপক শহরে ছিলেন না। জিনিসপত্রের দুর্মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে গিয়েছিল। বাইরের আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই সুযোগে জেলখানার কয়েদীরা জেলখানা ভেঙে বেরিয়ে আসে এবং শহরে লুটপাটের তাণ্ডব বইয়ে দেয়। অসৎ ও চরিত্রহীন লোকেরা এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। তারা বাগানের (যা দামিশ্কবাসীদের আয়-আমদানীর একটা বড় উৎস ছিল) দরজা ভেঙে ফেলে এবং খিড়কিগুলো খুলে নিয়ে যায় এবং সে সবের জড়ে মূলে সব বিক্রি করে দেয়। দামিশ্কে একদিকে এই অরাজক অবস্থা চলছিল আর ঐদিকে তাতার অধিপতি কাযানের আগমন সংবাদে অবশিষ্ট আশা-ভরসাটুকুও মলিন ও নিষ্প্রভ হবার উপক্রম হয়।

কাযানের সঙ্গে ইবনে তায়মিয়া (র)-র মুলাকাত

এরূপ অবস্থা দেখে শহরের সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ ও ইবনে তায়মিয়া (র) এক পরামর্শ সভায় মিলিত হন। অতঃপর আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, ইবনে তায়মিয়া (র) কতিপয় 'আলিম ও সঙ্গী-সাথী সমভিব্যাহারে কাযানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং দামিশ্কের জন্য শান্তির বার্তা লাভের চেষ্টা চালাবেন।

৬৯৯ হিজরীর ৩রা রবী'উ'ছ-ছানী সোমবার নাবাক[১] নামক স্থানে দামিশ্কবাসীদের প্রতিনিধি ও ইসলামের দূত ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) এবং প্রবল পরাক্রমশালী তাতারী বাদশাহ কাযানের সাক্ষাতকার অনুষ্ঠিত হয়। শায়খ কামালুদ্দীন ইব্নু'ল-আনজা যিনি দামিশ্ক থেকে ইব্নে তায়মিয়া (র)-র সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং উক্ত মজলিসে শরীক ছিলেন, উল্লিখিত সাক্ষাতকারের এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

---

১. জায়গাটি দামিশ্ক ও হিম্স-এর মধ্যবর্তীতে অবস্থিত। সেখানকার পানি বিশেষভাবে মশহূর। আজকাল সেখানে একটি খামার আছে। ১৯৫১ সনে হিম্স যাবার পথে এই লেখক জায়গাটি দেখেছিলেন।

আমি শায়খ-এর সঙ্গে উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তিনি সুলতান (কাযান)-কে 'আদ্‌ল ও ইনসাফ সম্পর্কিত কুরআনু'ল করীমের আয়াত ও হাদীস শরীফ এবং আল্লাহ্‌ ও তদীয় রসূল (স)-এর ইরশাদ ও হুকুম-আহকাম শোনাচ্ছিলেন। তাঁর আওয়াজ ক্রমান্বয়ে উচ্চ গ্রামে উঠছিল এবং তিনি ক্রমেই সুলতানের নিকটবর্তী হয়ে চলেছিলেন, এমন কি এক পর্যায়ে তাঁর হাঁটু সুলতানের হাটুর সঙ্গে লাগার উপক্রম হয়। অবশ্য সুলতান তাতে মনে কিছু নেন নি। তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে কান লাগিয়ে তাঁর কথা শুনছিলেন। তাঁর সমগ্র দেহ-মন তাঁর প্রতি নিবিষ্ট ছিল। শায়খ-এর ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় ও প্রভাব তাঁকে এতটা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল এবং তিনি তৎকর্তৃক এতটা প্রভাবিত ছিলেন যে, তিনি সে সমস্ত লোককে জিজ্ঞাসা করেন, কে এই 'আলিম? আমি আজ পর্যন্ত এমন লোক দেখিনি এবং এই লোকের চেয়ে অধিকতর সাহসী ও শক্ত অন্তকরণের লোক আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। আমার ওপর অদ্যাবধি আর কারুর এমন প্রভাব পড়েনি। লোকে তাঁর পরিচয় তুলে ধরে এবং তাঁর জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা ও তাঁর 'আমলী কামালিয়াত সম্পর্কে আলোচনা করে।

ইবনে তায়মিয়া (র) কাযানকে বলেন, তোমার দাবী যে, তুমি মুসলমান এবং আমি জানতে পেরেছি, তোমার সঙ্গে কাযী, ইমাম ও মুওয়ায্‌যিনও থাকেন। কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও তুমি আমাদের মুসলমানদের ওপর হামলা করেছ, অথচ তোমার বাপ-দাদা কাফির হওয়া সত্ত্বেও এরূপ কর্ম থেকে বিরত থেকেছেন এবং তারা যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা তারা পূর্ণ করেছেন, আর তুমি যে অঙ্গীকার করেছিলে তা তুমি ভঙ্গ করেছ, যা কিছু বলেছিলে তা পুরো করনি এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের ওপর তুমি জুলুম করেছ।

শায়খ কামালুদ্দীন বলেন, এরূপ কঠোর ভাষায় কথা বলা সত্ত্বেও শায়খ (ইবনে তায়মিয়া) অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেন। তাতারীদের হাতে যে সব মুসলিম বন্দী ছিল, শায়খ (র)-এর সুপারিশে তাদের একটি বিরাট সংখ্যককে ছেড়ে দেওয়া হয়। শায়খ (র) বলতেন ঃ গায়রুল্লাহ (আল্লাহবহির্ভূত সত্তা ও শক্তি)-কে কেবল তারাই ভয় পাবে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)- কে কেউ শাসকদের সম্পর্কে তাঁর ভীতি ও আশংকার কথা ব্যক্ত করলে তিনি বলেছিলেন ঃ যদি তুমি নির্দোষ ও নিরপরাধ হতে তাহলে কাউকে ভয় পেতে না।[১]

---

১. الكواكب الدرية فى مناقب الامام المجتهد شيخ الاسلام ابن تيمية রচয়িতাঃ আশ-শায়খ মার'আ ইব্‌ন য়ূসুফ আল-কারামী আল-হাম্বলী, পৃ. ২৫, শামিল মজমূ'আ ফারাজুল্লাহ যাকী আল-কুরদী।

অপর এক সঙ্গী কাযীউ'ল-কুযাত আবু'ল-'আব্বাস এর সঙ্গে কিছুটা যোগ করেছেন ঃ

> উক্ত মজলিসে ইবনে তায়মিয়া (র) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সম্মুখে খাবার রাখা হয় এবং সকলেই এ খাবারে শরীক হয়। কিন্তু ইবনে তায়মিয়া (র) হাত গুটিয়ে নেন এবং খাবার গ্রহণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ আপনি খানায় শরীক হচ্ছেন না কেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ কবে থেকে এ খাবার জায়েয? এ তো গরীব মুসলমানদের ভেড়া-বকরীর গোশ্ত দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এবং সাধারণ জনগণের সযত্নে রোপিত বৃক্ষের ডাল-পালা জ্বালানি করে রান্না করা হয়েছে। কাযান তার জন্য দু'আ করার আবেদন জানাল। শায়খ নিম্নোদ্ধৃত ভাষায় দু'আ করেন ঃ
>
> হে আল্লাহ্! যদি তুমি মনে করে থাক, কাযানের এ যুদ্ধের পেছনে উদ্দেশ্য তোমার বাণীকে পৃথিবীর বুকে সমুন্নত করা এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা তাহলে তাকে তুমি সাহায্য কর। আর যদি তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে রাজ্য লাভ এবং দুনিয়ার লোভ, তাহলে তার সঙ্গে তুমিই বোঝাপড়া কর। আশ্চর্যের বিষয়, শায়খ (র) দু'আ করছিলেন আর কাযান আমীন! আমীন! বলছিল। এদিকে আবার অবস্থা ছিল, আমরা আমাদের কাপড় গোছাচ্ছিলাম যে, এখন তো জল্লাদের প্রতি তাঁর গর্দান উড়িয়ে দেবার হুকুম হবে। অতএব তাঁর রক্তের ছিঁটা যেন আমাদের কাপড়ে না লাগে।

আবুল 'আব্বাস বলেন ঃ

> মজলিস যখন ভেঙে গেল এবং আমরা দরবারের বাইরে এলাম তখন আমরা তাঁকে বললাম, আপনি তো আজ আমাদের মেরেই ফেলতে বসেছিলেন! এখন আমরা আর আপনার সঙ্গে যাব না। তিনি বললেন, আমি নিজেই তোমাদের সঙ্গে যাব না। অনন্তর আমরা রওয়ানা হয়ে গেলাম এবং তিনি কিছুটা দেরী করে প্রত্যাবর্তন করেন। নেতৃস্থানীয় খান ও আমীর-উমারা যখন এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হ'ল এবং তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারল অমনি চতুর্দিক থেকে তারা এসে ভীড় করতে লাগল এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে ও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তাঁকে ঘিরে ধরল। অতঃপর তিনি যখন দামিশ্‌কে প্রত্যাবর্তন করেন তখন সঙ্গী হিসাবে তিন শ' অশ্বারোহী তাঁকে অনুগমন করে।
>
> পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা ছিল, আমরা পথিমধ্যে থাকতেই একদল আমাদেরকে আক্রমণ করে এবং আমাদের পরনের কাপড় খুলে নেয়।[১]

১. আল-কাওয়াকিবুদ্দুর্রিয়্যাঃ, ২৫ পৃ..

দামিশকে তাতারীদের বিশৃঙ্খল কার্যকলাপ

দামিশ্‌কবাসীরা যদিও তাতারী সুলতানের পক্ষ থেকে শান্তির পরওয়ানা লাভ করেছিল এবং দামিশ্‌কে সে সম্পর্কে ঘোষণাও প্রদান করা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও দামিশ্‌কের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে তাতারীদের ধ্বংসযজ্ঞ ও অরাজকতা অব্যাহত ছিল এবং শহরের আশ্রয় প্রাচীরের বাইরে হাঙ্গামাজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। শহরে দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং জিনিসপত্রের সীমাহীন আক্রা চলছিল। এদিকে তাতারীরা দামিশ্‌কবাসীদের নিকট দাবী জানায়, সাবেক সরকারের যে পরিমাণ ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র ও নগদ অর্থ-কড়ি লোকের কাছে লুকানো রয়েছে, সেগুলো তাতারীদের নিকট সোপর্দ করতে হবে। তারা সায়ফুদ্দীন[১] কুবজুককে তাদের পক্ষে সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে। নতুন শাসক নাগরিকদের ওপর কঠোরতা প্রদর্শন করতে শুরু করেন। শহরের ওপর তাতারীদের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরিই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। দুর্গাধ্যক্ষ আরজুওয়াস তার দুর্গ সোপর্দ করেন নি। শুধু তাই নয়, দুর্গ প্রত্যপর্ণ করতেও তিনি পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ইবনে কাছীর বলেন, তাঁর এই অস্বীকৃতির পেছনে প্রেরণাদানকারী ছিলেন ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)। তিনি দুর্গাধ্যক্ষকে পয়গাম পাঠান, যতক্ষণ পর্যন্ত দুর্গের একটি ইটও নিরাপদ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যেন দুর্গ তাতারীদেরকে সোপর্দ করা না হয়। দুর্গাধ্যক্ষ শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত এ ব্যাপারে অনড় থাকেন এবং তাতারীরা আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও দুর্গের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়।[২] তারা শহরে জুলুম-নিপীড়ন চালাতে শুরু করে এবং চিরাচরিত অভ্যাস মাফিক সর্বপ্রকার অরাজকতার আশ্রয় নেয়। অগণিত মুসলিম নারী-পুরুষ বন্দী করে এবং ক্রীতদাসে পরিণত করে। কেবল সালিহিয়া মহল্লায় ৪০০ মানুষ নিহত এবং প্রায় চার হাজারের মত বন্দী হয়। বড় বড় শরীফ খান্দান, অভিজাত পরিবার ও 'আলিম-'উলামা ঘরের বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরীদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করা হয়। কুতুবখানা (লাইব্রেরী) লুট করা হয় এবং ওয়াক্‌ফকৃত কিতাবসমূহ সের দরে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

এমন অবস্থা দেখে ইবনে তায়মিয়া (র) পুনর্বার কাযানের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রয়োজন অনুভব করেন। তিনি একদল মুসলিমসহ ২৫শে রবী'উ'ছ-ছানী তারিখে পুনরায় সুলতানের সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশে গমন করেন, কিন্তু দু'দিন অপেক্ষা করা সত্ত্বেও তাঁকে সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। ইতোমধ্যে দামিশকে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, তাতারীরা (যারা তখনও পর্যন্ত শহরের বাইরে

---

১. তুর্কী বংশোদ্ভূত ও সম্ভবত তাতারী নও-মুসলিম ছিলেন ;

২. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৪ খণ্ড, ১৭ পৃ ;

ছাউনি ফেলে অবস্থান করছিল) শহরে প্রবেশ করতে চাচ্ছে। একথা শুনে মানুষের অবশিষ্ট ছিটেফোঁটা আশা-ভরসাটুকুও উবে যাবার উপক্রম হয় এবং শহরের সর্বত্র আতংক ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন শহর ছেড়ে চলে যেতে চায়। কিন্তু যাবে কোথায়? তাতারীরা দুর্গ জয়ের আয়োজনে মেতে ওঠে। পরিখা খনন করা হতে থাকে। মিনজানীক স্থাপন করা হয়। বেগার খাটানো হবে, এই ভয়ে লোকে যে যার ঘরে বসে থাকে।

ইবনে কাছীর বলেন ঃ

> রাস্তা ও সড়কগুলো ছিল জনশূন্য। কখনো কখনো দু'একজনকে চলাফেরা করতে দেখা যেত। জামে মসজিদে মুসল্লীর সংখ্যা খুবই কমে গিয়েছিল। উমায়্যা মসজিদে জুমু'আর নামাযে বড় কষ্টে এক কাতার পুরা হত এবং কিছু লোক পেছনে দাঁড়াত। প্রয়োজনে কেউ বাইরে বেরুলেও তাতারীদের ছদ্মবেশে বের হত এবং প্রয়োজন ফুরোতেই তাৎক্ষণিকভাবে ফিরে আসত। তারপরও আশংকা থাকত প্রচুর, হয়ত-বা এটাই শেষ বের হওয়া; আর ফিরে নাও আসতে পারি।[১]

১৯ শে জুমাদা'ল-উলা কাযান ইরাক অভিমুখে যাত্রা করেন এবং একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তার অধীনে ষাট হাজার সৈন্য সিরিয়ার হেফাজতের জন্য রেখে যান। যাত্রাকালে তিনি ঘোষণা দেন, "আমরা আমাদের প্রতিনিধি ও বিরাট বিপুল সেনাবাহিনী রেখে যাচ্ছি এবং আগামী বছর শীত মওসুমে আমরা ফিরে আসছি। সে সময় আমরা সিরিয়ার সঙ্গে মিসরও জয় করব।" কাযান যদিও চলে গিয়েছিলেন,কিন্তু অপর তাতারী আমীর বূলাঈ দামিশক ও সংলগ্ন এলাকায় লুটতরাজের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিল। বহু জনবসতি বিরান হয়ে গিয়েছিল। বিপুল সংখ্যক মুসলিম শিশুকে ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছিল। খোদ দামিশ্‌ক থেকে সে বিরাট অংকের অর্থ আদায় করেছিল। ৮ই রজব তারিখে ইবনে তায়মিয়া (র.) বূলাঈর সেনানিবাসে গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাত করেন, বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করেন এবং এক বিরাট সংখ্যককে মুক্ত করাতে সক্ষম হন।[২] এই সব মুক্ত লোকের ভেতর মুসলমান যেমন ছিল, তেমনি ছিল অমুসলিম (যিম্মী) সিরীয় নাগরিকও।[৩]

৩রা রজব তারিখে দামিশকে দুর্গাধ্যক্ষের পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক ঘোষণায় বলা হয়, মিসরীয় ফৌজ সিরিয়ার দিকে আসছে। পরবর্তী দিনেই বূলাঈ ও তার তাতারী সঙ্গী-সাথিগণ দামিশ্‌ক ছেড়ে রওয়ানা হয়। ৭ তারিখ পর্যন্ত দামিশ্‌ক ও তার আশেপাশে একজন তাতারী সৈন্যও আর অবশিষ্ট ছিল না।

---

১. আল-বিদায়া, ওয়া'ন-নিহায়া, ১৪শ খণ্ড, পৃ.৯ ;
২. আল-বিদায়া, পৃ.১০ ;
৩. ইবনে তায়মিয়া, মুহাম্মদ আবূ যুহরাকৃত, ৩৯ পৃ ;

৯ই রজব তারিখে সংবাদ পাওয়া গেল, সুলতান (মুহাম্মদ ইবনে কালাউন) ও মিসরীয় ফৌজ তাতারীদের হাত থেকে সিরিয়া মুক্ত করবার জন্য রওয়ানা হয়ে গেছেন। সে সময় দামিশ্‌কে কোন দায়িত্বশীল শাসক কিংবা ব্যবস্থাপক কেউ ছিলেন না। শহরের আশ্রয়-প্রাচীর তাতারীদের হামলার কারণে ভগ্নদশায় পড়েছিল। দুর্গাধ্যক্ষ আরজুওয়াশ ঘোষণা দেন, শহরের অধিবাসীদেরকে আশ্রয় প্রাচীর ও বিভিন্ন ফটকের হেফাজত করতে হবে। কেউ যেন নিজের বাড়ী-ঘরে শুয়ে বসে না কাটায়। সবাই যেন সশস্ত্র অবস্থায় আশ্রয়-প্রাচীরে উপস্থিত থাকে। লোকেরা সকলেই এ নির্দেশ পালন করে। ইবনে কাছীর বলেন, ঐ দিনগুলোতে ইবনে তায়মিয়া (র)-র নিয়মিত রুটিন ছিল, তিনি সারা রাত জেগে শহরের আশ্রয়-প্রাচীর টহল দিয়ে ফিরতেন এবং লোকদেরকে জিহাদ ও রিবাত ফী সাবীলিল্লাহ্ সম্পর্কিত আয়াত পাঠ করে শুনিয়ে সবর করতে ও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করতেন।[১]

মদের বিরুদ্ধে জিহাদ

মিসরীয় ফৌজ, মুসলিম সুলতানের আগমন ও তাতারীদের যাত্রার সংবাদে দীনদার ধার্মিক মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও মনোবল বেড়ে যায়। তারা সে সব অন্যায় ও গর্হিত কর্ম দূর করতে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন যেগুলো এই শিক্ষা-দীক্ষাহীন জাতিগোষ্ঠী এবং সেই গোষ্ঠীর খোদাভীতিবর্জিত শাসকদের যুগে জন্মলাভ করেছিল। হাফিজ ইবনে তায়মিয়া (র) ছিলেন এ ক্ষেত্রে অগ্রগামী। সিরিয়ায় তাতারী প্রতিনিধি সায়ফুদ্দীন কুবজুক শুঁড়িখানার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তা ছিল তার আমদানীর একটা বিরাট উৎস। তার সংক্ষিপ্ত শাসনামলে অনেক নতুন শুঁড়িখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখন আর সেগুলোর টিকে থাকবার কোন বৈধ কারণ ছিল না। এদিকে দামিশ্‌কে সে সময় কোন শাসক কিংবা দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ছিলেন না। সুতরাং ইবনে তায়মিয়া (র) এ দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিলেন। তিনি তাঁর ছাত্র ও বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে করে গোটা শহর টহল দেন। যেখানেই শুঁড়িখানা দৃষ্টিগোচর হয়েছে অমনি তার ভাণ্ড ও পানপাত্র ভেঙে-চুরে দূরে নিক্ষেপ করেছেন, মদ উপুড় করে ঢেলে ফেলে দিয়েছেন এবং সে সব শুঁড়িখানায় যে সব মাতাল ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক বাস করত এবং নানাবিধ কুকর্ম ও অসামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে লিপ্ত হ'ত তাদেরকে তিনি শাস্তি দান করেন। এ ধরনের ভূমিকা গ্রহণে সাধারণভাবে গোটা শহরেই সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।[২]

---

১. আল-বিদায়া, ১১ পৃ. ;

২. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া ;

বদ 'আকীদাগ্রস্ত পাহাড়ী লোকদেরকে শায়েস্তাকরণ ও তাদের মাঝে ইসলামের প্রচার

৬৯৯ হিজরীতে যখন তাতারী বাহিনী দামিশকে প্রবেশ করেছিল এবং তারা জনগণের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চালিয়েছিল, সে সময় পার্বত্য এলাকার (খ্রিস্টান বাহিনী ও ইসমাঈলী শী'ঈ) অধিবাসীরা তাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিল। মুসলিম ফৌজ যখন তাতারীদের হাতে পরাজিত হয়ে ফিরে আসছিল এবং তাদের এলাকা দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন এসব পাহাড়ী লোকেরা তাদের ওপর আক্রমণ করে বসে, তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া ছিনিয়ে নেয় এবং বহু মুসলমানকে তারা শহীদ করে দেয়। তারা কখনো কোন বাহিনীর আনুগত্য করে নি, না তারা সত্য ধর্ম (দীন-ই-হক)-ই কবূল করেছিল আর না তারা কোন ব্যবস্থাপনারই পাবন্দ ছিল (অর্থাৎ এরা কোন রকম প্রশাসনিক আইন-কানূনেরই ধার ধারত না এবং উচ্ছৃঙ্খল ও বল্গাহীন জীবন যাপন করত)।[১]

সিরিয়ার আকাশ থেকে দুর্যোগের মেঘ কেটে যেতেই ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বস্তি লাভের সুযোগ মিলতেই ইবনে তায়মিয়া (র) এই সব হাঙ্গামাবাজ ও অশান্তি উৎপাদনকারী লোকদেরকে শায়েস্তা করা এবং তাদের মাঝে ইসলামের প্রচার জরুরী মনে করেন। সৌভাগ্যবশত সে সময় সালতানাতের নায়েব জামালুদ্দীন আকূশ আল-আফরাম জরদ ও কিসরাওয়ান নামী পাহাড় অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন। ইবনে তায়মিয়া (র) এ সুযোগকে ফায়দা হাসিলের মোক্ষম মুহূর্ত মনে করে স্বেচ্ছাসেবক ও হাওরানের অধিবাসীদের এক বিরাট সংখ্যক লোক সঙ্গে করে নায়েবে সালতানাতের সহগামী হন। নায়েবে সালতানাতের আগমন বার্তা পেয়েই গোত্রের সর্দার ইবনে তায়মিয়া (র)-র খেদমতে হাযির হয়। শায়খ (র) তাকে তওবা করান এবং তাকে ভালভাবে ও সর্বোত্তম উপায়ে তাবলীগ করেন। এতে বিরাট উপকার হয়। তারা মুসলিম ফৌজের যেসব জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিয়েছিল সর্দার তা ফিরিয়ে দেবার পূর্ণ যিম্মাদারী গ্রহণ করে। বায়তু'ল মালের পক্ষ থেকে তাদেরকে চাঁদা হিসাবে টাকা ধার্য করা হয়। তারা এ চাঁদা পরিশোধের অঙ্গীকার করে। এই অভিযান ১৩ই যি'ল-কা'দা তারিখে সাফল্যের মাঝ দিয়ে প্রত্যাবর্তন করে।[২]

তাতারীদের পুনরাগমন ও ইবনে তায়মিয়া (র)-র জিহাদ ঘোষণা

৭০০ হিজরীর প্রারম্ভেই তাতারীদের পুনরাগমন সংবাদ দামিশ্‌কে এসে পৌঁছে। লোকের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায় এবং এতে মিসর ও অন্যান্য নিরাপদ স্থান ও সুরক্ষিত দুর্গাভিমুখে পালাবার হিড়িক পড়ে যায়। লোকে যে যার

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া', ২. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া;

আসবাব-পত্র, পোশাকাদি, খাদ্যশস্যসহ সামান্যতম জিনিসটুকু পর্যন্ত বিক্রি করে সফরের রসদ সংগ্রহ করতে থাকে। সওয়ারীর ভাড়া মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে যায় এবং পশুর দাম কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পৌছে। এসব দেখে ইবনে তায়মিয়া (র) দামিশ্‌কের জামি' মসজিদে ওয়াজ-নসীহত ও দর্‌স প্রদানের সিলসিলা অত্যন্ত জোরেশোরে শুরু করেন। লোকদেরকে জিহাদে উজ্জীবিত ও উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। পলায়ন রুখবার জন্য তিনি তাদের সুপ্ত আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলেন এবং এরূপ ভীরুতা প্রদর্শনের জন্য তাদেরকে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করেন। তিনি লোকদেরকে মুসলমানদের জন্য এবং মুসলিম দেশগুলোর হেফাজত ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে মুক্ত হস্তে ব্যয় করতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন এবং বলেন ঃ মানুষ পালাবার পেছনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে, এখানে থেকেই তা মুসলমানদের হেফাজত ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র জন্য ব্যয় করুক। তিনি বলতেন, এবার তাতারীদেরকে খোলা ময়দানে মুকাবিলা করতে হবে। তাদের সঙ্গে জিহাদ এবার ফরয। তাঁর এই উপর্যুপরি বক্তৃতায় মানুষ আবার আশায় বুক বাঁধে। এদিকে শহরে সরকারীভাবে ঘোষণা দেওয়া হয়, আর একটি লোকও সরকারী পরওয়ানা ও অনুমতি ব্যতিরেকে শহর পরিত্যাগ করতে পারবে না। এতে বেশ সুফল দেখা দেয়। পালাবার সিলসিলা বন্ধ হয়। এদিকে মিসর সুলতানের রওয়ানা হবারও সংবাদ এসে যায়। ফলে লোকেরা স্বস্তি ফিরে পায়।

মিসর সফর

রবী'উ'ছ-ছানী মাসে পুনরায় তাতারীদের আগমন সংবাদে আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সংবাদ পাওয়া গেল, তারা বেরাহ নামক স্থান পর্যন্ত পৌছে গেছে। শহরে সাধারণভাবে জিহাদের ঘোষণা প্রদান করা হয়। তাতারীদের অগ্রসর হবার সংবাদ উপর্যুপরি এসে পৌছুচ্ছিল। লোকদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয় এবং তাদেরকে বলা হয় যেন তারা যে যার কাজে নিয়োজিত থাকে। সুলতান মিসর থেকে রওয়ানা হয়ে গেছেন। ইতোমধ্যে আকস্মিকভাবে সংবাদ এসে পৌছে, সুলতান সিদ্ধান্ত পাল্টিয়েছেন। একথা শুনে তাদের আশার সৌরকরোজ্জ্বল গণ্ড পুনরায় হতাশার কালো মেঘে ছেয়ে গেল এবং লোকজন যে যার পরিবার-পরিজনকে মিসরসহ অন্যান্য নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিতে লাগল। এই অবস্থা দেখে ইবনে তায়মিয়া (র) সিরিয়ার ভাইসরয়-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশে (যিনি দামিশ্‌কের বাইরে তাতারীদের প্রতিরোধ করবার জন্য ছাউনি ফেলে অপেক্ষা করছিলেন) গমন করেন। তিনি তাকে আশ্বস্ত করেন এবং বলেন, আমরা মজলুম, তদুপরি অত্যাচারিত ও নিপীড়িত। অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

ومن عاقب بمثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله ان الله لعفوغفور -

কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে তুল্য প্রতিশোধ গ্রহণ করলে ও পুনরায় সে অত্যাচারিত হলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন; আল্লাহ নিশ্চয়ই পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল। [সূরা হাজ্জ ঃ ৬০ আয়াত, ২২]

সিরিয়ার নায়েব ও আমীর-উমারা ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র নিকট আবেদন জানান যেন তিনি স্বয়ং মিসর গিয়ে সুলতানকে সিরিয়ার হেফাজত এবং তাতারীদের বিরুদ্ধে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করেন। অনন্তর তিনি যানবাহন যোগে মিসর রওয়ানা হন। তাঁর পৌছুতে পৌছুতে সুলতান কায়রোয় প্রবেশ করেছিলেন। ইবনে তায়মিয়া (র) সুলতানের সুপ্ত মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলবার প্রয়াস পান এবং বলেন ঃ যদি সিরিয়া আপনার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত না হত এবং মিসর ও সিরিয়ার সুলতান হিসাবে সরাসরি আপনি যদি যিম্মাদার নাও হতেন, এতদ্‌সত্ত্বেও যদি সিরিয়ার সাধারণ গণমানুষ আপনার সাহায্যপ্রার্থী হত, তথাপি তাদের সাহায্য করা আপনার অপরিহার্য দায়িত্বের অন্তর্গত ছিল। আর সিরিয়ার হেফাজতের ব্যাপারে যদি আপনার কোন মাথা ব্যথা কিংবা চিন্তা-ভাবনা না থাকে তাহলে আমাদেরকে পরিষ্কার বলে দিন, আমাদের ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই করে নিই এবং কাউকে সেখানকার শাসক হিসাবে নির্বাচিত করি যিনি বিপদমুহূর্তে তার খেদমত ও হেফাজত করবেন এবং ভারসাম্যময় অবস্থায় তার থেকে ফায়দা গ্রহণ করবেন। ইবনে তায়মিয়া (র) সুলতানকে নিশ্চয়তা দেন এবার জয় মুসলমানদেরই হবে। তিনি আট দিন যাবত মিসর দুর্গে অবস্থান করেন এবং সুলতানকে জিহাদ ও তাতারীদের মুকাবিলায় অনুপ্রাণিত করতে থাকেন।

ইবনে তায়মিয়া (র)-র ঈমান ও য়াকীন উদ্দীপক আলোচনা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠাপূর্ণ প্রয়াসের ফল হল। সুলতান দ্বিতীয়বার সিরিয়া আগমনে উৎসাহিত হন এবং মিসরীয় ফৌজ জিহাদের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যায়। এসব শ্রবণে দামিশকবাসিগণ তখনও পুরোপুরিভাবে খুশী হতে পারেনি, এমনি মুহূর্তে তাতারীদের কাছাকাছি আসবার ও সুলতানের ফিরে যাবার সংবাদ এসে পৌছে। সবচে' দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার ছিল, শহরের শাসনকর্তা ইবনু'ন-নুহাস প্রকাশ্যে ঘোষণা জারী করেন যে, সফর করবার মত যার শক্তি রয়েছে সে যেন অবশ্যই দামিশ্‌ক ছেড়ে চলে যায়। এ ঘোষণায় শহরের সর্বত্র হুলস্থূল পড়ে যায়। হাট-বাজার বন্ধ হয়ে যায়। লোকজন বন-জঙ্গল ও মাঠ-ময়দান পানে পালাতে

থাকে। সবার মুখেই এক কথাঃ শত্রুর খোরাকে পরিণত হওয়াই দামিশ্‌কবাসীদের ভাগ্যের লিখন রয়েছে। বড় বড় 'উলামায়ে কিরাম ও দামিশকের নেতৃস্থানীয় ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গ শহর ছেড়ে অজানার পথে পাড়ি জমায়। তাদের অনুসারী ও সম্পর্কিত লোকেরা পূর্বেই চলে গিয়েছিল। নেতৃস্থানীয় ও অভিজাত লোকদের হাতে গোণা কয়েকজন লোকই মাত্র দামিশকে থেকে গিয়েছিল। শহরের ঘোষণা দেওয়া হয়, যারা জিহাদে যোগ দিতে আগ্রহী তারা যেন সেনাবাহিনীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। কেননা তাতারীরা খুবই কাছে এসে পড়েছে। 'উলামায়ে কিরামের মধ্যে যাঁরা তখনও দামিশকে ছিলেন (যাঁদের ভেতর ইমামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শরফুদ্দীন ইবনে তায়মিয়াও ছিলেন) তাঁরা নায়েব-ই-সালাতানাতকে সাহস যোগাতে থাকেন এবং আমীরে আরব 'মুহান্না'কেও জিহাদে অনুপ্রাণিত করে তোলেন। ইতিমধ্যে ইবনে তায়মিয়া (র) মিসর থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি সুলতানের আগমন বার্তা ও সালতানাতের আমীর -উমারার জিহাদের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পের সুসংবাদ ব্যক্ত করেন। এদিকে এই খবর পাওয়া গেল, তাতার সুলতান ফিরে যাবার ইচ্ছা পোষণ করেছেন এবং ফোরাত নদী পার হয়ে ইরাক পৌঁছে গেছেন। و كفى الله المومنين القتال "আর মু'মিনদের সংগ্রামে আল্লাহই যথেষ্ট।"[১]

তাতারীদের সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধ ও ইবনে তায়মিয়া (র)-র কৃতিত্বপূর্ণ অবদান

৭০২ হিজরীর রজব মাসে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেল যে, তাতারীরা এবার সিরিয়া অভিমুখে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক। এ সংবাদ জনসাধারণের মাঝে আবার চিত্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। সালাতে কুনূতে নাযিলার[২] ব্যবস্থা ও বুখারী শরীফ খতম করা হয়। লোকে অভ্যাস মাফিক মিসর ও অন্যান্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্থান অভিমুখে ধাবিত হয়। মিসর সুলতান ও মিসরীয় সেনাবাহিনীর আগমন যতই বিলম্বিত হচ্ছিল লোকের ভেতর অস্থিরতাও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৮ই শা'বান তারিখে মিসরীয় ফৌজের একটা বড় অংশ খ্যাতনামা তুর্কী আমীরদের নেতৃত্বাধীনে এসে পৌঁছে। অতঃপর দ্বিতীয় দলটিও এসে পৌঁছে। লোকের মনে নিরাপত্তার ভাব ফিরে আসে, ফিরে আসে স্বস্তি। কিন্তু এতে আরেকটি ব্যাপার ঘটে। অপরাপর স্থানের আশ্রয় গ্রহণকারী লোকদের আগমনের ধারা শুরু হয়ে যায় এবং উত্তরাঞ্চলীয় শহরগুলো থেকে ব্যাপক হারে লোকজন নিজ নিজ শহর ছেড়ে দামিশকে আসতে থাকে। বিভিন্ন রকমের গুজবও

---

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৪শ খণ্ড, ১৬ পৃ.:

২. এতদসম্পর্কিত ব্যাখ্যা পুস্তকের শেষোংশে "পরিশিষ্টে" সংযোজিত হয়েছে। সেখানে দেখা যেতে পারে। —অনুবাদক।

ছড়াতে থাকে। সিরিয়ার আমীরগণ একত্র হয়ে শত্রুর মুকাবিলায় অঙ্গীকারাবদ্ধ হন, কসম খান এবং শহরে ঘোষণা প্রদান করা হয় যেন কেউ শহর পরিত্যাগ না করে। ইবনে তায়মিয়া (র) শহর থেকে বাইরে গিয়ে সেনাবাহিনীকে বিষয়টি অবহিত করেন এব, তাদের থেকেও অনুরূপ কসম গ্রহণ করেন। তিনি আমীর-উমারা ও জনগণকে কসম খেয়ে খেয়ে বলতেন ঃ এবার তোমরা অবশ্যই জয়লাভ করবে। এ ব্যাপারে তিনি এতটা নিশ্চিত ছিলেন যে, যদি কেউ বলত, আপনি ইনশাআল্লাহ্ বলুন, তখন তিনি বলতেন, ان شاء الله تحقيقا। لا تعليقا আমরা মজলুম, আর মজলুম অবধারিতভাবেই সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। ثم بغى عليه لينصرنه الله "অতঃপর যাদেরকে নিপীড়ন করা হয় তাদেরকে আল্লাহ অবধারিতভাবে সাহায্য করবেন।" অতএব আল্লাহ্র এই ওয়াদা মুতাবিক বিজয় আমাদের নিশ্চিত, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই বিন্দুমাত্র।[১]

এ সময় একটি প্রশ্ন ওঠানো হয়, আর যাই হোক, তাতারীরা মুসলমান। অতএব, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করাটা ধর্মীয় বিধান মতে কতটা সঙ্গত? তারা তো কাফিরও নয়, আবার বিদ্রোহীও বলা যায় না তাদেরকে। বিদ্রোহী নয় এজন্য যে, তারা কখনো কোন মুসলিম শাসকের (আমীরের) আনুগত্যাধীনে আসেনি বিধায় তাদেরকে বিদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত করা চলে না। আর সে প্রশ্নও তাই অবান্তর। অতএব, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে কিসের ভিত্তিতে? 'উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের শিকার হন। ইবনে তায়মিয়া (র) এ দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটিয়ে বলেন, তারা খারিজীদের ন্যায় বিবেচিত হবে এবং তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হুকুম এদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। খারিজীরা সায়্যিদুনা 'আলী (রা) ও হযরত মু'আবিয়া (রা) উভয়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছিল। তারা নিজেদেরকে খিলাফতের অধিক হকদার বলে মনে করত। তাতারীরাও ঠিক তাদের মতই অপরাপর মুসলমানদের তুলনায় নিজেদেরকে হুকুমতের অধিক হকদার মনে করে এবং বলে, আমরা তাদের মুকাবিলায় বেশী হক ইনসাফ কায়েম করতে পারি। তারা মুসলমানদের ওপর জুলুমের মিথ্যা অপবাদ দেয়, অথচ তাদের তুলনায় নিজেরা আরও বেশী মাত্রায় গর্হিত কর্ম ও অশোভন আচরণে লিপ্ত। তাঁর এই বিশ্লেষণের দ্বারা 'উলামায়ে কিরাম তৃপ্ত ও নিশ্চিত হন এবং বিষয়টি তাদের উপলব্ধিতে ধরা দেয়। এক্ষেত্রে তিনি এতটা আত্মবিশ্বাসী ও নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি বলতেন ঃ যদি তোমরা আমাকেও তাতারীদের কাতারে কুরআন শরীফ মাথায় দাঁড়ানো দেখতে পাও সেমত অবস্থায় আমাকেও তোমরা হত্যা করবে। এতে লোকের সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূরীভূত হয় এবং তাদের মনোবল বেড়ে যায়।

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া।

দামিশকে তখন এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজ করছিল। সুলতানের কোন আগমন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল না। সিরীয় ও মিসরীয় ফৌজের যুদ্ধ করবার কোন নিশ্চয়তাও ছিল না। ওদিকে প্রতি মুহূর্তে তাতারীদের আগমন সংবাদ এসে পৌছুচ্ছিল। বিভিন্ন শহর থেকে দলে দলে লোকজন পালিয়ে এসে দামিশকে আশ্রয় নিচ্ছিল। গোটা শহরই আশ্রয় গ্রহণকারী লোকজনে ভরে ছিল। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র.)-র পক্ষে সেনানিবাসে যাবার জন্য বেরিয়ে লোকের ভিড়ে পথ পাওয়াই দুষ্কর হচ্ছিল। যারা তাঁর দৃঢ় সংকল্প ও অটুট মনোবলের বিষয়ে অবহিত ছিল না, তারা তাঁকে এই বলে ভর্ৎসনা করছিল, আপনি তো আমাদেরকে পালাতে বাধা দিচ্ছেন আর এখন দেখছি আপনি নিজেই পালাবার পথ খুঁজছেন? ইমাম (র) তাদের কথার কোন জবাব না দিয়েই নীরবে পাশ কাটিয়ে চলে যান। শহরে কোন প্রশাসক ছিলেন না। গুণ্ডা ও বদমাইশেরা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিল। লোকে উঁচু জায়গা ও মীনারে আরোহণ করে মুসলিম বাহিনী খুঁজে ফিরত এবং নানাবিধ জল্পনা-কল্পনার আশ্রয় নিত। প্রত্যেকেই যার যার কিসমতের ফয়সালার অপেক্ষায় ছিল, অপেক্ষায় ছিল যুদ্ধ হবে কিনা? যদি যুদ্ধ হয়ই তাহলে কে জয়ী হবে? আল্লাহ্ না করুন, যদি মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয় তাহলে মুসলমানদের আর কোথাও দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না, তাদের 'ইযযত-আবরূ ও জান-মালের কোন নিরাপত্তাই থাকবে না।

মোটকথা এ ছিল যেন নিম্নোক্ত আয়াতেরই প্রতিচ্ছবি ঃ

واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا - هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا -

যখন তোমাদের চোখ বিস্ফারিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে। তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। [সূরা আহযাব ঃ ১০-১১ আয়াত]

ইবনে তায়মিয়া (র) সিরীয় বাহিনীতে গিয়ে উপস্থিত হলে বাহিনীর আমীর-উমারা তাঁর নিকট এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তিনি যেন সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সত্বর আগমনের জন্য তাঁর দরবারে দরখাস্ত পেশ করেন। ইবনে তায়মিয়া (র) সুলতানের সঙ্গে মুলাকাত করেন। ইবনে তায়মিয়া (র)-র সঙ্গে কৃত আলোচনায় ও কথাবার্তায় সুলতানের সংকল্প ও মনোবল আরও অটুট ও দৃঢ় হয়। তিনি ইবনে তায়মিয়া (র)-র সঙ্গে সেনা

ছাউনিতে আসেন। সুলতান তাঁর নিকট এই আগ্রহ ব্যক্ত করেন, যুদ্ধকালে তিনি যেন সুলতানের সঙ্গে থাকেন। ইবনে তায়মিয়া (র) বলেন, প্রত্যেকে তার কওমের পতাকাতলে যুদ্ধ করবে আর এটাই সুন্নত। আমি সিরীয় বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত। সেজন্য আমি সেই পতাকাতলেই যুদ্ধ করব। তিনি সুলতানকে পুনরপি জিহাদের তালকীন করেন এবং বলেন, আমি এক আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, জয় আমাদেরই হবে। এবারও আমীরগণ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, ইন্‌শাল্লাহ বলা সমীচীন। তিনি বললেন ঃ انشاءالله تحقيقا لا تعليقا

২৯শে শা'বান জুমু'আর রাতে রমযানের চাঁদ দেখা গেল। দামিশ্‌কবাসী তারাবীহ্‌র প্রস্তুতি গ্রহণ করে। একদিকে ছিল রমযানের আনন্দ, আর অপরদিকে ছিল শত্রুর ভয় ও ভবিষ্যতের আশংকা। জুমু'আর দিন খুব কঠিন অবস্থার মাঝ দিয়ে অতিক্রান্ত হয়। শনিবার দিন লোকে মীনারে আরোহণ করে দেখতে পেল সেনা ছাউনির দিকে ধুলি-বালি উড়ছে এবং অন্ধকার ছেয়ে আছে। তারা বুঝতে পারল, আজই মুকাবিলা হবে। সাধারণের মাঝে ব্যাপকভাবে দু'আ-মুনাজাত শুরু হয়। শিশু ও মহিলারা নিজ নিজ দালান-কোঠায় খালি মাথায় দাঁড়িয়েছিল। শহরে ছিল দারুণ উত্তেজনা। ২রা রমযান শনিবার জোহর বাদ সুলতানের ফরমান জামি' মসজিদে পাঠ করে শোনান হয়। এতে বলা হয়, শনিবার দিন দ্বিপ্রহর হতে সিরীয় ও মিসরীয় ফৌজ সুলতানের সঙ্গে কাতারবদ্ধ হবে। মুসলমানরা যেন আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর সাহায্য ও বিজয়ের জন্য দু'আ করে এবং দুর্গ ও শহরের আশ্রয়-প্রাচীরের হেফাজতে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে।

২রা রমযান ছাকহাব প্রান্তরে একদিকে সিরীয় বাহিনী ও মিসরীয় ফৌজ, অপর দিকে তাতারী বাহিনী কাতারবদ্ধ হয়। ইবনে তায়মিয়া (র) ফতওয়া প্রদান করেন, মুজাহিদ বাহিনী যেন সিয়াম ভঙ্গ করে, যাতে করে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সৃষ্টি হয়। তিনি এক একটি পতাকা ও এক একটি কোম্পানীর নিকট নিজেই যেতেন। এ সময় তাঁর হাতে খাবার বস্তু থাকত আর তিনি তাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে ইফতার করতেন এবং হাদীস শোনাতেন, انكم ملاقوالعدو غدا والفطر اقوى لكم - নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আগামী কাল দুশমনের সঙ্গে তোমাদের মুকাবিলা হবে। সিয়াম ভঙ্গের দ্বারা তোমরা অধিকতর শক্তিশালী হবে।

যুদ্ধ শুরু হ'ল। সুলতান স্বয়ং এ যুদ্ধে তাঁর সেনাবাহিনীর মাঝে উপস্থিত ছিলেন। আব্বাসী খলীফা আবু'র -রবী' সুলায়মান সুলতানের পাশেই ছিলেন। শেষ পর্যন্ত উভয় বাহিনীই একে অপরের ভেতর ঢুকে পড়ে এবং যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সুলতান অত্যন্ত দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। তিনি তাঁর ঘোড়ার পায়ে শেকল পরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে পালাতে না পারে। তিনি এবার আল্লাহ্‌র সঙ্গে

অঙ্গীকার করেন। ভীষণ যুদ্ধ চলে। বড় বড় তুর্কী আমীর এ যুদ্ধে মারা যান। অবশেষে মুসলমানরা বিজয় লাভে ধন্য হয় এবং তাতারীদের পদস্খলন ঘটে। রাতের বেলা তাতারীরা প্রাণ রক্ষার্থে টিলা, পাহাড় ও টিকরীর ওপর গিয়ে আশ্রয় নেয়। মুসলমানগণ সারা রাত জেগে পাহারা দেয় এবং তাদের পালাবার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাদেরকে তীরের মুখে রেখে দেয়। বিপুল সংখ্যক তাতারী নিহত হয়। সকালে মুসলমানেরা তাদেরকে রশিতে বেঁধে বেঁধে নিয়ে আসছিল এবং তাদের গর্দান উড়িয়ে দিচ্ছিল। পলাতকদের একটি বিরাট সংখ্যক ঘাঁটিও বিপজ্জনক স্থানে পড়ে এবং অনেকেই ফোরাত নদীতে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ হারায়।

৪ঠা রমযান সোমবার ইবনে তায়মিয়া (র) দামিশ্‌কে প্রবেশ করেন। লোকেরা তাঁকে মহা আড়ম্বরে অভ্যর্থনা জানায়, মুবারকবাদ দেয় এবং তাঁর জন্য দু'আ করে।

৫ই রমযান মঙ্গলবার (৭০২ হি.) সুলতান তাঁর সাম্রাজ্যের অমাত্যবর্গ, খলীফা এবং শাহী ফৌজের সঙ্গে বিজয়ী বেশে দামিশ্‌কে প্রবেশ করেন।

বিদ'আত প্রত্যাখ্যান ও গর্হিত কর্মের অবসান

তাতারীদের হাঙ্গামা থেকে নিষ্কৃতি মিলতেই ইবনে তায়মিয়া (র) নিয়ম মাফিক পূর্বের মতই জোরেশোরে পঠন-পাঠন, সুন্নাহ্‌র প্রচার-প্রসার এবং বিদ'আত প্রত্যাখ্যানের মিশন শুরু করেন। তিনি শির্‌ক ও জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে জিহাদে মশগুল হয়ে পড়েন যা ছিল তাঁর প্রিয় পেশা এবং তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য। এ যুগেই ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের সঙ্গে মেলামেশা এবং অজ্ঞ ও জাহিল নেতাদের শিক্ষার ফলে মুসলমানদের মধ্যে এমন বহু আচার-আচরণ এসে গিয়েছিল যেগুলো ছিল জাহিলিয়াতের স্মারক চিহ্ন এবং মুশরিক ও মূর্তিপূজারী জাতিগোষ্ঠীর রীতি। দামিশ্‌কের পাশে কলূত নদীর কিনারে একটি পাথর ছিল। পাথরটি সম্পর্কে জনমনে নানা ধরনের কাহিনী বিস্তার লাভ করেছিল। এটি মূর্খ ও কল্পনাপূজারী মুসলমানদের জন্য একটি ফিত্‌নায় পরিণত হয়েছিল। মুসলমানেরা সেখানে যেত এবং মানত করত। ইবনে তায়মিয়া (র.) ৭০৪ হিজরীর রজব মাসে নিজেই শ্রমিক ও পাথর মিস্ত্রী সহকারে সেখানে যান এবং সেটি কেটে টুকরো করে শির্কের এই দরজাটি চিরতরে বন্ধ করে দেন। আর এভাবেই একটি বিরাট ফিত্‌না খতম হয়।[১]

১. আল-বিদয়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৪শ খণ্ড, ৩৪ পৃ.।

তিনি ইসলামী শারী'আত ও সুন্নাহর বিরুদ্ধে যে কাজই সংঘটিত হতে দেখতেন সাধ্যমত তা স্বহস্তেই বদলে দিতে ও বাধা দিতে চেষ্টা করতেন। কেননা এটি ছিল ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর এবং ধর্মীয় মর্যাদাবোধের প্রাথমিক দাবী।

من رایٔ منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان -

তোমাদের ভেতর কেউ যদি শরীয়তবিরোধী (মুনকার=গর্হিত) কাজ সংঘটিত হতে দেখতে পাও তবে সে তার হাত দিয়ে তা বদলে দেবে, যদি সে সামর্থ্য না থাকে তবে মুখ দিয়ে তার বিরোধিতা করবে; আর তার সে সামর্থ্যও যদি না থাকে তবে অন্তর দিয়ে তা করবে; আর এটিই হচ্ছে দুর্বলতম ঈমান। [আল-হাদীস]

সালতানাতের তথা রাষ্ট্রীয় কর্মে অতিরিক্ত ব্যস্ততার জন্য শাসন ক্ষমতায় সমাসীন ব্যক্তিবর্গের ফুরসত ছিল না। 'উলামায়ে কিরাম কতক মুহূর্তে অনেক জিনিসকেই গুরুত্ব দিতেন না এবং কতক সময় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে ও বিরোধিতায় অবতীর্ণ হতে ইতস্তত করতেন। আর এজন্যই অধিকাংশ সময় ইবনে তায়মিয়া (র)- কেই এ দায়িত্ব আন্‌জাম দিতে হত। আর এ দায়িত্ব সম্পাদনে তাঁর সহযোগী ও সহকর্মী ছিল তাঁরই ছাত্র ও প্রিয় ভক্ত-অনুরক্তদের একটি দল। এজন্য তিনি সম্মানসূচক الله। حسبة শর'ঈ, নৈতিক ও চারিত্রিক বিষয়ে তদারকীর জন্য এক ধরনের পুলিশ বিভাগ কায়েম করে রেখেছিলেন। ফলে বিদ'আতী ও সুন্নাহর বিরোধিতা, প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত লোকদের দৃষ্টি এড়াতে এবং 'উলামায়ে কিরামের ক্রোধ ও অসন্তোষ থেকে বাঁচতে যদি সক্ষমও হত, তবুও তারা এই শর'ঈ পুলিশের দৃষ্টি থেকে বেঁচে যেতে পারত না। ৭০৪ হিজরীর রজব মাসেরই ঘটনা। জনৈক বৃদ্ধ লোককে, যে নিজেকে আল-মুজাহিদ ইবরাহীম ইবনু'ল-কাত্তান বলে পরিচয় দিত, তাঁর নিকট নিয়ে আসা হয়। সে বিরাট লম্বা-চওড়া একটি গুডরী পরিহিত ছিল। তার মাথার চুল ও হাত-পায়ের নখ ছিল বড় বড়। গোঁফ এতটা বেড়েছিল যে, তা মুখের ওপর এসে পড়ছিল। সে খুব গালিগালাজ করত এবং খুব বেশী অশ্লীল কথা বলত। এছাড়া নেশাকর বস্তুও সে ব্যবহার করত। ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর গুডরী টুকরো টুকরো করে দেবার হুকুম দেন। হুকুম মিলতেই লোকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার গুডরী ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। লোকে তার মাথার চুল কেটে দেয় এবং গোঁফ ছেঁটে দেয়। তার নখ কাটা হয়। অশ্লীল কথাবার্তা বলা ও নেশাকর বস্তু থেকে তাকে তওবা করান হয়।[১]

---

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ৩৩ পৃ;

তেমনি একজন বর্ষীয়ান বিখ্যাত লোক ছিল মুহাম্মদ আল-খাব্বায আল-বিলাসী। সে হারাম বস্তু ব্যবহার করত। ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের সঙ্গেই ছিল তার ওঠাবসা। সে স্বপ্নফল ব্যাখ্যা করত এবং এমন সব মসলার ব্যাপারে অনধিকার চর্চা করত, যে বিষয়ে তার কোন জ্ঞান ছিল না। ইবনে তায়মিয়া (র.) তাকে ডেকে পাঠান এবং তাকেও তার যাবতীয় অপকর্ম থেকে তওবা করান। ঐতিহাসিক ইবনে কাছীর বলেন যে, এসব ঘটনাও এক শ্রেণীর মানুষের অসন্তোষ সৃষ্টির কারণ হয়েছিল।

ধর্মদ্রোহী (মুলহিদ) ও ফিতনাবাজ লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ

অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সংশোধন ছাড়াও ইবনে তায়মিয়া (র) সে সমস্ত ফিতনাবাজ লোকের ব্যাপারেও উদাসীন ছিলেন না, যারা এ ধরনের প্রতিটি সংকট মুহূর্তে মুসলমানদেরকে বিপদে ফেলতে এবং ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র লিপ্ত হতে এতটুকু কার্পণ্য করেনি। ৬৯৯ হিজরীতে যদিও তিনি নায়েবু'স-সালতানাত (সাম্রাজ্যর রিজেন্ট বা ভাইসরয়) আল-আফরামের সঙ্গে জর্দ ও কিসরাওয়ান গিয়ে সেখানকার অধার্মিক ও দুষ্ট প্রকৃতির গোত্রগুলোকে উপযুক্ত শিক্ষা দান ও কঠোরভাবে সতর্ক করেছিলেন এবং তাদের অনেকেই পূর্বকৃত অপকর্ম থেকে তওবা ও ভবিষ্যতে অনুরূপ অপকর্ম থেকে বিরত হবার এবং সাম্রাজ্যের আইন-কানূন ও মুসলিম শাসকদের প্রতি অনুগত থাকার ওয়াদা করেছিল; কিন্তু বিগত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, তারা তাদের দুষ্টামী থেকে বিরত হয়নি এবং তাদের অধিকতর হুশিয়ারী প্রদান ও শায়েস্তা করা দরকার এবং যে কোন বিপজ্জনক মুহূর্তে তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার সমূহ আশংকা বিদ্যমান। অনন্তর যিল-হজ্জ মাসের প্রথম ভাগে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রা) তদীয় শিষ্য-শাগরিদ ও বন্ধু-বান্ধবের একট বিরাট দল নিয়ে দ্বিতীয়বারের মত জর্দ ও কিসরাওয়ান অভিমুখে গমন করেন এবং তাদেরকে তাবলীগ করেন। তাদের একটি বড় অংশই তওবা করে এবং ইসলামের হুকুম-আহকামের প্রতি আনুগত্য অবলম্বন করে।

জর্দ এলাকার রাফেযী (বাতিনী, ইসমাঈলী, হাকিমী ও নুসায়রী) গোত্রগুলো খোলাখুলিভাবে মুসলমানদেরকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দিয়েছিল। তারা ক্রুসেডার ও তাতারীদেরকে মুসলিম দেশগুলোর ওপর হামলা পরিচালনায় উস্কানি দিয়েছিল এবং এজন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেছিল। মুসলমানদের অসহায়ত্ব ও দুর্বলতা থেকে ফায়দা উঠিয়ে তাদের জান-মাল ও 'ইযযত-আবরূর ওপর তারা হামলা চালিয়েছিল। ইবনে তায়মিয়া (র)-র মর্যাদা-দীপ্ত ও জেদী মনের ওপর এ ছিল এক বিরাট ক্ষত। তিনি এই সব প্রকৃতিগতভাবে দুষ্ট কিসিমের মুনাফিককে

ক্ষমা করতে পারছিলেন না যারা এমনতর কঠিন মুহূর্তে ও নাযুক সময়েও মুসলমানদের হেনস্থা করেছিল এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল ও তাদের প্রতিপক্ষকে সাহায্য করেছিল। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাদের কৃত পাপ ও বিশ্বাসভঙ্গের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করতে মনস্থ করেন এবং সেই সঙ্গে চিরদিনের তরে এমনি এক ব্যবস্থা নিতে ইচ্ছা করেন যাতে ভবিষ্যতে কোন যুদ্ধ কিংবা বিপদ মুহূর্তে তারা আর মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে। তিনি সুলতান আন-নাসির (মিসর ও সিরিয়ার সুলতান)-এর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন এবং তাদের দুষ্টামী ও বিপদের আশংকা সম্পর্কে সতর্ক করেন। একটি পত্রে তিনি সুলতানকে লেখেন ঃ

> তাতারীরা সিরিয়াভিমুখী হলে এসব বাতেনী (নুসায়রী ও ইসমাঈলী) মুসলিম ফৌজের সঙ্গে অত্যন্ত অসদাচরণ করে। এরাই সে সব বাতেনী যারা সাইপ্রাসের (খ্রিস্টান) অধিবাসীদেরকে বার্তা পাঠিয়েছিল, সিরীয় উপকূলের একটি অংশের ওপর তাদেরকে দখল দিয়েছিল এবং তাদের ক্রুসখচিত পতাকা নিজেরাই বহন করেছিল। তারা মুসলমানদের ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র ও এত বেশী সংখ্যক কয়েদী সাইপ্রাসে পাঠিয়েছিল, যার প্রকৃত সংখ্যা ও পরিমাণ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। বিশ দিন পর্যন্ত মেলা বসেছিল যেখানে মুসলিম বন্দী, ঘোড়া ও অশত্রশস্ত্র সাইপ্রাসবাসীদের হাতে (যারা ছিল ক্রুসেডার ও মুসলমানদের প্রতিপক্ষ) বিক্রি হতে থাকে। তাতারীদের আগমনে তারা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালায়। তাতারীদের মুকাবিলার উদ্দেশে মুসলিম ফৌজ যখন মিসর থেকে যাত্রা করে তখন তাদের চেহারা ফিকে ও বিমর্ষ হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা সুলতানের আগমনের মাঝ দিয়ে মুসলমানদেরকে যখন মহাবিজয় দানে ধন্য করলেন তখন তাদের ভেতর মাতম শুরু হয়। এই নয়, এর চেয়েও অধিক গুরুতর বিষয় তাদের ওখানে সংঘটিত হয়েছে। চেঙ্গীয খানকে মুসলিম দেশগুলোর ওপর হামলা চালাতে এরাই আহ্বান জানিয়েছিল। হালাকূ খানের বাগদাদ অধিকার, আলেপ্পোর বরবাদী ও সালেহিয়ার ধ্বংসযজ্ঞের পেছনেও ছিল এরাই। এ ছাড়া তাদের ইসলামের সঙ্গে শত্রুতা ও মুসলিম হত্যার আরও অনেক ঘটনাই রয়েছে।
>
> তাদের প্রতিবেশে যে সব মুসলমান বসবাস করে, তারা অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত। প্রতি রাতেই তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসে এবং গোলযোগ সৃষ্টি করে, যে সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এরা ডাকাতি ও লুটতরাজ করে। শান্তিপ্রিয় অভিজাত পরিবারগুলোকে পেরেশান ও বিব্রত করে এবং নানাবিধ পাপাচার সংঘটন করে থাকে। সাইপ্রাসের

খ্রিস্টানেরা তাদের এলাকায় এলে তারা তাদের মেযবানী করে এবং মুসলমানদের হাতিয়ার তাদেরকে সোপর্দ করে। সৎ ও নেককার মুসলমানের সাক্ষাৎ পেলে তারা হয় তাকে হত্যা করে, নইলে তার সর্বস্ব ছিনিয়ে নেয়। খুব কম মুসলমানই তাদের হাত থেকে বাঁচতে পেরেছে।[১]

৭০৫ হিজরীর ২রা মুহাররাম তারিখে তিনি এক অভিযানের সঙ্গে ঐ সব ফেতনাবাজ মুলহিদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবার জন্য রওয়ানা হন। তাঁর পেছনে নায়েবু'স-সালতানাত (Regent) একটি বাহিনীসহ দামিশকে থেকে বের হয় ও জর্দ-এর এলাকা, তায়ামিনা ও রাফেযীদের পাহাড়ের ওপর চড়াও হয়। বিদ্রোহী গোত্রগুলোকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সেখানকার গোটা এলাকা, যা খুবই দুর্গম ও সুরক্ষিত ছিল, মুক্ত করা হয়। ইবনে তায়মিয়া (র) ফতওয়া প্রদান করেন, বনূ নযীরের মত তাদের বাগানের গাছপালা কেটে ফেলা যথার্থ হবে। কেননা এসব বাগানকে তারা তাদের শত্রুর মুকাবিলায় গোপন ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে এবং এগুলোই তাদের ফৌজী আড্ডা ও যাবতীয় ষড়যন্ত্রের আখড়া। ঐতিহাসিক ইবনে কাছীর লিখেন, শায়খুল ইসলাম-এর উপস্থিতি ও অংশ গ্রহণের ফলে বিরাট লাভ হয় এবং এই সুযোগে তাঁর জ্ঞান ও বীরত্বের ব্যাপক প্রকাশ ঘটে। এরই সঙ্গে তাঁর শত্রুদের অন্তর-মন হিংসায় ও দুঃখের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হতে থাকে।[২]

রিফাঈদের সঙ্গে বিতর্ক

৯ই জুমাদা'ল-উলা, ৭০৫ হিজরী রিফাঈ ফকীরদের একটি বিরাট দল নায়েবু'স-সালতানাত-এর নিকট গমন করে। ইবনে তায়মিয়া (র)-ও সেখানে তশরীফ নেন। রিফাঈদের দাবী ছিল, ইবনে তায়মিয়াকে তাদের ওপর তাঁর হুকুম-আহকাম জারী করা থেকে বিরত রাখা হোক এবং তাদেরকে তাদের নিজ অবস্থার ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক (অর্থাৎ তাদেরকে তাদের মর্জি মাফিক চলতে দেওয়া হোক)। ইবনে তায়মিয়া (র) এর উত্তরে বলেন, এমনটি সম্ভব নয়। প্রত্যেককেই কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অধীনে থাকতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহ্ নির্দেশিত সীমারেখার বাইরে যেই পা ফেলবে, অমনি তাকে প্রত্যাখ্যান ও উক্ত পদক্ষেপের বিরোধিতা করা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়বে। রিফা'ঈগণ এই সুযোগে তাদের সত্যানুসারিতা ও জনপ্রিয়তা প্রমাণ করবার জন নিজেদের কিছু কর্মনৈপুণ্য ও ভেল্কিবাজি প্রদর্শন করতে চায়। (হকপন্থী হবার অনুকূলে) তাদের দাবী ছিল, আগুন আমাদের ওপর কোনরূপ ক্রিয়া দর্শে না। আগুনের

---

১. ইবনে তায়মিয়া, মুহাম্মদ আবূ যুহরাকৃত, ৪৫ পৃ.।

২. আল-বিদায়া, ১৪খ. ৫৪ পৃ.।

মাঝে লাফিয়ে পড়ে আমরা তা দেখিয়ে থাকি। আমরা যদি সুস্থ শরীরে ও নিরাপদে আগুন থেকে বেরিয়ে আসতে পারি তাহলে মেনে নিতে হবে যে, আমরা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হকপন্থী এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট। ইবনে তায়মিয়া (র) বললেন, এতো শয়তানী ছাড়া আর কিছুই নয়; কিছুতেই সে সব বিশ্বাস করা চলে না এবং তার ওপর নির্ভরও করা যায় না। এ তো স্রেফ প্রতারণাপূর্ণ কলাকৌশল মাত্র। কেননা যে লোক আগুনে লাফিয়ে পড়বে প্রথমে তাকে হাম্মামে নিয়ে গোসল করাতে হবে, তার শরীর সিরকা ও ঘাস দিয়ে ভাল করে ঘসে মেজে ধুতে হবে; তারপর সে আগুনে প্রবেশ করবে এবং তার ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রদর্শন করবে। আর যদি ধরেও নেওয়া হয়, কোন লোক গোসলের পর আগুন প্রবেশ করছে আর সে যদি বিদ'আতী দলের কেউ হয় তবে সে ক্ষেত্রেও তার ওপর নির্ভর করা যাবে না, তাকে বিশ্বাস করা চলবে না, বরং তাকে দাজ্জাল মনে করতে হবে। এমনি মুহূর্তে একজন রিফা'ঈ সুফী (শায়খ সালিহ)-এর মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে যায় যে, এই ভেল্কিবাজি তাতারীদের কাছে চলতে পারে, শরীয়তের মুকাবিলায় চলে না। সকলেই একথা ধরে বসে এবং একেই দলীল বানিয়ে নেয়। শেষাবধি এই ফয়সালা হয়, তারা লোহার শেকল গর্দান থেকে নামিয়ে ফেলবে। আর যে কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধিতা করবে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। ইবনে তায়মিয়া (র) অতঃপর এ বিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, যার ভেতর রিফা'ঈ তরীকার ওপর বিস্তারিতভাবে আলোকতপাত করেন এবং উক্ত তরীকার অবস্থা (হালত), পথ ও মত (মাসলাক) ও ধ্যান-ধারণাকে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সঙ্গে তুলাদণ্ডে ওজন করে দেখিয়ে দেন।[১]

৮ই রজব নায়েবু'স-সালাতানাতের উপস্থিতিতে 'উলামায়ে কিরামের একটি মজলিস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে ইবনে তায়মিয়া (র)-র 'আকীদা-ই ওয়াসিতিয়া' নামক পুস্তিকার ওপর আলোচনা চলে। 'উলামায়ে কিরাম তাঁকে নানা রকম প্রশ্নোত্তর করেন। এর ফলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাঁর 'আকীদা আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের 'আকীদা মাফিক। অতঃপর অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধাসহকারে তাঁকে তাঁর বাড়ী পৌছে দেওয়া হয়। জনসাধারণের এক বিরাট অংশ মশাল হাতে তাঁকে অনুগমন করেছিল যা ছিল যে যুগে কাউকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাবার একটি পন্থা।[২]

---

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৪শ খণ্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা।

২. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৪শ খণ্ড, ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা।

ইবনে তায়মিয়া (র.)-র বিরোধিতা ও মিসরে তলব

দামিশকের বুকে ইবনে তায়মিয়া (র)-র এক ধরনের ধর্মীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কায়েম হয়ে গিয়েছিল। যদি তিনি দেখতে পেতেন, হুকুমত কোন বিদ'আত কিংবা অন্যায় ও গর্হিত কর্ম প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অলসতা করছে অথবা 'ধরি মাছ না ছুই পানি'র ভাব দেখাচ্ছে এবং 'উলামায়ে কিরামও নিশ্চুপ বসে আছেন অমনি তিনি আইন নিজ হাতে উঠিয়ে নিতেন এবং স্বয়ং শর'ঈ আহকাম ও বিধান জারী করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর একদল ভক্ত ছাত্র এবং দীনদার ও বিশুদ্ধ 'আকীদাসম্পন্ন বিরাট একদল জনতা আর প্রতিদিনই তাঁর প্রভাব বলয় বাড়ছিল। তাঁর এই ধর্মীয় উত্থান ও ব্যক্তিগত প্রভাব বৃদ্ধি 'আলিমদের একটি দল পসন্দ করতে পারেনি। এর ভেতর তারা তাঁর আত্মম্ভরিতা (خوسرى) দেখতে পায়। ফলে একদল হিংসুটে ও ঈর্ষাকাতর লোকের সৃষ্টি হয়, যারা ইবনে তায়মিয়া (র)-র পতন ও অবমাননাকর অপমান দেখতে অভিলাষী ছিল। ঐতিহাসিক ইবনে কাছীর লিখেন ঃ

وكان للشيخ تقى الدين من الفقهاء جماعة يحسدونه لتقدمه عند الدولة وانفراده بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر- وطاعة الناس له ومحبتهم له وكثرة اتباعه وقيامه فى الحق وعلمه وعمله -

> শায়খ তকীয়্যুদ্দীন (ইবনে তায়মিয়া)-র প্রতি ঈর্ষাকাতর লোকদের ভেতর একদল 'আলিম ও ফকীহও ছিলেন, যাঁরা রাজদরবারে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের ক্ষেত্রে একাকীই দায়িত্ব পালন, তাঁর প্রতি জনগণের আনুগত্য ও ভালবাসা, তাঁর অনুসারী ও ভক্তবৃন্দের বর্ধিত সংখ্যা, তাঁর ধর্মীয় জোশ, অটুট মনোবল, ইচ্ছাশক্তি ও তাঁর 'ইল্‌ম ও 'আমল দৃষ্টেই তাঁকে হিংসা করত।[১]

ওয়াহদাতু'ল-ওজুদের 'আকীদা প্রত্যাখ্যান

এদিকে এমন কিছু ঘটনা সংঘটিত হয় যদ্দরুন 'আকাইদ সম্পর্কিত বাহাছ পুনরায় ছড়িয়ে পড়ে এবং এ সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনার বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে থাকে।[২] এর থেকেও বড় ব্যাপার ছিল এই যে, তিনি শায়খ মুহ্‌য়ি উদ্দীন

---

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৪শ খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা।

২. একটি বৈঠক ৮ই রজব তারিখে নায়েবু'স-সালতানাতের দরবারে অনুষ্ঠিত হয়। শায়খ-এর উপস্থিতিতে 'আকীদা-ই-ওয়াসিতিয়া' পাঠ করা হয় এবং এর ওপর আলোচনা হয়। এরপর দু'টি

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইবনে 'আরাবী (র)-র ওয়াহ্‌দায়তু'ল-ওজুদ মতবাদকে খোলাখুলিভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন। মিসর ও সিরিয়ায় তাঁর (ইবনে 'আরাবীর) বিরাট একদল ভক্ত ও সমর্থক ছিল। অধিকন্তু 'উলামা ও মাশায়িখ-ই-কিরামের একটি বিরাট দল তাঁকে একজন অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার 'আরিফ, মুহাক্কিক 'আলিম, তওহীদের ইমাম ও একজন মহান বুযুর্গ হিসাবে মানতেন। ইবনে তায়মিয়া (র)-র ধারণা ছিল, তাঁর অনুসন্ধান, গবেষণা ও তাঁর ইলহাম (ঐশী প্রেরণা)-সমূহ আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম -এর আনীত শিক্ষা ও তওহীদের সে সব শিক্ষার বিলকুল পরিপন্থী যে শিক্ষা প্রত্যেক নবী তাঁর যুগে প্রদান করেছিলেন, হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর শেষ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও পূর্ণতা দান করেছেন, যে শিক্ষা কুরআন ও হাদীস থেকে পরিষ্কার বোধগম্য হয় এবং যা শব্দ ও অর্থগতভাবে সূত্র-পরম্পরায় আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। শায়খ মুহয়িউদ্দীন 'আরাবী ৬৩৮ হিজরীতে (ইবনে তায়মিয়ার জন্মের ২৩ বছর পূর্বে) ইনতিকাল করেছিলেন। তাঁর কিতাব, বিশেষত 'ফুতূহাতে মাক্কিয়্যা' ও 'ফুসূসু'ল-হিকাম' সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল এবং শিক্ষিত মহলে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) দর্শন, তাসাওউফ ও অধ্যাত্মবাদ খুবই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং এই সূত্রে 'ফুতূহাত' ও 'ফুসূস'ও পড়েছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থের নানা জায়গায় উক্ত দু'টি কিতাবের উদ্ধৃতি পেশ করেছেন এবং সে সব প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, তাঁর অধ্যয়ন সরাসরি ছিল। তিনি ঐ সব গ্রন্থ অধ্যয়ন থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ঐ সব গ্রন্থের পেশকৃত শিক্ষা ও নবূওতের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কোন রাস্তা খোলা নেই। তিনি শায়খ ইবনে 'আরাবীর মতবাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

> ইবনে 'আরাবী ও তাঁর অনুসারীদের মত হল এই, অস্তিত্ব বা সত্তা (ওজূদ) একই। তাঁরা বলেন, মাখলূকের (সৃষ্ট বস্তুর) অস্তিত্বই স্রষ্টার অস্তিত্ব। তাঁরা ভিন্ন দু'টি অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন না যার ভেতর একে অপরের স্রষ্টা, বরং তাঁরা বলেন, স্রষ্টাই মাখলূক তথা সৃষ্ট বস্তু এবং সৃষ্ট বস্তুই স্রষ্টা।[১] সত্তা ও অস্তিত্বের মাঝে 'প্রভু' ও 'দাসে'র কোন পার্থক্য নেই। সেখানে না কেউ

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর) বৈঠকে শায়খ সফীউদ্দীন আল-হিন্দী ও আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনু'য-যামালকানীর সঙ্গে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এসব আলোচনায় প্রমাণিত হয়, এই 'আকীদা আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের বিরোধী নয়। অতঃপর শায়খ (র) অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। জনসাধারণ মশাল হাতে তাঁকে অনুগমন করেছিল (ইবনে কাছীর, ১৪শ খণ্ড, ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা;)।

১. আর-রাদ্দু'ল-আকওয়াম 'আলা মা ফী ফুসুসি'ল-হিকাম, ১১পৃ.।

স্রষ্টা, না কেউ মাখলূক; না কেউ আহ্বানকারী (দা'ঈ), আর না কেউ আহ্বানে সাড়া প্রদানকারী (মুজীব)। সত্তা যখন চক্ষুগুলোর ওপর উদ্ভাসিত হলেন এবং তিনি যখন তার ভেতর প্রকাশিত হলেন তখন চোখের দিক থেকে তার ভেতর রঙ-বেরঙের ও নানারূপ পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক যেমন আলোক-রশ্মি বিভিন্ন রঙের সীসা ও কাচের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন রঙে প্রতিবিম্বিত হয়।[১] এরই ভিত্তিতে তারা বলে, গো-বৎস পূজার (যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র পূজা ছিল। আর তা এজন্য যে, বিরাজমান তো একই) কেন বিরোধিতা করেছিলেন? তাদের মতে, মূসা 'আলায়হি'স-সালাম সেই সব 'আরিফীনের একজন ছিলেন যাঁরা প্রতিটি বস্তুর মাঝেই সত্য প্রত্যক্ষ করে থাকেন এবং তাকে প্রতিটি বস্তুর হুবহু প্রতিচ্ছবি মনে করেন। তাদের মতে, ফির'আওন তার দাবী انا ربكم الاعلى "আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব"-এর ক্ষেত্রে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, বরং সেটাই সত্য ছিল।[২]

'ফুসূসু'ল-হিকাম' গ্রন্থকারের মতে, ফির'আওন যেহেতু (সৃষ্টিগত দিক থেকে) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তিনি যুগ-মানব ছিলেন, সেহেতু তিনি انا ربكم الاعلى যথার্থই বলেছেন। আর তা এ জন্য যে, যখন সকলেই কোন না কোন অর্থে 'রব' তখন আমি তাদের ভেতর সর্বোচ্চ। কেননা আমাকে প্রকাশ্যে তোমাদের শাসন ক্ষমতা পরিচালনার ও ফয়সালা করবার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, যাদুকররা যখন ফিরআওনের সত্যতা সম্পর্কে জানতে পারল তখন তারা তার বিরোধিতা করেনি, বরং তার স্বীকৃতি দিয়েছে এবং বলেছে ঃ

اقض ما انت قاض انما تقضى هذه الحيوة الدنيا -

তোমার যা ফয়সালা করবার কর; তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনের কর্তৃত্ব ফলাতে পার।

এজন্যই ফির'আওনের এই কথা বলা যথার্থই ছিল, انا ربكم الاعلى (আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রভু) যদিও ফির'আওন যথার্থই সত্যের ওপর ছিল।[১]

ইবনে 'আরাবী হযরত নূহ 'আলায়হি'স-সালামকে সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত করেন আর তাঁর কাফির জাতিগোষ্ঠীকে সম্মান জানান এবং তাদের যথার্থতার সার্টিফিকেট প্রদান করেন যারা পাথর পূজা করেছে। তিনি বলেন, ওরা

১. আর-রাদ্দু'ল আকওয়াম, ১০২ পৃষ্ঠা।

২. এ সব উক্তিকে তিনি 'ফুসূসু'ল-হিকাম' প্রণেতার দিকে সম্পর্কিত করেছেন।

৩. الفرقان بين الحق والباطل ১৪৭ পৃষ্ঠা।

(মূর্তিপূজকরা) প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্‌রই 'ইবাদত করেছিল আর এই তুফান ছিল প্রকৃতপক্ষে মা'রিফত-ই-ইলাহীর প্রচণ্ড উত্তাল এবং সেই সমুদ্রের প্রবল উচ্ছ্বাস যার ভেতর তারা নিমজ্জিত হয়।[১]

মনে হচ্ছে, ইবনে তায়মিয়া (র)-র যুগে "ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ"-এর 'আকীদার ভেতর চরম বাড়াবাড়ি সৃষ্টি হয়েছিল এবং লোকে এই পর্যায়ে শরীয়ত, বুদ্ধি-জ্ঞান ও নৈতিকতার সকল সীমারেখা অতিক্রম করে গিয়েছিল এবং অস্থির প্রায় অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। ইবনে তায়মিয়া (র) লেখেন ঃ

> এই সিলসিলায় একদল ('ইল্‌মে কালাম, দর্শন ও তাসাওউফ সম্পর্কে যারা ওয়াকিফহাল ছিলেন) সবচেয়ে বেশী বিভ্রান্ত হয়। তাদের ভেতর ইবনে সাব'ঈন, সদরুদ্দীন কওনবী (ইবনে 'আরাবীর ছাত্র), বিল্‌য়ানী ও তিলিমসানী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের ভেতর তিলিসমানী এ বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান ও পরিচয়ে অগ্রগামী ছিলেন। তিনি ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ মতবাদে কেবল বিশ্বাসীই ছিলেন না, বরং এর ওপর 'আমলও করতেন। অনন্তর তিনি মদ পান করতেন এবং নিষিদ্ধ ও অবৈধ কর্মে লিপ্ত হতেন (বিরাজমান অস্তিত্ব ও সত্তা যখন এক, তখন আর হালাল-হারামের পার্থক্য কেন?)।
>
> আমাকে একজন বিশ্বস্ত লোক জানিয়েছেন, তিনি তিলিমসানীর নিকট 'ফুসূসু'ল-হিকাম'-এর পাঠ গ্রহণ করতেন এবং একে তিনি আল্লাহ্‌র ওলী ও 'আরিফগণের বাণী (কালাম) বলে মনে করতেন। যখন তিনি 'ফুসূস' পড়েন এবং দেখতে পান, এর বিষয়বস্তু কুরআন শরীফের প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট বিরোধী তখন তিনি তিলিমসানীকে জিজ্ঞেস করেন, এই কালাম তো কুরআন মজীদের বিরোধী। এর জওয়াবে তিনি বলেন, গোটা কুরআনই তো শির্‌ক-এ পরিপূর্ণ। কেননা তা 'রব' ও বান্দার মাঝে ফরক করে। তওহীদ তো আমাদের কালামে রয়েছে। তার এও উক্তি রয়েছে, কাশ্‌ফ-এর মাধ্যমে সেসব প্রমাণিত হয় যা সুস্পষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধিবহির্ভূত ও এর বিরোধী।[২]

---

১. এখানে একথা উল্লেখ করা জরুরী মনে হচ্ছে, শায়খ-ই-আকবর-এর কিতাবাদি ও তৎসম্পর্কিত 'ইল্‌ম সম্পর্কে যারা গভীর আগ্রহ পোষণ করেন তাদের একটি দল মনে করেন, শায়খ (ইব্‌নে 'আরাবী)-এর কিতাব, বিশেষত ফুসূসুল'ল-হিকাম-এ ব্যাপকভাবে মিশ্রণ ও সংযোজন ঘটানো হয়েছে। শায়খ-এর ভক্ত ও তাঁর জ্ঞানের ধারক ও বাহক দামিশ্‌কের শায়খ আহমদ আল-হারুন আল-আসাল দৃঢ়তা সহকারে বলতেন, ফুসূস-এর ১/৩ অংশই ভেজাল ও ভিত্তিহীন।

২. আল-ফুরকানু বায়না'ল হারু ওয়া'ল-বাতিল, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

তিলিমসানী ও তার সমচিন্তায় বিশ্বাসী এক সাথী আমাকে স্বয়ং শুনিয়েছেন, আমাদের একবার একটা মৃত কুকুরের পাশে দিয়ে যেতে হয়েছিল। কুকুরের গায়ে ছিল বিশ্রী ঘা। তিলিমসানীর বন্ধু বলল ঃ এও কি খোদাওয়ান্দ তা'আলার সত্তা (যাত)? তিনি এভাবে তার জওয়াব দেনঃ কোন বস্তুই কি তাঁর সত্তা-বহির্ভূত? হ্যাঁ, সব কিছুই তাঁর সত্তার ভেতর আছে।[১]

কতক লোক বলেছিল, অস্তিত্ব ও বিদ্যমান সত্তা যখন এক, তখন স্ত্রী কেন হালাল আর মা কেন হারাম? সেই পণ্ডিত জওয়াব দেন ঃ আমাদের কাছে সবই এক, কিন্তু ঐসব অবগুণ্ঠনধারী (যারা তওহীদে হাকীকী সম্পর্কে অজ্ঞ) বলল, মা হারাম। আমরাও বললাম, হ্যাঁ, তোমাদের ওপর হারাম।[২]

শায়খুল ইসলাম ৭০৪ হিজরীতে শায়খ আবুল ফাত্‌হ নস্‌র আল-মুনজীকে একটি বিস্তৃত চিঠি লেখেন। এতে তিনি প্রকাশ করেন, "তিনি ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ মতবাদের সমর্থকদের সৃষ্ট অনিষ্ট আল্লাহ্‌র রাহের পথিক (সালিক)- দের থেকে প্রতিরোধ করাকে প্রায় এতটাই জরুরী মনে করেন যতটা জরুরী মনে করেন তাতারীদের মুকাবিলা ও উৎসাদন করাকে। শায়খ (র) বেশ ভালভাবেই অবগত আছেন, আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের দাওয়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, বরং বলা চলে, গোটা সৃষ্টি, কিতাব নাযিল ও রসূলদের প্রেরণের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই হ'ল এটা; দাওয়াত ও আনুগত্য হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই يكون الدين كله لله। তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গোটা সৃষ্টি জগতকে তার স্রষ্টার দিকে আহ্‌বান জানানো। ঐ সব ঐক্য ও মিলনবাদীরা (اتحادی) আল্লাহ্‌র পথের পথিকদের জন্য এই তওহীদকে যে তওহীদ সহকারে আল্লাহ্‌ পাক স্বীয় সহীফাসমূহ অবতরণ করেছেন এবং তাঁর নবীদেরকে দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছেন সেই ঐক্যের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন যার নাম রেখেছে তারা তওহীদ ও এর প্রকৃত কারিগর (حقیقت صالح) - কে অকেজো ও বেকার অভিহিত করা এবং মহাস্রষ্টা (আল্লাহ্‌ রাব্বু'ল'-আলামীন)কে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনেরই নামান্তর। আমি প্রথম দিকে শায়খ ইবনে 'আরাবী সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করতাম এবং আমার দৃষ্টিতে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁর 'ফুতূহাত-ই-মাক্কিয়্যাঃ', 'কুনহা'ল-মুহকাম', 'আল-মারবূত', 'আদ-দুররাতু'ল-ফাখিরা', 'মাতালি'উ'ন-নুজূম' ইত্যাদি গ্রন্থের জ্ঞানগত উপকারিতা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ক আলোচনা

১. প্রাগুক্ত।

২. আর-রাদ্দু'ল-আকওয়াম, ৪২ পৃষ্ঠা।

প্রাপ্তিই এর কারণ। কিন্তু তখনো পর্যন্ত আমি তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের যথার্থতা সম্পর্কে জ্ঞান ও 'ফুসূসু'ল-হিকাম' প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়নের সুযোগ পাই নি। আমরা তখন আমাদের দীনী ভাইদের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনা ও সত্যান্বেষণের মাঝে মগ্ন ছিলাম এবং আমি তাঁর অনুসরণ করতাম ও প্রকৃত পথের সন্ধান জানতে চাইতাম। যখন প্রকৃত সত্য উদ্ভাসিত হল তখন এই ধারায় আমাদের অপরিহার্য দায়িত্ব, কর্তব্য ও আমাদের করণীয় সম্পর্কে জানা হয়ে গেল। ইতোমধ্যে প্রাচ্য থেকে কয়েকজন বিশ্বস্ত বুযুর্গের আগমন ঘটে। তাঁরা ইসলামী তরীকা, ইসলাম ধর্মের হাকীকত ও ঐ সমস্ত লোকের (ইবনে 'আরাবী, সদর রূমী, তিলিমসানী, ইবনে সাব'ঈন) অবস্থার হাকীকত জানতে চাইলে আমি তাদের সম্পর্কে অপরিহার্য বিষয়াবলী জানতে সক্ষম হই। ঠিক তেমনিভাবে সিরিয়ার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে কিছু একনিষ্ঠ, ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যান্বেষী আল্লাহ্‌র পথের পথিককে অনুরোধ করে পাঠাই যেন ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ মতবাদের সমর্থকদের বাণীর মোটামুটি বক্তব্য, তাদের দাবী সংক্ষিপ্তাকারে গুছিয়ে লেখা হয়। জনাবে ওয়ালা স্বীয় আত্মার আলোক-রশ্মি, প্রকৃতিগত মেধা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও কল্যাণ চিন্তার সাহায্যে যা তিনি ইসলাম, মুসলিম ও তরীকতের ভাইদের প্রতি পোষণ করেন, এক্ষেত্রে এমন কোন পদক্ষেপ যেন গ্রহণ করেন যদ্দ্বারা আল্লাহ্‌র রেযামন্দী, দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর মাগফিরাতের সুদৃঢ় আশা করা চলে।"

অতঃপর তিনি বেশ বিস্তারিতভাবে সে সমস্ত 'আকীদা তথা ধর্ম-বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, পথ ও মতের পর্যালোচনা করেছেন যা "ইত্তিহা'দ"।[১] ও "হু'লূল"[২] সম্পর্কে খৃস্টানদের বিভিন্ন দল-উপদল (যেমন য়া'কূবিয়া, নস্তরিয়া, মালকানিয়া প্রভৃতি) তথাকথিত মুসলিম ফের্কাগুলোর (যেমন রাফিযী ও জাহমিয়াদের নাম উল্লেখ করা যায়) ভেতর প্রচলিত ছিল। অধিকন্তু তিনি 'ইত্তিহাদে মু'আয়্যিন'[৩], 'ইত্তিহাদে মুতলাক'[৪], "হুলূল-ই-মু'আয়্যিন'[৫] ও 'হুলূল-ই-মুতলাক'[৬]-এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন এবং যেসব লোক এসব আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা থেকে তাঁর দৃষ্টির প্রসারতা, পূর্ববর্তী ধর্মসমূহ ও পথ-মত সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা পরিমাপ করা যায়। অতঃপর শায়খ ইবনু'ল-'আরাবীর মতবাদ ও পর্যালোচনা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ও সতর্কতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন [যার থেকে পরিমাপ করা যায়, তিনি 'ফুতূহাতে মাক্কিয়্যা' ও 'ফুসূসু'ল-হিকাম' খুবই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করেছিলেন

১-৬. এতদ্‌সম্পর্কিত ব্যাখ্যা পুস্তকের শেষাংশে "পরিশিষ্টে" দেওয়া হয়েছে। সেখানে দেখা যেতে পারে। —অনুবাদক।

এবং সে সবের বক্তব্যের সার-নির্যাস তাঁর আয়ত্তে এসে গিয়েছিল যদ্দারা সে সবের পেশকৃত বিভিন্নমুখী জ্ঞান ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ (হাকাইক) অনুধাবন করা তাঁর জন্য সহজ হয়ে গিয়েছিল]। এক্ষেত্রে তাঁর ও ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ মতবাদের অপরাপর প্রবক্তাদের পার্থক্য ও ইবনে 'আরাবীর কথিত বক্তব্যের হাকীকত তথা সারবত্তা উপলব্ধিতে ধরা পড়ে। এরই সঙ্গে তিনি এর ফলাফল, পরিণতি ও অনিবার্য অনিষ্টকারিতা বর্ণনা করেন, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ও নির্লিপ্ত থেকে সে সবের প্রতি সন্দেহ ও আশংকা ব্যক্ত করবার পূর্ণ অধিকার প্রদান করেন এবং তার অপরাপর মিত্র (ইত্তিহাদী)- দের ভেতর পার্থক্য রেখা নিরূপণ করেন। উক্ত পত্রেই এক স্থানে তিনি লিখেছেন ঃ

لكن ابن عربى اقربهم الى الاسلام واحسن كلاما فى مواضع كثيرة فانه يفرق بين المظاهر والظاهر فيقر الامروالنهى والشرائع على ما هى عليه ويامر بالسلوك بكثير مما امربه المشائخ من الاخلاق والعبادات ولهذا كثير من العباد ياخذون من كلامه سلوكهم ينتفعون بذالك وان كانوا لايفقهون حقائقه ومن فهمها منهم وافقه فقد تبين قوله ـ

ওঁদের ভেতর ইবনে আরাবী ইসলামের কাছাকাছি অবস্থান করেন এবং তাঁর কথিত উক্তি অনেক জায়গায় তুলনামূলকভাবে ভাল। কেননা তিনি প্রকাশমান বস্তুসমূহ (মাজাহির) ও প্রতীয়মান তথা প্রকাশিতের (জাহির) মধ্যে পার্থক্য করেন, শর'ঈ আদেশ-নিষেধ এবং ধর্মীয় বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকামকে যথাস্থানে রাখেন, মাশাইখে কিরাম যে সমস্ত নীতি-নৈতিকতা, 'আমল-আখলাক ও 'ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি তাকীদ প্রদান করেছেন সে সব অবলম্বনের জন্য পরামর্শ দেন। এজন্য বহু 'আবেদ ও সূফী তাঁর কথিত উক্তি (কালাম) থেকে আধ্যাত্মিক পথ (সলূক) গ্রহণ করে থাকেন যদিও তাঁরা সে সবের হাকীকত ভাল রকম বোঝেন না। তাঁদের ভেতর যাঁরা সে সব হাকীকত বোঝেন, সে সবের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন ও সমর্থন করেন তার নিকট তাঁর (ইবনে 'আরাবীর) কালামের হাকীকত দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে যায়।[১]

---

১. শায়খ নসর আল-মুনজীর নামে শায়খুল ইসলামের পত্র جلاء العينين ج. ١

অপর এক স্থানে লিখছেন ঃ

وهذه المعانى كلها هى قول صاحب الفصوص والله تعالى اعلم بما مات الرجل عليه والله يغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات - ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولاتجعل فى قلوبنا غلاللذين امنوا ربنا انك رؤف الرحيم -

এ সমস্ত রচনা সবই "ফুসূসু'ল-হিকাম" গ্রন্থের রচয়িতার। আল্লাহ ভাল জানেন তাঁর শেষ পরিণতি কি হয়েছিল অর্থাৎ কিসের ওপর ভিত্তি করে তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন। আল্লাহ পাক সমস্ত ঈমানদার মুসলিম নারী-পুরুষকে, চাই জীবিত হোক কিংবা মৃত, ক্ষমা করুন। হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।[১]

অতঃপর সদর রূমীর মতবাদ[২] সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখছেন ঃ هوابعدعن الشريعةالاسلام (সে ইসলামী শরী'আ থেকে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত)।[৩] এরপর তিলিমসান ও ইবনে সাব'ঈনকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি তিলিমসানীর ওপর সবচেয়ে বেশী নাখোশ ছিলেন। ইসলামের প্রতি জিদ ও মমত্ববোধে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি এতদূর পর্যন্ত লিখেছেন ঃ

واما الفاجر التلمسانى فهواخبث القوم واعمقهم فى الكفر فانه لايفرق بين الوجود والثبوت كما يفرق ابن عربى ولايفرق بين المطلق والمعين كما يفرق الرومى ولكن عنده ماثم غيره ولاسوى بوجه من الوجوه وان العبدانما يشهد السوى ما دام محجوبا فاذا انكشف حجابه رأى انه ماثم غير، يبين له الامر ولهذا كان يستحل جميع المحرمات -

১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৫৭ পৃ.।

২. আল্লামা-সদরুদ্দীন কওনবী।

৩. শায়খ নসর আল-মুনজীর নামে শায়খুল-ইসলামের পত্র جلاءالعينين পৃ. ৫৭।

এখন বাকী থাকল দুরাচার (ফাসিক) তিলিমসানী।[১] তা এই দলের লোকদের ভেতর তার নষ্টামিই ছিল সবচেয়ে বেশী এবং কুফরীর ক্ষেত্রে সেই ছিল সর্বাপেক্ষা গভীর পানির। আর তা এজন্য যে, সে অস্তিত্ব (ওজূদ) ও সাক্ষ্য-প্রমাণের ভেতর অন্তত ইবনে 'আরাবীও যেমনটি প্রভেদ করেছেন তেমনটিও করে না। তেমনি সে মুতলাক (সম্পূর্ণ, একচ্ছত্র) ও মু'আয়্যিন (معين স্থিরীকৃত, প্রতিষ্ঠিত)-এর মাঝেও কোনরূপ প্রভেদ করে না যেমনটি সদরুদ্দীন কওনবী থেকে বর্ণিত আছে। তার মতবাদ তো এই যে, আল্লাহ্‌র সত্তা (ذات - যাত) ভিন্ন অপর কোন কিংবা ভিন্নতর কিছুর অস্তিত্বই নেই। বান্দা যদি ভিন্নতর কিছু দেখতে পায় তবে তা কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ সে পর্দার আড়ালে লুক্কায়িত। যখন এই পর্দা উঠে যাবে তখন সে দেখবে, ভিন্নতর কিছুর অস্তিত্ব নেই। কেবল তখনই প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সে অবহিত হতে পারবে। আর এরই ভিত্তিতে এই তিলিমসানী সমস্ত অবৈধ ও নিষিদ্ধ বস্তুকে হালাল মনে করত।[২]

পরিশেষে তিনি (ইবনে তায়মিয়া) এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা লিপিবদ্ধ করছেন ঃ

জাহমিয়া ফের্কার মুতাকাল্লিমগণ কোন কিছুর 'ইবাদত করে না এবং উক্ত ফের্কার যে সমস্ত লোক 'ইবাদত-বন্দেগীতে আগ্রহী তারা সব কিছুরই 'ইবাদত করে। কারণ এই দলের মুতাকাল্লিমদের মনে আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কিংবা কোন কিছুর 'ইবাদতের প্রতি কোন আগ্রহই নেই। তারা নিজেদেরকে নির্গুণ হিসাবে অভিহিত করে। কিন্তু তাদের ফের্কার সাধারণ লোকদের মনে 'ইবাদতের প্রেরণা বিদ্যমান। আর এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা, মন সব সময় অস্তিত্বশীল বস্তুর প্রতিই আকৃষ্ট হয়, ঝুঁকে পড়ে; অস্তিত্বহীন কিংবা শূন্যের দিকে নয়। এজন্য তাদেরকে বাধ্য হয়েই সৃষ্ট বস্তু (মাখলূকাত)-র পূজা-অর্চনা করতে হয়; হয় সাধারণ অস্তিত্বশীল কোন কিছুর অথবা অন্য কোন দৃশ্যমান বস্তুর, যেমন চন্দ্র, সূর্য, মানুষ, মূর্তি প্রভৃতির। তেমনি ইত্তিহাদী (মিলনবাদী)- দের কথিত উক্তি (ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ বা সর্বেশ্বরবাদ) পৃথিবীর তাবৎ শির্‌ক-এর ওপর বেষ্টনী সৃষ্টি করে রয়েছে। তারা আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদ তথা একত্ববাদের সমর্থক নয়, বরং তারা এমত পরিমাণ সম-অর্থের তওহীদের সমর্থক যা তাঁর (স্রষ্টার) ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে রয়েছে। এজন্য তারা অন্যদেরকে নিজেদের 'রব' বা প্রভু-প্রতিপালকের সমকক্ষ বানায়। আল-কুরআনের ভাষায় وهم بربهم

---

১. তিলিমসানী তার ভক্তদের মাঝে 'আফীফ তিলিমসানী নামে মশহূর।

২. جلاء العينين পৃ. ৭৮।

يعدلون -এরই ভিত্তিতে একজন নির্ভরযোগ্য লোকের বর্ণনা, সাব'ঈন হিন্দুস্তানে যাবার ইচ্ছা পোষণ করত এবং বলত, কোন ইসলামী ভূখণ্ডে এ ধরনের বিশ্বাস ও মতবাদের স্থান হবার নয়। হিন্দুস্তানের লোকেরা[১] যেহেতু মুশরিক, তারা প্রতিটি বস্তুরই পূজা-অর্চনা করে থাকে- এমন কি গাছপালা, জীব-জন্তু প্রভৃতিরও (তাই তাদের সঙ্গে বেশ ভালই কাটবে)। আর এটাই হল 'ইত্তিহাদী'দের কথিত বক্তব্যের অন্তর্নিহিত সত্য (হাকীকত)। আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু লোককে জানি, যারা দর্শন ও কালাম শাস্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত অর্থাৎ তারা ঐসব শাস্ত্রের চর্চা করেন এবং ঐসব ইত্তিহাদীদের প্রদর্শিত পন্থায় খোদাপরস্ত ও 'ইবাদতগুযার তাপসে পরিণত হন। তারা যখন আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী বর্ণনা করেন তখন বলেন, তিনি (আল্লাহ) এমন নন, তেমন নন এবং তাঁর সিফাত বর্ণনায় তারা মুসলমানদের অনুকরণে বলেন, তিনি (আল্লাহ্) সৃষ্টি বস্তুর মত নন। কিন্তু সেই সঙ্গে স্রষ্টার সে সমস্ত সিফাতও তারা অস্বীকার করেন যে সমস্ত সিফাত তথা গুণাবলী আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স সালাম বর্ণনা করেছেন। তাদের ভেতর কারুর যখন বিশেষ ভাব ও মত্ততা দেখা দেয় তখন তারা সরাসরি 'ইত্তিহাদী'দের পথ ধরেন এবং বলতে থাকেনঃ প্রাণীকুল মাত্রেই তো আল্লাহ্। তাদেরকে যখন বলা হয়, একথা বলার পর কোথায় রইল তোমাদের অস্বীকৃতি (যে আল্লাহ্ এমনটি নন, তেমনটি নন) আর কোথায়ই বা তোমাদের এই ইতিবাচক উক্তির তাৎপর্য (যে সমস্ত প্রাণীই খোদা), তখন তারা বলতে থাকে যে, সেটা ছিল আমাদের উন্মত্ততা আর এটি হচ্ছে আমাদের আনন্দ-সুখ (যওক)। এই পথভ্রষ্টদেরকে যদি কেউ বলে, যে আনন্দ-সুখ ও উন্মত্ততা ধর্মীয় 'আকীদা-বিশ্বাসের অনুকূল না হয় তাহলে সেসবের ভেতর একটি অথবা দু'টিই বাতিল হবে। উন্মত্ততা ও আনন্দ-সুখ প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্র পরিচিতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসেরই পরিণাম ফল আর তা এজন্য যে, আত্মার (কলব) মা'রিফত ও হাল দুটোই পরস্পরের পরিপূরক (متلازم)। অনন্তর জ্ঞান ও মা'রিফতের পরিমাণ মাফিক উন্মত্ততা, মুহব্বত ও হাল হয়ে থাকে অর্থাৎ 'ইল্ম তথা জ্ঞান ও মা'রিফত যে পরিমাপের হবে ঠিক সেই পরিমাপেই 'ইশকে ইলাহীতে উন্মত্ততা, প্রেম ও বেকারার অবস্থার সৃষ্টি হবে। এসব লোক যদি আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম ও নবীয়ে মুরসালদের রাস্তা ইখতিয়ার করত যাঁরা এমন এক আল্লাহ্র 'ইবাদতের আদেশ করেন যিনি একক ও যাঁর কোন শরীক নেই এবং যারা তাঁর এমন গুণাবলীর বর্ণনা দেন যা স্বয়ং তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন এবং

১. হিন্দুস্তানের আদি অধিবাসীরা।

তাঁর নবীগণ বর্ণনা করেছেন। তারা (ইত্তিহাদীগণ) যদি তাদের পূর্ববর্তী প্রথম যুগের মুসলমানদের অনুসরণ করত তাহলে তারা সৎ পথ পেত, হেদায়েত পেত এবং ঈমান ও য়াকীনের স্বাদ, মিষ্টতা ও অন্তরের প্রশান্তি তারা লাভ করত। কেউ ঠিকই বলেছে[১] যে, আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের নিকট আল্লাহ তা'আলার সিফাতের সদর্থক জ্ঞান বিস্তৃত এবং (যে সমস্ত সিফাত বা গুণ তাঁর যোগ্য নয়) সে সবের নঞর্থক জ্ঞান সংক্ষিপ্তাকারে বর্তমান রয়েছে (ان الرسل جاءوباثبات مفصل و نفي مجمل)-এর বিপরীতে বে-দীন اهل تعطيل। (জাহমিয়া সম্প্রদায় ও দার্শনিকগণ যাদের দ্বারা ইত্তিহাদীগণ প্রভাবান্বিত) আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে 'না' তথা نفى করতে গিয়ে খুবই লম্বা ফিরিস্তির আশ্রয় নেয় আর আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে সদর্থক করবার মুহূর্তে খুবই কার্পণ্য করে। কুরআন মজীদ আল্লাহ্‌র গুণাবলীর সদর্থক বর্ণনায় ভরপুর এবং সে ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। যেমন ان الله بكل شى عليم (আল্লাহ্ সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত) وعلى كل شى قدير, (আর সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান), انه سميع بصير (আর তিনি শ্রোতা, দ্রষ্টা), وسع كل شى رحمة وعلما (করুণা ও জ্ঞানে তিনি প্রতিটি বিষয়েই ব্যাপক ও বিস্তৃত)। আর নঞর্থের ক্ষেত্রে তিনি একটি ব্যাপক ও অর্থপূর্ণ কথা বলে দিয়েছেন। যেমন ليس كمثله شى (তাঁর মত নয় কোন কিছুই), لم يكن له كفوااحد(তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়), هل تعلم له سميا (তুমি কি তাঁর সম গুণসম্পন্ন কাউকেও জান?), سبحن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين (ওরা যা আরোপ করে তা থেকে তিনি পবিত্র ও মহান তোমার প্রতিপালক যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রসূলগণের প্রতি)।

এরূপ 'আকীদা-বিশ্বাসের দ্বারা যে নৈতিক বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা ও যে অরাজকতা বিস্তার লাভ করছিল এবং দুরাচার প্রবৃত্তি-পূজারীরা একে যেভাবে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখছেন ঃ

এই 'আকীদার দাবীদারেরা প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা, কল্পনা-বিলাসিতা ও 'আকীদাগত যাবতীয় অনিষ্টের মূল হোতা। এর পরিণাম ফল কোথাও কোথাও এভাবে দেখা দিয়েছে, কতক লোক কিশোর বালকদের প্রেমে লিপ্ত

---

১. স্বয়ং ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর রচনায় নানা জায়গায় একথা বলেছেন।

হয় এবং বলে, এদের ভেতর আল্লাহ্র তাজাল্লী রয়েছে এবং এরা আল্লাহর সৌন্দর্যের বিকাশস্থল। কতক লোক চুমু খায় এবং আপন প্রেমাস্পদকে বলে, তুমি খোদা। কতক স্বীয় সন্তানাদির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে এবং ঈশ্বরত্বের দাবী করে ইত্যাদি।[১]

এ ছিল এমন একটি যুগ যখন আল-মালিকু'ন-নাসির মুহাম্মদ ইবনে কালাউন ছিলেন মিসরের নামেমাত্র সুলতান, আর আমীর রুকনুদ্দীন বায়বার্স আল-জাশনগীর ছিলেন সাম্রাজ্যের উযীরে আ'জম ও সকল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। জাশনগীর শায়খ নস্র আল-মুনজীর একজন ভক্ত ও মুরীদ ছিলেন এবং তিনি শায়খ ইবনে 'আরাবীর প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন। শায়খ সম্পর্কে ইবনে তায়মিয়া (র) যে ধারনা পোষণ করতেন এবং যে ধারণা তিনি মাঝে মাঝেই বক্তৃতার মাঝে ও লিখিতাকারে প্রকাশও করতেন সে সম্পর্কে খবরা-খবর মিসরেও গিয়ে পৌঁছুত। আর এটাই শায়খ নস্র আল-মুনজীর ক্রোধের উদ্রেকের জন্য যথেষ্ট ছিল। জাশনগীর সাধারণ তুর্কী আমীরদের ন্যায় মামুলী লেখাপড়া জানতেন যদিও সামরিক প্রতিভা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট যোগ্য ছিলেন। তিনি তাঁর শায়খ-এর মতামত দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলেন এবং ইবনে তায়মিয়া (র) সম্পর্কে সেমত ধারণাই পোষণ করতেন যেমন ধারণা পোষণ করতেন তাঁর শায়খ। সিরিয়া ছিল মিসর সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ এবং সকল দিক দিয়েই এর অধীনস্থ। মিসরের সুলতান এমন সব লোককে ডেকে পাঠাবার ও তাদের সম্পর্কে ফয়সালা প্রদানের অধিকার রাখতেন, যারা তার দৃষ্টিতে সাম্রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জন-নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর কিংবা কোনরূপ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ হতে পারেন। সাধারণত ব্যক্তিগত ঝোঁক বা প্রবণতা কিংবা দরবারী লোকদের অভিপ্রায় কিংবা অভিরুচি এর পেছনে কাজ করত। সে সময়ও অবস্থা তাই ছিল। সাম্রাজ্যের উযীর আ'জম-এর শায়খ নস্র আল-মুনজীর ইবনে তায়মিয়া (র)-র সঙ্গে শত্রুতা ছিল আর তিনি ইমামকে নিপীড়ন ও শাস্তির শিকারে পরিণত করতে চাচ্ছিলেন।

মিসরে ইবনে তায়মিয়া (র)

যা-ই হোক, ৭০৫ হিজরীর ৫ই রমাদান তারিখে সিরিয়ায় ইবনে তায়মিয়া (র)-র নিকট মিসরে হাযির হবার ডাক এসে পৌছে। এতে তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও ছাত্রকুল খুবই উদ্বেগাকুল হয়ে ওঠে। নায়েবু'স-সালতানাত (যিনি তাঁর প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ ও অন্যতম ভক্ত ছিলেন) তাঁকে বাধা দিতে চেষ্টা করেন এবং বলেন, আমি ইতিমধ্যেই সুলতানের সঙ্গে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁকে

---

১. الرد الاقوم على فصوص الحكم-পৃষ্ঠা ৫২।

বোঝাবার ও ব্যাপারটার একটি নিষ্পত্তি ঘটাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু ইবনে তায়মিয়া (র) সফরের জন্য এক পায়ে খাড়া ছিলেন। তিনি বললেনঃ মিসর সফরের ভেতর আমি অনেক কল্যাণ ও লাভের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। শেষাবধি বন্ধু-বান্ধব ও গুণগ্রাহী ভক্তবৃন্দ নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে সজল চোখে বিদায় জানান। জনতা বহু দূর অবধি তাঁর অনুগমন করেছিল আর বিপদাশংকায় সবার মন ছিল ব্যথা ভারাক্রান্ত।

দামিশক থেকে রওয়ানা হয়ে গাযযার জামি মসজিদে এক বিরাট সমাবেশে তিনি দর্‌স প্রদান করেন।

বন্দী ও মুক্তি

২২শে রমাদান তারিখে তিনি মিসর এসে পৌছেন। সেদিন ছিল শুক্রবার। জুমু'আ বাদ কেল্লার ভেতর এক বিরাট মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিচার বিভাগের সদস্যবর্গ ও সাম্রাজ্যের পদাধিকারী ব্যক্তিবৃন্দ অংশ নেন। ইবনে তায়মিয়া (র) সেখানে আলোচনার সূত্রপাত করতে চাইলেন, কিন্তু তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। উপস্থিত কতিপয় ব্যক্তি তাঁর ধর্ম-বিশ্বাস ('আকীদা) ও কতক মসলা[১]-মাসায়েলের ব্যাপারে আপত্তি তোলেন। এর জওয়াব দেবার জন্য তিনি হাম্‌দ ও ছানা পাঠ করে যেই বক্তব্যের সূচনা করতে গেলেন অমনি তাঁকে বলা হল, আমরা আপনার খুতবা শোনার জন্য এখানে সমবেত হইনি। অতঃপর তিনি জানতে চাইলেন, আমার এই মকদ্দমায় সালিসী করবেন কে আর কেই-বা রায় প্রদান করবেন? তাঁকে কাযী ইবনে মাখলূফ মালিকীর[২] নাম বলা হয়। তিনি তখন তাকে (মাখলূফ মালিকীকে) বললেনঃ আপনি তো আমার প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষ হিসাবে আপনি কি করে সালিসী করতে পারেন? এতে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং ইবনে তায়মিয়ার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেন[৩] যার পরিণতিতে তিনি কিছুকাল বুরুজে বন্দী থাকেন। অতঃপর 'ঈদের রাত্রে মিসরের 'জুব' (جب) কূপ নামক বিখ্যাত কয়েদখানায় তাঁকে তাঁর ভাই শরফুদ্দীন 'আবদুল্লাহ ও যয়নুদ্দীন 'আবদুর রহমানসহ স্থানান্তরিত করা হয়[৪] পরবর্তী বছর

---

১. এই 'আকীদা ও মসলা ছিল প্রাচীন কালাম শাস্ত্রবিষয়ক যার ওপর দামিশ্‌কে একবার নয়, দু'বার নয়, বারবার আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ নিয়ে ইবনে তায়মিয়া (র) বই-পুস্তকও লিখেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, استواء على العرش - এর হাকীকত, আল্লাহ্‌র কালামের হাকীকত এবং হরফ ও আওয়াজের আলোচনা।

২. মিসরে ইবনে তায়মিয়ার বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

৩. এই বৈঠকের স্মৃতিচারণ স্বয়ং ইমাম ইবনে তায়মিয়া একটি চিঠিতে লিখেছেন। সম্প্রতি المحنة নামে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

৪. ইবনে কাছীর, ৩৮ পৃষ্ঠা

অর্থাৎ ৭০৬ হিজরীতে 'ঈদের রাতে নায়েব-এ মিসর কয়েকজন বিচারপতি ও ফকীহ্র পক্ষ থেকে ইবনে তায়মিয়া (র)- কে মুক্তি দানের জোর তৎপরতা চলে। উপস্থিত কয়েকজন মুক্তির জন্য কতিপয় 'আকীদা থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রকাশ্য ঘোষণা দানের শর্ত আরোপ করে। ইবনে তায়মিয়া (র) ব্যাপারটা জানতে পেরে এ ধরনের ঘোষণা প্রদান করতে পরিষ্কার অস্বীকার করেন। ছ'বার তাঁকে দাওয়াত জানান হয় যেন তিনি স্বয়ং এসে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। কিন্তু তিনি তাতেও রাযী হন নি। তাঁর জওয়াব বরাবর একই ছিল, السجن احب الى مما يدعوننى اليه। (তারা আমাকে যে বিষয়ের দিকে আহ্বান করছে, তার তুলনায় জেলখানা আমার নিকট অধিকতর পসন্দনীয়)।[১]

স্বয়ং শায়খুল ইসলামের ভাষায় মতপার্থক্যের ভিত্তি ও মতামত বিশ্লেষণ

সৌভাগ্যের বিষয়, স্বয়ং শায়খুল ইসলাম (র) তাঁর একটি পুস্তকে মিসরের বিতর্ক সভা, অতঃপর কারাবন্দী থাকাকালীন বিভিন্ন ঘটনা, মুক্তির ব্যাপারে জোর তৎপরতা ও শায়খ কর্তৃক তা অস্বীকার, এতদসত্ত্বেও স্বীয় মত ও পথের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিজেই করেছেন। পুস্তকটি অতি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তকের মাধ্যমে বহু নতুন নতুন ও জরুরী বিষয় সম্পর্কে জানা গেছে। উক্ত পুস্তকের বিভিন্ন স্থান থেকে তার কিছু উদ্ধৃতি এখানে পেশ করা হচ্ছে।[২]

> একদিন জেলের দারোগা আমার নিকট এলেন এবং বললেন ঃ নায়েব-এ মিসর আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলে পাঠিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত আপনি কত দিন জেলে থাকতে চান? জেল থেকে বের হবার আপনার কি আদৌ ইচ্ছে নেই? আপনি কি এখনও আপনার "সেই কথা"র ওপর অনড় ও অটল রয়েছেন? আমি ধারণা করলাম যে, এই লোকের মারফত কোন মৌখিক পয়গাম পাঠানো সমীচীন হবে না (এজন্য যে, জানি না সে ঠিকমত পয়গাম পৌঁছুতে পারবে কিনা)। আমি তখন তাকে বললাম, নায়েব সাহেবকে আমার সালাম দেবেন এবং বলবেন, আমি জানি না সেই কথাটা কি ? আমি তো আজ পর্যন্ত এটাই জানতে পারলাম না, কোন্ অপরাধে আমাকে বন্দী করা হয়েছে এবং আমার কসূরই বা কি। অধিকন্তু আমি আপনার প্রেরিত পয়গামের জওয়াব কোন ভৃত্যের মুখে পাঠাতে চাই না।

---

১. ইবনে কাছীর, ৪২ পৃষ্ঠা।

২. এই পুস্তিকাটি দামিশ্কের বিখ্যাত কুতুবখানা "আজ-জাহিরিয়্যা"তে শায়খ-এর আপন ভ্রাতা ও জেলখানার সাথী শায়খ শরফুদ্দীন ইবনে তায়মিয়ার হস্ত লিখিত বর্তমান ছিল। আমার পরম বন্ধু শায়খ মুহাম্মদ আবদুর রায্যাক হাময়া, হারাম শরীফের সাবেক ইমাম-এর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও শায়খ মুহাম্মদ নাসীফের ব্যবস্থাপনায় ও তত্ত্বাবধানে আরও কতিপয় পুস্তিকাসহ এটি প্রকাশিত হয়েছে। সংকলনের নাম "মাজমু'আ 'ইলমিয়া"।

আপনি আপনার বিশ্বস্ত লোকদের থেকে এমন চারজনকে পাঠাবেন যারা সমঝদার হবেন, সত্য কথনে নির্ভীক ও আমানতদার হবেন যাতে করে আমি তাকে কোনরূপ না বাড়িয়ে-কমিয়ে কথা বলতে পারি। কেননা আমি জানি, আমার এ ব্যাপারে অনেক রকম মিথ্যাচার ও বিকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে।

এরপর দারোগা এলেন এবং তার সঙ্গে ছিলেন আরো একজন। তাকে আমি চিনতাম না। কিন্তু লোকেরা আমাকে বলল, তার নাম 'আলাউদ্দীন আত-তাবরিসী। যারা তাকে জানত এবং চিনত তারা তার প্রশংসাও করে। লোকে জানে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ধৈর্য, সহ্য গুণ ও যে কোন ধরনের তিক্ত কথা শোনার মত শক্তি দান করেছেন এবং যে কোন সাধারণ ও ইতর শ্রেণীর লোকের সঙ্গেও আমি ন্যায় ও ইনসাফের সঙ্গে কথা বলি। সেক্ষেত্রে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল লোকের সঙ্গে কথা বলার বেলায় তো কথাই নেই। কিন্তু দেখতে পেলাম তারা আমার সঙ্গে এমন পন্থা অবলম্বন করল, যদ্দ্বারা পরিমাপ করা যাচ্ছিল, তারা তাদের দাবী মেনে নেবার জন্য আমাকে বাধ্য করতে চাচ্ছিল। তারা একটি চিরকুটও বের করল যাতে সংঘটিতই হয় নি এমন সব ঘটনা, মিথ্যা ও মনগড়া কথা লেখা ছিল এবং তাতে পরিষ্কার আল্লাহ্র নাফরমানীর দিকে আহ্বান ছিল। আমি যখন তাদেরকে এর জওয়াব দিতাম এবং তাদেরকে আমার পয়গাম পেশ করতাম তখন তারা তা শুনবার জন্য তৈরি থাকত না, বরং তারা তাদের দাবী মেনে নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করত এবং ওয়াদা নিতে চাইত, আমি আর আমার আগের কথায় ও মতে ফিরে যাব না (যদিও কুরআন ও হাদীসে আলোচনা-সমালোচনার ক্ষেত্রে নম্র ও মিষ্ট ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ এসেছে। কিন্তু জুলুম করা হলে সেক্ষেত্রে জালিমের বিরুদ্ধে কঠোর ও কর্কশ ভাষা ব্যবহারের ও আত্মমর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত হবার নির্দেশ রয়েছে)। কথা বলার একটা পর্যায়ে আমি তাদেরকে বললাম, এ ব্যাপারে আমার ফয়সালা করবার অধিকার নেই। এ ব্যাপারটা তো আল্লাহ্, তদীয় রসূল (স) ও তামাম দুনিয়ার মুসলমানদের। আল্লাহ্র দীনের পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কোন ইখতিয়ার আমার নেই। আর আমি তোমাদের কিংবা অপর কারুর কারণে দীন ইসলাম থেকে সরে যেতে পারছি না, তেমনি পারি না মিথ্যা কিংবা অপবাদের স্বীকৃতি দিতে।

যখন আমি দেখলাম, তারা এর ওপর পীড়াপীড়ি করছে তখন আমি কড়া ভাষায় কথা বলি। আমি তাদের বললাম ঃ বাজে কথা ছেড়ে দাও। গিয়ে নিজের চরকায় তেল দাও গে ! আমি তোমাদের কারুর কাছে এ দরখাস্ত

করিনি, আমাকে জেল থেকে বের করে নিয়ে যাও। সে সময় উপরের দরজা বন্ধ ছিল। আমি বললাম ঃ দরজা খোল; আমি চলে যাচ্ছি। যা-ই হোক, এভাবেই আলোচনার যবনিকাপাত ঘটল।

আমি দূতকে বলেছিলাম, আমি এসব মসলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে যা কিছু লিখেছি কিংবা বলেছি তা সব সময় কোন না কোন প্রশ্ন ও ফতওয়া চাওয়ার প্রেক্ষিতে জওয়াব হিসাবে লিখেছি, বলেছি। আমি এ মসলা-মাসায়েলের ব্যাপারে কাউকেই প্রথমে চিঠি লিখিনি কিংবা নিজের থেকে উদ্যোগী হয়ে কাউকে সম্বোধনও করি নি। কোন সত্য-সন্ধানী যখন আমার নিকট আসে, বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা করে, ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে সেক্ষেত্রে কি আমি সত্য গোপন করব কিংবা সে রকম সুযোগ আছে কি! অথচ নবী করীম সাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من النار -

'ইল্‌ম বা জ্ঞানের সম্পর্কে কাউকে যদি কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় যে সম্পর্কে সে জানে, অতঃপর সে যদি তা গোপন করে তবে আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন।

অপর দিকে আলাহ্ পাক বলেন ঃ

ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدي منْ بعدما بيناه للناس فى الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون -

আমি মানুষের জন্য কিতাবে যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ নাযিল করেছি তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তাদেরকে লা'নত দেন এবং অভিশাপকারিগণও তাদেরকে অভিশাপ দেয়।
[সূরা বাকারা, ১৫৯ আয়াত]

এখন আমি তোমাদের বলায় কি সত্যান্বেষীর জিজ্ঞাসার জওয়াব দানে গড়িমসির আশ্রয় নেব যাতে আমাকেও কুরআন বর্ণিত পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়? সুলতান কি আমাকে তা করতে বলেন ? অথবা অপর কোন মুসলমান? আসল কথা এই যে, তোমরা এই সব ভিত্তিহীন কথার ভিত্তিতেই, যে সব কথা তোমাদের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে, বাদশাহ্‌র হুকুমকে ঢাল বানাতে চাও।

এরপর দূত বলল, জনাবে ওয়ালা! কথার মাঝে বাদশাহ্‌র নাম দয়া করে টেনে আনবেন না। কেউ বাদশাহ্‌র শানে কথাবার্তা বলে না। আমি বললামঃ জী, হ্যাঁ! এ সময় কেউই বাদশাহ্‌র ব্যাপারে কোন কিছু কথা শুনতে সাহস করে না। আর এই যে ফেতনা তা এজন্যই। আমি সিরিয়া থেকেই একথা শুনেছিলাম, আমি বাদশাহর সমালোচনা করেছি বলে আমাকে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে এবং তাঁকেও অপবাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি মনে করতাম, কেউ একথা বিশ্বাস করবে না।

আমি তাকে বললাম, এ ব্যাপারে যে ক্ষতি হবে তজ্জন্য আমি দায়ী হব না। আমার ভয় কিসের আর কিসেরই বা আশংকা! এই মামলায় আমি যদি মারা যাই অর্থাৎ আমাকে যদি মেরে ফেলা হয় তাহলে আমি উন্নত দর্জার শাহাদত লাভ করব। আর এটা আমার জন্য বিরাট সৌভাগ্যের বিষয় হবে। কিয়ামতের দিন আমাকে সন্তুষ্ট করা হবে। আর যারা আমার হত্যার নিমিত্ত হবে, এ ব্যাপারে কোন না কোন ভূমিকা পালন করবে, কিয়ামত পর্যন্ত তারা লা'নত ও অভিশাপের পাত্র হবে। এজন্য যে, সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদী জানে, আমি ন্যায় ও সত্যের ওপর মারা যাচ্ছি, যে ন্যায় ও সত্যসহ আল্লাহ পাক তদীয় রসূলকে প্রেরণ করেছেন। আর যদি আমাকে বন্দী করা হয় তাহলে কসম আল্লাহ্‌র! আমার বন্দিত্ব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি বিরাট নে'আমত হিসাবে পরিগণিত হবে। লোক আমার থেকে কিছু ছিনিয়ে নেবে এমন ভয় আমার নেই। আমি কোন মাদরাসার প্রিন্সিপাল নই, তত্ত্বাবধায়কও নই। আমার কোন জায়গা-জমিও নেই, নেই বিত্ত-সম্পদ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আমি মালিক নই, রাষ্ট্রীয় পদেও আমি সমাসীন নই। কি আছে আমার ছিনিয়ে নেবার (যেজন্য আমি ভীত ও শংকিত হব) ? কিন্তু এ ব্যাপারে যা কিছু ক্ষয়ক্ষতি তা তোমাদেরই হবে এজন্য যে, যারা এ ব্যাপারে সিরিয়ায় বসে শত্রুতা করেছে, আমি জানি, তাদের উদ্দেশ্য তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা এবং তোমাদের ধর্মের, তোমাদের রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধন করা। তাদের কেউ কেউ তাতারীদের দেশে গেছে এবং কেউ কেউ এখনো সেখানেই অবস্থান করছে। সেই সব লোকই তোমাদের দীন-দুনিয়া দু'টোই বরবাদ করতে উঠে পড়ে লেগেছে এবং আমাকে নিছক ঢাল বানিয়েছে। কেননা তারা জানে, আমি তোমাদের বন্ধু ও শুভাকাঙক্ষী এবং আমি তোমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জগতেরই কল্যাণ চাই। এ ব্যাপারে আরও বহু কিছু কথা পর্দান্তরালে রয়ে গেছে যা সময়ে প্রকাশ পাবে। অন্যথায় মিসরে কারুর সঙ্গেই আমার কোন শত্রুতা ছিল না, ছিল না কোন বিরোধ। আমি সদা-সর্বদাই মিসরবাসীদের প্রিয়পাত্র, তাদের এবং তাদের শাসক ও 'আলিম-উলামার বন্ধু ও মদদগার থেকেছি।

সে বলল ঃ সুলতানের নায়েবকে গিয়ে আমি কি জওয়াব দেব?

তাঁকে সালাম বলবে এবং আমার পয়গাম পৌঁছে দেবে, আমি বললাম। আপনি তো অনেক কথাই বলেছেন, সে বলল।

আমি বললাম ঃ মোটামুটি কথা, এই চিরকুটে যা কিছু আছে তার একটা বড় অংশই মিথ্যা। অবশ্য এই কথাটা استوى حقيقة আমি বলেছি এবং মালিকী মযহাবভুক্ত ও মালিকী মযহাববহির্ভূত 'আলিমগণের অনেকেই লিখেছেন যে, এর ওপর আহলে সুন্নত ওয়া'ল জামা'আতের ইজমা' (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গ ও এই উম্মতের ইমাম ও মহান 'উলামায়ে কিরামের কেউই এমত অস্বীকার করেন নি। তা আমি এমন একটি সর্বসম্মত 'আকীদাকে, যাকে কোন 'আলিমই অস্বীকার করেন নি, কি করে ছাড়তে পারি? 'আল্লামা আবূ 'উমার ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র বলেন ঃ

اهل السنة مجموعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها فى القران والسنة ـ والايمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز الانهم لايكيفون شيئا من ذالك ولا يجدون فيه صفة محصورة واما اهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ـ ولايحمل شيئا منها على الحقيقة ويزعمون ان من اقربها مشبهة وعندمن اقربها نا فون للمعبود والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم ائمة الجماعة ـ

কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ্ তা'আলার যেসব সিফাতের (গুণ বা গুণবাচক নামের) উল্লেখ আছে তার স্বীকৃতি ও তার ওপর ঈমান আনয়নের অপরিহার্যতা এবং এসব সিফাতের প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণ ও পরোক্ষ অর্থে তার ব্যবহার না করার অনুকূলে আহলু'স-সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের ইমামগণের মধ্যে ইজমা' (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁরা এ সব সিফাতের কোনরূপ দূরতম ব্যাখ্যা (তা'বীল) গ্রহণেরও পক্ষপাতী নন এবং এসব গুণকে সীমাবদ্ধ করতেও প্রস্তুত নন।

পক্ষান্তরে বিদ'আতপন্থিগণ, যেমন জাহমিয়া, মু'তাযিলাদের সমস্ত উপদল ও খারিজী, এরা সকলেই আহলে সুন্নাতের উপরিউক্ত আকীদা প্রত্যাখ্যান

করেছে। তারা উল্লিখিত সিফাতসমূহের প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণ করে না এবং মনে করে, যারা এ সব গুণ (হাত, পা, কান, চোখ ইত্যাদি) স্বীকার করে তারা মুশাব্বিহা (আল্লাহ্র সাদৃশ্য কল্পনাকারী)। তাদের মতে, যারা তা স্বীকার করে তারা মা'বূদের বৈশিষ্ট্য নাকচকারী।

এ ব্যাপারে তাঁদের কথাই সঠিক যাঁরা আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সুন্নতের বক্তব্য অনুযায়ী মত প্রকাশ করেছেন। আর তাঁরা হলেন আহ্লু'স-সুন্নাতের ইমামগণ।

"আশ-শায়খু'ল 'আরিফ আবূ মুহাম্মদ 'আবদুল কাদির গীলানী (র) তদীয় 'গুনিয়াতু'ত্তালিবীন' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

وهوبجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالاشياء -

তিনি উচ্চ মর্যাদার দিক থেকে আরশের ওপর সমাসীন, সমগ্র বিশ্বজাহান পরিবেষ্টনকারী এবং সমস্ত কিছুর জ্ঞান তাঁর আয়ত্তাধীন।

একটু সামনে এগিয়ে বলেন ঃ

ولايجوزوصفه بانه فى كل مكان بل يقال انه فى السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى..............وينبغى اطلاق صفة الاستواءمن غيرتاويل وانه استواء الذات على العرش -[১]

তাঁর প্রতি এরূপ কথা আরোপ করা জায়েয নয় যে, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, বরং এভাবে বলতে হবে, তিনি আসমানী জগতে আরশের ওপর সমাসীন। যেমন আল্লাহ্র বাণীঃ দয়াময় আরশে সমাসীন (সূরা ৩২ ঃ ৫)। ..... 'সমাসীন' থাকার এই গুণকে কোনরূপ পরোক্ষ বা দূরতম ব্যাখ্যার (তা'বীল) আশ্রয় ব্যতীত গ্রহণ করা উচিত। আর তা হচ্ছে, তাঁর সত্তা আরশের ওপর সমাসীন।

ইবনে মাখলূফ (তা'বীলের মাধ্যমে) যে 'আকীদা-বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটান তা স্বয়ং ইমাম মালিক (র) ও তাঁর সাথী ইমামগণ এবং আবুল হাসান

---

১. শায়খ (র) তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে মযহাব চতুষ্টয়ের বিখ্যাত 'আলিমদের আরও বহু উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এখানে আমরা মাত্র দু'টি পেশ করলাম।

আশ'আরী ও তাঁর সঙ্গী ইমামদের সমস্ত নস-এর খেলাফ। তাঁরা সকলেই এরই ব্যাখ্যা দান করেছেন আমরা যা বলছি। এরই ওপর ভিত্তি করে হাম্বলী মযহাবের অনুসারিগণ ও আশ'আরীপন্থীদের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জনগণের মধ্যে ঐক্য ফিরে আসে। যখন হাম্বলীগণ এ সম্পর্কে আবুল হাসান-আশ'আরীর উক্তি খুঁজে পেল তখন তারা বলল, এটা তো শায়খ আল-মুওয়াফফাক[১]-এর কথার থেকে ভাল। আর এভাবেই তাদের ভেতরকার সব রকমের ঈর্ষা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয় এবং শাফি'ঈ ফকীহ প্রমুখের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় ঃ

الحمد لله على اتفاق كلمة المسلمين ۔

মুসলিম ঐক্যের জন্য আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা।

আমারও 'আকীদা এই ঃ

هو مستو على العرش حقيقة بذاته بلاتكئيف ولاتشبيه ۔

তিনি আরশের ওপর সমাসীন রয়েছেন স্ব-সত্তায়, কোনরূপ পরোক্ষ তাৎপর্য ও সাদৃশ্য কল্পনা ব্যতিরেকেই। সে বলল ঃ আপনি এটা লিখে দিন এবং এটাই মেনে চলুন। আমি বললাম ঃ ঠিক এই সব শব্দেই তোমাদের কাছে আমার ঐ 'আকীদা লেখা আছে এবং এ বিষয়ের ওপর দামিশ্‌কেও প্রচুর আলোচনা হয়েছে। তদুপরি এর ওপর মুসলমানরাও একমত। এখন আমি এ ব্যাপারে আর কি বৃদ্ধি করব?

আমি তাকে আরও বললাম, আমি পঞ্চাশটিরও বেশী কিতাব সরবরাহ করেছি, যেগুলোর সবটিই মুহাদ্দিছীন কিরাম, সুফিয়ান 'ইজাম, মুতাকাল্লিমীন ও মযহাব চতুষ্টয়ের 'আলিম ও ফকীহগণের কিতাব। আর সব কিতাবই আমার মত সমর্থন করছে। অতঃপর আমি আমার বিরোধীদেরকে তিন বছর সময় দিচ্ছি, তারা এ সময়ের ভেতর এর বিরুদ্ধে একটি হরফও ইসলামের ইমামগণের থেকে প্রমাণ করে দেখাক। এখন বলুন, আমি কি করব!

চাপরাশী চলে যাবার পর জেল দারোগা এলেন এবং বললেন ঃ নায়েব-এ সুলতান আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং আপনাকে আপনার 'আকীদা সম্পর্কে নিজ হাতে লিখে দিতে বলেছেন। আমি বললাম ঃ নায়েব সাহেবকে আমার সালাম দেবেন এবং আমার পক্ষ থেকে বলবেন, এ মুহূর্তে আমি

১. শায়খ মুওয়াফফাক উদ্দীন ইবনে কুদামা, যাঁর ঝোঁক হাম্বলী মযহাবের তা'বীলের দিকে।

যা-ই কিছু লিখি না কেন, লোকে বলবে, শায়খ (র) তাঁর আগেকার 'আকীদার ভেতর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন অথবা তিনি তাঁর 'আকীদা পরিবর্তন করেছেন। ঠিক আজকের মতই দামিশকে যখন আমার বিরোধীরা আমাকে আমার 'আকীদা লিখে দেবার দাবী জানিয়েছিল, তখনও আমি আমার আগের লেখাই পেশ করেছিলাম। আমি বললাম, সিরিয়ায় তিনটি মজলিসে পঠিত 'আকীদা এটিই এবং সিরিয়ার ভাইসরয় সরকারী ডাকের সঙ্গে তা আগেই পাঠিয়েছেন। আর এ সব লেখাই আপনার কাছে বর্তমান রয়েছে। তা ছাড়া 'আকীদা এমন কোন জিনিস নয় যা আমি আমার পক্ষ থেকে মনগড়াভাবে উদ্ভাবন করব, এমন কি দৈনিক একটি করে 'আকীদার ঘোষণা দেব। আমি আগে যে 'আকীদা প্রকাশ করেছি সেই 'আকীদাই এখনো পোষণ করি এবং আপনাদের কাছে আমার যে লেখা রয়েছে সেটি আমারই লেখা। আপনারা সেটি দেখে নিন। এরপর তিনি ফিরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর পুনরায় আসলেন এবং আমাকে কিছু লিখে দিতে বললেন। আমি বললাম ঃ বলুন, আমাকে কি লিখতে হবে? তিনি আমাকে ক্ষমাপত্র জাতীয় কিছু এবং আমি যেন কারুর সঙ্গে বিবাদ কিংবা বিরোধিতায় লিপ্ত না হই এ ধরনের অঙ্গীকারনামা লিখে দিতে বললেন। আমি তাকে আমার সম্মতির কথা জানিয়ে বললাম ঃ দেখুন, কাউকে কষ্ট দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়; কারুর থেকে প্রতিশোধও আমি নিতে চাই না, তেমনি কারুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া কিংবা কাউকে আক্রমণ করাও আমার ইচ্ছা নয়। এমন সকলকেই আমি মাফ করছি যারা আমার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি এটা লিখে দিতে চাইলাম। এরপর আমি বললাম, এটা লেখার কোন নিয়ম নেই। কেননা মানুষ তার হক মাফ করে দেবে, এটা লেখার অপেক্ষা রাখে না।

আমি তাঁকে আরও বললাম, শায়খ নস্‌র আল-মুনজীকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করা দরকার যাতে তিনি চেষ্টা-তদবীর করে এর কিছুটা সংস্কার-সংশোধন ও ইন্তেজাম করেন। আমার একমাত্র লক্ষ্য হল আল্লাহ ও তদীয় রসূল (স)-এর আনুগত্য। আর যে জিনিস আমি আসলে বিপজ্জনক মনে করি তা হল মিসরবাসীদের পারস্পরিক মতবিরোধ এবং একে অপরের কোন কথাকে কেন্দ্র করে না জানি কোথাও গোলযোগ ছড়িয়ে পড়ে যা শুরু হয়ে গেছে ! আর সিরিয়ায় যা কিছু ঘটেছে তা তো আপনার জানাই আছে, অথচ মিসরের তুলনায় সিরিয়ায় ঐক্যের সম্ভাবনা অনেক বেশী। আমি আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, গোলযোগের আগুন নেভাতে (তা সে মিসরেই হোক অথবা অন্য কোথাও) সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার ক্ষেত্রে আমি সবার অগ্রগামী থাকব এবং কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠায় আমি

কারুর পেছনে থাকব না। আমি এও বলছি, ইবনে মাখলূফ আমার সঙ্গে যে ব্যবহারই করুক, আমি সাধ্যমত তার সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করব। তার কল্যাণ কামনায় আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি করব না এবং তার শত্রুকেও আমি কখ্খনো সাহায্য করব না। আর প্রকৃত মদদ ও আশ্রয়দাতা তো আল্লাহ্ই! এটাই আমার নিয়ত এবং এটাই আমার অটুট সংকল্প, অথচ সকল বিষয় ও যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে আমি ওয়াকিফহাল। কিন্তু এও আমি জানি, শয়তান মু'মিনের দিলে গোলযোগ ও অরাজকতার বীজ নিক্ষেপ করে আর আমি কখ্খনো আমার মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে শয়তানের সহযোগী হব না।

এই যে চক্র ও পেরেশানীর হাত থেকে মুক্তি পাবার পথ হল আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করা, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা এবং সাচ্চা দিল নিয়ে তাঁরই দরবারে আশ্রয়প্রার্থী হওয়া। কেননা তিনি ভিন্ন আর কোন আশ্রয় নেই।

فانه سبحانه لاملجاء منه الااليه ولاحول ولاقوة الابالله -

এখন বাকী থাকল ইস্তিগাছা তথা সাহায্য প্রার্থনার প্রশ্ন। তা এ ব্যাপারে তামাম দুনিয়ার মুসলমানরা একমত এবং ইসলামের এটা সুস্পষ্ট ও অকাট্য মসলা যে, আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন অপর কারুর ইবাদত, কারুর নিকট দু'আ ও সাহায্য প্রার্থনা কিংবা কারুর ওপর তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করা জায়েয নয় এবং কেউ যদি আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতা অথবা প্রেরিত পয়গম্বরের ইবাদত তথা বন্দেগী করে কিংবা তার নিকট দু'আ অথবা সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে সে মুশরিক। কোন মুসলমানের পক্ষে একথা বলা জায়েয নয়, 'হে জিবরাঈল! হে মীকাঈল! হে ইবরাহীম! হে মূসা! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে মাগফিরাত করুন অথবা আমার ওপর রহম করুন কিংবা আমাকে রিযিক দিন বা আমাকে সাহায্য করুন অথবা আমার ফরিয়াদ শুনুন কিংবা আমার শত্রুর হাত থেকে আমাকে আশ্রয় দিন, 'আমাকে বাঁচান' এবং এ জাতীয় আরো কথা। এ সব একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই খাস। এ সব একমাত্র তাঁরই বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত এবং এটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ও বিখ্যাত মসলা। 'উলামায়ে কিরাম যে সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে গেছেন এবং তাঁরা আল্লাহ ও তদীয় রসূল (সা)-এর নির্ধারিত সীমারেখা ও অধিকারসমূহের ভেতর পার্থক্য বর্ণনা করে গেছেন।[১] এটি ইসলামের

১. এখানে শায়খুল-ইসলাম (র) তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কুরআন পাকের বহু আয়াত ও হাদীস একত্র করেছেন। বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন رسالة المحنة شامل رساله مجموعه علميه ص: ٦٠-٦٢

মূলনীতির অন্যতম। এখন তুমি দূত (ইবনে মাখলূফ) যদি ইসলাম ধর্ম ও খ্রিস্ট ধর্মের ভেতর পার্থক্য করতে না পার, যারা হযরত 'ঈসা মসীহ ও তাঁর শ্রদ্ধেয়া মাতার নিকট দু'আ প্রার্থনা করে তাহলে আমি কি করতে পারি! কিন্তু যারা সায়্যিদা নফীসা[১]-কে 'রব' বানায় এবং বলে যে, তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত লোককে আশ্রয় দেন, বিপদগ্রস্ত লোকের ফরিয়াদ শোনেন, দরকারী সাহায্য করেন এবং তারা তাঁর স্নেহের ছায়া ও প্রভাব তলে আছে, এই বিশ্বাসে তারা তাকে সিজদা করে এবং মানুষ যেভাবে আসমান-যমীনের রব তথা প্রভু-প্রতিপালকের দরবারে কান্নাভেজা কণ্ঠে দু'আ করে, ঠিক তেমনি তারা তার নিকট মিনতি জানায়। তারা এমন জীবিতের ওপর নির্ভর করে যার ইন্তিকাল হয়ে গেছে আর সেই জীবন্ত সত্তার ওপর ভরসা করে না যিনি চিরঞ্জীব থাকবেন, যাঁর লয় নেই, ক্ষয় নেই এবং যিনি অবিনশ্বর। এতে কোনই সন্দেহ নেই, এমন সত্তাকে শরীক করা যিনি সায়্যিদা নফীসা থেকে উত্তম তাদের শরীক করা থেকে অধিকতর শক্তিশালী হবে।[২]

এখন বাকী থাকল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি'স-সালাম-এর অধিকার (আমার পিতামাতা তাঁর ওপর কুরবান হোন)। যেমন তাঁর ভালবাসাকে আপন প্রাণ, সম্পর্কিত জন ও বিত্ত-সম্পদের মুকাবিলায় অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ, তাঁকে মর্যাদা প্রদর্শন, তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ ও আনুগত্য ইত্যাদি। তা এগুলো তো বিরাট ব্যাপার! ঠিক তেমনি তাঁকে দু'আর ভেতর ওসীলা বানানো নিঃসন্দেহে উত্তম কাজ। কিন্তু তাঁর নিকট দু'আ ও আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং তাঁর দোহাই দেওয়া হারাম। আমি এ বিষয়ের ওপর الصارم المسلول على شاتم الرسول নামে একটি পুস্তক লিখেছি। এ পুস্তকে উল্লিখিত সমস্যার বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ দিতে চেষ্টা করেছি, যে বিষয়ে আমার জানা মতে এর আগে অন্য কোন পুস্তকে এত ব্যাপক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়নি। ঠিক তেমনি সে সমস্ত কায়দা-কানূন ও ঈমানের মূলনীতি সম্বন্ধেও বহু নিবন্ধ ও পুস্তক-পুস্তিকা আমি লিখেছি যেগুলো দীন ইসলাম সম্পর্কে অত্যন্ত উপকারী।

শায়খ (নস্‌র আল-মুনজী)-এর গোচরে একথা আসা দরকার। আমি আশংকা করি, না জানি গোটা ব্যাপারটাই তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়! এমন কিছু না ঘটে যায়, যার খারাপ পরিণতি

---

১. সায়্যিদা নফীসা আহলে বায়ত-এর অন্যতম এবং তাঁর কবর কায়রোয় অবস্থিত। সাধারণ মানুষ এ কবরকে সম্মান জানিয়ে থাকে।

২. শায়খুল ইসলাম ইমাম তায়মিয়া (র) তওহীদ সম্পর্কিত আয়াত-ই কারীমা ও হাদীস পাক উদ্ধৃত করেছেন। الجنة। দেখুন।

তাঁকে, ইবনে মাখলূফ প্রমুখকে সইতে হয়। আমি একথা এজন্য বলছি, আমাকে এ ধরনের কথা বলার জন্য বলা হয়েছে যা তাঁর জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। আমি তাতে রাযী হই নি। কেননা আমি তাঁর আন্তরিক সুহৃদ। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনো তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করি নি। যদি তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করতাম তাহলে একথা আমি প্রকাশ করতাম না (আমাকে এমন কথা বলতে বলা হয়েছে যা বললে তাঁর ক্ষতি হবে)। সৎ ও আল্লাহভীরুতার কাজে আমি তাঁদের উভয়ের সহযোগী।

আপনি তাঁকে এও বলে দেবেন, সেই বুনিয়াদ যার উপর যাবতীয় কায়-কারবার দুরস্ত হতে পারে তা হল এই যে, সকলেই আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করুক এবং মাহে রমযানের এই পবিত্র ও বরকতময় দশকে তওবা করুক। মানুষের দিল ও অভ্যন্তর ভাগ যখন ঠিক হয়ে যাবে তখন তার বাহ্যিক দিক আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যাবে। "যারা মুত্তাকী ও পরোপকারী–আল্লাহ তাদের সঙ্গেই থাকেন।" [আল-কুরআন]

ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون -

কারা অভ্যন্তরে সংস্কার প্রয়াস, তা'লীম ও তার প্রভাব

আল-কাওয়াকিবু'দ্দুর্রিয়ার লেখক শায়খুল ইসলামের সমসাময়িক ও সহপাঠী শায়খ 'আলামুদ্দীন আল-বারযালীর বরাত দিয়ে লেখেন ঃ

শায়খ যখন মজলিসে গেলেন, দেখতে পেলেন, কয়েদীরা খেল-তামাশা ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত। আর এভাবেই তারা নিজেদের মনকে ভুলিয়ে রাখে এবং সময় কাটায়। তাস, দাবা প্রভৃতি খেলার বেশ প্রতাপ। সালাতের কাযা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। শায়খ এ সবের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন এবং কয়েদীদেরকে নিয়মিত সালাত আদায়, আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ, সৎ কর্ম, তসবীহ-তাহলীল, তওবা-ই ইস্তিগফার ও আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ ও মুনাজাতের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি তাদেরকে সুন্নাহর তা'লীম ও কল্যাণকর কাজে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে শুরু করেন। ফলে অল্পদিনেই 'ইল্‌ম ও ধর্ম চর্চা এমনভাবে শুরু হয়ে যায় যে, এই জেলখানা অনেক মাদরাসা ও খানকাহ্‌র চেয়েও বেশী প্রোজ্জ্বল ও বরকতময় হয়ে ওঠে। লোকে শায়খ (র)-এর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এতখানি সম্পৃক্ত এবং জেলের এই ধর্মীয় ও ইলমী পরিবেশের প্রতি এতটা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে যে, অনেক কয়েদী জেল থেকে মুক্তি পাবার পরও তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগে প্রস্তুত ছিল না, বরং জেলে তাঁর খেদমতে অবস্থান করাকেই অধিকতর পছন্দ করত।[১]

১. আল-কাওয়াকিবুদ্দুররিয়া, ১৮১ পৃষ্ঠা।

চার মাস পর (১৪ই সফর, ৭০৭ হি.) পুনরায় তাঁর মুক্তির চেষ্টা চলে। কাযীউ'ল-কুযাত বদরুদ্দীন ইব্ন জিমা'আ স্বয়ং তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করেন এবং অনেকক্ষণ কথা বলেন। কিন্তু তিনি জেলের বাইরে আসতে রাযী হন নি। অবশেষে ২৩শে রবী'উ'ল-আওয়াল তারিখে আমীর হুসসামুদ্দীন মুহিন্না ইবন 'ঈসা মালিকু'ল-'আরব[১] স্বয়ং জেলখানায় যান এবং শায়খ (ইবনে তায়মিয়া)-কে কসম দেন। অতঃপর তিনি তাঁকে সাথে করে নায়েব-ই মিসর-এর ঘরে নিয়ে আসেন। আমীর হুসসামুদ্দীন তাঁকে তাঁর সঙ্গে দামিশক নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু নায়েব-এ সালাতানাত (সাম্রাজ্যের ভাইসরয়) পরামর্শ দেন, শায়খ (র)-কে এখনও কিছুদিন মিসরে অবস্থান করাই ভাল হবে যাতে লোকে তাঁর 'ইল্ম ও মর্যাদা সম্পর্কে পরিমাপ করতে পারে এবং তাঁর থেকে উপকৃত হতে পারে।

ইব্ন তায়মিয়া (র)-এর চারিত্রিক সমুন্নতি

ইতোমধ্যে ইব্ন তায়মিয়া (র)-র সীরাত তথা জীবন-চরিতের সমুন্নতি অধিকতর উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়। তিনি কোন শক্তির সামনেই তাঁর উন্নত মস্তক অবনত করেন নি কিংবা কোন জাগতিক প্রেরণা অথবা আর্থিক স্বার্থই তাঁর পবিত্র চরিত্রকে কলুষিত করতে পারেনি। তিনি সুলতান প্রদত্ত খেলাত ও উপহার-উপঢৌকনাদি গ্রহণ করতেও পরিষ্কার অস্বীকার করেন।

তাঁর দ্বিতীয় কৃতিত্বপূর্ণ অবদান হল, তিনি জেল থেকে বের হতেই তাঁর সব বিরোধীকে এবং সে সব লোককে যারা তাঁকে কষ্ট দিতে প্রয়াস পেয়েছিল, মাফ করে দেন। এক্ষেত্রে তাঁকে কে কত কষ্ট দিয়েছিল কিংবা কে কতটা বিরোধিতায় নেমেছিল সে বিচারে তিনি যান নি। তিনি পরিষ্কার ঘোষণা দেন, কারুর বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিযোগ নেই এবং কাউকে তিনি জওয়াবদিহিরও সম্মুখীন করতে চান না। কারা মুক্তির পর তিনি সিরিয়াতে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তিনি বলেন ঃ

تعلمون رضى لله عنكم انى لا احب ان يوذى احد من عموم المسلمين فضلا عن اصحابنا شئ اصلا - لاظا هرا اوباطنا - ولاعندى عتب على احد منهم ولالنوم

---

১. আমীর হুসসামুদ্দীন আরব বংশে আমীরানা খান্দানের সদস্য এবং সিরিয়ার একজন প্রভাবশালী ও শক্তিশালী রঈস ছিলেন। সিরিয়ার অধিবাসী হবার কারণে তিনি ইব্ন তায়মিয়ার জিহাদী তৎপরতা ও সংস্কার-প্রচেষ্টা সম্পর্কে মিসরীয়দের তুলনায় অধিকতর জ্ঞাত ছিলেন। এজন্য তিনি ইব্নে তায়মিয়ার মুক্তির ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখান। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ, উচ্চ বংশ ও স্বাধীনতাপ্রিয়তার কারণে তিনিও তাঁর আগ্রহে সাড়া দেন এবং কারাগারে বাইরে আসতে সম্মত হন।

اصلا بل لهم عندى من الكرامة والاجلال والمحبة اضعاف ما كان ـ كل بحسبه ولايخلوا الرجل اما ان يكون مجتهدا اومخطئاً او مذنبا فالاول ماجور مشكور ـ والثانى مع اجره على الاجتهاد معفوعنه والثالث فالله يغفرلنا وله ولسائر المؤمنين ـ لااحب ان ينتصر من احد بسبب كذبه على وظلمه او عدوانه ـ فانى قد احللت كل مسلم وانا احب الخير لكل المسلمين ـ واريدلكل مؤمن من الخيرمااريده لنفسى والذين كذبواوظلموا هم فى حل من جهتى -

আল্লাহ্ পাক আপনার প্রতি প্রসন্ন থাকুন! আপনি অবগত আছেন, আমি চাই না আমার জন্য মুসলমানদের কারুর কষ্ট হোক, আর আমি এও চাই না, সে কষ্ট বাহ্যিক হোক অথবা প্রচ্ছন্ন, কোন মুসলমান পাক। যেখানে সাধারণ মুসলমানের ক্ষেত্রে আমার অবস্থা এই, সেখানে আমার বন্ধুদের (উলামায়ে কিরাম ও আহলে দীন) ক্ষেত্রে তা পছন্দ করবার অর্থাৎ আমার কারণে তাঁরা কোন কষ্ট পাক, প্রশ্নই ওঠে না। কারুর বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, নেই কোন নিন্দা কিংবা কোন ভর্ৎসনা, বরং প্রকৃত অবস্থা হল, তাঁদের প্রতি আমার সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ, তাঁদের প্রতি আমার ভালবাসা আমার হৃদয়ে আগের চেয়ে অনেক গুণ বেশীই রয়েছে আর প্রত্যেকের প্রতি তাঁদের মর্যাদা মুতাবিক। মানুষ (কোন মানুষের সঙ্গে মতভেদ ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ক্ষেত্রে) হয় মুজতাহিদ হন অথবা হন ভ্রমে নিপতিত কিংবা গোনাহ্‌গার। মুজতাহিদ সওয়াব ও শোকর দুটোরই হকদার হন, ভ্রমে নিপতিত ব্যক্তি ক্ষমার যোগ্য। থাকল কেবল গোনাহগার। আল্লাহ আমাদেরকে, তাদেরকে ও সমস্ত মু'মিন মুসলমানকে ক্ষমা করুন। আমি চাই না কোন লোক থেকে কেবল এজন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করতে যে, সে আমার ওপর অপবাদ আরোপ করেছিল অথবা জুলুম কিংবা বাড়াবাড়ি করেছিল। কেননা প্রত্যেক মুসলমানকে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি এবং আমি সমস্ত মুসলমানের কল্যাণ কামনা করি। আমি প্রত্যেক ঈমানদার মুসলমানের জন্য তাই চাই যা আমি নিজের জন্য চাই। যে সমস্ত লোক মিথ্যা বলেছে এবং যারা জুলুম করেছে, আমার পক্ষ থেকে তারা মুক্ত ও স্বাধীন। আমার পক্ষ থেকে তাদের কোন আশংকা নেই।[১]

১. ইবনে তায়মিয়া, মুহাম্মদ আবূ যুহ্‌রাকৃত, পৃ. ৬৩।

দর্‌স প্রদান ও জনকল্যাণ

জেল থেকে বেরিয়ে আসবার পর ইবনে তায়মিয়া (র) দরস প্রদান ও জনকল্যাণমূলক কর্মে মশগুল হয়ে পড়েন। মিসরের পরিবেশ তখন তাঁর জন্য উপযোগী ছিল না। 'আলিম-'উলামা ও কাযীগণ তাঁর সম্পর্কে নানা রকমের বিভ্রান্তি ছড়িয়ে রেখেছিল। সূফী সম্প্রদায়ও (যাদের ভেতর তওহীদে ওজূদীর গন্ধ বেশ ভালই পাওয়া যেত) তাঁর প্রতি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করত এবং তাঁর প্রতি বিতৃষ্ণ ছিল। মযহাব চতুষ্টয়ের ভেতর কেবল হাম্বলী মযহাব ও নানান 'আকাইদের ভেতর থেকে কেবল "আকাইদে সলফ" (প্রাচীন বুযুর্গদের 'আকীদা)-এর ওকালত ও প্রতিনিধিত্বের জন্য দেশে কোন শক্তিশালী প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব বর্তমান ছিল না।[১] অপরাপর মযহাবের বড় বড় কাযী ও 'আলিম বর্তমান ছিলেন। এই সমস্ত কারণে ইবনে তায়মিয়া (র) মিসরে আরো কিছুকাল অবস্থান, দর্‌স প্রদান ও কল্যাণধর্মী কাজে আত্মনিয়োগের সংকল্প গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি দস্তরমত ও দস্তরহীনভাবে দর্‌স প্রদান করতে এবং মজলিস অনুষ্ঠান শুরু করে দেন। নির্ভেজাল 'ইলমী ও কালামশাস্ত্রীয় মসলা-মাসায়েলের ওপর কায়রোর বিখ্যাত মাদরাসা, বিশেষত সালিহিয়া মাদরাসায় তিনি কয়েকটি দর্‌স প্রদান করেন। এর ফলে বিশিষ্ট জনেরা ও বোদ্ধা লোকেরা উপকৃত হয় এবং তারা তাঁর প্রকৃত ধ্যান-ধারণা ও 'আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত হয়।

দর্‌স প্রদানের এই ধারা ছ'মাস কাল চলে, যার ফলে সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলেই ধর্মীয় ও তত্ত্বগত দিক দিয়ে উপকৃত হয় এবং জনগণ তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অসাধারণ মেধা, প্রতিভা ও গভীর বিদ্যাবত্তার প্রতি ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হয়।

মায়ের নামে ইবনে তায়মিয়া (র)-র পত্র

ইবনে তায়মিয়া (র) মিসরে এসেছিলেন হঠাৎ করে। তাঁর ধারণা ছিল না, তাঁকে এখানে এত দীর্ঘ সময় অবস্থান করতে হবে। তাঁর মাতাসহ গোটা পরিবারই ছিলেন সিরিয়ায়। তিনি ভালভাবে ফিরে আসবেন, এই আশায় তাঁরা অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন। ইবনে তায়মিয়া (র) ধর্মীয় মুসলিহাতের খাতিরে যখন কিছুকাল মিসরে অবস্থানের ফয়সালা করলেন তখন তিনি তাঁর ওয়ালেদা মুহতারামাকে তাঁর এই সংকল্পের কথা জানিয়ে দেন এবং এজন্য তাঁর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রেরিত পত্র ছিল সূক্ষ্ম আবেগ-অনুভূতি, পবিত্র ভালবাসা, সন্তান সৌভাগ্য, পুরুষোচিত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও দৃঢ়তার সাক্ষাৎ প্রতিফলন আর এ পত্র লেখা হয়েছিল অত্যন্ত সরল ও সাবলীল ভাষায়। প্রেরিত পত্র এখানে উদ্ধৃত করা গেল ঃ

২. আকস্মিকভাবে সে সময় কাযী হাম্বলী খুবই সীমিত জ্ঞান ও উপলব্ধির অধিকারী ছিলেন এবং তাঁরই কারণে হাম্বলীদের পাল্লা ছিল দুর্বল (দ্র. ইবনে কাছীর, পৃ. ১৪/৩৭)।

من احمدبن تيمية الى الوالدة سعيدة -- على سيدنا محمدواله وصحبه وسلم تسليما -

আহমদ ইবনে তায়মিয়ার পক্ষ থেকে মাখদূমা ওয়ালেদা সাহেবার প্রতি। আল্লাহ্ পাক তাঁর অফুরন্ত নে'মত দ্বারা তাঁর চক্ষু শীতল রাখুন, স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা তাঁকে ধন্য করুন এবং তাঁকে স্বীয় দাসীদের অন্তর্গত করুন।

আসসালামু 'আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু,

আমি সেই আল্লাহ পাকের শোকর গুযারী করছি যিনি ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নেই। প্রশংসার যোগ্য একমাত্র তিনিই এবং তিনিই সকল বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি নাযিল হোক শেষ নবী, মুত্তাকীদের ইমাম, আল্লাহ্র বান্দা ও রসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরদের ওপর।

আপনার খেদমতে আমি এই পত্র লিখছি। আমার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে গিয়ে আপনাকে জানাচ্ছি, আল্লাহ পাক আমাকে যে নে'মত ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন এবং মহাদানে আমাকে অনুগৃহীত করেছেন, আমি তা বেশ বুঝতে পারছি। এজন্য আমি তাঁর দরগায় শোকর গুযারী করছি। অধিকন্তু আরও বেশী পাবার জন্য তাঁর দরবারে প্রার্থনা জানাচ্ছি। তাঁর নে'মত অফুরন্ত এবং তাঁর অনুগ্রহ সংখ্যাতীত। আপনার অবগতির জন্য লিখছি, এ মুহূর্তে কতক জরুরী কাজের জন্য আমি মিসরে অবস্থান করছি। এক্ষেত্রে আমি যদি কোন প্রকার অলসতা কিংবা গাফিলতির আশ্রয় নিই তাহলে দীন-দুনিয়া উভয়টিরই অকল্যাণ ও ক্ষতির আশংকা রয়েছে। আল্লাহ্র কসম করে বলছি, এখানে আমি আমার নিজস্ব এখতিয়ার কিংবা ইচ্ছায় অবস্থান করছি না আর আপনার থেকে আমার এই সুদূর অবস্থান আমি নিজে এখতিয়ার করি নি। (আমার হৃদয়াবেগ ও আগ্রহের অবস্থা হল,) মন চায়, হায়! আমার যদি পাখির মত দু'টো পাখা থাকত আর আমি যদি পাখায় ভর দিয়ে একবার উড়লেই আপনার কাছে পৌঁছে যেতে পারতাম! কিন্তু হায়! সুদূর মিসর প্রবাসীর হৃদয় কন্দরের গুমরে মরা কান্নার আওয়ায ও চিত্র এবং তার অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। আপনি যদি প্রকৃত অবস্থা জানতে পারেন তাহলে আপনি (দীনী জযবা ও বুলন্দ হিম্মতীর কারণে) এ মুহূর্তে আমার মিসরে অবস্থানের পক্ষেই রায় দেবেন। যতদূর আমার ইচ্ছা, আমি এক মাস কালও মিসরে অবস্থান ও বসবাস করবার কখনো সংকল্প নেই নি, বরং আমি প্রত্যহ

মনেপ্রাণে আমার নিজের ও আপনার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মঙ্গল প্রার্থনা করে থাকি। আপনিও আমাদের জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ্ পাক আমাদের ভাগ্যে শুভ ও কল্যাণ নির্ধারণ করেন।

আল্লাহ পাক তাঁর অপার অনুগ্রহে কল্যাণ ও রহমত এবং হেদায়াত ও বরকতের এমন সব দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন যা প্রথমে আমার কল্পনায়ও ছিল না। আমি সব সময় এখান থেকে বেরিয়ে পড়বার চিন্তায় রয়েছি এবং আল্লাহ্র দরবারে ইস্তেখারা করছি। কেউ যেন একথা মনে না করে, আমরা আপনার নৈকট্য ও সান্নিধ্যের মুকাবিলায় পার্থিব ও জাগতিক কোন স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। জাগতিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া তো দূরের কথা (নফল পর্যায়ের কোন কিছুর ভেতর থেকে), এমন কিছুর অগ্রাধিকার দেবার জন্যও প্রস্তুত নই যার মুকাবিলায় আপনার নৈকট্য ও খেদমত ধর্মীয় দিক দিয়েও উত্তম। কিন্তু এমন কিছু জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ও সমস্যা রয়েছে যা পরিত্যাগ করলে আমাদের সাধারণ ও বিশেষ দু'ধরনের ক্ষতির আশংকা রয়েছে। যিনি এখানে উপস্থিত তিনিই কেবল তা পরিমাপ করতে পারবেন, অন্য কেউ নয়। আপনার খেদমতে তাই আবেদন, আপনি আল্লাহ্র কাছে অধিক পরিমাণে দু'আ করতে থাকুন যেন তিনি আমাদের অনুকূলে কোন কল্যাণকর ফয়সালা প্রদান করেন (অর্থাৎ আমরা মিসরেই অবস্থান করব– নাকি ঘরে ফিরব)। কেননা আল্লাহ্ই সকল কিছু সম্পর্কে খবরদার, পক্ষান্তরে আমরা একেবারেই বেখবর। সঠিক পরিমাপ সম্পর্কে তিনিই অবহিত, পক্ষান্তরে আমরা অজ্ঞ। তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সকল বস্তু সম্পর্কেই ওয়াকিফহাল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ মানুষের সৌভাগ্য এই যে, সে আল্লাহ্র দরবারে মঙ্গল প্রার্থনা করে, তার ভাল-মন্দের ফয়সালার ভার তাঁরই ওপর ন্যস্ত করে এবং তিনি যে ফয়সালা করেন সন্তুষ্ট চিত্তে তা মেনে নেয়। আর তার মন্দ ভাগ্য এই যে, সে ইস্তেখারা ও আল্লাহ্র দরবারে মঙ্গল প্রার্থনা করা পরিত্যাগ করে এবং তাঁর প্রদত্ত ফয়সালায় অসন্তোষ ও অতৃপ্তি প্রকাশ করে।

আম্মা!

আপনি তো জানেন, একজন ব্যবসায়ীও ভিন দেশে থাকা অবস্থায় যখন তার টাকা-পয়সা ও মালমাত্তা নানা হাতে ও নানা জনের কাছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে ও অবস্থানের মেয়াদ বাড়াতে বাধ্য হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বিক্ষিপ্ত টাকা-পয়সা আদায় ও মালমাত্তা গুছিয়ে নিতে সক্ষম হয়। আর আমরা যে মহান উদ্দেশে ও বিরাট কাজের জন্য অবস্থান

করছি তার প্রকৃতিই তো ভিন্ন। এর সঙ্গে পার্থিব লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন তুলনাই চলে না। ব্যস! আমাদের আশ্রয় ও শক্তিদাতা একমাত্র আল্লাহ্ই। আপনার ও বাটিস্থ ছোট-বড়, আত্মীয়-পরিজন সকলের ওপর সালাম।

صلى الله على سيدنا محمد واله وسلم تسليما كثيرا -

পুনর্বার বন্দী

মিসর ছিল "ওয়াহদাতু'ল -ওজূদ" 'আকীদার স্থায়ী কেন্দ্র। বিখ্যাত সূফী কবি ইবনু'ল-ফারিদ (র) এই 'আকীদার একজন উৎসাহী প্রচারক ছিলেন। তাঁর কবিতায় ও কাব্যের নানা স্থানে উক্ত মতবাদের ঝলক দেখতে পাওয়া যায়। ৬৩২ হিজরীতে কবি ইনতিকাল করেন। ইবনে তায়মিয়া (র) খোলাখুলিভাবে উল্লিখিত 'আকীদার সমালোচনা ও তা প্রত্যাখ্যান করতেন এবং স্বীয় দরস মাহফিল ও ব্যক্তিগত বৈঠকে তাঁর (ইবনু'ল-ফারিদ-এর) বাণী ও কর্মের সমালোচনা করতে থাকতেন। কেননা তাঁর মতে ওয়াহ্দাতু'ল-ওজূদ 'আকীদা ছিল কুরআন ও সুন্নাহ্র পরিপন্থী এবং এ মতবাদকে তিনি শেষ যুগের সূফী বুযুর্গদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির অন্তর্গত মনে করতেন। তিনি তাঁর গ্রন্থের নানা জায়গায় হযরত শায়খ 'আবদুল কাদির জীলানী (র) ও শায়খ 'আদীয়্যি ইবন মুসাফির উমুবীর ন্যায় মুহাক্কিক ও দৃঢ় বিশ্বাসী সূফী দরবেশের নাম অত্যন্ত আদব, সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁর সমসাময়িক বুযুর্গ, সূফী দরবেশদের সমালোচনা করতে আদৌ ইতস্তত করতেন না, যাঁরা তাঁর মতে গ্রীক দর্শন এবং মিসর ও ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা (اشراق) দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। শায়খ (র)-এর এসব বক্তৃতা ও সমালোচনায় তাসাওউফপন্থী মহলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মিসরের বিখ্যাত শায়খ-ই তরীকত ইবনে 'আতাউল্লাহ্ আল-ইস্কান্দারী (আল-হিকাম প্রণেতা) তাসাওউফপন্থী মহলের পক্ষ থেকে শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট ইবনে তায়মিয়া (র)-র বিরুদ্ধে নালিশ করেন। সূফীদের একটি বড় দল স্বয়ং কেল্লায় গিয়ে ইবনে তায়মিয়া (র)-র নামে অভিযোগ পেশ করে। সুলতান এসব অভিযোগে প্রভাবিত হয়ে 'দারু'ল-'আদল'-এ একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের এবং এজন্য প্রয়োজনীয় তদন্তের নির্দেশ দেন। এ মজলিসে ইবনে তায়মিয়া (র) স্বয়ং অংশ নেন এবং নিজেই নিজের মোকদ্দমার ওকালতি করেন। তাঁর যুক্তিপূর্ণ ও জোরদার বক্তব্যে সবাই নিশ্চুপ মেরে যায় এবং ইমামের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়।

কিন্তু এতেও ইমামের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রশমিত হয় নি। তাঁর বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ ছিল, তিনি প্রকাশ্যে এ কথা প্রচার করেন, আল্লাহ ভিন্ন অপর কারোর দোহাই পাড়া যাবে না এবং স্বয়ং সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যক্তিসত্তার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করাও জায়েয নয়। এ অভিযোগ পেশ হলে কতক 'আলিম-'উলামা বলেন, এতে তো দোষের কিছু নেই (অর্থাৎ একথা বলার জন্য ইমামকে অভিযুক্ত করা চলে না)। কাযীউ'ল-কুযাত কেবল এতটুকু বললেন, এ কথার ভেতর অবশ্যই কিছুটা বেয়াদবী আছে। কিন্তু কেউই বলেনি, একথা কুফরের সীমারেখায় গিয়ে পৌঁছেছে। ফলে এ অভিযোগও মাঠে মারা যায়।

অবশেষে নিত্য দিনের অভিযোগ, বিক্ষোভ ও হৈ-হাঙ্গামায় হুকুমতও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। হুকুমত শায়খ-এর সামনে তিনটি প্রস্তাব পেশ করে এবং তন্মধ্যে যে কোন একটি বেছে নেবার পরামর্শ দেয়ঃ তিনি তাঁর স্বদেশ দামিশ্‌কে ফিরে যাবেন অথবা আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান গ্রহণ করবেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে তাঁকে কতক শর্ত মেনে চলতে হবে, নতুবা তিনি কারাগারে গমন করবেন। শায়খ (র) শেষোক্ত প্রস্তাবটিতে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। কিন্তু তাঁর ছাত্র ও বন্ধু-বান্ধব তাঁকে দামিশ্‌ক সফরে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে এবং তাদের পীড়াপীড়িতে তিনি তা মঞ্জুর করেন এবং ৭০৭ হিজরীর ১৮ই শাওয়াল তারিখে তিনি রওয়ানা হয়ে পড়েন। কিন্তু সেদিনই তাঁকে মিসরে ফিরিয়ে আনা হয় এবং বলা হয়, হুকুমত আপনার জেলখানায় থাকাকেই সঙ্গত মনে করছে। কিন্তু কাযী ও 'আলিম-'উলামা এবার দ্বিধান্বিত ছিলেন এই ভেবে, এবার তিনি কোন্ অভিযোগের কারণে জেলে যাবেন। মালিকী মযহাবের কাযী শামসুদ্দীন আত-তিউনিসী পরিষ্কার ভাষায় বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি (বিধায় তাঁকে জেলে পাঠানো যুক্তি ও ন্যায়নীতি বিরোধী)। নূরুদ্দীন মালিকীও ব্যাপারটা বুঝে উঠতে ও মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। 'আলিম-'উলামা ও বিচারকগণের এই মানসিক টানা-পোড়েন দেখে নিজেই ফয়সালা করেন, তিনি নিজের থেকেই জেলে যাবার জন্য তৈরী। নূরুদ্দীন আয-যাওয়াদী বলেন, তাঁকে এমন জায়গায় রাখা না হোক যা হবে তাঁর মর্যাদা উপযোগী। হুকুমতের পক্ষ থেকে বলা হয়, জেলের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি কোনরূপ আনুকূল্য প্রদর্শন কিংবা বিশেষ সুবিধা প্রদানের তাঁরা বিরোধী। এজন্য তারা আদৌ প্রস্তুত নন। الدولة ماترضى الايمسى الحبس (হুকুমত তো তাকে সেখানেই রাখতে চায় যার নাম জেলখানা)। অনন্তর বিচারকদের বন্দিত্বে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং এ অনুমতি প্রদান করা হয়, খেদমতের জন্য কেউ তাঁর সঙ্গে থাকতে পারে।[১]

---

১. বিস্তারিত জানতে চাইলে দ্র. ইব্‌ন কাছীর, ১৪খ, ৪৬ পৃষ্ঠা।

এই বন্দী দশায় ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) রুটিন মাফিক নিয়মিত কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। এই বন্দিত্ব নজরবন্দীরই নামান্তর ছিল মাত্র। ছাত্র ও 'আলিম-'উলামা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারতেন এবং তাঁর বিদ্যাবত্তা ও পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা থেকে উপকৃত হতে পারতেন। গুরুত্বপূর্ণ মসলা-মাসায়েলের ব্যাপারে তাঁর নিকট ফতওয়াও গ্রহণ করা হত।

কিছুকাল পরই মাদ্‌রাসা-ই-সালিহিয়ায় কাযী ও ফকীহদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্মেলনে আগত মেহমানদের সম্মিলিত ইচ্ছা ও ঐকান্তিক আগ্রহে ইবনে তায়মিয়া (র)-কে মুক্ত করে দেওয়া হয়। জনগণ তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা জানায় এবং পূর্বের তুলনায় আরও বেশী করে লোক তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে।

রাজনৈতিক পরিবর্তন ও ইবনে তায়মিয়া (র)-র ওপর কঠোরতা বৃদ্ধি

অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই মিসরের রাজনৈতিক পরিবর্তন এত দ্রুততার সঙ্গে সংঘটিত হয় যে, ইবনে তায়মিয়া (র)-র জন্য তা বিপদাশংকা বাড়িয়ে তোলে এবং তাঁর প্রতিপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে যা খুশী করবার মওকা পেয়ে যায়। তখন পর্যন্তও মিসরে ও সিরিয়ার প্রকৃত সুলতান ছিলেন নাসির ইবনে কালাউন, যিনি ইবনে তায়মিয়া (র)-র বিদ্যাবত্তা, নিষ্ঠা ও অপরিমেয় মর্যাদার নিদারুণ ভক্ত ছিলেন, ছিলেন সহানুভূতিশীল। ইব্‌নে তায়মিয়া (র)-ই তাঁকে তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে তুলেছিলেন। সুলতান তাঁর বীরত্ব, ঈমানী শক্তি ও দৃঢ়তা নিজেই দেখেছিলেন। ৭০৮ হিজরীতে তিনি (সুলতান কালাউন) অনেকগুলো কারণে বিরক্ত হয়ে সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন এবং কির্ক-এ গিয়ে অবস্থান করার ও সেখানকার সীমিত রাজত্বে তুষ্টি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেন।

তাঁর এই সিদ্ধান্তে রুকন উদ্দীন বায়বার্স জাশনগীরের জন্য মিসরের সিংহাসন ফাঁকা হয়ে যায় এবং তিনি তাঁর স্বায়ত্তশাসিত সালতানাতের ঘোষণা দেন। এখন তিনি মিসর ও শাম (বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, জর্দান ও ফিলিস্তীন)-এর সার্বভৌম শাসক এবং তাঁর শায়খ নসর আল-মুনজী এই বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্যের আধ্যাত্মিক নেতা ও বিশেষ উপদেষ্টা। ইব্‌নে তায়মিয়া (র)-কে তাঁর ধর্মীয় 'আকীদা ও গবেষণালব্ধ অভিমত পোষণ করা ছাড়াও (যিনি শায়খ নসর আল-মুনজীর মানসিক প্রবণতার প্রকাশ্য বিরোধী ছিলেন) স্বয়ং সুলতান নাসির ইবন কালাউনের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সমর্থক ছিলেন বলে মনে করা হত। এজন্য তাঁর বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের পক্ষে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক

দু'টি ক্ষেত্রের মিলন হয়ে যায়। অনন্তর এই পরিবর্তনের পরই ইব্‌ন তায়মিয়া (র)-কে আলেকজান্দ্রিয়ায় নির্বাসন দেবার এবং সেখান নজরবন্দী জীবন যাপনের সরকারী ফরমান জারী হয়। ৭০৯ হিজরীর সফর মাসের শেষ তারিখে তাঁকে আলেকজান্দ্রিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কথিত আছে, হুকুমতের এও একটি উদ্দেশ্য ছিল, তাসাওউফ ও তাসাওউফপন্থীদের প্রাচীন কেন্দ্র এই নতুন শহরে সম্ভবত উগ্রপন্থীদের কেউ (তাদের লালিত 'আকীদা-বিশ্বাসের বিরোধিতার কারণে) তাঁকে হত্যা করুক। অপর দিকে হুকুমতও কোনরূপ বদনাম ও ইলযাম ছাড়াই এই মাথা ব্যথার হাত থেকে মুক্তি পাক।[১]

কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়াতেও শায়খ ইবনে তায়মিয়া (র)-র সত্বর একদল ছাত্র ও ভক্ত জুটে যায় এবং দলে দলে তাঁর নিকট লোকজনের আগমন শুরু হয়। তিনি সেখানেও নিশ্চুপ ও নিষ্ক্রিয় বসে থাকেন নি। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রচার-প্রসার এবং শির্ক ও বিদ'আত প্রত্যাখ্যানই ছিল তাঁর নেশা ও পেশা। সত্বরই জনমনে তাঁর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর ভাই শরফুদ্দীন ইবনে তায়মিয়া, যিনি ছিলেন সেখানকার সাথী ও কারা সহচর, দামিশকবাসীদের উদ্দেশে লিখিত এক পত্রে বলেন ঃ

وانقلب اهل الثغر اجمعين الى الاخ مقبلين عليه مكرمين له وفى كل وقت ينشر من كتاب الله وسنة رسوله ماتقربه عين المؤمنين وذالك شجى فى حلوق الاعداء ـ واستقر عند عامة المؤمنين وخواصهم من اميروقاض وفقيه ـ ومفت وشيخ وجماعة المجتهدين الا من شذ من الاغمار الجهال مع الذلة والصغار محبة الشيخ وتعظيمه وقبول كلامه والرجوع الى امره ونهيه ـ

আমার শ্রদ্ধেয় ভাইয়ের প্রতি আলেজান্দ্রিয়াবাসী খুবই আকৃষ্ট এবং তিনি তাদের মনে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। তিনি সর্বদাই কুরআন ও সুন্নাহর প্রচার-প্রসারে নিমগ্ন থাকেন। এতে একদিকে যেমন ঈমানদারদের চক্ষু শীতল হয়, অপর দিকে শত্রুরা দারুণ মর্মপীড়ায় ভোগে। শায়খ-এর প্রতি ভালবাসা ও মর্যাদাবোধ সকল শ্রেণীর মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত। এদের ভেতর শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তিবর্গ যেমন রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন

১. ইবনে কাছীর, ১৪শ খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা;

বিচারালয়ের কাযী, ফকীহ, মুফতী, সূফী-দরবেশ ও 'উলামায়ে মুজতাহিদও। নিরেট গণ্ডমূর্খ ছাড়া আর সকলেই তাঁর গুণমুগ্ধ ও ভক্তে পরিণত হয়েছেন। তাঁর বাণী ও আলাপচারিতা সকলের নিকট পছন্দনীয় এবং সকলেই অবনত মস্তকে তাঁর নির্দেশ মেনে চলে।

সে সময় আলেকজান্দ্রিয়াতে সাবঈনিয়্যা ফের্কার বাতিল চিন্তাধারা ও ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ মতবাদ বেশ আসন গেড়ে বসেছিল। কতিপয় লোক অত্যন্ত জোরেশোরে ও উৎসাহের সঙ্গে এসব মতবাদ প্রচার করত। বুদ্ধিজীবীদের আসর থেকে নির্গত হয়ে এসব 'আকীদা ও ধ্যান-ধারণা জনগণের নিকট বেশ প্রিয় হয়ে উঠছিল। ঐসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপক বিষয়ের চর্চার ফলে জনসাধারণের আমল-আখলাকের ওপর তার যে কুপ্রভাব পড়তে পারত এবং এর ফলে শরীয়তের প্রকাশ্য বিষয়াদির ক্ষেত্রে যে বল্গাহীন স্বাধীনতা ও দুঃসাহসিকতা প্রদর্শনের মানসিকতা সৃষ্টি হতে পারত তা হচ্ছিল। ইবনে তায়মিয়া (র) অত্যন্ত জোর ও প্রবল উৎসাহের সঙ্গে ঐ সব বাতিল 'আকীদা ও ভ্রান্ত চিন্তাধারার বিরোধিতায় নামেন এবং সে সব প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর আট মাস আলেকজান্দ্রিয়ায় থাকাকালেই ঐ সব বাতিল 'আকীদা ও ভ্রান্ত চিন্তাধারায় ধস নামে এবং ইতর ও ভদ্র সকলেই এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। ইবনে তায়মিয়া (র) এদের অনেককেই তওবা করান এবং এ সব মতবাদ ও আকীদা-বিশ্বাসের একজন নেতৃস্থানীয় প্রচারকও তওবা করে।[১]

ইবনে তায়মিয়া (র) আলেকজান্দ্রিয়ার যে স্থানে অবস্থান করছিলেন সেই স্থানটি ছিল খুবই বিস্তৃত ও নয়নাভিরাম। এর একটি খিড়কি ছিল সমুদ্রের দিকে খোলা, আর একটি ছিল শহর অভিমুখে। লোকে অবাধে তাঁর নিকট আসা-যাওয়া করত এবং তাঁর আলাপচারিতা থেকে উপকৃত হত।

রুকন উদ্দীন জাশনগীরের পতন

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) জাশনগীর ও তাঁর শায়খ-এর পতনের ব্যাপারে প্রকাশ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন এবং বলতেন, زالت ايامه وانتهت رياسته وقرب القضاء اجله "তার দিন ঘনিয়ে এসেছে, তার রাজত্ব শেষ অংকে উপনীত হয়েছে এবং তার নির্ধারিত কাল নিকটবর্তী।" এরপর তার রাজত্ব এক বছরও পেরোয় নি সুলতান নাসির ইবন কালাউন সাম্রাজ্যের শাসনভার পুনরায় স্বহস্তে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন এবং ৭০৯ হিজরীর ১৩ই শা'বান তারিখে তিনি দামিশ্ক অভিমুখে রওয়ানা হন। দামিশ্কবাসীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল

---

১. দামিশ্কবাসীদের নামে শায়খ শরফুদ্দীনের পত্র; ইবনে কাছীর, ১৪শ খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।

হৃদ্যতাপূর্ণ ও গভীর। তারা তাঁকে উষ্ণ ও সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। ১৭ই শা'বান তারিখে সাড়ম্বরে তিনি দামিশ্‌ক প্রবেশ করেন। অতঃপর দামিশ্‌ক থেকে মিসর অভিমুখে রওয়ানা হন। মিসরের জনগণও তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। রুকন উদ্দীন জাশনগীর অতঃপর পরিবর্তিত পরিস্থিতিদৃষ্টে নিজেই ইস্তিফা দেন। ঈদের দিন সুলতানের কাফেলা মিসরে প্রবেশ করে এবং ১১ মাস কয়েক দিন রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনের পর পুনরায় ক্ষমতার রজ্জু তিনি স্বহস্তে ধারণ করেন। জাশনগীর মিসর থেকে পলায়ন করেন। অতঃপর ৭ই যি'লকদ তারিখে সিরিয়ার নায়েব আমীর সায়ফুদ্দীনের হাতে তিনি ধরা পড়েন এবং মিসরে তাকে হত্যা করা হয়।

এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকেরা একমত, জাশনগীর তাঁর প্রধান মন্ত্রিত্বের (مدار المهامى) যুগে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী উযীর ছিলেন। তাঁর স্বশাসিত রাজত্ব ও তাঁর অধঃগতি সাথে সাথেই শুরু হয়। তাঁর রাজত্বের ঘোষণা দেবার পর পরই তাঁর সকল কৃতিত্ব, সৌভাগ্য ও জনপ্রিয়তা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তার পতন কাল শুরু হয়ে যায়। তাঁর আরব্ধ কাজও বিগড়ে যায়। মিসরীয় ঐতিহাসিক মাকরীযী পরিষ্কার লিখেছেন ঃ

وكان رحمه الله خيرا عفيفا كثيرا الحياء وافر الحرمة جليل القدر مهاب السطوة فى ايام امارته فلما تلقب بالسلطنة ورسم باسم الملك اتضع قدره واستضعف جانبه وطمع فيه وتغلب عليه الامراء والمماليك ولم تنجح مقاصده ولاسعد فى شئ من تدبيره الى ان انقضت ايامه واناخ به حمامه -

তিনি (সুলতান রুকন উদ্দীন জাশনগীর) বেশ ভাল, সংযত, সহিষ্ণু, লজ্জাশীল ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী আমীর ছিলেন। কিন্তু যেদিন থেকে তিনি সুলতান উপাধি গ্রহণ করলেন এবং শাহী পোশাক অঙ্গে ধারণ করলেন তাঁর মর্যাদায় ভাটা পড়ল, তাঁকে দুর্বল ভাবা হতে লাগল, লোকে তাঁর বিরুদ্ধে সাহসী হয়ে উঠল। আমীর-উমারা ও গোলাম-নফরেরা মাথা তুলে দাঁড়াল। শেষাবধি তিনি তাঁর লক্ষ্য হাসিলে ব্যর্থ হলেন এবং তাঁর সকল কলা-কৌশলই মাঠে মারা যেতে লাগল। আর এভাবেই তাঁর শাসনকাল শেষ হল এবং তাঁর হায়াত জওয়াব দিয়ে বসল।[১]

---

১. খুতাত-ই মিসর, ২য় খণ্ড, ৪১৮ ;

অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার, তার এই অপ্রত্যাশিত পতন ছিল আল্লাহ্‌র এক মুখলিস দা'ঈ হক-এর বিরোধিতা ও যন্ত্রণা দেবার ফলে। আর এভাবেই তিনি উচ্চারিত নিম্নোক্ত শ্লোকের লক্ষ্যে পরিণত হন ঃ

بس تجربہ کردیم درین دیر مکافات

بادرد کشاں ھر کہ در افتاد بر افتاد

ইবনে তায়মিয়া (র)-র মুক্তি ও শাহী সম্মান লাভ

ইবনে তায়মিয়া (র)-র সমসাময়িক শায়খ আলামুদ্দীন আল-বারযালী বলেন, ঈদের দিন সুলতান যখন মিসরে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর সবচেয়ে বেশী তাড়া ও চিন্তা ছিল ইবনে তায়মিয়া (র)-কে মুক্তি দিয়ে যথোপযুক্ত সম্মান ও তা'জীমের সঙ্গে মিসরে নিয়ে আসার। অনন্তর পরদিনই (৭০২ হিজরীর ২রা শওয়াল) আলেকজান্দ্রিয়াতে সুলতানের তলবনামা গিয়ে পৌছে এবং ৮ই শওয়াল তারিখে তিনি মিসরের উদ্দেশে রওয়ানা হন। বিরাট একদল মানুষ অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে বিদায় জানায়।

ইবনে তায়মিয়া (র) শাহী দরবারে পৌছুলে সুলতান নিজেই কয়েক কদম অগ্রসর হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। সুলতানের সঙ্গে মিসর ও সিরিয়ার কাযী ও প্রখ্যাত 'উলামায়ে কিরামও উপস্থিত ছিলেন। কাযী জামালুদ্দীন ইবনু'ল-কালানিসী নামে সেনাবাহিনীর একজন কাযী এ সময় উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। ইবনে তায়মিয়া (র)-র আগমন ও সুলতান কর্তৃক তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের চাক্ষুষ ঘটনা তিনি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

> সুলতান যখন খবর পেলেন, ইবনে তায়মিয়া (র) পৌছে গেছেন অমনি তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং শাহী দরবারের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে এলেন। সেখানেই দু'জনের মোলাকাত ও কোলাকুলি হয়। সুলতান ইবনে তায়মিয়া (র)-কে সাথে করে শাহী প্রাসাদের সেই অংশের দিকে অগ্রসর হন, যার খিড়কি ছিল রাজোদ্যানের দিকে উন্মুক্ত। সেখানে বসে উভয়ে ঘণ্টা খানেক যাবত একান্তে কথাবার্তা বলেন। অতঃপর পরস্পর হাত ধরাধরি করে দরবারে ফিরে আসেন। এরপর সুলতান সিংহাসনে উপবেশন করেন। সুলতানের ডান পাশে ছিলেন মিসরের কাযী ইবনে জিমা'আ আর বাম পাশে সাম্রাজ্যের উযীর ইবনু'ল-খলীল। ইবনে তায়মিয়া (র) বসেছিলেন সুলতানের সামনে তাঁর মসনদের পাশেই। এ সময় উযীর সুলতানের নিকট দরখাস্ত পেশ করেন, যিম্মী (ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজা)-কুলকে

আগের মতই সাদা পাগড়ী ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হোক।[১] বিনিময়ে তারা শাহী কোষাগারে বার্ষিক সাত লক্ষ দিরহাম অতিরিক্ত রাজস্ব প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছে। এ সময় দরবারীদের মাঝে এক ধরনের নীরবতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এঁদের ভেতর 'আল্লামা ইবনু'য-যামালকানীও ছিলেন। কাযী ও 'আলিমদের প্রতি লক্ষ করে সুলতান এ ব্যাপারে তাঁদের অভিমত জানতে চান। কিন্তু এরপরও তারা মুখ খোলেন নি। এ সময় ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর হাঁটুর ওপর ভর করে বসে পড়েন এবং অত্যন্ত আবেগোদ্দীপনা ও ক্রোধের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন এবং উযীরকে কড়া ভাষায় জেরা করতে থাকেন। এ সময় তাঁর কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চ গ্রামে উঠছিল এবং সুলতান তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করছিলেন। সে সময় ইবনে তায়মিয়া (র) এভাবে কথাবার্তা বলেন যেভাবে কথা বলতে অপর কেউ সাহস করতে পারত না। তিনি সুলতানকে সম্বোধন করে বলেন ঃ নিতান্তই আফসোসের বিষয় হবে, (সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির পর) আপনার এই প্রথম দরবারের উদ্বোধন এমন কোন কার্যের দ্বারা হয় যদ্দারা আপনি এই নশ্বর পৃথিবীর নিকৃষ্ট স্বার্থের জন্য যিম্মীদের কোন সহায়তা করেন। আল্লাহ্ পাক আপনার ওপর কত বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, আপনার হৃত সাম্রাজ্যকে আপনার হাতেই ফিরিয়ে দিয়েছেন, আপনার শত্রুকে হেয় ও অপমানিত করেছেন এবং আপনার প্রতিপক্ষের ওপর আপনাকে জয়যুক্ত করেছেন। এতদ শ্রবণে সুলতান বললেন, এ আইন তো জাশনগীরের তৈরী। জওয়াবে ইবনে তায়মিয়া বললেন ঃ এটা তো আপনারই ফরমানে হয়েছিল, সে সময় জাশনগীর আপনারই নায়েব ছিলেন। সুলতান ইবনে তায়মিয়া (র)-র এই সত্য কথনে অত্যন্ত প্রীত হন এবং উক্ত আইন পূর্বের মতই বহাল থাকে।[২]

---

১. বিগত দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা 'আলিমদেরকে এই সিদ্ধান্তে পৌছুতে বাধ্য করেছিল, ইসলামী সাম্রাজ্যের অমুসলিম প্রজাদের পোশাক-পরিচ্ছদে কিছু বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্নাদি থাকা দরকার। ক্রুসেড যুদ্ধের পর মিসর ও সিরিয়ায় এমন বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টান থেকে গিয়েছিল যারা এসব দেশের জন্মসূত্রে নাগরিক ছিল না, বরং তারা ভিন দেশ থেকে এসেছিল। এরা বহিরাক্রমণকারীদের পক্ষে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে গুপ্তচর বৃত্তি করত। এ ছাড়াও তারা মুসলিম সমাজ জীবনে অনুপ্রবেশ করে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করত। ৭২১ হিজরীর সংঘটিত ঘটনাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে ইব্‌নে কাছীর লিখেছেন, ২রা জুমাদা'ল-উলা তারিখে কায়রো শহরে বিস্ময়করভাবে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে! সুদৃশ্য ঘর-বাড়ী, আলীশান মহল, বেশ কিছু মসজিদ এই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লোকেরা এই দুর্ঘটনায় এতটাই অভিভূত ছিল যে, মসজিদে মসজিদে কুনূতে নাযিলা পড়া হয়। পরে তদন্তে দেখা যায়, কতিপয় দুষ্ট খ্রিস্টানের শয়তানীই এর জন্য দায়ী। তারপর থেকে এই নির্দেশ জারী করা হয়, খ্রিস্টানেরা নীল রঙের পোশাক পরিধান করবে, পাগড়ীতে ঘন্টি বাঁধবে এবং কোথাও তাদের সাহায্য-সহায়তা গ্রহণ করা হবে না। এরপর অগ্নিকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি আর ঘটে নি। এসব অভিজ্ঞতার পর কিছুকাল থেকে মিসরের খ্রিস্টানদের ওপর নির্দেশ ছিল, তারা যরদ বর্ণের পাগড়ী পরবে। সুলতান নাসিরের পুনরাগমনে খ্রিস্টানেরা উক্ত নির্দেশ বাতিল করার প্রয়াস চালিয়েছিল।

২. ইবনে কাছীর, ১৪শ খণ্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা।

মিসরে সুন্নতে য়ূসুফী

ইবনু'ল-কালানিসী বলেন, স্বয়ং ইবনে তায়মিয়া (র) আমাকে বলেছেনঃ সুলতান যখন আমাকে একান্তে ডেকে নিলেন তখন তিনি আমাকে সে সব কাযীকে হত্যার ব্যাপারে ফতওয়া চান যারা জাশনগীরকে সমর্থন করেছিল এবং সুলতানকে অপসারণের ব্যাপারে ফতওয়া প্রদান করেছিল। তিনি আমাকে সেই ফতওয়া বের করে দেখিয়েছিলেনও। এরই সাথে তিনি আমাকে এও বলেন ঃ ঐ সমস্ত লোকই আপনার বিরুদ্ধে হাঙ্গামা বাঁধিয়েছিল এবং আপনাকে কষ্ট দিয়েছিল। সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল, আমি যেন তাঁর কথায় প্রভাবিত হয়ে তাদেরকে হত্যার ফতওয়া দিই। আমি তাঁর মতলব ধরে ফেলি এবং আমি ঐ সমস্ত কাযী ও 'আলিম-উলামার প্রশংসা করতে শুরু করি এবং সুলতানের দ্বারা তাঁদের কোন ক্ষতি হোক তারও ভীষণ বিরোধিতা করি। আমি সুলতানকে বলি ঃ আপনি যদি তাঁদেরকে হত্যা করেন তবে এতে আপনার কি লাভ? আপনি তো তাঁদের বিনিময় পাবেন না। তিনি এরপরও আমাকে (উত্তেজিত করবার জন্য)বললেন ঃ আপনার ক্ষতি করবার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি তারা করে নি এবং আপনাকে হত্যা করবার জন্য তারা বারবার ষড়যন্ত্র করেছে। আমি বললাম ঃ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে আমার নীতি হল, কেউ যদি আমাকে কষ্ট দেয় তজ্জন্য তার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আমি তাকে সম্পূর্ণরূপে মাফ করে দিই। আর কেউ যদি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূলের সঙ্গে অপরাধ করে থাকে তাহলে আল্লাহ নিজেই তার বদলা নেবেন। আমি আমার নিজের ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ করি না। এভাবে আমি তাঁকে বোঝাতে থাকলাম। শেষাবধি সুলতান তাঁদের অপরাধ ক্ষমা করলেন।[১]

ইবনে কাছীর লিখেন, মিসরে ইবনে তায়মিয়া (র)-র সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী মালিকী মযহাবের কাযী ইবনে মাখলূফ বলতেন ঃ আমরা ইবনে তায়মিয়ার মত উদার হৃদয়বিশিষ্ট কোন মানুষ আর দেখিনি। আমরা তাঁর বিরুদ্ধে সুলতানকে উত্তেজিত করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি (যদিও আমরা তাতে সফল হইনি)। কিন্তু তিনি যখন ক্ষমতা পেলেন, তখন আমাদের সবাইকে পরিষ্কার মাফ করে দিলেন। শুধু তাই নয়, বরং আমাদের হয়ে ওকালতি করলেন।[২]

সুলতানের সঙ্গে বৈঠকের পর শায়খ (র) কায়রোয় এলেন এবং আগের মতই পঠন-পাঠন, সংস্কার-সংশোধন ও তাবলীগী কর্মে মগ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর মুক্তির খবর পেয়ে আগ্রহী ও অত্যুৎসাহী বিদ্যার্থী, তাঁর ভক্ত ও অনুরক্তবৃন্দ

---

১. ইবনে কাছীর, ১৪শ খণ্ড, ৫৪ পৃ.। ২. প্রাগুক্ত।

চতুর্দিক থেকে ধেয়ে আসতে লাগল। শহরের 'আলিম-'উলামা' হাযির হয়ে নিজেদের ভুলের স্বীকৃতি দিতে লাগলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি সবাইকেই বলে দিলেন, কারোর বিরুদ্ধেই তাঁর কোন অভিযোগ নেই কিংবা কোন দাবী নেই। সবাইকেই তিনি মাফ করে দিয়েছেন। অতঃপর এদিক থেকে পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে এবং তাঁর মিশনের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য তাঁকে রাজধানীতে থাকতে হবে অনুমান করে তিনি বাড়ীতে একটি দীর্ঘ পত্র দেন। পত্রে তিনি তাঁর অবস্থার কথা লিখে জানান এবং কিছু জরুরী কিতাব চেয়ে পাঠান।

ইবনে তায়মিয়া (র)-র সম্মানজনক মুক্তি লাভের পর যখন তাঁর বিরোধীরা দেখতে পেল, তাঁর সৌভাগ্য তারকার আরও সমুন্নতি ঘটেছে এবং কোন

'ইল্মী সমস্যার ভিত্তিতে এখন আর তাঁর বিরুদ্ধে হাঙ্গামা সৃষ্টি করা কঠিন তখন তারা জনসাধারণকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করে। আর ইবনে তায়মিয়া (র)-র বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করা (অন্তত মিসরে ও যেখানে জনসাধারণ তাঁর সম্পর্কে খুব বেশী ওয়াকিফহাল ছিল না) খুব বেশী কঠিন কাজ ছিল না। অনন্তর ৭১১ হিজরীর ৪ঠা রজব তারিখে কতিপয় কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক তাঁর ওপর হাত তোলে এবং তাঁকে যাতনা দেয়। কিন্তু এই খবর হুসায়নিয়্যা মহল্লায় [সাধারণ প্রসিদ্ধি অনুসারে যেখানে সায়্যিদুনা হুসায়ন (রা)-এর মস্তক মুবারক দাফন হয়েছে][১] পৌছুতেই তথাকার অধিবাসীরা শায়খ (র)-এর ওপর হামলার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে জমায়েত হয়। শায়খ (র) তাদেরকে এ থেকে নিবৃত্ত রাখেন এবং বলেন ঃ

اماان يكون الحق لى اولكم اولله فان كان الحق لى فهم فى حل منه وان كان لكم فان لم تسمعوا منى ولم تستفتونى فافعلوا ماشئتم وان كان الحق لله فالله ياخذ حقه ان شاء -

দেখ, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনটি পথ খোলা রয়েছে। প্রতিশোধ গ্রহণ যদি আমার অধিকারে থাকে তাহলে আমি ঘোষণা দিচ্ছি, আমি আমার সে অধিকার প্রত্যাহার করছি। কারোর বিরুদ্ধেই আমার কোন অভিযোগ কিংবা দাবী নেই। আর প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার তোমাদের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে

১. এই জনশ্রুতির বিরদ্ধে ইমাম ইবনে তায়মিয়ার নামে رأس سيدنا حسين নামে একটি পুস্তিকা রয়েছে।

সেক্ষেত্রে তোমরা যদি আমার কথা মানতে প্রস্তুত না হও কিংবা সে বিষয়ে আমার নিকট কিছু জানতেও না চাও তাহলে তোমাদের অভিরুচি। কিন্তু এ অধিকার যদি আল্লাহ্‌র হয় তাহলে তিনি চাইলে সে অধিকার তিনিই আদায় করবেন।

ইতোমধ্যেই 'আসরের ওয়াক্ত এসে যায়। ইমাম জামি' মসজিদে (সম্ভবত জামি' হুসায়নীতে) জামা'আতে শরীক হবার জন্য যেতে উদ্যত হলে তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা (বিপদ হবে ভেবে) তাঁকে বাধা দেয়। কিন্তু শায়খ (র) কোনরূপ বাধার তোয়াক্কা না করে মসজিদ যান। সঙ্গে গেল তাঁর বিরাট একদল অনুরক্ত সমর্থক।

এরপর একবার এক প্রকাশ্য মজলিসে একজন 'আলিম তাঁকে খুব কঠোর ভাষায় গালমন্দ করেন। পরে উক্ত আলিম তাঁর ভুল বুঝতে পারেন কিংবা তিনি আশঙ্কা করেন হুকুমতের তরফ থেকে কোন শাস্তি নেমে আসে এর জন্য। তিনি শায়খ (র)-এর নিকট ক্ষমা চান। শায়খ (র) খোলা মনে তাঁকে ক্ষমা করে দেন এবং বলেন, لا انتصر لنفسى "আমি আমার নিজের ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ করি না।"[১]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর মিসর অবস্থানকালে কেবল পঠন-পাঠন ও কুরআন-সুন্নাহ্‌র প্রচার-প্রসারের মাঝেই নিজেকে সীমিত রাখেন নি, বরং রাজধানীতে অবস্থানের সুযোগে তিনি সুলতানকে মূল্যবান পরামর্শ দেন এবং সুলতানকে দিয়ে কতগুলো জরুরী উপকারী ফরমানও জারী করান। ইবনে কাছীর লিখেছেন, ৭১২ হিজরীতে দামিশকে সুলতানের ফরমান এসে পৌঁছায়, আর্থিক উপহার কিংবা কোন প্রকার ঘুষের বিনিময়ে যেন কাউকে কোন পদে নিযুক্ত করা না হয়। কেননা এর স্বাভাবিক পরিণতি হবে এই ঃ অযোগ্য, অবিশ্বস্ত ও দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরা দায়িত্বশীল পদে এসে যাবে এবং যোগ্য, সৎ ও বিশ্বস্ত লোকেরা বঞ্চিত হবে। ইবনে কাছীর বলেন, এই ফরমান ইবনে তায়মিয়ার প্রস্তাব ও প্রচেষ্টারই ফল ছিল।[২] ঠিক তেমনি আরো একটি ফরমান জারী হয়, হত্যাকারী তথা খুনীর ওপর কোন প্রকার জুলুম কিংবা বাড়াবাড়ি করার এখতিয়ার কারোর নেই। হুকুমত তাকে গ্রেফতার করবে এবং শরীয়ত মুতাবিক তার থেকে কিসাস (বদলা, খুনের বদলে খুন) গ্রহণ করবে। ইবনে কাছীর বলেন, এটাও ছিল ইবনে তায়মিয়ার প্রস্তাবনার ফসল।[৩]

---

১. মুহাম্মদ আবূ যুহরাকৃত, ইবনে তায়মিয়া।

২. ইবনে কাছীর, ১৪শ খণ্ড, ৬৬ পৃ.।

৩. ইবনে কাছীর, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৬।

দামিশ্‌ক প্রত্যাবর্তন

৭১২ হিজরীর শওয়াল মাসে তাতারীদের হামলার অভিপ্রায়ের খবর উপর্যুপরি এসে পৌছুচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সুলতান নিজে মিসর থেকে বেরিয়ে তাদের মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ৮ই শওয়াল তারিখে দামিশ্‌ক অভিমুখে রওয়ানা হন। ২৩ শে শওয়াল তারিখে তিনি দামিশ্‌ক প্রবেশ করেন। সুলতানের সঙ্গে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)ও ছিলেন যিনি পুরো সাত বছর পর তাঁর স্বগৃহ মা'লূফ-এ আসলেন। লোকে তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানায়। শহরের অধিবাসীবৃন্দ তাদের আনন্দ প্রকাশ করে। পুরুষ ছাড়া বহু মহিলাও তাঁকে এক নজর দেখবার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসে। শায়খ-এর এ সফর ছিল জিহাদের নিয়তে। কিন্তু দামিশ্‌কে এসে যখন তিনি জানতে পারেন, তাতারী বাহিনী ফিরে গেছে, তখন তিনি দামিশ্‌ক থেকে বায়তুল-মুকাদ্দাস যিয়ারতের নিয়ত করেন। সেখানে কিছু দিন অবস্থানের পর আরও কয়েকটি জায়গা পরিদর্শন শেষে ১লা যী-কা'দাহ তারিখে তিনি দামিশ্‌ক প্রত্যাবর্তন করেন এবং সার্বক্ষণিকভাবে নিজের কাজে মশগুল হয়ে পড়েন।

ফিক্‌হী মসলা-মাসাইলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান

এবার দামিশ্‌ক প্রত্যাবর্তনের পর যদিও শায়খুল ইসলাম তাঁর পুরনো ধর্মীয়, তত্ত্বগত ও সংস্কার-সংশোধনমূলক কর্মে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন এবং অভ্যাস মাফিক পঠন-পাঠন, ফতওয়া প্রদান ও লেখার কাজ শুরু করে দেন, কিন্তু এবার তাঁর ভেতর একটি লক্ষণীয় পরিবর্তন ছিল এই, এ যাবত তাঁর অধিকাংশ মনোযোগ ইসলামের 'আকীদা ও মূলনীতি এবং 'ইলমে কালামের সে সমস্ত সমস্যার দিকে ছিল যে সব সমস্যা আশ'আরীপন্থী ও হাম্বলী মযহাবের অনুসারী 'আলিমগণের মধ্যে বিতর্কের কেন্দ্র হিসাবে বিরাজ করছিল। কিন্তু এবার তাঁর বিশেষ মনোযোগ ফিকহী মাসাইল ও তার অন্তর্গত খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে নিবদ্ধ হয়। মনে হচ্ছিল, এবার তিনি অনুভব করেন, তিনি প্রথমোক্ত বিষয়বস্তুর ওপর প্রয়োজন মাফিক উপকরণ ও দলীল-প্রমাণ সরবরাহ করেছেন এবং তাঁর বক্তৃতামালা, শিক্ষকতা ও লেখনী দ্বারা সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে। এবার তিনি তাঁর তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য ও আল্লাহপ্রদত্ত মেধাগত যোগ্যতা নিয়ে ফিকহী মসলা-মাসাইলের দিকে মনোনিবেশ করেন।

কয়েক পুরুষ ধরে ইবনে তায়মিয়া (র)-র খান্দান হাম্বলী মযহাবের অনুসারী হিসাবে চলে আসছিলেন। স্বয়ং ইবনে তায়মিয়া (র)-র অধিকাংশ ফতওয়া হাম্বলী মযহাবানুসারী। কিন্তু তাই বলে তিনি আপাদমস্তক হাম্বলী মযহাবের আনুগত্য করেন নি। কুরআন ও সুন্নাহর বিপুল ভাণ্ডারের ওপর তাঁর যেমন গভীর পাণ্ডিত্য

ও দখল ছিল, ফিকহী মযহাবের মূলনীতি ও প্রমাণপঞ্জীর ব্যাপারে তাঁর যেমন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল, এরপর তাঁর পক্ষে হাম্বলী মযহাবের চৌহদ্দীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা এবং শতকরা এক শ' ভাগ ক্ষেত্রেই তার আনুগত্য মেনে চলা কষ্টকর ছিল। সেজন্য তিনি কতক মুহূর্তে ইমাম চতুষ্টয়ের মযহাবের ভেতর সেই মযহাবকেই অগ্রাধিকার দিতেন যাঁর দলীল-প্রমাণ তাঁর নিকট অধিকতর শক্তিশালী মনে হত এবং যাঁর সঙ্গে সাহাবা-ই-কিরাম ও তাবিঈদের অধিকাংশ জামা'আতের ঐকমত্য থাকত। তিনি তাঁর গভীর জ্ঞান, কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে মসলা বের করার শক্তি ও চিন্তার দৃঢ়তা সত্ত্বেও ইমাম চতুষ্টয়ের জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা, সর্বোত্তম ইজতিহাদ, সাধুতা, আল্লাহভীতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্যের স্বীকৃতি দিতেন। তাঁর মতে, তাঁরা (ইমাম চতুষ্টয়) ছিলেন সত্যান্বেষী, সুন্নাহ্‌র দৃঢ় অনুসারী ও গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তাঁদের ইজতিহাদের মৌল উৎস ছিল কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে নববী, কুরআন ও হাদীসের নস (نص), পরিষ্কার ও সুপ্রকাশিত আল্লাহ্‌র বিধানসমূহ, ইজমা' ও শর'ঈ কিয়াস এবং এ ব্যাপারে তিনি আনুগত্য পোষণকারী ছিলেন, বিদ'আতী (مبتدع) ছিলেন না। আর এজন্য তিনি স্বীয় যুগের সেই সমস্ত এলাকাকে খুবই অপসন্দ করতেন যারা ইমাম চতুষ্টয় সম্পর্কে বল্গাহীন উক্তি ও ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করত। ঐ সব লোকের মুখ বন্ধ ও মুজতাহিদ ইমামদের সমর্থন ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশে তিনি دفع الملام عن الائمة الاعلام নামে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। পুস্তিকাটি এতসংক্রান্ত বিষয়ে অন্যতম সর্বোত্তম পুস্তিকা। পুস্তিকার প্রারম্ভে তিনি লেখেন ঃ

يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القران وخصوصا العلماء الذين هم ورثة الانبياءالذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم فى ظلمات البروالبحر -وقد اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم اذ كل امة قبل مبعث محمد (صلى الله عليه وسلم) علمائها شرارها الا المسلمين فان علمائهم خيارهم فانهم خلفاء الرسول فى امته والمحيون لمامات من سنته بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا و ليعلم انه ليس احد من الائمة المقبولين عندالامة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شئ من سنة دقيق ولاجليل فانهم متفقون اتفاقا

يقينياعلى وجوب اتباع الرسول وعلى ان كل احد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا وجد لو احد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلابد له من عذر فى تركه ، وجميع الاعذار ثلاثة اصناف (احدها) عدم اعتقاده ان النبى (صلى الله عليه وسلم) قاله (والثانى) عدم اعتقاده ارادة تلك المسئلة بذالك القول (والثالث) اعتقاده ان ذالك الحكم منسوخ -

কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট নির্দেশ মুতাবিক আল্লাহ্ ও তদীয় রসূলের প্রতি ভালবাসার পরই ঈমানদারদের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসার হাত বড়িয়ে দেওয়া তথা তাদেরকে ভালবাসা ওয়াজিব, বিশেষত সেসব 'আলিম-'উলামার বন্ধুত্ব ও ভালবাসা যাঁরা আম্বিয়া-ই কিরামের ওয়ারিছ ছিলেন এবং যাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা সে সব মর্যাদা দান করেছেন যার সাহায্যে আঁধারে আলো ও পথের সন্ধান মেলে। সকল মুসলিম এ ব্যাপারে একমত, এসব হযরত হেদায়েত ও জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। হযরত (সা.) -এর নবূওত লাভের পূর্বে অপরাপর (নবীদের) উম্মতের 'আলিম সম্প্রদায় (তাদের অপকর্মের কারণে সবচে' নিকৃষ্ট সম্প্রদায় ছিল। কিন্তু এই উম্মতের আলিম সম্প্রদায় সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট সম্প্রদায়। তাঁর কারণ, তাঁরাই হচ্ছেন এই উম্মতের ভেতর রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী। তাঁরা সুন্নাহ্র জীবিতকারী, তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ্র কিতাবের রওনক বৃদ্ধি পায়, তার প্রচলন ঘটে এবং তাঁরাই এর পতাকাবাহী। আল্লাহ্র কিতাব কুরআনুল করীমের তাঁরাই মুখপাত্র ও ব্যাখ্যাতা, কুরআনই তাঁদের রসনার পরিচ্ছদ এবং এটাই তাঁদের প্রমাণপঞ্জী। মনে রাখা দরকার, ঐ সকল ইমামের মধ্যে যাঁরা সাধারণভাবে মুসলমানদের আস্থাভাজন ও জনপ্রিয়, এমন একজনও ছিলেন না যিনি জেনেশুনে রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের কোন ছোট কিংবা বড় সুন্নতের বিরোধিতা করেছেন। কেননা তাঁরা সবাই নিশ্চিতই এ ব্যাপারে একমত ছিলেন, হুযূর আকরাম (সা.)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ ওয়াজিব এবং তিনিই একমাত্র সত্তা যাঁর সমস্ত কথা, বিধি-বিধান অবশ্য গ্রহণীয় (অন্যথায় অপর যে কারোর কোন কথা কবুল করাও যেতে পারে, আবার পরিত্যাগ

করাও যেতে পারে)। ঐ সব ইমামের ভেতর যদি কারোর এমন কোন কথা পাওয়া যায় যা কোন সহীহ হাদীসের বিরোধী তাহলে বুঝতে হবে অবশ্যই উক্ত ইমামের এ বিরোধিতার পেছনে সঙ্গত কোন কারণ থেকে থাকবে, ওযর থাকবে উক্ত হাদীস তরক করার। এ ওযর তিন ধরনের হতে পারে ঃ প্রথমত, উক্ত ইমাম স্বীকারই করেন না, নবী করীম (সা.) এমনটি বলেছেন এবং হাদীসটি বিশুদ্ধ। দ্বিতীয়ত, তাঁর ধারণা, এই হাদীস থেকে এ মসলা বেরিয়ে আসে না এবং এটা হাদীসের মর্ম নয়। তৃতীয়ত, তাঁর গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্ত হল, এ হুকুম মনসূখ হয়ে গেছে।[১]

তিন তালাকের মসলা

যেভাবে তিনি কতক মুহূর্তে হাম্বলী মযহাবের নির্ধারিত গণ্ডীর বাইরে পা ফেলেছেন এবং প্রাপ্ত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে অপরাপর মযহাবের অগ্রাধিকার দান করেছেন, ঠিক তেমনি কতক মসলার ক্ষেত্রে তিনি মযহাব চতুষ্টয়ের বিরুদ্ধেও ফতওয়া দিয়েছেন এবং তাঁর নিকট সরাসরি প্রাপ্ত কুরআন ও সুন্নাহ্র নস ও দলীল-প্রমাণের অনুসরণ করেছেন। এ ধরনের মসলার সংখ্যা (যেখানে সামগ্রিকভাবে তিনি ইমাম চতুষ্টয়ের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন) সাকুল্যে দু'চারটের বেশী হবে না। এসবের ভেতর সবচে' বিখ্যাত মসলা হল একই মজলিসে তিন তালাকের মসলা।

মসলাটি হল, যদি কেউ তার স্ত্রীকে এক মজলিসে তিন তালাক (চাই একবার শব্দোচ্চারণ করেই হোক কিংবা কয়েকবার ভিন্ন ভিন্ন শব্দোচ্চারণ করেই হোক) দিয়ে দেয় তাহলে ইমাম ও মুসলিম উম্মাহ্র ঐকমত্যে উপরিউক্ত ব্যক্তি বিদ'আতী কথা উচ্চারণ করেছে এবং শরীয়তবিরোধী কর্ম করেছে এবং গোনাহগার হয়েছে, কিন্তু তার প্রদত্ত তালাকের বিধান কি? অর্থাৎ এক্ষেত্রে তালাক হবে কিনা এবং তার স্ত্রী তার জন্য বায়েন হবে কি? শরীয়ত মাফিক উক্ত স্বামী রজ'ঈ তালাকের ন্যায় তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে কি? শরীয়তের বিধান মাফিক তার জন্য তা সম্ভব হবে কি? (যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অপর কোন পুরুষের সঙ্গে নিকাহর আওতায় আসবে, তার সঙ্গে সহবাসের স্বাদ গ্রহণ করবে, অতঃপর কোন কারণে তাকে আবার তালাক দেবে, অতঃপর প্রথমোক্ত স্বামী তাকে পুনরায় বিয়ে না করবে) অথবা তিন তালাক এক তালাক হিসাবেই গণ্য হবে? এবং উক্ত স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যাবে। ইমাম চতুষ্টয়, ফিক্হ ও

---

১. دفع الملام عن الائمة الاعلام

হাদীসশাস্ত্রের ইমাম (ইমাম আওযা'ঈ, ইবরাহীম নাখ'ঈ, সুফিয়ান ছওরী, ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়হ, আবূ ছওর বুখারী), জমহূর সাহাবা ও তাবিঈদের অভিমত হল, বিদ'আত ও গোনাহে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এমতাবস্থায় তিন তালাকই আরোপিত হবে এবং (বিনা তাহলীলে) স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন সম্ভব হবে না। ইমাম নববী (র) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

وقداختلف العلماءفى من قال لامرأته انت طالق ثلاثا فقال الشافعى ومالك وابوحنيفة واحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث ـ

'আলিমদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, "তোমাকে তিন তালাক দিলাম" এমতাবস্থায়, ইমাম শাফি'ঈ, মালিক, আবূ হানিফা, আহমদ (ইবনে হাম্বল) এবং পূর্ব ও পরবর্তী যুগের সমস্ত আলিমের মতেই তা তিন তালাক হিসাবে গণ্য হবে।

'আল্লামা ইবনে রুশ্‌দ 'বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

جمهور فقهاءالامصار على ان الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقه الثالثة ـ

সকল বিজ্ঞ ফকীহ এ ব্যাপারে একমত, একই সঙ্গে তিন তালাক উচ্চারণ করলে তা তিন তালাক হিসাবেই বিবেচিত হবে।

শায়খুল ইসলামের প্রিয় শাগরিদ হাফিজ ইবনে কায়্যিম যাদু'ল-মা'আদ নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

وهذا قول الائمة الاربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة ـ

ইমাম চতুষ্টয়, সকল তাবি'ঈ ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম এ মতই পোষণ করেন।

ঐ সকল হযরতের প্রমাণপঞ্জীর ভেতর কতিপয় মরফু' হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে যদ্দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূল আকরাম (স) এই সব ক্ষেত্রে তিন তালাক কিংবা তিন তালাকের অতিরিক্ত তালাককে তিন তালাক হিসাবেই অভিহিত করেছেন এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যাবার পক্ষে ফতওয়া দিয়েছেন।[১]

১. এসব হাদীসের সনদ ও মতনের ওপর অপর পক্ষ আপত্তি তুলেছেন এবং প্রথম পক্ষ সেসব আপত্তির মুহাদ্দিসসুলভ জওয়াব দিয়েছেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র) এবং তাঁর কতক সাথী-বন্ধু ও শাগরিদের অভিমত এই যে, এই তিন তালাক (অর্থাৎ একই বৈঠকে একই মুখে) এক তালাক ও তালাক-ই রাজ'ঈ হিসাবে পরিগণিত হবে এবং এরপর স্বামী তার স্ত্রীকে এভাবে ফিরিয়ে নিতে পারবে যেভাবে একবার এক তালাকের পর ফিরিয়ে নিতে পারে। তিনি লিখেছেন ঃ

وهذا القول منقول عن طائفة من السلف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الزبير ابن عوام وعبدالرحمن بن عوف ويروى عن على وعن ابن مسعود وابن عباس وهو قول داؤد واكثر اصحابه ويروى عن ابى جعفر احمد (الباقر) ابن على بن حسين وابنه جعفر (الصادق) ولهذا ذهب الى ذلك من ذهب من الشه عة ـ

আর এই অভিমত রসূল আকরাম (স)-এর একদল বিশিষ্ট সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে। এঁদের মধ্যে রয়েছে যুবায়র ইবনে 'আওয়াম, আবদুর রহমান ইবনে 'আওফ (রা)। হযরত আলী, ইবনে মাস'উদ ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এর সপক্ষে একটি মত পাওয়া যায়। আর এটাই ইমাম দাউদ জাহিরী ও অধিকাংশ সাহাবীর মত। এ ছাড়া আবূ জা'ফর মুহাম্মদ (আল-বাকির) ইবনে আলী ইবনে হুসায়ন ও তৎপুত্র জা'ফর (আস-সাদিক)-এর অভিমতও তাই। আর তাই শী'আদের একটি মযহাবও এই মত গ্রহণ করেছে।[১]

শায়খুল ইসলাম তাঁর এই মতের সমর্থনে কুরআন, হাদীস ও কিয়াস থেকে প্রমাণপঞ্জী পেশ করেছেন।[২]

এই মসলার ক্ষেত্রে ঘটনা এই, চাই এ ব্যাপারে তিনি একা না-ই হন এবং তাঁর পূর্বে প্রাচীন যুগের 'উলামায়ে মুজতাহিদীনের কেউ এ মতও পোষণ করুন, তবুও এ বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নেই, এর খ্যাতি ও শোহরত তাঁর ব্যক্তিসত্তার দ্বারাই হয়েছিল এবং এর পতাকা বহন তিনিই করেছিলেন। আর সেজন্যই যখন তিনি এ মসলার ক্ষেত্রে তাঁর পর্যালোচনা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পেশ করলেন এবং স্বীয় মতামত প্রকাশ করলেন অমনি সাধারণভাবে ফকীহ মহলে এক ধরনের বিস্ময় ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হল।

---

১. ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮।

২. বিস্তারিত আলোচনা ও প্রমাণপঞ্জীর জন্য ইবনে কায়্যিম-এর যাদুল-মাআদ بحث فى من طلق ثلاث بكلمة واحدة ৪র্থ খণ্ড এবং اغاثة اللهفان দ্র.

হলফ বি'ত-তালাক-এর মসলা ও ইবনে তায়মিয়ার নজরবন্দী

সে যা-ই হোক, এক সঙ্গে তিন তালাকের মসলা ছিল নির্ভেজাল ফিক্‌হী মসলা এবং ছিল ঘরোয়া ও পারিবারিক সমস্যা যার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দেখা দিত একটি খান্দানের সামগ্রিক জীবন ও যিন্দেগীর ওপর। কিন্তু দ্বিতীয় যে মসলাটির ব্যাপারে তিনি মযহাব চতুষ্টয় ও বিখ্যাত মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত মত পোষণ করেন এবং যে বিষয়টি পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেন, রাজনীতি ও রাজা-প্রজার পরস্পরের সম্পর্ককে পর্যন্ত প্রভাবিত করত তা ছিল হলফ বি'ত-তালাক-এর মসলা।

সে যুগে হলফ বি'ত-তালাক-এর রেওয়াজ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকে কোন কথার ওপর অত্যধিক জোর ও গুরুত্ব দেবার জন্য অথবা স্বীয় বক্তব্য ও কথার সত্যতা কিংবা দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে অবলীলায় তালাকের আশ্রয় গ্রহণ করত এবং কথার মাঝখানে তালাক টেনে নিয়ে আসত। যেমন, আমি অবশ্যই এমনটি করব, অন্যথায় আমার স্ত্রী তালাক (على الطلاق لافعلن كذا) অথবা এ আমি কখ্‌খনোই করব না, করলে তালাক (على الطلاق لامتنعن عن كذا) কিংবা তোমাকে এমনটি করতে হবে, নইলে স্ত্রী তালাক (على الطلاق لتفعلن كذا) অথবা আমি এই জিনিষ এত মূল্যে খরিদ করেছি, যদি ভুল বলে থাকি তবে স্ত্রী তালাক (على الطلاق اشتريتها بكذا)। ইবনে তায়মিয়া (র) দেখতে পেলেন, আসলে এটা এক ধরনের কসম (শপথ) এবং তাকীদ প্রদানের একটি পন্থা। কিন্তু লোকে জোর দেবার ও নিশ্চিত বিশ্বাস উৎপাদনের উদ্দেশে কথার মাঝখানে অনর্থক তালাক কথাটি টেনে আনে, অথচ এ ক্ষেত্রে তার আসল মকসূদ তালাক নয়, থাকেও না। প্রকৃতপক্ষে এটি এক প্রকার কসম। কিন্তু একে ভুল বুঝে শর্তাধীনে তালাক (طلاق معلق) ধরে নিয়ে এক্ষেত্রে তালাকের বিধান প্রয়োগ করছে এবং এতে শত শত ঘর ও পরিবার শুধু এ কারণেই ভেঙে যাচ্ছে এবং দাম্পত্য ও পরিবারিক জীবনে গভীর সংকট ও বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে।

এরপর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের যুগ থেকে বায়'আত (খলীফার প্রতি আনুগত্যের শপথ) দৃঢ় ও অধিকতর মযবুত করবার উদ্দেশে বায়'আতের বাক্যের মধ্যে তালাক শব্দটি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই শব্দটি বায়'আতের অংশে পরিণত হয়েছে ঃ যদি আমি অমুকের প্রতি আনুগত্যের শপথ প্রত্যাহার করি তাহলে আমার বিবি তালাক। ইবনে তায়মিয়া (র) এই মসলা নিয়ে গভীর

চিন্তা-ভাবনার পর ফতওয়া দিতে শুরু করেন, এ হলফেরই একটি ধরন মাত্র। এর অন্যথাকারী কিংবা কথিত উক্তি ও বক্তব্যের বিপরীত অবস্থায় শপথ বাক্য উচ্চারণকারী কসম ভঙ্গকারী হিসাবে বিবেচিত হবে এবং এ ক্ষেত্রে কসম ভঙ্গের দায়ে তাকে কাফফারা আদায় করতে হবে; স্ত্রী তালাক হবে না।

যদিও ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর ফতওয়ার সমর্থনে মযহাব চতুষ্টয়ের কতক ইমাম ও তাঁদের কতক সাথীর উক্তি পেশ করেছেন। কিন্তু ঘটনা হল, এই ফতওয়া ছিল ঐ সব মযহাবের মশহূর মত ও ফতওয়া হিসবে-স্বীকৃত অভিমতের বিরোধী এবং তা ছিল ইমামের নতুন গবেষণালব্ধ পর্যালোচনা ও ইজতিহাদী বিশ্লেষণ। ফলে এই ফতওয়ার প্রতিক্রিয়ায় জনমনে সাধারণভাবে চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং 'আলিম সমাজ ও কাযী মহল তাঁকে এ ধরনের ফতওয়া প্রদান থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন যাতে করে জনমনে অধিকতর চিত্ত বিক্ষোভ ও চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি না হয়। হাফিজ ইবনে কাছীর ৭১৮ হিজরীর ঘটনাবলীর বিবরণ পেশ করতে গিয়ে লেখেন ঃ

> ১৫ই রবী'উ'ল-আওয়াল বৃহস্পতিবার কাযীউ'ল-কুযাত শামসুদ্দীন ইবনে মুসলিম ইমাম ইবনে তায়মিয়ার সঙ্গে মোলাকাত করেন এবং তাঁকে পরামর্শ দেন যাতে তিনি হলফ বি'ত-তালাক সম্পর্কে ভবিষ্যতে আর কোন ফতওয়া না দেন। শায়খ (র) তাঁর এই পরামর্শ কবুল করেন এবং কাযীউ'ল-কুযাতের খাতিরে ও মুফতীদের রেয়ায়েত করে এই ওয়াদা করেন। জুমাদা'ল-উলার শুরুতে মিসর থেকে সুলতানের ফরমানও এসে পৌঁছে। এতে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-কে হলফ বি'ত-তালাক-এর মসলার ক্ষেত্রে ফতওয়া দেওয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল। একটি প্রকাশ্য ও সাধারণ মাহফিলে এই ফরমান পড়ে তাঁকে শোনানো হয়। ইমাম এ ফরমান মেনে নেন এবং শহরে এর ঘোষণা দেওয়া হয়। সুলতানের এই ফরমানের পূর্বেই মুফতীদের একটি দল কাযী ইবনে মুসলিমের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন। তাঁদের পরামর্শে কাযী সাহেব ইবনে তায়মিয়া (র)-র

১. এই মসলার সঠিক রূপ ও প্রকৃতি এবং উভয়পক্ষের দলীল-প্রমাণ বোঝবার জন্য দ্র. শায়খ মুহাম্মদ আবূ যুহরা মিসরীর 'ইবনে তায়মিয়া' নামক পুস্তকের 'হলফ বি'ত-তালাক' অধ্যায়, ৪৩৬-৩৭ পৃ.।

নিকট এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন, তিনি যেন এই মসলার ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকেন। তিনি মতবিরোধ ও হাঙ্গামার হাত থেকে বাঁচবার জন্য তা মেনে নেন।[১]

মনে হয়, সুলতানের ফরমান প্রকাশিত হবার পর এই ধারণায় যে, সরকারের এই মসলার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার কোনই অধিকার নেই এবং কোন 'আলিমের পক্ষে হুকুমতের ভয়ে তাঁর ইল্‌ম ও 'আকীদা গোপন করা জায়েয নয় অথবা এই মসলার ব্যাপারে তিনি পরিপূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর বক্ষ আরও উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল বিধায় পুনরায় তিনি তাঁর তাহকীক মুতাবিক ফতওয়া দেওয়া শুরু করেন এবং হুকুমতের নিষেধাজ্ঞামূলক ফরমানের কোন পরওয়াই করেন নি। সেজন্য ইবনে কাছীর ৭২০ হিজরীর সংঘটিত ঘটনাবলীর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ

> ২২ শে রজব বৃহস্পতিবার দারু'স-সা'আদায় নায়েব-এ সালতানাতের উপস্থিতিতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে মযহাব চতুষ্টয়ের কাযী, মুফতী ও শায়খুল ইসলাম শরীক হন। বৈঠকে শরীক ব্যক্তিবর্গ এই বলে আপত্তি উত্থাপন করেন, তিনি (ইবনে তায়মিয়া) তালাকের মসলায় পুনরায় ফতওয়া দিতে শুরু করেছেন। অনন্তর নায়েব-ই সালতানাত তাঁকে দুর্গের ভেতর নজরবন্দী করবার নির্দেশ জারী করেন এবং তিনি (৭২০ হিজরীর ২২শে রজব) কেল্লার ভেতর অবরুদ্ধ হন।

কিন্তু তাঁর এই বন্দী জীবন খুব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পাঁচ মাস আঠার দিন পর ১০ই মুহাররাম ৭২১ হিজরীতে সরাসরি মিসর থেকে তাঁর মুক্তির নির্দেশ এসে পৌছে এবং তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।[২]

শেষ বন্দিত্ব

৭২১ হিজরী থেকে ৭২৬ হিজরী পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর শায়খুল ইসলাম পূর্ণ আযাদী ও মনোনিবেশ সহকারে দর্‌স-তাদরীস, গ্রন্থ প্রণয়ন, ফতওয়া প্রদান ও ওয়া'জ-নসীহতের ভেতর মশগুল হয়ে পড়েন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বেশীর ভাগ মাদরাসা হাম্বলিয়া অথবা কাসাসীনে অবস্থিত নির্ধারিত মাদরাসায় পাঠ দান করতেন। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর পুরনো কিতাবাদি ও ছোট-খাট পুস্তক-পুস্তিকার দিকেও নজর দেন এবং কতিপয় পুস্তক নতুন প্রণয়ন করেন।

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, ৮৭ পৃ.

২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, ৮৭

সম্ভবত তিনি এই সময়ে অনেক বেশী উপকারী কাজ করতে পারতেন এবং তাঁর লেখনী থেকে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশ কিছু মূল্যবান ও দুর্লভ কিতাব বেরিয়ে আসত। কিন্তু তাঁর জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব, কতকগুলো মসলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে তাঁর একক সিদ্ধান্ত ও অভিমত তাঁর সমসাময়িক কালের লোকদের জন্য এবং স্বয়ং তাঁর জন্য ছিল এক বিরাট পরীক্ষা যার জন্য তাঁকে বারবার বিরাট মূল্য দিতে হত। এরপরও বেশী দিন নিশ্চিত ও আরামে উপবেশন করা ভাগ্যে জুটত না। মাত্র কিছু দিন অতিবাহিত না হতেই নতুন আরেকটি মসলা আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয় যা ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর মানুষের মনোযোগ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় যা তালাকের মসলার মত শুধু নির্ভেজাল ফিকহী মসলা ছিল না, বরং এতে আবেগের উপাদানও ছিল এবং যার ভেতর জনমন বিক্ষুব্ধ করবার মত উপকরণও ছিল প্রচুর। বলা দরকার, মসলাটি ছিল হুযূর আকরাম (স)-এর কবর যিয়ারত সম্পর্কিত।

সতের বছর আগে ইবনে তায়মিয়া (র) ফতওয়া দিয়েছিলেন, কোন কবর যিয়ারতের উদ্দেশে -চাই কি তা রওযা মুবারকই হোক না কেন (এর অধিকারীর ওপর হাযারো দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক) ইহতিমামের সঙ্গে সফর করা (আরবী ভাষায় যাকে شد الرحل বলা হয়) জায়েয নয়। কেননা এ সম্পর্কে হাদীসে উক্ত হয়েছে ঃ

لاتشدالرحال الاالى ثلاثة مساجد : المسجدالحرام ومسجدى هذا والمسجد الاقصى -

তিনটি মসজিদ ব্যতিরেকে আর কোথাওর উদ্দেশে ইহতিমামের সঙ্গে সফর করবে না। মসজিদ তিনটি হল ঃ মসজিদু'ল-হারাম, আমার মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে নববী ও মসজিদু'ল-আকসা (বায়তু'ল মাকদিস)।

অতঃপর তিনি স্বাভাবিক নিয়মেই এর শরঈ হেকমত্ এবং এর বিরোধিতার ক্ষেত্রে এর খারাপ ও ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরেছেন। এর সংক্ষিপ্তসার এরূপঃ

উল্লিখিত তিনটি মসজিদবহির্ভূত অন্য কোথাও ইহতিমামের সঙ্গে সফরের দ্বারা শির্ক ও শির্কমূলক 'আকীদা ও 'আমলের দরজা খুলে যাবে। লোকে এরূপ যিয়ারতকে ইবাদত ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করতে থাকবে। সেখানে পৌঁছে শরীয়ত নির্দেশিত সীমারেখা লংঘন করবে এবং

তওহীদের অঞ্চল-প্রান্ত হস্তচ্যুত হবে। হুযূর আকরাম (স) স্বীয় কবর মুবারককে অজ্ঞ জাতিগোষ্ঠী ও রসম-রেওয়াজের হাত থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে এতখানি উদ্‌গ্রীব ছিলেন যে, তিনি বলেন ঃ

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا -

আল্লাহ পাক ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে লা'নত দিন। কেননা তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে ছেড়েছে।[১]

অধিকন্তু তিনি বড়ই ইহতিমামের সঙ্গে দু'আ করতেন ঃ

اللهم لاتجعل قبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا -

হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে পূজার স্থান বানিও না। আল্লাহ্‌র ক্রোধ সে সব জাতিগোষ্ঠীর ওপর কঠোরতর হোক যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে।[২]

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

لاتتخذوا قبرى عيدا وصلوا على فان صلاتكم حيثما كنتم تبلغنى -

তোমরা আমার কবরকে আনন্দ উৎসবের স্থান বানিও না, বরং তোমরা আমার উদ্দেশে দরূদ ও সালাম পাঠাবে। আর তোমরা যেখানে থেকেই দরূদ ও সালাম পাঠাও না কেন তা আমাকে পৌঁছান হবে।[৩]

আর এজন্যই তিনি কোন প্রান্তর কিংবা ময়দানে দাফন হওয়াকে পছন্দ করেন নি, বরং তিনি হযরত 'আইশা (রা)-র কামরায় দাফন হন। স্থান হিসেবে এটি ছিল সবচে' নিরাপদ ও সুরক্ষিত। এসবের একমাত্র দাবী ছিল, রওযা মুবারককে সে সমস্ত সমূহ বিপদাশংকা থেকে মুক্ত ও সুরক্ষিত রাখা এবং ইহতিমামের সঙ্গে দলে দলে যিয়ারতের উদ্দেশে আগমনের অনুমতি না দেওয়া। অবশ্য যাঁরা মসজিদে নববী (স)-তে সালাত আদায়ের নিয়তে আগমন করবেন

---

১. বুখারী ও মুসলিম।

২. মালিক ও মুসনাদ ইমাম আহমদ।

৩. সুনান আবী দাউদ প্রভৃতি।

তাঁরা সুন্নত তরীকায় রওযা মুবারক যিয়ারত করবেন এবং রসূল (স)-এর ওপর দরূদ ও সালাম পাঠাবেন যেভাবে সাহাবা-ই কিরাম (রা) ও তাবি'ঈন পাঠাতেন।[১]

বিভিন্ন কার্যকারণের ভিত্তিতে সতের বছর পূর্বের এই ফতওয়া টেনে বের করা হয় এবং ব্যাপকভাবে তা প্রচার করা হয়। এর ফলে একদিকে যেমন সাধারণ মুসলমানদের আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত লাগে, যারা এই যিয়ারতকে এক বিরাট নে'মত ও মহাসৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করত এবং এই নে'মত লাভে যারা গভীরভাবে আগ্রহী ছিল তারা এর ভেতর রসূল আকরাম (স)-এর দরবারের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও আদব প্রদর্শনে কমতি লক্ষ্য করেন। অপর দিকে 'উলামায়ে কিরাম এর ভেতর গোটা উম্মার বিরোধিতা ও তাঁর নিজের আত্মম্ভরিতা দেখতে পান। আর সম্ভবত এটাই ছিল তাঁর বিরোধিতার আসল কারণ।

যা-ই হোক, এই মতবিরোধ এতখানি গুরুত্ব লাভ করে এবং এর এতটা চর্চা চলে যে, শেষ পর্যন্ত তৎকালীন হুকুমত ('উলামায়ে কিরাম কর্তক হুকুমতের দৃষ্টি আকর্ষণ অথবা নিজেদের রাষ্ট্রীয় শান্তি-শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে) এতে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বোধ করেন এবং ৭২৬ হি. ৭ই শা'বান তারিখে তাঁকে (ইবনে তায়মিয়াকে) বন্দী করবার নির্দেশ জারী হয়। শায়খ (র) এই নির্দেশকে খোশ আমদেদ জানান এবং অত্যন্ত আনন্দ ও উৎফুল্ল মনোভাব প্রকাশ করেন। তিনি তাঁকে বন্দী করবার নির্দেশ জারীর সংবাদ পেতেই বলে ওঠেন ঃ

انا كنت منتظرا ذلك وهذا فيه خير كثير ومصلحة كبيره -

আমি তো এরই অপেক্ষায় ছিলাম। আর এর ভেতর প্রচুর কল্যাণ ও বিরাট স্বার্থ লুকিয়ে রয়েছে।

---

১. তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে যতদূর জানা যায় তাতে (আল্লাহ্র ওয়াহদানিয়াত তথা একত্ববাদের যত বেশী পারা যায় ইহতিমাম করতে হবে এবং শিরক্ ও মুশরিকী আমল ও রসম-রেওয়াজের তামাম পন্থা রুদ্ধ কতে হবে) কোন জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন না। কিন্তু এর জন্য নবী করীম (স)-এর কবর যিয়ারতকে আদতে বন্ধ করে দেওয়া অনুভূতির তীক্ষ্ণতা ও বাড়াবাড়ির হাত থেকে মুক্ত নয়। আর এটি এমন বিষয়ও নয় যা তাঁর জ্ঞানগত ও ধর্মীয় মর্যাদার পরিপন্থী। তাঁর প্রতি আমাদের সুধারণা ও তাঁর কামালিয়তের স্বীকৃতি দানের পথে প্রতিবন্ধকও নয়। এ মসলা এতটা সঙ্গীনও ছিল না যার জন্য তাঁকে বন্দী করতে হবে এবং তিনি সেই অবস্থাতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন

শায়খ (র)-কে দামিশ্‌ক দুর্গে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাঁর জন্য একটি প্রাসাদ-কক্ষ খালি করে দেওয়া হয়। বাইরে থেকে পানির ঝর্ণা দুর্গের ভেতর নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। ইমামের খেদমত ও আরাম-আয়েশের জন্য তদীয় ভ্রাতা যয়নুদ্দীন ইবনে তায়মিয়াকে তাঁর সঙ্গে অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। ব্যয় নির্বাহের জন্য হুকূমত প্রয়োজনীয় অর্থও বরাদ্দ করে।

দুর্গাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ হবার পর লোকেরা প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অবাধ সুযোগ লাভ করে। হিংসুটে ও বিরোধী পক্ষের লোকেরা এ সময় তাঁর বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধব ও শাগরিদদের ওপর আক্রমণ চালায়। কতককে পশুপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়ে চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করানো হয় এবং ঢ্যাড়া পেটানো হয়। অতঃপর কাযীউ'ল-কুযাতের হুকুমে একটি জামা'আতকে কয়েদও করা হয়। কিছু দিন পর তাদের সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু শায়খুল ইসলামের বিশিষ্টতম শাগরিদ ও স্থলাভিষিক্ত হাফিজ ইবনে কায়্যিম স্বীয় উস্তাদ ও শায়খ-এর সঙ্গেই থাকেন এবং শায়খ (র)-এর ওফাতের পর মুক্তি পান।[১]

'আলিম ও ধার্মিক লোকদের দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ

শায়খুল ইসলাম (র)-এর কয়েদ ও নজরবন্দী যেখানে বিরোধী ও হিংসুটে লোকদের একটি ক্ষুদ্র দলের আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভের কারণ হয়, সেখানে হাযার হাযার 'আলিম ও লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জন্য তা দুঃখ ও বেদনার কারণ হয়। তারা একে সুন্নাহ্‌র মুকাবিলায় বিদ'আতের বিজয় এবং হক ও হকপন্থীদের জন্য অবমাননার সমার্থক হিসাবে ধরে নেয়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কোণ থেকে এবং বড় বড় 'আলিম ও ধার্মিক লোকের পক্ষ থেকে সুলতান-ই-মু'আজ্জাম (আল-মালিকু'ন-নাসির)-এর খেদমতে এমন সব চিঠিপত্র আসতে শুরু করে যেসব চিঠিপত্রে এ ঘটনায় তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া ও বিস্ময়ের প্রতিফলন ঘটেছিল। এ ক্ষেত্রে আমরা কেবল একটি চিঠি যা বাগদাদের 'উলামায়ে কিরাম সুলতানের খেদমতে পাঠিয়েছিলেন, উদ্ধৃত করছি। এর থেকেই পরিমাপ করা যাবে, শায়খ (র)-এর দাওয়াত ও খ্যাতি তৎকালীন মুসলিম জাহানে কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সমস্ত হকপন্থী তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কতখানি সম্পর্কিত ও তাঁর প্রতি কতটা আকৃষ্ট ছিলেন। 'উলামায়ে বাগদাদ লিখেন ঃ

---

১. ইবনে তায়মিয়া, মুহাম্মদ আবূ যুহরাকৃত, ৮০ পৃ.।

لما قرع اهل البلاد المشرقية والنواحى العراقيه التضييق على شيخ الاسلام تقى الدين احمد بن تيميه سلمه الله عظم ذالك على المسلمين وشق على ذوى الدين وارتفعت رؤس الملحدين وطابت نفوس اهل الاهواء والمبتدعين : ولما رأى علماء هذه الناحية عظم هذه النازلة من شماتة اهل البدع واهل الاهواء باكابر الفضلاء وائمة العلماء انهوا حال هذا الامر الفظيع والامر الشنيع الى الله شرفا: وكتبوا اجوبتهم فى الحضرة الشريفة السلطانيه زادها تصويب ماجاب به الشيخ سلمه الله فى فتاوا هو ذكروا من علمه وفضائله بعض ماهو فيه وحملوا ذالك بين يدى مولانا ملك الامراء اعز الله انصاره وضاعف اقتداره غيرة منهم على هذا الدين ونصيحة للاسلام وامراء المؤمنين ـ

পূর্বাঞ্চলের শহরগুলো ও ইরাকের অধিবাসীরা যখন জানতে পারল, শায়খুল ইসলাম ও তকীয়্যুদ্দীন আহমদ ইবনে তায়মিয়ার জীবনকে সংকুচিত ও দুর্বিষহ করে তোলা হচ্ছে তখন মুসলিম জনসাধারণ সে সংবাদে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে এবং ধার্মিক ব্যক্তিগণ তীব্র মানসিক যাতনা ভোগ করেন। দেখা গেল, এর ফলে ধর্মদ্রোহী (মুলহিদ)-রা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে, উৎফুল্ল হয়েছে। প্রবৃত্তিপূজারী ও বিদ'আতীরা ইমামের দুরবস্থা দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়েছে। এদিককার 'উলামায়ে কিরাম যখন এ ঘটনার গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারলেন এবং তাঁরা যখন দেখতে পেলেন, বিদ'আতী ও বাতিলপন্থীরা এই শ্রেষ্ঠতম মুসলিম মনীষী ও 'আলিমগণের ইমামের এই অবমাননা ও দুঃসহ সংকেট আনন্দে উৎফুল্ল তখন তারা এই অনভিপ্রেত ঘটনা ও এর (অশুভ) প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সুলতানকে অবহিত করা প্রয়োজন মনে করলেন এবং শায়খ (র)-এর ফতওয়ার সমর্থনে নিজেদের উত্তর লিখে পাঠালেন। তাঁরা শায়খ (র)-এর 'ইল্ম (জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তা), তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে নিজেদের অনুভূতি ও উপলব্ধিও লিপিবদ্ধ করেন এবং এ সবই মালিকু'ল-মু'আজ্জামের খেদমতে পাঠিয়ে দেন। আর এসবের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল নিছক একটাই আর তা হ'ল ধর্মীয় মর্যাদাবোধের দাবী ও মুসলিম সুলতানের কল্যাণ কামনা।[১]

---

১. উকূদুদ্দুররিয়া, ৩৫০ পৃ.; কাওয়াকিবুদ্দুররিয়া, ১৯৮ পৃ.।

কারাগারে ইবনে তায়মিয়া (র)-র কর্মব্যস্ততা

দীর্ঘকাল পর কারাগার জীবনে শায়খ (র) তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলতে এবং একাগ্রতারূপ মহাসম্পদ লাভে সক্ষম হন। সম্ভবত এর প্রতি লক্ষ্য করেই তিনি বলেছিলেন, فيه خير كثير و مصلحة كبيرة তিনি এই নির্জন ও নিঃসঙ্গ জীবনের পরিপূর্ণ মর্যাদা দান করেন এবং পরিপূর্ণ আত্মনিমগ্নতা ও গভীর আগ্রহ সহকারে ইবাদত ও তেলাওয়াতে কালামে পাকের ভেতর মশগুল হয়ে পড়েন। এরপর হাতে যা কিছু সময় থাকত তা অধ্যয়ন, গ্রন্থ রচনা ও স্বীয় গ্রন্থের সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজে ব্যয় করতেন। আর এটিও ছিল স্বয়ং এক চিরন্তন ইবাদত। এই অবকাশ জীবনে তাঁর সবচে' বড় নেশা ছিল কুরআন পাক তেলাওয়াত। এবারের বন্দী জীবন ছিল দু'বছরের। এই সংক্ষিপ্ত মুদ্দতে তিনি তাঁর ভাই শায়খ যয়নুদ্দীন ইবনে তায়মিয়ার সাথে কুরআন মজীদ ৮০ বার খতম করেন।[১]

কারাগারে তিনি যা কিছু লিখেছিলেন তার বেশীর ভাগই ছিল তাফসীর সম্পর্কিত। এর কারণও ছিল সম্ভবত তেলাওয়াতের আধিক্য ও কুরআন মজীদ গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন। কতিপয় মসলা বিষয়ে তিনি পুস্তিকা ও উত্তর পত্র লেখেন। বাইরে থেকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ তত্ত্বগত প্রশ্নাদি ও ফিক্‌হী সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ চেয়ে পাঠানো হত তিনি তার জওয়াব দিতেন। সাধারণ দর্‌স প্রদান ও ওয়া'জ-নসীহত ছাড়া তাঁর আর সব কিছুই রুটিন মাফিক চলছিল, তেলাওয়াতের আধিক্য ও ইবাদতের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

নতুন বিধিনিষেধ, লেখাপড়ার উপকরণাদি থেকে বঞ্চিত

কারাগারে বসে শায়খ (র) যা কিছুই লিখতেন লোকে তা হাতে হাতে লুফে নিত এবং তা দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত পৌছে যেত। অপরাপর যেসব পুস্তক-পুস্তিকা ও মসলা-মাসাইল তিনি জেলখানায় বসে লিখেছিলেন তার ভেতর একটি পুস্তিকা ছিল যিয়ারতের মসলা সম্পর্কিত। এতে তিনি মিসরের আবদুল্লাহ্ ইবনু'ল-আখনাঈ নামক মালিকী মযহাবের একজন কাযীকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[২] এতে তিনি প্রমাণ করেন, উল্লিখিত কাযী খুবই অল্প জ্ঞানের অধিকারী অকাট মূর্খ ছাড়া আর কিছু নন। কাযী সাহেব এর বিরুদ্ধে

---

১. আল-বিদায়া, ১৩৮ পৃ.।

২. দ্র الاخنائية। মিসর থেকে মুদ্রিত।

সুলতানের নিকট অভিযোগ দায়ের করেন এবং নিজের ক্রোধ প্রকাশ করেন। অতঃপর সুলতান ফরমান জারী করেন, শায়খ-এর নিকট কাগজ কলম দোয়াত যা কিছু আছে তা ছিনিয়ে নেওয়া হোক এবং তাঁর নিকট এমন কিছু যেন না থাকে যার সাহায্যে তিনি লিখতে পারেন।

৭২৮ হিজরীর ৯ই জুমাদা'ল-উখরা এই নির্দেশ পালিত হয়। তাঁর কাছ থেকে লেখাপড়ার সর্ববিধ উপকরণ ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ১লা রজব তারিখে তাঁর সমস্ত পাণ্ডুলিপি ও লিখিত পৃষ্ঠা জেল থেকে তুলে 'আদিলিয়া'[২]র বড় কুতুবখানায় (লাইব্রেরী) নিয়ে রাখা হয়। এসব কিতাবের পরিমাণ ছিল ষাট খণ্ডের এবং ১৪টি কাগজের সেরেজা ছিল যাতে তিনি লেখাপড়া করতেন।

কয়লার সাহায্যে লিখন

এত কিছুর পরও শায়খ (র) কোনরূপ ক্ষোভ প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন, এমন কি হুকুমতের নিকট অভিযোগটুকু পর্যন্ত তিনি করেন নি। তাঁর থেকে দোয়াত কলম নিয়ে যাবার পর এদিক ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত কাগজপত্রে কয়লার সাহায্যে লিখতে শুরু করেন। তাঁর কতিপয় পুস্তিকা ও নিবন্ধ কয়লা লিখিত পাওয়া গিয়েছিল এবং বহু কাল এগুলো উক্ত অবস্থায় সুংরক্ষিত থাকে। এরূপ অসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় তাঁকে শোকরগুযার ও সন্তুষ্টচিত্ত মনে হত। তিনি এও অনুভব করতেন, তিনি জিহাদের ময়দানের মর্দে মুজাহিদের মর্যাদাধারী এবং এক্ষেত্রে অবস্থার কোন হেরফের হয়নি। এক পত্রে তিনি বলেন ঃ

نحن ولله الحمد فى عظيم الجهاد فى سبيله بل جهادنافى هذا مثل جهادنايوم قاذان والجبلية والجهمية والاتحادية وامثال ذلك وذلك من اعظم نعم الله علينا و على الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون -

আলহামদুলিল্লাহ্! আমরা এক বিরাট জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ভেতর ব্যাপৃত আছি। আমাদের এখানকার জিহাদ কাযানের ঘটনা, কোহিস্তানের জিহাদ, জাহমিয়া ও ইত্তিহাদী (ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ মতবাদী) প্রমুখের বিরুদ্ধে

---

২. এই ইমারতটি আজ আল-মাকতাবা জাহিরিয়ার সামনে অবস্থিত। এখানেই ইবনে খাল্লিকান তাঁর বিখ্যাত পুস্তক وفيات الاعيان লিখেছিলেন. আল-ফিয়াহ গ্রন্থ প্রণেতা ইবনে মালিক দরস প্রদান করেছিলেন। বর্তমানে মাজমাউল ইলমী আল-আরাবীর কেন্দ্র।

সংগ্রাম আমাদের অতীত জিহাদগুলোর তুলনায় মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটি আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আমাদের ওপর এক বিরাট ইহসান। কিন্তু অধিকাংশই লোকই এর হাকীকত সম্পর্কে অবহিত নয়।[১]

আত্মসমর্পণ ও আত্মতুষ্টি এবং হাম্‌দ ও শোকর

অপর এক পত্রে তাঁর ঈমানী অবস্থা, আল্লাহর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ এবং তাঁর ইচ্ছাকেই সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেবার শান নিম্নোক্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ঃ

كل ما يقضيه الله تعالى فيه الخير والرحمة والحكمة ان ربى لطيف لما يشاء انه هو القوى العزيزالعليم الحكيم ولايدخل على احد ضرر الامن ذنوبه مااصابك من حسنةفمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك فالعبد عليه ان يشكر الله ويحمده دائما على كل حال ويستغفر من ذنونه فالشكر يوجب المزيد من النعم والاستغفار يدفع النقم ولايقضى الله للمرء من قضاء الاكان خيرا له ان اصابته سراء شكر وان اصابته ضراء صبر وكان خيراله ـ

আল্লাহ পাক তাঁর বান্দার জন্য যে ফয়সালাই করেন তার ভেতরেই কল্যাণ, বরকত, রহমত ও হেকমত নিহিত রয়েছে। আর নিশ্চয় আমার রব তাঁর ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের ক্ষেত্রে অতি সূক্ষ্ম, আর তিনি শক্তিশালী, পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞ। মানুষ কেবল তার গোনাহ্‌র কারণেই ক্ষতির সম্মুখীন হয়। (আল্লাহ বলেন) "তুমি যা কিছু ভাল পাও তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে লাভ কর আর খারাপ যা কিছু পাও তা তোমার নিজের অর্জিত।" এজন্য বান্দাহ্‌র কর্তব্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করা, তাঁর হাম্‌দ ও ছানা পাঠ করা এবং নিজ গোনাহ্‌র জন্য তাঁর দরবারে তওবাহ ইস্তিগফার করা। আর তা এজন্য করতে হবে, শোকর আদায় সজীব ও অধিকতর নে'মত লাভের কারণ হয় এবং তওবাহ ইস্তিগফার আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও শাস্তিকে প্রদমিত করে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তদীয় বান্দাহ্‌র জন্য যে ফয়সালাই করেন তা তার অনুকূলে শুভ প্রমাণিত হয়। হাদীস শরীফে উক্ত হয়েছে ঃ মু'মিন যখন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কোন নে'মত ও আনন্দদায়ক বস্তু লাভ করে তখন শোকর আদায় করে। আর যখন বিপদ মুসীবত আপতিত হয় তখন সবর করে, ধৈর্য ধরে। এটাই তাঁর জন্য কল্যাণ।

---

১. ইবনে তায়মিয়া, মুহাম্মদ আবু যাহরাকৃত।

শায়খ (র) এ অবস্থায় স্বীয় অভিমতের বিশুদ্ধতা ও নিজের নির্দোষিতা সম্বন্ধে পুরোপুরি স্থির নিশ্চিত ছিলেন। তিনি তাঁর অপরাধ স্রেফ এতটুকুই মনে করতেন, তিনি একটি শর'ঈ মসলার ক্ষেত্রে সমসাময়িক শাসকের কথা অমান্য করেছেন এবং যাকে তিনি হক মনে করেছেন, জিদ ধরে তিনি তার ওপর আড় হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তিনি তাঁর এ অপরাধের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং একে তিনি তাঁর ঈমান ও তওহীদের দাবীর পরিপূরক মনে করেন।

غاية ماعندهم انه خولف مرسوم بعض المخلوقين والمخلوق كائنا من كان اذاخالف امر الله تعالى ورسوله لم يجب بل لا تجوز طاعته فى مخالفة امرالله ورسوله باتفاق المسلمين -

আমার বিরুদ্ধে তাদের সবচে' বড় অভিযোগ হল, একজন মানুষের (যিনি অপরাপর মানুষের মতই আল্লাহ্‌র একজন বান্দাহ) নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে। সে মানুষ সমসাময়িক শাসক কিংবা সুলতান যিনিই হোন, যখন আল্লাহ ও তদীয় রসূল (স)-এর নির্দেশের বিরোধিতা করবে তখন তার নির্দেশ কখনোই মানা যাবে না, বরং মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যে আল্লাহ্‌র ও তাঁর রসূল (স)-এর বিরোধিতার ক্ষেত্রে তার আনুগত্য জায়েয হবে না।

জীবনের শেষ দিনগুলো ও ইনতিকাল

শায়খুল ইসলামের ভাই যয়নুদ্দীন 'আবদুর রহমান বলেন, কুরআন মজীদ আশি বার খতম করবার পর যখন তিনি পরবর্তী খতমের উদ্দেশে নতুন করে তেলাওয়াত আরম্ভ করে সূরা কামার-এর নিম্নোক্ত আয়াতে গিয়ে পৌঁছুলেন ঃ

ان المتقين فى جنت ونهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر -

তখন আমার পরিবর্তে 'আবদুল্লাহ ইবন্ মুহিব্ব ও আবদুল্লাহ আয-যুর'আর সঙ্গে (দওর) শুরু করলেন। এ দু'জন বড় নেককার লোক ছিলেন এবং ছিলেন সহোদর ভ্রাতা। শায়খ (র) তাঁদের কিরাআত খুবই পসন্দ করতেন। এই নতুন দওর শেষ হবার আগেই তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এল।

মৃত্যু রোগ-যন্ত্রণা শুরু হতেই দামিশক-এর নায়েব (শাসনকর্তা) রোগ পরিচর্যার উদ্দেশে আগমন করেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর নায়েব ওযরখাহী করতে শুরু করেন এবং বলেন ঃ আমার দ্বারা কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে কিংবা কষ্ট পেয়ে থাকলে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। জবাবে শায়খ (র) বলেন ঃ

انی قد احللتك وجميع من عادانی وهولايعلم انی علی الحق واحللت السلطا ن المعظم الملك الناصر من حبسه ایای - لكونه فعل ذلك مقلدا معذورا و لم يفعله لحظ نفسه وقد احللت كل احد مما بینی وبینه الا من كان عدو الله ورسوله (صلی الله علیه وسلم)

আমি আমার পক্ষ থেকে আপনাকে ক্ষমা করেছি আর তাদেরকেও ক্ষমা করেছি যারা আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে। আর আমি যে সত্যের ওপর আছি তা তারা জানে না। সুলতান মু'আজ্জাম আল-মালিকুন-নাসির আমাকে বন্দী করেছিলেন বলে তাঁর বিরুদ্ধেও আমার কোন অভিযোগ নেই। কেননা তিনি নিজের থেকে এ কাজ করেন নি, বরং 'উলামায়ে কিরামের প্রতি আস্থা ও আনুগত্যের কারণে করেছেন। এজন্য তাঁকে আমি মা'যূর মনে করি। আমার পক্ষ থেকে আমি তাদের সবাইকেই মাফ করেছি, কেবল তাদেরকে নয়, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (স)-এর দুশমন।

ইনতিকালের বিশ-বাইশ দিন আগে তাঁর শরীর এমনই খারাপ হয়ে পড়ে যা পরে আর ভাল হয়নি। আর এ অবস্থায় ২২ শে যি'ল-কা'দাঃ, ৭২৮ হিজরীর রাত্রে পরপারের ডাক এসে পৌঁছে এবং ৬৭ বছর বয়সে তিনি এই মর জগত ছেড়ে মহালোকে প্রস্থান করেন।

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام -

মুওয়াযযিন দুর্গের মীনারে চড়ে শায়খু'ল-ইসলাম (র)-এর মৃত্যুবার্তা ঘোষণা করেন। অতঃপর বুরুজে মোতায়েন পাহারারত চৌকিদার সেখানে থেকে উক্ত ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন। বিদ্যুৎ বেগে এ খবর শহরে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্গের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং সর্বসাধারণকে দুর্গে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হয়। লোক দলে দলে আসছিল এবং শায়খ (র)-এর মরদেহ যিয়ারত করে যাচ্ছিল। অনেকেই ভালবাসার আতিশয্যে তাঁর কপালে চুমু দিচ্ছিল, যে কপাল ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার মালিক (আল্লাহ্)-এর সামনে সিজদাবনত থাকত।

গোসল প্রদানের পূর্বেই কুরআন মজীদ খতম করা হয়। পুরুষদের পর মহিলাদেরকে আসার অনুমতি প্রদান করা হয় এবং তারাও যিয়ারত করে। গোসল প্রদানের সময় কেবল গোসল প্রদানকারীরাই থাকতে পেরেছিলেন।

জানাযা ও দাফন

গোসল প্রদানের পর একটি সালাতে জানাযা দুর্গাভ্যন্তরেই অনুষ্ঠিত হয়। শায়খ মুহাম্মদ তামীম জানাযা পড়ান। জানাযার পর কফিন বাইরে আনা হয়। দুর্গ ও জামি 'মসজিদের মধ্যবর্তী সকল রাস্তা ছিল লোকে লোকারণ্য। চার প্রহর বেলা গড়িয়ে যাবার মুহূর্তে জানাযা জামি' মসজিদে (জামি' উমায়্যা) গিয়ে পৌঁছে। ভীড়ের চাপ এত বেশী ছিল যে, সৈন্যদেরকে কফিন ঘিরে রাখতে হয়। অন্যথায় জানাযার হেফাজত ও ইন্তিজাম করা ছিল সত্যিই কঠিন। লোকের সংখ্যা অনুমান করা ছিল কষ্টকর। জনতার এই ভীড়ে কেউ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে বলল ঃ

هكذا تكون جنائز ائمة السنة

'ইমামু'স-সুন্নাহ্‌র (সুনাহ্‌র ইমামের) জানাযা এমত শানেরই হয়ে থাকে।' এতদ্‌শ্রবণে লোকে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

বাদ জোহর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জনতার ভীড় ক্রমেই বাড়ছিল। শেষাবধি পথ-প্রান্তর, গলি-খুপচী ও বাজার-ঘাট সর্বত্রই লোক কানায় কানায় ভর্তি হয়ে যায়। চতুর্দিকেই কেবল মাথা আর মাথাই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। বাজার-ঘাট ছিল বন্ধ। হোটেল-রেস্তোরাঁও ছিল বন্ধ। খাবার মেলা কষ্টকর ভেবে অনেক লোকই রোযার নিয়ত করে।

জানাযা আদায়ের পর পুনরায় কফিন ওঠানো হয়। কফিনবাহী খাটিয়া কাঁধে বহনের সুযোগ ছিল না। জানাযা হাতে হাতে ও মাথায় মাথায় দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। চতুর্দিক থেকেই কান্না ও আহাজারির শব্দ ভেসে আসছিল। সেই সাথে লোকের মুখে মুখে তাঁর প্রশংসা ফিরছিল এবং তাঁর জন্য দু'আ গুঞ্জরিত হচ্ছিল। ভক্তির আতিশয্যে লোকে তাদের রুমাল ও কাপড় ছুড়ে জানাযার স্পর্শ লাভ করছিল। ভিড়ের চাপে কার জুতা-চপ্পল যে কোথায় ছিটকে পড়ছিল তার কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না! তেমনি দশা ছিল মাথার রুমাল কিংবা পাগড়ীর। জানাযা এক নজর দেখা ও তার অনুগমনের উদ্দেশে লোকে এত বেশী মত্ত হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের কারোরই কাপড়-চোপড় কিংবা জুতা-চপ্পলের প্রতি কোন খেয়াল ছিল না। মাথার ওপর দিয়ে জানাযা গড়িয়ে চলছিল। কখনো কিছু দূর অগ্রসর হচ্ছিল, আবার হটে আসছিল, আবার কখনো একেবারেই থেমে যাচ্ছিল। ঘোড়ার বাজার পৌঁছুলে লোক সংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে যায়। এখানে জানাযা রাখা হয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা যয়নুদ্দীন আবদুর রহমান সামনে এগিয়ে জানাযা পড়ান। এরপর আস-সূফীয়া সমাধিভূমিতে ইমামের ভাই শরফুদ্দীন 'আবদুল্লাহর পাশেই দাফন করা হয়।[১]

---

১. সূফিয়া কবরস্থান বিরাট বড় লেখক ও বুযুর্গদের (যেমন ইব্‌ন আসাকির, ইবনু'স-সালাহ, ইবনু'ল-আছীর, আবুল হাজ্জাজ আল-মিযযী, হাফিজ 'ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাছীর প্রমুখ) দাফনগাহ হিসাবে খ্যাত। বর্তমানে এর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এখন এরই ওপর বড় বড়

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভোরে দুর্গ থেকে জানাযা বেরিয়েছিল, কিন্তু অত্যধিক ভিড়ের কারণে আসরের আযানের মুহূর্তে দাফন করা সম্ভব হয়। গোটা শহরই জানাযার অনুগমন করেছিল। উপস্থিতির সংখ্যা ৬০ হাযার থেকে এক লক্ষের মত হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল যার ভেতর ১৫ হাযারের মত মহিলাও ছিল। বিভিন্ন বাড়ী-ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা নারী-পুরুষ ও শিশু দর্শকের সংখ্যা এর অতিরিক্ত। কোন জানাযায় এত বেশী জনসমাগম দামিশ্‌কের ইতিহাসে আর দেখা যায়নি। বনী উমায়্যার শাসন আমলে যখন দামিশ্‌কের জনবসতি বেশী ছিল তখনও সম্ভবত এর অন্যথা ঘটেনি।[১]

গায়েবানা সালাত-ই জানাযা

সুদূর উত্তর ও দক্ষিণ ভূভাগের অধিকাংশ মুসলিম দেশে গায়েবানা জানাযা পড়া হয়। ইবনে রজব তাঁর طبقات الحنابلة নামক গ্রন্থে লেখেন ঃ

وصلى عليه صلاة الغائب فى غالب بلاد الاسلام القريبة والبعيدة حتى فى اليمن والصين واخبر المسافرون انه نودى باقصى الصين للصلاة عليه يوم جمعة الصلاة على ترجمان القران -

নিকট ও দূরবর্তী মুসলিম দেশগুলোতে (ইমামের) গায়েবানা জানাযা পড়া হয়, এমন কি য়ামন ও সূদুর চীনেও তাঁর গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রমণকারীরা বর্ণনা করেছেন, চীনের একটি দূরবর্তী শহরে জুম'আর দিন গায়েবানা জানাযার ঘোষণা নিম্নোক্ত ভাষায় দেওয়া হয়েছিল: কুরআন করীমের মুখপাত্রের জানাযা হবে।

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর) ইমারত ও দালান-কোঠা দাঁড়িয়ে আছে। কেবল শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র)-এর কবর জামি'আ সারিয়া হল ও হাসপাতাল ভবনের সামনে এখনও তাঁর অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। ১৩৭০ হিজরীর ১০ই শওয়াল (২৮শে জুলাই, ১৯৫১ খৃ.) তারিখে সিরিয়ার শায়খ আল্লামা মুহাম্মদ বাহজাতুল বায়তার-এর নেতৃত্বে ও সমভিব্যাহারে বর্তমান লেখক উক্ত কবর যিয়ারত করেন। 'আল্লামার মুখে শুনেছি, ভার্সিটির কোন নির্মাণ কর্মের প্রয়োজনে রাতভর কবর স্থানে খনন কাজ চলে। সকালে সিরিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শুকরী আল-কুতিলী খ্রিস্টান ভাইস চ্যান্সেলরকে সতর্ক করে দেন, ইবনে তায়মিয়া (র)-র কবর যদি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয় তাহলে আমি সউদী সুলতান ইবনে সউদকে কী জওয়াব দেব? তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। অতঃপর কবরটিকে অক্ষত রেখে দেওয়া হয় যা আজও নিরাপদ হেফাজতেই রয়েছে।

১. ইবনে কাছীর শায়খ আলামুদ্দীন আল-বারযালীর বরাতে যিনি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সমসাময়িক ও সহপাঠী ছিলেন এ সমস্ত লিখেছেন (দ্র. ১৪শ. খণ্ডের ১৩৬-৩৯)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উল্লেখযোগ্য গুণাবলী ও কামালিয়াত

শায়খু'ল ইসলাম হাফিজ ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর যুগে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে মুজতাহিদের আসন ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন এবং তাফসীর, হাদীস ও ফিক্হশাস্ত্রে একই সঙ্গে স্বীয় নেতৃত্ব, গভীর পাণ্ডিত্য ও অস্বাভাবিক দক্ষতার যে ছাপ রেখেছিলেন তার পেছনে তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও মেধার একটি বিরাট ভূমিকা ছিল। আর এটি ছিল তাঁর ওপর আল্লাহ্ পাকের এক মহা দান ও বিরাট এক অনুগ্রহ। ইবনে তায়মিয়া (র)-র যুগে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান এতটা বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং কুরআন ও হাদীসশাস্ত্রের منقولات এত বিশাল ও বিস্তৃত ভাণ্ডার সংগৃহীত হয়ে গিয়েছিল যে, কোন লোকের পক্ষেই অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া ব্যতিরেকে সে সব জ্ঞান-ভাণ্ডার আয়ত্তে আনা যেমন সম্ভব ছিল না, তেমনি বিতর্কিত মাসাইল ও সমস্যার ক্ষেত্রে স্বীয় সমসাময়িক খ্যাতনামা 'আলিম ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সামনে মুখ খোলার সাহসও সঞ্চয় করে উঠতে পারত না। একই সাথে কোন মসলার ব্যাপারে পূর্ববর্তী কোন 'আলিমের পেশকৃত সিদ্ধান্তের সঙ্গে মতভেদের অধিকারও থাকত না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ইবনে তায়মিয়া (র)-কে যে স্মৃতি ও ধারণ শক্তি দান করেছিলেন তার সাহায্যে তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, উসূলে ফিক্হ, ইমামদের মতভেদ সম্পর্কিত বিষয়শাস্ত্র, কালামশাস্ত্র, ইতিহাস, সীরাত ও আছার, রিজালশাস্ত্র, অভিধান ও ব্যাকরণশাস্ত্রের যে বিরাট জ্ঞান-ভাণ্ডার তখন পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল, যত গ্রন্থ ও উৎস-উপকরণ তখন পর্যন্ত বর্তমান ছিল এবং যে পর্যন্ত তাঁর দক্ষতা ও ক্ষমতা ছিল, অধ্যয়ন করেন এবং স্বীয় শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত স্মৃতিশক্তির সাহায্যে সে সব নিজ বক্ষে ধারণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর জ্ঞানগত ও লেখক জীবনে সে সব থেকে এভাবে সাহায্য-সহায়তা গ্রহণ করেন যেভাবে একজন যুদ্ধাভিজ্ঞ ধানুকী তার তূণীরের সাহায্য নিয়ে থাকে।

সমসাময়িক সকলেই তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, ধারণ ক্ষমতা, উল্লেখযোগ্য মেধা ও ধী-শক্তির স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের সকলেই এ ব্যাপারে একমত ঃ তিনি খুবই স্মতিশক্তির অধিকারী, দ্রুত উপলব্ধিক্ষম এবং তীক্ষ্ণ মেধা ও ধী-শক্তির মালিক ছিলেন। তাঁর সহপাঠী 'আল্লামা 'আলামুদ্দীন আল-বারযালী বলেন ঃ

قل ان سمع شيئا الاحفظه وكان ذكيا كثير المحفوظ ـ

তিনি যা কিছু শুনতেন অমনি তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত, খুব কমই বিস্মৃত হতেন। তিনি খুবই ধী-শক্তির অধিকারী ছিলেন। বহুবিধ জিনিস তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডারে রক্ষিত ছিল।[1]

রিজালশাস্ত্রের ইমাম ও ইসলামের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাফিজ যাহবী বলেন ঃ

مارأيت اشد استحضارا للمتون وعزوها منه وكانت السنة بين عينيه وعلى طرف لسانه ـ

হাদীসের মূল পাঠ متن অধিক পরিমাণে মনে রাখতে, সময়মত তা থেকে সাহায্য-সহায়তা গ্রহণ করতে, বিশুদ্ধ বরাত প্রদানে এবং সম্পর্ক-সূত্র বর্ণনায় তাঁর চেয়ে অধিক পারঙ্গম আর কাউকে আমি দেখিনি। হাদীসের বিপুল বিস্তৃত ভাণ্ডার যেন তাঁর চোখের সামনে ও ঠোঁটের কোণে ভেসে বেড়াত।[2]

তাঁর স্মৃতিশক্তির সপক্ষে সবচেয়ে বড় দলীল তাঁর সমসাময়িক লোকদের এই সাক্ষ্য, যে হাদীস সম্পর্কে ইবনে তায়মিয়া (র) অজ্ঞতা প্রকাশ করবেন সেটা কোন হাদীসই নয়। হাদীসের ভাণ্ডার যতটা ব্যাপক ও সুবিস্তৃত আর তা সদাসর্বদা স্মৃতির মণিকোঠায় কেবল নয় ঠোঁটের মাথায় ধরে রাখা যতটা শক্ত, তারপরও হাদীস সম্পর্কে এককভাবে তাঁরই স্মৃতিশক্তি ও জ্ঞানের ওপর আস্থা স্থাপন এবং তাঁরই মতামত ও উক্তির ওপর ফয়সালা প্রদান কেবল তখনই করা যেতে পারে, যখন মেনে নেওয়া হয় যে, তাঁর যুগে সর্বাপেক্ষা বড় হাফিজ-ই-হাদীস তিনিই ছিলেন যাঁর স্মৃতিশক্তি তাঁকে কখনই প্রতারিত করে না। হাফিজ যাহবী বলেন ঃ

يصدق عليه ان يقال كل حديث لايعرفه ابن تيمية فليس بحديث ـ

---

১. আর-রাদ্দু'ল-ওয়াফির, পৃ. ৬৬।
২. আল-কাওলু'ল-জলী, পৃ.১০১।

তাঁর সম্পর্কে এ কথা বলা যথার্থ হবে, ইবনে তায়মিয়া যে হাদীস জানেন না না সেটা কোন হাদীসই নয়।[১]

তাঁর কতিপয় সমসাময়িক ব্যক্তি এতদূর পর্যন্ত বলেছেন, কয়েক শতাব্দী যাবত এত বড় স্মৃতিশক্তির অধিকারী কেউ জন্মগ্রহণ করেন নি। 'আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনু'য-যামালকানী, যিনি শায়খুল ইসলামের সমসাময়িক ছিলেন, বিতর্ক সভায় যিনি ছিলেন তাঁর প্রতিপক্ষ এবং বহু মসলা-মাসাইলে যিনি তাঁর সঙ্গে তীব্র মতানৈক্য পোষণ করতেন, নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁর আল্লাহপ্রদত্ত এই গুণের সাক্ষ্য দিয়েছেন ঃ

لم ير من خمس مائة سنة او قال اربع مائة سنة والشك من الناقل - احفظ منه -

পাঁচ কিংবা চার শতাব্দী (সংখ্যার যথার্থতা সম্পর্কে বর্ণনাকারী দ্বিধান্বিত) যাবত এরূপ স্মৃতিশক্তির অধিকারী মানুষ জন্মান নি।[২]

তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে হাফিজ যাহাবী বলেন ঃ كان يتوقدذكاء।

তিনি প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ ছিলেন।

অন্যত্র বলেছেন ঃ كان اية من الذكاء وسرعة الادراك

আল্লাহপ্রদত্ত মেধা, প্রতিভা ও দ্রুত উপলব্ধির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় পুরুষ।[৩]

ব্যাপক পাণ্ডিত্য ও সামগ্রিকতা

এই আল্লাহপ্রদত্ত স্মৃতিশক্তি ও সজ্ঞান মেধা শক্তি দ্বারা তিনি পারিবারিক সম্পর্ক, কঠোর পরিশ্রম, অধ্যয়নের প্রতি আগ্রহ, প্রবল জ্ঞান-স্পৃহা, সব চেয়ে বড় কথা, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তিনি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও তৎকালের প্রচলিত বিভিন্ন শাস্ত্রে এতটা পাণ্ডিত্য লাভে সক্ষম হন যে, সে সময়ে তাঁর চেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও সর্বজনস্বীকৃত খ্যাতনামা উস্তাদ ও নানা শাস্ত্রের ইমাম তাঁর ব্যাপক পাণ্ডিত্য দৃষ্টে বিস্ময়াভিভূত হয়ে যেতেন এবং সাক্ষ্য দিতেন, তিনি জ্ঞানের গভীর সমুদ্র এবং ইসলামের চলন্ত গ্রন্থাগার বিশেষ এবং প্রতিটি শাস্ত্রে তিনি এতটা দখল রাখেন যে, মনে হয় এই শাস্ত্রটিতেই তাঁর বিশেষ অধিকার রয়েছে। 'আল্লামা তকীয়্যুদ্দীন ইবনে দাকীকু'ল-'ঈদ-এর মর্যাদা হাদীসশাস্ত্রে সর্বজনস্বীকৃত এবং সে যুগের 'উলামায়ে কিরাম সর্বতোভাবে তাঁকে তাঁদের ইমাম ও মুরুব্বী হিসাবে মানতেন। ৭০০ হিজরীতে ইবনে তায়মিয়া (র) মিসরে গেলে 'আল্লামা ইবনে দাকীকু'ল-'ঈদের সাথে মোলাকাত হয়। এই মোলাকাতের পর 'আল্লামা নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন ঃ

১. আল-কাওয়াকিব, ১৪৫ পৃ.। ২. ঐ ১৪৫। ৩. আর-রাদ্দু'ল-ওয়াফির, ২৯ পৃ.।

لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه ياخذ منها ما يريد ويدع ما يريد -

ইবনে তায়মিয়ার সাথে যখন আমার সাক্ষাত হ'ল তখন আমি অনুভব করলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখাই তাঁর নখদর্পণে; যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করেন এবং যেটি ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন।[১]

'আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনু'য-যামালকানী যিনি নিজেই একজন প্রখ্যাত 'আলিম ও বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন–নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করেছেনঃ

كل اذا سئل عن فن من العلم ظن الرائى و السامع انه لايعرف غير ذلك الفن و حكم ان احدا لايعرف مثله -

জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন শাখায় যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয় তখন (অবলীলায় তাঁকে প্রশ্নের উত্তর দিতে দেখে) দর্শক ও শ্রোতা মনে করেন, তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়া আর কিছু জানেন না এবং তাঁর সম্পর্কে এই ধারণা কায়েম করতে বাধ্য হন, এই শাস্ত্রে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।[২]

'আল্লামা তকীয়্যুদ্দীন ইবনু'স-সুবকী ছিলেন তাঁর একজন মশহূর প্রতিপক্ষ। شد الرحال সম্পর্কিত মসলাসহ আরও কতক ফিকহী মসলার ক্ষেত্রে তিনি ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতামত খণ্ডন করে কিতাব পর্যন্ত লিখেছেন এবং কবিতাকারে তাঁর সম্পর্কে স্বীয় মতামতও প্রকাশ করছেন।[৩] এতদ্‌সত্ত্বেও হাফিজ যাহবীকে লিখিত এক পত্রে তিনি লেখেন ঃ

المملوك يتحقق كبير قدره وزخارة بحره وتوسعه فى العلوم الشريعة والعقلية وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه فى كل ذلك المبلغ الذى لا يتجاوزه الوصف والمملوك يقول ذالك دائما -

গরীবের এ ব্যাপারে বেশ ভালই জানা আছে, ইবনে তায়মিয়া একজন জলী'লুল-কদর 'আলিম, 'ইল্‌মে শরীয়তে ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানে গভীর ব্যুৎপত্তির অধিকারী এক অন্তহীন সমুদ্র! সে এও জানে, উন্নত মেধা, শ্রম ও

১. আর-রাদ্দু'ল-ওয়াফির, ৩১ পৃ.।
২. ঐ. ৩০ পৃ.।
৩. দ্র তরজমা আল্লামা তকীয়্যুদ্দীন ইবনুস সুবকী

চিন্তার জগতে তাঁর অবস্থান কোথায় এবং এও জানে, তিনি 'ইলমী কামালিয়াতে এমন এক স্তরে উপনীত হয়েছেন যে, তাঁর প্রশংসা করাও কঠিন। গরীব তাঁর বৈঠকে সর্বদাই এ কথা স্বীকার ও প্রকাশ করে থাকে।[১]

ইতিহাস তাঁর বিশেষ বিষয় ছিল না এবং ইতিহাসকে তিনি তাঁর আলোচ্য বিষয়ও বানান নি। এতদ্‌সত্ত্বেও ইমাম যাহবীর মত খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও সমালোচক বলেন ঃ

ومعرفته بالتاريخ والسير فعجب عجيب -

ইতিহাস ও জীবন-চরিত (সীরাত) সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান এক কথায় বিস্ময়কর!

ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, প্রশস্ত দৃষ্টি ও উপস্থিত বুদ্ধির একটি বিস্ময়কর ঘটনা তাঁরই সুযোগ্য শাগরিদ হাফিজ ইবনে কায়্যিম তদীয় যাদু'ল-মা'আদ নামক গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

একটি মুসলিম দেশে (সম্ভবত সিরিয়া কিংবা ইরাকে) য়াহূদীরা একটি প্রাচীন দস্তাবিজ (লিখিত দলীল) পেশ করে যা দেখতে প্রাচীনকালের লিখিত এবং কাগজও বেশ পুরনো আমলের মত মনে হচ্ছিল। সেখানে লিখিত ছিল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম খায়বারের য়াহূদীদেরকে জিযয়া প্রদানের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন। লিখিত দস্তাবিজটির ওপর হযরত আলী (রা), সা'দ ইবনে মু'আয (রা) ও সাহাবায়ে কিরামের অনেকেরই দস্তখত ছিল। কতিপয় অজ্ঞ লোক ইতিহাস ও জীবন-চরিত সম্পর্কে এবং সে যুগের অবস্থাদি সম্পর্কে যাদের দৃষ্টি গভীর ও বিস্তৃত ছিল না, তাদের প্রতারণার শিকারে পরিণত হয় এবং এর যথার্থতা সম্পর্কে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যায়। তারা এর ওপর আমল করতে শুরু করে এবং য়াহূদীদেরকে জিযয়া প্রদানের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। এই দস্তাবিজ শায়খুল ইসলামের [ইবনে তায়মিয়া (র)-র] খেদমতে পেশ করা হলে তিনি একে একেবারেই বিশ্বাসের অযোগ্য ও জাল বলে মত প্রকাশ করেন এবং এর জাল ও বানোয়াট হওয়া সম্পর্কে দশটি দলীল পেশ করেন। সে সবের ভেতর একটি দলীল ছিল, দস্তাবিজের ওপর হযরত সা'দ (রা) ইবনে মু'আয-এর দস্তখত রয়েছে, অথচ খায়বার যুদ্ধের আগেই তিনি ইনতিকাল করেছেন। দ্বিতীয়ত, দস্তাবিজে উল্লেখ রয়েছে, য়াহূদীদেরকে জিযয়া থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে, অথচ তখন পর্যন্ত জিযয়ার হুকুমই অবতীর্ণ হয়নি এবং সাহাবা-ই কিরামও এ সম্পর্কে কিছু জানতেন না।

১. আল-কাওয়াকিব, ১৪৬ পৃ.।

জিযয়ার হুকুম খায়বার যুদ্ধের তিন বছর পর তাবূক যুদ্ধের বছর অবতীর্ণ হয়। তৃতীয়ত, এতে উল্লেখ রয়েছে, য়াহূদীদেরকে বেগার (বিনা মজুরির শ্রম) খাটানো যাবে না। এটি একটি অবান্তর বিষয় এজন্য যে, য়াহূদী কিংবা অ-য়াহূদী যেই হোক কারও থেকে বেগার শ্রম গ্রহণ রীতিসিদ্ধ ছিল না। হুযূর আকরাম (সা) ও সাহাবা-ই কিরাম এ ধরনের জুলুম ও যবরদস্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তাঁরা কারো থেকে বেগার শ্রম গ্রহণ করতেন না। এতো অত্যাচারী ও নিপীড়ক বাদশাহ্‌দের আবিষ্কার যা আজ পর্যন্ত চলে আসছে। চতুর্থ দলীল হল, জ্ঞানী-গুণী, সিয়ার ও মাগাযীর লেখক, মুহাদ্দিছ, ফকীহ ও মুফাসসিরদের কেউ এ ধরনের কোন দস্তাবিজের উল্লেখ কিংবা আলোচনা করেন নি এবং ইসলামের প্রথম যুগগুলোতেও এ দলীলের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়নি। সঙ্গত কারণেই বলা চলে, এ দস্তাবিজ জাল, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট এবং এর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে। শায়খু'ল -ইসলামের উল্লিখিত বিশ্লেষণে য়াহূদীদের সকল জারিজুরি ফাঁস হয়ে যায় এবং তাদের কৃত্রিমতার সকল মুখোশ খুলে পড়ে।[১]

তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও প্রখর মেধা নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে আঁচ করা যাবে।

ইবনে তায়মিয়া (র)-র সমসাময়িক শায়খ সালিহ তাজুদ্দীন বর্ণনা করেন ঃ একবার আমি তাঁর দরবারে হাযির হলাম। এক ইয়াহূদী তাঁকে তকদীর সম্পর্কে কোন মসলা জিজ্ঞেস করেছিল এবং এ সম্পর্কে তাঁর আপত্তি ও প্রশ্ন আট লাইনের পদ্যে লিখে পাঠিয়েছিল। শায়খ (র) অল্প কিছুক্ষণ ভাবলেন, এরপর জওয়াব লিখতে শুরু করলেন। আমরা যারা মজলিসে উপস্থিত ছিলাম মনে করলাম! হয়তো তিনি গদ্যে জওয়াব দিচ্ছেন। কিন্তু তিনি যখন লেখা ছেড়ে উঠলেন এবং আমাদের একজন কাগজ উঠিয়ে যখন দেখতে পেল, উক্ত য়াহূদী যে ছন্দে ও যে তাল-মাত্রায় প্রশ্ন পাঠিয়েছিল, শায়খ (র) সেই একই ছন্দ ও তাল-মাত্রায় ১৪৮টি শ্লোকের পদ্যে তাৎক্ষণিকভাবে জওয়াব দিয়েছেন, তখন আর আমাদের বিস্ময়ের কোন অবধি রইল না! উত্তর-পত্রে তিনি এত বিপুল জ্ঞানের সমাবেশ ঘটিয়েছেন যে, যদি তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে যাওয়া হত তাহলে দু'টি বিরাট আকারের গ্রন্থের রূপ নিত।[২]

---

১. যাদু'ল-মা'আদ, ১ম খণ্ড, ৩৩৬ পৃ. واماهدية فى عقد الذمة واخذ الجزيةالخ নামক অধ্যায়।

২. আল-কাওয়াকিব, ১৫৪ পৃ.।

তাঁর এই গভীর পাণ্ডিত্য ও ব্যাপকতা দেখে সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের লোকেরা তাঁর সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করেছেন। তাঁরা ক্ষণজন্মা মনীষী, নেতৃস্থানীয় বিশ্লেষক, মুজতাহিদদের শেষতম ব্যক্তি এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম (ايت من ايات الله) প্রভৃতি অভিধায় তাঁকে অভিহিত করেছেন। ইবনে সায়্যিদিন্নাস (মৃ. ৪৩৪ হি.) বলেন ঃ

لم ترعين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه -

তাঁর সমসাময়িক লোক ও যারা তাঁকে দেখেছে তাঁর মত আর কাউকে দেখে নি এবং তিনি নিজেও তাঁর সমতুল্য আর কাউকে দেখেন নি।[১]

হাফিজ শামসুদ্দীন যাহবীর ন্যায় বিস্তৃত দৃষ্টির অধিকারী ঐতিহাসিক ও সমালোচক মনীষী এতদূর পর্যন্ত বলেছেন ঃ

لوحلفت بين الركن والمقام لحلفت انى ما رايت بعينى مثله ولاوالله راى هو مثل نفسه فى العلم -

যদি রুক্ন ও মকামে ইবরাহীমের মাঝে আমাকে কেউ কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করে তাহলে আমি হলফ করে বলব, 'ইল্ম-এর ক্ষেত্রে তাঁর মত আর কাউকে আমি দেখিনি এবং তিনিও তাঁর সমতুল্য আর কাউকে দেখেন নি।

বীরত্ব ও চিন্তার দৃঢ়তা

ইবনে তায়মিয়া (র)-র বীরত্ব, সাহসিকতা ও মৃত্যু সম্পর্কে ভয়শূন্যতা তাঁর সমসাময়িক সকলের এমন কি তুর্কী সর্দার ও ফৌজী অফিসারদের পক্ষেও বিস্ময়কর ছিল। মুগলদের বিরুদ্ধে তিনি যে শৌর্য-বীর্য, পুরুষোচিত সাহস ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা সে যুগের বিখ্যাত তুর্কী ফৌজী অফিসার ও অধিনায়ক কুবজুককেও বিস্মিত করে তুলেছিল। হাফিজ সিরাজুদ্দীনের ভাষায় ঃ

وكان اذاركب الخيل يحول فى العدو كاعظم الشجعان ويقوم كأثبت الفرسان وينكى العدو من كثرة الفتك بهم ويخوض بهم خوض رجل لايخاف الموت -

তিনি যখন ঘোড়ায় আরোহণ করতেন তো বিরাট বড় বীরের মতই শত্রুব্যূহে প্রবেশ করতেন এবং যখন দাঁড়াতেন তখন দৃঢ়পদ অশ্বারোহীর

৩. প্রাগুক্ত।

মতই দাঁড়াতেন। শত্রুকে আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়ে বিপর্যস্ত করে তুলতেন। এমন বেপরোয়াভাবে শত্রু সারির ভেতর ঢুকে পড়তেন যে, দেখে মনে হত তাঁর বুঝি মরণের ভয় নেই![১]

কিন্তু এখানে যুদ্ধের ময়দানে তিনি কী বীরত্ব দেখিয়েছেন কিংবা তৎকালীন শাসক সুলতানদের মুকাবিলায় কিভাবে সত্য উচ্চারণ করেছেন তার বর্ণনা দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কেননা পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এখানে আমরা তাঁর সে সব বীরত্বব্যঞ্জক খেদমত তুলে ধরতে চাই যা তিনি মসি যুদ্ধে, জ্ঞানের ময়দানে, গবেষণা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এবং সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আঞ্জাম দিয়েছেন। বিদগ্ধ জ্ঞানীরা জানেন, অধিকাংশ মসলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে (যে সব মসলা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল) তিনি একক ছিলেন না। সে সব মসলা নিয়ে এর আগেও অনেক আলোচনা হয়েছে এবং বই-পুস্তিকাও লেখা হয়েছে। এছাড়াও তাঁর যুগে আরও কয়েকজন তাঁর সঙ্গে অভিন্ন মত পোষণ করতেন। কিন্তু তিনি যেরূপ নির্ভীকভাবে, স্পষ্ট ভাষায় ও উদাত্ত কণ্ঠে তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন এবং জনসমক্ষে প্রকাশ করেছেন, লেখায় ও বক্তৃতার মাঝ দিয়ে অবলীলায় ব্যক্ত করেছেন, তেমনটি আর কেউ করেন নি। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নির্ভেজাল তওহীদের বিশ্লেষণে, আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কারোর নিকট সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা প্রত্যাখ্যানে, সে যুগে প্রচলিত বিদ'আত ও গর্হিত কর্মের বিরোধিতায়, ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ, হুলূল ও ইত্তিহাদ-এর ন্যায় বিভ্রান্তিমূলক মতবাদের বিরুদ্ধে বাক ও মসি যুদ্ধে, তাসাওউফের দাবীদার ও বি'দআতীদের গোপন প্রতারণার গ্রন্থি উন্মোচনে তিনি যে বীরত্ব ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন এবং যে সব মসলা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে তিনি সঠিক মনে করতেন, তা সে কালামশাস্ত্র সম্পর্কিতই হোক কিংবা ফিকহী মযহাব সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রেই হোক, সে সব দলীল-প্রমাণ সহযোগে এমন জোরালোভাবে পেশ করতেন যে, সে সব প্রমাণ করতে গিয়ে যে সব মুকদ্দমা ও দলীল-প্রমাণ কায়েম করেছেন এবং জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারায় ও বিশ্বাসে সুদৃঢ় থেকেছেন, এজন্য যে কষ্ট ভোগ করেছেন তা থেকে কেবল তাঁর বীরত্ব ও দৃঢ়তাই নয়, তাঁর মহান মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বেরও প্রমাণ মেলে। ইমাম যাহবী তাঁর জ্ঞান-চর্চা, ধর্মীয় বীরত্ব ও দৃঢ়তার কথা যেরূপ প্রশংসার সঙ্গে পেশ করেছেন নিম্নে তার পরিচয় মিলবে ঃ

---

১. আল-কাওয়াকিব, ১৬১ পৃ.।

اطلق عبارات احجم عنها الاولون والاخرون وهابوا وجسرهو عليها حتى قام عليه خلق من علماء مصروالشام قياما لامزيد عليه و بدعوه وناظروه وكاتبوه وهو ثابت لأيداهن ولايجابى بل يقول الحق المر الذى اداه اليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعة دائرته فى السنن والاقوال مع ما اشتهر عنه من الورع كمال الفكر وسرعة الادراك والخوف من الله العظيم والتعظيم لحرمات الله فجرى بينه وبينهم حملات حربية ووقعات شاميةومصرية وكم من نوبة رموه عن قوس واحدة فينجيه الله ـ

তিনি তাঁর বোধগম্য বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এমন সব টীকা ব্যবহার করেছেন যা পূর্ববর্তী ও শেষ যুগের বিজ্ঞ 'আলিমগণ ব্যবহার করতে সাহস পাননি। ফল দাঁড়ায় এই, মিসর ও সিরিয়ার বিরাট একদল 'আলিম তাঁর বিরোধী হয়ে যান এবং এ সকল 'আলিম তাঁর বিরোধিতার ক্ষেত্রে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেন নি। তাঁরা ইবনে তায়মিয়া (র)-র ওপর বিদ'আতী হবার অপবাদ দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে বিতর্কে নেমেছেন এবং তাঁকে পত্র লিখেছেন। কিন্তু তিনি সর্বাবস্থায় নিজস্ব চিন্তাধারায় ও 'আকীদা-বিশ্বাসে সুদৃঢ় থেকেছেন, কোন ক্ষেত্রেই তিনি তাদেরকে কোন ছাড় দেননি কিংবা কাউকে বিশেষ খাতিরও করেন নি, বরং সব সময় তিনি সে সব তিক্ত সত্য কথাই বলতে চেয়েছেন যা নিজস্ব ইজতিহাদ, চিন্তা-ভাবনা, মেধা, আচার-অভ্যাস ও কথাবার্তার ওপর পড়েছিল। কেবল এটিই একমাত্র বিষয় ছিল না, বরং এর সঙ্গে তাঁর যুহ্‌দ, পরহেযগারী, দূরদৃষ্টি, দ্রুত বোধশক্তি, আল্লাহ্-ভীতি, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধি-বিধানের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধাও এর অন্তর্গত ছিল। তাঁর ও তাঁর সমসাময়িক বিরোধিতাকারী মহলের ভেতর বড় বড় লড়াই-সংঘর্ষ হয়েছে, সিরিয়ায় ও মিসরে বিরাট মুকাবিলা হয়েছে। বহুবার এমনও হয়েছে যে, সমস্ত দল-উপদল একদিকে, অপরদিকে তিনি একা নিজে। এরপরও আল্লাহ্ পাক তাঁকে তাঁর বিরোধীদের অনিষ্টের হাত থেকে রক্ষা করেছেন, বাঁচিয়ে নিয়েছেন।[১]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর সমসাময়িকদের ভেতর জ্ঞানের গভীরতা ও পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে অবধারিতভাবেই বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন যা তাঁর সমসাময়িক সকলেই উচ্চ কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁর আসল বৈশিষ্ট্য যা

১. আর-রাদ্দু'ল-ওয়াফির, ৭১ পৃ.।

তাঁকে তাঁর সমসাময়িক খ্যাতনামা 'আলিম ও জ্ঞানীদের মাঝে বিশিষ্টতা দান করেছিল এবং ইতিহাসের পাতায় তাঁকে এক অনন্য ও অসাধারণ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিল তা কেবল তাঁর পাণ্ডিত্যের দ্যুতিতেই ছিল না, বরং ছিল তাঁর চিন্তার দৃঢ়তা, অপূর্ব বিশ্লেষণী শক্তি ও তাঁর মুজতাহিদসুলভ রীতি-পদ্ধতিতে। তিনি সেই সব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শাস্ত্র এবং সেই সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকাই পাঠ করেছিলেন যা তাঁর সমসাময়িকেরাও করেছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি তাঁর অধীত জ্ঞান-ভাণ্ডার ও পুস্তকাদির ভেতর থেকেই নিজস্ব রাস্তা বের করে নিয়েছেন এবং সত্বরই এক বিশিষ্ট আসন লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। আরবী ব্যাকরণ তো সবাই পড়েছিলেন এবং সকলেই সীবাওয়ায়হ্‌র অন্ধ অনুসরণকেই নিজেদের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর উক্তিকে অভ্রান্ত ও শেষ কথা মনে করা হত। কিন্তু ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর "আল-কিতাব" (যাকে ব্যাকরণবিদগণ আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রের ঐশী গ্রন্থের মর্যাদা দিয়ে থাকেন) সমালোচনার দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করেছিলেন। আবূ হায়্যান নাহভী যখন সীবাওয়ায়হ-এর বরাত দেন তখন তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন, সীবাওয়ায়হ কি নবী ছিলেন (যার সব কথাই আমাদেরকে মানতে হবে)? তাঁর ওপর কি আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র নাযিল হয়েছে? তিনি তাঁর "আল-কিতাব" গ্রন্থে আশিটি স্থানে ভুল করেছেন। গ্রীক যুক্তিশাস্ত্র ও দর্শনের অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তাঁর যুগের অধিকাংশ 'আলিম ও ফকীহ সংযত ছিলেন এবং যাঁরাই তা অধ্যয়ন করেছেন তাঁরাই কমবেশি এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, দর্শনশাস্ত্রের সবচেয়ে বড় সমালোচক ও মুসলমানদের মধ্যে এর নাড়ি-নক্ষত্র সম্পর্কে যিনি সবচেয়ে বেশী ওয়াকিফহাল, সেই হুজ্জাতু'ল-ইসলাম ইমাম গাযালী (র) তাঁর গ্রন্থে, এমন কি 'ইহ্‌য়াউ'ল-উলূম'কেও গ্রীক অধিবিদ্যা ও নীতি দর্শনের প্রভাব থেকে পুরোপুরি রক্ষা করতে পারেন নি, বরং দর্শনের ঐতিহাসিকগণ তাঁর বহু রচনায় গ্রীক দর্শনের ছায়াপাত লক্ষ্য করেছেন।[১] পক্ষান্তরে ইবনে তায়মিয়া (র) গ্রীক-দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উঁচিয়েছেন, অথচ কোথাও তাঁকে এর সঙ্গে সমঝোতা করতে দেখা যায় নি। তিনি "কিতাবু'র-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন" নামক গ্রন্থে গ্রীক দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রের যুক্তিসিদ্ধ সমস্যা ও প্রতিপাদ্য বিষয়গুলোর ওপর সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন। সে সবের ওপর কার্যকর ব্যবচ্ছেদ (অপারেশন) চালিয়ে এর পুরো ব্যবস্থাটাকেই আহত এবং স্বীয় ক্ষুরধার ও শাণিত সমালোচনার তীর বর্ষণ করে তিনি এর গোটা অবয়বকেই ঝাঁঝরা করে ফেলেন। ফিক্‌হ ও হাদীসের ক্ষেত্রে আলোচনা ও দৃষ্টি ক্ষেপণের বেশ কিছু কাল আগে

---

১. বিস্তারিত জানতে চাইলে فلسفة الاخلاق فى الاسلام وصلاتها بالفلسفة الاغريقية এবং تاريخ الاخلاق ড. মুহাম্মদ ইউসুফ মূসাকৃত।

থেকেই কতক সীমাবদ্ধ গণ্ডী তৈরী হয়ে গিয়েছিল যে গণ্ডীর বাইরে কদম ফেলতে কেউ সাহস পেতেন না এবং বহু কাল থেকে ফিকহ ও হাদীসের এই বিস্তৃত ভাণ্ডারে আর কিছুই সঞ্চিত হয়নি। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বহু ফিকহী মসলার ক্ষেত্রে যেগুলো সমাধান হয়ে গেছে বলে মনে করা হত, সেগুলো সম্পর্কে পুনরায় চিন্তা-ভাবনা করেন এবং স্বীয় গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণের ফল পরিপূর্ণ সাহসিকতা ও তত্ত্বগত গাম্ভীর্যের সঙ্গে পেশ করেন। এর ফল হল, স্থবির মস্তিষ্কে ও পণ্ডিত মহলের বিবশ কারখানায় পুনরায় স্পন্দন সৃষ্টি হয় এবং চিন্তা-চেতনার বদ্ধ দুয়ার অর্গলমুক্ত হয়। অবশেষে তিনি দৃঢ় চিত্তে কেবল কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সাহাবায়ে কিরামের অনুসৃত আদর্শের (اثار) আলোকে ফতওয়া দিতে শুরু করেন। হাফিয যাহবী তাঁর জীবদ্দশায় লিখেছেন ঃ

وله الان عدة سنين لا يفتى بمذهب معين بل بماقام الدليل عليه ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية ببراهين ومقدمات وامور لم يسبق اليها -

> এদিকে আজ কয়েক বছর যাবত (মযহাব চতুষ্টয়ের ভেতর) কোন একটি নির্দিষ্ট মযহাব মুতাবিক তিনি ফতওয়া দেন না, বরং যে মযহাবের দলীল-প্রমাণকে তিনি সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত মনে করেন সেই মুতাবিকই তিনি ফতওয়া দিচ্ছেন। তিনি নির্ভেজাল সুন্নাহ ও ইসলামের প্রথম যুগের বুযুর্গদের অনুসৃত পন্থার সাহায্যে এমন সব দলীল-প্রমাণ, প্রতিপাদ্য ও কার্যকারণ সম্পর্ক কায়েম করেছেন যে ক্ষেত্রে তিনি একক ও তুলনাহীন। তাঁর পূর্বে আর কেউ এমন দলীল-প্রমাণ ও প্রতিপাদ্য কায়েম করতে সক্ষম হননি।[১]

এই সব 'ইজতিহাদ'-এর ক্ষেত্রে কখনো কখনো তাঁকে একক ভূমিকায় দেখা যায়, কখনো ভুল-ভ্রান্তির শিকারও হয়েছেন, যেমনটি সাধারণত ভুলে ভরা মানুষের ক্ষেত্রে ঘটেই থাকে। এমন নয় যে, প্রতিটি মসলার ক্ষেত্রে তাঁর পেশকৃত দলীল-প্রমাণ শক্তিশালী হবেই এবং আমরা তা মানতে বাধ্য হব। কিন্তু এতে সন্দেহের এতটুকু অবকাশ নেই, তিনি তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সনিষ্ঠ ও অকপট ছিলেন। তিনি নফ্স-পরস্তী তথা আত্মপূজা, প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার আনুগত্য, আরামপ্রিয়তা অথবা কোন মুসলিহাত বা উপযোগিতার খাতিরে কোন ইমামের মত, কোন ফিকহী মযহাব অথবা জমহুর তথা সমষ্টিগত মতামত পরিত্যাগ এবং কোন মসলার ইস্তিম্বাত করতেন না। তিনি ছিলেন সত্যান্বেষী, দলীল-প্রমাণের

১. আল-কাওয়াকিবুদ্দুর্রিয়া, পৃ. ১৫৬-৫৭।

পাবন্দ এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুগত। এ সম্পর্কে ফতহু'ল-বারী প্রণেতা শাফি'ঈ মযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হাফিয ইবনে হাজার 'আসকালানী (র) যা বলেছেন আমাদের পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এখানে তা তুলে ধরছি। তিনি বলেন ঃ

انه شيخ مشائخ الاسلام فى عصره بلا ريب والمسائل التى انكرت عليه ماكان يقولها بالتشهى ولايصر على القول بها الابعد قيام الدليل عليه غالبا فالذى اصاب فيه وهوالاكثرسيستفاد منه ويترحم عليه بسبة والذى اخطاء فيه لايقلد فيه بل هو معذور لان ائمة عصره شهدواله بان ادوات الاجتهاد فيه حتى كان اشدالمتعصبين عليه والعاملين فى ايصال الشر اليه وهوالشيخ جمال الدين الزملكانى شهد له بذالك ـ

নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ ছিলেন। যে সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে সেগুলোও তিনি নিজের খেয়াল-খুশির বশবর্তী হয়ে করেন নি। সাধারণত যখন তিনি কোন দলীল-প্রমাণের ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে আশ্বস্ত হতেন তখনই কেবল তিনি তার ওপর অনড় ভূমিকা নিতেন। যে সমস্ত মসলার ক্ষেত্রে তিনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর এ জাতীয় মসলার সংখ্যাই অধিক, সে সমস্ত মসলার ক্ষেত্রে আমাদেরকে তাঁর অনুসরণ করা উচিত, উচিত তা থেকে উপকৃত হওয়া এবং এজন্য তাঁর অনুকূলে দু'আ-খায়র করা। যে সমস্ত মসলার ব্যাপারে তাঁর ভুল হয়েছে সে ক্ষেত্রে আমাদের উচিত তাঁর অনুসরণ না করা। এ ব্যাপারে তিনি মা'যূর, ক্ষমার্হ এবং তা এজন্য যে, তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠতম 'আলিম-'উলামা স্বীকার করেছেন, তাঁর ভেতর ইজ্তিহাদ করবার সমস্ত শর্তই বিদ্যমান ছিল। এমন কি তাঁর একজন বড় প্রতিপক্ষ, যিনি তাঁকে হেনস্থা করতেও তৈরি থাকতেন অর্থাৎ শায়খ জামালুদ্দীন আয-যামালকানী, তিনিও এর স্বীকৃতি দিয়েছেন।[১]

নিষ্ঠা ও নিবিষ্টচিত্ততা

ইবনে তায়মিয়া (র)-র জীবনের একটি উজ্জ্বলতর দিক ছিল এই, তিনি 'ইলমে দীনের খিদমতের জন্য সর্বদাই নিবেদিত ছিলেন, উৎসর্গীত ছিলেন। তিনি তাঁর গোটা জীবনভর আর কোন কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন নি। তাঁর অধিকাংশ সমসাময়িক, বন্ধু-বান্ধব ও সমবয়স্ক, যাঁদের অনেকেই বড় বড় নিষ্ঠাবান বুযুর্গ

১. আর-রাদ্দুল ওয়াফির, ৭৮ পৃ.।

ছিলেন, বিরাট বড় মনীষী ছিলেন, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদে নিযুক্ত থেকেছেন কিংবা রাজা-বাদশাহ্র উপহার-উপঢৌকনে ধন্য হয়েছেন অথবা রাষ্ট্রীয় ভাতা পেয়েছেন, কিন্তু ইব্ন তায়মিয়া (র) গোটা জীবনভর এসব থেকে মুক্ত থেকেছেন। তিনি 'ইলম ও দীনের চর্চা, ফতওয়া প্রদান, দর্স ও তাদরীস তথা পঠন-পাঠন, ওয়া'জ-নসীহত, গ্রন্থ প্রণয়ন, তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণা ভিন্ন আর কোন পেশার সঙ্গেই নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন নি। তাঁর একজন সমসাময়িক ব্যক্তি জ্ঞানের প্রতি তাঁর নিস্পৃহ মানসিকতা ও এর সঙ্গে সম্পর্কহীনতার সাক্ষ্য নিম্নোক্ত ভাষায় দিয়েছেন ঃ

ماخالط الناس فى بيع ولا شراء ولامعاملة ولاتجارة ولا مشاركة ولامزارعة ولاعمارة ولاكان ناظرا اومباشرا لمال وقف۔ ولم يقبل جراية ولاصلة لنفسه من سلطان ولا امير ولا تاجر ولاكان مدخرا دينارا ولادرهما ولا متاعا ولا طعاما وانما كانت بضاعته مدة حياته وميراثه بعد وفاتةرضى الله عنه العلم اقتداءبسيد المرسلين فانه قال ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولادرهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذبه اخذبحظ وافر۔

তিনি লোকের সঙ্গে বেচা-কেনায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে, অংশীদারী কারবারে, কৃষিকর্মে, ইমারত নির্মাণে প্রভৃতি কোন ধরনের কাজেই সম্পর্ক রাখেন নি। কখনো ওয়াক্ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক কিংবা মুতাওয়াল্লীও তিনি থাকেন নি। কোন সরকারের ভাতা কিংবা কোন সুলতান, শাসক কিংবা ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রদত্ত উপহার-উপঢৌকনও গ্রহণ করেন নি। টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ কিংবা কোন খাদ্য-দ্রব্য তিনি কখনও সঞ্চয় করেন নি। তাঁর জীবিতকালে সম্পদ বা পুঁজি বলতে ছিল একমাত্র 'ইল্ম বা জ্ঞান-ভাণ্ডার আর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকার বলতেও একমাত্র এটাই ছিল। আর এটাই নবী জীবনের আদর্শ। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আলিমগণ নবীদের ওয়ারিছ। আর কোন নবীই উত্তরাধিকার হিসেবে টাকা-পয়সা কিংবা ধন-সম্পদ রেখে যান নি, যা রেখে গেছেন তা হল 'ইল্ম-এর উত্তরাধিকার। যারা এই উত্তরাধিকার পেয়েছে তারা বড়ই ভাগ্যবান।[১]

১. আল-কাওয়াকিবুদ-দুর্রিয়্যাঃ, পৃ. ১৫৬-৫৭।

কাওয়াকিবু'দ-দুরিয়্যার লেখক বিশ্বস্ত লোকদের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন ঃ

انه قد قطع جل وقته وزمانه فى العبادة حتى انه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله ولم يزاوله لامن اهل ولا من مال -

তিনি তাঁর গোটা কাল ও সময় 'ইবাদত-বন্দেগীর মাঝে কাটিয়েছেন, এমন কি তিনি নিজের জন্যও অপর কোন পেশাই অবলম্বন করেন নি যা তাঁকে আল্লাহ্‌র ধ্যান-জ্ঞান থেকে অন্য দিকে লিপ্ত রাখবে আর চাই তা ধন-সম্পদই হোক কিংবা পরিবার-পরিজনই হোক।[১]

তাঁর পেশা ও 'ইলম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা, দীনের মধ্যে আত্মনিমগ্নতা ও জীবনের বহুবিধ ব্যস্ততা (যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কারাগারে ও গৃহে নজরবন্দী অবস্থায় কেটেছে) তাঁকে এতটুকু অবকাশও দেয় নি যাতে করে তিনি বিয়ে করতে পারেন। গোটা জীবনই তিনি একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় জ্ঞানের অনুসন্ধানে ও জিহাদী যিন্দেগীর মাঝে কাটিয়ে দিয়েছেন। কাওয়াকিবু'দ-দুর্রিয়্যার লেখক তাঁর দৈনন্দিন জীবনের কর্মতালিকা ও সময়-সূচীর বর্ণনা নিম্নোক্তভাবে দিয়েছেন ঃ

ولايزال تارة فى افتاء الناس وتارة فى قضاء حوائجهم حتى يصلى الظهر مع الجماعة ثم كذالك بقية يومه ثم يصلى المغرب ويقراء عليه الدرس ثم يصلى العشاء ثم يقبل على العلوم الى ان يذهب طويل من اليل وهوفى خلال ذالك كله اليل والنهار لايزال يذكرالله تعالى ويوحده ويستغفره -

কখনো তিনি ফতওয়া দানে মশগুল হতেন, কখনো-বা লোকের নানা প্রয়োজন পূরণে। আর এভাবেই জোহরের ওয়াক্‌ত এসে যেত। তিনি জামা'আতে জোহর আদায় করতেন। এভাবেই দিনের অবশিষ্ট ভাগ কাটত। এরপর তিনি মাগরিব আদায় করতেন। তারপর দর্‌স প্রদান করতেন তিনি। এরপর এশার সালাত আদায় করতেন। অতঃপর দর্‌স ও অধ্যয়ন শুরু হয়ে

১. প্রাগুক্ত ১৫৬ পৃ.।

যেত। আর এভাবেই রাতের একটা বিরাট অংশ অতিবাহিত হত। এরই ভেতর তিনি রাত-দিন সমানভাবে আল্লাহর যিক্‌র, কালিমায়ে তাওহীদ ও দু'আ-ই ইস্তিগফারে মশগুল থাকতেন।[১]

'ইল্‌ম তথা জ্ঞান যদি হয় কোন মুদাররিস কিংবা মুফতীর একটি গরজ, সাময়িক পেশা ও খেদমতের বিষয়, তবে সে ক্ষেত্রে ইবনে তায়মিয়া (র)-র জন্য তা খোরাক ও পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদে পরিণত হয়েছিল এবং এটি তাঁর অন্যতম স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। শায়খ সিরাজুদ্দীন আবূ হাফ্‌স আল-বাযযার বলেন ঃ

وكان العلم كانه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره فانه لم يكن مستعارا بل كان له شعارا او دثارا -

মনে হত 'ইল্‌ম তাঁর শিরা-উপশিরায়, অস্থি-মজ্জায়, শরীরের প্রতিটি রক্ত-কণিকায় মিশে গেছে। 'ইল্‌ম তাঁর নিকট সাময়িক প্রয়োজন কিংবা আপাত চাহিদার বিষয় ছিল না, বরং এ ছিল তাঁর অঙ্গীভূত অঙ্গাবরণ।[২]

তাঁর ইখলাস তথা অকপট নিষ্ঠা ও অকৃত্রিম নিঃস্বার্থপরতার এও একটি বড় দলীল যে, তিনি তাঁর বিরোধী প্রতিপক্ষ ও তাঁর অকল্যাণকামীদের সর্বক্ষেত্রেই অঙ্গবরণ ক্ষমা করেছেন এবং পরিষ্কার ঘোষণা দিয়েছেন ঃ احللت كل مسلم عن ايذائه لى "আমি সমস্ত মুসলমানকে ক্ষমা করেছি যারা আমাকে কষ্ট দিয়েছে কিংবা কষ্টের কারণ হয়েছে।" সুলতান আন-নাসির -এর ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পর বহু পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তাঁর সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ কাযী ইবনে মাখলূফকে যেভাবে ক্ষমা করেছেন এবং সুলতানের নিকট তাঁর ও তাঁর সহযোগী সাম্রাজ্যের কর্মকর্তা ও 'আলিমদের যেভাবে প্রশংসা ও তাঁদের জন্য সুপারিশ করেছেন, তা থেকে তাঁর নিঃস্বার্থপরতা, উদার মহানুভবতা ও অকপট নিষ্ঠার পরিচয় মেলে। এ থেকে এও প্রমাণিত হয়, তাঁর সমস্ত ইখতিলাফ 'ইল্‌মী ও ধর্মীয় ভিত্তির ওপর ছিল, এতে স্বীয় প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিস্বার্থের সামান্যতম গন্ধও ছিল না। তাঁর এই ইখলাস (নিষ্ঠা) ও নিবিষ্টচিত্ততার ফল হয়েছিল এই, ৬৭ বছরের কর্মব্যস্ত, ঘটনাবহুল ও উত্তাল জীবনে লেখনী, গবেষণা ও জ্ঞান-সম্ভারের এমন এক ভাণ্ডার তিনি রেখে গেছেন যা জ্ঞানীদের একটি গোটা সম্প্রদায়ের জন্য গর্বের ধন হতে পারে। এই ইখলাস ও নিবিষ্টচিত্ততারই ফল হল, তিনি যুগ ও পরিবেশের ওপর এমন এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে গেছেন যাতে করে তাঁকে নিঃসন্দেহে এক নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা ও একজন যুগন্ধর ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলা যেতে পারে।

---

১. আল-কাওয়াকিবুদ-দুর্রিয়্যা, পৃ. ১৫৬। ২. ঐ।

তৃতীয় অধ্যায়

তাঁর লেখনীর বৈশিষ্ট্য

ইবনে তায়মিয়া (র)-র রচনাসমূহ কতকগুলো একক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল যা সেই যুগের সাধারণ রচনাসমূহ থেকে তাকে অধিকতর উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত করে তোলে। এর ফল হল, কয়েক শতাব্দী গুজরে যাবার পরও, বিরাট গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান ও মেধাগত বিপ্লব সত্ত্বেও তা অদ্যাবধি নতুন বংশধরদের মন-মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে এবং এরই ফলে এই বুদ্ধিবৃত্তিপ্রিয়তা ও নিত্য-নতুন চাহিদার যুগেও তা নতুনভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিম্নোক্ত চারটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ঃ

১. ইবনে তায়মিয়া (র)-র প্রায় সমস্ত রচনার পাঠকের ওপর এই প্রভাব পড়ে যে, এই গ্রন্থের লেখক শরীয়তের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও দীন তথা ধর্মের রূহ (আত্মা)-এর রহস্যবিদ। তাঁর হাতে ধর্মের বিভিন্ন দিক ও মূলনীতি এসে ধরা দিয়েছে। এজন্য প্রতিটি আলোচ্য বিষয়ে তাঁর আলোচনা-সমালোচনা নীতিগত, কেন্দ্রানুগ, তৃপ্তিকর ও সান্ত্বনাদায়ক ও নিশ্চিত বিশ্বাস উৎপাদকও হয়ে থাকে। তিনি খুঁটিনাটি বিষয়ের পরিবর্তে উসূল তথা নীতির ওপর জোর দেন এবং এভাবে আলোচনার সূত্রপাত করেন যে, পাঠক অনুভব করেন, এটাই দীনের মেযাজ, এই হচ্ছে তার রূহ। আর ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এটাই হচ্ছে শরীয়তে মুহাম্মদীর দাবী। তিনি তাঁর সমসাময়িক ও অপরাপর লেখকদের তুলনায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের গোপন রহস্য শরীয়তের এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং দীনের রূহ সম্পর্কে অবহিতি ও তার মুখপাত্র হিসাবে সার্থক প্রতিনিধিত্ব যা তাঁর প্রতিটি ছোট-বড় রচনায় পরিষ্কারভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, বিশেষত তিনি যখন 'আকাইদ ও গুরুত্বপূর্ণ 'ইলমে কালাম সম্পর্কিত ফিকহী মসলা-মাসাইলের ওপর আলোচনা করেন।

২. তাঁর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, তাঁর গ্রন্থে জীবনের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। অনুভূত হয়, ঐ সব গ্রন্থ কোন শিক্ষায়তনের কোণে কিংবা বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপে লিখিত হয় নি, বরং ঠিক জীবনের ময়দানে ও জনসাধারণের মাঝে

লেখা হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থাদি থেকে খুব সহজেই তাঁর যুগকে চিহ্নিত করা যায় এবং সেই সমাজ ও সভ্যতার মন-মানসিকতা ও চরিত্রের পরিমাপ করা যায় যে সমাজ-সভ্যতার সঙ্গে এ সবের লেখক সম্পর্কিত ছিলেন।[১]

অতঃপর এ সব গ্রন্থ থেকে তাঁর আবেগ ও প্রেরণা, পছন্দ ও অপছন্দেরও পরিমাপ করা যেতে পারে। বোঝা যায়, এ সবের লেখক মন-মস্তিষ্ক ও মানবীয় আবেগ-অনুভূতির অধিকারী একজন মানুষ ছিলেন, কেবল লেখার নিষ্প্রাণ যন্ত্র কিংবা বুদ্ধিপিণ্ড ছিলেন না।

কুরআন তাফসীরের ক্ষেত্রে তিনি যে তরীকা বা পন্থা এখতিয়ার করেছিলেন তার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল, জীবনের সঙ্গে এর সম্পর্ক ও যোগসূত্র রয়েছে। এর লেখক আয়াতে ইলাহী তথা খোদায়ী নিদর্শনকে তাঁর চারপাশের জীবন ও সমসাময়িক কালের মানুষের ওপর আরোপ করেন এবং ঐ সব আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের খতিয়ান নেন। সেই সাথে আপন সমসাময়িক লোকদের ও উম্মার বিভিন্ন শ্রেণীর খতিয়ানও গ্রহণ করেন। তিনি আমাদেরকে বলে দেন, এসব আয়াত ও হাকীকত থেকে জীবনের কোথায় বিচ্যুতি ঘটছে এবং এর ফলে কী পরিণতি দেখতে পাচ্ছি।[২] জীবনের এই গুণ তাঁর অপরাপর রচনায় খুবই কম পাওয়া যায় কিংবা পাওয়া যায় না বললেই চলে।

৩. তিনি যে বিষয়বস্তুর ওপরই কলম ধরেন তার ওপর এত প্রচুর উপকরণের সমাবেশ ঘটান যা বিশটির অধিক গ্রন্থে ও শত শত পৃষ্ঠায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে থাকে। তাঁর এই রচনা পদ্ধতি (যাকে বিশ্বকোষ জাতীয় লেখনী-পদ্ধতি বলা যেতে পারে) তাঁর সমস্ত রচনার উল্লেখযোগ্য গুণ, চাই কি তা কুরআন-উক্ত আলোচনার ওপর হোক কিংবা হোক তা বুদ্ধিবৃত্তিক। আর এভাবেই তাঁর গ্রন্থগুলোতে এক জায়গায় এতটা উপকরণ মিলে যে, তাঁর একটি গ্রন্থ অধিকাংশ সময় একটি গ্রন্থাগারের স্থলাভিষিক্তরূপে পরিণত হয় এবং একজন বিদ্যার্থীকে বহু গ্রন্থের দ্বারস্থ হবার হাত থেকে মুক্তি দেয়।[৩] অধিকাংশ সময় এই সব উপকরণ ও মাল-মশলা ও কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করতে আলোচনার প্রান্ত হাত থেকে বেরিয়ে যায় এবং নিবিষ্ট পাঠক তাঁর কথামালা ও উদ্ধৃতির আধিক্যের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। তাঁর পক্ষে আলোচনা

---

১. নমুনা হিসাবে দেখুন

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم -

২. দ্র. তাফসীর সূরা নূর, সূরা ইখলাস প্রভৃতি।

৩. উদাহরণস্বরূপ দেখুন

منهاج السنة والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح -

গোছান ও আয়ত্তে আনা কঠিন হয়ে পড়ে। এই অসুবিধা ও কাঠিন্য সত্ত্বেও তাঁর [ইবনে তায়মিয়ার (র)] লিখিত কিতাবাদির এই উপকারী দিকটিও খাটো করে দেখার সুযোগ নেই যে, এসব গ্রন্থ পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক বুযুর্গ-মনীষীদের কথিত উক্তি ও মতামতের এক ভাণ্ডার এবং আপন বিষয়বস্তুর ওপর একটি ছোটখাটো বিশ্বকোষ বিশেষ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে এটিও তাঁর এক অবদান যে, তিনি বহু প্রাচীন উপকরণ ও উপাদান আমাদের জন্য সংরক্ষণ করে গেছেন এবং বহু মতামত ও নানা চিন্তাসমষ্টিকে তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করে নষ্ট হবার হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

৪. তাঁর গ্রন্থাদি সাধারণ কালাম ও ফিক্‌হশাস্ত্রীয় রচনা থেকে এ দিক দিয়েও বিশিষ্ট যে, তাতে এসব বিষয়বস্তুর ওপর লিখিত অপরাপর গ্রন্থের মতে শুষ্ক, জটিল ও "মতন" (متن)-সমূহ দ্বারা ভারাক্রান্ত নয় যার মধ্যে সাধারণত প্রতিটি শব্দ বন্ধন, টীকা ও ফুটনোট দ্বারা ভরপুর থাকে। ইবনে তায়মিয়া (র)-র রচনায় ঋজুতা, জোর, আরবীয়তা (عربية) ও কোথাও (অনিচ্ছাকৃত) অলংকরণ, সাহিত্য ও বাগ্মিতার শান সৃষ্টি হয়ে যায় যা তাঁর কিতাবাদিকে (যা অধিকাংশই বিরাট ভলিউমবিশিষ্ট) চিত্তাকর্ষক, হৃদয়গ্রাহী, জীবন্ত ও ওজস্বী করে তোলে। বিশেষত তিনি যখন প্রাচীন বুযুর্গদের তরীকা-পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার ও তাঁদের ধর্মীয় 'ইল্‌ম, আমল ও চিন্তার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলতের ওপর আলোচনা করেন তখন তাঁর কলম অত্যন্ত জোরদার এবং তাঁর আলোচনা ছন্দায়িত হয়ে ওঠে। তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিক ও জীবনীকারগণ তাঁর জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও কামালিয়াতের ক্ষেত্রে নানা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাঁর ভাষার অলংকরণ ও বাগ্মিতার আলোচনাও করেছেন।

হাফিজ আবু হাফ্‌স বলেন ঃ

يجرى كما يجرى التيار ويفيض كما يفيض البحر ويصير منذ يتكلم الى ان يفرغ كالغائب عن الحاضرين مغمضاعينيه ويقع عليه اذ ذاك من المهابة ما يرعد القلوب ويحير الابصار والعقول -

তাঁর কথায় বন্যার বেগ ও সমুদ্রের উন্মত্ততা পরিলক্ষিত হয়। কথার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এমন মনে হয় যেন তিনি শ্রোতাদের মাঝে উপস্থিত নন, তিনি যেন তাদের মাঝ থেকে হারিয়ে গেছেন। কথা বলার সময় তিনি চোখ

বন্ধ করেন, তারপর তিনি বক্তৃতা করেন। আর এ সময় তিনি এমনই এক ভীতিকর ও মর্যাদাপূর্ণ প্রভাবে উজ্জীবিত হন যা গোটা মজলিসকেই আশ্চর্য রকমের প্রভাবিত করে ফেলে।[১]

তাঁর রচিত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করলে বোঝা যায়, শব্দের সাবলীলতা ও জ্ঞানের উত্তাল তরঙ্গময়তা কেবল তাঁর মজলিসের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট নয়, তাঁর লেখনীও এক্ষেত্রে তাঁর সহযোগী ছিল। আকশেহরী তাঁর সফরনামায় (ভ্রমণ কাহিনীতে) এই একই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ وقلمه ولسانه متقاربان "তাঁর কলম ও যবান পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলে।"

তাঁর সৌন্দর্য ও গুণাবলীর সাথে সাথে একজন ঐতিহাসিক ও সমালোচকের পক্ষে একথা প্রকাশ করাও আবশ্যক, তাঁর কিতাবাদি ও আলোচনায় অস্থিরতা ও বিশৃংখলা, এক বিষয়বস্তু থেকে অন্য বিষয়বস্তুর দিকে প্রত্যাগমন, সামান্য সম্পর্কের রেশ ধরে অপর কোন আলোচনার সূত্রপাত এবং উক্ত আলোচনা দীর্ঘ করার আধিক্য লক্ষ্য করা যায় যা তাঁর কিতাবাদি অধ্যয়নকারীর পক্ষে (বিশেষত তাঁর রচনা পদ্ধতি তথা লেখার ধরন ও কথা বলার বিশেষ ভঙ্গীর সঙ্গে যিনি অভ্যস্ত নন) কঠিন পরীক্ষা ও অসুবিধার কারণ হয়ে দেখা দেয়। এর প্রধান কারণ তাঁর মেধার তীক্ষ্নতা, প্রতিভার প্রাচুর্য, জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও তাঁর স্বভাবজাত আবেগ-উদ্দীপনা। মনে হয় তাঁর মেধা ও লেখনী আলোচনা করবার সময় একটি কেন্দ্রবিন্দুর ওপর স্থির নিবদ্ধ হতে পারে না; নিত্য-নতুন বিষয়বস্তুর আগমন ও বহির্গমন এত প্রবলভাবে ও দ্রুততার সাথে ঘটতে থাকে যে, তিনি নির্ধারিত বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেন না। আর এটাই ছিল তাঁর দর্‌স-এর বৈশিষ্ট্য। তাঁর শাগরিদ আবূ হাফ্‌স আল-বাযযার বলেন ঃ

كان ابن تيمية اذاشرع فى الدرس يفتح الله عليه اسرار العلوم وغوامض ولطائف ودقائق وفنون ونقول واستدلالات بايات واحاديث واستشهاد باشعار العرب وهو مع ذالك كما يجرى التيار ويفيض كما يفيض البحر -

ইবনে তায়মিয়া যখন দরস প্রদানের সূচনা করতেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ওপর 'ইলম তথা জ্ঞানের গুপ্ত রহস্য, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্য, জ্ঞানী-গুণীদের কথিত বাণী ও বর্ণনা, কুরআন পাকের আয়াত ও হাদীসে নববীর দ্বারা

১. আল-কাওয়াকিব, পৃ. ১৫৫;

প্রমাণপঞ্জী, আরবী কবিতার সাক্ষ্য ও উপমা-উদাহরণের উৎসমুখ খুলে দিতেন। মনে হত, প্রবল বেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে এবং সমুদ্র প্রমত্ত বেগে আন্দোলিত হচ্ছে।[১]

এই মেধার বহির্গমন ও স্থানান্তর, বিষয়বস্তুর প্রাচুর্য ও দলীল-প্রমাণ এবং বুদ্ধির প্রাখর্যের কারণে তাঁর তার্কিক ও সমালোচকদেরকে বিতর্ক সভায় খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। তিনি তাঁর আলোচনায় ও বিতর্কে এত বিস্তর মসলা-মাসাইলের সমাবেশ এবং এত বিভিন্নমুখী জ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটাতেন যে, তাঁর প্রতিপক্ষকে একটি স্থির কেন্দ্রবিন্দুর ওপর দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে খুবই বেগ পেতে হত। এজন্যই সিরিয়া ও মিসরের 'উলামায়ে কিরাম ও ফকীহগণ সাধারণ মজলিসে তাঁর সঙ্গে আলোচনা ও বিতর্কে অবতরণ পরিহার করতে চাইতেন এবং অধিকাংশ সময় অক্ষমতা জ্ঞাপন করতেন। এই অসুবিধা সম্পর্কে তাঁরই একজন সমসাময়িক মনীষী ও তার্কিক শায়খ সফী উদ্দীন আল-হিন্দী নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

ماراك يابن تيمية الا كالعصفور حيث اردت ان اقبضه من مكان فر الى مكان اخر -

ওহে ইবনে তায়মিয়া! তুমি এক ছোট্ট চিড়িয়া। তোমাকে ধরবার জন্য যখনই একদিকে হতে বাড়াই অমনি তুমি উড়ে গিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নাও।[২]

তাঁর এই মেযাজী বৈশিষ্ট্য (যা কোন ঘাটতিজনিত নয়, বরং জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর আধিক্য, পরিপূর্ণতা ও মেধার ক্ষেত্রে তাঁর প্রাচুর্যের কারণে) তাঁর সকল রচনায় পাওয়া যায়। সত্যান্বেষণ যাঁদের জীবনের ব্রত তাঁরা যদি ধৈর্য ও সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করেন এবং এই অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করেন তাহলে এই প্রমত্ত সমুদ্র থেকে বহু মূল্যবান মণিমুক্তা আহরণ করতে পারবেন।

---

১. আল-কাওয়াকিব, পৃ. ১৫৫।

২. নুযহাতু'ল'-খাওয়াতির, ২য় খণ্ড, ১৪০ পৃ. তরজমা মুহাম্মদ বিন 'আবদুর রহীম আল-আরমাবী। (আশ-শায়েখ সফীউদ্দীন আল-হিন্দী)।

চতুর্থ অধ্যায়

বিরোধিতার কারণ এবং তাঁর সমালোচক ও সমর্থক

উপরিউক্ত অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধির পরিপক্কতা, স্বীকৃত নিষ্ঠা ও দীনদারীর সাথে একজন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনে এই প্রশ্ন জাগে, তাঁর সমসাময়িক ও শেষ যুগের কতক মনীষী পণ্ডিত কেন এত কঠোরতার সঙ্গে তাঁর বিরোধিতা করলেন এবং তাঁর ব্যক্তিসত্তা তাঁর যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান কাল অবধি কেনই বা আলোচনা ও সমালোচনার বস্তু হয়ে রইল? এ ধরনের একজন সামগ্রিক কামালিয়াতের অধিকারী মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে সকলে একমত হবেন, এটাই তো ছিল স্বাভাবিক। এ প্রশ্ন জাগা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত আর তাই মনে রাখতে হবে, বিরোধিতা আর মতভেদের মধ্যে দুস্তর ফারাক রয়েছে। মতভেদ জ্ঞানী-গুণী ও গবেষক পণ্ডিতদের অধিকার আর এই অধিকার তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া যায় না। এখানে মতভেদ নয়, বরং বিরোধিতা পথভ্রষ্টতা ও কুফরীর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এবং আলোচনার বিষয় হয়েছে তাঁর জীবন-চরিত। তাঁর সমসাময়িক ইতিহাসের আলোকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে এই প্রশ্নের জওয়াব দেয়া দরকার।

১. প্রথমত, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার এটাই প্রমাণ, তাঁর ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে শুরু থেকেই দু'টি পক্ষ সৃষ্টি হয়েছে এবং দু'পক্ষের ভেতর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সংঘর্ষ চলছে। ইতিহাসে যাঁরাই বিশিষ্ট আসন লাভ করেছেন এবং যাঁরাই অস্বাভাবিক ও অত্যাশ্চর্য কামালিয়াতের অধিকারী হয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে হামেশাই এমনটি ঘটতে দেখা গেছে। এক দল তাঁদের ভক্তে পরিণত হয়েছে যারা তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে এবং প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির আশ্রয় নিয়েছে। অন্য দল তাঁদের বিরোধিতা ও সমালোচনায় কোমর বেঁধেছে এবং সেক্ষেত্রেও তারা বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত করে ছেড়েছে। আজীমুশ্বান ও অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে ইতিহাসের এটি এক ধারাবাহিক ও পর্যায়ক্রমিক অভিজ্ঞতা যে, ইতিহাস দর্শন ও মনস্তত্ত্ববিদ্যার কতক অধ্যাপক ও "শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষণজন্মা প্রতিভা"-র পর্যবেক্ষক একে স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবে অভিহিত করেছেন।

২. ইবনে তায়মিয়া (র)-র ব্যক্তিসত্তার মাঝে তাঁর সমসাময়িকদের জন্য সর্বাপেক্ষা বড় পরীক্ষা ছিল, তিনি তাঁর যুগের ও সেই পরিবেশের সাধারণ মেধা ও জ্ঞানগত মানের তুলনায় উন্নততর ছিলেন। আর স্বীয় যুগের সাধারণ মানের তুলনায় উচ্চতর স্থান আল্লাহ্‌র এক অপূর্ব নেয়ামত এবং একটি ঈর্ষাযোগ্য কামালিয়াত। আর এই কামালিয়াতের অধিকারী ব্যক্তিকে তাঁর এই কামালিয়াতের জন্য বিরাট মূল্য দিতে হয়। তাঁকে তাঁর সমকালীন লোকদের পক্ষ থেকে অব্যাহত পরীক্ষার মাঝে কাটাতে হয় এবং সমকালীন ব্যক্তিবর্গও জীবনভর তাঁর থেকে উদ্ভূত এক ধরনের মুসীবত ও সংকটে নিপতিত থাকেন। তারা তাঁর চিন্তার সজীবতা, সমুন্নত দৃষ্টি ও ইজতিহাদী শক্তির সঙ্গী হতে পারেন না এবং তারা তাঁর হিমালয়সম জ্ঞান ও চিন্তাধারা পর্যন্ত পৌঁছুতে ব্যর্থ হন। অপর দিকে তিনিও তাদের নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ পরিভাষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। তিনি জ্ঞান ও বিচক্ষণতার মুক্ত নীলিমায় এবং কুরআন ও হাদীসের সমুন্নত ও বিস্তৃত পরিসরে অবাধে বিচরণ করেন। তাঁর জ্ঞানের অবতরণ ক্ষেত্র হয় প্রথম যুগের এবং প্রথিতযশা শিক্ষকদের রেখে যাওয়া পুঁথি-পুস্তক ও এর অনুধাবন কর্ম। সুস্পষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বহুবিধ শাস্ত্রের মুজতাহিদ ও মুজাদ্দিদ হয়ে থাকেন তাঁর মত ব্যক্তিগণ। মোটকথা, উপলব্ধি ও ধারণ ক্ষমতার এই পার্থক্য তাঁর ও তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের মাঝে এমন এক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটায় যার আর নিরসন হয় না। আর এ কখনো তাঁর সমসাময়িকদের তৃপ্ত করতে পারে না। প্রতিটি যুগের কামালিয়াতের অধিকারী ও শাস্ত্রের মুজতাহিদ 'উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে অভিযোগ করেছেন, তাঁদের গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান তাঁদের যুগের জ্ঞানগত ও পাঠক্রমের মান থেকে উন্নততর পর্যায়ের এবং 'আলিমদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে যাদের চিন্তার দৌড় পুঁথিগত বিদ্যার বেশী নয়। আর এটাই 'আলিম-উলামা ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের বিরোধিতার কারণ।

৩. বিরোধীদের একটি দল এজন্যই তাঁর বিরোধী ছিল যে, তিনি তাঁর অসাধারণ জ্ঞান, মেধা, আপন ব্যক্তিত্বের চিত্তাকর্ষক ক্ষমতা ও বুলন্দীর কারণে আম-খাস নির্বিশেষে সকলের ভেতর জনপ্রিয় এবং হুকুমতের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভেতর প্রভাব ফেলে চলেছিলেন। তাঁর জ্ঞান ও বক্তৃতার সামনে অন্য কারুর প্রদীপই আর জ্বলছিল না। তিনি যেখানেই থাকেন সকলের ওপর ছেয়ে যান। দরস প্রদান করলে দরস-এর অপরাপর মাহফিলগুলো নিষ্প্রভ ও রওনকহীন হয়ে পড়ে। তাকরীর করলে জ্ঞান-সমুদ্র উপচে পড়ে। আল্লামা যাহবী নিম্নোক্ত অর্থপূর্ণ কথার ভেতর দিয়ে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন ঃ

غير انه يغترف من بحر وغيره من الائمة يغترفون من السواقى

মনে হয় যেন তিনি সমুদ্র থেকে পানি ভরছেন আর অপরাপর 'উলামায়ে কিরাম নদী-নালা কিংবা ছোটখাটো খাল-বিল থেকে পানি নিচ্ছেন (আল-কাওয়াকিবুদ্দুর্রিয়া, ১৪৫ পৃ.)।

প্রতি যুগের 'আলিম-'উলামা আর যা-ই হোন, মানুষ ছিলেন এবং মানবীয় মন-মস্তিষ্ক ও মানবীয় অনুভূতি তাঁদেরও ছিল। এজন্য এই হীনমন্যতাবোধ এবং মানবীয় প্রকৃতির এই প্রাচীন দুর্বলতা ও কমযোরী, যার হাত থেকে বেঁচে থাকা কঠিনও বটে, যদি তাদের বিরোধিতার কারণ হয়ে থাকে তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র)-র সঙ্গে তীব্র মতানৈক্য ও ঈর্ষা পোষণের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নিম্নোক্ত যে কবিতাটি ঐতিহাসিকগণ উদ্ধৃত করেছেন সকল যুগের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য ঃ

حسدوا الفتى اذلم ينالوا سعيه فالناس اعداء له وخصوم -

৪. শায়খুল ইসলাম-এর মেযাজী বৈশিষ্ট্যও সমকালীন বহু লোককে তাঁর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হতে সাহায্য করেছিল যা সাধারণত সেই সব ক্ষণজন্মা পুরুষের মাঝে দেখতে পাওয়া যায় যাঁরা অসাধারণ রকমের প্রতিভাবান, বিস্তৃত দৃষ্টিসম্পন্ন, যাঁদের জানাশোনার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থাৎ স্বভাবের উগ্রতা ও অনুভূতির তীক্ষ্ণতা যা কতক মুহূর্তে তাদেরকে তাদের কোন কোন প্রতিপক্ষের কঠোর সমালোচনা এবং তাদের (প্রতিপক্ষের) মূর্খতা, স্থূলবুদ্ধি ও স্বল্প বিদ্যা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করত, তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে তাঁর মুখ দিয়ে এমন সব কথা বের হত যার ফলে তাঁর সমসাময়িক জ্ঞানীমহল এবং তাদের ভক্ত-অনুরক্ত ও ছাত্রদের অন্তর-মানস আহত হত, হত হেনস্থ। এতে তাদের অন্তরে স্থায়ীভাবে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বীজ রোপিত হয় যা জ্ঞানগত ও ফিকহী পরিভাষা, কুফর ও গোমরাহীর ফতওয়া এবং অব্যাহত বিরোধিতা ও রেষারেষির আকারে প্রকাশ পেত। ...শায়খুল ইসলামের সমসাময়িক লোকেরা, তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও জীবনীকারগণ তাঁর ফযীলত ও মর্যাদা, মানাকিব (প্রশংসা) ও অবস্থা বয়ান করতে গিয়ে এই ' মেযাজী অবস্থা' যা অনেকখানি তাঁর যিন্দেগীর অবস্থা, চিন্তাগত ও 'ইলমী কামালিয়াতের ফল ছিল, উপেক্ষা করেন নি। 'আল্লামা যাহবী, যিনি তাঁর 'ইল্মী ও দীনী কামালিয়াতে খুবই প্রভাবিত ছিলেন, এক স্থানে লিখছেন ঃ

تعتريه حدة فى البحث وغضب وصدمة للخصوم تزرع له عداوة فى النفوس ولولا ذالك لكان كلمة اجماع فان كبارهم خاضعون لعلومه معترفون بانه بحر لاساحل له وكنزليس له نظير -

আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ককালে কখনো কখনো তাঁর মেযাজ উগ্র হয়ে যায় এবং স্বীয় প্রতিপক্ষ আলোচকের ওপর এমনভাবে তিনি আঘাত হানেন যে, এর ফলে তার মনে শত্রুতার বীজ উপ্ত হয়। যদি এমনটি না হতো তাহলে তাঁর মহামর্যাদা ও কামালিয়াতে কেউ দ্বিমত পোষণ করতেন না, সবাই একমত হতেন। কেননা তাঁর সমসাময়িক খ্যাতিমান পণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠতম 'আলিম-'উলামা সকলেই তাঁর 'ইল্‌ম ও যোগ্যতার সামনে মস্তকাবনত এবং তাঁরা পরিষ্কার ও সাফ সাফ স্বীকার করেছেন যে, তিনি (ইবনে তায়মিয়া) এক কূল-কিনারাহীন সমুদ্র এবং এমন এক জ্ঞানভাণ্ডার যার কোন নজীর নেই।

তাঁর যিন্দেগীতে এমন কতিপয় ঘটনার সাক্ষাৎ মেলে যে, কোন কোন 'ইলমী কিংবা দীনী (ধর্মীয়) মসলার ক্ষেত্রে স্বীয় সমসাময়িকদের স্বল্প বুদ্ধি অথবা তাদের অধ্যয়ন ও দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ততা তিনি বরদাশ্‌ত করতে পারেন নি এবং প্রকাশ্যে ও খোলাখুলি তা তিনি প্রকাশ করে দিয়েছেন। আর এই প্রকাশের কারণে তাঁর সমসাময়িক সেই সব জ্ঞানী-গুণী বন্ধুরা স্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুতে পরিণত হয়ে গেছেন। অনন্তর যিয়ারতের মসলার ব্যাপারে তকী ইবন আল-আখনাঈ মালিকী তাঁর অভিমত প্রত্যাখ্যান করেন। এ সম্পর্কে লিখিত তাঁর পুস্তিকা পাঠ করবার পর ইবনে তায়মিয়া (র) তার জওয়াব লেখেন। এতে তিনি তকী মালিকীর স্বল্প বিদ্যা ও জানাশোনার ক্ষেত্রে স্বল্পতার অভিযোগ আনেন এবং বলেন, এই মসলার ব্যাপারে তাঁর লেখার যোগ্যতা নেই। তাঁর এই মতামত তকী মালিকীর আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত করে ও তাঁকে কঠিন পরীক্ষার মাঝে নিক্ষেপ করে এবং মর্মপীড়ার কারণ হয়। তাঁর কোন কোন জীবনীকারের ধারণা, তাঁর সর্বশেষ নজরবন্দী, বন্দী জীবনের দীর্ঘসূত্রিতা এবং শেষাবধি তাঁর লেখার উপকরণ (কাগজ, কালি, কলম ইত্যাদি) ছিনিয়ে নেবার পেছনে এই মন্তব্য প্রকাশই দায়ী।[১]

ঠিক তেমনি আবূ হায়্যান মুফাসসির যাঁকে তাঁর যুগে আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রের ইমাম মনে করা হত, ইবনে তায়মিয়া (র)-র খেদমতে দীন ভক্ত বেশে হাযির হন এবং তাঁর প্রশংসায় একটি আবেগঘন কাসীদা লিখে আনেন যার প্রথম স্তবক ছিল ঃ

لما اتانا تقى الدين لاح لنا داع الى الله فرد ماله وزر -

তকীয়্যুদ্দীন (ইবনে তায়মিয়া) যখন আমাদের কাছে এলেন তখন আমরা এমন এক আল্লাহ্‌র দাঈকে দেখতে পেলাম যিনি স্বীয় বৈশিষ্ট্যে একক এবং যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৪ খণ্ড, ১৩৪ পৃ.।

উক্ত কাসীদার একটি স্তবক এরূপ ঃ

يامن يحدث عن علم الكتاب أصغ هذا الامام الذى قدكان يتنظر -

ওহে! সেই ব্যক্তি যিনি পুঁথি-পুস্তকে লিখিত জ্ঞানের কথা আলোচনা করতেন। মন দিয়ে শুনুন, ইনিই সেই ইমাম, বহু কাল ধরে যাঁর অপেক্ষা করা হচ্ছিল।

আলাপ-আলোচনা কালে এক পর্যায়ে আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রের কোন সমস্যা নিয়ে কথাবার্তা আরম্ভ হয়। আবূ হায়্যান তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে সীবাওয়ায়হ্-এর উদ্ধৃতি দেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল ইবনে তায়মিয়া (র) সীবাওয়ায়হ-এর নাম শুনতেই নিশ্চুপ মেরে যাবেন এবং তাঁর যুক্তির সামনে মস্তক নুইয়ে দেবেন। কিন্তু তাঁর প্রত্যাশার বিপরীতে জওয়াব মিলল ঃ সীবাওয়ায়হ আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রের এমন কোন নিষ্পাপ নবী তো নন যে, তাঁর কোন ভুল হতে পারে না এবং তিনি এ বিষয়ে চূড়ান্ত কথা বলে গেছেন। তিনি তাঁর 'আল-কিতাব' নামক গ্রন্থে ৮০টি জায়গায় ভুল করেছেন যা তুমি বুঝতেও পারবে না। একথা শুনে আবূ হায়্যান ইবনে তায়মিয়া (র)-র প্রতি এত বেশী ক্ষেপে যান যে, তিনি উক্ত কাসীদা তাঁর 'দীওয়ান' থেকে বাদ দিয়ে দেন। এরপর তিনি তাঁর ভক্তই থাকেন নি তাই নয়, বরং চিরদিনের জন্য তাঁর বিরোধী ও সমালোচকে পরিণত হন।

৫. বিরোধিতার একটি কারণ তাঁর কোন কোন গবেষণা, পর্যালোচনা ও কতক বিষয়কে অপর কতক বিষয়ের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান, যেসব ক্ষেত্রে তিনি শুধু একক ও স্বতন্ত্র ভূমিকাই পালন করেন নি, বরং মশহূর মযহাব ও ইমাম চতুষ্টয়ের প্রদত্ত অভিমত ও ব্যাখ্যা থেকে স্বতন্ত্র অভিমত ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যে সমস্ত লোকের ফিক্হ্শাস্ত্র ও তার বিপরীতের ইতিহাস, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের কথিত উক্তি ও মসলা-মাসাইলের ওপর ব্যাপক দৃষ্টি রয়েছে তাদের জন্য তো এই একক ভূমিকা কোন আতংকের বস্তু এবং ইবনে তায়মিয়া (র)-র ফযীলত ও কামালিয়াত অস্বীকার করবার হেতু নয়। তাঁরা জানেন, যদি মশহূর ইমামগণের ও আল্লাহ্র প্রিয় আওলিয়ায়ে কিরামের একক ভূমিকা ও মসলা-মাসাইল একত্র করা যায় তাহলে একক ক্ষেত্রসমূহ খুবই হালকা ও মামুলী দৃষ্টিগোচর হবে ও সে সমস্ত লোকের শুভ ধারণা যাঁরা এই একক ভূমিকাকে মকবুল ও সত্য হবার পরিপন্থী মনে করেন এবং একক ও স্বতন্ত্র ভূমিকা পালনকারীর শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও বিলায়েতের জন্য তাঁর কোন উক্তি, অভিমত ও গবেষণাই প্রখ্যাত কোন গবেষণার বিরোধী হবে না বলে শর্ত আরোপ করেন তারা অসুবিধার মাঝে পড়ে যাবেন। স্বয়ং শায়খ মুহয়ি উদ্দীন ইবন 'আরাবী, যাঁর মর্যাদা ও বিলায়াতের স্বীকৃতি

দিয়েছেন বিরাট সংখ্যক লোক, তিনিও এমন বহু ফিকহ ও কালামশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একক ভূমিকা নিয়েছেন এবং তাঁর এই ব্যাখ্যা প্রদানের পূর্বে অনুরূপ ব্যাখ্যা কিংবা অভিমত আর কেউ দেন নি। তাঁর এই একক ভূমিকা সেই যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সুন্নাহ্‌র 'আলিমগণের ভেতর আলোচনা-সমালোচনার বিষয় হয়ে রয়েছে।[১]

কিন্তু যে সকল লোকের দৃষ্টি 'বিরোধীয়' বিষয়বস্তুর প্রতি তেমন গভীর ও ব্যাপক নয় অথবা যাঁরা 'উলামায়ে মুতাকাদ্দিমীন (ইসলামের আদি যুগের 'উলামা ও বিদ্বানমণ্ডলী)-এর অনুকূলে একক সিদ্ধান্ত ও ভূমিকা গ্রহণের অনুমতি দিতে পারেন, কিন্তু কামালিয়াতের অধিকারী ও সূক্ষ্মদর্শী সমকালীন কোন মনীষীর পক্ষে তার সুযোগ নেই, তাদের জন্য এই একক ভূমিকাও বিরোধিতার কারণ, বিভ্রান্ত 'আকীদা, গোমরাহী ও ইজমা'র অনিষ্টকারিতার পক্ষে দলীলে পরিণত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে হাদীসশাস্ত্রে মু'মিনদের আমীর হাফিজ ইবনে হাজার 'আসকালানীর এই উক্তি (যা ওপরে উক্ত হয়েছে) অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ, যথাযথ ও সর্বপ্রকার বাড়াবাড়ি ও অতিশয়োক্তি থেকে মুক্ত।

তিনি বলেন ঃ

فالذى اصاب فيه وهو الاكثر يستفاد منه ويترحم عليه بسببه والذى اخطاء فيه لايقلد فيه بل هو معذور -

যে সমস্ত মসলায় নিজস্ব ইজতিহাদ দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে তিনি সমর্থ হয়েছেন আর সংখ্যার দিক দিয়ে যেগুলো অধিক, সেগুলো থেকে আমাদেরকে ফায়দা নিতে হবে এবং এজন্য তাঁর অনুকূলে আমাদের দু'আ করতে হবে। আর যে সমস্ত মসলার ক্ষেত্রে তিনি ইজতিহাদী ভুলের শিকার হয়েছেন সেক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে তাঁকে মা'যূর বিবেচনা করতে হবে।

৬. তাঁর বিরোধিতার একটি শক্তিশালী কারণ হল, তারা (বিরোধীরা) সেই বাকভঙ্গী, (আল্লাহ্‌র) গুণাবলী ও রূপক বিষয়াবলী (মুতাশাবিহাত)-এর ব্যাখ্যার সেই তরীকা বা পন্থার বিরোধিতা করেছেন যা 'আশ'আরী 'আকীদা' বরং আহলে সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আতের 'আকীদা নামে কথিত ছিল এবং এই 'আকীদা থেকে বিচ্যুতিকে হয় অজ্ঞতা ও মূর্খতা, নয়তো আহলে সুন্নত ওয়াল-জামা'আতের বিরোধিতা হিসাবে অভিহিত করা হত। পূর্বেই বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) পূর্ণ শক্তিতে ও পরিপূর্ণ সাহসিকতার সঙ্গে এর সাথে দ্বিমত

১. 'আল্লামা নু'মান আল-জালাউ'ল'-আয়নায়ন নামক গ্রন্থে একক অভিমতগুলো একত্র করেছেন। দ্র. উক্ত গ্রন্থের ৪৩ পৃ.।

পোষণ করেন এবং (আল্লাহ্‌র) গুণাবলী সম্পর্কে সাহাবা-ই কিরাম, তাবি'ঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, মুতাকাল্লিমীন ও মুতাকাদ্দিমীন, ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী, কাযী আবূ বকর আল-বাকিল্লানী ও ইমামু'ল-হারামায়ন পর্যন্ত তাঁদের মত ও পথ তাঁদেরই কথিত উক্তি ও রচনাসমূহ থেকে বর্ণনা করেন। তাঁদের লিখিত কিতাবাদি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেন, উল্লিখিত সকল মহাত্মাই এই সব সিফাত বা গুণের উপর ঈমান আনা অপরিহার্য ভাবতেন, সে সবের সেই হাকীকত মানেন যা আল্লাহ তা'আলার শান তথা মর্যাদা মুতাবিক ليس كمثله شئ অর্থাৎ তাঁর (স্রষ্টার) অনুরূপ কোন বস্তুই নয়, এর উপযুক্ত এবং তাশ্‌বীহ[১] ও তাজসীম[২] অধিকন্তু নফী[৩] ও তা'তীল[৪] থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি দাবী করে বলেন, এর বিপরীত একটি শব্দও সাহাবা-ই কিরাম, তাবি'ঈন ও সলফে সালিহীন থেকে প্রমাণিত নয়।

সে সময় গোটা মুসলিম বিশ্বের ওপর আশ'আরী 'আকীদা-বিশ্বাসী 'উলামায়ে কিরাম ও মুতাকাল্লিমদের প্রভাব ছিল। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র এই মতানৈক্য যা নির্ভেজাল 'ইল্‌মী তথা তত্ত্বগত বুনিয়াদের ওপর ছিল, একটি বিদ'আত এবং يتبع غير سبيل المؤمنين অর্থাৎ মু'মিনদের নয় এমন পথের অনুসরণের সমার্থক মনে করা হয় এবং তাঁর ওপর তাজসীম-এর অপবাদ আরোপ করা হয়। সে সময় যেহেতু (আল্লাহ্‌র গুণাবলীর) তা'বীল তথা জটিল ব্যাখ্যার ওপরই জোর দেওয়া হচ্ছিল বিধায় তাঁর সমস্ত লেখনী শক্তি এরই মুকাবিলায় ব্যয়িত হয়। তা'বীল-এর প্রত্যাখ্যানে তাঁর এই অনমনীয় ভূমিকার ফলে লোকে তাঁর ওপর 'তাজসীম' (আল্লাহ্ অবয়ববিশিষ্ট-এই মতবাদ) বিশ্বাসী বলে সন্দেহ করে। এ ব্যাপারে এত দূর বাড়াবাড়ি করা হয় যে, তাঁর ওপর এমন সব বর্ণনার সম্পর্ক আরোপ করা হয় যদ্দারা পরিষ্কার প্রমাণিত হয়, তিনি মুজাস্‌সামা ফির্কার (আল্লাহ অবয়বশিষ্টি এই মতে বিশ্বাসী দল) লোক। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়, তিনি দামিশ্‌কের উমায়্যা মসজিদে খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি মিম্বরের এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে পা রাখলেন এবং বললেন, যেভাব আমি ওপরের ধাপ থেকে নীচের ধাপে নেমে এলাম, ঠিক তেমনি আল্লাহ পাক ('আরশ-মু'আল্লা থেকে যমীনের নিকটতম আসমানে) নেমে আসেন।[৫] ইমাম

১. স্রষ্টার সঙ্গে কোন কিছুর উপমা দেওয়া ও সাদৃশ্য প্রতিপাদন।

২. আল্লাহ দেহধারী হওয়া।

৩. আল্লাহ্‌র সমস্ত গুণকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন।

৪. স্রষ্টার সিফতকে অবকাশ দেওয়া কিংবা স্রষ্টাকে সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত ভাবা। -(অনুবাদক)

৫. এই বর্ণনা প্রখ্যাত পর্যটক ইবনে বতূতা চাক্ষুষ ঘটনা হিসাবে তাঁর সফরনামায় লিপিবদ্ধ করেছেন। বর্তমান লেখক সিরিয়ার 'আল্লামা শায়খ বাহজাতু'ল-বায়তার-এর সাথে বিষয়টি

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইবনে তায়মিয়া (র) ও তাঁর ছাত্রবৃন্দ অত্যন্ত সজোরে এই অপবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বারবার বলেছেন, তিনি যেমন 'তা'তীল' মতবাদ স্বীকার করেন না ঠিক তেমনি-'তাজসীম'-এরও দুশমন। এরপরও তিনি তা'বীল বা জটিল ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যেভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত জোরের সাথে লিখেছেন এবং বলেছেন তাকেও বিরোধী পক্ষ 'তাজসীম'-এর প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন। বহু উলামা ও তাঁদের অনুসারীদের ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র বিরোধিতা করবার পেছনে এটিও ছিল একটি শক্তিশালী কারণ। আর প্রকৃত সত্য হল, তা'বীল ও তাজসীমের মাঝের এই পথ এতই বন্ধুর ও নাযুক যে, তা সবার আয়ত্তে আসা মুশকিল। অতঃপর হাম্বলী মযহাবের অনুসারী ও তা'বীল অস্বীকারকারীদের ভেতরকার কতিপয় লোক যখন 'তাজসীম'-এর সীমারেখায় প্রবেশ করল ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র ওপর 'তাজসীম'-এর অপবাদ আরোপ তখন আর অস্বাভাবিক কিংবা কষ্ট-কল্পনা থাকল না। যদিও প্রকৃত ঘটনা হল, তিনি এই অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

৭. বিরোধিতার আরও একটি কারণ শায়খ-এ আকবর শায়খ মুহ্য়ি উদ্দীন ইবনে 'আরাবীর বিরোধিতা। অনেক লোকের নিকট, বিশেষত যাঁরা তাসাওউফের প্রতি ছিলেন অনুরক্ত, ইবনে তায়মিয়া (র)-র এ ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। আর এ অপরাধই তাঁর সমস্ত যোগ্যতা ও অনুগম সৌন্দর্য ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে, যেহেতু তিনি ইবনে 'আরাবীর মশহূর অভিমত ও গবেষণালব্ধ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাঁর ওয়াহ্দাতু'ল-ওয়াজূদ মতবাদ সবলে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তিনি ছিলেন তাঁর বিরোধীদের একজন।

এক্ষেত্রে আমাদের পথ মত ও অভিরুচি ঠিক তাই যা ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ আলফে ছানী হযরত শায়খ সরহিন্দী (র) স্বীয় মকতূবাত-এ লিপিবদ্ধ করেছেন।

عجائب کاروبار است شیخ محی الدین از مقبولان نظر می اید واکثر علوم اوکه مخالف ارائے اهل حق اند؛ خطاوناصواب ظاهر میشود۔

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর) নিয়ে আলোচনা করলে তিনি বলেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বর্ণনাটি একেবারেই ভিত্তিহীন। স্বয়ং ইবনে বতূতাই উল্লেখ করেছেন, তিনি ৭২৬ হিজরীতে রমযান মাসে দামিশ্কে এসেছেন। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ, শায়খুল-ইসলাম ৭২৬ হিজরীর শা'বান মাসেই অন্তরীণ হয়েছেন।

আশ্চর্য কারবার! শায়খ মুহয়ি উদ্দীনকে মকবুল বান্দাদের ভেতর দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, কিন্তু তাঁর অধিকাংশ 'ইল্‌মই-যা আহলে হক তথা সত্যপন্থীদের পথ ও মতের বিরোধী, ভুল ও বেঠিক মনে হয়।[১]

একই পত্রে সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি বলেন ঃ

اکثر معارف کشفیه اوکه ازعلوم اهل سنت جدا افتاده است ازصواب دور است بس متابعات نه کند ان را مگر کسے که دلش مریض است یا مقلدصرف ۔

তাঁর অধিকাংশ কাশ্‌ফ জ্ঞান যা আহলে সুন্নত ওয়া'ল- জামা'আতের 'ইল্‌ম-এর সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করে, বিশুদ্ধ নয়। তাঁর অনুসরণ একমাত্র তারাই করবে যার অন্তর মানস (দিল্‌) অসুস্থ অথবা যে অন্ধ মুকাল্লিদ (ভক্ত অনুসারী)।

কিন্তু শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র প্রত্যাখ্যান ও মতভেদের সম্পর্ক যতটা সেক্ষেত্রে তিনি একা নন। জালাউ'ল-'আয়নায়ন প্রণেতা সে সকল লোকের তালিকা প্রদান করেছেন যাঁরা ঐ সব মসলার ক্ষেত্রে 'ইবনে তায়মিয়া (র)-র সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ ঐসব বিষয়ে পুস্তিকা পর্যন্ত রচনা করেছেন। এই তালিকায় 'আল্লামা সাখাবী, 'আল্লামা সা'দুদ্দীন তাফতাযানী, মুল্লা 'আলী কারী, হাফিজ ইবনে হাজার 'আসকালানী, আবূ হায়্যান মুফাস্‌সির, শায়খু'ল-ইসলাম 'ইয্‌যু'দ-দীন ইব্‌নে 'আবদুস সালাম, হাফিজ আবূ যুর'আ, শায়খুল ইসলাম সিরাজুদ্দীন আল-বুলুক্বীনীর মত খ্যাতনামা 'আলিম-উলামা' ও আইম্মায়ে কিরাম দৃষ্টিগোচর হন।

অতঃপর শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র বিরোধিতা শায়খ আকবরের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও আবেগ-উত্তেজিত নয়, এ বিরোধিতা ধর্মীয় মর্যাদাবোধ ও শর'ঈ গায়রতের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল যুগেই এর অসংখ্য নজীর মিলবে। আত্মমর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও শরীয়তের মুহাফিজগণ যখনই কারোর এমন কোন উক্তি দেখতে পেয়েছেন যা সুন্নত ও শরীয়তের 'নস' ও এর পর্যায়ক্রমিক অকাট্য 'আকাইদের খেলাফ, যদিও হাকীকতে তা না হয়, কিন্তু মানুষ তার দৃষ্টি, দূরদর্শিতা ও উপলব্ধি শক্তির কারণেই শরীয়তী বিধানের অধীন, সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য জগতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর, অমনি তারা সেই উক্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং যার মুখ দিয়েই এমনতরো উক্তি প্রকাশিত হয়েছে তার মর্যাদা ও খ্যাতি যত উচ্চ মার্গেরই হোক

১. জালাউ'ল-'আয়নায়ন, ৪৩-৪ পৃ.।

না কেন এবং বিলায়াত ও মকবুলিয়াতের যত ব্যাপ্তিই ঘটুক না কেন, তার উক্তি প্রত্যাখ্যান করা থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে পারে নি। আর তা এজন্য যে, তাদের নিকট শরীয়তের সম্মান ও মকামে নুবূওতের মর্যাদা সকল প্রকার সম্মান ও মর্যাদার উর্ধ্বে ও অগ্রগণ্য ছিল। স্বয়ং হযরত মুজাদ্দিদ আলফে-ছানী (র) এমনতরো ক্ষেত্রে তাঁর ফারুকী রক্তের (উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত) জোশ ও ধর্মীয় মর্যাদাবোধের চিৎকার দাবিয়ে রাখতে পারেন নি এবং সবলে এ জাতীয় উক্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেউ তাঁকে লিখেছিল, শায়খ 'আবদুল কবীর য়ামীনী এ মত পোষণ করেন, আল্লাহ 'আলিমু'ল-গায়েব নন অর্থাৎ তিনি অদৃশ্যের খবর জানেন না। এতে তিনি তাকে লেখেন ঃ

> মখদূমী! অধমের এ জাতীয় কথা শোনার মত আদৌ ধৈর্য নেই। এ ধরনের কথা শোনামাত্র আমার প্রতিটি শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত ফারুকী রক্ত[১] সচল হয়ে ওঠে এবং এ জাতীয় কথার অন্যতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেরও অবকাশ দেয় না॥ তা এ ধরনের কথা শায়খ কবীর য়ামীনীর হোক কিংবা শায়খ আকবর শামীরই হোক। আমাদের মুহাম্মদ আল-'আরাবী (স.)-র কালাম আবশ্যক, মুহয়ি উদ্দীন (ইবনে) 'আরাবী, সদরুদ্দীন কওনবী ও 'আবদুর রাযযাক কাশীর কালামের আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা তো 'নস' (কুরআন ও সুন্নাহ) চাই, 'ফস'[২] নয়; 'ফুতূহাত-ই মদীনা'[৩] আমাদেরকে 'ফুতূহাত-ই মাক্কিয়্যা'[৪]-র চাহিদা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে।[৫]

এই মর্যাদাবোধ ও আবেগ, এই ইখতিলাফ ও ইনকার (মতভেদ ও অস্বীকৃতি)-এর কারণ ধর্মীয় মর্যাদাবোধ এবং কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সাহায্য-সমর্থন ভিন্ন আর কিছু নয় এবং এই যে আল্লাহ ও তদীয় রসূল (সা)-কে সকল কিছুর ওপর অগ্রাধিকার প্রদান এবং কাউকে ভালবাসা একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের জন্যই ভালবাসা কোন লোকের পক্ষে দূষণীয় হতে পারে না, বরং তা তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও প্রশংসনীয় গুণাবলীর মধ্যেই গণ্য হবার যোগ্য। কেননা নিম্নোক্ত হাদীসটি সঠিক অর্থে তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ঃ

ثلث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان - من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما - ومن احب عبدا لايحبه الا الله -

---

১. বলা দরকার, মুজাদ্দিদ আলফে-ছানী (র) হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর বংশধর ছিলেন (অনুবাদক)।

২. শায়খ আকবর-এর বিখ্যাত গ্রন্থ "ফুসূসূল -হিকাম"-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা।

৪. শায়খ আকবরের বিখ্যাত গ্রন্থ।

৫. মকতূবাত-ই ইমাম রব্বানী, ১০০তম পত্র, ১ম খণ্ড।

ومن يكره ان يعود فى الكفر بعد ان انقذه الله كما يكره ان يلقى فى النار -

তিনটি বস্তু যার ভেতর পাওয়া যাবে সে বস্তু তিনটির কারণে ঈমানের স্বাদ ও মিষ্টতা অনুভব করবে। এক, সব কিছুর মুকাবিলায় আল্লাহ ও তদীয় রসূল (সা) তার নিকট প্রিয় হবে; দুই, ভালবাসলে কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই কাউকে ভালবাসবে; তিন, কুফরী থেকে আল্লাহ পাক নাজাত প্রদানের পর পুনরায় কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন তার নিকট আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মতই অপছন্দনীয় হবে।[১]

৮. একটি দল ইবনে তায়মিয়া (র) সম্পর্কে মারাত্মক ভ্রান্তির শিকার হয়েছিল। কোন কোন অসতর্ক ও পক্ষপাতদুষ্ট লেখক এমন সব উক্তি তাঁর নামে চালিয়েছেন যা আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের সাধারণ 'আকীদা বিরোধী এবং যেসব উক্তি মশহূর 'উলামায়ে কিরামের মতে কুফ্‌র। তাঁর প্রতি এমন সব উক্তিও আরোপ করা হয়েছে যদ্দারা রিসালতের মহামর্যাদার প্রতি বেয়াদবী প্রকাশ পায় এবং তাকে খাটো করা হয় (আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ও সমস্ত মুসলমানকে এর হাত থেকে পানাহ দিন)। এ ধরনের ব্যাপার এককভাবে কেবল ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সঙ্গেই হয়নি, মুসলিম উম্মাহ্‌র অপরাপর বুযুর্গ ও শ্রেষ্ঠ সন্তানরাও হিংসুটে ও শত্রুদের এহেন ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়েছেন। তাঁদের প্রতি এমন সব উক্তি ও আকীদা আরোপ করা হয়েছে যা থেকে তাঁরা একেবারে মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন। ষড়যন্ত্রের জাল এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে যে, তাঁদের লিখিত গ্রন্থ ও কিতাবাদিতে এমন সব নিবন্ধ ও অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে যা কুফ্‌র ও গোমরাহীর হেতু ছিল। এর থেকেও এক কদম অগ্রসর হয়ে (কুফরী উক্তিনির্ভর) স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করে এসব মহান বুযুর্গদের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ব্যাপকভাবে সে সব গ্রন্থের ফলাও প্রচার করা হয়েছে। হুজ্জাতু'ল-ইসলাম ইমাম গাযালী (র)-র সঙ্গেও একই আচরণ করা হয়েছে। বিরাট এক দল 'আলিমের ধারণা যে,

المضنون به على غير اهله للمضنون به على اهله -

মা'আরিজু'ল-কুদ্‌স, মিশকাতু'ল-আনওয়ার-এর মত ভিত্তিহীন ও আরোপিত গ্রন্থ ইমাম গাযালী (র)-র শত্রু ও অকল্যাণকামীরা নিজেরা রচনা করে তাঁর নামে চালিয়েছে। শায়খ মুহয়ি উদ্দীন ইবনে 'আরাবীর গ্রন্থের ক্ষেত্রেও ইমাম শা'রানীর ধারণা মতে এমনটিই ঘটেছে এবং নিবন্ধ ও সারাংশের ভেজাল

১. বুখারী ও মুসলিম।

মেশানো হয়েছে। ইমাম শা'রানী (র) স্বয়ং তাঁর নিজের লেখা গ্রন্থ সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। الاجوبة المرضية। নামক গ্রন্থে তিনি বলেন ঃ

> আমার আল-বাহরি'ল-মাওরূদ ফি'ল-মাওয়াছীক ওয়া'ল-'উহূদ নামক গ্রন্থে কতক হিংসুটে ও পরশ্রীকাতর লোক এমন সব নিবন্ধ ঢুকিয়ে দেয় যা ছিল শরীয়তবিরোধী এবং জামি' আযহারসহ বিভিন্ন জায়গায় এর খুব ফলাও প্রচার করা হয়। এর ফলে এক হাঙ্গামা ও গোলযোগের সূত্রপাত ঘটে। শেষাবধি আমি আমার হাতে লেখা বিশুদ্ধ ও সংরক্ষিত মূল কপিটি 'উলামায়ে কিরামের প্রশংসাসূচক মন্তব্য ও অনুমোদনমূলক অভিমত লিখিত ছিল। এরপর তাঁরা ঐসব সংযোজিত নিবন্ধের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হন এবং হাঙ্গামা ও গোলযোগের অবসান ঘটে।

ইবনে তায়মিয়া (র)-র সঙ্গে শুরু থেকেই তাঁর সমসাময়িক ও কোন কোন পরশ্রীকাতর লোকের যেমন আচরণ লক্ষ্য করা গেছে তাতে করে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, তাঁর প্রতিও এমন সব কুফরী উক্তি ও অবমাননাকর নিবন্ধের এক বিরাট স্তূপ আরোপ করা হয়েছে। ফলে বহু নিষ্ঠাবান ও ধর্মীয় মর্যাদা রক্ষায় উদ্দীপ্ত 'আলিম এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর বিরোধিতাই নয়, বরং তাঁকে গোমরাহ, পথভ্রষ্ট, এমন কি কাফির বলতেও তৈরী হয়েছেন। স্বয়ং অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ও নবম শতাব্দীর শুরুতে পরশ্রীকাতর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিরোধীদের একটি দল এ ব্যাপারে এতটাই বাড়াবাড়ি করেছিল যে, তারা ফতওয়া দিত, যারা ইবনে তায়মিয়াকে 'শায়খুল-ইসলাম' বলবে তারা কাফির। এসব প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর সত্যবাদিতা, মর্যাদা ও ইমামতের সপক্ষে হাফিজ-ই-শাম (সিরিয়ার হাফিজ) শামসুদ্দীন আশ-শাফি'ঈ (মৃ. ৮৪২ হিজরী) তাঁর মশহূর গ্রন্থ الرد الوافر على من زعم ان من سمى ابن تيمية شيخ الاسلام كافر লিখেছেন।[১] এতে সাতাশি জন আকাবির ও মশহূর 'উলামা এবং শাস্ত্রবিদ ইমামের রায়, প্রতিক্রিয়া, স্বীকৃতি ও তাঁর (ইবনে তায়মিয়ার) মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাঁদের অভিমত উদ্ধৃত করেছেন, সেই গ্রন্থ যেখানে হাফিজ ইবনে হাজার 'আসকালানী ও 'আল্লামা 'আয়নী (র)-র পর্যালোচনা ও অভিমত লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁর সমর্থন করেছেন ও শায়খুল ইসলামের মন খুলে প্রশংসা করেছেন, তাঁকে মুবারকবাদ জানিয়েছেন এবং

১. এই কিতাবটি একটি সংকলন আকারে সংকলিত ও বিন্যস্ত করেছেন ফারজুল্লাহ যাকী কুর্দী। শায়খ 'আবদুল কাদির তিলিমসানীর ব্যবস্থাপনায় মাতবা'আ কুর্দিস্তান থেকে ১৩২৯ হিজরীতে মিসরে প্রকাশিত হয়। এটি শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়ার জীবনীর একটি বিরাট মূল্যবান ভাণ্ডার।

প্রকাশ করেছেন যে, তিনি নিঃসন্দেহে একজন বিশুদ্ধ 'আকীদানুসারী, সুন্নী মতাবলম্বী স্বীকৃত শায়খুল-ইসলাম ছিলেন। 'আল্লামা 'আয়নী এত দূর পর্যন্ত লিখেছেন,

من نسبه الى الزندقة فهو زنديق وقد سارت تصانيفه الى الافاق وليس فيها شيء مما يدل على الزيغ والشقاق -

যারা তাঁর (ইবনে তায়মিয়ার) ওপর যিন্দীক-এর অপবাদ দেবে তারা নিজেরাই স্বয়ং মুলহিদ ও যিন্দীক। তাঁর লিখিত রচনা গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তাতে এমন কিছু নেই যা ভ্রান্তিপূর্ণ ও আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের 'আকীদা বিরোধী বলে প্রমাণ করা যায়।

মনে হয় এই সিলসিলা বরাবর অব্যাহত ছিল এবং ঐসব ভিত্তিহীন উক্তি ও উদ্ধৃত বিবরণের নকল তস্য নকল হতে থাকে। আর লোকেরা এসব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কলম হাতে তুলে নিতে থাকে। এই ধারায় সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন হিজরী দশম শতাব্দীর মশহূর 'আলিম ও লেখক 'আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী[১] যিনি ইবনে তায়মিয়ার বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠিন ফতওয়া লেখেন এবং তাঁর সম্পর্কে তাঁর কলম দিয়ে عبد خذله الله تعالى واضله واعماه واصمه واذله - (আল্লাহ পাক তাকে অপদস্থ, পথভ্রষ্ট, অন্ধ, বোবা ও অবমানিত করেছেন) ইত্যাকার বাক্য পর্যন্ত উচ্চারিত হয়েছে।

কিন্তু ঐ ফতওয়ার এবারত থেকে বোঝা যায়, স্বয়ং 'আল্লামা ইবনে হাজার (র) নিজে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র লিখিত কিতাব পড়েন নি এবং এ ব্যাপারে তাঁর জানাশোনা ব্যক্তিগত ও সরাসরি ছিল না। তাঁর সমস্ত নির্ভরতা ও ফতওয়ার বুনিয়াদ ছিল সেই সব উক্তি যা ইবনে তায়মিয়া (র)-র নামে সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এবং তৎকালে তাঁর বিরোধীরা তাদের স্ব স্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করত এবং আপনাপন মজলিসে আলোচনা করত। তিনি ঐ ফতওয়ায় শায়খুল ইসলামের কালাম ও ফিক্‌হশাস্ত্রীয় تفردات উদ্ধৃত করার পর লিখছেন ঃ

وقال بعضهم ومن نظرالى كتبه لم ينسب اليه اكثر هذه المسائل -

---

১. ৯০৯ হিজরীতে মিসরে জন্ম এবং ৯৭৩ হিজরীতে মক্কা মু'আজ্জমায় তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে তোহফাতু'ল-মুহতাজ, الزواجر عن الصواعق المحرقة ، واقتراف الكبائر - الفتاوى الفقهية والحد يثية এবং অত্যন্ত বিখ্যাত। ইনি 'আল্লামা ইবনে হাজার 'আসকালানী (র)-র বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফতহু'ল-বারী'র লেখক থেকে ভিন্ন এবং পরবর্তী যুগের লোক। ইবনে হাজার 'আসকালানী (র) হাদীসের মশহূর ইমাম, অত্যন্ত মুহাক্কিক ও বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী 'আলিম। শেষ যুগের 'আলিমদের মধ্যে তাঁর তুলনা মেলা ভার। ইবনে হাজার মক্কী এসব দিকে তাঁর পূর্বসূরীর সমপর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হন নি।

কেউ কেউ বলেন, যিনিই তাঁর গ্রন্থাদি সরাসরি অধ্যয়ন করেছেন তিনিই উল্লিখিত মসলা-মাসাইলের ক্ষেত্রের অধিকাংশকেই তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত-করণ সঠিক নয় বলে মনে করেন।

ফতওয়ার শেষে স্বীয় দ্বিধা ও সন্দেহ নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ

فان صح عند مكفر او مبتدع يعامله الله تعالى بعد له والايغفر الله لنا وله ـ

অর্থাৎ তিনি যদি এমনতরো 'আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে প্রমাণিতও হয় যা বিদ'আত ও কুফরীর হেতু, সেক্ষেত্রে আল্লাহ পাক স্বীয় ইনসাফের ভিত্তিতে তাঁর সঙ্গে আচরণ করবেন অথবা আমাদেরকে ও তাঁকে ক্ষমা করবেন।

এই ফতওয়ার জওয়াব এবং ইবনে তায়মিয়া ও ইবনে হাজার (র)-এর বিজ্ঞোচিত দাবী উত্থাপন করেছেন বাগদাদের প্রখ্যাত বিদ্বজ্জন পরিবারের সদস্য ইরাকের গৌরব ও গর্ব রূহ'ল-মা'আনী প্রণেতা 'আল্লামা মাহমূদ আলূসীর খ্যাতিমান পুত্র 'আল্লামা খায়রুদ্দীন নু'মান আলূসী (র) তাঁর العينين في محاكمة الاحمدين নামক বিরাট গ্রন্থে। এতে তিনি উক্ত 'আল্লামার (ইবনে হাজার মক্কীর) প্রতিটি বক্তব্যের একটি একটি করে বিস্তারিত জওয়াব দিয়েছেন এবং প্রমাণ করেছেন, তাঁর [ইবনে তায়মিয়া (র)-র] বলে বর্ণিত বক্তব্যের একটি অংশ একেবারেই ভিত্তিহীন ও অপবাদমাত্র এবং শায়খুল ইসলাম [ইমাম তায়মিয়া (র)]-এর গ্রন্থসমূহে বরং এর বিপরীত বক্তব্য ও বর্ণনাই দেখতে পাওয়া যায়। একটি অংশ (যা খুবই হাল্কা) বিস্তৃতির দাবী রাখে। এর যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় হয়ত তা প্রকৃত সত্য নয় অথবা এটাই তাঁর একমাত্র বক্তব্য নয়। এ ছাড়াও উক্ত গ্রন্থে তিনি (নু'মান আলূসী) শায়খুল ইসলাম-এর জীবন-চরিত ও নানা অবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান ভাণ্ডার জমা করে দিয়েছেন।[১]

ইবনে হাজার মক্কীর পর থেকে আজ পর্যন্ত মুহাক্কিক (তত্ত্বজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ) 'আলিম, প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ও ন্যায়বান লেখকগণ 'আল্লামা ইবনে হাজারের এতদ্‌সম্পর্কিত বক্তব্যের সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করে আসছেন এবং নিজেদের লিখিত গ্রন্থ ও পুস্তক-পুস্তিকায় শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া(র)-র নির্দোষিতা এবং তাঁর উচ্চ মরতবা ও মর্যাদার কথা প্রকাশ করে আসছেন। স্বয়ং 'আল্লামা ইবনে হাজার মক্কীর যোগ্য শাগরিদ মুল্লা'আলী কারী[২] শায়খুল ইসলাম

১. গ্রন্থটি ছোট মিসরীয় টাইপে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬২, হি. ১২৯৮ সনে মিসরের বুলাক নামক প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত।

২. আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম। মক্কা মু'আজ্জমা সফর করেন এবং সেখানেই বসবাস শুরু করেন। হজ্জের

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

[ইবনে তায়মিয়া (র)] সম্পর্কে তাঁর উস্তাদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে অত্যন্ত উচ্চ কণ্ঠে ইমাম তায়মিয়া (র) সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্য করেছেন। শরাহ শামাইল-ই তিরমিযী ও মিরকাত শরহে মিশকাতে লেখেন :

ومن طالع شرح منازل السائرين تبين له انهما كان من اكابر اهل السنة والجماعة ومن اولياء هذه الامة -

আর যিনিই মানাযিলু'স-সায়িরীন-এর শরাহ (মাদারিজু'স-সালিকীন) অধ্যয়ন করবেন তার কাছেই এটি স্পষ্ট প্রতিভাত হবে, ইবনে তায়মিয়া ও ইবনে কায়্যিম ছিলেন আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের একজন শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ এবং এই উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার একজন ওলী।

অতঃপর শেষ যুগে ইমামু'ল-মুতাআখখিরীন শায়খু'ল-ইসলাম শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ দেহলভী (র) শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সপক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন এবং পরিষ্কার লিখেছেন, তিনি কেবল সুন্নী 'আকীদাবিশিষ্ট ও পূর্ববর্তী বুযুর্গদের অনুসারী একজন 'আলিমই ছিলেন না, শরীয়তের একজন বড় মুখপাত্র ও ওয়াকীল, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র একনিষ্ঠ খাদেম ও উম্মতে মুহাম্মাদিয়্যার একজন জলীলু'ল-কদর 'আলিমও ছিলেন। তিনি ছিলেন ক্ষণজন্মা পুরুষদের অন্যতম যাঁরা কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করেন। যে সমস্ত লোক তাঁর বিরোধিতা ও পদাংক অনুসরণ করেছেন, জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। শাহ সাহেব কুরআন-সুন্নাহ্‌র ধারক-বাহক ও 'উলামায়ে ইসলামের সমতা সাধন করে এবং মশহূর হাদীস يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله (এই 'ইল্‌মে কুরআন-সুন্নাহ্‌র ধারক-বাহক প্রতিটি জাতি ও বংশের ন্যায়বান লোকেরাই হবেন) দ্বারা দলীল পেশ করে শায়খু'ল-ইসলাম (ইবনে তায়মিয়া) সম্পর্কে বলেন :

وعلى هذا الاصل اعتقدنا فى شيخ الاسلام ابن تيمية (رحـ) فانا قد تحققنا من حاله انه عالم بكتاب الله ومعانيه اللغوية والشرعية وحافظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وا ثار السلف عارف لمعانيهما اللغوية والشرعية استاذ فى النحو

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর) নিয়ম-কানূন ও বিধি-বিধান এবং ফিক্‌হ্ ও হাদীস সম্পর্কিত অবহিত 'আলিমদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে মিরকাত, শরহে ফিক্‌হ-ই আকবর, শরহে শিফা', শরহে শামাইল তিরমিযী, শরহে নুখবাঃ, শরহে শাতিবিয়াঃ, শরহে জাযারিয়া, খুলাসা কামূস প্রভৃতি বিখ্যাত। তাসাওউফ ও 'ইলমে মা'রিফতেও কামিল ছিলেন। ১০১৪ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। মিসরের জামি' আযহারে বিরাট জামা'আত সহকারে তাঁর গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

واللغة محرر لمذهب الحنابلة فروعه واصوله فائق فى الذكاء ذولسان وبلاغة فى الذب عن عقيدة اهل السنة لم يؤثر عنه فسق ولابدعة اللهم الا هذه الامور التى ضيق عليه لاجلها وليس شيء منها الاومعه دليله من الكتاب والسنة وأثار السلف فمثل هذا الشيخ عزيز الوجود فى العلم ومن يطيق ان يلحق شا عره فى تحريره ؛ والذين ضيقوا عليه ما بلغوا معشار ماأتاه الله تعالى وان كان تضيقه ذالك نا شيئا من اجتهاد ومشاجرة العلماء فى مثل ذالك ماهى الا كمشاجرة الصحابة رضى الله تعالى عنهم فيما بينهم والواجب فى ذالك كشف اللسان الابخير۔

এরই ভিত্তিতে আমরা শায়খু'ল-ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র ওপর 'আকীদা রাখি। তাঁর অবস্থাদি দ্বারা আমাদের নিকট প্রমাণিত হয়ে গেছে, তিনি আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআনু'ল-করীমের একজন 'আলিম, এর আভিধানিক ও শর'ঈ অর্থ সম্পর্কে খুবই ওয়াকিফহাল, আরবী ব্যাকরণ ও অভিধানশাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, হাম্বলী মযহাবের খুঁটিনাটি বিষয় ও উসূল-এর পরিষ্কার ও বিবাদ মীমাংসাকারী ও বিন্যস্তকারী, একক মেধার অধিকারী, ভাষার ওপর অপূর্ব দখল এবং আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের 'আকীদার সমর্থন ও প্রতিরক্ষায় অত্যন্ত বাগ্মী ও স্পষ্টভাষী। তাঁর দ্বারা কোন অন্যায় কিংবা বিদ'আত প্রমাণিত হয়নি। ব্যস! এই কয়েকটি মাত্র মসলার ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে কঠোরতা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যেও এমন কোন মসলা নেই যে মাসআলা সম্পর্কে তাঁর নিকট কুরআন, সুন্নাহ্ ও পূর্ববর্তী বুযুর্গদের অনুসৃত আদর্শের ভেতর কোন দলীল ছিল না। জ্ঞানের জগতে এমত মনীষীর তুলনা মেলা ভার। কি লেখনী, কি বক্তৃতায় তাঁর পর্যায়ে উপনীত হন এমন সাধ্য কার? আর যে সমস্ত লোক তাঁর সঙ্গে কঠোরতা ও রূঢ় আচরণ করেছে তাঁর [ইবনে তায়মিয়া (র)-র] কামালিয়াত ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্কই ছিল না, যদিও এই কঠোরতা একটি ইজতিহাদী বিষয় ছিল। এতদসম্পর্কে 'উলামায়ে কিরামের ইখতিলাফ তথা মতভেদ সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর পারস্পরিক মতবিরোধেরই অনুরূপ। অতএব এ ক্ষেত্রে সংযতবাক হওয়াই আমাদের পক্ষে সমীচীন এবং ভাল খারাপ কোন কিছু আমাদের মুখ থেকে যেন বের না হয়।[১]

১. উদ্ধৃত অংশটি শাহ সাহেব (র) লিখিত একটি আরবী চিঠির অংশ। চিঠিটি তিনি তাঁরই সমসাময়িক মনীষী মখদূম মু'ঈন উদ্দীন ঠাঠোভী (সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত ঠাঠের অধিবাসী)-কে তার একটি পত্রের জওয়াবে লিখেছেন। উক্ত পত্রে তিনি শাহ সাহেব (র)-

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ সাহেব (র)-এর সাফাই ও সাক্ষ্য এবং উল্লিখিত প্রশংসাসূচক মন্তব্যের পর কোন 'আলিম কিংবা লেখকের আক্রমণাত্মক সমালোচনার, ইবনে তায়মিয়া (র)-র জ্ঞান ও চিন্তামার্গের ধারে-কাছে পৌঁছবার যোগ্যতাও যাদের নেই, আদৌ কোন জ্ঞানগত গুরুত্ব বহন করে না। হাকীমু'ল-ইসলাম শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ (র), আল্লাহ পাক যাঁকে গভীর পাণ্ডিত্য, বিচিত্র কামালিয়াত, মুজতাহিদী চিন্তা ও দৃষ্টি, মতভেদের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের পথ ও 'উলামায়ে ইসলামের কার কি মর্যাদা সে সম্পর্কে পরিমাপ করবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তাই এ ব্যাপারে তাঁর মতামতই চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচনার দাবী রাখে।

داستان فصل گل خوش می سراید عندلیب -

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর) কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র কোন কোন একক সিদ্ধান্ত ও তাঁর বিরোধীদের মতভেদের উদ্ধৃতি প্রদান করে তাঁর সম্পর্কে শাহ সাহেব (র)-এর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। এই পত্র সংকলনটি শাহ সাহেব (র)-এর প্রখ্যাত ছাত্র খাজা মুহাম্মদ আমীন কাশ্মীরী কর্তৃক সংকলিত। সংকলনটি مناقب ابى عبدالله محمد اسمعيل البخارى وفضيلة ابن تيمية - নামে মাতবা'-ই আহমদী থেকে মুদ্রিত। جلاء العينين গ্রন্থেও এটি অবিকল উদ্ধৃত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

আরিফ বিল্লাহ ও মুহাক্কিক আলিম হিসাবে শায়খুল ইসলাম (র.)

সাধারণত শায়খু'ল-ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-কে লোকে একজন মুতাকাল্লিম, তর্কবিশারদ, হাদীসশাস্ত্রবিদ (মুহাদ্দিস) ও ফকীহ্ হিসাবেই জানে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর কামালিয়াত তথা পরিপূর্ণতা ও তাঁর যুক্তিতর্কমূলক রচনার যাঁরা পাঠক তারা তাঁর সম্পর্কে যে ধারণা তাদের মন ও মস্তিষ্কে গেঁথে নেন তা হল এই, তিনি [ইবনে তায়মিয়া (র)] একজন অত্যন্ত মেধাবী, ক্ষুরধার বুদ্ধিবৃত্তি ও গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী, শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শনকারী এবং একজন জাহিরী 'ইলমের অধিকারী 'আলিমের বেশী কিছু নন। তাঁর বিশিষ্ট শাগরিদ হাফিজ ইবনে কায়্যিম (র)-কে বাদ দিলে [যিনি শায়খু'ল-ইসলামের কিতাব মানাযিলু'স-সায়িরীন-এর শরাহ মাদারিজু'স-সালিকীন-এ তাঁর নিজের ও স্বীয় মাহবূব উস্তাদের জীবনের নিভৃত ও প্রচ্ছন্ন (বাতেনী) দিকটি হেফাজত করেছেন এবং প্রমাণ করে দিয়েছেন, তাঁরা দু'জনেই উন্নত মার্গের 'আরিফ বিল্লাহ ও মা'রিফতের অধিকারী বুযুর্গ ছিলেন] যাঁরা সাধারণ জীবনীকার ও চরিতকারদের সাহায্যে শায়খু'ল-ইসলামকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন অথবা তাঁর পরবর্তী অনুসারী ও সম্পর্কিত জনদের দেখে তাঁর সম্পর্কে একটা ধারণা সৃষ্টি করে নিয়েছেন, তাঁরা তাঁকে একজন শুষ্ক ও নীরস মুহাদ্দিস ও জাহিরী 'ইলমের অধিকারী একজন 'আলিমের চেয়ে বেশী মর্যাদা দিতে পারেন নি। কিন্তু মাদারিজু'স-সালিকীন গ্রন্থে হাফিজ ইবনে কায়্যিম কোথাও কোথাও শায়খুল ইসলাম (র)-এর অল্প-স্বল্প যে সব বাণী ও অবস্থার বিবরণ পেশ করেছেন এবং 'আল্লামা যাহবী প্রমুখ তাঁর আলোচনায় তাঁর চরিত্র ও রুচি, অভ্যাস ও চারিত্রিক উৎকর্ষ, তাঁর 'আমল ও দৈনন্দিন বৃত্তির (شغل) যে আলোচনা করেছেন তা সামনে রাখলে একজন ন্যায়বান লোক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, শায়খু'ল-ইসলাম (র)-কে এই উম্মতের ওলী-'আরিফ ও আল্লাহ্ওয়ালা লোকদের মধ্যে গণনা করা উচিত এবং তিনি পরিপূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে যান, তিনি [ইবনে তায়মিয়া (র)] সেই সব মনযিলে অধিষ্ঠিত এবং তিনি সেই সমস্ত মকসূদ লাভে ধন্য হয়েছেন যা লাভ করতে সাধারণত শত বছরের রিয়াযত ও মুজাহাদা, তরীকতের ইমামদের

সান্নিধ্য এবং সদাসর্বদা যিক্‌র ও মুরাকাবার রাস্তা ইখতিয়ার করা হয় এবং যাকে পরবর্তীকালের সূফিয়ানে কিরাম 'নিসবত মা'আল্লাহ' তথা আল্লাহ্‌র সঙ্গে নিসবত বলে বুঝিয়ে থাকেন।

ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء -

সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানীরা এই সত্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল যে, আনন্দ-সুখ তথা আস্বাদন ক্ষমতা ও মা'রিফত, হাকীকী (প্রকৃত) ঈমান ও ইয়াকীন, ইখলাস (নিষ্ঠা) ও দৃঢ়তা, অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ও চারিত্রিক শুচি-শুভ্রতা, সুন্নাহ্‌র পরিপূর্ণ অনুসরণ ও ফানা ফি'শ-শারী'আত তথা শরীয়তের মাঝে আত্মবিলোপই হল সেই সব যথার্থ লক্ষ্য যার জন্য বিভিন্ন উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা হয়। তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ এসব লক্ষ্য হাসিলকে কোন একটি ওসীলার মধ্যে সীমাবদ্ধ তা মানেন না, বরং যাঁরা বলার তাঁরা এতদূর পর্যন্ত বলেছেন (আর তাঁরা ভুলও বলেন নি) ঃ

طرق الوصول الى الله بعدد انفاس الخلائق -

প্রাথমিক যুগে এসব লক্ষ্য হাসিলের সর্বাধিক প্রভাবমণ্ডিত, কার্যকর ও শক্তিশালী মাধ্যম ছিল রাসূল আকরাম (সা)-এর সাহচর্য যার (রাসায়নিক) প্রভাব সর্বজনবিদিত। (তাঁর ইনতিকালের কারণে) এই নে'মত থেকে বঞ্চিত হবার পর উম্মতের চিকিৎসকমণ্ডলী ও নবুওতের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব যুগে পরিবর্তিত বিভিন্ন প্রক্রিয়া স্থির করেন। শেষে বিভিন্ন কার্যকারণের প্রেক্ষিতে (পবিত্রতম ব্যক্তিত্বের) সাহচর্য ও যিক্‌র-আযকারের আধিক্যের ওপর জোর দেওয়া হয় যার একটি পরিশীলিত, সুসংস্কৃত ও সুবিন্যস্ত তরীকাই আজ তাসাওউফ ও সুলূক নামে সর্বত্র মশহূর হয়ে গেছে। কিন্তু কেউই একথা অস্বীকার করে না, ঐ সব লক্ষ্য অর্জন কেবল যেসব উপায়-উপকরণের ওপর সীমাবদ্ধ নয়; মনোনয়ন ও নির্বাচন এবং আল্লাহ্‌র দান موهبت ভিন্ন ঈমান ও ইহ্‌তিসাব[১] নফসের মুহাসাবা তথা আত্মজিজ্ঞাসা, সুন্নাহ্‌র আনুগত্য ও অনুসরণ, হাদীস ও শামাইল গ্রন্থের সঙ্গে মুহব্বত ও 'আজমতের সাথে ইশতিগাল[২], নফল ইবাদত-বন্দেগী ও দু'আ'-দরূদের আধিক্য, নিয়্যত ও ছওয়াবের আশায় খেদমতে খাল্‌ক তথা সৃষ্টির সেবা, জিহাদ, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ, দাওয়াত ও তাবলীগ। এ সবের ভেতর যে কোন একটি নিষ্ঠা (استحضار) ও ইহতিমামের সঙ্গে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যম এবং নিসবত লাভের কারণ হতে পারে। মাধ্যম তথা উপায়-উপকরণ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য এক। শায়খুল ইসলাম (র)-এর অবস্থাসমষ্টি থেকে পরিষ্কার জানা যায়, তাঁর এই লক্ষ্য হাসিল ছিল এবং সেটি প্রকাশ করাই এখানে উদ্দেশ্য।

১. ছওয়াব লাভের আশায় কোন কাজ করাকে ইহতিসাব বলে।

১. বিস্তারিত জানতে দ্র. صراط مستقيم মওলানা ইসমাঈল শহীদ ও মওলানা আবদুল হাই সংকলিত সৈয়দ আহমদ শহীদ (র)-এর মলফুজাত।

তাঁর খোলামেলা ও সহজ সরল জীবন, তাঁর রুচি, চরিত্র, অভ্যাস ও আচার-আচরণ এবং তাঁর অবস্থাদৃষ্টে এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যায়, তিনি 'আরিফ (ওলী, দরবেশ), তত্ত্বজ্ঞ 'আলিম, আল্লাহ্‌র মক্‌বূল ও কামিল বান্দাহদের একজন ছিলেন। এর কোন বাহ্যিক মাপযন্ত্র, কম্পাস কিংবা কোন যুক্তিনির্ভর দলীল-প্রমাণ থাকে না। আল্লাহ্‌ওয়ালা ও ওলী-'আরিফদের জীবনী অত্যধিক পড়াশোনা করে করে এবং তাঁদের সাহচর্যে থাকতে থাকতে একজন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও রুচিসম্পন্ন মানুষের এক ধরনের ক্ষমতা ও আত্যন্তিক প্রেম লাভ ঘটে (وجدان) যদ্দারা তিনি এ বিষয়ে ফয়সালা করতে পারেন। কিন্তু এর পরও এমন কিছু অবস্থা ও 'আলামত রয়েছে যদ্দারা পরিমাপ করা যায় যে, এই ব্যক্তি স্বীয় ধর্মীয় মাত্রার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের তুলনায় উন্নততর এবং ধর্মের বিশুদ্ধতর অবস্থা ও রুচিসমূহ ও আল্লাহ্‌ওয়ালাদের চরিত্র-আখলাক দ্বারা ভূষিত। যেমন আল্লাহ্‌র দাসত্ব (عبوديت) ও প্রতিনিধিত্বের (انابت) এক বিশেষ অবস্থা, ইবাদতের স্বাদ ও মগ্নতা, দু'আ'র স্বাদ ও বিভোরতা, যুহ্‌দ ও দুনিয়ার প্রতি অবজ্ঞা, উৎসর্গ ও বদান্যতা, বিনয় ও নিঃস্বার্থপরতা, আনন্দ ও তৃপ্তি, সুন্নাহ্‌র পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ, সালিহ বান্দাদের মাঝে জনপ্রিয়তা, সমসাময়িক 'আলিমগণের সাক্ষ্য, ভক্ত ও অনুসারীদের দীনদারী, উত্তম চরিত্র প্রভৃতি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়। আমরা এখানে উল্লিখিত বিষয়বস্তুসমূহের শিরোনামের অধীনে শায়খুল ইসলামের সমসাময়িক ব্যক্তি ও ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্য ও তাঁদের প্রতিক্রিয়া উদ্ধৃত করছি।

আল্লাহর দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্বের স্বাদ

আল্লাহ্‌র গোলামীর স্বাদ ও আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের প্রকৃত অবস্থা এ কথার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে, এই ব্যক্তির অভ্যন্তর ভাগ নিশ্চিত বিশ্বাস (ইয়াকীন) দ্বারা সমৃদ্ধ, আল্লাহ্ তা'আলার 'আজমত ও জাঁকজমকপূর্ণ আড়ম্বর দ্বারা ভরপুর, স্বীয় অসহায়ত্ব, নিরুপায় অবস্থা মহারাজাধিরাজের কুদরত ও গৌরব মহিমার পর্যবেক্ষণ দ্বারা আলোকিত। এই নিশ্চিত বিশ্বাস (ইয়াকীন) ও পর্যবেক্ষণ (مشاهده) যখন কারোর ভেতর কিংবা অন্তরদেশে সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন শব্দসমষ্টি ও সকল কাজের মাধ্যমে প্রকাশ ঘটে তার। এই সিলসিলায় হাকীকত ও লৌকিকতার মাঝে আসমান-যমীনের ফারাক। এই ফারাক দৃষ্টিসম্পন্ন ও অত্যন্ত প্রেমের অধিকারী লোকের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। ليس التكحل فى العينين كالكحل। ইবনে তায়মিয়ার ঘটনাবলী আমাদেরকে বলে দেয় যে, তিনি ইয়াকীন ও মুশাহাদা লাভ করেছিলেন এবং তা তাঁর ভেতর এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা ও জোর-যবরদস্তি এবং এক প্রকার প্রতিনিধিত্ব ও গোলামীর (انابت وعبوديت) অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছিল। পেছনের

পৃষ্ঠাগুলোতে বলা হয়েছে, যখনি কোন মসলার ব্যাপারে সমস্যা দেখা দিত কিংবা কোন আয়াত বোঝার ক্ষেত্রে অসুবিধা হত তখনই তিনি বিজন কোন মসজিদে চলে যেতেন এবং মাটিতে কপাল-ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ বলতে থাকতেন, يامعلم ابراهيم فهمنى। অর্থাৎ হে ইবরাহীম (আ)-এর শিক্ষক! আমাকে তুমি বুঝবার ক্ষমতা দাও।[১]

ইমাম যাহবী বলেন ঃ

لم أر مثله فى ابتهاله واستغاثه وكثرة توجهه -

তাঁর মত কান্না-কাটি করতে, আল্লাহ্‌র দরবারে সাহায্য চাইতে ও ফরিয়াদ জানাতে এবং তাঁরই দিকে তাওয়াজ্জুহ্ তথা গভীর মনোনিবেশ করতে আমি আর কাউকে দেখিনি।

তিনি [ইবনে তায়মিয়া (র)] বলেন ঃ

انه ليقف خاطرى فى المسئلة او الشيء اوالحالة التى تشكل على فاستغفر الله تعالى الف مرة او اكثر اواقل حتى ينشرح الصدر وينجلى اشكال ما اشكل -

কোন সময় কোন সমস্যার জট খুলতে আমি যখন হিমশিম খাই অথবা কোন ব্যাপারে যখন সমস্যার মাঝে নিক্ষিপ্ত হই তথা কঠিন সংকট দেখা দেয়, আমি তখন এক হাজার বার আস্তাগফিরুল্লাহ পাঠ করি কিংবা এর কম-বেশী। এর পর সমস্যার জট খুলে যায়, কেটে যায় সংকট, সমাধান হয় সব সমস্যার।

এমতাবস্থায় সভা-সমাবেশ ও হাট-বাজারের হৈ-হট্টগোল তাঁর ক্ষেত্রে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করত না। তিনি বলেন ঃ

واكون اذ ذالك فى السوق او المسجد اوالدرب اوالمدرسة لا يمنعنى ذالك من الذكر والا ستغفار الى ان انال مطلوبى -

এমনতরো অবস্থায় আমি বাজারে যাই কিংবা মসজিদে থাকি অথবা কোন গলিতে কিংবা মাদরাসায় অবস্থান করি, আমার যিক্‌র ও তওবা ইস্তিগফারে এ সব আর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। আমি আমার কাজে মগ্ন থাকি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি মকসূদ হাসিল করতে সক্ষম হই।[২]

১. আল-'উকুদু'দ-দুরিয়্যা, পৃ. ৬।

২. আল-কাওয়াকিবু'দ -দুর্রিয়্যা, পৃ. ১৪৫।

এই ইয়াকীন ও গোলামীর স্বাদ (ذوق عبوديت) যখন সৃষ্টি হয়ে যায় এবং মানুষের প্রতিটি পরতে পরতে তা ছড়িয়ে পড়ে তখন মানুষের মাঝে তার অসহায়ত্ব, দীনতা-হীনতা, স্বীয় নিঃস্বতার এমন অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে যায় যে, সে আল্লাহ্‌র শাহী আস্তানায় ভিক্ষার পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমতের ভিক্ষা চাইতে থাকে। এ সময় তার শিরা-উপশিরা ও প্রতিটি লোমকূপ থেকে এই আওয়াজ নির্গত হয় ঃ

مفلسانيم امده در كوے تو شيئاً لله از جمال روے تو
دست بلكشا زنبيل ما افرين بردست وبربازوے تو -

ইবনে তায়মিয়া (র)-র অবস্থা থেকে মনে হয়, তিনি এই দারিদ্র্য-সম্পদ ও বিনয়ের সম্মান লাভে ধন্য ছিলেন। ইবনে কায়্যিম (র) বলেন, "আমি এ সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র)-এর এমনতরো অবস্থা দেখেছি যা আর কারো কাছে দেখতে পাইনি। তিনি (ইবনে তায়মিয়া) বলতেন ঃ আমার কাছেও কিছু নেই, আমার ভেতরও কিছু নেই।" অধিকাংশ সময় তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করতেন ঃ

انا المكدى انا المكدى - وهكذا كان ابى وجدى -

আমি তোমার দুয়ারের ভিখারী, তোমার দরজার ভিখারী আমি। আর আমি নতুন কিংবা অপরিচিত ভিখারী নই; আমরা পুরুষানুক্রমে তোমার দয়ার ভিখারী, আমার বাপ ও দাদাও এই ভিখারীই ছিলেন।

ইবাদতের স্বাদ ও মগ্নতা

ইবাদতের স্বাদ ও এর মাঝে মগ্নতা ততক্ষণ পর্যন্ত আসতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ তার মিষ্টতা ও এর প্রকৃত স্বাদ পাবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না এ তার ব্যথার মলম, মনের খোরাক ও আত্মার শক্তিতে পরিণত হয় এবং এর আসন جعلت قرة عينى فى الصلوة (সালাতকে আমার চক্ষু শীতলকারী বানানো হয়েছে) এবং ارحنا يابلال (হে বিলাল! সালাতের আযান ও ইকামত দ্বারা আমাকে আরাম দাও) দ্বারা সম্বন্ধ বা যোগসূত্র কায়েম করা না হবে। ইবনে তায়মিয়া (র)-র সমসাময়িক লোকেরা ও তাঁর অবস্থা সম্পর্কে যাঁরা জানতেন, তাঁরা সাক্ষ্য দেন, তিনি এই জাগ্রত সম্পদ লাভ করেছিলেন এবং তাঁর নির্জনতা, মুনাজাত ও নফল 'ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত বেশী রকমের নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। আল-কাওয়াকিবু'দ-দুররিয়া গ্রন্থে

বলা হয়েছে ঃ

وكان فى ليلة منفردا عن الناس كلهم خاليابربه عز و جل ضارعا اليه مواظبا على تلاوة القران العظيم مكررا لانواع التعبدات الليلية والنهارية وكان اذا دخل فى الصلاة ترتعد فرائضه واعضاوه حتى يميل يمنة ويسرة ـ

রাত্রে তিনি সকল লোক থেকে আলাদা অবস্থান করতেন। সে সময় একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল-'আলামীনই তাঁর সাথী হতেন। একাকী থাকতেন তিনি এবং সেই সঙ্গে করতেন অশ্রু বিসর্জন। সব সময় তিনি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে থাকতেন। দিনরাত বিভিন্ন নফল ইবাদত-বন্দেগীর মাঝে অতিবাহিত করতেন। যখন নামায শুরু করতেন, তাঁর কাঁধ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি কাঁপতে থাকত, এমন কি ডাইনে-বামে স্পন্দিত ও শিহরিত হত![১]

এ ধরনের মন-মানসের অধিকারী ও রুচিসম্পন্ন মানুষের শক্তি ও প্রফুল্লতা যিক্‌রে ইলাহী ও আল্লাহ্‌র 'ইবাদত দ্বারাই কায়েম হয়। এ ক্ষেত্রে কোনরূপ পার্থক্য ঘটলে তার শক্তিই লোপ পেয়ে বসে এবং তিনি অনুভব করতে থাকেন, দিনটি তার উপবাসেই কাটল। ইবনে কায়্যিম (র) বলেন ঃ

وكان اذاصلى الفجر يجلس فى مكانه حتى يتعالى النهار جدايقول هذه غدوتى لولم اتغد هذه الغدوة سقطت قواى ـ

ফজরের সালাত আদায়ের পর তিনি স্বস্থানেই বসে থাকতেন এবং বসে থাকতে থাকতেই বেলা বেড়ে যেত। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতেন ঃ এটাই আমার নাশতা। এই নাশতা গ্রহণ না করলে আমার শক্তিতে ভাটা পড়বে। শেষ পর্যন্ত আমার কর্মশক্তিই লোপ পাবে।[২]

এই আগ্রহ ও ইহতিমামের ওপর আল্লাহ তাআলা দৃঢ়তা দান করেন এবং যিক্‌র-আযকার, 'ইবাদত-বন্দেগী ও অপরাপর আমল অতঃপর তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। ইমাম যাহবী লেখেন ঃ

له اوراد واذكار يد منها بكيفية وجمعية ـ

তিনি বিশেষ বিশেষ সময়ের 'আমল ও যিক্‌রসমূহ পাবন্দীর সঙ্গে আদায় করতেন এবং সর্বাবস্থায় অত্যন্ত যত্নের সাথে তা আদায় করতেন।[৩]

১. আল-কাওয়াকিব, পৃ. ১৫৬।

২. আর-রা'দ্দুল-ওয়াফির, পৃ. ৩৬।

৩. ঐ, পৃ. ১৮।

যুহদ ও নির্জনতা অবলম্বন এবং দুনিয়ার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন

যুহ্‌দ ও দুনিয়ার প্রতি অবজ্ঞার সত্যিকার অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না দুনিয়ার হাকীকত পরিপূর্ণভাবে উদ্ভাসিত এবং ان الدار الاخرة لهى الحيوان (আর পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন) ও وما عند الله خيروابقى (আর যা আল্লাহ্‌র নিকট তাই উত্তম ও স্থায়ী)-এর অবস্থা পুরোপুরি ছেয়ে যায় এবং এই নিশ্চিত বিশ্বাস (ইয়াকীন) ও বিশুদ্ধ মা'রিফত আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। তাঁর সমসাময়িকগণ তাঁর যুহ্‌দ, নির্জনতা (تجريد) ও দারিদ্র্য অবলম্বনের কথা নানা জায়গায় উল্লেখ করেছেন। তাঁর সহপাঠী ও সমসাময়িক কালের একজন বিশিষ্ট মনীষী শায়খ 'আলামুদ্দীন আল-বারযালী (মৃ, ৭৩৮ হি.) বলেন ঃ

وجرى على طريقة واحدة من اختيار الفقر والتقلل من الدنياورد ما يفتح به عليه -

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর [ইবনে তায়মিয়া (র)-র] অবস্থা একই রকম ছিল, আর তা হল, তিনি দারিদ্র্যকেই সর্বদা অগ্রাধিকার দিয়েছেন। দুনিয়ার সাথে নামকাওয়াস্তে অর্থাৎ যতটুকু না হলেই নয় ততটুকুই মাত্র সম্পর্কে রেখেছিলেন, আর যেটুকু পেয়েছেন তাও ফিরিয়ে দিয়েছেন।[১]

কারোর অবস্থা যখন এমন হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাঁকে মনের দিক দিয়ে সম্পদশালী করেন তখন রোম ও পারস্য সম্রাটের বিশাল সাম্রাজ্যও তাঁর নিকট তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে হয়। এর প্রতি চোখ তুলে চাওয়াকেও সে গোনাহ্ এবং আল্লাহ্‌র নে'মতের না-শোকরী মনে করে। সে সময় আত্মহারা হয়ে সে বলতে থাকে ঃ

من دلق خود بافسر شاہان نمی دہم -
من فقر خود بملك سليمان نمی دہم
از رنج فقر در دل گنج كه يافتم -
اين رنج رابراحت شاہان نمی دہم -

তাঁর এই উচ্চ মর্যাদাসন সম্পর্কে যারা জানত না তারা তাঁর সম্বন্ধে ভুল ধারণা করত যে, তিনি সাম্রাজ্যের ওপর লোভাতুর দৃষ্টি নিয়ে তাকান। আর তিনি তাদের এই অজ্ঞতা ও অরুচির ওপর মাতম করেন এই ভেবে যে, এই চিরন্তন সম্পদ লাভের পরও কি এই ধ্বংসশীল রাজ্য ও রাজত্বের দিকে কেউ চোখ তুলে চাইতে পারে? ইবনে তায়মিয়া (র)-র অবস্থা ছিল এই। আল-মালিকু'ন-নাসির

১. আর-রাদ্দু'ল-ওয়াফির, পৃ. ৬৫।
* অর্থ পরিশিষ্টে দেখুন।

একবার তাঁকে বলেছিলেন ঃ আমি শুনেছি, বহু লোক আপনার অনুগত হয়ে গেছে এবং আপনি সাম্রাজ্য কব্জা করার কথা ভাবছেন। শায়খ (র) অত্যন্ত প্রশান্তির সঙ্গে যা উপস্থিত সকলেই শুনেছিল, উত্তর দিয়েছিলেন ঃ

انا افعل ذالك ؟ والله ان ملكك وملك المغل لا يساوى عندى فلسا -

এমন কাজ আমি করব? আল্লাহ্‌র কসম! আপনার ও তাতারী মোগলদের মিলিত সাম্রাজ্যের দাম আমার কাছে এক পয়সাও নয়।[১]

বদান্যতা এবং নিজের তুলনায় অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার দান

আল্লাহ্‌ওয়ালা ও নবী চরিত্রের উত্তরাধিকারপ্রাপ্তদের বিশেষ গুণ হল বদান্যতা ও নিজের তুলনায় অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার দান। ইবনে কায়্যিম (র) তদীয় زادالمعاد গ্রন্থে الم نشرح সূরার তাফসীরে লিখেছেন, বক্ষ সম্প্রসারণের সম্পদ এবং ঈমান ও য়াকীনের পরিণাম ফল হ'ল বদান্যতা এবং নিজের তুলনায় অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান। সেজন্য যে এই সম্পদের কিছুমাত্রও লাভ করবে বদান্যতা ও আত্মোৎসর্গ হবে তার চিহ্ন। শায়খু'ল-ইসলাম (র)-এর সমসাময়িকগণ ও তাঁর বন্ধু-বান্ধব তাঁর বদান্যতার কথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছেন এবং শত মুখে তাঁর প্রশংসা করেছেন। 'আল-কাওয়াকিবু'দ-দুর্রিয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে, وهواحدالاجوادالاسخياء الذين يضرب بهم المثل অর্থাৎ তিনি এমন কতিপয় দানশীল লোকের অন্যতম যাঁদের দানশীলতার খ্যাতি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে।[২] তাঁর সমসাময়িক আল-হাফিজ ইবনে ফাদলুল্লাহ আল-'উমারী তাঁর বদান্যতার নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

كانت تاتيه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث فيهب ذلك باجمعه ويضعه عند اهل الحاجة فى موضعه لا ياخذ منه شيئا الا ليهبه ولايحفظه الا ليذهبه -

তাঁর নিকট রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, উন্নত জাতের ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু, স্থাবর সম্পত্তি ও মালামাল এলে তিনি সব কিছুই অপর কাউকে দিয়ে দিতেন কিংবা অভাবী লোকদের কাছে রেখে দিতেন। কেবল কাউকে কিছু দিতে কাউকে দেবার জন্যই রাখতেন।[৩] হলেই তিনি সেখান থেকে নিতেন এবং কিছু রাখতে হলে তাও পরবর্তীতে।

---

১. আল-কাওয়াকিবুদ-দুর্রিয়া, পৃ. ১৬৬।

২. আল-কাওয়াকিবু'দ-দুর্রিয়া, পৃ. ১৪৬। ৩. ঐ, পৃ. ১৫৮।

৩.

তাঁর বদান্যতা এত দূর গিয়ে পৌঁছেছিল যে, যখন দেবার মত কিছু থাকত না, তখন শরীরের কাপড় খুলেই দিয়ে দিতেন।

كان يتصدق حتى اذ لم يجد شيئا نزع بعض ثيابه فيصل به الفقراء -

তিনি অকাতরে দান করতেন। যখন দেবার মত কিছু থাকত না তখন নিজের কোন পরিধেয় কাপড়ই তাকে দিয়ে দিতেন এবং দরিদ্র ও অভাবী লোকদের প্রয়োজন মেটাতেন।[১]

وكان يتفضل من قوته الرغيف والرغيفين فيوثر بذالك على نفسه -

খাবারের ভেতর থেকে একটা দু'টো রুটি তিনি বাঁচিয়ে রাখতেন এবং নিজের প্রয়োজন উপেক্ষা করে অন্যকে তা দিয়ে দিতেন।[২]

নিজের মুকাবিলায় অপরকে প্রাধান্য দান (ايثار)-এর একটি নাযুক মকাম হল, মানুষ তার শত্রু ও প্রতিপক্ষের সাথে উদার ও খোলা মন নিয়ে বরং ক্ষমা ও অনুগ্রহ এবং এর চেয়েও অগ্রসর হয়ে দু'আ ও কল্যাণ কামনা নিয়ে মিশবে। এই মকাম কেবল তারাই লাভ করতে পারে যারা আত্মম্ভরিতা ও জৈবিক কামনা-বাসনাগুলোকে পিছে ফেলে বহু দূরে এগিয়ে গেছেন এবং যাদের ওপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজির এমন বর্ষণ হয়েছে, যাঁরা শান্তি-সুখ এত বেশী পরিমাণে লাভ করেছেন যে, তাঁরা ঐসব বিরোধিতাকে মুকাবিলায় অত্যন্ত তুচ্ছ ও উপেক্ষণীয় মনে করেন এবং যাঁদের ভেতর স্বীয় দুশমন ও বিরোধীদের জন্যও কল্যাণ কামনা ও সহানুভূতির প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

ওপরে বলা হয়েছে, ৭০৯ হিজরীতে যখন তিনি দ্বিতীয়বারের মত মুক্তি পান, তখন একদিন সুলতান তাঁকে একা পেয়ে তাঁর নিকট সেসব কাযীর ব্যাপারে ফতওয়া নিতে চান যারা জাশনগীরকে সমর্থন ও সহযোগিতা যুগিয়েছিল এবং সুলতানের অপসারণ ও পদচ্যুতির পক্ষে ফতওয়া প্রদান করেছিল। সুলতান এও বলেছিলেন, এসব কাযী আপনার বিরুদ্ধেও হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছিল এবং আপনাকে কষ্ট দিয়েছিল। এর উত্তরে ইবনে তায়মিয়া (র) সেসব লোকের প্রশংসা করেছিলেন, অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে তাদের পক্ষে সুপারিশ করেছিলেন এবং তাদের হত্যা করা থেকে সুলতানকে নিবৃত্ত রাখেন। তাঁর সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ কাযী

---

১. ঐ, পৃ. ১৫৭।

২. আল-কাওয়াকিবু'দ-দুর্রিয়া, পৃ. ১৫৭।

ইবনে মাখলুফ মালিকীর এই উক্তিও পেছনে উদ্ধৃত করা হয়েছে, "আমরা ইবনে তায়মিয়ার মত উদার ও মহানচেতা আর কাউকে দেখিনি। আমরা সুলতানকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছি। কিন্তু তিনি যখন ক্ষমতা পেয়েছেন আমাদেরকে পরিষ্কার মাফ করে দিয়েছেন এবং উল্টো আমাদের পক্ষে ওকালতি করেছেন।"

তাঁর যোগ্য শাগরিদ ও সকল সময়ের সাথী হাফিজ ইবনে কায়্যিম বলেন ঃ তিনি শত্রুর জন্যও দু'আ করতেন। আমি তাদের একজনের বিরুদ্ধেও বদ দু'আ করতে দেখিনি। একদিন আমি তাঁর সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ ও এমন একজন মানুষের মৃত্যু খবর নিয়ে আসলাম, যে শত্রুতা সাধনে এবং যন্ত্রণা প্রদানে সকলের তুলনায় অগ্রগামী ছিল। তিনি আমাকে ধমক দিলেন ও আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজি'উন' পড়লেন। অতঃপর তৎক্ষণাৎ তার বাড়ী গেলেন, তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন, সমবেদনা জানালেন এবং পরিবারের লোকদেরকে (সান্ত্বনা দিয়ে) বললেন ঃ (তোমরা ভেবো না!) তিনি গেলেও আমি তো রয়েছি। তোমাদের যখন যা দরকার হবে আমাকে বলবে। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করব। এভাবেই তিনি তাদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করেন এবং সান্ত্বনামূলক কথাবার্তা বলেন। এতে তারা খুবই প্রীত হয় এবং তাঁকে প্রাণ খুলে দু'আ করে। তারা খুব বিস্মিতও হয়।

ক্ষমা ও সদয় ব্যবহার, শত্রু ও বিরোধীদের সাথে স্নেহ-মমতার এই আসন আর্থিক কুরবানীর তুলনায় খুবই বুলন্দ এবং অগ্রবর্তী আসন (مقام)। এটি সেই আসন যা সিদ্দীক ও বিশিষ্ট আওলিয়ায়ে কিরাম পেয়ে থাকেন। ইবনে তায়মিয়া (র) এই আসনে আসীন ছিলেন এবং এই আসনে সমাসীন কোন কবি ফারসী ভাষায় যা বলেছিলেন তাতে যেন তিনি ইবনে তায়মিয়া (র)-র অবস্থারই প্রতিধ্বনি করেছিলেন ঃ

بـرکـه مارا یارنبود ایـزد اور ایار باد -
هر که مارا رنج داده راحتش بسیار باد
ہر که اندر راه ماخارے نهد ازدشمنی -
هرگلے کز باغ عمـرش بشگفد بے خاربـاد -

বিনয় ও স্বার্থলেশহীনতা

বিনয় ও স্বার্থলেশহীনতা আল্লাহ্ওয়ালাদের বিশেষ গুণ ও সেই কামালিয়াতের মরতবা যা হাজারো কারামত থেকে বুলন্দ এবং হাজারো ফযীলতের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর। এই আসন কেবল তখনই হাসিল হয় যখন মানুষর 'খুদী' তথা আমিত্ব লোপ পায় এবং আত্মার পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধি (تزکیه) ঘটে। শায়খুল-ইসলাম (র)-এর জ্ঞানের পরিপূর্ণতা এবং ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষেত্রে

চরম মার্গে উন্নীত হবার সাথে সাথে এই কামালিয়াতও লাভ হয়েছিল। তাঁর কথা থেকে বোঝা যায়, তিনি স্বার্থলেশহীনতা, সব কিছুই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে করবার মানসিকতা (للهيت), আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নিজ সত্তার অস্বীকৃতির উচ্চতম দরজায় উপনীত হয়েছিলেন। ইবনে কায়্যিম (র) বলেন, তিনি অধিকাংশ সময় বলতেন ঃ مالى شيىء ولامنى شىء ولافى شيىء কেউ তাঁর মুখের ওপর প্রশংসা করলে তিনি বলতেন ঃ

والله انى الى الان اجدد اسلامى كل وقت وما اسلمت بعد اسلاما جيدا

আল্লাহ্‌র কসম! আমি আজ পর্যন্ত বরাবর আমার ইসলামের তাজদীদ (নবায়ন) করে আসছি এবং এখন পর্যন্ত আমি বলতে পারি না, আমি পরিপূর্ণরূপে মুসলমান।[১]

কখনো কেউ তা'রীফ করলে তিনি এও বলতেন ঃ انا رجل ملة لا رجل دولة আমি মুসলিম উম্মাহর একজন নগণ্য সদস্যমাত্র; তখ্‌ত-তাজের কেউ নই।[২]

স্বার্থলেশহীনতা ও গোলামীর এই দর্জায় পৌছে মানুষের এই অবস্থা হয়ে যায় যে, তার নিজের কারুর ওপর কোন হক আছে বলে মনে করেন না। তিনি তার দাবীও করেন না, কারোর বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিযোগও থাকে না। কারোর থেকে তিনি প্রতিশোধও গ্রহণ করেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে [ইবনে তায়মিয়া (র)-কে] সেই আসনেই পৌছে দিয়েছিলেন। ইবনে কায়্যিম (র) বলেনঃ

سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول العارف لا يرى له على احد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا؛ ولذالك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب۔

আমি শায়খু'ল-ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (আল্লাহ্ তাঁর রূহ্‌কে পবিত্র রাখুন)-র মুখে শুনেছি, তিনি বলতেন ঃ 'আরিফ ব্যক্তি কারো ওপর কোন হক আছে বলে মনে করেন না এবং কারোর ওপর তাঁর কোন ফযীলত (মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব) আছে বলেও মনে করেন না। আর এজন্যই তিনি কাউকে অভিযুক্ত করেন না, কারোর নিকট চান না বা দাবী করেন না কিংবা কাউকে মারধোরও করেন না।[৩]

১. মাদারিজু'স-সালিকীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯৬।

২. আল-কাওয়াকিবু'দ-দুর্রিয়া, পৃ. ১৬৪।

৩. মাদারিজু'স-সালিকীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৬ও, পৃ. ৪৯৬।

তাঁর অবস্থা সম্পর্কে যিনি জানেন কেবল তিনিই বুঝবেন একথা বলে প্রকারান্তরে তিনি তাঁর নিজের অবস্থাই বর্ণনা করেছেন।

প্রশান্তি ও আনন্দ

এই ঈমান, ইয়াকীন ও আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে এই নির্ভেজাল সম্পর্ক, সৃষ্টি জগত থেকে পরিত্রাণ, চিত্তের মুক্তি ও সম্পর্কহীনতার পর মানুষের এমন প্রশান্তি ও আনন্দ লাভ ঘটে যে, এই জীবনেই সে জান্নাতী সুখ ও স্বাদ পেতে থাকে। শায়খু'ল-ইসলাম (র) [ইবনে কায়্যিম বর্ণিত] স্বয়ং একবার বলেছিলেন ঃ

ان فى الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخرة -

(মু'মিনের জন্য) দুনিয়াতেই এমন এক জান্নাত (বেহেশ্ত) রয়েছে, যে এখানে প্রবেশ করেনি সে পরকালীন জান্নাতেও প্রবেশ করবে না।[১]

চক্ষুষ্মান লোকেরা জানেন, আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কখনো তাঁর মুখলিস (নিষ্ঠাবান, অকপট) বান্দাদেরকে এই জীবনেই لاخوف عليهم ولاهم يحزنون -এর সম্পদ দান করেন এবং বান্দা এর নমুনা (দুনিয়ার বিস্তৃতির পরিমাণ মাফিক) এখানেও দেখে নেন। শায়খু'ল ইসলাম (র) ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের বিবরণ থেকে জানা যায়, তিনি এই সম্পদ লাভ করেছিলেন। স্বয়ং একবার উত্তেজিত হয়ে তিনি বলেছিলেন ঃ

مايصنع اعدائى بى - ان جنتى وبستانى فى صدرى ان رحت فهى معى لاتفارقنى -

দুশমন আমার কি করবে? আমার জান্নাত, আমার বেহেশতী বাগিচা আমার বক্ষে; যেখানেই যাই কিংবা থাকি না কেন, তা আমার সাথেই থাকবে।[২]

এই প্রশান্তি ও তুষ্টির সম্পর্ক জীবতকালে এবং মৃত্যু-পরবর্তীতে তাঁর সাথেই থেকেছে। ইবনে কায়্যিম (র) লিখেছেনঃ একবার আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম। আমি কতকগুলো মন্দ কাজ সম্পর্কে তাঁর সাথে আলোচনা করলাম। এতে তিনি বললেনঃ ঃ

امانا فطريقى الفرح والسرور به -

ভাই! আমার সম্বন্ধ তো আনন্দ ও প্রফুল্লতার সঙ্গে।[৩]

---

১. আর-রাদ্দু'ল-ওয়াফির, পৃ. ৩৬।

২. আল-ওয়াবিল আস-সায়্যিব, পৃ. ৬৬।

৩. ইগাছাতু'ল-হিফান।

ইবনে কায়্যিম বলেন ঃ

وهكذا كانت حاله فى الحياة يبدو ذالك على ظاهره وينادى به عليه حاله ـ

তাঁর জীবনে এই অবস্থাই বর্তমান ছিল। তাঁর চেহারায় সর্বদাই খুশীর আমেজ থাকত ও তাঁকে সর্বদাই আনন্দ-উৎফুল্ল দেখা যেত এবং তাঁর সব কিছুর ভেতর এটাই ফুটে উঠত।[1]

সুন্নাহ্‌র পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ

এই আসন (কবূলিয়াত ও সিদ্দীকিয়াত)-এর প্রারম্ভ হয় সুন্নাহর আনুগত্য ও অনুসরণ থেকে এবং এর শেষও হয় সুন্নাহ্‌র পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের ওপর। হাদীস ও সুন্নাহ্‌র সঙ্গে ইবনে তায়মিয়া (র)-র নিবিড় সম্বন্ধ ও ঘনিষ্ঠতা তাঁর বিরোধীরাও স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর এই নিবিড় সম্বন্ধ ও ঘনিষ্ঠতা কেবল জ্ঞানগত ও দৃষ্টি ক্ষেপণের মধ্যেই ছিল না, কার্যত ও বাহ্যিকভাবেও ছিল। তাঁর সমসাময়িক সকলেই সাক্ষ্য দেন, রিসালাতের মকাম বা আসনের যেমন আদব ও সম্মান এবং সুন্নাহ্‌র আনুগত্য ও অনুসরণের যেমন সযত্ন প্রয়াস ইবনে তায়মিয়া (র)-র এখানে দেখতে পেয়েছি, আর কারুর কাছে তা দেখতে পাইনি। হাফিজ সিরাজুদ্দীন আল-বায্‌যার কসম খেয়ে বলেন ঃ

لاوالله ما رأيت احدا تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احرص على اتباعه ونصر ماجاء به منه ـ

আল্লাহ্‌র কসম! আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এত আদব ও এত ভক্তি-সম্মান প্রদর্শনকারী, তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণকারী এবং তাঁর আনীত দীনের সাহায্য করতে আগ্রহী ইবনে তায়মিয়ার চেয়ে বেশী আর কাউকে দেখিনি।[2]

এই জিনিসটি তাঁর ওপর এত অধিক প্রবল এবং তাঁর জীবনে এত বেশী উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত ছিল যে, দর্শকের মন তা দেখামাত্রই সাক্ষ্য দিত, পরিপূর্ণ আনুগত্য অনুসরণ ও সুন্নাহ্‌র প্রতি প্রগাঢ় প্রেম ও ভালবাসা একেই বলে। 'আল্লামা 'ইমাদুদ্দীন আল-ওয়াসিতী বলেন ঃ

ماراينافى عصرنا هذا من تستجلى لنبوة وسننها من اقواله وافعاله الاهذاالرجل يشهد القلب الصحيح ان هذا هوالاتباع حقيقة ـ

---

১. মাদারিজু'স-সালিকীন।

২. আল-কাওয়াকিবু'দ-দুরিয়া, পৃ. ১৪৯।

আমরা আমাদের যুগে একমাত্র ইবনে তায়মিয়াকেই পেয়েছি, যাঁর জীবনে নবূওতে মুহাম্মদীর নূর এবং যাঁর কথায় ও কাজে সুন্নাহ্‌র আনুগত্য ও অনুসরণ স্পষ্ট প্রতীয়মান ছিল। সুস্থ মন-মানস এ কথার সাক্ষ্য দিত, প্রকৃত আনুগত্য ও পরিপূর্ণ অনুসরণ একেই বলে।[১]

সত্যবাদী পুণ্যাত্মাগণের মধ্যে জনপ্রিয়তা ও সমকালীন উলামায়ে কিরামের সাক্ষ্য

বিরাট এক দঙ্গল জনতা কোন ব্যক্তির যতই তা'রীফ কিংবা প্রশংসা করুক, আল্লাহ্‌র দরবারে তা তার মকবূল হবার এবং তার দৃঢ়তা ও উচ্চ মরতবার দলীল নয়, বরং দলীল তখনই হবে যখন সে যুগের পুণ্যাত্মা ও দৃঢ়চেতা বুযুর্গ ও জ্ঞানী-গুণী ও দূরদর্শী ব্যক্তিদের সাক্ষ্য ও প্রশংসা এর সাথে যুক্ত হবে। অধিকন্তু তাঁর অনুসারী, তাঁর ভালবাসার ও সম্পর্কিত জন এবং তাঁর সঙ্গে ওঠা-বসাকারী ব্যক্তিবর্গের ভেতর সদুপদেশ ও ন্যায়নীতি, শুভ ধারণা, তাকওয়া তথা আল্লাহ্ ভীতি ও সতর্কতা এবং পরকালের ভয়-ভীতি ও চিন্তা পাওয়া যাবে। তিনি স্বীয় যুগের লোকদের থেকে দীনদারী এবং সোজা-সরল ও মধ্যম পন্থা অনুসরণের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট হবেন। ইবনে তায়মিয়া (রা)-র ব্যাপার ছিল এই যে, সে যুগের বিশিষ্টতম পুণ্যাত্মা ও জ্ঞানী-গুণিগণ তাঁর মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর 'আকীদার বিশুদ্ধতা ও সুস্থতার সমর্থন করতেন, স্বীকৃতি দিতেন এবং অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁর প্রশংসা করতেন। তাঁর বিরোধীদের ভেতর বিরাট সংখ্যক ছিলেন সরকারের কাছের লোক ও দুনিয়া পূজারী যারা পদমর্যাদার প্রতি লোভাতুর এবং সম্পদ ও সম্মানের আকাঙ্ক্ষী ছিল।[২] 'কাওয়াকিব' প্রণেতা লিখছেন ঃ

قالوا ومن امعن النظر ببصيرته لم يرعالما من اهل اى بلد شاء موافقاله الا وراءه من اتبع علماء بلده للكتاب والسنة واشغلهم بطلب الاخرة والرغبة فيها وابلغهم فى الاعراض عن الدنيا والاهمال لها ولايرى عالما مخالفاله منحرفاعنه الاوهو من اكبرهم نهمة فى جمع الدنيا واكثرهم رياءا وسمعة والله اعلم-

লোকে বলে, যিনিই কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করবেন তিনিই দেখতে পাবেন, যে শহরেই তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত রয়েছে তাঁরা সেই শহরের 'উলামায়ে কিরামের ভেতর কুরআন-সুন্নাহ্‌র সর্বাধিক অনুসরণকারী, আখিরাত তথা পারলৌকিক

---

১. জালা'উ'ল-'আয়নায়ন, পৃ. ৮।

২. এর ভেতর তাঁরা ব্যতিক্রম, যাঁরা কোন ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কিংবা জ্ঞান ও নীতিগত প্রশ্নে তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন। ومامن عام الاوقد خص منه البعض

জীবন কামনায় মশগুল, এর প্রতি সর্বাধিক লোভী, পার্থিব জগতের প্রতি নিস্পৃহ ও উপেক্ষ এবং এর দিকে অমনোযোগী দৃষ্টিগোচর হবে। এর বিপরীতে যাদেরকে তাঁর বিরোধিতায় দেখা যায় -দেখা যাবে তারা দুনিয়ালোভী, লোভী, রিয়াকার তথা প্রদর্শনীসর্বস্ব এবং খ্যাতি ও শোহরত লাভের আকাঙ্ক্ষী। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।[১]

আল্লামা যাহবীর এ কথাও বিস্মৃত হবার মত নয় ঃ

واخيف فى نصر السنة المحفوظة حتى اعلى الله تعالى مناره وجمع قلوب اهل التقوى على محبته والدعاءله ـ

সুন্নাহ্‌র সাহায্য ও সমর্থনের অপরাধে তাঁকে অনেক ভয়-ভীতি দেখানো হয়েছে, ধমক দেওয়া হয়েছে, এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সফলকাম ও সম্মানিত করেছেন এবং আল্লাহ্‌ভীরু লোকদের অন্তর মানসকে তাঁর প্রতি ভালবাসা ও দু'আর জন্য সমবেত করে দিয়েছেন।[২]

অন্তর্দৃষ্টি ও কারামত

যদিও কাশ্‌ফ ও কারামত বুযুর্গী ও মকবূলিয়াতের অংশ নয়, এর দলীলও নয়। বিশেষজ্ঞগণ পরিষ্কার লিখেছেন যে, الاستقامة فوق الكرامة "ইস্তিকামত তথা স্থৈর্য কারামতের ঊর্ধ্বে।" আর এখন এই মসলা কোন আলোচনা-সমালোচনার মুখাপেক্ষী নয়। কিন্তু এও সত্য, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বহু মকবূল বান্দাহ্‌কে পুরস্কারস্বরূপ এই সম্পদও দান করে থাকেন এবং তাদের হাত কিংবা মুখ থেকে এমন সব ঘটনার প্রকাশ ঘটে যা তাদের মকবূলিয়াত ও শ্রদ্ধা-সম্মানের সহায়ক শক্তি ও চিহ্নসমূহের অন্তর্গত হয়ে থাকে। আহলে সুন্নত ওয়া'ল- জামা'আতের সর্বসম্মত মসলা হল, كرامةالاولياءحق অর্থাৎ "আওলিয়া-ই কিরামের কারামত সত্য" এবং কুরআন ও হাদীসে অনেক সাক্ষ্য ও ঘটনা আছে। স্বয়ং শায়খুল-ইসলাম (র)-এর গ্রন্থে এই মসলার তাকরীর ও এই হাকীকত তথা মূল তত্ত্বের প্রমাণ রয়েছে।

এসব ঘটনার সাক্ষ্য যা কারামত ও অলৌকিক কর্ম হিসেবে সংঘটিত হয়েছে, তাঁর ছাত্র, বন্ধু-বান্ধব ও সমসাময়িক লোকেরা দিয়েছেন এবং পরবর্তী লোকেরা স্বীকার করেছেন, এসব কারামত এত বেশী মশহূর ও এত অধিক সংখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। জামি' বুখারীর ভাষ্য 'উমদাতু'ল-কারী প্রণেতা 'আল্লামা 'আয়নী 'তাকরীয আর-রাদ্দু'ল-ওয়াফির' নামক গ্রন্থে লিখছেন ঃ

---

১. আল-কাওয়াকিবু'দ-দুর্রিয়া, পৃ. ১৬১।

২. জালা'উ'ল-'আয়নায়ন, পৃ. ৬।

وهذا الامام مع جلالة قدره فى العلوم نقلت عنه على لسان جم غفير من الناس كرامات ظهرت منه بلا التباس ـ

তাঁর (ইবনে তায়মিয়ার) জ্ঞানগত মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও কামালিয়াতসহ ইবনে তায়মিয়া থেকে এমন কারামতও প্রকাশ পেয়েছে যা বিরাট একদল লোক উদ্ধৃত করেছেন। আর এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।[১]

উল্লিখিত কারামতেরই একটি শাখা "সত্য অন্তর্দৃষ্টি (فراست صادقه) যা মু'মিনশ্রেষ্ঠ (اكبر مؤمنين) ও আওলিয়া-ই মুত্তাকীন (اولياء متقين) তথা আল্লাহভীরু ওলীয়ে কামিলগণের হাসিল হয়ে থাকে। এই অন্তর্দৃষ্টির অত্যাশ্চর্য ও বিরল ঘটনাবলী এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। হাফিজ ইবনে কায়্যিম (র) 'মাদারিজু'স-সালিকীন' ও অপরাপর গ্রন্থে এই অন্তর্দৃষ্টির বহু ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। মাদারিজু'স-সালিকীন গ্রন্থের এক স্থানে তিনি লিখছেন ঃ

ولقد شاهدت من فراسة شيخ الاسلام امورا عجيبة وما لم نشاهده منها اعظم و وقائع فراسته تستدعى سفرا منخما ـ

আমি শায়খু'ল-ইসলামের অন্তর্দৃষ্টির অত্যাশ্চর্য ও বিরল সব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছি এবং যেসব ঘটনা আমার পর্যবেক্ষণে আসে নি (বরং সেগুলো আমি বিশ্বস্ত লোকদের মুখ থেকে শুনেছি) সেগুলো আরও বিরাট আকারের। তাঁর অন্তর্দৃষ্টির ঘটনাসমূহ লিপিবদ্ধ করতে হলে বিরাট ভল্যুমের দরকার।[২]

ওয়াহদাতু'ল-ওয়াজূদ, ফানা' ও বাকা', মা'রিফত, কলবের 'আমল প্রভৃতি মসলার ওপর তিনি যা কিছু লিখেছেন, তা থেকে বোঝা যায়, তিনি কার্যতও সে সব স্তর ও মনযিল অতিক্রম করেছিলেন এবং এই সিলসিলায় اذواق عاليه ও احوال الصحيحه হাসিল করেছিলেন। তিনি যা কিছু বলতেন ও লিখতেন, তা কেবল সাধারণ মেধা ও জ্ঞানের শক্তিতে কিংবা কলমের জোরে নয়, বরং তাঁর অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণেরই ফল ছিল তা। এই সব মসলা ও আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর বাণী, দর্শন ও তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তত্ত্বজ্ঞ সুফী তাসাওউফ ও শাস্ত্রের মুজতাহিদদের (যেমন মাখদূম শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মুনায়রী ও ইমাম রব্বানী হযরত শায়খ আহমদ সিরাহিন্দীর) বাণী ও দর্শন (كلام) ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সঙ্গে মিলে যায়। 'রিসালাতু'ল'-'উবূদিয়াত' নামক পুস্তিকায় ফানা'-র বিভিন্ন কিসিম, এর বিভিন্ন মরতবা ও মকাম-এর বিস্তারিত বয়ান করতে গিয়ে লিখছেন ঃ

---

১. আর-রাদ্দু'ল-ওয়াফির, পৃ. ৮৯।

১. মাদারিজু'স-সালিকীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫০।

ফানা' তিন প্রকার ঃ ফানা'-র একটি মকাম তাই, যা আম্বিয়া-ই কিরাম ('আ) ও ওলীয়ে কামিলগণের হাসিল হয়ে থাকে। আরেকটি মকাম সেই সমস্ত ওলী ও পুণ্যাত্মার হাসিল হয়ে থাকে যারা কামালিয়াত ও তরক্কীর সেই দরজায় উপনীত হন না। একটি মকাম মুনাফিক, মুলহিদ (ধর্মদ্রোহী) ও সাদৃশ্যবাদীদের। প্রথম মকাম হল, আল্লাহ্ ব্যতিরেকে সব কিছুই সে এমনভাবে বিস্মৃত হবে যে, কেবল আল্লাহ্র জন্যই প্রেম-ভালবাসা ও আল্লাহ্রই জন্যই 'ইবাদত-বন্দেগী, আল্লাহ্রই ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা স্থাপন এবং কেবল আল্লাহ্রই কামনা অবশিষ্ট থাকবে। এর বাইরে আর কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না। শায়খ বায়েযীদ বিস্তামীর কথিত এই উক্তি لاارید الامایرید (তিনি যা চান একমাত্র তা ভিন্ন আর কিছুই আমি চাই না)-এর এই অর্থই গ্রহণ করা উচিত অর্থাৎ আল্লাহ্র ইচ্ছা ও অভিরুচিই একমাত্র আমার ইচ্ছা-অভিরুচি। আর এর দ্বারা ধর্মীয় ইচ্ছা-ইরাদা বোঝানোই আমার উদ্দেশ্য। বান্দাহ্র কামালিয়াত এটাই যে, তার ভেতর সেই ইচ্ছা-অভিরুচি, সেই প্রেম-ভালবাসা, সেই রেযামন্দীই ক্রিয়াশীল থাকবে যার ইরাদা আল্লাহ্ করবেন, তিনি যাতে রাযী হন এবং যা তিনি পছন্দ করেন। এর অর্থ সেই সব খোদায়ী আদেশ-নির্দেশ যার ভেতর বাধ্যতামূলক কিংবা ইচ্ছাধীন নির্দেশ থাকবে। এটাই ফেরেশ্তাকুল, আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম এবং সালিহীন বান্দাহ্দের মকাম। যার এই মকাম হাসিল হয়েছে তার 'কাল্ব-ই সালীম' তথা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণরূপ সম্পদ হাসিল হয়েছে (الامن اتى الله بقلب سليم)। 'উলামায়ে কিরাম এর এই তাফসীর করেছেন যে, বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ গায়রুল্লাহ্র 'ইবাদত-বন্দেগী কিংবা গায়রুল্লাহ্র ইচ্ছা-অভিরুচি অথবা গায়রুল্লাহ্র প্রেম ও ভালবাসা থেকে পাক পবিত্র হবে। এর নাম ফানা' রাখা হোক অথবা না রাখা হোক, এটাই ইসলামের প্রারম্ভ ও শেষ এবং এটাই দীনের গোপন ও প্রকাশ্য তত্ত্ব।

ফানা'র দ্বিতীয় প্রকার ছিল এই যে, আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কিছুর পর্যবেক্ষণ থেকে একেবারেই মুক্ত ও বেপরোয়া হয়ে যাবে। এটি এমন একটি মকাম, বহু সালিক (অধ্যাত্ম পথের পথিক)- কে যার সম্মুখীন হতে হয়। তাদের কলবের যিক্র, 'ইবাদত ও ঐশী প্রেমের দিকে আকর্ষণ এবং এমন প্রবল মোহ সৃষ্টি হয় যে, তাদের মন-মানস আল্লাহ ভিন্ন অপর কিছুর পর্যবেক্ষণের তাপ কিংবা শক্তি সইতে পারে না এবং স্বীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন আর কিছু দেখতে পারে না। গায়রুল্লাহ্র তাদের দিলে ঠাঁই হয় না, এমন কি তার অনুভূতিটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না। এই মকামে যেভাবে এই মোহ ও আকর্ষণের ভূমিকা রয়েছে ঠিক তেমনি কোন দরজায় তাদের মন-মানসের দুর্বলতারও ভূমিকা রয়েছে। কুরআন মজীদে রয়েছে ঃ

واصبح فؤاد ام موسى فارغا وان كادت لتبدى به لولان ربطنا على قلبها -

'মূসা-জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল। আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিলে সে তার পরিচয় তো প্রকাশ করেই দিত।'

মুফাসসিরগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ হযরত মূসা ('আ)-এর মার অন্তর-মানস হযরত মূসা (আ)-এর খেয়াল ও স্মরণ ছাড়া আর সব কিছু থেকেই মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এ ধরনের ব্যাপার সাধারণত সে সব লোকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যাদের ওপর আকস্মিক কোন ভালবাসা কিংবা ভীতি অথবা প্রত্যাশার প্রভাব জেঁকে বসে। সে সময় তাদের অন্তর-মানস সেই বন্ধু কিংবা শত্রু অথবা বাঞ্ছিত জন ভিন্ন আর সব বস্তু থেকে মুক্ত ও খালি হয়ে যায় এবং কোন কোন সময় এই ভালবাসা কিংবা ভীতি অথবা যাচ্ঞার ভেতর এমনভাবে ডুবে যায় যে, তা ছাড়া আর কোন কিছুর অনুভূতিটুকু পর্যন্ত থাকে না। এমন কোন লোকের ওপর যিনি ফানা'র এই মকামের ওপর অবস্থান করছেন যখন এই অবস্থার প্রভাব পরিপূর্ণরূপে জেঁকে বসে তখন তিনি উক্ত জেঁকে বসা অস্তিত্বের দরুন স্বয়ং নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে যান। সেই "শুহূদ" (উপস্থিত, আধ্যাত্মিক উন্নতির সেই অবস্থান যেখানে সাধক তত্ত্বে মগ্ন হতে থাকেন)-এর উপস্থিতির প্রভাব এমনভাবে জেঁকে বসে যে, স্বয়ং তার নিজের "শুহূদ" থাকে না। সেই বর্ণিতের স্মরণ ও আলোচনার এমন প্রভাব জেঁকে বসে যে, নিজের চিন্তা-ভাবনা একেবারেই লোপ পেয়ে যায়। এক-এর মা'রিফত বা পরিচয় এমনভাবে ছেয়ে যায় যে, নিজের মা'রিফত বা পরিচয় আর অবশিষ্ট থাকে না। সে সময় সেই এক অস্তিত্ব ব্যতিরেকে সমস্ত উপস্থিত অস্তিত্ব তার দৃষ্টিতে অস্তিত্বহীন ও শূন্য হয়ে যায়। যার আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা কিংবা মা'রিফতে এই মকাম লাভ ঘটে তার দৃষ্টিতে গোটা সৃষ্টিজগতই অস্তিত্বহীন ও শূন্য হয়ে যায়। যার আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা কিংবা মা'রিফতে এই মকাম লাভ ঘটে তার দৃষ্টিতে গোটা সৃষ্টিজগতই অস্তিত্বহীন ও ধ্বংসশীল দৃষ্টিগোচর হয় এবং কেবল আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বই অবশিষ্ট থেকে যায়। আর প্রকৃত ব্যাপার হল, এসব সৃষ্টিজগত প্রকৃত অর্থে অস্তিত্বহীন ও ধ্বংস হয় না, বরং সেই ব্যক্তির "শুহূদ" ও স্মরণ ধ্বংস ও অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তিনি সে সবের বোধ ও 'শুহূদ' থেকে ধ্বংস হয়ে যান। যখন এই জিনিসের প্রাধান্য হয়ে যায় এবং বন্ধুর ভেতর এমন দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, তার ভাল-মন্দ কিংবা ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য তথা বিবেচনা শক্তি লোপ পেতে বসে, তখন কোন কোন সময় তিনি নিজেকেই প্রকৃত (عين) বন্ধু মনে করতে থাকেন। গল্পচ্ছলে বলা হয়, একবার এক লোক নদীতে লাফিয়ে পড়ে। তার প্রেমিক দাঁড়িয়ে দেখছিল। সেও তার পেছনে নদীর ভেতর লাফিয়ে

পড়ল। বন্ধু বলল ঃ আমি তো নদীতে লাফিয়ে পড়েছিলাম। তুমি কেন আমার পেছনে লাফিয়ে পড়লে? সে বলল ঃ তোমার ভালবাসা আমার বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটিয়েছিল। আমার কোন হুশ ছিল না, এমন কি আমার মনে হয়েছে যে, তুমি আর আমি একই।

এই মকামে পৌছে অনেক লোকেরই পা পিছলে গেছে। তারা মনে করেছে, এই হচ্ছে "ইত্তিহাদ" বা (স্রষ্টা ও সৃষ্টির) মিলন এবং প্রেমিক প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলে এক হয়ে যায়, এমন কি তাদের আসল অস্তিত্বের কোন পার্থক্যই আর অবশিষ্ট থাকে না। এ ধারণা একেবারেই অমূলক ও ভ্রান্ত। স্রষ্টার সঙ্গে কোন বস্তুই মিলে-মিশে এক হতে পারে না, বরং ঘটনা হলো, কোন বস্তুই কোন বস্তুর সঙ্গে মিলে এক হতে পারে না। দু'টি বস্তুর মধ্যে পরিপূর্ণ মিলন কেবল তখনই হতে পারে যখন সেই দু'টি বস্তু বদলে যায় অথবা নষ্ট হয় কিংবা তাদের মিলনে তৃতীয় এক বস্তুর সৃষ্টি হয়, যখন কোনটিই আর স্বরূপে কিংবা স্ব-আকৃতিতে অবশিষ্ট থাকে না। যেমন পানি, দুধ, পানি ও মদ একত্রে মিশে তৃতীয় এক জিনিস তৈরি হয়। অবশ্য পছন্দনীয় ইরাদা (ইচ্ছা, আকাঙক্ষা) ও অপছন্দনীয় ইরাদায় মিলন হতে পারে। দু'জন ব্যক্তি পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় ইচ্ছার ভেতর এক হতে পারে। একজন যাকে ভালবাসে, অপরজনও তাকে ভালবাসে। একজন যাকে ঈর্ষা করে, অপরজনও তাকে ঈর্ষা করে। একজন যে জিনিস পছন্দ করবে, অপরজনও সেই জিনিসই পছন্দ করবে। ঠিক তেমনি একজন যার সাথে শত্রুতা করবে, অপরজনও তার সাথে শত্রুতা করবে। কিন্তু সেই পরিপূর্ণ ফানা বা ধ্বংস ও বিলুপ্তি যার ভেতর অপরাপর অস্তিত্বসমূহ একেবারেই অস্তিত্বহীন হতে শুরু হয় আর তার উপস্থিতি ও অনুভূতিটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে না, এটি একটি অপূর্ণ মকাম। হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা)-এর মত বুযুর্গ আওলিয়া-ই কিরাম৷ মুহাজির ও আনসারদের ভেতর যাঁদের অগ্রগামিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত, তাঁরা এই ফানা'র ভেতর পতিত হন নি। যখন তাঁরাই এর থেকে ঊর্ধ্বে ছিলেন তখন আম্বিয়া-ই কিরাম-এর কথা উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এ ধরনের স্বাদ, রুচি ও অবস্থা সাহাবা-ই কিরামের পরবর্তী লোকদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। তাদের মন-মানসের ওপর কোন কোন সময় এমন ঈমানী অবস্থা (كيفيات) দেখা দিত যে, তাদের হুশ-বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি লোপ পেয়েছে। সাহাবা-ই কিরাম (রা) বড় পরিপূর্ণ হালত এবং শক্তিশালী মন-মানসের অধিকারী ছিলেন। ঈমানী হালত ও কায়ফিয়াতের সময় তাঁদের বুদ্ধি-বিভ্রম কিংবা হুশ-জ্ঞানের বিলুপ্তি যেমন ঘটত না, তেমনি তাঁদের ভেতর পর্দা বা যবনিকা, দুর্বলতা, মাতলামি ও আত্মবিলুপ্তি, ফানা অথবা আত্মবিহ্বলতা ও উন্মত্ততার অবস্থাও সৃষ্টি হত না। এ অবস্থার সূচনা হয় তাবি'ঈদের যুগে বসরার রিয়াযতকারী অত্যধিক

'আবিদ ('ইবাদত গুযার, 'ইবাদতকারী) লোকদের ক্ষেত্রে। তাঁদের ভেতর কেউ কেউ কুরআন মজীদের তেলাওয়াত শুনে বেহুশ হয়ে যেত। কেউ কেউ মারাও গেছে। উদাহরণ হিসাবে আবূ জুহায়র নাবীনা (অন্ধ), বসরার কাযী যুরারাহ্ ইব্ন আবী আওফার নাম উল্লেখ্য। তেমনি সূফী বযুর্গদেরও ফানা ও নেশাগ্রস্ততার এমন সব অবস্থা লাভ ঘটেছে যে, এমনতরো অবস্থায় তাঁদের ভেতর হুশ্-বুদ্ধি ও সুস্থ বিবেচনা শক্তি লোপ পেয়েছে। এমনতরো অবস্থায় অনেক সময় তাঁদের মুখ দিয়ে এমন সব কথা বেরিয়ে যেত যে, হুশ ফিরে পাবার পরে তাঁরা প্রকাশ্যে ভুল বুঝতে পারতেন। শায়খ বায়েযীদ বিস্তামী, শায়খ আবুল হাসান নূরী ও শায়খ আবূ বকর শিবলী (র) এ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন এবং তাঁদের থেকে এ ধরনের অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আবূ সুলায়মান দারানী, মা'রূফ কারখী, ফুযায়ল ইবনে 'ইয়াদ, বরং জুনায়দ বাগদাদী (র) প্রমুখ থেকে এ ধরনের কোন ঘটনা বর্ণিত হয়নি। এমন অবস্থায়ও তাঁদের হুশ-বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি লোপ পায় নি এবং তাঁরা এ জাতীয় ফানা ও মত্ততাবস্থার মধ্যে পতিত হতেন না। এই সব কামিল বুযুর্গদের মন-মস্তিষ্কে আল্লাহ্র মুহব্বত ও তাঁর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছু থাকে না। তাঁদের জ্ঞান এত ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং তাঁরা এতখানি বিবেচনা শক্তির অধিকারী হন যে, সব কিছুই তাঁদের চোখে সে সবের নিজস্ব রূপ ও আকৃতিতে ধরা পড়ে। সৃষ্টিজগত তাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে কিংবা অস্তিত্বহীন হয় না। তাঁদের দৃষ্টিতে সৃষ্টিজগত আল্লাহ্র হুকুম ও ইচ্ছার সাথে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরই ইচ্ছার অনুগত ও অধীন প্রতিভাত হয়, বরং তসবীহ-তাহলীল ও ফরমাঁবরদারীর ভেতর মশগুল দৃষ্টিগোচর হয়। এভাবে এই পর্যবেক্ষণ তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি ও আল্লাহ্র স্মরণকে বাড়িয়ে দেয় এবং তাঁর মা'রিফত (পরিচয়)। ইখলাস (নিষ্ঠা), তাওহীদ ও 'ইবাদত-বন্দেগী বর্ধিত করে। এটাই সেই হাকীকত যার দিকে কুরআন আহ্বান জানিয়েছে এবং এটাই মু'মিন, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত, ওলীয়ে কামিল ও দরবেশ 'আরিফগণের মকাম। আর আমাদের পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এঁদের সকলেরই ইমাম, সর্দার ও তাঁদের ভেতর পরিপূর্ণতম ও সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। এজন্য যখন তাঁর মি'রাজ হ'ল, সেখানে গিয়ে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ তথা নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করলেন এবং আল্লাহ্র সঙ্গে কথাবার্তা ও অন্তরঙ্গ আলাপ হল, অতঃপর তিনি এই জগতে প্রত্যাবর্তন করলেন তখনও তাঁর অবস্থার মাঝে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটেনি এবং এর কোন প্রভাব-প্রতিক্রিয়াও কেউ তাঁর মাঝে অনুভব করে নি, অথচ এমত ক্ষেত্রে হযরত মূসা (আ) বেহুশ ও আত্মবিলুপ্তির মাঝে নিক্ষিপ্ত হতেন।

আরও একটি অবস্থা আছে যাকে কখনো-সখনো ফানা নামে অভিহিত করা হয়। আর তা হল, মানুষ এ কথার সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নেই এবং স্রষ্টার অস্তিত্বই সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব এজন্য যে, প্রভু ও ভৃত্যের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এ জাতীয় ফানা'র ধারণা কিংবা বিশ্বাস সে সমস্ত পথভ্রষ্ট ও ধর্মদ্রোহী (মুলহিদ)-দের যারা হুলূল* ও ইত্তিহাদ*-এর 'আকীদায় বিশ্বাসী। দৃঢ় চিত্তের অধিকারী বুযুর্গের ভেতর কেউ যদি বলেন যে, আল্লাহ ভিন্ন আর কিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হয় না অথবা আমি গায়রুল্লাহ্‌র দিকে দৃষ্টিপাত করি না কিংবা এই জাতীয় অন্য কোন কথা বলেন তখন তার অর্থ হয় এই যে, তাঁকে ছাড়া কোন স্রষ্টা কিংবা তাঁকে ভিন্ন কোন কুশলী ব্যবস্থাপক অথবা তিনি ব্যতিরেকে কোন মা'বূদ আমি দেখতে পাই না অথবা আমি ভালবেসে বা ভীতি সহকারে কিংবা আশা-ভরসার সঙ্গে তিনি ভিন্ন অপর কারোর ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করি না এজন্য যে, নিয়ম হল, চোখ সাধারণত তাকেই দেখে যার সঙ্গে হৃদয়-মন জড়িত। যার কোন জিনিসের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হবে অথবা আশা-অকাঙ্ক্ষার সম্পর্ক কিংবা ভয়-ভীতি ও ঈর্ষার সম্পর্ক অথবা হৃদয়-মনের সঙ্গে সম্পর্কিত এমন কিছু নয় তখন অন্তর-মানসে তার দিকে মনোনিবেশের কোন ইচ্ছাই জাগবে না, তার দিকে চোখ তুলেও চাইবে না এবং তাকেও দেখবে না। যদি কখনো তার প্রতি চোখ পড়েও যায় তবে তা হবে আচম্বিতে অথবা শুধুই চোখ পড়বে। যেমন কোন লোক কোন দেওয়াল কিংবা পাঁচিল অথবা এমন কোন জিনিষ দেখে যার সাথে তার হৃদয়-মন সম্পর্কিত নয়। পুণ্যাত্মা বুযুর্গগণ কখনো-সখনো নির্ভেজাল তওহীদ এবং পরিপূর্ণ ইখলাস তথা নিষ্ঠা সম্পর্কে কথা বলেন। তার অর্থ হয় এই যে, বান্দাহ্‌ গায়রুল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌ ভিন্ন সকল বস্তুনিচয়)-র দিকে দৃকপাতই করবে না এবং আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কিছুকে ভালবাসবে না কিংবা ভয় করবে না অথবা আশা নিয়ে তার দিকে চোখ তুলেও চাইবে না, বরং হৃদয়-মন তামাম সৃষ্টিজগত থেকে একেবারেই খালি ও মুক্ত থাকবে। (আর তাকালেও) সে সবের দিকে সে আল্লাহ্‌র নূরের সাথে দেখবে। সত্যেরই মাধ্যমে শুনবে এবং সত্যেরই শক্তিতে সে চলবে। আল্লাহ্‌ যাকে ভালবাসেন তাকে সে ভালবাসবে; আল্লাহ্‌ যার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন তার প্রতি সেও বিদ্বিষ্ট মনোভাব পোষণ করবে। আল্লাহ্‌ যাকে বন্ধু বানান তাকে সেও বন্ধু বানাবে এবং আল্লাহ্‌ যার সাথে শত্রুতা করেন সেও তার সাথে শত্রুতা করবে। তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করবে এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে তাকে ভয়

---

* পরিশিষ্ট দেখুন। -অনুবাদক।

করবে না। এটাই সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ, দীন-ই হানীফপন্থী তওহীদবাদী মুসলিম মু'মিন যার ভেতর নবী মুরসালওয়ালা মা'রিফত, গবেষণা, বিশ্লেষণ ও তওহীদ পাওয়া যায়। এটাই সেই মকাম যার ওপর আম্বিয়া-ই কিরামের অনুসারিগণ অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন এবং এটিই ফানা-ই মাহমূদ তথা প্রশংসিত ফানা'। এই মকামে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গেরই প্রশংসা করেছেন আল্লাহ রাব্বু'ল-'আলামীন এবং তাদেরকে আওলিয়া-ই মুত্তাকীন, পুণ্যাত্মা সংস্কারকদের দল ও বিজয়ী সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

অবশিষ্ট ফানা ফি'ল-ওজূদওয়ালাদের কিসিম ঃ (তওহীদ-ই ওজূদী অথবা ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ) আর তা হল কারামেতা (মুসলমানদের ভেতর একটি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। ॥অনুবাদক)-দের মত ফিরআওন বংশধরদের গবেষণা কিংবা বিশ্লেষণ ও তওহীদের মা'রিফাত। সূফী বুযুর্গ ও পুণ্যাত্মা বান্দাদের কারুর নিকটই এর এ অর্থ ছিল না। সৃষ্টি জগতের ভেতর যে জিনিষই আমি আমার চোখ দিয়ে দেখি তাই আসমান-যমীনের 'রব' তথা প্রভু-প্রতিপালক, একথা কেবল তারাই বলতে পারে যারা ধ্বংসাত্মক রকমের গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট এবং যারা বুদ্ধি-বিভ্রান্ত অথবা ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের খপ্পরে পতিত কিংবা যারা ক্ষিপ্ততা ও ধর্মদ্রোহিতার ভেতর কোন একটির শিকার। সমস্ত মাশাইখ-এ কিরাম॥দীন ইসলামের ভেতর যাঁরা নেতৃত্বের আসনে সমাসীন এবং যাঁদেরকে অনুসরণ করা হয়ে থাকে তাঁরা সকলেই এই মত ও পথের ওপরই একমত যা এই উম্মাহ্র প্রাচীন বুযুর্গ ও ইমামগণের পথ ও মত ছিল আর তা হল, স্রষ্টা সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সৃষ্টিজগত থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী। তাঁর সৃষ্টি জগতে তাঁর সত্তার যেমন কোন অংশ নেই, তেমনি তাঁর সত্তার মাঝেও তাঁর সৃষ্টি জগতের কোন অংশ নেই। তাঁরা সকলের এ বিষয়ে একমত, অসৃষ্ট বস্তু (قديم)-কে সৃষ্ট বস্তু (حادث) থেকে পৃথক এবং স্রষ্টাকে সৃষ্ট জীব বা সৃষ্টি (مخلوق) থেকে বিশিষ্ট জানতে হবে, বুঝতে হবে। এ বিষয়ে তাঁদের যে সব বাণী ও উক্তি বর্ণিত হয়েছে এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে তা বলার সুযোগ নেই। তাঁরা এও বলেছেন, হৃদয়-মানসে কখনো কখনো এমন সব অসুখ-বিসুখ তথা রোগ-ব্যাধি ও সন্দেহ এসে দেখা দেয় এবং কোন কোন লোকের ওপর এমন সব অবস্থা জেঁকে বসে যে, তাদের সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব পর্যবেক্ষণের সুযোগ ঘটে এবং তাঁরা ন্যায়-অন্যায় তথা ভালমন্দের ভেতর পৃথকীকরণ শক্তির দুর্বলতা কিংবা লোপ পাবার কারণে তাকেই অর্থাৎ সৃষ্টি জগতকেই আসমান যমীনের স্রষ্টা ভাবতে শুরু করে। যেমন এক ব্যক্তি সূর্যের একটি আলোক-রশ্মি দেখছে এবং ভাবছে এটাই সেই আসমানের সূর্য।

এখানে এটাও বোঝা দরকার, স্রষ্টা ও সৃষ্টি জগতের ভেতর পার্থক্যের দু'টি মকাম রয়েছে। একটি মকাম হচ্ছে, বান্দা বিচ্ছেদের পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রাচুর্য ও ভিড় তাকে পেরেশান করবে। তার হৃদয়-মানস এই ভিড় ও বিচ্ছেদের কারণে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকবে। সে হৃদয় ও দৃষ্টির ইতস্তত বিক্ষিপ্ততার মাঝে গ্রেফতার থাকবে। কখনো প্রেম ও ভালবাসা, কখনো ভয় ও কখনো আশা-আকাঙ্ক্ষার কারণে, যা এই সব সৃষ্ট জীবের সঙ্গে কায়েম হয়ে যায়, তার একাগ্রতা তওহীদে হাকীকী হাসিল হবে না। মানুষ যখন এই বিচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্নতা থেকে ঐক্যের দিকে, ভিড় থেকে একত্বের দিকে স্থানান্তরিত হয় তখন সে হৃদয়-মানস একাগ্রতা, মানসিক শান্তি এবং সেই লা-শরীক ও একক আল্লাহ্র তাওহীদ ও ইবাদতের মিষ্টতা ও স্বাদ লাভ করে এবং তার মন-মানস সৃষ্ট জীবের দিকে মনোযোগী থাকার পর আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে যায়। তার মুহব্বত, তার ভয়, তার আশা-ভরসা, তার সাহায্য প্রার্থনা সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে যায়। এমন অবস্থায় কতক মুহূর্তে তার মন-মানসে সৃষ্ট জীবের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের সুযোগ আর অবশিষ্ট থাকে না যার সাহায্যে সে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে পার্থক্য করবে। আল্লাহ্র দিকে তার পূর্ণ মনোযোগ ও সৃষ্টির দিক থেকে পরিপূর্ণ পরানুখতা লাভ ঘটে যায়। ওপরে আমরা যে দ্বিতীয় প্রকার ফানার কথা আলোচনা করেছি এই অবস্থাও তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

কিন্তু এরপর বিচ্ছেদের অপর একটি মকাম রয়েছে যা এর চেয়ে সমুন্নত ও উচ্চতর। আর তা হল, বান্দাহ পর্যবেক্ষণ করবে যে, সৃষ্ট জীব আল্লাহ তা'আলার সাথে কায়েম, তাঁর নির্দেশের অনুগত এবং তাঁর ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীন। আল্লাহ পাকের ওয়াহদানিয়াতের সামনে সে তার ভিড় ও প্রাচুর্যকে শূন্য ও অস্তিত্বহীন দেখবে। সে এই পর্যবেক্ষণ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা এই সৃষ্ট বস্তুসকলের প্রতিপালক (রব), সার্বভৌম প্রভু (ইলাহ), স্রষ্টা ও মালিক। এমনতরো অবস্থায় তার দিল্ (অন্তঃকরণ) আল্লাহ তা'আলার দিকে একাগ্র হয় এবং সে নিষ্ঠা ও ভালবাসা, আশা ও ভয়, সাহায্য প্রার্থনা ও আল্লাহ্র ওপর তাওয়াক্কুল এবং আল্লাহ্র জন্যই ভালবাসা ও আল্লাহ্র জন্যই বিদ্বেষ পোষণের মত অবস্থা লাভ করে। সে স্রষ্টা ও সৃষ্টির ভেতরকার পার্থক্যকে পরিষ্কার দেখতে থাকে এবং এতদুভয়ের মাঝে পরিষ্কার পার্থক্য নির্ণয় করতে থাকে। সে সৃষ্ট জীবের ছিন্নভিন্ন রূপ ও ভিড়কেও দেখতে থাকে এবং এ কথারও সাক্ষ্য দিয়ে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর প্রতিপালক (রব), সব কিছুর মালিক ও স্রষ্টা (ان الله ا

هوالله لاالاهو وانه خالقه وملیکه ورب کل شیء) এটাই সঠিক ও সত্য সরল 'শুহূদ' এবং এটাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র গবেষণামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী সাক্ষ্য।[১]

তাঁর রচনাবলীতে এ ধরনের গবেষণামূলক বিশ্লেষণ এবং সমূহ সঠিক জ্ঞান আরও অনেক রয়েছে। হাফিজ ইবনে কায়্যিম 'মাদারিজু'স-সালিকীন' নামক গ্রন্থে ইবনে তায়মিয়া (র)-এর গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ ও অবস্থার বহুবিধ ভাণ্ডার একত্র করেছেন। তাঁর এসব জ্ঞান-ভাণ্ডার সংগ্রহ ও অবস্থাদৃষ্টে মুল্লা 'আলী কারী উস্তাদ ও শাগরিদ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

> যিনিই মানাযিলু'স-সায়িরীন-এর ভাষ্য (মাদারিজু'স-সালিকীন) অধ্যয়ন করবেন তার সামনেই এ সত্য দিবালোকের ন্যায় ধরা পড়বে, তাঁরা দু'জন (ইবনে তায়মিয়া ও ইবনে কায়্যিম) আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আত-এর শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ এবং উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার ওলীকুলের অন্যতম ছিলেন।[২]

---

১. رسالة العبودية فى تفسيرقوله تعالى ياايهاالناس اعبدوا ربكم ৩৫-৮ পৃ.; মিসরের মাতবা'আ-ই হুসায়নিয়া থেকে প্রকাশিত مجموعة رسائل -এর অন্তর্ভুক্ত।

ومن طالع شمح منازل السائرين تبين له انهما كانامن اكابر اهل السنة والجماعة ومن اولياءهذه الامة ۔

২. মিরকাত শরাহ মিশকাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪২৭

৬ষ্ঠ অধ্যায়

শায়খু'ল-ইসলাম হাফিজ ইবনে তায়মিয়া (র)-এর পূনর্জাগরণ ও সংস্কারমূলক কাজ

শায়খু'ল-ইসলাম হাফিজ ইবনে তায়মিয়া (র) ইসলামের দা'ওয়াত ও সাধনাবহুল সংগ্রাম তথা রেনেসাঁর ইতিহাসে যে গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আনজাম দিয়েছেন যদিও তা অনেকাংশে জ্ঞান ও কর্মের নানা শাখা ও দিক জুড়ে রয়েছে তথাপি তা নিম্নোক্ত চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে যা তাঁর সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব রাখে। গুরুত্বপূর্ণ শাখা চারটি এই ঃ

১. তওহীদী 'আকীদার পুনরুজ্জীবন ও শির্কমূলক 'আকীদা ও আচার-অনুষ্ঠানসমূহ বাতিলকরণ;

২. দর্শন, যুক্তিশাস্ত্র ও 'ইল্মে কালাম-এর সমালোচনা ও কুরআন ও সুন্নাহ্র রীতি-পদ্ধতি ও পন্থাসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান;

৩. অমুসলিম জাতিগোষ্ঠী ও বিভিন্ন ফের্কার প্রত্যাখ্যান এবং তাদের 'আকীদা-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান ও সমূহ প্রভাবের মুকাবিলা;

৪. 'ইল্মে শরীয়তের পুনরুজ্জীবন ও ইসলামী চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটানো।

অমুসলিম ও অনারব জাতিগোষ্ঠীর সংস্রব ও পারস্পরিক মেলামেশা, ইসমাঈলী শী'আ ও বাতেনী হুকূমতের প্রভাব-প্রতিপত্তি, অধিকন্তু জাহিলী ও পথভ্রষ্ট সূফীদের শিক্ষা ও কর্মের ফলে সাধারণ মুসলমানদের ভেতর শির্কমূলক 'আকীদা-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির প্রচলন হতে চলছিল। বহু মুসলমান নিজেদের ধর্মীয় নেতা, তরীকতের মাশাইখ ও পুণ্যাত্মা আওলিয়া-ই কিরাম সম্পর্কে এমন সব অতিরঞ্জিত ও শির্কমূলক ধারণা ও 'আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করতে শুরু করেছিল যা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানগণ হযরত 'উযায়র ও 'ঈসা

মসীহ (আ) এবং স্ব স্ব সম্প্রদায়ের সাধু-দরবেশ ও মঠের পাদ্রী-সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে পোষণ করত। বুযুর্গানে দীনের মাযারে যা কিছু শুরু হয়েছিল তা ছিল সে সব কাজকর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের সফল অনুকরণ যেগুলো অমুসলিম জাতি-গোষ্ঠীর উপাসনালয়ে এবং তাদের সাধু ব্যক্তিদের কবরের উপর অনুষ্ঠিত হ'ত। কবরবাসীদের নিকট পরিষ্কারভাবে আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনার মত ব্যাপার শুরু হয়েছিল। তাদের নিকট ফরিয়াদ জানানো, দোহাই দেওয়া, চাওয়া ও দু'আ করার রেওয়াজ চালু হয়ে গিয়েছিল। তাদের কবরের ওপর বড় বড় মসজিদ নির্মাণ এবং স্বয়ং কবরগুলোকেই সিজদাগাহ বানানো, সেগুলোর ওপর প্রতি বছর মেলা বসান এবং দূর-দূরান্তর থেকে সফর করে সেখানে আসা সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছিল। হি. সপ্তম শতাব্দীর শেষে এর বাড়াবাড়ি এবং 'আকীদা ও 'আমলের বিপর্যয় ও বিকৃতি যে পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল তার কিছুটা পরিমাপ নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে করা যাবে যা স্বয়ং শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র রচনাবলী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উদ্ধৃতাংশে তিনি কারুর প্রশ্নের জওয়াব দিতে গিয়ে অথবা কোন আলোচনার প্রেক্ষিতে স্বীয় যুগের কোন কোন গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার উল্লেখ করেছেন এবং এ থেকে তাঁর যুগের ধর্মীয় অধঃপতন ও ইসলামের হৃৎপিণ্ডের ওপর জাহেলিয়াতের হামলা কতটা তীব্র ছিল তার কিছুটা পরিমাপ করা যাবে।

> বহু লোক মৃত ব্যক্তিকে একেবারেই খোদার মর্যাদায় এবং সেই যিন্দা পীর, যে তার কবরের খাদেম অথবা তার স্থলাভিষিক্ত, পয়গম্বরের আসনে বসিয়েছে। তারা মৃত ব্যক্তির কাছে নিজেদের মনোবাঞ্ছা পূরণ এবং বিপদ-আপদ দূরীকরণের নিমিত্ত দাবী-দাওয়া পেশ করে। তারা তাদের সেই যিন্দাপীর অথবা বুযুর্গকে এতটা মর্যাদা দিয়ে রেখেছে যে, সেই পীর বা বুযুর্গ যে বস্তু হালাল করবেন তাই হালাল এবং যে জিনিষকে হারাম করবেন তাই হারাম জানবে। তারা তাদের হিসাব থেকে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র খোদায়ীর পদ এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে নবূওতের আসন থেকে অপসারিত করে দিয়েছে। আকছার এমনও হয় যে, কোন নও মুসলিম অথবা তার অনুসারী ভক্তিবশত সেখানে আসে এবং সাহেব-এ মাযার (মাযারের অধিবাসী)-এর নিকট কোন বাদশাহ্র জুলুম অবসান অথবা অপর কোন মকসূদ পূরণের জন্য দু'আ করে তখন এই সব খাদেম (মাযারের) ভেতরে ঢোকে এবং ফিরে এসে বলে, আমি হযরতের কাছে আপনার মকসূদ আরয করে দিয়েছি এবং হযরত সাহেব পয়গম্বর (সা) সাহেবকে বলে দিয়েছেন, পয়গম্বর সাহেব আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তা পৌঁছিয়েছেন। (এরপর) আল্লাহ্ তা'আলা অমুক বাদশাহ্র নিকট তাঁর

নিজের দূত পাঠিয়ে দিয়েছেন, খবরদার! অমুক লোকের ওপর যেন কোন বাড়াবাড়ি কিংবা জুলুম না হয়। এটা কি খোলাখুলি মুশরিক ও খ্রিস্টানদের ধর্ম নয়? এতে তো ভুল বর্ণনা এবং সুস্পষ্ট মূর্খতা রয়েছে যে, একজন মুশরিক ও একজন খ্রিস্টানও যা সইতে পারবে না এবং তারাও এই ধোঁকায় প্রবেশ করতে চাইবে না। এই সমস্ত খাদেম যে রকম অবলীলায় মাযারে আসা মানত ও নযর-নেয়ায এবং ঐ সব মাযারে প্রদত্ত দ্রব্যসামগ্রী খেয়ে ও ভোগ করে থাকে তাতে কুরআন মজীদের এই আয়াতের পূর্ণ ব্যাখ্যা ও চিত্র পাওয়া যাবে ঃ

يايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله -

হে মু'মিনগণ! (ইয়াহূদী) পণ্ডিত ও (খ্রিস্টান) সংসার বিরাগীদের ভেতর অনেকে লোকের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। [সূরা তওবা ঃ আয়াত-৩৪]

প্রকাশ্য কবর পূজা

এই সব মূর্খের ভেতর অনেকে পরিষ্কার কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়ে। কোন কোন লোককে এভাবে দু'আ করতে শোনা গেছে ঃ "হযরত! আমার গোনাহ-খাতা মাফ করে দিন, আমার ওপর রহম করুন, দয়া করুন।" কতক লোক কবরকে সামনে করে ও কা'বা শরীফের দিকে পিঠ ফিরিয়ে নামায পড়ে এবং বলে, কবর হচ্ছে বিশিষ্ট লোকদের কিবলা এবং কা'বা হচ্ছে সাধারণ মানুষের (কিবলা)। এও ঐ সব লোকেরই উক্তি। 'ইবাদত-বন্দেগী ও যুহ্‌দ-এর ক্ষেত্রে বিশিষ্ট যিনি এবং যার শত সহস্র মুরীদ মু'তাকিদ তথা ভক্ত ও অনুরক্ত রয়েছে এবং এটাও সম্ভব, তিনি স্বীয় শায়খ-এর অনুসারীদের ভেতর সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই লোকই তার শায়খ সম্পর্কে একথা বলেছেন। এমন কোন কোন বুযুর্গও রয়েছেন যিনি বিরাট রিয়াযত ও মুজাহাদা করেন। যখন মুরীদ তার হাতে হাত দিয়ে তওবা করে তখন তিনি সর্বাগ্রে তাকে হেদায়েত করে থাকেন সর্বাগ্রে তার শায়খ (পীর)-এর কবর (মাযার)-এ গিয়ে চিল্লাকাশী'[১] করতে যেমনটি মূর্তি পূজারীরা তাদের স্ব স্ব মূর্তির নিকট আসর জমিয়ে বসে থাকে। এই সব কবরপূজারীদের ভেতর অনেক লোকের ঐ সব কবর পূজায় এমনভাবে

১. চল্লিশ দিন যাবত সংসারের ঝামেলামুক্ত হয়ে একাগ্র চিত্তে আল্লাহ্‌র যিক্‌র, তসবীহ-তাহলীল ও ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকাকে চিল্লাকাশী বলা হয়। -অনুবাদক।

চোখের পানি আসে, ভক্তিমিশ্রিত বিনয় ভাব ফুটে ওঠে, দু'আ অবস্থা ও হুযূর-ই-কাল্‌ব (একাগ্রচিত্ততা) হাসিল হয় যা তাদের মসজিদে হাসিল হয় না। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

في بيوت اذن الله ان ترفع ويذ كرفيهااسمه -

সেসব ঘরে (মসজিদে) যেগুলো সমুন্নত করা এবং সেগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করা আল্লাহর নির্দেশ। [সূরা আন-নূর ঃ আয়াত-৩৬]

আল্লাহ্‌কে ভয় নেই, মাযারবাসীকে ভয়

এসব লোকের 'আকীদা-বিশ্বাস এবং কবর ও মাযারের সাথে সম্পর্ক এত বেশী যে, তারা অবলীলায় গোনাহ্ কবীরা ও নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হয়ে থাকে (তাদের মনে এতটুকু সংকোচ স্পর্শ করে না)। কিন্তু তারা যখন কোন মাযারের গম্বুজ কিংবা কলস দেখতে পায় অমনি থেমে পড়ে। একে অপরকে বলে, "খবরদার! মাযারের গম্বুজের কলস দেখা যাচ্ছে" (অতএব আর নয়)। তারা সেই কলসের নীচে শায়িত লোকটির কথা তো মনে করে, ভয় করে, তার থেকে বিপদাশংকাও করে; কিন্তু সেই আল্লাহ্‌র কথা এতটুকু মনে রাখে না, তাঁর নির্দেশের এতটুকু পরওয়া করে না যিনি আসমান যমীনের স্রষ্টা, যাঁর হুকুমে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। তাদের ধারণা, যদি কেউ তাদের সঙ্গে আলোচনায় কিংবা তর্কে প্রবৃত্ত হয় তাহলে স্বীয় প্রতিপক্ষকে ঐ সব বুযুর্গের প্রভাব ও ক্ষমতার কথা বলে ভয় দেখায় যেমন করে মুশরিকেরা হযরত ইবরাহীম 'আলায়হি'স-সালামকে ভয় দেখিয়েছে। কুরআন শরীফে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

وحاجه قومه قال اتحاجونى فى الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربى شيئا وسع ربى كل شيىء علما - افلا تتذكرون - وكيف اخاف ماشركتم ولاتخافون انكم اشركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطانا - فاى الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون - الذين امنو ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون -

তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হল। সে বলল ঃ তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে? তিনি তো আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করেছেন। আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করলে তোমরা যাকে তাঁর শরীক কর তাকে আমি ভয় করি না, সব কিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত; তবে কি তোমরা অবধান করবে না? তোমরা যাকে

আল্লাহ্‌র শরীক কর আমি কিরূপে তাকে ভয় করব? অথচ তোমরা আল্লাহ্‌র শরীক করতে ভয় কর না যে বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে কোন সনদ দেন নি; সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বল, দুই দলের ভেতর কোন দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী? যারা ঈমান এনেছে এবং জুলুম (শির্ক) দ্বারা তাদের ঈমানকে কলুষিত করে নি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎ পথপ্রাপ্ত।[১]

আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও হেয় জ্ঞান করা

এই সব কবর ও মাযারপূজারী তওহীদ ও এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে ঠাট্টা-মস্করা করে এবং আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে তাদেরকে ভক্তি-সম্মান করে যাদেরকে তারা নিজেদের সুপারিশকারী ও কর্মনিয়ন্তা বানিয়ে রেখেছে। এদের অনেকেই বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ, যিয়ারত ও হাজ্জীদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এবং বিশ্বাস করে যে, তাদের ইমাম ও পীর-বুযুর্গের যিয়ারত বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জের চেয়ে উত্তম। এ ধরনের 'আকীদা-বিশ্বাস শী'আ ও অনেক সুন্নী নামে কথিত লোকের ভেতরও পাওয়া যায়। কিছু লোক মসজিদ ও পাঞ্জেগানা সালাত আদায়কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এবং বিশ্বাস করে যে, এর চেয়ে তাদের পীরের দু'আ উত্তম ও অনেক মরতবাপূর্ণ। এ জাতীয় 'আকীদা ঐ সব শী'আর ভেতর অদ্যাবধি বর্তমান যারা য়ূনুস কায়সীর সাথে নিজেদেরকে সম্পর্কিত করেছে। তাদের গাওয়া নিম্নোদ্ধৃত গান থেকে এর পরিমাপ করা যাবে ঃ

تعالوا نخرب الجامع - ونجعل فيه خماره -
ونكسر المنبر - ونجعل منه طنباره -
ونخرق المصحف - ونجعل منه زماره -
وننتف لحية القاضى - ونجعل منه اوتاره -

এস, আমরা মসজিদ ধ্বংস ও বিরান করি এবং সেখানে আমরা মদের দোকান খুলি; (মসজিদের) মিম্বর ভেঙে এস আমরা তা দিয়ে বাদ্যযন্ত্র তৈরি করি; কুরআন ছিঁড়ে ফেলে তা দিয়ে বাঁশী বানাই এবং (শর'ঈ আদালতের বিচারক) কাযীর দাড়ি উপড়ে এর দ্বারা তাঁত বুনি।

মুশরিক কাফিরদের দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন

তাদের দুঃসাহসের অবস্থা এমন যে, তারা অবলীলায় মিথ্যা কসম খায়, কিন্তু তারা পীরের নামে মিথ্যা কসম খায় না। তাদের ভেতর কেউ কেউ বলে, যে রিযিক আমার পীরের পক্ষ থেকে মিলবে না আমার জন্য তা কবুল

১. সূরা আনআম; ৮১-৮৩ আয়াত।

নয়। তাদের ভেতর কেউ কেউ বকরী যবেহ করে এবং বলে ঃ আমি আমার আকা (প্রভু)-র নামে যবেহ করছি। কেউ কেউ তো পরিষ্কার ভাষায় বলে, তাদের শায়খ (পীর) নবী-রসূলদের থেকেও অতি উত্তম ছিলেন। তাদের কেউ কেউ তাদের (পীরদের) সম্পর্কে উলূহিয়াত (ঈশ্বরত্ব, খোদায়িত্ব)-এর আকীদা পোষণ করে যেমনটি খ্রিস্টানগণ হযরত ঈসা মসীহ (আ) সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করে। যখন তারা তাদের পীরের কথা আলোচনা করে তখন অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে করে এবং তাদের উলূহিয়াতের দাবী করে। তারা তাদের বুযুর্গদের প্রতি বিরাট বিরাট কবিতা রচনা করে রেখেছে যে সব কবিতার ভেতর স্পষ্ট খোদায়ী দাবী রয়েছে, রয়েছে বিরাট বিরাট সব "লান তারানী"*। কেউ বলে, মূসা (আ) তূর পর্বতে আমারই সাথে কথা বলেছিলেন এবং আমারই 'তাজাল্লী' দেখে বেহুশ হয়ে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলে, 'আরশের ওপর আমিই চীৎকার মেরেছিলাম যাতে সারা বিশ্বে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল এবং সাত সমুদ্র আমারই ভয়ে সারাক্ষণ উদ্বেলিত ও ঊর্মিমুখর।[১]

বুযুর্গদের সম্পর্কে উলূহিয়াতের 'আকীদা

অনেক মূর্খ জাহিল ও মুশরিক পয়গম্বর ও বুযুর্গানে দীন সম্পর্কে এই 'আকীদা পোষণ করে যে, তাঁরাই (পীর-পয়গম্বরগণই) দুনিয়ার তাবৎ ব্যবস্থাপনা আনজাম দিয়ে থাকেন। জীবের জন্ম ও আহার্যের প্রয়োজন তাঁরাই মিটিয়ে থাকেন এবং বিপদ-আপদ দূর করা তাঁদেরই কাজ। মুসলমানদের 'আকীদা এ কখনো হতে পারে না, অথচ খ্রিস্টানরাও এ জাতীয় 'আকীদা কেবল হযরত ঈসা মসীহ (আ)-এর ক্ষেত্রেই পোষণ করে থাকে। কেননা তারা 'ইত্তিহাদ' ও 'হুলূল'* আকীদায় বিশ্বাসী। এর ভিত্তিতে হযরত ইবরাহীম, মূসা ও অপরাপর আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম সম্পর্কেও এ জাতীয় 'আকীদা তারা পোষণ করে না। প্রথম শ্রেণীর মূর্খ ও জাহিল হওয়া সত্ত্বেও না।[২]

অনেক লোকের বিশ্বাস, যে শহরে কিংবা যে বস্তীতে কোন পীর বা বুযুর্গের মাযার থাকে সেই পীর বা বুযুর্গেরই বদৌলতে ও বরকতে উল্লিখিত শহর ও বস্তীর লোকেরা রিযিক পেয়ে থাকে। এছাড়া দুঃখ-কষ্টে সাহায্য-সহানুভূতি

---

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-বাকরী, ৩৫১ পৃ.।

* পরশিষ্ট দেখুন। *

পরিশিষ্ট দেখুন।

২. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-বাকরী, ৩২৮ পৃ.।

ও শত্রুর হাত থেকে নিরাপত্তা লাভ ঘটে, দেশ হেফাজতে থাকে। যে লোক সম্পর্কে তাদের এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় তার সম্পর্কে তারা বলে, তিনি অমুক শহরের রক্ষক। উদাহরণস্বরূপ তারা বলে থাকে, সায়্যিদা নফীসা মিসর ও কায়রোর রক্ষক, অমুক অমুক বুযুর্গ দামিশক প্রভৃতি শহরের মুহাফিজ আর অমুক অমুক বাগদাদ প্রভৃতি শহরের পাহারাদার। তাদের বিশ্বাস, ঐ সব পুণ্যাত্মা বুযুর্গ ও পীর-পয়গম্বরদের কবরের বরকতেই উল্লিখিত শহর ও বস্তীগুলোর বালা-মুসীবত দূরীভূত হয়ে থাকে।[১]

তাদের অবস্থা এই, যখন দুশমন দামিশক অভিমুখে ধাবিত হল তখন এই সব কবর পূজারীর দল পীর-বুযুর্গদের কাছে ধরনা দেবার উদ্দেশ্যে তাদের কবর ও মাযারগুলোর পানে রওয়ানা হল। তাদের প্রত্যাশা ছিল, এই সব পীর-বুযুর্গ তাদের বিপদ প্রতিরোধে সক্ষম। কোন কবি বলেছেন ঃ

یاخائفین من التتر - لوذو بقبر ابی عمر -

ওহে তাতারদের আক্রমণাশংকায় ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তিবর্গ! আবূ ওমরের কবরের আশ্রয়ে এস (তাহলে বাঁচবে)। অপরজন বলেন ঃ

عوذوا بقبرابی عمر - ینجیکم من الضرر -

আবূ ওমরের কবরের আশ্রয় নাও; তিনি তোমাদেরকে সকল প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা ও দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দেবেন।[২]

মাশহাদ[৩]-এর ফেতনা

এই পীর পূজা তথা আওলিয়া-পরস্তী ও কবর (পীর-বুযুর্গদের কবরগুলো সাধারণত মাযার নামেই খ্যাত।—অনুবাদক) পূজার স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতিই হল, মসজিদের মুকাবিলায় "মাশহাদ"-এর গুরুত্ব বাড়বে এবং তা সকলের যিয়ারতগাহ, সাধারণ মানুষ ও অজ্ঞ লোকদের হাজত পূরণের কিবলায় পরিণত হবে। অনন্তর মুসলিম জাহানের কোণে কোণে মাশহাদ ও মাযার ব্যাঙের ছাতার মতই গজিয়ে উঠল। হাজার নয়, লাখো লাখো আসল ও নকল কবর রচিত হল। আমীর-উমারা তথা ক্ষমতাসীন শাসকবর্গ অত্যন্ত উদার ও অকৃপণভাবে এবং অত্যন্ত উৎসাহের সাথে এসব রাতের আঁধারে গজিয়ে ওঠা মাশহাদ ও মাযারের নামে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করলেন। এসব মাযার ও বুযুর্গদের জায়গায় গড়ে উঠল আকাশচুম্বী প্রাসাদ এবং নির্মিত হলো

---

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-আখনাঈ, ৮২ পৃ.।

২. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-বাকরী, ২৭৭-৮ পৃ.।

৩. পরিশিষ্ট দেখুন।

রৌপ্যমণ্ডিত গম্বুজ। পাণ্ডা, ঝাড়ুদার ও খাদেমদের একটি স্থায়ী গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। ধুমধাম ও বিরাট জাঁকজমকের সঙ্গে পীর-বুযুর্গদের এসব মাযার সফরের রেওয়াজ দেখা দিল এবং বিরাট বিরাট কাফেলা দূর-দূরান্তের এলাকা থেকে এভাবে সফর করে যেতে থাকল যেভাবে হাজীদের কাফেলা হজ্জে যেত। অনেক সময় এসব কাফেলা হজ্জ কাফেলার চেয়েও বিরাট আকৃতি ধারণ করত। মুসলিম জনসাধারণের সাধারণ মনোযোগ মসজিদ থেকে সরে গিয়ে মাশহাদের প্রতি কেন্দ্রীভূত হলো। হি. সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে 'মাযার ও মাশহাদ'সমূহ তাদের দীনী যিন্দেগীতে তথা ধর্মীয় জীবনে কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভ করেছিল এবং সেগুলো বায়তুল্লাহ্ শরীফের প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। শায়খু'ল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-এর লিখিত রচনাবলী থেকে জানা যায়, মাশহাদ-এর এই ফেতনা কতখানি মযবুতভাবে আসন গেড়ে বসেছিল এবং মূর্খ জাহিল ও উদ্দেশ্যবাদী মুসলমানদের সম্পর্ক এর সাথে কতখানি ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল। এই ফেতনা শক্তিশালী ও বিস্তৃত হবার পেছনে ফাতেমী[১] সালতানাতের দূর পাশ্চাত্য হতে শুরু করে মিসর ও সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত শতাব্দীব্যাপী আড়ম্বরপূর্ণ হুকুমতের বিরাট ভূমিকা ছিল। তদুপরি রাফেযী ও শী'আ সম্প্রদায়ের সম্পর্ক শুরু থেকেই মসজিদের তুলনায় মাশহাদ এবং "হারামায়ন শারীফায়ন"[২] এর মুকাবিলায় নজফ ও কারবালার সাথে বেশী ছিল। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র জন্মের পূর্বেই যদিও মিসর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ফাতিমী হুকুমত খতম হয়ে গিয়েছিল, তথাপি তার মানসিক ও সভ্যতাগত প্রভাব তখনও অবশিষ্ট ছিল, বিশেষ করে সিরিয়ায় তখনও বিপুল সংখ্যক ইসমা'ঈলী ও অপরাপর শী'আ বর্তমান ছিল যাদের সাহচর্যের প্রভাব সাধারণ ও অজ্ঞ মুসলমানদের ওপর গিয়ে পড়ছিল। অতঃপর ভ্রান্ত কিসিমের তাসাওউফ, যার ভেতর বুযুর্গদের মাযার ও মাশহাদ বিশেষ গুরুত্ব ও পবিত্রতার দাবীদার এবং এসব মাযার ও মাশহাদে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সমাবেশ (ওরস) প্রভৃতির রেওয়াজ এ সবের (মাযার ও মাশহাদের) রওনক আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং এখন তা শির্ক ও বিদ'আতের বিরাট আড্ডায় পরিণত হয়েছিল। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) ঐসব মাযার ও মাশহাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন ঃ

মাযার ও মাশহাদ-এর হজ্জ

> কিছু লোক আছে যারা কবরগুলোর হজ্জ করে। কিছু লোক এসব সফরের আদব ও হুকুম-আহকামের ওপর কিতাব পর্যন্ত লিখেছে যার নাম রেখেছে তারা "মনাসিক হাজ্জ আল-মাশাহিদ" (مناسك حج المشاهد)।

১. সাধারণভাবে ফাতেমী সালতানাত নামে মশহুর। মূলত এটি উবায়দী হুকুমত ছিল। দ্র. ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক, ১ম খণ্ড, ২৯০ পৃ.।

২. মক্কা ও মদীনা শরীফ।

অনন্তর আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন নু'মান আল-মুলাক্কাব বি'ল-মুফীদ' নামক একজন শী'আ 'আলিমের উল্লিখিত নামের কিতাব রয়েছে। এতে বহু মাথামুণ্ডুহীন অলীক বর্ণনা আহলে বায়ত-এর নামে পেশ করা হয়েছে। এসব বর্ণনার যে কোন ভিত্তি নেই সে ব্যাপারে তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ অনবহিত নন। কিছু কিছু লোক বিরাট ধুমধামের সাথে ও মহাআড়ম্বর সহকারে পীর-বুযুর্গদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে-সফর করে। যদিও তারা একে মানাসিক-এ হজ্জ (হজ্জের আরকান) অথবা হজ্জ বলে না বটে, কিন্তু এতদুভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এদের কেউ কেউ কসম খেতে গিয়ে বলে ঃ

وحق النبى الذى تحج اليه المطايا -

তারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর পানে হজ্জের কথা বলে, কিন্তু বায়তুল্লাহ্ শরীফের পানে হজ্জ করার কথা আলোচনা করে না। কোন কোন হাজীদের হজ্জের পেছনে প্রধান উদ্দেশ্যই থাকে রসূল (সা)-এর কবর মুবারক যিয়ারত, বায়তুল্লাহ্র হজ্জ নয়।[১]

বায়তুল্লাহ্র হজ্জের ওপর প্রাধান্য দান

কিছু কিছু লোক (পীর-বুযুর্গদের) কবর যিয়ারতকে বায়তুল্লাহ্র হজ্জের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কোন কোন লোকের এরূপ 'আকীদা রয়েছে যে, যদি অমুক বুযুর্গের কবর দু'তিনবার যিয়ারত করা যায় তাহলে এক হজ্জ হয়ে যাবে। কেউ কেউ কোন কোন বুযুর্গের মাযারকে 'আরাফাত ময়দানের সাথে তুলনা করে থাকে এবং হজ্জ মৌসুমে সেখানে সফরে যায় ও সেখানে উকূফ (অবস্থান) করে থাকে যেরূপ 'আরাফাত প্রান্তরে হাজ্জীগণ অবস্থান করে থাকেন। পূর্ব ও পশ্চিমা দেশগুলোতে এ রকম ঘটনা ঘটে থাকে। কারো কারো 'আকীদায় এই সব পবিত্র স্থান যিয়ারত কিংবা আপনাপন বুযুর্গের কবর যিয়ারতের উদ্দেশে ভ্রমণ হজ্জের সফর অপেক্ষা উত্তম। এক মুরীদ যিনি সাতবার হজ্জ করেছিলেন অপর মুরীদকে বলেন ঃ পীর শায়খ-এর কবর যিয়ারত এই সাত হজ্জের বিনিময়ে বিক্রি করবে? সে তার পীরের সাথে পরামর্শ করল। পীর তাকে এই বলে নিরুৎসাহিত করে, এই ব্যবসায়ে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এদের কাউকে কাউকে একথাও বলতে শোনা গেছে, কেউ সাত বার তার পীরের কবর প্রদক্ষিণ করলে এক হজ্জের সওয়াব পাবে।[২]

---

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-বাকরী, ২৯৫ পৃ.।

২. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-বাকরী, ২৯৭ পৃ.।

মসজিদের জনশূন্যতা, ভগ্ন ও জীর্ণ দশা এবং মাশহাদ (মাযার)-এর জমজমাট ও রমরমা অবস্থা

তাদের অনেকেই মসজিদগুলোকে জনশূন্য, ভগ্নাদশায় ও ধ্বংস-প্রায় অবস্থায় ফেলে রাখে। পক্ষান্তরে মাশহাদ ও মাযারগুলোকে জনবহুল ও জমজমাট রাখে। পাঞ্জেগানা সালাত আদায়ের নিমিত্ত যে সব মসজিদ নির্মিত হয়েছিল তাদের সে সব মসজিদ একেবারেই জনশূন্য ও আলোবিহীন দৃষ্টিগোচর হয়। গরীব মহল্লাবাসী যদি কোনক্রমে ফরাশ কিংবা জায়নামাযের ব্যবস্থা করতে পারল তো করল, নইলে তাও হয় না। দেখে শুনে মনে হয়, এ যেন কোন সরাইখানা যার দেখবার কেউ নেই! এর বিপরীতে মাযার ও মকবরাগুলো দেখুন, উপরে গেলাফ চড়ানো, স্বর্ণ-রৌপ্যের ঝালরমণ্ডিত, মেঝে মর্মর পাথরের মোজাইককৃত, সকাল-সন্ধা দু'বেলাই নযর-নেয়ায আসছে। একি আল্লাহ্ ও তাঁর আয়াতসমূহ এবং তদীয় রাসূল (সা)-এর প্রতি সুস্পষ্ট অবজ্ঞা ও শির্ক-এর প্রতি প্রকাশ্য সম্মান প্রদর্শন নয়? এসব কেন হয়? তাদের বিশ্বাস, মাযারে শায়িত বুযুর্গ ব্যক্তির দু'আ ও তার দোহাই আল্লাহ্র ঘরে গিয়ে আল্লাহ্র নিকট চাওয়া এবং আল্লাহর দোহাই দেবার তুলনায় অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসু। এজন্য স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্র ঘরের (মসজিদের) মুকাবিলায় সেই ঘর অগ্রাধিকার লাভ করে যে ঘর বানানো হয় মানবগোষ্ঠীর দু'আর জন্য। যদি মসজিদের জন্যও কোন ওয়াকফ থাকে এবং মাযারের জন্যও কোন ওয়াকফ থাকে, দেখা যাবে মাযারের নামে ওয়াকফ তাদের নিকট অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং মসজিদের তুলনায় পরিমাণে বিরাট অংকের। এক্ষেত্রে তারা 'আরবের মুশরিকদের পদে পদে অনুসরণ করছে যাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সূরা আন'আম-এ নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا - فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم - ساء ما يحكمون -

আল্লাহ্ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তার ভেতর থেকে তারা আল্লাহ্র জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, 'এটা আল্লাহ্র জন্য এবং এটি আমাদের দেবতাদের জন্য,' যা তাদের

দেবতাদের অংশ তা আল্লাহ্র কাছে পৌছায় না এবং যা আল্লাহ্র অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌছায়; তারা যা মীমাংসা করে তা নিকৃষ্ট।[১]

ওপরের উদ্ধৃতি থেকে পাঠক পরিমাপ করতে পারবেন, হি. সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও এবং যখন ইসলামের বড় বড় ইমাম, শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস ও ফকীহ বর্তমান ছিলেন, বিরাট বিরাট মাদরাসা ও জ্ঞানের কেন্দ্র ('ইলমী মারকায) বিদ্যমান ছিল, তথাপি মুসলিম জনসাধারণ কিরূপ মূর্খতাপ্রসূত 'আকীদা ও কার্যকর গোমরাহীতে জড়িত ছিল এবং কোন্ পর্যায়ের শির্কমূলক 'আকীদা ও আমল মুসলিম সমাজ জীবনে সাধারণ মুসলিম মন-মেযাজে আসন গেড়ে বসেছিল। সাধারণ মুসলমান ও অজ্ঞ জাহিলদের কথা বাদ দিলেও বহু 'উলামা ও ফুকাহাও এসব 'আমল-'আকীদা সম্পর্কে বহুবিধ সন্দেহ ও সংশয়ের শিকার ছিল এবং তাদের লেখা ও প্রদত্ত ফতওয়া থেকে অনুমিত হয় যে, শির্ক ও তওহীদ সম্পর্কে তাদের মন-মস্তিষ্কও ততটা পরিষ্কার ও একাগ্র ছিল না যতটা এমন একজনের থাকা উচিত যিনি তওহীদের 'আকীদা সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে গ্রহণ করেছেন এবং যার সামনে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুবর্ণ যুগ ও সাহাবা-ই কিরাম (রা)-এর কল্যাণ ও বরকতময় যমানার নমুনা, বাণী ও কর্ম রয়েছে। এই শ্রেণীটির চিন্তাধারার পরিমাপ, যারা নিজেদের যুগ-যমানার প্রচলিত প্রথা ও প্রাচীন অভ্যাসমূহ দ্বারা প্রভাবিত ছিল, ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সমসাময়িক শায়খ 'আলী ইবন ইয়া'কূব আল-বাকরী ও আল-আখনাঈর সে সব রচনা থেকে করা যাবে যার প্রত্যাখ্যানে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) দু'টি বিস্তৃত গ্রন্থ লেখেন।[২] যে গ্রন্থ থেকে ইতিপূর্বে উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে।

---

১. সূরা আন'আম, ১৩৬ আয়াত; আয়্যামে জাহিলিয়াতে মুশরিকদের নির্বুদ্ধিতা ও আল্লাহ তা'আলার প্রতি ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তারা উৎপন্ন ফসল বা গবাদি পশু আল্লাহ্ ও দেবতাদের জন্য উৎসর্গ করত। ভাল বস্তু দেবতাদের ভাগে দিত, অধিকন্তু আল্লাহ্র ভাগ থেকে দেবতাদের ভাগে মিশিয়ে দিত এই বলে যে, আল্লাহ্ মুখাপেক্ষী নন, তাঁর প্রয়োজন নেই; দেবতারা মুখাপেক্ষী, তাদের প্রয়োজন রয়েছে। অথচ তারা এটুকু বুঝতে চেষ্টা করত না যে, মুখাপেক্ষী দেবতা কিরূপে মা'বূদ হতে পারে!

২. تلخيص كتاب الاستغاثه المعروف بالرد على البكرى - مطبعة سلفيه مصر سنة ١٣٤٦ هـ اور كتاب الرد على الاخنائى واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية - ايضا مطبعه سلفيه سنة ١٣٤٦هـ

শেষোক্ত গ্রন্থটি প্রথমোক্ত গ্রন্থের হাশিয়ায় লিখিত।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সংস্কার কর্ম এবং শির্কমূলক 'আকীদার প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতা

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) ঐ সব শির্কমূলক কর্মকাণ্ড ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে জিহাদী ও পুনর্জাগরণের পতাকা তুলে ধরেন এবং সাধারণ মানুষের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি, অধিকন্তু বিশিষ্ট ও সাধারণ নির্বিশেষে সকলের রোষ ও ভর্ৎসনার দিকে একেবারেই ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি প্রচলিত কর্মকাণ্ড, রীতিনীতি, শির্কমূলক 'আকীদা ও ধ্যান-ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন এবং ঐসব 'আকীদা ও কল্পিত ধ্যান-ধারণার ওপর কুঠারাঘাত করেন যা ছিল শির্কমূলক কর্মরীতির বুনিয়াদ।

ঐসব মাযারে জনতার ভিড় ও শির্কমূলক কর্মকাণ্ড ও রীতিনীতির সবচেয়ে বড় কারণ ছিল, জনসাধারণ ঐসব মাযারবাসীর নিকট নিজ নিজ মকসূদ হাসিল ও উদ্দেশ্য পূরণের নিমিত্ত দু'আ করত, তাদের নামে দোহাই দিত, তাদের আশ্রয় প্রার্থনা করত। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর রচনায় পরিষ্কারভাবে লিখেন, আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কারোর নিকট দু'আ আদৌ জায়েয নয় এবং এটি সুস্পষ্ট শির্ক যা মুসলমানদের অজ্ঞতা ও অমুসলিম জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে মেলামেশার দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। আর-রাদ্দু 'আলা'ল-বাকরী গ্রন্থে তিনি বলেন ঃ

গায়রুল্লাহ্‌র নিকট দু'আ ও সাহায্য কামনার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষামালা অধ্যয়ন করা এবং তা ভালভাবে উপলব্ধির পর নিশ্চিত ও অকাট্যভাবেই জানা যায়, তিনি তাঁর উম্মতকে কোন মৃত পয়গম্বর কিংবা পুণ্যবান লোকের কাছে দু'আ করবার অনুমতি দেন নি, না ফরিয়াদ জ্ঞাপন হিসাবে, আর না সাহায্য কামনা হিসাবে আর না উপকার পাবার আশায়। ঠিক তেমনি তাঁর উম্মতের পক্ষে কোন মৃতের কিংবা জীবিত ব্যক্তির সামনে সিজদাবনত হওয়া কিংবা জীবিত কিংবা মৃতকে সিজদা করা জায়েয নয় এবং যে সব 'আমল ইবাদতের শামিল (জীবিত কিংবা মৃতের সামনে অনুমোদিত নয়) তেমন কিছু। আমরা বেশ ভালই জানি যে, তিনি ঐসব বিষয়কে নিষেধ করছেন এবং এগুলো সেসব শির্ক-এর অন্তর্গত, আল্লাহ্ পাক ও তদীয় রসূল (সা) যেগুলোকে হারাম বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু যেহেতু বিগত যমানাগুলোতে অজ্ঞতা ও মূর্খতা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল এবং নবূওতের শিক্ষা ও রিসালতের চিহ্নাদি সম্পর্কে জানাশোনা খুবই কম ছিল, সেজন্য বহু 'উলামা' ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ সব অজ্ঞ মূর্খদেরকে কাফির বলতে

সতর্কতা অবলম্বন করেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের সামনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা এবং দীন সম্পর্কিত বিধি-বিধান স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে।[১]

অন্য একবার তিনি লিখছেন ঃ

মৃতের নিকট স্বীয় প্রয়োজনীয় জিনিস চাওয়া অথবা তার নিকট ফরিয়াদ জানানো প্রচলিত রীতি হিসাবে অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। শরীয়তে মুহাম্মদীর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে এটি এক প্রকার মূর্তিপূজা। এজন্যই ঐ সব দু'আকারীর সামনে কখনো কখনো শয়তান মাযারে শায়িত বুযুর্গের বেশে অথবা কোন অদৃশ্য বস্তুর আকৃতিতে এসে থাকে। অনেক সময় মূর্তিপূজকদের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটতে দেখা যায়, বরং ঘটনা এই যে, যেমনটি হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা) বলেন ঃ মূর্তিপূজার সূচনা কবর থেকেই হয়েছে।[২]

আরও একবার তিনি বলেন ঃ

কোন মৃতের কিংবা অদৃশ্য ব্যক্তির নিকট কিছু চওয়া, চাই তিনি পয়গম্বরই হোন অথবা না-ই হোন, এমন 'আমলের অন্তর্গত যা হারাম। এই ব্যাপারে মুসলিম ইমামগণ একমত। আল্লাহ্ এবং তদীয় রসূল (সা) এ বিষয়ে যেমন আদেশ করেন নি, তেমনি সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও তাবি'ঈদের কেউই এমনটি করেন নি এবং মুসলিম ইমামগণের কেউ তা পছন্দও করেন নি। যে দীন এ মুহূর্তে আমাদের সামনে ও সংরক্ষিত আকারে চলে আসছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের সর্বোত্তম ও সোনালী যুগে আদৌ এর কোন প্রচলন ছিল না। কোন লোক মুশকিলে কিংবা বিপদে-আপদে পড়লে কিংবা কারোর কোন প্রয়োজন দেখা দিলে কেউ অতীত কালের কোন বুযুর্গ কিংবা পয়গম্বরের নাম ধরে ধরে একথা বলত না, ياسيدى فلان انا فى حسبك (হুযূরে ওয়ালা! আমি আপনার আশ্রিত)। আমি আপনার গিলাফ ধরেছি অথবা ওহে বাবা বুযুর্গ! আমার জরুরত আপনি মিটিয়ে দিন, পূরণ করে দিন আমার সকল জরুরী হাজত, যেমনটি সে যুগের কোন কোন মুশরিক তাদের এমন সব সাধু পুরুষের নাম ধরে বলত যারা হয় মারা গেছে অথবা সেখানে বর্তমান নেই। অন্য কোথা থেকেও একথা প্রমাণিত হয় না যে, কোন সাহাবী আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর ইনতিকালের পর তাঁর অথবা অন্য কোন

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-বাকরী, ৩৩৭ পৃ.।

১. ঐ, ৫৬ পৃ.।

পয়গম্বরের রওযা মুবারকের পাশে গিয়ে কিংবা দূরে থেকে তাঁর কিংবা তাঁদের দোহাই দিয়েছেন। সাহাবা-ই কিরাম (রা)-এর সাথে কাফির মুশরিকদের বড় বড় যুদ্ধ হয়েছে, বহু বার তাঁদের শত্রুদের বিরুদ্ধে দৌড়াতে হয়েছে, ভীষণ সংঘর্ষ হয়েছে, মাঝে মাঝে মারাত্মক সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁরা কখনো না কোন নবীর দোহাই দিয়েছেন, আর না নবী ভিন্ন অপর কারোর দোহাই পেড়েছেন, না আল্লাহ্‌র কোন সৃষ্ট জীবের কসম খেয়েছেন, না কোন আম্বিয়া (আ) কিংবা গায়র আম্বিয়ার কবরে দু'আর জন্য গেছেন, আর না নামায পড়বার জন্যই গিয়েছেন। ইমাম মালিক (র) ও কতক 'উলামা তো এতটুকুও পছন্দ করেন নি যে, কোন লোক রওযা মুবারকের পাশে গিয়ে নিজের জন্যই দু'আ করবে। তাঁরা পরিষ্কার বলেছেন যে, এটি এমন এক বিদ'আত যার নজীর সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও তাবি'ঈদের যুগে মেলে না।[১]

তিনি তাঁর বিখ্যাত 'আত-তাওয়াসসুল ওয়া'ল-ওয়াসীলা' নামক গ্রন্থে লিখছেন ঃ

ফেরেশতাকুল ও আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের নিকট তাঁদের ইনতিকালের পর অথবা তাঁদের অবর্তমানে দু'আ করা, তাঁদের কাছে চাওয়া, তাঁদের দোহাই দেওয়া, তাঁদের নিকট কিংবা তাঁদের প্রতিকৃতির নিকট সুপারিশ কামনা এমন একটি নতুন দীন (ধর্ম) আল্লাহ্ পাক যা আমাদের জন্য শরীয়ত হিসাবে অনুমোদন দেন নি, আর এ দীনসহ কোন নবীকেও পাঠান নি এবং এর সমর্থনে কোন আসমানী কিতাবও নাযিল করেন নি।[২]

গায়রুল্লাহ্‌র নিকট দু'আ হারাম হবার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

উক্ত গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি এই হারামের তাৎপর্য বয়ান করতে গিয়ে লিখছেন ঃ

ফেরেশতাকুল আমাদের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে, একথা বলা সত্ত্বেও আমাদেরকে ফেরেশতাদের নিকট দু'আ করতে আল্লাহ্ পাক নিষেধ করেছেন। তেমনি আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ), নেককার ও সালিহ্ বান্দাহগণ যদিও তাঁদের কবরে জীবিত, যেমন কোন কোন আলামত (آثار) থেকে এতে জানা যায় যে, তারা জীবিত মানুষদের জন্য দু'আও করেন, কিন্তু কারোরই স্বয়ং তাদের নিকট দু'আ করা জায়েয নয় এবং সলফে সালিহীন তথা প্রাচীন বুযুর্গদের থেকেও এমনতরো বর্ণনা পাওয়া যায় না। কেননা এ

১. আর-রাদ্দু আলা'ল-বাকরী, ২৩৪ পৃ.।

২. قاعده جليله فى التوسل والوسيله ১৫ পৃ.।

জাতীয় কর্মের মাধ্যমে শির্ক-এর রাস্তা খুলে যায় এবং তাঁদের পূজা শুরু হয়। এর বিপরীতে তাঁদের জীবদ্দশায় তাঁদের নিকট কিছু চাওয়া হলে কিংবা প্রার্থনা পেশ করলে তা শির্ক পর্যন্ত পৌঁছায় না। দ্বিতীয় বিষয় হলো, ফেরেশতাকুল, আম্বিয়া-ই-কিরাম ও পুণ্যবান লোকেরা তাঁদের ইনতিকালের পর জীবিত লোকদের জন্য যা কিছু দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন তা একটি আল্লাহ্ কর্তৃক সৃজন নির্ধারিত (تكوينى) ব্যাপার যার ভেতর অপরের প্রার্থনা ও দু'আর কোন ভূমিকা নেই। এর বিপরীতে জীবিতাবস্থায় প্রার্থীর চাওয়া শরীয়ত অনুমোদিত। ইনতিকালের পর তাঁরা ঐ সব বস্তুর জন্য আর দায়ী (مكلف) থাকেন না।

কবরবাসীর নিকট দু'আকারীদের বিভিন্ন শ্রেণী ও এর রূপ

এক জায়গায় তিনি কবরের নিকট দু'আ ও সওয়ালকারীদের বিভিন্ন প্রকার ও অবস্থা লিখে আলাদা আলাদা হুকুম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

কেউ যখন কোন পয়গম্বর কিংবা পুণ্যবান লোকের কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় কিংবা এমন কোন কবরের কাছে যায় যে কবর সম্পর্কে তার ধারণা, এটি কোন পয়গম্বর অথবা আল্লাহ্‌র কোন সালিহ্ বান্দাহ্‌র কবর হবে (অথচ তাদের ধারণা সত্য নয়) আর এই ভেবে তারা সেই কবরে প্রার্থনা জানায়, যাঞ্চা করে, সিজদা করে। এগুলো তিন ধরনের হয়ে থাকে।

প্রথমত, তারা কবরবাসীর নিকট নিজ নিজ প্রয়োজন পূরণের নিমিত্ত হাত পাতে, প্রার্থনা জানায়। যেমন, তার নিকট তারা তাদের পালিত জীব-জানোয়ারের অসুখ-বিসুখ সারিয়ে দেবার অথবা ঋণ পরিশোধের কিংবা স্বীয় দুশমন থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ অথবা নিজেদের পরিবার-পরিজনের ও পালিত পশুগুলোর শরীর স্বাস্থ্য যেন ভাল থাকে তজ্জন্য আবেদন জানায় এবং এমনও সব বিষয়ের জন্য আবেদন জানায় যা পূরণের ক্ষমতা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কারোর নেই। এ তো সুস্পষ্ট শির্ক, আর যারা এতে লিপ্ত তাদের তওবাহ করানো উচিত। যদি তওবাহ করে তবে তো ভাল, অন্যথায় তাদের কতল করতে হবে।

আর যদি তারা বলে যে, আমি এই মাযারবাসী কিংবা এই পয়গম্বর অথবা এই বুযুর্গ ওলীর নিকট এজন্যই আবেদন করছি, আমার প্রার্থনা জানাচ্ছি যেহেতু তিনি আমার তুলনায় আল্লাহ্‌র অধিকতর প্রিয়ভাজন, নিকটজন। তিনি যদি আমার এ সব ব্যাপারে আল্লাহ্‌র দরবারে একটু সুপারিশ করেন, সেজন্য তাকে আমি ওসীলা বা মাধ্যম বানাচ্ছি যেমন করে রাজা-বাদশাহ্‌র দরবারে কার্য সিদ্ধির জন্য সেখানকার বিশিষ্ট ও সাধারণ লোকদের ওসীলা বানানো হয়ে থাকে, তাহলে এ আমলও খ্রিস্টান ও মুশরিকদের আমলের

মতই। কেননা তারাও এ কথাই বলে, তারা তাদের সাধু-সন্ন্যাসী ও মঠবাসী লোকদেরকে (আহবার ও রুহবান) কেবল সুপারিশকারী হিসেবেই নিয়ে থাকে এবং নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের দিয়ে সুপারিশ করাতে চায় মাত্র। ঠিক তেমনি মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে অবহিত করেছেন, (মূর্তিপূজার কারণ হিসেবে) তারা বলে যে, مانعبدهم الاليقربونا الى الله زلفى অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট সান্নিধ্যে পৌছিয়ে দেবে বলেই আমরা দেব-মূর্তিগুলোর পূজা-অর্চনা করি। আরও ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ام اتخذوا من دون الله شفعاء ط قل اولوكانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون ـ قل لله الشفاعة جميعا ط له ملك السموات والارض ثم اليه ترجعون ـ

তবে কি ওরা আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্যকে সুপারিশ ধরেছে? বল, 'ওদের কোন ক্ষমতা না থাকলেও এবং ওরা না বুঝলেও?' বল, 'সকল সুপারিশ আল্লাহ্‌রই ইখতিয়ারে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই; অতঃপর তাঁরই নিকট তোমরা ফিরে যাবে।' [সূরা যুমার ঃ ৪৩-৪৪]

আরও ইরশাদ হচ্ছে ঃ

مالكم من دونه من ولى ولاشفيع ـ افلاتتذكرون ـ

আরও ইরশাদ হচ্ছে ঃ তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই; তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

(সূরা সজদা ঃ ৪)

এমনি ইরশাদ হচ্ছে ঃ

من ذالذى يشفع عنده الاباذنه ـ

কে সে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?

[সূরা বাকারা ঃ ২৫৫]

দ্বিতীয়ত, উক্ত বুযুর্গ কিংবা মাযারবাসীর নিকট কোন কর্মের তলব করা হবে না কিংবা তার নিকট দু'আও করা হবে না। তাঁর নিকট কেবল এতটুকু দরখাস্ত পেশ করা হবে, তিনি আবেনদকারীর আবেদনে সাড়া দিয়ে আবেদনকারীর উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য একটু দু'আ করে দেবেন যেন তার মকসূদ পুরা হয়। যেমনটি কোন লোক জীবিত লোকের নিকট গিয়ে বলে যে, আপনি আমার জন্য একটু দু'আ করুন, যেমন করে সাহাবায়ে কিরাম (রা) হুযূর আকরাম (সা)-এর নিকট দু'আর জন্য দরখাস্ত করতেন। জানা দরকার, জীবিত মানুষের ক্ষেত্রে তো এটা জায়েয এবং শরীয়ত

অনুমোদিতও। কিন্তু একজন মৃত পুণ্যাত্মা অথবা একজন পয়গম্বর এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পর তাঁর নিকট দু'আর দরখাস্তের পেছনে শরীয়তের কোন সমর্থন নেই এবং এটি শরীয়তসম্মত কোন কর্ম নয় যে, আমরা কোন পীর-বুযুর্গ কিংবা পয়গম্বরের নিকট তাঁর ইনতিকালের পর বলি, আপনি আমাদের জন্য দু'আ করুন অথবা আপনি আপনার প্রভু প্রতিপালক (রাব্ব)-কে বলে কয়ে আমাদেরকে এটা সেটা পাইয়ে দিন। কোন সাহাবী কিংবা তাবি'ঈ থেকেও এ জাতীয় কর্মের প্রমাণ নেই এবং এটা কোন ইমামেরও মসলা নয়। কোন হাদীসও এর প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যাবে না। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত ওমর (রা)-এর যমানায় একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে লোকেরা হযরত 'আব্বাস (রা)- কে দিয়ে দু'আ করিয়েছিল এবং তাঁকে ওসীলা (বন্ধু, মাধ্যম) বানিয়েছিল এবং বলেছিল, 'হে আল্লাহ! এর আগে যখন আমরা দুর্ভিক্ষাবস্থার মুখোমুখি হতাম তখন তোমার নবী (সা)-কে ওসীলা বানাতাম আর তুমি বৃষ্টি বর্ষণ করতে। এখন আমরা আমাদের পয়গম্বর (সা)-এর চাচাকে ওসীলা বানাচ্ছি। অতএব, তুমি তোমার রহমতের বারিধারা পাঠাও। অনন্তর বৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা তাঁদের এই প্রয়োজন ও বিপদের মুহূর্তে তো রওযা মুবারকের কাছে যান নি এবং একথা বলেন নি, 'হে আল্লাহ্র রসূল! আমাদের জন্য আপনি দু'আ করুন এবং বৃষ্টি পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আমরা আপনার নিকট ফরিয়াদ জানাচ্ছি।' কোন সাহাবী কখনো এরকম করেন নি। এটি এমনই এক বিদ'আত কুরআন ও হাদীসে যার কোন প্রমাণ মেলে না।

তৃতীয় সূরত হল, যিয়ারতকারী একথা বলবে, 'হে আল্লাহ্! অমুক পীর কিংবা বুযুর্গের তোফায়লে, তোমার দরবারে যার বিরাট সম্মান ও মর্যাদা– আমাকে অমুক জিনিসটি দিয়ে দিন, আমার সঙ্গে এমনতরো আচরণ করুন।' তা অনেক লোকের অভ্যাসই এমন। কিন্তু এমনটি করা কোন সাহাবী কিংবা তাবি'ঈ অথবা প্রাচীন বুযুর্গদের কারোর থেকেই বর্ণিত নেই যে, তাঁরা এভাবে দু'আ করতেন। কোন কোন 'উলামায়ে কিরাম ও বুযুর্গ এর কেবল আঁ-হযরত (সা)-এর জন্য এজাযত দিয়েছেন এবং কেউ কেউ বলেন যে, তাও আঁ-হযরত (সা)-এর জীবদ্দশায় ছিল, চিরদিনের জন্য নয়।[১]

---

১. রিসালা যিয়ারাতি'ল-কুবূর মাশমুলা মাজমু' রাসাইল, ১০৬-১২ পৃ. সংক্ষেপিত। তাওয়াস্সুল সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতবাদ বিখ্যাত ও সকলের জানা। বিস্তারিত জানতে চাইলে দ্র. قاعده جليله في التوسل والوسيله কিন্তু অধিকাংশ ইমাম ও উলামা এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন।

জীবিত লোকের নিকটও এমন কিছু চাওয়া জায়েয নয় যা ইহজাগতিক কার্য-কারণের উর্ধ্বে

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রা) কেবল এটুকুকেই যথেষ্ট মনে করেন নি যে, কোন মৃত বুযুর্গ কিংবা পীর-পয়গম্বর অথবা মাযারবাসীর নিকট কিছু চাওয়া, প্রার্থনা দু'আ করা জায়েয নয়, বরং কোন জীবিত লোকের নিকটও এমন কোন বস্তু দাবী করা কিংবা কোন জিনিস চাওয়া যা পার্থিব বস্তুনিচয়ের উর্ধ্বে এবং 'কুদরত'-এর 'কুন ফায়াকুন' (كن فيكون)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত অথবা সেসব বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত যা কেবল আল্লাহ্‌র কুদরত ও ইচ্ছা-অভিরুচির সাথেই সঙ্গতিশীল হতে পারে এবং যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের সঙ্গে নির্দিষ্ট রেখেছেন, তাঁর মতে, নাজায়েয ও শির্ক। তিনি তদীয় পুস্তিকা 'যিয়ারাতু'ল-কুবূর'-এ বলেন ঃ

> বান্দাহ্‌র কাম্য বা ঈপ্সিত বস্তু যদি সেসব বিষয় ও কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত হয়, যার ওপর কেবল আল্লাহ্‌র অসীম কুদরত বা ক্ষমতা রয়েছে তা আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কারোর নিকট চাওয়া৷ চাই তিনি বাদশাহ্ই হন, নবী হন, পীর অথবা বুযুর্গ হন, হন জীবিত অথবা মৃত—জায়েয নয়। উদাহরণত, নিজের কিংবা জীব-জানোয়ারের রোগ-মুক্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্য কামনা, কোন নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই স্বীয় ঋণ পরিশোধ প্রার্থনা , গৃহবাসীদের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বালা-মুসীবতের পরিহার অথবা শত্রুর ওপর জয় লাভ, কলবের হেদায়েত, গোনাহ্‌র মাগফিরাত, জান্নাত তথা বেহেশতে প্রবেশ, জাহান্নামের হাত থেকে পরিত্রাণ, বিদ্যা লাভ, কুরআন শরীফ পড়তে পারা, আত্মার সংস্কার, চারিত্রিক পরিশুদ্ধি, নফসের পবিত্রতা ইত্যাদি। এসব কেবল আল্লাহ্‌র নিকটই চাওয়া যেতে পারে। কোন লোকের পক্ষে কোন রাজা-বাদশাহ্ অথবা পীর-পয়গম্বরের নিকট, চাই তিনি জীবিত হোন অথবা মৃত-একথা বলা জায়েয নয় যে, আপনি আমার গোনাহ্-খাতা মাফ করে দিন, আমাকে আমার শত্রুর ওপর জয়যুক্ত করে দিন, আমার রোগ-ব্যাধি নিরাময় করে দিন, আমার স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিন অথবা আমার ঘরের লোকেরা আমার পশুগুলো যেন ভাল থাকে ইত্যাদি। এ ধরনের দু'আ ও ফরমায়েশ জায়েয নয়। যদি কোন লোক কোন সৃষ্ট জীবের নিকট এ জাতীয় প্রার্থনা জানায় চাই৷ সে যে কেউ হোক, তাহলে সে মুশরিক এবং সে এমন সব মুশরিকদের মধ্যে পরিগণিত হবে যারা ফেরেশতাদেরকে ইবাদত করত, নবী-রসূলদেরকে পূজা করত, তাঁদের মূর্তি তৈরি করে তার সামনে প্রণতি জানাত, ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করত, যেমন খ্রিষ্টান সম্প্রদায় হযরত 'ঈসা মসীহ (আ) ও তাঁর সম্মানিতা মা হযরত মরিয়ম (আ)-এর উদ্দেশে দু'আ করত।

---

১ الواسطة بين الخلق والحق ৪৫-৪৬ পৃ.।

মধ্যস্থতার হাকীকত

এই ক্ষেত্রে মধ্যস্থতার একটি বিতর্ক সৃষ্টি করা হয় থাকে এবং যে সমস্ত লোক হুযূর আকরাম (সা)-এর অথবা কোন ওলী-বুযুর্গের কিংবা পুণ্যাত্মার নিকট দু'আ অথবা সুপারিশ করাবার বিরোধী, তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, তাঁরা মধ্যস্থতা অস্বীকার করেন। অথচ নবী-রসূলগণ স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে মধ্যস্থতা ও যোগসূত্র স্থাপনকারী এবং তাঁদের ব্যতিরেকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছা, এক কথায় অসম্ভব। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) সুস্পষ্টভাবে এর জওয়াব প্রদান করেছেন এবং বলেছেন, মধ্যস্থতার দু'টো অর্থ রয়েছে, যার একটি অর্থ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সকলেই সে বিষয়ে একমত এবং তারই ওপর সমগ্র দীন-এর বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। আরেকটির অর্থ বাতিল, ভিত্তিহীন ও মনগড়া। তিনি এ বিষয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পুস্তিকাই রচনা করেছেন যার নাম الواسطة البين الخلق والحق - এতে তিনি বলেছেন,

রসূলের মধ্যস্থ হবার অর্থ যদি হয় এই যে, সৃষ্টিজগতের জন্য এমন একজন মধ্যস্থতাকারী আবশ্যক যিনি আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকাম ও তাঁর ইচ্ছা-অভিরুচি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবকে বাতলে থাকেন, তাহলে এটি সর্বৈব সত্য এজন্য যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির পক্ষে তাঁর (আল্লাহ্‌র) বিধি-বিধান, পালনীয় নির্দেশ, তাঁর পছন্দ ও অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ জানবার জন্য তাঁরা ভিন্ন আর কোন মাধ্যম নেই। আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয়বন্ধু ও মকুবল বান্দাহ্‌দের জন্য যেসব নে'মতরাজি রেখেছেন (মৃত্যু- পরবর্তী জীবনে) এবং তাঁর শত্রুদের জন্য যে আযাবের ওয়াদা করেছেন, তা তাঁদের ভিন্ন জানা যায় না। আল্লাহ্ পাকের কোন্ নাম ও গুণাবলী আল্লাহ্ তা'আলার অবিভাজ্য সত্তার শান ও মর্যাদার উপযোগী আর কোন্‌টি উপযোগী নয় কেবল বুদ্ধিবলে তা জানা যায় না, তা বুদ্ধির অগম্য। এসব হাকীকত ও বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ মাত্র আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের মাধ্যমেই হতে পারে, যাঁদেরকে আল্লাহ্ পাক স্বীয় বান্দাদের হেদায়েত ও তা'লীম প্রদানের জন্য পাঠিয়েছেন। এটি এমন একটি মৌলিক বিষয় যার ওপর কেবল মুসলমানরাই নন, বরং ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা পর্যন্ত একমত। তারা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে এ ধরনের মাধ্যমের সমর্থক। এসব মাধ্যম আল্লাহ্ পাকের সেসব পয়গম্বর যাঁরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হুকুম-আহকাম ও তথ্যাদি পৌছিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

الله يصطفى من الملئكة رسلا ومن الناس -

(আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পয়গাম পৌছে দেবার জন্যেই ফেরেশতা ও মানুষের ভেতর থেকে মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। সূরা হজ্জ ঃ ৭৫)। যারা এই মাধ্যম অস্বীকার করে, তারা সমস্ত ধর্মের ও জাতি-গোষ্ঠীর মতে কাফির। আর মাধ্যমের অর্থ যদি এই হয় যে, মুনাফা, লাভ, ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ ও

অবসানের জন্য এমন একটি মাধ্যমের প্রয়োজন অর্থাৎ এমন এক ব্যক্তিত্ব অপরিহার্য, যিনি রিযক, দরকারী সাহায্য, পথহারা লোকদের পথ দেখাতে আল্লাহ্ ও তদীয় বান্দাদের মধ্যে মাধ্যম হবেন, লোকে তার নিকট যে সমস্ত জিনিস চাইবে এবং তিনি আল্লাহ্কে বলে কয়ে সেসব জিনিস তাদেরকে দেবেন, লোকে তারই নিকট বুকভরা আশা করবে, তাহলে জেনে রেখ, এটাই হল পয়লা নম্বরের শির্ক যার ভিত্তিতে আল্লাহ্ তা'আলা পৌত্তলিক মুশরিকদেরকে কাফির অভিহিত করেছেন। কেননা তারা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যদেরকে অভিভাবক, বন্ধু ও সুপারিশকারী ধরে রেখেছিল যাদের মাধ্যমে তারা মুনাফা অর্জন করত এবং ক্ষতিকর বস্তুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেত।

জনসাধারণ, অজ্ঞ মানুষ এবং সাধারণের মতই বহু বিশিষ্ট লোক এত দূর পর্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছিল, কেবল হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) ও জনাব রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামই নন বরং সাধারণ আওলিয়া-ই--কিরাম ও সালিহীনকে নিজেদের ও আল্লাহ্র মাঝে মাধ্যম বানিয়ে রেখেছিল এবং দু'আ ও সাহায্য প্রার্থনা, আশা ও ভরসা (তাওয়াক্কুল) সবকিছুর সম্পর্ক তাঁদেরই সঙ্গে কায়েম রেখেছিল। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাদের সম্পর্কে এই পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেন ঃ

আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম ভিন্ন 'ইলমে দীনের যে সমস্ত ইমাম ও নেতা রয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কেও এটাই বিস্তারিত বিবরণ যে, যে ব্যক্তি তাদেরকে রসূল (সা) এবং উম্মতের ভেতর মাধ্যম মানে এই অর্থ ও দৃষ্টিকোণ থেকে যে, তারা রসূল (সা)-এর হুকুম -আহকাম ও মসলা-মাসাইলের প্রচারক ও শিক্ষক এবং উম্মার মুরুব্বী, অনুসরণীয়। ব্যক্তিত্ব ও কর্মের আদর্শ নমুনা তাহলে তা ঠিকই আছে। এ সমস্ত ইমাম ও 'উলামায়ে কিরাম যদি কোন মসলা-মাসাইলের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হন তবে তাদের এই ঐকমত্য অকাট্য দলীল হিসাবে বিবেচিত হবে। কেননা এরা সকলেই গোমরাহীর উপর একমত হতে পারেন না। আর যদি কোন মসলার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়, তাহলে এক্ষেত্রে সে আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। কেননা তাঁদের ভেতর কেউই একক বা ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ নির্দোষ কিংবা নিষ্পাপ নন। তাঁদের ভেতরের প্রত্যেকের কালামের গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণের কিছু অংশ নেওয়া যেতে পারে এবং কিছুটা অংশ পরিত্যাগ করা যেতে পারে। কেবল রসূলুল্লাহ্ সাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের মর্যাদামণ্ডিত সত্তাই পরিপূর্ণরূপে নির্দোষ এবং তাঁর কোন হুকুম ও নির্দেশনাই পরিত্যাজ্য নয়।

১. আল-ওয়াসিতা, ৪৬পৃ.।

আর কোন লোক যদি একথা মনে করে যে, এই সব বুযুর্গানে দীন, 'উলামা ও আইম্মায়ে কিরাম আল্লাহ্ এবং তাঁর সৃষ্টিকুলের ভেতর ঠিক তেমনি মাধ্যম, যেমন কোন সম্রাট কিংবা রাজা-বাদশাহ ও তার প্রজাকুলের মাঝে সচিব ও দ্বাররক্ষীরা হয়ে থাকে, এরাই আল্লাহ্ পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রয়োজনসমূহ পৌঁছিয়ে থাকেন এবং তাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদেরকে হেদায়েত ও রিযিক (জীবিকা) প্রদান করেন, সৃষ্টিকুল তাদের নিকট প্রার্থনা জানায় এবং তারা আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা জানায় ঠিক তেমনি, যেমনি করে সচিব ও দ্বারক্ষী বাদশাহ্র নিকট প্রজাদের প্রয়োজনের কথা পেশ করে তা পূরণ করে থাকে। লোকে বাদশাহ্র নিকট সরাসরি নিজেদের আবেদন নিবেদন পেশ করে না, একে তারা বেআদবী মনে করে। তারা সচিবদের নিকট আবেদন পেশ করে। কেননা তাদের নিকট আবেদন পেশ করা অধিকতর ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। আর তা এজন্য যে, তারাই বাদশাহ্র নিকট সান্নিধ্যে অবস্থান করেন, প্রার্থীরা করে না। যারা এ জাতীয় এবম্বিধ মাধ্যমের সমর্থক এবং এই অর্থে বুযুর্গানে দীন, 'উলামায়ে কিরাম ও নেককার লোকদেরকে মাধ্যম মানে, তারা কাফির ও মুশরিক। তাদেরকে এ থেকে তওবাহ করানো ওয়াজিব। যদি তওবাহ করে তবে তো ভাল, অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করতে হবে। এরা প্রকৃতপক্ষে সাদৃশ্যবাদের হাতে বন্দী; কেননা তারা সৃষ্ট জীবকে স্রষ্টার সদৃশ জ্ঞান করে রেখেছে এবং আল্লাহ্র সমকক্ষ ও নজীর ঠাওরিয়ে নিয়েছে।[১]

মাশহাদসমূহ নিকৃষ্ট বিদ'আত

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) সেই সমস্ত মাশহাদ ও যিয়ারতগাহ্র ভীষণ বিরোধী ছিলেন যা গোটা মুসলিম বিশ্বে শির্ক ও বিদ'আত, অন্যায়-অনাচার ও পাপাচার এবং নানাবিধ নিষিদ্ধ ও গর্হিত কর্মের আখড়ায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। যেগুলো মুসলিম বিশ্বে এক বিরাট ফেতনার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এগুলো শরীয়তের প্রকাশ্য বিরোধী এবং বিগত যুগের ঘৃণিত বিদ'আত। الرد على البكرى গ্রন্থে তিনি বলেন ঃ

এই সব মসজিদ, যেগুলো কবরের ওপর নির্মাণ করা হয়েছে, মাশহাদ নামে অভিহিত। এ এমন একটি বিদ'আত, যা লোকে ইসলামে সৃষ্টি করেছে আর এগুলোর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমনকে লোকে রেওয়াজে পরিণত করেছে, ইসলামী শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নেই। ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীতে, যে শতাব্দীর কল্যাণময়তা ও মর্যাদার সাক্ষ্য দিয়েছেন স্বয়ং আঁ-হযরত (সা),

১. আল-ওয়াসিতা, ৪৮ পৃ.।

এর কোন অস্তিত্ব ছিল না, বরং বিশুদ্ধ হাদীসে হুযূর আকরাম (সা) থেকে প্রমাণিত যে, তিনি এ সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছেন, লোকদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। বুখারীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء هم مساجدا -

আল্লাহ্ ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদেরকে অভিশপ্ত করুন। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। হযরত 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ লোকেরা কবর মুবারককে মসজিদে পরিণত করবে এই আশংকা না থাকলে তা খোলা ময়দানে করা হত। কেননা কবরকে সিজদাস্থলে পরিণত করাকে আঁ-হযরত (সা) অপছন্দ করতেন। ইনতিকালের পাঁচ দিন পূর্বে তিনি যা বলেছিলেন, তাও সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

ان كان من قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد - الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى انهاكم عن ذالك -

তোমাদের পূর্বে যারা গুযরে গেছেন তারা কবরকে মসজিদে পরিণত করত। মনে রেখ, তোমরা কবরকে মসজিদ বানাবে না। আমি তোমাদের তা করতে নিষেধ করছি।

আরও এগিয়ে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

মুসলমানরা 'তুস্তার' জয় করলে সেখানে হযরত দানিয়াল (আ)-এর কবর পান। শহরবাসীরা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ করত এবং পানি চাইত। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হযরত ওমর (রা)-কে এ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন। উত্তরে তিনি হযরত আবূ মুসা আশ'আরী (রা)-কে লিখেন যে, দিনের বেলা ১৩টি কবর খনন করুন এবং রাত্রিকালে খোদিত কবরগুলোর যে কোন একটিতে তাঁকে (হযরত দানিয়ালকে) দাফন করুন যাতে লোকে কোনরূপ ফেতনার শিকার না হয় এবং তাঁর নিকট বৃষ্টি না চায় (কিংবা বৃষ্টির জন্য ধর্ণা না দেয়)। মূলত এটিই ছিল সাহাবায়ে কিরামের তরীকা। এজন্যই সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও তাবি'ঈদের যুগে ইসলামী ভূখণ্ডে একটি মসজিদও এমন পাওয়া যেত না যা কোন কবরের ওপর নির্মাণ করা হয়েছে এবং কোথাও কোন মাশহাদও ছিল না যিয়ারত করবার মত ঃ না হেজাযে, না য়ামানে, না সিরিয়ায়, না মিসর, ইরাক কিংবা খোরাসানে।

অপর এক গ্রন্থে তিনি লেখেন ঃ

কবর অভিমুখে বিশেষ উদ্দেশ্যে সফর এবং তাকে উপাসনালয়, মসজিদ ও মেলার জায়গায় পরিণতকারী লোকের সন্ধান সাহাবায়ে কিরাম (রা), তাবিঈন এবং তাব'তাবিঈনের যুগে পাওয়া যেত না। ইসলামে এমন কোন কবরের অস্তিত্বও ছিল না, ছিল না কোন মাশহাদ যে কবর বা মাশহাদ বিশেষ উদ্দেশ্যে সফর করতে হবে। এ প্রথা ইসলামের তিন শতাব্দীর পরের সৃষ্টি। আর বিদ'আতের বৈশিষ্ট্যই এই যে, এতে যে পরিমাণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরোধিতা হয়, ঠিক ততটা বিলম্বে তার প্রাদুর্ভাব ঘটে। শুরুতে সেসব বিদ'আতের প্রকাশ ঘটে যার বিরোধিতা এতটা স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে হয় না।[১]

বাতেনী ও রাফেযী সম্প্রদায় মাশহাদ-এর আবিষ্কারক

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সুচিন্তিত অভিমত হল এই যে, এসব মাশহাদ ও মাযারে অনুষ্ঠিত ও মাযার মাশহাদকেন্দ্রিক বিদ'আত ও এর দাওয়াত শুরু করেছিল বাতেনী ও রাফেযী সম্প্রদায় এবং তারা এতদসম্পর্কিত মনগড়া ও কাল্পনিক হাদীস রচনা করে। কেননা তাদের প্রকৃত আকর্ষণ ছিল তো ইমাদের মাযার ও মাশহাদ-এর সাথে। তিনি বলেন ঃ

সর্বপ্রথম যারা ঐ সব মাশহাদ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরের ফযীলত বর্ণনায় হাদীস তৈরী করেছিল, তারা হল রাফেযীসহ অপরাপর বিদ'আতী সম্প্রদায়, যাদের নিয়ম হচ্ছে এই যে, তারা মসজিদগুলো বিরান ও জনশূন্য করে এবং মাশহাদগুলোর যেখানে শিরক, মিথ্যা ও একটি নয়া দীনের উদ্ভব ঘটে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও জনসমাগম ঘটায় এবং এসবের প্রতি অতিশয় সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করে। অথচ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিভিন্ন স্থানে মাশহাদ ও মাযারের পরিবর্তে মসজিদের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

قل امر ربى بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له -

বল, আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের। প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে। [সূরা আ'রাফ ঃ ২৯]

---

১. الردعلى البكرى পৃ. ২৮১।

২. الرد على الا خنائى ১০২ পৃ.।

وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا ـ

এবং এই যে, মসজিদগুলো আল্লাহ্‌রই জন্য। সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না। [সূরা জিন্ন ঃ ১৮]

انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر ـ

তারাই তো আল্লাহ্‌র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌ ও পরকালে। [সূরা তওবাহ ঃ ১৮]

ولاتباشروهن رانتم عكفرن فى المساجد ـ

আর তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সংগত হয়ো না। [সূরা বাকারা ঃ ১৮৭]

ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها ـ

আর তার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং সে সবের বিনাশ সাধনে প্রয়াসী হয়? [সূরা বাকারা ঃ ১১৪]

অধিকন্তু সহীহ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, তিনি বলতেন ঃ

ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى انها كم عن ذالك ـ

তোমাদের পূর্বে যেসব জাতি-গোষ্ঠী ছিল (ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান) তারা কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করত। কিন্তু খবরদার! তোমরা কবরগুলোকে মসজিদ বানাবে না। আমি তোমাদেরকে তা করতে নিষেধ করছি।[১]

অধিকাংশ মাশহাদ ও মাযারই জাল

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র গবেষণাপ্রসূত অভিমত হ'ল, এই সব মাশহাদ ও প্রসিদ্ধ যিয়ারতগাহগুলোর অধিকাংশই নকল ও জাল। তিনি এই সিলসিলায় কত সুন্দর লিখেছেন যে, যেহেতু মাশহাদ ও মাযারসমূহ চিনবার ও জানবার উপর শরীয়তের কোন বাধ্যবাধকতা নেই এবং এ সেই দীনেরও অন্তর্গত নয়, যে দীনের হেফাজত ও সংরক্ষণের যামানত স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। এজন্য এসব মাশহাদ ও মাযারের অধিকাংশই জাল ও প্রতারণাপূর্ণ এবং বহু মাযার ও মাশহাদের আদৌ কোন ভিত্তি নেই। বহু লোকই এ সবের যথার্থতার ব্যাপারে বিভ্রান্তির শিকার। তিনি বলেন ঃ

১. الرد على الا خنائى ৪৯ পৃ.।

وكثير من المشاهد كذب وكثير منها مشكوك فيه وسبب ذالك ان معرفة المشاهد ليست من الدين الذى تكفل الله بحفظه لعدم حاجتهم الى معرفة ذلك -

মাশহাদগুলোর অনেকগুলিই জাল ও মিথ্যা এবং অনেকগুলিই সংশয়পূর্ণ। এক্ষেত্রে লোকে এত বিভ্রান্তির শিকার কেন? উত্তরে বলা যায় ঃ প্রকৃত রহস্য এই যে, মাশহাদের পরিচয় লাভ করা এই দীনের অন্তর্গত বিষয় নয় যার সংরক্ষণ ও হেফাজতের যিম্মাদারী স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। কেননা উম্মার এতদসম্পর্কে জ্ঞাত হবার ও গবেষণা চালাবার প্রয়োজন নেই এবং এর ওপর দীনের কোন কাজও থেমে নেই।[১]

মাশহাদ ও মাযার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক হবার কাহিনী

এই ধারাক্রমে একটি বড় রকমের ফেতনা বিস্তার লাভ করছিল যে, এসব মাশহাদ ও মাযারে বড় বড় রোগী আরোগ্য লাভ করে এবং এখানে দু'আ কবূল হয়। লোকে এ ব্যাপারে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের বর্ণনা দিত। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)- কে আল্লাহ্ তা'আলা দীনের ক্ষেত্রে যে দৃঢ়তা এবং ঈমান ও য়াকীনের যে মকাম দান করেছিলেন তারই ভিত্তিতে তিনি সে সব গল্প-গুজব ও গালভরা দাবীতে প্রভাবিত হবার লোক ছিলেন না এবং দীনের অকাট্য সত্য ও কুরআন-সুন্নাহ্‌র 'নস'সমূহ ঐ সব বর্ণিত ও কথিত গল্প-কাহিনীর ভিত্তিতে পরিত্যাগ করতে পারতেন না। তিনি স্বীয় আল্লাহ্ প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি ও ধর্মীয় অনুধাবন শক্তির সাহায্য নেন এবং প্রমাণ করেন যে, এসব কল্প-কাহিনী ও ভিত্তিহীন। এই সিলসিলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীব-জানোয়ারের আরোগ্য লাভের ঘটনা বর্ণনা করা হত। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) এর পেছনে নিহিত যে কারণের কথা বর্ণনা করেছেন, তা খুবই আশ্চর্য ধরনের, ব্যতিক্রমী ও শিক্ষণীয়। তিনি এক স্থানে লিখেছেন ঃ

কায়রোয় একদল লোক উবায়দী (ফাতিমী নামে খ্যাত)-দের সম্পর্কে এই 'আকীদা পোষণ করত যে, তারা বুযুর্গ ওলীদের অন্তর্গত ছিলেন। আমি যখন তাদেরকে বললাম যে, (ওলী হওয়া তো দূরের কথা) তারা তো মুনাফিক ও ধর্মদ্রোহী (যিন্দীক) এবং তাঁদের ভেতর ধর্মদ্রোহিতার ব্যাপারে যারা সবচেয়ে

১. অধিকাংশ মাশহাদ ও মাযার জাল হওয়া সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) যা লিখেছেন ইতিহাসে ও গবেষণায় তা সুপ্রমাণিত। উদাহরণত, কায়রোয় সায়্যিদুনা হুসায়ন (রা)-এর পবিত্র মস্তক, সায়্যিদা যয়নব (রা), সায়্যিদা সকীনা, নাজাফে হযরত আলী (রা), দামিশকে নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণীগণের এবং ভারতবর্ষের কোন কোন মাযার বিশেষত, লাহোরে হযরত আলী হুজবীরী ওরফে দাতা গঞ্জে বখ্‌শ-এর মাযার রয়েছে বলে যে জনশ্রুতি রয়েছে তা ইতিহাসের নিরিখে সংশয় ও সন্দেহের উর্ধ্বে নয়।

কম ও হাল্কা ভূমিকা পালন করেছে তারাও একজন রাফেযীর চেয়ে কম নন, তখন তারা খুবই বিস্মিত হ'ল। তারা বলতে লাগল যে, আমরা তো পেট ব্যথায় আক্রান্ত ঘোড়া তাদের মাশহাদ ও মাযারে নিয়ে যাই এবং সেখানে যাবার পর ঘোড়াগুলো ভাল হয়ে যায়। আমি তাদেরকে বললাম যে, এটা তো তাদের কুফরীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় দলীল। এরপর আমি কয়েকজন সহিসকে ডাকলাম এবং তাদেরকে বললাম যে, সিরিয়া ও মিসরে যখন তোমাদের ঘোড়ার পেটে ব্যথা দেখা দেয় তখন সেগুলো কোথায় নিয়ে যাও? তারা বলল ঃ আমরা সিরিয়ায় থাকাকালে ইসমাঈলী এলাকায় অবস্থিত কবরস্থানে নিয়ে যাই। যেমন 'আলীকা, মুনকিয়া প্রভৃতি কবরস্থানে আর মিসরে খ্রিস্টানদের একটি খানকায় নিয়ে যাই আর নিয়ে যাই উবায়দীদের কবরস্থানে। আমি বললাম ঃ তোমরা কি মুসলমান বুযুর্গদের কবরস্থানেও নিয়ে যাও? যেমন হযরত লায়ছ ইবন সা'দ, ইমাম শাফি'ঈ, ইবনুল কাসিম প্রমুখ বুযুর্গের কবরে? তারা 'না' সূচক জওয়াব দিল। আমি এসব ভক্তদেরকে বললাম ঃ নাও, শোন! এরা ঐসব ঘোড়াকে কাফির ও মুনাফিকদের কবরের পার্শ্বে নিয়ে যায় এবং সেগুলোর রোগমুক্তি ঘটে। এর কারণ এই যে, ঐ সকল লোকের কবরে আযাব হচ্ছে। সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে যে, চতুষ্পদ ও অপরাপর জীব-জানোয়ার কবরবাসী মুর্দাদের আওয়াজ শুনতে পায়। এসব ঘোড়া যখন এ ধরনের আওয়াজ শোনে ঘাবড়ে যায়। এই ঘাবড়ানি ও ভয়-সন্ত্রস্ততার কারণে তাদের পেট পানি হয়ে যায় এবং তারা পায়খানা করে ফেলে। কেননা ভয়-সন্ত্রস্ততার কারণে অধিকাংশ সময় শরীরের বাধন ঢিলা হয়ে যায়। একথা শুনে তারা খুব বিস্মিত হল। আমি অধিকাংশ সময় লোকদেরকে একথাই বলতাম এবং আমি জানতাম না যে, আর কেউ একথা লিখেছে কিনা। পরে জেনেছি যে, কতক আলিমও এই কারণই বর্ণনা করেছেন।[১]

মুশরিকদের জন্য শয়তানের প্রতিকৃতি

স্বয়ং বুযুর্গদের ও আওলিয়ায়ে কিরামের কবরের ব্যাপারে উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও সফলতা লাভের যে সব ঘটনা ও কাহিনী বর্ণনা করা হয়ে থাকে, অধিকন্তু মাযারে শায়িত (صاحب مزار) ব্যক্তির যিয়ারত, তার সাথে পারস্পরিক কথোপকথন ইত্যাদি ঘটনার কথা বলা হয়ে থাকে, ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) এর অন্য কারণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

কেউ কেউ তাদের শায়খ (পীর)-এর দোহাই দেয় এবং বলে যে, তারা তাঁকে (পীরকে) দেখেছে এবং কোন কোন সময় তাঁরা তাদের কোন কোন কাজও করে দিয়েছে। এ থেকে তাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, হয়তো

---

১. الرد على البكرى ৩১১ পৃ।

শায়খ বা পীর নিজেই এসেছেন অথবা ইনি কোন ফেরেশতা ছিলেন যিনি তার পীর বা শায়খ-এর আকৃতিতে আবির্ভূত হয়েছেন এবং এটি তাঁর কারামত। এ থেকে তার শিরকী আকীদা আরও বদ্ধমূল হয় এবং তা সকল সীমা ছাড়িয়ে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে গিয়ে পৌছে। তার জানা নেই যে, এ ধরনের কথা ও কায়-কারবার শয়তান মূর্তিপূজারীদের সাথেও করে থাকে। শয়তান ঐ সব মূর্তিপূজকদের সামনে অনেক সময় আবির্ভূত হয় এবং কিছু কিছু গায়েবী বা অদৃশ্য জগতের কথা বলে এবং তাদের কোন কোন উদ্দেশ্যও সিদ্ধি করে দেয়। কিন্তু (মনে রাখতে হবে যে,) এ সবই শেষ যুগে উদ্ভূত বিষয়; ইসলামের আদি তথা সাহাবায়ে কিরামের যুগে এসবের আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল না।

অপর এক জায়গায় লিখছেন ঃ

শয়তান অধিকাংশ সময় সেসব লোকের আকৃতিতে আবির্ভূত হয় যাদের দোহাই দেওয়া হয়। তরীকতের বহু পীরের ভক্ত ও অনুরক্ত এসব ঘটনার কথা আমাকে জানিয়েছেন এবং বিরাট সংখ্যক একদল লোক আমাকে বলেছেন যে, তারা কিছু কিছু জীবিত মানুষ এবং কোন মুর্দার নিকট যখন ফরিয়াদ পেশ করেছেন তখন তারা এ জাতীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। অতএব একথা আজ দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, শয়তান তার সাধ্যমত মানুষকে পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ্ করবার চেষ্টা চালায়। যদি সে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ হয় তাহলে শয়তান তাকে প্রকাশ্য শিরক এবং নির্ভেজাল কুফরীর মাঝে নিক্ষেপ করে। তাকে নির্দেশ দেয় আল্লাহ্‌র যিকর না করতে, শয়তানকে সিজদা করতে, তার উদ্দেশ্যে পশু কুরবানী দিতে কিংবা উৎসর্গ করতে। তাকে মৃত জন্তু ভক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়, নির্দেশ দেয় রক্ত পান করতে এবং নগ্ন বেহায়পনায় উৎসাহিত করে। এ সমস্ত সেসব শহরেই অধিক পরিমাণে সংঘটিত হয় যেখানে কেবল কুফরী বিরাজমান অথবা ইসলাম থাকলেও দুর্বল অবস্থায় বিদ্যমান (কিংবা ইসলামের প্রভাব ক্ষীণ)। অধিকন্তু সেসব শহরেই শয়তানী কর্মকাণ্ড বেশী চলে যেখানকার লোকদের ঈমান দুর্বল। অনন্তর মিসর ও সিরিয়ায় এমনটিই দেখা গেছে। তাতারীদের ভেতর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এ ধরনের ঘটনার আধিক্য লক্ষ্য করা যেত। এরপর যতই তাদের ভেতর ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে, ইসলামের হাকীকত সম্পর্কে তারা জ্ঞান লাভ করেছে ঠিক ততটাই শয়তানের আছর দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়েছে।[১]

১. সূরা ইখলাসের তফসীর।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন যে, স্রেফ নেককার বুযুর্গদের বেলায়ই এ জাতীয় ব্যাপার সংঘটিত হয় না বরং নক্ষত্র পূজারীদেরকেও এ ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হতে হয় এবং তারা এ ধরনের অনুভূতি ও বিজয় লাভ করে থাকে। তিনি বলেন ঃ

> যেসব লোক নক্ষত্রের নিকট দু'আ করে, তাদের ওপর এমন অবস্থার অবতারণা হয় যাকে নক্ষত্রপুঞ্জের আধ্যাত্মিকতা বলা হয়। অথচ তা আধ্যাত্মিকতা নয়, বরং তা শয়তান যা তার শির্ক-এর কারণে তাকে পথভ্রষ্ট করতে অবতরণ করে থাকে, যেমনটি কোন কোন সময় শয়তান পুতুল ও মূর্তির ভেতর ঠাঁই নেয়, কখনো ও কোন সময় মানুষের সাথে কথা বলে এবং কতক মুহূর্তে পূজারী ও পুরোহিতদের দর্শনও দিয়ে থাকে, মাঝে মধ্যে অন্যদেরকেও দর্শন দেয়।[১]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সংস্কার কর্ম ও তার প্রভাব

হি. সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী (যে শতাব্দী মানব সম্পদ বৃদ্ধি এবং মানব উৎপাদনের আলোচনা কিতাবের শুরুতেই অতিক্রান্ত হয়েছে) যদিও বুযুর্গ শ্রেষ্ঠ 'উলামায়ে কিরাম ও মাশাইখ-এ 'ইজাম দ্বারা তা পরিপূর্ণ ছিল এবং নিবন্ধ রচনা ও গ্রন্থ প্রণয়ন, ওয়াজ-নসীহত ও পথ-প্রদর্শন এবং দাওয়াত ও তবলীগের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলছিল এবং এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বিজ্ঞ 'উলামায়ে কিরাম এবং কুরআন-সুন্নাহ্র বাহকগণ এই প্রকাশ্য শির্ক ও নিন্দিত জাহিলিয়াতকে কোনক্রমেই সহ্য করেন নি এবং লেখনীর মাধ্যমে অবশ্যই এর বিরোধিতা করে থাকবেন। কিন্তু এমনতরো মহান 'উলামা যাঁরা এই অবস্থার বিরুদ্ধে জিহাদী পতাকা উত্তোলন করেন এবং নিজেদের মুল্যবান জ্ঞান-সাধনা ও এক্ষেত্রের কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও এই বিরাট ফেতনার মুকাবিলার জন্য ময়দানে নামেন এবং সাধারণ গণমানুষকে সম্বোধন করেন এবং এই প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট শির্ক-এর প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতাকে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পরিণত করেন, হয় ছিলেন না অথবা ইতিহাসের দৃশ্যপটে অনুপস্থিত ছিলেন কিংবা তাঁদের মাঝে অত্যন্ত বিশিষ্ট ও উন্নত ব্যক্তিত্ব কেউ ছিলেন না এবং তাঁরা এই বিষয়ের উপর এমন কোন মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞান-ভাণ্ডার স্মৃতি হিসাবে রেখেও যান নি যা তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের স্মৃতিকে জীবন্ত করে রাখবে। বস্তুত এই বিশ্বব্যাপী ফেতনার মুকাবিলা, তৌহিদী আকীদার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের জন্য শায়খু'ল ইসলাম ইবনে তায়মিয়ার মত শক্তিশালী ও উন্নত ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল। অধিকন্তু সেই সব শির্কমূলক 'আকীদা ও প্রথা-পদ্ধতির বিস্তারিত পর্যালোচনা ও খতিয়ান নেওয়া এবং

১. কিতাবু'ন-নুবূওয়াত; ২৭৪ পৃ.।

যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে ও শক্তভাবে প্রত্যাখ্যান করাও আবশ্যক ছিল যেসব আকীদা ও প্রথা-পদ্ধতি মুসলিম সমাজ জীবনকে ছেয়ে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। তওহীদের মেযাজই এই যে, তা জটিল ব্যাখ্যা এবং সাধারণ জনগণের পক্ষপাতিত্ব তথা প্রশ্রয়ের সাথে চলতে পারে না। তার জন্য আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালাম-এর খোলামেলা বক্তব্য এবং চূড়ান্ত ও অস্পষ্টতামুক্ত সম্বোধন পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল যা পূর্ণত্ব, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিরুপণকারীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারত। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর যুগে আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালামের প্রতিনিধিত্বের অপরিহার্য দায়িত্ব আঞ্জাম দেন এবং فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين (অতএব তুমি নির্দেশ মাফিক দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চালিয়ে যাও এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা কর)-এর ওপর আমল করেন, যার ফল দাঁড়াল এই যে, ঐসব আকীদা-বিশ্বাস ও প্রথা-পদ্ধতির ভেতর যেসব মূর্খতা ও জাহিলিয়াত অমুসলিমদের সাথে মেলামেশা ও সাহচর্য এবং পথভ্রষ্ট ফের্কা ও স্বার্থবাজ লোকদের প্রভাবে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তাতে এক ব্যাপক ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। ইসলামের তৌহিদী 'আকীদা-বিশ্বাস যা ছিল আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালামের প্রেরণের সর্বাপেক্ষা বড় উদ্দেশ্য এবং তাঁদের দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু, তা পুনরায় পরিচ্ছন্ন হয়ে আরও উজ্জ্বলরূপে সামনে আসতে সক্ষম হয়।

ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة -

ইমাম ইবনে তায়মিয়ার এই একটি মাত্র কৃতিত্বপূর্ণ কর্মই যদি অবশিষ্ট থাকত, তিনি আর কিছু যদি নাও করতেন তবুও মুজাদ্দিদ হিসাবে তাঁর স্থান এবং তাঁর দাওয়াত ও অটুট সংকল্পের প্রমাণের জন্য তা হত যথেষ্ট।

তাঁর রচিত গ্রন্থের প্রভাবে তাঁর পরেও সময়-সময় ইসলামের দা'ওয়াত ও পুনর্জাগরণের ইতিহাসে এমন সব বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব জন্ম নিতে থাকেন যাঁরা স্ব স্ব যুগের শিরকী 'আকীদা-বিশ্বাস, প্রথা-পদ্ধতি ও ঘৃণ্য জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে জিহাদী পতাকা উত্তোলন করেন এবং ألا لله الدين الخالص (মনে রেখ, নির্ভেজাল দীন একমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য)-এর আওয়াজ এত সজোরে উচ্চারণ করেন যার ফলে মুসলিম বিশ্বের পাহাড়-প্রান্তর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে।

সপ্তম অধ্যায়

দর্শন, যুক্তিবাদ ও কালামশাস্ত্রের সমালোচনা ঃ কুরআন সুন্নাহ্‌র দাওয়াতী পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ

বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কারের ক্ষেত্রে শায়খুল ইসলাম হাফিজ ইবনে তায়মিয়া (র)-র আরেকটি বিরাট অবদান হ'ল, দর্শন, যুক্তিবাদ ও কালামশাস্ত্রের বিশদ সমালোচনার গুরু দায়িত্ব তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন এবং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের আলোকে কুরআন-সুন্নাহ্‌র দাওয়াতী পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেছেন। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র এ অবদানের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হলে আমাদেরকে তলিয়ে দেখতে হবে মুসলিম জাহানের ভাব, চিন্তা ও মন-মানসের ওপর দর্শন ও যুক্তিবাদের তখন কি অপ্রতিহত প্রভাব ছিল এবং কেমন বৈরী পরিবেশ ও পরস্থিতিতে এ দুঃসাহসিক কাজে তাঁকে হাত দিতে হয়েছিল।

মুসলিম জাহানে গ্রীক দর্শন ও যুক্তিবাদ

খলীফা মনসুরের আমলেই[১] দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রের গ্রীক গ্রন্থাগার অনুবাদের বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গিয়েছিল। মু'তাযিলা সম্প্রদায় 'গরম খাবারের' মতই অনূদিত গ্রীক গ্রন্থগুলো লুফে নিল এবং বুদ্ধি-চর্চার নামে গোগ্রাসে সেগুলো গিলতে লাগল। ফলে তখন থেকেই তাদের রচনাবলীতে গ্রীকদের দার্শনিক পরিভাষার অনুপ্রবেশ শুরু হয়। তবে (আরবদের হাতে) গ্রীক শাস্ত্রের প্রকৃত উৎকর্ষ ঘটে খলীফা মামূনের হাতে। কেননা এ অনুবাদ-যজ্ঞের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক মামূন নিজেও ছিলেন গ্রীক শাস্ত্রের একজন উঁচুদরের সমঝদার।

---

১. আনুমানিক ১৩৬ হি.

ঐতিহাসিক সা'ঈদ উন্দুলুসীর মতে, খলীফা মামূনের অনুরোধেই রোম সম্রাট কর্তৃক প্লেটো ও এ্যারিস্টটলসহ শীর্ষস্থানীয় গ্রীক দার্শনিকদের রচনা-সম্ভার 'উপঢৌকন'রূপে বাগদাদে প্রেরিত হয়। পরে মামূন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সেগুলোর সযত্ন অনুবাদ প্রকাশের মাধ্যমে বিদগ্ধ সমাজকে গ্রীক শাস্ত্র-চর্চায় উৎসাহিত করেন। ফলে গ্রীক-শাস্ত্র ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং দর্শন শাস্ত্রের বিজয় যাত্রা শুরু হয়। মামূনের উদার পৃষ্ঠপোষকতার বদৌলতে মুসলিম জাহানের প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ সম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবী সমাজ গ্রীক শাস্ত্রে 'সর্বোচ্চ জ্ঞান' অর্জনের প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠেন। এরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অমূল্য 'রচনাকর্ম' খলিফা মামূনের গুণগ্রাহী দরবারে পেশ করতেন আর তিনি উদার হাতে তাদের মাঝে বড় বড় পদ ও পদক বিতরণ করতেন। গ্রীক শাস্ত্রে পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে আব্বাসী সালতানাত এভাবেই মহান রোম সাম্রাজ্যের সমকক্ষতার দাবীদার হয়ে ওঠে।[১]

মামূনের পরেও গ্রীক গ্রন্থাগারের অনুবাদ কর্মযজ্ঞ অবাহত ছিল এবং ইতিহাসের তথ্য মতে চতুর্থ হিজরী শতকের ভেতরেই এর একটা বিরাট অংশ আরবীতে ভাষান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

ভাষান্তরিত এই 'গ্রীক গ্রন্থাগারে' প্লেটোসহ শীর্ষস্থানীয় সকল গ্রীক দার্শনিকের রচনাবলীই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু মুসলিম জাহানের একাডেমিক অংগনে এ্যারিস্টটলের রচনাবলী সর্বাধিক সমাদর ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। সম্ভবত অনুবাদ কর্মীদের ব্যক্তিগত ঝোঁক ও পসন্দের কারণেই এটা ঘটেছিল। কেননা তাদের কিছু সংখ্যক ছিলেন ঈসাপুর ও হাররান অঞ্চলের। আর অধিকাংশই ছিলেন নাস্তুরী ও য়া'কুবী সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রিষ্টান দার্শনিক। তাছাড়া এ্যারিস্টটল নিকটতম সময়ের দার্শনিক ছিলেন এবং তাঁর রচনাবলীতে পূর্বসূরী দার্শনিকদের মতামত ও চিন্তাধারা অধিক পরিপাটি ও বিন্যস্ত আকারে পরিবেশিত হয়েছিল। ফলে ধীরে ধীরে এ্যারিস্টটলই মুসলিম জাহানে গ্রীক দর্শনের একক প্রতিনিধির আসন অলংকৃত করে বসেন এবং দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতীকরূপে অখণ্ড স্বীকৃতি আদায় করে নেন। মুসলিম জাহানের জন্য এটা ছিল চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। কেননা দার্শনিকদের কাতারে এ্যারিস্টটলই এমন ব্যক্তি বিভিন্ন কারণে[২] যিনি আসমানী ভাবধারা এবং ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন, ছিলেন বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনার উৎসাহী প্রবক্তা।

---

১. তাবাকাতুল উমাম, পৃ. ৪৭।

২. ইমাম ইবনে তায়মিয়ার দর্শন সমালোচনা প্রসংগে কিছু কিছু কারণের বিশদ আলোচনা আসছে।

গ্রীক দর্শনের অন্ধ অনুকরণ

গোড়ার দিকে মুসলিম দার্শনিকেরা এ্যারিস্টটলীয় দর্শন ও যুক্তিবাদকে কোনরকম বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া চোখ বুজে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না; বরং স্বাধীন ও মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে তাঁর দর্শন ও যুক্তিবাদের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণে এগিয়ে এসেছিলেন এবং যা কিছু তাঁদের বিচারে ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়েছে নির্দ্বিধায় সেগুলো তাঁরা প্রকাশ করেছেন। আলিমদের অনেকেই তখন এ উদ্দেশ্যে শক্ত হাতে কলম ধরেছিলেন এবং বলতে গেলে মু'তাযিলাপন্থী আলিমদের ভূমিকাই ছিলো এক্ষেত্রে অগ্রণী। এ প্রসংগে নাযযাম ও আবু আলী জিব্বাঈর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় শতকে হাসান বিন মূসা নওবাখতী তাঁর "কিতাবু'ল-আরা ওয়াদ্দিয়ানাত" গ্রন্থে এ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খণ্ডন করেছেন। চতুর্থ শতকে ইমাম আবু বকর বাকিল্লানী তাঁর 'দাকায়েক' গ্রন্থে দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন ভ্রান্তি তুলে ধরার সাথে সাথে গ্রীক যুক্তিবাদের তুলনায় আরব যুক্তিশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। পঞ্চম শতকে (আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল প্রণেতা) 'আল্লামা 'আবদুল করীম শাহরাস্তানী পিথাগোরাসীয় ও এ্যারিস্টটলীয় দর্শনের বিরুদ্ধে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন এবং যুক্তিশাস্ত্রের স্বীকৃত নীতিমালার আলোকেই তাঁদের উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণ খণ্ডন করেন। একই শতকের শেষ ভাগে অভ্যুদয় ঘটে মহাত্মা ইমাম গাযালী (র)-এর 'তাহাফাতু'ল-ফালাসিফা'র মত যুগান্তকারী গ্রন্থের যাঁর ক্ষুরধার লেখনী কাঁপিয়ে দিয়েছিল গ্রীক দর্শনের মজবুত দুর্গের বুনিয়াদ। এক'শ বছর পর্যন্ত প্রায় বেসামাল অবস্থা ছিল দর্শনের রথী-মহারথীদের।[১] ষষ্ঠ শতকের 'আল্লামা আবুল বারাকাত বাগদাদী এ ক্ষেত্রে আরো ব্যাপক অবদান রাখেন 'আল-মু'তাবার' গ্রন্থে। অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের আলোকে এ্যারিস্টটলের অধিকাংশ মতামতকে তিনি ভুল প্রমাণিত করেন। এই শতকে ইমাম রাযী (র) কালামশাস্ত্রবিদ ও আশায়েরাপন্থীদের প্রতিনিধিরূপে গ্রীক দর্শনের বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিনির্ভর সমালোচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

তবে মুসলিম জাহানে গ্রীক দর্শনের মুখপাত্ররূপে পরিচিত বুদ্ধিজীবীরা এ্যারিস্টটলের যাদুকরী ব্যক্তিত্বের দ্বারা এমনই প্রভাবিত ছিলেন যে, তাঁরা তাঁকে যাবতীয় ভুল ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করতেন। সময়ের ধারায় এ প্রভাব ও অনুরাগ বেড়েই চলেছিল এবং দর্শন পূজারীদের মনের মন্দিরে তিনি 'দেবত্বে'র মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে চলেছিলেন। এক্ষেত্রে প্রত্যেক উত্তরসূরিকে পূর্বসূরীর চেয়ে এক ধাপ অগ্রসর মনে হতো। দার্শনিক আবূ নসর আল-ফারাবী (মৃ. ৩৩৯ হি. ৯৫০ খৃ.) প্লেটো ও এ্যারিস্টটল সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

---

১ বিস্তারিত আলোচনা প্রথম খণ্ডে দেখুন।

وكان هذان الحكيمان هما مبدعان للفلسفة منشأن لاوائلها واصولها ومتممان لاواخرها وفروعها، وعليهما المعول فى قليلها وكثيرها -

এ উভয় দার্শনিকই হলেন দর্শনশাস্ত্রের স্থপতি, দর্শনের প্রাথমিক ও মৌলিক নীতিমালা উদ্ভাবনকারী এবং আলোচনা ও সিদ্ধান্তমালা বিন্যস্তকারী। মোটকথা, দর্শনশাস্ত্রের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বিষয়ে তাঁদের কথাই শেষ কথা।[১]

এ্যারিস্টটল-প্রেমে দার্শনিক ইবনে সিনা (মৃ. ৪২৮ হি.) আল-ফারাবীকেও হার মানিয়েছেন। 'মানতিকু'শ-শিফা' গ্রন্থে এ্যারিস্টটলের উদ্দেশে তিনি তাঁর শ্রদ্ধা পেশ করে বলেছেন ঃ এত দীর্ঘ যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তাঁর মতবাদ ও গবেষণায় নতুন কিছু সংযোজন করা সম্ভব হয়নি।[২]

দর্শন জগতে ইবনে সীনা-উত্তর যুগে দার্শনিক ইবনে রুশদের (মৃত. ৫৯৫ হি.) চেয়ে উজ্জ্বল কোন প্রতিভার নাম আমাদের জানা নেই। সেই তিনিও এ্যারিস্টটল প্রেমের ধারাবাহিকতায় ইবনে সীনা থেকে দু'কদম এগিয়ে ছিলেন। দর্শন আলোচনায় তাসাওউফের পরিভাষা প্রয়োগ অসংগত না হলে বলা যেতো, এ্যারিস্টটলের অস্তিত্বের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে 'ফানা ফি'শ-শায়খ'-এর দুর্লভ মর্যাদা তিনি লাভ করেছিলেন। ইবনে রুশদের জীবনীকারের ভাষায় ঃ

اماتمجيد ابن رشد لارسطو فلا حد له فيكاد يولهه ، وقد وضع له اوصافا تجعله فوق درجات الكمال الانسانى عقلا وفضلا -

ولوكان ابن رشد يقول بتعدد الالهة لجعل ارسطورب الارباب -

এ্যারিস্টটলের প্রতি ইবনে রুশদের প্রেম ও ভক্তি এমনই মাত্রাহীন ছিল যে, পারলে তিনি তাঁর পূজোই করতেন। এমন এমন গুণ ও অভিধা তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বে আরোপ করেছেন যা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে তাঁকে মানবীয় পূর্ণতার উর্ধ্বে তুলে ধরে। ইবনে রুশ্‌দ বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী হলে নিঃসন্দেহে এ্যারিস্টটলকে তিনি ঈশ্বরের ঈশ্বর বলে ঘোষণা দিতেন।[৩]

সপ্তম শতকের দার্শনিক সমাজে নাসিরুদ্দীন তূসী-র (মৃ. ৬৭২) বিশাল ব্যক্তিত্ব যথার্থ কারণেই এমনই অখণ্ড শ্রদ্ধা ও সমীহ লাভ করেছিল যে, দর্শন শাস্ত্রের একাডেমিক অংগনে 'মুহাক্কিক তূসী' নামেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন।

---

১. আল-জামউ বায়না রায়ি'ল-হাকীমায়ন।

২. ইসলাম ও গ্রীক দর্শন প্রবন্ধ, শিবলী নো'মানী রচিত। আন্-নাদওয়াহ প্রথম বর্ষ, মানতিকু'শ-শিফা গ্রন্থের উদ্ধৃতিসহ।

৩. তারীখু ফালাসিফাতি'ল-ইসলাম ফি'ল-মাশরিক ওয়া'ল-মাগরিব; লুতফী জুম'আকৃত, পৃ. ১৫৫।

এটা মুসলিম জাহানের সেই নাযুকতম সময়ের কথা যখন তাতারী হামলার মুখে ইসলামী খিলাফতের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদের পতনের কারণে গোটা উম্মাহ্ বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় উপনীত হয়েছিল এবং এক ভয়ংকর বুদ্ধিবৃত্তিক অবক্ষয়ের চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছিল। সে সময় হালাকু খানের বিশেষ প্রিয়পাত্র মুহাক্কিক তূসীই ছিলেন গ্রীক জ্ঞান ও দর্শনের ধারক, বাহক ও রক্ষক। তাঁর কৃতী ছাত্রদের হাতেই গোড়াপত্তন হয়েছিলো ইরানের দর্শন ও যুক্তিবাদ প্রধান শিক্ষা ব্যবস্থার[১] এবং তাদের সুযোগ্য নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়ে আসছিল পঠন-পাঠন এবং রচনা ও গবেষণার সকল কর্মকাণ্ড। নাসিরুদ্দীন তূসী ছিলেন সেই চিন্তাধারার অনুসারী যারা এ্যারিস্টটলকে 'আদি প্রজ্ঞা'র মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং তাঁর গবেষণা ও মতামতকেই শেষ কথা বলে বিশ্বাস করে বসেছিলেন। তাই ইমাম রাযীর মুকাবিলায় এ্যারিস্টলের পক্ষ নিয়ে কোমর বেঁধে তিনি মাঠে নামলেন। ফলে ঝিমিয়ে পড়া এ্যারিস্টটলীয় দর্শন ও যুক্তিবাদে নতুন প্রাণের সঞ্চার হল।

দর্শন ও যুক্তিবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যায়নে ইবনে তায়মিয়ার অবদান

নাসিরুদ্দীন তূসীর মৃত্যুর দশ বছর পর শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তায়মিয়া (র) জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের যখন শুরু তখন নাসিরুদ্দীন তূসী ও তাঁর ছাত্রদের বদৌলতে গ্রীক দর্শন ও যুক্তিবাদ তথা এ্যারিস্টটলীয় দর্শন ও যুক্তিবাদেরই জয় জয়কার ছিল সর্বত্র এবং এ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জনই ছিল তখনকার সমাজে মেধা ও শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ান্ত মাপকাঠি। সুতরাং দর্শন ও যুক্তিবাদের সমালোচনায় মুখ খোলার দুঃসাহস ছিল না কারো। হাদীস ও ফিকাহবিদরা এ ময়দানের 'শাহসওয়ার' ছিলেন না। তাই দর্শন ও যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে তাঁরা খুব কড়া ভাষায় ফতওয়া জারি করতে পারতেন বটে, কিন্তু তাতে এ বুদ্ধিবৃত্তিক ফেতনার সর্বনাশা সয়লাব রোধ হতো না। কেননা চিন্তা ও বুদ্ধির জগতে দর্শন ও যুক্তিবাদ স্বীয় আসন পাকাপোক্ত করে নিয়েছিল অনেক আগেই এবং দর্শন ও যুক্তিবাদীদের মন-মগজে সংশয়বাদ শিকড় গেড়ে বসেছিল বেশ গভীরভাবেই। এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে সকল বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করার প্রবণতাও বিদ্যমান ছিল। পক্ষান্তরে দর্শন ও যুক্তিবাদের সাথে যে মহলটির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না তারা হয়ে পড়েছিল ভীতি ও হীনমন্যতার অসহায় শিকার। এ সর্বনাশা ফেতনার সফল মুকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন ছিল এমন সাহসী পুরুষের যিনি নির্ভীক সমালোচনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে

১. তূসীর ছাত্রদের মাঝে কুতুবুদ্দীন সিরাজী ও কুতবুদ্দীন রাযীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী যুগের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার কর্ণধার আল্লামা সাইয়িদ শরীফ ছিলেন কুতবুদ্দীন রাযীর ছাত্র। তাঁর শিক্ষা দর্শনই ভারতবর্ষে প্রসার লাভ করে। আজকের প্রচলিত দরসে নিযামী সে শিক্ষা ব্যবস্থারই উন্নত অথবা বিকৃত রূপ।

দর্শন ও যুক্তিবাদের তত্ত্বগত ভুল ও দুর্বলতাগুলো তুলে ধরতে পারবেন পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সাথে। বলাই বাহুল্য, সময়ের সে মহাপ্রয়োজনই পূরণ করেছিলেন শায়খুল ইসলাম 'আল্লামা ইবনে তায়মিয়া (র)। বলতে গেলে দর্শন ও যুক্তিবাদের মুক্ত সমালোচনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিচার-বিশ্লেষণই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান মিশন। এভাবে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) এমন এক পূজনীয় ব্যক্তিত্বের (এ্যারিস্টটলের) বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, মুসলিম জাহানের দার্শনিকবৃন্দ যাকে অতিমানবীয় সত্তারূপে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন এবং যাঁর চিন্তাধারার বিন্দুমাত্র সমালোচনাও ছিল অমার্জনীয় অপরাধ।

ইবনে তায়মিয়া (র)-র সমালোচনা, মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণের ধরন ও প্রকৃতি এবং দৃষ্টিকোণ ও ভিত্তি কি ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর তাঁর রচনাসম্ভার থেকে সংগ্রহ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত হবে। তাই নিচে বিভিন্ন শিরোনামে তাঁর রচনাবলীর সংক্ষিপ্তসার ও উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে। আশা করি এভাবে ইমাম সাহেবের চিন্তাধারা ও গবেষণা পদ্ধতি আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

গণিত ও প্রকৃতি বিজ্ঞানে গ্রীক অবদানের স্বীকৃতি

গ্রীক দার্শনিকদের, বিশেষ করে এ্যারিস্টটলের গবেষণাকর্ম ও রচনাসম্ভার সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়ার মতামত ও মন্তব্য খুবই ভারসাম্যপূর্ণ ও বস্তুনিষ্ঠ। প্রথমেই তিনি গণিত, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও অতিপ্রাকৃত জ্ঞানের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা টেনেছেন। অতঃপর পূর্বসূরী ইমাম গাযালী (র)-র মত তিনিও গণিত ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধিকাংশ সিদ্ধান্তের বিশুদ্ধতা মেনে নিয়ে এ ক্ষেত্রে গ্রীক পণ্ডিতদের অসাধারণ মেধা ও সাফল্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন অকুণ্ঠ চিত্তে। তাঁর ভাষায় ঃ

نعم لهم فى الطبعيات كلام غالبه جيد وهوكلام كثيرواسع ولهم عقول عرفوا بها ذلك وهم قد يقصدون الحق لايظهر عليهم العناد ـ

প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তারা যে সুদীর্ঘ ও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন সেগুলোর অধিকাংশই গ্রহণযোগ্য। অবশ্য তা বোঝবার মত মেধাও তাঁদের ছিল, আর এও ঠিক, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা অবিমৃষ্যকারিতা মুক্ত ও সত্যসন্ধানী ছিলেন।[১]

১. আর-রাদ্দুআলা'ল-বাকরী, পৃ. ২৪৩।

অন্যত্র তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, গণিত, প্রকৃতি বিজ্ঞান ইত্যাদিই হলো গ্রীক পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীদের মূল বিষয় এবং তাঁদের চিন্তা ও গবেষণার সঠিক ক্ষেত্র। তাঁর ভাষায় ঃ

لكن لهم معرفة جيدة بالامور الطبعية، وهذابحر علمهم وله تفرغوا وفيه ضيعوا زمانهم ـ

প্রকৃতি বিজ্ঞানে তাঁদের জানাশোনা পর্যাপ্ত ছিল। মুলত এটাই ছিল তাঁদের বিশেষজ্ঞতার ক্ষেত্র এবং নিজেদের মেধা ও সময়ের প্রায় সবটুকু একাজেই তাঁরা শেষ করেছেন।[১]

গ্রীক গণিত বিজ্ঞান সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেনঃ

فهذه الاموروامثالها مما يتكلم فيه الحساب امر معقول مما يشترك فيه ذووا العقول ، ومامن احد من الناس الايعرف منه شيئا فانه ضرورى فى العمل ولهذا يمثلون به فى قولهم الواحد نصف الاثنين ولاريب ان قضاياه كلية واجبة القبول لاتنتقض البتة ـ

গণিতশাস্ত্রবিশারদের আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ এমনই স্বতঃসিদ্ধ যে, জ্ঞানী মাত্রই সেগুলো সম্পর্কে একমত এবং সকল মানুষেরই সে সম্পর্কে কিছু না কিছু জ্ঞান রয়েছে। কেননা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সর্বক্ষেত্রেই এর প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। এক যে দুয়ের অর্ধেক সে সম্পর্কে কারই বা দ্বিমত থাকতে পারে? এ ধরনের মূলতত্ত্বগুলো নিঃসন্দেহে অবশ্য গ্রহণীয় ও অখণ্ডনীয়।[২]

বিরোধের মূল ক্ষেত্র অতিপ্রাকৃত দর্শন

মূলত ইলাহিয়্যাত তথা আল্লাহতত্ত্ব ও অতিপ্রাকৃত দর্শনই হলো গ্রীক দার্শনিকদের সাথে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র বিরোধের ক্ষেত্র। অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বার বার তিনি বলেছেন, ইলাহিয়্যাত ও অতিপ্রাকৃত জ্ঞানের জগতে গ্রীক দর্শন একেবারে অন্তসারশূন্য এবং গ্রীক দার্শনিকরা শিশুর মতই অজ্ঞ। তাঁর আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ দাবী হলো, এটা যেহেতু গ্রীক দার্শনিকদের কর্ম ও গবেষণার ক্ষেত্র নয়, সেহেতু এ বিষয়ে অনধিকার চর্চা করে নিজেদেরকে তাঁরা হাস্যাস্পদই করে তুলেছেন শুধু। তাঁর ভাষায় ঃ

১. তাফসীর সুরাতি'ল-ইখলাস, পৃষ্ঠা ৫৭।

২. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন, পৃষ্ঠা ১৩৪।

للمتفلسفة فى الطبعيات خوض وتفصيل تميزوا به بخلاف الالهيات ، فانهم من اجهل الناس بها وابعدهم عن معرفة الحق فيها، وكلام ارسطو معلمهم فيهاقليل كثير الخطاء ـ

দর্শনশাস্ত্র নিয়ে যারা সময় কাটান প্রকৃতি বিজ্ঞানে তাঁদের বিশেষ জ্ঞান রয়েছে বটে, তবে ইলাহিয়্যাত সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার কোন শেষ নেই। এ সম্পর্কে তাদের গুরু এ্যারিস্টটল অল্প-সল্প যা বলেছেন তাতে ভুলের সংখ্যা প্রচুর।[১]

প্রকৃতি বিজ্ঞানে গ্রীক দার্শনিকদের ব্যুৎপত্তি এবং অতিপ্রাকৃত বিজ্ঞানে তাঁদের অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী অবস্থা সম্পর্কে অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

وامامعرفة الله تعالى فحظهم منها مبخوس جدا، وامالائكته وكتبه ورسله فلا يعرفون ذلك البتة ولم يتكلموافيه لا ينفى ولاباثبات وانما تكلموا فى ذلك متأخروهم الداخلون فى الملل ـ

আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভে এরা বড় বঞ্চিত ও ভাগ্যাহত। আর ফিরিশতা, কিতাব ও রসূল সম্পর্কে তো এদের বলতে গেলে কোন জ্ঞানই নেই। তাই এ সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন বক্তব্যই তাঁদের নেই। মূলত উত্তরসূরি দার্শনিকরাই এ সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রেখেছেন। কেননা তাঁরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিলেন।[২]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে, গ্রীক দর্শনের 'মূল স্তম্ভ' যাঁরা তাঁরাও এ কথা স্বীকার করেছেন যে, এতদ্‌সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের সূত্র ও প্রাথমিক জ্ঞাতব্য বিষয়গুলোই তাদের জানা নেই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ইয়াকীন ও প্রত্যয় অর্জন তাদের পক্ষে খুবই দুষ্কর।

তিনি লিখেছেন ঃ

بل قدصرح اساطين الفلسفة بان العلوم الالهية لا سبيل فيها الى اليقين وانما يتكلم فيها بالاحرى والاخلق فليس لهم فيها الا الظن وان الظن لايغنى من الحق شيئا ـ

১. মা'আরিজু'ল-উসূল মিন মাজমু'আতির রাসাইলু'ল-কুবরা, পৃষ্ঠা ১৮৬।

১. তাফসীর সুরাতি'ল-ইখলাস, পৃষ্ঠা ৫৭।

দর্শনশাস্ত্রের দিকপালগণ স্পষ্ট স্বীকার করেছেন, ইলাহিয়্যাত ও আল্লাহতত্ত্বে ইয়াকীন ও প্রত্যয় লাভের কোন উপায় নেই। বড় জোর বলা চলে, "এ সম্পর্কে এটাই অধিক যুক্তিসংগত কথা।" সুতরাং দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হলো, দার্শনিকদের কাছে আন্দাজ অনুমান ছাড়া কিছুই নেই। আর কুরআনের ভাষায়, "আন্দাজ অনুমান সত্যের বিকল্প হতে পারে না।"[১]

গ্রীক অতিপ্রাকৃত দর্শন এবং ঐশী জ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা

গ্রীক দার্শনিকদের ইলাহিয়াত সংক্রান্ত অনুমান নির্ভর বক্তব্যের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের পর ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) প্রশ্ন রেখেছেন নবী-রসূলদের ঐশী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মুকাবিলায় নিজেদের বাজে আন্দাজ-অনুমানগুলো পেশ করার নির্বোধ আস্পর্ধা তারা দেখায় কি করে? অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় তিনি লিখেছেন ঃ

> দর্শনের আদি গুরু এ্যারিস্টটলের ইলাহিয়াত সংক্রান্ত আলোচনা খুঁটিয়ে দেখলে যে কোন সচেতন পাঠক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবেন, রাব্বু'ল-'আলামীনের পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতার ক্ষেত্রে গ্রীক দার্শনিকদের সত্যিই কোন তুলনা নেই। তা সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক অর্বাচীন যখন গ্রীকদের অতিপ্রাকৃত দর্শনকে রসূলদের ঐশী জ্ঞান ও শিক্ষার মুকাবিলায় টেনে আনে তখন বিস্ময়ে বেদনায় নির্বাক হয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। কেননা ব্যাপারটি তখন গ্রাম্য জমিদারকে শাহানশাহের সাথে তুলনা করার মত দাঁড়ায়, বরং আরো জঘন্য। কেননা শাহানশাহ যেমন গোটা সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপক, তেমনি জমিদার তাঁর গাঁয়ের ব্যবস্থাপক, সুতরাং উভয়ের মাঝে একটা দূরতম সাদৃশ্য অন্তত রয়েছে। অথচ নবী ও দার্শনিকদের মাঝে সেটকুও নেই। কেননা নবীরা যে 'ইল্‌ম ধারণ করেন সে সম্পর্কে দার্শনিকদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই, এমন কি তার ধারে কাছে ঘেঁষাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সত্য বলতে কি, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান ধর্মনেতারাও আল্লাহ্-তত্ত্বে তাঁদের চেয়ে অধিক অবগত। এখানে আমি কিন্তু ওহীনির্ভর 'ইলমের কথা বোঝাতে চাচ্ছি না। সে 'ইল্‌ম আমাদের আলোচনার বিষয়ই নয়। কেননা তা শুধু নবীদেরই বৈশিষ্ট্য, অন্যদের তাতে কোন অংশ নেই। আমি 'আকল ও বুদ্ধিজাত সেই 'ইলমের কথাই বোঝাতে চাচ্ছি যার সম্পর্ক হল তাওহীদ ও রিসালাতের সাথে, (আল্লাহ্‌র) যাত ও সিফাত তথা সত্তা ও গুণের পরিচয়ের সাথে এবং পরকাল ও পরকালীন সৌভাগ্যের নিয়ামক 'আমলগুলোর সাথে, যেগুলোর অধিকাংশই নবীরা 'আকল ও বুদ্ধিজাত

---

১. নাকযু'ল-মানতিক, পৃষ্ঠা ১৭৮।

প্রমাণাদির সাহায্যে বয়ান করেছেন। দীন ও শরীয়তের এই 'বুদ্ধিজাত' ইলম সম্পর্কেই আমাদের দার্শনিক বন্ধুরা সম্পূর্ণ বেখবর। 'ওহীনির্ভর' 'ইলমের তো প্রশ্নই আসে না। কেননা সেগুলো নবীদের একক বৈশিষ্ট্য। সুতরাং দর্শন ও নববী 'ইলমের তুলনামূলক আলোচনায় সে প্রসঙ্গ আমরা উত্থাপনই করব না।[১]

গ্রীক দার্শনিকদের অজ্ঞতা ও অবিমৃষ্যকারিতা

ইলাহিয়্যাত ও আল্লাহ্‌তত্ত্বে গ্রীক দার্শনিকদের জ্ঞানের দৈন্য ও বিভিন্ন গায়বী বিষয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করার প্রবণতা ও কারণ সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বলেন ঃ

নবীদের বর্ণিত গায়বী বিষয়সমূহ এবং 'আকল ও বুদ্ধিজাত' মূলতত্ত্ব (হাকীকত) সমূহ যা যাবতীয় অস্তিত্বকে বেষ্টন করার সাথে সাথে সেগুলোর নির্ভুল শ্রেণী-বিন্যাসও করে থাকে, সে সম্পর্কে দার্শনিকরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কেননা সেগুলোর পূর্ণ অবগতি অর্জন তার পক্ষেই সম্ভব যার জ্ঞান বিদ্যমান অস্তিত্বসমূহের সকল প্রকরণকে বেষ্টন করতে সক্ষম। অথচ দার্শনিকদের জ্ঞান গণিত ও সংশ্লিষ্ট কিছু শাস্ত্রের মাঝে সীমাবদ্ধ। মূলত বিদ্যমান অস্তিত্বসমূহের খুব অল্পই তাদের জ্ঞানের পরিধিতে এসেছে। কেননা মানুষের অবলোকন ও অনুভবের অন্তর্ভুক্ত অস্তিত্বসমূহের তুলনায় অবলোকন ও অনুভব-উর্ধ্ব অস্তিত্বসমূহের সংখ্যা অনেক অনেক বেশী। এজন্যই দার্শনিকদের পরিবেশিত তথ্যাবলীর মাঝেই যাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ এবং যারা মনে করে, তাদের জানা বিষয়ের বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই তারা নবীদের মুখে ফিরিশতা, আরশ, কুরসী, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির আলোচনা শোনা মাত্র অবাক বনে যায় এবং নিজেদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের আলোকে নবীদের বাণী ও বক্তব্যের এমন ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে যার সপক্ষে তাদের হাতে কোন যুক্তি নেই। অবলোকন ও অনুভব-বহির্ভূত বিষয়গুলোর অনস্তিত্ব সম্পর্কেও তাদের কোন ইতিবাচক জ্ঞান নেই। কেননা কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা আর তার অস্তিত্ব না থাকা এক নয়। যা আমাদের জানা নেই তার অস্তিত্ব নেই এটা যুক্তির কথা নয়। মূলত গায়বী ও অদৃশ্য বিষয়ের অস্তিত্ব অস্বীকারকারীরা সেই চিকিৎসকের মত যিনি কিছুতেই 'জিন'-এর অস্তিত্ব স্বীকার করতে রাজি নন। কেননা চিকিৎসাশাস্ত্রে এর কোন প্রমাণ নেই। অথচ ভদ্রলোক ভেবে দেখলেন না যে, চিকিৎসাশাস্ত্রে 'জিন'-এর অস্তিত্ববিরোধী প্রমাণও তো নেই। অর্থাৎ কোন

১. আর-রাদ্দু 'আল্যাল-মানতিকিয়্যীন, ৩৯৫ পৃষ্ঠা।

শাস্ত্রে সাধারণ লোকদের তুলনায় যার জ্ঞান অধিক সে তার জ্ঞানের অহমিকায় উক্ত শাস্ত্রবহির্ভূত বিষয়গুলোকে অস্বীকার করতে শুরু করে। বস্তুত বিভিন্ন বিষয় গ্রহণ ও স্বীকার করার ক্ষেত্রে মানুষের তত বিচ্যুতি ঘটেনি। যতটা ঘটেছে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে। কেননা যে জিনিসের হাকীকত সম্পর্কে মানুষ পূর্ণ অবগত নয় তা মিথ্যা প্রমাণিত করার এবং তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার ঝোঁক ও প্রবণতা মানুষের আদি স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويله -

তাদের জ্ঞান যে বিষয়ের নাগাল পায়নি তা তারা অস্বীকার করে বসল, অথচ সে বিষয়ের হাকীকত এখনো তাদের কাছে পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি।

(সূরা য়ূনুস ঃ আয়াত-৩৯)

প্রতিমা ও তারকাপূজক গ্রীস

প্রাচীন গ্রীক ইতিহাস থেকে জানা যায়, গণিতশাস্ত্র, প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যে অমূল্য অবদানের মাধ্যমে যে গ্রীক জাতি হাযার বছর ধরে চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে মানব সভ্যতার নেতৃত্ব দিয়েছে তারা নিজেদের সুদীর্ঘ ইতিহাসের অধিকাংশ সময় কিন্তু তারকা ও প্রতিমা পূজায় কাটিয়েছে। ফলে তাদের চিন্তা ও বিশ্বাসের জগত ছিল হাজারো কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। আধুনিক ইতিহাস গ্রীসের প্রতিমাতত্ত্ব ও তাদের জাতীয় দেব- দেবীর অনেক অজানা তথ্য উদঘাটন করে দিয়েছে যা সন্দেহাতীতরূপেই প্রমাণ করে, প্রাচীন গ্রীসদেশের সর্বত্র দেব-দেবী ও মঠ-মন্দিরের জাল বিস্তৃত ছিল। আরবদের হাত ঘুরে যে গ্রীক দর্শন য়ূরোপে পৌছেছিল তাতে তারকা ও প্রতিমা পূজার ছাপ ও প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও শিরকী ধ্যান-ধারণাকেই গ্রীক দার্শনিকরা দর্শনের চটকদার পরিভাষার আবরণে পরিবেশন করেছিলেন। আর গ্রীকদের ধর্মীয় ইতিহাস না জানার কারণে সেগুলোকেই মুসলিম দার্শনিকরা পরম সত্য জ্ঞানে লুফে নিলেন এবং গবেষণা ও যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা সুপ্রমাণিত করার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র বিরল প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টিই বলতে হবে যে, কয়েক শতক আগেই সকলের সামনে এ সূক্ষ্ম দিকটি তিনি তুলে ধরেছিলেন। তাঁর ভাষায় ঃ

. اما قدماء اليونان فكانوا مشركين من اعظم الناس شركا وسحرا، يعبدون الكواكب والاصنام ولهذا عظمت عناياتهم بعلم الهيئة والكواكب لاجل عبادتها وكانوا يبنون لها الهياكل -

প্রাচীন গ্রীকরা যাদু ও শির্‌ক বিশ্বাসে সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তারকা ও প্রতিমা পূজায় তারা ডুবে ছিল। গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি ও জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে তাদের এত মাতামাতির রহস্য এখানেই নিহিত। এজন্য তারা রীতিমত ইবাদতখানাও তৈরি করত।[১]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

ولهذا كان رؤسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك فالاولون يسمون الكواكب الالهة الصغرى ويعبدونها باصناف العبادات كذالك كانوا في ملة الاسلام لاينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد بل يسوغون الشرك اويأمرون به اولايوجبون التوحيد ـ

তাদের উত্তর ও পূর্বসূরী মহারথীরা শির্‌কের নির্দেশ দিত। পূর্বসূরীরা গ্রহ-তারাকে ক্ষুদে খোদা নাম দিয়ে বিভিন্নভাবে সেগুলোর উপাসনা করত। মুসলমানদের মধ্যে যারা তাদের অনুসারী তাদেরও একই অবস্থা। কাউকে তারা শিরক থেকে বিরত রাখে না, তাওহীদকেও অপরিহার্য মনে করে না বরং বৈধ কিংবা জরুরী মনে করে শির্‌কের নির্দেশ প্রদান করে। নিদেনপক্ষে তাওহীদকে অপরিহার্য মনে করে না।[২]

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গ্রীক দার্শনিকদের পার্থক্য

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সূক্ষ্মদর্শিতা ও বাস্তববোধের আরেকটি প্রমাণ হলো, পরবর্তী ও পূর্ববর্তী গ্রীক দার্শনিকদের মাঝে তিনি পার্থক্য রেখা টেনেছেন। তাঁর মতে, এ্যারিস্টটলের পূর্বসূরী দার্শনিকরা গায়বী বিষয়, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও ভাবধারার সাথে অধিক পরিচিত ছিলেন। অদৃশ্য ও অজড় অস্তিত্বকে অস্বীকার করার প্রবণতা তাদের ছিল না। পক্ষান্তরে এ্যারিস্টটলের মাঝে সে প্রবণতা প্রকটভাবে আমরা দেখতে পাই। এক স্থানে তিনি লিখেছেন ঃ

এ্যারিস্টটল-ভক্ত দার্শনিকরা পূর্ববর্তীদের অনুগমন করেন নি, অথচ তারাই ছিলেন গ্রীক দর্শনের মূল স্তম্ভ। বিশ্বের নশ্বরতায় তারা যেমন বিশ্বাস করতেন, তেমনি এ বিশ্বাসও তাদের ছিল যে, দৃশ্যমান জগতের ঊর্ধ্বে আরেকটি জগতের অস্তিত্ব আছে। সেই ঊর্ধ্ব জগতের এমন কিছু বিবরণ তাঁরা দিতেন যা জান্নাত সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে সক্রেটিস প্রমুখ দিকপাল দার্শনিকদের বক্তব্যে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়, পুনরুত্থানেও তারা বিশ্বাস করতেন।[৩]

১. তাফসীরু সুরাতি'ল-ইখলাস, পৃ. ৫৭। ২. নাকযু'ল-মানতিক, পৃ. ১৭৭।
৩. তাফসীরু সুরাতি'ল-ইখলাস, পৃ. ৬৭

ধর্মতত্ত্বের সাথে এ্যারিস্টটলের অপরিচয়

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বর্ণিত এ পার্থক্যের কারণ হলো, নবী-রসূলদের পুণ্যভূমিতে প্রাচীন দার্শনিকদের যাতায়াত ছিল। ফলে ধর্মীয় তত্ত্ব ও ভাবধারার সাথে পরিচয় লাভের সুযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে এ্যারিস্টটলের জীবনে কখনো সে সুযোগ আসেনি। কতিপয় ঐতিহাসিকের বরাত দিয়ে তিনি বলেন ঃ

> দার্শনিকদের জীবন-বৃত্তান্ত যাঁরা গ্রন্থবদ্ধ করেছেন তাঁদের মতে, দর্শনশাস্ত্রের 'আদি পুরুষ' পিথাগোরাস, সক্রেটিস ও প্লেটো নবী-রসূলদের পুণ্যভূমি সিরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে যাতায়াত করতেন। সেই সুবাদে লুকমান হাকীমের কাছ থেকে এবং হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ)-এর শিষ্যদের কাছ থেকে তাঁরা জ্ঞান আহরণ করতেন। কিন্তু এ্যারিস্টটলের জীবনে সে সকল পুণ্যভূমি সফরের সুযোগ আসেনি। ফলে পূর্বসূরীদের কাছে নবী-রসূলদের বাণী ও শিক্ষার কিছু অংশ থাকলেও তাঁর কাছে তার ছিটেফোঁটাও ছিল না, ছিল শুধু প্রতিমা-পূজকদের ধর্ম সংক্রান্ত কিছু তত্ত্ব। সেগুলোর আলোকেই তিনি অনুমাননির্ভর এক দর্শনের বুনিয়াদ রেখেছেন, যা তাঁর ভক্তরা চোখ বুজে দৈব বিধানের ন্যায় অনুসরণ করছে।[১]

দুর্ভাগ্যবশত এ্যারিস্টটলের এই অভিশপ্ত দর্শনই মুসলিম জাহানে ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং সমগ্র গ্রীক দর্শনের প্রতিনিধিত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

ولكن هذه الفلسفة التى يسلكها الفارابى وابن سينا وابن رشد والسهروردى المقتول ونحوه فلسفة المشائين وهى المنقولة عن ارسطو الذى يسمونه المعلم الاول -

> কিন্তু আল-ফারাবী, ইবনে সীনা, ও ইবনে রুশদ প্রমুখ যে দর্শন অনুসরণ করেন মূলত তা এ্যারিস্টটল প্রবর্তিত দর্শন—দার্শনিকরা যাঁকে 'আদি গুরু' বলে থাকেন।[২]

গ্রীক দর্শনে আল্লাহ্র অবস্থান

এ্যারিস্টটলের দর্শনে আল্লাহ্র অস্তিত্ব নিছক কল্পনা ও চিন্তার গণ্ডীতেই আবদ্ধ। ইমাম ইবনে তায়মিয়ার ভাষায় ঃ

فاذا تصور العاقل اقوالهم حق التصور تبين له ان هذا الواحد الذى اثبتوه لا يتصور وجوده الافى الاذهان لافى الاعيان -

---

১. নাকযু'ল-মানতিক, ১১৩ পৃ. ২. আর-রাদ্দু-'আলা'ল-বাকরী, পৃ. ২০৬।

দার্শনিকদের আল্লাহ্ সম্পর্কিত মতামতগুলো কোন বিদগ্ধজন গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন, যে-একক সত্তার কথা তাঁরা বলেছেন,. তাঁর অস্তিত্ব চিন্তা ও কল্পনার রাজ্যেই শুধু সম্ভব॥ বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব নেই।[১]

আল্লাহ্ পাকের কর্ম ও গুণাবলী অস্বীকার করার ক্ষেত্রে দার্শনিকরা যে 'উদারতা'র পরিচয় দিয়েছেন এবং যাবতীয় সৌন্দর্য ও পূর্ণতা, কুদরত ও ক্ষমতা রহিত করার ক্ষেত্রে যে উৎসাহ দেখিয়েছেন সেদিকে ইংগিত করে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) মন্তব্য করেছেন, আল্লাহ্‌র মর্যাদা ও বড়ত্বের ওপর এর চেয়ে নির্লজ্জ হামলা আর হতে পারে না। জনৈক বিদগ্ধ পণ্ডিতের মন্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেন ঃ

لقد احسن بعض الفضلاء اذقال الصفع احسن من توحيد الفلاسفة بل قصر فيما قال -

জনৈক বিদগ্ধ ব্যক্তি সুন্দর বলেছেন, "তাওহীদ ও একত্ববাদের দার্শনিক ধারণা হজম করার চেয়ে চপেটাঘাত সহ্য করা অনেক সহজ।" ভদ্রলোকের এ মন্তব্যও কিন্তু যথেষ্ট সংযত।[২]

মুসলিম দার্শনিকদের অন্ধ গ্রীক অনুকরণ

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে, পরবর্তী মুসলিম দার্শনিকরা গ্রীক দর্শনের উচ্ছিষ্ট ভোজন ও এ্যারিস্টটলের অন্ধ অনুকরণের কারণেই বহু স্থানে মারাত্মক ভ্রান্তি ও স্ববিরোধিতার স্বীকার হয়েছেন। এইসব মুসলিম দার্শনিকদের প্রতি ইমাম সাহেবের ক্ষোভ ও ক্রোধের তাই শেষ নেই। কেননা রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে প্রাপ্ত আল্লাহ্‌র মহা নেয়ামতের কোন কদর তারা করেননি এবং চোখের সামনে হিদায়াতের রৌশনি থাকা সত্ত্বেও তা থেকে উপকৃত হননি; বরং মানুষের চোখ থেকেও তা আড়াল করে রাখার অপচেষ্টায় মেতেছিলেন। তাঁর ভাষায় ঃ

ان هؤلاء المتفلسفة المتأ خرين في الا سلام من اجهل الخلق عند اهل العلم والايمان وفيهم من الضلال والتناقض مالايخفى على اذ كياء الصبيان ، لانهم لما التزموا ان لا يسلكوا الا سبيل سلفهم الضالين وان لا يقروا الا بما يبنونه على تلك القوانين

১. তাফসীরু সুরাতি'ল-ইখলাস-পৃ. ৩৭।

২. আর-রাদ্দ 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন, পৃ. ২২১।

وقد جاءهم من النور والهدى والبيان ما ملأ القلوب والالسنه والاذان صاروا بمنزلة من يريد ان يطفىء نور الشمس بالنفخ فى الهباء او يغطى ضؤها باالعباء ـ

ঈমান ও ইল্‌মের যারা অধিকারী তাদের চোখে পরবর্তী মুসলিম দার্শনিকরা হলো মূর্খের সেরা। কেননা তাদের ভ্রান্তি ও স্ববিরোধিতা এত সুস্পষ্ট যে, বুদ্ধিমান বালকের পক্ষেও তা বোঝা সম্ভব। আসলে তারা যেহেতু ধরেই নিয়েছেন যে, ভ্রান্ত পূর্বসূরীদের পথেই চলতে হবে এবং তাদের নীতিমালার ভিত্তি মূলের উপর তৈরী প্রাসাদেই বাস করতে হবে, সর্বোপরি হৃদয় ও কর্ণের পর্দা উন্মোচনকারী যে নূর ও হিদায়াত এসেছে তা অবশ্যই পরিহার করে চলতে হবে, তাই এরা সেই নির্বোধ ব্যক্তির মতই যে ফুঁ দিয়ে সূর্যের আলো নিভাতে চায় কিংবা চাদর দিয়ে তা আড়াল করতে চায়।[১]

নবুওয়তের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ ইবনে সীনা

দর্শনের প্রতি অন্ধপ্রেম এবং এ্যারিস্টটলের তল্পি বহনের কারণে যে সকল মুসলিম দার্শনিক ধর্মীয় তত্ত্ব, আকীদা ও মৌলবিশ্বাসের দার্শনিক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন এবং দর্শনের আলোকেই তা বুঝতে ও বোঝাতে চেয়েছেন, 'হুকামায়ে ইসলাম' নামে তাদের স্মরণ করা হলেও তাঁর মতে অদৃশ্য জ্ঞান ও তত্ত্বের নির্ভুল উপলব্ধি নিছক গ্রীক দর্শনের সাহায্যে এবং এ্যারিস্টটলীয় নিয়মনীতির আলোকে সম্ভব নয়। ইবনে সীনাকে মনে করা হয় ইসলামী প্রাচ্যে এ্যারিস্টটলীয় দর্শেনের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ও মুখপাত্র। তাই ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁকেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁর সুতীব্র সমালোচনার প্রধান লক্ষ্যস্থল রূপে। ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

> ইবনে সীনা বলতে চান, "নবুওয়ত মুলত নফস ও আত্মশক্তিসমূহের একটি। আর শক্তির দিক থেকে মানুষের নফস ও আত্মার শ্রেণীর ভেতর তারতম্য অবশ্যই আছে।" বস্তুত নবুওয়তের হাকীকত ও প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ মুর্খের পক্ষেই শুধু এমন কথা বলা সম্ভব। এটা তো সেই ব্যক্তির মতই হলো, যে শুধু কবিদের শ্রেণী সম্পর্কে অবগত হয়েই প্রমাণ করতে চায় যে, আইন বা চিকিৎসাবিদদের একটা শ্রেণীও দুনিয়াতে আছে। অর্থাৎ কবিদের বিদ্যমানতাকেই সে আইনজ্ঞ ও চিকিৎসকদের বিদ্যমানতার সপক্ষে প্রমাণরূপে দাঁড় করাতে চায়। তবু উদাহরণটা যুৎসই হলো না। কেননা চিকিৎসক ও কবির তুলনায় নবী আর অ-নবীর পার্থক্য ও দূরত্ব তো

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-বাকরী, পৃ. ১১৫।

পরিমাপ করাই সম্ভব নয়। কিন্তু এই দার্শনিকরা নবুওয়তের হাকীকত ও প্রকৃতি সম্পর্কে এমনই অজ্ঞ যে, এ বিষয়টাকেও তারা গুরু দার্শনিকদের নির্ধারিত নিয়মমালার আলোকে বিশ্লেষণ করতে চাইল, অথচ নবুওয়তের হাকীকত এবং নবীদের পদমর্যাদা সম্পর্কে গুরুদের কোন ধারণাই ছিল না।[১]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

(এই উম্মাহর) বিভিন্ন ফেরকার মধ্যে নবুওয়তের হাকীকত ও প্রকৃতি সম্পর্কে সবচেয়ে অজ্ঞ হলো গ্রীক দর্শন পূজারী, বাতেনী ও নাস্তিক্যবাদীরা। তাদের ধারণায় নবুওয়তের বুনিয়াদ হলো এমন একটি 'সাধারণ গুণ' যা সকল মানুষের মাঝেই বিদ্যমান আছে। সেটা হলো 'স্বপ্ন'। বস্তুত এ্যারিস্টটল ও তাঁর অনুসারীদের দর্শনে নবুওয়ত সম্পর্কিত কোন আলোচনা পাওয়া যায় না। আল-ফারাবী-পন্থীদের মতে নবীর চেয়ে দার্শনিক শ্রেষ্ঠ। ইবনে সিনা অবশ্য নবুওয়তকে আরেকটু ছাড় দিয়েছেন। তাঁর মতে, নবুওয়তের বৈশিষ্ট্য তিনটি ঃ প্রথমত শিক্ষা গ্রহণ ছাড়াই নবীর শিক্ষা লাভ হয়। এর নাম তিনি দিয়েছেন 'কুওয়তে কুদসিয়াহ্' বা দৈব জ্ঞান। তবে এর হাকীকত ও প্রকৃতি 'কুওয়তে হাদসিয়াহ্' বা লব্ধ জ্ঞানেরই অনুরূপ। দ্বিতীয়ত, অন্তর্লোকে তিনি কোন জ্ঞাত বিষয়ের ধ্যান গ্রহণ করেন। ফলে মানসপটে কিছু নূরানী আকৃতি উদ্ভাসিত হয়। অতঃপর ভেতর থেকে কিছু 'বাণী' তিনি শ্রবণ করেন, ঠিক যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তি তার মানসপটে উদ্ভাসিত আকৃতির সাথে কথোপকথনে লিপ্ত হয়, অথচ এগুলোর অস্তিত্ব শুধু তার ভেতরেই, বাইরে এর কোন অস্তিত্ব নেই। তদ্রূপ তাদের ধারণায় একজন নবী যা কিছু শ্রবণ ও অবলোকন করেন অন্যরা সে শ্রবণ ও অবলোকনের অংশীদার হয় না। কেননা এগুলো তার অন্তঃঅবলোকন। সুতরাং অন্তর্লোকেই এর অস্তিত্ব, বাইরে কোন অস্তিত্ব নেই। কারো মস্তিষ্কে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হলে কিংবা পিত্ত, কফ ইত্যাদির প্রাবল্য ঘটলে তার বেলায়ও উপরিউক্ত অবস্থা দেখা দিতে পারে। তৃতীয়ত, নবী এমন এক শক্তির অধিকারী হন যার মাধ্যমে তিনি সৃষ্টিজগতের প্রকৃতিতে ব্যতিক্রম ঘটাতে পারেন। ফলে তাঁর হাতে অলৌকিক বিষয় প্রকাশ পায়। ইবনে সিনার মতে এটাই হলো নবীদের মু'জিযা। কেননা তাঁর ধারণায় বিশ্বে যা কিছু ঘটে তা আত্মিক, দৈব কিংবা প্রাকৃতিক শক্তির ফল। এই দর্শনজীবীদের ধারণায় নবীদের মনোজগতে যা কিছু ঘটে তা 'অতিক্রিয়াশীল বোধশক্তির' অবদান ছাড়া আর কিছু নয়।

---

১. আন-নুবুওয়াত, পৃ. ২২।

(নবুওয়তের এ ধারণা মগজে ধারণ করে) নবীদের বাণী ও বক্তব্যকে তারা নিজেদের মতামতের সাথে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করলেন। এর সহজ উপায় হিসাবে তারা শব্দ নিতেন নবীদের, কিন্তু সেগুলো ব্যাখ্যা করতেন নিজেদের বিশ্বাস ও মূলনীতির আলোকে অর্থাৎ নিজেদের বিশ্বাস ও ধারণা পরিবেশন করতেন নববী শব্দমালার আবরণে। এভাবেই তাদের রচনাবলীতে নববী শব্দপঞ্জী ও পরিভাষার ব্যাপক ব্যবহার ঘটেছে। ফলে নবী ও দার্শনিকদের উদ্দেশ্য ও উভয় উদ্দেশ্যের প্রকৃতিগত পার্থক্য সম্পর্কে যারা বে-খবর তারা মনে করে বসেন, দার্শনিকরা যা বোঝাতে চাচ্ছেন নবীদের উদ্দেশ্যও বুঝি তাই। এভাবেই বহু দল ও ফেরকা গোমরাহ হয়েছে। ইবনে সিনা ও তাঁর অনুগামীদের লেখনীতে এ বিষয়টি পরিষ্কার চোখে পড়ে।[১]

কালামশাস্ত্রের দুর্বলতা, কালামবিদদের দ্যোদুল্যমানতা

গ্রীক দার্শনিক ও তাদের অনুগামী মুসলিম দর্শনজীবীদের মাঝেই ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সমালোচনা সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং কালামশাস্ত্রবিদদের সমালোচনায়ও তিনি সমান তৎপর ছিলেন। কেননা এই ভদ্রলোকেরা ইসলামের আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন সত্য, কিন্তু গায়েবী বিষয়গুলো প্রমাণ করতে গিয়ে দার্শনিকদের 'প্রমাণ পদ্ধতি ও দর্শনের সীমাবদ্ধ ও ভ্রান্তিপূর্ণ পরিভাষাই তারা ব্যবহার করেছেন, অথচ সেগুলোর স্বতন্ত্র আবেদন ও প্রভাব রয়েছে, রয়েছে আলাদা অর্থ ও তাৎপর্য। 'আন-নবুওয়াত' গ্রন্থের এক স্থানে তিনি লিখেছেন ঃ

> সৃষ্টিতত্ত্ব, স্রষ্টার অস্তিত্ব ও পুনরুত্থানের সত্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে কালাম শাস্ত্রবিদদের বক্তব্য 'আকল ও যুক্তির বিচারে যেমন সারগর্ভ ও সন্তোষজনক নয়, তেমনি (কুরআন-সুন্নাহর) 'নকল' ও উক্তিগত দিক থেকেও প্রামাণ্য নয়। (অর্থাৎ 'আকল ও নকল তথা 'যুক্তি' ও 'উক্তি' কোন বিচারেই তা মনোত্তীর্ণ নয়।) নিজেরাও তারা এ সত্য স্বীকার করে থাকেন। শেষ জীবনে ইমাম রাযী (র) পরিষ্কার বলেছেন ঃ দর্শন ও কালামশাস্ত্রের 'প্রমাণীকরণ পদ্ধতি' সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনার পর আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তাতে রোগের আরোগ্য নেই এবং পিপাসা নিবারণেরও ব্যবস্থা নেই। পক্ষান্তরে কুরআন-সুন্নাহর পক্ষকেই আমি নিরাপদ ও নিকটতম পথরূপে পেয়েছি। নফী ও নেতিবাচক বর্ণনার ক্ষেত্রে নিচের আয়াত দু'টি লক্ষ্য কর।
>
> ليس كمثله شيء -
>
> (কোন কিছুই তাঁর তুল্য নয়)

১. আন-নুবুওয়াত, পৃ. ১৬৮।

ولايحيطون به علما -

(ক্ষুদ্র জ্ঞানে তারা তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না।)

ইছবাত ও ইতিবাচক বর্ণনার ক্ষেত্রে নীচের আয়াত ক'টি ভেবে দেখুন!

الرحمن على العرش استوى -

দয়াময় আরশে সমাসীন হলেন।

اليه يصعد الكلم الطيب -

পবিত্র বাণীসমূহ তাঁরই সমীপে আরোহণ করে।

أامنتم من فى السماءان يخسف بكم الارض -

তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশ অধিপতি তোমাদেরসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেবেন না।

অবশেষে তিনি বলেন, আমার মতো যে কেউ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে তাকে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হবে। গাযালী ও ইবনে আকীল প্রায় অভিন্ন কথাই বলেছেন এবং এটাই হচ্ছে 'সত্য'।[১]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

মুতাকাল্লিম (কালামশাস্ত্রবিদ)-গণ স্বভাব বুদ্ধির পথ অনুসরণে যেমন ব্যর্থ হয়েছেন তেমনি নববী শরীয়তের পথ অনুসরণও তাঁদের কপালে জোটেনি। ফল দাঁড়িয়েছে, একদিকে তাঁদের স্বভাব-সারল্য লোপ পেয়েছে, অন্য দিকে শরীয়তের স্থির পথ থেকেও বিচ্যুতি ঘটেছে। বুদ্ধিজাত জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁরা 'সাফসাতাহ' ও 'নাস্তিক্যবাদে'র শিকার হয়েছেন। পক্ষান্তরে কুরআন-সুন্নাহজাত জ্ঞানের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত সূক্ষ্মতা ও জটিলতার আবর্তে ডুবে গেছেন।[২]

কতিপয় কালামশাস্ত্রবিদের আরেকটি মারাত্মক দুর্বলতার কথাও তিনি তুলে ধরেছেন অর্থাৎ প্রায়শ তাদের আপত্তি ও প্রশ্নগুলো হয় খুব সবল আবেদনপূর্ণ, অথচ উত্তর ও সমাধানগুলো হয় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও আকর্ষণশূন্য। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে, মুতাকাল্লিমদেরকে ইসলামের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র মনে করে তাদের রচনাবলীতেই নিজেদের অধ্যয়ন যারা সীমিত রেখেছেন তাদের জন্য এ 'দুর্বলতা' খুবই মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। তিনি বলেন ঃ

১. আন-নবুওয়াত, পৃ. ১৪৮।

২. কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নেই, সব আমাদের স্বপ্ন, এরূপ মতবাদ।

নবুওয়ত সংক্রান্ত আলোচনায় মুতাকাল্লিমরা এমন সব প্রশ্নের অবতারণা করেন যা যেমন বেগবান তেমনি সহজে বোধগম্য। পক্ষান্তরে উত্তরগুলো হয় (তথ্য ও উপস্থাপনাগত) দুর্বলতায় নির্জীব। কিছু কিছু উদাহরণ ইতিপূর্বে আমরা পেশ করে এসেছি। ফল এই দাঁড়ায় যে, তাদের রচনাবলী থেকেই যারা 'ইলম, ঈমান ও হিদায়াতের আলো পেতে চায় তাদের আকীদা ও বিশ্বাসের ভিত কেঁপে ওঠে এবং ঈমান ও ইয়াকীনের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। কেননা তাদের ধারণায় মুতাকাল্লিমরাই হলেন ইসলামের রক্ষক, প্রতিনিধি ও কৌশলী। তাদের কাঁধেই অর্পিত হয়েছে ইসলামের যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পৃষ্ঠপোষকতার সুমহান দায়িত্ব, অথচ তাদের কাছেই নবুওয়তের (সত্যতা ও প্রয়োজনীয়তার) পক্ষে সন্তোষজনক কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই। ফলে ঈমান ও 'ইলমের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে, মূর্খতা ও মুনাফেকীর দুয়ার খুলে যায়, বিশেষত তাদের জন্য এটা খুবই সর্বনাশা যাদের জানাশোনার পরিধি মুতাকাল্লিমের পরিবেশিত যুক্তি-প্রমাণেই সীমিত।[১]

দর্শন ও কালামশাস্ত্রবিদদের অভিন্ন দোষ ও দুর্বলতা

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে, দর্শন ও কালামশাস্ত্রবিদরা একই ভুল করেছেন এবং এত বিরোধ সত্ত্বেও উভয় দল একই কর্মপন্থা অনুসরণ করেছেন। তাদের প্রধান দোষ ও দুর্বলতা হল, কিয়াস ও যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যে বিষয়ের 'ইলম' হাসিল করা সম্ভব নয় সেখানেও তারা কিয়াস ও যুক্তি প্রয়োগ করেছেন এবং 'ফিতরত ও নবুওয়াত' (স্বভাববোধ ও ঐশী জ্ঞান) উভয়ের সাথে দ্বন্দ্ব ও শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ফলে উভয় দলের চিন্তা ও গবেষণায় ভ্রান্তি প্রচুর এবং সারবত্তা কম।[২]

দীর্ঘসূত্রিতা ও কৃত্রিমতা

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে, দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদদের যুক্তি ও যুক্তি-প্রয়োগ পদ্ধতি অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘসূত্রিতা ও কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট। যে সকল বিষয় ও উদ্দেশ্য মুতাকাল্লিমরা দীর্ঘ ও জটিল যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন সেগুলো আরো সহজ, সংক্ষিপ্ত ও স্বভাবোপযোগী পথ ও পন্থায় প্রমাণ করা সম্ভব, অথচ দর্শন ও কালামশাস্ত্রবিদরা তা না করে অযথা ঘুর পথ অবলম্বন করেছেন। যেমন, কাউকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ তোমার কান কোথায়? সে নিজের ডান হাত মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে বহু কষ্টে বাম কান পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে বলল, 'এই যে আমার কান' অথচ সহজভাবে ডান হাতে ডান কান কিংবা বাম হাতে বাম কান দেখিয়ে দিলেই হতো। প্রসংগক্রমে একটি কবিতা পংক্তি ইমাম সাহেব উদ্ধৃত করেছেন ঃ

---

১. আন-নুবুওয়াত, পৃ. ২৪০ ২. নাকযুল-মানতিক, পৃ. ১৬২

اقـام يـعـمـل اياما رويته وشبه الـمـاء بعد الجهد بالـمـاء -

অনেক চিন্তা-গবেষণা ও পণ্ডশ্রমের পর (সোজা পথে এসে) সে বলল, পানির পরিচয় এই যে, তা পানি।

কালামশাস্ত্রীয় যুক্তিমালা বিকল্পহীন নয়

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) মুতাকাল্লিমদের এ অন্তঃসারশূন্য দাবি মেনে নিতে মোটেই রাজি নন এ কারণে যে, আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্যগুলো প্রমাণের জন্য মুতাকাল্লিমদের 'প্রমাণীকরণ' পদ্ধতিই একমাত্র পথ, অন্য কোনভাবেই সেগুলো প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের 'প্রমাণীকরণ' পদ্ধতি ও উপাদানগুলো নির্ভুল হলেও এ ধারণা অবশ্যই ভুল যে, সেগুলো ছাড়া আর কোন প্রমাণীকরণ পদ্ধতি ও উপাদান নেই। কেননা অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, যে বিষয়ের 'ইলম ও জ্ঞান মানুষের জন্য অধিক প্রয়োজন তার পথ ও পন্থা, উপায় ও উপকরণও সেই অনুপাতে আল্লাহ পাক সহজ ও ব্যাপক করে দেন। এজন্যই স্রষ্টার অস্তিত্ব ও একত্ব, নবুওয়তের সত্যতা ও অপরিহার্যতার প্রমাণ নিদর্শন এত অধিক এবং সেগুলো আয়ত্ত করার পথ ও পন্থাও এত প্রচুর। আসলে বেশীর ভাগ লোকেরই কালামশাস্ত্রীয় যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। এমন লোকেরই সেগুলোর প্রয়োজন হয় যাদের অন্য কোন বিষয়ে জ্ঞান নেই কিংবা অন্য পথ ও পন্থাগুলো যারা এড়িয়ে চলে।[১]

শ্রেণী বিশেষের উপকার

অবশ্য ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) এ কথা স্বীকার করেন, মানসিক গঠন ও প্রকৃতিগত কারণে কালাম ও যুক্তিশাস্ত্রীয় প্রমাণীকরণ পদ্ধতিই কোন কোন লোকের জন্য অধিক উপযোগী। এ ছাড়া তাদের সন্তোষ ও তৃপ্তি হয় না। তাই বলে এর অর্থ এ নয় যে, জ্ঞান ও প্রত্যয় লাভের পথ মাত্র ঐ একটিই, বরং এ হলো এক ধরনের ' বৈকল্য' যা শিক্ষা, দীক্ষা, পরিবেশ ও বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার ফল। তিনি বলেন ঃ

> কিছু লোকের বেলায় 'প্রমাণীকরণ' পদ্ধতি ও উপাদানগুলো যত সূক্ষ্ম, জটিল ও দীর্ঘ হয় ততই তা তৃপ্তি ও সন্তোষের কারণ হয়। কেননা সূক্ষ্ম ও জটিল চিন্তা-ভাবনার অতলে দীর্ঘ ডুব দেওয়া তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। তাই প্রমাণ ও যুক্তির উপাদান অল্প হলে কিংবা সহজ ও বোধগম্য হলে তাদের মন তাতে আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট হয় না। এদের বেলায় কালাম ও যুক্তিশাস্ত্রীয় প্রমাণীকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে অবশ্য বাধা নেই। তবে

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন, পৃ. ২৫৫।

এজন্য নয়, কাঙ্খিত 'জ্ঞান ও প্রত্যয়'-এর ওপর তা নির্ভরশীল; বরং এ জন্যই যে, এটাই উপরিউক্ত শ্রেণীর মানসিক অবস্থার উপযোগী। কেননা সামান্য মেধার সাধারণ লোকদের জ্ঞাত ও বোধগম্য কোন বিষয় এদের সামনে পেশ করা হলে এরা ধরেই নেয় যে, এটা গুরুত্ব পাওয়ার মত কোন কথা নয় কিংবা এর বুদ্ধিবৃত্তিক কোন মূল্য নেই। স্বভাবগত কারণেই এরা এমন জটিল ও সূক্ষ্ম যুক্তি-প্রমাণ জানতে চায় যার আনুষঙ্গিক উপাদান হবে দীর্ঘ ও প্রচুর। এদের জন্য অবশ্যই উপরিউক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

যুক্তি প্রয়োগের কুরআনী পদ্ধতি অধিক হৃদয়গ্রাহী ও বিশ্বাস উৎপাদক

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর বিভিন্ন রচনায় অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, দীন ও শরীয়তের গায়েবী বিষয়সমূহ প্রমাণ করার ক্ষেত্রে কুরআনের 'যুক্তি প্রয়োগ' পদ্ধতি ও বর্ণনাভংগীই বলিষ্ঠতা ও হৃদয়গ্রাহিতার দিক থেকে সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট। তিনি লিখেছেন ঃ

> ঐশ্বরিক বিষয়াবলী প্রমাণের জন্য দর্শন ও কালামশাস্ত্রবিদদের উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণের তুলনায় কুরআনী যুক্তিগুলোই অধিকতর পুর্ণাংগ, প্রাঞ্জল ও মর্মস্পর্শী। তদুপরি দর্শন ও কালামশাস্ত্রবিদদের বড় বড় ভুল-বিচ্যুতি থেকেও আল্লাহ্‌র কালাম চিরপবিত্র।[১]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

> আল্লাহ্‌র রবূবিয়াত, ইলাহিয়াত, তাওহীদ, আল্লাহ্‌র 'ইল্‌ম, কুদরত, পুনরুত্থান ইত্যাদি ঐশী বিষয় প্রমাণ করার জন্য কুরআন যে সকল যুক্তি ও কিয়াস প্রয়োগ করেছে সেগুলোই হচ্ছে সর্বোত্তম 'ইলম এবং মানুষের নফ্‌স ও আত্মার পূর্ণতা লাভের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।[২]

আল্লাহর গুণাবলী ও সত্তা সম্পর্কে কুরআন ও দর্শনের মৌলিক পার্থক্য

আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাত তথা সত্তা ও গুণের বর্ণনায় কুরআন ও দর্শনের মৌলিক পার্থক্য নির্দেশ করে ইমাম ইবনে তায়মিয়া একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব আলোচনা করেছেন।

> আল্লাহ্‌র সিফাত ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে কুরআন সর্বদা বিস্তারিত বর্ণনার পথ গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে নেতিবাচক ক্ষেত্রে শুধু তামছীল বা সাদৃশ্য অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়েছে। যথা ঃ ليس كمثله شيء এটাই নবীদের পদ্ধতি অর্থাৎ ইতিবাচক ক্ষেত্রে 'সম্প্রসারণ' ও নেতিবাচক ক্ষেত্রে

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন, পৃ. ৩২১।
২. ঐ, পৃ. ১৫০।

'সংকোচন'। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের (গ্রীক দার্শনিকদের) নীতি হল, নেতিবাচক আলোচনায় তারা সর্বশক্তি ব্যয় করেন, অথচ ইতিবাচক দিকটি আলতোভাবে ছুঁয়ে যান শুধু।[১]

সমগ্র জীবনের ওপর গুণাবলী অস্বীকারের প্রভাব

সমগ্র গ্রীক গ্রন্থাগার ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে। সিফাত ও গুণাবলীর না-বাচক আলোচনা গ্রীক দার্শনিকদের কাছে এত অধিক গুরুত্ব পেয়েছে যে, শাব্দিক অর্থেই আল্লাহ্ একটি নিষ্ক্রিয়, অক্ষম ও কাল্পনিক অস্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ কে? কী তাঁর গুণাবলী? এ ধরনের ইতিবাচক আলোচনায় তাদের কাছে দু'চারটি অন্তঃসারশূন্য ও দুর্বোধ্য দার্শনিক পরিভাষা ছাড়া কিছুই নেই। ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, আল্লাহ্র সাথে গ্রীক দর্শনপূজারীদের প্রেমময় ও প্রাণবন্ত সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি কখনো। কেননা এমন সম্পর্কের জন্য আল্লাহর সিফাত ও গুণাবলীর উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য। অথচ দর্শন গোঁ ধরেছে সেগুলো অস্বীকার করার। পৃথিবীর গোটা বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস প্রমাণ করে, যে সত্তার কর্ম ও গুণাবলী সম্পর্কে মানুষের কোন ধারণা নেই, তার সাথে তার হৃদয় ও আত্মার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না কখনো। কোন সত্তার সাথে ভয় ও প্রেম, আশা ও প্রত্যাশা এবং চাওয়া ও পাওয়ার সম্পর্কের জন্য সিফাত ও গুণাবলীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, অথচ গ্রীক দর্শনে তা একেবারে অনুপস্থিত। ধর্ম ও মানব চরিত্র বিষয়ক ইতিহাসবিদদের মতে এ কারণেই আল্লাহ্ ও ধর্মের সাথে গ্রীকদের সম্পর্ক ছিল নামমাত্র ও ভাসা ভাসা। তাতে কোন প্রাণ ছিল না, ছিল না গভীর উত্তাপ ও নিবিড় উষ্ণতা। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) সত্যই বলেছেন, লক্ষ 'না'-একটি হাঁ-এর সমকক্ষ হতে পারে না। বস্তুত নিছক 'নফী' বা 'না'-এর ওপর কখনো ধর্ম ও জীবনের সুউচ্চ ইমারত গড়ে উঠতে পারে না। সম্ভবত এ কারণেই পাশ্চাত্যে গ্রীক দর্শন এবং প্রাচ্যে বৌদ্ধ ধর্ম আল্লাহ্র ধারণা ও বিশ্বাসের ওপর একটি আদর্শ মানব সমাজ গড়ে তুলতে মর্মান্তিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে এ দুই দর্শন দ্বারা প্রভাবিত সমাজের একটিতে মূর্তিপূজা এবং অন্যটিতে নাস্তিকতা এত সন্তর্পণে এমন জাঁকিয়ে বসতে পেরেছে। কেননা প্রেম ও ইবাদতের স্বভাব চাহিদা ও আবেগের অধিকারী সাধারণ মানুষের মন এমন দর্শনে কিছুতেই সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হতে পারে না যেখানে সবটুকু মনোযোগ নিয়োজিত হয় বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও দর্শন-বিলাসিতায়, যে দর্শনের কোন ভূমিকা নেই হৃদয় ও আত্মাকে প্রেম ও মুহব্বত এবং ভাব ও মা'রিফতের পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে।

---

১. আন-নুবুওয়াত, পৃ. ১৫৩

সাহাবা কিরাম (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে, কুরআন ও দর্শনের এ গুণগত পার্থক্যের কারণেই নবুওয়তের ছায়ায় ও নবী-সান্নিধ্যে দীক্ষাপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কিরাম (রা.) যে 'ইল্‌ম ও মা'রিফাত হাসিল করেছিলেন ব্যাপকতায়, পূর্ণতায় ও প্রত্যয়ের গভীরতায় তা ছিল তুলনাহীন। তাকাল্লুফ ও কৃত্রিমতার নাম-গন্ধ ছিল না তাতে। সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরবর্তীকালের দর্শন ও কালামশাস্ত্র প্রভাবিত লোকদের তুলনা করে ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

واصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مع انهم اكبر الناس علما نافعا وعملا صالحا اقل الناس تكلفا يصدر عن احدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة اومن المعارف ما يهدى الله به امة وهذا من من الله على هذه الامة وتجد غيرهم يحشون الاوراق من التكلفات والشطحات ما هومن اعظم الفضول المبتدعة والاراء المخترعة -

উত্তম ইলম ও উত্তম আমলের বিচারে সর্বোত্তম হওয়া সত্ত্বেও সাহাবা-ই কিরাম (রা) তাকাল্লুফ ও বাহ্যিকতা দোষ থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন। একজন সাহাবীর মুখ থেকে হিকমত ও মারিফাতের এক-দু'টি শব্দ বের হতো আর তার বরকতে একেকটি জনপদের হিদায়াতের ফয়সালা হয়ে যেত। 'উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এটা আল্লাহ্ পাকের বিরাট নিয়ামত। পক্ষান্তরে অন্য লোকেরা কৃত্রিম ও অন্তঃসারশূন্য কথা দিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরে ফেলে, যা অপ্রয়োজনীয় আলোচনা ও নবউদ্ভাবিত মতামতের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়।[১]

ইসলামী বিশ্বে গ্রীক যুক্তিবাদের যাদুকরী প্রভাব

যুক্তিনির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ বিশদ সমালোচনার মাধ্যমে গ্রীক দর্শনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করার পর ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বহু কীর্তিত গ্রীক যুক্তিবাদের সমালোচনায়ও অবতীর্ণ হয়েছেন পূর্ণ সাহসিকতা ও আত্মপ্রত্যয়ের সাথে। মুসলিম মনীষীদের ওপর মান্তিক ও যুক্তিবাদের প্রভাব দর্শনশাস্ত্রের চেয়ে বেশী বই কম ছিল না। এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল ছিল, যুক্তিবাদ হলো আগাগোড়া বুদ্ধি দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত, নির্ভুল ও বিশুদ্ধ একটি শাস্ত্র যা সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের একটা নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। সাইয়েদ কুরতবীর বর্ণনা মতে, তৃতীয় শতকেই যুক্তিশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ ব্যাপক প্রসার লাভ করে। পঞ্চম

১. নাকযু'ল-মানতিক, পৃ. ১১৪।

শতকে ইমাম গাযালী (র)-ও যুক্তিশাস্ত্রকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন ঃ এ হচ্ছে যে কোন শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভের পূর্ব শর্ত, এমন কি তিনি তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ المستصفى-এর এক স্থানে এতদূর পর্যন্ত বলেছেন ঃ

هى مقدمة العلوم كلهاومن لا يحيط بها فلا ثقة بعلومه اصلا ـ

মানতিক হলো যাবতীয় 'ইলমের পূর্বশর্ত। এ শাস্ত্রে যার পর্যাপ্ত দখল নেই তার 'ইলমেরও কোন আস্থাযোগ্যতা নেই।[১]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

اما المنطقيات فاكثرها على منهج الصواب والخطاء نادر فيها وانما يخالفون اهل الحق فيها بالاصطلاحات والايرادات دون المعانى والمقاصد ، اذ غرضها تهذيب طرق الاستدلالات ذالك مما يشترك فيه النظار ـ

যুক্তিশাস্ত্রীয় নিয়ম ও সূত্রসমূহের অধিকাংশই নিখুঁত ও নির্ভুল। খুঁত ও ত্রুটি তাতে খুবই বিরল। গ্রীক যুক্তিবাদীদের সাথে হক্কানী 'আলিমদের বিরোধ মূলত পারিভাষিক ও গৌণ, মৌলিক ও উদ্দেশ্যগত কোন বিরোধ নেই। কেননা এ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হলো প্রমাণ ও যুক্তি প্রয়োগের কর্মকাণ্ডকে 'ত্রুটিমুক্তকরণ'। আর এ বিষয়ে সকল চিন্তানায়কই একমত।[২]

সপ্তম শতকের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ইবনে রুশদের মানতিক প্রীতি এমন মাত্রাতিরিক্ত ছিল যে, তাঁর ধারণায় এটা হলো মানবীয় সৌভাগ্যের উৎস ও সত্যের মাপকাঠি। এ মাধ্যমকে উপেক্ষা করে হাকীকত ও 'সত্যের' নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। ইবনে রুশদের জীবনীকারের ভাষায় ঃ

كان متهوسا بمنطق ارسطو وقال عنه انه مصدر السعادة للناس وان سعادة الانسان تقاس بعلمه بالمنطق والمنطق اداة تسهل الطريق الشاقة فى الوصول الى الحقيقة التى لا يصل اليها العامة بل بعض الخاصة بفضل المنطق ـ

এ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবাদের তিনি অন্ধ প্রেমিক ছিলেন। তাঁর মতে, মানতিক ও যুক্তিবাদ হলো মানবীয় সৌভাগ্যের উৎস। কোন মানুষের সৌভাগ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হলে দেখতে হবে, যুক্তিশাস্ত্র সম্পর্কে কি পরিমাণ

১. আল-মুস্‌তাস্‌ফা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১০।
২. ঐ, পৃ. ৩।

জ্ঞান তার আছে। এ এমন এক মাধ্যম ও উপকরণ যা 'সত্যে' উপনীত হওয়ার দুরূহ পথকে সহজ করে দেয়। আর সত্যের নাগাল পাওয়া সাধারণ 'লোকের তো বটেই, অনেক বিশিষ্ট লোকের ভাগ্যেও জোটে না।[১]

মুসলিম মনীষীরা গ্রীক যুক্তিশাস্ত্র কৃতার্থ চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন এবং শাস্ত্রের প্রতিটি মূলনীতি, নিয়ম ও সূত্র দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রের সমালোচনা ও কাটা-ছেঁড়ার কাজ মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে হলেও কিছু না কিছু চলে আসছিল। কিন্তু আমাদের জানা মতে স্বতন্ত্রভাবে গ্রীক যুক্তিবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সমালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা কেউ বড় একটা উপলব্ধি করেন নি। ফলে এ বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ ও বিশদ আলোচনাপূর্ণ কোন গ্রন্থের খোঁজ পাওয়া যায় না।

যুক্তিজাত জ্ঞানের মানদণ্ড

ইবনে তায়মিয়া (র)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি যুক্তিশাস্ত্রকে স্বতন্ত্র বিষয় বস্তু রূপে গ্রহণ করেন এবং স্বাধীন ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে মুজতাহিদসুলভ সমালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের দুরূহ দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। এ বিষয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত রচনাকর্ম হলো نقض المنطق। এবং পূর্ণাংগ ও বিশদ রচনাকর্ম হলো الرد على المنطقيين। শেষোক্ত গ্রন্থে তিনি একাডেমিক ও শাস্ত্রীয় পর্যায়ে মানতিকের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা[২] করে দেখিয়েছেন, মুসলিম মনীষীরা শাস্ত্রটিকে যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন এবং যতটা নির্ভুল ও দৃঢ়মূল ধরে নিয়েছেন ততটা এর প্রাপ্য নয়। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) এ কথা মেনে নিতে মোটেই রাজি নন, যুক্তিবিদ্যাই হচ্ছে আকল ও বুদ্ধিজাত 'ইলমসমূহের বিশুদ্ধতার মাপকাঠি এবং নির্ভুল যুক্তি প্রয়োগ, সিদ্ধান্ত আহরণ ও নিশ্চিত জ্ঞান অর্জনের একমাত্র পথ। তিনি বলেন ঃ

যুক্তিবিদ্যাকে এরা আকল ও বুদ্ধিজাত জ্ঞানের মানদণ্ড মনে করে। তাদের মতে ছন্দবিদ্যা যেমন কাব্য বিষয়ের মাপকাঠি, ব্যাকরণশাস্ত্র যেমন ভাষাগত বিশুদ্ধতার রক্ষাকবচ এবং জ্যোতির্বিদ্যার যন্ত্রপাতি যেমন নির্ভুল সময় নির্ধারণের মাধ্যম, তেমনি যুক্তিশাস্ত্রের নিয়ম ও সূত্রসমূহ যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমেই চিন্তাশক্তিকে চিন্তাগত ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

---

১. তাবীজ ফালাসাফাতি'ল-ইসলাম, কৃত মুহাম্মদ লুতফী জুম'আ, পৃ. ১২০-১২১।

২. সম্প্রতি বইটি মাতবা' কায়্যিমা থেকে ছেপে এসেছে। এর ভূমিকা লিখেছেন মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী। বইটির কলেবর ৫৪৫ পৃষ্ঠা, শাস্ত্রবিশারদদের বইটি অবশ্যই পড়া দরকার।

এ দাবী বাস্তবানুগ নয়। কেননা আল্লাহ্ পাক আদম সন্তানের স্বভাবে যে বোধশক্তি গচ্ছিত রেখেছেন তার সাহায্যেই সে বুদ্ধিজাত 'ইলম ও জ্ঞান হাসিল করতে পারে। মানুষের তৈরী মানদণ্ডের ওপর তা নির্ভরশীল হতে পারে না। আরবী ভাষায় বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য 'অনুকরণ' ছাড়া উপায় নেই। কেননা এটা একটা জাতির নিজস্ব অভ্যাসের বিষয় যা সম্পূর্ণ শ্রবণ নির্ভর। সুতরাং সে নিয়ম-কানুনগুলো জানার একমাত্র মাধ্যম হলো 'ইসতিকরা' (সার্বিক অনুসন্ধান)। কিন্তু আকল ও বুদ্ধিজাত 'ইলমের ক্ষেত্রে কারো তাকলীদ বা অন্ধ অনুগমন চলে না। অনুরূপভাবে মাপ, ওজন, সংখ্যা কৃষ্টি ইত্যাদির ক্ষেত্রে মানদণ্ডের ইত্যাদির প্রয়োজন। গ্রীকশাস্ত্র উদ্ভাবনের পূর্বেও দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি 'বস্তু'-সমূহের 'হাকীকত বা মূল সত্য' সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করত। এমন কি আলোচ্য শাস্ত্র উদ্ভাবনের পরও অধিকাংশ জাতি নিজস্ব পদ্ধতিতেই তা করে আসছে এবং দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির অধিকাংশ জ্ঞানজীবীই 'মূল সত্য' সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য এ্যারিস্টটল প্রণীত 'নিয়ম ও সূত্র' শেখার প্রয়োজন বোধ করেন না। নিজেদের অবস্থা তলিয়ে দেখলে এরাও নিশ্চিত বুঝতে পারবেন, উক্ত মানব-প্রণীত শাস্ত্র ছাড়াই এরা হাকীকতসমূহের জ্ঞান অর্জন করে আসছে।[১]

যুক্তিশাস্ত্রীয় সংজ্ঞাসমূহের খুঁত ও ত্রুটি

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) যুক্তিবাদীদের এ, দাবীও মানতে রাজি নন, বিভিন্ন বিষয় ও বস্তুর যুক্তিশাস্ত্র প্রদত্ত সংজ্ঞা ও পরিচয়সমূহ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এমন নিখুঁত ও সর্বাংগীন যে, সে সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপনের কোন অবকাশই নেই। ইমাম সাহেবের ভাষায় ঃ

وصاروا يعظمون امر الحدود يد عون انهم هم المحققون لذالك وان ما يذكره غيرهم من الحدود انما هى لفظية لا تفيد تعريف الماهية والحقيقة بخلاف حدودهم ويسلكون الطرق الصعبة الطويلة والعبارات المتكلفة الها ئلة وليس لذلك فائدة الا تضيع الزمان واتعاب الا ذهان وكثرة الهذيان ودعوى التحقيق بالكذب والبهتان وشغل النفوس بما لا ينفعها ، بل قد يضلها عما لابدلها منه واثبات الجهل الذى هو اصل النفاق فى القلوب وان ادعوا انه اصل المعرفة والتحقيق .

---

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন, পৃ. ২৭-২৮।

যুক্তিবাদীরা যুক্তিশাস্ত্রীয় সংজ্ঞাসমূহের মহিমা কীর্তনে বড় তৎপর। নিজেদের তারা শাস্ত্রজ্ঞ বলে জাহির করে। তাদের দাবী হলো, যুক্তিবাদ বহির্ভূত 'আলিমদের সংজ্ঞাসমূহ নিছক শব্দসর্বস্ব। ফলে তা যুক্তিবাদীদের সংজ্ঞাসমূহের ন্যায় হাকীকত ও মাহিয়াতের (মূল সত্য ও সত্তার) জ্ঞান দান করে না। বস্তুত যুক্তিবাদীরা বড় দীর্ঘ ও দুর্গম পথে চলতে এবং কৃত্রিম ও ভয়ানক বাক্য বিস্তার করতে বেশ অভ্যস্ত। কিন্তু তাতে অযথা কাজে সময়ের অপচয়, মস্তিষ্কের ক্লান্তি ও প্রলাপোক্তির মাধ্যমে পাণ্ডিত্যের মিথ্যা দম্ভ প্রকাশ ছাড়া আর কোন সার্থকতা নেই; বরং সেগুলো বিভ্রান্তি ও মূর্খতা বিস্তারের মাধ্যমে হৃদয়ে মুনাফিকীর জন্ম দেয়, যদিও তাদের দাবী মতে এগুলো মা'রিফত ও সত্য উদ্‌ঘাটনের বুনিয়াদ।[১]

খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) প্রমাণ করেছেন, গ্রীক যুক্তিবিদ্যা মানুষকে দিয়ে পাহাড় কেটে 'তিনকা' বের করে আনার পণ্ডশ্রমই শুধু করায়। নাকযু'ল-মানতিক গ্রন্থে তিনি লিখেছেন ঃ

এটা সুস্পষ্ট, বাস্তব জ্ঞানহীন চরমপন্থীরাই শুধু যুক্তিশাস্ত্রের অপরিহার্যতার দাবীদার হতে পারে। খোদ যুক্তিবাদীরাও তো অন্যান্য শাস্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের নিয়ম ও সূত্রগুলো রক্ষা করেন না, বরং দীর্ঘসূত্রিতা, অর্থহীনতা, ত্রুটিপূর্ণতা, সংক্ষিপ্ততা ও দুর্বোধ্যতার কারণে তা এড়িয়ে যান। যুক্তিশাস্ত্রের কয়েকটি বিষয় তো রীতিমত পাহাড় কেটে তিনকা বের করে আনার শামিল।[২]

ভাষায় ও চিন্তায় যুক্তিবাদের প্রভাব

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে যুক্তিবাদের একটি বড় ক্ষতি হল এই যে, তাতে স্বভাবের সজীবতা, চিন্তার স্বচ্ছতা ও ভাষার স্বতঃস্ফূর্ততা আশংকাজনকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। তাই অতিমাত্রায় যুক্তিবাদীদের চিন্তা ও রচনায় এক ধরনের দুর্বোধ্যতা, জটিলতা ও বক্রতা পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী যুগে রচিত শাস্ত্রীয় 'মূল গ্রন্থ' ও পাঠ্যপুস্তকগুলো এ দাবীর সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। ইমাম সাহেবের ভাষায় ঃ

وما زال نظار المسلمين يعيبون طريق اهل المنطق ويبينون ما فيها من العى واللكنة وقصور العقل وعجز المنطق ويبينون انها الى افساد المنطق العقلى واللسانى اقرب منها الى تقويم ذالك -

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন, পৃ. ৩১।

২. নাকযু'ল-মানতিক, পৃ. ১৫৫।

গোড়া থেকেই মুসলিম মনীষীরা যুক্তিবাদীদের কর্মধারার প্রতিবাদে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে আসছেন, তাদের রচনা ও রসনা স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়ে জড়তাগ্রস্ত এবং চিন্তাশক্তি স্বাভাবিক গতি হারিয়ে রুদ্ধ হয়ে পড়ে। মোটকথা, যুক্তিবাদ চিন্তা ও ভাষার উৎকর্ষ সাধন ও শক্তি জোগানের চেয়ে তাকে ক্ষতিগ্রস্তই করে বেশী।[১]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

اذاتسعت العقول وتصوراتها اتسعت عباراتها واذاضاقت العقول والتصورات بقى صاحبها كانه محبوس العقل واللسان ، كما يصيب اهل المنطق اليونانى ، تجده من اضيق الناس علما وبيانا واعجزهم تصورا وتعبيرا ، ولهذا من كان منهم ذكيا اذا تصرف فى العلوم وسلك مسلك اهل المنطق طول وضيق وتكلف وتعسف وغايته بيان البين وايضاح الواضح من العى وقد يوقعه ذالك فى انواع من السفسطة التى عافى الله بها من يسلك طريقه -

বুদ্ধি ও চিন্তাধারায় ব্যাপ্তি ঘটলে ভাষা ও রচনায়ও সে ব্যাপ্তির ছাপ পড়ে। পক্ষান্তরে বুদ্ধি ও চিন্তাধারায় সংকীর্ণতা দেখা দিলে মনে হবে ভাষা ও চিন্তাগত দিক থেকেও যেন সে রুদ্ধ হয়ে পড়েছে, গ্রীক যুক্তিশাস্ত্র-প্রেমিকদের বেলায় সাধারণত যেমন হয়ে থাকে। তুমি নিজেই দেখতে পাবে, জ্ঞান ও ভাষা এবং চিন্তা ও প্রকাশের দিক থেকে তারাই সর্বাধিক দুর্বল ও সংকীর্ণতাগ্রস্ত। এজন্যই তাদের হুশিয়ার লোকেরাও অন্যান্য শাস্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের পাল্লায় পড়ে দীর্ঘসূত্রিতা, দুর্বোধ্যতা ও জটিলতার দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েন। বড় জোর জ্ঞাত বিষয়কে পুনরায় বর্ণনা করা এবং স্পষ্ট বিষয়কে অধিকতর স্পষ্ট করার কৃতিত্বটুকু তারা পেতে পারেন। যুক্তিবাদের অপপ্রভাবে তাদের চিন্তা ও মেধা এবং ভাষা ও রচনা তালাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কখনো-বা সংশয়বাদ ও বস্তুর 'সত্য' অস্বীকার করার বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যুক্তিবাদীদের পথ যারা এড়িয়ে চলে তারাই শুধু এ বাতিক থেকে বেঁচে থাকতে পারে।[২]

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন, ১৯৪ পৃ.।

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন, ১৬৭ পৃ.।

কিছু ব্যতিক্রম

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র দৃষ্টিপথে এমন কিছু ব্যক্তিত্বও রয়েছেন গ্রীক শাস্ত্র-চর্চায় শীর্ষ মর্যাদা লাভ করা সত্ত্বেও যাঁরা প্রাঞ্জল, সাবলীল ও প্রাণবন্ত রচনার কারণে উচ্চ স্তরের সাহিত্যিক স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছেন। যেমন, দর্শন ও যুক্তিবাদের দিকপাল ইবনে সীনার কাসীদাগুলোকে উচ্চাঙ্গ আরবীর উত্তম নমুনা মনে করা হয়, এমন কি তাঁর অন্যান্য রচনাতেও আরবী ভাষার সুষমা ও অলংকার সৌন্দর্যের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে, যা গ্রীক শাস্ত্রসেবীদের রচনাবলীতে বড় একটা নজরে পড়ে না। ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে, এটা মূলত ইসলামী সাহিত্যের সাথে নিবিড় সম্পর্ক এবং ইসলামী শাস্ত্রসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষার বরকত ও সুফল। ইবনে সীনার বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন ও ঘটনাবলী এ ধারণার সত্যতাই প্রমাণ করে। ইবনে তায়মিয়া (র)-র ভাষায় ঃ

ومن وجد فى بعض كلامه فصاحة وبلا غة كما يوجد فى بعض كلام ابن سينا وغيره فلما استفاده من المسلمين من عقولهم والسنتهم والا فلو مشى على طريقة سلفه واعرض عما تعلمه من المسلمين لكان عقله ولسانه يشيه عقولهم والسنتهم ـ

ইবনে সীনা প্রমুখ দার্শনিকদের রচনাবলীতে যে অলংকার ও সৌকর্য পরিলক্ষিত হয় সেটা মূলত মুসলিম মনীষা ও সাহিত্য থেকে রসদ সংগ্রহেরই সুফল। তিনিও যদি পূর্বসূরীদের পথ ধরে চলতেন এবং মুসলিম মনীষীদের কাছ থেকে কিছুই না শিখতেন তাহলে তাঁর চিন্তা ও সাহিত্যও পূর্বসূরীদের মতই সংকীর্ণ ও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ত।[১]

মানতিক সম্পর্কে সামগ্রিক মন্তব্য

বিস্তৃত সমালোচনা ও পর্যালোচনার পর যুক্তিবাদ সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সামগ্রিক মন্তব্য তাঁর নিজের ভাষায়-ই শুনুন ঃ

فحقه النافع فطرى لا يحتاج اليه وما يحتاج اليه ليس فيه منفعة الا معرفة اصطلاحهم وطريقهم وخطأهم ـ

যুক্তিবাদের যতটুকু অংশ বিশুদ্ধ ও উপকারী তা স্বভাবজাত। সুতরাং বিশুদ্ধ স্বভাবের অধিকারী ব্যক্তির তা শেখার প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে প্রয়োজনীয় অংশটুকুর সুফলও শুধু এই যে, শাস্ত্রকারদের পরিভাষা, তাদের প্রমাণীকরণ পদ্ধতি কিংবা তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অবগতি লাভ ঘটে।[২]

---

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতিকয়্যীন, ১৯৯ পৃ.।
২. প্রাগুক্ত, ২০১ পৃ.।

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

انی کنت دائما اعلم ان المنطق الیونانی لا یحتاج الیه الذکی ولاینتفع به البلید ـ

সব সময়ই আমার বিশ্বাস ছিল, ধীমানদের জন্য গ্রীক যুক্তিবিদ্যার কোন প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে বুদ্ধিবঞ্চিত ব্যক্তিরা তা থেকে কোন উপকার লাভ করতে পারবে না।[১]

যুক্তিবিদ্যার প্রাপ্য স্থান ও মর্যাদা

গ্রীক যুক্তিবাদ সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সমালোচনায় কিছুটা অতিরঞ্জন ও প্রান্তিকতার ছাপ আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু পঞ্চম শতকের পর থেকে গোটা মুসলিম জাহানে গ্রীক যুক্তিবাদ যে যাদুকরী প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং চিন্তা ও মস্তিষ্ক যুক্তিবাদরূপী দেবতার সামনে যেভাবে প্রণত হয়ে পড়েছিল তাতে বড় ধরনের ফাটল ধরানোর জন্য এমন মারমুখী সমালোচনারই প্রয়োজন ছিল। আমাদের শিক্ষাঙ্গন ও মাদ্‌রাসা মহলে যুক্তিবাদের প্রতি কেন অনুরাগ ও সংবেদনশীলতা বিদ্যমান ছিল তা বুঝতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে, যাবতীয় জ্ঞান, প্রজ্ঞা, স্বভাব, মেধা ও প্রতিভা সত্ত্বেও যুক্তিবিদ্যায় সনদ নেই এমন ব্যক্তিকে মূর্খ ও নির্বোধ মনে করা হতো। দর্শন ও যুক্তিবাদ সুদীর্ঘ কাল ধরে ভারতবর্ষে মেধা ও প্রজ্ঞার শাস্ত্ররূপে পরিচিত ছিল। এ ধরনের অতিরঞ্জন ও অতিভক্তির প্রতিক্রিয়াও অত্যন্ত তীব্র হওয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক। কেননা তীব্র প্রতিক্রিয়ার পথ ধরেই একটি ভারসাম্যপূর্ণ মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটতে পারে এবং সেটাই ছিল ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র উদ্দেশ্য। তাই এত কড়া সমালোচনার পরও আমরা তাঁকে বলতে শুনি, চিন্তার ব্যায়াম ও বুদ্ধি-চর্চার মাধ্যমে যুক্তিবিদ্যা মানুষের মেধা ও বোধকে ধারালো করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। এতে কোন সন্দেহ নেই এবং শাস্ত্রটাকে এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখা হলে ক্ষোভ কিংবা আপত্তিরও কোন অবকাশ নেই। ইমাম সাহেবের ভাষায় ঃ

وایضا فان النظر فی العلوم الدقیقة یفتق الذهن ویدربه به ویقویه علی العلم فیصیر مثل کثرة الرمی بالنشاب ورکوب الخیل تعین علی قوة الرمی والرکوب وان لم یکن ذالك وقت قتال ، وهذا مقصد حسن ـ

এটা ঠিক যে, জটিল শাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন মেধাকে বিকশিত ও পরিপক্ব করে এবং জ্ঞান আহরণে শক্তি যোগায়। যেমন তীরন্দাযী ও অশ্ব চালনার

১. ঐ :

অনুশীলনের ফলে নিশানা পাকা হয় এবং অশ্বারোহণ সহজ হয়। আর যুদ্ধকালীন ছাড়াও মানুষ এগুলো অভ্যাস করে। এটা অবশ্যই মহৎ উদ্দেশ্য।[১]

কিন্তু অতি উৎসাহীরা এ শাস্ত্রকে যেভাবে মাধ্যমের পরিবর্তে উদ্দেশ্যের আসনে বসিয়েছে এবং 'ইলমের সহায়ক থেকে মূল ইলমের মর্যাদায় আসীন করেছে তাতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও ইনসাফপ্রিয় যে কোন ব্যক্তি দ্বিমত পোষণ করতে বাধ্য হবে।

দীন ও ইলাহ সংক্রান্ত তত্ত্ব ও 'সত্য' বর্ণনায় যুক্তিবাদের দৈন্য

দর্শন ও যুক্তিবাদ সম্পর্কে গোড়া থেকেই একটি অতিরঞ্জিত মনোভাব কাজ করছে। অর্থাৎ বুদ্ধিজাত 'ইলমের ন্যায় দীন ও ইলাহ সংক্রান্ত 'ইলমের ক্ষেত্রেও শাস্ত্রদ্বয়ের নিয়ম ও সূত্রগুলোকেও চূড়ান্ত মানদণ্ডের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। মুসলিম মনীষীদের এ বুদ্ধিবৃত্তিক পদস্খলন ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র নজর এড়ায় নি। বেশ জোরালো ভাষায় এ আত্মঘাতী মনোভাবের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলছেন ঃ যুক্তিবাদকে বিচারকের মর্যাদা দাও, আপত্তি নেই। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীতে তাকে অবশ্যই আবদ্ধ রাখতে হবে। দীনী তত্ত্ব ও সত্যকেও উক্ত মানদণ্ডে যাচাই করার অর্থ হলো লোহা ও পাথর মাপার দাঁড়িপাল্লা দিয়ে সোনা-চাঁদি মাপার নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শন। নাকযু'ল-মানতিক গ্রন্থে তিনি লিখেছেন ঃ

> এটাতো স্বীকৃত সত্য যে, কাঠ, সীসা ও পাথর মাপার দাঁড়িপাল্লা দিয়ে সোনা চাঁদি মাপা সম্ভব নয়। অর্থ ব্যবস্থায় সোনা-চাঁদির যে মূল্য ও গুরুত্ব, সকল জাগতিক 'ইলমের তুলনায় নবীদের বর্ণিত গায়েবী তত্ত্ব ও সত্যের মূল্য ও গুরুত্ব তার চেয়ে বহু গুণ বেশী। তোমাদের উদ্ভাবিত যুক্তিবাদ সেগুলোর সত্যাসত্য নির্ধারণের মাপকাঠি হতে পারে না। কেননা এ দাঁড়িপাল্লায় অজ্ঞতা ও অবিচার উভয় দোষ বিদ্যমান অর্থাৎ দীনী ও গায়েবী বিষয়গুলোর ওজন তথা মর্যাদা ও প্রকৃতি সম্পর্কে যুক্তিবাদীরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং সেগুলোর হাকীকত বর্ণনা করার যোগ্যতা তাদের নেই। অন্য দিকে সত্য প্রমাণিত হওয়ার পরও তা স্বীকার করে নিতে তারা অভ্যস্ত নয়। সুতরাং তারা অবিচারক, অথচ এ এমন এক সত্য, মানুষের কাছে যার কোন বিকল্প নেই এবং মানব জাতির সৌভাগ্য ও সফলতা যার ওপর নির্ভরশীল।[১]

---

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতিকিয়ীন, পৃ ২৫৫

১. নাকযু'ল-মানতিক, পৃ. ১৬৪।

নবম শতকের স্বভাব-শুদ্ধ 'আলিম ও সমালোচক 'আল্লামা ইবনে খালদুনের একটি উদ্ধৃতি এখানে পেশ করা আশা করি অসংগত হবে না। কেননা তার উদ্ধৃতিতেও একই ভাব ও বক্তব্য বিধৃত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, স্বভাবশুদ্ধতার কারণেই দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন সময়ের মানুষও অভিন্ন সত্যে উপনীত হতে পারে এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় পূর্ণ সাদৃশ্য সৃষ্টি হতে পারে। দেখুন না, ইমাম ইবনে তায়মিয়ার মত 'আল্লামা ইবনে খালদুনও 'আকল ও বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা ও দীনী ও গায়েবী তত্ত্ব ও সত্য অনুধাবনে আকলের অক্ষমতার কথা কেমন সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর এক লেখায় ঃ

> 'আকল একটি নির্ভুল নিক্তি। সুতরাং তার সিদ্ধান্তগুলো সুনিশ্চিত সত্য। ভুলের কোন অবকাশ নেই তাতে। কিন্তু এ নিক্তিগুলো তুমি যদি তাওহীদ, আখেরাত, নবুওত এবং আল্লাহ্ ও তাঁর সিফাতসহ আকল ও বুদ্ধি-উর্ধ্ব তত্ত্ব ও সত্যগুলো মাপতে চাও তাহলে হবে তা পণ্ডশ্রম। যেমন, সোনা মাপার নিক্তি দেখে কারো সেটা ভারি পছন্দ হলো আর অমনি তার মগজে সেটা দিয়ে পাথর মাপার আগ্রহ চাপল। আগ্রহের আতিশয্যে একবারও সে ভাবল না ব্যাপারটা কত অসম্ভব! এতে কিন্তু নিক্তির বিশুদ্ধতায় কোন হেরফের হয় না। কেননা সব কিছুরই সামর্থ্যের একটা সীমা আছে। তদ্রূপ 'আকলের কর্মক্ষমতারও একটা সীমা আছে যা সে কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করে যেতে পারে না। আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাত তথা গুণ ও সত্তাকে 'আকল বেষ্টন করতে পারে না। কেননা আকল হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিশাল সৃষ্টি জগতের একটি ক্ষুদ্র কণামাত্র।[১]

যুক্তিবাদের বিশদ শাস্ত্রীয় সমালোচনা এবং ইবনে তায়মিয়া (র)-র ইজতিহাদ ও সংযোজন

যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে কিছু মৌলিক আপত্তি উত্থাপন ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করেই ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) ক্ষান্ত হননি বরং একজন মুজতাহিদের দৃষ্টিতে গোটা শাস্ত্রের আগাগোড়া বিচার-বিশ্লেষণ ও বিশদ সমালোচনা-পর্যালোচনার ঐতিহাসিক দায়িত্বও তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে। শাস্ত্রের বহু স্বীকৃত উসূল ও সূত্রের ভ্রান্তি প্রমাণকল্পে তিনি নিরেট শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত যুক্তিনির্ভর ও সারগর্ভ আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন সংজ্ঞার খুঁত ও দুর্বলতা তুলে ধরে নিখুঁত ও সর্বাংগীন বিকল্প সংজ্ঞা পেশ করেছেন। সেই সাথে বহু কাযিয়া ও তার বিন্যাস সম্পর্কে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। সর্বোপরি এ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবাদের মূল ভিত্তি কিয়াস (যুক্তিভিত্তিক

---

১. মুকাদ্দিমা ইবনে খালদূন, ৪৭৩ পৃষ্ঠা।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রণালী)-এর তুলনায় ইসতিকরা তথা সার্বিক অনুসন্ধানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে তিনি বলেছেন, জ্ঞান ও প্রত্যয় লাভের এটা হচ্ছে সহজ, স্বাভাবিক ও নিরাপদ পন্থা। দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রে নতুন সৃষ্টি ও সংযোজন তখন অসম্ভব মনে করা হতো। কিন্তু উভয় শাস্ত্রে বেশ কিছু নতুন ধারণা ও মতবাদ সংযোজনের মাধ্যমে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) প্রমাণ করেছেন, মানবরচিত শাস্ত্রে শেষ কথা বলে কিছু নেই। মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী মরহুম 'আর-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন' গ্রন্থের ভূমিকায় ইমাম সাহেবের এ অনন্য কীর্তি আলোচনা প্রসংগে লিখেছেন ঃ

> গভীর মনোযোগ ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে বইটি পড়লে দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্র সংক্রান্ত এমন কিছু আলোচনা আপনি পাবেন ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র নিজস্ব উদ্ভাবন ও আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকদের গবেষণা ও মতবাদের সাথে যেগুলো পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। যেমন, মুসলিম যুক্তিবাদীরা এ্যারিস্টটলের অনুকরণে বরাবর দাবী করে এসেছেন, كليات (বিধি ও সূত্রসমষ্টি)-ই হলো জ্ঞান ও প্রত্যয় লাভের বুনিয়াদ। استقراء (অনুসন্ধান প্রণালী) নয়। ফলে কোন কোন ইংরেজ লেখক সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ যুক্তিবাদী মিল (?)-কেই 'ইসতিক্‌রা' প্রণালীর আধুনিক যুক্তিবিদ্যার ভিত্তি স্থাপনকারী বলে দাবী করেছেন, অথচ মিল-এর জন্মের কয়েক শ' বছর আগেই ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) ইসতিকরা-এর পক্ষে জোরালো যুক্তি পেশ করে গেছেন।

বুদ্ধিজাত জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুকরণ বৈধ নয়

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) অনুভব করলেন, তাঁর বিরোধিতা ও সমালোচনার জবাবে প্রতিপক্ষ হয়ত বলবে, কয়েক প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ মেধা ও প্রতিভার সম্মিলিত ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে সুপ্রাচীন গ্রীক শাস্ত্র ক্রমান্বয়ে আজ উৎকর্ষ ও পূর্ণতার এমন পর্যায়ে এসে পৌছেছে, ভুল-ত্রুটির আশংকা তাতে নেই বললেই চলে। সুতরাং পরবর্তীদের আপত্তি ও সমালোচনার অর্থ বুদ্ধিবৃত্তিক দুঃসাহস ও সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) এ ধরনের হীনমন্যতাকে প্রশ্রয় দিতে রাজি নন। সুস্পষ্ট ভাষায় তাই তিনি বলে দিয়েছেন, যেহেতু গ্রীকশাস্ত্র নিছক বুদ্ধিজাত শাস্ত্র এবং যেহেতু ব্যাপক অধ্যয়ন ও চিন্তা-গবেষণাই এগুলোর ভিত্তি, সেহেতু অন্ধ অনুকরণের কোন অবকাশ এখানে নেই। খোদ শাস্ত্রকাররাও তাদের শাস্ত্রকে ওহী বা অন্য কোন ঐশী সূত্রযোগে লোকপ্রাপ্ত বলে দাবী করেন নি। তাদের মতেও আকল ও বুদ্ধিই হচ্ছে আলোচ্য শাস্ত্রসমূহের উৎস। সুতরাং দেশ-কাল নির্বিশেষে সকল চিন্তা-নায়কেরই অধিকার আছে সমালোচনার কষ্টি পাথরে

সেগুলোর ভুল-শুদ্ধ পরখ করে দেখার এবং পূর্ববর্তীদের কোন সিদ্ধান্ত বুদ্ধিবিরোধী মনে হলে নির্দ্বিধায় তা প্রত্যাখ্যান করার। الرد على المنطقيين-এর এক স্থানে তিনি কতিপয় দিকপাল যুক্তিবাদীর নিম্নোক্ত মন্তব্য উল্লেখ করেছেন ঃ

> এ এমনই পরীক্ষিত শাস্ত্র যা হাযার বছর ধরে শ্রেষ্ঠ মেধা ও প্রতিভার সযত্ন অনুশীলন ও পরিশীলনে গড়ে উঠেছে এবং প্রতি যুগের জ্ঞানী-গুণীরা তা গ্রহণ করে এসেছেন।

অতঃপর এ মন্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা নাকচ করে দিয়ে ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

هب ان الامر كذالك ، فهذه العلوم عقلية محضة ليس فيها يجوز ان تصحح بالنقل تقليد لقائل وانما تعلم بمجرد العقل فلا بل ولايتكلم فيها الابالمعقول المجردفاذادل المعقول الصريح على بطلان الباطل منها لم يجز رده، فان اهلها لم يدعوا انها ما خوذة عمن يجب تصديقه بل عن عقل محض فيجب التحاكم فيهاالى موجب العقل الصريح -

> তাদের দাবী না হয় মেনে নেয়া গেল। কিন্তু শাস্ত্রগুলো যে নিছক বুদ্ধিজাত তাতে তো কারো দ্বিমত নেই। তাহলে এ সকল ক্ষেত্রে বুদ্ধি প্রয়োগের পরিবর্তে অনুকরণের বৈধতা কোথায়? সুতরাং কারো উদ্ধৃতি ও মতামতের সাহায্যে নয়, বরং বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকেই আলোচনা চলবে এবং সত্য-মিথ্যার মীমাংসা হবে অর্থাৎ সুস্পষ্ট কোন যুক্তি শাস্ত্রীয় সুত্র-সিদ্ধান্তকে যদি ভ্রান্ত প্রমাণিত করে তাহলে কোন অজুহাতেই বুদ্ধির দাবীকে অগ্রাহ্য করা যাবে না। কেননা খোদ যুক্তিবাদীরাও দাবী করেন নি যে, অপরিহার্য আনুগত্যের অধিকারী কোন ব্যক্তির মাধ্যমে এ শাস্ত্র প্রাপ্ত। তারাও স্বীকার করেন, বুদ্ধিই হচ্ছে আলোচ্য শাস্ত্রের উৎস। সুতরাং মুক্তবুদ্ধির যাবতীয় সিদ্ধান্ত দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয়াই হবে জরুরী।[১]

মুসলিম জাহানে বুদ্ধিজাত জ্ঞান-চর্চায় স্থবিরতা ও ইবনে তায়মিয়ার কর্মের গুরুত্ব

ইবনে তায়মিয়া (র) ঠিকই বলেছেন, বুদ্ধিজাত শাস্ত্রকে বাধ্যতামুলক-ভাবেই বুদ্ধির গণ্ডীতে অবস্থান করতে হবে, উদ্ধৃতিনির্ভর হওয়া চলবে না [illegible]তুতেই। কিন্তু ইসলামী জাহানের শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্গনে এমনই অবক্ষয় ও

১. আ[illegible] 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন, পৃষ্ঠা ২০৮

স্থবিরতা দেখা দিল যে, মুসলিম মেধা সৃষ্টিধর্মী কাজ ছেড়ে দিয়ে উচ্ছিষ্ট ভোজনে মেতে উঠল। দর্শন ও যুক্তিবাদীদের অবস্থাও ভিন্ন ছিল না। পূর্বসূরীদের রচনা ও গবেষণা কর্মের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য দানই তাদের দৃষ্টিতে ছিল শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। ফলে বুদ্ধিনির্ভর শাস্ত্র পরিণত হলো উদ্ধৃতিনির্ভর শাস্ত্রে। পূর্বসূরীদের ভাব ও বক্তব্য সবচে' কম শব্দে পরিবেশন করতে পারাই ছিল উত্তরসুরিদের জ্ঞানের শেষ দৌড়। মোটকথা, প্রাচ্যের সেই চরম অবক্ষয়ের যুগে দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রে ইজতিহাদ ও নব সংযোজন তথা সৃষ্টিধর্মী অবদানের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইউরোপের অবস্থা ছিল ভিন্ন। ইবনে সীনা, ইবনে রুশদ প্রমুখ মুসলিম মনীষাদের মাধ্যমে গ্রীক দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রের ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার লাভ করার পর কিছুদিন তারা তা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু যথাসময়ে স্বাধীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা কর্মে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফলে গ্রীক দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রের চেহারাই পাল্টে গেল। কিয়াস (যুক্তি প্রণালী)-এর পরিবর্তে ইস্‌তিকরা (অনুসন্ধানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রণালী)-এর ওপর যুক্তিবিদ্যার বুনিয়াদ রাখা হলো। সর্বোপরি জীবন যুদ্ধের সাথে প্রায় সম্পর্কহীন অতিপ্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ঈশ্বরতত্ত্বের চেয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানই সর্বাধিক গুরুত্ব পেল। এই চিন্তা-বিপ্লব শুধু কেবল ইউরোপকে নয়, গোটা মানব সভ্যতাকেই বিপুলভাবে প্রভাবিত করল। পক্ষান্তরে আমাদের প্রাচীনপন্থী বুদ্ধিজীবী মহল ও বিদ্যাপীঠগুলো প্রাচ্যের গ্রীক শাস্ত্রসেবীদের রচিত ব্যাখ্যা ও টীকা গ্রন্থসমূহ এমনভাবে আঁকড়ে থাকল যে, চিন্তা-গবেষণার জগতে সেটাই যেন শেষ কথা! এমন পরিবেশে গ্রীক দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র ইজতিহাদ, স্বাধীন সমালোচনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যালোচনা ইতিহাসের গতিপথে নিঃসন্দেহে একটি মাইল ফলকের মর্যাদা লাভ করেছে এবং ইজতিহাদ ও গবেষণার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

অষ্টম অধ্যায়

বাতিল ধর্ম ফেরকাগুলোর আকীদা-বিশ্বাসের মুকাবিলা

প্রায় সকল বাতিল মাযহাব ও ফেরকার বিরুদ্ধেই ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) খড়গহস্ত ছিলেন। তাদের ভ্রান্ত 'আকীদা ও মতবাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদ ও মসিযুদ্ধেই কেটেছে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ। বস্তুত তাঁর রচনা-সমগ্রের খুব কম অংশই এমন পাওয়া যাবে যাতে কালামশাস্ত্রীয় আলোচনা ও তার্কিক পর্যালোচনা নেই। তবে এখানে আমরা খ্রিস্ট ধর্ম ও শিয়া মতবাদের বিরুদ্ধে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র কলম যুদ্ধের কথাই শুধু আলোচনা করতে চাই। কেননা এ উভয় ধর্ম ও মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি স্বতন্ত্র দু'টি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ[১] রেখে গেছেন। তদুপরি উভয়ের মাঝে একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্রও বিদ্যমান রয়েছে অর্থাৎ উভয় দলই অতিরঞ্জিত প্রেমের মহড়া দিতে গিয়ে নিজেদের গোমরাহী ডেকে এনেছে। সেদিকে ইঙ্গিত করেই রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা)-কে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

يهلك فيك اثنان محب غال ومبغض -

> দু'টি দল তোমাকে কেন্দ্র করে হালাক হবে। একদল হবে তোমার প্রতি অতিমাত্রায় প্রেম প্রদর্শনকারী আর অন্যদল হবে বিদ্বেষ পোষণকারী।

সর্বোপরি ইবনে তায়মিয়া (র)-র যুগে এ দু'টি ধর্ম ও মতবাদই শুধু জীবন্ত ও শক্তিশালী আন্দোলনরূপে সক্রিয় ছিল। সম্ভবত এ কারণেই ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) উভয়ের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে কলম ধরেছিলেন।

---

১. প্রথম গ্রন্থটি হলো الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح এতে খ্রিষ্ট ধর্মের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হলো منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية এটি মূল শিয়া মতবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে রচিত।

খ্রিস্ট ধর্ম খণ্ডন

মুসলিম জাহানে খ্রিস্টবাদের নতুন আন্দোলন

মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক অধঃপতনের সুযোগে বিভিন্ন অঞ্চলের বাতিল ধর্ম ও মতবাদগুলো নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এর মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যালঘু ধর্ম হিসাবে খ্রিস্টবাদই সবচেয়ে বেশী সাহস ও কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করল। মিসর ও সিরিয়াসহ বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলে খ্রিস্টানরা বিপুল সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল। সেই সাথে তাদের রাষ্ট্র শক্তি ছিল সিরিয়ার সীমান্ত সংলগ্ন। হিজরী পঞ্চম শতকের শেষ ভাগে সিরিয়া ও ফিলিস্তীন অঞ্চলে ইতিহাসখ্যাত ক্রুসেড নামে ইউরোপীয়দের সশস্ত্র হামলার এসব যুদ্ধে সিরিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে গেল। ফলে সুদীর্ঘ নব্বই বছর ধরে বায়তুল মুকাদ্দাসের ওপর খ্রিস্টান শক্তির দখল ও খবরদারী কায়েম ছিল। হিত্তীন যুদ্ধে খ্রিস্টান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করলেও সিরিয়ার উপকূলে একটি খ্রিস্টান সীমান্ত রাজ্য বহাল তবিয়তে বিদ্যমান ছিল। সিরিয়াকে তারা পুনরায় খ্রিস্টবাদ ও ক্রুসেডের ছায়াতলে ফিরিয়ে আনার খা'ব দেখতে শুরু করেছিল। তাতারী হামলা একদিকে মুসলিম শক্তিকে আধমরা করে ফেলেছিল। অন্যদিকে খ্রিস্টবাদীদের মরা দেহে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিল। ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নতুন উদ্যমে তারা জেগে উঠল। এ সিরিজের প্রথম খণ্ডে আমরা বলে এসেছি, ৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাতারীদের দামিশ্‌ক বিজয়ের মুহূর্তে খ্রিস্টান অধিবাসীরা হানাদার বাহিনীকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাগত জানিয়েছিল। মূল্যবান উপহার-উপঢৌকন নিয়ে তাদের বরণ করেছিল, এমন কি ক্রুসেড মাথায় নিয়ে মিছিল করে সদম্ভ শ্লোগান দিয়েছিল ঃ প্রভু যিশুর ধর্ম বিজয়ী হলো।[১]

الجواب الصحيح - গ্রন্থ প্রণয়ন

খ্রিস্টান পাদ্রীরা মুসলিম আলিমদের সাথে ধর্মালোচনা কালে খ্রিস্টবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণকল্পে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করত। আর মুসলিম আলিমগণ সেগুলোর জবাব দেয়ার সাথে সাথে খ্রিস্ট ধর্মের ভুল-বিচ্যুতিগুলো তুলে ধরতেন। এই ধারাবাহিকতার এক পর্যায়ে সাইপ্রাসের খ্রিস্টান পাদ্রীদের লেখা একটি বিতর্ক গ্রন্থ সিরিয়ায় এসে পৌছল। তাতে যুক্তি ও উদ্ধৃতি উভয়ের সাহায্যে খ্রিস্ট ধর্মের 'আকীদা-বিশ্বাসগুলোর সারবত্তা প্রমাণের অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল, এমন কি সীমাহীন ধৃষ্টতার সাথে এ দাবীও করা, হয়েছিল যে, মুহাম্মদ (সা) আরবের নবী, বিশ্বের নবী নন; আরব জাতির জন্যই তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। সুতরাং খ্রিস্টান

১. বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড।

তথা অন্য জাতির জন্য তাঁর ওপর ঈমান আনা জরুরী নয়। দামেশকের ধর্মীয় ও সুধী মহলে সম্ভবত বইটি বেশ গুরুত্ব লাভ করেছিল। খ্রিস্টান পাদ্রীদের এ অমার্জনীয় ধৃষ্টতার সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য এমন এক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল, দর্শন, কালাম ও সকল বাতিল মতবাদ সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের সাথে সাথে বাইবেল ও খ্রিস্টবাদের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসও যাঁর নখদর্পণে রয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-ই ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি। সবার অনুরোধে তাই তিনি কলম ধরলেন এবং الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح নামে চার খণ্ডের বিশাল কলেবরের এমন আলোড়ন সৃষ্টিকারী জওয়াব লিখলেন যা যথার্থভাবেই আলোচ্য বিষয়ে এক সমৃদ্ধ বিশ্বকোষের মর্যাদা লাভ করেছে এবং ইমাম সাহেবের রচনাসমগ্রেও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।[১]

বস্তুত ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র এ মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা, দৃষ্টির গভীরতা এবং জ্ঞান ও অধ্যয়নের ব্যাপকতার এক উজ্জ্বল প্রমাণ। ইমাম সাহেব তাঁর লেখায় ইসলামের পক্ষ সমর্থন ও সাফাই পেশ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং খ্রিস্ট ধর্মের ভিত্তিমূলেও কার্যকর হামলা চালিয়েছেন। নবুওয়তে মুহাম্মদীর সত্যতা ও সার্বজনীনতা প্রমাণের জন্য কালামশাস্ত্র ও বিতর্কবিদ্যার প্রাচীন ও গতানুগতিক যুক্তি-প্রমাণের পরিবর্তে এমন অভিনব যুক্তি-প্রমাণ তিনি পেশ করেছেন যা অধিক হৃদয়গ্রাহী ও ঈমান-উদ্দীপক। কোন সত্যসন্ধানী মানুষের পক্ষেই অতঃপর ইসলামের সত্যতা স্বীকার না করে উপায় নেই। সর্বোপরি খ্রিস্ট ধর্মের ইতিহাস ও কালামশাস্ত্র, খ্রিস্ট ধর্ম-পণ্ডিতদের জটিল ও দুর্বোধ্য বক্তব্য এবং শেষ নবীর সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের এত বড় ভাণ্ডার তিনি গড়ে তুলেছেন যে, বিরাট একটা গ্রন্থাগার চষে ফেলা ছাড়া তা সংগ্রহ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। সুপ্রসিদ্ধ মিসরীয় পণ্ডিত শায়খ মুহাম্মদ আবু যুহরা যথার্থ মন্তব্য করেছেন ঃ

وان هذا الكتاب اهدأ ما كتبه ابن تيمية فى الجدال وهو وحده جدير بان يكتب ابن تيمية فى سجل العلماء العاملين والائمة المجاهدين والمفكرين الخالدين ـ

১. ১৩৯৫ পৃষ্ঠার এই বইটি ১৩২২ হিজরী, মুতাবিক ১৯০৫ খৃ. শায়খ ফরজুল্লাহ বাকী কুরদী ও শায়খ মোস্তফা দামেশ্‌ক-এর তত্ত্বাবধানে মিসর থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র বিতর্ক বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটিই হচ্ছে সবচে' নম্র ও প্রশান্ত গ্রন্থ। আর এই একটিমাত্র গ্রন্থই কর্মবীর 'আলিম, মুজাহিদ, ইমাম ও অমর চিন্তানায়কদের পুণ্য তালিকার শীর্ষে তাঁর স্থান লাভের জন্য যথেষ্ট।[১]

এখন আমরা বিভিন্ন উদ্ধৃতির সাহায্যে আলোচ্য গ্রন্থের এমন সার-সংক্ষেপ পেশ করব যাতে ইমাম সাহেবের চিন্তা ও গবেষণার সারমর্ম পাঠক হৃদয়ংগম করতে পারেন।

খ্রিস্ট ধর্মে রোমীয় প্রতিমা পূজার অনুপ্রবেশ

যে সকল মুসলিম লেখক গবেষক খ্রিস্ট ধর্মের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন তাঁদের অধিকাংশ খোদ খ্রিস্ট ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কেই ছিলেন বেখবর। ফলে খ্রিস্ট ধর্মকে তাঁরা মৌলিকভাবে 'ঈসা (আ)-এর ওপর অবতীর্ণ আসমানী ধর্ম বলে ভুল করে বসেছিলেন। এভাবে খ্রিস্ট ধর্ম তাদের চোখে এমন মর্যাদা লাভ করেছিল যা তার মোটেই প্রাপ্য ছিল না। পক্ষান্তরে খ্রিস্ট ধর্মের ইতিহাস, ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের ওপর ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র গভীর দৃষ্টি থাকার কারণে এ সত্য তাঁর অজানা ছিল না যে, খ্রিস্ট ধর্ম হযরত 'ঈসা (আ)-এর শিক্ষা ও গ্রীক-রোমকদের শিরকী 'আকীদা- বিশ্বাস ও প্রতিমা-তত্ত্বের জগাখিচুড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। এই স্বচ্ছ ইতিহাস জ্ঞানের কারণেই সমসাময়িক খ্রিস্ট ধর্মের বিরুদ্ধে অন্য সমালোচকদের তুলনায় এমন নির্ভীক সাহসিকতার সাথে কলম ধরা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তিনি লিখেছেন ঃ

> রোমক ও গ্রীক জাতি প্রতিমাপূজক মুশরিক ছিল। উর্ধ্ব জাগতিক ও অধঃজাগতিক প্রতিমা-প্রতিকৃতির তারা পূজা করত। হযরত 'ঈসা (আ) তাদের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছানোর দায়িত্ব দিয়ে শিষ্যদেরকে সেসব দেশে পাঠালেন। শিষ্যদের অনেকে 'ঈসা (আ)-এর জীবদ্দশাতেই নির্দেশিত এলাকায় চলে গিয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ গিয়েছিলেন উর্ধ্বাকাশে তাঁর অন্তর্ধানের পর। প্রেরিত শিষ্যরা মূর্তিপূজকদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ডাকলেন। সে ডাকে সাড়া দিয়ে কিছু কিছু লোক আল্লাহ্‌র ধর্ম গ্রহণ করল এবং বেশ কিছুদিন সত্যের পথে অবিচল থাকল। পরে শয়তান তাদের কারো কারো অন্তরে হযরত 'ঈসা (আ)-এর দীনকে বিকৃত করার মন্ত্রণা দিল। এদের হাতেই হযরত 'ঈসা (আ)-এর শিক্ষা মুশরিকদের 'আকীদা-বিশ্বাসের সংমিশ্রণে এক নতুন ধর্মের গোড়া পত্তন হলো।[২]

---

১. আল-জওয়াব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮।

১. ইবনে তায়মিয়া, পৃ. ৫৯৯।

অন্যত্র লিখেছেন ঃ

> নবীদের তাওহীদবাদী ধর্ম ও মুশরিকদের প্রতিমাবাদী ধর্ম। এ দু'টি (সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী) ধর্মের মিশ্রণে খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীরা তৃতীয় একটি ধর্মের গোড়া পত্তন করল। এ নতুন ধর্মের কিছু অংশ হলো নবীদের থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা আর বাকী অংশ হলো মুশরিকদের কাছ থেকে সংক্রামিত 'আকীদা ও বিশ্বাস। এভাবে তাদের হাতেই قانيم। বা 'ত্রি-সত্তা' শব্দটির সৃষ্টি হয়। নবীদের বাণী ও বক্তব্যে এ উদ্ভট ধারণার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে তারা আকৃতি ও কায়াবিশিষ্ট প্রতিমার স্থলে নিরাকার ও কায়াহীন প্রতিমা সৃষ্টি করে নিল। সেই সাথে চাঁদ, সূর্য ও তারকামুখী হয়ে নামায পড়া এবং বসন্তকালীন রোযা রাখার প্রচলন ঘটাল, যাতে শরীয়তের সাথে প্রকৃতির একটা যোগসূত্র সৃষ্টি হয়।

বর্তমান খ্রিস্টধর্ম কনস্টান্টাইনের আমলে গড়া

আরো এক ধাপ এগিয়ে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) দাবী করেন, খ্রিস্ট ধর্মের প্রথম যুগে পলের হাতেই এ ধর্মটির প্রাথমিক পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটেছিল। দ্বিতীয় বড় ধরনের পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটেছে চতুর্থ শতকের সুপ্রসিদ্ধ রোমক সম্রাট কনস্টান্টাইনের আমলে। তিনি ছিলেন প্রথম খ্রিস্টান রাষ্ট্রশক্তির স্থপতি। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

> পোপ ও ধর্মনেতাদের হাতে খ্রিস্ট ধর্মের 'আকীদা-বিশ্বাস ও বিধান প্রণয়নের কাজ চলতে থাকে। ক্রমে সম্রাট কনস্টান্টাইনের আমলে তিন শত আঠার জন প্রতিনিধির সম্মেলনে খ্রিস্ট ধর্মের সেই ঐতিহাসিক 'আইনপত্র' রচিত হয় এবং বিভিন্ন ফেরকা ও উপদল তা অনুমোদন করে। কিন্তু আরয়ূসীসহ কিছু সংখ্যক বিরোধী ধর্মনেতা দলীল রচয়িতাদের অভিশম্পাত করে বেরিয়ে আসেন। উক্ত আইনপত্রে এমন সব বিধান স্থান পেয়েছিল যার সাথে আসমানী কিতাবের কোন সম্পর্কই নেই বরং সেগুলো আগাগোড়া সকল আসমানী কিতাব ও জ্ঞান-বুদ্ধির সুস্পষ্ট বিরোধী।

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

> এই ধর্মীয় সমঝোতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তারা হযরত 'ঈসা (আ)-সহ সকল নবী ও রসূলের পথ ও পন্থা থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ নতুন এক 'আকীদা ও বিশ্বাস গড়ে তুলেছিল। নবীদের বাণী ও বক্তব্যে সেগুলোর কোন হদিস পাওয়া যায় না। আসমানী কিতাবের কোথাও আল্লাহ্‌র (তিন বা অধিক) রূপ ও বিভূতির কোন উল্লেখ নেই। আল্লাহ্‌র কথিত 'গুণত্রয়ের'ও কোন

অস্তিত্ব নেই। তদ্রূপ আল্লাহ্র কোন রূপ ও বিভূতিকে পিতা, পুত্র বা পবিত্রাত্মা নামে অভিহিত করারও কোন প্রমাণ নেই, প্রমাণ নেই এমন ধারণারও যে, খোদার এক পুত্র আছেন যিনি খোদা এবং খোদা থেকে সৃষ্ট, যিনি পিতার মূল সত্তা থেকে অভিন্ন এবং খোদা যেমন স্রষ্টা তেমনি একজন স্রষ্টা। অনুরূপ শিরক ও কুফরীভিত্তিক অন্যান্য 'আকীদা ও বিশ্বাসও কোন নবী থেকে বর্ণিত নয়।[১]

ইঞ্জীল বা সুসমাচারসমূহের স্বরূপ

মুসলিম পণ্ডিতদের আরেকটি ভুল হল, ইঞ্জীলকে তারা কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাবের সমপর্যায়ে ধরে আলোচনায় নেমেছেন। বলা বাহুল্য, পাদ্রীদের অপপ্রচার ও নতুন নিয়মের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতাই হলো এ ধরনের মৌলিক বিভ্রান্তির উৎস। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) কিন্তু ইঞ্জীলকে তার প্রাপ্য মর্যাদাই দিয়েছেন। তাঁর মতে, ইঞ্জীলের সুসমাচার চতুষ্টয়ের ধর্মীয় মর্যাদা সীরাত ও হাদীস গ্রন্থগুলোর চেয়ে কোন অংশেই বেশী নয়। তিনি বলেন ঃ

> উপরিউক্ত সুসমাচার চতুষ্টয়ের বর্ণনাকারীরা হযরত 'ঈসা (আ)-এর বাণী ও বক্তব্য, শিক্ষা ও কর্ম এবং বিভিন্ন মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনা সংকলন করেছেন মাত্র, এমন কি তাদের স্বীকৃতি মতে হযরত 'ঈসা (আ) সম্পর্কে তাদের দেখা ও শোনার সবটুকুও তারা গ্রন্থবদ্ধ করেনি। সুতরাং আমাদের নবীজীর বাণী ও কর্মের বর্ণনাসম্বলিত হাদীস ও সীরাত গ্রন্থ যেমন কুরআনের সমতুল্য নয়, তেমনি সুসমাচার সংকলকদের সংকলনসমূহও আসমানী কিতাবের সমতুল্য নয় বরং সুসমাচারগুলো বড় জোর সীরাত ও হাদীস গ্রন্থগুলোর অনুরূপ মর্যাদাই শুধু দাবী করতে পারে।[২]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

খ্রিস্টানদের হাতে ইঞ্জীল নামে এখন যে কিতাব আছে তা তাদের স্বীকারোক্তি মতেই হযরত 'ঈসা (আ)-এর লেখা নয়, এমন কি তাঁর আদেশেও লেখা হয়নি, বরং ঊর্ধ্বাকাশে অন্তর্ধানের পর তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য মথি ও যোহন এবং পরোক্ষ শিষ্য মার্ক ও লুক লিখেছেন। তদুপরি এত অধিক সংখ্যক লোক সেগুলো ধারণ ও সংরক্ষণ করেনি যাতে (বর্ণনার সূত্রগত দিক থেকে) তা সন্দেহাতীত বলে ধরা যেতে পারে। এছাড়া সংকলকগণ নিজেরাই স্বীকার

১. আল-জওয়াব, খণ্ড. ৩. পৃষ্ঠা ১৩৪।

১. আল-জওয়াব, খণ্ড ২, পৃ. ১০।

করেছেন, হযরত 'ঈসা (আ)-এর বাণী ও জীবন-বৃত্তান্তের তারা সবটুকু নয়, বরং আংশিক সংকলন করেছেন মাত্র। দুই, তিন বা চার জনের বর্ণনায় ভুল হওয়ার যথেষ্ট আশংকা আছে, বিশেষত খোদ হযরত 'ঈসা (আ) সংক্রান্ত তথ্যের ক্ষেত্রেও তারা ভুল করেছেন, এমন কি কে ক্রুসবিদ্ধ হয়েছেন তাও আজ স্পষ্ট নয়।[১]

ইঞ্জীলের মত তাওরাতের সত্যতা সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলে তিনি লিখেছেন ঃ

> তাওরাতের সংকলন ও বর্ণনাতেও সূত্র-বিচ্ছিন্নতা ঘটেছে। কেননা ইয়াহূদীদের বর্ণনা মুতাবিক বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংসের পর নির্বাসিত বনী ইসরাইলীদের মধ্যে আযর নামক এক ব্যক্তি তাওরাত লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি নবী ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে ইয়াহূদীদের দ্বিমত রয়েছে। তবে তাদের দাবী মতে উক্ত অনুলিপিকে অন্য একটি প্রাচীন অনুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছিল। কারো মতে মরক্কোতে পাওয়া একটি অনুলিপি আনিয়ে তার সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছিল। এর মাধ্যমে যে সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা এই যে, (বর্ণনার সূত্রগত দিক থেকে) তাওরাতের (বিষয় ও) শব্দসমূহ সন্দেহাতীত নয় এবং ক্ষেত্র বিশেষ ভুলের আশংকাও উড়িয়ে দেবার মত নয়। কেননা দু'চারজন লোক যে কিতাব সংকলন করেন, মিলিয়ে দেখেন এবং সংরক্ষণ করেন তাতে ভুল হওয়াই স্বাভাবিক।[২]

তাই ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সিদ্ধান্ত হলো ঃ

> হযরত 'ঈসা (আ) থেকে ইঞ্জীলের শব্দসমূহের নিরবচ্ছিন্ন ও সন্দেহাতীত কোন সূত্র-পরম্পরা খ্রিস্টানদের হাতে নেই। তদ্রূপ খ্রিস্ট ধর্মের বর্তমান 'আকীদা-বিশ্বাসগুলোও নিরবচ্ছিন্ন ও সন্দেহাতীত সূত্র দ্বারা প্রমাণিত নয়। ইয়াহূদীদের অবস্থাও অভিন্ন। তাদের কাছেও তাওরাতের শব্দ ও নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের কোন নিরবচ্ছিন্ন ও সন্দেহাতীত সূত্র নেই যেমনটি রয়েছে কুরআন ও আহকামে শরীয়তের ক্ষেত্রে মুসলমানদের হাতে। বিশিষ্ট ও সাধারণ সকলেরই তা জানা আছে।[৩]

কুরআন, ইঞ্জীল ও তাওরাতের মাঝে পার্থক্য করে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বলেন ঃ

---

১. আল-জওয়াব, খ. ২, পৃ. ১০।

২. আল-জওয়াব,

৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, ৩৭২।

কুরআনুল করীমের শব্দ ও অর্থ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে নিরবচ্ছিন্ন ও সন্দেহাতীত সূত্র-পরম্পরায় চলে আসছে। সুন্নাহর ক্ষেত্রেও রয়েছেও অনুরূপ নিরবচ্ছিন্ন ও সন্দেহাতীত সূত্র-পরম্পরা। সেই সাথে মুসলমানদের নিকট রয়েছে তাদের প্রিয় নবীর ঘটনাবহুল জীবন-বৃত্তান্ত যার সত্যতা বিভিন্ন সূত্রে সুপ্রমাণিত। যথা ঃ উম্মাহর সর্বসম্মত স্বীকৃতি, সেগুলোর ওপর আমলের ধারাবাহিকতা ইত্যাদি। কুরআন মুসলমানদের সিনায় সংরক্ষিত আছে এবং এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা কোন লিখিত অনুলিপির ওপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং আল্লাহ্ না করুন, কুরআনের সকল অনুলিপি বিলুপ্ত হয়ে গেলেও কুরআন সংরক্ষণে তার বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়বে না। পক্ষান্তরে বাইবেলের অনুলিপিগুলো বিলুপ্ত হলে তাদের কাছে বিকল্প কোন সংরক্ষণ ব্যবস্থা নেই। কেননা তাদের কাছে শব্দসমূহের নিরবচ্ছিন্ন কোন সূত্র-পরম্পরা নেই। দু'একজন বাইবেল-হাফেজ, তাদের ওপর নির্ভর করার কোন উপায় নেই। এজন্যই নবুওয়ত যুগের পর থেকে তাদের কিতাবে (শব্দ ও অর্থগত দিক থেকে) বরাবর পরিবর্তন ও বিকৃতি চলে আসছে। আর এজন্যই মুসলমানদের ন্যায় সূত্র-পরম্পরা রক্ষা করার প্রচলন তারা করেনি। সূত্র-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মুসলমানরা গড়ে তুলেছেন রিজাল-শাস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার, যার কোন অস্তিত্ব নেই তাদের ইতিহাসে।[১]

ইঞ্জীলের পরিবর্তন ও বিকৃতি

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হলো, ইঞ্জীল ও তাওরাতের শব্দগত পরিবর্তন সংক্রান্ত দাবীর তিনি সমর্থক নন। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃত ব্যাপার এই, শব্দগত পরিবর্তনের দাবী সমর্থন করা সত্ত্বেও অর্থগত বিকৃতির ওপরই তিনি অধিক জোর দিয়েছেন। এ কৌশল অবলম্বনের কারণ বর্ণনা করে আল-জওয়াব গ্রন্থে তিনি নিজেই বলেছেন, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান পণ্ডিতেরাও যেহেতু অর্থগত পরিবর্তন ও বিকৃতি স্বীকার করে নিয়েছেন, সেহেতু এটাকে ভিত্তি করেই তাদের বিরুদ্ধে আমাদের বিতর্কে নামা উচিত। তাঁর ভাষায় ঃ

واذاعرف ان جميع الطوائف من المسلمين واليهود والنصارى يشهدون انه قد وقع فى هذه الكتب تحريف وتبديل فى معا نيها وتفاسيرها وشرائعها فهذا القدر كاف

১. আল-জওয়াব, খ. ১, পৃ. ৩৭৬।

মুসলিম, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান সকলেই যখন ইঞ্জীল ও তাওরাতের অর্থ, ব্যাখ্যা ও বিধানগত বিকৃতির সত্যতা মনে নিয়েছে তখন এতটুকুতেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা যথেষ্ট।[১]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

ولكن علماء المسلمين وعلماء اهل الكتب متفقون على وقوع التحريف فى المعانى والتفسير -

কিন্তু ইঞ্জীল ও তাওরাতের অর্থ ও ব্যাখ্যাগত বিকৃতি বিষয়ে মুসলিম ও কিতাবী সকল 'আলিমই একমত।[২]

তবে তাওরাত ও ইঞ্জীলের শব্দগত বিকৃতির ক্ষেত্রে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) এ দাবী মানতে রাজী নন যে, আসমানী কিতাবগুলো আগাগোড়া এমন বিকৃত হয়ে গেছে যাতে মূল আসমানী শব্দগুলোর কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। তিনি বলেন ঃ মুসলিম 'আলিমদের কেউ আমার জানা মতে এ দাবী করেন নি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবুওয়ত লাভের পর আসমানী কিতাবসমূহের শব্দগুলো সকল ভাষাতেই পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে। সুতরাং মুসলিম 'আলিমদের নামে এ ধরনের উক্তি চালু করা সংগত নয়।[৩]

তবে এ দাবী তিনি অবশ্যই সমর্থন করেন যে, আসমানী কিতাবের বহু স্থানে মূল শব্দগুলো বদলে দিয়ে আংশিক শব্দগত বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। এটাকে মুসলিম 'আলিমদের সাধারণ মতামতরূপে আখ্যায়িত করে ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

فجمهور المسلمين يمنعون هذا ويقولون ان بعض الفاظها بدل كما قد بدل كثير من معانيها -

মুসলিম 'আলিমরা এ দাবী অস্বীকার করেছেন (ইঞ্জীল ও তাওরাতের সকল শব্দ-সমষ্টির সত্যতা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমর্থন করেছেন)। তাঁদের মতে, বহুক্ষেত্রে যেমন অর্থ ও ব্যাখ্যাগত বিকৃতি ঘটেছে তেমনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে শব্দগত বিকৃতিও ঘটেছে।[৪]

والصواب الذى عليه الجمهور انه بدل بعض الفاظها -

১. আল-জওয়াব, ১ম খ., পৃ. ৩৭৬।

২. আল-জওয়াব, ১ম খ., পৃ. ৩৮০।

৩. আল-জওয়াব, ১ম খ. পৃ. ৩৭৩।

৪. আল-জওয়াব, ১ম খ., পৃ. ৩৭৩।

জমহূর বা সাধারণ মুসলিম 'আলিমদের সিদ্ধান্তই সঠিক। অর্থাৎ উক্ত কিতাবসমূহের কিছু কিছু শব্দে অবশ্যই পরিবর্তন করা হয়েছে।[১]

নবীদের শব্দ ওরা হৃদয়ংগম করতে পারেনি

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে, খ্রিস্টানদের বিভ্রান্তি তথা ত্রিত্ববাদসহ যাবতীয় শিরকী 'আকীদা-বিশ্বাসের প্রধান কারণ এই যে, নবীদের মুখ নিঃসৃত বহু শব্দেরই ভাব ও অর্থ তারা হৃদয়ংগম করতে পারেনি। ফলে তাদের হাতে সে সকল শব্দের অর্থ-বিকৃতি ঘটেছে। তিনি বলেন ঃ এদিক থেকে ইয়াহূদীদের অবস্থা কিছুটা হলেও ভাল। হঠকারিতা, অহংকার ও সত্য প্রত্যাখ্যানের বেলায় তারা খ্রিস্টানদের তুলনায় এক কাঠি এগিয়ে আছে সত্য, কিন্তু নবীদের ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের সাথে তারা অতটা অপরিচিত নয়।[২]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) জোর তাকীদ দিয়ে বারবার বলেছেন যে, সঠিক ভাব ও অর্থ হৃদয়ংগমের মাধ্যমে আসমানী কিতাব থেকে নির্ভেজাল শিক্ষা ও বিধান আহরণ করতে হলে নবীদের শব্দ ও পরিভাষা জানা খুবই জরুরী।

তাঁর ভাষায় ঃ

ان معرفة اللغه التى خاطبنا بها الا نبياء وحمل كلامهم عليها امر واجب متعين ومن سلك غير هذا المسلك فقد حرف كلامهم عن مواضعه وكذب عليهم وافترى -

নবীরা যে ভাষায় আমাদের সম্বোধন করেছেন তা হৃদয়ংগম করা এবং যে শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করেছেন তা অক্ষুণ্ণ রাখা সুনির্দিষ্ট ভাবেই অপরিহার্য। এ পথ ছেড়ে অন্য পথে যারা চলবে এবং নবীদের শব্দসমূহকে তার প্রয়োগ ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত করবে তারা অবশ্যই নবীদের নামে অপবাদ রটানোর অপরাধে অপরাধী হবে।[৩]

মূলত নবীদের শব্দ ও পরিভাষা হৃদয়ংগমে ব্যর্থতার পরিণতিতেই খ্রিস্ট ধর্মে পুত্র ও পবিত্রাত্মার ভুল অর্থের পথ ধরে ত্রিত্ববাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

শব্দের সঠিক অর্থ নির্ণয়

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

কিতাবীদের বর্ণনামতে 'পিতা ও পুত্র' শব্দ দু'টি নবীরা ব্যবহার করেছেন। (আমাদের মতে) তাঁদের কাছে পিতার অর্থ ছিল রব ও প্রতিপালক এবং পুত্রের অর্থ ছিল প্রিয় ও পসন্দনীয়। কেননা কোন সূত্রেই একথা বর্ণিত হয়নি

---

১. আল-জওয়াব, ২য় খ., পৃ. ৪।
২. আল-জওয়াব, ২য় খ., পৃ. ১০৯।
৩. ঐ, ৩য় খণ্ড, ১৮১ পৃ.।

যে, নবীরা আল্লাহ্‌র বিশেষ কোন রূপ বা বিভূতি অর্থে পুত্র শব্দটি ব্যবহার করেছেন কিংবা এ কথা বলেছেন যে, আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর একটি রূপ বা বিভূতিকে জন্ম দিয়েছেন এবং জন্ম সূত্রে তাঁর কোন-পুত্র রয়েছে। সুতরাং "পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মার নামে মানুষের বায়'আত (বাপ্তিস্ম) গ্রহণ করো।" এ ধরনের কোন বাণী 'ঈসা (আ) থেকে বর্ণিত হয়ে থাকলেও আল্লাহ্‌র অনাদি কোন রূপ ও বিভূতি দ্বারা পুত্র শব্দের ব্যাখ্যা করা হযরত 'ঈসা (আ)-এর নামে অপবাদ আরোপ ছাড়া কিছু নয়। কেননা তাঁর ভাষায় পুত্র শব্দের এ অর্থ ছিল না। তদ্রূপ 'রূহুল-কুদস্' ও পবিত্রাত্মা শব্দটি নবীদের পরিভাষায় আল্লাহ্‌র প্রাণবাচক কোন রূপ বা বিভূতি অর্থে কখনো ব্যবহৃত হয়নি। তাঁদের পরিভাষায়, পবিত্রাত্মা হচ্ছেন সেই 'স্বর্গীয় সত্তা' যা আল্লাহ্ তাঁর নির্বাচিত বান্দা তথা নবীদের উপর নাযিল করতেন এবং তার মাধ্যমে তাঁদের মদদ করতেন।[১]

খ্রিস্টানদের সরাসরি সম্বোধন করে অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

তোমাদের গোমরাহীর কারণ এই যে, নবীদের কথার সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট অর্থ উপেক্ষা করে এমন সব দুর্বোধ্য ব্যাখ্যা তোমরা দিয়েছ যা তাঁদের কথা থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই প্রকাশ পায় না। সুনির্দিষ্ট অর্থের পরিবর্তে দুর্বোধ্য অর্থ গ্রহণ করে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ব্যাখ্যার পিছনে তোমরা পড়েছ। তা না করে নবীদের কথার সরল অর্থই যদি তোমরা আঁকড়ে ধরতে তাহলে এমনভাবে বিভ্রান্ত হতে না। কেননা নবীদের বক্তব্যে 'পুত্র' শব্দটি যতখানে এসেছে খোদার রূপ বা বিভূতি অর্থে কোথাও ব্যবহৃত হয়নি; বরং আল্লাহ্‌র প্রিয় ও পসন্দনীয় ব্যক্তি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তদ্রুপ পবিত্রাত্মা শব্দটিও বিশেষ রূপ বা বিভূতি অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, ওয়াহী ও ফিরিশতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ এ সরল ও স্বাভাবিক অর্থ বাদ দিয়ে এমন অর্থ তোমরা গ্রহণ করেছ যা শব্দ থেকে কোনক্রমেই প্রকাশ পায় না।[২]

ব্যাপক ও সাধারণ ক্ষেত্রে 'পুত্র ও পবিত্রাত্মা' শব্দ দু'টির ব্যবহার

অতঃপর ইমাম সাহেব বাইবেল ও তাওরাতের বিভিন্ন শ্লোক উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেছেন যে, পুত্র ও পবিত্রাত্মা শব্দ দু'টি হযরত 'ঈসা (আ)-এর জন্য বিশিষ্ট নয়; বরং অন্যদের জন্যও তা দেদার ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি লিখেছেন ঃ

---

১. আল-জওয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮১-১৮২।

২. আল-জওয়াব, ৩ খ., পৃ. ১৫৫।

এমনকি তোমাদের ধর্মগ্রন্থের 'পুত্র ও পবিত্রাত্মা' শব্দ হযরত 'ঈসা (আ) ছাড়া অন্যদের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। শিষ্যদের সূত্রে তোমরা নিজেরাই তো বর্ণনা করো যে, হযরত 'ঈসা তাদের বলেছেন, আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের পিতা এবং আমার ও তোমাদের উপাস্য। তোমাদের কথা মতেই শিষ্যরা আরো বলেছেন যে, পবিত্রাত্মা তাদের মাঝেও প্রবিষ্ট হয়। তোমাদের হাতে তাওরাতের যে অনুলিপি আছে তাতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, "সদাপ্রভূ মূসাকে বললেন, ফেরাউনের কাছে যাও এবং তাকে বল ঃ প্রতিপালক বলেছেন, ইস্রায়েল আমার পুত্র, আমার প্রথমজাত। আমার 'ইবাদত করার জন্য আমার পুত্রকে ছেড়ে দাও। নইলে আমি তোমার পুত্রকে, তোমার প্রথম জাতকে হত্যা করব। ফেরাউন সে নির্দেশ অমান্য করায় সদাপ্রভূ সিংহাসনে উপবিষ্ট ফেরাউনের প্রথম জাত পুত্র এবং ফেরাউনের স্বজাতির সমস্ত প্রথম জাত পুত্রকে হত্যা করলেন। এমন কি তাদের পশুকুলের প্রথম জাতগুলোকেও হত্যা করলেন।" দেখ, তাওরাতে সকল ইসরাঈলীকে আল্লাহ্র পুত্র ও প্রথমজাত বলা হয়েছে এবং মিসরীয়দের পুত্রদেরকেও ফেরাউনের পুত্র বলা হয়েছে। শুধু কি তাই, পশুকুলের প্রথম জাত শাবকগুলোকেও পশুর মালিকদের পুত্র বলা হয়েছে।[১] অনুরূপভাবে গীত-সংহিতায় আছে, "তুমি আমার পুত্র, তুমি আমার কাছে প্রার্থনা করো, আমি তোমাকে দান করব।"

বাইবেলে হযরত ঈসা (আ) বলেছেন, "আমি আমার ও তোমাদের পিতা এবং আমার ও তোমাদের উপাস্যের নিকট যাচ্ছি।" তিনি আরো বলেছেন ঃ প্রার্থনা কালে তোমরা বলো, হে আমাদের স্বর্গস্থিত পিতা! অমুক অমুক দানে আমাদের ধন্য কর। তদ্রূপ পবিত্রাত্মা প্রবিষ্ট হওয়ার বিষয়টি হযরত 'ঈসা (আ) ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রেও উল্লিখিত হয়েছে।[২]

মোটকথা, অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের আলোকে তিনি দেখিয়েছেন যে, যে সকল শব্দযোগে খ্রিস্টধর্মে হযরত 'ঈসার পুত্রত্ব, প্রবিষ্টতা ও ঈশ্বরত্ব সহ বিভিন্ন 'আকীদা-বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে সেগুলো ইঞ্জীল-তাওরাতের বহু স্থানে 'ঈসা (আ) ছাড়া অন্যদের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এটা প্রমাণিত সত্য যে, শব্দগুলোর অর্থ রূপক। অতঃপর ইমাম সাহেব সিদ্ধান্ত টেনে লিখেছেন ঃ

মোটকথা, তাওরাত, ইঞ্জীল ও যবূরসহ কোন আসমানী কিতাবে কিংবা কোন নবীর ভবিষ্যদ্বাণীতেই এমন কোন কথা নেই যাতে হযরত 'ঈসা (আ)

১. বাইবেলের বর্তমান বাংলা অনুবাদে অবশ্য কিঞ্চিত পরিবর্তন করা হয়েছে। অনুবাদক।

২. আল-জওয়াব, ৩ খ., পৃ. ১৮৫-১৮৬।

সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রমাণিত হতে পারে যে, আল্লাহ্‌র সত্তায় একীভূত ও প্রবিষ্ট হওয়ার গুণ তাঁর ছিল। তাঁর বৈশিষ্ট্য অতটুকুই যা আল-কুরআনে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه -

বস্তুত পূর্ববর্তী সকল আসমানী সহীফা এবং নবীদের যাবতীয় ভবিষ্যদ্বাণী আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের সাথে পূর্ণ সংগতিপূর্ণ এবং পরস্পরের সমর্থক। যে সকল শব্দ দ্বারা খ্রিস্টানরা হযরত 'ঈসা (আ)-এর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করে থাকে এবং আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের উক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সেগুলো হযরত ঈসা (আ) ছাড়া অন্যদের সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং সে সবের সাহায্যে তাঁর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করা ভিত্তিহীন। 'পুত্র ও প্রভু' শব্দ দু'টি যেমন হযরত 'ঈসা (আ)-র মত অন্যদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি পবিত্রাত্মার প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরের প্রকাশ ও প্রবিষ্টতার কথা হযরত 'ঈসা (আ)-র মত অন্যদের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে। অথচ সেই সুবাদে তারা কেউ তো ঈশ্বর হতে পারলেন না।[১]

খ্রিস্টান ধর্মবেত্তারা মাঝে মধ্যে শ্লোক-নির্ভর আলোচনা থেকে সরে এসে রূপ ও বিভূতিত্রয় এবং প্রবিষ্ট ও একীভূত হওয়া সম্পর্কে যুক্তিকেন্দ্রিক আলোচনার অবতারণা করেন এবং গোটা বিষয়টাকে সূফীবাদী ও দার্শনিক রূপ দান করেন। তাই ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। আর দর্শন যেহেতু তাঁর প্রিয়তম বিষয় এবং কালামশাস্ত্র, আকায়েদ ও 'আদি সত্তার একত্ব' ইত্যাদি জটিল দার্শনিক আলোচনায় বারবার তাঁকে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে, তাই এখানেও তিনি হাত খুলে লিখেছেন এবং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা করে দেখিয়েছেন যে, ত্রিত্ববাদ 'আকল ও যুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী স্বকপোলকল্পিত এক আকীদা ও দর্শন যার সাথে সত্যের দূরতম সম্পর্কও নেই।[২]

আকল ও যুক্তিবিরোধী কথা

'আকল ও যুক্তির আলোকে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ত্রিত্ববাদের দুর্বোধ্যতা, অন্তসারশূন্যতা ও অযৌক্তিকতা তুলে ধরা হলে খ্রিস্টান ধর্মবেত্তারা ঘুরে ফিরে আবার বাইবেলীয় শ্লোকের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বলতে শুরু করেন যে, কি করা যাবে, আসমানী কিতাবে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। 'আকীদা

১. আল-জওয়াব, ২ খ., পৃ. ১৮৯-১৯০।
২. আল-জওয়াব, ৩য় খ., পৃ. ১১৯, ১৯০-১৯১, ২১৫।

ও বিশ্বাসগত এই বিষয়গুলো 'আকল ও যুক্তি-উর্ধ্ব সত্য। সুতরাং ঈমান ও নিরংকুশ আনুগত্যই এ সকল ক্ষেত্রে অপরিহার্য। বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে তা বুঝতে বা বোঝাতে চাওয়া অনুচিত। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) প্রথমে তো আসমানী কিতাবে ত্রিত্ববাদের অস্তিত্বই স্বীকার করতে রাজী নন। তাঁর মতে বরং ত্রিত্ববাদ বিরোধী শিক্ষাই তাতে বিদ্যমান। তদুপরি জোর দিয়ে তিনি বলেছেন যে, সম্পূর্ণ আলাদা দু'টি বিষয়কে এখানে ঘুলিয়ে ফেলা হচ্ছে। কেননা কতগুলো বিষয় হলো 'আকল ও যুক্তির বিচারে অসম্ভব। পক্ষান্তরে কতকগুলো বিষয় এমন আছে যার হাকীকত অনুধাবন করা মানবীয় 'আকল-বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং সেগুলোর পক্ষে বা বিপক্ষে 'আকল-বুদ্ধির নিজস্ব কোন সিদ্ধান্ত নেই। তিনি বলেন, নবীদের বাণী ও শিক্ষায় দ্বিতীয় বিষয়গুলোই শুধু পাওয়া যায়। অর্থাৎ 'আকল ও বুদ্ধি-উর্ধ্ব বিষয় সেখানে অবশ্যই আছে, তবে 'আকল ও বুদ্ধি পরিপন্থী কোন বিষয় নেই, থাকতে পারে না। বলা বাহুল্য যে, বুদ্ধি বিরোধী ও বুদ্ধি-উর্ধ্ব বিষয়ের মাঝে দুস্তর ব্যবধান রয়েছে। ইমাম সাহেবের ভাষায়–

لايميزون بين ما يحيله العقل ويبطله ويعلم انه ممتنع وبين ما يعجز عنه العقل فلا يعرفه ولا يعلم فيه بنفى ولا اثبات وان الرسل اخبرت بالنوع الثانى ولا يجوز ان تخبر با لنوع الاول فلم يفرقوابين محالات العقول ومحارات العقول وقد ضاهوا فى ذلك من قبلهم من المشركين الذين جعلوا لله ولداوشريكا ـ

'আকল ও বুদ্ধির যে বিষয়গুলোকে সুনিশ্চিতভাবে অসম্ভব ও বাতিল সাব্যস্ত করে, আর যে বিষয়গুলো সম্পর্কে বুঝে শুনে হাঁ-বাচক কিংবা না-বাচক সিদ্ধান্ত নিতে 'আকল ও বুদ্ধির অক্ষমতা প্রকাশ করে এই উভয়ের মাঝে দুস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও খ্রিস্টান পণ্ডিতরা তা মানতে রাজী নন। বস্তুত দ্বিতীয় বিষয়গুলো সম্পর্কেই শুধু নবীরা ওয়াহীযোগে সংবাদ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে প্রথম বিষয়গুলোর অস্তিত্ব তাঁদের বাণী ও বক্তব্য অসম্ভব ও অকল্পনীয়। আসলে তারা বুদ্ধি বিরোধী ও বুদ্ধি-উর্ধ্ব বিষয়ের মাঝে তফাৎ খুঁজে পাননি। এ ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান ও অংশীদারিত্ব প্রমাণকারী মুশরিকদের কাতারভুক্ত হয়ে পড়েছেন।[১]

ইমাম সাহেব অত্যন্ত জোরালো ভাষায় দাবী করেছেন যে, সত্যধর্ম কখনো সুস্থ 'আকল ও বিচার-বুদ্ধির বিরোধী হতে পারে না। এ কথার ভুরি-ভুরি প্রমাণ রয়েছে আসমানী কিতাবগুলিতে। তিনি বলেন, এখানে দুটি দল হোঁচট খেয়েছে। একদল 'আকল ও বুদ্ধির এমন লাগামহীন ব্যবহার শুরু করল যে, 'আকল ও

১. আল-জওয়াব, খ. ২, পৃ. ৮৯।

বুদ্ধির গণ্ডিবহির্ভূত বিষয়গুলোকেও তারা সেই মানদণ্ডে যাচাই করতে লাগল। এমন কি স্থূল সত্য এবং নবীদের সুস্পষ্ট বক্তব্যকে পর্যন্ত তারা উপেক্ষা করে গেল। বলা বাহুল্য যে, 'আকল ও বুদ্ধির প্রতি এটা সুবিচার ছিল না মোটেই। পক্ষান্তরে অন্যদল বুদ্ধিজাত সুস্পষ্ট বিষয়গুলোকেও প্রত্যাখ্যান করল এবং কল্পনাপ্রসূত 'শ্রবণজাত' ও 'স্থূল' প্রমাণসমূহ আঁকড়ে পড়ে থাকল। বলা বাহুল্য যে, এটাও ছিল চরম সীমা লংঘন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, দু'টি সত্য সর্বদা পরস্পর সমর্থক ও সহগামী হয়, পরস্পরবিরোধী হয় না কখনো। পক্ষান্তরে বাতিল ও অসত্য স্বভাবতই স্ববিরোধী এবং পরস্পরবিরোধী হয়। নবী-বিরোধীদের সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করেন,

والسماء ذات الحبك انكم لفى قول مختلف يؤفك عنه من افك ـ

শপথ বহু পথ বিশিষ্ট আকাশের! তোমরা তো পরস্পর-বিরোধী কথায় লিপ্ত। যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সেই তা (কুরআন) পরিত্যাগ করে। সূরা যারিয়াতঃ ৭-৮-৯ আয়াত;

বস্তুত সুস্থ 'আকল ও বিচার-বুদ্ধি দ্বারা প্রমাণিত সত্য কোন ঐশীবাণী কিংবা নির্ভুল স্থূল অনুভবের বিরোধী হতে পারে না। তদ্রূপ বিশুদ্ধ ও প্রমাণোত্তীর্ণ ঐশী-বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সত্য 'আকল কিংবা স্থূল অনুভবের প্রতিকূল হতে পারে না। অনুরূপভাবে নির্ভুল অনুভবের শক্তি দ্বারা প্রমাণিত সত্যও 'আকল ও নকল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হতে পারে না।[১]

ইসলাম ও খ্রিস্টবাদের মাঝে এখানেই পার্থক্য। ইসলামে 'আকল ও নকল তথা যুক্তি ও উক্তির মাঝে রয়েছে পূর্ণ সংগতি। এখানে যুক্তি ও বুদ্ধি-উর্ধ্ব অদৃশ্য সত্যসমূহ অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু তা যুক্তির পরিপন্থী নয় মোটেও।

পক্ষান্তরে খৃস্টবাদের বহু বিধান ও বিশ্বাসই যে যুক্তি পরিপন্থী, খ্রিস্টান ধর্মবেত্তারাও তা স্বীকার করে থাকেন। তবে তারা বলেন যে, এগুলো হচ্ছে বুদ্ধি উর্ধ্ব স্তরের বিষয়। চোখ বুজে সেগুলো মেনে নেওয়াই আমাদের কর্ম।

তাওহীদ ও হযরত 'ঈসার মানবত্বে বিশ্বাসী খ্রিস্টান দল

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা এই যে, যে সকল খ্রিস্টান পাদ্রী ও ধর্মনেতা আল্লাহ্‌র তাওহীদ ও একত্বে এবং হযরত 'ঈসা (আ)-র রিসালাত ও মানবত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু বিভিন্ন কারণে খ্রিস্টান জগতে বিশেষ জনপ্রিয়তা পাননি, আলোচ্য গ্রন্থে তিনি তাঁদের পরিচয় ও বক্তব্য তুলে ধরেছেন। সেই সাথে খ্রিস্ট ধর্মের দল-উপদলগুলোর বিস্তারিত তালিকা

---

১. আল-জওয়াব, খ. ২, পৃ. ৩১২, খ. ৩, পৃ. ৩।

দিয়ে তাদের 'আকীদা ও বিশ্বাসের বিশদ ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনাও পেশ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে ইমাম তায়মিয়া (র) নও-মুসলিম মনীষী হাসান বিন আয়্যুব-এর সেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিও গ্রন্থবদ্ধ করেছেন যাতে প্রবন্ধকার তার ইসলাম গ্রহণের কারণসমূহ তুলে ধরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। প্রবন্ধটি অত্যন্ত তথ্যবহুল ও সারগর্ভ।

তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী কিতাবে শেষ নবীর সুসংবাদ

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের শুভাগমন ও নবুওয়ত সম্পর্কিত আসমানী কিতাবের সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর দিকে নজর দিয়েছেন এবং ব্যাপকতা ও সার্বিকতার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের খুঁটিনাটি সকল বাণী, তথ্য ও উপকরণ একত্র করেছেন যা অন্য কোন কিতাবে পাওয়া দুষ্কর। প্রতিটি সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটাও তিনি প্রমাণ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রেই শুধু এগুলো প্রযোজ্য।

যেমন যোহন লিখিত সুসমাচারে হযরত 'ঈসা (আ)-এর নিম্নোক্ত বাণী বর্ণিত হয়েছে ঃ

'জগতের অধিপতি আসছেন। তখন আমার কিছুই থাকবে না।' ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) একথা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামই হলেন হযরত 'ঈসা (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর একমাত্র লক্ষ্য। তিনি বলেন ঃ

> কেননা এটা সর্বস্বীকৃত ও সন্দেহাতীত সত্য যে, হযরত 'ঈসা (আ)-এর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামই একমাত্র মানব যাঁর জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য গোটা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষের দেহ ও হৃদয় তাঁর অনুগত ছিল। জীবদ্দশায় ও পরবর্তীতে, যুগে যুগে, পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র মানুষের বাহ্যিক ও আত্মিক সর্বপ্রকার আনুগত্য তিনি লাভ করেছেন। জীবদ্দশায় বাদশাহদের বাহ্যিক আনুগত্য করা হলেও মৃত্যুর পর তাদের প্রতি কারোরই আনুগত্য থাকে না। কেননা যে আনুগত্যের সাথে আখেরাতের পাওয়া না-পাওয়ার সম্পর্ক নেই সে আনুগত্যের ব্যাপারে পৃথিবীর কোন ধর্মের অনুসারীর আকর্ষণ নেই। কিন্তু নবীদের আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, তার সাথে রয়েছে আখিরাতের শাস্তি ও পুরস্কার এবং আশা ও ভীতির সম্পর্ক।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পূর্ববর্তী নবীদের দীন ও নবুওয়তের সত্যতার ঘোষণা দান করেছেন এবং তাঁদের নাম ও মর্যাদা তুলে ধরেছেন। বস্তুত তাঁর দাওয়াত ও মেহনতের কল্যাণেই বড় বড় জাতি হযরত মূসা ও 'ঈসা (আ)সহ সকল নবীর উপর ঈমান এনেছে। তাঁর মাধ্যম ছাড়া এটা কিছুতেই সম্ভব হতো না। কেননা যে ক'জন নবীর নামের সাথে কিতাবীদের পরিচয় ছিল তাঁদের নবুওয়ত ও মর্যাদার ব্যাপারে তারা একমত ছিল না। হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ)-সহ বিভিন্ন নবীর প্রতি বিভিন্ন দল দোষারোপ করত। আর হযরত হূদ, সালিহ, শু'আয়ব (আ) ও অন্যান্য নবীর তো নাম পর্যন্ত তাদের জানা ছিল না।[১]

নবুওয়তের দলীল ও মু'জিযাসমূহ

অতঃপর ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের মু'জিযা সম্পর্কে সুবিস্তৃত ও সারগর্ভ আলোচনা করেছেন এবং স্বভাব মাফিক এত অধিক তথ্য-উপকরণ একত্র করেছেন যা এক সাথে অন্য কোথাও পাওয়া সহজ নয়।[২] আলোচনার শুরুতে ইমাম সাহেব মু'জিযার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি এবং মু'জিযার সত্যতা প্রমাণের উপায় সম্পর্কে কালামশাস্ত্রীয় বহু মৌলিক ও সূক্ষ্ম তথ্য তুলে ধরেছেন।

ইমাম সাহেবের আলোচনা কিন্তু শুধু সীরাত ও কালাম শাস্ত্র গ্রন্থের মশহূর মু'জিযাগুলোকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়নি; বরং সংশ্লিষ্ট আলোচনার বৃত্তকে সম্প্রসারিত করে রাসূলের গোটা জীবন ও চরিত্রকেই তিনি মু'জিযারূপে পেশ করেছেন এবং সীরাত ও শামায়েলের খুবই আকর্ষণীয় সার-সংক্ষেপ তুলে ধরেছেন। বস্তুত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবন ও চরিত্রই হচ্ছে নবুওয়তের মুহাম্মদীর সর্বশ্রেষ্ঠ দলীল ও মু'জিযা। প্রচলিত ধারার পরিবর্তে মু'জিযার গণ্ডিকে ব্যাপ্ত ও সম্প্রসারিত করে তিনি লিখেছেন ঃ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সীরাত, চরিত্র, বাণী ও কর্ম তথা জীবনের প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণ একেকটি জীবন্ত মু'জিযা। তাঁর উপর অবতীর্ণ শরীয়তও একটি স্বতন্ত্র মু'জিযা। তদ্রূপ উম্মতের সমষ্টিগত

---

১. দেখুন আল-জওয়াব, খ. ৪, পৃ. ১৬, পৃ. ৮৬-৯৫, পৃ. ৭৮-৮৬।

২. আল-জওয়াব, খ. ৪, পৃ. ৬৬, ২২৪।

'ইল্‌ম ও প্রজ্ঞা এবং জীবন ও চারিত্র্যের শুচিতা ও পবিত্রতাও তাঁর নবূওয়াতের একটি মু'জিযা। এমন কি উম্মতের নেককার লোকদের কারামতসমূহও তাঁর নবুওয়তের মু'জিযা বলে গণ্য হবে।[১]

মু'জিযারূপে উম্মতে মুহাম্মদীর উত্থান ও ইসলামী বিপ্লব

পবিত্র নবী জীবনের এক মনোজ্ঞ সার-সংক্ষেপ পেশ করার পর যা পড়লে হৃদয়ের গভীরে এ বিশ্বাস অবশ্যই বদ্ধমূল হয় যে, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত সত্য রাসূল। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

ইসলামের দা'ওয়াত গোটা আরবভূমিতে ছড়িয়ে পড়ল। এর পূর্বে প্রতিমা পূজা, গণক ও জ্যোতিষীদের কথায় বিশ্বাস, স্রষ্টাকে অস্বীকার, সৃষ্টির দাসত্ব, হিংসা, হানাহানি ও রক্তপাত ইত্যাদি হাজারো শির্‌ক, অনাচার ও পাপাচারে সারা আরব নিমজ্জিত ছিল। আখেরাত তথা মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবনের কোন ধারণা ছিল না মানুষের। মুর্খতার আঁধারে নিমজ্জিত এ জাতিই নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের নূরানী শিক্ষার বরকতে হয়ে গেল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, সর্বশ্রেষ্ঠ ধার্মিক, চরিত্রবান। খৃস্টানরা সিরিয়াতে সাহাবা-ই কিরামকে দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠল, "স্বীকার করতেই হয় যে, হযরত 'ঈসার শিষ্যরা এঁদের চেয়ে উত্তম ছিলেন না।" এঁরা হলেন নববী 'ইল্‌ম ও 'আমলের উজ্জলতম প্রতীক যা গোটা পৃথিবীতে আলো ও দীপ্তি ছড়িয়েছে। এদের মুকাবিলায় অন্যান্য জাতির কীর্তিমান পুরুষদের দেখো; যে কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি উভয়ের মাঝে আসমান-যমীন তফাত অনুভব করতে পারবেন।[২]

সকল গুণ-গরিমায় তাঁর উম্মত অন্যান্য উম্মতের তুলনায় শীর্ষতম স্থানের অধিকারী। দুনিয়ার অন্যান্য জাতির জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে এ উম্মতের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার তুলনা করা হলে নিঃসন্দেহে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে। তদ্রূপ 'ইবাদত ও ধার্মিকতা এবং আল্লাহ-প্রেম ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে এ উম্মতের সাথে অন্যান্য উম্মতের তুলনা করা হলে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এ উম্মতই শ্রেষ্ঠ ধার্মিক, শ্রেষ্ঠ প্রেমিক। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ত্যাগ ও কুরবানী, বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং বিপদে ধৈর্য ও সবর ইত্যাদির ক্ষেত্রে তুলনা করা হলেও এ উম্মতের পাল্লাই হবে ভারি। বদান্যতা ও উদারতা, নিঃস্বার্থপরতা ও আত্মত্যাগ তথা চারিত্রিক মাহাত্ম্য ও নৈতিক পবিত্রতার সকল ক্ষেত্রেই এ উম্মতই শ্রেষ্ঠ, এ উম্মতই অনন্য। বলা বাহুল্য যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

১. আল-জওয়াব, খ. ৪, পৃ. ৮৬-৯৫, পৃ. ৮৭-৮৬।

১. আল-জওয়াব, ৪ খ., পৃ. ১৮১।

সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুমহান সান্নিধ্য ও সংস্পর্শ থেকেই এগুলো তারা লাভ করেছিল। কেননা তাঁর পূর্বে অন্য কোন কিতাব ও নবীর তারা অনুসারী ছিল না। ফলে আলো ও নূরের অন্য কোন উৎস থেকে তারা বিন্দুমাত্র আলো লাভ করেনি। তাঁর নবুওয়তের 'মিশকাত' ও দীপাধার থেকেই তারা আলো পেয়ে ছিল। পক্ষান্তরে হযরত 'ঈসা (আ) এসেছিলেন পূর্ববর্তী তাওরাতী শরীয়তের সম্পূরকরূপে। সুতরাং হযরত 'ঈসা (আ)-এর অনুসারীদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং গুণ ও গরিমার কিছু অংশ এসেছে তাওরাত ও যবূর থেকে, কিছু অংশ এসেছে হযরত 'ঈসা (আ) ও অন্যান্য নবীর শিক্ষা থেকে, আর বাদবাকীটুকু এসেছে 'হাওয়ারী' শিষ্যদের পরবর্তী যুগের দার্শনিকদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে। পক্ষান্তরে এই উম্মতের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের পূর্বে কোন কিতাব ও নবীর অস্তিত্ব ছিল না; বরং তাঁদের অধিকাংশইতো হযরত মূসা, 'ঈসা ও দাউদ (আ)-এর ওপর এবং তাদের কিতাবসমূহের ওপর ঈমান-ই এনেছে তাঁর মাধ্যমে। নবুওয়তে মুহাম্মদীই তাদের নির্দেশ দিয়েছে সকল নবী ও কিতাবের ওপর ঈমান আনার এবং নবীদের মঝে পার্থক্য না করার।[১]

শরীয়তে মুহাম্মদীর অলৌকিকতা

শরীয়তে মুহাম্মদীর পূর্ণাঙ্গতা ও সর্বাংগীনতার আলোচনা প্রসংগে ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের শরীয়তই হলো পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত। কেননা 'আকল ও বুদ্ধির বিচারে যা উত্তম ও নির্ভুল এ শরীয়তে তার সবগুলোই বিদ্যমান। তদ্রূপ 'আকল ও বুদ্ধির বিচারে যা ঘৃণিত ও বর্জনীয় এ শরীয়াতের তার সবগুলোই বর্জিত। এমন কোন নির্দেশ আমাদের রসূল (সা) দিয়ে যাননি যে সম্পর্কে আজ বলা যেতে পারে যে, এ নির্দেশ না দিলেই ভাল হতো। এমন কোন নিষেধও তিনি জারি করে যাননি যে সম্পর্কে আজ বলা যেতে পারে যে, এ নিষেধাজ্ঞা না হলেই ভালো হতো। যাবতীয় উত্তম ও পবিত্র জিনিস তিনি হালাল করে গেছেন, অথচ (স্থান, কাল ও পাত্রগত কারণে) পূর্ববর্তী শরীয়তে কিছু হালাল জিনিসও হারাম ছিল। তদ্রূপ যাবতীয় ঘৃণিত ও নাপাক জিনিস তিনি হারাম করে গেছেন, অথচ পূর্ববর্তী শরীয়তে সেগুলোর কিছু কিছু হালাল ছিল। দুনিয়ার সকল জাতি ও ধর্মের উত্তম ও সুন্দর জিনিসগুলো মুহাম্মদী শরীয়তে বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ্, ফিরিশতা ও আখেরাত সম্পর্কে তাওরাত, ইঞ্জীল ও যবূরের

২. আল-জওয়াব, খ. ৪. পৃ. ৮২।

বিবরণগুলো পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাংগীনরূপে কুরআন ও সুন্নাহ্য় পুনঃবিবৃত হয়েছে। তদুপরি এমন কিছু বিষয়ের বিবরণও তাতে এসেছে যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে ছিল না। দয়া, মায়া, ন্যায়বিচার ও উত্তম কর্মের সুফল সংক্রান্ত বিবরণ আরো মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী আঙ্গিকে এবং আরো সংযোজিত হয়ে শরীয়তে মুহাম্মদীতে এসেছে। ইসলামের 'ইবাদত ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য জাতির ইবাদত ব্যবস্থার তুলনা করলে 'আকল ও প্রজ্ঞার অধিকারী সকলকেই এ সত্য স্বীকার করতে হবে যে, ইসলামী 'ইবাদত ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। শাস্তি নীতিসহ শরীয়তের যাবতীয় আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।[১]

প্রসংগক্রমে ইবাদত সম্পর্কে অন্যান্য জাতি ও ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনার পর ইসলামী ইবাদতের উদ্দেশ্য, তাৎপর্য, কল্যাণ ও সুফল সম্পর্কেও তিনি অত্যন্ত সারগর্ভ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা পেশ করেছেন[২] এবং প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামই ছিলেন ন্যায় ও সত্যের এবং জ্ঞান ও গুণের আদর্শ মানব। তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সাহাবা-ই কিরাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন নিজেদের ব্যক্তি জীবনে, শাসন ক্ষেত্রে, খেলাফত পরিচালনায় এবং মানুষের সাথে আচার-আচরণে ইনসাফ ও সততার এবং ন্যায় ও ধার্মিকতার এমন সব উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন যার বিন্দুমাত্র নজীর দুনিয়ার অন্য কোন জাতির ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না।[৩]

নবুওয়তে বিশ্বাসী মাত্রেরই মুহাম্মদী নবুওয়তের স্বীকৃতি প্রদান অপরিহার্য

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) অত্যন্ত যুক্তিসমৃদ্ধ ভাষায় দাবী করেছেন যে, নবুওয়তের হাকীকত ও প্রকৃতি এবং এর প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তির পক্ষে–তা যে নবীর অনুসারীই তিনি হোন–মুহাম্মদী নবুওয়তকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কেননা যে সকল প্রমাণ ও নিদর্শনের সাহায্যে পূর্ববর্তী নবুওয়তসমূহের সত্যতা প্রমাণ করা হয় সেগুলোর সাহায্যে নবুওয়তে মুহাম্মদীর সত্যতা আরো সহজেই প্রমাণ করা সম্ভব। যেমন, পূর্ববর্তী নবুওয়তসমূহের সত্যতা প্রমাণের জন্য মু'জিযা পেশ করা হলে আমরা বলব, পূর্ববর্তী নবীদের মু'জিযার তুলনায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের মু'জিযাসমূহ অধিক মহিমান্বিত ও নূরপূর্ণ। তদুপরি সেগুলো এমন নিরবচ্ছিন্ন ও সন্দেহাতীত বর্ণনাসূত্র দ্বারা প্রমাণিত যা পূর্ববর্তীদের মু'জিযার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তদ্রূপ তাঁর ওপর অবতীর্ণ কুরআন অন্যান্য আসমানী কিতাবের চেয়ে পূর্ণাঙ্গ এবং

১. আল-জওয়াব, ৪ খৃ., পৃ. ৮২-৮২।
১. আল-জওয়াব, পৃ. ১০৪-১১০।
২. আল-জওয়াব, খণ্ড ৪, পৃ. ১১৯।

তাঁর উম্মত পূর্ববর্তী উম্মতের তুলনায় অধিকতর বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী এবং মুহাম্মদী শরীয়তের আহকাম ও বিধানসমূহ অধিক উপযোগী ও কল্যাণপ্রসূ। প্রকৃতপক্ষে নবুওয়তে মুহাম্মদী অস্বীকার করা সকল নবীর নবুওয়ত অস্বীকার করারই নামান্তর। কেননা তখন পূর্ববর্তী কোন নবুওয়তের সত্যতা প্রমাণ করাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বলেন, নবুওয়তে মুহাম্মদী সত্যতা অস্বীকার করে অন্যান্য নবীর নবুওয়ত প্রমাণ করতে চাওয়ার অর্থ হলো কোন শাস্ত্রের দ্বিতীয় সারির শাস্ত্রবিদদের পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞা মেনে নিয়ে উক্ত শাস্ত্রের স্থপতি ও আদিগুরুর শাস্ত্রজ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করে বসা। এ প্রসঙ্গে ইমাম সাহেব কয়েকটি আকর্ষণীয় উদাহরণ টেনে বলেন ঃ

এর অর্থ এই যে, কেউ বলল, (ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র এবং হানাফী ফিকহের বিন্যাস ও গ্রন্থনাকারী) যুফার ও ইবনুল কাসিম, মুযানী উঁচু দরের ফকীহ হলেও আবূ হানীফা, শাফিঈ ও মালিকের কোন ফিকাহ জ্ঞান ছিল না, কিংবা আখ্‌ফাশ, ইবনুল আনবারী ও মুবাররাদ বিশিষ্ট আরবী ব্যাকরণবিদ ছিলেন, তবে খলীল, সীবাওয়ায়হ ও ফাররা ব্যাকরণের কিছুই জানতেন না। কিংবা মলকি ও মাসীহী প্রমুখ চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণেতাদের তুলনায় বুকরাত ও জালিনুস চিকিৎসা শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য কোন ব্যক্তিত্ব নন। কিংবা দাউদ, সুলায়মান, য়ামলিখা, আকুস, দানিয়েল তো পয়গম্বর ছিলেন, কিন্তু মুহাম্মদ ইবন'আবদুল্লাহ নবী ছিলেন না; সেক্ষেত্রে শেষের স্ববিরোধী দাবীটি আগের গুলোর চেয়েও হাস্যকর হবে। সুতরাং হযরত মূসা ও 'ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাওরাত ও ইঞ্জীলকে আসমানী কিতাব স্বীকার করে নিয়ে যে নরাধম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবুওয়তকে অস্বীকার করবে এবং আল-কুরআনের অমর্যাদা করবে, তাকে বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া আর কিছু বলার উপায় থাকবে না। আল-কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাব যিনি অধ্যয়ন করেন, মুহাম্মদী নবুওয়তের প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহ এবং পূর্ববর্তী নবুওয়তগুলোর প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহ যার সামনে রয়েছে, সর্বোপরি মুহাম্মদী শরীয়ত ও অন্যান্য শরীয়তের মাঝে তুলনা করার মত বিচার শক্তি যার রয়েছে এ বক্তব্যের সাথে তিনি অবশ্যই একমত হবেন।[১]

শরীয়তে মুহাম্মদীর সার্বজনীনতা

'আল-জওয়াবের' শুরুতে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) খ্রিস্টানদের বহুল আলোচিত যে দাবীটি উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কেও কিছু বলা উচিত মনে হয়। খ্রিস্টানদের দাবী এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম মরু

১. আল-জওয়াব, খ. ১, পৃ. ১৮১।

আরবের জন্যই ছিলেন। সুতরাং খ্রিস্টান জগত তাঁর নবুওয়ত মানতে বাধ্য নয়। বর্তমান আরব খ্রিস্টানদের মাঝেও এ ধারণা দেখা যায়। এমন কি কিছুদিন যাবৎ ভারতবর্ষেও কোন কোন মহল থেকে প্রচার চালানো হচ্ছে যে, পরকালীন মুক্তির জন্য পূর্ববর্তী যে কোন ধর্মের পূর্ণাংগ অনুসরণই যথেষ্ট; একজন নিষ্ঠাবান য়াহূদী, খৃস্টান বা অমুসলিমের জন্য নবুওয়তে মুহাম্মদীর উপর ঈমান আনা জরুরী নয়। বস্তুত এ ভ্রান্ত আকীদা ইসলামী দাওয়াতের বিশ্ব ব্যাপকতা এবং নবুওয়তে মুহাম্মদীর সার্বজনীন রূপের ওপর চূড়ান্ত আঘাতের শামিল। এ ধারণা সত্য হলে চিরদিনের জন্য ইসলাম প্রচারের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং পৃথিবীর কোণে কোণে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ যে ত্যাগ ও কোরবানী পেশ করেছে তা সম্পূর্ণ অর্থহীন প্রতিপন্ন হবে। খ্রিস্টানদের এ শয়তানী চক্রান্তের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই এর দাঁতভাঙা জওয়াব দিতে গিয়ে তিনি তাঁর সবটুকু লেখনী শক্তি এতে ঢেলে দিয়েছিলেন। ফলে এই একটি মাত্র প্রসঙ্গ 'আল-জওয়াব' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ২৮ পৃষ্ঠ থেকে ২৩০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং তথ্য ও উপাদানগত বিচারে এটাই একমাত্র পূর্ণাংগ ও সারগর্ভ আলোচনা যা একজন বিদগ্ধ 'আলিম ও মুতাকাল্লিমের কলম আমাদেরকে উপহার দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল আয়াত ও সহী হাদীস এমন সুন্দরভাবে তিনি পরিবেশন করেছেন যে, অতঃপর মুহূর্তের জন্যও এ হাস্যকর ধারণার অবকাশ থাকে না যে, নবুওয়তে মুহাম্মদী আরব উপদ্বীপেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং নবুওয়তে মুহাম্মদীর উপর ঈমান না এনেও মুক্তির কোন উপায় হতে পারে। একস্থানে তিনি লিখেছেন ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

كان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة -

পূর্ববর্তী নবীরা নিজ নিজ গোষ্ঠীর জন্য প্রেরিত হতেন আর আমি প্রেরিত হয়েছি গোটা মানবজাতির জন্য।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

قل ياايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات والارض -

হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের জন্য প্রেরিত সেই আল্লাহ্র পক্ষ হতে যাঁর নিরংকুশ আধিপত্য আসমান যমীনে বিস্তৃত।

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

وماارسلناك الاكافة للناس بشيرا ونذيرا -

গোটা মানবতার জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই আপনাকে আমি প্রেরণ করেছি।

কুরআনুল করীমে যে সকল আয়াতে ইয়াহূদী, খ্রিস্টান, মুশরিক, পৌত্তলিক তথা জিন-ইনসানকে যতবার দাওয়াত দেয়া হয়েছে তার সংখ্যা গণনাও এক কষ্টকর কাজ। বস্তুত এটা এক সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ইসলামী 'আকীদা যার জন্য স্বতন্ত্র প্রমাণ পেশ করার কোন প্রয়োজন নেই। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ 'আল্লায়হি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও তাবলীগের ঘটনাবলী এবং বিভিন্ন দেশ ও দেশনেতার নামে দূত ও পত্র প্রেরণের ইতিহাস আমাদের সামনে রয়েছে, রয়েছে ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকদের বিরুদ্ধে লাগাতার জিহাদের সুদীর্ঘ ইতিহাস। সর্বোপরি রয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যা কিতাবীদের প্রতি ঈমানের আহ্বানসম্বলিত আয়াতে আয়াতে ভরপুর। এরপর কেমন করে এ কথা বলা চলে যে, আরব ছাড়া অন্য কোন জাতির প্রতি প্রেরিত রাসূল হওয়ার দাবী রাসূল নিজেও করেন নি?[১]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

আরো কয়েকগুণ দলীল ও যুক্তি-প্রমাণ আমরা পেশ করতে পারি যা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে, খ্রিস্টানসহ সকল আহলে কিতাবের প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হওয়ার ঘোষণা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। তিনি তাদের দাওয়াত দিয়েছেন এবং দাওয়াত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। সর্বোপরি উম্মতকেও দাওয়াত দিয়েছেন ও জিহাদের এ ধারা অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। নবীর তিরোধানের পর সনদবিহীন ও ভিত্তিহীনভাবে উম্মত এ কাজ নিজে থেকে শুরু করেনি যেমন করেছে হযরত 'ঈসার পর তাঁর নামধারী অনুসারীরা। কেননা নবীজীর ওফাতের পর তাঁর শরীয়তে বিন্দুমাত্র সংযোজন, সংশোধন ও পরিবর্তনের অধিকার কারো নেই। মুসলমানদের 'আকীদা এই যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যা হালাল বা হারাম করেছেন তাই শুধু হালাল বা হারাম হতে পারে এবং আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল যা অনুমোদন করেছেন তাই শুধু শরীয়তের মর্যাদা পেতে পারে।[২]

শী'আ মতবাদ খণ্ডন

আহলে সুন্নতের 'আকীদা-বিশ্বাস এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে শী'আবাদের বিরুদ্ধে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বিভিন্ন সময় শক্ত হাতে কলম ধরেছেন। তবে শী'আবাদের বিরুদ্ধে منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والعترية নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থও তিনি লিখেছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থ রচনার প্রেক্ষাপট এই যে, শী'আ

১. আল-জওয়াব, খ. ১, পৃ. ১১৫-১১৬। ২. আল-জওয়াব পৃ. ১১৭-১৮।

মতবাদ ও ইমামত সংক্রান্ত 'আকীদা খণ্ডনের উদ্দেশ্য সমসাময়িক শী'আ 'আলিম ইবনু'ল-মুতাহ্হির منهاج الكرامة فى معرفة الامامة নামে বিরাট কলেবরের একটি বই লিখেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কিতাবটি মূলত তিনি লিখেছিলেন তাঁর ভক্তিভাজন তাতারী সম্রাট ওয়ালিজা খোদাবান্দা খানের উদ্দেশ্যে যিনি তাঁর তাবলীগ ও মেহনতের সুবাদে শী'আবাদ গ্রহণ করেছিলেন। হাতে হাতে কিতাবটি সিরিয়াতে এসে পৌছল এবং ইবনে তায়মিয়া (র)-র নজরেও পড়ল। শী'আদের বড় গর্ব ছিল যে, আহলে সুন্নতের কোন 'আলিমের পক্ষেই এ কিতাবের জওয়াব দেয়া সম্ভব নয়। হযরত আলী (রা) এবং আহলে বায়তের ইমামত ও ইসমত (নিষ্পাপতা), প্রথম তিন খলীফার খেলাফতের অবৈধতা এবং সাধারণভাবে সকল সাহাবার চরিত্র হনন এই ছিল কিতাবের প্রধান আলোচ্য বিষয়। হযরত আলী (রা) সহ বার ইমামের ইমামত ও 'ইসমতের তথাকথিত 'আকীদাকে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ করার এতে অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল। এমনকি তিন খলীফাসহ সকল সাহাবার চরিত্র হননের ক্ষেত্রে ইতিহাস গ্রন্থের পাশাপাশি কুরআন হাদীসের আয়াত ও রেওয়ায়াত ব্যবহারের ধৃষ্টতাও এতে দেখানো হয়েছিল। সত্যি বলতে কি, গ্রন্থকার তাঁর মেধা, প্রজ্ঞা, যুক্তিপ্রয়োগ ক্ষমতা এবং গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের মহড়া দিতে বিন্দুমাত্র কসুর করেন নি। তাঁর ধারণায় এ গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে শী'আবাদের পক্ষ থেকে আহ্লে সুন্নতের 'আলিম সমাজকে ' শেষ কথা' বলে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ উত্তরসূরী শী'আদের মত গ্রন্থকারও উসূল ও আকীদার ক্ষেত্রে মু'তাযিলাপন্থী ছিলেন। তাই যাত ও সিফাত তথা আল্লাহ্র গুণ ও সত্তা এবং আহ্লে সুন্নতের 'আকীদা ও মৌল বিশ্বাস সম্পর্কেও তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন এবং তাতে দর্শন ও কালামশাস্ত্রের সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ের অবতারণা করেছেন। এ ছাড়া 'আকায়েদ, তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাসসহ বিভিন্ন শাস্ত্রীয় আলোচনায় ও জটিল তত্ত্ব-কথায় বইটি ছিল ভরপুর। সুতরাং একজন সর্বজ্ঞান-বিশারদ পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষেই এ কিতাবের সমুচিত জওয়াব লেখা সম্ভব ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে শী'আ গ্রন্থকাররা জাল হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে বেশ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অন্যদিকে হাদীস শাস্ত্রের এত বিস্তৃতি ঘটেছিল এবং হাদীস সংকলনের এমন বিরাট ভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল যে, সমালোচনা বিজ্ঞান এবং রিজাল-শাস্ত্রের নীতিমালার আলোকে হাদীসের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের কাজ খুবই জটিল ও দুরূহ হয়ে পড়েছিল। সুতরাং এ খিদমত আঞ্জাম দেয়া এমন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল, হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের গোটা ভাণ্ডার যার নখদর্পণে রয়েছে এবং সূত্র, বর্ণনা ও বরাতের ক্ষেত্রে যাকে প্রতারিত করা সম্ভব নয় কিছুতেই। সেই সাথে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কেও থাকতে হবে তাঁর সুগভীর জ্ঞান যাতে প্রথম দৃষ্টিতেই গ্রন্থকারের ঐতিহাসিক বিচ্যুতি ও মিথ্যাচার

তাঁর কাছে ধরা পড়ে যায় এবং কোন জাল বর্ণনাই তাঁর কাছে ছাড় না পায়। এটা স্বীকৃত সত্য যে, ইতিহাসের সুবিশাল ভাণ্ডার থেকে উপাদান সংগ্রহ করে যে কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিকেই কলংকিত করে দেখানো সহজ। কিন্তু তার পক্ষ থেকে সাফাই পেশ করা খুবই কঠিন। তদুপরি সাহাবা চরিত্রে কলংক লেপন হচ্ছে শী'আদের প্রিয়তম বিষয় এবং মেধা ও প্রতিভা প্রয়োগের উর্বরতম ক্ষেত্র।

বলা বাহুল্য যে, ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-ই ছিলেন সেই যোগ্যতম ব্যক্তি। কেননা তিনি ছিলেন সে যমানার আমীরু'ল-মু'মিনীন ফি'ল-হাদীস। হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের গোটা গ্রন্থাগার তাঁর সামনে ছিলো উন্মুক্ত। আর তাঁর সম্পর্কে বিদগ্ধজনদের মন্তব্য হলো ঃ যে হাদীস সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) 'জানিনা' বলেন, আদতে সেটা হাদীসই নয়। সুতরাং আহলে সুন্নাতের পক্ষ থেকে আলোচ্য কিতাবের সমুচিত জবাব লেখার জন্য ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-কে জোর অনুরোধ জানানো হলো। দীন ও 'ইলমের বড় সৌভাগ্য যে, সাহাবা চরিত্র হননের এ ভয়ংকর ফিতনা প্রতিরোধে গোটা উম্মাহর পক্ষ থেকে কলম হাতে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) এগিয়ে এলেন এবং আলোচ্য শী'আ গ্রন্থের রচনালগ্নেই এমন দাঁতভাঙা জওয়াব লিখলেন যা তাঁর পরবর্তীকালের কোন 'আলিমের পক্ষে বলতে গেলে দুঃসাধ্যই হতো। এখন যে কেউ এ বিষয়ে কলম ধরবেন তাকে মূলত ইবনে তায়মিয়া র)-র ভাণ্ডার থেকেই রসদ সংগ্রহ করতে হবে।

'মিনহাজু'স-সুন্নাহ'[১] নামে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র এ জওয়াবী গ্রন্থ তাঁর রচনা-সমগ্রে এক বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। ইবনে তায়মিয়ার বিদগ্ধ জ্ঞান, প্রজ্ঞাপূর্ণ দূরদৃষ্টি, জাগ্রত মেধা এবং অধ্যয়নের ব্যাপ্তি ও পরিপক্কতা সম্পর্কে জানতে হলে এ বইটি অবশ্যই পড়ে দেখতে হবে। ইবনুল-মুতাহহিরের 'মিনহাজুল কারামা' থেকে উদ্ধৃতি পেশ করে যখন তিনি জবাবী কলম ধরেন আর তাঁর ধর্মীয় মর্যাদাবোধ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, জ্ঞান সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ জাগে এবং হাদীস, তাফসীর ও ইতিহাস সংক্রান্ত তথ্য উপাদানের ঢল নামে, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রতিপক্ষকে বলতে ইচ্ছা করে ঃ

يايها النمل اد خلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لايشعرون - (النمل ١٨)

হে পিপীলিকা দল! গর্তে ঢুকে পড়, সুলায়মান ও তার বাহিনী নিজেদের অজান্তেই হয়ত তোমাদের পিষে ফেলবে। [সূরা নমল, আয়াত-১৮]

১. চার খণ্ডের এই বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২১৪। ১৩২২ হিজরীতে শেখ মুস্তফা আল-বাবরী তত্ত্বাবধানে মিসরের আমীরিয়া প্রকাশনা থেকে ছাপা হয়েছে। আল্লামা যাহবী আল-মুনতাকা নামে বইটির সংক্ষেপ করেছেন। অতি সম্প্রতি শেখ মুহাম্মদ লতীফের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মুহিববুদ্দীন আল-খতীবের তত্ত্বাবধানে মিসর থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থ রচনার অন্তর্গত কারণ

মিনহাজু'স-সুন্নাহ গ্রন্থের রচনা কর্মে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র হাত দেওয়ার মূল কারণ হলো, মিনহাজু'ল-কারামার লেখক ইবনু'ল-মুতাহ্হির খুলাফায়ে রাশেদীনসহ প্রথম সারির বিশিষ্ট সাহাবা-ই কিরামের বিরুদ্ধে নগ্ন ভাষায় বিষোদগার করেছেন এবং তাঁদেরকে নিকৃষ্টতম মানুষ প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। অথচ আহলে সুন্নাতের ইমাম ইবনে তায়মিয়ার মতে ঈমান ও ধার্মিকতায় এবং চরিত্র ও নৈতিকতায় নবীদের পর তাঁরাই হলেন শ্রেষ্ঠতম মানব। তাঁদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার অর্থ হলো ইসলামের ভিত্তিমূলে আঘাত হানা, নবুওয়তে মুহাম্মদীকে অসফল প্রমাণিত করা এবং কুফর ও ধর্মত্যাগের মহা ফেতনার দরজা খুলে দেওয়া। এক স্থানে তিনি লিখেছেন ঃ

> এ পাষণ্ড যদি সেই মহামানবদের চরিত্রে হামলা না চালাত যাঁরা হলেন আহলুল্লাহ্দের পথিকৃত, মানবজাতির পথ-প্রদর্শক এবং নবীদের পর আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, হামলাও এমন নির্দয় ও জঘন্য যা কাফির ও মুনাফিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে এবং ঈমানদারদের অন্তরে সন্দেহ ও দুর্বলতা সৃষ্টি করে দীন ও ইসলামের সর্বনাশ সাধনের শামিল, তা না হলে সমালোচনার মাধ্যমে এ ব্যক্তির স্বরূপ তুলে ধরার কোন গরজ আমাদের থাকত না। আল্লাহ্ পাক তার ও তার সমমনাদের উপযুক্ত বদলা বিধান করুন।

শী'আদের কথামতে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরাই উত্তম

সাহাবাদের চরিত্র হনন এবং তাঁদের হেয় প্রতিপন্ন করার ঘৃণ্য শীআ মানসিকতার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন ঃ

> উম্মতে মুহাম্মদী হলো শ্রেষ্ঠ উম্মত। তাদের মাঝে প্রথম যুগের মুসলমানগণ হলেন শ্রেষ্ঠতম। উত্তম ইলম ও উত্তম 'আমলের ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন সবার ওপরে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কুচক্রীরা সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র অঙ্কন করেছে। তাদের বিবরণ থেকে মনে হয়, এই পুণ্যাত্মাদের যেমন হক ও সত্যের জ্ঞান ছিল না, তেমনি হকের অনুগতও তাঁরা ছিলেন না; বরং তাঁদের অধিকাংশই জেনেশুনে হকের বিরোধিতা করতেন এবং জালিমদের সাথে হাত মেলাতেন। কেননা সত্যের নাগাল পাওয়ার মত 'চিন্তাশক্তি' তাঁদের ছিল না। চিন্তা শক্তিকে যাঁরা কাজে লাগায় না, দুনিয়ার মোহ এবং প্রবৃত্তির ফাঁদে পড়া ছাড়া তাঁদের আর কি হবে! তাদের দাবী মতে, সাহাবাদের কেউ কেউ খাহেশের কারণেই খিলাফতের দাবীদার হয়েছিলেন। তাদের এ সকল

কথার অনিবার্য অর্থ এই দাঁড়ায় যে, নবীর ওফাতের পর গোটা উম্মত গোমরাহীতে ডুবে গিয়েছিলো। কেউ হিদায়াতের পথে ছিলো না। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে যে, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান জাতি (ইয়াহূদী ও খ্রিস্ট ধর্মের বিকৃতি সত্ত্বেও) সাহাবাদের চেয়ে উত্তম ছিলেন। কেননা কুরআন শরীফে আছে ঃ

ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون -(اعراف)

মূসার কওমে এমন এক জামাআত রয়েছে, যারা সত্যের পথ বাতলে দেয় এবং সে মুতাবিক ইনসাফ করে। সূরা আ'রাফ;

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান জাতি সত্তরের অধিক ফিরকা হবে, তার মধ্যে একটি দলই শুধু নাজাত পাবে। কিন্তু শীআদের কথা মেনে নিলে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর হক ও ইনসাফের ওপর অবিচল একটি দলও বিদ্যমান ছিল না। আর সর্বোত্তম যুগের এই অবস্থা হলে পরবর্তীদের তো কোন প্রশ্নই আসে না। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে যে, ধর্ম বিকৃতির অপরাধ সত্ত্বেও ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান জাতি এই উম্মতের চেয়ে উত্তম। অথচ এই উম্মতের প্রশংসা করেই আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

كنتم خير امة اخرجت للناس -

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের হিদায়াতের জন্য তোমরা উত্থিত।[১]

উম্মতের শ্রেষ্ঠরা শীআদের চোখে নিকৃষ্ট

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

নবী-রসূলদের পর শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী এই জামাআতকে যাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের সনদ দিয়েছে খোদ আল-কুরআন—শী'আপন্থীরা উম্মতের নিকৃষ্টতম জামা'আত প্রমাণ করে ছেড়েছে। তাঁদের সুমহান চরিত্রে জঘন্যতম অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। এমন কি তাঁদের সুকর্মগুলোকেও কুকর্মরূপে তুলে ধরা হয়েছে। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তির পূজারীর নামধারী মুসলমানদেরকে যাদের চেয়ে বড় মূর্খ, অত্যাচারী, মিথ্যাচারী, পাপাচারী এবং ঈমানের নূর ও হাকীকত থেকে বঞ্চিত আর কেউ নেই—উম্মতের উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জামা'আতরূপে তুলে ধরা হয়েছে। এভাবে গোটা উম্মাহকে কাফির বা গোমরাহ আখ্যায়িত করে নিজেদের ক্ষুদ্র দলটিকেই শুধু সত্যপন্থী বলে দাবী করা হচ্ছে।

১. ঐ, খণ্ড ১, পৃ. ১৫২।

একটি উদাহরণ

তারা সেই ব্যক্তির মতো যাকে বিরাট বকরী-পালের মালিকের পক্ষ থেকে বলা হলো ঃ 'এ-পালের সবচেয়ে তাজা বকরীটি কুরবানীর জন্য আমাকে বেছে দাও।' কিন্তু সে সবচেয়ে দুর্বল ও কংকালসার বকরীটি বেছে বের করল যাতে না আছে গোশ্‌ত, না আছে চর্বি। উপরন্তু সেটাকেই সে পালের সেরা বকরী বলে দাবী করে বলল, এটাকেই কুরবানী করা উচিৎ। পালে আর যা দেখছো এগুলো বকরীই নয়, শুয়োর। কুরবানী করা দূরের কথা এগুলো মেরে ফেলাই উচিত।

ইমাম শা'বীর মন্তব্য

ইমাম শা'বী (র)-র মন্তব্য উদ্ধৃত করে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন যে, ইয়াহূদী-খ্রিস্টানরা তাদের নবীদের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে রাফিযীদের চেয়ে বেশী সচেতন। ইয়াহূদীদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম কারা? তারা বললো, হযরত মূসার শিষ্যরা। অনুরূপভাবে খ্রিস্টানদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলল, হযরত 'ঈসার শিষ্যরা। পক্ষান্তরে রাফিযীদের প্রশ্ন করা হলো, তোমাদের মাঝে নিকৃষ্টতম কারা? তারা বলল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহাবারা। তখন ভদ্রলোকদেরকে সাহাবাদের জন্য মাগ্‌ফিরাত প্রার্থনার অনুরোধ করা হলো। কিন্তু তারা তাদের প্রতি মুখ খারাপ করল।[১]

প্রথম সারির মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ আর কাফিরদের সাথে সখ্যতা

রাফিযীদের স্বভাব এই যে, মুসলমানদের পরিবর্তে ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও মুশরিকদের সাথেই তারা হাত মিলিয়ে থাকে। তাদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলতেই তারা অধিক আগ্রহী। বলুন তো, শীর্ষস্থানীয় আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী এবং কাফির ও মুনাফিকদের সাথে সখ্যতা স্থাপনকারীদের চেয়ে অধিক গোমরাহ্ আর কে হতে পারে?[২]

অতঃপর কাফিরদের সাথে শী'আদের সখ্যতা ও দহরম-মহরমের ঘটনাবলী উল্লেখ করে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

কাফিরদের সাথেই তাদের অধিকাংশের অন্তরঙ্গতা। মুসলমানদের চেয়ে তাদের সাথেই তাদের অধিক ঘনিষ্ঠতা। তাই পূর্বদিক থেকে যখন তাতারী হামলার সয়লাব এল এবং খুরাসান, ইরাক, সিরিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে খুনের

১. ঐ, খণ্ড ১, পৃ. ৬।
২. ঐ, খণ্ড ২, পৃ. ৮৩।

দরিয়া বয়ে গেল তখন শী'আ রাফিযীরা ছিল তাদের দোসর ও সাহায্যকারী। তদ্রূপ হলবের শী'আরাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুদের মদদ যোগানোর কাজে ছিল বেশ তৎপর। সিরিয়াতেও খ্রিস্টান হানাদারদের রাফিযীরা মদদ যুগিয়েছে। তোমরা দেখে নিও, ইরাক কিংবা অন্য কোথাও ইয়াহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে এই শী'আ রাফিযীরাই হবে তাদের বিশ্বস্ত মিত্র। মোট কথা, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফির, মুশরিক, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের মদদ যোগানোর জন্য সব সময় এরা এক পায়ে খাড়া।[১]

ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক মানসিকতা

'মিন্‌হাজু'ল-কারামা' গ্রন্থে এক স্থানে খাজা নাসিরুদ্দীন তুসীর নাম নিতে গিয়ে ভক্তি গদগদ ভাষায় ইবনু'ল-মুতাহহির লিখেছেন ঃ

شيخنا الامام الاعظم خواجة نصير الملة والحق والدين محمد بن الحسن الطوس قدى الله روحه -

গ্রন্থকারের এ অর্থপূর্ণ ভক্তি প্রদর্শন ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র ঈমানী জযবার আগুনে যেন তেল ছিটিয়ে দিল।

আব্বাসী খলীফার হত্যাকাণ্ড এবং বাগদাদের গণহত্যায় তুসীর ঘৃণ্য ভূমিকা এবং তার নাস্তিক্যবাদী 'আকীদা ও চিন্তাধারার বিশদ বিবরণ তুলে ধরে সীমাহীন ক্ষোভের সাথে তিনি লিখেছেন ঃ

কী আশ্চর্য! এ লোক হযরত আবূ বকর, ওমর, 'উছমান (রা) সহ শীর্ষস্থানীয় সাহাবা এবং পরবর্তী যুগের ইমাম, 'আলিম ও মুজতাহিদদের শানে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে। নির্দ্বিধায় তাঁদের পূত-পবিত্র চরিত্রে জঘন্য কলংক লেপন করছে। এমনকি মুখ বাঁকা না করে তাঁদের নামটা পর্যন্ত সে নিতে রাযী নয়। অথচ ইসলামের এক প্রকাশ্য দুশমনের নামে সে বিতরণ করছে شيخنا الامام الاعظم -এর মত রাশভারি খেতাব! তার জন্যই কিনা কামনা করছে রহমত। অথচ এই তুসীর 'আকীদা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে কুফরীর ফতোয়া সে নিজেই জারী করেছে। এমন 'এক চোখ অন্ধ' যারা তাদের লক্ষ্য করেই বুঝি আল-কুরআন ইরশাদ করেছে ঃ

الم ترالى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا اهؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا . اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجدله نصيرا

---

১. ঐ, খণ্ড ২, পৃ. ৮৪।

তুমি তাদের দেখনি, যাদের দেওয়া হয়েছিল কিতাবের কিছু অংশ; তবুও তারা মূর্তি ও তাগুতে ঈমান রাখে, আর কাফিরদের সম্পর্কে বলে যে, এরা মুসলমানদের চেয়ে অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত। এদের ওপরই তো আল্লাহ্র লা'নত নাযিল হয়, আর আল্লাহ্র লা'নত যাদের ওপর তাদের বাঁচানেওয়ালা কেউ নেই।[১] [নিসা ঃ আয়াত-৫১-৫২]

শী'আদের আজব ভেলকি

শী'আদের একটি সুপরিচিত মুদ্রাদোষ সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন যে, নবীদের সাথে নসব ও রক্তসূত্রে সম্পর্কিত (ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন) পুরুষদের অর্থাৎ তাঁদের পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্তুতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেও তাঁদের জীবন-সঙ্গিনী ও স্ত্রীদের শানে তারা চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শনপূর্বক লাগামহীন অপবাদ আরোপ করে থাকে। এটা মূলত তাদের ঘৃণ্য প্রবৃত্তি ও জঘন্য সাম্প্রদায়িক মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ। তাই হযরত ফাতিমা (রা) এবং হাসান-হুসায়ন ভ্রাতৃদ্বয়কে সম্মান করলেও উম্মু'ল-মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা)-র শানে এরা চরম গোস্তাখী করে এবং তাঁর চরিত্রে কলংক লেপন করে।[২] আরো মজার ব্যাপার এই যে, মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা)-এর প্রতি এরা ভক্তিতে গদগদ, অথচ তাঁর পিতা হযরত আবূ বকর (রা) সম্পর্কে মুখে গালির খৈ ফোটে। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

> মুহাম্মদ ইবন আবূ বকরের প্রতি এরা মাত্রাহীন ভক্তি দেখায়। অবশ্য হযরত উছমান (র)-এর বিরুদ্ধে গোলযোগ সৃষ্টিতে শরীক সকলের প্রতিই এদের এ ভক্তি উচ্ছ্বাস। তদ্রূপ গৃহযুদ্ধে হযরত আলী (রা)-র পক্ষ সমর্থক সকলেই তাদের ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে। এমনকি মুহাম্মদ ইবন আবূ বকরকে তারা পিতা আবূ বকর (রা)-এর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে দেয়। আরো মজার ব্যাপার এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের পর উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যিনি, তাঁর নামে তারা অভিসম্পাত দেয় মুখ ভরে। অথচ যার ভাগ্যে নবী সান্নিধ্য কিংবা অন্য কোন গৌরব জোটেনি কখনো তার প্রশংসা করে মনভরে। নবী-নসবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে এ ধরনের অদ্ভুত সব স্ববিরোধিতা রয়েছে তাদের।[৩]

সাহাবা-বিদ্বেষ মনের মলিনতার প্রমাণ

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

---

১. ঐ, পৃ. ৯৯-১০০।

১. মিনহাজু'স-সুন্নাহ্, খণ্ড ২, পৃ. ১৯৩।

২. ঐ, পৃ. ২০০-২০০১।

নবীদের পরে যাঁরা শ্রেষ্ঠ মু'মিন এবং আল্লাহ্‌র পথের অগ্রপথিক তাঁদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করা হৃদয়ের মারাত্মক পচন ও ব্যাধিরই প্রমাণ। তাই মালে গনীমতে তাঁরাই শুধু হিস্‌সা পাবে যাঁদের অন্তরে আনসার ও মুহাজির তথা অগ্রসারির মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ নেই, আছে নিখাদ ভালবাসা ও সুগভীর শ্রদ্ধা, যারা তাঁদের জন্য মহান প্রতিপালকের দরবারে দু'আ করে, মাগফিরাত প্রার্থনা করে ঃ

والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم -

এবং তাদের জন্যও যারা পূর্ববর্তী (মুহাজির)-দের পরে এসেছে, তারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। ঈমানদারদের প্রতি আমাদের অন্তরে যেন বিদ্বেষ না থাকে (সে তাওফীক দান করুন)। হে আমাদের প্রতিপালক! নিঃসন্দেহে আপনি মেহেরবান, করুণার আঁধার।

[সূরা হাশর ঃ আয়াত-১০]

দুই সাহাবা-প্রধানের প্রতি বিদ্বেষ

হযরত আবূ বকর (রা) ও ওমর (রা)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ এবং তাঁদের মহান চরিত্রে কলংক লেপন কেবল দু'ধরনের ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। প্রথমত, ইসলাম-বিদ্বেষী মুনাফিক যাদের মূল উদ্দেশ্যই হলো দুই মহান সাহাবার চরিত্র হননের ছিদ্রপথে রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দীনকে অপবাদ দেওয়া। রাফিযীদের আদি গুরু এই দলের অন্তর্ভূক্ত ছিল। বাতেনী ফিরকার দলনায়কদেরও একই অবস্থা ছিল। দ্বিতীয়ত, সেই মূর্খের দল যারা চরম মূর্খতা ও প্রবৃত্তি সেবার কারণে অন্ধত্বের শিকার হয়েছে। এটা সাধারণ শী'আদের অবস্থা অর্থাৎ যাদের অন্তরে ঈমান বিদ্যমান রয়েছে।

রিসালতের প্রতি অপবাদ

মুসলমান মাত্রই সন্দেহাতীতভাবে জানে যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে হযরত আবূ বকর, ওমর ও উছমান (রা)-এই তিন সাহাবা প্রধানের বিশেষ সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তিনজনই তাঁর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত ছিলেন। এমন কি তাঁর সাথে তাঁদের আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল। প্রথম দু'জনের কন্যা তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে অপরজন ছিলেন একে একে তাঁর দুই কন্যার ভাগ্যবান স্বামী। কোথাও

এমন কোন প্রমাণ নেই যে, তিনি তাঁদের নিন্দা করেছেন কিংবা অভিসম্পাত দিয়েছেন; বরং সুপ্রমাণিত সত্য এই যে, সর্বান্তকরণে তাঁদের তিনি ভালোবাসতেন এবং তাঁদের সততা, ধার্মিকতা, আন্তরিকতা ও নিঃশর্ত আত্মনিবেদনের প্রশংসা করতেন। এমতাবস্থায় হয় আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, নবীর জীবদ্দশায় ও পরে তিন সাহাবা-প্রধান বাহ্যিক ও আন্তরিক উভয় দিক থেকেই সৎ ও বিশ্বস্ত ছিলেন এবং ঈমান ও আমলে খাঁটি ছিলেন, নতুবা নবীর জীবদ্দশায় ও পরে ঈমান ও আমলে তাঁরা কপট ছিলেন। এই কপটতা সত্ত্বেও রাসূল (সা) কেন তাঁদেরকে এমন স্নেহ ও নৈকট্য দান করেছিলেন? এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। তাঁদের মনের কপটতা তাঁর অগোচরে ছিল কিংবা জেনে-শুনেও তোষামোদের কৌশল তিনি অবলম্বন করেছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই নবী চরিত্র কলংকিত হবে। এমনকি তাঁর নবূওয়তের সত্যতাও হবে প্রশ্নের সম্মুখীন। অবস্থাটি হবে কবির ভাষায় ঃ

فان كنت لاتدرى فتلك مصيبة

وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم -

'জানা ছিলো না, যদি বল তাহলেও বিপদ; আর যদি বল যে, তুমি জানতে তাহলে তো মহাবিপদ।'

পক্ষান্তরে যদি বলা হয় যে, নবীর জীবদ্দশায় তাঁরা সত্যে অবিচল ছিলেন, পরে তাঁদের বিচ্যুতি ঘটেছিল তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, সাহাবাদের বিশেষত অগ্রসারির সাহাবাদের ঈমান ও আমল এবং জীবন ও চরিত্র গঠনে আল্লাহ্র রাসূল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। যে নবীকে ওহীযোগে অতীত ও আগামী ইতিহাসের 'ইল্ম দান করা হয়েছিল, কী আশ্চর্য! তিনি তাঁর বিশিষ্টতম সাহাবাদের ভবিষ্যত ধর্মচ্যুতির কথাটাই জানতে পারলেন না! উম্মতকে এ সম্পর্কে সতর্ক করে যাওয়াই তাঁর দায়িত্ব ছিল যেন অজ্ঞতাবশত তাদেরকে খলীফা মনোনীত করে উম্মত বিভ্রান্ত না হয়। যে নবীকে সকল ধর্মের ওপর তাঁর ধর্ম বিজয়ী হবে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তাঁর বিশিষ্টতম সাহাবারা কিভাবে মুরতাদ হতে পারেন! এসব কথা বলে রাফেযীরা আসলে রসূল (সা)-এর মহান ব্যক্তিত্বকেই ক্ষত-বিক্ষত করতে চেয়েছে। সুকৌশলে মানুষের অন্তরে তাঁরা এ ধারণা দিতে চেয়েছে যে, রসূল আদর্শ চরিত্রের ছিলেন না বলেই তার সাথীরা কপট ও দুশ্চরিত্র ছিল। তিনি আদর্শ চরিত্রের হলে তাঁর সাথীরাও সৎ ও চরিত্রবান হ'ত। এ কারণেই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন 'আলিমদের সুচিন্তিত মন্তব্য হলো, "রাফেযী মতবাদ মূলত নাস্তিক্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের ফসল মাত্র।"[১]

১. ঐ, খণ্ড ৪, পৃ. ১২৩।

সাহাবাদের মর্যাদা সন্দেহাতীতরূপে সত্য

সাহাবাদের 'আদালত তথা বিশ্বস্ততা ও ন্যায়নিষ্ঠাকে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ মনে করেন। তাঁদের সততা ও সত্যবাদিতা এবং ধার্মিকতা ও ন্যায়নিষ্ঠা সম্পর্কে তাঁর অখণ্ড বিশ্বাস ও অবিচল আস্থা রয়েছে। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকেই তিনি বিশ্বাস করেন যে, সাহাবারা হলেন ইসলামের সুমহান শিক্ষার আদর্শ দৃষ্টান্ত এবং নবীর প্রজ্ঞাপূর্ণ তরবিয়াত ও নূরানী সোহবতের বাস্তব নমুনা। তাঁর মতে, সন্দেহাতীত বর্ণনা সূত্রে এবং আল-কুরআনের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াত দ্বারা সাহাবায়ে-কিরামের ফযীলত ও মর্যাদা সুপ্রমাণিত। সুতরাং ইতিহাস গ্রন্থের সাদামাটা বর্ণনা কিংবা অনির্ভরযোগ্য কোন হাদীস দ্বারা এই সত্যকে প্রশ্নের সম্মুখীন করা যায় না। তিনি লিখেছেন ঃ

> কুরআন-সুন্নাহর দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে সাহাবায়ে -কিরামের ফযীলত তথা শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব প্রমাণিত হওয়ার পর প্রক্ষিপ্ত বা দুর্বল সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়েত দ্বারা তা ক্ষুণ্ন করা যায় না। কেননা সন্দেহ কখনোই নিশ্চিত জ্ঞানের বিকল্প হতে পারে না। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা' ও কিয়াসযোগে এ নিশ্চিত সত্যে আমরা উপনীত হতে পেরেছি, নবীদে পর সাহাবারাই ছিলেন উম্মাহর শ্রেষ্ঠ জামা'আত। এ সুনিশ্চিত জ্ঞান সন্দেহাকীর্ণ কোন বক্তব্যে কিছুতেই খর্ব হতে পারে না। পরন্তু সে বক্তব্যগুলোর শিকড়হীনতা প্রমাণিত হয়ে গেলে আর তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।[১]

সাহাবারা নিষ্পাপ ছিলেন না

"রসূলের মত সাহাবারাও নিষ্পাপ ছিলেন, সুতরাং সামান্যতম বিচ্যুতিও তাঁদের জীবনে ঘটা সম্ভব নয়" ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) এ মতে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু এ বিশ্বাস তাঁর অবশ্যই ছিল যে, ন্যায়-নিষ্ঠা, আল্লাহ্-ভীতি, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার বিচারে তাঁরাই ছিলেন উম্মাহ্‌র শ্রেষ্ঠ অংশ। তাঁদের কারো জীবনে সাময়িক কোন বিচ্যুতি ঘটে থাকলেও সে তুলনায় নেক ও পুণ্যের এবং ত্যাগ ও কুরবানীর পরিমাণ এত বেশী এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে সন্তুষ্ট করার উদ্যোগ ও আয়োজন এত বিপুল ছিল যে, কথিত দু'চারটি ত্রুটির কাফ্‌ফারা তাঁদের অনেক আগেই আদায় হয়ে গেছে। মোটকথা, তাঁদের নেক ও পুণ্যের পাল্লা 'ত্রুটির' তুলনায় অনেক ভারি। ইমাম সাহেব বলেন ঃ

> আগেও আমরা বলেছি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের পর কাউকে আমরা নিষ্পাপ মনে করি না। তাই ইজতিহাদী ভুলের কথা অস্বীকার করার প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

১. ঐ, খণ্ড ৩, পৃ. ২০৯।

والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون ، لهم ما يشاؤون عند ربهم . ذلك جزاء المحسنين ، ليكفر الله عنهم اسوا الذى عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذى كانوا يعملون - (الزمره ٣٥/٣٣)

যিনি সত্যের বাণী বহন করে এনেছেন আর সেই সত্যকে যাঁরা স্বীকার করেছেন, তারাই হলেন মুত্তাকী ও ধর্মনিষ্ঠ। তাঁদের কাম্য বস্তুগুলো আপন প্রতিপালকের নিকট তারা মজুদ পাবে। নেক বান্দাদের এই হলো বিনিময় যেন আল্লাহ্ তাদের ত্রুটিসমূহ মুছে দিতে পারেন এবং তাদের নেকী ও পুণ্যের বিনিময় দিতে পারেন। [সূরা যুমার ঃ আয়াত-৩৩-৩৫]

অন্যত্র এরশাদ করেছেন ঃ

اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى اصحاب الجنة . وعد الصدق الذى كانوا يوعدون -

এদেরইতো নেক আমলসমূহ আমি কবূল করে থাকি এবং জান্নাতীভুক্ত করে ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে থাকি। আর তা করা হয় তাদের সাথে সাথে কৃত সত্য প্রতিশ্রুতি মুতাবিক।[১] [সূরা আহ্‌কাফ ঃ আয়াত-১৬]

ইতিহাসে সাহাবায়ে-কিরামের নজীর নেই

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বলেন, অবশ্যম্ভাবী মানবীয় দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে নবীদের পরে কোন মানবগোষ্ঠী এমন নেই যাদের জীবন ও চরিত্র সাহাবা-কিরামের চেয়ে উত্তম হতে পারে। তাঁদের কারো জীবনে ছোটখাঁটো দু-একটি বিচ্যুতি ঘটে থাকলেও তা বড় একটি সাদা কাপড়ে দু'একটি হাল্কা কালো দাগের মতই তুচ্ছ। কিন্তু ছিদ্রান্বেষণকারীদের চোখে কাপড়ের কালো দাগটাই যদি বড় হয়ে ধরা পড়ে এবং গোটা কাপড়ের শুভ্রতা নজর এড়িয়ে যায় তাহলে সেটা তাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতারই কারণে বলতে হবে। অন্যান্য মানবগোষ্ঠীর অবস্থা তো এই যে, মাঝে মধ্যে দু'একটি শুভ্র বিন্দু ছাড়া গোটা আমলনামাটাই তাদের মসীবর্ণ।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাই লিখেছেন ঃ

সাহাবায়ে-কিরাম (রা) হলেন উম্মাহ্‌র সর্বোত্তম জামা'আত। হক ও হিদায়াতের পথে অবিচল থাকা এবং বিরোধ ও ফিতনা থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে কেউ তাঁদের সমকক্ষ হতে পারেনি। তাঁদের পাক-পবিত্র জীবনে

---

১. ঐ. খণ্ড ৩. পৃ. ২৩৮।

মানবীয় দুর্বলতার দু'একটি ঘটনা যদিও-বা চোখে পড়ে, সেগুলোকে অন্যদের জীবন ও চরিত্রের সাথে তুলনা করতে গেলে উল্লেখ করার মতো বিষয়ই নয়; বরং দোষ তাদের যাদের চোখে সাদা কাপড়ের ছোট্ট কালো দাগটা ধরা পড়ে অথচ গোটা কাপড়ের শুভ্রতা নজর এড়িয়ে যায়। মূর্খতা ও অবিচার ছাড়া এটা আর কি? এই মহামানবদের অন্য কোন মানবগোষ্ঠীর সাথে তুলনা করা হলে তখন পাহাড় বুলন্দ হয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব আত্মপ্রকাশ করবে। তা সত্ত্বেও কেউ যদি নিজের কল্পনায় আদর্শ মানবের এমন কোনরূপ মানদণ্ড নির্ধারণ করে নেয় যা আল্লাহ্‌র মোটেই ইচ্ছে নয়, তাহলে তা ধর্তব্যেরই বিষয় নয়। কেউ যদি আদর্শ ইমামের এমন ধারণা পোষণ করে যে, তাঁর ও নিষ্পাপ সত্তার মাঝে কার্যত কোন তফাত নেই, তারপর দাবী করে যে, 'আলিম, শায়খ, আমীর কিংবা বাদশাহকে সেই কাল্পনিক নিষ্পাপ ইমামের মানদণ্ডে অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে, যত অধিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারীই তিনি হোন না কেন এবং দীন ধার্মিকতার গুণ-গরিমার যে শীর্ষ সোপানেই তিনি অবস্থান করুন, উত্তম ও কল্যাণকর কাজের যত তাওফীকই আল্লাহ্ তাকে দিয়ে থাকুন, উপরিউক্ত মানদণ্ডে তাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তাঁর এমন পূর্ণ হতে হবে যে, কোন বিষয়ই তাঁর অগোচর হবে না এবং কোন চিন্তা ও পদক্ষেপে তাঁর ভুল হবেই না, মানবীয় দোষ ও দুর্বলতা থেকেও তাকে মুক্ত ও পবিত্র হতে হবে, মনে তার কামনা-বাসনা থাকবে না, ক্রোধ ও উত্তাপ থাকবে না, ইত্যাদি তাহলে অবশ্যই সে উন্মাদের সুচিকিৎসা আমাদের হাতে নেই। অনেকে তো ইমামদের জন্য এমন মানদণ্ডও কল্পনা করে বসে থাকে যা নবীদের ক্ষেত্রেও করা হয় না।[১]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বারবার জোর দিয়ে বলেছেন ঃ মানবতার গোটা ইতিহাস যিনি জানেন, জানেন বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও সমাজের ইতিবৃত্ত, সর্বোপরি যিনি লাভ করেছেন বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর জীবন ও চরিত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা, তাঁকে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, বিভেদ ও ফিতনার প্রা ঘৃণা পোষণ এবং হক ও সত্যের পথ অনুসরণের ক্ষেত্রে সাহাবা কিরামের চেয়ে ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ, প্রবৃত্তি ও পাশবিকতা এবং পার্থিব লালসা থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে তাঁদের চেয়ে পবিত্র কোন জাতি ও সমাজ মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে নেই। ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

فمن استقرأ اخبار العلم فى جميع الفرق تبين له انه لم يكن قط طائفة اعظم اتفاقا على الهدى والرشد وابعد الفتنة والتفرق والاختلاف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم

১. ঐ, খণ্ড ৩, পৃ. ২৪২।

خير الخلق بشهادة الله لهم بذلك اذيقول تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس تا مرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ـ

পৃথিবীর জাতিবর্গের ইতিহাস ও ঘটনাবলী মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, হিদায়াত ও সরল পথে ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং ফিতনা ও বিভেদ থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের চেয়ে উত্তম ও উজ্জ্বল কোন মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব পৃথিবীর ইতিহাসে আর ঘটেনি। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁদের উৎকর্ষের সনদ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ তোমরা সেই শ্রেষ্ঠ জামা'আত মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে যারা উত্থিত, সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ হলো তোমাদের স্বভাব আর তোমরা আল্লাহতে বিশ্বাসী।

উম্মাহর সকল কল্যাণের উৎস সাহাবায়ে কিরাম

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) সত্যই বলেছেন যে, মুসলিম উম্মাহর কাছে 'ইল্ম ও 'আমল এবং কল্যাণ ও বরকতের যে সম্পদ-ভাণ্ডার রয়েছে এবং (শত প্রতিকূলতার মাঝেও) ইসলামের যতটুকু শান-শওকত ও প্রচার-প্রসার পরিলক্ষিত হচ্ছে, এমনকি গোটা সভ্যতার প্রতি যতটা আগ্রহ এবং কল্যাণ ও সুকৃতির প্রতি যতটা অনুরাগ অনুভূত হচ্ছে- তা মূলত সাহাবায়ে-কিরামের সুমহান ত্যাগ ও কুরবানী, ইসলাম ও আন্তরিকতা, হিম্মত ও সাহসিকতা এবং তাঁদের খুন-পসিনারই বরকতময় ফসল মাত্র। অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় ইমাম সাহেব তাই লিখেছেন ঃ

واما الخلفاء والصحابة فكل خير فيه المسلمون الى يوم القيامة من الايمان والاسلام والقران والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار ـ وانتصارهم على الكفار وعلو كلمة الله فانما هو ببر كة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين وجاهدوا فى سبيل الله وكل مؤمن امن بالله فللصحابة رضى الله عنهم عليه فضل الى يوم القيامة وكل خير فيه الشيعة وغيرهم فهو ببركة الصحابة وخير الصحابة تبع لخير الخلفاء الراشدين فهم كانوا اقوم بكل خير فى الدين والدنيا من سائر الصحابة ـ

ঈমান ও ইসলাম, 'ইলম ও কুরআন, 'ইবাদত ও মা'রিফাত, জান্নাত প্রাপ্তি ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি, মুসলমানদের বিজয় ও প্রাধান্য, এক কথায় কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের যাবতীয় কল্যাণ ও নি'আমতের উৎস হচ্ছে সাহাবায়ে-কিরামের সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানী। তাঁদের মেহনত ও মুজাহাদা ছিল শুধু আল্লাহ্‌রই জন্য যাঁরা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছেন। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত ঈমানের দৌলত লাভকারী সকল মু'মিন সাহাবা কিরামের অপরিশোধ্য ঋণ পাশে আবদ্ধ হতে বাধ্য। এমন্ কি কারো কাছে কল্যাণকর কিছু থাকলে সেগুলোও সাহাবা-কিরাম থেকে উৎসারিত। কল্যাণ ও বরকতের ঝর্নাধারার উৎসমুখ হচ্ছেন খোলাফায়ে রাশেদীন। কেননা দীন ও দুনিয়ার যাবতীয় কল্যাণের পথে তাঁরাই ছিলেন অগ্রপথিক।

সিদ্দীকী খিলাফত নবূওয়তের সত্যতার প্রমাণ

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) আরেকটি বড় কাজের কথা লিখেছেন। তাঁর মতে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত মূলত নবুওয়তে মুহাম্মদীর পূর্ণতা ও সত্যতারই এক অকাট্য দলীল। ওফাতুন্নবীর পর হযরত আবূ বকর (রা)-এর স্থলাভিষেক দ্ব্যর্থহীনভাবেই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সা) সত্যই আল্লাহ্‌র রসূল (সা) ছিলেন। তাঁর মেযাজ ছিল নবুওয়তের মেযাজ, সিয়াসত ও রাজনীতির মেযাজ নয়। দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের মেযাজ ও প্রকৃতির সাথে এর কোন তুলনা হতে পারে না, যারা সাধারণত পুত্র ও পরিবারের সদস্যদেরই স্থলাভিষিক্ত করে থাকেন। তাঁর মাঝে যদি রাজ্যলোভ ও পরিবার-প্রীতির কণামাত্রও বিদ্যমান থাকত তাহলে হযরত আলী (রা) ও আব্বাস (রা)সহ হাশিম পরিবারের বহু যোগ্য সদস্যের যে কোন একজনকে স্থলাভিষিক্ত করার মাধ্যমে খান্দানী সালতানাতের বুনিয়াদ রেখে যাওয়া যেত এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তিনি লাভ করেছিলেন তা হাশিম পরিবারের অনুকূলে চির সংরক্ষিত করে রাখা যেত। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

একথাও ভেবে দেখার মত যে, হযরত আবূ বকর (রা) ও ওমর (রা)-এর খিলাফত মুহাম্মদী নবূওয়ত ও রিসালতের পূর্ণতা ও সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এর দ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, তিনি সত্য রাসূল ছিলেন, দুনিয়াদার বাদশাহ ছিলেন না। কেননা পরিবারকে প্রাধান্য দিয়ে নিকটজনদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করাই হয় সেই লক্ষণ। এভাবে নিজেদের হাতেই তারা রাজ্য ও শাসনক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখে। আশ-পাশের শাসক ও নৃপতিদের তো আমরা এ নীতিই অবলম্বন করতে দেখে আসছি। বুওয়াইহ ও সালজুক বংশসহ সিরিয়া, য়ামন,

পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের শাসক নৃপতিরা নিজ নিজ পরিবারের নিকটজনদের হাতেই শাসন ক্ষমতা অর্পণ করে যেতেন। মুশরিক ও খ্রিস্টান বাদশাহদের নীতিও ছিল তাই। ফিরিঙ্গী সম্রাট ও চেঙ্গীয় পরিবারের বাদশাহরা রাজ্য ও রাজত্ব রাজপরিবারেই কুক্ষিগত করে রাখার চেষ্টা করেন। প্রায়শ তাঁদের মুখে এ ধরনের কথা শোনা যায় যে, অমুক ব্যক্তি রাজপরিবারভুক্ত কিংবা তা নয়। অমুকের দেহে নীল রক্ত আছে কিংবা নেই। এমতাবস্থায় পিতৃব্য পুত্র আলী (রা), আকীল (রা), রাবী'আ (রা) ইবনুল হারিছ ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা), আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিছ ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) প্রমুখের পরিবর্তে হযরত আবু বকর ও ওমর (রা)-কে খিলাফত প্রদান একথাই প্রমাণ করে যে, কোন রাজকীয় আইন বা ঐতিহ্যের তিনি অনুগত ছিলেন না। এছাড়া 'আবদে মনাফ পরিবারে ছিলেন হযরত উছমান ইবন আফ্ফান (রা), খালিদ ইবন সা'ঈদ ইবন আস (রা), আবান ইবন সা'ঈদ ইবন আস (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। আবদে মনাফ পরিবার ছিল কুরায়শের অন্যতম শাখা এবং বংশসূত্রে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকটতর। তাঁর এ আচরণ একথারই অকাট্য প্রমাণ যে, তিনি আল্লাহ্র বান্দা এবং আল্লাহ্র রসূল ছিলেন, বাদশাহ ছিলেন না। কেননা খিলাফতের জন্য বংশ-নৈকট্য কিংবা পারিবারিক আভিজাত্য নয় বরং ঈমান ও তাকওয়া এবং 'ইলম ও 'আমলই ছিল তাঁর দৃষ্টিতে যোগ্যতার একমাত্র মানদণ্ড। তাই শুধু বংশ-নৈকট্য ও পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে কাউকে তিনি অগ্রাধিকার দেননি। এ ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের পর তাঁর উম্মত আল্লাহ্র 'ইবাদত ও আনুগত্যে অবিচল থাকবে, তাঁর হুকুম ও বিধান মেনেই তারা জীবন যাপন করবে। গোত্রীয়, পারিবারিক কিংবা ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ তাদের উদ্দেশ্য হবে না, এমনকি কোন কোন নবীকে যে সালতানাত ও রাজত্ব দান করা হয়েছিল তাও তাঁরা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে এই বলে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন যে, আপনি বান্দা ও রসূল হওয়া অথবা রসূল ও বাদশাহ হওয়া এই দুইয়ের একটি গ্রহণ করুন। তিনি রসূল ও বান্দা হওয়াটাই পসন্দ করেছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) ও ওমর (রা)-এর মনোনয়ন প্রকৃতপক্ষে এই নববী দৃষ্টিভঙ্গিরই পূর্ণতম প্রতিফলন ছিল। কেননা পরিবারভুক্ত কাউকে তিনি স্থলাভিষিক্ত করে গেলে মানুষের এ কথা বলার সুযোগ হতো যে, তিনি উত্তরাধিকারীদের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করে গেছেন।[১]

---

১. ঐ, খ. ৪, পৃ. ১২৬।

জাহিলিয়াতের বংশ-পূজা

হযরত আলী (রা)-র অছি হওয়া এবং তাঁর বর্তমানে অন্য কারোর খিলাফত অবৈধ হওয়ার ধারণা যারা পোষণ করে, নিঃসন্দেহে তারা জাহিলিয়াতের বংশ পূজার মারাত্মক ব্যাধির শিকার। জাহিলী যুগে একথা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না যে, বংশ- কৌলিন্য ও আত্মীয়তা সূত্রে নয় বরং গুণ ও যোগ্যতার মাপকাঠিতেই শুধু পদ ও মর্যাদা লাভ করা যায়। ইসলামের পূর্বে আরব, ইরান ও হিন্দুস্তান সহ পৃথিবীর সব দেশের, সব জাতির মাঝেই এই চিন্তা ও মানসিকতা বিদ্যমান ছিল। খিলাফতে হযরত আলী (রা)-র অগ্রাধিকারের দাবীদাররা মূলত নিজেদের রীতি, ঐতিহ্য এবং নিজস্ব জাতীয় চিন্তা ও মানসিকতার দ্বারাই প্রভাবিত। নবীদের রুচি-প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি তারা উপলব্ধি করতে পারেনি। এটাই স্বাভাবিক। কেননা সাধ ও সাধ্যের ক্ষুদ্র গণ্ডীতেই মানুষের চিন্তা আবর্তিত হয়ে থাকে।

ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

> চিন্তায় ও কথায় রাফিযীরা জাহিলিয়াতের মুশরিকদেরই প্রতিচ্ছবি যেন। বংশ ও পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে তাদের গোঁড়ামী সীমাহীন। খান্দান ও পরিবারই হল তাদের কাছে সখ্যতা ও মিতালীর ভিত্তি। ঈমান ও তাকওয়ার বিচারে ক্ষতিকর নয় এমন সব বিষয়কেও তারা মানুষের জন্য আপত্তিকর মনে করে। এটা জাহিলী চিন্তাধারারই প্রতিফলন।[১]

শী'আভক্তি হুসায়ন বংশধরের জন্য অগ্নিপরীক্ষা

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে, শী'আরা আসলে আহলে বায়ত ও নবী পরিবারের ' বোকা বন্ধু'। তাদের অতিরঞ্জিত ভক্তি ও মিথ্যা বর্ণনা আহলে বায়তের সুনামের পরিবর্তে বদনামই করেছে বেশী। তাঁর ভাষায় ঃ

> শী'আদের অযাচিত ভক্তি-শ্রদ্ধা আসলে আহলে বায়তের জন্য বিপদ ও পরীক্ষা। কেননা প্রশংসার ছলে তারা যা বলে সেগুলো মোটেই প্রশংসার বিষয় নয়। তাঁদের নামে এমন সব ভিত্তিহীন কথা তারা দাবী ও প্রচার করে যে, আহলে সুন্নাতের কিতাবসমূহে তাঁদের প্রকৃত ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণিত না হলে শী'আদের তথাকথিত ভক্তি প্রশংসায় তাঁদের কলংকের সীমা থাকত না।[২]

---

১. ঐ, খ ৪, পৃ. ২৮৭।

২. ঐ, খ ২, পৃ. ১২৫।

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

প্রশংসা ও কুৎসার পার্থক্যই শী'আদের জানা নেই, জানা নেই প্রশংসা ও মহিমা প্রমাণ করার পথ ও পন্থা।[১]

গোঁড়ামির পরিণতি

হযরত আলী (র)-ও আহলে বায়তের 'ইমামত' প্রমাণ করার জন্য 'মিনহাজু'ল -কারামাহ' গ্রন্থকার প্রচুর আয়াত ও হাদীস পেশ করেছেন। আয়াত ও হাদীসের এ ধরনের মর্মান্তিক অপপ্রয়োগ থেকে বোঝা যায়, গোঁড়ামী ও অন্ধপ্রেম মানুষকে বিভ্রান্তির কোন অতলে নিক্ষেপ করতে পারে। মজার ব্যাপার এই যে, অধিকাংশ আয়াত কিংবা বলা চলে প্রায় সবগুলো আয়াতই আহলে বায়তের সাথে সম্পর্কিত কিংবা বিশিষ্ট নয়। পক্ষান্তরে বর্ণিত হাদীসগুলোর অধিকাংশই জাল কিংবা দুর্বল। ইমাম ইবনে তায়মিয়ার ভাষায় ঃ

الروايات المسيبة التى لا زمام لها ولا خطام -

অর্থাৎ এমন সব হাদীস যার মাথামুণ্ডু কিছুই নেই। এক্ষেত্রে শী'আদের আস্পর্ধা এত সীমা ছাড়া যে, বহু হাদীস তারা বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছে, অথচ সেখানে সেগুলোর চিহ্ন মাত্র নেই। কোন কোন হাদীস সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মন্তব্য হলো, ইসলামী জাহানে হাদীসের যতগুলো সংকলন এ পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছে তার কোনটিতেই সেগুলোর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাবে না। কুরআন ও সুন্নাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞানের দৈন্যের কারণে এমনকি সাদামাটা পরিভাষাগুলোও তারা বুঝে উঠতে পারে না। কখনো আবার বুঝে শুনেও ভুল ব্যাখ্যা চালিয়ে দেয়।

আয়াত পেশ করার ক্ষেত্রে 'মিনহাজু'ল কারামাহ'র লেখক এমন সব মজার কাণ্ড ঘটিয়েছেন এবং এমন সব হাস্যকর ও বেমক্কা তাফসীর করেছেন যে, বাজারে চালু একটা চুটকির কথাই তাতে স্মরণ হয় ঃ "ক্ষুধার্তকে জিজ্ঞেস করো দুইয়ে দুইয়ে কত, দেখবে চটজলদি সে জওয়াব দেবে, কেন চার রুটি?" লেখক ভদ্রলোক চল্লিশটি আয়াত পেশ করে দাবী করেছেন যে, এগুলো হযরত আলী (রা) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। যেমন, এক হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন ঃ 'গাদীরে খুম'-এ খুতবা প্রদানের পর

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا -

---

১. ঐ, খ ২, পৃ. ১২৬।

আয়াতটি[1] যখন অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ

الله اكبر على اكمال الدين واتمام النعمة ورضا الرب برسالتى وبالولاية لعلى من بعدى -

সকল বড়ত্ব আল্লাহ্‌র। কেননা তিনি দীনের পূর্ণাঙ্গতা এবং নি'আমতের পূর্ণতা দান করেছেন। অতঃপর আমার রিসালত এবং আমার পরে আলীর বিলায়াত-এর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

কথিত 'হাদীস' সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়ার নির্দ্বিধ মন্তব্য এই যে, হাদীসটি জাল হওয়ার ব্যাপারে কোন হাদীস শাস্ত্রকারেরই দ্বিমত নেই। আর তাই নির্ভরযোগ্য কোন সংকলনে সেটি স্থান পায়নি। তদুপরি তাফসীর ও ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকেও হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সিহাহ্ সিত্তাসহ সকল মুসনাদ ও তাফসীর গ্রন্থের আলোকে এটা প্রমাণিত সত্য যে, উল্লিখিত আয়াতটি বিদায় হজ্জের নয় তারিখে আরাফায় অবস্থানকালে নাযিল হয়েছিল। জনৈক ইয়াহূদী হযরত ওমর (রা)-কে বলেছিল, 'আপনাদের কুরআনে এমন এক আয়াত রয়েছে যা আমাদের উপর নাযিল হলে সেদিনটিকে আমরা 'উৎসব দিবস' ঘোষণা করতাম।' হযরত ওমর (রা) আয়াতটি জানতে চাইলে সে - اليوم اكملت لكم। আয়াতটির কথা বলল। তখন হযরত ওমর (রা) বললেন, আমার বেশ মনে আছে, কবে এবং কোথায় আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এটা আরাফা দিবসে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওকূফ ও অবস্থানকালে নাযিল হয়েছে। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বলেন, অন্যান্য সূত্রেও একথা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত। মুসলমানদের সকল কিতাবেই এর উল্লেখও রয়েছে। মোটকথা, এটা 'য়াওমে খুম'-এর নয় দিন পূর্বে নয়ই যিলহজ্জ রোজ শুক্রবারের ঘটনা। সুতরাং গাদীরে খুমের ঘটনায় আয়াতটি নাযিল হওয়ার দাবী কোনক্রমেই মেনে নেওয়া যায় না। লেখক ভদ্রলোকের বর্ণিত হাদীসের নিম্নোক্ত বাক্যটিও লক্ষ্যণীয় ঃ

اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله -

হে আল্লাহ্! আলীকে যে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাকে তুমি বন্ধুরূপে গ্রহণ করো এবং আলীর সাথে যে শত্রুতা করে তুমিও তাকে শত্রুরূপে চিহ্নিত

---

১. আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে আমি পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নি'আমত পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ধর্মরূপে ইসলামকেই আমি মনোনীত করে দিলাম।

করো এবং আলীকে যে সাহায্য করে তুমিও তাকে সাহায্য করো এবং আলীকে যে ত্যাগ করে তুমিও তাকে ত্যাগ করো।

এখন প্রশ্ন হলো, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক মকবুল দু'আ আর কার হতে পারে? এ হাদীস বিশুদ্ধ হলে এবং আল্লাহ্‌র রাসূল এ ধরনের দু'আ করে থাকলে তার ফল প্রকাশ পাওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী। অথচ ইতিহাস থেকে বিপরীত কথাই প্রমাণিত হচ্ছে।

ইবনু'ল মুতাহহির -এর মতে, مرج الجرين يلتقين ، بينهما برزخ لا يبغيان আয়াতের بحرين দ্বারা আলী ও ফাতিমাকে বোঝানো হয়েছে। আর برزخ لايبغيان হলেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম। পক্ষান্তরে يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان দ্বারা হাসান ও হুসায়ন ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লেখকের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে লিখেছেন ঃ

ان هذا وامثاله بقوله من لا يعقل مايقول وهذا بالهذيان اشبه منه بتفسير القران وهو من تفسير الملاحدة والقرامطة الباطنية للقران بل هو شر من كثير منهم ـ

এ ধরনের কথা সে-ই বলতে পারে যে নিজের কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। এগুলোকে তাফসীর না বলে প্রলাপ বলাই বরং সঙ্গত। বস্তুত এ ধরনের তাফসীর নাস্তিক্যবাদী কারামেতা ও বাতিনী ফিরকার লোকেরাই করে থাকে। এগুলো বরং আরো জঘন্য।

অতঃপর ইমাম সাহেব লেখকের এ উদ্ভট তাফসীর খণ্ডনের উদ্দেশ্যে ছয়টি অকাট্য যুক্তি পেশ করেছেন।

১. এটা সূরা আর-রাহমান এর আয়াত। আর সকল তাফসীরকারের মতেই এটা মক্কী সূরা। অথচ হাসান ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্ম হয়েছে মদীনা শরীফে আলোচ্য সূরা অবতরণের কয়েক বছর পরে।

২. সূরাতু'ল-ফুরকানের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা আলোচ্য আয়াতের তাফসীর পরিষ্কার হয়ে যায় ঃ

وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج ـ ٢

১. দুই সমুদ্রকে তিনি মিশিয়ে দিয়েছেন, সমুদ্র দু'টি একত্রিত হয়েছে। উভয়ের মাঝে রয়েছে পর্দা, ফলে উভয়ে নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করতে পারে না।

২. তিনিই আল্লাহ্, যিনি দুই নদীকে একত্রে মিশিয়ে দিয়েছেন। একটি হলো মিঠা ও সুস্বাদু, অপরটি হলো নোনা ও বিস্বাদ।

البحرين। দ্বারা আলী ও ফাতিমাকে বোঝানো হয়ে থাকলে উভয়ের এক জনকে অবধারিতভাবে ملح اجاج বা নোনা ও বিস্বাদ বলতেই হবে যা মোটেই সুখকর বিষয় নয়।

৩. برزخ দ্বারা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বোঝানো হয়ে থাকলে তিনি অন্তরায় ও প্রতিবন্ধক প্রমাণিত হবেন। আর সেটা প্রশংসার নয়, নিন্দার বিষয়।[১]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র কিতাবের আলোচ্য অংশ এ ধরনের অসংখ্য চিত্তাকর্ষক আলোচনায় ভরপুর। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ্ ও ইতিহাসের আলোকে শী'আ গ্রন্থকারের প্রতিটি প্রলাপের এমন সারগর্ভ ও তীর্যক জওয়াব তিনি দিয়েছেন যা তাঁর বিস্ময়কর মেধা ও প্রতিভা, 'ইল্‌ম ও প্রজ্ঞা এবং যুক্তি উপস্থাপন কৌশল ও বিতর্ক প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে। শী'আ গ্রন্থকারের যাবতীয় যুক্তি-প্রমাণ সম্পর্কে সামগ্রিক মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম সাহেব লিখেছেন যে, হযরত আলী (রা) -র মর্যাদা ও ফযীলত এবং মর্তবা ও বিলায়াত এমন বিশুদ্ধ ও স্বীকৃত দলীল-প্রমাণ দ্বারা সুপ্রমাণিত যে, অতঃপর এ ধরনের মিথ্যাচার ও বিকৃত তথ্য ও জাল হাদীস পরিবেশনের কোনই প্রয়োজন পড়ে না।[২]

আলোচ্য কিতাবের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশে ইমাম সাহেব সাহাবীদের সমালোচনার দাঁতভাঙা জওয়াব দিয়েছেন। লেখক ইবনু'ল-মুতাহহির সাধারণভাবে সাহাবায়ে-কিরাম এবং বিশেষভাবে প্রধান সাহাবাদ্বয়, আরো বিশেষভাবে হযতর আবূ বকর (রা)-এর চরিত্রে জঘন্য কলংক লেপন করেছেন এবং কুরআন, হাদীস, ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থের বরাত টেনে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গুরুতর অভিযোগ প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। কথিত অপবাদ ও অভিযোগগুলোর ওপর চোখ বুলালেই আপনি বুঝবেন যে, শত্রুতা ও বিদ্বেষের সর্বগ্রাসী সয়লাব একজন শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তিকে পর্যন্ত কোথা থেকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। .খানে আমরা দু'টি মাত্র নমুনা পেশ করছি ঃ

কুরআনের যে আ.়ত মুসলিম উম্মাহর মাঝে আবূ বকর (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বোচ্চ কথা ঘোষণা করেছে, সেটি হলো ঃ

الاتنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانى اثنين
اذ هما فى الغار اذيقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ـ

---

১. ঐ, খ ৪, পৃ. ৬৭-৬৮।

২. ঐ খ. ৪, পৃ. ১৮৬।

তোমরা রসূলের সাহায্য না করলে কি হবে, আল্লাহ্ই তো তাকে সে সময় সাহায্য করেছেন যখন কাফিররা তাকে বের করে দিয়েছিল। আর তিনি ছিলেন দু'জনের দ্বিতীয়জন, যখন উভয়ে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন আর তিনি তাঁর সাথীকে লক্ষ্য করে বলছিলেন, অস্থির হয়ো না। আল্লাহ্ তো আমাদের সাথে রয়েছেন। [সূরা তাওবাহ]

কিন্তু শী'আ ইবনুল-মুতাহহিরের মতে, এ আয়াতে হযরত আবূ বকর (রা)-এর মর্যাদা ও ফযীলতের কোন কিছু নেই। কেননা হযরত আবূ বকরকে সফর সঙ্গী করার কারণ এও হতে পারে যে, তিনি যেন তাঁর অনুপস্থিতিতে গুপ্তচর বৃত্তির সুযোগ না পান। সুতরাং আলোচ্য ঘটনা থেকে তাঁর প্রতি রসূলের অনাস্থাই প্রমাণিত হচ্ছে। তদুপরি আয়াতের لاتحزن শব্দ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবূ বকর ভীতু ও অস্থির প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর মনে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস ও আসমানী ফয়সালা সম্পর্কে আশ্বাসবোধ ছিল না। তৃতীয়ত, কুরআন শরীফে যেখানেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাকীনা ও প্রশান্তি নাযিলের কথা বলা হয়েছে সেখানে মু'মিনদেরও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অথচ আলোচ্য আয়াতে হযরত আবূ বকরকে বাদ দিয়ে রাসূলের কথাই শুধু বলা হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, হযরত আবূ বকরের প্রতি সাকীনা ও প্রশান্তি নাযিল করা হয়নি।

জওয়াবে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) প্রথমে দেখিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতে হযরত আবূ বকর (র)-এর কী অতুলনীয় মর্যাদা ও ফযীলত এবং কী অনন্য গুণ ও মহত্তের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং হিজরতের নাযুক মুহূর্তে রাসূলের সাথীত্বের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য কি! অতঃপর তিনি গ্রন্থকারের প্রতিটি প্রলাপোক্তির দাঁতভাঙা জওয়াব দিয়েছেন। ইমাম সাহেব বলেন, গ্রন্থকারের মতে হযরত আবূ বকরকে সাথে নেওয়ার কারণ এই যে, তিনি যেন হিজরতের বিষয়টি শত্রুদের কাছে ফাঁস করে দেওয়ার সুযোগ না পান। সুতরাং বোঝা গেল আবূ বকর খুবই অবিশ্বস্ত ছিলেন এবং তাঁর প্রতি রাসূলের মোটেই আস্থা ছিল না। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো ঃ পৃথিবীর নির্বোধতম ব্যক্তিও কি এমন মানুষ ও ঝুঁকিপূর্ণ সফরে এমন অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে সফরসঙ্গীরূপে নির্বাচন করতে পারে? ইমাম সাহেবের ভাষায় ঃ

فقبح الله من نسب رسوله الذى هو اكمل الخلق عقلا وعلما وخبرة الى مثل هذه الجهالة والغباوة -

এমন ব্যক্তির মুখে আল্লাহ্ চুন কালি দিন, যে তাঁর রাসূল (সা)-কে যিনি 'ইল্‌ম ও প্রজ্ঞায়, 'আকল ও বুদ্ধিতে এবং অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতায় জগতের শ্রেষ্ঠ—এমন বোকা মনে করে।[১]

১. ঐ, খ ৪, পৃ. ২৫৫।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) আরো লিখেছেন ঃ

> আমার জানা মতে, খুরবান্দা নামক যে তাতারী বাদশাহ্‌র জন্য ভদ্রলোক এ 'কিতাব' লিখেছেন তার সামনে এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত হলে এমন মন্তব্যই তিনি করেছেন যা একজন হুশিয়ার লোকের করা উচিত। অথচ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহান ব্যক্তিত্ব তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, পবিত্র।
>
> তিনি বলেছেন ঃ এটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

দ্বিতীয় অপবাদের জওয়াবে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন যে, ভয় ও উৎকণ্ঠা মানুষের স্বভাব ও ফিতরতের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি নবী-রাসূল ও আহলে বায়তের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও এ স্বভাব ও ফিতরত থেকে মুক্ত নন। অতঃপর কুরআন হাদীসের আলোকে একথার সত্যতা প্রমাণ করে ইমাম সাহেব লিখেছেন যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর উৎকণ্ঠা ও ভয় নিজের জন্য মোটেই ছিল না, ছিল প্রাণ-প্রিয় রাসূলের জন্য। ইবনে মুতাহহিরের দ্বিতীয় দলীলের জওয়াবে ইমাম সাহেব বলেন, গ্রন্থকার কৌশলে পাঠককে এ ধারণা দিতে চেয়েছেন যে, কুরআন শরীফে সাকীনা সংক্রান্ত আয়াতের সংখ্যা প্রচুর এবং সর্বত্র রাসূলের সাথে মু'মিনদের উল্লেখ রয়েছে, অথচ একটি মাত্র আয়াতেই এমন হয়েছে।[১] আয়াতটি হল ঃ

ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ، ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها ـ

> হুনায়ন দিবসের কথা স্মরণ করো, যখন সংখ্যাধিক্য তোমাদের গর্বিত করে তুলেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজেই আসল না; বরং এই প্রশস্ত পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং তোমরা পলায়নপর হলে। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে স্বীয় রসূল ও মু'মিনদের উপর 'সাকীনা' নাযিল করলেন এবং এমন সৈন্যদল পাঠালেন যাদের তোমরা দেখতে পাওনি।

---

১. আরেকটি আয়াতে রয়েছে ঃ

انجعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانزل الله سكينته على المؤ منين (الفتح ..)

এখানে বিশেষভাবে মু'মিনদের কথা বলার প্রয়োজন ছিল। কেননা পূর্বে ثم وليتم مدبرين (অতঃপর তোমরা পলায়নপর হলে) বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআন শরীফে একাধিক স্থানে 'সাকীনা' নাযিলের কথা শুধু মু'মিনদের প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে। অতঃপর ইমাম সাহেব এর কারণ ও তাৎপর্য বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।[১]

এ ধরনের গোঁড়ামির দ্বিতীয় নমুনা হলো, হাদীস ও সীরাত গ্রন্থের বর্ণনা মতে বদর যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম 'ঝুপড়িতে' অবস্থান করছিলেন, হযরত আবূ বকরও সাথে ছিলেন আর সেই সুযোগে গ্রন্থকার এক ফ্যাকড়া বের করে ফেললেন। তিনি বললেন, রসূল জানতেন যে, হযরত আবূ বকরকে যুদ্ধে পাঠালে যুদ্ধের ছকই হয়ত পাল্টে যাবে। কেননা আগেও কয়েকটি 'গায্ওয়া'তে তিনি পিঠ দেখিয়ে সেরেছেন। এখানে এসে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র 'ইল্ম ও ঈমানের শান্ত দরিয়ায় যেন ঝড় উঠল। তিনি লিখলেনঃ এ ধরনের ডাহা মিথ্যা ভাষণ প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধ ও গায্ওয়া সম্পর্কে 'বর্ণজ্ঞান'টুকুও এ ভদ্রলোকের নেই। না থাকাটাই স্বাভাবিক। কেননা রসূলের জীবন-চরিত সম্পর্কে জানার কোন আগ্রহই শী'আদের নেই। নইলে ভদ্রলোক অবশ্যই জানতে পেতেন যে, গাযওয়ায়ে বদরেই শুধু মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের লড়াই হয়েছিল এবং এ যুদ্ধেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। সীরাত, হাদীস, গাযওয়া ও ইতিহাস শাস্ত্রের সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, বদরই হলো প্রথম গাযওয়া যাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম লড়াই করেছিলেন। এর আগের কোন গাযওয়া বা সারিয়াতে লড়াই ও সংঘর্ষ হয়নি। একটি মাত্র সারিয়াতে কিঞ্চিত সংঘর্ষ হলেও হযরত আবূ বকর (রা) তাতে শরীকই ছিলেন না। তাহলে একথা বলা কিভাবে ঠিক হবে যে, এর আগে কয়েকবার তিনি যুদ্ধ থেকে পিঠ দেখিয়ে সেরেছেন। দ্বিতীয় কথা, আমাদের হাতে তো কোন যুদ্ধ থেকে হযরত আবূ বকর (রা)-এর পলায়নের প্রমাণ নেই। সুতরাং দাবী যিনি করছেন তাকেই প্রমাণ করতে হবে কোন্ যুদ্ধ থেকে তিনি পলায়ন করেছেন। তৃতীয় কথা, না'উযুবিল্লাহ! হযরত আবূ বকর (রা) সত্যি সত্যি এত ভীরু হয়ে থাকলে 'সেনাপতির' ঝুপড়িতে তাঁকে স্থান দেওয়া দূরের কথা যুদ্ধক্ষেত্রে আনাও প্রজ্ঞার পরিচায়ক হতে পারে না।[২]

---

১. ঐ, খণ্ড ৪, পৃ. ২৭৩-৭৭।

২. দেখুন পৃষ্ঠা ২৮২-২৮৬।

হযরত আলী (রা) সম্পর্কে শী'আদের স্ববিরোধিতা

ইমাম ইবনে তায়মিয়ার মতে, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে একদিকে আল্লাহ ও আল্লাহ্র পুত্রের মর্যাদা দিয়েছে, অন্যদিকে ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার কল্পিত ঘটনায় তাঁকে এমন অসহায় ও দুর্বল প্রতিপন্ন করেছে যে, শত্রুদের অপমান ও লাঞ্ছনা এবং বিদ্রূপ ও পরিহাস নীরবে হজম করা ছাড়া তাঁর যেন কোন গত্যন্তর ছিল না। তেমনি শী'আ বন্ধুরা একদিকে তো হযরত আলী (রা)-র এমন গুণাবলী ও শক্তি-সাহসের কথা প্রচার করে যাতে মনে হয় তাঁর মর্যাদা স্বয়ং রসূলের চেয়েও বুঝি এক কাঠি বাড়া, যেন তাঁকে ছাড়া ইসলামের প্রসার ও বিজয়ই ছিল অসম্ভব। আলী (রা)-র শেরপাঞ্জা ও যুলফিকারের বদৌলতেই ইসলামের হেলালী ঝাণ্ডা বুলন্দ এবং শিরক ও বাতিলের ঝাণ্ডা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। অথচ পূর্ববর্তী তিন খিলাফতকালে তাঁকে এমন অসহায় ও মজবুর দেখানো হয়েছে যে, একের পর এক তাঁর বিবেক ও বিশ্বাসের বিরোধী কাজগুলি সংঘটিত হচ্ছিল, পদে পদে আহলে বায়তের ওপর অপমান, লাঞ্ছনা, নির্যাতন ও নিপীড়ন নেমে আসছিল অথচ শেরে খোদা অসহায় দর্শকের মত তা কেবল দেখছিলেন। অন্যায়ের মুখেও তিনি ছিলেন নির্বিকার, নির্যাতনের মুখেও নীরব। একটি বারের জন্যও শোনা যায়নি তাঁর হায়দরী হাঁক, খাপমুক্ত হয়নি তাঁর যুলফিকার। এ বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতার কী জওয়াব হতে পারে? ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

> শী'আ পন্থীরা স্ববিরোধী বক্তব্যই প্রদান করে থাকে। হযরত আলীকে তারা শ্রেষ্ঠ সাহসী ও বীরযোদ্ধা বলে দাবী করে। আল্লাহ্র রসূলের দীনকে যেন তিনিই কায়েম করেছেন এবং আল্লাহ্র রসূল সর্বতোভাবে তাঁর উপরই ছিলেন নির্ভরশীল। শী'আরা এতদূরও বলে থাকে যে, দীন কায়েমের ক্ষেত্রে হযরত আলী আল্লাহ্র শরীক ছিলেন। অথচ ইসলামের বিজয় অর্জিত হওয়ার পর তাঁর অক্ষমতা ও দুর্বলতা, অসহায়ত্ব ও অস্থিরতা এবং তাকিয়া ও ছলনা-নির্ভরতার কল্পিত ঘটনা থেকে মনে হয় যেন তাঁর চেয়ে কমযোর, অসহায়, নীতি ও বিবেক বর্জিত মানুষ আর দ্বিতীয়টি ছিল না। অথচ সন্দেহাতীত সত্য এই যে, ইসলাম কবূল করার পর হক ও সত্যের তিনি ছিলেন অধিক অনুগামী। আশ্চর্য! দীন কায়েমের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র শরীক ছিলেন, কাফির মুশরিকদের যিনি পর্যুদস্ত করে ছাড়লেন এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করলেন, সেই শক্তি ও সাহস তিনি তাদের বিরুদ্ধে কেন দেখালেন না যারা নাকি তাঁরই চোখের ওপর ইসলামের

গোড়া কাটতে শুরু করেছিল; অথচ সংখ্যায় ও শক্তিতে তারা কাফিরদের তুলনায় দুর্বলই ছিল। পরন্ত এই বিরোধীরা তো আর যাই হোক—হক ও সত্যের কিছুটা কাছাকাছিই ছিল।[১]

ইমামত প্রসঙ্গ

শী'আদের ইমামতের 'আকীদা প্রসঙ্গেও ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বিশদ আলোচনা করেছেন। দীনের রোকন হিসাবে ইমামতের যে সংজ্ঞা ও পরিচয় তারা পেশ করেছে, তিনি কঠোর ভাষায় তা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাদের যুক্তি ও উক্তি-নির্ভর যাবতীয় দলীল-প্রমাণ খণ্ডন করেছেন। সেই সাথে 'ইমামে গায়েব'-এর 'আকীদা সম্পর্কে সুতীব্র কটাক্ষ করে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ফিতনা ও বিভেদ, ফাসাদ ও গোলযোগ এবং অলসতা ও কর্মবিমুখতা ছাড়া এ 'আকীদার আর কোন ফসল নেই।[২]

কুরআন-সুন্নাহর প্রতি শী'আদের নিস্পৃহতা

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন যে, কুরআন হেফজ করা এবং এর অর্থ ও তাফসীর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার প্রতি শী'আদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তদ্রূপ সহীহ্, য'ঈফ ও মওযু' হাদীসের পরিচয় লাভ, হাদীসের সঠিক ভাব ও অর্থ উদ্ধার এবং সাহাবা-কিরামের বাণী ও বক্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নেই, কিছু সংখ্যক আহলে বায়তের বর্ণিত স্বল্প সংখ্যক হাদীস ও বাণী-ই হলো তাদের বিদ্যার দৌড়। এসবের মধ্যে আবার যথারীতি সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ তো রয়েছেই।[৩]

জুমু'আ জামা'আত ও মসজিদ বিমুখতা

ইমামদের সম্পর্কে শীআদের অতিরঞ্জন ও সীমালংঘন সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন যে, ইমামদের তারা প্রায় খোদার আসনে বসিয়ে আল্লাহ্র 'ইবাদতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে। অথচ নবী-রসূল ও তাঁদের অনুসারী ইমামগণ লা-শরীক আল্লাহ্র 'ইবাদতেরই নির্দেশ দিয়ে গেছেন। মসজিদে কখনো সালাত আদায় করলেও তা করে একা একা। সালাত ও জামা'আত কায়েমের বড় একটা গরজ নেই তাদের। ইমামদের সমাধিক্ষেত্রগুলো

১. ঐ, খণ্ড ৪, পৃ. ৫৬।

২. ঐ, খণ্ড, ৩, পৃ. ২৪৯-২৫০।

৩. মিনহাজুস-সুন্নাহ, ৪০ পৃ.।

তাদের কাছে মসজিদের চেয়েও পবিত্র ও বরকতপূর্ণ। তাই মসজিদের পরিবর্তে সেখানেই তারা ই'তিকাফ করে এবং হাজীদের আল্লাহ্র ঘর যিয়ারতের মত সেগুলোর যিয়ারতের নিয়তে তারা দূর-দূরান্তর সফর করে থাকে।

পরবর্তী শী'আরা মু'তাযিলাবাদে বিশ্বাসী

বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে শী'আরা সাধারণত মু'তাযিলাদের অনুসারী। পক্ষান্তরে কিছু লোক গ্রীক দার্শনিকদের ভক্ত। তাদের মাঝে অতিমাত্রায় দর্শন প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। শী'আ 'আলিমদের কেউ কেউ যুগপৎ দর্শন, মু'তাযিলী ও রাফিযী চিন্তাধারায় প্রভাবিত। মিনহাজু'ল-কারামাহ গ্রন্থকার তাদেরই একজন। তাঁর কিতাবের 'আকাইদ ও 'ইলমু'ল-কালাম সংক্রান্ত আলোচনাগুলোতে দর্শন ও মু'তাযিলী চিন্তাধারার ছাপ সুস্পষ্ট। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-ও পাল্টা দর্শন ও কালামশাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক ও জটিল আলোচনার অবতারণা করে সেগুলোর প্রামাণ্য ও বিস্তারিত জওয়াব দিয়েছেন এবং যেহেতু 'উক্তি ও উদ্ধৃতি'-নির্ভর 'ইলমের মত 'আকল ও যুক্তি-নির্ভর 'ইলমের সমুদ্রেরও তিনি এক পাকা ডুবুরী, সেহেতু বেশ হাত খুলেই তিনি লিখতে সক্ষম হয়েছেন। গ্রন্থকারের প্রতিটি কথার দাঁতভাঙা জওয়াব দেওয়ার পর আফসোসের সাথে তিনি বলেছেন যে, 'আকল ও যুক্তিনির্ভর 'ইলমের ক্ষেত্রে শী'আদের জানাশোনার স্তর একেবারেই হাল্কা। এমনকি তাদের বিদগ্ধ 'আলিমদেরও মনে হয় এ শাস্ত্রের পাঠশালায় অবোধ নির্বোধ শিশু।[১]

অতীত ইতিহাস

বিভিন্ন স্থানে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন যে, ইতিহাসের সকল অধ্যায়ে শী'আরা কাফির ও মুশরিকদের শক্তি যুগিয়েছে এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সাথে গাদ্দারী করে ইসলামী সালতানাতের ক্ষতি সাধন করেছে। তাই কতকটা বাধ্য হয়েই যেন তাকে এ নির্মম সিদ্ধান্ত টানতে হয়েছে।

মোটকথা, ইসলামের নামে তাদের গোটা ইতিহাসই মসিলিপ্ত।[২]

ভারসাম্যপূর্ণ মধ্য পন্থায় আহলে সুন্নত

ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে, ইসলামী ফিরকা ও উপদলসমূহের মধ্যে আহলে সুন্নতই শুধু অতিরঞ্জন ও শিথিলতা পরিহার করে ভারসাম্যপূর্ণ পথ ও মধ্যপন্থা গ্রহণ করেছে। তাঁর মতে, আহলে বায়তের প্রতি মুহব্বত পোষণ এবং সাহাবা-কিরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাঝে কোন বিরোধ নেই। আহলে সুন্নত অত্যন্ত সার্থকভাবে এ উভয় নি'আমতকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করে এসেছে এবং এটাই হলো প্রকৃত ইসলাম। তিনি লিখেছেন ঃ

---

১. ঐ, খ. ১, পৃ.

২. ঐ, খ. ৪, পৃ. ১১১।

আহলে সুন্নত সকল মু'মিনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন পূর্বক 'ইল্‌ম ও প্রজ্ঞা এবং ন্যায় ও ইনসাফের আলোকেই আলোচনা ও বক্তব্য পেশ করে থাকে। তাদের পথ মুর্খ ও নির্বোধদের পথ নয়, নয় প্রবৃত্তি পূজারী ও শয়তানের সেবাদাসদের পথ। খারিজী ও রাফিযী উভয় পথ ও মতই তাদের নিকট সমানভাবে বর্জনীয়। পূর্ববর্তী সকলের প্রতিই রয়েছে তাদের সমান শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এবং আস্থা ও বিশ্বাস। সাহাবায়ে-কিরামের ফযীলত ও মর্যাদা এবং তাঁদের গুণ ও মহত্ত্ব সম্পর্কে তারা অত্যন্ত সচেতন। সাথে সাথে আহলে বায়তের ইহসান ও অবদানের ঋণ স্বীকার করাকেও তারা অত্যন্ত জরুরী মনে করে। শরীয়তের দৃষ্টিতে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদাটুকু দিতে তারা একান্ত বদ্ধপরিকর।[১]

১. ঐ, খ. ১, পৃ. ১৬৫।

নবম অধ্যায়

শরীয়তী 'ইলমসমূহের পুনরুজ্জীবন

ইমাম ইবনে তায়মিয়ার সময়কাল

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র যুগে শরীয়ত সংক্রান্ত শাস্ত্রসমূহের অসাধারণ বিস্তৃতি ঘটেছিল। বিশেষত তাফসীর, হাদীস, ফিকহ্ ও ফিকহ্ বিজ্ঞান ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে এত বিরাট 'গ্রন্থাগার' তৈরী হয়ে গিয়েছিল যে, শুধু একটি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি ও বৈদগ্ধ অর্জন করা, এমনকি শাস্ত্রীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করাও তখনকার মাঝারি পর্যায়ের একজন 'আলিমের পক্ষে দুর্লভ 'একাডেমিক কৃতিত্ব' মনে করা হতো। তবে তাঁর যুগে এমন 'আলিম ও অধ্যাপকের সংখ্যাও প্রচুর ছিল যাঁরা সব ক'টি শাস্ত্রের গ্রন্থাগার আগাগোড়া অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আবার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক 'আলিম এমনও ছিলেন যাঁরা নিজেদের দুর্লভ স্মৃতিশক্তি, আত্মনিমগ্নতা, ব্যাপক অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কল্যাণে গোটা কুতুবখানা নিজেদের সিনায় সংরক্ষণ করে নিয়েছিলেন এবং বিতর্ক, আলোচনা-সমালোচনা ও অধ্যাপনার সময় ইচ্ছেমত সেগুলোর ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে সক্ষম হতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনু'য-যামালকানী, আল্লামা তকীউদ্দীন, আলী ইবনে সুবকী, শামসুদ্দীন আয-যাহবী, আবুল হাজ্জাজ আল-মিযযী প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। طبقات الشافعية الكبرى থেকে সেই সময়ের বৈদগ্ধ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাগত বৈচিত্র্য সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। সে সময় দু'একজন 'আলিম এমনও ছিলেন যাঁদেরকে শাব্দিক অর্থেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের জীবন্ত বিশ্বকোষ হিসাবে গণ্য করা যেত। তবে একথাও সত্য যে, শাস্ত্রীয় বিস্তৃতি সত্ত্বেও চিন্তা ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে সে তুলনায় গভীরতা সঞ্চারিত হয় নি। দীর্ঘদিন থেকেই এমন 'আলিম ও চিন্তানায়কের সুতীব্র অভাব অনুভূত হচ্ছিল

যাঁরা ইসলামী গ্রন্থাগারের উপর সমালোচনা ও পর্যালোচনার দৃষ্টি দিতে পারেন এবং পূর্বসুরীদের মতামত ও চিন্তাধারা বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজস্ব মতামত ও গবেষণা সংযোজন করতে পারেন। পূর্বসূরীরা যে মহামূল্যবান 'ইলমী মীরাছ ও একাডেমিক উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছিলেন, উত্তরসুরীদের অধিকাংশই তখন সেগুলো আয়ত্ত করা এবং ব্যাখ্যা ও সংক্ষিপ্তসার পেশ করার মাঝেই নিজেদের কর্মকাণ্ড সীমিত রেখেছিলেন। নতুন গবেষণা ও সংযোজনের ধারা বন্ধ ছিল বেশ কিছুদিন থেকেই। ইজতিহাদ ও সৃজনমুখী রচনাকর্মের তখন দারুণ অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। সে যুগের 'গৌরবময়' রচনাকর্মগুলোর বৈশিষ্ট্য শুধু এই যে, বিক্ষিপ্ত তথ্যসমূহকে তাতে সুবিন্যস্ত আকারে গ্রন্থবদ্ধ করা হয়েছিল অথবা পূর্ববর্তী কোন মূল ফিকহ্ গ্রন্থের উত্তম ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছিল।

ইবনে তায়মিয়ার রচনাকর্মের বৈশিষ্ট্য

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর আল্লাহ-প্রদত্ত প্রখর মেধা ও স্মৃতি শক্তি কাজে লাগিয়ে গোটা ইসলামী গ্রন্থাগার আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন এবং নিজস্ব রচনাকর্মে সেগুলোর সুন্দর ও উপযোগী প্রয়োগও ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অতৃপ্ত মেধা ও প্রজ্ঞা এবং সৃজনশীল চিন্তা ও প্রতিভা, সর্বোপরি জলপ্রপাতের মত উচ্ছল গতিময় লেখনীশক্তি শুধু ব্যাখ্যা, টীকা ও সংক্ষেপীকরণের গতানুগতিক কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট ছিল না। কর্মের এক সুবিস্তৃত জগত যেন হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডাকছিল। কুরআন-সুন্নাহর সুগভীর জ্ঞান, শরীয়তের ভাব ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা এবং ফিকহ্ ও ইজতিহাদের অঙ্গনে পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধের ছাপ তাঁর প্রতিটি লেখা ও রচনায় ছিল সুস্পষ্ট। যে বিষয়েই তিনি কলম ধরতেন সাম্প্রতিক চিন্তা ও তথ্য সংযোজনের মাধ্যমে তাতেই নতুন প্রাণ সঞ্চার করতেন। তাঁর কোন রচনাকর্মই নতুন একাডেমিক তথ্য ও তত্ত্ব, নতুন ইজতিহাদ ও সংযোজন এবং মৌলিক আলোচনা ও সমালোচনার অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত নয়; বরং তাতে রয়েছে কুরআন-সুন্নাহর অধ্যয়ন ও উপলব্ধি অর্জনের নতুন নতুন দিক-নির্দেশনা, নব নব দিগন্তের ইশারা। ইমাম সাহেবের দু'টি বিরাট ও মূল্যবান গ্রন্থ الجواب الصحيح، منهاج السنة-এর বিস্তারিত পর্যালোচনা এবং বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার ইতিপূর্বে আমরা পেশ করে এসেছি। তাঁর অন্যান্য রচনাকর্মেও রয়েছে মুজতাহিদসুলভ প্রজ্ঞা, সৃজনশীল মেধা এবং বিরল সমালোচনা শক্তির স্বাক্ষর, যা যুগে যুগে মুসলিম জাহানের সৃজনশীল মেধা ও প্রতিভাগুলোকে নতুন চিন্তার খোরাক যোগায় এবং বিদগ্ধজনদের সামনে নতুন তথ্য ও উপাদান, অভিনব গবেষণা ও ইজতিহাদের সওগাত তুলে ধরে। এ প্রসঙ্গে الرد على

النبوات ، اقتضاء الصراط المستقيم ، منطقيين প্রভৃতি[১] গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যায়। মানুষকে চিন্তা ও গবেষণার পথে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের সামনে নতুন নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক ও শিক্ষণীয় ক্ষেত্র তুলে ধরা, চিন্তা ও গবেষণার জন্য নতুন নতুন বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে উল্লিখিত বইগুলো স্ব-স্ব গণ্ডিতে অত্যন্ত সার্থক ও ফলপ্রসূ রচনা।

তাফসীর

তাফসীর শাস্ত্রকে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর রচনা ও গবেষণা জীবনের বিশেষ বিষয়রূপে গ্রহণ করেছিলেন। এ শাস্ত্রে তাঁর অনুরাগ এত প্রবল ছিল যে, প্রায় সব লেখাতেই তাফসীর বিষয়ক উপাদান ও উপকরণ প্রচুর পরিমাণে স্থান পেয়েছে। নিজস্ব মতামতের সমর্থনে প্রয়োজনীয় তাফসীর ও ব্যাখ্যাসম্বলিত আয়াত পেশ করা ছিল তাঁর প্রিয় স্বভাব। বিষয় প্রসঙ্গে কোন আয়াত সামনে এলে প্রয়োজনীয় তাফসীর ও ব্যাখ্যা না করে এগিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না। তাঁর ছাত্রদের বর্ণনা মতে ত্রিশ খণ্ডেরও বেশী এক সুবিশাল তাফসীর গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন। বলা বাহুল্য যে, উক্ত তাফসীরের পাণ্ডুলিপি হস্তগত হলে তাফসীর জগতের এক অমুল্য রত্ন ও নির্ভরযোগ্য ভাণ্ডাররূপে তা গণ্য হত। জ্ঞান ও চিন্তার গভীরতা, বোধ ও রুচির পরিচ্ছন্নতা, রিওয়ায়াত ও বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিপক্কতা, জ্ঞান ও পরিবেশ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন সমস্যার নির্ভুল সমাধান প্রদানের সহজাত ক্ষমতা, দীন ও শরীয়তের প্রশ্নে আপোষহীন মনোভাব এবং আমর বি'ল-মা'রূফ ও নাহী 'আনি'ল-মুনকারের যে টগবগে আবেগ ও দাওয়াতী জযবা আল্লাহ পাক তাঁকে দান করেছিলেন সে দিকে লক্ষ্য করে বলা যায় যে, তাঁর কলমে লেখা তাফসীর গ্রন্থই সম্ভবত সর্বোত্তম ও সর্বাঙ্গীন তাফসীরের মর্যাদার অধিকারী হতে পারত। উপরিউক্ত বিস্তৃত ও ধারাবাহিক তাফসীর গ্রন্থটি বিলুপ্ত হয়ে গেলেও বিভিন্ন সূরার খণ্ডিত তাফসীর ছাপার অক্ষরে ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। সেগুলো থেকেও তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর সুবিশাল ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা লাভ করা যায়। এ পর্যন্ত প্রকাশিত খণ্ডিত তাফসীরগুলো হলো ঃ (১) তাফসীরু সূরাতি'ল-ইখলাস, (২) তাফসীরু মু'আওয়াযাতায়ন, (৩) তাফসীরু সূরাতি'ন-নূর। এ ছাড়া তাঁর রচনা সমগ্র থেকে তাফসীর বিষয়ক অংশগুলো

---

১. শেষোক্ত কিতাবটির বিষয়বস্তু যদিও অমুসলিমদের আচার-অনুষ্ঠান, রীতি ও বৈশিষ্ট্য বর্জন সংক্রান্ত আলোচনা, তথাপি ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাতেও যথারীতি মূল্যবান ও অনবদ্য আলোচনার অবতারণা করেছেন। ফলে তা ইমাম সাহেবের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহের অন্যতম বিবেচিত হয়েছে। গ্রন্থটির একটি সংস্করণ কায়রো থেকে বেশ জাঁকজমকের সাথে প্রকাশিত হয়েছে। উর্দূ সংস্করণও অতিশীঘ্র প্রকাশিত হচ্ছে।

স্বতন্ত্র গ্রন্থাগারে পকাশ করা হয়েছে।[১] কুরআন-প্রেম ও তাফসীর নিমগ্নতা ইমাম সাহেবের জীবনের এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক ছিল যে, তাঁর জানাযায় ঘোষণা হয়েছিল এভাবে ঃ কুরআনের মুখপাত্রের জানাযা (الصلواة على ترجمان القران) উসূলে তাফসীর সম্পর্কেও তাঁর একটি চটি বই রয়েছে এবং আমাদের জানা মতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেটাই হচ্ছে প্রথম রচিত পুস্তিকা।

হাদীস

হাদীস ও হাদীস ব্যাখ্যা-শাস্ত্রে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র স্বতন্ত্র কোন রচনাকর্ম নেই। কেননা সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে এ শাস্ত্র এমন ব্যাপ্তি ও পূর্ণতা লাভ করেছিল যে, নতুন রচনাকর্মের বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। তবে তাঁর রচনা-সমগ্রে উসূলে হাদীস, রিজাল শাস্ত্র, হাদীস সমালোচনা ও হাদীসতত্ত্বের যে বিপুল উপাদান পাওয়া যায় সেগুলো স্বতন্ত্র গ্রন্থের রূপ পেলে মানে ও কলেবরে নিঃসন্দেহে তা এক অমূল্য ভাণ্ডারের মর্যাদা লাভ করবে। বিশেষত জাল হাদীস সম্পর্কে যেরূপ নির্দ্বিধ ও যুক্তিনিষ্ঠ মতামত তিনি পেশ করেছেন তা অন্য কোথাও পাওয়া দুষ্কর। এ প্রসঙ্গে 'মিন্‌হাজু'স-সুন্নায়' যে পরিমাণ উপাদানে তিনি গ্রহ করেছেন এবং বহু সংখ্যক প্রচলিত হাদীস সম্পর্কে যে সারগর্ভ বক্তব্য রেখেছেন তা অত্যন্ত কার্যকর, দুর্লভ ও মূল্যবান।

উসূল-ই-ফিকহ

ফিক্‌হ্ বিজ্ঞানে (উসূলে-ই-ফিক্‌হ্) ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ইজতিহাদী প্রজ্ঞা ছিল সে যুগের আলিমদের জন্য ঈর্ষণীয় বিষয়। ফিকহ্ বিজ্ঞানসংক্রান্ত তাঁর সব রচনাতেই পরিদৃষ্ট হয়। বিশেষত اقتضاء الصراط المستقيم গ্রন্থ এবং ফতওয়া সংকলনে এতদসংক্রান্ত আলোচনার বিরাট ভাণ্ডার রয়েছে। এ ছাড়া رسالة القياس এবং منهاج الوصول الى علم الاصول নামক স্বতন্ত্র দুটি বইও তাঁর স্মৃতি হয়ে আছে।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র রচনাবলীর পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, তাঁর লেখার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কিংবা অর্ধেক অংশ জুড়ে আছে 'আকাইদ ও কালামশাস্ত্র-সংক্রান্ত আলোচনা। বিভিন্ন শহরের নামে নামকরণকৃত[২] তাঁর পুস্তিকাগুলোতে তাঁর কালাম ও 'আকাইদ সংক্রান্ত চিন্তাধারা ও যুক্তিপ্রয়োগ ক্ষমতা, ধর্মীয় আপোষহীনতা, সুগভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মেধার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে।

---

১. সম্প্রতি এটা 'তাফসীরু ইবনে তায়মিয়া' নামে মাতবা'আ কায়্যিমাহ, বোম্বে থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

২. যে শহর থেকে কোন বিষয়ে ফতওয়া চেয়ে পাঠানো হতো সাধারণত সে শহরের নামেই উক্ত 'ফতওয়ার নামকরণের রেওয়াজ ছিল। যেমন শরাহ ইসবাহানিয়া, রিসালা, হামাবিয়া, তাদমুরিয়া, ওয়াসিতিয়া, কীলানিয়া, বাগদাদিয়া, আযহারিয়া ইত্যাদি।

ফিকহ্ ও ইসলামী আইন শাস্ত্র

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র আমলে প্রত্যেক ফিকহ্ এতটা বিন্যস্ত ও গ্রন্থবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করেছিল যে, তাতে নতুন সংযোজনের চেষ্টা ছিল এক দুরূহ ব্যাপার। তা সত্ত্বেও অসংখ্য আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা, কিয়াস ও ফিকহ্শাস্ত্রের মুল নীতিমালার আলোকে তিনি নিজস্ব ইজতিহাদ প্রয়োগ করেছেন এবং ফিকহ্শাস্ত্রের আহকাম ও সিদ্ধান্তমালা যে বিশুদ্ধ হাদীস থেকে গৃহীত তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। সেই সাথে হাদীস ও ফিকহ্-শাস্ত্রের (কল্পিত) বিরোধ দূর করে উভয়ের মাঝে সমন্বয় ও সাদৃশ্য তুলে ধরার সার্থক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। প্রত্যেক মাযহাবের বিচারক ও মুফতীগণ স্ব-স্ব যুগের উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান এবং যুগের দাবী ও চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে চিন্তা, গবেষণা ও ইজতিহাদের আশ্রয় নিয়েছেন। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)ও উদ্ভূত সমস্যা ও যুগচাহিদার প্রেক্ষিতে নিজস্ব ইজতিহাদ প্রয়োগ করেছেন এবং ফতওয়া ও সিদ্ধান্তমালার এক বিশাল ভাণ্ডার রেখে গেছেন যা فتاوى । ابن تيمية নামে চার খণ্ডের বিরাট কলেবরে প্রকাশিত হয়েছে।[১] ফিকহী আহকাম ও মাসায়েল ছাড়াও উক্ত সংকলনে রয়েছে বিভিন্ন তাত্ত্বিক প্রশ্ন ও মৌলিক আলোচনার এক বিরাট ও মূল্যবান ভাণ্ডার।

পরবর্তী যুগে ইমাম ইবনে তায়মিয়ার প্রভাব

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) যে মহান বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মযজ্ঞ আঞ্জাম দিয়েছেন তাতে যেমন ছিল ব্যাপকতা ও গভীরতা, তেমনি ছিল উক্তি ও যুক্তি উভয় জ্ঞানের চমৎকার সমন্বয়। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান এই যে, শরীয়তী শাস্ত্রসমূহের সংস্কারের খিদমতও তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন এবং ইসলামী চিন্তা ও গবেষণা জগতে দৃশ্যমান বশ্যতা ও অবক্ষয় দূর করেছেন, 'ইলমের নতুন নতুন পথ রচনা করেছেন, চিন্তা ও গবেষণার নব নব দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। এমন মূল্যবান রচনা-সম্ভার তিনি রেখে গেছেন যা চিন্তায় প্রসারতা আনতে সক্ষম এবং যা মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগ্রত করে এবং কর্মে উচ্ছল গতি সৃষ্টি করে। তাঁর রচনা-

১. উক্ত ফতওয়া সংকলন মিসর থেকে ১৩২৬ হিজরীতে শেখ ফারাজুল্লাহ যাকী কুরদীর তত্ত্বাবধানে ছাপা হয়েছে। চার খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৮৬। চতুর্থ খণ্ডের শেষে الاختيارات العلية নামে একটা অধ্যায় যোগ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন বিষয়ে ইমাম ইবনে তায়মিয়ার ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্তসমূহ একত্র করা হয়েছে। ফতওয়া সংকলনের পঞ্চম খণ্ডে রয়েছে কালাম ও 'আকাইদ শাস্ত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনা। সউদী সরকার فتاوى । ابن تيمية নামে ত্রিশ খণ্ডের যে বিশাল সংকলন ছেপেছেন তাকে ফিকহশাস্ত্রের এক পূর্ণাঙ্গ বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে।

সম্ভারের কল্যাণকর প্রভাবেই যুগে যুগে বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী লেখক, চিন্তাবিদ, সংস্কারক, নিষ্ঠাবান অসংখ্য দাওয়াতী কর্মী জন্ম নিয়েছেন। আট শতকের পর থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে সেই ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে নিঃসন্দেহে ইমাম ইবনে তায়মিয়ার তাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে এবং একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ইসলামী চিন্তার জগতে এবং 'ইল্‌ম ও শরীয়তের অংগনে শীর্ষস্থানীয় যুগশ্রেষ্ঠদের কাতারে শামিল হওয়ার যোগ্যতা তাঁর রয়েছে। বিশেষত হিজরী বার শতকের পর থেকে ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন দিগন্তে যে সকল চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি-বৃত্তিক ও সংস্কার আন্দোলন জন্ম লাভ করেছে, সেগুলোর বড় উৎস ও চালিকা শক্তিই হলো ইমাম ইবনে তায়মিয়ার রচনা-সম্ভার।

দশম অধ্যায়

ইসলামী চিন্তাধারার পুনরুজ্জীবন ঃ আকাইদের উৎস কুরআন ও সুন্নাহ্

'আকীদা ও বিশ্বাসের নির্ভুল উৎস

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র একটি মৌলিক সংস্কারমূলক অবদান এই যে, বিলুপ্তপ্রায় ইসলামী চিন্তাধারার তিনি পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন এবং সম্ভবত এটাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। অন্যান্য চিন্তাধারার তুলনায় ইসলামী চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য এই যে, আসমানী ওহী এবং নবুওয়তে মুহাম্মদী হলো এর ভিত্তি–কিয়াস ও যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও অনুমান এবং মানবীয় বুদ্ধি ও গবেষণা এর ভিত্তি নয়। কালামুল্লাহ ও সুন্নতে রসূল (সা)-এর আলোকেই নির্ধারিত হবে 'আকীদা ও বিশ্বাস এবং দীনি হাকীকত ও সত্যসমূহের ভিত্তি। আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাত, সৃষ্টি ও কর্ম, বিশ্বের আদি ও অন্ত, সৃষ্টি ও লয়, কর্মফল ও শাস্তি-পুরস্কারসহ যাবতীয় অতিপ্রাকৃতিক বিষয় সম্পর্কে রাসূল (সা) যা বলেছেন এবং যতটুকু বলেছেন সেগুলোই হচ্ছে 'আকীদা ও বিশ্বাস এবং হাকীকত ও চিরন্তন সত্য। বস্তুত ওহী ও নবুওয়ত ছাড়া এগুলো জানার এবং বিশ্বাস করার অন্য কোন মাধ্যম নেই। কেননা প্রাথমিক জ্ঞাত বিষয়ই হলো যাবতীয় তথ্য ও সত্য জানার মাধ্যম। অথচ দীনী ও গায়বী হাকীকত ও সত্যসমূহের প্রাথমিক সূত্রগুলোও কারো জানা নেই। কোন নতুন ও অজ্ঞাত বিষয় জানার একমাত্র মাধ্যম হলো জ্ঞাত বিষয় ও সূত্রগুলোকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা যা মানুষকে কোন অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান লাভের পর্যায়ে উপনীত করে। কিন্তু মুশকিল এই যে, প্রাকৃতিক ও জড়জাগতিক বিষয়সমূহের প্রারম্ভিক সূত্রগুলো আমাদের যেমন জানা আছে৷ দীনী ও গায়বী হাকীকত বা সত্যসমূহের প্রারম্ভিক সূত্র ও উপাত্তগুলো সেরূপ জানা নেই। আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাত তথা গুণ ও সত্তা মানুষের 'আকল ও বুদ্ধি এবং স্থূল অনুভূতি ও ইন্দ্রীয় শক্তির ঊর্ধ্বের বিষয় এবং এ সম্পর্কে মানুষের কোন রকম

অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ নেই এবং বুদ্ধির ব্যবহার ও যুক্তি প্রয়োগেরও কোন বুনিয়াদ নেই। ليس كمثله شيئ তাঁর কোন তুলনা নেই। সুতরাং এ সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের জন্য সেই মুবারক জামা'আতের ওপর নির্ভর করা ছাড়া কোন উপায় নেই যাঁদেরকে আল্লাহ্ নিজেই অনুগ্রহবশত স্বীয় গুণ ও সত্তার 'ইল্ম দান করেছেন এবং সত্য লাভের জন্য নূর ও হিদায়াত দান করেছেন। এই ঐশী মাধ্যমকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করার কিংবা এ বিষয়ে আলোচনা ও যুক্তি প্রয়োগ করার কোন অধিকার আমাদের নেই। এই চিরন্তন সত্যকেই আল-কুরআন আল্লাহ্র এক নবীর মুখে এভাবে ভাষা দিয়েছে ঃ

قال اتحاجونى فى الله وقد هدان -

তিনি বললেন ঃ তোমরা কি আল্লাহ (-র যাত ও সিফাত) সম্পর্কে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও, অথচ আল্লাহ আমাকে এ সম্পর্কিত জ্ঞান দান করেছেন?

দর্শনের অর্থহীন প্রয়াস

এ এমনই স্পষ্ট ও আলোকিত সত্য যার পর আল্লাহর যাত ও সিফাতের 'ইল্ম হাসিলের জন্য দর্শন কিংবা যুক্তিবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণের কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু মানুষের জ্ঞান সাধনার ইতিহাসে রীতিমত বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত এ অর্থহীন কর্মকাণ্ডে দর্শন নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে এবং এমন বিষয়ের অনুসন্ধান চেষ্টায় সে তার শ্রেষ্ঠ মেধা, প্রতিভা ও চিন্তাশক্তিকে ব্যয় করেছে যে বিষয়ের প্রারম্ভিক সূত্র ও উপাত্তগুলোও তার জানা নেই এবং নিশ্চিত জ্ঞান ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লাভের কোন মাধ্যম তাঁর নাগালে নেই বলে সে নিজেই স্বীকার করেছে। তা সত্ত্বেও দর্শনসেবীরা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে এই নাযুক বিষয়টির অবাধ চুলচেরা বিশ্লেষণ ও খুঁটিনাটি আলোচনায় নাক গলিয়েছেন যেমনটি করে থাকেন অভিধান শাস্ত্রবিদগণ শব্দমালা নিয়ে, ব্যাকরণবিদগণ বাক্যবিন্যাস নিয়ে, পদার্থবিদগণ বিভিন্ন পদার্থ নিয়ে এবং শল্যবিদগণ মানবদেহ নিয়ে। জটিল ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতিপ্রাকৃত বিষয়সমূহে তাদের অবাধ আলোচনা দেখে মনে হয় যেন হাতে ধরা যায়, চোখে দেখা যায় এমন সাধারণ ও স্থূল কোন বিষয় নিয়ে তারা নাড়াচাড়া করছেন।

কালামশাস্ত্রবিদদের দর্শনপ্রীতি

আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চিন্তার জগতে গ্রীক দর্শনের আগ্রাসন রোধ করার গুরুদায়িত্ব নিয়ে যাদের বুদ্ধিবৃত্তিক যাত্রা সেই মুতাকাল্লিমগণও দর্শনের মূলনীতি ও পরিভাষাগুলো মেনে নিলেন এবং আল্লাহ্র যাত ও সিফাত সম্পর্কে

দার্শনিকদের মত তারাও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণে এমন আত্মবিশ্বাসের সাথে মেতে উঠলেন মনে হলো তারাও যেন নিজেদের ধরা-ছোঁয়ার ভেতরের কোন সত্তাকে নিয়ে সাধারণ আলোচনায় রত হয়েছেন। দর্শন-দুর্গে ফাটল ধরাতে যারা মাঠে নামলেন দুর্ভাগ্যবশত নিজেরাই তারা হারিয়ে গেলেন দর্শনের কল্পনা ও পরিভাষার গোলক ধাঁধায়। সওয়াল-জওয়াব ও তর্ক-বিতর্কের উচ্ছ্বাসে দর্শনের এই বুনিয়াদী গলদটুকু ধরিয়ে দিতে তারা ভুলে গেলেন যে, যে নাযুক বিষয়ে হস্তক্ষেপের দুঃসাহস তাঁরা করেছেন তার প্রারম্ভিক সূত্র ও উপাত্তগুলো পর্যন্ত তাদের জানা নেই। দার্শনিকদের একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া তাঁদের দায়িত্ব ছিল যে, গণিত শাস্ত্র, প্রকৃতি বিজ্ঞান হচ্ছে তোমাদের আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্র। সুতরাং সে গণ্ডীতেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখা তোমাদের কর্তব্য। ইলাহিয়াত ও আল্লাহ্-তত্ত্বের নাযুক সীমানায় অনুপ্রবেশ করা সীমালংঘন ছাড়া আর কিছু নয়। কালাম-শাস্ত্রবিদদের উচিত ছিল আল-কুরআনের ভাষায় দার্শনিকদের সম্বোধন করে বলা ঃ

هانتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لاتعلمون (ال عمران ٢٢)

যে বিষয়ে তোমাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞান ছিল সে বিষয়ে তো বিতর্ক করে সেরেছ, কিন্তু যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞানই নেই সে বিষয়েও কেন বিতর্ক করছ? আল্লাহ্ই শুধু জানেন; তোমরা কিছুই জানো না।

(আল-ই ইমরান ঃ আয়াত-২২)

পরবর্তী যুগে ইসলামী চিন্তাধারার অবক্ষয়

ইসলামী চিন্তাধারার অবক্ষয় পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, আল্লাহ্র অস্তিত্ব, জগতের নশ্বরতা, একত্ববাদ ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনসহ যাবতীয় 'আকীদা ও বিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণের জন্য মুতাকাল্লিমদের বিন্যাস প্রদত্ত দর্শনভিত্তিক যুক্তি-প্রমাণকেই মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। হাদীস ও ফিকহবিদদের ক্ষুদ্র দলটি বাদে আর সকলে কালাম ও যুক্তিশাস্ত্র-বিশারদদের আকল-বুদ্ধিকেই মাপকাঠি ধরে নিয়েছিলেন। কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে মুতাকাল্লিমদের রচনাবলীকেই তারা আহকাম ও আকাইদের উৎসরূপে গ্রহণ করেছিলেন। হামলা থেকে আত্মরক্ষা করা এবং (দর্শনের স্বঘোষিত মূল নীতিমালা অক্ষুণ্ন রেখে) শরীয়ত দর্শন-বিরোধী নয় প্রমাণ করার জন্য আয়াত ও হাদীসের ক্ষেত্রে তারা দর্শনোপযোগী ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতেন। দর্শনের আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মন ও মানস তাদের এতই প্রভাবিত হয়েছিল যে, দর্শনের স্বঘোষিত মূলনীতি খণ্ডন এবং কালাম শাস্ত্রের

প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধনের পরিবর্তে আয়াত ও হাদীসকেই তাঁরা দর্শনোপযোগী করার প্রয়াস নিতেন। এই অদ্ভুত মানসিকতা সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

> অবস্থা এই যে, নবীদের আসমানী শিক্ষা যাচাই করার জন্য প্রত্যেক দল স্বতন্ত্র নিয়ম বেঁধে রেখেছে। নিজেদের 'আকল-বুদ্ধির ওপর তাদের এত অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস যে, আকল বুদ্ধি যা অনুমোদন করে সেটাকেই মূল ধরে নবীদের শিক্ষা ও বক্তব্যকে তারা তার অনুগত করে নেয় এবং নিজেদের নির্ধারিত নিয়ম ও স্বীকৃত নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটুকুই তারা গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে উপরোক্ত নিয়ম ও নীতিমালার সাথে সংঘর্ষপূর্ণ অংশটুকু নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করে।[১]

কালামশাস্ত্রের মূল নীতিমালাই হলো সত্যের মাপকাঠি, গভীর ও উচ্চাঙ্গ জ্ঞানের আধার এবং নিগূঢ় তত্ত্ব ও অভিজ্ঞানের ভাণ্ডার, একথা বিশ্বাস করার পর মানস জগতে এক বিরাট দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হত। অর্থাৎ কালাম শাস্ত্রে এগুলো 'প্রকৃত 'ইল্ম হলে রাসূল ও সাহাবা-কিরামের হাদীস ও বাণীতে এ গুলোর হদিস নেই কেন? এ সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও রহস্যের আলোচনা তাঁরা করেন নি কেন? দর্শন ও কালাম শাস্ত্রের ওপর যাদের পূর্ণ 'ঈমান' ছিল এবং দর্শনের যাদুতে এভাবে মন-মগজ যাদের আচ্ছন্ন ছিল তারা কখনো কখনো সরাসরি, কখনো-বা পরোক্ষ ভাষায় বলে দিত যে, তখন ছিল ইসলামের শৈশবকাল। এ সকল হাকীকত ও অভিজ্ঞান সম্পর্কে সে যুগের 'সাদা-সিধা' ও নিরীহ মানুষগুলোর কোন ধারণা ছিল না। পক্ষান্তরে দর্শন-প্রেমের পাশাপাশি সাহাবায়ে-কিরামের প্রতি শ্রদ্ধাও যাদের অন্তরে ছিল তারা এমন মানসিক দ্বন্দ্ব ও হতবুদ্ধিতায় ভুগছিলেন যে, এ প্রশ্নের সন্তোষজনক কোন মীমাংসায় পৌছানো তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। সে যুগের দর্শন প্রভাবিত বিভিন্ন মতের বুদ্ধিজীবীদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

> যাদের বিশ্বাস এই যে, কালাম শাস্ত্রে দীনের মৌল বিষয়সমূহ, মৌলিক জ্ঞান, আল্লাহতত্ত্ব, আদি রহস্য ও মৌলিক দর্শন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাদের অনেকে বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম দীনের মৌল বিষয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। অনেকে অবশ্য কিছুটা সমীহ করে বলে যে, অবগত তিনি ছিলেন তবে প্রকাশ করেন নি। যাদের অন্তরে সাহাবা ও তাবি'ঈদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। আবার দার্শনিক ও কালামশাস্ত্র বিদদের মতামতের প্রতিও প্রগাঢ় আস্থা রয়েছে তারা পড়েছে মহা বিপদে।

১. بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول খ. ১. পৃ. ৩।

তাদের এ প্রশ্নের কোন জওয়াব নেই যে, সেই সম্মানিত ব্যক্তিগণ উপরিউক্ত 'শ্রেষ্ঠ 'ইলম' সম্পর্কে কিছু বলে যান নি কেন? যাদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান ও শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে তাদের মনে এ খটকা লেগেই আছে যে, দীনের এ বুনিয়াদী ও মৌলিক বিষয়গুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি কেন দিয়ে গেলেন না। অথচ অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় এর প্রয়োজন ছিল অনেক বেশী।[১]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বলেন, দর্শন কালামশাস্ত্র পূজারীদের মতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বাণী অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত যা 'ইলম ও হিদায়াতের জন্য সহায়ক নয়। আশ্চর্য! নিজেদের দুর্বোধ্য ও দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্যকে তারা দ্ব্যর্থহীন ও সুনির্দিষ্ট বলে রায় দিচ্ছে, অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দ্ব্যর্থহীন ও সুনির্দিষ্ট কালামকেও দ্ব্যর্থবোধক ও অস্পষ্ট বলে উড়িয়ে দিতে চাইছে।[২]

'আকল ও বুদ্ধির পূজা

দার্শনিক ও মুতাকাল্লিম উভয় পক্ষই কয়েক শতক ধরে 'আকল ও বুদ্ধির এমন জয়গান গেয়েছেন এবং যাত ও সিফাত সংক্রান্ত আলোচনায় বুদ্ধির ভূমিকাকে এমন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছে যেন 'আকল ও বুদ্ধিই হচ্ছে এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মাপকাঠি। স্থূল বিষয়সমূহের জন্য যেমন পঞ্চেন্দ্রিয়, প্রায়োগিক ক্ষেত্রসমূহের ক্ষেত্র তেমনি অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধান-লব্ধ জ্ঞান। এই সূরতহালের ফল এই দাঁড়াল যে, আহকাম ও 'আকাইদ উভয় ক্ষেত্রে 'আকলই হলো সকল সিদ্ধান্তের বুনিয়াদ ও মাপকাঠি। বিগত ছ' শতক ইসলামী ইতিহাসে কোন আলিম ও চিন্তানায়কই 'আকল ও বুদ্ধির এই একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আওয়াজ তোলার হিম্মত করেন নি। আল্লাহ-তত্ত্ব সম্পর্কে দর্শন শাস্ত্রের অনধিকার চর্চার বিরুদ্ধে ইমাম গাযালী (র) তীর্যক লেখনী পরিচালনা করলেও 'আকল-বুদ্ধির একচ্ছত্র আধিপত্য এবং সর্বত্র নাক গলানোর প্রবণতার বিরুদ্ধে তিনি ততটা সোচ্চার হতে পারেন নি। আমাদের জানা মতে, ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি 'বুদ্ধির' স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন এবং পূর্ণ সাহসিকতার সাথে এ সত্য তুলে ধরেছিলেন যে, ওহী ও নবুওয়তই হলো 'আকাইদের মূল উৎস। কোন 'আকীদার সত্যতা প্রমাণের জন্য 'আকল ও বুদ্ধি সহায়ক হতে পারে, উৎস হতে পারে না। ইমাম সাহেব পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন ঃ

ان العقل ليس اصلا لثبوت الشرع فى نفسه ولامعطيا له صفة لم تكن ولامفيدا له صفة كمال -

১. ঐ খ. ১. পৃ. ১২। ২. ঐ খ. ১. পৃ. ১৬৪।

প্রকৃতিগতভাবেই 'আকল শরীয়তের জন্য মূল ও বুনিয়াদের ভূমিকা পালন করে না এবং এমন কোন 'অবস্থান'ও তাকে দান করে না যা পূর্বে ছিল না এবং পূর্ণতার গুণও তাকে দান করে না।[১]

'আকল -বুদ্ধির প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থান

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে, 'আকল শুধু সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। অর্থাৎ রাসূলের সত্যতা ও নিষ্পাপতার স্বীকৃতি পর্যন্ত মানুষকে পৌঁছিয়ে দেওয়াই হলো 'আকলের দায়িত্ব; অতঃপর তার ছুটি। 'আকল শুধু মৌলিকভাবে রসূলের সত্যতা প্রমাণ করবে এবং রাসূলের যাবতীয় সংবাদ ও নির্দেশ বিশ্বাস ও পালন করতে উদ্বুদ্ধ করবে। যেমন নতুন আগন্তুককে কেউ শহরের মুফতীর কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে বলল যে, ইনি আলিম ও মুফতী। পরে সেই সাধারণ পথ-প্রদর্শক ও মুফতী সাহেবের মাঝে কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে মুফতী সাহেবকে অগ্রাধিকার প্রদান করাই হবে তার অবশ্য কর্তব্য। পথ-প্রদর্শনকারী সেই সাধারণ ব্যক্তির তখন একথা বলার অধিকার থাকবে না যে, আমি পথ না দেখালে মুফতী সাহেবের কাছে তুমি পৌঁছতে কিভাবে?[২]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) আরো বলেন ঃ রিসালাত ও নবুওয়তের সত্যতা প্রমাণের পর 'আকলের কর্তব্য হলো রসূলের প্রতি আস্থা রেখে তাঁর নিরংকুশ আনুগত্য করে যাওয়া যেমন প্রত্যেক শাস্ত্রে শাস্ত্র-বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্তকেই শেষ কথা মেনে তার আনুগত্য করা হয় এবং নিঃশব্দে তাঁর যাবতীয় পরামর্শ অনুসরণ করা হয়। তদ্রূপ আহকাম ও গায়বী বিষয়ের ক্ষেত্রে রাসূলই হলেন অথরিটি এবং তাঁর কথাই হতে হবে শেষ কথা। ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

> 'আকলের দিক-নির্দেশনায় কোন ব্যক্তি যখন জানতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রসূল, অতঃপর কোন নিশ্চিত সূত্রে রাসূল -প্রদত্ত কোন সংবাদ সে অবগত হয় আর 'আকল তাতে সন্দেহ প্রকাশ করে তখন খোদ 'আকলেরই দাবী এই যে, বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ভার এমন ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দিতে হবে যিনি সে বিষয়ে 'আকলের চেয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী। তাকে ভাবতে হবে যে, 'আকল এটা উপলব্ধি করতে অক্ষম এবং আল্লাহ্‌র যাত, সিফাত ও আখিরাতের 'ইলম 'আকলের তুলনায় রসূলেরই অধিক। রাসূল ও সাধারণের মাঝে যে পার্থক্য তা রোগী ও চিকিৎসকের পার্থক্যের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী। 'আকলের নির্দেশে মানুষ ইয়াহূদী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় এবং কষ্ট সত্ত্বেও তার ব্যবস্থাপত্র মেনে চলে শুধু এ জন্য যে,

---

১. ঐ খ. ১. পৃ. ৪৬।

১. ঐ খ. ১. পৃ. ৭০।

(ইয়াহূদী হলেও) চিকিৎসা শাস্ত্রে সে তার চেয়ে অভিজ্ঞ। সুতরাং আস্থার সাথে তার পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র মেনে চললে আরোগ্য লাভ হবে। অথচ সে জানে যে, চিকিৎসকের ভুলও হতে পারে এবং ব্যবস্থাপত্র হুবহু মেনে চলার পরও অনেকের আরোগ্য লাভ হয় না। এমন কি ভুল চিকিৎসা অনেক সময় রোগীর মৃত্যুরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এত কিছু জেনেও মানুষ চিকিৎসকের পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র মেনে চলে। এমন কি তার নিজস্ব ধারণা ও অভিজ্ঞতার বিপরীত হলেও চিকিৎসকের কথা সে অমান্য করে না। সুতরাং বোঝা উচিত, নবী-রসূলের মুকাবিলায় অন্য কোন সৃষ্টির (আকলের) কি মর্যাদা থাকতে পারে? সেই সাথে মনে রাখা উচিত যে, রাসূল চির সত্যবাদী এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সর্বদা সত্য বিষয়ই তাঁকে অবগত করানো হয়। সুতরাং রাসূলের কোন সংবাদ বাস্তবের বিপরীত হওয়া অসম্ভব। শুধু আকলের দোহাই দিয়ে রসূলের বাণী ও বক্তব্যের বিরোধিতাকারীদের মূর্খতা ও গোমরাহীর কোন সীমা-পরিসীমা নেই।[১]

রসূলের উপর নিঃশর্ত ঈমান আনা অপরিহার্য

দর্শন ও যুক্তিবাদের প্রভাব-বিকারগ্রস্তদের মানসিকতা এ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল যে, শরীয়ত যুক্তি ও দর্শনের মূলনীতির অনুগত হলে সাগ্রহে তারা তা মেনে নিত, অন্যথায় তাদের মগজ তা গ্রহণ করতে কুণ্ঠা বোধ করত এবং তাদের মানস জগতে সীমাহীন দ্বন্দ্ব ও জটিলতা সৃষ্টি হত। এদের মধ্যে যাদের স্পর্ধা ও দুঃসাহস সীমা ছাড়িয়ে যেত তারা নির্দ্বিধায় বলে দিত যে, শরীয়তকে অবশ্যই বুদ্ধি ও যুক্তির অনুগত হতে হবে। অমুক বক্তব্য যেহেতু বুদ্ধি ও যুক্তির পরিপন্থী সেহেতু তা গ্রহণযোগ্য নয়। অতটা দুঃসাহস দেখানোর মুরোদ যাদের ছিল না শরীয়তকে তারা বুদ্ধি ও যুক্তির অনুগত করার জন্য অদ্ভুত ব্যাখ্যা প্রদান করত এবং দূরতম সম্ভাবনা খুঁড়ে বের করতেও তারা সংকোচ বোধ করত না। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বিভিন্ন প্রসঙ্গে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা দেখিয়েছেন যে, রসূল (সা)-এর প্রতি নিঃশর্ত বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য। এই নিঃশর্ত বিশ্বাসই হচ্ছে নবুওয়ত ও রিসালাতের দাবী। প্রকৃতপক্ষে এরই নাম হলো ঈমান। শর্তযুক্ত বিশ্বাসকে শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলার কোন উপায় নেই। ইমাম সাহেবের ভাষায় ঃ

ففى الجملة لايكون الرجل مؤمنا حتى يؤمن بالرسول ايمانا جازما ليس مشروطا بعدم معارض فمتى قال او من بخبره الاان يظهر له معارض بدفع خبره لم يكن مؤمنا به فهذا اصل عظيم يجب معرفته -

---

১. بيان موافقة صريح المعقول খ. ১. পৃ. ৮৩।

মোটকথা, মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন নয় যতক্ষণ না সে বিপক্ষে যুক্তি থাকার শর্ত ছাড়াই নির্দ্বিধ ঈমান আনবে। কেউ যদি বলে যে, রসূল (সা) প্রদত্ত সংবাদসমূহে তখনই আমি ঈমান আনব যখন উক্ত সংবাদসমূহের বিপক্ষে কোন যুক্তি থাকবে না, তাহলে সে রসূল (সা)-এর প্রতি বিশ্বাসী নয়। এই শর্ত দীনের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি যে সম্পর্কে অবহিত থাকা অত্যাবশ্যক।[১]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

ইসলাম দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দিয়েছে যে, রসূল (সা)-এর প্রতি মানুষকে অবশ্যই এমন নির্দ্বিধ ও ব্যাপক ঈমান আনতে হবে যাতে কোন শর্ত বা মাত্রা যোগ হবে না। সুতরাং রাসূল (সা)-এর প্রতিটি সংবাদেই বিশ্বাস করতে হবে এবং প্রতিটি নির্দেশই পালন করতে হবে। রসূল (সা)-এর বাণী ও বক্তব্য-বিরোধী সব কথাই বাতিল ও মিথ্যা বলে গণ্য করতে হবে। যে ব্যক্তি নিজের 'আকল ও বুদ্ধির সম্মতি সাপেক্ষে রসূল (সা)-এর কথা বিশ্বাস করে এবং 'আকল ও যুক্তির অনুমোদন না পেলে রসূল (সা)-এর কথা প্রত্যাখ্যান করে অর্থাৎ বুদ্ধি ও যুক্তিকেই রসূল প্রদত্ত 'সংবাদে'র মুকাবিলায় প্রাধান্য দেয়, আবার রসূল (সা)-এর প্রতি ঈমান পোষণের দাবীও করে তাহলে সেটা হবে চরম স্ববিরোধিতা, বুদ্ধিভ্রষ্টতা ও ধর্মহীনতা। তদ্রূপ যে ব্যক্তি বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে আশ্বস্ত না হয়ে রসূল (সা)-এর কথা বিশ্বাস করবে না বলে তার কুফরীতে কোন দ্ব্যর্থতা নেই।

বুদ্ধি ও যুক্তির তাসের ঘর

মুক্তবুদ্ধির প্রবক্তাদের দাবী এই যে, 'যুক্তি ও (শরীয়তের) উক্তির মাঝে প্রায়শ বিরোধ ও বৈপরীত্য দেখা যায়। যে বিষয়গুলোকে 'আকীদা ও চিরন্তন সত্যরূপে নবী-রাসূলগণ পেশ করেছেন তার কোন কোনটি বুদ্ধি ও যুক্তি বিরোধী। এমনকি হাজার বছরের চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে লব্ধ এবং দর্শনের ভিত্তিরূপে স্বীকৃত 'সত্য'সমূহের সাথেও সেগুলোর বিরোধ বাঁধে। কিন্তু ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, বুদ্ধিজাত যে সকল সিদ্ধান্তকে রাসূল প্রদত্ত সংবাদ তথা কুরআন-সুন্নাহর সাথে বিরোধপূর্ণ বলা হচ্ছে তলিয়ে দেখলে সেগুলোকে কল্পনার বিলাসীদের তৈরি বুদ্ধি তাসের ঘর ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণ ও তদন্তের মাধ্যমে খুব নিকট থেকে দেখা হলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, সেগুলো নিছক বাক্য বিস্তার মাত্র যার কোন বুদ্ধিবৃত্তিক বুনিয়াদ আদৌ নেই। ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

---

১. ঐ খ. ১, পৃ. ১০১।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই ও তদন্তের পর সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যে সকল বুদ্ধিজাত সিদ্ধান্তকে যুক্তিবাদীরা বড়াই করে কুরআন-সুন্নাহ্র বিরোধী বলেন সেগুলোর পিছনে কোন সত্য নেই। এটা আসলে অবোধ শিশুকে কল্পিত দৈত্য-দানবের ভয় দেখানোর মতই হাস্যকর। বুদ্ধিজাত বিষয়গুলোর প্রতি গভীর ও পূর্ণ দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, সেগুলো বরং রাসূল প্রদত্ত সংবাদের সত্যতার দলীল-প্রমাণরূপে কাজ করছে এবং ঘোষণা করছে যে, রাসূল প্রদত্ত সংবাদের নির্গলিতার্থ সর্বাংশে সত্য। হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা দর্শনের সর্বাত্মক প্রভাবের কারণেই শুধু কেউ কেউ এ সত্য অস্বীকার করে থাকে। যেমন উপাস্য দেবতারা কেউ ক্ষতি করতে পারে॥ এই ভয়ে কেউ কেউ প্রকম্পিত হয় কিংবা নিজের ঈমানী দুর্বলতার কারণে ইসলামের শত্রুদের হামলার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে।[১]

অন্যত্র লিখেছেন ঃ

নিছক অজ্ঞতার কারণে দর্শনের জাঁকজমকপূর্ণ অথচ অন্তঃসারশূন্য পরিভাষা ও শব্দমালায় যারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে তারা সেই দুর্বলচিত্ত যোদ্ধার মত যে কাপুরুষ শত্রুর জাঁকালো 'ইউনিফরম' দেখেই ভড়কে যায় এবং আসল অবস্থা তলিয়ে দেখার কথা ভুলে বসে। কিন্তু সাহসে বুক বেঁধে একটু ভেবে দেখলেই সে বুঝতে পারবে যে, শত্রুই বরং তার ভয়ে কাঁপছে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا -

অতিশীঘ্র কাফিরদের অন্তরে আমরা ভীতি সঞ্চার করে দেব। কেননা এমন বস্তুকে তারা আল্লাহ্র শরীক ঠাওরিয়েছে যে সম্পর্কে আল্লাহ্ কোন ছাড়পত্র নাযিল করেন নি।[২] [আল-'ইমরান, ১৫১]

বুদ্ধিমানদের বোকামি

আল্লাহ্-তত্ত্ব সংক্রান্ত জটিল ও সূক্ষ্ম আলোচনাগুলো নিয়ে দার্শনিকদের বড় গর্ব। অথচ চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, পাগলের প্রলাপের সাথে সেগুলোর বিশেষ কোন তফাত নেই। সেগুলোকেই তাদের ভক্তরা রাসূলদের বাণী ও বক্তব্যের মুকাবিলায় গর্বের সাথে পেশ করে থাকে। ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

প্রজ্ঞাবান মাত্রই দার্শনিকদের কথা চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন অনুসন্ধিৎসা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দাবীদার এবং বুদ্ধির ও যুক্তির দোহাই পেড়ে রসূলদের

১. ঐ, খ. ৪, পৃ. ১৫৩। ১. ঐ, খ. ৪, পৃ. ১৫৪।

বাণী ও বক্তব্য প্রত্যাখ্যানকারী এই সব লোকেরা দর্শনের পর্বত চূড়া এবং বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার শীর্ষ সোপান থেকে এমন সব কথা বলে যা পাগলের প্রলাপের মতই শোনায়। যে সত্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রমাণিত তাও তারা অস্বীকার করে এবং ভিত্তিহীন ও সুপ্রকাশিত ভ্রান্ত বিষয়কেও নিজেদের ছলনাপূর্ণ কথার মোড়কে গ্রহণযোগ্যরূপে পেশ করে থাকে।

সুস্থ বুদ্ধি ও ঐশী বাণীর মাঝে কোন বিরোধ নেই

'আকল ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে যথাযথ উপকার গ্রহণের প্রতি আল-কুরআন মানুষকে বরাবর উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই মানুষের 'আকল ও বুদ্ধির প্রতি ইবনে তায়মিয়ারও পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে। তাঁর মতে, বিশুদ্ধ যুক্তি ও বিশুদ্ধ উক্তির মাঝে বিরোধ হতে পারে না। তিনি বলেন ঃ সুদীর্ঘ অধ্যয়ন ও গবেষণার জীবনে 'যুক্তি' ও 'উক্তির' মাঝে আমি কখনো বিরোধ ও বিপরীত কিছু দেখিনি। তবে শর্ত এই যে, যুক্তিটি হবে সুস্থ ও ব্যাধিমুক্ত এবং উক্তিটি হবে সুসংরক্ষিত ও সুপ্রমাণিত। এ প্রসঙ্গে بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول নামে বিরাট কলেবরের আলাদা একটি বইও তিনি লিখেছেন এবং বিস্তারিত ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের আলোকে দেখিয়েছেন যে, যুক্তি ও (শরীয়তের) উক্তির মাঝে পূর্ণ সংগতি বিদ্যমান। কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত সত্যকে সুস্থ বুদ্ধি অবশ্যই স্বীকার করে নেয়। শরীয়তের যাবতীয় উক্তিকে 'আকল সর্বদা অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ও সমর্থনই দিয়ে এসেছে। প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাথে পর্যালোচনা করলে 'আকল ও বুদ্ধির এই ইতিবাচক ভূমিকাই আমাদের চোখে পড়বে। ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

> বিশুদ্ধ, সুস্পষ্ট ও সুপ্রমাণিত বুদ্ধিজাত প্রমাণসমূহ এবং যাবতীয় স্বভাবজাত জ্ঞান রাসূল প্রদত্ত সংবাদের অনুকূল, প্রতিকূল নয়। বিশুদ্ধ বুদ্ধিজাত প্রমাণসমূহ সবই (শরীয়তের) যুক্তি ও বর্ণনার অনুরূপ, বিন্দুমাত্র প্রতিরূপ নয়। আল্লাহ্‌র ফযলে বিভিন্ন ফেরকার মতবাদ ও চিন্তাধারা গভীর মনোযোগসহ আমি অধ্যয়ন করেছি এবং এ ধারণার সত্যতাই উপলব্ধি করেছি।[১]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

> স্পষ্ট যুক্তি কখনও শরঈ বিশুদ্ধ উক্তির বিরোধী হতে পারে না। বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত সত্যতা আমি যাচাই করে দেখেছি। আমি নিশ্চিত যে, শরীয়তের বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট উক্তির বিপক্ষে যা কিছু বলা হয় তা ভ্রান্ত ধারণার সমাহার ছাড়া কিছুই নয়। 'আকল ও বুদ্ধিই এগুলোর ভ্রান্তি

১. ঐ, প্রথম খণ্ড পৃ. ৮৪।

প্রমাণ করে; বরং বুদ্ধি ও যুক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগ উপরিউক্ত ধারণাসমষ্টির বিপরীত এবং শরীয়তের সম্পূর্ণ অনুকূল বিষয়ই সুপ্রমাণ করে। আমি তাওহীদ ও সিফাত এবং তকদীর ও নবুওয়তসহ শরীয়তের বড় বড় মৌল বিশ্বাসকে আলোচ্য দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, যুক্তির আলোকে যা প্রমাণিত সত্য শরীয়তের কোন উক্তি বর্ণনাই তার বিরোধী হতে পারে না। তবে গভীর অনুসন্ধানের পর দেখা গেছে যে, সুস্পষ্ট যুক্তির পরিপন্থীরূপে চিহ্নিত উক্তি ও বর্ণনাগুলো হয় জাল হাদীস কিংবা দুর্বলসূত্রে বর্নিত 'যঈফ হাদীস।' সুতরাং প্রমাণরূপে সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা নিশ্চিত জানি যে, 'আকল ও যুক্তির বিচারে 'অসম্ভব' কোন বিষয়ের সংবাদ রাসূল দিতে পারেন না। তবে এমন বিষয়ের সংবাদ দিতে পারেন যে সম্পর্কে দিশেহারা 'আকল কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম। মোটকথা, রসূল এমন কোন সংবাদ দেন না যা 'আকল অস্বীকার করে, তবে এমন সংবাদ প্রদান করেন যার হাকীকত অনুধাবন করতে 'আকল সক্ষম নয়।[১]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে দাবী করেছেন এবং তাঁর দাবী যথেষ্ট গুরুত্ব লাভের যোগ্য যে, কোন হাদীস ও শরঈ উক্তিই 'আকল-বুদ্ধির বিরোধী হতে পারে না। এমন কিছু চোখে পড়লে দেখা যাবে শাস্ত্রকারগণ আগে থেকেই সেটাকে জাল কিংবা দুর্বলরূপে চিহ্নিত করে রেখেছেন।

সর্বোত্তম বুদ্ধিজাত প্রমাণ আল-কুরআন

কালামবিদ ও দার্শনিকদের এ দাবী ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) মানতে রাজী নন যে, নিছক বর্ণনা ও বিবরণই হলো আসমানী কিতাব আল-কুরআনের বুনিয়াদ। বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, কুরআনুল করীমে সর্বোত্তম বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ও প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। সে সব এমনই অকাট্য ও সুস্পষ্ট যে, দর্শন ও কালামবিদদের 'মাকড়সার জাল'তুল্য যুক্তি-প্রমাণ তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না। তিনি লিখেছেন ঃ

> কুরআনুল করীমে আল্লাহ্ পাক এমন অনুপম বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ পেশ করেছেন যার গভীরে প্রবেশ করা দর্শন ও কালামবিদদের কর্ম নয়। এরা সেসব দলীল ও সিদ্ধান্ত নিয়ে নাড়া-চাড়া করে আল-কুরআন সর্বোত্তম পন্থায় যেগুলোর সার -নির্যাস পেশ করে দিয়েছে।[২]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

---

১. ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮৩। ২.

স্রষ্টার প্রমাণ এবং তাঁর গুণ ও কর্মের পরিচয় প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীর মানুষের কাছে যা কিছু পেশ করেছেন তা স্পষ্ট ও যুক্তিসম্মত। বুদ্ধিজীবিদের 'আকল-বুদ্ধির এবং চিন্তা-কল্পনার সর্বোচ্চ সীমারও বহু উর্ধ্বে তার অবস্থান। যে সকল যুক্তি-প্রমাণ নিয়ে পূর্বাপর দার্শনিক ও কালামবিদগণ গর্ব করে থাকেন আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে প্রাসঙ্গিকভাবে সেগুলো এসে গেছে। কিন্তু দর্শনসেবিগণ সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটাতে অভ্যস্ত বিধায় সোজা ভাষায় সেগুলো পরিবেশন করেন না।

রসূল (সা)-এর শিক্ষায় কোন গোঁজামিল নেই

দর্শন ও কালামপন্থীদের অনেকের মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম যাত ও সিফাতের ক্ষেত্রে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরিহার করে সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছেন। তাই আল-কুরআনের বিরাট অংশই ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। আল্লাহ্র বিশেষ তাওফীকে পরবর্তী যুগের মুতাকাল্লিমগণ 'আকীদা ও মৌল বিশ্বাসগুলোকে বিস্তারিত, প্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গরূপে উম্মাহর সামনে তুলে ধরেছেন। এ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির জওয়াবে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি নির্দেশ ছিল সুস্পষ্টরূপে (শরীয়ত) পৌঁছে দেওয়ার। সে অনুসারে শরীয়তের প্রতিটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বিষয়েরই তিনি বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। 'আকাইদ ও মৌল বিশ্বাস এবং যাত ও সিফাত হলো দীনের বুনিয়াদ। এগুলো ছাড়া মানুষের পক্ষে আল্লাহ্র মা'রিফত এবং পরকালীন সৌভাগ্য ও মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। সুতরাং রাসূলের পক্ষে এ উপলব্ধির সাথে যে কিতাবের পঠন-পাঠনের আহ্বান এসেছে বারবার তাতে এ ধরনের সংক্ষিপ্ততা ও দুর্বোধ্যতার অবকাশই বা কোথায়?

ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

> দা'ওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে গিয়ে আল্লাহ্র রাসূল সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গরূপেই আল্লাহ্র কালাম পৌঁছিয়েছেন এবং তার ভাব ও উদ্দেশ্য আল্লাহ্র রসূল অন্য শব্দ দ্বারা অবশ্যই নির্ণয় করে দিয়েছেন। এটা অসম্ভব যে, বাহ্য অর্থ গ্রহণযোগ্য নয় এমন শব্দ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও আল্লাহ্র রসূল (সা) সে শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ বয়ান করে দেন নি। এ ধারণাও কোনক্রমেই যুক্তিগ্রাহ্য নয় যে, ব্যাখ্যা ও দিক-নির্দেশনা পেশ না করেই মানুষকে তিনি কালামের ভাব ও উদ্দেশ্য বোঝার নির্দেশ দেবেন শুধু এই যুক্তিতে যে, মানুষ নিজের বুদ্ধিতেই তা বুঝে নেবে। বস্তুত রসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে এ এক গুরুতর অপবাদ যিনি আল্লাহ্র কালাম মানুষের কাছে হুবহু পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন।[১]

১. ঐ. খ. ৩. পৃ. ১০।

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

> আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে সুস্পষ্ট তাবলীগের নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ্র সে নির্দেশ তিনি হুবহু পালন করেছেন। কেননা রসূল (সা)-এর চেয়ে আল্লাহ্র অধিক অনুগত আর কে হতে পারে? সুতরাং রসূল (স)-র প্রতি এই সুস্পষ্ট তাবলীগের পর তাঁর বাণী ও শিক্ষায় অস্পষ্টতা ও গোঁজামিল থাকার কোন অবকাশ নেই। তবে আয়াতগুলোকে আল-কুরআন متشابهات (রহস্যপূর্ণ) আখ্যা দিয়ে ঘোষণা দিয়েছে যে, এগুলোর تاويل আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না সেখানে তা'বীলের অর্থ তাফসীর বা ব্যাখ্যা নয়; বরং সেগুলোর হাকীকত, বাস্তব রূপ ও পরিণাম।[১]

ইবনে তায়মিয়ার দাওয়াত ও তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদান

মোটকথা, ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র আপোষহীন নির্দ্বিধ ঘোষণা এই যে, ওহী ও নবূওয়ত তথা কুরআন ও সুন্নাহকেই 'আকাইদ ও মৌল বিশ্বাসের উৎসরূপে গ্রহণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহই হবে একমাত্র মাপকাঠি। গোটা জীবনে মানুষকে তিনি এ দা'ওয়াতই দিয়েছেন। এ সম্পর্কিত আলোচনা ও যুক্তি-প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তাঁর সমগ্র রচনাবলীতে। এভাবেই ইসলামী চিন্তাধারার মাঝে তিনি নতুন গতি সঞ্চার করেছেন, প্রাণ ও সজীবতা এনেছেন যা গ্রীক দর্শন, কালামশাস্ত্র এবং অনারবীয় ভাবধারার মন্দ প্রভাবে প্রায় নির্জীব হয়ে পড়েছিল।

---

১. ঐ, খ. ১, পৃ. ১৬৭। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রমাণ করেছেন যে, তিনটি অর্থে تاويل শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, কুরআনের পরিভাষায় এর অর্থ হলো হাকীকত ও পরিণাম। পূর্বসূরীদের পরিভাষায় এর অর্থ হলো তাফসীর। পক্ষান্তরে উত্তরসূরী কালামবিদদের পরিভাশায় তা'বীল মানে কোন কারণে কোন শব্দের সেই অর্থ গ্রহণ করা যা বাহ্যত সম্ভব নয়।

একাদশ অধ্যায়

তাকলীদ-পূর্ব যুগে কুরআন, সুন্নাহ্‌ ও ফিক্‌হ্‌শাস্ত্র

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, হিজরী চতুর্থ শতকের পূর্বে এক ইমাম কিংবা এক মাযহাবের তাকলীদের প্রচলন ছিলনা। নির্দিষ্ট আলিম ও বিশেষ মাযহাবের তাকলীদ ছাড়াই মানুষ আমল করত এবং এটাকেই তারা শরীয়তের ওপর আমল এবং রসূল (স)-এর প্রত্যক্ষ অনুসরণ মনে করত। প্রয়োজনের মুহূর্তে অবশ্য যে কোন আলিম থেকে 'মাসআলা' জিজ্ঞাসা করে নিত। চতুর্থ শতকেও মাযহাবভিত্তিক তাকলীদ এবং মাযহাব ভিত্তিক ফিকহ্‌ চর্চা ও ফতওয়া প্রদানের সাধারণ রেওয়াজ ছিল না। শায়খুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (র) লিখেছেন ঃ

> চতুর্থ শতকেও উম্মাহর দুটি শ্রেণীর কর্মধারা ভিন্ন ছিল। মুসলমান এবং মুজতাহিদের মাঝে বিরোধ নেই॥ এমন সর্বসম্মত মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণ শ্রেণীর মানুষ 'শরীয়ত প্রবর্তক' রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামেরই তাকলীদ করত। ওযু, গোসল, সালাত, যাকাত ইত্যাদি তারা পিতামাতা কিংবা শহরের শিক্ষক মুরুব্বীদের নিকট থেকে জেনে নিয়ে সে মুতাবিক কাজ করে যেত। কখনো কোন অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হলে নিকটস্থ মুফতীকেই সে সম্পর্কে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করে নিত। এক্ষেত্রে মাযহাবের কোন বন্ধন ছিল না। বিশিষ্টদের মধ্যে যাঁরা হাদীস চর্চা করতেন তাঁদের জন্য তো বিশুদ্ধ হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের বাণী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় অন্য কিছুর প্রয়োজনই ছিল না। যে মশহুর ও বিশুদ্ধ হাদীস যার ওপর কোন ফকীহ আমল করেছেন কিংবা আমল না করার যুক্তিসংগত কোন কারণ নেই অথবা সাহাবা ও তাবিঈদের বাণী ও বক্তব্য যা পরস্পরের জন্য সম্পূরক হত তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। তবে রিওয়ায়েতসমূহের বাহ্য

বৈপরীত্য কিংবা অগ্রাধিকার নির্ধারণের অক্ষমতা কিংবা অন্য কোন কারণে বিশেষ কোন মাসআলায় মন আশ্বস্ত না হলে তারা পূর্ববর্তী ফকীহদের সিদ্ধান্ত খুঁজে দেখতেন। সে বিষয়ে একাধিক মত থাকলে নির্ভরযোগ্যতম মতই গ্রহণ করতেন তা সেটি আহলে মদীনা বা আহলে কুফা যে কোন একটিই হোক। বিশিষ্টদের মধ্যে যাদের তাখরীজ তথা বিশ্লেষণ ও আহরণ যোগ্যতা ছিল তারা কোন মাসআলায় পূর্ববর্তী মুজতাহিদের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না পেলে তাখরীজ ও ইজতিহাদ ফি'ল-মাযহাবের মাযহাব স্বীকৃত মূলনীতির অনুগত থেকে ইজতিহাদ প্রয়োগের পন্থা গ্রহণ করতেন। এর ওপর ভিত্তি করে তাকে উক্ত মাযহাবের অনুসারী ধরে হানাফী বা শাফি'ঈ বলা হতো। এমন কি হাদীস সেবীদের মধ্যে যার যে মাযহাবের প্রতি ঝোঁক ছিল এবং অধিকাংশ মাসআলায় যিনি যে মাযহাবের সাথে ঐকমত্য পোষণ করতেন তার পরিচয় সে মাযহাবের সাথেই সম্পৃক্ত হতো। নাসাঈ ও বায়হাকীকে শাফি'ঈ বলা হয় এ কারণেই। তখন ফতওয়া ও বিচার বিভাগীয় পদে ইজতিহাদী যোগ্যতার অধিকারী ফকীহদেরই নিয়োগ করা হত।[১]

তাকলীদের সূচনা ও কার্যকারণ

চতুর্থ শতকের আলিমদের ক্রমবর্ধমান মতানৈক্য, বিতর্কপ্রিয়তা, ধর্মীয় ও নৈতিক অবক্ষয়, 'ইলম চর্চায় ভাটা এবং মনোবল ও অধ্যবসায়ের ঘাটতি ইত্যাদি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, দীন ও ঈমানের হিফাজতের জন্য পূর্ববর্তী ইমাম ও মুজতাহিদের বিন্যস্ত ও গ্রন্থবদ্ধ মাযহাবগুলোরই তাকলীদ করা উচিত এবং সমসাময়িক আলিমদের পরিবর্তে পূর্ববর্তী ইমামদের ফতওয়া অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। তবে তখনো পরবর্তীকালের মতো একক তাকলীদের বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়নি, প্রয়োজনের তাকীদে পরবর্তীতে তা আরোপিত হয়েছিল। অবশ্য এ বাধ্যবাধকতাও ছিলো প্রশাসনিক, সাংবিধানিক নয়। অরাজকতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে উম্মাহকে বাঁচানোর জন্য মাযহাবের একক তাকলীদ প্রবর্তন করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না তখন। বস্তুত এটা ছিল ঘটনাপ্রবাহের স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতি। বিশেষত তাতারী হামলার পর গোটা ইসলামী জাহানে জ্ঞান ও চিন্তার দৈন্য ও অবক্ষয়, মুজতাহিদ ব্যক্তিত্বের অভাব এবং বিভিন্ন ফিরকা ও ফেতনার অপতৎপরতা এমন প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছিল যে, কুরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক যে মাযহাবগুলো গবেষণা ও পর্যালোচনার সকল ধাপ এবং বিন্যাস ও গ্রন্থনার সকল পর্যায় অতিক্রম করে এসেছে সেগুলোর ওপর আমল করাই ইসলামী উম্মাহর বরেণ্য ও নেতৃস্থানীয়

১. হুজ্জাতুল্লাহি'ল বালিগা ১ম খণ্ড, পৃ. ১২২।

আলিমগণ নিরাপদ মনে করলেন। আর এ শর্ত ও বৈশিষ্ট্য চারটি মাযহাবেই শুধু পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তাই স্বাভাবিক কারণেই চার মাযহাবের গণ্ডিতে তাকলীদ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

তাকলীদের প্রকৃতি

তবে আলোচ্য তাকলীদের প্রকৃতি ছিল এই যে, কুরআন ও সুন্নাহর যথার্থ আমল এবং শরীয়ত প্রবর্তক রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের একক আনুগত্যই হতো মুকাল্লিদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তার ও রাসূলের মাঝে ইমাম (মুজতাহিদ) শিক্ষক ও উস্তাদের ন্যায় একটা প্রয়োজনীয় মাধ্যম মাত্র। মোটকথা, ইমাম ও মুজতাহিদের ভূমিকা শরীয়তের ব্যাখ্যাদানকারী মুখপাত্রের, আনুগত্যের অধিকারী বা আইন প্রবর্তকের নয়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী (র)-র ভাষায় ঃ

لايدين الايقول النبى صلى الله عليه وسلم ولايعتقد حلالاالاماحله الله ورسوله ولاحراما الاماحرمه الله ورسوله لكن لمالم يكن له علم بماقاله النبى صلى الله عليه وسلم ولابطريق الجمع بين المختلفات من كلامه ولابطريق الا ستنباط من كلامه اتبع عالما راشدا على انه مصيب فيما يقول ويفتى ظاهرا متبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان خالف مايظنة اقلع من ساعته من غيرجدال ولااصرار-

মুকাল্লিদ শুধু সুন্নতে রাসূলেরই অনুসারী। আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা) যা হালাল করেছেন তাকেই সে হালাল মনে করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা) যা হারাম করেছেন তাকেই সে হারাম মনে করে। তবে যেহেতু রসূল (সা)-এর বাণী ও বক্তব্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং 'বাহ্য বিরোধপূর্ণ'।

হাদীসগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা তার নেই, তাই একজন প্রজ্ঞাবান আলিমের তাকলীদ সে গ্রহণ করে এই ভিত্তিতে যে দৃশ্যত সুন্নতে রসূলের ভিত্তিকে সঠিক রেখেই তিনি ফতওয়া দিচ্ছেন। সুতরাং কখনো এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হওয়া মাত্র বিনাবাক্যে সে তার মাযহাব বর্জন করে হাদীস অনুযায়ী আমল শুরু করবে।[১]

---

১. হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগাহ, খ. ১, পৃ. ১২৪।

বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের তাকলীদ (যা কুরআন-সুন্নাহর নির্ভুল আনুগত্যেরই বাস্তবরূপ) সম্পর্কে কারো কোন আপত্তি থাকতে পারে না। কেননা সাধারণ উম্মী শ্রেণীকে ইজতিহাদের মাধ্যমে স্ব-উদ্যোগে কুরআন-সুন্নাহ মুতাবিক আমল করতে বলার অর্থ অসাধ্য সাধনে তাকে বাধ্য করা এবং গায়ের জোরে সহজ সত্যকে অস্বীকার করা। এ ধরনের তাকলীদের (এক বা একাধিক ফকীহ-মুজতাহিদের শরণাপন্ন হওয়ার) রেওয়াজ মুসলিম জাহানে সব যুগেই বিদ্যমান ছিল এবং এটা খণ্ডিত আকারে হোক কিংবা সার্বক্ষণিক ভিত্তিতে কোনক্রমেই আপত্তিকর হতে পারে না। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী (র) বলেন ঃ

> ফতওয়া প্রদান ও গ্রহণের এ প্রক্রিয়া রিসালতের পুণ্য যুগ থেকেই চলে আসছে। সুতরাং সর্বক্ষণ একই ব্যক্তির ফতওয়া গ্রহণ কিংবা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জন থেকে গ্রহণ করায় কিছুই যায় আসে না। তবে শর্ত এই যে, অন্তরে উপরিউক্ত বিশ্বাস দৃঢ়মূল থাকতে হবে (অর্থাৎ রসূলের আনুগত্যই হবে মুখ্য উদ্দেশ্য)। এতে আপত্তির কি আছে? ফকীহ ও মুজতাহিদ সম্পর্কে আমাদের ঈমান তো এ নয় যে, 'ইলম ও ফিক্‌হ-এর ওহী আল্লাহ্ তাকে দান করেছেন এবং তার কোন ভুল হতে পারে না। সুতরাং (রাসূলের মতই) তাঁর আনুগত্য আমাদের ওপর ফরয। কোন মুজতাহিদের তাকলীদ আমরা এ দৃষ্টিকোণ থেকেই করে থাকি যে, কুরআন-সুন্নাহর তিনি বিশেষজ্ঞ। তাঁর সিদ্ধান্ত হয় কুরআন-সুন্নাহর কোন প্রত্যক্ষ নির্দেশ থেকে গৃহীত কিংবা কুরআন-সুন্নাহ থেকে আহরিত কিংবা বিভিন্ন সূত্রে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, অমুক অবস্থায় অমুক হুকুম অমুক علت (শরীয়ত স্বীকৃত কারণ)-এর সাথে সম্পৃক্ত। অতঃপর পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সাথে غير منصوص (প্রত্যক্ষ নির্দেশবিহীন) বিষয়কে তিনি منصوص (প্রত্যক্ষ নির্দেশযুক্ত বিষয়)-এর উপর কিয়াস ও অনুমান করেছেন। অর্থাৎ মুজতাহিদ যেন বলছেন যে, আমার মনে হয় আল্লাহ্‌র রসূল (সা) প্রকারান্তরে বলেছেন, এই 'ইল্লত ও কারণ যে সকল ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে সেই সকল ক্ষেত্রে এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। সুতরাং আলোচ্যমালায় মুজতাহিদের কিয়াস উপরিউক্ত মূল ধারারই অন্তর্ভুক্ত এবং তার যাবতীয় সিদ্ধান্ত মূলত সুন্নতে রসূলের সাথেই সম্পৃক্ত। আসলে শরীয়তের কিছু আহকাম পরোক্ষ ও দ্ব্যর্থবোধক দলীল-নির্ভর হওয়ায় তাকলীদের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এমন না হয়ে সকল আহকাম যদি প্রত্যক্ষ দ্ব্যর্থহীন দলীল-নির্ভর হত তাহলে কোন ঈমানদার কখনো কোন মুজতাহিদের তাকলীদ করত না। কেননা মা'সূম ও নিষ্পাপ রসূল (স)-এর আনুগত্যই শুধু আল্লাহ্ আমাদের ওপর

ফরয করেছেন। এখন যদি মুজতাহিদের মাযহাব পরিপন্থী কোন বিশুদ্ধ হাদীস আমাদের সামনে এসে পড়ে আর আমরা তা পাশ কেটে কিয়াসের অনুগমন করি তাহলে আমাদের মত জালিম আর কে হবে এবং রোজ কিয়ামতে আল্লাহ্কে আমরা কি জওয়াব দেব।

পরবর্তী যুগের বিচ্যুতি ও সীমালংঘন

কিন্তু মুসলিম উম্মাহর সাধারণ স্তরে মূর্খতা ও অজ্ঞতা ধীরে ধীরে এমন শিকড় গেড়ে বসল যে, কোন কোন স্থানে ইমাম ও মুজতাহিদকে মাধ্যম ও যোগসূত্রের পরিবর্তে আইন প্রণেতা ও আনুগত্যের হকদার মনে করা হতে লাগল। মাযহাবী গোড়ামী এমন চরমে গেল যে, কোন কারণেই মাযহাবী সিদ্ধান্তে কমা, সেমিকোলন পর্যন্ত কেউ বাদ দিতে রাযী হলো না। সাধারণ শ্রেণীকে অবশ্য এজন্য দোষ দেওয়া চলে না। কেননা কুরআন ও সুন্নাহর 'অনুসরণ' মনে করেই তারা মাযহাব গ্রহণ করেছে। তদুপরি অগ্রাধিকারের কারণ নির্ণয়ের মাধ্যমে মাযহাব বর্জন কিংবা পরিবর্তন তাদের পক্ষে যেমন দুরূহ, তেমনি ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু আলিমের অবস্থাও এই ছিল যে, হাদীসের সাথে আপন ইমামের সিদ্ধান্তের অসঙ্গতি এবং অন্য ইমামের সিদ্ধান্তের সঙ্গতির কথা নিশ্চিতভাবে জানা সত্ত্বেও আপন মাযহাব নিয়েই তাঁরা গোঁ ধরে থাকতেন। এমনকি ইমামের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট হাদীস পেশ করা হলেও হাদীসের প্রতি তাদের অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া জাগত না। এ ধরনের অর্বাচীনদের সম্পর্কে সপ্তম শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ শাফি'ঈ আলিম শায়খুল ইসলাম 'ইযযুদ্দীন ইবন আবদুস সালাম লিখেছেন ঃ

ومن العجب العجيب ان الفقهاء المقلدين يقف احدهم على ضعف ماخذ امامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا وهومع ذلك يقلده فيه ويترك من شهد الكتاب والسنه والاقيسة الصحيحة لمذهبهم جمودا على تقليد امامه بل يتحيل لدفع ظاهر الكتاب والسنة يتأولها بالتا ويلات البغيدة الباطلة نضالاعن مقلده ...

বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, স্বীয় ইমামের দলীলগত দুর্বলতার যুক্তিসঙ্গত কোন কৈফিয়ত না থাকা সত্ত্বেও অনেক মুকাল্লিদ ফকীহ্ শুধু অন্ধ গোঁড়ামী বশে ইমামের তাকলীদে অবিচল থাকেন এবং অন্য মুজতাহিদের কুরআন-সুন্নাহ ও বিশুদ্ধ কিয়াসের সমর্থনপুষ্ট সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে থাকেন। এমনকি ইমামের পক্ষ সমর্থনের জন্য কুরআন-সুন্নাহ্র স্বাভাবিক অর্থ এড়িয়ে উদ্ভট ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতেও তাঁরা কুণ্ঠা বোধ করেন না।[১]

১. হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগাহ, পৃ. ১২৪;

তদ্রূপ সাধারণ শ্রেণীতেও একটা দল এমন ছিল যারা স্বয়ং ইমামকে ভুলের ঊর্ধ্বে মনে করত। তাদের অন্তরের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল এই যে, কোন অবস্থাতেই ইমামের তাকলীদ ছাড়া যাবে না। এদের সম্পর্কেই শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (র.) লিখেছেন ঃ

وفى من يكون عاميا ويقلد رجلامن الفقهاء بعينه يرى انه يمتنع من مثله الخطأ وان ما قاله هوالصواب البتة واضمرفى قلبه ان لا يترك تقليده وان ظهر الدليل على خلافه وذالك مارواه الترمذى عن عدى بن حاتم انه قال سمعته يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراء : اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوالهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئاحرموه -

(তাকলীদের অবৈধতা সম্পর্কে ইবনে হাযমের ফতওয়া) সেই সাধারণ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে এই বিশ্বাস নিয়ে নির্দিষ্ট কোন মুজতাহিদের তাকলীদ করে যে, নিঃসন্দেহে তিনি ভুলের ঊর্ধ্বে এবং তাঁর মত অভ্রান্ত। সুতরাং দলীল-প্রমাণ তাঁর বিপক্ষে গেলেও তাকলীদ বর্জন করা চলবে না। এ ধরনের তাকলীদের নিন্দাই করা হয়েছে। তিরমিযী শরীফে 'আদী ইবন হাতিম হতে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

اتخذوا احبارهم ورهبا نهم اربابا من دون الله -

নিজেদের ধর্মনেতা ও পুরোহিতদেরকে তারা (য়াহূদী-নাসারারা) আল্লাহ্র পরিবর্তে রবের মর্যাদা দিয়েছিল।

অতঃপর তিনি ইরশাদ করলেন ঃ তারা তাদের পূজা করতনা, তবে ধর্মনেতারা যে বস্তুকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করত সেটাকেই তারা হালাল বা হারাম মনে করত।[১]

ইমাম ইবনে তায়মিয়ার দৃষ্টিতে তাকলীদ ও ইজতিহাদ

সব যুগের প্রজ্ঞাবান ও শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ এই ধরনের লাগামহীন তাকলীদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। কেননা এটা রসূল (সা)-এর প্রাপ্য আনুগত্যের সমতুল্য। তাকলীদের বিরুদ্ধে ইবনে হায্ম ও অন্যান্য চরমপন্থী আলিমের ঢালাও ফতওয়া তাঁরা সমর্থন করেন না সত্য, তবে শর্তহীন তাকলীদের

১. হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগা, পৃ. ১২৫।

বৈধতাও স্বীকার করেন না যা রসূল (সা)-এর প্রাপ্য আনুগত্যের সমতুলনা দাবী করে। বস্তুত তাকলীদ সম্পর্কে এটাই হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ ও যুক্তি-নির্ভর মত। পূর্বসূরীদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র) হলেন এই মতের প্রবক্তা। ইমাম ইবনে তায়মিয়া অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, সাধারণ শ্রেণী এবং অমুজতাহিদ আলিমদের জন্য মুজতাহিদের তাকলীদ ছাড়া কোন উপায় নেই। বস্তুত মাযহাব অনুসরণ তাদের জন্য একটি অনস্বীকার্য বাস্তব প্রয়োজন। তবে ইমাম ও মুজতাহিদের ভূমিকা হবে নিছক মাধ্যম ও শিক্ষকের। ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

> হালাল হারাম ও ফরয ওয়াজিবের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর নিরংকুশ আনুগত্য জ্বিন ও ইনসানের জন্য অপরিহার্য এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের ওপর তা ফরয। কিন্তু কিছু আহকাম এমন রয়েছে যা অনেকেই জানে না। সেগুলো জানার জন্য তারা বিদ্বানদের শরণাপন্ন হয় যাঁরা রসূল (সা)-এর শিক্ষা এবং তাঁর বাণী ও বক্তব্যের ভাব ও অন্তর্নিহিত মর্ম সম্পর্কে অধিক অবগত। সুতরাং যে সকল ইমাম ও মুজতাহিদের তাকলীদ করা হয় তাদের ভূমিকা নিছক মাধ্যম ও শিক্ষকের, পথ ও পথ-প্রদর্শকের। মানুষকে তাঁরা রসূল (সা) পর্যন্ত পৌছে দেন এবং নিজেদের ইজতিহাদ ও সামর্থ্য অনুযায়ী রসূল (সা)-এর বাণী ও বক্তব্যের মর্ম মানুষকে বুঝিয়ে দেন। একজন আলিমকে আল্লাহ্ এমন 'ইলম ও প্রজ্ঞা দান করেন যা হয়ত অন্য আলিমকে দান করেন না। আবার শেষোক্ত আলিমের কাছে হয়ত কোন মাসআলা সম্পর্কে এমন 'ইলম থাকে যা প্রথম জনের কাছে থাকে না। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وداؤد وسليمن اذ يحكمان فى الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم - وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمن - وكلا اتينا حكما وعلما -(سورة الانبيا - ٨٩)

> দাউদ ও সুলায়মানের কথা স্মরণ কর, উভয়ে লোকদের বকরীপাল কর্তৃক নষ্ট করা ফসল সম্পর্কে বিচার করছিলেন। তাদের বিচার-কর্ম আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম; অনন্তর সুলায়মানকে আমি সঠিক ফয়সালা উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিলাম। অবশ্য জ্ঞান ও বিচার-প্রজ্ঞা আমি উভয়কেই দান করেছিলাম।
>
> {সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত-৮৯)

দেখুন, আল্লাহ্‌র বিশিষ্ট নবী দাউদ ও সুলায়মান (আ) একটি মোকদ্দমায় ভিন্ন রায় দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ পাক উভয়ের জ্ঞান ও বিচার-প্রজ্ঞার প্রশংসা করার সাথে সাথে হযরত সুলায়মানকে বিশেষ প্রজ্ঞা দান করার

কথাও উল্লেখ করেছেন। সুতরাং নবীদের ওয়ারিছ ও উত্তরাধিকারী হিসাবে আহকাম সংক্রান্ত ইজতিহাদের ক্ষেত্রে আলিমদের মাঝেও অনুরূপ তারতম্য রয়েছে। যেমন (অন্ধকার বা অপরিচিত স্থানে) চারজন লোক আলামত ও সূত্র ধরে কা'বার দিক নির্ণয় করল এবং প্রত্যেকেই পিছনে একদল মুকতাদী নিয়ে চার দিকে মুখ করে নামায শুরু করল। এক্ষেত্রে চার ইমামের প্রত্যেকেরই এই বিশ্বাস যে, তার দিকটাই হচ্ছে সঠিক দিক। এমতাবস্থায় সকলের নামাযই শুদ্ধ হবে। অথচ এক ইমামই শুধু কা'বামুখী হয়ে নামায আদায় করছে এবং তার ইজতিহাদই ছিল সঠিক। এই মুজতাহিদ সম্পর্কেই দ্বিগুণ ছওয়াবের কথা হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطأ فله اجر -

ফায়সালাকারী মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে দ্বিগুণ বিনিময় লাভ করবে। পক্ষান্তরে ভুল ইজতিহাদের শিকার হলে একটি বিনিময় অবশ্যই লাভ করবে।[১]

ইমাম সাহেবের মতে, বিশেষ ফিকহী মাযহাবের পরিমণ্ডলে কারো মানস গড়ে উঠা এবং সে অনুসারে শরীয়তের আহকাম ও ইবাদতসমূহ পালন করা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। গোড়া থেকেই এ ধারা চলে এসেছে। তবে মুসলমানের যথার্থ কর্তব্য এই যে, নিজেকে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর অনুগত মনে করবে এবং কুরআন সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত যে কোন সিদ্ধান্ত নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখবে।

মানুষ সাধারণত মা, বাপ, মুরব্বী ও প্রতিবেশীদের 'আকীদা ও মাযহাবের পরিমণ্ডলেই বড় হয়, সন্তান যেমন দীনের ক্ষেত্রে মা, বাপ, মুরব্বী ও দেশবাসীর অনুগমন করে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির পর আল্লাহ্ ও রসূল (সা)-এর আনুগত্য তার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তখন আর এ খোড়া অজুহাত চলবে না যে, بل نتبع ما الفينا عليه ابائنا আমরা বরং সে পথেই চলব যে পথে পূর্বপুরুষদের চলতে দেখেছি। অতএব, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর আনুগত্যের বিপরীতে পূর্বপুরুষ কিংবা দেশবাসীর 'আকীদা-বিশ্বাসে যারা অবিচল থাকবে, জাহিলি য়াতের গণ্ডীভুক্ত হয়ে তারা আযাবের উপযুক্ত হবে। তদ্রূপ শরীয়তের কোন বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর সঠিক নির্দেশ জানার পরও যারা তা কবূল করতে গড়িমসি করবে এবং পূর্ববর্তী মত আঁকড়ে থাকবে নিঃসন্দেহে তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধী বিবেচিত হবে।[২]

১. ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম, ২য় খণ্ড, ২০১-২।

২. ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম, খ. ২, পৃ. ৩৮৪।

আলিমদের মধ্যে যাদের গবেষণা, যুক্তি-প্রয়োগ এবং বিভিন্ন মতের মাঝে অগ্রাধিকার নির্ধারণের যোগ্যতা রয়েছে তাদের সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

اما القادر على الاستدلال فقيل يحرم عليه التقليد مطلقا وقيل يجوز عند الحاجة كما اذا ضاق الوقت عن الاستدلال وهذا القول اعدل -

যুক্তিপ্রয়োগের যোগ্যতা আছে এমন ব্যক্তিদের জন্য সর্বাবস্থায় তাকলীদ হারাম ও বৈধ উভয় ধরনের মত রয়েছে। তবে তৃতীয় মত এই যে, প্রয়োজনের সময় তাদের জন্য তাকলীদের অবকাশ রয়েছে যখন গবেষণা ও যুক্তি বিশ্লেষণের পর্যাপ্ত সময় তার হাতে নেই। এটাই অধিকতর যুক্তি সঙ্গত মত।[১]

তবে পূর্ণাঙ্গ ইজতিহাদী যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তি সম্পর্কে ইমাম সাহেবের ফয়সালা এই যে, কোন সিদ্ধান্তের বিপক্ষে-তিনি যদি আয়াত বা হাদীস দেখতে পান আর যুক্তিগ্রাহ্য কোন সুরাহা তার হাতে না থাকে তাহলে আয়াত বা হাদীসের অনুসরণই তার জন্য জরুরী। ইমাম সাহেবের ভাষায়–

اما اذا قدر على الاجتهاد التام الذى يعتقد معه ان القول الاخر ليس معه ما يدفع به النص فهذايجب عليه اتباع النصوص وان لم يفعل كان متبعا للظن وما تهوى الانفس وكان من اكبر العصاة لله ورسوله -

অবশ্য ইজতিহাদী যোগ্যতাবলে কেউ যদি সাব্যস্ত করতে পারেন যে, অমুক সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে এমন কোন প্রমাণ নেই যা ইজতিহাদ সুরাহা করতে পারে তাহলে তার জন্য আয়াত বা হাদীস অনুসরণ করাই জরুরী। তা না করলে সে কল্পনা ও প্রবৃত্তির অনুগামী এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর অবাধ্য বলে গণ্য হবে।[২]

ফিকহ্ শাস্ত্রে ইমাম ইবনে তায়মিয়ার মর্যাদা

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) সাধারণত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মাযহাব ও মূলনীতি মুতাবিক ফতওয়া প্রদান করেছেন। তাঁর অধিকাংশ ফতওয়া চার ইমাম কিংবা হিদায়াতপ্রাপ্ত কোন-না-কোন ইমামের ইজতিহাদের অনুকূল হতো। তবে ক্ষেত্র বিশেষে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'-কিয়াসের আলোকে নিজস্ব

১. ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম, খ. ২, পৃ. ৩৮৫।

২. ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম।

ইজতিহাদও তিনি প্রয়োগ করেছেন। এ সকল দিক বিবেচনা করে তাঁকে হাম্বলী মাযহাবের 'মুজতাহিদে মুনতাসিব' (অনুগামী মুজতাহিদ) বলাই যুক্তিযুক্ত হবে।[১]

ইমাম ইবনে তায়মিয়ার সংস্কার প্রচেষ্টার ফল

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) যেভাবে কুরআন-সুন্নাহ্‌কে আকাইদের উৎসরূপে গ্রহণ করার জোরালো আহবান জানিয়েছেন এবং সার্থকতার সাথে নিজেও তা প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন, তেমনি ফিকহ্ ও আহকামের ক্ষেত্রেও কুরআন ও সুন্নাহকে মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করার জোর দাওয়াত দিয়েছেন এবং নিজেও তা আমল করে দেখিয়েছেন নিঃসন্দেহে এটা ইমাম ইবনে তায়মিয়ার অন্যতম সংস্কারমূলক অবদান। এ ক্ষেত্রে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত ছিল তাঁর আদর্শ ঃ

فان تنازعتم فى شيئى فردوه الى الله ورسوله -

কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শরণাপন্ন হও।

'ইলম ও ফিকহ্-এর অঙ্গনে সুদীর্ঘ ইজতিহাদ প্রক্রিয়ায় তাঁর এ দাওয়াত নতুন চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোড়ন এবং সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ্ ফিরে আসার অপূর্ব চেতনা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করল। মোটকথা, 'কল্যাণ-যুগের' যে ইসলামী চিন্তা-চেতনা মুসলিম জীবনের বুনিয়াদ ছিল, ইমাম ইবনে তায়মিয়ার মহৎ প্রচেষ্টায় মুসলিম জাহানে তা পুনরুজ্জীবিত হলো। এ সকল বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রায়োগিক সংস্কার অবদানের কারণে ইসলামের ইতিহাসে তিনি সেই বরণীয় ব্যক্তিবর্গের অন্যতম হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন যাঁদের দ্বারা আল্লাহ্ পাক দীন ও শরীয়তের তাজদীদ ও পুনরুজ্জীবনের মহান খিদমত গ্রহণ করেছেন।

ذالك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم -

এটা আল্লাহর দান; যাকে ইচ্ছা তাকেই তিনি তা দান করেন। আর আল্লাহ মহান দাতা।

---

১. মুজতাহিদে মুনতাসিব অর্থ শাখা ও মূলনীতিতে ইজতিহাদী যোগ্যতা সত্ত্বেও যুক্তি-প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত আহরণের ক্ষেত্রে কোন ইমামের অনুগমন করেন এবং সাধারণত তাঁর ইজতিহাদের গণ্ডী অতিক্রম করেন না। ফিকহ্ শাস্ত্রে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মর্যাদা ও ইজতিহাদী যোগ্যতা সম্পর্কে জানতে হলে পড়ুন মুহাম্মদ আবূ যুহরা রচিত ابن تيميه। পৃ. ৩৫০-৪৫১

দ্বাদশ অধ্যায়

ইবনে ইবনে তায়মিয়ার সুযোগ ছাত্র ও উত্তরসূরী

হাফিজ ইবনুল কায়্যিম

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র কর্মব্যস্ত দাওয়াতী জীবন এবং আকর্ষণীয় মহান ব্যক্তিত্ব স্বাভাবিক নিয়মেই আপন যুগ ও সমাজের ওপর সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে ছাত্র, শিষ্য ও ভক্তদের এক বিরাট জামাআত তার চারপাশে জড়ো হয়েছিল। তাঁর ছাত্র-শিষ্যদের সুদীর্ঘ তালিকায় প্রিয়তম ছাত্র হাফিজ ইবনু'ল-কায়্যিম যে বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করেছিলেন তা অন্য কারো ভাগ্যে জোটেনি। বস্তুত তিনি ছিলেন ইমাম সাহেবের সুবিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডারের ধারক, বাহক ও প্রচারক। জীবনের অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থায় প্রিয়তম উস্তাদের বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিলেন তিনি এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটুট ছিল উস্তাদের প্রতি ছাত্রের এ দৃষ্টান্তপূর্ণ বিশ্বস্ততা। এমনকি ইমাম সাহেবের ইনতিকালের পরও প্রিয়তম উস্তাদের প্রেম ও ভালোবাসা এবং আদর্শ ও বিশ্বাসে তিনি অটল ও অবিচল ছিলেন। ইবনু'ল-কায়্যিমের সুগভীর 'ইলম ও প্রজ্ঞা, অতুলনীয় গুণ ও মর্যাদা এবং কর্ম ও অবদানের কথা বিবেচনা করলে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনারই প্রয়োজন। তাঁর গবেষণা ও রচনাকর্মেরও পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন হওয়া উচিত ব্যাপক পর্যায়ে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপারে এই যে, তাঁর জীবনের খুব কম তথ্যই আমাদের হাতে এসেছে। তাঁর সুযোগ্য ও সুবিখ্যাত ছাত্র হাফিজ ইবনে রজব 'তাবাকাতু'ল-হানাবিলা' গ্রন্থে 'ইবনু'ল-কায়্যিম' অধ্যায়ে যে কয়টি তথ্য দিয়েছেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেগুলোকেই এখন পরিবেশন করা হয়। এর কারণ সম্ভবত এই যে, স্বীয় জীবন ও ব্যক্তিত্বকে প্রিয়তম উস্তাদের মাঝে এমনভাবে তিনি বিলিয়ে দিয়েছিলেন যে, সমসাময়িকদের চোখে তাঁর আলাদা ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠার সুযোগ পায়নি। হাফিজ সাহেবের জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে যতদূর জানা গেছে সেটাই এখানে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

নাম ও বংশ

জন্ম ৬৯১ হিজরী, নাম-মুহাম্মদ, কুনিয়াত বা উপনাম-আবূ আবদুল্লাহ, উপাধি-শামসুদ্দীন, পিতার নাম-আবূ বকর ইবন আইয়ুব। জন্মস্থান দামেশ্‌কেই তিনি প্রতিপালিত হয়েছেন এবং সেখানেই সমাধিস্থ হয়েছেন। তাঁর পিতা আবূ বকর ছিলেন প্রখ্যাত জাওযিয়া বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ। এ সূত্রেই তাঁর নামের শেষে আল-জাওযী অভিধা যুক্ত হয়ে থাকে। শিহাব নাবলুসী আল-'আমির, কাযী তকীউদ্দীন, সুলায়মান, ফাতিমা বিনতে জাওহার, 'ঈসা ইবন মুত'ইম, আবূ বকর ইবন আবদুদ্দাইম প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছদের দরসে তিনি হাদীস 'শ্রবণ' করেন। অতঃপর হাম্বলী মাযহাবে জ্ঞান অর্জন করে মুফতী পদে বরিত হন এবং ফতওয়া প্রদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীতে তিনি ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র এমন ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন যে, মৃত্যুই শুধু তাঁদের পৃথক করতে পেরেছিল। ৭১২ হিজরীতে মিসর থেকে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র ফিরে আসার পরই হাফিজ ইবনু'ল-কায়্যিম তাঁর সংস্পর্শে আসেন।[১]

জ্ঞানগত মর্যাদা

হাফিজ ইবনে রজব লিখেছেন ঃ সকল ইসলামী শাস্ত্রেই তাঁর দখল ছিল। তবে তাফসীর জগতে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। উসূল বিষয়ক শাস্ত্রসমূহেও তিনি শীর্ষস্থানের অধিকারী ছিলেন। হাদীস ও হাদীস-বিজ্ঞান এবং ইজতিহাদ ও সূক্ষ্ম যুক্তি-প্রয়োগে তাঁর কোন সমকক্ষ চোখে পড়ে না। ফিক্‌হ, ফিক্‌হ-বিজ্ঞান, আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং কালাম শাস্ত্রেও তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। সুফী দর্শন ও তাসাওউফ তত্ত্বেও তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কুরআন-সুন্নাহ্‌র ভাব ও মর্ম, ঈমানের হাকীকত ও তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বড় আলিম কাউকে দেখিনি। নিষ্পাপ তিনি ছিলেন না নিশ্চয়, তবে উপরিউক্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তাঁর মত মানুষ আমি দেখিনি। আল্লামা যাহবী বলেন, হাদীসের মতন ও সনদের প্রতি তাঁর অখণ্ড মনযোগ ছিল। ফিক্‌হ অধ্যয়নেই তিনি সদা নিমগ্ন থাকতেন এবং শাস্ত্রীয় জটিল বিষয়গুলো বিশদভাবে লিখতেন। ব্যাকরণ অধ্যাপনায় বেশ নাম ছিল তাঁর এবং হাদীস-বিজ্ঞানে ও ফিক্‌হ -বিজ্ঞানে ভালো যোগ্যতা ছিল

যুহদ ও ইবাদত

হাফিজ ইবনে রজবের মতে, বিনিদ্র রজনী যাপনে অভ্যস্ত ইবনু'ল-কায়্যিম বড় ইবাদত প্রেমিক ছিলেন। খুব দীর্ঘ ও প্রশান্তিপূর্ণ হতো তাঁর সালাত। সদা যিকিরে সজীব ছিল তাঁর যবান। হৃদয়ে ছিল আল্লাহ-প্রেম ও আল্লাহতে সমর্পি-

১. আল-বিদায়া, খ. ১৪, পৃ. ২৩৪।

হওয়ার এক উদ্বেলিত ভাব। পবিত্র মুখাবয়বে ছিল আল্লাহ্‌র হুযুরে নিজের দৈন্য ও নিঃস্বতা এবং অসহায়ত্ব ও দীনতা প্রকাশের এক নূরানী দীপ্তি। এ দুর্লভ ভাবের অভিব্যক্তিতে আমার মনে হয়েছে তিনি সত্যিই অনন্য ও অতুলনীয়। কয়েকবার হজ্জ সমাপন ছাড়াও দীর্ঘদিন তিনি মক্কায় অবস্থান করেছেন। মক্কাবাসীরা তাঁর সার্বক্ষণিক ইবাদত ও তাওয়াফের বিস্ময়কর সব ঘটনা শুনিয়ে থাকে।

আল্লামা ইবনে কাছীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন ঃ ইবনু'ল-কায়্যিম বড় ভালোবাসার মানুষ ছিলেন। হিংসা ও ঈর্ষা তাঁর স্বভাবেই ছিল না। কাউকে কষ্ট দেওয়া কিংবা হেয় করা তিনি জানতেন না। তাঁর একজন অতি প্রিয় সহচর হিসাবে সমসাময়িক দুনিয়ার তাঁর চেয়ে ইবাদত পাগল ও নফল প্রেমিক কেউ ছিল কিনা আমার জানা নেই। দীর্ঘ রুকূ' সিজদা সহ বড় প্রশান্তিপূর্ণ সালাত তিনি পড়তেন। সাথীদের মুখে এজন্য তাঁকে তিরস্কার ও শুনতে হতো, কিন্তু এ স্বাদের জিনিস পরিত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। মোটকথা, গুণে ও কর্মের বিচারে তাঁর তুলনা পাওয়া দুষ্কর।[১]

অগ্নি পরীক্ষা

উস্তাদ ও শায়খের মত ইবনে কায়্যিমকেও বিভিন্ন পরীক্ষা ও মুজাহাদার মুখোমুখি হতে হয়েছে বারবার। শেষ বারের মত ইবনে তায়মিয়া (র)-কে দুর্গে বন্দী করা হলে তিনিও কারাজীবনে নিক্ষিপ্ত হন। তবে উভয়কে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখা হয়। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মৃত্যুর পর তিনি মুক্তি লাভ করেন। দীর্ঘ বন্দী জীবনের সবটুকু সময় তাঁর কেটেছে কুরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন নিমগ্নতায়। ইবনে রজবের ভাষায় ঃ

فقتح عليه من ذلك خير كثير ، وحصل له جانب عظيم من الاذواق والمواجيد الصحيحة وتسلط بسبب ذلك على الكلام فى علوم اهل المعارف والدخول فى غوامضهم وتصانيفه ممتلئة بذالك ـ

বন্দী জীবন তাঁর জন্য খুবই কল্যাণপ্রসু হয়েছিল। সে সময় এমন গভীর প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞান তিনি লাভ করেছিলেন যে, তত্ত্বজ্ঞানীদের জটিল ও সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করা তাঁর জন্য সহজ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর রচনা-সমগ্র এ ধরনের বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ।

---

১. আল-বিদায়া, খ. ১৪ পৃ. ২৩৪, ২৩৫।

ছাত্র ও সমমসাময়িকদের স্বীকৃতি

বহু সংখ্যক আলিম ইবনু'ল-কায়্যিমের জীবদ্দশায় এমনকি মৃত্যুর পরও তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করেছেন এবং উপকৃত হয়েছেন। সমমসাময়িক বিদগ্ধজনদের চোখে তিনি ছিলেন গভীর শ্রদ্ধা ও সমীহার পাত্র এবং তাঁর শিষ্যত্ব লাভ ছিল তাদের জন্য গৌরবের বিষয়। তাঁর ছাত্রদের তালিকায় ইবনে আবদুল হাদী এবং ইবনে রজবের মত মহাত্মাদের নামও রয়েছে। তাঁর সম্পর্কে কাযী বুরহানুদ্দীন যুর'আর মন্তব্য হল, 'আসমানের নিচে এখন তাঁর চেয়ে বিস্তৃত জ্ঞানের মানুষ চোখে পড়ে না।'

রচনা ও অধ্যাপনা

আল-জাওযিয়ায় দীর্ঘদিন ইমামতের দায়িত্ব পালন ছাড়াও সদরিয়া বিদ্যাঙ্গনে বহুদিন ধরে তিনি অধ্যাপনার কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে কিতাবও লিখেছেন প্রচুর। ইবনে রজবের মতে, পড়া-লেখা ও বই সংগ্রহে তাঁর ঝোঁক ছিল প্রচণ্ড। ফলে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন বিরাট ও সমৃদ্ধ এক গ্রন্থাগার। তদুপরি সংগৃহীত কিতাবের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল তাঁর স্বহস্তে অনুলিপিকৃত।

রচনা-বৈশিষ্ট্য

সুবিন্যাস ও শৈলী বিচারে তাঁর রচনাবলী স্বীয় উস্তাদ ও শায়খ ইবনে তায়মিয়্যা (র)-থেকেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। কেননা তাসাওউফের মিষ্টতা এবং ভাষার লালিত্যের চমৎকার সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর লেখায়। সম্ভবত তাঁর স্বভাব ও চরিত্রেরই ছায়াপাত ঘটেছিল তাতে। কেননা উষ্ণতার চেয়ে স্নিগ্ধতাই ছিল তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য।

গুরুত্বপূর্ণ রচনাসমূহ

ইবনে কায়্যিম রচিত গ্রন্থের সুদীর্ঘ তালিকা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থের নাম শুধু এখানে আমরা পেশ করছি।

১। تهذيب سنن ابى داؤد

২। مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين আল্লামা আবদুল্লাহ্ আনসারী হারাবী রচিত منازل السائرين - এর এই ব্যাখ্যা গ্রন্থটি তাসাওউফ তত্ত্বে এক অনবদ্য রচনা।

৩। زاد المعاد فى هدى خير العباد এ গ্রন্থের বিস্তারিত পর্যালোচনা আসছে।

৪। جلاء الا فهام فى الصلوة والسلام على خير الانام

৫। اعلام الموقعين عن رب العالمين ইবনে কায়্যিমের অন্যতম বিশিষ্ট এই রচনাকর্মে ফিকহ্ ও হাদীসসেবীদের জন্য মূল্যবান তথ্যের বিরাট সমাবেশ রয়েছে।

৬। الكافية الشافية فى الا نتصار اللفرقة النا جية

৭। الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة

৮। حادى الارواح الى بلاد الا فراح (জান্নাতের বিবরণ সম্পর্কে এর টীকা);

৯। كتاب الداء والدوا

১০। مفتاح دار السعادة

১১। اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة الجهمية

১২। عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين

১৩। بدائع الفوائد

১৪। الكلم الطيب والعمل الصالح

১৫। تحفة الورود باحكام المولود

১৬। كتاب الروح

১৭। شفاء العليل فى مد سائل القضا ؤالقدر والحكمة والتعليل-

১৮। نفحة الارواح وتحفة الافراح

১৯। الفوائد

২০। الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية

২১। الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى

২২। روضة المحبين ونزهة المشتاقين

২৩। اغاثة الهفان فى مكائد الشيطان

২৪। طريق الهجرتين وباب السعادتين

মৃত্যু

৭৯১ হিজরীর ২৩ শে রজব রোজ বুধবার রাতে তিনি ইনতিকাল করেন এবং পরদিন বাদ জোহর জামে মসজিদে তাঁর জানাযা এবং বাবু'স-সাগীর কবরস্থানে দাফন অনুষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন এবং তাঁর দরজা বুলন্দ করুন।

যাদু'ল-মা'আদ গ্রন্থ পর্যালোচনা

বহু গ্রন্থ প্রণেতা আলিমদের অন্যতম হাফিয ইবনু'ল-কায়্যিম রচনার মান ও পরিমাণ উভয় দিক থেকেই উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর কয়েকটি রচনা এতই মূল্যবান যে, সেগুলোর বিস্তারিত পরিচিতি ও সার-সংক্ষেপে তুলে ধরা বেশ ফলদায়ক হতো। বিশেষ করে বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে اعلام الموقعين এবং সংস্কারধর্মিতার দিক থেকে مدارج السالكين ও اغاثة الهفان এমনই কালোত্তীর্ণ রচনা যে, সময়ের প্রয়োজনেই ইবনে তায়মিয়ার الجواب الصحيح - الرد على المنطقيين গ্রন্থ দুটির মত এগুলোরও সুবিস্তৃত পরিচিতি ও সার-সংক্ষেপে তুলে ধরা উচিত। কিন্তু সেজন্য এক স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন। তা ছাড়া ইবনু'ল -কায়্যিমের জীবনীগ্রন্থই হল এর উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাই এখানে আমরা তাঁর সুবিখ্যাত زاد المعاد فى هدى خير العباد গ্রন্থটিই নির্বাচন করছি। কারণ এতে তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের বিচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলোর চমৎকার সমাবেশ ঘটেছে। সেই সাথে সীরাত, হাদীস, ফিকহ, কালাম ও তাসাওউফ-তত্ত্বসহ ইসলামী শাস্ত্রের বহু শাখার আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। আমল ও সংশোধন এবং দাওয়াত ও সংস্কারের ক্ষেত্রে ইহ্‌য়াউ'ল-'উলূমের পরে এমন বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ রচনা সম্ভবত আর নেই। নিখুঁত তথ্য-বিশ্লেষণ, নির্ভরযোগ্যতা ও কুরআন-সুন্নাহর সাথে সঙ্গতির ক্ষেত্রে ইবনু'ল -কায়্যিমের যাদু'ল-মা'আদ বরং ইমাম গাযালীর ইহ্‌য়াউ'ল-'উলূমকেও ছাড়িয়ে গেছে। মনে হয় উম্মাহকে তিনি এমন কিছু উপহার দিতে চেয়েছিলেন যা দীনিয়াত গ্রন্থাগারের সার্থক প্রতিনিধিত্ব এবং শরীয়ত বিষয়ে সফল গাইড ও পথ-নির্দেশকের ভূমিকা পালন করতে পারে। যারা হাদীস প্রেমিক এবং সুন্নতে নববীর অনুসরণই যাদের সযত্ন প্রয়াস-এ কিতাবটির প্রতি তাদের সুগভীর অনুরাগ ছিল সব যুগে। এ কিতাব ছিল তাদের জীবনের বিশ্বস্ত বন্ধু, চলার পথের আলোক প্রদীপ এবং জীবন সফরের অমূল্য পাথেয়। ভারতে ১২৯৮ হিজরীতে এবং মিসরে ১৩২৪ হিজরীতে কিতাবটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ভারতীয় সংস্করণের কলেবর হলো বড় সাইজের ৯৩৭ পৃষ্ঠা, পক্ষান্তরে মিসরীয় ক্ষুদ্র টাইপ সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো ৯২৬। কিতাবের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ

> আপন নবীর পরিচয় যিনি পেতে চান এবং তাঁর সীরাত ও আখলাক সম্পর্কে বিশদ জানতে চান, তার জন্য জরুরী কিছু বিষয়বস্তুর সমষ্টি হলো এ বইটি। এর জন্য এমন সময় কলম হাতে নিয়েছি যখন হৃদয় আমার সুদীর্ঘ সফরের অস্থির পরিবেশে বিষাদক্লান্ত এবং ইলমের পুঁজি অল্প। স্বাভাবিকভাবেই এ

সময় মন আমার বিক্ষিপ্ত ও নির্জীব এবং কোন কাজে একাগ্রতা ও নিমগ্নতা প্রায় অসম্ভব। তদুপরি প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি হাতের কাছে নেই, জরুরী ও মত বিনিময়ের জন্যও পাশে নেই কোন বিদগ্ধ আলিম।[১]

গ্রন্থকারের এ বক্তব্য প্রথম দিকে কয়েকটি অধ্যায় অনুচ্ছেদ সম্পর্কে হলে আশ্চর্যের তেমন কিছু নেই। কিন্তু গোটা বইটি সম্পর্কে হলে সত্যি তা এক বিস্ময়কর ব্যাপার । কেননা হাদীসের মতন, সনদ ও রিজাল (বর্ণনাকারী) সম্পর্কে যে বিস্তৃত ও সারগর্ভ আলোচনার অবতারণা তিনি করেছেন, সীরাত ও ইতিহাসের যে -বিপুল খুঁটিনাটি তথ্য ও প্রমাণপঞ্জী তুলে ধরেছেন, তাতে সাধারণের মনে এ ধারণাই হবে যে, এক বিরাট ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে বসেই বুঝি বইটি লেখা হয়েছে। সত্য সত্যই আগাগোড়া বইটি সফরের অবস্থায় লেখা হয়ে থাকলে স্বীকার করতেই হবে যে, গ্রন্থকার সকল ইসলামী শাস্ত্রে, বিশেষত হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রে বিস্ময়কর ব্যুৎপত্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ক্ষেত্রে পূর্বসূরী মুহাদ্দিছদের তিনি ছিলেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যুগের অনন্য উস্তাদ ইবনে তায়মিয়া (র)-র সার্থক উত্তরসূরী ছিলেন তিনি।

কিতাবের শুরুর দিকে ইবনু'ল-কায়্যিম নবুওয়ত ও ওহীর স্তর ও পর্যায় সম্পর্কে এমন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, ওহীর প্রকার ও প্রকৃতি সম্পর্কে এমন পূর্ণাঙ্গ আলোকপাত করেছেন যা সাধারণ সীরাত গ্রন্থে পাওয়া যায় না।[২] অতঃপর নবী জীবনে ইসলামী দাওয়াত যে-সকল পর্ব ও পর্যায় অতিক্রম করেছে তার অনবদ্য বিবরণ তুলে ধরেছেন। নবীর নামসমূহের মর্ম ও তত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত ও উপভোগ্য আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে স্বীয় উস্তাদের অনুকরণে ফিকহ ও ব্যাকরণের প্রচুর মাসআলা ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব এবং কিছু কিছু নিজস্ব অনুভব ও উপলব্ধিজাত বিষয়ও তিনি তুলে ধরেছেন। সেই সাথে সীরাত সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যমালা এবং রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত ছোট-বড় সকল ঘটনা একত্রিত করে দিয়েছেন। তাতে তাঁর আখলাক-চরিত্র, স্বভাব-প্রকৃতি ও দৈহিক আকৃতি, আচার-অভ্যাস এবং দৈনন্দিন আমল সংক্রান্ত আলোচনারও একটা উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ তাতে এসে গেছে।[৩] এরপর শুরু হয়েছে সালাতসহ রসূল (র)-এর অন্যান্য ইবাদত সম্পর্কে বিস্তারিত ও সূক্ষ্ম আলোচনা। বলা চলে যে, এ প্রসঙ্গে তিতি তাঁর ব্যাপক ও বিস্তৃত হাদীস অধ্যয়নের সার-নির্যাস আমাদের উপহার দিয়েছেন এবং এখানেই তাঁর মুহাদ্দিছসুলভ প্রজ্ঞা এবং গবেষণাসুলভ জ্ঞান গভীরতার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে ফিকহ ও হাদীসের

---

১. যাদু'ল-মা'আদ (ভারতীয় সং), পৃ. ১৫।

২. যাদু'ল-মা'আদ (ভারতীয় সং), খ. ১, পৃ. ১৮।

৩. যাদু'ল-মা'আদ (ভারতীয় সং), ১ম খ., পৃ. ২৫-৪১

উসূল শাস্ত্রীয় কিছু সূক্ষ্ম আলোচনা[১] এবং রিজাল শাস্ত্রীয় কিছু মূল্যবান তথ্যও তাঁর কলম থেকে আমরা পেয়েছি।[২] চার ইবাদত (সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ) বিষয়ক এ অধ্যায়গুলো আহকাম ও ফিকহ-সংক্রান্ত আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে ঈমান ও ভাব-উদ্দীপক কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ও তিনি পরিবেশন করেছেন। যাকাত ও সাদাকা অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন যে, গোটা সৃষ্টি জগতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামই ছিলেন সর্বাধিক উন্মুক্ত চিত্ত, প্রফুল্ল হৃদয় ও প্রশান্ত আত্মার অধিকারী মানব। কেননা শরহে সদর তথা চিত্তোন্মুক্ততা অর্জনে দান ও সদয়াচরণের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। নবুওয়তের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের জন্য শৈশবে স্থূলভাবেই আল্লাহ তাঁর রসূল (সা)-কে 'শরহে সদর' দান করেছিলেন এবং সিনা মুবারক উন্মুক্ত করে শয়তানের অংশ ফেলে দিয়েছিলেন। দান, বদান্যতা ও আত্মত্যাগের মহৎ চরিত্রের কারণে এই চিত্তোন্মুক্ততা আরো উৎকর্ষ লাভ করেছিল। উপরিউক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে ইবনু'ল-কায়্যিম সীরাতুন্নবীর ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন ও শরহে সদরের বিভিন্ন কারণ পর্যালোচনা করে লিখেছেন ঃ

'শরহে সদর' বা চিত্তোন্মুক্ততা লাভের বহু উপায় রয়েছে। আর সেগুলো রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাঝে পূর্ণতম মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এর মধ্যে তাওহীদ হলো সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী উপায়। তাওহীদের বিশ্বাস যত পূর্ণাঙ্গ ও শক্তিশালী হবে 'শরহে সদর' সেই অনুপাতে উৎকর্ষতা লাভ করবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه -

ইসলামের জন্য যার হৃদয় আল্লাহ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন সে তো তার রবের পক্ষ থেকে আলোকপ্রাপ্ত ।[৩]

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد فى السماء -

আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করতে চান তার হৃদয়কে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে বিপথগামী করতে চান তার হৃদয়কে করে দেন সংকীর্ণ ও রুদ্ধ। ইসলাম গ্রহণ তার জন্য তখন দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, যেন সে আকাশে আরোহণ করছে।

---

১. যাদু'ল-মা'আদ (ভারতীয় সং), ১ম., পৃ. ৬৯, ১০৫।
২. যাদু'ল-মা'আদ (ভারতীয় সং), ১ম খ., পৃ. ৭৩, ৯৯।
৩. সূরা যুমার-২২।

মোটকথা, হিদায়াত ও তাওহীদ হচ্ছে 'শরহে সদর' লাভের সর্বাধিক শক্তিশালী উপায়। পক্ষান্তরে শিরক ও গোমরাহী হচ্ছে হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও রুদ্ধতার বড় কারণ।

'শরহে সদর' লাভের আরেকটি উপায় হলো বান্দার অন্তরে আল্লাহ্ প্রদত্ত সেই ঈমানী নূর ও আলোক যা সিনাকে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করে এবং কলবকে করে প্রফুল্ল ও আনন্দিত। এই নূর ও আলোক বান্দার অন্তর থেকে অপসৃত হলে তা সংকীর্ণ হয় এবং চুপসে যায়। বান্দা তখন এক অন্ধকার ও সংকীর্ণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার যন্ত্রণা অনুভব করে। তিরমিযী শরীফে রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে ঃ

اذا دخل النور القلب انفسح وانشرح . قالوا وما علامة ذالك يارسول الله قال الانابة الى دار الخلود والتجا فى عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله ـ

বান্দার অন্তরে 'নূর' প্রবেশ করলে তা উন্মুক্ত ও প্রশস্ত হয়। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! তার আলামত কি ? ইরশাদ হলো, চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণ, ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি অনাগ্রহ ও নির্লিপ্ততা এবং মৃত্যু আসার আগেই সেজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ।

এই নূর ও আলোক মানুষ যে পরিমাণ লাভ করে 'শরহে সদর' নামের ঐশী সম্পদে সেই পরিমাণ সে ঐশ্বর্যশালী হয়। এমনকি তা স্থূল আলো ও অন্ধকার, চিত্তের প্রশস্ততা ও প্রফুল্লতা এবং সংকীর্ণতা ও অপ্রফুল্লতা সৃষ্টি করে থাকে।

'শরহে সদর' লাভের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপায় হলো, 'ইলম ও জ্ঞান, যা মানব চিত্তকে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করে। এমনকি তা গোটা বিশ্বের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতিকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। পক্ষান্তরে মূর্খতা আনে হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও রুদ্ধতা। 'ইলমের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি অনুপাতেই ঘটে হৃদয়ের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি। তবে যে কোন আলিমের ভাগ্যে এ মহান সম্পদ জোটে না। এটা শুধু রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া 'ইলমেরই বৈশিষ্ট্য। উপকারী ও কল্যাণপ্রসূ 'ইলম শুধু এটাই। এ মহাসম্পদ সৌভাগ্য যিনি লাভ করবেন তিনিই হবেন সবচেয়ে প্রশস্ত ও উন্মুক্ত চিত্ত। চরিত্র ও নৈতিকতায় তিনিই হবেন সর্বোত্তম এবং তাঁর জীবন ও সময়ই হবে সবচেয়ে সুখী ও প্রশান্তিপূর্ণ।

'শরহে সদর' লাভের আরেকটি বড় উপায় হলো ইনাবাত ইলাল্লাহ' তথা আল্লাহ-নিমগ্নতা। অর্থাৎ হৃদয়ের সবটুকু অনুভূতি দিয়ে তাঁকে প্রেম করা, সব দুয়ার থেকে মুখ ফিরিয়ে তাঁর দুয়ারেই শুধু পড়ে থাকা এবং তাঁর ইবাদতেই শুধু ডুবে থাকা। মোটকথা, 'শরহে সদর' লাভের জন্য এর চেয়ে কার্যকর ও ফলপ্রসু উপায় আর নেই। এ সম্পদ ও ঐশ্বর্য কখনো তুমি পেয়ে গেলে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বলে উঠবে যে, জান্নাতে গিয়েও এ নিয়ামত আমি পেতে চাই।

'শরহে সদর' ও হৃদয়ের প্রশান্তি লাভে প্রেম ও ভালোবাসাও বিরাট ভূমিকা পালন করে। যার হৃদয়ের সবুজ অঙ্গনে প্রেমের ময়ূর পেখম মেলেছে এবং যার জীবনে ভালোবাসার স্বর্গসুখ নেমে এসেছে সেই শুধু তা অনুভব করতে পারবে। প্রেম যত গভীর হবে, বাধ ভাঙা জোয়ারের মত ভালবাসা যত উচ্ছসিত হবে, চিত্তোন্মুক্ততা ও চিত্তপ্রশান্তিও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। পক্ষান্তরে এ সম্পদ ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত অপদার্থদের দিকে তাকালেও হৃদয় হয়ে যাবে সংকীর্ণ ও আবিলতাপূর্ণ। তাদের দর্শন হলো চোখের পীড়া এবং তাদের সঙ্গ হলো আত্মার ব্যাধি।

এবার বিপরীত দিক থেকে বলা যায় যে, হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও আবিলতা সৃষ্টির একটি বড় কারণ হলো গায়রুল্লাহ্‌র মোহ জালে আটকা পড়ে আল্লাহ্ বিমুখ হওয়া এবং আল্লাহ্‌র যিকির ও ইবাদতে অনাগ্রহী ও উদাসীন হওয়া। যে গায়রুল্লাহর সাথে বান্দার প্রেম হবে সে গায়রুল্লাহ্ দ্বারাই তাকে আযাব ও কষ্ট দেওয়া হবে। সে গায়রুল্লাহ্‌র প্রেমের জাহান্নামী আগুনেই জ্বলে পুড়ে খাক হতে থাকবে। তার চেয়ে বদনসীব, অভিশপ্ত, অসুখী ও হতভাগা পৃথিবীতে আর কেউ হতে পারে না। বস্তুত প্রেম ও মুহব্বত দুই প্রকার ঃ এক প্রেম হৃদয় মনে সজীবতা আনে, আত্মাকে পুষ্টি ও খাদ্য যোগায়, চোখ জুড়ায়, প্রাণ শীতল করে। এককথায়, মাটির পৃথিবীকে জান্নাতে রূপান্তরিত করে। সেই প্রেম হলো আল্লাহ্-প্রেম, যা হৃদয় ও আত্মার সবটুকু ইচ্ছা ও অনুভূতিসহ আল্লাহর (যাত ও সিফাত তথা গুণ ও সত্তার) মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে। আরেকটি প্রেম আছে যা আত্মার যন্ত্রণা, বুকের জ্বালা, হৃদয়ের সংকীর্ণতা এবং চিন্তার আবিলতা সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনকে জাহান্নামে পরিণত করে। সেটা হলো গায়রুল্লাহ্‌র প্রেম ও মোহ।

সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষেত্র যিকিরের সার্বক্ষণিকতা হলো 'শরহে সদর' লাভের আরেকটি উপায়। যিকিরই মানব হৃদয়ে আনে পরম তৃপ্তি ও শান্তি এবং নিবিড় তুষ্টি ও প্রশান্তি। পক্ষান্তরে গাফলত ও উদাসীনতা হলো হৃদয়ের সংকীর্ণতা, বদ্ধতা, যন্ত্রণা ও অস্থিরতার অন্যতম কারণ।

'শরহে সদর' লাভের ক্ষেত্রে সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া ও সদয় আচরণের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যার স্বভাবে রয়েছে সৃষ্ট জীবের কল্যাণ ও উপকারের সীমাহীন জযবা ও আবেগ, নিঃসন্দেহে তার হৃদয় হবে উন্মুক্ত, প্রশস্ত, প্রশান্ত ও তৃপ্ত। পক্ষান্তরে যে কৃপণের স্বভাবে ইহসান ও কল্যাণের জযবা নেই- সে হতভাগ্যের হৃদয় হবে সংকীর্ণ, বিষাদগ্রস্ত, বিপর্যস্ত ও আবিলতাপূর্ণ। সদকা ও দানে অভ্যস্ত ত্যাগী মানুষের উদাহরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ্র রসূল ইরশাদ করেছেন ঃ মনে কর এক লোকের দেহে দু'টি লৌহবর্ম রয়েছে। যখন সে সদকা প্রদানের নিয়ত করে তখন বর্ম প্রশস্ত হতে থাকে। এমনকি তার কাপড়ের নীচের অংশ মাটিতে গড়াগড়ি খায়। ফলে তার পায়ের দাগগুলো মুছে যায়। পক্ষান্তরে কৃপণের অবস্থা এই যে, বর্মের প্রতিটি অংশ তার শরীরে চেপে বসে; তাতে আর কোন প্রশস্ততা ও স্বাচ্ছন্দ্য অবশিষ্ট থাকে না।

'শরহে সদর' লাভের আরেকটি উপায় হলো বীরত্ব ও সাহসিকতা। সাহসী মানুষের বক্ষ থাকে উন্মুক্ত, প্রশস্ত ও মনোবলসম্পন্ন। পক্ষান্তরে ভীরুর অন্তর হয় ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ। পশুরা যে পরিমাণ সুখ, আনন্দ, স্বাদ ও তৃপ্তি লাভ করে- তার ভাগ্যে ততটুকুই মাত্র জোটে। কৃপণ, আল্লাহ-বিমুখ, আল্লাহর যিকির থেকে গাফিল, তাঁর নাম ও সিফাত সম্পর্কে অজ্ঞ, তাঁর দীন সম্পর্কে বেখবর এবং গায়রুল্লাহ্র মোহজালে আটকা পড়া ব্যক্তির মত ভীরু ও বুযদিল ব্যক্তিত্ব আত্মার তৃপ্তি ও প্রশান্তি এবং হৃদয়ের অনাবিল আনন্দ ও সন্তুষ্টির সুমহান সম্পদ-ঐশ্বর্য থেকে হয় সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এই আনন্দ ও প্রশান্তিই কবরে বসন্ত-সজীব সবুজ বাগিচার রূপ ধারণ করে। তদ্রূপ হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও আবিলতাই যন্ত্রণাদায়ক জেলখানার রূপ ধরে হাযির হয়। পৃথিবীতে মানুষের সিনায় বিদ্যমান কলবের যে অবস্থা ছিল সে অবস্থাই তার হবে কবরের নিঃসঙ্গ জীবনে। এখানের আনন্দ সেখানেও আনন্দের রূপ ধারণ করবে এবং এখানের অশান্তি সেখানেও অশান্তির কারণ হবে। তবে (রোগ, ব্যাধি, দারিদ্র ও অন্যান্য কারণে) পৃথিবীতে ঈমানদারদের যে সাময়িক কষ্ট ও অশান্তি দেখা দেয় তদ্রূপ (সম্পদ ও ক্ষমতা এবং ভোগ ও পাশবিকতার মাধ্যমে) কাফির ও গাফিল ব্যক্তিরা যে ক্ষণিক সুখ লাভ করে তা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। হৃদয়ে সর্বক্ষণ বিদ্যমান থাকা স্বভাবের অবস্থাই হলো বিবেচ্য।

'শরহে সদর' লাভের জন্য হৃদয়কে সেই সব ঘৃণ্য দোষ ও বৃত্তি থেকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে যা হৃদয়ে সংকীর্ণতা ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে এবং কলবের আরোগ্য লাভে প্রতিবন্ধক হয়। 'শরহে সদর' লাভের উপায়গুলো

আয়ত্ত্ব করার সাথে সাথে উপরিউক্ত ঘৃণ্য দোষগুলো থেকে কলবকে পবিত্র না করলে 'শরহে সদরের' উল্লেখযোগ্য অংশ থেকেই মানুষ মাহরূম হবে। বড় জোর এই হবে যে, তার ভিতরে দু'টি বিপরীত উপাদানের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলতে থাকবে। তদ্রূপ অপয়োজনীয় বিষয়সমূহ দেখা, শোনা, ও বলা এবং বিনা প্রয়োজনে মেলামেশা, পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদি পরিহার করে চলাও জরুরী। কেননা এ অপয়োজনীয় বোঝাগুলো কলবের জন্য আযাব, কষ্ট ও বিপদের কারণ এবং হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও রুদ্ধতার উৎস। এগুলোর কারণে মানব হৃদয় ভীষণ কষ্ট বোধ করে। দুনিয়া-আখিরাতের অধিকাংশ কষ্ট ও আযাব মূলত এগুলোরই ফল। হায় আল্লাহ্! এই বিপদসংকুল মরুভূমিতে দৌড়ঝাঁপ করেই যার জীবন কেটে যায় সে কতই না পেরেশানি, বিপর্যস্ততা ও সংকীর্ণচিত্ততার মাঝে দিন যাপন করে। পক্ষান্তরে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তির সুখ-শান্তি ও হৃদয়ের প্রফুল্লতার কি কোন সীমা -পরিসীমা আছে যে তার জীবন ও চরিত্রের সবকটি উত্তম স্বভাব ও গুণ ধারণ করে রেখেছে? এর কর্মে ও আচরণে সেগুলোর প্রকাশ ঘটাচ্ছে? এদের সম্পর্কেই তো ইরশাদ হয়েছে ঃ ان الابرار لفى نعيم। নিঃসন্দেহে সৎ লোকেরা জান্নাতে আছে। অতঃপর প্রথমোক্তদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ ان الفجار لفى جحيم (নিঃসন্দেহে অসৎ লোকেরা জাহান্নামে আছে)। এ উভয় অবস্থারই অবশ্য বহু স্তর রয়েছে এবং স্তর থেকে স্তরের তফার্ত ও দূরত্বের সঠিক 'ইলম আল্লাহ্‌রই শুধু রয়েছে। মোট কথা, সজীবতা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় 'শরহে সদর' তথা হৃদয়ের প্রশস্ততা ও আত্মার স্বভাব ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র রসূল (স.) ছিলেন সৃষ্টি জগতে সকলের চেয়ে পূর্ণ, সকলের চেয়ে অগ্রগামী। সেই সাথে স্থূল ও দৈহিক দিক থেকেও তাঁর 'শরহে সদর' এমন ছিলো যার সমকক্ষ পৃথিবীর অন্য কোন মানুষ হতে পারে না।[১] যে মানুষ রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের পদাংক অনুসরণে যত অধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে 'শরহে সদর' ও হৃদয়ে প্রশস্ততাজনিত সুখ ও শান্তির সম্পদ ঐশ্বর্য সে তত অধিক লাভ করবে। বলা বাহুল্য যে, কাজ প্রশস্তকরণ, ভার অপসারণ এবং স্বনামধন্য উচ্চ মর্যাদা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌র রসূল (স) শীর্ষতম সোপানে[২] এবং চূড়ান্ত

১। উল্লেখ্য যে, এই শরহে সদর মুলত বক্ষ বিদীর্ণ করণেরই ফলশ্রুতি ছিল। এ ঘটনা সম্পর্কে আহলে সুন্নতের সকল প্রাজ্ঞ আলিম ও সীরাতকার একমত। যাদু-মা'আদে হাফিজ ইবনু'ল কায়্যিমও তা উল্লেখ করেছেন।

২। 'আমি কি তোমার বক্ষ সম্প্রসারিত করি নাই? আর তোমার বোঝা কি নামিয়ে সেই দেই নাই যা তোমার পৃষ্ঠদেশ বাঁকা করে দিয়েছিল। আর তোমার স্মরণকে শীর্ষতম সোপানে উন্নীত করেছি।' [আল-কুরআন]

বিন্দুতে অবস্থান লাভ করেছিলেন। সুতরাং উম্মতও তাঁর পদাংক অনুসরণ অনুপাতে এ সম্পদ ও নিয়ামতের অংশ পেতে থাকবে।[১]

গ্রন্থকার প্রতিটি ইবাদতের আহকাম ও মাসায়েল বর্ণনার পূর্বে সেগুলোর অবতরণকাল, হিকমত ও তত্ত্ব এবং কল্যাণ ও তাৎপর্য সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা করেছেন। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তা যেমন সবাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ তেমনি আঙ্গিকের দিক থেকেও তা আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী। এখানে আমরা একটি মাত্র নমুনা পেশ করছি ঃ

সিয়ামের উদ্দেশ্য হলো নফসের কুপ্রবৃত্তিগুলোকে দমন করা এবং মানুষের মধ্যে অভ্যস্ত ও প্রিয় জিনিসগুলো থেকে বিরত থাকার অভ্যাস ও শক্তি সৃষ্টি করা এবং তার রিপুশক্তিতে এতটা ভারসাম্য সৃষ্টি করা যাতে তার অন্তরে চিরন্তন সৌভাগ্য লাভের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। সেই সাথে ক্ষুধা-পিপাসার মুকাবিলা করার পর্যাপ্ত শক্তি সৃষ্টি করাও সিয়ামের উদ্দেশ্য। সিয়াম আমাদেরকে মানুষের ক্ষুধার্ত কলিজার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা বুঝতে পারি, পৃথিবীর লাখ লাখ আদম সন্তান অহরহ কিয়ামতের কি কঠিন আযাব ভোগ করছে, যারা জঠর জ্বালা নিবারণের জন্য পায় না এক মুঠো অন্ন এবং পিপাসাকাতর কলজে ঠাণ্ডা করার জন্য এক কাৎরা পানি। পানাহার ও কামরিপু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সিয়াম শয়তানকে মানুষের জীবনে তার শয়তানী ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে দেয় না, বরং বাধা দেয়। ফলে পরকালীন জীবনের চিন্তা বাদ দিয়ে প্রতি মুহূর্ত নফসের পায়রবী করার অভিশাপ থেকে সে মুক্তি পায়। সিয়াম মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে স্থিরতা ও প্রশান্তি আনে, তার পাশবিকতা ও উন্মত্ততা দমন করে এবং রিপুগুলোর মুখে মযবুত লাগাম এঁটে দেয়। সিয়াম হচ্ছে মুত্তাকীদের জন্য লাগাম, নফস ও আত্মার স্থায়ী যুদ্ধে আত্মার জন্য ঢাল এবং নৈকট্য প্রত্যাশী নেককারদের জন্য এক সফল মুজাহাদা ও সাধনা। মানুষের সমস্ত আমলের মধ্যে একমাত্র সিয়ামই হচ্ছে আল্লাহ্‌র জন্য বিশিষ্ট। একজন সিয়াম সাধক আসলে কি করেন? তার মা'বুদ ও মাহবুবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য পাশবিকতা ও ভোগের চাহিদা দমন করেন। সুতরাং সিয়ামের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর মুহব্বত ও ভালোবাসা এবং রেযা ও সন্তুষ্টির পথে পাশবিক সুখ ও ভোগ বর্জনের মাধ্যমে এক মহান ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করা। সিয়াম হচ্ছে বান্দা ও আল্লাহ্‌র মাঝে এক গোপন রহস্য, যা অবগত হওয়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যদের এটা তো জানা সম্ভব যে, সিয়াম সাধক নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করেছে। কিন্তু সেটা সে মা'বূদের রেযা ও সন্তুষ্টি লাভের

১. যাদুল-মা'আদ, ১৫৮ থেকে ১৬০ পৃ. ১ম খণ্ড (নিজামী);

"উদ্দেশ্য"বর্জন করেছে, এ জানা সম্ভব নয়। এ হলো বান্দার কলব ও হৃদয়ের এমন এক সুগোপন ভাব ও অনুভূতির নাম যা অন্য কারো পক্ষে জানা অসম্ভব। এটাই হচ্ছে সিয়ামের হাকীকত। দৈহিক ও আত্মিক শক্তির হিফাজত, সংরক্ষণ ও অপচয় রোধেও সিয়ামের বিস্ময়কর অবদান রয়েছে। সিয়াম হচ্ছে সেই পাশবিক আবর্জনাগুলোর বিরুদ্ধে এক সার্থক রক্ষা-ব্যবস্থা যা মানুষের ওপর পূর্ণ প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হলে তার আত্মা ও চরিত্রে পচন ধরিয়ে ছাড়ে। সেই সাথে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর উপাদানগুলো থেকেও সিয়াম মানুষের শরীরকে মুক্ত করে। সুতরাং সিয়াম যুগপৎ দেহ ও আত্মার স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং পাশবিক স্বেচ্ছাচারিতায় বিধ্বস্ত স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রেও তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সিয়াম তাকওয়ার মহৎ গুণ অর্জনের অত্যন্ত সহায়ক ইবাদত। এজন্যই ইরশাদ হয়েছে ঃ

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون -

হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের ওপর সিয়ামের বিধান ফরয করা হলো যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। আশা করি তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে। (বাকারা-১৮৩) ; এ কারণেই আল্লাহ্‌র রসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ الصوم جنة। (সিয়াম ঢালস্বরূপ)। এজন্যই বিবাহের সামর্থ নেই অথচ কামশক্তি প্রবল, এমন ব্যক্তিদের সিয়াম সাধনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মোটকথা, সিয়ামের কল্যাণ ও উপকারিতা এত স্পষ্ট ও অবধারিত যে, মানুষের সুস্থ বুদ্ধি সহজেই তা উপলব্ধি করতে পারে। জাগ্রত অনুভূতি অনায়াসেই তা অনুভব করতে পারে। তাই বান্দাদের জন্য রহমত ও অনুগ্রহরূপে এবং দেহ ও আত্মার জন্য ঢাল ও রক্ষাকবচ হিসেবে সিয়ামের বিধান আল্লাহ্ পাক ফরয করেছেন। এ ক্ষেত্রে রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের কর্মপন্থাই ছিল সর্বোত্তম ও পূর্ণাঙ্গ। কেননা আমাদের দিক থেকে তা হলো সবচেয়ে সহজ ও স্বভাব অনুকূল, আবার উদ্দেশ্য হাসিলের দিক থেকে সবচেয়ে কার্যকর ও সফল। মানুষের পক্ষে তার অভ্যস্ত ও প্রিয় বিষয়গুলো বর্জন করা যেহেতু কষ্টসাধ্য ও সময়-সাপেক্ষ বিষয়, সেহেতু সিয়ামের বিধান ফরয করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা হয়নি; বরং হিজরতের পরে ইসলামের মধ্যবয়সে তা ফরয করা হয়েছে। মুসলমানদের স্বভাব ও তবিয়ত ইতিমধ্যে তাওহীদ ও সালাতসহ বিভিন্ন আহকামে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সিয়াম ফরয হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরীতে। সুতরাং রসূল (স.) জীবনে একে একে নয়টি রমযানের সিয়াম পালন করেছেন। সিয়াম ফরয করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রজ্ঞাসম্পন্ন পর্যায়ক্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

প্রথমে মুসলমানদের সিয়াম পালন কিংবা 'ফিদয়া'[১] আদায় করার এখতিয়ার ছিল। পরবর্তীতে এ ব্যবস্থা রহিত করে সিয়াম বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়। তবে সিয়াম পালনে অক্ষম বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে ফিদয়া প্রদানের অবকাশ এখানো আছে। (বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ্ বিষয়ক গ্রন্থসমূহে দেখুন) অসুস্থ ও মুসাফিরকে রমযানের পরিবর্তে পরে কাযা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী মহিলাদের ক্ষেত্রেও গর্ভস্থিত সন্তানের কিংবা দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রাণের আশংকা দেখা দিলে সিয়াম স্থগিত রাখার অনুমতি রয়েছে।

হজ্জ অধ্যায় হলো কিতাবের সর্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী অংশ। এ অধ্যায়ে গ্রন্থকার সুগভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং বিস্ময়কর দূরদৃষ্টি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সুস্পষ্ট সাক্ষর রেখেছেন। হজ্জ মাসায়েল এবং রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজ্জ সম্পর্কে এমন সারগর্ভ, তথ্যবহুল, তাত্ত্বিক ও বিস্তৃত আলোচনা আর কোন কিতাবে এই অধমের চোখে পড়েনি। গোটা হজ্জ অধ্যায়টি মিসরী সংস্করণের ১৮০ পৃষ্ঠা থেকে ৩৪৯ মোট ১৬৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত।

বিদায়ের হজ্জের বিবরণ দিতে গিয়ে মদীনার যাত্রা থেকে শুরু করে ফিরে আসা পর্যন্ত দীর্ঘ সফরের ধারাবাহিক ঘটনা এমন সুন্দরভাবে তিনি তুলে ধরেছেন যে, পাঠকের সামনে এই মুবারক সফরের একটা পূর্ণাঙ্গ ও জীবন্ত ছবি ফুটে ওঠে। সত্যি বলতে কি, আলোচ্য অধ্যায়টি হজ্জ সংক্রান্ত গোটা হাদীস ভাণ্ডারের সার-নির্যাস এবং বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ের এক সুন্দরতম সংগ্রহ হয়ে উঠেছে।[২] হজ্জের মত বিরোধপূর্ণ বহু মাসায়েল সম্পর্কেও তিনি পর্যাপ্ত আলোকপাত করেছেন এবং হাদীস ভিত্তিক স্বাধীন ইজতিহাদ প্রয়োগ করে নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁকে বিশেষ কোন ফিকহী মাযহাবের অনুসারী মনে হয়নি। যেমন হাম্বলী মাযহাবের মুকাল্লিদ হওয়া সত্ত্বেও অকাট্য যুক্তি ও তথ্যের আলোকে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হজ্জে 'কিরান' করেছেন, 'ইফরাদ বা তামাত্তু নয়।[৩] এমনকি রসূল (স.)-এর হজ্জে কিরান আদায়ের বিবরণ দিতে গিয়ে নেতৃস্থানীয় পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী আলিমগণ যে সকল ভূল-ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন, বস্তুনিষ্ঠ তথ্য-প্রমাণের আলোকে সেগুলো তিনি চিহ্নিত করেছেন। সাথে সাথে তাঁদের ভুলের উৎস ও কারণও উল্লেখ করেছেন।[৪]

---

১. অক্ষম ব্যক্তিদের প্রতিদিনের সিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে আহার করানো।

২. যাদু'ল-মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৬-২৪৬।

৩. ঐ, পৃ. ১৮৫-১৯০

৩. ঐ, পৃ. ১৮৫-১৯০

এ প্রসঙ্গে তাবি'ঈগণের কাতারে হযরত তাউস, পরবর্তী পূর্বসূরীদের কাতারে আল্লামা তাবারী এবং উত্তরসূরী ইমামদের কাতারে কাযী 'ইয়ায ও আল্লামা ইবনে হাযমের মত পথিকৃত ও দিকপাল ব্যক্তিবর্গের ভুল-ভ্রান্তি তুলে ধরতেও তিনি পিছ-পা হন নি।[১] এখানে তাঁর জ্ঞানের পরিপক্কতা, মর্যাদা ও গুরুত্ব এবং গ্রন্থকারের ইমামত ও বৈদগ্ধ প্রমাণের জন্য হজ্জ অধ্যায়টিই যথেষ্ট।

স্বীয় উস্তাদ ইমাম ইবনে তায়ামিয়া (র)-র রুচি ও স্বভাবের প্রভাবে এবং নিজস্ব বৈদগ্ধ ও দূরদৃষ্টির তাকীদে স্থানে স্থানে তিনি আকায়িদ ও কালাম শাস্ত্রীয় আলোচনার স্বচ্ছন্দ অবতারণা করেছেন এবং শরীয়তের রূহ ও প্রাণ তুলে ধরার সার্থক প্রয়াস চালিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাওয়াক্কুলের হাকীকত ও আসবাব গ্রহণের বৈধতা সম্পর্কে যে গবেষণাধর্মী ও তথ্যবহুল আলোচনা তিনি পেশ করেছেন এক কথায় তা অনবদ্য ও উপভোগ্য।[২]

রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সালামের গাযওয়া যুদ্ধসমূহের বিবরণ শুরু করার পূর্বে রীতিমাফিক জিহাদের হাকীকত ও তাৎপর্য এবং এর স্তর ও পর্যায় সম্পর্কে তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ বক্তব্যের অবতারণা করেছেন।[৩] অতঃপর ইসলামী দাওয়াতের সূচনা, মক্কার ঘটনাপ্রবাহ, মদীনায় হিজরত, জিহাদের ফরয বিধান অবতরণ, মালে গনীমত বণ্টন, সন্ধি ও নিরাপত্তা, জিযয়া কর এবং আহলে কিতাব ও মুনাফিকদের সাথে আচরণ ইত্যাদির আহকাম ও বিধান বিস্তারিতভাবে লিখেছেন।[৪] জিহাদ ফরয হওয়ার হিকমত ও তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি জান্নাতের হাকীকত এবং জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামতের তুলনায় মানুষের জান ও মাল যে কত তুচ্ছ ও নগণ্য- তাও তুলে ধরেছেন বেশ ঈমান উদ্দীপক ভাষায়। এখানে এসে তাঁর ঈমানী তেজ ও লেখনী শক্তি উভয়ের সার্থক সমন্বয় ঘটেছে বলে মনে হয়। তিনি লিখেছেন ঃ

> মানুষ তার জান-মালকে জানমালের মালিকের রাস্তায় ব্যয় করবে, এটাই হলো প্রেম ও মুহব্বত এবং জান্নাত ও তার অফুরন্ত নিয়ামতের দাবী। কেননা মু'মিনের জান-মাল তিনি খরিদ করে নিয়েছেন। কোন ভীরু অপদার্থের ও শূণ্যহস্ত ফকীরের সাধ্য কি এমন পণ্যের দাম হাঁকে। আল্লাহর কসম! এ কোন অচল পণ্য নয় যে, ভীরু, দুর্বল ও ফকীর-মিসকীন এর দরাদরি করতে পারে এবং এ পণ্যের বাজার এত মন্দা নয় যে, অভাবী নাখাস্তা লোকও তা করযরূপে চাওয়ার সাহস করতে পারে। এ পণ্য তো

১. যাদু'ল-মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৯-২৫১।
২. ঐ পৃ. ২৬৪-২৬৬।
৩. ঐ পৃ. ২৯১-২৯৪।
৪. ঐ, পৃ. ২৯৫-৩৩২।

জহুরী ও সমঝদারদের বাজারে বিক্রির জন্য ছাড়া হয়েছে। জান্নাতের মালিক তো জানের চেয়ে কম মূল্যে তার পণ্য বেচতে রাযী নন। ভীরু অপদার্থের দল তো মূল্য শুনেই পিছিয়ে এসেছে। আর প্রেমিক মজনূর দল হুড়োহুড়ি করে এগিয়ে গেছে জানের বাজি লাগাতে যে, মালিক দয়া করে তার জানটা যদি জান্নাতের মূল্যরূপে কবুল করেন। শেষ পর্যন্ত এ মহাপণ্য সেই পূণ্যাত্মাদের হাতে চলে গেল যারা মু'মিন ভাইদের প্রতি ছিলেন সদয় ও বিনম্র, কিন্তু কাফিরদের বেলায় ছিলেন বজ্র কঠোর। 'ইশক ও প্রেমের দাবীদারদের সংখ্যা যখন বেড়ে গেল তখন তাদের কাছে দাবীর সত্যতার প্রমাণ তলব করা হলো। কেননা বিনা প্রমাণে সবার দাবী স্বীকার করে নিলে আশিক মজনূ আর ভণ্ড মজনূর মাঝে পার্থক্য করার কোন উপায় থাকবে না। দাবীদাররা হর কিসিমের প্রমাণ পেশ করল কিন্তু তাদের বলা হলো বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া তোমাদের দাবী গৃহীত হবে না।

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله -

আপনি বলে দিন, আল্লাহ্কে সত্যই যদি তোমরা ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ্ তোমাদের ভালোবাসবেন।

এ কঠিন পরীক্ষার কথা শুনে সবাই পিছিয়ে গেল। কাজে-কর্মে, আচরণে, অভ্যাসে ও চরিত্রে তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে যারা রসূল (সা)-এর সত্যিকার অনুসারী ছিলেন তারাই শুধু নিজেদের দাবীতে অটল থাকলেন। অতঃপর চূড়ান্ত পরীক্ষার মানদণ্ড ঘোষণা করে ইরশাদ হলো ঃ

يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم -

"আল্লাহ্র পথে তারা জিহাদ করে এবং নিন্দুকের নিন্দা বা সমালোচনার মোটেই পরওয়া করে না।" এবার কিন্তু প্রেম ও মুহব্বতের অধিকাংশ দাবীদার কেটে পড়ল। মুজাহিদরাই শুধু টিকে রইল। তখন তাদের লক্ষ্য করে বলা হল, এখন থেকে আশিক ও প্রেমিকদের জান-মালে তাদের মালিকানা নেই। সুতরাং যে পণ্যের সওদা হয়ে গেছে তা প্রকৃত মালিককে বুঝিয়ে দাও।

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة -

নিঃসন্দেহে আল্লাহ, মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন এই শর্তে যে, তাদেরকে জান্নাত দেওয়া হবে।

বিক্রয় চুক্তি হয়ে যাওয়ার পর বিক্রেতা ও ক্রেতার কর্তব্য হল পণ্য বুঝিয়ে দেওয়া এবং মূল্য পরিশোধ করা। ব্যবসায়ীরা যখন ক্রেতার মর্যাদা, দয়া, মহিমা, ক্ষমতার সর্বব্যাপকতা প্রত্যক্ষ করল এবং মূল্যরূপে প্রাপ্তব্য চিরস্থায়ী

জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামত সম্পর্কে অবগত হলো তখন তাদের বুঝতে বাকি রইল না যে, জানমালের এ সওদাবাজিতে তারা দারুণ জেতা জিতেছে। এখন ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহে পড়ে এ বিক্রয় চুক্তি প্রত্যাহার করা হবে সীমাহীন বোকামী ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। তাই তারা খরিদদারের প্রতিনিধির হাতে সানন্দে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের সমস্ত ইচ্ছা ও এখতিয়ার বিলুপ্ত করে বায়আতে রিযওয়ানে শরীক হলো। নবীর হাতে হাত রেখে তারা শপথ করল–এ মূল্য কখনো আমরা ফেরত নেব না এবং বিক্রয় চুক্তি প্রত্যাহারেরও আবেদন জানাব না। মোটকথা, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে এবং তারা তাদের সব কিছু সোপর্দ করে দিয়েছে তখন তাদের বলা হল–তোমাদের জীবন ও সম্পদ এখন থেকে আমার হয়ে গেছে এবং এখন তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে আমি তোমাদের ফিরিয়ে দিচ্ছি।

ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احياء عندربهم يرزقون -

"আল্লাহর রাস্তায় যারা নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে কর না। আপন প্রতিপালকের কাছে তারা জীবিত, তাদের রিযিক প্রদান করা হয়।" লাভের লোভে আমি তোমাদের জান-মাল দাবী করিনি। আমি শুধু আমার দান ও দয়ার প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছি। দেখছ না, কেমন তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিস নিয়ে কী বিরাট ও অফুরন্ত মূল্য তোমাদের হাতে তুলে দিলাম! তদুপরি তোমাদের জান-মাল তোমাদের জন্যই আমি সঞ্চিত করে রেখেছি। এখানে হযরত জাবির (রা)-এর ঘটনা স্মরণ করুন। রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছ থেকে একটি উট খরিদ করলেন। তদুপরি বিক্রিত উট ফেরতও দিলেন। তাঁর পিতা ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর পিতার সাথেও অনুরূপ মু'আমালা করলেন। আল্লাহ্ তাকে জীবিত করে আবরণ সরিয়ে সরাসরি কালাম করলেন, হে আমার বান্দা! কী চাওয়ার আছে তোমার, বলো। মানুষ তার ক্ষুদ্র অনুভূতি ও উপলব্ধি দ্বারা আল্লাহ্‌র দয়া ও করুণা এবং দান ও ইহসানের কতটুকুই বা অনুভব করতে পারে? এ জান-মাল আল্লাহ্‌ই তো দিয়েছেন। বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের তাওফীকও তিনিই দিয়েছেন। যাবতীয় দোষ ও খুঁত সত্ত্বেও দয়া করে সে মাল কবূল করেছেন এবং বান্দার হাতে কল্পনাতীত মূল্য তুলে দিয়েছেন। নিজের দেওয়া মাল দিয়েই নিজের বান্দাকে খরিদ করেছেন। তদুপরি বান্দার তিনি প্রশংসা করেছেন, অথচ তাঁর দেয়া তাওফীক ছাড়া বান্দার পক্ষে এ বিরাট সওদা করা সম্ভব ছিল না। আল্লাহ্‌র পথে আহবানকারী রসূল (স) সাহসী ও আত্মসম্মানবোধসম্পন্নদের আল্লাহ্‌র ও জান্নাতের দিকে ডাকলেন। ঈমানের

নকীব বিবেকসম্পন্নদের আহ্বান শোনালেন । ফলে জান্নাতের আশায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধানকারী যাত্রী দলের মাঝে মহাযাত্রার এক অভূতপূর্ব কোলাহল জেগে উঠল এবং আশা-প্রত্যাশার স্বর্ণতোরণ পেরিয়ে মনযিলে মকসূদে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত কারো মনেই যেন স্বস্তি নেই। আছে শুধু ব্যাকুল প্রতীক্ষার আনন্দ-বেদনা।[১]

অতঃপর হাফিজ ইবনু'ল-কায়্যিম রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের গাযওয়া, প্রতিনিধি প্রেরণ ও অন্যান্য ঘটনার ধারাবাহিক ও বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। হাদীছ ও সীরাত উভয় শাস্ত্রেই তাঁর সুগভীর ও সুতীক্ষ্ণ নজরে ছিল। ঐতিহাসিক ও সমালোচক হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন যুগ-অনন্য মুহাদ্দিছ। তাই আলোচ্য গ্রন্থের এ অংশটি অন্যান্য সীরাত গ্রন্থের তুলনায় অধিকতর মূল্যবান, সারগর্ভ ও তথ্যনির্ভর হয়েছে। মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। গাযওয়া ও ঘটনাবলীর ধারা বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বিভিন্ন আয়াতের তাফসীর ও সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহও পেশ করেছেন উদারতার সাথে।[২] গাযওয়াসমূহের আলোচনায় তাঁর অনুসৃত রীতি এই যে, প্রতিটি গাযওয়ার পর তিনি ফিকহসংক্রান্ত একটি পরিচ্ছেদ লিখেছেন এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনা থেকে সম্ভাব্য যাবতীয় ফিকহী মাসায়েল আহরণপূর্বক সবিস্তারে তা বর্ণনা করেছেন। যেমন খয়বর, মক্কা, হুনায়ন ও আওতাস বিজয়ের ঘটনা বর্ণনার পর যথাক্রমে ঃ

فيماكان فى غزوة خيبر من الاحكام الفقهية ـ فصل فى اشارة الى مافى هذه الغزوة من الفقه واللطائف فصل الى اشارة ماتضمنت هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنكت الحكمية ـ

শিরোনামে সংশ্লিষ্ট ঘটনা থেকে আহরিত ফিকহী মাসায়েলগুলো গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। প্রতিটি পরিচ্ছেদেই ফিকহশাস্ত্রের অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য ও মসলা-মাসায়েল পরিবেশিত হয়েছে।

গাযওয়া বর্ণনায় পূর্ববর্তী সীরাত বিশারদদের তথ্য ও গবেষণা দ্বারা তিনি উপকৃত হয়েছেন সত্য, তবে তা অনুকরণসর্বস্ব নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তীদের সর্বস্বীকৃত মতামত সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলে নিজস্ব অধ্যয়ন ও প্রজ্ঞার ফসল পেশ করেছেন। বর্ণনা মুতাবিক সাধারণভাবে এটাই ধারণা করা হয় যে, মদীনার আনসারী কিশোরীদের নিম্নোক্ত স্বাগত সঙ্গীতটি,

طلع البدر علينا   من ثنيات الوداع

১. যাদু'ল-মা'আদ, পৃ. ৩১১-৩১২।

২. যাদু'ল-মা'আদ, পৃ. ৩৫২।

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع

হিজরত কালে রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের মদীনায় শুভাগমন উপলক্ষে গীত হয়েছিল। কিন্তু হাফেজ ইবনু'ল-কায়্যিম এ ধারণার সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন যে, সঙ্গীতটি আসলে (মদীনা শরীফ থেকে সিরিয়ার দিকে অবস্থিত) তাবূক থেকে ফেরার সময় রসূলুল্লাহ (স)-কে স্বাগত জানিয়ে গীত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন ঃ

وبعض الرواة بهم فى هذا ويقول انما كان ذالك عند مقدمه المدينة من مكة وهو وهم ظاهر فان ثنياة الوداع انما هى من ناحية الشام لا يراها القادم من مكة الى المدينة ولايمر بها الا اذا توجه الى الشام -

ভূল ধারণার শিকার হয়ে কতিপয় বর্ণনাকারী বলেন যে, আলোচ্য গীতটি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকালে গাওয়া হয়েছিল। এটা পরিষ্কার ভুল। কেননা الوداع হচ্ছে সিরিয়ার দিকে অবস্থিত। মক্কা থেকে আগত কাফেলার সামনে তা পড়তে পারে না। সিরিয়া অভিমুখী না হলে তা সামনে পড়ার কথা নয়।[১]

গাযওয়া তাবূক বর্ণনার পরও তিনি যথারীতি বিস্তারিতভাবে সংশ্লিষ্ট ফিকহী মাসায়েল গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। তাতে বেশ কিছু সূক্ষ্ম ইজতিহাদ এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও নাগরিক বিষয়ও স্থান পেয়েছে। গাযওয়ার আলোচনা শেষে দরবারে রিসালাতে বিভিন্ন আরব প্রতিনিধি দলের আগমন[২] এবং দরবারে রিসালাত থেকে বিভিন্ন সম্রাট ও শাসকদের নামে চিঠি ও প্রতিনিধি দল প্রেরণের বিস্তারিত বিবরণও ইবনু'ল-ক্যায়িম তুলে ধরেছেন।[৩]

দ্বিতীয় খণ্ডের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে নববী চিকিৎসা প্রসংগ অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনকে রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে চিকিৎসা ও ব্যবস্থা-পত্র দিয়েছেন সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা। এ প্রসঙ্গে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে নববী চিকিৎসার রহস্য, তাৎপর্য ও উপযোগিতা তুলে ধরেছেন। অবশ্য ফাঁকে ফাঁকে ফিকহ ও হাদীস সংক্রান্ত আলোচনাও রয়েছে

১. যাদু'ল-মা'আদ. পৃ. ৪৬৬ ;
২. ঐ, পৃ. ৪৬৯-৪৮২;
৩. ঐ, পৃ. ৪৮৩-৫১৮;

যথারীতি।[১] কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে ইবনু'ল-কায়্যিম যে মূল্যবান কাজটি করেছেন তা এই যে, বর্ণানুক্রমানুসারে ঐ সকল ঔষধ ও উপকরণের নাম তিনি সংগ্রহ করেছেন যা বিশুদ্ধ, দুর্বল কিংবা অন্তত কোন জাল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোকে গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণের ম্যাধমে সেগুলোর চিকিৎসা গুণাগুণও তুলে ধরেছেন একজন সর্বদর্শী চিকিৎসা বিজ্ঞানীর মত।[২] নববী চিকিৎসা অধ্যায়ে দেহজ রোগ ও চিকিৎসার পাশাপাশি কলব ও আত্মার ব্যাধি ও চিকিৎসা প্রসঙ্গ তিনি টেনেছেন এবং 'ইশ্‌ক ও প্রেমজাত ব্যাধি, 'ইশ্‌ক ও মুহব্বতের হাকীকত ও প্রকৃতি, কারণ ও প্রকার এবং প্রেমজাত ব্যাধি ও চিকিৎসা সম্পর্কে এমন সারগর্ভ, তত্ত্বপূর্ণ ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা পেশ করেছেন যা মানব স্বভাব ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর সুগভীর জ্ঞান ও বিস্তৃত পড়াশোনার কথা যেমন প্রমাণ করে, তেমন জীবন ও জীবন-সমস্যা এবং হৃদয়ঘটিত ব্যাধি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে।[৩]

নববী চিকিৎসার প্রকৃতি অবশ্য সেটাই যা শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ (র) লিখেছেন। অর্থাৎ এ চিকিৎসা ওয়াহী ও শরীয়ত নির্ভর নয় ; বরং নিজস্ব চিকিৎসা জ্ঞান এবং আরবদের অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা-নির্ভর।[৪] তবু রসূল (স) এর প্রতিটি বাণী ও নির্দেশের ওপর যারা ভক্তি, ভালোবাসা, বিশ্বাস ও নির্ভরতার সাথে আমল করতে অভ্যস্ত-তাদের জন্য হাফিজ ইবনু'ল কায়্যিমের 'যাদু'ল-মা'আদ' সত্যি এক মহা মূল্যবান তথ্য-ভাণ্ডার।

আলোচনা অধ্যায় শেষ করে হাফিজ সাহেব দরবারে রিসালতের বিচার ও ফয়সালা-সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করেছেন এবং অভ্যাস মাফিক এ অধ্যায়েও ফিকহ ও মু'আমালা সংক্রান্ত তত্ত্ব, তথ্য ও মাসায়েলের এক বিশাল ও মূল্যবান ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন।[৫] এভাবে উম্মাহকে এমন এক বহুমুখী গ্রন্থ তিনি উপহার দিয়েছেন যাতে ফিকহ, হাদীস, তাফসীর থেকে শুরু করে সীরাত, ইতিহাস ও কালামশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় আলোচনাগুলো আমাদের জন্য সহজলভ্য হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য গ্রন্থের একমাত্র সমালোচনার দিক এই যে, তাতে প্রায় সকল ইসলামী শাস্ত্র মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ফলে প্রয়োজনীয় বিষয়টি খুঁজে পাওয়া হয়ে পড়েছে মহা দুষ্কর। সম্ভবত আলোচ্য গ্রন্থ রচনার সময় আপন শায়খের প্রভাব তাঁর ওপর পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

---

১. যাদু'ল মা'আদ ২য় খণ্ড, পৃ. ২-১৪১ ;

২. যাদু'ল-মা'আদ. খ. ২,পৃ. ৮-৬২-১৪১ ;

৩. ঐ খ. ২, পৃ. ৯২-৯৭ ;

৪. হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগা, খ., পৃ. ১০২ (প্রকাশ মিসর)।

৫. যাদু'ল আ'আদ, ২য় খণ্ড, ১৪২ থেকে শেষ পর্যন্ত।

তাই মূল আলোচনার ফাঁকে দুর্বলতম সূত্র ধরেও প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে তিনি এমন স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। প্রতিটি শাস্ত্র সংশ্লিষ্ট আলোচনাকে পৃথক পৃথক অধ্যায়ে বিন্যস্ত ও গ্রন্থবদ্ধ করে দিলে তা থেকে উপকৃত হওয়া সহজ হতো এবং গ্রন্থটির আকর্ষণও বহুগুণ বেড়ে যেত।[১] তবে উল্লিখিত দুর্বলতা সত্ত্বেও এটি ইসলামী জাহানের সেই মহামূল্যবান গ্রন্থগুলোর অন্যতম যা একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের সার্থক বিকল্প হতে পারে। 'যাদু'ল-মা'আদ' গ্রন্থ সাথে থাকার অর্থ হলো জীবন-মৃত্যুর শংকামুক্ত সর্বজ্ঞানবিশারদ একজন 'আলিম বন্ধু আপনার সাথে রয়েছেন। আল্লাহ্‌র পথের হাজারো পথিক দীন ও সুন্নতের পথে চলতে গিয়ে যাদু'ল-মা'আদ' থেকে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করেছেন, আত্মার খোরাক হাসিল করেছেন এবং ঈমানের স্বাদ ও লযযত পেয়েছেন।

ইবনে আবদুল হাদী

হাদীস শাস্ত্রে বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী এবং দীনের প্রচার ও সংস্কার কাজে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র জীবন উৎসর্গকারী ছাত্রদের মাঝে ইবনু'ল-কায়্যিমের পর ইবনে আবদুল হাদী, ইবনে কাছীর ও ইবনে রজবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যু বরণকারী 'আল্লামা ইবনুল আবদুল হাদীর জীবনীকারদের মতে, তাঁর জীবনে আরো কিছুটা অভিনিবেশের পরিচয় দিলে নিঃসন্দেহে তিনি শীর্ষস্থানীয় আলিমদের একজন হতে পারতেন। এমনকি বড় বড়দের ছাড়িয়ে যাওয়াও তাঁর পক্ষে কষ্টকর হতো না। আল্লামা সাফাদীর মন্তব্য হলো, لو عاش لكان اية বেঁচে থাকলে তার ব্যক্তিত্ব হতো যুগ-অনন্য।' গ্রন্থে আল্লামা যাহবী মন্তব্য করেছেন ঃ

هو الفقيه البارع المقرى، المجود المحدث الحافظ النحوى الحاذق ذو الفنون كتب عنى واستفدت منه -

তিনি বিজ্ঞ ফিকহবিদ, যোগ্য কারী, মুহাদ্দিছ, হাফেজ, ব্যাকরণবিদ এবং বিভিন্ন শাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। আমার কাছ থেকে তিনি হাদীস শুনেছেন এবং লিখেছেন। আমিও তাঁর কাছ থেকে উপকৃত হয়েছি।[২]

---

১. ৪৭ সনে মদীনা শরীফে অবস্থানকালে خير الزاد নামে এ দুরূহ কাজটি আমি শুরু করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

২. আদ্দুরারু' ল-কামিনাহ, খ. ৩, পৃ ৩২২

যুগশ্রেষ্ঠ আল্লামা আবুল হাজ্জাজ আল-মিয্যী তাঁর বিরল প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছেন এভাবে ঃ

ما التقيت به الا واستفدت منه ـ

যখনই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে তখনই কোন -না-কোন বিষয়ে উপকৃত হয়েছি।[১]

আল্লামা সাফাদী বলেন ঃ

كنت اذا لقيته سألته عن مسائل ادبية وفوائد عربية فينحدر كالسيل ـ

তাঁর সাথে আমার দেখা হলে আরবী ভাষা ও সাহিত্য প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করতাম তখন তাঁর মুখ থেকে যেন ঢল নামত।[২]

ইতিহাস ও তাফসীরবিশারদ আল্লামা ইবনে কাছীর তাঁর কথা লিখেছেন এভাবে ঃ

حصل من العلوم مالا يبلغه الشيوخ الكبار وتفنن فى الحديث والنحو والتصريف والفقه والتفسير والاصلين والتاريخ والقراة وله مجاميع والتاليف مفيدة كثيرة وكان حافظا جيدا لاسماء الرجال وطرق الحديث عارفا بالجرح والتعديل مبصرا بعلل الحديث حسن الفهم ، له جيد المذاكرة صحيح الذهن مستقيما على طريقة السلف واتباع الكتاب والسنة مثابرا على فعل الخيرات ـ

জ্ঞান ও 'ইলমের জগতে যে উচ্চ মর্যাদা তিনি লাভ করেছিলেন তা বয়োবৃদ্ধ ও বড় বড় আলিমদের পক্ষেও সাধারণত সম্ভব হয় না। হাদীস, ব্যাকরণ, ফিকহ, তাফসীর, ফিকহ ও হাদীসের উসুল শাস্ত্র, ইতিহাস, কিরাত শাস্ত্রসহ সকল শাস্ত্রেই অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। বেশ কিছু মূল্যবান রচনা ও সঞ্চয়ন তিনি রেখে গেছেন। রিজাল শাস্ত্র ও হাদীসের সনদ তাঁর মুখস্থ ছিল। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন এক অসাধারণ হাফিজ। হাদীস ও সনদের বিচার-বিশ্লেষণ শাস্ত্রেও তাঁর ভালো দখল ছিল। সনদ ও রেওয়ায়েতের দোষ ও খুঁত নির্ণয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আলিমগণের

১. আদ্দুরারুল কামিবাহ, খ. ৩, পৃ. ৩৩২।

২. ঐ।

সাথে আলোচনার মজলিসে অত্যন্ত সপ্রতিভ ছিলেন। তাঁর চিন্তা ছিল স্বচ্ছ। সালাফ তথা পূর্বসূরীদের পথে ও মতে অবিচল ছিলেন। কুরআন-সুন্নাহর কঠোর অনুসারী ছিলেন। ভালো কর্মে ও নেক কাজে নিষ্ঠাবান ছিলেন।[১]

সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত

নাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ, উপাধি আল-'ইমাদ, উপনাম আবূ আবদুল্লাহ ও আবুল আব্বাস। তবে ইবনে আবদুল হাদী নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। বংশসূত্র এরূপঃ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আবদুল হাদী ইবন আবদুল হামীদ ইবন আবদুল হাদী ইবন ইউসুফ ইবন মুহাম্মদ বিন কুদামা। পরিবারটি তাদের মূল আবাসভূমি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে দামিশকে চলে আসে এবং সালেহিয়্যা মহল্লায় বসবাস শুরু করে। সেখানে ৭০৪ হিজরীতে ইবনে আবদুল হাদী জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন রিওয়ায়েতে ইলমু'ল -কিরাত শিক্ষা করেছেন। হাদীসসহ পাঠ্য পুস্তকসমূহের শ্রেষ্ঠাংশ পড়েছেন কাযী আবুল ফযল, সুলায়মান ইবনে হামযা, আবু বকর ইবন আবদুদ্দাইম, ঈসা ইবন মুত'ইম হাজ্জার, যয়নব বিনতু'ল-কামাল প্রমুখের কাছে। হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার অধ্যয়ন ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। রিজাল-শাস্ত্র ও সনদ বিশ্লেষণ-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ফিকহের মাযহাব সম্পর্কে তাঁর পরিপক্ক জ্ঞান ছিল। হাদীস ও ফিকহ-এর উসূল শাস্ত্রে এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট দখল ছিল। আল্লামা ইবনে রজব লিখেছেন,

ولازم الشيخ تقى الدين ابن تيمية مدة وقرأ عليه قطعة من الاربعين فى اصول الدين للرازى -

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়ার সংস্পর্শে তিনি বেশ কিছুদিন ছিলেন এবং তাঁর কাছে ইমাম রাযীর الار بعين فى اصول الدين। এর অংশ-বিশেষ পড়েছিলেন।

ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ উস্তাদ ছিলেন শায়খ নজমুদ্দীন হাররানী। সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও যুগশ্রেষ্ঠ আলিম হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল-মিয্‌যী-এর খিদমতে দশ বছর ছিলেন। আল্লামা যাহবীর কাছেও পড়েছেন এবং তিনি রিজাল ও সনদ-বিশ্লেষণ শাস্ত্রসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে ছাত্রের বিরল প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছেন অকুণ্ঠচিত্তে। আল্লামা হুসায়নীর বর্ণনা মতে দীর্ঘদিন যাবত তিনি সদরিয়া ও যিয়াইয়া বিদ্যাঙ্গনে প্রধান অধ্যাপকরূপে অধ্যাপনার দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন।[২]

---

১. আল-বিদায়া, খ. ১৪, পৃ. ২১০।

২. আদ্দুরারু' ল-কামিনাহ, খ. ৩, পৃ ৩২২;

সমসাময়িক আলিম 'আল্লামা ইবনে কাছীর তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে লিখেছেন ঃ তিন মাসের মত তিনি ফোড়া ও জ্বরে ভুগেছেন। শেষ দিকে রোগ বেড়ে গিয়েছিল এবং প্রচণ্ড দাস্ত শুরু হয়েছিল। অবশেষে ৭৪৪ হিজরী, জুমাদা'ল উলার দশ তারিখ রোজ বুধবার আসরের আযানের পূর্বে তিনি ইনতিকাল করেন। ইবনে কাছীর বলেন, তাঁর পিতা আমাকে বলেছেন, ইবনে আবদুল হাদীর যবানে শেষ কথা ছিল ঃ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين পরের দিন মুজাফ্‌ফরী জামে মসজিদে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে শহরের কাযী, বিশিষ্ট আলিম, সরকারী কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীসহ সর্বস্তরের মানুষ জানাযায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন। ইবনে কাছীর আরো লিখেছেন ঃ

وكانت جنازته حافلة مليحة عليها ضؤ ونور -

তাঁর জানাযায় প্রচণ্ড ভিড় হয়েছিল এবং এক বিশেষ নূর ও দীপ্তি বিরাজ করছিল সেখানে।

তিনি রওযাতে আস-সায়ফ ইবনু'ল-মাজদ-এর পাশে সমাধিস্থ হয়েছেন।[১]

রচনাবলী

আল্লামা ইবনুল হাদী তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে বেশ কিছু অমর রচনা-কীর্তি রেখে গেছেন[২] যা কলেবর ও পৃষ্ঠা সংখ্যার দিক থেকে যেমন তেমনই তথ্য, উপাদান ও রচনা শৈলীর দিক থেকেও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থ আবার একাধিক খণ্ড বিশিষ্ট। ذيل طبقات الجنابلة গ্রন্থে হাফেজ ইবনে রজব তাঁর রচনাবলীর যে দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন তা থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলোর নাম এখানে পেশ করা হচ্ছে।

১। الاحكام الكبرى (সাত খণ্ড) ; ২। المحرر فى الاحكام ; ৩। العمدة فى الحفاظ (দুই খণ্ড) ; ৪। تعليقة للثقات (দুই খণ্ড); ৫। احاديث الصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم ; ৬। الاعلام فى ذكر مشائخ الائمة الاعلام، اصحاب الكتب الستة ; ৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্ম সম্পর্কে বিরাট কলেবরের একটি গ্রন্থ ; ৮। تعليقة على سنن البيهقى (দুই খণ্ড) ; ৯। ترجمة الشيخ تقى الدين ابن تيمية ; منتقى من تهذيب الكمال للمزى (৫ম

১. আল-বিদায়া, খ. পৃ. ২১০।

২. এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সুপ্রসিদ্ধ সর্বজনপ্রিয় আলিম গ্রন্থকার মাওলানা আবদুল হাই লখনভীর নাম করা যেতে পারে যিনি মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে এক বিরাট ও মূল্যবান রচনা ভাণ্ডার রেখে গেছেন।

খণ্ড) ; ১০। منتخب من مسند الامام احمد (দুই খণ্ড) ; ১১ منتخب
شرخ । ১৩ ; منتخب من سنن ابی داؤد । ১২ من سنن البيهقى
الرد । ১৫ ; الفية لا بن مالك । ১৪ । ইমাম যাহবীর রচনাবলীর সমালোচনা ;
على ابى حيان النحوى এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন হাদীস সম্পর্কে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা-পুস্তিকা এবং বিভিন্ন গ্রন্থের টীকা যেগুলোর তালিকা বেশ দীর্ঘ। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত প্রসঙ্গে আল্লামা তাকীউদ্দীন ইবনে সুবকী আল্লামা ইবনে তায়মিয়ার মতামত খণ্ডন করে شفاء السقام فى زيارة خير الانام গ্রন্থ লিখেছিলেন তার জওয়াবে আল্লামা ইবনে আবদুল হাদী লিখেছেন الصارم المنكى فى الرد على السبكى নামে সুন্দর ও সারগর্ভ সমালোচনা গ্রন্থ যা আল্লামা ইবনে আবদুল হাদীর সুগভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের ওপর তাঁর ব্যাপক অধ্যয়ন ও পড়াশোনার সাক্ষ্যই বহন করে।

ইবনে কাছীর

নাম ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে ওমর, উপনাম আবুল ফিদা; তবে ইবনে কাছীর নামেই তিনি পরিচিতি লাভ করেছেন। তিনি কয়েস গোত্রের সন্তান, সিরিয়ার বুখারা শহরের পার্শ্ববর্তী মাজদাল গ্রামে যেখানে তাঁর আব্বা খতীবের দায়িত্ব পালন করছিলেন -৭০১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ৭০৬ হিজরীতে পিতার সাথে দামিশকে চলে আসেন। শায়খ বুরহানুদ্দীন আল-ফাযারী প্রমুখের কাছে ফিকহ্ অধ্যয়ন করেন। ইবনে সুওয়ায়দী আবুল কাসিম ইবন আসাকির প্রমুখ হাদীস শাস্ত্রবিশারদদের কাছে হাদীস শ্রবণ করেন। তবে আল্লামা আল-মিয্‌যীর তিনি বিশেষ ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি তাঁর প্রিয় কন্যার পাণিও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে প্রচুর হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। ফতওয়া, অধ্যাপনা, বিতর্ক আলোচনা ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। ফিকহ, তাফসীর ও আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ দখল ছিল। রিজাল শাস্ত্র এবং সনদ বিশ্লেষণ-শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। উম্মুস সালিহ বিদ্যাঙ্গনে অধ্যাপক ছিলেন। আল্লামা যাহবীর ইনতিকালের পরে তানকাযিয়া বিদ্যাঙ্গনেও অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর সম্পর্কে আল্লামা যাহবীর মন্তব্য হলো ঃ

هو فقيه متقن ومحدث محقق ومفسر نقاد وله تصانيف صفيدة -

তিনি পরিপক্ক ফকীহ, গবেষক, মুহাদ্দিছ, সমালোচক ও তাফসীর বিশারদ। তাঁর বেশ কিছু উপকারী রচনা রয়েছে।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন ঃ

كان كثير الا ستحضار وسار نصائيفه فى البلاد فى حياته وانتفع به الناس بعد وفاته ـ

অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী ছিলেন। জীবদ্দশায়ই তাঁর রচনাবলী বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন কি মৃত্যুর পরও মানুষ সেগুলো থেকে উপকার লাভ করেছে।

শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর জ্ঞান, মর্যাদা ও বৈদগ্ধের সশ্রদ্ধ প্রশংসা করতেন। তাঁর সাথে তাঁর ছাত্র সম্পর্কও ছিল। ইবনে হাজার বলেনঃ

اخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه وامتحن بسببه ـ

"ইবনে তায়মিয়া থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তাঁকে গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন।"

এ ভালবাসার মাশুলও তাঁকে দিতে হয়েছিল। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে ইমাম সাহেবের জীবন-বৃত্তান্ত যত্ন ও আন্তরিকতার সাথে সবিস্তারে লিখেছেন এবং সর্বশক্তি দিয়ে তাঁর পক্ষ সমর্থন করেছেন। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র জীবন-বৃত্তান্তের অধিকাংশ বিষয় আল-বিদায়া থেকেই আমরা নিয়েছি। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলী হলো ঃ

(১) التكميل فى معرفة الثقات الضعفاء والمجاهيل (পাঁচ খণ্ড);
تخريج ادلة (৩) ;الهدى والسنن فى احاديث المسانيد والسنن (২)
طبقات (৬) ;علوم الحديث ـ (৫) ;مسند الشيخين (৪) ;التنبيه
الشافعية;

আহ্‌কাম সম্পর্কে বিস্তৃত কলেবরের একটি গ্রন্থ রচনায় তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু তা সম্পূর্ণ হয় নি। মুসনাদে ইমাম আহমদকে বর্ণনানুক্রমে বিন্যস্ত করে তাতে তাবারানী ও আবু য়া'লার সংযোজনও অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তবে তাঁর মূল রচনাকীর্তি হলো দু'টি গ্রন্থ যা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং আজ পর্যন্ত গবেষক ও বিদগ্ধজনদের মহলে উপকারী গ্রন্থের মর্যাদা পেয়ে আসছে। একটি হলো তাফসীরে ইবনে কাছীর। হাদীস ও বর্ণনা ভিত্তিক তাফসীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে আল্লামা ইবনে কাছীরের তাফসীরকেই মনে করা হয় সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। আল্লামা সুয়ূতী লিখেছেন ঃ

له التفسير الذى لم يؤلف مثله -

এমন এক তাফসীর গ্রন্থ তিনি লিখেছেন যার অনুরূপ পূর্বে রচিত হয়নি।

ইবনে কাছীরের পূর্বে বর্ণনাভিত্তিক তাফসীরগুলোতে মুহাদ্দিছসুলভ সতর্কতা এবং হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে প্রজ্ঞার দারুণ অভাব ছিল। ফলে সেখানে দুর্বল হাদীস ও ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহের বহুল অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। হাফিজ ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীরে হাদীস শাস্ত্রের স্বীকৃত নীতিমালা অনুসরণ করেছেন এবং মুহাদ্দিছসুলভ সতর্কতার মাধ্যমে পূর্ববর্তী তাফসীরকারদের বুহ দুর্বলতা সযত্নে পরিহার করেছেন। অবশ্য একথা সত্য যে, তাঁর মত বরেণ্য মুহাদ্দিছের কাছে আমাদের যতটা প্রত্যাশা ছিল হাদীস বিচারের ক্ষেত্রে ততটা উচ্চ মান তিনি বজায় রাখতে পারেন নি। কিছুটা উদারতা প্রদর্শন করে ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহের একাংশ তিনিও গ্রহণ করেছেন। তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, প্রাচীন তাফসীর গ্রন্থগুলোর মাঝে হাদীসশাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইবনে কাছীরের তাফসীরই হলো সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও উপকারী। সম্প্রতি মিসরের স্বনামধন্য গবেষক পণ্ডিত আল-উস্তায আহমদ শাকের عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير নামে তাফসীর ইবনে কাছীরের সংক্ষেপ করেছেন। এতে মূল গ্রন্থের যাবতীয় সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে দুর্বল হাদীস, অনির্ভরযোগ্য ইসরাঈলী বর্ণনা, পুনরুক্ত বর্ণনা ও সনদ এবং বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় ও দীর্ঘ আলোচনা ছাঁটাই করা হয়েছে। ফলে কিতাবটির উপযোগিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইবনে কাছীরের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রচনা হলো আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া। ১৩৫১ হিজরীতে মিসর থেকে চৌদ্দ খণ্ডে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আরব ঐতিহাসিকদের রীতি অনুযায়ী সৃষ্টির আদি থেকে শুরু করে ৭৬৭ হিজরী পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাস এতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। আল্লামা ইবনু'ল আছীরের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-কামিলি' শেষ হয়েছে ৬২৮ হিজরী পর্যন্ত এসে। এতে 'আল বিদায়া'তে ১৩৯ বছরের ইতিহাস সংযোজিত হয়েছে। তাতারী হামলা এবং আট শতকের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে উপরিউক্ত সময় কাল ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও ঘটনাবহুল। এ কারণে এবং নির্ভরযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতার কারণেও 'আল-বিদায়া' সকল ঐতিহাসিকের প্রিয় উৎস গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়ে এসেছে। ৭৭৪ হিজরীতে হাফিজ ইবনে কাছীর ইনতিকাল করেন এবং দামিশ্‌কের প্রসিদ্ধ সুফিয়া কবরস্থানে সমাধিস্থ হন।[১]

---

১. যায়ল তাযকিরাতি'ল-হুফফাজ (শামসুদ্দীন আবুল মাহাসিন আল-হুসায়নী কৃত)।

হাফিয ইবনে রজব[১]

সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত

নাম আবদুর রহমান, পিতার নাম আহমদ ইবনে রজব। তাঁর বংশ-সূত্র এরূপ ঃ আবদুর রহমান ইবন আহমদ ইবন রজব ইবন আবদুর রহমান ইবনু'ল হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন আবুল বারাকাত মাস'উদ। পারিবারিক আবাসভূমি ছিল বাগদাদ। সেখানেই তিনি ৭৩৫ হিজরীতে রবী'উ'ল-আওয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ৭৪৪ হিজরীতে অল্প বয়সেই পিতার সাতে দামিশকে আসেন। মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম ইবনু'ল খাববায এবং ইবরাহীম ইবনু'ল-আত্তার প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। মিসরে আবুল ফাতাহ-আল-মায়দুমী এবং আবুল হারাম আল-কালানিসী প্রমুখ থেকে হাদীস গ্রহণ করেন। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন ঃ ইবনে রজব বিপুল সংখ্যায় হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং হাদীছ-চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। ফলে হাদীস শাস্ত্রে অল্পকালের মধ্যেই তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করে ফেলেন। হাফিজ আবুল ফযল তাকীয়ুদ্দীন ইবনে ফাহদ মক্কী (মৃ. ৮৭১ হি.) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

الامام الحافظ الحجة والفقيه العمدة احد العلماء الزهاد والائمة العباد مفيد المحدثين واعظ المسلمين -

> তিনি হাদীসের হাফিজ ও ইমাম, শ্রেষ্ঠ ফকীহ্, দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ আলিমদের একজন, ইবাদত গুযার ইমামদের অন্যতম, মুহাদ্দিছগণের শিক্ষক এবং মুসলমানদের খতীব।

তিনি আরো লিখেছেন ঃ তিনি ধার্মিক ও মুত্তাকী নেতা ছিলেন। মানুষের অন্তরে তাঁর প্রতি মুহব্বত পয়দা করে দিয়েছিলেন আল্লাহ্ পাক। দল-মত নির্বিশেষে সকলে তাঁর সততা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে একমত ছিলেন। তাঁর ওয়াজের মজলিস অত্যন্ত উপকারী ও প্রভাব সৃষ্টিকারী ছিল।

আশ-শিহাব ইবন হাজ্জী তাঁর 'ইলম ও প্রজ্ঞাগত মর্যাদা সম্পর্কে বলেন ঃ

১। হাফিজ ইবনে রজব আল্লামা ইবনে তায়মিয়ার প্রত্যক্ষ ছাত্র নন। ইমাম সাহেবের মৃত্যুর আট বছর পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তবে হাফিজ ইবনে কায়্যিমের তিনি প্রিয়তম ছাত্র এবং ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) ও ইবনে কায়্যিম দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তিনি ইবনে তায়মিয়া (র)-র অবদান ধন্য এবং ইবনে তায়মিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিতদের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীস শাস্ত্রের তিনি অসাধারণ সমালোচক ও গবেষক ছিলেন। সমসাময়িকদের মাঝে হাদীসের সনদ এবং সনদের বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক পারদর্শী ছিলেন। আমাদের সমসাময়িক অধিকাংশ হাম্বলী আলিম তাঁর ছাত্র ছিলেন।

৭৯৫ হিজরীতে রজব মাসে তাঁর ইনতিকাল হয় এবং দামিশকের আল-বাবু'স -সগীরে সমাধিস্থ হন। ইনতিকালের কয়েকদিন পূর্বে কবরস্থানে এসে জনৈক কবর খননকারীকে বলেন ঃ আমার জন্য একটা কবর খনন করবেন। আদেশ পালিত হলে তিনি সেই কবরে নেমে অনেকক্ষণ শুয়ে কাটালেন। অতঃপর উঠে এসে বললেন, ভালই। এর কয়েক দিন পরই তাঁর ইনতিকাল হয় এবং সেই কবরেই তাঁকে দাফন করা হয়।

রচনাবলী

তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন। ফাতহু'ল-বারী নামে বুখারী শরীফের একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনার কাজে হাত দিয়ে বেশ কিছু দূর এগুলেও তা শেষ করে যেতে পারেননি। ইবনে আবূ য়া'লা কৃত 'তাবাকাতু'ল -হানাবিলা' গ্রন্থের তিনি পরিশিষ্ট যোগ করেছেন। ওয়াজ ও উপদেশমূলক একটা গ্রন্থ হলো اللطائف فى وظائف الايام। এতে ফিকহ্ -সংক্রান্ত বেশ কিছু উপকারী কথা ও মূলনীতির আলোচনা রয়েছে। ইমাম নববীর اربعين। এর ব্যাখ্যাও লিখেছেন তিনি। নববীর 'আরবাঈনে' মোট বিয়াল্লিশটি হাদীস ছিল। তিনি আরো আটটি হাদীস যোগ করেন। বইটি ১৩৪৬ হিজরীতে মুস্তফা আল- বাবী আল-হালাবী–এর প্রেস থেকে ছেপে বের করা হয় ; ماذئبان جائعان ارسلا فى غنم الخ। হাদীসটির স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করেছেন। শেষোক্ত বই তিনটি প্রকাশিত হয়ে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর রচনাবলীতে হাফিজ ইবনে কায়্যিমের দাওয়াতী জযবা ও সংস্কারবাদী মনের আকুতি লক্ষ্য করা যায়। সেই সাথে ইবনে কায়্যিমের ভাষার মিষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা এতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে।

উপরে উল্লিখিত কয়েকজন ছাত্র ও ছাত্রের ছাত্র ছাড়াও অষ্টম ও নবম শতাব্দীর কতিপয় বিশিষ্ট আলিম, লেখক ও সংস্কারক এমন রয়েছেন যাদের সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়নি যে, তাঁরা শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়ার কিংবা তাঁর কোন ছাত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন কিনা। তবে তাদের রচনাবলীতে শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র 'ইলম ও প্রজ্ঞা, আবেগ ও চিন্তাধারা এবং দাওয়াতী জযবা ও ব্যাকুলচিত্ততার পূর্ণ ছাপ বিদ্যমান রয়েছে। শায়খুল

ইসলামের ছাত্রদের কাছ থেকে কিংবা তাঁর রচনাবলী থেকে উপকৃত হয়ে থাকুন কিংবা সে সুযোগ তাদের জীবনে নাই এসে থাকুক-চিন্তার ঐক্য এবং রুচি ও কর্মের অভিন্নতার ভিত্তিতে তাঁদেরকে ইবনে তায়মিয়া (র)-র চিন্তাধারার অনুগামী একই পরিবারভুক্ত বলে নির্দ্বিধায় ধরে নেওয়া যেতে পারে। এ পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাঝে الموافقات। গ্রন্থের স্বনামধন্য রচয়িতা আল্লামা আবূ ইসহাক শাতিবী (মৃ. ৭৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ الاعتصام। মূলত সেই সংস্কার আন্দোলনেরই একটি অনবদ্য সংযোজন, যে আন্দোলনের শুভ সূচনা হয়েছিল শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র যুগে, তাঁরই মুবারক হাতে। الاعتصام। গ্রন্থটি সুন্নত ও বিদআত সম্পর্কে সবচেয়ে তথ্যবহুল, সারগর্ভ, মৌলিক ও সর্বাঙ্গীন রচনাকর্ম।

সমাপ্ত–

১. পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১৯, প্রকাশ মিসর।

গ্রন্থকার ঃ

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) সেই যে ত্রিশের দশকে তাঁর পূর্বপুরুষ বালাকোটের শহীদ আমীরু'ল-মু'মিনীন হযরত সাইয়েদ আহমদ বেরলভী (র)-এর অনুপম চরিত গ্রন্থ "সীরাত সাইয়েদ আহমদ শহীদ" লিখে তারুণ্যদীপ্ত বয়সেই উর্দূ সাহিত্যের আসরে নিজের একটি উল্লেখযোগ্য আসন করে নিলেন তারপর বিগত প্রায় পৌণে এক শতাব্দী ধরে তাঁর কলম অবিশ্রান্তভাবে লিখে গেছে মুসলিম ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়গুলোর ইতিবৃত্ত। পাঁচ খণ্ডে রচিত 'তারিখে দাওয়াত ও আযীমত'-এর ভাবানুবাদ **'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস'** তাঁর এমনি একটি অমূল্য গ্রন্থ। সীরাত থেকে ইতিহাস, ইতিহাস থেকে দর্শন ও সাহিত্য পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর অবাধ গতি। তাঁর "মা-যা খাসিরা'ল-আলামু বিনহিতাতি'ল-মুসলিমীন" **Islam and the World**-এর বঙ্গানুবাদ 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?' একখানি চিন্তাসমৃদ্ধ অনবদ্য আরবী গ্রন্থ যার অনুবাদ পৃথিবীর অনেক ভাষায় হয়েছে। 'নবীয়ে রহমত' ছাড়াও তাঁর রচিত "আল-মুরতাযা" শীর্ষক হযরত আলী (রা)-এর জীবনী গ্রন্থখানা আরবী, উর্দূ ও ইংরেজী ভাষায় প্রভূত সুনাম অর্জন করেছে। সমসাময়িক বিশ্বে তাঁর চাইতে অধিকতর খ্যাতিমান ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অন্য কোনও আলেম জন্মেছেন কি না এবং থাকলেও তাঁর মত এত অধিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন কিনা সন্দেহ রয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রায় সকল জনপদে যেমন তিনি আমন্ত্রিত হয়ে সে সব দেশ সফর করেছেন, তেমনি নোবেল পুরস্কার তুল্য মুসলিম বিশ্বের সব চাইতে মূল্যবান 'বাদশা ফয়সাল' পুরস্কারে তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন। তিনি একাধারে রাবেতায়ে আলমে ইসলামী-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, লখনৌর বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম নদওয়াতুল-উলামা-এর রেকটর, ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম মুসলিম পার্সোন্যাল ল' বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। তাঁর অস্তিত্ব কেবল ভারতীয় মুসলমানদের জন্যই নয়, গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যই এক বিরাট নেয়ামত ছিলেন। তাঁর বেশ কটি বই ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। একাধিকবার তিনি বাংলাদেশ সফরও করেছেন। তাঁর আত্মজীবিনীমূলক গ্রন্থ এ পর্যন্ত ৭ খন্ডে প্রকাশিত 'কারওয়ানে যিন্দেগী' শুধু তাঁর আত্মজীবনীমূলক নয়, এটা সমসাময়িক বিশ্বের অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও ব্যক্তির এক অপূর্ব আলেখ্যও বটে। তাঁর রচনায় আল্লামা শিবলীর অনবদ্যতা, আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর সূক্ষ্মদর্শিতা, মাওলানা মানাযির আহসান গিলানীর সতর্কতা, মাওলানা আশরাফ আলীর থানবীর তাক্ওয়া, সর্বোপরি তাঁর পূর্বপুরুষ সাইয়েদ আহমদ বেরলভী (র)-এর দরদ প্রতিফলিত হয়েছে। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (র), মাওলানা মনযূর নোমানী (র), ও রঈসুত-তাবলীগ মাওলানা ইউসুফ (র)-এর অনেক মূল্যবান গ্রন্থে তাঁর লিখিত সারগর্ভ ভূমিকাগুলো পড়বার মতো। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (র) এবং মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী (র)-এর খলীফা। বিগত হিজরী ১৪২১ সনের ২২ রমযান জুম'আর পূর্বে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াতরত অবস্থায় ইনতিকাল করেন। রায়বেরেলীর পারিবারিক কবরস্থানে রওয়ায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ্য় তাঁকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ ব্রাদার্স-ঢাকা

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস

[৩য় খণ্ড]

(23) تاریخ دعوت و عزیمت سوم

از سید ابوالحسن علی ندویؒ

مترجم: ابوسعید محمد عمر علی

ناشر: محمد برادرس 38، بنگلہ بازار، ڈھاکہ 1100.

আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

অনূদিত

মুহাম্মদ ব্রাদার্স

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (৩য় খণ্ড)
মূল ঃ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)
অনুবাদ ঃ আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (র)

প্রকাশকাল
জানুয়ারী, ২০১৫ ঈসায়ী
মাঘ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ; রবিউস সানী ১৪৩৬ হিজরী

প্রকাশনায়
মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
সেলঃ 01822-806163; 01728-598440

মুদ্রণে ঃ মেসার্স তাওয়াক্কুল প্রেস
৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
সালসাবিল

ISBN: 978-984-90178-1-3

মূল্য ঃ ২৩০.০০ (দুইশত ষাট) টাকা মাত্র।

Shangrami Shadhakder Itihas: (History of the Soviours of Islamic Sprit) written by Allama Sayeed Abul Hasan Ali Nadvi (R) in Urdu and translated by A. S. M. Omr Ali (R) into Bengali and Published by Muhammad Abdur Rouf, Muhammad Brothers, 38, Bangla Bazar, Dhaka-1100. BANGLADESH. Cell Phone: 01822-806163

উৎসর্গ

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে যাঁরা চরম আত্মত্যাগের সম্মুখীন হয়েও বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি,

এ পথের সকল প্রতিকূলতাকে যাঁরা হাসিমুখে মুকাবিলা করেছেন, অত্যাচারী জালিমের খড়গ-কৃষাণ ও বদ্ধ কারা-প্রাচীর যাঁদের বিশ্বাসের ভিতকে এক বিন্দুও টলাতে পারেনি,

বিলাসী ও আয়েশী জীবনযাপনের শত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যাঁরা নির্লোভ ও নির্মোহ জীবন যাপন করে মানুষের সামনে অনুপম আর্দশ স্থাপন করেছেন,

পর্ণ কুটিরে বাস করে এবং অনাড়ম্বর পরিবেশে থেকেও যাঁরা রাজা-বাদশাহ্র ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতার সামনে নিজেদের শির সমুন্নত রেখেছেন,

দুঃখী ও মজলুম মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যাঁরা তাদের হতাশ অন্তরে আশা-ভরসার প্রদীপ জ্বালিয়েছেন,

তাদেরকে কাছে টেনেছেন,

আপন করেছেন,

রূহানিয়াতের প্রোজ্জ্বল আলোক-ধারায় যাঁরা পাপক্লিষ্ট ও পথভ্রষ্ট মানুষকে হিদায়াতের প্রশস্ত রাজপথে এনে দাঁড় করিয়েছেন, সেই সব জানা-অজানা মর্দে মু'মিন ও মর্দে মুজাহিদের পবিত্র রূহের উদ্দেশে।

আমাদের কথা

খুলাফায়ে রাশেদীনের পর মুসলিম ইতিহাসের আদর্শবাদী ধারা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়লেও পরবর্তী প্রত্যেকটি যুগে এমন কিছু কিছু বিরল ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা পুনরায় ফিরে যেতে চেয়েছেন ইসলামের মূল আর্দশের দিকে এবং আজীবন সংগ্রাম ও সাধনা করেছেন ইসলামী আর্দশের পুনঃ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। তাঁরা কেউ কেউ যেমন–ওমর বিন 'আবদুল 'আযীয, গাযী সালাহুদ্দীন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই সাধনা ও সগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন, কেউ কেউ এই সাধনার কারণে তৎকালীন রাষ্ট্র শক্তির কোপদৃষ্টিতে পতিত হয়েছেন, আবার অনেকেই রাষ্ট্রীয় অঙ্গন থেকে দূরে অবস্থান করে ইসলামের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, দার্শনিক ও সামাজিক আর্দশকে সমুন্নত রাখার কঠোর সাধনায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস যতটা মুসলিম রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের ইতিহাস, তার চাইতেও অধিক এই সব সাধক ও সংগ্রামী পুরুষদের ইতিহাস। আজকের বিশ্বব্যাপী ইসলামী নবজাগরণের পেছনে এইসব অমর সাধকদের শত সহস্র বছরের নিঃস্বার্থ সাধনার অবদানকে অস্বীকার করা আর বাস্তবতাকে অস্বীকার করা একই কথা।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইসলামের ইতিহাসের এই স্বর্ণোজ্জ্বল ধারা আজও আমাদের কাছে প্রায় অজানাই রয়ে গেছে। ইসলামী আদর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকামী এই বিপ্লবী তাৎপর্যমণ্ডিত প্রবাহের চাপা পড়া ইতিহাস পুনরুদ্ধারকল্পে আত্মনিয়োগ করে উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (র) মুসলিম উম্মাহকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। উর্দু ভাষায় রচিত তাঁর এ সম্পর্কিত যুগান্তকারী গ্রন্থ 'তারীখ-ই-দা'ওয়াত ও 'আযীমত' ছয় খণ্ডে সমাপ্ত এবং হযরত 'ওমর ইবন 'আবদুল 'আযীয (র) থেকে শুরু করে বিপ্লবী অগ্নিপুরুষ সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র) পর্যন্ত সাধক সংগ্রামীদের আলেখ্য এতে স্থান লাভ করেছে। এই গ্রন্থমালা বাংলা ভাষায় প্রকাশের কর্মসূচী মুহাম্মদ ব্রাদার্স ইতোপূর্বেই গ্রহণ করেছে। বর্তমান গ্রন্থ উক্ত তারীখ-ই-দা'ওয়াত ও 'আযীমত গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ। এতে দু'জন মহান সাধক হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) এবং হযরত শায়খ শরফুদ্দীন

ইয়াহইয়া মুনায়রী (র)-এর সংগ্রামী জীবনালেখ্য স্থান পেয়েছে। চতুর্থ খণ্ডের কাজও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ সত্বরই সে খণ্ডটিও প্রকাশিত হবে।

পূর্ববর্তী সংস্করণগুলোর মত বর্তমান সংস্করণটিও বহুল প্রচার আশা করছি। এক্ষণে আমরা পরম করুণাময়ের দরবারে এই গ্রন্থের লেখক আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)-এর জান্নাতী রূহের উদ্দেশ্যে সালাম পেশ করছি এবং এর অনুবাদকের সুস্থ ও কর্মময় দীর্ঘ হায়াত কামনা করছি। আল্লাহ্ পাক আমাদের এই নগণ্য খেদমতটুকু কবুল করুন। আমীন!

সেপ্টেম্বর, ২০০৩ ইং — প্রকাশক

ঢাকা–১১০০

অনুবাদকের আরয

আল্লাহ্‌পাকের অপর অনুগ্রহে অবশেষে মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত 'আলিম, লেখক ও চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল হাসান 'আলী নদভী রচিত 'তারীখ-ই-দা'ওয়াত ও 'আযীমত' সিরিজের তৃতীয় খণ্ডের বাংলা তরজমা 'ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক' নামে প্রকাশিত হল। যাঁর অসীম কৃপায় এটি বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে পৌঁছতে পারল সেই মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে জানাই অসংখ্য শোকর ও সজূদ।

উর্দু-ভাষী পাঠকের নিকট 'তারীখ-ই-দা'ওয়াত ও 'আযীমত'-এর নতুন করে পরিচয়ের অবকাশ নেই। সর্বপ্রথম ভারতে প্রকাশিত হলেও ইতিমধ্যেই তা আরবী ও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাঠক মহলে সাড়া জাগিয়েছে। কুয়েত ও বৈরুত থেকে আরবী ভাষায় গ্রন্থটির পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজী ভাষায় Savious of Islamic Spirit নামে দুটি সংস্করণ, উর্দু ভাষায় লাখনৌ থেকে দুটি সংস্করণ এবং করাচী থেকে উর্দুতে এর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৭৯ সালে সর্বপ্রথম এ সিরিজের ৩য় খণ্ডটি আমার হাতে আসে। বইটি আমাকে আকৃষ্ট করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমি তরজমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি; কিন্তু তখন অন্য একটি বই আমার হাতে থাকার এটির তরজমায় স্বভাবতই একটু বিলম্ব হয়। তারপর ১৯৮০ সালের শেষ দিকে তরজমার কাজে হাত দিই এবং ১৯৮১ সালের মে মাসে তা সম্পন্ন করতে সক্ষম হই। তরজমার সঙ্গে এর পূর্বকার দু'টি খণ্ড সংগ্রহের সযত্ন চেষ্টা চালিয়ে যাই। অতঃপর মেজর জেনারেল আকবর খান রচিত ইসলামের প্রতিরক্ষা কৌশলের উপর প্রণীত বিখ্যাত 'হাদীছের দেফা' গ্রন্থটির তরজমায় হাত দিই এবং আল্লাহ্‌র ফযলে যথাসময়ে তা সম্পন্ন করতেও সমর্থ হই। অবশেষে বহু চেষ্টা-তদবীরের পর Karim international- এর স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর নাজমুল করিম সাহেবের আন্তরিকতায় উক্ত খণ্ড দুটি সংগ্রহে সমর্থ হয়েছি। এজন্য আমি তাঁর কাছে ঋণী। আল্লাহ্‌র রহমত এবং পাঠকের দু'আ' পেলে সত্বর সে দু'টির তরজমাও পেশ করতে সক্ষম হব।

বর্তমান পুস্তকের তরজমা সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পের দায়িত্ব বহন করতে নিরন্তর যে পরিশ্রম আমাকে করতে হয়েছে তজ্জন্য নিজের কাজের প্রতি যতটুকু সুবিচার করা দরকার ছিল তা পারিনি। তবুও এতে প্রশংসার যদি কিছু থাকে তবে তা বিশিষ্ট অনুবাদক ও লেখক বন্ধুবর আবদুল মতীন জালালাবাদীর প্রাপ্য। কেননা এর সম্পাদক হিসাবে একে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলতে তিনি চেষ্টার কোন কসূর করেন নি। আর দোষত্রুটি কোথাও কিছু ঘটলে তার সকল দায়-দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিচ্ছি। এরপর আগামী সংস্করণ ছাড়া কাফফারা আদায়ের কোন সুযোগ দেখছি না।

আমার সকল বক্তব্য প্রথম খণ্ডের জন্য তুলে রেখে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সকল হাম্‌দ আল্লাহ্‌র ।

....

অনেক আগেই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় এক্ষণে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। এ গ্রন্থের প্রতি পাঠকের আগ্রহ আমাকে উৎসাহিত করেছে প্রচুর। তাঁদের প্রতি শুকরিয়া জানাবার ভাষা আমার নেই। সেই সঙ্গে সিরিজের অন্যান্য খণ্ডের প্রতি পাঠকের চাহিদা ও আগ্রহ দৃষ্টে দীন অনুবাদক গভীরভাবে অভিভুত বটে। বিশেষ করে সংগ্রাম সম্পাদক বন্ধুবর আবুল আসাদ, আজিজিয়া কুতুবখানার স্বত্বাধিকারী জনাব ওজীহ্ আহমদ সাহেব এবং চট্টগ্রামের মাওলানা আবদুর রহীম ইসলামাবাদী সিরিজের অন্যান্য খণ্ডের দ্রুত তরজমা করার জন্য এযাবত যেভাবে আমাকে তাকীদ দিয়ে এসেছেন তজ্জন্য আমি তাঁদের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ্‌র অসীম মেহেরবানী, অবশেষে তাঁরই অপার অনুগ্রহে ১ম খণ্ডটির তরজমার কাজও শেষ হবার পর এক্ষণে প্রকাশের অপেক্ষা করছে এবং ২য় খণ্ডটির তরজমার কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। পাঠকের দু'আ ও আল্লাহ্‌র রহমত হলে শারীরিক অসুস্থতা এবং নিরন্তর কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও আগামী ডিসেম্বরের পূর্বেই তরজমার কাজ শেষ করতে সক্ষম হব বলে আশা করি।

অনুবাদকের পরম সৌভাগ্য, 'যব ঈমান কী বাহার আঈ' (ঈমান যখন জাগলো' নামে প্রকাশিত) এবং বর্তমান গ্রন্থের অনুবাদের সূত্রে এ সব গ্রন্থের মূল লেখক 'আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (মা. জি. 'আ)-র সঙ্গে অধমের সাক্ষাৎ ও সাহচর্য লাভের সুযোগ ঘটে। তাঁর গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় এবং তাঁর লেখনীর প্রতি এদেশের পাঠক সমাজের প্রচুর আগ্রহ দৃষ্টে তিনি

অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ সময় তিনি সিরিজের অন্যান্য খণ্ডের তরজমার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে দীন অনুবাদককে অনুগৃহীত করেন। পরম করুণাময়ের দরবারে একান্ত মুনাজাত, তিনি যেন হযরত (মা. জি. 'আ)-কে হায়াত দারায করেন এবং অধমকে তাঁর গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সোহবতের ফয়েয থেকে বরকত লাভ করবার তওফীক দান করেন।

....

বর্তমান গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় একযুগ আগে। এরপর এ সিরিজের কোন খণ্ডই আর প্রকাশিত হয়নি। অথচ এসব খণ্ডের প্রতি পাঠকের আগ্রহের কোন কমতি ছিলনা। দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে বিশিষ্ট প্রকাশক মুহাম্মদ ব্রাদার্স-এর স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর অধ্যাপক আবদুর রউফ সাহেব আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)-এর সকল গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করায় কতিপয় শর্তাধীনে অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থের মত বর্তমান গ্রন্থটিও তিনি প্রকাশ করছেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর দীনের জন্য আমাদের এ খেদমতটুকু কবুল করুন। আমীন!

— আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র এবং সালাম ও শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের ওপর। আলহামদুলিল্লাহ্। 'তারীখ-ই-দা'ওয়াত ও 'আযীমত'-এর তৃতীয় খণ্ড পেশ করার সৌভাগ্য হ'ল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের মাঝখানে এত দীর্ঘ বিরতি ঘটে যে, গ্রন্থকার বিমর্ষ এবং আগ্রহী পাঠক নিরাশ হয়ে পড়েন। ইতোমধ্যে গ্রন্থকারের ছোট্ট কলম কিছু গ্রন্থ-রচনা করেছে এবং তা প্রকাশিত হয়েছে। যতই বিলম্ব ঘটছিল ততই এ সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছিল যে, আল্লাহ্ না করুন, এই ফলপ্রসু ও কল্যাণকর সিলসিলা প্রাচীন গ্রন্থকারদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের-এমন কি খোদ এই গ্রন্থকারের কতকগুলো ধারাবাহিক গ্রন্থ প্রণয়ন প্রকল্পের মতো অসম্পূর্ণই না থেকে যায়। সম্ভবত এমনটিই হ'ত–কমপক্ষে এ বিরতি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হ'ত–যদি না এর ভেতর একটি লক্ষণীয় অভিব্যক্তি এবং অবশ্য পালনীয় ইশারা-ইঙ্গিত ও প্রচণ্ড দাবির অস্তিত্ব থাকত।

আমার আধ্যাত্মিক উস্তাদ হযরত মাওলানা 'আবদুল কাদির সাহেব রায়পুরী (তাঁর বরকত চিরন্তন হোক) 'তারীখ-ই-দা'ওয়াত ও 'আযীমত' বারবার শুনে এবং বারবার তাঁর মজলিসে-মাহফিলে পড়িয়ে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সম্মান ও সাহস বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই দু'খণ্ডের পর তিনি তৃতীয় খণ্ডের জন্য তাগাদা দিতে থাকেন এবং এই খাদেম (গ্রন্থকার)-কে তা সম্পূর্ণ করার জন্য বারবার নির্দেশ প্রদান করেন। অনেক বার এমনও হয়েছে যে, আমি বাইরে থেকে যখনই তাঁর খেদমতে গিয়ে হাযির হয়েছি তখনই তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল, তৃতীয় খণ্ড কি সমাপ্ত করেছ? কয়েকবার আমি আমার সংকট ও বিড়ম্বনার কথা তাঁকে জানাই। তিনি তা শুনেই বলে ওঠেন, অন্তত তৃতীয় খণ্ডটি শেষ করে ফেল। অতঃপর তিনি যখন জানতে পারলেন যে, এই অংশটিতে সুলতানুল মাশায়িখ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন মাহবুবে ইলাহী (কা)-এর আলোচনা থাকবে, তখন তিনি তাঁর রূহানী ও বিশেষ সম্পর্কের কারণে তাগাদার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেন। এদিকে এই অধমের অবস্থা এই হয়েছিল যেন সে কলম রেখে দিয়েছিল এবং এ প্রসঙ্গে ইতি টানার উপক্রম হয়েছিল। জুন, ১৯৬১ সালে আমি একবার হযরত রায়পুরী সাহেবের খেদমতে হাযির হলে দেখতে পাই, হযরত খাজা (র)-এর মলফুযাতের সেই

সংকলন পঠিত হচ্ছে–যা আমীর খসরূ (র) কর্তৃক সংগৃহীত ও 'আফযালুল ফাওয়াইদ' নামে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং যা আমার এক প্রিয় দোস্ত তোহ্ফাস্বরূপ নিয়ে এসেছেন। এ সংকলনটি এমনই সনদবিহীন ও ভিত্তিহীন বর্ণনায় ভরপুর যে, তা শ্রবণ করাটাও কোন বিশ্লেষণী শক্তি ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ব্যক্তি, এমন কি সাধারণ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষেও বোঝাস্বরূপ মনে হবে। এর সংগ্রাহক হিসাবে আমীর খসরূ (র)-কে সম্পর্কিতকরণ আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। হযরত খাজা সায়্যিদ মুহাম্মদ গেসূদরায (র)–যাঁর ও সুলতানুল মাশায়িখের ভেতর কেবল একটিই মাধ্যম রয়েছে এবং তাও হযরত চেরাগে দিল্লী (র)-এর, যিনি উক্ত আধ্যাত্মিক সিলসিলার নয়নমণি এবং গুপ্ত রহস্যের অধিকারী–সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, 'ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ' ছাড়া মলফূযাতের যতগুলি সংকলন মশহুর হয়ে আছে–তাঁর সবগুলোই বাহুল্য দোষে দুষ্ট ও অবিশ্বাস্য। যা হোক, মজলিসে উক্ত কিতাব পঠিত হচ্ছিল। হযরত রায়পুরী কখনো কখনো এর কোন কোন অধ্যায়ে বিস্ময় প্রকাশ করছিলেন। তাঁর অর্ধনিমিলিত ও অর্ধ-উন্মীলিত অথচ চিত্তাকর্ষক দৃষ্টি–যা কখনো কখনো এই গ্রন্থকারের ওপরও পড়ছিল এবং ইশারা-ইঙ্গিতে বলছিল যে, যদি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাস্য কিতাব খুঁজে পাওয়া যেত তা হলে এ ধরনের অনির্ভরযোগ্য ও অবিশ্বাস্য কিতাব হাতে নেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠত না। তাঁর ঐ দৃষ্টি আমার অন্তরে গিয়ে তীরের মতো বিদ্ধ হ'ল এবং আমি সেখানেই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, প্রথম অবকাশেই আমি অবশ্যই এ দায়িত্ব সম্পাদন করব এবং এ সওগাত আমাকে অবশ্যই পেশ করতে হবে।

এ কাজ মাঝপথে আটকে পড়ার অন্যতম কারণ ছিল পথের বন্ধুরতা। ভারতীয় উপমহাদেশের আওলিয়ায়ে কিরাম, ইসলামের মুবাল্লিগবৃন্দ এবং মহান বুযুর্গগণের জীবনী সম্পর্কে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর ভেতর বিরাট আকারের গ্রন্থও রয়েছে। কিন্তু যখন এ যুগের কোন গ্রন্থকার তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী একত্রিত করার মানসে কাজে নামেন এবং তাঁদের প্রকৃত কামালিয়াত, তাঁদের দীনী ও তবলীগী চেষ্টা-সাধনা, তাঁদের তা'লীম ও তরবিয়তের ফলাফল এবং তাঁদের মেযাজ ও প্রকৃতির ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেন এবং এ যুগের লোকদের জন্য ঐ সব জীবন-বৃত্তান্ত শিক্ষণীয়, উৎসাহ-উদ্দীপক ও সাহসিকতামণ্ডিত করে তোলার প্রয়াস পান, তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী ও অন্যান্য অবস্থা প্রকাশ্য দিবালোকে উদ্ভাসিত করে তুলতে প্রয়াস পান, প্রয়াস পান তাঁদের জীবনের সত্যিকার বিশুদ্ধ কাঠামো উপস্থাপিত করতে–তখন বিদগ্ধ রচনাকারীকে দারুণ ভাবে নিরাশ হতে হয়–হতে হয় বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন। কোন কোন সময় শত শত পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ থেকে, এমন কি কতিপয় গ্রন্থ

থেকেও একটি পৃষ্ঠা লিখবার মতো উপকরণ সংগ্রহ করা যায় না। এভাবে মহান ও শ্রেষ্ঠতম মনীষীদের জীবন-কাহিনীতে এমন সব বিরাট শূন্যতা দৃষ্টিগোচর হয় যে, কোনরূপ কল্পনা, অনুমান ও ভাষার অলংকার-চাতুর্য দিয়েও তা পূরণ করা যায় না। গোটা পুস্তকের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কাল্পনিক গল্প, অলৌকিক কাহিনী ও বুদ্ধিবিভ্রম ঘটাবার মতো ঘটনাবলী কল্পকাহিনীতে ভরপুর থাকে। তাতে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের দুঃখজনক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক, যিনি স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধকরণ ও গ্রন্থ প্রণয়নের আবশ্যকতা পূরণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের এত ব্যাপক অধ্যয়ন করেছেন যার দ্বিতীয় কোন নযীর বর্তমান যুগে মেলা দুরূহ। এই বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণেতা ও ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ও প্রখ্যাত লোকদের জীবনী আটটি বিরাট খণ্ডে সমাপ্ত করেছেন; তাঁকেও নিম্নোক্ত উপায়ে অভিযোগ পেশ করতে দেখা গেছে ঃ

'দেশের জন্য কি পরিহাস দেখুন, প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের শত শত ইতিহাস লেখা হয়েছে এবং বিভিন্ন শিরোনামে লেখা হয়েছে, কিন্তু এগুলোর ভেতর কোন গ্রন্থই ঐতিহাসিকের বিশুদ্ধ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয় না। যে কোন কিতাব হাতে নিন, মনে হবে–যদিও যুদ্ধের ময়দান ও বিলাস মাহফিলের গল্প-কাহিনী, বিউগল ও কাড়া-নাকাড়ার বর্ণনা থেকে এর কোন কোন পৃষ্ঠা মুক্ত–কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের ঝংকার থেকে তা আদৌ মুক্ত নয়। ছন্দোবদ্ধ বাণী ও অলংকার-সমৃদ্ধ গাথার কাঁটাবর্ণে আপনার আঁচল জড়িয়েও আপনি তা খুঁজে পাবেন না। এমতাবস্থায় কী করে আশা করা যায় যে, আমরা আমাদের মহান পূর্বপুরুষদের জ্ঞান-সমৃদ্ধ জীবনের সঠিক চিত্র ত্রুটিমুক্ত এ্যালবামে পাব? ঐসব বুযুর্গের কিছু কিছু জীবনী-গ্রন্থ পাওয়া যায় যাঁরা তরীকতের কোন না কোন সিলসিলার সঙ্গে যুক্ত ও সম্পৃক্ত ছিলেন। কিন্তু এ এক নিদারুণ পরিহাস যে,আপনি যদি সেসব গ্রন্থ থেকে তাঁদের নাম ও বংশ-পরিচয়, লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা, জীবনযাপন ও জ্ঞান-সাধনা সম্পর্কে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করতে চান তবে একটি শব্দও তাতে পাবেন না। কাড়া-নাকাড়ার ও রণদামামার কাজ এখানে অবশ্য নেই, কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের ঝংকার থেকে এর একটি পৃষ্ঠাও আপনি মুক্ত পাবেন না। দেখা যায়, ঐ সব গ্রন্থকারের সকল শক্তি ব্যয়িত হয়েছে ঐ সব মহান বুযুর্গের কাশ্‌ফ ও কারামাত তথা অলৌকিক কাহিনীর বর্ণনায় এবং তাঁদেরকে এই পর্যায়ে উপনীত করবার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে যেন তাঁরা রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের উর্ধ্বের অপর কোন সৃষ্টি; আদৌ এ জগতের কেউ নন। মনে হয় তাঁরা খান না, পান করেন না, শয়ন করেন না এবং মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও জ্ঞান-সাধনার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক কিংবা প্রয়োজনীয়তা নেই। তাঁদের কাজ শুধু যেন এই

যে, তাঁরা আল্লাহর সৃষ্টি প্রাকৃতিক বিধান সর্বদাই ভেঙে-চুরে খান খান করে যাবেন এবং প্রাণীজগত, উদ্ভিদ জগত ও বস্তু জগতের চারটি মৌলিক পদার্থের (আগুন, পানি, বাতাস ও মাটি) ওপর যে কোন উপায়ে নিজেদের শাসন কর্তৃত্ব চালিয়ে যাবেন।"

এ মুহূর্তে আপনি যদি এর বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে চান তবে ভারতীয় উপমহাদেশের চিশতিয়া সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা বরং আর এক দিক থেকে এ উপমহাদেশে ইসলামী সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খাজা মু'ঈনউদ্দিন চিশতী (র) এর জীবন-চরিত সম্পর্কিত কিতাবাদি অধ্যয়ন করুন এবং তা থেকে সংক্ষিপ্ত কোন জীবনী প্রণয়নে প্রয়াসী হোন, সম্ভবত আপনার মনে হবে, যুগটা যেন ইসলামের প্রাথমিক যুগ; গ্রন্থ রচনা ও কিতাবাদি প্রণয়ন যুগের সূচনাই যেন হয়নি। বাস্তব ঘটনা কিন্তু তা নয়। কেননা এ যুগেই আমরা কাযী মিনহাজ উদ্দীন 'উছমানী জুযেজানীর তাবাকাতে নাসিরী এবং নূরউদ্দীন আওফীর কিতাব 'লুবাবুল আলবাব'-এর সাক্ষাত পাই। এ দুটো কিতাবই হিজরী সপ্তম শতাব্দীর রচনা। আর যদি তা কোন মতে মেনেও নেওয়া হয় তবে এ ব্যাপারে কী বলা যাবে যে, শায়খুল ইসলাম হযরত বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী (র), যিনি ছিলেন একজন মহান আধ্যাত্মিক নেতা ও অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সংস্কারক–যিনি তাঁর যুগকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন এবং এমন একটি শহরে জীবনপাত করেছিলেন যা ছিল সে যুগের ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র, যে যুগে রাজনৈতিক অবস্থার ভেতর ভারসাম্য ও স্থায়িত্ব সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তথাপিও এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবন-চরিত লিখতে গিয়ে এবং তাঁর কার্যাবলীর ইতিহাস প্রণয়ন করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, অথচ তাতে অদ্ভুত ও অলৌকিক কাহিনী এবং কাশ্‌ফ ও কারামতের ঘটনাবলীর কোন কমতি দেখা যায় না।

এদিক থেকে হযরত সুলতানুল মাশায়িখ খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) এবং হযরত মাখদুমুল মুল্‌ক শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মুনায়রী (র) (যাঁরা হিজরী অষ্টম শতাব্দীর দু'জন নামকরা ব্যক্তিত্ব এবং মহান আধ্যাত্মিক নেতা ও সংস্কারক) বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিলেন। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত কোন তরীকতপন্থী নেতার এবং কোন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের জীবন-বৃত্তান্তই এতখানি আলোকোজ্জ্বল নয় যতখানি এ দু'জন মহান বুযুর্গের। এ উপকরণ এদিক থেকেও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার যে, সেগুলো এঁদের মলফুযাত ও চিঠিপত্রাদি (মকতুবাত) থেকে অথবা সমসাময়িক ইতিহাস এবং তাঁদের খাদেম ও মুরীদানদের লিখিত কিতাবাদি থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এদিক দিয়ে ঐতিহাসিককে এখানে সর্বাপেক্ষা কম সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হতে হয়।

অবশ্য বাছাই ও পর্যালোচনার কাজ এখানেও অপরিহার্য। কেননা সংঘটিত ঘটনাবলী ও সন-তারিখ নিয়ে অত্যন্ত বিশৃংঙ্খল ও পরস্পরবিরোধিতা এখানেও দৃষ্টিগোচর হয়।

কিন্তু এ দু'জন মহান বুযুর্গকে বেছে নেবার কারণ এ নয় যে, তাঁদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিক উপকরণ অত্যন্ত সহজেই হস্তগত হয়। এটা অন্যান্য আরো কিছু ব্যক্তিত্বের বেলায়ও প্রযোজ্য। তবে এঁদের বেছে নেবার কারণ হ'ল, তাঁরা ইসলামী রেনেসাঁ তথা পুনর্জাগরণের ইতিহাসে সম্মানিত আসন অধিকার করেন এবং ভারতীয় উপমহাদেশে (যা সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে ইসলাম জগতের কেন্দ্রবিন্দু এবং নবজাগরণ ও রেনেসাঁ আন্দোলনেরও উৎসভূমি) সংস্কারধর্মী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন—যা নিজেদের যুগ ও পরবর্তী বংশধরদের সর্বাধিক প্রভাবিত করেছে।

জীবন-বৃত্তান্ত ও শিক্ষামালা বাছাই ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রন্থকার সব সময়ই সেসব অনুচ্ছেদ ও অধ্যায়গুলোকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন যা বর্তমান বংশধরদের জন্য উপকারী, শিক্ষণীয়, অনুকরণীয়, সাধারণের পক্ষে বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক এবং যাতে ভুল বোঝাবুঝি ও গলদ আচরণের সম্ভাবনা কম এবং যা কাল্পনিক ও নৈতিক দর্শনের সঙ্গে কম সম্পর্কযুক্ত। কেননা ঈমান ও একীন, 'ইশ্ক ও মুহব্বত, রাসূল কারীম (স)-এর বাস্তব জীবনাদর্শ (সুন্নত) অনুসরণের প্রেরণা ও আবেগ, অটুট সংকল্প ও উচ্চ মনোবল, দাওয়াত ও তবলীগের প্রতি আগ্রহ, আমল ও আখলাকের সংস্কার, বিশুদ্ধ 'ইল্ম ও ধর্মীয় বিধান অধ্যয়ন ও অনুসরণই ছিল ঐ সমস্ত বুযুর্গের আসল সম্পদ এবং তাঁদের জীবনেতিহাসের আসল পয়গাম।

সম্ভবত গ্রন্থকারে অন্যান্য ব্যস্ততা এবং এমন সব কাজ-কর্ম যা কোন দিনই শেষ হবার নয়—এত সত্বর বর্তমান কিতাবকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছবার সুযোগ দিত না, যদি স্বীয় জন্মভূমি (রায়বেরেলী)-র সাই নদীর বন্যা একটা গ্রামে (ময়দানপুর) গ্রন্থকারকে বন্দী করে এর প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ যুগিয়ে না দিত। ফলে যে কাজে মাসের পর মাস লেগে যেত সে কাজ আল্লাহ্র ফযলে কয়েক সপ্তাহের ভেতরই হয়ে গেল। "আল্লাহর সেনাবাহিনী আসমান-যমীনের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।"

গ্রন্থকারের এটা নৈতিক দায়িত্ব বন্ধু ও সহযোগীদের শুকরিয়া আদায় করা। প্রাচীন উৎসের ভেতর গ্রন্থকার সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতজ্ঞ 'সিয়ারুল আওলিয়া' প্রণেতা আমীর খোর্দ এবং 'ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ' গ্রন্থের প্রণেতা আমীর হাসান 'আলা সিজযীর নিকট যাঁরা হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর জীবন-বৃত্তান্ত ও শিক্ষামালার সর্বাধিক বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য উপকরণ সরবরাহ করেছেন। আমি

হযরত মাখদুমুল মুল্ক শরফুদ্দীন বিহারী (র)-এর জীবনীমালার ভেতর 'সীরাতুশ্ শরফ' থেকে বিরাট সাহায্য ও দিক-নির্দেশনা লাভ করেছি এবং এ থেকে প্রাচীনতম উৎসের সন্ধান পেয়েছি। মাওলানা সাইয়েদ মানাযির আহ্সান গিলানী (র)-এর রচিত গ্রন্থরাজির অধ্যায়গুলো বরাবরের মত আমার জন্য বিরাট উপকারী ও সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় ওয়ালিদ সাহেব মাওলানা হাকিম সাইয়েদ 'আবদুল হাই (র)-এর মূল্যবান গ্রন্থ 'নুযহাতুল খাওয়াতির' স্বাভাবিক নিয়মেই ইতিহাস ও তাযকিরার একটি বিশ্বকোষের কাজ দিয়েছে এবং গ্রন্থকার এ থেকে এভাবে সাহায্য ও সহায়তা নিয়েছেন, এর দিকে হাত বাড়িয়েছেন এত বারবার যেমন কোন ছাত্র বারবার অভিধানের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। এ বিষয়ের ওপর ব্যাপক অধ্যয়নের পর পরিমাপ করতে পেরেছি, তাঁর দৃষ্টি কত বিস্তৃত ও গভীর এবং তাঁর নির্বাচন ও রুচি কত পবিত্র ও শালীন ছিল।

আমি সহযোগী বন্ধুদের মধ্যে জনাব মাওলানা সাইয়েদ নাজমুল হুদা সাহেব নদভী দসনবী ও বন্ধুবর মওলবী মুরাদুল্লাহ্ সাহেব মুনায়রী নদভীর নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যাঁরা হযরত মাখদূমুল মুল্ক (র)-এর জীবন-কাহিনী ও রচনাবলীর মধ্যে কতক দুষ্প্রাপ্য বিষয় আমাকে যোগান দিয়েছেন। বন্ধুবর মওলবী শাহ্ শাব্বীর 'আতা নদভী (যিনি ইতিহাস ও জ্ঞানগত বিষয়ে গভীর আগ্রহ তাঁর স্বনামখ্যাত পিতা থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন) থেকেও কতক জরুরী বিষয়ে সহায়তা পেয়েছি। ভাগ্যবান বন্ধুবর সাইয়েদ মুশাররাফ 'আলী নদভীও গ্রন্থকারের শুকরিয়া পাবার হকদার। এ গ্রন্থকার বর্তমান পুস্তকের বিরাট অংশ রচনা করেন এবং প্রিয় বন্ধু অত্যন্ত সাহসিকতা ও কঠোর পরিশ্রমের সাথে তা লিপিবদ্ধ করেন। মওলবী ইকবাল আহমদ সাহেব আ'জমীও শুকরিয়া পাওয়ার হকদার যিনি সময়-অসময়ে আমাকে নানা সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এসব বুযুর্গ ও বন্ধুদের উপযুক্ত শুভ প্রতিদান দিন এবং তাঁদের আমলকে কবুল করুন।

প্রথম থেকে শেষাবধি আল্লাহ্র যাবতীয় প্রশংসা, তাঁরই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মদ (স), তাঁর বংশধর, সাহাবীকুল ও সমগ্রের ওপর মহান আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক।

মারকাযে দা'ওয়াতে ইসলাহ্ ও
তবলীগ, লাখনৌ

আবুল হাসান 'আলী
১১ সফর, ১৩৮২ হিজরী
২৪ জুলাই, ১৯৬২ ঈসায়ী

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

ভারতবর্ষে চিশ্‌তিয়া সিলসিয়া এবং এ সিলসিলার শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গগণ

হযরত শায়খ খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুলতানুল মাশায়িখ হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর জীবনী ও কামালিয়াত

বিষয়	পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়
চরিত্র ও গুণাবলী

বিষয় পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়
স্বাদ-আহ্লাদ ও বাস্তব অবস্থাদি

পঞ্চম অধ্যায়
পরোপকার ও গভীর বিশ্লেষণ

ষষ্ঠ অধ্যায়
ফয়েয ও বরকত

সপ্তম অধ্যায়

হযরত খাজা (র) এর তা'লীম ও তরবিয়তের প্রভাব এবং তাঁর খলীফাদের ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক খিদমত

মাখদূমুল মূল্ক হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আহ্মাদ ইয়াহ্ইয়া মুনায়রী (র)

প্রথম অধ্যায়

জীবনের ঘটনাবলী ও বিভিন্ন অবস্থা জন্ম থেকে বায়'আত ও এজাযত লাভ পর্যন্ত

বিষয় | পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায়
মকতূবাত

সপ্তম অধ্যায়
মকামে কিবরিয়া

অষ্টম অধ্যায়
মানবতার সম্মান ও মর্যাদা

নবম অধ্যায়
বিশ্লেষণসমূহ ও উচ্চতম জ্ঞান

দশম অধ্যায়

দীনের হেফাজত ও শরীয়তের সাহায্য-সমর্থন

সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস

[৩য় খণ্ড]

প্রথম অধ্যায়

ভারতবর্ষে চিশতিয়া সিলসিলা ও এ সিলসিলার শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গগণ

ইসলামী বিশ্বের আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক কেন্দ্র

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী (খ্রিস্টীয় ১২শ শতাব্দী) ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ শতাব্দীর শেষভাগে বিশাল বিস্তৃত ইসলামী বিশ্বে এমন এক সুবিশাল নতুন রাষ্ট্রের বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটেছিল যা প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবীয় যোগ্যতা ও প্রতিভায় ছিল পরিপূর্ণ এবং যার ললাটে নিকট-ভবিষ্যতে ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত ও পয়গামের বিশ্বজয়ী কেন্দ্র ও ইসলামী জ্ঞান-ভাণ্ডারের রক্ষক ও আমানতদার হওয়ার কথা লেখা ছিল।

এ শতাব্দীর প্রাক্কালেই অর্ধবন্য তাতারীদের আক্রমণ সমগ্র মুসলিম জাহানের ওপর পঙ্গপালের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। এদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুর বন্য অত্যাচারে দেশের পর দেশ, সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য, শহরের পর শহর, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির পীঠস্থান, শিক্ষায়তন ও আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রভূমিসমূহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, জীবনের অটুট বাঁধন, ভদ্র ও মর্যাদাশীল লোকদের মান-সম্ভ্রম সবই ধূলোয় মিশে যায়। বুখারা, সমরকন্দ, রে, হামাদান, জুনযান, কাযভীন, মার্ভ, নিশাপুর, খাওয়ারিযম এবং শেষ পর্যন্ত খিলাফতের কেন্দ্র ও ইসলামের আবাসভূমি বাগদাদ এ দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের শিকারে পরিণত হয় এবং তার অতীত ও সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি

ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এরূপ আকস্মিক বিপদ ও দুর্যোগের শিকারে পরিণত হয়ে মুসলিম জাহানের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে ওঠে এবং সমগ্র প্রাচীন ইসলামী বিশ্বের ওপর রাজনৈতিক অবক্ষয়, চিন্তা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে আসে। এ সময় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ভারতবর্ষই কেবল একটি মাত্র দেশ যা দুনিয়াব্যাপী এ অশুভ ফিতনা ও বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এখানে তখন প্রাণবন্ত, শক্তিশালী, অত্যুৎসাহী, আবেগদীপ্ত তুর্কী বংশোদ্ভূত লোকদের রাজত্ব চলছিল যারা ঐ সমস্ত তাতার ও মোগলদের আক্রমণের অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে মুকাবিলা করতে সক্ষম ছিলেন। তারা নিজেদের ঈমানী শক্তি ও ইসলামের নবোদ্দীপ্ত উৎসাহ আবেগের ভিত্তিতে সমর শক্তি, রণকৌশল ও সাহসিকতায় কেবল ওদের সমকক্ষই ছিলেন না, বরং তুলনামূলকভাবে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। তাতার ও মোগল বাহিনী বারবার ভারতবর্ষের ওপর হামলা চালাতে থাকে এবং প্রতিবারই প্রচণ্ড মার খেয়ে পিছু হটতে থাকে। একমাত্র সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালেই চেঙ্গিয খানের বংশধর মোগলরা পাঁচবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। প্রথম আক্রমণ ঘটে ৬৯৬ হিজরীতে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম আক্রমণ পরিচালনাকালে সুলতানের পক্ষ থেকে মালিক তুগলক (মালিক গাযী) এমন বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করেন এবং মোগলদের এমনভাবে পরাজিত করেন যে, সেদিন থেকে ভারতবর্ষের স্বপ্ন মোগলদের মন-মগজ থেকে উঠে যায় এবং তাদের লোভাতুর দৃষ্টি চিরদিনের তরে ঘোলাটে ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।[১]

মুসলিম বিশ্বের অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর কাছে মান-সম্ভ্রম, ঈমান ও 'আকীদা ছিল অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। তাঁদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী ছিলেন তারা নিজেদের দেশে শান্তি ও জীবনের নিরাপত্তা লাভে বঞ্চিত হয়ে অবশেষে শান্ত ও নিরাপদ ইসলামের এই নতুন আবাসভূমি ভারতবর্ষের দিকে দলে দলে হিজরত করতে শুরু করে। যোগ্যতম ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদের অভিজাত ও ভদ্র পরিবারবর্গের হিজরতকারী এ কাফেলা বন্যার বেগে ইরান, তুর্কিস্তান, ইরাক থেকে ভারতবর্ষের দিকে আছড়ে পড়তে থাকে, যার ফলে দিল্লী একটি আন্তর্জাতিক শহরে– এককালের মুসলিম সাম্রাজ্যের গৌরব বাগদাদ ও কর্ডোভার ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত হয়। শুধু দিল্লীই নয় বরং ভারতবর্ষের অন্যান্য শহর ও শহরতলী পর্যন্ত সিরাজ ও ইয়ামানের সমকক্ষতা লাভ করে। ভারতবর্ষের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যিয়াউদ্দীন বারনী প্রমুখ এ সমস্ত অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত

১. মুনতাখাবুত্তাওয়ারীখ, পৃ. ১৮৬ ও তারীখে ফীরোযশাহী, ঐতিহাসিক যিয়াউদ্দীন বারনীকৃত, পৃ. ২৫১, ৩০২, ৩২০ ও ৩২৩।

বংশ-গোত্রের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলীর, মশহূর উলামায়ে কিরাম ও পণ্ডিতমণ্ডলীর, ইসলামের সুমহান ও শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ ও মনীষীদের নামের যে তালিকা পেশ করেছেন যাঁরা তাতারী ফিতনার পরিণতিতে ভারতবর্ষে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং পরে এখানে শিক্ষকতা ও ধর্মপ্রচার তথা জনগণের ব্যাপক আত্মশুদ্ধির অভিযানে মনোনিবেশ করেছিলেন। অধিকন্তু সাম্রাজ্যের ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্বও সামলিয়ে ছিলেন এবং যাঁরা ছিলেন সাম্রাজ্যের গৌরব ও সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু, তাতে মনে হয় তখন সমগ্র ইসলামী বিশ্বের আভিজাত্য, মর্যাদা ও মহত্ত্বের এখানেই যেন সমাবেশ ঘটেছিল।[১]

এই বিপ্লবের ফলে ভারতবর্ষ শুধু মুসলিম জাহানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অংশেই পরিণত হয় নাই, বরং ইতিহাসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এদিকেই ছিল যে, সে (ভারতবর্ষ) ইসলামের চিন্তা ও আত্মিক শক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপ্লব ও পুনরুজ্জীবনেরও নতুনতর কেন্দ্রে পরিণত হতে যাচ্ছে। উপরন্তু ইসলামের জ্ঞান-গবেষণা, ঈমানের বিপ্লবী দাওয়াত ও আকীদার অটুট ও দৃঢ়সংকল্পের ইতিহাস রচয়িতাদের ধারাবাহিক ও পর্যায়ক্রমিকভাবে কয়েক শতাব্দী ধরে এরই উপর সকল মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে।

মুসলিম ভারতের স্থপতি

মুসলিম বিশ্বের জন্য ভারতবর্ষের আবিষ্কার ও প্রাপ্তি একটি নতুন দুনিয়া আবিষ্কার থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। হিজরীর প্রথম শতাব্দীতেই এখানে ইসলামের উৎসাহদীপ্ত কাফেলার আগমন ঘটেছিল এবং ৯৩ হিজরীতে ইসলামের বীর সন্তান মুহাম্মদ ইবন কাসিম ছাকাফী সিন্ধু থেকে মুলতান অবধি সমগ্র এলাকা তলোয়ার ও চারিত্রিক মাধুর্যের সাহায্যে মুসলিম অধিকারে আনয়ন করেন। অধিকন্তু এ উপমহাদেশের স্থানে স্থানে দ্বীপ ও উপদ্বীপের ন্যায় ইসলামের মুবাল্লিগবৃন্দের কেন্দ্র ও খানকাহ্‌সমূহ স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল এবং সেগুলো অন্ধকার রাত্রিতে প্রান্তরের মধ্যে ক্ষুদ্র প্রদীপের ন্যায় আলো বিকিরণ করছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ বিজয়ের পুরো কৃতিত্বের অধিকারী হচ্ছেন আলেকজাণ্ডারের ন্যায় দুঃসাহসী ইসলামের বীর সৈনিক সুলতান মাহমূদ গযনভী (৪৪১ হি.) এবং ভারতবর্ষে সুদৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তিতে ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের কৃতিত্বের অধিকারী হচ্ছেন সুলতান শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরী (৬০২ হিজরী)। আর এখানে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও ঈমানী বিজয় প্রতিষ্ঠার মূল স্থপতি হচ্ছেন শায়খুল ইসলাম হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র) (৬২৭ হি.)।

---

১. তারীখে ফীরোযশাহী দ্রষ্টব্য ঃ পৃ. ১১১ ও ১১২।

ভারতবর্ষে বিজয়ের প্রাক্কালেই ইসলামের প্রসিদ্ধ চারটি আধ্যাত্মিক সিলসিলা কাদিরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া ও সুহরাওয়ার্দিয়া তরীকা জন্মলাভ করেছিল এবং বেশ কিছুকাল থেকেই ফলে-ফুলে সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠছিল। নিজস্ব সময় ও সুযোগ মুতাবিক এদের প্রত্যেকটিরই ফয়েয ও বরকত ভারতবর্ষে পৌঁছে যায় এবং ভারতবর্ষের ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি ও কাঠামো নির্মাণে সবগুলো সিলসিলারই যৌথ অবদান রয়েছে। আল্লাহ্ পাকও তাঁদের প্রচেষ্টাকে ধন্য করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক বিজয়ে এবং এখানে ইসলামের চারা রোপণে (যার ছায়া ও ফল লাভে দুনিয়ার একটি বিরাট অংশ উপকৃত হতে যাচ্ছিল) আল্লাহ্র কুদরতী বিধান চিশতিয়া সিলসিলাকে বেছে নিয়েছিল। "আর তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা পয়দা করেন ও যেমনটি ইচ্ছে। বাছাই করেন।" (আল-কুরআন)

আল্লাহ্র এ সমস্ত গুপ্ত রহস্য ছাড়াও চিশতিয়া তরীকার ওপর আমাদের এ দেশের প্রতিবেশীসুলভ অধিকারও ছিল। চিশতিয়া তরীকার সিলসিলা আমাদের দেশেরই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইরানে উজ্জ্বলতররূপে বিকশিত হচ্ছিল। স্বীয় সংবেদনশীল মেযাজ, প্রেম ও ভালবাসা ভিত্তিক হবার কারণে যা চিশতিয়া তরীকার মৌলিক পুঁজি ও মূলধনও বটে, এ সিলসিলা ভারতবর্ষের অধিবাসীবৃন্দের অন্তর-মন জয় এবং স্বীয় প্রেমে পাগলপারা ও মাতোয়ারা করতে যে অত্যন্ত সহজেই সক্ষম হবে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কেননা প্রাচীনকাল থেকেই ভারত ভূমির প্রাণসত্তা ও কাঠামো প্রেম ও বেদনার জারক রসে সঞ্জীবিত।

ভারতবর্ষের সাথে চিশতিয়াদের প্রাথমিক সম্পর্ক

উপরে উল্লিখিত জানা-অজানা গূঢ় রহস্য ও কৌশলসমূহের কারণে আল্লাহ্ তাঁর প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ীই ভারতবর্ষের বুকে ইসলামের পরিচিতি ও প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে চিশতিয়া সিলসিলাকে নির্বাচিত করেন। আর চিশতীয়া তরীকার ধারক ও বাহক মহান সন্তানদের প্রতি ভারতবর্ষের দিকে গতি পরিবর্তনের গায়েবী ইঙ্গিত আসে। সর্বাগ্রে চিশতিয়া তরীকার যে বুযর্গ সাধক ভারতবর্ষের দিকে নিজের গতিধারা পরিচালিত করেন তিনি ছিলেন খাজা আবূ মুহাম্মাদ চিশতী[১] যাঁর দু'আ, পবিত্র ও বরকতময় অস্তিত্ব সুলতান মাহমূদ

১. খাজা আবূ মুহাম্মাদ চিশতী (মৃত্যু ৪০৯ অথবা ৪১১ হিজরীতে) খাজা আবূ আহমাদ চিশতীর পুত্র ও খলীফা ছিলেন যিনি খাজা আবু ইসহাক শামীর সর্বপ্রধান খলীফা এবং খাজা নাসিরুদ্দীন আবূ য়ূসুফের পীর ও মুরশিদ ছিলেন। খাজা নাসিরুদ্দীন আবু য়ূসুফ আবার খাজা কুতুবদ্দীন মওদুদ (র)-এর পীর ছিলেন এবং তিনি (খাজা কুতুবুদ্দীন মওদূদ চিশতী) হাজী শরীফ যিন্দানীর পীর; হাজী শরীফ যিন্দানীর খলীফা হযরত খাজা উছমান হারূনী এবং খাজা উছমান হারূনীর খলীফা হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র)।

গযনভীর ধারাবাহিক বিজয়ের পেছনে সদা ক্রিয়াশীল ছিল। মাওলানা জামী 'নাফাহাতুল উন্স' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

"যখন সুলতান মাহমুদ সোমনাথ[১] আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তখনই খাজা আবূ মুহাম্মাদ গায়েবী নির্দেশ পান যেন তিনি সুলতান মাহমূদের সাহায্যার্থে গমন করেন।

"তিনি ৭০ বছর বয়সে কতিপয় দরবেশ সাথে নিয়ে রওয়ানা হন এবং সেখানে পৌঁছে স্বয়ং জিহাদে শরীক হন।"

হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)

কিন্তু যেমন সুলতান মাহমূদের রাজনৈতিক বিজয়ের পরিপূর্ণতা এবং ইসলামী সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ও মযবুত ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সৌভাগ্য লাভ সুলতান শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘোরীর ভাগ্যে নির্ধারিত ছিল, ঠিক তেমনিই আবূ মুহাম্মাদ চিশতী (র)-এর মিশনের পূর্ণতা সাধন, ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার, মযবুতভিত্তিক ইসলামী কেন্দ্র এবং সততা ও হিদায়াতের প্রতিষ্ঠা উক্ত সিলসিলারই একজন বুযর্গ আওলিয়াকুল শিরোমণি হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী সিজযী[২] (র)-এর ভাগ্যে নির্ধারিত হয়েছিল।

প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ (যার মধ্যে তাবাকাতে নাসিরীর লেখক কাযী মিনহাজুদ্দীন 'উছমানী জুনজানীও অন্তর্ভুক্ত, যিনি হযরত খাজা সাহেবের অল্পবয়স্ক

---

১. সুলতান মাহমূদ ৪১৬ হিজরীতে সোমনাথ আক্রমণ করেন। যদি উল্লিখিত বছর (৪০৯ অথবা ৪১১ হিজরী) খাজা আবূ মুহাম্মাদ চিশতীর ঠিক মৃত্যু সন হয়ে থাকে তবে এর পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত মাওলানা জামী "আক্রমণ" দ্বারা ভারতবর্ষের আক্রমণকে বুঝিয়েছেন এবং তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণকেই সোমনাথ আক্রমণের সমার্থক ভেবেছেন। কেননা সুলতান মাহমূদের একমাত্র সোমনাথ বিজয়ই ভারতবর্ষের বাইরে ব্যাপক খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি পেয়েছিল। সোমনাথ আক্রমণের পূর্বেই তিনি ৮ বার ভারত আক্রমণ করেন। এর মধ্যে কোন একটিতে (সম্ভবত প্রথম আক্রমণ পরিচালনাকালে) শায়খ আবূ মুহাম্মাদ (র) সুলতান মাহমূদের সঙ্গী ছিলেন।

২. খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র) স্বীয় জন্মভূমির প্রকৃত নামে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে 'সিজযী' হবেন; কিন্তু লেখকদের ভুলেই হোক কিংবা সাধারণের উচ্চারণদোষে হোক তিনি 'সঞ্জরী' হয়ে গেছেন। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এবং কবিতা ও গাঁথা থেকে অবগত হওয়া যায় যে, প্রথমে 'সিজযীই' লেখা হত এবং বলা হত। 'সিজয' সিজিস্তান-এর দিকে সম্পর্কিত। প্রাচীন ভূগোলবেত্তাগণ একে সাধারণভাবে খুরাসান প্রদেশের অন্তর্গত বলে ধরে নেন। বর্তমানে এর অধিকাংশ এলাকাই ইরানের এবং বাকী অংশ আফগানিস্তানের অন্তর্গত। এই এলাকার রাজধানী ছিল জরনূজ যার ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে

(বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

সমসাময়িকও ছিলেন[১]।) বলেন, হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র) সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘোরীর সেইসব সৈন্যবাহিনীর সাথেই ছিলেন যারা আজমীরের রাজা রায় পাথুরাকে (পৃথ্বিরাজ–[২]) পরাজিত করেন এবং ভারতবর্ষ বিজয় সম্পূর্ণ

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর) যাহিদানের নিকট পাওয়া যায়। এককালে সিজিস্তানের সীমানা গযনী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (আহসানুত-তাকাসীম)

কোন কোন ভূগোলবেত্তার মতে, 'সিজয' সিজিস্তানের অন্তর্গত একটি বিশেষ জায়গার নাম যার দিকে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে একজনকে সিজযী বলা চলে। কখনো কখনো সমগ্র সিজিস্তানের দিকে সম্পর্কিত হওয়ার কারণেও একজনকে সিজযী বলা হয়।

'প্রাচ্যের খিলাফতের ভৌগোলিক সীমারেখা'র লেখক মি. জি. বি. স্ট্রেঞ্জ ৩০ পৃষ্ঠা জুড়ে সিজিস্তানের ভৌগোলিক সীমারেখা বর্ণনা করেছেন। এর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে 'সিস্তান' ফরাসী শব্দ, সংগীস্তান থেকে উদ্ভূত। আরবরা তাকে সিজিস্তান বলে। উক্ত এলাকার যমীন নীচুতে এবং হ্রদ জেরাহ নামক জায়গার পাশে এবং তার পূর্বদিকে অবস্থিত। হিলমন্দ নদীসহ যতগুলি নদী উক্ত হ্রদে পতিত হয়, এর সবগুলির উৎসমূল এ এলাকাতেই পড়ে।

ফারসী ভাষায় সিস্তানকে 'নিমরোজ' (দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্র) বলা হয়। সিস্তাস্তন খুরাসানের দক্ষিণে অবস্থিত বলে একে দক্ষিণ অঞ্চলের রাষ্ট্র বলা হয়েছে (পৃ. ৫০৩ ও ৫০৪)

১. কাযী সাহেবের জন্ম ৫৮৯ হিজরীতে হয়েছিল।

২. পৃথ্বিরাজ অথবা রায় পাথুরা (১১৭৭-১১৯৪ খ্রিস্টাব্দ) সোমেশ্বরের পুত্র ছিলেন-যিনি আজমীরে চৌহান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা অরুনা রাজার পুত্র এবং এ বংশেরই প্রখ্যাত শাসক ভোগর রাজা ওরফে দলীল দেবের ভাই ছিলেন। সোমেশ্বরের দিল্লীর তুমার রাজপুত নৃপতির বংশ এবং আজমীরের চৌহান বংশের ওপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ছিল। সোমেশ্বর দিল্লীর শেষ তুমার রাজা আনন্দ পাল (অনঙ্গ পাল)-এর জামাতা ছিলেন এবং এই সুবাদে পৃথ্বিরাজ দিল্লীর শেষ নৃপতির দৌহিত্র হন। আনন্দ পালের জীবিত কোন পুত্রসন্তান ছিল না বিধায় তিনি পৃথ্বিরাজকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে নৃপতির মৃত্যুর পর পৃথ্বিরাজ স্বাভাবিকভাবেই দিল্লীর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং পৈত্রিক সূত্রে রাজা সোমেশ্বরের মৃত্যুর পর আজমীরের শাসনভারও লাভ করেন। এভাবেই রাজা পৃথ্বিরাজ রাজপুত রাজাদের দু'টি শক্তিশালী কেন্দ্র দিল্লী ও আজমীরের সিংহাসনের অধিকারী হন। যেহেতু আজমীর ছিল তাঁর জন্মস্থান ও পৈত্রিক আবাসভূমি এবং দাদার সিংহাসনও এখানেই ছিল, তাই ষোল আনা সম্ভাবনা যে, পৃথ্বিরাজ অধিকাংশ সময় আজমীরেই কাটাতেন। আর এ কারণেই সে যুগে আজমীরই ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র। ব্যক্তিগতভাবে পৃথ্বিরাজ অত্যন্ত উৎসাহী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী বীর বাহাদুর এবং অদ্বিতীয় তীক্ষ্ণধী রাজপুত ছিলেন। অনেকগুলি যুদ্ধে তিনি বিজয় শিরোপা লাভে সক্ষম হন যা শতাব্দীকাল পর্যন্ত তাঁর নাম ও খ্যাতিকে অম্লান ও উজ্জ্বল রেখেছিল। কনৌজের রাজা জয়চন্দ্রের মেয়ে সংযুক্তাকে স্বয়ম্বর সভা থেকে উঠিয়ে আনার কারণে তিনি রূপকথার রাজপুত্রের ন্যায় কিংবদন্তীর নায়ক হিসেবে উত্তর ভারতের গাঁথা ও কাব্যে স্থান লাভ করেন যা অদ্যাবধি গীত ও পঠিত হয়ে থাকে। পৃথ্বিরাজ স্বীয় রণনৈপুণ্যে, দৃঢ় চেতনায় এবং বিবিধ বিজয়ের কারণে ভারতবর্ষের শেষ দু'জন বাহাদুর রাজপুত এবং শক্তিশালী নৃপতির মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য। কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ পরাজয় তাঁর মান-মর্যাদা পর্দার অন্তরালে ঠেলে দেয়। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে (হিজরী ৫৮৭) যখন সুলতান শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘোরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন পৃথ্বিরাজ থানেশ্বর থেকে ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত তরাইন (বর্তমানে তেলোণ্ডী) নামক স্থানে একটি সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁর মুকাবিলা করেন এবং সুলতানকে পরাজিত করেন। পরবর্তী বছর ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে (হিজরী ৫৮৮) সুলতান বিরাট প্রস্তুতি নিয়ে নব উদ্যমে এক লাখ বিশ হাজার সৈন্যসহ দ্বিতীয়বার আক্রমণ করেন। পৃথ্বিরাজ তিন লাখ ঘোড়সওয়ার এবং তিন হাযার হাতি সহকারে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হন। ১৫ জন রাজপুত রাজাও নিজ নিজ বাহিনীসহ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। পৃথিরাজ পরাজিত হন এবং বন্দী অবস্থায় নীত ও নিহত হন। এভাবেই রাজপুতদের স্বাধীন সাম্রাজ্য এবং ভারতবর্ষের প্রাচীনতম শাসনামলের পরিসমাপ্তি ঘটে। (অধ্যাপক ঈশ্বরী প্রসাদ ও অন্যান্য ঐতিহাসিক থেকে সংক্ষিপ্তভাবে সংকলিত)

করেন। এ বিজয়ে তাঁর দুআ ও তাওয়াজ্জুহ এবং আধ্যাত্মিক শক্তির এক বিরাট ভূমিকা ছিল।[১]

পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র) সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘোরীর আক্রমণ পরিচালনার মধ্যবর্তী সময়ের (৫৭৯ হিজরী থেকে ৬০২ হিজরী) প্রথমদিকেই আজমীরে যা সে সময়ে রাজপুত শক্তি ও সাম্রাজ্যের এবং হিন্দু ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার একটি বিরাট কেন্দ্র[২] ছিল, অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, যখন মুহাম্মাদ ঘোরীর আক্রমণ দ্বারা ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়নি এবং যখন তাঁর আক্রমণ পরিচালনা উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ঠিক এমনি এক মুহূর্তে এমন একটি ঘটনার উদ্ভব ঘটে যদ্দারা ভারতবর্ষের ভাগ্যের ফয়সালা হয়ে যায়। রাজা পৃথ্বিরাজ কোন এক মুসলমানকে (সম্ভবত তাঁরই দরবারের সাথে সম্পর্কিত কেউ হবেন)– কষ্ট ও বিপদের মধ্যে ফেলেন। এর প্রতিকার চেয়ে হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র) পৃথ্বিরাজকে একটি পত্র লিখেন। পৃথ্বিরাজ অত্যন্ত গর্বভরে অবমাননাকর ভাষায় ঐ পত্রের জবাবে বলেন, 'এই লোকটি এখানে আসার পর এমন বড় বড় কথা বলে যা কেউ কখনও বলেনি এবং শোনেও নি।' হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র) ঐ জবাব শুনে বলেন, 'আমি পৃথ্বিরাজকে জীবিত বন্দী করে মুহাম্মাদ ঘোরীর হাতে তুলে দিলাম।' এর পরপরই মুহাম্মাদ ঘোরী হামলা করেন। পৃথ্বিরাজ মুকাবিলা করেন এবং পরাজিত হন।[৩]

যাই হোক, ঘটনার বিবরণে যতটুকু জানা যায় তাতে কোনই সন্দেহ নেই যে, হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র) মুহাম্মাদ ঘোরীর হামলার মধ্যবর্তী সময়ে এবং ভারতবর্ষে ইসলামী সাম্রাজ্য সাধারণভাবে ও সুদৃঢ়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠালাভের পূর্বেই প্রাচীন ভারতবর্ষের বিরাট রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র আজমীরকেই আবাসস্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। এ সিদ্ধান্ত ছিল তাঁর অটুট সংকল্প, উচ্চ মনোবল ও ঈমানী সাহসিকতার এমন একটি উজ্জ্বল ঘটনা যার নজীর শুধু ধর্মীয় নেতা ও বিশ্ববিজেতাদের জীবনকথায় পাওয়া যাবে। তাঁর দৃঢ়তা, ধৈর্য,

---

১. তাবাকাতে নাসীরী, পৃ. ৪০; তারীখে ফিরিশতা, পৃ. ৫৭ মুনতাখাবুতাওয়ারীখ, পৃ. ৫০।

২. আজমীর থেকে ৭ মাইল উত্তরে পুশকর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ ভূমি যার দর্শন উপলক্ষে দুর-দরাজ এলাকা থেকে লোক সমাগম ঘটত। এর ঝিল (হ্রদ ও পুকুর) ধর্মীয় পবিত্র বস্তুর মর্যাদা লাভ করেছিল। একমাত্র মানস সরোবরই তার সমপর্যায় ও সমমর্যাদার দাবি করতে পারত। পুশকরের ঝিল সম্পর্কে সাধারণ্যে এ ধরনের বিশ্বাসও প্রচলিত যে, ব্রহ্মা সেখানে ধ্যানস্থ হন এবং স্বরস্বতী নিজস্ব পাঁচটি ধারা দ্বারা প্রকটিত হন। (আজমীর গেজেটিয়ার, পৃ. ১৮)।

৩. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৪৭ মাআছিরুল কিরাম, পৃ. ৭।

ঐকান্তিকতা, আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরশীলতা, তাকওয়া, পরহেযগারী ও ত্যাগ স্বীকারের কারণেই, যে ভূখণ্ড ছিল হাযার হাযার বছর ধরে সত্যিকার ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মের প্রকৃত রূপ ও পরিচিতি থেকে বঞ্চিত, তাওহীদের বজ্রকণ্ঠ থেকে ছিল বধির ও অজ্ঞ, সেই ভূখণ্ডই 'উলামায়ে কিরামের আবাসভূমি এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দীনী পরিপূর্ণতার বিশ্বস্ত আমানতদার ও সংরক্ষক হয়ে পড়ে। তার আকাশ-বাতাস আযানের শব্দে অনুরণিত আর পর্বতমালা ও গিরি-কন্দর 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত এবং শহর-বন্দরগুলি আল্লাহ্‌র কালাম ও রসূল পাক (সা)-এর বাণীতে গুঞ্জরিত ও মুখরিত হয়ে ওঠে।

সিয়ারুল আওলিয়ার গ্রন্থকার কী সুন্দর করেই না লিখেছেন ঃ

ভারতবর্ষ নামক দেশটির শেষ পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত কুফর ও শিরকের রাজত্ব ছিল। আল্লাহদ্রোহীরা তারস্বরে 'আনা রাব্বুকুমুল আ'লা' (আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু) আওয়ায হাঁকছিল। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ ইট, পাথর, গাছ, পশু, গাভী ও গোবরকে প্রণতি জানাচ্ছিল। কুফর ও অন্ধকার দ্বারা মানুষের অন্তর-মন ছিল আচ্ছন্ন ও তালাবদ্ধ। সবাই ছিল দীন ও শরীয়তের হুকুম সম্পর্কে অনীহ, অসতর্ক এবং আল্লাহ্ ও তাঁর বার্তাবাহী রসূল (স) সম্পর্কে অজ্ঞ ও বেখবর। এরা কেউ কেবলা চিনত না, আল্লাহ্ আকবার আওয়াজ কেউ শোনেনি। বিশ্বাসীদের সূর্য হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)-এর কদম মুবারক এদেশের মাটিতে পড়ামাত্রই রাজ্যের নিশ্ছিদ্র অন্ধকাররাশি ইসলামের সুশোভিত আলোকমালায় রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত হয়ে গেল। একমাত্র তাঁরই প্রচেষ্টা ও প্রভাবে যেখানে ক'দিন আগেও শিরকের কালো প্রতীক বিরাজ করত, সেখানে মসজিদ, মিহরাব ও মিম্বর দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। যে আসমান পৌত্তলিকতা ও শিরকের বিষবাষ্পে ছিল ভরপুর, সেখানে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উত্থিত হতে লাগল। এদেশে যাঁরাই ঈমান ও ইসলামের মহামূল্যবান সম্পদের অধিকারী হয়েছেন এবং কিয়ামততক হবেন শুধু তাঁরাই নন, বরং তাঁদের সন্তান-সন্তুতি, অধঃস্তন বংশধরগণ সবই তাঁরই 'আমলনামার অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের যতই সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে থাকবে এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসার সীমা যতই বিস্তৃত হতে থাকবে, তার ছওয়াব শায়খুল ইসলাম খাজা মু'ঈনুদ্দীন হাসান সিজযী (র)-এর রূহ মুবারকে ততই পৌঁছতে থাকবে।[১]

---

[১] সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৪৭।

এভাবে ভারতবর্ষের বুকে আল্লাহ্‌র নাম যা কিছু নেয়া হয়েছে এবং ইসলামের জন্য যা কিছু কাজ করা হয়েছে, তার সবই চিশতীদের এবং তাদের একনিষ্ঠ ও উচ্চ-দৃঢ় মনোবলের অধিকারী উক্ত সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)-এর সৎকর্মশীলতা ও কার্যকলাপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবার যোগ্য। আর এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই যে, এ উপমহাদেশে চিশতিয়া সিলসিলার দাবি ও অধিকার অত্যন্ত প্রাচীন। মাওলানা গুলাম 'আলী আযাদ ঠিকই লিখেছেন ঃ

> এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই যে, চিশতিয়া সিলসিলার মহান বুযর্গ ও মনীষীদের ভারতীয় উপমহাদেশের ওপর চিরন্তন দাবি ও অধিকার রয়েছে।[১]

সিয়ারুল আকতাব গ্রন্থের লেখকও ঠিকই বলেছেন ঃ

> এদের (চিশতিয়া সিলসিলার মহান সাধকদের) পদধূলির বরকতেই ভারতবর্ষের বুকে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে এবং কুফরীর অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে।[২]

হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)-এর জীবদ্দশায়ই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্র আজমীর থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়ে যায় এবং আজমীর তার গুরুত্ব অনেকটা হারিয়ে ফেলে। খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র) নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে তাঁর প্রধান খলীফা খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার বাকী (র)-কে দিল্লীতে অধিষ্ঠিত করেন। আজমীরেই তিনি তাঁর বাকী জীবন ইসলামের প্রচার, ধর্মোপদেশ দান, তা'লীম ও তরবিয়ত এবং সত্যের সাধনায় নিমগ্ন থাকার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত করেন। কোন প্রাচীন ঐতিহাসিক উৎসের মধ্যেই এসব প্রচার-প্রচেষ্টা ও প্রয়াসের পরিণতি বা প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার নির্ভরযোগ্য ও বিস্তারিত কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। সাধারণভাবে এতটুকুই বলা হয়ে থাকে যে, বিরাট ও বিপুল সংখ্যক আল্লাহ্‌র বান্দা তাঁর হাতে ঈমান ও ইহসানের অমূল্য সম্পদ লাভে ধন্য হয়েছিল এবং মানুষ দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল। আবুল ফযল 'আঈন-ই-আকবরী' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

> (তিনি) আজমীরেই অবস্থান গ্রহণ করেন এবং ইসলামের প্রদীপ শিখা উজ্জ্বলতররূপে প্রজ্জ্বলিত করেন। তাঁর পবিত্র সত্তায় মুগ্ধ হয়ে লোকে দলে দলে ঈমানরূপ সম্পদ লাভে ধন্য হয়েছিল।[৩]

১. মাআছিরুল কিরাম, পৃ. ৭।
২. সিয়ারুল আকতাব, পৃ. ১০১।
৩. আঈন-ই-আকবরী, স্যার সায়্যিদ সংস্করণ, পৃ. ২৭০।

প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল যাবত ধর্মোপদেশ এবং ইসলামী শিক্ষার প্রচার, ইসলামের মুবাল্লিগ ও সূফী-সাধকদের তা'লীম ও তরবিয়ত এবং সত্যের অনুসরণে অত্যন্ত কায়মনে লিপ্ত থেকে ৯০ বছর বয়সে ৬২৭ হিজরীতে তিনি সেই মুহূর্তে ইন্তেকাল করেন যখন ভারতবর্ষের মাটিতে তাঁর নিজ হাতে লাগানো সাধের চারাটি ফলে-ফুলে সুশোভিত এবং রাজধানী দিল্লীতে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত ও দীক্ষাপ্রাপ্ত সে যুগের মনীষী হযরত খাজা বখতিয়ার কাকী (র) ধর্মোপদেশ ও হিদায়াতের কাজে অত্যন্ত সংগ্রামরত এবং কায়মনোবাক্যে নিমগ্ন। অন্যদিকে তাঁরই একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত অন্যতম খাদিম সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ ইসলামী সাম্রাজ্যের ব্যাপকভিত্তিক প্রসারে, তার ভিত্তি সুদৃঢ়করণে, ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠায় এবং সৃষ্টির কল্যাণ সাধন ও প্রতিপালনে গভীরভাবে মশগুল।

খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র)

খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র) ক্ষুদ্র শহর আওশ[১] নামক স্থানে (মাউরাউন্নাহার) জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র দেড় বছর বয়সে তিনি পিতাকে হারান। মা-ই তাঁকে লালন-পালন করেন। পাঁচ বছর বয়সে তিনি মক্তবে ভর্তি হন এবং মাওলানা আবূ হাফস আওশী (র)-এর নিকট শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর বাগদাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে তরীকতের এক মহান ও শ্রেষ্ঠ বুযর্গের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য লাভ ঘটে যাঁর নেতৃত্বে তিনি আধ্যাত্মিকতার সোপান বেয়ে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছুতে সক্ষম হন। ফকীহ্ আবুল-লায়েছ সমরকন্দী (র)-এর ঐতিহাসিক ও বরকতময় মসজিদে উল্লেখযোগ্য ও খ্যাতনামা 'উলামায়ে কিরাম ও তরীকতের সাধকদের উপস্থিতিতেই তিনি খিলাফতের খিরকা লাভে ধন্য হন। অতঃপর ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন এবং স্বীয় পীর ও মুরশিদের নির্দেশ ও হিদায়াত মুতাবিক দিল্লীকেই স্থায়ী ঠিকানারূপে মনোনীত করেন যা উর্বর ও প্রসারমান ইসলামী সালতানাতের রাজধানী ছিল এবং যা একদিকে উচ্চ মনোবলসম্পন্ন মুসলিম বাদশাহদের আনুকূল্য ও অনুগ্রহ প্রদর্শনে এবং জ্ঞানী-গুণীজনের মর্যাদা ও কদর দানীর ফলে, অন্যদিকে তাতারীদের হামলার ফলে 'উলামায়ে কিরাম, ভদ্র ও অভিজাত মহলের এবং বিজ্ঞসুধী ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ওলীয়ে কামিলদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিল। এক কথায় বলতে গেলে তখন দিল্লীতে মুসলিম জাহানের সম্পদ ও প্রতিভা স্থানান্তরিত হচ্ছিল।

---

১. ইয়াকূত মু'জামুল বুলদান নামক গ্রন্থে বলেন ঃ আওশ ফাবগানা রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রধান শহরের নাম।

সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ তাঁকে যথাযোগ্য কদর ও মর্যাদা দান করেন। কিন্তু তিনি শাহী দরবারের সাথে কোনরূপ সম্পর্ক রাখা পসন্দ করলেন না। সুলতানের তরফ থেকে পেশকৃত হাদিয়া-তোহফা কিংবা কোনরূপ জায়গীর ও ভূ-সম্পত্তি কবূল করা থেকেও তিনি বিরত রইলেন। প্রথমে তিনি কিলোখড়ি, পরে মালিক 'ইযযুদ্দীনের মসজিদের নিকট ফকীর-দরবেশের জীবন যাপন শুরু করেন।[১] সুলতান বরাবরের মতই শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তাঁর দরবারে হাযিরা দিতে থাকেন এবং এ ভক্তি ও শ্রদ্ধার মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে। শেষাবধি খাজা বখতিয়ার কাকী (র)-এর দরবারে শহরবাসী লোকজনের আনাগোনা এমনভাবে বেড়ে যায় যে, সে যুগের শায়খুল ইসলাম শায়খ নাজমুদ্দীন সুগরা (র)-এর মনেও তাঁর সম্পর্কে কিছুটা অসন্তুষ্টি ও ঈর্ষা সৃষ্টি হয়। হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র) স্বীয় খলীফার সাথে মুলাকাতের উদ্দেশ্যে দিল্লী এলে শায়খ নাজমুদ্দীন সুগরা (র), যিনি খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)-এর অত্যন্ত পুরানো দোস্ত ছিলেন, বখতিয়ার সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করেন। এতে হযরত খাজা চিশতী (র) স্বীয় ভক্ত মুরীদকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

> বাবা বখতিয়ার! এত সত্বর তুমি এত মশহূর হয়ে গেছ যে, আল্লাহ্র বান্দাদের মনে তোমার সম্পর্কে ঈর্ষা সৃষ্টি হয়ে গেছে। তুমি এ জায়গা ছাড় এবং আজমীরে চলে এস। তুমি সেখানেই বসবাস করবে এবং তোমার খিদমতের জন্য আমি সব সময় প্রস্তুত থাকব।[২]

হযরত খাজা (র) এমন একটি কথা উচ্চারণ করলেন যা তাঁর মত উচ্চ ও মহান মর্যাদার অধিকারী শায়খের পক্ষেই সম্ভব যিনি ইখলাস ও রব্বানী ভাবধারার পূর্ণতম মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন। ন্যায়, সত্য ও আল্লাহ্র পথের যিনি পথিক, আল্লাহ্র এক নগণ্য সৃষ্টির অভিযোগ ও হা-হুতাশকেও যেক্ষেত্রে তিনি গুনাহ্ মনে করেন, সেক্ষেত্রে শায়খুল ইসলামের অসন্তুষ্টি ও অভিযোগের কথা তো বলাই বাহুল্য। উপরন্তু ইসলামের প্রাণকেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করাকে তিনি মোটেই পসন্দ করতেন না। সূক্ষ্মতর উপায়ে আপন মুরীদকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে, যদি এখানকার জ্ঞানী-গুণী ও বিদগ্ধজনেরা তোমার সম্মান, মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে থাকে তবে আমি তো জ্ঞাত আছি। এখানে কে খাদিম আর কে মাখদূম, কে শায়খ (পীর) আর কে মুরীদ সে প্রশ্ন অবান্তর। ওখানে (আজমীরে) তুমি মাখদূমের মত থাকবে আর আমি খাদিম হিসেবে তোমার খিদমতে সর্বদা প্রস্তুত থাকব। এতে হযরত খাজা কুত্বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র) সে জবাবই দিয়েছিলেন যা দেওয়া তাঁর পক্ষেই ছিল সম্ভব ও স্বাভাবিক। তিনি নিবেদন করলেন ঃ

---

১. তারীখে ফিরিশতা, পৃ. ৭২০। ২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৫৪।

মাখদূম তো বহুত দূরের কথা, আমি আপনার সামনে খাদিমের অধিকার নিয়ে দাঁড়াবার যোগ্যতাও তো রাখি না; বসা তো আরও অসম্ভব ও অকল্পনীয়।[১]

অবশেষে শায়খ ও মুরশিদ হযরত খাজা বখতিয়ার কাকী (র)-কে আজমীর গমনের নির্দেশ দেন। বিশ্বস্ত মুরীদও সাথে সাথে কোনরূপ আপত্তি ও প্রতিবাদ ছাড়াই মুরশিদের আদেশ পালনে প্রস্তুত হয়ে যান। কিন্তু যখন শহরের বাইরে পা রাখেন তখনই শায়খ হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র) আপন মুরীদের অসম্ভব ও অস্বাভাবিক রকমের জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তিনি এও বুঝতে পারেন যে, এ জনপ্রিয়তা আল্লাহ্র তরফ থেকে এবং এতে প্রবৃত্তিজাত ও নিজস্ব সৃষ্টিজাত কোন বিষয়ই নেই। সুযোগ্য মুরীদ যে সমস্ত দিল্লীবাসীর মন ইতিমধ্যেই প্রেমবিমুগ্ধ ও আবেশবিহ্বল করে ফেলেছে এটা তিনি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতার ভাষায় ঃ

খাজা কুত্বুদ্দীন (র) স্বীয় শায়খ ও মুরশিদের সাথে আজমীরের দিকে রওয়ানা হন। এ সংবাদ দিল্লীবাসীদের কানে পৌঁছুতেই শহরে একটা হাঙ্গামা ও গোলযোগের উপক্রম হয়। সমস্ত শহরবাসী, এমন কি সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশও শহর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর অনুগামী হন। যেখানেই খাজা কুত্বুদ্দীনের কদম মুবারক পড়ছিল সেখানকার পদস্পর্শিত ধূলিকে লোকেরা তাবাররুক ভেবে সাথে সাথেই উঠিয়ে নিচ্ছিল আর অস্থির ও বিহ্বলচিত্তে কান্নাকাটি করছিল।[১]

একটি মাত্র মন-মানসকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং একটি সামান্যতম কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখতে গিয়ে আল্লাহ্র লাখো বান্দার মন-মানসকে ব্যথাতুর ও বেদনাক্রান্ত করে তোলা মোটেই সমীচীন ছিল না। তাই মুরশিদ আপন মুরীদকে আজমীর নিয়ে যাবার ইরাদা পরিত্যাগ করে বলেন ঃ

বাবা বখতিয়ার! তুমি এখানেই থাক। কেননা তোমার বাইরে যাবার কথা জেনে আল্লাহ্র এতগুলি বান্দা অত্যন্ত ব্যথাতুর ও বিপর্যস্ত অবস্থায় পৌঁছে গেছে। আমি এটাকে জায়েয মনে করি না যে, এতগুলি লোকের অন্তর-জ্বালাকে বাড়িয়ে তুলি। যাও, এ শহরকে আমি তোমার আশ্রয়ে রেখে গেলাম।[২]

---

১. ঐ. পৃ. ৫৪।
২. সিয়ারুল আওলিয়া পৃ. ৫৫।
৩. আখয়ারুল আখবার, পৃ. ২৬।

সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ, যাঁর রাজধানী এমন একটি পবিত্র সত্তার উপস্থিতি ও অবস্থিতি থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছিল, উপরিউক্ত ঘটনার ফলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)-এর শুকরিয়া আদায় করেন। খাজা কুত্‌বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র) শহরে প্রত্যাগমন করেন আর ওদিকে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র) আজমীরের পথে রওয়ানা হন।

হযরত খাজা কুত্‌বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র) দিল্লী ফিরে এসেই স্বীয় চাটাইয়ের আসনে বসে জোরেশোরে ধর্মীয় উপদেশ, শিক্ষা ও তদনুযায়ী বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলেন। তিনি শুধু সরকার ও শাহী দরবারের সাথে সম্পর্কই ছিন্ন করেন নি, বরং এটাকেই জীবনের লক্ষ্য ও মূলনীতি বানিয়ে নেন। এমনকি স্বীয় সিলসিলাভুক্ত সবার জন্যই এ নীতি নির্ধারণ করেন যে, দারিদ্র্য বরণ ও ধনাঢ্যতা বর্জনের সাথে সাথে শাহী দরবার থেকে দূরে অবস্থান করেই নিজেদের কাজ করে যেতে হবে। এরূপ সংস্রবহীনতা ও বর্জন নীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও বিশিষ্ট এবং সাধারণ, বাদশাহ এবং গরীব সকলেই তাঁর ভক্ত ও অনুরক্তে পরিণত হয় এবং তাঁকে কেন্দ্র করে মানুষের আনাগোনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

> সমগ্র দুনিয়া, অভিজাত-অনভিজাত, বিশিষ্ট ও সাধারণ সবাই ছিল তাঁর দু'আ ও অনুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত এবং পাগলপারা।[১]

সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ সপ্তাহে দু'বার তাঁর দরবারে হাযির হতেন এবং তাঁর খেদমতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। দিল্লীতে যা তখন শুধু ভারতবর্ষের রাজধানীই ছিল না, বরং মুসলিম জাহানের নবতর শক্তি, ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত ও সংস্কারের নতুন কেন্দ্র এবং বিশিষ্ট 'উলামায়ে কিরাম, শিক্ষকমণ্ডলী, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, অভিজাত মহল, তরীকতের পথ-প্রদর্শক ও সিলসিলাভুক্ত অন্যান্য বুযর্গ এবং ইসলামী বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সন্তান ও প্রতিভাধরদের সমাবেশস্থলও ছিল, সেখানে তরীকতের প্রচার ও প্রসার, মানুষের অন্তর-মানসকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার বাস্তব প্রশিক্ষণ এবং নবোত্থিত ইসলামী সাম্রাজ্যের সঠিক নৈতিক নেতৃত্ব ও পথ-প্রদর্শনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন, দারিদ্র্য অনুসরণ ও ধনাঢ্যতা বর্জনের নীতিকে এতটুকু কালিমাযুক্ত ও ধূলি-মলিন না করে আঞ্জাম দেওয়াটা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। এজন্য প্রয়োজন ছিল পর্বতপ্রমাণ ধৈর্য ও দৃঢ়তা এবং বাতাসের মত ক্ষিপ্র প্রবহমান গতি যাতে কোন কিছুর গায়ে আঁচড়টিও না লাগে। হযরত খাজা সাহেব (র) অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে এবং সুন্দর ও সুচারুরূপে নাযুক ও কঠিন এ

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া।

দায়িত্বটি আঞ্জাম দেন। একাজের জন্য তিনি দীর্ঘ সময় পাননি। স্বীয় শায়খ ও মুরশিদ হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতি (র)-এর পর বড় জোর চার কি পাঁচ বছর তিনি জীবিত ছিলেন।[1] কিন্তু তাঁর বদৌলতে ভারতবর্ষে চিশতিয়া সিলসিলা বুনিয়াদই শুধু প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বরং যে সুমহান ও উচ্চ লক্ষ্যের জন্য হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র) ভারতবর্ষকে নিজের অবস্থানস্থল ও কর্মক্ষেত্ররূপে বাছাই করেছিলেন তা অত্যন্ত সুষ্ঠুতার সাথে সার্থকতা লাভ করে।

তখন তাঁর বয়স ৫০ বছর কি তার কিছু বেশী হবে, ঐশী প্রেম ও মুহব্বতের যে হুতাশন তিনি ধৈর্য ও স্থৈর্যের ভিতর বাক্সবন্দী করে রেখেছিলেন এবং যে আগুন তিনি গোটা সৃষ্টির বাস্তব প্রশিক্ষণ ও হিদায়াতের মহত্তম লক্ষ্য ও কল্যাণ দ্বারা নিপিষ্ট করে রেখেছিলেন, তাই হঠাৎ করে জ্বলে ওঠে, ছাপিয়ে ওঠে সব কিছুর ওপর ঃ

صدائے تیغ تو امد ببزم زندہ دلاں
كدام سركه درد ذوق ایں سرود نماند

আপনার তলোয়ারের ধ্বনি সজীব অন্তর লোকদের সমাবেশে পৌছেছে। এমন ব্যক্তি কে আছেন যিনি এ ধ্বনির দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নি?

একবার শায়খ 'আলী সাকাজ্জীর[2] খানকাহ্তে 'সামা'র' মজলিস ছিল অত্যন্ত সরগরম। এক কাওয়াল কবিতা আবৃত্তি করল ঃ

کشتگان خنجر تسلیم را - هر زمان ازغیب جانے دیگراست

আত্মসমর্পণের অস্ত্রাহত ব্যক্তিরা প্রতি মুহূর্তে অদৃশ্য জগৎ থেকে নবজীবন লাভ করে থাকে।

এতে খাজা কুত্বুদ্দীনের উন্মত্ততা ও মুমূর্ষ প্রায় অবস্থা দেখা দেয়। খানকাহ থেকে আবাসস্থল পর্যন্ত কোনক্রমে আসেন, কিন্তু মত্ততা ও বেহুঁশী অবস্থা কাটেনি। কিছুটা হুঁশ ফিরতেই তিনি কবিতাটি আবৃত্তি করতে নির্দেশ দেন। আদেশ মাত্রই তা পালন করা হয়। এভাবেই চার রাত্র-দিন একাদিক্রমে তিনি বেহুঁশপ্রায় অবস্থায় কাটান। কিন্তু যখনই সালাতের ওয়াক্ত এসে যেত তখনই তিনি চেতনা ফিরে পেতেন। সালাত আদায় করতেন। অতঃপর পুনরায় উক্ত কবিতা আবৃত্তির নির্দেশ দিতেন। আবৃত্তি করা হতো, ফলে তিনি পুনরায়

১. যদি খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)-এর মৃত্যুসন ৬২৭ হিজরী মেনেও নেয়া যায় তবে খাজা কুত্বুদ্দীন (র) তাঁর ইন্তিকালের পর মাত্র ৬ বছর বেঁচেছিলেন।

২. কতক বর্ণনাতে 'সিজযী' লিখিত পাওয়া যায়।

বেহুঁশী অবস্থায় চলে যেতেন। পঞ্চম রাত্রিতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১] এ ঘটনা ৬৩৩ হিজরীর।[২]

ইন্তিকালের আগে 'ঈদের দিন তিনি 'ঈদগাহ থেকে ঘরের দিকে ফিরছিলেন। পথে তাঁকে এমন একটি জায়গা অতিক্রম করতে হয় যেখানে কোন গ্রাম কিংবা বসতি ছিল না। খাজা কুত্বুদ্দীন সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন এবং অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে কাটান। জনৈক খাদিম আরয করল, আজ 'ঈদের দিন। উপরন্তু সবাই আপনার জন্য অপেক্ষমান, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? উত্তর এলো : مرا ازین زمین بوئے دلہامی اید "আমার এখান থেকে অন্তরের খোশবু আসছে।" পরে কোন এক সময় উক্ত যমীনের মালিককে ডেকে নিজস্ব অর্থ দ্বারা তা খরিদ করেন এবং নিজের দাফনের জন্য সে যমীনটুকুই নির্বাচন করেন। শেষ পর্যন্ত সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।[৩]

হযরত খাজা কুত্বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র)-এর খলীফার সংখ্যা (যাঁদের নাম আওলিয়া' কিরামের জীবনীগ্রন্থে বিদ্যমান) নয় কিংবা দশজনের কম ছিল না। কিন্তু তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়া, হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)-এর অসম্পূর্ণ কাজগুলি সম্পন্ন করা, আর জারিকৃত কাজগুলি অব্যাহত রাখা, তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহের পরিপূর্ণতা সাধন ও প্রসারের সৌভাগ্য হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-ই লাভ করেছিলেন।

হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)

যেমনিভাবে হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র) ভারতবর্ষের বুকে চিশতিয়া সিলসিলার ভিত্তি স্থাপনকারী ও প্রতিষ্ঠাতা, তেমনি হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর এ সিলসিলার মুজাদ্দিদ ও দ্বিতীয় আদম। তাঁরই দু'জন খলীফা সুলতানুল মাশায়িখ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন দেহলভী (র) এবং হযরত শায়খ 'আলাউদ্দীন 'আলী সাবির পীরানে কলীরী (র)-এর মাধ্যমে এই সিলসিলা ভারতবর্ষের বুকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এঁদের খলীফা ও সিলসিলাভুক্ত অন্যান্য লোকদের দ্বারা এখন পর্যন্ত তা সঞ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত আছে।

خم خمخانہ بامہر ونشان است ۔

শরাব ও শরাবখানা প্রতিষ্ঠিত ও চিহ্নিতাবস্থায় বিরাজমান রয়েছে।

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া বর্ণনায় হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)।

২. কতক বর্ণনায় ৬৩৩ হিজরীর পরিবর্তে ৬৩৪ হিজরী পাওয়া যায়।

৩. সিয়ারুল আওলিয়া, বর্ণনায় হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র), পৃ. ৫৫; বর্তমানে জায়গাটি হযরত কুত্বুদ্দীন (র)-এর নামে প্রসিদ্ধ।

হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-এর প্রকৃত নাম মাস'ঊদ; উপাধি ছিল ফরীদুদ্দীন। সাধারণভাবে 'গঞ্জে শকর' উপাধিতেই তিনি সারা দুনিয়ায় মশহুর হয়ে আছেন।[১] তিনি হযরত 'ওমর ফারূক (রা)-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতামহ কাযী শু'আয়ব তাতারী হামলা ও গোলযোগের কারণে কাবুল থেকে লাহোরে আগমন করেন। কিছুকাল কাসূর নামক স্থানেও অবস্থান করেন এবং কাহীনওয়াল শহরের কাযীর পদ ও জায়গীর প্রাপ্ত হন। এখানে ৫৬৯ হিজরীতে তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকালেই তিনি মুলতান সফর করেন (যা সে সময় ভারতবর্ষের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মীয় শিক্ষার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল)। শহরের শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট থেকে শিক্ষালাভ করেন। মাওলানা মিনহাজুদ্দীন তিরমিযীর নিকট ফিকহের উল্লেখযোগ্য কিতাব 'আন-নাফে' পড়েন এবং এখানেই ৫৮৪ হিজরীতে হযরত খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত লাভ ঘটে এবং পরে তাঁরই হাতে বায়'আত গ্রহণের সৌভাগ্যও লাভ করেন। শায়খ ফরীদুদ্দীন (র) খাজা কাকী (র)-এর ব্যক্তিত্বে ও সান্নিধ্য লাভে এতই মুগ্ধ ও প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন যে, শিক্ষালাভের সকল পাট চুকিয়েও তিনি স্বীয় মুরশিদের সাহচর্যে কাল কাটাবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। ওলীয়ে কামিল হযরত শায়খ (র) তাঁকে নিবৃত্ত করেন এবং পড়াশোনা সমাপ্ত করার নির্দেশ দেন। তখন তিনি ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে লেখাপড়া সমাপ্ত করেন।[২]

শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি স্বীয় শায়খ ও মুরশিদের খিদমতে দিল্লীতে গিয়ে উপস্থিত হন। শায়খ (র) তাঁর অবস্থানের জন্য গযনী দরজার সন্নিকটে একটি জায়গা নির্বাচিত করেন এবং সেখানেই তিনি রিয়াযত ও মুজাহাদায় (কঠোর আত্মিক সাধনা) নিমগ্ন হয়ে পড়েন। সলূক পরিপূর্ণতার পর তিনি খিলাফত লাভে ধন্য হন এবং শায়খ (র)-এর এজাযতে হাঁসিতে অবস্থান গ্রহণ করেন যা তাঁরই একনিষ্ঠ একজন ভক্ত (যিনি পরে তাঁরই সর্বশ্রেষ্ঠ খলীফাদের মধ্যে পরিগণিত হন) শায়খ জামালুদ্দীন খতীবে হাঁসির আবাসভূমি ছিল। শায়খের ইন্তিকালের মুহূর্তে তিনি হাঁসিতে ছিলেন। ইন্তিকালের তৃতীয় দিনে তিনি দিল্লীতে আসেন।

---

১. এ উপাধির প্রকৃত ঘটনা ও ইতিহাস সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত বিধায় আমরা কিছু বলতে অক্ষম।

২. 'রাহাতুল কুলুব' নামক গ্রন্থে, যা তাঁরই সকল মলফূযাতের সংকলন, এ সফরের ও অন্যান্য ভ্রমণের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আছে। উক্ত কিতাব নির্ভরযোগ্য নয় বিধায় তার ওপর নির্ভর করা হয়নি। অপর কোন কোন পুস্তকে আরও বিস্তারিত মিলবে।

শায়খ (র)-এর মাযারে ফাতিহা পড়েন। কাযী হামীদুদ্দীন নাগোরী (র) শায়খ খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র)-এর ওসীয়ত মুতাবিক তাঁর প্রদত্ত খিরকা ও অন্যান্য আমানত তাঁকে সোপর্দ করেন। এটা ছিল খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-কে স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে যাবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। দু'রাকাআত সালাত আদায় করে তিনি খিরকা পরিধান করেন এবং স্বীয় শায়খ খাজা কাকী (র)-এর স্থলাভিষিক্ত হন।

দিল্লী আসার এবং শায়খ হযরত খাজা কুতবুদ্দীন কাকী (র)-এর স্থলাভিষিক্ত হবার তৃতীয় দিনে সরহিঙ্গা নামীয় তাঁরই একজন পুরনো বন্ধু ও ভক্ত হযরত গঞ্জে শকর (র)-কে দেখার প্রবল আগ্রহে দিল্লী আসেন। খাদিমরা তাঁকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। ভক্ত ও খাদিমদের ভীড়ে উক্ত দরবেশ শায়খ (র)-এর মুলাকাতের সুযোগ লাভে ব্যর্থ হন। অগত্যা অপেক্ষায় থাকেন কবে তিনি বাইরে আসেন। একদিন হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন (র) বেরিয়ে আসতেই দরবেশ তাঁর পায়ের ওপর পড়ে যান এবং কেঁদে কেঁদে বলতে থাকেন, "যতদিন আপনি হাঁসিতে ছিলেন ততদিন অতি সহজেই এবং বিনা বাধায় আপনার সাক্ষাত লাভে ধন্য হতাম। এখানে আমাদের মত গরীবদের পক্ষে আপনার সাক্ষাত লাভ মোটেই সম্ভব নয়।" শায়খ (র) এ কথায় অত্যন্ত ব্যথা পান এবং বুঝতে পারেন যে, দিল্লীতে থেকে তাঁর নিজের আন্তরিক শান্তি লাভ এবং সর্বসাধারণ ও দরিদ্র মানুষের পক্ষে তাঁর দেখা-সাক্ষাত লাভের অবাধ সুযোগ নেই। তিনি তখনই বন্ধু-বান্ধবদের বললেন, "আমি হাঁসি যাব।" উপস্থিত সবাই আরয করল, "শায়খ কুতবুদ্দীন (র) তো আপনাকে এখানেই বসিয়ে গেছেন। এখন আপনি আবার কোথায় যাবেন?" উত্তরে হযরত ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র) জানান, "শায়খ (র) তাঁর আমানত সোপর্দ করে দিয়েছেন। এখন আমি শহরে থাকি আর প্রান্তরে থাকি কিংবা জঙ্গলে যাই তা আমার সাথেই থাকবে।"[১]

আবাসস্থল হিসেবে হাঁসিকে তিনি বেছে নেন যেন শান্তিতে থাকতে পারেন এবং থাকতে পারেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। এখানেও খাজা কুতবুদ্দীন (র)-এর একজন মুরীদ মাওলানা নূর তুর্কের কারণে [যিনি হাঁসির অধিবাসীদেরকে তাঁর (হযরত গঞ্জে শকরের) মর্তবা ও মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করিয়ে দেন] তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং এতে বিপুল জনসমাগম হতে থাকে। অবশেষে তিনি তাঁর পুরনো আবাসস্থল কাহীনওয়ালে গমন করেন। কাহীনওয়াল ছিল মুলতানের সন্নিকটে। তাঁর খ্যাতি ও মর্যাদার কথা দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে গেছে তখন। তিনি

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ৭২।

আজুদহনকে[১] অবস্থানস্থল হিসেবে নির্বাচন করেন এবং বলেন ঃ যেহেতু আজুদহনের অধিবাসীবৃন্দ জাহিল ও অজ্ঞ এবং জায়গাটিও অখ্যাত ও অপরিচিত, তাই এখানে ঝামেলা কম হবে। কিন্তু এখানে পৌঁছুবার স্বল্পকালের ভেতরই তিনি মশহূর হয়ে ওঠেন এবং চতুর্দিক থেকে লোকের ভীড় বাড়তে শুরু করে। হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-এর খ্যাতি ও মর্যাদার সূর্য তখন মধ্যাহ্ন গগনে এবং তার আলোকচ্ছটা চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত। অল্পদিনের ভেতরেই লোকসমাগম বেড়ে যায় এবং আগত লোকের আনাগোনা বিরামহীন গতিতে চলতে থাকে। ফলে অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত তাঁর ঘরের দরজা খোলা থাকত।

এখানে অবস্থানকালে বেশ কিছুদিন টানাপোড়েন, দুঃখ-কষ্ট ও কঠোর দারিদ্র দশায় তাঁর জীবন কাটে। পীলু গাছের ফল ছিঁড়ে আনা হ'ত এবং এতে কিছু লবণ ছিটিয়ে তাই গরীব জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হত, আর নিজেও মেহমান ও সমস্ত খাদিমকে নিয়ে তাই খেতেন। আল্লাহ্র ওপর তাওয়াক্কুল ও নির্ভরশীলতার অবস্থা এমন ছিল যে, একবার তিনি সিয়াম শেষে ইফতারের উদ্দেশ্যে এক লোকমা মুখে উঠিয়েই বললেন, এর ভেতর নীতিহীনতার গন্ধ পাচ্ছি। খাদিম উত্তরে জানায়, লবণ ছিল না। তাই একটু লবণ ধার নিয়ে এতে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, তুমি নীতিহীন কাজ করেছ। আমার জন্য এরূপ খাবার শোভা পায় না।[২] কিছুকাল পর অবস্থা এমন হয়েছিল যে, রাত-দিন চুলা জ্বলত এবং অর্ধেক রাত অবধি খানাপিনার ধারাবাহিকতা বজায় থাকত। সেখানে যেই আসত সেই তার খাবার প্রস্তুত পেত।[৩] তাঁর হৃদয়ের উষ্ণতা ও অন্তরের প্রীতি সবার প্রতিই ছিল একরকম। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) বলেন ঃ আশ্চর্য ছিল তাঁর শক্তি, আর এমন আশ্চর্য ছিল তাঁর জীবন-ধারণ পদ্ধতি যা বরদাশ্ত করা অন্য কারো পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। তিনি নবাগত এবং বহু বছর যাবত পরিচিত ও একান্ত সান্নিধ্যে বসবাসকারী সবার সাথে একই রূপ খোশমেযাজ, দয়া, প্রীতি ও একাগ্রতার সাথে মিশতেন। মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাক বলেন ঃ তাঁর ব্যক্তিগত খাদিম আমিই ছিলাম। তিনি যা বলতেন, আমাকেই বলতেন। তাঁর ঘরে-বাইরে তথা সদরে-অন্দরে ছিল একই অবস্থা। তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যের মাঝে কোন বিরোধ বা পার্থক্য ছিল না। বছরের পর বছর তাঁর খিদমত ও সাহচর্যে থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁর মধ্যে কোনরূপ পরস্পর-বিরোধিতা লক্ষ্য করিনি।[৪]

---

১. আজুদহনকে বর্তমানে পাকপত্তন বলা হয়। বর্তমানে এটি মণ্টোগোমারী জেলার একটি ছোট শহর (পাকিস্তান)

২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৬৬।

৩. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৬৪।

৪. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৬৫।

একবার সুলতান নাসীরুদ্দীন মাহমূদ সমগ্র সেনাবাহিনী সমেত আউচ ও মুলতান সফরে আসেন এবং খাজা (র)-এর দর্শনলাভের উদ্দেশ্যে আজুদহনে হাযির হন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া তাঁর অবস্থা বর্ণনা করেন ঃ "ভীড় ছিল নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অবশেষে খাদিমকুল একটি কৌশল অবলম্বন করল। হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-এর একটি পিরহান (জামা)-এর আস্তিন প্রাসাদের বাইরে টাঙিয়ে দেওয়া হল। সেনাবাহিনী আসত এবং তাতে চুমু দিয়ে চলে যেত। শেষ পর্যন্ত আস্তিন টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে তিনি মসজিদে তশরীফ রাখেন এবং খাদিমবৃন্দকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ আমার চারিপাশে বেষ্টনী তৈরি কর যেন কোন দর্শনপ্রার্থী এর ভেতর না আসতে পারে। লোকেরা আসত এবং বাইরে দাঁড়িয়ে সালাম জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে যেত। আকস্মিকভাবে একজন বৃদ্ধ ফরাশ বেষ্টনী ভেদ করে ভেতরে এসে পড়ে এবং শায়খ (র)-এর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে। সে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে চুমু দেয় এবং বলে, 'শায়খ ফরীদ! শ্রান্ত হয়ে গেছ। আল্লাহ্ পাকের দেওয়া এ পুরস্কারের আরও বেশি শুকরিয়া আদায় কর।' শায়খ (র) একথা শুনে জোরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে উঠেন এবং উক্ত ফরাশকে অত্যন্ত খাতির ও সম্মান করেন।"[১]

সুলতান নাসীরুদ্দীন নিজেই শায়খ (র)-এর দরবারে হাযির হওয়ার সংকল্প নেন। সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি গিয়াছুদ্দীন বুলবন, যিনি সুলতানের সাথেই ছিলেন, আরয করলেন ঃ সাথে বিরাট সৈন্যবাহিনী, আর এদিকে আজুদহন পানি ও ঘাস-পাতাহীন শুষ্ক ও রুক্ষ জায়গা। আপনার নির্দেশ হলে এ বান্দাহ্ নিজে গিয়ে জাহাঁপনার পক্ষ থেকে 'ওযরখাহী করে আসত ও হাদিয়া তোহ্ফা পেশ করত। অতঃপর কিছু নগদ অর্থ ও চারটি গ্রাম জায়গীর প্রদানের শাহী ফরমান নিয়ে বুলবন খাজা (র)-এর দরবারে হাযির হন এবং অর্থ ও ফরমান শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-এর সামনে পেশ করেন। তখন শায়খ (র) বলেন, "এটা কি?" গিয়াছুদ্দীন বুলবন জানান, এতে কিছু নগদ অর্থ-কড়ি আছে আর তার সাথে হুযূরকে প্রদত্ত জায়গীরের শাহী ফরমান। শায়খ (র) মুচকি হেসে উত্তর দেন, "নগদ টাকা-কড়ি আমাকে দিয়ে যাও, আর শাহী ফরমান ফিরিয়ে নাও। ওর গ্রাহক অনেক মিলবে।" একথা বলে তিনি নগদ টাকা-কড়ি তখনই উপস্থিত দরবেশদের মধ্যে বিলিয়ে দেন।[২]

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৭৯।

২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৭৯-৮০।

সুলতান গিয়াছুদ্দীন বুলবন হযরত শায়খ (র)-এর সাথে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। দিল্লীর সালতানাত লাভ করাকেও তিনি হযরত (র)-এর দু'আ, প্রেম ও আন্তরিক মুহব্বতের পরিণতি মনে করতেন এবং তাঁর খাদিমবৃন্দের খিদমত করাকেও তিনি নিজের জন্য পরম সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করতেন। হযরত খাজা শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র) একবার এক ব্যক্তির অনুরোধ-উপরোধে একান্ত বাধ্য হয়ে বাদশাহ্র নিকট তার সম্পর্কে একটি সুপারিশ পত্র লিখে দেন, যা একই সাথে সুপারিশ ও অমুখাপেক্ষিতার আশ্চর্য এক সংমিশ্রণ ও সমন্বয় ছিল। তিনি লিখেন ঃ

> আমি এ ব্যক্তির বিষয় আল্লাহ্ পাক এবং পরে আপনার সামনে পেশ করছি। যদি আপনি তাকে কিছু দেন তবে আল্লাহ্ পাকই প্রকৃত দাতা হবেন আর আপনি তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। আর যদি না দেন তবে তাতেও আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাই প্রকাশ পাবে। সেক্ষেত্রে আপনি আপনার অসমর্থতার কারণে দায়ী হবেন না।[১]

হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন (র) সমসাময়িককালে খ্যতনামা ওলীয়ে কামিল ও অন্যান্য সিলসিলার প্রবীণ বুযুর্গদের সাথেও বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। তিনি তাঁদের মর্তবা ও মর্যাদার প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। শায়খুল ইসলাম শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী (র), যিনি সুহরাওয়ারদিয়া তরীকার খ্যাতনামা মুরশিদ এবং ভারতবর্ষের অন্যতম প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক নেতা ও মুবাল্লিগ, তাঁরই সমসাময়িককালের–সম্ভবত সমবয়সী ছিলেন।[২] উভয়ের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও খোলামেলা চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হত। হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন (র) শায়খ বাহাউদ্দীন (র)-কে শায়খুল ইসলাম উপাধিতে সম্বোধন করতেন। উভয়ের খলীফা ও মুরীদবর্গও নিজেরা গভীর আন্তরিকতামণ্ডিত ও প্রীতিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে পরস্পরের সাথে মিলিত হতেন। তাঁরা একে অপরের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। শায়খুল ইসলাম হযরত যাকারিয়া মুলতানী (র)-এর পৌত্র শায়খ রুকনুদ্দীন আবুল ফাত্হ (র) এবং শায়খুল কবীর হযরত শায়খ ফরীদ (র)-এর খলীফা সুলতানুল মাশায়িখ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর ভেতর বিরাট হৃদ্যতা ও প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

---

১. আখবারুল আখয়ার; আসল চিঠি অলংকরপূর্ণ আরবী ভাষায় লিখিত।

২. শায়খুল ইসলাম শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (র)-এর জন্ম ৫৬৬ হিজরীতে এবং শায়খ ফরীদ (র)-এর জন্ম ৫৬৯ হিজরীতে।

হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন (র)-এর জীবনের প্রকৃত ও আসল সম্পদ এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর বিপুল আগ্রহ ও আবেগ, ঐশী প্রেমে মত্ততা ও আল্লাহ্রই জন্য পাগলপারা-প্রায় অবস্থা। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) এক দিনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, শায়খুল কবীর হযরত খাজা শায়খ ফরীদুদ্দীন (র) নিজস্ব হুজরায় (কামরা) ছিলেন। মাথা ছিল উন্মুক্ত আর চেহারা ছিল পরিবর্তিত। হুজরার মধ্যে পাগলের মত তিনি পায়চারী করছিলেন আর নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন ঃ

خواهم که همیشه درو فائے توزیم۔
خاکے شوم وبزیرپائے توزیم مقصود من خسته ز کو نین توئ۔
ازبہر تو میرم از برائے توزیم

আমার ইচ্ছা যে সর্বদাই তোমার হয়েই আমি বেঁচে থাকি, মাটিতে মিশে যাই। তোমারই পায়ের তলায় আমি জীবন কাটিয়ে দেই। আমার মত নিঃস্ব ও সর্বহারার ইহকালে ও পরকালে একমাত্র কাম্য তুমিই। তোমারই জন্য বেঁচে থাকি আর তোমারই জন্য মারা যাই।

এই কবিতা আবৃত্তির পর তিনি সিজদাবনত হয়ে মাটিতে মাথা রাখছিলেন। অতঃপর আবার এই কবিতাই আবৃত্তি করছিলেন এবং কামরার মধ্যে চতুর্দিকে অস্থিরভাবে পায়চারী করছিলেন। এভাবে তিনি বারবার সিজদায় পড়ছিলেন এবং বহুক্ষণ ঐ অবস্থায়ই কেটে যাচ্ছিল।[১]

আল্লাহ্র ভয়-ভীতিতে তিনি সব সময় কাঁদতেন। কখনও উপদেশপূর্ণ কথা শুনলে কিংবা মর্মস্পর্শী বর্ণনা কানে এলে অথবা তার সামনে প্রেমোদ্দীপক কবিতা আবৃত্তি করা হলে কিংবা কোন বুযুর্গের কোন প্রভাব সৃষ্টিকারী ঘটনা শুনলে তিনি বে-এখতিয়ার কেঁদে ফেলতেন। কোন সময় অবিরাম কাঁদতে থাকতেন। সর্বদাই সিয়াম পালন করতেন। পবিত্র কুরআনুল করীম হিফ্য ও তিলাওয়াতের প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন এবং এ দু'টির (সিয়াম ও কুরআন হিফ্য) জন্য খাস খলীফা ও বিশেষ বিশেষ মুরীদকে ওসীয়ত করতেন ও তাকিদ দিতেন।[২] তিনি সামা'র (এক প্রকার প্রেম ও ভক্তিমূলক গযল) প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। কেউ বলেছিলেন, সামা'র বৈধতা নিয়ে 'উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। তাতে তিনি বলেন ঃ

سبحان الله! یکے سوخت وخاکستر شد یگرے هنوز در اختلاف است ۔

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া। ২. সুলতানুল মাশায়িখ (র)-এর জীবনী দ্রষ্টব্য।

সুবহান্নাল্লাহ! একজন জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল আর তারা এখনও মতভেদেই লিপ্ত রইল।[১]

তাঁর সারা জীবনের নীতি ছিল ধনী ও ক্ষমতাসীনদের থেকে দূরে থাকা, নিজের অবস্থা গোপন রাখা এবং দরবেশী জীবন যাপন করা। স্বীয় প্রবীণ বুযর্গদের রীতি-নীতি ও চলন-পদ্ধতি আয়ত্ত করে এবং সেগুলির মধ্যে ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠার হিফাযত তথা তরীকার প্রচার ও প্রসারের গোপন রহস্য নিহিত আছে জেনে তিনি তার ওপরই শক্ত ও সুদৃঢ়ভাবে কায়েম ছিলেন। আপন তরীকতের (তরীকতে চিশতিয়া) একজন ভাই হযরত শায়খ বদরুদ্দীন গযনভী (র) [যিনি ছিলেন হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র)-এর শ্রেষ্ঠ খলীফাদের অন্যতম] সাম্রাজ্যের কিছু অমাত্যবর্গের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তারা শায়খ গযনভী (র)-এর জন্য দিল্লীতে একটি খানকাহও তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পদ্ধতিতে তাঁর খিদমতও করতেন। বিপ্লবাত্মক রুযী-রোযগারের কারণে যখন তিনি শাহী আমীরের রোষানলে পড়েন, তখন তাঁকে বেশ দুঃখ-কষ্ট পোহাতে হয়। তিনি এই দুর্দশা থেকে উদ্ধারের আশায় শায়খুল কবীর হযরত গঞ্জে শকর (র)-এর নিকট দু'আপ্রার্থী হলে তিনি জবাবে লিখেছিলেন ঃ

যে ব্যক্তি নিজস্ব পদ্ধতিতে চলতে চায় সে অবশ্যই এমন অবস্থায় পতিত হবে যেখানে সে সর্বদা অস্থির ও পেরেশান থাকবে। আপনি তো পীরানে পাক হযরত খাজা কাকী (র)-এর ভক্তদের অন্যতম। অতএব তাঁর তরীকা ও পন্থার পরিপন্থী খানকাহ্ কেনই-বা নির্মাণ করলেন আর কেনই-বা সেখানে অধিষ্ঠিত হলেন? হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন (র) এবং হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)-এর তরীকা ও জীবন-পদ্ধতিতে এটা ছিল না যে, নিজের জন্য খানকাহ্ নির্মাণ করে দোকান সাজাবেন। তাঁদের আদর্শ ও নীতিই ছিল নাম নিশানাহীন নির্জন বাস।[২]

এই স্বভাবগত ঝোঁক ও প্রবণতার কারণে এবং সর্বসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভীড় ও আনাগোনার ফলে ইন্তিকালের পূর্বে পুনরায় তাঁর জীবনে অভাব-অভিযোগ ও টানাপোড়েন দেখা দেয়। সিয়ারুল আওলিয়া পুস্তকে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) বলেন ঃ

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া।

২. সিয়ারুল 'আরিফীন, পৃ. ৮৫; বযমে সূফীয়া থেকে গৃহীত।

শুয়ূখুল 'আলম হযরত শায়খ ফরীদ (র) শেষ বয়সে ইন্তিকালের কাছাকাছি সময়ে খুবই আর্থিক অনটনের ভেতর ছিলেন। আমি রমযান মাসে তাঁর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। এত অল্প পরিমাণ খাবার আসত যে, তা উপস্থিত লোকদের জন্য মোটেই যথেষ্ট হ'ত না। সে সময় কোন রাত্রিতেই আমি পূর্ণ পরিতৃপ্তি সহকারে খেতে পাইনি। খাদ্য-সামগ্রী যা দেখা যেত তা ছিল নিতান্তই সামান্য ও মামুলী ধরনের। আমি রওয়ানা হবার প্রাক্কালে হযরত শায়খ (র) আমাকে একটি সুলতানী (সম্ভবত সে যুগের প্রচলিত মুদ্রা) পথ খরচের জন্য দিলেন। ঐ দিনই মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাকের মাধ্যমে নির্দেশ পেলাম, আজ অবস্থান কর, কাল যেও। ইফতার মুহূর্তে হযরত শায়খ ফরীদ (র)-এর ঘরে খাবার কিছুই ছিল না। আমি জানতে পেরেই তৎক্ষণাৎ শায়খ (র)-এর খিদমতে যাই এবং আরয করি যে, হুযূরের দরবার থেকে আমাকে একটি সুলতানী দেওয়া হয়েছিল। যদি অনুমতি পাই তবে তা দিয়ে কিছু খানা-পিনার ইন্তিজাম করতে পারি। হযরত অনুমতি দেন এবং আমার জন্য প্রাণ খুলে দ'আ করেন।[১]

সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর বর্ণনা থেকে ইন্তিকালের অবস্থা নিম্নরূপ বর্ণনা করেন ঃ

মুহাররাম মাসের পাঁচ তারিখে অসুখ অত্যন্ত বেড়ে যায়। 'ইশার সালাত জামা'আতেই আদায় করেন। সালাতের পর তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর হুশ ফিরে পেলে জিজ্ঞাসা করেন. 'আমি কি 'ইশার সালাত আদায় করেছি? সবাই বলল, হাঁ! তিনি বলেন, 'দ্বিতীয়বার পড়ি, জানি না কখন কি হয়!' তিনি সালাত আদায় করেন এবং এরপর আবারও বেহুশ হয়ে যান। এবার বেহুশী অবস্থা ছিল দীর্ঘক্ষণ। হুশ ফেরার পর পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি দ্বিতীয়বার সালাত আদায় করেছি?' জানানো হ'ল, হাঁ! আপনি ইতিমধ্যেই তা দু'বার আদায় করেছেন।' তখন তিনি উত্তরে বললেন, 'আরও একবার আদায় করি। কে জানে কখন কি হয়?' এরপর তিনি তৃতীয় দফা সালাত আদায় করেন। অতঃপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।[২]

ইন্তিকালের তারিখ ছিল ৫ই মুহাররাম, মঙ্গলবার, হিজরী ৬৬৪।[৩] আজুদহনে (পাকপত্তনে) তাঁকে দাফন করা হয়। পরে সুলতান মুহাম্মদ তুগলক তাঁর কবরের উপর গুম্বজ নির্মাণ করে দেন।

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৬৬। ২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৮৯।

৩. সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা কতিপয় স্থানে ৬৬৯ হিজরীর এমন অনেক ঘটনা বর্ণনা দিয়েছেন যা হযরত খাজা শায়খ ফরীদ (র)-এর জীবনী সম্পর্কিত। কতক জায়গায় হযরত খাজা নিজামুদ্দীন

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

হযরত খাজা শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র) পাঁচজন ছেলে ও তিনজন কন্যা রেখে যান। পুত্রদের নাম যথাক্রমে শায়খ নাসরুদ্দীন নাসরুল্লাহ্, শায়খ শিহাবুদ্দীন, শায়খ বদরুদ্দীন সুলায়মান, খাজা নিজামুদ্দীন ও শায়খ ইয়া'কূব। কন্যাত্রয় হলেন বিবি মাসতূরা, বিবি ফাতিমা ও বিবি শরীফা।

হযরত খাজা শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-এর ওফাতের পর তৃতীয় পুত্র শায়খ বদরুদ্দীন সুলায়মান (র) পিতার স্থলাভিষিক্ত হন! তাঁরই পুত্র সাজ্জাদানশীন শায়খ 'আলাউদ্দীন আজুদহনী (র) পবিত্রতা ও আল্লাহ্ভীরুতার দিক দিয়ে অত্যন্ত মশহূর ছিলেন। মুহাম্মদ তুগলকও তাঁর মুরীদ দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।[১] আল্লাহ্ পাক রূহানী সিলসিলার ন্যায় হযরত খাজা শায়খ ফরীদ (র)-এর সন্তান-সন্ততি ও বংশাবলীর ক্ষেত্রেও অত্যন্ত বরকত দান করেছিলেন। হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অংশে তাঁর বংশধরগণ ছড়িয়ে আছেন। সাধারণভাবে তাঁরা ফরীদী নামে খ্যাত।

হযরত খাজা শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-এর পাঁচজন খলীফার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মত। এঁরা হলেন শায়খ জামালুদ্দীন হাঁসুবী (র), শায়খ বদরুদ্দীন ইসহাক (র), শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র), শায়খ 'আলী আহমদ সাবির (র) এবং শায়খ আরিফ (র)।

শায়খ জামালুদ্দীন (আহমদ ইবন মুহাম্মদ) খতীব হাঁসুবী (র) হযরত খাজা শায়খ ফরীদ (র)-এর অত্যন্ত প্রিয় ও বিশ্বস্ত খলীফা ছিলেন। তাঁরই খাতিরে তিনি সুদীর্ঘ ১২ বছর যাবত হাঁসিতে অবস্থান করেন। যখনই তিনি কাউকে খিলাফতনামা লিখে দিতেন, তখনই বলতেন, "যাও, হাঁসিতে গিয়ে শায়খ জামালুদ্দীনকে দেখিয়ে নেবে।" যদি শায়খ জামালুদ্দীন খিলাফতনামা কবূল করে নিতেন তবে তিনিও কবূল করতেন। শায়খ জামাল নামঞ্জুর করলে তিনিও নামঞ্জুর করতেন এবং বলতেন, 'জামালের ছেঁড়া জিনিস সেলাইয়ের অযোগ্য।' তিনি প্রায়ই বলতেন, "জামাল আমার সৌন্দর্য।"[২]

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর) আওলিয়া (র)-এর লিখিত বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, "হযরত খাজা (র) আমাকে এটা বলেছেন, এটার জন্য হিদায়েত করেছেন।" যদি ঐ সন সঠিক ও বিশুদ্ধ মনে করা হয় তবে ৬৬৪ হিজরী মৃত্যু তারিখ যা সাধারণভাবে মশহূর ও অধিকাংশ কিতাবেই উল্লিখিত ও বর্ণিত, তা সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে এবং মেনে নিতে হয় যে, হযরত শায়খ ফরীদ (র)-এর ওফাত এর পরে হয়েছিল। অন্যান্য পুস্তকে যা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে অনুমান করা চলে যে, হযরত শায়খ ফরীদ (র)-এর ওফাত ৬৭০ হিজরীতে হয়েছিল, যা খাযীনাতুল আসফিয়া ও তাযকিরাতুল 'আশিকীন নামক গ্রন্থের বরাত দিয়ে পেশ করা হয়েছে।

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১৯৬।

২. নুযহাতুল খাওয়াতির, সিয়ারুল আওলিয়া ও আখবারুল আখয়ার প্রভৃতি থেকে গৃহীত।

শায়খ জামালুদ্দীন স্বীয় শায়খ (র)-এর জীবদ্দশায় ৬৫৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। শায়খ কুত্‌বুদ্দীন মুনাওয়ার [হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর প্রিয় খলীফা] তাঁরই পৌত্র।

শায়খ বদরুদ্দীন ইবন ইসহাক ইবন 'আলী (র) বুখারার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অন্যতম ছিলেন। তিনি হযরত খাজা শায়খ ফরীদুদ্দীন (র)-এর খলীফা, খাদিম এবং জামাতা ছিলেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ছিলেন স্বীয় শায়খ (র)-এর শিক্ষা ও সাহচর্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। চোখ থাকত সর্বদাই অশ্রুভেজা। প্রায়ই কাঁদতেন, যার ফলে চোখের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। জনৈক ব্যক্তি বলেছিল, "আপনি যদি কান্না সংযত করেন তাহলে আপনার ব্যবহারের জন্য আমি সুরমা বানিয়ে দেব।" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "চোখের ওপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।" তাঁর ইবাদত-বন্দেগী, আল্লাহ্‌র পথে অব্যাহত প্রয়াস ও নিরলস সাধনা দেখে শায়খুল কবীর হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-এর স্মৃতি জীবন্ত হয়ে উঠত। তিনি অত্যন্ত প্রতিভাধর ও ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। বহু দিন তিনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মু'ইয্‌যিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। পরিপূর্ণ শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে বুখারা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। ফারসী ও আরবী ভাষায় এমত পরিমাণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, অবলীলাক্রমে কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করে যেতে পারতেন। পঠিত ও শিক্ষণীয় অধ্যায়কে পদ্যে ঢেলে সাজাবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। 'কিতাবুস্ সরফের' সমস্যাবলী সম্পর্কে তাঁর পদ্যে লিখিত একখানা পুস্তকও পাওয়া যায়। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর সালাতের ইমাম খাজা মুহাম্মদ এবং খাজা মুহাম্মদ মূসা হযরত শায়খ বদরুদ্দীন ইবন ইসহাকেরই সাহেবযাদা ছিলেন। ৬৯০ হিজরীর ৬ই জমাদিউছ ছানী তাঁর ওফাত হয়।[১]

শায়খ 'আরিফকে হযরত খাজা শায়খ ফরীদুদ্দীন (র) খিলাফত প্রদান করে সিবিস্তান পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তিনি এ খিলাফতনামা স্বীয় শায়খ (র)-কে এই বলে ফিরিয়ে দেন যে, এ বড় নাযুক দায়িত্ব। তিনি এতবড় দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত নন। শায়খ (র)-এর দু'আ ও অনুগ্রহই তাঁর জন্য যথেষ্ট। অতঃপর শায়খ (র)-এর এজাযত নিয়ে হজ্জ-পর্ব সমাধা করবার নিয়তে তিনি বায়তুল্লাহ্ শরীফ রওয়ানা হন। পরে সেখান থেকে আর ফিরে আসেন নি।[২]

---

১. নু'যহাতুল খাওয়াতির।

২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১৮৪ ও ১৮৫।

শায়খ কবীর 'আলাউদ্দীন 'আলী ইবন আহমদ সাবির ইসরাঈল বংশীয় ছিলেন। নির্জনবাস এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও রিযামন্দী লাভের উদ্দেশ্যে দুরূহ সাধনায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। পীরান কলীর নামক স্থানে ইবাদত, জনসেবা এবং আত্মোন্নতির ভেতর মশগুল থেকে ১৩ই রবিউল আওয়াল, ৬৮১ হিজরী অথবা ৬৯০ হিজরীতে তিনি ওফাত পান। হযরত শায়খ শামসুদ্দীন তুর্ক পানিপথী এঁরই খলীফা ছিলেন।[১]

সুলতানুল মাশায়িখ হযরত শায়খ নিজামুদ্দীন (র) চিশতিয়া সিলসিলার প্রথম বুযুর্গ যাঁর প্রভাব-বলয় ও প্রতিপত্তি নিজের জীবদ্দশায়ই সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে এবং যিনি ভারতবর্ষের ইসলামী সমাজ জীবনকেও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেন। রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ ও দরিদ্রের পর্ণ কুটির জীবন পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি নিজেকে শ্রদ্ধাশীল করে তোলেন। তিনি ভারতবর্ষের বুকে তরীকতের প্রথম শায়খ ও আধ্যাত্মিকতার পথপ্রদর্শক (মুরশিদ) যাঁর সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য জীবনী পাওয়া যায়।

---

১. নুযহাতুল খাওয়াতির। আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, শায়খ 'আলী আহমদ সাবিরের অবস্থা সম্পর্কে সমসাময়িক বর্ণনা ও ইতিহাস নীরব। সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে আমীর খোরদ তাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলেন যে, শায়খ 'আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (র) সন্দেহ পোষণ করেন যে, এটা হযরত শায়খ 'আলী আহমদ সাবির পীরান কলীরীর বর্ণনা অথবা এ নামেরই অপর কোন বুযর্গ ব্যক্তির বর্ণনা। আমীর খোরদ বলেন ঃ

"অধম নিজ ওয়ালিদ (র)-এর কাছ থেকে শুনেছে যে, একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দরবেশ ছিলেন যাঁকে 'আলী আহমদ সাবির বলা হ'ত। তিনি দরবেশীতে অটল ও মযবুত নিসবত ও প্রভাবসম্পন্ন এবং ডিগ্রী নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন (র)-এর মুরীদ ছিলেন এবং তিনি তাঁকে বায়'আত গ্রহণের এজাযতও দিয়ে রেখেছিলেন।

সমসাময়িক কিংবা নিকটবর্তীকালের বর্ণনায় তাঁদের বর্ণনা থাকুক আর নাই থাকুক কিংবা ছিটেফোঁটা ও সংক্ষিপ্ত থাকুক, তাদের সিলসিলার মহান বুযর্গগণের অবস্থাদি, উচ্চ মর্যাদা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে আসন, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের এই সিলসিলার জনপ্রিয়তার ওপর ঐকমত্য এবং সারা দুনিয়ায় এর ফয়েয ও বরকত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সাক্ষী যে, এই সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা অত্যন্ত উচ্চ মকাম, উচ্চ নিসবতের অধিকারী, অধিকন্তু আল্লাহ্ পাকের নিকট মকবূল ও প্রিয় বান্দারূপে গৃহীত। ইতিহাসের সাক্ষ্যও এর থেকে বড় হতে পারে না। এটাই ইতিহাসের প্রথম অসতর্কতা ও ভুল নয়। প্রাচীনকালে বহু কামিল ব্যক্তি এমনও অতিক্রান্ত হয়ে গেছেন যাঁরা ইতিহাসের তীক্ষ্ণদৃষ্টি থেকে এড়িয়ে গেছেন এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছেন।

এই সিলসিলায় (সাবিরিয়া চিশতিয়া) বড় বড় ও বিরাট মাশায়িখ, 'আরিফ, মুহাক্কিক ও সংস্কারক জন্মেছেন। যেমন হযরত মাখদূম আহমাদ 'আবদুল হক রুদাওলভী (র) যাঁর পবিত্র বরকতময় সত্তাকে কতক পণ্ডিত ও বিজ্ঞজন নবম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হিসেবে গণ্য করেছেন, হযরত শায়খ

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অপরদিকে তাঁর পীর ও মুরশিদগণ লিখিত কোন কিছুই রেখে যান নি। তাঁদের খলীফাবর্গও স্বীয় পীর ও মুরশিদগণের মলফুযাত ও জীবনের ঘটনা ও অবস্থাদি না সংগ্রহ করেছেন, আর না তাঁরা স্বীয় শায়খ ও মুরশিদগণের মালফূযাত ও জীবনীর সংকলন তৈরি করেছেন।[১] কিন্তু তাঁর মলফূযাত ও জীবনী সংকলনের বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দু'টো মূলবান, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য উৎস রয়েছে। তন্মধ্যে একটি ফাওয়ায়িদুল ফুওয়াদ-আমীর হাসান 'আলা সিজযী (মৃত্যু ৭৩৭ হিজরী) এটি রচনা করেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর

(পূর্বের পৃষ্ঠার পর) আবদুল কুদ্দুস গংগুহী (র), হযরত শায়খ মুহিবুল্লাহ এলাহাবাদী (র), শায়খুল 'আরব ওয়াল আজম হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র), কুতুবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী (র), কাসিমুল 'উলুম হযরত মাওলানা কাসিম নানূতবী (র) যিনি দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী (র), হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (র), হযরত খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (র), হযরত শায়খ 'আবদুর রহীম রায়পুরী (র), হযরত মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী (র), হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস কানদেহলভী (র), শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কানদেহলভী (র) প্রমুখ। আমাদের এ যুগেও আল্লাহ্ তা'আলা এই সিলসিলা দ্বারা দীন ইসলামের হিফাযত ও বিশ্বব্যাপী রেনেসাঁর কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। এ মুহূর্তে সবচেয়ে ব্যাপক ও কার্যকরী এই সিলসিলা জোরদারভাবে সক্রিয়। দারুল উলুম দেওবন্দ এবং মাজাহিরুল 'উলুম সাহারানপুরের তা'লিমী খিদমত, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-এর লেখনী ও মাওয়া'ইজ গ্রন্থসমূহ ও সর্বশেষ মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (র)-এর দাওয়াত ও তাবলিগী আন্দোলন অভিযানের দ্বারা এই সিলসিলার ফয়েয দুনিয়াব্যাপী প্রসার লাভ করেছে। অধ্যাপক খালীক আহমদ নিজামী 'তারীখে মাশায়িখে চিশ্‌ত' (চিশতিয়া তরীকার মহান বুযর্গদের ইতিহাস) নামক গ্রন্থে বলেন ঃ বিগত শতাব্দীগুলিতে কোন বুযর্গই চিশতিয়া সিলসিলার সংস্কারমূলক মৌলিক নীতিগুলি এমনভাবে চুষে নিতে সক্ষম হয়নি যেমনটি মাওলানা মুহাম্মাদ ইলয়াস (র) সক্ষম হয়েছেন। (২৩৪ পৃ.)

আজও রায়পুরে হযরত মাওলানা আবদুল কাদির সাহেবের খানকাহ্ চিশতিয়া সিলসিলার প্রাচীন খানকাহ্গুলির একাগ্রতা, কর্মতৎপরতা, আল্লাহ্‌র স্মরণে নিমগ্নতা, প্রেম ও প্রীতির ও ব্যথা-বেদনার কর্ম কোলাহলের স্মৃতিকেই জীবন্ত করে তোলে। আফসোস যে, হযরত মাওলানা 'আব্দুল কাদির সাহেবের ওফাতের পর এ খানকাহ্টিও প্রাচীন অবলুপ্ত খানকাহ্গুলির তালিকায় স্থান পেয়েছে। "আল্লাহ্ ব্যতীত প্রতিটি বস্তুই ধ্বংসশীল।"—আল-কুরআন।

১. হযরত নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র)-এর মলফূযাত-খায়রুল মাজালিসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার হযরত পীর ও মুরশিদ জনাব সুলতানুল আওলিয়া কুদ্দিসাল্লাহু সিররুহুল 'আযীয বলেন, আমি কোন কিতাব প্রণয়ন করি নাই এজন্যই যে, খিদমতে শায়খুল ইসলাম হযরত ফরীদুদ্দীন (র), শায়খুল ইসলাম হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র) এবং বাকী অন্যান্য চিশতিয়া তরীকার বুযর্গগণ যাঁরা আমাদের শেজরার অন্তর্গত, কেউই কোন কিতাব প্রণয়ন করেন নাই। খায়রুল মাজালিস-এর অনুবাদ সিরাজুল মাজালিসের ৩৫ পৃ.।

প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা শুনেছেন এবং এর সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন। তাঁর সাথী ও খাদিমবৃন্দও এর বিশুদ্ধতাকে সাধারণভাবে স্বীকার করেছেন এবং একে জীবনের ওসীলা ও তাবিযরূপে গ্রহণ করেছেন।[১]

দ্বিতীয়, সিয়ারুল আওলিয়া; আমীর খোরদ সায়্যিদ মুহাম্মাদ মুবারক 'আলভী কিরমানী (মৃত্যু ৭৭০ হিজরী) এটি রচনা করেন। আমীর খোরদ খোরদসালগীতে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর হাতে বায়'আত হন এবং তাঁর সাহচর্য ও সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। এরপর হযরত শায়খ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লীর হাতে বায়'আত হন। তাঁর পিতা নুরুদ্দীন মুবারক ইবন সায়্যিদ মুহাম্মদ কিরমান (মৃত্যু ৭৪৯ হিজরী) হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর পুরনো বন্ধু ও একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। এ কিতাবের অধিকাংশ বর্ণনা তাঁর থেকেই নেওয়া হয়েছে। স্বীয় শায়খ হযরত নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র)-এর থেকে শোনা বহু বর্ণনাও এতে লিপিবদ্ধ করেছেন। নিজের চোখে দেখা অবস্থাদি ও নিজ কানে শোনা মলফূযাতও এতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর জীবন ও ঘটনাপঞ্জী, তাঁর শ্রেষ্ঠতম খলীফাদের অবস্থা ও কামালিয়াতের এটাই বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য সংকলন। উল্লিখিত দু'টি কিতাবের ফলেই বিশেষ করে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর জীবন ও অবস্থাদি, ঝোঁক ও স্বাভাবিক প্রবণতা, তা'লীম ও তরবিয়তের প্রক্রিয়া, সংস্কার ও প্রচারধর্মী নিরলস প্রয়াস ও সাধনা, তাঁর ফয়েয ও বরকত এবং প্রভাবপঞ্জী সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং ইতিহাসের উজ্জ্বলতর লেখনীমালার মধ্যে তা বন্দী হয়ে পড়ে।

এ মহান ব্যক্তির মর্যাদা ও প্রভাব, বিভিন্ন অবস্থা ও উৎসমূলের সহজপ্রাপ্যতার কারণে, ইসলামী রেনেসাঁর ইতিহাসের কেন্দ্রীয় ও যুগনায়ক ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাঁর সত্তাকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

---

১. এতে ৩রা শা'বান, ৭০৭ হিজরী থেকে ৯ই শা'বান, ৭২০ হিজরী পর্যন্ত বিভিন্ন মজলিসের মলফূযাত সংকলিত হয়েছে।

হযরত শায়খ খাজা
নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র.)

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুলতানুল মাশায়িখ হযরত নিজামুদ্দীন (র)-এর জীবনী ও কামালিয়াত

নাম মুহাম্মাদ, নিজামুদ্দীন উপাধিতে সাধারণ্যে খ্যাত ও পরিচিত। পিতার নাম আহমদ ইবন 'আলী। তিনি ইমাম হুসায়ন (রা)-এর বংশধর ছিলেন। মাতামহ সায়্যিদ বংশোদ্ভূত ছিলেন। পিতামহ খাজা 'আলী এবং মাতামহ খাজা 'আরব দু'জনেই একই পিতামহের পৌত্র ছিলেন। উভয়ই বুখারা থেকে এসে কিছুদিন লাহোরে অবস্থান করার পর সেখান থেকে বদায়ূন আসেন।

৬৩৬ হিজরীতে তিনি বদায়ূনে জন্মগ্রহণ করেন।[১] বদায়ূন (প্রাচীন বদাউন)[২] অভিজাত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের আবাসভূমি ছিল। বহু নেতৃস্থানীয়, সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় বুযর্গ ইরান ও খুরাসান প্রভৃতি স্থান থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর বয়স হিসাব করে উপরিউক্ত জন্ম সনকেই নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন।

২. বদাউন রোহিলাখণ্ডের সুঠ নদীর বাম তীরে অবস্থিত। সে যুগে জনবসতিপূর্ণ ও জৌলুসপূর্ণ স্থান ছিল। দিল্লীর জন্য সীমান্ত শহর হিসেবে বিবেচিত হত। সেজন্য পুরাতন দিল্লীর একটি দরজার নামই ছিল বদাউন দরজা (নুযহাতুল খাওয়াতির)।

বদাউন কেল্লার বর্তমান ধ্বংসাবশেষ তার অতীত মর্যাদা ও সুদৃঢ় ভিত্তির স্বাক্ষর বহন করছে। ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মুহাম্মাদ ঘোরীর প্রধান সেনাপতি কুতবুদ্দীন আয়বক একে জয় করেন এবং আপন ক্রীতদাস মালিক শামসুদ্দীন আলতামাশকে বদাউনের আমীর (শাসনকর্তা) নিযুক্ত করেন। আল তামাশ এখানে ১২২২ খ্রিস্টাব্দে একটা সুদৃশ্য ও প্রশস্ত মসজিদ নির্মাণ করান যা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। দিল্লীর দু'জন বাদশাহ আলতামাশ এবং তাঁরই পুত্র রুকনুদ্দীন ফিরোয শাহ উভয়েই সিংহাসনে আসীন হবার পূর্বে বদাউনের গভর্নর ছিলেন (ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, বুদায়ল বদাউন)। 'দীনি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন উক্তি' নামক মওলবী শফী এম.এ. কৃত গ্রন্থ থেকে বর্ণিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪১।

প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

হযরত নিজামুদ্দীন পাঁচ বছর বয়সে পিতৃহীন হন। তাঁর সৎকর্মশীলা ও আল্লাহ্‌ভক্ত মা এই ইয়াতীম শিশুর প্রতিপালন এবং ধর্মীয় ও নৈতিক প্রশিক্ষণ পুরুষোচিত সাহসিকতা ও প্রিতৃস্নেহে সম্পন্ন করেন। কিতাব পড়বার মত বয়সে উপনীত হলে তিনি মাওলানা 'আলাউদ্দীন উসূলীর[১] সামনে নীত হন এবং ফিকহ্‌-এর প্রাথমিক কিতাবাদির শিক্ষা সেখানেই লাভ করেন। কুদুরী সমাপ্ত করার পর মাওলানা 'আলাউদ্দীন বললেন, "মাওলানা নিজামুদ্দীন! এখন শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও ফযীলতের পাগড়ী মাথায় বাঁধো!" ঘরে এসে তিনি মাকে জানালেন, উস্তাদ তাকে দস্তারবন্দীর হুকুম দিয়েছেন। এখন দস্তার কোত্থেকে আনি। মা বললেন, 'বাবা! নিশ্চিত থাক, আমিই তার বন্দোবস্ত করব।' অতঃপর তূলা ক্রয় করে সুতা কাটিয়ে পাগড়ী বানিয়ে দিলেন।[২] এতদ্‌সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে 'উলামায়ে কিরাম ও সে যুগের সৎকর্মশীল মহান ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানান হয়। শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযী (র)-এর মুরীদ খাজা 'আলী এক প্যাঁচ বাঁধেন এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীবৃন্দ তাঁর কল্যাণকর জ্ঞান ও সার্বিক পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য দু'আ' করেন।[৩]

কঠোর দারিদ্র্য ও মা'য়ের প্রশিক্ষণ

ছোট অথচ অভিজাত পরিবার যা পিতার স্নেহচ্ছায়া থেকে বঞ্চিত– দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ সইবে, তাতে আর বিচিত্র কি! আর এতে নতুনত্বেরও তেমন কিছু নেই। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) বলেন, মা'র অভ্যাস ছিল, যেদিন আমাদের ঘরে রান্না করবার মত কিছুই থাকত না তখন তিনি বলতেন ঃ আমরা আজ সবাই আল্লাহ্‌র মেহমান। আমি একথা শুনে বড়ই মজা পেতাম। একদিন আল্লাহ্‌র জনৈক বান্দাহ স্বল্প পরিমাণের খোরাক ঘরে পৌঁছিয়ে যায়। পর পর বেশ কয়দিন তা দিয়ে রুটি প্রস্তুত হতে থাকে। আমি শেষ পর্যন্ত হাঁপিয়ে উঠলাম এবং এই আশায় থাকলাম, ওয়ালিদা সাহেবা কখন বলেন যে, আজ আমরা সবাই আল্লাহ্‌র মেহমান। শেষাবধি সে খোরাকীর শেষ দানাটুকু শেষ হবার পর আমার ওয়ালিদা সাহেবা বললেন, 'আজ আমরা সবাই আল্লাহ্‌র মেহমান।' এ কথা শোনায় যে পরিমাণ মজা ও আনন্দ পেয়েছিলাম তা বর্ণনাতীত।[৪]

---

১. মাওলানা আলাউদ্দীন 'আলী আল-উসূলী শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযী (র)-এর মুরীদ ছিলেন। স্বীয় শায়খ হযরত জালালুদ্দীন তাবরিযী (র)-এর পদাংক অনুসরণের ওপর প্রচ্ছন্ন অবস্থা ও রহস্যের খুবই প্রচেষ্টা (ইহতিমাম) ছিল। সবর ও রেযামন্দী (ধৈর্য ও সন্তুষ্টি) সহকারে জীবন যাপন করতেন এবং সব সময় পরোপকার অথবা 'ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন (নুযহাতুল খাওয়াতির, ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদের বরাতে)।

২. খায়রুল মাজালিসের অনুবাদ সিরাজুল মাজালিস, পৃ. ১৪৫।

৩. ঐ, পৃ. ৯৬। ৪. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১১৩।

শায়খুল কবীর[১] হযরত শায়খ ফরীদ (র)-এর সাথে সম্পর্ক এবং আন্তরিক মিল-মুহব্বত

হযরত খাজা শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) বলেন, আমি তখন ছোট ছিলাম। বয়স সম্ভবত বারো বছর কিংবা তার কিছু বেশি অথবা কম। তখন আমি অভিধান পড়তাম। আবূ বকর খাররাত নামে প্রখ্যাত এক ব্যক্তি, কেউ কেউ আবূ বকর কাওয়ালও বলেন, আমার উস্তাদের নিকট আসেন। তিনি মুলতান হয়ে আসছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী (র)-এর নিকট থেকে আসছি। এর পর তিনি তাঁর মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও গুণ- বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ওখানকার জনগণ সর্বদা আল্লাহ্র যিকরকারী, তাঁরই ধ্যানে মশগুল, সাথে সাথে বহুবিধ নফল বন্দেগীতে এমতরূপ মগ্ন এবং সেখানে যিকরের পরিবেশ এমনই যে, ঘরের চাকরাণী, সেবিকা ও দাসী-বান্দীরা পর্যন্ত যাঁতায় গম পিষতে পিষতে যিকরে ইলাহীতে নিমগ্ন থাকে এবং এ ধরনের আরও অনেক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনাই তিনি দিচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর কোন জিনিসই আমার অন্তরে স্থান পাচ্ছিল না। এরপর লোকটি বলা শুরু করল যে, তারপর আমি সেখান থেকে আজুদহন আসলাম। সেখানে আমি এমত দীনদার বাদশাহ্র সাক্ষাত পেলাম। লোকটি শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরীদুদ্দীন (র)-এর কথা আলোচনা করলেন। এটা শুনতেই আমার অন্তরমানসে প্রেম ও প্রীতির ফল্গুধারা স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় উৎসারিত হয় এবং তাঁর মুহব্বত ও অন্তরের আকর্ষণ এমনতরভাবেই স্থান করে নেয় যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর নাম নিতেই আমি স্বাদ অনুভব করতাম এবং আমি প্রতিটি সালাতের পরই আনন্দ ও উল্লাস সহকারে তাঁর নাম জপতাম।[২]

দিল্লী ভ্রমণ

ষোল বছর বয়সে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) বদায়ূন থেকে দিল্লী এসে উপস্থিত হন।[৩]

---

১. এই পুস্তকে শায়খুল কবীর বলতে প্রত্যেক স্থানে শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-কে বুঝানো হয়েছে।

২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১০০; ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃ. ১৪৯।

৩. এটা সিয়ারুল আওলিয়ার বর্ণনা, আর এটাই সহীহ্ ও শুদ্ধ বলে মনে হয়। কেননা দিল্লীতে তিন-চার বছর ছাত্রজীবন কাটানোর পর খাজা সাহেব আজুদহন যান এবং হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন (র)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। বায়'আতের সময় তিনি বিশ বছর বয়সের ছিলেন বলে জানিয়েছেন। (সিরাজুল আওলিয়া, পৃ. ১০৭)।

দিল্লীতে ছাত্রজীবন

তিনি দিল্লী এসে শিক্ষা গ্রহণের ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন। এ সময়সীমা ছিল তিন থেকে চার বছর। দিল্লীতে সে সময় বহু প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ বর্তমান ছিলেন।[১] এটা ছিল সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমূদের রাজত্বকাল এবং তৎকালীন উযীরে আযম ছিলেন গিয়াছুদ্দীন বলবন। মাওলানা শামসুদ্দীন খারিযমী যিনি মুস্তাওফিল মামালিক হয়ে শামসুল-মুলক উপাধি লাভ করেন। তিনি শিক্ষকদেরও মহান উস্তাদ-এর মর্যাদা রাখতেন। সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদের যিম্মাদারী এবং নানাবিধ ব্যস্ততার সাথে সাথে তিনি সে যুগের 'আলিম-'উলামার মত পঠন-পাঠনের দায়িত্বও পালন করেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) ছিলেন তাঁর অন্যতম ছাত্র।

উস্তাদের প্রিয়পাত্র

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর সাথে মাওলানা শামসুদ্দীনের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। আর তিনি ছিলেন তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় শাগরিদ। তিনি নিজে যে বিশেষ হুজরায় পড়াশুনা করতেন, সেখানে আর কোন শাগরিদের প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু খাজা নিজাম (র) এবং তাঁর দু'জন বন্ধু মাওলানা কুতুবুদ্দীন নাকিল এবং মাওলানা বুরহানুদ্দীন বাকী ছিলেন এর ব্যতিক্রম।[৩]

খাজা শামসুল মুলকের অভ্যাস ছিল, যদি কোন শাগরিদ অনুপস্থিত থাকত কিংবা দেরী করে আসত, তবে তিনি বলতেন, শেষ পর্যন্ত আমার এমন কোন ক্রটি হয়েছে যে জন্যে আপনি আসেন নি। হযরত খাজা স্বয়ং এ কাহিনী বলতে গিয়ে মুচকি হেসেছেন এবং বলেছেন যে, যদি তিনি কখনও কাউকে ঠাট্টা করতে চাইতেন তবে বলতেন, আমার দ্বারা এমন কী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে যে, আপনারা আসেন নি? কিন্তু আমি কখনো উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে কিংবা দেরী করে এলে আমার অন্তরে উদিত হত যে, তিনি আজ আমাকেও এমনটি বকবেন। কিন্তু আমাকে দেখামাত্রই নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করতেন ঃ

اخر کم از انکہ گاہ گاہے - ائ وبما کنی نگاہے

এটা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠত এবং সমস্ত শ্রোতার ওপর কান্নাবস্থা দেখা দিত। তিনি এও বলেন যে, তিনি তাঁর নিজস্ব হুজরায়

---

১. দেখুন, কাযী যিয়াউদ্দীন বারনীকৃত তারীখে ফীরোযশাহী, পৃ. ১১২।

২. এটা ছিল হিসাব বিভাগীয় প্রধান বা একাউনট্যান্ট জেনারেলের পদ যা বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিকেই দেওয়া হত।

৩. সিয়ারুল 'আরেফীন।

আমাকে সাথে বসাতেন। আমার শত আপত্তি সত্ত্বেও তিনি তা মঞ্জুর করতেন না।[১]

জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অগ্রাধিকার

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) লেখাপড়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ প্রদত্ত অসামান্য প্রতিভা ও ধী-শক্তি দ্বারা সহপাঠীদের ভেতর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অগ্রাধিকার লাভ করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিতর্ক ও প্রশ্নোত্তরে (যা প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল) তাঁর বাকপটুতা ও বাকচাতুর্যের এবং প্রমাণপঞ্জী উপস্থাপনা শক্তির এমনই প্রকাশ ঘটে যে, তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত যে সমস্যা ও প্রশ্নের ওপরই আলোচনা করতেন অন্যান্য ছাত্র তাতে লা-জওয়াব হয়ে যেত এবং গোটা বিতর্ক ও প্রশ্নোত্তর সভায় তাঁর জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা ও প্রতিভার স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত। অতঃপর তাঁর সহপাঠীরা তাঁকে মাওলানা নিজামুদ্দীন 'বাহ্হাছ' (বাগ্মী) এবং মাওলানা নিজামুদ্দীন 'মাহফিল শিকন্' (মাহফিল ও বৈঠক চূর্ণ-বিচূর্ণকারী) উপাধিতে সম্বোধন করতে থাকে।[২]

'মাকামাত' কণ্ঠস্থ ও এর কাফফারা

সে যুগের পাঠ্যতালিকায় 'আরবী সাহিত্যের প্রখ্যাত পুস্তক 'মাকামাতে হারীরী' অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাধারণভাবে ছাত্ররা পুস্তকটির মর্মোদ্ধার এবং তার কঠিন শব্দ ও বাক্যসমষ্টি মুখস্থ করাকেই যথেষ্ট মনে করত। কিন্তু হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) তাঁর সীমাহীন জ্ঞানস্পৃহা, উচ্চ মনোবল ও সাহসিকতার দ্বারা এর চল্লিশটি মাকামাই মুখস্থ করে ফেলেন। পরে এরই কাফফারাস্বরূপ হাদীছের মশহূর কিতাব 'মাশারিকুল আনওয়ার' মুখস্থ করেন।[৩]

হাদীছের এজাযত প্রাপ্তি

তিনি কামালুদ্দীন যাহিদ (মৃত্যু ৬৮৪ হিজরী) নামে বিখ্যাত সে যুগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ শায়খ মুহাম্মাদ ইবন আহমদ আল-মারিকলী-এর নিকট হাদীছ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি 'মাশারিকুল-আনওয়ার' প্রণেতা আল্লামা হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আস্-সাগানীর সরাসরি ছাত্র ছিলেন। 'ইল্মে ফিকহ্তে (ইসলামী আইন শাস্ত্রে) তিনি একই সূত্রে 'হিদায়া' প্রণেতা 'আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল- মারগিনানীর ছাত্র

---

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃ. ৬৮।

২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১০১।

৩. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১০১।

ছিলেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) তাঁর নিকট থেকে মাশারিকুল-আনওয়ারের দর্‌স গ্রহণ করেন এবং হাদীছ সম্পর্কে এজাযত লাভ করেন।[১]

অন্তরের অস্থিরতা এবং আল্লাহ্‌র দিকে ধাবমানতা

হযরত খাজা নিজাম (র) যদিও সমগ্র দেহ-মন দিয়ে শিক্ষা অর্জনের পেছনে নিমগ্ন ছিলেন এবং তাঁর উঁচু মনোবল ও সাহসিকতা এবং অটুট ও সুদৃঢ় সংকল্প এক্ষেত্রে কোনরূপ অলসতা ও গাফিলতির প্রশ্রয় দেবার পক্ষপাতী ছিল না, তথাপি তাঁর অন্তর-মানস অন্য কোন বস্তু অধীর আগ্রহে খুঁজে ফিরছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা এবং প্রকাশ্য জ্ঞানরাজ্যের উন্মুক্ত পরিবেশে তাঁর প্রকৃতি ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে যেত। একদিন তিনি বলেন ঃ যৌবনে যখন লোকজনের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিলাম এবং তাদের সাথে উঠাবসা করতাম, তখন সর্বদাই নিজেকে ভারাক্রান্ত মনে হত এবং মনে মনে বলতাম, কখন আমি এ সমস্ত লোকের মাঝ থেকে চলে যেতে পারব–যদিও এ সমস্ত লোক ছিলেন শিক্ষিত ও সুধীজন এবং তাঁরা সর্বদা জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন বিষয় ও শাখা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন, তথাপি অধিকাংশ সময়ই তাদের প্রতি আমার প্রকৃতি থাকত চরমভাবে বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ। আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের বলতামঃ দেখ, আমি কিন্তু চিরদিনই তোমাদের মাঝে থাকব না। কিছুদিন তোমাদের এখানে আমি মেহমান মাত্র। আমীর হাসান 'আলা সিজযী (র) বলেন, "আমি আরয করলাম, এটা কি শায়খুল ইসলাম হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন (র)-এর খিদমতে হাযির হবার পূর্বেকার ঘটনা?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।"

ওয়ালিদা সাহেবার ইন্তিকাল

দিল্লীতে অবস্থানকালীন হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর শ্রদ্ধেয়া ওয়ালিদা সাহেবা ইন্তিকাল করেন।

মা'য়ের স্মৃতি স্মরণ

অনেককাল পর একদিন হযরত খাজা (র) স্বীয় মা'য়ের ইন্তিকালের কথা বর্ণনা করেন। বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি এমত পরিমাণ কেঁদেছিলেন যে, অতিরিক্ত কান্নার ফলে তিনি যা কিছুই বলছিলেন পুরাপুরি বোঝা যাচ্ছিল না।

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১০৫। এজাযতনামা আরবীতে লিখিত এবং সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে তা অবিকল উদ্ধৃত করা হয়েছে। এজাযতনামা ২২শে রবিউল আওয়াল, ৬৭১ হিজরীতে প্রদত্ত। যার অর্থ এই যে, যখন তিনি এজাযতনামা পান তখন তাঁর বয়স (জন্ম তারিখ ৬৩৬ হিজরী হিসাবে) ৪৩ বছর ছিল এবং এ ঘটনা শায়খুল কবীর হযরত শায়খ ফরীদ (র)-এর ওফাতের ১৩ বছর পরের ঘটনা এবং সে সময়কার ঘটনা, যখন তিনি নিজেই জনগণের হিদায়াত ও ইরশাদ এবং তা'লীম ও তরবিয়তের আসনে সমাসীন এবং তাঁর খ্যাতি দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।

আল্লাহ্র প্রতি মা'য়ের ইয়াকীন ও তাওয়াক্কুল

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) বলেন, "একদিন নতুন চাঁদ দেখে মা'য়ের খিদমতে হাযির হলাম এবং কদমবুসি করলাম। অতঃপর পবিত্র চাঁদ দেখার শুভ সংবাদ বরাবরের মতই পেশ করলাম। তিনি বললেন, 'আগামী মাসে চাঁদ দর্শন উপলক্ষে কার কদমবুসি করবে?' আমি বুঝে ফেললাম যে, ইন্তিকালের মুহূর্ত সমাগত। দুঃখ ও বিষাদে আমার অন্তর-মন ভরে গেল। আমি কাঁদতে শুরু করলাম। আমি বললাম, 'আম্মা! এ অধম ও গরীব বেচারাকে কার কাছে সোপর্দ করে যাচ্ছেন?' তিনি উত্তরে জানালেন, এর জবাব আগামীকাল পাবে। আমি আপন মনেই বললাম এ মুহূর্তেই কেন তিনি জবাব দিচ্ছেন না। তিনি এও বললেন, 'যাও! আজ রাত শায়খ নাজীবুদ্দীনের ওখানেই কাটাবে।' মা'য়ের নির্দেশ মুতাবিক আমি সেখানেই গেলাম। শেষরাত্রে ভোরের দিকে ঘরের সেবিকা দৌড়াতে দৌড়াতে এসে ডেকে বলল, বিবি সাহেবা তাঁকে ডাকছেন। আমি ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সব খবর ভাল তো? সে 'হ্যাঁ' বলায় আমি নিশ্চিন্তে মা'য়ের খিদমতে হাযির হলে তিনি বললেন, 'গতকাল তুমি আমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করেছিলে আর আমি তার জবাব দেবার ওয়াদাও করেছিলাম। এখন আমি তার জবাব দিচ্ছি। মনোযোগ সহকারে শোন।' তিনি বললেন, 'তোমার ডান হাত কোন্‌টি?' আমি আমার ডান হাত বাড়িয়ে দিলাম। তিনি আমার ডান হাত নিজের হাতের মুঠোর ভিতর টেনে নিলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ্ পরওয়ারদিগার। একে তোমার হাতেই সোপর্দ করছি। একথা বলেই তিনি ইন্তিকাল করলেন। আমি এতে আল্লাহ্ পাকের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করলাম আর আপন মনেই বললাম যে, আমার আম্মা যদি স্বর্ণ ও মণিমুক্তায় পূর্ণ একটি ঘরও আমার জন্য রেখে যেতেন তবুও আমি এত খুশি হতাম না।"[১]

একটি ভুল আকাঙ্ক্ষা

সে সময় রাজধানী দিল্লীর আকাশে-বাতাসে, বিশেষ করে ছাত্র ও বিদ্বানমণ্ডলীর গোটা সমাজে বিচার ও ফতওয়া বিভাগ সম্পর্কিত আলোচনা ও চর্চা এবং এসব পদে 'আলিম-'উলামার নিযুক্তি এবং কাযী ও মুফতীদের জাঁকজমক ও জৌলসপূর্ণ জীবন-যাপন, উপরন্তু ধন-দৌলতের কিস্সা-কাহিনীতে ছিল সরগরম। হযরত খাজা নিজাম (র)-এর প্রকৃতিগত সৌভাগ্য এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক যোগ্যতা সত্ত্বেও এ সময় তাঁর বয়স ছিল কম। জ্ঞানগত বৈশিষ্ট্য এবং

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ১৫১।

জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে অভাব-অনটন তথা দারিদ্র্যের কারণে তাঁর মনে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ পদলাভের কামনা-বাসনা যদি জেগেই থাকে তবে তা মানবীয় প্রকৃতির পক্ষে একেবারে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। একদিন তিনি শায়খ নাজীবুদ্দীন মুতাওয়াক্কিল (র)-এর নিকট গিয়ে আরয করলেন, "দু'আ' করুন যেন আমি কাযী হতে পারি।" শায়খ নাজীবুদ্দীন কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) মনে করলেন, হয়ত তিনি শুনতে পাননি। দ্বিতীয় বার কিছুটা উচ্চ শব্দে বললেন, "আমি আপনার নিকট দু'আ'র দরখাস্ত করছি যেন কোথাও কাযী হয়ে যেতে পারি।" শায়খ উত্তর দিলেন, "অন্য আর যাই কিছু হও, কাযী হয়ো না।"[১]

আজুদহনে প্রথমবার উপস্থিতি

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) আজুদহন গিয়ে উপস্থিত হবার পূর্বেই দিল্লীতে শায়খুল কবীর (র)-এর আপন ভাই খাজা নাজীবুদ্দীন মুতাওয়াক্কিল (র)-এর সাথে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁর সাথে বেশ কিছুকাল অবস্থানও করেছিলেন। তাঁর সাহচর্য ও আলাপ-আলোচনা শায়খুল কবীর হযরত খাজা শায়খ ফরীদ (র)-এর প্রতি প্রীতি ও মুহব্বতের সে স্ফুলিংগ— যা অল্প বয়সে এবং বদায়ূনে অবস্থানকালীন সময়ে তাঁর রক্ত-মাংসে মিশে গিয়েছিল—প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে ও নতুন বিপ্লব সৃষ্টি করে। তিনি শায়খুল কবীর (র)-এর এর খিদমতে হাযির হবার অটুট সংকল্প গ্রহণ করেন এবং শেষাবধি হাযিরও হয়ে যান।

প্রার্থী, না প্রার্থনা পূরণকারী?

খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) এই মুলাকাত এবং প্রথমবারের উপস্থিতির অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে নিজেই বলেছেন যে, আমি যখন শায়খুল কবীর (র)-এর খিদমতে হাযির হই তখন তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবের কারণে আমি আমার বাকশক্তি হারিয়ে ফেলি। শুধুমাত্র কোনক্রমে এতটুকুই উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম, "কদমবুসি করতে অত্যন্ত আগ্রহী।" শায়খ (র) যখন দেখতে পেলেন আমি অত্যন্ত ভীত ও হতচকিত, তখন তিনি বললেন : لكل داخل دهشة প্রতিটি নবাগতই ভীত-বিহ্বল হয়ে থাকে।[২]

মুরীদকে সাদরে গ্রহণ

শায়খুল কবীর হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র) হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-কে অত্যন্ত সমাদর করেন। তিনি ইরশাদ করেন, "এই ভিনদেশী

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃ. ২৮।
২. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃ. ৩১।

ছাত্রটির জন্য জামাতখানায় যেন চারপায়ী বিছানো হয়।" হযরত খাজা নিজাম (র) বলেন, "যখন চারপায়ী বিছানো হল তখন আপন মনেই বললাম, আমি কখনোই চারপায়ীর ওপর বিশ্রাম নেব না। কত সম্মানিত মুসাফির, আল্লাহ্র কালাম পাকের কত হাফিয এবং আল্লাহ্র কত 'আশিক প্রেমিক ভূমিশয্যায় শায়িত– আর আমি চারপায়ীর ওপর কেমন করে শুই?" এ সংবাদ খানকাহ্র ব্যবস্থাপক মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাক পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুতেই তিনি বললেন, "তুমি নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করবে, না কি শায়খ (র)-এর নির্দেশ মান্য করবে?" আমি বললাম, "শায়খ (র)-এর নির্দেশই মান্য করব।" বললেন, "তবে যাও, চারপায়ীর ওপর শুয়ে পড়।"[১]

বায়'আত

এখানে উপস্থিত থাকাকালীন কোন এক মুহূর্তে যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে তিনি এসেছিলেন সে উদ্দেশ্য পূরণ করেন এবং শায়খুল কবীর (র)-এর হাতে হাত রেখে বায়'আত নেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল বিশ বছর।[২]

শিক্ষার ধারাক্রম অব্যাহত অথবা পরিত্যক্ত

সম্ভবত হযরত খাজা নিজামুদ্দীনের কতকগুলি কিতাব অধ্যয়ন তখনও বাকী ছিল। গভীর আগ্রহ ও স্পৃহা দাবি করছিল যেন পড়াশোনার পাট এখানেই চুকিয়ে দেয়া হয় এবং প্রকৃত 'ইল্ম ও আল্লাহ্র মারিফত (পরিচয়) লাভের পেছনেই জীবন ব্যয় করা হয় যা মানব সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য। শিক্ষা আহরণ ও শিক্ষা প্রদানের দীর্ঘ ধারাবাহিকতা প্রথমেও তাঁর সংবেদনশীল মন-মানসিকতা এবং সদাজাগ্রত আত্মার ওপর বোঝাস্বরূপ ছিল। কিন্তু প্রয়োজন ও আবশ্যকীয় মনে করে, কিন্তু অন্য কোন অবলম্বন খুঁজে না পেয়ে তিনি তাই আঁকড়ে ধরে ছিলেন। কিন্তু যখন 'ইল্মে য়াকীনের প্রতিষেধক এবং 'ইলমে হাকীকীর উৎসমূল মিলে গেল, তখন এ দীর্ঘ ধারাক্রম বজায় রাখা তাঁর স্বভাব ও প্রকৃতির ওপর দুর্বহ বোঝাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু যে শায়খ ও মুরশিদে কামিলের সাথে তিনি আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, তিনি আধ্যাত্মিক কামালিয়াত হাসিলের সাথে সাথে 'ইলমের দিক দিয়েও কামিল ছিলেন। তিনি তরীকতের 'ইল্ম হাসিলের জন্য আবশ্যকমত জাহিরী 'ইল্ম হাসিল করাকেও অত্যন্ত দরকারী ও অপরিহার্য মনে করতেন।

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১০৭।
২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১০৭।

স্বয়ং তাঁর শায়খ ও মুরশিদও এ হিদায়াত দান করেছিলেন। অতএব মাওলানা নিজামুদ্দীনের দ্বারা ইরশাদ (ধর্মীয় পথ-নির্দেশনা) এবং তরবিয়তের (নির্দেশিত পথের বাস্তব প্রশিক্ষণ) যে দুনিয়াব্যাপী দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া স্রষ্টার অভিপ্রেত ছিল, সেরূপ দায়িত্ব পালনের জন্য দরকার ছিল গভীর পাণ্ডিত্যের। এমনিতেও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও বিচক্ষণ শায়খ ও মুরশিদগণ আল্লাহ্র যিনি প্রার্থী–তাঁর গণ্ডী ও সীমারেখার দিকটিও দেখে থাকেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) বায়'আত গ্রহণের পর বললেন, "লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে দিয়ে কি নফল 'ইবাদত-বন্দেগী ও রিয়াযত-মুশাহাদায় লিপ্ত হয়ে পড়ব?" শায়খুল কবীর (র) বললেন, "আমি কাউকেই লেখাপড়া ও শিক্ষালাভের পথ ছেড়ে দিতে বলি না। ওটাও কর এবং এটাও কর অর্থাৎ লেখাপড়ার সাথেই আধ্যাত্মিক সাধনাও চালিয়ে যাও। দেখতে থাক কোনটি বিজয়ী হয়।" তিনি আরও বললেন ঃ "দরবেশের জন্যও অল্পবিস্তর 'ইলম হাসিল করা অবশ্যই উচিত।"[১]

শায়খুল কবীর (র) থেকে দর্স গ্রহণ

শায়খুল কবীর (র)-এর বিশেষ অনুগ্রহ ও খাস মেহেরবানী যে, তিনি স্বয়ং খাজা নিজাম (র)- কে সরাসরি নিজস্ব তত্ত্বাবধানে কতকগুলি বিষয় পড়াতে শুরু করেন। তিনি বলেন, "নিজাম। তোমাকে কিছু কিতাব আমার থেকেও পড়তে হবে।" অতঃপর শায়খগণের ইমাম হযরত শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ারদী (র)-এর তাসাওউফ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ কিতাব 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ'-এর দর্স দেওয়া শুরু করেন এবং ছয়টি অধ্যায় পড়ান। এ ছাড়াও আবূ শাকূর সালেমীর ভূমিকাও প্রথম থেকে শেষ অবধি পৃথক পৃথক পাঠ করে শিক্ষা দেন। অধিকন্তু তিনি 'ইলমে তাজবীদও শিক্ষা দেন এবং পবিত্র কুরআনুল করীমের ছয় পারা তাজবীদ সহকারে পড়ান।[২]

"দরস"-এর আনন্দ

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) বহুকাল অতীত হবার পরও উক্ত দরসের আনন্দ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতেন। তিনি বলতেন, "আওয়ারিফ-এর দর্স গ্রহণকালে যে সমস্ত হাকীকত ও গোপন রহস্য হযরত শায়খুল কবীর (র)-এর মুখ থেকে শুনেছিলাম তা আর কখনও শুনতে পারব না। হযরত শায়খ (র)-এর বর্ণনার যাদুকরী ক্ষমতা ও তার বিস্ময়কর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এমনি ছিল যে,

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১০৭।
২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ১০৬।

তিনি যখন ধর্মীয় ভাষণ দিতেন তখন কায়মনে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতাম–কত সুন্দর হ'ত যদি আমি এ অবস্থায় মারা যেতাম।[১]

আত্মবিলুপ্তির শিক্ষা

'আওয়ারিফ'-এর যে কপি দর্স প্রদানের সময় হযরত শায়খ (র)-এর হাতে থাকত তা ছিল কিছুটা ত্রুটিযুক্ত এবং লেখাগুলি ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কয়েক সবকের পরই এমন একটি জায়গা এল যেখানে শায়খ (র)- কে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তিত থাকতে হয়। হযরত খাজা নিজাম (সরলতা ও তারুণ্যের কারণে) বলে বসেন, "আমি শায়খ নাজীবুদ্দীন মুতাওয়াক্কিলের নিকট অন্য আর একটি কপি দেখেছি। উক্ত কপিটি বিশুদ্ধ ছিল"। শায়খুল কবীর (র) বললেন, "ফকীর-দরবেশদের ভুলত্রুটিযুক্ত কপি সংশোধনের ক্ষমতা নেই।" কয়েকবারই তিনি কথাটি আওড়াতে থাকেন। হযরত খাজা নিজাম (র) বলেন, প্রথমদিকে তো খেয়ালই করতে পারিনি। কিন্তু বারবার আওড়ানোর ফলে সহপাঠী মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাক আমাকে বললেন, "শায়খুল কবীর (র)-এর কথার লক্ষ্যস্থল তো তুমি।" হযরত খাজা নিজামুদ্দীনের তো তখন হুঁশ হারাবার উপক্রম। তিনি বলে ওঠেন, "না'উযুবিল্লাহ! এর দ্বারা হযরত শায়খুল কবীর (র)-এর ওপর আপত্তি উত্থাপন করা আমার মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না।" হযরত খাজা নিজাম (র) বলেন, "আমি বারবার ওযরখাহী করলাম, কিন্তু তাঁর বিমর্ষ ভাব দূর হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।" তিনি বলেন, "অবশেষে আমি সেখান থেকে উঠে গেলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম না আমার কি করা উচিত। সে দিন দুঃখ ও বিষাদের যে পাহাড় আমার ওপর ভেঙে পড়েছিল এবং সমস্ত দিনটা যেভাবে কেটেছিল, সম্ভবত আর কারও জীবনে তেমন দিন আসেনি। দুঃখ ও বিমর্ষচিত্তে বাইরে বেরিয়ে আসলাম। একবার এমনও মনে হয়েছিল যে, কুয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবনটাই শেষ করে দেই। কিন্তু শান্তভাবে চিন্তা-ভাবনার পর সে কল্পনা পরিত্যাগ করলাম। এরপর পেরেশান ও হয়রান অবস্থায় আমি জঙ্গলের দিকে চললাম এবং বহুক্ষণ কেঁদে কাটালাম।"

শিহাবুদ্দীন নামে শায়খুল কবীর (র)-এর জনৈক সাহেবযাদা যাঁর সাথে খাজা নিজাম (র)-এর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তিনি শায়খুল কবীর (র)-এর নিকট খাজা নিজাম (র)-এর উপরিউক্ত অবস্থার বর্ণনা দেন। মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। শায়খুল কবীর (র)-এর খিদমতে উপস্থিত হবার অনুমতি তাঁর মিলে গেল।

---

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃ. ৭৫।

দ্বিতীয় দিনে তিনি নিজেই ডেকে পাঠালেন। বললেন, "এ সবই তো তোমার পূর্ণতা প্রাপ্তির স্তরে উপনীত হবার জন্যই করা হয়েছে। পীর মুরীদের কল্যাণকামী ও সংশোধন অভিলাষী হয়ে থাকেন।"

চূড়ান্ত মুহূর্ত

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর জন্য সে মুহূর্তটি –যখন শায়খুল কবীর (র) তাঁর "আমি শায়খ নাজীবুদ্দীনের নিকট একটি উত্তম কপি দেখেছি" শুনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন– অত্যন্ত কঠিন ও নাযুক মুহূর্ত ছিল। বাহ্যত এরূপ একটি নির্দোষ ও নিষ্পাপ বাক্য বলাতে এবং এই সংবাদ জ্ঞাত করাতে যে, আমি আপনার ভাইয়ের নিকট উত্তম একটি কপি দেখেছি– এমন পরিমাণ অসন্তুষ্টি ও প্রতিবাদ প্রকাশের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কামিল শায়খ এমন একজন ছাত্র থেকে, যিনি ভাবী জীবনে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত হতে যাচ্ছেন এবং যাঁকে গণমানুষকে আত্মশুদ্ধির তরবিয়ত দিতে হবে– এতটুকু অহমিকা থাকা পসন্দ করেন নি। তদুপরি আল্লাহ্র পথের নবীন এই পথিককে হালতের যে পূর্ণ-তম স্থানে পৌঁছুতে হবে তজ্জন্য তার অস্থিরতা ও অভাববোধ জাগ্রত করা এবং তাঁর অন্তর-মানসকে দ্রবীভূত করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু একজন ধীমান, যোগ্যতা ও প্রতিভাসম্পন্ন যুবকের পক্ষে– যে জ্ঞানের সর্বোচ্চ ধাপ অতিক্রম করেছে– এ সময়টি ছিল অত্যন্ত নাযুক আর এরই ওপর তাঁর গোটা ভবিষ্যত নির্ভর করছিল। মাওলানা সায়্যিদ মানাযির আহসান গিলানী ঠিকই লিখেছেন ঃ

> প্রার্থীর মধ্যে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যুক তার পার্থক্য ও যাচাই-বাছাই করার মুহূর্ত সমাগত। দুনিয়া দেখছিল– এখন মাওলানা নিজামুদ্দীনের সিদ্ধান্ত কি হয়? মাওলানা কি 'বাহ্হাছ' (তর্ক-বিতর্ককারী, তার্কিক, debator) অথবা 'মাহফিল শিক্ন' (আলোচনা বৈঠক চূর্ণ-বিচূর্ণকারী)-এর উপাধি নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন যেমনটি আরও লাখো 'বাহ্হাছ' ও 'মাহফিল শিক্ন' দুনিয়ার এ রঙ্গমঞ্চে এসেছে, আবার চিরাচরিত নিয়মে বিদায় নিয়ে চলেও গেছে, অথবা মাশায়িখে কিরামের নেতৃত্বের যে সিংহাসন শূন্য পড়ে আছে তার ওপর আসীন হবার যোগ্যতা অর্জন করেন।
>
> হিম্মত ও দৃঢ় মনোবলের দিক দিয়ে ঘাটতি হলে তিনি বলতে পারতেন– 'ভালো! আমার কি অপরাধ? আমি কি অন্যায়টাই বা এমন করেছি? একটা ভাল কপির সন্ধান জানতাম সেটাই প্রকাশ করেছি, আর এর জন্য এত রোষ ও উষ্মা প্রকাশের অর্থ কি?' এই ছোট্ট ঘটনাটিই যদি সামনে যেত, তবে

এটাই লম্বা ফিরিস্তিতে রূপ নিতে পারত– এত লম্বা যে, শয়তানের ভূড়িও তার তুলনায় ছোট বলে প্রমাণিত হত। কিন্তু এটা তো জানা কথা যে, তিনি নিজের আত্মার চিকিৎসার্থে এসেছিলেন, শায়খুল কবীরের কমযোরী ও দুর্বলতার চিকিৎসা করানোই আজূদহন আসবার তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি পরিষ্কারভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে, এটা চিকিৎসকের প্রতিষেধক মাত্র। এরপর সমালোচনার সুযোগ ও অধিকারই বা তাঁর ছিল কোথায়![1]

বন্ধুর ভর্ৎসনা

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) বলেন, "আমি শায়খুল কবীর (র)-এর খিদমতে আজূদহনে অবস্থান করছিলাম। জনৈক 'আলিম যিনি আমার দোস্ত ও সহপাঠী ছিলেন–তখন আজূদহন আসেন। তিনি আমাকে ছেড়া-ফাঁটা পুরনো কুর্তা গায়ে দেখে অত্যন্ত উদ্বেগ ও আফসোসের সাথে বললেন, 'মাওলানা নিজামুদ্দীন! তুমি নিজের এ কি অবস্থা করেছ? তুমি যদি কোন শহরে গিয়ে পঠন-পাঠনে লিপ্ত থাকতে তাহলে তুমি এ যুগের মুজতাহিদ হতে পারতে এবং বিরাট শান-শওকতের সাথে জীবন-যাপন করতে পারতে। আমি আমার দোস্তের এ সব কথাই শুনলাম এবং নানাবিধ ওযরখাহী করে বিদায় দিলাম। এরপর যখন আমি শায়খুল কবীর (র)-এর খিদমতে হাযির হলাম তখন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই বলতে শুরু করলেন, 'নিজাম! যদি তোমার কোন দোস্ত তোমার সাথে সাক্ষাত করতে আসে আর তোমাকে তোমার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে এবং বলে, কেন তুমি পঠন-পাঠনের সে পেশা ছেড়ে দিলে যা তোমার অবস্থার পরিবর্তন ও সৌভাগ্য লাভের কারণ ঘটত, তাহলে তুমি তার কি উত্তর দেবে?' আমি আরয করলাম, 'শায়খ আমাকে যা বলার নির্দেশ দেবেন আমি তাই বলব।' এতে তিনি বললেন, যদি কখনও আর কেউ তোমাকে অনুরূপ প্রশ্ন করে তবে তুমি এই কবিতাটি তাকে শুনিয়ে দেবে ঃ

نه همرهی تو مرا راه خویش گیر وبرد

ترا سلامتی باد امر انگو نساری

আমার এমন কোন সাথী নেই যে আমাকে আমার রাস্তায় পরিচালিত করবে;
তুমি নিরাপদে থাক আর আমি আমার দীনতা নিয়েই তৃপ্ত থাকি।

---

১. ভারতবর্ষে মুসলমানদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, পৃ. ৯৪-৯৫ (হিন্দুস্তান মেঁ মুসলমানোঁ কা নিজামে তালীম ও তরবিয়ত)।

"এরপর হুকুম হল যে, খানকাহ্র বাবুর্চিখানা থেকে নানাবিধ খানাভর্তি একটি পাত্র মাথায় করে উক্ত বন্ধুর নিকট নিয়ে যাও। আমি হুকুম তামিল করলাম। আমার দোস্ত যখন এ দৃশ্য দেখলেন তখন কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে এসে পাত্রটি মাথা থেকে নামিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'এ তুমি কি করেছ?' আমি সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। সে সমস্ত শুনে তিনি বললেন, ' তোমাদের শায়খ এমন যে, তিনি তোমাকে আত্মশুদ্ধি ও বিনয়ের এত উচ্চ স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। তুমি আমাকেও তাঁর খিদমতে নিয়ে চল।' বন্ধুটির খাবার খাওয়া সমাপ্ত হলে স্বীয় চাকরকে লক্ষ্য করে বলল, 'এই পাত্রটি উঠিয়ে আমাদের সাথে চল।' আমি বললাম, না, তা হয় না। এ পাত্র যেভাবে আমি মাথায় উঠিয়ে এনেছি, ঠিক তেমনিভাবে আমি মাথায় উঠিয়ে ফিরে যাব।' মোটকথা, আমরা উভয়েই শায়খুল কবীর (র)-এর পবিত্র খিদমতে উপস্থিত হলাম। অতঃপর আমার দোস্ত হযরত শায়খ (র)-এর হাতে হাত দিয়ে বায়'আত নেন এবং ভক্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।"

উপস্থিতি কতবার?

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) হযরত শায়খুল কবীর (র)-এর জীবদ্দশায় তিনবার আজূদহন গিয়ে হাযির হন। প্রথমবারে, না কোন্ বারে খিলাফত লাভের সৌভাগ্য ঘটে, কোন জীবনী গ্রন্থেই তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই।

শায়খুল কবীর (র)-এর অনুগ্রহ

কোন এক ২৫শে জমাদিউল আওয়াল সালাতুল জুম'আ বাদ ডাক এল। শায়খুল কবীর (র) নিজের মুখের থুথু হযরত খাজা শায়খ নিজামুদ্দীন (র)-এর মুখে দিলেন এবং কুরআন মজীদ হিফয করার ওসীয়ত করলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহ্ পাক তোমাকে দীন ও দুনিয়া উভয়ই দান করলেন।"

বিদায় ও ওসীয়ত

অতঃপর তিনি তাঁকে দিল্লীর দিকে রওয়ানা করে দেন। বিদায়কালে বললেনঃ "দিল্লী গিয়ে মুজাহাদায় মশগুল থাকবে। বেকার থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। নফল রোযা আল্লাহ্র পথে অর্ধেক এগিয়ে দেয়। আর সালাত ও হজ্জ (নফল) বাকী অর্ধেক।"

সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, তিনি তাঁকে খিলাফতনামা লিখিত দেন এবং হিদায়াত করেন যেন তা মাওলানা জামালুদ্দীনকে হাঁসিতে এবং

কাযী মুনতাজিবকে দিল্লীতে দেখানো হয়। তিনি আরও ইরশাদ করেনঃ "তুমি একটি ছায়াযুক্ত বৃক্ষের ন্যায়। তোমার ছায়ায় আল্লাহ্‌র মাখলূক আরাম পাবে, আশ্রয় পাবে। যোগ্যতা ও উপযুক্ততা বাড়াতে হলে এবং উন্নতি করতে হলে মুজাহাদা করতে থাকবে।"

হযরত খাজা নিজাম (র) বলেন, "ফিরতি পথে হাঁসিতে আমি শায়খ জামালুদ্দীনকে খিলাফতনামা দেখালাম। তিনি তাতে অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।"

একটি দু'আর আবেদন

একদা ১লা শা'বান হযরত খাজা নিজাম (র)-এর তরফ থেকে শায়খুল কবীর (র)-এর খিদমতে এই মর্মে দু'আ'র আবেদন পেশ করা হয় যেন সৃষ্টির পেছনে তাকে ঘুরতে না হয়। তাঁর আবেদনটি কবূল করা হয় এবং তিনি তাঁর জন্য দু'আ' করেন।[১]

একবার তিনি বললেন, "আমি আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের জন্য অল্প কিছু দুনিয়াও চেয়ে নিয়েছি।" হযরত খাজা (র) বলেন, "আমি একথা শুনেই চিন্তিত হয়ে পড়লাম যে, যেখানে বড় বড় ও মহান ব্যক্তিরা অবধি দুনিয়ার কারণে ফিতনা ও দুর্বিপাকে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, সেখানে আমার মত লোকের কি অবস্থা হবে।" শায়খ তৎক্ষণাৎ বললেন, "তুমি ফিতনায় পড়বে না। ধ্যান ও বিনয় গচ্ছিত ও জমা রাখবে।" এরপর আমি দুর্ভাবনামুক্ত হলাম।[২]

আজূদহন থেকে দিল্লী

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) স্বীয় মুরশিদ ও মুরব্বী থেকে বিদায় নিয়ে ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মিক তথা রূহানীভাবে বিজয়, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শন ও আল্লাহ্‌র বিধান মাফিক প্রশিক্ষণ দান এবং ইসলামের প্রচার-প্রসার, তবলীগ ও হিদায়াতের মহান ও পবিত্রতম অভিযানে বের হলেন। একজন নিঃস্ব ও সহায়-সম্বলহীন ফকীর ভারতবর্ষেরই নয়, বরং হিজরী সপ্তম শতাব্দীর গোটা মুসলিম জাহানের সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও সুসংহত ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানীর দিকে চলেছেন। শুধু ইখলাস, আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীলতা এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্ট তামাম মাখলূকাত থেকে বিমুখতা ব্যতীত আর কোন পাথেয় কিংবা হাতিয়ার তাঁর ছিল না। মাওলানা সায়্যিদ মানাযির আহসান গিলানী কী সুন্দরই না লিখেছেন!

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১১৬।
২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১২৩।

(তিনি) ভারত বিজয় অভিযানে আজুদহন থেকে ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লীর দিকে রওয়ানা হচ্ছেন যেখানে নীচু পর্যায় থেকে উঁচু পর্যায় পর্যন্ত বেশুমার মিথ্যা 'ইলাহ' আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। এর মধ্যে তাঁরাও আছেন যাঁদের সামান্য অঙ্গুলী হেলনে মানুষের ধড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এদের মধ্যে তাঁরাও আছেন যাঁদের সামান্যতম করুণা ও অনুগ্রহ মানুষকে মাটির আসন থেকে উঠিয়ে নেতৃত্ব ও সম্পদের আসমানে পৌছিয়ে দিতে পারে। অলিতে গলিতে 'ইয্যত-আব্রু বিক্রি হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি ভাগ-বণ্টিত হচ্ছে; চারদিকে টাকা-পয়সা ছড়ানো হচ্ছে। আর যে সমস্ত মাধ্যমে এসব অর্জিত হচ্ছে, সুলতানুল মাশায়িখ সে সবগুলিরই অধিকারী। তিনি পড়া-শোনা করেছেন। আজুদহন যাবার আগে দিল্লীর জ্ঞানী ও গুণীজনের সভায় 'সভামঞ্চের নায়ক' হিসেবে সাধারণ ও ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। আর কিছু না হোক, অন্তত বিচার বিভাগের কোন একটি পদ থেকে শুরু করে শায়খুল ইসলাম ও রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ আসনের খিদমত পর্যন্ত সকল রাস্তাই তাঁর সামনে উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু স্রষ্টার আকৃতিতে যে 'ইলাহ্‌র' সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন তাতে তাঁর বুক এমন পরিপূর্ণ ছিল যে, সেখানে কোন মাখলূকের পক্ষেই স্থান সংকুলানের অবকাশ ছিল না।

ন্যায্য অধিকার প্রত্যর্পণ

শায়খুল কবীর (র) মুরীদী ও খিলাফত প্রদানের সাথে সাথে কয়েকবারই তাকিদ দেন যে, বিরুদ্ধবাদীদের খুশি ও সন্তুষ্ট করার সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা যেন গ্রহণ করা হয় এবং হকদারদের যেভাবেই হোক সন্তুষ্ট ও রাযী করাতে চেষ্টার কোন ত্রুটিই যেন না করা হয়। খাজা (র) বলেন, "আমি যখন দিল্লী চললাম তখন আমার স্মরণ হ'ল যে, জনৈক ব্যক্তির নিকট আমি বিশ 'জিতল' (অথবা চিতল)[1] দেনা আছি এবং কোন এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি কিতাব ধার নিয়ে এসেছিলাম। সেটা পরে হারিয়ে যায়। বদায়ূনে থাকাকালীন আমি দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম যে, যখনই দিল্লী পৌছুব তখন ঐ সমস্ত পাওনাদারকে সন্তুষ্ট ও রাযী করতে চেষ্টা করব। এরপর আমি আজুদহন থেকে দিল্লী ফিরে এলাম। আমি যে ব্যক্তির নিকট বিশ জিতল ঋণী ছিলাম সে ছিল একজন কাপড় বিক্রেতা। আমি তার থেকে কাপড় খরিদ করেছিলাম। আমার কাছে কোন সময়েই বিশ জিতল সংগৃহীত হয়নি যে আমি ঋণ পরিশোধ করতে পারি।

১. জিতল অথবা চিতল—তামার মুদ্রা যা সে যুগে প্রচলিত ছিল।

জীবিকার ক্ষেত্রে আমি ছিলাম অত্যন্ত অনটনের ভেতর। কখনও পাঁচ জিতল হাতে আসে, কখনও-বা দশ জিতল। একবার দশ জিতল হাতে আসতেই আমি উক্ত কাপড় বিক্রেতার দরজায় গিয়ে হাযির। আওয়ায দিতে সে বাইরে বেরিয়ে এল। আমি তখন বললাম যে, তোমার বিশ জিতল আমার যিম্মায় আছে। একবারে দেবার সামর্থ্য আমার নেই। দশ জিতল সাথে এনেছি, এটা নিয়ে নাও; বাকী দশ জিতল ইনশাআল্লাহ এর পরে পৌঁছিয়ে দেব। লোকটি বলল, মনে হচ্ছে তুমি মুসলমানদের নিকট থেকে এসেছ। লোকটি উক্ত দশ জিতল নিয়ে নিল আর বলল, আমি বাকী দশ জিতল মাফ করে দিলাম।

"এরপর সেই লোকটির নিকট গেলাম, যার নিকট থেকে কিতাব ধার নিয়ে ছিলাম। লোকটি আমাকে চিনতে পারেনি। আমি বললাম, একবার আমি একটি কিতাব আপনার নিকট থেকে ধার নিয়েছিলাম যেটা পরে হারিয়ে গেছে। এখন আমি উক্ত কিতাবের একটা কপি করে আপনাকে দিয়ে দেব। আমি কিতাবটি যেভাবে লেখা ছিল ঠিক সেভাবেই লিখে আপনাকে পৌঁছিয়ে দেব। লোকটি বলল ঃ তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানকার পরিণাম এরূপই হয়ে থাকে। এরপর সে বলল, আমি উক্ত কিতাবটি তোমাকে দিয়ে দিলাম।[১]

দিল্লীর অবস্থানস্থল

খাজা সাহেব (র) যখন দিল্লীবাসীদের তথা ভারতবাসীদের খিদমতের জন্য দিল্লী পৌঁছলেন তখন, যদিও দিল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহও শাহী মহল ও প্রাসাদোপম উট্টালিকা দ্বারা আবদ্ধ ছিল এবং যত্রতত্র নিত্য-নতুন ইমারত নির্মিত হচ্ছিল, তবু খাজা সাহেব (র)-এর কোন অবস্থানের ঠিক ছিল না। অবস্থানস্থল হিসেবে গিয়াছপুরে যতদিন ছিলেন, ততদিন তিনি এত ঘন ঘন আবাস পাল-টিয়েছেন যে, মনে হচ্ছিল যেন গোটা শহরে এই ফকীরের নিজের দরবেশী সাজ-সামান রাখবার এবং চাটাই বিছাবার মত একফোঁটা জায়গাও নেই। সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা মীর খোর্দ স্বীয় ওয়ালিদ সায়্যিদ মুবারক মুহাম্মাদ কিরমানীর ভাষায়, যিনি খাজা (র)-এর দোস্ত এবং বন্ধু ছিলেন—বাসগৃহ পরিবর্তনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তা পাঠকদের উপদেশ গ্রহণের জন্য এখানে উদ্ধৃত করা হলো। সায়্যিদ মুবারক মুহাম্মদ-কিরবানী বলেন ঃ

> যতদিন সুলতানুল মাশায়িখ [খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)] দিল্লী শহরে ছিলেন ততদিন তাঁর এমন কোন বাসা-বাড়ি ছিল না যা তাঁর মালিকানাধীন।

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃ.১৪।

তিনি সারা জীবন নিজস্ব ইখতিয়ারে নিজের জন্য কোন স্থানও নির্বাচন করেন নি। যখন তিনি বদায়ূন থেকে আসেন তখন মিএঞা বাজার সরাইয়ে যাকে নেমকের সরাইও বলা হত–অবতরণ করেন। ওয়ালিদা সাহেবা ও বোনকে সেখানেই রাখেন এবং স্বয়ং নিজে একটি কামানগীরের দরবারে–যা উল্লিখিত সরাইয়ের সামনে ছিল–স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। আমীর খসরূ (র)-এর বাসাও ছিল উক্ত মহল্লাতেই। কিছুদিন পর বীর আরযের বাসা খালি হয়। তাঁর পুত্র নিজের এলাকায় চলে গিয়েছিল। আমীর খসরূর মাধ্যমে, যিনি বীর আরয-এর দৌহিত্র ছিলেন, সুলতানুল মাশায়িখের আবাসের জন্য বাড়িটি পাওয়া গেল। এই বাড়িতে তিনি দু'বছর বাস করেন। বাড়িটি শহরের নিকটবর্তী হিন্দুস্তান দরজা এবং মন্দ্বপুলের কাছেই ছিল। বাড়ির মহল ও রোয়াক ছিল উঁচু ও অত্যন্ত শানদার। ইতিমধ্যেই বীর আরয-এর ছেলে এসে যায়। তাই সুলতানুল মাশায়িখকে উক্ত বাড়ি থেকে স্থানান্তরে গমন করতে হয়। নিজস্ব কিতাবাদি– যা ব্যতিরেকে আর কোন সামান তাঁর ছিল না–সমকক্ষীয় লোকদের মাধ্যমে ছাপড়াওয়ালী মসজিদে (যা সিরাজ বাক্কালের সামনে অবস্থিত ছিল) নিয়ে আসেন। দ্বিতীয় দিনে শায়খ সদরুদ্দীনের অন্যতম মুরীদ সা'দ কাগজী এ কাহিনী শোনেন এবং সুলতানুল মাশায়িখ-এর নিকটে এসে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা এবং অনুরোধ-উপরোধ সহকারে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। বালাখানার ওপর একটি উত্তম ও সুন্দর কক্ষ নির্মিত হয়েছিল। সেখানেই তাঁর থাকার জায়গা করে দেওয়া হয়। সুলতানুল মাশায়িখ এখানে এক মাস অবস্থান করেন। এরপর এখান থেকেও বিদায় নেন এবং কায়সার পুলের সন্নিকটবর্তী মিষ্টি বিক্রেতা ও বাবুর্চির সরাইয়ে–সরাইয়ের মাঝখানে একটি বাড়িও ছিল–সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করেন। কিছুকাল পর সেখান থেকেও স্থানান্তরিত হয়ে মুহাম্মাদ নামক ফল বিক্রেতার বাড়ির মাঝখানে অবস্থিত শাদী গোলাবীর ঘরে অবস্থান নেন। এখানে অবস্থানকালীন শামসুদ্দীন শরাবদারের[১] পুত্র ও আত্মীয়-স্বজন–যারা তাঁর ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন–হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-কে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে শামসুদ্দীন শরাবদারের বাড়িতে নিয়ে আসেন। কয়েক বছর যাবত সুলতানুল মাশায়িখ এ বাড়িতেই থাকেন। এ বাড়িতে থাকাকালীন তাঁর গোটা সময়টাই অত্যন্ত আরাম ও শান্তির মধ্যে কাটে।"[২]

১. বাদশাহর পানি পান করানোর পদ।
২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১০৮।

দারিদ্র্য ও অনাহার

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর দিল্লীতে আসার পর থেকেই বিবিধ পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের পালা শুরু হয় যা ডিঙ্গিয়ে এ পথের পথিকদের গোটা সৃষ্টি জগতের প্রত্যাবর্তনস্থল ও রূহানী ফয়েয লাভের উৎসমূলে পরিণত হতে হয়। আর তা আসে অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই। এটা ছিল সেই সময় যখন সারা ভারতবর্ষের ধন-দৌলত, সোনা-রূপা ও বিবিধ জওয়াহেরাত প্লাবনের বেগে এসে দিল্লীতে জমা হচ্ছিল। প্রাচুর্যের অবস্থা এমনই ছিল যে, এক জিতলে দুই সের মজাদার রুটি পাওয়া যেত, আর দুই জিতলে মিলত এক মণ খরবুযা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও খাজা সাহেবের দারিদ্র্য ও অনটনের অবস্থা ছিল এমন যে, তিনি বলেন, "অনেক সময় আমার কাছে একটি কপর্দকও থাকত না যা দিয়ে রুটি কিনে আমি নিজে খাই এবং মা-বোন ও দায়িত্বাধীন ঘরের লোকদের খাওয়াই। খরবুযার প্রাচুর্য ও প্রচুর আমদানী সত্ত্বেও গোটা মৌসুম চলে যেত, কিন্তু আমাদের পক্ষে খরবুযার স্বাদ গ্রহণ সম্ভব হত না। তথাপি আমি আমার অবস্থার প্রতি তুষ্ট ছিলাম আর কামনা করতাম– মৌসুমের বাকী সময়টাও যেন অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং আমরা আগের অবস্থায়ই থাকি।"[১]

অন্যের মাধ্যম ব্যতিরেকে

একবার তিনি শহরের প্রান্তসীমায় মন্‌্থ দরজার সন্নিকটে অবস্থিত একটি বুরুজে অবস্থান করছিলেন। কয়েক দিন কেটে যাওয়ার পরও খাবার মত কোন কিছুর সংস্থান সম্ভব হয়নি। জনৈক ছাত্র কোনভাবে জানতে পায়, কয়েক দিন যাবত হযরত (র) অনাহারে ও চরম অনটনের মাঝে দিন কাটাচ্ছেন। তখন সে এ সম্পর্কে প্রতিবেশী কোন জোলাকে অবহিত করে। লোকটি খানা পাকিয়ে আনে। খানা খাওয়াবার প্রাক্কালে হাত ধোয়াবার সময় খানা আনয়নকারীদের ভিতর কেউ বলে বসে, 'আল্লাহ পাক ছাত্রটির মঙ্গল করুন যে সময়মত আমাদের এ খবর পৌঁছিয়েছে।' খাজা (র) একথা শোনা মাত্রই হাত গুটিয়ে নেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, 'কি খবর দিয়েছিল?' লোকটি বলে, 'অমুক ছাত্র আপনি যে কয়েক দিন যাবত অনাহারে আছেন তা আমাদের জানিয়েছিল। এরপর আমরা খাবার রান্না করে নিয়ে আসি।' এতে তিনি বলেন, 'আমাকে মাফ কর।' এরপর লোকেরা বহু অনুরোধ-উপরোধ করা সত্ত্বেও তিনি সে খাবার আর গ্রহণ করেন নি।[২]

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১১৩।

২. জাওয়ামিউল কিলাম [খাজা সায়্যিদ মুহাম্মাদ গেসূ দরাজ (র)-এর মলফূযাত]।

শায়খুল কবীর (র)-এর ওফাত

শেষবার তিনি শায়খুল কবীর (র)-এর খিদমতে ওফাতের তিন-চার মাস পূর্বে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন যে, ৫ই মুহাররাম[১] শায়খুল কবীর (র) ওফাত পান এবং শাওয়াল মাসেই হযরত খাজা গঞ্জে শকর (র) আমাকে দিল্লী পাঠিয়ে দেন। অসুখ-বিসুখ আগেই শুরু হয়েছিল। রমযান মাস। রোগ-যন্ত্রণার কারণে তিনি সিয়াম পালনে ছিলেন অপারগ ও অক্ষম। একদিন আমি খরবুযা কেটে শায়খ (র)-এর সামনে রাখলাম। শায়খ নিজে গ্রহণ করলেন এবং কাটা এক টুকরা আমাকেও দিলেন। সে মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল যে, জানি না এরূপ সম্পদ আবার কখন মিলবে যা আজ তিনি নিজের পবিত্র হাতে আমাকে দিলেন। ইচ্ছে হয়েছিল এটা আমি খেয়ে নিই এবং ধারাবাহিকভাবে দু'মাস সিয়াম পালন করে তার কাফফারা আদায় করি। তিনি বললেন, 'কখ্খনো নয়, এ হতে পারে না। আমার জন্য এমতাবস্থায় শরীয়তের অনুমতি থাকলেও তোমার জন্য তা কখনোই জায়েয হবে না।'[২]

তিনি বলেন ঃ ইন্তিকালের সময় তিনি [শায়খ ফরীদ (র)] আমাকে স্মরণ করেন এবং বলেন ঃ নিজামুদ্দীন তো এখন দিল্লীতে। তিনি এও বলেন, আমিও আমার শায়খ কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র)-এর অন্তিম মুহূর্তে হাযির ছিলাম না; আমি ছিলাম তখন হাঁসিতে। 'ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, এ কথার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি এমন কান্না কেঁদেছিলেন যে, উপস্থিত সবার অন্তর এতে দ্রবীভূত না হয়ে পারেনি।[৩]

ওফাতের পর তিনি আজূদহন উপস্থিত হন। মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাক শায়খুল কবীর (র)-এর ওসীয়ত মুতাবিক জামা, মুসাল্লা (জায়নামায) ও লাঠি সোপর্দ করেন যা হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-কে দেবার জন্য শায়খুল কবীর (র) মাওলানার হাতে সোপর্দ করেছিলেন।[৪]

গিয়াছপুরে অবস্থান

'ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, একদিন তিনি শহরের শোরগোল সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, প্রথম থেকেই শহরে কোনদিনই আমার

---

১. হিজরী ৬৬৪।

২. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ।

৩. ঐ, পৃ. ৫৩।

৪. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১২২।

মন বসেনি। একদিন কেল্লাখানের হাওযের ওপর ছিলাম। সে সময় আমি পবিত্র কুরআন মজীদ মুখস্থ করছিলাম। সেখানেই একজন দরবেশ আল্লাহ্‌র ধ্যানে ছিলেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি এই শহ-রেই থাকেন?" তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, "আপনি নিজের মর্জি মাফিক এই শহরে থাকেন"? তিনি বললেন, "কথা তো তা নয়।" এরপর উক্ত দরবেশ একটি ঘটনার বর্ণনা দেন ঃ "একবার আমি অত্যন্ত সজ্জন এক দরবেশের সাক্ষাত পেলাম। কামাল দরজার বাইরে সেই বেষ্টনীর মাঝে যেখানে একটি উঁচু জমি আছে এবং যার উপর শহীদগণের চার পার্শ্বের পাঁচিল নির্মিত, সেখানেই উক্ত দরবেশ উপবিষ্ট ছিলেন। উক্ত দরবেশ আমাকে বললেন, 'যদি ঈমান-আমানের মঙ্গল চাও তো এ শহর ছেড়ে চলে যাও।' আমি সেই মুহূর্ত থেকেই শহর ছেড়ে চলে যাবার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে আসছি। কিন্তু ঘটনা এমনভাবে মোড় নিচ্ছে যে, পঁচিশ বছর হয়ে যাচ্ছে তবু আমি যাবার সুযোগ পাচ্ছি না।" হযরত খাজা এ কাহিনী বর্ণনার পর বলেন যে, আমি যখন উক্ত দরবেশের এ কথা শুনলাম তখন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি এ শহরে থাকব না। কয়েকটি জায়গা সম্পর্কে আমার ধারণায় আসত বটে যে আমি সেখানে চলে যাই, কখনও-বা মনে ভাবতাম যে, পিটয়ালী[১] শহরে চলে যাই। সে সময় সেখানে একজন তুর্ক ছিল। কখনও মনে করতাম যে, বিশনালা চলে যাব। সেটা একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গা। এরপর আমি সেখানেই চলে যাই এবং তিনদিন সেখানে থাকি। কিন্তু সেখানে ভাড়ায় কিংবা নগদ মূল্যে কোন বাড়িই পাওয়া যায়নি। উক্ত তিন দিনের প্রতি দিনই কারো না কারো মেহমান হিসেবেই কাটাই। একদিন সেখানকার একটি বাগানে–যাকে 'বাগে হায়রাত' বলা হয়, গিয়ে মুনাজাত করতে মনে সাধ জাগে। আমি আরয করলাম, খোদাওয়ান্দ। আমি এই শহর ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছি। তবে কোন জায়গাই নিজস্ব মর্জি মুতাবিক এখতিয়ার করব না। যেখানেই তোমার মর্জি, সেখানেই আমি চলে যেতে চাই। আকস্মিকভাবে এক গায়েবী আওয়ায শোনা গেল- যার ভেতর গিয়াছপুরের নাম ভেসে আসল। আমি গিয়াছপুর কখনও দেখিনি। আর এটাও জানতাম না যে, গিয়াছপুর কোথায়! আমি আওয়ায শোনার পর আমার একজন দোস্তের নিকট যাই। উক্ত দোস্ত ছিলেন নিশাপুরের অধিবাসী একজন নকীব। আমি তাঁর বাড়ি যাই এবং সেখানে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে, তিনি গিয়াছপুর গেছেন। আমি মনে মনেই ভাবি যে, তাহলে সেটাই গিয়াছপুর। মোটকথা, আমি

১. আম্ব জেলার একটি ছোট শহর।

গিয়াছপুর আসলাম। সে জায়গায় তখন আজকের মত আবাদী ও লোকবসতি গড়ে ওঠেনি। জায়গাটা ছিল অখ্যাত ও অজ্ঞাত। লোকজনও ছিল কম। আমি আসলাম ও বসবাস করতে শুরু করলাম। যখন সুলতান কায়কোবাদ[১] কিলোখড়িকে[২] নিজস্ব আবাস হিসেবে মনোনীত করেন তখন থেকেই লোক সমাগম সেখানে বাড়তে থাকে। আমীর-উমারা, সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এবং তৎসহ সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ও সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। আমি যখন লোকজনের এরূপ ভীড় লক্ষ্য করলাম, তখন মনে মনেই ভাবলাম– এখন দেখছি এখানে থেকেও চলে যেতে হবে। আমি যখন এরূপ ধারণায় মগ্ন ছিলাম, ঠিক সে মুহূর্তে একজন বুযর্গ ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যিনি আমার উস্তাদও ছিলেন–শহরে ইন্তিকাল করেন। নিজের মনেই বললাম, আগামীকাল আমি যখন তাঁর ফাতেহাখানিতে যাব, তখনই কোন দিকে বেরিয়ে পড়ার কথা চিন্তা করা যাবে। আপন মনেই এমত সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করি। সেদিনই সালাতুল 'আসর বাদ একজন যুবক আমার নিকট আসল। যুবকটি অত্যন্ত সুন্দর, কিন্তু দুর্বল ও হালকা-পাতলা ধরনের। আল্লাহ্ই জানেন -সে আধ্যাত্মিক পথের কোন পথিকই ছিল অথবা অন্য কেউ। সে আসামাত্রই আমাকে লক্ষ্য করে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করল ঃ

آں روز کہ بہ شیدی نمی دانستی -

کہ انگشت نمائے جہاں خواہی شد

যেদিন আল্লাহ্ তোমাকে চাঁদ বানিয়েছিলেন সেদিনই তোমার বোঝা উচিত ছিল যে, তোমার দিকে সারা দুনিয়ার মানুষ অঙ্গুলী সংকেত করবে।

হযরত খাজা নিজাম (র) বলেন যে, যুবকটি আমাকে আরও কিছু বলেছিল যা আমি লিখে নিয়েছিলাম। এরপর সে বলল, প্রাথমিক অবস্থায় মানুষের পক্ষে মশহুর হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। আর যখন কোন ব্যক্তি মশহুর হয়েই যায়, তখন এমন হওয়া উচিত যেন কিয়ামতের দিন রাসূল পাক (স)-এর সামনে তাকে লজ্জিত হতে না হয়।

---

১. সুলতান মু'ঈয্‌দীন কায়কোবাদ (হিজরী ৬৮৬ থেকে ৬৮৮ পর্যন্ত) বোগরা খানের পুত্র এবং সুলতান গিয়াসুদ্দীন বুলবনের পৌত্র ছিলেন। রাজত্বকাল তিন বছর।

২. স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান 'আছারুস্ সানাদীদ' নামক গ্রন্থে লিখেন যে, মু'ঈযুদ্দীন কায়কোবাদ ৬৮৩ হিজরীতে একটি কেল্লা নির্মাণ করেন এবং কিলোখড়ি তার নাম রাখেন। যদিও বর্তমানে উক্ত কেল্লার নাম-নিশানাও নেই, কিন্তু সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি সৌধের পাশেই কিলোখড়ি এবং দশ পাঁচটা ঝুপড়িও সেখানে বিদ্যমান। চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪।

এরপর সে বলল যে, এটা কি ধরনের হিম্মত ও মনোবল যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি থেকে পালিয়ে গিয়ে নির্জনবাস গ্রহণ করা হবে? তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, শক্তি-সাহস ও মনোবলের অধিকারী হলে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মাখলূকের মধ্যেও আল্লাহ্‌র ধ্যানে ও স্মরণে মশগুল থাকা সম্ভব। সে কথা শেষ করতেই আমি কিছু খাবার তার সামনে এনে রাখলাম। কিন্তু সে হাত বাড়াল না। তখনই আমি অন্তরে নিয়ত করে ফেলি যে, আমি এখানেই থাকব। যখন আমি এরূপ নিয়ত করে ফেললাম তখন সে অল্প খাবার খেয়ে চলে গেল।[১]

জনস্রোত

গিয়াছপুরে অবস্থানকালীন সময়ে আল্লাহ্‌র বান্দারা হযরত খাজা নিজাম (র)-এর দিকে স্রোতের বেগে আসতে শুরু করে এবং এখান থেকেই তাঁর আধ্যাত্মিক ও আদর্শিক বিজয়ের দরজা খুলে যায়।

তাযকিরা গ্রন্থসমূহ থেকে এটা জানা যায় না যে, কতদিন গিয়াছপুর অবস্থানের পর তাঁর পবিত্র ও বরকতময় সত্তা জনতার দৃষ্টি ও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল এবং গিয়াছপুরের খানকাহ্‌র প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে এতটুকু জানা যায় যে, গিয়াছপুরে অবস্থান গ্রহণের পরেও তিনি দীর্ঘকাল সংকট ও অভাব-অনটনের ভিতর দিয়েই অতিবাহিত করেন। এমন কি বেশ কিছুকাল তিনি ভীষণ গরম ও লু-হাওয়া চলাকালীন সময়েও বেশ দূরে অবস্থিত জামে মসজিদে জুম'আর দিন পায়ে হেঁটে যেতেন। এরূপ সংকট ও অনটনের পর স্রষ্টার স্বাভাবিক নিয়মেই কিছুটা সুখ-শান্তি ও স্বস্তির যুগ ফিরে আসে[২] এবং জনস্রোত এমনভাবে খানকাহমুখী হতে শুরু করে যে, তার সামনে দিল্লীর সুলতানের দরবারী মর্যাদাও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।

অনুগ্রহ বিতরণকারী ফকীর

সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা বলেন, পুরাতন অভ্যাগত ও মেহমান, নবাগতের মধ্যে পরদেশী অথবা শহরবাসী যেই তাঁর কাছে আসত, সন্দর্শন ও কদমবুসির সৌভাগ্য লাভে সক্ষম হত; তিনি কাউকেই বঞ্চিত করতেন না। পোশাক-আশাক, নগদ অর্থ এবং হাদিয়া-তোহফা যাই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আসত, সবকিছুই আগত ও বিদায়ী লোকজনের জন্য ব্যয় করা হত এবং যেই আসুক না কেন, কখনই খালি হাতে ফিরে যেত না।[৩]

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১২৯।

২. দুঃখের পর সুখ অবধারিত, নিশ্চয়ই দুঃখের পর সুখ অবধারিতভাবেই আসে। (আল-কুরআন)।

৩. সিয়ারুল আওলিয়া।

হযরত খাজা নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র) বলেন,

> বিজয় অভিযানের অবস্থা ও নমুনা এমনই ছিল যে, ধন- দৌলতের সমুদ্র যেন দরজার সামনে ঢেউ খেলত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্তই নয়, বরং 'ইশা পর্যন্ত লোকজনের আসার বিরাম ছিল না। কিন্তু আনয়নকারীর চেয়ে গ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। লোকে যাই কিছু আনত, তার চেয়ে বেশি পরিমাণেই হযরত খাজা (র)-এর অনুগ্রহ পেত।[১]

জাগ্রত হবার পর প্রথম প্রশ্ন

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল, দুপুরের আহার গ্রহণের পর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে উঠেই সর্বপ্রথম দু'টি সওয়াল জিজ্ঞেস করতেন। প্রথমত, ' বেলা কি চলে গেছে?' এবং দ্বিতীয়ত, ' কেউ আসেনি তো?' এটা এজন্য জিজ্ঞেস করতেন যেন কাউকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে না হয়।[২]

দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং বিনিময় ও দান

দুনিয়া তাঁর দিকে যে পরিমাণে ঝুঁকেছিল তার প্রকৃতি ও মানসিকতাও সে পরিমাণ দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছিল। অধিকাংশ সময়ই তিনি কাঁদতেন। সাফল্য ও জয়যাত্রা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পেত, ঠিক সম-পরিমাণে তিনি কাঁদতেন এবং অনুরূপভাবেই তিনি প্রয়াস চালাতেন যেন তাঁর খিদমতে আনীত দ্রব্য ও সম্পদসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে বিলি-বণ্টিত হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরপরই লোক পাঠিয়ে হিদায়াত দিতেন, যা কিছুই আসুক না কেন, সঙ্গে সঙ্গেই যেন তা বিলি-বণ্টন করে দেওয়া হয়। যখন সব কিছুই বণ্টিত হয়ে যেত এবং অভাবী ও দুঃস্থ লোকদের নিকট তাদের প্রাপ্য পৌঁছে যেত, তখন তিনি তৃপ্তি ও আরাম বোধ করতেন। প্রতি জুম'আর দিনে হুজরা ও ভাণ্ডার ঘর এমন করে খালি করে দিতেন যেন তিনি ঘর ঝাড়ু দিয়ে জঞ্জাল পরিষ্কার করে ফেলছেন। এরপর তিনি মসজিদে যেতেন। যদি বাদশাহ কিংবা শাহযাদাদের মধ্যে কেউ তখন আস্তানায় হাযির হত এবং তাদের নযর- নেয়ায ও আগমন খবর পৌঁছত, তাহলে নির্লিপ্ততার সুরে ঠাণ্ডা নিশ্বাস ফেলে তিনি বলতেন, কোথায় এসেছে? ফকীরের সময় নষ্ট করতে এসেছে![৩]

---

১. সিরাজুল মাজালিস (খায়রুল মাজালিসের অনুবাদ); হযরত খাজা নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র)-এর মালফূযাত।

২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১২৬।

৩. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১২০।

জমি-জায়গা ও অতিরিক্ত ধন-সম্পদ থেকে বিরত থাকা

আমীর হাসান 'আলা সিজযী বলেন যে, একবার আমি উপস্থিত ছিলাম। সে সময় একজন আমীর বাগান, অনেক জায়গা-জমি এবং অন্যান্য আসবাবপত্রের দলীল-দস্তাবিজ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর খিদমতে পাঠিয়েছিল এবং এভাবে স্বীয় একনিষ্ঠ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিল। হযরত খাজা (র) তা কবূল করলেন না বরং মুচকি হেসে বললেন, "যদি আমি এটাকে কবূল করি তবে এরপর লোকে বলাবলি শুরু করবে যে, শায়খ বাগান ভ্রমণে গেছেন এবং নিজ জায়গা-জমি ও ক্ষেত-খামার দেখতে গেছেন। এসব কাজের সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমাদের কোন শায়খ ও বুযর্গ কেউই জায়গা-জমি কবূল করেন নি।"[১]

ফকীরের শাহী দস্তরখান

তিনি নিজে সারা বছর সিয়াম পালন করতেন। কিন্তু শাহী দস্তরখান দু'বেলাই বিছানো হত এবং বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে এতে রাখা হত। আমীর-গরীব, বাদশাহ-ফকীর, শহরের নাগরিক ও পরদেশী, নেককার এবং বদকার কারুরই এতে বাছ-বিচার ছিল না। সর্বশ্রেণীর ও সর্বস্তরের মানুষ এক জায়গায় বসে এবং একই সাথে খাবার খেত। নিয়ে যাবারও অনুমতি ছিল। কেউ কেউ খেত এবং বেঁধেও নিয়ে যেত। এই শাহী দস্তরখান নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ছিল অনন্য। এই দস্তরখানে বসে শত শত হাযার হাযার দরিদ্র মানুষের সেসব খাবার খাওয়ার সৌভাগ্য হত যারা সেগুলোর নামও শোনেনি। শাহী দরবারে বড় বড় আমীর-উমারা এবং সাম্রাজ্যের বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গেরও উক্ত দরস্তরখানে শরীক হবার ইচ্ছে হত এবং খাবারের স্বাদ ও গন্ধের কথা স্মরণ করত। লোকদের হিদায়াত তথা সৎপথ প্রদর্শন, সুলূক ও তরবিয়তের সাধারণ ফয়েয ছাড়াও (যার দরজা সব সময় খোলাই থাকত) হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর এটাও একটি ফয়েয ছিল যা দিল্লীতে পূর্ণ প্রাচুর্যের সাথে অব্যাহত ছিল এবং তিনি লাখো আল্লাহ্‌র বান্দার লালন-পালনের মাধ্যম ছিলেন। মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী দরবেশের শাহী দস্তরখানের বর্ণনা দিতে গিয়ে কি সুন্দরই না বলেছেন!

> আজ রাজপ্রাসাদের প্রাচুর্যের কাহিনীর সাথে নিঃস্ব ও গরীবদের জন্যও কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করা হয়। অথচ ইসলামের ইতিহাসে গরীব ও আমীরের মাঝখানে যোগসূত্র রক্ষা করত—ইসলামের এই সব সূফীর খানকাহ্। এ

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃ. ৯৯।

সমস্ত বুযর্গের দরবার সেই দরবার ছিল যেখানে সুলতানও খাজনা পাঠাতেন। স্বয়ং সাম্রাজ্যের যুবরাজ খিযির খান পর্যন্ত উক্ত দরবারের ভক্ত ও অনুরক্তদের অন্তর্গত ছিলেন। সুলতান 'আলাউদ্দীন যিনি সারা ভারতবর্ষ থেকে রাজস্ব আদায় করতেন– তাঁকেও রাজস্বের একটি অংশ এই বুযর্গদেরকে প্রদান করতে হত।[১] এই খানকারই মাধ্যমে দেশের গরীব ও দরিদ্র শ্রেণীর কাছে তাদের ন্যায্য হিস্যা পৌঁছে যেত।

প্রকৃত ঘটনা এই যে, ইসলামী রাজত্বের কোন একটি যুগ এবং সে সময়ে ভারতবর্ষের কোন একটি প্রদেশ ও অঞ্চল খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ–

تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم -

অর্থাৎ 'ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিকট থেকে গ্রহণ কর এবং দরিদ্র ও অভাবী লোকদের মধ্যে তা বণ্টন করে দাও' কার্যকরী করতে সত্যাশ্রয়ী ও সূফীদের এ সম্প্রদায় মশগুল ছিল না। বিশেষ করে যখন কোন বুযর্গের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে আমীর-উমারা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ওপর তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি কায়েম হয়ে যেত, তখন গরীব ও দুঃস্থ জনগণের ভাগ্য অত্যন্ত সুপ্রসন্ন হয়ে যেত।[২] ইসলামের এই সমস্ত মনীষীর অবস্থা সম্পর্কে জানুন ও একবার চিন্তা করুন, দেখবেন, আমীর ও গরীবদের মাঝখানে ঐ সমস্ত মনীষী ও বুযর্গের অস্তিত্ব এবং পবিত্র সত্তা এক সেতুবন্ধন হিসেবে বিরাজ করছে। দেশের ও রাষ্ট্রের গরীব নিরাশ্রয় ও সহায়-সম্বলহীন মুসলমানদের এটা একটা আশ্রয় শিবির হিসেবেই পরিগণিত হয়ে আসছিল; বরং এ সমস্ত খানকাহ্‌র মাধ্যমেই গরীব ও নিঃস্বদের কাছেও ঐ সমস্ত নিয়ামত পৌঁছে যেত যেগুলোর নাম তারা সম্ভবত শোনেওনি।[৩]

শায়খ (র)-এর খোরাক

শায়খ নিজেও খানায় শরীক হতেন, কিন্তু সেই শাহী-দস্তরখান যার ওপর বিবিধ প্রকারের খাদ্যদ্রব্য ও নিয়ামত ছড়ানো থাকত, তাতে শরীক হতেন না। বরং তাঁর খোরাক ছিল সাধারণভাবে এক আধখানা রুটি, কিছু করেলা ইত্যাদি সবজি অথবা কিছু ভাত।[৪]

---

১. নিজামে তা'লীম, পৃ. ২১৪।
২. নিজামে তা'লীম, পৃ. ২২০।
৩. নিজামে তা'লীম, পৃ. ২২৮।
৪. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১২৫।

নিয়ম-প্রণালী

দস্তরখানে বসবার কয়েকটি কানুন ও নিয়ম-প্রণালী এরূপ ছিল যে, সবার আগে মুরশিদ (র)-এর নিকটাত্মীয় হতেন; এরপর 'উলামায়ে কিরাম, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং শেষদিকে অভিজাত মহল আসন নিতেন।[১]

সমকালীন সুলতানের সাথে সম্পর্কহীনতা

চিশতিয়া সিলসিলার বুনিয়াদ ভারতবর্ষের গোটা সাম্রাজ্যের ধর্মীয় নেতৃত্ব ও পথ প্রদর্শনই নয়, বরং ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, মুসলিম সমাজ জীবনের সংস্কার ও সংশোধন এবং তন্মধ্যে রূহানিয়াত (আধ্যাত্মিকতা) ও আল্লাহ্‌র সাথে নৈকট্যপূর্ণ সম্পর্কে প্রাণ সঞ্চারের সাথে সাথে সে যুগের সুল-তানদের সাথে সম্পর্কহীনতার মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এটা এ সিলসিলার একটি প্রতীক চিহ্ন ও চিশতিয়া তরীকার মাশায়িখে কিরামের পবিত্র উত্তরাধিকার ও আমানত হিসেবে পরিগণিত হত। চিশতিয়া সিলসিলার মাশায়িখে কিরাম সীসার ন্যায় মযবুত, সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করার ব্যাপারে নিজেদের যোগ্যতা ও প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় দেন। একদিকে তাঁরা শাহী দরবারের ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ প্রবণতা এবং যুগের বিভিন্ন ফিতনা-ফাসাদের উৎখাত সাধন করেন, অপরদিকে নীতি, আদর্শ এবং 'আকীদার দিক দিয়ে এরূপ সিদ্ধান্তও নেন যে, শাহী কিংবা রাজদরবারের সাথে তাদের সরাসরি কোন সম্পর্ক থাকবে না।

হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র) থেকে আরম্ভ করে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল যে, শাহী দরবারে যাওয়া যেমন চলবে না, ঠিক তেমনি যুগের যিনি সুলতান—তাঁর সাথে মুলাকাত করতে যাওয়াও চলবে না। সবাই এ নীতি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ছিলেন। এর পরিণতি এই হয়েছিল যে, রাজনীতির তিক্ত কাঁটা তাঁদের আঁচলে জড়িয়ে কখনও তাঁদেরকে বিব্রত করতে পারেনি এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্নমুখী বিপ্লব ও রাজবংশের উত্থান-পতন তাঁদের কেন্দ্রগুলিতে ও তৎপরতার মধ্যে কোনরূপ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। তাঁদের একনিষ্ঠতা, ঐকান্তিকতা ও নিঃস্বার্থপরতা সকল প্রকার রাজনৈতিক বিভেদ ও বৈপরীত্য সত্ত্বেও সঠিক ও অব্যাহত থাকে এবং এরই কারণে ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকালব্যাপী এ সিলসিলার পক্ষে তাঁদের মিশন অব্যাহত রাখা এবং উপমহাদেশে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কায়েম করার নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ মিলেছিল। সম্ভবত এরই পরিণতিতে এ সিলসিলা সাধারণ লোকসমাজে জনপ্রিয়তা ও চিরন্তনতা লাভে সক্ষম হয়েছিল।

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ২০২।

হযরত শায়খ নিজামুদ্দীন (র) যখন থেকে শায়খুল কবীর (র)-কর্তৃক ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে জয় করতে এবং তবলীগ ও হিদায়াতের জন্য আদিষ্ট হয়ে এসেছিলেন, তারপর থেকে দিল্লীর সিংহাসনে একের পর এক পাঁচজন বাদশাহ অধিষ্ঠিত হন এবং তাঁরা অত্যন্ত জাঁকজমক ও দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করেন। কিন্তু মাত্র একবার ছাড়া এবং তাও ধর্মীয় প্রয়োজন হেতু (সামা' হালাল অথবা হারাম সম্পর্কিত বাহাছে) আর কখনও শাহী দরবারে যান নি অথবা তৎকালীন বাদশাহদেরও কাউকে নিজ দরবারে আসবার অনুমতি দেন নি। গিয়াছুদ্দীন বলবনের রাজত্বকালে তাঁর [শায়খ নিজাম (র)] খ্যাতির দীপ্ত সূর্য ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা মধ্যাকাশে উপনীত হয় নাই বিধায় সুলতান গিয়াছুদ্দীনের নজর তাঁর ওপর পড়ে নাই। সুলতান মু'ঈযযুদ্দীন কায়কোবাদ খেলাধূলা, ক্রীড়া-কৌতুক, শিকার ও ভ্রমণেই বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন।

জালালুদ্দীন খিলজীই প্রথম বাদশাহ ছিলেন যিনি জ্ঞানী, দৃঢ়চেতা, সহিষ্ণু, প্রতিভা ও মনীষার সন্ধান লাভে সক্ষম এবং গুণীজনের একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। এ সময় হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তা সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়েছিল। সুলতান জালালুদ্দীন কয়েকবার তাঁর দরবারে উপস্থিত হবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু কখনও তা মঞ্জুরী লাভে সক্ষম হয় নি। শেষ পর্যন্ত সুলতান আমীর খসরূ (র)-এর সাথে (যিনি সুলতানের সভাকবি ও সেক্রেটারী ছিলেন) এমত পরিকল্পনা করেন যে, একবার আগমন সংবাদ না জানিয়েই হযরত শায়খ (র)-এর খিদমতে উপস্থিত হবেন। আমীর খসরূ (র) সমীচীন মনে করেন যে, স্বীয় মুরশিদকে এ সম্পর্কে অবগত করানো হবে। কেননা তিনি তাঁকে বাদশাহর আগমন সংবাদ না দিলে সম্ভবত তা তার জন্য মঙ্গলজনক হবে না। যদিও এ ব্যাপারে বাদশাহ্ আমীর খসরূ (র)-কে স্বীয় গোপন অভিসন্ধির অংশীদার বানিয়েছিলেন, তথাপি শায়খ ও মুরশিদের নিকট এ পরিকল্পনা ও অভিসন্ধি গোপন রাখা তার নিকট সমীচীন মনে হয়নি। আমীর খসরূ (র) শায়খ খাজা নিজাম (র)-এর নিকট গিয়ে আরয জানান যে, আগামীকাল বাদশাহ্ আপনার খিদমতে হাযির হবেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)একথা শোনামাত্রই স্বীয় মুরশিদ শায়খুল কবীর (র)-এর কবর যিয়ারতের নিয়তে আজুদহন অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। বাদশাহ্ যখন এ সংবাদ অবগত হলেন তখন আমীর খসরূ (র)-এর ওপর তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন, যেহেতু আমীর খসরূ (র)তাঁর গোপন পরিকল্পনা ফাঁস করে দিয়েছেন এবং খাজা (র)-এর কদমবুসির সৌভাগ্য থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছেন। জিজ্ঞাসিত

হয়ে আমীর খসরূ (র) উত্তর দেন যে, বাদশাহ্র অসন্তুষ্টিতে জীবন হারাবার ভয় ছিল, কিন্তু মুরশিদ (র)-এর অসন্তুষ্টিতে ছিল ঈমান হারাবার ভয়। বাদশাহ অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। তিনি এ উত্তর খুবই পছন্দ করেন এবং নিশ্চুপ হয়ে যান।[১]

সুলতান 'আলাউদ্দীনের পরীক্ষা ও শ্রদ্ধা

সুলতান 'আলাউদ্দীন খিলজী যিনি প্রাচীন ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী ও সৌভাগ্যবান বাদশাহ– যাঁকে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারও বলা হয়– আপন চাচা সুলতান জালালুদ্দীনের পরে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। প্রথমদিকে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর প্রতি তাঁর অনুরাগ ও বীতরাগ বা শ্রদ্ধা ও ঘৃণা কোনটিই ছিল না। কেউ কেউ সুলতানকে হযরত খাজা (র) সম্পর্কে ভুল ধারণা দেবার প্রয়াস পেয়েছিল এবং তাঁর প্রতি ব্যাপক জনস্রোতের গতি ও অসাধারণ জনপ্রিয়তা সাম্রাজ্যের জন্য বিপদজনক–এমত ধারণা সৃষ্টিরও প্রয়াস চালিয়েছিল। সুলতান 'আলাউদ্দীন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর খিদমতে আপন পুত্র ও যুবরাজ খিযির খানের হাতে বিনীতভাবে লিখিত একটি দরখাস্ত পাঠান যার মধ্যে সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পরামর্শ ও উপদেশ দেবার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। যখন খিযির খান এই আবেদন পত্র নিয়ে খাজা (র)-এর খিদমতে উপস্থিত হন, তখন তিনি কাগজখানা হাতে নিয়েই এবং তা না পড়েই মজলিসে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করে বলেন, আমি দু'আ' করছি।' এরপর তিনি বলেন, "দরবেশদের বাদশাহ্র সাথে কি কাজ? আমি একজন ফকীর মানুষ। শহরের এক কোণে পড়ে আছি। বাদশাহ এবং মুসলমানদের জন্য দু'আ' প্রার্থনায় মশগুল। আর এতে যদি বাদশাহ্র কোনরূপ আপত্তি কিংবা অভিযোগ থেকে থাকে, তাহলে আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আল্লাহ্র যমীন অত্যন্ত প্রশস্ত।" সুলতান 'আলাউদ্দীন এরূপ জবাবে অত্যন্ত প্রীত হন এবং বলেন, আমি জানতাম যে, সাম্রাজ্যের কোন ব্যাপারে কিংবা রাজনীতিতে খাজা হযরত (র)-এর কোনরূপ যোগসূত্র নেই। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা চায় যে, আল্লাহ্র বান্দাদের সাথে আমার টক্কর বাধুক এবং এভাবে রাষ্ট্র ও দেশ ধ্বংস হয়ে যাক।[১]

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১৩৬।
২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১৩৪।

বাদশাহ্র আগমন সংবাদে 'ওযরশাহী

সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী সুলতানুল মাশায়িখের নিকট বহু অনুনয়-বিনয় করেন এবং বলে পাঠান যে, "আমি হুযুরেরই একজন ভক্ত ও অনুরক্ত মাত্র; আমার অন্যায় ও বেয়াদবী হয়েছে। আমাকে যেন মাফ করা হয় এবং হাযির হবার এজাযত দেওয়া হয় যাতে কদমবুসি করবার সৌভাগ্য ঘটে।" হযরত খাজা (র) বলেন যে, "আসবার প্রয়োজন নেই। আমি দূরে থেকেই দু'আ' করছি। আর দূরের দু'আ' অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও কার্যকর হয়ে থাকে।"[১]

ঘরের দু'টি দরজা

সুলতান এরপরও সাক্ষাত লাভের জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। এতে হযরত বলেন, "এ ফকীরের ঘরে দু'টি দরজা। বাদশাহ্ এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেন আর আমি অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাব।"[২]

ইসলামের জন্য চিন্তা-ভাবনা

যদিও সুলতান 'আলাউদ্দীনের হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর খিদমতে উপস্থিত হবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয় নাই, তথাপি তাঁর প্রতি সুলতানের ভক্তি-শ্রদ্ধা বরাবর অক্ষুণ্ন ছিল এবং তিনি সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তথা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার ক্ষেত্রে হযরত খাজা (র)-এর মুখাপেক্ষী হতেন। এক্ষেত্রে সুলতান দু'আ'র দরখাস্ত পেশ করতেন এবং তিনি আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার সাথে দু'আ' করতেন।

কাযী যিয়াউদ্দীন বারনী বলেন যে, যখন মালিক নায়েব (মালিক কাফূর) বিরঙ্গীলের অবরোধে ব্যস্ত তখন তেলেঙ্গানার রাস্তা বিপদপূর্ণ হয়ে যায়। রাস্তায় অবস্থিত থানা ও ফাঁড়িগুলিও উঠে যায়। চল্লিশ দিনেরও বেশি হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সৈন্যবাহিনীর নিরাপত্তা ও মঙ্গলজনক কোন খবরই সুলতানের নিকট পৌঁছুচ্ছিল না। সুলতান ছিলেন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। দরবারের আমীর-উমারা ও অমাত্যবর্গ আশংকা প্রকাশ করছিল হয়ত-বা সৈন্যবাহিনী কোন দৈব-দুর্বিপাকের শিকারে পরিণত হয়েছে, ফলে রসদপত্র ও চিঠিপত্রাদির যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। এরূপ চিন্তা-ভাবনা ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কালেই একদিন সুলতান মালিক কারা বেগ এবং কাযী মুগীছুদ্দীন বিয়ানুবীকে হযরত খাজা (র)-এর খিদমতে পাঠান এবং বলে দেন যে, মুসলিম সৈন্যবাহিনীর

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১৩৫।
২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১৩৫।

মঙ্গলামঙ্গলের কোন খবর না পেয়ে সুলতান অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। ইসলামের জন্য চিন্তা-ভাবনা ও দরদ-অনুভূতি সুলতানের চেয়েও তাঁর অনেক বেশী। অতএব তিনি যদি বাতেনী চোখের সাহায্যে সৈন্যবাহিনীর কোনরূপ অবস্থা অবগত হন তাহলে তিনি যেন তা জানিয়ে নিশ্চিন্ত ও খুশী করেন। সুলতান পয়গামবাহীদের হিদায়াত করে দেন যে, ঐ মুহূর্তে হযরতের মুখ দিয়ে যাই বেরুবে তা সঙ্গে সঙ্গেই হিফাযত করবে এবং এর মধ্যে যেন কোন কম-বেশি না করা হয় এবং সুলতানের প্রেরিত পয়গাম তারা পৌঁছায়। তিনি পয়গাম শোনামাত্রই বাদশাহ্‌র বিজয়ের বর্ণনা দিতে শুরু করেন এবং বলেন, "এটা তো সামান্য ও নগণ্য বিজয়। আমরা আরও বড় বিজয়ের আশা রাখি।" একথা শুনে মালিক কারা বেগ এবং কাযী মুগীছুদ্দীন অত্যন্ত খুশী মনে ফিরে আসেন এবং সুলতানকে ঐ সুসংবাদ দেন। সুলতান তা শুনে অত্যন্ত খুশী হন। তিনি স্থির নিশ্চিত হন যে, বিরঙ্গীলের বিজয় হয়ে গেছে। ঐ দিন সালাতুল 'আসর সম্পন্ন করার অব্যবহিত পরই মালিক কাফূরের দূত এসে পৌঁছে এবং বিরঙ্গীলের বিজয় সংবাদ ব্যক্ত করে। জুম'আর দিন বিজয়-পত্র মসজিদের মিম্বর থেকে পড়ে শোনানো হয়। প্রাঙ্গণে খুশীর কাড়া-নাকাড়া বাজতে থাকে এবং আনন্দ-উৎসবের ধুম লেগে যায়।[১]

আরও একবার যখন মোগলরা দিল্লী আক্রমণোদ্যত হয়েছিল তখন সুলতান স্বয়ং যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি হযরত খাজা (র)-এর খিদমতে আরয করেন, "এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নাযুক মুহূর্ত। আপনি একটু খেয়াল রাখবেন।" এরপর হযরত খাজা নিজাম (র) সমস্ত খানকাহ্‌বাসীদের লক্ষ করে বলেন, "আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ কর এবং তাঁরই দরগাহে মুসলমানদের জয়লাভের জন্য দু'আ' করতে থাক।" এরপর সবাই দু'আ' ও মুনাজাতে মগ্ন হয়ে যায় এবং অল্প কিছু পরেই বিজয়ের খবর এসে পৌঁছে। মোগলরা এ যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়।[২]

কাযী যিয়াউদ্দীন সুলতান 'আলাউদ্দীন খিলজীর রাজদরবারের অন্যতম সভাসদ ছিলেন। তিনি বলেন যে, সুলতানের গোটা রাজত্বকালে তাঁর মুখ দিয়ে হযরত খাজা (র)-এর শানে কোন অমর্যাদাকর উক্তি কখনই বের হয়নি। যদিও দুশমন ও হিংসুটে স্বভাবের লোকেরা শায়খ (র)-এর শাহী জাঁকজমক ও খানকাহ্‌মুখী জনস্রোত এবং শাহী লঙ্গরখানার মত ব্যাপক ও বিস্তৃত

১. তারীখে ফীরোযশাহী, পৃ. ৩৩৩।
২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১৬০।

কাণ্ডকারখানাকে সুলতানের চোখে উদ্দেশ্যপূর্ণ করে তুলতে কল্পনার রঙ মিশ্রিত এমন সব পন্থা-পদ্ধতি এখতিয়ার করত যাতে সুলতানের মনে শায়খ (র)-এর প্রতি বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। সুলতান কিন্তু কখনও সেদিকে ভ্রুক্ষেপই করেন নি। বিশেষ করে রাজত্বের শেষদিকে তিনি হযরতের প্রতি মাত্রাধিক পরিমাণে একনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন।

সুলতান কুত্‌বুদ্দীনের বিরোধিতা ও হত্যা

সুলতান 'আলাউদ্দীনের পর সুলতানের দ্বিতীয় পুত্র কুত্‌বুদ্দীন মুবারক শাহ সাম্রাজ্যের যুবরাজ খিযির খানকে বঞ্চিত করে জোরপূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন।

খিযির খান যেহেতু হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়ার মুরীদ ছিলেন এবং তিনিই (খিযির খান) মরহুম সুলতান 'আলাউদ্দীনের সিংহাসনের ন্যায্য ও প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন–যাঁর কাছে থেকে কুত্‌বুদ্দীন মুবারক শাহ ক্ষমতার মসনদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন–সেহেতু কুত্‌বুদ্দীন হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর প্রতি সর্বদাই অসন্তুষ্ট থাকতেন। সুলতান জামে' মীরি নামে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং সকল বুযর্গ ও 'উলামায়ে কিরামের ওপর নির্দেশ ছিল যেন তাঁরা সেখানে গিয়ে সালাতুল জুম'আ আদায় করেন। সুলতানুল মাশায়িখ বলে পাঠান ঃ "আমাদের কাছেই একটি মসজিদ আছে। তার হক বেশী বিধায় আমরা সেখানেই সালাত আদায় করব।" তিনি অতঃপর জামে' মীরিতে সালাত আদায় থেকে বিরত থাকেন। এতে বাদশাহ্ ভীষণভাবে ক্ষেপে যান। উপরন্তু প্রতি চান্দ্রমাসের প্রথম দিনে আত্মীয়-বান্ধব এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ শাহী দরবারে উপস্থিত হয়ে বাদশাহ্‌র খিদমতে নযরানা পেশ করত। সুলতানুল মাশায়িখ এ অনুষ্ঠানেও শরীক হতেন না; প্রথামাফিক রসম পালনের উদ্দেশ্যে স্বীয় খাদিম ইকবালকে পাঠিয়ে দিতেন। এতে সুলতান আরো বিগড়ে যান। তিনি তাঁর সমস্ত উযীর ও আমীর-উমারাকে নির্দেশ দেন কেউ যেন হযরত খাজা নিজামুদ্দীনের যিয়ারত লাভের উদ্দেশ্যে গিয়াছপুর না যায়।

আমীর খসরু (র) লিখেছেন যে, বাদশাহ্‌র নির্দেশ ছিল, যে ব্যক্তি শায়খের মাথা আনবে, তাকে হাযার তংকা বখশিশ দেওয়া হবে। একদিন শায়খ যিয়াউদ্দীন রূমীর দরবারে সুলতান কুত্‌বুদ্দীন এবং হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) সামনাসামনি হয়ে যান। শায়খ একজন মুসলমান হিসেবে সুলতানকে সালাম জানান। সুলতান কুত্‌বুদ্দীন জবাবদানে বিরত থাকেন। এ ধরনের ঘটনাবলী চার

বছরের শাসনামলে পর্যায়ক্রমে ঘটতে থাকে।[১] চান্দ্রমাসের প্রথম তারিখের অনুষ্ঠানে উপস্থিতির ব্যাপারে পীড়াপীড়ির ঘটনা সবশেষে ঘটেছিল। যাই হোক, অবশেষে সুলতান তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী খসরু খান কর্তৃক নিহত হবার পর এই বিরোধিতার অবসান ঘটে।

গায়েবী লঙ্গরখানা

ঐ যুগেই সুলতান কুত্বুদ্দীনের তরফ থেকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে বাধা-নিষেধ অরোপ করা হয়েছিল যে, দরবারের কোন আমীর-উমারা এবং সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে যেন কোনরূপ নযরানা হযরত খাজা (র)-এর খিদমতে পেশ করা না হয়। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া এটা জানবার পর বিশেষভাবে তাকিদ দেন যেন পূর্বের তুলনায় বেশী করে খানা পাকানো হয় এবং দস্তরখানের পরিধি আরও অধিক প্রসারিত করা করা হয়। হযরত শায়খ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র) বলেন ঃ

> একবার সুলতান কুত্বুদ্দীনকে কোন হিংসুটে বলে যে, শায়খ আমাদের হাদিয়া-নযরানা কবূল করেন না, অথচ আমীর-উমারা ও সরদারদের আনীত নযরানা কবূল করেন। সুলতান কুত্বুদ্দীন এর সত্যতা অবহিত হবার পর নির্দেশ পাঠান যে, কোন আমীর অথবা সরদার শায়খ (র)-এর ওখানে যাবে না। দেখা যাক, তিনি এত পরিমাণ লোকের দাওয়াত কোথা থেকে করেন। অধিকন্তু তিনি গোয়েন্দা নিযুক্ত করেন। তাদের ওপর দায়িত্ব চাপানো হয়েছিল যেন তারা কোন আমীর খাজা (র)-এর দরবারে গেলে লক্ষ্য রাখে এবং যথাসময়ে গিয়ে বাদশাহ্কে তা অবহিত করে। হযরত শায়খ (র) একথা শোনার পর বলেন ঃ আজ থেকে খাবার বেশী করে পাক করা হোক। বেশ কিছুকাল অতিক্রান্ত হবার পর একদিন বাদশাহ্র লোকজনকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ শায়খের খানকাহ্র অবস্থা কি? তারা বলল যে, আগে যে পরিমাণ পাক করা হত বর্তমানে তার দ্বিগুণ পাক করা হয়ে থাকে। একথা শোনার পর বাদশাহ অত্যন্ত লজ্জিত হন এবং বলেন, আমিই ভুলের মধ্যে ছিলাম। তাঁর গোটা কারবারই তো গায়েবী জগতের।[২]

গিয়াছুদ্দীন তুগলকের রাজত্বকাল এবং সরকারী বিতর্ক সভা

কুত্বুদ্দীন মুবারক শাহ্র পর কয়েক মাস খসরু খান অন্যায় ও যবরদস্তিমূলকভাবে রাজত্ব করেন এবং ইসলামী প্রথা-পদ্ধতিকে হেয় করে

---

১. নিজামে তালীম, পৃ. ২২০।

২. খায়রুল মাজালিস, পৃ. ২০৩।

ইসলামেরই অবমাননা করেন। ৭২১ হিজরীতে গিয়াছুদ্দীন তুগলক (মালিক গাযী) খসরূ খানকে হত্যা করে তুগলক বংশের রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। সুলতান গিয়াছুদ্দীন যদিও তেমন বিদ্যাবত্তার অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু 'আলিম-'উলামা ও শরীয়তের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) সামা' শুনতেন। একারণে দিল্লীর সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে এর ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে এবং জনগণের আগ্রহ এর প্রতি বৃদ্ধি পায়।[১] শায়খযাদা হুস্‌সামুদ্দীন ফারজাম নামের এক ব্যক্তি দীর্ঘ দিন যাবত হযরত নিজামুদ্দীন (র)-এর স্নেহচ্ছায়ায় প্রতিপালিত হয়েছিল, তথাপি মুজাহাদার গভীর আগ্রহ-উদ্দীপনা এবং ইশ্‌কের অমূল্য নিয়ামত ও সম্পদ থেকে সে লাভবান হতে পারে নি। অধিকন্তু সাম্রাজ্যের উপ-শাসক কাযী জালালুদ্দীন আলুয়ালজীরও আহলে দর্দ ও ইশ্‌ক (মা'রিফতপন্থী)দের প্রতি এক ধরনের বিদ্বিষ্ট মনোভাব ছিল। কাযী সাহেব এবং অন্যান্য 'উলামায়ে কিরাম শায়খযাদা হুস্‌সামুদ্দীনকে নিজেদের মতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করল এবং বাদশাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করল এই বলে যে, খাজা নিজামুদ্দীন এ যুগের ইমাম। অথচ তিনি সামা' শোনেন যা ইমাম আযম আবূ হানীফার মাযহাব মতে হারাম। তাঁরই কারণে হাযার হাযার আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌ এই অপ্রিয় ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হচ্ছে। এ মাসয়ালা সম্পর্কে সুলতান ছিলেন সম্পূর্ণ বেখবর। তাঁর আশ্চর্য লাগছিল এই ভেবে যে, এতবড় একজন ইমাম এরূপ শরীয়ত বিগর্হিত কর্মে লিপ্ত! লোকেরা সামা' হালাল হবার ফতওয়া এবং শরীয়তের কিতাবসমূহের বিভিন্ন রিওয়াত বাদশাহ্‌র সামনে পেশ করে। বাদশাহ বললেন যে, যেহেতু 'উলামায়ে দীন সামা'র হারাম হবার সপক্ষে ফতওয়া দিয়েছেন এবং তাঁরা একে নিষেধ করে থাকেন, সেহেতু হযরত খাজা (র) এবং শহরের সমস্ত 'উলামায়ে কিরাম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে আহ্বান করা হোক; অতঃপর একটি জলসা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ ব্যাপারে একটি ফয়সালা করা হোক প্রকৃত সত্য কোন্‌টি। মীর খোরদের ভাষায় শুনুন ঃ

> শাহী-প্রাসাদে হযরত খাজা (র)-কে আহ্বান জানানো হল। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) কাযী মুহীউদ্দীন কাশানী এবং মাওলানা ফখরুদ্দীন নামক দু'জন শীর্ষস্থানীয় 'আলিম ও যুগশিক্ষক সমভিব্যাহারে শাহী প্রাসাদে তশরীফ আনেন। সর্বপ্রথম উপ-শাসক কাযী জালালুদ্দীন হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-কে সম্বোধন করে ওয়ায-নসীহত শুরু করেন এবং

১. সামা'র হাকীকত, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং এর আদব ও আহকাম সম্পর্কিত বাহাছ চতুর্থ অধ্যায়ে 'স্বাদ ও বিভিন্ন অবস্থা' শীর্ষক শিরোণাম দেখুন।

কিছু অশোভনমূলক উক্তি করেন। এমন কি এও বলেন যে, যদি এরপরও আপনি সামা'র হালাল হবার দাবি অব্যাহত রাখেন এবং তা শুনতে থাকেন তাহলে মনে রাখবেন, শরা'র হাকীম হিসেবে আমি আপনাকে শাস্তি দেব। একথা শুনতেই হযরত খাজা (র) বলে ওঠেন ঃ যে পদের গর্বে গর্বিত হয়ে তুমি আজ এই কথা বলছ, তা থেকে তুমি অপসারিত হবে। অতঃপর এর ঠিক বার দিন পর কাযী স্বীয় পদ থেকে অপসারিত হয়ে দিল্লী থেকে বিদায় নেন। সংক্ষেপে ঘটনা এই যে, উক্ত বিতর্ক মজলিসে সমস্ত 'উলামায়ে কিরাম, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, আমীর-উমারা এবং পদস্থ সরকারী কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। বাদশাহ এবং উপস্থিত সকলেরই হযরত খাজা (র)-এর ওপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এবং সকলেই তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছিল। শায়খযাদা হুসসাম তখন বললেন ঃ আপনার মজলিসে সামা' হয়ে থাকে, লোকেরা নৃত্য করে এবং আহ্ উহ্ ধ্বনি উচ্চারণ করে থাকে। তিনি এ ধরনের অনেক কথা বললেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) তাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ চেঁচিও না, বেশি কথা বলার দরকার নেই। আগে বল যে, সামার সংজ্ঞা কি? প্রত্যুত্তরে শায়খযাদা হুসসাম বললেন ঃ আমি জানি না। অবশ্য এতটুকু জানি যে, 'উলামায়ে কিরাম সামা'কে হারাম বলে থাকেন। হযরত খাজা (র) বললেন ঃ সামা'র অর্থ যখন তোমার জানা নেই তখন তোমাকে আমার বলার কিছু নেই, আর বলাও উচিত নয়। এতে শায়খযাদা হুসসাম লজ্জিত হন। বাদশাহ গভীর আগ্রহের সাথে তাঁর তাকরীর (বক্তৃতা) শুনছিলেন। যখনই কেউ জোরে কথা বলতে চেষ্টা করত তখনই তিনি বলতেন, চেঁচিও না। শোন, শায়খ (র) কি বলছেন। মজলিসে উপস্থিত উলামায়ে কিরামের মধ্যে মাওলানা হামীদুদ্দীন এবং মাওলানা শিহাবুদ্দীন মুলতানী নিশ্চুপ ছিলেন। মাওলানা হামীদুদ্দীন এতটুকু বললেন যে, বাদী হযরত খাজা (র)-এর মজলিসের অবস্থা সম্পর্কে যে বর্ণনা দিলেন তা ঘটনার বিপরীত এবং সত্যের অপলাপ মাত্র। আমি নিজে দেখেছি এবং বহু বুযর্গ ও দরবেশকেও আমি সেখানে দেখেছি। ঠিক সেই মুহূর্তে শায়খুল ইসলাম শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী (র)-এর দৌহিত্র মাওলানা 'আলামুদ্দীন এসে উপস্থিত হন। বাদশাহ তাঁকে বললেন ঃ "আপনিও একজন 'আলিম এবং পর্যটকও বটেন। এক্ষণে সামা' নিয়ে বাহাছ হচ্ছে। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি সামা' শ্রবণ হালাল, না হারাম?" মাওলানা 'আলামুদ্দীন বললেন ঃ আমি এ সম্পর্কে একখানা পুস্তিকা প্রণয়ন করেছি এবং সেখানে এর হারাম ও হালাল হওয়া সম্পর্কে দলীল-প্রমাণও পেশ

করেছি। আমার গভীর পর্যবেক্ষণের ফলাফল এই যে, যে হৃদয় দিয়ে শোনে তার জন্য সামা' হালাল, আর যে ব্যক্তি নফ্স (রিপু, প্রবৃত্তি) -এর সাহায্যে শোনে, তার জন্য এটা হারাম। এরপর বাদশাহ্ মাওলানা 'আলামুদ্দীনকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি বাগদাদ, শাম (সিরিয়া), তুরস্ক প্রভৃতি শহরসহ প্রায় সর্বত্রই ভ্রমণ করেছেন। সেখানকার বুযর্গ ও মাশায়িখে কিরাম সামা' শোনেন কিনা? সেখানে কি কেউ কাউকে তা শুনতে মানা করে? মাওলানা আলামুদ্দীন উত্তরে বললেন যে, ঐ সমস্ত শহরে বুযর্গ ও মাশায়িখে কিরাম সামা' শুনে থাকেন আর কেউ কেউ তা দফ এবং শাবানা সহকারে তা শুনেন, কেউ মানা করে না। আর সামা' তো মাশায়িখে কিরামের মধ্যে হযরত জুনায়েদ (র), হযরত শিবলী (র)-এর সময় থেকেই প্রচলিত হয়ে আসছে। বাদশাহ্ মাওলানা 'আলামুদ্দীনের মুখের এমত বর্ণনা শোনার পর নিশ্চুপ হয়ে যান এবং আর কিছুই বলেন নি। মাওলানা জালালুদ্দীন আরয করেন যে, বাদশাহ্ যেন সামা' হারাম হবার ফরমান জারি করেন এবং ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাবের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। এতে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) বাদশাহকে বললেন, আমি চাই যে, আপনি এ ব্যাপারে কোন ফরমান যেন জারি না করেন এবং এ ব্যাপারে কোনরূপ ফয়সালা পেশ করতে বিরত থাকেন। মাওলানা ফখরুদ্দীন (যিনি মজলিসে উপস্থিত ছিলেন)-এর বর্ণনা এই যে, চাশ্তের প্রথম ওয়াক্ত থেকে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত বাহাছ অব্যাহত থাকে। মজলিসে উপস্থিত কোন ব্যক্তিই এর হারাম হবার সপক্ষে দলীল পেশ করতে পারে নি। অপর আর একটি বর্ণনায় অবগত হওয়া যায় যে, বাদশাহ্ ফয়সালা করেন, হযরত খাজা (র) সামা' শুনতে পারেন। কেউ এ থেকে তাঁকে নিষেধ করতে পারবে না। কিন্তু এ বর্ণনাটি পরিত্যক্ত। ঐ দিনগুলিতে কেউ হযরত খাজা (র) কে বলেন যে, এখন তো সামা'র সপক্ষে বাদশাহ্র ফরমানই মিলে গেছে। যে সময় যে মুহূর্তে চাইবেন, সামা' শুনবেন। এটা তো এখন হালাল হয়ে গেছে। হযরত খাজা (র) বললেন, যদি তা হারাম হয় তবে কারো বলায় তা হালাল হতে পারে না। আর যদি হালাল হয় তবে কারো বলায় তা হারাম হতে পারে না। মজলিস সমাপ্তির পর বাদশাহ্ হযরত খাজা (র) কে অত্যন্ত তাযীম ও তাকরীমের সঙ্গে বিদায় দেন।[১]

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া থেকে সংক্ষেপিত, পৃ. ৫২৭-৩২।

হযরত খাজা (র)-এর যবানীতে বিতর্ক সভার অবস্থা

কাযী যিয়াউদ্দীন বারনী স্বীয় গ্রন্থ 'হাসরতনামায়' লিখেন যে, হযরত খাজা (র) উক্ত মজলিস থেকে বিদায় নিয়ে ঘরে তশরীফ আনেন এবং যোহরের ওয়াক্তে মাওলানা মুহীউদ্দীন কাশানী এবং আমীর খসরুকে ডেকে পাঠান। তিনি ইরশাদ করেন যে, দিল্লীর আলিমদের অন্তর হিংসা ও দুশমনিতে ভরা। তাঁরা প্রশস্ত ও উন্মুক্ত ময়দান পেয়েছে এবং শত্রুতামূলক বহু কথাবার্তা বলেছে। সব চেয়ে এটাই আশ্চর্যের ব্যাপার দেখলাম যে, সহীহ্ হাদীছ শোনাটা পর্যন্ত এরা মেনে নিতে পারছে না। এর জবাবে তারা এটাই বলে যে, আমাদের শহরে হাদীসের তুলনায় ফিকহ্ই অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। এ কথা শুধু সেই বলতে পারে যার হাদীসে নববী (সা)-এর ওপর আদৌ কোন ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই। আমি যখনই কোন সহীহ হাদীছ পড়তে থাকি, তখনই তারা নারায হয়ে থাকে যে, এ হাদীস দ্বারা ইমাম শাফি'ঈ দলীল দিয়ে থাকেন এবং তিনি আমাদের আলিমদের দুশমন বিধায় আমরা তা শুনব না। জানি না এদের আদৌ কোন 'আকীদা আছে কিনা। এরা শাসকের (উলুল আম্র) সামনে এরূপ যবরদস্তিমূলকভাবে কাজ-কারবার করে এবং সহীহ হাদীছ পাঠকে থামিয়ে দেয়। এমন 'আলিম আমি দেখিও নি আর এ ধরনের আলিমের কথা শুনিওনি যে, তার সামনে সহীহ হাদীছ পাঠ করা হয় অথচ সে বলে যে, আমি শুনব না। আমি বুঝতে পারি না যে, আসলে রহস্যটা কি। আর যে শহরে এরূপ ধৃষ্টতা ও যবরদস্তি দেখানো হয়, সে শহর কি করে টিকে থাকতে পারে? এর প্রতিটি দালান-কোঠার ইট-কাঠ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলেও তা মোটেই তাজ্জবের ব্যাপার হবে না। এরপর বাদশাহ, আমীর-উমারা এবং সাধারণ জনগণ শহরের কাযী ও আলিমদের থেকে এটা শুনবে যে, এই শহরে হাদীসের ওপর 'আমল করা হয় না। তা'হলে হাদীছে নববী (স)-এর ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধা কী করে থাকবে? আমার ভয় হয় যে, না জানি আলিমদের এ ধরনের অশ্রদ্ধা ও বেয়াদবীর কারণে আসমান থেকে কোন বালা-মুসীবত, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী অবতীর্ণ হয়।[১]

দিল্লীর ধ্বংস

এই ঘটনার ঠিক ষষ্ঠ বছরে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর ওফাতের পর সুলতান গিয়াছুদ্দীন তুগলকের পুত্র ও উত্তরাধিকারী মুহাম্মদ তুগলক দিল্লী খালি করার এবং দেবগীরে (দৌলতাবাদ) রাজধানী স্থানান্তরের ফরমান

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৫৭২।

জারি করেন এবং এ ব্যাপারে এরূপ জিদ ও ক্ষিপ্ততার আশ্রয় নেন যে, বাস্তবে শহরের প্রতিটি ইট ঝনঝনিয়ে উঠে এবং দিল্লীর মত কোলাহলমুখর একটি শহর ঘনবসতির কারণে যেখানে লোকের থাকার জায়গা পাওয়া যেত না– এমনভাবে জনশূন্য হয়ে পড়ে যে, বন্য পশু ও হিংস্র প্রাণী ব্যতিরেকে কোন জীবিত প্রাণীর চেহারা পর্যন্ত সেখানে দৃষ্টিগোচর হত না।

মুহাম্মদ কাসিম তারীখে ফিরিশতায় লিখেন যে, সরকারী কর্মকর্তারা একটি লোককেও দিল্লীর আলো-বাতাসে তিষ্ঠাতে দেয়নি; সবাইকে জড়ে-মূলে দৌলতাবাদ (দেবগীর) পাঠিয়ে দেয়। ফলে দিল্লী এমনভাবে বিরান ও জনশূন্য হয়ে পড়ে যে, একমাত্র শকুন, শিয়াল ও বন্য জন্তু ছাড়া আর কোন জীবজন্তু কিংবা জনপ্রাণীর সাড়া-শব্দও সেখানে পাওয়া যেত না।[১]

যে সমস্ত আলিম উক্ত মসজিদে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা ছাড়া অন্যান্যরাও তাদের বদৌলতে দৌলতাবাদে নির্বাসিত হয়। দৌলতাবাদ পৌঁছার পর সেখানকার দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর মুকাবিলা তাদের করতে হয়। হাযার হাযার নর-নারী তো রাস্তাতেই মারা যায়। হাযার হাযার লোক সেখানে পৌঁছামাত্র দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর শিকারে পরিণত হয়। আর এভাবে হযরত খাজা (র)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়।

সময়ের ব্যবস্থাপনা

আমীর খোরদ হযরত খাজা (র)-এর সময়ের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে লিখেছেনঃ প্রতিদিন ইফতারের পর (যা আহলে জামা'আতের সাথেই হত) তিনি স্বীয় বালাখানার বিশ্রামস্থলে তশরীফ নিতেন। বন্ধু-বান্ধব ও সেবকবৃন্দকে যারা সাধারণত শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসত–মাগরিব ও 'ইশার মধ্যবর্তী সময়ে প্রাসাদের ওপরেই ডেকে পাঠানো হ'ত। প্রায় এক ঘণ্টাকাল সময় তাদের পারস্পরিক সহাবস্থান, সান্নিধ্য ও সন্দর্শনের সৌভাগ্য লাভ ঘটত। বিভিন্ন রকমের শুকনো ও তাজা ফল-মূলাদি, সুস্বাদু ও রুচিকর খাবার এবং নানা প্রকার পানীয় দ্রব্যাদি হাযির করা হ'ত। মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এসব গ্রহণ করত। তিনি প্রত্যেকের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করতেন এবং প্রত্যেকের শুভাশুভ অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন।[২]

---

১. তারীখে ফিরিশতা, ১ম খন্ড, পৃ. ২৪৩।
২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১২৫।

আমীর খসরুর বৈশিষ্ট্য

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) 'ইশার সালাত আদায়ের জন্য অতঃপর নীচে অবতরণ করতেন। জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের পর পুনরায় প্রাসাদে তশরীফ রাখতেন। কিছুক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন, অতঃপর আরাম ও বিশ্রাম সুখ ভোগ করবার জন্য চারপায়ীর ওপর শরীর এলিয়ে দিতেন। সে সময় খাদিম তসবীহ্ এনে হযরত খাজা (র)-এর হাতে উঠিয়ে দিত। এই সময়ে একমাত্র আমীর খসরু ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর সান্নিধ্যে আসতে সাহস পেত না।[1] তিনি হযরত খাজা (র)-এর সামনে বসে নানা ধরনের কাহিনী ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। তিনি খোশমেযাজে থাকা অবস্থায় মাথা নেড়ে দিতেন। সময়ে অসময়ে জিজ্ঞেস করতেন যে, তুর্ক! কি খবর? আমীর খসরু এতটুকু শোনামাত্রই দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার মওকা বের করে নিতেন। তিনি একটু সূত্রের উল্লেখ করতেই আমীর খসরু গোটা ফিরিস্তিই পেশ করে দিতেন।

রাত্রের প্রস্তুতি

যখন আমীর খসরু এবং সাহেবযাদাগণ অনুমতি নেবার পর বিদায় হতেন তখন খাদিম ইকবাল এসে পানিভর্তি কয়েকটি পাত্র ওযূর জন্য রেখে দিয়ে বাইরে চলে যেত। এরপর হযরত খাজা (র) স্বয়ং উঠতেন এবং দরজায় শেকল লাগিয়ে দিতেন। তারপর সেখানকার খবর একমাত্র আল্লাহ্ পাক ছাড়া আর কেউ জানত না। আল্লাহ্ জানেন যে, সারারাত ধরে একান্তে ও নিভৃতে কি সব গোপন আলাপ হত এবং স্বীয় মহান প্রভু-প্রতিপালকের সাথে কি গভীর আকুতি ও অনুরাগের কথা হত।

সাহ্রী

সাহ্রীর ওয়াক্ত হলে খাদিম এসে হাযির হত এবং বাইরে থেকে দরজায় নক্ (দস্তক) করত। হযরত খাজা (র) দরজা খুলে দিতেন। সাহ্রী–যার ভিতর বিভিন্ন রকমারী খাদ্যদ্রব্য থাকত–সামনে রাখা হত। তিনি এ থেকে খুব অল্প

---

১. হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর সঙ্গে আমীর খসরুর যে গভীর আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তা তাঁর জীবন-চরিত ও দীওয়ান পাঠে অবগত হওয়া যায়। ফুলের সাথে বুলবুলের যে সম্পর্ক এবং আগুনের সাথে পতঙ্গের যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি সম্পর্ক ছিল আমীর খসরুর স্বীয় মুরশিদ হযরত খাজা (র)-এর সঙ্গে। হযরত খাজা (র)-এরও এই সত্যিকার ও খাঁটি 'আশিকের সাথে এতখানি হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল যে, তিনি বলতেন من از همه تنگ نیایم অর্থাৎ কখনো কোন মুহূর্তে উদাস, নিঃসঙ্গ ও বিরক্তি বোধ করি, কিন্তু এমতাবস্থায়ও তোমার সাথে তা হয় না। আরও একবার তিনি বলেছিলেন ঃ কখনও কখনও নিজেকেও নিজের কাছে বিরক্তিকর ও অসহ্য লাগে, কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে তা মনে হয় না।" সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৩০২।

পরিমাণেই গ্রহণ করতেন। অবশিষ্ট অংশটুকুর জন্য বলতেন যে, এগুলি বাচ্চাদের জন্য হিফাযতে রেখে দাও। খাজা 'আবদুর রহীম যিনি সাহ্‌রী নিয়ে যাবার দায়িত্বে ছিলেন, বলেন ঃ অধিকাংশ সময়ই এমন হত যে, তিনি সাহ্‌রী গ্রহণ করতেন না। আমি আরয করতাম ঃ হযরত! এমনিতেই ইফতারীর মুহূর্তেও আপনি খুব কমই খান। যদি সাহ্‌রীও কিছু গ্রহণ না করেন তবে শারীরিক দুর্বলতা অত্যন্ত বেড়ে যাবে। একথা শোনামাত্রই তিনি কাঁদতে থাকতেন এবং বলতেন ঃ "কত গরীব ও অসহায় মানুষ মসজিদের কোণায় ও চত্বরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় পড়ে আছে, অনাহারে তারা রাত কাটিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় এ খানা আমি কিভাবে গলাধঃকরণ করতে পারি!" অধিকাংশ সময় তাই দেখা গেছে যে, সাহ্‌রীর সময় যা এনেছি তাই আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছি।

ভোর বেলায়

দিনের বেলায় যারই দৃষ্টি তাঁর চেহারা মুবারকের ওপর পড়ত, সে-ই দেখতে পেত প্রস্ফুটিত ফুলের পাঁপড়িসদৃশ একটি চেহারা আর চোখ সারা রাত বিনিদ্র যাপনের কারণে লাল। এরূপ কঠোর মুজাহাদার কারণেও তাঁর ভিতর কখনো দুর্বলতা পরিলক্ষিত হ'ত না কিংবা তাঁর স্বাভাবিক আচার-আচরণে কোনরূপ পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হত না। কেউ বলতেও পারত না যে, তিনি চার শ' অথবা পাঁচশ' রাকাত সালাত আদায় করতেন কিংবা তিনি এই পরিমাণ তসবীহ্ পাঠে অভ্যস্ত। তাঁর জীবন ও যিন্দেগী এভাবে কাটত যে সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ পাক ছাড়া আর কেউ অবহিত ছিল না।

দিনের বেলায়

প্রত্যহ দিনের রেলা তিনি স্বীয় মাশায়িখের মুসাল্লার (জায়নামায) ওপর কিবলামুখী হয়ে গভীর আত্মনিমগ্নতার ভেতর অতিবাহিত করতেন যেন তিনি আল্লাহ্‌কে দেখছেন। সাক্ষাতপ্রার্থীদের ভিতর বিভিন্ন শ্রেণীর লোকই থাকত। 'উলামায়ে কিরাম, মাশায়িখ, শ্রদ্ধেয় ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, ইতর-ভদ্র, প্রত্যেকের বিদ্যা-বুদ্ধি ও মর্যাদা মুতাবিক যার যে বিষয়, সেই বিষয়েই তিনি তার সাথে কথা বলতেন এবং তার সন্তুষ্টি সাধন করতেন। বাহ্যত তিনি তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন বটে, কিন্তু বাস্তবে তিনি মশগুল থাকতেন স্বীয় পরম আরাধ্য প্রেমাস্পদকে নিয়ে।[১]

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১২৫ ও ১২৯।

মনস্তুষ্টি সাধন ও প্রশিক্ষণ

যোহ্‌রের ওয়াক্ত হত। সালাত আদায়ের পর যে সমস্ত আত্মীয়-বান্ধব কদমবুসির জন্য আসত, তাদেরকে আহ্বান করা হত এবং তাদের মনস্তুষ্টি সাধনের কথাবার্তায় তিনি কিছু সময় অতিবাহিত করতেন। 'ইবাদত-বন্দেগী, সলুক ও আল্লাহ্‌র মুহব্বত সম্পর্কে তাদের প্রয়োজনীয় হিদায়াত করতেন। যবরদস্ত 'আলিম ও বুযর্গ ব্যক্তিরও (যারা সে মজলিসে উপস্থিত থাকতেন) সাহস হত না যে, মাথা উঁচিয়ে তাঁর চেহারা মুবারকের প্রতি লক্ষ্য করে। এটাই ছিল আল্লাহ্-প্রদত্ত তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার প্রকাশ।

ওফাত নিকটবর্তী হলে

বয়স আশি বছর অতিক্রান্ত হতেই তাঁর মধ্যে পরলোক যাত্রার সমূহ লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। একদিন তিনি বললেন, আমি স্বপ্নে রাসূলে মকবুল (সা)-কে দেখলাম। হুযুর (স) বললেন, "নিজাম! তোমার সান্নিধ্য আমি গভীরভাবে কামনা করছি।"[১]

মর্যাদাশীল খলীফাদের এজাযতনামা প্রদান মুহব্বত ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের উপদেশ দান

রোগাক্রান্ত অবস্থায় তিনি কতিপয় হযরতকে খিলাফতনামা প্রদান করেন এবং এযাজতনামা লিখে দেন। মাওলানা ফখরুদ্দীন যরাবী মযমূন তৈরী করেন এবং সায়্যিদ হুসায়ন কিরমানী তা লিপিবদ্ধ করেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) এর ওপর দস্তখত করেন। দস্তখতের ভাষা ছিল নিম্নরূপ ঃ

من الفقير محمد بن على البداؤنى البخارى

'দীনাতিদীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে 'আলী আল-বাদায়ুনী আল-বুখারীর পক্ষ থেকে।' এই এজাযতনামার ওপর ৭২৪ হিজরীর ২০ শে যিলহজ্জ তারিখের উল্লেখ ছিল। এ থেকে জানা যায় যে, এটা ওফাতের তিন মাস সাতাশ দিন পূর্বে লেখা হয়েছিল।[২]

যে সমস্ত বুযর্গের জন্য এসব এজাযতনামা প্রস্তুত করা হয়েছিল তা তাঁদের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর যে সমস্ত বুযর্গ সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের হাতে তা প্রদান করা হয়। প্রথমে শায়খ কুত্‌বুদ্দীন মুনাওয়ারকে আহ্বান

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১৪১।

২. হযরত খাজা (র)-এর ওফাত হয় ৭২৫ হিজরীর ১৮ই রবিউছ-ছানী মাসে।

করা হয়। সুলতানুল মাশায়িখ (র) তাঁকে খিলাফতনামা প্রদান করেন। ইরশাদ হল, যাও! এর শুকরিয়া স্বরূপ দু'রাকাত শোকরানা সালাত আদায় কর। বন্ধু-বান্ধব তাঁকে মুবারকবাদ জানান। এ সময়েই শায়খ নাসিরুদ্দীন মাহমূদ চেরাগে দিল্লীকে তিনি স্মরণ করেন। তাঁকেও খিরকা, খিলাফত ও এজাযতনামা প্রদান করেন এবং ওসীয়ত করেন। শায়খ নাসিরুদ্দীন মাহমূদ চেরাগে দিল্লী কেবলই দাঁড়িয়েছেন এমন সময় শায়খ কুতবুদ্দীন মুনাওয়ারকে পুনরায় ডাকা হয়। তিনি এলে হযরত খাজা (র) ইরশাদ করেন, শায়খ নাসিরুদ্দীন মাহমূদের খিলাফত প্রাপ্তিতে তাঁকে মুবারকবাদ জানাও। অনুরূপ আদেশ শায়খ নাসিরুদ্দীন মাহমূদের প্রতিও করা হয়। অতঃপর উভয়েই উভয়ের খিলাফত প্রাপ্তিতে পরস্পরকে মুবারকবাদ জানান এবং একে অপরে কোলাকুলি করার আদেশ প্রাপ্ত হন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) অতঃপর বললেন ঃ তোমরা উভয়ে পরস্পরের ভাই। কে আগে খিলাফত পেলে আর কে পরে পেলে, এ নিয়ে মনে কিছু করবে না।[১]

ওফাতের অবস্থা

ওফাতের ৪০ দিন পূর্বে ইস্তিগরাক ও আশ্চর্যজনক এক অবস্থার সৃষ্টি হয়। আমীর খোরদ ওফাতের অবস্থা বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। তাঁর বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

> সেদিন ছিল শুক্রবার। জুম'আর দিন। সুলতানুল মাশায়িখ (র)-এর ওপর এক অত্যাশ্চর্য অবস্থা বিরাজ করছিল। নূরে তাজাল্লী দ্বারা তাঁর অভ্যন্তরীণ ভাগ উজ্জ্বল ও আলোকিত মনে হচ্ছিল। সালাতের ভিতর বারবার সিজদা দিচ্ছিলেন। এরূপ অদ্ভুত আশ্চর্যজনক অবস্থার ভিতর দিয়ে তিনি ঘরে তশরীফ নেন। কান্নার বেগ বাড়তে থাকে। প্রত্যহ বার কয়েক বেহুঁশ ও ইস্তিগরাকের হালতে পৌঁছে যান। আবার তিনি প্রকৃতিস্থ হন। বলতে থাকেন যে, আজ জুম'আর দিন; দোস্ত তার দোস্তের ওয়াদার কথা স্মরণে আনছে। এরপরই তিনি আপন ভুবনে ডুবে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায়ও তিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন–'সালাতের ওয়াক্ত কি হয়ে গেছে? আমি কি সালাত আদায় করেছি?' যদি জওয়াব দেওয়া হ'ত যে, আপনি সালাত আদায় করেছেন, তখন বলতেন ঃ আবারও পড়ে নিই। এভাবেই প্রতিটি ওয়াক্তের সালাতই তিনি দু'বার পড়তেন। যতদিন তিনি এরূপ অবস্থায় ছিলেন ততদিন এই দু'টি কথারই পুনরাবৃত্তি করতেন, 'আজ জুম'আর দিন'–'আমি কি সালাত আদায় করেছি?'

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ২২০-২১ ও ৪৮-৪৯।

এ সময়েই একদিন তিনি সমস্ত খাদিম ও মুরীদ, যারা তখন উপস্থিত ছিলেন, সবাইকে ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ "তোমরা সাক্ষী থাক যে, যদি ইকবাল (খাদেম) ঘরের আসবাব-পত্রাদির ভেতর থেকে কোন একটি জিনিসও অতিরিক্ত সঞ্চয় করে থাকে তবে আগামীকাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে তাকে এজন্য অবশ্যই জবাবদিহি হতে হবে। খাদেম ইকবাল আরয করল যে, আমি কোন কিছুই সঞ্চয়ের জন্য মওজুদ করি নাই, ঘরেও রাখি নাই, বরং সব কিছুই সদকা করে দিয়েছি। প্রকৃতই উক্ত নওজোয়ান এরূপই করেছিল। কয়েকদিনের প্রয়োজনোপযোগী সামান্য কিছু খাদ্যশস্য খানকাহ্‌র ফকীর ও দীন-দরিদ্রের জন্য রেখে বাদবাকী সব কিছুই বন্টন করে দিয়েছিল। আমার চাচা সায়্যিদ হুসায়ন আমাকে অবহিত করেন যে, খাদ্যশস্য ছাড়া আর সব কিছুই অভাবী ও প্রার্থীদের মধ্যে পৌঁছে গেছে। এ তথ্য অবগত হয়ে সুলতানুল মাশায়িখ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) স্বীয় খাদেম ইকবালের উপর নারায হন। তাকে ডাকা হয় এবং তাকে তিনি বলেন যে, এই নাপাক ধূলিকণাকে কেন রেখেছ? ইকবাল আরয করল যে, খাদ্যশস্য ছাড়া অন্য আর যা কিছু ছিল সব কিছুই বণ্টিত হয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ যেখানে যে আছে তাদের সবাইকে ডাক। লোকজন উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার ভেঙে দাও এবং সমস্ত খাদ্যশস্য নির্বিঘ্নে উঠিয়ে নিয়ে যাও। এরপর ঝাঁড়ু দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজন সমবেত হয় এবং খাদ্যশস্য দেখতে না দেখতে নিঃশেষে উঠিয়ে নিয়ে যায়। রোগাক্রান্ত থাকাকালীন কতিপয় বন্ধু-বান্ধব ও খিদমতগার এসে হাযির হয় এবং তারা জিজ্ঞেস করে যে, গরীবদের বর্তমান আশ্রয়স্থলের অবর্তমানে আমাদের ন্যায় হতভাগা মিসকীনদের অবস্থা কি হবে? তিনি বললেন, 'এখানে এত পরিমাণ পাবে যা দিয়ে তোমাদের গ্রাসাচ্ছাদন বেশ ভালভাবেই চলে যাবে।' আমি কতক বিশ্বস্ত বুযর্গের মুখ থেকে শুনেছি যে, লোকেরা আরয জানায়, আমাদের মধ্যে ভাগ্যবান ব্যক্তিটি কে হবেন ?[১] তিনি বলেছিলেন,-'যার ভাগ্য তাকে মদদ করবে।' কতক দোস্ত ও খাদেম আমার নানা মাওলানা শামসুদ্দীন ওয়ামেগানীর নিকট আরয জানায় যেন

১. সম্ভবত ভাবী আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী ও খলীফা সম্পর্কেই এ প্রশ্ন ছিল।

তিনি সুলতানুল মাশায়িখকে জিজ্ঞেস করেন যে, সকলেই আপন আপন 'আকীদা অনুযায়ী নিজ আয়ত্তাধীন এলাকার মধ্যে বড় বড় ইমারত বানিয়ে ফেলেছে এবং সবারই নিয়ত এই যে, আপনি তার ইমারতে আরাম করবেন (অর্থাৎ উক্ত ইমারত আপনার দাফনগাহ্ হবে)। যদি উক্ত অনিবার্য অবস্থা এসে যায় তবে কোন্ ইমারতে আপনাকে দাফন করা হবে? মাওলানা শামসুদ্দীন এই পয়গাম হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর খিদমতে পৌঁছালে তিনি বলেন ঃ আমি কোন ইমারতের নিচেই দাফন হতে চাই না। জঙ্গলের নিরিবিলিতেই আমি মাটির খোরাকে পরিণত হতে চাই। অতঃপর এমনটিই হয়েছিল। তাঁকে ময়দানের বাইরে দাফন করা হয়। পরবর্তীতে সুলতান মুহাম্মদ তুগলক তাঁর কবরের ওপর গুম্বজ নির্মাণ করেন।

ওফাতের ৪০ দিন পূর্ব থেকেই তিনি খাদ্য গ্রহণ একেবারেই ছেড়ে দিয়ে ছিলেন। এমন কি খাদ্যের ঘ্রাণ পাওয়াকেও তিনি সহ্য করতেন না। কান্নার বেগ এত বেশী ছিল যে, ক্ষণিকের তরেও অশ্রু বিসর্জনে বিরতি ছিল না।

এই সময়েই একদিন আখী মুবারক মাছের শুরুয়া নিয়ে হাযির। ভক্তবৃন্দ বহু চেষ্টা করল যেন তিনি এ থেকে কিছু অন্তত গ্রহণ করেন। সুলতানুল মাশায়িখ জিজ্ঞেস করেন, 'এটা কি?' বলা হ'ল যে, এটা মাছের অল্প কিছু শুরুয়া। একথা শোনার পর তিনি বললেন, 'প্রবাহিত পানিতে এটা নিক্ষেপ কর'। এ থেকে এতটুকু পরিমাণও তিনি গ্রহণ করলেন না। আমার চাচা সায়্যিদ হুসায়ন আরয করলেন ঃ আজ কয়েক দিন অতিবাহিত হতে চলল, হুযূর খানাপিনা একদম ছেড়ে দিয়েছেন। শেষ অবধি এর ফলাফল কি দাঁড়াবে? তিনি বললেন, 'সায়্যিদ। যে হুযূর আকরাম (স)-এর মুলাকাতের গভীর আগ্রহী, তার পক্ষে দুনিয়ায় পুনরায় খাবার গ্রহণ আদৌ কি সম্ভব?' মোট কথা চল্লিশ দিন পর্যন্ত এভাবেই তিনি খানাপিনা থেকে বিরত থাকেন। এক দানাও তিনি গ্রহণ করেন নি। এরপর তিনি কথাও খুব কম বলেছেন। ওফাতের দিন বুধবার পর্যন্ত এরূপ অবস্থায়ই কাটে।

১৮ ই রবিউছ্-ছানী ৭২৫ হিজরী বেলা উঠার পর যুহ্দ ও ইবাদত, হাকীকত ও মা'রিফত এবং হিদায়াত ও সত্যের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা অস্তমিত হয়ে যায়।

জানাযা পড়ান শায়খুল ইসলাম বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মূলতানীর দৌহিত্র শায়খুল ইসলাম রুকনুদ্দীন। জানাযার পর শায়খুল ইসলাম রুকনুদ্দীন বলেন ঃ

> এখন আমি জানতে পারলাম যে, আমাকে চার বছর পর্যন্ত দিল্লীতে এজন্যই রাখা হয়েছিল যেন আমি এই জানাযার ইমামতি দ্বারা সৌভাগ্য হাসিল করি।[১]

সারাটা জীবন একাকীত্বের মধ্যে কেটেছিল বিধায় তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। রূহানী সিলসিলা ছিল সারা হিন্দুস্তানে পরিব্যাপ্ত এবং এখনও তা অব্যাহত আছে।

১.সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১৫২-৫৪।

তৃতীয় অধ্যায়

চরিত্র ও গুণাবলী

সামগ্রিক গুণাবলী

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত, সামগ্রিক ও সঠিকতম পরিচিতি সেই শব্দসমষ্টির ভিতর নিহিত য খিলাফত প্রদানের মুহূর্তে তাঁর বহুদর্শী শায়খ ও মুরশিদ (শায়খুল কবীর হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর রহমাতুল্লাহি 'আলায়হি)-এর পবিত্র যবান থেকে উচ্চারিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ

باری تعالی تراعلم وعقل وعشق داره ست وهر بدین صفت موصوف باشداز وخلافت مشائخ نیکو اید بے

> আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে ইল্‌ম ও আকল এবং ইশকের ন্যায় মূল্যবান সম্পদ দান করেছেন। আর এ সমস্ত গুণের যিনি আঁধার হবেন তিনি মাশায়িখে কিরামের তরফ থেকে খিলাফতের অর্পিত যিম্মাদারী অতি উত্তমভাবে পালনে সক্ষম।

হযরত খাজা (র)-এর জীবন ও চরিত্র উপরিউক্ত গুণাবলীর সামগ্রিকতা দ্বারা সুসজ্জিত। তাঁর চরিত্রে 'ইল্‌ম, 'আকল ও 'ইশ্‌ক—এই তিনটি দিকই পরিদৃষ্ট হয়। মুহ্ববত, প্রকৃত মা'রিফাত এবং শ্রেষ্ঠ বুযর্গগণের তরবিয়ত (প্রশিক্ষণ) ও সোহবত (সাহচর্য) যা উৎকৃষ্টতম প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও সুফল দান করতে পারে এবং যার উৎকৃষ্টতম সমষ্টির নাম শেষ যুগে তাসাওউফের উপর গিয়ে পড়েছে, অর্থাৎ ইখলাস ও আখলাক (বিশুদ্ধচিত্ততা ও চরিত্র-ব্যবহার)–এর উৎকৃষ্টতম নমুনা তাঁর জীবনে পরিদৃষ্ট হয়।

ইখলাস

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর জীবনে মহামূল্যবান সম্পদ যা তাঁকে সমসাময়িকদের ওপর শুধু নয়, বরং ইসলামের মনীষীবৃন্দের মধ্যেও একটি সমুন্নত মর্যাদা, শুধু স্বীয় যমানারই নয়, বরং ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন যুগেও,

সাধারণ স্বীকৃতি ও চিরন্তন স্থায়িত্ব লাভ করেছে এবং তাঁকে জনপ্রিয়তার বিশিষ্ট পুরস্কার দ্বারা পুরস্কৃত করেছে, তা তাওহীদ ও ইখলাসের সেই বিশিষ্ট অবস্থা ও স্বাদ যার মধ্যে মুহব্বত (ঐশী-প্রেম) ও রিযায়ে ইলাহী (আল্লাহ্র সন্তুষ্টি) ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই আর কাম্য ও লক্ষ্য থাকে না। মুহব্বত ও ইয়াকীনের প্রেমাগ্নি সকল প্রকারের কণ্টকময় প্রতিবন্ধকতাকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। দুনিয়া-প্রীতি, জৌলুসপ্রীতি এবং এ ধরনের সকল প্রেমের কামনা-বাসনার মূল উৎপাটিত হয়ে গিয়েছিল।

আমীর হাসান আলী সিজযী বর্ণনা করেন ঃ একবার মজলিসে আলোচনা চলছিল যে, কিছু লোক মসজিদে অবস্থান করে এবং সেখানেই কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে ও নফল আদায় করে। আমি আরয করলাম, যদি নিজের ঘরেই অবস্থান করে তবে তা কেমন হবে। তিনি বললেন, ঘরে এক পারা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা মসজিদে একবার সমগ্র কুরআন শরীফ খতম করার চাইতে উত্তম। এ প্রসঙ্গেই এ আলোচনা উত্থাপিত হয় যে, বিগতকালে এক ব্যক্তি দামিশকের জামে মসজিদে সারারাত নফল ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকত এই লোভে যে, এতে তার খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়বে এবং এর ফলে শায়খুল ইসলাম পদে (যা শূন্য ছিল) তার নিযুক্তিও মিলে যেতে পারে। এ কথা শোনার পর হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর চোখ অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে যায় এবং তিনি বলে উঠেন ঃ

بسوز اول شیخ الاسلامی را وپس خانقاه را وبعد ازان خودرا

> এমন শায়খুল ইসলামের গদীতে আগে আগুন লাগিয়ে দাও, এরপর আগুন লাগিয়ে দাও তার খানকাহ্তে; এরপর খোদ শায়খুল ইসলামকেই জ্বালিয়ে দাও।[১]

তিনি নিজের সম্পর্কেই শুধু নয়, স্বীয় খলীফা ও স্থলাভিষিক্তদের মধ্যেও (যাদের দ্বারা সত্যতা, আখলাক এবং আত্মশুদ্ধির খিদমত নেওয়াই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য) লক্ষ্য করতেন যে, তারা ইখলাসের এমনতরো মকামে পৌঁছে গিয়েছিল যে, জাঁকজমক ও জৌলুসপ্রীতি তাদের অন্তর-মানস থেকে একদম নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। মাওলানা ফসীহুদ্দীন প্রশ্ন করেছিলেন যে, বুযর্গদের খিলাফতের হকদার সাধারণত কারা হয়ে থাকেন? উত্তরে হযরত খাজা (র) বললেন ঃ

کسے راکه در خاطروتو قع خلافت بناشد ـ

---

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ; পৃ. ২৪।

"তিনিই খিলাফতের হকদার বলে বিবেচিত হবার যোগ্য হয়ে থাকেন যিনি এর প্রত্যাশী নন এবং নন এর প্রতি সামান্যতম আগ্রহীও।"[১]

সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা বলেন যে, একবার তাঁকে তাঁর একজন বিশিষ্ট খাদেম সম্পর্কে—যাকে এজাযত প্রদান করা হয়েছিল—অবহিত করা হয় যে, সে কয়েকটি কম্বল একত্রে ভাঁজ করে গদী বানিয়ে বিছিয়ে তার ওপর বুযর্গের ন্যায় বসে এবং আমীর-উমারা, জনসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তার খিদমতে শ্রদ্ধাবনত ও ভক্তি-শ্রদ্ধাসহকারে এসে থাকে। এতে তিনি এত মর্মাহত হন যে, সে পরে এলে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তাকে তাঁর এজাযতনামা থেকে বঞ্চিত করেন। দীর্ঘকাল তার প্রতি হযরত খাজা (র)-এর এই বিরক্তিকর মনোভাব অব্যাহত থাকে। যতদিন পর্যন্ত না তার থেকে কোন ওযর প্রকাশ পেয়েছে এবং এ ব্যাপারে সে মাফ না চেয়েছে, ততদিন তাঁর ক্ষমাসুলভ ও স্নেহদৃষ্টি তার প্রতি পতিত হয়নি।[২]

শত্রুর প্রতি উদারতা

আন্তরিকতা তথা বিশুদ্ধচিত্ততা, আত্মবিসর্জন এবং সব কিছুর প্রতি উপেক্ষা ও নিস্পৃহ মানসিকতার মকামে পৌঁছে সালিক (আধ্যাত্মিক পথের পথিক)-এর অন্তর থেকে দুঃখ-বিষাদ, অভিযোগ, প্রতিশোধস্পৃহা এবং অপরকে কষ্ট দেওয়ার ক্ষমতাই নিঃশেষ হয়ে যায়। সে শুধু আত্মীয়-স্বজনের প্রতিই স্নেহপ্রবণ, সদয় ও বন্ধুবৎসল হয় না, বরং দুশমনের প্রতিও কৃতজ্ঞ ও উদার মনোভাব প্রদর্শন এবং দুশমনের অনুকূলে প্রার্থনাকারীতে পরিণত হয় যেন দুশমনীও তার জন্য ইহসান। যে-কোন আহত অন্তরের উপশমের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার অন্তর থেকে বর্ষিত হয় পুষ্পবৃষ্টি। আমীর 'আলা সিজযী বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত খাজা (র) নিম্নোক্ত চরণটি আবৃত্তি করেন ঃ

هرکه مارا رنج داده راحتش بسیار باد

"যে আমাকে দুঃখ-যন্ত্রণা দেয়, আল্লাহ্ তাকে সুখে-শান্তিতে রাখুন।" এরপর তিনি নিম্নোদ্ধৃত কবিতার লাইন দুটি আবৃত্তি করেন ঃ

هرکه او خارے نہد در راه من از دشمنی

هرگل کز باغ عمرش بشگفد بے خار باد

যে আমার রাস্তায় কাঁটা বিছায় আল্লাহ্ করুন তার জীবনের গুলবাগিচায় যে ফুল ফুটবে তা যেন কাঁটাহীন থাকে।

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৩৪৫।

২. সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে।

সিয়ারুল 'আরিফীন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, হযরত খাজা নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র) বলতেন যে, হিসার আন্দরপতে (গিয়াছপুরের নিকট অবস্থিত) ঝজ্জু নামে এক ব্যক্তির হযরত খাজা (র)-এর সঙ্গে সীমাহীন দুশমনী ছিল যার সঙ্গত কোন কারণ ছিল না। সে ভাল-মন্দ অনেক কিছুই বলত এবং হযরত খাজা (র)-কে কিভাবে দুঃখ-কষ্ট দেওয়া যায় সেই ফিকিরেই থাকত। একদিন সে মারা যায়। হযরত শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) তার জানাযায় শরীক হন এবং দাফন শেষ হবার পর তার শিয়রে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করেন ও মুনাজাত করেন, " হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি যা কিছু বলেছে, মন্দ চিন্তা করেছে আমার সম্পর্কে, আমি তা মাফ করেছি। আমার কারণে সে যেন শাস্তি না পায়।"[১]

একবার মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের ভেতর কেউ আলাপ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, কোন কোন লোক জনাবেওয়ালাকে মিম্বর ও অন্যান্য স্থানে মওকামত ভাল-মন্দ বলে থাকে, আমরা যা শুনতে পারি না। এতে হযরত খাজা (র) বল-লেন, আমি তাদের সবাইকে মাফ করেছি। তোমরাও তাদেরকে মাফ করে দিও এবং এ ধরনের লোকের সাথে তোমরা এজন্য ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। এরপর তিনি আরও বললেন, যদি কখনও দু'ব্যক্তির ভেতর মনোমালিন্য দেখা দেয় তবে সে মনোমালিন্য দূরীভূত করবার শ্রেষ্ঠতম পন্থা হ'ল একজন তার মন থেকে তথা অন্তরের নিভৃততম প্রদেশ থেকে শত্রুতার বিষবাষ্প দূর করে দেবে। এতে অপরের মন থেকেও শত্রুতার জোর ও তীব্রতা হ্রাস পাবে।

একদিন তিনি বললেন, দুনিয়ার সাধারণ নীতি এই যে, ভালোর সাথে ভালো এবং মন্দের সাথে মন্দ ব্যবহার করা হবে। কিন্তু আল্লাহ্র বান্দাদের নীতি এই যে, মন্দের মুকাবিলায়ও ভালো ব্যবহার করবে। তিনি এও বললেন ঃ

> কেউ কেউ যদি তোমার পথে কাঁটা বিছায় আর তুমিও তার পথে কাঁটা বিছাও তাহলে তো সারা দুনিয়াটাই কাঁটায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। সর্বসাধার-ণের ভেতরও সাধারণ নীতি এই যে, সোজা-সরল লোকের সাথে সোজা-সরল ব্যবহার এবং বাঁকা-টেড়া লোকের সাথে বাঁকা-টেড়া ব্যবহার করা। কিন্তু দরবেশের নীতি হ'ল -সোজা সরল লোকের সঙ্গে সোজা-সরল ব্যবহার তো বটেই, এমন কি বাঁকা-টেড়া লোকদের সঙ্গেও সৎ ও উত্তম ব্যবহার করা।"[২]

---

১. সিয়ারুল 'আরিফীন।

২. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ পৃ. ৮৭।

এক্ষেত্রে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর মাপকাঠি এত উঁচু ও সমুন্নত ছিল যে, মন্দ বলা তো দূরের কথা, মন্দ কামনা করাটাও ছিল তাঁর রুচি ও প্রকৃতির বাইরে। একবার তিনি বলেছিলেন, মন্দ বলাটা নিঃসন্দেহে খারাপ। কিন্তু মন্দ কামনা অধিকতর খারাপ।[১] যখন এ ধরনের ব্যবহার তাঁর সবার সাথে তখন স্বীয় শায়খ, নিয়ামতপ্রাপ্ত ওলী-আওলিয়া, বন্ধু-বান্ধব এবং সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার সুন্দর ও শ্রেষ্ঠতম হবেই বা না কেন, যাদের ইহসান দ্বারা তিনি পরিপূর্ণরূপে আপ্লুত হয়েছিলেন।

সিয়ারুল 'আরিফীন নামক গ্রন্থে আছে যে, হযরত শায়খ নজীবুদ্দীন মুতাওয়াক্কিলের দৌহিত্র খাজা 'আতাউল্লাহ ছিল একজন বেপরোয়া ও নির্ভীক যুবক। একদিন সে শায়খের দরবারে কাগজ, কালি ও কলম নিয়ে হাযির হল। বলল, আমার জন্য অমুক সর্দারকে একটি সুপারিশপত্র লিখে দিন যাতে সে আমাকে উল্লেখযোগ্য একটা অংকের টাকা দিয়ে দেয়। শায়খ (র) বললেন, উক্ত সর্দারের সাথে যেমন আমার কখনো মুলাকাত হয় নি, তেমনি সেও কখনো আমার এখানে আসেনি। যার সঙ্গে আমার আদৌ পরিচয় হয়নি, তাকে আমি এ ধরনের চিরকুট কি করে লিখতে পারি? এতে সে ভীষণ রাগান্বিত হয় এবং বলতে শুরু করে যে, আপনি আমারই নানার মুরীদ আর আমাদেরই খান্দানের দানে লালিত। আর কিনা আজই এতদূর অকৃতজ্ঞ হয়ে গেছেন যে, আপনার দ্বারা আমার জন্য এতটুকু চিরকুট লেখাও চলে না? এ আপনি কী ধরনের পীর-মুরীদীর জাল বিছিয়ে রেখেছেন এবং আল্লাহ্‌র মাখলুককে ধোঁকা দিচ্ছেন। এই বলে সে দোয়াত সজোরে যমীনে নিক্ষেপ করে উঠে চলে যেতে উদ্যত হয়। অমনি হযরত খাজা (র) তার জামার প্রান্তদেশ টেনে ধরেন এবং বলেন, অসন্তুষ্ট হয়ে কোথায় যাচ্ছ? খুশী হয়ে যাও। এরপর একটা পরিমাণমত টাকা দিয়ে তাকে খুশী করে বিদায় দেন।[২]

দোষ গোপন এবং মহত্ত্ব ও ঔদার্য

সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে আছে যে, হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর দরবারে আগমনকারীদের সাধারণ নিয়ম ছিল, বাইরে থেকে যখনই কেউ আসত, শিরনী (মিষ্টান্ন দ্রব্য) অথবা কোন তোহফা খরিদ করে সাথে নিয়ে আসত এবং দরবারে পেশ করত। একবার কতকগুলি লোক এইরূপ নিয়তেই আসছিল। জনৈক মৌলভী সাহেবও তাদের সাথে ছিলেন। তিনি ভাবলেন, সব লোকই তো

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৫৫৪।

২. সিয়ারুল 'আরিফীন।

বিভিন্ন কিসিমের হাদিয়া-তোহফা পেশ করবে এবং তারা সেগুলি হযরত খাজা (র)-এর সামনে একত্রে রাখবে। এরপর খাদিম সেগুলি উঠিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি কি করে জানবেন কে কি এনেছে? অতঃপর তিনি কিছু মাটি রাস্তা থেকে উঠিয়ে নিয়ে কাগজে বেঁধে সুলতানুল মাশায়িখ (র)-এর দরবারে হাযির হন। প্রত্যেকেই যে যার জিনিস সামনে রেখে দেয়। মৌলভী সাহেবও নিজের পুটলিটা যথা নিয়মে সামনে রেখে দেন। খাদিম সবকিছু উঠিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যত হয় এবং পুটলিটাও উঠাতে যায়। এতে হযরত খাজা (র) বললেন, "এটাকে এখানেই রেখে যাও। এটা হবে আমার চোখের সুরমা।" হযরত খাজা (র)-এর আমল-আখলাক এবং উদার ও প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে উক্ত 'আলিম সাহেব তওবা করেন এবং তাঁর মুরীদ হন।[১]

স্নেহপ্রবণতা ও আত্মীয়-কুটুম্বিতা

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত খাজা (র)-কে সাধারণ মানবমণ্ডলী এবং ব্যক্তি-বিশেষের সাথে সাথে মুসলমান ও আত্মীয়-কুটুম্বদের সঙ্গে এমনই স্নেহপ্রবণতা ও মুহব্বত দান করেছিলেন যে, যদি তাকে মায়ের স্নেহপ্রবণতার সঙ্গে তুলনা করা হয় কিংবা তা থেকেও অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয় তবে বাস্তব ঘটনাবলী দৃষ্টে তাকে আদৌ অতিরঞ্জিত বলে মনে হবে না। মহান ও শ্রেষ্ঠতম বুযর্গদের এই স্নেহপ্রবণতা প্রকৃতপক্ষে নবীয়ে আকরাম (স)-এর সেই স্নেহ প্রবণতারই উত্তরাধিকারিত্ব যার হাকীকত কুরআনুল করীমের সূরা তওবাতে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

> তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছেন। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে উহা তার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, বিশ্বাসীদিগের প্রতি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।" [সূরা তওবাহ ঃ ১১৮]

অধিকন্তু এটা সেই হুকুমেরই তামিল যে সম্পর্কে খোদ রাসূলে করীম (স)-কে সম্বোধন করা হয়েছে ঃ

> এবং যারা তোমার অনুসরণ করে সেই সমস্ত বিশ্বাসীর প্রতি বিনয়ী হও।
> [সূরা শু'আরা ঃ ২১৫ আয়াত]

এই আত্মীয়তা-কুটুম্বিতা ও স্নেহপবণতা এমনই এক সুদৃঢ় 'ইত্তিহাদ' (ঐক্য) পয়দা করে দিয়েছিল যে, অপরের শারীরিক কষ্টে নিজের কষ্ট এবং অপরের আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তিতে নিজের মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি মিলত। আমীর হাসান 'আলা সিজযী বর্ণনা করেন যে, একবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল

১. সিয়ারুল আওলিয়া পৃ. ১৪২।

ছায়ায় স্থান সংকুলান না হওয়াতে কেউ কেউ রৌদ্রে বসেছিল। ছায়ায় উপবেশনকারীদের লক্ষ্য করে হযরত খাজা (র) বললেন, ভাইয়েরা! তোমরা একটু মিলেমিশে বস যাতে তোমাদের ভাইদেরও স্থান সংকুলান হয় এবং তারাও বসতে পারে। এরা রৌদ্রে বসে আছে আর আমি তাদের অগ্নিদগ্ধ করছি।[১]

একবার তিনি জনৈক বুযর্গের একটি উক্তি উদ্ধৃত করলেন যা ছিল প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজ অবস্থারই প্রতিনিধিত্ব আর তা ছিল এই যে, "আল্লাহ্‌র মাখলুক আমারই সামনে আহার করে থাকে,আর তাদের খানা আমি আমার কণ্ঠনালীতে অনুভব করি। অর্থাৎ তারা নয়, সে খানা যেন আমি খাচ্ছি।"[২]

আমীর হাসান 'আলা সিজযী বলেন যে, আমি একবার অসময়ে গিয়ে হাযির হই এবং আরয করি যে, আমি এদিকে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছিলাম। একবার হাযিরা দিতে মন চাইল। কোন কোন দোস্ত বলল যে, যদি কেউ অন্য কোন উদ্দেশ্যে ও কাজে এসে থাকে এবং প্রথম থেকে এখানে আসার আদৌ ইচ্ছা না থাকে, তবে হযরত শায়খ (র)-এর খিদমতে উপস্থিত না হওয়াটাই সমীচীন। আমি মনে মনে ভাবলাম যে, যদিও নিয়মটা এই, কিন্তু অন্তর তো প্রবোধ মানে না, আমি এখানে এসেও হযরত খাজা (র)-এর সঙ্গে একবার সাক্ষাত না করেই ফিরে যাই। আজ আমি সেই নিয়মের খেলাফই করব। যখন দেখা করলাম তখন উত্তর ছিল, এসে ভালই করেছ। এরপর আরও বললেনঃ বুযুর্গদের নিয়ম এটাই যে, কেউ তাদের নিকট ইশরাকের পূর্বে এবং 'আসরের পরে যায় না। কিন্তু আমার এসব কোন নিয়ম নেই। যখনই মন চাইবে চলে আসবে।[৩]

সাধারণের প্রতি সমবেদনা

এই আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকেরা এমনিতে দুনিয়ার প্রতি উদাসীন এবং অন্তর থেকেই এর প্রতি বিমুক্ত, কিন্তু দুনিয়াবাসীর দুঃখ-শোক ও আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের চিন্তায় তাঁরা থাকেন বিমর্ষ চিত্ত। তাঁরা একদিকে নিজের শোক-দুঃখ ভুলে থাকেন, অপরদিকে সারা দুনিয়ার শোক-ব্যথাকে নিজেদের শোক-ব্যথায় পরিণত করেন। একথা বলবার অধিকারী প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই যাঁরা বলেন ঃ

سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

সমগ্র দুনিয়ার ব্যথা-বেদনা আমাদের অন্তরে লালিত ও পোষিত ।

---

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃ. ৯১।
২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৭৭।
৩. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃষ্ঠা ৯৮।

খাজা নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র)-এর দৌহিত্র খাজা শরফুদ্দীনকে কোন এক মজলিসে জনৈক সূফী বলেছিলেন যে, খাজা নিজামুদ্দীন (র) আশ্চর্য উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। একাকী থাকেন, পরিবার-পরিজন কিংবা বাচ্চা-কাচ্চার কোন ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা নেই। এসব থেকে তিনি এমনই মুক্ত যে, একবিন্দু চিন্তা-ভাবনাও তাঁকে স্পর্শ করেনি। হযরত খাজা (র)-এর ভক্ত শরফুদ্দীন উক্ত মজলিস থেকে উঠে হযরত খাজা (র)-এর খিদমতে হাযির হন। ইচ্ছা করেছিলেন যে নিজেই তা বলবেন। এদিকে হযরত খাজা (র) নিজেই বলেন ঃ

মিঞা শরফুদ্দীন ! সময়ে আমার অন্তরে যে দুঃখ-বেদনার সঞ্চার হয়ে থাকে সম্ভবত অপর কোন ব্যক্তির তা থেকে বেশি হয় না। কোন লোক যখন আমার নিকট আসে, নিজেদের হাল-অবস্থা আমাকে ব্যক্ত করে, তখন তারও দ্বিগুণ ব্যথা-বেদনা ও চিন্তা-ভাবনা আমার অন্তরে সঞ্চারিত হয়। অত্যন্ত কঠোরমনা ও নির্মম হৃদয় সে, যার দীনী ভাইয়ের শোক-ব্যথা তার অন্তরে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। এছাড়া আরও বলা হয়েছে ঃ

المخلصون على خطر عظيم -

আল্লাহ্র মুখলিস বান্দারা সর্বদাই বড় বিপদের মুকাবিলা করে থাকেন।"

হযরত খাজা (র)-এর মতে মুসলমানদের অন্তরকে খুশী করা[১], তাদের অন্তর প্রশান্তি ও আনন্দে ভরে দেওয়া সর্বোৎকৃষ্ট আমল এবং আল্লাহ্র নৈকট্যলাভের উত্তম মাধ্যম। সিয়ারুল আওলিয়া নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন ঃ

আমাকে স্বপ্নে একটি কিতাব দেওয়া হয়। তাতে লেখা ছিল, যতটুকু সম্ভব মানুষের অন্তর খুশী রাখতে এবং আনন্দ ও তৃপ্তিতে তা ভরে দিতে। কেননা মু'মিনের অন্তর রবুবিয়তের গোপনতম রহস্যের স্থান। জনৈক বুযর্গ কত সুন্দরই না বলেছেন ঃ

می کوشش کہ راحت بجانے برسد
یا دست شکستہ بنانے برسد

চেষ্টা কর যেন মানুষের অন্তর তোমার দ্বারা আরাম পায় অথবা যে গরীব ও দীন-ভিখারী সে যেন তোমার দ্বারা রুটি-রুযীর বন্দোবস্ত করতে পারে।

একবার বলেছিলেন ঃ

কিয়ামতের দিন কোন পণ্যসামগ্রীর এত বেশি দাম হবে না যেরূপ দাম হবে অপরের সুখ-সুবিধার প্রতি খেয়াল রাখায় এবং অপরের অন্তর-মনকে আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরে দেওয়ায়।[২]

---

১. সিয়ারুল 'আরিফীন। ২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১২৮।

ছোটদের প্রতি স্নেহ

হযরত খাজা (র) স্বীয় মূল্যবান মুহূর্তের হাযারো রকমের ব্যস্ততা সত্ত্বেও এবং অধ্যাত্ম জগতের উন্নত মার্গে বিচরণ করা সত্ত্বেও কচি মা'সূম বাচ্চা ও ছোটদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ছিলেন এবং নিজের ভীষণ কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তাদের অন্তর হাসি-খুশী ও মায়া-মমতায় ভরে দিতে আলাদা সময় করে নিতেন। এই বিরাট দায়িত্ব এবং আধ্যাত্মিক নিমগ্নতা সত্ত্বেও তিনি বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের প্রতি পুরো লক্ষ্য রাখতেন এবং এমনকি তাদের ছোটখাটো কথাবার্তার দিকেও খেয়াল রাখতেন।

খাজা রফী'উদ্দীন ছিল তাঁর আপন ভাতিজার পুত্র । যদি কখনও খাবার সময় হ'ত এবং সে তখন হাযির না থাকত তবে বড় বড় বুযর্গ দস্তরখানের ওপর উপবিষ্ট থাকা সত্ত্বেও তিনি তার আগমনের অপেক্ষা করতেন। তিনি আপন ছেলের মতই একাকিত্বে ও মজলিসের জনসমাগমে তাকে তরবিয়ত দিতেন ও মন রক্ষা করে চলতেন।[১]

খাজা রফী'উদ্দিন তীর-ধনুক এবং সাঁতার খেলা ও কুস্তি লড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহী ছিল। হযরত সুলতানুল মাশায়িখ অত্যন্ত আদর-সোহাগের সাথে তার সঙ্গে এসব বিষয়ে কথাবার্তা বলতেন, তাকে উৎসাহ দিতেন ও উদ্দীপ্ত করে তুলতেন। এসব বিষয়ের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম দিক এবং খুঁটিনাটি বিষয়ে তাকে তা'লীম দিতেন যাতে সে খুশী হয়।[২]

যে সমস্ত অভিজাত বংশীয় যুবক এবং অর্থ-কড়ির দিক দিয়ে সামর্থ্যের অধিকারী ব্যক্তি স্বীয় যুগের সৌখিন লোকদের ন্যায় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করত, হযরত খাজা (র) তাদেরও খাতির করতেন এবং এটাকে তাদের যৌবন ও তারুণ্যের স্বাভাবিক দাবি মনে করে উপেক্ষা করতেন। অধিকন্তু স্বীয় চরিত্র মাধুর্য, সদ্ব্যবহার এবং স্নেহ ও ভালবাসার দ্বারা তাদেরকে ইসলাহ্ (সংস্কার-সংশোধন) ও তরবিয়তের অধীন আনয়ন করতে প্রয়াসী হতেন।

সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা আমীর খোরদ লিখেন যে, আমার চাচা সায়্যিদ হুসায়ন কিরমানী ছিলেন তখন যুবক। সে যুগের স্বাভাবিক প্রবণতা মাফিক যৌবনসুলভ চপল পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে একদিন তিনি হযরত খাজা (র)-এর দরবারে এসে হাযির। হযরত খাজা (র) তাকে দেখে বলেন, سید بیا بنشین وسعادت ببر (সায়্যিদ এসে বস এবং সৌভাগ্যের অংশীদার হও।)

---

১. ঐ, পৃ. ২০৩।
২. ঐ, পৃ. ২০৩।

আল্লাহ্ই ভাল জানেন যে, এই আদর-সোহাগ ও স্নেহ-মমতা এবং খাতির-যত্নের ফলে কত যুবকেরই না ইসলাহ ও তরবিয়ত লাভ সম্ভব হয়েছে, আর কত কঠিন বন্য স্বভাবের লোকই না প্রেম ও মুহব্বতের নিগড়ে আবদ্ধ হয়েছে এবং আল্লাহ্র মকবুল বান্দা ও কামিল বুযর্গগণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

হযরত খাজা (র)-এর সব আখলাক ও গুণাবলী এবং সূফীয়ায়ে কিরামের ন্যায় জীবনচরিত দেখে ইমাম গাযালী (র)-এর সেই অভিমত ও সাক্ষ্যের সত্যতা প্রমাণিত হয় যা তিনি 'সত্যের সন্ধানে' দীর্ঘ সফর এবং বিভিন্ন গ্রুপ ও মানুষের নানা শ্রেণী সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের পর প্রকাশ করেছিলেন, "আমি নিশ্চিতভাবেই জানতে পেরেছি যে, সূফী সম্প্রদায়ই একমাত্র আল্লাহ্র পথের পথিক, তাঁদের জীবনচরিতই সর্বোত্তম জীবনচরিত, তাঁদের পথই অত্যধিক মযবুত ও সুদৃঢ় এবং তাঁদের আখলাকই (চরিত্র-ব্যবহার) সর্বোপেক্ষা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, সঠিক ও বিশুদ্ধ। যদি বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞানীদের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং শরীয়তের সূক্ষ্ম-তত্ত্ববিদগণের সূক্ষ্ম জ্ঞান একত্রে মিলেও তাঁদের জীবনচরিত ও আখলাক থেকে উত্তম কোন কিছু আনয়ন করতে চায়, তবে তা সম্ভব হবে না। তাঁদের প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন সকল প্রকার গতিবিধি নবুওতের উজ্জ্বল প্রদীপের দীপ্ত আলোকমালা দ্বারা নির্দেশিত ও আলোকপ্রাপ্ত। আর নূরে নবুওত থেকে উজ্জ্বলতর কোন নূর দুনিয়ার বুকে কিই-বা হতে পারে যা থেকে আলো গ্রহণ করা যেতে পারে।"[১]

১. আল-মুনকিয মিনাদ-দালাল (দিশারী ও সত্যের সন্ধান নামে বাংলায় অনূদিত)।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাদ-আহ্‌লাদ ও বাস্তব অবস্থাদি

প্রেম-মুহব্বত ও স্বাদ-আহ্‌লাদ

হযরত খাজা (র)-এর জীবন-চরিত এবং জীবনের কেন্দ্রবিন্দু যা তাঁর গোটা আমল-আখলাক ও সামগ্রিক অবস্থাকে ঘিরে আবর্তিত, তা ছিল ঐশী প্রেম যা আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত এবং যা তাঁর জীবনের প্রথম প্রভাত থেকেই তাঁর ভেতর ছিল প্রতিভাত। প্রেমের স্ফুলিঙ্গ যা তাঁর প্রকৃতি ও স্বভাবে আশৈশব একদম মিশে গিয়েছিল, শায়খুল কবীরের সাহচর্য ও চিশতিয়া তরীকার সম্পর্কের কারণে যিনি উত্তপ্ত লৌহশলাকায় পরিণত হয়েছিলেন, তাঁর সারাটা জীবন এবং অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল দিল্লী ও তার পারপার্শ্বিক পরিবেশকে উত্তপ্ত ও আলোকিত করে রেখেছেন এবং ঐ একই কারণে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের আবহাওয়া ও পরিবেশ ঐশী প্রেমের (ইশকে ইলাহীর) উত্তাপ দ্বারা উত্তপ্ত ও দ্রবীভূত ছিল। তাঁর সমগ্র অবস্থা, কর্মব্যস্ততা, আলাপ-আলোচনা ও বৈঠকাদি, কাব্যচয়ন ও নির্বাচন, সংঘটিত ঘটনাবলী ও তাঁর রেখে যাওয়া শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত– মোটকথা প্রত্যেকটি জিনিস থেকেই সেই আধ্যাত্মিকতার রশ্মি এবং সেই উত্তপ্ত 'ইশকের প্রকাশ ঘটত।

ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এক দিন আল্লাহ্‌র ওলীদের জীবনের ঘটনাবলীর ওপর আলোচনা হচ্ছিল। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন জনৈক বুযর্গের কাহিনী বর্ণনা করল, তাঁর ইন্তিকাল হচ্ছিল এবং আস্তে আস্তে আল্লাহ্‌র নাম তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছিল। একথা শোনার পর হযরত খাজা (র)-এর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে এবং নিম্নোদ্ধৃত চতুষ্পদী আবৃত্তি করেনঃ

آیم بسر کوئے تو پویاں پویاں
رخسارہ با بدیدہ شویاں شویاں
بیچارہ زوصل جویاں جویاں
جاں می دہم ونام تو گویاں گویاں

তোমার গলিতে চলে আসছি উত্তম ও স্বচ্ছল গতিতে আর গণ্ডদ্বয় চোখের পানিতে ধুয়ে চলছি। তোমার মিলনের প্রত্যাশায় জীবন দিয়ে দিচ্ছি আর তোমার নাম জপে চলেছি।

এ প্রেমের পরিণতি এই ছিল যে, অন্তরে স্বীয় প্রেমাস্পদের ধ্যান-ধারণা ছাড়া অন্য কোন কিছুর স্থান ছিল না এবং কোন দিকে লক্ষ্য করার মত অবকাশও ছিল না।

আমীর হাসান 'আলা সিজযী বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি বলেন, যদি কখনো আকস্মিকভাবে ঐ সমস্ত কিতাব অধ্যয়ন করতে শুরু করি যা আমি পড়েছি, তখন আমার প্রকৃতিতে ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং নিজের মনেই বলি, 'এ আমি কোথায় এসে পড়েছি।' এক্ষেত্রে তিনি হযরত খাজা (র) আবূ সাঈদ আবুল খায়ের (র)-এর ঘটনা বিবৃত করেন। খাজা আবূ সা'ঈদ কামালিয়াতের দরজায় পৌঁছবার পর যে সকল কিতাব তিনি এককালে পাঠ করেছিলেন এবং যা ঘরের এক কোণে শোভা পাচ্ছিল, একদিন অধ্যয়ন করা শুরু করেন। অমনি গায়েবী আওয়াজ ভেসে আসে, ' হে আবূ সা'ঈদ! আমাদের প্রতিজ্ঞাপত্র ফিরিয়ে দাও। এখন তো তুমি অন্য জিনিসে মশগুল হয়ে গেছ।' হযরত খাজা (র) এই পর্যন্ত পৌঁছেই কেঁদে ফেলেন। প্রেমের এই বাদশাহ্র পরিণতি তো এই ছিল যে, রাতের নির্জন ও গোপন একাকিত্বে অতিবাহিত করবার পর দিনের আলোয় যখন তিনি উপস্থিত হতেন তখন মনে হত –আমীর খোরদের ভাষায়– মত্ততা উপচে পড়ছে। রাত বিনিদ্র কাটবার কারণে চোখ সাধারণত রক্তবর্ণ ধারণ করত এবং প্রেমের এই উত্তাপ এবং মত্ততার এই আমেজের পরিণতি এই ছিল যে, বৃদ্ধ বয়সেও বরাবরই তিনি সিয়াম পালন করে চলতেন। স্বল্প পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ, বিনিদ্র রাত্রি যাপন এবং কঠিন মুজাহাদা সত্ত্বেও দুর্বলতা কিংবা শক্তিহীনতার কোন আলামত তাঁর মধ্যে পাওয়া যেত না। আশি বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও চেহারায় সেই লালচে আভা এবং তারুণ্য ও খুশীর সেই ঝলকেরই সাক্ষাত মিলত যা সাধারণত যৌবনেই মেলে বরং তা যেন দিন দিন বেড়ে চলছিল।[১]

সামা'[২]

প্রেমের এই উত্তাপ, জ্বালা ও অস্থিরতা উপশমের একটি মাত্র মাধ্যম ছিল আর তা হল 'সামা' অর্থাৎ 'ইশ্‌কে ইলাহীতে ভরপূর কাব্য এবং আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ শ্লোকমালা শোনা যদ্দ্বারা অন্তর তার তাপ উদ্গীরণের সুযোগ পায় এবং

১. সিয়ারুল আওলিয়া।

২. সামা'র মসলা (বিনা বাদ্যযন্ত্রে-এর পক্ষে-বিপক্ষে, অনুকূলে ও প্রতিকূলে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারসাম্যময় ও যুক্তিপূর্ণ বিধান এই যে, সামা' আদতে হারাম যেমন নয় তেমনি তা কোন 'ইবাদত-বন্দেগী, আনুগত্য-অনুসরণও নয়-নয় কোন পরম লক্ষ্য, বরং এ একটি ভারসাম্যময় ও নির্দিষ্ট কতিপয় শর্তাধীনে একটি তদবীর ও চিকিৎসা এবং প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী ও যোগ্যতার

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

অশ্রুর ঝাপ্টা দ্বারা তার উষ্ণতা হ্রাস করার মওকা মেলে। এরই সঙ্গে মুজাহাদার ফলে ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ-প্রকৃতি এবং আহত দেমাগ নফী'র যিক্রের কারণে যেন সজীবতা ফিরে পায়। মাওলানা রূমীও সামা'র একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। স্বয়ং হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) নিজ মুখেও 'সামা' সম্পর্কে তথা এর বৈধতা-অবৈধতা সম্পর্কে অনুরূপ কথাই বলেছেন ঃ

> 'সামা' সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত মুরীদ, ভক্তি-শ্রদ্ধার অধিকারী আধ্যাত্মিক পথের কঠোর সাধকের জন্যই সাজে–যখন প্রকৃতি ও দেহ আহত ও বিবশ হয়ে পড়ে (যে সামা' থেকে শক্তি ও সজীবতা লাভ করবে)। হাদীছ পাকে বলা হয়েছে, ان لنفسك عليك حقا। "তোমাদের ওপর তোমাদের শরীরেরও হক রয়েছে।" একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত নফস সামা'র মাধ্যমে আরাম ও শান্তি লাভ করার পর পুনরায় কাজের উপযোগী হয়।[১]

মাওলানা কাশানী নামক জনৈক বুযর্গ বলেন,

> রিয়াযত ও মুজাহাদাকারীদের অন্তঃকরণ ও নফস আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থার আধিক্যবশত কখনো কখনো বিরক্তি ও বিতৃষ্ণায় ভরে যায় এবং অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং এর ওপর সেই ফয়েয ও প্রশস্ততা –যা সকল আমল ও হালতের ক্ষেত্রে ঢিলেমী ও অলসতার কারণে ঘটে–প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য শেষ যুগে বুযর্গগণ মিষ্টি ও সুমধুর আওয়াজে রুচিশীল ও শোভন এবং গান ও উৎসাহ-উদ্দীপনামূলক কবিতা শ্রবণকে রূহানী চিকিৎসা হিসেবে অনুমোদন করেন, অবশ্য তা যদি শরীয়তের গণ্ডী অতিক্রম না করে।[২]

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর) অধিকারী ব্যক্তির জন্য জরুরত মাফিক কখনও মুবাহ্, আবার কখনও কল্যাণকর। এ ক্ষেত্রে চিশতিয়া তরীকার প্রসিদ্ধ বুযুর্গ কাযী হামীদুদ্দীন নাগোরীর উক্তি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও ভারসাম্যময় বলে মনে হয়। এক বৈঠকে সামা' হালাল কি হারাম এ সম্পর্কে বাহাছ হচ্ছিল। কাযী সাহেব বললেন ঃ

"আমি হামীদুদ্দীন সামা' শুনি এবং একে মুবাহ্ মনে করি। এর পেছনে ভিত্তি হল–'উলামায়ে কিরামের বর্ণিত 'রিওয়ায়েত এবং তা এজন্যও যে, আমি অন্তরের ব্যথার রোগী আর সামা' হল এর দাওয়াই। ইমাম আবূ হানীফা (র) মদ দ্বারা চিকিৎসা করানো সেই ক্ষেত্রে জায়েয বলেন যখন রোগ নিরাময়ের আর কোন দাওয়াই মেলে না। এরই ওপর কিয়াস যে, আমার মনের দুরারোগ্য ব্যাধির একমাত্র চিকিৎসা সঙ্গীতলহরী শ্রবণ। অতএব আমার জন্য তা শোনা হালাল হলেও তোমাদের জন্য তা হারাম।' 'সিয়ারুল আকতাব, কলমী।

১.সিয়ারুল আওলিয়া।

২. মিসবাহুল হিদায়াত, পৃ. ১৮০-১৮২।

অতঃপর 'সামা' হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) এবং তাঁর বুযর্গদের (যাঁরা এমত অবস্থার অধিকারী এবং প্রেমের আগুনে দগ্ধীভূত হচ্ছিলেন) আরাম ও শান্তির উপকরণ, শক্তির খোরাক এবং আপন প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে উপস্থিত হবার মাধ্যম ছিল– যাকে ঐ সমস্ত বুযর্গ মানসিক চিকিৎসার্থে ও প্রয়োজনীয়তার তাকীদে অবলম্বন করতেন আর তাও অবলম্বন করতেন চিকিৎসা ও প্রয়োজনের স্বাভাবিক দাবি মাফিক। এটা তাদের না 'ইবাদত-বন্দেগী ছিল আর না ছিল আল্লাহ্র নৈকট্যলাভের মাধ্যম। এটা আধ্যাত্মিক সাধন পথে স্থায়ী কোন পদ্ধতি কিংবা রাত্র-দিনের একমাত্র ধ্যান-ধারণাও ছিল না।

এরই সাথে সাথে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) শরীয়ত-বিরোধী গর্হিত বিদআত এবং ক্রীড়া- কৌতুকের বিষয়াদি যা অমুসলিমদের প্রভাব থেকে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে প্রবৃত্তি ও খেয়ালী পূজকরা অথবা বিভ্রান্ত সুফীরা সামা'র মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, নিজেকেও যেমন দূরে রাখেন তেমনি স্বীয় অনুসারীদেরও এসব থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকার কড়া তাকীদ দেন। সামা'র আদব সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

> সামা' চার প্রকার। যথা ঃ হালাল, হারাম, মাকরূহ ও মুবাহ্। সামা'র ভাবসাগরে উন্মুক্ত ব্যক্তি যদি 'মাহবূবে হাকীকী' তথা প্রকৃত প্রেমাস্পদের অত্যধিক লক্ষ্যাভিসারী হয় তবে 'সামা' মুবাহ্। আর 'মাহবূবে মাজাযী' তথা অপ্রকৃত প্রেমাস্পদের দিকে হলে তা হবে মাকরূহ। 'মাহবূবে মাজাযী'র পূর্ণ লক্ষ্যাভিসারী হলে তা হবে হারাম আর 'মাহবূবে হাকীকী'র দিকে পূর্ণ লক্ষ্যাভিসারী হলে তা হবে হালাল। সামার ব্যাপারে যিনি আগ্রহী হবেন তিনি যেন এই চারটি বিষয়ে জেনেই এ পথে অগ্রসর হন।

> অধিকন্তু তিনি আরও বলেন,

> সামা মুবাহ্ হবার জন্য কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। সামা' যিনি শোনাবেন তাঁর জন্য শর্ত এই যে, তিনি একজন বয়স্ক ব্যক্তি হবেন; অল্পবয়স্ক কিংবা কোন নারী যেন না হয়। শ্রোতা যা কিছু শোনবেন তা যেন আল্লাহ্র স্মরণ থেকে মুক্ত না হয়। আর যা কিছু শোনানো হবে তা যেন নির্লজ্জতা ও হাসি-ঠাট্টামূলক কিছু না হয়, আর সামা'র মাধ্যম তবলা, ঢোল, সারেঙ্গী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র যেন না হয়।[১]

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৪৯১-৪৯২।

বাদ্যযন্ত্রের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা এবং এর ওপর নিষেধাজ্ঞা

হযরত খাজা (র) বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন এবং এ ব্যাপারে কারো থেকে কোন প্রকার শৈথিল্য প্রকাশ পেতে দেখলে অত্যন্ত নারায হতেন, আর এক্ষেত্রে কোনরূপ ওযর-আপত্তি তিনি গ্রহণ করতেন না। সিয়ারুল আওলিয়া নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

> মজলিসে একবার এক ব্যক্তি হযরত সুলতানুল মাশায়িখ (র)-এর খিদমতে আরয করল, বর্তমানে বেঁচে আছেন এমন কতিপয় দরবেশ এমন একটি মজলিসে– যেখানে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র ছিল–অংশগ্রহণ করেছেন এবং এর সাথে তাঁরা নাচেও অংশ নিয়েছেন। সুলতানুল মাশায়িখ (র) একথা শুনে বললেন, তাঁরা মোটেই ভাল কাজ করেন নি। যে কাজ শরীয়ত বিরোধী তা আদৌ পসন্দনীয় নয়। এতে আরও এক ব্যক্তি আরয করল, এই সমস্ত দরবেশ যখন উল্লিখিত মজলিস থেকে বের হয়, তখন লোকেরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে, আপনারা একী করলেন? এ মজলিসে তো বাদ্যযন্ত্র ছিল। আপনারা সামা' কিভাবে শুনলেন এবং নাচেই বা অংশ নিলেন কিভাবে? তারা জবাবে বলল, আমরা সামা'র মধ্যে এমনিভাবে মগ্ন ও সমাহিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, আমাদের খেয়াল করার আদৌ কোন অবকাশই ছিল না যে, এখানে কোন বাদ্যযন্ত্র আছে। হযরত সুলতানুল মাশায়িখ একথা শুনে বল-লেন, এটা কোন জবাব হল না। এটা তো প্রতিটি নাফরমানী ও অন্যায় কাজের ক্ষেত্রেই বলা চলে।[১]

হযরত খাজা (র) বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে অত্যন্ত কড়াকড়ি করতেন। তিনি বলতেন ঃ

> যেখানে একজন মহিলার জন্য ইমামের ভুল শোধরাবার নিমিত্ত সালাতের মধ্যে হাতের শব্দে কিংবা তালি বাজিয়ে ইমামকে সতর্ক করবার অনুমতিটুকু পর্যন্ত দেওয়া হয়নি এবং এটাকে অহেতুক ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে, যেখানে অহেতুক ক্রীড়া-কৌতুক থেকে পরহেয থাকার ব্যাপারে এতখানি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে[২] সেখানে বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা স্বভাবতই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৫২০-৫২১।

২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৫২২।

সামা'র মধ্যে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর অবস্থা

হযরত খাজা (র) বলতেন ঃ

> আল্লাহ্ পাক যাকে ব্যথা-বেদনা ও স্বাদ-উপলব্ধি দান করেছেন তিনি বাদ্যযন্ত্র ব্যতিরেকেই ও একটিমাত্র কলি শ্রবণেই অশ্রু আপ্লুত হয়ে ওঠেন। কিন্তু যার স্বাদ ও উপলব্ধির ব্যাপারে আদৌ কোন মাত্রাজ্ঞান নেই, তার সম্মুখে পাঠ আবৃত্তি যতই চলুক না কেন, আর যত বাদ্যযন্ত্রই তার সামনে উপস্থাপিত হোক না কেন, তার ওপর কোনটিরই আছর হবে না। কেননা সে তো বেদনার্তদের কেউ নয়। এ সম্পর্ক তো বেদনা-বিধুরতার সঙ্গে—বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে নয়।[১]

বস্তুত হযরত খাজা (র)-এর অবস্থা তো এই ছিল যে, ইশ্‌ক-ইলাহী ও আধ্যাত্মিক ভাবধারামণ্ডিত কবিতা শুনতেই তিনি অশ্রু-আপ্লুত হয়ে উঠতেন, অথচ লোকে তা জানতে পারত না। খাদিম শুকনো রুমাল দিত আর সে রুমাল অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠত। এরপরই শুধু লোকেরা জানতে পারত হযরত খাজা (র) অশ্রু-ভারাক্রান্ত।[২]

আমীর খোরদ (যিনি নিজেও শৈশব ও বাল্যে এ ধরনের সামা'র মজলিসে শরীক হতেন এবং অধিকাংশ সময়ই আপন পিতা ও চাচার সঙ্গে এইসব ভাব-গম্ভীর মজলিস ও মত্ততা সৃষ্টিকারী উত্তেজক কবিতা নিয়ে আলোচনা করতেন যা সেখানে পড়া হত) বলেন যে, কখনো কখনো অনেকগুলো কবিতা আবৃত্তি করা হত, কিন্তু কোনরূপ আবেশ-বিহ্বলতা সৃষ্টি হত না। আকস্মিকভাবে কেউ হিন্দী দোহা কিংবা ফারসী প্রেম ও ভক্তিমূলক কবিতা আবৃত্তি করে বসত আর মজলিসে ভাবের জোয়ার সৃষ্টি হত।

কথিত আছে যে, একবার কয়েরবাক নামক বাদশাহ্র একজন আমীর একটি মাহফিলের আয়োজন করেন। শহরের নেতৃস্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বুযর্গ এতে হাযির হন। 'সামা' শুরু হল। কথক অনেক কিছুই শোনাতে থাকল, কিন্তু তাতে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল না। শেষ অবধি হাসান বাহদী কাওয়াল নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

در کلبه درویشی در محنت بیخویشی
مگذار مرا بامن هر سوئے مکن افسانه

দরবেশীর গৃহে আত্মবিস্মৃতির সাধনায় আমাকে একা ছেড়ে দিও না; এবং বিভিন্ন ধরনের গল্প-কাহিনী আমার নিকট বর্ণনা করো না।

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৫২৩। ২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৫৪।

কবিতাটি আবৃত্তি করতেই হযরত সুলতানুল মাশায়িখ (র)-এর ওপর কান্না ও আবেগাপ্লুত অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং এ অবস্থার প্রতিক্রিয়া মজলিসে উপস্থিত সবাইকে অভিভূত ও আচ্ছন্ন করে দেয়।[১]

অন্য আর একটি মজলিসের ঘটনা।

বালাখানাতে মজলিস অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। আমীর খসরূ দাঁড়িয়ে এবং সুলতানুল মাশায়িখ অসুস্থতার কারণে চারপায়ীর ওপর উপবিষ্ট ছিলেন। হাসান বাহ্‌দী শায়খ সা'দী (র)-এর নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ

سعدی تو کیسی که درائ دریں کمند

چنداں فتادہ اند که ماصید لاغریم

"সা'দী, তুমি কেন এই ফাঁদে পা দিচ্ছ?

পতিত অনেক শিকারের মধ্যে আমরা দুর্বল শিকার মাত্র।"

হযরত খাজা (র)-এর তখন অশ্রুরুদ্ধ অবস্থা এবং এতে তিনি গভীরভাবে সমাহিত হয়ে যান। খাজা ইকবাল রুমাল এগিয়ে দিয়ে চলছিলেন আর তিনি বারবার চোখ মুছে হাসান বাহ্‌দীর দিকে তা ঠেলে দিচ্ছিলেন। কিছু বিলম্বে 'সামা' সমাপ্ত হল। আমীর খসরূর পুত্র আমীর হাজী তার পিতারই গযল আবৃত্তি করতে শুরু করে যার একটি পংক্তি ছিল এই ঃ

خسرو تو کیستی که درائیے دریں شمار

کیں عشق تیغ بر سر مرد ان دین زده است

"খসরূ! এ পথে গণ্য করবার মত তুমি কে?

এ হচ্ছে প্রেমের তরবারি; আল্লাহ্‌র মরদে মুজাহিদের মস্তকেই এটি নিক্ষিপ্ত হয়।"

অমনি হযরত খাজা (র)-এর ওপর পূর্বোক্ত অবস্থার সৃষ্টি হল এবং তিনি অনেক বেশী কাঁদলেন।[২]

একবার আমীর খসরূ গযল পড়েন, যার প্রথম স্তবক ছিল এই ঃ

رخ جمله را نمود مرا گفت تو مبین

زیں ذوق مست بیخبرم کیں سخن چه بود

"সকলকেই তিনি দর্শন দিলেন, কিন্তু আমাকে বলা হল, তুমি দর্শন থেকে বিরত থাক ;

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ৫১৪।

২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৫১৫।

এ কী কথা! এর আস্বাদনেই আমি বিভোর।

তিনি আড় চোখে আমীর খসরুকে একবার দেখলেন। ব্যস! পূর্বোক্ত অবস্থায় তিনি ফিরে গেলেন।[১]

সাধারণত যে কবিতাতে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর স্বাদ অনুভূত হত ও তিনি আবেগাপ্লুত হতেন, দিল্লীর মজলিস-মাহফিল এবং শহরের অলিতে গলিতে বেশ কিছুকাল যাবত তার চর্চা অব্যাহত থাকত। লোকেরা এ থেকে আনন্দ ও স্বাদ উপভোগ করত।[২] সুলতান 'আলাউদ্দীনও তাঁর দরবারের সভাসদ এবং হযরত (র)-এর দরবারে যাতায়াতকারীদের বিশেষভাবে তাকীদ দিয়ে রেখেছিলেন যে, যে কবিতায় হযরত খাজা (র)-এর স্বাদ ও মত্ততা আসবে তা যেন মনে রাখা হয় এবং বাদশাহকে শোনানো হয়। অধিকাংশ সময় এমন হত যে, বাদশাহ যখন এ রকম কবিতা শুনতেন, যে কবিতা হযরত খাজা (র)-এর মত্ততা ও আবেগ এনেছিল– অত্যন্ত প্রশংসা করতেন এবং বহুক্ষণ ধরে এর স্বাদ গ্রহণ করতেন।

কুরআনুল কারীমের স্বাদ

কুরআনুল করীমের স্বাদ গ্রহণ, তাকে হিফয করার ব্যবস্থাকরণ ও তিলাওয়াতের আধিক্য চিশতিয়া তরীকার তথা চিশতিয়া সিলসিলার মাশায়িখে কিরামের চিরন্তন নীতি। হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র) থেকে নিয়ে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) পর্যন্ত সবাই কুরআন মজীদ থেকে বিশেষভাবে স্বাদ গ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যেকেই তাঁদের নিজ নিজ খাস খলীফা ও বিশিষ্ট মুরীদদিগকে কুরআনুল করীম হিফয করতে এবং এরই মাঝে মগ্ন ও আত্মসমাহিত দেখতে চেয়েছেন আর এ ব্যাপারে বিশেষভাবে তাকীদও করে গেছেন।[৩]

খিলাফত প্রদানের মুহূর্তে শায়খুল কবীর (র) হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-কে কুরআনুল করীম হিফয করতে ওসীয়ত করেছিলেন। হযরত খাজা (র) সে ওসীয়ত পূরণ করেছিলেন এবং দিল্লী পৌঁছুতেই এ সিলসিলাও শুরু করে দেন। হযরত খাজা (র) নিজ মুরীদ ও বিশিষ্ট সাথীদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতে থাকেন–দিতে থাকেন বিশেষ তাকীদ। আমীর হাসান 'আলা

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৫১৬।

২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৫১০।

৩. বিস্তারিত জানবার জন্য দেখুন 'মুসলমানূঁকা নিযামে তা'লীম ও তরবিয়ত' ২য় খণ্ড, মাওলানা মানাযির আহসান গীলানীকৃত।

সিজযী যখন হযরত খাজা (র)-এর ভক্তে পরিণত হন, তখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। কবিতা রচনা ও কাব্য-চর্চাই ছিল তাঁর সারা জীবনের হবি। হযরত খাজা (র) তাকে দিক-নির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন যেন সে কাব্য-চর্চার মুকাবিলায় কুরআনুল করীমের সাধনাকেই ওপরে স্থান দেয়। ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ গ্রন্থে আমীর বলেন ঃ

بارها لفظ مبارك مخدوم شنيده أم مى بايد كه قران خواندن بر شعر گفتن غالب آيد

অর্থাৎ আমি আমার মখদূমের মুখ থেকে এ ধরনের কথা অনেকবারই শুনেছি যে, কবিতা আবৃত্তির তুলনায় কুরআনুল করীমের তিলাওয়াত অধিকতর হওয়া উচিত।[১] অতঃপর তাকে কুরআন মজীদ হিফ্‌য করার হিদায়াত দান করেন। তার এক-তৃতীয়াংশ হিফয করতেই তিনি বললেন ঃ

ديگرها اندك اندك يادگير وياد گرفته بيشينه مكرر مى كن -

অর্থাৎ অল্প অল্প করে হিফ্‌য কর আর হিফ্‌যকৃত অংশ বারবার দোহ্‌রাতে থাক।[২]

মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাকের সাহেবযাদা খাজা মুহাম্মদ হযরত খাজা (র)-এর পক্ষপুটে লালিত-পালিত হচ্ছিলেন। তাঁকেও তিনি কুরআন মজীদ হিফ্‌য করান। খাজা মুহাম্মাদ ইমাম ছিলেন, ছিলেন একজন ভাল হাফিয এবং তাঁর এলহানও (কণ্ঠস্বর) ছিল অত্যন্ত মিষ্ট। তাঁকে তিনি সালাত আদায়ের ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর পঠিত কিরাত শুনে তাঁর চোখ অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত, আমেজ অনুভব করতেন তিনি।[৩] তাঁর অপর এক ভাই খাজা মূসাও ছিলেন একজন হাফিয ও কারী। স্বাভাবিক নিয়ম ছিল যে, যখনই তিনি দস্তরখানের ওপর বসতেন তখনই সর্বাগ্রে খাজা মুহাম্মাদ এবং খাজা মূসা কুরআন মজীদের কিছু অংশ তিলাওয়াত করতেন। একে দু'আয়ে মায়েদা' বলা হত।[৪] এরপর শুরু হত খানাপিনা। স্বীয় দৌহিত্র (ভাগিনার সন্তান) খাজা রফীউদ্দীন প্রমুখকেও কুরআন মজীদ হিফ্‌য করিয়েছিলেন। তিনি নিজেও নফল নামাযে কুরআন শরীফ পড়তেন এবং বিশিষ্ট খাদিমদের থেকে জানতে চাইতেন যে, এ ব্যাপারে তাদের অভ্যাস-আচরণ কি?

---

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃ. ২৪৯। ২. ঐ পৃষ্ঠা ৯৩।
৩. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ২০০। ৪. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১৯৯।

শায়খ (র)-এর সাথে সম্পর্ক

এমনিতেই কোন ব্যক্তি যদি কারো কাছ থেকে কোনরূপ অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয় (যদি তার স্বভাব-প্রকৃতিতে ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধের প্রেরণা বিদ্যমান থাকে) তবে তার প্রতি অনুগত হয়ে থাকে এবং তাকে স্বীয় উপকারী বন্ধু মনে করে। কিন্তু হযরত খাজা (র)-এর স্বীয় মুরশিদ-এর সাথে গভীর প্রেমপূর্ণ ও আত্মিক সম্পর্ক ছিল। তাঁর বৈশিষ্ট্য ও আত্মিক উন্নতিতেও মুরশিদের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এই মেহনতের ফল এই হয়েছিল যে, যখন কোন মাহবূব (প্রেমাস্পদ)-এর প্রশংসা কীর্তন করা হত, তখনই তাঁর আপন শায়খ ও মুরশিদ-এর স্মৃতি জাগরূক হয়ে উঠত এবং তাকেই তিনি এর সত্যতার মাপকাঠি মনে করতেন।

জামা'আতের ব্যবস্থাপনা ও দৃঢ় মনোবল

বার্ধক্যের শত দুর্বলতা এবং কঠোর কঠিন মুজাহাদা সত্ত্বেও জাম'আতে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন। সিয়ারুল আওলিয়া' প্রণেতা বলেন ঃ

> বয়স আশি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল, তবুও জামা'আতের সাথেই তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন। এজন্য উঁচু বালাখানা থেকে জামা'আতখানায় অবতরণ করতেন এবং সেখানেই উপস্থিত দরবেশ ও সঙ্গী-সাথীদের সাথে তা আদায় করতেন। বয়সের আধিক্য সত্ত্বেও সর্বদা সিয়াম পালন করতেন। বিনা সিয়ামে খুব কম দিনই অতিবাহিত হত।[১]

শরীয়তের পাবন্দী এবং সুন্নতের অনুসরণে কর্মপন্থা

হযরত খাজা (র) স্বয়ং সুন্নতে রসূল (স)-এর অনুসরণের ক্ষেত্রে নিয়মিত ও কঠোর ছিলেন।

এ ব্যাপারে তিনি স্বীয় সঙ্গী-সাথী ও খাদিমকুলকেও অত্যন্ত তাকীদ দিতেন। সুন্নত ছাড়াও মুস্তাহাব ও নফল যাতে ফওত হতে না পারে সেজন্যও তাঁর কঠোর তাকীদ ছিল। সিয়ারুল আওলিয়া নামক গ্রন্থে হযরত খাজা (র) নিম্নরূপ উক্তি করেছেন ঃ

> রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর অনুকরণ ও অনুসরণে অত্যন্ত মযবুত ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করা উচিত এবং এও দেখা উচিত যেন কোন মুস্তাহাব ও নফলও ফওত হতে না পারে।[২]

> মাশায়িখে কিরামের জন্য এবং যিনি বায়'আত গ্রহণ করবেন (পীর), তাঁর জন্য শরীয়তের হুকুম-আহকাম এবং তরীকত ও হাকীকতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা দরকার। তাহলে তাঁরা আর শরীয়তের খেলাফ কোন কাজ করার জন্য বলতে পারবেন না।[৩]

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ১২৫। ২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৩১৮। ৩. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃ. ১৪৭।

পঞ্চম অধ্যায়

পরোপকার ও গভীর বিশ্লেষণ

জ্ঞানের মর্যাদা

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) বাতিনী 'ইলমে কামালিয়াত লাভের সাথে সাথে যাহিরী 'ইলমেও অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। সেকালের প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাই তিনি দৃঢ় মনোবল, কঠিন অধ্যবসায় ও সুশৃঙ্খলভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে সে যুগের শ্রেষ্ঠতম বুযর্গ ও মনীষীবৃন্দ রয়েছেন। সাহিত্য ও ধর্মীয় বিষয়ে তিনি প্রখ্যাত অডিটর জেনারেল শামসুল মুল্‌ক মাওলানা শামসুদ্দীন খারিযমী থেকে শিক্ষা লাভ করেন। মাওলানা কামালুদ্দীন যাহিদ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ মারিকলী থেকে হাদীছের দরস গ্রহণ করেন–যিনি ছিলেন 'মাশারিকুল আনওয়ার' প্রণেতা ইমাম হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাগানীর শাগরিদ। একই মাধ্যমে তিনি 'হিদায়া' প্রণেতার শাগরিদও বটেন। তিনি কিছু কিতাব শায়খুল কবীর হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-এর নিকটও অধ্যয়ন করে 'ইলমের ভাণ্ডার পূর্ণ করেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক

যদিও স্বীয় প্রকৃতিগত মেধা এবং শায়খ-এর বাতিনী নিসবত (সম্পর্ক)-এর প্রভাবে তিনি দিন দিনই শব্দের মুকাবিলায় অর্থ, অর্থের মুকাবিলায় প্রকৃত তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং নামের চেয়ে নামকরণের ভেতরেই বেশী নিমজ্জিত হয়ে পড়েন, তথাপিও জ্ঞান ও সাহিত্যের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং জ্ঞানের জন্য তাঁর নিষ্ঠা ও আস্বাদন শেষ অবধি অবিচল থাকে।

সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, মাওলানা রুক্‌নুদ্দীন চিগর আল্লামা জারুল্লাহ্ যামাখশারীর 'কাশশাফ' ও 'মুফাসসাল' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয় এবং এ দু'টি ব্যতিরেকেও কতিপয় কিতাব হযরত সুলতানুল মাশায়িখ (র)-এর খাতিরে তাঁর খিদমতে নকল করে পৌছিয়েছিলেন।[১] এ দু'টি কিতাবই সুপ্রসিদ্ধ মু'তাযিলী

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৩১৭।

মনীষী আল্লামা মাহমূদ জারুল্লাহ্ যামাখশারী (মৃত্যু ৫৩৮ হিজরী) রচিত। প্রথমটি তফসীর গ্রন্থ এবং দ্বিতীয়টি আরবী ব্যাকরণ গ্রন্থ। এ থেকেও তাঁর জ্ঞানের প্রতি সীমাহীন নিষ্ঠা ও প্রীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থেই রয়েছে যে, সায়্যিদ খামুশ ইবনে সায়্যিদ মুহাম্মাদ কিরমানী একান্ত সান্নিধ্যে 'খামসায়ে নিযামী' নামক গ্রন্থ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর নিকট অধ্যয়ন করতেন।[১] হযরত খাজা (র)-এর সাহিত্যপ্রীতি এত বেশী গভীর ও পবিত্র ছিল যে, আমীর খসরুর মত একজন শীর্ষস্থানীয় নামযাদা কবিকেও (যিনি স্বীয় ক্ষেত্রে তুলনাহীন এবং ফারসী সাহিত্যের প্রথম সারির কবিদের অন্যতম) তাঁর কাব্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছিলেন— করেছিলেন পথ-নির্দেশনা। সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে রয়েছে যে, প্রথমদিকে আমীর খসরু যে সব গযল গাইতেন সেগুলিকে হযরত সুলতানুল মাশায়িখ (র)-এর খিদমতে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য পেশ করতেন। একবার তিনি আমীর খসরুকে বলেছিলেন যে, গযল ইস্পাহানীদের পদ্ধতিতে গাইবে।[২]

হাদীছ ও ফিকহ্র ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ

সুলতান গিয়াছুদ্দীন তুগলকের দরবারে সামা সংক্রান্ত মাসআলা নিয়ে যে বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে হযরত খাজা (র) উক্ত মাসআলার ওপর যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন এবং এর ওপর যে সমালোচনা পেশ করেছিলেন তা থেকেও তাঁর জ্ঞানগত মরতবা ও মর্যাদা এবং প্রশস্ত ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে হযরত শায়খ 'আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (র)-এর পূর্বে 'সিহাহ সিত্তা' হাদীছ গ্রন্থের তেমন পরিচিতি ও প্রচলন ছিল না এবং মানুষের পরিচিতি ও অবগতির সীমারেখা বুখারী ও মুসলিম শরীফের বাইরে অগ্রসর হতে পারেনি। হাদীছের মধ্যে 'মাশারিকুল আনওয়ার' ও 'মিশকাত শরীফকেই 'ইল্মের পুঁজি এবং হাদীছশাস্ত্রের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ ধাপ মনে করা হত।[৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন الثقافه الاسلاميه فى الهند এর হাদীছ অধ্যায়। সূফীদের মুখে মওযূ ও য'ঈফ হাদীছের আধিক্য ও ছড়াছড়ি এবং বুযর্গদের মালফূযাত মজলিসগুলিতে বেদেরেগ বর্ণিত হত। আজগুবী ও মনগড়া এবং মওযূ' হাদীছ সম্পর্কে জ্ঞান আল্লামা মুহাম্মাদ তাহির পাটনীর পূর্বে এখানে

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ২১৯।
২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৩০১।

পরিদৃষ্ট হয় না। হযরত খাজা (র)-এর মালফূযাত ও জীবন-চরিত থেকে জানা যায় যে, তিনি এমনি ধরনের অনেক ভিত্তিহীন বর্ণনাকে (যা মুখ-নিঃসৃত ও সৃষ্ট) প্রমাণপঞ্জী হিসেবে উপস্থাপন করতেন না এবং তাঁর এ ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি ছিল যে, সহীহ হাদীছের নির্বাচিত সংকলন হচ্ছে বুখারী ও মুসলিম। ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে যে, এই হাদীছটি কিরূপ – السخي حبيب الله وان كان كافرا "দাতা কাফির হলেও আল্লাহ্‌র দোস্ত।" তিনি শুনে বললেন, এটা কোন হাদীছ নয়, কোন ব্যক্তির কথিত উক্তি। এক ব্যক্তি আরয করল যে, এটা হাদীছ আরবা'ঈনের অন্তর্গত অন্যতম হাদীছ। তিনি বললেন, যা কিছু বুখারী ও মুসলিমে আছে সেগুলিই সহীহ্।[১]

ইল্‌মের গুরুত্ব

স্বীয় মাশায়িখে কিরামতের মতই হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর দৃষ্টিতেও 'ইল্‌মের অত্যন্ত গুরুত্ব ও মর্যাদা ছিল এবং তিনি একে আধ্যাত্মিক পথের

এক্ষেত্রে একটা কথা প্রকাশ করে দেওয়া দরকার যে, হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) বুখারী ও মুসলিমের মরতবা সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও কিন্তু এমন মনে হয় যে, সিহাহ্ সিত্তা সাধারণভাবে এবং বুখারী ও মুসলিম বিশেষভাবে ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রচলন না হওয়ার কারণে এর সাথে 'উলামায়ে কিরাম ও বুযর্গ মাশায়িখ সম্পৃক্ত ছিলেন না। স্বয়ং তিনিও (যদি বিতর্ক সভার রোয়েদাদ সঠিক হয় তবে) বিতর্ক সভায় যে হাদীছগুলিকে সামা হালাল হবার স্বপক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করেছিলেন, সেগুলি কোন সিহাহ্ সিত্তা গ্রন্থেই নেই। তদুপরি মুহাদ্দিছগণের নিকটও হাদীছগুলির মান এমন কিছু উঁচু নয়। বিপক্ষীয় উলামায়ে কিরামও–যাঁদের অধিকাংশই সে যুগের শ্রেষ্ঠ আলিম-উলামা এবং বিচার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন–যেভাবে আলোচনা ও দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন তা থেকে 'ইল্‌মে হাদীছে তাদের অজ্ঞতাই শুধু প্রকাশ পায় নি, বরং একজন 'আলিমে দীনের এ ব্যাপারে যে ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত ছিল সে ক্ষেত্রেও ঘাটতি অনুভূত হয়। সহীহ্ হাদীছ গ্রন্থ, মনগড়া ও আজগুবী হাদীছ এবং হাদীছশাস্ত্রের ন্যায়ানুগ ও আপত্তিকর বিষয়াবলী প্রকাশিত না হবার কারণে খানকাহ্গুলিতে এমন অনেক রসম-রেওয়াজ, এমন কি সিজদা তা'জিমী প্রচলিত ছিল এবং বহুবিধ রিওয়ায়েত বিভিন্ন দিন ও মুহূর্তের ফযীলত সম্পর্কে মশহূর ছিল। এগুলি মাশায়িখে কিরামের মলফূযাতগুলিতে অত্যন্ত জোরেশোরে বর্ণনা করা হয়েছে, হাদীছের সহীহ্ সংকলনগুলিতে যার কোনই অস্তিত্ব নেই এবং মুহাদ্দিছগণ এ ব্যাপারে কঠোর সমালোচনা করেছেন। এসব সামনে রেখেই মুহাদ্দিছকুল ও তাঁদের নিষ্ঠাবান ভক্তবৃন্দের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে যাঁরা ভারতবর্ষে হাদীছশাস্ত্র প্রচার এবং সহীহ ও যঈফ হাদীছের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন।

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃ. ১০৩।

পথিকদের সালেকীন-এর জন্য এবং যে সমস্ত লোক হিদায়াত ও তরবিয়তের খিদমত আঞ্জাম দেন তাঁদের জন্য অত্যন্ত জরুরী মনে করতেন।

বাংলার একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান যুবক–যিনি পরে আখী সিরাজুদ্দীন নামে মশহূর হয়েছিলেন এবং যিনি পাণ্ডুয়ার মশহূর 'আলিম চিশতিয়া খানকাহ্‌র প্রতিষ্ঠাতা ও হালকার মধ্যমণি ছিলেন–লাখনৌতি থেকে মুরীদ হওয়ার নিয়তে দিল্লী আসেন এবং হযরত খাজার মুরীদ হন। তিনি মাওলানা ফখরুদ্দীন যরাবীকে বলেছিলেন, এই যুবক অত্যন্ত যোগ্যতার অধিকারী। যদি কিছু যাহিরী 'ইল্‌ম হাসিল করতে পারে তবে দরবেশীতে সে সুদৃঢ় অবদান রাখতে পারবে। এ কথা শুনে মাওলানা ফখরুদ্দীন আরয করেন যে, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে তাকে কিছু দিন আমার সাহচর্যে রেখে জরুরী মাসআলা-মাসায়েল তা'লীম দিয়ে দিতে পারি। এতে তিনি বললেন, সে আপনার মুহব্বতের সবচেয়ে বড় হকদার। এরপর মাওলানা ফখরুদ্দীন তাকে নিজের সাথে নিয়ে যান এবং অল্প দিনেই দরকারী 'ইল্‌মের সঙ্গে পরিচিত ও সম্পৃক্ত করে তোলেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর ওফাতের পর ইল্‌মে পরিপূর্ণতা লাভের জন্য উক্ত হযরত কিছু দিন দিল্লীতে অবস্থান করেন। অতঃপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পূর্ব বাংলায় চিশতিয়া নিজামিয়া সিলসিলার প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।[১]

গভীর জ্ঞানরাজি ও প্রবন্ধাদি

যাহিরী ও বাতিনী 'ইলমের ব্যাপকতা, ইখলাস, নিবিষ্ট চিন্তা ও মুজাহাদার ভিত্তিতে তিনি লাভ করেছিলেন গভীর ও বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিশ্লেষণাত্মক ও পর্যবেক্ষণমূলক অভিজ্ঞতা–যা সাধারণত কামিল ওলী-আওলিয়া ও মহান একনিষ্ঠ সাধকদের ভাগ্যে জুটে থাকে–যা অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা, চারিত্রিক পবিত্রতা এবং ইখলাসের অনিবার্য পরিণতি–তাসাওউফপন্থীরা যাকে ইল্‌মে লাদুন্নীর সমার্থক মনে করেন। সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা বলেন, ইল্‌ম সম্পর্কিত যখনই কোন আলোচনা হত কিংবা সমস্যা দেখা দিত– তখনই তিনি বাতিনী নূরের আলোকে তার সন্তোষজনক জবাব প্রদান করতেন।

---

১. সিয়ারুল 'আরিফীন ইত্যাদি।

তিনি উক্ত সমস্যার ওপর এমনই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিতেন যে, হাযিরানে মজলিস বিস্মিত হয়ে যেত এবং একে অপরকে বলত যে, এটা তো কোন কিতাবী জবাব নয়, বরং তা রব্বানী ইলহাম এবং ইলমে লাদুন্নীর ফয়েয। এর ভিত্তিতে শহরের শ্রেষ্ঠতম 'উলামায়ে কিরামের মধ্যে যারা 'ইল্মে তাসাওউফ অস্বীকার করতেন এবং তাসাওউফপন্থীদের যারা কট্টর বিরোধী ছিলেন তাঁরাও হযরত খাজা (র)-এর ভক্তে পরিণত হন এবং লজ্জিত হন নিজেদের জ্ঞানের পরিমাপে ও অহমিকায়।

শরীয়তের বিশুদ্ধ ও সঠিক জ্ঞান

জ্ঞানের এই গভীরতা, সুন্নতের অনুসরণ এবং শরীয়তের বিধি-বিধানের ওপর সুদৃঢ় ও অবিচল আস্থা তাঁর মন-মগজকে এতখানি শান্ত, সুস্থ, সোজা-সরল বানিয়েছিল যে, তাসাওউফপন্থীদের মধ্যে যে সমস্ত বিষয় দীর্ঘকাল থেকে প্রকাশ্য শরীয়তের খেলাফ চলে আসছিল এবং অনেক স্থানেই তা তাসাওউফপন্থীদের রীতি-নীতি ও স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) সুস্থ মন-মগজে সে সব গ্রহণ করতেন না। তাঁর রুচি, প্রকৃতি ও পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা ছিল এর খেলাফ ও পরিপন্থী।

তাসাওউফপন্থী শিবিরে বহু দিন থেকে এ ধারণা চলে আসছিল যে, বিলায়েত নবূওতের তুলনায় সর্বোত্তম এবং আওলিয়ার মর্যাদা আম্বিয়ায়ে কিরাম থেকে বেশী। কেননা বিলায়েত মা'বূদে হাকীকীর সঙ্গে গভীর সম্পৃক্তি এবং আল্লাহ্ ব্যতীত সমস্ত কিছুর সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতির নাম। অপরদিকে নবূওতে (দা'ওয়াত ও তবলীগের কারণে) সৃষ্টি জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে হয়। অতঃপর এর মধ্যেও আরও কয়েকটি দল-উপদল সৃষ্টি হয়ে গেছে। এদের কেউ কেউ আবার মনে করেন যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের বিলায়েত নবূওতের দরজা থেকে উত্তম। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) কিন্তু এসব মতবাদ স্বীকার করতেন না। ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, হযরত খাজা (র) বলেছেন, এমত মাযহাব বাতিল ও ভ্রান্ত এবং তা এই কারণে যে, যদিও আম্বিয়ায়ে কিরাম সৃষ্টি জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকেন, কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁরা মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন, তার একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মুহূর্তও আওলিয়া কিরামের সমস্ত সময়-ক্ষণ থেকে বেশী মর্যাদার দাবি রাখে।[১] ইমাম রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (র) এতটুকু বাড়িয়েছেন যে, আম্বিয়া কিরাম ঠিক যে

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃ. ১২০।

মুহূর্তে সৃষ্টি জগত নিয়ে ব্যস্ত ও সম্পৃক্ত থাকেন, সে অবস্থায়ও তারা ওলীদের আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার মুহূর্ত থেকেও আল্লাহ্র প্রতি অধিক নিবিষ্ট ও সম্পৃক্ত থাকেন। সৃষ্টির প্রতি তাদের সম্পৃক্ততা যেহেতু আল্লাহ্র হুকুমেই হয়ে থাকে সেহেতু আল্লাহ্র সম্পৃক্ততা ঐশী আদেশের সমার্থক হয়ে থাকে।

হালাল বস্তু আল্লাহ্র পথের প্রতিবন্ধক নয়

তাসাওউফ সম্পর্কে সাধারণভাবে এটাই বুঝানো হয়েছে ও মশহুর করে দেওয়া হয়েছে যে, তাসাওউফ মানেই নিঃসঙ্গ, বেকার তথা কর্মহীন জীবন, আর কর্মব্যস্ততা হচ্ছে আল্লাহ্র মিলনপথের প্রতিবন্ধক তথা আধ্যাত্মিক সাধন পথের জন্য বিষবৎ। হযরত খাজা (র) 'ইলমে মা'রিফাত ও হাকীকতের যেই মকামে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং উপায়-উপকরণ ও রসম- রেওয়াজ তথা আচার-অনুষ্ঠানের ঊর্ধ্বে উঠে পরম লক্ষ্য ও আরাধ্যের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন তার অর্থ এটাই ছিল যে, তিনি সে পর্যায়কে পেছনে ফেলে বহুদূর সামনে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং বৈধ ও শরাসম্মত কার্যকলাপের আলোকোজ্জ্বলতা ও তার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্যে উপনীত হওয়া তাঁর দৃষ্টির আওতায় ছিল। হযরত খাজা সায়্যিদ মুহাম্মদ গেসূ দরায-এর মলফূযাত 'জাওয়ামি'উল কালিম'-এ বলা হয়েছে যে, হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) বলেছেন, কোন জিনিস যা বৈধ তা আল্লাহ্র পথে নিষিদ্ধ ও অধ্যাত্ম্য সাধনার পথে প্রতিবন্ধক নয়। অন্যথায় তা কখনই শরীয়তে বিধেয় ও বৈধ হত না।[১]

কলব (আত্মা) আল্লাহ্র দিকে নিবিষ্ট হলে কোন বস্তুই ক্ষতিকর নয়

একবার হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) বললেন, আল্লাহ্র দিকে নিবিষ্টচিত্ত এবং পবিত্র আত্মার দরকার। এরপর যে কাজেই থাক, তোমার কোন ক্ষতি হবে না।[২]

দুনিয়া পরিত্যাগের হাকীকত

দুনিয়া পরিত্যাগ এবং প্রকৃত যুহ্দ ও দরবেশীর হাকীকত বর্ণনা করতে গিয়ে একবার তিনি বলেন ঃ

> দুনিয়া পরিত্যাগের অর্থ এটা নয় যে, কেউ নিজেকে নগ্ন করে দেবে অর্থাৎ নেংটি পরে বসে যাবে ধ্যানে; বরং এর সঠিক অর্থ এই যে, সে কাপড়ও পরবে, খানাও খাবে এবং যখনই যা কিছু জুটবে, তাকে কাজে লাগাবে,

১. জাওয়ামি'উল কালিম, পৃ. ১৬০।

২. অর্থাৎ শরাসম্মত জীবনোপকরণ এবং প্রকাশ্য কাজ-কর্ম ইত্যাদি।

কিন্তু তা কখনই পুঞ্জীভূত করবে না এবং নিজের অন্তর মানসকে কোন বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ রাখবে না। আর এটাই দুনিয়া পরিত্যাগের অর্থ।[১]

বাধ্যতামূলক ও ইচ্ছাধীন আনুগত্য

তিনি আরও বলেন, আনুগত্য দুই প্রকার ঃ বাধ্যতামূলক ও ইচ্ছাধীন। বাধ্যতামূলক আনুগত্য বলতে বোঝায় তাকেই যার উপকারিতা আনুগত্য পোষণকারীর ওপর গিয়ে বর্তায় ; যেমন সালাত, সিয়াম, হজ্জ ও তাসবীহ্-তাহ্লীল ইত্যাদি। ইচ্ছাধীন আনুগত্য বলতে তাকেই বুঝায় যার উপকারিতা, শান্তি ও কল্যাণ অন্যেরা লাভ করে ; যেমন মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, স্নেহ-প্রীতি, অন্যের সঙ্গে সদয় ব্যবহার ইত্যাদি। এগুলিকে ইচ্ছাধীন আনুগত্য বলা হয়ে থাকে এবং এর ছওয়াবও অসীম ও অপরিমেয়।

বাধ্যতামূলক আনুগত্য গ্রহণীয় হবার জন্য বেশি প্রয়োজন ইখলাসের এবং ইচ্ছাধীন আনুগত্য যেভাবেই করবে, ছওয়াব মিলবে।[২]

কাশ্ফ ও কারামত আল্লাহ্র পথের অন্তরায়

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) আরও বলেছেন যে, ওলী-আওলিয়া থেকে যা কিছু প্রকাশ পায় তা তাঁদের নেশা ও মত্ততারই পরিণতি। তা এই জন্য যে, তাঁরা নেশাধারী। অপরদিকে আম্বিয়ায়ে কিরাম সহীহ্ ও সঠিক বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী। সালিক (আধ্যাত্মিক পথের পথিক)-এর জন্য কাশ্ফ ও কারামত অধ্যাত্ম সাধনা পথের অন্তরায়স্বরূপ। মুহব্বত দ্বারাই দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়।[২]

আওলিয়া ও আম্বিয়ায়ে কিরামের জ্ঞান

তিনি আরও বলেন ঃ মরতবার স্তর তিনটি ঃ তন্মধ্যে প্রথম মরতবা যাকে অনুভূতির পরিমাপ বলা হয়; দ্বিতীয়টিকে বুদ্ধির পরিমাপ এবং তৃতীয়টিকে পবিত্রতার পরিমাপ বলা হয়। অনুভূতির পরিমাপের অন্তর্গত বিষয়াদির মধ্যে খানাপিনার যাবতীয় দ্রব্য, গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি অনুভবযোগ্য বিষয়াদি পরিগণিত। এরপর 'আকল তথা বুদ্ধিগত পরিমাপ যার সম্পর্কে দুটি 'ইলমের সঙ্গে—একটি অর্জিত এবং অপরটি সর্বজনস্বীকৃত বিষয়। কিন্তু 'আলমে কুদ্সে পৌঁছে বুদ্ধির সাহায্যে লব্ধ যে কোন ইল্মই সর্বজনস্বীকৃত বলে মালুম হতে থাকে।

---

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃ. ১৪।
২. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃ. ৭।
৩. ঐ, পৃ. ৩৩।

অতঃপর তিনি আরও বলেন যে, যার ওপর 'আলমে কুদসের দরওয়াজা খুলে যায় তার 'আলামত কি হতে পারে? যে ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে ('আলমে 'আকল) থাকেন এবং যিনি কোন কোন মাসআলাকে সর্বজনস্বীকৃত অথবা অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে সমাধান করেন এবং এর থেকে তিনি একপ্রকার আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে থাকেন, তিনি আলমে কুদসে রাস্তা পান না। এ ক্ষেত্রে তিনি জনৈক বুযর্গের ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলতেন, অদৃশ্য জগৎ থেকে কিছু জ্ঞান ও ঘটনা মনের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। আল্লাহ্ চাহে তো আমি সেসব লিখব। এরপর তিনি অনেক কিছুই লিখলেন। অতঃপর বললেন, অনেক কিছুই লেখা হয়েছে, কিন্তু যা ছিল আসল উদ্দেশ্য তা লিপিবদ্ধ করা গেল না।[১]

দুনিয়ার মুহব্বত ও দুশমনী

একদিন আলোচনা হচ্ছিল যে, কারও দুনিয়ার প্রতি মুহব্বত সৃষ্টি হয়ে থাকে আর কারও হয়ে থাকে ঘৃণা। তিনি বললেন ঃ তিন ধরনের লোক রয়েছে। কিছু লোক রয়েছে যারা দুনিয়ার সঙ্গে মুহব্বত রাখে এবং দিন-রাত এর চিন্তা-ভাবনায় ও স্মরণে থাকে। এদের সংখ্যা বহু। কিছু লোক এমনও আছে যারা দুনিয়াকে ঘৃণা করে এবং ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে এর নাম উচ্চারণ করে এবং সর্বদাই এর দুশমনীতে লিপ্ত থাকে। তৃতীয় প্রকার লোক যারা না দুনিয়ার সাথে মুহব্বতের সম্পর্ক রাখে আর না রাখে ঘৃণার সম্পর্ক এবং দুনিয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে না মুহব্বতের সঙ্গে তার নাম উচ্চারণ করে, আর না ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে। এরা প্রথমোক্ত দুই প্রকারের চেয়ে ভাল। এর পর তিনি একটি কাহিনী শোনালেন ঃ জনৈক ব্যক্তি হযরত রাবিয়া বসরী (র)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে দুনিয়াকে ভীষণ নিন্দাবাদ করতে লাগল। হযরত রাবিয়া বসরী (র) তাকে বললেন ঃ মেহেরবানী করে এরপর আর এখানে আসবেন না। মনে হচ্ছে আপনি দুনিয়াকে অত্যন্ত ভালবাসেন, এজন্য বারবার দুনিয়ার আলোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন।[২]

তিলাওয়াতে কালামে পাকের মরতবা

একবার তিনি তিলাওয়াতে কুরআন পাকের মরতবা বর্ণনা করতে গিয়ে বল-লেন, প্রথম মরতবা এই যে, যা কিছু পড়বে তার অর্থ হৃদয়ে অনুভূত হবে।

দ্বিতীয় মরতবা এই যে, তিলাওয়াতকালীন মুহূর্তে আল্লাহ্র 'আজমত ও শান ও শওকত মনের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হবে এবং তৃতীয় মরতবা, তিলাওয়াতকারীর অন্তর-মানস্ আল্লাহকে নিয়ে মশগুল ও সম্পৃক্ত হবে।

---

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃ. ৬৯।
২. ঐ, পৃ. ১৮৯।

তিনি বললেন ঃ কুরআন পাঠকালীন নিদেনপক্ষে এতটুকু বোধশক্তি তো প্রতিটি ব্যক্তিরই থাকা উচিত, 'আমি এই নিয়ামতের কতখানি হকদার ছিলাম, আর এই মূল্যবান সম্পদ লাভের এমন ভাগ্যই বা আমার ছিল কোথায়?' যদি এসব হাসিল না হয় তবে তিলাওয়াতকালীন যে ছওয়াব ও পুরস্কারের ওয়াদা প্রদত্ত হয়েছে তা স্মৃতিপটে জীবন্ত ও ভাস্বর করে ধরে রাখা দরকার।[১]

যদিও হযরত খাজা (র), যেমন তিনি কয়েকবারই বলেছেন, কোন লিখিত গ্রন্থ রেখে যান নি,[২] কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় গ্রন্থরাজি তাঁরই হাতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং তাঁরই সাহচর্যে ধন্য ও গৌরবান্বিত সেই সমস্ত মহান খলীফা ও নামযাদা সঙ্গী-সাথীবৃন্দ যাঁরা বিশুদ্ধ আমল ও সঠিক নির্ভেজাল 'ইল্‌মের বাস্তব উপলব্ধির পরিপক্কতা কুরআনুল করীমে বর্ণিত راسخين فى العلم শানের অনুরূপ ছিল। আমীর হাসান 'আলা সিজযীর ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ এবং আমীর খোরদ -এর সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর বহু বাণী ও মলফূযাত বর্ণিত হয়েছে যার মধ্যে তাঁর শান-শওকতের প্রকাশ ঘটেছে।

---

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃ. ৭১।

২. ঐ পৃ. ৪৫; এবং খায়রুল মাজালিস, পৃ. ২৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফয়েয ও বরকত

ঈমানের নব জাগরণ এবং ব্যাপক ও সাধারণ তওবা

ঐ সমস্ত ফয়েয ও বরকত সম্বন্ধে বর্ণনা করার পূর্বে যা হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ ও তওবা করার মাধ্যমে লাখ লাখ মুসলমান লাভ করেছিল এবং এমন এক যুগে যখন মুসলিম হুকুমত সৌভাগ্যের স্বর্ণ শিখরে আসীন এবং গাফিলতী, আল্লাহ্-বিমুখতা, আত্মপূজার উপায়-উপকরণের ছিল পূর্ণ যৌবন– এমন একটি নতুন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক (রূহানী) প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে যাকে প্রতিটি অনুভবকারী ব্যক্তিই অনুভব করেছেন, সমীচীন মনে হচ্ছে যে, তরীকতের বুযর্গগণের সাধারণ বায়'আত, জনগণকে সৎপথ প্রদর্শন, ইসলামের উপদেশ প্রদান, তওবার হিকমত ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে দেওয়া যাক যেন জানা যায় যে, কোন্ অবস্থা ও অনিবার্যতার কারণে এমত তরীকা ও পদ্ধতি এখতিয়ার করা হয়েছিল এবং এর দ্বারা কী ধর্মীয় কল্যাণ ও উপকারিতা লাভ করা গেছে। বর্তমান লেখক 'তারীখে দাও'য়াত ওয়া 'আযীমত'-এর প্রথম খণ্ডে হযরত সায়্যিদুনা 'আবদুল কাদির জিলানী (র) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যা কিছু লিখেছিলেন প্রথমে সেটাকেই কিছুটা সংক্ষিপ্ত ও ছাঁট-কাট করে উদ্ধৃত করছি।

> শ্রেষ্ঠ যুগসমূহ অতিক্রান্ত হওয়ার পর জনবসতির বিস্তৃতি, জীবনের দায়িত্ব এবং জীবিকার চিন্তা-ভাবনা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, বিশিষ্ট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ শুদ্ধি ও সংস্কার এবং প্রশিক্ষণের কাজ নেয়া সম্ভব ছিল না এবং বৃহৎ পরিমাপের কোন ধর্মীয় ও আত্মিক বিপ্লবের আশা-ভরসাও করা যেত না। অতএব তখন সামনে কোন্ পন্থা-পদ্ধতিই বা খোলা ছিল যার মাধ্যমে মুসলমানরা বিরাট সংখ্যায় নিজেদের ঈমানের পুনর্জাগরণ ঘটাবে, ধর্মীয় দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতাসমূহকে পূর্ণ দায়িত্বানুভূতি ও উপলব্ধির সঙ্গে পুনরায় কবূল করবে যাতে করে তাদের মধ্যে নিজেদের ঈমানী চেতনা ও ধর্মীয় উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, বিমর্ষ ও মৃত অন্তর-মাঝে পুনরায়

প্রেমের উত্তাপ সৃষ্টি হয়, তাদের ক্লান্ত ও দুর্বল দেহে পুনরায় চলার শক্তি ও প্রাণপ্রবাহ সৃষ্টি হয়, কোন একনিষ্ঠ আল্লাহ্ভীরু বান্দার প্রতি তাদের আস্থা দৃঢ় হয় এবং তাঁর থেকে আত্মিক ও প্রবৃত্তিজাত রোগ-ব্যাধিতে সুচিকিৎসা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সঠিক আলো ও পথ-নির্দেশনা লাভ সম্ভব হয়। পাঠকরা নিশ্চয়ই ধারণা লাভে সক্ষম হয়েছেন যে, যেই ইসলামী হুকুমতের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল হিদায়াতের পথ দেখাবার, সেই হুকুমত তার দায়িত্ব পালনে শুধু উদাসীন হয়েই যায় নি, বরং তাঁর রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের আমল ও কৃতকর্মও সে কাজের জন্য ক্ষতিকর এবং সে-পথের অন্তরায় ও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অপরদিকে তারা এমন বদগুমান, খেয়াল-খুশীর পূজারী ও সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেছিল যে, নতুন কোন সংগঠন এবং নতুন কোন দাওয়াত কিংবা আহ্বান যার ভেতর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের সামান্য মাত্র গন্ধও পাওয়া যেত, তারা সেটাকে বরদাশ্ত করতে পারত না, সঙ্গে সঙ্গেই তা নির্মূল করে দিত। এমতাবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে নতুন ধর্মীয় জীবন, নতুন নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং একেবারে গোড়া থেকে নতুনভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্মতৎপরতা সৃষ্টি করবার জন্য এছাড়া আর কোন্ পন্থা অবশিষ্ট ছিল যে, আল্লাহ্র কোন ভক্ত ও একনিষ্ঠ বান্দা হুযূর আকরাম (সা)-এর প্রবর্তিত তরীকার ওপর ঈমান ও আমল তথা শরীয়ত অনুসরণের বায়'আত নেবেন এবং মুসলমান তাঁর হাতের ওপর হাত রেখে নিজেদের পূর্ব অলসতা ও জাহিলিয়াতের জীবন থেকে তওবা করবে—করবে ঈমানী চেতনার পুনরুজ্জীবন। অতঃপর সেই নায়েবে রসূল তাদেরকে ধর্মীয় বিষয়সমূহে প্রশিক্ষণ দেবেন, নিজের মুল্যবান প্রভাবমণ্ডিত সাহচর্য, স্বীয় প্রেমের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, দৃঢ়তা ও স্বীয় প্রাণের উষ্ণতা থেকে পুনরায় ঈমানী উত্তপ্ততা, উষ্ণ প্রেম, একনিষ্ঠতা ও একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সকল কিছু করবার মানসিকতা, সুন্নতে নববী অনুসরণে আবেগ-উদ্দীপনা এবং পারলৌকিক জীবনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। তাদের এই নতুন সম্পর্ক থেকে অনুভূত হোক যে, তারা একটি জীবন থেকে তওবা করেছে এবং সম্পূর্ণ নতুন আর এক জীবনে পদার্পণ করছে এবং আল্লাহ্র প্রিয় এমন এক বান্দার হাতের ওপর হাত রেখে দিয়েছে যিনি অনুভব করেন যে, ঐ সমস্ত বায়'আতকারীর সংশোধন, নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণ এবং তাদের দীনী খিদমত আল্লাহ্ পাক আমার উপর সোপর্দ করেছেন, আর এই মুহব্বত ও আস্থার কারণে আমার ওপর এক নয়া দায়িত্ব বর্তেছে। অতঃপর

তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতা ও গবেষণা এবং কুরআনুল করীম ও সুন্নতে নববী (সা)-এর মূলনীতি ও শিক্ষা মুতাবিক তাদের ভেতর রূহানী ভাবধারা ও তাকওয়া এবং তাদের জীবনে ঈমান, গভীর প্রত্যয়, ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা এবং তাদের আমল ও অবস্থার ভেতর ঈমানী ভাবধারা ও প্রাণপ্রবাহ সঞ্চার করতে প্রচেষ্টা চালাবেন। এটাই প্রকৃত হাকীকত সে সব বায়'আত ও প্রশিক্ষণের যা ধর্মের একনিষ্ঠ মুবাল্লিগগণ যুগে যুগে ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্জাগরণ এবং মুসলমানদের সংস্কার ও সংশোধনের কাজে পরিচালনা করেছেন এবং আল্লাহ্র লাখ লাখ বান্দাকে ঈমানের হাকীকত ও ইহ্সানের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।[১]

বায়'আত একটি অঙ্গীকার ও পারস্পরিক ওয়াদা পালনের নাম

বায়'আত পেছনের সমস্ত গুনাহ্ থেকে তওবা এবং আল্লাহ্ ও তদীয় রসূল (সা)-এর বিধি-বিধান প্রতিপালন এবং সুন্নতে নববীর পূর্ণ অনুসরণ করবার পারস্পরিক প্রতিশ্রুতিরই নাম। সুলতানুল মাশায়িখ (র) বায়'আত গ্রহণ করার সময় বায়'আতকারীদের থেকে কী শপথ উচ্চারণ করতেন এবং ভবিষ্যতের জন্য কী অঙ্গীকারই বা নিতেন কোন জীবনী গ্রন্থেই তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) স্বয়ং স্বীয় শায়খ ও মুরশিদ শায়খুল কবীর হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-এর বায়'আত নেবার তরীকা এবং তাঁর উপদেশাবলীর আলোচনা করেছেন এবং স্বীয় শায়খ-এর সাথে তার যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল—তাঁকে অনুসরণের যে আবেগ ও প্রেরণা ছিল—তার থেকে এ ধারণাই করা চলে যে, তিনিও তেমনিই স্বীয় মুরীদবর্গকে শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করে থাকবেন।

তিনি বলেন, "যখন কোন ব্যক্তি শায়খুল 'আলম শায়খ ফরীদুদ্দীন-এর খিদমতে মুরীদ হবার নিয়তে আসত, তিনি তাকে বলতেন, একবার সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস পড়। এরপর সূরা বাকারার শেষ রুকূ امن الرسول থেকে শেষ পর্যন্ত পড়াতেন। অতঃপর شهد الله انه ..... ان الدين عند الله الاسلام لا اله الا الله পর্যন্ত পড়াতেন। এরপর বলতেন ঃ তোমরা এই দুর্বলের হাতের ওপর বায়'আত করে তাঁর শায়খ-এর হাতের ওপর এবং (এই ধারাক্রম অনুসারে) হযরত পয়গম্বর (সা)-এর মুবারক হাতের ওপর ও আল্লাহ্ পাক পরওয়ারদিগারে 'আলম-এর সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করলে যে, নিজেদের হাত, পা ও চোখকে হিফাযত করবে এবং শরীয়ত-নির্দেশিত পথ ও পন্থাসমূহে কায়েম থাকবে।"

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৩২৬।

বায়'আতের এই শিক্ষা ও উপদেশাবলীতে ইসলামের বুনিয়াদী 'আকীদাসমূহ যেমন এসে গেছে–তেমনি এসে গেছে "শুনব ও অনুসরণ করব"–এর ওয়াদা ও অভিপ্রায়ের কথাও। একথাও এসে গেছে যে, আল্লাহ্ পাকের দরবারে একমাত্র মনোনীত ও গৃহীত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। এর দ্বারা এ অনুভূতিও জাগ্রত করে দেওয়া হত যে, এই বায়'আত প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র হাতের ওপরই করা হয়েছে এবং শায়খ-এর হাত সেই মুবারক হাতেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। এর দ্বারা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন-এর সঙ্গেও অঙ্গীকার করা হয়েছে যে, বায়'আতকারী তার হাত-পা ও চোখকে পাপরাশি থেকে হিফাযতে রাখবে এবং শরীয়ত-নির্দেশিত পথের ওপর নিজেকে কায়েম রাখবে। ঈমানের পুনর্জাগরণ এবং আল্লাহ্ ও তদীয় রসূল (সা)-এর সঙ্গে নিজের অঙ্গীকার প্রতিপালনের এর চাইতে উত্তম বোধগম্য তরীকা আর কী হতে পারে? এটা তো বলা যায় না যে, বায়'আতকারীদের শতকরা একশ'ভাগ এ প্রতিজ্ঞার ওপর কায়েম থাকত। তবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বায়'আতকারীদের একটি বিরাট অংশ এই স্বীকারোক্তি ও অঙ্গীকার রক্ষা করত এবং আল্লাহ্র হাযার হাযার লাখ লাখ বান্দা এই ঈমানী পুনর্জাগরণ ও বিপ্লবাত্মক অবস্থার মাধ্যমে নিজেদের শুধরে নিত।

সাধারণ ও ব্যাপক বায়'আত-এর হিকমত

সাধারণ গণমানুষকে বায়'আত ও হিদায়াতের লক্ষ্যে পরিণত করার ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত বুযর্গ খোলাখুলি ও সাধারণ অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন এবং সেভাবে কোনরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বাছাই-মনোনয়ন ছাড়াই লোকদের অনুমতি ছিল যে, তারা বায়'আত গ্রহণ করুক এবং মুরীদ দলভুক্তদের কাতারে শামিল হোক। বিশেষ করে হযরত খাজা (র)-এর দরবারে এ অধ্যায়ে যে প্রশস্ত ও উদার সুযোগ-সুবিধা ছিল, তাতে কারও কারও খট্‌কা সৃষ্টি হতে পারে যে, বায়'আত যখন একটি অঙ্গীকারের নাম এবং এর সম্পর্ক যখন গোটা জীবনের সঙ্গে জড়িত, তখন এতে এত খোলামেলা ও উদারতার সুযোগ রাখা হল কেন? হযরত খাজা (র) একবার নিজেই এর উত্তর দিয়েছিলেন এবং এরূপ সাধারণ অনুমতির হিকমত বর্ণনা করেছিলেন।

মাওলানা যিয়াউদ্দীন বারনী (তারীখে ফীরোযশাহীর প্রণেতা) বলেন যে, আমি একদিন সুলতানুল মাশায়িখের খিদমতে হাযির ছিলাম। ইশরাক থেকে চাশ্‌ত পর্যন্ত আমি তাঁর হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক আলোচনা শুনতে থাকি। ঐ দিন বিশেষ করে অনেক লোকই বায়'আত গ্রহণ করে। এ দৃশ্য দেখে আমার মনে এ

ধারণার সৃষ্টি হল যে, পূর্ব যমানার বুযর্গগণ মুরীদ করবার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন, কিন্তু সুলতানুল মাশয়িখ (র) স্বীয় বদান্যতা ও করুণার কারণে এক্ষেত্রে সাধারণ অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি সবাইকে মুরীদ বানিয়ে নিচ্ছেন। আমি চাইলাম যে, এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করি। সুলতানুল মাশায়িখ স্বীয় কাশ্‌ফ দ্বারা আমার জিজ্ঞাসা সম্পর্কে অবহিত হয়ে বললেন ঃ

মাওলানা যিয়াউদ্দীন! সব ধরনের কথাই তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করে থাক। কিন্তু এটা তো জানতে চাও না যে, কোনরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ছাড়াই যে কোন আগত ব্যক্তিকেই কেন আমি মুরীদ করি।

একথা শোনার পর আমার শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হ'ল আর আমি তাঁর পা আঁকড়ে আরয করলাম যে, বেশ কিছুকাল থেকে আমার অন্তরে এই সমস্যা তোলপাড় করে ফিরছিল এবং আজও এ ওয়াসওয়াসা আমার মনে এসেছিল। আল্লাহ্ পাক আপনার মনে একথার উদয় ঘটিয়েছেন। এরপর তিনি বললেন ঃ

> আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক যুগে স্বীয় অপার ও পরিপূর্ণ হিকমত-এর একটি বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। এর পরিণাম এই যে, প্রতিটি যুগের লোকজনের জীবন-যাপন পদ্ধতি ও আচার-আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এবং তাদের মেযাজ ও প্রকৃতি অতীত যুগের লোকদের প্রকৃতি ও চরিত্রের সঙ্গে মিল খায় না। অল্প লোকের মধ্যেই এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। আর এটা অভিজ্ঞতারই ফসল। মুরীদ হবার আসল উদ্দেশ্য তো এটাই যে, মুরীদ আল্লাহ্ ব্যতীত আর সমস্ত কিছুর সঙ্গেই সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র সঙ্গেই নিজেকে সম্পৃক্ত ও তাঁরই প্রতি সমর্পিত করবে, যেমনটি তাসাওউফের কিতাবগুলিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। পূর্ব যমানার বুযর্গগণ যতক্ষণ পর্যন্ত মুরীদের মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত অপর সকল কিছুর সঙ্গেই এই সম্পর্কচ্যুতি লক্ষ্য না করতেন, বায়'আতের জন্য হস্ত প্রসারিত করতেন না। কিন্তু সুলতান আবূ সা'ঈদ আবুল খায়ের-এর রাজত্বকাল থেকে বুযর্গ শ্রেষ্ঠ শায়খ ফরীদুল হক ওয়াদ্দীন (কু.স.)-এর সময়কাল পর্যন্তএ সমস্ত মহান বুযুর্গ ছিলেন দুনিয়ার বুকে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অন্যতম। আল্লাহ্‌র বান্দাদের ভীড় এঁদের দরওয়াজায় লেগেই থাকত এবং উঁচু-নীচু প্রতিটি শ্রেণীর লোকই সেখানে সমবেত হ'ত। ঐ সমস্ত আল্লাহ্‌র বান্দা পারলৌকিক দায়িত্বানুভূতির কথা স্মরণ করে ভীত হয়ে এইসব আল্লাহ্ প্রেমিক লোকদের আশ্রয় আঁকড়ে ধরতে চাইল। তখন ঐসব মহান বুযর্গও সাধারণ ও বিশিষ্ট সর্বশ্রেণীর লোকদেরই বায়'আত কবূল করেছেন এবং খিরকায়ে তওবা ও তাবারুক দান করেছেন।

এখন আমি তোমার সওয়ালের জওয়াব দিচ্ছি, আমি কেন মুরীদ করবার ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করি না এবং নিজেকে নিশ্চিন্ত করি না। এর একটি কারণ এই যে, আমি ধারা-পরম্পরা শুনে আসছি, বহু লোক মুরীদ হবার পর অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে তওবা করে প্রত্যহ নিয়মিত জামা'আতে সালাত আদায় করতে থাকে এবং অন্যান্য নফল 'ইবাদত-বন্দেগীতেও নিজেকে নিয়োজিত রাখে। এখন আমিও যদি শুরু থেকেই এ ব্যাপারে শর্ত আরোপ করি যে, তার ভেতর মুরীদ হবার হাকীকত (প্রকৃত তাৎপর্য) অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন যাবতীয় বস্তু থেকে সম্পর্কচ্যুতির নযীর পাওয়া যাচ্ছে কিনা এবং তাকে তওবা ও পবিত্রতার খিরকা না দেই, তবে তারা কল্যাণের এ পরিমাণটুকুও–যা ঐ সমস্ত বান্দার কারণে তাদের ভেতর আসছে–তা থেকেও তারা বঞ্চিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমি দেখছি, একজন মুসলমান অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে ও বিনয়-নম্রভাবে আমার নিকট আসে এবং বলতে থাকে যে, সে সমস্ত গুনাহ থেকে তওবা করেছে। আমি তার কথা সত্য মনে করে তাকে বায়'আত করে নিই। বিশেষ করে এজন্য যে, বহু বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনি, অনেক বায়'আতকারীই এ বায়'আতের কারণে পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে ফিরে আসে।"[১]

জনজীবনে এর প্রভাব

এই বায়'আত ও সম্পর্ক, যদ্দারা মুসলমানদের প্রতিটি শ্রেণী সমভাবে উপকৃত ও কল্যাণমণ্ডিত হ'ল, সাধারণ জীবন -যিন্দেগী ও সামাজিক জীবন, জনগণের চরিত্র, অভ্যাস, কাজ-কর্ম ও সময়ের গতিধারার ওপর এবং শাসকশ্রেণী থেকে শুরু করে শ্রমজীবি শ্রেণী পর্যন্ত মানুষের সামগ্রিক অবস্থার ওপর এর কি প্রভাব পড়ল এবং রাজধানী দিল্লীতে যেখানে সারা ভারতবর্ষের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ—আর শত শত নয়, হাযার হাযার বছরের ধনভাণ্ডারের সোনা-দানা ও হীরা-জহরত, শিল্পী ও কারিগরদের শিল্পজাত দ্রব্যাদি এবং সমগ্র দেশের প্রত্যন্ত বিভিন্ন কোণ থেকে উপহার-উপঢৌকন, দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি প্লাবনের ন্যায় আছড়ে পড়ছিল, সেখানে দীনদারী, আল্লাহ-সন্ধানী, ঐশী প্রেম, তওবা ও আল্লাহ্র নৈকট্য, পারস্পরিক লেন-দেনে পরিচ্ছন্নতা, স্পষ্ট ভাষণ এবং আমানতদারী তথা বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে কেমনতরো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৩৪৬-৩৪৮ মাওলানা যিয়াউদ্দীন বারনীর 'হাসরতনামার' বরাত দিয়ে উদ্ধৃত।

তার বিস্তারিত বিবরণ সে যুগের বিজ্ঞ, দুরদর্শী ও বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক যিয়াউদ্দীন বারনীর মুখেই শুনুন। তিনি সুলতান 'আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ[১]

সুলতান 'আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের বুযুর্গগণের মধ্য থেকে তাসাওউফের পদ শায়খুল ইসলাম হযরত নিজামুদ্দীন, শায়খুল ইসলাম 'আলাউদ্দীন এবং শায়খুল ইসলাম রুকনুদ্দীন দ্বারা অলংকৃত ছিল। দুনিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ঐ সমস্ত পবিত্র আত্মার দ্বারা বরকতময় ও সমৃদ্ধিশালী হয় এবং তাঁদের হাতে বায়'আত করে, তাঁদের সাহায্যে ও সহযোগিতায় পাপী ও গুনাহগার লোকেরা তওবা করে, হাযার হাযার পাপাচারী ও বদকার এবং বেনামাযী তাদের অন্যায় ও পাপাচার থেকে নিজেদের ফিরিয়ে রাখে এবং চিরদিনের জন্য তাঁরা সালাতের পাবন্দ হয়ে যায় এবং গোপনীয়তার সঙ্গে ধর্মীয় কার্যকলাপের প্রতি আবেগ-উদ্দীপনা প্রকাশ করে। তাদের তওবা হয়েছিল সহীহ ও বিশুদ্ধ। বাধ্যতামূলক ও ইচ্ছাধীন তথা ফরয ও নফল ইবাদত-বন্দেগী তাদের স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল এবং বস্তুজগতের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক লোভ ও আকর্ষণ যা মানুষের কল্যাণ ও আনুগত্যের বুনিয়াদ–ঐ সমস্ত বুযুর্গের উন্নত ও প্রশংসনীয় চরিত্র এবং দুনিয়াবী স্বার্থের প্রতি নির্লোভ ও নিস্পৃহ মন-মানসিকতা দৃষ্টে এদের মন থেকে কমে যায়। আধ্যাত্মিক পথের পথিক (সালিক)-দের নফল 'ইবাদত ও ওযীফা পাঠের আধিক্য এবং বান্দাহ্‌সুলভ গুণাবলীর অব্যাহত অনুশীলনী দ্বারা তাদের অন্তরে কাশফ ও কারামত লাভের আরযু পয়দা হতে থাকে। সে সব মহান বুযুর্গের 'ইবাদত-বন্দেগী ও কার্যকলাপ এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানের বরকতের কারণে জনগণের পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্যেও সততা ও ঈমানদারীর সৃষ্টি হয়। তাঁদের উন্নত চরিত্র, দীনের জন্য কঠোর-কঠিন মুজাহাদা ও রিয়াযত পরিদৃষ্টে আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকদের মন-মানসে নিজেদের আমল-আখলাকেও পরিবর্তনের খাহেশ সৃষ্টি হয় এবং ঐ সব দীনি বাদশাহদের মুহব্বত ও আমল-আখলাকের প্রভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ফয়েযের বারিধারা দুনিয়ার বুকে বর্ষিত হতে থাকে, আর আসমানী বালা-মুসীবতের দরওয়াজা বন্ধ হয়ে যায়। তাঁদের যামানার লোকজন দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর মুসীবত থেকে রক্ষা পায় এবং তাঁদের

১. তারীখে ফীরোযশাহীর উদ্ধৃত অংশের এ অনুবাদ সায়্যিদ সাবাহুদ্দীন রাহমান এম.এ. (রফীক, দারুল মুসান্নিফীন)-এর গ্রন্থ 'বযমে সূফিয়া' থেকে কাটছাঁট করে উদ্ধৃত করা হয়েছে। পৃ. ১০৯-২০২।

একনিষ্ঠ ও ভালবাসামণ্ডিত 'ইবাদত-বন্দেগীর বরকতে মোগলদের ফিতনা বিলুপ্ত হয় এবং তারাও বিনষ্ট হয়ে যাযাবরে পরিণত হয়। ঐ তিনজন বুযুর্গের অস্তিত্বের কারণে সমসাময়িক কালের শরীয়ত ও তরীকতের সকল বিধি-বিধানের বিস্ময়কর শ্রীবৃদ্ধি ও গৌরব লাভ ঘটে। কত না আশ্চর্য ছিল সে যুগ যা সুলতান 'আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালের শেষ দশ বছরে পরিদৃষ্ট হয়েছিল। একদিকে সুলতান 'আলাউদ্দীন রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণের জন্য সমস্ত নেশা জাতীয় ও নিষিদ্ধ দ্রব্য এবং পাপাচার ও অন্যায় বিভিন্ন প্রকার কঠোর শাস্তির মাধ্যমে বন্ধ করে দেন। অপরদিকে সে যুগেই শায়খুল ইসলাম নিজামুদ্দীন বায়'আতের দরওয়াজা সাধারণের জন্য খুলে দেন। গুনাহগার ও পাপীদের খিরকা পরিধান করান এবং তাদেরকে পাপাচার ও অন্যায় থেকে তওবা করিয়ে মুরীদ বানান। সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ধনী-গরীব, বাদশাহ-ফকীর, নিরক্ষর ও শিক্ষিত, আশরাফ ও আতরাফ, শহুরে ও গ্রামবাসী, যুদ্ধ বিজয়ী বীর (গাযী) ও মুজাহিদ, স্বাধীন ও গোলাম সবাইকে তাকওয়া ও পাক-পবিত্রতার তা'লীম দেন। নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবা ও সাধারণ মানুষ, চাকর-বাকর সবাই সালাত আদায় করত এবং অধিকাংশ মুরীদ চাশ্‌ত ও সালাতুল ইশরাকেরও পাবন্দ হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীন ও সৎকর্মশীল লোকেরা শহর থেকে গিয়াছপুর পর্যন্ত কতিপয় অবসর বিনোদন কেন্দ্রে চবুতরা কায়েম করে দিয়েছিল, ছাপ্পড় ফেলে দিয়েছিল, কূয়া খনন করে দিয়েছিল, পানি ভরতি ঘড়া এবং মাটির লোটা রেখে দিয়েছিল, দিয়েছিল চাটাই বিছিয়ে। প্রতিটি চবুতরা ও প্রতিটি ছাপড়াতে একজন করে চৌকিদার ও একজন কর্মচারী নিযুক্ত করে দিয়েছিল যেন মুরীদ ও তওবাকারী সৎলোকদের শায়খ নিজামুদ্দীন (র)-এর আস্তানা পর্যন্ত আসা-যাওয়া করতে ও সালাত আদায় করতে কোন বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে না হয়। চবুতরা ও ছাপড়াতে নফল পাঠকারী মুসল্লীদের ভীড় দেখা যেত। অধিকাংশ লোকের মাঝে চাশ্‌ত, ইশরাক, সালাতুল আওয়াবীন, তাহাজ্জুদ ও বেলা গড়িয়ে যাবার মুহূর্তের নামাযের প্রচলন হয়ে গিয়েছিল। ঐ সব নফল সালাত প্রতিটি ওয়াক্তে কে কত রাকাত আদায় করেছে এবং প্রতি রাকাতে কালামে পাকের কোন্ সূরা এবং কোন্ কোন্ আয়াত পড়েছে, তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হত। অধিকাংশ নতুন মুরীদ শায়খ (র)-এর পুরানো মুরীদদের থেকে গিয়াছপুর যাতায়াতের মুহূর্তে জিজ্ঞেস করত, শায়খ (র) রাতের বেলায় কত রাকাত সালাত আদায় করেন এবং প্রতিটি রাকাতে কি পড়েন, 'ইশার সালাতের পর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর কতবার

দরূদ পাঠান এবং শায়খ ফরীদ (র) ও শায়খ বখতিয়ার কাকী (র) দিনে-রাতে কতবার দরূদ পাঠিয়ে থাকেন আর সূরা ইখলাস কতবার পড়েন। নতুন মুরীদেরা পুরানো মুরীদদেরকে এবম্বিধ প্রশ্নই জিজ্ঞেস করত। তারা সিয়াম, নফল এবং কম আহার সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করত। পুণ্যের ঐ যুগে অধিকাংশ লোকেরই কুরআন পাক হিফ্য করার গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। নতুন মুরীদ শায়খ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর পুরানো মুরীদদের সাহচর্যে থাকত। পুরানো মুরীদদের আনুগত্য, 'ইবাদত-বন্দেগী, দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতি, তাসাওউফের গ্রন্থাদি পাঠ, মাশায়িখে কিরামের প্রশংসনীয় গুণাবলী ও তাঁদের কার্যকলাপ তথা পারস্পরিক লেনদেন বর্ণনা করা ব্যতীত আর কোন কাজ ছিল না। দুনিয়া এবং দুনিয়াদার লোকদের সম্পর্কে কোন আলোচনা তাদের মুখেই আসত না। দুনিয়া এবং দুনিয়াবাসীর মেলামেশার কাহিনীর প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ ছিল না, সেটাকে তারা দূষণীয় ও পাপ বলে মনে করত। নফল 'ইবাদত-বন্দেগীর আধিক্য ও পাবন্দির ব্যাপারগুলো ঐ বরকতময় যুগে এমত পরমাণে বেড়ে গিয়েছিল যে, বাদশাহী মহলের অনেক আমীর-উমারা, সেন্যাধ্যক্ষ, শাহী ফৌজ ও নওকর শায়খ (র)-এর মুরীদ হতেন এবং চাশ্ত ও সালাতুল ইশরাক আদায় করতেন। আইয়াম বিজ'-এর সিয়াম ও যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের সিয়ামও পালন করতেন। আর এমন কোন মহল্লাও ছিল না যেখানে এক মাস বিশ দিন পর নেক্কার লোকদের সম্মেলন হত না কিংবা সূফীদের সামার মহফিল হত না এবং তারা পারস্পরিক কান্নাকাটি করতেন না। শায়খ (র)-এর কতিপয় মুরীদ তারাবীহের নামাযে এবং ঘরেও খতমে কুরআন করতেন। যে সমস্ত লোক এ বিষয়ে একটি স্থিতি অবস্থায় উপনীত হতে সক্ষম হয়েছিল। তারা রমযান মাসে, জুম'আর দিনে এবং ধর্মীয় আনন্দ-উৎসবের রজনীগুলিতে ভোর পর্যন্ত জেগে কাটাত, দুই চোখের পাতা কখনও এক করত না। শায়খ (র)-এর মুরীদদের মধ্যে যাঁরা উচ্চস্তরের ছিলেন তাঁরা সারা বছর ধরেই রাত্রির এক বা দুই-তৃতীয়াংশ তাহাজ্জুদ পাঠে কাটিয়ে দিতেন। কোন কোন 'ইবাদত-গুযার ব্যক্তি 'ইশার সময়কার ওযূ দিয়েই ফজর আদায় করতেন। শায়খ (র)-এর মুরীদদের ভেতর থেকে কতিপয় ব্যক্তিকে আমি জানি যে, শায়খ নিজামুদ্দীন (র)-এর ফয়েয ও অনুগ্রহ দৃষ্টিলাভে কাশ্ফ ও কারামতের অধিকারী হয়েছিলেন। শায়খ (র)-এর পবিত্র অস্তিত্ব, তাঁর নিশ্বাসের বরকত এবং তাঁর মকবুল দু'আর কারণে এদেশের অধিকাংশ মুসলমান 'ইবাদত-বন্দেগী, তাসাওউফ ও

যুহ্‌দ-এর দিকে ঝুঁকে পড়া এবং শায়খ (র)-এর মুরীদ হবার দিকেই অগ্রগামী হয়েছিল। সুলতান 'আলাউদ্দীন গোটা পরিবারসহ শায়খ নিজামুদ্দীন (র)-এর একনিষ্ঠ ভক্তে ও অনুরক্তে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। ব্যক্তি বিশেষ ও সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সবার অন্তরেই সততা ও নেককাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। আলাউদ্দীনের রাজত্ব কালের শেষ কয়েক বছরে প্রেমের দালালী, অন্যায় ও পাপাচার, মদ জুয়া ও অশ্লীলতা ইত্যাদির নামও উচ্চারিত হত না অধিকাংশ লোকের মুখে। বড় গুনাহ জনগণের নিকট কুফরীর সমার্থক বলে প্রতীয়মান হত। মুসলমানরা লজ্জাবশত সুদখোরী ও মজুদদারীতে খোলাখুলি লিপ্ত হতে পারত না। দোকানদারদের মধ্যে মিথ্যা বলা, ওযনে কম দেওয়া ও ভেজাল মেশানোর রেওয়াজ উঠে গিয়েছিল। অধিকাংশ ছাত্র ও বড় বড় লোক যারা শায়খ (র)-এর খিদমতে থাকত, তাসাওউফ ও তরীকতের হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত কিতাবাদি অধ্যয়নের দিকেই ঝুকে পড়েছিল। কূতুল কুলূব, ইয়াহ্‌ইয়াউল 'উলূম, তরজমা ইয়াহ্‌ইয়াউল উলূম, 'আওয়ারিফ, কাশফুল মাহজূব, শরাহ্ তা'আররুফ, রিসালা কুশায়রী, মিরসাদুল 'ইবাদাত, মকতুবাতে আয়নুল কুযাত, কাযী হামীদুদ্দীন নাগোরীর লাওয়ায়েহ ও লাওয়ামেহ এবং ফাওয়ায়িদুল ফুওয়াদ-এর বহু ক্রেতা ও পাঠক সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। বেশীর ভাগ লোক পুস্তক বিক্রেতাদের কাছে মা'রিফত ও হাকীকত সম্পর্কিত কিতাবাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করত। এমন কোন পাগড়ী পরিহিত ব্যক্তি ছিল না যার পাগড়ীতে মিসওয়াক ও চিরুণী দৃষ্টিগোচর হত না। সূফী-দরবেশদের অতিরিক্ত ক্রয়ের কারণে লোটা ও চামড়ার পাত্রের অভাব দেখা দিয়েছিল। মোদ্দা কথা, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-কে অতীত যুগের হযরত শায়খ জুনায়দ বাগদাদী (র) এবং শায়খ বায়েযীদ বিস্তামী (র)-এর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি করেই পয়দা করেছিলেন।[১]

প্রেমের বাজার

তওবা, ঈমানী পুনরুজ্জীবন এবং অবস্থার সংস্কার দ্বারা দিল্লীর প্রতিটি অলি-গলি প্রভাবিত হচ্ছিল এবং শাহী দরবার ও শাহী মহলসহ "বামে হাযার সতুন" পর্যন্ত তার ঢেউ গিয়ে পৌঁছেছিল। একটি নতুন পরিবর্তন এই ছিল যে,

---

১. তারীখে ফীরোযশাহী, যিয়াউদ্দীন বারনীকৃত, পৃ. ৩৪১-৪৬।

মস্তিষ্ক-উদ্ভূত অহংকার ও আত্মিক বিমর্ষতার এই জগতে– যেখানে বাঁশরী ও চিত্তহারী বস্তু ব্যতিরেকে দীর্ঘকাল অন্য কিছুর অস্তিত্ব ছিল না, সেখানে ঐশী আবেগ-উদ্দীপনার একটি মলয় সমীরণ প্রবাহিত হতে শুরু করে এবং প্রেমের সওদার ব্যাপক লেনদেন ঘটে। প্রতিটি স্থানে প্রেমের আলোচনা, হাকীকত ও মা'রিফতের কথাবার্তা এবং আধ্যাত্মিক ভাবধারাপূর্ণ ও প্রেম সম্বলিত কবিতাবলী গুঞ্জরিত হতে থাকে। সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা আমীর খোরদ কি সুন্দর লিখেছেন ঃ

> মুহব্বত ও 'ইশকের কারবারের যুগে একটি বাজার লেগেছে। সামা'র কাহিনী, ইখলাস ও আনুগত্য, প্রীতি ও নম্রতা, অন্তরের প্রশান্তি ও প্রেমিকের পায়ের ওপর মাথা রেখে দেওয়া ব্যতিরেকে আর কোন কিছুতেই জনসাধারণের শান্তিলাভ ঘটত না।[১]

খলীফাদের তরবিয়ত

ইরশাদ ও তরবিয়তের এই সিলসিলা এবং 'ইশ্ক ও মুহব্বতের এই তরীকা-পদ্ধতিকে হিন্দুস্তানের দূর-দূরান্তর এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া এবং বহুদিন পর্যন্ত এই সিলসিলা ও পদ্ধতিকে কায়েম ও বহাল রাখবার জন্য তিনি উচ্চ মনোবলসম্পন্ন ও যোগ্যতার অধিকারী আপাদমস্তক একনিষ্ঠ খলীফাদের গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। তাদের ভেতর সে সব গুণ ও পরিপূর্ণতা সৃষ্টির প্রয়াস চালান যে সব কামিল বুযর্গদের জন্য অপরিহার্য। তাদের দিয়ে মুজাহাদা (আধ্যাত্মিক পথের কঠোর-কঠিন সাধনা) করান, তাদের কলব (আত্মা)-এর দেখাশোনা করেন, তাঁদের মধ্যে যিনি উচ্চতর যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন এবং 'ইল্ম-এর অলংকার থেকেও ছিলেন মাহরূম, তিনি তাদের পরিপূর্ণ 'ইল্ম হাসিলের বন্দোবস্ত করেন। তাঁদের মধ্যে যাঁদের অন্তর থেকে এখন পর্যন্ত বাহাছ-বিতর্কের নেশা কাটে নি, তাঁদের তিনি শুধরে দেন। যাঁরা আল্লাহ্র সৃষ্টি জগতকে পথ-প্রদর্শন ও সামাজিক নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা রাখেন কিন্তু তাদের নির্জনবাস, লোকালয় বর্জন, একক ও নিঃসঙ্গ 'ইবাদত-বন্দেগী ও মুজাহাদায় আগ্রহ ছিল তাঁদেরকে তিনি সামাজিক জীবন এখতিয়ার করতে ও আল্লাহ্র মাখলূকের যুলুম-অত্যাচার বরদাশ্ত করতে বাধ্য করেন। সংস্কার ও তরবিয়তের যে দুনিয়াব্যাপী কর্মকাণ্ডের নীলনক্শা তাঁর সামনে ছিল এবং আপন বিশিষ্ট সাথীদের থেকে দীনের দাওয়াত ও তবলীগের যে খিদমত নেবার ছিল, সে পথের অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সব কিছুই তিনি বিদূরিত করেন।

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৫১০।

সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একদিন অযোধ্যার অধিবাসী, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দোস্ত ও খাদিমবৃন্দ নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, সুলতানুল মাশায়িখ (র)-এর নিকট থেকে পঠন-পাঠন ও বাহাছ-বিতর্কের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করা হবে। যদিও ঐ সব দোস্তের মধ্যে প্রত্যেকেই প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী 'আলিম ছিলেন এবং সুলতানুল মাশায়িখের সোহবত ও সাহচর্যের ফয়েয ও বরকতে আল্লাহ্র স্মরণে ছিলেন নিরন্তর মশগুল, তথাপি যে কর্মে তাঁরা জীবন কাটিয়েছেন তার প্রতি তাঁরা স্বাভাবিকভাবে তখনও কিছুটা আকৃষ্ট ছিলেন। মাওলানা জালালুদ্দীনের নেতৃত্বে সবাই তাঁর খিদমতে হাযির হলেন। হযরত সুলতানুল মাশায়িখ (র)-এর ওপর যিকরে ইলাহীর কারণে এমনি এক নূরে তাজাল্লী ছিল যে, লোকেরা তাঁর সামনে কথা বলার সাহস পেত না। এ ব্যাপারে মাওলানা জালালুদ্দীনের সাহসের কিছুটা সুনাম ছিল। তিনি বললেন যে, যদি এজাযত দেন তবে সাথী দোস্তরা কোন সময় বাহাছ-আলোচনা করতে পারে। সুলতানুল মাশায়িখ (র) বুঝতে পারলেন যে, এটা এখানে উপস্থিত সমস্ত 'উলামায়ে কিরামের সম্মিলিত ইচ্ছাও বটে এবং মাওলানা জালালুদ্দীন এদের সবার প্রতিনিধিত্ব করছেন। তিনি বললেন, আমি কি করব, ওদের দিয়ে অন্য কোন খিদমত নেওয়াই তো আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল।[১]

মাওলানা সায়্যিদ নাসীরুদ্দীন মাহমূদ, যিনি পরে হযরত খাজা (র)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ খলীফা ও প্রকৃত স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন এবং চেরাগে দিল্লী নামেই যিনি সারা দুনিয়াব্যাপী খ্যাতিমান ছিলেন, অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠেন কোথাও কোন জঙ্গল অথবা পাহাড়ে গিয়ে যিকরে ইলাহীতে মগ্ন হতে। একদিন তিনি আমীর খসরূর মাধ্যমে বলে পাঠান যে, অধম অযোধ্যায় বসবাস করে। লোকজনের ভীড়ে আমার সাধনার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। যদি এজাযত দেন তবে আমি কোন বিয়াবান ময়দানে কিংবা কোন পাহাড়ে গিয়ে ঝঞ্ঝাট-ঝামেলামুক্ত হয়ে আল্লাহ্র 'ইবাদত করি। আমীর খসরূ যখন এ পয়গাম পৌঁছালেন, তিনি বললেন ঃ

> তাঁকে বলে দিও, তোমাকে জনসমাজে থাকতে হবে এবং মানুষের অমানবিক ও অমানুষসুলভ আচার-আচরণকে বরদাশ্ত করতে হবে, আর বদান্যতা ও ত্যাগের দ্বারাই এর উত্তর দিতে হবে।[২]

মাওলানা হুস্সামুদ্দীন মুলতানী খিলাফত প্রাপ্তির পর আরয করেছিলেন যে, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে শহর ছেড়ে দেই এবং কোন ঝর্ণাধারার ধারে

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৩০৬।

২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ২৩৭।

গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করি। কেননা শহরে যে পানি মেলে তা কূয়ার আর সে পানিতে ওযূ করলে অন্তরের প্রশান্তি লাভ ঘটে না।[১] এতে তিনি বললেন, "না, তুমি শহরেই থাকবে, থাকবে সাধারণ একজন মানুষের মত। মন চাচ্ছে তোমাকে আরামের জায়গায় নিয়ে যেতে এবং এমন জায়গায় রাখতে যেখানে সামাজিকতার কোন বালাই নেই। যখনই তুমি শহরের বাইরে গিয়ে পড়বে এবং কোন ঝর্ণাধারার কিনারে বসবাস করতে শুরু করবে, তখন বিদেশী ও শহুরে লোকজন খুঁজে তোমাকে বের করবে, চারদিকে মশহূর হয়ে পড়বে, যে অমুক জায়গায় অমুক দরবেশ অবস্থান করছেন। ফলে জনসাধারণ তোমার সময় নষ্ট করবে। তাছাড়া কূয়ার পানির ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও শরীয়তের দৃষ্টি এ ব্যাপারে অত্যন্ত উদার।"

চিশতী খানকাহ্

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত খাজা (র)-কে অত্যন্ত মর্যাদাবান খলীফা (প্রতিনিধি) দান করেছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকজন বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন ঃ

১. মাওলানা শামসুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া, ২. শায়খ নাসীরুদ্দীন মাহ্মূদ, ৩. শায়খ কুত্বুদ্দীন মুনাওয়ার হাঁসভী, ৪. শায়খ হুসসামুদ্দীন মুলতানী, ৫. মাওলানা ফখরুদ্দীন যর্‌রাবী, ৬. মাওলানা আলাউদ্দীন নীলি, ৭. মাওলানা বুরহান উদ্দীন গরীব, ৮. মাওলানা ইউসুফ চুন্দিরী, ৯. মাওলানা সিরাজুদ্দীন আখী সিরাজ, ১০. মাওলানা শিহাবুদ্দীন।

বিশিষ্ট মুরীদবর্গ

১. খাজা আবূ বকর, ২. মাওলানা মুহীউদ্দীন কাশানী, ৩. মাওলানা ওয়াজীহুদ্দীন পায়েলী, ৪. মাওলানা ফখরুদ্দীন মরোযী, ৫. মাওলানা ফসীহুদ্দীন, ৬. আমীর খসরূ, ৭. মাওলানা জালালুদ্দীন, ৮. খাজা করীমুদ্দীন সমরকন্দী, ৯. আমীর হাসান 'আলা সিজযী, ১০. কাযী শরফুদ্দীন, ১১. মাওলানা বাহাউদ্দীন আদহামী, ১২. শায়খ মুবারক গোপামভী, ১৩. খাজা মুওয়াইয়িদুদ্দীন কারভী, ১৪. খাজা তাজুদ্দীন দওরী, ১৫. খাজা যিয়াউদ্দীন বারনী, ১৬. খাজা মুওয়াইয়িদুদ্দীন আনসারী, ১৭. খাজা শামসুদ্দীন খওয়াহিরযাদা, ১৮. মাওলানা নিজামুদ্দীন শিরাযী, ১৯. খাজা সালার, ২০. মাওলানা ফখরুদ্দীন মিরাবী।

---

১. পানি ভর্তিকারীদের অসতর্কতার দরুন এবং কোন কিছুর এতে পতিত হবার আশংকায়।

এদের মধ্যে হযরত শায়খ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র)-কে তিনি খাস খিলাফতনামা প্রদান করেন এবং নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে যান। তিনি (হযরত নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী) ছিলেন তাঁর শায়খ (র)-এর পূর্ণ অনুসরণকারী। তিনি অত্যন্ত নাযুক ও সঙ্গীন অবস্থাতে এবং কঠিন রাজনৈতিক সংকটেও জনগণের হিদায়াতের বাসনায় ইরশাদ ও হিদায়াতের প্রদীপ উজ্জ্বল রেখেছিলেন।

ফীরোয তুগলকের সিংহাসনারোহণ এবং এ থেকে ভারতবর্ষের যে ফয়েয ও বরকত পৌঁছেছিল তার ভেতর হযরত সায়্যিদ নাসীরুদ্দীন (র)-এরই হাত ছিল।[১] পুরো বত্রিশ বছর পর্যন্ত তিনি চিশতিয়া সিলসিলার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা রাজধানী দিল্লীতে বসে অত্যন্ত সাফল্য ও কামিয়াবীর সাথে পরিচালনা করেন। অতঃপর আলোর এই প্রদীপ থেকে অন্য প্রদীপ আলোকিত হল যিনি দক্ষিণ ভারতেই শুধু নয়, বরং সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশকে 'ইশ্‌ক ও মুহব্বতের উত্তাপ দিয়ে উত্তপ্ত এবং তাঁর খোশবু দ্বারা সুগন্ধিযুক্ত করে তুলেছিলেন অর্থাৎ হযরত সায়্যিদ মুহাম্মাদ গেসূ দরায–যিনি গুলবার্গে[২] সমাহিত (ওফাত ৮২৫ হিজরী) আছেন।

হযরত সায়্যিদ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র)-এর অপর খলীফা 'আল্লামা কামালুদ্দীন (ওফাত ৭৫৬ হিজরী) যাঁর বংশধর ও খলীফাবৃন্দ এই সিলসিলাকে এই শতাব্দী পর্যন্ত অত্যন্ত জোরেশোরে কায়েম রাখেন। এই সিলসিলায় হযরত ইয়াহ্ইয়া মাদানী, শাহ কলীমুল্লাহ্ জাহানাবাদী, মাওলানা শাহ ফখরুদ্দীন দেহলভী, খাজা নূর মুহাম্মাদ মাহারভী, শাহ নিয়ায আহমদ বেরেলভী এবং খাজা সুলায়মান তৌনসভীর ন্যায় মহান বুযর্গ রয়েছেন যাঁরা 'ইশকে ইলাহী তথা ঐশী প্রেমের বাজার রেখেছিলেন গরম ও উত্তপ্ত এবং যাঁরা আল্লাহ্‌র লাখ লাখ বান্দার অন্তরমানসকে আল্লাহ্‌র মুহব্বত ও কামনায় ভরপুর করে দিয়েছিলেন।[৩]

হযরত চেরাগে দিল্লীর খলীফাদের মধ্যে শায়খ আবদুল মুকতাদির কুন্দী, শায়খ থানেশ্বরী এবং শায়খ মখদূম জাহানিয়া জাঁহাগাশ্‌ত নামে পরিচিত, জালালুদ্দীন হুসায়ন বুখারী বিশেষভাবে স্মরণীয়। এঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ যুগের বুযর্গ এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের লক্ষ্যস্থল ছিলেন।

---

১. দেখুন তারীখে ফীরুযশাহী, সিরাজ আফীফ কৃত।

২. হযরত খাজা সায়্যিদ মুহাম্মাদ গেসু দরাযের জীবন- বৃত্তান্ত ও কামালিয়াত সম্পর্কে জানতে হলে স্বতন্ত্র পুস্তক প্রণয়ন প্রয়োজন।

১. এসব বুযর্গের বিস্তারিত জীবন-বৃত্তান্ত জানতে হলে দেখুন "তারীখে মাশায়িখে চিশ্‌ত" –অধ্যাপক খালীক আহমদ নিযামীকৃত।

দিল্লীর কেন্দ্রীয় খানকাহ্‌র পর দা'ওয়াত ও হিদায়াতের মসনদে ধারাবাহিকভাবে পরপর হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) ও হযরত সায়্যিদ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র)-এর ন্যায় মহান দুই বুযুর্গ সমাসীন ছিলেন। ভারতবর্ষের পাণ্ডুয়া, লখনৌতি, দৌলতাবাদ, গুলবর্গা, বুরহানপুর, যয়েনাবাদ, মাণ্ডো, আহমদাবাদ, সফীপুর, মানিকপুর, সলোন নামক বিভিন্ন জায়গায় চিশতিয়া খানকাহ্ কায়েম হয়, যাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী এক প্রদীপ থেকে অন্য প্রদীপ আলোকিত করার ন্যায় দা'ওয়াত ও তবলীগের সিলসিলা কায়েম রাখেন এবং 'ইশক ও মুহব্বত, সততা ও ইখলাস, উচ্চ মনোবল ও অটুট সংকল্প, খিদমতে খালৃক তথা সৃষ্টির সেবা, কুরবানী ও আত্মত্যাগ, বদান্যতা ও দানশীলতা, দারিদ্র্য ও যুহ্‌দ, 'ইলম ও মা'রিফতের প্রদীপ আলোকিত রাখেন। এ সবের মধ্যে প্রতিটি খানকাহ্ এবং তার ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক কার্যাবলীর জন্য একটি বিরাট পুস্তকের দরকার– বিশেষ করে বাংলাদেশে শায়খ 'আলাউল হক পাণ্ডবী[1], হযরত নূর কুতবুল 'আলম পাণ্ডবী[2], দাক্ষিণাত্যে শায়খ বুরহানুদ্দীন গরীব–তাঁর খলীফাদের মধ্যে শায়খ যয়নুদ্দীন, শায়ক ইয়াকূব, শায়খ কামালুদ্দীন নাগোরী ফিতানী, অতঃপর তাঁর খলীফা কুত্‌বে 'আলম 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাহমূদ ইবন আল-হুসায়ন (ওফাত ৮৫৭ হিজরী) এবং তাঁর ফরযন্দ ও খলীফা শাহ্ 'আলম গুজরাটি দারিদ্র্যের চাটাই-এর আসনে বসে নিজ নিজ যুগে রাজত্ব করেছেন।

---

১. শায়খ 'আলাউদ্দীন 'আলাউল হক পাণ্ডবীর আসল নাম ওমর। পিতা আস'আদ লাহোরী বাংলার উযীর পদে সমাসীন ছিলেন। শায়খ 'আলাউল হক হযরত মাহবুবে ইলাহীর মশহুর খলীফা আখী সিরাজ নামে পরিচিত মাওলানা সিরাজুদ্দীন 'উছমানী আউধী (ওফাত ৭৫৮ হিজরী)-এর খলীফা এবং পাণ্ডুয়ার মশহুর 'আলিম ও চিশতী খানকাহ্‌র প্রতিষ্ঠাতা। সায়্যিদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (ওফাত ৮০৮ হিজরী) তাঁরই খলীফা। ৮০০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

২. নাম নূরুদ্দীন, উপাধি নূরুল হক ও কুতবে 'আলম; পিতা শায়খ 'আলাউল হক পাণ্ডবীর খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা দান করেছিলেন। তাঁর যুগে পাণ্ডুয়ার খানকাহ্ ছিল তদানীন্তন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ চিশতী খানকাহ্। মুজাহাদা, খিদমতে খালৃক, বস্তুগত স্বার্থের প্রতি নিস্পৃহতা ও আত্মোৎসর্গ এবং 'ইলমে হাকীকতে অত্যন্ত উচ্চ মরতবার অধিকারী ছিলেন। খলীফার ভেতর হযরত শায়খ হুসসামুদ্দীন হুসসামুল হক মানিকপুরী (ওফাত ৮৫৩ হিজরী) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য–যাঁদের পবিত্র সত্তার প্রভাবে বিহার ও অযোধ্যায় চিশতিয়া নিজামিয়া সিলসিলার ব্যাপক প্রচার ঘটে। ৮১৮ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। কিতাবাদির মধ্যে "মুনিসুল ফুকারা', 'আনিসুল গুরাবা', 'মাকাতীব কা মাজু'আ' স্মরণীয়। মলফূযাত ও মকতুবাতে গযবের সরলতা ও প্রভাব বিদ্যমান। নুযহাতুল খাওয়াতির, ৩য় জিলদ দ্রষ্টব্য।

মালবে শায়খ ওয়াহীদুদ্দীন ইউসুফ, শায়খ কামালুদ্দীন, মাওলানা মুগীছুদ্দীন প্রমুখ, অযোধ্যায় হযরত শায়খ মুহাম্মদ মীনা লাখনবী, শায়খ সা'দুদ্দীন কুদওয়াই খায়রাবাদী, শায়খ 'আবদুস সামাদ ওরফে সফীউদ্দীন সফীপুরী, শায়খ হুসসামুল হক মানিকপুরী, শায়খ 'আবদুল করীম মানিকপুরী এবং শাহ পীর মুহাম্মদ সলোনী ও শাহ পীর মুহাম্মাদ লাখনবী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা সবাই নিজামিয়া সিলসিলার মহান বুযর্গ যাঁরা স্ব-স্ব স্থানে হিদায়াত ও তবলীগ এবং তা'লীম ও তরবিয়তের সিলসিলা অত্যন্ত জোরেশোরেই অব্যাহত রেখেছিলেন। এঁদের থেকে ফয়েযপ্রাপ্তদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতিরেকে আর কেউ বলতে পারবে না।

এসব খালেস চিশতী খানকাহ্ ব্যতিরেকেও ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে এমন সব নামকরা খানকাহ্ও কায়েম ছিল যার মহান বুযর্গ ও সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতাদের সিলসিলায়ে নিজামিয়ার চিশতী বুযর্গদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল এবং যাঁরা চিশতিয়া তরীকার ব্যাপারে গভীর আগ্রহী ও সম্পৃক্ততার অধিকারী ছিলেন। এর ভেতর জৌনপুরের খানকায়ে রশীদী এবং ফুলওয়ারী শরীফের খানকায়ে মুজীবী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খানকায়ে রশীদীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত 'আল্লামা মুহাম্মাদ রশীদ জৌনপুরী (ওফাত ১০৮৩ হিজরী)-এর শায়খ তৈয়ব বেনারসী এবং সায়্যিদ আহম[illegible]ুল হালীম হুসায়নী মানিকপুরী থেকে চিশতিয়া নিজামিয়া সিলসিলার এজাযত হাসিল করেছিলেন। খানকায়ে মুজিবীর প্রতিষ্ঠাতা তাজুল 'আরিফীন হযরত শাহ্ মুহাম্মাদ মুজীবুল্লাহ্ কাদিরী ফুলওয়ারীর (ওফাত ১১৯১ হিজরী) সিলসিলায়ে চিশতিয়া নিজামিয়া স্বীয় পীর হযরত খাজা 'ইমামুদ্দীন কলন্দর এবং হযরত শাহ মু'ঈনুদ্দীন কারজুবীর মাধ্যমে পৌঁছেছিল। শাহ মুঈনুদ্দীন কারজুবী হযরত শায়খ পীর মুহাম্মাদ সলোনীর খলীফা ছিলেন।

পরিশেষে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র)-এর পবিত্র সত্তা নিজামিয়া ও সাবিরিয়া সিলসিলার এবং তার বৈশিষ্ট্য ও বরকতের সমষ্টি ছিল। হযরত হাজী সাহেব নিজামিয়া সিলসিলার নিসবত হযরত শায়খ 'আবদুল কুদ্দুস গঙ্গোহীর মাধ্যমে লাভ করেছিলেন, যিনি অযোধ্যার হযরত দরবেশ ইবন মুহাম্মাদ ইবন কাসিম থেকে নিজামিয়া সিলসিলার এজাযত লাভ করেছিলেন। হযরত দরবেশ তিন তরীকা (সূত্র) থেকে নিজামিয়া সিলসিলা পেয়েছিলেন।[১]

---

১. দেখুন 'তাযকিরাতুর রশীদ', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৬।

সপ্তম অধ্যায়

হযরত খাজা (র)-এর তা'লীম ও তরবিয়তের প্রভাব এবং তাঁর খলীফাদের ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক খিদমত

হযরত সুলতানুল মাশায়িখ স্বীয় খলীফা ও মুরীদদের অত্যন্ত যত্ন-তদবীর ও অভিনিবেশ সহকারে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান করেছিলেন। সুলতান 'আলাউদ্দীন খিলজীর দরবারের আমীর-উমারা ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে খাজা মুওয়াইয়িদুদ্দীন ছিলেন একজন উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি। হযরত খাজা (র)-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এ সম্পর্ক দিনে দিনে এত বৃদ্ধি পায় যে, তার মন-মিযাজ রাজদরবারের প্রতি বিরূপ ও বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে এবং হযরত খাজা (র)-এর খিদমতেই এসে তিনি অবস্থান করতে শুরু করেন। সুলতান তাঁর যোগ্যতা ও কর্ম-ক্ষমতায় ছিলেন মুগ্ধ এবং তিনি তাঁর প্রয়োজন অহরহ অনুভব করতেন। একদা সুলতান তাঁর জনৈক পাহারাদারের মাধ্যমে হযরত খাজা (র)-এর নিকট অভিযোগ পেশ করেন এবং বলেন যে, হযরত সবাইকেই তাঁর নিজের মত বানাতে চান। হযরত খাজা (র) এর জবাবে বলেছিলেন, নিজের মত কী, আমার চেয়েও উত্তমই বানাতে চাই।

হযরত খাজা (র)-এর সোহবত (সাহচর্য ও সংসর্গ) ও তরবিয়ত দ্বারা শুধু 'ইবাদত-বন্দেগী ও রিয়াযত-মুজাহাদার গভীর আগ্রহ এবং নিজের সংস্কারশুদ্ধি ও উন্নতির চিন্তাই সৃষ্টি হত না, দাওয়াত ও তবলীগের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা, "আমরু বিল মা'রূফ ওয়ানাহী 'আনিল মুনকার" তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধে হিম্মত ও উচ্চ মনোবল, তৎকালীন যুগের সুলতানদের সামনে কালেমায়ে হক তথা হক-কথা বলার সাহসিকতা ও নির্ভীকতাও সৃষ্টি হত। এটা ছিল আল্লাহ্র নাম এবং আল্লাহ্র বান্দাদের সাহচর্যের অনিবার্য সুফল। যে অন্তরে একবার আল্লাহ্র ভয় অনুপ্রবিষ্ট হবে, তাঁর অন্তর থেকে গায়রুল্লাহ্র ভয় স্বাভাবিকভাবেই বিদায় নেবে এবং যে অন্তর দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা থেকে

মুক্ত ও স্বাধীন–তার ওপর কারও ভীতি যেমন কার্যকর হয় না, তেমনি তারও কাউকে ভয় পাবার কোন কারণ থাকে না। যার সামনে স্রষ্টার মহান মর্যাদা এবং সৃষ্টি জগতের যথার্থ অবস্থান ও স্থান প্রকাশিত হয়ে গেছে– সে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের শান-শওকত এবং তাঁদের দরবারের জাঁকজমক, তাঁদের গোলাম-নফর ও রাজকর্মচারীদের কাতারবন্দী, সম্মুখ দৃষ্টি ও হাঁকডাককে বাচ্চাদের খেলাধূলা ও ভাঙা-গড়ার মিছামিছি কৌতুকের বেশী এতটুকু গুরুত্ব দেয় না এবং জাঁকজমকপূর্ণ কোন প্রদর্শনীর স্থলে সত্য কথনে ও হক-কথা উচ্চারণে তাঁদেরকে কখনও বিরত রাখতে পারে না। এটাই তাওহীদবাদিতা ও নির্জনতার স্বাভাবিক পরিণতি, প্রকৃত তাসাওউফের বৈশিষ্ট্য এবং আল্লাহ্র বান্দা ও কামিল দরবেশের রীতি।

হযরত খাজা (র)-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খাদিম ও মুরীদবৃন্দ ঐশী প্রেম, সত্য কথন ও নির্ভীকতার এমন সব নমুনা পেশ করে গেছেন যার নযীর মেলা খুবই কঠিন।

তৎকালীন সুলতানদের সঙ্গে নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতার নমুনা

সুলতান মুহাম্মাদ তুগলকের শান-শওকত ও জাঁকজমক সম্পর্কে ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই অবহিত। সুলতানকে একবার হাঁসীর কাছ দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। সেখান থেকে চার ক্রোশ দূরে অবস্থিত বংশী নামক স্থানে শাহী তাঁবু স্থাপিত হয়। সুলতান মুখলেসুল মুল্ক নিজামুদ্দীন মুজিরবারীকে, যুলুম-যবরদস্তি, হৃদয়হীনতা ও নিষ্ঠুরতার জন্য যে ছিল বিখ্যাত– সে সময় হাঁসীর কেল্লা পরিদর্শনের জন্য পাঠান। সে যখন হযরত শায়খ কুতবুদ্দীন মুনাওয়ার (হযরত শায়খ জামালুদ্দীন হাঁসোভীর পৌত্র এবং হযরত সুলতানুল মাশায়িখের খলীফা) এর বাড়ির নিকটে গিয়ে উপস্থিত হয় তখন জিজ্ঞাসা করে যে, এ বাড়ী কার? লোকজন বলল, এটা সুলতানুল মাশায়িখের খলীফা শায়খ কুতবুদ্দীন মুনাওয়ারের বাড়ি। এতে সে বলল, অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা যে, বাদশাহ্ এতদ অঞ্চলে পদার্পণ করেছেন, অথচ শায়খজী তাঁকে সালাম করবার জন্য একবারও হাযির হলেন না। মুখলেসুল মুল্ক বাদশাহ্র কাছে ফিরে গিয়ে সব কিছু বিবৃত করল এবং এও বলল যে, হাঁসীতে সুলতানুল মাশায়িখের একজন খলীফা আছেন যিনি জাঁহাপনাকে সালাম দিতে হাযির হন নাই। বাদশাহ্ একথা শুনে রেগে যান এবং তক্ষুণি হাসান সার বুরহানাকে যে ছিল একজন অহংকারী ও জাঁকজমকপ্রিয় লোক, শায়খ কুতবুদ্দীনকে আনবার জন্য পাঠান। হাসান সার বুরহানা বাড়ির কাছে গিয়ে একাকী পায়ে হেঁটে শায়খজীর দহলিজে এসে অত্যন্ত বিনীতভাবে

উপবেশন করেন। শায়খজী তাঁকে ডেকে পাঠান। হাসান সার বুরহানা গিয়ে আরয করলেন যে, বাদশাহ্ আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, এতে কি আমার কোন এখতিয়ার আছে? হাসান বললেন ঃ আমার ওপর বাদশাহী হুকুম যে কোনভাবেই হোক না কেন, আমি যেন আপনাকে নিয়ে যাই। শায়খ বললেন, আলহামদুলিল্লাহ্, আমি নিজ এখতিয়ারে যাচ্ছি না। অতঃপর গৃহবাসীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র হাতে সোপর্দ করলাম।" এই বলেই মুসাল্লা কাঁধের ওপর ফেলে এবং লাঠি হাতে পদব্রজেই রওয়ানা হয়ে পড়েন। হাসান সার বুরহানা সওয়ারির কথা বলতেই তিনি অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, আমার শক্তি আছে, আমি পায়ে হেঁটে যেতে পারি। বংশী পৌছুতে সুলতান খবর পেলেন এবং শায়খকে দিল্লী যাবার নির্দেশ দিলেন। দিল্লী পৌছে শাহী দরবারে ডেকে পাঠালেন। শায়খ তৎকালীন নায়েবে বারবাক ফীরোয শাহকে বললেন যে, আমরা ফকীর মানুষ, শাহী দরবারের আদব-কায়দা সম্পর্কে কিছু জানি না। আপনি যেভাবে পরামর্শ দেবেন সেভাবেই তা পালিত হবে। ফীরোয শাহ্ ছিলেন বিশুদ্ধ 'আকীদার অধিকারী ও ফকীর প্রিয় মানুষ। তিনি বললেন যে, লোকে আপনার সম্পর্কে অনেক কিছুই বাদশাহ্র কানে লাগিয়েছে। আপনি যদি কিছুটা বিনয় ও তাজীমের সাথে কাজ করেন তবে উত্তম হবে। তিনি শাহী মহলের দহলিজে পা রাখতেই রাজ্যের আমীর-উমারা, ঘোষক (নকীব) সবাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পান। সাহেবযাদা নুরুদ্দীন হাঁসি থেকে একই সঙ্গে এসেছিলেন। তাঁর বয়স ছিল কম এবং তিনি ইতোপূর্বে রাজা-বাদশাহদের দরবার দেখেন নি বিধায় ভীত হয়ে পড়েন। শায়খ কুত্বুদ্দীন মুনাওয়ার তাকে ডেকে বললেন, বাবা নূরুদদীন! العظمة والكبرياء لله। "শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আল্লাহ্র জন্য।" সাহেবযাদা নূরুদ্দীন বলেন যে, একথা শুনতেই আমার ভেতরে একটি শক্তির সঞ্চার হল, সমস্ত ভয়-ভীতি দূর হতে লাগল। রাজ্যের যে সমস্ত আমীর-উমারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তারা আমার নিকট একদম বকরীবৎ মনে হতে লাগল। সুলতান যখন জানতে পারলেন যে, শায়খজী আসছেন তখনই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তীর-ধনুক হাতে নিয়ে তীরন্দাযীতে মশগুল হয়ে পড়লেন। শায়খ কাছে আসতেই স্বাভাবিক নিয়মের খেলাফ তাঁকে তা'জীম ও মুসাফাহা করলেন। শায়খ অত্যন্ত শক্তভাবে বাদশাহ্র হাত আঁকড়ে ধরেন। বাদশাহ বলেন, আমি আপনার এলাকায় গিয়েছিলাম। আপনি আমাকে অভ্যর্থনাও জানান নি, এমনকি আমার সাথে একবার সাক্ষাতও করেন নি। শায়খজী বললেন, এ দরবেশ নিজেকে এতখানি যোগ্য মনে করে না যে, বাদশাহ্র সঙ্গে মুলাকাত

করবে। এক কোণে পড়ে বাদশাহ ও মুসলিম জনসাধারণের জন্য দু'আ-খায়েরে মশগুল আছি। অক্ষম মনে করে রেহাই দিলে খুশী হই। বাদশাহ্ এতে অত্যন্ত প্রভাবিত হন। আপন ভ্রাতা ফীরোয শাহকে বলেন, শায়খজীর যেমনটি মর্যি তেমনটিই কর। শায়খ মুনাওয়ার বললেন, বাপ-দাদার ভিটে-মাটিতে গিয়ে এক কোণে পড়ে থাকতে পারাটাই আমার মত ফকীরের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। ফীরোয শাহ এ আকাঙ্ক্ষা তৎক্ষণাৎ পূরণ করলেন। শায়খজীর প্রত্যাবর্তনের পর বাদশাহ্ একজন আমীরকে বললেন যে, যে সমস্ত বুযর্গের সঙ্গে মুসাফাহা করার সুযোগ আমার হয়েছে তাদের মধ্যে যারাই আমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন তাদেরই হাতে আমি কাঁপুনি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু শায়খ মুনাওয়ার এতখানি শক্তভাবে মুসাফাহা করলেন যে, তার ওপর আমার কোন প্রভাব পড়েছে বলে মনে হচ্ছিল না।

বাদশাহ ফীরোয শাহ এবং মাওলানা যিয়াউদ্দীন বারনীকে তৎকালীন এক লাখ তংকা[১] সমেত শেখ মুনাওয়ারের খিদমতে পাঠান। (তংকা দর্শনে) শায়খ বলেন, এই দরবেশ এক লাখ তংকা গ্রহণ থেকে আল্লাহ্র দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। প্রেরিত শাহী প্রতিনিধিদ্বয় ফিরে এসে সুলতানকে সব কিছু অবহিত করেন। সুলতান বললেন, এক লাখ যদি কবূল না করেন তবে পঞ্চাশ হাযারই তাঁর খিদমতে পেশ কর। কিন্তু শায়খ তাও কবূল করলেন না। সুলতান এতে বললেন, যদি শায়খ এটাও কবূল না করেন তবে লোকে আমাকে কি বলবে! শেষ পর্যন্ত তংকার অংক দু'হাযারে এসে দাঁড়ায়। ফীরোয শাহ ও মাওলানা যিয়াউদ্দীন শেষাবধি আরয করলেন যে, এর কম অংকের কথা আমরা বাদশাহ্র সামনে কিছুতেই আলোচনা করতে পারি না। শায়খ বললেন, সুবহানাল্লাহ! দরবেশের তো দু'সের চাল-ডাল এবং এক রত্তি ঘি-ই যথেষ্ট। সে এই হাযার হাযার টাকা দিয়ে কি করবে! অবশেষে অনেক চেষ্টা-তদবীর ও তালবাহানার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং এই কথা বলে যে, শাহী উপহার গ্রহণে একেবারে অস্বীকৃতি জানানোর ফলে বাদশাহ নিজেকে অসন্তুষ্ট ও অপমানিত বোধ করবেন—তাঁকে মাত্র দু'হাযার তংকা গ্রহণ করতে রাযী করানো হয় এবং তিনি সে তংকা আধ্যাত্মিক পথের সাধকবৃন্দ ও অভাবী লোকদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে হাঁসি ফিরে যান।[১]

যে সময় সুলতান মুহাম্মাদ তুগলক দিল্লীর অধিবাসীদেরকে দেবগীরে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন-তখন তিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন যে, তিনি তুর্কিস্তান ও খুরাসানকে স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করবেন এবং চেঙ্গীয খানের বংশধরদের ভিত্তি

১. তংকা বা তঙ্গা ছিল সে যুগের ভারতবর্ষীয় মুদ্রা। এতে এক তোলা রৌপ্য থাকত, তুর্কী শব্দ যার অর্থ সাদা-শুভ্র অর্থাৎ রৌপ্য মুদ্রা।

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ২৫৩, ৩৫৫।

উপড়ে দেবেন। সে সময়েই হুকুম হয় যে, দিল্লী ও তৎসন্নিহিত এলাকার জনসাধারণ শ্রেণী-নির্বিশেষে যেন হাযির হয়, বড় বড় তাঁবু সংস্থাপিত হয়, ঐ সমস্ত তাঁবুতে মিম্বর স্থাপন করা হয় এবং উক্ত মিম্বরে উঠে শ্রদ্ধেয় 'আলিমবৃন্দ যেন ভাষণ দেন ও জিহাদের উৎসাহ প্রদান করেন। ঐদিন হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর খাস খলীফা মাওলানা ফখরুদ্দীন যাররাবী, মাওলানা শামসুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া এবং শায়খ নাসীরুদ্দীন মাহমূদকে ডেকে পাঠানো হয়। শায়খ কুত্বুদ্দীন দবীর ছিলেন হযরত সুলতানুল মাশায়িখের একজন দৃঢ় বিশ্বাসী ভক্ত ও মুরীদ এবং মাওলানা ফখরুদ্দীন যাররাবীর শাগরিদ। মাওলানা ফখরুদ্দীনকে সর্বাগ্রে শাহী দরবারে আনা হয়। সুলতানের সঙ্গে মুলাকাতে মাওলানা অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। কয়েকবারই তিনি বলেন যে, আমি আমার মাথাকে ঐ ব্যক্তির দরবারে কর্তিত ও পতিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ আমি হক-কথা বলতে বিরত হব না যেমন, তেমনি এ লোকও আমাকে মাফ করবে না। মাওলানা যখন শাহী দরবারে প্রবেশ করেন তখন শায়খ কুত্বুদ্দীন দবীর মাওলানার জুতা উঠিয়ে নেন এবং খাদিমের ন্যায় বগলে চেপে দাঁড়িয়ে পড়েন। সুলতান এতে কিছু বলেন না এবং মাওলানা ফখরুদ্দীনের সঙ্গে কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়েন। সুলতান বলেন ঃ আমার ধারণা যে, আমি চেঙ্গীয খানের বংশধরদের সমূলে উৎপাটন করি। আপনারা কি আমাকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা দেবেন? মওলানা জবাবে 'ইনশাআল্লাহ' বললেন অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি ইচ্ছে করেন তবেই সহযোগিতা করতে পারি। সুলতান বললেন, এটা তো সন্দেহমূলক কথা। মাওলানা বললেন, ভবিষ্যত সংক্রান্ত ব্যাপারে এমনটিই বলা হয়ে থাকে। সুলতান এ কথা শুনে হোঁচট খেলেন এবং বললেন, আমাকে কিছু নসীহত করুন। মাওলানা বললেন, ক্রোধ দমন করুন। সুলতান বললেন, কোন্ ধরনের ক্রোধ? মাওলানা বললেন, হিংস্র প্রাণীর ক্রোধ। এবার সুলতান এতখানি ক্রোধান্বিত হন যে, তাঁর চেহারায় তা প্রকাশ পাচ্ছিল, কিন্তু এর বাহ্যিক প্রকাশ থেকে তিনি বিরত থাকেন। এরপর সুলতান খাবার নিয়ে আসার জন্য আদেশ করেন। খাবার আনা হল। সুলতান এবং মাওলানা দু'জনেই একই পাত্রে খাচ্ছিলেন। মাওলানা এত অনিচ্ছা ও বিরক্তির সঙ্গে খাবার খাচ্ছিলেন যেন মনে হচ্ছিল যে, তিনি সুলতানের সঙ্গে একই পাত্রে খাবার গ্রহণ পসন্দ করছেন না। সুলতান অধিকতর ঘনিষ্ঠতা প্রকাশের নিমিত্ত হাড়ি থেকে গোশত আলাদা করে করে মাওলানার সামনে রাখছিলেন আর মাওলানা অত্যন্ত বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার সঙ্গে অল্প-স্বল্প খাচ্ছিলেন। অতঃপর দস্তরখানা বিস্তৃত করা হয় এবং সুলতান মাওলানাকে বিদায় দেন। বিদায় মুহূর্তে একটি পশমী পোশাক এবং টাকার

একটি থলে পেশ করেন। কিন্তু মাওলানার হাতে এ সব খেলাত ও টাকার থলে আসবার আগেই শায়খ কুত্‌বুদ্দীন দবীর (র)[১] হাত বাড়িয়ে সেটাকে নিয়ে নেন। মাওলানা বিদায় হবার পর সুলতান শায়খ কুত্‌বুদ্দীন দবীরকে বলেন, ওহে ধোঁকাবাজ! তুমি এসব কী করলে? প্রথমে ফখরুদ্দীনের জুতা নিজের বগলে নিলে, অতঃপর তাঁর খেলাত ও টাকার থলেও নিজে সামলে নিলে এবং তাকে আমার তলোয়ারের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলে, আর সে বিপদ নিজের মাথায় বরণ করে নিলে! শায়খ কুত্‌বুদ্দীন দবীর বললেন যে, মাওলানা ফখরুদ্দীন আমার উস্তাদ এবং আমার মুরশিদের খলীফাও বটেন। আমার জন্য এটাই সমীচীন ছিল যে, তাঁর জুতা শ্রদ্ধাভরে আমি মাথায় তুলে নিই–বগলে নেয়া তো অত্যন্ত ছোট ব্যাপার। আর এসব খেলাত ও টাকার থলে এমন কিইবা গুরুত্ব রাখে! সুলতান বললেন, এসব কুফরী 'আকীদা ছেড়ে দাও, অন্যথায় আমি তোমাকে কতল করব। শেষে যখনই মাওলানা ফখরুদ্দীন যাররাবী (র)-এর আলোচনা সুলতানের দরবারে উঠত, তখনই সুলতান হাত কচলিয়ে বলতেন, আফসোস! ফখরুদ্দীন আমার রক্তলোলুপ তলোয়ারের হাত থেকে বেঁচে গেল।

ইসলামী সালতানাতের পথপ্রদর্শন ও তত্ত্বাবধান

চিশতিয়া তরীকার মহান বুযর্গগণ যদিও যুগের সুলতান-বাদশাহ্‌দের সংশ্রব বর্জন এবং শাহী দরবার থেকে দূরত্বে থাকবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং এটাকেই নিজের ও নিজেদের গোটা সিলসিলার চিরন্তন উসূল তথা মূলনীতি বানিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু যুগের সুলতান ও বাদশাহ্‌দের সত্য-সঠিক পথপ্রদর্শন এবং তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালনে তাঁরা আদৌ গাফিল ছিলেন না এবং যখনই কোন সঠিক পরামর্শ অথবা কোন নির্বাচন, মনোনয়ন কিংবা নিজের রূহানী প্রভাব ব্যবহার করবার মওকা মিলত, তখনই তাঁরা এই সুবর্ণ সুযোগকে কিছুতেই হাতছাড়া করতেন না। ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সাম্রাজের কয়েকজন শাসক এবং প্রদেশ ও স্বায়ত্তসাসিত রাজ্যগুলির কয়েকজন প্রশাসক এসব চিশতিয়া সিলসিলার বুযর্গগণের সঙ্গে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক রাখতেন। এই সম্পর্ক থেকে অনেক অনাসৃষ্টি ও ফিতনা-ফাসাদ দূরীভূত হয় এবং অনেক নিষিদ্ধ ও অনাচারমুলক কার্যকলাপের মূলোৎপাটন এবং বহু আহ্‌কামে শরীয়তের প্রচলন ঘটে।

ভারতবর্ষের সুলতানদের মধ্যে সুলতান ফীরোয তুগলক স্বীয় উত্তম চরিত্র, প্রজাবাৎসল্য, দয়া প্রদর্শন, শান্তিপ্রিয়তা, জনকল্যাণ, যুলুম-অত্যাচারের মূলোৎপাটন, ইসলাম প্রচারের আগ্রহ, মাদরাসা কায়েম ইত্যাদি বিষয়ে যে বিশেষ

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ২৭ ও ১৭৩।

বৈশিষ্ট্যের দাবিদার ছিলেন, সম্ভবত অপর কোন শাসকই তেমনটি ছিলেন না। 'সিরাজ আফীফ' এবং 'তারীখে ফীরোযশাহী'তে এই বাদশাহ্‌র গঠনমূলক কার্যাবলী এবং সে যুগের কল্যাণ ও বরকত, শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে।

তারীখে ফিরিশতার লেখক লিখেছেন ঃ

> তিনি একজন মহান ন্যায়বিচারক, ভদ্র ও দয়ালু, পরোপকারী ও ধৈর্যশীল বাদশাহ ছিলেন। প্রজাবৃন্দ ও সৈন্যবাহিনী সবাই তাঁর ওপর সন্তুষ্ট ছিল। তাঁর শাসনামলে কেউ যুলুম করতে সাহস পেত না।[১]

লেখক তাঁর শাসননীতির তিনটি বড় বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

১. তিনি কোন মুসলমান কিংবা কোন যিম্মীকে বন্দী অথবা শাস্তি দেন নি। পুরস্কার ও বিভিন্ন প্রকার উপহার-উপঢৌকন প্রদান এবং এ জাতীয় কাজের মাধ্যমে তিনি জনগণের আত্মিক প্রশান্তি প্রদান করায় কাউকে বন্দী করা কিংবা শাস্তি দেবার দরকার হয়নি।

২. খাজনা, ট্যাক্স ইত্যাদি যা কিছুই প্রজাদের কাছে থেকে আদায় করা হত তা তাদের সাধ্য অনুযায়ী আদায় করা হত। অতীত সুলতানগণ যে সব অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায় করার নিয়ম চালু করেছিলেন, সে সব তিনি মওকুফ করে দেন। প্রজাদের সম্পর্কে অশান্তি উৎপাদনকারী এবং ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কোন অভিযোগই তিনি কানে তোলেন নি, বরং তাঁর বদৌলতে দেশের জনগণ ও প্রজাবৃন্দ অত্যন্ত সুখে-শান্তিতে ও খোশহালে ছিল।[২]

৩. রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পদে এবং বিভিন্ন প্রদেশের শাসন কর্তৃত্বে তিনি দীনদার ও আল্লাহ্-ভীরু লোকদের নিযুক্ত করেন। যাঁরা ছিল অশান্তি উঃপাদনকারী ও ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী এবং অসৎ প্রকৃতির, সুলতান তাঁদের কোন পদই দেননি। কেননা তিনি জানতেন الناس على دين ملوكهم। অর্থাৎ জনগণ তাদের রাজা-বাদশাহদের অনুসৃত নীতি-নিয়মেরই অনুসারী হয়ে থাকে।[৩]

কিন্তু অনেক লোকই জানেন না যে, ফীরোয শাহ তুগলকের সিংহাসনারোহণ ও তাঁর মনোনয়নের পেছনে হযরত খাজা নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র)-এর বিশেষ হাত এবং তাঁর কামিয়াবী ও সৌভাগ্যের মূলে তাঁর দু'আ ও তাওয়াজ্জুহ্‌র ভূমিকা ছিল অনেক বেশী। সিরাজে 'আফীফ-এ বর্ণিত আছে ঃ

---

১. তারীখে ফিরিশতা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৮।

২. শাস্তি দানের যে সব নতুন তরীকা সাবেক সাবেক সুলতানগণ আবিষ্কার করেছিলেন।

৩. তারীখে ফিরিশতা, ১ম খণ্ড, পৃ ২৭১।

সুলতান মুহাম্মাদ তুগলক ঠাঠ মালিক তুগার বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে যখন গমন করেছিলেন, তখন তিনি হযরত শায়খ নাসীরুদ্দীনকেও সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে সুলতানের ইন্তিকাল হলে এবং সুলতান ফীরোয শাহ্ শাহী তখতে উপবেশন করলে হযরত শায়খ নাসীরুদ্দীন ফীরোয শাহকে পয়গাম পাঠিয়েছিলেন যে, তুমি আল্লাহ্র সৃষ্টি জগতের সঙ্গে ইনসাফ ও সুবিচার করবে, নাকি আমি এসব গরীব ও অসহায় মানুষের জন্য আল্লাহ্র নিকট অপর কোন শাসনকর্তা চাইব? সুলতান ফীরোয জবাব দিয়েছিলেন ঃ

بابند گان خدائے تعالی حلم وزرم واتفاق کنم

অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র বান্দাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার, ধৈর্যশীলতা ও ঐক্যের জন্য কাজ করব। হযরত শায়খ এ উত্তর শোনার পর বলে পাঠিয়েছিলেন, যদি তুমি আল্লাহ্র মাখলূকের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার কর তবে আমি আল্লাহ্ পাকের নিকট থেকে তোমার জন্য চল্লিশ বছর চেয়ে নিয়েছি (অর্থাৎ তুমি চল্লিশ বছর রাজত্ব করতে পারবে)। আর প্রকৃত ঘটনাও এই যে, সুলতান ফীরোয শাহ্ চল্লিশ বছরই রাজত্ব করেছিলেন।[১]

সুলতান মুহাম্মাদ শাহ্ বাহমনী (৭৫৯-৭৭৬)-কে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত বুযর্গই বাদশাহ্ হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁর হাতে বায়'আতও হয়েছিলেন। কিন্তু হযরত শায়খ বুরহানুদ্দীন গরীব (র)-এর খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত হযরত শায়খ যয়নুদ্দীন (ওফাত ৮০১ হিজরী) এই ভিত্তিতে বায়'আত হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন যে, বাদশাহ্ মদ্যপান ও শরীয়ত নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত। তিনি বলেছিলেন ঃ

আল্লাহ্র সৃষ্টি জগতের ওপর হুকুমত করার যোগ্য ও অধিকারী একমাত্র সেই ব্যক্তি যিনি ইসলামী বিধি-বিধান তথা এর নিদর্শনাবলীর হিফাযত করার চেষ্টা করবেন এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে কোন অবস্থাতেই শরীয়ত বিরোধী কার্যাবলীর ধারে-কাছেও যাবেন না।

৭৬৭ হিজরীতে সুলতান যখন দৌলতাবাদে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন তখন তিনি হযরত শায়খকে পয়গাম পাঠান যে, হয় আপনি আমার দরবারে হাযির হবেন অথবা নিজ হাতে আমার খিলাফতের বায়'আত লিখে পাঠিয়ে দেবেন। শায়খ এর জবাবে বলেন যে, একবার কোন এক উপলক্ষে একজন 'আলিম, একজন সাইয়েদ ও একজন হিজড়া (নপুংসক) কাফিরদের হাতে বন্দী

১. তারীখে ফীরোযশাহী, পৃ. ২৮।

হয়। অতঃপর তারা এদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এদের তিনজনকেই পূজার ঘরে নেয়া হবে। যে মূর্তিকে সিজদা করবে তার জীবন বাঁচবে, আর যে তা করতে অস্বীকার করবে তাকে হত্যা করা হবে। প্রথম 'আলিমকে নেওয়া হল। তিনি কুরআনুল করীমের অব্যাহতির বিধানের[১] ওপর আমল করেন এবং মূর্তির সামনে ম্যথা নুইয়ে নিজের জান বাঁচিয়ে নেন। সাইয়েদ সাহেব 'আলিমকে অনুসরণ করেন। এরপর যখন হিজড়ার পালা আসল—তখন সে বলল, আমার সারাটা জীবনই তো কেটে গেছে অশালীন কর্মের ভেতর দিয়ে। তাছাড়া আমি 'আলিমও নই–সাইয়েদও নই যে, এগুলির কোন একটি মর্যাদা ও ফযীলতের দোহাই দিয়ে এমন কাজ করতে পারি। সে নিহত হওয়াটাকেই নিজের জন্য মঞ্জুর করে নিল এবং মুর্তিকে সিজদা করল না। আমার ইচ্ছাও উক্ত হিজড়ার কাহিনীরই অনুরূপ। আমি তোমাদের সব রকমের জুলুম বরদাশ্‌ত করব, কিন্তু তোমাদের দরবারে হাযির হব না আর তোমার হাতে বায়'আতও করব না। একথা জেনে বাদশাহ তো রেগে আগুন। তিনি তক্ষুণি তাঁকে শহর পরিত্যাগ করে চলে যাবার নির্দেশ দিলেন। শায়খও নির্দ্বিধায় স্বীয় মুসাল্লা কাঁধে ফেলে সোজা শায়খ বুরহানুদ্দীন (র)-এর কবরগাহে গিয়ে তাঁর কবরের শিয়রের দিকে নিজের লাঠি পুঁতে দিলেন এবং মুসাল্লা বিছিয়ে তার ওপর বসে পড়লেন। বললেন যে, এখন কেউ যদি বাপের বেটা হও তবে আমাকে এ জায়গা থেকে উঠাও। বাদশাহ শায়খ-এর এ ধরনের শক্ত মনোভাব ও দৃঢ়তা লক্ষ্য করে লজ্জিত হলেন এবং নিজ হাতে নিম্নোক্ত চরণ দু'টি কাগজে লিখে সদর শরীফের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন– ر من ان ام تو باش تزان

শায়খ বললেন যে, যদি সুলতান মুহাম্মাদ শাহ গাযী শরীয়তের রীতি-নীতির হিফাযত ও প্রচলনের প্রয়াস চালান এবং বিজিত এলাকা থেকে সকল পানশালা এক্ষুণি উঠিয়ে দেন, নিজের পিতার সুন্নতের ওপর আমল করেন এবং লোকের সামনে শরাব পান না করেন,–কাযী, 'উলামা ও প্রধানদের নির্দেশ দেন যে, তারা 'আমরু বিল মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনিল মুনকার' তথা 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ'-এর ব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা চালাবে তা হলে ফকীর যয়নুদ্দীন থেকে সুলতানের বড় দোস্ত ও কল্যাণকামী অপর কেউ হবে না। অতঃপর নিম্নোক্ত কবিতাটি নিজের কলম দিয়ে নিজ হাতেই লিখে দেন ঃ

تا من بزیم نکوئش نه کنم
جزنیك دلی وفیك خوئی ند کنم

---

১. لا ان تتقوا منهم تقاة। অর্থাৎ তবে ব্যতিক্রম যদি তোমরা তাদের (কাফিরদের) নিকট থেকে কোন ভয় বা আশংকা কর তবে তোমরা তাদের সম্বন্ধে সতর্কতার সাথে সাবধানে থাকবে। সূরা আলে-'ইমরান, ৩য় রুকু।

آنہا کہ بجائے مابدیہا کردند
تادست رست بجز نکوئی نہ کنم ۔

অর্থাৎ যতক্ষণ আমার ধড়ে প্রাণ আছে ততক্ষণ আমার দ্বারা ভাল, সহৃদয়, উত্তম ব্যবহার ও সদয় আচরণ ছাড়া আর কিছু প্রকাশ পাবে না। যে সমস্ত লোক আমার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করেছে, যখনই সুযোগ মিলবে আমি তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করব।

সুলতান মুহাম্মাদ শাহ তাঁর নামের সঙ্গে 'গাযী সম্বোধন দেখে অত্যন্ত খুশী হন এবং ফরমান জারি করেন যে, শাহী উপাধির সঙ্গে এটা যেন অতিরিক্ত যোগ করা হয়। হযরত শায়খ-এর সঙ্গে মুলাকাত হবার আগেই সুলতান মারহাটওয়াড়ার হুকুমত মসনদে 'আলী খান মুহাম্মাদের হাওয়ালা করেন এবং স্বয়ং গুলবার্গা পৌঁছেন। অতঃপর গোটা রাজ্য থেকে মদের দোকান উৎখাত করে শরীয়তের বিধি-বিধান প্রচলন ও প্রসারে সমগ্র প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেন। দাক্ষিণাত্যের চোর-ডাকাত ও দুষ্কৃতিকারীদের–যাদের নাম দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে গিয়েছিল, চুরি-ডাকাতিই ছিল যাদের একমাত্র নেশা ও পেশা–তাদেরকে সমূলে উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা করেন। ফলে ছ'-সাত মাসের ভেতরেই গোটা দেশ এদের যুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে যায়। একটি বর্ণনা অনুসারে ছয় মাসের ভেতর চোর-ডাকাতদের বিশ হাযার মাথা কেটে বিভিন্ন দিক থেকে গুলবার্গায় আনয়ন করা হয়। সুলতান এই গোটা সময়টা হযরত শায়খ যয়নুদ্দীনের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং একনিষ্ঠ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাড়াতে থাকেন। শায়খ (র)-ও সুলতানকে উৎসাহ প্রদান, সম্মান প্রদর্শন এবং দরকারী হিদায়াত ও পরামর্শ প্রদানে কখনও ত্রুটি করেন নি।[১]

চিশতিয়া তরীকার বুযর্গদের বিরাট বিরাট খানকাহ্ ভারতবর্ষের যে সমস্ত অংশে ও প্রদেশে স্থাপিত হয়, সেখানকার ইসলামী হুকুমত ও তৎকালীন সুলতানদের হিদায়াত ও পথ-প্রদর্শন এবং ইসলামী হুকুমতের হিফাযতের ক্ষেত্রে এসব বুযর্গ কখনই অলসতা প্রদর্শন করেন নি। পাণ্ডুয়াতে স্থাপিত বাংলার জগদ্বিখ্যাত খানকাহ সেখানকার ইসলামী হুকুমতের জন্য শক্তির উৎস ও আশ্রয়লাভের মাধ্যম ছিল। যখন সেখানকার ইসলামী রাজত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের ভিত নড়ে উঠল, তখন ঐসব দরবেশ এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেন

১. তারীখে ফিরিশতা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬০-৬২ পূনঃ সংস্করণ, ১৮৩২।

এবং তা পুর্নবহালের জন্য সাধ্যমত ও সম্ভাব্য সব উপায়ে প্রয়াস চালান।[১] অধ্যাপক খালীক আহমদ নিযামী 'তারীখে মাশায়িখে চিশ্‌ত' বা 'চিশতিয়া তরীকার মহান বুযর্গগণের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> হযরত নূর কুতবে 'আলম ছিলেন শায়খ 'আলাওল হকের উপযুক্ত সন্তান। যে যুগে তিনি হিদায়াত ও ইরশাদের মসনদে সমাসীন ছিলেন, সে সময় বাংলার রাজনীতি অত্যন্ত নাযুক অবস্থার মাঝ দিয়ে অতিক্রম করছিল। রাজা গণেশ (যিনি রাজশাহী জেলার ভাতুড়িয়ার জায়গীরদার ছিলেন) বাংলার সিংহাসন দখল করে বসেন এবং মুসলমানদের শক্তি সমূলে বিনাশ করতে দৃঢ়সংকল্প হন। হযরত নূর কুত্‌বে 'আলম সরাসরি এবং সাইয়েদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (র)-এর মাধ্যমে সুলতান ইবরাহীম শারকীকে বাংলাদেশ আক্রমণের দাওয়াত দেন। সাইয়েদ আশরাফ জাহাঙ্গীর (র)-এর সংকলনগুলিতে সেই সব চিত্তাকর্ষক চিঠিপত্র বিশেষভাবে পড়বার মত যার ভেতর উক্ত রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও সংঘাতের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। সাইয়েদ আশরাফ জাহাঙ্গীর (র) যে চিঠি হযরত নূর কুতবে 'আলমের চিঠির জবাবে লিখেছেন তা বাংলাদেশের শ্রদ্ধেয় সূফীদের কার্যাবলীর ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছে।[২]

এই কতিপয় ঘটনা থেকেই অনুমান করা যাবে যে, চিশতিয়া সিলসিলার মহান বুযর্গগণের তাসাওউফ শুধু নির্জনবাস, আত্মহনন ও দুনিয়া বর্জন ছিল না। তাঁরা নিজ নিজ কালে যুগের ধারাকে বদলাতে থাকেন এবং যুগের অবস্থাচক্রের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার চেষ্টাও চালিয়েছেন। অত্যাচারী ও যালিম সুলতানের মুখোমুখী হক-কথা বলতে, তাদের ভুল ও অন্যায় প্রবণতা মুকাবিলা করতে ও রুখে দাঁড়াতে এবং তাদের সলা-পরামর্শ দানেও কোনরূপ ইতস্তত করতেন না এবং যখনই তাঁদের মওকা মিলত, তাঁরা সংস্কার-সংশোধন ও বিপ্লবী প্রয়াস গ্রহণেও দ্বিধা করতেন না।

ইসলামের প্রচার ও প্রসার

চিশতিয়া সিলসিলার বুনিয়াদ ভারতবর্ষের মাটিতে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ওপর পড়েছিল এবং তার উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠাতা হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র)-এর হাতে এত অধিক সংখ্যায় মানুষ মুসলমান হয়েছিল

---

১. বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, গুলাম হুসেন সলীমকৃত রিয়াযুস-সালাতীন, তারীখে বাঙ্গালা, পৃ. ১১০—১১৬।

২. তারীখে মাশায়িখে চিশ্‌ত, পৃষ্ঠা ২০২।

যে, ইতিহাসের এই অন্ধকারে তার পরিমাপ করা কঠিন। সাধারণভাবে স্বীকার করা হয় যে, ভারতবর্ষে মুসলমানদের সংখ্যার এই আধিক্য অনেকাংশেই হযরত খাজা চিশতী (র)-এর চেষ্টা-সাধনা ও আধ্যাত্মিকতারই অনিবার্য ফসল। এর মধ্যে একটি বিরাট সংখ্যা হযরত খাজা (র)-এর রূহানী কুওত, উজ্জ্বল কামালিয়াত এবং আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য ঘটনাবলীর কারণেই মুসলমান হয়েছিল। সে যুগের ভারতবর্ষ যোগ ও তান্ত্রিক সাধনার বিরাট কেন্দ্র ছিল। এখানকার অনেক ফকীর ও সন্ন্যাসী তান্ত্রিক-যোগসাধনা ও আত্মিক শক্তিতে ছিল অত্যন্ত বলীয়ান। কঠোর কঠিন সাধনা এবং বিভিন্ন প্রকার অনুশীলন ও যোগাভ্যাস দ্বারা তারা কাশ্‌ফ ও সম্মোহনের বিরাট শক্তি আত্মস্থ করে রেখেছিল। তাদের মধ্য থেকে অনেক লোকই এই নবাগত মুসলমান ফকীরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তাঁকে তকলীফ দেবার জন্য তাঁর নিকট আসে। কিন্তু তারা সত্বরই জেনে যায় যে, এই বিদেশী মুসাফির দরবেশ তাদের থেকেও আত্মিক ও সম্মোহনী শক্তিতে অনেক বেশী অগ্রসর এবং অবশেষে ফিরআউনের যাদুকরদের মত তারাও পরিমাপ করতে পারে যে, তাঁর কামালিয়াত ও শক্তির উৎসমূল অন্য কিছু। এরই সঙ্গে তাদের চরিত্রের পবিত্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বৈরাগ্যসুলভ নির্লোভ জীবন যাপন, ঈমান ও ইয়াকীনের শক্তি, আল্লাহ্র সৃষ্ট জীবের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং মানবতার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দর্শনে বিরুদ্ধবাদীরাও তাদের ভক্ত ও অনুরক্তে পরিণত হয়। তাযকিরা ও তাসাওউফের কিতাবগুলিতে এই সিলসিলায় যোগী ও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মুকাবিলা এবং হযরত খাজা (র)-এর উজ্জ্বলতর আধ্যাত্মিক শক্তি, কাশফ ও সম্মোহনী শক্তির ঘটনাবলী যেরূপ ব্যাপকতর আধিক্যের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও ঐতিহাসিক সনদ থেকে ও প্রাচীনতর সমসাময়িক উৎসের মাধ্যমে তা প্রমাণ করা কঠিন, তবুও ভারতবর্ষের সে সময়কার লোকের আগ্রহ ও প্রবণতা এবং আজমীরের ধর্মীয় ও আত্মিক কেন্দ্রিকতা দেখতে গেলে এটা মোটেই যুক্তিবহির্ভূত মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে যে জিনিস জনসাধারণকে হযরত খাজা (র)-এর প্রেমিক এবং ইসলাম গ্রহণে উন্মুখ করেছিল তা তাঁর একক আত্মিক শক্তি ছিল না, বরং তাঁর আধ্যাত্মিকতা, একনিষ্ঠতা, নিষ্কলুষ চরিত্র এবং সহজ সরল জীবনযাপন পদ্ধতি যা ভারতবর্ষের জ্ঞানী-গুণী ও সাধারণ মানুষ এর পূর্বে আর কখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেনি।

হযরত খাজা (র)-এর সিলসিলার ভেতর হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (র)-এর প্রচেষ্টা ও তাওয়াজ্জুহ ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ

গুরুত্বের অধিকারী। তাঁর মজলিস ও খানকাহতে সকল জাতি-ধর্মের এবং সর্বশ্রেণীর লোকের আগমন ঘটত। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) বলেন ঃ

> শায়খুল ইসলাম খাজা ফরীদুদ্দীনের খিদমতে প্রতিটি শ্রেণী ও আত্মিক শক্তি ও বর্ণের এবং জাতি-ধর্মের লোক আসত–আসত দরবেশ ও অ-দরবেশও।

হযরত খাজা (র)-কে আল্লাহ্ তা'আলা উচ্চতর যোগ্যতা ও আত্মিক শক্তি দান করেছিলেন। তার প্রেক্ষিতে এটা অসম্ভব নয় যে, ইসলাম প্রচারে সেটারও একটা ভূমিকা ছিল এবং নও-মুসলিমদের একটি বিরাট অংশ তাঁর আধ্যাত্মিকতা এবং কাশফ ও কারামত দেখেই মুসলমান হয়েছিল। পাঞ্জাব ও পাক-পত্তনের চতুষ্পার্শ্বের বহু জাতি-গোষ্ঠী ও খান্দান তাদের পূর্বপুরুষদের ইসলাম গ্রহণকে হযরত খাজা (র)-এর তাওয়াজ্জুহ ও তবলীগের পরিণতি বলে মনে করেন এবং নিজেদের সম্পর্ক তাঁর দিকে যুক্ত করেন। অধ্যাপক আরনল্ড তাঁর পুস্তক "Preaching of Islam"-এ লিখেছেন ঃ

> পাঞ্জাবের পশ্চিম প্রদেশগুলির অধিবাসীবৃন্দ খাজা বাহাউল হক মুলতানী এবং বাবা ফরীদ পাক-পত্তনীর তা'লামের কারণে ইসলাম কবূল করে। এ দু'জন মহান বুযর্গ ত্রয়োদশ শতাব্দীর নিকট শেষপাদে এবং চর্তুদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে আগমন করেন। বাবা ফরীদ শকরগঞ্জ (র)-এর জীবনী আলোচনা যিনি করেছেন, তিনি লিখেছেন যে, ষোলটি জাতিগোষ্ঠীকে তিনি তাঁর তা'লীম ও তালকীন তথা শিক্ষা ও দীক্ষা প্রদান করে ইসলামে দাখিল করেছিলেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে, উক্ত গ্রন্থকার উক্ত জাতিগোষ্ঠীগুলির মুসলমান হবার বিস্তারিত বিবরণ লিখেন নি।[১]

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) ভারতবাসীদের ভেতর ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন যে, শুধু বক্তৃতা-বিবৃতি ও বাণী শ্রবণে কোন লোকের পক্ষে তার প্রাচীন বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা থেকে ফিরে আসা এবং নতুন ধর্ম গ্রহণ করা, বিশেষ করে হিন্দু জাতির পক্ষে যারা নিজেদের গোঁড়ামি ও জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতা তথা ছুৎমার্গকে কঠোরভবে মেনে চলত, তাদেরকে শুধু বক্তৃতার চমৎকারিত্বে এবং ওয়ায-নসীহতের মনোহারিত্বে মুসলমান বানিয়ে ফেলা মোটেই সহজ নয়। এর জন্য প্রভাবশীল ও দীর্ঘ সোহবতের প্রয়োজন।

---

১. দা'ওয়াতে ইসলাম, মওলবী 'ইনায়েতুল্লাহ কৃত অনুবাদ, পৃ. ২৯৭।

ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, একবার একজন মুসলিম ক্রীতদাস হযরত খাজা (র)-এর মুবারক মজলিসে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং তার সাথে তার এক হিন্দু বন্ধুকেও নিয়ে আসে। সে বলল, এ আমার ভাই। হযরত খাজা (র) উক্ত ক্রীতদাসকে বললেন, তোমার এ ভাইটির ইসলামের দিকেও কি কিছু প্রবণতা আছে? ক্রীতদাস বলল, একে হযরতের পবিত্র খিদমতে এজন্যেই নিয়ে এসেছি যেন আপনার কৃপাদৃষ্টির বরকতে সে মুসলমান হয়ে যায়। একথা শোনামাত্রই হযরত খাজা (র)-এর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, কারও বলার কারণে এ জাতির মন-মানস ও অন্তর– রাজ্যের পরিবর্তন হয় না। অবশ্য হ্যাঁ! এর যদি আল্লাহ্র কোন নেক বান্দার সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য ঘটে—তবে আশা করা যায় যে, তাঁর পবিত্র সোহবতের বরকতে সে মুসলমান হয়েও যেতে পারে।[১]

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ সময়ে যেখানে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র) দিল্লীর ন্যায় একটি কেন্দ্রীয় অবস্থানে হিদায়াত ও ইরশাদ–এর আসনে সমাসীন ছিলেন এবং তাঁর খানকাহ্র দরজা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য খোলা ছিল, আর এটা ছিল সেই যুগ যখন ভারতবর্ষের দূর-দূরান্ত ও প্রত্যন্ত এলাকা থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনে ও বিভিন্ন উপলক্ষে লাখ লাখ অমুসলিম দিল্লীতে আগমন করত এবং নিজেদের জাতীয় শুভ ধারণার ভিত্তিতে হযরত খাজা (র)-এর পবিত্র যিয়ারত লাভের উদ্দেশ্যেও হাযির হ'ত –বিরাট সংখ্যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। মেওয়াট এলাকায় যা হযরত খাজা (র)-এর কেন্দ্র গিয়াছপুর থেকে দক্ষিণ দিকের খানিকটা সন্নিকটেই অবস্থিত ছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদের রাহাজানী ও অবাধ্য আচরণের কারণে কিছুকাল পূর্বে সুলতান নাসীরুদ্দীন মাহমূদের যমানায় শহরের আশ্রয়-প্রাচীর দিল্লীর দরজা সন্ধ্যা লাগতেই বন্ধ হয়ে যেত–হযরত খাজা (র)-এর ফয়েয ও বরকতে এবং তাঁর তা'লীম ও তরবিয়তের প্রভাবে সেই মেওয়াটিরাও উপকৃত হয়ে থাকবে এবং এটা আদৌ আশ্চর্য নয় যে, তারা বিরাট সংখ্যায় তাঁরই যমানায় মুসলমানও হয়ে থাকবে।

চিশতিয়া তরীকার খানকাহগুলি নিজ নিজ প্রভাবাধীনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পার্শ্ববর্তী এলাকার অমুসলিম অধিবাসীদেরকে নিজেদের আমল-আখলাক, রূহানী ভাবধারা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব দ্বারা–যার পরিবেশ উক্ত খানকাহ্গুলিতে বিদ্যমান ছিল, অবশ্যই প্রভাবিত করেছে। পাণ্ডুয়ার চিশতিয়া

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃ. ১৮২।

খানকাহ্ এবং আহমদাবাদ ও গুলবর্গার চিশতী বুযর্গদের প্রভাবে অমুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশের মুসলমান হওয়া আদৌ অমূলক কল্পনা নয়। একাদশ শতাব্দীতে চিশতিয়া সিলসিলার মুজাদ্দিদ হযরত শাহ কলীমুল্লাহ জাহাঁনাবাদী ইসলাম প্রচারে অত্যন্ত উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁর খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত শায়খ নিজামুদ্দীন আওরঙ্গাবাদীকে যে সব চিঠিপত্র লিখেছেন, তন্মধ্যে বিভিন্ন স্থানে এর জন্য তাকীদ ও হিদায়াত লক্ষ্য করা যায়। এগুলি পাঠে তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও উদ্বেগ-অস্থিরতার পরিমাপ করা যায়। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন ঃ

در آں کوشید کہ صورت اسلام و وسیع گردد وذا کرین کثیر -

ইসলামের সীমানার যেন বিস্তৃতি ঘটে এবং এর অনুসারীর সংখ্যা যেন ব্যাপকভাবে বর্ধিত হয় সেজন্য কোশেশ করবে।

অধ্যাপক খালীক আহমদ নিযামী লিখেছেন ঃ

শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর তবলীগী চেষ্টা-সাধনার ফল এই হয়েছিল যে, বহু হিন্দুই ইসলামের ভক্ত-অনুরক্তে পরিণত হয়। কতক লোক যদিও আত্মীয়-স্বজনের ভয়ে মুসলমান হবার কথা প্রকাশ করত না, কিন্তু অন্তর থেকে তারাও মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

নিতান্তই আফসোস ও পরিতাপের বিষয় যে, কেউই ভারতবর্ষের মহান বুযর্গদের, বিশেষ করে চিশতিয়া সিলসিলার বুযর্গদের তবলীগী প্রয়াসের ইতিহাস ও বিবরণী লিপিবদ্ধ করার শ্রম স্বীকারে রাযী হন নি। কিন্তু সমস্ত ঐতিহাসিকই এ বিষয়ে একমত—ভারতবর্ষের বুকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সবচেয়ে বড় মাধ্যম ইসলামের এই সব শ্রদ্ধেয় মহান সূফী ও ফকীর-দরবেশগণই। আর এটাও দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, তাসাওউফের এ ধারাবাহিকতায় চিশতিয়া সিলসিলা এবং এর মহান বুযর্গগণের প্রাধান্য ও গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত এবং এক্ষেত্রে তাঁদের অংশ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী।

ইল্ম-এর খিদমত ও প্রচার

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) এবং তাঁর খলীফাগণ তাঁদের অনুসারীবৃন্দের 'ইল্ম হাসিল ও তার পূর্ণতা প্রাপ্তির ব্যাপারে কতখানি উৎসুক ছিলেন তার পরিমাপ হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন (র)-এর কথিত উক্তি এবং স্বয়ং হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র)-এর শায়খ সিরাজুদ্দীন 'উছমানী আওদী (আখী

সিরাজ–প্রতিষ্ঠাতা, পাণ্ডুয়া খানকাহ্) -এর সঙ্গে কৃত আচরণ থেকে অনুমান করা যাবে। তিনি যতদিন পর্যন্ত 'ইল্ম হাসিল ও তার পূর্ণতা অর্জন না করেছিলেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁরা তাকে শর'ঈ ও রূহানী ক্ষেত্রে কোন কিছুর এজাযত দেন নি। এর সুফল এই হয়েছিল যে, ধর্মীয় শিক্ষাদান ও সৎপথ প্রদর্শন, দরস ও তাদরীস তথা পঠন-পাঠন এবং 'ইলমের প্রচার ও প্রসার উভয়টিই এই সিলসিলার ইতিহাসে পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলেছে। এই সহাবস্থান মুসলমানদের অবনতি ও অধঃপতনকাল পর্যন্ত চলেছিল। হযরত খাজা (র)-এর একজন খলীফা মাওলানা শামসুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া ঐ যুগের বহু 'উলামায়ে কিরাম ও মুদাররিসীনের উস্তাদ ছিলেন। শায়খ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র) একটি বিখ্যাত কবিতায় বলেছেন ঃ

سَأَلْتُ الْعِلْمَ مَنْ أَحْيَاكَ حَقًّا ـ فَقَالَ الْعِلْمُ شَمْسُ الدِّيْنِ يَحْيٰى ـ

আমি 'ইলমকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তোমাকে সত্যিকার জীবন কে দান করেছেন; উত্তরে সে মাওলানা শামসুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া (র)-এর নাম উল্লেখ করল।

শায়খ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (র)-এর বিশিষ্ট মুরীদ ও ভক্ত-অনুরক্তদের মধ্যে কাযী 'আবদুল মুকতাদির কুন্দী (ওফাত ৭৯১ হিজরী), তাঁর প্রিয় শাগরিদ শায়খ আহমদ থানেশ্বরী (ওফাত ৮২০ হিজরী) এবং মাওলানা খাওয়াজগী দেহলভী (ওফাত ৮০৯ হিজরী) ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত উলামা, 'উস্তাদকুল শিরোমণি ও ইলমের মুজাদ্দিদবর্গের অন্যতম ছিলেন। কাযী 'আবদুল মুকতাদির এবং মাওলানা খাওয়াজগীরের প্রিয় শাগরিদ শায়খ শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে ওমর দৌলতাবাদী (ওফাত ৮৪৯ হিজরী) ভারতীয় উপমহাদেশের গৌরব ও মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হতেন। আর মালিকুল 'উলামা কাযী শিহাবুদ্দীনের নাম ভারতবর্ষের জ্ঞানের ইতিহাসে উজ্জ্বলরূপে বিরাজিত ও বিকশিত ছিল। তাঁর শরাহ কাফিয়া ('শরাহ হিন্দী' নামে আরব ও অনারব সর্বত্রই মশহুর)-এর টীকাকারদের মধ্যে 'আল্লামা গাযরূনী এবং মীর গিয়াছুদ্দীন মনসূর শিরাজীর ন্যায় মহান ব্যক্তিও রয়েছেন। ইনিই তিনি, যিনি রোগাক্রান্ত হলে সুলতান ইবরাহীম শারকী পানির পেয়ালা ভরে তার পক্ষে সাদ্কা করেন এবং দু'আ করেন যে, মালিকুল 'উলামা আমার সালতানাতের 'ইযযত ও আবরূস্বরূপ। তাঁর মৃত্যু যদি অবধারিত হয়েই থাকে তবে তাঁর পরিবর্তে আমাকেই যেন কবূল করা হয়।

এই সিলসিলার একজন বুযর্গ 'আলিম মাওলানা জামালুল আওলিয়া শিবলী লোদী (ওফাত ১০৪৭ হিজরী), যাঁর প্রখ্যাত ও নামকরা শিষ্য-শাগরিদদের মধ্যে মাওলানা লুতফুল্লাহ কুর্দী, শায়খ মুহাম্মাদ তিরমিযী কালপভী, শায়খ মুহাম্মাদ রশীদ জৌনপুরী এবং সায়্যিদ ইয়াসীন বানারসীর মত মহান 'আলিম ও যমানার শ্রেষ্ঠ বুযর্গ রয়েছেন। মাওলানা লুতফুল্লাহ কুর্দীর শাগরিদ ছিলেন হিন্দুস্তানের মশহুর 'আলিম মাওলানা আহমদ মিঠোভী ওরফে হামীদ আহমদ, কাযী 'আলীমুল্লাহ্ কুচেন্দোভী এবং মাওলানা 'আলী আসগর কনৌজী যাঁরা দরস ও তাদরীস তথা পঠন-পাঠন-এর তৎপরতা অব্যাহত রাখেন এবং বড় বড় খ্যাতনামা 'আলিম ও মুদাররিস তাঁদের শিক্ষাকেন্দ্র (হালকায়ে দরস) থেকে উপযুক্ততা ও পরিপূর্ণতা হাসিল করে বের হয়ে আসেন। টিলাওয়ালী মসজিদের প্রখ্যাত দারুল 'উলুম, যার দায়িত্বে ছিলেন শাহ পীর মুহাম্মাদ লাখনোভী (ওফাত ১০৮৫ হিজরী)-এই সিলসিলার তা'লীম ও রূহানিয়াতের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। স্বয়ং দরসে নিজামী[১] (যার বিশ্বব্যাপী খ্যাতি সর্বজনস্বীকৃত)-এর প্রতিষ্ঠিতা মোল্লা নিজামুদ্দীন (ওফাত ১১৬১ হিজরী)-এর বিখ্যাত খলীফা ও বংশধর এই সিলসিলার সঙ্গে রূহানী সম্পর্ক রাখতেন। এছাড়া সাধারণভাবেও চিশতিয়া তরীকার মহান বুযর্গগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ, গভীর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানপ্রীতি একটি ঐতিহাসিক সত্য যা হযরত নূর কুতবে 'আলম, হযরত জাহাঙ্গীর আশরাফ সিমনানী, হযরত শাহ কলীমুল্লাহ জাহানাবাদীর চিঠিপত্রে এবং পাণ্ডুয়া, গুলবর্গা, মানিকপুর, সলোন ইত্যাদি খানকাহ্র শিক্ষামূলক তৎপরতা ও এর প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন থেকে সহজেই আঁচ করা যায়।

শেষ কথা

চিশতিয়া সিলসিলার ইতিহাসের এই উজ্জ্বল অধ্যায় সমাপ্ত করার পূর্বে একটি তিক্ত সত্য প্রকাশ করে দেওয়া বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, তাসাওউফ ও রূহানী ভাবধারার ইতিহাস আমাদের বলে দেয় যে, প্রত্যেকটি সিলসিলার প্রারম্ভ জোরালো উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রবল আবেগ-অনুপ্রেরণা দ্বারাই হয়েছে। অতঃপর তা গতানুগতিকতায় এবং পরিশেষে রসম-রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এখানেও যে সিলসিলার প্রারম্ভ 'ইশ্ক, মুহব্বত, যুহ্দ ও আত্মোৎসর্গ, দারিদ্র্য ও পরমুখাপেক্ষিতাহীনতা, রিয়াযত ও মুজাহাদা, দা'ওয়াত ও তবলীগ দিয়ে হয়েছিল, তার ভেতর ক্রমান্বয়ে এমন সব পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত এর ব্যবস্থাপনায় তিনটি উল্লেখযোগ্য ক্রিয়াশীল বস্তু রয়ে গেছে।

১. মোল্লা নিজামুদ্দীন কর্তৃক উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত শিক্ষা কারিকুলাম অনুযায়ী প্রদত্ত শিক্ষা-পদ্ধতি। –অনুবাদক।

ক. ওয়াহ্‌দাতুল ওজূদের 'আকীদার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি, এর প্রচারে সীমাহীন আগ্রহ এবং এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অধ্যায়গুলোর ঘোষণা ও অবাধ আলোচনা।

খ. মাহ্‌ফিলে সামা'র আধিক্য, ভাবাবেগ ও নৃত্যের মাত্রাতিরিক্ততা।

গ. শরীয়তের বাধানিষেধ-বহির্ভূত ওরস অনুষ্ঠানের আয়োজন, তার ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তি।

যে সমস্ত আমল, রসম-রেওয়াজ ও 'আকীদা–যার সংস্কার ও সংশোধনের জন্য খালিস ও বিশুদ্ধ দীনের এসব দৃঢ়চেতা ও মনোবলসম্পন্ন মুবাল্লিগবৃন্দ ইরান ও তুর্কিস্তানের দূর-দূরান্ত থেকে এসেছিলেন–ক্রমে ক্রমে তাঁদের খানকাহ্‌গুলি এমন রূপলাভ করেছিল যে, অমুসলিম জনবসতিগুলির জন্য এটা একটি বিব্রতকর সমস্যা ও প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় যে, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ভেতর (যে সবের সংস্কার ও সংশোধনের নিমিত্ত ইসলামের এসব মুবাল্লিগ জল-স্থল অতিক্রম করে তশরীফ এনেছিলেন) কার্যত পার্থক্য কি? তওহীদ শব্দের ব্যবহার এবং তওহীদের দা'ওয়াত ওয়াহ্‌দাতুল ওজূদের অর্থের ভেতরেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। সুন্নত ও শরীয়তের অনুসরণ–যে বিষয়ের ওপর ঐ সমস্ত বুযর্গ এত বেশী জোর দিয়েছিলেন, জাহিরীপন্থীদের প্রতীক চিহ্ন এবং হাকীকত অজ্ঞ লোকদের আলামত হিসেবে রূপ লাভ করে। শরীয়ত ও তরীকত দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পথের নাম হিসেবে মেনে নেওয়া হয়–যার মধ্যে পারস্পরিক বিভিন্নতাই নয়, পারস্পরিক বিরোধও বর্তমান। বাদ্যযন্ত্র ও সামা'র যান্ত্রিক উপকরণসমূহ যেগুলিকে পূর্ববর্তী যুগে বুযুর্গগণ এত কঠোর-কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন, তা এই তরীকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ব্যথা-বেদনা ও 'ইশকের উপাদান যা ছিল চিশতিয়া তরীকার পুঁজি ও মূলধন—আজকের এ বাজারে এর এত দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে যে, সত্য-সন্ধানীকে আজ আফসোসের সঙ্গে বলতে শোনা যাচ্ছে যে, দারিদ্র্য যে তরীকার ছিল গর্ব ও অহংকার, আজ তাই আমীরী চাল-চলন ও শাহী ঠাট-বাটে পরিণত হয়েছে

এ সবের থেকে বেশী বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এবং ইতিহাসের সকরুণ পরিণতি এই যে, আল্লাহ্‌র যে সমস্ত বান্দার জীবনের লক্ষ্যই ছিল আল্লাহ্‌র সকল বান্দাহ্‌র মাথাকে দুনিয়ার তামাম আস্তানা থেকে উঠিয়ে একক আল্লাহ্‌র আস্তানার দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়া এবং আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য সব বস্তুতে আটকে পড়া অন্তরকে মুক্ত করে এক আল্লাহ্‌র সঙ্গে জুড়ে দেওয়া এবং যাঁদের দা'ওয়াত ও

জীবন-যিন্দেগী ছিল আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর জীবন ও যিন্দেগীর প্রতিচ্ছবি আর নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর ঃ

مَاكَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرِسُوْنَ - وَلَايَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُ الْمَلٰئِكَةَ وَالنَّبِيِّيْنَ اَرْبَابًا ط اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ - (ال عمران ٨)

"কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিকমত ও নবূওত দান করবার পর সে মানুষকে বলবে যে, 'আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও,' এটা তার জন্য শোভন নয় ; বরং সে বলবে, 'তোমরা রব্বানী হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।'

"ফিরিশতাগণকে ও নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করতে সে তোমাদেরকে নির্দেশ দেবে না। তোমাদের মুসলমান হওয়ার পর সে কি তোমাদেরকে কাফির হতে বলবে?" [সূরা আল-'ইমরান ঃ ৮ম রুকূ']

যমানার বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনে স্বয়ং তাঁরাই প্রার্থিত বস্তু ও লক্ষ্য এবং তাঁদের আস্তানাগুলিই সিজদাস্থল ও উপাস্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

মাখদূমুল মুল্ক

হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মুনায়রী (র)

প্রথম অধ্যায়

জীবনের ঘটনাবলী ও বিভিন্ন অবস্থা জন্ম থেকে বায়'আত ও এজাযত লাভ পর্যন্ত

খান্দান

নাম আহমদ, শরফুদ্দীন উপাধি, মাখদূমুল মুল্ক বিহারী তাঁর খেতাব। পিতার নাম ছিল শায়খ ইয়াহইয়া। ইনি ছিলেন যুবায়র ইবন 'আবদুল মুত্তালিবের অধঃস্তন পুরুষের অন্তর্গত। এদিক থেকে তাঁর খান্দান কুরায়শ বংশের প্রধান শাখা হাশিমী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। হযরত মুনায়রী (র)-এর পিতার পিতামহ মাওলানা মুহাম্মাদ তাজ ফকীহ স্বীয় যুগের বিখ্যাত 'উলামা ও মাশায়িখে কিরামের অন্তর্গত ছিলেন। আল-খালীল (শাম)[১] থেকে আবাস স্থানান্তর করে বিহারের অর্ন্তগত মুনায়র[২] নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। কতক গ্রন্থকার তাঁকে সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘোরীর সমসাময়িক বলেছেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ তাজ ফকীহ (র)-এর ব্যক্তিত্বের কারণে মুনায়র এবং তৎপার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। কিছুকাল তিনি মুনায়র-এর অবস্থান করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং জীবনের বাকী অংশ খালীলেই অতিবাহিত করেন। তাঁর খান্দান দস্তুরমত মুনায়রেই থেকে যায়।

---

১. বর্তমানে এ শহর হাশিমী রাষ্ট্র জর্দানের একটি শহর, বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে প্রায় ১৫/১৬ মাইল দূরে অবস্থিত এবং হযরত খলীলুল্লাহ (আ)-এর দাফনগাহ হবার সৌভাগ্য লাভে ধন্য। শরীফ ও নেককার লোকদের এটা প্রাচীন বসতি। স্থানটি আবহাওয়ার মিষ্টি আমেজ, অধিবাসীদের বিনয়-নম্র ব্যবহার, মেহমানদারী ও উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য মশহুর।

২. এখন সাধারণভাবে 'মিনায়র' নামে মশহুর। কিন্তু প্রাচীন উৎস ও বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এর আসল উচ্চারণ 'মুনয়ার' ছিল। ফারহাঙ্গে ইবরাহিমী –যার অপর নাম শরফনামা ইবরাহিমী এবং শরফনামা আহমদ মুনায়রীও, যা ৮৬২ হিজরী থেকে ৮৭৯ হিজরীর মধ্যবর্তীকালের রচনা–এর ভূমিকায় এর লেখক ইবরাহীম কাওয়াম ফারুকী তাঁর কবিতার একটি চরণে কিতাবের নাম এভাবে ছন্দোবদ্ধ করেছেন ঃ شرف نامه احمد منیری এ চরণটি তখনই ছন্দোবদ্ধ ও সমপাল্লার হতে পারে যখন এটাকে 'মুনয়ারী' পড়া হবে। এই কিতাবের আলোচনায় নিম্নে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর তালিকা সূচীতে ইংরেজীতেও এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ মুনয়ারী (Munyari)।

শায়খ আহমদ শরফুদ্দীন (র)-এর নানা শায়খ শিহাবুদ্দীন জগজ্জোত (র) সুহরাওয়ার্দিয়া সিলসিলার মাশায়িখে কিরামের অন্যতম ছিলেন। পিতৃভূমি ছিল কাশগড়। সেখান থেকে তিনি ভারতবর্ষে আসেন এবং জাঠলী নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। জাঠলী পাটনা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত। ইনি শায়খুশ শুয়ূখ হযরত শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ারদী (র)-এর মুরীদমণ্ডলীর অন্তর্গত ছিলেন। যুহ্দ, পরহেযগারী ও দৃঢ়তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উচ্চ মরতবার অধিকারী ছিলেন এবং এ কারণেই 'জগজ্জোত' অর্থাৎ 'দুনিয়ার আলো' উপাধিতে মশহূর হন। তাঁর এক কন্যার গর্ভে শায়খ আহমদ শরফুদ্দীন (র) এবং অপর কন্যার গর্ভে শায়খ আহমদ চরমপোশ (র)-এর মত নামী বুযর্গ পয়দা হন।[১] তিনি ছিলেন হযরত ইমাম হুসায়নের বংশধর। এদিক দিয়ে শায়খ শরফুদ্দীন (র)-এর মাতৃকুল সায়্যিদ বংশধর।

জন্ম

৬৬১ হিজরীর শা'বান মাসের শেষ জুম'আর দিনে মুনায়র নাম স্থানে তাঁর জন্ম হয়। شرف اگیں ছিল জন্ম তারিখ। শায়খ শরফুদ্দীনের ভাই ছিলেন তিনজন যাঁদের নাম যথাক্রমে শায়খ খলীলুদ্দীন, শায়খ জালালুদ্দীন ও শায়খ হাবীবুদ্দীন।

শিক্ষা

হযরত শায়খ শরফুদ্দীনের পড়াশোনা করার মত বয়স হতেই তাঁকে মকতবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে যুগে সবগুলি মুসলিম দেশেই সাধারণত নিয়ম ছিল যে, ছাত্রদেরকে তাদের পাঠ্য পুস্তকের প্রতিটি শব্দাক্ষর মুখস্থ করানো হ'ত এবং অভিধানের সংক্ষিপ্ত কিছু কিতাবও। এর উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রের স্মৃতিভাণ্ডার যেন শব্দ-সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়। পরবর্তীকালে হযরত শায়খ এ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতিকে তাঁর কতিপয় লেখায় সমালোচনা করেছেন এবং স্মৃতিশক্তি ও সময়ের এ ধরনের অপব্যবহারে আফসোস প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, একমাত্র কুরআনুল করীম ছাড়া এ জাতীয় কিতাবকে এভাবে রফ্ত করানো-যা ধর্মের দৃষ্টিতেও কোন সুফল বহন করে না, অবান্তর প্রচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। মা'দানুল মা'আনী' নামক গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি বলেন ঃ

---

১. 'সীরাতুশ শরফ' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, মুনায়র নামক কসবাটি ৫৭৭ হিজরীতে মুসলমানদের হাতে বিজিত হয়। গ্রন্থকার একটি ঐতিহাসিক নজীর তুলে ধরেছেন যা নিম্নরূপ ঃ এর দ্বারা এটা স্বীকার করতে হয় যে, মুনায়র বিজয় ৫৮৮ হিজরীতে শিহাবুদ্দীন ঘোরীর ভারতবর্ষ বিজয়েরও আগের ঘটনা। মুসলমানরা কি তাহলে গযনী আমলের পূর্বেই বাংলা-বিহার সীমান্তে প্রবেশ করেছিল এবং তারা ইসলামী উপনিবেশ ও কর্তৃত্ব স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল? বিষয়টি ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে গবেষণার দাবিদার।

শৈশবে আমার উস্তাদ মহোদয়গণ আমাকে অনেক কিতাবই মুখস্থ করিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ মাসাদির, মিফতাহুল লুগত ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। মিফতাহুল লুগাত বিশটি অংশের সমষ্টি একটি গ্রন্থ যার একটি খণ্ডের মত আমাকে মুখস্ত করান। এর পরিবর্তে কুরআন মজীদই আমাকে মুখস্থ করাবার দরকার ছিল।[১]

নিতান্তই আফসোসের বিষয় এই যে, কোন 'তাযকিরা' গ্রন্থেই তাঁর প্রাথমিক উস্তাদগণের নাম এবং সেসব কিতাব ও ইল্‌মের বিস্তারিত বিবরণ নেই যা তিনি দেশে থেকে শিখেছিলেন। এতটুকু অনুমান করা চলে যে, তিনি মুনায়র থেকেই মাঝারী রকমের শিক্ষা লাভ করেন এবং সে যুগের বড় বড় উস্তাদের নিকট শিক্ষা লাভ করার মত গৌরব অর্জন করেন।

মাওলানা শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামার শিষ্যত্ব গ্রহণ এবং সোনারগাঁও সফর

দেশে থেকে শিক্ষালাভের যতখানি সুযোগ-সুবিধা লাভ করা সম্ভব ছিল, তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ ফায়দা উঠাবার পর আল্লাহ্ পাক তাঁকে 'ইল্‌ম হাসিলে পরিপূর্ণতা এবং আরও অধিকতর তরক্কী দানের উদ্দেশ্যে অন্যবিধ ইন্তেজাম করেন। দিল্লীর প্রখ্যাত উস্তাদ মহোদয়গণের মধ্যে মাওলানা শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা যিনি সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশের রাজত্বকালে জ্ঞানমার্গের একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ ছিলেন—সম্ভবত সুলতান গিয়াছুদ্দীন বলবনের রাজত্বকালে[২] তাঁর নিকট ব্যাপক লোক সমাগমের ফলে এবং হিংসুকদের ঈর্ষাকাতরতায় বাদশাহ্‌র ইঙ্গিতে তিনি দেশত্যাগে বাধ্য হন এবং সে যুগে ভারতবর্ষের মুসলিম সাম্রাজ্যের শেষ সীমান্ত শহর সোনারগাঁও[৩] অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বিহার প্রদেশের ওপর দিয়ে অতিক্রম করাকালে তিনি

১. মা'দানুল মা'আনী মতবায়ে শরফুল আখবার, পৃ. ৪৩।

২. যদি এটা মেনেও নেয়া হয় যে, মাওলানা শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামার মূনায়র আগমনের সময় শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ কমপক্ষে বারো বছর বয়স্ক ছিলেন তাহলে এ সময় হিজরী ৬৭০ সাল সুলতান গিয়াছুদ্দীন বলবনের রাজত্বকাল। ইনি ৬৬৪ হি. থেকে ৬৮৬ হিজরী পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এ থেকে জানা যায় যে, মাওলানা আবূ তাওয়ামা (র) সুলতান গিয়াছুদ্দীন বলবনের ইঙ্গিতেই হিজরত করেছিলেন।

৩. মুসলিম রাজত্বকালে সোনার গাঁও ছিল পূর্ববঙ্গের রাজধানী। এখন এটা একটি অখ্যাত জায়গা যা অবজ্ঞাত অবস্থায় পড়ে আছে এবং Painam (পয়নাম) নামে ঢাকা (বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ) জেলার অন্তর্গত। ব্রহ্মপুত্র নদ এর থেকে দু'ক্রোশ দূর দিয়ে প্রবাহিত। সোনার গাঁওয়ের চারপাশে বহু সংখ্যক মসজিদের নিশানা পাওয়া যায় যা থেকে বুঝা যায়, কোন এককালে এটি একটি বিরাট বড় মুসলিম শহর ছিল। শেরশাহ গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড নামে পরিচিত যে শাহী সড়ক তৈরি করেছিলেন এটা তার শেষ মাথা।

কয়েকদিন মুনায়রে অবস্থান করেন। সম্ভবত সে সময় দিল্লী থেকে সোনার গাঁও যেতে এটি সরাইখানার ন্যায় কাফেলার বিশ্রামস্থল ও জনবসতি ছিল। অধিবাসীবৃন্দ জানতে পারে যে, দিল্লীর একজন যবরদস্ত 'আলিম মুনায়র আসছেন। "মানাকিবুল আসফিয়া"[১] লেখকের বর্ণনামতে শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া শায়খ মাওলানা শরফুদ্দীনের প্রগাঢ় প্যাণ্ডিত্য, নেক আমল ও তাকওয়া দৃষ্টে অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং বলেন যে, 'ইল্মে দীন বা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষালাভ এমনি 'ইল্ম ও আমলের অধিকারী ব্যক্তিত্বের কাছ থেকেই করা উচিত। অতএব তিনি তাঁর পিতামাতার নিকট সোনার গাঁও যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং তাঁদের এজাযত লাভের পর তিনি মাওলানা শরফুদ্দীনের সাহচর্য অবলম্বন করেন এবং সোনার গাঁও গমন করেন। স্বয়ং শায়খ তদীয় গ্রন্থ "খাওয়ানে পুর নে'মত"-এর ষষ্ঠ মজলিসে উস্তাদ মুহতারাম সম্পর্কে নিজের প্রতিক্রিয়া ও ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে গিয়ে নিম্নরূপ ভাষার আশ্রয় নেন ঃ

مولا نا شرف الدین ابو توامه این چنین دانشمندے که در تمامه هندوستان مشار آلیه بودند وبیچ کسن رادر علم ایشان شبیه نه بود۔

অর্থাৎ "মাওলানা শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র) এমন একজন 'আলিম ছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টিই ছিল যাঁর প্রতি নিবদ্ধ এবং জ্ঞানের জগতে তাঁর সমকক্ষ তখন কেউ ছিলেন না।"[২] সোনার গাঁও পৌঁছে তিনি ইল্ম হাসিলের ভেতর একান্তভাবে নিবিষ্ট হয়ে যান।

মানাকিবুল আসফিয়া' প্রণেতা বলেন যে, জনাব মুনায়রী (র) অধ্যয়ন ও পাঠাভ্যাসে এতখানি নিমগ্ন ছিলেন এবং সময়ের এতখানি মূল্য দিতেন যে, ছাত্র ও আগন্তুকদের সাধারণ দস্তরখানে হাযির হওয়া এবং সবার সঙ্গে খানায় শরীক হওয়া ও সেখানে অধিক সময় অতিবাহিত করা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। মাওলানা শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা তাঁর নিবিষ্টতা ও প্রকৃতির এ ধরনের গভীর দাবি দৃষ্টে তাঁর জন্য স্বতন্ত্র ইন্তেজাম করেন। তাঁর খাবার অতঃপর তাঁর নিজ কক্ষে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত।[৩]

---

১. "মানাকিবুল আসফিয়ার" লেখক মাখদূম শাহ শু'আয়ব। ইনি হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আহমাদ মুনায়রী (র)-এর চাচাতো ভাই এবং শায়খ 'আবদুল' আযীয ইবনে মাওলানা মুহাম্মাদ তাজ ফকীহ (র)-এর পৌত্র। এদিক দিয়ে এ গ্রন্থ শায়খ শরফুদ্দীন (র)-এর জীবন-বৃত্তান্তের প্রাচীনতম ও খান্দানী উৎস।

২. খাওয়ানে পুরানে'মত ১৫ পৃ., মাতবায়ে আহমদী।

৩. মানাকিবুল আসফিয়া, পৃ. ১৩১-৩২।

শায়খ শরফুদ্দীনের এ সময়টা গভীর নিবিষ্টতা ও একাকিত্বের মাঝে অতিবাহিত হয়। বলা হয়ে থাকে যে, সোনার গাঁও অবস্থানকালে দেশ থেকে যে সব চিঠিপত্র এসে পৌঁছুত তিনি সেগুলিকে একটি ঝুড়িতে নিক্ষেপ করতেন এবং এগুলি এই ধারণায় পড়তেন না যে, না জানি এর কারণে তাঁর প্রকৃতিতে বিশৃঙ্খল, মানসিক বিপর্যয় ও অশান্তির কারণ ঘটে এবং উদ্দেশ্য হাসিলের পথে তা বাঁধা ও বিঘ্নের সৃষ্টি করে।[১]

শায়খ মুনায়রী (র) সোনার গাঁওয়ে মাওলানার খিদমতে প্রচলিত সর্বপ্রকার জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ধর্মীয় শিক্ষা ও কল্যাণকর জ্ঞানে পরিপূর্ণতা লাভের পর মহান উস্তাদের মনে খাহেশ সৃষ্টি হয় যেন তিনি (শায়খ মুনায়রী) সে সমস্ত 'ইল্‌মও হাসিল করেন যা সে যুগের তরুণ ও উৎসাহী যুবকেরা অত্যন্ত আগ্রহভরে শিক্ষালাভ করত। যেমন, রসায়নশাস্ত্র ইত্যাদি। শায়খ মুনায়রী (র) এতে আপত্তি করেন এবং বলেন যে আমার জন্য ধর্মীয় শিক্ষাই যথেষ্ট।

বিবাহ

মাওলানা শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র) মূল্যবান রত্নসম এই যুবকের উপযুক্ত কদর ও সম্মান প্রদান করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হন নি। স্বীয় কন্যাকে শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহ্ইয়া মুনায়রী (র)-এর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তাঁকে জামাতারূপে গ্রহণ করেন। সোনার গাঁওয়ে অবস্থানকালেই শায়খ মুনায়রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শায়খ যাকীউদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন।

দেশে প্রত্যাবর্তন

কতক জীবনী-রচয়িতার বর্ণনামতে শিক্ষা সমাপনান্তে যখন তিনি চিঠির ঝাঁপি খোলেন, তখন প্রথম চিঠি খুলতেই তিনি তাতে শায়খ ইয়াহ্ইয়া (র)-এর ইন্তিকালের সংবাদ দেখতে পান। এ সংবাদ মিলতেই তাঁর মায়ের কথা মনে পড়ে এবং সন্তানের মনে উছলে ওঠে মাতৃভক্তিরসের ফল্গুধারা। তিনি দেশে ফিরবার জন্য শ্রদ্ধেয় উস্তাদের নিকট এজাযত চাইলেন এবং পুত্র শায়খ যাকীউদ্দীনকে সাথে নিয়ে মুনায়র প্রত্যাবর্তন করেন।[২]

শায়খ ইয়াহ্ইয়া মুনায়রী (র)-এর ইন্তিকাল হয় ঐতিহাসিকদের মতে ৬৯০ হিজরীর ১১ই শা'বান তারিখে। এজন্য এটা স্বীকার করতে হয় যে, তাঁর (শায়খ শরফুদ্দীন-এর) দেশে প্রত্যাবর্তনকাল ছিল ৬৯০ হিজরীর কোন এক মাস। এর

১. সীরাতুশ শরফ, পৃ. ৪৬ ও নুযহাতুল খাওয়াতির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯।
২. সীরাতুশ শরফ, পৃ. ৫২।

চেয়ে বেশী বিলম্বের সুযোগ এজন্য নেই যে, শায়খ নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী–যাঁর হাতে তিনি দিল্লী গিয়ে বায়'আত হয়েছিলেন– ইন্তিকাল করেন ৬৯১ হিজরীতে। এ জন্য মুনায়র প্রত্যাবর্তন এবং দিল্লী পৌঁছা ৬৯০ হিজরীর শেষ কিংবা ৬৯১ হিজরীর প্রথম দিককার ঘটনা বলে স্বীকার করতে হয়। এ যুগে সফরে দুঃখ-কষ্ট-যাতনা এবং সোনার গাঁও থেকে দিল্লী পর্যন্ত দূরত্ব দৃষ্টে এ বর্ণনা স্বীকার করে নিতে কিছুটা কষ্ট হয় এবং এ ঘটনাও সন্দেহ থেকে মুক্ত নয় যে, তিনি ৬৯০ হিজরী পর্যন্ত চিঠি খুলে দেখেন নি আর পিতার ইন্তিকালের পরপরই তাঁর চিঠির ঝাঁপি খোলার সুযোগ হয়, আবার তাও খুলতেই হাতে পড়ে পয়লাতেই তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ সংক্রান্ত চিঠিটা। কাজেই শায়খ মুনায়রী (র)-এর দেশে ফেরার একমাত্র কারণ শুধু একটি চিঠির আকস্মিক পাঠই বলা ঠিক হবে না, বরং এ থেকে এটা অবশ্যই প্রকাশ পায় যে, তিনি ৬৯০ হিজরীর পূর্বে তাঁর স্বদেশভূমি মুনায়রে প্রত্যাবর্তন করেন নি। কেননা এই প্রত্যাবর্তনকালে কোন জীবনীকারই তাঁর সঙ্গে তাঁর পিতার সাক্ষাতের কোন বর্ণনা উল্লেখ করেন নি। মানাকিবুল আসাফিয়া' গ্রন্থে (যা তাঁর সম্পর্কে জানবার একটি খান্দানী উৎসও বটে) বলা হয়েছে ঃ

> সেখান থেকে তিনি মুনায়র প্রত্যাবর্তনের নিয়ত করলেন। মায়ের খিদমতে উপস্থিত হয়ে স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র (শায়খ যাকীউদ্দীন)-কে তাঁর দাদীর কোলে তুলে দিলেন এবং বললেন যে, একেই আপনার সন্তান মনে করুন। আর আমাকে এজাযত দিন যেন যেখানে ইচ্ছা আমি যেতে পারি এবং মনে করবেন যে, শরফুদ্দীন মারা গেছে। এরপর তিনি দিল্লী রওয়ানা হয়ে যান এবং দিল্লীর মহান বুযুর্গগণের খিদমতে হাযির হন।[১]

যাই হোক, তাঁর উচ্চ মনোবল, সত্যের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও নিষ্ঠা এবং ইশকে ইলাহীর সুপ্ত স্ফুলিংগ তাঁকে এর এজাযত দেয়নি যে, তিনি যাহিরী 'ইলমে পরিপূর্ণতা লাভকেই যথেষ্ট মনে করে মুনায়র অবস্থান করবেন এবং যাহিরী 'আলিমদের ন্যায় দর্‌স ও তাদরীস তথা পঠন ও পাঠনকেই একমাত্র পেশা হিসেবে আঁকড়ে ধরবেন। অল্পবয়স্ক যাকীউদ্দীনকে নিজ মায়ের হাওয়ালা করেন এবং বলেন যে, একেই আমার স্মৃতি ও খান্দানের আশার বাতি জেনে নিজের কাছে রাখুন, অন্তরকে প্রবোধ দিন এবং আমাকে দিল্লী যাবার অনুমতি দিন যেন আমার পরম লক্ষ্য ও আরাধ্যকে আমি লাভ করতে পারি।

---

১. মানাকিবুল আসফিয়া, পৃ. ১৩২।

দিল্লী সফর ও একজন মহান বুযর্গের নির্বাচন

যাই হোক, ৬৯০ হিজরীর শেষভাগে কিংবা ৬৯১ হিজরীর প্রথমপাদে তিনি দিল্লী রওয়ানা হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ জলীলুদ্দীন ছিলেন সফরসঙ্গী। অনুমান করা যায় যে, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী উস্তাদের তা'লীমের ফয়েয ও বরকতে এবং স্বীয় প্রকৃতিগত সূক্ষ্ম উপলব্ধি থেকে তাঁর মধ্যে সমসাময়িক 'উলামা ও মাশায়িখে কিরামকে তীক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দেখার অভ্যাস এবং যাহিরী ইলমের মানদণ্ডে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবৃত্তি গড়ে উঠেছিল। দিল্লী পৌঁছে তিনি যে যুগের বিখ্যাত বুযর্গদের দরবারে হাযিরা দেন এবং তাঁদেরকে এই দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন যে, এঁদের মধ্যে কাকে তাঁর মুরশিদ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু জীবনীকারদের বর্ণনানুসারে দিল্লীর বুযর্গানে দীন ও মাশায়িখে কিরামের মধ্যে কেউই তাঁর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য মনে হ'ল না। মানাকিবুল আসফিয়ার বর্ণনা মুতাবিক তিনি সবার দরবারে হাযিরা দেবার পর বলেন, "এটাই যদি হয় পীর-মুরীদী তবে আমিও একজন পীর"[১] اگر شیخی انیست ماه। শুধু হযরত সুলতানুল মাশায়িখ শায়খ নিজামুদ্দীন (র)-এর খিদমতে হাযির হয়ে তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। শায়খ মুনায়রী (র) ও সুলতানুল মাশায়িখ (র)-এর মাঝে কিছু জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হয়। সুলতানুল মাশায়িখ (র) তাঁর বিভিন্ন প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ উত্তরও দিয়েছিলেন। হযরত খাজা (র) তাঁকে ভক্তি ও সম্মান করেন এবং পানের একটি থালা পেশ করেন ও বলেন ঃ سیمرغیست نصیت "একটি বাজপাখী উচ্চে উড্ডীয়মান, কিন্তু আমাদের জালের ভাগ্যে নেই তাকে ধরার ও বন্দী করার।"

এরপর তিনি দিল্লী থেকে পানিপথ আসেন এবং শায়খ বু'আলী (শরফুদ্দীন) কলন্দর পানিপথীর খেদমতে হাযির হন। সেখানেও তিনি তাঁর লক্ষ্য ও আরাধ্যের সন্ধানে ব্যর্থ হন। তিনি বলেন ঃ

شیخ است اما مغلوب حال است به تربیت دیگرے نمی
پرو ازد-

অর্থাৎ "শায়খ আছে, কিন্তু পরাজিত অবস্থায়, অন্যের তরবিয়ত দিতে তিনি অপারগ ও অক্ষম।[২]

১. ঐ।

২. মানাকিবুল আসফিয়া, পৃষ্ঠা ১৩২।

শায়খ নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী (র)

দিল্লী ও পানিপথ থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে আসার পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ জলীলুদ্দীন খাজা নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী (র) প্রসঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাঁর তরীকা ও গুণাবলীর বর্ণনা দেন। শায়খ মুনায়রী (র) বললেন যে, দিল্লীর যিনি কুতুব ছিলেন (অর্থাৎ হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া) তিনিই যখন একটি পানপাতা দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন, তখন আর অন্যের কাছে গিয়ে কী করব? ভাই যখন বেশী পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন তখন তিনি সাক্ষাতের জন্য মনস্থির করেন এবং দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তিনি এমন শান-শওকতের সঙ্গে দিল্লী পৌঁছেন যে, তাঁর মুখে পান-পোরা ছিল আর কিছু পান ছিল রুমালে বাঁধা অবস্থায়। খাজা নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী (র)-এর দৌলতখানার নিকটে পৌঁছতেই তাঁর এক ধরনের কাঁপুনি দেখা দেয় এবং তিনি ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে পড়েন। এতে তিনি আশ্চর্য হন এবং বলেন যে, ইতিপূর্বেও আমি অন্যান্য মাশায়িখে কিরামের দরবারে হাযির হয়েছি, কিন্তু কোথাও এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হইনি।

তিনি হযরত শায়খ ফিরদৌসী (র)-এর খিদমতে গিয়ে পৌঁছুলেন। তাঁর ওপর শায়খের নযর পড়তেই তিনি বললেন যে, মুখে পান, আবার রুমালে পানের পাতা, অথচ দাবি যে, আমিও শায়খ! একথা শুনতেই তিনি মুখ থেকে পান বের করে ফেলেন এবং ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ভদ্র ও বিনীতভাবে উপবেশন করেন। কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর তিনি বায়'আতের জন্য দরখাস্ত করেন। হযরত খাজা নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী (র) এ দরখাস্ত কবূল করেন এবং তাঁকে সিলসিলাভুক্ত করে নেন[১] ও এজাযত প্রদান করে বিদায় দেন।

---

১. মানাকিবুল আসাফিয়া, পৃ. ১৩২।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতবর্ষে ফিরদৌসীয়া সিলসিলা এবং এর মহান বুযুর্গগণ

খাজা নাজমুদ্দীন কুবরা (র)

বুযর্গকুল শ্রেষ্ঠ 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ' প্রণেতা ও সুহ্‌রাওয়ারদিয়া তরীকার ইমাম শায়খ শিহাবুদ্দীন 'উমর সুহরাওয়ারদীর মহান পিতৃব্য শায়খ-ই-তরীকত খাজা যিয়াউদ্দীন আবুন নাজীব 'আবদুল কাহির সুহ্‌রাওয়ারদী (র) (ওফাত ৫৬৩ হিজরী)-এর শ্রেষ্ঠতম খলীফাবৃন্দের মধ্যে আবুল জনাব আহমদ ইবনে 'উমর যিনি সাধারণত খাজা নাজমুদ্দীন কুবরা (র)[১] নামে সমধিক খ্যাতির অধিকারী একজন বুযর্গ ছিলেন। খাওয়ারিয্‌ম ছিল তাঁর জন্মভূমি। তিনি তাসাওউফ ও আধ্যাত্মিক তরীকার সাধন-পথের একজন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। বুযর্গকুল শিরোমণি শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ারদীও রূহানী সম্পর্কের দিক থেকে নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মনে করে এবং স্বীয় মুরশিদের স্থলাভিষিক্ত ও গদ্দীনশীন জেনে তাঁর অত্যন্ত আদব ও সম্মান করতেন। 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ' (যা এর প্রণেতার যুগের পর থেকে আজ পর্যন্ত তরীকতের আগ্রহী পথিকের জন্য সংবিধান ও সঞ্জীবনী সুধাস্বরূপ) যখন তিনি প্রণয়ন করেন, তারপরই তা শায়খ নাজমুদ্দীন (র)-এর খিদমতে পেশ করেন। তিনি তা পড়ে দেখেন এবং সাধারণ্যে গৃহীত হবার ও চিরস্থায়িত্ব লাভের জন্য দু'আ করেন।

হযরত শায়খ নাজমুদ্দীন (র)-এর ওপর তাওহীদ ও আত্মবিলোপ, মুহব্বত ও 'ইশ্‌কে ইলাহীর পরিবেশেরই প্রাবল্য ছিল। তিনি গোপন রহস্য ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উচ্চ দরজার অধিকারী ছিলেন। মানাকিবুল আসফিয়ার লেখক বলেন ঃ

---

১. তাঁর উপাধি ছিল কুব্‌রা। যেহেতু ছাত্রাবস্থায় বাহাছ ও বিতর্ক সভায় তিনি প্রতিপক্ষকে সহজেই ঘায়েল করে দিতেন, ফলে তাঁর উপাধি পড়ে যায় الطامة الكبرى (বড় আপদ)। ব্যবহারের আধিক্যে الطامة বাদ পড়ে গিয়ে শুধু 'কুব্‌রা' থেকে গেছে। দেখুন খাযীনাতুল আসফিয়া, পৃ. ২৫৯।

তিনি তাওহীদ, মা'রিফাত, তরীকত ও হাকীকতের উসূল ও কায়দা-কানূনের ব্যাপারে অত্যন্ত বিরাট ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে ইশারা-ইঙ্গিত দিতেন। আরবী ও ফারসী ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে তাঁর লেখা ছিল প্রচুর। এসব লিখিত গ্রন্থের মধ্যে 'তাবাসির' এবং সলূকের তরীকা বর্ণনামূলক একটি ছোট্ট পুস্তিকা সারা ভারতীয় উপমহাদেশে মশহূর ছিল।

'মানাকিবুল আসফিয়ার' গ্রন্থকার তাঁর কিছু কবিতা এতে উদ্ধৃত করেছেন যার ভেতর 'ইশ্‌ক ও মত্ততার আশ্চর্যজনক অবস্থা, দুঃখ-জ্বালা ও দ্রবীভূত হওয়া এবং পাগলপারা ও আত্ম-নিমগ্নতার আশ্চর্য এক বিশ্ব দৃষ্টিগোচর হয়।

তিনি ৬১০ হিজরীর ১০ই জমাদিউল আওয়াল খাওয়ারিযম -এ তাতারীদের বিরুদ্ধে পুরুষসিংহের ন্যায় লড়তে লড়তে শাহাদতবরণ করেন। খলীফাবৃন্দের মধ্যে শায়খ মাজদুদ্দীন বাগদাদী ('মিরসাদুল 'ইবাদ' প্রণেতার শায়খ), শায়খ সা'দুদ্দীন হামুবিয়া, বাবা কামাল জুনায়দী, শায়খ রাযীউদ্দীন আলীলালা, শায়খ সায়ফুদ্দীন বাখরযী, শায়খ নাজমুদ্দীন রাযী, শায়খ জামালুদ্দীন মক্কী এবং মাওলানা বাহাউদ্দীন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'মানাকিবুল আসফিয়া'তে বলা হয়েছে যে, খাজা ফরীদুদ্দীন 'আত্তারও তাঁর মুরীদভূক্ত ছিলেন।[১]

ভারতীয় উপমহাদেশে কুবরোবী সিলসিলার আগমন

হযরত খাজা নাজমুদ্দীন কুবরা (র)-এর তরীকাকে 'তরীকায়ে কুবরোবিয়া' বলা হয়। তিনটি পথে এ তরীকা ভারতবর্ষে পৌঁছে। তন্মধ্যে একটি আমীর সায়্যিদ 'আলী ইবনুশ শিহাব হামদানী কাশ্মীরি (র) (ওফাত ৭৮৬ হিজরী)-এর মাধ্যমে যিনি শায়খ শরফুদ্দীন মাহমূদ ইবনে 'আবদুল্লাহ আল-মাযবেকানীর খলীফা ছিলেন। তিনি আবার শায়খ আলাউদ্দীন সিমনানী (র) থেকে এজাযতপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তিনি তিনটি মাধ্যম ও সূত্রে খাজা নাজমুদ্দীন কুবরা (র) থেকে এজাযতপ্রাপ্ত ছিলেন। সায়্যিদ 'আলী হামদানী (র) ৭৭৩ অথবা ৭৮০ হিজরীতে কাশ্মীর আগমন করেন এবং তাঁর ঐকান্তিক তবলীগ ও ফলপ্রসু চেষ্টা-সাধনার ফলে কাশ্মীরের অধিকাংশ জনবসতি মুসলমান হয়ে যায়। কুবরোবিয়া হামদানিয়ার এ সিলসিলা কাশ্মীরে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সজীব ও প্রাণবন্ত থাকে। এই সিলসিলায় একজন মহান বুযর্গ ছিলেন মাওলানা ইয়াকূব সরফী কাশ্মীরি (ওফাত ১০০৩ হিজরী) যিনি স্বীয় যুগে হাদীছ ও তাফসীরশাস্ত্রের একজন বড় 'আলিম 'আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী মক্কীর ছাত্র এবং ইমামে রাব্বানী হযরত মুজাদ্দিদ আলফে-ছানী (র)- এর শিক্ষকদের অন্তর্গত। এ সিলসিলা কাশ্মীরে এখন পর্যন্ত তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

---

১. মানাকিবুল আসফিয়া, পৃ. ৯৯।

কুবরোবিয়া তরীকা ভারতীয় উপমহাদেশে পৌঁছবার দ্বিতীয় মাধ্যম ছিল আমীরুল কবীর শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ কুতবুদ্দীন মুহাম্মাদ মাদানী (ওফাত ৬৭৭ হিজরী) যিনি হযরত খাজা নাজমুদ্দীন কুবরা (র)-এর অন্যতম খলীফা ছিলেন। তিনি সুলতান কুতবুদ্দীন আয়বেকের অথবা সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশের যমানায় ভারতবর্ষে আসেন এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত দিল্লীতে শায়খুল ইসলাম পদে সমাসীন ছিলেন। অতঃপর কড়া (মানিকপুর) জয় করে তিনি সেখানেই বসবাস শুরু করেন।[১] তিনি একই মাধ্যমের খলীফা ছিলেন শায়খ "আলাউদ্দীন জুয়ুরী (ওফাত ৭৩৪ হিজরী)-এর। এ সিলসিলা বড় বড় মাশায়িখ সৃষ্টি করেন। এ সিলসিলাই সিলসিলায়ে জুনায়দিয়া নামে দাক্ষিণাত্যের কিছু কিছু অংশে এখনও বিদ্যমান আছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ফিরদৌসিয়া সিলসিলার আগমন

এ সিলসিলারই একটি শাখা ফিরদৌসিয়া নামে পরিচিতি লাভ করে। হযরত খাজা নাজমুদ্দীন কুবরা (র)-এর একজন মহান খলীফা ছিলেন খাজা সায়ফুদ্দীন বাখরযী (র)। এঁরই খলীফা খাজা বদরুদ্দীন সমরকন্দী (র) ফিরদৌসী সিলসিলার মহান বুযর্গগণের ভেতর সর্বাগ্রে ভারতীয় উপমহাদেনে আগমন করেন[২] এবং এখানে অবস্থান ও বসবাস করা শুরু করেন। ফিরদৌসিয়া তরীকার বুনিয়াদ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন।

খাজা বদরুদ্দীন সমরকন্দী (র)

খাজা বদরুদ্দীন (র)-এর তরীকার বৈশিষ্ট্য ফানা (ধ্বংস ও আত্মবিনাশ) ও আত্মবিলোপ, ইচ্ছাশক্তি ও গ্রহণশক্তি পরিত্যাগ এবং কারামত ও অতি অদ্ভূত কার্যকলাপ জনসমক্ষে গোপন রাখা। সে সময় ভারতীয় উপমহাদেশে চিশতিয়া সিলসিলা সর্বজনগ্রাহ্য ও জনপ্রিয় হতে চলেছিল। হযরত খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র) হিদায়াত ও ইরশাদের মধ্যাহ্ন গগনে প্রদীপ্ত সূর্যের ন্যায়

---

১. তাঁর বংশে ভারতীয় উপমহাদেশের বড় বড় 'উলামা, মাশায়িখ ও মুজাহিদ পয়দা হন, যাঁদের মধ্যে হযরত সায়্যিদ আদম বিন্নুরী (র)-এর খলীফা হযরত শাহ্ 'আলামুল্লাহ্ নক্শবন্দী রায়বেরেলবী, হযরত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (র), হযরত মাওলানা খাজা আহমদ নাসিরাবাদী (র) অত্যন্ত মশহুর ছিলেন। 'নুযহাতুল খাওয়াতির'-এর লেখক মাওলানা সায়্যিদ 'আবদুল হাই এ বংশেরই একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

২. হযরত শায়খ রুকনুদ্দীন ফিরদৌসীর পূর্বে এই সিলসিলার 'ফিরদৌসী' নামকরণ দৃষ্টিগোচর হয় না। সাধারণভাবে এই সিলসিলার মহান বুযর্গগণ এবং তাঁদের সিলসিলাকে 'কুবরোবিয়া' বলা হয়। এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে প্রকৃতপক্ষে হযরত শায়খ রুকনুদ্দীন ফিরদৌসীর সময় থেকে। সেই সময় থেকে এই সিলসিলার বুযুর্গগণ ফিরদৌসী নামে কথিত হন। (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

অবস্থান করছিলেন। খাজা বদরুদ্দীন সমরকন্দী (র)-কে এমনই একটি যুগে এবং এমনি এক পরিবেশে এমন একটি তরীকার বুনিয়াদ স্থাপনের কাজ করতে হয় যার মধ্যে সাধারণ সম্প্রীতির সর্বজনগ্রাহ্যতার উপকরণ কম ছিল এবং যাঁর বুযর্গগণ আধ্যাত্মিক অবস্থার গোপনীয়তাকে প্রকাশ্য অবস্থার ওপর আগ্রহভরেই অগ্রাধিকার দিতেন। 'মানাকিবুল আসফিয়া' প্রণেতা যিনি নিজেও ফিরদৌসী তরীকার একজন অনুসারী ছিলেন–লিখেছেন ঃ

> তাঁর তরীকা ছিল শত্তারিয়া 'ইশকিয়া। তিনি প্রায়ই বলতেন ঃ 'ইল্মে দীন হাসিল করাকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করবে এবং তদনুযায়ী আমল করবে, আমল করবে খালেসভাবে একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই। কেননা আমলবিহীন 'ইল্ম যেমন কল্যাণবর্জিত, তেমনি ইখলাস (নিষ্ঠা)-বিহীন আমলও ফলপ্রসু নয়। কারামত (অলৌকিকতা) লাভের প্রত্যাশী হবে না। ইবাদত–বন্দেগীতে দৃঢ়তা ও অবিচল নিষ্ঠাই প্রকৃত কারামত। ভারতীয় উপমহাদেশে ফিরদৌসিয়া তরীকার উসূল ও কায়দা-কানূনের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খাজা বদরুদ্দীন সমরকন্দী (র) এবং তাঁর মহান পীর-মুরশিদগণের হাতে। এর পূর্বে সর্বসাধারণ ও বিশিষ্টজনেরা আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতিরেকে অত্যদ্ভুত কার্যকলাপ ও কারামতের ভিত্তিতেই পীর-মুরীদী করতেন। জানা যায় যে, খাজা কুত্বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র)-এর যমানায় ভারতীয় উপমহাদেশে বহু মুহাক্কিক তরীকতপন্থী ছিলেন। যেমন শায়খুল ইসলাম শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (র), শায়খুল ইসলাম শায়খ নাজমুদ্দীন সুগরা (যিনি দিল্লীর শায়খুল ইসলাম ছিলেন), শায়খুল ইসলাম খাজা বদরুদ্দীন সমরকন্দী (র), শায়খুল ইসলাম শায়খ মু'ঈনুদ্দীন সিজযী (র) যিনি খাজা কুত্বুদ্দীন বখতিয়ার (র)-এর পীর ছিলেন। আল্লাহ্ পাক এঁদের সবার প্রতি রহমত নাযিল করুন। কিন্তু বিশিষ্ট ও সাধারণ জনগণের ধাবমান গতি যেভাবে হযতর খাজা কুত্বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র)-এর দিকে ছিল,

---

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর) 'মানাকিবুল আসফিয়া' প্রণেতার বর্ণনা দৃষ্টেও প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন ঃ খাজা রুকনুদ্দীন ভারতবর্ষে এরূপ শান-শওকতে আগমন করেন যে, আরব ও আরব-বহির্ভূত অঞ্চলেও তাঁর ফয়েয ও প্রভাব পৌঁছে যায়। তিনি স্বীয় তরীকতের পীরদের শাজরার প্রভাব সৃষ্টি করেন এবং 'মাশায়িখে ফিরদৌসী' নামে বিখ্যাত হন। এই শাজরার সঙ্গে জড়িত যাঁরা, তাঁরা নিজেদের সিলসিলাকে এই নামেই ডেকে থাকেন এবং ফিরদৌসী নামে স্মরণ করেন। বহু পুরনো প্রবাদ الالقاب تنزل من السماء ذلك فضل الله يوتيه من يشاء আসমান থেকে নাম অবতীর্ণ হয়। এটা আল্লাহ্র দান, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। মানাকিবুল আসফিয়া, পৃ. ১২৫।

তা ঐ সমস্ত বুযর্গের কারও প্রতিই তেমন ছিল না। এর কারণ হযরত খাজা কুত্‌বুদ্দীন (র) থেকে অত্যদ্ভূত কার্যাবলী ও কারামত বহুল পরিমাণে প্রকাশিত হত।

মানাকিবুল আসফিয়া'র লেখক তাঁর মিযাজ ও প্রকৃতি এবং তাঁর তরীকার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আরও লিখেছেন ঃ

খাজা বদরুদ্দীন সমরকন্দী (র)-এর ধরন-ধারণ ভারতবর্ষের অপরাপর বুযুর্গের ধরন-ধারণ থেকে আলাদা ছিল। ভারতবর্ষের বুযর্গগণের অধিকাংশই সংসার-তরণীর কর্ণধার ছিলেন এবং কেউ কেউ রিয়াযত ও মুজাহাদার মধ্যে কাল কাটাতেন। খাজা বদরুদ্দীন সমরকন্দী (র)-এর তরীকা ছিল শত্‌তারিয়া 'ইশকিয়া তরীকা। এ তরীকার ভিত্তিভূমি ছিল অবলম্বিত ইচ্ছাধীন 'ফানা'র ওপর এবং এ তরীকার সালিক (আধ্যাত্মিক পথের পথিক)-গণের আমল موتوا قبل ان تموتوا অর্থাৎ "মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুবরণ কর"-এর ওপর। এটা আল্লাহ্‌র রাহের এবং রূহানিয়াত গগনের দ্রুত উড্ডয়নগামী পাখি। এই প্রথম পদক্ষেপেই কলহ-কোন্দল অতিক্রম করে যায় এবং জীবনের ওপর সহজেই বাজী ধরে। সাধকের বিরাট ব্যাঘ্র-পুরুষ হওয়া আবশ্যক। যারা এ পথে (আধ্যাত্মিক পথে) পদক্ষেপের অভিসারী তারা যেন নিজেকে 'ফানী' (ধ্বংসশীল)-রূপে পরিগণিত করে।[১]

খাজা বদরুদ্দীন সমরকন্দী রাহ্‌মাতুল্লাহি 'আলায়হি সামা' গাইতেন এবং আবেশে বিভোর ও বিহ্বল হয়ে যেতেন। তিনি সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীর শেষে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর যুগে ওফাত পান। কোন্ সালে ওফাত পান তার কোন উল্লেখ তাযকিরা গ্রন্থে মেলেনি।[২]

খাজা রুকনুদ্দীন ফিরদৌসী (র.)

খাজা বদরুদ্দীন সমরকন্দী (র)-এর বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন খাজা রুকনুদ্দীন ফিরদৌসী (র)। 'মানাকিবুল আসফিয়া' প্রণেতার বর্ণনা মুতাবিক তাঁর শৈশবেই আপনাপন শায়খের প্রশিক্ষণাধীনে লালিত-পালিত হয়েছিলেন এবং তাঁর থেকেই জাহিরী ও তরীকতের তা'লীম হাসিল করেছিলেন এবং তাঁর থেকে

১. মানাকিবুল আসফিয়া, পৃ. ১২৩।

২. নুযহাতুল আসফিয়ার মতে মৃত্যু সন ৭১৬ হিজরী। 'নুযহাতুল খাওয়াতির লেখকের বিচার-বিশ্লেষণ অনুযায়ী এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। 'খাওয়াতির'-লেখকের মতে, তাঁর ইন্তিকাল হয়েছিল সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে।

খিলাফতনামা প্রাপ্তির পর তাঁরই স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর যমানা থেকেই এ সিলসিলা ফিরদৌসিয়া সিলসিলা নামে অভিহিত হয়।

শায়খ রুকনুদ্দীন ফিরদৌসীও আল্লাহ্র প্রেমে ও ধ্যানে আবেগ-বিহ্বল হয়ে যেতেন। তাঁর ইন্তিকালও সপ্তম শতাব্দীর শেষে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর যুগেই হয়।[১]

খাজা নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী (র)

খাজা নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী শায়খ 'ইমাদুদ্দীন দেহলভীর সাহেবযাদা এবং খাজা রুকনুদ্দীন ফিরদৌসীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও খলীফা ছিলেন। তিনি সারাটা জীবনই স্বীয় শায়খ ও বুযর্গ চাচার খেদমতে কাটিয়ে দেন। অতঃপর তাঁর ওফাতের পর তিনি গদ্দীনশীন হন এবং ফিরদৌসী সিলসিলার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং তাওহীদ ও 'ইশকে ইলাহীর ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য এমন একজন মুহাক্কিক, মুজতাহিদ, ইমাম ও তরীকা প্রতিষ্ঠাতাকে তরবিয়ত দান করেন যিনি শুধু যে তাঁর মহান পীরের নামকেই ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে জীবিত রেখেছিলেন তা নয়, বরং অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পূর্ব ভারতকে স্বীয় রূহানী ফয়েয ও 'ইশকের উত্তাপ ও উষ্ণতা দ্বারা জীবন্ত ও সমৃদ্ধ করে রেখেছিলেন এবং স্বীয় উচ্চ বিশ্লেষণী শক্তি, মহান মকাম ও দুর্লভ জ্ঞানের ভিত্তিতে 'আঈনুল কুযাত হাম্মদানী (র), খাজা ফরীদুদ্দীন 'আত্তার (র.) এবং মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (র.)-এর স্মৃতিকেই জাগিয়ে তুলেছিলেন। মানাকিবুল আসফিয়া' প্রণেতা তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

> তিনি লোকচক্ষুর আড়ালে আত্মগোপন করাকেই নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ এবং এর সব উপকরণ থেকে তিনি ছিলেন মুক্ত। 'আমার আওলিয়াগণ আমার পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে' (অর্থাৎ আল্লাহ্র ওলীগণ সৃষ্টির চোখে এমনভাবে অবগুণ্ঠিত থাকেন যে, আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কেউ তার খবর জানতে পারে না)-এর মহান প্রতিভূ

---

১. 'খাযীনাতুল আসফিয়া'; উল্লিখিত তারিখ ৭২৪ হিজরী সঠিক নয়। তার আরও একটি প্রমাণ-এটাও তাঁর খলীফা শায়খ নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী (র)-এর ওফাত সন সম্মিলিত মতে ৬৯১ হিজরী এবং একথা যুক্তিবিরুদ্ধ যে, তিনি তাঁর খলীফা ও গদ্দীনশীন-এর পরেও ৩৩ বছর বেঁচে থাকবেন এবং হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ তাঁকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর খলীফার হাতে বায়আত করবেন। এজন্য 'নুযহাতুল খাওয়াতির' প্রণেতার এই বর্ণনা অত্যন্ত সহীহ ও বিশুদ্ধ মনে হচ্ছে যে, তাঁর ইন্তিকাল সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে হয়েছিল।

ছিলেন তিনি। তাঁর মুরীদগণের মধ্যে বড় বড় 'আরিফ ও মুহাক্কিক 'আলিম ছিলেন। 'ফতওয়ায়ে তাতারখানি', প্রণেতা মাওলানা 'আলম আন্দসমী (র)[১] তাঁর মুরীদ ছিলেন। উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবধারাপুষ্ট কবিতা তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে। খাজা নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী (র)-এর সমস্ত কামালিয়াত অন্তরালে ছিল।[২]

১. এর অর্থ মাওলানা ফরীদুদ্দীন 'আলম ইবনুল আলা হানাফী আন্দরপতী। ৭৭৭ হিজরীতে 'ফতওয়ায়ে তাতারখানিয়া' প্রণয়ন করে স্বীয় দোস্ত আমীরে কবীর তাতার খানের নামে নামকরণ করেন। ফীরোয শাহ্‌র অভিপ্রায় ছিল যে, সেটা তাঁর নামে নামকরণ করা হবে। কিন্তু তিনি তা কবূল করেন নি। সম্ভবত ৭৮৬ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকাল হয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন নুযহাতুল খাওয়াতির, ২য় খণ্ড।

২. মানাকিবুল আসফিয়া, পৃ. ১২৬।

তৃতীয় অধ্যায়

মুজাহাদা, নির্জনবাস, লোকালয়ে অবস্থান এবং ইরশাদ ও প্রশিক্ষণ

দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তন

'মানাকিবুল আসফিয়া' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, খাজা নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী (র) বায়'আত করার পর তাঁকে লিখিত এজাযতনামাও প্রদান করেন। শায়খ শরফুদ্দীন আরয করেন ঃ আমার তো এখনও জনাবের খেদমতে কিছুদিন থাকবার সুযোগ হয়ে ওঠেনি এবং আমি সুলূক (আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন স্তর)-এর তা'লীমাতও এখন পর্যন্ত জনাবের খেদমত থেকে হাসিল করিনি। এ ধরনের গুরুত্ববহ, দায়িত্বপূর্ণ ও নাযুক কর্ম কিভাবে সম্পাদন করব? খাজা নাজীবুদ্দীন (র) তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে, এই গোটা কারবারটা তো অদৃশ্য হস্তের ইশারায় সাধিত হয়েছে এবং তাঁর তরবিয়ত নবূওতের তরফ থেকেই হবে। এরপর তিনি তাঁকে বিদায় দেন এবং বলেন ঃ

"পথিমধ্যে যখন কোন খবর শুনতে পাবে, তখন যেন ফিরে না আস।" অতঃপর দুই-এক মনযিল পথই মাত্র অতিক্রম করেছিলেন, এমন সময়ে তিনি হযরত খাজা সাহেব (র)-এর ওফাতের সংবাদ অবগত হন। তিনি ওসীয়ত মাফিক সফর অব্যাহত রাখেন এবং মুনায়র-এর দিকে রওয়ানা হন।[১]

প্রেমের উচ্ছ্বাস

তিনি যখন খাজা নাজীবুদ্দীন (র) থেকে বিদায় নিলেন তখন তাঁর অন্তরে বেশ আঘাত লাগে। 'ইশ্‌কে ইলাহী তথা বিভু প্রেমের উত্তাপ তাঁর অস্থি-মজ্জায় মিশে গিয়েছিল। তিনি বলেন ঃ

> আমি যখন খাজা নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসীর সঙ্গে মিলিত হলাম তখন থেকেই আমার দিলে একটি ক্লেশ ও ব্যথা এসে আসন গ্রহণ করে যা দিন দিন প্রবল থেকে প্রবলতরভাবে বর্ধিত হতে থাকে।[২]

---

১. মানাকিবুল আসফিয়া, পৃ. ১৩২-৩৩।

২. মানাকিবুল আসফিয়া, পৃ. ১৩৩।

যখন তিনি বেহ্য়া[১] নামক স্থানে পৌঁছেন এবং ময়ূরের ঝংকার শোনেন, তখন তাঁর দিলের মাঝে একটি ব্যথা মোচড় দিয়ে ওঠে এবং সকল ধৈর্য ও সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়। অতঃপর তিনি গিরীবন চক জঙ্গলের পথ ধরেন এবং আত্মগোপন করেন। ভাইসহ সফরের সঙ্গী-সাথীরা অনেক খোঁজাখুজি সত্ত্বেও কোনরূপ সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়। অবশেষে তারা এজাযতনামা এবং খাজা নাজীবুদ্দীন (র)-এর তাবাররুক নিয়ে ফিরে আসেন এবং এসব কিছুই ওয়ালিদা সাহেবার হাওয়ালা করেন।[২]

রাজগীরের জঙ্গলে

কথিত আছে যে, তিনি বার বছর পর্যন্ত বেহ্য়ার জঙ্গলে কাটান। তখন কেউ তাঁকে জানতেও পারেনি। এরপর তাঁকে রাজগীর[৩]-এর জঙ্গলে দেখা গেছে, কিন্তু কারও সাক্ষাত লাভের সুযোগ ঘটেনি। এই পাহাড় ও জঙ্গলটি প্রতিটি ফিরকা এবং প্রতিটি ধর্মের ও জাতিগোষ্ঠীর রিয়াযতে লিপ্ত সাধক ও 'আবেদ শ্রেণীর লোকদের নির্জনবাসের জন্য প্রসিদ্ধ। গৌতম বুদ্ধও বছরের পর বছর ধরে এখানে বসে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কাল কাটান। যে সময় মাখদূম সাহেব (র) এখানে মুজাহাদা ও রিয়াযতে মশগুল ছিলেন সে সময় এখানে স্থানে স্থানে হিন্দু যোগীরাও নির্জনবাস করছিল। বিভিন্ন গ্রন্থে সে সব হিন্দু যোগীর সঙ্গে তাঁর কতিপয় কথোপকথনের বর্ণনাও দৃষ্ট হয়। পাহাড়ের পাদদেশে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ সংলগ্ন হযরত মাখদূম (র)-এর হুজরা আজও বর্তমান। 'মাখদূম কুণ্ড' নামেও একটি ঝরণা বিখ্যাত হয়ে আছে।

---

১. বেহ্য়া মুনায়র থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দূরে পশ্চিমে শাহআবাদ' (আরা) জেলায় অবস্থিত। বর্তমানে এটি ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের একটি স্টেশন।

২. মানাকিবুল আসফিয়া, পৃ. ১৩৩।

৩. ডক্টর হান্টার গেজেটিয়ার এ লিখেছেন, রাজগীরের পাহাড় দু'টি কেল্লার সমান্তরাল রেখার আকারে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে চলে গেছে–যার মাঝে একটি সংকীর্ণ উপত্যকা রয়েছে–যার স্থানে স্থানে নালা ও গুহা কর্তন করছে। এই পাহাড় যা কোথাও হাযার ফুটের অধিক উচ্চ নয়, বিরাটাকৃতি প্রস্তরখণ্ড দ্বারা মণ্ডিত এবং ঘন ঝোপঝাড় দ্বারা আবৃত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। প্রাচীনত্বের একটি বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। কেননা এর ওপর অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মের পুরাতন স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া যায়। জেনারেল কানিংহাম বলেন যে, চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং (Hiuen Tsiang) যে কপুটিকা (Kapotika) পাহাড়ের উল্লেখ করেছেন, তা এটাই। উষ্ণ প্রস্রবণ এখানে বহু। ড. বুকানিন হ্যামিল্টন বলেন যে, এই রাজগীরই সেই রাজগৃহ যেখানে গৌতম বুদ্ধের আবাস ছিল এবং প্রাচীন মগধের রাজধানী ছিল। নতুন রাজগীরের দুই-তৃতীয়াংশ বর্গমাইল পুরাতন শহর থেকে দূরে অবস্থিত। সীরাতুশ্-শরফ; পৃ. ৬৫-৬৭, সংক্ষিপ্ত।

এই বারটা বছরের পুরো সময়কাল তিনি রিয়াযত ও মুজাহাদা, নির্জনবাস ও মুরাকাবা, অত্যাশ্চর্য ও ভবঘুরে অবস্থা এবং আত্মহারা ও অচৈতন্য অবস্থার মাঝ দিয়ে অতিবাহিত করেন। জঙ্গলের পাতা খাদ্যের কাজ দিত। সে সময়কার কঠোর রিয়াযত সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে একবার তিনি স্বীয় মুরীদ কাযী যাহিদকে বলেছিলেন, "আমি যে রিয়াযত করেছি সে রিয়াযত যদি পাহাড়ও করত তবে সে গলে পানি হয়ে যেত। কিন্তু শরফুদ্দীন কিছুই হল না।" তাঁর বর্ণিত একটি ঘটনা এবং বলার ধরন থেকে জানা যায় যে, তিনি উক্ত রিয়াযত, কঠোর পরিশ্রম ও সাধনায় খুব বেশি তৃপ্ত ছিলেন না। গোসলের একটি ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, তিনি 'আযীমত-এর খেলাফ মনে করে শরীয়ত প্রদত্ত রুখসতের ওপর আমল করেন নি। একবার ভীষণ শীতে ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করার কারণে তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই অপ্রয়োজনীয় কষ্টের পুরস্কার এই মিলেছিল যে, সেদিনের ফজরের সালাত কাযা হয়ে গিয়েছিল।[১]

বিহারে বসবাস এবং খানকাহ্ নির্মাণ

সে যুগেই সুলতানুল মাশায়িখ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর একজন খলীফা, যার নামও ছিল মাওলানা নিজামুদ্দীন, বিহারে বসবাস করতেন। তিনি মাওলানা নিজাম মওলা নামে মশহুর ছিলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, কেউ কেউ রাজগীরের জঙ্গলে গিয়েছিল এবং মাখদূম সাহেব (র)-এর সঙ্গে তাদের মুলাকাতও হয়েছে, তখন তার মনেও তাঁর সাক্ষাতের আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠল। তিনি এবং তাঁর কতিপয় ভক্ত-অনুরক্ত সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে মুলাকাত করেন। এরপর তিনি মাঝে মধ্যেই জঙ্গলে গিয়ে হযরত মাখদূম (র)-এর সঙ্গে মিলিত হতেন। মাখদূম সাহেব (র) সত্যের প্রতি তার তীব্র অন্বেষা এবং ইখলাস (একনিষ্ঠতা) দেখে বলেন, এই জঙ্গল অত্যন্ত বিপদসংকুল ও ভয়াবহ। তোমার আগমনে আমি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। তোমরা শহরেই থাক। আমি জুম'আর দিন শহরে আসব এবং জামে' মসজিদেই মুলাকাত হবে। লোকজন সবাই এই সিদ্ধান্ত মঞ্জুর করল। মাখদূম সাহেব (র) জুম'আর দিন শহরে আসতেন এবং এক প্রহর মাওলানা নিজামুদ্দীন ও তাঁর অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে কাটিয়ে জঙ্গলে ফিরে যেতেন। একটা দীর্ঘ সময় এভাবেই অতিবাহিত হল। পরে সে সব ভক্ত-অনুরক্তের দল পরস্পরের ভেতর পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়

---

১. সীরাতুশ্-শরফ, পৃ. ৭২।

যে, এমন একটি জায়গা নির্মাণ করা উচিত যেখানে তিনি জুম'আর সালাত আদায় করার পর কিছুক্ষণ আরাম করতে পারেন। অতঃপর বীরজুন শহরে– যেখানে এখন তাঁর খানকাহ্ অবস্থিত– সেখানে দু'টি ছাপড়া ফেলে দেন তারা। তিনি জুম'আর সালাত আদায় শেষ করে উঠতেন এবং সেখানে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে বসতেন। আবার কখনও কখনও দু'একদিন অবস্থান করেও যেতেন। এরপর মাওলানা নিজামুদ্দীন বিহার প্রদেশের সুবেদার (গভর্নর) মাজেদুল-মুল্‌ক-এর অনুমতি নিয়ে স্বীয় হালাল ও পবিত্র অর্থ-কড়ি দিয়ে একটি পাকাপোক্ত ইমারত তৈরি করে দেন। ইমারত নির্মিত হলে সেখানে তিনি একটি দাওয়াত দেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর ভক্ত মুরীদবর্গ এতে শরীক হন এবং তাঁরা মাখদূম সাহেব (র)-কে গদ্দীনশীন হবার জন্য দরখাস্ত পেশ করেন। সবার অনুরোধে তিনি এতে রাযী হন।

এই ঘটনা ৭২১ হিজরী থেকে ৭২৪ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত হয়।[১] সময়টা ছিল সুলতান গিয়াছুদ্দীন তুগলকের রাজত্বকাল।

৭২৫ হিজরীতে সুলতান মুহাম্মাদ স্বীয় পিতার স্থলাভিষিক্ত ও রাজকীয় সিংহাসনে সমাসীন হন। তিনি মাশায়িখ, সুফিয়ায়ে কিরাম এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে তাঁদের নির্জনবাস থেকে বাইরের জনজীবনে টেনে আনতে এবং উৎসাহ ও ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে আল্লাহ্‌র প্রিয় সৃষ্টির খেদমত ও হিদায়াতে আত্মনিয়োগে উৎসাহিত করতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন, আর এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় চেষ্টা-তদবীর চালাতেন। তিনিই হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর প্রিয় খলীফা হযরত খাজা নাসীরুদ্দীন চেরাগের দিল্লী (র)-কে শাহী লশকরের সঙ্গে যেতে বাধ্য করেন। হযরত খাজা (র)-এর অপর খলীফা মাওলানা ফখরুদ্দীন যার্‌রাবী (র) ও মাওলানা শামসুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া (র) প্রমুখকে মিম্বরে উপবেশন করে বক্তৃতাদানে এবং জনগণকে জিহাদে আগ্রহান্বিত করে তুলতে বাধ্য করেন। শায়খ কুতবুদ্দীন মুনাওয়ার হাঁসোভী (র)-কে তাঁর নির্জন আবাসগৃহ থেকে বের করে দিল্লী ডেকে পাঠান।[২] তিনি যখন গুপ্তচর মারফত খবর পেলেন যে, মাখদূম সাহেব (র) বছরের পর বছর জঙ্গলে কাটানো ও বহিঃজগতের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতির পর শহরের বুকে পদার্পণ করেছেন এবং

---

১. 'সীরাতুশ্-শরফ' প্রণেতা মওলবী সায়্যিদ জমীরুদ্দীন আহমদ–বহু কার্যকারণ ও দলীল-প্রমাণ দ্বারা এটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন যে, মাখদূম (র)-এর বসবাসের কাল ৭২১ থেকে ৭২৪ হিজরীর মধ্যবর্তীকাল ছিল। বিস্তারিত-সীরাতুশ্-শরফ পৃ. ৮১।

২. বিস্তারিত এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর বর্ণনায় গেছে।

লোকজনের সঙ্গে উঠাবসা শুরু করেছেন, তখনই তিনি সুবে বিহারের সুবেদার মাজেদুল মুল্‌ক-এর নামে ফরমান লিখে পাঠালেন যে, শায়খ (র)-এর জন্য যেন একটি খানকাহ্‌ নির্মাণ করা হয় এবং রাজগীর পরগণাকে খানকাহ্‌র দরিদ্র মেহমান ও অভ্যাগতদের ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁর হাতে সোপর্দ করা হয়। তিনি যদি তা কবূল না করেন তবে যবরদস্তি করেও যেন কবূল করানো হয়। তিনি এই সঙ্গে একটি বুলগেরীয় মুসাল্লা (জায়নামায) তাঁর খেদমতে পাঠান।

এই শাহী ফরমান মাজেদুল মুল্‌ক-এর নিকট পৌঁছুলে তিনি হযরত মাখদূম (র)-এর খেদমতে হাযির হন এবং আরয করেন যে, বাদশাহ্‌ যা কিছু লিখেছেন আমার কি সাধ্য যে আমি তা তা'মিল না করি। কিন্তু আপনি যদি বাদশাহ্‌র এই দান কবূল না করেন তবে বাদশাহ এেকে তাঁর নির্দেশের প্রতি ব্যত্যয় ও অবহেলা প্রদর্শন হিসেবে ধরে নেবেন। আর এক্ষেত্রে বাদশাহ্‌র আচরণ কেমন হবে তা তো সবারই জানা। আল্লাহ্‌ই জানেন আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা হবে। মাখদূম (র) মাজেদুল মুল্‌ক-এর মজবূরী ও অসহায় অবস্থার কথা ভেবে এবং তৎকর্তৃক বারবার অনুরুদ্ধ হয়ে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত চিত্তে তা কবূল করেন। কিন্তু সুলতানের ওফাতের পর সুলতান ফীরোয শাহ তুগলক সিংহাসনে আরোহণ করলে তিনি প্রদত্ত জায়গীরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।[1] খানকাহ্‌র নির্মাণ শুরু হল এবং অল্প দিনেই এর নির্মাণ সুসম্পন্ন হল। 'সীরাতুশ-শরফ' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

> খানকাহ্‌র নির্মাণ শুরু হল এবং অতি অল্পদিনেই তা সম্পন্ন হল। মাজেদুল মুল্‌ক লঙ্গরখানার সমস্ত দরিদ্র অধিবাসী, সূফী সম্প্রদায় এবং শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর মুরীদবর্গকে দাওয়াত করেন। মজলিসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জামাতখানার প্রাঙ্গণে সামা' হতে থাকে। একটি আলাদা জায়গা, যেখানে একটি রোয়াক ছিল, মাখদূম (র)-এর জন্য ঠিকঠাক করা হয় এবং বাদশাহ প্রেরিত পূর্বোল্লিখিত বুলগেরীয় মুসাল্লা সেখানে বিছানো হয়। মাখদূম (র) তার ওপর উপবেশন করেন। মজলিসে উপস্থিত একজন মুসাফির দরবেশ আপন জায়গা ছেড়ে উঠে মাখদূম (র)-এর হুজরায় প্রবেশ করেন। মাখদূম (র) তার দিকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ এই মনযিল (স্থান) ও মকাম তোমাদের। আমি তো শুধু মাজেদুল মুল্‌ক-এর হুকুম তা'মিল করছি মাত্র। কেননা 'উলিল-আমর' (শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তি)-এর আনুগত্য ব্যতিরেকে কোন গত্যন্তর নেই।

১. মানাকিবুল আসফিয়া, পৃ. ১৩৫।

এখানে যা কিছু রয়েছে তা ফকীর ও দরিদ্র লোকদের জন্য সাদকা। আমি ইসলামের জন্যই তো উপযুক্ত নই, আর এই মুসাল্লার জন্য তো বহু দূরের কথা।

উক্ত ফকীর বললেন ঃ

মাখদূম! আপনাকে খানকাহ্ এবং মুসাল্লার কারণে কেই-বা চেনে। আপনাকে যারা চেনে তারা একমাত্র সত্যের কারণেই চেনে। আমরা যারা এখানে এসেছি তারা একমাত্র আপনার বাতিনী শক্তি এবং আপনারই খাতিরে এসেছি। এখানে আপনার বরকতে ইসলাম প্রকাশ পাবে এবং শক্তি সঞ্চয় করবে।

মাখদূম (র) বললেন ঃ

ফকীরদের যবান দিয়ে যা বের হয় সেটাই ঘটে থাকে।

উপদেশ ও হিদায়াত প্রদান

তিনি ৭২৪ হিজরী থেকে ৭৮২ হিজরী পর্যন্ত (যে বছরে তিনি ওফাত পান) কম সে কম অর্ধ শতাব্দীকালেরও অধিক সময় পর্যন্ত আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলকে হিদায়াত ও সৎপথ প্রদর্শন এবং শিক্ষার্থীদের তা'লীম ও তরবিয়ত প্রদানে অতিবাহিত করেন। শায়খ হুসায়ন মু'ঈয্য বলখীর মতে–এই সময়ের মধ্যে এক লক্ষের অধিক মানুষ তাঁর মুরীদ দলভুক্ত হয় যার ভেতর কতিপয়ের মতে–কম-সে-কম তিনশত জন এমন ছিলেন যাঁরা ওলীয়ে কামিল ও 'আরিফ এবং পরম সত্যের সান্নিধ্যে পৌঁছেছিলেন। কতিপয় হিন্দু ফকীর তথা যোগী সন্ন্যাসী ইসলাম কবূল করে তাঁরই হাতে কামালিয়াত ও হাকীকতের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে।

জনগণকে সৎপথ প্রদর্শন ও প্রশিক্ষণ দানের বিরাট বড় মাধ্যম ও কেন্দ্র ছিল তাঁর সেই সব মজলিস যার মধ্যে মাশায়িখে কিরামের দস্তুর মুতাবিক প্রত্যেক শ্রেণীর লোকজনের হাযির হবার এবং অনুষ্ঠিত মজলিস থেকে উপকৃত হবার এজাযত ছিল। ভক্ত-অনুরক্ত ও শিক্ষার্থীর দল এসব মজিলসে শরীক হতেন। কোন লোকের কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবার থাকলে জিজ্ঞাসা করত এবং সন্তোষজনক জবাবও মিলত। এসব মজলিসে আলাপ-আলোচনার কোন স্থায়ী ও নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু ছিল না। যা কিছু আল্লাহ্ পাক তাঁর অন্তরে উদয় ঘটাতেন, তাই তিনি বলতেন। এই মজলিস গভীর মা'রিফত, হাকীকত ও তাসাওউফ-এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পয়েন্ট ও চুলচেরা বিশ্লেষণের ওপর নির্ভরশীল হত। যয়েন বদর 'আরাবী "মি'দানুল মা'আনী' নামক তাঁর বাণী-সংকলনের ভূমিকায় লিখেছেন ঃ

প্রতিটি মজলিসে এবং সুযোগ আসামাত্রই সত্য-সন্ধানী, অটল ও দৃঢ় বিশ্বাসী মুরীদবর্গ এবং হাযিরানে মজলিস যারা এর সঙ্গে সম্পর্কিত, তারা তরীকত

সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কিংবা শরীয়তের কোন শিক্ষার বিশ্লেষণ করার জন্য দরখাস্ত করত এবং মা'রিফতের গোপন রহস্য কিংবা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত শুনতে চাইত। হযরত মাখদূম (র) প্রত্যেক প্রশ্নকারীর সন্তোষজনক জবাব প্রদান করতেন এবং অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক পন্থায় তাকে বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর উপদেশ ও বাণী বড় বড় সূক্ষ্ম পয়েন্ট এবং অত্যন্ত মূল্যবান উপকারিতা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াবলীতে সমৃদ্ধ হত। প্রত্যেক প্রশ্নকর্তা ও প্রশ্নের অবস্থা মাফিক তিনি এমন বক্তৃতা দিতেন যাতে আনন্দের আমেজ সৃষ্টি হত যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না এবং এমন সব মকামের সন্ধান মিলত যা এই সীমাবদ্ধ অনুভূতির জগতে ধারণযোগ্য নয়।

কখনো কখনো দীনিয়াত কিংবা তাসাওউফ সম্পর্কিত কিতাবাদিও মজলিসে পঠিত হত। মাখদূম (র) এক-একটি মসলার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন। ফিক্হ, উসূলে হাদীছ, তাফসীর, তাসাওউফ সব কিছু নিয়েই আলাপ-আলোচনা হত। হাযিরানে মজলিস, বিশেষ করে 'উলামায়ে কিরাম এথেকে বেশি উপকৃত হতেন। উপদেশ প্রদান ও তরবিয়তের দ্বিতীয় মাধ্যম (বিশেষ করে সে সমস্ত লোকের জন্য যারা অন্য কোন জগতে বিরাজ করতেন) ছিল তাঁর লিখিত মকতূবাত (চিঠিপত্র)। হযরত মুজাদ্দিদ আলফে-ছানী (র.) ভিন্ন (যাঁর মকতূবাত জীবন্ত ও চিরঞ্জীব একটি কীর্তি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 'ইলমে মা'রিফতের একটি মহামূল্যবান ভাণ্ডার) সম্ভবত অপর কেউ স্বীয় কলম ও লেখনী শক্তির সাহায্যে এবং চিঠিপত্র ও বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে এতবড় বিরাট আলোড়ন সৃষ্টিকারী সুদূর-প্রসারী সংস্কার ও তরবিয়তের খেদমত দেননি। শুধুমাত্র তাসাওউফের ভাণ্ডারেই নয়, বরং 'ইল্ম ও মা'রিফত, বিভিন্ন পয়েন্ট ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের বিশ্বব্যাপী ভাণ্ডারে মকতূবাতের এ সংকলন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে গোটা ফারসী সাহিত্যে খুব কম পুস্তকই উক্ত পুস্তকের সমতুল্য। উক্ত মকতূবাত হযরত মাখদূম (র)-এর আমলেও সংস্কার, নৈতিক পরিশুদ্ধি ও প্রশিক্ষণের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে এবং সেই সব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছাড়াও—যাদের নামে আসলে চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল —শত শত ব্যক্তি এথেকে কামিল ও মুহাক্কিক শায়খের 'শ্বাস-প্রশ্বাস' ও তাওয়াজ্জুহ্র ফায়দা উঠিয়েছে। হযরত মাখদূম (র)-এর ওফাতের পর প্রতিটি শতাব্দীতেই হাযার হাযার মানুষ এথেকে ফায়দা হাসিল করেছে। খানকাহ্গুলিতে এর দরস দেওয়া হয়েছে, মহান বুযর্গগণ এর ওপর বক্তৃতা দিয়েছেন, বিশ্লেষণ করেছেন এবং কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে যাবার পর আজও তার ভেতর এমন তা'ছীর ও স্পন্দন বিদ্যমান যে, মনে হয় লেখক বুঝি এইমাত্র তা লিখেছেন এবং এখনও এর শব্দসমষ্টি ধারালো ফলকের মত অন্তরের এপাশ থেকে ওপাশ বিদীর্ণ করে দেয়।

চতুর্থ অধ্যায়

গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

আত্মবিলুপ্তি

হযরত মাখদূম শায়খ শরফুদ্দীন মুনায়রী (র)-এর সবচেয়ে উজ্জ্বল ও উল্লেখযোগ্য গুণাবলী যা তাঁর মেযাজ ও রুচিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং যে ব্যাপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক– তা ছিল অস্তিত্বহীনতা, আত্মবিলুপ্তি যা কঠোর মুজাহাদা ও রিয়াযতের মহোত্তম ফল এবং আধ্যাত্মিক পথের পথিক (সালিক)-এর জন্য উন্নততর কামালিয়াতের প্রতীক। তাঁর মকতূবাতের প্রতিটি শব্দ এবং তাঁর উপদেশ ও বাণীর প্রতিটি হরফ থেকে এর প্রকাশ ঘটেছে।

কুবরোবিয়া সিলসিলার মাশায়িখে কিরামের এই বিশিষ্ট রীতিনীতি এবং ইমামে তরীকা হযরত শায়খ নাজমুদ্দীন কুবরা (র)-এর এই ছিল উত্তরাধিকার যার তিনি পুরোপুরি ওয়ারিছ হন।

'মানাকিবুল আসফিয়া' গ্রন্থে রয়েছে যে, এক সময় সে যুগের মাশায়িখে কিরাম একত্রিত হয়েছিলেন। প্রত্যেকেই যার যার দিলের আরযূ ব্যক্ত করেন। শায়খ মাখদূম (র)-এর পালা আসলে তিনি বলেন ঃ

> আমার আরযূ এই যে, এ দুনিয়ার বুকে আমার নাম-নিশানাও যেন অবশিষ্ট না থাকে এবং পর জগতেও।

একটি পত্রে স্বীয় ক্রন্দনমুখর অবস্থার প্রতি বিলাপ ও মাতমের যরূরত (প্রয়োজনীয়তা) ও ফযীলত সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন তা ছিল সরাসরি নিজেরই অবস্থা এবং স্বীয় অন্তর্নিহিত স্বরূপেরই প্রতিফলন ও প্রকাশ। তিনি বলেন ঃ

> আরিফগণের উক্তি যে, আল্লাহ্র কসম! পুনরপি আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিজের জন্য কান্নাকাটির আওয়াজ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় কোন আওয়াজ নেই। অতএব উচিত এই যে, আজ এই পথের যিনি সিদ্দীক এবং দীন ও ধর্মের নেতা, তিনি বিলাপ ও আহাজারী যেন খাজা উয়ায়েস

করনী (র) থেকে শিখেন। হে ভ্রাত! যে প্রতিটি মুহূর্তে নিজের ওপর মাতম ও আহাজারী করে না, সে এমন একজন দাবিদার যে কিয়ামত সম্পর্কে গাফিল এবং একজন মৃত লাশ যার অন্তর দুঃখ ও আফসোস দ্বারা পরিপূর্ণ। এটা কেমনতরো মিথ্যা প্রবৃত্তি যে, আজ সবার মস্তিষ্কেই এরই কেনাবেচা চলছে! প্রত্যেক ব্যক্তিই এটা চাচ্ছে যে, পার্থিব জাঁকজমক হওয়া দরকার এবং আমাদের প্রদত্ত বিধি-বিধানের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালিত ও প্রচলিত হওয়া উচিত, উচিত দুনিয়ার সম্পদ, প্রাচুর্য আর মান-ইয্যতের অধিকারী হওয়া। আবার এসবের সাথে সাথে আল্লাহ্‌র সঙ্গেও পরিচয়ের সূত্র নিবিড় হওয়া দরকার। আল্লাহ্‌র কসম! এটা অসম্ভব, হতে পারে না।

অপর এক পত্রে তিনি যে আত্মহনন, অস্তিত্বহীনতা ও আত্ম দুশমনীর নসীহত করেছেন, তাও ছিল সরাসরি নিজেরই অবস্থা ও প্রতিচ্ছবি এবং নিশ্চিতভাবেই এ পত্র কামালিয়াতের সেই পর্যায়ে পৌঁছবার পর লেখা হয়েছিল যে অবস্থায় পৌঁছানো ব্যতিরেকে আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌ ও তরীকতের কামিল ব্যক্তিগণ তার দাওয়াত প্রদানকে মুনাফিকী এবং لما تقولون مالا تفعلون (তোমরা কেন তা বল যা তোমরা নিজে কর না)-এর বাস্তবায়ন বলে মনে করেন।

অপর এক পত্রে কোনরূপ ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়াই স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে স্বীয় দুরবস্থা সম্পর্কে তিনি অভিযোগ ও বিলাপ করছেন ঃ

আমরা দুর্ভাগ্য, দুর্ভোগ ও বিপদে জড়িয়ে রয়েছি। আমরা দুনিয়ার গোলামী করছি। প্রবৃত্তি ও স্বভাবের দাসত্ব বরণ, অলস পথের পৈতা ধারণ এবং স্বভাব ও অভ্যাসের পূজা করা ছাড়া আমাদের কোন কাজ নেই। আর অলস ও গাফিল ব্যক্তিদের খাতায় ছাড়া অন্য কোথাও আমাদের নামও নেই। আল্লাহ্‌ওয়ালা মানুষের রাস্তায় চলি এবং তওহীদের অনুসারী বলে আমাদের যে দাবি তা তো গালভরা বুলি, বাগাড়ম্বর ও অন্ধত্বপণার কারণ ভিন্ন আর কিছু নয়। আমাদের অবস্থা তো এই যে, আমাদের দুর্ভাগ্যে ইয়াহূদী, অগ্নিপূজক, গির্জা ও মন্দিরের অধিবাসীরাও আজ লজ্জা পায়।

হযরত শায়খ মাখদূম (র) থেকে যে মুনাজাত বর্ণিত হয়েছে, তা তাঁর দিলের অবস্থা, আবেগ ও অনুভূতিরই পূর্ণ প্রতিধ্বনি।

এই অস্তিত্বহীনতা ও অস্তিত্ব বিলুপ্তির স্বাভাবিক ও অপরিহার্য পরিণাম এই ছিল যে, মানুষের নিন্দাবাদ ও প্রশংসা বাক্য তাঁর ক্ষেত্রে ছিল সমান। একটি পত্রে তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজেরই কাহিনী শোনান ঃ

আল্লাহ্ প্রেমিকগণের সৃষ্টি জগতের প্রশংসা ও স্তুতি কিংবা নিন্দাবাদ ও প্রত্যাখ্যানে কিইবা ক্ষতি? তাদের কাছে তো সৃষ্টি জগতের কুৎসা ও স্তুতি সব সমান। সে ভাল নয় যে সৃষ্টি জগতের সবার নিকট ভাল এবং মন্দ কিংবা খারাপ সে নয় যে সৃষ্টিজগতের সবার নিকট মন্দ কিংবা খারাপ ; বরং প্রশংসিত জন তিনিই, যিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রশংসিত এবং নিন্দিত ও মন্দ সেই যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিন্দিত কিংবা মন্দ।

এই অস্তিত্বহীনতা ও আত্মহারা অবস্থার পরিণতি এই ছিল যে, যদিচ আল্লাহ্র দরবারের মকবূল বান্দাদের সঙ্গে আল্লাহ্র যে কায়-কারবার, তারই ভিত্তিতে হযরত মাখদূম (র) থেকে অধিক সংখ্যায় কারামত ও অন্যান্য আশ্চর্যজনক কার্য সংঘটিত হত, কিন্তু তিনি নিজের এই মেযাজ ও অবস্থার কারণে কারামত প্রকাশের প্রতি অত্যন্ত বিতৃষ্ণা বোধ করতেন এবং এমন কোন জিনিসকেই তিনি পসন্দ করতেন না যদ্দারা তাঁর মর্তবা ও আল্লাহ্র দরবারে তাঁর মকবূল বান্দা হওয়ার কথা প্রকাশ পায়। 'মানাকিবুল আসফিয়া' প্রণেতা লিখেন ঃ

যদিও তাঁর সকল কর্মের ভিত্তি ছিল অলৌকিকতা ও কারামতের ওপর, তবু কারামত প্রকাশে তিনি ছিলেন নারায। তিনি তাঁর দুর্বলতা ও অসহায় অবস্থাই প্রকাশ করতেন। যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজ কিংবা কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য কোনরূপ সাহায্যের প্রত্যাশী হত তবে তিনি তাকে মীরান জালাল দেওয়ানার কাছে সোপর্দ করে দিতেন।[1]

এটা ছিল সেই যুগ যে যুগের বুযর্গদের কারামত ও অলৌকিকতার আলোচনা চলত ঘরে ঘরে এবং জনসাধারণ একেই আল্লাহপ্রাপ্তি ও তাঁর মনোনীত বান্দাহ হবার আলামত মনে করত।

'মানাকিবুল আসফিয়া' গ্রন্থে রয়েছে যে, একবার কতিপয় লোক কিছু মৃত মাছি নিয়ে হযরত মাখদূম (র)-এর কাছে আসে এবং বলে যে, বিখ্যাত উক্তি যে, الشيخ يحيى ويميت। (শায়খ জীবিত করেন এবং মারেন)। আপনি হুকুম দিন যেন এ মাছি গুলি জীবিত হয়ে ওঠে। তিনি বললেন, আমি নিজেই তো মৃতপ্রায় দুর্ভাগা ; অন্যকে কী জীবিত করব!

আখলাক ও মহান চরিত্র

সূফিয়ায়ে কিরামের আখলাক ও চরিত্র নবুওতের উজ্জ্বল আলোকমালা দ্বারা সমৃদ্ধ ও আলোকিত হয়ে থাকে। এজন্য ঐ সমস্ত হযরতের চরিত্র ও আখলাক

১. মানাকিবুল আসফিয়া, পৃ. ১৩৫।

সেই মহান ব্যক্তির চরিত্রের প্রতিবিম্ব যে সম্পর্কে কুরআনুল করীমে স্পষ্ট সাক্ষ্য ঃ انك لعلى خلق عظيم (নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত) বিদ্যমান। 'মানাকিবুল আসফিয়া' প্রণেতা লিখেছেন ঃ

اخلاق شيخ شرف الدين مانند اخلاق نمى بود -

> শায়খ শরফুদ্দীনের চরিত্র ও আখলাক নবী (স)-এর চরিত্র ও আখলাকের মতই ছিল।

তাঁর মতে নবী (স)-এর চরিত্র দ্বারা ভূষিত হওয়া এবং নবী (স)-এর মহান জীবন-চরিতের ছাঁচে নিজেকে ঢেলে সাজানো কতখানি জরুরী ছিল তা তার লিখিত মকতূবাতের উদ্ধৃতি থেকেই পরিষ্কার পরিমাপ করা যাবে। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল স্বয়ং তাঁর নিজেরই অবস্থা যেটাকে একটা মূলনীতি হিসেবে এখানে বর্ণনা করা যাচ্ছে ঃ

> আর প্রকৃত চরিত্র ও আখলাক সেটাই যা তরীকতের জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। তাঁরা নিজেদের সকল অবস্থায় শরীয়তের পায়রবী করেন এবং নিজেদের আখলাককে রাসূল করীম (স)-এর সুন্নাহ্ (জীবনাদর্শ)-এর কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করে দেখেন। আর যিনি শরীয়তকে বিশ্লেষণ করেন না, তার তরীকত (তাসাওউফ)-এর কিছুই হাসিল হয় না।[১]

অপর এক পত্রে তিনি বলেন ঃ

> যিনি যত বেশি শরীয়তের অনুসরণে দৃঢ় হবেন তিনি তত বেশি উত্তম ও মহান চরিত্রের অধিকারী হবেন, আর যিনি যত বেশি উন্নত ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী হবেন তিনি তত বেশি আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হবেন। উত্তম চরিত্র আদম (আ.)-এর উত্তরাধিকার (মীরাছ) এবং আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত তুহ্ফা। অতএব অপরিহার্যভাবেই ঈমানদারের পক্ষে উত্তম চরিত্র থেকে অধিকতর উত্তম পদ্ধতি এবং অপর কোন সৌন্দর্য ও অলংকারের বস্তু নেই। আর উত্তম চরিত্র ও আখলাকের হাকীকত আল্লাহ্ তা'আলার আহকাম পালন এবং তাঁরই প্রেরিত রাসূল (সা.)-এর আনীত শরীয়তের অনুসরণ করা। কেননা সারওয়ারে কায়েনাত (সা.)-এর সমস্ত কার্যকলাপ ও চলাফেরা সব সময়ই (স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির নিকট) পসন্দনীয় ছিল এবং যে কেউই হুযূর আকরাম (সা.)-এর অনুসরণ করে তার উচিত সে যেন তার জীবন ও যিন্দেগী তেমনিভাবে অতিবাহিত করে যেমনিভাবে অতিবাহিত করে গেছেন স্বয়ং রাসূল করীম (স)।[২]

---

১. মানাকিবুল আসফিয়া, পৃ. ৫৯। ২. ৬৪তম পত্র ।

হযরত শায়খ মাখদূম (র)-এর অবস্থা ও জীবন-চরিত্র বলে দেয় যে, তিনি তাঁর চরিত্র ও আখলাককেও নবী করীম (স)-এর পদাংক অনুসরণ করতে পুরোপুরি কোশেশ করেছেন এবং তাঁর আখলাক, আল্লাহ্র সৃষ্টি জগতের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার, দয়া ও স্নেহ, মানুষের দোষক্রটিকে প্রচ্ছন্ন রাখা এবং আল্লাহ্র বান্দাহ্গণের মনকে সান্ত্বনা প্রদান করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন হুযূর আকরাম (স)-এর মহান ও উন্নততর চরিত্রের অনুসারী ও একটি বাস্তব নমুনা।

স্নেহ ও করুণা

তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমলহৃদয়, আল্লাহ্র বান্দাহ্গণের অধিকারের বেলায় অত্যন্ত সদয় ও সহানুভূতিশীল, বন্ধুবৎসল এবং শত্রুর প্রতি দয়ালু। 'আরিফ ও আল্লাহ্র বান্দাহ্দের মকাম ও মর্যাদা এবং জীবন-যাপন পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি যা কিছু লিখেছেন তা তাঁরই সত্যিকার চিত্র। তিনি বলেন ঃ

> তাঁর (সূফীর) রহমত ও স্নেহ-রশ্মি প্রত্যেকটি বস্তুর ওপরই পতিত ও চমকিত হয়। নিজে খান না, মানুষকে খাওয়ান; নিজে পরিধান করেন না, মানুষকে পরিধান করান। মানুষ তাঁকে যে কষ্ট দেয় তার প্রতি তিনি ভ্রুক্ষেপও করেন না এবং তাদের কৃত যুলুমের প্রতিও দৃষ্টি ফেরান না। তাঁর প্রতি যারা যুলুম করে তিনি তাদেরই সুপারিশকারী হন। বিশ্বাসঘাতকের প্রতিশোধ নেন বিশ্বস্ততা দিয়ে আর গালির বদলা নেন শুভ কামনা ও প্রশংসাগীতির মাধ্যমে। তুমি কি জান তিনি এসব কেন করেন? এজন্য যে, তিনি সব কিছু থেকেই নিরাপদ। তাঁর দিলের খোলা দিগন্ত রেখা থেকে সৃষ্টির প্রতি প্রশান্তি বায়ু ভিন্ন আর কিছুই প্রবাহিত হয় না। স্নেহ ও করুণার ক্ষেত্রে তিনি সূর্যের ন্যায় উদার। তাঁর রশ্মি দোস্তের ওপর যেমন চমকিত ও প্রতিফলিত হয়, তেমনি প্রতিফলিত হয় দুশমনের ওপরও। বিনয়ের ক্ষেত্রে তিনি হন যমীনের ন্যায়। গোটা সৃষ্টিকুল তাঁর ওপর পা রাখে, করে নিত্য পদদলিত–কিন্তু তিনি কারও সঙ্গে ঝগড়া করেন না, বিবাদ করেন না। সৃষ্টির ওপর অত্যাচার চালাতে তাঁর হাত সংকুচিত হয়। গোটা সৃষ্টি জগতটাই তো তার পরিবার বিশেষ, কিন্তু তিনি কারও পরিবারের সদস্য নন। দানশীলতার ক্ষেত্রে তিনি সমুদ্রের ন্যায় অকৃপণ। দুশমনকে ঠিক তেমনি প্রতিপালন করেন যেমন করেন দোস্তকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গোটা জগতের ওপর করুণা আর স্রেফ করুণা হয়েই তিনি বর্ষিত হন। কেননা তিনি চিরমুক্ত, চির আযাদ। যা কিছু দেখেন একই জায়গা থেকে দেখেন (অর্থাৎ তামাম মাখলুককে তাঁরই পবিত্র সত্তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত মনে করেন)। তাঁর চোখ

সামগ্রিকতার অধিকারীর চোখ হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি এসব গুণ দ্বারা গুণান্বিত না হয়, তার তরীকতে কোন মরতবা ও মকাম হাসিল হয় না।[১]

এই করুণা ও স্নেহের পরিণতি এই ছিল যে, আল্লাহ্‌র কোন বান্দার অন্তরে আঘাত দেওয়া হযরত মাখদূম (র)-এর নিকট ছিল পাপ।

একবার তিনি নফল সিয়াম পালন করছিলেন। এক ব্যক্তি বেশ তোড়জোড় করে তাঁর খেদমতে একটি তুহ্‌ফা নিয়ে আসে এবং বলে যে, আমি অত্যন্ত আগ্রহভরে এটা আপনার খেদমতে এনেছি যেন তা আপনি গ্রহণ করেন। তিনি তখনই সেটা গ্রহণ করেন এবং বলেন ঃ

> সিয়াম ভঙ্গের কাযা আছে, কিন্তু দিল্ (অন্তর, মন) ভঙ্গের তো কোন কাযা নেই।

এর অনিবার্য ফল এও ছিল যে, তিনি সাধ্যমত প্রচ্ছন্নতার আড়ালেই আশ্রয় নিতেন এবং কারো সম্পর্কে কোন গুনাহ্ কিংবা কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি অবগত হলে তার ভিন্নতর ব্যাখ্যা দিতেন।

মানাকিবুল আসফিয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একদিন এক ব্যক্তি আগে বেড়ে গিয়ে ইমামতি করে এবং তিনি তার পেছনে সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে কেউ আরয করল যে, এই ব্যক্তি শরাবখোর। তিনি বললেন, সব সময় পান করে না। লোকেরা বলল, সব সময়ই পান করে। জবাবে বললেন, রমযান মাসে পান করে না বোধ হয়।[২]

দুনিয়ার সাথে সম্পর্কহীনতা

হাকীকী মা'রিফত এবং পরিপূর্ণ 'ইশ্‌ক-এর ফল স্বাভাবিকভাবেই উভয় জগতের সঙ্গে অনাসক্তি ও গা বাঁচিয়ে চলা। তিনি মাজেদুল মুল্‌ক -এর সনির্বন্ধ অনুরোধে এবং তাকে মুহাম্মাদ তুগলকের অসন্তোষ ও রোষবহ্নির হাত থেকে বাঁচাবার তাকীদে খানকাহ্‌র জন্য যে জায়গীর অসন্তুষ্ট চিত্তে কবূল করেছিলেন তা তিনি দরিদ্রের বন্ধু এবং দয়ার্দ্রচিত্ত বাদশাহ্ ফীরোয তুগলকের রাজত্বকালে ফিরিয়ে দেন। আর 'সীরাতুশ্ শরফ'-এর সেই বর্ণনা যদি সত্যি হয়, হয় সঠিক যা 'মু'নিসুল কুলূব' নামক গ্রন্থের বরাত দিয়ে লেখা হয়েছে, তাহল তিনি দিল্লী গমন করে জায়গীরের বাবত প্রদত্ত পরোয়ানা বাদশাহ্‌কে সোপর্দ করেন। এরপর খানকাহ্‌র নির্মাণ ও এর বিস্তৃতির ব্যাপারে আর কোনরূপ সম্পর্ক রক্ষা কিংবা আগ্রহ দেখান নি। যদি কেউ এ ব্যাপারে তাঁকে কোন পরামর্শ দিত, তবে তা তাঁর প্রকৃতিতে বিরূপ ছায়া ফেলত। 'গঞ্জে লা ইয়াখফা' প্রণেতা লিখেছেন ঃ

---

১. ৬৪তম পত্র।

২. মানাকিবুল আসফিয়া, পৃ. ১৪১; সম্ভবত ঘটনাটি রমযান মাসের।

শায়খ হামীদুদ্দীন (র) মাখদূম শায়খ (র)-এর দোস্ত ছিলেন। নির্জনেও তাঁর সঙ্গে থাকতেন। একবার অর্ধেক রাত অতিবাহিত হবার পর মাখদূম (র)-এর খেদমতে হাযির হন। চাঁদনী রাত। মাখদূম (র) বাইরে বের হয়ে আসলেন এবং প্রাঙ্গণে প্রাচীরের নিকট বসে পড়লেন। শায়খ হামীদুদ্দীনও এক মুহূর্ত বসে থাকলেন। অল্প কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, যদি এই চবুতরা কিছু বেড়ে যায় তবে প্রাঙ্গণ স্পষ্ট ও পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হবে। মাখদূম (র) উঠে দাঁড়ালেন এবং বলতে লাগলেন ঃ আমি মনে করছিলাম যে, এই আবছা রাতে ধর্মীয় ব্যাপারে সম্ভবত কোন সমস্যা দেখা দিয়ে থাকবে যার সমাধানের জন্য আপনি এখানে তশরীফ এনেছেন। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, আমি ভুল ধারণার ভেতর ছিলাম। আপনি বলেছেন, চবুতরা বাড়াও আর এই ফকীর বলছে, এই পুতুল ঘরকে বিরান করে দাও।[১]

বুলন্দ হিম্মত

হযরত মাখদূম (র)-এর বড় আরও একটি স্বাতন্ত্র্য এবং তরক্কী ও কামালিয়াত হাসিলের গোপন রহস্য তাঁর পাহাড়সম বুলন্দ হিম্মত ও উন্নত মনোবল যা তাঁর জীবনের অবস্থাদিতে এবং লিখিত মকতূবাতের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ, বন্ধু-বান্ধব ও খাদিমকুলকে হামেশা উচ্চ সাহস ও চাহিদার ব্যাপ্তির জন্য উৎসাহিত করেছেন ও তাকীদ দিয়েছেন। নিশ্চিতই এ ব্যাপারে তাঁর আমলও বেশি হবে। একটি পত্রে অত্যন্ত আশা-উদ্যমময় পদ্ধতিতে তিনি উচ্চ সাহসিকতার যে তা'লীম দেন তা হল ঃ

তুমি যতই ভীরু ও কাপুরুষ হও না কেন, হিম্মত বুলন্দ ও সমুন্নত রাখবে। ভ্রাত! পুরুষের হিম্মত কোন বস্তুর সঙ্গেই দুর্বল হয় না। তার হিম্মতের বোঝা আসমান-যমীন, 'আরশ-কুরসী, বেহেশ্ত-দোযখ কেউই উঠাতে পারে না।

ঐসব আল্লাহ্ওয়ালার হিম্মত এমন পাক-পবিত্র এবং এমন প্রশস্ত যে, তার ভেতর জঞ্জাল ও আবর্জনার নাম-নিশানাও থাকে না যেন এ সমস্ত লোক সেখানে উড়তে পারে এবং কোন দিগন্তই 'রবূবিয়ত-এর দিগন্ত' থেকে অধিকতর পাক এবং কোন ময়দানই ওয়াহ্দানিয়াত তথা একত্ববাদের ময়দান থেকে অধিকতর প্রশস্ত ও বিস্তৃত নেই। পুরুষের হিম্মত কা'বা শরীফ ও বায়তুল মুকাদ্দাসের আশে-পাশে ঘোরাফেরা করে না এবং আসমান-যমীনও তাওয়াফ করে না। সুবহানাল্লাহ্! কতই না অদ্ভুত কাজ! এক ব্যক্তি

১. সীরাতুশ শরফ, ১২৮ পৃ.।

নিজ জায়গায় বসেছে, পা দুখানি আঁচলে টেনে নিয়ে এবং মাথাটা উরু প্রান্তে স্থাপন করে আছে। অথচ তার অবস্থা তো এই যে, তার মস্তক (হিম্মত) স্থান ও কাল অতিক্রম করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে। কতই না মুবারক সে হিম্মত যা আদম সন্তান ভিন্ন আর কোথাও পাবে না।

সীরাতুশ্ শরফ প্রণেতা ঠিকই লিখেছেন ঃ

তাঁর (শায়খ মাখদূম-এর) চোখ সর্বদাই দুষ্প্রাপ্য বস্তুর ওপর লেগে থাকত। কেননা প্রাপ্ত দ্রব্য তাঁর নিকট অকিঞ্চিৎকর দৃষ্টিগোচর হত এবং প্রশস্ত মনো-বল এবং বুলন্দ হিম্মতের কারণে প্রতিটি ক্ষণ ও প্রতিটি মুহূর্তে উন্নততর বস্তু তাঁর চোখের সামনে ফিরত।

তিনি অন্যদেরকেও এমনি বিস্তৃত মনোবল ও উন্নত সাহসিকতা অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন।

যদি উভয় জগতই তোমার দরজায় এনে হাযির করা হয় এবং বলা হয় যে, এ সবই তোমার আয়ত্তাধীন, যেভাবে খুশি ব্যবহার কর–তবু তুমি সতর্ক ও হুঁশিয়ার থাকবে। এমনটি যেন না হয় যে, দুনিয়া ও আখিরাতের ঊর্ধ্বে যে সব বস্তু রয়েছে এর কারণে তা পর্দার অন্তরালে হারিয়ে যায় এবং তদবধি পৌঁছুবার সকল রাস্তা ছিন্ন হয়ে যায়।

তাজরীদ ও তাফরীদ

তাজরীদ ও তাফরীদ-এর অধিবাসীরা সৃষ্টিজগত থেকে সম্পর্কচ্যুতি এবং সত্যপ্রীতির দিক দিয়ে সেই মকাম পর্যন্ত পৌঁছে যান যেখানে কোন অপরিচিতের পক্ষে পৌঁছা কিংবা তার উচ্চতা অনুভব ও উপলব্ধি করা সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত মুশকিল ব্যাপার। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বয়ং তিনি নিজের অবস্থার বর্ণনা দেন কিংবা মনযিলের নিশানা বাতলান তার সন্ধান মেলা ভার। ঐ সব আল্লাহ্ওয়ালার জনসমুদ্রে নির্জনতা অবলম্বন এবং আপন ভুবন সফরের মাধ্যমে মূল্যবান সম্পদ হাসিল হয় এবং তাঁরা 'কাজের সাথে হাত এবং বন্ধুর সাথে হৃদয়' (دست بکار ودل بیار) -এর প্রতিচ্ছবি, পথ-প্রদর্শন ও তরবিয়তের কঠিন দায়িত্বে সমাসীন থাকেন এবং নবী করীম (স)-এর আনুগত্যের শান তাঁদেরকে হামেশা সৃষ্টিকুলের মধ্যবর্তীতে স্থান দেয়। 'তাজরীদ' ও 'তাফরীদ' কোন্ মকামকে বলা হয় এবং যাঁরা এ মকামে পৌঁছে গিয়ে থাকেন তাঁদের অবস্থা কি হয়ে থাকে, তা তাঁর নিজের মুখেই শুনুন ঃ

তাজরীদ' সমস্ত আত্মীয়তা সূত্র ও সম্পর্ক এবং সমগ্র সৃষ্টিজগত থেকে পৃথক হয়ে থাকে। আর 'তাফরীদ' নিজে নিজেকে পরিত্যাগ করার নাম–ঠিক তেমনি যেন দিলের মাঝে কোনরূপ ধূলিমালিন্য না থাকে, না থাকে পৃষ্ঠদেশে কোন বোঝা। কারো সঙ্গে হিসাব-কিতাবের কোন সম্পর্ক যেমন থাকবে না–তেমনি থাকবে না অন্তরের মাঝে পার্থিব চিন্তা-ভাবনার কোন বাজার কিংবা মেলা, আর সৃষ্টির সঙ্গে তার কোনরূপ কায়-কারবারও থাকবে না। তার হিম্মত তথা সাহসিকতার বাজপাখি 'আরশে মু'আল্লাকেও অতিক্রম করে যাবে এবং উভয় জগত অতিক্রম করে স্বীয় পরম আরাধ্যের সান্নিধ্যে গিয়ে উপনীত হবে। উভয় জগত থাকতে দোস্ত ব্যতিরেকে কোন সন্তুষ্টির কারণ যেন না ঘটে এবং উভয় জগতের অনুপস্থিতিতে দোস্তের সঙ্গী হয়েও যেন অখুশিরও কোন কারণ না ঘটে। একজন প্রিয়ভাজন কত সুন্দরই না বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্ সঙ্গে থাকতে কোন ভয়াবহতাই বড় নয় আর আল্লাহ ব্যতীত অপর কিছুর সঙ্গী হয়ে কোন শান্তি ও আরামের উপকরণও শান্তি ও আরামের নয়।' এজন্যই বলা হয়েছে যে, যে কেউ আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন থেকে দূরে সরে যায় সে প্রকৃতই দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদে নিপতিত, যদি কয়েকটি দেশের ধনভাণ্ডারের মালিকও সে হয়। আর যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত, সে উভয় জগতের বাদশাহ– যদিও রাতের খাবার তার না জোটে।[১]

অন্য আর এক চিঠিতে তিনি লিখছেন ঃ

দোস্ত অস্তিত্ব ব্যতিরেকেও মওজুদ আছেন, আর অন্যরা বিদ্যমান থাকতেও অস্তিত্বহীন। কিন্তু শর্ত এই যে, তুমি গোটা বিশ্ব থেকে পলায়ন করবে এবং নিজের মধ্যে নিজেকে ফিরিয়ে আনবে। দিল্ (অন্তর)-কে নিজের থেকে উঠিয়ে নিজের থেকেই হাত গুটিয়ে নেবে যেমন আসহাবে কাহফ করেছিলেন। নিজের দিলকে কাহফ (গুহা) বানাবে এবং নিজেরই দিলে এসে নিজেই নিজের ওপর জানাযা পড়ে নেবে। নিজের নফসের রাগ ও হিংসা-বিদ্বেষকে নিজের দিল (অন্তর-রাজ্য) থেকে টেনে বাইরে নিক্ষেপ করবে যেন তোমাকে সমগ্র মাখলুকাতের সামনে তুলে ধরা হয় যেমন আস-হাবে কাহফকে উদ্ভাসিত করে তুলে ধরা হয়েছিল। (কুরআন শরীফে এতদসম্পর্কিত আয়াত রয়েছে ঃ) "যদি তুমি তাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে যাও তবে তুমি পেছনে ভেগে আসবে, আর তোমার অন্তঃকরণ তাদের প্রভাবে অভিভূত হয়ে পড়বে যদি তুমি তাদেরকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ কর।

১. বাষট্টিতম চিঠি।

সৎকার্যে আদেশ এবং মুসলমানদের অবস্থা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা

তাজরীদ ও তাফরীদের এরূপ সমুন্নত মকাম সত্ত্বেও যেখানে দিলে ধূলিমালিন্য এবং কোন মখলূকের সঙ্গে যোগাযোগ কিংবা সম্পর্ক রক্ষার কোনরূপ সুযোগই নেই, সেখানেও তিনি (শায়খ মুনায়রী) আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের অবস্থার প্রতি করুণাশীল ছিলেন এবং মুসলমানদের অবস্থা ও কার্যকলাপের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা ও তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন। আর সেহেতুই তিনি সমকালীন বাদশাহদের সঙ্গে কখনো কখনো চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতেন এবং ন্যায়বিচার, ফরিয়াদী ও মযলুমের সাহায্য-সহায়তা এবং তাদের হিফাযতের দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। একবার খাজা 'আবিদ জাফর আবাদীর মালমাত্তা হারিয়ে যায়। এতে তিনি সুলতানুশ শায়খ ফীরোয শাহকে একটি চিঠি লিখেন। এতে তিনি হুযূর আকরাম (সা.) এবং মহান সাহাবা (রা.) বর্ণিত যালিম ও মযলুমদের সম্পর্কিত কতিপয় ঘটনা ও হাদীছ উদ্ধৃত করার পর লিখেন ঃ

> আল্লাহ্র অশেষ শুকরিয়া যে, আজ সেই মহান শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত ব্যক্তি যিনি মযলুম ও অসহায়দের আশ্রয় এবং ইনসাফ ও সুবিচার যাঁর দরবার থেকে দুনিয়াবক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে, তিনি আজ সৌভাগ্যের এমনি এক দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছেন যে সম্পর্কে ইসলামের পয়গম্বর বলেছেন ঃ এক মুহূর্তের ন্যায়বিচার ষাট বছরের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।

হযরত শরফুদ্দীন আহমদ মুনায়রী (র) দীনী 'ইল্ম হাসিল এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ তা'লীম লাভ করেন সোনার গাঁওয়ে। এজন্য স্বাভাবিক ও সঙ্গত কারণেই তিনি বাংলা এবং সেখানকার অবস্থাদি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন এবং সেখানকার মুসলমানদের অবস্থাদি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও খোঁজ-খবর নিতেন।

সুন্নতের অনুসরণ

এ পথের সালিক (আধ্যাত্মিক পথের পথিক)বৃন্দ স্বীয় কারামত ও মকামসমূহে যে পরিমাণে উন্নতি করেন তাদের ওপর হুযূর (স)-এর প্রেমময়তা এবং তাঁর পূর্ণ অনুসরণের গুরুত্ব ও আবশ্যকতাও সেই পরিমাণে দিবালোকের মত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং তাঁদের সামনে আরও সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছুতে এবং গৃহীত (মকবূল) হতে হলে রাসূল

করীম (স)-এর পূর্ণ অনুসরণ এবং তাঁর আনীত সুন্নত ও শরীয়তের নিকট পরিপূর্ণ আত্মবিলোপ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর (হযরত মুনায়রী-এর) যে 'আকীদা ও সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল তা তুলে ধরার জন্য নিম্নোক্ত চিঠিটিই যথেষ্ট ঃ

قال الله تعالى : قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ـ

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ "বল (হে মুহাম্মাদ!) যদি তোমরা আল্লাহ্র ভালবাসা পেতে চাও তবে আমার অনুসরণ কর; তাহলে আল্লাহ্ও তোমাদের ভাল-বাসবেন" উল্লিখিত বক্তব্যকেই সমর্থন করে।

এ থেকে জানা গেল যে, কতিপয় অযোগ্য, নাদান ও বাজে লোক যারা তাদের ভ্রান্ত 'আকীদা-বিশ্বাস ও মূর্খতার কারণে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর পথ অবলম্বন করে না–তারা এই উক্তি অনুসারে অত্যন্ত বদবখ্ত তথা হতভাগা। একজন পথ-প্রদর্শক ব্যতিরেকে সোজা-সরল রাস্তায় নিরুদ্বিগ্ন গতিতে চলা এক কথায় অসম্ভব।

এই মূলনীতির ওপর তিনি যেরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে আমল করতেন এবং সুন্নতে নববী (স)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণের ক্ষেত্রে সদাজাগ্রত থাকতেন, তার পরিমাপ নিম্নোক্ত ঘটনা থেকেও পাওয়া যাবে ঃ

ঠিক যে দিন তিনি ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ১২১ বছর। তিনি দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার শেষপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। এই অন্তিম মুহূর্তেও পরিপূর্ণ দৃঢ়তা ও অটুট সংকল্প নিয়ে তিনি সুন্নতের অনুসরণে শেষ ওযূ করেন। শায়খ যঈন বদর 'আরাবী ওফাতনামায় লিখেন ঃ

তিনি বদন মুবারক থেকে জামা খুলে ওযূর নিমিত্ত পানি চাইলেন, আস্তিন গুটিয়ে মিসওয়াকের জন্য হাত বাড়ালেন এবং সজোরে বিসমিল্লাহ উচ্চারণপূর্বক ওযূ শুরু করলেন। তিনি ওযূ করতে গিয়ে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ দু'আ-দরূদ পড়ে চলছিলেন। কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করলেন, কিন্তু মুখমণ্ডল ধুতে ভুলে গেলেন। শায়খ খলীল তাঁকে এ ভুলের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। এরপর তিনি পুনরায় গোড়া থেকে ওযূ করতে শুরু করলেন। বিসমিল্লাহ ও দু'আ-দরূদ পূর্বের ন্যায়ই প্রতিটি নতুন স্থান ধৌতের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ধৈর্য ও সতর্কতার সাথে পড়ছিলেন আর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বিস্ময় প্রকাশ করছিল যে, এরূপ অবস্থাতেও তিনি এতখানি অভিনিবেশের পরিচয় দিচ্ছেন! কাযী যাহিদ ডান পা ধোয়ার

ব্যাপারে একটু সাহায্য করবার মানসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি সে হাত ফিরিয়ে দিয়ে বললেন 'থাম'। তারপর নিজে নিজেই ওযূ সমাপন করলেন। অতঃপর চিরুনী চেয়ে নিয়ে দাড়ি সুন্দররূপে আঁচড়ালেন, জায়নামায নিলেন এবং দু'রাকাত নামায আদায় করলেন।[১]

সুন্নতে নববী অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক অভ্যাসের বশেই তিনি বিদ'আতের প্রতি ছিলেন বিদ্বেষী। বিদ'আতের ক্ষেত্রে তিনি এতখানি সতর্ক ও সাবধানী ছিলেন যে একবার তিনি বলেছিলেন,

> এখানে অথবা অন্য কোনখানেই হোক না কেন, সুন্নত ও বিদ'আত সামনে আসামাত্রই সুন্নতকে পরিত্যাগ করা উত্তম হবে যদি সুন্নতকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয়।[২]

---

১. যঈন বদর 'আরাবীকৃত ওফাতনামা থেকে।

২. খানপুর নে'মত, তৃতীয় মজলিস, চতুর্থ অধ্যায়ের ফারসী উদ্ধৃতির তরজমা প্রিয় বন্ধু সূফী মুহাম্মাদ হুসায়ন সাহেব এম.এ.-এর লিখিত যার জন্য গ্রন্থকার তাঁর নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

পঞ্চম অধ্যায়

ওফাত

হযরত মাখদূম শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রী (রা.)-এর জীবন-বৃত্তান্ত, তাঁর কামালিয়াত এবং উচ্চ মকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে যা কিছু তাঁর সমসাময়িক জীবনীকাররা ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন তা মোটেই যথেষ্ট নয়। অবশ্য তাঁর ইন্তিকালের বিবরণ যা তাঁর খাস খলীফা ও এসব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শায়খ যঈন বদর 'আরাবী লিপিবদ্ধ করেছেন, তাও যদি সংরক্ষিত থাকত তাহলেও তা তাঁর মর্যাদা ও মরতবা পরিমাপ করবার জন্য কিছুটা যথেষ্ট হত। ইসলামী ইতিহাসে কতিপয় মহান বুযর্গ ও ইমামের ওফাতের ঘটনাবলী এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার ও মৃত্যুকে খোশ আমদেদ জানাবার বিবরণ এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এথেকে সে সমস্ত মহান ব্যক্তির মর্যাদা, আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক, ঈমান ও ইয়াকীনের পরিমাপই শুধু হয় না, বরং তা থেকে ইসলামের সত্যতাও দিবালোকের ন্যায় জনসমক্ষে ভেসে ওঠে। কোন উম্মত ও জাতিগোষ্ঠীর মহান বুযর্গ কিংবা কোন ধর্মের মহান নেতৃবৃন্দের শেষ জীবনের ঘটনাবলী ও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের বৃত্তান্ত এতখানি প্রভাব সৃষ্টিকারী, ঈমানের আলো বর্ধক ও আবেগ-উদ্দীপক নয় যতখানি ইসলামের মহান ব্যক্তিদের ঘটনাবলী বিশুদ্ধ ইতিহাস আমাদের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছে।

হযরত মাখদূম মুনায়রী (রা.)-এর ওফাতের যে বৃত্তান্ত এখানে বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে তাঁর নজীরবিহীন দৃঢ়তা, শরীয়তের পূর্ণ অনুসৃতির ব্যাপারে আবেগ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা, উম্মতে মুহাম্মাদী (সা.)-এর জন্য চিন্তা-ভাবনা, ইসলাম-অনুসারীদের জন্য দরদ, ভালবাসা ও কল্যাণ কামনা এবং জীবনের নাযুক মুহূর্তেও তাদের চিন্তা ও তাদের জন্য দু'আ, আল্লাহ্ পাকের রহমতের আশাবাদ, সুদৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার সঙ্গে সেই মহান সত্তার পরমুখাপেক্ষীহীনতা ও শ্রেষ্ঠত্বের ভীতি, ঈমানের নিরাপত্তা, উত্তম পরিণাম লাভের চিন্তা ও সতর্ক মনোযোগই প্রকাশ পায়।

হযরত শায়খ যঈন বদর 'আরাবী বলেন ঃ

সেদিন ছিল বুধবার। ৭৮২ হিজরীর ৫ই শাওয়াল তারিখে আমি তাঁর খেদমতে হাযির হলাম। ফজরের সালাত আদায়ের পর তিনি মালিকুশ্-শার্‌ক খাজা নিজামুদ্দীন খাজা মালিক নির্মিত নতুন হুজরায় তক্তপোশের ওপর বালিশ হেলান দিয়ে বসেছিলেন। সহোদর ভ্রাতা শায়খ জলীলুদ্দীন, খাস খাদিম এবং আরও কতিপয় বন্ধু-বান্ধব ও খাদেম যারা হযরত শায়খ-মুনায়রী (র)-এর খেদমতের জন্য পরপর কয়েক রাত ধরে জাগ্রত ছিলেন—তাঁদের মধ্যে কাযী শামসুদ্দীন, মাওলানা শিহাবুদ্দীন (যিনি ছিলেন খাজা মীনার ভাগিনা), মাওলানা ইবরাহীম, আমূ কাযী, মিঞা হেলাল ও 'আকীক এবং আরও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব ছিলেন। তিনি পবিত্র মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেন, "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আযীম।" অতঃপর উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের দিকে মুখ করে বললেন, তোমরাও বল। সবাই এ হুকুম তা'মিল করল এবং সবাই পড়ল—'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আযীম।' অতঃপর মুচকি হেসে বিস্ময়ের সুরে বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! অভিশপ্ত শয়তান এ মুহূর্তে তওহীদের মসলার ক্ষেত্রেও আমার পদস্খলন ঘটাতে চায়—করতে চায় বিভ্রান্ত। আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহ ও কৃপা, তার দিকে আমি কীভাবে দৃষ্টিপাত ও লক্ষ্য করতে পারি! অতঃপর তিনি 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল-'আযীম' পড়তে শুরু করলেন এবং উপস্থিত সবাইকেও বললেন, তোমরাও পড়। এরপর তিনি নিজে দু'আ-দরূদ ও ওযীফার ভেতর মশগুল হয়ে গেলেন। চাশ্‌তের সময় তিনি এ থেকে ফারেগ হলেন। কিছু বিলম্বের পর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার হাম্‌দ ও ছানার ভেতর মশগুল হলেন, সজোরে 'আলহামদু লিল্লাহ' আলহামদু লিল্লাহ' পড়তে লাগলেন, বলে চললেন আলহামদু লিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল-মিন্নাতু লিল্লাহ্, আল-মিন্নাতু লিল্লাহ।

এরপর হযরত মাখদূম (র) হুজরা থেকে বেরিয়ে হুজরার প্রাঙ্গণে আসেন এবং তাকিয়ার (বালিশ) আশ্রয় নেন। অল্পক্ষণ পরেই হস্ত মুবারক বাড়িয়ে দিলেন যেন তিনি মুসাফাহা করতে চাচ্ছেন। তিনি কাযী শামসুদ্দীনের হাত নিজের হাতের ভেতর টেনে নিলেন এবং অনেকক্ষণ ধরে রাখলেন। অতঃপর তার হাত ছেড়ে দিলেন। খাদেমদের বিদায় পালা তার থেকেই শুরু হল। অতঃপর কাযী যাহিদের হাত ধরে নিজের পবিত্র বুকের ওপর স্থাপন করলেন এবং বললেন ঃ আমরা তো সেই—আমরা তো সেই। অতঃপর

বললেন, আমরাই সেই দিওয়ানা, আমরাই সেই পাগল। এরপর বিনয়-নম্রতা ও দীনতার একটা বিশেষ স্বরূপ প্রকাশ পেল এবং তিনি বললেন, না, বরং আমরা তো সেই দিওয়ানাদের জুতার ধূলি। অতঃপর প্রতিটি উপস্থিত ব্যক্তিকে ইশারা করলেন এবং প্রত্যেকের হাতে ও দাড়িতে চুমো দিলেন, আল্লাহ তা'আলার রহমত ও মাগফিরাতের আশাবাদী হবার জন্য তাকীদ করলেন এবং বুলন্দ আওয়াজে পড়লেন ঃ

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ - اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا -

"তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গুনাহ্ মাফ করবেন।" অতঃপর এই কবিতাটি আবৃত্তি করলেন ঃ

خدایا رحمتت در یائے عام است

از انجا قطرئے برما تمام است

এরপর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ কাল যদি তোমাদের প্রশ্ন করা হয় তাহলে বলবে–'লা তাকনাতু মির-রাহমাতিল্লাহ' নিয়ে এসেছ। যদি আমাকেও বলা হয়–তাহলে আমিও তাই বলব। এরপর কলেমার শাহাদাত বুলন্দ আওয়াজ পড়তে শুরু করলেন ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আও পড়লেন ঃ

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَبِيًّا وَّبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَّبِالْمُؤْمِنِيْنَ اِخْوَانًا وَبِالْجَنَّةِ ثَوَابًا وَّبِالنَّارِ عَذَابًا -

অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ পাককে আমার 'রব' হিসেবে, ইসলামকে দীন (জীবনব্যবস্থা ও জীবন দর্শন) হিসেবে, মুহাম্মাদ (স)-কে নবী, কুরআন পাককে ইমাম, পবিত্র কা'বাকে কিবলা, মু'মিনদেরকে ভাই, জান্নাতকে আল্লাহ্দত্ত পুরস্কার এবং জাহান্নামকে আল্লাহ্র শাস্তি হিসেবে পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি ও তৃপ্তি সহকারে মেনে নিচ্ছি।

এরপর অযোধ্যার মাওলানা তকীউদ্দীনের দিকে লক্ষ্য করে নিজের হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, পরিণাম ও কল্যাণ শুভ হোক। অতঃপর পবিত্র মুখে ডাক দিলেন, আমূ! মওলানা আমূ ছিলেন হুজরার অভ্যন্তরে। তিনি ডাক শোনামাত্রই–'এই যে আমি' বলে দৌড়ে আসলেন। তিনি তার হাত ধরলেন এবং তার পরশ নিজের চেহারা মুবারকের ওপর বুলাতে লাগ-লেন। তিনি বলতে লাগলেন, তুমি আমার অনেক খেদমত করেছ। আমি তোমাকে পরিত্যাগ করব না। সম্পর্ক গভীর ও গাঢ় রেখ, তাহলে আমরা একত্রে সহাবস্থান করতে পারব। যদি কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হয়–কি এনেছ? তবে বলবে :

لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرِ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ـ

যদি আমাকেও জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে আমিও এই জবাবই দেব। বন্ধু-বান্ধবদের বল, ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে। আমার সম্মান ও মর্যাদা যদি সেদিন রক্ষা পায় (অর্থাৎ জাহান্নামের হাত থেকে বেঁচে যদি জান্নাত লোকের অধিকারী হবার সার্টিফিকেট লাভ করতে পারি) তবে আমি কাউকেই পরিত্যাগ করব না। এরপর হেলাল ও 'আকীকের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আমাকে অত্যন্ত খুশি-খোশালীতে রেখেছ, আমার বিরাট খেদমত করেছ। আমি যেমনটি তোমাদের ওপর খুশি ছিলাম–তোমরাও তেমনি খুশি হবে এবং খুশী থাকবে সর্বদাই। তিনবার স্বীয় হাত মিঞা হেলালের পিঠের ওপর রাখলেন এবং বললেন, সফল ও ভাগ্যবান থাকবে। সে সময় তাঁর দু'খানা পা-ই মিঞা হেলালের কোলে ছিল আর তার ওপর তিনি বড়ই মেহেরবান ছিলেন।

ইতোমধ্যে মাওলানা শিহাবুদ্দীন নাগোরী আসেন। তিনি কয়েকবার তাঁর মাথা, মুখমণ্ডল, দাড়ি ও পাগড়ীতে চুমো খেলেন। তিনি আহ্! আহ্! সূচক আনন্দ-ধ্বনি করছিলেন আর 'আলহামদু লিল্লাহ' 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে যাচ্ছিলেন। তিনি হাত নামিয়ে নেন এবং দরূদ শরীফ পড়তে থাকেন। মাওলানা শিহাবুদ্দীনের নজরও ছিল হযরত মাখদূম (র)-এর চেহারা মুবারকের ওপর এবং তিনিও দরূদ শরীফ পড়ছিলেন। এরপর তিনি মাওলানা শিহাবুদ্দীন-এর ভাগিনা খাজা মু'ঈন-এর নাম নেন এবং বলেন, আমার বিরাট খেদমত করেছে আর আমার সঙ্গে তার ঐক্যও ছিল। অত্যন্ত সুন্দরভাবে সে আমার সাহচর্যে কাটিয়েছে। তার পরিণামও শুভ ও কল্যাণময় হোক। এই সময় মাওলানা শিহাবুদ্দীন, মওলানা মুজাফফর বলখী ও

মাওলানা নাসিরুদ্দীন জৌনপুরীর নাম নেন এবং বলেন, এ দু'জনের সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি? তিনি অত্যন্ত খুশিভরে মুচকি হেসে এবং নিজের সকল অঙ্গুলী দ্বারা সিনা মুবারকের দিকে ইশারা করে বললেন, মুজাফফর আমার প্রাণ-প্রতীম, আমার প্রিয়; মাওলানা নাসিরুদ্দীনও ঠিক তেমনিই। খিলাফত ও ইকতিদা গ্রহণের জন্য যে সব শর্ত ও গুণ অপরিহার্য, তা এ দু'জনের মধ্যে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। আমি যা কিছু বলেছি তা এই গরীবদেরকে সৃষ্টির ফেতনা থেকে হিফাযত করবার স্বার্থেই বলেছি।[১] এই সুযোগে মাওলানা শিহাবুদ্দীন কিছু পেশ করে আরয করলেন, মাখদূম! এটি কবূল করুন। তিনি বললেন, আমি কবূল করলাম। এটা কি, আমি তো তোমার সারা ঘর-বাড়িই কবূল করে নিয়েছি। এরপর তাদেরকে টুপী প্রদান করা হল। তারা পুনরুপি বায়'আত হবার দরখাস্ত পেশ করলে তিনি তা কবূল করেন।

এইসব চলকালীন কাযী মীনা হযরত মাখদূম (র)-এর খেদমতে এসে হাযির হলেন। মিঞা হেলাল পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং আরয করলেন, ইনি কাযী মীনা। কাযাঁ মীনা! কাযী মীনা! কয়েকবার উচ্চারণ করলেন। কাযী মীনা বললেন, আমি আপনার খেদমতে হাযির আছি এবং হাতে চুমো দিলেন। তিনি তার হাত স্বীয় চেহারা মুবারকে, দাড়িতে ও গণ্ডদেশের ওপর বুলিয়ে নিলেন এবং বললেন, তোমার ওপর আল্লাহ্র রহমত হোক। ঈমানের সঙ্গে থাকো আর ঈমানের সঙ্গেই দুনিয়া থেকে বিদায় নাও। স্নেহের সুরে এও বললেন, মীনা তো আমাদের। ইতোমধ্যে মওলানা ইবরাহীম আসলেন। হযরত মাখদূম (র) তার দাড়িতে স্বীয় ডান হাতের পরশ বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি আমার অতি উত্তম খেদমত করেছ এবং আমায় পরিপূর্ণ সঙ্গ দান করেছ। সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে থাকবে। মাওলানা ইবরাহীম আরয করলেন, মাখদূম![২] আপনি কি আমাতে সন্তুষ্ট ও রাযী আছেন? বললেন, হ্যাঁ। আমি তোমাদের সবার ওপর সন্তুষ্ট ও রাযী আছি। তোমাদেরও আমার ওপর রাযী হওয়া দরকার। যা কিছু আছে সবই আমার পক্ষ থেকে। এরপর কাযী শামসুদ্দীনের ভাই কাযী নূরুদ্দীন হাযির হন। তিনি কাযী নূরুদ্দীনের হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেন এবং অত্যন্ত স্নেহ ও প্রীতির সঙ্গে তার দাঁড়ি, চেহারা, গণ্ডদেশ ও হাতের ওপর বার

১. এখানে জানা যায়নি কোন্ ঘটনার প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২. এখানে মুদ্রিত এবং হাতে লেখা কপিতে صبح البياض শব্দটি রয়েছে। সম্ভবত এর অর্থ হবে আজ ভোরবেলা।

কয়েক চুমো দেন। আনন্দের সঙ্গে তিনি আহ্! আহ্! করে যাচ্ছিলেন। তিনি তাকে বললেন, তুমি আমাদের সাহচর্যে খুব থেকেছ আর আমাদের খেদমতও করেছ খুব। আল্লাহ্ চাহে তো কাল (বেহেশতে) একই জায়গায় আমরা থাকব। এরপর মাওলানা নিজামুদ্দীন কোহী হাযির হন। তিনি টুপী মুবারক নিজের মাথা থেকে নামিয়ে তাকে দান করেন এবং উত্তম ফল লাভের জন্য দু'আ করলেন। বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে মন্‌যিলে মকসূদে পৌঁছিয়ে দিন। অতঃপর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, বন্ধুগণ! যাও, স্বীয় দীন ও ঈমানের উপর কায়েম ও মশগুল থাক।

এরপর লেখক যঈন বদর 'আরাবী তাঁর হস্ত মুবারকে চুমো দিলেন। স্বীয় চক্ষু, মাথা ও শরীরে তার পরশ বুলিয়ে নিলেন। হযরত মাখদূম (র) জিজ্ঞাসা করলেন, কে? আমি আরয করলাম, আপনার আস্তানার ভিখারী আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এবং আরয করছে যে, তাকে নতুনভাবে আপনার গোলামীতে কবূল করা হোক। তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, যাও! তোমাকেও কবূল করলাম। তোমাদের ঘর ও পরিবারবর্গের সকল সদস্যকেও কবূল করলাম। ঘনিষ্ঠ ও সুসম্পর্ক কায়েম রেখ। যদি আমার 'ইয্‌যত-আবরূ রক্ষা পায়, তাহলে আমি কাউকে পরিত্যাগ করবার বান্দা নই। আমি আরয করলাম, আশা তো অনেকখানিই।

কাযী শামসুদ্দীন আসলেন এবং হযরত (র)-এর পার্শ্বে উপবেশন করলেন। মওলানা শিহাবুদ্দীন, হেলাল ও 'আকীক আরয করল যে, মাখদূম! কাযী শামসুদ্দীন সম্পর্কে আপনার কী হুকুম? তিনি বললেন, কাযী শামসুদ্দীন সম্পর্কে আর কী বলব। কাযী শামসুদ্দীন তো আমার সন্তান, কয়েক জায়গায় তাকে আমি সন্তান লিখেছি। চিঠিপত্রে তাকে আমি আমার ভাইও লিখেছি। তার জ্ঞানবত্তা ও দরবেশী জীবন প্রকাশের এজাযত হয়ে গেছে। তারই খাতিরে এত কিছু বলা ও লেখার সুযোগ এল। তা না হলে এসব কে লিখত? এরপর ভাই ও বিশিষ্ট খাদেম শায়খ খলীলউদ্দীন, যিনি পাশেই বসেছিলেন, তাঁর হাত ধরলেন। হযরত মাখদূম (র) তার দিকে ফিরলেন এবং বললেন, খলীল! সুসম্পর্ক কায়েম রেখ। তোমাকে 'উলামা ও দরবেশরা ছাড়বে না। মালিক নিজামুদ্দীন খাজা মালিক আসবে। তাকে আমার সালাম পৌঁছে দিও। আমার তরফ থেকে ওযরখাহী করবে এবং বলবে যে, আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট, সন্তুষ্টচিত্তে যাচ্ছি। তোমরাও আমার প্রতি সন্তুষ্ট থেকো। আরও বললেন ঃ যতদিন পর্যন্ত মালিক নিজামুদ্দীন আছে, তোমাকে ছাড়বে না।

শায়খ খলীলউদ্দীন অত্যন্ত অভিভূত ছিলেন। চোখে ছিল তাঁর অশ্রুর বন্যা। হযরত মাখদূম (র) যখন তাঁকে অন্তর-মন বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখলেন, তখন

অত্যন্ত স্নেহভরে বললেন, সম্পর্ক বজায় রেখো আর অন্তর-মনকে শক্ত কর। এরপর তিনি বললেন, কে? প্রত্যুত্তরে হেলাল আরয করল, মওলানা মাহমূদ সূফী। এতে তিনি গভীর আফসোস ও পরিতাপের সাথে বললেন, বেচারা বড় গরীব। তার জন্য আমার বড় চিন্তা, বেচারার কেউ নেই। এরপর তিনি তার শুভ পরিণতির জন্য দু'আ করলেন। এরপর খেদমতে হাযির হলেন কাযী খান খলীল। হযরত মাখদূম (র) বললেন, বেচারা কাযী আমার বহু পুরানো দোস্ত, –আমার সাহচর্যে বহু দিন কাটিয়েছে। আল্লাহ পাক তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং তার পরিণতি শুভ হোক। তার সন্তানও আ-মাদের দোস্ত। সবার পরিণাম ফলই শুভ ও কল্যাণবহ হোক এবং আল্লাহ তা'আলা দোযখের আগুন থেকে রেহাই দিন।

এরপর খাজা মু'ইয়্যুদ্দীন হযরত মাখদূম (র)-এর খেদমতে তশরীফ রাখেন। তিনি তারও কল্যাণ ও শুভ কামনা করলেন। অতঃপর মাওলানা ফযলুল্লাহ কদমবুসী করেন। ভালো, ভালো। আল্লাহ পরিণাম ফল শুভ করুন, বললেন। হযরত মাখদূম (র)-এর ফতুহ নামক বাবুর্চি কাঁদতে কাঁদতে আসল এবং পায়ের উপর গিয়ে পড়ল। তিনি বললেন, বেচারা ফতুহ যা কিছু এবং যেমনটি ছিল, আমারই ছিল। তার জন্যও কল্যাণকর দু'আ করলেন। এরপর মাওলানা শিহাবুদ্দীন কদমবুসী করার সৌভাগ্য লাভ করেন। হেলাল এই বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন যে, ইনি হাজী রুক্নউদ্দীনের ভাই মাওলানা শিহাবুদ্দীন। তিনি তাঁরও শুভ পরিণতির জন্য দু'আ করলেন এবং বললেন, ঈমান তাজা রেখ, আর আল্লাহ্র রহমতের প্রত্যাশী হয়ে পড়বে ঃ

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ـ

কিছুক্ষণ পর যোহরের কাছাকাছি সময়ে সায়্যিদ জহীর উদ্দীন স্বীয় চাচাতো ভাইকে সাথে নিয়ে হযরত মাখদূম (র)-এর খেদমতে হাযির হন। তিনি তাকে একেবারে কোলের ভিতর টেনে নিলেন এবং অত্যন্ত স্নেহ ও করুণাভরে বললেন, আমি যে পরিণাম! পরিণাম! বলছিলাম–তা এই। এরপর তিনবার তাকে কাছে টেনে নিলেন এবং শেষবার এই আয়াত পড়লেন ঃ

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ـ

তিনি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহ্ তাআলার রহমত ও মাগফিরাতের প্রত্যাশী ও প্রার্থী করে তুললেন। এরপর সেখান থেকে উঠলেন এবং

হুজরাতে তশরীফ নিয়ে গেলেন। সায়্যিদ জহীরউদ্দীনের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ বসলেন এবং অনেকক্ষণ ধরে তার সাথে আলাপও করলেন। এরপর খলীলের ভাই মুনাওয়ার আরয পেশ করেন যে, আমি আপনার হাতে তওবাহ করতে ও বায়'আত হতে চাই। তিনি তাকে 'এস' বলে ডেকে নিলেন এবং তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তওবাহ ও বায়'আত হওয়ার সুযোগ দানে ধন্য করলেন। অতঃপর একটি কাঁচি চেয়ে পাঠালেন। কাঁচি দিয়ে তাঁর চুল কাটালেন ও টুপি পরিয়ে দিলেন এবং বললেন, যাও দু' রাকাত সালাত আদায় করে এসো। ঠিক এমনিভাবে তাঁর পুত্রকেও তিনি বায়'আত করেন এবং তার প্রতিও ঐ একই আদেশ দেন।

ইতিমধ্যেই মাওলানা নিজামুদ্দীন মুফতীর ভাই কাযী 'আলম আহমদ মুফতী যিনি ছিলেন বিশিষ্ট মুরীদবর্গের অন্যতম–আসেন এবং অত্যন্ত আদবের সঙ্গে হযরত মাখদূম মুনায়রী (র)-এর সামনে উপবেশন করেন। এরই মাঝে মালিক হুসসামুদ্দীনের ভ্রাতা আমীর শিহাবুদ্দীন স্বীয় পুত্রসহ তাঁর খেদমতে হাযির হন এবং এসে উপবেশন করেন। হযরত মুনায়রী (র)-এর পবিত্র দৃষ্টি তার প্রতি পতিত হতেই বললেন, কুরআনুল করীমের পাঁচটি আয়াত তিলাওয়াত করতে পারবে? উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ আরয করল–ছেলে এখনও ছোট। সায়্যিদ জহীর উদ্দীন মুফতীর পুত্রও হাযির ছিল। মিয়া হেলাল যখন দেখলেন এই মুহূর্তে তাঁর কালামে রব্বানী শোনার আগ্রহ খুব বেশি, তিনি তক্ষুণি ছেলেটিকে ডেকে পাঠালেন এবং পাঁচটি আয়াত তিলাওয়াত করে শোনাতে নির্দেশ দিলেন। সায়্যিদ জহীরুদ্দীনও যখন অনুভব করলেন মাখদূম মুনায়রীর (র) তবিয়ত মুবারক কুরআন মজীদ শুনতে খুবই আগ্রহী, তখন স্বীয় পুত্রকে কুরআন মজীদের পাঁচটি আয়াত পড়তে ইশারা করলেন। ছেলেটি সম্মুখে এসে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে উপবেশন করল। সে সূরা আল-ফাতহ এর শেষ রুকূর আয়াত محمد رسول الله والذين معه থেকে তিলাওয়াত শুরু করল। হযরত মাখদূম (র) তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আরাম করছিলেন, উঠে বসলেন এবং চিরন্তন প্রথা মুতাবিক অত্যন্ত আদবের সঙ্গে দু'হাঁটু মিলিয়ে বসে গেলেন আর গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআন মজীদ শুনতে লাগলেন। ছেলেটি যখন ليغيظ بهم الكفار পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল তখন সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। ফলে তার পক্ষে সামনে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। তিনি তাকে পরবর্তী শব্দগুলি শিখিয়ে দিলেন। ছেলেটি যখন কিরাত খতম করল তখন তিনি বললেন, খুবই ভাল পড়ে আর

মাখরাজও আদায় করে ভাল, কিন্তু ভয় পেয়ে যায়। এ সময় তিনি একজন পশ্চিমা দরবেশের কথা উত্থাপন করলেন। ঐ দরবেশের তবিয়ত যখন ভাল থাকত তখন তিনি কুরআন শরীফ শুনতে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠতেন। আর যখন তার তবিয়ত ভাল যেত না–তখন তিনি কুরআন শুনতে আগ্রহী হতেন না।

এরপর কাযী 'আলমের প্রতি শরবত ও পান দেবার হুকুম হল। তিনি ওযরখাহী করলেন (এতক্ষণে না দিতে পারায়)। তিনি শরীর থেকে পিরহান (জামা) খুলতে চাইলেন এবং চাইলেন ওযূ সম্পাদনের জন্য পানি। আস্তিন গুটিয়ে তিনি মিসওয়াক চাইলেন, সরবে বিসমিল্লাহ্ পড়লেন এবং ওযূ শুরু করলেন। প্রতিটি নতুন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করবার ক্ষেত্রে যে পৃথক পৃথক দু'আ আছে তা পড়লেন। কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করলেন, কিন্তু মুখ ধৌত করতে ভুলে গেলেন। শায়খ ফরীদুদ্দীন (রা.) স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, মুখমণ্ডল ধোয়া বাকী রয়ে গেছে। তখন তিনি প্রথম থেকেই ওযু শুরু করলেন এবং বিসমিল্লাহ থেকে শুরু করে যেখানে যে দু'আ পড়তে হয় অত্যন্ত সতর্কতা ও মনোযোগের সঙ্গে তা পড়লেন। মুফতী সৈয়দ জহীর উদ্দীন (রা.) এবং হাযিরানে মজলিস দেখছিলেন আর বিস্ময় প্রকাশ করছিলেন এমতাবস্থায়ও তাঁর এতখানি সতর্কতা ও অভিনিবেশ প্রত্যক্ষ করে। কাযী যাহিদ পা ধৌত করার ব্যাপারে সাহায্য করতে চাইলেন। হযরত মাখদূম (রা.) তাকে থামিয়ে দিলেন এবং বললেন, দাঁড়িয়ে থাকো। এর পর তিনি নিজে নিজেই শেষতক ওযূ করলেন এবং পরিপূর্ণভাবে ওযূ সমাপনের পরে চিরুনী চেয়ে পাঠালেন, দাঁড়ি আঁচড়ালেন। এরপর মুসাল্লা (জায়নামায) চাইলেন এবং নামায শুরু করলেন। দু'রাকাত পড়ে সালাম ফেরালেন এবং ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ার কারণে কিছুক্ষণ আরাম করলেন। শায়খ খলীলউদ্দীন আরয করলেন, হযরত! শান্তির সঙ্গে হুজরায় তশরীফ নিয়ে চলুন, ঠাণ্ডা এসে গেছে। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, জুতা পরলেন এবং হুজরার দিকে চললেন। মাখদূম মুনায়রী (র)-এর একটি হাত ছিল মাওলানা যাহিদ-এর কাঁধে আর অপরটি ছিল মওলানা শিহাবউদ্দীনের কাঁধে। হুজরাতে তিনি বাঘের চামড়ার ওপর শুয়ে পড়লেন। মিঞা মুনাওয়ার তওবাহ্র বায়'আতের জন্য দরখাস্ত পেশ করলেন। তিনি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং তাকেও তওবাহ ও বায়'আত দ্বারা ধন্য করলেন। তার মাথার উভয় পার্শ্বের চুলই কিছু কিছু কেটে ছেটে দিলেন, টুপি পরিয়ে দিলেন

এবং বললেন, যাও! দু'রাকাত সালাত আদায় কর। আর এটাই ছিল শেষ তওবাহ্ ও আখেরী বায়'আত যা তিনি করিয়েছিলেন। এখানেই একটি স্ত্রীলোক আপন দুই পুত্রসহ এসে হাযির হয় ও কদমবুসী লাভে ধন্য হয়। 'আসরের সালাত আদায়ের পর মাগরিবের কাছাকাছি সময়ে খাদেমকুল আরয করল যে, হযরত! চারপায়ীর ওপর আরাম করুন। মাখদূম মুনায়রী (র) চারপায়ীর ওপর তশরীফ রাখেন এবং আরাম করেন।

মাগরিবের সালাত আদায়ের পর শায়খ জলীল উদ্দীন, কাযী শামসুদ্দীন, মাওলানা শিহাবুদ্দীন, কাযী নূরুদ্দীন, হেলাল, 'আকীক ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব এবং খাদেমবর্গ যারা খেদমতে নিয়োজিত ছিল–চারপায়ীর চারিপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত মাখদূম (র) কিছু বিলম্বে বুলন্দ আওয়াজে–'বিসমিল্লাহ্' বলা শুরু করলেন। কয়েকবার 'বিসমিল্লাহ্' বলার পর জোরে জোরে পড়লেন ঃ

لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ـ

এরপর উচ্চৈস্বরে 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' পড়লেন। অতঃপর কালেমায়ে শাহাদাত পড়লেন ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

এরপর বললেন ঃ

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ

বেশ কিছুক্ষণ ধরে কলেমায়ে শাহাদাত আওড়াতে থাকলেন। অতঃপর কয়েকবার বললেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم ـ لا اله الا الله محمد رسول الله ـ

এরপর অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে এবং অন্তরের সমস্ত শক্তি 'মুহাম্মাদ' প্রয়োগে ও গভীর আগ্রহ-উদ্দীপনা সহকারে 'মুহাম্মাদ' 'মুহাম্মাদ' এবং اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الخ শেষ পর্যন্ত পড়লেন। অতঃপর নিম্নোদ্ধৃত আয়াত رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ শেষ তক, এবং رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه

وسلم نبيا পড়ে তিনবার কালেমায়ে তৈয়েবা নির্দিষ্ট নিয়মে পড়লেন। অতঃপর আসমানের দিকে হাত উঁচু করে তুলে ধরলেন এবং গভীর আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে, যেমন কেউ দু'আ' ও মুনাজাত করে, বললেন ঃ

اللهم اصلح امة محمد صلعم اللهم ارحم امة محمد صلعم اللهم اغفر لامة محمد صلعم اللهم تجا وز عن امة محمد صلعم اللهم اغث امة محمد صلعم اللهم انصر من نصر دين محمد صلعم اللهم فرج عن امة محمد صلعم فرجا عاجلا اللهم اخذل من خذل دين محمد صلعم برحمتك يا ارحم الراحمين -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! উম্মতে মুহাম্মদীকে সংশোধন করো। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (স)-এর উম্মতের ওপর রহম করো। হে আল্লাহ! উম্মতে মুহাম্মদীকে মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর থেকে বালা ও মুসীবত সরিয়ে নাও। হে আল্লাহ! উম্মতে মুহাম্মদীকে আশ্রয় দাও। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (স)-এর দীনকে যে সাহায্য করে তুমি তাকে সাহায্য কর। উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর থেকে বিপদ-আপদ সত্বর দূর করে দাও। হে আল্লাহ! যারা দীনে মুহাম্মদীকে অপমানিত করতে চায়, তাদের তুমি অপমানিত ও লাঞ্ছিত করো। আর এ কেবল তোমারই রহমতে সম্ভব। কেননা তুমিই সবচেয়ে বড় রহমকার।" এই শব্দগুলো উচ্চারণের সাথে সাথেই আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। সে সময় তাঁর যবান মুবারকে নিম্নোক্ত শব্দসমষ্টি উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ

لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ - لَا اِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ

এরপর একবার 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলেন এবং এরই সঙ্গে আর প্রাণবায়ু বেরিয়ে অনন্তলোকে প্রস্থান করল। তারিখটা ছিল ৭৮২ হিজরীর ৬ই শওয়াল, রোজ বৃহস্পতিবার 'ইশার সালাতের ওয়াক্ত। পরে বৃহস্পতিবার দিনে চাশতের নামাযের সময় হযরত মাখদূম (র)-কে দাফন করা হয়।[১]

সালাতে জানাযা ও দাফন

সালাতে জানাযা হযরত শায়খ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রা.) পড়ান যিনি মাখদূম মুনায়রী (র)-এর ইন্তিকালের পর পৌঁছেছিলেন। লাতাইফে

১. শেখ যঈন বদর 'আরাবী (র) কৃত "ওফাতনামা" পুস্তিকা, ১৩২৯ হি. আগ্রায় মুদ্রিত।

আশরাফী[১] গ্রন্থে হযরত মাখদূম সাহেব (র)-এর স্বয়ং নিজের ওসীয়ত ও ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করা এবং হযরত শায়খ আশরাফ জাহাঙ্গীর (র)-এর সেখানে পৌঁছানো ও ওসীয়ত মুতাবিক জানাযা পড়ানোর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। এথেকে অবগত হওয়া যায় যে, মাখদূম সাহেব (র)-এর ওসীয়ত ও তথ্য মুতাবিক জানাযা তৈরি করে রাস্তার ওপর রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর অপেক্ষা চলছিল। শায়খ আশরাফ জাহাঙ্গীর (র) দিল্লী থেকে বাংলার চিশতিয়া সিলসিলার মশহূর বুযর্গ হযরত শায়খ 'আলাউদ্দীন 'আলাউল হক লাহোরী পাণ্ডোবী (রা.)-এর খেদমতে তশরীফ নিতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে বিহার শরীফে ঠিক সেই সময় পৌঁছান যখন হযরত মাখদূম (রা.)-এর জানাযা তৈরি করে রাস্তার ওপর রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং ইমামের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছিল। তিনি জানাযা পড়ান এবং নিজ হাতে কবরে শুইয়ে দেন।[২]

হযরত মাখদূম (র)-এর কবর কাঁচা এবং তার ওপর কোন গম্বুজ নেই। সূর সালতানাতের যুগে তার আশে-পাশের ঘরবাড়ি, মসজিদ, হাউজ ও ফোয়ারা নির্মিত হয়। কিন্তু যেহেতু হযরত মাখদূম রাসূল আকরাম (স)-এর সুন্নত পরিপূর্ণভাবে অনুসরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক ও মনোযোগী ছিলেন, সেটা খেয়াল করে তাঁর কবর যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায়ই রেখে দেওয়া হয়।[৩]

সন্তান-সন্ততি ও বংশধর

'সীরাতুশ্-শরফ' প্রণেতা লিখছেন ঃ

> মাখদূম (রা.)-এর ঔরসে সন্তান-সন্ততির ধারা বর্তমানে একজন পৌত্রীর মাধ্যমে অব্যাহত আছে। তাঁর সাহেবযাদা শাহ যাকীউদ্দীন পিতার জীবদ্দশায়ই বারিকা নামে একটি কন্যা রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন। এই কন্যার শাদী মুবারক সায়্যিদ ওয়াহীদুদ্দীন রিযভীর ভাগিনা শায়খ নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী (রা.)-এর সাথে সুসম্পন্ন হয়। এদের দাম্পত্য জীবনে তোহরা নামীয় একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে যার বিবাহ হয় শিহাবুদ্দীন 'আলভী তূসীর সঙ্গে। শায়খ 'আলীমুদ্দীন ও শায়খ ইমামুদ্দীন নামে এদের দুটি পুত্র সন্তান

---

১. লাতায়েফে আশরাফী, ১২৯৫ হি. দিল্লী থেকে মুদ্রিত, ৯৪ পৃ.।

২. লাতাইফে আশরাফী হযরত নিজামুদ্দীন য়ামনী, যিনি নিজাম হাজী গরীবুল য়ামনী নামে পরিচিত--এর কৃত, যিনি হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (র)-এর মুরীদ ছিলেন এবং তাঁর সাহচর্যে তিরিশ বছর কাটান। এটা হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রা.)-এর জীবন-চরিতও বটে, তেমনি তাঁর শিক্ষামালার সংকলনও বটে।

৩. সীরাতুশ-শরফ।

নওশা-ই-তওহীদ খিলাফত উৎসাদন করেন–তখন দরগাহ্র খাদেমগণ হযরত বারিকার সন্তানদের নিয়ে এসে খানকাহ্র খিলাফতের পদে সমাসীন করেন। এঁদের মধ্যে প্রথম বুযর্গ যিনি গদ্দীনশীন হন, তিনি ছিলেন শাহ বীখ।[১]

মাখদূম সাহেব (র)-এর ভাইদের থেকে বংশীয় ধারা অব্যাহত থাকে। তাঁদের বংশধর অদ্যাবধি মুনায়র ও বিহার প্রদেশে বিদ্যমান।

বিশিষ্ট খলীফা এবং মুরীদবর্গ

"সীরাতুশ্-শরফ" প্রণেতা লিখছেন ঃ

মাখদূম (রা.)-এর মুরীদদের তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ। নওশা-ই-তাওহীদ এই সংখ্যা লক্ষাধিক বলেন। এই সংখ্যাকে অতিরঞ্জিত বললে বোধহয় ভুল বলা হবে না। তবে এতটুকু বলা যায় যে, এ সংখ্যা নিশ্চিতই অধিক। আর এর ভেতর হিদায়াত-প্রার্থী ছাত্রদের সংখ্যাও অন্তর্ভুক্ত। হযরত মাখদূম (রা.)-এর নির্বাচিত ছাত্রদের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

মাওলানা মুজাফফর বলখী, মালিকযাদা ফযলুল্লাহ, মওলানা নাসীরুদ্দীন জৌনপুরী, মাওলানা নিজামুদ্দীন দর্দনহিসারী, শায়খ 'উমর, কুত্বুদ্দীন, ফখরুদ্দীন, শায়খ সুলায়মান খাজগী, খাজা আহমদ, ইমাম তাজুদ্দীন, হুসায়ন মু'ইয্য বলখী যিনি নওশা-ই-তাওহীদ নামে পরিচিত, মাওলানা কামরুদ্দীন, মাওলানা আবুল কাসিম, মাওলানা আবুল হাসান, কাযী শরফুদ্দীন, কাযী মিনহাযুদ্দীন দর্দনহিসারী, মাওলানা তকীউদ্দীন আওধী, মাওলানা শিহাবুদ্দীন নাগোরী, শায়খ খলীলুদ্দীন, মাওলানা রফী'উদ্দীন, মাওলানা আদম হাফিয, যঈন বদর 'আরাবী, কাযী সদরউদ্দীন, শামসুদ্দীন খাওয়ারিযমী[২], শায়খ মু'ইয্যুদ্দীন, মাওলানা করীমুদ্দীন, মাওলানা খাজা হামীদউদ্দীন, সওদাগর শায়খ মুবারক, যাকারিয়া গরীব, কাযী খানা

---

১. সীরাতুশ্-শরফ, পৃ. ১৫০।

২. 'সীরাতুশ-শরফ' প্রণেতার এখানে ভুল হয়েছে যে, ইনি সেই শামসুদ্দীন খাওয়ারিযমী যিনি সুলতান গিয়াছুদ্দীন বলবনের রাজত্বকালে শামসুল মুল্ক উপাধি ধারণ করে তখতনশীন হয়েছিলেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়, শামসুল মুল্ক মুসতাওফিল মুমালিক (নিরীক্ষক) মাওলানা শামসুদ্দীন খাওয়ারিযমী যিনি বলবনের রাজত্বকালে সিংহাসনারূঢ় হয়েছিলেন–অষ্টম হিজরী শতাব্দী-শুরুর পূর্বেই মারা যান। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) তাঁরই শাগরিদ ছিলেন। হয়তো সীরাতুশ্ শরফ প্রণেতা নামের ক্ষেত্রে ভ্রমে পতিত হয়েছেন অথবা হযরত মাখদূম (র) থেকে যিনি ফয়েয লাভ করেছিলেন তিনি অন্য কোন শামসুদ্দীন খাওয়ারিযমী ছিলেন।

নাজমুদ্দীন শা'ইর, কাযী বদরুদ্দীন জাফরাবাদী, মাওলানা লুত্ফউদ্দীন, আহমদ সফীদবাফ, শায়খ যাকীউদ্দীন, মাওলানা নিজামুদ্দীন খানযাদা মাখদূম (র), মাওলানা আহমাদ আমু, মাওলানা যয়নুদ্দীন, শায়খ শু'আয়ব, সায়্যিদ শিহাবুদ্দীন, ইমাম হালিফী, হাজী রুক্নুদ্দীন, মাওলানা আওহাদুদ্দীন যিনি শায়খ নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসীর ভাগ্না, শায়খ রুস্তম ও শায়খ ওয়াজহুদ্দীন এবং শায়খ ওয়াহীদ উদ্দীন [তিনজনই শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-এর বান্ধব], মাওলানা হুস্সামুদ্দীন হযরতখানী প্রমুখ।[১]

রচিত গ্রন্থাদি

হযরত মাখদূম শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মুনায়রী (রা.)-কে বহু গ্রন্থ প্রণেতাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু তাঁর প্রণীত অনেক গ্রন্থ ও চিঠিপত্রই কালের বিবর্তনে এবং লোকের গাফলতির কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। আবার অনেকগুলির নাম জীবন-চরিতসমূহেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যে সমস্ত কিতাবের এ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া গিয়েছে কিংবা যে সব গ্রন্থের সন্ধান মিলে কিংবা যেসব গ্রন্থে তাঁর নাম চোখে পড়ে, তা নিম্নরূপ ঃ

রাহাতুল কুলূব, আজওয়াবাহ, ফাওয়াইদে রুক্নী, ইরশাদুত-তালিবীন, ইরশাদুস সালিকীন, রিসালায়ে মাক্কিয়্যা, মি'দানুল মা'আনী, লাতাইফুল মা'আনী, ইশারাতে মুখ্খুল মা'আনী, খানেপুর নে'মত, তুহফায়ে গায়বী, রিসালায়ে দর তলবে তালেবান, মালফূযাত, যাদে সফর, 'আকাইদে শরফী, ফাওয়াইদে মুরিদীন, বাহরুল মা'আনী, সাফারুল মুজাফফার, কানযুল মা'আনী, গঞ্জে লা ইউফনী, মু'নিসুল মুরীদীন, শরাহ আদাবুল মুরীদীন।[২]

কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় স্মৃতি এবং তাঁর উচ্চ মরতবা, তাহকীকের মকাম ও ইজতিহাদী শক্তির সর্বাপেক্ষা বড় প্রকাশ তাঁর 'মকতূবাত' এবং মকতূবাত সাহ্ সদী' ইত্যাদি নামের গ্রন্থাদি।

১.সীরাতুশ্-শরফ, পৃ. ১১৫-১১৬।

২. সীরাতুশ-শরফ, নুযহাতুল খাওয়াতির প্রভৃতি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মকতূবাত

মকতূবাত, তাঁর শিক্ষা ও সাহিত্যিক মান

হযরত মাখদূম (র)-এর জীবন্ত স্মৃতি এবং তাঁর বিদ্যাবত্তা ও কামালিয়াতের দর্পণ তাঁর মকতূবাত (চিঠিপত্র)-এর বিরল ও দুর্লভ সংকলন যা শুধু সে যুগের প্রণীত গ্রন্থাদির মধ্যেই নয়, বরং মা'রিফাত ও হাকীকতের গোটা ইসলামী ভাণ্ডারেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। জ্ঞানের গভীরতা, বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের অভূতপূর্বতা, সমস্যা ও সংকটের গ্রন্থি মোচন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, যথার্থ উপলব্ধি, মুজতাহিদসুলভ জ্ঞান ও দৃষ্টি, কুরআন ও সুন্নাহ্র বিশুদ্ধ ও গভীর বোধশক্তি, মকামে নবুওতের সম্মান ও মর্যাদার বর্ণনা, শরীয়তের প্রতি সমর্থন ও সহায়তা এবং শরীয়তের সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতার দিক দিয়ে আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে গোটা ইসলামী পাঠাগারে হযরত মাখদূম (র) এবং ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-এর মকতূবাতের আর কোন দ্বিতীয় নজীর চোখে পড়ে না। এই সব মকতুবাত ব্যাপক অধ্যয়নের পর পরিমাপ করা যায় যে, উম্মতে মুহাম্মাদিয়া (স)-এর বিশেষজ্ঞ ও 'আরেফীনের জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনার নিপুণতা কোন্ উচ্চ মার্গে পৌঁছেছিল এবং তাঁরা আল্লাহ্র পরিচয়, ঈমান ও ইয়াকীন, পর্যবেক্ষণ ও বুদ্ধি-জ্ঞান, আত্মার প্রশান্তি ও পবিত্রতা, রূহের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য, তীক্ষ্ণ বোধ, চরিত্রের সূক্ষ্মতা, মানবীয় প্রকৃতির দুর্বলতা ও ভুলভ্রান্তির আবিষ্কার ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কি পর্যন্ত তরক্কী করতে পেরেছিলেন এবং তাঁদের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তি কল্পনার ডানা মেলে কোন্ কোন্ সমুচ্চ শাখায় নিজেদের বাসা নির্মাণ করেছে এবং কোন্ কোন্ মহাশূন্যে পাখা মেলেছে।

'ইল্ম ও মা'রিফত ছাড়াও এসব মকতূবাত লেখনীর জোর, বর্ণনাশক্তি ও উত্তম রচনাশৈলীর মাপকাঠিতেও একটি সর্বোত্তম নমুনা। এগুলোর অনেকাংশই এতখানি উন্নত যে, তাকে দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট ও উচ্চ পর্যায়ের সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। দুনিয়ার অধিকাংশ ভাষায় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের শাখায় এই

বাড়াবাড়ি করা হয়েছে যে, শুধু সেই সব ব্যক্তিত্বকেই সাহিত্যিক ও লেখক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরই লেখা ও চিন্তার ফসলকেই সাহিত্যের আদর্শ নমুনা হিসেবে পেশ করা হয়েছে যারা সাহিত্য ও রচনাকে একটি পেশা কিংবা যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশের একটি মাধ্যম হিসেবে মনোনীত ও নির্বাচিত করেছেন অথবা যারা প্রাচীনকালে সরকার কিংবা দরবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন অথবা রচনার ক্ষেত্রে যারা শিল্পসুলভ ও প্রচলিত রীতিনীতি তথা লৌকিকতা রক্ষা করে কাজ করেছেন। এর ফল এই হয়েছে যে, 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাঞ্জল লেখক হিসেবে সর্বদাই 'আবদুল হামীদ কাতিব, আবূ ইসহাক আস-সাবী, ইবনুল 'আমীদ, সাহিবে ইবনে 'ইবাদ, আবূ বকর খারিযমী, আবুল কাসিম হারিরী এবং কাযী ফাযিলের নাম নেয়া হয়ে থাকে। অথচ তাঁদের লেখার একটা বিরাট অংশ কৃত্রিম, জীবন ও আত্মা থেকে মাহরূম এবং প্রভাব সৃষ্টির ক্ষমতা থেকে মুক্ত। তাঁদের তুলনায় ইমাম গাযালী, ইবনে জওযী, ইবনে শাদ্দাদ, শায়খ মুহীউদ্দীন ইবনে 'আরাবী, আবু হাইয়ান তাওহীদী, ইবনে কাইয়িম, ইবনে খালদূন অধিকতর শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে আখ্যায়িত হবার হকদার। তাঁদের গ্রন্থে বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী রচনা, ধ্যান-ধারণা ও আবেগ-অনুপ্রেরণার প্রকাশ এবং মানবীয় প্রভাব ও অনুভূতির চিত্র অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু ঐসব নিরাপরাধ লোকদের অপরাধ এই যে, তাঁরা কখনও সাহিত্য সাধনা ও রচনাকে তাঁদের চিরন্তন পেশা অথবা যোগ্যতা ও প্রতিভা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেননি। তাঁদের অধিকাংশ লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম ও জ্ঞানের চর্চা করা।

সবচেয়ে মজার ও শিক্ষণীয় ব্যাপার হ'ল এই যে, একই লেখক দু'টি কিতাব লিখেছেন ঃ একটি সরাসরি বুদ্ধিমত্তা ও কৃত্রিমতা দিয়ে পরিপূর্ণ এবং অপরটি নেহায়েত সাদামাটা জৌলুসহীন। সেই যুগের সোসাইটি ও সাহিত্যসেবী গোষ্ঠী প্রথমোক্ত রচনার ভূয়সী প্রশংসাগীতিতে সোচ্চার। সম্ভবত উক্ত গ্রন্থের লেখকও আলোচ্য গ্রন্থকে জীবনের উপার্জন এবং অহংকারের পুঁজি মনে করে থাকবেন। কিন্তু বাস্তববাদী যমানা ও বিপ্লবের মহাকাল তার সঠিক ও নির্ভুল ফয়সালা ঠিকই শুনিয়েছে। বুদ্ধিমত্তার ছাপ সম্বলিত চাকচিক্যপূর্ণ গ্রন্থটি পাঠাগারের সৌন্দর্য হিসেবে বিরাজ করতে থাকে এবং অপর কিতাবটির তরে চিরদিনের জন্য খেলাত প্রদত্ত হয় এবং হেমন্তবিহীন উদ্যানের ন্যায় চির বসন্তে পরিণত হয়। ইবনে জওযীর স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যাকে তিনি বেশ গর্বের সঙ্গে "আল-মুদহিশ" (গভীর বিস্ময়ে নিক্ষিপ্তকারী) নামে নামকরণ করেছিলেন–

লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত صيد الخا طر নামক কিতাবটি যেখানে তিনি অত্যন্ত সরল সহজ তরীকায় স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করেছিলেন, সম্ভবত যাকে তিনি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণও মনে করেন নি– আজ তা সাধারণ্যে প্রিয় এবং সাহিত্যের ছাত্রদের লক্ষ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

ভারতবর্ষের ফারসী সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এখানকার সাহিত্য ও রচনার ওপর জহুরী আবুল ফযল এবং নে'মত আলী খানের প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। অথচ রচনার জন্য যদি আবেগ ও বাস্তবতার প্রভাবশালী প্রকাশকে মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয় তাহলে তাঁদের লেখনীর বিরাট একটা অংশ যেখানে শব্দের চাকচিক্য, বিস্ময়কর কারুকাজ ও শাব্দিক প্রশ্রয় ও পক্ষপাতিত্বের প্রাধান্য ছাড়া কিছুই দেখা যাবে না। ফলে সেগুলো নিজেদের মূল্য হারিয়ে ফেলবে এবং খুব অল্প অংশই সাহিত্য ও রচনার সাধারণ মানদণ্ডে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হবে এ সবের মুকাবিলায় এমন বহু গ্রন্থ মনোযোগ দেয়ার উপযোগী বিবেচিত হবে যেগুলোর প্রতি সাধারণভাবে সাহিত্যের ইতিহাসকার ও সমালোচকবৃন্দ সর্বদাই উপেক্ষা প্রদর্শন করে এসেছেন। হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রী (র) এবং হযরত মুজাদিদ্দ আলফে ছানী শায়খ আহমদ ফারূকী (র)-এর 'মকতূবাত'-এর বৃহৎ অংশ, সম্রাট 'আলমগীর (র)-এর 'রুক'আত', শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলবী (র)-এর 'ইযালাতুল খিফা' এবং শাহ 'আবদুল আযীয দেহলবী (র)-এর 'তুহফায়ে ইছনা 'আশারিয়া'-এর বহু অংশই সাহিত্যে ও রচনাশৈলীর উত্তম আদর্শ ও সফল নমুনা। এমন মনে হয় যে, প্রতিটি ভাষায় সাহিত্যের যে সীমা অগ্রপথিকরা অংকন করে দিয়েছেন, তার চৌহদ্দী থেকে বের হবার, অপরাপর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিষয়-শাস্ত্রের ভাণ্ডারকে আবর্জনামুক্ত করার এবং নতুন সাহিত্য-মহারথীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার মাথা-ব্যথ্যা সাধারণভাবে সহনযোগ্য মনে করা হয় নি এবং এভাবেই শতাব্দীকাল ব্যাপী ঐ সব সাহিত্য -রত্নরাজির ওপর ধূলির আস্তরণ জমতে থাকে।

সাহিত্য ও রচনার ক্ষেত্রে সাধারণ ঐতিহাসিক ও সমালোচকবৃন্দের অধিকাংশই এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করছেন যে, যে লেখায় উত্তম বাকভঙ্গীর সঙ্গে অন্তরের জ্বালা ও তাপ এবং হৃদয়ের তপ্ত লোহুও শামিল হয় সে লেখায় এমন প্রভাব ও এমন শক্তি সৃষ্টি হয় যে, স্বীয় সমসাময়িক যুগেও হাযারো দিলকে তা আহত করে এবং শত শত বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরও তার সজীবতা ও প্রাণস্পন্দন এবং তার তাছীর ও অভিভূত করবার শক্তি অক্ষত থাকে।

লেখা ও বক্তৃতাকে সর্বোত্তম ও কামিয়াব বানাবার জন্য যতগুলি গুণ ও যোগ্যতা, অলঙ্কারশাস্ত্রের যতবিধ মূলনীতি ও নিয়ম-কানুন আবশ্যক, সাহিত্য-সমালোচকেরা সে সবেরই বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন এবং প্রতিটি যুগেই তার ওপর বিতর্ক চলে আসছে। কিন্তু খুব কম লোকের কাছেই এটা অনুভূত হয়েছে যে, সেসব গুণাবলী ও যোগ্যতার ভিতর একটি বড় প্রভাব সৃষ্টিকারী ও না ভোলার মতো উপাদান অথবা কার্যকর শক্তি বক্তার খুলুসিয়ত (আন্তরিকতা বা একনিষ্ঠতা) ও বেদনাকাতরতা। সাহিত্য ও রচনাশৈলীর ভাণ্ডারকে যদি একটি নতুন ও অধিকতর বাস্তবসম্মত এবং গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা হয় তবে তাকে দু'টি ভাগে ভাগ করলে বোধহয় অন্যায় হবে না।

(এক) সে সমস্ত লেখা ও ধ্যান-ধারণার প্রকাশ যা অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও দাবি এবং কোন শক্তিশালী দৃঢ়ভিত্তিক 'আকীদা কিংবা বিশ্বাসের আওতাধীনে জন্মলাভ করে এবং যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কোনরূপ ফরমায়েশী কিংবা হুকুম তা'মিল করতে গিয়ে, দুনিয়াবী ফায়দা হাসিল অথবা কোন শক্তিশালী শাসক কিংবা বিত্ত-সম্পদের অধিকারী কোন ধনিকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ছিল না, বরং তিনি খোদ নিজ বিবেকের ও 'আকীদার অনুশাসন মেনেছিলেন যার ভেতর শাসক ও ধনিকশ্রেণীর নির্দেশ পালনের চেয়েও অধিকতর শক্তি নিহিত এবং যা উপেক্ষা ও অমান্য করা কোন বিবেকবান মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।

(দুই) সে সমস্ত লেখা যা কোন হুকুম তা'মিল করতে গিয়ে (অর্থাৎ ফরমায়েশী) অথবা কোন দুনিয়াবী স্বার্থোদ্ধার কিংবা ওপর মহলের কোন ব্যক্তি বিশেষের হুকুম তা'মিলের স্বার্থে লিখিত।

সাহিত্যের এই উভয় প্রকারের ভেতর আসমান-যমীন ফারাক বিদ্যমান। প্রথম প্রকার সাহিত্য দীর্ঘ দিন ধরে সজীব ও প্রাণবন্ত থাকে। তার বিশেষত্ব এই যে, যদি তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ধর্মীয় ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কিত হয়, তবে তার হৃদয় ও চরিত্রের ওপর গভীর ও বিপ্লবাত্মক প্রভাব পড়ে। হাযার হাযার মানুষের অন্তরে তা পড়বার পর সংশোধন তথা পরিশুদ্ধির ব্যাপারে উৎসাহ ও প্রেরণার সৃষ্টি হয়। এর বিপরীতে দ্বিতীয় প্রকারের সাহিত্য সাময়িক অভিনন্দন এবং ক্ষণিকের আনন্দ ও তৃপ্তি ছাড়া হৃদয় ও আত্মার ওপর দীর্ঘস্থায়ী কোন প্রভাব রেখে যায় না। তার জীবন ও আয়ূ সীমিত ও সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। প্রথম প্রকারের সাহিত্যে স্বতঃস্ফূর্ততা ও সহজ সাবলীল থাকে আর দ্বিতীয় প্রকারের সাহিত্যে থাকে শিল্প ও ব্যবস্থাপনাজাত সাজসজ্জা। এই দু'প্রকার সাহিত্যের ভেতর পার্থক্য

সেইরূপ যা এই দৃষ্টান্তমূলক কাহিনীর ভেতর দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। জনৈক ব্যক্তি একটি শিকারী কুকুরকে জিজ্ঞেস করেছিল, হরিণ পালাবার ব্যাপারে তোমার চেয়ে বেশি এগিয়ে যায় আর তাকে পাকড়াও করার ক্ষেত্রে তুমি এত পিছিয়ে পড় কেন? হরিণ নিজের জন্য দৌড়ায় আর আমি দৌড়াই আমার মনিবের জন্য–এটাই ছিল কুকুরের জবাব।

মোটকথা, এই বাতেনী অবস্থা, বিশ্বাস ও পর্যবেক্ষণ, দা'ওয়াতের প্রাধান্য, আত্মার সঙ্গে সম্পর্কের অধিকারীকে বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করতে এবং মন্যিলে মকসুদ তথা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুবার আবেগ ও উৎসাহ, ইখলাস ও বেদনাকাতরতা, আত্মার সৌন্দর্য ও হৃদয়ের পবিত্রতা এবং এ সবের সঙ্গে প্রশান্তকর বিশুদ্ধ আনন্দ ও ভাষার ওপর আল্লাহ্ পাক হযরত শায়খ শরফুদ্দীন (র) কে-এক মহা সাহিত্যিক মর্যাদা ও মকাম (স্থান) দান করে ছিলেন এবং তিনি স্বীয় ধ্যান-ধারণা ও আবেগ-অনুপ্রেরণা প্রকাশের জন্য একটি স্থায়ী নিয়ম-কানুন সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন–যা একমাত্র তাঁরই জন্য ছিল নির্দিষ্ট। তাঁর 'মকতূবাত' শুধু ফারসী সাহিত্যেই নয়, বরং ইসলামী সাহিত্যেও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে এবং মা'রিফাত, হাকীকত, ইসলামের দা'ওয়াত ও সংস্কার-সংশোধনের ভাণ্ডারে কম জিনিসই এমন মিলবে যা স্বীয় সাহিত্য-গুণ, শক্তি ও প্রভাব সৃষ্টিতে তাঁর দ্বিতীয় নজীর হতে পারে।

চিঠিপত্রের (মকতূবাত) সংকলন এবং যাকে লেখা হয়েছে

মকতূবাতের সবচেয়ে মশহূর ও নির্ভরযোগ্য সংকলন সেটি যা চৌসা[১] নামক কসবা (ক্ষুদ্র শহর)-এর শাসনকর্তার নামে লিখিত। এই সংকলনটিতে ১০০ টি চিঠি রয়েছে। কোথাও 'মকতূবাতে শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মুনায়রী'- এর নামে ছাপা হয়েছে, কোথাও 'সাহ্ সদী মকতূবাত' নামে, আবার কোথাও 'মকতূবাতে সদী' নামে। এর সংকলক হযরত মাখদূম (র)-এর বিশিষ্ট ও বিশ্বস্ত শাগরিদ শায়খ যঈন বদর 'আরাবী ভূমিকায় লিখেছেন ঃ

> অধম বান্দা যঈন বদর 'আরাবী বলছি যে, কাযী শামসুদ্দীন, চৌসা নামক কসবার শাসনকর্তা বারবার তাঁর খেদমতে আবেদন করেছেন যে, এই গরীব কতকগুলি অসুবিধার কারণে হযরত মাখদূম (র)-এর মজলিসে হাযির হতে এবং তাঁর সাহচর্যের সৌভাগ্য লাভে (যা 'ইল্ম ও মা'রিফাত হাসিলের

১. চৌসা হযরত মাখদূম সাহেব (র)-এর আমলে একটি কেন্দ্রীয় ও প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। এ যুগে তা প্রাচীন জেলা শাহআবাদ কমিশনারীর একটি অখ্যাত পল্লী।

মাধ্যম) বঞ্চিত। অতএব বিনীত প্রার্থনা যে, 'ইলমে সুলূক (অধ্যাত্ম পথের জ্ঞান)-এর প্রতিটি অধ্যায়েই বান্দার বোধ-শক্তি ও সামর্থ মুতাবিক কিছু অংশ যেন লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় যাতে দূরে নিক্ষিপ্ত এই অধম এর থেকে লাভবান হতে পারে। এই দরখাস্ত যা অত্যন্ত ইখলাস ও অনুনয়-বিনয় সহকারে করা হয়েছিল—মঞ্জুর করা হয় এবং হযরত মাখদূম (র) অধ্যাত্ম পথের পথিকদের (সালিকীন) মরতবা ও মকাম এবং মুরীদদের অবস্থাদি ও কার্যকলাপের ব্যাপারে আবশ্যকমত কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করে দেন এবং এইভাবে তওহীদ ও মা'রিফাত, ইশ্ক ও মহব্বত, আকর্ষণ ও কোশেশ, বন্দেগী ও দাসত্ব, তাজরীদ ও তাফরীদ, প্রশংসা ও ভর্ৎসনা তথা পীর-মুরিদীর অনেক জরুরী ও উপকারী রচনাসমূহ ও হেদায়েত, প্রাচীনকালের বুযর্গদের বহু কাহিনী এবং অবস্থা ও কার্যকলাপের অনেক ভাণ্ডারই লেখার ভেতর এসে যায়। এই চিঠিপত্রগুলো ৭৪৭ হিজরীর বিভিন্ন মাসে বিহার থেকে চৌসা নামক পল্লীতে প্রেরিত হত। খানকাহ্র খাদেম ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এসব চিঠি-পত্রের (মাকতুবাত) নকল রেখেছিল যাতে সত্যের প্রার্থী ও পরবর্তীতে আগত বংশধরদের এটা কাজে লাগে।

অন্য আর একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন 'মকতূবাতে জওয়াবী" নামে আলাদাভাবেও প্রকাশিত হয়েছে এবং "সাহ্ সদী মকতূবাত" (سه صدى مكتوبات) - এর (ইসলামী কুতুবখানা পাঞ্জাব, লাহোর থেকে প্রকাশিত) সংকলনের ভেতরও শামিল। এটা ঐসব মকতূবাতের অবশিষ্টাংশ যা শায়খ মুজাফফরের নামে তার বিনীত দরখাস্তের জওয়াবে লেখা হয়েছিল এবং এর ভেতর অধিকাংশই আধ্যাত্মিক পথে চলতে গিয়ে আগত সম্ভাব্য সমস্যা ও সংকটের সমাধান এবং উক্ত রাস্তার ধাপে ধাপে উন্নতি, অগ্রগতি ও বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। এর থেকে শায়খ মুজাফফরের উচ্চ সামর্থ ঐশী পুরস্কারের পরিমাপ করা যায়। শায়খ মুজাফফর ওসিয়ত করেছিলেন, এসব চিঠিপত্র যেন মৃত্যুর পর তার সঙ্গেই দাফন করে দেয়া হয়। আকস্মিকভাবেই কিছু চিঠিপত্রের ওপর তার খাদেমের নজর পড়ে এবং তারা সেগুলি কপি করে নেয়। এই সংকলন "মকতূবাতে জওয়াবী" নামে চিহ্নিত হয়। সংকলনে আটাশটি চিঠি রয়েছে। মকতূবাতের তৃতীয় এক সংকলন যেখানে একশো তেপান্নটি চিঠি রয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তির নামে। এই মকতূবাত ৬৬৯ হিজরীর জমাদিউল আওয়াল ও ৭৬৯ হিজরীর রমযানুল মুবারকের মধ্যবর্তী সময়ে লেখা হয়েছে।

যাদের নামে এসব চিঠিপত্র লেখা হয়েছিল, তাদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম এখানে দেওয়া গেল ঃ

কসবা আঙ্গুলীর অধিবাসী শায়খ 'উমর, কাযী শামসুদ্দীন, কাযী যাহিদ, মাওলানা কামালুদ্দীন সন্তোষী, মাওলানা সদরুদ্দীন, মওলানা যিয়াউদ্দীন, মাওলানা মাহমূদ সিঙ্গানী, শায়খ মুহাম্মাদ জাফর আবাদী যিনি দেওয়ানা নামে পরিচিত, মাওলানা নিজামুদ্দীন, সুলতান মুহাম্মাদ, মাওলানা নাসীরুদ্দীন, আমীন খান, মালিক খিযির, শায়খ কুত্বুদ্দীন, শায়খ সুলায়মান, সুলতানুশ্ শারক্ ফীরোয শাহ।

রচনার উৎস

হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মুনায়রী (র)-এর মকতূবাত অধ্যয়ন করলে পাঠকের কাছে পরিষ্কার অনুভূত হয় যে, এই মহাজ্ঞান, এই দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ সূক্ষ্ম ব্যাপারসমূহ ও পর্যালোচনা লেখকের শুধু ধীশক্তি, জ্ঞানের প্রাচুর্য, গভীর চিন্তা ও অধ্যয়নেরই পরিণতি নয়, বরং এটা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, তাঁর গভীর নিষ্ঠা ও বিশ্বাসেরই ফলশ্রুতি। আল্লাহ্র মহান দরবার, মুখাপেক্ষী নন এমনি শান, তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব, গৌরব মহিমা ও সৌহার্দ্য, মু'মিনের আশা ও ভয়, 'আরিফ ও আল্লাহ্র পথের পথিকদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও মিলন, আনন্দ ও বেদনা, রহমতের দরিয়ার প্রবল উচ্ছ্বাস, তওবা ও আল্লাহ্র নৈকট্যলাভের প্রয়োজনীয়তার ওপর যা লেখা হয়েছে, তাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কোন গোপন রহস্যভেদী এবং হাকীকতের সঙ্গে পরিচিত কেউ তা লিখেছেন। প্রবৃত্তির ভ্রান্তি, শয়তানের প্রতারণা, নীচ চরিত্র এবং আধ্যাত্মিক পথের ঘাঁটি সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তা সবই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, বিস্তৃত ও কার্যকর জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

তরীকতপন্থীদের ভ্রান্তির ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ, শরীয়তের আবশ্যকতা, শরীয়তের কষ্টকর বিধানসমূহের স্থায়িত্ব, বেলায়েতের ওপর নবুওতের প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার এবং মকামে নবুওতের মহান মর্যাদা সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে, তার মূল্য ও কদর এবং তার উপকারিতা পরিমাপ করবার জন্য তখনকার সময় ও পরিবেশ সম্পর্কে জানা জরুরী যে সময় ও পরিবেশে এই মকতূবাত লেখা হয়েছে। এখানে আমরা বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে সেই সব মকতূবাতের কিছু উদ্ধৃতি পেশ করব। যিনি বিস্তারিতভাবে জানতে ও উপকার পেতে আগ্রহী, তিনি আসল মকতূবাতের শরণাপন্ন হতে পারেন।

সপ্তম অধ্যায়

মকামে কিবরিয়া

দুনিয়া জাহানের মহান স্রষ্টার পরমুখাপেক্ষীহীনতা

একটি পত্রে মহান আল্লাহ্‌পাকের পরমুখাপেক্ষীহীনতা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা হ'ল, তাঁর কোন কর্ম ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কারও কোন বাদ-প্রতিবাদ কিংবা কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ নেই। لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ তিনি যাকে ইচ্ছা ঈমানী দৌলত ও কবুলিয়তের খেলাত দিয়ে ধন্য করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাঁর মহান দরবার থেকে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত করেন। যাকে ইচ্ছা তিনি মাটির দুনিয়া থেকে সপ্তাকাশের উর্ধ্বে উঠিয়ে নেন এবং যাকে ইচ্ছা সপ্তাকাশের উর্ধ্ব থেকে ধূলি-মলিন দুনিয়ায় নিক্ষিপ্ত করেন।

اگر گوئی چرا چنین است। যদি তোমরা বল ঃ এমনটি কেন হবে? তাহলে প্রদত্ত উত্তর হবে নিম্নরূপ ঃ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ এটা আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ—যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন।

কার এতখানি সাহস যে, আল্লাহ্ পাককে এটা বলতে পারে, কেন তুমি অমুককে এত ধন-দৌলত দিলে আর অমুককে দিলে না? যেমন একজন বাদশাহ্ একজনকে ওযারতী তথা মন্ত্রিত্বের পদ দিয়ে ধন্য করেন আর অন্যজনকে দারোয়ানী কিংবা চাপরাশির পদে অধিষ্ঠিত করেন, ঠিক তেমনি মহান আল্লাহ্ পাক যখন কাউকে দীন ও ঈমানের সম্পদ দান করেন, তখন তাকে কখনো মন্দের হাত থেকে সরিয়ে নেন, আবার কখনো তাকে হীন ও নীচ, যালিম ও হারামখোর সম্প্রদায়ের ভেতর থেকে বের করে আনেন। কার এতখানি বুকের পাটা যে বলবে اَهٰؤُلَاءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا। অর্থাৎ এরাই কী সে সমস্ত লোক যাদেরকে আল্লাহ্ পাক অনুগৃহীত করেছেন আমাদের মধ্য থেকে?' হুকুম হচ্ছে যে, ফুযায়ল ইবন 'আয়ায—সে ছিল ডাকু—তাকে আমার দরবারে নিয়ে এস ; আমি যে তাকেই চাই। বাল'আম বা'উর, যে চার শো বছর পর্যন্ত মুসাল্লা (জায়নামায) থেকে এতটুকু সরে নি,

তাকে আমার দরবার থেকে দূরে নিয়ে যাও; সে আমার দরবার থেকে বহিষ্কৃত। আমি ওমরকে চাই, যে পুতুল পূজায় মত্ত ; আর 'আযাযীল যে সাত হাযার বছর পর্যন্ত আমার ইবাদতে মশগুল, তাকে আমি চাই না। কার এতখানি সাহস যে বলবে, কেন এমনটি হ'ল?

যদি সেই মহান প্রভুর কৃপাদৃষ্টি একবার নিক্ষিপ্ত হয় তাহলে সব দোষ-ত্রুটিই উপেক্ষণীয় ও বিজ্ঞোচিত, সব অপূর্ণতাই পূর্ণতা, বিশ্রী রূপই সকল সৌন্দর্যের আঁকর। হে ভ্রাত! একমুষ্টি মাটিই তো ছিলে, যিল্লতী ও অবজ্ঞেয় অবস্থায় পথিমধ্যে পড়েছিল, পায়ের তলায় লেগেছিলে। এরপর মহান কৃপানিধানের করুণাদৃষ্টি পতিত হতেই ঘোষিত হ'ল ঃ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيْفَةً। (আমি পৃথিবীর বুকে খলীফা হিসেবে পাঠাতে চাই)।"

এই পরমুখাপেক্ষীহীনতাকেই অন্য আর একটি চিঠিতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

উপদেশ ও শিক্ষালাভের জন্য সতর্কীকরণের চক্ষু উন্মোচন কর। আদম (আ)-এর আক্ষেপ আর নূহ (আ)-এর ফরিয়াদ শোন। ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর ব্যর্থতা আর ইয়াকূব (আ)-এর মুসীবতের দাস্তান (ঘটনা) কান দিয়ে শোন। কূয়ার মধ্যে নিক্ষিপ্ত ইউসুফ (আ)-এর চাঁদ-মুখ দেখ, হযরত যাকারিয়া (আ)-এর মাথার ওপর করাত এবং হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর গর্দানের ওপর রাখা তলোয়ারও গভীরভাবে অবলোকন কর। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হৃদয়ের জ্বালা এবং দিলের অস্থিরতা গভীরভাবে লক্ষ্য কর আর পড় ঃ

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ -

"সেই পবিত্র মহান সত্তা ব্যতীত আর সব কিছু ধ্বংসশীল।"

একস্থানে আল্লাহ পাকের দরবারের উন্নত ও মহান মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন ঃ

হে আমার ভ্রাত! ভালভাবে অনুধাবন কর। যে লোকমা (খাদ্যের গ্রাস) শিকারী বাজপাখির জন্য তৈরি করা হয়েছে—একটি চড়ুই কিংবা অনুরূপ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাখীর পেটে কি করে তা ঢুকতে পারে? সেই লম্বা পোশাক যা ভাগ্যবান ও সম্পদশালী লোকের শরীরের পরিমাপ অনুযায়ী সেলাই করা হয়েছে—তা আমাদের মত নগণ্য ছোটখাট আকৃতির লোকের জন্য কি করে উপযোগী হতে পারে?

অন্য আর এক পত্রে এটা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

আল্লাহ্‌র করুণা বায়ু যখন প্রবাহিত হয় তখন মাটির পক্ষে পরশমণিতে রূপ নিতে এবং আল্লাহ্‌র দরবার থেকে বহিষ্কৃত ও বিতাড়িতের পক্ষে গৃহীত হতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। একথা যেখানে ভয়েরও বটে—সেখানে তা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ও উৎসাহ-উদ্দীপকও বটে।

তিনি আরও বলেন ঃ

> এই মহামূল্যবান সম্পদ লাভ আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। এটা কোন দাবি বা অধিকারের বিষয় নয়। সেই মহান আল্লাহ্‌র কসম! ব্যাপারটা যদি দাবি কিংবা অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত হ'ত, তাহলে আমার ও তোমাদের ভাগ্যে একটি বিন্দু পরিমাণও জুটত না। কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্ক এর মাঝ থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এমন কি এখন যেভাবে একজন পবিত্র আত্মাও এই সম্পদের প্রত্যাশী, ঠিক তেমনি বাক-সর্বস্ব ও নাপাক হাযারো নগণ্য জিনিসও এর প্রত্যাশী। যে আবর্জনা ও ভস্মস্তূপ কুকুরের আবাসস্থল হতে পারে—তাই একদিন বাদশাহ্‌র শাহী দরবারে পরিণত হতে পারে। অবশ্য আল্লাহ্ পাক তাঁর মহা-হিকমত-এর জন্য কিছু কার্যকারণও নিধারিত করে রেখেছেন।

অপর একটি চিঠিতে এই বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে ঃ

> কার্যকারণবিহীন অনুগ্রহ একজনকে অনুগৃহীত করে–আর কার্যকারণবিহীন ইনসাফ ও সুবিচার অন্যকে গলিয়ে দেয়। 'ওমর (রা)-কে মূর্তিঘর থেকে বের করে এনে মকবূল বান্দা হিসেবে গড়ে তোলা হয়–আর 'আবদুল্লাহ্ ইবন উবাইকে মসজিদেও অপমানিত ও লাঞ্ছিত থাকতে হয়।

অন্যত্র বলেছেন ঃ

> স্বীয় কৃপা ও মেহেরবাণীতে একজন পাপীকে তিনি ডেকে পাঠান যেন তাকে স্বীয় অপার ক্ষমা ও কৃপাসিন্ধুতে অবগাহন করিয়ে নিতে পারেন, করুণা ও কৃপার পবিত্রতা যেন হৃদয়-মন থেকে জাহির হয়। তাঁর কহর ও গযব কখনো কোন পবিত্র বান্দাকেও ডেকে পাঠায় যেন তাকে ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত মসিলিপ্ত ধোঁয়া দিয়ে তার চেহারাকে কালিমামণ্ডিত করতে পারেন। উদ্দেশ্য এই যে, সেই মহাশক্তিধর রাজাধিরাজ–যিনি সর্বপ্রকার কার্যকারণমুক্ত, তা প্রমাণিত হয়ে যায়। কখনো তিনি কোন হতভাগ্যের অঞ্চল প্রদেশ থেকে কোন নবীকে বের করে আনেন, আবার কখনো নবীর আঁচলের তলা থেকে কোন হতভাগ্যের জন্ম দেন। কখনো কোন কুকুরকে টেনে এনে আওলিয়ার

সারিতে বসিয়ে দেন, আবার কখনো কোন ওলী-দরবেশকেও কুকুরের দীর্ঘ সারিতে দাঁড় করান। কিন্তু যখন তিনি কাউকে কবূল করে নেন তখন তাকে আর ছুঁড়ে ফেলে দেন না, আবার কাউকে পরিত্যক্ত ও বাতিল বলে ঘোষণা করলে অতঃপর কোন কিছুর বিনিময়েই আর তাকে কবূল করেন না।

অপর একটি চিঠিতে লিখেন ঃ

চোখের নজর নিবদ্ধ রাখতে হবে 'কুদরত' (আল্লাহ্ পাক) ও 'ফযল' (অনুগ্রহ)-এর ওপর। যদি চান তবে হাযারো গির্জা ও পূজার ঘরকে তিনি কা'বায় ও বায়তুল মুকাদ্দাসে পরিণত করতে পারেন এবং হাযার হাযার নাফরমান পাপী ও গুনাহ্গারকে আল্লাহ্র 'হাবীব' ও আল্লাহ্র 'খলীল' (বন্ধু) খেতাব দিতে পারেন। এর মাঝে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। যদি তিনি চান এক মুহূর্তে হাযার হাযার কাফিরকে মু'মিন বানিয়ে দিতে পারেন, হাযারো মুশরিক ও পুতুল পূজারীকে তওহীদবাদীতে রূপান্তরিত করতে পারেন, আর এর জন্য তাঁর কোন অবকাশের দরকার নেই। হাযার হাযার অভিশপ্তকে অনুগ্রহপ্রাপ্ত এবং হাযার হাযার পানশালাকে তিনি সমান্তরাল রাস্তায় মিশিয়ে দিতে পারেন। এ ব্যাপারে কারও কোনরূপ উচ্চবাচ্য করারও অবকাশ নেই।

অপর এক পত্রে তিনি বলেন ঃ

যা ইচ্ছা তাই তিনি করেন। কারও ধ্বংসের পরওয়া যেমন তাঁর নেই, তেমনি নেই কারও নাজাতের পরওয়াও। একজন উন্মুক্ত প্রান্তরে পিপাসায় জীবন দিচ্ছে আর বলছে যে, দুনিয়ার বুকে পানির এত নহর বয়ে চলেছে, অথচ আমি এখানে পানি বিহনে জীবন দিতে চলেছি! গায়েব থেকে আওয়াজ ভেসে আসে, হাযারো সিদ্দীক (সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বান্দাহ্)-কে আমি ভয়ংকর জঙ্গলে নিয়ে আসি এবং তাদেরকে আমার ইচ্ছাশক্তির তেগ ও তলোয়ার হেনে নিঃশেষ করে দেই যাতে করে কিছু কাক ও শকুন তাদের চক্ষু, চোয়াল ও মাথার খুলি (অর্থাৎ শবদেহ) থেকে নিজেদের রূযী সংগ্রহ করতে পারে। যদি কোন অভিযোগকারী অভিযোগের ভাষা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে চায়, তখন আমি এই কথা বলে তার মুখ বন্ধ করে দেই যে, لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ অর্থাৎ পক্ষীকূলও আমার আর সিদ্দীকও আমারই; মাঝে তোমরা প্রশ্ন উঠাবার কে ?[১]

১. ৫৬ নং মাকতূব।

অন্য এক পত্রে তিনি বলেছেন ঃ

কারুরই স্বীয় পরিণতি সম্পর্কে এ খবর ও জ্ঞান নেই যে, তার সঙ্গে কী ব্যবহার করা হবে। দু'ধরনের ব্যবহারের সম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

দু' ধরনের (ভাল এবং মন্দ) ব্যবহার সম্পর্কিত ঘটনার বেশুমার কাহিনী তিনি এমন প্রভাব সৃষ্টিকারী পত্রে লিখেছেন যে, তা পড়বার পর মানুষের রক্ত পানি হয়ে যায়।

ভাই আমার! রাস্তা নিরাপদ নয়, অথচ মনযিলও বহু দূরে। আমার কাম্য অসীম, শরীর দুর্বল, দিল অসহায়, অন্তর 'আশিক আর মস্তক বাসনাপূর্ণ।

কত চেহারাই না আছে যেসব কবরের ভেতর কিবলার দিক থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, কত পরিচিত আপনজনই রয়েছে যাকে প্রথম রাত্রিতেই অপরিচিত করে দেওয়া হয়। কত ব্যক্তি আছে যাদেরকে বলা হয় ঃ বাসর রাতের ঘুম ঘুমাও— আর অন্যকে বলা হয় অলক্ষুণে ঘুম ঘুমাও। কখনো বা এমনভাবে পরিত্যাগ করেন যে, কোনরূপ আনুগত্যের বিনিময়েই আর ফিরিয়ে নেন না।

من لم يكن للوصال اهلا - فكل احسانه ذنوب -

পরম স্রষ্টার সঙ্গে মিলিত হবার যোগ্যতা যে রাখে না, তার প্রতিটি সৎকর্ম ও সদাশয়তাই গুনাহরূপে বিবেচিত হয়।

আর কখনো বা এমনি কবূল করেন যে অতঃপর কোন অন্যায় ও অবাধ্যতারই আর পরওয়া করেন না।

فى وجهه شافع يمحوا ساءته

من القلوب ويأتى بالمعاذير

তার মুখমণ্ডলে সুপারিশকারী আলামত বিদ্যমান। তিনি হৃদয় থেকে পাপের কালিমারাশি বিদূরিত করেন এবং ওযর কবূল করেন।

খলীলুল্লাহ্ হযরত ইবরাহীম ('আ)-কে পুতুল ঘর থেকে বের হতে দেখ আর يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ (যিনি মৃতের থেকে জীবিত বের করেন) পড়; নূহ ('আ)-এর ঘর থেকে কিন'আনকে বেরিয়ে আসতে দেখ আর يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ (যিনি জীবিতের থেকে মৃত্যু দান করেন) স্মরণ কর। আদম ('আ)-এর ছবিকে এমনই স্থায়িত্ব দান করলেন যে, পদস্খলনের

ক্ষতিও তা মুছে ফেলতে পারে নি; আর ইবলীসকে সন্ধির স্বরবর্ণের ন্যায় এমনি মুছে দিলেন যে, বিরাট আনুগত্যের হকও তাকে কোন ফায়দা পৌঁছাতে পারে নি। যেমন কারুর জন্য لَهُمُ الْبُشْرٰى (ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদ)-এর সংবাদ, তেমনি– আল্লাহ্র দরবার থেকে বহিষ্কৃতদের জন্য لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ (পাপীদের জন্য আজ কোনই সুসংবাদ নেই)-এর ঘোষণা। যেমনি কোথাও سِيْمَاهُمْ فِى وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ (তাদের চেহারায় সিজদার দাগ চিহ্নিত দেখবে) আছে, তেমনি– يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمَاهُمْ (পাপীরা তাদের কুৎসিত চেহারার জন্য চিহ্নিত হবে)-ও আছে।

অন্য আর এক চিঠিতে তিনি বলেন ঃ

শাহানশাহ মহারাজাধিরাজ-এর গুণাবলী ও কার্যকলাপ, সৌন্দর্য ও গৌরব-মহিমা, পরাক্রম ও ক্ষমাশীলতা দু'টোই নিজ নিজ কাজ করে যায় আর এ দু'টো গুণই আপন কর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং সৃষ্টি জগতে এটা এমনি ব্যয় হয় যে, ঈমানদারের জন্য ভয় ও প্রত্যাশার মাঝখানে অবস্থান করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

এক স্থানে আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তার মর্যাদা فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ (তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন)-এর ব্যাখ্যা করতে ও তার উদাহরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

কখনো করুণাময় সত্তা কার্যকারণহীনভাবে বলেন যে, ভেতরে এসে যাও ; এখানে কুকুরের পায়ের আশপাশকেও বন্ধুর চোখের তুতিয়া বানাই এবং كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ[১] বলে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য কুকুরের মর্যাদা বাড়িয়ে দেই। আবার কখনো আল্লাহ্র ভয়াবহ ও পরাক্রমশালী সত্তা কার্য-কারণহীনভাবে আওয়াজ দেন যে, খবরদার! সাবধান! এখানে ফিরিশতাকুলের শিক্ষক ('আযাযীল)-এর মস্তক থেকে –যে সাত লক্ষ বছর আল্লাহ্র মহান দরবারে ই'তিকাফরত ছিল, শাহী পোশাক খসিয়ে وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىْ (আর তোর ওপর আমার লা'নত ও অভিসম্পাত)-এর কলংক কপালে লাগিয়ে দেন। কখনো ওমরকে–যে ছিল অপরিচিত, মূর্তির সামনে থেকে হটিয়ে নিজের কাছে ডেকে এনে বলেন,

---

১. এখানে আসহাবে কাহফের কুকুরের মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

انا لك شئت ام ابيت وانت لى شئت ام ابيت (হে 'ওমর!) আমি তোমার, তুমি চাও আর নাই চাও; আর তুমি আমার, তুমি চাও আর নাই চাও এবং বাল'আম বাউরের–যে ছিল নিকট ও পরিচিতজন, ইসমে আ'যম-এর মহামূল্যবান খেলাত দ্বারা যাকে ভূষিত করা হয়েছিল–মসজিদ থেকে বাইরে টেনে এনে কুকুরের লম্বা সারিতে বেঁধে দেওয়া হয় এবং বলা হয় فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ (তাদের অবস্থা কুকুরের মত হয়ে গেছে। যদি তুমি তাদের ওপর হামলা কর তাহলে তারা জিভ বের করে হাঁপায়, আর যদি তাদের নিজেদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় তবুও তারা হাঁপায়)। কখনো শত সহস্র প্রকারের বালা-মুসীবত ও দুর্যোগ-তকলীফের নির্মম চাকা সেই মহান সত্তার সন্ধান-ভিখারীদের অতৃপ্ত হৃদয়-মনের ওপর দিয়ে চালিয়ে দেন, আবার কখনো কখনো হাযার হাযার বিরাট পবিত্র ও মর্যাদামণ্ডিত স্থানের অধিবাসীদেরকে (অর্থাৎ ফিরিশতাদেরকে) তার অভ্যর্থনায় পাঠিয়ে দেন এবং অত্যন্ত মেহেরবানী ও হৃদয়গ্রাহিতার সঙ্গে তাকে নিজের কাছে ডেকে নেন। কখনো-বা পাহাড়সম গুনাহরাজিও মাফ করে দেন, আবার কখনো একটি সিকি পরিমাণও ছেড়ে দেন না। কখনো বেহেশতের সদর মকামে স্থান দেন, আবার কখনো এমনভাবে বাইরে নিক্ষেপ করেন যে, দরজার ওপর থাকতেও অনুমতি দেন না। এখানে জ্ঞান ও বুদ্ধি থাকে আনতপ্রায় আর পীর-মুরীদ দেওয়ালে অংকিত চিত্রের ন্যায়। এখানে চান এবং তাই ফয়সালা করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন)-এর বহিঃপ্রকাশ।

মহা করুণা সিন্ধুর প্রবল উচ্ছ্বাস

যিনি পরমুখাপেক্ষী নন ও যিনি সকল অভাবমুক্ত–সেই মহান আল্লাহ্‌র শান, তাঁর সাধারণ ইচ্ছাশক্তি, কুদরতে কামিলা, প্রবল প্রতাপ ও পরাক্রমশীলতা সম্পর্কে ওপরে যে সব উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, সব অধ্যয়ন করবার পর মানুষের ওপর একটি ভীতিকর অবস্থার সঞ্চার হয় এবং এটা কিছুমাত্র আশ্চর্য নয় যে, একজন একনিষ্ঠ ও দৃঢ়-বিশ্বাসী ব্যক্তির যবান থেকে, যাকে আল্লাহ পাক লেখনী ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ শক্তির পুরোটাই দান করেছেন, পাঠকের ওপর নিরাশার আবহওয়া বিরাজ করতে পারে (আর এটা আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত নয়)। 'উলামায়ে রব্বানী এবং নায়েবে রাসূল ও নবীগণ সুসংবাদদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী

হিসেবে আদর্শ নমুনা হয়ে থাকেন এবং তাঁরা আল্লাহ্‌র বান্দাহগণকে তাঁর রহমত থেকে নিরাশ করেন না, বরং তাদের উৎসাহ ও মনোবল বাড়িয়ে থাকেন এবং আমল ও ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালাতে উৎসাহিত করেন। এটাই আম্বিয়া 'আলায়হিমুস-সালামকে দুনিয়ায় পাঠাবার এবং তাঁর নায়েবগণের দা'ওয়াত ও সকল চেষ্টা-সাধনার আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাই গৌরব মহিমার সঙ্গে সৌন্দর্য এবং পরাক্রমশালীতার সঙ্গে ক্ষমাশীলতার শানও তেমনি জোরের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ঃ

رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (আমার রহমতের ধারা প্রতিটি বস্তুতে বিস্তৃত) এবং قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمَ۔

(বল, হে আমার বান্দাহ সকল! যারা নিজেদের নফসের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ, আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল গুনাহরাজিই মাফ করবেন। কেননা একমাত্র তিনিই ক্ষমাশীল, দয়ালু)-এর বিস্তারিত বিবরণ তেমনি অলংকার ও বাগ্মিতা প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি দিয়েছেনঃ

হে আমার ভ্রাত! আল্লাহ্ তা'আলার অপার করুণাসিন্ধুতে যখন কারামত ও মাগফিরাতের উত্তাল ঢেউ ওঠে তখন সমস্ত পদস্খলন ও পাপরাশিই বিলীন ও ধ্বংস হয়ে যায়, সব দোষ-ত্রুটিই বুদ্ধিমত্তায় পরিণত হয়। আর তা এজন্য যে, পদস্খলন ও নাফরমানী ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল এবং আল্লাহ্‌র রহমত চিরন্তন। ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল বস্তু চিরন্তন ও নিত্য বস্তুর মুকাবিলা কী করে করতে পারে? এই মুঠিভর মাটির সারাটা ভিত্তি রহমতের ওপরই তো! অন্যথায় আমাদের এই অস্তিত্বের এই কালিমাময় পশমী কম্বল এবং আমাদের নাপাক মাটির এই বিন্দুর কী ক্ষমতা ছিল যে, রাজাধিরাজের বিস্তৃত আঁচলের ওপর কদম রাখে? কতই না পানশালার অধিবাসী মদ্যপায়ী মাতাল–যাদের চেহারার ওপর শয়তান কালি ঢেলে দিয়েছে এবং যাদের কিসমতের চারা প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার আবর্জনা স্তূপে গজিয়েছে, আকস্মিকভাবে প্রেরিত দূত এসে হাযির হয়েছেন আল্লাহ তা'আলার দরবার থেকে তার কবূলিয়তের বার্তা নিয়ে এবং বলছেন– তোমার সাথে আমার কিছু কথা বলার রয়েছে।[১]

১. ৫৬তম পত্র।

সাধারণ প্রতিদান

হযরত মাখদুম মুনায়রী (র) চিঠির প্রাপকের উৎসাহ ও মনোবল বাড়িয়ে দেন, অবস্থার সংস্কার ও সংশোধন এবং আল্লাহ্‌র রহমতের এমনই আগ্রহ তার ভেতর জন্মিয়ে দেন যেন শাহী দস্তরখান তাকে নির্বাচিত করে রেখেছে এবং সারাটা দুনিয়াই তাঁর সাধারণ প্রতিদান ও পারিতোষিক আর রহমতের প্রবল জোয়ারে ভাসছে। এখানে কারুর বঞ্চিত হবার কোন প্রশ্নই নেই। কেননা এখানে খোদ প্রেমাস্পদই তার সন্ধানপ্রার্থী ও আকাঙ্ক্ষী। অন্যথায় কোথায় এই যালিম, মূর্খ ও ধ্বংসশীল মানব– আর কোথায় সেই পবিত্র মহান সত্তা। لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ তাঁর অনুরূপ আর কোন সত্তা নেই।

> অনুগ্রহের দরোজা খোলা রয়েছে আর দস্তরখান সামনেই রয়েছে পাতা। জলদি কর এবং নিজেকে তার মধ্যে শামিল করে নাও। হে ভ্রাত! মানুষ কী করে মানুষকে চাইবে? কিন্তু অসীম সেই অনুগ্রহের ভাণ্ডার–তা প্রভুকে যেমন পরিত্যাগ করে না, তেমনি পরিত্যাগ করে না গোলামকেও। বিত্ত-সম্পদের মালিককে যেমন ছেড়ে দেয় না, তেমনি ছেড়ে দেয় না বিত্তহীন ফকীরকেও। যেমন সূর্য যখন তার উদয় পথে এসে দেখা দেয়, যদি সমস্ত দুনিয়াবাসী সাহসে কোমর বাঁধে যে, তার উজ্জ্বল নূরের একটি বিন্দু পরিমাণও সে হাতে উঠিয়ে নেবে, তাতে সে সক্ষম হবে না। কিন্তু সে স্বয়ং স্বীয় বদান্যতা ও অনুগ্রহ বিতরণের সাধারণ নীতি অনুসারে যেমন করে শাহী-প্রাসাদ ও আমীর-উমারার বাসগৃহের উপর চমক সৃষ্টি করে, তেমনি গরীব ও অসহায় লোকদের দুঃখের কুঁড়ে ঘরকেও আলোক-উদ্ভাসিত করে তোলে। তুমি পানি ও মাটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর না, সেই সম্পদ ও সৌভাগ্যের দিকে তাকাও, তাকাও يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ (আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন আর তারাও আল্লাহ্‌কে ভালবাসে)-এর নির্দেশের প্রতি। এক জায়গায় বলেন ঃ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (আল্লাহ ঈমানদারগণের বন্ধু), আবার অন্যত্র বলেন– وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ (আর তাদের 'রব' তাদেরকে পান করান)। আল্লাহ্‌র মুকার্রাব ফিরিশতাগণও এই 'ইয্‌যত ও খেলাত লাভে সক্ষম হয়নি যা তোমরা হাসিল করেছ। ফেরেশতাকুল মুকার্রাব (নৈকট্যপ্রাপ্ত) ও নিষ্পাপ, পাক ও পবিত্র, নিত্য তসবীহ পাঠকারী ও পবিত্রতা ঘোষণাকারী এবং বিরাট রূহানী শক্তিসম্পন্ন; কিন্তু পানি ও ফুলের ব্যাপারই আলাদা।

দয়ালু সমালোচক

রহমতের এই ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি এবং খোদ দয়ালু সত্তার সহায়তা, প্রতিকারের উপায় ও সমালোচনার ভিত্তিতে তিনি বড় বড় পাপে লিপ্তদেরকে দাওয়াত দেন যেন তারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে ও নৈকট্যে ফিরে আসে এবং খাঁটি অন্তরে তওবাহ করে স্বীয় কিসমত (ভাগ্য) ও স্বীয় হাকীকতের ভেতর বৃহৎ থেকে বৃহত্তর পরিবর্তন ঘটিয়ে নেয়। তিনি এই সুযোগে গুনাহগারদের এবং ঐসব মুল্যহীন বস্তুকে স্মরণ করিয়ে দেন যাদের ও যেসবের দেখতে দেখতে ভাগ্যই পাল্টে গেছে এবং মূল্যহীন বস্তুও অমূল্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। গুনাহ্‌র মাত্রা ও পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন, আল্লাহ্‌র রহমত তার থেকেও অনেক বেশি বিস্তৃত, ব্যাপক, শক্তিশালী ও বিজয়ী। সওদাকৃত বস্তু যতই দোষত্রুটি ও খুঁতযুক্ত হোক না কেন, যখন কট্টর সমালোচক খরিদ্দার তা খরিদ করে নিয়েছে, তখন আর তাতে দোষ কী থাকে আর কারইবা এত স্পর্ধা যে, তার ভেতর থেকেও দোষত্রুটি খুঁজে বের করে?

তিনি বলেন ঃ

> হে ভ্রাত! তুমি যতই পাপে লিপ্ত হয়ে থাক না কেন, তওবার আঁচল আঁকড়ে ধর এবং আল্লাহ্‌র রহমতের প্রতি আশাবাদী হয়ে যাও। কেননা তুমি ফিরাউনের দরবারের যাদুকরদের থেকে নিশ্চয়ই অধিক পাপী নও আর আসহাবে কাহ্‌ফের কুকুরের চেয়ে বেশী ময়লা ও অপবিত্রও নও। তূর পাহ-াড়ের পাথরের তুলনায় অধিকতর নিষ্প্রাণ জড় পদার্থ অথবা 'উসতূনে হান্নানা'[১] থেকে বেশি মুল্যহীনও তুমি নও।

তওবার তা'ছীর

তওবাহ দ্বারা মানুষের অবস্থার পরিবর্তন এবং তার তরক্কী ও কামালিয়াত হাসিল হয়ে থাকে। তওবার অবস্থা ও তার শর্তাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ঃ

---

১. "উসতূনে হান্নানা' মসজিদে নববীর সেই খুঁটি যার ওপর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রসূল (স) খুতবাহ দিতেন। মিম্বরে নববী নির্মিত হবার পর তার ওপর দাঁড়িয়ে খুতবাহ্ দিলে বিচ্ছেদ ব্যথায় তার থেকে অস্ফূট স্বরে কান্নার আওয়াজ পাওয়া গিয়েছিল।

এক প্রকারের তওবাহ এভাবে হয় যে, মুরীদ তাতে অনুতপ্ত হয়। এই তওবাকে 'গরদিশ' (আবর্তন, বিবর্তন ও ঘূর্ণন) বলা হয় অর্থাৎ আবর্জনা ও পাপ-পংকিলতার অবস্থা থেকে পবিত্র অবস্থায় সে পরিবর্তিত হয়ে গেল। গির্জা ছিল—মসজিদে রূপান্তরিত হল। পুতুল পূজার ঘর ছিল—'ইবাদতখানায় পরিণত হল। বিদ্রোহী ও অবাধ্য ছিল, মানুষ হয়ে গেল। মাটি ছিল—সোনায় পরিণত হল। ছিল অন্ধকার রাত্রি, দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেই মুহূর্তে ঈমানদারের হৃদয়-মানসে প্রদীপ্ত সূর্য উদিত হয় এবং ইসলাম আপন সৌন্দর্য তুলে ধরে এবং সে (তওবাকারী) মা'রিফতের রাস্তা খুঁজে পায়।

অষ্টম অধ্যায়

মানবতার সম্মান ও মর্যাদা

একটি বিপ্লবাত্মক দা'ওয়াত

কোন গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা প্রভাব সৃষ্টিকারী অংশের একটি অংশ সেটাই যেখানে মানুষের মর্যাদা ও মকাম, মানষের অন্তঃকরণের উচ্চতা ও প্রশস্ততা, তার যোগ্যতা ও তরক্কীর সম্ভাবনা এবং মুহব্বতের কদর ও মূল্য তুলে ধরা হয়।

এ বিষয়ে কবিতায় হাকীম সানাঈ (র), খাজা ফরীদুদ্দীন 'আত্তার (র) এবং মাওলানা রূম (র) অনেক কিছু বলেছেন। কিন্তু গদ্যে হযরত মাখদূমুল মুল্ক বিহারী (র)-এর 'মকতূবাত' (চিঠিপত্রাদি) থেকে অধিকতর শক্তিশালী, অলংকারপূর্ণ ও প্রভাবশালী কোন লেখা আজও আমার নজরে পড়েনি। এগুলি পড়ে মানুষের অন্তরে আস্থা, মনোবল, সাহসিকতা, আশা-ভরসা, উন্নতি ও ঊর্ধ্বগতি এবং সেই চূড়ান্ত কামালিয়াতের স্তর পর্যন্ত পৌঁছুবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয় যা একমাত্র মানুষের জন্যই নির্ধারিত এবং সেই হতাশা ও নিরাশা, স্বল্প মনোবল ও অনাস্থা, উদাসীনতা ও লজ্জাশীলতা বিদূরিত হয় যা কতক অদূরদর্শী ও মোটা বুদ্ধির প্রচারকরা সৃষ্টি করে দিয়েছিল এবং যার পরিণ-তিতে মানবতা উলঙ্গ-অনাবৃত ও সংশোধনের অযোগ্য একটি স্বাভাবিক ত্রুটি এবং ক্ষতিপূরণের অতীত একটি বিচ্যুতি ও অপরাধে পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং গুহা ও প্রাচীর গাত্র থেকে এই আওয়াজই আসতে শুরু করেছিল وجودك ذنب لا يقاس به ذنب (তোমার অস্তিত্বই একটি পাপ যার সমকক্ষ পাপ আর একটিও নেই) এবং এটাই বুঝানো হচ্ছিল যে, মানুষের উন্নতির পথে খোদ মানবতা সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিবন্ধক ও একটি দুস্তর বাঁধা যাকে রাস্তা থেকে হটানো মানুষের জন্য সর্বাধিক জরুরী। মানুষ নিজেকে ফিরিশতাদের ঈর্ষা ও সিজদার পাত্র হিসেবে মনে করার পরিবর্তে ফিরিশতাদের ঈর্ষা করতে শুরু করেছিল এবং জড় প্রকৃতি ও মানবীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে ও বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজের অভ্যন্তরে ফিরিশতাদের গুণাবলী সৃষ্টি এবং তাদের (ফিরিশতাদের তকলীদ অন্ধ অনুকরণ) করার খাহিশমন্দ হয়ে পড়েছিল।

এরূপ পরিবেশে হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মুনায়রী (র) একটি অচেনা আওয়াজ উঠালেন এবং এরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে ও অলংকারিকভাবে মানবতার সমুন্নতি, মানুষের উচ্চ মর্যাদা ও প্রেমময়তা এবং তাঁর 'খলীফাতুল্লাহ্' হবার ঘোষণা দিলেন এই বিষয়টিকে তাঁর "মকতূবাতে" এত পুনরাবৃত্তি করলেন এবং বিভিন্ন কায়দা-কানূন ও প্রথা-পদ্ধতিতে একে বর্ণনা করলেন যে, যদি সেগুলি এক জায়গায় জমা করা হয় তাহলে এ বিষয়ে এমন একটি সাহিত্য ভাণ্ডার গড়ে উঠবে যা পড়ে মানুষের মন উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উত্তেজনার প্রাবল্যে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং মানুষের বিমর্ষ অন্তঃকরণে ও মৃতপ্রায় দেহে নবজীবনের সঞ্চার হবে আর স্বীয় মানবতা ও মনুষ্যত্বের জন্য সে গর্ববোধ করবে।

স্রষ্টার বিশেষ দৃষ্টি

এক পত্রে তিনি লিখেছেন যে, অস্তিত্ব ও সৃষ্ট বস্তুর সংখ্যা তো অনেকই ছিল এবং একটি অপেক্ষা অন্যটি শ্রেষ্ঠ; কিন্তু প্রেমাস্পদতা ও খিলাফতের গর্বপূর্ণ খেলাত দুর্বলভাবে সৃষ্ট মানুষের দেহ-কাঠামোতেই যেন যথাযথ মানাচ্ছিল। মানুষ নিশ্চয়ই ফিরিশতাদের মত 'মা'সুম' (নিষ্পাপ) ছিল না। তার পক্ষে গুনাহ্তে লিপ্ত হওয়া কিংবা তার থেকে কোন অন্যায় ঘটে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু সৃষ্টি জগতের মহান স্রষ্টার কৃপাদৃষ্টি সব কিছুই শুধরে নেবার জন্য যথেষ্ট এবং এটা সেই 'পাসঙ্গ' (পাথর যা দাঁড়ি-পাল্লার উভয় দিক ঠিক রাখার জন্য দেওয়া হয়) যা পাল্লার যে দিকেই রাখা হবে সে দিকই নিঃসন্দেহে ভারী হবে এবং ঝুঁকে যাবে। তিনি বলেন ঃ

> অস্তিত্বমান ও সৃষ্ট বস্তুর সংখ্যা তো বেশুমার, কিন্তু কোন অস্তিত্বশীল বস্তুর সঙ্গেই সেই কায়কারবার ছিল না, যা ছিল পানি-মাটি মিশ্রিত এই জড়পিণ্ডটির সঙ্গে। যখন তিনি চাইলেন অর্থাৎ আল্লাহ্ রাব্বুল 'ইয্যতের যখন মঞ্জুর হল যে, মাটির এই জড়পিণ্ডটিকে অস্তিত্বময় রূপ দান করবেন এবং খিলাফতের মহান দায়িত্বে সমাসীন করবেন, ঊর্ধ্বজগতের ফিরিশতাকূল তখন সমস্বরে আরয করল, "আপনি যমীনের বুকে এমন একটি সৃষ্টিকে খলীফা বানিয়ে পাঠাতে চাচ্ছেন যারা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করবে।" মেহেরবান চিরন্তন সত্তা জবাব দিলেন, ليس فى الحب مشورة অর্থাৎ প্রেম কোনরূপ পরামর্শের অপেক্ষা রাখে না, আর 'ইশ্ক ও তদবীরও একত্র হয় না। তোমাদের তসবীহ্ ও তাহলীলের কী মূল্য যদি তা

আমার দরবারে কবুল না হয়! আর সে সব গুনাহেই বা কী ক্ষতি যদি আমার গৌরব-মহিমা ও অনুগ্রহ বিতরণকারী ক্ষমা ও মার্জনার পরশ তার উপর হস্ত বুলিয়ে দেয়।

فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ -

"অতঃপর ঐ সব লোকদের পাপরাশিকে আল্লাহ্ পাক সত্বর পুণ্যরাজিতে পরিবর্তিত করে দেবেন।" তবে হ্যাঁ! তোমরা চিরদিনই সোজা-সরল রাস্তায় চলতে অভ্যস্ত আর তারা চলবে চতুর্দিকে। কিন্তু যখন আমরা তাদেরকে চাইলাম তখন রহমতের ফরাশ তাদের জন্য বিছিয়ে দিলাম। যদি গুনাহ্ তাদের কপালে কোন কলংক রেখা এঁকে দেয়, তাহলে আমার মেহেরবানী তা মুছে দেবে। তুমি শুধু দেখছ যে, বিভিন্ন কার্যকলাপে আমি তাদের কাম্য। কিন্তু এটা দেখছ না যে, মুহব্বতের ব্যাপারেও সে (মানুষ) আমার প্রার্থিত ও কাম্য। কোন কবি কী সুন্দরই না বলেছেন ঃ

واذا الحبيب اتى بذنب واحد

جاءت محاسنه بالف شفيع

অর্থাৎ "আমার 'হাবীব্' (প্রেমিক, বন্ধু) যখন একটি গুনাহ্ করে, তখন তার সৌন্দর্য ও গুণাবলী হাযারো সুপরিশপত্র নিয়ে হাযির হয়।"

মুহব্বতের আমানত

অন্য এক স্থানে মানুষের প্রেমময়তা ও বিশেষত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন,

মুহব্বতের সঙ্গে অন্য মাখলুকাতের কোন যোগসূত্র ছিল না। কেননা তাদের সাহসিকতা ও হিম্মত উন্নত ছিল না। ফিরিশতাদের কাজ-কর্মে তোমাদের যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য দৃষ্টিগোচর হয়, তা এই কারণেই যে, তারা প্রেমের বাণীর লক্ষ্যস্থল নয়। আর মানুষের রাস্তার মধ্যে যে উত্থান-পতন দৃষ্টিগোচর হয় তা এইজন্য যে, তাদের সঙ্গে মুহব্বতের ব্যাপার রয়েছে। অতএব যার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শেষভাগ পর্যন্ত মুহব্বতের খোশবু পৌঁছেছে—তার উচিত শান্তি ও নিরাপত্তাকে সালাম জানানো এবং নিজেকে নিজ থেকে বিদায় দেওয়া। কেননা মুহব্বত কোন বস্তুরই পরওয়া করে না। আদম (আ)-এর কিসমত ও সৌভাগ্যের তারকা যখন উদিত হল, তখন সারা সৃষ্টি জগতে সৃষ্টি হল একটি উত্তাল তরঙ্গ। কথকরা বলল, এত হাযার বছরের তসবীহ ও তাহ্লীলকে উপেক্ষা করা হল আর মাটির পুত্তলি আদম (আ)-কে করা হল

মর্যাদামণ্ডিত এবং আমাদের ওপর দেওয়া হল তাঁকে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার। আওয়াজ ভেসে এল, তোমরা মাটির এই বহিরাঙ্গ দেখো না, সেই পবিত্র অমূল্য রত্নটিকে দেখ যা তার অভ্যন্তরে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ মুহব্বতের জ্বলন্ত আগুন তাদের অন্তঃকরণে লাগানো হয়েছে।"[১]

অপর এক পত্রে এই বৈশিষ্ট্যকে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন : আল্লাহ্পাক আঠারো হাযার 'আলম পয়দা করেছেন। কিন্তু এসব মাখলুকাত হৃদয়ের জ্বালা ও মুহব্বতের বাণীর সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এবং এর থেকে কোন অংশও তারা লাভ করেনি। এই মুল্যবান সম্পদ একমাত্র মানুষের হিস্যায় এসেছে। অস্তিত্বশীল বস্তুর অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে কারুর ভাগ্যেই এই সৌভাগ্য লাভ ঘটেনি।

হাসিলে ওজূদ : মানুষের অস্তিত্ব লাভ

অপর আর এক চিঠিতে পানি ও মাটির 'কিসমত' (ভাগ্য) ও 'ইয্যত (সম্মান)-এর কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন,

"হে আমার ভ্রাত! মাটি-পানির সৌভাগ্য কিছুমাত্র কম নয় এবং আদম (আ) ও আদম বংশধরের মরতবা কোন মামুলী ব্যাপার নয়। 'আরশ-কুরসী, লওহ ও কলম, আসমান-যমীন সবই মানুষের বদৌলতেই। উস্তাদ আবূ 'আলী দাক্কাক (র) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)- কে স্বীয় খলীফা বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে খলীলুল্লাহ উপাধি দান করেছেন وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً - এবং হযরত মূসা (আ)-এর শানে ইরশাদ হয়েছে : وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىْ অর্থাৎ আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য মনোনীত করেছি; আর মু'মিনদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে : يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ (আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন আর তারাও আল্লাহকে ভালবাসে)। লোকেরা বলেছে যে, যদি এই প্রেম ও মুহব্বতের বাণীর সঙ্গে দিলের কোন সম্পর্ক না থাকত তবে 'দিল্'কে দিল্ বলার কোনই অধিকার থাকত না। আর মুহব্বতের সূর্য যদি আদম (আ) এবং তাঁর বংশধরদের মনে-প্রাণে আলো ও কিরণ দান না করত, তবে আদম (আ)-এর ব্যাপারটাও অন্যান্য অস্তিত্বশীল বস্তুর মতই হত।

---

১. ৪৬ নং পত্র।

আমানতের বোঝা

মানুষের উন্নত মর্যাদা ও তার বৈশিষ্ট্য সেই আমানতের বোঝা কাঁধে উঠাবারই পরিণতি, যা কবূল করতে আসমান-যমীন ও পাহাড়সমূহ বিনীতভাবে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিল এবং এই যালিম ও জাহিল মানব তাকে আপন দুর্বল কাঁধে উঠিয়ে নিয়েছিল। তার এই সহায়হীনতা কাজে লাগল। মাটির বিন্দু চিন্তা করল যে, যদি এই বিরাট ও মহান দায়িত্বের যথাযথ হক আদায়ে কোনরূপ অব-হেলা ও বিচ্যুতি ঘটে যায়, তবে তার কাছে এমন কীই বা আছে যা (শাস্তিস্বরূপ) ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

> পানি ও মাটির মরতবা অতি উচ্চ এবং তার হিম্মত অতি বৃহৎ। দারিদ্র্য, ভিক্ষাবৃত্তি, সম্পদহীনতা যদিও তার জড়পিণ্ডে অনুপ্রবিষ্ট, তবুও যখন আমানতের প্রদীপ্ত ভাস্কর আসমানের বুকে স্বীয় অস্তিত্বের প্রোজ্জ্বল ঘোষণা দিল, জগতের ফিরিশতাকুল— যারা সাত লক্ষ বছর ধরে আল্লাহ্‌পাকের তসবীহ ও পবিত্রতা গোষণার ফুল্লকাননে স্বীয় খোরাক সংগ্রহ করছিল এবং نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ (আমরা তোমার তসবীহ পাঠ করছি এবং আমরাই তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি)-এর সরব ধ্বনি উচ্চারণ করছিল, অতি বিনীতভাবে নিজেদের অসহায়তা প্রকাশ করল এবং দুর্বলতার স্বীকৃতি দিল فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا 'অতঃপর তারা দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করল। আসমান বলল, আমার গুণ হল আমার উচ্চতা যমীন বলল, আমার খেলাত (পুরস্কার) হল আমার মাটিময় বিছানা; পাহাড় বলল, আমার পদ তো পাহারাদারী এবং এক পায়ের ওপর মহান স্রষ্টার নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা; ধন-সম্পদ তথা রত্নরাজি বলল, আমার সীমার মধ্যে যেন চুলও প্রবেশ না করতে পারে। এরপর নির্ভীক মাটির বিন্দুটি দারিদ্র্য ও অনটনের আস্তিন থেকে আবেদনের হাতখানি বের করল এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের মহান আমানতের বোঝাকে বুকে উঠিয়ে নিল। চিন্তা করল না ইহলোক-পরলোকের কোন বস্তুরই। সে বলল, আমার কাছে আছেই বা কী যা ছিনিয়ে নেওয়া হবে। যখন কোন বস্তুকে হেয় ও লাঞ্ছিত করা হয় তখন তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। আমি মাটি, আমাকে কার সঙ্গে মেশানো হবে? সে পুরুষোচিত দৃপ্ত পদভঙ্গীতে সম্মুখে অগ্রসর হল এবং সেই বোঝা যা সপ্তাকাশ ও যমীন বহনে সাহসী হয়নি—হাসি-খুশির সঙ্গে উঠিয়ে নিল এবং 'আরও অতিরিক্ত ও বেশি কিছু আছে কী'-এর সরব ধ্বনি উচ্চারণ করল।[১]

১. ৪৯ নম্বর পত্র।

মাটির ঢেলার সৌভাগ্য

অন্য এক জায়গায় লিখেছেন ঃ 'মুহব্বতের বাজপাখীর আদম (আ)-এর পবিত্র বক্ষ ব্যতিরেকে আর কোথাও নীড় মেলেনি। আসমানের উচ্চতা এবং 'আরশ-কুরসীর বিশালতা প্যাড়ি দিয়ে সে প্রেমিকের হৃদয়কে স্বীয় বাসা বানিয়েছে।

একই আলংকারিক ও কারুকার্যমণ্ডিত কলম দিয়ে তিনি লিখেছেন ঃ

পানি ও মাটিকে কম (মূল্যের) মনে ভেবো না। যা কিছু কামালিয়াত পানি ও মাটির ভেতরেই আছে এবং যা কিছুই দুনিয়ায় এসেছে, মাটি ও পানির সঙ্গেই এসেছে। এ সব ভিন্ন আর যা কিছুই দৃষ্টিগোচর হয়, তা দেওয়াল চিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।"

অন্য এক স্থানে মানুষের মরতবা বর্ণনা করতে গিয়ে এবং তার অবস্থার ওপর তার স্রষ্টার অনুগ্রহ ও কৃপা এবং মুহব্বতের দৃষ্টি বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

হে ভ্রাত! স্রষ্টার এই মাটি ও পানির সঙ্গে একটি বিশেষ লেনদেনের ব্যাপার এবং বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে। একটি বর্ণনায় এসেছে যে, যখন মালাকুল মওত এই উম্মতের কারও জান কবয করেন, তখন মহান মর্যাদার মালিক রাব্বুল 'ইয্যত তাকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ আগে তাকে আমার সালাম পৌঁছাও, তার পরেই তার রূহ কবয কর। তুমি কুরআন মজীদে পড়ে থাকবে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক কোন প্রকার মধ্যস্থতা ছাড়াই মু'মিনদের সালাম বলবেন – سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ অর্থাৎ সালাম! শান্তি! দয়ালু প্রতিপালকের তরফ থেকে বাণী।' যেমনি লা-হাওলাহা ইল্লাল্লাহ'–তাঁর কালাম, চিরন্তন– তাঁর সালামও তেমনি চিরন্তন। যদি মাটির এই মুষ্টির সঙ্গে এই চিরন্তন অনুগ্রহ ও কৃপাদৃষ্টি না হত তাহলে শেষ দিবসে তাকে সালামও করা হত না।

আল্লাহ্র গুপ্ত-রহস্যের ধারক ও বাহক

অপর এক চিঠিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, তার খিলাফতের পদ এবং তার উচ্চ মনোবলের পেছনের গোপন-রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

মানুষ আল্লাহ্র গুপ্ত রহস্যের অধিকারী এবং তাকে وَ نَفَخْتُ مِنْ رُّوْحِى (আর আমি ফুৎকার করলাম আমার রূহ)-এর সৌভাগ্য দ্বারা মণ্ডিত করা হয়েছে। রিসালত, আসমানী সহীফা এবং আল্লাহ্র দীদার লাভের ন্যায় মহামূল্যবান সম্পদ তারই বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্গত।

তিনি বলেন ঃ

> আল্লাহ তা'আলা আঠারো হাযার 'আলমের মধ্যে কোন শ্রেণীকেই মানব শ্রেণী অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ মনোবলসম্পন্ন করে পয়দা করেন নি এবং কোন শ্রেণী সম্পর্কেই نَفَخْتُ مِنْ رُّوْحِى - এর ন্যায় ইরশাদ করেন নি, কোন শ্রেণীর মাঝেই বার্তাবাহক নবী প্রেরণ করেন নি, নাযিল করেন নি কারও প্রতি আসমানী কিতাব কিংবা কোন শ্রেণীকেই পাঠাননি সালাম। স্বীয় দীদাররূপ মহামুল্যবান নে'মত দিয়েও তিনি কাউকে ধন্য করেন নি। একমাত্রই মানুষই তো ছিল, সে স্বীয় মুহব্বতের শক্তি ও উচ্চ মনোবলের কারণে বিচ্ছেদের জ্বালা বহনে সক্ষম নয়। দুনিয়ার মাঝে তার দিলের পর্দা উঠিয়ে নিয়েছেন আর পরিণাম দিবসে তার চোখ থেকে উঠিয়ে নেবেন পর্দা। এরই পরিণতিতে দুনিয়ার ভেতর সে তাঁকে ভিন্ন আর কারও নিকট প্রার্থী নয় এবং পরলোকে তাঁর সৌন্দর্য ভিন্ন তার চোখ কিছুই দেখেনি। এই সবক তারা মানবকুল مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى (দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন হয় নাই এবং সে বিদ্রোহও করে নাই)-এর মকতবেই অধ্যয়ন করেছিল।

সিজদা ও ঈর্ষার পাত্র

অন্য এক জায়গায় মানুষের সেই মর্তবা বর্ণনা করতে গিয়ে, যার কারণে সে ফিরিশতাকুলের সিজদার এবং অন্যান্য তামাম সৃষ্টিকুলের ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হয়েছিল, লিখেছেন ঃ

> হে আমার ভ্রাত! যে বস্তু তোমাকে ফিরিশতাদের সিজদার এবং অন্যান্য সৃষ্টিকুলের ঈর্ষার পাত্রে পরিণত করল তা খুবই বিরাট। মানুষ স্বীয় মাটির অস্তিত্বে যতই ধূলি-ধূসরিত হোক না কেন, মৌলিক দিক দিয়ে এতখানি উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময় ও পবিত্র যে, ফিরিশতাসুলভ আছর এবং মানবীয় কল্পনাবৃত্তি তার হাকীকত উপলব্ধি করতে অক্ষম ও দুর্বল। যখন এই অর্থের আলোকশিখা প্রোজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে, তখন ফিরিশতাকুল হয়রান এবং আসমান চিন্তাকুল হয়ে পড়ে।

সতর্ক দিল্

কিন্তু মানুষ ও মানব শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব সেই এক টুকরো গোশতের কারণে– যাকে হৃদয় বলা হয় এবং হৃদয়ের কদর ও কীমত এবং জীবন ও জীবনীশক্তির মূল্য সেই রত্নের কারণে যাকে মুহব্বত বলে। দিল্ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

আল্লাহ্ পাক 'আরশ পয়দা করলেন আল্লাহ্র মুকাররবগণের নিকট সোপর্দ করলেন, বেহেশত পয়দা করলেন এবং রিদওয়ানকে তার পাহারাদারীর দায়িত্বে নিয়োজিত করলেন, দোযখ সৃষ্টি করলেন আর মালিককে তার দারোয়ান নিযুক্ত করলেন। কিন্তু মু'মিনের দিল যখন পয়দা করলেন, বললেন—'দিল' রাহমানের (কুদরতের) দুই অঙ্গুলীর মাঝখানে অবস্থিত।

(القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن)[১]

অপর একটি পত্রে তিনি দিলের বিশালতা, প্রশস্ততা ও শক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

যদি কোন বস্তু 'দিল' অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় ও মূল্যবান হত তবে তিনি (আল্লাহ্) তাঁর মা'রিফতের মণি-মুক্তারূপ সম্পদ তার ভেতরই রাখতেন। আল্লাহ্ পাকের সেই নির্দেশের এটাই অর্থ যে ঃ

لايسعنى سمائى ولا ارضى ولكن يسعنى قلب عبدى المؤمن -

অর্থাৎ "আসমানে আমার স্থান সংকুলান হয় না, সংকুলান হয় না আমার স্থান যমীনেও; কিন্তু মু'মিন বান্দাহ্র অন্তরে আমার স্থান সংকুলান হয়।" আসমান আমার মা'রিফতের উপযুক্ত নয়, যমীনও এর উপযোগী নয়; একমাত্র মু'মিন বান্দাহ্র 'দিল'ই এই পর্বত প্রমাণ দায়িত্ব ও কর্তব্যের পবিত্র আমানতের বোঝা কাঁধে উঠিয়েছে। রুস্তমের ঘোড়াই একমাত্র রুস্তমকে পিঠে বহন করার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের গৌরব মহিমা-সূর্য যখন পাহাড়ের ওপর—যার অপেক্ষা অধিকতর জমাট শিলাবৎ ও বৃহৎ অবয়বধারী কোন কিছুই জগতে নেই—একবার চমকাল, তখনই তা টুকরো টুকরো হয়ে গেল وَجَعَلَهُ دَكًّا আর সেই সূর্য তিনশো ষাটবার মু'মিনের দিলের ওপর চমকিত হয় আর সে هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ (আরও অধিক কিছু আছে?)-এর ধ্বনি উঠিয়ে থাকে আর ডেকে ডেকে বলে, الغياث - الغياث। আমি পিপাসার্ত। আমি পিপাসার্ত।[২]

---

১. ৪৩ নম্বর চিঠি।

১. ৩৮ নম্বর পত্র।

অধিকতর পরাজিত, অধিকার প্রিয়

'দিল'-এর একটি বিশেষত্ব এও যে, প্রতিটি বস্তুই ভেঙে যাবার পর মূল্যহীন হয়ে যায়–কিন্তু এটা যতবারই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়–ততই তা অধিকতর মূল্যবান বিবেচিত হয়।[১] তিনি বলেন ঃ

হে ভ্রাত! ভাঙা জিনিসের কোন মূল্য নেই, কিন্তু 'দিল' (অন্তর) যত টুকরো হয় ততই তা অধিক মূল্যবান বিবেচিত হয়। মূসা (আ) একবার অতি সংগোপনে আল্লাহ্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, اين اطلبك - তোমাকে আমি কোথায় তালাশ করব? জবাব মিলেছিল ঃ আমি সেই সমস্ত লোকের নিকট বেশি থাকি যাদের অন্তর আমারই কারণে ভেঙে টুকরো হয়ে যায়– قال انا عند قلوبهم المنكسر -[২]

মুহব্বতের রাজত্ব

অন্তরের পুঁজি হ'ল মুহব্বত আর মুহব্বত গোটা সৃষ্টি জগত ও সমস্ত সময়টাকে ঘিরে রেখেছে। ইহ জগত থেকে পরজগত পর্যন্ত এর প্রভাব অব্যাহত। হযরত মুনায়রী (র) বলেন ঃ

মুহব্বতের বাণী তিনকাল (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত)-কেই ঘিরে রেখেছে। আদি, অন্ত ও মধ্যবর্তীতে এরই রাজত্ব। বিশেষজ্ঞগণ বলেন ঃ এ জগত ও সে জগত সবই চাইবার জন্য। যদি কেউ বলে যে, সে জগত চাইবার জগত নয়। হ্যাঁ! তবে সালাত ও সিয়াম পালিত হবে না–কিন্তু চাইবার থাকবে। কিয়ামতের দিন তামাম হুকুম-আহকামের ওপর কলম 'মনসূখ' ও 'বাতিল' হয়ে যাবে, কিন্তু এই দু'টি জিনিস চিরদিনের তরে চিরকালের তরে থাকবে আর তা হল আল্লাহ্র জন্যই প্রেম এবং আল্লাহ্র জন্যই সমগ্র প্রশংসা।[৩]

---

১. এটাকেই ইকবাল এভাবে বলেছেন ঃ

نہ بچا بچا کے توڑ کہ اسے ، ترا آئینہ ہے
وہ ائینہ جو شکستہ ہو وعریزتر ہے نگاہ آئینہ ساز مین

২. ৪৬ নম্বর পত্র।

৩. ৪৬ নম্বর পত্র।

নবম অধ্যায়

বিশ্লেষণসমূহ ও উচ্চতম জ্ঞান

উচ্চতম ও সূক্ষ্ম জ্ঞান ও নিবন্ধসমূহ

হযরত শায়খ শরফুদ্দীন (র)-এর মকতূবাতে অমূল্য বিশ্লেষণ এবং উন্নত সূক্ষ্ম জ্ঞান ও নিবন্ধরাজির এমন একটি ভাণ্ডার রয়েছে যা হাকীকত ও মা'রিফতের খুব কম গ্রন্থেই মিলবে। এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে এমন সব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নির্যাস, শত শত বছরের রিয়াযত ও আল্লাহ্-প্রদত্ত জ্ঞানেরই ফলশ্রুতি যা পড়বার পর উন্মত্ততা ও মিষ্টি অনুভূতির এমনই এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যা বড় বড় আনন্দঘন কোন সাহিত্য-কথিকা ও রসাল-কাব্য থেকে লাভ করা যায় না।

ওয়াহ্‌দাতুশ্ শুহূদ

এই গ্রন্থে এমন কতক বিশ্লেষণও পাওয়া যায় যে সম্পর্কে বিজ্ঞজন মহলে প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, তা কয়েক শতাব্দী পরের বিশ্লেষণ এবং যে শতাব্দীতে (অষ্টম শতাব্দী) হযরত মাখদূম (র) জীবিত ছিলেন, সেই শতাব্দীর কোন লোকই এর সঙ্গে পরিচিত ছিল না। এসব বিশ্লেষণের অন্যতম হল, "তওহীদে শুহূদী" বা "ওয়াহ্‌তুশ্ শুহূদ"-এর মতবাদ। এই মতবাদ বিশ্লেষণের চর্চা বস্তুত হিজরী একাদশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়। হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র) যখন "ওয়াহ্‌দাতুল ওজূদ"-এর সমান্তরাল এর দাওয়াত ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিবরণী পেশ করেন এবং এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই যে, তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতি ও তবলীগ এবং তাঁর প্রচারের অবলম্বন—হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-এরই দান এবং তিনিই এই মাসআলার ইমাম ও মুজাদ্দিদের মর্যাদা রাখেন। কিন্তু এটা দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, দু'শো-আড়াই শো বছর পূর্বে মাখদূমুল মুল্‌ক শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্‌ইয়া মুনায়রী (র)-এর মকতূবাতেও অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই মাসআলার বর্ণনা মিলে। তিনি স্বীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং উক্ত মকামের বিশ্লেষণের আলোকে এটা প্রমাণ করেছেন যে, সাধারণভাবে যাকে 'ওয়াহদাতে

ওজূদ' এবং অসত্যের শুধু নিশ্চিহ্ন ও পরিপূর্ণ ধ্বংস মনে করা হয়, তা প্রকৃতপক্ষে 'ওজূদে হাকীকী' বা বাস্তব অস্তিত্বের সামনে অন্যান্য অস্তিত্বশীল বস্তুর এমনভাবে নিষ্প্রভ ও পরাভূত হয়ে যাওয়া যেমন সূর্যের প্রদীপ্ত আলোকের সামনে তারকারাজির রৌশনী নিষ্প্রভ এবং তার সত্তার অস্তিত্ব গুরুত্বহীন হয়ে যায়। তিনি দু'টি শব্দে এই গুরুত্বকে এভাবে বর্ণনা করেন ঃ

نابودن دیگر است ونادیدن دیگر -

অর্থাৎ " কোন বস্তুর অস্তিত্বহীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া এক জিনিস আর দৃষ্টিগোচর না হওয়া অন্য জিনিস।" তিনি আরও বলেন, এটা এমন একটি নাযুক ও সঙ্গীন স্থান যেখানে অনেক বড় বড় লোকেরও পদস্খলন ঘটে গেছে এবং যেখানে একমাত্র আল্লাহ্র তওফীক ও খিযির (আ)-এর মতো কামিল ওলীর পথ-প্রদর্শন ও নেতৃত্ব ব্যতিরেকে হাকীকতের সংকীর্ণ পথের ওপর কায়েম থাকা কঠিন।

সত্য প্রকাশের নূর থেকে 'সালিক' (আধ্যাত্মিক পথের পথিক)-এর ওপর এভাবে জাহির হয় যে, সমগ্র অস্তিত্বশীল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুর আকার, উজ্জ্বলতা ও দীপ্তি এর উজ্জ্বল প্রভায় তার দৃষ্টি থেকে ঢাকা পড়ে যায়–যেভাবে সূর্যের প্রখর দীপ্তির সামনে অণু-পরমাণুবৎ আলো আড়াল হয়ে যায় এবং সে সব ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র অস্তিত্বই নেই কিংবা অণু-পরমাণুগুলো সবই সূর্যে পরিণত হয়ে গেছে; বরং কথা এই যে, সূর্যের প্রখর রশ্মি জাহির হবার পর অণু-পরমাণুগুলোর মুখ লুকানো ছাড়া প্রকাশ্যে চেহারা দেখাবার কোনই পথ নেই। তেমনি একথাও ঠিক নয় যে, বান্দাহ্ খোদা হয়ে গেছে تَعَالَى اللّٰهُ عَنْ ذَالِكَ عُلُوًّا كَبِيْرًا কিংবা বান্দাহ্র অস্তিত্ব বাস্তবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়া ও নিশ্চিহ্ন হওয়া এক জিনিস আর দৃষ্টিগোচর না হওয়া অন্য জিনিস। কবি 'আরিফ ঠিকই বলেছেন ঃ

پیش توحید او نه کهنه است نه نواست
همه هیچ اندهیچ اوست که اواست

যখন তুমি আয়না দেখ তখন তুমি আয়নাকে দেখ না এই জন্য যে, তুমি তখন আপন সৌন্দর্যে বিভোর থাক। আবার এও বলতে পার না যে, আয়নার অস্তিত্বই বিলীন হয়ে গেছে অথবা আয়না তোমার সৌন্দর্যের রূপ নিয়েছে কিংবা তোমার সৌন্দর্যই আয়না হয়ে গেছে। 'কুদরত'কে শক্তিসমষ্টির ভেতর এভাবেই দেখা যায়–যাকে সূফীগণ ফানা ফিত্-তাওহীদ

বলেন। বহু লোকের কদমই এই জায়গায় পিছলে গেছে। আল্লাহ্‌র তওফীক, চিরন্তন অনুগ্রহ এবং মুর্শিদের পথ প্রদর্শন ও নেতৃত্ব ব্যতিরেকে এই প্রান্তর কেউ সহজে অতিক্রম করতে পারে না।

পরিবর্তন ও বিবর্তন গুণাবলীর মধ্যে, সত্তার মধ্যে নয়

এই সন্দেহ দেখা দেয় যে, সূর্যের সামনে অন্যান্য আলোর নিষ্প্রভ হয়ে যাবার যে উদাহরণ দেওয়া হল এবং তা থেকে এটা প্রমাণ করা হল যে, আলো নিশ্চিহ্ন হয় না, শুধু সূর্যের সামনে নিষ্প্রভ হয়ে যায় এবং তার অস্তিত্ব অবজ্ঞেয় দৃষ্টিগোচর হয়। অথচ ঘটনা তো এই যে, সূর্যের সামনে প্রদীপের কোন যথার্থতাই থাকে না, তার অস্তিত্বকে অস্তিত্ব বলাই ঠিক নয়। সে তো তার মুকাবিলায় নিশ্চিহ্নই হয়ে যায়। একই বস্তু একই সময়ে অস্তিত্বশীল ও অস্তিত্বহীন হতে পারে না। শায়খ এর জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন যে, এই পরিবর্তন তো গুণাবলীর ক্ষেত্রে, সত্তার ক্ষেত্রে নয়। সূর্য পানির ঝর্ণায় উজ্জ্বলরূপে প্রতিবিম্বিত ও প্রতিফলিত হয়, পানিকে উত্তপ্তও করে তোলে। এর দ্বারা পানির গুণের পরিবর্তন সংঘটিত হয়, পানির মৌলিকত্বে কোন পরিবর্তন ঘটে না–আর পানি কোন অর্থেই সূর্যে পরিণত হয় না।

দ্রুতগতিসম্পন্ন বস্তুর নড়া-চড়া চোখে পড়ে না

কামিল ও পরিপূর্ণতার চূড়ান্ত সীমায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের তরক্কী, আধ্যাত্মিক মকামসমূহ অতিক্রম এবং তাদের বাতেনী অবস্থা এমন হয়ে থাকে যেগুলি–এ পথের প্রাথমিক মুসাফির এবং কখনো ও কোন সময় তাদের সমসাময়িকেরাও জানতে পারেন না। আম্বিয়া 'আলায়হিমুস সালাম এবং কামালিয়াতের ওয়ারিশান ও কামিল আওলিয়া কিরামের কামালিয়াতের অবস্থাসমূহ এমনই সূক্ষ্ম, নাযুক ও গোপনীয় হয় যে, অধিকাংশ সময়ই তাদের সমসাময়িক এবং সাহচর্যে অবস্থানকারী ব্যক্তিবর্গ সে সব থেকে অপরিচিত ও নাওয়াকিফ থাকেন এবং ঐ সমস্ত উন্মত্ত ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ আকর্ষণ ও সলূকের অধিকারীকে প্রাধান্য দেন যারা তাদের পদদ্বয়ের পার্শ্বে পৌঁছুবারও ক্ষমতা রাখেন না। এসব কামিল মহাত্মা যাঁদেরকে আল্লাহ্ পাক অতি উন্নতমানের প্রতিভা, সুউচ্চ মনোবল ও অসীম ধৈর্যশক্তি দান করেন, তারা না জামার কলার ছিঁড়ে ফেলেন, আর না তারা ধ্বনিই উঠান; তারা উন্মত্তবৎ নাচতেও শুরু করেন না। তাদের থেকে অধিক সংখ্যায় কারামত কিংবা অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডও সংঘটিত হয় না অথবা তারা নানামুখী দাবিও করেন না কিংবা কোন অবস্থার প্রকাশও হতে দেন না।

হযরত শায়খ (র) লিখেছেন যে, গতি যত দ্রুত হবে, ঠিক সে পরিমাণেই তার নড়াচড়া দৃষ্টিগোচর হবে না। তিনি বলেন, ঝড়ো হাওয়া সবাই অনুভব করতে পারে, কিন্তু প্রাতঃসমীরণ যা হৃদয়ের পাঁপড়িদলের সঙ্গে কাতুকুতু খেলে, ফুলের বাগানকে দান করে নব-বসন্ত, এমনি মৃদুমন্দগতিতে প্রবাহিত হয় যে, তার খবরও কেউ রাখে না। এক পত্রে তিনি লিখেছেন ঃ

> কোন বস্তুর গতি যখন দ্রুততর হয়ে ওঠে–তখন তা দৃষ্টিগোচর হয় না। তোমরা কি দেখতে পাও না যে, পাথরের যাতা (চাক্কী) যখন দ্রুতবেগে ঘুরতে শুরু করে......তখন যে ব্যক্তি দেখে, সে ভাবে–যাতা বুঝি বন্ধই রয়েছে, পাথর বুঝি ঘুরছে না। হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রা.)-কে কেউ বলেছিল যে, আপনি 'সামা' (এক প্রকার আধ্যাত্মিক সঙ্গীত) শ্রবণের সময় নিজের জায়গা থেকে এতটুকু নড়াচড়া করেন না। তিনি তখন নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেছিলেনঃ
>
> وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ -
>
> অর্থাৎ, "তোমরা পাহাড় দেখে মনে করো যে, তা স্থির দাঁড়িয়ে আছে। অথচ তা মেঘমালার মতই সতত সঞ্চরণশীল।"
>
> তুমি আমার গতি দেখতে পাও না, গতি যখন দ্রুততায় পর্যবসিত হয়, তখন তা আর চোখে পড়ে না। প্রাতঃসমীরণ এভাবে বয় যে, কেউ তার খবর রাখে না।[১]

প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার উৎসাদন আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হ'ল তাকে পরাভূতকরণ

তরবিয়ত ও সংশোধনের ধারায় একটা বড় ভ্রান্তি এই যে, সত্যের বহু প্রার্থী ও সিদ্দীক প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার একেবারে জড়েমূলে উৎসাদন চান এবং এটাকে তাঁরা খুবই জরুরী মনে করেন। তাঁরা বলেন যে, তরীকত ও মা'রিফতপন্থীর অভ্যন্তরে প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার মূল উৎসও যেন বাকী না থাকে....। শায়খ মাখদূম (র) বলেন, প্রবৃত্তির উৎসাদন আসল উদ্দেশ্য নয়, বরং পরাভূতকরণই মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ইমাম গাযালী (র)-ও তাঁর সুবিখ্যাত 'ইহইয়াউল 'উলূম' নামক গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, সংশোধন ও তরবিয়তের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কাম-ক্রোধ ইত্যাদিকে জড় থেকে উপড়ে দেওয়া কিংবা কারুর প্রকৃতিগত যোগ্যতাকে গুম করে দেওয়া নয়, বরং তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা লাভ এবং তাকে পরাভূত করার শক্তি হাসিল করা। কুরআন মজীদের

---

১. চতুর্থ পত্র।

সূরায় তা'রীফের ক্ষেত্রে والفاقد الغيظ (ক্রোধ উৎসাদনকারী) বলা হয় নি, وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ (ক্রোধ দমনকারী) বলা হয়েছে। মূলে যদি ক্রোধেরই উদ্রেক না হত, তাহলে ক্রোধ দমনের কিংবা গিলে ফেলার প্রশ্ন দেখা দিত কীভাবে? শায়খ (র) অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে লিখেছেন ঃ

এটা সেই ব্যক্তির মূর্খতা ও আহম্মকী যে মনে করে যে, শরীয়তের দাবি প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা এবং মানবীয় দোষগুণ থেকে একেবারে পাক-পবিত্র হওয়া। তারা এটা চিন্তা করেনি যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমিও মানুষ, কখনো আমিও রাগান্বিত হই এবং তাঁর ক্রোধের প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেতে দেখা যেত। আল্লাহ্ তা'আলার ফরমানে– وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ (এবং ক্রোধ দমনকারী) বলে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে– রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রকৃতিতে ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই বলে তাঁকে প্রশংসা করা হয় নি। আর শরীয়ত প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা থেকে মুক্তির দাবি কী করে করতে পারে যখন হুযূর (স)-এর ন'জন স্ত্রী বর্তমান ছিলেন। যদি কারুর প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা একদম নিঃশেষ ও নির্মূল হয়ে যায়– তবে তার চিকিৎসা করা দরকার যেন তা পুনরায় ফিরে আসে এবং তার ভেতর তা পুনরপি সৃষ্টি হয়। কেননা পরিবারের সদস্য ও সন্তান-সন্তুতিদের প্রতি স্নেহ-মমতা, জিহাদের ময়দানে কাফিরদের প্রতি ক্রোধ, সন্তান-সন্তুতি তথা বংশের ধারাক্রম ও সুনাম বজায় রাখা এসব 'নফস' (প্রবৃত্তি) জাত অনুভূতি ও কামনা-বাসনার সঙ্গে সম্পর্কিত। পয়গম্বরগণও ('আ) এ আকুলতা ব্যক্ত করেছেন যেন তাঁদের বংশের ধারা অব্যাহত থাকে। কিন্তু শরীয়তের দাবি এই যে, কামনা-বসনাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরাভূত রাখতে হবে, রাখতে হবে আহকামে শরীয়তের অধীন, যেমনিভাবে ঘোড়া লাগামের এবং কুকুর শিকারীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। কুকুরকেও ট্রেনিংপ্রাপ্ত হতে হবে। এমন যেন না হয় যে, শিকারীর ওপরই সে হামলা করে বসে। শিকারের জন্য ঘোড়ার আবশ্যকতাও রয়েছে। কিন্তু এমন ঘোড়ার দরকার যাকে পোষ মানানো হয়েছে, –নইলে সে স্বীয় আরোহীকেই নিচে নিক্ষেপ করবে। ক্রোধ এবং ইন্দ্রিয়জাত কামনা-বাসনাও ঠিক তেমনি কুকুর ও ঘোড়ার মত। পারলৌকিক সৌভাগ্যকেও এ দু'টি বস্তু ব্যতিরেকে শিকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু শর্ত এই যে, তা হবে অধীনস্থ ও নিয়ন্ত্রণাধীনে। যদি তা প্রাধান্য পায় এবং বিজয়ী হয়–তাহলে এ দু'টিই ধ্বংসের কারণ হবে। অতএব রিয়াযত ও মুজাহাদার আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল–এ দু'টি গুণকে পরাজিত ও পরাভূত করা এবং তা বাস্তবে সম্ভব।

কারামতও (অলৌকিকতা) এক প্রকার মূর্তি

যেভাবে ওপরে বলা হল যে, হযরত মাখদূম (রা.)-এর যমানায় চারিদিকেই ছিল কারামতের চর্চা। জনসাধারণ একে বুযর্গীর জন্য অপরিহার্য শর্ত এবং জনপ্রিয়তা ও ব্যাপকভাবে গৃহীত হবার মাপকাঠি বলে মনে করত! হযরত মাখদূম (র) এই সাধারণ প্রবণতা ও প্রসিদ্ধির বিপরীতে এটাই প্রমাণ করতেন যে, কারামতও আহলুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্ওয়ালা ব্যক্তিদের জন্য একটি পর্দা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর শক্তির সঙ্গে জড়িত ও বিলুপ্ত থাকার প্রমাণবহ। আর এদিক থেকে এটা এক ধরনের মূর্তিও বটে যাকে অস্বীকার করা এবং এর হাত থেকে দূরে সরে থাকা কোন কোন সময় জরুরী হয়ে পড়ে।

> কারামতও এক ধরনের মূর্তি। কাফির মূর্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এবং এই সম্পর্ক রাখার কারণে সে আল্লাহ্র দুশমনে পরিণত হয়। যখন মূর্তির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ও মুক্ত থাকার ঘোষণা দেওয়া হয় এবং ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়, তখন সে আল্লাহ্র দোস্তে পরিণত হয়। 'আরিফগণের মূর্তি (বোত্) হচ্ছে কারামত। যদি কারামতের ওপর কেউ তুষ্ট ও তৃপ্ত হয়ে যায়, তাহলে সে বঞ্চিত ও (আল্লাহ্র দরবার থেকে) বরখাস্ত হয়। আর যদি কারামতের সঙ্গে সম্পর্কহীনতার প্রকাশ ঘটায়, তাহলে (আল্লাহ্র) মুকার্রাব তথা নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাহ্গণের অন্তর্ভুক্ত হয় ও তাঁর দরবারে উপনীত হয়। একারণেই আল্লাহ্ পাক যখন তাঁর মকবূল বান্দাহগণের থেকে কারামতের প্রকাশ ঘটান তখন তাঁদের অন্তরে ভয়-ভক্তি ও বিনয় মিশ্রিত ভাবের আধিক্য ঘটে, দীনতা ও নম্রতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়, বর্ধিত হয় তাদের ভীতি।[১]

কাশ্ফ, কারামত ও ইস্তিদরাজ

'সিদ্দীক' (সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও আমানতদার) বান্দাহ্গণের ওপর 'কাশ্ফ' ও সঠিক দূরদৃষ্টির মাধ্যমে যে সব বিষয়ের প্রকাশ ঘটে এবং ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য যে সব ঘটনা তাঁদের সামনে উদ্ভাসিত হয়, হতে পারে যে, কোন কোন লোকের বেলায় অনুরূপ বিষয়ের প্রকাশ ঘটে না। কিন্তু এর দ্বারা তাদের সম্পর্কে কোন আপত্তি উঠানো চলে না এবং তাদের কামালিয়াতের কোন ত্রুটিও এতে প্রমাণিত হয় না। আপত্তিজনক এবং ত্রুটিযুক্ত বস্তু বলতে 'ইস্তিকামাত' (সুদৃঢ় ভিত্তি)-এর সংকীর্ণ পথ থেকে সরে যাওয়া। 'সিদ্দীক'গণের ওপর এভাবে যেসব বস্তু ও বিষয় উন্মোচিত হয়ে পড়ে তা তাদের 'ইয়াকীন' বৃদ্ধির কারণ হয় এবং এর দ্বারা তাদের

১. অষ্টম পত্র।

'মুজাহাদাহ্'-এর মধ্যে অধিকতর পরিপক্বতা এবং তাদের সদ্‌গুণাবলী, উন্নত ও প্রশংসিত চরিত্রের মধ্যে আরও উন্নতি ঘটে। আর এ ধরনের অবস্থা যদি এমন লোকের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়, যে ব্যক্তি শরীয়তের হুকুম-আহকামের পাবন্দ নয়, তাহলে সে এর পরবর্তী কারণ এবং এর ধোঁকা ও বোকামীর মাধ্যমে পরিণত হয়। সে এর ধোঁকায় পড়ে লোকদেরকে পর্যুদস্ত ও নিকৃষ্ট ভাবতে শুরু করে। কখনো এমন হয় যে, ইসলামের সম্পর্ক থেকেও সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ সে আর মুসলমান থাকে না এবং সে 'আহকামে ইলাহিয়া' তথা ঐশী-বিধানের সীমারেখা এবং হালাল-হারামের অস্বীকারকারীতে পরিণত হয়ে যায়। সে সুন্নতের অনুসৃতি পরিত্যাগ করে এবং 'ইলহাদ' ও 'যিন্দিকী' ভাবধারার শিকারে পরিণত হয়।

সেবার মর্যাদা

'সালিক'-এর জন্য একটি মহান কর্ম ' খেদমত' বা সেবা। খেদমতের ভেতর সেই সমস্ত উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য কোন 'ইবাদত ও আনুগত্যে নেই। এর একটি এই যে, সেবার কারণে 'নফ্‌স' (প্রবৃত্তি) মৃত হয়ে থাকে এবং তা থেকে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব, অহংকার ও গর্ব বের হয়ে যায় এবং সৃষ্টি হয় বিনয় ও নম্রতা। খেদমত তথা সেবা তাকে সভ্য ও সুজন বানিয়ে দেয়, তার চরিত্রকে সঠিকভাবে শুধরে দেয়, তাকে সুন্নত ও তরীকতের জ্ঞান শেখায়, নফ্‌সের অন্ধকার ও বিপদাপদ দূর করে দেয়। এটা মানুষকে সূক্ষ্মদর্শী ও ক্ষীণ আত্মা বানিয়ে দেয়; তার ভেতর ও বাহির আলোকিত হয়ে যায়। এসব উপকারিতা খেদমতের সঙ্গে নির্দিষ্ট। একজন বুযর্গকে কেউ প্রশ্ন করেছিল, আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছুতে কতগুলি রাস্তা রয়েছে? জবাবে তিনি বলেছিলেন, অস্তিত্বশীল প্রাণী এবং দুনিয়ার মধ্যে যতগুলি অণু-পরমাণু রয়েছে, এতগুলিই রাস্তা রয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছুতে। কিন্তু কোন রাস্তাই হৃদয়ের শান্তি ও তৃপ্তি দান অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ ও নিকটতম নয়। আমরা এই রাস্তা ধরেই আল্লাহ্‌কে পেয়েছি এবং আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে এরই ওসিয়ত করেছি।

ইসলাহে নফ্‌স-এর মানদণ্ড

'ইসলাহে নফ্‌স' তথা নফ্‌সের সংশোধনের মানদণ্ড ঐ সব মহাত্মার দৃষ্টিতে অত্যন্ত উন্নত এবং মহান। বস্তুতপক্ষে এ ব্যাপারে তৃপ্তিলাভ করা খুবই মুশকিল যে, নফস্ খোদায়ী দাবি থেকে পশ্চাদপসরণ এবং প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনাজাত বিষয়বস্তুর পাকড়াও থেকে মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে গেছে এবং তরবিয়ত ও ইসলাহ

(আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ ও সংশোধন)-এর সেই মকামে পৌঁছে গেছে যে, এখন তার ওপর আস্থা স্থাপন ও নির্ভর করা চলে। হযরত শায়খ শরফুদ্দীন (র)-এর নিকট তার আলামত এই যে, সে স্বীয় খাহেশ ও অভিপ্রায় অনুসারে অগ্রসর হবে না, শরীয়তের হুকুম মুতাবিক চলবে, শরীয়তের হুকুম-আহকামের তথা বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে রুখসত কিংবা জটিল ব্যাখ্যার আশ্রয় নেবে না। যদি নফ্সের ওপর কোন বিশেষ প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা ও স্বভাব বিজয়ী থাকে তবে বস্তুতই সে সেই জানোয়ারের অনুরূপ, যে এই কামনা-বাসনার সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি ও প্রকাশস্থল। এক পত্রে তিনি বলেন ঃ

> আমার ভ্রাত! মানুষের নফ্স বড় ধোঁকাবাজ ও প্রতারক। সে হামেশাই মিথ্যা দাবি ও বাগাড়ম্বর করে যে, প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা আমার শাসনাধীন হয়ে গেছে। তার থেকে এর প্রমাণ চাওয়া উচিত এবং তার প্রমাণ একমাত্র এই যে, সে স্বীয় হুকুমে এক কদমও অগ্রসর হবে না, চলবে শরীয়তের নির্দেশ মাফিক। যদি সে সর্বদা শরীয়তের অনুসৃতি ও আনুগত্যে তৎপরতা প্রদর্শন করে তবে সে ঠিকই বলছে। যদি সে শরীয়তের বিধি-বিধানে নিজস্ব ইচ্ছা-অভিরুচি ও অভিপ্রায় মাফিক রুখসত ও জটিল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চায় তবে সে হতভাগ্য– এখন পর্যন্ত ফাঁদে পড়া বন্দী। যদি সে ক্রোধের দাস হয়, তবে সে মানুষরূপী একটি কুকুর। যদি সে হয় উদরের দাস অর্থাৎ পেটসর্বস্ব, তবে সে একটি আস্ত জানোয়ার, আর সে যদি হয় বদ প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার হাতে বন্দী, তবে সে নিকৃষ্ট শূকর; যদি সে বেশ-ভূষা ও সৌন্দর্যের গোলাম হয়, তবে সে পুরুষরূপী স্ত্রীলোক। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেকে শরীয়তের আহকাম মাফিক সুসজ্জিত করে এবং নফ্সের পরীক্ষা নিয়ে থাকে, নিজ প্রবৃত্তির বাগডোরকে শরীয়তের হাতে তুলে দেয়, যে দিকে শরীয়ত ইঙ্গিত করে, সে দিকেই নিজ প্রবৃত্তিকে ঘুরিয়ে দেয়–কেবল তখনই বলা যায় যে, তার গুণাবলী তার শাসনাধীন ও নির্দেশানুগত হয়ে গেছে। অতএব যে সমস্ত লোককে আল্লাহ পাক দূরদৃষ্টি দান করেছিলেন এবং যারা বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন, তাঁরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত স্বীয় নফ্সকে তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতির লাগাম পরিয়ে রেখেছিলেন।[১]

১. ৯৬ নম্বর পত্র।

দশম অধ্যায়

দীনের হিফাযত ও শরীয়তের সাহায্য-সমর্থন

একটি সংস্কার ও সংশোধনমূলক কাজ

হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মুনায়রী (র)-এর সমগ্র কার্যাবলী শুধু এই নয় যে, তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্র রাস্তা দেখিয়েছেন, মা'রিফতে ইলাহী ও আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টির আবশ্যকতা ও গুরুত্ব হৃদয়মূলে গেঁথে দিয়েছেন, হাযার হাযার লাখ লাখ মানুষের অন্তরে 'ইশকে ইলাহী তথা বিভু প্রেম এবং আল্লাহ্কে চাইবার আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, 'সলূক' ও মা'রিফতের গোপন রহস্য ও ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র বিষয়াবলী এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও উচ্চতর জ্ঞানরাজির প্রকাশ ঘটিয়েছেন, বরং উম্মতের অন্যান্য কতিপয় সংস্কারক-সংশোধক ও চুলচেরা বিশ্লেষণকারী দার্শনিকদের মত তাঁর এটাও একটা বিরাট ও আলোকোজ্জ্বল কৃতিত্ব যে, তিনি সঠিক মুহূর্তে দীনের হিফাযতের পবিত্র দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন, মুসলমানদের দীন ও ঈমানকে বিভ্রান্ত সূফীদের বাড়াবাড়ি ও সীমাতিরিক্ততা, 'মুলহিদ'দের বিকৃতি এবং 'বাতেনী' ও যিন্দীক ফিরকার প্রভাব থেকে হিফাযত করেছেন এবং সে সব ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তিকে দিবালোকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন যা বদ-'আকীদাসম্পন্ন সূফী, মূর্খ ও জাহিল পীর এবং দর্শন ও বাতেনী ধ্যান–ধারণা প্রভাবিত প্রাচ্যবিদদের দাওয়াত ও তবলীগ দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশের ন্যায় একটি বহু দূরে অবস্থিত রাষ্ট্রকে (যেখানে ইসলাম বহু ঘোরালো চড়াই-উৎরাই পার হয়ে পৌঁছেছিল এবং কিতাব ও সুন্নত থেকে সরাসরি জ্ঞান অর্জনের উপায়-উপকরণ প্রথম থেকেই কমযোর ও সীমাবদ্ধ ছিল) মোহগ্রস্ত করে রেখেছিল। তিনি স্বীয় মকতূবাতে সে সব 'আকীদা ও ধ্যান-ধারণার ওপর চরম আঘাত হানেন যার প্রচ্ছন্ন ছায়ায় এখানে ইলহাদ, কুফরী ও যিন্দিকী ভাবধারা বিস্তার লাভ করছিল এবং ইসলামী 'আকীদা নড়বড়ে হচ্ছিল। ইসলামের বিশুদ্ধ 'আকীদা এবং আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি-পদ্ধতির পক্ষে তিনি অত্যন্ত প্রভাবমণ্ডিত ও জোরদার ওকালতী

করেন। তিনি যে হাকীকত ও মা'রিফতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উন্নত ও মহান মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, পৌঁছেছিলেন কাশ্‌ফ, শুহূদ ও দীপ্তির উচ্চতর মকামে, রিয়াযত ও মুজাহাদার দীর্ঘ ও কঠিনতম স্তরগুলো অতিক্রম করেছিলেন এবং রিয়াযত ও মুজাহাদা তথা আধ্যাত্মিকতার ময়দানে 'ইমাম' ও মুজতাহিদ-এর মরতবায় উপনীত হয়েছিলেন—এ ব্যাপারে সবাই একমত। এজন্য এক্ষেত্রে তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিশেষ মূল্য ও গুরুত্ব রাখে এবং তাঁকে প্রত্যাখ্যান বরং অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করা বড় বড় আধ্যাত্মিক দীপ্তিতে দীপ্তিমান ও কাশ্‌ফসম্পন্ন মহাপুরুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। কেননা তাঁর ব্যাপার তো এই ছিল যে,

ہوں اس کوچہ کے ہر ذرہ سے آگاہ

ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں

অর্থাৎ "এই গলি-পথের প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে আমি অবহিত আছি, কেননা বহুকাল যাবত এ পথেই আমি আনাগোনা করেছি।"

বিলায়েতের মর্যাদা থেকে নবুওতের মর্যাদা উত্তম

দীর্ঘকাল ধরে তাসাওউফের কতিপয় মহলে এমত ধারণা প্রচার করা হচ্ছিল যে, বিলায়েতের মকাম নবুওতের মকাম থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং তা এজন্য যে, আল্লাহ্‌র সেই মহান সত্তার প্রতি মনোনিবেশ এবং সৃষ্টি জগতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চ্যুতির নাম 'বিলায়েত' —আর নবুওতের বিষয়বস্তু মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত জানানো যার সম্পর্ক সৃষ্টিজগতের সঙ্গে। এজন্য ওলীর সেই মহান সত্য সত্তার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এবং নবী সৃষ্টিজগতের কল্যাণের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হওয়া অপেক্ষা নিঃসন্দেহে মহান ও উত্তম। অবশ্য এদের মধ্যে কেউ কেউ কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেন, সাধারণভাবে বিলায়েতের মর্যাদা নবুওতের মর্যাদা থেকে উত্তম নয়, বরং উল্লিখিত কথার মর্মার্থ এই যে, নবীদের বিলায়েত তাঁর নবুওতের মর্যাদা অপেক্ষা উত্তম। নবী যখন স্রষ্টার প্রতি মশগুল হন তখন তাঁর এই অবস্থা সৃষ্টিজগতের প্রতি তাঁর দাওয়াত জানাবার ধারাবাহিক দায়িত্ব পালনে মশগুল হবার অবস্থা থেকে উত্তম হয়ে থাকে।

কিন্তু উল্লিখিত বক্তব্যের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে অর্থই বের করা হোক না কেন, এইরূপ 'আকীদা ও ধ্যান—ধারণা দ্বারা নবুওতকে অবজ্ঞা ও খাটো করে দেখার রাস্তা খুলে যায়, এর গুরুত্ব ও মর্যাদা কমে যায়, খুলে যায় ইলহাদ ও যিন্দিকী ধ্যান—ধারণা। হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্‌ইয়া মুনায়রী (রা.) এ ধরনের 'আকীদা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং জোরালো ও

বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, নবুওতের মকাম বিলায়েতের মকাম অপেক্ষা লক্ষগুণে উন্নত ও মহান। নবীর সমগ্র অবস্থা ও গোটা মুহূর্ত ওলীর সমস্ত হালত ও সময়ের চেয়ে উত্তম। শুধু তাই নয়, নবীদের একটি নিঃশ্বাস আওলিয়াগণের সারাজীবনের সাধনা অপেক্ষাও উত্তম। এক্ষেত্রে তিনি মুহাক্কিক ও 'আরিফসুলভ অনেক কথাই লিখেছেন এবং যেহেতু তিনি নিজেই বিলায়েত ও মা'রিফতের উচ্চতম মরতবায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, এজন্য তাঁর মতামত ব্যক্ত করা শুধু তাঁর অপূর্ব মেধাশক্তি ও জ্ঞানশক্তির ফলশ্রুতিই নয় বরং তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ওপর স্থাপিত। একটি পত্রে তিনি লিখেন ঃ

> আমার প্রিয় ভাই শামসুদ্দীনের জানা দরকার যে, তরীকতের বুযর্গগণের সম্মিলিত মতে–সকল সময় এবং সকল অবস্থাতেই আওলিয়ায়ে কিরাম আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর পদাংকানুসারী এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) আওলিয়াকুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান। বিলায়েতের দ্বারা যে নৈকট্যলাভ ঘটে, তা আম্বিয়া কিরামের হিদায়াতের তুল্য। সকল নবী (আ)-ই বিলায়েতের অধিকারী, কিন্তু ওলী-আওলিয়া কেউই নবী হন না। আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আত এবং তরীকতের মুহাক্কিক (বিশেষজ্ঞ)-গণের এই মাসআলার ক্ষেত্রে কোনরূপ ইখতিলাফ কিংবা মতভেদ নেই। অবশ্য মুলহিদদের একটি দল বলে যে, আওলিয়া আম্বিয়ায়ে কিরাম অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাবান। তারা তাদের বক্তব্যের সমর্থনে এই দলীল পেশ করে যে, আল্লাহ্‌র ওলীগণ সব সময় আল্লাহ্‌তেই বিভোর থাকেন, আর আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) অধিকাংশ সময়ই সৃষ্টিকুলকে দাওয়াত জানাতে ও তবলীগে মশগুল থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহতে মশগুল থাকেন সর্ব মুহূর্তে–তিনি সেই ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম ও মর্যাদাবান হবেন যিনি কিছু সময় মাত্র আল্লাহ্‌তে বিভোর থাকেন। একটি দলের (যারা সূফী-দরবেশগণের সঙ্গে মুহব্বতের দাবিদার এবং যারা তাঁদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করেন এবং আনুগত্য-অনুসরণের ভান দেখান) বক্তব্য এই যে, বিলায়েতের মকাম নবুওতের মকাম অপেক্ষা অধিক মর্যাদামণ্ডিত। কেননা নবী ওহীর ইল্‌মের অধিকারী আর আওলিয়া গোপন রহস্য-জ্ঞানের অধিকারী। ওলীগণ এমন সব গোপন রহস্য অবগত হয়ে থাকেন যে সম্বন্ধে নবীগণ থাকেন অনবহিত ও বেখবর। তারা ওলী-দরবেশগণের জন্য 'ইল্‌মে লাদুন্নী-র অধিকারী হওয়া প্রমাণিত করেন এবং এক্ষেত্রে (কুরআনে বর্ণিত) হযরত মূসা ('আ) ও হযরত খিযির ('আ)-এর ঘটনা দলীল হিসেবে পেশ করেন। তাঁরা বলেন, হযরত খিযির (আ) ওলী ছিলেন আর হযরত মূসা (আ) ছিলেন নবী। হযরত মূসা ('আ)-এর ওপর জাহিরী ওহী আসত। যতক্ষণ পর্যন্ত ওহী

আসত না– তিনি কোন ঘটনার গোপন-রহস্য এবং কোন কথার অন্তর্বর্তী ভেদ অবগত হতে পারতেন না। হযরত খিযির (আ) 'ইলমে লাদুন্নী'র অধিকারী ছিলেন বিধায় তিনি ওহী ব্যতিরেকেই গায়েব তথা অদৃশ্য বস্তু ও জগত সম্পর্কে জেনে নিতেন। এমনকি হযরত মূসা ('আ)-কেও তাঁর অধীনে শাগরিদী (শিষ্যত্ব) করার আবশ্যকতা দেখা দেয়। আর সবাই জানে যে, শাগরিদ অপেক্ষা উস্তাদ অধিকতর উত্তম ও মর্যাদাবান হয়ে থাকেন। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে, এই তরীকার নেতৃবৃন্দের –দীনের ব্যাপারে যাঁদের ওপর নির্ভর করা যায়–তাঁরা এ ধরনের উক্তি ও 'আকীদা সম্পর্কে অত্যন্ত নাখোশ এবং তাঁরা একথা মেনে নিতে আদৌ রাযী নন যে, কারোর মরতবা আম্বিয়ায়ে কিরামের মরতবা অপেক্ষা অধিকতর উন্নত কিংবা তাঁদের সমমানের হতে পারে। রইল হযরত মূসা ('আ) ও হযরত খিযির ('আ)-এর ঘটনা। এর জবাব এই যে, হযরত খিযির ('আ) আংশিক ফযীলতের অধিকারী ছিলেন এবং তা ছিল তাঁর বিশেষ ঘটনাবলীর ইলমে লাদুন্নী। আর হযরত মূসা ('আ) সাধারণ ফযীলতের অধিকারী ছিলেন। আংশিক ফযীলত ব্যাপক ও সাধারণ ফযীলতকে নাকচ করতে পারে না–পারে না মনসূখ করতে। যেমন, হযরত মারইয়াম ('আ) এক ধরনের ফযীলতের অধিকারিণী ছিলেন। যেহেতু তাঁর গর্ভে পুরুষের সংসর্গ ব্যতিরেকেই হযরত' ঈসা ('আ) পয়দা হয়েছিলেন। কিন্তু এজন্য তাঁর মর্যাদা ও ফযীলত হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত ফাতিমা (রা.) অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব ও প্রাধান্যের অধিকারী নয়। তাঁদের ফযীলতের প্রাধান্য ও গুরুত্ব দুনিয়ার নারীকুলের ওপর। মনে রেখো, আওলিয়াকুলের সকলের সব 'আমল ও অবস্থা, শ্বাস-প্রশ্বাস ও গোটা জীবন নবীদের একটি কদমের মুকাবিলায়ও ক্ষুদ্র ও অস্তিত্বহীন দৃষ্টিগোচর হবে। আওলিয়াকুল যে বস্তুর প্রার্থী, যে বস্তুর জন্য তাঁরা দুর্গম পথ অতিক্রম করেন, করেন কঠোর পরিশ্রম ও মেহনত, আম্বিয়ায়ে কিরাম বহু আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়ে থাকেন। আম্বিয়ামে কিরাম তাঁদের দাওয়াতী কাজ আল্লাহ্র হুকুমেই আঞ্জাম দিয়ে থাকেন এবং হাযার হাযার আল্লাহ্র বান্দাহ্কে আল্লাহ্প্রাপ্ত ও তাঁর সান্নিধ্য লাভের অধিকারী বানিয়ে দেন।

আম্বিয়ায়ে কিরামের একটি নিঃশ্বাস ওলীদের সমগ্র জীবনের সাধনা থেকেও উত্তম

আম্বিয়ামে কিরামের একটি নিঃশ্বাস আওলিয়ায়ে কিরামের তামাম জীবন অপেক্ষা উত্তম। আর তা এজন্য যে, আওলিয়ায়ে, কিরাম যখন চরম মার্গে উপনীত হন–তখন 'মুশাহাদাহ্' (পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান)-এর সংবাদ দেন এবং মানবীয় অন্তরাল থেকে মুক্তি পান, যদিও সে অবস্থায়ও তাঁরা মানুষই থাকেন।

পক্ষান্তরে পয়গম্বরগণ প্রথম পদক্ষেপেই 'মুশাহাদা'র মকামে অধিষ্ঠিত হন যা আওলিয়া কিরামের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ ধাপ। অতএব আওলিয়াকে আম্বিয়ায়ে কিরামের ওপর কিয়াস করাই ঠিক নয়। হযরত খাজা বায়েযীদ বিস্তামী (র)- কে কেউ প্রশ্ন করেছিল যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের অবস্থাসমূহ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেছিলেন যে, তওবাহ্। তওবাহ্! এ ব্যাপারে (মন্তব্য প্রকাশের) কোন অধিকারই আমাদের নেই। অতএব আওলিয়া কিরামের মরতবা সম্পর্কে অন্যান্য সৃষ্টিকুলের জ্ঞান ও উপলব্ধি এবং ধ্যান-ধারণা যেরূপ ক্ষীণ ও প্রচ্ছন্ন, ঠিক তেমনি আম্বিয়ায়ে কিরামের মরতবাও আওলিয়াকুলের জ্ঞান ও উপলব্ধির ঊর্ধ্বে। আওলিয়া আম্বিয়ায়ে কিরামের অকৃত্রিমতায় আপন গতিতে ধাবমান আর আম্বিয়ায়ে কিরাম আওলিয়া কিরামের মুকাবিলায় উড়ন্ত গতিতে ধাবমান। আর এটা তো ঠিক যে, পায়ে চলার গতি উড়ন্ত গতির মুকাবিলা করতে পারে না।

আম্বিয়ায়ে কিরামের দেহ আর আওলিয়ার আত্মা

আম্বিয়ায়ে কিরামের মাটির দেহ পাক-পবিত্রতা ও আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের ক্ষেত্রে আওলিয়ায়ে কিরামের ভেদ ও রহস্যের সমতুল্য। অতএব ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান যাদের একজনের দেহ যেখানে পৌঁছে, সেখানে অন্যজনের শুধুমাত্র ভেদ ও রহস্য পৌঁছাতে পারে।[১]

শরীয়তের চিরন্তনতাও অপরিহার্য

এমনি আর একটি ভ্রান্ত ধারণা কতিপয় মহলে বিস্তার লাভ করেছিল যে, শরীয়তের বাধ্য-বাধকতা ও অনুসরণের আবশ্যকতা একটি বিশেষ সময় ও বিশেষ সীমারেখা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ; 'সালিক' যখন পর্যবেক্ষণের মকাম এবং 'ইয়াকীন'-এর মরতবায় উপনীত হয়, পৌঁছে যায় আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে, তখন সে শরীয়তের পাবন্দী ও শরঈ বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যায়। এরূপ আকীদা সাধারণ্যে বেশ ব্যাপক ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং বহু 'মুলহিদ-কাফির' ও বে-আমল সূফী ও অকাট মূর্খ পীর-দরবেশ এর মাধ্যমে এ এক বিরাট ফিতনার সূত্রপাত করেছিল এবং এর দ্বারা কতিপয় মহলে শুধু বিশৃঙ্খলা ও বে-আমলই নয়, 'ইলহাদ ও যিন্দিকী' ভাবধারাও বিস্তার লাভ করেছিল। কতক লেখাপড়া জানা লোকও এ 'আকীদাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবার স্বার্থে কুরআন মজীদের মশহুর আয়াত واعبد ربك حتى يأتيك اليقين অর্থাৎ

১. মকতূবে রিসতম।

"এবং ইয়াকীন তোমাতে না আসা পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের 'ইবাদত (দাসত্ব ও গোলামী) কর"[১]-এর দলীল পেশ করে এবং বলে যে, 'ইবাদত ও শরীয়তের পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের সিলসিলা ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম থাকা দরকার যতক্ষণ পর্যন্ত না 'ইয়াকীন' হাসিল হয়। 'ইয়াকীন' হাসিল হয়ে গেলেই শরীয়তের কষ্টকর বিধানগুলো পালনের বাধ্যবাধকতা অপসৃত হয়ে গেল। হযরত শায়খ শরফুদ্দীন (র) এ ধরনের অমূলক 'আকীদা ও বিভ্রান্তিকে অত্যন্ত জোরের সাথে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ বিষয়ের ওপর তাঁর কতিপয় 'মকতূবাত' (চিঠিপত্র)ও রয়েছে যেখানে তিনি পূর্ণ জোশ ও শক্তির সঙ্গে এটা প্রমাণ করেছেন যে, শরীয়তের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও পাবন্দী শেষ নিশ্বাস ত্যাগের প্রাক-মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকে এবং কোন অবস্থাতেই ও কোন সময়েই শরীয়তের অবশ্য পালনীয় বিধানগুলো থেকে মানুষ অব্যাহতি পায় না।

শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দী সর্বাবস্থায় অপরিহার্য এক পত্রে তিনি লিখেছেন ঃ

> প্রিয় ভাই শামসুদ্দীন! অবগত হও যে, শয়তান কখনও কখনও সূফী ও আহলে রিয়াযতের ওপর এটা জাহির করে যে, পাপ পরিত্যাগের আসল উদ্দেশ্য হল প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা পরাভূত এবং মানবীয় দোষ-গুণ এতে পর্যুদস্ত হয়ে যাবে এবং অন্য উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ তাঁর ওপর বিজয়ী হবে আর দিল্ হবে মানবীয় অন্ধকারাচ্ছন্নতা ও যিকরে ইলাহীর প্রভাব থেকে মুক্ত, যার ফলে সে আল্লাহ্‌র মা'রিফতের হাকীকত লাভ করবে। শরীয়তের পাবন্দী পরিপূর্ণ মিলনের কা'বা গৃহে পৌঁছুবার একটি রাস্তা মাত্র। যে ব্যক্তি এই কা'বাগৃহে পৌঁছে গেছে, তার আবার রাস্তা, খোরাক কিংবা সওয়ারীর কী আবশ্যকতা থাকতে পারে? অতঃপর শয়তান এই দলকে বুঝাতে শুরু করে যে, যদি সে সালাত আদায় করে তবে তা তার জন্য অন্তরায় সৃষ্টি করবে। আর তা এজন্য যে, সে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হয়েছে। এ সমস্ত লোক বলে যে, আমরা তো চিরন্তন মুশাহাদার মধ্যে অবস্থান করি এবং সালাত, রুকূ ও সিজদার আসল উদ্দেশ্য এই যে, গাফিল দিল্ তথা মানুষের অলস অন্তর সর্বদা তাঁর উপস্থিতিতে আবিষ্ট থাকবে। আমরা এক মুহূর্তও গাফিল হই না, আধ্যাত্মিক জগতের সেই দৃশ্যমান বস্তু দেখি যা আম্বিয়ায়ে কিরামকে পবিত্র প্রতিবেশে দেখানো হয়। আমাদের আবার ঐ সব 'ইবাদত-বন্দেগী ও শরীয়তের বিধি-বিধান

১. আয়াতের সঠিক তাফসীর জানতে খ্যাতনামা মুফাসসিরদের তাফসীর দেখুন। এখানে ইয়াকীন অর্থ মৃত্যু।

পালনের কী আবশ্যকতা থাকতে পারে? প্রকৃতপক্ষে এটা খোদ ইবলীসের অবস্থা ও তারই ঘটনার ন্যায়। সে তার নৈকট্যের পূর্ণতা দেখেছিল এবং বলেছিল যে, আদম (আ)- কে সিজদা করে কী লাভ? আদমের মর্যাদা তার তুলনায় কম; তাকে সিজদা করায় আমার কী ফায়দা হবে? আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে তার ঘটনা অলীক কাহিনী কিংবা উপন্যাস হিসেবে পেশ করেন নি, বরং সেইসব লোকের জন্য শিক্ষণীয় উপদেশ হিসেবে বিবৃত করেছেন যারা এ ধরনের শয়তানী বিভ্রান্তির শিকার। তারা যেন জানতে ও বুঝতে পারে যে, যে কোন মুকার্রাব (নৈকট্যপ্রাপ্ত) বান্দাহ্র পক্ষেও শরীয়তের আনুগত্য ব্যতিরেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। যে সমস্ত বুযর্গানে দীন বলেছেন যে, শরীয়তের অনুসরণ আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছবার একটি সরল রাস্তা– তাঁরা ঠিক ও সত্য কথাই বলেছেন।

শরীয়তের স্থায়িত্বের গোপন রহস্য

শয়তান এখানে একটি বিষয় ঐ দলের দৃষ্টি বহির্ভূত রেখেছে। সে তাদের এটাই বিশ্বাস করিয়েছে যে, শরীয়তের উদ্দেশ্য হল শুধু আল্লাহ্র হুযূরী লাভ করা। আসলে এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। শরীয়তের উদ্দেশ্য এটা ব্যতিরেকে আরও আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এমনই যে, যেমন কোন পরিপূর্ণ জানালায় পাঁচটি কীলক (পেরেক) মারা হয়েছে। যদি কীলকটি তা থেকে আলাদা হয়ে যায় তবে জানালাটি সম্পূর্ণতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, যেমনটি খোদ ইবলীস আল্লাহ্র বন্দেগী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। যদি কেউ বলে যে, এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কী করে পাঁচটি কীলকের মত হবে যা সম্পূর্ণ জানালাটি আটকে রেখেছে? তার জবাব এই যে, তা চেনা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। এটা বস্তুত এমনই যেমন বিভিন্ন জিনিস ও ঔষধপত্রাদির মিশ্রণ। বুদ্ধি এর কারণ নিরূপণে অক্ষম–যেমন চুম্বক পাথর কেন লোহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে তা কেউ জানে না।

একটি পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত

শরীয়তের অবশ্য পালনীয় বিধি-বিধানসমূহ ও হুকুম-আহকামের পাবন্দীর মধ্যে কী হিকমত রয়েছে এবং তা মানুষের দীন ও ঈমান এবং স্বীয় স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক বহাল রাখার ক্ষেত্রে কী পরিমাণ জরুরী–তার একটা প্রকৃত উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

> এক ব্যক্তি পাহাড়ের চূড়ায় একটি প্রাসাদ (মহল) নির্মাণ করল। সেখানে সে বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন কিসিমের নে'মত-সামগ্রী জমা করল। যখন তার

অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এল–তখন সে তার ছেলেকে ওসিয়ত করল যে, তুমি এই প্রসাদকে সংস্কার ও সংশোধনসহ সকল উপায়ে ব্যবহারে লাগাতে পারবে। কিন্তু খোশবুদার একটি ঘাসের একটি অংশ যা আমি পেছনে ছেড়ে যাচ্ছি– সেটি যদি শুকিয়েও যায় তবুও তা বাইরে ছুড়ে ফেলবে না। পাহাড়ের চূড়ায় যখন বসন্তের মৃদু হিল্লোল দেখা দিল, তখন পাহাড় ও প্রান্তর সবুজ শ্যামলিমায় ছেয়ে গেল; বহুবিধ সতেজ ও খোশবুদার ঘাসের জন্ম হল–যা সেই পুরনো ঘাসটির চেয়েও তরতাজা। এর ভেতর থেকে অনেক ধরনের ঘাস ও ফুলই সেই প্রাসাদে এল যার খোশবু সারা মহলকে সুগন্ধিময় করে তুলল এবং তার সামনে উক্ত পুরনো শুকনো ঘাসের খোশবু মিইয়ে গেল। ছেলেটি মনে করল যে, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা এই পুরনো ঘাসটি মহলে এজন্য রেখেছিলেন যে, তার খোশবু চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং তার দ্বারা এই জায়গাটি খোশবুময় হয়ে উঠবে। এখন এই শুকনো ঘাসটি কোন্ কাজে আসবে? যে মুহূর্তে উল্লিখিত মহলটি ঐ ঘাস থেকে মুক্ত হয়ে গেল, তখনই একটি কালো সাপ গর্ত থেকে বেরিয়ে এল এবং ছেলেটিকে কামড়ে দিল। অমনি সঙ্গে সঙ্গে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। এর পেছনে কারণ কী ছিল? ঘাসটির দু'টি উপকারিতা ছিল। প্রথমত, সে খোশবু দিত। দ্বিতীয়ত, তার ভেতর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ এই ছিল যে, ঘাসটি যেখানেই থাকত, তার ধারে-কাছেও সাপ ঘেঁষতে সাহস পেত না। অর্থাৎ ঘাসটি ছিল সাপের প্রতিষেধক যা আর কেউ জানত না। ছেলেটি তার মেধাশক্তি ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার জন্য গর্বিত ছিল। কিন্তু এ আয়াতের মর্মার্থ তার জানা ছিল না وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (আর তোমাদের খুব অল্পই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে)। সে তার জ্ঞান ও মেধার অহমিকায় মারা গেল। এভাবেই এই–কাশ্ফ ও কারামতের অধিকারী দল এই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে যে, শরীয়তের যে গোপন রহস্য ছিল তা তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে এবং এইগুলো ভিন্ন শরীয়তের আর কোন গুপ্ত রহস্য নেই। অথচ এর চেয়ে বড় ভ্রান্তি আর কিছুই হতে পারে না যা এ পথের পথিক 'সালিক'দের সামনে কখনো কখনো দেখা দেয় এবং বহু লোকই এর শিকার হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। ঐ সমস্ত লোক শরীয়তের একটিই উদ্দেশ্য ভেবে বসে আছে। অথচ এটা বুঝতে চেষ্টা করে নি যে, এর ভেতর অন্যান্য গুপ্তভেদও রয়েছে। তারা এটাও খেয়াল করে নি যে, যদি অন্যান্য হিকমত না থাকত তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের এত

সালাত আদায়ের কী দরকার ছিল যার কারণে তাঁর কদম মুবারক ফুলে যেত? তিনি একথা বলেন নি যে, এটা উম্মতের ওপর ওয়াজিব— পয়গম্বরের ওপর নয়।[১]

'উলামা ও কামিল বুযর্গগণের আদর্শ

যেসব 'উলামায়ে কিরাম, মাশায়িখ ও সূফী কামালিয়াতের দরজায় পৌঁছে গেছেন, তাঁরা বুঝেছেন যে, শরীয়তের প্রত্যেকটি বাধ্য-বাধকতার ভেতরই একটি রহস্য রয়েছে, যার সঙ্গে আখিরাতের মহাসৌভাগ্যও সম্পৃক্ত ও জড়িত। এমন কি ঐসব বুযর্গ নিজেদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের মুহূর্ত পর্যন্ত শরীয়তের আদবসমূহের মধ্যকার একটি আদবও ত্যাগ করেন নি। হযরত জুনায়দ বাগদাদী (র)-এর একজন খাদেম তাঁকে তাঁর ইন্তকালের সময় ওযূ করাচ্ছিল। সে দাঁড়ি খেলাল করাতে ভুলে যায়। তিনি তার হাত-পা চেপে ধরলেন যেন এ সুন্নতটিও ভালভাবে আদায় করা হয়। লোকেরা বলল ঃ "হযরত! এই মুহূর্তেও কি এতটুকু শিথিলতা উপেক্ষার যোগ্য নয়?" তিনি বললেন, "আমি আল্লাহ্ পর্যন্ত এর বরকতেই পৌঁছুতে পেরেছি।" কামালিয়াতের অধিকারীদের এটাই ছিল রীতি। ফেরেববাজ লোকেরা সত্বরই ধোঁকায় পতিত হয়। যে বস্তুকে তারা দেখতে পায় না এবং যে বিষয় তাদের উপলব্ধিতে আসে না তাকেই তারা অস্তিত্বহীন মনে করেছে। ফজরের সালাত দু'রাকাত, জোহরের চারি রাকাত, আসরের চারি রাকাত, মাগরিবের তিন এবং 'ইশার চারি রাকাত; অতঃপর প্রতিটি রাকাতেই একটি করে রুকূ' ও দু'টি করে সিজদা রয়েছে। এসবের ভেতর এমন এক রহস্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার কামালিয়াত হাসিলের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে—এবং ইন্তিকালের মুহূর্ত পর্যন্ত তা বাধ্যবাধকতা সহকারে মেনে চললে তার আছর ও প্রতিক্রিয়া জাহির হয়। যদি 'সালিক এসব ছেড়ে দেয় এবং দুনিয়া থেকে চলে যায় তাহলে সে আখিরাতে দেখতে পাবে নিজের ধ্বংস। সে সময় বলবে, হায়! আমার সে কামালিয়াতের কি হল? জবাব দেওয়া হবে, সে কামালিয়াতের তক্তায় কীলক ছিল না। ফলে মরণের সময় তা মূল থেকে উপড় গেছে, ঠিক তেমনি যেমন করে ইবলীসের তামাম কামালিয়াত একটি নাফরমানীর কারণেই মাটিতে মিশে গেছে।

হযরত শায়খ শরফুদ্দীন (র) এ ব্যাপারে এত দৃঢ় বিশ্বাসী ও আপোসহীন ছিলেন যে, তিনি একটি পত্রে এই 'আকীদাকে (শরীয়তের পাবন্দী বিশেষ হালতে ও মকামে জরুরী নয়) প্রত্যাখ্যান করত বলেন ঃ

---

১. ১৮তম পত্র।

এটা ভুল এবং মুলহিদদের মাযহাব যারা বলে, যখন হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছে গেছি এবং কাশ্ফ ও শুহূদ হাসিল হয়ে গেছে, তখন শরীয়তের হুকুম উঠে গেছে। এ ধরনের 'আকীদা ও মাযহাবের উপর লা'নত।[১]

শরীয়তের শর্ত

তিনি তামাম মুহাক্কিক সূফীর মত অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই উক্তির সমর্থক ও দাবিদার যে, সলূক ও তরীকত হাসিল করা শরীয়তের অনুসরণ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। এক পত্রে তিনি বলেন ঃ

> যে ব্যক্তি তরীকতের ক্ষেত্রে শরীয়তের অনুসারী না হবে, তরীকতের দ্বারা তার কোন ফায়দা হাসিল হবে না। এটা মুলহিদদের মাযহাব যে, এগুলো একটি অন্যটির সহযোগিতা ব্যতিরেকেই চলতে পারে। তারা বলে যে, হাকীকত যখন প্রকাশ হয়ে গেছে তখন শরীয়তের আবশ্যকতা আর অবশিষ্ট রইল না। আল্লাহ্র লা'নত হোক এই 'আকীদার ওপর। বাতেনী ব্যতিরেকে জাহেরী মুনাফিকী ছাড়া আর কিছু নয়, ঠিক তেমনি জাহেরী (শরীয়ত) ব্যতিরেকে বাতেনী (তরীকত ও মা'রিফত) পরিষ্কার কুফরী ছাড়া আর কিছুই নয়। জাহের (শরীয়ত) বাতেন (তরীকত) ব্যতিরেকে ত্রুটিযুক্ত আর বাতেন জাহের ব্যতিরেকে এক ধরনের মস্তিষ্ক বিকৃতিরই নামান্তর। জাহের সব সময়ই বাতেনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং জাহের (শরীয়ত) বাতেন (তরীকত, মা'রিফত ও হাকীকত-এর সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত যে, তা কোনক্রমেই একটির থেকে অপরটি আলাদা হয় না।[২]

মুহাম্মাদ (স)-এর পদাংক অনুসরণ ব্যতিরেকে গত্যন্তর নেই

হযরত মাখদুম (র) মকতূবাতে অত্যন্ত আবেগ-উদ্দীপনার সঙ্গে এবং অত্যন্ত আস্থা ও ইয়াকীনের সঙ্গে এ কথার তবলীগ করতেন যে, হুযূর আকরাম (সা.) যিনি রাব্বুল 'আলামীনের মাহবূব বান্দাও বটেন, তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ ব্যতিরেকে নাজাত লাভ সম্ভব নয়—সম্ভব নয় হাকীকত পর্যন্ত উপনীত হওয়া কিংবা কামালিয়াত ও পারলৌকিক সৌভাগ্য লাভ করা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ -

> বলুন (হে রসূল!) তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন। [সূরা আলে-ইমরান ঃ ৩ ঃ ৩১]

---

১. ২৬ তম পত্র। ২. ২৬তম পত্র।

ফিরদৌসিয়া সিলসিলার প্রচার এবং এর কতিপয় কেন্দ্র

হযরত মাখদূমুল মুলক (র)-এর পর ফিরদৌসিয়া সিলসিলা কতটুকু উন্নতি করেছিল তা কোন গ্রন্থেই লিখিত আকারে দৃষ্টিগোচর হয় না। অতঃপর মাওলানা মুজাফফর বলখী ('আদন' বন্দরে যিনি শায়িত) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং বিহারের খানকাহতে এই সিলসিলা জারী হয়। স্বীয় যুগে মাখদুম শাহ শু'আয়ব ফিরদৌসী ইবন মাখদূম জালাল মুনায়রী, যিনি মাখদূমুল মুলক (রা.)-এর চাচাতো ভাই— মুঙ্গের জেলার শেখুপুরাতে খানকাহ কায়েম করেন। অতঃপর তাঁর খান্দানের লোকদের দ্বারা অদ্যাবধি এই সিলসিলা সেখানে কায়েম আছে। মাখদূম শাহ শু'আয়ব ফিরদৌসীর (বুযর্গানে ফিরদৌসিয়ার অবস্থা বর্ণনায়) 'মানাকিবুল আসফিয়া' নামে একটি কিতাব রয়েছে যা প্রকাশিত হয়েছে এবং বর্তমান গ্রন্থ লিখতে উক্ত কিতাবের বিশেষ সাহায্য নেওয়া হয়েছে। হযরত মাখদূম (র)-এর পর 'মুনায়র'-এ ফিরদৌসী সিলসিলার উন্নতি ঘটে। এর ভেতর তাঁর খান্দানের মাখদূম শাহ দৌলত মুনায়রী (মৃত্যু ১০১৭ হিজরী) অত্যন্ত মশহূর বুযর্গ ছিলেন। তাঁর একজন মুরীদ ও খলীফা আমানুল্লাহ সিদ্দিকী আসী সিন্দিলা কর্তৃক উত্তর প্রদেশ থেকে এ সিলসিলা জারী হয়। সম্ভবত দশম শতাব্দীতে পাটনা জেলার মতেতাহাতে ফিরদৌসিয়া সিলসিলার একটি খানকাহ কায়েম হয়েছিল এবং অদ্যাবধি এ সিলসিলা জারী রয়েছে। বিহার প্রদেশে এমন কোন খানকাহ নেই যেখানে এই সিলসিলা নেই। মহীশূর রাজ্যের মিশমার ভাটকল নামক মহল্লায়ও এই সিলসিলার খানকাহ আছে।

হযরত মাখদূম সাহেব (র)-এর দোহা ও হিন্দী প্রবাদ বাক্য

বিহার ও তার আশে-পাশে হযরত মাখদূম (র)-এর বহু দোহা ও হিন্দী প্রবাদ বাক্য সাধারণ্যে এখনো জনপ্রিয় এবং বহুলভাবে প্রচলিত।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস

৪র্থ খণ্ড

[মুজাদ্দিদে আল্‌ফে সানী (রহ)]

অনুবাদ

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

(24) تاریخ دعوت وعزیمت چہارم

از سید ابوالحسن علی ندویؒ

مترجم: ابوسعید محمد عمر علی

ناشر: محمد برادرس 38، بنگلہ بازار، ڈھاکہ 1100.

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস-৪র্থ খন্ড
[মুজাদ্দেদী আলফে সানী (রহ.)]
মূল ঃ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)
অনুবাদ ঃ আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (রহ.)

প্রকাশকাল
এপ্রিল, ২০১১ইং

প্রকাশকঃ মুহাম্মদ আবদুর রউফ
মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
সেলঃ ০১৭২৮৫৯৮৪৪০-০১৮২২৮০৬১৬৩

মুদ্রণে ঃ মেসার্স তাওয়াক্কাল প্রেস
৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
সালসাবীল

ISBN: 984-622-026-1

মূল্য ঃ ২৮০.০০ (দুইশত আশি) টাকা মাত্র।

Shangrami Shadhakder Itihash (Part Four) (Muzaddadi Alfe Sani): [History of Saviors of Islamic Spirit] written by Sayed Abul Hasan Ali Nadvi (Rh.) in Urdu and translated by Abu Sayed Muhammad Omr Ali (Rh.) into Bengali and published by Muhammad Abdur Rouf, Muhammad Brothers, 38, Bangla Bazar, Dhaka-1100; Bangladesh. April, 2011.

Price: Tk. 280.00 only. U.S.Dollar : 5.00 only.

উৎসর্গ

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে যাঁরা চরম আত্মত্যাগের সম্মুখীন হয়েও বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি, এ পথের সকল প্রতিকূলতাকে হাসিমুখে যাঁরা মুকাবিলা করেছেন,

অত্যাচারী জালিমের খড়্গ-কৃপাণ ও বদ্ধ কারাপ্রাচীর যাঁদের বিশ্বাসের ভিত্‌কে এক বিন্দুও টলাতে পারেনি,

বিলাসী ও আয়েশী জীবন যাপনের শত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যাঁরা নির্লোভ ও নির্মোহ জীবন যাপন করে মানুষের সামনে অনুপম আদর্শ স্থাপন করেছেন,

পর্ণ কুটিরে বাস করে এবং অনাড়ম্বর পরিবেশে থেকেও যাঁরা রাজা-বাদশাহ্‌র ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতার সামনে নিজেদের শির সমুন্নত রেখেছেন, দুঃখী ও মজলুম মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের হতাশ অন্তরে আশা-ভারসার প্রদীপ জ্বালিয়েছেন,

তাদেরকে কাছে টেনেছেন,

আপন করেছেন,

রূহানিয়াতের প্রোজ্জ্বল আলোকধারায় যাঁরা পাপক্লিষ্ট ও পথভ্রষ্ট মানুষকে হিদায়াতের প্রশস্ত রাজপথে এনে দাঁড় করিয়েছেন, সেই সব জানা-অজানা মর্দে মু'মিন ও মর্দে মুজাহিদের পবিত্র রূহের উদ্দেশে............

—অনুবাদক

অনুবাদকের আরয

আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্। ছুম্মা আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্। পরম করুণাময় ও করুণা নিধানের অপার মেহেরবানীতে অবশেষে 'তারীখে দাওয়াত ও 'আযীমত'-এর ৪র্থ খণ্ডের বাংলা তরজমা "সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস" নামে প্রকাশিত হল। এজন্য আমি সর্বপ্রথম সকল কর্মের নিয়ামক পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে শত সহস্র কোটি হাম্‌দ ও শোকর পেশ করছি, পেশ করছি তাঁরাই মহান দরবারে বিনীত সিজ্‌দা। অযূত সালাত ও সালাম প্রিয় নবী সাইয়েদুল মুরসালীন খাতিমুন-নাবিয়্যীন, শাফী'উল মুযনিবীন, রাহ্‌মাতুল্লিল-'আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সালামের প্রতি যাহার ওসীলায় আমরা হেদায়েত রূপ অমূল্য সম্পদ লাভে ধন্য হয়েছি, গৌরবান্বিত হয়েছি। সেই সাথে উম্মাহাতু'ল-মু'মিনীন, আহলে বায়ত, সাহাবায়ে কিরাম, তাবি'ঈন ও তাবা তাবি'ঈন, মুফাসসিরীন, মুহাদ্দিছীন, ফুকাহায়ে ইজাম ও আওলিয়ায়ে কিরামের উদ্দেশ্যে অসংখ্য সালাম পেশ করছি যাঁদের অপরিসীম ত্যাগ ও সাধনায় ইসলাম অবিকৃতরূপে আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

"তারীখে দা'ওয়াত ও 'আযীমত" নামটি "সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস" পাঠকের কাছে নতুন নয়। ইতোমধ্যে এ সিরিজের তিনটি খণ্ড পাঠকের হাতে পৌঁছেছে। বর্তমান খণ্ডটি সিরিজের ৪র্থ পুস্তক যা এখন পাঠকের হাতে। বর্তমান খণ্ডে ইসলামী রেনেসাঁর অগ্নিপুরুষ হিজরী দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ "মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছানী" নামে পরিচিত মর্দে মু'মিন ও মর্দে মুজাহিদ ইমামে রব্বানী শায়খ আহমদ ফারূকী সরহিন্দী (র)-র সংগ্রাম ও সাধনাবহুল অমর জীবনেতিহাস স্থান পেয়েছে। এ সিরিজের সর্বশেষ অর্থাৎ পঞ্চম খণ্ডটি উপমহাদেশের আরেক কীর্তিমান পুরুষ মর্দে মু'মিন হযরত শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (র)-র জীবনী ও তাঁর খান্দানের কর্মবহুল ইতিহাস স্থান পেয়েছে। আল্লাহ্‌র রহমত এবং পাঠক মহলের দো'আ পেলে আল্লাহ চাহে তো সিরিজের এই সর্বশেষ খণ্ডটিও সত্বর পাঠকের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হব।

সিরিজের তিনটি খণ্ড হাতে পাবার পর পাঠক চতুর্থ খণ্ডটি হাতে পাবার জন্য অধীর ভাবে অপেক্ষা করতে থাকেন এবং আমাদের ওপর তাকীদের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু নানা কারণেই আমার পক্ষে সেই তাকীদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন সম্ভব হয়নি। এজন্য আমি আমার সম্মানিত পাঠকমহলের কাছে বিনীত ক্ষমাপ্রার্থী। সবচে' বেশী তাকীদ ছিল এই সিরিজের সর্বাধিক গুণগ্রাহী অধমের পীর ভাই মাওলানা আবদুর রহীম ইসলামাবাদীর। তিনি যেভাবে এজন্য প্রয়োজনীয় তাকীদ দিয়েছেন এবং সর্বশেষ যে ভাষায় আমাকে এর জন্য চাপ দিয়েছেন তা আলোচ্য সিরিজের মূল গ্রন্থকার আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহমাতুল্লাহি 'আলায়হির প্রতি তাঁর অপরিমেয় শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, সেই সাথে বর্তমান খণ্ডের কেন্দ্রীয় চরিত্র ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ আল্‌ফে-ছানী

ও মুজাদ্দিদবর্গের তেজোদ্দীপ্ত জীবনী তুলে ধরেছেন তিনি এ সব গ্রন্থে। মুসলিম জাহানে তাঁর এই সিরিজটি সর্বজনস্বীকৃত ও প্রশংসিত। বিশ্বের কয়েকটি ভাষায় এগুলোর তরজমা হয়েছে। বাংলাদেশী মুসলিম সমাজের উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক 'ইসলামী রেঁনেসার অগ্রপথিক' নামে উক্ত সিরিজের তিনটি খণ্ডের অনুবাদ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় ও বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু সুদীর্ঘ এক যুগ যাবত প্রকাশিত এ সব খণ্ডের আর কোন সংস্করণ মুদ্রিত না হওয়ায় আগ্রহী পাঠকের ঐকান্তিক অনুরোধে আল্লামা নদভী লিখিত পুস্তকাদির তরজমা ও প্রকাশের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান "মজলিস নাশরিয়াত-ই- ইসলাম"-এর সংগে আমরা যোগাযোগ করি। "মজলিস নাশরিয়াত-ই- ইসলাম" কর্তৃপক্ষ আমাদের আগ্রহে সাড়া দিয়ে শর্তসাপেক্ষে এ সিরিজগুলো প্রকাশের অনুমতি দেন। ইতিমধ্যে এ সিরিজের তিনটি খণ্ড পাঠকের হাতে পৌঁছেছে। চতুর্থ খণ্ডে ইসলামী রেনেসাঁর অগ্নিপুরুষ হিজরী দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ 'মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছানী' নামে পরিচিত মর্দে মু'মিন ও মুজাহিদ ইমামে রব্বানী শায়খ আহমদ ফারূকী (র) -এর সংগ্রাম ও সাধনাবহুল অমর ইতিহাস স্থান পেয়েছে। সিরিজের পঞ্চম খণ্ডটি উপমহাদেশের আরেক কীর্তিমান পুরুষ মর্দে মু'মিন হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র)-এর জীবনী ও খান্দানের কর্মবহুল ইতিহাস স্থান পেয়েছে। অতি সত্ত্বর পঞ্চম খণ্ডটিও পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারব ইন্‌শাআল্লাহ্।

এক্ষণে যেই আগ্রহী পাঠকের স্বার্থে আমরা এই দুরুহ কাজে হাত দিয়েছি তাদের প্রয়োজন পূরণে এ প্রয়াস সফল হলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। আল্লাহ্ পাক আমাদের এ প্রয়াস নাযাতের ওসীলা বানান এবং এ প্রয়াস কবুল করুন এটাই আমাদের মুনাজাত।

—প্রকাশক

প্রকাশকের কথা

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন জীবন-দর্শন। অবস্থা, পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশের প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার সুন্দর ও নিখুঁৎ সমাধান রয়েছে ইসলামে। জীবন প্রবাহের স্রোতধারায় ইসলামের অনুশাসনমালা এক কালজয়ী আদর্শরূপে স্বীকৃত। অভ্যুদয়ের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বহু মনীষী ও আল্লাহ্ওয়ালা এর প্রচার ও সংরক্ষণে দিয়েছেন সীমাহীন কুরবানী। আমরা তাঁদের জীবনের কতটুকুই বা জানি?

আমরা সমাজের মূল স্রোতধারার সংস্কারক শক্তির কথা বেমালুম ভুলে যাই। যে সব মানব হিতৈষীবর্গ তাঁদের প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে সমাজের হিত সাধন করে গেছেন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে দান করেছেন এক সুষ্ঠু অবকাঠামো, মানবতার উত্তরণ ঘটিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও পারস্পরিক সম্প্রীতির ডোরে আবদ্ধ করেছেন মানব সমাজকে– তাঁরা রয়েছেন ইতিহাসের পাতায় অনুল্লেখ্য। পক্ষান্তরে ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো ভরে আছে রাজ-রাজড়াদের কাহিনীতে।

আজ মানুষ সচেতন হয়েছে অনেকটা। রাজ-দণ্ডমুণ্ডের অধিকারীরা আজ দিশেহারা। জ্ঞানরাজ্যে বিচরণকারীদের সংস্পর্শে এসে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চায়। যুগধর্ম ও পরিবেশের এই জরুরী মুহূর্তে সংস্কারক ব্যক্তিত্বসমূহকে স্থায়ী আসনে সমাসীন করার জন্য যে সব মনীষী ও চিন্তাবিদ তাঁদের ক্ষুরধার লেখনী নিয়ে কলমী জিহাদের বিস্তীর্ণ ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন, উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক ও লেখক আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

লাখনৌ-এর 'জামা'আতে দা'ওয়াত-ই-ইসলাহ ও তাবলীগ' যুগ-জিজ্ঞাসার প্রেক্ষাপটে সপ্তাহব্যাপী এক সেমিনারের আয়োজন করেছিল ১৩৭২ হিজরীর মুহাররম মাসে। এর আলোচ্য বিষয়ের শিরোনাম ছিল, "সংস্কার ও পুনর্জাগরণের ইতিহাস এবং উক্ত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।" জনাব আল্লামা নদভী উক্ত বিষয়ের ওপর নিবন্ধ পেশ করে এক নতুন ধারায় লেখনী পরিচালনার প্রেরণা লাভ করেন। এরপর আল্লাহ্‌র রহমত ও প্রাণান্তকর সাধনাকে সম্বল করে 'তারীখে দা'ওয়াত ও 'আযীমত' নামে সিরিজ পুস্তক প্রণয়নে হাত দেন এবং হযরত ওমর ইবনে 'আবদুল 'আযীয (র) থেকে তিনি এর সিলসিলা আরম্ভ করেন। এ পর্যায়ে তিনি পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেন। মুসলিম জাহানের স্বনামধন্য 'আলিম, মর্দে মু'মিন

শায়খ আহমদ সরহিন্দী (র)-র প্রতি গভীর অনুরাগ ও আকর্ষণের প্রমাণ বহন করে। অধম এজন্য তাঁর কাছে অন্তহীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে এবং এই নেককাজের জন্য পরম করুণাময়ের দরবারে যদি অধমের কিছু মাত্র আজর ও ছওয়াব প্রাপ্য হয়ে থাকে তবে তাঁকেও আমি এতে শরীক করতে চাই।

বর্তমান খণ্ডটি সর্বপ্রথম অনুবাদকের হাতে আসে আমার মুহতারাম শায়খ ও রূহানী মুরব্বী 'আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)-র প্রথম বাংলাদেশ সফরকালে। ১৯৮৪ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে তিনি এটি আমাকে ও মাওলানা মুহীউদ্দীন খান সাহেবকে হাদিয়া করেন। গ্রন্থের ইনার পৃষ্ঠায় হযরতের স্বহস্ত লিখিত স্বাক্ষর আজও বর্তমান। এরপর হযরত (র)-এর অনেকগুলো বই অনুবাদক কর্তৃক অনূদিত হয়ে বেরিয়ে আসে এবং সেগুলো পাঠক মহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। বর্তমান খণ্ডের তরজমার কাজে আমি হাত দিয়েছিলাম অনেক আগেই এবং একটা উল্লেখযোগ্য অংশের তরজমা করেছিলাম আমার শায়খ-এর মুবারক খেদমত ও সুহবতে থেকে পবিত্র মাহে রমযানে দাইরায়ে শাহ 'আলামুল্লাহ্য়। তারপরও এর বিলম্বের পেছনে দায়ী অন্য কতকগুলো কারণের সঙ্গে গ্রন্থের ৫ম ও ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদের তরজমায় পারিভাষিক ও বিষয়বস্তুর জটিলতা। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব এই জটিলতা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করেছি। এরপর ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদের ২২০ পৃষ্ঠার "মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছানীর অবদান" শীর্ষক সাবহেডিং থেকে ২২৮ নং পৃষ্ঠার ১ম প্যারা পর্যন্ত তরজমার ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হই। এজন্য আমাকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। অবশেষে হযরত হাফেজ্জী হুযূর (র)-এর কনিষ্ঠতম খলীফাবেফাকুল মাদারিসের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন মাওলানা ইসমাঈল সাহেবের (দা.বা.) দ্বারস্থ হই। তিনি এই জটিল সমস্যা সমাধানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে যেভাবে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন তার তুলনা নেই। আল্লাহ্ পাক তাঁর নেক হায়াত বৃদ্ধি করুন এবং তাঁর মুবারক সোহ্বত থেকে আমাদেরকে ফায়দা হাসিলের তৌফিক দিন। প্রিয়ভাজন মাওলানা আবদুর রায্যাক নদভীর প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল যিনি মূল লেখকের ভূমিকা অংশটুকু তরজমা করে আমাকে অনুগ্রহ করেছেন।

পরিশেষে পাঠক সমীপে বিনীত নিবেদন, বইটি ১ম সংস্করণ থেকে অনূদিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বেশ কিছু ফারসী উদ্ধৃতির তরজমা এতে দেওয়া সম্ভব হয় নি। আল্লাহ যদি তৌফীক দেন তবে দ্বিতীয় সংস্করণে এগুলোর প্রতি নজর দেওয়া হবে। বইটি মুহাম্মদ ব্রাদার্সের যিম্মাদার বন্ধুবর অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুর রউফ সাহেবের বদান্যতায় প্রকাশিত হচ্ছে। এর প্রকাশে বিভিন্ন পর্যায়ে যারা অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করেছেন তাদের জন্য দো'আ করছি। এতদসঙ্গে দোআ করছি, আল্লাহ্ পাক বই-এর মূল গ্রন্থকার আল্লামা নদভী (র) কে জান্নাতুল ফেরদাওসে স্থান দিন এবং অধমকে তাঁর স্নেহ ছায়ায় কবূল করুন। আমীন।

—অনুবাদক

লেখকের কথা

আনুমানিক ১৯৩৫-৩৬ এর কথা। আমার মুহ্তারাম মুরব্বী ও শ্রদ্ধেয় বড় ভাই ডাক্তার হাকীম মাওলানা সায়্যিদ আবদুল আলী (সাবেক নাজেম, নদওয়াতুল ওলামা) মরহুম আমাকে ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আল্ফে ছানীর মকতূবাত (পত্রাবলী) অধ্যয়ন করার পরামর্শ দেন। আমার বয়স তখন ২২/২৩ এর বেশী হবে না। সবেমাত্র নদওয়াতুল ওলামায় অধ্যাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছি। মারেফত ও হাকীকত সম্পর্কিত বিষয়াবলীর অধ্যয়ন সম্পর্কে ছিলাম সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাসাওউফ ও আধ্যাত্মিক পথের পরিভাষা সম্পর্কে ছিলাম সম্পূর্ণ অজ্ঞ, মন-মস্তিষ্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সাহিত্য (বিশেষভাবে আরবী সাহিত্য) ও ইতিহাসের রাজত্ব। মিসর ও বৈরুতের উন্নত প্রেস ঝকঝকে ছাপা গ্রন্থাবলী পাঠে ছিলাম অভ্যস্ত। আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই- (যাঁর স্নেহের আঁচলে আমি লালিত এবং তরবিয়তের কোলে বড় হয়েছিলাম) আমার এ অবস্থা সম্পর্কে খুব ওয়াকিফহাল ছিলেন। তারপরও আল্লামা ইকবালের ভাষায় ঃ

"যে ঘরের তুমি প্রদীপ, তার রুচি ও স্বভাব তোমার জানা"। কারণ কম পক্ষে তিন বছর থেকে হযরত মুজাদ্দিদ আল্ফে ছানী ও শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী (র.)-এর খান্দানের সাথে আমাদের খান্দানের চিন্তা-চেতনা ও আধ্যাত্মিকতার ধারা চলে আসছে। আমাদের ঘরে ওয়ালিদ মুহ্তারামের সংরক্ষিত গ্রন্থ ভাণ্ডারে দিল্লীর আহমদী প্রেসে ছাপা মকতূবাতের নোসখা বিদ্যমান ছিল যা তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ ছিল। ভাই সাহেবের নির্দেশে তা'লীমের লক্ষ্যে উক্ত মকতূবাত অধ্যয়নে মনোনিবেশ করি। এর মাঝে একবার আমি হিম্মত হারিয়ে ফেলি এবং কিতাব রেখে দেই। পত্রাবলীতে সমস্যা বেশি হয় যা তিনি তাঁর শায়খ হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র)-এর নামে লেখেন। এবং তিনি তাঁর অন্তরে যেসব চিন্তা-ভাবনার উন্মেষ ঘটে সে সবের বিবরণ পেশ করেন। কিন্তু ভাই সাহেবের পক্ষ থেকে বার বার তাকীদ ও নির্দেশ আসতে থাকে যে, আমি যেন যে কোন মূল্যে মকতূবাত (পত্রাবলী), শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র.)-এর ইযালাতুল খিফা, সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র.)-এর সীরাতে মুস্তাকীম এবং শাহ ইসমাঈল শহীদের মানসাবে নবুওয়াত অধ্যয়ন করে ফেলি।

অবশেষে সাহসে কোমর বেঁধে এ সাত-সাগর পাড়ি দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। অভিমান ও আত্মমর্যাদাবোধ নাড়া দিতে লাগলো যে, অত্যন্ত স্নেহশীল ভাইয়ের নির্দেশ পালন করতে পারছি না এবং এক বরকতপূর্ণ গ্রন্থের অধ্যয়ন করা

থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি, যুগ যুগ ধরে উলামা-মাশায়েখ যাকে রক্ষা-কবচ বানিয়ে রেখেছেন! এরপর আল্লাহ পাকের করুণা ও তাওফীক সঙ্গী হলো। গ্রন্থ অধ্যয়নে যতই অগ্রসর হতে লাগলাম ততই ভাল লাগতে লাগলো, নিজের সাধ্যানুপাতে গ্রন্থ হৃদয় স্পর্শ করতে লাগলো, ধীরে ধীরে এ গ্রন্থের আঁচলে আবদ্ধ হয়ে গেলাম। ফলে এর অধ্যয়নে এত বেশী স্বাদ ও তৃপ্তি অনুভব করতে লাগলাম যা কোন নামি-দামী সাহিত্য কর্মে মেলা দুষ্কর। যুগটি আমার জীবনের জন্য নাযুক ও টার্নিং পয়েন্ট ছিল। কঠিন মানসিক সংঘাত ও বড় ধরনের পরীক্ষা চলছে। এমন জটিল মুহূর্তে এ মকতূবাত পূর্ণাঙ্গ পথ প্রদর্শনের ভূমিকা রাখে। খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারছিলাম যে, আমার অন্তর প্রশান্তি ও তৃপ্তিতে কানায় কানায় পূর্ণ বরং নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছি। যতটুকু মনে পড়ে, এমন প্রশান্তি ইতিপূর্বে আর কখনও অনুভব করিনি। এ (অধ্যয়ন) সফর সৌভাগ্যক্রমে নিতান্ত আনুগত্যের মধ্য দিয়ে শুরু হয় যেখানে (বড় ভাই-এর) নির্দেশ পালন ও আত্মমর্যাদাবোধের জযবা ক্রিয়াশীল ছিল, কিন্তু তা অত্যন্ত আনন্দ ও তৃপ্তির সাথে সমাপ্ত হয়।

এর কিছুদিন পর এ লক্ষ্যে দ্বিতীয়বার মকতূবাত অধ্যয়ন আরম্ভ করি যে, এতে বিক্ষিপ্ত ও বার বার আলোচিত বিষয়গুলোকে ভিন্ন ভিন্ন শিরনামের অধীনে একত্রিত করা যায় কিনা। এ জন্য কিতাবের বিষয়বস্তুর একটি ইনডেক্স তৈরি করে কাজ আরম্ভ করি। উদাহরণস্বরূপ নির্ভেজাল তাওহীদের ও শিরকের কথা কোথায় কোথায় আলোচিত হয়েছে। মকতূবাতের নম্বরের উদ্ধৃতিসহ পৃষ্ঠাসমূহ এক স্থানে নোট করে নিই। নবুওয়াত রিসালাত-এর আলোচনা কোথায় কোথায় এসেছে, সুন্নত ও বিদআত সম্পর্কে কোন মকতূবাতে আলোকপাত করা হয়েছে এবং এ আলোচনা কত স্থানে হয়েছে যে, বিদ'আতে হাসানার কোন অস্তিত্ব কোথাও নেই, ওয়াহদাতুল ওজূদ ও ওয়াহদাতুশ শুহূদ সম্পর্কে কোন কোন মকতূবাতে আলোচনা করা হয়েছে, নিরেট বুদ্ধিবৃত্তিক ও নির্ভেজাল কাশ্‌ফ সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনা কোথায় হয়েছে। যা হোক এক সপ্তাহ মেহনতের পর এ সূচী ও তালিকা প্রস্তুতের পর্ব শেষ প্রান্তে এসে যায় এবং এ তালিকা মকতূবাতের ভেতরই রেখে দেই যে, এর সাহায্যে মকতূবাতের ভিন্ন ভিন্ন বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলো পৃথক পৃথক শিরনামের অধীনে একত্র করা সম্ভব হবে। কিন্তু কে যেন এ মকতূবাত পাঠ করার জন্য নিয়ে আর ফেরত আনেনি। মকতূবাতের নোসখার (যার বিকল্প পাওয়া তো সম্ভব ছিল বিধায় এত আফসোস হয়নি, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রমের পর যে সূচীটি তৈরি করা হয়েছিল তার (যার বিকল্প পাওয়া সম্ভব ছিল না) জন্য খুব আফসোস হয়। যা হোক আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্তই বলবত হয়।

বছর কয়েক পর আনুমানিক ৪৫-৪৬ এর কথা হবে, মকতূবাতকে বিষয় ভিত্তিক সংকলন ও বিন্যাস করার পরিকল্পনা মনে আসে। লক্ষ্য মকতূবাতকে

নববিন্যাসে পরিচয়সহ উপস্থাপন করা যদ্দারা নতুন প্রজন্ম ও আধুনিক চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতার শিক্ষিত যুবকরা উপকৃত হতে পারে এবং তাদের মধ্যে মকতূবাত পাঠে আগ্রহ জন্মে এবং এর মাধ্যমে মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছানী (র)-এর সংস্কার কর্মের বিশাল অবদান ও তাঁর প্রকৃত মর্যাদা ফুঁটে ওঠে। তাই এই গুরুত্বের ভিত্তিতে কাজ শুরু করা যে, প্রথমে নির্বাচিত মকতূবাতসমূহের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকার অবতারণা করা যাতে সংক্ষেপে এ সবের কেন্দ্রীয় চিন্তা ও মূল কথা এসে যায় যা একই শিরনামের অধীনে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং সমগ্র মকতূবাতে বিক্ষিপ্ত আকারে ছড়িয়ে আছে। অতঃপর অর্থের ধারা অনুযায়ী মকতূবাতের নির্বাচিত অংশসমূহ পেশ করা, একদিকে ফারসী (মূল) মকতূবাত, অপর দিকে তার উর্দূ তরজমা। অতঃপর টিকার মাধ্যমে কঠিন শব্দ বিশ্লেষণ এবং মকতূবাতে বর্ণিত হাদীসসমূহের রেফারেন্স ও উৎস গ্রন্থের উল্লেখ করা। এরপর মুসলিম উম্মাহর নির্ভরযোগ্য মান্যবর উলামা ও বিজ্ঞ-ইসলামী স্কলারদের সমর্থনমূলক বক্তব্য পেশ করা। মোটকথা, সবকিছু মিলে এ কাজের পরিধি ছিল বিরাট বিস্তীর্ণ। আর এ কাজে এত অধিক দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন ছিল যে, আমার মত একজন অল্প বয়স্ক যুবকের পক্ষে তাবলীগ, অধ্যাপনা ও লেখনীর তিন গলিতেই বিচরণ যার আঞ্জাম দেয়া ছিল একটি দুরূহ কাজ। ফল এই দাঁড়াল, তাওহীদ-রিসালাত ও নবুওয়াতের মনযিল পর্যন্ত পৌঁছার পর বিভিন্নমুখী কাজের ঝামেলা এত বেড়ে যায় যে, আর এ কাজটি করার অবকাশ দেয়নি। কিন্তু যতটুকু কাজ হয়েছিল, তাও ছিল অত্যন্ত মূল্যবান ও উপকারী। বন্ধুবর মাওলানা মনযুর নু'মানী তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা "আল-ফুরকানে ৬৬-৬৭ হিঃ মুতাবিক ৪৭-৪৮ ইংরেজীতে চার কিস্তিতে তা প্রকাশ করেন। এই ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ার কয়েক বছর পর যখন তারীখে দাওয়াত ও আযীমত (সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস) সিরিজের কাজ আরম্ভ করি তখন মকতূবাতের নতুন বিন্যাস ও খেদমতের পরিবর্তে অন্তরে মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর স্বতন্ত্র জীবনী লেখার আগ্রহ জন্মে। তারীখে দাওয়াত ও আযীমতের তৃতীয় খণ্ড অষ্টম শতাব্দীর ভারতবর্ষের দুই মহান্ আধ্যাত্মিক পথ-প্রদর্শক ও ওলীকুল শিরমণি হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রহ.) ও মাখদূমুল মুলক হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রী (রহ.) জীবনী ও পরিচিত সম্বলিত ছিল, আত্মপ্রকাশ করে। এরপর মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছানী (রহ.)-এর জীবনী লেখা জরুরী হয়ে যায় যদ্দারা উক্ত সিরিজের চতুর্থ খণ্ড শোভামণ্ডিত হবে। বিভিন্ন কারণে মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর ইনকিলাবী যুগ এবং সমস্যা ও সংকট পরিপূর্ণ মুহূর্তের অবস্থা সম্মুখে আসা প্রয়োজন এবং বর্তমান সময়ে হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর কর্মপন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা এবং জনসম্মুখে তা তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। কারণ, আজকাল যে কোন

দীনী কাজের সূচনা ক্ষণেই রাষ্ট্রীয় শক্তি ও ক্ষমতাকে নিজের প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করে নেওয়া হয়, যা অন্য যুগে দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই আমাদের সবার জানা দরকার যে, মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর সেই কর্মপন্থা কী ছিল যদ্দ্বারা সহায়-সম্বলহীন এক ফকীর এক নিভৃত খানকায় বসে দেশ ও সালতানাত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার গতিধারা বদলিয়ে দিতে সক্ষম হন। সর্বপ্রথম আমার সম্মানিত বড় ভাই সাহেবের মজলিসী আলোচনায় এ বাস্তবতা উপলব্ধি হয়। অতঃপর হযরত মানাজির আহ্সান গিলানী (রহ.)-এর এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ-পাঠে এ বিষয়ে অবহিত হই যা তিনি মাসিক আল-ফুরকানের মুজাদ্দিদ সংখ্যার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। আমি নিজেও বহুবার আমার আরবী বক্তৃতায় এই বাস্তবতা সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় আলোকপাত করি। এতে করে মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর কর্মপন্থা সম্পর্কে আমার বিশ্বাস ও তৃপ্তি বৃদ্ধি পেতে থাকলো। কিন্তু যখন পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র জীবনী রচনার চিন্তা করলাম, তখন দু'টি বিষয় এ পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ালো, প্রথম বিষয়টি হলো, মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর জীবনী লিখতে গেলে ওয়াহদাতুল ওহূদ ও ওয়াহদাতুশ শুহূদ এর দর্শন ও মতবাদের আলোচনা-পর্যালোচনা ও এর ব্যাখ্যা এবং এর ওপর দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনা ও সমালোচনা। অতঃপর দ্বিতীয়টিকে প্রাধান্য দান এবং এই মতবাদের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা ছাড়া সম্মুখে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু যখন এর বিশালতার কথা অন্তরে আসে তখন হিম্মতহারা হয়ে পড়ি একথা ভেবে যে, এ বিষয়ে এত বিশালকায় লাইব্রেরী প্রস্তুত হয়ে গেছে যার সার-সংক্ষেপ ও নির্বাচিত অংশ পেশ করাও ছিল জটিল ও দুরূহ কাজ।

দ্বিতীয়ত, সেই সব সূক্ষ্ম দার্শনিক আলোচনা ও ভূমিকা, পরিভাষা সমূহে বুঝা ছাড়া এ বিষয়ে কলম ধরা ছিল অসম্ভব। সবকথার পর এই বিষয়টি ছিল আমলী তথা ব্যবহারিক এবং আধ্যাত্মিক রুচি ও নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ওপর প্রতিষ্ঠিত– লেখক যে পথে চলেনি। সেই সাথে বিরাট সংখ্যক পাঠক শুধু এ বিষয়ে অজ্ঞই নয় যার সাথে সম্পর্ক রাখতেও অপ্রস্তুত। ফলে বুঝতে পারছিলাম না যে, এ সাগর কীভাবে পাড়ি দেওয়া সম্ভব হবে? আর যদি জীবনীগ্রন্থে, এই বিষয়ে আলোকপাত না করা হয় (অনেকের ধারণা মতে হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর আসল ময়দান ও তাঁর রেঁনেসা কর্মের রহস্য এখানেই নিহিত) তাহলে তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত রচনা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? দ্বিতীয় যে বিষয়টি লেখকের কলমের গতি রোধ করে ফেলে এবং সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তাহলো এই যে, এ বিষয়ে অর্থাৎ মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছানী (র)-এর ওপর এত বেশী লেখা-লেখি হয়েছে যে, লেখকের জন্য এত নতুন কিছু সংযোজন করা ও নতুন গ্রন্থ রচনা করার বৈধতার যৌক্তিকতা প্রমাণ করা ছিল দুঃসাধ্য। অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে এই সব সমস্যার সমাধান ।

এইভাবে চিন্তা করা হলো যে, مالايدرك كله يترك كله "অর্থাৎ সম্পূর্ণ অর্জন সম্ভব না হলেও আংশিক অর্জন পরিত্যাগ ঠিক নয়" এ নীতির ভিত্তিতে বিষয়টি শায়খ আকবরের বিদ্যাঙ্গনের কোন নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত ও নির্ভরশীল ব্যাখ্যাতা এবং স্বয়ং মকতূবাতের সাহায্যে পাঠকের সামনে এমনভাবে পেশ করা যায়, যদ্দারা এ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তারা ধারণা পেতে ও জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হন। কিন্তু যাঁদের সাহস ও আগ্রহ আছে তাঁরা বরাতগ্রন্থ ও মৌলিক উৎসের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে পারেন অথবা এ বিষয়ে বিশেষ পণ্ডিত ও অভিজ্ঞ নাবিকদের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারেন যারা এই বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও রুচির অধিকারী। আর এদের সংখ্যা খুবই কম।

আর দ্বিতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে আল্লামা ইকবাল (র.)-এর কবিতা আমাকে পথ প্রদর্শন করে এবং লেখকের সীমাবদ্ধ লেখালেখির অভিজ্ঞতাও তার সমর্থন করে ও সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করে ।

گاں مبرکہ بپایاں رسیدکارمغاں ۔ هزارباده ناطورده دررگ تاکراست ۔

অর্থাৎ হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) সম্পর্কে হাজার কাজ হবার পরও আজও অনেক কিছুই অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে এবং অনেক কিছুই লেখা সম্ভব।

এরপর ভাষা-রীতি, প্রশ্ন ও অবস্থাদি, মান ও মূল্যায়ন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বুঝানোর ধরন ও প্রকৃতি পরিবর্তনের কারণে অনেক সময় রচিত গ্রন্থের অবস্থা এমন হয় যে, মনে হয় যেন অন্য কোন ভাষায় এটি লেখা হয়েছে এবং এখন এর অনুবাদ প্রয়োজন। এরপর ভূমিকা ও ঘটনাবলী থেকে ফলাফল বের করা এবং কারণ ও ফলাফলের মাঝে সম্পর্ক তৈরি করা। বর্তমান যুগের অবস্থার ওপর উপযোগী করার পদ্ধতিও সব লেখকের ভিন্ন হয়ে থাকে। লেখকের অন্তর সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, যদি এ কাজ নিষ্ঠা ও মেহনতের সাথে করা হয় তাহলে গ্রন্থটি শুধু উপকারীই হবে না বরং হিজরী চৌদ্দ শতকের শেষ প্রান্তে এবং পনের শতকের জন্য (যা গ্রন্থ প্রকাশের অব্যহতি পরেই আরম্ভ হতে যাচ্ছে) একটি মূল্যায়নযোগ্য ও সঞ্জীবনী শক্তিসম্পন্ন পয়গাম হবে এবং আল্লাহ পাকের একজন নিষ্ঠাবান ও প্রিয় বান্দার এমন কর্মপ্রচেষ্টার রোয়েদাদ তৈরি হয়ে যাবে যে কর্ম তিনি অত্যন্ত নিরবে এবং বিনয় ও নম্রতার সাথে আঞ্জাম দেন, অথচ তার প্রভাব এক সহস্রাব্দ অতিক্রম করে দ্বিতীয় সহস্রাব্দে (আলফেছানী) বিস্তার লাভ করেছিল। আমাদের এ যুগের জন্যও (যার যমীন ও আসমান বাহ্যত বদলে গেছে) রয়েছে যার উপদেশ ও নসীহত।

অধম লেখকের কলব ও কলম উভয় আল্লাহ পাকের দরবারে সিজদাবনত এবং কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসায় সিক্ত যে, আঠারো বছরের সুদীর্ঘ বিরতির পর আবার তারীখে

দাওয়াত ও আযীমতের চতুর্থ খণ্ড লেখার তাওফীকপ্রাপ্ত হচ্ছি। এ বিরতি এত দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল যে, লেখক আশংকা বোধ করছিল যে, না জানি মৃত্যুর পয়গাম এসে যায় এবং এ গুরুত্বপূর্ণ সিলসিলা (সিরিজ লেখকের গ্রন্থাবলীর মধ্যে আল্লাহ যাকে বিশেষ জনপ্রিয়তা দান করেছেন) অসম্পূর্ণ থেকে যায়। চতুর্থ খণ্ড যেহেতু এমন এক মহান সংস্কারকের জীবনী সম্বলিত যার দীনী সংস্কার-কর্ম একদিকে এমন খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যা দাওয়াত ও সংস্কারের ইতিহাসের কারো ভাগ্যে লিখিত হয়নি যে, মুজাদ্দিদে আল্ফে ছানী (দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক) তাঁর নামের স্থলাভিষিক্ত হয়ে গিয়েছে। অনেক শিক্ষিত লোকও তাঁর নামের চেয়ে তারা লকবের (উপনাম) সাথে পরিচিত বেশি। অপর দিকে তাঁর সংস্কার কর্ম-প্রচেষ্টা এমন সফলতা অর্জন করেছে এবং যার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য এমন অনন্য ফলাফল প্রকাশিত হয় যে, রেঁনেসা ও সংস্কার প্রচেষ্টা এবং ইসলামী দাওয়াতের ইতিহাসে উদাহরণ মেলা ভার। ফলে নিজের অন্তরেই এ সিরিজ শেষ করার এক অদম্য আকর্ষণ ছিল এবং এআথে সিরিজের ভক্ত পাঠকদের বছরের পর বছরের দাবি ও পীড়া-পীড়িও ছিল যে, যে কোন মূল্যে এই কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করে ফেলা হোক, বরং অনেক দূরদর্শী ও রুচিশীল ঘনিষ্ঠ জন ও বুযুগের্র এ দাবীও ছিল যে, বর্তমান সমস্ত লেখা ও অন্যান্য কাজ স্থগিত রেখে যেন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এ সিরিজের কাজটি আগে শেষ করে ফেলি।

কিন্তু এ কাজটি যত সহজ মনে করা হচ্ছিল তত সহজ ছিল না। কারণ আধুনিক যুগের দাবী, আধুনিক, মন-মস্তিষ্ক ও গবেষণার আধুনিক মানদণ্ড অনুযায়ী এতটুকু যথেষ্ট ছিল না যে, মুজাদ্দিদের ওপর লিখিত জীবনী গ্রন্থ ও ইতিহাসের বিদ্যমান উপকরণ ও উপাত্ত একটু মামুলী নির্বাচন ও পরিমার্জন সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করলেই কাজ হয়ে যাবে। মুজাদ্দিদ সাহেব যে যুগে ও পরিবেশে স্বীয় রেঁনেসা কর্ম আঞ্জাম দিয়ে ছিলেন তার ওপর তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, চিন্তাগত ও রাজনৈতিক, নৈতিক ও সামাজিক, আকিদাগত ও কালাম শাস্ত্রীয় পদ্ধতির সমালোচনামূলক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা পেশ করা জরুরী। সে সময় কোন আন্দোলন কর্মতৎপর ছিল, হিন্দুস্থান ও তার প্রতিবেশী দেশগুলোতে কোন ধরনের মানসিক ও ধর্মীয় অস্থিরতা বিদ্যমান ছিল, ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী মহলে বিদ্রোহের কি কি প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল, কি ষড়যন্ত্রের প্রস্তুতি চলছিল ইসলামের ইতিহাসে এক সহস্রাব্দীর পূর্ণ হবার কাছাকাছি এ মুহূর্তটাতে, উৎসাহদীপ্ত ভাগ্য পরীক্ষাকামীদের অন্তরে কি কি ধরনের আশা-আকাংখার প্রদীপ প্রজ্জলিত করে দিয়েছিলো এবং সন্দেহবাদী অস্থির অন্তরে কি কি সন্দেহ সৃষ্টি করেছিল। এক দিকে দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান, অন্যদিকে প্লেটোনিক ও বাতেনী মতবাদ নবুওয়াত ও রিসালাতের মহত্ত্ব ও মর্যাদাকে খাটো

করার এবং রিয়াযতও, মুজাহাদা ও আত্মহননকে মারেফতে ইলাহী ও আল্লাহ্ প্রাপ্তি, মুক্তি ও দর্জা বুলন্দীর জন্য যথেষ্ট মনে করার মতো কেমন ফেতনা সৃষ্টি করা হয়েছিল, ওয়াহ্দাতুল ওজূদের মত চরমপন্থী আকীদা কিভাবে স্বাধীন ও বাধাঁ বন্ধনহীন বরং ধর্মদ্রোহিতা ও আল্লাহ্দ্রোহিতার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল?

সুন্নত ও শরীয়তের গুরুত্ব শুধু স্বল্প সংখ্যক প্রাজ্ঞ উলামায়ে কিরাম ও হাদীসের ব্যাখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিদআত খোলাখুলি ভাবে এবং কোন কোন সময় 'বিদআতে হাসানা'র নামে ও লেবাসে গোটা সমাজ এবং মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবনকে "গ্রাস করে ফেলেছিল। কেউ এ বিদআতে হাসানার বিরুদ্ধে আওয়াজ বুলন্দ করতে সাহস পাচ্ছিল না। সবচে' বড় বিষয় এই ছিল যে, মুসলিম বিশ্বের সবচে' ২য় বৃহত্তম সাম্রাজ্য এবং এখানে বসবাসরত বিস্তৃত মুসলিম সমাজের গতি কতকগুলো নিজস্ব রুচি ও প্রবণতা, ব্যক্তি স্বার্থ, বাইরের প্রভাব ও মনগড়া রাজনৈতিক স্বার্থ-সুবিধার ফলে দীনে হিজাযীর সাথে সম্পৃক্ততা, নবুওতে মুহাম্মাদীর আনুগত্য, ইসলামী তাহযীবের প্রতিনিধিত্ব করা থেকে বিচ্যুত হয়ে ভারতীয় দর্শন ও হিন্দুস্তানী সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ভারতীয় ধর্মের দিকে ফেরানো হচ্ছিল। এ ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে সফল করার জন্য সে যুগের কিছু প্রখর মেধাবী ও যোগ্যতর ব্যক্তি শামিল ছিল এবং "নুতন যুগ নুতন আইন, নুতন সহস্রাব্দ ও নতুন নেতৃত্বের" স্লোগান উচ্চারিত হচ্ছিল।

এ অবস্থা কিভাবে পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছে, এর জন্য কি কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়েছে, এতে কি পরিমাণ সফলতা অর্জিত হয়েছে, অতঃপর এক নিভৃত কোণে বসে কিভাবে তিনি মানুষকে আকষর্ণ করেন ও মানুষ গঠন ও আধ্যাত্তিক সংশোধন ও প্রশিক্ষণের এমন কাজ আঞ্জাম দেন যার ফলে এমন সব কর্মবীর তৈরি হয় যারা হিন্দুস্তানের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বসে, এরপর আফগানিস্তান তুর্কিস্তান, অতঃপর শাম, ইরাক, তুর্কী ও হেজায অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহ্র হুকুমাত কায়েমের জোর আন্দোলন, আল্লাহ্র বাণী (কালিমাতুল্লাহ) বুলন্দ করার প্রচেষ্টা, মুর্দা সুন্নাত যিন্দাহ, শরীয়তের সাহায্য এবং বিদআত প্রতিহত করার আজিমুশ্বান কাজ সম্পাদন করেন, ওয়াহ্দাতুল ওজুদ-এর চরমপন্থী প্রবক্তা ও বল্গাহীন সুফীদের প্রভাব মুক্ত করেছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, তিনি আল্লাহ্ অন্বেষণ, শরীয়তের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের সিংগা ফুকে দেন। কমসে কম তিন শতাব্দী পর্যন্ত এক বিশাল কাজ এমন সাহস, হিম্মত ও প্রচণ্ড ইচ্ছা শক্তির সঙ্গে ও নিবেদিত হয়ে সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যান যে, সমগ্র ইসলামী বিশ্বে তিনি দৃষ্টিগোচর হতে থাকেন এবং এ সুদীর্ঘ শতাব্দী তাঁরই রূহানী ও ইলমী নেতৃত্বের শতাব্দী বলার যোগ্য হয়। তাঁর বিশ্ব জোড়া প্রভাব দেখে বাস্তবদর্শী মানুষ এ কথা বলতে বাধ্য হন ঃ

"পৃথিবীকে আবার উজ্জীবিত করে তুললেন একজন মরদে খোদা।"

এ ধারাবাহিকতায় আরও দু'টি বিষয় লক্ষ্য করার মত ছিল। একটি ছিল এই যে, মুজাদ্দিদ (র.)-এর যুগের বাদশাহ আকবরের যুগের অবস্থা বর্ণনা করতে শুধু মুল্লা আব্দুল কাদের বদায়ূনীর মুন্তাখাবুত তাওয়ারীখ এবং সকল ঐতিহাসিক বরাত গ্রন্থের উপর সীমাবদ্ধ না থাকা যা বিশেষ দীনী আবেগ অথবা একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ বহন করে এবং আকবরী যুগের অন্ধকার থেকে অন্ধকার চিত্র পেশ করতে অভ্যস্ত, বরং সে ক্ষেত্রে ঐসব নিরপেক্ষ লেখক অথবা আকবরের রাজসভার ঐসব কলমধারীর লেখা ও বর্ণনা থেকে উপাত্ত-সংগ্রহ করা হয়েছে যারা শুধু যে আকবর বিরোধী ছিলেন না তাই নয় বরং তারা তাঁর প্রবক্তা এবং তাঁর চিন্তা ও দর্শনের প্রবক্তা, তাঁর সাম্রাজ্যের আইন ও আল্লাহ্প্রদত্ত প্রতিভার স্বীকৃতিদাতা প্রচারক ছিল। সেই সাথে সেই ধারাবাহিক পরিবর্তনের ঐতিহাসিক ও বিচক্ষণতাপূর্ণ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন যা জাহাঙ্গীরের যুগ থেকে শুরু হয়ে আলমগীরের যুগে এসে পূর্ণতা লাভ করে। এ ব্যাপারেও মুজাদ্দিদিয়া খান্দানের লেখকদের বিবরণ ও তার প্রতি অতি সুধারণা পোষণকারী ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্যের পরিবর্তে নিরপেক্ষ হিন্দুস্তানী ঐতিহাসিকদের গ্রন্থাবলী থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এ সবের আলোকে এ দাবীর প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

এ ছাড়া এরও প্রয়োজন ছিল চতুর্দশ শতাব্দী ধরে হিন্দুস্তান ও হিন্দুস্তানের বাইরে মুজাদ্দিদ (র) এক তাঁর যুগ সম্পর্কে উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় যে সব গ্রন্থা রচনা করা হয়েছে যাতে অনেক প্রসিদ্ধ ও সর্বজনস্বীকৃত অনেক বিষয়কে চ্যালেঞ্জও করা হয়েছে, অনেক নতুন নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে, বাস্তবতা ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ মনগড়া এক ভিন্ন চিত্র পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে (যা সেই সমুজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত চিত্র থেকে ভিন্ন যা আজ পর্যন্ত উপস্থাপন করা হচ্ছে) এ গ্রন্থে এ সব বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। যদিও সেসব দাবীর উল্লেখ না করেও এমনভাবে তা খণ্ডন করা দরকার যদ্দারা মুজাদ্দিদ (র.)-এর এ নতুন জীবনীগ্রন্থে তাঁর অবদানের পর্যালোচনায় অজান্তেই ঐসব গ্রন্থের উত্তর ও তাদের দাবী ও অভিযোগসমূহের খণ্ডন হয়ে যায়।

নিজের কঠিন ব্যস্ততা, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সফর ও স্বাস্থ্যগত দূর্বলতা এবং সহযোগিতাকারীর অভাব সত্ত্বেও চেষ্টা করা হয়েছে যে, তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত-এর এ খণ্ডে যা হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছানী (র)-এর খেদমত ও অবদান সম্পর্কে রচিত, এতে যেন কিছু নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ ঘটে আজও পর্যন্ত যার ওপর কোন গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়নি এবং এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানী ফলাফল, তেমন একক কর্ম ও চিন্তার আহ্বানসহ এ খণ্ডটি আত্মপ্রকাশ

করুক যদ্দ্বারা আমরা এ যুগের দাবীসমূহ পূর্ণ করতে পারি এবং সমাগত ১৫ দশ শতাব্দীকে স্বাগত জানাতে (বিভিন্ন মুসলিম জনপদ যার স্বাগতম জানিয়েছে) সহযোগিতা নিতে পারি। সবশেষে এর স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতাও জরুরী যে, মুজাদ্দিদ খান্দানের শাখাসমূহের এবং মুজাদ্দদী সিলসিলার বড় বড় মাশায়েখ সম্পর্কে সম্মানীয় হযরত মাওলানা আবুল হাসান যায়দ ফারূকী মুজাদ্দিদী সাহেব (প্রিয় পুত্র হযরত শাহ আবুল খায়ের মুজাদ্দেদী)-এর কাছ থেকে এমন সব মূল্যবান তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়েছে যা বাহ্যত অন্য কোন মাধ্যমে সংগ্রহ করা দুষ্কর ছিল। অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন প্রফেসর খালিক আহমাদ নিজামী কৃতজ্ঞতার হকদার যিনি অত্যন্ত উদার চিত্তে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ ভাণ্ডার থেকে কিছু প্রয়োজনীয় পাণ্ডুলিপি ও উপকারী তথ্য প্রদান করে এ থেকে উপকৃত হবার সুযোগ দানে ধন্য করেন। গ্রন্থকার ড. নাজির আহমাদ (আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি)- এর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

২৬ জুমাদাল-উলা ১৪০০ হি.

আবুল হাসান আলী নদভী

১৩ এপ্রিল ১৯৮০ খ্রি.

দাইরায়ে শাহ আলামুল্লাহ

রায়বেরেলী

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছানী (র)
হিজরী দশম শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়
আকবরের শাসনামল এবং তাঁর পরস্পর বিরোধী শাসনকাল

তৃতীয় অধ্যায়

হযরত মুজাদ্দিদ আলফ-ই ছানী (র.)

জীবন কাহিনী ঃ জন্ম থেকে খিলাফত প্রাপ্তি পর্যন্ত

চতুর্থ অধ্যায়

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী, অবস্থা, হেদায়েত, তা'লীম ও তরবিয়তী তৎপরতা এবং ওফাত

পঞ্চম অধ্যায়

হযরত মুজাদ্দিদ-এর সংস্কার ও পুর্নজাগরণমূলক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু

ষষ্ঠ অধ্যায়

ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজূদ অথবা ওয়াহ্‌দাতু'শ-শুহূদ

সপ্তম অধ্যায়
সম্রাট আকবর থেকে সম্রাট জাহাঙ্গীর পর্যন্ত

অষ্টম অধ্যায়

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর দু'জন বড় খলীফা এবং তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কিতদের মাধ্যমে তাঁর তাজদীদি কর্মের বিস্তৃতি ও পূর্ণতা সাধন

প্রথম অধ্যায়

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)

হিজরী দশম শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্ব

দশম শতাব্দীর ঐতিহাসিক অধ্যয়নের গুরুত্ব

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র জন্ম হয় হি. ৯৭১ সালের শাওয়াল মাসে আর তিনি ইনতিকাল করেন হি. ১০৩৪ সালের সফর মাসে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁর যুগ হি. দশম শতাব্দীর শেষ ২৯ বছর এবং একাদশ শতাব্দীর প্রায় ৩৩ বছর জুড়ে বিস্তৃত। সে হিসাবে তাঁর যুগের ঐতিহাসিক এবং তাঁর জীবনী লেখককে মূলত এই ৬৩ বছরের মুদ্দতকেই ধর্তব্যের মধ্যে আনতে হবে যা হিজরী বর্ষপঞ্জীর এই দুই শতাব্দীর শেষ এবং প্রথম এক-তৃতীয়াংশের সঙ্গে সম্পর্কিত।

কিন্তু মূলত কারো জন্মের দ্বারা, তা তিনি যত বড় মহা মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বই হোন না কেন-হঠাৎ করেই এমন কোন নতুন যুগের সূচনা হয়ে যায় না যিনি আচানক কোন অদৃশ্য লোক থেকে এই দৃশ্যমান জগতে এসে হাযির হন এবং এর উপর ঐ সব ঘটনা ও দুর্ঘটনা, সেই সব ঐতিহাসিক কার্যকারণ, সেই সব রাজনৈতিক ও জ্ঞানগত পটভূমি এবং সেই সব সাম্রাজ্য ও শক্তির প্রভাব না থাকে যা তাঁর জন্মের আগে থেকেই কার্যকর এবং পরিবেশ ও সমাজ জীবনের উপর প্রভাবশীল হচ্ছিল। এ জন্য আমাদেরকে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সীরাত তথা জীবন-চরিত ও জীবন-কাহিনীর বিন্যাস এবং তাঁর সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক কর্মকাণ্ডের আলোচনা, তাঁর যুগের মেযাজ উপলব্ধি এবং তাঁর কর্ম তথা মিশনের বাধা-প্রতিবন্ধকতা ও সহজসাধ্যতার সঠিক পরিমাপ ও পারস্পরিক তুলনা করবার জন্য তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক তথা চারিত্রিক দিক থেকে ঐতিহাসিক পর্যালোচনার প্রয়োজন পড়বে যদ্দ্বারা তাঁকে চেতনা ও জ্ঞান উন্মেষের সাথেই সম্মুখীন হতে হয় এবং যার ভেতরে তাঁকে সেই বিপ্লবাত্মক ও গৌরবোজ্জ্বল পুনর্জাগরণ ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড আনজাম দিতে

হয় যদ্দরুন তাঁকে অনায়াসে ও নির্দ্বিধায় "মুজাদ্দিদ-এ আলফে ছানী" (হিজরী দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক) বলা হয়।

এই পর্যালোচনায় আমাদেরকে এই ঐতিহাসিক সত্য ও বাস্তবতাকেও সামনে রাখতে হবে যে, একটি যুগ এবং সেই যুগের বিশ্ব ও মানব সমাজ একটি প্রবহমান নদীর ন্যায় যার প্রতিটি ঢেউ ও প্রতিটি তরঙ্গ আরেকটি ঢেউ ও তরঙ্গের সাথে সংযুক্ত ও সম্পর্কিত হয়ে থাকে। এজন্য দুনিয়ার কোন দেশ-তা সেই দেশ ও সেই রাষ্ট্র অবশিষ্ট পৃথিবী থেকে যতই বিচ্ছিন্নই হোক না কেন এবং যত পরস্পর সম্পর্কহীন জীবন যাপনই করুক না কেন, পার্শ্ববর্তী দুনিয়ার সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী, বিপ্লব, পরস্পর যুধ্যমান শক্তিসমূহ এবং শক্তিশালী আন্দোলন থেকে একেবারে সম্পর্কহীন ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়া শূন্য থাকতে পারে না, বিশেষত যখন এসব ঘটনা ও বিপ্লব তার সমপ্রকৃতি, সমমতাবলম্বী ও সমবিশ্বাসী প্রতিবেশী দেশসমূহে সংঘটিত হচ্ছে। এরই ভিত্তিতে এই ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় কেবল ভারতবর্ষের চৌহদ্দীতে সীমাবদ্ধ থাকা ঠিক হবে না। আমাদেরকে হিজরী দশম শতাব্দীর গোটা মুসলিম বিশ্ব এবং বিশেষ করে চারপাশের মুসলিম দেশগুলোর উপরও দৃষ্টি ক্ষেপণ করতে হবে যে সব দেশের সাথে যদিও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু ধর্মীয়, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত সম্পর্ক ছিল এবং সেখানে যে শীতার্ত ও উষ্ণ হাওয়া প্রবাহিত হত তার মৃদু হিল্লোল বহু দূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষ পর্যন্ত পৌঁছে যেত।

রাজনৈতিক অবস্থা

হিজরী দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে (সম্ভবত ৫৮৯ হিজরীতে সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যুবীর ইনতিকালের পর) বহুকাল পর মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রীয় অংশ (মধ্যপ্রাচ্য) রাজনৈতিক দৃঢ়তা ও সংহতি লাভ করেছিল এবং পশ্চিম এশিয়ার আরব দেশসমূহ এমন একটি পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল, যে পতাকা ঊর্ধ্বে উত্তোলনকারী নিজেকে ইসলামের মদদগার, পবিত্র মক্কা ও মদীনা ভূমির খাদেম এবং মুসলমানদের রক্ষক হিসেবে অভিহিত করতেন এবং যিনি (চাই কি নিজ রাজনৈতিক মুসলিহাতের কারণেই হোক) খিলাফতেরও পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন, যিনি শেষ আব্বাসী খলীফা মুস্তাসিম বিল্লাহ তাতারীদের হাতে শাহাদাত লাভের পর (হিজরী ৬৫৬) থেকে মিসরে "খ্রিস্টানদের পোপের" ন্যায় ধর্মগুরুতে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিলেন, উছমানী খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াদোয সুলতান সলীম (১ম) (হিজরী ৯১৮-৯২৬) ৯২২ হিজরীতে সিরিয়া এবং ৯২৩

হিজরীতে মিসর জয় করেন যা আড়াইশ' বছর থেকে মামলুক সুলতানদের অধীন শাসিত হয়ে আসছিল। সলীমের হামলার সময় এর শাসনকর্তা ছিলেন কানসুওয়া ঘুরী। ঐ ৯২৩ হিজরীতেই সুলতান সলীম খিলাফত, অতঃপর পবিত্র মক্কা ও মদীনা ভূমির অভিভাবকত্ব ও খেদমতের ঘোষণা প্রদান করেন। অতঃপর জযীরাতুল আরব, ক্রমান্বয়ে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম ও আরব দেশসমূহ (মরক্কো বাদে) সুলতান সলীমের, অতঃপর তাঁর স্থলাভিষিক্ত মহান সুলায়মান কানুনী (৯২৬-৯৭৪ হিজরী) (যাঁকে পাশ্চাত্যের লেখকগণ Sulaiman, the Magnificent নামে স্মরণ করে থাকেন)-র শাসনাধীনে এসে যায়। মহান সুলায়মানের শাসনামল (যাঁর মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর জন্ম হয়) ছিল উছমানী সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ। একদিকে য়ুরোপ, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীতে তাঁর বিজয় ও সৌভাগ্য পতাকা পতপত শব্দে উড়ছিল, অপরদিকে ইরানে তাঁর ফৌজ বিজয়দৃপ্ত পদচারণা অব্যাহত রেখে চলেছিল। মিসর ও সিরিয়ার সাথে ইরাক-ই-আরবও তাঁর বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের শাসক। সুলতান মুরাদ (৩য়)-এর যুগে সাইপ্রাস দ্বীপপুঞ্জ, তিউনিস প্রদেশ, ইরান সাম্রাজ্যের কয়েকটি উর্বর ও শস্যশ্যামল প্রদেশ এবং ইয়ামান উছমানী হুকুমতের অন্তর্গত ছিল। তাঁরই শাসনামলে ৯৮৪ হিজরীতে মক্কার হারাম শরীফ-এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। মুজাদ্দিদ সাহেবের বুঝবার ও উপলব্ধি হবার মত তখন বয়স হয়েছে। এসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে তিনি অবশ্যই জেনে থাকবেন। ঐ যুগের মুসলমান (চাই তিনি ভারতবর্ষের বাসিন্দাই হন) উছমানী তুর্কীদের (যাঁরা গোঁড়া প্রকৃতির হানাফী সুন্নী মুসলমান ছিলেন) এসব বিজয় ও সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিতে অবশ্যই আনন্দবোধ করে থাকবেন।

এই শতাব্দীর সূচনায় (হিজরী ৯০৫) ইরান ও খুরাসানে সাফাবী খান্দানের আবির্ভাব ঘটে। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শাহ ইসমাঈল সাফাবী (৯০৫-৯৩০ হিজরী)। এই বংশ ক্রমান্বয়ে গোটা এলাকায় নিজেদের সুদৃঢ় শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। এই সাম্রাজ্য ছিল উছমানিয়া সাম্রাজ্যের সমপর্যায়ের তথা সমকক্ষ যারা উছমানিয়া সাম্রাজ্যের মুকাবিলায় শী'আ ইছনা আশারী জাফরী ফিক্হকে ইরানের সরকারী মযহাব হিসেবে গ্রহণ করেছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও উপায়-উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি গোটা ইরানে এই মযহাবের প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব হাতে নেন এবং এতে তিনি বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেন। এভাবে এই হুকুমত তাঁর নিজ সীমারেখার উপর মযহাবী ইখতিলাফের ভিত্তিতে

একটি মানবীয় প্রাচীর খাড়া করত উছমানীদের [যাঁদের সম মযহাবভুক্ত (সুন্নী হানাফী) মুসলমান কনস্টান্টিনোপল থেকে নিয়ে লাহোর ও দিল্লী পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল] বিস্তৃত সাম্রাজ্যে স্বীয় অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবার হাত থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। এই বংশের হুকুমত বাগদাদ থেকে হেরাত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই বংশের সর্বাধিক মর্যাদাবান শাসক শাহ আব্বাস (৯৯৫-১০৩৭) হিজরী, ইতিহাসে যিনি মহান শাহ আব্বাস নামে খ্যাত এবং যাঁকে তাঁর নির্মাণ কর্মের কারণে এই বংশের শাহজাহান বলা যেতে পারে) ছিলেন হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের সমসাময়িক। সাফাবী হুকুমত শাহ আব্বাস (১ম)-এর যুগে সাফল্য ও গৌরবের স্বর্ণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়। তিনি তুর্কীদের সাথে সাফল্য ও গৌরবের সাথে লড়াই করে নাজাফ ও কারবালা ছিনিয়ে নেন। তিনি ছিলেন ভারতের সম্রাট আকবর এবং জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক। শাহ আব্বাস-এর পরেই এই বংশের অধঃপতন শুরু হয়ে যায়।

মুসলিম বিশ্বের অপর গুরুত্বপূর্ণ প্রাচ্য ভূখণ্ড তুর্কিস্তান যা শতশত বছর যাবত ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি এই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিষয় শাস্ত্রের কেন্দ্র ছিল, যাকে প্রাচীন সাহিত্যে 'মাওয়ারাউন-নাহর' নামে স্মরণ করা হয় এবং যে ভূখণ্ডটি হানাফী ফিকহ সংকলন ও সম্পাদনে (ইরাকের পরে) সর্বাধিক অংশগ্রহণ করেছে। এর কতিপয় জীবন্ত ও চিরন্তন গ্রন্থ, যা ভারতীয় উপমহাদেশে অদ্যাবধি পাঠ্য তালিকাভুক্ত, উক্ত ভূখণ্ডেই প্রণীত হয়।[১] অধিকন্তু নকশবন্দিয়া তরীকা (যে তরীকার সঙ্গে হযরত মুজাদ্দিদ এবং তাঁর মাশায়েখগণের সম্পর্ক রয়েছে) সেখানেই জন্ম ও বিকাশ লাভ করেছে এবং সেখান থেকেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। এই উর্বর এবং স্বর্ণ-প্রসবিনী দেশ হিজরী দশম শতাব্দীর সূচনাতে (হিজরী ৯০৫) থেকেই উযবেকদের শায়বানী বংশের শাসনকর্তৃত্বে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যায় এবং ৯১৬ হিজরী একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি ছাড়া যে বছর বাবর সাফাবীদের সাহায্যে মা-ওয়ারাউন-নাহর-এর উপর হামলা করেছিলেন এবং তৎকালীন রাজধানী সমরকন্দ দখল করেছিলেন-খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (রুশ বিপ্লব পর্যন্ত) তাদেরই শাসনাধীনে থাকে। দশম শতাব্দীতে শায়বানী বংশের দু'জন শাসনকর্তা উবায়দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (হিজরী ৯১৮-৯৪৬) এবং উবায়দুল্লাহ ইবনে ইস্কান্দর (৯৬৪-১০০৬ হিজরী)-এর রাজধানী ছিল বুখারা। তাদের বদৌলতে বুখারা পুনর্বার চিন্তা-চেতনা ও রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

১. যেমন শরহে বিকায়া, হিদায়া ইত্যাদি।

আফগানিস্তান ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা নিকটতম প্রতিবেশী দেশ যা এর পশ্চিমে অবস্থিত। এই দেশটি ১০ম শতাব্দীর তুর্কিস্তানের উযবেক, ইরানের সাফাবী এবং মাঝে মধ্যে স্থানীয় উৎসাহদীপ্ত লোকদের চারণক্ষেত্র হিসেবে থাকে। কাবুল ও কান্দাহার কখনো মুগল, কখনো ইরানীরা অধিকার করে বসত এবং হেরাত ইরান সীমান্তে অবস্থিত হবার কারণে অধিকাংশ সময় সাফাবী সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন থাকে। ৯২৮ হিজরীতে সম্রাট বাবর কান্দাহার জয় করেন। অতঃপর তিনি যখন ভারতবর্ষে তৈমুরী সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ পত্তন করেন তখন তিনি একেই স্থায়ী আবাসে পরিণত করেন যেখান থেকে তিনি কাবুল, বাদাখশান ও কান্দাহার অবধি রাজত্ব করতেন। সে সময় আফগানিস্তান হিন্দুস্তান এবং ইরান এই দুই সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীনে একটি সুশৃঙখল ও শান্তিপূর্ণ যুগে প্রবেশ করে। সে এই দুই সাম্রাজ্যের ভেতর এমনভাবে বণ্টিত হয়ে গিয়েছিল যে, হেরাত এবং সীস্তান প্রদেশ ইরানের অধিকারে থাকে (যদিও এর উপর মাঝে-মধ্যে উযবেকদের হামলা চলত)। কাবুল ছিল মুগল সাম্রাজ্যের অংশ এবং কান্দাহারের উপর কখনো মুগল, আবার কখনো-বা ইরানীরা কবজা জমিয়ে বসত। কোহিস্তানের উত্তরে সম্রাট বাবরের চাচাতো ভাই সুলায়মান মিরযা (বাবর যাকে বাদাখশানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন) একটি অর্ধ-স্বাধীন শাহী খান্দানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের অবশিষ্ট অংশ শায়বানী খান্দানের অধীনে। ৯৬৫ হিজরীতে ইরান সম্রাট তাহমাস্প কান্দাহার দখল করেন এবং হিজরী ১০০৩ পর্যন্ত এই শহর ইরানীদের দখলে থাকে। হিজরী ১০০৩ সনে শাহযাদা মুজাফফর হুসায়ন একে সম্রাট আকবরের নিকট সমর্পণ করেন। তখন থেকে আফগানিস্তান মুগল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এই ধারাবাহিকতা দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে। অতঃপর ১১৫১ হিজরীতে নাদির শাহ আফশারের হাতে বাবুর বংশের দুশো চল্লিশ বছরের হুকুমত আফগানিস্তান থেকে বিদায় নেয়।

দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে লোদী বংশের রাজত্ব চলছিল। এই বংশের শেষ সুলতান ইবরাহীম লোদী ৯৩২ হিজরীতে মুগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহীরুদ্দীন মুহাম্মদ বাবর গূরগানী (৮৮৮-৯৩৯ হিজরী)-র হাতে নিহত হন এবং মুগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় যা ভারতবর্ষের মুসলিম সালতানাতগুলোর ভেতর সর্বাধিক বিস্তৃত, সুশৃঙখল, সুদৃঢ় এবং দীর্ঘ আয়ুর অধিকারী ছিল। লোদী বংশ তাদের পাঠান বংশ ও ঐতিহ্যের কারণেই ইসলামে নিবেদিত এবং হানাফী মযহাবের পাবন্দ ছিলেন যারা নিত্য-নতুনপ্রিয়তা (تجدد پسندی) ও ধর্মহীন

(সেক্যুলার) রাজনীতির সম্পর্কে অপরিচিত ছিলেন। এই বংশের সবচে' দীনদার ও মা'আরিফ নওয়ায এবং উলামায়ে কিরাম-এর কদরদান ও অভিভাবক সুলতান ছিলেন সিকান্দার লোদী (মৃ. ৯২৩ হিজরী)। এই শতাব্দীর পাঁচটি সৌভাগ্যশীল বছর (৯৪৬ হিজরী-৯৫২ হিজরী) শেরশাহ সূরীর শাসনাধীনে অতিক্রান্ত হয় যাঁর চেয়ে অধিকতর সাংগঠনিক ও সাংবিধানিক যোগ্যতাসম্পন্ন, জনহিতকর কর্মে সামর্থ্যের অধিকারী মুসলিম নৃপতি এবং জ্ঞানবান ও দীনদার শাসক এর পূর্বে ভারতবর্ষের মুসলিম ইতিহাসে আর কেউ আসেনি। শেরশাহর ইনতিকালের পর আকবরের সিংহাসন আরোহণ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কপালে রাজনৈতিক ও শাসন বিভাগীয় সংহতি, সরকারের স্থিতি এবং দেশবাসীর ভাগ্যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জোটেনি। শেরশাহ সূরীর উত্তরাধিকারী সলীম শাহ তাঁর প্রতিভাবান পিতার যোগ্যতার ধারে কাছেরও ছিলেন না। সম্রাট বাবরের উত্তরাধিকারী নাসীরুদ্দীন হুমায়ুন (৯৩৭ হিজরী-৯৬৩ হিজরী) ভারতবর্ষে নিশ্চিন্ত তৃপ্তির সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেন নি। শের শাহের বিজয়দৃপ্ত আক্রমণ এবং ভাইদের বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে বিব্রত ও হতচকিত থাকেন তিনি এবং যতদিন অবধি ইরানের বাদশাহ তাহমাস্প সাফাবীর সাহায্য না নিয়েছেন তিনি স্বস্তি পান নি। ৯৬৩ হিজরীতে আকবর সিংহাসনে আরোহন করেন এবং পূর্ণ অর্ধশতাব্দী যাবত দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

মুজাদ্দিদ সাহেবের যমানাতেই, যখন তাঁর বয়স ছিল ৪৩ বছর, নূরুদ্দীন জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁরই শাসনামলে মুজাদ্দিদ সাহেব ইনতিকাল করেন। রাজধানীর এই কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্য ছাড়াও গুজরাট, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও আহমদ নগরে আঞ্চলিক সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল যা স্বায়ত্বশাসিত পন্থায় পরিচালিত হচ্ছিল। শেষের তিনটি রাজ্য ছিল শী'আ মযহাবভুক্ত।

ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অবস্থা

সে সময় গোটা মুসলিম বিশ্বের মন-মস্তিষ্কের উপর ধর্মের বাঁধন ছিল মযবুত। সাধারণভাবে গণ-মানুষ (তাদের জ্ঞানগত, নৈতিক ও চারিত্রিক দুর্বলতা সত্ত্বেও) গভীর বিশ্বাসী মুসলমান, ধর্মপ্রাণ, মর্যাদাবোধসম্পন্ন এবং ইসলামপ্রিয় ছিল। তাদের ভেতর বিশেষ ধর্মীয় মর্যাদাবোধ এবং ইসলামী প্রেরণা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা পাওয়া যেত। যদিও অনেক সময় বেদ'আত ও ইসলাম বিরোধী কাজে তারা জড়িয়ে পড়ত, তবুও সাধারণভাবে তারা কুফর ও ধর্মদ্রোহিতার প্রতি বিরূপ ও ঘৃণার মনোভাব পোষণ করত।

ধর্মের প্রতি তাদের এই সাধারণ আগ্রহ ও মেযাজের কারণে মুসলিম রাজা-বাদশাহগণকেও (যাঁরা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর বিরোধী শক্তিরও পরওয়া করতেন না এবং যাঁদের সামরিক শক্তি য়ুরোপকেও ভীত-সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল) ইসলামী প্রথা-পদ্ধতির প্রতি সম্মান এবং ধর্মের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার কথা প্রকাশ করতে ও ঘোষণা দিতে হত এবং জনসাধারণের অন্তর-রাজ্যে তাঁদের প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্মান ও ভালবাসার চিত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না যতক্ষণ না তাঁরা তাঁদের এই ধর্মীয় দিকটা উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরতেন। সুলতান সলীম (১ম)-এর সাম্রাজ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত স্থিতি আসেনি যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি নিজেকে 'খলীফাতুল মুসলিমীন' এবং 'খাদিমুল-হারামায়ন আশ-শারীফায়ন' এই সম্মানজনক উপাধিটি গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর দামিশক অবস্থানকালীন পবিত্র স্থানসমূহের প্রতি তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধা খোলাখুলি প্রকাশ করেছেন। ৯২৩ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে সুলতান সলীম দামিশক থেকে হাজীদের একটি কাফেলা পাঠান। কাফেলার সাথে এই প্রথমবার তুর্কী সুলতানের পক্ষ থেকে হাদিয়া হিসেবে কা'বা শরীফের গিলাফ পাঠানো হয়। তখন থেকে তুর্কী সুলতানগণ 'খাদিমুল-হারামায়ন' উপাধিটি ব্যবহার করতে থাকেন যার কারণে তাঁরা মুসলিম বিশ্বে বিরাট মর্যাদা লাভ করেন। সুলতান সুলায়মান-এর জীবনে বিনয় ও নম্রতা এবং সুগভীর ধর্মীয় আবেগ ও প্রেরণার কতিপয় দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি স্বহস্তে কুরআন মজীদ-এর আটটি কপি তৈরি করেন যা আজও সুলায়মানিয়া গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। তাঁর রচিত দীওয়ান-এর গযল ও কবিতাসমষ্টি থেকে তাঁকে একজন গভীর আকীদাসম্পন্ন মুসলমান হিসাবেই প্রতীয়মান হয়। তিনি মুফতী আবুস-সউদ (তফসীর-ই আবুস-সউদ প্রণেতা, ৯৫২ হিজরীতে মৃত্যু)-এর ফতওয়ার উপর ভিত্তি করে কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণ করেন এবং মক্কা মুকার্রামায় ছোট ছোট খাল খনন করান। সুলতান মুরাদ ৯৮৪ হিজরীতে কা'বা ঘর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন যা অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত আছে। আর এসবগুলোই হিজরী দশম শতাব্দীর উছমানীয় সুলতানদের উল্লেখযোগ্য অবদান।

ইরানের শী'আ সাম্রাজ্যেও সাধারণের মন-মস্তিষ্ক ধর্মীয় ও দীনী রুচির প্রতি প্রসন্নচিত্ত ছিল এবং সাফাবী সুলতানগণ তাদেরকে এর খোরাক সরবরাহ করতেন এবং ইসলাম ও আহলে বায়েত-এর প্রতি নিজেদের নিবিড় শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটিয়ে এর দ্বারা দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক স্থিতি ও সংহতি এবং জনগণের ভেতর লোকপ্রিয়তা অর্জনে সচেষ্ট ছিলেন। ইরানের শ্রেষ্ঠতম নৃপতি শাহ আব্বাস ১ম কেবল যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ইস্ফাহান থেকে মাশহাদ পর্যন্ত

আটশ' মাইল পদব্রজে সফর করেছিলেন এবং নাজাফ-এ উপস্থিত হয়ে হযরত আলী মুর্তাযা (রা)-এর পবিত্র রওযা ঝাড়ু দিয়েছিলেন। শাহ্ আব্বাসের প্রতি ইরানীদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও নানা জল্পনা-কল্পনা এসব কারণেই সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং জনগণের ভেতরে নানারূপ কিংবদন্তী ছড়িয়ে পড়েছিল।

তুর্কিস্তান এবং আফগানিস্তানের লোকদের বিশ্বাসের গভীরতা, দীন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, সুন্নী বিশ্বাসে একনিষ্ঠতা এবং হানাফী মযহাবের প্রতি কঠোর আনুগত্য প্রবাদে পরিণত হয়েছে। তাদের শাসক ও বিভিন্ন রাজ্যের রাজন্যবর্গ, সাম্রাজ্যের আমীর-উমারা, অমাত্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (স্ব-স্ব শ্রেণী ও মানদণ্ড মাফিক) অনেকটা তাদেরই সমগোত্রীয় ও একই রঙে রঞ্জিত ছিলেন।

ভারতবর্ষে মুসলিম সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ পত্তন হয়েছিল তুর্কী ও আফগান বংশের বিভিন্ন খান্দান ও শাসকদের হাতে। এজন্যই শুরু থেকেই এখানেও ধর্মের প্রভাব ছিল গভীর এবং এর প্রকৃতি ছিল সহজ সারল্যে ভরপুর যা ছিল তুর্কী ও আফগান মন-মানস ও রুচির বৈশিষ্ট্য। শুরু থেকেই এখানে তরীকায়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত এবং হানাফী মযহাবের (কতিপয় উপকূলীয় ভূখণ্ড এবং দক্ষিণ ভারতের মালাবার এলাকা বাদে) প্রতি আনুগত্য চলে আসছে এবং শুরু থেকেই সেটাই রাষ্ট্রের সংবিধান এবং আদালতের আইন হিসেবে অনুসৃত হচ্ছে। এখানে "ফাতাওয়া-ই তাতারখানী" এবং "ফাতাওয়া-ই কাযী খান"-এর ন্যায় হানাফী ফিকহ (jurisprudence, ন্যায়-শাস্ত্র)-এর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কিতাব প্রণীত হয়।[১]

ভারতবর্ষের মুসলিম ইতিহাসের কয়েকজন বাদশাহ তাঁদের সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়তের প্রতি সমর্থন, কুফর ও ধর্মদ্রোহিতা সম্পর্কে অসন্তোষ ও বিরূপ মনোভাব, বেদ'আত ও গর্হিত কর্মের বিরোধিতা ও তা দূরীকরণ এবং ধর্মীয় মর্যাদাবোধের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে মুহাম্মদ তুগলক ও ফীরূয তুগলক এবং দশম শতব্দীতে সুলতান সিকান্দার লোদীর নামোল্লেখই এক্ষেত্রে যথেষ্ট। "তাবাকাত-ই আকবরী", "তারীখ-ই ফিরিশতা" এবং "তারীখ-ই দাউদী"-এর গ্রন্থকারের বর্ণনা মুতাবিক সুলতান সিকান্দার লোদীর রাজত্বকালে ধর্মের প্রতি আনুগত্য এমনভাবে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে, মনে হচ্ছিল জীবনের একটি নতুন পন্থা জন্ম লাভ করেছে। তিনি নিজের চাইতেও ইসলামকে বেশী ভালবাসতেন। তাঁদের ভাষায় ঃ সুলতান তাঁর

১. ফাতাওয়া-ই আলমগীরি সংকলনের বহু পূর্বেই সংকলিত হয়ে মুসলিম বিশ্বে খ্যাতি লাভ করে এবং ফাতাওয়া-ই হিন্দিয়া নামে মিসর, সিরিয়া ও ইরাকে খ্যাত হয়।

জীবনের প্রথম থেকেই ধর্মের প্রতি অতিমাত্রায় অনুরক্ত ছিলেন। ইলম চর্চায় বাদশাহ ছিলেন প্রবল আগ্রহী। তাঁর আমলে হিন্দুদের ফারসী পাঠের সূচনা হয়। কায়স্থরা বাদশাহর পরামর্শ গ্রহণ করে। সুলতান তাঁর রাজ্যে সালার মাসউদের ছড়ি প্রেরণ একেবারে স্থগিত রাখেন যা প্রতি বছর যেত। কতক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, তা'যিয়া বের করা এবং (বসন্তের দেবী) শীতলা পূজাও তিনি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন।[১] মুশতাকী লিখেছেন যে, قبور بلا میت را نهر ساخته 'সে যুগে গজিয়ে উঠা বহু কবরের জায়গায় খাল খনন করত তিনি সে সবের নাম-নিশানাও মুছে ফেলেন'।[২]

সুলতান সলীম শাহ সূরী মসজিদে সালাতে স্বয়ং ইমামতি করতেন। নেশাকর পানীয় থেকে নিজেকে তিনি কঠোর সংযমে বেঁধে রাখেন।

এ যুগটা ছিল তাসাওউফের এবং বিভিন্ন তরীকা ও সিলসিলার চরম উন্নতির যুগ। মুসলিম বিশ্বের কোন দেশ ও এলাকাই এমন ছিল না যেখানে কোন না কোন সিলসিলা খুঁজে পাওয়া না যেত। প্রতিটি ঘরে ছিল এর চর্চা। এই সিলসিলায় তুর্কিস্তানের দু'টি প্রসিদ্ধ শহর এবং শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র বুখারা ও সমরকন্দ, আফগানিস্তানে হেরাত ও বাদাখশান, মিসরে আলেকজান্দ্রিয়া ও তানতা, ইয়ামানে তা'আয্য ও সান'আ এবং হাদরামাওত-এ তারীম, শাহর ও সীওন উলামা, সুফিয়া ও মাশাইখ-ই-কিরামের বিরাট কেন্দ্র ছিল। হাদরামাওতে বা'আলভী ঈদরৌস খান্দান বড়ই জনপ্রিয় ও কামালিয়াতের অধিকারী খান্দান ছিল। এ যুগেই ঐ সব দিকে শায়খ আবূ বকর 'আবদুল্লাহ ইবন আবূ বকরকে খুবই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী শায়খ ও কুতুব-ই-দওরান মনে করা হত। তারীম আলী (রা.) বংশীয় সৈয়দদের আবাস ছিল। সে যুগের মশহুর ওলীয়ে কিরামের ভেতর ছিলেন শায়খ সা'দ ইবন 'আলী আস-সুওয়ায়নী বান্দ হাজ্জ আস-সাঈদ। শায়খ মুহয়ি উদ্দীন আবদুল কাদির ঈদরৌসী (হিজরী ৯৭৮-১০৩) তদীয় বিখ্যাত গ্রন্থ النور السافر فی رجال القرن العاشر[৩] তাঁর জীবনী আলোচনার মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন যা গ্রন্থের ৪৬৬ পৃষ্ঠা থেকে ৪৮০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

হিজরী দশম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যদিও কাদিরিয়া ও চিশতিয়া সিলসিলার দু'টি শাখা (নিজামিয়া ও সাবিরিয়া) বিস্তার লাভ করেছিল এবং এ দু'টি শাখায় হাল ও কামালিয়াতের অধিকারী কয়েকজন ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু মূলত এই শতাব্দী ছিল সিলসিলা-ই ইশকিয়া শাত্তারিয়ার শতাব্দী, যে তরীকা

১. তারীখ-ই-হিন্দুস্তান, মওলভী যাকাউল্লাহ দেহলভী কৃত, ২য় খণ্ড, ৩৭৪ পৃ:

২. ওয়াকি'আত-ই-মুশতাকী;

৩. গ্রন্থটি হিজরী ১০১২ সালে আহমদাবাদে প্রণীত হয়।

(আধুনিক ব্যাখ্যা মুতাবিক) ভারতবর্ষের বিলায়েতের অধিকারী চিশতিয়া সিলসিলা থেকে এ দেশের রূহানী দায়িত্বভার নেয় এবং সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করে নেয়।[১]

শাত্তারিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা শায়খ 'আবদুল্লাহ শাত্তার খুরাসানী সম্ভবত নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং মাণ্ডো নামক স্থানে বসবাস করতে শুরু করেন। ৮৩২ হিজরীতে তাঁর ইনতিকাল হয় এবং মাণ্ডোতে দুর্গাভ্যন্তরে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি আমীরসুলভ শান-শওকতের সঙ্গে থাকতেন। তাঁর তীব্র আধ্যাত্মিক আকর্ষণীয় শক্তি ছিল। বহু লোক তাঁর থেকে উপকৃত হয় এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তাঁর তরীকা তথা সিলসিলা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। এই তরীকার দু'টি শাখা। একটি শাখা শায়খ মুহাম্মদ গওছ গোয়ালিয়রীর সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁর এবং শায়খ আবদুল্লাহ শাত্তারীর মাঝে তিন পুরুষের ব্যবধান রয়েছে। অপর শাখার প্রতিষ্ঠাতা শায়খ আলী ইবনে কাওয়াম জৌনপুরী (শায়খ আলী 'আশেকান-ই-সরাইমীরি)। তাঁর এবং শায়খ 'আবদুল্লাহ শাত্তারীর মাঝে দু'পুরুষের ব্যবধান রয়েছে। এই সিলসিলাই সম্ভবত প্রথমবারের মত যোগ-সাধনাকে তাসাওউফের সাথে মিলায় এবং তার সুলুক (আধ্যাত্মিক সাধনার পথ)-এর কতক তরীকা ও যিকর-আযকার, কতক আসন ও শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের পন্থা এখতিয়ার করেন এবং স্বীয় মুরীদদেরকে এর তা'লীম দেন। অধিকন্তু তিনি ইলম সিমিয়া[২]-কেও এর মধ্যে শামিল করেন। এসব আসনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তাঁর যিকিরসমূহের বিস্তৃত বিবরণ বাহাউদ্দীন ইবন ইবরাহীম আল-আনসারী আল-কাদেরী রচিত রিসালা-ই শাত্তারিয়ায় বর্তমান। শায়খ মুহাম্মদ শাত্তারী রচিত গ্রন্থ كليد مخازن -এ গ্রন্থকারের একটি বর্ধিত বিষয় রয়েছে যদদ্বারা ওয়াহদাতুল ওজূদ, পূজামণ্ডপ ও মসজিদ এবং শায়খ ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সাম্যের এবং এসব বস্তুর ভেতর আল্লাহ্‌র তাজাল্লীর বরং

১. এই শতাব্দীতে মাদারিয়া তরীকাও, যাঁর প্রতিষ্ঠাতা শায়খ বদীউদ্দীন মাদার মকনপুরী (মৃ. ৮৪৪ হিজরী)-ভারতবর্ষে পাওয়া যেত। এই সিলসিলার পরিধি ও পরিচয় চিহ্ন ওয়াহদাতুল ওজূদের চিন্তাধারা ও বিষয়সমূহের খোলামেলা প্রকাশ ও ঘোষণা, তাজরীদ-ই-জাহিরী (এতটা পর্যন্ত যে, কেবল লজ্জাস্থান আবৃত রাখাই যথেষ্ট) এবং কেবল তাওয়াক্কুল। কালক্রমে এই সিলসিলার অবনতি ও পতন ঘটে এবং বাধা-বন্ধনহীনতা বৃদ্ধি পায়। এমনকি 'মাদারী' শব্দটি বাজীকরের বিকল্প হিসেবে অভিহিত হয়। দশম শতাব্দীতে এই সিলসিলা বিশিষ্ট মহলে তার জনপ্রিয়তা হারিয়ে বসেছিল। 'নুযহাতুল-খাওয়াতির-এর চতুর্থ খণ্ডে (যে গ্রন্থে প্রতিটি সিলসিলার শায়খগণের জীবনী সংকলিত হয়েছে) অনুসন্ধান চালিয়ে দু'জন ব্যক্তিত্বর সন্ধান পাওয়া গেছে যাঁরা মাদারিয়া তরীকায় বায়'আত প্রাপ্ত ছিলেন।

২. হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, নদওয়াতুল উলামা গ্রন্থাগার, তাসাওউফ শাস্ত্র শিরো. ৪৭-৪৯ পৃ.

প্রকাশের পরিষ্কার প্রকাশ ঘটে যে, এসব কিছুই সেই একক সত্তারই বিভিন্ন রঙ ও বিকশিত দৃশ্য। শেষোক্তজনের কবিতা ঃ

عشقی شد و در مشرب شطار بر آمد * خود غوث جهاں شد

ইশ্‌ক সৃষ্টি হল ও শাত্তারী মতবাদ গ্রহণ করল এবং পৃথিবীর গওছ হিসেবে বরিত হল।

'রিসালা-ই ইশকিয়া' নামক পুস্তিকায় কাফিরীকে "জালাল-এ ইশ্‌ক" এবং মুসলমানিত্বকে "জামাল-এ ইশ্‌ক" বলা হয়েছে এবং তাতে এই কবিতাটি পাওয়া যায় ঃ

کفر و ایمان قرین یك دگراند * هر که را کفر نیست ایمان نیست

কুফর ও ঈমান একে অন্যের সাথী ও সম্পূরক; যার মধ্যে কুফর নেই, ঈমান নেই।

এক জায়গায় লিখেছেন ঃ

العلم حجاب اکبر گشت؛ مراد ازیں علم عبودیت که حجاب اکبر است ، ایں حجاب اکبر اگر از میان مرتفع شود کفر به اسلام واسلام به کفر آمیزد ، وعبادت خدائی وبندگی برخیزد ۔

ইল্‌ম হল বড় বাঁধা; ইলম-এর উদ্দেশ্য দাসত্ব ও গোলামী যা কিনা সবচে' বড় বাঁধা। বড় বাঁধা উঠে গেলে ইসলাম কুফরের সাথে এবং কুফর ইসলা-মের সাথে মিশে যাবে আর সেই সাথে ইবাদত-বন্দেগীও উঠে যাবে।

এই সিলসিলার সবচে' খ্যাতনামা ও প্রভাবশালী শাত্তারী শায়খ ছিলেন মুহাম্মদ গওছ গোয়ালিয়রী (মৃ. ৯৭০ হিজরী)। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এবং লোকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ছিল এবং তাঁর শান-শওকত আমীর-উমারা ও মন্ত্রীদের দরবারকেও ম্লান করে দিত। তাঁর জায়গীর থেকে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ ছিল নয় লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা (কতিপয় বর্ণনায় এক কোটির মত বলা হয়েছে)। তাঁর হাতীশালে চল্লিশটি হাতী ছিল এবং বিরাট এক দল চাকর-বাকর সর্বদা তাঁর সেবায় নিরত থাকত। আগ্রার বাজার পরিদর্শনে বের হলে লোকের ভীড় বেড়ে যেত। সকলকে মাথা ঝুকিয়ে সালাম করতেন, এমনকি জীনের উপর তাঁর সোজা হয়ে বসাও কঠিন হয়ে যেত। মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ূনীর বর্ণনা মুতাবিক শায়খ মুহাম্মদ গওছ সম্রাট আকবরকে কৌশলে তাঁর মুরীদ বানিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু সম্রাট সত্বরই নিজেকে এর থেকে মুক্ত করে নেন। তাঁর এই

আমীরানা, বরং বলা চলে, শাহী ঠাঁট-বাট সত্ত্বেও সারা দেশে তাঁর দারিদ্র্যের কথাই লোকমুখে প্রচারিত ছিল। কাউকে সালামকালে তিনি প্রায় রুকুর ন্যায় ঝুঁকে পড়তেন-চাই মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম। উলামায়ে কিরামের এতে আপত্তি ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে "জাওয়াহির-এ খামসা", "মিরাজিয়া"[১], "কানযুল-ওয়াহদাহ" এবং "বাহরুল-হায়াত"।[২] ভারতবর্ষের উপর এর বিরাট প্রভাব পড়ে এবং চিশতিয়া শাত্তারিয়া তরীকা সর্বসাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে।[৩] মুজাদ্দিদ সাহেব তাঁর ইনতিকালের এক বছর পর জন্মগ্রহণ করেন।

এই সিলসিলায় শায়খ আলী ইবনে কাওয়াম জৌনপুরী, যিনি আলী আশেকান সরাইমীরি নামে পরিচিত ও খ্যাত (মৃ. ৯৫৫ হিজরী), শায়খ লশকর মুহাম্মদ বুরহানপুরী (মৃ. ৯৯৩ হিজরী), আল্লাহ বখশ গড় মুক্তেশ্বরী (মৃ. ১০০২ হিজরী) অত্যন্ত জলীলুল কদর মাশায়েখ ছিলেন। বিরাট ও বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁদের থেকে উপকৃত হয়। আলী আশেকান সরাইমীরি সম্পর্কে কতক জীবনী লেখক লিখেছেন যে, তাঁর থেকে এত কারামত প্রকাশিত হয়েছে যে, হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.)-র পর অপর কারো থেকে তত প্রকাশিত হয়নি।[৪] শায়খ মুহাম্মদ গওছ গোয়ালিয়রীর স্থলাভিষিক্ত ও খলীফা শায়খ যিয়াউল্লাহ আকবরাবাদী (মৃ. ১০০৫ হিজরী) আল্লামা ওয়াজীহুদ্দীনের শাগরিদ ছিলেন। তিনি পঁয়ত্রিশ বছর আকবরাবাদে (যা সম্রাট আকবরের রাজধানী ছিল) ছিলেন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। সম্রাট আকবরের দরবারে তাঁকে কয়েকবার ডেকে পাঠানো হয়। মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ূনী লিখেছেন যে, আমি তাঁকে সুন্নত মুতাবিক সালাম করলাম। এতে তিনি মনঃক্ষুণ্ন হন ও নিজেকে অপমানিত বোধ করেন এবং ইসলামের এই পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন ও মানবশ্রেষ্ঠ রসূল (সা.)-এর সুন্নতের প্রতি বিদ্রূপ করেন। বদায়ূনী তাঁর উত্তম চিত্র অংকন করেন নি এবং তাঁর ঠাট্টা-বিদ্রূপের অনেক কাহিনী লিখেছেন।[৫]

---

১. তাঁর মিরাজ হয়েছিল বলে তিনি দাবী করেন। ফলে গুজরাটের উলামায়ে কিরামের ভেতর গোলযোগ ঘটে। কিন্তু মালিকুল-উলামা শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন (যিনি সে যুগে অধিকাংশ 'আলিমের উস্তাদ ছিলেন)-এর ইলমী ব্যাখ্যায় এর নিরসন হয়।

২. গ্রন্থটি অমৃতকুণ্ডের অনুবাদ। শেখ মুহাম্মদ ইকরাম তদীয় "রূদ-ই কাওছার" গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখেন ঃ এতে হিন্দু যোগী ও সন্ন্যাসীদের আচার ও ক্রিয়াকলাপের বিস্তারিত বর্ণনা তিনি ফারসীতে ভাষান্তর করেছেন। তাঁর প্রাথমিক রচনা "জওয়াহির-ই খামসায়" এর ছিটে-ফোটা ঝলক দেখান। এ থেকে শাত্তারিয়া তরীকার এই ارتباط। এর উপর আলোকপাত হয় যা এর হিন্দু যোগসাধনার সাথে ছিল। (৩৪-৩৬ পৃ.।

৩. বিস্তারিত জানতে চাইলে দ্র. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৪র্থ খণ্ড।

৪. বিস্তারিত জানতে চাইলে দ্র. 'আরিফ আলী প্রণীত "আল-'আশিকিয়া" অথবা নু. খা. ৫-খ.

৫. বিস্তারিত জানতে দেখুন মোল্লা আবদুল কাদির বিরচিত "মুনতাখাবুত্তাওয়ারীখ" অথবা নু. খা. ৫ খ.

এসব বুযুর্গ-মনীষী ছাড়াও শাহ আবদুল্লাহ সুন্দেলভী (৯২৪-১০১০ হি.) এবং শায়খ ঈসা ইবনে কাসিম সুন্দী যিনি হযরত শায়খ লশকর মুহাম্মদ 'আরিফ বিল্লাহর খলীফা ছিলেন (যিনি হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের সমসাময়িক ও নিকট বয়সী ছিলেন), ছিলেন ইশকিয়া শাত্তারিয়ার খ্যাতনামা মাশায়েখগণের অন্তর্গত।[১]

ইশকিয়া শাত্তারিয়া সিলসিলার এসব নামকরা মাশায়েখ ছাড়া ভারতবর্ষে অপরাপর জলীলুল কদর মাশায়েখও বর্তমান ছিলেন যাঁদের অন্যান্য সিলসিলার সাথেও সম্পর্ক ছিল। এঁদের ভেতর একজন ছিলেন শায়খ চায়ীন লাদাহ সুহনবী[২] (মৃ. ৯৯৮ হি.)। তিনি 'ফুসূস' ও 'নকদু'ন-নুসূস' গ্রন্থের দরস প্রদান করতেন। সম্রাট আকবর ছিলেন তাঁর ভক্ত। একদিন তাঁকে সালাতে মা'কূস আদায় করতে দেখে তিনি চলে যান।[৩] দ্বিতীয় জন ছিলেন শাহ আবদুর রাযযাক ঝিনঝানাবী (৮৮৬-৯৪৯হি.) কাদেরী চিশতী। তিনি ছিলেন এমন একজন আলিম যিনি গ্রন্থকার ও মুদাররিস হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় যুগে ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ এবং শায়খ আকবর[৪]-এর মতবাদের সবচে বড় নিশানবরদার ছিলেন। এ বিষয়ের উপর তাঁর লিখিত কয়েকটি পুস্তিকা রয়েছে। শায়খ আবদুল আযীয শকরবার (৮৫৮-৯৭৫হি.) ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ মতবাদের একজন সমর্থক এবং 'সাহিব-এ হাল' বুযুর্গ ছিলেন। তিনিও 'ফুসূসু'ল-হিকাম' এবং এর বিভিন্ন শরাহ পুস্তকের দরস প্রদান করতেন। এই বুযুর্গ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ(র.)-র মাতৃকুলের ঊর্ধ্বতন পুরুষও ছিলেন।

এই শতাব্দীতে হযরত শায়খ আবদুল কুদ্দুস গঙ্গূহী (মৃ.৯৪৪হি.) আধ্যাত্মিক খ্যাতির শীর্ষদেশে উপনীত হন এবং তাঁর দ্বারা চিশতিয়া সাবিরিয়া সিলসিলা নবতর শক্তি ও সজীবতা লাভ করে। তিনি ওয়াহদাতু'ল-ওজূদের গুপ্ত রহস্যসমূহ খোলামেলাভাবে প্রকাশ্যে বলতেন এবং এর দাঈ ছিলেন। জৌনপুরে শায়খ কুতবুদ্দীন বীনাদল(৭৭৬-৯২৫হি.) কলন্দরিয়া তরীকায় এবং আম্বালা জেলার ক্যাথলে শায়খ কামাল উদ্দীন (মৃ. ৯৭১ হি.) কাদিরিয়া সিলসিলা ও হালকার মধ্যমণি এবং নেতৃস্থানীয় পুরুষ ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে এই দু'টি তরীকা নবজীবন লাভ করে। শায়খ কামাল ক্যাথলী সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব (র.) তাঁর বুযুর্গ পিতা শায়খ আবদুল আহাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ যখন

---

১. দ্র. নু. খা. ৫ম খণ্ড।

২. সুহনা পূর্ব পাঞ্জাবের গড়গানওয়াহ জেলার একটি পল্লী। এখানকার উষ্ণ প্রস্রবণ প্রসিদ্ধ।

৩. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৪র্থ খণ্ড;

৪. মুহয়িউদ্দীন ইবনে আরাবী।

কাশফ-এর দৃষ্টিতে দেখা হয় তখন দেখা যায় যে, এই মহান সিলসিলায় (কাদিরিয়া সিলসিলায়) পীরানে পীর হযরত শায়খ আবদুল কাদির জিলানীর পর তাঁর চেয়ে বুলন্দ মরতবার অধিকারী কামালিয়াতসম্পন্ন শায়খ অপর কেউ দৃষ্টিগোচর হন না।[১] অযোধ্যায় শায়খ নিজামুদ্দীন আমবীঠবী, বন্দেগী মিঞা নামে খ্যাত ও পরিচিত, (৯০০-৯৭৯ হি.) চিশতিয়া সিলসিলার একজন উঁচুদরের শায়খ, শরীয়তের সমর্থক এবং সুন্নতের অনুসারী বুযুর্গ ছিলেন। 'ইহয়াউল-উলুম', 'আওয়ারিফ' এবং রিসালা-ই মাক্কিয়ার উপর ছিল তাঁর আমল। একবার জনৈক লোকের হাতে 'ফুসূস' দেখে তিনি তা কেড়ে নেন এবং অন্য একটি কিতাব অধ্যয়নের জন্য তাঁকে দেন। তাঁর সিলসিলায় যদিও সামা'-র ব্যাপক প্রচলন ছিল, কিন্তু তিনি নিজে এর থেকে মুক্ত ছিলেন।[২]

এই ছিল তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অবস্থা এবং এঁরাই ছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন চিন্তা-চেতনা ও শ্রেণী-মত নির্বিশেষে তরীকার শায়খ ও সিলসিলার বুযুর্গ যাঁরা হিজরী দশম শতাব্দীতে বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের আধ্যাত্মিক ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কায়েম করে রেখেছিলেন এবং ভারতবর্ষের গভীর ধর্মীয় মন-মানস পোষণকারী আল্লাহপ্রার্থী এবং দরিদ্র প্রেমিক সর্বস্তরের মানুষ তাঁদের সঙ্গে কোন-না-কোনভবে সম্পর্কিত এবং তাঁদের ভক্ত ও অনুরক্ত ছিল। এ বিষয়টি এত বিস্তৃতভাবে এজন্য বলা হল যাতে মুজাদ্দিদ সাহেবের যুগের পরিবেশ, রুচি-প্রকৃতি, প্রবণতা এবং সেযুগে দীনের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্জাগরণের কাজের সমস্যা ও সম্ভাবনা দুটোরই পরিমাপ করা যায়।

জ্ঞান রাজ্যের অবস্থা

হিজরী দশম শতাব্দী জ্ঞান রাজ্যের আবিষ্কার- উদ্ভাবনী, ইজতিহাদী চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টি, বিবিধ জ্ঞানের নবতর সংকলন এবং এসবের ভেতর উল্লেখযোগ্য ব্যাপ্তির শতাব্দী ছিল না। এইসব বৈশিষ্ট্য অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্তী পর্যন্ত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, যে শতাব্দীতে শায়খুল ইসলাম হাফিজ ইবনে তায়মিয়া (মৃ.৭২৮ হি.), শায়খুল ইসলাম তকীয়্যুদ্দীন ইবন দাকীকু'ল-'ঈদ (মৃ.৭০২ হি.), আল্লামা আলাউদ্দীন আল-রাযী (মৃ. ৭১৪ হি.), আল্লামা জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ আল-মিযযী (মৃ.৭৪২ হি.) এবং আল্লামা শামসুদ্দীন আয-যাহবী (মৃ.৭৪৮ হি.) ও আল্লামা আবু হায়্যান নাহবী (মৃ.৭৪৫ হি)-র মত সর্বজনশ্রদ্ধেয়

১. যুবদাতুল-মকামাত, ১০৮ পৃ.।

২. বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন নুযহাতুল খাওয়াতির, ৪র্থ খণ্ড;

উলামা' জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা হাদীস, উসূল, ইলমে কালাম,রিজাল শাস্ত্র এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যে উন্নত মানের মূল্যবান রচনা রেখে যান। হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ফতহুল বারী প্রণেতা আল্লামা ইবনে হাজার আল-আসকালানী (মৃ.৮২৫ হি.)-র যুগও অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল, যাঁর বুখারীর তুলনাহীন ব্যাখ্যা গ্রন্থ (ফতহুল বারী) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ لا هجرة بعد الفتح (মক্কা বিজয়ের পর যেমন হিজরতের সুযোগ নেই তেমনি ফতহুল বারীর পরও বুখারীর কোন ব্যাখ্যাগ্রন্থ নিষ্প্রয়োজন)।

দশম শতাব্দীর অধিকাংশই সংকলন, বিন্যাস, সরলীকরণ ও সংক্ষিপ্তকরণের শতাব্দী ছিল। এরপরও এর প্রথম ভাগে আল্লামা শামসুদ্দীন সাখাবী (মৃ.৯০২ হি.) এবং আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.)-র মত ধর্মীয় জ্ঞানে সমুদ্রতুল্য ইসলামের অন্যতম লেখক-শ্রেষ্ঠ গুযরে গেছেন। আল্লামা সাখাবী সম্পর্কে কোন কোন আলিমের উক্তিঃ ইমাম শামসুদ্দীন-এর পর ইলমে হাদীস, রিজালশাস্ত্র ও ইতিহাসে তাঁর পর্যায়ের আর কোন ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়নি। তারপর থেকেই হাদীসশাস্ত্রের অধঃপতন যুগ শুরু হয়। উসূল এবং মুসতালিহাতুল হাদীস-এ তাঁর কিতাব "ফতহু'ল-মুগীছ বিশারহি আলফিয়াতিল-হাদীছ" এবং রিজাল আলোচনায় الضوء اللامع لاهل القرن التاسع। আপন বিষয়-বস্তুর উপর তুলনাহীন সৃষ্টি মনে করা হয়ে থাকে। আল্লামা সুয়ূতী সকল রকমের প্রশংসা ও পরিচিতির উর্ধ্বে। তাঁকে ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম লেখক হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। তাঁর কোন কোন গ্রন্থ স্বীয় বিষয়বস্তুর উপর বিশ্বকোষের মর্যাদা রাখে। তৎকৃত তফসীরে জালালায়ন-এর প্রথম অর্ধাংশ শতাব্দীর পর শতাব্দী পাঠ্য পুস্তক হিসাবে পঠিত হয়ে আসছে এবং আজ পর্যন্ত তাঁর নামকে চির অমর করে রেখেছে।

এই শতাব্দীতে মিসর, সিরিয়া ও ইরাকে হাদীস ও রিজালশাস্ত্র, ইরানে যুক্তিশাস্ত্র ও দর্শন, তুর্কিস্তান ও ভারতবর্ষে ফিকহ শাস্ত্রের (হানাফী) জোর ছিল এবং একেই মর্যাদার মাপকাঠি ও একেই কামালিয়াতের সর্ব্বোচ্চ দর্জা মনে করা হত। মিসরে সহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ কাসতাল্লানী (মৃ.৯২৩ হি.), শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী (মৃ.৯২৫ হি.) তুরস্কে তফসীর প্রণেতা আল্লামা আবুস সুউদ (মৃ.৯৫২ হি.), হেজাযে আস-সাওয়াইকুল-মুহরিকাসহ আরও বহু গ্রন্থের লেখক আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী (মৃ.৯৭৪ হি.), কানযু'ল-উম্মাল-এর লেখক আল্লামা আলী মুত্তাকী

(মৃ.৯৭৫ হি) জ্ঞানমার্গের এক একজন উজ্জল জ্যোতিষ্কস্বরূপ ছিলেন এবং তৎকালীন বিশ্বের এক বিরাট অংশকে রত্নসম তাঁদের অমূল্য জ্ঞানরাজি বিতরণ পূর্বক উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছিলেন। মশহূর মুহাক্কিক ও মুনসিফ (কাযী, বিচারক) হানাফী আলিম ও গ্রন্থকার মোল্লা আলী কারী আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশে জন্মগ্রহণ করলেও মক্কা মু'আজ্জমাকে বসবাসের জন্য নির্বাচিত করে এক বিরাট জগতকে স্বীয় ইল্ম দ্বারা ধন্য ও উপকৃত করেন। ১১শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁর ইনতিকাল হলেও তাঁর জ্ঞানগত ও কিতাবী (লেখনী) খেদমতের কাল হিজরী দশম শতাব্দীই ছিল। এই শতাব্দীর শেষ ভাগে বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক আল্লামা কুতবুদ্দীন নহরওয়ালী[১] মক্কী ('আল-আ'লাম ফী আখবারি বায়তিল্লাহি'ল-হারাম' নামক গ্রন্থের প্রণেতা) ৯৯০ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। এই মনীষীর জন্মও হয়েছিল ভারতবর্ষের মাটিতেই এবং তুরস্ক ও হেজাযের সুল-তান ও আমীর-উমারা যাঁর যোগ্যতার যথাযথ সম্মান ও স্বীকৃতি দেন।

ইরান ভূখণ্ড আল্লামা জালালুদ্দীন দাওওয়ানী (মৃ. ৯১৮ হি.), মোল্লা ইমাদ ইবন মাহমূদ তারিমী (মৃ. ৯৪১ হি.) এবং আল্লামা গিয়াছুদ্দীন মনসূর (মৃ. ৯৪৮ হি.)-এর জন্য স্বভাবতই গর্ব করতে পারে যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন যাঁর প্রবল তরঙ্গ ভারতবর্ষ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এই যুগের শেষ পাদের বড় বড় উলামায়ে কিরামের ভেতর ছিলেন শায়খ মুহাম্মদ ইবন আশ-শায়খ আবি'ল-হাসান সিদ্দিকী আশ-শাফিঈ আশ'আরী মিসরী যাঁকে "আল-উস্তাযুল আজম" এবং "কুতুবুল-'আরিফীন" উপাধিতে স্মরণ করা হয়ে থাকে। তিনি বিস্ময়কর ও অত্যদ্ভুত সব বিষয় ও টিকা-টিপ্পনী বর্ণনার ক্ষেত্রে তুলনাহীন ছিলেন এবং আয়াতে পাকের সম্পর্ক নির্ধারণে এবং কুরআন পাকের তফসীর, হাদীস ও ফিকহ-এর ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি ছিল না। মিসরের বিখ্যাত জামি আযহার-এ তিনি দরস প্রদান করতেন। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা চতুর্দিক থেকে পতঙ্গের মতই এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত। এরই সাথে তিনি বিরাট বাতেনী জ্ঞানের অধিকারী, তরীকতের পীর ও সাহিত্যিক ছিলেন।[২] ১৯৯৩ হিজরীতে তাঁর ইনতিকাল হয়। ঠিক তেমনি প্রখ্যাত ভারতীয় মুহাদ্দিস রহমতুল্লাহ ইবন 'আবদুল্লাহ সিন্ধী হানাফী (মৃ. ৯৯৪ হি.) হেজাযে বসে হাদীসে নববী (সা)-র

---

১. নহরওয়ালা নহলওয়াড়ার আরবী রূপান্ত পট্টন (গুজরাট)-এর পুরনো নাম। ৪১৬ হিজরীতে সুলতান মাহমূদ গযনবী একে জয় করেন।

২. বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন 'আন্-নূরুস সাফির' ৪১৪ পৃ.

ব্যাপক প্রসার ঘটান এবং হাদীসশাস্ত্রে স্বীয় যোগ্যতা ও প্রতিভার স্বীকৃতি আদায় করেন। মালিকুল উলামা আল্লামা ওয়াজীহুদ্দীন ইবন নসরুল্লাহ গুজরাটী যিনি অর্ধ শতাব্দী ধরে ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের নানা শাখায় দরস প্রদান করেন। তাঁর ছাত্ররা এক শতাব্দীর অধিককাল পঠন-পাঠনের সিলসিলায় তৎপর থাকে। এই শতকের শেষ অর্ধেক তিনি আলোকোজ্জ্বল প্রভা বিস্তার করে রাখেন এবং এই শতকের একেবারে শেষ দিকে ইনতিকাল করেন (৯৯৮ হি.)। সে সময় য়ামন ছিল হাদীস বর্ণনা ও সনদের ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ কেন্দ্র এবং য়ামানী মুহাদ্দিস তাহির ইবন হুসায়ন ইবন 'আবদির রহমান আল-আহদাল দরস প্রদানের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। উল্লিখিত ৯৯৮ হিজরীতেই তিনি ওফাতপ্রাপ্ত হন।[১]

এই আমলেই ভারতবর্ষে ইরানের মনীষীবর্গের আগমন শুরু হয়ে গিয়েছিল যাঁরা 'আল্লামা জালালুদ্দীন দাওওয়ানী, মোল্লা ইমাদ ইব্‌ন মাহমূদ তারিমী এবং মীর গিয়াছুদ্দীন মনসূরের ফয়েযপ্রাপ্ত ছিলেন। সম্রাট হুমায়ূন-এর শাসনামলে মওলানা যয়নুদ্দীন মাহমূদ কামানগীর বাহদাঈ (মওলানা জামী ও মওলানা আবদুল গফূর লারীর ছাত্র) ভারতে আসেন। সম্রাট তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করেন। সম্রাট আকবরের যমানায় হাকীম আবুল ফাতাহ গীলানী, হাকীম হুমায়ূন (হাকীম হুমাম) এবং নূরুদ্দীন কারারী নামের বিজ্ঞ তিন ভ্রাতা গীলান থেকে আগমন করেন এবং রাজদরবারে প্রভাব সৃষ্টি করেন। কিছুকাল পর মোল্লা মুহাম্মদ য়াযদী বিলায়েত (ইরান) থেকে আগমন করেন। আমীর ফতহুল্লাহ শীরাযীও বিজাপুর অবস্থানের পর সম্রাট আকবরের দরবারে যোগ দেন এবং দরবারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। তিনি ছিলেন মীর গিয়াছুদ্দীন মনসূরের শাগরিদ। ৯৯৩ হিজরীতে তিনি সভাপতি (صدر) পদে বরিত হন। ভারতবর্ষে ইরানী আলিমদের রচনাবলী তাঁরাই নিয়ে আসেন। তাঁরা এখানকার নিসাব (পাঠ্যক্রম বা পাঠ্যসূচী) এবং পাঠ দানের তরীকা বা পন্থার উপর এত গভীর প্রভাব ফেলেন যা শেষাবধি দরস-ই নিজামী নামে পরিবর্তিত উন্নত সংস্করণে রূপ নেয় এবং যা ভারবর্ষের 'ইলমী ও দরসী (শিক্ষিত ও জ্ঞানী) মহলে আজও প্রভাব জাঁকিয়ে আছে।[২]

এ যুগেই বিশেষত দক্ষিণ ভারতে, নীশাপুর, আগ্রাবাদ, জুর্জান, মাযেনদারান ও গীলানের বহু বিজ্ঞ মনীষী ও সাহিত্যিকের নাম পাওয়া যায় দরবারে যাঁদের

১. তার জীবন কাহিনী ও কামালিয়াত সম্পর্কে জানতে আল্লামা ইবন আলী শওকানীর গ্রন্থ البدر الطالع পড়ুন।

২. বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন সায়্যিদ আবদুল হাই হাসানী কৃত الثقافة الاسلامية فى الهند।

প্রভাব ছিল।[১]

আফগানিস্তান তার সৈনিকবৃত্তি ও তলোয়ারবাজির সাথে সাথে 'ইল্ম ও দরস (জ্ঞান ও পঠন)-এর সম্পদ থেকেও বঞ্চিত ছিলনা। কাযী মুহাম্মদ আসলাম হারাবী ১০৬১ হিজরীতে, ভারতবর্ষের মাটিতেই যাঁর ইনতিকাল হয়েছিল, হেরাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং আফগানিস্তানেই মওলানা মুহাম্মদ ফাযেল বাদাখ-শানীর নিকট ইল্ম হাসিল করেন। মওলানা মুহাম্মদ সাদিক হালওয়াইও সে সময় আফগানিস্তানের অন্যতম প্রখ্যাত 'আলিম ছিলেন। হেরাত ইরান সীমান্তে অবস্থিত হবার কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র (মারকায) ছিল এবং এর সন্তানদের ভেতর কাযী মুহাম্মদ আসলাম হারাবী এবং তাঁরই নামকরা ও কৃতবিদ্য সন্তান মওলানা মুহাম্মদ যাহিদ (যিনি ভারতের শিক্ষকমহলে অত্যন্ত পরিচিত ও মশহূর ব্যক্তিত্ব) দর্শন শাস্ত্রে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেন। অনেককাল পর্যন্ত শেষোক্ত জনের তিনটি টীকাগ্রন্থ, যা زواهد ثلاثة নামে মশহূর—আলিম-'উলামা ও শিক্ষকমহলের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ও মর্যাদার মাপকাঠি হয়ে আছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণের ও উপকৃত হবার এই সম্পর্ক কেবল ইরানী মনীষী এবং বিলায়েতের উস্তাদদের সঙ্গেই অব্যাহত ছিল না, মিসর, হেজায এবং য়ামনের মুহাদ্দিছদের সাথেও কায়েম ছিল। শায়খ রাজেহ ইবন দাঊদ গুজরাটি (মৃ.৯০৪ হি.) আল্লামা সাখাবী থেকে হাদীস পাঠ করে ছিলেন। আল্লামা সাখাবী তাঁকে শায়খ মুহ্য়িউদ্দীন ইবন আরাবী সম্পর্কে শায়খ আল-'আলা আল-বুখারীর অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গি কি তা বলেছিলেন যাতে তিনি ভারতীয় মাশায়েখ ও উলামায়ে কিরামকে তা অবহিত করেন এবং শায়খ-ই আকবর সম্পর্কে তারা যে সুধারণা পোষণ করেন তার নিরসন হতে পারে।[২] আল্লামা সাখাবী الضوء اللامع নামক গ্রন্থে তাঁর এই ভারতীয় শাগরিদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং তাঁর জ্ঞানবত্তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। স্বীয় যুগের হাদীস শাস্ত্রের ইমাম 'কানুয'ল-'উম্মাল'-এর লেখক শায়খ 'আলী ইবন হুসসামুদ্দীন আল-মুত্তাকী যাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে,'সুয়ূতীর দান সমগ্র দুনিয়ার উপর এবং আলী মুত্তাকীর দান রয়েছে স্বয়ং সূয়তীর উপর—আল্লামা আবুল হাসান আশ-শাফিঈ আল-বিকরী, মক্কার হারাম শরীফের মুদাররিস এবং আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে হাজার মক্কী, মুফতী ও মুহাদ্দিছ-ই মক্কার ছাত্র ছিলেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আপনি নিশ্চয় পরিমাপ করতে পেরেছেন যে, ভারতীয় উপমহাদেশ সমুদ্র ও গগনচুম্বী পাহাড়-পর্বত বেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও

১. বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন নু.খা. ৪র্থ খণ্ড;

২. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৪র্থ খণ্ড।

(বেলুচিস্তানের বোলান এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্তের খাইবার গিরিপথই যার বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম) জ্ঞানগত ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বহির্বিশ্বের সাথে একেবারে সম্পর্কচ্যুত ছিল না। শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের ধারা অব্যাহত ছিল যদিও এধারায় শিক্ষা প্রদানের চেয়ে গ্রহণ এবং রফতানীর চেয়ে আমদানী কার্যক্রম বেশী ছিল এবং এমনটি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কেননা ভারতবর্ষে দীন ও ইল্ম দুটোই তুর্কিস্তান ও ইরানের পথ ধরেই পৌছেছিল।

মানসিক অস্থিরতা এবং আকীদার ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত চিন্তা

কিন্তু দশম শতাব্দীর রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও জ্ঞানগত পর্যালোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে যদি সেই মানসিক অস্থিরতা এবং আকীদাগত বিক্ষিপ্ত ও বিশৃংখল অবস্থার কথা আলোচনা না করি যা সেই যুগে ভারতবর্ষে এবং তার প্রতিবেশী দেশগুলোতে কোথাও কোথাও পাওয়া যেত যাতে করে উক্ত শতাব্দীর সঠিক অবস্থা আমাদের সামনে এসে যায় এবং এই ভুল বোঝাবুঝিও না থাকে যে, জীবন-নদী যা হাযারো মাইলের দূরত্বে প্রবাহিত হচ্ছিল পরিপূর্ণ শান্ত ছিল যার ভেতর দীনের তা'লীম ও তার প্রচার এবং আখলাক ও রূহানিয়াত (চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা)-এর প্রশিক্ষণ ও উন্নতির নৌকা পরিপূর্ণ ও নিরুদ্বেগ প্রশান্তির সাথে চালনা করা যেতে পারে এবং কোন প্রকার তরঙ্গাঘাতে কিংবা ঘূর্ণাবর্তে এর নিমজ্জিত হবার আশংকা ছিল না। যদি এমনটি হত তাহলে ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও নবজাগরণের পরিবর্তে তা'লীম ও তরবিয়ত 'তথা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ' এবং নশর ও ইশাআত তথা প্রচার-প্রসার- এই শিরোনামই এর জন্য অধিকতর উপযোগী ছিল। ভারতবর্ষ ইসলামের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (পবিত্র হেজায ভূমি, মিসর, সিরিয়া ও ইরাক) থেকে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত হবার কারণে, তুর্কিস্তান ও ইরান হতে ইসলাম এখানে পৌঁছুবার দরুন, তদুপরি আরবী ভাষার প্রচলন না হওয়াতে, বিশেষত ইলমে হাদীস (যদ্দ্বারা দীনের সহীহ রূহ, সুন্নত ও বিদ'আতের পার্থক্য, আমর বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার তথা সৎকাজে আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ-এর প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি এবং বিশুদ্ধ ধর্মীয় খতিয়ান নেওনের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়)-এর প্রচার না হওয়া , হজ্জ ও ইল্ম হাসিলের জন্য বাইরের দেশগুলোতে সফরের কষ্ট-ক্লেশ, ইসলাম অনুসারীদের বিপুল সংখ্যক অমুসলিম জনগোষ্ঠী কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকা (যারা নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসে কট্টর গোড়া, অমুসলিম রসম-রেওয়াজ তথা প্রথা-পদ্ধতির কঠোর অনুসারী এবং সীমাতিরিক্ত কল্পনাপুজারী) ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে বিশৃংখল ও অরাজকতাপ্রিয় দাওয়াত, বিভ্রান্ত

ফের্কা এবং ভাগ্যান্বেষী ধর্মীয় নেতাদের সহজ শিকারে পরিণত করে। এই পর্যায়ের একটি রূপ ছিল শী'আ মতবাদের সেই কট্টর ও আক্রমণাত্মক অবয়ব যা ইরানীদের প্রভাবে দক্ষিণ ভারতের কতক স্থানে ও কাশ্মীরে জন্ম নেয়। হিজরী দশম শতাব্দীর মধ্য ভাগে আহমদ নগর সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা বুরহান নিজাম শাহ শায়খ তাহির ইবনে রাদী ইসমাঈল কাযভীনির প্রভাবে (যিনি ইরান থেকে শাহ ইসমাঈল সাফাবীর ভয়ে আহমদ নগর পালিয়ে এসেছিলেন) শী'আ মতবাদ কবুল করেন এবং এতে বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত করে ছাড়েন। এমনকি তিনি মসজিদ, খানকাহ, হাটবাজার ও সড়কগুলোতে প্রকাশ্যভাবে খলীফাত্রয় (আবূ বকর, ওমর ও উসমান রা)-এর উপর অভিশাপ বর্ষণের নির্দেশ দেন। এই দায়িত্ব সম্পাদনকারীদের বিরাট অংকের বেতন-ভাতা বরাদ্দ করা হয়। আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের বহু লোককে হত্যা ও বন্দী করা হয়।[১] অপর দিকে মীর শামসুদ্দীন ইরাকীর চেষ্টায় কাশ্মীরে শী'আ মতবাদ বিস্তার লাভ করে। তিনি শী'আ মতবাদ প্রচারে অত্যন্ত তৎপরতা প্রদর্শন করেন। কথিত আছে যে, তার চেষ্টায় চৌত্রিশ হাজার হিন্দু শী'আ মতবাদ গ্রহণ করে। এও কথিত আছে যে, তিনি একটি নতুন ধর্মের পত্তন করেন যার নাম ছিল নূর বখশী। ফিকহ শাস্ত্রে একটি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন যার মসলা-মাসায়েল না আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের মসলা-মাসায়েলের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল, না ইমামিয়া ফের্কার সাথেই সংগতিপূর্ণ ছিল। এও কথিত আছে যে, কাশ্মীরে একটি নতুন ফের্কার উদ্ভব ঘটে যার 'আকীদা ছিল যে, সায়্যিদ মুহাম্মদ নূর বখ্‌শ প্রতিশ্রুত মাহদী।[২]

৯৫০ হিজরীতে পারস্য সাম্রাজ্যের সমর্থন ও সামরিক সাহায্য লাভের জন্য সম্রাট হুমায়ূন পারস্য সম্রাটের দ্বারস্থ হন। এ সময় শাহ তাহমাস্প ছিলেন পারস্য সম্রাট। পারস্য সম্রাট হুমায়ূনকে শী'আ মতবাদ কবুলের অনুরোধ জানান। হুমায়ূন সম্রাটকে একটি কাগজের উপর শী'আ মতবাদের আকীদাসমূহ লিখে দিতে বলেন। অতঃপর তিনি লিখিত আকীদাসমূহ পাঠ করেন। সম্রাটের ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের যদিও কোন নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই, কিন্তু এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, ইরানে অবস্থান, শাহানশাহ-ই ইরানের বদান্যতামূলক মেযবানী ও মুসাফির প্রীতি এবং তাঁর উদার সামরিক সাহায্যের প্রতিদান হিসেবে কৃতজ্ঞতার দিনর্শনস্বরূপ তাঁর হৃদয় কন্দরে শী'আ ইছনা 'আশারী মযহাবের জন্য

---

১. বিস্তারিত জানতে চাইলে দ্র. মুহাম্মদ কাসিম বিজাপুরী লিখিত "তারীখে ফিরিশতা" (গ্রন্থকার ইছনা আশারিয়া ফের্কাভুক্ত ছিলেন)।

২. প্রাগুক্ত;

একটি সুকোমল আশ্রয় অনিবার্যভাবেই সৃষ্টি হয়ে থাকবে যা তাঁর গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসী তৈমূরী বংশধরদের হৃদয়ে (যাঁরা গোঁড়া বিশ্বাসী সুন্নী হানাফী ছিলেন এবং তাঁদের কেউ কেউ নকশবন্দিয়া তরীকার বুযুর্গদের মুরীদ হিসাবেও সম্পর্কিত ছিলেন) পাওয়া যেত না। হুমায়ূনের সাহায্যের জন্য ইরান থেকে কিযিলবাশ আমীরগণ এসেছিলেন। হুমায়ূন স্বয়ং নেক দিল, মার্জিত ও সভ্য মানুষ ছিলেন। সর্বদাই তিনি বা-ওযূ থাকতেন। পাক-পবিত্র অবস্থা ব্যতিরেকে তিনি আল্লাহ রসূলের নাম নিতেন না। লাইব্রেরীর সিঁড়ি থেকে নামতে গিয়ে যেখানে আযান শ্রবণের সম্মানার্থে বসে পড়েছিলেন, পা পিছলে পড়ে যান। অতঃপর এই আঘাতেই তিনি ১৫ই রবীউ'ল-আওয়াল ৯৬৩ হি.-তে ইনতিকাল করেন।

তাঁর বিশিষ্ট আমীর-উমারা ও সাম্রাজ্যের সদস্যবর্গের ভেতর বৈরাম খান খানান ছিলেন অতি উত্তম ও বহু সদগুণবিশিষ্ট আমীর ও সর্দার। কোমল হৃদয়, জুমু'আ ও জামা'আতের পাবন্দ, উলামা ও বুযুর্গানের দীনের কদরদান ছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি ছিলেন তাফযীলী (تفضیلی)। তাঁর বিখ্যাত উক্তি ঃ

شہے کہ بگذرداز نہ سپہر افسر او * اگر غلام علی نیست خاك برسر او

যে সম্রাটের আধিপত্য ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল অতিক্রম করে, সেও যদি আলী (রা)-এর গোলাম হয়, তবে তার মাথায় ধুলি নিক্ষিপ্ত হোক।

মীর শরীফ আমেলী বিজ্ঞান ও দর্শনে অত্যন্ত বিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন। তিনি সম্রাট আকবরের আমলে ভারতবর্ষে আসেন। আকবর তাঁকে অত্যন্ত সমাদর করেন। ৯৯৩ হি.-তে প্রথমে কাবুল, অতঃপর ৯৯ হিজরীতে বাঙলার সভাপতি (صدر) পদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে আজমীর ও মোহানে জায়গীর প্রদান করেন। "মাআছিরুল-উমারা"-র লেখক খাফী খানের বর্ণনা মুতাবিক তিনি ধর্মদ্রোহিতামূলক ধ্যান-ধারণা পোষণ করতেন। তাসাওউফকে দর্শন শাস্ত্রের সঙ্গে মিশ্রিত করেন এবং সম্রাট ও সৃষ্টির একই অস্তিত্ব এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন।

ভারতবর্ষে দু'টি আন্দোলন ছিল খুবই বিশৃঙখলপ্রিয় এবং ইসলামী জীবনাদর্শের পক্ষে বিপজ্জনক ও ধ্বংসাত্মক। এর ভেতর একটি ছিল যিকরী আকীদা ও ফের্কা। এর বুনিয়াদ ছিল এই আকীদার উপর যে, হিজরী ১ম সহ-স্রাব্দে নবুওতে মুহাম্মদীর সমাপ্তি এবং ২য় সহস্রাব্দ থেকে একটি নতুন নবুওত ও হেদায়াতের সূচনা ঘটবে। এই আন্দোলন বেলুচিস্তানে শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়। কিন্তু তারা যাকে পয়গম্বর হিসেবে মান্য করত তার ভাষায় ৯৭৭ হিজরীতে আটক নামক স্থানে তার আবির্ভাব ঘটে। এই ফের্কার কিতাব "যিকরী কৌন

হ্যায়?" (যিকরী কারা?)-এর গ্রন্থকার যিকরিয়া ফের্কার প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা মুহাম্মদ-এর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন ঃ

"তিনি সোমবার ৯৭৭ হিজরী ভোরবেলা কুতব শহর থেকে যমীনের দিকে মানবীয় আকৃতিতে ফকীরী লেবাসে আটকের পাহাড়ী এলাকায় একটি উঁচু পাহাড়ের উপর কদম মুবারক স্থাপন করত আবির্ভূত হন।"[১]

যিকরীগণ মোল্লা মুহাম্মদকে শেষ নবী, সর্বোত্তম রসূল এবং প্রথম ও শেষ নূর হিসাবে মানে। 'মূসানামা' নামক হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে ঃ

حق تعالی گفت اے موسی بعد از مہدی پیغمبر دیگر نیہا فریدم نور اولین و آخرین همیں است که پیدا خواهم کرد ـ

"আল্লাহ তা'আলা বললেন যে, হে মূসা! মাহদীর পর আর দ্বিতীয় কাউকে পয়গম্বর করি নাই; মাহদী হল পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের নূর যাকে আমি সৃষ্টি করব।" (১১৮ পৃ.)

এই ফের্কার পুস্তকাদি যেমন 'মি'রাজনামা' (হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি), ছানা-ই-মাহদী (মুদ্রিত), সফরনামা-ই মাহদী, যিকর-ই ইলাহী প্রভৃতিতে এমন সব সুস্পষ্ট বাক্য (ইবারত) স্থান পেয়েছে যদ্দ্বারা মোল্লা মুহাম্মদের পাপমুক্তি ও পবিত্রতা এবং তার সম্পর্কে এমন সব বাড়াবাড়িপূর্ণ আকীদা-বিশ্বাস প্রকাশ পায় যদ্দ্বারা সমস্ত আম্বিয়া-ই কিরামের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব এবং নবী করীম (সা)-এর উপর তার ফযীলত ও মর্যাদা, দুঃসাহস, অপবাদ আরোপ ও সৃষ্টি এবং মনগড়া ও আজগুবী ধরণের নানা রকম প্রতারণার আশ্চর্য সব নমুনা জাহির হয়। তারা নিজেদের একটি স্থায়ী কালেমাও তৈরী করেছিল যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

لا اله الا الله نور پاك محمد مهدى رسول الله

অর্থ ঃ "আল্লাহ ব্যতিরেকে আর কোন ইলাহ নেই, নূর পাক মুহাম্মদ মাহদী আল্লাহ্র রসূল।" যারা সালাত আদায় করত তাদেরকে তারা কাফির বলত এবং তাদেরকে নিয়ে হাসি-মস্করা করত।[২] তদ্রূপ সওম (রোযা), হজ্জ, যাকাতকেও তারা ইনকার (অস্বীকার,প্রত্যাখ্যান) করত। বায়তুল্লাহর হজ্জের পরিবর্তে কোহে মুরাদ-এর হজ্জকে তারা জরুরী বিবেচনা করত।[৩] 'তারীখ খওয়ানীন-ই বালুচ'

১. "যিকরী কৌন হ্যাঁয়"? পৃ. ১৩
২. ইতিকাদনামা, হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি।
৩. যিকরী লেখকেদের লিখিত গ্রন্থ 'যিকরে তাওহীদ', 'মায় যিকরী হুঁ' 'তাফসীর যিকরুল্লাহ' ও মাযকূরাতুস সদর দ্র.। আরও দ্র. বালুচিস্তান ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার; এতে পরিষ্কার বিবৃত হয়েছে যে, তাদের ও আহলে সুন্নাহ্র আকীদার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। ১১৬পৃ.

নামক গ্রন্থে রয়েছে যে, বালূচিস্তানের কিছু এলাকায় যিকরীর ন্যায় ইসলাম বিরোধী মযহাব চালু ছিল এবং যিকরীরা মুসলমানদেরকে নামাযী বলে এদেরকে হত্যার যোগ্য মনে করত। মীর নাসীর খান আ'জম একদিকে শরীয়তে মুহাম্মদীর প্রচলন ঘটান এবং অপর দিকে যিকরীদের ইসলাম দুশমনী ও শির্ক প্রতিপালনের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত জিহাদের ক্রমিক ধারা অব্যাহত রাখেন যতক্ষণ পর্যন্ত না রক্তাক্ত ও চূড়ান্ত যুদ্ধের পর এই বিদ'আতকে পরিপূর্ণরূপে ও জড়ে মূলে উৎখাত করা হয়েছে।[১]

ভারতবর্ষে অপর সংশয়যুক্ত ফেরকা ছিল রৌশনাইয়া ফের্কা। পাঠানদের পতনোম্মুখ শক্তিকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দান এবং মুগলদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাকে প্রতিহত করবার জন্য এই ফের্কা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[২] তারা এই যুগের লেখকদের বর্ণনাসমূহকে ভাবনাযোগ্য ও গবেষণার মুখাপেক্ষী বানিয়ে দিয়েছে যে, তাদের ভেতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কতটা সক্রিয় ছিল এবং ঐতিহাসিক সত্য ও বাস্তবতা ছিল কতটা? এই ফেরকার অনুরাগী ভক্ত ও সমর্থক এবং এর বিরোধীদের বর্ণনা ও বিবৃতি এতটা পরস্পরবিরোধী যে, একজন এই ফেরকার প্রতিষ্ঠাতাকে "পীর-ই রওশন" বা আলোর পীর নামে স্মরণ করে, অপরজন "পীর-ই তারীক" বা অন্ধকারের পীর বলে। এই ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা হলেন বায়েযীদ আনসারী যিনি পীর-ই রৌশাঁ (বা রৌশন) নামে কথিত। তার পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ। ৯৩১ হিজরীতে জলন্ধরে (বাবর কর্তৃক মুগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার এক বছর পূর্বে) জন্মগ্রহণ করেন। তার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের প্রাথমিক দিনগুলো পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অভিভাবকদের অমনোযোগিতার মাঝে অতিবাহিত হয় এবং এজন্য তার শিক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়। কোন এক সফর কালে (কোন কোন বর্ণনানুসারে) সুলায়মান ইসমাঈলীর সঙ্গে তার সাক্ষাত ঘটে। বলা হয়ে থাকে যে, তার যোগী-সন্যাসীদেরও সাহচর্য

১. তারীখে বালুচ ঃ এই বিষয়ে দ্র. 'রিসালা আল-হক' (আকুড়া খটক)-এর ১০৭৯ সালের সংখ্যার একটি নিবন্ধ থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে যা দারুল উলূম তিরবত, বালুচিস্তানের সদর মুদাররিস মওলানা আবদুল হক কর্তৃক লিখিত। আরও দেখুন ১৯৮০ সালের "আল-হক" পত্রিকার জানুয়ারী সংখ্যার ذکری مذهب کا تفصیلی جائزہ শীর্ষক নিবন্ধ।

২. এই যুগে তাসাওউফের প্রভাব ও অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা দৃষ্টে কোন কোন দূরদর্শী ও উৎসাহী লোকের এই ধারণা অমূলক নয় যে, একে পাঠানদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং তাদেরকে একটি মযহাবী আন্দোলনের পতাকাতলে একত্র পূর্বক মুগল হুকুমতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত করা এবং এর দ্বারা আফগানদের অপসূয়মান ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে কাজে লাগানো হয়।

লাভ ঘটেছিল। তার জীবনীকারদের বর্ণনা মুতাবিক তিনি স্বপ্ন দেখতে থাকেন এবং অদৃশ্য লোক থেকে আওয়াজ শুনতে পান। তিনি যিকর-ই খফীতে মগ্ন হন এবং কিছুকাল পর ইসমে আ'জম জপতে গিয়ে ইসতিগরাকী হালতে উপনীত হন। যখন তিনি একচল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছেন তখন অদৃশ্য স্থান থেকে জনৈক আহবানকারী তাকে ডেকে বলে, এখন তাকে শরঈ পাক- পবিত্রতা বর্জন করতে হবে এবং মুসলমানদের নামাযের পরিবর্তে তাকে আম্বিয়া-ই কিরামের নামায পড়তে হবে।[১] এরপর তিনি সকলকে মুশরিক ও মুনাফিক ভাবতে থাকেন এবং চিল্লাকাশী শুরু করেন। এরপর তিনি প্রকাশ্যে তাবলীগের নির্দেশ প্রাপ্ত হন। ইমাম মাহদী হবার দাবী এবং ইলহামে রব্বানীর অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে।[২] তার মুরীদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। কতিপয় লোককে তিনি তার খলীফা নিযুক্ত করেন যাতে তারা তবলীগের কাজের আরও বেশী বিস্তার ঘটায়।

কিন্তু তার রচনা সিরাতুত-তওহীদ নামক গ্রন্থে তার যে তা'লীম বা শিক্ষামালা এসেছে তাতে একে তাসাউওফের প্রতি আসক্তির অতিরিক্ত তা'লীম ও বাড়াবাড়িপূর্ণ আত্মপরিচিতির ফল বলে মনে হয় যা কোন কামিল শায়খ এবং কুরআন ও সুন্নাহর গভীরতর ইল্‌ম ব্যতিরেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজে নিজে রিয়াযত ও মুজাহাদাকারীদের ভেতর জন্ম নেয়। এ গ্রন্থে তাদের কতক উসূল (মূলনীতি) ও আকীদা-বিশ্বাস বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলো সম্ভবত তার যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিধান যা সে যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত যখন তিনি মুগল ও তার বিরোধী আফগান গোত্রগুলোর সঙ্গে সংঘর্ষরত ছিলেন।

বায়েযীদ আনসারী পেশাওয়ার সন্নিহিত এলাকায় কতিপয় আফগান গোত্রকে নিজের ভক্ত মুরীদ বানিয়ে নেন। মেহমান্দযাই গোত্রেও তিনি তার মতবাদ প্রচারের কাজ শুরু করেন। সিন্ধী ও বেলুচীদের ভেতরও তার প্রভাব বিস্তার শুরু হয়। পীর ও উলামায়ে কিরামের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তার বিস্ময়কর সাফল্য লাভ ঘটে। শায়খ বায়েযীদ তার দাঈ ও প্রচারক দল প্রতিবেশী দেশগুলোর

---

১. কিন্তু স্বয়ং শায়খ বায়েযীদ তার কিতাব মকসুদুল মু'মিনীন নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, শরীয়ত হল গাছের বাকলের ন্যায় এবং বাকল ব্যতিরেকে গাছের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় (পৃ. ৪৪৪, হস্তলিখিত পাণ্ডু. পাঞ্জাব বিশ্ব. লাইব্রেরী)।

২. শায়খ বায়েযীদ স্বয়ং এ কথা প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, তিনি মাহদী। কাবুলের কাযী খান ও তার ভেতর যে বিতর্ক হয়েছিল উক্ত বিতর্কের বিবরণীতে এটি স্থান পেয়েছে (পাঞ্জাব বি. বি. রক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে)।

শাসনকর্তা, আমীর-উমারা ও আলিমগণের নিকট পাঠান। তাদের ভেতর একজন সম্রাট আকবরের দরবারেও আসে। তার জীবনের শেষ আড়াই বছর মুগলদের সঙ্গে যুদ্ধে অতিবাহিত হয় এবং ৯৮০ হিজরীতে কালাপানি নামক স্থানে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন ও হশত নগরে সমাহিত হন। তার লিখিত গ্রন্থের ভেতর তিনটি গ্রন্থ খায়রুল-বয়ান, মকসূদুল-মু'মিনীন ও সিরাতুত-তাওহীদ বর্তমান। এতে তৎকর্তৃক সৃষ্ট ফের্কার মূলনীতি ও আকীদা-বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। এর ভেতর 'খায়রুল-বয়ান' এবং 'মকসুদুল-মু'মিনীন' তার অনুসারীদের নিকট প্রায় পবিত্র গ্রন্থের মর্যাদা রাখে। তার সবচেয়ে বড় বিরোধী ছিলেন আখুন্দ দরবীযাহ যিনি সায়্যিদ 'আলী তিরমিযী (পীর বাবা নামে পরিচিত ও বিখ্যাত, ৯৯১ হিজরীতে মৃত্যু)-র মুরীদ ছিলেন। তিনি তার প্রত্যাখ্যানে 'মাখযানুল-ইসলাম' নামে একটি কিতাব লিখেন। হালনামা পীরই দস্তগীর (ফারসী) নামে শায়খ বায়েযীদের একটি আত্মজীবনী রয়েছে। এটি আলী মুহাম্মদ মুখলিস পরিবর্ধনসহ বিন্যস্ত করেন।

ভেতর ও বাইরের যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে, অধিকন্তু আলিম-উলামার প্রবল বিরোধিতার দরুন এবং এ জন্যও যে, তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল বিধায় এই ফের্কার লোকেরা হ্রাস পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত একেবারেই নাম-নিশানাহীন হয়ে যায়।[১]

'দাস্তান তুর্কতাযান-ই হিন্দ' গ্রন্থের লেখক মির্যা নসরুল্লাহ খান ফিদাঈ দৌলত ইয়ার জঙ্গ এই ফের্কার পরিচিতি পেশ করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"রৌশনাঈ একটি ফের্কার নাম, বায়েযীদ নামক একজন ভারতীয় এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সে আফগান (পাঠান)-দের ভেতর গিয়ে পয়গম্বরীর দাবী করে ও নিজেকে রৌশনাঈ পয়গম্বর হিসাবে পরিচয় দেয় এবং তাদেরকে স্বীয় অনুসারী বানায়। সে আসমানী সহীফাসমূহকে বর্জন করে এবং আল্লাহ্র ইবাদত পরিত্যাগ করে। তার কথাবার্তা থেকে জানা যায় যে, সে ওয়াহদাতুল-ওজুদ মতবাদের সমর্থক ছিল।[২] তার 'আকীদা ছিল যে, সেই ওয়াজিবুল-ওজুদ ছাড়া আর কারুর অস্তিত্ব নেই। পয়গম্বর-ই 'আরাবী (সা.)-র প্রশংসা করত। লোকদের সে সুসংবাদ শোনাত যে, সেদিন খুবই নিকটবর্তী যেদিন গোটা পৃথিবী তার পায়ের তলে এসে যাবে।"

---

১. উর্দু দাইরায়ে মা'আরিফ-ই ইসলামিয়ার নিবন্ধকার অধ্যাপক ডঃ মাওলানা মুহাম্মদ শফী মরহুমের নিবন্ধ, ৪র্থ খণ্ড দ্র.।

২. ঐ যুগে এতে কোন নতুনত্ব ছিল না। সূফীদের অধিকাংশই (কমপক্ষে ভারতবর্ষে) এই আকীদায় চরমপন্থী ছিল। (গ্রন্থকার)

হালনামা নোশ্‌ত-ই বায়েযীদ থেকে জানা যায় যে, তার উপর ইলহাম হত এবং জিবরাঈল নাযিল হত তার কাছে। আল্লাহ্ তাকে নবুওত দ্বারা ধন্য করেন। সে স্বয়ং নিজেকে নবী মনে করত। নামায পড়ত, কিন্তু কিবলা নির্ধারণ জরুরী মনে করত না। فاينما تولوا فثم وجه الله (অনন্তর তুমি যেদিকেই মুখ ফিরাও না কেন সেদিকেই আল্লাহ্ বর্তমান) আয়াত দ্বারা এর পক্ষে দলীল পেশ করত। পানি দিয়ে গোসলের প্রয়োজন বোধ করত না। তার বিরোধীদেরকে হত্যা করা জায়েয মনে করত।[১] গ্রন্থকার এই পর্যায়ে তার এমন কিছু কিছু উক্তির বর্ণনা দিয়েছেন যা 'আরিফ ও সূফীসুলভ এবং যা সমালোচনা করবার মত নয়। কিন্তু এর সাথে ইসলাম বিরোধী ধ্যান-ধারণাও এতে রয়েছে।

"তার কাছে আত্মপরিচিতি ও খোদা পরিচিতি সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। যদি হিন্দুকে সে আত্মপরিচিত দেখতে পেত তাহলে তাকে মুসলমানের উপর অগ্রাধিকার দিত। মুসলমানদের থেকে জিযয়া নিত। উৎপাদিত খাদ্যশস্যের এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) বায়তুল মালে জমা করাত এবং অভাবী লোকদের ভেতর বণ্টন করত। তার সকল সন্তান-সন্ততি অন্যায়-অনাচার থেকে মুক্ত এবং জুলুম-নির্যাতন থেকে অনেক দূরে অবস্থান করত। আরবী, ফারসী, হিন্দী ও পশতু ভাষায় তার কতকগুলো গ্রন্থ রয়েছে। তার খায়রুল-বয়ান নামক গ্রন্থটি ৪টি ভাষায় লেখা যা 'আল্লাহ তা'আলা' তাকে সরাসরি সম্বোধন করেছেন এবং তার বিশ্বাস মতে এটি আসমানী কিতাবের মর্যাদায় সমাসীন।"[২]

সমসাময়িক ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, পীর বায়েযীদ আফগান (পাঠান)-দের এক বিরাট শক্তি সংগ্রহ করেছিলেন এবং কোহে সুলায়মানকে ঘাটি বানিয়ে খায়বার গিরিপথ দখল করে চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার উপর হামলা করা শুরু করেছিলেন। এই ফেতনা দমনের জন্য সম্রাট আকবর সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি তাদের উৎখাত করতে পারেননি। বায়েযীদের ইনতিকালের পর তৎপুত্র ও স্থলাভিষিক্ত মুগল সাম্রাজ্যের জন্য একটি হুমকি হিসাবে থেকেই যায়। রাজা মানসিংহ, বীরবল ও যয়েন খান তার বিরুদ্ধে সফলতা লাভে সক্ষম হননি। বীরবল এক সংঘর্ষে তো মারাই যান। ৯৯৫ হিজরীতে মানসিংহের একটি আক্রমণও রৌশনাঈদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ হয়। অবশেষে সম্রাট শাহজাহানের আমলে (হিজরী ১০৫৮) এই ফেতনা নির্মূল হয়।[৩]

১. দা. মা. ই. ৪র্থ খণ্ড ,৩০৪-৫ পৃ.।

২. হালনামায়ে বায়েযীদ দর দাবিস্তানে মাযাহিব থেকে উদ্ধৃত, মোল্লা হাসান খান কৃত, ৩০৯ পৃ.।

৩. দাস্তান-ই তুর্কতাযান-ই হিন্দ থেকে সংক্ষেপিত। দুঃখের বিষয় যে, অনুবাদ ও জীবনী গ্রন্থে তার সম্পর্কে কিছু পাওয়া যায় না।

মাহদীবাদ ঃ এই আমলের সবচে' কাঁপন সৃষ্টিকারী আন্দোলন ছিল মাহদীবাদ যার প্রতিষ্ঠাতা সায়্যিদ মুহাম্মদ (ইবনে য়ূসুফ) জৌনপুরী (জন্ম ৮৪৭ হি.)-র মৃত্যু যদিও ১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভে (হি. ৯১০) হয়েছিল, কিন্তু তার প্রভাব ১০ম শতাব্দীর শেষ অবধি বাকী ছিল। নিরপেক্ষ ইতিহাস অধ্যয়নের আ-লোকে একথা বলা যেতে পারে যে, দু'তিন শতাব্দীর ভেতর কোন ধর্মীয় দাওয়াত ও আন্দোলন এই উপমহাদেশে (আফগানিস্তানসহ) এত ব্যাপক ও বিস্তৃত আকারে এবং এত গভীর ও শক্তিশালী পর্যায়ে মুসলিম সমাজের উপর প্রভাবশালী হয়নি যতটা হয়েছিল এই দাওয়াত ও আন্দোলন। সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক ও লেখকগণ পক্ষে ও বিপক্ষে যা কিছু লিখেছেন সে সবের অধ্যয়ন থেকে আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছুচ্ছি ঃ

১. সায়্যিদ মুহাম্মদ জৌনপুরী ছিলেন অভ্যন্তরীণ ও সৃষ্টিগতভাবে সে সমস্ত উন্নত, সমর্থ ও শক্তিশালী মনমানসের অধিকারী লোকের অন্যতম যাঁরা বহুকাল পর জন্ম নিয়ে থাকেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি অত্যন্ত নির্ভীক ও সাহসী বীর পুরুষ, স্বীয় পরিবেশ ও যুগের অবস্থা সম্পর্কে অতৃপ্ত, আমরু বি'ল-মা'রূফ ও নাহী 'আনিল-মুনকার তথা সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যায় ও গর্হিত কর্মের ক্ষেত্রে কঠিন তিরস্কার ও কঠোর ভর্ৎসনায় অত্যুৎসাহী ছিলেন এবং এ জন্যই সে সময়ই তাকে 'আসাদুল-উলামা' (আলিমদের মধ্যে ব্যাঘ্রসদৃশ) উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তরীকত তথা অধ্যাত্ম জ্ঞানের তা'লীম শায়খ দানিয়াল-এর কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং কঠোর রিয়াযত ও মুজাহাদা করেন। পাহাড়-পর্বত ও বিভিন্ন উপত্যকায় বহুদিন নিভৃত জীবন যাপন করেন যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই (বিশেষত যখন কামিল শায়খ-এর তত্ত্বাবধান ও পথ-নির্দেশনা লাভ ঘটে না) এমন সব ঘটনা ও ইশারা-ইঙ্গিত ঘটে যদ্দরুন পদস্খলনের আশংকা ও কতক সময় ভ্রান্ত প্রতীতি জন্মে এবং এমন লোক যিনি তাহকীক-এর মকাম ও দৃঢ়তার স্তরে না পৌঁছেছেন তিনি শব্দসমষ্টিকে ভ্রান্ত স্থানে প্রয়োগ এবং অদৃশ্য ইঙ্গিতকে ভুল অর্থে মনে করতে পারেন। অনন্তর এ সময়েই কোন এক সফরে তিনি ইমাম মাহদী হবার দাবী করেন। এরপরও কয়েকবার নানা জায়গায় নিজেকে 'মাহদী মাও'ঊদ' বা প্রতিশ্রুত মাহদী হবার ঘোষণা দেন এবং তার উপর ঈমান আনার দাওয়াত জানান।

২. তিনি অতিরিক্ত রিয়াযত, বাতেনী শক্তি এবং আমর বি'ল-মা'রূফ-এর আবেগোদ্দীপ্ত প্রেরণার কারণে সর্বোচ্চ দর্জার প্রভাবের অধিকারী (صاحب تاثیر)

ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সাহচর্য, তাঁর কথাবার্তা ও বর্ণনা-বিবৃতি শ্রোতা ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের উপর যাদুর ন্যায় ক্রিয়া করত এবং সুলতান ও আমীর-উমারা থেকে নিয়ে সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট জন সকলের উপর বেখুদী (আত্মবিলোপ) ও আত্মবিস্মৃতির তরঙ্গ বয়ে যেত এবং তার জন্য বিরাট থেকে বিরাটতর পদমর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে বিদায় জ্ঞাপন, দেশ-দুনিয়া পরিত্যাগ করত তার সহগামী হওয়া এবং নিজেকে তার হাতে সোপর্দ করে দেওয়া তার জন্য সহজ হয়ে যেত। রাজধানী মাণ্ডোতে গিয়াছ উদ্দীন খিলজীর সাথে এ ধরনের ঘটনাই ঘটেছিল এবং গুজরাটের জানপানীরে মাহমূদ শাহ গুজরাটির উপর এই প্রতিক্রিয়াই হয়। আহমদ নগর, আহমদাবাদ, বেদর ও গুলবার্গাতে এই দৃশ্যই দেখতে পাওয়া গিয়েছে। দলে দলে লোক তার হাতে বায়'আত হয়েছিল এবং হাজার হাজার মানুষ তার কাফেলায় শরীক হয়েছিল। সিন্ধু এলাকাতেও টালমাটাল দৃশ্য দেখতে পাওয়া গিয়েছিল এবং মানুষ থামানো মুশকিল হয়ে পড়েছিল। কান্দাহারেও তার বক্তৃতা কিয়ামত দৃশ্যের সৃষ্টি করে এবং কান্দাহারের শাসনকর্তা মির্যা শাহ বেগ তার দিকে ঝুঁকে পড়েন।

৩. তার জীবন ছিল নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা ও সংসার বিরাগ, যুহদ ও পরমুখাপেক্ষীহীনতা এবং আল্লাহ ব্যতিরেকে আর সব কিছুর সংশ্রব বর্জনের জীবন এবং ঘরে-বাইরে ও সফরে তার দায়েরা বা বৃত্তে সেই যুহদ ও আত্মোৎসর্গ এবং সেই যিকর ও ইবাদতের দৃশ্যেই ভরপুর দেখতে পাওয়া যেত। খাবারসহ সকল কিছুই সমান সমান, কারুর কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতি পক্ষপাত ব্যতিরেকেই বণ্টন করা হত। এ ক্ষেত্রে তার কিংবা পরিবারবর্গের বেলায়ও কোনরূপ রেআয়েত করা হত না। এই দৃশ্যে যে কোন নবাগত প্রভাবিত না হয়ে পারত না।

৪. এই দাওয়াত এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থপর, ত্যাগী, সাহসী, নির্ভীক ও আত্মভোলা দাঈ জন্ম দিয়েছিল যারা كلمة حق عند سلطان جائر অত্যাচারী শাসকের সামনে হক-কথা বলার অপরিহার্য দায়িত্ব অত্যন্ত শক্তি ও সাহসের সাথে পালন করে। আমরু বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার তথা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ-এর ক্ষেত্রে তারা কঠোর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এবং এ পথে হাসিমুখে জীবন বিলিয়ে দেয়। মানুষ তাদের অবস্থা জেনে ও পড়ে খুবই প্রভাবিত হয় এবং সায়্যিদ মুহাম্মদ জৌনপুরীর প্রশিক্ষণ ও সাহচর্যের প্রভাব স্বীকার না করে থাকতে পারে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ শায়খ 'আলা ইবনে হাসান আল-বিয়ানভী (শায়খ 'আলাঈ, মৃ. ৯৫৭ হি.)-র জীবন-বৃত্তান্ত দেখা যেতে পারে যিনি সুলতান সলীম শাহ ইবন শের শাহ সূরীর দরবারে দাওয়াত ও উপদেশ প্রদানের অপরিহার্য দায়িত্ব আনজাম দেন এবং শাহী আদব ও কুর্নিশের পরিবর্তে ইসলামী তরীকায় সালাম প্রদানকেই যথেষ্ট মনে করেন। দ্বিতীয়বার সফরের শ্রান্তি-ক্লান্তি ও প্লেগরোগে আক্রান্ত অবস্থায় কোড়ার আঘাত খান। এতেও তাঁর মৃত্যু না হওয়ায় হাতীর পায়ের সাথে বাঁধা হয় এবং সেনাবাহিনীর মাঝে তাঁকে ঘোরানো হয়।[১]

৫. তার দাওয়াতের রুকন ছিল পাঁচটি : (১) দুনিয়া বর্জন, (২) সৃষ্টিকুলের সংশ্রব বর্জন ও নির্জনতা অবলম্বন, (৩) দেশ থেকে হিজরত, (৪) সিদ্দীকগণের সাহচর্য, (৫) সার্বক্ষণিক যিকর (হিফজে আনফাসের তরীকায়)। তারা মুশাহাদায়ে ইলাহী তথা স্রষ্টাকে দর্শন (চাই মনশ্চক্ষু মারফত অথবা হৃদয় দিয়ে, জাগ্রতাবস্থায় অথবা স্বপ্নযোগে) জরুরী ও ঈমানের শর্ত হিসাবে অভিহিত করে।

৬. মত্ত অবস্থায় অথবা অর্থ ও মর্ম যথার্থভাবে উপলব্ধি না করতে পারায় তার থেকে নিজের সম্পর্কে কয়েকবার ও সুস্পষ্টভাবে এমন সব উক্তি ও দাবী প্রকাশ পেয়েছে[২] যার ভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মুশকিল এবং যেগুলো তার অনুসারীদেরকে (প্রথম দিকে তাদের নিয়ত যতই সহীহ এবং তাদের ধর্মীয় আবেগ ও প্রেরণা যতই কদরযোগ্য হোক না কেন) সহজেই একটি বিরোধী জমহূর ও আহলে সুন্নত ওয়াল-জামা'আত বিরোধী ফের্কায় রূপ দেয় যারা ঐসব উক্তির আশ্রয় নিয়েছে এবং সেসবের উপর নিজেদের 'আকীদার বুনিয়াদ রেখেছে। পরবর্তীকালে আগত ও চরমপন্থী ভক্ত-অনুরক্তগণ (যেমনটি সাধারণত হয়ে থাকে) এতে আরও বৃদ্ধি ঘটায় এবং তার পবিত্রতা বর্ণনায় ও সম্মান-শ্রদ্ধায় এতখানি বাড়াবাড়ির আশ্রয় নেয় যে, তাকে আম্বিয়ায়ে কিরামের সমপর্যায়ে এনে দাঁড় করায় এবং কতকের থেকে শ্রেয় ও উত্তম বানিয়ে দেয়। কোন কোন

---

১. বিস্তারিত দ্র. তরজমা শায়খ 'আলা ইবনে হাসান আল-বিয়ানভী, নুযহাতুল খাওয়াতির, ৪র্থ খণ্ড, অথবা মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, আবদুল কাদির বদায়ূনী কৃত। মওলানা আবুল কালাম আযাদ তাঁর বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভঙ্গিমায় শায়খ আলাঈর শাহাদতের মর্মস্পর্শী কাহিনী বিস্তারিতভাবে প্রভাবমণ্ডিত পন্থায় বর্ণনা করেছেন (তাযকিরা, ৫৩-৬১ পৃ.)।

২. এ ধরনের উক্তি চরমপন্থী অনেক সূফী ও কঠোর রিয়াযতকারী তাপসদের থেকে বর্ণিত আছে।

চরমপন্থী তো তাকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সমপর্যায়ে পৌঁছে দেয় (যদিও তাদের মতেও সায়্যিদ মুহাম্মদ জৌনপুরী তাঁর অনুসারী এবং দীনে মুহাম্মদীর অনুগত ছিলেন)। কেউ কেউ তো এতদূর পর্যন্ত ধৃষ্টতা ও বাড়াবাড়ি দেখায় যে, "যদি কুরআন ও সুন্নাহ তার কোন উক্তি ও কর্মের পরিপন্থী ও বিরোধী হয় তবে কুরআন -সুন্নাহর উপর আস্থা রাখা হবে না।" ঠিক এমনি করে তারা এও বাড়াবাড়ি করে যে, 'যে মুসলমান ঐশী নূর স্বচক্ষে অথবা অন্তর দিয়ে শয়নে-স্বপনে অথবা জাগরণে মুশাহাদা (পর্যবেক্ষণ) না করে সে মু'মিন নয়।' সাধারণ এবং এই ফের্কার মাঝে এই ব্যবধান কালের প্রবাহে বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হয়ে চলে। এমন কি মাহদাবী নামে স্বতন্ত্র ফের্কা পরিচয়ে আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামাআত থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সেই সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ফওত হয়ে যায় যে জন্য এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং যা সম্ভবত এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার চোখের সামনে ছিল।

দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই জামা'আতের প্রভাব হিন্দুস্তান ও আফগানিস্তানের উপর কায়েম থাকে এবং দাক্ষিণাত্যে এর অনুসারীদের কয়েকটি সাম্রাজ্য কায়েম হয়। দশম শতাব্দীর শেষে মাহদাবীদের শক্তি ও সংখ্যার যে বৃদ্ধি ঘটে তা এথেকে পরিমাপ করা যাবে যে, ইসমাঈল নিজাম শাহ ইবনে বুরহান নিজাম শাহ ২য়-এর শাসন আমলে (হি. ৯৯৬-৯৮) সাদ্দাহর অন্যতম মনসবদার জামাল খান মাহদাবী আহমদ নগরে শাহী অভিযানগুলোর বাগডোর স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ইসমাঈল নিজাম শাহকেও (যিনি দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন)স্বধর্মে নিয়ে আসেন। অল্প দিনের মধ্যেই হিন্দুস্তানের চতুর্দিক থেকে ভবঘুরে মাহদাবী জমা হয়ে যায়। জামাল খানের চারপাশে দশ হাজারের কাছাকাছি মাহদাবী একত্র হয় এবং তারা বুরহান নিজাম শাহর অনুপস্থিতিতে আহমদ নগর সাম্রাজ্যের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করে। ৯৯৮ হিজরীতে আহমদ নগরে ফিরে এলে তিনি মাহদাবী ধর্ম, যার প্রচলন ঘটে গিয়েছিল, খারিজ করে দেন এবং পূর্বের মতই ইছনা 'আশারী মযহাবের প্রচলন ঘটে ।[১]

দশম শতাব্দীর শেষে মাহদাবী মতবাদের আন্দোলনে সুস্পষ্ট দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। এই দাওয়াত ও সায়্যিদ মুহাম্মদ জৌনপুরীর দাবী এবং তার অধিকাংশ চরমপন্থী ভক্ত-অনুরক্তদের জোর-যবরদস্তির ফলে এই আকীদার মধ্যে একটি নড়বড়ে অবস্থা এবং মুসলিম সমাজ জীবনে এক ধরনের অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা

১. মওলবী যাকাউল্লাহ দেহলভী কৃত-তারীখে হিন্দুস্তান, ৪র্থ খণ্ড থেকে সংক্ষেপিত।

দেখা দিচ্ছিল। এর দরুন ঐ যুগের বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম, যাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর উপর গভীর দৃষ্টি ও দীনী 'ইল্‌ম তথা ধর্মীয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ দখল রাখতেন, তাঁরা অত্যন্ত পেরেশান ও চিন্তাযুক্ত ছিলেন এবং তাঁরা একে এক বড় রকমের গোমরাহী ও ফেতনার পূর্ব লক্ষণ মনে করতেন। অনন্তর সে যুগের হাদীস ও সুন্নাহর সবচে' বড় আলিম 'মাজমা'উ বিহারি'ল-আনওয়ার'-এর গ্রন্থকার আল্লামা মুহাম্মদ তাহির পাটনী (৯১৩-৯৮৬ হি.) এর প্রত্যাখ্যান ও প্রতিরোধের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, যতদিন পর্যন্ত এই বিদ'আত (যার আছর সমগ্র গুজরাটে এসে গিয়েছিল) নির্মূল না হবে ততদিন তিনি পাগড়ী পরিধান করবেন না। সম্রাট আকবর ৯৮০ হিজরীতে গুজরাট বিজয়ের পর আল্লামা মুহাম্মদ তাহিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্বহস্তে তাঁর মাথায় পাগড়ী বেঁধে দেন এবং বলেন ঃ দীনের সাহায্য ও সমর্থন এবং এই নতুন ফের্কার উৎসাদন (যার গুরুভার দায়িত্ব আপনি আপন কাঁধে উঠিয়ে নিয়েছিলেন) আমার যিম্মায় রইল। তিনি মির্যা 'আযীযুদ্দীনকে (যিনি তাঁর দুধ ভাই ছিলেন) গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং এই কাজে তিনি তাঁকে সাহায্য করেন। তাঁর শাসনামলে তাদের শক্তি হ্রাস পায়। কিন্তু মির্যা 'আযীয এই দায়িত্ব থেকে অপসারিত হলে তদস্থলে আবদুর রহীম খানখানান গুজরাটের শাসনকর্তা হন। এ সময় মাহদাবীরা পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে এবং ময়দানে অবতরণ করে। 'আল্লামা মুহাম্মদ তাহির পুনরায় পাগড়ী নামিয়ে ফেলেন এবং রাজধানী (দিল্লী) যাবার সংকল্প নেন। তাঁর পেছনে পেছনে মাহদাবীদের একটি দলও রওয়ানা হয় এবং উজ্জয়িনী পৌঁছুতে পৌঁছুতে তাঁকে শহীদ করে দেয়।[১]

অস্থিরতা ও বিক্ষিপ্তচিত্ততার কারণ

ইতিহাস ও ইতিহাস দর্শন অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে, এই ধরনের মানসিক অস্থিরতা ও প্রতিক্রিয়ার আক্রমণাত্মক আন্দোলন ও বিক্ষিপ্ত ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি হবার জোরদার কারণগুলো সাধারণত নিম্নরূপ হয়ে থাকে ঃ

১. সমাজের কথায় ও কাজে, বিশ্বাসে ও জীবন যাপনে সামঞ্জস্যহীনতা আর পারস্পরিক বৈপরিত্য যা অস্থির ও তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন প্রকৃতিতে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং তা একটা পর্যায়ে বিদ্রোহাত্মক আহবান ও আন্দোলনের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তারা স্বয়ং যদি কোন আন্দোলন সৃষ্টি না করতে পারে তাহলে সন্দেহ ও সংশয়ের শিকার হয়ে যায়। সাধারণত এসব আন্দোলন খুব তাড়াতাড়ি চরমপন্থা গ্রহণ করে বসে এবং স্বয়ং এই বিকৃত ও দুর্বল সমাজের তুলনায় ধর্মীয়

১. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৪র্থ খণ্ড।

দিক দিয়ে অধিক ভ্রষ্ট, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপজ্জনক এবং সমাজের জন্য অশান্ত ও অরাজকতাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মনে হয়, দশম শতাব্দীতে বিত্ত-সম্পদের প্রাচুর্য, পদ ও পদমর্যাদার প্রতি লোভ এবং এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার আগ্রহই এই বৈপরিত্যের জন্ম দিয়েছিল এবং দুনিয়াদার ও দুনিয়াপূজারীদের একটি বিরাট দল সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যারা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা ও নীতিমালাকে এক পাশে ঠেলে রেখে পদমর্যাদা লাভ কিংবা মজা ও ফূর্তি লুটবার জন্য সব ধরনের অনিয়ম ও উচ্ছৃংখল পন্থা অবলম্বন করতে শুরু করেছিল। এই শ্রেণী সাধারণত এমন সব যুগে জন্ম নেয় যখন বিশাল বিস্তৃত ও সুদৃঢ় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতার যুগ ফিরে আসে। মনে হয় সূরী শাসনামলের শেষ যুগ এবং মুগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর উপমহাদেশীয় সমাজের এই অবস্থাই লক্ষ্যণীয় আকারে প্রকাশ পেয়েছিল এবং বহুবিধ ইসলাম ও শরা-শরীয়ত বিরোধী কাজকর্ম, রসম-রেওয়াজ ও আইন প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল।[১] উমায়্যা ও আব্বাসী সাম্রাজ্যেও এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য বিকাশ লাভ ঘটেছিল এবং একেই হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ পাদের সবচে' বড় মুজাদ্দিদ ও দাঈ হযরত হাসান বসরী (মৃ. ১১০ হি.) মুনাফিক অভিধায় স্মরণ করেছেন।

২. সুলতান ও শাসনকর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তিবর্গের জোর-জুলুম, স্বেচ্ছাচারিতা, বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন, শরঈ বিধি-বিধানের প্রতি উপেক্ষা ও প্রকাশ্য প্রবৃত্তি পূজা যা ধর্মীয় প্রেরণায় উজ্জীবিত লোকদেরকে বিপ্লবী আন্দোলন ও বিদ্রোহে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

৩. রসম পূজা ও জাহির-পরস্তী যখন তার চরম মার্গে গিয়ে পৌঁছে সমাজ তখন নৈতিক, চারিত্রিক ও মানসিক অধঃপতন এবং শিক্ষিত মহল মারাত্মক জড়তা ও স্থবিরতার শিকার হয়ে যায়।[২] এবং শিক্ষা ব্যবস্থা যখন নিষ্প্রাণ, বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং মানস প্রকৃতিকে সান্তনা দানের যোগ্যতা থেকে

১. ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সুলতান সলীম শাহ অথবা ইসলাম শাহর শাসনামলে প্রতি বিলায়েত বা সরকারী আবাসে জুম'আর দিন সমস্ত আমীর-উমারা ও সরকারী কর্মকর্তা জমায়েত হত এবং একটি উঁচু শামিয়ানার তলে কুরসীর উপর সুলতান সলীম শাহর জুতা রেখে তার সামনে কুর্নিশ করত এবং শাহী আইন সংকলন পাঠ করা হত (তারীখে হিন্দুস্তান, সায়্যিদ হাশেমী ফরিদাবাদী কৃত, ৩য় খণ্ড ১ পৃ.)।

২. অধ্যাপক খালীক আহমদ নিজামী এই যুগের চিত্র অংকন করতে ও রোগের মূল সঠিকভাবে নিরুপণ করতে গিয়ে যথার্থই লিখেছেন, "মুসলমানদের সাধারণ সামাজিক ও

পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

মাহরূম হয়ে যায় তখন মানুষ এমন সব আন্দোলনের ভেতর তার মানসিক সান্তনার উপকরণ খুঁজে পায় (তা সে ভ্রান্ত ও সঠিক যে পন্থায়ই হোক) এবং এই সীমিত বৃত্তের বাইরে পা ফেলে। কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা থেকে গাফিলতি এবং হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতাও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী কারণ যার ফলে দীনের সহীহ্ মেযাজ পয়দা হয় এবং যদ্দ্বারা এর সঠিক পরিমাপ করা যায় যে, উম্মাহর উপলব্ধি ও আমলের মধ্যে আসল দীন রসূল আকরাম (সা.)-এর আদর্শ এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ও তাবিঈদের তরীকা থেকে কতটা দূরে সরে গেছে এবং কতটা বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

৪. এমন কোন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের অভাব যিনি মানসিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক দিয়ে সাধারণ মান থেকে উন্নত, শক্তিশালী ও চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং প্রভাবশালী আধ্যাত্মিকতার অধিকারী হবেন, যিনি মানসিক অস্থিরতা ও চিত্তচাঞ্চল্য দূর করবেন, সমাজের মরা দেহে নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে পারবেন এবং ইসলামের চিরন্তনতা ও শরীয়তে মুহাম্মদীর সত্যতা, উন্নতি ও বিকাশের বিস্তৃত সম্ভাবনার উপর নতুন আস্থা ও বিশ্বাসের সৃষ্টি করতে পারেন।

১০ম শতাব্দীর ইতিহাস অধ্যয়ন থেকে (অনুবাদ ও জীবনী গ্রন্থ এবং বিভিন্ন ঘটনা ও দুর্ঘটনার রোয়েদাদের সাহায্যে) জানা যায় যে, কমপক্ষে ভারতবর্ষে এই অস্থিরতা ও চিন্তার বিক্ষিপ্ততার এই স্বাভাবিক কারণসমূহ বিগত শতাব্দীগুলোর মুকাবিলায় বেড়ে গিয়েছিল এবং এরই ফলে মানসিক অস্থিরতা ও গোলযোগপূর্ণ আন্দোলন এই শতাব্দীতে খুব বেশী দৃষ্টিগোচর হয়।

দশম শতাব্দীর সবচে' বড় ফেতনা

দ্বিতীয় সহস্রাব্দ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

হিজরী দশম শতাব্দী এই দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, এর সমাপ্তিতে

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর) নৈতিক অবস্থা দ্রুততার সাথে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছিল। আফসানা-ই-শাহান এবং তারীখে দাউদী গ্রন্থে যে সব কিসসা-কাহিনীকে বিস্ময়করভাবে পেশ করা হয়েছে তা নৈতিক অধঃপতন ও বিশ্বাসের অশুভ অবস্থার দর্পণ। দরিদ্রদের বিলাস জীবন, ছাত্রদের খারাপ চাল-চলন ও উচ্ছৃংখলতা, তা'বীয ও মাদুলীতে অযথা বিশ্বাস, জিন-পরী ও দেবদেবীর কাহিনী, সুলায়মান (আ)-এর প্রদীপের কাহিনী কোন সুদৃঢ় সমাজ অথবা সুসংবদ্ধ নৈতিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে এভাবে ব্যাপক হতে পারত না। বস্তুত মাহদাবী আন্দোলন এই মানসিক অবনতি ও ধর্মীয় স্থবিরতা দূর করার একটি প্রয়াস ছিল" (সালাতীনে দিল্লীকে মযহাবী রুজহানাত, ৩৫১)।

ইসলামী বর্ষপঞ্জী এক হাজার বছর পূর্ণ এবং দ্বিতীয় হাজার বছর (দ্বিতীয় সহস্রাব্দ)-এর সূচনা হয়। সাধারণ অবস্থায় এই পরিবর্তন তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। পৃথিবীর দীর্ঘ বয়স এবং মানব জীবনের বিশাল বিস্তৃত পঞ্জিকা যেভাবে প্রতিটি শতাব্দীতে একবার পাতা উল্টায় তেমনি এক হাজার বছরের উপরও ১১শ শতাব্দীর নতুন পাতা উল্টাতে যাচ্ছিল। কিন্তু যখন মনের ভেতর ভীষণ রকমের বিক্ষিপ্ত ভাবনা, ধর্ম বিশ্বাসে বিরাট দোদুল্যমানতা, দীনের সহীহ তা'লীম এবং কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান সম্পর্কে কেবল অজ্ঞতা ও অলসতাই নয় বরং ভীতি ও ঘৃণা হয়, গ্রীকদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মানব বুদ্ধির শেষ ধাপ বলে অভিহিত করা হয় এবং এরই নাম "হিকমত", "জ্ঞান ও প্রজ্ঞা" এবং মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকেও পরিপূর্ণতার সুবিশাল বিস্তৃত দিগন্তে الافق المبين[১] হিসাবে অভিহিত করা হয়, কথার ফুলঝুরি সৃষ্টি এবং পিপড়াকে হাতী (কিংবা সুচকে ফাল) হিসাবে দাঁড় করানো হয়, শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্য তালিকাকে শিক্ষাঙ্গনের কামালিয়াত মনে করা হয়, 'ইলমে নবূওত তথা নবূওতের জ্ঞান, আসমানী গ্রন্থ, ওয়াহী অবতরণ এবং কুরআনের 'নস'সমূহকে উপহাস ও বিদ্রূপ করা হয় এবং এর উপর ঈমান আনাকে মূর্খতা, অন্ধ অনুকরণ ও বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে শত্রূতার সমার্থক মনে করা হয়, অতঃপর সেই সাথে তৎকালীন হুকূমত ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রতি (যা ভুল ও শুদ্ধভাবে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করত এবং একে নিজেদের ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষক ভাবত) অসন্তোষ, বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের সীমা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। এর পর সোনায় সোহাগার মত যখন এমন সব উৎসাহী ও ভাগ্যান্বেষী মানুষ সৃষ্টি হয়ে গেল যারা মেধা ও তৎকালের জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুসজ্জিত, যারা নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা ও পথ-প্রদর্শক এবং সম্মান ও শক্তির অধিকারী হবার সোনালী স্বপ্ন দেখছিল এবং তাদের দিল ও দিমাগে এ আশা-আকাঙ্খাও নিত্য-নতুন রূপ নিচ্ছিল যে, মাস ও বছরের বিবর্তন থেকে সেও ফায়দা লুটবে যে ফায়দা বিগত দিনের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ (তাদের কথা মত) লুটেছে এবং তাদের দাওয়াত ও আন্দোলন থেকে দেশ ও জাতির ইতিহাসে এক নতুন বর্ষপঞ্জীর সূচনা হয়েছে আর তাদের ধারণায় এর সর্বাধিক সফল ও পূর্ণাঙ্গ রূপ ছিল সেই আমলের সূচনা যা রসূল আকরাম (সা.)-এর আবির্ভাব এবং ইসলামের বিকাশ থেকে আরবে শুরু হয় এবং সমগ্র বিশ্বকে আপন ছায়াতলে ঢেকে নেয়। তাদের নিকট এই দীনের ইতিহাস এবং দুনিয়ার বর্ষপঞ্জীতে প্রথম সহস্রাব্দের সমাপ্তি এবং দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শুরু এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও সুবর্ণ

১. মুল্লা বাকির দামাদের الافق المبين নামক গ্রন্থের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সুযোগ ছিল যা খুব সত্বর ও বারবার ফিরে আসে না। যদি এই দুর্লভ সুযোগ খুইয়ে ফেলা হয় তবে পুনরায় এক হাজার বছর অপেক্ষা করতে হবে। এজন্য এই সুযোগ কোনভাবেই হারানো ঠিক হবে না, অন্যথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী আফসোস করতে হবে।

১০ম শতাব্দীর শেষার্ধে আমরা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে এর সবচে' অস্থির, তীক্ষ্ণ, সৃজনী ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী ভূখণ্ড ইরানে (যাকে অনেকগুলো সাদৃশ্যের দরুন প্রাচ্যের গ্রীস বলা সঙ্গত হবে) এই ধারণার ছায়া দৃষ্টিগোচর হয়। ইসলামের আবির্ভাব ও বিকাশের পর এছিল পয়লা সুযোগ যে, এক হাজার বছর পূর্ণ হচ্ছিল এবং দ্বিতীয় সহস্রাব্দ শুরু হতে চলেছিল। প্রতিটি শতাব্দীর মাথায় মুজাদ্দিদের আবির্ভাব হাদীস থেকেই প্রমাণিত এবং ইতিহাস থেকেও এর প্রমাণ মেলে। এজন্যই কতক ধীশক্তির অধিকারী দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শুরুতে মুজাদ্দিদের চেয়েও বেশী করে নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশ্বের নতুন যুগের একজন বিজেতার আত্মপ্রকাশের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল এবং এর ভিতর অনেক অত্যুৎসাহী লোক নিজেদের নাম এই পদের প্রার্থী তালিকায় লিখাবার প্রয়াসও শুরু করে দিয়েছিল। আফসোস যে, এই যুগের কোন মানসিক ও চৈন্তিক ইতিহাস প্রণীত হয়নি যার ভেতর এই যুগের মন-মস্তিস্ক, আবেগ-অনুপ্রেরণা, ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাঙ্খার প্রতিচ্ছায়া দৃষ্টিগোচর হবে। পুর্বের ও বিগত যুগগুলোর মত সব ইতিহাসই রাজা-বাদশাহদের দরবারকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় (অর্থাৎ ইতিহাসে জনগণ তথা দেশের সাধারণ মানুষ স্থান পায়নি। ইতিহাস লেখা হয়েছে অধিকাংশ রাজা-বাদশাহদের শানদার দরবার ও তাদের পরিচালিত অভিযান ও যুদ্ধ-বিগ্রহকে কেন্দ্র করেই—অনুবাদক)এবং এর ভেতর অধিকাংশই সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়, সম্রাটদের আড়ম্বরপূর্ণ জাঁকজমক, সাম্রাজ্যের পদস্থ কর্মকর্তাদের নিযুক্তি ও অপসারণ, আমীর- উমারার আরাম -আয়েশ ও বিলাস-ব্যসনের কাহিনী এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের চমকপ্রদ ও লোমহর্ষক বর্ণনাই মিলে। যদি দশম শতাব্দীর মুসলিম বিশ্বের কোন সুচিন্তিত ইতিহাস পাওয়া যেত তাহলে আমরা পরিষ্কার দেখতে পেতাম যে, দ্বিতীয় সহস্রাব্দের নৈকট্য কত মানুষের অন্তর-মানসে ভ্রান্ত আশার উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বেলেছিল এবং তা নতুনতর নেতৃত্বের মসনদ এবং একটি নতুন নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আখড়া বানাবার জন্য ঢাক-ঢোল জোগাতে শুরু করে দিয়েছিল।

সাফাবী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পর যিনি শী'ঈ মতবাদকে হুকুমতের শক্তি ও

সৌভাগ্যের সাহায্যে সমগ্র ইরানের অনুসৃত ধর্মে পরিণত করে দিয়েছিলেন এবং যদিও এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার সর্বোচ্চ পূর্বপুরুষ যার নিকট থেকে রাজ্য শাসনের উত্তরাধিকার পাওয়া গেছে সেই শায়খ সফিয়্যুদ্দীন স্বীয় রুচি ও মতাদর্শের দিক দিয়ে সূফী ছিলেন-কিন্তু যেহেতু শী'ঈ মতবাদ তাসাওউফের প্রতি বৈরিতা পোষণ করে-তাঁর শাসনামলে সেই ইরান যে ইরান একদিন ইমাম গাযালী তূসী, শায়খ ফরীদুদ্দীন আত্তার নীশাপূরী, মওলানা জালালুদ্দীন রুমী[১] এবং মওলানা আবদুর রহমান জামীর ন্যায় 'আরিফ ও তত্ত্বজ্ঞানীর জন্ম দিয়েছিল, যেই ইরান থেকে বাগদাদ, দিল্লী ও আজমীর পীরানে পীর সায়্যিদুনা হযরত আবদুল কাদের জীলানী, শায়খুশ-শুয়ুখ শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী, খাওয়াজা-ই বুযুর্গ শায়খ মু'ঈনুদ্দীন চিশতী এবং শহীদ-ই 'ইশক খাওয়াজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কা'কী আওশী (রা)-র মত বুযুর্গ সাধক লাভ করেছিল সেই ইরান থেকে তাসাওউফের প্রদীপ একেবারেই নির্বাপিত হয়ে যায়। অপর দিকে কুরআন ও সুন্নাহর সেই 'ইলম বা জ্ঞান ও হাদীস শাস্ত্র ইরান ছিল একদিন যার বড় কেন্দ্র, যেই ইরান ইসলামের ইতিহাসকে দান করেছিল মুসলিম ইবনু'ল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী নীশাপুরী, আবু 'ঈসা তিরমিযী, আবু দাউদ সিজিস্তানী,ইবনে মাজা কাযবীনী এবং হাফিজ আবূ 'আবদুর রহমান নাসাঈর মত হাদীসের ইমাম ও সিহাহ সিত্তাহ্‌র গ্রন্থকার, সংকলক সেই ইরান এখন কুরআন-সুন্নাহ ও 'ইলমে হাদীস সম্পর্কে একেবারেই অপরিচিত ও সম্পর্কহীন হয়ে গিয়েছিল। এখন তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত পুঁজি, তার বৈশিষ্ট্য ও প্রাধান্যের ক্ষেত্র গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান, তার দর্শন ও যুক্তি শাস্ত্র। এই বিপ্লব যা আরবের নবী (সা)-র সাহাবায়ে কিরাম (রা) এবং তাঁর সুন্নাহ ও হাদীসসমূহ থেকে এই মনুষ্য-প্রসবিনী মুসলিম দেশটির আত্মীয়তার সম্পর্কটি প্রথমেই কেটে দিয়েছিল। দেশের প্রতিভাবান, ধীশক্তি ও সৃজনী ক্ষমতার অধিকারী শ্রেণীর সম্পর্ক নবুওতে মুহাম্মদী, খতমে নবুওতের আকীদা এবং দীন ইসলামের স্থায়িত্ব ও চিরন্তনতার আকীদা থেকে যদিও বিচ্ছিন্ন করেনি, তবুও এ সম্পর্ককে দুর্বল করে দিয়েছিল অবশ্যই। যদি আহলে বায়ত (শী'আ মতবদের ভিত্তিতে)-এর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিসবত না থাকত তাহলে দেশটির পক্ষে পুনরায় অগ্নিপূজা, ইসলাম পূর্বযুগের সভ্যতা এবং ফেরদৌসীর শাহনামার রুস্তম ও ইস্ফান্দিয়ার-এর যুগের দিকে ফিরে যাবার সমূহ আশংকা ছিল।

এমতাবস্থায় নবম ও দশম শতাব্দীর ইরানে উচ্ছৃংখল আন্দোলন এবং ইসলা-

---

১. তিনি খুরাসানে অবস্থিত বলখের অধিবাসী ছিলেন, বর্তমানে আফগানিস্তানে অবস্থিত।

মের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক চক্রান্ত সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না, ছিল না কল্পনার বাইরে যার সবচে' প্রগতিশীল উদাহরণ নবম শতাব্দীর শেষ এবং দশম শতাব্দীর প্রথম দিককার নুকতাবী আন্দোলন যে আন্দোলন ইরানের এই অস্থির চিত্তের সর্বোত্তম প্রকাশ যা কখনো মাযদাকের অবয়বে, কখনো মানীরূপে, আবার কখনো-বা হাসান ইবন সাব্বাহ্‌র পোশাকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যা ছিল নির্ভেজাল ধর্মদ্রোহী আন্দোলন। ইস্কান্দার মুনশীর ভাষায় ঃ

"এই ফের্কা দার্শনিকদের মযহাব মুতাবিক বিশ্ব-জাহানকে "কাদীম" (অনাদি, চিরন্তন) মেনে থাকে। মানবদেহের পুনরুজ্জীবন লাভ এবং হাশর-নশর সম্পর্কে এরা কোনরূপ বিশ্বাস পোষণ করে না। আমলের ভাল-মন্দের শাস্তি ও পুরস্কারকে দুনিয়ার শান্তি বা আরাম ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আকারে একেই বেহেশত ও দোযখ মনে করে থাকে" (তারীখ আলম আরায়ে আব্বাসী, ২য় খণ্ড, ৩২৫ পৃ.)।

শাহনওয়ায খান তাদের সম্পর্কে বলেন ঃ

"ইল্‌ম নুকতা-ই ইলহাদ[১] ও যানদাকী[২]-ই ইবাহাত (অর্থাৎ সব কিছুই জায়েয) এবং ওয়াসী'উল-মাশরাবী (সবই বিশুদ্ধ ও সহীহ্)-র নাম। প্রাচীন কালের দার্শনিকদের মত তারাও পৃথিবীর অনাদি ও চিরন্তন হওয়া সমর্থন করে এবং হাশর-নশর ও কিয়ামত অস্বীকার করে। আমলের ভাল-মন্দের পুরস্কার ও শাস্তি এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে এই দুনিয়ারই প্রাচুর্য ও আরাম-আয়েশ এবং অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টকে মনে করে থাকে।"[২]

তারা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে এবং তারা বিশ্বাস করে যে, জড় জগত ও প্রাণীকূল উন্নতি করতে করতে অর্থাৎ ক্রমোন্নতির মাধ্যমে মনুষ্য পর্যায়ে উপনীত হয়।[৩] উদ্ভিদ উদগমের মধ্যে আল্লাহ্‌র কুদরতের কোন ভূমিকাই নেই, এ কেবল নক্ষত্ররাজি ও বিভিন্ন মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণের ফল[৪]। কুরআন পাককে নবী করীম (সা.) কর্তৃক প্রণীত বলে তারা মনে করে। শরীয়তের মসলা-মাসাইলকে জ্ঞানীজনদের উদ্ভাবিত বলে বিশ্বাস করে। এই ফের্কার অনুসারীরা নামায, হজ্জ

১-২. পুস্তকের শেষাংশে পরিশিষ্ট দেখুন।—অনুবাদক।

২ মাআছিরুল-উমারা, ২য় খণ্ড, ৬১৯ পৃ.।

৩. দাবিস্তানে মাযাহিব, পৃ. ৩০০।

৪. মাবলাগুর-রিজাল, পৃ. ২৫ক হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান, মওলানা আযাদ সংগ্রহ, মওলানা আযাদ লাইব্রেরী, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড়।

ও কুরবানীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।[১] রমযান মাসের নাম রেখেছে "মাহে গুরুসঙ্গী ও তিশনাগী"। পাক-পবিত্রতা অর্জন ও গোসলের মসলা-মাসাইল নিয়েও তারা হাসি-মস্করা করে[২] এবং চিরন্তন হারাম-এর হুরমতকেও তারা সমর্থন করে না। তারা কুরআন-হাদীস তথা ওয়াহী-নির্ভর জ্ঞান স্বীকার করে না এবং তারা বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের জোর সমর্থক।[৩]

এই ফের্কার প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় মাহমূদ পীসখাওয়ানীকে।[৪] হিজরী দশম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ ও ইরানের হাজার হাজার লোককে এই ফের্কা প্রভাবিত করে এবং ইরানে এর অনুসারীদের সংখ্যা হাজার হাজারে গিয়ে পৌঁছে।

নুকতাবীদের আকীদা ছিল এই যে, সৃষ্টির আদি থেকে মাহমূদ পীসখাওয়ানী পর্যন্ত আট হাজার বছরের মুদ্দত হয়। এই গোটা সময়কাল ছিল আরবদের নেতৃত্বের সময়। কেননা এই মুদ্দতে তথা সময়পর্বে পয়গম্বর কেবল আরবেই জন্মেছে।

মাহমূদ পীসখাওয়ানীর আবির্ভাব থেকে আরবদের নেতৃত্ব খতম হয়ে গেছে।[৫] অতএব আগামী আট হাজার বছর পর্যন্ত পয়গম্বর অনারবদের মধ্যেই

---

১. প্রাগুক্ত।

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত ঃ এই নিবন্ধে অধ্যাপক মুহাম্মদ আসলামের "দীন-ই ইলাহী আওর উস্‌কা পাস মানজার" নামক গ্রন্থ, অধিকন্তু আলীগড় মুসলিম য়ুনিভার্সিটির ড. নাযীর আহমদের "তারীখী ও আদবী মুতালি" নামক গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আরও বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের জন্য দ্র. নুকতাবীয়া য়া পীসখাওয়ানীয়া" ড. সাদিক কায়া।

৪. মাহমুদ পীসখাওয়ানী অথবা পেসখানী গিলানী আস্ত্রাবাদ নামক স্থানে হিজরী ৮০০ সনে এই নতুন ধর্মের ঘোষণা দেন। ৮৩২ হিজরীতে তার মৃত্যু হয়। এই ফের্কার বুনিয়াদ স্থাপিত হয় হিজরী নবম শতাব্দীর একেবারে প্রথম ভাগে। ক্রমান্বয়ে তা শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। এমনকি দশম ও একাদশ শতাব্দীতে ইরান ও ভারতবর্ষে এই ফের্কার অনুসারীদের সংখ্যা হাজার হাজারে গিয়ে পৌঁছেছিল। এই ফের্কাকে মুলহিদ (ধর্মদ্রোহী), তানাসুখিয়া ও যিন্দীক নামে ইরানী ঐতিহাসিক ও মুসলিম লেখকগণ স্মরণ করেছেন এবং যেহেতু মাহমূদের প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টি মাটি থেকেই হয়েছে এবং মাটিকে নুকতা বলে অথবা এ জন্য যে, সে কুরআনের মতলব (অর্থ, মর্ম) কে স্বীয় ধারণাকে ব্যক্ত করার মধ্যে হরফ ও নুকতার সংখ্যা থেকে সাহায্য নিয়েছে সেজন্য এই ফের্কাকে নুকতাবী অথবা আহলে নুকতা বলা হয়।

৫. মাহমুদ কিংবা তার কোন অনুসারীর কবিতা ঃ

رسید نوبت رندان عاقبت محمود

گذشت انکه که عرب طعنه بر عجم میزد

জন্ম নেবেন।[১]

নুকতাবীদের ধর্ম বিশ্বাস, যার কিছুটা বর্ণনা এখানে দেওয়া হল, বুনিয়াদী ও বিপ্লবাত্মক গুরুত্বের অধিকারী (এবং আমাদের এই আলোচনা ও মুজাদ্দিদ সাহেবের তাজদীদী তথা পুনর্জাগরণমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে)। তাদের বিশ্বাস মতে, "ইসলাম ধর্ম মনসুখ হয়ে গেছে। এজন্য মাহমুদের আনীত দীন কবুল করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।" ইসলাম ধর্মের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এখন নতুন দীন আবশ্যক।[২] দশম শতাব্দীর এই আকীদার আবির্ভাব ও ঘোষণা পরিষ্কার ইঙ্গিত দেয় যে, তারা এই সহস্রাব্দ আকীদার সমর্থক এবং দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকে তাদের মিশন জোরেশোরে শুরু করতে যাচ্ছিল। শাহ 'আব্বাস সাফাবী ইরানে নুকতাবী ধর্ম অনুসরণের অভিযোগে হাজার হাজার নুকতাবীকে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠিয়ে দেন। এ ব্যাপারে শাহ তাঁর পূর্ববর্তী শাহদের তুলনায় অধিকতর কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বাদশাহ্র দৃষ্টিতে এদের চেয়ে বেশী বিপজ্জনক আর কোন দল ছিল না। অনন্তর ১০০৩ হিজরীতে তিনি তাদের বিরাট সংখ্যককে পাইকারী হত্যা করেন। এই হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের কারণে বহু নুকতাবী জীবন বাঁচিয়ে ভারতবর্ষে পালিয়ে আসে। এদের মধ্যে মওলানা হায়াতী কাশীও ছিলেন যিনি দু'বছর বন্দী থাকার পর শীরায আসেন এবং ৯৮৬ হিজরীতে কিছু দিন দেশে কাটিয়ে শেষাবধি ভারতবর্ষে চলে আসেন। ৯৯৩ হিজরীতে তিনি আহমদ নগরে বর্তমান ছিলেন। শরীফ আমেলী নামক একজন আলিম এই ফেরকার নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি তার সময়কার কঠোরতার দরুন অতিষ্ঠ হয়ে ভারতবর্ষে চলে এসেছিলেন। সম্রাট আকবর তার সঙ্গে পীরের মত ব্যবহার করতেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞের ধারণা যে, মীর শরীফ আমেলীই মাহমুদ পীসখাওয়ানীর লেখা থেকে প্রমাণ পেশ করে সম্রাট আকবরকে নতুন ধর্ম প্রবর্তনে উৎসাহিত করেন। তিনি মাহমুদের ভবিষ্যদ্বাণী বিবৃত করেন যে, ৯৯০ হিজরীতে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে যে বাতিল ধর্ম মিটিয়ে দীনে হক কায়েম করবে।

ঐতিহাসিক বদায়ূনী ও খাজা কিলাঁ[৩] উভয়ে এ বিষয়ে একমত যে, শরীফ আমেলী ইরান থেকে পালিয়ে এসে শায়খ হুসায়ন খাওয়ারিযমীর পৌত্র মাওলানা মুহাম্মদ যাহিদের খানকাহে আশ্রয় নেন এবং সূফীদের মত থাকতে লাগেন।

---

১. দাবিস্তানে-মাযাহিব, ৩০১ পৃ,।

২. ঐ পৃ. ৩০০।

৩. مبلغ الرجال -এর গ্রন্থকার খাজা বাকী বিল্লাহর পুত্র খাজা উবায়দুল্লাহ।

যেহেতু তার স্বভাবের সঙ্গে দরবেশীর কোন সম্বন্ধ ছিল না বিধায় তিনি গালগল্প, নির্লজ্জ আচরণ ও বেহায়াপনাকে অবলম্বন বানান। মওলানা যাহিদ যখন তার আকীদা সম্পর্কে জানতে পারলেন তখনই তাকে খানকাহ থেকে বের করে দেন এবং শরীফ আমেলী দাক্ষিণাত্যে গমন করেন।

দাক্ষিণাত্যে তখন শী'আদেরই রাজত্ব চলছিল। লোকে শরীফ আমেলীকে শী'আ আলিম ভেবে লুফে নেয়। কিন্তু তারা যখন তার আকীদা সম্পর্কে জানতে পারল তখন তারা ক্ষেপে গেল। বদায়ূনীর ভাষায় ঃ

"দাক্ষিণাত্যের শাসক তার অস্তিত্বই শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত নেন যে, তাকে গাধার পিঠে বসিয়ে জনসমক্ষে তার মুখোশ তুলে ধরা হবে।"[১]

সম্রাট আকবর তাকে এক হাজারী মনসব প্রদান করে তার নৈকট্য-প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন[২] এবং বাংলায় তাকে দীন-ই ইলাহীর দাঈ নিযুক্ত করেন। সে ছিল সম্রাট আকবরের চারজন একান্ত বন্ধুদের অন্যতম। দীনে ইলাহীর মুরীদ-মু'তাকিদ (ভক্ত-অনুরক্ত)-দের সামনে সে আকবরের প্রতিনিধিত্বও করত।[৩] মা'আছিরুল-উমারা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ঃ তিনি তাসাওউফ ও ইলমে মারিফাত হাসিল করেছেন এবং এগুলোকে কুফরী ও খোদাদ্রোহিতার সাথে ঘুলিয়ে ফেলেছেন এবং প্রত্যেক বস্তুকেই আল্লাহ বলে দাবি করেছেন।

আবুল ফযল আল্লামী সম্পর্কে কতক সমসাময়িক ঐতিহাসিকের বর্ণনা যে, তিনি নুকতাবী আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। শাহ 'আব্বাস সাফাবী নসরাবাদ কাশানে বিশিষ্ট নুকতাবী দা'ঈ ও যিম্মাদার মীর সায়্যিদ আহমদ কাশীকে যখন হত্যা করেন তখন তার কাগজের স্তূপের ভেতর যে সব নুকতাবীর চিঠিপত্র পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্যে আবুল ফযলের একটি চিঠিও ছিল। সমকালীন ঐতিহাসিক ইস্কান্দার মুনশী তদীয় "তারীখ 'আলম আরাঈ 'আব্বাসী" গ্রন্থে বলেন ঃ

"ভারতবর্ষ থেকে গমনাগমনকারীদের থেকে জানতে পারলাম যে, শায়খ মুবারকের পুত্র ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী আবুল ফযল আকবরের দরবারে সম্রাটের নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন এবং সেও এই ধর্মের একজন অনুসারী। সে

১. মুনতাখাবুত-তাওয়ারীখ, ২য় খণ্ড, ২৪৬ পৃ.।

২. مبلغ الرجال ৩২ পৃ.।

৩. মুনতাখাব, ২য় খণ্ড, ২৪৫-২৪৮ পৃ.।

সম্রাট আকবরকে উদারচিত্ত বানিয়ে শরীয়তের রাস্তা থেকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে। মীর আহমদ কাশীকে লিখিত তাঁর পত্র থেকে যা মীর কাশীর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল, প্রমাণিত হয় যে, সে নুকতাবী ছিল।"[১]

খাজা কিলাঁ তদীয় مبلغ الرجال গ্রন্থে মাহমুদ পীসখাওয়ানীর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

شیخ ابو الفضل ناگوری بساط آں آئین خسارت قریں را در مملکت هندوستان گسترد

শায়খ আবুল ফযল নাগোরী সেই ক্ষতিকর আইনকে ভারতবর্ষেও ছড়িয়ে দিয়েছেন।

এই সব ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণের পর অনুমিত হয় যে, নুকতাবী ফের্কা অথবা আন্দোলনের দা'ঈ ও পতাকাবাহিগণ ভারতবর্ষে এসে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের জন্য নতুন যুগ, নতুন ধর্ম ও নতুন আইন-এর জন্য কিভাবে এক সিংহাসন ও মসনদ তৈরী করে রেখেছিল যার উপর সমাসীন হবার জন্য একজন এখতিয়ারসম্পন্ন ও শক্তিশালী উপযোগী ব্যক্তিত্বের দরকার ছিল আর এজন্য তাদের দৃষ্টিতে আকবরের চেয়ে সর্বাধিক যোগ্য আর কেউ ছিল না।[২]

---

১. تاریخی و ادبی مطالع নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ২৬৯ পৃ. — نظر طائرانه ایك پر نقطوی فرقه নামক নিবন্ধ থেকে গৃহীত, ডঃ নাযীর আহমদের

২. مبلغ الرجال ৩১-৩২ ও ৩৩ দ্র.।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকবরের শাসনামল এবং তাঁর পরস্পর বিরোধী শাসনকাল

সম্রাট আকবরের ধর্মীয় ও মযহাবী জীবন

ভারতবর্ষের সমস্ত ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, সম্রাটের সিংহাসন লাভ এবং প্রাথমিক শাসনামল কেবল একজন গোঁড়া বিশ্বাসী মুসলমান হিসাবেই শুরু হয়নি, বরং নির্মল আকীদা, ধর্মের প্রতি অতি মাত্রায় আকর্ষণ ও আগ্রহের মাঝ দিয়েই সূচনা ঘটেছিল। একথা প্রমাণের জন্য আকবরের শাহী দরবারের বিখ্যাত লেখক ও আলিম এবং আকবরের শাসনামলের ইতিহাস লেখক মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ুনী (মৃ.১০০৪ হি.)-র ইতিহাস প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মুনতাখাবু'ত-তাওয়ারীখ' থেকে বাছাই করে আকবরের শাসনামলের এই যুগের কতকগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং সম্রাটের অবস্থাদি উদ্ধৃত করা হচ্ছে যখন তিনি পূর্বসুরীদের মতই একজন সাদা-সিধা ও সৎ আকীদাসম্পন্ন মুসলমান ছিলেন এবং দীনী তা'লীম তথা ধর্মীয় শিক্ষা, বরং বলা চলে আদৌ কোন লেখাপড়ার সুযোগ না ঘটায়, পরিবেশের প্রভাব এবং আপন যুগের প্রথা মাফিক (যার ভেতর পীর-বুযুর্গ ও তাঁদের মাযার সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত ভক্তি, সীমাতিরিক্ত সু-ধারণা ও বিশ্বাস এবং বিদ'আতের ব্যাপক প্রচলন ছিল) বুযুর্গদের মাযারে লম্বা-চওড়া সফর করতেন, বদ'আকীদা এবং সর্বসাধারণ যে আকীদা পোষণ করত তার বিরোধী আকীদা পোষণের অভিযোগে কঠোর সাজা দিতেন,আল্লাহর ওলীদের মাযারে নযর-নিয়ায প্রদান করতেন,স্বয়ং গভীর আত্মনিমগ্নতার সাথে যিকর-এ মশগুল থাকতেন, 'আলিম ও সালিহ বান্দাদের সাহচর্যে সময় অতিবাহিত করতেন এবং সামা'র মজলিসে অংশগ্রহণ করতেন।

আকবরের দীনদারী এবং ধর্মের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহের সাক্ষ্য মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ুনীর বিবরণ থেকে উদ্ধৃত করতে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। কেননা এ ব্যাপারে সমস্ত ঐতিহাসিকই একমত এবং এথেকে বরং

আকবরের প্রশংসাই বেরিয়ে আসে। আর এ ব্যাপারে মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ূনীর ইতিহাস ও রচনার মধ্যে কোন রকম বিরোধিতামূলক আবেগের কাজ করা কিংবা শত্রুতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য আকবরের জীবনের অপরাংশ (দীন-ই ইলাহীর আদর্শ প্রচার, সমস্ত ধর্মই মূলত এক—এই আকীদা-বিশ্বাস, ইসলাম থেকে দূরত্বে অবস্থান ও ভীতি, অপরাপর ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত আনুকূল্য পোষণ ও উদারতা প্রদর্শন এবং ইসলাম সম্পর্কে বৈরী দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ)-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ুনীর বিবরণ উদ্ধৃত করতে (যার সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা এবং এসবের ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতার ব্যাপারে এর শেষ বছরগুলোতে কতিপয় মহলের পক্ষ থেকে বিরাট সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করা হয়েছে)[১] সতর্কতা অবলম্বন করব এবং কেবল এককভাবে তাঁর বর্ণিত বিবরণের উপরই নির্ভর করব না,বরং এগুলো আকবরের সাম্রাজ্যের নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত কর্মকর্তাবৃন্দ, দরবারের ইতিহাস লেখক এবং সেই যুগের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বিবরণ ও সাক্ষ্য এর সমর্থনে পেশ করব। মুন্তাখাবু'ত-তাওয়ারীখ-এর নিম্নোক্ত বিবরণসমূহ দেখুন ঃ

---

১. আকবরের শাসনামলের দ্বিতীয় পর্যায় সম্পর্কে মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ূনীর বর্ণিত বিবরণ ও সাক্ষ্যকে তাঁর ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব এবং আকবরের সঙ্গে ব্যক্তিগত শত্রুতা ও বিরোধিতা হিসেবে চিত্রিত করে তাঁর 'মুন্তাখাবুত-তাওয়ারীখ' নামক গ্রন্থটিকে ক্ষতযুক্ত ও অনির্ভরযোগ্য প্রমাণ করবার জন্য বিগত বছরগুলো থেকে যে অভিযান শুরু হয়েছে তার কোন সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ভিত্তি ও ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। এই অভিযোগের ভিত্তিও কেবল আবেগনির্ভর এবং সম্রাট আকবরের মর্যাদা রক্ষা ও তাকে সব ধরনের অভিযোগ থেকে মুক্ত করার প্রেরণা (যা বিশেষ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, যুগ ও পরিবেশের ফল এবং একটি উদ্দেশ্যের অধীনে ইতিহাস চর্চার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া), কুধারণা পোষণ ও Negative দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত। কেউ যদি খোলা মন নিয়ে মুন্তাখাবু'ত-তাওয়ারীখ অধ্যয়ন করেন তবে তিনি লেখকের নিষ্ঠা ও সততা, হৃদয়ের সবটুকু দরদ ও বেদনা এবং নির্ভীকভাবে সত্য কথা বলার সৎ সাহসের স্বীকার না করে পারবেন না। যিনি ব্যাপকভাবে ইতিহাস গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন তার মধ্যেই ইতিহাস ও রূপকথার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ, গ্রন্থকার ও তাঁর গ্রন্থের মান অনুধাবনের যোগ্যতা পয়দা হয়ে যায় এবং তিনি স্বয়ং পোদ্দারের মত আসল ও নকলের পার্থক্য বুঝতে পারেন।

এলিট 'মুন্তাখাবু'ত-তাওয়ারীখ' পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেন যে, ঘটনার বিবরণ দানকারী হিসাবে এমন খুব কম লেখকই আছেন যিনি বদায়ূনীর মত নিজের আবেগের প্রকাশ ঘটাতে চান, বিশেষত যিনি শাহী কর্ণের পক্ষে বিস্বাদ ও অমনোরম এবং যিনি স্বীয় ভ্রান্তি ও পদস্খলন এত খোলাখুলি ও বেপরোয়াভাবে বলতে পারেন (এলিট, ৫ম খণ্ড,৪৮০ পৃ.)।

"শাহযাদা সলীমের জন্মলাভে শুকরিয়া জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সম্রাট পায়ে হেঁটে আজমীর সফর করেন, প্রত্যাবর্তনের পথে দিল্লীতে ছাউনি ফেলেন এবং দিল্লীর আওলিয়ায়ে কেরামের মাযারসমূহ যিয়ারত করেন।"[১]

"আজুদহন গিয়ে হযরত শায়খুল মাশায়েখ ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেশকরের মাযার যিয়ারত করেন এবং মীর্যা মুকীম ইসফাহানীকে মীর ইয়াকূব কাশমীরীর সাথে রাফিযী [হযরত আলী (রা)-র বিরোধী] হবার অভিযোগে শাস্তি দেন।"[২]

"শা'বান-এর প্রথম দিকে সম্রাট আজমীর সফর করেন। সাত ক্রোশ দুর থেকে খালি পায়ে হেটে মাযারে উপস্থিত হন। নাকাড়া বাদ্য সহযোগে অনুষ্ঠান, আল্লাহওয়ালা, 'উলামা ও সালিহ বান্দাদের সাহচর্যে অবস্থান করেন এবং 'সামা'র মহফিল সরগরম থাকে।"[৩]

"ইবাদতখানায় "ইয়া হু" এবং "ইয়া হাদী"র যিকরে মগ্ন থাকতেন" (৯৮০ হিজরীতে ইবাদতখানার তিন ইমারত নির্মাণের বিস্তৃত বিবরণ)।[৪]

"ইবাদতখানায় প্রতি জুমু'আর রাত্রে সৈয়দ ও মাশায়েখ,'আলিম-'উলামা ও আমীর-উমারা ডেকে পাঠানো হত। সম্রাট স্বয়ং একটি মজলিসে যোগ দিতেন এবং মসলা-মাসাইলের আলোচনা করতেন।"

"এযুগেই কাযী জালাল এবং অপরাপর 'আলিমদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় তারা যেন কুরআন পাকের তফসীর বয়ান করেন।"[৫]

"৯৮৬ হিজরীর ঘটনা বর্ণনায় ফতেহপুর সিক্রীতে ইবাদতখানায় উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখে ইজামের সাহচর্যে জুমু'আর রাত্রে শবে বেদারী (রাত্রি জাগরণপূর্বক ইবাদত-বন্দেগী)-র আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়।"

"যখন খান যামান সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তখন তার মুকাবিলায় বহির্গত হবার পূর্বে সম্রাট দু'আ লাভের উদ্দেশ্যে দিল্লীর সমস্ত আও-লিয়ায়ে কিরামের মাযারে হাযিরা দেন।"[৬]

"মাহাম আঁকা কর্তৃক নির্মিত মাদরাসা খায়রু'ল-মানাযিলের পার্শ্বদেশ অতিক্রম করবার সময় ফূলাদ নামক জনৈক ব্যক্তি (শরফুদ্দীন হুসায়ন-এর ইঙ্গিতে) সম্রাটকে হত্যার উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করে। সম্রাট সামান্য আহত হন

১. মু. তা. ২য় খণ্ড, ১২৩ পৃ.।
২. ঐ, ১২৪ পৃ.।
৩. ঐ, ১৮৫ পৃ.।
৪. ঐ, ২০০ পৃ.।
৫. ঐ, (২য় খণ্ড) ২১১ পৃ.।
৬. ঐ, ২৫২ পৃ.।

এবং কয়েকদিনের চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই অতর্কিত হামলায় বেঁচে যাওয়াকে তিনি 'আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ক সংকেত এবং দিল্লীর হযরত পীরান পীরদের কারামত হিসাবে গণ্য করেন।"[১]

"একবার আজমীর যাবার পথে সেযুগের মশহুর বুযুর্গ শায়খ নিজাম নারনূলীর, যাঁর যুহ্‌দ ও তাকওয়ার খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল, খেদমতে হাযির হন।"[২]

"৯৮০ হিজরীতে আজমীরে সায়্যিদ হুসায়ন খাঙ্গ সওয়ারের মাযারে এবং কয়েক বছর পর হাঁসীতে হযরত কুত্‌ব জামালের মাযারে অত্যন্ত বিনয় ও শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে হাযির হয়ে ফাতিহা পাঠ করেন।"[৩]

"শায়খ সলীম চিশতীর সঙ্গে সম্রাটের গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। তাঁর রওযা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে নির্মাণ করান এবং তাঁর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসাবশত সম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী (জাহাঙ্গীর)-এর নাম রাখেন সলীম। কথিত আছে যে, শায়খ সলীম চিশতীর দু'আর বরকতে শাহযাদা সলীমের জন্ম হয়। সম্রাট শাহযাদা সলীমের জন্মের পূর্বে রাণী যোধা বাঈকে শায়খ সলীম চিশতীর মহলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যাতে রাণী তাঁর তাওয়াজ্জুহ ও দু'আ সার্বক্ষণিকভাবে লাভ করতে পারেন।"[৪]

"ঠিক তেমনি শাহযাদা মুরাদের জন্মও শায়খ-এর ঘরেই হয়েছিল।"[৫]

"শাহযাদা সলীম মকতবে যাবার উপযুক্ত হতেই তাঁর" বিসমিল্লাহ খানি" অনুষ্ঠানের জন্য সেযুগের মশহূর মুহাদ্দিছ মওলানা মীর কালাঁ হারাবীকে ডেকে আনা হয় এবং তিনি সম্রাট ও তাঁর সভাসদবর্গের উপস্থিতিতে শাহযাদাকে বিসমিল্লাহ খানি করান।"[৬]

"লেখাপড়া শেখার উপযুক্ত হতেই শাহযাদাকে শায়খ আবদুন নবীর ঘরে গিয়ে তাঁর নিকট হাদীসের তা'লীম হাসিলের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। শাহযাদা মওলানা জামীর 'চল্লিশ হাদীস' (চিহিল হাদীস) তাঁর নিকট পড়েন।"[৭]

---

১. মুন্তাখাবুত তাওয়ারীখ, ২৬২ পৃ.।
২. ঐ. ২৫২ পৃ.।
৩. ঐ. ২৩২ পৃ.।
৪. ঐ. ১০৮ পৃ.।
৫. ঐ, ১২৩ পৃ.।
৬. ঐ. ১৭০ পৃ.।
৭. ঐ. ৩০৪ পৃ.।

সম্রাট আকবর শায়খ আবদুন নবী (হযরত শায়খ আবদুল কুদ্দুস গঙ্গূহীর দৌহিত্র এবং আকবরের শাসনামলের সদর জাহান)-র প্রতি এতটাই ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করতেন যে, তিনি অধিকাংশ সময় তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর দরসে যোগদান করতেন। দু'-একবার তাঁর জুতাও সোজা করেছেন।"[১]

"সম্রাট তাঁর জন্য শাহী কারখানায় বিশেষভাবে দোশালা তৈরী করিয়েছিলেন এবং মোল্লা আবদুল কাদির-এর হাতে তাঁর খেদমতে পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আপনার জন্যই এটা শাহী কারখানায় তৈরী হয়েছে।"[২]

"ঐ আমলের মশহূর শাত্তারী শায়খ মুহাম্মদ গওছ গোয়ালিয়ারীর ভরণ-পোষণের জন্য এক কোটি মুদ্রা মূল্যের বার্ষিক রাজস্বের জায়গীর নির্দিষ্ট করেন। তাঁর ইনতিকালের পর তৎপুত্র শায়খ যিয়াউল্লাহ্‌র সঙ্গেও তিনি একইরূপ বিনয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার সম্পর্ক বজায় রাখেন।"[৩]

"বুযুর্গদের সঙ্গে এ ধরনের ভক্তি-শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্কে রক্ষা করে চলার এই ঐতিহ্য আকবর উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। তাঁর তৈমূরীয় পূর্বপুরুষ খাজা নাসিরুদ্দীন উবায়দুল্লাহ আহরার-এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। বাবর (প্রথম মুগল সম্রাট)-এর পিতামহ সুলতান আবু সাঈদ পায়ে হেটে তাঁর খেদমতে গমন করতেন এবং তাঁর পরামর্শ ব্যতিরেকে তিনি কোন কাজই করতেন না। বাবরের পিতা ওমর শেখ মির্যারও খাজা সাহেবের সঙ্গে ভক্তিপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। স্বয়ং বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে অত্যন্ত সসম্মানে তাঁর আলোচনা করেছেন। আকবরের বংশের নারী ও বেগমদের বৈবাহিক সম্পর্ক নক্‌শবান্দিয়া খান্দানের সঙ্গে হয়। হযরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরারের বংশের একজন বুযুর্গ খাজা ইয়াহইয়া ভারতবর্ষে আগমন করলে সম্রাট আকবর তাঁকে বিপুলভাবে সম্মানিত করেন, তাঁর ব্যয় নির্বাহের জন্য জায়গীর প্রদান করেন, তাঁকে হজ্জ প্রতিনিধি দলের আমীর নিযুক্ত করে মক্কা মুকার্রামায় পাঠান। প্রত্যাবর্তনের পর তাঁকে স্থায়ীভাবে আগ্রায় বসবাসের ব্যবস্থা করেন।"[৪]

"আকবর সপ্তার সাত দিনের জন্যই সাত জন ইমাম নিযুক্ত করে রেখেছিলেন যাঁরা পালাক্রমে নির্ধারিত দিনে নামাযের ইমামতি করতেন। বুধবার দিনের ইমামতির দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ূনীর উপর।"[৫]

---

১. মুন্তাখাবুত-তাওয়ারীখ, ২৩৭ পৃ.
২. ঐ. ২০২ পৃ.
৩. ঐ, ৩য় খণ্ড, ১০০ পৃ.।
৪. ঐ. ২৫১ পৃ.।
৫. ঐ, ২০৪ পৃ.।

"প্রতি বছর এক বিরাট সংখ্যক মানুষকে সরকারী খরচে হজ্জে পাঠাতেন। আমীরু'ল-হাজ্জের হাতে মক্কার শরীফের জন্য তোহফা এবং হারাম এলাকার অধিবাসীদের জন্য নগদ অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী পাঠাতেন।"[১] "হজ্জ কাফেলা রওয়ানা হবার দিন হাজীদের মত ইহরাম বেঁধে মাথার চুল কিছুটা ছেটে কেটে তকবীর বলতে বলতে খালি মাথায় ও নগ্নপদে বহুদূর অবধি তাদেরকে বিদায় জানাতে গমন করতেন। এই দৃশ্যে এক শোরগোল সৃষ্টি হত এবং লোকের চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠত।"[২]

শাহ আবূ তুরাব যখন হেজায থেকে ভারতবর্ষে কদম রসূল [রসূল (সা)-এর পবিত্র পদ-চিহ্ন] নিয়ে আসলেন এবং আগ্রার কাছাকাছি পৌঁছুলেন তখন সম্রাট তাঁর অমাত্যবর্গ ও একদল আলিম-'উলামা সমভিব্যাহারে শহর থেকে চার ক্রোশ বাইরে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।[৩]

পরিশেষে আমরা তাঁর দীনদারীর সাক্ষ্য মুগল শাসনামলের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক মীর আবদুর রাযযাক খাফী খান, যিনি সামসামুদ্দৌলা শাহনওয়ায খান নামে পরিচিত (১১১১-১১৭১ হি.),-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মাআছিরু'ল-উমারা'য় লিখিত নিম্নোক্ত বিবরণের উপর সমাপ্ত করছি। তিনি লিখছেন ঃ

اکبر بادشاہ بہ ترغیب شیخ در اجراء احکام شرعی و امر معروف و نہی منکر فراواں جہد می فرمود وخود اذان می گفت وامامت می کرد حتی بقصد ثواب بمسجد جاروب می زد۔

"সম্রাট আকবর শরীয়তের বিধি-বিধান, সৎকাজে আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ-এর ক্ষেত্রে খুবই চেষ্টা চালাতেন। স্বয়ং আযান দিতেন এবং ইমামতি করতেন। এমনকি ছওয়াবের নিয়তে মসজিদ ঝাড়ুও দিতেন।"[৪]

আকবরের মেযাজে পরিবর্তন এবং তাঁর শাসনামলের দ্বিতীয় যুগ[১]

সম্রাট আকবরের দীনদারী ও ধর্মপ্রীতির যে উদাহরণ উপরে দেওয়া হল পাঠক এর থেকে পরিমাপ করতে পারবেন যে, তা ছিল এমন এক ধরনের ভাসাভাসা ধরনের ধর্মবোধ যার বুনিয়াদ দীনের সহীহ সমঝ বা যথার্থ উপলব্ধি,

১. মুন্তাখাবুত-তাওয়ারীখ.২৫১ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত, ২৩৯।

৩. মাআছিরু'ল-উমারা, ২য় খণ্ড, ৫৬১ পৃ.।

৪. বলা হয় যে, জাহাঙ্গীর তাঁর জীবনীতে সম্রাট আকবরের ইনতিকালের যে বিবরণ রেখে

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কুরআন-সুন্নাহ্ সম্পর্কে অবহিতি এবং সরাসরি ইল্ম ও অধ্যয়নের উপর ছিল না। বিজ্ঞ আলিমদের তা'লীম এবং সহীহ্ দীনী সুহবত ও তরবিয়ত তথা সঠিক ধর্মীয় সাহচর্য ও প্রশিক্ষণ থেকে উপকৃত হবার পরিবর্তে যুগের রুচি, সিপাহীসুলভ মেযাজ এবং মধ্য এশিয়ার ধর্ম সম্পর্কে অনবহিত আমীর-উমারা ও ক্ষমতাধিকারীদের অনুসরণ ও অনুকরণ এবং তা সুধারণা নয় বরং দুর্বল 'আকীদা-বিশ্বাসের উপর স্থাপিত ছিল। আর এই দীনদারীর প্রধান অঙ্গসমূহ ছিল মাযারে হাযিরা দেওয়া, ক্রোশের পর ক্রোশ পায়ে হেটে মাযারে যাওয়া, সেখানকার গদ্দীনশীন-এর সঙ্গে (যারা অধিকাংশই হত 'ইল্ম বর্জিত মূর্খ, পূর্বপুরুষের গুণাবলী ও কামালিয়াত থেকে সহস্র যোজন দূর এবং বিশুদ্ধ রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতা শূন্য) স্বীয় বিনয়-নম্রতা ও আত্মোৎসর্গের প্রকাশ, খানকাহ্র ঝাড়-মোছ, যিক্র ও সামা মাহ্ফিলে যোগদান, দরবারী ও সরকারী 'আলিম-উলামা' ও শায়খদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন। আকবরের জীবনী থেকে পূর্বেই আমরা জেনে গেছি যে, তিনি একেবারেই নিরক্ষর ছিলেন।[২] তায়মুরী বংশের মেযাজের ভেতর সাধারণভাবে সীমাতিরিক্ততা, চরম পন্থাপ্রিয়তা ও মাত্রাতিরিক্ত সুধারণা অনুপ্রবিষ্ট ছিল। হুমায়ূন সম্পর্কে ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, পরিশ্রমের ক্ষেত্রে, যুদ্ধের ময়দানে, কষ্টসহিষ্ণুতায় ও প্রতিকূল পরিস্থিতি মুকাবিলায় তাঁকে মনে হত তিনি রক্ত-মাংসের মানুষ নন, বরং ইস্পাতে গঠিত। তিনি মানুষ নন, জিন্ন। কিন্তু তিনি যখন আরাম কিংবা বিশ্রামে যেতেন অমনি

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর) গেছেন তা থেকে জানা যায় যে, তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং কলেমায়ে শাহাদত পাঠ করে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। সেসময় তাঁর নিকট সূরা ইয়াসীন ও দু'আ পড়া হচ্ছিল। এ ব্যাপারে আমরা কোন আলোচনা করতে চাইনা, আল্লাহ্ তার সঙ্গে কি আচরণ করেছেন এবং তিনি কোন্ অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। আমরা তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করতে আগ্রহী যা তিনি নতুন ধর্ম ও আইন জারী করতে গিয়ে করেছিলেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের উপর তা কি কুফল বয়ে এনেছিল।

১. আকবরের চার বছর চারমাস চার দিন বয়সে প্রথা মাফিক মকতবে পাঠাবার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং মোল্লাযাদা 'ইসামুদ্দীন ইবরাহীম তাঁর গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি টের পান আকবরের লেখাপড়ার প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। একে শিক্ষকের ব্যর্থতা ও অমনোযোগিতা হিসাবে ধরা হয় এবং শিক্ষক হিসেবে মোল্লাযাদার পরিবর্তে মওলানা বায়েযীদ নিযুক্ত হন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। শেষে সম্রাট মওলানা বদায়ূনীকে নির্বাচিত করেন। কিন্তু এতেও শাহযাদার মন-মানসিকতা লেখাপড়ার প্রতি আকৃষ্ট হল না। রাজনৈতিক অবস্থা এবং এর ফলে সৃষ্ট প্রতিদিনের স্থান পরিবর্তনে পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকে। আকবরের লেখাপড়া শেখার প্রয়াস নিষ্ফল হয় এবং তিনি নিরক্ষরই থেকে যান। সংক্ষিপ্ত-তাওয়ারীখ আহদে আকবরী।

সব ভুলে যেতেন। তখন বোঝাই যেত না তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের একজন অকুতোভয় সিপাহী। তদীয় পৌত্র জাহাঙ্গীরের মধ্যেও এই বৈপরিত্য ও ভারসাম্যহীনতা দৃষ্টিগোচর হবে।

অতঃপর একথা বিস্মৃত হওয়াও ঠিক হবে না যে, যেই প্রতিকূল ও অস্বাভাবিক অবস্থার ভেতর দিয়ে তাঁর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিল, পিতৃব্যদের যেই মনুষ্যত্বহীনতা, হৃদয়হীনতা ও ভীরুতা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং যে তিক্ত বরং বিষাক্ত ঢোক তিনি তাঁর পিতার পরাজয় ও ইরান সফরকালে গিলে ছিলেন, অতঃপর বৈরাম খানের সাথে যা কিছু ঘটেছিল এ সবই তাঁর তবিয়তে মানবীয় প্রকৃতির দিক থেকে বদগুমানী, বড় থেকে বড় এবং ভাল থেকে ভাল লোকের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় এবং মেযাজে এক ধরনের তিরিক্ষি (تلون) ভাব সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

বিভিন্ন ধর্মের মাঝে তুলনা ও গবেষণা, বিতর্ক সভা এবং এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

এই অবস্থার সংস্কার ও সংশোধন, এ সব দুর্বলতার উপর তাঁর জয়লাভ করা এবং তাঁকে ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত করে তোলা ও ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখা বরং বহু মুসলিম সুলতানের মতই (যাদের মধ্যে কতক তাঁর বংশেই জন্ম হয়েছে) দীনের সমর্থক ও মদদগার বানিয়ে রাখবার জন্য উপযোগী সূরত এই হতে পারত যে, সম্রাট আকবর এই বাস্তব সত্য স্বীকারপূর্বক যে, তিনি অক্ষরজ্ঞানহীন অশিক্ষিত, (আর এটা এমনই এক দুর্বলতা যে, সম্রাট বাবর থেকে বাহাদুর শাহ পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের আর কোন সম্রাটকেই এমনটি পাওয়া যায় না) সাম্রাজ্য জয়ের অভিযান এবং রাজ্যের বিস্তৃতির দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ করতেন যার অসাধারণ যোগ্যতা ও খোদাপ্রদত্ত প্রতিভা তাঁর ভেতর ছিল এবং ধর্মীয় বিষয়াদিতে তিনি হস্তক্ষেপ না করতেন; বরং একজন সহজ সরল ও সাদাসিধে মুসলমান ও সৈনিকের মতই ধর্মীয় ব্যাপারগুলোকে 'আলিম-'উলামা' এবং সাম্রাজ্যের জ্ঞানী-গুণী অমাত্যবর্গের হাতে সোপর্দ করতেন, বাবর ও হুমায়ূন (শিক্ষিত এবং সাহিত্যিক রুচি থাকা সত্ত্বেও) যেমনটি করেছিলেন, বিশেষত নাযুক 'আকীদাগত ও কালামশাস্ত্রীয় মসলাগুলো, নানা ধর্মের প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অদৃশ্য তথা গায়বী লোকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহকে গবেষণা ও বিশ্লেষণের ময়দানে টেনে না আনতেন যেখানে সামান্যতম ভুল কিংবা অসতর্কতায় মানুষ কুফর ও ধর্মদ্রোহিতার সীমায় প্রবেশ

করে এবং দীন ও ঈমানের পুঁজি খুঁইয়ে বসে, যার ক, খ জ্ঞান তথা প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কেও আকবর স্রেফ অজ্ঞ ছিলেন, যা রাজনৈতিক স্বার্থ এবং এমন একজন সম্রাটের স্বার্থেরও পরিপন্থি ছিল, যিনি চারশ' বছরের মুসলিম সাম্রাজ্য থেকে রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। এই রূপ নাযুক আকীদাগত ও কালাম শাস্ত্রীয় মসলার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা এবং এ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যবহারের মত ভুল খলীফা মামুনুর রশীদ (১৭০ হি.-২১৮) -এর মত একজন বিজ্ঞ 'আলিম ও ক্ষণজন্মা খলীফার পক্ষেও আনুকূল্য বয়ে আনে নি এবং তিনি এ থেকে কোন সুফলও লাভ করতে পারেন নি।[১]

কিন্তু আকবর পেয়েছিলেন অস্থির প্রকৃতি এবং সন্দেহপ্রবণ মস্তিষ্ক। এ দিকে অনুপম সৌভাগ্য এবং অব্যাহত সাফল্য ও বিজয় তাঁকে তাঁর নিজের সম্পর্কে কতকটা আত্মতুষ্টি ও আত্মপ্রতারণার শিকারে পরিণত করে দিয়েছিল। তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন যে, তিনি যেভাবে রাজনৈতিক সমস্যা ও জটিলতার গ্রন্থি উন্মোচন এবং রাষ্ট্রীয় সংকটের সমাধান করে থাকেন ঠিক সেভাবে ধর্ম ও ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের কণ্টকপূর্ণ উপত্যকাও অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে অতিক্রম করতে পারেন।

অপরদিকে দরবারের কতিপয় ধূর্ত অমাত্য কিছুটা নিজেদের মেধাগত শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করবার জন্য এবং কিছুটা সম্রাটের খেলোয়াড়োচিত স্বভাব ও মজলিসের রৌনক বৃদ্ধির নিমিত্ত মোরগ,মেষ,ষাড় ও হাতীর লড়াই (যা প্রাচ্যের সুলতান ও আমীর-উমারার প্রাচীন ক্রীড়া-কৌতুক ছিল)-এর পরিবর্তে বিভিন্ন ধর্ম ও ফের্কার আলিমদের দঙ্গল কায়েম করেন এবং নাম দেন ধর্মীয় গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা। এ এক নিরেট ও বাস্তব সত্য যে, (আর ধর্ম ও চিন্তার ইতিহাসে এর শতবার অভিজ্ঞতা হয়েছে) যে, যদি এসব বিতর্ক অনুষ্ঠান, আলিম-উলামা ও বিভিন্ন ধর্মের প্রবক্তাদের কথার তুবড়ী ও কচকচানীর শ্রোতা যদি গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞান এবং সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের অধিকারী না হন,এর চেয়ে বড় কথা এই যে, আল্লাহ্র তওফীক যদি তার সহগামী না হয় তাহলে তার পক্ষে সন্দেহ ও সংশয়, অজ্ঞতা ও জাহিলিয়াতের বিজন উপত্যকায় পথ হারানো কিংবা ধর্মদ্রোহিতা ও কুফরীর গভীর আবর্তে নিক্ষিপ্ত হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নয়।

সম্রাট আকবর সম্পর্কে পুত্র জাহাঙ্গীরের সাক্ষ্যের চেয়ে আর কারো সাক্ষ্য অধিকতর বিশ্বস্ত হতে পারে না। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন ঃ

---

১. বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন 'ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক, ১ম খণ্ড, খালক-ই কুরআন-এর ফেতনা।

"ওয়ালেদ মাজেদ প্রতিটি ধর্ম ও মযহাবের জ্ঞানী-গুণী ও মনীষীদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতেন, বিশেষত ভারতীয় মনীষী ও পণ্ডিতদের সঙ্গে। তিনি নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও এসব বৈঠকের আধিক্যের দরুন 'আলিম-ফাযিলদের সাথে কথাবার্তায় কেউ তাঁর নিরক্ষরতা ও লেখাপড়া না জানা সম্পর্কে জানতে পারত না। গদ্য ও পদ্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহ এত ভাল বুঝতেন যার চেয়ে বেশী সম্ভব নয়।"[১]

ইসলাম,হিন্দু ধর্ম এবং ভারতবর্ষের অপরাপর ধর্ম ও ফের্কাগুলোর প্রতিনিধি ও প্রবক্তাদের উপরই এ ব্যাপার সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি, বরং এর জের ফিরিঙ্গীদের পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। স্বয়ং আবুল ফযল লিখছেন যে, দরবারের পক্ষ থেকে তওরীত, ইনজীল ও যবুরের তরজমা এবং এ সবের সারমর্ম সম্রাট অবধি পৌঁছুবার ব্যবস্থা করা হয় এবং এজন্য দরবারের একজন অমাত্য সায়্যিদ মুজাফফরকে নিযুক্ত করা হয়। কতিপয় খ্রিষ্টান শাসককে পত্র প্রেরণ করা হয়ঃ

"আমরা অবসর সময়ে সকল ধর্মের জ্ঞানী-গুণীদের সঙ্গে মিলিত হই এবং তাদের পবিত্র বাণী ও উন্নত চিন্তাধারা থেকে উপকৃত হই। ভাষার অপরিচিতি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সেজন্য এমন কাউকে পাঠিয়ে আমাদেরকে আনন্দ দান করবেন যিনি ঐ সমস্ত উচ্চ ভাব ও মর্ম উন্নত ভাষার মাধ্যমে মনে গেঁথে দিতে পারেন। সম্রাট শুনতে পেয়েছেন যে, আসমানী গ্রন্থ তওরীত, যবুর, ইনজীল-এর তরজমা আরবী-ফার্সী ভাষায় হয়েছে। তরজমাকৃত ঐ সব গ্রন্থ যদি এ দেশে থাকে তবে সর্বসাধারণের উপকারার্থে সেগুলো পাঠিয়ে দেবেন। ভালবাসা ও প্রীতিবন্ধনের নবায়ন এবং ঐক্যের বুনিয়াদ মজবূতকরণের ধারণায় জনাব সায়্যিদ মুজাফফরকে (যিনি আমাদের অবদানধন্য) ঐ সব তরজমার কয়েকটি নুসখা (কপি)-র জন্য পাঠানো হল। তিনি আপনাদের সাথে খোলাখুলি কথা বলবেন। আপনি তার উপর আস্থা রাখবেন এবং বরাবর চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।"[২]

তরজমা ছাড়াও স্বয়ং খ্রিস্টান পাদরীরা দরবারে এসে হাযির হয় এবং তারা তাদের ধর্ম সম্রাটের সামনে পেশ করে ত্রিত্ববাদ ও খ্রিস্টধর্ম দলীল-প্রমাণ সহযোগে প্রমাণিত করতে চেষ্টা চালায়। মোল্লা বদায়ূনী লিখেন ঃ

"দরবারে ফিরিঙ্গী মুলুকের সাধু পণ্ডিতদেরও একটি দল ছিল। এদেরকে পাদরী বলা হয়। তাদের বড় মুজতাহিদের নাম পাপা (পোপ)। তারা ইনজীল

১. তুযুক-ই জাহাঙ্গীরী, ১৫ পৃ.।
২. ইন্‌শা-ই আবুল ফযল, ৩৯ পৃ.।

পেশ করে এবং ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে দলীল-প্রমাণ পেশ করত খ্রিস্টবাদকে সত্য ধর্ম হিসাবে প্রমাণ করে।"[১]

বিতর্ক সভার পুরনো অভিজ্ঞতা এই যে, কোন ধর্মের সত্যতা ও তার শ্রেষ্ঠত্বের সপক্ষে ফয়সালা করার জন্য সর্বদা দলীল-প্রমাণের শক্তি এবং জ্ঞানগত প্রমাণই যথেষ্ট ও চূড়ান্ত হয় না। এর অনেকটাই নির্ভর করে সেই ধর্মের প্রবক্তা ও প্রতিনিধিবৃন্দের সুতীক্ষ্ণ বাগ্মিতা ও বাকশক্তির উপর। এমনও দেখা যায় যে, একটি কমযোর ধর্মের প্রতিনিধি অধিক বাক-সক্ষম বা বাকপটু, মিষ্টভাষী, মানব প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত এবং সুযোগ-সন্ধানী হয়েছে। ফলে তারা শ্রোতাদেরকে প্রভাবিত ও ভক্তে পরিণত করে ফেলেছে। অপর পক্ষে একটি সত্য সঠিক ধর্মের মুখপাত্র (কোন কারণবশত) এ সব বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত এবং ঐসব বাক-অস্ত্রশূন্য হয়েছে আর এসব ত্রুটির কারণে প্রতিযোগিতায় সে হেরে গেছে। এতে খুবই সন্দেহ রয়েছে যে, সম্রাট আকবরের দরবারে ইসলামের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র হিসাবে ভূমিকা পালন করার মত যে সব আলিম ছিলেন তাদেরকে ঐসব বিজ্ঞ ও চতুর ফিরিঙ্গীদের মুকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হত, তওরীত, ইনজীল ও খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে যাদের পড়াশোনা এবং এবং সেসবের দুর্বলতা সম্পর্কে জানাশোনা এবং ইসলামকে যুক্তির সাহায্যে ও কার্যকরভাবে পেশ করার যোগ্যতা এমত পরিমাণের ছিল না যদ্দারা তারা এসবকে ঐ সব পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারেন এবং ইসলামের মুখপাত্রের হক আদায় করতে পারেন। এ থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে, সম্রাটের মনে ঐসব বিদেশী খ্রিস্টান পণ্ডিতদের যৌক্তিক ও কার্যকর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং মুসলিম আলিমগণ (যারা এ ময়দানের মর্দে মুজাহিদ ছিলেন না) তাঁর দৃষ্টি পথ থেকে নিম্নে পতিত হন।

এর ফল যা হবার তাই হল। মোল্লা আবদুল কাদির লিখেছেন ঃ

"বিদআতী ও কল্পনাবিলাসী প্রবৃত্তি পূজকরা তাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও অমূলক সন্দেহ-সংশয়ের কারণে খাত থেকে বেরিয়ে আসল এবং বাতিলকে হকের সুরতে এবং ভুল-ভ্রান্তিকে সহীহ্-শুদ্ধ আবরণে পেশ করতে লাগল। সত্যপিয়াসী প্রতিভাবান সম্রাটকে, যিনি নিজে একেবারেই অক্ষর-জ্ঞানহীন ছিলেন, কাফিরদের অন্তরঙ্গতা আরও সন্দেহের আবর্তে নিক্ষিপ্ত করল এবং তাঁর বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল। ফলে আসল উদ্দেশ্য হল পণ্ড, সম্রাটের উপর থেকে শরীয়তের

---

১. মুন্তাখাবু'ত-তাওয়ারীখ, ২য় খণ্ড, ২৬০ পৃ.।

বাঁধন গেল টুটে। অবস্থা এতদূর গিয়ে গড়াল যে, পাঁচ-ছ' বছর পর ইসলামের কোন প্রভাবই আর তাঁর মধ্যে অবশিষ্ট রইল না এবং ব্যাপারটা গেল একদম পাল্টে।"১

অন্যত্র লিখেছেন ঃ

"ধর্মের রুকনসমূহের প্রতিটি রুকন এবং ইসলামী আকাইদের প্রতিটি আকীদা সম্পর্কে, চাই এর সম্পর্ক উসূল তথা মূলনীতির সাথেই হোক কিংবা এর কোন শাখা-প্রশাখার সাথেই হোক—যেমন নবুওত ও কালাম শাস্ত্রীয় মসলা, দীদারে ইলাহী তথা আল্লাহ্র দর্শন, মানুষের মুকাল্লাফ (মানুষ তার কর্মের জন্য দায়ী এই মত) হওয়া, বিশ্বজগতের সৃষ্টিকরণ, হাশর-নশর প্রভৃতি সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপের সাথে নানা ধরনের সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করা হতে লাগল।"২

এর উপর আরও যা ঘটল তা এই যে, তফসীর ও ইতিহাসের মত নাযুক বিষয় যেখানে আল্লাহ-ভীতিশূন্য ও ভাসাভাসা জ্ঞানের অধিকারী লোকদের মস্তিষ্কজাত বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টির বিরাট সুযোগ রয়ে গেছে, এই নিরক্ষর সম্রাটের দরবারে হাল্কা ও নিঃশংক পরিবেশে পড়া হতে লাগল।

মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ূনী অন্যত্র লিখেছেন ঃ

"এই দিনগুলোতেই কাযী জালাল এবং অপরাপর আলিমদের প্রতি হুকুম হয় যে, তারা কুরআন শরীফের তফসীর বয়ান করবেন। স্বয়ং উলামায়ে কিরামের মধ্যে এ ব্যাপারে বেশ দ্বন্দ্ব ছিল। রাজা মনঝুলার ভাঁড় দীপচান্দ বলত যে, যদি আল্লাহ তা'আলার নিকট গাভী সম্মানিত বিবেচিত না হত তাহলে কুরআনের প্রথম সূরায় তা উল্লিখিত হত না। যখন থেকে ইতিহাস গ্রন্থ পঠিত হতে লাগল তখন থেকে সাহাবা-ই কিরাম (রা) সম্পর্কে লোকের ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাস শিথিল হতে লাগল। সম্মুখে গিয়ে নামায, রোযা এবং তামাম ইসলামী শিক্ষামালাকে 'অন্ধ অনুকরণ' নাম দেওয়া হতে লাগল অর্থাৎ এগুলোকে অযৌক্তিক বলা হতে লাগল। দীনের ভিত্তি ওয়াহী ইলাহীর পরিবর্তে যুক্তির উপর রাখা হতে লাগল। ফিরিঙ্গীদের আনা-গোনাও চলতে থাকল। অনন্তর তাদের কোন কোন ধর্ম-বিশ্বাসও গ্রহণ করা হল।"৩

---

১. মুন্তাখাবু'ত-তাওয়ারীখ, ২য় খণ্ড, ২৫৫ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত, ৩০৭ পৃ.।

৩. মুন্তাখাবু'ত-তাওয়ারীখ, ২য় খণ্ড, ২১২ পৃ.।

আকবরের মেযাজ পরিবর্তনে দরবারের আলিম-উলামা ও সাম্রাজ্যের পদস্থ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব

সম্রাট আকবরকে ইসলামের সোজা-সরল রাস্তা (সিরাতে মুস্তাকীম)-এর উপর কায়েম রাখা এবং তাঁর মেযাজকে ভারসাম্যহীনতা ও ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার হাত থেকে বাঁচাবার ক্ষেত্রে শাহী দরবারের আলিম-উলামা এবং সাম্রাজ্যের অমাত্যবর্গ বিরাট মৌলিক ও উপকারী ভূমিকা পালন করতে পারতেন। কিন্তু এর জন্য একদিকে এমন সব 'আলিম-উলামার প্রয়োজন ছিল যাঁরা দীনের হিকমত ও সমঝ-এর ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ ছিলেন, যাঁদের দৃষ্টি আংশিকের তুলনায় সামগ্রিকতার প্রতি অধিকতর নিবদ্ধ, উপায়-উপকরণের তুলনায় লক্ষ্যের প্রতি অধিকতর নিবেদিত এবং বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার তুলনায় মিলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার দিকে অধিকতর আগ্রহী, যাঁরা উন্নত চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত ও স্বার্থলেশহীন, যাঁরা পদমর্যাদা ও দুনিয়াপ্রীতি থেকে যথাসম্ভব দূরে অবস্থান করবেন এবং যাঁদের একটা পরিমাণে আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়ায়ে নফ্স, আত্মিক পবিত্রতা) লাভ ঘটেছে, যাঁরা এই বিশাল উর্বর শ্যামল মুসলিম সাম্রাজ্যের গুরুত্ব ও মাধুর্য বেশ ভাল রকম উপলব্ধি করতে পারেন যা এই অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টি (যাদের ভেতর অদ্যাবধি নিজেদের সাম্রাজ্য ও ক্ষমতা হারাবার অনুভূতি বিদ্যমান এবং যাদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে কোন সাম্রাজ্যই কায়েম থাকতে পারে না) দ্বারা বেষ্টিত এবং অনুভব করতে পারেন এও যে, তাদেরকে যেই তায়মুরী সাম্রাজ্যের খেদমত ও নেতৃত্বের সোনালী ও ঐতিহাসিক সুযোগ মিলেছে তা এই মুহূর্তে তুর্কী উছমানী সাম্রাজ্যের পর বিস্তৃতি, উপকরণের আধিক্য, জনশক্তি এবং ধর্মীয় প্রেরণার কর্তৃত্ব, মোটের উপর সকল দিক দিয়েই দুনিয়ার সর্ববৃহৎ মুসলিম সাম্রাজ্য বিধায় এর হেফাযত করা, ইসলামের সঙ্গে এর সম্পর্ক কায়েম রাখা, এর শাসককে এসব নাযুক অবস্থায় এই 'লৌহ-সীসা' ও ঐ 'আগুন-তূলা' একত্রে রাখতে সাহায্য করা সময়ের সবচে' বড় ইবাদত এবং দেশ ও ধর্মের সবচে' বড় খেদমত।

অপরদিকে সাম্রাজ্যের এমন সব অমাত্য ও দরবারী উপদেষ্টা মেলাও প্রয়োজন ছিল যারা এই দীন (ইসলাম)-এর উপর [যেই সাম্রাজ্যের ভিত্তি সম্রাট বাবর রানা সঙঘের (৯৩৩ হি.) মুকাবিলায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে শরীয়ত নিষিদ্ধ সকল বস্তু থেকে তওবাহ্ করে এবং আল্লাহ্র বন্দেগী করবার প্রতিজ্ঞায় নতুনভাবে আবদ্ধ হয়ে রেখেছিলেন][1] নিজেরাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী এবং সম্রাটের ক্ষেত্রেও অনুরূপ

বিশ্বাসী হওয়াকে পসন্দ করেন, যারা সর্বপ্রকার মানসিক বিপর্যয় ও বিশৃংখলা থেকে মুক্ত ও নিরাপদ এবং ঐসব ধ্বংসাত্মক ও ধর্মদ্রোহী আন্দোলন থেকে দূরে অবস্থান করেন যা দশম শতাব্দীতে ইরান ও ভারতবর্ষে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং যা ছিল সাম্রাজ্য ও সমাজ দেহের সম্পর্ক দুর্বলকারী, বিশ্বাসগত ও নৈতিক নৈরাজ্য বিস্তারকারী, যাদের মধ্যে সাম্রাজ্যের শাসন-শৃঙখলা ও আইন প্রণয়নের যোগ্যতার সঙ্গে নৈতিক ও চারিত্রিক সমুন্নতি, ধর্মীয় সংহতি ও দৃঢ়তা এবং মযহাবী পাবন্দীও পাওয়া যায়।

যদি এ দু'টো উপাদান সম্রাট আকবর এবং তাঁর সাম্রাজ্য পেয়ে যেত তাহলে এতে সন্দেহের কোনই কারণ নেই যে, এই সাম্রাজ্য প্রাচ্যে ইসলামের সাহায্য-সমর্থন এবং দীনের খেদমতে সেই কর্ম সম্পাদন করত যা পাশ্চাত্যে তুরস্কের উছমানী সাম্রাজ্য করেছে। ইকবালের ভাষায় ঃ

نہ تھے ترکاں عثمانی سے کم ترکان تیموری

উছমানী তুর্কীদের চেয়ে তুর্কী তৈমুরীগণ কোন দিক দিয়েই অযোগ্য ছিল না।

কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আকবর (তাঁর সৌভাগ্য রবি ও খোশনসীবীর সাথে) এই দু'টো দলের মধ্যে থেকে যাদেরকে পেলেন তারা সংখ্যায় এতই কম যারা এই মানদণ্ডে পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হন না, বরং দুঃখজনক বিষয় এই যে, তারা এই পর্যায়ে খেদমতের পরিবর্তে বদ-খেদমতী, আকবরকে দীনের কাছে টেনে আনার পরিবর্তে আরও দূরে ঠেলে দেওয়া, দীন-ধর্মের প্রতি ঘৃণা ও বিরূপ মনোভাবের উদ্রেক করা এবং ইসলাম বিরোধী দাওয়াত ও আন্দোলন থেকে দূরে রাখা কিংবা সে সবের উৎখাত ও উৎসাদনে উৎসাহিত করার পরিবর্তে তাঁকে ঐসব দাওয়াত ও আন্দোলনের পতাকাবাহী বরং সেসবের খয়ের-খা বানাবার খেদমতে আত্মনিয়োগকারী ছিল।

দরবারী আলিম-'উলামা'

সম্রাট আকবরকে যে দু'টো বস্তু গোমরাহীর দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তার প্রথমটি হল দরবারী আলিম-উলামা। আমরা প্রথমে তাদের নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আকবর প্রথমে তাঁদের ভীষণ ভক্ত ছিলেন, তাঁদের উপর তিনি সর্বাধিক নির্ভর করেন এবং যাঁরা দরবারে সম্রাটের সবচে'বেশী নৈকট্য লাভ করেছিলেন, যাঁরা ছিলেন—ইসলামের একজন শ্রেষ্ঠতম আলিম ও বিশেষজ্ঞ

১. বিস্তারিত 'তারীখে ফিরিশতা'য় দেখুন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক-এর মতে সকল প্রকার অরাজকতা ও বিপর্যয়ের পেছনে তিনটি ক্রিয়াশীল উপাদানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها

"দীনের বিকৃতি ও ক্ষতিসাধন ক্ষমতাসীন রাজা-বাদশাহ, উলামায়ে সু' (আত্মবিক্রীত স্বার্থসর্বস্ব দুনিয়াপূজারী আলিম-'উলামা) এবং স্বার্থ শিকারী ভণ্ড সূফীরা ছাড়া আর কে করেছে?"

আমরা এক্ষেত্রেও মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ুনীর সাক্ষ্য উদ্ধৃত করছি যিনি স্বয়ং রাজদরবারের একজন সদস্য ছিলেন এবং তাঁর এসব বিবরণের মধ্যেও যা তিনি এক ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসেবে স্বীয় দল ও সাথীদের সম্পর্কে স্বয়ং দিয়েছেন, এতে তাঁর কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ কিংবা শত্রুতা ছিল বলে মনে হয় না। দরবারী আলিমদের ছবি এঁকেছেন তিনি এভাবে ঃ

"প্রতি জুমু'আর রাত্রে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, পীর-মাশায়েখ, উলামায়ে কিরাম এবং আমীর-উমারাকে তিনি ইবাদতখানায় ডেকে পাঠাতেন। দরবারে কে সামনে বসবেন আর কে পিছনে বসবেন এ নিয়ে উলামা ও মাশায়েখদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেতে শুরু করে। প্রত্যেকেই একে অপরের সামনে এবং বিশিষ্ট আসনে উপবেশন করতে চাইত। বাদশাহ এ সমস্যার সমাধান করে নির্দেশ দেন যে, আমীর-উমারা পূর্ব দিকে, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ পশ্চিম দিকে, উলামায়ে কিরাম দক্ষিণ দিকে এবং মাশায়েখগণ উত্তর দিকে বসবেন। বাদশাহ নিজে এক একটি হাল্‌কায় আসতেন এবং মসলা-মাসাইল তাহকীক করতেন।"[১]

মোল্লা সাহেব লিখছেন, "এক রাত্রে আলিম-উলামা' বিরাট জোরে জোরে কথা বলতে ও তর্ক-বিতর্ক করতে লাগলেন। এ থেকে সম্রাটের মনে বিরক্তির সৃষ্টি হয় এবং একে তিনি বেতমিযী ও দুনিয়াদারী হিসাবে ধরে নেন।"[২]

"পারস্পরিক কথা কাটাকাটি অবশেষে একে অপরের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। মতপার্থক্য এতদূর পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায় যে, একে অপরকে তাঁরা কাফির ও পথভ্রষ্ট বলতে থাকেন। ক্রোধে সবাই ফুঁসছিলেন এবং ঝগড়া অবশেষে চীৎকারে গিয়ে দাঁড়ায়। সভ্যতা ও ভব্যতার সকল মাত্রা তাঁরা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।"

১. মুন্তাখাবু'ত -তাওয়ারীখ, ২য় খণ্ড,২০২ পৃ.।
২. প্রাগুক্ত, ২০৩ পৃ.।

সম্রাট আকবর এতে সাংঘাতিক ত্যক্ত ও বিরক্ত হয়ে মোল্লা আবদুল কাদিরকে নির্দেশ দেন যে, অতঃপর যেই আলিম এই মজলিসে কোনরূপ বদতমীযী প্রদর্শন করবেন তাকে সেখান থেকে উঠিয়ে দেবেন।

উচ্চ ধর্মীয় পদমর্যাদাধিকারীদের মধ্যে একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন মোল্লা আবদুল্লাহ সুলতানপূরী,[১] যাঁর পদমর্যাদা ও উপাধি ছিল মখদূমু'ল-মুল্ক, যিনি কেবল এই ভয়ে যাতে হজ্জ করতে না হয়, হজ্জের ফরযিয়ত তথা বাধ্যবাধকতা আর অবশিষ্ট নেই বলে ফতওয়া দিয়েছিলেন। যাকাতের ক্ষেত্রেও তিনি শরঈ কৌশল ও চালবাজীর আশ্রয় নিতেন এবং এভাবে শরীয়তের বাধ্য-বাধকতা থেকে বেঁচে যেতেন।[২] সম্রাট আকবরের শাসনামলে এবং তাঁর সৌভাগ্য রবি মধ্যাহ্ন গগনে থাকাকালে তিনি এত ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন যে, স্বর্ণভর্তি কয়েকটি সিন্দুক তাঁর পৈতৃক কবরস্থান থেকে উদ্ধার করা হয় যেগুলো মুর্দার বাহানায় তিনি সেখানে দাফন (প্রোথিত) করেছিলেন।[৩]

মখদূমুল-মুল্ক-এর পর পরবর্তী মর্যাদা ছিল সদরু'স- সুদূর মওলানা আবদুন-নবীর[৪] যিনি ছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ 'আলিম, বিশেষ করে হাদীস শাস্ত্রের উপর তাঁকে একজন বিশেষজ্ঞ মনে করা হত। কিন্তু মুন্তাখাবু'ত-তাওয়ারীখ-এর কতক বর্ণনা থেকে অনুমিত হয় যে, তাঁর পাণ্ডিত্য তেমন উচ্চ মানের ছিল না এবং আরবী ভাষার কতক শব্দের সংশোধন ও বিশ্লেষণ সম্পর্কেও তাঁর তেমন জ্ঞান ছিল না।[৫] সম্রাট আকবর তাঁকে সদরু'স-

---

১. পূর্ব পাঞ্জাবে জলনধরের নিকট সুলতানপুর অবস্থিত। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন নুযহাতুল খাওয়াতির,৪র্থ খণ্ড।

২. অর্থাৎ বছর অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই সেই বিত্ত যার উপর যাকাত ফরয—স্বীয় স্ত্রী কিংবা অপর কোন আত্মীয়কে দিয়ে দিতেন। সে নেবার পর আবার পূর্বোক্ত মালিককে ফিরিয়ে দিত। এভাবে ঐ বছরের যাকাত দেওয়া থেকে বেঁচে যেতেন। পরবর্তী বছরও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতেন।

৩. এক বর্ণনামতে তার কবর থেকে তিন কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণের ইট পাওয়া গিয়েছিল।

৪. শায়খ আবদুন নবী শায়খ আহমদ গঙ্গূহীর পুত্র এবং হযরত শায়খ আবদুল কুদ্দূস গঙ্গূহী (রা)-এর পৌত্র। হেজাযের উলামা-ই কিরাম থেকে হাদীসের তা'লীম পাবার কারণে পারিবারিক মত ও পথ ওয়াহ্দাতু'ল-ওজূদ ও সামা সম্পর্কে তাঁর মতান্তর ঘটে। পিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাল ছিল না।(দ্র. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৫ম খণ্ড)।

৫. হেজাযের আলিম-উলামা বিশেষ করে আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে হাজার হায়তামী মক্কীর মত উস্তাদের নিকট ইলমে হাদীস শিক্ষালাভ এবং লেখক হবার কারণে একথা কিছুতেই সঙ্গত মনে হয় না যে, তিনি মা'মুলী আরবী শব্দও ভুল পড়তেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

সুদূর পদে নিযুক্ত করেন। ফলে তিনি এমন শান-শওকত, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভ করেন যে, সাম্রাজ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অমাত্যও তাঁর সামনে নিস্প্রভ হয়ে যান। সম্রাট কয়েকবার স্বহস্তে তাঁর জুতা পরিয়ে দেন। বড় বড় উলামায়ে কিরাম তাঁর দর্শন লাভের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে তাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। সমগ্র ভারতবর্ষর উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখ এবং সাজ্জাদানশীনদের জায়গীর প্রদান,উপহার-উপঢৌকন ও ভাতা মঞ্জুর তাঁর এখতিয়ারাধীন ছিল। এক্ষেত্রে তিনি যে উদার মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছিলেন বিগত শাসনামলগুলোতেও এর নজীর মেলা ভার।

কিন্তু মোল্লা আবদুল কাদিরের বর্ণনা মুতাবিক (যিনি তাঁর সমসাময়িক দোস্ত এবং দরবার সঙ্গী ছিলেন) মনে হয় যে, উলামায়ে কেরামের উন্নত পবিত্র-আখলাক, স্বীয় খান্দানের সর্বোত্তম ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য বরং সাধারণ ভদ্রতা ও সৌজন্য এবং কখন, কোন সময় কি করা দরকার সে জ্ঞানটুকুও তাঁর ছিল না। সম্ভবত তাঁর এই উচ্চ পদ তাঁর ভেতর এই পরিবর্তন সৃষ্টি করে থাকবে। এর নৈতিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্রাট এবং তাঁর দরবারের অমাত্য ও সভাসদবর্গের উপর শুভ হত না। মোল্লা আবদুল কাদির তাঁকে তাঁর পদমর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অপব্যবহার এবং এর অবৈধ সুযোগ নেওয়া ও এর থেকে অন্যায় ফায়দা উঠানোর জন্য অভিযুক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, "তিনি গোটা ভারতবর্ষের ধর্মীয় জায়গীরদারদের দৌড়ান শুরু করেন। লোকে শায়খ-এর উকীল, ফাররাশ, দ্বাররক্ষী, সহিস—এমনকি মেথরদেরকে পর্যন্ত ঘুষ দিতে বাধ্য হয়ে গিয়েছিল। কেননা ঘুষ প্রদান ব্যতিরেকে কোন কার্যোদ্ধার হত না।"[১]

আমরু বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার তথা সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ এবং ধর্মীয় বিষয়ে খতিয়ান গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি হিক-মত ও স্থান-কাল-পাত্রের প্রতি দৃকপাত করতেন না। ফলে কখনো কখনো সম্রাটও এর আওতায় পড়ে যেতেন। মাআছিরু'ল-উমারা নামক গ্রন্থের একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, "সম্রাট আকবরের এক রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে আমীর-উমারা, উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখগণ সম্রাটকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছিলেন। সম্রাটের গায়ে যাফরানী রঙের পোশাক ছিল। শায়খ এই পোশাকের ব্যাপারে আপত্তি তোলেন এবং অন্য পোশাক পরিধানের তাকীদ দেন। কিন্তু এই তাকীদ এতটা উত্তেজনার সাথে দিয়েছিলেন যে, তার লাঠির অগ্রভাগ সম্রাটের

১. মুন্তাখাবু'ত-তাওয়ারীখ, ২য় খণ্ড, ২০৫ পৃ.।

শাহী পোশাকে গিয়ে লাগে। সম্রাট সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন, কিন্তু একে তিনি তাঁর জন্য অপমানজনক মনে করেন এবং শাহী হারেমে গিয়ে স্বীয় মাতার নিকট অভিযোগ করেন। মাতা ছিলেন এক বুযুর্গ পরিবারের মেয়ে। তিনি সম্রাটকে বুঝিয়ে দেন যে, তাঁর এই সহিষ্ণুতা প্রদর্শন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁর প্রশংসা-গাঁথা হিসাবে কীর্তিত হবে যে, তাঁর একজন আলিম প্রজা সম্রাটকে লাঠি দিয়ে আঘাত করেছিল এবং সম্রাট শরীয়তের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নিশ্চুপ ছিলেন।"[১]

এছাড়া মুসীবত আরও ছিল। তন্মধ্যে এও একটি যে, মখদূমু'ল-মুল্ক এবং শায়খ আবদুন-নবী একে অপরের প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পড়েন। মখদূমু'ল-মুল্ক শায়খ আবদুন-নবীকে ইলযাম (অপবাদ দেওয়া,দোষারোপ করা) দিতেন এবং অপরপক্ষে শায়খ আবদুন-নবী মখদূমু'ল-মুল্ককে মূর্খ ও কাফির বলতেন। অতঃপর একে কেন্দ্র করে উভয়ের সমর্থকবৃন্দ পরস্পরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেত। মখদুমু'ল-মুল্ক এবং সদর শায়খ আবদুন-নবীর অবস্থা থেকে (যদি তা সেরকমই হয় যে রকমটি ইতিহাসে-বর্ণিত হয়েছে) পরিমাপ করা যায় যে, এদু'জন মনীষী জ্ঞান, ধর্মীয় প্রজ্ঞা, নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতা এবং আত্মিক পবিত্রতা ও বিশুদ্ধি কোন দিক দিয়েই এই সঙ্গীন যুগ (আকবরের শাসনামল) এবং এই গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল পরিবেশে (আকবরের দরবারে) দীনের সঠিক প্রতিনিধিত্ব ও রসূল(সা)-গণের যথার্থ নিয়াবতের (স্থলাভিষিক্তের) জন্য উপযোগী ছিলেন না। এর জন্য যদি উমায়্যা খলীফা সুলায়মান ইব্ন আবদি'ল-মালিকের উপদেষ্টা ও মন্ত্রী রাজা 'ইব্ন হায়াত এবং আব্বাসী খলীফা হারূনুর রশীদ-এর ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা ও কাযীউ'ল-কুযাত কাযী আবূ য়ূসুফ-এর পর্যায়ের 'আলিম, মুত্তাকী ও কুশলী না হলেও নিদেনপক্ষে আবদুল 'আযীয আসিফ খান এবং কাযী শায়খু'ল-ইসলাম[২]-এর মত সাহিব-এ কামাল, উন্নত মেধার অধিকারী, নিবিষ্ট-চিত্ত সাধক ও মুত্তাকী সাম্রাজ্যের উপদেষ্টা হতেন। আকবরের দরবারে (সামনে বলা হবে) ইরান ও ভারতবর্ষের যেসব মেধাসম্পন্ন, প্রতিভাবান, পাণ্ডিত্যের অধিকারী, যুক্তিবাদী আলিম-উলামা' ও সাহিত্যিক সমবেত হয়েছিল তাদের মুকাবিলা করার জন্য এদের উভয়ের চেয়েও অনেক বেশী যোগ্যতর দীন ও শরীয়তের প্রতিনিধি এবং সাম্রাজ্যের মযহাবী তথা ধর্মীয় মুহাফিজ ও উপদেষ্টার প্রয়োজন ছিল।

---

১. মাআছিরু'ল-উমারা, ২য় খণ্ড, ৫৬১ পৃ।

২. এঁদের উভয়ের সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন হাকীম সায়্যিদ আবদুল হাই হাসানীকৃত 'ইয়াদে আয়্যাম' (তারীখে গুজরাট)।

আকবর যিনি (মোল্লা আবদুল কাদিরের বর্ণনানুসারে) ঐ সমস্ত আলিম-উলামাকে, যাঁরা তাঁর শাসনামলের সৌন্দর্য হিসাবে বিরাজ করতেন, গাযালী ও রাযীর থেকেও উত্তম মনে করতেন, যখন তাদের এই ধরনের দেখতে পেলেন তখন পূর্ববর্তী যুগের আলিমদেরকেও এদের সাথে তুলনা করে গোড়া থেকেই 'আলিমদের বিরোধী হয়ে যান।

সাম্রাজ্যের অমাত্য এবং দরবারের উপদেষ্টাবর্গ

সাম্রাজ্যের অমাত্যদের সম্পর্কে আকবরের দুর্ভাগ্য দরবারের আলিমদের চেয়ে কম ছিল না। শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ হবার কারণে তাঁর উপর প্রতিটি বাকচাতুর্যের অধিকারী প্রতিভাবান ও সৃজনশীলদের যাদু ক্রিয়া করত,বিশেষ করে তিনি যদি তখনকার বিলেত (ইরান) থেকে আগমন করতেন যাকে ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানের লোকেরা গ্রীসের মর্যাদা দিত। ঠিক সেই সময় যখন আকবরের কদম ধর্মের ময়দানে পতনোন্মুখপ্রায় কাঁপছিল, ইরান থেকে হাকীম আবুল ফাতাহ গীলানী, হাকীম হুমায়ূন (হাকীম হুমাম) এবং নুরুদ্দীন কারারী নামক তিন সহোদর ভ্রাতা আগমন করেন এবং দরবারে উচ্চাসন লাভ করেন। কিছুকাল পর মোল্লা য়াযদী ইরান থেকে আসেন এবং সাহাবা-ই কিরাম সম্পর্কে লাগামহীনভাবে সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেন। হাকীম আবুল ফাতাহ এক-পা অগ্রসর হলেন এবং দীনের হাকীকতসমূহ (নবুওত, ওয়াহী ও মু'জিযাসমূহ) প্রভৃতিকে খোলাখুলি অস্বীকার করেন।[১] এই সময় শরীফ আমেলীরও ইরান থেকে আগমন ঘটে (যার কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে) যিনি ছিলেন মাহমূদ পীসখাওয়ানীর পদাংক অনুসারী এবং ধর্মদ্রোহী আকীদা পোষণকারী। এই সব ইরানী সুধী ও মনীষী ছাড়াও নড়বড়ে আকীদা ও মানসিক অস্থিরতার এই যুগেই কাল্পীর অধিবাসী প্রখর উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী, বিজ্ঞজনদের মাহফিলের সৌন্দর্য বর্ধনকারী হাস্যরসিক হিন্দু ব্রহ্মদাস দরবারে প্রবেশ করেন এবং খুব সত্বর সম্রাটের মেযাজে অনুপ্রবেশ ও সভাসদের আসন লাভ করেন এবং খাস মোসাহেব হিসেবে অভ্যর্থিত হয়ে বীরবল নামে ধন্য ও গর্বিত হবার সুযোগ পান।[২] তিনি হাওয়ার গতি আঁচ করতে পেরে ধর্মীয় ব্যাপারে এবং নাযুক ইসলামী 'আকীদা ও মসলা-মাসাইলের বিষয়ে অকুণ্ঠ ও বিদ্রূপাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেন। যেহেতু তখন এরই কদর ছিল বিধায় চতুর্দিক থেকে তিনি

---

১. মুন্তাখাবু'ত-তাওয়ারীখ, ২য় খণ্ড, ২১১ পৃ.।

২. রাজা বীরবলের চরিত্র জানতে দেখুন দরবারে আকবরী, হুসায়ন আযাদকৃত ৩৩৬-৮৩।

বাহবা পেতে থাকেন। ধর্মের ব্যাপারে সম্রাটের মেযাজকে অযৌক্তিকভাবে অবিবেচক বানাতে তারও বিরাট ভূমিকা ছিল।[১]

মোল্লা মুবারক ও তাঁর দুই পুত্র ফৈযী ও আবু'ল-ফযল

অতঃপর অধিকতর বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, বোঝার উপর শাকের আটি হিসেবে দরবারে মোল্লা মুবারক নাগোরীর আনাগোনা শুরু হয়[২] এবং তাঁর দুই পুত্র ফৈযী ও আবু'ল-ফযল সম্রাটের মন-মস্তিষ্কে এমনভাবে আসর জাঁকিয়ে বসেন এবং শাহী দরবারে এমন গৌরবময় আসন লাভ করেন যা ইতিপূর্বে অপর কারোর ভাগ্যে জোটেনি। মোল্লা মুবারক এবং আবুল ফযল ও ফৈযী এই তিনজনের অবস্থা নিরপেক্ষভাবে অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, এঁরা কেবল ভারতবর্ষেই নন বরং স্বীয় যুগের অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, উচ্চতর জ্ঞানগত যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী, বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান ও সাহিত্যে অসাধারণ দখল এবং ফার্সী রচনা ও কাব্যে সুনিপুণ পণ্ডিত ছিলেন। মোটের উপর সে যুগের শিক্ষাব্যবস্থা, পঠন ও গবেষণা পদ্ধতি এবং প্রচলিত ও জনপ্রিয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিষয়-শাস্ত্রের দিক দিয়ে তাঁরা অত্যন্ত জ্ঞানী ও মেধাবী ছিলেন। যদি এই পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রীয় জ্ঞান, মেধার তীক্ষ্ণতা, প্রকৃতির ভারসাম্যতা এবং ভাষা ও লেখনীর সাযুজ্যের সঙ্গে এই পিতা-পুত্রদের ভেতর দীনী ইস্তিকামাত তথা ধর্মীয় অটলতা, ধর্মে গভীরতা ও দৃঢ়তা, আল্লাহ্‌ভীতি ও পরকাল প্রয়াসী ইখলাস এবং আল্লাহর জন্যই সব কিছু করার মানসিকতাও থাকত তাহলে তারা সে যুগে এমন খেদমত আঞ্জাম দিতে পারতেন এবং একে কালের ফেতনা ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারতেন যার নজীর মেলা হত ভার। কিন্তু তাঁদের অবস্থা এবং স্বয়ং আবুল ফযল ও ফৈযীর রচনাসমূহ থেকে যে সব মৌলিক সত্য বেরিয়ে আসে তা নিম্নরূপ ঃ

(১) মোল্লা মুবারক (যিনি ছিলেন এই ত্রিরত্নের সূচনাবিন্দু)-এর স্বভাব ও প্রকৃতিতে অস্থিরতা এবং মানসিকতায় প্রকৃতিগতভাবে গোলমাল ও বিশৃঙখলা ছিল। মযহাব চতুষ্টয় (হানাফী, শাফিঈ, মালিকী ও হাম্বলী) এবং এ সবের এখতিলাফসমূহ সম্পর্কে অবহিত হবার পর তাঁর ভেতর জমা ও সমন্বয় সাধন এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পরিবর্তে সবগুলোকেই অস্বীকার ও সে সবের প্রতি অসন্তোষের প্রবণতা সৃষ্টি হয় এবং তিনি এই গোটা ফিকহী সম্পদ ও শ্রদ্ধাভাজন

---

১. বিস্তারিত দ্র. মুন্তাখাবু'ত-তাওয়ারীখ, ২য় খণ্ড, ১৬১ পৃ.

২. আবুল ফযল তদীয় আকবরনামায় মোল্লা মুবারকের প্রথম দরবারে প্রবেশকে দ্বাদশ বর্ষের ঘটনায় বিবৃত করেছেন।

পূর্বসূরীদের শ্রমসাধ্য প্রয়াস সম্পর্কে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। এদিকে শীরাযের বিখ্যাত পণ্ডিত দার্শনিক আবুল ফযল গাযারূনীর চক্রে শরীক হবার ফলে তাঁর উপর দর্শনশাস্ত্র প্রভাব জাঁকিয়ে বসে। তাসাওউফের ইমাম ও মাশায়েখে কিরাম থেকে ইলমে তরীকত ও মা'রিফতের ফয়েয হাসিল করা এবং শয়তানী চক্রান্ত ও নফসের রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে অবহিত না হয়ে সরাসরি এতদসম্পর্কীয় কিতাবাদি অধ্যয়ন মারফত তাসাওউফ ও প্রাচ্য-দর্শন সম্পর্কে অবহিত হতে গিয়ে তিনি মারাত্মক ভ্রমে পতিত হন এবং এ সবের গলি-খুপচি অতিক্রম করার পর তাঁর ভেতর এক অস্থিরচিত্ততা ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। তাঁর ভেতর প্রতিটি রঙে রঞ্জিত হবার এবং "বাতাস বুঝে নাও বাও"-এর সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্‌র সাহেবযাদা খাজা কিলাঁ, শায়খ মুবারকের কন্যার ঘরে যাঁর প্রশিক্ষণ লাভ ঘটেছিল[১], তাঁর সম্পর্কে লিখেন ঃ

در هر عصر هم مشرب و مذهب شعار وقت خود می ساخت که ملوک وامراے عصر بداں مذهب رغبت داشتند ۔

"প্রতিটি যুগের প্রচলিত ধর্ম ও মতাদর্শ তিনি আত্মস্থ করতেন, সেই অনুযায়ী চলতেন যে মত অনুযায়ী চলতে রাজ্যের আমীর-উমারা পসন্দ করে।"[২]

স্যার ওয়েলেসলী হেগ বলেন ঃ শায়খ মুবারক বিভিন্ন সময় সুন্নী, শী'আ, সূফী, মাহদাবী ছাড়াও না জানি আরও কি কি ছিলেন।[৩]

(২) স্বভাব ও প্রকৃতির দিক দিয়ে তিনি ছিলেন উদ্যমী ও মর্যাদালোভী। এজন্য জ্ঞান ও পাঠ্য জগতের সীমিত গণ্ডীর ভেতর বন্দী থাকা তাঁর অস্থির প্রকৃতির উপযোগী ছিল না। তাঁর রাজসরকারে ও শাহী দরবারে আপন জ্ঞান ও মেধার প্রভাব সৃষ্টির আগ্রহ দেখা দিল এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি সম্রাট আকবরের ছায়াতলে (যে ছায়াকে সৌভাগ্যের চাবিকাঠি মনে করা হত) আসলেন এবং কেবল একাই নন আপন দুই পুত্রকেও এর আওতায় নিয়ে এলেন।

(৩) মনে হয়, সে যুগের আলিম-উলামা (বিশেষ করে মখদুমুল-মুল্‌ক এবং শায়খ আবদুন নবী, যাঁরা শাহী দরবারে সীমাহীন প্রভাব জাঁকিয়ে বসে ছিলেন) তাঁকে সেই মর্যাদা দেয়নি, স্বীয় মেধা ও মর্যাদার ভিত্তিতে যার তিনি যোগ্য

---

১. খাজা কিলাঁ খাজা হুসসামুদ্দীনের ঘরে প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন। খাজা হুসসামুদ্দীনের স্ত্রী ছিলেন মোল্লা মুবারকের দ্বিতীয় কন্যা। তারীখে হিন্দুস্তান, ৫ম খণ্ড, ৯৪৭ পৃ.।

২. مبلغ الرجال ৩৩ পৃ.;

৩. Cambridge History of India, ৪র্থ খণ্ড, ১৮ পৃ.।

ছিলেন। অধিকন্তু তাঁর কিছু কিছু 'আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও অস্থিরমতি মেযাজের দরুন ধর্মীয় মহলে তিনি বিরোধিতার সম্মুখীন হন কিংবা তাঁর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শিত হয়। এতে তাঁর অন্তর-মানস গভীরভাবে আহত হয়। মওলভী মুহাম্মদ হুসায়ন আযাদের সাহিত্যমণ্ডিত ভাষায় ঃ

"শায়খ মুবারক ঐসব লোকের নিপীড়নমূলক তীর এত খান যে, তাঁর দিল্ চালুনীর মত ঝাঝরা হয়ে গিয়েছিল। শায়খ (আবুল ফযল)ও শায়খের পিতা মোল্লা মুবারক মখদূম ও সদর প্রমুখের হাতে বছরের পর বছর যে আঘাত খেয়েছিলেন জীবনেও তার ক্ষতিপূরণ হবার ছিল না।"[১] অন্যত্র ঃ "মখদূমের হাতে শায়খ মুবারকের উপর যেসব বিপদ-মুসীবত নেমে এসেছিল তাঁর ছেলেরা তা ভোলেনি। এ সবের প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় তাঁরা আকবরের কান ভারী করতে শুরু করল, সেই সাথে আকবরের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটা শুরু হল।"[২]

মওলভী মুহাম্মদ হুসায়ন আযাদ নিজেও মুক্তবুদ্ধি ও উদার চিন্তার হওয়া সত্ত্বেও লিখেছেন ঃ

"ফৈযী ও আবুল ফযলের ব্যাপার তাঁদের পিতার মতই দ্বিধাগ্রস্ত থাকে।"

আলিম-উলামার এই বিরোধিতা এবং কালের এই অবিচার এই গোটা পরিবারকেই হীনমন্যতাবোধের শিকারে পরিণত করে যা বিভিন্ন রূপে এবং অধিকাংশ সময় "শ্রেষ্ঠত্ববোধের" আকারে প্রকাশিত হয় এবং তাঁরা এটা প্রমাণ করে দেন যে, তাঁদের জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তা এবং তাঁদের মেধা ও প্রতিভার সামনে কারুর প্রদীপ জ্বলতে পারে না। ইসলাম এবং গোটা ধর্মীয় ব্যবস্থা এই প্রয়াসের শিকারে পরিণত হয়। এমনকি যখন সকল প্রদীপ এই দুই ভ্রাতার জ্ঞানবত্তা ও মেধার প্রদীপের সামনে নির্বাপিত বা নির্বাপিত-প্রায় হয়ে গিয়েছিল এবং সেই সাম্রাজ্যে তাঁদেরই বুলি আওড়ানো হচ্ছিল, কিন্তু এরই সাথে ইসলামের কুসুম কানন যখন তাঁদের চোখের সামনে জ্বলছিল তখন (মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ূনীর বর্ণনানুসারে) আবুল ফযলের মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল নিম্নোক্ত কবিতা পংক্তিদ্বয় ঃ

آتش بدوست خویش در خرمن خویش *
چو خودزده ام چه نالم از دشمن خویش

---

১. দরবারে আকবরী, ৪৯-৫০ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত ৩৮৯ পৃ.।

کس دشمن من نیست نم دشمن خویش *

اے وائے من دوست من و دشمن خویش

আগুন ছিল আর ছিল আমার হাত আমারই খড়-কুটায়। আমি নিজেই যখন এতে আগুন দিয়েছি তখন 'দুশমনের প্রতি আর কি অভিযোগ করব। কেউ আমার দুশমন নয়, আমি নিজেই আমার দুশমন। আফসোস! আমি নিজেই আমার দোস্ত, আমি নিজেই আমার দুশমন।

মোল্লা মুবারকের দুই উপযুক্ত পুত্র ছিল যাঁদের একজনের নাম ছিল আবুল ফয়েয ফৈযী (জন্ম ৯৫৪ হি.) এবং অন্যজন আবুল ফযল আল্লামী (জন্ম ৯৫৮ হি.)।

ফৈযী সাহিত্য ক্ষেত্রে ছিলেন উচ্চতর প্রতিভার অধিকারী এবং তাঁর ফারসী কাব্যেও এ ক্ষেত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য সর্বজনস্বীকৃত। এ ক্ষেত্রে তাঁর যোগ্যতার প্রশ্নে কেউই দ্বিমত পোষণ করেন না। আল্লামা শিবলী নু'মানী তদীয় "শি'রুল-'আজম" নামক গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন যে, "ফার্সী কাব্য সাহিত্যে ছ'শ বছরের বিস্তৃত মুদ্দতে হিন্দুস্তান মাত্র দু'জন লোকই জন্ম দিয়েছে যাঁদেরকে ফার্সী ভাষাভাষী লোকদেরকেও অনন্যপ্রায়চিত্তে মেনে নিতে হয়েছে আর সে দু'জন হলেন খসরু (আমীর খসরু) এবং ফৈযী।"

"ফৈযী খাজা হুসায়ন মারবীর ছাত্র ছিলেন এবং তিনি প্রতিটি বিষয়েই পারদর্শিতা লাভ করেন। ৯৭৪ হি.-তে (আকবরের দ্বাদশতম সিংহাসন আরোহণ বর্ষে) তিনি দরবারে পৌঁছেন এবং সম্রাটের অনুগ্রহ লাভে ধন্য হন। সম্রাটের নৈকট্য দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু তদসত্ত্বেও তিনি দরবারের কোন খেদমতে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন নি। তিনি ছিলেন চিকিৎসক, ছিলেন কবি ও লেখক এবং এই সব পেশায় তিনি নিয়োজিত থাকতেন। শাহযাদাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব তাঁরই উপর অর্পিত ছিল। অনন্তর সিংহাসন আরোহণের দ্বাদশবর্ষে শাহযাদা দানিয়ালের শিক্ষার ও প্রশিক্ষণের ভার তাঁর উপর অর্পিত হয় এবং অতি অল্প দিনেই তিনি তাকে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ (مراتب) শিখিয়ে দেন। এই বছরই সম্রাট আকবর ইজতিহাদ ও ইমামতের দাবীতে মসজিদে গিয়ে খুতবা পাঠ করেন। খুতবা লিখেছিলেন ফৈযী। সম্রাট শায়খ 'আবদুন-নবীর শক্তি খর্ব করতে প্রেসিডেন্সী কয়েক অংশে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। অনন্তর ৯৯০ হি.-তে আগ্রা, কালিঞ্জর ও কালপীর প্রেসিডেন্সী ফৈযীকে প্রদান করা হয়। ৯৯৩ হি.তে য়ূসুফযাঈ পাঠানদের বিরুদ্ধে সম্রাট আকবর যখন অভিযান প্রেরণ করেন তখন ফৈযীও এই অভিযানে গমনে আদিষ্ট হন। ৯৯৬ হি.তে যে বছর ছিল

সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণের ৩৩তম বর্ষ, ফৈযী 'কবি সম্রাট' (ملك الشعراء) উপাধি প্রাপ্ত হন। ৩৬তম বর্ষে (মুতাবিক ৯৯৯ হি.) ফৈযীকে খান্দেশ রাজ্যে দৌত্য কর্মে নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এই দায়িত্ব আনজাম দেন। ১০০৪ হি.তে সফর মাসে (সিংহাসন আরোহণের ৪০তম বর্ষে) তিনি ইন্তিকাল করেন।"[১]

সাহিত্যিক রচনাসমূহ, সংস্কৃতের অনুবাদ, কাব্য ও দীওয়ান ছাড়াও তাঁর সর্বাধিক বিখ্যাত রচনা কুরআন মজীদের নুকতাবিহীন 'সওয়াতি'উল-ইলহাম'[২] নামক তাফসীর গ্রন্থ। দু'বছরের মুদ্দতে (১০০২ হি.) এটি সমাপ্ত হয়। এর বিনিময়ে সম্রাট ফৈযীকে দশ হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করেন।[৩] ফৈযী তাঁর এই রচনা কর্মের জন্য রীতিমত গর্ব অনুভব করতেন এবং এ থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অগাধ শক্তিমত্তার পরিমাপ করা যায়। ধর্মীয় মতপার্থক্য সত্ত্বেও বদায়ূনী নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁর সুবিপুল জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন ঃ

---

১. شعر العجم ৩য় খণ্ড থেকে সংক্ষেপিত (পৃ. ২৮-৭২)

২. ফৈযী এই তাফসীর লিখতে গিয়ে এই বাধ্যবাধকতা আরোপ করেন যে, এতে তিনি কোন নুকতাযুক্ত হরফ ব্যবহার করবেন না। ফলে তা সেই যুগে এবং তৎপরবর্তী যুগে সর্বত্র তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। স্বীয় যোগ্যতার প্রমাণ এবং এই অভিযোগের জবাবে তিনি লিখেছেন যে, ধর্মীয় তথা দীনী ইল্‌মে তাঁর কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু এই কর্ম সম্পাদন থেকে আরবী ভাষায় তাঁর অসীম শক্তিমত্তার যতই প্রকাশ ঘটুক না কেন এতে কোন জ্ঞানগত ও বাস্তব উপকারিতা নেই। এ ঠিক তেমনি যেমন কোন কোন লিপিকুশলী চাউলের উপর قل هو الله লিখে স্বীয় সূক্ষ্ম লিপিকুশলতা ও নৈপুণ্য প্রকাশ করেন। এইরূপ লৌকিকতার দরুন লেখায় কোন লাবণ্য এবং বাক্যে কোনরূপ স্বাদ, সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য নেই।

সম্ভবত এর চেয়ে বেশী উপকারী ও উল্লেখযোগ্য ইলমী তথা জ্ঞানগত কৃতিত্ব হিসাবে বিবেচিত হবে তাই যা সেই যুগেরই একজন সিরীয় আলিম যাঁর নাম মুহাম্মদ বদরুদ্দীনমা'রূফ বি-ইবনিল গুয্যা আদ-দামিশকী (মৃ. ৯৮৪ হি.) আনজাম দেন। তিনি এক লাখ আশি হাজার কবিতা—শ্লোকে কুরআন মজীদের তাফসীর সম্পন্ন করেন। এরই একটি সংক্ষিপ্ত-সারও কাব্যাকারে তৈরী করেন এবং উছমানী খলীফা সুলায়মান আজমের খেদমতে পেশ করেন। সুলতান উলামায়ে কিরামকে দেখতে দেন যে, এর ভেতর উম্মাহর সাধারণ আকীদা বিরোধী কোন কিছু আছে কিনা কিংবা কোনরূপ বিকৃতি আছে কিনা। উলামায়ে কিরাম এর সত্যতার স্বীকৃতি দেন এবং প্রশংসা করেন। সুলতান এতে লেখককে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করেন (الكواكب السائرة بنجم الدين الغزى)। অধিকন্তু নায়লুল আওতারের লেখক আল্লামা মুহাম্মদ ইবন আলী আশ-শাওকানী আল-য়ামানী-এর البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع (মৃ. ১২৫০ হি.) দ্বিতীয় ভাগ, অনু. মুহা. ইবন মুহা. আল-গুয্যা ২৫২ পৃ. দেখুন।

১. মাআছিরুল্ উমারা, ২য় খণ্ড, ৫৮৭ পৃ.।

در فنون جزئيه از شعر و معمه و عروض وقافيه و تاريخ و لغت و طب وانشاء عديل در روزگار نداشت

ফুনূন-ই জুযইয়্যা অর্থাৎ কবিতা ও হেয়ালী (রূপক), ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গি, ইতিহাস ও অভিধান, চিকিৎসাশাস্ত্র ও লেখালিখিতে তিনি তাঁর যুগের অদ্বিতীয় প্রতিভা ছিলেন।

বই-পুস্তক ও কিতাবাদির প্রতি প্রবল আগ্রহী ও উৎসাহী ছিলেন। দুর্লভ কিতাবাদির একটি বিরাট সংগ্রহশালা তিনি গড়ে তোলেন যেথায় ৪০০৬ খানা পুস্তক ছিল। এ সবের অধিকাংশই ছিল স্বয়ং গ্রন্থকারের লিখিত কিংবা সেযুগের লিখিত।

মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ূনী এবং সেই যুগের সে সমস্ত লোক যাঁদের হৃদয় কন্দরে ইসলামের প্রতি ভক্তি-প্রযুক্ত ভালবাসা ও সম্মানবোধ ছিল, যাঁরা সম্রাট আকবরের শাসনামলের এইরূপ অবস্থাদৃষ্টে অত্যন্ত বিমর্ষ ও অসন্তুষ্ট ছিলেন—এ বিষয়ে একমত যে, ফৈযীও তাঁর পিতার মতই আকীদার ক্ষেত্রে নড়বড়ে এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন এবং সম্রাট আকবরকে ধর্মহীন ও ধর্মদ্রোহী (ملحد) বানাবার ক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। মোল্লা 'আবদুল কাদির বদায়ূনী স্বীয় "মুন্তাখাবুত-তাওয়ারীখ" নামক গ্রন্থে ফৈযীর যেই চিত্র অংকন করেছেন তার ভেতর থেকে অতিশয়োক্তি ও শব্দের কচকচানীর অংশটুকু বাদ দিলেও তাঁর (ফৈযীর) মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাধারার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। মওলানা শিবলী شعر العجم নামক গ্রন্থে ফৈযীর অনুকূলে জোর ওকালতি করেছেন। এরপরও তিনি লিখছেন ঃ

"তিনি উদার, স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। তিনি জানতেন যে, গোঁড়া ও পক্ষপাতদুষ্ট মৌলভীরা ধর্মের যে অবস্থা তৈরী করে রেখেছে তা ইসলামের প্রকৃত চিত্র নয়। শী'আ-সুন্নীর বিবাদকে তিনি প্রকৃত ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন মনে করতেন। এই ঘরোয়া দ্বন্দ্বকে তিনি বিদ্রূপ করতেন। এরপর মোল্লা বদায়ূনী তাঁর লেখা থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করেছেন যার ভেতর ঠাট্টা-মস্করার উপাদান রয়েছে।[১] বদায়ূনী লিখছেন যে, ফৈযী ও আবুল ফযল জ্ঞান চর্চার মাহফিল কায়েম করান যে মাহফিলে দরবারীরা প্রকাশ্যে দেখতে পেত যে, ঐসব পক্ষপাতদুষ্ট লোকগুলোর নিকট অভিশাপ বর্ষণ ও কুফরী ফতওয়া প্রদান ব্যতিরেকে আর কোন হাতিয়ার নেই।"

---

১. شعر العجم ৩য় খণ্ড, ৪৯-৫০ পৃ.।

মনে হয় ফৈযীর জীবনকালেই তাঁর এই ধর্মদ্রোহিতামূলক ধ্যান-ধারণার শোহরত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকে তাঁর মৃত্যুর যে তারিখ বের করেছেন তা থেকে এটাই প্রকাশ পায়। তাঁর মৃত্যুর বর্ণনাও বেশ শিক্ষণীয়।[১]

আবুল ফযলও তাঁর অপার মেধা, সৃষ্টিশীলতা এবং বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ছিলেন ব্যতিক্রমী প্রতিভা। যেমন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফৈযী কাব্য ক্ষেত্রে পূর্ণ শক্তি-সামর্থের অধিকারী ছিলেন, তেমনি লেখনী ও রচনাশক্তিতেও তাঁর তুলনা ছিলেন তিনি নিজেই। 'আকবরনামা'র তৃতীয় খণ্ডের ৮৩-৪ পৃষ্ঠায় তিনি লিখছেন যে, অল্প বয়সেই তাঁর ভেতর আত্মঅহংকার, আত্মপ্রদর্শনী ও তাকলীদের বিরুদ্ধে পাগলামী সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।"[২]

৯৮১ হিজরীতে তিনি আগ্রায় শাহী দরবারে প্রবেশ করেন এবং আয়াতুল কুরসীর তাফসীর সম্রাটকে পেশ করেন। অতঃপর ৯৮২ হিজরীতে সূরা আল-ফাতাহর তাফসীরের হাদিয়া পেশ করেন। এ সবের মাধ্যমে সম্রাটের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা ও নৈকট্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। এমনকি তিনি মন্ত্রীত্বের ন্যায় মহা গৌরবমণ্ডিত পদ ও সর্বময় ওকালত লাভ করেন। তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্বপূর্ণ অবদান তদরচিত "আঈন-ই আকবরী" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থটি। আঈন-ই আকবরী গ্রন্থকে তায়মূরী আমলের রাষ্ট্রীয়, সামরিক, শিল্প, কৃষি, আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক, জ্ঞানগত ও ধর্মীয় অবস্থা ও ঘটনাবলীর দর্পণ মনে করতে হবে। তাঁর অপর উল্লেখযোগ্য কীর্তি "আকবরনামা"[৩] যা ভারতবর্ষের তায়মূরী সুলতানদের জীবনকাহিনী সম্বলিত। এ ছাড়া ইনশা-ই আবুল ফযল বা আবুল ফযল পত্র ও রচনা-সমগ্র নামে তাঁর চিঠিপত্রের সংকলন ও অপরাপর রচনাসমূহ রয়েছে। ১০১১ হিজরীতে জাহাঙ্গীরের ইঙ্গিতে বীর সিংহ দেব তাঁকে হত্যা করে। সম্রাট আকবর এতে খুব মর্মাহত হন এবং তাঁর মৃত্যুতে অশ্রু বিসর্জন করেন।

---

১. মুন্তাখাবুত তাওয়ারীখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫ ও ৪০৬, ফৈযীর ধর্ম সম্পর্কে পর্যালোচনা মওলভী মুহাম্মদ হুসায়ন আযাদকৃত দরবারে আকবরী, ৪৭১ পৃ. দ্র.।

২. বায্‌মে তায়মূরিয়্যাঃ, ১৬৩ পৃ.।

৩. "আকবরনামা" সম্পর্কে প্রখ্যাত ফরাসী মনীষী Carra de Vaux লিখেছেন ঃ এটি এমন এক জ্ঞান-ভাণ্ডার যা নিয়ে প্রাচ্য সংস্কৃতি গর্ব করার অধিকার রাখে। যে সব মানুষের মেধা এই বৃহৎ কলেবরের গ্রন্থের মাধ্যমে নিজেদের পরিচয় পেশ করেছে তাদের সরকার ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিজেদের যুগের অগ্রবর্তী মনে হয়। Corra de vaux, LESPEN-SEURS DEL ISLAM-Paris 1921.

ডঃ মুহাম্মদ বাকির উর্দূ দাইরাঃ মা'আরিফ-ই ইসলামিয়্যাঃ-তে "আবুল ফযল" নামক নিবন্ধে বলেন ঃ

"আবুল ফযল সম্রাট আকবরের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার মধ্যে বেশ ভালরকম প্রভাব জাঁকিয়ে বসেছিলেন। অনন্তর সম্রাট আকবর যখন ৯৮২ হিজরীতে (১৫৭৫ খৃ.) ফতেহপুর সিক্রীতে বিভিন্ন ধর্মের আলিম-উলামা, জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিতদের আলোচনা শোনার জন্য ইবাদতখানা কায়েম করেন তখন আবুল ফযল উক্ত আলোচনা মাহফিলে শরীক হতেন এবং সর্বদা আকবরের 'আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি আনুকুল্য প্রদর্শন করতেন। এমনকি তিনি আকবরকে বুঝিয়েছিলেন যে, ধর্ম সম্পর্কে সম্রাটের দৃষ্টিভঙ্গি সমসাময়িক আলিম-উলামার তুলনায় অনেক বেশি উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। ১৫৭৯ খৃ.-এ শাহী দরবার থেকে একটি পত্র জারী করা হয় যে, মযহাবী আলিমদের মতভেদ ও মতানৈক্যসমূহ নিরসনের লক্ষ্যে সম্রাটই হবেন চূড়ান্ত ফয়সালাকারী। ইবাদতখানায় অনুষ্ঠিত আলোচনা মাহফিলই আকবরের মনে একটি নতুন ধর্ম উদ্ভাবনের ধারণা জন্ম দেয় এবং ১৫৯২ খৃ.-এ "দীন-ই ইলাহীর" বুনিয়াদ রাখে। অন্যদের ন্যায় আবুল ফযলও এ নতুন ধর্ম কুবল করেন।"[১]

মাআছিরু'ল-উমারা নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, 'জান্নাত-ই মাকানী' অর্থাৎ সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বয়ং লিখছেন যে, "শায়খ আবুল ফযল আমার পিতার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন যে, জনাব রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ছিল অনুপম বাকপটুত্ব আর কুরআন ছিল তাঁরই কালাম। এ জন্য যখন তিনি (আবুল ফযল) দাক্ষিণাত্য থেকে আসছিলেন তখন আমি বীর সিংহ দেবকে তাঁকে হত্যা করতে বলি। এরপর আমার পিতা এই 'আকীদা-বিশ্বাস থেকে বিরত হন।"[২]

কিন্তু এ সম্পর্কে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সাক্ষ্য স্বয়ং আবুল ফযলের একটি বাক্য থেকে পাওয়া যাবে। এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি তাঁর জ্ঞান ও মেধার সাহায্যে সম্রাটের মনোবাঞ্ছাকে জ্ঞানগত পোশাকে সুশোভিত করা, তাকে শাস্ত্রীয় অস্ত্রে সুসজ্জিত করা এবং সম্রাট আকবরকে সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা থেকে যমানার ইমাম এবং হাদিয়ে দাওরান-এর উচ্চতর পদে পৌঁছুতে যে কীর্তি

---

১. উর্দূ দাইরাঃ মা'আরিফে ইসলামিয়্যাঃ, ১খ. ৮৮৯-৯০ পৃ.।

২. সায়্যিদ সাবাহুদ্দীন আবদুর রহমান লিখেছেন যে, তুযুক-ই জাহাঙ্গীরীর নওল কিশোর সংস্করণে সম্রাট জাহাঙ্গীরের এই বর্ণনা নেই। কিন্তু মেজর ডেভিড ব্রাইস কৃত এর ইংরেজী অনুবাদ থেকে উক্ত বর্ণনা সমর্থিত হয় (৫৩-৫৪ পৃ.)।-বায্মে তায়মূরিয়্যাঃ. ১১৬ পৃ.।

আনজাম দিয়েছিলেন এ জন্য তাঁর বিবেক পরিতৃপ্ত ছিল না। তিনি কখনো কখনো আপন জীবন ও সজাগ-সচেতনতার পরিচয় দিতেন। খান-খানানকে লিখিত এক পত্রে তিনি এ সম্পর্কে লিখছেন ঃ

"এই বেদনাদায়ক কাহিনীর একটি মা'মূলী দুঃখজনক দিক হল এই যে, লেখক (আবুল ফযল) অর্থহীন ব্যস্ততার জাহান্নামে ফেসে গিয়ে আল্লাহ্র গোলামীর মর্যাদা থেকে ছিটকে যেয়ে প্রকৃতির গোলামে পরিণত হয়েছে এবং এর (ধ্বংসের) এতটা কাছাকাছি পৌঁছে গেছে যে, তাকে খোদার বান্দার পরিবর্তে টাকা-পয়সার গোলাম বলা হচ্ছে।....... সে এই লেখনীর ভেতর তার এই শোক প্রকাশ করছে এবং উপলব্ধি করছে যে, দুনিয়ার বুকে অতিক্রান্ত ঐ তেতাল্লিশ বছরের বোকামীপ্রসূত দৌড়ঝাপ থেকে বিশেষত সেই বারো বছরের টানাপোড়েন ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে যা কোন পরিক্রমা ও যুগ-প্রবাহের সাহচর্যে কেটেছে, আমার ভেতর না সহ্য শক্তি আছে, না আছে এড়িয়ে চলার ও পরহেয করার শক্তি। আমি একে লিখিত আকারে এনে প্রকাশ্যে তা স্বীকার করছি।"

صبرے نه كه از عشق به پرهيزم من - بختے نه كه بادوست در اميزم من

دستے نـه كـه باقضا آويـزم مـن - پائے نه كه از ميانه بگريزم من [১]

আমি যে প্রেম থেকে এড়িয়ে চলব সে ধৈর্য আমার নেই; এ ভাগ্যও নেই যে, আমি বন্ধুর সাথে মিলিত হব।

আমি যে ভাগ্যের ফয়সালার সাথে হাত মেলাব সে হাত আমার নেই, আর মাঝখান থেকে যে পালিয়ে যাব সে পাও আমার নেই।

রাজপূত রাণীদের প্রভাব

সম্রাট আকবরের জন্য এক বিরাট পরীক্ষার ব্যাপার এবং ইসলাম থেকে তাঁর মন-মেযাজ বিযুক্ত হবার একটি শক্তিশালী কারণ ছিল এই যে, সাম্রাজ্যকে সুসংহত করার নিমিত্তে তিনি রাজপূত রাজন্যবর্গের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং তাদেরকে সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। তাদের পূর্ণ আস্থা লাভের জন্য এবং তাদেরকে এক দেহে লীন করবার জন্য এমন সব কাজ করেন যা তার পূর্ববর্তী সুলতানগণ তখন অবধি করেন নি। যেমন গরু যবাহ্র উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ, সূর্যের দিকে মুখ করে বসে ঝরোকা দর্শন, দাড়ি মুণ্ডন, ভদ্রা করানো, কপালে তিলক লাগানো, হিন্দু রাণীদের সাথে মিলে সর্বপ্রকার হিন্দুয়ানী প্রথা ও

১. আবুল ফযলের রচনাসমগ্র, দ্বিতীয় দফতর, ১০২ পৃ. (লাখনৌ) ৮৮৩ খৃ।

আচার-অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ ইত্যাদি। আকবরের এক স্ত্রী ছিল রাজা বিহারী মলের কন্যা এবং রাজা ভগবান দাসের বোন। দ্বিতীয় স্ত্রী যোধপুরের রাণী ও জাহাঙ্গীরের মা যোধাবাই। কোন কোন ইতিহাসে এভাবেই বলা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকের গবেষণাপ্রসুত সিদ্ধান্ত এই যে, ইনি জাহাঙ্গীরের স্ত্রী এবং শাহজাহানের মাতা ছিলেন। এই সব হিন্দু রাণী এবং তাদের মাধ্যমে ও আত্মীয়তার কারণে তাদের ভাই ও আত্মীয়-বান্ধবদের সম্রাটের উপর বেশ প্রভাব ছিল আর এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। আকবরের দীন ও ধর্মের প্রাসাদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে ধস নামে তা এই সম্পর্কেরই পরিণতি ছিল।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, মথুরার কাযী আবদুর রহীম একটি মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম জমা করেন। কিন্তু কাছের এক ব্রাহ্মণ রাতারাতি সে সব সাজ-সরঞ্জাম উঠিয়ে নিয়ে মন্দির নির্মাণে লাগিয়ে দেয়। মুসলমানরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে ইসলাম এবং ইসলামের নবী সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শানে গোস্তাখী করতে থাকে। কাযী আবদুর রহীম সদরুস-সুদূর শায়খ আবদুন-নবীর আদালতে বিষয়টি পেশ করেন। শায়খ আবদুন-নবী তার নামে তলবী নোটিশ জারী করেন। তদন্তে দেখা গেল যে, ঘটনাটি আসলে সত্য। এতে সদরুস-সুদূর তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ রাণী যোধাবাঈ-এর পুরোহিত ছিল। রাণী সম্রাটের উপর চাপ প্রয়োগ করছিল যেন তিনি মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে তাকে প্রাণে রক্ষা করেন। সম্রাট আদালতের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ এবং সেই সাথে সদরুস-সুদূরকে অসন্তুষ্ট করতে চাচ্ছিলেন না। সদরুস-সুদূর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। কিন্তু এতে করে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হবার পরিবর্তে আরও জটিল আকার ধারণ করে। বদায়ূনীর ভাষায় ঃ

"ভারতের ঐ সব রাজন্যবর্গের দুহিতারা এই বলে সম্রাটের কানভারী করে যে, তিনি (সম্রাট) মোল্লাদেরকে এমনভাবেই মাথায় তুলেছেন যে, তারা সম্রা-টের ইচ্ছারও কোন পরওয়া করেন না। দরবারে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, হানাফী মযহাবে রসূল (সা)-এর গালি প্রদানকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়। এইজন্য এই পদক্ষেপ গ্রহণ সেই মযহাবেরও বিপরীত যে মযহাবের আইন এই দেশে চলে।"

ইজতিহাদ ও ইমামতনামা

এটাই ছিল সুবর্ণ সুযোগ যখন মোল্লা মুবারক সম্রাটের সহায়তা করেন এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক রাজকীয় ঘোষণা তৈরী করেন যা সম্রাট আকবর

এবং তাঁর সাম্রাজ্যের গতিধারা পাল্টে দেবার ক্ষেত্রে ভিত্তি প্রস্তর হিসাবে প্রমাণিত হয় যাকে মানসিক ও সাংস্কৃতিক ধর্মদ্রোহিতার গোটা প্রাসাদের সদর দরজা বলা যেতে পারে।[১] এই রাজকীয় ঘোষণায় পরিষ্কার বলা হয় যে,

"খোদার নিকট ন্যায়বিচারক বাদশাহ্র মর্তবা মুজতাহিদের মর্তবার চেয়ে বেশি এবং হযরত সুলতানে কাহ্ফুল-আনাম, আমীরুল-মু'মিনীন, গোটা বিশ্বের উপর আল্লাহ্র ছায়া আবুল-ফাত্হ জালালুদ্দীন মুহাম্মদ আকবর বাদশাহ গাযী, যিনি সর্বাধিক ন্যায়বিচারক, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী, এরই ভিত্তিতে এমন সব দীনি মসলা তথা ধর্মীয় সমস্যায় যে সবের মধ্যে মুজতাহিদগণ পরস্পর ভিন্ন মত পোষণ করেন, যদি তারা নিজেদের প্রোজ্জল মেধা (ثاقب) এবং যথার্থ অভিমতের আলোকে মানুষের আসানীকে সামনে রেখে কোন একটি দিককে অগ্রাধিকার প্রদান করত তাকেই নির্দিষ্ট করে দেন এবং এর ফয়সালা করেন তবে এমতাবস্থায় সম্রাটের এই ফয়সালা অকাট্য ও সর্বসম্মত হিসাবে অভিহিত হবে এবং প্রজাবর্গ ও সর্বসাধারণের উপর এর অনুসরণ চূড়ান্ত ও অপরিহার্য বিবেচিত হবে।"

এই রাজকীয় ঘোষণা ৯৮৭ হিজরীর রজব মাসে তৈরী করা হয় এবং সমগ্র সাম্রাজ্যে কার্যকর ও বলবত করা হয়। সম্রাটের ইঙ্গিতে তামাম উলামা এই ঘোষণায় দস্তখত করেন। ঘোষণার আলোকে সম্রাট ইমাম মুজতাহিদ, যার আনুগত্য বাধ্যতামূলক ও আল্লাহ্র খলীফা হিসাবে অভিহিত হন এবং এটাই সেই সফরের সূচনা-বিন্দু যা শুধু ইসলাম থেকেই মুখ ফিরায়নি বরং এর থেকে শত্রুতা ও মতভেদে গিয়ে তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

এক নজরে রাজকীয় ঘোষণা

সমসাময়িক সুলতান ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের প্রতি শর্তহীন সাহায্য-সমর্থন, তাদের পদস্খলন ও নিয়ম-নীতিহীনতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তাদের নিবর্তনমূলক বিধি-বিধানসমূহ (এবং কোন কোন সময় ইসলামকে সুস্পষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও তাকে বদনামকারী), ভুল পদক্ষেপ ও পরিকল্পনাসমূহের জন্য তাত্ত্বিক প্রমাণপঞ্জী এবং ফিকহী ও কালামশাস্ত্রীয় সনদ সরবরাহ করার নজীর দ্বারা মুসলিম সাম্রাজ্যের দীর্ঘ ইতিহাস মুক্ত নয়। সমসাময়িক 'আলিম-উলামা দ্বারা

---

১. এই ঘোষণার সম্পূর্ণ মূল অংশ মুন্তাখাবুত তাওয়ারীখ, ২য় খণ্ড, ২৭১-৭২ পৃ.; তাবাকাত-ই কুবরা, ৩৪৩-৪৪ পৃ. দেখা যেতে পারে। নুযহাতুল খাওয়াতির-এ এর পুরো আরবী তরজমা রয়েছে।

বারবার পদস্খলন ও ভুল সংঘটিত হয়েছে এবং তারা (কোন ইখতিয়ারী বা ইচ্ছাকৃত মুসলিহাত কিংবা কোন অনিবার্য প্রয়োজনের কারণে) স্বীয় পদমর্যাদা ও অবস্থানের পরিপন্থী কাজ করেছেন। কিন্তু এ রকম সমসাময়িক সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা বরং দীন ও শরীয়তের পরিপন্থী পরিকল্পনা গ্রহণের ধারাবাহিকতায় এই ঘোষণার[১] যা শায়খ মুবারক সম্রাট আকবরের জন্য তৈরী করেছিলেন, খুব কমই তুলনা মিলবে। এতে (অর্থাৎ এই ঘোষণায়) এমন একজন যুবক সম্রাটকে মুজতাহিদ থেকেও উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয় এবং মুজতাহিদদের ইখতিলাফী মসলার ক্ষেত্রে তাকে অগ্রাধিকার ও নির্বাচনের অধিকার প্রদান করা হয়, তাকে সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ, বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ মেনে নেওয়া হয় যিনি ছিলেন একেবারেই নিরক্ষর, যার স্বভাবে প্রথম থেকেই নিয়ন্ত্রণহীনতা ও সীমাতিরিক্ত স্বাধীনতা রয়েছে, ইসলামের 'আলিম-উলামা' এবং দীন ও শরীয়তের ব্যাখ্যাতাদের উপর থেকে যার আস্থা ও বিশ্বাস উঠে গিয়েছিল এবং স্বীয় দরবার ও আপন গৃহের হিন্দুয়ানী পরিবেশ দ্বারা যিনি গভীরভাবে প্রভাবিত এবং দ্রুততার সঙ্গে হিন্দু ধ্যান-ধারণা ও আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণের দিকে ধাবিত, যিনি সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ও পূর্ণ ক্ষমতার মালিক, এর ফায়দা কেবল প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা কিংবা খেয়াল-খুশীর অধিকারী অথবা ঐ সমস্ত দরবারী আলিম-উলামা পর্যন্ত পৌঁছুত যারা সম্রাটের নামে এবং তৎপ্রদত্ত বিধি-বিধান ও ফরমানাদির আড়ালে স্বাধীনতা ও উচ্ছৃংখলতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইত, ইসলামী শারী'আকে ক্রীড়া-কৌতুকে পরিণত করতে চাইত কিংবা নিজেদের পুরনো শত্রু বা প্রতিপক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের খাব দেখত। শায়খ মুবারকের মত তীক্ষ্ণধী ও সতর্ক মানুষের পক্ষে এই পদক্ষেপের ফলাফল ও পরিণতি চোখ এড়িয়ে যাবার মত নয়। এ জন্য এর ব্যাখ্যা দেওয়া বড় কঠিন যে, এই ঘোষণার পেছনে কি পরিকল্পনা কাজ করছিল? একজন দূরদর্শী ঐতিহাসিক যাঁর এ ধরনের পদক্ষেপের ফলাফল ও পরিণতির উপর দৃষ্টি রয়েছে আজ মোল্লা মুবারকের আত্মাকে সম্বোধন করে বলতে পারে ঃ

فان كنت لا تدرى فتلك مصيبة - وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم

"যদি তোমার এই কর্মপন্থার স্বাভাবিক ফল তুমি না জেনে থাকো তবে তা এক দুঃখজনক ব্যাপার। আর যদি তুমি জেনেশুনে এ কাজ করে থাক তাহলে তা আরও বেশী বিস্ময়কর ও দুঃখজনক।"

---

১. এই ঘোষণা প্রকাশের সময় আকবরের বয়স ছিল ৩৮ বছর।

মাখদূমুল-মুলূক এবং সদরু'স-সুদূর-এর পতন

এই ঘোষণা প্রকাশ, মোল্লা মুবারকের তাত্ত্বিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং তাঁর উপযুক্ত দুই পুত্র ফৈযী ও আবুল ফযলের দরবারে আসা-যাওয়ার পর মখদূমু'ল-মুলূক মোল্লা আবদুল্লাহ সুলতানপূরী এবং সদরু'স-সুদূর মওলানা 'আবদুন্নবী গঙ্গূহীর পতন শুরু হয়ে যায়। মখদূমু'ল-মুলূক এবং শায়খ আবদুন্নবী দরবারের এই নতুন রঙ দৃষ্টে নিজেদেরকে গৃহকোণে গুটিয়ে নেন। এরপর একদিন তাদেরকে জোর করে দরবারে আনা হয় এবং জুতার সারিতে বসতে দেওয়া হয়।[১] মখদূমু'ল-মুলূক হিজায গমনের হুকুম পান। ৯৮৭ হিজরীতে তিনি হিজায গমন করেন। সেখানকার উলামায়ে কিরাম তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং উস্তাযু'ল-'উলামা শায়খ শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে হাজার হায়তামী মক্কী তাঁকে অত্যন্ত সসম্মানে গ্রহণ করেন। মক্কা মু'আজ্জমায় প্রায় তিন বছর কাল অবস্থান করত তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু গুজরাট পৌঁছুতেই তাঁকে বিষপ্রয়োগ করা হয় এবং ৯৯০ হিজরীতে তিনি সেখানেই ইনতিকাল করেন। সম্রাটের ইঙ্গিতেই যে তাঁর বিষপ্রয়োগ ঘটেছিল এর বহু প্রমাণ রয়েছে। খাফী খান তদীয় মা'আছিরু'ল-উমারা গ্রন্থে এর স্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন।[২]

শায়খ আবদুন্নবীও হিজায গমনের অভিলাষী ছিলেন। কিছুকাল সেখানে তিনি অবস্থানও করেন। কিন্তু মনে হয় তিনি তাঁর পূর্ব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদা বিস্মৃত হতে পারেন নি। তিনি ভারতবর্ষে আসেন এবং সম্রাটের ক্ষমা ভিক্ষা চান। মোল্লা আবদুল কাদিরের বর্ণনা যে, সম্রাট রাজা টোডর মলকে তার সঙ্গে বুঝা-পড়া করে নিতে বলেন। রাজা তাঁকে বন্দী করেন ও নির্যাতন- নিপীড়নের শিকারে পরিণত করেন। এই অবস্থায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু মা'আছিরু'ল-উমারার বর্ণনা মতে সম্রাট তাঁর ব্যাপারটা আবুল ফযলকে সোপর্দ করেন। আবুল ফযল তাঁকে গলা টিপে হত্যা করেন।[৩]

আলফেছানীর প্রস্তুতি এবং দীনে ইলাহীর প্রচলন

সম্রাটকে স্বাধীন মুজতাহিদ (মুজতাহিদ মুতলাক) ও সত্যপথী অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব বানিয়ে দেবার পর দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল এই যে, ইসলামের আবির্ভাব ও প্রকাশের পর এক হাজার বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে এবং দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সূচনা

---

১. মুন্তাখাবুত তাওয়ারীখ, ৩য় খণ্ড, ৭৯-৮৩ পৃ.।
২. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৪র্থ খণ্ড।
৩.প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড।

হচ্ছে। এই নতুন হাজার বছর থেকে পৃথিবীর এক নতুন বয়স শুরু হচ্ছে। এর জন্য একটি নতুন দীন (ধর্ম), এক নতুন আইন, একজন নতুন শরী'য়ত (আইন) রচয়িতা এবং একজন নতুন শাসক চাই আর এর জন্য আকবরের মত রাজমুকুট ও দণ্ডমুণ্ডের মালিক, ন্যায়বিচারক ইমাম (নেতা) ও বুদ্ধিমান অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী আর কেউ নেই। মোল্লা আবদুল কাদিরের ভাষায় ঃ

"সম্রাটের মস্তিষ্কে যেহেতু একথা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, ইসলামের পয়গম্বরের আবির্ভাবের মুদ্দতের হাজার বছর পূর্তি হয়ে গেছে যা এই দীনের স্বাভাবিক বয়স, অতএব তার অন্তরের প্রচ্ছন্ন চাহিদা ও দাবী প্রকাশে এখন আর কোন প্রতিবন্ধকতা রইল না।"[১]

এই ফয়সালার পর সেই সমস্ত পরিবর্তন শুরু করে দেওয়া হয় যার ফলে রাষ্ট্রের মধ্যে এই ধারণা ব্যাপক ও দৃঢ়মূল হয়ে যায়। অনন্তর মুদ্রার উপর (যা প্রত্যেকের হাতে গিয়ে পৌঁছে এবং যার চেয়ে বড় কোন ইশতিহার হয়না) 'আল্‌ফ'-এর তারিখ মুদ্রণ করা হয়।[২] বিশ্ব ইতিহাসে একটি পার্থক্য নিরুপণকারী বিভাজন রেখা কায়েম করার জন্য এবং একে দু'টি মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে বন্টন করার জন্য "তারীখে আলফী" নামে একটি নতুন তারীখ তথা দিনপঞ্জী সংকলন ও সম্পাদনের কাজ আলিমদের একটি বোর্ডের উপর সোপর্দ হয়। এতে হিজরী বর্ষের পরিবর্তে তিরোধানের কথা উল্লেখ করা হয়। লোকের মন-মস্তিষ্কে একথা বসিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল যে,

"সেই যুগ-নায়কের সময় এসে গেছে যিনি হিন্দু-মুসলমানের বাহাত্তর ফের্কার মতভেদ মেটাবেন আর তা সম্রাটের পবিত্র সত্তার গুণ।"[৩]

এথেকেই আকবর শাহীর দীন-ই ইলাহীর সূচনা ঘটে যার ভেতর ছিল তওহীদের পরিবর্তে (সূর্য উপাসনার আঙ্গিকে) প্রকাশ্য শির্ক,নক্ষত্র পূজা, মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান বিশ্বাসের পরিবর্তে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস। আকবর (তৎকর্তৃক প্রবর্তিত দীনে ইলাহীতে) দস্তুর মত বায়'আত গ্রহণ করতেন। এই ধর্মে দাখিল হবার জন্য দাখিল হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি থেকে যে কালেমা পড়ানো হত তাতে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সঙ্গে 'আকবার খালীফাতুল্লাহ' (আকবর আল্লাহ্র খলীফা) ও শামিল করা হত। কলেমার সাথে একটি ইকরারনামা থাকত যেখানে বলা হত ঃ

---

১. মুন্তাখাবুত তাওয়ারীখ, ৩০১ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত, ২৭৯ পৃ.।

"আমি আমার একান্ত অভিলাষ, উৎসাহ ও আন্তরিক আগ্রহে অপ্রাকৃত ও অন্ধ আনুগত্যমূলক ধর্ম ইসলাম থেকে যে ধর্ম সম্পর্কে বাপ-দাদা থেকে শুনেছি ও দেখেছি, সেই ধর্ম থেকে নিজেকে বিমুক্ত ও বিচ্ছিন্ন করছি এবং আকবরশাহী দীনে ইলাহীতে দাখিল হচ্ছি এবং এই দীনের ইখলাসের চারটি ধাপ অর্থাৎ তরক-ই মাল (ধন-সম্পদ বিসর্জন), তরক-ই জান (আত্মবিসর্জন), তরক-ই নামূস ও 'ইযযত (মান-সম্মান বিসর্জন) এবং তরক-ই দীন (দীন বিসর্জন) কে কবুল করছি।"[১]

এই দীনে (দীনে-ই ইলাহীতে) সূদ, জুয়া, শুকর মাংস বৈধ ছিল এবং গরু যবাহ নিষিদ্ধ ও বিবাহ আইন সংশোধন করা হয়েছিল। পর্দা ও খাতনা প্রথা নিষিদ্ধ ছিল। দেহ ব্যবসাকে সুসংহত করা হয়েছিল এবং এর জন্য স্থান নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল, এর জন্য আইন বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মৃতের দাফন ক্রিয়ার মধ্যেও সংশোধন আনা হয়েছিল। মোটকথা একটি স্থায়ী ভারতীয় আকবরী ধর্ম সংকলিত হয়েছিল যার ভেতর মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির প্রাচীন আইন মুতাবিক এই দীন ও জীবন-পদ্ধতির পাল্লা ছিল অবনমিত যে দিকে স্বাভাবিক ঝোঁক বা প্রবণতা এবং প্রবৃত্তির তৃপ্তির উপকরণ ছিল এবং বহির্দেশীয় জাতীয় ও রাজনৈতিক স্বার্থ এর অগ্রাধিকারের অনুকূলে ছিল।[২]

সম্রাট আকবরের ধর্মীয় ও মেযাজগত বিকৃতি এবং এর চূড়ান্ত পরিণতি

আকবরের এই ধর্মীয় ও মেযাজী বিকৃতি ও বিপর্যয় কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল তা নিরুপণে আমরা সর্বপ্রথম আকবরের বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধ-শক্তি যার কাছে বাঁধা প্রড়ছিল সেই আবুল ফযল 'আল্লামীর উদ্ধৃতি পেশ করব। এগুলো সেই সামগ্রিক পরিবর্তন ও বিকৃতির বিভিন্ন পর্যায় যা আবুল ফযলের বিবরণে ও বর্ণনায় পাওয়া যায়। সেগুলোকে একত্র করলে সেই অগ্নি-শৃঙ্খলের কিছুটা কল্পনা করা যাবে যা সেই সময় ইসলামের গলায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

১. মুন্তাখাবুত তাওয়ারীখ, ২৭৩ পৃ.।

২. এই উদারতাও সকলের সঙ্গে শান্তি-সমঝোতার আন্দোলন অথবা নতুন ধর্ম ও আইনে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সমান আচার-আচরণ কায়েম থাকেনি। স্বাভাবিকভাবেই এই ধর্ম ও ফের্কার পাল্লা ঝুকে যায় যার প্রতি দরবারে প্রভাব এবং স্বভাবে ঝোঁক ছিল। ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-এর লেখক ডব্লিউ এইচ মোরল্যাণ্ড এবং এ. সি. চ্যাটার্জি এ কথা স্বীকার করেছেন যে, আকবর হিন্দুদের খুশী করবার জন্য গো-হত্যাও বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর নির্দেশের অমান্যকারীদেকে কঠিন শাস্তি দেন। আকবরের আইনগুলো ইসলাম ধর্মের তুলনায় হিন্দু ধর্মের অনুকুলে ও সমর্থনেই বেশী হত। তাঁর এই কর্মকৌশল ফলপ্রসূ হয়।

تو خود حدیث مفصل بخواں ازیں مجمل

অগ্নিপূজা

"জাহাঁপনা স্বীয় আলোকোজ্জ্বল বিবেক থেকে রৌশনী (আলো)-কে অত্যন্ত প্রিয় এবং এর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনকে খোদাপরস্তী ও আল্লাহ্‌র প্রশংসা জ্ঞান করতেন। এই মূর্খ নাদান একে খোদা বিস্মৃতি ও অগ্নিপূজা বলে থাকে।"[১]

"সূর্য অস্ত যাবার পর (খাদেম ও পরিচারক) বারটি কর্পূরের বাতি জ্বালায় আর প্রতিটি চেরাগ স্বর্ণ ও রৌপ্যের বারকোষে রেখে সম্রাটের সামনে নিয়ে আসে। তাদের ভেতর থেকে একজন সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিকারী খাদেম বাতিটা হাতে নিয়ে নানা রকম চিত্তহারী সুরে খোদার প্রশংসা গীতি গায় এবং শেষে সম্রাটের দীর্ঘায়ু ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দু'আ করে।"[২]

সূর্য পূজা

"দো-আশিয়ানা মনযিল" নামক ইমারতে ঈশ্বর বন্দনা হত এবং এখান থেকেই সূর্যের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সূচনা হয়েছিল। তিনি বলেন যে, রাজা-বাদশাহদের অবস্থার উপর সূর্যের এক বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে। এজন্যই এর উপাসনাকে খোদার ইবাদত মনে করা হয়। কিন্তু অপরিণামদর্শী মানুষ বদগুমানীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। জনসাধারণ কিজন্য কালিমা লিপ্ত মনের অধিকারী বিত্ত-সম্পদের মালিককে নিজেদের লাভের নিমিত্ত সম্মান করে এবং নিজেদের অন্ধত্বের কারণে এই আলোর ঝর্নাধারার সম্মান জ্ঞাপনে সংকুচিত হয় এবং ইবাদত গুযার-এর উপর ভর্ৎসনা করে? যদি স্বয়ং তার বুদ্ধিবিভ্রম না ঘটে থাকে তাহলে সূরা ওয়াশ-শাম্‌স কেন ভুলিয়ে দেওয়া হল?"[৩]

গঙ্গাজল

"সম্রাট ঘরে-বাইরে সব সময় গঙ্গার পানি পান করতেন। আস্থাভাজন কর্মচারীদের একটি দল নদীর ধারে মোহরাংকিত কুঁজোয় পানি ভরে আনবার জন্য আদিষ্ট। জাহাঁপনা যখন আগ্রা ও ফতেহ্ পূরে অবস্থান করতেন সূর কসবা থেকে পানি আনা হত। শাহী তাবু যখন লাহোরে স্থাপন কর হত হরি দ্বার-এর সর্বোত্তম

---

১. A Short History of India-এর উর্দূ অনুবাদ, পৃ. ২৫১

২. আঈন-ই আকবরী, ১ম খণ্ড, ২৮ পৃ. লাখনৌ সং. ১৮৮২।

৩. আঈন-ই আকবরী, ৩য় খণ্ড, ১৮৪ পৃ.।

পানিতে আবদার-খানা প্লাবিত হত। বাবুর্চিখানায় যমুনা ও চেনাবের পানি অথবা বৃষ্টির পানি খরচ হয় । কিন্তু তার ভিতর কিছুটা গঙ্গাজল মিশানো হয়।"১

চিত্রাংকন

"একদিন জাহাঁপনা নির্জনে ও নিভৃত স্থানে, যেখানে কেবল সৌভাগ্যবান মুরীদদেরই সমাবেশ ছিল, বললেন যে, একদল লোক চিত্রাংকন শাস্ত্রের দুশমন এবং এই পেশার দোষ-ত্রুটি বয়ান করে। কিন্তু তাদের কথা ও যুক্তি মন কবুল করে না বরং যুক্তি-বুদ্ধির কথা এই যে, চিত্র শিল্পী অধিকাংশ মানুষের চেয়ে অধিকতর খোদাপ্রেমিক হতে পারে। এজন্য যে, এই ব্যক্তি জীবজন্তুর ছবি আঁকতে গিয়ে তার প্রতিটি অঙ্গের ছবি আঁকে এবং ছবি সম্পূর্ণ করার পর যখন দেখে যে, এই বাহ্যিক যাদুকরিতা সত্ত্বেও সে এতে আত্মা বা প্রাণের সঞ্চার করতে অক্ষম তখন সে সেই মহা ও পরম স্রষ্টার 'কুদরতে কামেলা' পরিমাপ করতে পারে এবং পরম স্রষ্টার সামনে সিজদাবনত হয়।"২

ইবাদতের ওয়াক্ত

"ভোর মুবারক দিনের সূচনা এবং আলোক বিচ্ছুরণের শুরু, দুপুর যখন সূর্যের জ্বলন্ত আলোক-রশ্মি তামাম জাহানকে প্লাবিত করে এবং মানুষের ভেতর বিবিধ বর্ণের আনন্দের আমেজ সৃষ্টি করে এবং সন্ধ্যা যখন আলোর উৎস (সূর্য) মানুষের চোখের আড়ালে হারিয়ে যায় (অস্ত যায়)।"৩

সিজদা-ই তা'জীমী বা সম্মানসূচক সিজদা

"ভক্ত- দাসেরা সম্মানসূচক সিজদা করে এবং একে স্বর্গীয় তথা ঐশ্বরিক সিজদা গণ্য করে।"৪

বায়'আত ও ইরশাদ

"সত্যান্বেষী হাতে পাগড়ী নিয়ে পবিত্র পায়ের উপর মাথা রাখত এবং মুখে এভাবে বলত যে, জাগ্রত ভাগ্যের সাহায্য ও দয়ায় এবং সৌভাগ্য রবির পথ-প্রদর্শনায় ও দিক-নির্দেশনায় (যা বিবিধ প্রকার ক্ষতির কারণ ছিল) আমি আমার দিলের তাওয়াজ্জুহ (মনোযোগ) সম্রাটের আনুগত্যের প্রতি ঝুকিয়ে দিচ্ছি।"৫

---

১. আঈন-ই আকবরী, ১ম খণ্ড, ৩৩ পৃ.
২. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ৭৮ পৃ.।
৩. ঐ, ১ম খণ্ড, ১০৫ পৃ.।
৪. ঐ, ১ম খণ্ড,১০৭।
৫. ঐ, ১১০।

সাক্ষাতের আদব

"পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় একজন বলত, 'আল্লাহু আকবার' এবং অন্যজন এর প্রত্যুত্তরে বলত, 'জাল্লা জালালুহু' (স্মর্তব্য যে, সম্রাটের মূল নাম ছিল আকবর এবং কুনিয়াত ছিল জালালুদ্দীন। সালামের পরিবর্তে উপরিউক্ত বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে সম্রাটের বন্দনা গাওয়াই ছিল মূখ্য উদ্দেশ্য। অনুবাদক)।"[১]

হিজরী সন ও তারিখের প্রতি ঘৃণা

"দীর্ঘ কাল যাবত সম্রাটের অভিলাষ ছিল ভারতবর্ষে নতুন বর্ষ ও মাস জারী করে (এক্ষেত্রে বিরাজিত) অসুবিধাগুলো দূর করবেন এবং মানুষকে আরাম দেবেন। জাহাঁপনা হিজরী সনকে এর ত্রুটির কারণে পসন্দ করতেন না। কিন্তু অপরিণামদর্শী ও স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন অবুঝ লোকের আধিক্যের কারণে যারা সন-তারিখের প্রচলনকেও একটি ধর্মীয় বিষয় মনে করে মহানুভব সম্রাটের মনরঞ্জক প্রকৃতি তাদের মন ভাঙতে চায়নি বিধায় প্রথম দিকে আপন খেয়াল বাস্তবায়িত করতে পারেন নি।"[২]

অনৈসলামী পালা-পার্বণ ও আনন্দ উৎসব

"প্রথম রাজকীয় উৎসব অনুষ্ঠান (জশন جشن) জশনে নওরোযী (নওরোয, নববর্ষের উৎসব) নামে অভিহিত । সূর্য যখন বর্ষ-পরিক্রমা সম্পূর্ণ করত পরবর্তী বছরে পদার্পণ করে এবং স্বীয় প্রাচূর্য ও সমৃদ্ধি দ্বারা গোটা জগদ্বাসীকে উপকৃত করে তখন ঊনিশ দিন পর্যন্ত পরিপূর্ণ আনন্দ-ফুর্তি ও আমোদ-প্রমোদের ঢেউ বয়ে চলে। এই সময় দু'দিন ঈদের পর্ব পালন করা হয় এবং বেশুমার নগদ অর্থ ও রকমারী জিনিষ দান ও উপহার-উপঢৌকন হিসেবে বণ্টন করা হয়। ১লা ফেব্রুয়ারী এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারীর দিন, যা য়াওমুশ-শারফ, ঈদের জন্য নির্দিষ্ট। পার্শীদের নিয়ম হল, প্রতি মাসের সেই দিনকে যা মাসের সাথে একই নামের, অত্যন্ত বরকতময় ধারণা করে এবং সেই দিন আনন্দোৎসব করে ও সীমাহীন গান-বাজনা ও খানা-পিনার আয়োজন করে। সম্রাটও এই প্রথার অনুকরণ করলেন এবং প্রতিটি সৌর মাস একটি বিশেষ উৎসবের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এসব দিনের তালিকা-সূচী নিম্নরূপ ঃ

---

১. আঈন-ই আকবরী, ১১০।

২. আঈন-ই আকবরী, ১৯৬ পৃ.।

'উনিশ ফরওয়ার দীন, তৃতীয় ইরদী বেহেশ্‌ত, ষষ্ঠ খোরদাদ, এয়োদশ তীর, সপ্তম আমেরদাদ, চতুর্থ শহরপুর, ষষ্ঠদশ মহর, দশ আবান, নবম আযর; অষ্টম, পঞ্চদশ ও তেইশ দে, দ্বিতীয় বাহমান, পঞ্চম ইস্‌ফিন্দার।

"এ সমস্ত দিনে উৎসব (جشن) অনুষ্ঠিত হত এবং প্রতিটি উৎসব অনুষ্ঠানে নানা ধরনের ও বিভিন্ন প্রকারের আলোকসজ্জাসহ সাজ-সজ্জা করা হত। উপস্থিত লোকেরা আনন্দের আতিশয্যে বেএখতিয়ার আনন্দ ধ্বনি করত।

"প্রতিটি প্রহরের সূচনায় নাকাড়া বাজান হত। আমোদ-প্রমোদকারীরা নিজেদের গান-বাদ্য ও যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে আনন্দের ফোয়ারা ছোটাত।"[১]

যাকাত আদায় না করতে রাষ্ট্রীয় ফরমান

"বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মচারীবৃন্দ এবং অধীনস্থ রাজ্যসমূহের গোমস্তাদের জানা দরকার যে, এই সৌভাগ্যের যুগে যার সূত্রপাত ঘটেছে উৎসব-বর্ষ থেকে এবং যা দ্বিতীয় করন (قرن)-এর সপ্তম বর্ষ (অর্থাৎ ৩৭ বছর, কেননা 'করন' দ্বারা এখানে তিরিশ বছর বুঝানো হয়েছে), যা সম্পদ ও সৌভাগ্যের বসন্ত এবং জালাল ও জামালের (মহত্ত ও সৌন্দর্য) প্রকাশ কাল—এই ফরমান প্রকাশিত হয় যে, সাম্রাজ্যের কর্মকৌশলের দাবী যে, হুকুমত ও সিয়াসত (সরকার ও রাজনীতি) যা স্থানীয় ও বিদেশাগত এবং কর্মচারী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থের হেফাজতের নাম এবং যা রাজস্বের একটি মাধ্যম যার উপর সামরিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তি, যা জান-মাল ও আকীদা-বিশ্বাস এবং বাজারের তত্ত্বাবধান করে । যদি ঐ সব বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন লোকদের নিক্তি ভুল হয়ে যায়, যা খাটি ও খাদ-এর পরীক্ষা করে তাহলে নির্ভেজাল ভেজালে এবং ভাল মন্দে পরিবর্তিত হবে। আল্লাহ্‌র প্রশংসা যে, শুরু থেকেই সম্রাটের লক্ষ্য সাধারণের কল্যাণ এবং প্রজা সাধারণের লালন-পালনের দিকে রয়েছে, যারা সম্রাটের সন্তানতুল্য এবং আল্লাহ্‌র আমানত। আল্লাহ্‌র জন্য মিনতি যে, ভারতবর্ষ এবং অধীনস্থ অন্যান্য প্রদেশসমূহ 'আদল তথা ন্যায়বিচার ও প্রাচুর্যের কেন্দ্র এবং দুনিয়ার তাবৎ মুসাফিরের অবতরণস্থল।

"অতি সম্প্রতি শাহী দরবার থেকে এই মর্মে নির্দেশনামা ঘোষিত হয়েছে যে, বিভিন্ন প্রকার খাদ্য-শস্য, উদ্ভিজরাজি, ঔষধপত্র, লবন ও মেশক, নানা প্রকার সুগন্ধি, বস্ত্র ও তুলা, পশমী উপকরণ, ঘাস-বাঁশ ও অন্যান্য বস্তুসামগ্রী, যে সমস্তর উপর জীবন ও যিন্দেগী নির্ভরশীল, কেবল হাতী-ঘোড়া, উট, বকরী,

---

১. আঈন-ই আকবরী, ৬৪ পৃ.।

অস্ত্রশস্ত্র ও জরুরী সামানের (যা প্রথম থেকেই ব্যতিক্রম) যাকাত অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশগুলোতে এবং ছোট-বড় সমস্ত ট্যাক্স মাফ করা হচ্ছে।"[১]

হিন্দুরা একত্ববাদী

"আমাদের সামনে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, এই যে লোকের মুখে মুখে ফিরে যে, হিন্দুরা একক খোদার শরীক ঠাওরায়—একথা ঠিক নয়। যদিও বহু কথা ও দলীল-প্রমাণ আপত্তিকর, কিন্তু এই জাতি একত্ব প্রয়াসী ও এদের খোদাপরস্তীর নিশ্চিত বিশ্বাস রয়েছে।"[২]

গোশ্‌ত ভক্ষণ

"তিনি (সম্রাট) বলেন যে, যদি জীবনের সমস্যা-সংকুলতা, সংকট আমার স্মৃতিপটে অংকিত না হয়ে যেত তাহলে মানুষের গোশ্‌ত ভক্ষণে আমি প্রতিবন্ধক হতাম এবং আমি এই দিক দিয়ে এর উপর এক সঙ্গে আমল করতে চাই না যে, এতে বহু কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং মানুষ এর শোকে-দুঃখে পাগলপারা হয়ে যাবে। তিনি বলেন যে, কসাই, জেলে এবং তাদের মত অন্যরা, যাদের পেশা জীবন নেওয়া, তাদের আবাস সাধারণের বসতিস্থল থেকে আলাদা করা হোক এবং তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারীদের থেকে জরিমানা আদায় করা হোক।"[৩]

শূকর

"তিনি বলেন যে, যদি শূকর হারাম হবার পেছনে তার পৌরুষ ও মর্যাদাহীনতা-ই কারণ হয় তাহলে ব্যাঘ্র কিংবা অনুরূপ অপরাপর (হিংস্র) প্রাণী হালাল হওয়া আবশ্যক।"[৪]

মদ্য পান

"এই মাসের উৎসব অনুষ্ঠানে সম্রাট মদ্যপান করতেন,মীর সদর জাহান, মুফতী মীর 'আদল ও মীর আবদুল হাইও মদপান করেন এবং সম্রাটের মুখে এই কবিতা এসে যায়।"[৪]

در دور پادشاه خطا بخش و جرم پوش
قاضی قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش

১. তাবাকাত-ই আকবরী, ৬৭-৬৮।
২. আঈন-ই আকবরী, ৩য় খণ্ড,২য় পৃ.।
৩. ঐ, ৩য় খণ্ড, ১৮৯ পৃ.।
৪. ঐ, ৩য় খণ্ড, ১৮৫ পৃ.।

অপরাধ ক্ষমাকারী ও পাপ গোপনকারী বাদশাহ্‌র যুগে কাযী ও মুফতী হল মদ্য পানকারী।

হিন্দু প্রথা

"খান আ'জম মির্যা কোকার মাতা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এতে জাহাঁপনা এতটাই শোকাভিভূত হন যে, শোকে প্রকাশ্যে মস্তক ও গোঁফ মুণ্ডন করেন। আপ্রাণ চেষ্টা চলে যাতে মরহূমার জ্যেষ্ঠপুত্র ব্যতিত আর কেউ কেশ মুণ্ডন না করে। কিন্তু তথাপি অকৃত্রিম সেবকবৃন্দ সম্রাটের অনুসরণ করে।"[১]

ইলাহী সনের প্রচলন

"৯৯২ হিজরীতে শাহানশাহী (রাজোচিত) জ্ঞান ও বিদ্যা-বুদ্ধির আলো, জ্ঞান ও পূর্ণতার সেই উজ্জল প্রদীপ জ্বালান যা স্বীয় বরকতময় রৌশনীর সাহায্যে সমগ্র পৃথিবীকে উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান করে দেয়। খোশনসীব ও সত্য প্রিয় সম্প্রদায় ব্যর্থতার উপাধান থেকে মাথা তুলল এবং বেহুদাগো ও অলস মতের লোকেরা লোকচক্ষুর অন্তরালে মুখ লুকাল। কিবলায়ে আলম (অর্থাৎ সম্রাট)-এর সদিচ্ছা বাস্তব রূপ লাভ করল এবং বিজ্ঞলোকদের স্মারক মীর ফতহুল্লাহ শীরাযী এই কর্ম সম্পাদনের জন্য সাহসে কোমর বাঁধল। আল্লামা শীরাযী আধুনিক গুরগানী বর্ষগঞ্জিকাকে সামনে রেখে জাহাপঁনার সিংহাসন আরোহণ বর্ষকে ইলাহী সনের প্রথম বর্ষ হিসাবে অভিহিত করেন।"[২]

এই সব বুনিয়াদী সত্য তুলে ধরার পর, যদ্দ্বারা সম্রাট আকবরের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার পরিপূর্ণ অবয়ব তৈরী হয়ে যায়, এক্ষণে মোল্লা আবদুল কাদির বদায়ূনীর প্রদত্ত কতক বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি তথ্য দ্বারা এই অবয়বকে অধিকতর পূর্ণতা দানে কোন ক্ষতি নেই এবং দীন ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ায় তা ইসলাম ও ইসলামী শরী'আতের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণ-পুরুষ-এর সঙ্গে যে দূরত্ব ও আতংক বরং ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছিল তার একটি চিত্রও যেন লোকের সামনে আসতে পারে।

দীন ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন

"মুসলিম মিল্লাতের সমগ্র পুঁজিকে ধ্বংসশীল এবং অসৎ যুক্তি-বুদ্ধির সমষ্টি হিসাবে অভিহিত করা হয় এবং এর স্রষ্টা (আল্লাহ্‌র পানাহ চাই) আরবের সেই

১. আঈন-ই আকবরী, ৩য় খণ্ড, ৬০৬ পৃ. (উর্দূ)।
২. আকবরনামা, ৩য় খণ্ড, ৮৩০ পৃ.।

সব কতিপয় গরীব বেদুঈন অভিহিত হন যাঁদের ভেতর সকলেই ছিল হাঙ্গামাবাজ ও ডাকাত এবং ফেরদাউসীর শাহনামার দু'টো বিখ্যাত কবিতা থেকে এর সনদ গ্রহণ করা হয় যা তিনি উদ্ধৃতি হিসাবে বলেছিলেন ঃ

زشیر شتر خوردن وسوسمار * عرب را بجاے رسیدست کا

که ملك عجم را کنند آرزو * تفو باد بر چرخ گردان تفو[২]

"উটের দুধ পান করে আর গোসাপ ও বেজীর গোশ্‌ত খেয়ে আরবরা ধ্বংস হয়েছে; এখন তারা অনারব দেশগুলো জয় করার আশা পোষণ করে, বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের উপর অভিশাপ।"

ইসরা ও মি'রাজ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ

"যাই হোক, জ্ঞান-বুদ্ধি একথা কি করে মেনে নিতে পারে যে, একজন ভারী দেহধারী হওয়া সত্ত্বেও হঠাৎ করে ঘুম থেকে উঠেই আসমানের উপর গিয়ে হাযির হন এবং আল্লাহর সঙ্গে নানা ধরনের ৯০ হাজার কথা বলেন, কিন্তু তাঁর বিছানা তখনও পর্যন্ত উষ্ণই থাকে আর লোকে তাঁর দাবী মেনে নেয়! এ ধরনেরই আরেকটি উদাহরণ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণের মত কথাকেও তারা মেনে নেয়।"

এরপর মাটি থেকে উঠানো একটি পায়ের দিকে উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে তিনি প্রশ্ন রাখেন ঃ

"যতক্ষণ পর্যন্ত না অপর পা যমীনের উপর নামিয়ে আনছি আমার পক্ষে দাঁড়ানো অসম্ভব, আমি দাঁড়াতে পারি না। আসলে এ সব কিসের গল্প?"[১]

মকাম-ই নবূওতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন

"অর্থাৎ হিজরতের প্রথম পাদেই কুরায়শ কাফেলা লুণ্ঠন, চৌদ্দ জন মহিলাকে বিবাহকরণ এবং স্ত্রীদের মনোরঞ্জন ও সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত মধু ভক্ষণ নিষিদ্ধকরণ (এ সব কথার পেছনে নবূওতের উপর আপত্তি উত্থাপনই ছিল আসল উদ্দেশ্য)।"[২]

নববী নামে আতংকবোধ ও কষ্ট অনুভব

"আহমদ, মুহাম্মদ, মুস্তফা প্রভৃতি নাম বাইরের কাফিরদের খাতিরে এবং অন্দরের মহিলাদের কারণে সম্রাটের নিকট বোঝা অনুভূত হতে থাকে। শেষে

১. আঈন-ই আকবরী, ১ম খণ্ড, ৫৬৪ পৃ.।
২. মুন্তাখাবুত তাওয়ারীখ, ৩০৭ পৃ.।

কিছু দিন পর একান্ত আপর জনদের নাম তিনি বদলেও দেন। যেমন ইয়ার মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ খানকে তিনি রহমত নামেই ডাকতেন এবং লেখার সময়ও তাদেরকে উল্লিখিত নামেই সম্বোধন করতেন।"[১]

নামাযের অনুমতি না দেওয়া

"দীওয়ানখানায় কারোর সাধ্য ছিল না যে, প্রকাশ্যে নামায আদায় করে।"[২]

এক স্থানে লিখেন ঃ

"নামায, রোযা ও হজ্জ তো এর আগেই হারিয়ে গিয়েছিল।"[৩]

ইসলামের রুকনসমূহের অবমাননা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ

"মোল্লা মুবারকের এক পুত্র ছিল আবুল-ফযলের শিষ্য। সে ইসলামের ইবাদত সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করে। এসব পুস্তিকা শাহী দরবারে জনপ্রিয়তা পায় এবং এই পুস্তিকাই তার সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের কারণ হয়।"[৪]

ভারতবর্ষের মুসলিম ইতিহাসের সঙ্গীন ও বিপজ্জনক মোড়

মোটকথা, সেই সময় ভারতবর্ষ যেখানে দীন-ই ফিতরত-এর পবিত্র বৃক্ষের রোপণ, লালন-পালন ও ফলে-ফুলে সুশোভিতকরণের জন্য চারশ বছর যাবত উপর্যুপরি সর্বোত্তম মানবীয় শক্তি-সামর্থ্য, মেধাগত যোগ্যতা এবং সূফী-দরবেশগণের রূহানিয়াত তথা আধ্যাত্মিকতা ব্যয়িত হয়েছিল একেবারে হঠাৎ করেই ধর্মীয়, মানসিক ও সভ্যতা-সাংস্কৃতিক ইরতিদাদ (ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, ধর্ম পরিত্যাগ, ইসলাম বর্জন)-এর রাস্তায় গিয়ে পড়ছিল যার পৃষ্ঠপোষকতা করছিল যুগের এক বিরাট বৃহত্তম সাম্রাজ্য এবং বিশাল এক সামরিক শক্তি যেই শক্তি ও সাম্রাজ্যের পেছনে সেই যমানার কতিপয় প্রতিভাবান ও মনীষাসম্পন্ন লোকের জ্ঞানগত ও মস্তিষ্কপ্রসূত সাহায্য-সহযোগিতাও ছিল। সেই সময় যদি অবস্থার গতি এটাই থাকত এবং এর রাস্তা রোধকারী কোন শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব না থাকত কিংবা কোন বিপ্লবাত্মক ঘটনা সংঘটিত না হত তাহলে এদেশের পরিণতি হি. একাদশ শতাব্দীতে বাহ্যত তাই হত যা হিজরী নবম শতাব্দীতে মুসলিম স্পেনের (যাকে বর্তমান বিশ্ব কেবল স্পেন নামেই চিনে ও

১. মুন্তাখাবুত তাওয়ারীখ, ৩১৪ পৃ., ৩খ.।
২. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ৩১৫ পৃ.।
৩. প্রাগুক্ত, ২৫১ পৃ.।
৪. প্রাগুক্ত, ২৫১ পৃ.।

জানে) অথবা হি, চতুর্দশ শতাব্দীতে (রুশ বিপ্লবের পর) তুর্কিস্তানের হয়েছে। কিন্তু مردے از غیب بروں آید وکارے بکند

এখন আমরা এই অধ্যায়কে সীরাত-ই নববী (স.)-র লেখক ও ইসলামের ঐতিহাসিক মওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী (র)-র সেই বাগ্মিতাপূর্ণ বাক্য দ্বারা শেষ করছি যা তিনি ہندوستان کے غربت کدہ میں مسافر اسلام-এর ভ্রমণ-কাহিনী শোনাতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"এই অলস ঘুমের মাঝে চারশ' বছর অতিবাহিত হয়ে গেল আর মুসাফিরের সফর সূচনার হাজারো বছর অতিক্রান্ত হচ্ছিল। যুগটি ছিল সম্রাট আকবরের, যখন অনারব দেশের একজন যাদুকর এসে সম্রাটের কানে এই মন্ত্র ফুঁকল যে, আরব উদ্ভূত ধর্মের (অর্থাৎ ইসলামের) সহস্র বছর বয়স পূর্তি হয়েছে। এখনই সময় একজন নিরক্ষর সম্রাটের মাধ্যমে নিরক্ষর নবী (স)-র ধর্ম মনসূখ হয়ে দীন-ই ইলাহীর আবির্ভাব ও প্রকাশ ঘটার। অগ্নি উপাসক মজূসীরা তাদের উপাসনাগার উত্তপ্ত করল, খৃস্টানরা গির্জার ঘন্টা বাজাল, ব্রাহ্মণ পুরোহিত পুতুল সাজাল এবং যোগ-সাধনা ও তাসাওউফ মিলিত হয়ে কা'বা এবং পূজামণ্ডপকে একই প্রদীপ দ্বারা আলোকমণ্ডিত করতে বদ্ধপরিকর হল। এই পাঁচ মিশেলী আন্দোলনের যে আছর হল তার ছবি যদি কেউ দেখতে চায় তাহলে সে যেন دبستان مذاهب অধ্যয়ন করে, দেখতে পাবে কত পৈতাধারীর হাতে তসবীহ এবং কত তসবীহধারীর গলায় পৈতা। শাহী আস্তানায় কত আমীর-উমারা সিজদাবনত, কত পাগড়ীধারী সম্রাটের দরবারে হাত জোড় করে দণ্ডায়মান তাও দেখা যাবে এবং মসজিদের মিম্বর থেকে এ আওয়াজও শোনা যাবে,

تعالی شانہ۔ اللّٰہ اکبر

"এ সবই হচ্ছিল। এমন সময় সরহিন্দ-এর দিক থেকে একজন ঘোষকের কণ্ঠ শোনা গেল, "পথ পরিষ্কার করুন, পথিক আসছেন।" একজন ফারূকী মুজাদ্দিদ ফারূকী শানে আবির্ভূত হলেন। ইনি ছিলেন আহমদ সরহিন্দী।"[১]

---

১. মুকাদ্দিমা সীরাত সাইয়িদ আহমদ শহীদ, ৩০-৩১ পৃ.।

তৃতীয় অধ্যায়

হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফ-ই ছানী (র)

জীবন কাহিনী ঃ জন্ম থেকে খিলাফত প্রাপ্তি পর্যন্ত

খান্দান

হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব বংশগত দিক দিয়ে ফারূকী।[১] তাঁর বংশধারা[২]

---

১. হযরত মুজাদ্দিদ হযরত ফারূক-ই আজম-এর সঙ্গে বংশসূত্রে সম্পর্কিত হবার দরুণ গর্ব অনুভব করতেন এবং তার ধর্মীয় মর্যাদাবোধকে এর দাবী ও স্বভাবিক পরিণতি বলে মনে করতেন। জমহূর আহলে সুন্নত ও আকাইদে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে একজন আরিফ শায়খ আবদুল কবীর য়ামানীর একটি গবেষণার কথা শ্রবণে তাঁর কলম থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিম্নোক্ত কথাগুলো বেরিয়ে গিয়েছিল ঃ مخدوما! ایں فقیر را تاب استماع امثال ایں سخنان نیست بے اختیار رگ فاروقیم درحرکت می آید মকতূব ১০০ (দফতর আওয়াল, মুল্লা হাসান কাশ্মিরীর নামে)। অপর এক পত্রে এ কথা শুনে যে, সামানা কসবার খতীব জুমুআর খুতবায় খুলাফায়ে রাশিদীন-এর উল্লেখ ইচ্ছাকৃতভাবেই পরিত্যাগ করেছেন, তিনি লিখেন ঃ

چوں استماع ایں خبر وحشت انگیز در شورش آور دو رگ فاروقیم را حرکت داد بچن کلمات اقدام نمود - (পত্র নং ১৫, ৬ষ্ঠ খণ্ড, দফতর দ্বিতীয়)।

২. বংশধারা সম্পর্কে আমরা উল্লিখিত খান্দানের নয়নমণি, পণ্ডিত ও গবেষক মওলানা শাহ আবুল হাসান যায়দ ফারূকীর গবেষণামূলক আলোচনার উপর নির্ভর করেছি যা তিনি মুজাদ্দিদ সাহেবের বংশ-লতিকা সম্পর্কে তদীয় মাকামাত-ই খায়র গ্রন্থে حضرات اباء و اجداد کرام শিরনামে (২৬-৩৩) পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর গবেষণামূলক সিদ্ধান্ত এই যে, আটাশ মাধ্যম ওমর-এর পরে যাঁকে আমীরুল মু'মিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব মনে করা হয়, চারটি মাধ্যম সাধারণভাবে নসবনামা সংক্রান্ত কিতাবাদি থেকে পড়ে গেছে। সে চারটি মাধ্যম হল ঃ হাফ্‌স, 'আসেম, হযরত 'আবদুল্লাহ এবং হযরত ওমর আল-ফারূক। সম্ভবত ২৭তম মাধ্যম 'আবদুল্লাহ্‌র পর ওমরের নাম দৃষ্টে গ্রন্থকারগণ বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন যে, ইনিই মশহূর 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওমর (রা) সাহাবীর পুত্র সাহাবী। কিন্তু যেহেতু উক্ত আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওমরের কোন পুত্রের নাম নাসির ছিল না, এই জন্য এই সমস্যা দেখা দেয় এবং অনুসন্ধানের আবশ্যকতা দেখা দেয়। এই খান্দানের একজন বিরাট পণ্ডিত ও তত্ত্বজ্ঞ বুযুর্গ শাহ মুহাম্মদ হাসান মুজাদ্দিদী (সাঈদাঁদ সিন্ধ) ও মাহমূদ আহমদ সাহেব 'আব্বাসীর অভিমতও তাই এবং আহমদ হুসায়ন খানও جو هر معصومی-তে তাই লিখেছেন।

ঊর্ধ্বতন ৩১ মাধ্যমে আমীরুল মু'মিনীন ফারূক-ই আজম হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। বংশ-লতিকা এইরূপ ঃ

হযরত শায়খ আহমদ (মুজাদ্দিদ আল্‌ফ-ই ছানী) ইব্‌ন মখদুম আবদুল আহাদ ইব্‌ন যয়নুল-'আবিদীন ইবন 'আবদুল হায়্যি ইবন মুহাম্মদ ইবন হাবীবুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইমাম রফীউদ্দীন ইবন নাসীরুদ্দীন সুলায়মান ইবন ইউসুফ ইবন ইসহাক ইবন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন শু'আয়ব ইবন আহমদ ইবন ইউসুফ ইবন শিহাবুদ্দীন 'আলী ফররুখ শাহ ইব্‌ন নূরুদ্দীন ইবন নাসীরুদ্দীন ইবন মাহমূদ ইবন সুলায়মান ইবন মাসঊদ ইবন 'আবদিল্লাহ্‌ আল-ওয়াইজ আল-আসগার ইবন 'আবদিল্লাহ আল-ওয়াইজ আল-আকবার ইবন আবু'ল-ফাতাহ্‌ ইবন ইসহাক ইবন ইবরাহীম ইবন নাসির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্‌ ইবন ওমর ইবন হাফ্‌স ইব্‌ন 'আসেম ইব্‌ন হযরত আবদিল্লাহ ইবন হযরত ওমর আল-ফারূক (রা)।

হযরত মুজাদ্দিদ আলফ-ই ছানী (র)-এর ১৫তম ঊর্ধ্বপুরুষ শিহাবুদ্দীন 'আলী ফররুখ শাহ কাবুলী এই সিলসিলার খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ কামিল ও খ্যাতিমান ফারূকী বংশীয় মনীষী, সংস্কারক ও মাশায়েখ যেমন হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে-শকর প্রমুখ তাঁরই বংশধর। দুঃখের বিষয় এই যে, আফগানিস্তানের 'উলামা' ও মাশায়েখের জীবনী আলোচনায় কোন বিস্তৃত তাযকিরা ও তাবাকাত গ্রন্থ না থাকায় তাঁদের বিস্তারিত জীবন-কাহিনী পাওয়া যায় না। তাঁদের যে ছিটেফোটা জীবনী পাওয়া যায় তার উৎস সেই সব গ্রন্থ যা মুজাদ্দিদ সাহেব ও তাঁর খান্দানের বিবরণ লিখতে গিয়ে লেখা হয়েছে।[১] শিহাবুদ্দীন 'আলী ফররুখশাহ কাবুলী ছিলেন শায়খ নূরুদ্দীনের পুত্র এবং শায়খ নসীরুদ্দীনের পৌত্র। এজন্যই তাঁর খান্দানকেও কাবুলের সঙ্গে সম্পর্কিত করে স্মরণ করা হয়। তিনি প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী ছিলেন। ইস-লামের প্রচার-প্রসার ও প্রচলনে, কুফর ও শির্ক-এর রীতিনীতি ও চালচলনের প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শনে তিনি বিশেষ উৎসাহী ও বৈশিষ্ট্যের দাবীদার ছিলেন।[২]

পিতার ইনতিকালের পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আফগান (পাঠান) ও মুগলদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ নিরসনে প্রশংসনীয় প্রয়াস চালান। পার্থিব জাঁকজমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের সাথে সাথে বাতেনী সম্পদেও তিনি সম্পদশালী ছিলেন। বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁর ফয়েয লাভে ধন্য হয়। ওফাতের পূর্বেই ক্ষমতা সাহেবযাদা শায়খ ইউসুফকে সোর্পদ

১. যেমন যুবদাতুল মাকামাত, হাদায়াতুল কুদ্‌স প্রভৃতি;

২. যুবদাতুল মাকামাত, ৮৮-৮৯ পৃ.।

করত কাবুল থেকে ষাট মাইল উত্তরে অবস্থিত তাঁরই নামে নামকৃত ফররুখ শাহ উপত্যকায় নির্জনতা অবলম্বনপূর্বক ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন হন এবং সেখানেই সমাধিস্থ হন।

শায়খ ইউসুফ জাহিরী ইল্‌ম হাসিলের পর স্বীয় বুযুর্গ পিতা সুলতান ফররুখ শাহ্ থেকে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণও লাভ করেন এবং তাঁর সাম্রাজ্য পরিত্যাগের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ন্যায়বিচার, সংস্কার ও সংশোধন এবং দীনদারীতে তিনি সুনামের অধিকারী ও সর্বজন-প্রিয় ছিলেন। তাঁর ভেতরও ইশ্‌ক-ই ইলাহীর সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গই ছিল যা তাঁর পূর্বপুরুষদেরকে সময় সময় মওলানা রূম (র)-এর এই কবিতার প্রতি অনুগত ও আমলকারী হবার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করছিল।

ملك دنيا تن پرستاں را حلال

ما غلام ملك عشق لا يزال

দুনিয়ার রাজত্ব ভোগবাদীদের জন্য বৈধ, কিন্তু আমরা অবিনশ্বর প্রেমরাজ্যের গোলাম।

তিনিও শেষ বয়সে সাম্রাজ্য ও ক্ষমতার মসনদ থেকে অবসর নিয়ে নির্জনতা অবলম্বন করেন এবং তদীয় সাহেবযাদা শায়খ আহমদ সাম্রাজ্যের দায়িত্ব হাতে তুলে নেন। তিনিও পিতার ন্যায় ইল্‌ম, তাকওয়া ও শাহী পোশাকে দরবেশ সিফতের বুযূর্গ ছিলেন। ঐশী আকর্ষণ তাঁকে এতটাই অভিভূত করে ছিল যে, তিনি সাম্রাজ্যের সকল কিছু থেকে হাত গুটিয়ে নেন এবং চিরতরে তাকে বিদায় আরয জানান এবং সন্তানদেরকেও এর থেকে দূরে থাকবার জন্য ওসিয়ত করেন। কিছুটা সম্পদ পরিবার-পরিজনদের জন্য রেখে অবশিষ্ট সকল সম্পদ দরিদ্রদের ভেতর বন্টন করে দেন। তিনি তাঁর বুযুর্গ পিতা ছাড়াও শায়খুশ শুয়ূখ হযরত শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (কু. সি) থেকে বাতেনী সম্পদ লাভ করেছিলেন এবং খিলাফত লাভে ধন্য হয়েছিলেন।

তারপর খান্দানের মুরুব্বীগণও দীনদারী ও যুহ্‌দ-এর অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং স্ব-স্ব যুগের জনপ্রিয় ও উচ্চ মরতবাসম্পন্ন মাশায়েখ থেকে সুলূকের প্রশিক্ষণ ও বাতেনী ফয়েয হাসিল করতে থাকেন তা সে যে কোন মহান সিলসিলার সঙ্গেই সম্পর্কিত হোক।

ইমাম রফীউদ্দীন মুজাদ্দিদ সাহেবের ষষ্ঠ ঊর্ধ্বতন পুরুষ এবং শায়খ শিহাবুদ্দীন 'আলী ফররুখ শাহ্‌র নবম অধস্তন পুরুষ ছিলেন। তিনি 'যুবদাতুল মাকামাত' প্রণেতার ভাষ্য মুতাবিক জাহিরী ও বাতেনী উভয় প্রকার ইল্‌মের সমন্বয় ছিলেন। বাতেনী তরবিয়ত ও সুলূকের তালীম হযরত মাখদূম জাহাঁনিয়াঁ জাহাঁগাশ্‌ত সাইয়্যিদ জালালুদ্দীন বুখারী (মৃ. ৭৮৫ হি.) থেকে হাসিল

করেছিলেন। এ থেকে জানা যায় যে, তিনি ৮ম শতাব্দীর শেষ কিংবা ৯ম শতাব্দীর প্রথম দিককার বুযুর্গ ছিলেন। তিনি এই খান্দানের প্রথম বুযুর্গ যিনি কাবুল থেকে ভারতবর্ষে তশরীফ রাখেন এবং সরহিন্দ-এ বসবাস করতে মনস্থির করেন। এর প্রাচীন নাম ছিল সহরন্দ। এ জায়গাটা ছিল অনাবাদী ও বন্য পশুর আবাস। এর ও সামানার মাঝে যেখানে শাহী রাজস্ব যেত আর কোন বসতি ছিল না। এর ভিত্তিতে পার্শ্ববর্তী লোকজন বিশেষত এখান থেকে ৬/৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিত সুরায়স গ্রামের অধিবাসীরা হযরত মখদূম জাহাঁনিয়াঁর খেদমতে হাযির হয়ে (সুলতান ফীরূয শাহ তুগলক যাঁর ভক্ত ও মুরীদ ছিলেন) অনুরোধ জানান যে, রাজধানীতে গিয়ে তিনি যেন সেখানে শহর আবাদের আন্দোলন করেন। সুলতান তাঁর খাহেশ ও ফরমায়েশ তামিল করেন এবং ইমাম রফীউদ্দীনের জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা ও সুলতানের অন্যতম পারিষদ খাজা ফতহুল্লাহকে উক্ত দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। খাজা সাহেব দু'হাজার অশ্বারোহীসহ সেখানে তাশরীফ নেন এবং দুর্গ নির্মাণ করেন। হযরত মখদূম জাহাঁনিয়াঁ ইমাম রফীউদ্দীনকে যিনি তাঁর খলীফা ও সালাতের ইমাম ছিলেন, সুন্নাম কসবায় অবস্থান করতেন, দুর্গের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে ও উক্ত শহরে বসবাস করতে নির্দেশ দেন। কেননা তিনি (ইমাম রফীউদ্দীন) ছিলেন উল্লিখিত শহরের বিলায়েতের অধিকারী। তখন থেকে তাঁর খান্দান সেখানেই বসবাস করছে।[১] দুর্গের ভিত্তি এবং সরহিন্দ-এর পত্তনের সূচনা ৭৬০ হিজরীতে বলে বলা হয়।[২]

---

১. বিস্তারিত যুবদাতুল মাকামাত, ৮৯-৯০ দ্র.

২. প্রাচীন ইতিহাসের সম্পর্ক যতটা তাতে মনে হয় যে, এই শহর কখনো শতদ্রু জিলার সদর মকাম ছিল। বিখ্যাত চীনা প্ররিব্রাজক হিউ-এন-সাং (যিনি খৃ. সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ সফর করেছিলেন) এর উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর সফরনামায় লিখেছেন যে, এর আশেপাশে সোনা পাওয়া যায়। হিন্দীতে 'সর' অর্থ শের অর্থাৎ ব্যাঘ্র এবং 'আন্দ' অর্থ জঙ্গল। এককালে এটি হিন্দু ও গাযনাবীদের জন্য সীমান্তের ভূমিকা পালন করত এবং এর সামনে থেকে ভারতবর্ষ শুরু হয়ে যেত। সম্ভবত এজন্যই এটি 'সরহিন্দ' নামে মশহূর হয়ে যায় যা 'সহরান্দ'-এর কাছাকাছি উচ্চারণ। ৫৮৭/১১৫১ সালে সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী সরহিন্দ জয় করেন। ফীরূয শাহ তুগলকের সিংহাসন আরোহণ অবধি দিল্লীর সুলতানগণ সরহিন্দকে আদৌ গুরুত্ব দেন নি। পরিবর্তে সামানাই তাঁদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। ফীরূযশাহ তুগলকের আমল থেকে সরহিন্দের প্রতি নতুনভাবে মনোযোগ প্রদান শুরু হয়। এরপর থেকে সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ আমীর-উমারা সরহিন্দ ও ফীরূযপুরের নাজিম হতে থাকেন। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এর গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। সম্রাট বাবুর কয়েকবারই সরহিন্দ আসা-যাওয়া করেন। হুমায়ূনও সরহিন্দ আগমন করেন এবং এখান থেকেই দিল্লী এসে পুনর্বার সিংহাসনের অধিকারী হন। মুগল আমলে শহরের প্রাচুর্য ও ঔজ্জ্বল্যের অবস্থা ছিল এই যে, এখানে ৩৬০ মসজিদ, সরাইখানা, কুয়া ও মকবারা পাওয়া যেত। দা.মা.ই সরহিন্দ শরীফ নিবন্ধ থেকে সংক্ষেপিত।

এভাবে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জন্মের দু'শো বছর আগে থেকেই সরহিন্দ আবাদ চলে আসছিল।[১] তাযকিরা ও অনুবাদ গ্রন্থাবলী থেকে শোনা যায় যে, সেখানে অভিজাত ও আলিম-উলামার খান্দান বসতি স্থাপন করেছিল এবং এই মাটি থেকে কয়েকজন কামালিয়াতসম্পন্ন বুযুর্গ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[২] মনে হয় এর উত্থান ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে এর সম্পর্ক হি. ১০ম শতাব্দীর প্রথম পাদেই হয়েছিল। ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর খান্দানের কতিপয় নির্বাচিত ব্যক্তি ছাড়া বড় কোন সরহিন্দী আলিমের নাম তাযকিরা ও অনুবাদ গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ১০ম শতাব্দী শুরু হবার পর সরহিন্দে জ্ঞানগত ও ধর্মীয় জাগরণ এবং দরস-তাদরীস তথা পঠন-পাঠনের উষ্ণ বাজার দৃষ্টিগোচর হয় এবং কয়েকজন কামালিয়াতসম্পন্ন ও নেতৃস্থানীয় আলিমের নাম নজরে পড়ে যাঁরা শিক্ষকতা ও হেদায়াতের মসনদে সমাসীন ও জনকল্যাণে নিবেদিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রথম বিখ্যাত মুদার্রিস মওলানা ইলাহদাদ ইবন সালিহ্ সরহিন্দী (মৃ. ৯২৭ হি.)-র নাম পাওয়া যায়। এরপর মওলানা শের আলী কাদেরী (মৃ. ৯৮৫ হি,), মওলানা আলী শের (মৃ. ৯৮৫ হি.)[৩], মুফতী আহমদ সরহিন্দী (মৃ. ৯৮৬ হি.), আলহাজ্জ ইবরাহীম সরহিন্দী (মৃ. ৯৯৪ হি) যিনি আল্লামা শিহাবুদ্দীন ইবন হাজার হায়তামী মক্কীর ছাত্র ছিলেন, মওলানা আবদুল্লাহ্ নিয়ায মাহদাবী[৪] (মৃ.১০০০ হি.) এবং এমন কতিপয় মনীষীর নাম দৃষ্টিগোচর হয় যাঁদের মৃত্যু সন জানা যায়নি। যেমন সেকালের মশহূর উস্তায মখদূমুল-মুল্ক মুল্লা আবদুল্লাহ্ সুলতানপুরীর উস্তাদ মওলানা আবদুল কাদির, শায়খ 'আলী আশিকান জৌনপুরীর মুরীদ মওলানা আবদুস সামাদ হুসায়নী, মও-লানা আমানুল্লাহ্ , মওলানা কুতবুদ্দীন ও মাওলানা মাজদুদ্দীন। শেষোক্ত জন সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর উস্তাদ মওলানা ইয়া'কুব কাশ্মীরীর সাক্ষ্য এই যে, তিনি তাঁর যুগের সর্বাধিক পাণ্ডিত্যের অধিকারী আলিম ছিলেন। সম্রাট

---

১. হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বীয় বাসভূমি সরহিন্দ সম্পর্কে "মকতুবাতে' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং এতে খাস নূরানিয়ত ও সাকীনার উল্লেখ করেছেন (দ্র. মকতূবাত, দফতর ২য়, মকতূব ২২)।

২. ইতিহাস ও অনুবাদ গ্রন্থে কেবল তারীখে মুবারকশাহীর লেখক ইয়াহ্য়া ইবন আহমদের নাম মিলে যিনি হি. ৯ম শতাব্দীর অন্যতম গ্রন্থকার। তিনি তারীখে মুবারকশাহী ৮৩৮ হিজরীর সীমানায় লিখেন। তিনি নিজেকে ঈশ্বরান্দী লিখতেন (দামাই)।

৩. সম্ভবত দু'জন একই ব্যক্তি হবেন। গুলযারে আবরার ও নুযহাতুল খাওয়াতিরে উভয়ের নাম চিহ্নিত বিন্যাসে এসেছে।

৪. কথিত আছে যে, তিনি শেষ বয়সে মাহদাবী আকীদা থেকে তওবাহ্ করেছিলেন।

বাবুরের সঙ্গে সরহিন্দে তাঁর মোলাকাত হয়। সম্রাট তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করেন। মওলানা মীর 'আলী ও মওলানা বদরুদ্দীন সরহিন্দীও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১]

হযরত মখদূম শায়খ 'আবদুল আহাদ

খাজা মুহাম্মদ হাশিম কাশ্‌মী "যুবদাতু'ল-মাকামাত" নামক গ্রন্থে হযরত মখদূম শায়খ আবদুল আহাদ-এর কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হযরত খাজা হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর খেদমতে লাগাতার তিন বছর ছিলেন এবং তার জানাশোনার বেশির ভাগ উৎস সেই সব বাণী ও উক্তি যা তিনি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুখে বিভিন্ন সময় শুনেছেন। এক্ষেত্রে যদি কিছু অতিরিক্ত থেকে থাকে তা পুত্রবৎ মর্যাদা থেকে অর্জিত তথ্যের। এজন্য তাঁর প্রদত্ত বিবরণকে নির্ভরযোগ্য ও হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বাণী সংকলনের মাধ্যমে প্রাপ্ত মনে করতে হবে। এখানে এর সংক্ষিপ্ত-সার পেশ করা হচ্ছে।

হযরত শায়খ আবদুল আহাদের যৌবনারম্ভে এবং ইল্‌ম হাসিল- কালীন প্রভু পরওয়ারদিগারের অন্বেষা ও ইলমু'ল-য়াকীন লাভের প্রেরণা এমনভাবে পেয়ে বসে যে, ইল্‌ম-এ পরিপূর্ণতা লাভের অপেক্ষা না করেই সেযুগের বিখ্যাত চিশতিয়া সাবিরী সিলসিলার শায়খ হযরত আবদুল কুদ্দূস গঙ্গূহী (র)-র খেদমতে হাযির হন এবং তাঁর থেকে যিক্‌র-আযকার-এর তালকীন ও সুলূক-এর তা'লীম হাসিল করেন। যখন তিনি হযরত 'শায়খ'-এর আস্তানায় পড়ে থাকবার আগ্রহ ও সংকল্পের কথা প্রকাশ করেন তখন আলোকিত অন্তরের অধিকারী পীর তা মনজুর করেন নি। তাকে তিনি ইলমে দীন ও ইলমে শারী'আত হাসিল ও এক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা অর্জনের তাকীদ দেন এবং বলেন যে, "ইল্‌ম ব্যতিরেকে যে দরবেশী লাভ ঘটে তাতে লবণ-পানি কিছুই হয়না।" মখদূম হযরত শায়খ (র)-এর বয়সের আধিক্য দৃষ্টে আরয করেন যে, আমার আশংকা হয় 'ইলমে দীন-এ পূর্ণতা অর্জনের পর যখন আমি আবার এই আস্তানায় হাযির হব তখন এই চিরন্তন সম্পদ পাই কিনা?[২] উত্তরে শায়খ (র) বলেন : যদি আমাকে না পাও তাহলে আমার ছেলে রুকনুদ্দীন থেকে তা হাসিল করবে। মখদূম হুকুম তামিল করেন এবং ইল্‌ম হাসিলে মশগুল হন।

তকদীরের ব্যাপার যে, তিনি যেই আশংকা ব্যক্ত করেছিলেন অবশেষে তাই সত্যে পরিণত হল। ইল্‌ম হাসিল থেকে ফারিগ হবার পূর্বেই শায়খ গঙ্গূহী (র)

১. এসব নাম নুযহাতুল খাওয়াতির-এর ৪র্থ খণ্ড থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁদের জীবনী জানতে চাইলে দ্র. উক্ত গ্রন্থ।

৩. শায়খ-এর চির বিদায় গ্রহণের প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছিল।

পরলোকে যাত্রা করেন। মখদূম প্রচলিত ইল্‌ম-এ পরিপূর্ণতা লাভের পর কিছুদিন বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন এবং সেখানকার বুযুর্গদের থেকে উপকৃত হন। অতঃপর হযরত শায়খ রুকন উদ্দীন-এর খেদমতে হাযির হন, সুলূক-এর বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করেন এবং চিশতী ও কাদিরী সিলসিলায় খিলাফতের খিরকা এবং তালকীন ও তরবিয়তের এজাযত লাভে ধন্য হন।[১]

এ দু'জন বুযুর্গ শায়খ আবদুল কুদ্দূস গঙ্গূহী ও শায়খ রুকনুদ্দীন- এর উপর ইস্তিগরাক-এর প্রাবল্য ছিল এবং তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রেমে উন্মত্ত ছিলেন। বিশেষত শায়খ আবদুল কুদ্দূস (র) 'ওয়াহদাতু'ল-ওজুদ'-এর প্রকাশ করতে ও ঘোষণা দিতে নিজেকে আদিষ্ট ভাবতেন এবং তিনি এর একজন অত্যুৎসাহী দাঈ ও মুবাল্লিগ ছিলেন। অধিকন্তু সুন্নাহ্‌র অনুসরণ ও আমলের ক্ষেত্রে 'আযীমতের উপর চলার ব্যাপারে দৃঢ়পদ ছিলেন। আত্মবিলুপ্তি ও নাফসানিয়াত শূন্যতার প্রাবল্য ছিল। অত্যন্ত নরম দিলের মানুষ ও অত্যধিক ইবাদতগুযার বুযুর্গ ছিলেন। সর্বদা মৃত্যুর কথা স্মরণ করতেন এবং অন্তিম মুহূর্তের কথা বেশি করে ভাবতেন।[২]

স্বীয় পীর যাঁদের হাতে তিনি বায়'আত হয়েছিলেন অর্থাৎ শায়খ 'আবদুল কুদ্দূস গঙ্গূহী ও শায়খ রুকনউদ্দীন (র) ছাড়া মখদূম শায়খ আবদুল আহাদের কাদিরী সিলসিলার মশহূর বুযুর্গ হযরত শাহ্ কামাল ক্যাথলীর সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল। হযরত শাহ কামাল স্বীয় যুগের বিরাট কামালিয়াতের অধিকারী ও সাহিব-ই হাল বুযুর্গ ছিলেন।[৩]

শায়খ আবদুল আহাদের একথা পূর্বেই গুযরে গেছে যে, যদি অন্তচক্ষুর সাহায্যে দেখা যায় তবে দেখা যাবে যে, কাদিরিয়া সিলসিলায় এর প্রতিষ্ঠাতা পীরান পীর হযরত শায়খ আবদুল কাদির জীলানী (র)-র পর অনুরূপ মর্তবার লোক খুব কমই চোখে পড়ে। তাঁর পৌত্র শাহ্ সিকান্দরও বড় উচ্চ মরতবার শায়খ ছিলেন। হযরত মখদূম তাঁর থেকেও উপকৃত হয়েছিলেন।

হযরত মখদূম আবদুল আহাদ ইল্‌ম হাসিল থেকে ফারিগ হয়ে আল্লাহওয়ালা মানুষের সন্ধানে বিভিন্ন শহর সফর করেন। সফরকালীন তিনি দৃঢ় সংকল্প হন যে, যেখানে বিদ'আতের চিহ্নমাত্র চোখে পড়বে সেখানে মুরীদ হওয়া তো দূরের কথা

১. শায়খ রুকনউদ্দীন তাঁকে যে খিলাফতনামা প্রদান করেছিলেন তা যুবদাতু'ল-মাকামাত-এ হুবহু লিপিবদ্ধ রয়েছে (দ্র.৯২-৯৬ পৃ.)। এর বড় অংশই আরবীতে।

২. কামালিয়াত, যওক ও ওয়াজ্‌দ-এর জন্য দ্র. হযরত শায়খ গঙ্গুহীর পুত্র শায়খ রুকনউদ্দীন রচিত 'লাতাইফে কুদ্দুসী', খাজা মুহাম্মদ হাশিম কাশমী কৃত যুবদাতুল-মাকামাত, ৯৭-১০১ পৃ. এবং নুযহাতুল-খাওয়াতির, ৪র্থ খণ্ড।

৩. তাঁর সম্পর্কে জানতে চাইলে দ্র. নুযহাতুল-খাওয়াতির, ৪র্থ খণ্ড।

তার সাহচর্যও এড়িয়ে চলবেন। সফরে শায়খ ইলাহদাদ-এর সাহচর্য থেকেও উপকৃত হন। রোহতাস-এ শায়খ ইলাহদাদ এবং 'তাওদীহু'ল-হাওয়াশী'র গ্রন্থকার মওলানা মুহাম্মদ ইবন ফখর-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং তাঁদের দরস-এ শরীক হন। তিনি বাঙ্গলায়ও তাশরীফ নেন এবং জৌনপুরেও কয়েকদিন হযরত সায়্যিদ 'আলী কাওয়াম ('আলী আশিকান)-এর খেদমতে থাকেন। এই সফর থেকে তিনি সরহিন্দ ফিরে আসেন। অতঃপর আ-মৃত্যু এখানেই অবস্থান করেন, আর কোথাও যাননি। মা'কূলাত (মানতিক, দর্শন ও ইলমে কালাম্ব সম্পর্কিত) ও মানকূলাত (কুরআন-হাদীস ও এতদসম্পর্কিত)-এর প্রচলিত কিতাবসমূহ অত্যন্ত পাবন্দীর সাথে, গভীর অধ্যবসায় ও চিন্তশীলতার সঙ্গে পড়াতেন। হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব বলতেন যে, তিনি সব ধরনের বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হ-এ তাঁর কোন তুলনা ছিলনা। যখন তিনি উসূলে বায়দাবীর দরস প্রদান করতেন তখন ইমাম আবূ হানীফা (র)-র ফিক্হ-এর ক্ষেত্রে তাঁর উচ্চতর শান, মর্যাদা ও নেতৃত্ব ফুটে উঠত। তিনি তাসাওউফের কিতাবাদিরও দ্রস দিতেন। বিশেষত 'তা'আর্রুফ' 'আওয়ারিফুল-মা'আরিফ' ও ফুসূসুল হিকাম-এর মর্মার্থ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদির গুঢ় রহস্যের সমাধান করতে তিনি অত্যন্ত পারঙ্গম ছিলেন। বিচার-বিশ্লেষণ ও রুচির দিক দিয়ে তিনি শায়খুল আকবার-এর মতানুসারী ছিলেন। কিন্তু খোদাদত্ত উন্নত প্রতিভা, সংযম ও শরীয়তের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের দরুন মুখ দিয়ে কখনো মত্ততা ও প্রলাপমূলক কথা বের হয়নি। স্বার্থলেশহীনতা ও নির্জনতার প্রাধান্য ছিল। ছাত্রের আধিক্য সত্ত্বেও কখনো কারো থেকে খেদমত নিতেন না। ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিজেই বাজার থেকে নিয়ে আসতেন। সুন্নত অনুসরণের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। যথাসম্ভব কোন সুন্নত তাঁর থেকে ছুটতে পারত না। অভ্যস্ত বিষয়াদি, লেবাস-পোশাকেও সুন্নত অনুসরণের ইহতিমাম করতেন। 'আযীমতের উপর আমল করতেন এবং রুখসত থেকে পরহেয করতেন। যদিও চিশতিয়া ও কাদিরিয়া সিলসিলায় বায়'আত হয়েছিলেন ও খিলাফত পেয়েছিলেন এবং এসব তরীকায় উচ্চ নিসবতের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তাঁর ইখলাস তথা ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও বুলন্দ হিম্মতির দলীল এই যে, তিনি নক্শবান্দিয়া তরীকার প্রতিও গভীর আগ্রহের কথা প্রকাশ করতেন এবং এ সম্পর্কে অত্যন্ত প্রশংসামূলক উক্তি করতেন। যেমন তিনি বলতেন যে, "আমি দু'আ করি যেন এই মহান সিলসিলা আমাদের দেশে এসে পৌছে। হে খোদা ! আমাকে এর মারকাযে পৌছে দিন.

যেন আমি এথেকে উপকৃত হতে পারি"। তিনি লেখকও ছিলেন। 'কুনূযু'ল হাকাইক' ও 'আসরারু'ত-তাশাহ্হুদ' তাঁর অন্যতম রচনা।[১]

হযরত মুজাদ্দিদ (র) বলেন যে, আমার ওয়ালেদ মাজেদকে অনেকবার বলতে শুনেছি যে, আহলে বায়ত-ই কিরাম-এর মুহব্বত ঈমানের হেফাজত ও ঈমানী মৃত্যুর ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রয়েছে। যখন মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হল তখন আমি একথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি বললেন ঃ আলহামদু লিল্লাহ! আমি সেই মুহব্বতে মাতাল এবং সেই অনুগ্রহ সাগরে নিমজ্জিত।

الهی بحق بنی فاطمه   که بر قول ایماں کنی خاتمه[২]

হে আল্লাহ্! ফাতিমা (রা)-এর বংশধরদের ওসিলায় দোআ করি, ঈমানী কালেমার সাথে যেন আমার মৃত্যু হয়।

সফরকালে যখন তিনি সেকেন্দ্রা[৩] নামক স্থানে পৌঁছেন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন তখন সেখানে তাঁর শরাফত ও নজাবত (অভিমত), উপদেশ ও তাকওয়া-পরহেযগারী এবং ইল্ম ও 'আমলের সামগ্রিকতাদৃষ্টে সেখানাকার এক শরীফ খান্দান নিজেরাই বিবাহের প্রস্তাব দেন এবং উক্ত খান্দানের সালিহা খাতুন নাম্নী এক নেক-সীরত (সচ্চরিত্রবতী) মহিলার সঙ্গে 'আক্দ সম্পন্ন করেন। মখদূমের সকল সন্তান এই মহিলারই গর্ভজাত।

হযরত মখদূম (র) কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুরশিদের ন্যায়ই সাত সন্তান দান করেছিলেন। যাঁদের নাম জানা গেছে তাঁদের নাম নিম্নরূপ ঃ

শাহ্ মুহাম্মদ, শায়খ মুহাম্মদ মাসঊদ, শায়খ গুলাম মুহাম্মদ, শায়খ মওদূদ।[৪] দু'ভাইয়ের নাম ও বিস্তারিত কিছু জানা যায় নি। এঁদের মধ্যে হযরত মুজাদ্দিদ (র) ছিলেন মধ্যমণি। অপরাপর সকল সন্তানই ছিলেন 'আলিম ও যোগ্যতার অধিকারী এবং তাঁরাও প্রচলিত 'ইল্ম ও সুলূক-এর তা'লীম আপন ওয়ালেদ ও সমকালীন বুযুর্গদের থেকেই লাভ করেছিলেন।

হযরত মখদূম আশি বছর বয়সে ১০০৭ হিজরীর ১৭ই রজব তারিখে এই

---

১. খাজা মুহাম্মদ হাশেম কাশ্মী 'যুবদাতুল-মাকামাত' নামক গ্রন্থে আসরারু'ত-তাশাহহুদের কিছু বিষয় উদ্ধৃত করেছেন (১১৮-২০ পৃ.)। হযরত মুজাদ্দিদের মুখে হযরত মখদূমের কতক ফাওয়াইদ ও গবেষণার নির্যাস উদ্ধৃত করেছেন (১২০-২২ পৃ.)।

২. যুবদাতুল-মাকামাত, ১২৩ পৃ.।

৩. যুবদাতুল মাকামাত প্রণেতা একে আটাওয়াহ্র নিকটবর্তী বলেছেন। এথেকে মনে হয় যে,তা বর্তমান উত্তর প্রদেশে (ইউ.পি.তে) অবস্থিত ছিল।

৪. শায়খ গুলাম মুহাম্মদ ও শায়খ মওদূদের নামে মুজাদ্দিদ সাহেবের পত্রাবলী রয়েছে। দ্র. ১খ

নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।[১] কবর মুবারক সরহিন্দ শহর থেকে পশ্চিম দিকে আনুমানিক এক মাইল দুরে অবস্থিত।[২]

হযরত মখদুম (র)-এর জীবন-চরিতের বিশেষ সম্পদ হল তাঁর সত্যপ্রিয়তা, ন্যায়পরায়ণতা, শরীয়ত ও সুন্নতের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ এবং এসবের উপর আমল করবার সযত্ন প্রয়াস, ধর্মীয় মর্যাদাবোধ, আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে উন্নত মনোবল ও বুলন্দ হিম্মতি বলা যেতে পারে। এই সম্পদই হৃদয়ের গহীন কোণে [যাঁর ভাগ্যে দীনের তাজদীদ (সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন) এবং ভারতবর্ষে মিল্লাতের পুঁজি ও সম্পদের তত্ত্বাবধানের সৌভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল] সযত্নে রোপিত হয়েছিল যাঁকে ঐশী অনুগ্রহ প্রোজ্জল পূর্বক ও অনন্য সেই কামালিয়াত দান করত মধ্যাহ্ন সূর্যে পরিণত করে দিয়েছিল।

জন্ম ও অন্যান্য অবস্থা

জন্মও শিক্ষা

৯৭১ হিজরীর (১৫৬৩ খৃ.) ১৪ই শওয়াল জুমু'আর রাত্রে সরহিন্দ শহরে তাঁর জন্ম। নাম রাখা হয় শায়খ আহমদ। خاشع শব্দ থেকে তাঁর জন্ম সন নির্ণীত হয়। শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে রুশ্‌দ ও সা'আদত (সাধুতা ও সৌভাগ্য)-এর আলামত পরিস্ফুট ছিল। بالائے سرش زهوش مندی می تافت ستارہ بلندی

সমকালীন বুযুর্গদের বিশেষত হযরত শাহ কামাল ক্যাথলীর (যাঁর সঙ্গে ওয়ালেদ বুযুর্গের বাতেনী নিসবত তথা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিল) তাঁর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ও স্নেহ দৃষ্টি ছিল এবং তিনি তাঁর সাথে বিশেষ ধরনের ব্যবহার করতেন।[৩] সাত বছর বয়ঃক্রমকালে যখন শায়খ কামাল ইহলোক ত্যাগ করেন তখন শায়খ-এর হুলিয়া মুবারক তাঁর স্মরণ ছিল এবং যে ঘরে ওয়ালেদ সাহেবের সাথে গিয়ে দেখা করেছিলেন তার ছবিও তাঁর স্মৃতিপটে জাগরুক ছিল।

কুরআন মজীদ হিফ্‌জ-এর মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় এবং অল্প সময়েই তিনি তা সমাপ্ত করেন। অতঃপর ওয়ালেদ মাজেদের (পিতার) খেদমতে ধারাবাহিক শিক্ষা শুরু করেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর খোদাদত্ত প্রতিভার

---

১. বিস্তারিত জানার জন্য যুবদাতুল-মাকামাত, ১২৭ পৃ.। কেউ কেউ তাঁর ইন্তিকাল ১৭ই রজব আবার কেউ কেউ ২৭ জমাদিউল আখিরা বলেছেন। ১০০৭ হিজরীর ব্যাপারে সকলেই একমত।

২. যুবদাতুল-মাকামাত, ১২২ পৃ.

৩. বিস্তারিত জানতে চাইলে দ্র. যুবদাতুল মাকামাত, ১২৭-১২৮ পৃ.।

স্ফুরণ ও বিকাশ ঘটতে দেখা যায়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহ যথা সত্বর গ্রহণ এবং সেগুলো নিজের ভাষায় সরল পন্থায় পেশ করবার ক্ষেত্রে তাঁর বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ পায়। বেশির ভাগ লেখাপড়া তিনি স্বীয় বুযুর্গ পিতা এবং কিছু কিছু সমকালীন কয়েকজন বিখ্যাত 'আলিম থেকে হাসিল করেন। কিছুকাল পর সেযুগের বিখ্যাত ইলমী ও তা'লীমী মারকায (শিক্ষাকেন্দ্র) সিয়ালকোট গমন করেন এবং যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন, 'ইলমে কালাম ও উসূলে ফিক্হ-এ অভিজ্ঞ, যাঁর মেধা ও স্মৃতিশক্তি, ব্যাপক অধ্যয়ন ও পাঠদান শক্তির খ্যাতি ছিল দেশ জোড়া সেই মওলানা কামাল কাশ্মীরীর[১] নিকট যাঁর শাগরিদদের মধ্যে আল্লামা 'আবদুল হাকীম সিয়ালকোটির ন্যায় নেতৃস্থানীয় আলিম ও মুদার্রিসীন জন্মগ্রহণ করেছেন, তৎকালীন নিসাবে তা'লীম (পাঠ্য সূচী)-এর কতক সর্বোচ্চ ও উন্নত পর্যায়ের কিতাব (যেমন 'আদুদী) পড়েন এবং হাদীস শাস্ত্রের তৎকালীন সম্রাট শায়খ শিহাবুদ্দীন আহমদ ইব্ন হাজার হায়তামী মক্কীর[২] শাগরিদ শায়খ ইয়া'কূব সরফী কাশ্মীরীর নিকট হাদীসের কতক কিতাবাদি পাঠ করেন। শিহাবুদ্দীন আহমদের রচিত কিতাবাদির মধ্যে সহীহ বুখারীর একটি ভাষ্য রয়েছে।

শায়খ ইয়া'কূব-এর বড় বড় মুহাদ্দিছ ও গ্রন্থকারদের থেকে হাদীস ও তাফসীরের কিতাবাদি এবং তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহের এজাযত লাভ ঘটেছিল। তিনি তাঁর যুগের মশহূর 'আলিমে রব্বানী কাযী বাহলূল বাদাখশানী থেকে যিনি 'ইলমে হাদীস ও তাফসীরে সর্বোচ্চ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন এবং হাদীসে শায়খ 'আবদুর রহমান ইব্ন ফাহ্দ-এর সুযোগ্য ও সুপ্রিয় শাগরিদ ছিলেন, সহীহ বুখারী, মিশকাতুল মাসাবীহ্, শামাইলে তিরমিযী ও অপরাপর কিতাবাদি, ছালাছিয়াত-ই বুখারী ও মুসালসাল হাদীস-এর সনদ হাসিল করেন। অধিকন্তু মুতাকাদ্দিমীন-এর দস্তুর মাফিক তাফসীরের কিতাবাদি প্রভৃতির সনদও সেই সব

১. মওলানা কামালুদ্দীন ইব্ন মূসা ৯৭১ হিজরীতে কাশ্মীর থেকে সিয়ালকোট স্বীয় আবাস পরিবর্তন করেন এবং অর্ধশতাব্দীকাল পঠন-পাঠনে নিমগ্ন থেকে ১০১৭ হিজরীতে লাহোরে ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন (নুযহাতুল খাওয়াতির)।

২. মওলানা ইয়া'কূব ইব্ন আল-হাসান আস-সারফী কাশ্মীরীর জন্ম ৯০৮ হিজরীতে কাশ্মীরে। বিদ্যার্জন ও তরীকা লাভের উদ্দেশ্যে সমরকন্দ গমন করেন যেখানে শায়খ হুসায়ন খারিযমী থেকে কুবরাবিয়া তরীকা হাসিল করেন এবং বেশ কিছুকাল তাঁর সান্নিধ্যে কাটান। হেজাযে গিয়ে ইলমে হাদীস শিক্ষা করেন এবং সেখান থেকে ফিক্হ, হাদীস ও তাফসীরের সর্বোত্তম কিতাবাদি সংগ্রহ করত সঙ্গে নিয়ে আসেন। ১০০৩ হিজরীর ১২ই যী-কা'দাঃ তারিখে তাঁর ইনতিকাল হয়(নুযহাতুল-খাওয়াতির, ৫ম খণ্ড, ৪৩৯ পৃ.)। এভাবেই স্বীয় উস্তায মওলানা ইয়া'কূব-এর মাধ্যমে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সিহাহ্ অধ্যয়ন এবং হাদীসের মৌলিক কিতাবাদির সঙ্গে পরিচিতি লাভের সুযোগ ঘটে থাকবে।

তাফসীরের মুফাসসির পর্যন্ত পৌঁছান।[১] সতের বছর বয়সে শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে।

তিনি পার্থিব ও অপার্থিব এবং এ সবের মৌলিক ও শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে শিক্ষা সমাপ্তির পর দরস ও তাদরীস তথা পঠন ও পাঠন-এর সূচনা করেন এবং আরবী ও ফারসীতে কিছু পুস্তিকাও লিখেন যাঁর ভেতরে রিসালায়ে তাহলীলিয়া, রিসালায়ে রদ্দে মযহাবে শী'আ অন্তর্গত। তিনি রাজধানী আকবরাবাদ (আগ্রা)ও গমন করেন এবং আবুল ফযল ও ফৈযীর সাহচর্যেও কাটান। কিন্তু মত ও রুচির বিভিন্নতার কারণে তাঁদের সঙ্গে তাঁর খাপ খায়নি। কয়েকবার তর্ক ও বাদানুবাদ পর্যন্ত তা গিয়ে গড়ায় এবং আবুল ফযলের লাগামহীন উক্তিতে তিনি তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সেখানে যাতায়াত বন্ধ করে দেন। আবু'ল-ফযল লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে পাঠান ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। একবার ফৈযী যিনি সে সময় নুকতাবিহীন তাফসীর سواطع الالهام রচনায় ব্যস্ত ছিলেন, এক স্থানে উপযোগী নুকতাবিহীন শব্দ পেতে ও মর্ম প্রকাশে বাধার সম্মুখীন হন। ফলে কলম থেমে যায়। হযরত মুজাদ্দিদ-এর সঙ্গে তাঁরা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি সমস্যার সমাধান করেন। ফলে ফৈযীকে তাঁর যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি প্রদান করতে হয়।

আগ্রায় তাঁর অবস্থান কিছুটা দীর্ঘ হয়ে যায়। পিতার তাঁকে দেখার সাধ জাগে। বার্ধক্য ও সফরের দুরত্ব সত্ত্বেও তিনি আগ্রায় তাশরীফ নেন। হযরত মুজাদ্দিদ স্বয়ং ওয়ালেদ বুযুর্গের সঙ্গে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। দিল্লী ও সরহিন্দের মাঝে যখন তাঁরা থানেশ্বর শহর অতিক্রম করছিলেন তখন সেখানকার রঈস ও অমাত্য, একই সঙ্গে সেযুগের অন্যতম 'আলিম ও ফাযেল এবং সুল-তানের নৈকট্যপ্রাপ্ত ও থানেশ্বরের তৎকালীন শাসক শায়খ সুলতান অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদেরকে গ্রহণ করেন ও মেহমান হিসাবে পরম সমাদরে আপ্যায়িত করেন। অতঃপর এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে এবং হযরত মুজাদ্দিদ-এর আমল-আখলাক ও বৈশিষ্ট্যদৃষ্টে তাঁকে আপন কন্যা সম্প্রদানের আগ্রহ ব্যক্ত করেন। ওয়ালেদ সাহেব এই সম্বন্ধ কবুল করেন এবং সেখানেই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বর-বধূকে রুখসত করত সরহিন্দ তশরীফ নেন।

সুলূক-এ প্রশিক্ষণ ও পরিপূর্ণতা লাভ এবং হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্র হাতে বায়'আত গ্রহণ

এক্ষেত্রে তাসাওউফ ও সুলূক-এর অপরিহার্যতা এবং এর শরঈ ও ইল্মী

১. মুসালসাল হাদীস ও অন্যান্য হাদীসের সনদ যুবদাতুল মাকামাত গ্রন্থে বিদ্যমান।

প্রমাণপঞ্জীর উপর নতুন করে লিখবার দরকার করে না। কেননা এই সিরিজের (তারীখে দাওয়াত ও 'আযীমত সিরিজ যা 'ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক' নামে অনূদিত হয়ে ইতিমধ্যেই তিনটি খণ্ড পাঠকমহলে পৌঁছে গেছে।-অনুবাদক) পাঠক ১ম খণ্ডের অধ্যয়ন থেকেই, যেখানে হযরত খাজা হাসান বসরী, সায়্যিদুনা হযরত 'আবদুল কাদির জিলানী ও মাওলানা জালালুদ্দীন রূমীর আলোচনা স্থান পেয়েছে এবং তৃতীয় খণ্ডে তো আগাগোড়া ভারতবর্ষের দু'জন বুযুর্গ-শ্রেষ্ঠের জীবনীই স্থান পেয়েছে, এ বিষয়ে জানতে পেরেছেন। যদি আরও জানতে চান, তৃপ্তি পেতে চান তাহলে মৎপ্রণীত "তাযকিয়া ও ইহসান তাসাওউফ ও সুলূক" (এ বইটিও ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।-অনুবাদক) নামক পুস্তকটি পড়ুন।

এখানে কেবল এতটুকু বলা প্রয়োজন মনে করছি যে, যেই পরিবেশ ও যেই যুগে হযরত মুজাদ্দিদ (র) কে স্বীয় নায়ুক ও কষ্টসাধ্য পুনর্জাগরণ ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড আনজাম দিতে হয়েছিল সেখানে তাসাওউফ ইসলামী সমাজ ও পরিবেশের মধ্যে এমনভাবে ঘুলিয়ে গিয়েছিল যে,তা এর মেযাজ ও রুচিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। বিশিষ্ট লোকদের কথা তো পরে, সাধারণ লোকেরা অবধি কোন 'আলিম, শিক্ষক কিংবা সংস্কারককে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বীকৃতি দিতে, তাঁর ভক্ত সমর্থকে পরিণত হতে এবং তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতি ও বিদ্যা-বুদ্ধি থেকে উপকৃত হতে চাইত না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা তাসাওউফ ও সুলূক-এর গলি-খুপচির সঙ্গে পরিচয় এবং মকবূল ও নির্ভরযোগ্য কোন সিলসিলা বা তরীকার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং কোন পীর-মাশায়েখের সাহচর্য্য ধন্য না হতেন। এমনিতেও কোন না কোন দর্জায় তাযকিয়ায়ে নফস বা আত্মশুদ্ধি, ইখলাস ও য়াকীন, ব্যথা ও জ্বালা ব্যতিরেকে (যা সাধারণত অধিক যিকর ও সাহচর্য ছাড়া হাসিল হয় না) শুধু 'ইল্ম-এর প্রাচুর্য ও বাগ্মিতার জোরে কোন প্রকৃত বিপ্লব সাধিত হয় না। মোটের উপর সেই যুগ ও পরিবেশে তাসাওউফ ও সুলূক, রূহানী কুওত (আধ্যাত্মিক শক্তি) ও হৃদয়ের জ্যোতি ব্যতিরেকে সংস্কার ও বিপ্লবের প্রয়াস চালানো ছিল ঠিক তেমনই যেমন অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক প্রশিক্ষণ, অনুশীলন বা মহড়া ছাড়াই কোন ব্যক্তির পক্ষে যুদ্ধের ময়দানে অবতণ করা এবং কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সশস্ত্র ফৌজের মুকাবিলা করা অথবা কোন এমন লোক যিনি বাকশক্তি থেকে প্রকৃতিগতভাবেই বঞ্চিত- শেখাবার ও বুঝাবার দায়িত্ব পালন করতে চান। এটা ছিল জ্ঞান-বুদ্ধি ও ঐশী কৌশলেরই দাবী যে, সংস্কার ও বিপ্লবের এই ময়দানে অবতরণের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত শায়খ আহমদ

আস-সরহিন্দীকে তাসাওউফ ও সুলূকের কেবল সূক্ষ্মতত্ত্ববিদই বানাননি বরং কামালিয়াতসম্পন্ন ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত বুযুর্গদের সাহচর্য ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, অতঃপর ঐশী অনুগ্রহ ও বিশেষ মনোনয়নের মাধ্যমে তাঁকে এতে ইমামত (নেতৃত্ব) ও ইজতিহাদের দর্জায় পৌঁছে দিয়েছিলেন যেন তিনি এই বিরাট দায়িত্বকে পূর্ণ প্রস্তুতি ও পরিপূর্ণ আস্থাসহকারে আনজাম দিতে পারেন এবং এর প্রভাব পৃথিবীর প্রত্যন্ত কোণে কোণে ও পরবর্তী শতাব্দীগুলোতেও কায়েম থাকে।

ذلك تقدير العزيز العليم

সরহিন্দ পৌঁছে পিতার জীবিত কাল অবধি তাঁরই খেদমতে অতিবাহিত করেন, তাঁর থেকে অপরিমেয় বাতেনী ফায়দা হাসিল করেন এবং চিশতিয়া ও কাদিরিয়া তরীকার সুলূক অতিক্রম করেন। এরই সাথে জাহিরী ইল্ম-এর তা'লীমের সিলসিলাও অব্যাহত রাখেন।

এসময়ই হজ্জ-ই বায়তুল্লাহ্ ও মদীনা শরীফের যিয়ারতের প্রতি প্রবল আগ্রহ জন্মে এবং এই আগ্রহের আতিশয্য তাঁকে অশান্ত ও অস্থির করে তোলে। কিন্তু যেহেতু বুযুর্গ পিতা ছিলেন বয়োবৃদ্ধ এবং বাহ্যত দুনিয়া থেকে তাঁর বিদায় মুহূর্তও ঘনিয়ে আসছিল বিধায় এমতাবস্থায় তাঁকে ছেড়ে যাওয়াও তিনি সমীচীন মনে করেন নি। অতঃপর ১০০৭ হিজরীতে পিতার মৃত্যুতে সেই প্রতিবন্ধকতা যখন আর রইল না তখন ১০০৮ হিজরীতে হারামায়ন শারীফায়ন উপস্থিতি ও বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্জ আদায় মানসে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং সরহিন্দ থেকে যাত্রা করে দিল্লী পৌঁছেন। দিল্লীর উলামা ও ফুযালা-ই কিরাম যাঁদের কানে তাঁর বুযুর্গী ও কামালিয়াতের খ্যাতি পূর্বেই গিয়ে পৌঁছেছিল—তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। এঁদের মধ্যে মওলানা হাসান কাশ্মীরীও ছিলেন যাঁর সঙ্গে তিনি পূর্বেই পরিচিত ছিলেন। আলাপচারিতার সময় তিনি হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্র উচ্চ মর্তবা ও আধ্যাত্মিক শক্তির উল্লেখ করেন যিনি কিছু দিন আগেই মাত্র দিল্লী এসেছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বীয় পিতার সুত্রে নক্শবান্দিয়া তরীকার আলোচনা ও এব্যাপারে তাঁর আগ্রহের কথা শুনেছিলেন বিধায় তিনিও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং একে হারামায়ন শারীফায়ন-এ উপস্থিতির প্রস্তুতি ও এর একটি সওগাত মনে করে হাযিরা দেবার সংকল্প গ্রহণ করেন এবং মওলানা হাসান কাশ্মীরী[১]-র সমভিব্যাহারে সেখানে

১. হযরত মুজাদ্দিদ (র) সমগ্র জীবনভর তাঁর (হযরত হাসান কাশ্মীরীর) অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ ছিলেন। যেহেতু তাঁর মাধ্যমেই তিনি এই চিরন্তন সম্পদ লাভে ধন্য হয়েছিলেন (দেখুন পত্র নং ২৭৯, ১ম দফতর)।

গিয়ে হাযির হন। সম্ভবত সেই মুহূর্তে অদৃশ্য লোক থেকে এই আওয়াজ ভেসে এসে থাকবে ঃ

آمد آں یارے کہ ما می خواستیم

বন্ধুর শুভাগমন ঘটল আমরা যার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিলাম।

এই قران السعدين-এর অবস্থা বর্ণনা করবার ও এর পরবর্তী ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করবার পূর্বে হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্-র পরিচিতি পেশ করা জরুরী মনে করছি।[১] এই ধারাবাহিকতায় আমরা সেই নিবন্ধ উদ্ধৃত করছি যা নুযহাতুল-খাওয়াতির (৫ম খণ্ড)-এর লেখক হযরত খাজা (কু-সি)-র আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন এবং তাই হবে যথেষ্ট। যেহেতু উক্ত গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদির সারাংশ এসে গেছে।

হযরত শায়খ আবদুল বাকী নকশবন্দী দেহলভী (খাজা বাকী বিল্লাহ)

মহান শায়খ কুতুবু'ল-আকতাব ইমামুল-আইম্মা রাদিয়্যুদ্দীন আবু'ল মুআয়্যিদ 'আবদুল-বাকী ইব্ন আবদিস-সালাম বাদাখ্শী (বাকী বিল্লাহ নামে খ্যাত), অতঃপর দেহলভীর অস্তিত্ব পৃথিবীর জন্য বরকত ও সৌন্দর্যের কারণ ছিল। তাঁর পবিত্র জীবন ও অস্তিত্ব ছিল সৃষ্টিজগতের মহান উদ্দেশ্য ও চূড়ান্ত লক্ষ্যের বিকাশ ও অভিব্যক্তি।[২] তাঁর পবিত্র যবান ছিল হাকীকতের মুখপাত্র এবং তাঁর পবিত্র সত্তা ছিল আল্লাহ্ পরিচিতির সংক্ষিপ্ত-সার, ইল্ম ও মা'রিফতে আল্লাহর উন্মুক্ত নিদর্শন। বিলায়াত ও রূহানিয়াতের আলোকোজ্জ্বল এই মিনার ৯৭১-৭২ হিজরীর প্রান্তরেখায় কাবুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং মওলানা মুহাম্মদ সাদিক হালওয়াঈর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তাঁর সাথে মাওয়ারাউন-নাহ্র সফর করেন এবং দীর্ঘকাল তাঁর সান্নিধ্যে কাটান। অতঃপর তাঁর অন্তর মানসে সূফী তরীকায় প্রবেশের আগ্রহ জন্মে যার পরিণতিতে প্রচলিত প্রথাসিদ্ধ বিদ্যার্জন পরিত্যাগ করেন এবং মাওয়ারাউন-নাহ্র-এর শহরসমূহের বহু বুযুর্গশ্রেষ্ঠ-এর মজলিসে হাযিরা দিতে থাকেন। তিনি সর্বাগ্রে মখদূম আ'জম দহবেদীর খলীফা মওলানা লুতফুল্লাহর খলীফা শায়খ খাজা উবায়দ-এর হাতে তওবা করেন। কিন্তু

১. নকশবন্দিয়া তরীকার বুযুর্গ শ্রেষ্ঠদের, বিশেষত এই সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নক্শবন্দ-এর জীবনী, এই সিলসিলার বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ নিসবতের সংক্ষিপ্ত অবহিতি লাভের জন্য সিলাসিলার প্রস্ফুটিত পুষ্প হাকীমুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ দেহলভী রচিত গ্রন্থাদি বিশেষ করে الانتباه فى سلاسل اولياء الله অধ্যয়ন করুন।

২. অর্থাৎ এই আয়াত وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (আমি জিন্ন ও ইনসানকে এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আমার ইবাদত করে) এর বাস্তব ব্যাখ্যা ও উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।

ইস্তিকামত (দৃঢ়তা,স্থিরতা)-র চিহ্ন যখন ফুটে উঠল না তখন শায়খ আহমদ য়াসুভী সিলসিলার বুযুর্গ শায়খ ইফতিখার-এর সমরকন্দ আগমনে তিনি তাঁর হাতের উপর দ্বিতীয় বার তওবা করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বারও যখন স্বীয় দৃঢ়তা ও অটুট সংকল্পের ক্ষেত্রে ঘাটতি অনুভব করলেন তখন অস্থির অবস্থায় আমীর 'আবদুল্লাহ্ বল্খীর হাতে তৃতীয় দফা তওবা করেন এবং কিছুকাল এর সীমারেখা রক্ষায় পাবন্দ থাকেন। কিন্তু শেষ অবধি এই তওবাও অটুট রইল না। ইতিমধ্যে তিনি স্বপ্নে হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নক্শবন্দ-এর যিয়ারত লাভ করেন এবং আল্লাহ্ওয়ালাদের তরীকার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। যেখানেই সম্ভব হত তিনি সেখানেই গমন করতেন, এমন কি তিনি কাশ্মীরে শায়খ বাবা কুবরাবীর খেদমতে পৌঁছেন এবং তৎকর্তৃক উপকৃত হন। তাঁর সাহচর্যে তাঁর উপর ঐশী অনুগ্রহ ধারা বর্ষিত হয় এবং এই সিলসিলার পরিচিত অদৃশ্যতা ও অস্তিত্বহীনতার (غيبت و فنائيت) চিহ্নসমূহ প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত শায়খ-এর ইনতিকালের পর তিনি শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। এভাবে ভ্রমণ ও কল্যাণ অন্বেষার কাল অতিবাহিত হবার পর হযরত খাজা 'উবায়দুল্লাহ আহ্রার (র)-র রূহ প্রকাশিত হয়ে তাঁকে নক্শবন্দী তরীকার তা'লীম দেন এবং তিনি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হন। এরপর তিনি মাওয়ারাউ'ন-নাহ্র যান। সেখানে শায়খ মুহাম্মদ আমকিনকীর সঙ্গে সাক্ষাত ঘটে। তিনি তাঁকে তিন দিন পর তরীকার এজাযত প্রদান করত বিদায় দেন। অতঃপর তিনি হিন্দুস্তানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং লাহোরে একবছর অবস্থান করেন। এখানে বহু 'উলামায়ে কিরাম তাঁর থেকে উপকৃত হন। এরপর তিনি সেখান থেকে রাজধানী দিল্লীতে তাশরীফ নেন এবং ফীরূযী দুর্গে অবস্থান করেন। দুর্গের ভেতর একটি বড় খাল ও একটি বিরাট মসজিদ ছিল। ওফাত পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন।

তিনি উচ্চ পর্যায়ের সাহিবে ওয়াজ্দ ও যওক এবং নেহায়েত নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের লোক ছিলেন। অপরিচিত ও ভিন লোকদের থেকে স্বীয় উন্নততর হালত লুকিয়ে রাখতে সচেষ্ট থাকতেন এবং নিজেকে হেদায়েত দানের যোগ্য মনে করতেন না। কেউ যদি তাঁর নিকট বাতেনী উপকার ও কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে আগমন করত তখন তিনি তাঁকে বলতেন ঃ আমার কাছে কিছু নেই, অন্য কোন বুযুর্গের খেদমতে গমন করুন। আর তেমন কোন বুযুর্গ ব্যক্তিত্বের সন্ধান পেলে আমাকেও বলবেন। মোটকথা, এতদুদ্দেশ্যে আগমনকারী লোকদের খেদমত ও অন্তরকে প্রবোধ দানে মশগুল থাকতেন এবং কোন প্রয়োজন বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মসলার বিশ্লেষণ দানের নিমিত্তই কেবল মুখ খুলতেন ও সম্বোধিত ব্যক্তির পথ

প্রদর্শনের নিমিত্তে মসলার পূর্ণ বিশ্লেষণ করতেন। তিনি বন্ধুদেরকে তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াতে নিষেধ করতেন এবং নিজেকে তাদেরই ন্যায় একজন মনে করতেন ও সকল অবস্থায় তাদের সঙ্গে সমব্যবহার ও সমআচরণ করতেন। বিনয় ও নম্রতার ধারণায় তিনি খালি মাটির উপরও বসে যেতেন।

তিনি অত্যাশ্চর্য রূহানী ও প্রভাব শক্তির অধিকারী ছিলেন। যার উপর তাঁর নজর পড়ে যেত তার অবস্থা বদ্‌লে যেত এবং পয়লা সাহচর্যেই যওক ও শওক এবং মা'রিফতের অধিকারী লোকদের কায়ফিয়াত তথা অবস্থা লাভ ঘটত এবং প্রথম তাওয়াজ্জুহ ও তালকীনেই প্রার্থীর কলব জারী হয়ে যেত। তাঁর ফয়েয ও সৃষ্টিকুলের উপর স্নেহধারা এত সাধারণ ও ব্যাপক ছিল যে, ভীষণ শীতের এক রাত্রে কোন কাজে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে যান। ফিরে এসে দেখতে পান যে, লেপের ভিতর এক বিড়াল শুয়ে। তিনি তাকে জাগানো ও সরিয়ে দেবার পরিবর্তে ভোর অবধি বসেই কাটিয়ে দেন। একবার লাহোর অবস্থানকালে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এসময় তিনি কিছু খাননি। তাঁর নিকট যেই খাবারই আসত অভাবী ও হাজতমন্দদের মাঝে তা বিলিয়ে দিতেন। লাহোর থেকে দিল্লী যাবার পথে একজন অক্ষম ও অসহায় লোকদৃষ্টে সওয়ারী থেকে নেমে পড়েন এবং তাকে উঠিয়ে নেন। অতঃপর পরিচিত লোকদের হাত থেকে বাঁচার নিমিত্ত তিনি আপন মুখ ঢেকে তার গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পায়ে হেটে চলেন, এরপর তিনি আরোহণ করেন। ভুল স্বীকার করতে এবং নিজেকে অপরাধী ভাবতে তিনি আদৌ ইতস্তত করতেন না। তিনি তাঁর সাথীদের থেকেই নয় বরং সর্বসাধারণ থেকেও নিজেকে বিশিষ্ট ভাবতেন না।

কথিত আছে যে, তাঁর প্রতিবেশী এক যুবক সর্বপ্রকার কুকর্মে জড়িত ছিল। তিনি সব কিছু জানা সত্ত্বেও তা বরদাশ্‌ত করতেন। একবার তাঁর মুরীদ খাজা হুসামুদ্দীন দেহলভী স্থানীয় শাসনকর্তার নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করলে শাসনকর্তা তাকে বন্দী করেন। শায়খ জানতে পেরে মুরীদের উপর অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মুরীদ জানায়, "হযরত! যুবকটি বড়ই দুষ্ট প্রকৃতির।" হযরত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ঃ জী, হাঁ! তোমরা ছিলে বড়ই সৎ ও সাধু আর তাই তার অন্যায় ও দোষ-ঘাট তোমাদের অনুভবে ধরা পড়েছে। কিন্তু আমিতো আমাকে তার চেয়ে ভাল মনে করি না আর নিজেকে ফেলে শাসনকর্তা অবধি তার সম্পর্কে অভিযোগ নিয়ে দৌড়েও যাইনি। এরপর চেষ্টা-তদবীর করে শাসনকর্তাকে বলে তাকে ছাড়িয়ে আনেন। ওদিকে সে অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে শুধরে নেয় এবং পরিশীলিত ও মার্জিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

যখনই তাঁর মুরীদদের থেকে কোন অন্যায় কিংবা ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পেত তখনই তিনি বলতেন যে, এছিল আমারই অন্যায় ও বিচ্যুতি যা তার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। ইবাদত-বন্দেগী ও পারস্পরিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। সেজন্য প্রথম দিকে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। কেননা এব্যাপারে বহু হাদীস ও শক্তিশালী দলীল-প্রমাণ রয়েছে।

এই যে কয়েকটি ঘটনা পেশ করা হল তা তাঁর ফযীলত ও কামালিয়াতের এক মা'মূলী অংশ এবং তাঁর বিশাল চরিত্র-সিন্ধুর একটি বিন্দু মাত্র। এজন্যই দেখা যায় যে, অত্যল্পকালের মধ্যেই কত বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁর থেকে বাতেনী ফয়েয লাভে ধন্য হয়েছে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে যতদুর জানা যায়, এই মুবারক সিলসিলা (নক্শবান্দিয়া তরীকা) তাঁরই মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে যা তাঁর আগে আর কেউ জানতও না।[১]

শায়খ মুহাম্মদ ইব্ন ফযলুল্লাহ বুরহানপূরী বলেন যে, ওয়াজ-নসীহতে ও লোকদেরকে সৎপথ প্রদর্শনে তাঁর কোন তুলনা ছিলনা। কেননা মাত্র তিন চার বছরের মুদ্দতে স্বীয় কল্যাণকর ও ফলপ্রসু প্রয়াসের মাধ্যমে জগতে তিনি আলোর বিস্তার ঘটান। এর বিস্তৃত বিবরণ মুল্লা হাশেম কাশ্মীর "যুবদাতু'ল-মাকামাত" নামক গ্রন্থে মিল্বে। তিনি মাত্র চল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন এবং ভারতবর্ষে আগমনের পর কুল্লে চার বছর জীবিত ছিলেন। আর এই স্বল্পকালের ভেতর তাঁর সঙ্গী-সাথী ও বান্ধববর্গ কামালিয়াতের সর্বোচ্চ সোপানে পৌঁছে যান, এমনকি তাঁরা বিগত কালের সিলসিলাগুলোর প্রভাব বিলুপ্ত করে দেন এবং নক্শবান্দিয়া তরীকা সমস্ত সিলসিলার উপর বিজয় লাভ করে।

মুহাম্মদ ইব্ন ফযলুল্লাহ মুহিব্বী "খুলাসাতু'ল-আছার" নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, "হযরত শায়খ আল্লাহ্‌র একটি নিশানী, প্রদীপ্ত জ্যোতি, ঐশী গুপ্ত-রহস্য,

---

১. নক্শবান্দিয়া সিলসিলা ভারতবর্ষে দু'টো পথে পৌছে। তন্মধ্যে একটি আমীর আবুল 'আলা আকবরাবাদীর মাধ্যমে যিনি আপন পিতৃব্য আবদুল্লাহ আহরারী থেকে নক্শবান্দিয়া তরীকায় এজাযত ও খিলাফত লাভ করেছিলেন। এই তরীকায় চিশতিয়া ও নক্শবান্দিয়া তরীকা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত ও জড়িত। কাল্পী, মারহারা, দানাপুর প্রভৃতি জায়গায় আবুল আলাঈ সিলসিলা তাঁর দ্বারাই চালু আছে। দ্বিতীয় পথ হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্‌র। মূলত ভারতবর্ষে এই সিলসিলার প্রচার হযরত খাজার আগমন এবং হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর এই সিলসিলায় প্রবেশের মাধ্যমে ঘটে। অতঃপর তা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে (আছ্ছাকাফাতুল ইসলামিয়্যা ফি'ল-হিন্দ, নুযহাতুল খাওয়াতির-এর গ্রন্থকার মওলানা সায়্যিদ আবদুল হাই কৃত)।

ইল্‌মে জাহের ও বাতেন ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। নীরব প্রকৃতি, বিনয়ী ও এমন সচ্চরিত্রের মালিক ছিলেন যে, মানুষের মধ্যে আদৌ বিশিষ্ট ভাবতেন না, এমন কি তিনি সাথী-বান্ধবদেরকে তাঁর সম্মানে দাঁড়াতে বাধা দিতেন এবং তাঁর সঙ্গে মা'মূলী আচার-আচরণ প্রদর্শনের কথা বলতেন।

মুহিব্বী বলেন যে, তাঁর থেকে অলৌকিক সব ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। যার উপর তাঁর চোখ পড়ত অথবা যেই তাঁর সিলসিলায় দাখিল হত অমনি তার উপর বিলুপ্তি ও ফানার প্রভাব জেঁকে বসত যদিও এই পথের সঙ্গে তার কোন পূর্ব সম্বন্ধ নাও থাকত। মানুষ তাঁর দরজায় বেহুশের মত পড়ে থাকত। কারো কারোর উপর প্রথম পাদেই 'আলমে মালাকূত উদ্ভাসিত হয়ে যেত যা ছিল অদৃশ্য আকর্ষণেরই পরিণতি।

তাঁর মুরীদদের মধ্যে মুজাদ্দিদিয়া তরীকার ইমাম ও প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (র), হযরত শায়খ তাজুদ্দীন ইব্‌ন সুলতান উছমানী সম্ভলী, শায়খ হুসসামুদ্দীন ইব্‌ন শায়খ নিজামুদ্দীন বাদাখশী, শায়খ ইলাহদাদ দেহলভী (র)-র মত জলীলুল-কদর মাশায়েখ ও সৃষ্টিকুলের মারজা' (প্রত্যাবর্তনস্থল) বুযুর্গ ছিলেন।

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে কতিপয় দুর্লভ পুস্তিকা, মূল্যবান পত্র ও পবিত্র কবিতা রয়েছে যন্মধ্যে "সিলসিলাতু'ল-আহরার" নামক গ্রন্থ রয়েছে যে গ্রন্থে তিনি ফারসী ভাষায় ব্যক্ত শ্লোকে স্বীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।

১০১৪ হিজরীর জুমাদা'ল-আখিরার ১৪ তারিখে বুধবার চল্লিশ বছর চার মাস বয়সে দিল্লীতে ইনতিকাল করেন। তাঁর কবর পশ্চিম দিল্লীতে কদম রসূল (স)-এর সন্নিকটে অবস্থিত। প্রত্যহ বহু লোক তাঁর কবর যিয়ারত করে থাকে।

বায়'আত ও পূর্ণতা প্রাপ্তি

হযরত মুজাদ্দিদ (র) হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ (র)-র খেদমতে হাযির হন। হযরত খাজা যেন তাঁর অপেক্ষায় বসে ছিলেন। সাদর আগ্রহ ও স্নেহভরে তিনি তাঁকে গ্রহণ করেন। হযরত খাজা (র)-র স্বভাব প্রকৃতিতে ছিল প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাবোধ এবং তিনি বিলম্বে ধরা দিতেন। কাউকে নিজে থেকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতেন না। কিন্তু এখনকার অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে প্রার্থীত জনই স্বয়ং প্রার্থী। আল্লাহ্ পাকই চাচ্ছিলেন হযরত খাজা (র) কর্তৃক হযরত মুজাদ্দিদকে রূহানী পূর্ণতা দান করতে এবং সেই নিসবতে খাস প্রদান করতে যা সেই যুগে নক্‌শবান্দিয়া তরীকা বহন করছিল, যার বাতেনী সুলূক-এর জগত ও ভারতবর্ষের এই রূহানী পরিবেশে প্রয়োজন ছিল এক নতুন ধরন ও

পদ্ধতিতে দীনের তাজদীদ অথবা নবজীবন দানের কাজ নেওয়া, তরীকতকে শরীয়তের অধীনে স্থাপন, সুলুকের মনযিল (স্তর)-সমূহকে অতিক্রম করানো এবং উপায়-উপকরণের সাহায্যে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান। হযরত খাজা (র) তাই প্রথা-বিরুদ্ধভাবে বলেন ঃ আপনি কিছু দিন আমাদের মেহমান হিসাবে থাকুন। এক মাস, নিদেনপক্ষে এক সপ্তাহই থাকুন।

হযরত খাজা (র) যখন ভারতবর্ষে আগমনের এরাদা করেন তখন তিনি ইস্তিখারা করেছিলেন। ইস্তিখারার মাধ্যমে জানতে পারেন যে, একটি সুন্দর তোতা পাখী, খুব মিষ্টি ভাষায় কথা বলে, উড়ে এসে তাঁর হাতের উপর বসল। তিনি তাঁর মুখের থুথু পাখীর মুখে দিচ্ছেন আর পাখী তার চঞ্চু দ্বারা তাঁর মুখে চিনি পরিবেশন করছে। হযরত খাজা (র) তাঁর পীর ও মুরশিদ হযরত খাজা আ-মকিনকীকে এই ঘটনা বিবৃত করলে তিনি বলেন যে, তোতা ভারতবর্ষীয় পক্ষী। তোমার প্রশিক্ষণের দ্বারা ভারতবর্ষে এমন কোন ব্যক্তির জন্ম লাভ ঘটবে যাঁর মাধ্যমে বিরাট এক জগত আলোকদীপ্ত হবে। এর একটি অংশ তুমিও লাভ করবে।[১]

এই নির্দেশ প্রাপ্তির পর হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জন্য কোনরূপ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন কিংবা ওযর পেশের সুযোগই-বা ছিল কোথায়? কেননা তাঁর নিজের ভেতরই তো একজন খিযির-এর ন্যায় পথ-প্রদর্শক ও ঝর্ণা আবেহায়াতের সন্ধানে আকুলি-বিকুলি করছিল। তিনি এই দাওয়াত কবুল করেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর অবস্থান এক মাস দুই সপ্তাহে গিয়ে দাঁড়ায়। এই নিকট সান্নিধ্যে নক্শবান্দিয়া তরীকা হাসিলের প্রতি তাঁর এত বিপুল আগ্রহ জন্মে যে, তিনি বায়‘আত হবার দরখাস্ত পেশ করেন। হযরত খাজা (র) নির্দ্বিধায় তাঁর আবেদন কবুল করেন এবং নিভৃতে নিয়ে গিয়ে কলবী যিকিরের তালকীন করেন। তাঁর তাওয়াজ্জুহের ফলে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কলবী যিকির জারী হয়ে যায় এবং তিনি এর এমন মিষ্টতা ও স্বাদ অনুভব করেন যে, দিনের পর দিন বরং প্রতি মু-হূর্তে তা বর্দ্ধিত হতে থাকে। হযরত খাজা (র) তাঁর এই অবস্থা ও উন্নতির বিদ্যুৎ গতি দৃষ্টে বুঝতে পারেন যে, এই সেই অপরূপ দর্শনীয় তোতা যা তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল এবং এরই অপরূপ সৌন্দর্যে ও কণ্ঠ-সংগীতের দ্বারা ভারতবর্ষের ফুলবাগিচায় বরং ইসলামের বাগিচায় নবতর বসন্তের সমাগম হবে।

جہانے را دگر گوں کرد یك مرد خود آگا ھے

১. যুবদাতুল মাকামাত, ১৪০-৪১. হাযারাতুল -কুদ্স, ২৬-২৭ পৃ.।

আত্মসচেতন এক পুরুষ পৃথিবী পাল্টে দিল, পাল্টে দিল পৃথিবীর পরিবেশ।

এই দুই-আড়াই মাসে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর যে বাতেনী কায়ফিয়াত (আধ্যাত্মিক অবস্থা) ও উন্নতি লাভ ঘটে এবং তিনি সুলূক-এর যেসব স্তর অতিক্রম করেন তা বর্ণনা করা ও শব্দের গাথুনীতে তা উপলব্ধি করা কিংবা করানো সম্ভব নয়।[১]

اکنوں کرا دماغ کہ پرسد زباغباں
بلبل چہ گفت وگل چہ شنید وصبا چہ کرد

কার এমন দুঃসাহস যে বাগানের মালিকে জিজ্ঞেস করবে যে, বুলবুল কি বলল, ফুল কি শুনল আর ভোরের স্নিগ্ধ কোমল বাতাস কি বার্তা বয়ে আনল।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) এরপর সরহিন্দ তশরীফ নেন। এই প্রথম বারেই হযরত খাজা (র) তাঁকে সুখবর দেন যে, তুমি নক্শবান্দিয়া তরীকার নিসবত পরিপূর্ণরূপেই লাভ করেছ। আশা করা যায় এতে দিন দিন তোমার উন্নতি লাভ ঘটবে। দ্বিতীয় বার যখন তিনি দিল্লীতে হাযির হন তখন তিনি (হযরত খাজা) তাঁকে খেলাফতের খেলাত দ্বারা ধন্য করেন এবং আল্লাহ্ সন্ধানীদেরকে তরীকতের তা'লীম, ইরশাদ ও হেদায়েত দানের এজাযত দেন এবং তাঁর বিশিষ্টতম সাথীদেরকেও তরীকতের তা'লীম প্রদানের জন্য তাঁর নিকট সোপর্দ করেন।

এরপর হযরত মুজাদ্দিদ তৃতীয় ও শেষ বারের মত হযরত খাজা (র)-র খেদমতে হাযির হন। হযরত খাজা (র) বহু দূর অবধি বাইরে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন ও বিরাট সুসংবাদ প্রদান করেন। তিনি তাঁকে তাওয়াজ্জুহ্র হাল্কার মধ্যমণি বানান এবং মুরীদদেরকে নির্দেশ দেন যে, তাঁর উপস্থিতিতে কেউ যেন তাঁর (হযরত খাজার) প্রতি মনোনিবেশ না করে। বিদায় দেবার সময় বলেন যে, "খুবই দুর্বল বোধ হচ্ছে। জীবনের আশা খুবই কম। এরপর তিনি তাঁর দুই দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্র হযরত খাজা উবায়দুল্লাহ ও হযরত খাজা 'আবদুল্লাহকে তাঁর উপস্থিতিতে তৎকর্তৃক (হযরত মুজাদ্দিদ) তাওয়াজ্জুহ প্রদান করেন এবং বলেন যে, এদের মাকেও গায়েবানা তাওয়াজ্জুহ দিন। তাওয়াজ্জুহ্র আছরও তাৎক্ষণিকভাবেই দেখা দেয়।[২]

১. যদি কেউ তা দেখতে চান তাহলে তিনি হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ্র দুই পুত্র হযরত খাজা উবায়দুল্লাহ ও খাজা আবদুল্লাহর নামে লিখিত ৪র্থ খণ্ডে সংরক্ষিত দফতর ১-এর ২৯৬ নং পত্র দেখুন। মওলানা মুহাম্মদ হাশেম কাশ্মীর নামে লিখিত ৫ম খণ্ডের দফতর ১-এর ২৯০ নং পত্রও পাঠ করতে পারেন।

২. যুবদাতুল মাকামাত, ১৫৫ পৃ.।

হযরত মুজাদ্দিদ-এর উচ্চতর মরতবা সম্পর্কে হযরত খাজা (র)-র মৌখিক সাক্ষ্য

হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র) তাঁর এক অকৃত্রিম বন্ধুকে এই সম্পর্কের পর একটি পত্রে লিখেন ঃ সরহিন্দের অধিবাসী শায়খ আহমদ বিপুল বিদ্যাবত্তার অধিকারী শক্তিশালী 'আমলওয়ালা বুযুর্গ। অধীনের সঙ্গে কয়েক দিনের উঠা-বসায় তাঁর অত্যদ্ভুত কামালিয়াত ও গুণাবলী ধরা পড়েছে। আশা করা যায় যে, সে এমন এক প্রদীপে পরিণত হবে যদ্‌দ্বারা এক বিশাল জগৎ প্রদীপ্ত হবে। তাঁর সামগ্রিক অবস্থার উপর আমার অটুট আস্থা রয়েছে।

স্বয়ং হযরত মুজাদ্দিদ-এর প্রথম তাওয়াজ্জুহ ও তালকীন থেকেই দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, তিনি এই পথের সর্বোচ্চ সোপানে গিয়ে উপনীত হবেন। এরই সাথে নিজের দোষ-ত্রুটি ও আপন অস্তিত্বহীনতা সম্পর্কেও তাঁর অন্তরে বদ্ধমূল ধারণা ছিল। এই সঙ্গে তিনি নিম্নোক্ত কবিতাটি প্রায় আবৃত্তি করতেন ঃ

ازیں نورے کہ از تو برد لم تافت
یقین دانم کہ آخر خواہمت یافت[১]

তোমার থেকে যে নূর আমার অন্তরজগতে প্রজ্জ্বলিত হল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অবশেষে তা কাংক্ষিত প্রেমাস্পদকে পেয়েই যাবে।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই আধ্যাত্মিক তরক্কী এবং ইল্‌মী ও 'আমলী ফযীলত তথা মর্যাদার সাথে সাথে স্বীয় শায়খ ও মুরশিদকেও অত্যন্ত আদব ও সম্মান করতেন। কোন সময় শায়খ (র) যদি তাঁকে ডেকে পাঠাতেন তখন চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত এবং তাঁর শরীরে কাঁপন দেখা দিত।[২] এদিকে শায়খ-এর আচরণও তাঁর সঙ্গে এমন ছিল যা খুব কমই কোন শায়খ তার মুরীদের সঙ্গে করে থাকেন। একবার তিনি বলেন ঃ

شیخ احمد آفتاب است کہ مثل ما ھزاراں سیار گاں در ضمن ایشاں گم اند

"শায়খ আহমদ সেই প্রদীপ্ত ভাস্কর যার আলোক—বিভায় আমাদের মত হাযারো তারকা নিষ্প্রভ।"[৩]

১. যুবদাতুল মাকামাত, ১৪৫ পৃ.।
২. প্রাগুক্ত, ১৪৯ পৃ. ।
৩. প্রাগুক্ত, ৩৩০ পৃ.।

চতুর্থ অধ্যায়

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী, অবস্থা, হেদায়েত, তা'লীম ও তরবিয়তী তৎপরতা এবং ওফাত

সরহিন্দে অবস্থান

হযরত খাজা থেকে ফয়েয লাভ ও কামালিয়াত হাসিলের পর হযরত মুজাদ্দিদ (র) সরহিন্দ গিয়ে একান্ত নিভৃত জীবন অবলম্বন করেন। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তিনি রূহানিয়াত প্রার্থীদেরকে তরবিয়ত (প্রশিক্ষণ) দানে বিরত থাকেন এবং নিজের মধ্যে ঘাটতি তীব্রভাবে অনুভব করতে থাকেন। আধ্যাত্মিক উন্নতি দ্রুততর গতিতে হচ্ছিল এবং তাঁর প্রকৃতিও ছিল উত্থানমুখী। এমতাবস্থায় প্রার্থীদের তা'লীম ও তরবিয়তের প্রতি মনোনিবেশ করা ছিল তাঁর পক্ষে দুষ্কর। এর জন্য অধঃমুখী হওয়া দরকার ছিল যা তখন অবধি হয়নি।

এক পত্রে তিনি লিখেছেন যে, (এই অবস্থায়) "আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কিত জ্ঞান দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। যে সব প্রার্থী আমার নিকট জড়ো হয়েছিল তাদেরকে একত্র করে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি বললাম এবং তাদেরকে বিদায় দিলাম। কিন্তু ঐ সব প্রার্থী একে আমার বিনয় ভেবে আমার প্রতি তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ত্যাগে রাযী হলনা। কিছু কাল পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় হাবীব (স.)-এর তোফায়ল-এ অপেক্ষমান ও প্রত্যাশিত আহওয়াল দান করেন।"[১]

অবশেষে সেই মুহূর্তও ঘনিয়ে এল ও তাঁর ফয়েয সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হল এবং প্রার্থীদের পূর্ণতা দান ও হেদায়েত প্রদানের কাজ শুরু হল। মুজাদ্দিদ সাহেব স্বীয় মুরীদ ও তরীকতের ভ্রাতৃবৃন্দের অবস্থা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা বিস্তৃত আকারে আপন শায়খকে লিখে জানাতে থাকেন। এমন সব সুস্বপ্ন ও কায়ফিয়াত প্রকাশিত হয় যদ্দ্বারা তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, আল্লাহ্ পাক তাঁকে দিয়ে বড় কোন কাজ নেবেন এবং তাঁর দ্বারা দীনের কোন আজীমু'শ-শান খেদমত

---

১. মকতূবাত, পত্র নং ২৯০, দফতর ১।

আনজাম পাবে।[১] তৃতীয় বারের উপস্থিতির পর আর হযরত খাজা (র)-র সাহচর্য ভাগ্যে জোটেনি।

লাহোর সফর

হযরত মুজাদ্দিদ কিছুকাল সরহিন্দে অবস্থানপূর্বক স্বীয় শায়খ-এর ইঙ্গিতে ও নির্দেশে লাহোর সফর করেন। দিল্লীর পর লাহোর ছিল তৎকালীন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় 'ইলমী ও দীনী মারকায (শিক্ষা ও ধর্মীয় কেন্দ্র)এবং সেখানে বহু সংখক 'উলামা ও মাশায়েখ বর্তমান ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এক বিপুল সংখ্যক তাঁর আগমন বার্তা শ্রবণে তাঁকে সাদর ও উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করেন।[২] মওলানা তাহের লাহোরী (যিনি পরে হযরত মুজাদ্দিদ-এর বিশিষ্ট খলীফাদের অন্তর্গত হন), মওলানা হাজী মুহাম্মদ,মওলানা জামালুদ্দীন তালভী তাঁর হস্তে হস্ত স্থাপন পূর্বক বায়'আত করত মুরীদ দলভুক্ত হন। এখানে যিক্‌র ও মুরাকাবার হালকা কায়েম হত এবং সাহচর্যের মজলিস সরগরম থাকত।[৩]

হযরত মুজাদ্দিদ লাহোর অবস্থান কালেই হযরত খাজা (র)-র ইনতিকালের খবর পান। মুজাদ্দিদ-এর উপর এর গভীর প্রভাব পড়ে। অস্থির ও বিপর্যস্ত অবস্থায় তিনি দিল্লী দিকে সফরের মোড় ঘুরিয়ে দেন। পথেই সরহিন্দ কিন্তু তথাপিও ঘরে না গিয়ে সোজা স্বীয় শায়খ ও মুরশিদের মাযারে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি শায়খ (র)-এর পুত্রদের ও তরীকতের ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি শোক জ্ঞাপন করেন এবং তাদের ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সান্ত্বনা প্রদানের নিমিত্ত কয়েক দিন দিল্লী অবস্থান করেন। অতঃপর তরবিয়ত ও হেদায়েতের যেই মাহফিল খাজা (র)-র অবর্তমানে শূন্য হয়ে গিয়েছিল তা পুনরায় জীবন্ত এবং বিমর্ষ ও শোকাহত দিল সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।[৪]

কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি সরহিন্দ গমন করেন। এরপর মাত্র একবার দিল্লী ও দু'তিনবার আগ্রা যাবার সুযোগ ঘটে। শেষ জীবনে তিন বছর শাহী সৈন্যের সঙ্গে (যার বিবরণ সামনেই মিলবে) কয়েকটি শহর ও স্থান অতিক্রম কালে সে সব শহর ও স্থানের লোকজন তাঁর সাহচর্য থেকে উপকৃত হয়।[৫]

১. দ্র. পত্র নং ৮৪, দফতর ২।

২. যুবদাতুল-মাকামাত, ১৫৭ পৃ.।

৩. যুবদাতু'ল-মাকামাত, ১৫৮ পৃ. রওদাতু'ল-কায়্যূমিয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, এই সফরে খান খানান ও মুর্তাযা খান (সায়্যিদ ফরীদ) বায়'আত ও মুরীদ হন। ১১৭ পৃ.।

৪. প্রাগুক্ত, রওদাতু'ল-কায়্যূমিয়া, ১৬৬-৬৭।

৫. প্রাগুক্ত, রওদাতু'ল-কায়্যূমিয়া, ১৬৬-৬৭।

দাওয়াত ও তাবলীগ, হেদায়াত ও তরবিয়তের বিস্তৃত ব্যবস্থাপনা এবং তৎপ্রতি ধাবমান ব্যাপক জনস্রোত

১০২৬ হিজরীতে তিনি তাঁর বহু খলীফাকে হেদায়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানের প্রেরণ করেন। এঁদের ৭০ জনকে মওলানা মুহাম্মদ কাসিমের নেতৃত্বে তুর্কিস্তানের দিকে পাঠিয়ে দেন, ৪০ জনকে মওলানা ফররুখ হুসায়নের নেতৃত্বে আরব,য়ামন, শাম (বর্তমান সিরিয়া, লেবানন,জর্দান ও ফিলিস্তীন) ও রোম (তুরস্ক)-এর দিকে পাঠানো হয়। ১০ জন যিম্মাদার ও তরবিয়তপ্রাপ্ত হযরত মওলানা মুহাম্মদ সাদিক কাবুলীর অধীনে কাশগড়ের দিকে,৩০ জন খলীফা মওলানা শায়খ আহমদ বাকীর নেতৃত্বে তূরান, বাদাখশান ও খুরাসান গমন করেন। এ সমস্ত হযরত স্ব-স্ব স্থানে বিরাট সাফল্য অর্জন করেন এবং আল্লাহ্‌র বান্দাগণ এঁদের থেকে উপকৃত হয়।[১]

বহু নামী-দামী উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখ যাঁদের আপন আপন জায়গায় বিরাট সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখা হত, দুর্গম ও দুরতিক্রম্য মনযিল অতিক্রমপূর্বক সরহিন্দ-এ উপস্থিত হন এবং বায়'আত গ্রহণ করেন ও আধ্যাত্মিক উপকার লাভ করেন। এঁদের মধ্যে বাদাখশানের শাহের আস্থাভাজন শায়খ তাহের বাদাখ্‌শী, তালিকানের বিখ্যাত 'আলিম শায়খ আবদুল হক শাদমানী, মওলানা সালেহ্‌ কূলাবী, শায়খ আহমদ বরসী, মওলানা ইয়ার মুহাম্মদ ও মওলানা য়ুসুফ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এঁদের অধিকাংশকেই খিলাফত ও এজাযত প্রদান করত দাওয়াত ও হেদায়াতের নিমিত্ত স্ব-স্ব স্থানে পাঠিয়ে দেন।[২]

ভারতবর্ষেও তিনি বিভিন্ন জায়গায় তাঁর খলীফাদেরকে দাওয়াত ও হেদায়াতের নির্দেশ দেন। খাজা মীর নু'মানকে খিলাফত প্রদান করত দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। তাঁর খানকাহে কয়েকশ' আরোহী ও অগণিত মানুষ পায়ে হেটে যিক্‌র ও মুরাকাবার উদ্দেশ্য হাযির হ'ত। শায়খ বদী'উদ্দীন সাহারনপূরীকে খিলাফত প্রদান করত প্রথম সাহারনপুর, অতঃপর শাহী সৈন্যনিবাস আগ্রায় মোতায়েন করেন। সেখানে তিনি লোকপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং সর্বজনগ্রাহ্য হন। সাম্রাজ্যের বহু অমাত্য তাঁর ভক্ত ও অনুরক্তে পরিণত হন। সেনাবাহিনীর হাযার হাযার সদস্য তাঁর মুরীদ হয়। প্রতিদিন লোকের এত বেশী ভীড় হ'ত যে,

---

১. যুবদাতুল মাকামাত, ১৫৯ পৃ.।

২. বিস্তারিত দ্র. রওদাতু'ল-কায়্যূমিয়্যা, ১২৮-২৯, হাযারাতু'ল-কুদ্‌স-এও খলীফাদের আলোচনায় নানাভাবে তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ এবং হেদায়াত ও তরবিয়তের নিমিত্ত নির্দেশ দানের উল্লেখ রয়েছে। দ্র. ২৯৯-৩৬৯ পৃ.।

বড় বড় আমীর-উমারা খুব কষ্টে তাঁর যিয়ারত লাভে সক্ষম হ'ত। মীর মুহাম্মদ নু'মান কাশ্মীকে যিনি হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্‌র অন্যতম খলীফা ছিলেন, পুনরুপি বায়'আত করত এজাযতনামা প্রদান পূর্বক বুরহানপুর প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি সকলের প্রত্যাবর্তন স্থলে পরিণত হন। লোকের অবস্থার সংশোধন ও পরিশুদ্ধি ঘটে। শায়খ তাহের লাহোরীকে লাহোর (যা ছিল ভরতবর্ষের দ্বিতীয় শিক্ষা ও রাজনৈতিক কেন্দ্র)-এর আধ্যাত্মিক জ্ঞান-পিপাসুদের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। তাঁর মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী এলাকায় আধ্যাত্মিক ফয়েয পৌঁছে। শায়খ নুর মুহাম্মদ পাটনীকে এজাযত প্রদান করত পাটনা শহরের দিকে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁর মাধ্যমে তৎসন্নিহিত এলাকায় হেদায়াত ও তাবলীগ এবং ধর্মীয় জ্ঞান (দীনী ইল্‌ম) থেকে ফায়দা হাসিলের ধারা শুরু হয়। শায়খ হামীদ বাঙ্গালী[১]কে সুলুকের মনযিলসমূহ অতিক্রম করিয়ে এবং তা'লীম ও তরীকতের এজাযত প্রদানপূর্বক বাঙ্গালা অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। শায়খ তাহের বাদাখ্‌শীকে কামালিয়াত হাসিলের পর তা'লীম ও তরীকতের এজাযত দান করত জৌনপুর প্রেরণ করেন। মওলানা আহমদ বার্কী তা'লীম ও তরবিয়তে অনুমতি লাভের পর বার্ক পৌঁছে জনগণকে সৎপথ প্রদর্শন ও প্রশিক্ষণ দানে মশগুল হয়ে পড়েন এবং স্বীয় মুরীদদের অবস্থাসমূহ পত্রের মাধ্যমে হযরতের খিদমতে লিখে পাঠাতে থাকেন। শায়খ আবদুল হাই হিসার শাদমান (ইস্ফাহান এলাকার)-এর অধিবাসী ছিলেন। মকতূবাত-এর ২য় দফতর তৎকর্তৃক বিন্যস্ত ও সংকলিত। হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাকে তা'লীম ও তরীকতের অনুমতি প্রদান পূর্বক পাটনা অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। শায়খ আবদুল হাই শহরের মধ্যে তরীকত পিয়াসীদের তৃষ্ণা নিবারণ করতেন। শায়খ নূর মুহাম্মদ গঙ্গা নদীর ধারে হেদায়াত ও তরবিয়তের ঝর্নাধারা জারী করে রেখেছিলেন। শায়খ হাসান বার্কীও আপন স্বদেশভূমিতে সুন্নাহ ও তরীকা প্রচারে আদিষ্ট ছিলেন। সাইয়্যিদ মুহিব্বুল্লাহ মানিকপূরীকে খিলাফত প্রদান করত মানিকপূর প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর অনুমতিক্রমে এলাহাবাদে স্থানান্তরিত হন। শায়খ করীমুদ্দীন বাবা হাসান আবদালী বিশেষ তাওয়াজ্জুহ দ্বারা ধন্য হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।[২] ১০২৭ হি. পূর্ণ হয়নি—হযরত মুজাদ্দিদ-এর জালালতে শান, হেদায়াত ও তরবিয়ত (প্রশিক্ষণ) শক্তির কথা ভারতবর্ষের বাইরেও পৌঁছে গিয়েছিল। লোকে দলে দলে হযরত মুজাদ্দিদ-এর যিয়ারত ও তাঁর থেকে উপকার লাভের আশায় আগমন

---

১. পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমানের অন্তর্গত মঙ্গলকোটে তাঁর মাযার বর্তমান। —অনুবাদক।

২. হাযারাতু'ল-কুদ্স ও অপরাপর গ্রন্থ।

করতে থাকে। মাওয়ারা উন-নাহ্র, বাদাখশান, কাবুল ও অপরাপর অনারব দেশের অনেক শহরেই তাঁর খ্যাতির কথা গিয়ে পৌঁছেছিল। ভারতবর্ষে এমন শহর খুব কমই ছিল যেখানে তাঁর কোন প্রতিনিধি কিংবা কোন দাঈ ইলাল্লাহ (আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারী) বিদ্যমান ছিলেন না।

সমকালীন সম্রাট জাহাঙ্গীরের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি

১০১৪ হিজরীতে সম্রাট জালালুদ্দীন আকবরের মৃত্যু হয় এবং (তদীয় পুত্র) নূরুদ্দীন জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহন করেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর যে অব্যাহত চাপ ও নির্যাতন নেমে এসেছিল যা এই বিশাল ভূখণ্ড (যা মুসলিম বিজেতাগণ তাদের টাটকা খুন, ইসলামের সংস্কারক ও সেবকগণ তাঁদের শরীর নিঃসৃত ঘর্ম এবং আধ্যাত্মিক সাধকগণ নিশীথ রাতের কান্নার মাধ্যমে আর্দ্র ও সিক্ত করেছিল) থেকে ইসলামের মূলোৎ-পাটনের কাজ যে শক্তি ও পরিকল্পনা মাফিক করা হয়েছিল তা তাঁর ব্যাথাতুর দিল্ ও ইসলামের মর্যাদাবোধ-উদ্দীপ্ত প্রকৃতিকে অস্থির করে তোলার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কিছুটা তাঁর অবস্থার পূর্ণতা সাধন ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিতে গম্ভীরভাবে নিমগ্নতার দরুন আর কিছুটা এজন্যও বটে যে,ফেতনা তখন মধ্যাহ্ন গগনে অবস্থান করছিল এবং তখন অবধি সেই সব প্রান্তিক উপায়-উপকরণ তাঁর হাতে এসে পৌঁছেনি যে সবের সাহায্যে তিনি সাম্রাজ্য ও তার প্রবণতা এবং মুসলমানদের সম্পর্কে তার রাজনীতির উপর প্রভাব ফেলতে পারেন। তিনি তাঁর সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনমূলক কর্মকাণ্ড তখন অবধি পূর্ণ শক্তিতে শুরু করেন নি আর যদি শুরু করেও থাকেন তবে তার বিস্তৃত বিবরণ ইতিহাসে মেলে না। তবে এতটুকু জানা যায় যে, তিনি খানে খানান সায়্যিদ সদর জাহান, মুর্তাযা খান প্রমুখ আমীর ও অমাত্যের মাধ্যমে সম্রাটকে উপদেশপূর্ণ বার্তা প্রেরণ করেন। ঐসব অমাত্য সম্রাটের আস্থাভাজন ও নৈকট্যপ্রাপ্ত ছিলেন। অপর দিকে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধাও তাদের অন্তরে আসন গেড়ে ছিল।

জাহাঙ্গীরের ইসলামের প্রতি কোন প্রকার শত্রুতামূলক মানসিকতা ছিলনা, তাই নয় বরং এক ধরনের প্রসন্ন দৃষ্টি ও ভক্তি বিজড়িত মানসিকতাই ছিল এবং কোন নতুন ধর্মের প্রচলন ও আইন জারীর প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ কিংবা আগ্রহ ছিল না। তাঁর জীবন-দর্শন ছিল তাঁর প্রপিতামহ (সম্রাট বাবর)-এর এই বাণী ঃ

بابر بعیش کوش که عالم دوباره نیست

"বাবর! আনন্দ-আয়েশে মত্ত হও; পৃথিবী আর পুনরায় ফিরে আসবে না।"

তিনি সম্রাটের এই সরল ও উদার প্রকৃতি থেকে ফায়দা গ্রহণ করে ভারতবর্ষের মাটি থেকে সেই সমস্ত প্রভাব-প্রতিক্রিয়া নিঃশেষ করবার সংকল্প নেন যা সাবেক সম্রাটের আমলে জন্ম নিয়েছিল এবং যার বিস্তৃত বিবরণ আগামীতে স্বতন্ত্র এক অধ্যায়ে বিবৃত হবে।

কিন্তু এই বিপ্লবাত্মক মিশন শুরুর পূর্বেই গোয়ালিয়র দুর্গে তাঁর বন্দিত্ব বরণের ঘটনা সংঘটিত হয় যা কয়েক দিক দিয়ে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জীবন এবং সেই যুগের সংস্কার ও পুনর্জাগরণের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সীরাত ও জীবনীমূলক সাধারণ বই-পুস্তকে কথিত হয়ে আসছে যে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের সামনে "মকতূবাত" (পেত্রাবলী)-এর সেই সব নাযুক বিষয় পেশ করা হয় যার উপলব্ধি ও অনুধাবন তাসাওউফের পরিভাষা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহ এবং লেখকের উদ্দেশ্য ও মানসিকতা উপলব্ধি ও অনুধাবনের উপর নির্ভরশীল বস্তুতপক্ষে যা ছিল সেই সব সাময়িক কাশ্‌ফ ও অনুভূতিলব্ধ বিষয় যা সালিক (আধ্যাত্মিক পথের পথিক)-এর আধ্যাত্মিক জগতে ভ্রমণ ও চলাকালে সাময়িকভাবে দেখা দিয়ে থাকে এবং যেগুলি সম্পর্কে স্বীয় শায়খ ও মুরুব্বীকে অবহিত করা জরূরী।[১]

জাহাঙ্গীরের জন্য এই সব বিষয় উপলব্ধি ও অনুধাবন ছিল তাঁর ক্ষমতা বহির্ভূত এবং যেসবের ভেতর একজন সহজ সরল সুন্নী আকীদা বিশিষ্ট মুসলমানের জন্য যিনি কাশ্‌ফ, ওয়াকি'আ, 'উবূর ও ইস্তিক্‌রার-এর পার্থক্য জানেন না ,ভীত-সন্ত্রস্থ ও উদ্বিগ্ন হবার পরিপূর্ণ উপকরণ বিদ্যমান ছিল। তিনি এতে বিরাট বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং সে সবকে সাধারণ মুসলমান এবং আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের স্বীকৃত আকীদার পরিপন্থী ভাবেন, একে আত্মপূজা

১. দ্র. পত্র নং ১১, দফতর ১ম হযরত মুর্শিদ খাজা বাকী বিল্লাহ্‌র নামে। জাহাঙ্গীর ছাড়াও আধ্যাত্মিকতার এই জগত সম্পর্কে যারা অজ্ঞ—এ ধরনের অনেক পাণ্ডিত্যের অধিকারী লোকও এজাতীয় লেখা পড়ে সংকটে নিপতিত হন। এঁদের মধ্যে খ্যাতনামা আলিম, 'ইলমে হাদীসের প্রকাশক, শরীয়ত ও তরীকতের সমন্বয়ক হযরত শায়খ আবদুল হক বুখারী দেহলভীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি এবিষয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর হযরত মুজাদ্দিদের সঙ্গে পত্র বিনিময়ও হয়েছিল। অবশেষে তাঁর সকল সন্দেহ-সংশয়ের অবসান ঘটে এবং তিনি তৃপ্ত হন যা তিনি তাঁর এক পত্রে বলেছিলেন। তদীয় পুত্র শায়খ নূরুল হক বর্ণনা করেন যে, "গভীর অনুসন্ধানে একথা জানা গেছে যে, হাসান খান নামক জনৈক পাঠান যে হযরত শায়খ (মুজাদ্দিদ)-এর অন্যতম মুরীদ ছিল—কোন কথায় ব্যথা পেয়ে ও অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যায় এবং তার নিকট রক্ষিত শায়খ-এর মকতূবাতের একটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি বিকৃত ও বর্ধিত করত বিকৃত অবস্থায় স্থানে স্থানে ছড়িয়ে দেয়" (মানাকিবু'ল-'আরিফীন, শাহ্ ফতেহ্ মুহাম্মদ ফতেহ্‌পূরী চিশতী, ১২৬পৃ)। ভুল বোঝাবুঝি এবং গোলমাল ও হাঙ্গামার ভিত্তি এই সব বিকৃত পত্র (মকতূব)ও হতে পারে।

জ্ঞান করেন। স্বীয় আত্মজীবনী "তুযুক"-এ যেখানে ঘটনাবলীর আলোচনা পেশ করেছেন সেখানে তাঁর বিস্ময়ের পরিষ্কার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাবে। মুজাদ্দিদ সাহেবের উল্লেখ করেছেন তিনি খুবই অনুচিত পন্থায় ও কতকটা অবজ্ঞাভরে।[১] এথেকেও পরিমাপ করা যায় যে, তিনি (সম্রাট) মুজাদ্দিদ সাহেবের মর্তবা ও মকাম সম্পর্কে আদৌ অবহিত ছিলেন না এবং তিনি একজন তূরানী মুগল আমীরের কলম দিয়ে যিনি মুসলমানদের সাধারণ আকীদা-বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু জানেন না, যিনি নিজেকে তাদের মদদগার ও মুহাফিজ মনে করেন, নির্দ্বিধায় স্বীয় ধারণা ব্যক্ত করছেন। শায়খ বদী'উদ্দীন সাহারনপূরী শাহী সৈন্যদের মধ্যে যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন এবং সাম্রাজ্যের অমাত্যবর্গের যে হারে তাঁর খেদমতে আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছিল একেও লোকেরা রঙ চড়িয়ে ও ফুলিয়ে ফাপিয়ে পেশ করতে শুরু করে এবং এর দ্বারা বিপদাশংকার কথা ব্যক্ত করা হয়। এও বলা হয় যে, হযরত মুজাদ্দিদ শায়খ (বদী'উদ্দীন)-এর মাধ্যমে সৈন্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছেন এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিকল্পনা আঁটছেন। এ সময় শায়খ বদী'উদ্দীনের দ্বারা স্বীয় ভক্তির আতিশয্যে এমন কতকগুলো বেফাস কথা ও অসর্তকতাও প্রকাশ পায় এবং তিনি তাঁর কতক ঘটনা কাশ্‌ফ-كلموا الناس على قدر عقولهم (জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিমাপ অনুযায়ী লোকের সাথে কথা বল)-এর উপদেশের প্রতি দৃকপাত না করে এর এমন কিছু বিবরণ দেন যা عوام كا الانعام এবং خواص كالعوام (অর্থাৎ অনেক সময় সমাজের বিশিষ্ট লোকেরাও সাধারণ লোকের মত এবং সাধারণ মানুষ পশুর ন্যায় আচরণ করে)-এর বোধ ও উপলব্ধি শক্তি বহির্ভূত ছিল যা তাদের মধ্যে নানা বিভ্রান্তি ও কানাঘুষার জন্ম দেয়।[২] এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হযরত মুজাদ্দিদ (র) অবধি গিয়ে পৌছে। সম্রাট জাহাঙ্গীর আধ্যাত্মিক জগত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। দরবারে তাঁর কান ভারী করবার মত লোকেরও অভাব ছিল না এবং যেহেতু মুজাদ্দিদ সাহেব শী'আদের বিভ্রান্তিকর আকীদা-বিশ্বাস এবং এর কার্যকর প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার মুকাবিলা করে চলেছিলেন যা ইরানীদের (যাদের সকলেই ছিল শী'আ দলভুক্ত) ভারতে আগমন ও শাহী দরবারে জেঁকে বসার পর থেকে মুসলিম সমাজ জীবনের উপর ছেয়ে যাচ্ছিল। তিনি সুস্পষ্টভাবে ও পরিষ্কার ভাষায় আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের

১. দ্র. তুযুক-ই জাহাঙ্গীরী (সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী), ২৭২-৭৩ পৃ. ১৪শতম রাজ্যাভিষেক বর্ষের ঘটনাবলী, ১০২৮ হি.।

২. যুবদাতু'ল-মাকামাত, ৩৪৮ পৃ.।

'আকীদা-বিশ্বাস প্রচার করতেন। এথেকে যদি দরবারের প্রভাবশালী ইরানী আমীর-উমারা কোন প্রকার ফায়দা লুটতে চেয়ে থাকেন তবে অবাক হবার কিছু নেই। উল্লিখিত সমস্যাকে রাজনৈতিক রূপ দেবার পর এর গুরুত্ব আরও বেড়ে যায় এবং সম্রাটও তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

এ ছিল এমন এক সময় যখন হযরত মুজাদ্দিদ (র) আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যাহ্ন গগনে বিরাজ করছিলেন এবং তাঁর ব্যস্ততা ও কর্মতৎপরতা, একই সঙ্গে তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। সম্ভবত এর ভেতর আল্লাহর কোন অপার কুদরত ও হিকমতও থেকে থাকবে যে, তাঁর আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও উত্থানের যৌবন লগ্নে তাঁকে এই বিপদ ও পরীক্ষার মাঝে নিক্ষেপ করত 'আবদিয়ত তথা গোলামীর সেই সব মকাম অতিক্রম করানো হবে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সেই মকামে উন্নীত করা হবে স্বভাবত যা মুজাহাদা ও পরীক্ষা ব্যতিরেকে হাসিল হয় না।

গোয়ালিয়রে দুর্গে বন্দী হবার কারণসমূহ

ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থের সাধারণ বই-পুস্তকে গোয়ালিয়র দুর্গে তাঁর নজরবন্দী করার পেছনে কারণ হিসেবে সেই বিশেষ পত্রের (মকতূব যা হযরত মুজাদ্দিদ স্বীয় শায়খ ও মুরশিদকে লিখেছিলেন) নাযুক তথা সংবেদনশীল বিষয়াদি, মুকাশিফাত ও আধ্যাত্মিক জগতে পরিভ্রমণের সিলসিলার সেই সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহকেই দায়ী করা হয় যদ্দ্বারা তিনি বহু আকাবিরে উম্মত (উম্মাহ্‌র শ্রেষ্ঠতম সন্তান)-এর মধ্যে উচ্চতর মকামের অধিকারী বলে প্রমাণিত হন।

কিন্তু লেখকের মতে এতে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে যে, হযরত মুজাদ্দিদের উপর এই বিপদ কেবল এই ভূল বোঝাবুঝির দরুন এসেছিল এবং এর কারণ ছিল জাহাঙ্গীরের ধর্মীয় মর্যাদাবোধের ও জমহূর আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের 'আকীদা-বিশ্বাস ও স্বীকৃত বিষয়াদির প্রতি সমর্থন কিংবা কেবল দরবারী 'আলিম অথবা সেই যুগের সম্মানিত 'আলিম ও শ্রদ্ধেয় মাশায়েখদের দাবী ও পীড়াপীড়ির দরুন করা হয়। জাহাঙ্গীর কোন কালেই এধরনের মন-মানসের লোক ছিলেন না এবং তাঁর ধর্মীয় অনুভূতিও কখনও এতটা তীব্র ও সংবেদনশীল ছিলনা যে, তিনি তাঁর উপলব্ধি ও বোধশক্তি বহির্ভূত একটি সম-স্যার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের কিংবা রাজনীতির সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক ছিলনা যদ্দরুন এমন একজন উন্নত মর্যাদর অধিকারী ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে এতবড় বিরাট

পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন যিনি হাযার হাযার মানুষের ভালবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার কেন্দ্র ছিলেন।

এর আগে তাঁর পিতা (সম্রাট আকবর) ও পিতামহ (হুমায়ুন)-এর আমলে শায়খ মুহাম্মদ গওছ গোয়ালিয়রী মে'রাজের দাবী করেছিলেন এবং এর দরুন উলামায়ে কিরামের মধ্যে গোলযোগ ও অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল।[১] তাঁর বিরুদ্ধে ফতওয়াও প্রদত্ত হয়েছিল। কিন্তু তদসত্ত্বেও সম্রাট হুমায়ূন কিংবা আকবর তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি। স্বয়ং জাহাঙ্গীরের আমলেই বহু মাশায়েখ "ওয়াহদাতু'ল-ওজুদ"-এর শেষ সীমা "স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক ও অভিন্ন" এই অবধি পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের এসব মত খোলাখুলি প্রকাশও করতেন। সেই যুগেই শায়খ মুহিব্বুল্লাহ এলাহাবাদী[২] আরবীতে التسوية নামক গ্রন্থ লিখেন এবং ফারসীতে এর ভাষ্য লিখেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর এসবের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করেন নি। একথা মনে রাখতে হবে যে, বিতর্কিত পত্র ১১ (যাকে গোটা কাহি-নীর ভিত্তি বানানো হয়েছিল) হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্‌র নামে ১০১২ হি. তে লিখিত এবং তিনি বন্দী হন ১০২৮ হিজরীতে এর ১৬ বছর পর।

লেখকের মতে এর প্রকৃত কারণ ছিল এই যে, দরবারের আমীর-উমারা ও সাম্রাজ্যের অমাত্যবর্গের সঙ্গে হযরত মুজাদ্দিদ-এর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল এবং তারা হযরতকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন যা এমন একজন তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন শাসকের পক্ষে, যিনি তাঁর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেছিলেন এবং সম্রাটের অপরাপর পুত্রদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় অব-তীর্ণ হয়ে সিংহাসনে উপবেশন করেছিলেন, তৎপ্রতি সন্দেহ সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট ছিল। এও সম্ভব যে, সম্রাট সেই প্রভাবমণ্ডিত ও জ্বালাময়ী পত্রগুলো সম্পর্কেও অবহিত হয়ে থাকবেন যেসব পত্র হযরত মুজাদ্দিদ সাম্রাজ্যের ঐ সব অমাত্য বরাবর অবস্থার সংস্কার ও পরিবর্তন এবং ইসলামের সমর্থনে সমর্থনকারী ভূমিকা কামনায় লিখেছিলেন।

দরবারের এসব আমীর-উমারা ও সাম্রাজ্যের অমাত্যবর্গের মধ্যে ছিলেন খান আ'জম মির্যা 'আযীযুদ্দীন, খান জাহান খান লোদী, খান খানান মির্যা আবদুর রহীম, মির্যা দারাব, কিলীজ খান প্রমুখ।[৩]

১. বিস্তারিত দ্র. অধ্যাপক মুহাম্মদ মাস'উদের শাহ মুহাম্মদ গওছ গোয়ালিয়রী নামক গ্রন্থ, করাচী সং।

২. মৃ.১০৫৮ হি.।

৩. এথেকেও এমতের সমর্থন মিলে যে, জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে নিজেই লিখছেন যে, শায়খ-এর খলীফা প্রতিটি প্রদেশ ও নগরে নিয়োজিত (২৭২ পৃ.)। অধিকন্তু তাঁর গ্রেফতারের কারণ ছিল জনগণের উত্তেজনা প্রশমন (২৭৩)।

মুগল সম্রাটগণ মাশায়েখ-ই 'ইজামের প্রতি জনগণের সীমাতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা, তাঁদের দিকে ব্যাপক জনস্রোত এবং তাঁদের চতুষ্পার্শে পতঙ্গের ন্যায় জনসমাগমকে সব সময় ভীতির চোখে দেখতেন। মুজাদ্দিদ সাহেবের শ্রেষ্ঠতম খলীফা হযরত সায়্যিদ আদম বিন্নুরীর সঙ্গেও একই ব্যাপার ঘটে। ১০৫২ হিজরীতে তিনি যখন লাহোর তশরীফ নেন তখন তাঁর সঙ্গে উলামা, সায়্যিদ বংশীয় লোক ও মাশায়েখ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর দশ সহস্র ভক্ত-অনুরক্ত ছিল। সম্রাট শাহজাহান তখন লাহোরেই অবস্থান করছিলেন। তিনি তাঁর লোকপ্রিয়তায় ভীত ও আতংকিত হয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেন যাতে তিনি ভারতবর্ষ থেকে হিজরতপূর্বক পবিত্র ভূমির দিকে (মক্কা ও মদীনা) গমন করেন। গোয়ালিয়র দুর্গের কারাজীবন শেষ হবার পরও দীর্ঘকাল অবধি শায়খকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে রাখার পেছনে সম্ভবত এটাই ছিল কারণ যাতে সম্রাট বুঝতে পারেন-সাম্রাজ্যের আমীর-উমারা ও অমাত্যবর্গের সঙ্গে শায়খ-এর সম্পর্কের প্রকৃতি কি এবং তিনি যেন নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে, তাঁর থেকে সাম্রাজ্যের কিংবা ক্ষমতার প্রতি বিপদাশংকার কোন কারণ নেই কিংবা কোন প্রতিপক্ষ ও ভাগ্যান্বেষী শক্তির পক্ষে তাঁকে দিয়ে ফায়দা লুটবার সুযোগ নেই। সম্রাট যখন তাঁর কর্মপন্থা দৃষ্টে পরিপূর্ণরূপে আশ্বস্ত হলেন এবং তাঁর ইখলাস (ঐকান্তিক নিষ্ঠা), আল্লাহ্র প্রতি নিবেদিতচিত্ততা, নিঃস্বার্থপরতা ও উন্নত মর্যাদা পর্যবেক্ষণ করলেন এবং তিনি যখন নিজেই প্রত্যক্ষ করলেন যে, দুনিয়ার শান-শওকত ও জাঁকজমক তাঁর নিকট কানাকড়ির মূল্যও বহন করে না তখন তিনি তাঁকে সরহিন্দে স্বাধীনভাবে অবস্থানের অনুমতি দেন।

গোয়ালিয়র দুর্গে নজর বন্দী

সে যাই হোক, সম্রাট হযরত মুজাদ্দিদকে স্বীয় আবাসে (আগ্রায়) ডেকে পাঠান এবং সরহিন্দের শাসনকর্তাকে যে কোন প্রকারেই হোক শায়খকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দেন। (নির্দেশ প্রাপ্তির পর) শায়খ সে সময় উপস্থিত পাঁচজন মুরীদ সমভিব্যাহারে রওয়ানা হন। সম্রাট তাঁর আগমন সংবাদ শ্রবণের পর স্বীয় আমীরদেরকে হযরত শায়খকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য প্রেরণ করেন, শাহী মহলের নিকট তাঁবু স্থাপন করান এবং সাক্ষাতের নিমিত্ত তাঁকে দরবারে ডেকে পাঠান। তিনি দরবারে গমন করেন, কিন্তু শরীয়ত বিরোধী হওয়ায় সম্রাটকে কুনির্শ করেন নি। জনৈক খোদাভীতিহীন সভাসদ বিষয়টির প্রতি সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন যে, জাহাঁপনা! শায়খ দরবারের রীতিনীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন। সম্রাট এর কারণ জিজ্ঞেস করায়

তিনি বলেনঃ আমি অদ্যাবধি আল্লাহ ও তদীয় রসূল (স) নির্দেশিত আদব-কায়দা ও নির্দেশ অনুসরণ করে আসছি। এর বহির্ভূত অন্য কোন আদব ও রীতিনীতির সঙ্গে তিনি পরিচিত নন। সম্রাট অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সিজদা করতে বলেন।[১] উত্তরে শায়খ বলেন ঃ আল্লাহ ভিন্ন কাউকে যেমন কখনও সিজদা করিনি, কখনও করবও না। সম্রাট এতে আরও অসন্তুষ্ট হন এবং গোয়ালিয়র দুর্গে তাঁকে নজরবন্দী করবার নির্দেশ দেন।[২]

এই ঘটনার পূর্বে শাহজাহান (শায়খ-এর যিনি ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন) আল্লামা আফযাল খান ও খাজা 'আবদুর রহমান মুফতীকে ফিক্হ-এর কিতাবাদি ও এই পয়গামসহ হযরত মুজাদ্দিদ-এর নিকট পাঠান যে, এজাতীয় পরিস্থিতিতে সম্রাটদের প্রতি সম্মানসূচক সিজদা (সিজদা-ই তাহিয়্যাঃ)-র অনুমতি রয়েছে। আপনি যদি সম্রাটকে সিজদা করেন তাহলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না, এ বিষয়ে আমি জামিন হতে ও দায়িত্ব নিতে রাজী আছি। শায়খ উত্তরে জানান যে, এ অনুমতি শুধু কারও ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্যই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শরীয়তের মূল স্পিরিটের ('আযীমত-এর) দাবী এই যে, আল্লাহ ভিন্ন অপর কাউকে সিজদা করা যাবে না।[৩]

গ্রেফতারীর এই দুঃখজনক ঘটনা মার্চ ১৬১৯/১০২৮ হিজরীর রবী'উছ-ছানী মাসের কোন এক সময় সংঘটিত হয়। কেননা সম্রাট তাঁর আত্মজীবনীতে এই মাসের সংঘটিত ঘটনাবলীর মাঝেই এর উল্লেখ করেছেন। গ্রেফতারীর পর তাঁর ঘর-বাড়ী, কুয়া, বাগান ও কিতাবাদি সব কিছুই বাজেয়াফ্ত করা হয় এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদেরকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়।[৪]

গোয়ালিয়র কারাভ্যন্তরে সুন্নত-ই য়ূসুফী (আ) পালন

গোয়ালিয়রের এই বন্দী জীবন আল্লাহ তা'আলার বহু হিকমত, অপার অনুগ্রহ, ধর্মীয় উপযোগিতা, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সাধারণ জনগণের মধ্যে বর্ধিত জনপ্রিয়তার উপর স্থাপিত ছিল। হযরত য়ূসুফ ('আ)-এর সুন্নত অনুসরণপূর্বক কারা-সঙ্গীদের মাঝে তিনি দীনের তাবলীগ ও হেদায়াতের পয়গাম পৌঁছুবার

---

১. দরবারী সিজদার প্রচলন ঘটে সম্রাট আকবরের আমল থেকে এবং তা শাহী আদবের অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্রাট আওরঙ্গযীব তা উঠিয়ে দেন।

২. হাযারাতুল কুদ্স ,১১৭ পৃ.।

৩. প্রাগুক্ত, ১১৬ পৃ. ।

৪. তূযুক-ই জাহাঙ্গীরী, ২৭২-২৭৩ পৃ. ও মকতূব ২, দফতর ৩য়।

কাজ জোরে-শোরে শুরু করেন। হযরত য়ূসুফ (আ)-এর মতই তিনি তাঁর কারা-সঙ্গীদেরকে সম্বোধন করতেন ঃ

يا صاحبى السجن أ أرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار

(হে কারা সঙ্গীদ্বয়! বিভিন্ন প্রতিপালক উত্তম নাকি একক পরাক্রমশালী আল্লাহ?" সূরা য়ূসুফ ঃ ৩৯ আয়াত)-এর আওয়াজ এত সজোরে উচ্চারণ করেন যে, দুর্গের প্রতিটি দরজা ও দেওয়াল ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে এবং এর আওয়াজ দুর্গের বাইরে থেকেও শ্রুত হয়। কথিত আছে যে, কয়েক হাযার অমুসলিম কয়েদী তাঁর দাওয়াত ও তবলীগ, তাঁর সাহচর্য ও প্রশিক্ষণ ধন্য হয়ে ইসলাম কবুল করে এবং শতশত কয়েদী মুরীদও সাহচর্য ধন্য হয়ে উচ্চতর মকামে উন্নীত হতে সক্ষম হয়। ডঃ টি, ডব্লিউ. আর্নল্ড-এর ভাষায় ঃ

"সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে (১৬০৫-১৬২৮ খৃ.) শায়খ আহমদ মুজাদ্দিদ নামক একজন সুন্নী আলিম শী'আ 'আকীদা-বিশ্বাস প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে খুবই মশহূর ছিলেন। সে সময় শাহী দরবারে শী'আদের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। তারা কোন এক অজুহাতে তাঁকে বন্দী করতে সক্ষম হয়। দু'বছর তিনি বন্দী ছিলেন। আর এই সময়কালের মধ্যে তিনি তাঁর কারা-সঙ্গীদের ভেতর থেকে শতশত মূর্তিপূজককে ইসলামে দীক্ষিত করেন।"

তেমনি Encyclopaedia of Religion and Ethics -এ ইসলামের প্রচার প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, "১৭শ শতকে ভারতবর্ষে শায়খ আহমদ মুজাদ্দিদ নামক জনৈক 'আলিমকে অন্যায়ভাবে বন্দী করা হয়। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, কারাগারে থাকাকালে তিনি তাঁর সাথীদের মধ্য থেকে কয়েকশ' মূর্তিপূজারীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেন।"[১]

বন্দী জীবনের নে'মত ও স্বাদ

গোয়ালিয়র দুর্গের এই স্বল্পকালীন বন্দী জীবনে হযরত মুজাদ্দিদ-এর উপর যে হারে আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষিত হয় এবং তাঁর যে আধ্যাত্মিক উন্নতি, প্রকৃত বিনয়-নম্রতার স্বাদ ও নির্জনে আল্লাহ্র বিস্ময়কর শানের উপলব্ধি-রূপ স্বাদ লাভ ঘটে হযরত তাঁর বিশিষ্ট খাদেমদের নামে প্রেরিত পত্রে নে'মতের শুকরিয়া হিসেবে অত্যন্ত রসিয়ে রসিয়ে তা উল্লেখ করেছেন। মীর মুহাম্মদ নু'মানের নামে লিখিত এক দীর্ঘ পত্রে যা তিনি গোয়ালিয়র থেকে পাঠিয়েছিলেন– বলেন ঃ

১. য়ূরোপের দৃষ্টিতে হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী, মওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী কৃত। দ্র. আল-ফুরকান, মুজাদ্দিদ সংখ্যা, ১৩৫৭ হি.

"যদি কেবল আল্লাহ্র অনুগ্রহে ঐশী ফয়েয ও অনুগ্রহ বর্ষণের ধারা এবং তাঁর অফুরন্ত পুরস্কার ও বদান্যতার উপর্যুপরি প্রকাশ এই অধমের কারান্তরালের সঙ্গী না হত তাহলে হতাশা ও নিরাশার গভীর পংকে নিমজ্জিত হবার সমূহ আশংকা বিদ্যমান ছিল এবং আশা- ভরসার ক্ষীণ সুত্রটুকুও ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। সেই সর্বময় সত্তার যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে মহাদুর্যোগের মধ্যেও নিরাপত্তা ও প্রশান্তি দান করেছেন, অত্যাচার-নির্যাতনের মধ্যেও সম্মানিত করেছেন, দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আমার প্রতি ইহসান (সদয় আচরণ) করেছেন, আরাম ও মুসীবতের মাঝে শুকরিয়া জ্ঞাপনের তওফীক দিয়েছেন এবং আম্বিয়া' আলায়হিমু'স-সালাত ওয়া'স-সালামের আনুগত্য ও আওলিয়া-ই কিরামের পদাংক অনুসরণকারী এবং 'উলামা ও বুযুর্গদের প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমত ও বরকত প্রথমে আম্বিয়া-ই কিরাম 'আলায়হিমু'স-সালামের উপর, অতঃপর তাঁদের অনুসরণকারীদের উপর নাযিল হোক।"[১]

মনে হয় সম্রাটের নির্দেশে হযরত মুজাদ্দিদ-এর গ্রেফতারীর খবর চতুর্দিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার পর নানা রকম আলোচনা ও গুঞ্জন শুরু হয়। এক কিসিমের লোক এর উপর রঙ চড়িয়ে ফলাও প্রচার করে এবং নানা রূপ কাল্পনিক জল্পনা-কল্পনা চলে। খাদেম ও ভক্তকুল স্বাভাবিকভাবেই এতে আহত ও কষ্ট অনুভব করে। নানাজনের নানা মন্তব্য ও সমালোচনার প্রতি ইঙ্গিতপূর্বক তিনি তাঁর অপর এক নিষ্ঠাবান ভক্ত শায়খ বদী'উদ্দীনকে কারাগার থেকে লিখেন ঃ

"অধম যখন এই কারাগারে পৌঁছে তখন প্রথম অবস্থাতেই অনুভব করছিল যে, লোকের নিন্দা ও কটু-কাটব্যের ঢেউ শহর-বন্দর ও গ্রাম-গঞ্জের দিক থেকে দ্যুতিময় মেঘের ন্যায় উপর্য্যুপরি ধেয়ে আসছে এবং আমার আধ্যাত্মিক অবস্থাকে নীচু স্তর থেকে উচ্চতর পর্যায়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বছরের পর বছর আমাকে জামালী তরবিয়তের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার উচ্চতর মকামসমূহে উত্তরণ ঘটানো হয়েছে আর এখন জালালী তরবিয়তের মাধ্যমে সেই সমস্ত মকাম অতিক্রম করানো হচ্ছে। অতএব আপনার সবর (ধৈর্য)-এর নয় বরং রিদা (তুষ্টি) ও তসলীম (সমর্পিতচিত্ততা)-এর মকামে অবস্থান করা দরকার এবং জামাল ও জালাল (স্নিগ্ধতা ও তীব্রতা-ঐশী সত্তার দুইটি রূপ) কে সমতুল্য ও সমরূপ জ্ঞান করুন।"[২]

---

১. পত্র নং ৫, দফতর ৩য়, ৭ম খণ্ড, হযরত মওলানা আবদুশ শাকূর অনূদিত, ইমাম রব্বানী নামক নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

২. পত্র নং ৬, দফতর ৩য়, ৭ম খণ্ড।

হযরত মুজাদ্দিদ কারাগার থেকে তাঁর পুত্রদেরকেও পত্র লিখেন। এসব পত্রে তাদেরকে ধৈর্য ধারণ, আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও তাঁর ফয়সালাকে অবনত মস্তকে মেনে নেবার জন্য উপদেশ দেন এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ দান, দু'আ ও মুনাজাত, যিক্‌র ও তিলাওয়াত, আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে সব কিছুকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং নিজেদের লেখাপড়ার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দানের জন্য অব্যাহত তাকীদ প্রদান করতে থাকেন।[১]

কতক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত মুজাদ্দিদ-এর এই অহেতুক গ্রেফতারীর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দরবারের ধর্মভীরু আমীর ও সাম্রাজ্যের অমাত্যবর্গের মাঝে দেখা দেয়। কোন কোন জায়গায় হাঙ্গামা ও গোলযোগের ঘটনাও ঘটে।[২] আবদুর রহীম খান খানান, খান-ই আ'জম, সায়্যিদ সদর জাহান, খান জাহান লোদী প্রমুখ জাহাঙ্গীরের এই পদক্ষেপে অসন্তুষ্ট ও মনঃক্ষুণ্ন ছিলেন। সমকালীন ইতিহাস থেকে এই হাঙ্গামা ও গোলযোগের খুব একটা বেশি সক্ষ্য পাওয়া যায় না এবং পূর্ণ নির্ভরতার সাথে একথাও বলা যায় না যে, এসবের সাথে হযরত মুজাদ্দিদ-এর গ্রেফতারীর সম্পর্ক কতটা ছিল।

সে যাই হোক, (যে কোন কারণেই হোক)[৩] সম্রাট স্বীয় পদক্ষেপের দরুন লজ্জিত হন কিংবা তাঁর এই বন্দিত্বকালকেই যথেষ্ট মনে করেন এবং হযরত মুজাদ্দিদ-এর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ ব্যক্ত করত শাহী মহলে আগমনের দাওয়াত জানান। হযরত মুজাদ্দিদ পূর্ণ এক বছর গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী ছিলেন। এতদ্দৃষ্টে তাঁর মুক্তি জুমাদা'ল-আখিরা ১০২৯ হি./ মে ১৬২০ হয়ে থাকবে মনে হয়।

শাহী সৈন্য ও রাজকীয় সাহচর্যে অবস্থান এবং এর প্রভাব ও বরকত

হযরত মুজাদ্দিদ (র) বিরাট সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে দুর্গের বাইরে বেরিয়ে আসেন। তিন দিন সরহিন্দ অবস্থান পূর্বক আগ্রার শাহী সেনানিবাসে তশরীফ নেন। যুবরাজ শাহযাদা খুররম এবং উযীরে আ'জম তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

১. পত্র নং ২, দফতর ৩য়, ৭ম খণ্ড, হযরত খাজা মুহাম্মদ সাঈদ ও খাজা মুহাম্মদ মাসূমের নামে প্রেরিত পত্র।

২. এই ধারায় সেনাপতি মহাবত খানের বিদ্রোহের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, মহাবত খানের বিদ্রোহের ঘটনা ১০৩৫/১৬২৬ সালের। এর চার পাঁচ বছর পূর্বেই হযরত মুজাদ্দিদ মুক্তি পেয়েছেন এবং তিনি ইতিমধ্যেই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। কাজেই উল্লিখিত তথ্য সত্য নয়।

৩. কথিত আছে যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বপ্নে হযরত রসূল মকবূল (স)-এর যিয়ারত লাভ করেন। তিনি দেখতে পান যে, সরওয়ারে কায়েনাত (সা) আফসোসের সাথে আঙুল দাঁতে কামড়ে বলছেন ঃ জাহাঙ্গীর! তুমি কত বড় এক ব্যক্তিকে বন্দী করে রেখেছ।

সম্রাট কয়েক দিন শাহী সৈন্যের মাঝে অবস্থানের জন্য তাঁর আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি এতে সম্মত হন। এই সাহচর্যের দ্বারা সম্রাট ও তাঁর সৈন্যকুল খুবই উপকৃত হন। জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, "শায়খকে মুক্তি দানের পর আমি শায়খকে শাহী খেলাত ও ব্যয় নির্বাহের জন্য এক সহস্র (স্বর্ণ) মুদ্রা প্রদান করি এবং স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কিংবা তাঁর (সম্রাটের) সঙ্গে অবস্থানের এখতিয়ার দিই। তিনি আমার সাথে অবস্থানকেই অগ্রাধিকার প্রদান করেন।"

হযরত মুজাদ্দিদ শাহী সেনানিবাসে তাঁর এই অবস্থান এবং এর উপকারিতা ও বরকত সম্পর্কে তাঁর পুত্রদেরকে লিখেন যে, সেনাশিবিরে এভাবে স্বার্থলেশহীনভাবে থাকাকে আমি খুবই দুর্লভ সম্পদ মনে করছি এবং এখানকার একটি মুহূর্তকে অন্য যে কোন স্থানের সহস্র মুহূর্তের তুলনায় শ্রেয় জ্ঞান করছি।[১]

অপর একপত্রে তিনি লিখেন ঃ

"আল্লাহ্ পাকের যাবতীয় প্রশংসা এবং তাঁর মনোনীত বান্দাগণের উপর সালাম। এদিকে যে অবস্থা ও রূপ লাভ করছে তা আল্লাহ্র প্রশংসা ও স্তুতিলাভের যোগ্য। অত্যাশ্চর্য ও বিস্ময়কর সাহচর্যের মাঝে আমার দিন কাটছে এবং আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহে ধর্মীয় ব্যাপারে ও ইসলামের মূলনীতি বিষয়ে আলোচনায় কোনরূপ ছাড় প্রদানের কিংবা সমঝোতার অবকাশ পড়েনা।

"আল্লাহ্ পাকের রহমতে ঐসব মজলিসে সেই সব কথাবার্তাই আলোচিত হয় যা একান্ত বৈঠকে ও নিভৃত মাহফিলে আলোচিত হয়ে থাকে। একটি বৈঠকের অবস্থা লিখতে গেলেও বিরাট ভলিউমের দরকার পড়বে।"[২]

সে সময় অনুষ্ঠিত একটি শাহী মজলিসের বিবরণ পেশ করতে গিয়ে অপর এক পত্রে তিনি বলেন ঃ

"আমার পুত্রদের প্রেরিত পত্র পেলাম। আল্লাহর প্রশংসা যে, আমি ভাল আছি। অদ্যকার সদ্য সংঘটিত একটি ব্যাপারে তোমাদেরকে লিখছি, ভালভাবে মনে রেখ। অদ্য শনিবার রাত্রে শাহী মজলিসে গিয়েছিলাম। রাত্রির একপ্রহর অতিক্রান্ত হবার পর সেখান থেকে ফিরে আসি। এরপর হাফিজ থেকে তিন পারা কুরআন শরীফ শুনি, রাত্র দ্বিপ্রহরের অতীত হলে ঘুম আসল।"[৩]

খাজা হুসসামুদ্দীনকে লিখিত অপর এক পত্রে বলেন ঃ

---

১. পত্র নং ৪৩, দফতর ৩য়;

২. পত্র নং ১০৬, দফতর ৩য়;

৩. পত্র নং ৭৮, দফতর ৩য়; মওলানা সায়্যিদ যিওয়ার হুসায়ন কৃত "হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফেছানী"র উর্দূ অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত।

"আমার পুত্র ও সঙ্গী-সাথীদের যারাই আমার সাথে রয়েছে তারা আধ্যাত্মিক পথে দ্রুত উন্নতি করছে। তাদের উপস্থিতির দরুন এই সেনা ছাউনী যেন খানকায় পরিণত হয়েছে।"[১]

শাহী সৈন্যের সঙ্গে তিনি লাহোর পৌঁছেন। সেখান থেকে তিনি সরহিন্দ যাত্রা করেন। সরহিন্দে তিনি সম্রাটকে ভোজের দাওয়াত জানান। হযরতের ইচ্ছা ছিল সরহিন্দ থেকে যাবার, কিন্তু তাঁর বিচ্ছেদ সম্রাটের মনঃপুত ছিল না। সেখান থেকে দিল্লী, দিল্লী থেকে বানারস, অতঃপর বানারস থেকে আজমীর গিয়ে অবস্থান করেন।

জাহাঙ্গীরের উপর মুজাদ্দিদের প্রভাব

কোন কোন গ্রন্থে অধুনা যেসব গ্রন্থে মুজাদ্দিদের জীবনী নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে হযরত মুজাদ্দিদের সঙ্গে সম্রাট জাহাঙ্গীরের গভীর শ্রদ্ধা ও রীতি মাফিক বায়'আতের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাস গ্রন্থেই এর সমর্থন মেলে না। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর "আত্মজীবনী"তে কয়েক স্থানে যেভাবে হযরত মুজাদ্দিদ-এর উল্লেখ করেছেন তা থেকে উল্লিখিত বর্ণনার সত্যতা সমর্থিত হয় না। একজন সম্রাট ক্ষমতার নেশায় যতই মোহগ্রস্ত হোন এবং তাঁর লেখার ভঙ্গী যতই রাজকীয় হোক, তিনি তাঁর শায়খ-এর আলোচনা এরূপ ভঙ্গিতে করতে পারেন না। অধ্যাপক ফ্রাউমান তদীয় গ্রন্থেও (পৃ.৩৫-৩৬) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, জাহাঙ্গীর হযরত মুজাদ্দিদের হাতে মুরীদ হবার কথা প্রমাণিত নয় এবং তাঁর মধ্যে বড় রকমের কোন পরিবর্তনও সাধিত হয় নি। অপরাপর প্রথমিক প্রাচীন জীবনীকারদের কেউই না জাহাঙ্গীরের বায়'আতের উল্লেখ করেছেন, না শাহজাহানের কথাই উল্লেখ করেছেন। অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে, জাহাঙ্গীর হযরত মুজাদ্দিদ-এর সাহচর্য থেকে উপকৃত হয়েছেন। তাঁর মধ্যে নতুন ধর্মীয় প্রেরণা জাগ্রত হওয়া, বিধ্বস্ত মসজিদগুলোর পুন নির্মাণ এবং বিজিত এলাকায় মকতব-মাদরাসা কায়েমে তাঁর আগ্রহের ক্ষেত্রে এর বিরাট ভূমিকা ছিল। ১০৩১/১৬২১ সালে কাংড়া দুর্গ জয়ের সময় তিনি যেভাবে ইসলামী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং সেখানে ইসলামী প্রথা-পদ্ধতির প্রচলন ঘটিয়েছিলেন[২] এথেকেও তাঁর এই পরিবর্তন ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতির পরিচয় মেলে যাকে মুজাদ্দিদ সাহেবের সাহচর্যের ফয়েয (ফল) বলা যেতে পারে।

১. পত্র নং ৭২, দফতর ৩য়;
২. দ্র. তুযুক-ই জাহাঙ্গীরী, ৩৪০ পৃ. ৭ম অধ্যায়;

জীবনের অন্তিম যাত্রা

খাজা মুহাম্মদ কাশ্মী লিখেন যে, ১০৩২/১৬২২ সাল। তিনি (হযরত মুজাদ্দিদ) তখন আজমীরে। তিনি তাঁর ভক্তদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ তাঁর বিদায়ের দিন ঘনিয়ে আসছে। সরহিন্দে অবস্থানরত তাঁর পুত্রদেরকে লিখিত একপত্রে তিনি বলেন ঃ ایام انقراض عمر نزدیک وفرزندگان دور "জীবনের অন্তিম মুহূর্ত ঘনায়মান আর সন্তানগণ দূরে।" পুত্রেরা পত্র পেতেই আজমীরে এসে উপস্থিত হন। একদিন একান্তে পেতেই দুই পুত্র খাজা মুহাম্মদ সা'ঈদ ও খাজা মুহাম্মদ মা'সূমকে বললেন ঃ এখন আর আমার এই পার্থিব জগতের প্রতি এতটুকু আকর্ষণ কিংবা ভ্রূক্ষেপ নেই। উর্ধ্বজগতের চিন্তা-ভাবনাই এখন আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং অন্তিম যাত্রার মুহূর্ত অতি সন্নিকট মনে হচ্ছে।[১]

সেনা ছাউনি থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সরহিন্দে হযরত মুজাদ্দিদ-এর অবস্থান ছিল ১০ মাস ৮ কিংবা ৯দিনের মত।[২] আজমীর থেকে সরহিন্দ প্রত্যাবর্তনের পরই তিনি সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং নিভৃত জীবন এখতিয়ার করেন। তদীয় পুত্রগণ ও দু'তিনজন বিশিষ্ট খাদেম[৩] ব্যতিরেকে সেখানে অপর কারুর গমনা-গমনের অনুমতি ছিল না। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুমু'আ ভিন্ন তিনি বাইরে বের হতেন না। গোটা সময় যিক্‌র ও ইস্তিগফার এবং জাহিরী ও বাতেনী আমলের মধ্যে অতিবাহিত করতেন। এ সময় تبتل الیه تبتیلا (সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল তাঁরই হও)-এর ছিলেন তিনি মূর্তরূপ।

যি'ল-হজ্জের মাঝামাঝি তাঁর শ্বাস কষ্টের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। তিনি প্রায়ই কাঁদতেন এবং রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে প্রায়ই اللهم الرفيق الاعلى "হে আল্লাহ! আমার সর্বোত্তম সাথী ও বন্ধু" বলতেন। এরই মধ্যে অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটে এবং কয়েক দিন সুস্থতার মধ্যে অতিবাহিত হয়। তাঁর এই সুস্থতা দৃষ্টে বিমর্ষ আত্মীয়-পরিজন ও আহত ভক্তকুল কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এমতাবস্থায় তিনি বলতেন ঃ রোগজনিত দুর্বলতার মধ্যে যে স্বাদ ও মিষ্টতা

---

১. যুবদাতু'ল-মাকামাত. ২৮২ পৃ.

২. হযরত মুজাদ্দিদ ও তাঁর সমালোচকবৃন্দ, ১৬৪-৬৫ পৃ.

৩. এই সব সৌভাগ্যবানদের মধ্যে খাজা মুহাম্মদ হাশিম কাশ্মীও ছিলেন। কিন্তু তিনি ইনতেকালের সাতমাস পূর্বে রজব ১০৩৩ হিজরীতে তাঁর দাক্ষিণাত্য থেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে আসবার জন্য (সেখানে তখন অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজ করছিল) চলে গিয়েছিলেন। এই সময় শায়খ বদরুদ্দীন সরহিন্দী তাঁর খেদমতে ছিলেন। জীবনের শেষ দিনগুলোর অবস্থা তাঁরই সূত্রে যুবদাতুল-মাকামাত গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। এতে তাঁর পুত্রদের প্রদত্ত তথ্যও রয়েছে।

অনুভূত হত আজ কয়েক দিনের সুস্থতার মাঝে তা পাচ্ছি না। এমত অবস্থায় তিনি অধিক পরিমাণে সদকা ও দান-খয়রাত করতেন। ১২ই মুহার্রাম তারিখে তিনি বলেন ঃ আমাকে বলা হয়েছে যে, ৪৫ দিনের মধ্যেই তোমাকে এই জগৎ ছেড়ে অপর জগতের দিকে যাত্রা করতে হবে এবং আমাকে আমার কবরের জায়গাও দেখানো হয়েছে। একদিন তাঁর পুত্রেরা দেখতে পেলেন তিনি খুব কাঁদছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন ঃ আমার প্রভুর সঙ্গে মিলন কামনায় কাঁদছি। পুত্রেরা বলল ঃ আমাদের প্রতি এই (অস্বাভাবিক) ঔদাসিন্য ও উপেক্ষার কারণ কি? উত্তর ছিল ঃ আল্লাহ্র যাত (সত্তা) তোমাদের তুলনায় অধিকতর প্রিয় বলে।

২২ শে সফর তারিখে তিনি খাদেম ও আত্মীয়-বান্ধবদেরকে ডেকে বললেন যে, আজ চল্লিশ দিন পূর্ণ হল। দেখা যাক, বাকী সাত-আট দিনে কী ঘটে। এর পর আল্লাহ্র অফুরন্ত অনুগ্রহ ও অপরিমেয় পুরস্কারের কথা বলতে থাকেন। ২৩শে সফর তারিখে তিনি তাঁর সমস্ত কাপড় ও পোশাকাদি খাদেমদের মধ্যে বন্টন করে দেন। যেহেতু তাঁর শরীরের কোন সূতী বস্ত্র ছিলনা বিধায় তিনি ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হন এবং পুনরায় জ্বর দেখা দেয়।[১] ফলে হযরত সরওয়ারে কায়েনাত (স)-এর মুবারক মেযাজ অসুখ থেকে কিছুটা সুস্থতা ফিরে পাবার পর যেভাবে পুনর্বার রোগাক্রান্ত হন হযরত মুজাদ্দিদ কর্তৃক এই সুন্নতও আদায় হয়।

এই পীড়িতাবস্থায় ঐশী জ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যের ভাণ্ডার তাঁর সামনে নতুনভাবে উন্মোচিত হতে থাকে এবং তিনি তাঁর বর্ণনা দিতে থাকেন। পুত্র খাজা মুহাম্মদ সাঈ'দ পীড়িতাবস্থায় এই ধরনের গুরুভার আলোচনা তাঁর পক্ষে উপযোগী নয় বিধায় তা অন্য কোন সময়ের জন্য (সুস্থতা ফিরে আসা অবধি) মুলতবী রাখার অনুরোধ জানান। উত্তরে হযরত মুজাদ্দিদ জানান ঃ প্রিয় বৎস! সেই সময় ও প্রয়োজনীয় অবকাশ আর কবে মিলবে যে, এই সব বিষয় তখনকার জন্য তুলে রাখব ? রোগের তীব্রতা বৃদ্ধির এই দিনগুলোতেও জামা'আত ব্যতিরেকে সালাত আদায় করতেন না। কেবল জীবনের শেষ চার-পাঁচ দিন সকলের অনুরোধে সাড়া দিয়ে একাকী আদায় করেন। এতদ্ভিন্ন বিবিধ দু'আ ও ওজীফা, দু'আ মাছুরা, যিক্র ও মুরাকাবা প্রভৃতি নিয়মিত আমলের ক্ষেত্রে এতটুকু ব্যত্যয় ঘটতে দেন নি। শরীয়ত ও তরীকতের বিবিধ আদব ও আহকামের ক্ষেত্রেও তিনি এতটুকু বিচ্যুতি আসতে দেন নি। একবার রাত্রের শেষ

---

১. সম্ভবত এসময় নভেম্বর মাস ছিল। কেননা ইনতেকাল হয়েছিল ডিসেম্বর মাসে আর এসময় এই এলাকায় শীতকাল।

তৃতীয়াংশে উঠে ওযু করলেন, দাঁড়িয়েই তাহাজ্জুদ আদায় করলেন, এরপর বললেন ঃ এটাই আমার জীবনের শেষ তাহাজ্জুদ নামায। তাই হয়েছিল, এরপর আর তাহাজ্জুদ আদায়ের সুযোগ আসে নি।

ইনতিকালের কিছু পূর্বে غيبت ও ইস্তিগরাকের প্রাবল্য দেখা দেয়। তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় উত্তরে তিনি জানান যে, তাঁর এই অবস্থা দুর্বলতার কারণে নয় বরং ইস্তিগরাকের কারণে। যেহেতু কতকগুলো আধ্যাত্মিক ব্যাপার তাঁর সম্মুখে উন্মোচিত ও উদ্ভাসিত হচ্ছিল। এইরূপ দুর্বল অবস্থা ও রোগের তীব্রতা সত্ত্বেও তিনি সুন্নতের পাবন্দী, বিদ'আতের পরহেয এবং সার্বক্ষণিক যিক্‌র ও মুরাকাবায় লিপ্ত থাকার জন্য ওসিয়্যত করতেন এবং বলতেন ঃ সুন্নত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রাখবে। তিনি বলেন ঃ সাহিবে শরীয়ত (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) الدين نصيحة। "দীনের অপর নাম কল্যাণ কামনা" মুতাবিক উম্মতের কল্যাণ কামনায় ও সদুপদেশ দানের ক্ষেত্রে কোনরূপ ত্রুটি রাখেন নি। অতএব দীনের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি থেকে সুন্নাহর আনুগত্য ও পূর্ণ পাবন্দীর রাস্তা পেতে এবং এর উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকতে চেষ্টা করবে। তিনি আরও বললেন ঃ (মৃত্যুর পর) আমার দাফন-কাফনের ক্ষেত্রে সুন্নতের উপর পরিপূর্ণরূপে আমল করবে। একটি সুন্নতও যেন বাদ না যায় সেদিকে খেয়াল রাখবে। এরপর তিনি তাঁর স্ত্রীকে লক্ষ করে বললেন ঃ তোমার পূর্বেই আমি বিদায় নিচ্ছি বলে বোধ হচ্ছে। অতএব আমার কাফনের ব্যবস্থা তোমার মোহরের অর্থ দিয়ে করবে। তিনি তাঁর পুত্রদেরকে আরও বললেন ঃ কোন অজ্ঞাত স্থানে আমাকে কবর দেবে। পুত্ররা হযরতকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন যে, প্রথমে তো হযরতের ওসিয়্যত ছিল আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খাজা মুহাম্মদ সাদিককে[১] যেখানে দাফন করা হয়েছে সেখানে দাফন করার। তিনি বললেন ঃ হাঁ, তোমরা ঠিকই বলছ বটে, তবে এমুহূর্তে আমার এই আগ্রহই প্রবল। যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর উত্তরে পুত্রেরা নিশ্চুপ হয়ে গেছে এবং এব্যাপারে তারা দ্বিধান্বিত তখন তিনি বললেন ঃ আচ্ছা, যদি তা না হয় তবে শহরের বাইরে আমার বুযুর্গ পিতার পাশে, না হয় বাগানে কোথাও দাফন করবে আর আমার কবরকে মাটির রাখবে যাতে অল্পদিনেই আমার কবর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কোনরূপ নাম-নিশানা যেন অবশিষ্ট না থাকে। এতেও যখন দেখতে পেলেন তাঁর পুত্রেরা চিন্তায় পড়ে গেছে তখন তিনি স্মিত হেসে বললেন ঃ ঠিক আছে, যেখানে ভাল মনে কর সেখানেই আমাকে কবর দিও।

---

১. খাজা মুহাম্মদ সাদিক ছিলেন হযরত মুজাদ্দিদ-এর জ্যেষ্ঠপুত্র যিনি ১০২৫ হিজরীর ৯ই রবীউ'ল-আওয়াল তারিখে পিতার জীবদ্দশায় ইনতিকাল করেন।

২৭শে সফর মঙ্গলবার রাত পরের দিন তাঁর ইহলোক থেকে বিদায় নেবার পালা। যেসব খাদেম রাত জেগে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেছেন, তাদেরকে কাছে ডাকলেন এবং বললেন ঃ বড়ই পরিশ্রম করেছ তোমরা। আর মাত্র এই রাত্রির পরিশ্রমটাই বাকী রয়ে গেছে; এরপর তোমাদের ছুটি। শেষ রাত্রে বললেন ঃ اصبح ليلا রাতটা কেটে যাক, ভোর হোক। সকালের দিকে পেশাবের জন্য পাত্র চেয়ে পাঠালেন। পাত্র আসলে দেখা গেল তাতে বালি নেই। এতে কাপড়ে পেশাবের ছিটা লাগতে পারে ভেবে তা ফিরিয়ে দিলেন। উপস্থিত কেউ বলল যে, হেকীমকে দিয়ে পরীক্ষা করাবার জন্য বোতলে পেশাব করানো যাক। তিনি বল-লেন যে, আমি আমার ওযু নষ্ট করতে চাইনা। আমাকে বিছানায় শুইয়ে দাও। তিনি যেন বুঝতে পারছিলেন আর বেশী দেরী নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে ইহজগত থেকে বিদায় নিতে হবে। নতুন ভাবে ওযু করার অবকাশ আর মিলবে না। বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলে সুন্নত তরীকা মুতাবিক ডান গালের নিচে ডান হাত রেখে যিক্‌র-এ মশগুল হয়ে পড়লেন। পুত্রেরা শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুততা দৃষ্টে কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করলেন। জানালেন, ভাল আছি। আরও বললেন ঃ আমি যে দুই রাক'আত নামায পড়েছি তাই যথেষ্ট। এরপর 'আল্লাহ'! আল্লাহ! যিক্‌র ছাড়া আর কোন কথা বলেন নি। মুহূর্তের মধ্যে তিনি তাঁর জীবন প্রদীপকে পরম প্রভু সমীপে পেশ করলেন। দিনটা ছিল মঙ্গলবার সকাল ১০৩৪ হিজরীর ২৮শে সফর মুতাবিক ১০ই ডিসেম্বর, ১৬২৪ঈ।

يا ايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية

ইনতেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর।[১]

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর লাশ যখন গোসল প্রদানের জন্য বাইরে আনা হল দেখা গেল সালাতে কিয়ামরত অবস্থায় যেরূপ দুই হাত পরস্পর বাঁধা অবস্থায় থাকে তেমনি বাম হাতের কব্জীর উপর ডান হাতের বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দিয়ে বাঁধা। পুত্রেরা হাত দু'টো পরস্পরের থেকে আলাদা করে দেন। কিন্তু গোসল প্রদানের পর দেখা গেল হস্তদ্বয় পূর্বের অবস্থায় ফিরে এসেছে। শেষ পর্যন্ত এই অবস্থায় ছিল। মুখের দিকে তাকালে মনে হচ্ছিল তিনি যেন মুচকি হাসছেন।

هم چناں زی که وقت رفتن تو- همه گریاں شوند تو خنداں

এমন জীবন তুমি করহ গঠন; মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভূবন।

হাত যতই আলাদা করা হচ্ছিল ততই আপনা-আপনিই পূর্বের ন্যায় এসে

১. মওলানা যায়দ আবু'ল হাসান-এর গবেষণায় চন্দ্রবর্ষের হিসাবে তাঁর বয়স ছিল ৬২ বছর ৪মাস, ১৪দিন আর সৌরবর্ষ অনুসারে ৬০বছর ৬মাস ৫দিন।

যাচ্ছিল। দাফন-কাফন সব কিছুই সুন্নত মুতাবিক আঞ্জাম দেওয়া হয়। বুযুর্গ পুত্র খাজা মুহাম্মদ সাঈদ জানাযায় ইমামতি করেন। অতঃপর দেহ মুবারক কবরে শুইয়ে দেওয়া হয়।[১]

আচার-অভ্যাস ও দৈনন্দিন কর্মসূচী

খাজা মুহাম্মদ হাশেম কাশ্মী হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর খেদমতে তাঁর জীবনের শেষ তিন বছর ঘরে বাইরে সর্বত্র সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন। হযরত-এর আচার-অভ্যাস ও দৈনন্দিন কর্মসূচী তিনি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন।[২] এখানে তাঁর লিখিত অংশের সংক্ষিপ্ত-সার পেশ করা হচ্ছে। মওলানা বদরুদ্দীন সরহিন্দীর গ্রন্থ "হাযারাতু'ল-কুদ্স"-থেকে কিছুটা বর্ধিত অংশও পেশ করা হয়েছে।[৩]

"হযরতকে প্রায়ই একথা বলতে শুনেছি যে, আমাদের আমল ও চেষ্টা-সাধনার মূল্যই বা কতটুকু। যা কিছু তা সবই আল্লাহ পাকের অপার অনুগ্রহ। কিন্তু এর মাধ্যম বা উপায়-উপকরণ হিসেবে যদি কোন কিছুকে গণ্য করা হয় তবে তা সায়্যিদু'ল-আওয়ালীনা ওয়া'ল-আখিরীন (স.)-এর আনুগত্য যার উপর সকলের কর্মের ভিত্তি মনে করি। আল্লাহ তা'আলা যাই কিছু দান করেছেন তাঁরই পায়রবী ও সদয় অনুসরণের পথে দিয়েছেন—তা অল্পই হোক কিংবা বিস্তর, আংশিক বা সামগ্রিক। আর যা পাইনি তা এজন্য পাইনি যে, মানবীয় দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাজনিত কারণে পূর্ণ আনুগত্যের ক্ষেত্রে ত্রুটি ও ঘাটতি ছিল। একদিন বললেন, একদিন পায়খানায় প্রবেশের সময় ভুলক্রমে প্রথমে ডান পা রেখেছিলাম। সেদিন আমি বহু রূহানী হালত থেকে বঞ্চিত ছিলাম। এক বার তিনি তাঁর শাগরিদ সালেহ খাতলানীকে তাঁর কাপড়ের ব্যাগ থেকে কয়েকটি লুঙ্গি নিয়ে আসার জন্য বলেন। তিনি গিয়ে ছ'টি লুঙ্গি নিয়ে আসেন। এতদ্দৃষ্টে তিনি খুবই অসন্তোষ ভরে বললেন ঃ আমাদের সূফীর এখনও জানা নেই যে, হাদীসে বলা হয়েছে ঃ الله وتر يحب الوتر (আল্লাহ বেজোড়, বেজোড়কেই তিনি পছন্দ করেন)। এটি মুস্তাহাব। লোকে মুস্তাহাবকে কি মনে করে? যদি দুনিয়া ও আখিরাতও এমন কোন নেক আমলের বিনিময়ে দিয়ে দেওয়া হয় যে নেক আমল আল্লাহ পছন্দ করেন তবে এরূপ দুনিয়া ও আখিরাতেরও কোন মূল্য নেই। জনৈক খাদেম বলেন যে, আমি শায়খ মুহাম্মদ ইব্‌ন ফযলুল্লাহ (কু. সি)-কে বললাম,

১. যুবদাতু'ল-মাকামাত থেকে সংক্ষেপিত, পৃ. ২৫৬, ৩০০;
২. প্রাগুক্ত, ১৯২-২১৫ পৃ;
৩. প্রাগুক্ত,

"আপনি সরহিন্দে যা কিছু দেখেছেন আমাদেরকেও কিছু শোনান।" তিনি বললেন, "অন্ধের চোখে কি পড়বে আর কি দেখবে সে। যেটুকু দেখেছি তাতো এই যে, সুন্নতের আদব ও ছোট-খাটো জিনিসের ভেতর থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও তিনি পরিত্যক্ত হবার সুযোগ দিতেন না। সুন্নতের এতটা ইহতিমাম অপর কারুর পক্ষে নেহায়েত দুরূহই বটে।"

আরেক জন সাক্ষ্য দিলেন যে, হযরতের আধ্যাত্মিক অবস্থা আমাদের অনুভব ও উপলব্ধির বাইরে। কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে, হযরতের হালতদৃষ্টে ইসলামের প্রথম যুগের আওলিয়া-ই কিরামের অবস্থা বই-পুস্তকে যতটা পড়েছি তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে এবং এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত হয়েছি যে, তাতে এতটুকু অতিশয়োক্তি করা হয়নি বরং জীবনী লেখকগণ যেটুকু লিখেছেন কমই লিখেছেন। তাঁর (হযরত মুজাদ্দিদ-এর) গোটা দিন ইবাদত-বন্দেগী ও যিক্‌র-আযকারের মধ্যেই কেটে যেত। একজন বিশিষ্ট খাদেম (যার খেদমত হযরতের ওযূ করানো, জায়নামায বিছানো ও ইবাদত সংশ্লিষ্ট ছিল) বলেন ঃ দুপুরে খাবার গ্রহণের পর হযরতের বিশ্রাম গ্রহণকালে এবং রাত্রের দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হবার পর আমার কিছুটা ফুরসত মিলত। তিনি তাঁর খাদেম ও শাগরিদদেরকে অধিক পরিমাণে সার্বক্ষণিক ইবাদত-বন্দেগী, যিকর ও মুরাকাবার মাঝে অতিবাহিত করবার জন্য তাকীদ দিতেন এবং বলতেন ঃ এই দুনিয়া দারুল 'আমল তথা কর্মের ময়দান এবং আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমার অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে বাহ্যিক আমলের সাথে সমন্বয় ও সম্মিলন ঘটাও। হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের (আল্লাহর মাহবূব ও উচ্চ মরতবার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও) ইবাদতের আধিক্যের দরুন পা মুবারক ফুলে যেত।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) ফিক্‌হ শাস্ত্রে ও মূলনীতি বিষয়ে (উসূলে ফিক্‌হ) গভীর পাণ্ডিত্য রাখতেন। এতদসত্তেও এব্যাপারে তিনি এতখানি সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, মসলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে তিনি নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি পর্যালোচনা করতেন এবং ঘরে থাকুন কিংবা বাইরে সফরেই হোন সে সব সাথেই রাখতেন। ইখতিলাফী মসলার ব্যাপারে মুফতীদের সম্মিলিত রায় ও ফকীহকুল শ্রেষ্ঠদের অগ্রাধিকার প্রদত্ত অভিমতের উপর আমল করতেন। অধিকাংশ সময় নিজেই ইমামতি করতেন। একবার এর পেছনের নিহিত কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ শাফিঈ ও মালিকী মযহাবের অনুসারীদের নিকট সূরা ফাতিহা পাঠ ব্যতিরেকে সালাত আদায় হয় না বিধায় তারা ইমামের পেছনেও সূরা ফাতিহা পাঠ করে। বহু হাদীস থেকেও তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

কিন্তু আমাদের ইমাম আবূ হানীফা (র)-র মতে মুকতাদীর পক্ষে সূরা ফাতিহা পাঠ জায়েয নয়। হানাফী মযহাবের ফকীহদেরও এটাই মযহাব। যেহেতু আমি বিভিন্ন মযহাবের মাঝে সম্মিলন ও সমন্বয়ের জন্য কোশেশ করি এই জন্য ইমামতি করাকেই এর সহজ সূরত মনে করি।

শীত কিংবা গ্রীষ্ম যখনই হোক হযরতের ঘরে-বাইরের আমল ছিল নিম্নরূপঃ

"অধিকাংশ সময় রাত্রির শেষার্ধে এবং কখন কখনও শেষ তৃতীয়াংশে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তেন। সেই সময়ের জন্য হাদীসে যেসব দু'আ বর্ণিত আছে তা পাঠ করতেন। খুবই যত্ন ও সতর্কতার সাথে পরিপূর্ণরূপে ওযু করতেন যাতে প্রয়োজনীয় সকল অঙ্গের সর্বত্র ওযূর পানি গিয়ে পৌঁছে। কাউকে ওযুর পানি ঢালবার অনুমতি দিতেন না। ওযু কালীন কেবলামুখী হতেন। অবশ্য পা ধৌত করবার সময় উত্তর কিংবা দক্ষিণ দিকে ফিরতেন। নিয়মিত মেসওয়াক করতেন। এসময় হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহ পাঠ করতেন। এরপর পূর্ণ একাগ্রতা ও মনোযোগের সাথে দীর্ঘ কেরাআত সহকারে নফল নামায পড়তেন। নফল সমাপ্তির পর বিনয় কাতর চিত্তে (খুশূ) ও ইস্তিগরাকের সাথে মুরাকাবার মাঝে মশগুল হয়ে যেতেন। ফজরের কিছু পূর্বে সুন্নত মুতাবিক সামান্য ঘুমিয়ে নিতেন এবং সুবহে সাদিকের পূর্বেই উঠে পড়তেন। নতুন করে ওযু করতেন। ফজরের সুন্নত ঘরেই আদায় করতেন। সুন্নত ও ফরযের মাঝে নীরবে سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم পাঠ করতে থাকতেন। ফজরের সালাত সুবহে কাযিব-এর শেষ ভাগ ও সুবহে সাদিকের প্রথম ভাগে আদায় করতেন যাতে করে "গুলুস ও আসফার" *সম্পর্কিত দু'টি মযহাবের উপরই আমল হয়ে যায়। স্বয়ং ইমামতি করতেন এবং ফজর নামাযে সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজের মধ্যবর্তী সূরাসমূহের যেকোন একটি পাঠ করতেন (যেমনটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত)। ফজরের সালাতের পর ইশরাক পর্যন্ত হাল্‌কা করতেন। অতঃপর দীর্ঘ সালাতু'ল-ইশরাক আদায় করত তসবীহ ও দু'আ মাছুরাসমূহ পাঠ থেকে মুক্ত হয়ে ঘরে ফিরতেন, ঘরের ও পরিবারের লোকজনের খোঁজ-খবর নিতেন এবং তাদের প্রয়োজন মেটাতেন। এছাড়া দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াদি সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিতেন।[১] এরপর তিনি তাঁর নিজের ঘরে ফিরে আসতেন এবং পূর্ণ একাগ্রতা ও মনোনিবেশ সহকারে কুরআন শরীফ তেলাওয়াতে ডুবে যেতেন। তেলাওয়াত সমাপ্তির পর মুরীদ ও শাগরিদেরদেরকে ডেকে তাদের অবস্থা জিজ্ঞাসাবাদ করতেন ও প্রয়োজনীয় হেদায়েত দিতেন। এসময়ই বিশিষ্ট বন্ধু-

---

১. হাযারাতুল-কুদ্‌স, ৮২ পৃ.

বান্ধব ও শাগরিদদেরকে ডেকে তাদের রূহানী 'ইল্‌ম সম্পর্কে আলোকপাত করতেন এবং তাদেরকে তাওয়াজ্জুহ প্রদান করতেন এবং তারাও নিজেদের অবস্থা ও কায়ফিয়্যাত সম্পর্কে শায়খকে অবহিত করতেন। তিনি তাদেরকে বুলন্দ হিম্মত, সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ, সার্বক্ষণিক যিক্‌র এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক শুদ্ধির অবস্থা গোপন রাখার জন্য তাকীদ প্রদান করতেন। কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র 'আজমত তথা মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন ঃ সমগ্র বিশ্বজগত এই কালেমার মুকাবিলায় ততটুকু গুরুত্বও রাখেনা যতটুকু রাখে সমুদ্রের বিপুল জলরাশির মুকাবিলায় এক কাত্‌রা পানি। খাদেম ও উপস্থিত লোকদেরকে ফিক্‌হ-এর গ্রন্থাদি অধ্যয়নের প্রতি তাকীদ এবং 'উলামায়ে কিরাম থেকে শরীয়তের হুকুম-আহকাম তথা বিধি-বিধানসমূহের জ্ঞান আহরণে উৎসাহিত করতেন।

"তিনি বলতেন ঃ কাশ্‌ফ-এর মধ্যে তিনি দেখতে পান যে, গোটা বিশ্ব বিদ'আতের অন্ধকার পংকে নিমজ্জিত আর এর মাঝে সুন্নতের আলোক-রশ্মি জোনাকীর আলোর ন্যায় মিটমিট করছে। গীবত (পরনিন্দা ও পরচর্চা) ও অপরের ছিদ্রান্বেষণের ব্যাপারে তিনি ভীষণ সতর্ক ছিলেন। তৎপ্রতি সম্মান ও ভীতির কারণে খাদেমগণও তাঁর সামনে গীবত করতে পারত না। নিজের অবস্থা ও কায়ফিয়াত সযত্নে লুকিয়ে রাখতেন। দু'বছরের সময়কালে তিন-চার বার ফোটা ফোটা অশ্রু দু'গণ্ড বেয়ে ঝরে পড়তে দেখেছি। তেমনি তিন চার বার উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক আলোচনা কালে দু'গণ্ড ও চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে যেতে দেখেছি।

"ঠিক দ্বিপ্রহরে ও চাশ্‌তের সালাত আদায় অন্তে অন্দর মহলে গমন করতেন এবং ঘরের লোকজনের সঙ্গে একত্রে আহার করতেন। ছেলেরা কিংবা পরিবারস্থ লোকেরা কোন জিনিষ তৈরী করলে তা হযরতের সামনে পেশ করতেন। ছেলে ও খাদেমদের কেউ তখন না থাকলে তার অংশ তিনি আলাদা রেখে দিতেন। খাবার সময় অন্যকে খাওয়াতে বেশি ব্যস্ত থাকতেন এবং বেশির ভাগ সময় অন্যদের খোঁজ-খবর নেওয়া ও যত্ন-আত্তিরের মাঝেই অতিবাহিত হত। কখনও কখনও নামে মাত্র খাবার গ্রহণ করতেন। দেখে মনে হত খাওয়ার প্রবৃত্তি নেই, সুন্নতের পায়রবীই একমাত্র উদ্দেশ্য।[১] শেষ জীবনে যখন নির্জন ও নিভৃত জীবন যাপন করতে শুরু করেন এবং রোযা রাখতেন তখন খাবারও সেই একই ঘরেই গ্রহণ করতেন। খাওয়ার পর আম রেওয়াজ মাফিক ফাতিহা পাঠ করতেন না, যেহেতু সহীহ হাদীসে এর কোন প্রমাণ মেলে না। ফরয আদায়ের পরও ফাতিহা পাঠের অভ্যাস ছিল না যেমনটি অনেক বুযুর্গের নিয়ম ছিল।

১. হাযারাতু'ল-কুদ্‌স, ৮৭ পৃ;

"দুপুরের আহারের পর সুন্নত মাফিক অল্পক্ষণ গড়িয়ে নিতেন (কায়লুলা)। জোহরের প্রথম ওয়াক্তে মুওয়ায্যিন আযান দিতেন। তিনি ওযু করত সুন্নতে যওয়াল পড়তেন। জোহরের সালাত সমাপনের পর কোন হাফিজ থেকে কমবেশি একপারা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত শুনতেন। আর যদি দরস হত তবে দরস প্রদান করতেন। আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সঙ্গী-শাগরিদ ও খাদেমদের সাথে নীরবতা পালন ও মুরাকাবার মধ্যে নিমগ্ন হতেন এবং খাদেমদের আধ্যাত্মিক কায়ফিয়াতের দিকে মনোযোগ দিতেন। মাগরিবের সুন্নত আদায়ের পর সালাতুল আওয়াবীন পড়তেন, কখনো চার রাক'আত—কখনো ছয় রাক'আত। এশার ওয়াক্ত শুরু হবার পরপরই তাৎক্ষণিকভাবে তা আদায় করে নিতেন। বিত্‌র নামাযে হানাফী ও শাফিঈ উভয় মযহাবের দু'আ-ই কুনূতই একত্রে পাঠ করতেন। এরপর দু'রাকআত নফল কখনো বসে আবার কখনো দাঁড়িয়ে আদায় করতেন। শেষ দিকে এই সালাত খুব কমই আদায় করেছেন। বিত্‌রের পর সাধারণভাবে পরিচিত দুই সিজদা দিতেন না।

"রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। এশার সালাত ও বিত্‌র আদায়ের পর বিশ্রামের জন্য খুব তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তেন এবং দু'আ মাছুরা পাঠে মগ্ন হতেন। অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করতেন। বিশেষত জুমু'আ, সোমবার রাত্র ও দিনে তা আরও বেশি করে পড়তেন। কুরআন তেলাওয়াতের সময় চেহারা মুবারক ও পড়ার ভঙ্গিদৃষ্টে শ্রোতৃবর্গ অনুভব করত যে, কুরআন পাকের রহস্য ও বরকতের আয়াতসমূহের ফয়েয উপচে পড়ছে। সালাতের ভেতর ও বাইরে কুরআনের ভীতি প্রদর্শনমূলক আয়াতসমূহ পাঠকালে কিংবা যে সমস্ত আয়াত বিস্ময় প্রকাশক বা জিজ্ঞাসাবোধক সে সব আয়াত তেলাওয়াতকালে তাঁর মাঝেও অনুরূপ ভাব ও ভঙ্গি ফুটে উঠত। সালাতে সব রকমের সুন্নত, মুস্তাহাব ও এর প্রয়োজনীয় আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। তাহিয়্যাতু'ল-ওযু ও তাহিয়্যাতু'ল-মসজিদ সালাতও খুব ইহতিমামের সাথেই আদায় করতেন। তারাবীহ ব্যতিরেকে কোন নফল সালাত জামা'আত সহকারে আদায় করতেন না। আশুরা কিংবা শবে কদরের নফল জামা'আতের সাথে আদায় করতে নিষেধ করতেন।

"পীড়িতের সেবা-শুশ্রূষার উদ্দেশ্যে গমন করতেন এবং এসময় হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহ পাঠ করতেন। কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যেও গমন করতেন। কতক উচ্চ পর্যায়ের দীনী কিতাব (উদাহরণত তফসীরে বায়দাবী, সহীহ বুখারী, মিশকাতু'ল-মাসাবীহ, ফিক্‌হ, উসূল ও ইলমে কালামের ক্ষেত্রে হেদায়া,

বায়দাবী, মাওয়াকিফ এবং ইলমে তাসাওউফে 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ-এর নাম করা যেতে পারে)-এর দরস প্রদান করতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আলোচনা-সমালোচনা কিংবা তর্ক-বিতর্কের প্রশ্রয় দিতেন না। জীবনের শেষ দিকে এক্ষেত্রে দেবার মত সময় তাঁর খুব কমই ছিল। ছাত্রদেরকে ধর্মীয় 'ইলম হাসিলের প্রতি খুবই তাকীদ দিতেন এবং 'ইল্ম হাসিলকে সুলূক ও তরীকতের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করতেন। অধিক পরিমাণে হাম্‌দ ও ইস্তিগফার পাঠ করতেন এবং নে'মতের পরিমাণ অল্প হলেও বেশি শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় করতেন।

"রমযান মাসের বড়ই ইহতিমাম করতেন। কুরআন শরীফ কমপক্ষে তিন খতম করতেন। নিজে হাফিজে কুরআন ছিলেন। এজন্য রমযানের বাইরেও মুখস্ত তেলাওয়াত করতেন এবং বিভিন্ন হাল্‌কা বা বৈঠকেও শুনতে থাকতেন।[১] ইফতার তাড়াতাড়ি এবং সাহ্‌রীর ক্ষেত্রে বিলম্ব করতেন—হাদীসে যেমন বর্ণিত হয়েছে এবং এর খুবই ইহতিমাম করতেন।[২]

"যাকাত আদায়ের পদ্ধতি ছিল এইরূপ ঃ কখনও কোথাও থেকে হাদিয়া কিংবা নযর-নেয়ায এসে গেলে তা বছর অতিক্রান্তির জন্য অপেক্ষা করতেন না, আসা মাত্রই তাৎক্ষণিকভাবে হিসাব করত যাকাত আদায় করতেন। যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে অভাবী, দুঃস্থ, বিধবা ও আত্মীয়দের অগ্রাধিকার দিতেন। কয়েকবার হজ্জ আদায়ের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তা আর হয়ে ওঠেনি। সর্বদাই এর জন্য আগ্রহান্বিত ও লালায়িত ছিলেন এবং এই লালিত বাসনা বুকে নিয়েই এই নশ্বর জগত থেকে বিদায় নেন।

"চরিত্র ও বিনয়-নম্র ব্যবহার, আল্লাহর সৃষ্টিকুলের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ-মমতা, আল্লাহ্‌র ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ ও অবনত মস্তকে তা মেনে নেবার ক্ষেত্রে তিনি চূড়ান্ত দর্জায় উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর আত্মীয়-পরিজন, অনুরক্ত শাগরিদ ও ভক্তকুল অত্যাচারী শাসকদের দ্বারা বেশ নিপীড়িত হয়েছিল। কিন্তু তিনি এসবই সন্তুষ্টচিত্তে ও অবনত মস্তকে মেনে নিয়েছিলেন, অভিযোগের একটি বাক্যও মুখে আসতে দেন নি। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কেউ আগমন করলে তিনি তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং মজলিসের মধ্যে তাকে বসতে দিতেন, তার স্বাদ, রুচি ও প্রকৃতি উপযোগী কথা বলতেন। অমুসলিম তা তিনি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হোন কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারীই হোন, তাকে তা'জীম করতেন না। আগেভাগেই সালাম করতেন। আমার মনে পড়ে না

১. যুবদাতু'ল-মাকামাত, সংক্ষেপিত, ১৯২-২১৫ পৃ;

২. হযরাতু'ল-কুদ্‌স,৯১ পৃ;

কেউ কখনো তাঁকে আগে সালাম দিতে পেরেছে। তিনি তাঁর উপর নির্ভরশীল লোকদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। কারুর ইনতিকালের খবর পেলে প্রভাবিত হতেন, ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজি'উন পাঠ করতেন, তার সালাতে জানাযায় শরীক হতেন এবং তাঁর জন্য দু'আ ও ঈসালে ছওয়াব করতেন।[১]

"তাঁর পোশাক ছিল একটি কুর্তা যার দুই কাঁধই ফাড়া হত। এর উপর আবা থাকত। কিন্তু গ্রীষ্মকালে কেবলই কুর্তা গায়ে দিতেন। সুন্নত মাফিক মাথায় পাগড়ী পরিধান করতেন এবং শামলা ঝুলে থাকত দুই কাঁধের মাঝে পিঠ বরাবর (কেবল পেশাব-পায়খানার সময় ছাড়া)। পাজামা টাখনুর উপর থাকত। জুমু'আ ও দুই ঈদে মূল্যবান পোশাক পরিধান করতেন। নতুন কাপড় পরিধান করলে পূর্বের জোড়া কোন খাদেম কিংবা প্রিয় মেহমানকে দিয়ে দিতেন। সাধারণত ৫০-৬০ জন আলিম-উলামা, ওলী-'আরিফ, মাশায়েখ, হাফিজ ও নেতৃস্থানীয় গণ্যমান্য লোক তাঁর খেদমতে পড়ে থাকত। কখনো কখনো এ সংখ্যা শ'র কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছত। হযরত-এর মেহমান হিসেবেই তাঁরা আপ্যায়িত হতেন।"[২]

হুলিয়া মুবারক (চেহারা ও আকৃতি বর্ণনা)

হযরতের অন্যতম খলীফা এবং ১৭ বছরের সাহচর্য ধন্য শায়খ বদরুদ্দীন সরহিন্দী "হাযারাতু'ল-কুদস" গ্রন্থে শায়খ মুজাদ্দিদ (র)-এর চেহারা-সূরত ও আকৃতি নিম্নোক্ত রূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

"হযরত ছিলেন গৌর বর্ণের, সাদার ভাগই বেশী। ললাট দেশ ও গণ্ডদ্বয় এত উজ্জল আভামণ্ডিত যে, দর্শকের চোখ ধাঁধিয়ে যেত। প্রশস্ত ভ্রূযুগল ধনুকের ন্যায় বাঁকা, দীর্ঘ ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ, চিকন সূক্ষ্ম রেখাযুক্ত। চক্ষুদ্বয় প্রশস্ত, কালো অংশ খুবই কালো এবং সাদা অংশ খুবই সাদা, চোখের মণি উজ্জ্বল। ওষ্ঠদ্বয় পাতলা ও লালিমামণ্ডিত, মুখ মধ্যমাকৃতির, দাঁত পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ় সংবদ্ধ মুক্তার ন্যায় ঝলমলে,ঘন দীর্ঘ চাপ দাড়ি মর্যাদার প্রতীক। গণ্ডদেশে মাঝারি ধরনের কিছু চুল ছিল। তিনি ছিলেন মধ্যম আকৃতির ছিমছাম হাল্কা-পাতলা গড়নের।"[৩]

সন্তান-সন্তুতি

আল্লাহ তা'আলা হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে সাতজন পুত্র সন্তান দান করেছিলেন। এঁদের ভেতর দু'জন অল্প বয়সে হযরতের জীবদ্দশায়ই ইনতিকাল

---

১. হাযারাতু'ল-কুদ্স, শায়খ বদরুদ্দীন সরহিন্দীকৃত, পাঞ্জাব আওকাফ বিভাগ থেকে মুদ্রিত, ১৯৭১ খৃ. ৯১-৯২ পৃ;

২ প্রাগুক্ত. ৯২ পৃ;

৩, প্রাগুক্ত ,১৫৫ পৃ.

করেন। শায়খ মুহাম্মদ ফররুখ, শায়খ মুহাম্মদ 'ঈসা ও শায়খ মুহাম্মদ আশরাফ দুগ্ধপোষ্য শিশু অবস্থায় ইনতিকাল করেন। খাজা মুহাম্মদ সাদিক 'ইল্‌ম হাসিল ও সুলূক-এ পূর্ণতা প্রাপ্তির পর ১০২৫/১৬১৬ সালে ২৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিন পুত্র 'আলীকদর খাজা মুহাম্মদ সাঈদ, খাজা মুহাম্মদ মা'সূম ও খাজা মুহাম্মদ ইয়াহয়া শেষ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই চারজন সম্পর্কে একথা বলা যায় ঃ

این سلسله از طلائے ناب ست * این خانه تمام افتاب ست

এ বংশধারা খাটি স্বর্ণের, এ খান্দান গোটাই উজ্জ্বল সূর্য।

হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (র) এঁদেরকে দেখে খুবই প্রশংসনীয় উক্তি করেছিলেন এবং شجرۃطیبۃ ও جواهر علویه দ্বারা তা'বীর করেছিলেন। বলেছিলেন ঃ

فقرائے باب اللّٰه اند دلهائے عجیب دارند

প্রথম পুত্র হযরত খাজা মুহাম্মদ সাদিক হযরত মুজাদ্দিদ-এর সামনেই কামালিয়তের দর্জায় উপনীত হয়েছিলেন। হযরত তাঁর এই পুত্ররত্ন সম্পর্কে প্রশংসনীয় উক্তি করেছিলেন এবং তাঁর উচ্চ মানের জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক যোগ্যতার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। এক পত্রে তিনি বলেন ঃ অধমের এই প্রাণপ্রিয় পুত্র আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আধার এবং জয্‌ব ও সুলূক-এর মকামসমূহের সহীফা (পুস্তক) বিশেষ।[১]

দ্বিতীয় পুত্র হযরত খাজা মুহাম্মদ সা'ঈদ ১০০৫/১৫৯৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭শে জুমাদা'ল-আখির, ১০৭০/২৮শে মার্চ, ১৬৬০ সালে ইনতিকাল করেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সিলসিলার প্রচার, ভক্ত মুরীদ ও অনুরক্ত শাগরিদদের তা'লীম ও তরবিয়ত প্রদানে তিনি বিরাট অংশ নেন।[২]

তৃতীয় পুত্র হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম যিনি স্বীয় বুযুর্গ পিতার 'ইলম-এর ধারক-বাহক, ভাষ্যকার, গুপ্ত-রহস্যের ভাণ্ডার, বিশ্বস্ত রক্ষক, খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে মুজাদ্দিদিয়া তরীকা-এর তা'লীম ও তাছীর এমনভাবে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে যে, কথক ঠিকই বলেছেন ঃ

چراغ هفت کشور خواجه معصوم * منور از فروغش هند تا روم

১. পত্র নং ২৭৭, ১ম খণ্ড, ফযীলত ও কামালিয়ত সম্পর্কে দ্র যুবদাতু'ল-মাকামাত, ৩০২-৩ পৃ;
২. দ্র. প্রাগুক্ত ৩০৮-১৫ পৃ.

খাজা মা'সূম সপ্ত মহাদেশের প্রদীপ; তাঁর আলোয় সমুজ্জ্বল ভারত থেকে রোম।

দিল্লীর বিখ্যাত খানকাহ যা আরব-আজমের আধ্যাত্মিক ধারার প্রাণকেন্দ্র ছিল (এবং যে খানকাহ্র স্ব-স্ব যুগে উত্তরাধিকারিত্ব বহন করেছিলেন খাজা সায়ফুদ্দীন, মির্যা মাজহার জানেজানাঁ, হযরত শাহ গুলাম 'আলী এবং হযরত শাহ আহমদ সা'ঈদ) তাঁরই সিলসিলার ছিল। মওলানা খালিদ রূমী কুর্দী এই খানকাহ থেকেই হযরত শাহ গুলাম 'আলীর পদতলে বসে দীক্ষা গ্রহণ পূর্বক এই সিলসিলাকে সিরিয়া ও তুরস্ক পযন্ত নিয়ে যান যার থেকে এই তরীকা ইরাক, সিরিয়া, কুর্দিস্তান ও তুরস্কের নগর-বন্দরে ও ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে।[১]

তাঁর পত্রসমূহ هر سه اجزاء মকতূবাত-ই ইমাম রব্বানী-র এক ধরনের ভাষ্য ও বিস্তৃত বিবরণ এবং ইল্ম ও সূক্ষাতিসূক্ষ্ম রহস্যের এক ভাণ্ডার বিশেষ। তাঁর জীবনের বিস্তৃত ঘটনাপঞ্জী ও কামালিয়াত সম্পর্কে জানতে চাইলে একটি স্থায়ী গ্রন্থের আবশ্যক।

سفینہ چاھئے اس بحر بیکر اں کیلئے

সম্রাট মুহ্য়িদ্দীন আওরঙ্গযীব তাঁরই হস্তে হস্ত স্থাপন পূর্বক বায়'আত হয়েছিলেন এবং তৎপুত্র খাজা সায়ফুদ্দীনই তাঁকে (সম্রাটকে) সুলূক-এ প্রশিক্ষণ দান করেছিলেন। তিনি সম্রাটকে ভারতবর্ষের মুসলিম শাসক হতে এবং আকবরের প্রভাব থেকে পরিপূর্ণরূপে পাক-পবিত্র করে গড়ে তুলেছিলেন। সম্রাটকে তিনি তাঁর পত্রে شہزادہ دین پناہ নামে উল্লেখ করতেন।

১১ই শওয়াল, ১০০৭/২৭শে এপ্রিল,১৫৯৯ তারিখে খাজা মুহাম্মদ মা'সূম জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯ই রবীউল-আওয়াল, ১০৭৯/ ৭ই আগস্ট, ১৬৬৮ তারিখে ইনতিকাল করেন।[২]

চতুর্থ পুত্র খাজা মুহাম্মদ ইয়াহয়া, হযরত মুজাদ্দিদ-এর ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৯বছর। বুযুর্গ ভ্রাতাদের নিকট 'ইল্ম হাসিল করেন এবং তরীকতে কামালিয়াত লাভ করেন। ১০৯৬/১৬৮৫ সালে তিনি ইনতিকাল করেন।[৩]

১. তাঁর ফযীলত সম্পর্কে জানতে চাইলে দ্র. শরহে দুর্রে মুখতার প্রণেতা আল্লামা শামীর কিতাব سل الحسام الهندى لنصرة مولنا خالد النقشبندى এই সিলসিলার মাশায়েখ এখনও সিরিয়া, ইরাক, কুর্দিস্তান ও তুরস্কে বর্তমান। লেখক তাদের ভেতর কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে শায়খ ইবরাহীম গালা য়ামানী, শায়খ আবু'ল-খায়র ময়দানী, শায়খ মুহাম্মদ নাবহান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২. গ্রন্থের শেষে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। নুযহাতু'ল-খাওয়াতির থেকে এ আলোচনা সংগৃহীত ও উদ্ধৃত।

৩. ভূপালের শাহ রঊফ আহমদ ও তাঁর পৌত্র হযরত শাহ পীর আবু আহমদ ও তাঁর প্রপৌত্র হযরত শাহ মুহাম্মদ ইয়া'কূব তাঁরই বংশধর।

পঞ্চম অধ্যায়

হযরত মুজাদ্দিদ-এর সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু

হযরত মুজাদ্দিদ-এর আসল সংস্কার ও পুণর্জাগরণমূলক কর্মকাণ্ড বা অবদান কি ছিল?

দৃষ্টিসম্পন্ন ও ন্যায়পরায়ণ সকল লোকই যারা হি. একাদশ শতাব্দীর (যেখান থেকে হি. দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সূচনা হয়) ইসলামের ইতিহাসের উপর সাধারণ এবং ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামের ইতিহাসের উপর বিশেষভাবে নজর বুলিয়েছেন[১] তারাই এবিষয়ে একমত যে, হযরত শায়খ আহমদ সরহিন্দীর দ্বারা ইসলামের হেফাজত ও এর শক্তি যোগানোর ক্ষেত্রে যেই ঐতিহাসিক ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালিত হয়েছে হাদীসের সহজ সরল পরিভাষায় যাকে "তাজদীদ"[২] বলা হয়েছে এবং এইক্ষেত্রে তিনি এমন খ্যাতি অর্জন করেছেন যা তাঁর নামের স্থলাভিষিক্তে পরিণত হয়েছে যার নজীর ইসলামের ইতিহাসে ইতো-পূর্বে আর পাওয়া যায় না।

শায়খ আহমদ সরহিন্দীর সেই ঐতিহাসিক ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড কি ছিল? ইসলামের রূহ তথা প্রাণশক্তি ও চিন্তা-চেতনায় সজীবতা ও নবজীবন সঞ্চার, যুগের গুরুত্বপূর্ণ ও সঙ্গীনতরো ফেতনার উৎসাদন ও মূলোৎপাটন, মুহাম্মদী নবূওত ও ইসলামী শরীয়তের সত্যতা ও চিরন্তনতার উপর নতুন করে বিশ্বাস ও আস্থা পুনঃস্থাপন, আরবের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনুগত্য ও

---

১. গ্রন্থের প্রথম দু'টি অধ্যায়ে এর উপর বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

২. সুনানে আবী দাউদের বিখ্যাত হাদীস

ان الله عز وجل بعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় এমন একজনের আবির্ভাব ঘটাবেন যিনি এই উম্মাহ্‌র জন্য দীনের পুনর্জাগরণ ঘটাবেন (আবু দাউদ প্রভৃতি)। হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে চাইলে দ্র. আবদুল বারী নদভীকৃত جامع المجددين -এর মওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভীর ভূমিকা, ১৬-২৪ পৃ.।

অনুসরণ-অনুকরণ থেকে মুক্ত New-Platonist Theosohy তথা নব্য-প্লেটোবাদী ধর্মতত্ত্ব নির্ভর সেই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, সত্য-সন্ধান ও খোদা-সন্ধানী প্রয়াসের শূন্যগর্ভতা প্রদর্শন, "হামাউস্ত" ও ওয়াহ্দাতু'ল-ওজূদ 'আকীদা ও মতবাদের খণ্ডন ও পর্দা উন্মোচন, যে আকীদা ও মতবাদ বিপুল প্রচার, জনপ্রিয়তা ও বাড়াবাড়ির চরম পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছিল যদ্দরুন মুসলিম ধর্ম বিশ্বাসে ফাটল এবং সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা জন্মলাভ করছিল এবং এরই পাশাপাশি এর সমতুল্য 'ওয়াহদাতুশ-শুহূদ' আকীদা ও মতবাদকে শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ সহযোগে ও বিন্যস্ত আকারে পেশ করা, বিদ'আত (যা একটি স্থায়ী ও চিরন্তন শরীয়তের রূপ পরিগ্রহ করেছিল)-এর খোলাখুলি প্রত্যাখ্যান ও সুস্পষ্ট বিরোধিতা, এমন কি "বিদ'আতে হাসানা"-র অস্তিত্বকেও অস্বীকার, অবশেষে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের উৎপাটিত পদসমূহকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন, আকবরের আমলের ইসলাম বিরোধী প্রভাব বলয়ের নিশ্চিহ্নকরণ এবং ভারতবর্ষে এমন একটি সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক ধর্মীয় বিপ্লব আনয়নের বিজ্ঞোচিত ও সফল প্রয়াস চালানো যদ্দরুন একদিকে সম্রাট আকবরের সিংহাসনে মুহ্য়ি'দ্দীন আওরঙ্গযীব আলমগীর সিংহাসনারূঢ় হন,অপর দিকে হাকীমু'ল-ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দেহলভী এবং তাঁর খলীফাবর্গ ও শাগরিদকুলের সেই সিলসিলা জন্মলাভ করে যাঁরা রূহানী ও বাতেনীভাবে এই সিলসিলার সঙ্গেই সম্পর্কিত ও সম্পৃক্ত ছিলেন এবং যাঁরা কুরআন-সুন্নাহ্র প্রচার ও প্রসারে, এর মর্ম অনুধাবন ও উদ্ঘাটনে, তাঁদের দর্স-তাদরীস তথা পঠন-পাঠনে ও মাদরাসা কায়েমে, আত্মিক পরিশুদ্ধি, আকীদা-বিশ্বাস ও প্রথা-পদ্ধতির সংস্কার সাধনে বিরাট খেদমত, অতঃপর সর্বশেষে জিহাদ ও আল্লাহ্র কলেমাকে সমুন্নত করার মাধ্যমে কেবল ভারতবর্ষেই ইসলামকে কায়েম ও ইসলামের বৃক্ষকে পল্লবিত ও বিকশিত করেন নি বরং একে মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান (বিশেষ করে 'ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রে), ইসলামের চিন্তা-চেতনা ও এর দাওয়াতের কেন্দ্রে পরিণত করেন।

কিন্তু এই বিরাট বিস্তৃত সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু এবং হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সেই আসল কাজ কি ছিল যা তাঁর সকল সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক কর্মকাণ্ডের উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার পাবার দাবী রাখে? বিভিন্ন জন তাদের স্ব-স্ব ধারণা ও রুচি মুতাবিক এর জওয়াব দিয়েছেন। এদের মধ্যে তিনটি দল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

১. একদলের মতে, তিনি এই জন্য মুজাদ্দিদ আলফেছানী (দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ) হিসাবে অভিহিত হবার দাবীদার, যেহেতু তিনি ভারতীয়

উপমহাদেশকে পুনর্বার ইসলামের জন্য উম্মুক্ত করেন এবং একে ব্রাহ্মণ্যবাদ অথবা এক ধর্মের কোলে যাবার পরিবর্তে পুনর্বার মুহাম্মদ আরাবী (সা)-র ও হেজাযী দীন (ইসলাম)-এর তত্ত্বাবধানে ও অভিভাবকত্বাধীনে তুলে দেন এবং একে হিজরী একাদশ শতাব্দী (খৃস্টীয় ষষ্ঠদশ শতক)-এর মত গুরুত্বপূর্ণ শতাব্দীতে সেই ভয়াবহ পরিণতির হাত থেকে বাঁচিয়ে দেন হি. ১৩শ/ ১৯শ শতাব্দীতে যে পরিণতি হতে যাচ্ছিল, বরং বস্তুতপক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম মিল্লাতকে এই সর্বপ্লাবী আকীদাগত, মানসিক ও সাংস্কৃতিক ধর্মদ্রোহিতার তাৎক্ষণিক বিপদাশংকা থেকে মুক্ত ও নিরাপদ করেন যে বিপদাশংকা সম্রাট আকবরের মত অটুট মনোবল ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ব্যক্তিত্ব ও তাঁর অতুলনীয় প্রতিভাবান উপদেষ্টাত্রয় (মুল্লা মুবারক, ফৈযী ও আবু'ল-ফযল)-এর অপূর্ব ধী-শক্তিবলে একটি বাস্তব ঘটনায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এই মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব এবং এই বুদ্ধিবৃত্তিক ও সভ্যতাগত ধর্মহীনতা সেই রাজনৈতিক অধঃপতন ও ক্ষমতাচ্যুতি থেকেও অনেক বেশী নাযুক, সঙ্গীন ও সুদূরপ্রসারী ছিল যা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ভারতীয় উপমহাদেশের বিকাশোন্মুখ অমুসলিম শক্তির উত্থান এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংরেজ শক্তির থাবা বিস্তার ও ক্ষমতালাভের মাধ্যমে দেখা দিয়েছিল। সম্ভবত 'আল্লামা ইকবাল (র)তাঁর বিখ্যাত কবিতায় এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছিলেন ঃ

وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان * اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار

"ভারতবর্ষে মুসলিম মিল্লাতের তিনি সম্পদ রক্ষক;
আল্লাহ্ পাক তাকে সঠিক মুহূর্তেই সতর্ক করেছিলেন।"

২. দ্বিতীয় দলের মতে, তাঁর আসল সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক কাজ ছিল এই যে, তিনি তরীকতের উপর শরীয়তের অগ্রাধিকার ও প্রাধান্যকে এমন প্রত্যয় ও আস্থার সাথে পর্যবেক্ষকসুলভ ও অভিজ্ঞ ভঙ্গীতে এতটা জোরের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে বিবৃত করেছেন যা তাঁর পূর্বে আর কেউ করেন নি। এর ফলে তরীকত যে শরীয়তের অনুগত ও খাদেম তা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে যায়। সূফী ও তরীকতপন্থী কোন কোন মহলে তরীকত শরীয়তের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত—এরূপ ধারণার ফলে কোথাও কোথাও শরীয়ত থেকে বিচ্যুতি, রিয়াযত ও মুজাহাদা (কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনা) ও বাতেনী অনুভূতি ও শক্তির উপর পরিপূর্ণ নির্ভরতার যে ফেতনা শুরু হয়ে গিয়েছিল (যোগ ও সন্ন্যাসবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হবার কারণে) ভারতবর্ষ ছিল যার সর্বাপেক্ষা বড় টার্গেট, তা থেমে যায়। এরপর আর কারুর পক্ষে পষ্টাপষ্টিভাবে একথা বলার হিম্মত

হয়নি যে, "শরীয়ত ও তরীকত সম্পূর্ণ পৃথক দু'টি বস্তু এবং তরীকতের উপর শরীয়তের পাহারাদারী চলবে না"।

৩. তৃতীয় দল যারা মনে করেন যে, তিনি "ওয়াহ্দাতু'ল-ওজুদ"-এর 'আকীদা ও মতবাদের উপর এমন কার্যকর আঘাত হানেন যে, তাঁর পূর্বে অপর কেউ আর এমন আঘাত হানতে পারে নি। অতঃপর তিনি এর ক্রমবর্ধমান সয়লাবকে থামিয়ে দেন বরং এর গতিমুখকে পাল্টে দেন যা শেষ শতাব্দীগুলোতে গোটা 'ইলমী ও আধ্যাত্মিক জগতকে আপন আয়ত্ত্বে নিয়ে এসেছিল এবং যার বিরুদ্ধে লেখাপড়া জানা কোন মানুষের পক্ষে মুখ খোলা ও স্বীয় মুর্খতার প্রমাণ দেওয়া ও রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে-দুপুরে দাঁড়িয়ে দিনকেই অস্বীকারের নামান্তর ছিল। মওলানা সায়্যিদ মানাজির আহসান গীলানী মরহুম তদীয় هزاره دوم یا الف ثانی کا تجدیدی کارنامه নামক বিখ্যাত নিবন্ধে যথার্থই বলেছেন ঃ

"ওয়াহ্দাতু'ল-ওজুদ ও ওয়াহ্দাতুশ-শুহূদ-এর শাস্ত্রীয় আলোচনা-সমালোচনা কিংবা শরীয়ত ও তরীকতের মোল্লা ও সূফীসুলভ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভেতর হযরত শায়খ আহমদ ফারূকী সরহিন্দী (র)-এর প্রকৃত সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক কর্মকাণ্ড এমনভাবে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে যে, আজ হযরত (কু. সি. আ) কে 'মুজাদ্দিদ আলফেছানী' বলা একটি প্রথাগত ব্যাপার ছাড়া বাহ্যত এর আর কোন সঙ্গত ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না।"[১]

নবূওতে মুহাম্মদীর চিরন্তনতা ও প্রয়োজনীয়তার উপর আস্থা পুনর্বহাল

কিন্তু বাস্তবে মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র আসল কৃতিত্ব যার আলোক-প্রভায় তাঁর সমগ্র সংস্কার ও পুর্ণজাগরণমূলক কর্মকাণ্ড সচল ও সজীব দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাঁর তাজদীদ-এর মূল উৎস যা থেকে তাঁর গোটা বিপ্লবী ও সংস্কারমূলক কাজের স্রোতধারা উৎসারিত হয় এবং স্রোতস্বিনীতে পরিণত হয়ে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রবাহিত হয় তাহল নবুওতে মুহাম্মদী-এর চিরন্তনতা ও অপরিহার্যতার উপর মুসলিম উম্মাহ্র বিশ্বাস ও আস্থা পুনর্বহাল ও দৃঢ়করণ এমন এক পুণর্জাগরণমূলক ও বিপ্লবাত্মক অবদান যা তাঁর পূর্বে এত বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট সামর্থের সঙ্গে অপর কোন মুজাদ্দিদ আনজাম দেন নি। সম্ভবত আনজাম না দেবার কারণ এও যে, সে যুগে এর প্রয়োজনীয়তাই দেখা দেয় নি অথবা এর বিরুদ্ধে কোন সুসংগঠিত আন্দোলন কিংবা দর্শন সামনে আসে নি।[২]

১. তাযকিরায়ে ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ আলফেছানী, মওলানা মনজুর নু'মানীকৃত, ২৭ পৃ.।

২. এব্যাপারে সর্বাধিক সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র কাছে পাওয়া যায়। বিশেষত তাঁর النبوات نقض المنطق والرد على المنطقيين নামক এতদসম্পর্কিত গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু এগুলোও ইশারা-ইঙ্গিত ও মোটামুটি আলোচনার বেশি এগোয় নি।

এই সংস্কার ও পুণর্জাগরণমূলক নীতি ও পদক্ষেপের মাধ্যমে ঐ সমস্ত ফেতনার মূলোৎপাটন ঘটে যা সেই সময় মুসলিম বিশ্বে মুখ ব্যাদান করে ইস-লামের পবিত্র বৃক্ষের এবং তাঁর গোটা 'আকীদাগত, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবস্থাকে গিলে খাবার জন্য তৈরী ছিল। এসবের মধ্যে ইরানের নুকতাবী আন্দোলন এবং তার সমর্থক অনুসারীরাও শামিল যারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবূওত এবং তার স্থায়িত্ব ও চিরন্তনতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছিল এবং যারা ঘোষণা করেছিল যে, নবূওতে মুহাম্মদীর এক সহস্র বছর পূর্তি হল, এখন ধর্মীয় নেতৃত্ব ও জীবনের নতুন পুনর্গঠন ও আইন প্রণয়নের এমন এক যুগ শুরু হতে যাচ্ছে যার বুনিয়াদ হবে বুদ্ধিবৃত্তি ও দর্শনের উপর, যার নেতৃত্ব থাকবে মাহমুদ পীস খাওয়ান ও তার দলের হাতে আর যার কেন্দ্র হবে ইরান ও ভারতবর্ষ।[১] এসব ফেতনার মধ্যে সম্রাট আকবরের দীন-ই আকবরী (ইতিহাসে 'দীন-ই ইলাহী নামে পরিচিত।—অনুবাদক) ও 'আঈন-ই জাদীদও অন্তর্ভুক্ত যা ভারতবর্ষে নবূওত ও শরীয়তে মুহাম্মদীর স্থান দখল ও এর বিকল্প হবার দাবীদার ছিল। ধর্মীয় জীবন-যিন্দেগী, ইবাদত ও আমল এবং সমাজ ও সংস্কৃতির সেই সব ধর্মীয় বিদ'আতও এর অন্তর্গত যা একটি সমান্তরাল শরীয়ত হতে যাচ্ছিল এবং যার একটি স্থায়ী ফিক্হ বা আইন শাস্ত্র প্রণীত ও সংকলিত হচ্ছিল আর তাও বস্তুতপক্ষে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-র সমাপ্তির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ ও শরঈ আইন প্রণেতার দাবীদার ছিল।

এক্ষেত্রে ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ-এর দর্শনও এসে যায় যার ভিত্তি ছিল স্বীয় দাঈ ও পতাকাবাহীদের কথিত উক্তি মাফিক কাশ্‌ফী হাকীকতের উপর এবং যে দর্শন সম্পর্কে এর চরমপন্থী অনুসারীও একথা দাবী করে না যে, খাতামান্নাবিয়্যীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) এ দর্শন প্রকাশ্যে প্রচার করেছেন, তিনি সাহাবায়ে কিরাম (র) এবং সাহাবায়ে কিরাম (র) পরবর্তী লোকদেরকে এর প্রতি দাওয়াত জানিয়েছেন। এই দাওয়াত ও দর্শনও নবূওতের পেশকৃত দাওয়াত ও তার সুস্পষ্ট শিক্ষামালা এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের (জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে) প্রতিপক্ষে পরিণত হতে চলেছিল এবং এক্ষেত্রে তার যতটুকু সাফল্য অর্জিত হত, এর মূল দিল ও দিমাগে তথা মন-মস্তিষ্কে ও মুসলিম সমাজ দেহে গেঁথে যেত ততই আহকাম-ই শারী'আত তথা শরীয়তের বিধি-বিধানসমূহের উপর আমল করা, ইসলামই যে একমাত্র সত্য ধর্ম ও মুক্তি লাভের মাধ্যম এই বিশ্বাসে দুর্বলতা দেখা দিত এবং ধর্মদ্রোহিতা, বল্গাহীন স্বাধীনতা, কোন কিছুই দোষনীয়

১. পুস্তকের ১ম অধ্যায়, দশম শতাব্দীর বড় ফেতনা দ্র.।

নয় বরং সব কিছুই বৈধ—এই মানসিকতা, আমল অপ্রয়োজনীয় ইত্যাদি রকমের ধারণার রাস্তা খুলে যেত, চাই কি এর সতর্ক ও পরহেযগার কথক সূফী-মাশায়েখ স্বয়ং শরীয়তের যতই পাবন্দ হোন, তিনি নিজে শরীয়তের প্রতি যতই কেন শ্রদ্ধাশীল না হোন এবং এই কর্মপন্থার তিনি যত বিরোধীই কেন না হোন।

এ প্রসঙ্গে ইমামিয়া ফের্কার কথাও এসে যায় যাদের বুনিয়াদী আকীদা-সমূহের মধ্যে ইমামতের 'আকীদাও রয়েছে, যারা ইমামতের এমন তা'রীফ করে থাকে এবং তাঁর এমন সব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেয় যা তাকে প্রায় নবীর সমপর্যায় ও সমকক্ষে পরিণত করে।[১] ঠিক তেমনি সাহাবা-ই কিরাম (রা)-এর এক বিরাট সংখ্যক জামা'আত সম্পর্কে এমন সব অভিমত পোষণ করে যদ্বারা নববী সত্তার সাহচর্যের প্রভাব, তাঁর বিপ্লবাত্মক ও রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার উপর কলংক আরোপিত হয় এবং যা هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِه وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে এক জনকে পাঠিয়েছেন রসূলরূপে যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াত, তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত)-এর পরিপন্থি। এই ফের্কার প্রভাব বিভিন্ন রাজনৈতিক ও জ্ঞানগত কারণে ভারতবর্ষে তখন দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করছিল এবং মুসলিম সমাজ (যার অধিকাংশই সুন্নী[২] আকীদায় বিশ্বাসী) তাদের আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা ও আচার-অভ্যাস দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হচ্ছিল।

---

১. ইমামিয়া ফের্কার নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ থেকে "ইমাম" সম্পর্কে যা কিছু প্রমাণিত হয় তার সার-সংক্ষেপ এই: ইমাম গোপন ও প্রকাশ্য সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত (নিষ্পাপ) ও পাক-পবিত্র হয়ে থাকেন। তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ বাধ্যতামূলক (ফরয) হয়ে থাকে। তাঁর হাতে মু'জিযা প্রকাশিত হয়। তিনি শরীয়ত সম্পর্কিত গভীর জ্ঞান (কোন কিছুই যার আওতাবহির্ভূত নয়) 'ইলমে লাদুন্নী হিসাবে পেয়ে থাকেন যা কিয়ামত অবধি আল্লাহ্র দলীল হিসাবে প্রতিটি যুগেই প্রকাশ পাবে (আশ-শরীফ আল-মুরতাদাকৃত কিতাবু'শ-শাফী, তূসী কৃত তালখীসু'শ-শাফী ও আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ হুসায়ন আল-কাশিফুল-গিতা' কৃত আসলু'শ-শী'আ ওয়া উসূলুহা থেকে উদ্ধৃত)।

২. আল্লামা মুহাম্মদ আবূ যুহরা তদীয় তারীখু'ল-মাযাহিবিল-ইসলামিয়া (১ম খণ্ড) নামক গ্রন্থে ঐ সব উক্তির পর্যালোচনা পেশ করতে গিয়ে বলেন: ইমামিয়া ফের্কার সমস্ত আলিম এবিষয়ে একমত যে, তাদের নিকট ইমামের মর্তবা নবীর মর্তবার কাছাকাছি। এব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। তিনি এও বিশ্লেষণ করেছেন وصى ও নবীর মধ্যে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, وصى -এর উপর ওয়াহী আসেনা (পৃ. ৫৯)।

এভাবেই তিনি নবূওতে মুহাম্মদীর উপর ঈমান ও আস্থার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে গ্রীক ও ইরানী দর্শন এবং মিসরীয়[১] ও ভারতীয় মরমীবাদী ভাবধারা থেকে উদ্ভাবিত সেই সব ভারী ও জটিল তালা খুলে দেন। একটি তীরের আঘাতেই তিনি সেই সব ফেতনার নির্মূল ঘটান মুসলমানদের প্রতিভাবান শ্রেণী যার শিকারে পরিণত হয়েছিল।

আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

মুজাদ্দিদ সাহেবের সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক অবদান হল, তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞামূলক এই উভয় জ্ঞানই যে বুদ্ধি বহির্ভূত জ্ঞান, আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাত তথা সত্তা ও গুণাবলীর সঠিক পরিচিতি, সন্দেহাতীত জ্ঞান এবং অকাট্যভাবে প্রমাণিত সত্যের নিশ্চিত উপলব্ধি থেকে অক্ষম তা তিনি প্রমাণ করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, এই উভয় উৎস থেকে অর্জিত ও লব্ধ জ্ঞান সন্দেহ ও সংশয়, ভূল-ভ্রান্তি, পদস্খলন ও ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত নয়। আল্লাহ্‌র সঠিক জ্ঞান ও যথার্থ পরিচিতি কেবল নবীগণের মাধ্যমেই লাভ করা যায়। যে রকম বুদ্ধির মর্যাদা অনুভূতি ও কল্পনার ঊর্ধ্বে তেমনি নবূওয়তের মর্যাদা বুদ্ধির উপর। আল্লাহ্‌র তা'জীম ও তাকরীম তথা তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান ও ইবাদতের নির্ভুল পন্থা সম্পর্কে অবহিতি নবূওয়তের উপর এবং নবীদের প্রদত্ত তথ্য ও শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। গ্রীক দার্শনিকগণ আল্লাহ্‌র সত্যিকার প্রকৃতি ও গুণাবলী সম্পর্কে সাংঘাতিক হোঁচট খেয়েছেন ও মারাত্মক ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন এবং হাস্যকর রকমের শিকার হয়েছেন। এজন্যই তা হয়েছে যে, যেমন বিশুদ্ধ ও নির্ভুল জ্ঞান-বুদ্ধি বলতে কিছু নেই এবং তেমনি খাটি ও নির্ভেজাল কাশ্‌ফ তথা আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞা বা intuition (যা অভ্যন্তরীণ কামনা-বাসনা ও বাইরের প্রভাব থেকে নিরাপদ) অত্যন্ত দুরুহ বরং দুষ্প্রাপ্য গুণ। মরমীবাদী ও দিব্যজ্ঞানিগণও দার্শনিকদের মতই হোঁচট খেয়েছেন এবং অনুমান, কষ্ট-কল্পনা ও মূর্খতার শিকার হয়েছেন। বুদ্ধি ও দিব্য জ্ঞান দুটো নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জন (য়াকীন) ও আল্লাহ প্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট নয়। এর অর্থ এই যে, কেবল নবূওয়তই আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাত এবং তাঁর বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভের একমাত্র মাধ্যম।

মুজাদ্দিদ আলফেছানী আরও ঘোষণা করেন যে, খাটি ও নির্ভেজাল জ্ঞান-বুদ্ধি কষ্ট-কল্পনার ন্যায় অসম্ভব এবং তা অন্তর্গত বিশ্বাস ও স্বীকৃত বিষয়াদি এবং বাইরের বিভিন্ন উপাদান ও প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এর বহু সিদ্ধান্ত ও

১. মিসর নব্য প্লেটোবাদের বিরাট কেন্দ্র ছিল যেখানে Polotinus Parphyry, Proclus প্রমুখের জন্ম হয় এবং নব্য প্লেটোবাদ নামে এক নতুন ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

ফলাফল ঐ সব বাইরের রঙ দ্বারা রঞ্জিত ও মিশ্রিত হয়ে সামনে আসে যা তার ভেতর ও বাইরে পাওয়া যায়। তিনি প্রমাণ করেন যে, বুদ্ধিবৃত্তি পরম সত্য আবিষ্কারের একটি ত্রুটিপূর্ণ মাধ্যম। পূর্ণ দলীল একমাত্র নবীদের নবূওয়ত আর নবূওয়ত ব্যতিরেকে প্রকৃত আত্মশুদ্ধি আদৌ সম্ভব নয়।

তিনি আত্মশুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিশুদ্ধির মধ্যে একটি পার্থক্য রেখা টেনেছেন এবং উভয়ের পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, আম্বিয়া-ই কিরাম-এর রিসালতের সত্যতা সমর্থনকারিগণ তাদের বিশ্বাসের পক্ষে প্রচুর যুক্তি রাখেন। আম্বিয়া-ই কিরাম প্রদত্ত তথ্যকে আপন বুদ্ধিবৃত্তির অধীনে সংস্থাপন করা নবূওয়ত অস্বীকৃতির নামান্তর। তিনি এই বিষয়টিও সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেন যে, জ্ঞান-বুদ্ধির বিরোধী হওয়া এক কথা আর এর আওতাবহির্ভূত হওয়া ভিন্ন কথা।

মুজাদ্দিদ সাহেবের বুদ্ধি ও স্বজ্ঞা-নির্ভর গবেষণাপ্রসূত বিপ্লবী সিদ্ধান্ত যার ভেতর ঐশী সমর্থন ও নবূওয়তের প্রদীপ্ত শিখা থেকে লব্ধ আলো অন্তর্গত, জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী, চিন্তা-চেতনার নতুন দ্বার উন্মোচনকারী, বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞান জগতের বহু সমকালীন মুদ্রাকে জাল প্রতিপন্নকারী, নবূওয়ত ও আসমানী শরীয়তের সত্যতা ও মর্যাদা ঘোষণাকারী ও ঐসবের উপর আবার গোড়া থেকে আস্থা পুনঃস্থাপনকারী জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং এমন এক সংস্কারমূলক ও বিপ্লবাত্মক জ্ঞানগত ও গবেষণাধর্মী কৃতিত্ব যা এককভাবে সে সময়কার শিক্ষাব্যবস্থা, জ্ঞানগত পরিবেশ ও মস্তিষ্কজাত প্রয়াস ও সাধনার ফল হতে পারে না। এজন্য যে, এর ভেতর এমন সব কথা বলা হয়েছে যার ভেতর থেকে কতকগুলো দর্শন ও চিন্তার জগতে শতাব্দীর পর পৌঁছেছে এবং যার সত্যতার উপর শেষাবধি জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সত্যতার সীলমোহর মেরে দিয়েছে। এ কেবল ঐশী সাহায্য ও মদদ এবং রব্বানী হেদায়েত তথা পথ-নিদের্শনার ভ্রূভঙ্গ ইঙ্গিত ছিল যা তাঁকে হি. দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সূচনায় দীন-ধর্মের সংস্কার ও পুনর্জাগরণ এবং নবূওত ও শরীয়তে মুহাম্মদীর প্রতিরক্ষার জন্য নির্বাচন করে, ছিল সেই ইখলাস (নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা), ধর্মীয় মর্যাদাবোধ এবং রসূলুল্লাহ (সা)-এর পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের ফয়েয যার উপর তিনি প্রথম থেকেই পথ চলা শুরু করেছিলেন।

এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ এবং এই সব ইশারা- ইঙ্গিতের স্পষ্টতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য সেই পটভূমি ও অবস্থা অনুধাবন করা প্রয়োজন যেখানে এই সব গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের মর্যাদা ও মূল্য পুরোপুরিভাবে উদ্ভাসিত হবে।

কিছু মৌলিক প্রশ্নমালা ও তার জওয়াব

দীন ও দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক প্রশ্ন যার সঠিক উত্তরের উপর এই জীবনের সংশোধন ও বিশুদ্ধ ব্যবস্থাপনা এবং পারলৌকিক জীবনের নাজাত তথা মুক্তি নির্ভর করে—তা এই যে, এই পৃথিবীর স্রষ্টা কে? তাঁর গুণাবলী কি? আমাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি? আর আমাদেরই বা তাঁর সঙ্গে কী ও কেমন সম্পর্ক হওয়া দরকার? তাঁর পসন্দনীয় ও আনন্দের বস্তুই বা কী এবং অপসন্দনীয় ও অসন্তোষের জিনিষই বা কী? এই জীবনের পর আর কোন জীবন আছে কি? যদি থাকে তাহলে তার প্রকৃতি কি এবং তার জন্য এই জীবনে দিক-নিদের্শনাই বা কী?

এই সব প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার যাত, সিফাত (সত্তা ও গুণাবলী) ও আফ'আল (কর্ম), জগতের নিত্যতা ও অনিত্যতা তথা নশ্বরতা ও অবিনশ্বরতা, পরলোক, জান্নাত, জাহান্নাম, ওয়াহী ও ফেরেশতাদের অস্তিত্বের আলোচনা এবং এমন সব অধিবিদ্যামূলক আলোচনা এসে যায় যা যে কোন ধর্ম ও আদর্শের মৌলিক দিকের অন্তর্গত।

এসব প্রশ্নের উত্তর এবং এসব সমস্যার সমাধান মানুষ দু'ভাবে দিতে চেষ্টা করেছে। তন্মধ্যে একটি বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে, দ্বিতীয়টি দিব্যজ্ঞান বা ঐশ্বরিক জ্ঞানের পথে। প্রথমটিকে আমরা দর্শন বলি আর দ্বিতীয়টিকে বলি মরমীবাদ (اشراقی تصوف)।

কিন্তু মৌলিকভাবে এই দু'টো পদ্ধতিই ভুল এবং তা কতকগুলো প্রাথমিক ভুল ধারণার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। আমরা এগুলো ভূমিকা হিসাবে মুজাদ্দিদ (র)-এর মকতূবাত থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে কিছুটা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহকারে পেশ করা সমীচীন মনে করি।

অবিমিশ্র যুক্তিবুদ্ধি ও নির্ভেজাল কাশ্ফ (তন্ময়তাপূর্ণ প্রেরণা)-এর সমালোচনা

বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে সর্বাগ্রে একথা মনে রাখতে হবে যে, সে তার প্রকৃতিগত দায়িত্ব পালন যেমন জানা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল নয়, সে তার থেকে কমতর বস্তুর মুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল। অনুভূতি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে অন-অনুভূত ও অজ্ঞাত বস্তুর ইল্ম হাসিল তথা জ্ঞান লাভ স্বীয় জ্ঞান-ভাণ্ডার এবং সূচনা ও ভূমিকার সাহায্যে এবং তা ইল্মী উপায়ে বিন্যস্ত করত সে এই পর্যায়ে গিয়ে পৌছে যা তার তখন

অবধি অর্জিত ছিল না। একথা ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত হতে পারত না। সমস্ত বোধগম্য বস্তু-নিচয়ের মিশ্রণ ও হজম এবং সে সবের পর্যালোচনা থেকে এ সত্যই ফুটে উঠবে যে, বুদ্ধিবৃত্তি ঐ সব সত্য ও বাস্তবতা এবং উন্নত জ্ঞান অবধি এই সব অনুল্লেখ্য অনুভূতি ও প্রাথমিক উপলব্ধিজাত জ্ঞানের সাহায্যেই পৌঁছেছে যা কোন বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানগত বিচার-বিশ্লেষণ ও বিন্যাস ছাড়াই ঐ বিরাট পরিণতি ও ফলাফল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না।

অনন্তর এটা সুস্পষ্ট যে, যেখানে মানুষের অনুভূতি ও সাংবেদনিক ইন্দ্রিয়সমূহ একেবারেই অসহায়, যেখানে তার নিকট জ্ঞানের আদৌ কোন উপায়-উপরকরণই নেই এবং যার প্রাথমিক উপাত্ত থেকেও সে বঞ্চিত, যেখানকার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তার কোন ধারণা ও অভিজ্ঞতাই নেই এবং যেখানে ধা-রণা কিংবা অনুমানের ভিত্তিই বর্তমান নেই সেখানে তার বুদ্ধিবৃত্তি ও মেধা, তার ধারণা কিংবা অনুমান কী করতে পারে? সেখানে তার জ্ঞান-বুদ্ধি তেমনি অসহায় যতখানি অসহায় একজন নৌকা ব্যতিরেকে সমুদ্র পাড়ি দেবার ক্ষেত্রে এবং এরোপ্লেন ব্যতিরেকে মহাশূন্য পাড়ি দেবার বেলায়। একজন লোক যতই মেধার অধিকারী হোক না কেন—সংখ্যা জ্ঞান ব্যতিরেকে তার পক্ষে অংক কিংবা বীজগণিতের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। যেই ব্যক্তি কোন ভাষার অক্ষর জ্ঞান শেখেনি এবং যে উক্ত ভাষার বর্ণমালা সম্পর্কে অজ্ঞ সে যতই মেধা ও প্রতিভার অধিকারী হউক না কেন এবং সে হাজার রকমের বুদ্ধি খাটাক, সহস্র প্রকার কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় নিক এবং যতই মাথার ঘাম পায়ে ঝরাক—উক্ত ভাষার একটি লাইনও পাঠ করতে সে সক্ষম হবে না। ঠিক তেমনিভাবে উল্লিখিত সমস্যার সমাধান কেবল জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যেও হতে পারে না। কেননা এর প্রাথমিক সুত্র বা উপাত্ত তো মানুষের লব্ধ নয় আর এক্ষেত্রে কষ্ট-কল্পনা কিংবা অনুমান-আন্দাজেরও কোন সুযোগ নেই।

আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির শক্তি ও কার্যকারিতার একটি সীমা রয়েছে, একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মাঝে সে গণ্ডিবদ্ধ যার বাইরে সে যেতে পারে না। সেরকম মানব ইন্দ্রিয়ের আলাদা আলাদা গণ্ডি রয়েছে এবং এর কার্যকারিতা এসবের ভেতর সীমাবদ্ধ। দর্শন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে হাজারো রকমের দর্শনীয় বস্তু দেখা যেতে পারে, কিন্তু এর দ্বারা একটি শব্দও শোনার কাজ চলে না। অপরাপর ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। এরপরও নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি ও কার্যকারিতা আপনাপন ক্ষমতা ও গণ্ডির মধ্যেও সীমাহীন নয়।

তেমনি বুদ্ধি যদিও ঐ সব বাহ্যেন্দ্রিয়ের ভেতর অধিকতর বিস্তৃত তথাপি তা সীমাবদ্ধ। ইব্ন খালদূনের ভাষায় ঃ

"বুদ্ধি বা বুদ্ধিবৃত্তি একটি নির্ভুল তুলাদণ্ড। তার সিদ্ধান্ত নিশ্চিত ও নির্ভুল। কিন্তু তুমি যদি এই তুলাদণ্ডে তাওহীদ, আখেরাত, নবূওয়ত, সিফাত-ই ইলাহী তথা ঐশী গুণাবলী এবং সেই সব বিষয় যা বুদ্ধির উর্ধ্বের সত্য মাপতে চাও তবে তা মাপতে পারবে না, মাপতে গেলে তা হবে পণ্ডশ্রম মাত্র। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, এক ব্যক্তির সোনা মাপার তুলাদণ্ড দৃষ্টে সেই তুলাদণ্ডে পাহাড় মাপার সাধ জাগল। আর এতো জানা কথা যে, সোনা মাপার যন্ত্রে পাহাড় মাপা আদৌ সম্ভব নয়। অবশ্য এর দ্বারা তুলাদণ্ডের যথার্থতার ব্যাপারে আদৌ কোন সন্দেহ জাগছে না। কেননা সব কিছুরই একটা সীমা আছে। অদ্রূপ বুদ্ধির কর্মক্ষমতারও একটা সীমা আছে যার বাইরে সে যেতে পারে না। সে আল্লাহ্র যাত ও সিফাত তথা তাঁর সত্তা ও গুণাবলী বেষ্টন করতে পারে না। কেননা বুদ্ধি তাঁর অস্তিত্বের একটি ক্ষুদ্র অণু মাত্র।"[১]

তৃতীয় কথাটি এই যে, বুদ্ধির মধ্যে পরিপূর্ণ অবিমিশ্রতা এবং এর সিদ্ধান্ত ও ফলাফলসমূহের ভেতর পূর্ণ নিরপেক্ষতা রক্ষা খুবই কঠিন। সত্যানুসন্ধানিগণ জানেন যে, নির্ভেজাল বুদ্ধিবৃত্তি ও একক বুদ্ধি থেকে অধিক দুর্লভ গুণসম্পন্ন বস্তু দুনিয়ার বুকে মেলা ভার। আবেগ-উদ্দীপনা ও কামনা-বাসনা,পরিবেশ, বিশেষ তা'লীম ও তরবিয়ত, নির্দিষ্ট আকীদা-বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি, খেয়ালী কল্পনা ও ভুল-ভ্রান্তির প্রভাব থেকে সে খুব কমই মুক্ত হয়ে থাকে। আর এজন্যই তার সিদ্ধান্তের ভেতর সব সময় অকপটতা ও বিশ্বস্ততা এবং তার ফলাফলের ভেতর অকাট্যতা সৃষ্টি হওয়া এতটা সহজ ও সাধারণ নয় যতটা মনে করা হয়।

কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, দাশনিকগণ ঐ সমস্ত সত্যকে উপেক্ষা করে আপন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণে ভুলের শিকার হয়েছেন এবং আল্লাহ্র যাত ও সিফাত তথা আল্লাহ্র সত্তা ও তাঁর গুণাবলী এবং তৎসম্পর্কিতের উপর কোনরূপ সামান-আসবাব ছাড়াই এবং কোন জ্ঞান ও আলো ছাড়াই এমন বিস্তারিত ও সূক্ষ্ম এবং এমন আস্থা ও বিদ্যাবত্তার সঙ্গে আলোচনা করেছেন যা একজন রসায়নবিদ তার রাসায়নিক পরীক্ষা-নীরিক্ষা সম্পন্ন করার পর করে থাকেন। তাঁদের এই আলোচনা ও গবেষণা সমগ্রটাই আন্দাজ-অনুমান ও খেয়ালী- কাল্পনিক রহস্যের সংমিশ্রণ এবং কল্পনার পর কল্পনাই যার ভিত্তি। এ ঐশী দর্শনের এমনই এক কাল্পনিক রূপকাহিনী যার কিছু নমুনা সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে পাওয়া যাবে।

১. মুকাদ্দিমা ইবন খলদূন, ৪৭৩ পৃ।

এই বুদ্ধিবৃত্তিবাদ ও দর্শনের মুকাবিলায় জ্ঞান আহরণের আরেকটি প্রয়াস রয়েছে যার নাম দিব্যজ্ঞান (Theosophy)। এর মূলনীতি হল এই যে, পরম সত্য ও নিশ্চিত জ্ঞান (হক ও য়াকীন)-এর অবহিতি লাভের জন্য বুদ্ধি, জ্ঞান ও দলীল-প্রমাণ উপকারী ও ফলপ্রসূ নয় বরং তা ক্ষতিকর। পরম ও নিশ্চিত সত্যের যথার্থ জ্ঞান লাভের জন্য মুশাহাদা তথা পরম সত্যের দর্শন ও পর্যবেক্ষণ শর্ত। আর এই মুশাহাদা কেবল তখনই সম্ভব যখন আধ্যাত্মিক আলো (نور باطنى), আত্মার পরিচ্ছন্নতা এবং এক অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় শক্তিকে জাগ্রত করা যাবে যা আধ্যাত্মিকতা ও ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু তেমনি উপলব্ধি ও অনুভব করতে পারে যেভাবে এই বাহ্যিক চক্ষু বাহ্যিক বস্তুসমূহের অনুভব ও উপলব্ধি করতে পারে যখন বস্তুবাদকে একেবারে ধ্বংস এবং বাহ্যিক অনুভূতি শক্তিকে মুর্দা করে দেওয়া হবে। এই ভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞান (Cognition) কেবল অবিমিশ্র ও নির্ভেজাল বুদ্ধিবৃত্তি ও অভ্যন্তরীণ রৌশনীর (نور باطنى) মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব যা রিয়াযত, আত্মহনন, মুরাকাবা ও গভীর ধ্যানমগ্নতার দ্বারা সৃষ্টি হয়।

একথা ঠিক যে, মানুষের মধ্যে এই অভ্যন্তরীণ অনুভব ও বোধশক্তি বর্তমান। এধরনের অপরাপর শক্তিও তার মধ্যে থাকা সম্ভব। কিন্তু সে যাই হোক, এসবই মানবীয় বোধশক্তিই তো, ঠিক তেমনি দুর্বল ও সীমাবদ্ধ, ভুলে ভরা ও সহজে পরিবেশ-প্রভাবের শিকার। সে রকম মানুষের সমগ্র শক্তি, জ্ঞান প্রকাশের গোটা মাধ্যম,এর অনুভব ও পর্যবেক্ষণেও ভুল ও আত্মপ্রতারণা সংঘটিত হয় যেমন অপরাপর ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে হয়। যদি এমনটি না হত তাহলে দিব্যজ্ঞানী ও মরমীবাদীদের তন্ময়তাপূর্ণ স্বজ্ঞা এবং আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও বিশ্লেষণের ভেতর সেই সব বিরাট রকমের পারস্পরিক বৈপরিত্য ও মতানৈক্য দেখা দিত না এবং বড় বড় সমস্যার ক্ষেত্রে তাদের পদস্খলন ঘটত না ও তারা ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হতো না। আর এক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিম মরমীবাদীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।[১]

সে যাই হোক, বুদ্ধিবৃত্তির মত এই বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষেও নির্ভেজাল ও অবিমিশ্র হওয়া খুবই কঠিন। আর এর উপর বাইরের প্রভাব এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বস্তুর ছায়া ও প্রতিবিম্ব পড়ে। এ দর্পণও হাকীকত তথা যথার্থ ও বাস্তব সত্যের নির্ভুল চিত্র পেশ করেনা। দিব্যজ্ঞানী ও মরমীবাদীদের পরিবেশ, তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও অনুসিদ্ধান্তসমূহের এই প্রভাব তাদের পর্যবেক্ষণের উপর

---

১. বিস্তারিত উদাহরণের জন্য দ্র. গ্রন্থকারের "মাযহাব ও তামাদ্দুন' ("ধর্ম ও কৃষ্টি" নামে প্রকাশিত) নামক গ্রন্থের اشراقيت শীর্ষক ১ম অধ্যায়।

পড়ে। এটাই কারণ যে, বহু দিব্যজ্ঞানী ও মরমীবাদী দার্শনিক তাদের কাশ্‌ফ ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে এমন বহু ঐ সব গ্রীক ও মিসরীয় কল্পনা-বিলাস ও ধ্যান-ধারণার সমর্থন দেখতে পেত যার কোন মাথা-মুণ্ডু কিংবা হাত-পা ছিল না এবং এমন বহু কল্পনা বাস্তবরূপে চোখের সামনে ধরা দিত বাইরের জগতে কোথাও যার আদৌ কোন অস্তিত্বই নেই।[১]

অতঃপর উল্লিখিত প্রশ্নমালা যেমন দর্শনের বিষয়বস্তু ও সীমারেখা বহির্ভূত তেমনি তা বহির্ভূত দিব্যজ্ঞানের সীমারেখারও। এর দ্বারা কেবল আলমে আরওয়াহ্ (আত্মার জগত)-র গুঢ় রহস্য ও আশ্চর্য বিষয়সমূহের ভ্রমণ সম্পন্ন হয়, কিছু সূরত দৃষ্টিগোচর হয়, কিছু রঙ নজরে আসে, কিছু আওয়াজ শ্রুত হয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের বিস্তারিত জ্ঞান, তাঁর শরঈ কানূন, পারলৌকিক জগতের মনযিলসমূহ এবং এর অবস্থাদি সম্পর্কে তেমনি অজ্ঞ ও বেখবর যেমন অজ্ঞ ও বেখবর সাধারণ মানুষ।

বস্তুত দর্শন ও মরমীবাদের মধ্যে একই রূহ (প্রাণ) এবং একই মন-মানসিকতা কাজ করে। উভয়েই পরম সত্যকে পয়গম্বরদের সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়াই নিজেদের চেষ্টা-সাধনায় জানতে ও পেতে চায়। মনযিল উভয়েরই এক; পথ অতিক্রমের পন্থা তথা ভ্রমণের তরীকা ভিন্ন। একজন কল্পনার পাখায় ভর করে সেখানে পৌঁছুতে চায় আর অন্যজন কোন গোপন সুড়ঙ্গ পথে (আধ্যাত্মিক পন্থায়) সেখানে হাযির হতে চায়।

কিন্তু হাকীকত তথা বিমূর্ত ও পরম সত্তার জ্ঞান কেবল পয়গম্বরগণের মাধ্যমেই লাভ করা যেতে পারে যাঁদেরকে নবূওত ও রিসালত দ্বারা আল্লাহ পাক ধন্য করে থাকেন, অপর কোন মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। তাঁদেরকে (নবী-রসূলগণকে) তিনি তাঁর যাত ও সিফাত, আসমান ও যমীনের মালাকূত তথা যমীন ও আসমানের রাজত্বের সব চেয়ে বড় জ্ঞান দান করেন এবং আপন পসন্দ-অপসন্দ ও হুকুম-আহকাম-এর সরাসরি জ্ঞান দান করেন এবং তাঁদেরকে নিজের ও মানুষের মধ্যকার মাধ্যম বানান। তাঁদের নবুওত ও রিসালত দুনিয়ার জন্য আল্লাহ্‌র সবচে' বড় নে'মত। আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাতের আজীমুশ্-শান 'ইল্‌ম তাঁদের অনায়াসে ও বিনামূল্যে দান করেন। এর একটি কণাও সহস্র বছরের দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা ও অনুধ্যান, আলোচনা-পর্যালোচনা, দলীল-প্রমাণ এবং শতশত বছরের মুরাকাবা-মুজাহাদা ও আত্মশুদ্ধি দ্বারা অর্জন করা যেতে পারে না। "এ আমাদের ও লোকসকলের উপর আল্লাহ্‌র এক মহাঅনুগ্রহ, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।"

১. দ্র. প্রাগুক্ত।

একথা ঠিকই বলেছেন যে, "কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না"। দার্শনিক ও মরমী জ্ঞানের অধিকারীরা এই নবুওতরূপী নে'মতের অমর্যাদা ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং সেই পরম সত্য অবধি তারা আপন শ্রম ও সাধনার মাধ্যমে পৌঁছুতে চায় যে বিষয়ে আল্লাহ পাক তাদেরকে বেনিয়ায ও মুক্ত রেখেছিলেন। হাজার বছরের সেই শ্রম ও সাধনার সেইসব পরস্পর-বিরোধী হাস্যকর উক্তি ও গবেষণা যা ঐশী দর্শনের পুঁজি এবং যারা নিজেদের ভক্ত-অনুরক্ত ও পদাংক অনুসারীদেরকে আল্লাহর নিকট সান্নিধ্যে নিয়ে যাবার ও তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত করবার পরিবর্তে আল্লাহ থেকে অধিকতর দূরবর্তী এবং তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে অপরিচিত, সম্পর্কচ্যুত ও মুক্ত করে দিয়েছে।

اَلَمْ تَرَى اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ-

"তুমি কি ওদেরকে লক্ষ্য কর না যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং ওরা ওদের কওমকে নামিয়ে আনে ধ্বংসের ময়দানে।" সূরা ইবরাহীম, ২৮ আয়াত;

হযরত মুজাদ্দিদ (র) দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা উভয়টির অলি-গলি ও অন্ধি-সন্ধি সম্পর্কে বেশ ভাল জানেন। অপর দিকে তিনি 'ইল্‌মে নবুওতের ওয়ারিছ এবং ওয়াহী ও রিসালতের মর্তবা সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল। তিনি দার্শনিক ও নব্য প্লেটোবাদীদের সেই কর্মপন্থা ও পদ্ধতির উপর বিরাট বিশেষজ্ঞসুলভ সমালোচনা করেছেন যা তাঁর সুবিপুল জ্ঞান ও গভীর বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক। এই আলোচনা তাঁর সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রীয় ও মৌলিক শাখা আর তা এই জন্য যে, গোটা শারী'আতে ইলাহী ও গোটা দীনী নিজাম তথা ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার বুনিয়াদ এই আলোচনার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে যে, অকাট্য জ্ঞান ও নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যম ও উৎস এবং মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার যাত ও সিফাত, আপন উদ্ভব ও পরিণতি এবং স্বীয় কল্যাণ ও মুক্তির সঠিক উৎস কি? তা কি চিন্তা-ভাবনা, জ্ঞানগত আলোচনা -সমালোচনা ও যুক্তি-তর্ক দর্শন যার প্রতিনিধিত্ব করে অথবা অভ্যন্তরীণ আলোক বিকীরণ, আত্মহনন, পরিশুদ্ধিকরণ, মনশ্চক্ষে পর্যবেক্ষণ ও এমন জ্ঞান যা গোপন ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে হাসিল হয়ে থাকে যাকে ঐশী ও মরমীবাদী দর্শন বলা হয় অথবা এতদুভয়ের বিপক্ষে আম্বিয়া 'আলায়হিমুস-সালাম-এর আনুগত্য অনুসরণ ও তাঁদের উপর ঈমান-এর দ্বারা? এটাই সেই সূচনা বিন্দু যেখান থেকে রাস্তা একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনটি ভিন্নমুখী পথের দিকে ধাবিত হয় এবং যা পরে আর কোথাও গিয়ে মিলিত হয় না।

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِه ذَالِكُمْ وَصّٰكُمْ بِه لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

"এবং এই পথই আমার সরল পথ, সুতরাং এরই অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এই ভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সাবধান হও।" সূরা আন'আম,১৫৩ আয়াত;

এই সূত্রে মুজাদ্দিদ সাহেব-এর কলম থেকে যেই দুর্লভ ও অমূল্য গবেষণা, উন্নততর জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান বের হয়েছে এবং তাঁর চিঠিপত্রের ভলিউম দফতরের মধ্যে যা ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে সে সবের তরজমা বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে পেশ করা হচ্ছে।

বুদ্ধিবৃত্তির সীমাবদ্ধতা এবং সার্বভৌম স্রষ্টার জ্ঞান

"আল্লাহ্ তা'আলার শোক্‌র যিনি আমাদেরকে অনুগৃহীত করেছেন, ইসলা-মের পথে পরিচালিত করেছেন এবং মুহাম্মদ মোস্তফা ('আলায়হি'স-সালাতু ওয়া'স-সালাম)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালাতু ওয়া'স-সালাম দুনিয়াবাসীর জন্য (আল্লাহ্‌র) রহমতস্বরূপ। কেননা হক সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ সমস্ত হযরতকে প্রেরণের মাধ্যমে আমাদের ন্যায় সীমিত ও স্বল্পবুদ্ধির লোকদেরকে এবং ভোতা উপলব্ধির অধিকারী মানুষগুলোকে স্বীয় যাত ও সিফাতের খবর দিয়েছেন এবং আমাদের বুদ্ধি যেই পরিমাণ ভোতা ও ক্ষুদ্র সেই পরিমাণ আপন সত্তা ও গুণাবলী (যাত ও সিফাত) সম্পর্কে অবহিত করেছেন, তাঁর পসন্দনীয় ও অপসন্দনীয় বস্তুসমূহকে পৃথক পৃথকভাবে এবং আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ- অকল্যাণ তথা লাভ-ক্ষতি বৈশিষ্ট্য সহকারে ফুটিয়ে তুলেছেন। যদি ঐ সমস্ত হযরতের মহান অস্তিত্ব আমাদের মাঝে না থাকত তাহলে মানবীয় বুদ্ধি এই বিশাল কারখানার যিনি স্রষ্টা তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে কষ্ট ও দুর্বিপাকে নিক্ষিপ্ত হ'ত এবং সেই পবিত্র সত্তার কামালাত তথা তাঁর শক্তি ও সামর্থ্যের পরিচয় উদঘাটন করতে ব্যর্থ হত। প্রাচীন যুগের দার্শনিকগণ যাঁরা তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধির কারণে নিজেদের সবচে' বড় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মনে করত, বিশ্বজাহানের স্রষ্টাকে অস্বীকার করত এবং আপন বুদ্ধির অভাব ও সংকীর্ণতার দরুন বস্তুসামগ্রীকে কালের দিকে সম্পর্কিত করত। আসমান-যমীনের স্রষ্টা সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গে নমরূদের বিতর্ক আলোচনা প্রসিদ্ধ। কুরআন মজীদেও এর উল্লেখ রয়েছে। হতভাগা

ফেরআওন বলত, مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ "মিসরবাসী! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন শাসক ও উপাস্য আছে বলে তো আমার জানা নেই।" অধিকন্তু সে হযরত মূসা (আ) কে সম্বোধান পূর্বক বলেছিল, لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ "হে মূসা! যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে শাসক ও উপাস্য মেনে নাও তবে অবশ্যই তোমাকে আমি কারাগারে পাঠাব।" হামানকে এই হতভাগাই বলেছিল, يَا هَامَانُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ط اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا "হামান! আমার জন্য একটি উঁচু প্রাসাদ নির্মাণ কর যাতে এতে আরোহণ করত আমি আসমানে উপনীত হতে পারি এবং উঁকি মেরে মূসার আল্লাহকে দেখতে পারি। আর আমিতো মূসার আল্লাহকে মিথ্যাই জ্ঞান করি।" মোটকথা এই যে, বুদ্ধি এই মহাসম্পদকে প্রমাণ করতে অক্ষম এবং ঐ সব আম্বিয়া-ই কিরাম (আ)-এর পথ-নির্দেশনা ছাড়া এই অমূল্য সম্পদের সন্ধান লাভে অসমর্থ।"[১]

আল্লাহ্‌র পরিচয়ের ক্ষেত্রে গ্রীক দার্শনিকদের নির্বুদ্ধিতা

সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা ও কুশলী ব্যবস্থাপকের অস্তিত্ব গ্রীক দাশনিকগণ যাঁকে 'আদি কারণ' (First Cause) নামে স্মরণ করে থাকেন এবং তাঁর কর্ম, সৃষ্টি ও সৃষ্টিজগতের অস্তিত্বে আসা সম্পর্কে ঐ সব দার্শনিক যেই বুদ্ধির ঘোড়া ছুটিয়েছেন ও কল্পনার পাহাড় গড়েছেন, তৈরী করেছেন কল্পনার আকাশচুম্বী প্রাসাদ সে সবের বিস্তৃত বিবরণ যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থে এবং ও সবের উপর আলোচনা-পর্যালোচনা ও সমালোচনা আকাইদ ও কালামশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থে দেখা যেতে পারে। এখানে সেসবের সুযোগ নেই।

কিন্তু হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর উন্নততর জ্ঞান অনুধাবনের জন্য এবং একথা জানার জন্য যে, ঐ সব কল্পনার ফানুস প্রত্যাখ্যানে, যা কেবলই গ্রীক মস্তিষ্ক-প্রসূত ও কল্পনা শক্তির আবিষ্কার-উদ্ভাবন, তাঁর লেখনী এত শক্তিশালী এবং তাঁর বর্ণনায় এতটা জোশ্ কেন সৃষ্টি হয়, সক্রিয় বুদ্ধি গ্রীক দার্শনিকদের নিকট, বস্তুত যা বিশ্বজাহানের ব্যবস্থাপক ও সৃষ্টিজগতের মধ্যে কার্যকর, বংশ-তালিকা পেশ করা হচ্ছে যা ঐ সমস্ত দার্শনিক ধারণা ও অনুমান করেছেন এবং যেসবের উপর তারা গোটা সৃষ্টি ও অনুজ্ঞা জগতের ভিত্তি স্থাপন করেছেন, তার এক একটি শব্দের উপর অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি-প্রমাণের বিরাট ফিরিস্তি পেশ করেছেন। কিন্তু এখানে সেসবের ভেতর থেকে কেবল তালিকা-সূচি পেশ করাকেই যথেষ্ট হবে বলে মনে করছি।

১. খাজা ইবরাহীম কুবাদয়ানীর নামে পত্র;

"আদি কারণ বা আদি সত্তা (স্বয়ম্ভু) যেহেতু সার্বিক বিষয়ে একজন এবং এটাও স্বীকৃত যে, এক থেকেই একের বহিঃপ্রকাশ বা নির্গমন ঘটতে পারে (একাধিক বা যৌগিক নয়)। অপর দিকে বিশ্বজগত বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণে গঠিত। সুতরাং আদি সত্তা বা কারণ থেকে এর নির্গমন বা অস্তিত্ব লাভ ঘটতে পারে না বরং তার অস্তিত্ব বা সত্তা থেকে তার সম্মতি, ইচ্ছা বা অবগতি ব্যতিরেকে প্রথম আক্ল, দার্শনিক মতে ফেরেশতা বা প্রধান ফেরেশতা জিবরীলের অভ্যুদয় এমনভাবে হল যেভাবে প্রদীপ হতে আলোর বিচ্ছুরণ (প্রকাশ) ঘটে এবং যেরূপ মানুষের ছায়া (তার ইচ্ছা ও অবগতি ব্যতীতই) অস্তিত্ব লাভ করে থাকে। প্রথম আক্ল (The universal spirit) এমন একটি সত্তা যা স্বীয় সত্তায় সত্তাবান। সে নিজে দেহ (জড়) নয় এবং অন্য কোন দেহও তার পাত্র (অবস্থান ক্ষেত্র) নয়। সে নিজ সত্ত্বা সম্বন্ধে অবহিত এবং নিজের 'সূচনাক্ষেত্র' (অস্তিত্ব সূত্র) সম্পর্কেও অবহিত। এখন তাকে ফেরেশতা নামে অথবা প্রথম আকল নামে কিংবা অন্য কোন নামে অভিহিত করা যায়। এর অস্তিত্ব দ্বারা তিনটি বিষয় অনিবার্য হয়ে পড়ে ঃ (১) দ্বিতীয় আকল, (২) আকল-সমূহের ঊর্ধ্বতম আকল (ফালাকুল আফ্লাক) (অথবা নবম আকল অথবা আরশে আজীম)-এর সত্ত্বা ও তার জড়দেহ। অতঃপর দ্বিতীয় আকল হতে অস্তিত্ব লাভ করেছে তৃতীয় আকল তথা (নক্ষত্রলোক) নক্ষত্র আকাশের সত্ত্বা ও তার জড় দেহ। অতঃপর তৃতীয় আকল হতে অস্তিত্ব লাভ করেছে চতুর্থ আকল তথা শনি আকলের (শনিলোক) (শনি -সৌরজগত) সত্ত্বা ও তার জড় দেহ। অতঃপর চতুর্থ আকল হতে অস্তিত্ব লাভ করেছে পঞ্চম আকল তথা বৃহস্পতি আকলের (বৃহস্পতিলোক) সত্ত্বা ও তার জড়দেহ। অতঃপর পঞ্চম আকল হতে অস্তিত্ব লাভ করেছে ষষ্ঠ আকল তথা মংগল আকলের (মংগল লোক) সত্ত্বা ও তার জড়দেহ। অতঃপর ষষ্ঠ আকল হতে অস্তিত্ব লাভ করে সপ্তম আকল তথা রবি-আকলের (রবিলোক) সত্ত্বা ও তার জড়দেহ। অতঃপর সপ্তম আকল হতে অস্তিত্ব লাভ করে অষ্টম আকল তথা শুক্র আকলের (শুক্রলোকের) সত্ত্বা ও তার জড়দেহ। অতঃপর অষ্টম আকল হতে অস্তিত্ব লাভ করে নবম আকল তথা বুধ আকলের (বুধলোক) সত্ত্বা ও তার জড় দেহ। অতঃপর নবম আকল হতে অস্তিত্ব লাভ করে দশম আকল তথা শনি (চন্দ্র) আকাশের (চন্দ্রলোকের) সত্ত্বা ও তার জড়দেহ। এটিই সর্বশেষ আকল এবং এই আকলকেই ফা'আল বা ক্রিয়াশীল (কর্মতৎপর, কর্মচঞ্চল = The active spirit) বলা হয়। এতে চন্দ্রলোকে কোন স্থিত দ্বারা 'অভ্যন্তর পূর্ণ' হওয়া অনিবার্য হল। এটি মূলত একটি জড় পদার্থ বিশেষ যা

কর্মতৎপর আকল ও শূন্যলোক (নিরীক্ষ)-সমূহের স্বভাবজাত ক্রিয়ার ফলে 'অস্তিত্ব ও বিনাশ'-কে গ্রহণ করে। এ ছাড়া গ্রহ-নক্ষত্রসমূহের আবর্তন প্রক্রিয়ার কারণও জড় পদার্থসমূহে বহুবিধ সংমিশ্রণ সৃষ্টি হয়, ফলে জন্ম লাভ করে খনিজ, উদ্ভিদ ও প্রাণীজ বস্তুসমূহ। মোটকথা, এ হচ্ছে (তথাকথিত দার্শনিকদের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত) দশ আকল (জড়দেহ মুক্ত= spirit) এবং নয় আকল (নিরীক্ষ বা 'লোক')।"

এ সব মূলত গ্রীক পণ্ডিতদের উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভট আবিষ্কার।.... মূলত এ সব (আজগুবি কাহিনী) হচ্ছে গ্রীক প্রতীমা-বিদ্যা, যা তারা 'দর্শন' ও ঐশী বিজ্ঞান নামে অভিহিত করেছে এবং মানুষ তা নিয়ে সতর্কতা ও সচেতনতার সংগে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা আরম্ভ করে দিয়েছে। অথচ এ সব হচ্ছে কাল্পনিক ও রূপকথা (যেমন বর্তমানে বৈজ্ঞানিক রূপকথা লেখা হয়)। এ প্রসংগে স্বতঃস্ফূর্তরূপে পবিত্র কুরআনের বাণী মনে পড়ে যায় ঃ ما اشهدتهم خلق

"আমি তো আসমান ও যমীন সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় এমন কি তাদের নিজেদের সৃজনপ্রক্রিয়ায়ও তাদের (স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীদের) সাক্ষী বানাইনি এবং ভ্রষ্টতা সৃষ্টিকারীদের তো আমি হাত-পা (সহায়ক)-রূপে গ্রহণ করি না (সূরা কাহফ, ৫১)।

ইমাম গাযালী (র) (উল্লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করার পর) যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, "এ সব নিছক দাবী ও আপনি মোড়ল জাতীয় সিদ্ধান্ত (যুক্তি-প্রমাণবিহীন উদ্ভট দাবী); বরং এ হচ্ছে 'আঁধারে আচ্ছাদিত (আঁধারের তলায়) আঁধার' (ظلمات فوق ظلمات) মাত্র। কেননা, কেউ যদি এটাকে তার দেখা স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলে দাবী করে তবুও তা হবে তার অসুস্থতা ও স্বভাব বিকৃতির প্রমাণ" (তাহাফতুল ফালাসিফা, পৃ. ৩০)।

অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "আমার প্রচণ্ড বিস্ময় জাগে যে, কোন উন্মাদ ব্যক্তিও কি করে নিজের এ মনগড়া বয়ানে তৃপ্ত হতে পারে? অথচ তারা 'বুদ্ধিজীবী' ও 'বিজ্ঞানী' নামধারী, যারা তাদের দাবী মতে বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়সমূহের চুলচেরা বিশ্লেষণে দক্ষতাবান" (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩)।

দার্শনিক প্রবরগণ আল্লাহ পাকের জন্য সমগ্র ও পরিপূর্ণতার গুণাবলী এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের সৃষ্টি করা অস্বীকার করে তাকে সম্পূর্ণ 'অথর্ব' (কর্মহীন) ও 'ইচ্ছাশক্তি বর্জিত' সাব্যস্ত করেছে এবং তাদের তথাকথিত দাবী মতে, এসব করেছে অনাদি একক সত্তা (ওয়াজিবুল ওয়াজূদ)-এর মাহাত্ম্য ও নিষ্কলুষতা বিধানের স্বার্থে। এ প্রসংগে ইমাম গাযালীর লেখনী স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে লিখেছেন—

"যারা আল্লাহ তা'আলার জন্য উল্লিখিত (কর্মবিহীন ও ইচ্ছাহীন সত্তা) হওয়ার মর্যাদা প্রদানে তুষ্ট তারা তো তাঁকে সেসব সত্তা হতেও তুচ্ছ সাব্যস্ত করল যার অন্তত নিজের অস্তিত্বের অনুভূতি রয়েছে। কেননা, যে নিজের ও অপরের অস্তিত্বের অনুভব করার ক্ষমতা রাখে সে মর্যাদায় ঐ সত্তার চেয়ে উন্নত হবে যার নিজের অস্তিত্বের অনুভূতি নেই। আল্লাহকে মহিমান্বিত করার এ উদ্ভট গবেষণা তাদের এ পর্যায়ে উপনীত করেছে যে, শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের সকল প্রচলিত ও সহজবোধ্য মর্ম ও ব্যাখ্যাকে তারা বাতিল করে দিয়ে তাকে এমন এক 'নির্জীব' বস্তুতে পরিণত করেছে দুনিয়ার (বিশ্বজগতের) কোথায় কি হচ্ছে সে সবের কিছুই যার জানা নেই। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, (মৃত ও নির্জীব তো নিজের খবরও রাখে না,) এ সত্ত্বা অন্তত নিজের খবর রাখে।

মূলত যারা আল্লাহর পথ হতে সরে যায় এবং হিদায়তের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পাশ কাটিয়ে যায় আল্লাহ তাদেরকে অনুরূপ শাস্তিই দিয়ে থাকেন। যারা আল্লাহর এ বাণী ঃ ما اشهدتهم আমি তো তাদের আসমান-যমীন সৃষ্টির সাক্ষী বানাইনি .... কে অস্বীকার করে, আল্লাহ সম্পর্কে যাদের ধারণা মন্দ, যারা মনে করে যে, বিশ্ব সৃজন ও প্রতিপালন (তথা আল্লাহর কাজ) -এর বাস্তবতা ও গভীরতা মানুষ তার বুদ্ধি বলে আয়ত্ত করতে সক্ষম, যারা নিজেদের বৃদ্ধিগর্বে গর্বিত, যারা এ ধারণা পোষণ করে যে, মানুষের যেহেতু জ্ঞান-বুদ্ধি রয়েছে সুতরাং নবীগণ ও তাঁদের বিশিষ্ট অনুসারীদের অনুসরণ করা আবশ্যকীয় নয়। এ সবের অনিবার্য পরিণতিই হচ্ছে এই যে, তারা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা ও উদ্ভাবন সম্পর্কে এ স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হল যে, কেউ তা তার দেখা স্বপ্নরূপে বর্ণনা করলেও তা কাল্পনিক ও বিস্ময়করূপ বিবেচিত হবে" (প্রাগুক্ত ৩১)।

এসব দেখার পরে (অর্থাৎ পৃথিবীর স্বঘোষিত বুদ্ধিমান, পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞানের এ দূরবস্থা প্রত্যক্ষ করার পর) রিসালাত নে'মতটির গুরুত্ব ও মূল্য উপলব্ধিতে আসে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيْ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ جَاءَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

'আমাদের কোন ক্ষমতা ও যোগ্যতা ছিল না হিদায়াত লাভের, যদি না আল্লাহ আমাদের পথ দেখাতেন; নিশ্চিতই আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ সত্য সহকারে (সত্য নিয়ে) এসেছেন।" অন্যথায় বুদ্ধি দিয়ে সত্যে উপনীত হওয়া আমাদের জন্য সম্ভব ছিল না। বস্তুত এ হচ্ছে 'বুদ্ধি'-র অসহায়ত্ব এবং ঐশী ও অতিজাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে (তথাকথিত) জ্ঞানধর, বুদ্ধিমান ও

পণ্ডিতদের (যাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা গণিত ও বাস্তব কর্ম সংক্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান যথা প্রকৌশল, রসায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সফল হলেও) চরম ব্যর্থতার শিক্ষণীয় নমুনা। কেননা, তারা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এমন সব বিষয় কিরূপে আরোপিত করল যেগুলো তাদের নিজেদের, এমনকি নিকৃষ্টতম সৃষ্টির জন্য আরোপ করতেও তারা সম্মত হবে না। কিরূপে তারা আল্লাহকে "অথর্ব, ইচ্ছাশক্তিবিহীন (নিরেট জড়) ও অবহিতিশূন্য সাব্যস্ত করল এবং এসব (অযোগ্যতা)-কেই তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের দাবিদার সাব্যস্ত করল? سبحان ربك পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা তোমার পালনকর্তার, যিনি ইজ্জতের মালিক, সে সব (অযোগ্যতা) হতে যা তারা আরোপ করে। শান্তি ও নিরাপত্তা রাসূলগণের জন্য (নিবেদিত)। সমস্ত প্রশংসা রাব্বুল আলামীন তথা জগতসমূহের স্রষ্টা-পালনকর্তা আল্লাহর জন্য।

এখন হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর নিম্নোক্ত বাণীসমূহ মনযোগ সহকারে পাঠ করুন। এগুলি তাঁর পত্রাবলীর বিভিন্ন স্থান হতে চয়ন করা হয়েছে ঃ

"বুদ্ধিই যদি আল্লাহর পরিচয় লাভের জন্য যথেষ্ট হত তবে গ্রীক দার্শনিকরা, যারা বুদ্ধিকে নিজেদের পুরোধা সাব্যস্ত করেছিল, তারা ভ্রান্তির প্রান্তরে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াত না এবং অন্যদের তুলনায় তারাই আল্লাহর পরিচয় অধিক পরিমাণে লাভ করত। অথচ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর ব্যাপারে এরাই সর্বাধিক অজ্ঞ। কেননা, তারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে অথর্ব ও নিষ্কর্ম সাব্যস্ত করেছে এবং তারা তাঁকে একটি বিষয় (তাদের কল্পিত ও কথিত কর্মতৎপর আকল) ব্যতীত অন্য কিছুর স্রষ্টা স্বীকার করে না। তদুপরি (তাদের ধারণা মতে) এই একটি সৃষ্টিও তাঁর দ্বারা ইচ্ছাবিহীন ও বাধ্যগত রূপে অস্তিত্ব লাভ করেছে, 'কর্মতৎপর আকল' বিষয়টিও তাদের নিজেদের মনগড়া আবিষ্কার। বিশ্বজগতের ঘটনাবলীকে আসমান ও যমীনের স্রষ্টার সংগে সম্পর্কিত না করে তারা এগুলোকে সে কল্পিত আক্লের সংগে সম্বন্ধযুক্ত করে। আর বিশ্বে চলমান ক্রিয়াসমূহকে প্রকৃত ক্রিয়াশীল সাব্যস্ত করে। তারা এরূপ করতে বাধ্য। কেননা তাদের দৃষ্টিতে কর্ম ও ঘটনা (মা'লূল) আর নিকটতম (প্রত্যক্ষ) কারক ('ইল্লাত)-এর ক্রিয়া ও পরিণতি। কর্ম ও ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে দূরবর্তী (পরোক্ষ) কারকের কোন প্রভাব ও কার্যকারিতা তারা স্বীকার করে না। এটাও তাদের একটি মূর্খতা যে, আল্লাহর সংগে এ সব ক্রিয়া-কর্মের সম্বন্ধ না থাকাকে তারা আল্লাহর জন্য পূর্ণতার গুণ বিবেচনা করে এবং তাঁকে অথর্ব ও নিষ্কর্ম সাব্যস্ত করাকেই তাঁর মর্যাদা মনে করে। অথচ (এমন 'ঠুঁটো জগন্নাথ' ও 'মিলাদ-যিয়ারতে'র রাষ্ট্রপতি হওয়া যে কোন পূর্ণাংগতা নয়, তা এ সব জ্ঞানধররা

ছাড়া সাধারণ জ্ঞানী মাত্রই বুঝতে পারে।) আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিজেকে আকাশ ও পৃথিবীর (তথা সমুদয় বিশ্বের) স্রষ্টা ঘোষণা- رب المشرق والمغرب পূর্ব-পশ্চিম তথা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মালিক করে নিজের প্রশংসা করেছেন। এ নির্বোধের হাঁড়িদের ধারণায় 'আল্লাহ' থাকার কোন প্রয়োজন নেই এবং তাঁর কাছে আকুতি-মিনতি বা প্রার্থনা করারও কোন দরকার নেই। (তা হলে আমার প্রশ্ন) প্রয়োজন, ঠেকাঠেকি, বিপদাপদ ও সমস্যাগ্রস্ততার ক্ষেত্রে তারা যেন তাদের সে 'কর্মতৎপর আকল'-এর দ্বারে ধর্ণা দেয় এবং নিজেদের প্রয়োজনগুলো মেটাবার জন্য সে আকলের কাছেই প্রার্থনা করে। কেননা, তাদের ধারণায় প্রকৃত ক্ষমতা রয়েছে সে আকলের অধিকারেই; বরং তাদের ধারণা মতে সে কর্মতৎপর আকলও তার কাজ-কর্মে বাধ্য ও ইচ্ছাশক্তি রহিত। সুতরাং তার কাছে নিজেদের প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনাও অযৌক্তিক ব্যাপার।

"মূল বিষয় হচ্ছে তেমনই যা কুরআন করীমে বিঘোষিত হয়েছে যে, ان الكافرين لا مولى لهم - কাফিরদের কোন 'মাওলা' বা কর্মবিধায়ক নেই। এ বুদ্ধিমানদেরও কোন অভিভাবক ও কর্মসাধক নেই। আল্লাহ নেই এবং কর্মতৎপর আকলও নেই। পুনশ্চঃ কথিত আকলটি আসলে কি বস্তু যে নাকি সব কিছুর ব্যবস্থাপনা করে এবং ঘটনাবলীর সৃষ্টি ও বহিঃপ্রকাশে যার সংগে সম্পর্কিত করা হয়? তার মূল অস্তিত্ব ও তা সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারেই তো রয়েছে শত শত (হাজার হাজার) প্রশ্ন ও বক্তব্য। কেননা, তার অস্তিত্ব শুধু দর্শনের এমন কতগুলি মনগড়া প্রাক-প্রমাণ উক্তির উপর নির্ভরশীল, যেগুলো ইসলামের প্রামাণ্য মূল-নীতিমালার বিচারে অপূর্ণাংগ ও অকেজো। সব কিছুকে স্বকীয় ক্ষমতাবান সত্তা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর প্রতি সম্পর্কিত না করে একটি কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয়ের প্রতি সম্পর্কিত করা কোন আহম্মকেরই কর্ম হতে পারে । বরং বস্তু-নিচয়ও তাদের সৃষ্টিকে দর্শনের মনগড়া তৈরী কোন অবাস্তব বিষয়ের সংগে সম্পর্কিত করাকে হাজার লজ্জা ও কলংকের ব্যাপার মনে করবে; বরং এ সব কিছু তাদের অস্তিত্বের সম্বন্ধ এক শক্তিমান মহান স্রষ্টার সংগে হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে কোন অবাস্তব কাল্পনিক বিষয়ের সংগে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার তুলনায় নিজেদের অস্তিত্ববিহীন হওয়াতে সম্মত ও আনন্দিত হবে এবং (এরূপ অপমানিতরূপে) অস্তিত্ব লাভের কোন কামালাত তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। (পবিত্র কুরআনের ভাষায়) كبرت كلمة... كذبا--অতি জঘন্য সে উক্তি যা তাদের মুখ গহবর হতে নিঃসৃত হয়, তারা যা বলে তা শুধু মিথ্যাই। 'দারুল হরব' (আল্লাহদ্রোহী কাফির রাজ্য) -এর কাফিররাও তাদের মূর্তি পূজা সত্ত্বেও এ দার্শনিকদের চেয়ে শ্রেয়।

কেননা, সংকট কালে তারা আল্লাহ সুবহানাহু-র কাছেই প্রার্থনা করে এবং মূর্তিগুলিকে তাঁর দরবারে সুপারিশের মাধ্যম মনে করে।

"আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, কিছু লোক এ আহম্মক (গ্রীক দার্শনিক)-দের 'হুকামা' (বুদ্ধিজীবী) নামে অভিহিত করে থাকে এবং হিকমত ও প্রজ্ঞার প্রতি তাদের সম্বন্ধ স্থাপন করে। এদের (দার্শনিকদের) অধিকাংশ বিষয়, বিশেষত ইলাহিয়্যাত (আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান - যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য) সংক্রান্ত তাদের ভাষ্য ভ্রান্ত এবং কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী। তাদের পুঁজি হচ্ছে অকাট্য মূর্খতা এবং যারা নিজেদের মূর্খ হওয়ার জ্ঞানের ব্যানারে মূর্খ--তাদের 'বুদ্ধিজীবী' ও পণ্ডিত নামে অভিহিত করা হল কোন মানদণ্ডে? তবে হাঁ, উপহাস ও কৌতুক-রূপে হলে হতে পারে কিংবা এরূপ হতে পারে যে জন্যে কোন অন্ধকে চক্ষুষ্মান (ও কোন বধিরকে শ্রুতিধর) বলা হয়" (মাকতূব, ৩/২৩, খাজা ইবরাহীম কুবাদয়ানীর নামে)।

"সা'দী, পরিচ্ছন্ন পথ-পরিক্রমা মুস্তাফা (স)-এর অনুসরণ ও অনুকরণ ব্যতীত অসম্ভব"।

জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তি দীনী হাকীকত অনুধাবনের বেলায় যথেষ্ট নয়

"ঐ আল্লাহ্‌র শোক্‌র যিনি আমাদেরকে তাঁর দিকে হেদায়েত বা পথ-প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ স্বয়ং যদি আমাদেরকে পথ-প্রদর্শন (হেদায়েত) না করতেন তবে আমরা হেদায়েত পেতাম না। নিশ্চিতই আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত পয়গম্বর সত্যসহ আর্বিভূত হয়েছেন"। আম্বিয়া' আলায়হিমু'স-সালামকে প্রেরণের মাধ্যমে তিনি আমাদের উপর যে দয়া ও করুণা প্রদর্শন করেছেন কোন্ ভাষায় আমরা তাঁর শুকরিয়া আদায় করব এবং কোন্ দিল দিয়ে সেই করুণা-সিন্ধুর অন্তহীন দয়া ও বদান্যতার উপর বিশ্বাস পোষণ করব। আর সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই-বা কোথায় যে, নেক আমলের মাধ্যমে সেই মহা নেয়ামতের প্রতিদান দেব। যদি ঐ সব হযরতের পবিত্র অস্তিত্ব না থাকত তাহলে আমাদের মত স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন অর্বাচীনদেরকে আসমান যমীনের স্রষ্টা ও তাঁর ওয়াহদানিয়াতের দিকে কে আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করত? গ্রীসের প্রাচীন আমলের দার্শনিকগণ তাঁদের মেধা সত্ত্বেও আসমান-যমীনের স্রষ্টার অস্তিত্বের দিকে (অগ্রসর হবার) রাস্তা খুজেঁ পায়নি এবং সৃষ্টি জগতের অস্তিত্বকে তারা "কাল" (دهر)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত করেছে। এরপর যখন দিনকে দিন আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাতু ওয়া'স-সালাম-এর দা'ওয়াত উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে চলেছে তখন পরবর্তী কালের (তথা শেষ যুগের) দার্শনিকগণ ঐ সব

আলোর বরকতে প্রাচীন যুগের দার্শনিকদের মত ও পথ প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরম স্রষ্টার অস্তিত্ব মেনে নেন ও তাঁর একত্ববাদের স্বীকৃতি দেন। অতএব আমাদের বুদ্ধি নবূওতের উজ্জ্বল আলোকমালার সাহায্য ব্যতিরেকে এ কাজে অসহায় ও অক্ষম এবং আমাদের উপলব্ধি আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাতু ওয়া'স-সালাম-এর অস্তিত্বের মাধ্যম ছাড়া এ ব্যাপারে বহু দূর অবস্থান করছে।"[১]

নবূওতের রীতি-পদ্ধতি বুদ্ধি ও চিন্তা-ভাবনার রীতি-পদ্ধতির উর্ধ্বে

নবূওতের পন্থা-পদ্ধতি বুদ্ধি ও চিন্তা-ভাবনা রীতি-পদ্ধতির থেকে উর্ধ্বে। যে সব বিষয় অনুধাবন করতে বুদ্ধি অক্ষম নবূওতের পথ ও পন্থায় সে সবের প্রমাণ মিলে। বুদ্ধি যথেষ্ট বিবেচিত হলে আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালাম প্রেরিত হতেন কেন? (তাঁদের সকলের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) আর পরকালের আযাবকেই বা কেন নবী প্রেরণের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হত? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً

"আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আযাব পাঠাই না যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন নবী পাঠাই" (আল-কুরআন)। বুদ্ধি যদিও দলীল কিন্তু তা পূর্ণ ও অকাট্য দলীল নয়। পূর্ণ ও অকাট্য দলীল তো আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালাম আবির্ভাবের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং তা মান্য করতে ও পালন করতে বাধ্য এমন সব লোকের ওযর-আপত্তির সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

رُسُلاً مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا -

"রসূল যিনি সুসংবাদদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী যাতে লোকদের জন্য আল্লাহ্‌র উপর কোন দলীল না থাকে নবীদের প্রেরণের পর, আর আল্লাহ্ তো প্রবল পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ"। যখন কোন কোন মসলার ব্যাপারে বুদ্ধির অনুধাবন ও উপলব্ধির ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রমাণ হয়ে গেল, তখন শরীয়তের সমস্ত বিধি-বিধানকে বুদ্ধির নিক্তিতে মাপা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ঐ সব মসলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধানকে বুদ্ধির ছাঁচে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা ও এর পাবন্দী বুদ্ধি যথেষ্ট হবার পক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদানের সমার্থক এবং নবূওতের পথ ও পন্থাকে অস্বীকৃতির শামিল। আল্লাহ আমাদেরকে এর হাত থেকে পানাহ দিন।

১. পত্র নং ২৫৯, খাজা মুহাম্মদ সাঈদের নামে।

বুদ্ধি নির্ভেজাল ও অবিমিশ্র হওয়া সম্ভব নয় এবং তা ঐশী সত্য অনুধাবনের জন্য (চাই কি তার নব্য-প্লেটোবাদী ও আত্মশুদ্ধির সহায়তা লাভ ঘটুক) উপকারী নয়

বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, (যার ঐশী সাহায্য-সমর্থন ও উচ্চস্তরের নির্ভূল চিন্তা-চেতনা ব্যতিরেকে আর কোন ভিন্নতর ব্যাখ্যা সম্ভব নয়) এই হি. দশম শতাব্দী (খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী) তে যখন সমগ পৃথিবীর উপর বিশেষ করে ইরান ও ভারতবর্ষের উপর যুক্তিবাদ ও দর্শনের সেই শিক্ষার প্রভাবে যা গ্রীক দর্শনের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং যা প্লেটো ও এ্যারিস্টোটলকে অভ্রান্ত ও সকল প্রকার নির্দোষিতার সাটিফিকেট পর্যন্ত প্রদান করেছিল, মস্তিষ্কের উপর বুদ্ধিবৃত্তির এমন প্রভাব জেঁকে বসেছিল যে, বুদ্ধিবৃত্তির ভূমিকা থেকে যৌক্তিক পন্থার উপর কোন ফলাফলকে প্রমাণ করে দেবার উপর এবং গ্রীক দার্শনিকগণ যে সব বস্তুকে অকাট্য ও নির্ভুল বলেছেন তাদের নাম নিয়ে নেবার পর ভাষা মূক এবং দৃষ্টি ঘোলা ও ফ্যাকাশে হয়ে যেত বরং যুক্তিবাদ ও দর্শনের পূজারী ঐ সব ধর্তব্য সত্যের সামনে সিজদাবনত হয়ে যেত।

মুজাদ্দিদ সাহেব (র) (আমাদের জানামতে কমপক্ষে উলামায়ে ইসলামের মধ্যে) প্রথমবার এই আওয়াজ সমুচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে নির্ভেজাল ও অবিমিশ্র হওয়া শারীরিক উপাদানের সম্পর্ক ও পরিবেশের মধ্যে ছড়ানো-ছিটানো জল্পনা-কল্পনা, আকীদা-বিশ্বাস ও স্বীকৃত বিষয়সমূহ, অধিকন্তু অন্তর্নিহিত প্রবণতা ও দৃঢ় আখলাক-চরিত্র ও কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব এমনকি এর (তথাকথিত নির্ভেজাল বুদ্ধিবৃত্তির) যদি অন্তর আলোক ও আত্মশুদ্ধির সাহচর্য ও সাহায্য-সহযোগিতা লাভও ঘটে তখনও ভেতর-বাইরের প্রভাব, তা'লীম ও তরবিয়ত তথা শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ এবং সমাজ ও পরিবেশের ভেতর যে সব বস্তু স্বীকৃত সত্যের মর্যাদা লাভ করেছে সে সবের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে চিন্তা ও অনুভূতির অটল উত্তরাধিকারিত্বে উপনীত হওয়া এবং দ্বিধাহীন সিদ্ধান্ত পেশ করা الشاذ كالمعدوم। অর্থাৎ যা কদাচিৎ পাওয়া যায় তা না থাকারই নামান্তর-এর শামিল যার উপর আদৌ আস্থা রাখা চলে না। মুজাদ্দিদ সাহেব (র)-এর এই গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্ত এবং তাঁর লিখিত পত্রসমূহে বার বার এ বিষয়ে জোর প্রদান সেই যুগ ও পরিবেশের দৃষ্টিকোণ থেকেই নয় বরং জ্ঞানগত ও চিন্তার জগতেও একটি নতুন আবিষ্কার এবং এ এমন এক বিপ্লবাত্মক ও সাহসী ঘোষণা যার মূল্য, মর্যাদা ও গুরুত্বের পরিমাপ সঠিকভাবে এখন পর্যন্ত করা হয়নি। অথচ একে আলোচনা, গবেষণা ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু বানাবার হকদার ছিল।

এ এক বিস্ময়কর সাদৃশ্য যে, মুজাদ্দিদ সাহেব (র)-এর প্রায় দু'শো বছর পর জার্মানীর বিখ্যাত দার্শনিক ইম্মানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant, 1724-1804) বুদ্ধির নির্ভেজাল ও বিমূর্ত হওয়া এবং এর পরিবেশ, উত্তরাধিকারিত্ব, অভ্যাসসমূহ ও আকীদা-বিশ্বাস থেকে মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে অবাধ সিদ্ধান্ত প্রদানের যোগ্যতার উপর তাত্ত্বিক ও গবেষণামূলক আলোচনার সূত্রপাত ঘটান। তিনি সাহসিকতার সঙ্গে ও খোলাখুলিভাবে বুদ্ধির সীমারেখা নির্ধারণ করেন এবং ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Critique of pure reason প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি বিশ্বের চিন্তাশীল ও দার্শনিক মহলে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং ডঃ স্যার মুহাম্মদ ইকবালের ভাষায় "প্রগতিশীল ও মুক্ত বুদ্ধির অধিকারীদের কৃতিত্বকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়।"[১] পশ্চিমা বিশ্বে তাঁর এই মহান কৃতিত্বকে জাঁকজমকপূর্ণ উপায়ে অভিনন্দিত করা হয়। অনেকে তো এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, "তিনি (কান্ট) ছিলেন জার্মান জাতির জন্য আল্লাহ্‌র এক সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।" The History of Modern Philosophy (আধুনিক দর্শনের ইতিহাস)-এর লেখক Dr. Harold Hoffding এই পুস্তকের উপর পর্যালোচনা পেশ করতে গিয়ে বলেন যে, এই পুস্তকটি দর্শনের উপর লিখিত ডঃ কান্টের এক অমর ও অবিস্মরণীয় কীর্তি (An immortal master-piece of Philosophy) যা মানুষের চিন্তাজগতের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় মাইলস্টোনের ভূমিকা পালন করেছে (a work which stands as a milestone in the long wandrings of human thought)।

কান্টের মতে, চিন্তা কাজ শুরু করে যুক্তি-তর্কের তোয়াক্কা না রেখে বদ্ধমূল ধারণার ভিত্তিতে অর্থাৎ সে অনিচ্ছা সহকারে অধিকাংশ সময় সাদা-সিধাভাবে আপন শক্তি-সামর্থ্য ও কল্পনাশক্তির সুস্থতার উপর আস্থার ভিত্তিতে। সে বিশ্বাস করে যে, সর্বপ্রকার সমস্যার আমিই সমাধান করতে পারি এবং সৃষ্টিজগতের রহস্যমূল অবধি আমার গতি ও বিচরণ। এরপর একটা যুগ আসে যখন সে বুঝতে পারে যে, এই চিন্তা-গঠন মহাজগত পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না এবং স্থপতিগণের ভেতর তাদের নকশা তথা পরিকল্পনা (প্লান) সম্পর্কে ঐকমত্য স্থাপিত হয় না। এই যুগটা সন্দেহ ও সংশয়ের যুগ। এরপর সে দেখতে পায় যে, এখনও এমন একটি কাজ বাকী যে কাজকে যুক্তিতর্কের তোয়াক্কা বর্জনকারী বদ্ধমূল ধারণাবাদী ও সন্দেহ-সংশয় পোষণকারী উভয়ের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল এবং তারা এটাকে উপেক্ষা করেছিল। আর তা ছিল এই যে, আমরা আমাদের

১. The Reconstruction of Religious Thought in Islam.P.5.

বুদ্ধিবৃত্তি ও আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করব এবং জানতে চেষ্টা করব যে, আমাদের ভেতর বস্তু-উপলব্ধির জন্য কি ধরনের তূরী ও শক্তি পাওয়া যায় এবং এসবের সাহায্যে আমরা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারি?

এরপর এখন একজন মুসলিম পণ্ডিত ও চিন্তাবিদের যিনি ভারতবর্ষের সীমিত জ্ঞান ও ঐতিহ্যভিত্তিক শিক্ষার পরিবেশে থেকেছেন, যিনি যুক্তিবাদ ও দর্শন শাস্ত্রের পরিবর্তে নবুওতের জ্ঞান এবং আল্লাহ্‌র পরিচয় ও সন্তুষ্টি লাভকেই আপন জীবনের লক্ষ্য হিসেবে অভিহিত করেছেন,নির্ভেজাল বুদ্ধিবৃত্তির সমালো - চনায় দর্শনের ঘোর-প্যাঁচ ও জটিলতা থেকে দূরে অবস্থান করত সাধারণের পক্ষে বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষণ বর্ণনা পাঠ করুন। মুজাদ্দিদ সাহেব (র) এই প্রশ্নের জওয়াব দিতে গিয়ে বলেছেন যে, বুদ্ধিবৃত্তি আপন সত্তার দিক দিয়ে ঐশী বিধানের মুকাবিলায় ত্রুটিযুক্ত ও অসম্পূর্ণ এবং তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে, এমন কেন হতে পারে না যে,আত্মার পরিচ্ছন্নতা ও পরিশুদ্ধির পর বুদ্ধিবৃত্তির ঐশীসত্তার সঙ্গে একটা নেশা ও মত্ততাহীন সম্বন্ধ সৃষ্টি হোক যার মাধ্যমে সে সেখান থেকে বিধি-বিধানসমূহ লাভ করবে এবং ফেরেশতার মাধ্যমে ওয়াহী প্রেরণের আর কোন প্রয়োজনই পড়বে না? এর উত্তরে মুজাদ্দিদ (র) বলেন ঃ

"ঐশী নীতির সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষাকারী ও সংযোগ স্থাপনকারী বুদ্ধিবৃত্তি এর দেহগত অস্তিত্বের সাথে, যে সম্বন্ধ কখনও পরিপূর্ণরূপে অপসৃত হয় না এবং তা পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ও অবিমিশ্রতা সৃষ্টি করতে পারে না। সন্দেহ ও সংশয় সর্বদাই তার সাথে চলে এবং কল্পনা তার ধারণাকে কখনো পরিত্যাগ করে না। ক্রোধ ও আকাংক্ষা ছায়ার মত তাকে অনুসরণ করে এবং লোভ ও মোহের মত নিন্দনীয় সিফাত হয় এর সার্বক্ষণিক সঙ্গী। ভুল-ভ্রান্তি ও মানবীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বভাবজাত; এগুলো মানুষ থেকে অপসৃত হয় না। অতএব বুদ্ধিবৃত্তি নির্ভরশীল নয় এবং তার গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বিধানসমূহ কল্পনা, অপরিপক্কতা ও অনুমানের আওতামুক্ত ও প্রভাব বহির্ভূত নয়, ভুল-ভ্রান্তির মিশ্রণ ও গলদের সন্দেহ থেকে নিরাপদ নয়। পক্ষান্তরে ফেরেশতারা এসব সিফাত থেকে পবিত্র এবং এই সব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। অতএব নিঃসন্দেহে তারা নির্ভরযোগ্য এবং তাদের গৃহীত বিধানসমূহ কল্পনা ও খেয়াল-খুশীর মিশ্রণ ও ভুল-ভ্রান্তির সন্দেহ থেকে নিরাপদ। কোন কোন সময় অনুভূত হয় যে, সেই সব জ্ঞান যেগুলো সে আধ্যাত্মিকভাবে লাভ করেছে, পঞ্চেন্দ্রিয় অবধি সেগুলো পৌঁছুবার ক্ষেত্রে এমন কতকগুলো বিষয় যা তার নিকট স্বীকৃত (কিন্তু অবাস্তব এবং ধারণা বা খেয়াল অথবা অন্য কোন উপায়ে অর্জিত) বেএখতিয়ার ঐ সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে এভাবে শামিল হয়ে

যায় যে, সে সময় একেবারেই এর বাছ-বিচার করা যায় না। অন্য সময় কখনও এর পার্থক্য শক্তি বা বিশিষ্টতা দান করা হয়, আবার কখনও হয় না। অতএব অবশ্যাম্ভাবীরূপে ঐ সব জ্ঞান-বিজ্ঞানে ঐ সব বিষয়ের অর্ন্তভুক্তির দরুন অবাস্তবতা ও অসত্যের রূপ সৃষ্টি হয়ে যায়। আর তা বিশ্বাসযোগ্য থাকে না।"[১]

নব্য প্লেটোবাদী ও (মরমীবাদী) আত্মার পরিশুদ্ধি

নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জন, বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল জ্ঞান, সভ্য ও মার্জিত চরিত্র, আত্মশুদ্ধি এবং এ সবের সাহায্যে মানবীয় সমাজ গঠন ও সুন্দর কৃষ্টি নির্মাণের একটি ক্রটিমুক্ত ও নিষ্পাপ মাধ্যম হিসাবে প্রাচীনকাল থেকেই নব্য প্লেটোবাদ ও আধ্যাত্মিকতাকে জ্ঞান করা হয়েছে। প্রাচীন কালে মিসর ও ভারতবর্ষ ছিল এর বিরাট কেন্দ্র। এই আন্দোলনের বিস্তার ও এর হৃদয়গ্রাহিতার ভেতর সেই প্রতিক্রিয়াও কাজ করছিল যা একদিকে চরম বুদ্ধিবৃত্তি পূজা, অপরদিকে পাগল-ামী পর্যায়ের ইন্দ্রিয় পূজার বিরুদ্ধে গ্রীস ও রোমে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং শেষাবধি তা আলেকজান্দ্রিয়া (মিসর) কে, যা ছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও নানা ধর্মের মিলনকেন্দ্র,—স্বীয় কেন্দ্রে পরিণত করে।

এই দর্শন ও আন্দোলনের আহবায়ক ও অনুসারীবৃন্দের উক্তি এই যে, নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জন ও বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের সবচে' বড় মাধ্যম হল মুশাহাদা তথা পর্যবেক্ষণ এবং এই মুশাহাদা লাভ করা যায় নূর-ই বাতেন তথা অভ্যন্তরীণ আলোকরশ্মি, আত্মার পরিচ্ছন্নতা ও অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়কে সজাগ ও জাগ্রতকরণের দ্বারা। বাস্তব তথা প্রকৃত জ্ঞান লাভ সেই নির্ভেজাল ও অবিমিশ্র বুদ্ধি এবং সেই অভ্যন্তরীণ আলোকরশ্মি দ্বারাই সম্ভব যা রিয়াযত, প্রবৃত্তির বিরোধিতা ও মুরাকাবা দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

যদি একথা মেনে নেয়া হয় তাহলে এর নির্গলিতার্থ হল এই যে, মানুষের ভেতর পঞ্চইন্দ্রিয় ছাড়াও একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কর্মরত আছে এবং এর কর্মের পরিণ-তিতে (মুশাহাদাত) অদেখা আলো, অশ্রুত আওয়াজ এবং প্রথম থেকে অজানা হাকীকত (যথার্থ, বাস্তব ও প্রকৃত জ্ঞান ও সত্য) প্রতিভাত হতে থাকে। কিন্তু এর কি নিশ্চয়তা আছে যে, এই ইন্দ্রিয়ও মানুষের অপরাপর ইন্দ্রিয়ের মত সীমাবদ্ধ, ভ্রান্তি ও ভুল বুঝাবুঝির শিকার হবে না? যদি এমন হত তবে এর পরিণতিতে পরস্পর বিরোধিতার অস্তিত্ব এবং সন্দেহ ও সংশয়ের আশংকা পাওয়া যেত না। কিন্তু নব্য প্লেটোবাদের ইতিহাস বলে যে, এই অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধ ও অনুভূত বিষয়সমূহ এবং তা যে সব পরিণতি, ফলাফল ও 'আকাইদ

১. খাজা আবদুল্লাহ ও খাজা উবায়দুল্লাহর নামে লিখিত পত্র, ১ম খণ্ড, পত্র নং ২৬৬।

অবধি পৌঁছে সে সবের ভেতরও ঠিক তেমনি পরস্পর বিরোধিতা ও মতভেদ পাওয়া যায় যেমন গ্রীসের দার্শনিকবৃন্দ এবং প্রাচ্যের বিজ্ঞ-পণ্ডিত বুদ্ধিজীবিদের ভেতর পাওয়া যায়। প্রাচীন প্লেটোবাদকে বাদ দিয়ে (যার ইতিহাস নিরাপদ ও সুরক্ষিত নয়) নব্য প্লেটোবাদকেই নিন না কেন। এর নেতৃবৃন্দের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের উপর বিন্যস্ত ও সম্পাদিত কর্মের ভেতর পরিষ্কার পারস্পরিক বৈপরিত্য পাওয়া যায়। Plotinus স্বীয় যুগের ধর্মীয় ব্যবস্থা ও প্রচলিত ইবাদত- বন্দেগীর সমর্থক নন। তিনি ছিলেন একজন মুক্তবুদ্ধি দার্শনিক যিনি কর্মের পরিবর্তে চিন্তা ও গভীর ধ্যানের উপর জোর দেন। কিন্তু তাঁর শিষ্য Parphyry (233-305) একজন নীতিবাদী মরমী ছিলেন। Plotinus বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের আত্মা পশুরূপে পুনর্জন্ম লাভ করে থাকে। কিন্তু Praphyry এধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। এই চিন্তাধারার তৃতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হলেন Proclus (A. B. 412-495) যিনি পুরো মিসরীয় প্রথা-পদ্ধতি মেনে চলতেন, ধর্মীয় ও মযহাবী আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন এবং দিনে তিনবার সূর্যের পূজা করতেন। তাঁর ধর্ম ছিল বিভিন্ন ধর্ম ও আকীদা-বিশ্বাসের এক জগা-খিচুড়ি। এরা সকলেই সত্যের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন।[১]

Parphyry খৃস্ট ধর্মের বিরোধিতা করেন এবং রোমকদের মূর্তিপূজা ও জাহিলী ভাবধারা (Paganism)-র পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনে রোম সম্রাটকে সমর্থন করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক আলোক-রশ্মি শির্ক ও মূর্তিপূজার এই ডুবন্তপ্রায় জাহাজের সঙ্গে আপন ভাগ্য জড়াতে বাধা দেয়নি।

মুসলমানদের মধ্যেও যাদের নব্য প্লেটোবাদ ও কাশ্‌ফের শক্তির উপর পরিপূর্ণ আস্থা ছিল তাদের অভ্যন্তরীণ অনুভূতি ও কাশ্‌ফের মধ্যে অনেক বৈপরিত্য পাওয়া যায়। একজন কাশ্‌ফ-এর অধিকারী ব্যক্তির সঙ্গে অপর একজন কাশ্‌ফ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির এখতিলাফ ঘটে। তার কাশ্‌ফকে প্রকৃত ঘটনার বিপরীত বলে আখ্যায়িত করে এবং কখনো একে অচৈতন্য বা মত্তাবস্থা (سكر) ও ভাবোন্মাদনার আধিক্য বলে অভিহিত করে। বহিঃ অস্তিত্ব নেই সে সবের সঙ্গে এই সব আহলে কাশ্‌ফ করমর্দন করেন এবং সে সবের সঙ্গে নিজেদের সাক্ষাতের কথা প্রমাণ করেন ইত্যাদি। তাসাওউফের ইতিহাস এধরনের উদাহরণ দ্বারা ভরপুর।

১. বিস্তরিত দ্র. Encyclopaedia of Religion & Ethics-এর New Platonism অধ্যায়।

শায়খু'ল-ইশরাক (master of illumination) শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (মাকতূল)

ঐ সব মুসলিম নব্য প্লেটোবাদীদের মধ্যে ৬ষ্ঠ/ ১২শ শতাব্দীর শায়খুল ইশরাক শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (৫৪৯-৫৮৭ হি./ ১১৫৪-১১৯১ খৃ.), যিনি 'মাকতূল' (নিহত) নামে পরিচিত, সবিশেষ খ্যাত। ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও বিক্ষিপ্তপূর্ণ 'আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার দরুন সুলতান আল-মালিকু'জ-জাহিরের নির্দেশে ৫৮৭ হিজরীতে তাকে হত্যা করা হয়। তিনি নিজেকে মাশ্শাঈ (এরিস্টোটলের অনুসারী) ও সূফী বলতেন। তার নিকট মাশ্শাঈ অর্থাৎ এরিস্টোটলীয় ধ্যান-ধারণার সাথে S. V. Den Bergh-এর উক্তি অনুযায়ী "সেই সমস্ত মরমী দর্শন বর্তমান যা মুসলমানরা গ্রীক সামঞ্জস্য বিধান দর্শন (نظريه تطبيق) নানা আকীদা-বিশ্বাস ও বিভিন্ন ধর্মের ঐক্য ও সম্মিলন থেকে গ্রহণ করেছে। Encyclopaedia of Islam; Vol. iv.সুহরাওয়ার্দী শিহাবুদ্দীন-এর নিবন্ধকার Bergh-এর মতে, "মূলত এটি তার আলোক-দর্শন (Philosophy of Ishraq) যা তিনি নব্য প্লেটোবাদী আলোর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধার করেছেন যা বস্তুর মৌলিক সত্য হিসাবে বিবেচিত।"[১]

শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আশ-শাহ্রযূরী বলেন যে, "তিনি ইশরাকী দর্শন (Speculative Philosophy) ও মাশ্শাঈ দর্শন (Gnostic Philosophy) কে একত্রে মিশিয়ে ফেলেছেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের নাম হিকমাতু'ল-ইশরাক যার ভাষ্য লিখেছেন 'আল্লামা কুতুবুদ্দীন শীরাযী। এটি 'শরাহ হিকমাতু'ল-ইশরাক' নামে পণ্ডিত ও ছাত্র-শিক্ষক মহলে বহুল খ্যাত।

শায়খুল ইশরাক সুহরাওয়ার্দী মনে করেন যে, উপলব্ধি ও বোধ-সমূহের সংখ্যা দশে সীমাবদ্ধ নয় বরং প্রতিটির নিমিত্তে একটি বুদ্ধি ও বোধশক্তি রয়েছে যা এর হেফাজত করে থাকে। তিনি এর নাম দিয়েছেন আনওয়ার-ই মুজাহাদা বা বিমূর্ত ও নিগুঢ় দ্যুতি। তাঁর মতে, আসমান একটি জীবিত মাখলূক। যেহেতু এর ভেতর বিমূর্ত আত্মা রয়েছে যা এতে গতি সঞ্চার করে থাকে। আসমান পরিবর্তন ও খণ্ড- বিখণ্ড হওয়া থেকে মুক্ত ও নিরাপদ। আসমান বাকশক্তির অধিকারী বিধায় এর ভেতর অপরাপর বোধশক্তিও পাওয়া যায়। তাঁর মতে, গোটা আসমান একটি জীবিত প্রাণী এবং আনওয়ার-ই 'আলিয়া অর্থাৎ পরম ও অসীম আলোর (Absolute Light) প্রভাব নক্ষত্ররাজির মাধ্যমে এর উপর পড়ে এবং এ সবেরই মাধ্যমে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে গতি সঞ্চারিত হয়। সবচে'

---

১. দাইরা-ই মা'আরিফে ইসলামিয়া।

বড় নক্ষত্র হল সূর্য। আলোকবাদীদের (ইশরাকিয়্যূন) ধর্মে সূর্যের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক। নিখিল বিশ্বে সরাসরি ও মাধ্যমে আলো আর আলোরই রাজত্ব চলছে। গতি ও উত্তাপ আলো থেকে জন্ম হয়ে থাকে। আর আগুনের মধ্যে এদু'টো গুণ ও উপাদান বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। যেভাবে নফ্স (আত্মা) 'আলম-ই আরওয়াহ্ তথা রূহের জগতকে আলোকোজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল করে ঠিক তেমনি আগুন আলম-ই আজসাম তথা ভৌতিক জগতকে আলোময় করে। আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক জগতে নিজের একজন খলীফা তথা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। বোধের জগতে ১ম বোধ, মহাকাশ জগতে নক্ষত্ররাজি ও তাদের বাঙময় (نفس ناطقه) আত্মা এবং উপাদানসমূহের জগতে মানবাত্মা, নক্ষত্ররাজির আলোকশিখা ও বিশেষভাবে আগুন (রাত্রির অন্ধকারে) তাঁর খলীফা অর্থাৎ তাঁর সংস্কার-সংশোধন ও প্লান পরিচালনা করে থাকে। খিলাফতে কুবরা তথা বৃহত্তর ও উচ্চতর প্রতিনিধিত্ব আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর পরিপূর্ণ আত্মাসমূহের অর্জিত হয়ে থাকে। খিলাফতে সুগরা তথা নিম্নতর ও ক্ষুদ্রতর প্রতিনিধিত্ব অগ্নির সঙ্গে সম্পর্কিত। কেননা অন্ধকার রাত্রে তা অসীম ও স্বর্গীয় জ্যোতি ও নক্ষত্ররাজির আলোক-শিখার প্রতিনিধিত্ব করে। খাদ্য-শস্য ও অন্যান্য শাক-সবজীর পাকতে ও পুষ্ট হতে সাহায্য করে। শায়খুল-ইশরাক শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর মতে জগত অবিনশ্বর ও অসৃষ্ট (কাদীম) এবং সময় বা কাল চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। তিনি আত্মার পুনর্জন্ম বা পুনঃ দেহপ্রাপ্তি স্বীকার করেন না, আবার তা অস্বীকারও করেন না (কেননা এ বিষয়ে উভয় পক্ষের দলীল-প্রমাণ সান্ত্বনাদায়ক নয়)।[১]

এভাবেই আপন যুগের বিশিষ্ট ইশরাকী পণ্ডিত, যিনি প্রাচ্যে শায়খুল ইশরাক উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন, যাঁর তীক্ষ্ণ মেধা, গভীর পাণ্ডিত্য ও সাধুতা তাঁর সমসাময়িকেরা পর্যন্ত স্বীকার করেছেন, তাঁকেও তাঁর অতীন্দ্রিয়বাদ, আত্মার পরিচ্ছন্নতা, গ্রীকদের কল্পিত মতবাদ ও ইরানী অগ্নি উপাসকদের তত্ত্বের কচ-কচানি গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে পারে নি। তিনি রসূল (সা)-এর আবির্ভাব এবং এর উপর বিন্যস্ত ও সংকলিত হেদায়াত, ধর্মীয় ও জাগতিক কল্যাণ ও আল্লাহ্র বিশুদ্ধ পরিচয় লাভ থেকে বঞ্চিত থাকেন। তিনি একটি ভারসাম্যহীন, বিশৃংখল ও অরাজকতাপূর্ণ ব্যর্থ জীবন অতিবাহিত করেন এবং পশ্চাতে কোন পথ-নির্দেশনা, সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ কোন ব্যবস্থা না রেখেই ইহ-লোক থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

১. বিস্তারিত দ্র. হুকামা-ই ইসলাম, ২য় খণ্ড, মওলানা আবদুস সালাম নদভীকৃত।

বুদ্ধিবৃত্তি ও কাশ্‌ফ একই নৌকার আরোহী

দার্শনিক কান্ট (Kant) নির্ভেজাল ও অবিমিশ্র বুদ্ধিবৃত্তির অস্তিত্বে খুবই সন্দেহ পোষণ করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে অবিমিশ্র থাকা, ভেতর ও বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা বলতে গেলে প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তিনি কাশ্‌ফ ও বাতেনী ইল্‌ম-এর জগত সম্পর্কে ছিলেন অজ্ঞ ও অপরিচিত। এজন্য তিনি এর থেকে সামনের কিছু বলতে পারেন নি। মুজাদ্দিদ সাহেব যিনি এই (বাতেনী ইল্‌মরূপ) সমুদ্রেরও সাতারু ছিলেন, এক কদম সামনে অগ্রসর হয়ে বিশুদ্ধ কাশ্‌ফ ও নির্ভেজাল ইলহামের কঠিন ও দুষ্প্রাপ্য হবার উপর বিস্তৃত আলোকপাত করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, মরমীবাদ ও আত্মিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমেও সেই সব অদৃশ্য সত্য (হাকীকত)এবং অভ্রান্ত ও সন্দেহাতীত জ্ঞান অবধি পৌঁছা সম্ভব নয় যা আম্বিয়া 'আলায়হিমুস-সালাম এবং তাঁদের আবির্ভাবের পথ ধরে সাধারণ ও বিশিষ্ট সর্বস্তরের লোক লাভ করে থাকে। ঠিক তেমনি নবীদের আবির্ভাব ব্যতিরেকে আল্লাহ্‌র মা'রিফত (জ্ঞান, পরিচয়) অবধি পৌঁছা যায় না, মুক্তিলাভও ঘটে না, তেমনি ঘটে না প্রকৃত আত্মশুদ্ধিও। এই সিলসিলায় তাঁর কতিপয় পত্রের উদ্ধৃতি পেশ করছি, পাঠ করে দেখুন।

"ঐ সব নাদানদের (হুকামা') একদল আম্বিয়া 'আলায়হিমুস-সালামের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ ব্যতিরেকেই মরমী সূফীদের (যারা প্রতিটি যুগেই আম্বিয়া-ই কিরামের অনুগত ও অনুসরণকারী) অনুকরণে রিয়াযত ও মুজাহাদার পথ অবলম্বন করেছেন এবং আপন যুগের পরিশুদ্ধির ব্যাপারে প্রতারিত হয়েছেন আর স্বীয় স্বপ্ন ও ধারণার উপর নির্ভর করেছেন এবং নিজেদের কল্পিত কাশ্‌ফকে ইমাম বানিয়েছেন। ফলে তারা নিজেরা যেমন গোমরাহ হয়েছেন তেমনি অন্যদেরকেও গোমরাহ করেছেন। এরা জানে না যে, এই পরিশুদ্ধি নফসের পরিশুদ্ধি যা গোমরাহীর দিকে পথ প্রদর্শন করে, কলব (হৃদয়)-এর পরিশুদ্ধি নয় যা কিনা হেদায়াতের বাতায়ন। এজন্য যে, কলবের পরিচ্ছন্নতা ও পরিশুদ্ধি আম্বিয়া 'আলায়হিমুস-সালামের অনুসরণের সঙ্গে সম্পর্কিত আর নফসের পরিশুদ্ধি (সংস্কার ও পরিশীলন) কলবের পরিশুদ্ধির সঙ্গে ওঁৎপ্রোতভাবে জড়িত। এই শর্তে যে, সে নফসের এসলাহ ও তরবিয়ত (সংস্কার-সংশোধন ও প্রশিক্ষণ দান) করবে। কলব যা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তার নূরের বিকাশস্থল-এর অন্ধকারের সঙ্গে নফস যেই পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি করবে তার অবস্থা হবে সেই প্রদীপের ন্যায় যেই প্রদীপ এজন্যই আলোকোজ্জ্বল করা হয়েছে যা গোপন শত্রু অর্থাৎ অভিশপ্ত ইবলীসের (তার আলোকে) ঘরকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবে।

"মোটকথা এই যে, রিয়াযত ও মুজাহাদার পন্থা দৃষ্টি (نظر) ও দলীল-প্রমাণের রঙের মধ্যে সেই সময় বিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টি করবে যখন তা আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালামের আনীত সত্ত্য সহকারে হবে যে সত্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁরা প্রচার করতেন এবং তাঁর (আল্লাহ্‌র) সাহায্য তাঁদের (নবীদের) সাহায্য করত। ঐ সব হযরতদের ব্যবস্থা এমন সব ফেরেশতাদের অবতরণের কারণে (যাঁরা ভুল-ত্রুটি ও গোনাহ-খাতা থেকেও নিরাপদ) অভিশপ্ত দুশমনের চক্রান্ত থেকে নিরাপদ। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সম্পর্কে বলেন ঃ اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰن "নিশ্চিতই আমার বিশিষ্ট বান্দা যাদের উপর (হে ইবলীস!) তোমার কোন কর্তৃত্ব নেই, চলবেও না"। একথা অন্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং সেই অভিশপ্ত শয়তানের অপবিত্র হাত থেকে তাদের রেহাই পাবার কল্পনাও করা যায় না। কেবল তারা রেহাই পাবে যারা আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের পায়রবী করবে ও তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে চলবে।

শায়খ সা'দী (র) সত্য বলেছেন ঃ

محالست سعدی که راه صفا
تواں رفت جز برپئے مصطفی

"সা'দী! শান্তির পথে চলতে চাইলে মুহাম্মদ মোস্তফা (সা)-র অনুসরণ ব্যতিরেকে চলা অসম্ভব।" আল্লাহ্‌র দরূদ ও সালাম তাঁর উপর, তাঁর বংশধরদের উপর এবং বেরাদরানে আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের উপর বর্ষিত হোক।"

কাশ্‌ফে ভেজাল

"একথা বুঝতে হবে যে, কাশ্‌ফের ভুল-ত্রুটি সব সময় শয়তান কর্তৃক নিক্ষেপের ভিত্তিতেই হয়না। অধিকাংশ সময় এমন হয় যে, কতক অবাস্তব ও সত্য থেকে মুক্ত কল্পিত বিধি-বিধানের ভেতর গিয়ে আসন গাড়ে। সেখানে শয়তানের কোন অধিকার থকে না। কিন্তুএই সব ধারণা ও কল্পনা বাইরে ছদ্মবেশ ধারণ করে আসে। এ ব্যাপারের একটি বিষয় হল এই যে, কোন কোন লোক স্বপ্নে নবী করীম (সা)-এর যিয়ারত লাভ করে থাকে এবং তারা নবী করীম (সা) থেকে এমন কতক বিধি-বিধান গ্রহণ করে (যা শরীয়তের প্রমাণিত মসলা-মাসাইল ও বিশুদ্ধ হাদীসের বিরোধী হয়)। এমতাবস্থায় উক্ত নিক্ষেপ (ইলকা) শয়তান কর্তৃক কল্পিত নয়। উলামা-ই কিরামের সুচিন্তিত অভিমত হল, শয়তান আঁ-হযরত (সা)-এর অনুরূপ আকৃতি ধারণ করতে পারে না। এমত অবস্থায় কেবল কল্পনারই ধারণা হয় যা অবাস্তব কে বাস্তব মনে করে বসেছে।"[১]

১. মুহাম্মদ সাদিক কাশ্মীরীর নামে লিখিত পত্র ১০৭,

অপর এক পত্রে তিনি বলেন ঃ

"নফস—চাই কি আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেই তা নফসে মুতমাইন্নাঃ (প্রশান্ত আত্মা)-য় পরিণত হোক, কিন্তু তা কখনো আপন স্বভাব ও দোষ-গুণ থেকে পরিপূর্ণ ভাবে মুক্ত হতে পারে না, হয় না। এজন্য ভুল-ত্রুটি তার ভেতরও রাস্তা করে নেবার সুযোগ পায়।"[১]

দার্শনিক এবং আম্বিয়া-ই কিরাম (আ)-এর শিক্ষার মধ্যে সংঘাত ও বৈপরিত্য

এতটুকু লিখার পর তিনি দার্শনিকদের এবং আম্বিয়া-ই কিরামের প্রদত্ত শিক্ষামালার মধ্যে সেই প্রকাশ্য সংঘাত ও বৈপরিত্যের দিকে ইঙ্গিত পূর্বক যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে এবং যে শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয় এবং যাঁদের (দার্শনিকদের) বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াস ও শূন্যমার্গে ভ্রমণ নিষ্ফল প্রয়াসের সমার্থক বৈ নয়,তিনি বলেন ঃ

"দার্শনিকদের অপূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি নবূওতের একেবারেই বিপরীত মেরুতে ও মুখোমুখি অবস্থানে অবস্থিত। নিখিল বিশ্বের প্রারম্ভিক উৎপত্তি সম্পর্কে যেমন, তেমনি পরলোক সম্পর্কেও—তাদের আলোচ্য সমস্যা ও সূত্র আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালামের শিক্ষামালার একেবারেই বিরোধী। তারা না আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাসকেই দুরস্ত করেছে, না পরকালীন বিশ্বাসকেই ঠিক করেছে। তারা বলেন যে, বিশ্বজগত অসৃষ্ট বস্তু (কাদীম) অথচ য়ারা ধর্মে বিশ্বাস করেন এবং নানা মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত তারা সম্মিলিতভাবে এটা সমর্থন করেন যে, জগত সৃষ্টি বস্তু তার সমস্ত শাখা-প্রশাখাসহ। তেমনি তারা আসমান বিদীর্ণ হওয়া, তারকারাজি খসে পড়া, পাহাড়-পর্বত টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া, সমুদ্র উত্তোলিত হবার সমর্থক নন যেগুলো কিয়ামত সংঘটিত হবার কালে ঘটবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ঠিক তেমনি মানুষের মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভের কথাকেও তারা অস্বীকার করে থাকে এবং কুরআন করীমের খুটিনাটি বর্ণনা ও ব্যাখ্যাসমূহও অস্বীকার করে। তাদের পরবর্তীরা যারা নিজেদের দর্শনগত মূল-নীতির উপর দৃঢ় রয়েছেন এবং আকাশসমূহ, নক্ষত্ররাজি আর এমনিভাবে অন্যান্য বস্তুসমূহকে অসৃষ্ট (কাদীম) হবার তারা সমর্থক এবং এসব ধ্বংস ও বিনাশ না হবার দাবীদার। তাদের খোরাক হল কুরআনী ব্যাখ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ, তাদের আহার্য হল ধর্মের মৌলিক ও নীতিগত মসলা-মাসাইলকে অস্বীকৃতি

১. শায়খ দরবেশের নামে লিখিত ৪১ নং পত্র।

জ্ঞাপন। এরা আশ্চর্য ধরনের মুসলমান যে, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে কিন্তু আল্লাহ্ ও তদীয় রসূল যা বলেছেন সেগুলো গ্রহণ করে না। এর চেয়ে বড় আহম্মকী আর হতে পারে না। জনৈক কবি কত সুন্দরই না বলেছেন ঃ

فلسفه چوں اکثرش باشد سفه پس کل آں
هم سفه باشد که حکم کل حکم اکثر است

"ফালসাফাহ্ (দর্শন) শব্দের বৃহত্তর অংশই (পাঁচ অক্ষরের তিন অক্ষর যেহেতু 'সাফাহ্' অর্থাৎ আহাম্মকী ও বোকামী) বিধায় এর গোটাটাই বোকামী ও আহাম্মকী। কেননা নীতিগত দিক দিয়ে বৃহত্তর অংশ সমগ্রের প্রতিনিধিত্ব করে।"

"এই দলটি তাদের জীবন এমন একটি যন্ত্র (যুক্তি বিদ্যা) শেখা ও শেখাতে ব্যয় করেছে যা চিন্তাগত ভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষাকারী এবং এব্যাপারে খুবই কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করেছে। কিন্তু যখনই তারা আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা, গুণাবলী ও কর্মসমূহ সম্পর্কে আলোচনায় উপনীত হয়েছেন যা সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, তখন তারা হাত-পা ছেড়ে দিয়েছেন এবং সেই যন্ত্রটিকে যা ভ্রান্তি থেকে রক্ষাকারী তা হাত থেকে ফেলে দিয়ে (দোরে দোরে) ঠোক্কর খেয়ে ফিরতে থাকলেন এবং গোমরাহীর বিজন মরু বিয়াবানে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরতে লাগলেন। যেমন একব্যক্তি বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধের সাজ-সামগ্রী তৈরী করতে থাকে, কিন্তু ঠিক যুদ্ধের মুহূর্তে হাত-পা ছেড়ে অবশ-বিবশ দেহে বসে পড়ে। তার দ্বারা যেমন কোন কিছু আশা করা যায় না এও ঠিক তেমনি।

"লোকে দর্শন শাস্ত্রকে খুব নিয়মতান্ত্রিক সুশৃঙ্খল শাস্ত্র বলে মনে করে এবং একে ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও নিরাপদ মনে করে। যদি একথা মেনেও নেওয়া যায় তাহলে এ সেই সব বিদ্যা বা শাস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেসব ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তি একাই যথেষ্ট হতে পারে যা এখানে আলোচনা বহির্ভূত এবং অর্থহীন (অনুপকারী) বিষয়ের শামিল এবং চিরস্থায়ী আখিরাতের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন। পারলৌকিক মুক্তির সঙ্গেও এর কোন সম্পর্ক নেই। আলোচনা কেবল সেই সব জ্ঞান-বিদ্যার ক্ষেত্রে যা বুদ্ধির ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এবং তা উপলব্ধি করতে অক্ষম। আর তা কেবল নবূওতের তরীকার সঙ্গেই ওঁৎপ্রোতভাবে জড়িত, পারলৌকিক নাজাত ও মুক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত।"

এরপর সামনে অগ্রসর হয়ে লিখেন ঃ

"যুক্তিবিদ্যা এমন এক শাস্ত্র যা (পরবর্তী উচ্চতর জ্ঞানের জন্য) একটি যন্ত্র বিশেষ এবং এ সম্পর্কে লোকেরা বলেছে যে, তা অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যা ভুল-ভ্রান্তি

থেকে রক্ষাকারী– তাদের কোন কাজে লাগেনা এবং মহান লক্ষ্যে তাকে ভুল-ভ্রান্তি থেকে বেরও করে আনেনি। যা তাদের কোন কাজে আসেনি তা অন্যদের কোন্ কাজে আসবে এবং তাদের ভুলের থেকে কিভাবে বের করবে?

"(আল্লাহ তা'আলা থেকে তাঁরই ভাষায় দু'আ রয়েছে:)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

"প্রভু হে! আমাদেরকে হেদায়াত দানের পর আমাদের হৃদয়কে আর বাঁকা করে দিও না। আর আমাদেরকে তোমার নিজের তরফ থেকে রহমত দান কর। নিশ্চিতই তুমি মহা দাতা।"

কিছু কিছু মানুষ যারা দর্শন শাস্ত্রে কিছুটা অধিকার রাখে এবং দার্শনিক কচ-কচানীর প্রতারণার মধ্যে নিক্ষিপ্ত। এই দলকে হুকামা (বিজ্ঞ পণ্ডিত, দার্শনিক) জ্ঞানে আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালামের সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ মনে করে বরং তারা এতদূর পর্যন্ত পৌছে গেছে যে, তারা তাদের মিথ্যা শাস্ত্রকে সত্য জ্ঞান করত একে আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালামের শরীয়তের উপর অগ্রাধিকার দেয়। আল্লাহ আমাদেরকে খারাপ 'আকীদা থেকে রক্ষা করুন। তবে হাঁ, যে মুহূর্তে তাদেরকে হুকামা' জানবে এবং তাদের জ্ঞানকে 'হিকমত' বলবে তখন অহেতুক এই বিপদে জড়াবে। এজন্য যে, 'হিকমত বলা হয় কোন বস্তুর সেই জ্ঞানকে যা যথার্থ ও বাস্তবতানুগ। অতএব যে সব জ্ঞান (উদাহরণত আম্বিয়া-ই কিরামের শরীয়তসমূহ) ঐ সব হিকমতের জ্ঞানের বিরোধী হবে তা ঐ সব হুকামার ধারণায় যথার্থ ও বাস্তবতার বিরোধী হবে।

সার-সংক্ষেপ এই যে, তাদের সত্যতা এবং তাদের জ্ঞানের সত্যতার স্বীকারের অর্থই হবে আম্বিয়া-ই কিরামকে এবং আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের জ্ঞানকে মিথ্যা জানা। এজন্য যে, এতদুভয়ের (আম্বিয়া-ই কিরাম ও দার্শনিকদের) জ্ঞান পরস্পরের একেবারে মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়িয়ে। একটাকে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থই হল আরেকটাকে মিথ্যা জ্ঞান করা। এখন যার যেমন ইচ্ছা–হয় আম্বিয়া-ই কিরাম (আ)-এর আনীত দীনের অনুসারী হবে এবং আল্লাহ্র দলে অন্তর্ভুক্ত হবে, নাজাত লাভকারীদের দলে শামিল হবে। আর যার ইচ্ছা দর্শন শাস্ত্রানুসারী হবে, শয়তানের দলে নাম লেখাবে এবং অসফল ও ব্যর্থ হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ - اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَاِنْ

يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ـ

"সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক, আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি আগুন যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেওয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয় যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। এটা নিকৃষ্ট পানীয় ও আগুন কত নিকৃষ্ট আশ্রয়!" সূরা কাহ্‌ফ, ২৯ আয়াত;

"আর শান্তি বর্ষিত হোক তাদের উপর যারা হেদায়াতের অনুসরণ করেছে এবং মুহাম্মদুর-রাসূলুল্লাহ (সা)-র আনুগত্যের পাবন্দী করেছে। আর রসূল (সা)-এর উপর, আম্বিয়া-ই কিরাম ও মালাইকা-ই ইজাম-এর উপর পরিপূর্ণ ও সর্বোত্তম দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।"[১]

নবূওত ব্যতিরেকে প্রকৃত আত্মশুদ্ধি সম্ভব নয়

"আমরা একথা বলি যে, আত্মার পরিচ্ছন্নতা ও পরিশুদ্ধি সেই সব নেক আমলের সঙ্গে সম্পর্কিত যেসব আমল আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পসন্দনীয় এবং তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য। আর এ বিষয়টি যা উপরে বর্ণনা করা হল নবূওতের উপর নির্ভরশীল। অনন্তর নবূওত ব্যতিরেকে অন্য কোনভাবে আত্মার পরিচ্ছন্নতা ও পরিশুদ্ধির হাকীকত লাভ হয় না।"[২]

নবী প্রেরণের আবশ্যকতা

মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র) নবী ও রসূলদের প্রেরণের আবশ্যকতা, হেদায়াত লাভের ক্ষেত্রে তাঁদের অপরিহার্যতা এবং এককভাবে বুদ্ধিবৃত্তি (তা সে যত উন্নত মার্গেরই হোক না কেন) যথেষ্ট না হওয়ার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে অপর এক পত্রে বলেন ঃ

"আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের আগমন ও আবির্ভাব দুনিয়াবাসীর জন্য রহমত। যদি তাঁদের অস্তিত্ব না থাকত তবে আমরা পথভ্রষ্টদেরকে আল্লাহ তা'আলা (যিনি ওয়াজিবু'ল-ওজূদ)-র সত্তা ও গুণাবলীর (যাত ও সিফাত) পরিচয়ের দিকে কে পথ প্রদর্শন করতেন এবং তাঁর পসন্দনীয় ও অপসন্দনীয় কাজের মধ্যে কে পার্থক্য-রেখা টেনে দিতেন?

"আমাদের ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান-বুদ্ধি হযরত আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের দাওয়াতের আলোক-রশ্মির সাহায্য ব্যতিরেকে সেই মর্ম অনুভবে

১. খাজা ইবরাহীম কুবাদযানীর নামে লিখিত পত্র, ২৩/৩

২. খাজা 'আবদুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহর নামে লিখিত, পত্র ২৬৬ নং।

অক্ষম এবং আমাদের অপূর্ণ উপলব্ধি ঐ সব হযরত-এর অন্ধ আনুগত্য ব্যতিরেকে এব্যাপারে অসহায় ও দুর্ভাগা।

"হাঁ, বুদ্ধিবৃত্তি অবশ্যই দলীল, কিন্তু দলীল হবার ক্ষেত্রে অপূর্ণ এবং তা কখনো পূর্ণ নিশ্চয়তা, আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টির পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে না। পরিপূর্ণ আস্থা ও প্রত্যয় কেবল আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের নবূওত দিতে পারে যার সঙ্গে চিরন্তন শাস্তি ও পারলৌকিক পুরস্কার জড়িত।"১

ঐশী জ্ঞান ও নবূওত

নবূওত আল্লাহ্র রহমত আর তা এজন্য যে, তা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয় লাভের মাধ্যম যা সর্বপ্রকার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সৌভাগ্য সম্বলিত। নবূওতের এই সম্পদ থেকেই এ কথার জ্ঞান ও বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে যে, আল্লাহ্র তা'আলার উপযোগী শান কী আর অনুচিত তথা অনুপযোগীই বা কী? এজন্য যে, আমাদের অদূরদর্শী ও অক্ষম বুদ্ধি যা সম্ভাবনা ও সৃষ্টির কলংক ও ক্রটি দ্বারা কলংকিত সে কি করে জানবে আল্লাহ্ তা'আলা যিনি চিরন্তন ও অসৃষ্ট (কাদীম), কোন্ নাম, গুণ ও কর্ম তাঁর শানের উপযোগী যেগুলো আত্মস্থ করা যায় আর কোনগুলো অনুপযোগী ও অসমীচীন যেগুলো থেকে এড়িয়ে চলা যায়। কেননা অধিকাংশ সময় এমন হয় যে, আপন ক্রটির দরুন আমাদের বুদ্ধি পূর্ণতাকে অপূর্ণ আর অপূর্ণতাকে পূর্ণ জ্ঞান করে। এই পার্থক্য জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য (যা নবূওত জন্ম দেয়) অধমের মতে, সর্বপ্রকার জাহিরী ও বাতেনী (প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য) নে'মতের চেয়ে বেশি। সে বড় হতভাগা যে অনুপযোগী ও অসমীচীন বিষয় ও অভদ্রোচিত বস্তুগুলো সেই পবিত্র সত্তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে। নবূওতই বাতিলকে হকের থেকে পৃথক করে এবং সে সবের ভেতর যেগুলো ইবাদতের হকদার নয় ও হকদার—পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছে। নবূওতের মাধ্যমেই এই সব হযরত (আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালাম) আল্লাহ তা'আলার রাস্তার দিকে মানুষকে দাওয়াত দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ্র বান্দাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্য ও মাওলার মিলন সৌভাগ্য দ্বারা ধন্য করে থাকেন এবং এই নবূওতের দ্বারা 'আলা ও জাল্লা মালিক কিসে সন্তুষ্ট হন সেই সন্তুষ্টির জ্ঞান লাভ হয় যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে এবং এর পার্থক্য ধরা পড়ে যে, তাঁর রাজ্যে বৈধ ও অনুমোদিত কোনটি আর কোন্টি অবৈধ ও অননুমোদিত। নবূওতের এধরনের উপকারিতা অনেক। অতএব এটা প্রমাণিত যে, আম্বিয়া-ই কিরামের আবির্ভাব ও আগমন আল্লাহ্র রহমত। যে ব্যক্তি নফসে আম্মারার (মন্দ

১. খাজা আবদুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহ্র নামে লিখিত, পত্র নং ২৬৬/১;

কর্মের, পাপ কর্মের প্ররোচক নফ্স) কামনা-বাসনার অনুসারী হয়ে অভিশপ্ত শয়তানের নির্দেশে নবূওতকে অস্বীকার করে এবং নবূওতের বিধি-নিষেধ ও চাহিদা মুতাবিক আমল না করে তবে সেক্ষেত্রে নবূওতের অপরাধ কোথায় আর তজ্জন্য নবূওতই বা রহমত হবে না কেন?"[১]

আম্বিয়া-ই কিরামের মারফতেই আল্লাহ্র পরিচয় লাভ ঘটে

"যেহেতু আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাতু ওয়া'স-সালামের অব্যাহত ধারার কারণে আল্লাহ্র দিকে (যিনি আসমান-যমীনের স্রষ্টা) তাঁদের দাওয়াত প্রদানের খ্যাতি ঘটল এবং ঐ সব হযরতের কালাম ও পয়গাম তথা কথা ও বার্তা সমুন্নত হল, তখন প্রতিটি যুগের নির্বোধেরা যারা নিখিল বিশ্বের স্রষ্টার প্রমাণের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ও সংশয়গ্রস্ত ছিল, নিজেদের ভুল সম্পর্কে অবহিত হয়ে বেএখতিয়ার স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিল এবং বস্তুসামগ্রী ও সৃষ্ট জীবজগতকে তাঁর দিকে সম্পর্কিত করল। এই আলোক-রশ্মি হযরত আম্বিয়া-ই কিরামের আলোকমালাসমূহ থেকেই গৃহীত এবং এই নে'মত আম্বিয়া-ই কিরামের নে'মতের খাঞ্চা থেকেই মিলেছে। আল্লাহ্র দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক কিয়ামত বরং অনন্তকাল অবধি।

"ঠিক তেমনি (কুরআন হাদীসের) সেই সমস্ত বাণী (منقولات) যা আমাদের পর্যন্ত আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম কর্তৃক পৌঁছানোর দরুন পৌঁছেছে, যেমন আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তার পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী, আম্বিয়া-ই কিরামের নবূওত, ফেরেশতাদের নিষ্পাপ (معصوم) হওয়া (তাঁদের উপর দরূদ, সালাম ও বরকত নাযিল হোক), হাশর-নশর, বেহেশ্ত-দোযখের অস্তিত্ব, জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি এবং জাহান্নামের চিরন্তন শাস্তি এসব এবং এধরনের অন্যান্য বস্তুসামগ্রী যেই গুলি সম্পর্কে শরীয়ত আমাদেরকে অবহিত করে, খবর দেয়। বুদ্ধি এগুলো পেতে অক্ষম, ঐ সব হযরত (আম্বিয়া-ই কিরাম)-দের থেকে না শুনে সেগুলো প্রমাণ করতে অক্ষম এবং এককভাবে যথেষ্ট নয়।"[২]

ঈমানের সঠিক স্তর বিন্যাস (সহীহ্ তরতীব)

"সর্বপ্রথম রসূলের উপর ঈমান আনতে হবে এবং তাঁর রিসালতকে সত্য বলে মানতে হবে যাতে করে তামাম হুকুম-আহ্কামের ক্ষেত্রে তাঁকে সত্য জ্ঞান করা যায় এবং তাঁর মাধ্যমে সন্দেহ ও সংশয়ের নিশ্চিত অন্ধকার থেকে মুক্তি

---

১. খাজা আবদুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহ্র নামে লিখিত, পত্র ২৬৬/১;

২. খাজা ইবরাহীম কুবাদয়ানীর নামে লিখিত, পত্র ২৩/২;

মেলে। এই ঈমানের মূল আর এ মূল সম্পর্কে প্রথমে যুক্তিসিদ্ধ ও অবহিত হতে হবে যাতে করে সমস্ত শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে অবলীলায় যুক্তিসিদ্ধ ও অবহিত হওয়া যায়। প্রতিটি শাখা-প্রশাখাকে আসল, সুদৃঢ় ও সুপ্রমাণিত করা ব্যতীত যুক্তিযুক্ত করা বড় কঠিন।

"এই সত্যতা অবধি পৌঁছা এবং আত্মিক প্রশান্তি লাভের নিকটতর রাস্তা হল যিক্র-ই ইলাহী তথা আল্লাহ্র যিক্র। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبِ۔ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى وَحُسْنُ مَاٰبٍ ۔

"মনে রেখ, আল্লাহ্র যিক্র দ্বারাই আত্মিক প্রশান্তি লাভ ঘটে। যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে তাদের জন্য সুসংবাদ ও সর্বোত্তম আশ্রয়স্থল।"

"গভীর অনুধ্যান, গবেষণা ও যুক্তি-প্রমাণের পথে এই মহান লক্ষ্যে পৌঁছা অসম্ভব। কবির ভাষায় ঃ

پائے استدلالیاں چوبین بود
پائے چوبین سخت بے تمکین بود

"যুক্তিবাদীদের পা হচ্ছে কাষ্ঠ নির্মিত, আর কাষ্ঠ নির্মিত পা হয় নড়বড়ে ও নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত।"[১]

আম্বিয়া-ই কিরামের রিসালত মান্যকারিগণ যুক্তিবাদী

"জানা দরকার যে, আম্বিয়া-ই কিরামকে যারা অনুসরণ করেন, অনুকরণ করেন তারা তাঁদের নবূওতকে প্রমাণ করবার পর এবং তাঁদের রিসালত সত্য বলে স্বীকার করবার পর তাদেরকে যুক্তিবাদীদের অন্তর্গত ধরতে হবে। আর এদের ঐ সব হযরতদের কথাকে দলীল ছাড়াই মেনে নেওয়া, সেই সময় (তাঁদের নবূওতকে যুক্তি-প্রমাণের সাথে মেনে নেবার পর) যুক্তি-প্রমাণ সিদ্ধ। যেমন একজন একটি মূলনীতিকে যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে গ্রহণ করে নিলেন। এর পর তার অর্থাৎ উক্ত মূলনীতির আওতায় যত শাখা-প্রশাখা জন্ম নেবে তা সবই ঐ প্রথম দলীল-প্রমাণের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে এবং সেই ব্যক্তি সেই মূল-নীতির দলীল-প্রমাণ সহকারে ঐ সমস্ত শাখা-প্রশাখার সমর্থনে দলীল- প্রমাণের অধিকারী হবেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْ لاَ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا ॰

---

১. মীর মুহাম্মদ নু'মানের নামে লিখিত, পত্র ৩৬/৩

بِالْحَقِّ - وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

"আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাম্‌দ ও শোক্‌র যিনি আমাদেরকে এর হেদায়াত দান করেছেন। আর আল্লাহ্ আমাদেরকে হেদায়াত দান না করলে আমরা হেদায়াত পেতাম না। নিশ্চিতই আমাদের প্রভু- প্রতিপালকের রসূল সত্যসহ আগমন করেছেন। আর শান্তি বর্ষিত হোক তাদের উপর যারা হেদায়াতের আনুগত্য করেছে।"[১]

আম্বিয়া-ই কিরামের শিক্ষামালাকে স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধির অধীনে আনয়ন নবূওত অস্বীকৃতির নামান্তর

"পাপ-পূণ্যের হিসাব, তূলাদণ্ড (মীযান) স্থাপন, পুলসিরাত সত্য। যেহেতু সত্য সংবাদবাহক (আ) এসবের সংবাদ দান করেছেন। নবূওতের তরীকা সম্পর্কে অজ্ঞ কারো কারোর এ সবের অস্তিত্বকে অসম্ভব জ্ঞান করা বিশ্বাসের অধঃপতন। কেননা নবূওতের পথ বুদ্ধির পথের উর্ধ্বে। আম্বিয়া-ই কিরাম প্রদত্ত সত্য শিক্ষামালা ও তথ্যসমূহকে বুদ্ধির আলোচনা-সমালোচনার নিরীখে ও বোধের দৃষ্টিতে সামঞ্জস্য বিধান করতে চাওয়া প্রকৃতপক্ষে নবূওতের পথকেই অস্বীকার করা। এসব বুদ্ধি-বহির্ভূত বিষয়ে আম্বিয়া-ই কিরামের কথাকে শর্তহীন ও প্রশ্নাতীতভাবে আমাদের মানতে হবে।"[২]

যুক্তি-বুদ্ধি বিরোধী এবং যুক্তিবুদ্ধির উর্ধ্বের মধ্যে পার্থক্য

"একথা মনে কর না যে, নবূওতের পথ ও পন্থা যুক্তিবুদ্ধি বিরোধী অথবা অযৌক্তিক বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বুদ্ধির পথ ও পন্থা (জ্ঞান ও যুক্তি-প্রমাণ) আম্বিয়া-ই কিরামের অনুসরণ অনুকরণ ব্যতিরেকে সেই মহান লক্ষ্য অবাধে পৌঁছুতে পারি না। যুক্তি-বুদ্ধি বিরোধী এক জিনিষ আর যুক্তি-বুদ্ধি বহির্ভূত বা উর্ধ্বে ভিন্ন জিনিষ। কোন চিন্তা-চেতনা কেবল তখনই বিচার-বিবেচনা করা যায় যখন বোধ ও উপলব্ধি এর প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারে।

আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পন্থা কেবল নবীদের মাধ্যমেই জানা যায়

"আম্বিয়া-ই কিরাম (আ)-এর ব্যতিরেকে গত্যন্তর নেই। কেননা দয়াল প্রভুর (যাঁর অস্তিত্ব যুক্তি-বুদ্ধির দিক দিয়ে অবধারিতভাবেই প্রমাণিত ও অপরিহার্য)

১. মীর মুহাম্মদ নু'মানের নামে লিখিত, পত্র৩৬/৩, ২. ২৬৬/১;

২. খাজা বাকী বিল্লাহ্‌র পুত্রদ্বয় খাজা 'আবদুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহর নামে লিখিত, পত্র ২৬৬/১;

কৃতজ্ঞতার দিকে পরিচালিত এবং সেসব অনুগ্রহ প্রদর্শনকারীর প্রতি জ্ঞানগত ও বাস্তব ভক্তি-শ্রদ্ধা কিভাবে প্রদর্শন করতে হবে তা তাঁর কাছ থেকে জেনে নিয়ে জানিয়ে দেন। কেননা আল্লাহ্র নিকট থেকে না জেনে তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন তাঁর মর্যাদা উপযোগী নয়। আর তা এজন্য যে, মানবীয় ক্ষমতা তা ধা-রণা করতে অক্ষম বরং অধিকাংশ সময় দেখা যায় মানুষ অশ্রদ্ধা ও অভক্তিকেই ভক্তি-শ্রদ্ধা বলে ধরে নিয়েছে এবং কৃতজ্ঞতাকে নিন্দা ও কুৎসার দিকে টেনে নিয়ে গেছে। আল্লাহ্র ইবাদত ও সম্মান-শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পন্থা নবূওতের মাধ্যমেই জানা যায় এবং আম্বিয়া-ই কিরাম প্রদত্ত জ্ঞান ও শিক্ষামালার উপর তা নির্ভরশীল। আওলিয়া-ই কিরামের প্রতি যে ইলহাম হয়ে থাকে তাও নবূওতের আলোক-রশ্মি থেকেই গৃহীত এবং আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের আনুগত্য ও অনুসরণের ফয়েয ও বরকত থেকে প্রাপ্ত।"[১]

পঞ্চেন্দ্রিয়ের তুলনায় যেমন বোধ-বুদ্ধি, তেমনি বুদ্ধি-বোধের তুলনায় নবূওতের মর্যাদা শ্রেষ্ঠতর

জ্ঞান-বুদ্ধির মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব যেমন পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপর, যেমন পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় না, জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে তা লাভ করা যায়। তেমনি নবূওতের তরীকা জ্ঞান-বুদ্ধির পন্থার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে যা পরিমাপ করা যায় না তা নবূওতের মাধ্যমে উপলব্ধিতে ধরা পড়ে। যে ব্যক্তি জ্ঞান-বুদ্ধির পন্থা ব্যতিরেকে জ্ঞান অর্জনের আর কোন পন্থার কথা স্বীকার করে না বস্তুত-পক্ষে সে নবূওতী তরীকাই স্বীকার করে না এবং সে হেদায়েতের বিরোধী।"[২]

নবূওতের মকাম

গ্রীসের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের ভেতর (যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আম্বিয়া-ই কিরামের দা'ওয়াত এবং নবূওতের আলোক-রশ্মি থেকে বহু দূরে লালিত-পালিত ও বর্ধিত হচ্ছিল) দিনরাত মশগুল থাকা এবং একেই জ্ঞান-প্রজ্ঞার চূড়ান্ত পর্যায় মনে করা, অপর দিকে কিতাব ও সুন্নাহর পথ-প্রদর্শন এবং এগুলো সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, হাদীস, সীরাত (আম্বিয়া-ই কিরামের বাণী ও জীবন-চরিত)-এর প্রতি আকর্ষণ ব্যতিরেকেই দৈহিক ব্যায়াম বা শারীরিক ক্রীড়া-কসরত, আত্মহনন ও চিল্লাকাশীর ভেতর সার্বক্ষণিকভাবে ডুবে থাকার কারণে বিগত শতাব্দীগুলোতে (যে শতাব্দীগুলোর সূচনা হয়েছে স্পষ্টত খৃ. অষ্টম

১. ইবরাহীম কুবাদয়ানীর নামে লিখিত, পত্র ২৩/৩;

২. প্রাগুক্ত;

শতাব্দী থেকে) নবূওতের মকাম তথা অবস্থানগত মর্যাদা সম্পর্কে কেবল এক ধরনের অপরিচিতি ও বিকর্ষণই নয় বরং এক রকমের অচেনা ও ভীতি সৃষ্টি হতে চলেছিল এবং যেহেতু আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের অবস্থা এমনিকি স্বয়ং নবী করীম (স)-এর জীবন-চরিত ঐ সব দার্শনিক পণ্ডিত ও মরমীবাদীদের সামনে এভাবে আসত যে, এই সব পবিত্রাত্মা সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করতেন, বিয়ে-শাদী করতেন, সন্তান-সন্ততি থাকত, হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন, কোন কোন সময় তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্যও করেছেন, পশুপাল চরিয়েছেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হতেন,খুশীর কথায় খুশী হতেন,দুঃখ ও ব্যথা-বেদনায় চিন্তিত ও বিষাদযুক্ত হতেন,তাঁদের জীবনে কোন কষ্ট-ক্লেশদায়ক ইবাদত ছিল না,না ছিল বছরব্যাপী,জীবনব্যাপী সিয়াম সাধনা ও চিল্লাকাশী যার উল্লেখ মধ্যম স্তরের আওলিয়া-দরবেশ ও সাধুদের জীবনে পাওয়া যায়। এরপর (অল্প বিস্তর যে সময়টুকু পাওয়া যায় তাও) রিসালতের দাওয়াত ও তাবলীগী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আল্লাহ্র মাখলুকের দিকে তাঁদেরকে মনোযোগ দিতে হয়। এ ছাড়া তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কর্ম পালন হতে পারত না। আর একদিকের মনোযোগ অপর দিকের মনোযোগের প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। এজন্য নব্য-প্লেটোবাদী ও অধ্যাত্মবাদী ঐ সব মহলে যেখানে দীনী ইল্ম তথা ধর্মীয় জ্ঞান বিশেষত হাদীসের সঙ্গে গভীর পরিচয় ছিলনা এবং যেখানে আওলিয়া-ই মুতাকাদ্দিমীন (প্রথম দিককার ওলীগণ) ও নব্য প্লেটোবাদীদের আধ্যাত্মিক উন্নতি, পরিপূর্ণ নিঃসঙ্গ ও নিভৃত জীবন যাপন, আত্মবিলোপ ও অনুপস্থিতির ঘটনাবলী দিনরাত তাদের মুখেমুখে ফিরে—এ ধারণা ব্যাপক হতে চলেছিল যে, ওলীর মকাম নবূওতের মকামের তুলনায় উত্তম আর ওলীর বিলায়েত গোটাটাই স্রষ্টার প্রতি মনোনিবেশ এবং সৃষ্টিজগতের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতির নাম আর নবূওতের বিষয়-বস্তু হল দাওয়াত যার সম্পর্ক হল সৃষ্টির সঙ্গে। ওলীআল্লাহর প্রতি সার্বক্ষণিক মনোযোগী থাকেন আর নবী থাকেন সৃষ্টির প্রতি। আর স্রষ্টার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টির প্রতি মনোযোগী হবার অবস্থার তুলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কেউ কেউ অবশ্য এক্ষেত্রে এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করে বলেছেন যে, ওলীর বিলায়েত নবীর নবূওত থেকে মোটের উপর উত্তম নয়। যারা এমনটি বলেছেন তাদের একথা বলার অর্থ এই যে, নবীর বিলায়েত তাঁর নবূওত থেকে উত্তম এবং নবী যখন স্রষ্টাকে নিয়ে মশগুল হন তখন তাঁর এই অবস্থা সেই অবস্থা থেকে উত্তম যখন তিনি দাওয়াত ব্যাপদেশে সৃষ্টিজগতের সঙ্গে মশগুল হন। কিন্তু এই চিন্তাধারা এই কথার প্রমাণ দেয় যে, বিলায়েতের মকামের

'আজমত, তার কামালিয়াত ও উন্নতি দ্বারা ভীতি মুসলমানদেরও এক বিরাট বিস্তৃত ধর্মীয় মহলে সৃষ্টি হতে চলেছিল যা মুসলিম উম্মাহ্‌র আসল উৎস নবুওত ও শরীয়তের সঙ্গে সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলছিল। আর এটা ছিল এমন এক বিপদ যার মুকাবিলা করা ইসলামের মুজাদ্দিদ এবং আম্বিয়া-ই কিরামের প্রতিনিধিবর্গের জন্য জরুরী ছিল।

আমাদের জানামতে, এব্যাপারে সর্বপ্রথম জোরালো দলীল-প্রমাণসহ ও আবেগোদ্দীপক পন্থায় হি. অষ্টম শতকের মধ্যভাগে ভারতবর্ষের মশহূর ওলীয়ে 'আরিফ ও তত্ত্বজ্ঞ সূফী হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনয়ারী (হি. ৬৬১-৭৮৬) আওয়াজ তোলেন এবং স্বীয় মকতূবাতে একে জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।[১] তিনি এতদূর পর্যন্ত লিখেছেন যে, আম্বিয়া-ই কিরামের একটি নিঃশ্বাস আওলিয়া-ই ইজামের গোটা যিন্দেগী থেকে উত্তম। আম্বিয়া-ই কিরামের মাটির দেহ আপন পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা ও ঐশী নৈকট্যের ক্ষেত্রে আওলিয়া-ই কিরামের দিল ও দিমাগ, তাঁদের একান্ত ও নিভৃত কানাকানির তুল্য।[২]

হযরত মখদূম বিহারীর পর পুনরায় হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীই এই বিরাট জ্ঞান-সমুদ্র এবং এই হি. ২য় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ ও সমাপ্তকারী হন। তিনি তাঁর মকতূবাতসমূহে প্রমাণ করেন যে, আম্বিয়া-ই কিরাম (আ) 'আকীদাগত, আধ্যাত্মিক, মেধাগত ও সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ তা'আলার শিল্পনৈপুণ্যের এবং ক্ষমা ও বদান্যতা গুণের সর্বোত্তম নমূনা হয়ে থাকেন। আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় হয়ে থাকে যে, কোন মনেযোগ, দৃকপাত ও ব্যস্ততাই সেই সম্পর্কের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না। এটা সেই বক্ষ সম্প্রসারণেরই নতীজা যদ্দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে নির্দিষ্ট করে থাকেন। তাঁদের উদার মহানুভবতা, সহ্যশক্তি,চিত্তের প্রশস্ততা এবং তাঁদের পয়গাম ও কর্মের (যা তাঁদেরকে সোপর্দ করা হয়ে থাকে) চাহিদা ও দাবী চিরন্তন স্বাভাবিকতা (صحو دائم), সার্বক্ষণিক সজাগ ও জাগ্রতাবস্থা, উপস্থিত বুদ্ধি ও সজাগ-সচেতন অনুভূতি যা বিলায়েতের অধিকারী ওলী-দরবেশদের নেই। আম্বিয়া-ই কিরামের যেখানে শুরু আওলিয়া-ই ইজামের সেখানে শেষ অর্থাৎ আওলিয়া-ই ইজামের কামালিয়তের শেষ ধাপ যেখানে সেখান থেকে নবীদের যাত্রা শুরু হয়। নবুওতের অনুসরণ ও আনুগত্যে ফরযসমূহের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ ঘটে যেখানে নফলের দ্বারা নৈকট্যে পৌঁছুতে পারে না। বিলায়েতের

---

১. ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক, ৩য় খণ্ড দেখুন।

২. প্রাগুক্ত;

কামালিয়াত নবূওতের কামালিয়াতের মুকাবিলায় ততটুকু গুরুত্ব রাখে যতটুকু রাখে এক ফোটা পানি সমুদ্রের বিপুল বারিরাশির মুকাবিলায়। এখন পাঠক মুজাদ্দিদ সাহেবের লেখনীর ভাষায় সেই সব হাকীকত ও উন্নত ইল্‌মের কথা শুনুন।

আম্বিয়া-ই কিরাম (আ) আল্লাহ্‌র সর্বোত্তম সৃষ্টি এবং সর্বোত্তম সম্পদ তাঁদেরকেই দেওয়া হয়েছে

"আম্বিয়া-ই কিরাম (আ) সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে আল্লাহ্‌র সর্বোত্তম সৃষ্টি আর সর্বোত্তম সম্পদই তাঁদেরকে দান করা হয়েছে। বিলায়েত নবূওতের অংশ মাত্র আর নবূওত হল সমগ্র। ফলে নিঃসন্দেহে নবূওত বিলায়েতের তুলনায় উত্তম হল—চাই তা নবীর বিলায়েতই হোক অথবা ওলীর বিলায়েতই হোক। অনন্তর স্বাভাবিক অবস্থা ইশ্‌ক-উন্মত্ত অবস্থা থেকে উত্তম। এজন্য যে, স্বাভাবিক অবস্থার ভেতর মত্তাবস্থা নিহিত যেমন বিলায়েত নবূওতের মাঝে নিহিত। অবশিষ্ট একক সচেতন অনুভূতি ও জাগ্রতাবস্থা যা সাধারণ মানুষের থাকে—আলোচনা বহির্ভূত। এই সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থার উপর প্রাধান্য দান কোন অর্থ বহন করে না। মত্তাবস্থা-নির্ভর স্বাভাবিক অবস্থা তো অবশ্যই মত্তাবস্থা থেকে উত্তম। ইলমে শরীয়ত যার উৎস হল নবূওত সরাসরি ধীর-স্থির ও স্বাভাবিক অবস্থা (صحو) হিসাবে কথিত। এই ইলম-এর বিরোধী যা কিছু হবে তা হবে سكر বা মত্তাবস্থা। মত্তাবস্থার অধিকারী ক্ষমার্হ। অনুসরণ-অনুকরণযোগ্য হল স্বাভাবিক জ্ঞান ও প্রাকৃতিক জ্ঞান, মত্তাবস্থা জ্ঞান নয়।"[১]

চিত্ত সম্প্রসারণের (انشراح صدر) কারণে সৃষ্টিজগতের প্রতি আম্বিয়া-ই কিরামের মনোযোগ আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশের প্রতিবন্ধক হয়না

"কতক মাশায়েখ আধ্যাত্মিক ভাবোন্মত্ত অবস্থার মুহূর্তে বলেছেন যে, বিলায়েত নবূওতের তুলনায় উত্তম। আবার অপর কতক লোক বলেছেন যে, এই বিলায়েত বলতে নবীর বিলায়েত বুঝানো হয় যাতে নবীর উপর ওলীর ফযীলতের ধারণা ও কল্পনাও যেন দূর হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা এর বিপরীত। এজন্য যে, নবীর নবূওত তাঁর বিলায়েত থেকে উত্তম। বিলায়েত-এ বক্ষের সংকীর্ণতার কারণে সৃষ্টির দিকে পুরোপুরি মনোনিবেশ হতে পারে না এবং নবূওতে বক্ষের বিপুল ব্যাপ্তি ও প্রসারতার দরুন আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ সৃষ্টিজগতের প্রতি মনোনিবেশে যেমন প্রতিবন্ধক হয়না, তেমনি সৃষ্টিজগতের

১. মিঞা সায়্যিদ আহমদ বিজওয়াড়ীর নামে লিখিত পত্র, ১০৮/১;

প্রতি মনোযোগ আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয় না। নবূওতের ভেতর এককভাবে সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ হয়না যাতে বিলায়েতকে (যার অভিমুখ ও মনোযোগ হয় আল্লাহ্র দিকে) অগ্রাধিকার প্রদান করা যায়। عياذا بالله سبحانه আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করি। অখণ্ড মনোযোগ সাধারণ লোকের বৈশিষ্ট্য। নবূওতের শান ও মর্যাদা এর থেকে ঊর্ধ্বের। এই হাকীকত অনুধাবন করা প্রেমোম্মত্ত সুফীদের পক্ষে দুষ্কর। এই জ্ঞান দৃঢ় চিত্তের অধিকারী সচেতন লোকদের পক্ষেই বুঝা সম্ভব।"

নবীদের অভ্যন্তরীণ দিক আল্লাহমুখী এবং বাহ্যিক সৃষ্টিমুখী

"কিছু কিছু মরমীবাদী সুফী বিলায়েতের জ্ঞানকে যা প্রেমোন্মত্ত অবস্থাভিমুখী, নবূওতের 'ইলমের উপর যা ধীরস্থির ও ভারসাম্যপূর্ণ —অগ্রাধিকার প্রদান করেন। আর এই প্রেমোন্মত্ত অবস্থারই উক্তি ঃ الولاية افضل من النبوة "নবূওত থেকে বিলায়েত উত্তম।" এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হল, বিলায়েতে আল্লাহ তা'আলার দিকে মনঃসংযোগ ঘটে আর নবূওতের সৃষ্টি অভিমুখে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে,সৃষ্টিমুখী হবার তুলনায় আল্লাহমুখী হওয়া উত্তম। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, নবীর বিলায়েত তাঁর নবূওত থেকে উত্তম।"

"অধমের মতে, এধরনের কথা অর্থহীন ও অনভিপ্রেত। এজন্য যে, নবূওতে সৃষ্টির দিকেই কেবল মনোযোগ দেওয়া হয় না,বরং সৃষ্টিমুখী মনোযোগের সাথে আল্লাহর দিকেও মনোযোগ থাকে। মকামে নবূওতের অধিকারীর অভ্যন্তর আল্লাহ্র সঙ্গী হয়ে থাকে আর বাহ্যিক হয় সৃষ্টিমুখী। যাদের গোটা মনোযোগই সৃষ্টিমুখী তারা হয় রাজনীতিবিদ নতুবা জাহিলদের অন্তর্গত।"

"ওলী-আওলিয়ার শুরু, নবী-রসূলদের শেষ" এই উক্তির প্রত্যাখ্যান

"এই উক্তি একেবারেই অর্থহীন যে, ওলী-আওলিয়ার যেখানে শুরু নবী-রসূলদের সেখানে শেষ। ওলী-আওলিয়ার শুরু এবং নবী-রসূলদের শেষ, তাদের মতে এর দ্বারা শরীয়ত বোঝান হয়েছে। যেহেতু তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানা নেই সেজন্য এই ধরনের কথা যবান থেকে সে বের করতে পেরেছে। এই ধরনের বিষয় আর কেউ বর্ণনা করেনি বরং অধিকাংশ লোক এর সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণাই ব্যক্ত করেছে। আর এটি দুর্বোধ্য বলেই মনে হয়। কিন্তু যারা সত্য ও ন্যায়পন্থী, যারা আম্বিয়া আলাহিমু'স-সালামের বুযুর্গী ও মাহাত্ম্যের দিকটিও দেখে থাকেন এবং শরীয়তের 'আজমত ও মর্যাদা তার উপর ভর করে থাকে তারা এসব সূক্ষ রহস্যাকে গ্রহণ করতে পারে এবং একে ঈমান বুদ্ধির ওসীলা বানাতে

পারে।[১] আম্বিয়া-ই কিরাম (আ) দাওয়াতকে সৃষ্টিজগতের উপর নির্ভরশীল রেখেছেন এবং কেবল কলব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

"হে বৎস! শোন, আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম দাওয়াতকে সৃষ্টিজগতের উপর নির্ভরশীল রেখেছেন। হাদীস শরীফে আছে যে, ইসলামের বুনিয়াদ পাচটি জিনিষের উপর (কলেমা শাহাদাত তথা আল্লাহ্‌র ওয়াহদানিয়াতের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান, সালাত, সিয়াম, হজ্জ ও যাকাত)। আর যেহেতু হৃদয়ের সঙ্গে সৃষ্টিজগতের সর্বাধিক সম্পর্ক রয়েছে সেজন্য হৃদয় দিয়ে এসত্য গ্রহণেরও তাঁরা আহবান জানান এবং হৃদয়োর্ধ্ব যে সব বস্তু রয়েছে সেগুলোকে তাঁরা আলোচনার আওতায় আনেন নি,লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যেও গণনা করেন নি। লক্ষ্য কর, বেহেশ্‌তের আরাম-আয়েশ, দোযখের জ্বালা-যন্ত্রণা ও অবর্ণনীয় কষ্ট, দীদারে ইলাহী-রূপ সম্পদ আর বঞ্চনার দারিদ্র্য–এসবই সৃষ্টিজগতের (আলমে খাল্‌ক) সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত – আলমে আম্‌র তথা অনুজ্ঞা জগতের এসবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।"[২]

নবূওতের অনুসরণে কু'র্‌ব বি'ল-ফারাইদ অর্জিত হয়

"ঠিক তেমনি ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতের আমলসমূহের যথাযথ আদায়। এর সম্পর্ক হল মানব দেহের সঙ্গে যা সৃষ্টিজগতের অন্তর্গত। আর যে সব আল-মে আম্‌র তথা অনুজ্ঞা জগতের অংশ তা নফল আমলসমূহের অন্যতম। যে নৈকট্য ঐসব আমলের যথাযথ আদায়ের পরিণাম ফল তা আমল মাফিক হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে যে নৈকট্য ফরয আদায়ের ফল তা আলমে খাল্‌ক-এর অংশ এবং যে নৈকট্য নফল আদায়ের ফল তা আলমে আম্‌র-এর অংশ। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ফরযের মুকাবিলায় নফল কোন গণনার মধ্যেই বিবেচ্য নয়। তার মর্যাদা তো এতটুকুও নয় যতটুকু মর্যাদা এক বিন্দু পানির সমুদ্রের বিপুল বারিবাশির মুকাবিলায়। সুন্নতের মুকাবিলায় নফলেরও একই অবস্থা। এথেকে এই দুই নৈকট্যের পারস্পরিক পার্থক্য ধারণা করা যেতে পারে এবং আলরে আমর-এর উপর আলমে খাল্‌ক-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য এই পার্থক্য থেকে উপলব্ধি করা যাবে।"[৩]

বিলায়াতের কামালিয়াত নবূওতের কামালিয়াতের মুকাবিলায় কোন গুরুত্ব বহন করে না

"আল্লাহ তা'আলা এই অধমের নিকট সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, বিলায়েতের কামালিয়াত নবূওতের কামালিয়াতের মুকাবিলায় কোনরূপ গণনার

১. মখদুমযাদা শায়খ মিঞা মুহাম্মদ সাদেকের নামে পত্র, ২৬০/১;
২. মখদুমযাদা শায়খ মিঞা মুহাম্মদ সাদেকের নামে পত্র, ২৬০/১;
৩. প্রাগুক্ত;

মধ্যেই আসে না। অতটুকু হিসাবের মধ্যেও পড়ে না যতটুকু পড়ে এক বিন্দু পানির সমুদ্রের বিপুল বারিরাশির মুকাবিলায়। অতএব যে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য নবূওতের পথে হাসিল হয়ে থাকে তা বিলায়াতের পথে অর্জিত মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের থেকে কয়েকগুণ বেশি। অনন্তর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সাধারণভাবে ও সম্পূর্ণত আম্বিয়া-ই কিরাম (আ)-ই লাভ করে থাকেন,আর ফেরেশতাগণ অংশত মর্যাদা লাভ করে থাকেন। এজন্য জমহূর 'উলামায়ে কিরামের কথাই ঠিক।

"এই বিশ্লেষণ থেকে পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন হল যে, কোন ওলীই নবীর দর্জাই উপনীত হতে পারেন না (আ), বরং ওলীর মস্তকই নবীর পায়ের নীচে স্থাপিত হবে।"[১]

'আলিম-উলামার জ্ঞান-গবেষণার বিশুদ্ধতা ও অগ্রাধিকারের কারণ

"যে সমস্ত ক্ষেত্রে 'আলিম-উলামা ও সূফীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে,সে সব ক্ষেত্রে তুমি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে সত্য আলিম-উলামার পক্ষে রয়েছে। এর পেছনে রহস্য এই যে, আম্বিয়া-ই কিরামের পদাংক অনুসরণের কারণে 'আলিম-উলামার দৃষ্টি নবুওতের কামালিয়াত ও জ্ঞান অবধি পৌঁছে যায় আর সূফীদের দৃষ্টি বিলায়াতের কামালিয়াত ও তাঁর ইল্‌ম ও মা'রিফতের ওপর সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। অতএব নিঃসন্দেহে যে জ্ঞান নবূওতের আলোক-পুঞ্জ থেকে আহরিত ও গৃহীত তা অধিক বিশুদ্ধ, নির্ভুল ও যথার্থ হবে সেই জ্ঞানের তুলনায় যা বিলায়াতের মর্তবা থেকে আহরিত ও গৃহীত।"[২]

"অধম তাঁর সকল গ্রন্থে ও পত্রে লিখেছে এবং বিচার-বিশ্লেষণ করেছে যে, নবূওতের কামালিয়াত সমুদ্রের ন্যায় আর বিলায়াতের কামালিয়াত সেই তুলনায় বারিবিন্দু। কিন্তু কি করা যাবে। একদল নবূওতের কামালিয়াত পর্যন্ত না পৌঁছুনোর দরুন বলেছে, الولاية افضل من النبوة। বিলায়াত নবূওতের থেকে উত্তম। অপর এক দল এর এভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছে যে, নবীর বিলায়াত তাঁর নবূওত থেকে উত্তম। এই দুই দল নবূওতের হাকীকত তথা প্রকৃত তাৎপর্য না জানার কারণে অদৃশ্যের ওপর ফয়সালা দিয়ে বসেছে। এই ফয়সালারই নিকট-বর্তী প্রেমোন্মত্ত অবস্থাকে সজ্ঞান ও সুস্থির অবস্থার ওপর প্রাধান্য দেওয়াও। যদি তারা সজ্ঞান ও সুস্থির অবস্থার হাকীকত সম্পর্কে অবহিত হত তবে কখনোই প্রেমোন্মত্ত অবস্থাকে সজ্ঞান ও সুস্থির অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত করত না।

چه نسبت خاك را با عالم پاك

১. খাজা 'আবদুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহ্‌র নামে লিখিত পত্র, ২৬৬/১

২. খাজা 'আবদুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহ্‌র নামে লিখিত পত্র, ২৬৬/১;

"সম্ভবত তারা বিশিষ্ট লোকদের (elite) সজ্ঞান ও সুস্থির অবস্থাকে জনসাধারণের সতর্ক ও জাগ্রতাবস্থার অনুরূপ ভেবে মত্তাবস্থাকে এর ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছে। ঠিক তেমনি বিশিষ্ট লোকদের মত্তাবস্থা (سکر) কে সাধারণ মানুষের নেশা ও মত্তাবস্থার অনুরূপ আখ্যায়িত করে একই রায় দেয়। কেননা বিজ্ঞজনদের নিকট এটা প্রমাণিত যে, সজ্ঞান ও সুস্থির অবস্থা মত্তাবস্থা (سکر) থেকে উত্তম। যদি সজ্ঞান, সুস্থির ও মত্তাবস্থা রূপক হয় তবুও, আর যদি আক্ষরিক অর্থেই হয় তবুও। এক্ষেত্রে অর্থের বা ব্যাখ্যার কোন হেরফের হবে না।"[১]

আম্বিয়া-ই কিরামের মর্যাদা নবূওতের কারণে

"এতটুকু অবশ্যই বুঝতে হবে যে, আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাতু ওয়া'স-সালাম যা কিছু মর্যাদা ও বুযুর্গী লাভ করেছেন তা নবূওতের পথে লাভ করেছেন, বিলায়াতের পথে নয়। বিলায়াতের স্থান নবূওতের জন্য একজন খাদেমের বেশী নয়। নবূওতের ওপর যদি বিলায়াতের আদৌ কোন অগ্রাধিকার কিংবা প্রাধান্য থাকত তাহলে মালা-ই আ'লা'র (সর্বোচ্চ উর্ধ্বতম আকাশের) ফেরেশতামণ্ডলী যাদের বিলায়াত সমস্ত বিলায়াতের তুলনায় অধিকতর কামিল–আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালাতু ওয়া'স-সালাম থেকে উত্তম হতেন। এই দলের একটি গ্রুপ যেহেতু বিলায়াতকে নবূওতের তুলনায় উত্তম বলে মেনে নিয়েছে সেহেতু মালা-ই আ'লার বিলায়াতকে আম্বিয়া-ই কিরামের বিলায়াত থেকে পূর্ণতরো ভেবেছে এবং স্বাভাবিক কারণেই মালা-ই আ'লার ফেরেশতামণ্ডলীকে আম্বিয়া-আলায়হিমু'স-সালাতু ওয়াস-সালাম থেকে উত্তম ধরে নিয়েছে বিধায় তারা জমহূর আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আত থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এসব কিছু ঘটেছে নবূওতের হাকীকত সম্পর্কে অনবধানতা ও অজ্ঞতার ফলে। যেহেতু নবূওত যুগের থেকে দূরত্বের কারণে লোকের চোখে নবূওতের কামালিয়াত বিলায়াতের কামালিয়াতের মুকাবিলায় ক্ষুদ্র ও নিষ্প্রভ দৃষ্টিগোচর হয় সেজন্য এই বিষয়টাকে আমি এই অধ্যায়ে বিস্তৃত ও খোলাখুলিভাবে লিখলাম এবং প্রকৃত অবস্থার একটি ক্ষুদ্র অংশ বর্ণনা করলাম।

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ـ[২]

---

১. খানখানান-এর নামে পত্র, ২৬৮/১;

২. খানখানান-এর নামে লিখিত পত্র, ২৬৮/১;

"হে আমাদের রব! আমাদের পাপ এবং কর্মে সীমালংঘন তুমি ক্ষমা কর, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর" (ত ঃ ১৪৮)।

ঈমান বি'ল-গায়ব (অদৃশ্যে বিশ্বাস) আম্বিয়া-ই কিরাম, সাহাবা, উলামা এবং সাধারণ মু'মিনদের অংশ

"বাদ হাম্‌দ ও সালাত! আমার বন্ধু ও ভাই মীর মুহিব্বুল্লাহ্‌র জানা দরকার যে, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর সমুদয় গুণাবলীর ওপর অদেখা বিশ্বাস আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাতু ওয়া'ত-তাসলীমাত ও তাঁর সঙ্গী-সাথীবৃন্দের অংশ এবং সে সমস্ত আওলিয়ার যাঁরা তামাম ও কামাল (সৃষ্টিকে তাঁর পরম স্রষ্টার দিকে দাওয়াত দানের উদ্দেশ্যে) প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁদের (পয়গম্বরদের) নিসবতও সাহাবাদের নিসবত হয়ে থাকে যদিও তা কমতরো ও অল্প। আর এই ঈমান বি'ল-গায়ব 'আলিম-উলামা ও সাধারণ মুমিনদেরও অংশ এবং ঈমানে শুহূদী সাধারণ সূফীদের অংশ—তা তারা বৈরাগ্যবাদীই হোক অথবা ভোগবাদীই। এজন্য যে, ভোগবাদী সূফীগণ যদিও প্রত্যাবর্তনকারী (مرجوع) কিন্তু তাদের প্রত্যাবর্তন (desccnd) পরিপূর্ণ হয় না। তাদের অন্তরাত্মা (باطن) তেমনি উপরের দিকে তাকিয়ে থাকে। যদিও তারা বাহ্যিকভাবে সৃষ্টিজগতের সঙ্গে থাকেন কিন্তু অন্তরগতভাবে থাকেন পরম স্রষ্টা আল্লাহ্‌র সঙ্গে। এজন্য সর্বদাই ঈমান-ই শুহূদী তাঁদের ভাগে পড়ে। আর আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাতু ওয়া'ত-তাসলীমাত পরিপূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তনকারী হয়ে থাকেন এবং ভেতর-বাহির সৃষ্টিকুলকে আল্লাহ জাল্লা শানুহূর দিকে আহ্বান জানাতে নিবিষ্ট থাকেন, সেজন্য ঈমান বি'ল-গায়ব তাঁদের ভাগে পড়ে।"

আম্বিয়া-ই কিরামের পূর্ণ প্রত্যাবর্তন পরম মার্গে উপনীত হবার আলামত

"এই অধম তাঁর কোন কোন পত্রে প্রমাণ করেছে যে, প্রত্যাবর্তন সত্ত্বেও ঊর্ধ্ব পানে তাকিয়ে থাকা অপরিপক্ক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ও ত্রুটির আলামত এবং পরিণতি বা পরম সত্য অবধি না পৌঁছুবার প্রমাণ। আর পরিপূর্ণ প্রত্যাবর্তন চূড়ান্ত মার্গে উপনীত হবার আলামত। সূফীগণ উভয় তাওয়াজ্জুহ্ বা মনঃসংযোগ (সৃষ্টির প্রতি মনঃসংযোগ ও স্রষ্টার প্রতি মনঃসংযোগ)-এর সামগ্রিকতাকেই কামালিয়াত মনে করেছেন এবং তাশবীহ (integration) ও তানযীহ (abstraction)-র সংযোগ ও সম্মিলনকেই আধ্যাত্মিক কুশলতার পরিপূর্ণতা গণ্য করেছেন।"

ان ایشا نند و من چنینم یا رب

শরীয়তের সাহায্য-সমর্থন, 'আকীদার সংস্কার-সংশোধন এবং শির্ক ও জাহিলী রসম-রেওয়াজ প্রত্যাখ্যান (তাসাওউফ কি?)

আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক শাক্তিশালী ও সুদৃঢ়করণ, অলসতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার হাত থেকে হেফাজত এবং আত্মিক রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার সেই পন্থা ও পদ্ধতি —কাল-পরিক্রমায় ও সময়ের বিবর্তনে এবং কতকগুলি কারণে পরবর্তীকালে যা তাসাওউফ নামে পরিচিতি লাভ করেছে, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল কুরআনী পরিভাষায় "তাযকিয়া" এবং সহীহ্ হাদীসের পরিভাষায় "ইহ্সান"-এরই সেই ধর্মীয় শাখা যাকে কুরআন মজীদে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দুনিয়ার বুকে প্রেরণের লক্ষ্য চতুষ্টয়ের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ ايتِه وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ - وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلَلٍ مُّبِيْنٍ -

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রসূলরূপে যে তাদের নিকট তেলাওয়াত করে তাঁর আয়াত, তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে" (৬২ ঃ ২)।

উম্মাহর এই খেদমত এবং দীনকে তার কলব (হৃদয়) ও কাঠামো, দেহ ও আত্মা, সংবিধান ও সম্পর্ক সহকারে কায়েম রাখার দায়িত্ব অর্পিত ছিল খাত-মান্নাবিয়্যীন (সা)-এর খুলাফায়ে রাশিদীন (পুণ্যাত্মা খলীফা চতুষ্টয়) ও তাঁর সত্যপন্থী প্রতিনিধি (উলামায়ে হক)-বৃন্দের যিম্মায়। তাঁরা শরীয়তে মুহাম্মদীর সাথে এই আত্মিক রোগ-ব্যাধির এই চিকিৎসার হেফাজত ও পুনরুজ্জীবন করতে থাকেন এবং জাহিরী ফিক্হশাস্ত্রের সঙ্গে বাতেনী ফিক্হ (তাযকিয়া বা তাসাওউফ)-এর প্রচার-প্রসারেও জোর তৎপর থাকেন। তাঁদের এই কাজ বিস্তারিতের পরিবর্তে সংক্ষিপ্তে এবং খুঁটিনাটির পরিবর্তে বেশির ভাগ মূলনীতির উপর স্থাপিত ছিল। কিন্তু খেলাফত সাম্রাজ্য ও মুসলিম বিজয়ের ক্রমবিস্তৃতি, বিপুল বিস্তৃত আকারে ইসলামের প্রচার, সম্পদ ও উপায়-উপকরণ, আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য, নবুওতের যুগ-যমানা থেকে দূরত্ব এবং فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ "বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল"-এরই সমার্থক, যখন শয়তানের প্রতারণা ও কলা-কৌশলসমূহ, বস্তুবাদের ফেতনা, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক রোগব্যাধি নিত্য-নতুনরূপে এবং নিত্য-নব দর্শনসহকারে আর্বিভূত হল তখন "তাযকিয়া" ও

"ইহ্সান"-এর শাস্ত্রও "তাসাওউফ"-এর মত নব আবিষ্কৃত পরিভাষার সাথে সেরকমই একটি সুবিন্যস্ত শাস্ত্রে পরিণত হল যেভাবে অনারব জাতিগোষ্ঠীসমূহের সংমিশ্রণে ভাষার ব্যকরণ (نحو), শব্দরূপ ও ধাতুপ্রকরণ (صرف) এবং অর্থ ও বাকভঙ্গীশাস্ত্র (معانی وبیان)-কে (যেসবের মূলনীতি ও সূচনা আরবীভাষী জাতিগোষ্ঠীসমূহের প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট ছিল) নাহ্ও ও বালাগাত (অলংকারশাস্ত্র)-এর বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম শাস্ত্রে রূপান্তরিত করে দেয় এবং এসব শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ জন্ম নেওয়া শুরু হয় যাঁরা স্থায়ী মাদরাসা ও জামে'আ (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন, এ সব শাস্ত্রের জন্য স্থায়ী পাঠ্য-সূচী তৈরী করেন। অতঃপর তাঁদের দিকে এসব শাস্ত্র শিখতে ও জ্ঞান আহরণে আগ্রহী শিক্ষার্থিগণ ধাবিত হতে থাকে।

ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে এই চিকিৎসা পদ্ধতির (তাযকিয়া বা তাসাওউফ যাই বলি না কেন) কর্মপরিধি কিতাব ও সুন্নাহ্, রসূল (সা)-এর জীবনাদর্শের অনুসরণ, তাঁর গুণাবলী ও চরিত্রের অনুকরণকে কেন্দ্র করে ছিল। কিন্তু কালের প্রভাব, অনারব ও নওমুসলিম জাতিগোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক মেলামেশা, অনারব সাধু-সন্ন্যাসীদের সাহচর্য ও তাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার পরিণতিতে তাসাওউফের ভেতর বিদ'আত, ইবাদত ও যুহ্দ-এর বাড়াবাড়ি ও সীমাতিরিক্ততা, একক নিঃসঙ্গপ্রিয়তা ও বৈরাগ্যবাদের জীবাণু ব্যক্তি বিশেষ ও শ্রদ্ধেয় লোকদের সীমাতিরিক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রথা এবং আরও বহু ভুইফোড় কাজ-কর্ম ও প্রথা প্রবেশ করতে শুরু করে। এমন কি এই সব অনৈসলামী এবং আপাদমস্তক অপরিচিত বাইরের 'আকীদা-বিশ্বাস কোন কোন আধ্যাত্মিক মহল ও সিলসিলার মধ্যে চুপিসারে ও অত্যন্ত সন্তর্পণে ঢুকে পড়ে যে, নিষ্ঠা, ঐকান্তিক মগ্নতা ও পূর্ণ একাগ্রতার সাথে একটা উল্লেখযোগ্য সময় ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকা এবং ফরয ও সুন্নতসমূহের পাবন্দী করা ও ইরফান-ই কামিল তথা পূর্ণ মা'রিফত হাসিল হবার পর একটি মনযিল এমনও আসে যখন সালিক (আধ্যাত্মিক পথের পথিক)-এর শরঈ ফরয ও প্রচলিত ইবাদতের আর বাধ্যবাধকতা থাকে না এবং তিনি (সালিক) ঐ সবের পাবন্দীর হাত থেকে মুক্ত হয়ে যান। এরই নাম "কষ্টের অবসান" (سقوط تكليف)। এই 'আকীদা-বিশ্বাসের লোকেরা কুরআন মজীদের বিখ্যাত আয়াত وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ "তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদত কর যতক্ষণ না তোমার নিকট মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়" দ্বারা দলীল পেশ করে। এ ছিল এক বিরাট ফেতনা যা গোটা শরঈ নিজামকে বেকার ও অকেজো এবং সালিককে বল্গাহীন ও ইবাদত-বন্দেগীর বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করে দিত।

অনুমিত হয় যে, হি. ৪র্থ শতাব্দী থেকেই আব্বাসী খেলাফত যখন যৌবন তারুণ্যের শীর্ষে এবং বিরাট বিরাট মুসলিম শহর আপন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও উন্নতি-অগ্রগতির শীর্ষবিন্দুতে অবস্থান করছিল, বিদ'আত ও বিকৃতির এই সিলসিলা খোলাখুলিভাবেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাসাওউফের সবচেয়ে প্রাচীনতম গ্রন্থ যা সেই সময় পর্যন্ত মুদ্রিত হয়েছিল তা ছিল শায়খ আবুন্নাস্‌র সিরাজ (মৃ.৩৭৮ হি.)-এর কিতাবু'ল-লাম'। এর একটি অংশের নাম[১] "কিতাবু'ল-উসওয়া ওয়া'ল-ইক'তিদা' বি রাসূলিল্লাহ (সা)। এরপর হযরত সায়্যিদ 'আলী হুজবীরী[২] (মৃ. ৪৬৫ হি.)-র "কাশফু'ল-মাহজূব" নামক গ্রন্থে সম্ভবত এরই ভিত্তিতে اقامت حقيقت بے حفظ شریعت محال ..... و حقیقت بے شریعت نفاق- এর মত সতর্কতা প্রদানকারী শব্দ উচ্চারিত হয়। ইমাম আবু'ল-কাসিম কুশায়রী (মৃ, ৪৬৫ হি.)-র "রিসালা-ই কুশায়রিয়া" নামক তাসাওউফ গ্রন্থ ছিল সবচেয়ে প্রাচীনতম পথ-নির্দেশনামামূলক গ্রন্থ ও সংবিধান। তাঁর যুগেই তাসাওউফের ভেতর এতটা অবনতি ও পতন দেখা দিয়েছিল যে, তিনি তদীয় গ্রন্থে লিখেন ঃ

وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة فعدو اقله المبالاة بالدين اوثق ذريعة .....

واستخفوا باداء العبادات واستهانوا بالصوم والصلوة-

"অন্তরসমূহ থেকে শরীয়তের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ বিদায় নিয়েছে। তারা দীন সম্পর্কে বেপরোয়া মনোভাবকে একটা বিরাট নির্ভরযোগ্য মাধ্যম ভেবে নিয়েছে। ইবাদত-বন্দেগী সম্পাদনকে তারা গুরুত্বহীন বিষয় ঠাওরিয়েছে এবং সিয়াম পালন ও সালাত আদায়কে মামূলী ব্যাপার ভেবেছে।"[৩]

তাঁর গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনামই হল 'শরীয়তের প্রতি তা'জীম ও তাকরীম' সম্পর্কিত এবং এতে তিনি পূর্বকালের সূফীয়ায়ে কিরাম ও মাশাইখ-ই 'ইজাম-এর শরীয়তের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সুন্নত অনুসরণের অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন। শেষ অধ্যায়ে وصية المريدين শীর্ষক শিরোনামে তিনি লিখেন ঃ بناء هذا الامر وملاكه على اداب الشريعة "এই বিষয়টির (তাসাওউফের) বুনিয়াদ ও নির্ভরশীল ভিত্তি হল শরঈ আদবের হেফাজতের উপর।"

---

১. কিতাবুল-লাম', পৃ. ৯৩-১০৪, লণ্ডন থেকে প্রকাশিত ১৯১৪।

২. পূর্ণ নাম আবুল হাসান 'আলী ইবন উছমান ইব্‌ন আবী 'আলী আল-জাল্লাবী। সাধারণভাবে তিনি দাতা গঞ্জে বখ্‌শ নামে খ্যাত। লাহোরে মাযার আছে।

৩. রিসালা-কুশায়রিয়া, পৃ. ১, মিসর সং

সমগ্র পুস্তকটি শরীয়তের হাকীকত ও বিশুদ্ধ ইল্‌ম মুতাবিক লিখিত। মুহাক্কিক সূফীগণ একে একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ্যপুস্তকের ন্যায় গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

তরীকতের মাশায়েখ ও হাকীকতের ইমামদের মধ্যে শরীয়তের সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী ও সমর্থক ছিলেন সায়্যিদুনা শায়খ 'আবদুল কাদির জিলানী (র)। তিনি তাঁর শিক্ষামালার ভেতর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন সুন্নতের পাবন্দী ও শরীয়তের পরিপূর্ণ আনুগত্যের ও অনুসরণের ওপর। আর তাঁর গোটা জীবনই ছিল এর সাক্ষাৎ নমুনা।

'গুনিয়াতু'ত-তালিবীন' লিখে তিনি তরীকতের পাড় শরীয়তের আঁচলের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছেন। "ফুতুহু'ল-গায়ব" নামক তদীয় মাওয়াইজ গ্রন্থের দ্বিতীয় নিবন্ধ "সুন্নতের অনুসরণ ও বিদ'আত বর্জন" সম্পর্কিত। তিনি এর সূচনা করেছেন এভাবে ঃ اتبعوا ولا تبتدعوا।

"সুন্নতের অনুসরণ কর এবং বিদ'আত এখতিয়ার কর না।" তরীকতকে শরীয়তের খাদেম ও অধীনস্থ বানানোর ক্ষেত্রে তিনি মুজাদ্দিদ-এর দর্জা হাসিল করেছিলেন। তিনি প্রথমে ফরযসমূহ, এরপর সুন্নতসমূহ, অতঃপর নফলে মশগুল হবার নির্দেশনা দান করতেন এবং প্রথমটি অর্থাৎ ফরয পরিত্যাগপূর্বক অন্যগুলোতে মশগুল হওয়াকে বোকামী ও ঔদ্ধত্য বলেন।

তাসাওউফের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও নির্ভরযোগ্য কিতাব হল শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর (মৃ. ৬৩২ হি.) 'আওয়ারিফু'ল-মা'আরিফ যাকে তত্ত্ববিদ বিশেষজ্ঞ সূফীগণ প্রতিটি যুগেই জীবন রক্ষাকবচ বানিয়ে রেখেছেন এবং বহু খানকাহ্‌তে এর নিয়মিত দ্‌রস অনুষ্ঠিত হত। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড শরীয়তের রুকনসমূহের আদব ও গুঢ় রহস্যসমূহের বর্ণনাসম্বলিত। শায়খ (র) স্বীয় গ্রন্থে উপসংহার টেনেছেন এভাবে যে, "কথায় কাজে কর্মে ও অবস্থাগতভাবে সর্বস্তরে সর্বপর্যায়ে রসূলুল্লাহ (সা)-র সুন্নত অনুসরণের নামই হল তাসাওউফ এবং এর ওপর সর্বদা কায়েম থাকার দ্বারা তাসাওউফের অনুসারীদের নফসসমূহ পাক-পবিত্র হয়ে যায়, পর্দা উঠে যায় এবং প্রতিটি জিনিষের মধ্যে রসূল (সা)-এর অনুসরণ হতে থাকে।"[১]

হি. নবম শতাব্দীতে শায়খ মুহ্‌য়িউদ্দীন ইবন 'আরাবী এবং তাঁর ছাত্রদের বৈদ্যুতিক প্রভাবে যা মুসলিম বিশ্বে তীব্র ও বেগবান স্রোতের ন্যায় বিস্তার লাভ করছিল, তাসাওউফ একটি দর্শনে পরিণত হয় যেখানে গ্রীক, অধিবিদ্যার বহু

১. বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন "তাসাওউফে ইসলাম", মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীকৃত।

পরিভাষা ও বিষয়গত দিক অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজুদ তাসাওউফপন্থীদের প্রতীক চিহ্ন ও গর্বের বস্তুতে পরিণত হয় এবং খানকাহ থেকে শুরু করে মাদরাসা অবধি সর্বত্র এর জয়গান গীত ও ধ্বনিত হতে থাকে। কুরআন ও সুন্নাহ্ সম্পর্কে অপরিচিতি, হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং এর সহীহ ও নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে খানকাহগুলি এমন সব 'আকীদা-বিশ্বাস ও সমূহ আমলের লীলাভুমিতে পরিণত হয় যার সনদ ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহে মেলা ভার এবং যে সম্পর্কে ইসলামের স্বর্ণযুগের মুসলমানরা একেবারেই অপরিচিত ছিল।

এদিকে ভারতবর্ষে যা হাজারও বছর থেকে যোগ ও সন্ন্যাসের কেন্দ্রভূমি ছিল, মুসলিম সূফীদের মুখোমুখি হতে হয় সেই সব বৈরাগ্যবাদী যোগীদের যারা তাদের ধ্যান ও নফসের শক্তি শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ ও যোগাসনসহ বিভিন্ন আসনের মাধ্যমে খুবই বাড়িয়ে নিয়েছিল। কোন কোন মুসলিম সূফী তাদের থেকে এই জ্ঞান অর্জন করে। অপর দিকে (গুজরাট বাদে যেখানে আরব 'আলিমদের শুভাগমন এবং হারামায়ন শারীফায়ন যাতায়াতের কারণে হাদীসের প্রচার লাভ ঘটেছিল এবং 'আল্লামা 'আলী মুত্তাকী বুরহানপূরী ও তাঁর খ্যাতিমান শাগরিদ আল্লামা মুহাম্মদ তাহির পাটনী জন্মলাভ করেছিলেন) এই দেশটি সিহাহ সিত্তা ও সেই সব গ্রন্থকারদের কিতাবাদি সম্পর্কে অপরিচিত ছিল যারা গলদ হাদীস ও বিদ'আত প্রত্যাখ্যানে ভূমিকা রাখেন এবং বিশুদ্ধ সুন্নত ও প্রমাণিত হাদীসসমূহের আলোকে জীবনের কর্মসূচী পেশ করেন। ভারতবর্ষের ঐসব স্থানীয় আধ্যাত্মিক দর্শন ও অভিজ্ঞতাসমূহের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া স্বীয় যুগের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় শাত্তারী শায়খ মুহাম্মদ গাওছ গোয়ালিয়ারীর জনপ্রিয় "জওয়াহিরে খামসা"-তে দেখা যেতে পারে যার বুনিয়াদ ছিল বেশীর ভাগ বুযুর্গদের বাণী ও তাঁদের অভিজ্ঞতার ওপর। মনে হয় যে, সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কিংবা নির্ভরযোগ্য সীরাত ও শামাইল গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করাকে প্রয়োজনীয় মনে করা হয়নি। এই গ্রন্থে নামায-ই আহযাব, সালাতু'ল-'আশিকীন, নামায তানবীরু'ল-কবর এবং বিভিন্ন মাসের নির্দিষ্ট নামায ও দু'আসমূহ রয়েছে যেগুলোর হাদীস ও সুন্নাহ্ থেকে কোন প্রমাণ নেই। "জওহারে দুওম"-এ "আসমায়ে আকবারিয়্যাঃ" তথা শ্রেষ্ঠ নামসমূহ খাস শায়খ-এর সংকলিত যেগুলোর মধ্যে ফেরেশতাদের হিব্রু ও সুরিয়ানী নাম রয়েছে এবং আহ্বানসূচক শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে যদ্দারা আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্যের নিকট সাহায্য কামনা করা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়েছে। দু'আ-ই বাশমাখ নামক একটি দু'আও রয়েছে যার ভেতর হিব্রু ও

সুরিয়ানী ভাষার নামসমূহ আহবানসূচক হরফ (حرف ندا) সহযোগে আছে। গোটা গ্রন্থের ভিত্তি দা'ওয়াত-ই আসমার উপর। ঐসব নামের মক্কেল মেনে নেওয়া হয়েছে তাকে যে তার আসল মাহিয়ত তথা প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত। হুরূফ-ই তাহজী এবং সেসবের মক্কেলদের আলোচনাও করা হয়েছে এবং ناد عليا مظهر العجائب- এর দু'আও আছে।

সুন্নত ও বিদ'আত, শরীয়ত ও দর্শন এবং তাসাওউফ ও যোগ-এর এই সংমিশ্রণের যুগে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক কাজ শুরু হয়। এই অবস্থার চিত্রাংকন করতে গিয়ে তিনি স্বয়ং স্বীয় মাখদূম মুরশিদতনয় খাজা 'আবদুল্লাহকে এক পত্রে বলেন ঃ

"এই মুহূর্তে পৃথিবীতে বিদ'আত এত অধিকহারে প্রকাশিত হচ্ছে যে, মনে হচ্ছে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার সমুদ্র আছড়ে এসে পড়ছে আর সুন্নতের আলোক-শিখা এর মুকাবিলায় এই উত্তাল তরঙ্গের মাঝে এভাবে টিমটিম করছে যেন মনে হচ্ছে যে, রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে কোথাও কোথাও জোনাকী পোকা তার (ক্ষীণ) আ-লোক-রশ্মি ছড়াচ্ছে।"[১]

হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই নাযুক ও সংকটময় যুগে যখন ভারতবর্ষে মুসলিম সালতানাতের হাতে ইসলামের জড়েমূলে উৎসাদন এবং খানকাহগুলোতে সুন্নতের অসম্মান করা হচ্ছিল এবং পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছিল ঃ শরীয়ত ও তরীকত দু'টো ভিন্ন জিনিষ যার রাস্তা ও রসম একে অপরের থেকে পৃথক এবং যার আইন-কানুন তথা বিধি-বিধান একে অন্যের থেকে আলাদা" এবং যেখানে কোন ইল্ম-এর অধিকারী (আলিম) ও হকের প্রার্থীকে যদি তিনি কোন বিষয়ে শরীয়তের দলীল- প্রমাণ জিজ্ঞাসা করবার হিম্মত করে বসতেন তখন তাকে এই বলে স্তব্ধ ও নিশ্চুপ করে দেওয়া হত ঃ

بے سجادہ رنگین کن گرت پیر مغان گوید
کہ سالك بے خبر نہ بود راہ و رسم منزلها

তখন তিনি পূর্ণ শক্তিতে আওয়াজ তোলেন যে, "তরীকত শরীয়তের অনুগত ও খাদেম। শরীয়তের কামালিয়াত হাল ও মুশাহাদার উপর অগ্রগামী। শরীয়তের একটি হুকুমের উপর আমল করা হাজার বছরের রিয়াযতের চেয়ে অধিকতর ফলপ্রসূ ও উপকারী। সুন্নতের অনুসরণে কায়লূলা (দুপুরের খাবারের পর বিছানায় একটু গড়িয়ে নেয়া) ইবাদতের উদ্দেশ্যে রাত্রি জাগরণের তুলনায় উত্তম। হারাম ও হালালের ক্ষেত্রে সূফী-দরবেশদের আমল দলীল নয়। এজন্য কুরআন-সুন্নাহ ও

১. মকতূব ২৩/২ মখদূম যাদা খাজা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌র নামে।

ফক্হ গ্রন্থের দলীল থাকতে হবে। গোমরাহ ও পথভ্রষ্টদের রিয়াযত-মুজাহাদা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম নয় বরং তা দূরত্ব বৃদ্ধির কারণ। শিঙ্গা বা তূরী এবং অদৃশ্য রূপ বা আকৃতি (اشكال غيبي) ক্রীড়া-কৌতুকের অন্তর্গত। শরীয়তের দায়-দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা কখনো অপসারিত হয় না।"

এখন এরপর মকতূবাতের সেই উদ্ধৃতি পাঠ করুন যা এই সব সত্যসম্বলিত।

"শরীয়ত তামাম জাগতিক ও পরকালীন সৌভাগ্যের যামানত দেয়। কোন কাম্য ও কাংক্ষিত বস্তু এমন নেই যে, তার পূর্ণতা সাধনের জন্য শরীয়ত ব্যতিরেকে আর কোন বস্তুর প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তরীকত ও হাকীকত যা সূফীদের বৈশিষ্ট্য–উভয় শরীয়তের খাদেম এবং ইখলাস অর্জনে তার সহায়ক ও সহযোগী। ঠিক তেমনি তরীকত ও হাকীকত অর্জনে লক্ষ্য কেবল শরীয়তকে তার আসল রূহ তথা প্রাণসত্তার সাথে আমলের ভেতর নিয়ে আসা, অন্য কিছু নয় যা শরীয়তের বৃত্ত বা গণ্ডি বহির্ভূত। সেসব হালত, ওয়াজ্দ-এর কায়ফিয়াত, ইলম ও মা'রিফত, যা সূফীদের সুলূকের ভেতর হাসিল হয়ে থকে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে না। সেগুলো কিছু সমস্যা ও ধ্যান-ধারণা যার মাধ্যমে তরীকতের পথের শিশু পথিকদের মন ভোলান এবং তাদের সাহস বাড়ানো হয়ে থাকে। এসবগুলো অতিক্রম করে রিযা বা সন্তুষ্টির মকামে উপনীত হওয়া দরকার যা মকামাত, সলূক ও জযবার চূড়ান্ত পর্যায়।"[১]

সেই একই পত্রে তিনি লিখেন ঃ

"সংকীর্ণ দৃষ্টির অধিকারী হালত ও ওয়াজ্দকে উদ্দেশ্য ও মুশাহাদা (পর্যবেক্ষণ) এবং তাজাল্লিয়াতকে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে গণ্য করে। এর অনিবার্য ফল দাঁড়ায় এই যে, কষ্ট-কল্পনা ও নানাবিধ ধ্যান-ধারণার কারাগারে তারা হয় বন্দী এবং শরীয়তের কামালিয়াত থেকে মাহরূম।"[২]

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ - اَللّٰهُ يَجْتَبِىْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ-

অপর এক পত্রে নফলের উপর ফরযের শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"যেসব আমলের দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা হয়ে থাকে সেগুলো হয়ত ফরয অথবা নফল। ফরযের মুকাবিলায় নফলের কোন গুরুত্বই নেই। স্ব-

১. মুল্লা হাজী মুহাম্মদ লাহোরীর নামে পত্র, ২৬/২;

২. প্রাগুক্ত;

ওয়াক্তে কোন ফরয আদায় এক হাজার বছরের নফলের থেকে উত্তম যদিও তা খালেস নিয়তে আদায় করা হয়।"[১]

অপর একটি পত্রে এই প্রসঙ্গে যে, নফসের ইসলাহ তথা সংস্কার- সংশোধন এবং এর যাবতীয় রোগ-ব্যাধি দূরীকরণ ও শরীয়তের হুকুম-আহকামের ওপর আমল হাজারও রিয়াযত-মুজাহাদার চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রসু ও উপকারী। তিনি বলেন ঃ

"শরীয়তের হুকুম-আহকামের ভেতর থেকে কোন একটি হুকুমের ওপর 'আমল প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা দূরীকরণে হাজার বছরের সেই সব রিয়াযত ও মুজাহাদা থেকে বেশি প্রভাবশীল যা নিজের থেকে করা হয়; বরং এই রিয়াযত ও মুজাহাদা যা শরীয়তের চাহিদার প্রেক্ষিতে হয় না তা প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা ও রোগ-ব্যাধিকে আরও বেশি শক্তি জোগায়। ব্রাহ্মণ ও যোগীরা রিয়াযত - মুজাহাদার ক্ষেত্রে চেষ্টার কোন ক্রটি রাখেনি, কিন্তু তা তাদের জন্য কিছুমাত্র উপকারী ও ফলপ্রসূ হয় নি। নিজের নফ্স তথা প্রবৃত্তিকে অধিকতর মোটা করা এবং তাকে আরও বেশি খাদ্য ও খোরাক জোগানো ছাড়া তা আর কোন কাজে আসেনি।"

অপর এক পত্রে শরীয়তের কামালিয়তের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে লিখছেনঃ

"পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ স্বপ্ন ও কল্পনায় মগ্ন এবং বাদাম ও আখরোটকেই যথেষ্ট ভেবে নিয়েছে। তারা শরীয়তের কামালিয়াতের কি খবর রাখে এবং তরীকত ও হাকীকতের প্রকৃত হাকীকত সম্পর্কেই বা কি জানে? তারা শরীয়তকে 'খোসা' এবং হাকীকতকে 'মগজ' মনে করে। তারা জানেনা যে,হাকীকতে হাল তথা অবস্থার হাকীকত কি জিনিষ। সূফীদের ভাসা ভাসা কথায় তারা ধোকায় পড়ে, প্রতারিত হয়। তারা তাদের হাল ও মকামে আসক্ত।"[২]

এক পত্রে একটি সুন্নতে নববীর ওপর 'আমল করার ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে লিখছেন ঃ

"ফযীলত সমগ্রটাই রসূল করীম (সা)-এর সুন্নত অনুসরণের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা শরীয়তের ওপর আমল করার সঙ্গে গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত। যেমন দুপুরে খাবার গ্রহণের পর একটু শোয়া যা সুন্নত পালনের নিয়তে করা হয় তা কোটি কোটি শবে বেদারী বা রাত্রি জাগরণ থেকে উত্তম

১. শায়খ নিজাম থানেশ্বরীর নামে পত্র, নং ২৯।

২. পত্র নং ৪০/১ শায়খ মুহাম্মদ চিগক্লীর নামে।

এবং যাকাতের একটি পয়সাও আদায় করা পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করা অপেক্ষা উত্তম যা নিজের পক্ষ থেকে করা হয়।"[১]

অন্য এক পত্রে বলেন ঃ

"পথভ্রষ্ট সূফীগণ যিক্‌র-ফিকরকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভেবে ফরয ও সুন্নত আদায়ের ক্ষেত্রে অলসতার আশ্রয় নেয়, চিল্লা ও রিয়াযত-মুজাহাদা এখতিয়ার পূর্বক জুমু'আ-জামা'আত পরিত্যাগ করে। তারা জানেনা যে, জামা'আতের সঙ্গে একটি ফরয নামায আদায় তাদের হাজারো চিল্লা থেকে উত্তম। তবে হাঁ, যিক্‌র-ফিক্‌র যদি শরীয়তের আদব রক্ষাপূর্বক হয় তবে তা খুবই ভাল এবং জরুরীও বটে। ত্রুটিপূর্ণ আলিমগণও নফলের প্রচলন ঘটাবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেষ্ট, কিন্তু তার ফরযগুলোকে খারাপ ও নিকৃষ্টতর রাখে।"[২]

মীর মুহাম্মদ নু'মানের নামে লিখিত একপত্রে বলেন ঃ

"এই দলের (সূফীদের) ভেতর একটি জামা'আত যারা সালাতের হাকীকত সম্পর্কে অবহিত এবং এর নির্দিষ্ট কামালিয়াত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারে নি। তারা নিজেদের রোগ-ব্যধির চিকিৎসা অন্য জিনিসের দ্বারা অনুসন্ধান করে এবং নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিল অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জড়িত মনে করে বরং তাদের ভেতর থেকে একটি দল নামাযকে নিষ্ফল মনে করে এবং একে অন্য ও অন্যান্যের উপর স্থাপিত মনে করে। রোযাকে নামাযের তুলনায় উত্তম বিবেচনা করে যে, এর ভেতর বেনিয়াযী তথা পরমুখাপেক্ষীহীনতা গুণের প্রকাশ রয়েছে। আর বিপুল সংখ্যক একদল লোক নিজেদের অস্থিরতার প্রশান্তি 'সামা' ও সঙ্গীত, ভাবোন্মত্ততা ও প্রেম বিহ্বলতার ভেতর খুঁজে বেড়ায় এবং তারা নাচ ও নৃত্যকেও কামালিয়াত ভেবে নিয়েছে। তারা কি শোনে নি যে, ما جعل الله في الحرام شفاء "আল্লাহ তা'আলা হারাম বস্তুর মধ্যে শিফা তথা রোগ মুক্তি রাখেন নি!" যদি তাদের সামনে সেই সব কামালিয়াত যা নামাযের মাধ্যমে হাসিল হয় একটি অণুও প্রকাশিত হয়ে যেত তাহলে তারা সামা ও সঙ্গীতের পেছনে ছুটে বেড়াত না এবং ভাবোন্মত্ততা ও আবেশ-বিহ্বলতাকে স্মরণ করত না।"[৩]

چوں نہ دیدند حقیقت رہ افسانہ زدند

একস্থানে নফসের পরিচ্ছন্নতার উল্লেখ করত যা অমুসলিম এবং পাপ-পংকিলতায় লিপ্ত মুরতাদ (مرتاض রিয়াযতকারী, কঠোর তপস্যাকারী)-দের অর্জিত হয়ে থাকে — লিখছেন ঃ

১. পত্র নং ১১৪/১ সূফী কুরবানের নামে।
২ .মাখদূমযাদা শায়খ মুহাম্মদ সাদেক-এর নামে পত্র,২৬০ নং পত্র।
৩. ২৬১ নং পত্র, মীর মুহাম্মদ নু'মানের নামে।

"প্রকৃত পরিচ্ছন্নতা ও আত্মিক পরিশুদ্ধি নেক আমল করার উপর নির্ভরশীল যা সালিকের মর্জির মধ্যে শামিল হবে। আর এ বিষয়টি নবূওতের উপর নির্ভরশীল যেমন উপরে বলা হয়েছে। অতএব নবূওত ও রিসালত ব্যতিরেকে প্রকৃত পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা হাসিল হতে পারে না। সেই পরিচ্ছন্নতা যা কাফির ও পাপ কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিরা লাভ করে তা নফসের তথা প্রবৃত্তির পরিচ্ছন্নতা— কলব তথা হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা নয়। নফসের পরিচ্ছন্নতা গোমরাহী ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করে না এবং ক্ষতির রাস্তা ছাড়া আর কোন রাস্তাও দেখায় না। বাকী কিছু কিছু অদৃশ্য বিষয়ের কাশ্‌ফ যা কাফির ও পাপীদের নফসের পরিচ্ছন্নতার মুহূর্তে কখনও সখনও হাসিল হয়ে যায় তা ইস্তিদ্‌রাজ। আর এ লাভ ক্ষতি ও ধ্বংস ডেকে আনা ব্যতিরেকে এদলের অনুকুলে আর কিছু বয়ে আনে না।"[১]

সালিক ও 'আরিফ তথ্য আধ্যাত্মিক পথের পথিক ও সাধক শরীয়তের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত এবং ফরয ও শরীয়তের হুকুম-আহকামের আনুগত্য ও অনুসরণ থেকে নিষ্কৃতি মিলবার বিপজ্জনক আকীদা যা গোটা শরঈ ব্যবস্থাপনাকে খতম করে দেবার জন্য একটি জ্বলন্ত দাহ্য বস্তুর ভূমিকা পালন করতে পারত— প্রত্যাখ্যান করে একটি পত্রে লিখছেন ঃ

"ভ্রান্ত তাসাওউফপন্থী এবং পরিণতি সম্পর্কে উদাসীন ধর্মদ্রোহী (মুলহিদ)-রা এই চিন্তায় মত্ত যে, তারা তাদের গর্দানকে শরীয়তের গোলামী থেকে মুক্ত ও স্বাধীন এবং শরীয়তের হুকুম-আহকাম তথা বিধি-বিধানকে জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট করে দেবে। তাদের ধারণা যে, বিশিষ্ট লোকেরা কেবল মা'রিফতের ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকেন, যেমন সাম্রাজ্যের আমীর-উমারা ও সুলতান ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দায়বদ্ধ। তারা বলেন যে, শরীয়তের উপর আমল করার উদ্দেশ্য হল মা'রিফত হাসিল করা। যখন মা'রিফতই হাসিল হয়ে গেল তখন শরীয়তের সকল দায়-দায়িত্ব চলে গেল। তারা তাদের দলীল হিসাবে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে থাকে ঃ

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ

"আর তুমি তোমার রব-এর ইবাদত করবে তোমার মৃত্যু (ইয়াকীন) না আসা অবধি।"

একপত্রে তিনি বলেন যে, হালাল-হারামের ক্ষেত্রে সূফী- দরবেশদের আমল দলীল নয়। তিনি লিখেন ঃ

"হালাল-হারামের ক্ষেত্রে সূফীদের আমল দলীল বা সনদ নয়। এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, আমরা তাদেরকে এব্যাপারে মা'যূর মনে করি, তাদেরকে ভর্ৎসনা

১. মিএগ্রা শায়খ বদীউদ্দীন-এর নামে পত্র, ২৭৪/১ নং ;

না করি এবং তাদের ব্যাপারটা আল্লাহ্ তা'আলার সোপর্দ করি। এব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ য়ূসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-র উক্তি নির্ভরযোগ্য, আবূ বকর শিবলী বা আবু'ল-হাসান নূরীর আমল নয়। এই যুগের ভ্রান্ত সূফীরা তাদের পীরের আমলকে বাহানা হিসাবে খাড়া করে নাচ-গানকে তাদের দীন ও মিল্লাত হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং একে আনুগত্য ও ইবাদত বানিয়ে নিয়েছে اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا তারা তাদের দীনকে ক্রীড়া- কৌতুকের বিষয়বস্তু বানিয়ে রেখেছে।"[১]

মুজাদ্দিদ সাহেব-এর শরীয়তের প্রতি এই সমর্থন জ্ঞাপন অন্ধ স্বাজাত্যবোধের (حميت) পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছিল এবং তিনি যখন কুরআন ও সুন্নাহ্ এবং জমহূর আহলে সুন্নাহ্র 'আকীদা-বিরোধী কোন সূফিয়ানা গবেষণা কিংবা হাল সম্পর্কে শুনতে পেতেন এবং এর সনদ তাসাওউফের কোন গ্রন্থ অথবা বুযুর্গদের হালত, বাণী বা উক্তি থেকে নেওয়া হত তখন তাঁরা ফারূকী শিরা-উপশিরা চঞ্চল হয়ে উঠত এবং তাঁর কলম থেকে শরীয়তের সমর্থন ও সুন্নাহ্র মর্যাদাবোধের প্লাবন উপচে পড়ত।

একবার কোন এক খাদেম জনৈক বুযুর্গ (শায়খ আবদুল কবীর য়ামানী)-এর এধরনেরই কোন বিরল ও লোমহর্ষক উক্তি নকল করেছিলেন। মুজাদ্দিদ সাহেব এটা সহ্য করতে পারেন নি। তাঁর কলম থেকে স্বত:ই নিম্নোক্ত মন্তব্য-গুচ্ছ বেরিয়ে যায় ঃ

" মখদূম! ফকীর-এর এ ধরনের কথা শোনার মত ধৈর্য নেই। এ জাতীয় কথা শুনলে আমার ফারূকী শিরা-উপশিরাগুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং তা ভিন্নতর কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ দেয় না, তা এধরনের কথা শায়খ কবীর য়ামানীরই হোক অথবা শায়খ আকবর শামীরই হোক। আমাদের মুহাম্মদ 'আরাবী (সা)-র কালাম দরকার, মুহয়িউদ্দীন ইবনে 'আরাবীর'[২] কালামে আমাদের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই সদরুদ্দীন কৌনবী ও শায়খ 'আবদুর-রাযযাক কাশীর কালামের। আমাদের নস-এ কাজ, ফস-এ[৩] কাজ নেই ফুতূহাত-ই মদীনা আমাদেরকে ফুতূহাত-ই মাক্কিয়্যার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে।[৪]

১. খাজা আবদুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহর নামে, পত্র নং ২৬৬/১;

২. মৃত্যু দামিশ্কে এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

৩. নস' দ্বারা 'নস-ই শরঈ' এবং 'ফস' দ্বারা শায়খ আকবরের 'ফুসূসুল-হিকাম-এর বিশেষ কোন অংশ বুঝান হয়েছে।

৪. পত্র ১০০, ২য় খণ্ড, মুল্লা হাসান কাশ্মিরীর নামে;

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর মতে, শরীয়ত মুতাবিক যে আমল করা হবে তা যিক্‌র-এর অন্তর্গত। এক পত্রে তিনি বলেন ঃ

"সর্বক্ষণ নিজেকে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর যিক্‌র-এ মশগুল রাখা দরকার। যে 'আমলই শরীয়ত মাফিক হবে তাই যিক্‌র-এর অন্তর্গত হবে, চাই কি তা কেনা-বেচাই কেন না হোক। অতএব সর্বপ্রকার চলাফেরা ও উঠা-বসার ভেতর শরঈ হুকুম-আহকামের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে তা সবই যিক্‌র-এ পরিণত হতে পারে। এজন্য যে, যিক্‌র অলসতা ও গাফিলতি দূর করারই নাম। যখন সমগ্র ক্রিয়াকলাপের ভেতর শরীয়তের আদেশ-নিষেধের প্রতি রে'আয়েত করা হবে তখন রে'আয়েতকারী এর আদেশ প্রদানকারী (আল্লাহ্ পাক যিনি একক সত্তা), যিনি প্রকৃত নির্দেশ প্রদানকারী ও নিষেধকারী, তাঁর প্রতি অলসতা প্রদর্শনের হাত থেকে মুক্তি পাবে এবং সে সার্বক্ষণিক যিক্‌র-রূপ সম্পদ লাভ করবে।"[১]

এই সমর্থন ও শরঈ মর্যাদাবোধের ভিত্তিতে মুজাদ্দিদ সাহেব তা'জীমি সিজদার উপর কঠোর সমালোচনা করেন যা কোন কোন পীর- মাশায়েখের এখ-ানে প্রচলন ঘটতে শুরু করেছিল এবং তাঁর কিছু কিছু ভক্ত মুরীদের এখানে এব্যাপারে অলসতা ও গাফিলতির খবর পেয়ে তাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছিলেন।[২] অধিকন্ত শির্কমূলক কার্যকলাপ ও প্রথা-পদ্ধতি প্রত্যাখ্যানে ও নিন্দা জ্ঞাপনে (যেসব ব্যাপারে সে যুগে অলসতা ও গাফিলতি শুরু হয়ে গিয়েছিল), শেরেকী প্রথার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, গায়রুল্লাহর নিকট সাহায্য প্রর্থনা ও প্রয়োজন পূরণের শেরেকী 'আকীদা, কাফির মুশরিকদের পালা-পার্বনের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন এবং তাদের রসম-রেওয়াজ ও আদব-অভ্যাসের প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও অনুসরণ, বুযুর্গদের জন্য জীবন্ত পশু উৎসর্গ করা ও যবাহ করা, পীর ও তাদের বিবির নিয়তে রোযা রাখা, প্রত্যাখ্যান ও নিন্দা জ্ঞাপনের ব্যাপারে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ব্যাখ্যাও প্রকাশ্য সতর্কবাণী সেই সব সুদীর্ঘ ও বিস্তৃত পত্রসমূহে দেখা যাবে যা তাঁরই মুরীদ একজন নেককার মহিলার নামে তিনি লিখেছিলেন।[৩]

এই আকীদার সংস্কার-সংশোধন, শির্ক ও বিদ'আত প্রত্যাখ্যান এবং নির্ভেজাল দীনের প্রতি দাওয়াত প্রদান সেই মহান পুনর্জাগরণমূলক কাজ ছিল যা দীর্ঘকাল পর হযরত মুজাদ্দিদ (র) ভারতবর্ষের মাটিতে শুরু করেছিলেন (যার

১. পত্র ২৫, ২য় খণ্ড, খাজা মুহাম্মদ শরফুদ্দীন হুসায়ন-এর নামে;

২. দ্র. পত্র ৯২, ২য় খণ্ড , মীর মুহাম্মদ নু'মান ও পত্র ২৯, ২য় খণ্ড, শায়খ নিজামুদ্দীন খানেশ্বরীর নামে;

৩. পত্র ৪১ ৩য় খণ্ড بصالحه از اهل ارادت

মুসলিম জনবসতি অমুসলিম সংখ্যাধিক্যের ভেতর ঘেরাও এবং ইসলামের প্রাথমিক কাল হবার দরুন শির্কমূলক জাহিলিয়াতের বিপদাশংকা দ্বারা সর্বদা সন্ত্রস্থ ছিল), অতঃপর এর পূর্ণতা ও বিস্তৃতি সাধন তাঁরই সিলসিলার খ্যাতনামা মাশায়েখ হাকীমুল-ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ দেহলভী ও তাঁর পরিবার[১] এবং সৈয়দ আহমদ শহীদ (র) ও তাঁর জামা'আত বক্তৃতা ও লেখনী, বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা, কুরআন-হাদীসের তরজমা এবং স্বীয় ব্যাপক বিস্তৃত তবলীগী সফরের মাধ্যমে করেছিলেন।

সুন্নাহর প্রচলন এবং বিদ'আতে হাসানার প্রত্যাখ্যান

এমন কোন জিনিষ যা আল্লাহ ও রসূল দীনের অন্তর্ভুক্ত করেন নি এবং যা করবার জন্য হুকুমও দেননি তা দীনের ভেতর শামিল করে নেওয়া, তার একটি অংশে পরিণত করা এবং তা ছওয়াব ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য করা, এর মনগড়া শর্ত ও আদবসমূহ বাধ্যতামূলক মেনে চলা–যেভাবে শরীয়তের একটি হুকুমকে মেনে চলা হয় –তাই বিদ'আত। বস্তুতপক্ষে বিদ'আত হল আল্লাহর দীনের ভেতর মনুষ্য- রচিত শরীয়ত গড়ে নেওয়া। এই শরীয়তের পৃথক ফিক্হশাস্ত্র রয়েছে, আরও রয়েছে স্থায়ী ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাবসমূহ যা কোন কোন সময় শরীয়তে ইলাহীর সমান্তরাল এবং কোন কোন সময় সংখ্যা ও গুরুত্বে তাকেও ছাড়িয়ে যায়। বিদ'আত এই সত্যকে উপেক্ষা করে যে, শরীয়ত পূর্ণতা পেয়েছে, যা নির্ধারিত হবার ছিল তা নির্ধারিত হয়ে গেছে, যেগুলো ফরয ও ওয়াজিব হবার ছিল সে সব ফরয ও ওয়াজিব বানানো হয়ে গেছে। দীনের টাকশাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন যদি কোন মুদ্রাকে উক্ত টাকশালের বলা হয় তবে তা হবে জাল মুদ্রা। ইমাম মালিক (র) কত সুন্দরই না বলেছেন ঃ

من ابتدع فی الاسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم ان محمد صلی الله علیه وسلم خان الرسالة فان الله سبحانه یقول "اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ" فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا۔

"যে ব্যক্তি ইসলামের কোন বিদ'আতের জন্ম দেয় এবং একে সে ভাল মনে করে সে প্রকারান্তরে একথারই ঘোষণা দেয় যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম (না'ঊযু বিল্লাহ্) রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খিয়ানত

---

১. যার ভেতর তাঁর খ্যাতনামা পৌত্র মওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ (মৃ. ১২৪৬ হি.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

করেছেন। এজন্য যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু বলেন, "আজ আমি তোমাদের নিমিত্ত তোমাদের দীনকে পূর্ণতা দান করলাম।" অতএব যা রিসালত ও নবুওত যুগে দীন ছিল না তা আজও দীন হতে পারে না।"

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত শরীয়তের বৈশিষ্ট্য হল এর সহজ- সাধ্যতা এবং প্রতিটি যুগে এর কার্যোপযোগিতা, আর তা এজন্য যে, শরীয়ত প্রদাতা যিনি তিনি মানুষের স্রষ্টাও বটেন। তিনি মানুষের প্রয়োজন, তার প্রকৃতি এবং তার শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত।

اَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ط وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ـ

"যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।"
সূরা মুলক, ১৪ আয়াত;

এজন্য শরীয়তে ইলাহী ও আসমানী শরীয়তে এসব কিছুরই অবকাশ রয়েছে। কিন্তু মানুষ যখন নিজেই শরীয়ত প্রদাতা হয়ে যাবে তখন সে এসবের ভেতর ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবে না। বিদ'আতের মিশ্রণ এবং সময় সময় বৃদ্ধির দীন এতটা কঠিন, জটিল ও দীর্ঘ হয়ে যায় যে, লোকে বাধ্য হয়ে এধরনের ধর্মের শেকল গলা থেকে খুলে ফেলে এবং وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ (তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই)-এর নে'মত ছিনিয়ে নেয়া হয়। এর নমুনা সে সব ধর্মের ইবাদত, প্রথা-পদ্ধতি, ফরয ও ওয়াজিবসমূহের দীর্ঘ তালিকা-সূচীতে দেখা যাবে যেসব ধর্মে বিদ'আত স্বাধীনভাবে তার কাজ করার সুযোগ পেয়েছে।

দীন ও শরীয়তের একটি বৈশিষ্ট্য হল এর বিশ্বব্যাপী একই রকম হওয়া। তা প্রতিটি যুগে ও প্রত্যেক কালে একই থাকে। দুনিয়ার কোন অংশের কোন মুসল-মান অধিবাসী দুনিয়ার অন্য যে কোন অংশেই যাক তার দীন ও শরীয়তের উপর আমল করতে কোন বেগ পেতে হবে না। তাকে স্থানীয় কোন দিক-নির্দেশনা ও পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন পড়বে না। এর বিপরীতে বিদ'আতের ভেতর একই রূপ ও ঐক্য পাওয়া যায় না। বিদ'আত প্রতিটি জায়গায় স্থানীয় ছাঁচ এবং রাষ্ট্রীয় কিংবা শহরের টাকশাল থেকে মুদ্রিত হয়ে বেরিয়ে আসে আর তা হয় বিশেষ ঐতিহাসিক ও স্থানীয় কার্যকারণ এবং একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের ফল। এজন্য প্রতিটি দেশ বরং এর থেকেও সামনে অগ্রসর হয়ে কোন কোন সময় এক একটি প্রদেশ এবং এক একটি শহরের বিদ'আত, এরপর মহল্লা ও ঘরসমূহের ধর্মীয় আবিষ্কার ও উদ্ভাবনসমূহ এসবেরই সঙ্গে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। আর এভাবেই শহরে শহরে ও ঘরে ঘরের দীন ভিন্ন হতে পারে।

এই সব চিরন্তন ও বিশ্বজনীন স্বার্থ ও কল্যাণ চিন্তার ভিত্তিতেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে বিদ'আত থেকে বাঁচার ও সুন্নতের হেফাজতের জন্য কঠোর তাকীদ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন ঃ

من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

"যে আমাদের দীনে নতুন কিছুর উদ্ভাবন কিংবা প্রবর্তন ঘটাবে যা এতে ছিল না তা রদ ও বাতিল হিসেবে গণ্য হবে।"

তিনি আরও বলেন ঃ

اياكم والبدعة فان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار -

"বিদ'আত থেকে বাঁচ! কেননা সব রকমের বিদ'আতই গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার নামান্তর আর সব রকমের গোমরাহীর পরিণতি হল জাহান্নাম।"

তিনি বিজ্ঞসুলভ ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন ঃ

ما احدث قوم بدعة الا رفع بها مثلها من السنة

"যখন কোন জাতিগোষ্ঠী দীনের ভেতর নতুন কোন কিছুর উদ্ভাবন ঘটায় তখন এর পরিণতিতে সমপরিমাণ সুন্নত অবশ্যই উঠে যাবে।"

সাহাবায়ে কিরাম এবং তাঁদের পর আইম্মায়ে 'ইজাম ও ইসলামের ফকীহ-বৃন্দ, স্ব-স্ব যুগের মুজাদ্দিদ ও সংস্কারকগণ এবং উলামায়ে রব্বানী সর্বদাই আপন আপন কালের বিদ'আতের কঠোরভাবে বিরোধিতা করেছেন এবং ইসলামী সমাজ ও ধর্মীয় মহলে ঐ সব বিদ'আত গৃহীত হবার ও প্রচলন ঘটার থেকে বাধা দেবার সাধ্য মত তাঁরা চেষ্টা করেছেন। এসব বিদ'আতের ভিতর সাধারণ মানুষ ও সরল বিশ্বাসী লোকদের যেই চুম্বক আকর্ষণ সব যুগেই থেকেছে এবং এথেকে সেই সব পেশাদার ও দুনিয়াদার ধর্মীয় দল-উপদল ও লোকের যেই সব ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত রয়েছে যার ছবি আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদের এই বিস্ময়কর আয়াতে এঁকেছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

"হে মু'মিনগণ! পণ্ডিত এবং সংসারবিরাগীদের মধ্যে অনেকেই লোকের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে।" সূরা তাওবা. ৩৪ আয়াত;

এর দরুন তাঁদেরকে তীব্র বিরোধিতা ও কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু তাঁরা এর পরওয়া করেন নি এবং একে তাঁরা তাঁদের যুগের জিহাদ ও শরীয়তের হেফাজত এবং দীন তথা ধর্মকে বিকৃতির হাত থেকে বাঁচাবার পবিত্র কর্তব্য মনে করেছেন। বিদ'আতের এই সব বিরোধীরা এবং সুন্নতের পতাকাবাহিগণ স্বীয় যুগের সাধারণ গণমানুষ এবং সাধারণের মত বিশিষ্ট লোকদের পক্ষ থেকে "অনড় ও স্থবির", "কল্পনাপূজারী" "ধর্মের দুশমন" ইত্যাদির ন্যায় খেতাব লাভ করেছেন। কিন্তু তথাপি তাঁরা এর পরওয়া করেননি। তাঁদের এই মৌখিক ও কলমী জিহাদ, হক প্রতিষ্ঠা ও বাতিলের উৎসাদন প্রয়াসের ফলে বহু বিদ'আত এভাবে খতম হয়ে গেছে যে, সে সবের উল্লেখ কেবল সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসেই রয়ে গেছে আর যেগুলো এখনো অবশিষ্ট রয়ে গেছে সে সবের বিরুদ্ধে হক্কানী (সত্যনিষ্ঠ) উলামায়ে কিরাম এখনও সংগ্রামে লিপ্ত।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِرُ - وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً -

"মু'মিনদের ভেতর কতক আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, ওদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করেছে আর কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করে নাই।" সূরা আহযাব, ২৩ আয়াত;

এই ব্যাপারে সবচে' বড় ভ্রান্তি ছিল বিদ'আতে হাসানার ভ্রান্তি। লোকে বিদ'আতকে দু'ভাগে ভাগ করে রেখেছিল ঃ বিদ'আতে সায়্যি'আঃ ও বিদ'আতে হাসানাঃ। তারা বলত যে, সব ধরনের বিদ'আতই বিদ'আতে সায়্যি'আঃ হয় না। বিদ'আতের অনেকগুলোই বিদ'আতে হাসানা তথা উত্তম ও কল্যাণকর বিদ'আত যা হাদীসে ব্যবহৃত كل بدعة ضلالة অর্থাৎ "প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী"-এর ব্যতিক্রম ও আওতামুক্ত।[১]

১. ঐ সব লোকের সবচে' বড় দলীল হযরত ওমর (রা)-এর উক্তি যা তিনি জামা'আত সহকারে তারাবীহ্ আদায়কারীদের দেখে করেছিলেন, نعمت البدعة هذه "এ বড় সুন্দর বিদ'আত।" অথচ সকলেই একমত যে, এখানে আভিধানিক অর্থেই একে বিদ'আত বলা হয়েছে। নইলে তারাবীহ্ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং সে সব হাদীস মুতাওয়াতির পর্যায়ের। বিদ'আতের সংজ্ঞার জন্য ইমাম শাতিবীর الاعتصام بالسنة এবং মওলানা ইসমাঈল শহীদের ايضاح الحق الصريح فى احكام الميت والضريح শীর্ষক দু'টি এ বিষয়ক সর্বোত্তম পুস্তক, পাঠ করা দরকার।

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র) বিদ'আতের এই ধরনের ভাগ-বন্টন এবং বিদ'আতে হাসানার বিরুদ্ধে যেই সর্বশক্তি প্রয়োগে জিহাদী পতাকা তুলে ধরেন, যেই আস্থা, শক্তি ও তাত্ত্বিক যুক্তি-প্রমাণ সহকারে একে প্রত্যাখ্যান করেন তার নজীর বহু দূর অবধি এবং বহুকাল অবধি পাওয়া যায় না। এপ্রসঙ্গে মকতূবাতের কতিপয় উদ্ধৃতি দেখা যেতে পারে।

সুন্নতে নববীর প্রচলন ও প্রচার-প্রসারের উৎসাহ এবং বিদ'আত উৎখাতের প্রেরণা দিতে গিয়ে স্বীয় মখদূমযাদা খাজা মুহাম্মদ আবদুল্লাহকে লিখিত এক পত্রে বলেন ঃ

"এটা সেই সময় যখন হযরত খায়রু'ল-বাশার (সর্বোত্তম মানব অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলা আলিহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং কিয়ামতের আলামতসমূহ জাহির হওয়া শুরু হয়ে গেছে—নবূওত যুগের দূরত্বের কারণে সুন্নত প্রচ্ছন্ন এবং যেহেতু মিথ্যা ও প্রতারণার যুগ, বিদ'আত প্রচলিত ও গৃহীত হচ্ছে, তখন কোন শ্যেনপক্ষী শাহবাযের প্রয়োজন যিনি সুন্নতের সাহায্য-সমর্থন করবেন এবং বিদ'আতকে পরাজিত করবেন ও পশ্চাতে নিক্ষেপ করবেন। বিদ'আতের প্রচলন দীনের ধ্বংসের নামান্তর এবং কোন বিদ'আতীকে সম্মান জ্ঞাপন ইসলামের প্রাসাদ-সৌধকে ধ্বসিয়ে দেবার সমার্থক। হাদীসে পাকে বলা হয়েছে ঃ

من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام

"যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে সম্মান প্রদর্শন করল সে ইসলামকে ধ্বংস করতে সাহায্য করল।"

"পূর্ণ দৃঢ়তা, অটুট সংকল্প ও হিম্মতের সাথে এদিকে মনোযোগ দেবার দরকার রয়েছে যে, সুন্নতের ভেতর থেকে কোন্ সুন্নতের প্রচলন ঘটাতে হবে এবং বিদ'আতের ভেতর থেকে কোন্ বিদ'আতের উৎসাদন করতে হবে। একাজ সব সময়েই জরুরী ছিল। কিন্তু ইসলামের দুর্বলতার এই যুগে যখন ইসলামী প্রথাসমূহের প্রতিষ্ঠা সুন্নতের প্রচলন ও বিদ'আতের ধ্বংসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, এ কাজ আরও জরুরী হয়ে গেছে।"

এরপর তিনি একই পত্রে বিদ'আতের ভেতর কোন প্রকারের ভাল দিক রয়েছে কিংবা এর ভেতর সৌন্দর্য লুকিয়ে রয়েছে এই রূপ ধারণার এবং বিদ'আতে হাসানার ব্যাখ্যা ও পরিভাষার বিরোধিতা করতে গিয়ে লিখেন ঃ

"অতীতের লোকদের ভেতর কেউ কেউ বিদ'আতের ভেতর কিছু কিছু ভাল দেখতে পেয়েছেন যে, বিদ'আতের কোন কোন প্রকারকে তারা ভাল বলে

অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই গরীব এই মাস'আলার ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে একমত নন। গরীব কোন বিদ'আতকেই 'হাসানা' মনে করে না এবং এক্ষেত্রে অন্ধকার ও পংকিলতা ভিন্ন কিছুই তার অনুভূত হয়না। নবী করীম (সা) বলেন ঃ كل بدعة ضلالة "প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী।"[১]

অপর এক পত্রে যা তিনি মীর মুহীববুল্লাহকে আরবীতে লিখে ছিলেন —বলেন,

"বুঝতে পারি না যে, লোকে কোথা থেকে এমন কোন কাজের ভাল হবার ফয়সালা করল যা ইসলামের ন্যায় পরিপূর্ণ দীন এবং আল্লাহর পসন্দনীয় ও মকবূল ধর্মের ভেতর নে'মতের পূর্ণতা দানের পর আবিষ্কার করা হয়েছে। তাদের কি এই মোটা কথাটা জানা নেই যে, পরিপূর্ণতা, পূর্ণাঙ্গতা ও কবূলিয়াত দানের পর কোন দীনের ভেতর কোন কিছু নতুন উদ্ভাবন করা হলে তার ভেতর ভাল বা সুন্দর হতে পারে না? فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلاَّ الضَّلَالُ "সত্যের পর গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কী থাকে?"

"যদি তারা এটা জানত যে, পরিপূর্ণ দীনের ভেতর কোন নবোদ্ভূত ও নতুন সৃষ্ট বস্তুর ভাল হবার পক্ষে ফয়সালা দান তার অপূর্ণতা ও অপূর্ণাঙ্গতারই মেনে নেবার নামান্তর এবং একথার ঘোষণা যে, নে'মত এখনও পূর্ণ হয় নাই তবে তারা কখনোই এর দুঃসাহস করত না।"[২]

অপর এক পত্রে এই ব্যতিক্রমের উপর কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ (দীনের ভেতর) যখন প্রতিটি নবোদ্ভূত ও নতুন উদ্ভাবিত বস্তুই বিদ'আত এবং প্রতিটি বিদ'আতই যখন গোমরাহী তখন কোন বিদ'আতে ভাল পাবার কী অর্থ? আর হাদীসে যখন পরিষ্কারভাবে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, প্রতিটি বিদ'আতই সুন্নত উঠিয়ে নেয় এবং এতে কোনরূপ নির্দিষ্টতা নেই তখন এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, প্রতিটি বিদ'আতই সায়্যি'আ:। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خير من احداث بدعة

"যখন কোন সম্প্রদায় কিংবা গোষ্ঠী দীনের ভেতর নতুন কিছুর উদ্ভাবন ঘটায় তখন এর ফলে সমপরিমাণ সুন্নত উঠিয়ে নেওয়া হয়। অতএব বিদ'আতের উদ্ভাবন ঘটাবার চেয়ে সুন্নত আঁকড়ে থাকা অনেক ভাল।"

হযরত হাসসান (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন,

ما ابتدع قوم بدعة فى دينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها اليهم الى

১. পত্র নং ২৩, ২য় খণ্ড, মখদুমযাদা খাজা মুহাম্মদ আবদুল্লাহর নামে।

২. পত্র নং ১৯, ২য় খণ্ড, মীর মুহিবুল্লাহর নামে।

يوم القيمة۔

"যখনই কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী তাদের দীনে কোন বিদ'আতের উদ্ভাবন ঘটাবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই সেই সব সুন্নতের ভেতর থেকে কোন সুন্নত, যার উপর তারা 'আমল করত, ছিনিয়ে নেবেন। এরপর কিয়ামত অবধি আর তা ফিরিয়ে দেবেন না।"

জানা দরকার যে, কোন কোন বিদ'আত যেগুলোকে উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখগণ হাসানা মনে করেছেন যখন সেগুলোর উপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা হয় তখন মনে হয় সেগুলোও সুন্নত উত্তোলনকারী।

একই পত্রে বিদ'আতে হাসানার অস্তিত্ব একেবারেই অস্বীকার করত তিনি লিখছেন ঃ

"লোকে বলে যে, বিদ'আত দুই প্রকার ঃ বিদ'আতে হাসানা ও বিদ'আতে সায়্যি'আ:। সেই নেক আমলকে বিদ'আতে হাসানা বলা হয় যা রিসালত যুগে ও খোলাফায়ে রাশিদীনের আমলে পরে জন্ম হয়েছে এবং যার কারণে কোন সুন্নত উঠে যায় না কিংবা বিদায় নেয় না। আর বিদ'আতে সায়্যি'আ: তাই যা সুন্নত উঠিয়ে দেয়। এই গরীবের ঐ সব বিদ'আতের ভেতর কোন বিদ'আতেই ভাল ও নুরানিয়াত চোখে পড়ে না এবং এতে সে অন্ধকার ও পংকিলতা ছাড়া কিছু অনুভব করে না। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, আজ কোন বিদ'আতী আমলের ভেতর দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার দরুন সজীবতা ও পরিচ্ছন্নতা চোখে পড়ছে, তাহলে কাল যখন দৃষ্টিশক্তি তার প্রাখর্য ও তীক্ষ্ণতা ফিরে পাবে তখন লোকসানের অনুভূতি ও লজ্জা ছাড়া আর কিছু মিলবে না।

بوقت صبح شود هم چورز معلومت
که با که باخته عشق در شب دیجور

সায়্যিদু'ল-বাশার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔

"যারা আমাদের দীনে এমন কোন কিছুর প্রবর্তন বা উদ্ভাবন ঘটায় যা এর মূলে ছিল না তা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হিসেবে গণ্য হবে।"[১]

এই সব বিদ'আতে হাসানার ভেতর যা সে যুগে প্রচলন ঘটছিল অন্যতম ছিল মীলাদ মাহফিল। এর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও মহত্তর সম্পর্কের কারণে একে বিদ'আত বলা ও এর বিরোধিতা করা খুবই নাযুক ও কঠিন কাজ ছিল। এর

১. পত্র নং ১৮৬, ১ম খণ্ড, খাজা আবদুর রহমান মুফতী কাবুলীর নামে।

ফলে জনগণের ভেতর ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হওয়া এবং একে বেআদবী ও (রসূলুল্লাহর প্রতি) ভালবাসার কমতি হিসাবে ধরার আশংকা ছিল। কিন্তু মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র অন্তর মানস এব্যাপারে সম্পূর্ণ নিঃশংক ও দ্বিধামুক্ত ছিল যে, যে জিনিসের অস্তিত্ব খায়রু'ল-কুরূন যুগে নেই তাতে দীনের তরক্কী ও উম্মতের কল্যাণ নেই। কাল-পরিক্রমায় এতে বিভিন্ন রকমের ফাসাদের আশংকা রয়েছে। তাঁকে খোলাখুলিভাবে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে যে, যদি মীলাদ মাহফিল অবারিত হওয়া থেকে মুক্ত হয় তাহলে এতে ক্ষতি কি? জওয়াবে তিনি বললেন ঃ

"মাখদূম! গরীবের মাথায় যা আসছে তাতে যতক্ষণ পর্যন্ত এর দরজা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া না হবে কামনা পূজারীরা এর থেকে বিরত হবে না। এর জায়েয হবার অনুকূলে যদি বিন্দুমাত্র ফতওয়াও দেওয়া হয় তাহলে তা ক্রমান্বয়ে কোথা থেকে কোথায় গিয়ে যে পৌঁছবে (তা কে জানে)!"[১]

قليلة يفضى الى كثيرة

এভাবেই হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র বিচক্ষণ ও সাহসী পদক্ষেপ (বিদ'আতের সাধারণ বিরোধিতা এবং বিদ'আতে হাসানার অস্তিত্ব সম্পর্কে মতভেদ)-এর ফলে একটি বিরাট বিপদাশংকার প্রতিরোধ এবং একটি বড় রকমের ধর্মীয় বিশৃঙ্খলার দ্বাররুদ্ধ হয়ে যায় যা গায়র মুহাক্কিক আলিমদের সমর্থন,খানকাহগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা ও সুধারণা, আমীর-উমারা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সোৎসাহী সমর্থনের কারণে মুসলিম সমাজে বিস্তার লাভ করে চলেছিল।

فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء

---

১. প্রাগুক্ত।

২. পত্র নং ৭২, ৩য় খণ্ড, খাজা হুসসামুদ্দীনের নামে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ওয়াহ্দাতু'ল-ওজূদ অথবা ওয়াহ্দাতু'শ-শুহূদ

শায়খ আকবর মুহ্য়ি-উদ্দীন ইবন 'আরাবী ও ওয়াহ্দাতু'ল-ওজূদ

প্রথম যুগের সুফীদের মুখ থেকে, যাঁরা আল্লাহ্-প্রেমে আত্মবিভোল হতেন, এমন সব উক্তি প্রকাশিত হয়েছে যদ্দারা ওয়াহদাতু'ল -ওজূদ মতবাদ প্রমাণিত হয়। এঁদের ভেতর বিখ্যাত শায়খ ও আরিফ হযরত বায়াযীদ বোস্তামীর (যিনি তরীকতের অধিকাংশ সিলসিলার শ্রেষ্ঠতম শায়খ) উক্তি ঃ سبحاني ما اعظم شأني "আমারই গৌরব! আমার মর্যাদা কত বিরাট!" ও ليس في جبتي الا الله "আমার জুব্বার ভেতর আল্লাহ্ ভিন্ন কিছু নেই" এবং হুসায়ন ইবন মনসূর হাল্লাজ-এর "আনা'ল-হক" বিশেষভাবে মশহূর।

কিন্তু শায়খ মুহয়িউদ্দীন ইবন আরাবী (ম. ৬৩৮/১২৪০ হি) যিনি 'শায়খ-এ আকবর' নামে জগদ্বিখ্যাত—এই মতবাদের মুজাদ্দিদ ও সর্বশেষ ব্যক্তি এবং জ্ঞানগত তথা তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এর প্রতিষ্ঠাতা ও ভিত্তি স্থাপনকারী এবং তাঁরই আমল থেকে এর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে, তা সূফীদের ভেতর মৌসুমী প্রভাবের মত দ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে শক্তিশালী থেকে শক্তিশালীতরো মেযাজও সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে নি। এমনকি তা রুচিশীল ও বিদগ্ধ গবেষকদের প্রতীক চিহ্নে এবং তাদের বিশ্বজনীন উক্তিতে পরিণত হয় এবং একে অস্বীকার করা নিজের মুর্খতার প্রমাণ দেওয়া ও সূফী মরমীদের মাহফিলে অপরিচিত ও ছেলেমানুষ ঘোষণার সমার্থক ছিল। মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র ভাষায় ঃ

"তিনি এভাবে তাঁর অধ্যায় ও পরিচ্ছেদসমূহ নির্ধারণ করেন যেভাবে 'ইলমে নাহ্ও ও সার্ফ-এ নিয়ম রয়েছে।"[১] শায়খ আকবর-এর নিকট ওয়াহদাতু'ল-ওজূদের হাকীকত কি এবং তিনি তা কিভাবে পেশ করেন, এর ওপর কি সব দলীল-প্রমাণ কায়েম করেন এবং তাকে কিভাবে ধ্রুব সত্য, একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং কাশ্ফ ও মুশাহাদার ব্যাপারে বানিয়ে দেন এবং তা কিভাবে একটি স্থায়ী দর্শন ও একটি স্কুলে পরিণত হল, এর ওপর এতবড় লাইব্রেরী তৈরী হয়ে গেল যার মোটামুটি ও সামগ্রিক খতিয়ান নেবার জন্যও একটি বৃহৎ আকারের দফতর

---

১. পত্র নং ৮৯, ৩য় খণ্ড, কাযী ইসমাঈল ফরীদাবাদীর নামে।

প্রয়োজন। বক্ষ্যমান পুস্তকে এর প্রাসঙ্গিক ও সামগ্রিক আলোচনাও কঠিন বৈকি। যেহেতু দর্শন ও তাসাওউফের সূক্ষ্ম পরিভাষাসমূহ জানা জরুরী এবং যেহেতু এর বাতেন তথা অন্তর্নিহিত অভিজ্ঞতা ও তাত্ত্বিক ভ্রমণ ও সুলূক (আধ্যাত্মিক রাস্তা)-এর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রয়েছে সেজন্য এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে তা আয়ত্ত্ব করা কঠিন। পাঠকদের ভেতর যেসব সুধী একে তাত্ত্বিকভাবে বুঝতে আগ্রহী তারা শায়খ আকবর-এর বিখ্যাত রচনা "ফতূহাত-ই মাক্কিয়্যা" ও "ফুসূসু'ল-হিকাম" পাঠ করতে পারেন।[১] হযরত মুজাদ্দিদ (র) ওয়াহদাতু'শ-শুহূদ প্রমাণ করতে গিয়ে দীর্ঘ সব পত্র লিখেছেন। এ সব পত্রে শায়খ আকবরের মতবাদকে তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন, যেভাবে তিনি এর সংক্ষিপ্ত-সার পেশ করেছেন ও এর প্রতিনিধিত্ব করেছেন তা থেকেও এই মতবাদ, এর লক্ষ্য ও মর্ম অনুধাবনে সাহায্য পাওয়া যাবে। এর প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি এই নিবন্ধের স্বস্থানে আসবে।

আমরা এখানে লাখনৌর আল্লামা 'আবদু'ল-আলীর, যিনি বাহরু'ল-'উলূম নামে পরিচিত ও খ্যাত (মৃ. ১২২৫ হি.), ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ নামক পুস্তিকার কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করছি। লেখক দর্শন শাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রের এক অতল সমুদ্র হবার সাথে সাথে শায়খ আকবরের ওয়াহ্দাতু'ল-ওজূদ মতবাদের একজন ব্যাখ্যাতা ও মুখপাত্র এবং তাঁর রচনাবলী, বিশেষত "ফতূহাতে মাক্কিয়্যা ও ফুসূসুল-হিকাম"-এর ডুবুরী ও সাতারু ছিলেন। এই সব উদ্ধৃতি কিছুটা হলেও শায়খ আকবরের মর্জি ও অভিরুচি বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। যদিও এর মধ্যেও এমন কতগুলো পরিভাষা ও ব্যাখ্যা রয়েছে যে সম্পর্কে তারাই অবহিত যারা এ বিষয়ে সূফীদের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী সম্পর্কে পরিচিত। এর থেকে অধিক সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যাখ্যা আমরা পাইনি বিধায় আমরা এর সাহায্য নিয়েছি।

"আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতিরেকে যা কিছু আছে তা হয়ত বিভিন্ন অবস্থা নয়ত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসমূহের জগত। সর্বপ্রকার অবস্থা ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসমূহ তাঁর মূর্ত প্রকাশ ও বিকাশ। তিনি এ সবের মধ্যে বিকশিত ও প্রকাশিত। তাঁর এই বিকাশ সেরূপ নয় হুলুল মতবাদে বিশ্বাসিগণ যার বিশ্বাস করে থাকে কিংবা সেরূপও নয় যেরূপ ইত্তিহাদ" মতবাদে বিশ্বাসিগণ বর্ণনা করে বরং এই বিকাশ সেই বিকাশের মত যা গণনার সংখ্যায় এক। গণনার সমস্ত সংখ্যা এক ভিন্ন আর কিছু নয়। সমগ্র বিশ্ব-জগতে একমাত্র সত্তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। আধিক্যের ভেতর তিনিই প্রকাশিত। আপন সত্তায় তিনি অধিক নন। আল্লাহ্র পবিত্র সত্তার অস্তিত্ব থেকেই

১. এ বিষয়ে সৈয়দ শাহ আবদুল কাদির মেহেরবান ফাখরী ময়লাপুরী (মৃ. ১২০৪ হি.) اصل الاصول في بيان مطابقة الكشف بالمعقول والمنقول নামক গ্রন্থের অধ্যয়ন উপকারী এবং এ বিষয়ে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৯৫৯ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।

সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহরই সত্তা এই সব কিছুতে প্রকাশিত। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন; আল্লাহ্ যাবতীয় শরীক থেকে মুক্ত ও পবিত্র।"

"আল্লাহ্ তা'আলার নাম ব্যতিরেকে কোন প্রকাশমান বস্তুই প্রকাশিত হয় না। সেই পবিত্র নাম চাই কি তানযীহি (সর্বোৎকৃষ্ট, যাবতীয় দোষত্রুটি ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত অতি প্রাকৃত) অথবা তা তাশবীহি (অন্তর্বাসী ও পরিব্যাপ্ত) হোক। এখন এই সব নাম যখন তার প্রকাশের বেলায় ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে প্রকাশমান বস্তুর ওপর নির্ভরশীল এবং এগুলো ব্যতিরেকে যখন তার পূর্ণতা কল্পনাই করা যায় না তখন আল্লাহ তা'আলা জগতের আ'য়ান অর্থাৎ মূল ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ও উপাদানসমূহকে অস্তিত্ব দান করেন যাতে সেই সব বৈশিষ্ট্য ও উপাদানসমূহ তাঁর প্রকাশস্থল হতে পারে এবং তাঁর নামসমূহের পূর্ণতা পুরোপুরি প্রকাশিত হতে পারে।"

আল্লাহ্ তা'আলা ব্যক্তি সত্তার পূর্ণতার ব্যাপারে অকাট্য রূপেই বেনিয়ায ও প্রাচূর্যের অধিকারী। কিন্তু নামসমূহের পূর্ণতার মর্যাদায় জগতের বাহ্যিক অস্তিত্ব থেকে বেনিয়ায নন। হাফিজ শীরাযী বলেন ঃ

پر تو معشوق گرافتاد بر عاشق چه -

ما بدو محتاج بوديم او به مسا مشتاق بود -

অর্থাৎ যদি মা'শূক তথা প্রেমাস্পদের ছায়া ও প্রতিবিম্ব 'আশিক তথা প্রেমিকের ওপর পড়ে যায় তো কি হল, আমরা তাঁর মুখাপেক্ষী ছিলাম এবং তিনি আমাদের জন্য পাগলপারা।

একথাটাই একটি হাদীসে কুদসী দ্বারা আরো বেশি প্রমাণিত হয়।

كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق -

অর্থাৎ (আল্লাহ্ বলেন) "আমি ছিলাম এক গুপ্ত ভাণ্ডার। অনন্তর আমি চাইলাম আমি পরিচিত হই। অতঃপর আমি সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করলাম যাতে আমার প্রকাশ ঘটে আর সৃষ্টিজগত আমার প্রকাশস্থল হয় ও প্রকাশস্থল হয় আমার নামসমূহের।"

"যারা দুই সত্তার তথা দুই অস্তিত্বের সমর্থক যার একটি আল্লাহ্র অস্তিত্ব আর একটি আকস্মিক ও দৈব ঘটনার (ممكن) তারা অন্যায় করছে, শিরক করছে আর তাদের এই শির্ক হল শির্ক-ই খফী। আর যারা এক অস্তিত্বের সমর্থক তারা বলেন যে, অস্তিত্ব কেবল আল্লাহ্র। তিনি ব্যতিরেকে আর যা কিছু আছে তা তাঁর প্রকাশ এবং তাঁর প্রকাশের আধিক্য তিনি যে এক তার পরিপন্থী নয়। তবে এই ব্যক্তি মুওয়াহহিদ তথা তৌহীদবাদী।

"তোমরা প্রকৃত ও যথার্থ সত্তার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ও উপাদান নও। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ম্ভূ সত্তা আর তোমরা সীমিত ও নির্ধারিত গণ্ডীতে আবদ্ধ। আর নির্ধারিত গণ্ডীতে আবদ্ধ সত্তা কখনোই স্বয়ম্ভূ সত্তা হতে পারে না। তবে হ্যাঁ, তোমরা নিজেদের হাকীকতের দিক দিয়ে যথার্থ সত্য। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ভেতর নির্দিষ্ট হয়েছেন। তোমরা আল্লাহকে যথার্থ অস্তিত্বশীল বস্তুসমূহের ভেতর নির্ধারণ ও সীমিতকরণের বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্ত ও স্বাধীন এবং নির্ধারণের বাধ্য-বাধকতা থেকে যুক্ত পাচ্ছ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে নির্দিষ্ট ও সীমিত বস্তুর ভেতর প্রকাশিত দেখতে পাচ্ছ। لا موجود الا الله لا اله الا الله আল্লাহ্ ভিন্ন কিছুর অস্তিত্ব নেই, আল্লাহ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নেই, নেই কোন মা'বূদ।"[১]

এই মতবাদের প্রভাব শায়খ-ই আকবরের যমানার পর এতটা ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল যে, বলা যেতে পারে, সূফী-দরবেশ, দার্শনিক ও কবিদের শতকরা নব্বই ভাগই এই মস্লার প্রবক্তা অথবা এর প্রভাবে ভীত হয়ে এর সমর্থকে পরিণত হয়। শায়খ-এর সঙ্গে মতানৈক্য পোষণকারীদের ভেতর অধিকাংশই ছিলেন মুহাদ্দিছ, ফকীহ্ এবং সেই সব 'আলিম-উলামা' যাঁদেরকে উলামায়ে জাহের বলা হয়। এঁদের ভেতর হাফেজ ইবন হাজার আসকালানী, আল্লামা সাখাবী, আবূ হায়্যান মুফাসসির, শায়খুল ইসলাম 'ইযযুদ্দীন ইবন আবদুস-সালাম, হাফিজ আবূ যুর'আ, শায়খুল ইসলাম সিরাজুদ্দীন আল-বুলুক্বীনী, মুল্লা আলী কারী, 'আল্লামা সা'দুদ্দীন তাফতাযানী (র)-র মত খ্যাতনামা 'আলিম ও শাস্ত্রবিদ ছিলেন।

এসব হযরত যদিও তাঁদের জ্ঞান ও মনীষা, কুরআন-সুন্নাহর ওপর ব্যাপক-বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞান এবং ধর্মীয় জ্ঞানে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, ছিলেন বহু অগ্রসর, কিন্তু দুই -একজন বাদে তাসাওউফ-এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁদের বিরোধিতাকে الناس اعداء ما جهلوا। "মানুষ যা জানে না তার দুশমনে পরিণত হয়"-এর সাধারণ মূলনীতির আওতায় ফেলে বিচার করা হয়।

শায়খুল ইসলাম ইবন তায়মিয়া এবং ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ আকীদার বিরোধিতা ও সমালোচনা

ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ মতবাদের বিরোধিতার সবচে' বড় পতাকাবাহী এবং এর ওপর কুরআন-সুন্নাহ্র ভিত্তিতে ও এর প্রভাব ও ফলাফলের আলোকে যা নিকটকালে এই মতবাদ ও গবেষণা-অনুসন্ধান পরিচালনের ফলে সূফীমহলে ও সর্বসাধারণের ভেতর জাহির হওয়া শুরু হয়েছিল, সমালোচনা, পর্যালোচনা এবং এর সমাধান ও নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে শায়খুল ইসলাম তাকিয়্যুদ্দীন হাফেজ ইবনে

১. বাহরু'ল-উলূম আল্লামা আবদুল আলী আনসারী লাখনবীকৃত "ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ" নামক পুস্তিকা, অনু, মাওলানা শাহ যায়দ আবুল হাসান ফারূকী মুজাদ্দিদী, নদওয়াতুল মুসান্নিফীন প্রকাশিত দিল্লী ২৯-৫৬ পৃ.।

তায়মিয়া (র)-র (৬৬১-৭২৮ হি.) নাম সর্বাধিক আলোকোজ্জ্বল। তিনি শায়খ-ই আকবরের ওফাতের (৬৩৮ হি.) তেইশ বছর পর জন্ম নেন। শায়খ-ই আকবরের যে শহরে ইনতিকাল হয় (দামিশকে) এবং যেই শহরে তিনি চির নিদ্রায় শায়িত সেখানেই ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লালিত-পালিত ও বর্ধিত হন, লেখাপড়া শেখেন, বাস্তব প্রশিক্ষণ লাভ করেন, তত্ত্বগত ও মানসিক পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেন। তাঁর অনুভূতি ও উপলব্ধি যখন সাবালকত্বের সীমায় পৌঁছে এবং তিনি যখন পরিবেশ ও পরিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর সমালোচনামূলক দৃষ্টিক্ষেপণ করার যোগ্যতা লাভ করলেন তখন শায়খ-ই আকবরের ইনতিকাল ৪০-৪৫ বছরের বেশি অতিক্রম করেনি। মিসর ও সিরিয়া (শাম)-র পরিবেশ তাঁর তাত্ত্বিক দুর্লভ গবেষণার কল-কোলাহলে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল এবং জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান (মা'রিফত)-এর পানশালা তাঁর একত্ববাদের স্বাদে মাতাল ছিল। মিসরে শায়খ আবুল-ফাত্‌হ্ নসর আল-মুনজী ছিলেন শায়খ আকবর (ইবনু'ল-'আরাবী)-এর কট্টর ভক্তদের অন্যতম এবং সাম্রাজ্যের প্রধান সচিব ও সর্বময় ক্ষমতার মালিক রুকনুদ্দীন বায়বার্স আল-জাশনগীর ছিলেন শায়খ নসর আল-মুনজীর ভক্ত ও মুরীদ। সিরিয়ায় যেমন ঠিক তেমনি অধিকাংশ আরব দেশগুলোতে শায়খ আকবরের পুস্তকাদি, বিশেষত "ফুতূহাত-ই মাক্কিয়্যা" ও "ফুসূসু'ল-হিকাম" সাধারণভাবে হাতে হাতে ঘুরত এবং লোকে তা পড়ে মাথা দোলাত। স্বয়ং ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র্‌া) স্বীকার করেছেন যে, ফুতূহাত-ই মাক্কিয়্যা, কুনহুল মুহকাম, আল-মারবূত, আদ-দূর্রুল ফাখিরা, মাতালি'উন-নুজূম প্রভৃতি গ্রন্থে বেশ ভাল জ্ঞানগত ও তত্ত্বগত উপকারিতা ও পয়েন্ট পাওয়া যায়। শায়খ আকবরের মতবাদের ধারক-বাহকদের ভেতর ইবন সাব'ঈন, সদরুদ্দীন কৌনবী (যিনি শায়খ-ই আকবরের প্রত্যক্ষ ও সরাসরি শাগরিদ ছিলেন), বিলাইয়ানী ও তিলিমসানী বিশেষ খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) এই পুরো দলের ভেতর শায়খ আকবরকেই সকলের ওপর অগ্রাধিকার দেন। এর ফলে জানা যায় যে, তিনি ইনসাফ ও যাচাই-বাছাইয়ের আঁচল একেবারে পরিত্যাগ করেন নি এবং কুরআনী নির্দেশ : واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل "আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি কর তখন ন্যায়-বিচার করবে"–এর ওপর আমল করেছেন। তিনি বলেন :

"এঁদের ভেতর ইবন আরাবীরই অবস্থান ইসলামের কাছাকাছি এবং তাঁর কথাবার্তা অনেক ক্ষেত্রেই তুলনামূলকভাবে ভাল। কারণ তিনি মাজাহির ও জাহির অর্থাৎ প্রকাশ পাবার স্থানসমূহ ও প্রকাশিতের ভেতর পার্থক্য করেন এবং শরীয়তের আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানসমূহকে আপন জায়গায় অনড় রাখেন। মাশায়েখ 'ইজাম যেসব আখলাক ও ইবাদতের প্রতি তাকীদ প্রদান করেছেন তা এখতিয়ার করার পরামর্শ দিয়েছেন। এজন্য বহু সূফী-দরবেশ তাঁর কথা থেকে আধ্যাত্মিকতা

তথা রূহানিয়াত গ্রহণ করে থাকেন যদিও তাঁরা সে সবের হাকীকত ভালভাবে উপলব্ধি করেন না, বোঝেন না। তাদের ভেতর যারা এসবের হাকীকত বোঝেন এবং সে সবের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেন তাদের ওপর তাঁর কথার তাৎপর্য প্রকাশিত হয়।"[১]

অপর এক জায়গায় একজন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী মুসলমান সম্পর্কে সুধারণা পোষণ এবং তাঁর সম্পর্কে নিজের মতামত পেশের যিম্মাদারীর নাযুকতা অনুভব করে লিখেছেন ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন যে, তাঁর (ইবনে 'আরাবীর) সমাপ্তি তথা ইনতিকাল কিসের ওপর হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মুসলমান নারী-পুরুষ জীবিত কিংবা মৃত সকলকে ক্ষমা করুন।

ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم -

"হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর আর ক্ষমা কর আমাদের সেই সব ভাইদের যারা ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রবর্তী এবং ঈমানদারদের প্রতি আমাদের হৃদয়ে কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।" (সূরা হাশ্র, ১০ আয়াত)

ওয়াহ্দাতু'ল-ওজূদ আকীদার চরমপন্থী প্রচারক এবং এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

কিন্তু মনে হয় যে, এই গবেষণা ও অনুসন্ধানের বিশেষ মেযাজ ও স্বাদ-এর খোলামেলা প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা এবং এর শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে অত্যুৎসাহ ও অতি আগ্রহ এবং এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন না করার দরুন স্বয়ং সিরিয়ায়, যা ছিল দীনী 'ইল্ম-এর বিরাট কেন্দ্র এবং মিসরের মুসলিম তুর্কী হুকূমতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ– এক ধরনের মানসিক ও নৈতিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল। লোকে শরীয়ত, জ্ঞান-বুদ্ধি ও নীতি-নৈতিকতার সীমা অতিক্রম করতে চলেছিল এবং এক ধরনের সংকটজনক পরিস্থিতি মুসলিম সমাজে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। জনৈক বিজ্ঞ পণ্ডিতের উক্তি ঃ মূলে নয় ফলে বৃক্ষের পরিচয়। ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ আকীদার বৃক্ষ যেভাবে ফলে-ফুলে সুশোভিত হতে যাচ্ছিল তা একজন শরীয়ত সমর্থক ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আলিম ও দাঈর জন্য উদ্বেগের বিষয় ও সমালোচনার পাত্র ছিল।

---

১. শায়খ নসর আল-মুনজীর নামে শায়খুল ইসলামের পত্র, জালাউল-'আয়নায়ন, পৃ. ৫৭।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বর্ণনা করেন (এবং তিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অত্যন্ত সংযত ও সতর্ক) যে, তিলিমসানী (যিনি এই মা'রিফাতের জ্ঞানে সবার চেয়ে অগ্রণী) ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ মতবাদের কেবল সমর্থকই নন বরং বাস্তবে এর নিষ্ঠাবান অনুসারীও ছিলেন। তিনি মদপান করতেন এবং অবৈধ ও নিষিদ্ধ কার্যে লিপ্ত থাকতেন (সত্তাই যখন একজন তখন আর হালাল-হারামের পার্থক্য কেন?)। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখছেন ঃ

"আমার কাছে একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য লোক বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তিলিমসানীর নিকট 'ফুসূসু'ল-হিকাম'-এর দরস গ্রহণ করতেন এবং একে আল্লাহর ওলী-'আরিফদের কালাম মনে করতেন। তিনি যখন 'ফুসূস' পড়লেন এবং দেখতে পেলেন যে, এর বিষয়বস্তু তো কুরআন শরীফের সুস্পষ্ট বিরোধী, তখন তিনি তিলিমসানীকে বললেন যে, এই কালাম তো কুরআনের বিরোধী। তিনি (তিলিমসানী) জওয়াব দিলেন যে, কুরআন তো গোটাটাই শির্ক দ্বারা ভর্তি। এজন্য যে, সে (কুরআন) রব ও আব্দ-এর মাঝে পার্থক্য করে। তাওহীদ তো আমাদের কালামে আছে। তার এ ধরনের উক্তি রয়েছে যে, "কাশ্ফ দ্বারা সে সব বিষয় প্রমাণিত হয়েছে যা সুস্পষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি (আক্ল) বিরোধী"।

তিনি আরও লিখেছেন ঃ

"এক ব্যক্তি, যে তিলিমসানী ও তার ধ্যান-ধারণার সাথী ছিল, সমর্থক ছিল—আমাকে স্বয়ং শুনিয়েছেন যে, আমরা একবার এক মরা কুকুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যার গায়ে ছিল ঘা। তিলিমসানীর সাথী তাকে লক্ষ করে বলল, "এও কি খোদাওয়ান্দ-এর যাত।" তিলিমসানীর জওয়াব ছিল, "কোন বস্তু কি তাঁর সত্তার বাইরে? হ্যাঁ, সব কিছুই তাঁরই সত্তার ভেতর।"

তিনি তাঁর অপর গ্রন্থ الرد الا قوم على فصوص الحكم-এ বলেন ঃ

"কেউ কেউ যখন জিজ্ঞেস করল যে, যখন ওজূদ এক তখন স্ত্রী কেন হালাল আর মা হারাম? এই পণ্ডিত উত্তরে বলেছিল যে, আমাদের কাছে সব এক। কিন্তু ঐ সব মাহজূবীন (যারা তাওহীদে হাকীকী সম্পর্কে অজ্ঞ ও অপরিচিত) বলল যে, মা হারাম। আমরাও বললাম যে, হ্যাঁ, তোমাদের (মাহজূবীনদের) ওপর হারাম।"

এটা বলা যায় না যে, এ ধরনের দুঃসাহসী কথাবার্তা ও উক্তি, সব কিছুই মুবাহ্র ধারণা এবং নৈতিক ও চারিত্রিক নৈরাজ্য ও অরাজকতার যিম্মাদারী শায়খ-ই আকবর-এর মত মুহাক্কিক আরিফের ওপর কিংবা তাঁর সব গ্রন্থের ওপর ফেলা যায় যিনি ছিলেন সুন্নতের কঠোর পাবন্দ, একজন আবেদ, যাহেদ, রিয়াযতকারী, মুজাহিদ, কঠোর কঠিন আত্মসমালোচক, শয়তানের চক্রান্ত ও কৌশল এবং নফসের প্রতারণা সম্পর্কে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ। কিন্তু তাঁর এখানে এ ধরনের দুয়েকটি

চরম বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা পাওয়া যায় যদদ্বারা সূচকে ফাল বানাবার মত লোকদের হাতে দরকারী মাল-মসলা এসে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ঃ

"মূসা (আ)-এর যুগে গো-বৎস পূজারীরা বস্তুতপক্ষে আল্লাহ্‌র পূজা-অর্চনাই করেছিল। মূসা (আ) যে হারূন (আ)-কে সমালোচনা করেছিলেন তা মূলত এজন্য যে, তিনি গো-বৎস পূজার (যা মূলত আল্লাহ্‌র পূজাই ছিল আর তা এ জন্য যে, সর্বময় অস্তিত্ব তো একই) বিরোধিতা কেন করলেন? তাঁর মতে, মূসা (আ) সেই সব ওলী-'আরিফদের অন্তর্গত ছিলেন যাঁরা প্রতিটি জিনিসের ভেতর 'হক'-এর মুশাহাদা (পর্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষ) করতেন এবং তাকে প্রতিটি বস্তুর যথার্থ প্রতিচ্ছবি মনে করতেন। তাঁর মতে, ফিরআওন তার দাবি انا ربكم الاعلى-এর ব্যাপারে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেননা সে প্রতিচ্ছবি ছিল। ফির'আওন যেহেতু সৃষ্টিগতভাবে হুকূমতের অধিকারী ছিল, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিল আর তাই সে 'সাহেবে হক' ছিল বিধায় সে সঙ্গতভাবেই انا ربكم الا على "আমি তোমাদের সর্বোত্তম প্রভূ" বলেছিল। কেননা যখন সকলেই কোন না কোনভাবে 'রব' বা প্রভূ-প্রতিপালক তখন আমি তাদের ভেতর সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ। কেননা বাহ্যিকভাবে আমাকে তোমাদের ওপর হুকূমত করার ও তোমাদের ব্যাপারে ফয়সালা করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন ঃ তারা বলে যে, যাদুকরেরা যখন ফির'আওনের দাবির সত্যতা সম্পর্কে জানতে পারল তখন তারা তার বিরোধিতা করেনি, বরং তা স্বীকার করে নিয়েছে এবং বলেছে যে, فاقض ما انت قاض انما تقضى هذه الحياة الدنيا "তোমার যা ফয়সালা করবার তা করে ফেল; তুমি এই জগতে নির্দেশ দেবার, ফয়সালা করবার ক্ষমতা রাখ।" এজন্যই ফিরআওনের এ কথা বলা অত্যন্ত সঙ্গত ছিল যে, আনা রাব্বুকুমু'ল-আ'লা-"আমি তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক।" তারা হযরত নূহ (আ)-এর ওপর সমালোচনা করে এবং তাঁর অবিশ্বাসী কওমকে যথার্থ ও সঠিক পথের পথিক ও সম্মানের পাত্র বলে মনে করে যারা পাথর পূজা করত। তারা বলে যে, ঐসব পাথর পূজারী আসলে আল্লাহ্‌র-ই ইবাদত করেছিল আর নূহ (আ)-এর তুফান ও প্লাবন মূলত মা'রিফাতে ইলাহীরই সয়লাব ছিল, ছিল উত্তাল তরঙ্গ যার ভেতর তারা নিমজ্জিত হয়েছিল"।[১]

আর এর দরুন এমন বহু আরিফ ও মাশায়েখ যারা শায়খ-ই আকবরকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার ওলী-আরিফ জ্ঞান করতেন এবং তাঁকে আল্লাহ্‌র মকবূল

---

১. শায়খ আকবরের এসব উক্তি الرد الاقوم على فصوص الحكم এবং الفرق بين الحق والباطل থেকে গৃহীত এবং ইমাম তায়মিয়া "ফুসূসুল-হিকাম" থেকে এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন যে, এখানে এ কথা উল্লেখ করা জরুরী যে, শায়খ আকবরের জ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ তাদের এক দল মনে করেন যে, শায়খ রচিত গ্রন্থাদি বিশেষত "ফুসূসুল-হিকাম"-এ প্রচুর সংযোজন ও পরিবর্ধন ঘটানো হয়েছে।

বান্দাদের অন্তর্গত মনে করতেন তারা স্ব-স্ব ভক্ত মুরীদ ও অনুসারীদেরকে ঐসব কিতাবাদির সাধারণ অধ্যয়নের ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। 'আন-নুরু'স-সাফির' নামক পুস্তকের গ্রন্থকার শায়খ মুহয়িউদ্দীন আবদুল কাদির ঈদরূসী তদীয় শায়খ আল্লামা বাহরুক থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর মুর্শিদ সেকালের বুযুর্গ শায়খ আবূ বকর 'ঈদরূসী বর্ণনা করেছেন যে, আমার মনে পড়ে না, আমার আব্বা (শায়খ আবদুল্লাহ ইবন আবূ বকর হাদরামী) আমাকে কখনো মেরেছেন কিংবা তিরস্কার করেছেন। একবারই কেবল এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল আর এর কারণ ছিল এই যে, তিনি আমার হাতে শায়খ-এ আকবর-এর 'ফুতূহাত-ই মাক্কিয়্যাঃ'-র একটি খণ্ড দেখেছিলেন। দেখার পর তিনি খুবই রাগান্বিত হন। সেদিনের পর থেকে আর কখনো সে বই আমি হাত দিয়ে স্পর্শ করিনি। তিনি বলতেন যে, আমার আব্বা শায়খ-এর "ফুতূহাত" ও "ফুসূস" নামক বই দু'টো পড়তে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। কিন্তু একই সাথে শায়খ-এর প্রতি সুধারণা পোষণের জন্যও তাকীদ করতেন এবং এই বিশ্বাস পোষণের জন্যও বলতেন যে, তিনি আল্লাহ্র একজন শ্রেষ্ঠতম ওলী ও আরিফ ছিলেন।[১]

ভারতবর্ষে ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজূদ আকীদা

অষ্টম শতাব্দীতে যখন এই আকীদা-বিশ্বাস ভারতবর্ষে আগমন করে তখন এর আগমনের হেতু ছিল এই যে, ভারতীয় উপমহাদেশ নিজেই এই মতবাদ ও দর্শনের প্রাচীনতম উৎসাহী সমর্থক ও প্রবক্তা ছিল এবং সূফী দর্শনের কতক ঐতিহাসিকের মতে, ইসলামের সূফিয়ায়ে কিরাম যারা ইরান, ইরাক ও মাগরিবে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাওহীদে ওজূদীর সবক ভারতবর্ষ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। উপমহাদেশে ইসলাম আগমনের পরও কোনরূপ বিরতি ছাড়াই এই ভূখণ্ড এই মতবাদ ও দর্শনের পতাকাবাহী "হামাউস্ত"-এর সমর্থক এবং আর্য সমাজের মেযাজ ও চিন্তা-চেতনা, তাদের ধর্ম ও দর্শনের (যা সেমিটিক জাতিগোষ্ঠী এবং আম্বিয়া-ই কিরামের জন্মভূমিতে সৃষ্ট ধর্মসমষ্টির বিপরীতে নির্ধারণ ও বিধি-নিষেধের বেড়াজাল থেকে মুক্ত ও পলায়নপর এবং ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজূদ ও 'ওয়াহ্‌দাতে আদয়ান' তথা 'সর্বেশ্বরবাদ' ও 'সব ধর্মই সত্য'-এই মতবাদের সমর্থক) প্রায়োগিকতার কারণে এই চিন্তাধারা আরও বেশী গভীর ও নতুন পত্র-পুষ্প পল্লবে রূপ নেয়। এখানে এসে এই দর্শন ও মতবাদ স্থানীয় চিন্তা-চেতনার সঙ্গে মিশ্রিত ও সমন্বিত হয়ে এক নতুন উদ্দীপনা ও এক নতুন দর্শন ও চিন্তাধারার জন্ম দেয়। এখানকার সূফীদের এক বিপুল সংখ্যককে এই মতবাদের সমর্থক, ধারক-বাহক ও প্রবক্তা হিসেবে দেখা যায়। এঁদের ভেতর বিশেষভাবে চিশতিয়া সাবেরিয়া তরীকার প্রখ্যাত বুযুর্গ শাহ আবদুল কুদ্দূস গঙ্গুহী (মৃ. ৯৪৪ হি./১৫৩৭ খৃ.), শায়খ আবদুর রাযযাক

১. আন-নূরু'স-সাফির, ৩৪৬ পৃ.।

ঝিনঝানুভী (মৃ. ৯৪৯ হি./১৫৪২ খৃ.), শুকুরবার নামে খ্যাত শায়খ আবদুল আযীয দেহলভী (মৃ. ৯৭৫ হি./১৫৬৮ খৃ.), শায়খ মুহাম্মাদ ইবন ফাদলুল্লাহ্ বুরহানপুরী (মৃ. ১০২৯ হি./১৬২০ খৃ.) এবং শায়খ মুহিবুল্লাহ্ ইলাহাবাদী (মৃ. ১০৫৮ হি./১৬৪৮ খৃ.) প্রত্যেকেই স্ব-স্ব যুগের ও কালের ইবনে আরাবী এবং স্ব-স্ব শহর নগরের ইবনে ফারিদ (মৃ. ৬৩১ হি./১২৩৪ খৃ.) ছিলেন। এঁদের অধিকাংশই হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র কিছু পূর্বের কিংবা তাঁর সময়ের কাছাকাছি অথবা লাগোয়া যুগের খ্যাতনামা বুযুর্গ ছিলেন।

শায়খ আলাউদ্দৌলা সিমনানীর ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ মতবাদের বিরোধিতা

ইতোপূর্বেই বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত মনীষী ও আলিম-উলামা ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, বিরোধিতা করেছিলেন এবং যারা শায়খ আকবর মুহিয়উদ্দীন ইবনু'ল-'আরাবীর সমালোচনা করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ইলমে জাহিরীতে পণ্ডিত হলেও ইলমে মা'রিফাত ও হাকীকত, আধ্যাত্মিক জগতের রিয়াযত ও মুজাহাদা, এর সূক্ষাতিসূক্ষ্ম রহস্যসমূহ ও এর হাকীকত তথা তত্ত্বজ্ঞান, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও এর রুচি-প্রকৃতি সম্পর্কে ছিলেন অজ্ঞ ও অপরিচিত। এজন্যই এই চিন্তা-চেতনার অনুসারীরা তাদের সমালোচনাকে এই বলে উপেক্ষা করতেন যে,

لذت نشناسی بخداتا پخشی এবং چوں نہ دیدند حقیقت رہ افسانہ زدند

সর্বপ্রথম যেই তত্ত্বজ্ঞানী আরিফ বিশেষভাবে ও গুরুত্ব সহকারে এই মতবাদের সমালোচনা করেন ও একে প্রত্যাখ্যান করেন তিনি হলেন শায়খ রুকনুদ্দীন আবুল মাকারিম আলাউদ্দৌলা সিমনানী।[১]

আলাউদ্দৌলা আস-সিমনানী (৬৫৯-৭৩৬/১২৬১-১৩৩৬) খুরাসানের সিমনান নামক স্থানে একটি ধনী ও বিখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের সদস্যরা সরকারে ও প্রশাসনের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শায়খ নূরুদ্দীন 'আবদুর রহমান আল-কাসরাকী আল-ইসফারাইনীর নিকট কুবরাবী তরীকায় আধ্যাত্মিক জ্ঞান হাসিল করেন এবং এজাযত লাভ করেন। তিনি শায়খ আকবর মুহয়ি উদ্দীন ইবনু'ল-'আরাবীর ওয়াহদাতুল-ওজূদ মতবাদের বিরুদ্ধে অতঃপর অব্যাহতভাবে বিতর্ক চালিয়ে যান এবং স্বীয় পত্রাবলীর ভেতর নানা জায়গায় এর আলোচনা করেন। তাঁর মতে, আধ্যাত্মিক পথের পথিকের (সালিক) সর্বোচ্চ

---

১. মকতূবাতে ইমাম রব্বানী, ৮৯ নং পত্র, ৩য় খণ্ড।

মনযিল তাওহীদ নয়, বরং 'উবূদিয়াত। তাঁর বাণীসমষ্টি তদীয় মুরীদ ইকবাল ইবন সালিক সীস্তানী সংকলন করেন যার কয়েকটি পাণ্ডুলিপি "চিহ্ল মজলিস" বা "মালফূজাত-এ শায়খ 'আলাউদ্দৌলা আস-সিমনানী" প্রভৃতি নামে বিভিন্ন লাইব্রেরীতে বিদ্যমান। জামীর "নাফাহাতুল-উন্স", পৃ. ৫০৪-১৫-এর অধিকাংশ অংশই এসব মালফূজাতের ওপর ভিত্তি করেই রচিত।[১]

ওয়াশহ্দাতুশ-শুহূদ

আমাদের জানা-শোনা মুতাবিক এমন দু'জন নামকরা ব্যক্তিত্ব গুজরে গেছেন যাঁদের কাছে ওয়াহ্দাতু'ল-ওজূদ মতবাদের সমান্তরাল ওয়াহদাতু'শ-শুহূদ মতবাদের আলোচনা ও সেদিকে ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায়। এ দু'টোর ভেতর রুচি ও এ্যাপ্রোচগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কেবল একটি ক্ষেত্রে ঐক্য বিদ্যমান আর তা হল সৎ নিয়্যত, সত্যের প্রতি অন্বেষা এবং ইখলাস তথা ঐকান্তিক নিষ্ঠা যার ওপর হেদায়েতের দরজা উন্মুক্ত হবার কুরআনী প্রতিশ্রুতি রয়েছে ঃ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا "আর যারাই আমার জন্য চেষ্টা-সাধনা করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব" (আল-কুরআন ২৯ ঃ ৬৯)। তন্মধ্যে একজন হলেন শায়খুল ইসলাম হাফিজ ইবনে তায়মিয়া যিনি ছিলেন মূলত একজন মুহাদ্দিছ, ফকীহ ও মুতাকাল্লিম। দ্বিতীয়জন হলেন মাখদূমুল মুল্ক শারাফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনয়ারী (র) যিনি ছিলেন মূলত একজন ওলী-আরিফ, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ও তাসাওউফের ইমাম। প্রথমোক্ত জনের লিখিত "আল-'উবূদিয়াহ" নামক গ্রন্থ থেকে পরিষ্কার প্রতিভাত হয় যে, তিনি ওয়াহদাতু'শ-শুহূদ মতবাদের গলি-খুপচী সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন এবং এই হাকীকত সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল ছিলেন যে, সালিক তথা আধ্যাত্মিক পথের পথিক তার অধ্যাত্ম সাধনার পথে এই মকামের সম্মুখীন হন এবং তা আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালাম ও তাঁদের পূর্ণ অনুসারী সাহাবায়ে কিরাম প্রমুখের মা'রিফাতের তুলনায় নিম্নস্তরের, কিন্তু ওয়াহদাতু'ল-ওজূদের মকাম থেকে উন্নত ও উচ্চতর।[২] কিন্তু যেহেতু এটা তাঁর আসল ময়দান ছিল না বিধায় এতদসম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েই তিনি ক্ষান্ত থেকেছেন।

কিন্তু মখদূম বিহারী (মৃ. ৭৮২/১৩৮০) তদীয় মকতূবাতে অত্যন্ত চমৎকারভাবে এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর আপন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানী গবেষণার আলোকে বলেন যে, "সাধারণভাবে যাকে ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ এবং আল্লাহ ভিন্ন আর সকল অস্তিত্বের শুধু নিশ্চিহ্ন ও পরিপূর্ণ ধ্বংস মনে করা হয় তা প্রকৃতপক্ষে ওজূদে হাকীকী বা প্রকৃত সত্তার অস্তিত্বের সামনে অন্যান্য

১. Meir লিখিত নিবন্ধ, দা.মা.ই।
২. দেখুন رسالة العبودية ৮৫-৮৮ পৃ., وما النوع الثانى فهو الغناء عن شهود السوى।

অস্তিত্বশীল বস্তুর এমনভাবে নিষ্প্রভ ও পরাভূত হয়ে যাওয়া যেমন সূর্যের প্রদীপ্ত রৌশ্নীর সামনে তারকারাজির আলো নিষ্প্রভ এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সত্তার অস্তিত্ব গুরুত্বহীন হয়ে যায়।" তিনি দু'টো শব্দে এই হাকীকত এভাবে বর্ণনা করেন ঃ

نا بودن دیگر ونا دیدن دیگر

অর্থাৎ কোন বস্তুর অস্তিত্বহীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া এক জিনিস আর দৃষ্টিগোচর না হওয়া অন্য জিনিস। তিনি আরও বলেন যে, "এটা এমন একটি নাযুক ও সঙ্গীন স্থান যেখানে অনেক বড় বড় লোকেরও পদস্খলন ঘটে গেছে এবং যেখানে একমাত্র আল্লাহ্র তওফীক ও খিযির (আ)-এর মতো কামিল ওলীর পথ-প্রদর্শন ও নেতৃত্ব ব্যতিরেকে হাকীকতের সংকীর্ণ পথের ওপর কায়েম থাকা কঠিন।"

একজন নতুন সংস্কারকের প্রয়োজন

কিন্তু এই বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট করবার জন্য এবং এ ব্যাপারে দালীলিক পূর্ণতা দানের জন্য এমন এক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল যিনি আধ্যাত্মিক পথের দুরূহ ও কণ্টকাকীর্ণ সফর করেছেন এবং এর উচ্চতর মনযিলসমূহ অতিক্রম করেছেন, হাকীকত সমুদ্রের যিনি ডুবুরী, রূহানী সমুদ্রের দক্ষ সাতারু, যিনি সেই সব বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এবং এর উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে হাকীকতের উপকূলে উপনীত হয়েছেন, যিনি কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে তার অস্তিত্বই নেই বলে একে দলীল বানাবেন না বরং নিজের চোখে দেখা একজন লোক এবং একজন বুলন্দ হিম্মত ও সমুন্নত দৃষ্টির অধিকারী মুসাফির (পর্যটক)-এর ন্যায় পূর্ণ আস্থার সঙ্গে চোখে দেখার মত এই বলে দেবেন যে, তৌহীদে উজূদীর সম্পর্ক যতটা তাতে

ہوں اس کوچہ کے ہر ذرہ سے اگاہ

ادھر سے مدتوں ایا گیا ہوں

"এই গলির প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে আমি অবহিত; বহুকাল আমি এ পথে আসা-যাওয়া করেছি।"

কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলবেন,

ستاروں سے اگے جہاں اور بھی ہیں

"নক্ষত্রপুঞ্জের পরে আরও জগত রয়েছে।"

ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ-এর সিলসিলায় এ পর্যন্ত এর পক্ষে ও বিপক্ষে তিনটি মত রয়েছে ঃ

১. ওয়াহ্দাতু'ল-ওজূদ-এর পরিপূর্ণ গ্রহণ ও স্বীকৃতি এবং একথা মেনে নেওয়া যে, তা এক অবধারিত সত্য এবং গবেষণা ও আধ্যাত্মিক মার্গের সর্বশেষ মনযিল বা চূড়ান্ত ধাপ।

২. ওয়াহ্দাতু'ল-ওজূদ মতবাদ পরিপূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান এবং এ কথা মেনে নেওয়া যে, এ মতবাদ কল্পনাপ্রসূত, খেয়ালী শক্তির কার্যকারিতা এবং অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে আর কিছু নয়।

৩. ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ মতবাদের সমান্তরাল ওয়াহদাতু'শ-শুহূদ মতবাদের দর্শন এবং এটা যে, বাস্তবে আধ্যাত্মিক পথের পথিক (সালিক)-এর যা কিছু দৃষ্টিগোচর হয় মূলত তা نفس الامری প্রকৃত বাস্তব।

তা এ নয় যে, ওজূদ এক এবং ওয়াজিবু'ল-ওজূদ ব্যতিরেকে সব ওজূদ মূলত নিষ্প্রভ ও অস্তিত্বহীন, বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মওজূদাত স্বীয় স্থানে বিদ্যমান ও প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ওয়াজিবু'ল-ওজূদের উজূদে হাকীকীর নূর তার ওপর এমনভাবে পর্দা ফেলে দিয়েছে যে, তা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। যেভাবে সূর্য উদিত হবার পর এর তীব্র আলোকরশ্মির সামনে নক্ষত্রপূঞ্জ ম্লান ও নিষ্প্রভ হয়ে যায় এও ঠিক তেমনি। এমতাবস্থায় যদি কেউ বলে বসে যে, নক্ষত্রপুঞ্জের কোন অস্তিত্বই নেই তবে সে মিথ্যাবাদী হবে না। ঠিক তেমনি বিশাল সৃষ্টিজগত সেই পরিপূর্ণ ও হাকীকী সত্তার সামনে এমনি মূল্যহীন দৃষ্টিগোচর হয় যেন আদতে তার কোন অস্তিত্বই নেই।

মুজাদ্দিদ আলফেছানীর (র)-র অবদান

মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র) এই তিন মতবাদের মুকাবিলায় চতুর্থ মতবাদ এখতিয়ার করেন। তাঁর মতে, ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ আধ্যাত্মিক পথের পথিক (সালেক)-এর সায়র ও সলূকের একটি মনযিল। সাধনা পথে অগ্রসর হবার কালে সে প্রত্যক্ষ করে যে, সেই পরম প্রভু ও পরিপূর্ণ সত্তা ব্যতিরেকে আর কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই, যা কিছু আছে তা একই অস্তিত্ব। বাকী যা কিছু তা সবই তাঁর 'একই বস্তুর বহু আংগিকে ও বহু রূপ-বর্ণে আত্মপ্রকাশ (تلوينات وتنوعات) অথবা শায়খ আকবর ও তাঁর মতবাদী আরিফীনদের মতে, অনুগামী বহিঃপ্রকাশ (تنزلات)।

কিন্তু তৌফীক-এ ইলাহী যদি সঙ্গী হয় আর শরীয়তের প্রদীপ শিখা যদি হয় পথ-প্রদর্শক এবং আধ্যাত্মিক পথের পথিকের হিম্মত যদি বুলন্দ হয় তাহলে দ্বিতীয় মনযিলও সামনে এসে দেখা দেয় আর সেটা হল ওয়াহদাতু'শ শুহূদ-এর মনযিল।

এভাবেই হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র) ওয়াহ্দাতু'ল-ওজূদ (যা কয়েকশ বছর যাবত সুযোগ্য সালেকীন ও আরিফীনের এবং সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী পণ্ডিত ও

দার্শনিকদের মতবাদ হিসেবে চলে আসছিল) প্রত্যাখ্যান করেন এবং এর সর্বাপেক্ষা বড় প্রবক্তা ও ভাষ্যকার শায়খ-এ আকবর মুহ্য়িউদ্দীন ইব্ন 'আরাবীর (যাঁর জ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্ব, সূক্ষ্মদর্শিতা ও রহস্যজ্ঞান এবং রূহানী কামালিয়াত অস্বীকার করা কঠিন) উচ্চ মর্তবা, আল্লাহ্র নিকট মকবূলিয়াত ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা (ইখলাস) অস্বীকার না করেও বরং উচ্চ কণ্ঠে তা স্বীকার করেও এর সঙ্গে আরও কিছু যোগ করেন এবং একটি নতুন অর্জন ও প্রাপ্তির ঘোষণা দেন যা একদিকে জমহূর মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস এবং কুরআন, সুন্নাহ ও শরীয়তে হক মুতাবিক, অপর দিকে তা পেছনের দিকে টেনে নেবার এবং এক বিরাট দলের জ্ঞান ও গবেষণা একেবারে উড়িয়ে দেবার পরিবর্তে এমন একটি বিষয়ের বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন যদ্দ্বারা শরঈ নস্, অকাট্য মূলনীতি সিয়ারে আনফুস ও আফাক-এর সর্বশেষ আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও গবেষণার মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়ে যায়।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ

এই ভূমিকার পর হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর কতকগুলো উন্নতমানের পত্রের (যা তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট ও সহজবোধ্য) উদ্ধৃতি পাঠ করুন।

স্বীয় আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ওয়াহদাতুল-ওজূদ মতবাদ থেকে ওয়াহদাতুশ-শুহূদ পর্যন্ত-উপনীত হবার হালত সম্পর্কে তাঁরই একজন সম্পর্কিত ভক্ত শায়খ সূফী'কে এক পত্রে লিখেছেন ঃ

"মাখদূম ও মুকার্রাম! অল্প বয়স থেকেই এই অধমের আকীদা-বিশ্বাস ছিল তওহীদবাদীদের আকীদা-বিশ্বাস। অধমের শ্রদ্ধেয় পিতাও বরাবর দৃশ্যত একই আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত তরীকার সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন।... সেই প্রবাদ অনুসারে যে, ابن الفقيه نصف الفقيه। "ফকীহ্র পুত্রও আধা ফকীহ্ হয়ে থাকেন।" অধমও সেই নিসবতে জ্ঞানগত ও তত্ত্বগতভাবে পিতার সূত্রে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ লাভ করেছিল। আর সে এতে বড়ই স্বাদ ও মজা পেত। এমনকি আল্লাহ্ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা কেবলই আপন ফযল ও করমে হাকীকত ও মা'রিফত সম্পর্কে অভিজ্ঞ মুওয়ায়্যিদুদ্দীন শায়খে রাশেদ, আল্লাহ্র পথের পথ-প্রদর্শক (রাহনুমায়ে রাহে খোদা) মুহাম্মদ আল-বাকী কুদ্দিসা সিররুহুর খেদমতে আমাকে পৌঁছে দিল আর তিনি (খাজা মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ্) এই অধমকে তরীকায়ে আলিয়া নকশবান্দিয়ার তা'লীম দিলেন এবং তার হালের ওপর গভীর মনোযোগ (তাওয়াজ্জুহ্) প্রদান করলেন।

"এই তরীকার অব্যাহত যিক্র ও শোগলের পর অল্পদিনেই এই অধমের ওপর তওহীদে উজূদী উদ্ভাসিত হল এবং এই উদ্ভাসনের ক্ষেত্রে এক ধরনের চরম পন্থা

সৃষ্টি হল। এই মকামের ইল্‌ম ও মা'রিতের ফয়েয অধিক পরিমাণে দেখা দিল এবং এই মর্তবার সূক্ষাতিসূক্ষ্ম রহস্যের ক্ষেত্রে এমন বিষয় খুব কমই ছিল যা উদ্ভাসিত করে তোলা হয় নি।

"শায়খ মুহ্‌য়িউদ্দীন ইব্‌ন আরাবীর নাযুক ও সূক্ষ্ম জ্ঞান যেমনটি দরকার ছিল সামনে এল এবং তাজল্লীয়ে যাতী যাকে 'ফুসূসুল হিকাম' প্রণেতা বর্ণনা করেছেন এবং তার সেই চরম উন্নতি লাভ ঘটল যে সম্পর্কে তিনি বলেন, مابعد هذا الاالعدم المحض। (এরপর কেবল বিরাট শূন্যতা ব্যতিরেকে আর কিছুই নেই) দ্বারা তাকে ধন্য করা হল এবং সেই তাজাল্লীর সেই সব ইল্‌ম ও মা'আরিফ যাকে শায়খ (ইবনে আরাবী) খাতিমুল বিলায়াত (বিলায়েতের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত স্তর)-এর সঙ্গে নির্দিষ্ট মনে করেন, বিস্তারিতভাবে ধরা পড়ল। অধম তাওহীদের এই মকামে হাল ও মত্ততার সেই সীমান্তে উপনীত হল যে, তার কোন কোন পত্রে (যা স্বীয় মুরশিদ) হযরত খাজা (বাকীবিল্লাহ) কে লিখেছিলেন, এ ধরনের মত্ততাবস্থার কবিতাও লিখে দিয়েছিল।

"অদৃশ্য জগতের খিড়কী দিয়ে দীর্ঘদিন এ অবস্থা চলে। এমনকি মাসের পর মাস ও বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়। অবশেষে মেহেরবান মালিকের অসীম অনুগ্রহ অধমের প্রতি মুখ তুলে চাইল। সেই অবস্থা প্রকাশ প্রকাশের অঙ্গনে তাঁর শুভ পদার্পণ ঘটল এবং বর্ণনাতীত আকৃতি ও বর্ণে নিঃশব্দে ليس كمثله شيء (তাঁর অর্থাৎ সেই পবিত্র সত্তার মত কেউ নেই)-এর চেহারার ওপর যেই পর্দা পড়েছিল তা সরিয়ে দিল এবং পূর্বেকার সকল জ্ঞান যা ইত্তিহাদ ও ওয়াহ্‌দাতুল ওজূদ (বিশ্বময় একক সত্তা)-এর খবর দিত তা অপসৃত হল এবং সীমান্ত ও (২) سريان নৈকট্য ও যাতী তথা একান্ত সত্তাগত সান্নিধ্য-সম্মিলন যা এই মকামে প্রকাশিত হয়েছিল, অবলুপ্ত হল। অতঃপর নিশ্চিত বিশ্বাস ও প্রতীতি দ্বারা জানতে পারলাম যে, আল্লাহ্‌ জাল্লা শানুহু এই জগতের সঙ্গে ঐ সব নিসবতের ভেতর থেকে কোন নিসবত (সম্বন্ধ, সংযোগ) রাখেন না। তাঁর সীমান্ত বেষ্টনী ও নৈকট্য মূলত জ্ঞানগত ও তত্ত্বগত, যেমন সত্যপথের অনুসারী পথিকগণ বিশ্বাস করে থাকেন (আল্লাহ্‌ পাক তাঁদের সাধনা ও প্রয়াসকে পুরস্কৃত করুন)। সেই পবিত্র সত্তা চূড়ান্ত বিচারে কোন কিছুর সঙ্গেই একীভূত হন না। সেই সত্তা তা রূপ-বর্ণ ও আকার-আকৃতি বিমুক্ত, বিশ্বজগতই কেবল আকার-প্রকার ও রূপ-বর্ণের দাগযুক্ত। যে সত্তা 'কেমন ও কিরূপ'-এর ঊর্ধ্বে তা যা 'কেমন কিরূপ' (অর্থাৎ সৃষ্টিজগত) তাঁর মত ও তুল্য হবে কি করে? যা নিত্য ও আবশ্যিক সত্তা (ওয়াজিব) তাঁকে অনিত্য ও আবশ্যিকতাবিহীন সম্ভব (মুমকিন)-এর সঙ্গে একীভূত বলা যায় কি? যা অনাদি অন্তহীন অব্যয় (কাদীম) তা কখনো অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব লাভকারী

(হাদিস)-এর হুবহু বা সদৃশ হতে পারে না। যার লয় ও ক্ষয় অসম্ভব তা "ক্ষয়িষ্ণু ও বিলীয়মানে"র সাথে অভিন্ন অস্তিত্ববান হতে পারে না। কেননা বুদ্ধিবৃত্তিক ও শরীয়তের দৃষ্টিতে হাকীকত ও মৌলতত্ত্বের পরিবর্তন অসম্ভব এবং বাস্তবে ও প্রকৃত বিচারে একটিকে অপরটির সাথে প্রযুক্ত করা কখনো শুদ্ধ হতে পারে না। এটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে, শায়খ মুহয়িউদ্দীন (ইবনুল আরাবী) এবং তাঁর অনুসারীরা মহান অনাদি স্রষ্টার সত্তাকে নিরেট অপরিজ্ঞাত সাব্যস্ত করেন এবং তাঁর সত্তাকে কোন 'বিধেয়'-এর উদ্দেশ্য মনে করেন না (যেমন আল্লাহ উদ্দেশ্য, অতি দয়ালু বিধেয় বাক্যটি তাদের চিন্তাধারায় প্রযোজ্য নয়)। এতদসত্ত্বেও সাত্ত্বিক পরিবেষ্টন এবং সত্তাগত নৈকট্য ও অঙ্গাঙ্গী সান্নিধ্য (স্রষ্টা ও বান্দার মধ্যে) সাব্যস্ত করেন। এ বিষয়ে আহলে সুন্নাহ্‌র আলিমগণের বক্তব্যই সঠিক ও যথার্থ (অর্থাৎ সব কিছুর যাকে ইবনুল আরাবী ও তাঁর অনুসারীরা 'একীভূত সত্তা' বলেছেন তার) ব্যাপার মূলত জ্ঞানগত নৈকট্য ও উপলব্ধিজাতি পরিবেষ্টন (বাস্তবিক নয়)।

"একীভূত সত্তা (তৌহীদে উজূদী) মতবাদের বিপরীত ও পরিপন্থী এই সব জ্ঞান ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব অর্জিত হওয়ার সময়টি এই অধমের জন্য ছিল প্রচণ্ড অস্থিরতার যুগ। কেননা সে সময়টাতে অধম এই একত্ববাদ (তৌহীদ) হতে ঊর্ধ্বতর অন্য কিছু বুঝত না, বোঝার জন্য প্রস্তুতও ছিল না। সেজন্য অধম অত্যন্ত বিনয় ও মিনতির সঙ্গে দোআ করত যাতে চলমান এই অভিজ্ঞান বিদূরিত না হয় (কেননা সম্ভবত এতে এক প্রকার মত্ততার স্বাদ থাকার কারণে তা অত্যন্ত প্রিয় ছিল)। অবশেষে সব পর্দা ও আবরণ যা সেই হাকীকতের ওপর পড়ে ছিল তা উঠে গেল এবং প্রকৃত সত্য উন্মুক্ত ও প্রস্ফুটিত হয়ে দেখা দিল। তখন বোঝা গেল যে, বিশ্বজগত যদিও আল্লাহ তা'আলার গুণগত পরিপূর্ণতার (কামালাত) জন্য আয়নার অবস্থানে রয়েছে, কিন্তু প্রকাশিত ও বিকশিত (আয়নায় যে প্রতিবিম্ব দেখা যায়) তা অভিন্ন রূপে প্রকাশমান সত্তা (অর্থাৎ যার প্রতিবিম্ব সে) নয় এবং ছায়া তার মূল সত্তা (অর্থাৎ যার ছায়া তার) হুবহু অস্তিত্ব হতে পারে না। একীভূত সত্তার মতবাদ পোষণকারী যেমন অভিমত পোষণ করেন (যেমন সূর্য ও তার কিরণ বা রোদ অভিন্ন নয় এবং আয়নার বুকে প্রতিফলিত সূর্য আসমানের ঐ সূর্য নয়। কেননা আসমানের সূর্যের তুলনায় আয়নায় প্রতিফলিত সূর্যের পরিধি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রও নয়)।

"একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি সুস্পষ্ট করা যায়। যেমন সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী কোন আলিমের ইচ্ছা হল যে, তিনি তাঁর বহুবিধ জ্ঞানের (কামালাত) প্রকাশ করবেন এবং তাঁর লুক্কায়িত ও প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য ও গুণাবলী জনসমক্ষে তুলে ধরবেন। তখন তিনি কতকগুলো হরফ ও ধ্বনি আবিষ্কার করলেন যাতে করে সে সব হরফ ও ধ্বনির দর্পণে তার লুক্কায়িত ও প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য ও গুণাবলীর বিচ্ছুরণ ও পরিস্ফুটন ঘটাতে পারেন। এমতাবস্থায় একথা বলা যায় না যে, এসব হরফ ও ধ্বনি

সমষ্টি যা ঐসব প্রচ্ছন্ন গুণের বিকাশ স্থল ও দর্পণরূপে পরিদৃশ্য হরফ ও ধ্বনিগুলো তার গুণাবলীর অভিন্ন সত্তা অথবা সে গুণাবলী পরিবেষ্টনকারী কিংবা সেগুলোর কাছাকাছি বা সেগুলোর সঙ্গে সত্তাগতভাবে একাত্মতাবোধক বরং সেগুলোর মধ্যে সেই সম্বন্ধই হবে যা নির্দেশক ও নির্দেশিত (দাল-মাদলূল)-এর মধ্যে এবং শব্দ ও অর্থের মধ্যে হয়ে থাকে। হরফ ও ধ্বনিগুলো ঐ সব গুণাবলীর নির্দেশক বা প্রমাণ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয় এবং যেই সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়েছে তা হবে ধারণা ও কল্পনা-প্রসূত। বাস্তবে ঐ সব সম্বন্ধ প্রকাশ করতে পারেন। এরূপ অবস্থায় একথা বলা যাবে না যে, তার লুক্কায়িত সৌন্দর্য ও গুণাবলীর (সদৃশ্যতা, একাত্মতা, পরিবেষ্টিত নৈকট্য, সত্তার সাথীত্ব, সত্তায় লীন ইত্যাদি)-এর কোন সম্বন্ধই সপ্রমাণ নয়। কিন্তু যেহেতু গুণাবলী এবং হরফ ও ধ্বনিসমূহের মধ্যে আত্মপ্রকাশকারী ও প্রকাশিত, বিকাশমান ও বিকশিত এবং নির্দেশক ও নির্দেশিত হওয়ার সম্বন্ধ সাব্যস্ত রয়েছে, সে কারণে কিছু কিছু (অধ্যাত্মচারী) লোকের কিছু কিছু আনুষঙ্গিক ও পার্শ্বজাত বিষয়ের (পরগাছা) সূত্রে কল্পনাপ্রসূত (মনে মনে মিষ্টি খাওয়ার ন্যায়) সম্বন্ধ লাভ হয়। কিন্তু বাস্তবে সে সব পরিপূর্ণতা ও গুণাবলী এ ধরনের যাবতীয় সম্বন্ধ থেকে বিমুক্ত ও পবিত্র। হক (চূড়ান্ত সত্য, পরম সত্য- আল্লাহ) ও খাল্ক (স্রষ্টা ও সৃষ্টি)-এর মধ্যে উল্লিখিত নির্দেশক ও নির্দেশিত হওয়ার এবং প্রকাশমান সত্তা ও প্রকাশিত বিশ্ব হওয়ার সম্বন্ধ ব্যতিরেকে অন্য কোন সম্বন্ধ নেই। একান্ততার মুরাকাবার (ধ্যান-নিমগ্নতার) আধিক্য কোন কোন মনীষী বুযুর্গের জন্য ঐ কল্পনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত প্রদানের কারণ হয়ে থাকে। মুরাকাবা ও ধ্যানের রূপ-চিত্র কল্পনা শক্তির জগতে চিত্রায়িত হয়। আবার কতক মনীষী বুযুর্গের ক্ষেত্রে একাত্মতার জ্ঞান-চর্চা ও তার পুনঃপৌণিকতার কারণে ঐরূপ সিদ্ধান্তের এক ধরনের রুচি অর্জিত হয়। কিছু লোকের জন্য (ধ্যান ও জ্ঞান-চর্চা নয় বরং) এই দিকে আকৃষ্ট হবার অর্থাৎ ওয়াহদাতুল-ওজূদ মতাবলম্বী হবার সূত্র 'প্রেমের আতিশয্য'। কেননা প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমাতিশয্যের কারণে প্রেমিকের দৃষ্টিতে প্রেমাস্পদ ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না এবং সেও তার প্রেমাস্পদ ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না এবং সে তার প্রেমাস্পদ ব্যতীত কোথাও কিছু দেখতে পায় না (যা কিছুই দেখে তাকেই প্রেমাস্পদ ও 'লায়লা' মনে হয়। جدھر دیکھتا ہوں ادھر توہی توہے যেদিকেই তাকাই শুধু তোমাকেই দেখতে পাই (বইয়ের পাতার লেখাগুলো প্রেমাস্পদের মাথার কেশরাজি মনে হয়)। কিন্তু বাস্তবও এমন নয় যে, বাস্তবেই প্রেমাস্পদ-ব্যতীত কোথাও অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই। কেননা তা ইন্দ্রিয় উপলব্ধি, জ্ঞান-বুদ্ধির উপলব্ধি ও শরীয়তের পরিপন্থী। কখনো এই প্রেমাতিশয্যই বেষ্টনীভুক্ততা ও সাত্তিক সান্নিধ্যের (সম্মিলন) সিদ্ধান্ত প্রদানে উদ্যত ও উজ্জীবিত করে। তবে তৌহীদ (একত্ববাদের মৌল বিশ্বাস)-এর এ স্তরটি পূর্ববর্তী স্তর (প্রকার) দু'টোর চেয়ে সমুন্নত এবং 'হালত' (হাল)-এর

পরিসীমার অন্তর্ভুক্ত যদিও তা যুক্তি-বুদ্ধি ও প্রকৃত বাস্তবের অনুকূল নয়। সেহেতু শরীয়ত ও প্রকৃত বাস্তবের সঙ্গে এ ধ্যান-ধারণার সমন্বয় বিধানের চেষ্টাও লৌকিকতা মাত্র। সার-কথা, এটি কাশ্‌ফ-এর বিচ্যুতি (খাতা) যা ইজতিহাদের বিচ্যুতির (خطاء اجتهادى) বিধানভুক্ত (অর্থাৎ মুজতাহিদের ভুল যেমন শাস্তি বা তিরস্কারযোগ্য নয় বরং ক্ষমার যোগ্য, তদ্রূপ এ ভুলও) তিরস্কার ও ভর্ৎসনার উর্ধ্বে বরং 'হাল' ও 'আত্মহারা' হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে একে সঠিক ও যথার্থতার সনদ দেয়া যায়" (মকতূব ১/৩১, শায়খ সূফীর নামে)।

ওয়াহ্দাতুশ-শুহূদ বা তৌহীদে শুহূদী (দৃষ্টি একক সত্তায় সীমিত থাকা)

শায়খ ফরীদ বুখারীকে লিখিত এক পত্রে হযরত মুজাদ্দিদ (র) বলেন, "আধ্যাত্মিক পথের পথিক সূফীগণের তাদের সুলূক ও অধ্যাত্ম পথে চলার কালে যেই তৌহীদ অর্জিত হয় তা দুই প্রকার ঃ তৌহীদে শুহূদী ও তৌহীদে ওজূদী। তৌহীদে শুহূদী অর্থ একেকে দেখা অর্থাৎ অধ্যাত্ম পথের পথিক সালিক-এর দৃষ্টিতে এক ব্যতীত কিছুই থাকবে না, তার দৃষ্টি 'এক' থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যত্র পতিত হবে না। আর তৌহীদে ওজূদী হল 'অস্তিত্বকে একের মধ্যে সীমিত করে দেখা, এককেই অস্তিত্ববান মনে করা এবং এক ব্যতীত অন্য সব কিছুকেই অস্তিত্বহীন মনে করা।"

একটু পরে গিয়ে লিখছেন,

"এক ব্যক্তি সূর্যের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী হল। এ বিশ্বাসের আধিক্য তারকারাজির অস্তিত্বের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকে অত্যাবশ্যকীয় করে না। তবে যে সময় ও যেই মুহূর্তে সে সূর্যকে দেখবে, তারকারাজি দেখবে না। তার দৃষ্ট বস্তু সূর্য ব্যতীত অন্য কিছুই হবে না এবং সূর্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকার দরূন তারকা না দেখা অবস্থায়ও তার জানা থাকবে যে, তারকারাজি অস্তিত্বহীন নয় বরং সে জানবে যে, তারকা আছে তবে পর্দাবৃত ও আচ্ছাদিত অবস্থায় এবং সূর্য রশ্মির তেজঃপ্রভাবে পরাজিত ও নির্জীব অবস্থায় রয়েছে" (পত্র নং ১১/৪৩, শায়খ ফরীদের নামে)। সামনে অগ্রসর হয়ে লিখছেন ঃ

"আমার মুর্শিদ কেবলা হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র) কিছুকাল তৌহীদে ওজূদী মতবাদ পোষণ করেছেন। তিনি তাঁর পুস্তক-পুস্তিকায় ও পত্রাবলীতে তা প্রকাশও করেছেন। কিন্তু শেষাবধি আল্লাহ তা'আলার পরম করুণা তাঁকে সেই অবস্থান (মকাম) থেকে তরক্কী দান করে এমন এক রাজপথে ও মহাসড়কে তুলে দেন যার ফলে তিনি পূর্ববর্তী স্তরের (তথ্য ও তত্ত্বাভিজ্ঞতার) সংকীর্ণতা ও সংকট থেকে মুক্তি পান" (প্রাগুক্ত)।

একটি পত্রে শায়খ-এ আকবর ও তাঁর অনুগামীদের মতবাদ বর্ণনা করতে গিয়ে

লিখেছেন ঃ

"তাঁরা ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ মতবাদে বিশ্বাসী। তাঁদের ধারণায়, বর্হিজগতে অস্তিত্ব বলতে একটিই, মাত্রই একটি আর তাহল আল্লাহ্র সত্তা (যাতে হক)। এর বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব আদতেই নেই, আদৌ নেই। অবশ্য এর জ্ঞানগত প্রমাণের তাঁরাও সমর্থক। তাঁদের কথা হল, الاعيان ماشمت رائحة الوجود। অর্থাৎ 'বস্তুজগত' বাহ্য অস্তিত্ব ও প্রকৃত সত্তার ঘ্রাণও পায়নি। তাঁরা বিশ্বজগতকে হক সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ছায়া বা প্রতিবিম্ব মনে করেন। কিন্তু তাঁদের মতে, এই ছায়ারূপী অস্তিত্বও কেবল উপলব্ধি ও অনুভবের পর্যায়ে, বাস্তবে ও বাহ্যজগতের ত্যা শুধুই নাস্তি মাত্র।"

(পত্র নং ১/১৬০, ইয়ার মুহাম্মদ জাদীদ বাখশী তালিকানীর নামে)।

এ পত্রেই হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব ওয়াহদাতুল-ওজূদ-এর স্তর থেকে তাঁর নিজের উন্নতি ও অগ্রগতির কাহিনী শোনাতে গিয়ে বলেন ঃ

"এই পত্র লেখক একসময় তৌহীদে ওজূদী (ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ)-তে বিশ্বাসী ছিল। ছেলে বেলা থেকেই তাঁর এই তৌহীদের জ্ঞান অর্জিত ছিল এবং অন্তরেও তাঁর এ বিশ্বাস দৃঢ় মূল ছিল। যদিও এ ব্যাপারে তিনি 'সাহিবে হাল' ছিলেন না (অর্থাৎ বিষয়টি তখন 'হালত'-এর পর্যায়ে ছিল না)। সুলূকের পথে পা রাখতেই প্রথমেই তাঁর সামনে তৌহীদে ওজূদীর রাস্তা উদ্ভাসিত হয় এবং লেখক একটা সময় পর্ব পর্যন্ত সেই মকামের মনযিল ও স্তরগুলো পরিভ্রমণ করেছেন এবং উল্লিখিত মকামের সঙ্গে সম্পর্কিত ও সম্বন্ধযুক্ত বহু তথ্য ও তত্ত্ব আহরণ করেছেন এবং তৌহীদবাদীদের সামনে আগত কঠিন পরিস্থিতি ঐসব উদ্ভাসিত ও ফয়েয লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে উত্তরণ ঘটল। এরপর একটা সময় পর্ব অতিক্রম করার পর দ্বিতীয় নিসবত এই অধমের ওপর জেঁকে বসল এবং এই জেঁকে বসা অবস্থায় তাঁর তৌহীদে ওজূদী সম্পর্কে বিরতি অনুভব করলাম। কিন্তু এই বিরতি সুধারণাপ্রসূত ছিল, অস্বীকৃতির কিংবা প্রত্যাখানের সাথে নয়। বেশ কিছুকাল এই অবস্থা চলল। শেষ পর্যন্ত ব্যাপরটি অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং অধমকে দেখান হল যে, এই স্তর (ওয়াহদাতু'ল-ওজূদের মনযিল) তুলনামূলকভাবে নিম্নস্তরের এবং আমি ছায়ার মকাম পর্যন্ত পৌঁছলাম যা পূর্ববর্তী মকামের তুলনায় ঊর্ধ্বের। এই অস্বীকৃতির ব্যাপারে তাঁর (পত্র লেখকের) কোন এখতিয়ার ছিল না। কেননা সে এই মকাম থেকে বের হতে চাচ্ছিল না। এজন্য যে, অনেক বড় বড় বুযুর্গ মাশায়েখ এই মকামের ওপর এসে এমনভাবে আসন গেড়ে বসে গেছেন যে, আর উঠবার নামটিও করেন নি। এরপর তিনি (অধম পত্র লেখক) ছায়া ও প্রতিবিম্বের মকাম পর্যন্ত পৌঁছলেন এবং নিজেকে ও বিশ্বজগতকে ছায়ারূপ পেলেন

তখন এই আকাংক্ষা জন্মাল যেন তাকে এই জগত (মকাম) থেকে পৃথক ও (কামাল-এর) মধ্যেই মনে করছিল। আর এই মকাম মোটের ওপর এর সঙ্গেই সম্বন্ধ রাখে। অনুগ্রহে ও বদান্যতার এই মকাম থেকে তাকে আরও উর্ধ্বতর মকামে নিয়ে যান এবং আবদিয়াতের মকামে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেই মুহূর্তে উল্লিখিত মকামের কামালিয়াত তথা পরিপূর্ণতা আমার দৃষ্টিগোচর হয় এবং এর উচ্চতা ভেসে ওঠে। ফলে পত্র লেখক (মুজাদ্দিদ আলফেছানী) বিগত মকামগুলোর থেকে আল্লাহ্‌র দরবারে তওবাহ্‌ ইস্তিগফার করতে থাকেন, তাঁর দরবারে বিনীতভাবে ক্ষমা চাইতে থাকেন। যদি তিনি এই অধমকে ঐ রাস্তা পর্যন্ত নিয়ে না যেতেন এবং এক মকামের অন্য মকামের ওপর অগ্রাধিকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে না দিতেন তাহলে সে এই মকামের মধ্যেই নিজের অধঃগমন মনে করত। সেজন্য তাঁর (লেখকের) মতে তৌহীদে ওজূদীর থেকে উচ্চতর কোন মকাম ছিল না।"

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل -

শায়খ-এ আকবর (ইবনুল আরাবী) সম্পর্কে ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ মত

মতের এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও শায়খ-এ আকবর সম্পর্কে নিজের অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে মুজাদ্দিদ আলফেছানী লিখেন ঃ

"এই অধম শায়খ মুহয়িউদ্দীন (ইবনুল আরাবী) কে আল্লাহ্‌র মকবূল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। কিন্তু তাঁর সেই সব ইল্‌ম ও জ্ঞান (যা জমহূর আলিম-উলামার আকীদা-বিশ্বাস এবং কুরআন-সুন্নাহ্‌র প্রকাশ্য বিষয়গুলোর বিরোধী) কে তিনি ভুল ও ক্ষতিকর মনে করেন। লোকে তাঁর সম্পর্কে বাড়াবাড়ির পথ ধরেছে এবং মধ্যবর্তী ও ভারসাম্যপূর্ণ রাস্তা থেকে দূরে সরে গেছে। একদল শায়খ (ইবনুল আরাবী) কে তীব্র ভর্ৎসনা ও নিন্দার শিকারে পরিণত করেছে এবং তাঁর অভিজ্ঞান (মা'রিফত) ও হাকীকতসমূহকে ভ্রান্ত আখ্যা দিয়েছে। অপর দল শায়খ-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য অবলম্বন করেছে ও তাঁর যাবতীয় মা'রিফত ও হাকীকতকে সত্য জ্ঞান করছে এবং দলীল-প্রমাণ ও সাক্ষ্য সহযোগে সে সবের সত্যতা ও যথার্থতা প্রতিপন্ন করছে। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, উভয় দলই এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও সীমা অতিক্রমের পথ ধরেছে এবং মধ্যবর্তী রাস্তা থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার যে, শায়খ মুহ্‌য়িউদ্দীন আল্লাহ্‌র মকবূল বান্দাদের কাতারে দৃষ্টিগোচর হচ্ছেন এবং তাঁর অধিকাংশ অভিজ্ঞান (মা'রিফত) ও হাকীকত যা আহলে হকের বিরোধী—ভ্রান্ত ও অশুদ্ধ দেখতে পাচ্ছি"।[১]

এক স্থানে তিনি নিজের এবং তৌহীদে ওজূদীর অস্বীকারকারী ও বিরোধীদের

১. পত্র নং ১/২৬৬, খাজা আবদুল্লাহ ও খাজা উবায়দুল্লাহ্‌র নামে লিখিত;

মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

"এই অধমের তৌহীদে ওজূদীর সমর্থকদের সঙ্গে মতের ভিন্নতা কাশ্‌ফ ও শুহূদের পথে এসেছে। উলামায়ে কেরাম এসবের (ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজূদ এবং গায়রুল্লাহ্‌র অস্তিত্বের একেবারেই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন)-অনিষ্টতার ব্যাপারে একমত। এই অধমের তৌহীদে ওজূদীর ঐসব কথিত উক্তি ও হালত-এর গুণ ও সৌন্দর্যের ভেতর কোন আপত্তি কিংবা অভিযোগ নেই। তবে এই শর্তে যে, এসবের অতিক্রম করে যাওয়া যায়।[১]

তৌহীদে ওজূদীর বিরোধিতা করার আবশ্যকতা

এখানে এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তৌহীদে ওজূদী যখন সুলূক (অধ্যাত্ম্য পথ) -এর একটি মনযিল এবং সালিক (অধ্যাত্ম্য পথের পথিক, সাধক)-এর জন্য একটি সাময়িক স্তর বা পর্যায় যার ওপর অধ্যাত্ম্য পথের পথিক (সালিক) এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিতদের একটি বিরাট দল প্রতিটি যুগেই পৌঁছেছেন, এদের মধ্যে একটি বড় দল এই স্তরের ওপর পৌঁছে থেমে গেছেন এবং কাউকে আল্লাহ্‌ পাকের তৌফীক এই মনযিল থেকে সম্মুখে এগিয়ে দিয়ে তৌহীদে শুহূদী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, তখন এর মধ্যে অন্যায় ও অনিষ্টতা কোথায়? এবং হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী এত তীব্রভাবে এর বিরোধিতা করলেন কেন? আর এর মুকাবিলায় এত জোরে-শোরে তৌহীদে শুহূদীর প্রমাণ পেশ এবং এর ওপর অগ্রাধিকার প্রদানে এত কলম চালাচালি করলেনই বা কেন?

এর উত্তর এই যে, তৌহীদে ওজূদীর সমর্থক এবং এর প্রচারকদের ভেতর (হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের যুগেও) একটি বিরাট সংখ্যা এমন জন্মে গিয়েছিল যে, যারা নিজেদেরকে শরীয়তের বিধি-বিধান, ইসলামের ফরয ওয়াজিব-এর মত বিষয়াদি থেকে মুক্ত ভেবে বসেছিল এবং এই কথা মনে করে যখন সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং যখন সব কিছুই সত্য তখন হক-বাতিলের পার্থক্য এবং ঈমান ও কুফরের বিশিষ্টতার প্রশ্ন তোলা কেন?[২] তাঁরা শরীয়ত ও এর ওপর আমল করাকে সাধারণ পর্যায়ের একটি জিনিস ভেবে নিয়েছিল। তাদের নিকট আসল মকসূদ (তৌহীদে ওজূদী) হল এর থেকে ঊর্ধ্বতর মকাম এবং এর সম্মুখস্থ মনযিল যা এই রাস্তার কামিল পথিক ও আল্লাহ্‌ পর্যন্ত যারা পৌঁছে গেছে তাদের হাসিল হয়ে থাকে। হি. দশম শতাব্দীতে যেই যুগটি ছিল হযরত মুজাদ্দিদ ছাহেবের মানসিক ও আধ্যাত্মিক (রূহানী) ক্রমোন্নতির যুগ-এই তৌহীদে ওজূদীর

১.পত্র নং২/৪২ খাজা জামাল উদ্দীন হুসায়ন-এর নামে লিখিত;

২. হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর উর্দূ সাহিত্যের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কবি মির্যা গালিব নিম্নোক্ত কবিতায় ঐসব লোকের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ঃ بم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم
ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہوگئیں ۔

রঙ ভারতবর্ষের ওপর এমনভাবে ছেয়ে ছিল যে, 'আরিফসুলভ রুচির অধিকারী কবিরা সকলেই এর গীত গাইত এবং কুফর ও ঈমানকে সমান অভিহিত করত, এমন কি কোন কোন সময় কুফরকে ঈমানের ওপর অগ্রাধিকার দেবার সীমা-রেখায় পদার্পণ করত। সে যুগে এমন বহু কবিতা মানুষের মুখে মুখে ফিরত যেখানে পরিষ্কার ভাবে এ ধরনের কথা বলা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে পেশ করছি ঃ

کفر وایمان قرین ایك دگرند ـ هرکه را کفرنیست ایمان نیست

"কুফর ও ইসলাম পরস্পরের সঙ্গে জড়িত; যার ভেতর কুফর নেই-ঈমানও নেই।"

এরপর এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে একটি বইয়ে লেখা হয়েছে ঃ

پس ازیں معنی اسلام درکفرست وکفر در اسلام یعنی تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل مراد از لیل کفرست ومراد از نهاراسلام ـ

"এই অর্থে ইসলাম আছে কুফরের মধ্যে আর কুফর আছে ইসলামের মধ্যে। অর্থাৎ تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل এখানে লায়ল (রাত্রি) বলতে কুফর এবং নাহার (দিন) বলতে ইসলাম বোঝায়।"

অপর জায়গায় এই কবিতা উদ্ধৃত করেন ঃ

عشق رابا کافری خویشی بود
کافری درعین درویشی بود

" প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে কুফরের সাথে;
আর কুফর রয়েছে দরবেশীর মধ্যে।"

সামনে অগ্রসর হয়ে লিখছেন ঃ

العلم حجاب اکبر گشت مراد ازیں علم عبودیت که حجاب اکبرست ایں حجاب اکبر اگراز میاں مرتفع شود کفربه اسلام واسلام به کفر امیزد وعبادت خدائی وبندگی برخیزد۔[১]

"ইল্‌ম হল বড় পর্দা; এই ইলমের মর্মার্থ হল উবূদিয়াত বা আল্লাহ্‌র গোলামী যা বড় পর্দা। এই পর্দা তুলে নেওয়া হলে কুফর ইসলামের সঙ্গে এবং ইসলাম

১. রিসালায়ে ইশকিয়া ৭১-৭৩;

কুফরের সঙ্গে মিশে যাবে। আল্লাহ্‌র ইবাদত তখন উঠে যাবে।"

আল্লাহ তা'আলা মুজাদ্দিদ সাহেবকে প্রখর ধর্মীয় চেতনা এবং ফারূকী মর্যাদাবোধের একটি বড় অংশ দান করেছিলেন এবং তাঁকে দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সেই হাদীছের বাস্তবায়ন দেখতে চাচ্ছিলেন যেই হাদীছে বলা হয়েছে (আর এটি তাঁর ভাগ্যে লেখা হয়ে গিয়েছিল) ঃ

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين -

"প্রত্যেক যুগে এই ইলমের ধারক-বাহক হবেন এমন সব ন্যায় ও ইসনাফপন্থী মুত্তাকী আলিম যারা দীনকে চরমপন্থীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের ভুল চিন্তা-চেতনা ও দাবি এবং মূর্খ জাহিলদের অপব্যাখ্যা থেকে মুক্ত রাখবেন" (মিশকাত, কিতাবুল-ইল্‌ম)।

এই জিনিসই উল্লিখিত আকীদা-বিশ্বাস ও দাওয়াতের জ্ঞানগত ও ধর্মীয় খতিয়ান নেবার কারণ হয় যার প্রচার-প্রসারে সেই যুগে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে ও ব্যাপকভাবে কাজ করা হচ্ছিল। আর মুজাদ্দিদ সাহেব পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, এর (ওয়াহ্‌দাতুল ওজূদ-এর) প্রভাবে শরীয়তের বাঁধন স্বভাবতই ঢিলা ও আলগা হতে চলেছিল, এর (শরীয়তের) প্রতি মানুষের সম্মান ও পবিত্রতাবোধ হ্রাস পাচ্ছিল। মুজাদ্দিদ সাহেব নিজেই তাঁর এক পত্রে লিখছেন ঃ

"অধিকাংশ সমকালীন লোক কতক জিনিসকে অনুকরণ করতে গিয়ে কেউ কেউ আপন জ্ঞান ও বিদ্যা-বুদ্ধির জোরে, আবার কেউ এমন বিদ্যার ওপর ভিত্তি করে যার ভেতর তার রুচি-প্রকৃতিও শামিল (চাই কি তা সীমিত পরিমাপের হোক) এবং কেউ কেউ ধর্মদ্রোহী চিন্তা-চেতনার ওপর ভর করে তৌহীদে ওজূদীর আঁচল ধরে রেখেছে এবং তারা সব কিছুকেই সেই পরম সত্য সত্তার পক্ষ থেকে মনে করে বরং সত্য বলেই জানে। আর তারা নিজেদের গর্দানকে কোন না কোন কিছুর আড়াল নিয়ে শরীয়তের বেড়ী ও বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্ত করে নেয় এবং শরীয়তের হুকুম-আহ্‌কাম তথা বিধি-বিধানের সম্পর্কে তারা অলসতা ও গাফিলতির আশ্রয় গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে তাদেরকে খুবই তৃপ্ত ও আনন্দিত দেখতে পাওয়া যায়। এসব লোক শরীয়ত নির্দেশিত বিষয়াদির ওপর আমলের আবশ্যকতার ব্যাপারে স্বীকৃতি দিলেও একে তারা সাময়িক ও গুরুত্বহীন মনে করে। তারা আসল মকসূদ তথা পরম লক্ষ্যকেই শরীয়ত-ঊর্ধ্ব ধারণা করে। না, কখখনো না। না,

১. মকতূবাত, ১/৪৩, শায়খ ফরীদ বুখারীর নামে;

কখখনো না। আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এ ধরনের বদ ও ভ্রান্ত আকীদা থেকে পানাহ্ চাই, আশ্রয় চাই।"[১]

এই পত্রেরই অন্যত্র লিখেছেন ঃ

"এই যুগে ঐসব দলের এমন বহু লোক রয়েছে যারা সূফী দরবেশের বেশ পরে নিজেদের জাহির করে, তৌহীদে ওজূদী মতবাদ প্রকাশ্যে জনসমক্ষে ঘোষণা দিয়ে বেড়াতে শুরু করেছে। আর এ ছাড়া অন্য কোন কিছুকেই কামালিয়াত বা বুযুর্গী মনে করে না। তারা ইলমের মাধ্যমে হাকীকত থেকে দূরে থেকে গেছে। সূফী-বুযুর্গদের উক্তি ও বানীকে তাদের মস্তিষ্কজাত বিষয়ের ওপর টেনে নামিয়েছে এবং তাদেরকে নিজেদের অনুসরণীয় বানিয়ে রেখেছে ও কল্পনাপ্রসূত বিষয়গুলোর দ্বারা নিজেদের পড়ন্ত বাজার গরম করে রেখেছে"।[১]

মুজাদ্দিদ সাহেবের অনন্য বৈশিষ্ট্য

মুজাদ্দিদ সাহেবের তাজদীদি তথা সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক কৃতিত্বপূর্ণ অবদান কেবল এই নয় যে, তিনি ওয়াহদাতুল ওজূদের সাধারণ্যে গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি ও সমকালের প্রচলিত মুদ্রা সম্পর্কে প্রমাণ করে দেন যে, তা সুলূক ও মা'রিফতের শেষ মনযিল নয় বরং এ অধ্যায়ে তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্যের মূল রহস্য এখানে নিহিত যে, এর ওপর তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের আলোকে সমালোচনা করেছেন এবং প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তিনি এই সমুদ্রে সাতার কেটে এবং এর তলদেশে ডুবুরীর মত ডুব দিয়ে উঠে এসেছেন এবং আল্লাহ্র অপার সাহায্যে তিনি আপন মা'রিফতের জাহাজ ও গবেষণাকে কাংক্ষিত তীরে পৌঁছিয়েছেন। আর এ ময়দানে তাঁর কোন সমকক্ষ কিংবা সফরসঙ্গী নেই বললেই চলে। বিখ্যাত পাশ্চাত্য লেখক পিটার হার্ডি এ বিষয়ে যদিও কোন অথরিটি নন তদসত্ত্বেও এ ব্যাপারে যথার্থই লিখেছেন যে,

"শায়খ আহমদ সরহিন্দীর সবচে' বড় সাফল্য এটাই যে, তিনি ভারতীয় ইসলামকে সূফীবাদী চরমপন্থা ও বাড়াবাড়ির হাত থেকে স্বয়ং তাসাওউফের মাধ্যমে মুক্তি দিয়েছেন। সম্ভবত এর কারণ এই যে, যেই মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন তার মূল্য ও মর্মার্থের ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত গভীর জ্ঞান ছিল"।[২]

মুজাদ্দিদ সাহেবের পর তৌহীদে ওজূদী সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গ মাশায়েখদের সমঝোতামূলক আচরণ

১. মকতূবাত, ১/৪৩, শায়খ ফরীদ বুখারীর নামে।

২. Sources of Indian Tradition. N. Y. P. 449.

এই অধ্যায় সমাপ্ত করার আগে একজন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক হিসাবে এই সত্য প্রকাশ করা জরুরী মনে করছি যে, হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর পর (তাঁর সেই বিশেষ সিলসিলা বাদে যা হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম-এর মাধ্যমে সমগ্র ভারতবর্ষ ও এর বাইরে ছড়িয়েছে) ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ সম্পর্কে সেই স্পষ্ট অকাট্য ও চূড়ান্ত প্রবণতা এবং ওয়াহদাতুশ-শুহূদ-এর ওপর সেই প্রত্যয় ও সুনিশ্চিত প্রতীতি আর অবশিষ্ট থাকেনি মুজাদ্দিদ সাহেব যার পতাকা উত্তোলন করেছিলেন এবং যার ওপর তিনি সচেতনভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তিনি যার দাঈ (আহ্বায়ক)-ও ছিলেন। তাঁর ইনতিকালের পরই তাসাওউফ ও মা'রিফতের হালকায় (সূফী-বুযুর্গদের মহলে) এবং সেই সব মহলেও যারা নিজেদেরকে এর সঙ্গে জড়িত মনে করতেন, ওয়াহদাতুল ওজূদ ও ওয়াহদাতুশ-শুহূদ-এর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সমঝোতার মনোভাব প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং কতিপয় উচ্চস্তরের আলিম-উলামা ও বিশেষজ্ঞ এতদূর পর্যন্ত লিখেছেন যে, "এ নিয়ে সৃষ্ট মতভেদ কেবলই শাব্দিক দ্বন্দ্ব বৈ কিছু নয়।" কেউ কেউ এও লিখেছেন যে, "মুজাদ্দিদ সাহেব এ ব্যাপারে ভুল বুঝেছেন এবং শায়খ-এ আকবর (ইবনুল আরাবী)-এর সব বই পড়েন নি।" এরই ওপর ভিত্তি করে মুজাদ্দিদিয়া তরীকার বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মির্যা মাজহার জানে জানাঁর ইঙ্গিতে তাঁরই মুরীদ মাওলানা গোলাম ইয়াহ্ইয়া বিহারী (মৃ. ১১৮০ হি.) "কলেমাতুল হক" নামে একটি বই লিখেন, যে বই-এ তিনি মুজাদ্দিদ সাহেবের এ বিষয়ক গবেষণা ও মতবাদ পরিষ্কার ভাষায় তুলে ধরেছেন এবং উভয়ের মধ্যে সমন্বয় প্রচেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যা স্বয়ং এ সিলসিলার কতিপয় মহলে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।

হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ মুজাদ্দিদ সাহেবের পথ ধরে

এই সিলসিলায় হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের পর যদি কোন তরীকতপন্থী বুযুর্গ সূফী, আরিফ ও তত্ত্বজ্ঞ বিশেষজ্ঞের কাছে ওয়াহদাতুশ-শুহূদ-এর সুস্পষ্ট ও নির্ভেজাল দৃষ্টিভঙ্গি ও সবক পাওয়া যায় যাঁকে হযরত মুজাদ্দিদ-এর পদাংক অনুসারী হিসাবে চোখে পড়ে তিনি হলেন মুজাদ্দিদিয়া আহসানিয়া[১] সিলসিলার বিখ্যাত শায়খ-এ তরীকত, দা'ঈ ইলাল্লাহ ও আল্লাহ্র পথের মুজাহিদ (মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ) হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রায়বেরেলভী (শাহাদত ১২৪৬ হি.)[২]

---

১. হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর খলীফা হযরত সাইয়েদ আদম বানুরীর নির্দিষ্ট সিলসিলা যা আদমিয়া ও আহসানিয়া সিলসিলা নামে কথিত হয়।

২. এটি তাঁর খান্দানী রুচির ফসলও হতে পারে যে, তাঁর চতুর্থ পূর্বপুরুষ হযরত সাইয়েদ শাহ আলামুল্লাহ (র) হযরত সাইয়েদ আদম বানুরীর বিশিষ্টতম খলীফা ছিলেন। এ ছাড়া তাঁর নিজের গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্তও হতে পারে। যেহেতু তিনি এ ময়দানে মুজতাহিদের মকামে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৩. দ্র. সিরাতে মুস্তাকীম, চতুর্থ হেদায়েত১/১২;

সপ্তম অধ্যায়

সম্রাট আকবর থেকে সম্রাট জাহাঙ্গীর পর্যন্ত

সাম্রাজ্যের প্রশাসনকে সঠিকপথে আনার লক্ষ্যে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-এর নীরব সাধনা ও কর্মপ্রয়াস এবং আকবর ও জাহাঙ্গীরের শাসনামলের সাহসী ও স্পষ্টভাষী উলামায়ে কিরাম ও বুযুর্গবৃন্দ

এখন আমরা হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র সেই সব প্রশংসনীয় সাধনা ও কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে আলোচনা করার আগে, যিনি সাম্রাজ্যের গতিমুখ অন্য দিকে পাল্টে দিয়েছিলেন, সেই সব বাস্তব সত্যের প্রকাশ জরুরী ও যুক্তিযুক্ত মনে করছি যে, সম্রাট আকবরের শাসনামল সম্পর্কে এমনতরো ধারণা করা ঠিক হবে না যে, ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত নীরব ও শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজ করছিল এবং আকবরের কর্মপন্থা ও ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং নিম্নোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে

من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه

فان لم يستطع فبقلبه وذالك اضعف الايمان - بخارى ومسلم -

"তোমাদের মধ্যে কেউ (শরীয়ত বিরোধী) অন্যায় ও গর্হিত কাজ দেখলে তা হাতের দ্বারা পাল্টে দেবে। যদি সে তা না পারে তবে মুখের দ্বারা তার পরিবর্তন ঘটাবে (প্রত্যাখ্যান করবে, প্রতিবাদ করবে)। আর তাও যদি না পারে তবে দিলের সাহায্যে (অর্থাৎ তাওয়াজ্জুহ শক্তির সাহায্যে, দুআর মাধ্যমে, নিদেনপক্ষে ঘৃণা প্রকাশের মাধ্যমে) তার পরিবর্তনে সচেষ্ট হবে। আর এটাই ঈমানের দুর্বলতম স্তর" (বুখারী-মুসলিম)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়েও কেউ আমল করে নি।

সম্রাট আকবরের শাসনামলের নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থে যেসব সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, তাঁরা স্ব-স্ব গণ্ডি ও বৃত্তের মধ্যে থেকে তাঁদের সাধ্য মতো এই অবস্থার ওপর নিজেদের অসন্তোষ ও ইসলামী আবেগের প্রকাশ ঘটান।

শায়খ ইবরাহীম মুহাদ্দিস আকবরাবাদী (মৃ. ১০০১ হি.) একবার আকবরের আহ্বানে ইবাদতখানায় আসেন এবং সম্রাটের জন্য নির্ধারিত শরীয়ত বহির্ভূত আদব ও সম্মান প্রদর্শনে বিরত থাকেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রেরণামূলক ধারার আশ্রয় নেন এবং সম্রাটের শাহী প্রভাবে আদৌ ভীত হননি।

শায়খ হুসায়ন আজমীরি যিনি হি. ১০৯ সালের পর ইনতিকাল করেন, আকবরের আজমীর আগমনে অসন্তুষ্ট হয়ে সেখান থেকে অন্যত্র গমন করেন। আকবর তাঁকে খানকাহ ও দরগাহের মুতাওয়াল্লীর পদ থেকে অপসারণ করেন এবং হেজায গমনের নির্দেশ জারী করেন। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পরও তিনি সম্রাটকে সম্মানসূচক সিজদা করেন নি। এতে সম্রাট তাঁর প্রতি নাখোশ হন, নারায হন এবং তাঁকে বাখর দুর্গে বন্দী করেন। সেখানে তিনি কয়েক বছর বন্দী জীবন অতিবাহিত করেন। মুক্তিলাভের পরও তিনি সম্রাটকে সম্মানসূচক সিজদা করা ও আদব প্রদর্শন থেকে বিরত থাকেন। তিনি সম্রাট প্রদত্ত উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করতেও অস্বীকার করেন।

শায়খ সুলতান থানেশ্বরী ছিলেন নৈকট্যপ্রাপ্ত ও ঘনিষ্ঠ দরবারীদের অন্যতম। তিনি সম্রাটের নির্দেশে মহাভারত ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। গরু যবাহর দরুন তিনি সম্রাটের তিরস্কার ও ভর্ৎসনার শিকার হন। এজন্য তাঁকে বাখর নামক স্থানে নির্বাসনে পাঠানো হয়। এরপর আবদুর রহীম খানে খাঁনার সুপারিশে তাঁকে থানেশ্বর অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয় এবং খাজনা আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কিছুকাল পর সম্রাটের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযোগ আসে। আর এ অভিযোগ ছিল তাঁর ইসলামী রীতিনীতি ও জীবন যাপনের বিরুদ্ধে। এজন্য তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। এ ঘটনা ছিল হিজরী ১০০৭ সালের।[১]

এক্ষেত্রে সবচে' সাহসিকতামণ্ডিত ও পৌরুষোচিত পদক্ষেপ ছিল শাহবায খান কাম্বূহ (মৃ. ১০০৮ হি.)-র। তিনি ছিলেন সম্রাট আকবরের দরবারের একজন বড় আমীর। শেষ দিকে তিনি মীর বখশীর পদও লাভ করেছিলেন। তিনিও সম্রাটের সামনে হক-কথা বলতে কখনো সংকুচিত হন নি। তিনি দাড়িও মুণ্ডন করেন নি কিংবা মদের কাছেও ঘেঁষেন নি। আকবর উদ্ভাবিত দীনে ইলাহীর প্রতিও তিনি কোন প্রকার আগ্রহ প্রদর্শন করেন নি কিংবা সামান্যতম নমনীয়তাও দেখান নি। মাআছির-উল-উমারার লেখক শাহনওয়ায খানের বর্ণনা ঃ একদিন সম্রাট আকবর আছর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময় ফতেহপুর সিক্রীর একটি পুকুর পাড়ে পায়চারী করছিলেন। শাহবায খান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট তাঁর হাত ধরেন এবং পায়চারী অব্যাহত রাখেন ও তাঁর সঙ্গে নানাবিধ আলোচনায় মশগুল হয়ে পড়েন। পার্শ্ববর্তী সকলেরই ধারণা ছিল, আজ শাহবায খান কিছুতেই সম্রাটের হাত থেকে নিজকে মুক্ত করতে পারবেন না এবং আজ অবধারিতভাবে তাঁর মাগরিবের নামায কাযা হবেই। শাহবায খানের নিয়মিত অভ্যাস ছিল, তিনি আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কারুর সাথে কথা বলতেন না। শাহবায খান যখন দেখতে পেলেন, সূর্য

---

১. তিনি ছিলেন মুজাদ্দিদ আলফেছানীর শ্বশুর (মুন্তাখাবুত-তাওয়ারীখ)।

ডুবতে যাচ্ছে তখন তিনি সম্রাটের কাছে নামায আদায়ের অনুমতি চাইলেন। সম্রাট কোন রূপ রাখ-ঢাক ছাড়াই বললেন, আমাকে একাকী ও নিঃসঙ্গ ছেড়ে যেও না। পরে নামায কাযা করে নিও। শাহবায খান এতে সম্রাটের হাতের মধ্য থেকে নিজের হাত টেনে বের করে নেন এবং নিজের চাদর মাটির ওপর বিছিয়ে সেখানেই নামাযের নিয়্যত বাঁধেন। নামায থেকে মুক্ত হতেই তিনি প্রতিদিনের নিয়মিত আমল ওজীফা পাঠে মশগুল হন। সম্রাট তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং বকাবকি করতে থাকলেন। আমীর আবুল ফাত্হ এবং হাকীম আলী গীলানী এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারা অবস্থার নাযুকতা অনুভব করে সামনে অগ্রসর হন এবং সম্রাটের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, আমরাও তো মহামতি সম্রাটের সুদৃষ্টি লাভের হকদার। অতঃপর সম্রাটের ক্রোধ কিছুটা শান্ত হয়। তিনি শাহবায খানকে ছেড়ে এ দু'জনের সঙ্গী হন।

শায়খ আবদুল কাদির উচাঈও সে সব সাহসী লোকের অন্যতম যারা শরীয়ত বিরোধী কর্মে সম্রাটকে কোনরূপ আনুকূল্য প্রদর্শন করেন নি, তাকে কোনরূপ সহযোগিতা করেন নি। একদিন সম্রাট তাঁকে আফিম খেতে দেন। তিনি তা খেতে পরিষ্কার অস্বীকার করেন। এতে সম্রাট মনঃক্ষুণ্ন হন। একদিন তিনি ইবাদতখানায় ফরয নামাযের পর নফল আদায় করছিলেন, এমন সময় সম্রাট মহল থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি তাঁকে নফল আদায় করতে দেখে বললেন, আপনার নফল আপন ঘরে গিয়ে পড়া উচিত। মাওলানা আবদুল কাদির জওয়াব দেন, হুযূরে ওয়ালা! এখানে (ইবাদতখানা) আপনার সাম্রাজ্য নয়। একথায় সম্রাট খুবই ক্রোধান্বিত হন। তিনি তাঁকে বলেন, আমার সাম্রাজ্য আপনার পছন্দ না হলে আপনি এখান থেকে চলে যান। তিনি তখনই উচ শহর অভিমুখে রওয়ানা হন এবং পরবর্তী জীবন ইবাদত-বন্দেগী ও সৃষ্টির সেবায় কাটিয়ে দেন। এ নামেই আরেকজন শায়খ ছিলেন যাঁর নামও ছিল আবদুল কাদের লাহোরী (মৃ. ১০২২ হি.)। সম্রাটের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তিনি সম্রাটের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁকেও এজন্য সম্রাটের নির্দেশে হেজাযে চলে যেতে হয়।

মির্যা আযীযুদ্দীন দেহলভী কোকা (মৃ. ১০৩৩ হি.) ছিলেন সম্রাট আকবরের সমবয়সী ও দুধভাই। আকবর তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। কিন্তু তিনিও ইসলামের শরা-শরীয়ত, দীনি মসলা-মাসাইল ও ধর্মীয় ব্যাপারে আদৌ আকবরকে পরওয়া করতেন না। এ ব্যাপারে তিনি সোজা-সাপ্টা ও স্পষ্ট বক্তব্য রাখতেন। আর এজন্য আকবর তাঁকে গুজরাটের গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করেন এবং এরপর বাংলা ও বিহারের সূবেদারীর পদে নিযুক্ত করেন। অধিকন্তু তাঁকে খান-ই আজম উপাধি দেন। এত ঘনিষ্ঠ ও নিকটজন হওয়া সত্ত্বেও তিনি সম্রাটের উদ্দেশ্যে তা'জীমি সিজদা, দাড়ি মুণ্ডন ইত্যাদি ব্যাপারে সম্রাটের দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেন নি এবং তাকে সহযোগিতাও দেন নি।

এঁদের অন্যতম ছিলেন শায়খ মুনাওয়ার আবদুল হামীদ লাহোরী (মৃ. ১০১৫ হি.)। আকবর তাঁকে ৯৮৫ হিজরীতে সভাপতি পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি আপন ধর্মের প্রতি দৃঢ়তা প্রদর্শনের দরুন সম্রাটের ক্রোধ ও ভর্ৎসনার পাত্রে পরিণত হন। সম্রাট তাঁর মালামাল ও সহায়-সম্পদ, এমন কি তাঁর কিতাবাদি ও বই-পুস্তক পর্যন্ত লুট করবার নির্দেশ জারী করেন। এরপর আগ্রায় ডেকে তাঁকে কঠিন বন্দীদশায় নিক্ষেপ করেন এবং সেখানেই তাঁর ইনতিকাল হয়।[১]

সম্রাট আকবরের পর জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁর শাসনকালেও দীর্ঘকাল তাঁর পিতা আকবরের আমলের অনুসৃত রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি ও আইন জারী থাকে। ইসলামের প্রকাশ্য বিরোধিতা ছাড়া আর সব ব্যাপারে পূর্বেকার নিয়ম-রীতিই সাম্রাজ্যে বহাল ছিল এবং তা ততদিন পর্যন্ত বহাল থাকে যতদিন না জাহাঙ্গীরের মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি শরীয়তে মুহাম্মদীর প্রতি সম্মান এবং ইসলামী শি'আরের প্রতি শ্রদ্ধা-বোধের দিকে ফিরেছে। এ আমলেও কয়েকজন উলামা ও মাশায়েখ বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে ঐসব শরীয়ত বিরোধী, বরং বলতে কি, দীন ও শরীয়ত পরিপন্থী আদব ও প্রথা-পদ্ধতি পালন করতে অস্বীকার করেন। তাঁরা শরীয়তের নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করতে রাযী হন নি এবং হক-কথা বলতেও কুণ্ঠিত হন নি। এঁদেরই একজন ছিলেন ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইলয়াস হুসায়নী গুরগাশ্তী নামক একজন তরীকতপন্থী বুযুর্গ যাঁকে সম্রাট জাহাঙ্গীর দরবারে ডেকে পাঠান। তিনি শাহী আদব ও প্রথা মাফিক সালাম ও আদব প্রদর্শন করতে অস্বীকার করেন। জাহাঙ্গীর তাঁকে গোয়ালিয়র দূর্গে বন্দী করেন। সেখানে তিনি তিন বছর বন্দী থাকেন। এরপর ১০২০ হিজরীতে তাঁকে বন্দী দশা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। জাহাঙ্গীর তাঁকে নিজের সাথে আগ্রায় নিয়ে আসেন।[২]

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল, সাম্রাজ্যের পথভ্রষ্টতা ও ভুল পথে যাবার ব্যাপারটিকে সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ বিরোধিতা এবং একে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার পূর্ণাঙ্গ ও বিজ্ঞোচিত প্রয়াস যিনি চালিয়ে ছিলেন তিনি হলেন হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী এবং দীনের হেফাজত ও ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্য-সহায়তার কৃতিত্বপূর্ণ অবদান তাঁরই ভাগ্যে লেখা ছিল এবং তিনিই একে পূর্ণতার স্তরে পৌঁছিয়ে ভারতবর্ষের বুকে সেই নীরব বিপ্লব সৃষ্টি করেন যার নজীর অমুসলিম বিশ্বের অপর কোন দেশ ও সাম্রাজ্যের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। যার পরিণতিতে আকবরের পর মোগল সাম্রাজ্যের সিংহাসনে যিনিই শাসক হিসেবে এসেছেন তিনি পূর্ববর্তী শাসকের থেকে উত্তম, ইসলাম বিরোধিতার জীবাণু থেকে মুক্ত ও নিরাপদ, ধর্মের

১. এসব নাম ও আকবরের বিরোধিতার ঘটনাবলী নুযহাতুল খাওয়াতিরের ৫ম খণ্ড থেকে গৃহীত হয়েছে।
২. নুযহাতুল-খাওয়াতির, ৫ম খণ্ড।

প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ এবং ইসলামের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ও বিশিষ্ট ছিলেন। এমন কি এ ধারাবাহিকতার সোনালী পরিপূর্ণতা লাভ ঘটে মুহ্যিদ্দীন আওরঙ্গযীব আলমগীরের সিংহাসন প্রাপ্তির মাধ্যমে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণ এবং মুজাদ্দিদ সাহেবের সাম্রাজ্যের সংস্কার কর্মের সূচনা

সম্রাট জালালুদ্দীন মুহাম্মদ আকবরের ইনতিকাল হয় হিজরী ১০১৪ সনে। সে সময় হযরত মুজাদ্দিদ-এর বয়স ছিল ৪৩ বছর। আকবরের শাসনামলের শেষ যুগে ভারতবর্ষে ইসলামের সম্মানজনক জীবন ও স্বাধীনতা এবং এদেশে ইসলামের বিজয়ী ও মাথা উচুঁ করে টিকে থাকার পক্ষে পরিষ্কার বিপদাশংকা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। মুজাদ্দিদ আলফেছানী (রা)-র আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ও ক্রমউন্নতির যুগ ছিল এটা। সাম্রাজ্যের অমাত্যবর্গের সাথে তাঁর কোন যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল না এবং সে সময়ও তখন আসেনি যে, তারা তাঁর উচ্চ মর্যাদা, তাঁর ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাত তথা নিষ্ঠা ও একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই সবকিছু করার তাঁর মন-মানসিকতা ও আধ্যাত্মিক-কামালিয়াত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবেন, হবেন অবগত। এজন্যই আসলেই সেই সম্পর্ক ও যোগসূত্র তখনো তাঁর হাতে আসেনি যার সাহায্যে ও মাধ্যমে তিনি শাহী দরবার পর্যন্ত নিজের অনুভব অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া পৌঁছে দিতে পারেন অথবা দীন ও আইন সম্পর্কে হুকুমতের সাধারণ পলিসির ওপর প্রভাব জমাতে পারতেন। সে সময় সাম্রাজ্যের শাসকদের মেযাজ ও রুচি, সরকার ও রাজদরবার এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও প্রশাসনে এমন সব ব্যক্তি জেঁকে বসেছিল যারা কোন মুখলিস ও নিষ্ঠাবান দীনদার লোককে সম্রাটের কাছা-কাছি যাবার সুযোগ দিত না। তারা এসবের চারপাশে এমন এক লৌহ-প্রাকার তৈরি করে রেখেছিল যা ভেদ করে বাইরের সজীব-সতেজ ও নিষ্কলুষ বাতাস এবং দেশের সাধারণ গণ-মানুষের পছন্দ-অপছন্দের কোন পরিমাপ ভেতরে প্রবেশ করতে পারত না। সে সময় ইসলাম ও মুসলমানদের এই বিশাল বিস্তৃত দেশে যেখানে তাদের স্বাধীন সাম্রাজ্য অব্যাহত ও ধারাবাহিকভাবে চলে আসছিল, সেই অবস্থাই ছিল কুরআন মজীদ নিম্নোক্তভাবে যার ছবি এঁকেছে,

ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه -

"পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিসহ হয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই।" [সূরা তাওবা, ১১৮-আয়াত]

কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণের (হি. ১০১৪) পর এই অবস্থা আর থাকেনি। জাহাঙ্গীরের ভেতর সেই বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ তথা তা'লীম-তরবিয়তের কারণে যা তিনি তাঁর পিতার ছত্র-ছায়ায় লাভ করেছিলেন, কোন উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় কল্যাণকামিতা, শরা-শরীয়তের প্রতি আকর্ষণ এবং ইসলামের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের নিয়মিত ও পূর্ণ বাধ্য-বাধকতার সঙ্গে পালন ও পরিষ্কার ধর্মীয় প্রবণতা যেমন পাওয়া যেত না, ঠিক তেমনি তাঁর ভেতর ইসলাম থেকে দূরত্ব ও এর প্রতি কোন প্রকার শংকা কিংবা ভীতি, অপর কোন ধর্মীয় দর্শন কিংবা জাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির দ্বারা মুগ্ধ ও প্রভাবিত হওয়া এবং নতুন কোন ধর্ম ও আইন-বিধান জারির প্রতি কোন প্রকার আগ্রহ পরিলক্ষিত হত না। অন্য কথায় তিনি যেমন ইসলামের সমর্থক ছিলেন না, তেমনি ইসলামের প্রতি বিদ্বিষ্টও ছিলেন না। সাধারণত যারা রাজশক্তি ও শাহী তখতের মালিক হন, যেসব শাসক আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হন তারা সাধারণের কাছে প্রিয় ও গৃহীত কোন প্রচলিত রীতি-নীতির বাতিল ও অপসারণ এবং নতুন কোন রীতি-নীতির প্রচলনের ঝুঁকি নিতে চান না। তারা কেবল কাজ ও খেয়ালের মজা ভোগ এবং ক্ষমতা ও রাজত্বের সম্মাননা লাভের আকাংক্ষী। সাধারণভাবে দেখা গেছে, এ ধরনের লোকদের ভেতর এ সমস্ত লোকের প্রতি এক ধরনের গোপন ও প্রচ্ছন্ন ভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ দেখতে পাওয়া যায় যাঁরা এই বস্তুগত স্তর থেকে একটু উঁচুতে এবং এই সব পার্থিব প্রদর্শন সর্বস্ব মানসিকতা ও পদমর্যাদাগত অবস্থানের প্রতি বিমুখ ও নিস্পৃহ হয়ে থাকেন। এসব লোকের মুকাবিলায় যারা কোন পদমর্যাদা লাভের দাবিদার কিংবা কোন নতুন আন্দোলন ও দর্শনের প্রতি আহ্বানকারী হন তাদের মধ্যে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা ও সামর্থ্য বেশি পাওয়া যায়।

সম্রাট জাহাঙ্গীর সাম্রাজ্যের শাসকদের মধ্যে এ ধরনের শাসকদের সঙ্গেই বেশি সম্পর্কিত ছিলেন এবং তিনি যখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন তখন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, এবার সাম্রাজ্যের গতি পরিবর্তন এবং ক্রমান্বয়ে তাকে সঠিক পথে নিয়ে আসার সময় এসে গেছে।

সঠিক কর্মপন্থা ও কর্মপদ্ধতি

সে সময় হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র) এবং সে সব হযরতের জন্য যাঁরা ইলমে দীন ও বাতেনী কামালিয়াত দ্বারা সুসজ্জিত ছিলেন, স্বয়ং নিজেরা আল্লাহ্‌র ধ্যান-খেয়ালে মশগুল ও আল্লাহ্‌র মাঝে আত্মনিমগ্নতার মত সম্পদ দ্বারা ভরপুর এবং ধর্মীয় মর্যাদাবোধের চেতনায় উদ্দীপ্ত ও মাতাল ছিলেন, ঐ অবস্থার সামনে যা সে সময়কার সাম্রাজ্যের শাসকের ওপর ছায়া বিস্তার করে রেখেছিল, তিনটি রাস্তাই ছিল ঃ

(১) দেশ ও সাম্রাজ্যকে তার নিজের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজেদের জন্য এমন কোন নির্জন কোণ বেছে নেওয়া যেখানে নিশ্চিন্তে ও নির্ভাবনায় আল্লাহর স্মরণে মশগুল, সত্যপথের প্রার্থী ও পথিকদের প্রশিক্ষণ দান এবং ইবাদত-বন্দেগী ও যিক্‌র-আযকারের একাগ্রতা ও উৎসাহ লাভ জুটতে পারত। এ ছিল সেই কর্মপন্থা যা হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র যুগে বিশের অধিক বরং শত শত আলিম-উলামা ও মাশায়েখ এখতিয়ার করেছিলেন। দেশের সর্বত্র তাঁদের খানকাহ ছিল এবং তাঁরা পূর্ণ একাগ্রতা ও নিরব নিশ্চুপতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিলেন এবং আল্লাহর সৃষ্টিকুল তাঁদের থেকে মূল্যবান আধ্যাত্মিক ও ঈমানী ফায়দা লাভ করছিল।

(২) ভারতবর্ষের নামকা ওয়াস্তে মুসলিম সাম্রাজ্য ও তার শাসককে (মুসলিম খান্দানে যার জন্ম নেবার সৌভাগ্য জুটে ছিল) ইসলাম বিরোধী ও ইসলাম দুশমন মনে করে (যা প্রমাণের জন্য বহু আইন-কানূন ও বিধি-বিধান এবং ব্যক্তিগত আমল-আখলাক পাওয়া যেত) এর সংস্কার-সংশোধনের ব্যাপারে একেবারে হতাশ ও নিরাশ হয়ে গিয়ে তার বিরুদ্ধে একটি ধর্মীয় ফ্রন্ট কায়েম করা এবং ইসলামকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষ ভেবে তার স্থায়ী বিরোধিতা ও তার বিরুদ্ধে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া।

যদি এতেও কাজ না হয় তাহলে ধর্মীয় মর্যাদাবোধ, জিহাদ ও আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় উজ্জীবিত এবং বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অসন্তুষ্ট ভক্ত-অনুরক্ত মুরীদান ও সাথীদেরকে একত্র করে, অতঃপর কোন সামরিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সাম্রাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করা এবং সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিকতর নেককার ও দীনদার কোন লোককে (চাই কি তিনি মুগল রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত কেউ হন এবং হন বাবুরের বংশের সন্তানদের কেউ) বসাবার চেষ্টা করা যিনি গোটা সাম্রাজ্যের গতিমুখ পাল্টে দেবেন এবং অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

(৩) সাম্রাজ্যের আমীর-উমারা ও দরবারের অমাত্যদের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করে, যাঁদের সঙ্গে প্রথম থেকেই সম্পর্ক আছে এবং তারাও তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করেন, তাঁর ইখলাস, আন্তরিক নিষ্ঠা ও অর্ন্তজ্বালার ওপর যাঁরা আস্থাশীল, তাদের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ-উদ্দীপনা ও মর্যাদাবোধ জাগিয়ে এবং তাঁদের দিলের ভস্মস্তূপের মধ্যে যেই ঈমানী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চাপা পড়ে আছে তাকে উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় করে সম্রাটকে সৎ পরামর্শ প্রদানে অনুপ্রাণিত করা, তার ইসলামী চেতনাকে যা আপন পিতা-পিতামহ ও পূর্বপুরুষদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি পেয়েছেন আলোড়িত ও আন্দোলিত করা, তাকে ইসলামের সমর্থন, মুসলমানদের আহত দিলের সুচিকিৎসা ও বিগত যুগের ক্ষতিপূরণে উদ্বুদ্ধ করা, নিজে সর্বপ্রকার পদ ও মর্যাদা বরং এর ছায়া পর্যন্ত এড়িয়ে চলা এবং এ সবের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলা, পরিপূর্ণ যুহ্‌দ ও নিস্পৃহতার প্রমাণ পেশ করা, রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের যারা উপযুক্ত তাদের

হাতেই রাজত্ব ও সাম্রাজ্য থাকুক এবং যারা যেসব পদ ও পদমর্যাদার উপযুক্ত তাদের কাছেই এসব থাকুক, এগুলো তাদেরকে সোপর্দ করা, এমন উঁচু দৃষ্টি ও নিঃস্বার্থপরতার প্রকাশ যাতে করে কোন কট্টর থেকে কট্টরতম বিরোধী ও চরমতম হিংসুকও পদমর্যাদা কামনা ও ক্ষমতা লাভের অপবাদ দিতে না পারে এবং কোন বিরোধী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রও যেন এ ব্যাপারে সফল হতে না পারে।

প্রথম নম্বর সম্পর্কে যতটা বলা যায় তাহলো এই যে, হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর পতিত স্বভাব এবং তাঁর শানে আযীমত তথা অটুট সংকল্পের শান ও সেই উচ্চ পদমর্যাদার সঙ্গে, যা দিয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে ধন্য ও গৌরবান্বিত করেছিলেন, এর আদৌ কোন সম্বন্ধ নেই। হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব-এর স্বীয় আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ও প্রশিক্ষণের পরই একথার বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দিয়ে অন্য কোন কাজই করিয়ে নিতে চান এবং তাকে শুধুই কতকগুলো আবশ্যকীয় ও ব্যক্তিগত ইবাদত-বন্দেগী ও উন্নতি এবং পীর-মুরীদির জন্য পয়দা করা হয়নি। তিনি তাঁরই সিলসিলার একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন শায়খ ও তরীকার ইমাম হযরত খাজা উবায়দুল্লাহ্ আহরার (মৃ. ৮৯৫ হি.)-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করে প্রকারান্তরে নিজেকেই সেই স্থানে তুলে ধরেছেন। খাজা উবায়দুল্লাহ্ বলতেন ঃ

اگرمن شیخی کنم هیچ درعالم مرید نیابد امام مرا کاردیگر فرموده اند وان ـ ترویج شریعت وتائید ملت است ـ

"আমি যদি কেবল পীর-মুরীদি করতে নেমে পড়ি তাহলে দুনিয়ার বুকে অন্য কোন পীর মুরীদ পাবে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে অন্য কোন কাজ সোপর্দ করেছেন; সে কাজ হল, শরীয়তের প্রচলন এবং মুসলিম মিল্লাতের সমর্থন-সহযোগিতা।"

অতঃপর উল্লিখিত বাক্যটিরই আরও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ঃ

لاجرم بصحبت سلاطین منی فتند وبتصرف خود ایشان رامنقادمی ـ ساختند وبتوسل ایشان ترویج شریعت می فرمودند ـ

"তিনি রাজা-বাদশাহদের দরবারে যেতেন এবং আপন আধ্যাত্মিক শক্তি ও রূহানী তাছীর তথা রূহানী প্রভাব দ্বারা তাদেরকে নিজের অনুগত ও বাধ্য বানিয়ে নিতেন। এরপর তাদের দিয়ে শরীয়ত জারী করতেন"।[১]

---

১. মকতূব নং ৬৫, খানে আজমের নামে।

দ্বিতীয় নম্বর সম্পর্কে যতটা বলা যায় যে, এটি এমন একজন রাজনৈতিক মানসিকতা পোষণকারী সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী দা'ঈ অথবা নেতার কর্মপন্থা হতে পারে যিনি তার কাজ সন্দেহ-সংশয় ও খারাপ ধারণা নিয়ে শুরু করেন এবং আপন সত্বরতা প্রিয়তা, দাওয়াতী প্রজ্ঞা ও কৌশল এবং কল্যাণ কামনা ও উপদেশ প্রদানের ওপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধ ঘোষণাকে অগ্রাধিকার দেবার পরিণতিতে সমকালীন হুকূমত ও ক্ষমতাধিকারীদেরকে স্বীয় প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়ে ফেলেন এবং ধর্মের বিজয়ী হবার সম্ভাবনা ও ক্ষেত্রকে আরও বেশি সংকীর্ণ করে তোলেন। একজন দা'ঈ ইলাল্লাহ (আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী) ও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্মপন্থা এ হতে পারে না যার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আপন ব্যক্তি স্বার্থ কিংবা দলীয় স্বার্থের জন্য ক্ষমতা লাভ নয়, কেবল দীনের প্রাধান্য ও বিজয় এবং আহকামে শরীয়তের প্রয়োগ ও প্রচলন যার একমাত্র লক্ষ্য তা সে যার হাত দিয়েই তা হোক না কেন।

কার্যকর ও বাস্তব পদক্ষেপের সম্পর্ক যতটা তাতে করে একথা বলা যায় যে, এ পথ ছিল কঠিন বিপদ-আপদ পরিপূর্ণ এবং ভারতবর্ষের সে সময়কার রাজনৈতিক চিত্র ও পরিবেশে ইসলাম সম্পর্কে তা এক ধরনের আত্মহত্যার পথে একটি পদক্ষেপ হত। মোগল সাম্রাজ্যের ভেতর, যেই সাম্রাজ্য সম্রাট বাবর তাঁর সুদৃঢ় হাতে কায়েম করেছিলেন, হুমায়ুন যার জন্য ইরানের সপ্ত প্রদেশ অতিক্রম করেছিলেন এবং আকবর উপর্য্যুপরি বিজয় ও দেশের পর দেশ জয় করে তাকে সুদৃঢ় করেছিলেন, যেই সাম্রাজ্যের দুর্বলতার কোন আলামত তখন পর্যন্ত জাহির হয় নি, শের শাহ সূরীর মত অটল মনোবলসম্পন্ন সম্রাটের স্থলাভিষিক্ত সুলতান সলীম শাহও তাকে খতম করতে সক্ষম ও সফল হননি। বিভিন্ন সময় মোগল শাসনের বিরুদ্ধে দেশে উত্থিত বিদ্রোহগুলোর সবটাই ব্যর্থতায় পযবর্সিত হয়। এরপরও যদি মোগল শাসকদের সিংহাসনচ্যুত করার প্রয়াস সফলও হত তবুও এর সমূহ আশংকা ছিল যে, রাজপুতরা যারা সম্রাট আকবরের শাসনামলে বিশেষভাবে উচ্চ পদগুলো লাভ করেছিল, যাদের সামরিক শক্তি স্বয়ং সাম্রাজ্যের অধিপতিদের কাছেই ছিল সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য পুঁজি, হুকূমতের ওপর জেঁকে বসত এবং এদেশে মুসলিম শাসন চিরদিনের জন্য নিঃশেষ হয়ে যেতে পারত।

তাছাড়া এ ধরনের প্রয়াস এর আগেও ব্যর্থ হয়েছিল। সম্রাট আকবরের শাসনামলে শায়খ বায়েযীদের, যিনি 'পীরে রৌশন' (আলোর পীর) এবং 'পীরে তারীক' (অন্ধকারের পীর) এই পরস্পরবিরোধী নামে বিখ্যাত, নেতৃত্বে এক বিরাট বড় ধর্মীয় আন্দোলন এবং তানযীমে ফের্কা রৌশ্‌নাইয়া নামে শুরু হয়েছিল। শায়খ বায়েযীদ বছরের পর বছর ধরে মোগল সালতানাতের প্রবল পরাক্রান্ত সেনাবাহিনীকে সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে মুকাবিলা করেছিলেন। তিনি কোহে

সুলায়মানকে ঘাটি বানিয়ে খায়বার গিরিপথের ওপর নিয়ন্ত্রণ জাঁকিয়ে বসেন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর ওপর আক্রমণোদ্যত হন। সম্রাট আকবর তার মুকাবিলায় রাজা মানসিংহ, রাজা বীরবল ও যয়েন খানকে পাঠান। কিন্তু তারা সবাই ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। রাজা বীরবল তো এক সংঘর্ষে মারাই যান। রৌশনাইয়ারা এক বিরাট বাহিনীর সাহায্যে গযনী দখল করে নেয়। এই ফেতনা সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে দমন করা হয় এবং সম্রাট শাহজাহানের আমলেই কেবল পরিপূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হয়। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও এই বিদ্রোহের পরিণতি একমাত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই হয় নি। শেষাবধি তাকে সুদৃঢ় ও সুসংহত মোগল সাম্রাজ্যের সামনে মাথা নত করতেই হয় এবং ইতিহাসে কেবল তার নামটিই অবশিষ্ট থাকে।

এ জাতীয় সামরিক পদক্ষেপ যা কোন সংস্কারের নামে গ্রহণ করা হয় সাম্রাজ্য ও ক্ষমতাসীন শাসকবর্গের নানা রকম বদগুমান ও কুধারণার টার্গেটে পরিণত হয় এবং তারা ধর্মকেই নিজেদের প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ধরে নিয়ে এর উৎসাদন ও নির্মূলকরণের ও এর অনুসারী ও সমচিন্তার লোকদের খুঁজে বের করে তাদেরকে উৎখাতের কাজে কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। সম্ভবত এরই ওপর ভিত্তি করে গোয়ালিয়র দূর্গে বন্দীত্ববরণ এবং সেনাবাহিনীর সাথে থাকার দায় থেকে রেহাই পাবার চার-পাঁচ বছর পর হি. ১০৩৫ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বিখ্যাত আমীর ও উযীর মহাবত খান যখন বিদ্রোহ করেন তখন দূরদর্শী ব্যক্তিগণ তাকে এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা পান। মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র ঈমানী দূরদর্শিতার এটি বিরাট বড় দলীল এবং তৌফিকে ইলাহীর এটি আলোকোজ্জ্বল প্রমাণ ছিল যে, তিনি অবস্থার মধ্যে বিপ্লব আনার জন্য বিপদপূর্ণ ও সন্দেহজনক রাস্তা এখতিয়ার করেন নি এবং ধ্বংসের পরিবর্তে নির্মাণ, নিগেটিভের পরিবর্তে পজিটিভ ও অবসান-উৎসাদনের পরিবর্তে স্থাপনের পথ ধরেন যা সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ ও ক্ষতির আশংকা থেকে মুক্ত ছিল।

এরপর মুজাদ্দিদ আলফেছানীর সামনে একটি রাস্তাই অবশিষ্ট থাকে আর তা এই যে, সাম্রাজ্যের সেই সব আমীর-উমারা ও অমাত্যের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন যাঁরা আর যাই হোক মুসলমান ছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব আপন গভীর জ্ঞান ও আল্লাহ-প্রদত্ত মেধার সাহায্যে জেনেছিলেন যে, আকবরের শাসনামলের ইসলাম বিরোধী পরিকল্পনা ও প্রোগ্রামে তাঁরা শরীক ছিলেন না। তারা আকবরের বহু পদক্ষেপকে অপছন্দ করতেন। কিন্তু কী করবেন? তাঁরা অসহায় ছিলেন, মজবূর ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ইসলামের প্রতি ভালবাসা এবং ধর্মীয় চেতনা ও মর্যাদাবোধ থেকে মুক্তও ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর শায়খ ও মুরশিদ হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ এবং স্বয়ং তাঁর সঙ্গে পীর-মুরীদির

সম্পর্ক না থাকলেও প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। তাঁরা হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের ইখলাস তথা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা, স্বার্থলেশহীনতা, ইসলামের জন্য দরদ ও ব্যথা সম্পর্কে জানতেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন বিশিষ্ট। যেমন নওয়াব সাইয়েদ মুর্তাযা ওরফে শায়খ ফরীদ (মৃ. ১০২৫ হি.), খানে আজম মির্যা কোকা (মৃ. ১০৩৩ হি.), খান জাহান লোদী (মৃ. ১০৪০ হি.), সদর জাহাঁ পাহানবী (মৃ. ১০২৭ হি.) ও লালা বেগ জাহাঙ্গীরি।

মুজাদ্দিদ সাহেব উল্লিখিত আমীর ও সাম্রাজ্যের অমাত্যবর্গকে সম্বোধন করেন এবং তাঁদের সাথে পত্র যোগাযোগ শুরু করেন এবং কাগজের পৃষ্ঠায় দিলের ব্যথাকে টুকরো টুকরো করে স্থাপন করেন। এসব পত্র আপন ব্যথা ও ইখলাস, আবেগ ও প্রভাব, কলমের জোর ও লেখনী শক্তির দিক দিয়ে সেসব চিঠি-পত্র সংকলনের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার যা দুনিয়ার যে কোন ভাষায় এবং যে কোন ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে লেখা হয়েছে এবং শত শত বছর অতিবাহিত হবার পর আজও তার ভেতর প্রভাব ও চিত্তাকর্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়।[১] এথেকেই পরিমাপ করা যায় ঐসব পত্র যাদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল তাদের দিলের ওপর তা কী প্রভাব ফেলেছিল। প্রকৃত অর্থে এসব পত্রই মুজাদ্দিদ সাহেবের দাওয়াত ও তাবলীগের দূত, তাঁর আহত দিলের সঠিক মুখপাত্র, অশ্রুর ফোটা ও দিলের টুকরো এবং হিজরী দশম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের বিশাল মোগল সাম্রাজ্যে যেই বিরাট বিপ্লব সাধিত হয় এতে তাঁর মৌল অংশ ও সবচে' বড় ভূমিকা রয়েছে।

সাম্রাজ্যের আমীর-উমারার নামে প্রেরণামূলক ও দাওয়াতী পত্র

ঐসব প্রেরণামূলক ও দাওয়াতী পত্রের একটি বিরাট অংশ নওয়াব সাইয়েদ ফরীদের[২] নামে প্রেরিত হয় যিনি মোগল সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন এবং

১. মকতূবাতের সাহিত্যিক মান ও মর্যাদা সম্পর্কে লেখকের সেই পর্যালোচনা পাঠ করা জরুরী যা তিনি "তারীখে দাওয়াত ও আযীমত" (সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস)-এর তৃতীয় খণ্ডে হযরত মখদূম শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রীর "মকতূবাত সহ-সদী" এবং "মকতূবাতে ইমাম রব্বানীর" আলোচনায় যা লেখা হয়েছে তা পাঠ করা যেতে পারে।

২. আমীরে কবীর নওয়াব মুর্তাযা ইবন আহমদ বুখারী যিনি সাইয়েদ ফরীদ নামে সমধিক পরিচিত, অত্যন্ত বিশাল ব্যক্তিত্ব, ব্যাপক গুণাবলী ও বহুমুখী যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। রাজনীতি ও প্রশাসন, বদান্যতা ও অনুগ্রহ বিতরণ, বিনয় ও আচার-ব্যবহার, ধর্ম ও দীনদার ধর্মভীরু লোকদের প্রতি ভালবাসা, উচ্চ মনোবল ও সমুন্নত দৃষ্টিভঙ্গির বিস্ময়কর নমুনা ছিলেন। আকবরের শাসন আমলেই মীর বখশীর পদ পর্যন্ত পদোন্নতি লাভ করেন। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে বসতেই তাঁর আরেক দফা পদোন্নতি ঘটে এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন ও মুর্তাযা খান উপাধি লাভ করেন। প্রথমে গুজরাট, পরে পাঞ্জাবের গভর্নর নিযুক্ত হন যে পদে তিনি দীর্ঘদিন অধিষ্ঠিত থাকেন। দানের ক্ষেত্রে তাঁর কোন জুড়ি ছিল না। কখনো কিছু না থাকলে শরীরের কাপড়টুকু পর্যন্ত দান করে দিতেন। বিধবা, অভাবী ও প্রয়োজন মুখাপেক্ষী লোকদের জন্য তিনি দৈনিক ও বার্ষিক ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। পিতৃহীন সন্তানদের ওপর পিতার ন্যায় স্নেহ-মমতা বিতরণ করতেন। বিবাহ উপযোগী গরীব মেয়েদের বিয়ে ও যৌতুকের ব্যবস্থা করা তাঁর প্রিয় নেশা ছিল। তাঁর দস্তরখানে প্রতিদিন দেড় হাজারের কাছাকাছি লোক খেত। ফরীদাবাদ শহর তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিঃ ১০২৫ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। নু-খা. ৫ম খণ্ড।

প্রাদেশিক গভর্নরদের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং আকবরের শাসন আমল থেকে সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন লোক ছিলেন। হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্‌র সঙ্গে ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তাঁর নেতৃত্ব ও ধর্মীয় মর্যাদাবোধ থেকে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী ফায়দা উঠিয়ে এবং এর দোহাই দিয়ে তাঁকে তাঁর নিজের দায়িত্ব ও পারিবারিক কর্তব্য পালনে উৎসাহিত করেন যাতে তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরকে সৎ পরামর্শ দিয়ে সাম্রাজ্যের গতিমুখ আকবরের রেখে যাওয়া পথে চলতে থাকা ইসলামের চাহিদা ও দাবিসমূহের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন ও সম্পর্কহীনতা, ইসলাম ও মুসলমানদের চরম দুর্দশা ও অসহায় অবস্থা থেকে দীনের সাহায্য-সমর্থন ও ইসলামের প্রতীক ও বিধি-বিধানের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন।

দুঃখের বিষয় এই যে, এসব পত্রের ওপর তারিখ লেখা নেই। নইলে দাওয়াতের হেকমত ও ক্রমিক অগ্রগতির কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক সামনে আসত এবং জানা যেত তিনি কিভাবে তাকে যাকে তিনি চিঠি লিখেছেন এবং পত্র প্রাপক কিভাবে সম্রাটকে, অতঃপর সম্রাট কিভাবে সাম্রাজ্যের গতিমুখকে ইসলামের সাহায্য-সমর্থনের পথে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং বিগত হুকূমতের প্রভাব বলয় কিভাবে ক্রমান্বয়ে দুর্বল থেকে দুর্বলতর ও নিস্তেজ থেকে নিস্তেজতর হল এবং সেই জায়গা ইসলাম দোস্তি ও ইসলাম পরিচিতি নেওয়া শুরু করল। আমরা আমাদের পরিমাপ মুতাবিক সে সব পত্রের উদ্ধৃতি কিছুটা বিন্যস্ত সহকারে পেশ করছি।

নওয়াব সাইয়েদ ফরীদ বুখারীকে লিখিত একপত্রে, যা সম্ভবত সম্রাট জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণের পর পরই লেখা হয়েছিল, লিখছেন ঃ

আপন শ্রদ্ধেয় পিতা-পিতামহদের, বিশেষ করে সায়্যিদুল কাওনাইন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর দৃঢ়পদ থাকার দোআ করার পর লিখেছেন ঃ

"সম্রাটের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক ঠিক তেমনি যেমন সম্পর্ক শরীরের সঙ্গে মনের। যদি মন ভাল থাকে, সুস্থ থাকে তাহলে শরীরও সুস্থ সবল থাকবে। আর মন যদি ভাল না থাকে তাহলে শরীরও খারাপ হবে, শরীরের ওপর এর প্রভাব পড়বে। সম্রাটের ভাল থাকাটার অর্থ দুনিয়াও ভাল থাকবে আর তাঁর খারাপ হবার অর্থ হবে দুনিয়া জাহানটাই খারাপ হওয়া।

"আপনার বেশ ভালই জানা আছে যে, বিগত কালে (আকবরের রাজত্ব কালে) মুসলমানদের মাথার ওপর দিয়ে কি বিপদের ঝড়টাই না বয়ে গেছে। এর পূর্বেকার শতাব্দীগুলোতে ইসলামের অসহায় অবস্থা থাকলেও মুসলমানদের লজ্জা ও অপমান

এর চেয়ে বেশি হয়নি। সে যুগে বেশির থেকে বেশি এই হয়েছে, মুসলমানরা নিজেদের ধর্মের ওপর থেকেছে এবং কাফির মুশরিকরা তাদের পথে অনড় থেকেছে। لكم دينكم ولى دين কিন্তু বিগত দিনগুলোতে অবিশ্বাসী কাফিররা প্রাধান্যে এসে খোলামেলা ভাবে ও প্রকাশ্যে মুসলিম দেশে কুফরী বিধানগুলো চালু করতো এবং মুসলমানরা ইসলামের বিধি-বিধানসমূহ প্রকাশ করতে বাধ্য ছিল। যদি কেউ সাহসও করত তাহলে তার ভাগ্যে মৃত্যুদণ্ড জুটতো. واحسرتاه واحزناه ، ومصيبتاه، واويلاه হায় আফসোস! হায় কি মুসীবত! হায় কি নিদারুন দুর্ভোগ! মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর (যিনি আল্লাহ্ রাব্বুল-'আলামীনের মাহবুব) অনুসারীরা ছিল অবমানিত ও লাঞ্ছিত আর তাঁর নবূওত অস্বীকারকারীরা সম্মানিত ও আস্থাভাজন! মুসলমানরা ছিল তাদের আহত দিল্ নিয়ে ইসলামের বিলাপ গানে মত্ত আর প্রতিপক্ষ দুশমনেরা হাসি-তামাশা ও ঠাট্টা-মস্করার সাথে তাদের কাটা ঘায়ে নুন ছিটাচ্ছিল। হেদায়েতের প্রদীপ্ত সূর্য গোমরাহীর নিকষ কালো আধারের বুকে মুখ লুকিয়ে এবং সত্যের উজ্জ্বল আলো (নূর) ছিল বাতিল তথা মিথ্যার পর্দান্তরালে প্রচ্ছন্ন ও লুক্কায়িত।

"আজ যখন ইসলামের বিজয় ও সৌভাগ্য রবির পথের প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর ও অপসৃত হবার এবং মুসলমানদের বাদশাহ্ সাম্রাজ্যের প্রধান হিসাবে সাধারণ ও বিশিষ্ট লোকদের কানে কানে পৌঁছে গেছেন, মুসলমানেরা যখন তাদের অনিবার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য ভাবছেন যে, তারা বাদশাহকে সাহায্য করবেন, সাহায্য করবেন শরীয়তের বিধান চালু করা ও মুসলিম মিল্লাতকে শক্তিশালী করার পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে, চাই সে সাহায্য ও শক্তি জোগান মুখ দিয়ে হোক কিংবা হাতে কলমে।"

অতঃপর কয়েক লাইন পর বিগত আমলের রোগ-ব্যাধি সঠিকভাবে সনাক্ত করে তিনি লিখছেন ঃ

"বিগত আমলে যেসব বিপদ-আপদ মুসীবতই মাথার ওপর এসেছে তা এসেছে উলামায়ে সূ' দলের অপকর্মের কারণেই। রাজা-বাদশাহদের এসব লোকই সঠিক পথ থেকে সরিয়ে দেয়। মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে যেই বাহাত্তর ফের্কা সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা যে পথভ্রষ্টতার রাস্তা ধরেছে তাদের অনুসরণীয় নেতা ছিল এসব উলামায়ে সূ'ই।

"উলামায়ে কিরামের মধ্যে এমন পথভ্রষ্ট লোক কমই হবেন যাদের গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা অন্যদের ওপর প্রভাব ফেলবে, আছর করবে। ঐ যুগের অধিকাংশ দরবেশরূপী মূর্খ সূফীও 'উলামায়ে সূ'র প্রভাব রাখে। তাদের সৃষ্ট ফেতনা-ফাসাদও বিধেয় ফাসাদ। যদি কোন লোক এই কল্যাণকর কাজে (দীনের সাহায্যের কাজে) দীনকে সাহায্য করার শক্তি-সামর্থ্য রাখে, যদি সে এক্ষেত্রে কোনরূপ দুর্বলতার

প্রকাশ ঘটায় এবং কারখানা ও ইসলামের ঘাটতি দেখা দেয় তাহলে ত্রুটি ও গাফিলতি প্রদর্শনকারী ব্যক্তি অভিযুক্ত হবে। এরই ওপর ভিত্তি করে এই নগণ্য ও দুর্বল চায় যে, সে মুসলিম সাম্রাজ্যের সাহায্যকারীদের কাতারে শামিল হোক এবং আপন সাধ্য মুতাবিক চেষ্টা-তদবীর চালিয়ে যাক। কেননা من كثر سواد قوم فهو منهم আশ্চর্য কি যে, এই অসহায় ও দুর্বলকে সেই মহান জামা'আতে শামিল করে নেয়া হবে। অধম তার দৃষ্টান্ত সেই বৃদ্ধার সাথে পেশ করতে চায় যে কিছু রশি নিলামে চড়িয়ে নিজেকে ইউসুফ (আ)-এর ক্রেতাদের কাতারে অর্ন্তভুক্ত করতে চেয়েছিল। আশা করি, খুব সত্বর এই ফকীর আপনার খেদমতে হাযির হবে। আপনার খেদমতে তার এও প্রত্যাশা, যেহেতু আপনি সম্রাটের বিশিষ্ট নৈকট্যধন্য এবং এসব কথা সম্রাটের গোচরে আনার সহজ সুযোগও আপনার আছে। অতএব আপনি প্রকাশ্যে অথবা নির্জনে একান্তে শরীয়তে মুহাম্মদীর প্রচলনে কোশেশ করবেন এবং মুসলমানদেরকে এই দীন ও দরিদ্র-দশা থেকে বের করে আনবেন।"[১]

সাইয়্যিদ ফরীদের নামে অপর এক পত্রে বলেন,

"এই মুহূর্তে অসহায় মুসলমানেরা যারা এরূপ দুর্দশা ও অসহায় অবস্থার শিকার, মুক্তির আশা আহলে বায়ত-এর নৌকার সাথেই জুড়ে দিয়েছে। মহানবী (সা)-এর ইরশাদ ঃ مثل اهل بيتى كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك "আমার আহলে বায়ত-এর উদাহরণ হল নূহ-এর কিশতীর ন্যায়। যে তাতে আরোহণ করল মুক্তি পেল, বেঁচে গেল। আর যে পেছনে পড়ে রইল সে ধ্বংস হল।"[২]

"আপনি আপনার বুলন্দ হিম্মতকে সেই মহান লক্ষ্যের ওপর নিবদ্ধ করুন যাতে করে এই মহাসৌভাগ্যের অধিকারী আপনি হতে পারেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে প্রভাবমণ্ডিত মর্যাদা ও শান-শওকত আপনার আছে। এই ব্যক্তিগত আভিজাত্য ও বংশগত মর্যাদার সাথে সাথে এই সৌভাগ্যও যদি আপনার ভাগ্যে জুটে যায় তাহলে সকল সৌভাগ্যবানদের আপনি ডিঙিয়ে যেতে পারবেন। এই নগন্য অধম এ ধরনের কিছু কথা আপনার সমীপে পেশ করার জন্য, যার উদ্দেশ্য ইসলামী শরীয়তের সমর্থন-সহযোগিতা ও প্রচলন, আপনার খেদমতে আগমনের অভিপ্রায় পোষণ করে।"[৩]

তৃতীয় আরেক পত্রে তিনি বলেন,

"সম্মানিত মহাত্মন! আজকের দিনে ইসলাম বড়ই অসহায় ও অপরিচিতির শিকার। একটি পয়সাও যদি কেউ এ মুহূর্তে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধিতে ব্যয় করে

১. মকতূব নং ৪৭, ১ম দফতর;
২. মেশকাত, আবু যর (রা) বর্ণিত, মুসনাদ আহমদ সূত্রে;
৩. মকতূব ৫১, ১ম দফতর;

কোটি কোটির বিনিময়ে তা ক্রয় করা হবে। দেখা যাক, আল্লাহ্ পাক কোন সৌভাগ্যবানকে এই মহা সম্পদ দানে সৌভাগ্যমণ্ডিত করেন। দীনের প্রচলন ও মুসলিম মিল্লাতকে শক্তিশালী করার কাজ যে যুগে যার দ্বারাই সম্পাদিত হোক তা উত্তম বিবেচিত হবে এবং তিনি সৌভাগ্যবান হবেন। বিশেষত এ সময় ইসলাম অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় রয়েছে এবং আপনার মত একজন সাইয়েদ বংশধরের জন্য এটাই শোভন হবে যে, এই সম্পদ আপনার খান্দানের জন্য পারিবারিক সম্পদ হবে। আপনার জন্য হবে তা সরাসরি নিজস্ব আর অন্যের জন্য তা হবে মাধ্যম। এই সম্পদ লাভের মধ্যে আপন পূর্বপুরুষের ওয়ারিশ হওয়া বিরাট মূল্য বহন করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন করে একবার বলেছিলেন, তোমরা এমন এক যুগে আছ যে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধগুলা দশভাগের একভাগও যদি ছেড়ে দাও তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমাদের পর একদল এমনও আসবে যে, তারা আদেশ-নিষেধগুলোর দশভাগের একভাগের ওপর আমল করলেও নাজাত পেয়ে যাবে। এই সময়ই সেই সময় এবং এই দলই সেই দল।"

گوئے توفیق وسعادت درمیان افگندہ اند

کس بہ میدان درنمی اید سواران راچہ شد ۔

সাইয়িদ ফরীদের পর হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর বাছাইয়ের দৃষ্টি মোগল সাম্রাজ্যের অপর সভাসদ খানে আজম[১]-এর ওপর গিয়ে পড়ে যিনি শাহী খান্দানের ঘনিষ্ঠ ও নিকট সান্নিধ্যে ছিলেন। জাহাঙ্গীরও তাঁর গুরুত্ব, সম্মান ও মর্যাদা অনুভব করতেন। নকশ্‌বান্দিয়া সিলসিলার বুযুর্গদের প্রতি তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহনের পরই সম্ভবত হযরত মুজাদ্দিদ তাঁকে নিম্নোক্ত পত্রটি লিখেছিলেন ঃ

ایدکم اللہ سبحانہ ونصرکم علی الاعداء الاسلام فی اعلاء الاسلام ۔

১. মির্যা আযীযুদ্দীন নামে আকবরের একজন দুধ ভাই হবার সুবাদে কোকা এই খেতাব লাভ করেছিলেন। প্রথম তাঁর বাড়ি ছিল গযনীতে। এরপর তিনি দিল্লীতে বসতি স্থাপন করেন। হিজরী ৯৮০ সালে তিনি গুজরাটের সুবেদার (গভর্নর) ছিলেন। তাঁকে মুহাম্মদ হুসায়ন মির্যার অবরোধ থেকে মুক্ত করবার লক্ষ্যে সম্রাট আকবর আগ্রা থেকে এক হাজার চারশো মাইল দূরে অবস্থিত আহমদাবাদ-এর সফর মাত্র নয় দিনে করেছিলেন। গুজরাটের পর বাংলা ও বিহারের সুবেদার হন। 'খানে আজম' উপাধি লাভ করেন। এই রূপ নিকট ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সত্ত্বেও আকবরের শরা-শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের দরুন তিনি তাকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করতেন। এতদসত্ত্বেও শাহী সীলমোহর 'উযূক' তাকে সোপর্দ করা হয়েছিল এবং তাকে "উকীল মুতলাক"-এর পদ দান করা হয়। জাহাঙ্গীরও তাঁকে হুকুমতের গুরুত্বপূর্ণ পদ দান করেছিলেন এবং গুজরাটর সূবেদারী প্রদান করেন। হি. ১০৩৩ সালে ইনতিকাল করেন (নুযহাতুল-খাওয়াতির, সংক্ষেপিত)।

"আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমাদেরকে সাহায্য করুন, ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ইসলামের বুলন্দী ও সমুন্নতির জন্য তোমাদেরকে সাহায্য করুন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীছ ঃ

الاسلام بداء غريبا وسيعود كما بداء فطوبى للغرباء -

"অসহায় ও অপরিচিতির মাঝ দিয়ে ইসলামের সূচনা হয়েছে, আবার সেই একই অসহায় ও অপরিচিতির মাঝেই সে ফিরে আসবে। অতএব তাদের জন্য মুবারক হোক যারা এই অবস্থার শরীক হবে।"

"ইসলামের এই অসহায় অবস্থা এ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, কাফিররা প্রকাশ্যে খোলাখুলিভাবে ইসলামের ওপর কটুকাটব্য করছে ও মুসলমানদের নিন্দা করছে এবং বাধাহীনভাবে কুফরী ও অনৈসলামী বিধানসমূহ জারী করছে এবং খোলা বাজারেও এসবের প্রশংসা গীত গাইতে লজ্জাবোধ করছে না। এর বিপরীতে মুসলমানরা ইসলামের হুকুম-আহ্কাম তথা বিধি-বিধান জারী করতে অসহায় বোধ করছে। আর কেউ যদি ইসলামী বিধানের ওপর আমল করে সেজন্য তাকে নিন্দিত ও ভর্ৎসনার শিকার হতে হয়।"

پری نهفته رخ ودیو درکرشمه وناز

بسوخت عقل ز حیرت که این چه بوالعجبی است -

সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি লিখেছেন ঃ

"আজকের দিনে জনাবের অস্তিত্বকে আমরা মূল্যবান ও দুর্লভ মনে করি এবং হেরে যাওয়া বাজিতে আপনি ছাড়া আর কাউকে আমরা ময়দানে পাচ্ছি না। আল্লাহ্ আপনার মদদগার ও সাহায্যকারী। بحرمة النبى واله الامجاد عليه وعليهم الصلوات والتحيات والتسليمات والبركات হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, لن يومن احدكم حتى يقال انه مجنون 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পার না, পারবে না যতক্ষণ না তাকে পাগল বলা হয়'। এই মুহূর্তে সেই পাগলামী যার ভিত্তি হল ইসলামী মর্যাদাবোধের আধিক্য তা আপনার স্বভাব ও প্রকৃতিতেই অনুভূত হয়। الحمد الله سبحانه على ذلك আজকের দিন সেই দিন যে, অল্প আমলকেই বিরাট পুরস্কারের বিনিময়ে বিরাট সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেন। আসহাবে কাহ্ফ থেকে একমাত্র বাস্তব হিজরত ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য আমল হয়েছে বলে প্রমাণিত নয় যাকে এত গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। দুশমনের প্রাধান্য ও জয়লাভের মুহূর্তে যদি বিশ্বস্ত ও অনুগত সৈনিক সামান্য দৃঢ়তাও প্রদর্শন করে তাহলে সে বিরাট সম্মানের অধিকারী হয় সে সময়ের বিপরীতে

যখন শান্তিকালীন সময় এবং শত্রু তার নিজ অবস্থানে থাকে। বাক জিহাদের এই মওকা যা আজ আপনার সামনে সমুপস্থিত আপনার জন্য শ্রেষ্ঠতম জিহাদ, জিহাদে আকবর। একে দুর্লভ সুযোগ মনে করুন, সম্পদ মনে করুন এবং هل من مزيد আরও আছে কি! বলুন। এই বাক জিহাদকে অসির যুদ্ধের চেয়েও উত্তম ভাবুন। আমরা দীন-হীন ফকীর মানুষ, অসহায় দুর্বল। আমরা এই সম্পদ থেকে মাহরূম।

هنيئالاارباب النعيم نعيمها

وللعاشق المسكين مايتجرع

داديم تراز گنج مقصود نشاں

گرمانه رسيديم تو شايد برسی -

এর কয়েক লাইন পরই লিখছেন,

"বিগত শাসনামলে দীনে মোস্তফা (ইসলাম)-এর সাথে যেই শত্রুতামূলক আচরণ চোখে পড়ত আজকের আমলে বাহ্যত ও দৃশ্যত সেই শত্রুতা নেই। আর যদি থাকেও তাহলে তা অজানা ও অজ্ঞতার কারণে। আশংকা হয়, না জানি এখানেও ব্যাপারটা সেরূপ শত্রুতার পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং মুসলমানদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

"جوبيد بر سرايمان خيش می لرزم"[১]

জাহাঙ্গীরের দরবারের অপর একজন উঁচু পদাধিকারী খান জাহানের[২] নামে এ ধরনেরই একটি বিষয় সংক্ষেপে লিখেছেন ঃ

"আপনি যেই খেদমত ও দায়িত্বে নিয়োজিত ও অধিষ্ঠিত যদি তা শরীয়তে মোস্তফার ওপর আমল করার সাথে একত্র করে নেন তাহলে আম্বিয়া, আলায়হিমু'স-সালাতু ওয়াস সালাম-ওয়ালা কাজ করবেন (তাঁদের ওপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক) এবং মজবুত দীনকে আলোকিত ও শোভিত করবেন। আমরা ফকীররা যদি বছরের পর বছরও প্রাণান্তকর পরিশ্রম করি তবু এই আমলের ক্ষেত্রে আপনাদের মত পুরুষ সিংহদের আশেপাশেও পৌঁছুতে পারব না।"

---

১. মকতুব নং ৬৫, ১ম দফতর।

২. আমীরে কবীর খান জাহান ইবন দৌলত খান লোদী। জাহাঙ্গীর তাঁকে বিশ্বাস করতেন এবং খুব ভালবাসতেন। খুবই ইল্ম দোস্ত ও উলামা-ই-কিরামের প্রতিপালনকারী ছিলেন। শাহজাহানের আমলে বিদ্রোহ করেন এবং ১০৪০ হিজরীতে তাঁকে হত্যা করা হয় (নুযহাতুল-খাওয়াতির)।

گوئے توفیق وسعادت درمیاں افگندہ اند۔
کس بہ میداں درنمی اید سواراں راچہ شد ۳

অন্য এক বিস্তারিত পত্রে তিনি লিখেছেন ঃ

“সেই সম্পদ যেই সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাকে ধন্য করেছেন এবং লোকে তার মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে অনবহিত (এবং আমার আশংকা হয় যে, সম্ভবত আপনি নিজেও সে বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল নন) তা এই যে, সমকালীন বাদশাহ্ সাত পুরুষ ধরে মুসলমান এবং তিনি আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের লোক, হানাফী মাযহাবের অনুসারী। যদিও কয়েক বছর থেকে এই যুগে যে, কিয়ামত নিকটবর্তী এবং নবীযুগ থেকে দূরবর্তী হবার দরুন কিছু কিছু লোক যারা লেখাপড়া জানেন, লোভের বশবর্তী হয়ে যা ভেতরের গলদের পরিণতি বৈ নয়, শাসক ও রাজা-বাদশাহ্র নৈকট্য অর্জন করে তাদের তোষামোদ ও চাটুকারিতায় (ইসলামের মত) মজবুত দীনের ভেতর সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং সহজ সরল লোকগুলোকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। জাহাঙ্গীরের মত প্রবল প্রতাপশালী সম্রাট যখন তাঁর কথা গভীর মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে শোনেন এবং তাঁকে মূল্য দেন তখন কেমন দুর্লভ সুযোগ যে, তিনি সরাসরি স্পষ্ট ভাষায় অথবা ইশারা-ইঙ্গিতে হক-কথা (ইসলামের কথা) যা আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের আকীদা-বিশ্বাস মুতাবিক (আল্লাহ্ তার প্রয়াস কবুল করুন) সম্রাটের কাছে তুলে ধরবেন এবং যতটুকু অবকাশ হয় সত্য পথের পথিকদের কথা সামনে তুলে ধরতে থাকবেন বরং বরাবর এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন যাতে এমন কোন সুযোগ সৃষ্টি হয়ে না যায় যে, মাযহাব ও মিল্লাতের কথা মাঝখানে এসে যায় যাতে করে ইসলামের সত্যতা এবং কুফরের মিথ্যা ও বাতিল হবার বিষয়টির প্রকাশের সুযোগ মেলে।”[১]

সাম্রাজ্যের ঐসব অমাত্য ও সভাসদ ছাড়াও তিনি আরেকজন উচ্চ পদাধিকারী লালা বেগকেও এ ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি পত্র লেখেন যিনি সম্রাট আকবর-পুত্র সুলতান মুরাদের বখ্‌শী ছিলেন এবং এক সময় বিহারের গভর্নরও ছিলেন। তিনি লিখছেন ঃ

“আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের, বিশেষভাবে আপনাদের ইসলামী মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি করে দিন। ইসলামের অসহায়ত্ব ও দারিদ্র্য-দশার একশ' বছর হচ্ছে। এতদূর পর্যন্ত তা পৌঁছে গেছে যে, মুসলিম দেশগুলোতে কাফিররা কেবল কুফরী ও অনৈসলামী বিধান জারী করাতেই সন্তুষ্ট হয় না। তারা চায় যে, ইসলামের

১. মকতূব নং ৮১, ১ম দফতর।

হুকুম-আহকাম একেবারেই মিটে যাক এবং মুসলমান ও মুসলমানিত্বের কোন প্রভাব যেন অবশিষ্ট না থাকে। তারা ব্যাপারটাকে এই সীমা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে যে, যদি কোন মুসলমান কোন ইসলামী শি'আর (প্রতীকী চিহ্ন) যেমন গরু যবেহ-এর প্রকাশ ঘটায় তাহলে তাকে এজন্য মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত প্রদান করা হয়"।[১]

সামনে অগ্রসর হয়ে লিখেছেন ঃ

"রাজত্বের প্রথম দিকেই যদি মুসলমানিত্বের প্রচলন ঘটে এবং মুসলমানরা কিছুটা সম্মান অর্জনে সক্ষম হয় তবে তো খুবই ভালো। আর যদি আল্লাহ্ না করুন, তাঁর আশ্রয় ভিক্ষা চাই, এ ব্যাপারে কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণে গড়িমসি করা হয় তাহলে ব্যাপার মুসলমানদের জন্য খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ্র পানাহ চাই, তাঁর দরবারে আশ্রয় ভিক্ষা চাই। দেখা যাক, কোন্ সৌভাগ্যবান এই মহা সৌভাগ্য লাভে ধন্য হন এবং কোন্ শ্যেন পক্ষী এই সম্পদ লাভ করে।" "এ আল্লাহ্র এক মহা অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। আল্লাহই মহা অনুগ্রহকারী।"[২]

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্যের আরেকজন আমীর ছিলেন সদরজাহাঁ।[৩] তাঁকে এক পত্রে লিখেন ঃ

"আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, মুকতাদায়ে ইসলাম মহান নেতৃবৃন্দ ও উলামায়ে কিরাম গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ্র দীনের উন্নতি ও শক্তিশালী করতে এবং এই সিরাতে মুস্তাকীম (সহজ সরল ও সোজা রাস্তা)-এর পরিপূর্ণতা সাধনে ব্যাপৃত আছেন, মশগুল আছেন। এই সহায়-সম্বলহীন এ ব্যাপারে আর কিইবা করতে পারে!"[৪]

অতীত ভুলের পুনরাবৃত্তি করবেন না

শেষে সেই মুবারক মুহূর্তও এসে গেল যখন সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন এবং তিনি (তাঁর হুকূমত ও এন্তেজামের সাধারণ মৌলনীতি মুতাবিক) চাইলেন যে, উলামায়ে কিরামের একটি জামা'আত ধর্মীয় ব্যাপারগুলোতে তাঁকে পরামর্শ দেবেন এবং ভুল-ভ্রান্তির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য রাজদরবারে বর্তমান

১. মকতূব নং ৮১, ১ম দফতর।

২. মকতূব নং ৮১, ১ম দফতর;

৩. মুফতী সদর জাহাঁ পায়হানী (বর্তমানে হরদুঈ জেলা)-র অধিবাসী ছিলেন। আরবী ভাষায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার ছিলেন। প্রথমে শাহী সেনাবাহিনীর মুফতী নিযুক্ত হন। অতঃপর সভাপতি পদে তিনি নির্বাচিত হন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর থেকে চল্লিশ হাদীছ মুখস্ত করেছিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁকে চার হাজারী মনসব ও বিশাল জায়গীর দান করেছিলেন। ১২০ বছর জীবিত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁর হুশ-জ্ঞান স্বাভাবিক ছিল। ১০২৭ হিজরীতে তিনি ওফাত পান (নুযহাতুল খাওয়াতির, ৫ম খণ্ড)।

৪. মকতূব নং ১৯৪, ১ম দফতর।

থাকবেন। তিনি সাম্রাজ্যের দীনদার ও ধর্মভীরু অমাত্যদের নির্দেশ দিলেন, তাঁরা যেন চারজন দীনদার আলিম অনুসন্ধান করে দরবারে সবসময় উপস্থিত থাকতে তাদেরকে উৎসাহিত করেন যাঁরা শরঈ মসলার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবেন এবং তাঁদের থেকে দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করা হবে। হযরত মুজাদ্দিদ ছাহেবকে আল্লাহ্ তা'আলা সত্যিকারের অন্তর্দৃষ্টি ও উন্নত ধর্মীয় দূরদৃষ্টি দান করেছিলেন এবং বিগত সাম্রাজ্যের বিপথ গমনের ইতিহাস ও এর কারণ সম্পর্কে গভীরভাবে জেনেছিলেন। তিনি এখবর শুনতেই খুশী হবার পরিবর্তে গভীর ভাবনায় ডুবে যান ও পেরেশান হয়ে পড়েন, হয়ে পড়েন বিচলিত। তিনি একটি চিঠি শায়খ ফরীদকে এবং আরেকটি পত্র নওয়াব সদর জাঁহাকে লিখেন। তিনি পত্রে বলেন ঃ

"আল্লাহ্র ওয়াস্তে এ ধরনের ভুল করবেন না। কয়েকজন জাহিরী আলিমের পরিবর্তে একজন মুখলিস ও নিঃস্বার্থপর আলিমে রব্বানী নির্বাচিত করুন।"

শায়খ ফরীদের নামে লিখিত পত্রে বলেন,

"আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সম্মানিত পূর্বপুরুষদের ওসীলায় আপনাকে দৃঢ়পদ রাখুন। শুনেছি যে, সম্রাট তাঁর উত্তম স্বভাব ও শান্ত প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে যা তাঁর স্বভাব-চরিত্রে রোপিত হয়েছে, আপনাকে চারজন দীনদার উলামায়ে কিরামের খেদমত হাসিলের জন্য বলেছেন যাঁরা শাহী দরবারে অবস্থান করবেন এবং শরঈ মসলা-মাসাইলের ব্যাপারে সম্রাটকে অবহিত করবেন যাতে করে সম্রাটের কোন নির্দেশ কিংবা কাজ শরীয়ত বিরোধী না হয়। আলহামদুলিল্লাহ 'আলা সুবহানাহু তা'আলা যালিকা। মুসলমানদের জন্য এর চেয়ে ভাল ও সুখবর এবং মাতম যাদাদের জন্য এর চেয়ে আনন্দদায়ক বার্তা আর কী হতে পারে? কিন্তু এই অধম প্রয়োজনের তাকীদে ও বাধ্য হয়ে এ ব্যাপারে কিছু পেশ করতে চায়। আশা করি এজন্য আমাকে মা'যূর মনে করা হবে। যেহেতু যার গরজ বেশী তাকে 'পাগল হিসেবে ক্ষমার্হ ভাবা যায়।

"আরয এই যে, এ ধরনের দীনদার আলিম প্রথম তো এমনিতেই কম যারা পদ, পদমর্যাদা ও ক্ষমতার মোহ কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন এবং শরীয়তের প্রচলন ও মিল্লাতের সমর্থন-সাহায্য ব্যতিরেকে যাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। যদি পদ ও পদমর্যাদা প্রীতির মোহে ঐ সব উলামা-ই-কিরামের কেউ একটা দিক অবলম্বন করেন এবং নিজের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করেন, ইখতিলাফী মাসআলা-মাসাইলগুলো মাঝখানে (অহেতুকভাবে) টেনে আনেন এবং এসবকে অবলম্বন করে সম্রাটের নৈকট্য ও তাঁর সান্নিধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা লাভ করতে চান তবে কোন সন্দেহ নেই যে, দীনের কাজ খারাপ হবে। পূর্বেকার যুগে উলামায়ে কিরামের মতভেদ ও মতানৈক্যই সমগ্র জগতকে মুসীবতের মাঝে

নিক্ষেপ করেছিল এবং এখন আবার সেই একই বিপদ সামনে। শরীয়তের প্রচলন, দীন-ধর্মের রেওয়াজ দানের কথা আর কী বলব, এই কাজটি দীনকে ধ্বংস করার কারণ হবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে এ থেকে আশ্রয় চাই এবং উলামায়ে সূ'র ফেতনা থেকেও পানাহ্ চাই। তবে চারের পরিবর্তে যদি একজন আলিমকে এই উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে নির্বাচিত করা হয় তাহলে উত্তম হবে। যদি সেই আলিম পরজগতের মধ্য থেকে কেউ হন তাহলে আর কী বলব! তাঁর সান্নিধ্য ও সাহচর্য পরশ পাথর তুল্য বিবেচিত হবে। আর যদি পর জগতের আলিমদের মধ্য থেকে কাউকে না পাওয়া যায় তবে এই শ্রেণীর উলামায়ে কিরামের মধ্য থেকে যেন সর্বোত্তম লোকটিকেই নির্বাচিত করা হয়। مالا يدركه كله لايترك كله "নাই মামার চেয়ে কানা মামাই ভাল।"

এরপর তিনি লিখেছেন ঃ

"বুঝতে পারছি না কী লিখব, কী লেখা দরকার। যেমন সৃষ্টিকুলের মুক্তি ও নাজাত উলামায়ে কিরামের সঙ্গে সম্পর্কিত, সমগ্র জগতের ক্ষয়-ক্ষতিও তাঁদের সঙ্গেই জড়িত ও সম্পৃক্ত। উলামায়ে কিরামের মধ্যে যারা সর্বোত্তম তাঁরা সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যেও সর্বোত্তম এবং তাদের মধ্যে যারা নিকৃষ্টতম সৃষ্টিজগতের মধ্যেও তারাই নিকৃষ্টতম। হেদায়েত ও গোমরাহীকে এই সম্প্রদায়ের সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া হয়েছে। জনৈক বুযুর্গ অভিশপ্ত ইবলীসকে দেখতে পেল যে, সে নিষ্কর্ম ও বেকার বসে আছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলে ইবলীস বলতে লাগল, এক্ষণে উলামায়ে কিরামই আমাদের কাজ করছেন, মানুষকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করার কাজ করছেন।

عالم كه كامرانى و تن پرورى كند -

او خويشتن گم است كرا رهبرى كند -

"মোটকথা, এ ব্যাপারে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও বিশুদ্ধ চিন্তা-চেতনা নিয়েই পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। যখন কোন ব্যাপার হাতছাড়া হয়ে যায় তখন আর কোন চিকিৎসাই কাজ দেয় না। আমার লজ্জা লাগে যে, এ ধরনের কথা দূরদর্শী ও বুদ্ধিমান (যেমন আপনি) লোকদের সামনেই বলা উচিত। কিন্তু একে নিজের জন্য সৌভাগ্যের মাধ্যম জেনে আপনাকে কষ্ট দিলাম।"[১]

---

১. মকতুব ৫৩, ১ম দফতর, সদর জাহাঁর নামে পত্র ১৯৪, ১ম দফতরেও এই বিষয়টি সংক্ষেপে লেখা হয়েছে।

সাম্রাজ্যের ভক্ত-অনুরক্ত অমাত্যবর্গ এবং তাদের সাথে পত্র যোগাযোগ

ঐসব ব্যক্তি যাদেরকে উদ্দেশ্য করে পত্র লেখা হয়েছিল তাদের ছাড়াও যাদের নামের পত্রে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র) ইসলামের দরিদ্রদশা, অসহায়ত্ব, ইসলামের বিধি-বিধান ও শি'আরসমূহের অসম্মান এবং মুসলমানদের অসহায় অবস্থার ওপর রক্তাশ্রু ঝরিয়েছেন এবং তাদেরকে আপন নৈকট্য ও আস্থা, মহান খেদমত, তাদের পদ ও পদমর্যাদার প্রভাব দ্বারা কাজ নিয়ে সম্রাটের অবস্থার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন ও তাদের মৌরছী ও খান্দানী ইসলামী প্রেরণাকে উস্কে দেবার দিকে চেষ্টার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন। কিছু বড় বড় আমীর-উমারা ও সাম্রাজ্যের অমাত্যের নামে তাঁর এক বিরাট সংখ্যক পত্র রয়েছে যেগুলো সংস্কার ও প্রশিক্ষণমূলক এবং যেসব পত্রে সুলূক ও তাসাওউফের কতক সূক্ষাতিসূক্ষ্ম রহস্য ও ইশারা-ইঙ্গিতের সমাধান করা হয়েছে। দুনিয়াদারীর প্রতি উদাসীনতা ও নিস্পৃহতা এবং পারলৌকিক নে'মতরাজি ও অভ্যন্তরীণ উন্নতি হাসিলের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এসব পত্র আমীরুল-উমারা আবদুর রহীম খানে খানাঁ (মৃ. ১০৩৬ হি.), কিলীজ খান আনদিজানী আকবরী (মৃ. ১০২৩ হি.), খাজা জাহাঁ (মৃ. ১০২৯ হি.), মির্যা দারাব ইবন খানে খানাঁ জাহাঙ্গীরি (মৃ. ১০৩৪ হি.) এবং শরফুদ্দীন হুসায়ন বাদাখশীর নামে লেখা হয়েছিল যেগুলো থেকে পরিমাপ করা যায় যে, ঐ সব মহান আমীর-উমারার হযরত আলফেছানীর সঙ্গে কত গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল। এসব চিঠিপত্র ঠিক তেমনি যেমন একজন শায়খ তাঁর প্রশিক্ষণাধীন মুরীদবর্গকে লিখে থাকেন, তাদের পদস্খলন ও ভুল-ভ্রান্তির ব্যাপারে সতর্ক ও হুশিয়ার করেন, তাদেরকে ওয়াজ-নসীহত তথা সদুপদেশও প্রদান করে থাকেন এবং তাদের দীনি তরক্কী (ধর্মীয় উন্নতি) ও আধ্যাত্মিক যোগ্যতা, সামর্থ্য ও পারস্পরিক সম্বন্ধের ওপর আনন্দ ও সন্তোষ প্রকাশ করেন। এর থেকে পরিমাপ করা যেতে পারে যে, এই শক্তিশালী সম্পর্ক ও গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধার পর ঐসব বড় বড় আমীর-উমারা হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর সাম্রাজ্যের সংস্কারের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় মুতাবিক সম্রাটের সামনে হক-কথা বলা এবং ইসলামের কল্যাণ কামনা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আদৌ ত্রুটি করেন নি এবং তাঁরা একাজে আপন মখদূম শায়খ-এর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও সাম্রাজ্যের অপরাপর আমীর-উমারার সঙ্গে (যাঁদেরকে তিনি এই মহান লক্ষ্যের নিমিত্ত পত্র লিখেছিলেন) সহযোগিতা করতে কুণ্ঠিত হন নি।

সংস্কার চেষ্টায় হযরত মুজাদ্দিদ-এর ব্যক্তিগত প্রভাব ও অবদান

এখন পর্যন্ত যা কিছু বিস্তারিত বলা হল এর সম্পর্ক হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর সঙ্গে সরাসরি চেষ্টা-তদবীরের ছিল। অর্থাৎ তিনি বড় বড় আমীর ও

সাম্রাজ্যের অমাত্যদেরকে ইসলাম ধর্মের সাহায্য-সমর্থন, সম্রাটকে ইসলামের সম্মান ও শরীয়তের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং অবস্থার সংস্কার-সংশোধনের ব্যাপারে লিখিত পত্র মারফত যেসব পত্রে ইসলামী মর্যাদাবোধের আলোক-রশ্মির ঝলক দৃষ্টিগোচর হয়, কিভাবে একের পর এক পত্র লিখেছেন এবং এসব পত্রের সাহায্যে এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের পূর্ণতা সাধনে কিভাবে কাজ নিয়েছেন। এই চেষ্টা ও সাধনা যে ব্যর্থ হয় নি তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। আর এসব পত্র যাদেরকে লেখা হয়েছিল, বিশেষ করে নওয়াব সাইয়েদ ফরীদ হুকূমতের গতিধারা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মৌলিক ও কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

কিন্তু তখন পর্যন্ত সাম্রাজ্যের যিনি মূল শাসক জাহাঙ্গীরের স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে সেই পরিবর্তন সৃষ্টি হয় নি যা এই বিরাট ও কঠিন কাজটি করবার জন্য দরকার ছিল। ব্যক্তি ও উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ সাম্রাজ্যগুলোতে রাজা-বাদশাহ্ ও সম্রাটদের ব্যক্তিসত্তা সেই কেন্দ্রীয় বিন্দু হয় যার চারপাশে হুকূমতের গোটা ব্যবস্থাপনা আবর্তিত ও বিবর্তিত হতে থাকে। কোন বিষয়ে তাঁর ইচ্ছা করা, তাঁর মস্তিষ্কের কোন ব্যাপারে কবুল করে নেয়া, আল্লাহর কোন মুখলিস ও নিঃস্বার্থপর বান্দার সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে ভক্তি ও ভালবাসা সৃষ্টি হওয়া এবং তাঁর নিঃস্বার্থপরতা ও নিষ্ঠার ওপর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন হাজার মাইলের দূরত্বকে ঘণ্টা ও মিনিটের মধ্যে অতিক্রম করিয়ে দেয় এবং কোন কোন সময় বাহ্য দৃষ্টিতে অসম্ভব ব্যাপারকেও কেবল সম্ভবই নয় বরং বাস্তবতায় পরিণত করে। তখন পর্যন্ত সম্রাট জাহাঙ্গীর হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর রূহানী তথা আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানগত মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। তিনি সেই সব বুযুর্গ শায়খ ও জ্ঞানী-পণ্ডিতদের দলের কেউ ছিলেন না যারা শাহী দরবারে যাতায়াত করতেন। এখন আর কোন্ সূরত ছিল যে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের সরাসরি মুখোমুখি তাঁর সাক্ষাত ঘটবে এবং সম্রাট তাঁর উঁচু মকাম তথা অবস্থানগত মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হবেন (আপন যোগ্যতা ও সামর্থ মুতাবিক)। আল্লাহ্র অপার হিকমত এরও এক অত্যাশ্চর্য ও বিরল এন্তেজাম করে দিলেন যা عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم (সম্ভবত তোমরা কোন জিনিস অপছন্দ কর আর তা তোমাদের অনুকূলে ভাল হয়)-এর সর্বোত্তম তফসীর ও ব্যাখ্যা।

জাহাঙ্গীরের প্রভাব স্বীকারকরণ

তৃতীয় অধ্যায়ে পাঠক গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী এবং শাহী সেনাবাহিনীতে নজরবন্দী হিসেবে মুজাদ্দিদ সাহেবের অবস্থানের কথা পড়েছেন। শাহী সেনাবাহিনীতে তিনি সাড়ে তিন বছর ছিলেন।[১] এ সময় তিনি সম্রাটের সাহচর্যে

১. ১০২৯ হিজরীর জুমাদা'ছ-ছানীতে তিনি গোয়লিয়র দুর্গ থেকে মুক্তি পান এবং শাহী সেনাবাহিনী থেকে বিদায় হন ১০৩২ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে সে হিসাবে সর্বমোট সাড়ে তিন বছরই হয়।

অবস্থান করেন। ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে আলাপ-আলোচনাও হত। সম্রাট হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর ধর্মীয় দৃঢ়তা ও মজবুতীর নমুনা সম্মানসূচক সিজদা ও শাহী আদব প্রদর্শন করতে অস্বীকৃতি, গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী থাকাকালে পূর্ণ আত্মমর্যাদা ও আত্ম-সম্মান রক্ষা করে থাকা ও ক্ষমা না চাওয়ার ভেতর দিয়ে দেখেছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ-এর রূহানী ফয়েয ও বরকত এবং তাঁর সান্নিধ্যের প্রভাব শত শত অমুসলিমের ইসলাম কবুলের রূপে দেখেন। অতঃপর শাহী সেনাবাহিনীর দীর্ঘ সাহচর্যে তাঁর যুহ্দ তথা জগত সংসারের প্রতি নির্লিপ্ততা ও উদাসীনতা এবং তাঁর ইবাদত-বন্দেগী ও দৈনন্দিন আমলগুলোর নিয়মিত আদায়ও তিনি দেখেন। মজলিসী আলাপ-আলোচনায় জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের অভিজ্ঞতাও লাভ করেন এবং নিশ্চিতই সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধি ও স্বভাবের অধিকারী তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ও সতর্ক একজন শাসক হিসাবে যিনি আমীর-উমারা, উলামা-মাশায়েখ, দীনদার ও দুনিয়াদার লোকদের এক বিপুল সংখ্যকের অবস্থা তাঁর পিতার যুগ থেকে তখন পর্যন্ত দেখার ও পর্যালোচনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর ফলে তাঁর মধ্যে মানুষ চেনার সেই যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যা সেই সব লোকের হাসিল হয় না যারা আসল-নকল, খাটি ও ভেজাল পরীক্ষা করার এত দীর্ঘ সুযোগ পান না। মুজাদ্দিদ সাহেব সম্পর্কে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি সে সব লোক থেকে অনেক আলাদা যারা এখন পর্যন্ত দরবারের সৌন্দর্য ও খানকাহ্নশীন হিসাবে অবস্থান করছেন।

নিচে আমরা আমরা জাহাঙ্গীরের নিজের লেখা থেকে যা তিনি বিস্তারিতভাবে লিখেছেন এবং কতকটা কৃতজ্ঞতা ও গর্ব প্রকাশ করেই লিখেছেন, কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করছি যা থেকে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর সাহচর্য ও আবেগদীপ্ত প্রেরণার প্রভাব পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়। জাহাঙ্গীরের সেই পদক্ষেপের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায় যদি এই ঘটনা সামনে রাখা হয় যে, এই দুর্গ একজন অভিজ্ঞ মুসলিম সেনাপতির পরিবর্তে রাজা বিক্রমজিতের হাতে বিজিত হয়েছিল।

জাহাঙ্গীর লিখছেন ঃ

"আলোচ্য মাসের ২৪ তারিখে ১লা রবিউল আওয়াল, ১০৩১ হিজরীতে আমি কাংড়া দুর্গ পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমি নির্দেশ দিলাম যে, কাযী ও প্রধান বিচারপতি (মীর-ই 'আদল) এবং অন্যান্য উলামায়ে কেরাম আমার সাথে যাবেন। যা ইসলামী শি'আর ও দীনে মুহাম্মদীর শর্তাবলী যুক্ত, তাঁরা সেগুলো আলোচ্য দুর্গে পালন করবেন। সংক্ষিপ্তভাবে এক ক্রোশ দূরত্ব অতিক্রম করে দুর্গের উচ্চতায় গিয়ে পৌছুলাম। তৌফীকে ইলাহীতে আমার উপস্থিতিতে আযান দেওয়ালাম। খুতবা পাঠ করা হল। আমার সামনেই গরু যবেহ করলাম যা এই দুর্গ

নির্মাণের পর থেকে আজ পর্যন্ত কখনো করা হয়নি। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই পুরস্কার প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে যা কোন সম্রাটের কখনো এই সৌভাগ্য জোটে নি, সিজদায়ে শোকর আদায় করলাম। আমি হুকুম দিলাম দুর্গের ভেতর বিশালাকারের সুউচ্চ একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য।"

এই রূপ সরাসরি ওপরোক্ত প্রচেষ্টায় প্রথমত সাম্রাজ্যের গতিমুখ ইসলামের প্রতি উদাসীনতা বরং অজ্ঞতা (এর চেয়েও সামনে অগ্রসর হয়ে বলা যায় বিরোধিতা) থেকে সরে এসে ইসলামের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা, ইসলামী শি'আর (প্রতীক চিহ্ন)-এর সমুন্নতি এবং মুসলিম সম্রাটের ইসলামের প্রতি আকর্ষণের দিকে পাল্টে গেল যার ধারাবাহিকতা জাহাঙ্গীরের শাসনামলের শেষ যুগ থেকে শুরু হয়ে সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে গিয়ে স্থিতি লাভ করে।

সম্রাট শাহ্জাহানের শাসনামল

সাহিবে কিরানে ছানী শাহজাহান বাদশাহ্ গাযী (হি. ১০০০-৭৫)-র শাসনামল ১০৩৬ হি. থেকে শুরু হয়ে বিরাট শান-শওকতের সঙ্গে ৩১ বছর স্থায়ী হয়। তিনি হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর ইনতিকালের ২ বছর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময়টি ছিল এক অননুভূত ক্রমিক সংস্কার ও তুলনামূলক ভাল যুগ। সম্রাট শাহজাহান সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তিনি হযরত মুজাদ্দিদ কিংবা তৎপুত্র খাজা মুহাম্মদ মা'সূম-এর কাছে যথা নিয়মে বায়'আত হয়েছিলেন কিংবা পীর-মুরীদ সম্পর্কে রাখতেন কিনা। কিন্তু এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, সম্রাটের হৃদয়ে সব সময় হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর প্রতি সহানুভূতি, শ্রদ্ধাবোধ ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছিল। অনন্তর হযরত মুজাদ্দিদ (র) যখন সম্রাটের তলব পেয়ে দরবারে আগমনে আগ্রহী হন এবং তিনি জানতেন যে, হযরত মুজাদ্দিদ সিজদায়ে তা'জীমি ও দরবারী আদব কবুল করবেন না তখন শাহজাহান তদীয় মোসাহেব আফযাল খান ও মুফতী আবদুর রহমানকে কিছু ফিক্হ সংক্রান্ত বই-পুস্তক তাঁর খেদমতে এই বলে পাঠান যে, 'সম্রাটদের জন্য সিজদায়ে তা'জীমি জায়েয এবং ফকীহগণ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এর অনুমতি দিয়েছেন। আপনি যদি সাক্ষাতের সময় সম্রাটের জন্য এসব সম্মান ও আদব প্রদর্শন করেন তাহলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না— এই মর্মে আমি যিম্মাদারী গ্রহণ করছি।' হযরত মুজাদ্দিদ (র) এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেন যে, এটা রুখসত আর আযীমতের দাবি হল কোন অবস্থাতেই গায়রুল্লাহকে সিজদা না করা।[১]

সম্রাট শাহজাহান সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত যে, তিনি একজন নেক দিল (সৎ অন্তকরণ বিশিষ্ট) বাদশাহ,শরীয়তের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণকারী,

১. বিস্তারিত জানতে দ্র. গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়।

বিশালাকৃতির মসজিদ নির্মাণে বিশেষ আগ্রহী এবং ব্যক্তিগতভাবে শরীয়তের পাবন্দ ছিলেন। আলিম-উলামা ও নেককার বুযুর্গদের নিজের কাছে রাখতেন এবং তাঁদের ওপর আস্থাশীল ছিলেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রী জুমলাতুল মালিক সা'দুল্লাহ খান আল্লামী (মৃ. ১০৬৬ হি.) সে যুগের একজন বিশিষ্ট আলিম ও শিক্ষক ছিলেন।[১] এই ব্যক্তিগত দীনদারী ও আল্লাহ-ভীতির সাথে সাথে (যা বিশাল ও বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী একজন স্বাধীন সম্রাটের জীবনে দুর্লভ প্রাপ্তিই বলতে হবে) সম্রাট শাহজাহান পূর্ব আমল থেকে চলে আসা বেশ কিছু শরীয়ত বিরোধী প্রথা-পদ্ধতি ও আদব বন্ধ করে দেন। শামসুল উলামা' মৌলভী যাকাউল্লাহ্ ফার্সী সাহিত্যের সমসাময়িক ইতিহাস 'বাদশাহ নামা' প্রভৃতির বর্ণিত বিবরণের ভিত্তিতে লিখেছেন ঃ

"সম্রাট শাহজাহান সিংহাসনে আসীন হতেই মিল্লাতে মোস্তফা ও শরীয়তে মুহাম্মদীর সেই সব রসম-রেওয়াজ, যেগুলোর মধ্যে কিছুটা বিচ্যুতি দেখা দিয়েছিল যে, এর প্রতি এতটা সম্মান প্রদর্শন করেন যে, প্রথমেই তিনি নির্দেশ জারী করেন, সিজদা একমাত্র মা'বূদে হাকীকী আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য। এখন থেকে ভবিষ্যতে আর কখনো কেউ কাউকে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে সম্মান প্রদর্শন করবে না। মহাবত খানের কথায় তিনি আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করার প্রথা চালু করেন। কিন্তু এটাও সিজদাসদৃশ বিধায় তা বন্ধ করে সালামের প্রচলন করেন।"[২]

স্যার রিচার্ড বার্টন লিখেছেন ঃ (Sir Richard Barton)

"শাহ্জাহান ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস কঠোরভাবে পুনরায় চালু করতে চাইতেন। কিন্তু অপরাপর ধর্মের অনুসারীরা আপত্তি উত্থাপন করুক তাও তিনি চাইতেন না। তিনি খুব সত্বর সম্রাটকে সিজদা করার প্রথা দরবার থেকে তুলে দেন। সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত ইলাহী সন যা সরকারী কাগজ-পত্রে ও মুদ্রায় লিখিত হত, সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার কয়েক বছর পর বন্ধ হয়ে যায়। ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু-মুসলমানের ভেতর বিবাহ, যা পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে ব্যাপক প্রচলন ছিল, নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।"[৩]

মৌলভী যাকাউল্লাহ্ সাহেব লিখছেন ঃ

"শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধানসমূহ এবং ইসলামী ইবাদতের তা'লীম প্রদানের উদ্দেশ্যে তিনি সরকারীভাবে কাযী ও শিক্ষক নিয়োগ করেন। শায়খ মাহমূদ গুজরাটিকে যেসব মুসলিম মহিলার হিন্দুদের সাথে বিয়ে হয়েছিল উপযুক্ত তদন্ত সাপেক্ষে সেসব মহিলাদের হিন্দুদের হাত থেকে উদ্ধার করার ভার অর্পণ করেন। হিন্দুদের দ্বারা দখলীকৃত দালান-কোঠা ও মসজিদকে আলাদা করার

১. দ্র. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৫ম খণ্ড।
২. তারীখে হিন্দুস্তান, ৭ম খণ্ড, ৫৫-৫৬, সংক্ষেপিত।
৩. Cambridge History of India. vol. Iv. p. 217।

ভারও তাকে প্রদান করা হয়। তিনি এ আদেশ পালন করেন। হিন্দুদের হাত থেকে অনেক মসজিদ তিনি মুক্ত করেন এবং দখলদারদের থেকে জরিমানা আদায় করে সেসব মসজিদ পুনর্নির্মাণ করেন। যেসব হিন্দু কুরআন শরীফের সঙ্গে বেআদবী করেছিল প্রমাণ সাপেক্ষে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন। এরপর সম্রাট নির্দেশ দেন যে, সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশে যেসব জায়গায় এ ধরনের ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর শরঈ বিধান মাফিক তদন্ত করা হোক।"[১]

কিন্তু শরীয়তের প্রতি এই সম্মান ও শ্রদ্ধা এবং দীনের ব্যাপারে মর্যাদাবোধের সাথে সাথে এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, সম্রাট শাহজাহান তাঁর শরীয়তের পাবন্দ, আলেম ও সুযোগ্য পুত্র আওরঙ্গযেবের মুকাবিলায় উদার ও মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শুকোহকেই অগ্রাধিকার প্রদান করতেন এবং তাকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ও নিজের স্থলাভিষিক্ত বানাতে চাইতেন। আর এটাই রাজতন্ত্র ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সাম্রাজ্য এবং ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ নীতির অনুসারী সাম্রাজ্যের শাসকদের সেই বৈশিষ্ট্য যেখানে তাদের ব্যক্তিগত দীনদারী রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদির ওপর প্রভাবশীল এবং কোন ভুল ও ক্ষতিকর স্থলাভিষিক্ত নির্বাচনে প্রতিবন্ধক হয় না।

শাহযাদা দারা শুকোহ্

সম্রাট আলমগীরের আমলে যে সব ইতিহাস লিখিত হয়েছে কেবল সে সবের ওপর নির্ভর করে আমরা দারা শুকোহ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারি না। এর ওপর নির্ভর করে তাঁকে চূড়ান্তভাবে বেদীন ও বদ-আকীদা পোষণকারীও বলতে পারি না এবং এও বলতে পারি না যে, সিংহাসনকে কেন্দ্র করে ভাইদের এই যুদ্ধ একান্তভাবেই দু'টো দর্শন, দু'টো চিন্তাধারা এবং ধর্ম ও ধর্মহীনতার যুদ্ধ ছিল। কিন্তু অমুসলিম ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের লিখিত বিবরণাদি থেকে এতটুকু জানা যায় যে, তিনি তার পিতামহ সম্রাট আকবরের চিন্তা-চেতনার কাছাকাছি সব ধর্ম মিলিয়ে এক ধর্ম করার দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত এবং শরীয়ত ও বেদান্তবাদী দর্শনের মধ্যে যোগ্যসূত্র রয়েছে তা প্রমাণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। ফরাসী পর্যটক ডা. বার্নেয়ার বলেন যে, "ইউযী সাহেব পাদ্রী ফ্লেমিশের ধর্মীয় বক্তৃতাগুলো খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে একই ধর্মের পতাকাতলে আনতে চাইতেন।" দাইরায়ে মা'আরিফ-এ ইসলামিয়ার নিবন্ধকারের ভাষ্য মতে,

"তিনি তাসাওউফের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন এবং হিন্দু দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি মুসলিম সূফী ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক কায়েম করে নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে (মুসলিম সূফী ও আলিম-উলামার সঙ্গে)

---

১. তারীখে হিন্দুস্তান, ৭ম খণ্ড, ১৭৫-৭৬ পৃ. সংক্ষেপিত।

ওয়াহদাতুল ওজূদ মতবাদী মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী সারমাদ, বাবা লাল দাস বৈরাগী ও কবীরের অনুসারীও ছিলেন।"

দারার শেষ দিককার কিছু কিছু রচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তিনি ওয়াহদাতুল ওজূদ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি হিন্দু দর্শন ও প্রতিমা তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন যদ্দরুন তিনি এমন কতকগুলো ধর্মদ্রোহিতামূলক ধ্যান-ধারণার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন যেগুলোর সুস্পষ্ট উদাহরণ হিন্দু দর্শনে পাওয়া যায়, ইসলামে যেসবের কোন অবকাশ নেই। দারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, বেদান্ত দর্শন ও তাসাওউফ যেসবের মাধ্যমে সত্য উপলব্ধি করা দরকার। এ দু'টো পরস্পর বিরোধী নয়, পার্থক্য যা তা কেবল শব্দের। উপনিষদের অনুবাদে যাকে তিনি ঐক্যের উৎস হিসেবে বর্ণনা করতেন, দারা দুই বৃহৎ ধর্মের, ইসলাম ধর্ম ও হিন্দু মতবাদের অনুসারীদের সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গিকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসার চেষ্টা চালান। অধিকন্তু তিনি এও চেয়েছিলেন যে, হিন্দুদের আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে মুসলমানদের পরিচিত করাবেন।"

দারার এসব চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা, প্রবণতা ও আবেগ-অনুভূতির ভিত্তি যা সে সময়কার ভারতীয় মুসলিম সমাজের অগোচরে ছিল না এবং যে সম্পর্কে সজাগ মস্তিষ্কের অধিকারী শাহযাদা আওরঙ্গযেব পরিপূর্ণ ফায়দা উঠিয়েছিলেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, ভারতবর্ষের ধর্মীয় মহল, দীনদার উলামায়ে কিরাম এবং শরীয়তের অনুসারী তরীকতপন্থী বুযুর্গানে দীন ও তাঁদের অনুসারীবৃন্দকে যাঁরা সম্রাট আকবরের শাসনামলে ইসলামের অসহায়ত্ব ও দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থার দৃশ্য দেখেছিলেন কিংবা তাঁদের পিতা-পিতামহদের কাছ থেকে শুনেছিলেন, এই ভ্রাতৃ যুদ্ধে দারা শুকোহ্র মুকাবিলায় ইসলামের সমর্থক, দীন ও শরীয়তের পাবন্দ শাহযাদা আওরঙ্গযেবের-এর সাহায্য-সমর্থনে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং দোআ ও উৎসাহ-অনুপ্রেরণা দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিল।[১]

এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের রেজাল্ট কী দাঁড়িয়েছিল তা সবার জানা আর তা এই যে, আওরঙ্গযেব দারা শুকোহ্র মুকাবিলায় জয়লাভ করেন এবং ১০৬৮ হিজরীতে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন ও অর্ধ শতাব্দীকাল দোর্দণ্ড প্রতাপে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন।

মুহ্য়িউদ্দীন আওরঙ্গযেব আলমগীর ও ধর্মীয় মর্যাদাবোধ

আওরঙ্গযেব আলমগীর (হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর খান্দানের সঙ্গে যাঁর শ্রদ্ধাবিজড়িত সম্পর্ক এবং প্রথম থেকে দাওয়াত ও রূহানী সম্পর্কে যিনি সম্পর্কিত ছিলেন) হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম-এর সঙ্গে বায়'আত ও পীর-মুরীদী সম্পর্ক

১. মকতূবাতে সায়ফিয়া, পত্র নং ৮৩, বনাম সূফী সা'দুল্লাহ আফগানী।

কায়েম করেছিলেন।[১] বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণে এ কথা প্রমাণিত যে, হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূমের সঙ্গে সম্রাটের সম্পর্ক কেবল গায়েবানা ও সাধারণ ভক্তি-বিজড়িত ছিল না বরং তিনি (সম্রাট) হযরত খাজার সঙ্গে যথারীতি ইসলাহী ও তরবিয়তী সম্পর্কও কায়েম করেছিলেন। আওরঙ্গযেব যখন শাহযাদা তখন থেকেই তাঁর ওপর হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম-এর বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং তিনি তাঁকে 'শাহযাদা দীনে পানাহ' (যা একটি সুস্পস্ট ভবিষ্যদ্বাণী ও সৌভাগ্যের ইঙ্গিতবাহী বাক্য ছিল) অভিধায় স্মরণ করতেন। হযরত খাজা সায়ফুদ্দীন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূমকে এক পত্রে লিখছেন ঃ

"বাদশাহ্ দীনে পানাহ্র হযরতের সঙ্গে ইখলাস তথা নিষ্ঠাপূর্ণ আন্তরিক সম্পর্ক অন্য ধরনের। তিনি এখন লাতাইফে সিত্তা (ছয় লতীফার যিক্র) ও সুলতানুল আযকার (ইসমে যাত তথা আল্লাহ, আল্লাহ যিক্র) অতিক্রম করে এখন নফী ও ইছবাত (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু যিক্র)-এর যিক্র-এর মনযিলে আছেন। তাঁর বর্ণনা এ রকম যে, কোন কোন সময় তাঁর (সম্রাটের) দিলে আদৌ ওয়াসওয়াসা আসে না এবং কখনো আসলেও তা স্থায়ী হয় না। তিনি এর হাত থেকে নিরাপদ। তিনি বলেন, এর আগে আমি ওয়াসওয়াসা ও বিপদ-আপদের ঝড়ো হাওয়ায় পেরেশান হয়ে যেতাম। তিনি এক্ষণে এই নে'মতের জন্য শুকরিয়া আদায় করেন।"[১]

খাজা সায়ফুদ্দীনের এই পত্রের জওযাব দিতে গিয়ে হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম যেই পত্র লিখেছেন তাতে তিনি আল্লাহ্র দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছেন যিনি সম্রাটকে রূহানী মর্তবা দান করেছেন। এই পত্র থেকে এও ফুটে ওঠে যে, সম্রাটের 'ফানায়ে কল্বী'র মকাম হাসিল হয়েছিল যা সুলূক তথা আধ্যাত্মিক সাধনা পথের একটি বড় মকাম।[২]

আবুল ফাতাহ "আদাবে আলমগীরি" নামক গ্রন্থে বলেন, "আওরঙ্গযেবের সিংহাসনে আরোহণের পর পরই খাজা মুহাম্মদ মা'সূম ও তাঁর বুযুর্গ ভ্রাতা খাজা মুহাম্মদ সাঈদ শাহী দরবারে আগমন করেন। এসময় আওরঙ্গযেব তাঁদেরকে তিনশ' স্বর্ণমুদ্রা নযরানা হিসেবে প্রদান করেন।"[৩]

অধ্যাপক মুহাম্মদ আসলাম "আওরঙ্গযেব কী তখতনশীনি মে উলামা ও মাশায়েখ কা কারদার" (আওরঙ্গযেবের সিংহাসনে আরোহণে উলামা'ও মাশায়েখে-ইজামের ভূমিকা) শীর্ষক নিবন্ধে "মারা'আতুল-আলম" ও ফুতূহাত-ই-আলমগীরি[৪] নামক দু'টি গ্রন্থের বরাতে কতকগুলো ঘটনা উদ্ধৃত

---

১. মকতূবাতে সায়ফিয়া, পত্র নং ২;
২. মকতূবাতে খাজা মুহাম্মদ মা'সূম, পত্র নং ২২০;
৩. আবুল ফাতাহ, আদবে আলমগীরি, ২খ, ৪৩১পৃ.;
৪. এ দু'টো বই লণ্ডনের অফিস লাইব্রেরী ও বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

করেছেন যা থেকে জানা যায় যে, সম্রাটের এই খান্দান এবং হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর সন্তানদের মধ্যে গভীর সম্বন্ধ ছিল।[১] তাঁরা সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাত করতেন এবং বাদশাহ তাঁদের খেদমতে মূল্যবান তোহফা ও উপহার-উপঢৌকন পেশ করতেন। দিল্লী থেকে লাহোর যাবার ও ফেরার পথে তিনি কয়েকবার সরহিন্দে হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম এবং মুজাদ্দিদী খান্দানের অপরাপর সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হন।

মুফতী গোলাম সরওয়ার সাহেব লিখিত 'খাযীনাতুল-আসফিয়া'র বর্ণনা মুতাবিক সম্রাট হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূমের খেদমতে অনুরোধ জানান যেন তিনি ঘরে ও বাইরে সফর অবস্থায় তাঁর সঙ্গে থাকেন। কিন্তু তিনি তাঁর সম্মানিত পিতার উপদেশ মুতাবিক সম্রাটের সঙ্গে থাকা পছন্দ করেন নি এবং নিজের জায়গায় আপন পুত্র খাজা সায়ফুদ্দীনকে দিল্লী পাঠিয়ে দেন। মকতূবাতে মা'সূমিয়া'তে দু'টি পত্র, একটি ২২১ নং পত্র, অপরটি ২২৭ নং পত্র সম্রাটের নামে লিখিত। আলোচ্য পত্র দু'টি থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূমের সঙ্গে সম্রাটের পীর-মুরিদীর ও তরবিয়তের সম্পর্ক ছিল এবং তাঁর ও সম্রাটের পারস্পরিক সম্বন্ধ, তাঁর দ্বারা সম্রাটের প্রভাবিত হওয়া ও তাঁর হেদায়েত মুতাবিক আমল করার আলোচনা অষ্টম অধ্যায়ে খাজা সায়ফুদ্দীনের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে আসবে। খাজা সায়ফুদ্দীন সম্রাটের সঙ্গে থেকে শরীয়তের প্রচলন

---

১. সম্রাট আলমগীরকে লিখিত হযরত খাজা সায়ফুদ্দীন-এর পত্রাবলী "মকতূবাতে সায়ফিয়া" নামে প্রকাশিত হয়েছে। ভিন্ন দৃষ্টিতে পাঠ করলে অনুমান করা যায় যে, সম্রাটের সম্পর্ক হযরত খাজা সায়ফুদ্দীনের সঙ্গে বিশেষভাবে এবং মুজাদ্দিদী খান্দানের সঙ্গে সাধারণভাবে কেবল শ্রদ্ধা ও ভক্তির ছিল না যেমনটি দীনদার ও সুধারণা বিশিষ্ট সম্রাটগণ তাদের শাসনামল ও সাম্রাজ্যের আলিম-উলামা ও বুযুর্গদের সঙ্গে পোষণ করতেন বরং এ সম্পর্ক রীতিনীতি (যাবেতা)-র তুলনায় সম্বন্ধ (রাবেতা) এবং ভক্তি-শ্রদ্ধার তুলনায় প্রশিক্ষণ ও উপকৃত হবার ছিল। হযরত খাজা সায়ফুদ্দীন তাঁর পিতাকে লিখিত এক পত্রে বলেন ঃ

"হযরত সালামত! এই দিনগুলোতে দীর্ঘ ও লম্বা সান্নিধ্য ও মজলিস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোন কোন সূক্ষ্মপত্রের আলোচনাও হয় এবং সম্রাট পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে তা শোনেন।" ১৪২ নং পত্রে যা শায়খ মুহাম্মদ বাকের লাহোরীর নামে লিখিত, তিনি বলেন,

"বাদশাহ দীনে পানাহ শনিবার রাত্রে যা এ মাসের তৃতীয় রাত্রি ছিল, গরীব খানায় আগমন করেন। যেই সাধারণ খাবার উপস্থিত ছিল তিনি তাই খেলেন। দীর্ঘ সময় সাহচর্যে অতিবাহিত করেন। মাঝে তিনি নিশ্চুপ থাকেন, মজলিসও অনুষ্ঠিত হয়। সংক্ষেপে এই যে, আশা করা যায় নিষ্ঠাবানদের অভিলাষ মাফিক তরীকায়ে আলিয়ার প্রচলন প্রকাশ পাবে।"

সম্পর্ক ও প্রভাবের এই সিলসিলা আলমগীরের ওফাতের পরও অব্যাহত থাকে। চিশতী নিজামী সিলসিলার মশহূর শায়খ যার মাধ্যমে এই তরীকা নব জীবন লাভ করে, শাহ কলীমুল্লাহ জাহানাবাদী (মৃ. ১১৪৩ হি.) তাঁর বিশিষ্ট খলীফা হযরত শায়খ নিজামুদ্দীন আওরঙ্গাবাদীকে লিখিত কোন কোন চিঠিতে নির্দেশ দেন যে, যেহেতু এই মুহূর্তে সম্রাটের সঙ্গে আওরঙ্গাবাদে মুজাদ্দিদী খান্দানের সাহেবযাদা আছেন সেজন্য সামা ও কাওয়ালীর মাহফিল অনুষ্ঠানে সতর্কতা অবলম্বন করা হোক যাতে করে তাঁর খারাপ না লাগে ও মনঃকষ্টের কারণ না হয়। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, দাক্ষিণাত্যের অভিযানে এবং সেখানকার দীর্ঘ অবস্থানে এই খান্দানের উঁচু মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিবর্গও সময় সময় সম্রাটের সান্নিধ্যে অংশগ্রহণ, দু'আ ও তাওয়াজ্জুহর মাধ্যমে সহযোগিতা করতেন।

ও সুন্নাহ পুনরুজ্জীবনের কাজে আগা-গোড়া সক্রিয় ও তৎপর থাকেন। তাঁর লিখিত পত্র সংকলন "মকতূবাতে সায়ফিয়া'তে সম্রাটের নামে ১৮টি পত্র[১] স্থান পেয়েছে যে সব পত্রে সম্রাটের মনোযোগ বিদ'আত উৎসাদন, সুন্নত পুনর্জীবন এবং আল্লাহ্র কলেমা ও বাণীকে বুলন্দ ও সমুন্নত করার দিকে টেনে আনা হয়েছে।

সাম্রাজ্যের কোন শাসক ও স্বশাসিত সম্রাটের গোটা কর্মকাণ্ড ও আখলাক-চরিত্র, তাঁর সিদ্ধান্ত ও গৃহীত পদক্ষেপসমূহের যিম্মাদারী গ্রহণ করা কঠিন এবং সেগুলোকে ইসলামী শিক্ষামালা ও শরীয়তের আহকাম তথা বিধি-বিধান মুতাবিক প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এতো কেবল খুলাফায়ে রাশেদীন এবং এমন কতিপয় শাসক সম্পর্কে বলা যায় যাঁরা উমাইয়া খলীফা হযরত ওমর ইবন আবদুল আযীয-এর ন্যায় খিলাফাত 'আলা মিনহাজু'ন-নবুওয়ার সমর্থক ছিলেন এবং সে মুতাবিক কাজও করেছেন। অতঃপর এই বিতর্কিত পদক্ষেপ এবং রাজনৈতিক ও এন্তেজামী কার্যকলাপসমূহ কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে ও উপযোগিতাকে সামনে নিয়ে গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং ঐতিহাসিকবৃন্দ সে সবের যেই চিত্র অংকন করেছেন তাও বা কতটা জেনেশুনে করেছেন, অধিকন্তু দীর্ঘকাল গুজরে যাবার পর এবং বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যের অবর্তমানে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ও রায় প্রদান করা সহজ নয়। এরপরও সম্রাট আলমগীর সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উপকরণ বিদ্যমান বিধায় সেসবের ওপর ভিত্তি করে নির্দ্বিধায় ও পরিপূর্ণ আস্থা সহকারে বলা যায় যে, সম্রাট হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক আন্দোলন, সাম্রাজ্যকে "ইসলামের ধ্বংসকারী"র পরিবর্তে "ইসলামের সেবক ও খাদেম" বানাবার বিপ্লবাত্মক কিন্তু নীরব প্রয়াস এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিদের ও পরিবারের গভীর ও নিঃস্বার্থ রূহানিয়াত ও চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব দ্বারা পরিপূর্ণরূপে প্রভাবিত ছিলেন এবং তিনি হযরত মুজাদ্দিদের দাওয়াত ও উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের সঙ্গে নিজকে একই সূত্রে গেঁথে নিয়েছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যে নিয়ম-নীতি শৃঙ্খলা এবং সাম্রাজ্যের মধ্যে সাহসী ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনতে চাচ্ছিলেন এবং তিনি প্রথমবারের মত এমন কতকগুলো সংস্কারমূলক কাজ করেছিলেন যদ্দরুন যদিও সরকারের ও রাষ্ট্রের অর্থনীতি প্রভাবিত হত, কিন্তু শরীয়তের কতকগুলো সুস্পষ্ট বিধানের কার্যকর বাস্তবায়ন হত।

আমরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে এই মুহূর্তে পেছনে ফেলে যে সম্পর্কে সমস্ত ঐতিহাসিক একমত যে, তিনি একজন শরীয়তের পাবন্দ, ধর্মের খাটি অনুসারী বরং তাঁর জীবন একজন মুত্তাকী পরহেযগার মুসলমানের জীবন ছিল এবং যার জন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে গুটিকয়েক নমুনাই যথেষ্ট।

"রমযান মাস। লু হাওয়া বইছিল। দিনও ছিল বড়। বাদশাহ দিনের বেলা রোযা রাখতেন। ওজীফা পাঠ করতেন। কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন।

১. পত্র নং ২০, ২২, ২৩, ২৬, ৩৪, ৩৯, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬৭,৭২, ৭৪, ৭৬, ৮০, ১৬১, ১৬৪, ১৬৫, মকতূবাতে সায়ফিয়া)।

লেখালেখি করতেন। কালাম পাক হিফজ করতেন এবং আপন আদালত ও সাম্রাজ্যের কাজগুলো নিষ্ঠার সাথে আঞ্জাম দিতেন। সন্ধ্যাবেলায় ইফতার করে মোতি মসজিদে সালাত আদায় করতেন, তারাবীহ ও নফলাদি আদায় করতেন। মাঝরাতে অল্প কিছু খেয়ে নিতেন। রাতের বেলা খুব কম ঘুমাতেন। অধিকাংশ সময়ই ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। কতকগুলো বরকতময় রাত্রে সারারাতই ইবাদত-বন্দেগীতে কাটিয়ে দিতেন। আর এভাবেই গোটা মাস কেটে যেত।"[১]

ইনতিকালের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক লিখেন ঃ "হিজরী ১১১৮; জ্বরের প্রকোপ খুব বেশি। চারদিন পর্যন্ত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও পরিপূর্ণ তাকওয়া সহকারে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামা'আতের সাথেই আদায় করেন। মৃত্যুর আগেই ওসিয়তনামা তৈরি করেছিলেন। এতে তিনি দাফন-কাফন সম্পর্কে লিখেছিলেন যে, সাড়ে চার টাকা যা আমি টুপি সেলাই করে জমিয়েছিলাম তা দিয়ে দাফন-কাফন করবে। আটশত পাঁচ টাকা যা আমি কুরআন নকল করে কামিয়েছিলাম তা ইয়াতীম-মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দেবে। ২৮শে যী-কা'দাহ, জুমুআর দিন ১১১৭ হিজরী সম্রাট ফজরের সালাত আদায় অন্তে কলেমায়ে তওহীদের যিক্র শুরু করেন। বেলা এক প্রহর হতেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করে অনন্তের পথে প্রস্থান করেন।[২]

আমরা এখানে সম্রাট আলমগীরের কেবল সেসব নির্দেশ ও ফরমান সম্পর্কে আলোচনা করব যেগুলো ইসলামী শি'আর (অভ্যাস, রীতিনীতি ও প্রতীকি চিহ্ন)-এর সম্মান এবং শরীয়তের বিধানসমূহের প্রচলন ও প্রয়োগের সঙ্গে সম্পর্কিত।

হিজরী ১০৬৯ সাল এবং সিংহাসনে আরোহণের দ্বিতীয় বছরের ঘটনাবলীর উল্লেখ করতে গিয়া ঐতিহাসিক লিখছেন ঃ

"জালালুদ্দীন মুহাম্মদ আকবর শাহের আমল থেকে দফতর ও জুলূসের বছর ও মাসের ভিত্তি গার্রাহ ফারওয়ার্দীর ওপর রাখা হয়েছিল। এই তারিখে সূর্য তারকা-গর্ভে প্রবেশ করে। বসন্তের মৌসুম। এই সম্রাটের জুলূসের তারিখও এই তারিখের কাছাকাছি ছিল। তো তিনি গোটা হিসাব ফারওয়ার্দী থেকে নিয়ে ইস্কানদার[৩] মাস পর্যন্ত নির্ধারণ করেছিলেন এবং মাসের নাম 'মাহে ইলাহী' রেখেছিলেন। যেহেতু এই পন্থা-পদ্ধতি অগ্নিপূজক বাদশাহ ও অগ্নি উপাসকদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ সেজন্য সম্রাট শরীয়তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে জুলূস, জশ্ন ও দফতরের হিসাবের জন্য বছর ও মাস আরবী চন্দ্র বর্ষের হিসাবে নির্ধারণ করেন এবং হুকুম দেন যে, সৌর বছরের ওপর আরবী বছর ও মাসের অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নওরোযের উৎসব এখন থেকে একেবারে রহিত করা হল।

---

১. তারীখে হিন্দুস্তান, ৮ম খণ্ড, শামসুল উলামা যাকাউল্লাহ দেহলভীকৃত, ২১৪ পৃ.।
২. তারীখে হিন্দুস্তান, ৮ম খণ্ড, ৪৬৫ পৃ.।
৩. ফারওয়ার্দী ও ইস্কান্দার প্রাচীন ইরানী বর্ষপঞ্জীর মাস।

"সকলেই জানে যে, সব সময় মৌসুমগুলোতে চন্দ্র মাসের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। চন্দ্র বছর ও মাসের হিসাব রাখতে বেশ কষ্ট হয়। কিন্তু এই ধার্মিক সম্রাট হিসাবের সহজের দিকে তাকান নি। শুধু অগ্নি উপাসক ও মজূসীদের সঙ্গে সাদৃশ্যের কারণে নওরোযের উৎসব রহিত করেন এবং ২য় জুলূসের তারিখ গার্রাহ রমযান নির্ধারণ করে তিনি জুলূসের নতুন বছর নির্ধারণ করেন এবং নওরোয উৎসবের জায়গায় ঈদুল ফিতরের উৎসব নির্ধারণ করেন"।[১]

সরকারী আয়-আমদানীর এক বিরাট উৎস যা শরীয়তসম্মত ছিল না তা রহিতকরণ সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক লিখছেন ঃ

"সম্রাট রাহদারী মাফ করে দেন। এই রাহদারী (পথকর) সকল পথের মোড়ে ও মাথায় নির্দিষ্ট সীমান্তে আদায় করা হত। এ থেকে লব্ধ ও অর্জিত সকল অর্থ রাজভাণ্ডারে জমা হত। পান্দরী তাঁকে তহবাজারী বলে, এ থেকেও যে লক্ষ লক্ষ টাকা রাজস্ব হিসেবে আদায় হত তাও রাজকোষে জমা হত এবং শরীয়ত-সম্মত ও শরীয়ত বিরোধী আরও বহু কর, নেশাকর বস্তুর ওপর ধার্যকৃত কর, ক্রীড়া-কৌতুকের ওপর থেকে আদায়কৃত কর, বিবিধ প্রকার জরিমানা থেকে আদায়কৃত কর, শোকরানা কর প্রভৃতি বাবদ যেই কোটি কোটি টাকা সরকারী রাজকোষে আসত তা সবই এই সম্রাট ভারতবর্ষ থেকে মাফ ও মওকূফ করে দেন।"[২]

মুহতাসিব বা ন্যায়পালের পদ শরঈ হুকূমতের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পদ এবং ইসলামী খেলাফতের একটি প্রতীক চিহ্ন ছিল। বহু আলিম-উলামা এই পদের ধরন ও প্রকৃতি, এর দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর الحسبة فى الاسلام নামে কিতাবও লিখেছেন। ভারতবর্ষের মুসলিম রাজ্যগুলোতে বহু কাল থেকে এই পদ স্থগিত ও এই কাজ বন্ধ ছিল। সম্রাট এই সুন্নতটি জীবিত করেন। ঐতিহাসিক লিখছেন,

"সম্রাট একজন প্রভাবশালী আলিমকে মুহতাসিব (ন্যায়পাল) নিযুক্ত করেন। তার ওপর নির্দেশ ছিল, তিনি মানুষকে নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তু থেকে বিশেষত মদ পান, ভাং, চাউল, বার্লি প্রভৃতি থেকে তৈরি উত্তেজক মদ, সর্বপ্রকার নেশা জাতীয় বস্তু ও অশ্লীলতা থেকে নিষেধ করবেন ও বিরত রাখবেন এবং যথাসাধ্য খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবেন।"[৩]

ইয়াযদহম বর্ষ ও হিজরী ১০৭৮-এর ১ম তারিখের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক লিখছেন ঃ

"প্রতিদিনই শরীয়ত সংক্রান্ত বিষয়াদি প্রচলন এবং ঐশী আদেশ-নিষেধ-এর প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনের ব্যাপারে সম্রাটের বাধ্য-বাধকতা বৃদ্ধি পেত। বিস্তারিত

১. প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, ৮৩-৮৪ পৃ.
২. প্রাগুক্ত, ৯০ পৃ.। ৩. প্রাগুক্ত, ৯২ পৃ.।

বিধানসমূহ জারী হত যে, পথকর ও পান্দ্রী প্রভৃতি মওকূফ করা হোক যার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকার রাজস্ব প্রতি বছর সরকারী রাজকোষে জমা হত। তিনি নেশা জাতীয় বস্তুর প্রচলন ও শয়তানের আড্ডা বন্ধ করতেন"।[১]

সামনে অগ্রসর হয়ে লিখছেন ঃ

"সম্রাট গান-বাজনা ও নৃত্যকে নিষেধ করে নির্দেশ জারী করেন। ঝরোকা দর্শনকে শরীয়ত বিরোধী জেনে ঝরোকায় নিজে বসা এবং ঝরোকার নিচে মানুষের জমায়েত হওয়াকে নিষিদ্ধ করে দেন"।[২]

ভারতীয়দের প্রাচীন নিয়ম ও বিশ্বাস মুতাবিক মুসলমান রাজা-বাদশাহগণও জ্যোতিষ শাস্ত্র ও জ্যোতিষীদের ওপর অনেক বেশি নির্ভর করতেন এবং তাদের দেওয়া হিসাব ও ফয়সালা মাফিক বিভিন্ন কাজ-কর্মের দিন তারিখ ধার্য করতেন। আলমগীর এটাও বন্ধ করে দেন। সবচে' বড় কথা হল, আদালতী ফয়সালাগুলোর গোটাটাই আমীর-উমারার ও শাসকদের আদালত এবং তাদের ফয়সালার ওপর নির্ভরশীল ছিল। আলমগীর শরীয়তের কাযী নিযুক্ত করেন এবং এক্ষেত্রে তাঁদেরকে সর্বোচ্চ এখতিয়ার (ক্ষমতা) প্রদান করেন।

"কবি ও জ্যোতিষী যারা খুব এখতিয়ারসম্পন্ন ছিলেন, বিশেষত সম্রাট শাহজাহানের আমলে, তাদের এখতিয়ার রহিত করেন। রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি ও ছোট-বড় মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে কাযী নিযুক্ত করা হয় এবং এ নিযুক্তি এমন স্থায়ী ছিল যে, সর্বোচ্চ পদাধিকারী আমীরগণ তাদেরকে ঈর্ষা করতেন, হিংসা করতেন।"[৩]

সমগ্র সাম্রাজ্যে শরঈ আইন-কানূন জারীর ও বিচারকদের বিচারকার্য সহজতর করার জন্য ফিক্হী মসলা-মাসাইল প্রণয়ন ও বিন্যস্তকরণের বিরাট বোঝা কাঁধে তুলে নেন এভং নির্ভরযোগ্য আলিম-উলামার একটি দলকে এ উদ্দেশ্যে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তারা সহজ সরল ভাষায় ও বাক্যে খুঁটিনাটি মসলাগুলোকে এক জায়গায় জমা করবেন এবং যে যেখান থেকে নেবেন তার বরাত বা সূত্র উল্লেখ করবেন। এজন্য রাজত্বের প্রথম থেকেই মাওলানা নিজামুদ্দীন বুরহানপূরীকে এর দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি সে সব আলিম থেকে সাহায্য গ্রহণ করেন যাঁরা হানাফী ফিক্‌হে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার ছিলেন।[৪] এ কাজ ৬ খণ্ডে সমাপ্ত হয় এবং

---

১. নুযহাতুল খাওয়াতির প্রণেতা ফারসী ইতিহাসের সূত্রে লিখেছেন, আলমগীর ১০৬৯ হি. তে ৮০ প্রকার অবৈধ ট্যাক্স মওকুফ করেছিলেন যার মোট আয় ছিল ৩০ লক্ষ বার্ষিক।

২. প্রাগুক্ত,২৭৫-৭৬ সংক্ষেপে।

৩. প্রাগুক্ত,২৭৭ পৃ. আরও দ্র. জহীরুদ্দীন ফারূকীর "আওরঙ্গযেব" নামক গ্রন্থের ৫৫৯-৬২ পৃ. A Reformer নামক অধ্যায়।

৪. হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই তাঁর الثقافة الاسلامیہ فی الهند নামক গ্রন্থে অনেক অনুসন্ধানের পর সেসব আলিমের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন যারা উক্ত বোর্ডে ছিলেন। তিনি এমন বিশজনের নাম লিখেছেন যারা গোটা ভারতবর্ষের জ্ঞানী-গুণী মহলের প্রতিনিধিত্ব করতেন। দামিশ্‌ক একাডেমী থেকে প্রকাশিত, পৃ. ১১০-১১১।

রাজকোষ থেকে এ বাবদ দু'লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয় (যা সে যুগের হিসাবে অবশ্যই বিরাট অংকের অর্থ ছিল)। এটি ভারতবর্ষে "ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি" নামে এবং মিসর, সিরিয়া ও তুরস্কে "আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা" নামে মশহূর এবং কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের দরুন এটি বিরাট গুরুত্ব অর্জন করেছে।

এর চেয়েও অধিক সাহসী পদক্ষেপ ছিল এই যে, সম্রাট তাঁর বিরুদ্ধেও প্রজা-সাধারণকে বিচার চাইবার ও শরীয়ত মুতাবিক ফয়সালা করাবার অনুমতি প্রদান করেন এবং এ কাজের জন্য শর'ঈ উকীল নিযুক্ত করেন। ভারতীয় ঐতিহাসিক লিখেন ঃ

"হি. ১০৮২ সালে সম্রাট নির্দেশ দেন যে, শহরে বন্দরে সর্বত্র ঘোষণা দিন, যদি সম্রাটের বিরুদ্ধে কারো কোন শর'ঈ দাবি থাকে তাহলে সে যেন বাদশাহ্র উকীলের কাছে মামলা রুজূ' করে এবং প্রমাণ সাপেক্ষে তার হক নিয়ে নেয় এবং এও নির্দেশ দেন, বাদশাহ্র পক্ষ থেকে শর'ঈ উকীল কাছে এবং নিকটবর্তী ও দূরবর্তী শহরগুলোতে নিযুক্ত হবেন যাতে করে যারা সম্রাট সমীপে হাজির হবার সাহস রাখে না তারা তার মাধ্যমে তাদের হক যেন দাবি করতে পারেন।[১]

মোগল দরবারে এবং মোগল সম্রাটদের জন্য সাধারণভাবে কুর্নিশ ও শাহী আদব প্রদর্শনের নিয়ম প্রচলিত ছিল যেগুলোতে বাড়াবাড়িমূলক সম্মান ও শরীয়ত বিরোধী আমল অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুন্নত মুতাবিক সালাম প্রদানের রেওয়াজ শাহী দরবারে তো দূরের কথা, আমীর-উমারা ও রঈস বরং বহু উলামা' ও মাশায়েখ-এর মজলিসেও ছিল না। সম্রাট এক্ষেত্রেও সংস্কার সাধন করেন এবং সুন্নত মুতাবিক সালাম প্রদানকেই যথেষ্ট মনে করার ব্যাপারে তাকীদ দেন। ঐতিহাসিকের ভাষায় ঃ

"ঐ দিনগুলোতেই হুকুম হল, মুসলমানরা যখন সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন শরীয়ত যেভাবে সালাম দিতে বলেছে অর্থাৎ আস-সালামু আলায়কুম বলে সালাম দেবে এবং একেই যথেষ্ট ভাববে। কাফিরদের মত মাথার ওপর হাত রাখবে না। কর্মকর্তারাও সাধারণ ও বিশিষ্ট সবার সাথে একই তরীকাই এখতিয়ার করবেন।"[২]

ঐ সব আবেগদীপ্ত প্রেরণা ও পদক্ষেপের ফলে ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও দীনি মহল বাদশাহ্ আলমগীরকে "মুহ্য়িদ্দীন" অর্থাৎ "ধর্মের পুনর্জীবন দানকারী" উপাধি প্রদান করেন। আল্লামা ইকবালের মতেও (যিনি ভারতীয় উপমহাদেশের ঝোঁক-প্রবণতা ও দর্শন, বেদান্ত দর্শন ও শরীয়তের মুখোমুখি হওয়া এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যত ছবির ভাগ্য পরীক্ষার ওপর গভীর দৃষ্টি ছিল।) আলমগীর ঐ

---

১. প্রাগুক্ত, ৩০০ পৃ.।

২. আলমগীরের প্রকাশ্য ধর্মীয় প্রবণতা এবং সাম্রাজ্যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে যদুনাথ সরকারের History of Aurangzib, vol-III, p-90. এবং lanepool-এর Aurangzib দ্র.।

সব কতিপয় ব্যক্তির অন্তর্গত ছিলেন যাঁদের মাথার ওপর এদেশে ইসলামের অস্তিত্ব নির্ভর করছিল। স্বয়ং গ্রন্থকারও তাঁর এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার, যা ২২শে নভেম্বর, ১৯৩৭ সালে লাহোরে কবির নিজ বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সম্পর্কে লিখতে গিয়ে "আরিফ হিন্দী কী খেদমত মে চন্দ ঘন্টে" নামক এক নিবন্ধে বলেছিলেন,

"ভারতবর্ষে ইসলামের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে কথা উঠলে আল্লামা (ইকবাল) মুজাদ্দিদ আলফেছানী, হযরত শায়খ আহমদ সরহিন্দী, হযরত শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ দেহলভী এবং সুলতান মুহ্য়িদ্দীন আলমগীরের খুবই প্রশংসা করলেন এবং বললেন, আমি সব সময় বলি, যদি তাঁদের অস্তিত্ব ও চেষ্টা-সাধনা এর পেছনে না থাকত তাহলে হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতি ও দর্শন ইসলামকে নিজের ভেতর হজম করে নিত।"

তিনি (আল্লামা ইকবাল) তাঁর এই নিশ্চিত বিশ্বাস ও গবেষণার ওপর ভিত্তি করেই আলমগীরের শানে নিম্নের আবেগদীপ্ত ও চিন্তা-উদ্দীপক কবিতাটি রচনা করেছিলেন ঃ

شاه عالمگیر گردوں استاں - اعتبار دود مان گور گاں

پایه اسلامیاں بر ترازو - احترام شرع پیغمبر ازو

در میان کار زار کفرو دین - ترکش مارا خدنگ آخریں

تخم الحادے که اکبر پرور ید - بازاندر فطرت دار ادمید

شمع دل در سینه هاروشن نبود - ملت ما ازفسادایمن نبود

حق گزید از ہند عالمگیر را - آں فقیر صاحب شمشیر را

از پئے احیائے دین مامور کرد - بہر تجدید یقین مامور کرد

برق تیغش خد من الحاد سوخت - شمع دین در محفل ما برفروخت

کور ذوقان داستانہا ساختند - وسعت ادراك او نشناختند

شعله توحیدرا پروانه بود - چوں براهیم اندریں بتخانه بود

درصف شاہنشہاں یکتاستے

فقراو از تربتش پیدا ستے

শেষ পর্যন্ত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর দু'জন মর্যাদাবান খলীফা ও প্রকৃত স্থলাভিষিক্ত হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম ও হযরত সাইয়েদ আদম বান্নুরী এবং

তাঁদের একনিষ্ঠ ও মর্যাদাবান খলীফা ও স্থলাভিষিক্তদের চেষ্টা-সাধনা এদেশে ফলপ্রসূ হয় এবং হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীতে ক্রমান্বয়ে এদেশ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের (যার ওপর চিন্তাগত ও জ্ঞানগত জড়তার মেঘ ছেয়ে ছিল) আধ্যাত্মিক ও ইলমী মারকাযে পরিণত হয় এবং মুসলিম বিশ্বের দূরদরায এলাকা থেকে লোকেরা এখানে তাদের আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানগত পিপাসা নিবারণের, তাযকিয়া ও ইহ্সানের মনযিল অতিক্রম এবং হাদীছের দরস গ্রহণের নিমিত্ত আসতে থাকে। এখানকার জায়গায় জায়গায় মুজাদ্দিদী খানকাহ্, কুরআন ও সুন্নাহ্র তা'লীম ও দরসে হাদীছের কেন্দ্র কায়েম হয়ে যায় এবং এক বিশাল জগত সেসব থেকে উপকৃত হয়।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বিরোধিতা ও তাঁর প্রতি পথভ্রষ্টতার অভিযোগ এবং এ অভিযোগের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবৃন্দ

এ অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকবে এবং পাঠকের সামনে কেবল একটি দিকই আসবে (যা যদিও খুবই উজ্জ্বল, প্রোজ্জ্বল ও আলোকিত এবং মুজাদ্দিদ সাহেবের সীরাত তথা জীবন-চরিত ও ইতিহাসে এদিকটি প্রধান ও উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে), যদি আমরা এই বিরোধিতামূলক আন্দোলন ও অভিযানের আলোচনা না করি যা মুজাদ্দিদ সাহেবের জীবনের শেষ পাদেই শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং যা ভারতীয় উপমহাদেশের সীমানা অতিক্রম করে হারামায়ন শারীফায়ন (মক্কা মু'আজ্জমা ও মদীনা মুনাওয়ারা) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে যার বুনিয়াদ মুজাদ্দিদ সাহেবের কোন কোন লেখা ও পত্রের কিছু কিছু এবারত ও বিষয়বস্তুর ওপর ছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীকে তাঁর জীবনেই সেই সাধারণ জনপ্রিয়তা দান করেছিলেন এবং মানুষ যেভাবে তাঁর দিকে ঝুঁকে ছিল এবং সূফী-বুযুর্গ ও আলিম-উলামা থেকে শুরু করে সরকারী প্রশাসনের লোকদের ওপর তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব পড়েছিল এবং কয়েক বছরের মধ্যে নক্শবান্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া সিলসিলা ভারত ও ভারতবর্ষের বাইরে যেভাবে বিস্তার লাভ করেছিল, অধিকন্তু তিনি যেসব নতুন ইল্ম ও জ্ঞান-গবেষণা তাঁর মকতূবাত ও মজলিসের মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিলেন যার অনেকগুলোই, সাধারণের কথা নাইবা বললাম, বহু বিশিষ্ট লোকের কাছেই অপরিচিত এবং একটি সীমা পর্যন্ত (যদিও ভীতিকর নাও হয়) বিস্ময়কর তো অবশ্যই ছিল এবং সেসবের মধ্যে অনেকগুলোই সেই সব কেন্দ্রের স্বীকৃত ও মান্য বিষয়-বস্তুর বিরোধী ছিল যা বংশ ও প্রজন্ম-পরম্পরায় স্থানান্তরিত হয়ে চলে আসছিল এবং এই ব্যাপারটি অধিকাংশ সময় সেই সব ক্ষণজন্মা পুরুষদের ক্ষেত্রেই সংঘটিত হয়েছে যাঁরা কোন ইল্ম ও বিষয় শাস্ত্রের মুজতাহিদ, কোন সিলসিলা ও তরীকার প্রতিষ্ঠাতা এবং স্বীয় যুগের সাধারণ জ্ঞানগত, মেধাগত ও অপ্রকাশ্য

মাপের চেয়ে উন্নত হন এবং যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা 'ইলম ও আল্লাহ প্রদত্ত কামালিয়াত দ্বারা ধন্য ও ভূষিত করে থাকেন এবং যাঁরা সাধারণ পরিভাষা ও প্রাচীন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বৃত্ত থেকে বাইরে পা রাখেন। অতঃপর তিনি বিদ'আতে হাসানার বিরুদ্ধে যেই কলমী জিহাদ শুরু করেন, পীর-বুযুর্গদের জন্য সিজদায়ে তা'জীমি বা সম্মানসূচক সিজদা, নৃত্য ও সামা, শব্দোচ্চারণের মাধ্যমে সালাতের নিয়ত করা, জামা'আতের সাথে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা ও মীলাদ মাহফিলের বিরোধিতা করেন কিংবা কাশ্ফ শরীয়তের দলীল নয়, তরীকতের মাশায়েখ ও আওলিয়ায়ে কিরামের পরিবর্তে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের কথা শরীয়তের দলীল বলে তিনি প্রমাণ করেন এবং কাশ্ফের বিশুদ্ধতা ও অভ্রান্ততা নিয়ে তিনি কথা বলেন ও স্বীয় যুগ ও দেশের বহু সিলসিলা ও খানকাহ্র প্রচলিত ও পরিচিত মা'মূলাতগুলো সুন্নাহ বিরোধী হওয়া জাহির করেন। অতঃপর এসবগুলোর থেকেও বেশি ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ থেকে (যাকে এক অকাট্য সত্য এবং মুহাক্কিক সূফীদের একটি সম্মিলিত মসলা মনে করা হত) এবং শায়খ-এ আকবর (মুহ্য়িদ্দীন ইব্ন আরাবী)-এর জ্ঞান ও গবেষণা থেকে, যাকে ইল্ম ও মা'রিফতের সিদরাতুল মুনতাহা (সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত ধাপ) অভিহিত করা হয়েছিল, সামনে পা বাড়ান, অগ্রসর হন এবং এর সমান্তরাল "ওয়াহদাতু'শ-শুহূদ"-এর দর্শন পেশ করেন। এরপর তাঁর সম্পর্কে মুখে ও কলমে একেবারে চুপ থাকা এবং কোনরূপ বিরোধিতা ও প্রত্যাখ্যানমূলক বরং পথভ্রষ্টতামূলক আন্দোলন ও অভিযান তাঁর শেষ-যমানায় কিংবা তাঁর তিরোধানের পর পরই সৃষ্টি না হওয়া কেবল সংস্কার ও পুনর্জাগরণের ইতিহাসে নয় বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও সংকলনের ইতিহাসেও একটি দুর্লভ ঘটনা হত।

এসব মতভেদ ও বিরোধিতাকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি সেই সব বিরোধিতা যা বিরোধিতাকারীদের কোন ভুল বর্ণনার ভিত্তিতে কিংবা কোন ভুল বোঝাবুঝির ফলে সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই ভুল বর্ণনা ও ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন হওয়া কিংবা সেই ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়ে যাবার পর নিরসন ঘটেছে। দ্বিতীয় সেই সব বিরোধিতা যা আকীদা-বিশ্বাস ও মতের ভিন্নতা অথবা কোন প্রকার গোত্রপ্রীতি কিংবা ব্যক্তিগত শত্রুতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল।

প্রথম প্রকারের মধ্যে আমরা হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (মৃ. ১০৫২ হি.)-র মতভেদকে ধরছি যাঁর জ্ঞানগত ও ধর্মীয় মর্যাদাগত অবস্থান, ইখলাস তথা নিষ্ঠা ও লিল্লাহিয়্যাত ও ধর্মীয় মর্যাদাবোধ স্বীকৃত বিষয় এবং যিনি হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর পীর ভাইও ছিলেন। সেই সাথে আপন পীরের খলীফা ও এজাযতপ্রাপ্তও বটেন। তিনি হযরত মুজাদ্দিদের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন,

তাঁর কোন কোন কথা ও গবেষণার ব্যাপারে বিস্ময় ও ভীতি প্রকাশ করেছেন এবং একপত্রে যা তিনি হযরত মুজাদ্দিদের নামে লিখেছেন, এর খোলাখুলি প্রকাশ করে দিয়েছেন।[১] হযরত শায়খ আবদুল হকের এই দীর্ঘ পত্রে হযরত মুজাদ্দিদের যেসব কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে সে সব সম্পর্কে মুজাদ্দিদী সিলসিলার বহু জ্ঞানী-গুণী আলিম ও সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতের সুচিন্তিত ও গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্ত হল, এটি একটি ব্যক্তিগত পত্র ছিল। হযরত শায়খ একে তাঁর "আল-মাকাতীব ওয়া'র-রাসাইল"-এ লেখেন নি। হযরত মিরযা মাজহার জানে-জানাঁর এরশাদ মুতাবিক শায়খ তাঁর এ পত্রটিকে নষ্ট করে ফেলার জন্য বলেছিলেন। এই পত্র লেখার ক্ষেত্রে মূলত যেই প্রেরণা ও আবেগ-অনুভূতি কাজ করেছে (এবং যা আসলেই প্রশংসনীয়) তা শায়খ-এরই ধারণা যে, মুজাদ্দিদ সাহেবের কোন কোন কথা ও গবেষণা দ্বারা কতিপয় এমন বুযুর্গের খাটোকরণ ও ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে যাঁদের উচ্চ মর্যাদার ব্যাপারে উম্মত একমত। কিন্তু তাঁর মকতূবাত (পত্র সংকলন)-এর ডুবুরী ও ব্যাখ্যাকার এবং মুজাদ্দিদ সাহেবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে যারা ওয়াকিফহাল তারা বহুবার বহুভাবে এর জওয়াব দিয়েছেন এবং স্বয়ং মকতূবাতের অধ্যয়ন ও হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জীবন এসব অভিযোগকে প্রত্যাখ্যান করে। এসব মকতূব-এর একটি বড় আন্দোলক হযরত শায়খ-এর সায়্যিদুনা 'আবদুল কাদির জিলানীর সঙ্গে সেই ঐকান্তিক ভক্তি-শ্রদ্ধাও যা ইশ্‌ক ও আত্মবিলোপের দর্জা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল এবং সর্বপ্রকারে তা কেবল প্রশংসাযোগ্যই নয় ঈর্ষাযোগ্যও বটে এবং এতে উম্মতের একটি বিরাট শ্রেণী সব যুগে ও সব দেশে শরীক। হযরত শায়খ-এর ধারণা যে, হযরত মুজাদ্দিদের কথা থেকে তাঁর ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রমাণিত হয়। এরও পাল্টা উত্তর হিসাবে লিখিত বিভিন্ন নিবন্ধে সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করা হয়েছে। এখানে সেই পত্রের বিভিন্ন অংশের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদির বিস্তারিত পর্যালোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। এজন্য আমাদের সেই সব রিসালার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে যেসবের উল্লেখ ওপরে করা হয়েছে। উক্ত পত্রে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর দিকে এমন সব কথা নিসবত (সম্পৃক্ত) করা হয়েছে যা সুস্পষ্ট ভিত্তিহীন এবং শত্রুদের দেওয়া অপবাদ। আশ্চর্য লাগে যে, হযরত শায়খ সেগুলো কিভাবে বিশ্বাস করলেন এবং সে সব পত্রে লিখলেন। হযরত শাহ

---

১. এই পত্রের ওপর অধ্যাপক খালীক আহমদ নিজামী "হায়াতে শায়খ আবদুল হক" নামক পুস্তকের শেষাংশে-পূর্ণাঙ্গভাবে লিপিবদ্ধ আছে। দেখুন ৩১২-৪৪ পৃ. এই পত্রের উত্তরে বহু পুস্তিকা লেখা হয়েছে যার ভেতর শায়খ বদরুদ্দীন সরহিন্দী, শায়খ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া (মুজাদ্দিদ সাহেবের কনিষ্ঠপুত্র) শায়খ মুহাম্মদ ফররুখ, শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী, কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী এবং হযরত শাহ গোলাম আলী দেহলভী (র)-র নাম নেওয়া যায়। মাওলানা ওয়াকীল আহমদ সিকান্দরপুরী "হাদিয়ায়ে মুজাদ্দিদিয়া" নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা এরই উত্তরে লিখেছেন। পুস্তকটি ৩৩৬ পৃষ্ঠার।

গোলাম আলী দেহলভীর কলম, যা ছিল ধৈর্য ও সৌম্য-শান্তির প্রতীক, এ ধরনের কথা উদ্ধৃত করতে গিয়ে সেই কলম থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বেরিয়ে যায় ঃ

العياذ بالله اين چه خلاف نويسى است واين چه بے تحقيق گوئى است دربيچ مكتوب ايشاں ايں چنيں عبارت نيست ياشيخ عفا الله عنك -

"আল-'আয়ায বিল্লাহ! আল্লাহ্র পানাহ চাই! এ কী ধরনের ভিত্তিহীন ও অসত্য কথা যার কোন সনদ নেই। হযরত মুজাদ্দিদের কোন পত্রেই এ ধরনের কথা নেই। হযরত শায়খ! আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন।

যেহেতু হযরত শায়খ মুখলিস ছিলেন, নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং তাঁর কলম থেকে সেসব কথা ও বর্ণনা-বিবৃতির ব্যাপারে যেগুলো হযরত মুজাদ্দিদের দিকে নিসবত করা হয়েছিল, যেই বিস্ময় ও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে-এর আন্দোলক ছিল তাঁর ধর্মীয় মর্যাদাবোধ ও ইলমী মকাম। এজন্য যখন তিনি তাঁর ভুল বিবৃতি সম্পর্কে জানতে পারলেন, হযরত মুজাদ্দিদ সম্পর্কে তাঁর ভ্রান্ত ধারণা দূর হল ও তাঁর উচ্চ মর্যাদা তাঁর সামনে প্রকাশিত হল অমনি তিনি এর ক্ষতিপূরণের জন্য এতটুকু বিলম্ব করেন নি এবং উচ্চ কণ্ঠে হযরত মুজাদ্দিদ-এর সঙ্গে তাঁর খুলূস (অকপটতা ও অকৃত্রিমতা) ও ভালবাসা প্রকাশ করেন যা তাঁর মত একজন আলেমে রব্বানীরই শান উপযোগী। তিনি খান হুসসামুদ্দীন আহমদ দেহলভীকে লিখিত এক পত্রে বলেন ঃ

"আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নিরাপদ শান্তিতে রাখুন এবং যাচঞাকারী নিষ্ঠাবান প্রার্থীদের মাথার ওপর তাকে স্থায়ী রাখুন। এই দুই তিন সময়পর্বে আমি আপনার অবস্থা সম্পর্কে না জানার কারণ হয়তো হতে পারে সেই অলসতা যা মানব স্বভাবের মধ্যেই রয়ে গেছে অথবা সেই অভিপ্রায় হতে পারে যে, আপনি যেন পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুন এবং খুশীর খবর শুনতে পারি। আশা করি, আপনি আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাকে অবহিত করবেন।

"বন্দেগী হযরত মিঞা শায়খ আহমদ এর সুসংবাদ জ্ঞাপক খবরের ব্যাপারে গভীর আগ্রহে তাকিয়ে আছি। আশা করি, যাচঞাকারীদের দোআ কবুল হবে। খুবই প্রভাব সৃষ্টি করবে। বর্তমানে তাঁর সঙ্গে অধমের আন্তরিক সম্পর্ক অত্যন্ত বেশী। মনুষ্য স্বভাবের কোন পর্দা কিংবা বিষণ্ন প্রকৃতির কোন প্রভাব আদৌ প্রতিবন্ধক হয় নি। আমি নিজে জানি না এর কারণ কি? এর থেকে চোখ সরিয়ে ও দৃষ্টি এড়িয়ে ন্যায় ও সুবিচারের পন্থার প্রতি রেআয়েত এবং বুদ্ধির নির্দেশে চাহিদা ও দাবি এই যে, এ ধরনের প্রিয়ভাজন বুযুর্গদের প্রতি কু-ধারণা না হওয়াই সমীচীন।

আমার অন্তরে যওক ও আত্যন্তিক প্রেম (وجدان) এবং প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে এমন কিছু অবস্থা ও কাইফিয়ত সৃষ্টি হয়ে গেছে যা বর্ণনা করতে আমার যবান অক্ষম। পাক পবিত্র আল্লাহ্ যিনি মানুষের দিল্ পাল্টানেওয়ালা ও অবস্থা পরিবর্তনকারী, স্থূল দর্শনধারীরা একথা বিশ্বাস করতে চাইবে না। আমি নিজেও জানতাম না আসলে অবস্থাটা কি এবং কেন। বেশি আর কি বলব এবং কি লিখব। প্রকৃত অবস্থার পুরো জ্ঞান তো আল্লাহ্রই আছে।"[১]

দ্বিতীয় প্রকারের মধ্য থেকে আমরা সর্বপ্রথম হি. দ্বাদশ শতাব্দীর একজন হেজাযী আলেম শায়খ হাসান আজমী, অতঃপর মক্কী (যিনি মদীনা মুনাওয়ারায় হাদীছের দরস দিতেন ও সে যুগের মশহূর হানাফী আলেম ছিলেন এবং হযরত শাহওয়ালী উল্লাহ্ সাহেবের উস্তাযুল হাদীছ শায়খ আবূ তাহির কুর্দীর উস্তাদ ছিলেন)[২] -এর কিতাব الصارم الهندى فى جواب سوال عن كلمة السرهندى[৩] -এর ওপর চোখ বুলাচ্ছি। কিতাবের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, ভারতবর্ষ থেকে হারামায়ন শারীফায়নে ১০৯৩ হিজরীতে শায়খ আহমদ সরহিন্দী এবং তাঁর কতকগুলো অনভিপ্রেত কথাবার্তা সম্পর্কে যা তাঁর পত্র সংকলন (মকতূবাত) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, একটি প্রশ্ন এসেছে এবং হারামায়ন শারীফায়ন (মক্কা মু'আজ্জমা ও মদীনা মুনাওয়ারা)-এর উলামায়ে কিরামের কাছে ফতওয়া চাওয়া হয়েছে যে, যিনি এ ধরনের কথা নিজের মুখ দিয়ে বের করবেন অথবা যিনি এ

---

১. বাশারাতে মাজহারিয়্যা, শাহ নঈমুল্লাহ বাহরাইচী, কুতুবখানা নদওয়াতুল উলামায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, ১২৮১ হি.।

২. হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ ছাহেব তদীয় "আনফাসুল আরিফীন" নামক গ্রন্থে তাঁর কথা আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, তিনি হাদীছে শায়খ-এর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলোতে পাণ্ডিত্য রাখতেন। তিনি সুস্পষ্টভাষী (فصيح اللسان) ও তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তিনি অধিকাংশ সময় শায়খ ঈসা মাগরিবীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন এবং তাঁর থেকে উপকৃত হয়েছেন। শায়খ আহমদ কাশশাশী, শায়খ মুহাম্মদ ইবনু'ল-আলা বাবেলী এবং শাফি'ঈ মাযহাবের মুফতী শায়খ যয়নুল 'আবেদীন ইবন আবদিল কাদির তাবারীর সাহচর্যও তিনি লাভ করেছেন। শাহ নি'মাতুল্লাহ কাদেরীর মত তরীকতপন্থী বুযুর্গের সঙ্গেও তিনি সাক্ষাত করেছিলেন এবং দাওয়াতে আসমা'রও চর্চা করতেন। তাঁর দরসে হাদীছে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ ছাহেবের উস্তাদ শায়খ আবু তাহির কুর্দী মাদানী সাধারণত হাদীছের মতন পাঠ করতেন। শেষ বয়সে মক্কায় অবস্থান ছেড়ে দিয়ে তায়েফে এককোণে নির্জন বাস শুরু করেন এবং ১১১৩ হিজরীতে সেখানেই ইনতিকাল করেন এবং সায়্যিদুনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা)-এর পাশে চির বিশ্রাম লাভ করেন (আনফাসুল 'আরিফীন-১৮৬-৮৭ পৃ.)। খায়রুদ্দীন যিরিকলী তাঁর "আল-আ'লাম" নামক গ্রন্থে তাঁকে 'আল-উজায়মী লিখেছেন। পিতার নাম ছিল আলী ইবৃন ইয়াহইয়া। ডাক নাম ছিল আবুল বাকা'। পূর্বপুরুষগণ য়ামানী ছিলেন। হিজরী ১০৪৯ সালে জন্ম (২য় খণ্ড, ২২৩ পৃ.)

৩. আরবী পাণ্ডুলিপি পাটনার খোদা বখশ লাইব্রেরীতে বর্তমান ২৭৫৩ নং। ১০৯৪ হিজরীতে এ গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। এটি কুতুবখানা আসিফিয়ার পাণ্ডুলিপির মধ্যেও বর্তমান। পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় ওপরে কেবল العضب الهندى লেখা আছে। লেখকের নিজের লেখায় কোথাও কিতাবের নাম নেই। উল্লিখিত কুতুবখানায় এ বিষয়ে আরও দু'টি বই বর্তমান।

ধরনের কথার ওপর বিশ্বাস পোষণ করেন কিংবা যিনি এসবের প্রচলন ও প্রচারে অংশ নেন তার ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম কি? এরপর গ্রন্থের সংকলক লিখেছেন যে, আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ ও শায়খ মাওলানা শায়খ মোল্লা ইবরাহীম ইবন হাসান কোরানী আমাকে নির্দেশ প্রদান করলেন এর জওয়াব দিতে এবং হারামায়ন শারীফায়ন-এর উলামায়ে কিরামের এতদসম্পর্কিত রায় ও ফতওয়া উদ্ধৃত করতে। গ্রন্থের লেখক এই সংকলনে দু'জন আলেম-এর যাঁর মধ্যে একজন পূর্বোক্ত মোল্লা ইবরাহীম কোরানী মাদানী, দ্বিতীয় জন আল্লামা জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আবদুর রাসূল আল-বারযানজীর ফতওয়া উদ্ধৃত করেছেন। সর্বপ্রথম এই ফতওয়া যাদের কাছে চাওয়া হয়েছিল সেই দু'জন যথাক্রমে মোল্লা ইবরাহীম কোরানী মাদানী এবং জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আবদুর রসূল আল-বারযানজী সম্পর্কে ব্যক্তিগত পরিচয় লাভ জরুরী। প্রথমোক্ত ব্যক্তির আলোচনা হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী "আনফাসুল আরেফীন" নামক গ্রন্থে (পৃ. ১৮৪-৮৬) করেছেন। ইনি শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর হাদীছের মূল উস্তাদ শায়খ আবু তাহির কুর্দীর পিতা এবং শায়খ। সে যুগের একজন শায়খ ও বুযুর্গ শায়খ ইয়াহ্ইয়া শাবী সম্পর্কে তাঁর সেই অভিমত থেকে, যা শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী উল্লেখ করেছেন এবং যেখানে শায়খ তাঁর ওপর তাজসীম-এর ফতওয়া প্রদান করেন যার জন্য তুরস্কের উযীরে সালতানাত যিনি তাঁর ভক্ত ছিলেন তাকে অবমাননার সাথে মজলিস থেকে বের করে দেন, একথা প্রকাশ পায় যে, তার মেযাজ কতটা খোশবক্ত এবং রায় কায়েমের ক্ষেত্রে ত্বরাপ্রিয় ছিল। সাইয়েদ মুহাম্মদ বারযানজী[১] যিনি এই ফতওয়ার দ্বিতীয় মুফতী-এর আলোচনা করতে গিয়ে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ সাহেব লিখেছেন, তাঁর মেযাজ কতকটা রুক্ষ ও শুষ্ক ছিল (১৮৪ পৃ.)।

এসবের পর ফতওয়া ও উলামায়ে কিরামের অভিমত (রায়) এবং শরীয়তের হুকুম বয়ান ও ঘোষণার ইতিহাসে এই ঐতিহাসিক সত্য ও বাস্তবতা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, উলামায়ে কিরাম ও মুফতীদের সামনে ঘটনার যেমন সূরত বর্ণনা করা হয় এবং যেভাবে সংঘটিত ঘটনা বিবৃত ও উদ্ধৃত করা হয় সেগুলোকে সামনে রেখেই এবং সেসবের আলোকেই ফতওয়া প্রদান করা হয়ে থাকে ও শরীয়তের হুকুম বর্ণনা করা হয়। বিখ্যাত প্রবচন ঃ

---

১. সাইয়েদ মুহাম্মদ বারযানজীর পূর্ণ নাম মুহাম্মদ ইবন আবদুর রাসূল ইবন আবদুস সাইয়িদ আল-হাসানী আল-বারযানজী। হি. ১০৪০ সালে জন্ম এবং ১১০৩ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। জন্মস্থান শাহরে যূর। শেষ বয়সে মদীনা শরীফে অবস্থান করেন। তাঁর "হাল্লু মুশকিলাতু ইবনুল আরাবী" নামে একটি পুস্তক আছে। তিনি সেই বারযানজী নন দিয়ারে আরব যার জন্মস্থান (আল-আ'লাম, যিরিকলী, ৭ম খণ্ড, ৭৫ পৃ.)। মুজাদ্দিদ সাহেবের প্রত্যাখ্যানে তাঁর قدح الزند নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রয়েছে। বিস্তারিত জানতে শায়খ আবদুল্লাহ্ মুরদাদ আবুল খায়রকৃত, ১ম খণ্ড, المختصر من كتاب نشر النور والنهر।

تنہا پیش قاضی روی راضی بیائی -

"একাকী সোজা কাযীর কাছে চলে যাও এবং আপন চাহিদা মাফিক ফতওয়া লিখে নিয়ে এস।"

এই সব উলামায়ে কিরাম ও মুফতী যাঁদের কাছে ফতওয়া চেয়ে পাঠানো হয় তারা এজন্য দায়ী থাকেন না। আর তাদের কাছে এত সময়ও থাকে না যে, তারা ফতওয়া প্রার্থীদের কথা ও বর্ণনা-বিবৃতির পূর্বাপর ঘটনা দেখবেন, বিচার-বিশ্লেষণ করবেন, সত্যাসত্য যাচাই-বাছাই করবেন এবং সেগুলোকে পূর্বেকার সব কিছু থেকে আলাদা করে لاتقربوا الصلوة (তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হইও না)-এর মত বিখ্যাত সাধারণ প্রবচনের মত নিজের সমর্থনে পেশ করা হয়নি। একথার পূর্ণ কার্যকারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান যে, ফতওয়ার উত্তরদাতা হযরতগণ মুজাদ্দিদ আলফেছানীর "মকতূবাত" সম্ভবত সরাসরি পড়েন নি অথবা তাদের দর্স ও ফতওয়া প্রদানের পর এতটা ফুরসত মিলত যাতে করে তারা এর আরও তাহকীক তথা বিচার-বিশ্লেষণ করতেন। অধিকন্তু সে সময় হারামায়ন শারীফায়ন-এ এই সিলসিলার এমন আলিম-উলামাও সম্ভবত উপস্থিত ছিলেন না যাঁরা তাঁদেরকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে পারতেন।

ফতওয়া প্রার্থীর জ্ঞান-গরিমা, উপলব্ধি, আমানতদারী ও যিম্মাদারির অনুভূতির সম্পর্ক যতদূর তার জন্য কেবল একটি উদাহরণই যথেষ্ট যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র) কা'বার হাকীকত সম্পর্কে যেই সূক্ষ্ম আরিফসুলভ আলোচনা করেছেন, মতামত ব্যক্ত করেছেন তাকে এ কথার ওপর আরোপ করা হয়েছে যে, তিনি একথার সমর্থক যে, বর্তমানে পরিচিত ইমারত কা'বা নয়, আর একথা সুস্পষ্ট কুফরীকে অবধারিত করে তোলে। লেখক বলেন,

"সেই সব কুফুরীর মধ্যে এও যে, তিনি অস্বীকার করেছেন যে, কা'বা বর্তমানে পরিচিত ইমারতের নাম।"

এখন এর বিপরীতে সেই পত্রটিও পাঠ করুন যা শায়খ তাজুদ্দীন সম্ভলীর নামে লিখিত যিনি তখন কেবলই বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ সমাপন শেষে ফিরেছিলেন। মুজাদ্দিদ সাহেব বায়তুল্লাহ্ শরীফের হালত শোনার আগ্রহ ও অস্থিরতার কথা প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেন ঃ

"অধমের কাছে যেভাবে কা'বার সূরত রব্বানী সৃষ্টিসমূহের সুরত ও অবয়বের (চাই সে মানুষ হোক অথবা ফেরেশতা) সিজদাস্থল, এর হাকীকত এসব সূরত ও অবয়বের হাকীকতের সিজদাস্থল। আর এভাবেই এ হাকীকত সমস্ত হাকীকতের ওপর এবং এর সঙ্গে যে সব কামালিয়ত সম্পর্কিত সে সমস্ত কামালিয়াতের ওপর

যা অপরাপর হাকীকতের সঙ্গে সম্পর্কিত, প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব রাখে, যেন এই হাকীকত জাগতিক হাকীকত ও হাকীকতে ইলাহীর মাঝে বরযখ তথা অন্তরাল।"[১]

এই একটি উদাহরণ থেকে সেই সব জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কুফরী ফতওয়ার হাকীকত ও মাহিয়ত-এর পরিমাপ করা যেতে পারে যা সে সব বর্ণনা ও উদ্ধৃতির ওপর জারি করা হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও লেখক শেষে এই সতর্কতা অবলম্বন করে লিখেছেন ঃ

"এও অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা ঐসব কথার বিশ্বাসী কথক এবং সেসব লেখা যিনি লিখেছেন, তার ওপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন এবং তার শেষ পরিণতি ভাল হয়েছে। যেমনটি তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে আচরণ করে আসছেন এবং তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতার শান বরাবর প্রকাশ পেয়েছে। আর এরও একটা কারণ ও পন্থা যে, তাঁর ঔরসজাত সন্তানদের মধ্য থেকে কেউ কেউ যখন হারামায়ন শারীফায়নে হাজির হয়েছেন তখন তাঁরা হাদীছের সনদ নেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, তাঁদের তরীকার বুনিয়াদ সুন্নতে মুহাম্মদীর পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং নবী করীম (সা)-এর পদাংক অনুসরণ করে চলার ওপর। তাঁরা হাদীছের মাশায়েখ-যেমন ইমাম যয়নুল আবেদীন তাবারী থেকে হাদীছের সনদ নিয়েছেন এবং আমাদের শায়খ ঈসা মুহাম্মদ ইবনুল মাগরিবী জা'ফরীকে এমনভাবে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করেছেন যে, তিনি শায়খ মুহাম্মদ মা'সূম থেকে নকশবান্দিয়া তরীকা হাসিল করেছেন যাতে করে তিনি তাঁর মহান ও মর্যাদার অধিকারী মাশায়েখ-এর বরকত হাসিল করতে পারেন।"[২]

লেখকের এই বর্ণনা থেকে যা তিনি অত্যন্ত সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে লিপিবদ্ধ করেছেন পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে, এই সব ফতওয়া কেবল ঐসব বিবরণের ওপর বিশ্বাস করে লিখা হয়েছিল যা তাঁদের সামনে পেশ করা হয়েছিল এবং মুফতী সাহেবান নিজেরা তাঁর (মুজাদ্দিদ সাহেবের) ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন। মুজাদ্দিদী খান্দানের সম্মান ও মর্যাদাবান লোকদের হারামায়ন শারীফায়ন উপস্থিতি, বিশেষ করে হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম (র)-এর সীরাত, আখলাক ও মর্যাদা-মণ্ডিত অবস্থা দেখার পর এই ভ্রান্ত ধারণা কেবল দূর হয়েই যায়নি বরং স্বয়ং লেখকের একজন জলীলুল কদর শায়খ ঈসা আল-মাগরিবী হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম-এর হাতে বায়'আত হয়েছেন এবং নকশবান্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া তরীকার নিসবত পয়দা করেছেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী "আনফাসুল আরেফীন" নামক গ্রন্থে তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং লিখেছেন ঃ

---

১. মকতূব নং ২৬৩, ১ম দফতর;
২. আস-সারিম আল-হিন্দী, (পাণ্ডুলিপি) পৃ. ২।

بالجمله يكےاز علمائے متقنين بود ووے استاد جمهور اهل حرمين است ويكے ازادعيئه حديث وقرأت سيدعمرباحسن يه حق وے گفتى من اراد ان ينظرالى شخص لا يشك فى ولايته فلينظرالى هذا۔

তুর্কিস্তানের একজন মুজাদ্দিদী বুযুর্গ মুহাম্মদ বেগ আল-উযবেকী এই সব ফতওয়ার পর হেজায আগমন করেন। তিনি তাঁর কিতাব عطية الوهاب الفاصلة بين الخطاء والصواب লিখে এটা প্রমাণ করেছেন যে, এই সব ফতওয়া মকতূবাতের বাক্যাংশের ভুল অনুবাদের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে এবং জ্ঞাতসারে এ ধরনের বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। তিনি ভুল অনুবাদের অনেকগুলো উদাহরণও পেশ করেছেন। এই বিশ্লেষণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বহু উলামায়ে কিরাম তাঁদের পূর্বের অভিমত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কেউ কেউ ইমাম রব্বানী (মুজাদ্দিদ আলফেছানীর)-র সমর্থন ও প্রতিরক্ষায় কিতাবও লিখেছেন। এঁদের মধ্যে হাসান ইবন মুহাম্মদ মুরাদুল্লাহ আত-তিউনিসী আল-মাক্কীও আছেন যিনি العرف الندى فى نصرة الشيخ احمد السرهندى নামক কিতাব লিখেছেন যেখানে তিনি লিখেছেন ও অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, হযরত মুজাদ্দিদের বিরুদ্ধে যেই অভিযান শুরু করা হয়েছিল তার ভিত্তি ছিল ভুল ও বিকৃত অনুবাদের ওপর। দ্বিতীয় জন ছিলেন আহমদ আল-য়াশীশী আল-মিসরী আশ-শাফি'ঈ আল-আযহারী। তিনি একথা খুব পরিচ্ছন্ন ও সাফাঈ সহকারে প্রকাশ করেছেন যে, হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের বিরুদ্ধে কুফরীর ফতওয়া প্রদান স্রেফ তাসাওউফের পরিভাষা ও দৃষ্টিকোণ সঠিকভাবে বুঝতে না পারা কিংবা ভুল বোঝার কারণে হতে পারে যে সব পরিভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন। মুহাম্মদ বেগ হেজাযের উলামায়ে কিরামের সাথে এ বিষয়ে বাহাছ-মুবাহাছা ও বিতর্ক করেছেন এবং সামনাসামনি আলাপ-আলোচনাও করেছেন যে জন্য আল-বারযানজীকে الناشرة الناجرة নামক কিতাব লিখতে হয় যেখানে তিনি মুহাম্মদ বেগকে খুবই অবজ্ঞাপূর্ণভাবে ও তাচ্ছিল্য সহকারে আলোচনা করেছেন।

ভারতবর্ষে হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের বিরোধিতা এবং তাঁর ওপর আপত্তি উত্থাপনের একটি লক্ষ্য-যোগ্য ঐতিহাসিক দস্তাবীয যা বিরোধিতাকারী ও আপত্তি উত্থাপকদের মানসিকতা ও চিন্তাধারার সুস্পষ্ট প্রতিনিধিত্ব করে এবং সেই দলের কতকটা মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে তা হল শায়খ আবদুল্লাহ খেশগী কাসূরী (১০৪৩-১১০৬ হি.)-র معارج الولاية নামক বিরাট ভলিউম আকারের

১. আনফাসুল আরেফীন, পৃ. ১৮৩।

কিতাব।[১] আবদুল্লাহ খেশগী (যাঁকে সংক্ষেপে 'আবদী নামেও স্মরণ করা হয়ে থাকে)-র অবস্থা থেকে মনে হয় যে, তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা বুযুর্গ ছিলেন।[২] স্বীয় যুগের প্রচলিত জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অধিকার ছিল। তাসাওউফের ক্ষেত্রে তিনি চিশতিয়া তরীকার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন এবং চিন্তা-চেতনা ও মতবাদের দিক দিয়ে ছিলেন ওয়াহদাতুল ওজূদ মতবাদে বিশ্বাসী বরং মনে হয় তিনি এক্ষেত্রে চরমপন্থী ছিলেন। তাঁর উস্তাদবৃন্দ ও ভক্তিভাজন ব্যক্তিদের অধিকাংশই হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের বিরোধী এবং ওয়াহদাতুল ওজূদ মতবাদে বিশ্বাসী সূফী ছিলেন। আর তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ (যেমন শায়খ নে'মত লাহোরী, কাযী নুরুদ্দীন, কাযী কাসূর) মুজাদ্দিদ সাহেবের কুফুরী ফতওয়ার ওপর দস্তখতও করেছিলেন। মনে হয় যে, তিনি সাইয়েদ মুহাম্মদ বারযানজী (قدح الزند-এর লেখক)-র সঙ্গে সম্পর্কিতদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন যারা আওরঙ্গাবাদে বাস করতেন[২] যেখানে বসে হি. ১০৯৬ সালে জনাব খেশগী উক্ত কিতাব সমাপ্ত করেছিলেন। আলোচ্য কিতাবের একটি উৎস সে যুগের আরেকটি কিতাব كاسر المخالفين যিনি হযরত মুজাদ্দিদ ও তাঁর অনুসারীদের রদ করতে গিয়ে এ কিতাবটি লিখেছিলেন।

কাসূরীর চিন্তাধারা ও তাঁর সাকূল্য বিদ্যার দৌড় কতটুকু তা এ থেকে পরিমাপ করা যাবে যে, তিনি মুজাদ্দিদ আলফেছানীর আপত্তিযোগ্য বিষয়গুলোর মধ্যে সালাতে মুখে নিয়ত না করাকেও গণ্য করেছেন। তিনি লিখছেন ঃ

"তিনি যখন সালাতের জন্য খাড়া হতেন অধিকাংশ সময় মনে মনে নিয়্যত করতেন, মুখ নড়াতেন না (অর্থাৎ মুখে উচ্চারণ করতেন না) এবং বলতেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর এটাই নিয়মিত অভ্যাস ছিল। কেননা নিয়্যত দিলের ব্যাপার, মুখের নয়।"

খেশগী "মকতূবাত"-এর অধ্যয়ন কি ভিন্ন দৃষ্টিতে করেছিলেন এবং তার ভেতর কী পরিমাণ দায়িত্বানুভূতি ও কারুর দিকে কোন কথা ও ধ্যান-ধারণার সম্বন্ধ করতে কতটা সতর্কতা ছিল-তার পরিমাপ নিম্নোক্ত বাক্যাংশ থেকে করা যাবে।

"প্রথম যুগের মাশায়েখগণ (মাশায়েখ-ই মুতাকাদ্দিমীন)-এর মধ্য থেকে যারা ওয়াহদাতুল ওজূদ মতবাদের সমর্থক ছিলেন, যেমন হুসায়ন মনসূর হাল্লাজ ও শায়খ মুহয়িদ্দীন আরাবী প্রমুখ, (শায়খ আহমদ সরহিন্দী) তাঁদেরকে মুলহিদ ও যিন্দীক

---

১. এই গ্রন্থের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি বর্তমান লেখক প্রফেসর খালীক আহমদ নিজামীর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে পাঠ করেছেন। জানতে পেরেছি এর একটি কপি লাহোরেও আছে।

২. বিস্তারিত দ্র. احوال واثار عبد الله خویشگی قصوری মুহাম্মদ ইকবাল মুজাদ্দিদী, দারুল মুওয়াররিখীন লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত।

৩. মনে হয় হি. একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আওরঙ্গাবাদ এই বিরোধী আন্দোলনের বিরাট বড় কেন্দ্র ছিল এবং সেখান থেকে এ বিষয়টি হেজায ভূমিতে গিয়েছিল।

বলতেন। তিন খণ্ডে সমাপ্ত মকতুবাতের অধিকাংশ স্থানে শায়খ মুহয়িদ্দীন আরাবীকে তিনি কাফির বলেছেন এবং কোন কোন জায়গায় তাঁকে মু'তাযিলা হিসাবে অভিযুক্ত করেছেন। এতই সব সত্ত্বেও তিনি তাঁকে আল্লাহ্‌র মকবুল বান্দাদের মধ্যে গণ্য করেছেন।"

ঐ সব আপত্তির সঙ্গে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর প্রশংসাও করেছেন। তিনি বলেন, "(হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ) তাঁকে সত্যপথের যারা প্রার্থী তাদেরকে দাওয়াত প্রদানের এজাযত দেন। অনন্তর তিনি সত্য পথের প্রার্থীদেরকে হেদায়েত তথা পথ-নির্দেশনা দিতেন। আল্লাহ্‌র দিকে পথ প্রদর্শন করতেন। শরীয়তের হুকুম-আহ্‌কাম অনুসরণের জন্য তাকীদ করতেন। যারা শরীয়তের বিধি-বিধান পরিত্যাগ করত তাদেরকে তিনি ধমক দিতেন। যারা শরীয়তের ওপর আমল করত তাদের প্রতি খুশী হতেন।"

মুজাদ্দিদ সাহেবের পক্ষ থেকে তিনি তা'বীল (ভিন্নতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ) ও করে থাকেন এবং তাঁর সম্পর্কে সুধারণাও প্রকাশ করেছেন। বিরোধীরা যে সব বাক্যাংশ ও শব্দসমষ্টির ওপর আপত্তি তুলেছে সেগুলো কপি করার পর লিখেছেন ঃ

"কিন্তু এটা জরুরী যে, ঐসব শব্দসমষ্টি দ্বারা জাহিরী তথা প্রকাশ্য অর্থই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু যদি তা দ্বারা বাতেনী তথা গুঢ় অর্থ বোঝায় যেমনটি উপরে গুজরে গেছে....এ থেকে কোন কুফরী ফতওয়া দেওয়া কিংবা নিন্দা বাক্য প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে না।"

কিন্তু এরপর সেই ধারণা যা সাহচর্য ও পরিবেশের প্রভাব ও লোক মুখে প্রচারিত গুজবের আধিক্য থেকে তাঁর মস্তিষ্কে গেড়ে গিয়েছিল—চেপে বসে। তিনি লিখেছেন ঃ

"কিন্তু সত্য হল এই যে, এমন কথা বলা যদ্দারা দরবারে নববী (সা)-এর প্রতি ক্ষুদ্রত্বের (تنقيص) ধারণা সৃষ্টি হয় তা ত্রুটি ও অপরাধ থেকে মুক্ত নয়।"

এই গ্রন্থের বেশির ভাগ গুরুত্ব ও খ্যাতি এজন্যই পেয়েছিল যে, এতে কাযী শায়খুল-ইসলাম[১] -এর সেসব পত্র লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা তিনি আওরঙ্গাবাদের কাযী কাযী হেদায়েতুল্লাহ্‌র নামে পাঠিয়েছেন। এ সম্পর্কে গ্রন্থকারের বর্ণনা যে, তা মুসলিম বাদশাহ (আওরঙ্গযেব আলমগীর)-এর নির্দেশে জারী করা হয় এবং এর

১. কাযী শায়খুল ইসলাম কাযীউল কুযাত আবদুল ওয়াহ্‌হাব গুজরাটির পুত্র এবং সম্রাট আলমগীরের আমলের অন্যতম খ্যাতনামা কাযী ছিলেন। হি. ১০৮৬ সালে আলমগীর তাঁকে সর্বপ্রধান কাযী তথা বিচারপতি পদে নিযুক্তি দেন। ১০৯৪ হিজরীতে তিনি এই পদ থেকে ইস্তিফা দেন এবং হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সম্রাটের বারবার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তিনি পুনরায় আর এই পদ গ্রহণ করেন নি। 'ইয়াদে আয়্যাম' নামক গ্রন্থ, মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আবদুল হাইকৃত, পৃ. ৭৮-৭৯; মাআছিরুল উমারা।

ওপর কাযী শায়খুল ইসলামের সীল মোহর ছিল। গ্রন্থকারের বর্ণনা মুতাবিক এর ওপর ২৭ শে শওয়াল, ১০৯০ হিজরীর তারিখ লিপিবদ্ধ। এই পত্র বা ফরমান গ্রন্থকার كاسر المخالفين[1] থেকে নকল করেছেন এবং এখানে তা হুবহু উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

"হি. ১০৯০ সালের শাওয়াল মাসের ২৭ তারিখ। কাযী হেদায়েতুল্লাহ জানুন যে, এ যুগে আমার কান পর্যন্ত একথা পৌঁছে গেছে আর আমি একথা শুনতে পেয়েছি যে, মকতূবাতে শায়খ আহমদ সরহিন্দীর কোন কোন মাকামাত দৃশ্যত আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের আকীদা বিরোধী। আলোচ্য শায়খ-এর যেসব ভক্ত আওরঙ্গাবাদে আছেন সেগুলো প্রচার করেন, সে সবের দরস প্রদান করেন এবং ঐ সব উল্লিখিত ভ্রান্ত ও বাতিল আকীদার সত্যতার ওপর বিশ্বাস রাখেন। সম্রাট আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন এই খাদেম শরীয়তের কাযীকে লিখেন যে, তাদেরকে রুশ্‌দ (?) ও ঐসব বিষয়ের দরস ও তাদরীস তথা পঠন-পাঠন বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং যার সম্পর্কে জানা যাবে যে, সে ঐ সব ভ্রান্ত ও বাতিল আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করে তাদেরকে শরীয়তের বিধান মুতাবিক শাস্তি দেওয়া হবে। এজন্য তা লিপিবদ্ধ করা হল। এখন এ হুকুম অবশ্য পালনীয় বিধান হিসাবে কার্যকর করতে হবে এবং হাকীকত তথা প্রকৃত বাস্তবতা লিখতে হবে।"[৩]

এই শাহী ফরমানকে বর্তমান কালের কিছু কিছু গ্রন্থে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যেন এটি এক মহা ঐতিহাসিক আবিষ্কার যা সম্রাট আলমগীর-এর মুজাদ্দিদী আন্দোলনের প্রভাব স্বীকার এবং হযরত মুজাদ্দিদ ও তাঁর খান্দানের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা বিজড়িত সম্পর্ক ও যোগাযোগের গোটা প্রাসাদকে গুড়িয়ে দেয়।

কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে তা এতটা গুরুত্ববহ ও আত্মহারা হবার মত ঘটনা নয় যতটা মনে করা হয়েছে। প্রথম কথা হল এই যে, এতে যেখানে মকতূবাতের আলোচনা করা হয়েছে সেখানে ظاہر در مخالفت عقائد اهل سنت والجماعة বলা হয়েছে। দ্বিতীয় কথা হল, যে কথার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে তা সে সব নিবন্ধের প্রচলন ও পাঠন এবং যে সব বিষয়ে থেকে বিরত রাখা হয়েছে তা এরই সাধারণ প্রচার ও পঠন-পাঠন। প্রকাশ থাকে যে, এই সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও রহস্যপূর্ণ বিষয়াদির (যেসবের উপলব্ধি তত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণ-এর পরিভাষা সম্পর্কে অবহিতি এবং আধ্যাত্মিক পথ (সুলূক) ও তাসাওউফ-এর কার্যকর ও বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সংস্পর্শের ওপর নির্ভরশীল) সাধারণ্যে প্রচার এবং তা সাধারণ মাহফিলে দরস প্রদান যেখানে আম-খাস তথা বিশিষ্ট সাধারণ সবাই শরীক হয়-বিক্ষিপ্ত ধ্যান-ধারণার কারণ ও মতানৈক্য সৃষ্টির উপলক্ষ্য হতে পারে এবং

১. আফসোস যে, এর গ্রন্থকার সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি।

২. মাআরিজুল বিলায়া, ৭০৮ পৃ.।

একজন শরীয়ত সমর্থক ও এর প্রতি সংবেদনশীল সম্রাটের যার একমাত্র লক্ষ্যই থাকে আপন দেশের সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখা এবং বুযুর্গদের সম্পর্কে লাগামহীন উক্তি ও সমালোচনার বাক্যবান থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং যাঁর নিজের এই দাওয়াত ও এই খান্দানওয়ালা শানের সঙ্গে হার্দ্যিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ সম্বন্ধের ওপর আস্থা আছে এবং যিনি আপন প্রভাব ও ক্ষমতা দ্বারা একে সফল ও সার্থক বানাবার ব্যাপারে খুবই সক্রিয় ও জোর তৎপর, ব্যবস্থাপনাগতভাবে এ ধরনের বাধ্য-বাধকতা আরোপ করা ও সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার রয়েছে। যদি ঐ ফরমানকে সম্রাট আলমগীরের ব্যক্তিগত জীবন-যিন্দেগী, তাঁর প্রকৃত ও সত্যিকার প্রবণতা ও আবেগ এবং এই খান্দানের সাথে তাঁর সেই সব যোগাযোগ ও সম্পর্কের (যার বিস্তারিত বিবরণ পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে পাঠক ইতোমধ্যেই পাঠ করেছেন) আলোকে দেখা হয় তাহলে এই কয়টি বাক্যের ভেতর সেই গোটা ইতিহাস এবং সম্রাট আলমগীরের সেই কর্মপন্থা প্রত্যাখ্যানের কোন উপকরণ নেই যিনি শেষাবধি মোগল সাম্রাজ্যের গতিধারা ভারতবর্ষ থেকে ইসলামী প্রভাব মিটিয়ে দেবার থেকে ইসলামী শরী'আতের প্রয়োগ ও প্রচলন এবং ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি চালু করার পেছনে নিয়োজিত করেন এবং যেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী, তাঁর খান্দান, খলীফা ও অনুসারীদের মৌলিক অংশ রয়েছে।

তা ঘটনা যাই হোক, ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরে হযরত মুজাদ্দিদ -এর ওফাতের পর তাঁর মকতূবাত এবং তাঁর কিছু কিছু আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে বিরোধিতা ও পথভ্রষ্টতার অভিযোগের যেই অভিযান পরিচালিত হয়েছিল যেই অভিযানে উলামায়ে কিরাম ও মুফতীদের একটি সংখ্যা শরীক হয়ে গিয়েছিলেন তা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম এক-চতুর্থাংশ পাদেই মুখ থুবড়ে পড়ে এবং এর যবনিকাপাত ঘটে। এখন তা কেবল ইতিহাসের (আর তাও কতকগুলো হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির ওপর নির্ভর করে) পাতায় সমাধিস্থ হয়ে গেছে। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধভাগেই ভারতবর্ষ থেকে তুর্কিস্তান পর্যন্ত মুজাদ্দিদী খানকাহ, হেদায়েত ও ধর্মীয় দিক-নির্দেশনার মারকায তথা কেন্দ্র কায়েম হয়ে গিয়েছিল। মুজাদ্দিদিয়া সিলসিলার বুযুর্গ মাশায়েখ ও উলামায়ে কিরাম মকতূবাতের নির্ভরযোগ্য আরবী অনুবাদ পূর্বক অধিকাংশ মুসলিম দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। শায়খ মুহাম্মদ মুরাদ মক্কী কাযীখানী হযরত মুজাদ্দিদ, তাঁর সন্তান-সন্ততি ও অধঃস্তন পুরুষ, সিলসিলার আরব ও তুর্ক মাশায়েখদের আরবী ভাষায় পরিচয় করিয়ে দেন যা "যায়লুর রাশাহাত" নামে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মকতূবাতের

অনুবাদও করেন যা "আদ-দুরারু'ল-মাকনূনাত আন-নাফীসাহ" নামে প্রকাশিত হয়। শায়খ মুহাম্মদ নূরুদ্দীন বেগ আল-উযবেকী'র আরবী পুস্তিকা "আতিয়্যাতু'ল-ওয়াহ্হাব আল-ফাসিলা বায়না'ল-খাতা ওয়া'স-সওয়াব"ও প্রকাশিত হয় এবং মকতূবাত-এর আরব দেশগুলোতে ও তুরস্কে এমনভাবে প্রচারিত হয় যে, যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝির নিরসন ঘটে।[১] বিখ্যাত আলিম আল্লামা শিহাবুদ্দীন মাহমূদ আলূসী বাগদাদী (মৃ. ১২৭০ হি.) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ "রূহুল-মা'আনী"তে মুজাদ্দিদ সাহেবের নাম খুবই সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়েছেন এবং প্রচুর স্থানে মকতূবাতের উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। বর্তমানে আর কোথাও উলামায়ে কিরামের বিরোধিতা ও পথভ্রষ্টতার অভিযোগ ও অভিযানের নাম-গন্ধও নেই।

فاما الزبد فيذهب جفاء - واما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض - كذالك يضرب الله الامثال -

আল্লাহ্র হেকমতের এ এক আশ্চর্য শান যে, বিরোধিতা ও পথভ্রষ্টতার অভিযোগের অভিযানের সবচে' বড় অংশ নিয়েছিল হেজাযের সেই সব উলামায়ে কিরাম যারা ছিলেন জাতিগতভাবে কুর্দী। শায়খ ইবরাহীম আল-কূরানী কুর্দী ছিলেন এবং সাইয়েদ মুহাম্মদ বারযানজীও শাহরে যূর-এ জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা সিলসিলা নক্শবান্দিয়া মুজাদ্দিদিয়ার প্রচার-প্রসারের জন্য একজন কুর্দী আলিম মাওলানা খালিদ শাহরে-যূরীকেই নির্বাচিত করেন যাঁর প্রশংসনীয় চেষ্টা-তদবীর ও কুওতে নিসবত দ্বারা এই সিলসিলা ইরাক, শাম, কুর্দিস্তান ও তুরস্কে এভাবে বিস্তার লাভ করে যার নজীর মেলা ভার।[২] "আল্লাহ্র সেনাবাহিনী আসমান যমীনের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।"

---

১. যেসব বুযুর্গ তাঁদের পূর্ববর্তী মত থেকে ফিরে এসেছিলেন কিংবা হযরত মুজাদ্দিদ ও তাঁর সিলসিলার অনুকূলে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাঁদের নাম নুযহাতু'ল-খাওয়াতিরের ৫ম খণ্ডে দেখুন।

২. বিস্তারিত ৮ম অধ্যায়ে দেখুন।

অষ্টম অধ্যায়

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর দু'জন বড় খলীফা এবং তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কিতদের মাধ্যমে তাঁর তাজদীদি কর্মের বিস্তৃতি ও পূর্ণতা সাধন

মশহুর খলীফাবৃন্দ

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মহান খলীফাবৃন্দের নাম ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের পরিমাপ করা কেবল কঠিনই নয় বরং তা প্রায় অসম্ভবও বটে। কেননা তাঁদের সংখ্যা কয়েক হাজার বলা হয়ে থাকে এবং তাঁরা সারা দুনিয়ায় বিক্ষিপ্ত ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন এবং তাঁরা খুবই কর্মতৎপর ছিলেন। খলীফাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম যাঁদেরকে তিনি কতকগুলো বাইরের দেশে ইসলাহ তথা চরিত্র সংশোধন ও প্রশিক্ষণমূলক কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন কিংবা ভারতবর্ষের কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এই খেদমতের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে গুজরে গেছে। এখানে আমরা বর্ণানুক্রমিক হিসাবে তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিখ্যাত তাঁদের তালিকাই তুলে ধরছি। এরপর দু'জন গুরুত্বপূর্ণ খলীফা (হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম এবং হযরত সাইয়েদ আদম বান্নুরী)-র আলোচনা কিছুটা বিস্তারিত পেশ করা হবে। এরপর তাঁদের খলীফাবৃন্দ ও তাঁদের সিলসিলার প্রচার এবং যাঁদের মাধ্যমে সংস্কার-সংশোধন ও প্রশিক্ষণমূলক কেন্দ্রের বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছে এবং সেগুলো থেকে সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলেই যেভাবে উপকৃত হয়েছে তাঁরাও সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনায় আসবেন। এর থেকে পরিমাপ করা যাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র সিলসিলাকে কিভাবে সাধারণ্যে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করেছেন এবং তাঁর সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক চেষ্টা-সাধনাকে কিভাবে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করেছেন। আর এসব আল্লাহ্‌র মর্জি ও অভিপ্রায়, কুদরতের অদৃশ্য সাহায্য-সমর্থন, আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্যতা, সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইখলাস এবং সুন্নতে রসূল (সা)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ ব্যতিরেকে হতে পারে না।

این سعادت بازور بازور نیست

تانه بخشد خدائے بخشنده

(১) হযরত সাইয়েদ আদম বান্নুরী; (২) মাওলানা আহমদ বারকী; (৩) মাওলানা আহমদ দীবানী; (৪) মাওলানা আমানুল্লাহ লাহোরী; (৫) মাওলানা

বদরুদ্দীন সরহিন্দী; (৬) শায়খ বদীউদ্দীন সাহারন পূরী; (৭) শায়খ হাসান বারকী; (৮) শায়খ হামীদ বাঙ্গালী; (৯) হাজী খিযির খান আফগানী; (১০) মীর সগীর আহমদ রূমী; (১১) শায়খ তাহির বাদাখশী; (১২) শায়খ তাহির লাহোরী; (১৩) খাজা উবায়দুল্লাহ ওরফে খাজা কিলাঁ; (১৪) খাজা আবদুল্লাহ ওরফে খাজা খোর্দ; (১৫) শায়খ আবদুল হাই হিসারী; (১৬) মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ লাহোরী; (১৭) শায়খ আবদুল হাদী ফারূকী বদাউনী; (১৮) মাওলানা ফররুখ হুসায়ন হারাবী; (১৯) মাওলানা কাসিম আলী; (২০) শায়খ করীমুদ্দীন বাবা হাসান আবদালী; (২১) সাইয়েদ মুহিব্বুল্লাহ মানিকপূরী; (২২) শায়খ মুহাম্মদ সাদেক কাবুলী; (২৩) মাওলানা মুহাম্মদ সালেহ কূলাবী; (২৪) মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীক কাশমী; (২৫) শায়খ মুযযাম্মিল; (২৬) হাফিজ মাহমূদ লাহোরী; (২৭) শায়খ নূর মুহাম্মদ পাটনী; (২৮) মাওলানা ইয়ার মুহাম্মদ জাদীদ বাদাখশী তালেকানী; (২৯) মাওলানা ইয়ার মুহাম্মদ কাদীম; (৩০) শায়খ ইউসুফ বারকী; (৩১) মাওলানা ইউসুফ সামারকান্দী।

হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম[১]

শায়খে তরীকত, ইমামে ওয়াক্ত মহান বুযুর্গ হযরত মা'সূম ইবন আহমদ ইবন 'আবদুল আহাদ আল-আদাবী আল-উমারী অর্থাৎ খাজা মুহাম্মদ মা'সূম নকশবান্দী সরহিন্দী স্বীয় পিতার প্রিয় সন্তান। আকারে- প্রকারে, স্বভাবে- প্রকৃতিতে ও অর্থগত তথা পারিভাষিক অর্থে পিতার নিকটতর, আনুগত্যে ও অনুসরণে অগ্রগতি, পিতার ইলমের বিশেষ ধারক, মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (র)-র পুত্রদের মধ্যে সবচে' মশহুর এবং তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক বরকতময় সত্তার অধিকারী।[২]

হিজরী ১০০৭-৯-এর ১১ই শাওয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। কিছু কিছু পাঠ্য পুস্তক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খাজা মুহাম্মদ সাদেক থেকে এবং বেশীর ভাগ কিতাব শ্রদ্ধেয় পিতা ও শায়খ মুহাম্মদ তাহির থেকে পাঠ করেন। শ্রদ্ধেয় পিতার খেদমতে থেকে তরীকতের তা'লীম হাসিল করেন এবং মাত্র তিন মাসে কুরআন মজীদ হিফজ করেন। পিতার নিসবত হাসিল করার ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থা ছিল শরহে বেকায়া প্রণেতা সদরু'শ-শারী'আর মতই যিনি তাঁর পিতামহের লেখাকে লেখার সাথে সাথেই হিফ্‌জ করে ফেলতেন। এজন্যই তিনি সেই মর্যাদায় উপনীত হন যা তাঁর

---

১. খাজা মুহাম্মদ মা'সূম সম্পর্কে অধিকাংশ তথ্য নুযহাতুল খাওয়াতির, ৫ম খণ্ড থেকে গৃহীত।

২. বর্ণনানুক্রম হিসাবে এই তালিকা মাওলানা সাইয়েদ যেওয়ার হুসায়ন লিখিত "হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী" (করাচীর ইদারায়ে মুজাদ্দিদিয়া প্রকাশিত) থেকে গৃহীত। তাঁদের অবস্থা জানতে উল্লিখিত গ্রন্থের ৭২৪-৮০০ পৃ. দ্র. "তাযকিরায়ে ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ আলফেছানী" মাওলানা মনযূর নু'মানীকৃত নিবন্ধ, "তাযকিরায়ে খুলাফায়ে মুজাদ্দিদ আলফে ছানী" মাওলানা নাসীম আহমদ-ফরিদীকৃত, ৩১০-৩৫১ পৃ.দ্র.।

পিতার সাথীদের মধ্যে আর কেউ পারেন নি। অনন্তর তাঁর পিতা তাঁকে "কাইয়ূমিয়াত" -প্রভৃতির মত উঁচু মকামের সুসংবাদ প্রদান করেন। পিতার ইনতিকালের পর তিনিই তাঁর আসনে সমাসীন হন এবং হারামায়ন শারীফায়ন সফর করত হজ্জ ও যিয়ারত দ্বারা ধন্য হন। তিনি একটা উল্লেখযোগ্য সময় মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করে হিন্দুস্তানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পাঠদান ও মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণে ব্যয় করেন। তফসীরে বায়যাবী, মিশকাত, হেদায়া, আদুদী ও তালবীহ্‌র মত কিতাবাদি তিনি অধিকাংশ সময় পড়াতেন।

শায়খ মুরাদ ইবন আবদুল্লাহ্ কাযযানী "যায়লু'র-রাশাহাত" নামক গ্রন্থে লিখেন, "তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার মতই আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন ছিলেন। তিনি দুনিয়াকে আলোকিত করেন এবং আপন তাওয়াজ্জুহ ও বুলন্দ হালতের বরকত দ্বারা মূর্খতা ও বিদ'আতের অন্ধকার রাশি দূরীভূত করে দেন। হাজার হাজার আল্লাহর বান্দা খোদায়ী রহস্যসমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত হয় এবং তাঁর মুবারক সাহচর্য দ্বারা উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে যে, নয় লক্ষ মানুষ তাঁর হাতে বায়'আত হয়। তন্মধ্যে তাঁর খলীফাবৃন্দের সংখ্যা ছিল সাত হাজার। এই সব খলীফার মধ্যে শায়খ হাবীবুল্লাহ্ বুখারীও ছিলেন যিনি তাঁর যুগে খুরাসান ও মা-ওয়ারাউন-নাহ্‌র-এর সবচে' বড় বুযুর্গ শায়খ ছিলেন। তাঁর বরকতময় সত্তার বদৌলতে বুখারার পরিবেশ বিদ'আতের অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে সুন্নতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর চার হাজার মুরীদকে কামালিয়াতসম্পন্ন বানিয়ে তাদেরকে খিলাফত ও এজাযত দিয়ে ধন্য করেন।"

শায়খ মুহাম্মদ মা'সূম (র) লিখিত "মকতূবাত" (পত্রাবলী) তিন খণ্ডে সংকলিত এবং শ্রদ্ধেয় পিতা (হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী র)-র মকতূবাতের মতই শরীয়ত ও মা'রিফতের গূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি ও ইশারা-ইঙ্গিত সম্বলিত এবং অধিকাংশই মুজাদ্দিদ সাহেবের সূক্ষ্ম 'ইল্‌ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মর্যাদা রাখে।

১০৭৯ হিজরীর ৯ই রবিউল আওয়াল সরহিন্দ শহরেই ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। কবর মুবারক বিখ্যাত এবং সকলের যিয়ারত-গাহ্ হিসাবে মশহূর।

হযরত সাইয়েদ আদম বান্নুরী[১]

শায়খে আরিফ ও ওয়ালী-এ কবীর হযরত আদম ইবন ইসমাঈল ইবন বাহ্ওয়াহ ইবন ইউসুফ ইবন ইয়া'কূব ইবন হুসায়ন হুসায়নী কাসেমী বান্নুরী, নক্‌শবান্দিয়া সিলসিলার বিখ্যাত বুযুর্গ। তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা স্বপ্নে তাঁর জন্মের

১. হযরত শায়খ আদম বান্নুরীর আলোচনা নুযহাতুল খাওয়াতির-এর ৫ম খণ্ড থেকে গৃহীত যা এখানে অল্পই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

সুসংবাদ স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের যবান মুবারক থেকে পেয়েছিলেন। সরহিন্দের একটি গ্রাম বান্নুর-এ তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই লালিত-পালিত হন।

হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের একজন মুরীদ হাজী খিযির রূগানী থেকে মূলতানে আধ্যাত্মিকতার সবক হাসিল করেন এবং দু'মাস তাঁর খেদমতে থেকে শায়খ-এর হুকুমে হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব (র)-এর খেদমতে হাজির হন এবং সেখানে দীর্ঘকাল তাঁর খেদমতে অবস্থান পূর্বক তরীকতের ইল্‌ম হাসিল করেন। 'খুলাসাতুল মা'আরিফ' নামক গ্রন্থে আছে, শায়খ মুহাম্মদ তাহির লাহোরীর খেদমতে তিনি রব্বানী আকর্ষণ লাভ করেন যা তিনি তাঁর শায়খ ইস্কান্দার থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা শায়খ কামালুদ্দীন ক্যাথলী থেকে হাসিল করে ছিলেন। মোটের ওপর তিনি মর্যাদার সেই আসনে উপনীত হয়ে ছিলেন যা তাঁর সমকালে অনেক বুযুর্গই পৌঁছুতে পারেন নি। তাঁর তরীকা ছিল শরীয়তে মুহাম্মাদিয়্যা ও সুন্নতে নাবাবিয়্যার আনুগত্য ও অনুসরণ যা থেকে তিনি কথায় ও কাজে এক চুল এদিক ওদিক করতেন না।

তাঁর থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ উপকৃত হয়। কথিত আছে যে, চার লক্ষ মুসলমান তাঁর হাতে বায়'আত হয় এবং তাঁদের মধ্য থেকে এক হাজার জন প্রচুর ইল্‌ম ও মা'রিফাত হাসিল করেন। বলা হয়ে থাকে, তাঁর খানকাহয় কোন দিন কখনো এক হাজারের কম লোক থাকত না। সকলেই তাঁর মেহমান হত এবং তাঁর সান্নিধ্য থেকে আধ্যাত্মিক উপকার লাভ করত। "তাযকিরায়ে আদমিয়া" নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, হযরত সাইয়েদ আদম বান্নুরী যখন হিজরী ১০৫২ সালে লাহোর গিয়েছিলেন তখন তাঁর সাথে দশ হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তি, উলামা, মাশায়েখ সহ সকল শ্রেণীর লোক ছিল। সম্রাট শাহজাহান সে সময় লাহোরেই অবস্থান করছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তায় সম্রাট দুশ্চিন্তায় পড়েন। তিনি তাঁর উযীর সা'দুল্লাহ খানকে শায়খ-এর খেদমতে পাঠান। কিন্তু আলাপ সুখকর না হওয়ায় উযীর শায়খ-এর বিরুদ্ধে সম্রাটের কাছে অভিযোগ করেন। ফলে সম্রাট তাঁকে হারামায়ন শারীফায়ন সফরের নির্দেশ প্রদান করেন। অনন্তর তিনি আপন সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-স্বজনসহ হেজাযের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান এবং হজ্জ সমাপন শেষে মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান গ্রহণ করেন ও সেখানেই ইনতিকাল করেন।

ইল্‌মে হাকীকত ও ইলমে মা'রিফত বিষয়ে তাঁর কয়েকটি পুস্তক-পুস্তিকা রয়েছে যার ভেতর ফারসীতে লেখা দু'খণ্ডে সমাপ্ত "খুলাসাতু'ল-মা'আরিফ" নামক একটি কিতাবও রয়েছে যা এভাবে শুরু করা হয়েছে ঃ

الحمد لله رب العلمين حمدا كثيرا بقدر كمالات اسمائه والائه الخ ـ[১]

তাঁর পুস্তকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি স্থান পেয়েছে।

শায়খ আদম বান্নুরী (র) নিরক্ষর ছিলেন। তিনি কারুর থেকে ইল্ম হাসিল করেন নি। হিজরী ১০৫৩ সালের ২৩শে শাওয়াল তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় ইনতিকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকী'র সায়্যিদুনা হযরত উছমান (রা)-এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

মুজাদ্দিদিয়া মা'সূমিয়্যা সিলসিলা এবং এর মহান বুযুর্গবৃন্দ

আমরা প্রথমে হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম (র)-এর সিলসিলার মহান বুযুর্গবৃন্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি যদ্দ্বারা তাঁর জনপ্রিয়তা ও তাঁর প্রতি ধাবমান জনস্রোত, তাঁর থেকে উপকার লাভের বৃত্তের বিস্তৃতি, মানুষ কি বিপুল সংখ্যায় তাঁর দিকে ঝুঁকেছিল এবং কিভাবে পতঙ্গের ন্যায় ঝাপিয়ে পড়েছিল, তাঁর সান্নিধ্যে বিপুল জনসমাগমের উপস্থিতি এবং সে সময়কার মুসলিম সমাজ ও মুসলমানদের জীবন-যিন্দেগীর ওপর তাঁর বিশাল ও গভীর-প্রভাবের কিছুটা পরিমাপ করা যাবে। তাঁদের বিস্তারিত হালত ও জীবন-চরিত সম্পর্কে জানতে হলে সে সমস্ত বই-পুস্তক অধ্যয়ন করা আবশ্যক যা তাঁদের সম্পর্কে পৃথকভাবে লেখা হয়েছে কিংবা সে সব গ্রন্থ ও সংকলনের দ্বারস্থ হতে হবে যেখানে তাঁদের মোটামুটি আলোচনা এসেছে। ভারতবর্ষের বুযুর্গদের সম্পর্কে জানতে হলে মাওলানা হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই প্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থ "নুযহাতু'ল-খাওয়াতির"-এর ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ডের অধ্যয়ন যথেষ্ট বিবেচিত হবে।

হযরত খাওয়াজা সায়ফুদ্দীন সরহিন্দী

হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম (র)-এর তরীকার প্রচার-প্রসার এবং এ সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (র)-র উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যের পূর্ণতা সাধন (যার ভেতর আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কে নবায়ন, সুন্নাহ অনুসরণের রেওয়াজ এবং গর্হিত বিষয়াদি ও বিদআতের উৎখাত বিশেষ গুরুত্ববহ) হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম-এর উপযুক্ত সন্তান ও খলীফা হযরত খাজা সায়ফুদ্দীন সরহিন্দী (হি. ১০৪৯-১০৯৬)-র মাধ্যমে হয় যিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার নির্দেশে রাজধানী দিল্লীতে অবস্থান গ্রহণ করেন।

তাঁর হাতে সেই খানকাহ্‌র ভিত্তি স্থাপিত হয় যা পরবর্তী কালে হযরত মির্যা মাজহার জানে-জানাঁ ও হযরত শাহ্ গুলাম আলী দেহলভী আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের

---

১. এটি গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত পাঠাগারে বিদ্যমান।

বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রে পরিণত করেন যার আলোয় একদিকে আফগানিস্তান ও তুর্কিস্তান, অপর দিকে ইরাক, শাম ও তুরস্ক আলোকোদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং কবির এ কথা বাস্তব সত্যে পরিণত হয়,

چراغ ہفت کشور خواجہ معصوم

منوراز فروغش ہند تا روم

সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গযেব (যেমনটি ওপরে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম-এর হাতে বায়'আত হয়েছিলেন) হযরত খাজা সায়ফুদ্দীন (র) থেকে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ লাভ করেন। হযরত খাজার শাহী মহলে গমন ও দেওয়ালে আঁকা ছবির ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন এবং সম্রাট কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে তা বন্ধ করার নির্দেশ দানের কথা ইতিহাসে এসেছে। খাজা সায়ফুদ্দীন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতাকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন এবং খাজা মুহাম্মদ মা'সূম (সম্রাটকে লিখিত একপত্রে) এতে আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি লিখছেন ঃ

"এ কেমনতরো বড় নি'মত যে, শাহী শান-শওকত ও বাদশাহী দবদবা ও আড়ম্বর সত্ত্বেও কলেমায়ে হক কবুল করা এবং একজন নাচিজের কথার প্রভাব মেনে নেয়া!"

খাজা সায়ফুদ্দীন সম্রাটের মধ্যে যিকরের আছর জাহির হওয়া এবং সম্রাটের সুলূকের কতকগুলো মনযিল অতিক্রম করা সম্পর্কেও পিতাকে অবহিত করেন এবং খাজা মুহাম্মদ মা'সূম এতেও তাঁর আনন্দ ও তৃপ্তির কথা প্রকাশ করেন। এক পত্রে তিনি বলেন ঃ

"বাদশাহ দীনে পানাহর যেই হালতের কথা তুমি উল্লেখ করেছ, যেমন লতীফাগুলোর মধ্যে যিক্‌র প্রবাহিত হওয়া, সুলতানু'য-যিক্‌র ও রাবিতা হাসিল হওয়া, বিপদের কমতি, কলেমায়ে হক কবুল করা, কোন কোন গর্হিত কাজ-এর উৎসাদন ও আবশ্যকীয় বিষয়াদির চাহিদা মিটে যাওয়া সবই বিস্তৃত ভাবে জানতে পারলাম। আল্লাহ তা'আলার শোকর জ্ঞাপন করা দরকার। বাদশাহদের কাতারে এমনটি দুর্লভই বলতে হবে।"[১]

সম্রাট তাঁর সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। "মা'আছিরে আলমগীরি'র লেখক মুহাম্মদ সাকী মুস্তাঈদ খান হি. ১০৮০ সালের (১৩ই মুহার্রাম) ঘটনাবলী লিখতে গিয়ে সম্রাটের রাতের প্রথম প্রহরের পর হায়াত বখ্‌শ বাগান থেকে হযরত খাজার আবাসগৃহে গমন, সেখানে এক প্রহর বসে তাঁর বরকতময়

---

১. মকতূব হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম, ৩য় খণ্ড, পত্র নং ২২০;

সাহচর্যে অবস্থানপূর্বক হযরত খাজার পবিত্র বাণী থেকে উপকৃত হওয়া, অতঃপর তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর শাহী প্রাসাদে প্রত্যাবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন।[১]

হযরত খাজার বিশেষ আকর্ষণ ও রুচি ছিল আমরু বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার তথা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ-এর প্রতি। এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কর্মতৎপর ছিলেন। "যায়লু'র-রাশাহাত"-এর গ্রন্থকার শায়খ মুরাদ ইবন আবদুল্লাহ্ আল-কাযযানীর বর্ণনা মুতাবিক তাঁর এই প্রচেষ্টার ফল হয়েছিল এই যে, মনে হচ্ছিল ভারতবর্ষের মাটি থেকে বিদ'আত উৎখাত হয়ে যাবে। এরই ওপর ভিত্তি করে তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা তাঁকে "মুহতাসিবু'ল-উম্মাহ" (উম্মাহর তত্ত্বাবধায়ক, ন্যায়পাল)-উপাধি দিয়েছিলেন। খুবই শক্তিশালী প্রভাব সৃষ্টিকারী আকর্ষণ শক্তিসম্পন্ন বুযুর্গ ছিলেন। মানুষ তাঁর খানকাহ্য় পাগলের ন্যায় উন্মত্ত প্রায় অবস্থায় পড়ে থাকত। এরই সাথে তিনি বড় আড়ম্বর ও জাঁকজমকের অধিকারী শায়খ ছিলেন। বিভিন্ন রাজ্যের সুলতান ও আমীর-উমারা তাঁর মজলিসে আদবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকত। তাঁর সামনে তাঁদের বসার সাহস হত না। তাঁর দিকে জনস্রোতের অবস্থা ছিল এই যে, দৈনিক চৌদ্দ'শ মানুষ দু'বেলা পেট পুরে আপন ইচ্ছা ও অভিপ্রায় মুতাবিক তাঁর খানকাহ্ থেকে খাবার পেত।[২]

খাজা সায়ফুদ্দীনের পর তাঁর খলীফা সাইয়েদ নূর মুহাম্মদ বদায়ূনী (মৃ. ১১৩৫ হি.) তদস্থলে সমাসীন হন এবং তাঁর খানকাহ মুহাম্মদী আলোয় আলোকিত রাখেন। তারপর হযরত মির্যা মাজহার জানে-জানাঁ তাঁর আসনে সমাসীন হন। তাঁর আলোচনা একটু পরেই আসবে।[৩]

হযরত খাজা মুহাম্মদ যুবায়র থেকে মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী পর্যন্ত

হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূমের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন হযরত খাজা মুহাম্মদ নক্‌শবন্দ (১০৩৪-১১১৪ হি.)। তিনি হুজ্জাতুল্লাহ নক্‌শবন্দ নামে মশহুর। হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত ও খলীফা বানিয়েছিলেন। পিতার ইনতিকালের পর তিনি সার্বক্ষণিকভাবে জনগণের হেদায়েত ও পথ-নির্দেশনা দানের কাজে মগ্ন হয়ে পড়েন।

---

১. মাআছিরে আলমগীরি, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৭১, পৃ. ৮৪।

২. যায়লুর রাশাহাত, পৃ. ৪৮-৪৯।

৩. চিতলী কবরের বর্তমান খানকাহ মূলত হযরত শাহ গুলাম আলীর যুগে প্রতিষ্ঠিত হয় যিনি এই গৃহকে যেখানে হযরত মির্যা সাহেবকে দাফন করা হয়েছিল খরিদ করে মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণ করেছিলেন।

তাঁর খলীফাদের মধ্যে ছিলেন খাজা মুহাম্মদ যুবায়র (ইবন আবি'ল-'আলা ইবন খাজা মুহাম্মদ মা'সূম, মৃ. ১১৫১ হি.)। তাঁর দিকে সত্য পথের পথিকরা এমনভাবে ঝুঁকে পড়ে যা সেই যুগে অপর কারুর প্রতি তেমনটি দেখা যায় নি। যখন তিনি ঘর থেকে মসজিদে তশরীফ নিতেন অমনি আমীর-উমারা তাদের দোশালা ও পাগড়ী ঘর থেকে মসজিদ পর্যন্ত তাঁর গমন পথের ওপর বিছিয়ে দিতেন যাতে তাঁর পা মাটিতে না পড়ে। যদি কোন সময় কোন রোগী দেখতে যেতেন কিংবা কারুর দাওয়াতে গমন করতেন তখন তাঁর সঙ্গে এত পরিমাণ লোক সওয়ার হয়ে যেত যেমনটি সাধারণত রাজা-বাদশাহদের বেলায় দেখা যায়।

হযরত খাজা মুহাম্মদ যুবায়র অনেক বড় বড় খলীফা রেখে যান যাঁদের মধ্যে তিনজন ছিলেন খুবই বিখ্যাত। একজন ছিলেন হযরত শাহ যিয়াউল্লাহ যাঁর খলীফাদের মধ্যে হযরত শাহ মুহাম্মদ আফাক অন্যতম। দ্বিতীয়জন হযরত খাজা মুহাম্মদ নাসির আনদালীব যাঁর পুত্র ও খলীফা হলেন খাজা মীর দর্দ দেহলভী। তৃতীয় জন হলেন হযরত খাজা আবদুল আদল যাঁর খলীফা হলেন হযরত শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দেহলভীর পুত্র কুরআনুল করীমের অনুবাদক হযরত শাহ আবদুল কাদির দেহলভী (র)।

হযরত খাজা যিয়াউল্লাহ একজন বড় দরের শায়খে তরীকত ও ছাহেবে নিসবত বুযুর্গ ছিলেন। হযরত শাহ গুলাম আলী বলতেন, যিনি অবয়বধারী নিসবতে মুজাদ্দিদী দেখেন নি তিনি হযরত খাজা যিয়াউল্লাহকে যেন দেখে নেন।২

তাঁর খলীফা হযরত শাহ মুহাম্মদ আফাক (হিজরী ১১৬০-১২৫১) কে আল্লাহ তা'আলা ব্যাপক জনপ্রিয়তা দান করেছিলেন এবং খ্যাতির শীর্ষে উন্নীত করে ছিলেন। দিল্লী থেকে কাবুল পর্যন্ত মানুষ তাঁর থেকে ফয়েয হাসিল করে। কাবুল গেলে আফগান বাদশাহ যমান শাহ তাঁর হাতে বায়'আত হন।

হযরত শাহ মুহাম্মদ আফাক-এর খলীফা ছিলেন সে যুগের উওয়ায়স হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী (র) (১২০৮-১৩১৩ হি.) যাঁর শক্তিশালী আকর্ষণ ক্ষমতা, গরম নফস, যুহদ ও তাজরীদ, শরীয়তের অনুসরণ, সুন্নাহ ও হাদীছের ইলম তথা জ্ঞান, ইশ্‌কে ইলাহী ও নবী করীম (সা)-এর প্রতি ভালবাসা অর্ধ-শতাব্দীর অধিক কাল ভারতবর্ষের (বিশেষ করে উত্তর ভারতের) গোটা পরিবেশকে উত্তপ্ত ও আলোকিত রেখেছিল এবং স্বয়ং তাঁর ভাষায় ঃ ইশকের দোকানের বাজার উত্তপ্ত থাকে।৩

---

১. প্রাগুক্ত, ১৬ পৃ.।

২. দুরুল মা'আরিফ, মলফুযাতে হযরত শাহ গুলাম আলী।

৩. দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাতা ও নাযেম হযরত মাওলানার মুরীদ ও খলীফা ছিলেন। যেমন মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী, নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম নাযেম, (পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্র.)

ভারতবর্ষের দূরদর্শী ও সতর্ক ঐতিহাসিক এবং খ্যাতনামা জীবন-চরিতকার মাওলানা হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই (নুযহাতু'ল খাওয়াতির-এর লেখক)-এর ভাষায় ঃ

"ভক্ত ও অনুরক্তেরা পতঙ্গের ন্যায় তাঁর চারপাশে ভীড় জমায় এবং হাদিয়া তোহফার বৃষ্টি বর্ষিত হয়। বড় বড় আমীর-উমারা ও রঈস দূরদরাজ ও দূরতিক্রম্য এলাকা থেকে ভক্তের ন্যায় এসে হাজির হয় এবং তাঁকে কেন্দ্র করে জনস্রোত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা এতই বৃদ্ধি পায় যা সে যুগে আর কোন শায়খে তরীকতের ছিল না।

"কাশ্‌ফ ও কারামতের ঘটনা তাঁর থেকে এত প্রচুর প্রকাশিত হয়েছে যা বিশ্বাস না করে উপায় নেই। এ ব্যাপারে প্রথম যুগের আওলিয়ায়ে কিরামের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা আবদুল কাদির জিলানী ব্যতিরেকে এর আর কোন নযীর মেলে না।"[১]

তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে বর্তমান লেখকের " তাযকিরায়ে হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জে মুরাদবাদী" নামক পুস্তক দেখুন।

মির্যা মাজহার জানে জানাঁ এবং হযরত শাহ্ গুলাম আলী

হযরত সাইয়েদ নূর মুহাম্মদ বদাউনীর খলীফা হযরত মির্যা মাজহার জানে জানাঁ শহীদ[২] (হি.১১১১৩) / ১১৯৫ হি) যিনি পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত তাঁর পবিত্র সত্তা দ্বারা মানুষের অন্তর রাজ্যকে উষ্ণ ও উত্তপ্ত রাখেন, রাখেন আলোকিত এবং রাজধানী দিল্লীতে প্রেমের বাজারকে উচ্চতার শীর্ষে নিয়ে পৌছান। হাকীমুল ইসলাম হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভীর মত দূরদর্শী সমকালীন বুযুর্গ তাঁর সম্পর্কে নিম্নরূপ সাক্ষ্য দিয়েছেন ঃ

"ভারতবর্ষের লোকদের অবস্থা আমাদের কাছে প্রচ্ছন্ন নয়। কেননা আমাদের জন্ম এখানেই এবং এখানেই আমরা জীবন কাটিয়েছি। আরব দেশ আমি নিজে

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)
মাওলানা মসীহুযযামান খান শাহজাহানপুরী (হায়দারবাদের নিজাম হযরত মাহবূব আলী খানের উস্তাদে আ'লা), মাওলানা সাইয়েদ জহূরুল ইসলাম ফতেহপুরী, মাওলানা সাইয়েদ তাজাম্মুল হুসায়ন বিহারী, মাওলানা হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই, নাযেম, নদওয়াতুল উলামা, নওয়াব সদর ইয়ার জঙ্গ, মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী (সদরুস সুদূর, ধর্মীয় বিষয়াদি, হায়দরাবাদ), হুসসামুল মুল্‌ক সাফিয়্যুদ্দৌলা নওয়াব সাইয়েদ আলী হাসান খান, নদওয়ার নাজেম। মাওলানার সিলসিলার ব্যাপক প্রচার-প্রসার প্রথমোক্ত মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরীর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সাধিত হয়।

১. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৮ম খণ্ড;

২. আসল নাম শামসুদ্দীন হাবীবুল্লাহ, মাজহার তাখাল্লুস, পিতার নাম মির্যা জান। সেই সুত্রে আলমগীর মরহুম জানে জানাঁ নাম রাখেন। কেননা সন্তান পিতার জান তুল্য হয়ে থাকে। ফলে সকলের মুখে মুখে এই নামই প্রচারিত হয়ে যায়।

দেখেছি এবং ব্যাপকভাবে সফরও করেছি। আফগানিস্তান ও ইরানের লোকদের অবস্থা সেখানকার বিশ্বস্ত লোকদের মুখে শুনেছি। এসব কিছুর পর এই সিদ্ধান্ত পৌঁছেছি যে, এমন কোন বুযুর্গ যিনি শরীয়ত ও তরীকতের সংকীর্ণ রাস্তা এবং কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে তাঁর মত সোজা সরল ও দৃঢ়পদ এবং ছাত্রদের নেতৃত্ব দান ও দিক-নির্দেশনা দানে তাঁর অবস্থানগত মর্যাদা এত সমুন্নত ও তাঁর তাওয়াজ্জুহ এত শক্তিশালী যে, আমাদের কালে এসব দেশের মধ্যে কোন দেশে ওপরে যার আমরা আলোচনা করেছি, পাওয়া যায় না। অতীত যুগে এবং প্রাচীন বুযুর্গদের মধ্যে অবশ্য হতে পারে। কিন্তু সত্য বলতে গেলে প্রত্যেক যুগে এমন সব বুযুর্গ অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায় না, সেখানে এমন যুগে যেখানে ফেৎনা-ফাসাদ পরিপূর্ণ তেমনটি পাওয়া তো আরও অসম্ভব।"[১]

হযরত মির্যা মাজহার জানে জানাঁর খলীফাদের মধ্যে মা'মূলাতে মাজহারিয়ার লেখক হযরত মাওলানা নঈমুল্লাহ বাহরাইচী (মৃ. ১১৫৩-১২১৮ হি.), এবং সে যুগের ইমামে বায়হাকী "মালা'বুদ-দামিনহু" ও তফসীরে মাজহারীর লেখক হযরত কাযী ছানাউল্লাহ পানীপথী (মৃ. ১২২৫ হি.) এবং মাওলানা গুলাম ইয়াহইয়া বিহারী (মৃ. ১১৮০ হি.)-র মত খ্যাতনামা উলামা ও মাশায়েখ ছিলেন।[২] কিন্তু মির্যা সাহেবের সিলসিলা বরং মুজাদ্দিদিয়া তরীকার বিশ্বব্যাপী প্রচার তাঁরই উপযুক্ত খলীফা হযরত শাহ গুলাম আলী বাটালভী[৩] (১১৫৬-১২৪০ হি.)-র ভাগ্যে নির্ধারিত ছিল। তাঁকে মুজাদ্দিদিয়া সিলসিলার মুজাদ্দিদ বরং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুলূক ইলাল্লাহ, তাযকিয়া ও ইহসান তথা আত্মশুদ্ধি (যার পরিচিত নাম তাসাওউফ)-র মুজাদ্দিদ বলা যথার্থ হবে যার ওপর আরব-অনারব সকল পিপাসার্ত মানুষ আত্মিক পিপাসা নিবারণের উদ্দেশ্যে ঝাপিয়ে পড়েছিল। ভারতবর্ষের এমন কোন শহর ছিল না যেখানে তাঁর কোন খলীফা ছিলেন না। কেবল এক আম্বালা শহরেই তাঁর পঞ্চাশজন খলীফা ছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খান তদীয় "আছারু'স-সানাদীদ" নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"আমি হযরতের খানকায় নিজের চোখে রোম, শাম, বাগদাদ, মিসর, চীন ও ইথিওপিয়ার লোকদের দেখেছি যে, তারা উপস্থিত হয়ে বায়'আত করছে এবং খানকাহর খেদমত করাকে চিরন্তন সৌভাগ্য ভাবছে এবং কাছাকাছি শহরগুলোর লোকেরা যেমন হিন্দুস্তান, পাঞ্জাব ও আফগানিস্তানের কথা না বলাই ভাল, টিড্ডির

১. কলেমাতে তায়্যিবাত, পৃ. ১৬৪-৬৫;

২. খলীফা ও বড় বড় মুরীদদের তালিকা চাইলে দ্র. মাকামাতে মাজহারী-এর ৬৪ পৃষ্ঠায় যেসব খলীফার নাম দেওয়া হয়েছে তাঁদের সংখ্যা ৪৩ জন।

৩. তাঁর আসল নাম ছিল আবদুল্লাহ; শাহ গুলাম আলী নামেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

ঝাঁকের মত লাফিয়ে পড়ছে। হযরতের খানকাহতে পাঁচশ'র কম নয়—ফকীর মিসকীন অবস্থান করত এবং সবার রুটি-কাঁপড় তাঁর যিম্মায় ছিল।"[১]

শাহ্ রঊফ আহমদ মুজাদ্দিদী "দুররু'ল-মা'আরিফ" নামক গ্রন্থে কেবল একদিনের শিক্ষার্থীদের জন্মভূমির তালিকা সূচী লিখেছেন যারা ২৮শে জুমাদাল ঊলা, ১২৩১ হি. দিল্লীর সেই খানকাহ্য় তাঁর থেকে উপকার লাভের মানসে হাজির ছিল।

"সমরকন্দ, বুখারা, গযনী, তাশকন্দ, হিসার, কান্দাহার, কাবুল, পেশাওয়ার, কাশ্মীর, মুলতান, লাহোর, সরহিন্দ, আমরোহা, সম্ভল, রামপুর, বারেলী, লাখনৌ, জায়েস, বাহরাইচ, গোরখপুর, আজীমাবাদ, ঢাকা, হায়দরাবাদ, পূনা প্রভৃতি।"[২]

তাঁর এই ব্যাপক ফয়েয দৃষ্টে তাঁর উপযুক্ত শাগরিদ মাওলানা খালিদ রূমী (কুর্দী)-র ফারসী এই কবিতা ঘটনার সঠিক ও হুবহু চিত্র মনে হয়।

خبراز من دہید آں شاہ خوباں را بہ پنہانی [৩]

کہ عالم زندہ شد بار دگراز ابر نیسانی

হযরত শাহ্ গুলাম আলীর বড় বড় জলীলু'ল কদর খলীফা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত শাহ্ সা'দুল্লাহ, তাঁর খলীফা শাহ্ মুহাম্মদ নঈম (মিসকীন শাহ নামে খ্যাত) (মৃ ১২৬৪ হি.) ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হায়দরাবাদে আগমন করেন এবং লম্বা সময় সেখানে অবস্থান করেন। আসিফ জাহ ৬ষ্ঠ আ'লা হযরত মীর মাহবূব আলী খান তাঁর মুরীদ ছিলেন।[৪] শাহ্ সা'দুল্লাহর দ্বিতীয় খলীফা সাইয়েদ মুহাম্মদ পাদশাহ বুখারী (মৃ. ১৩২৮ হি.)।[৫] হযরত শাহ্ গুলাম আলীর একজন খলীফা হযরত শাহ্ রঊফ আহমদ ছাহেব মুজাদ্দিদী (১২০১-১২৬৬ হি.) ভূপালে মুজাদ্দিদিয়া খানকাহ্র ভিত্তি স্থাপন করেন।[৬] বাহরাইচে মাওলানা শাহ্ বাশারত উল্লাহ বাহরাইচী (মৃ. ১২৫৪ হি.) মুজাদ্দিদিয়া নক্শবান্দিয়া সিলসিলার প্রচার করেন। বুখারায় শায়খ গুল মুহাম্মদ সর্বস্তরের মানুষের শায়খ হিসাবে সকলের মধ্যমণি হন এবং তিনি সিলসিলায়ে মুজাদ্দিদিয়ার ফয়েয সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে রেখেছিলেন।[৭] শায়খ আহমদ বাগদাদী কাদিরী বাগদাদ থেকে এসে বায়'আত ও এজাযত হাসিল করেন।[৮]

---

১. আছারু'স-সানাদীদ, ৪র্থ অধ্যায়। ২. দুররু'ল-মা'আরিফ, পৃ. ১০৬।
৩. ৫৯ পংক্তির কবিতা যা শাহ আবদুল গনী মুহাদ্দিছ দেহলভী গোটাটাই উদ্ধৃত করেছেন।
৪. মাখবার-এ দাকান, মাদ্রাজ; ২রা জানুয়ারী, ১৮৯৬ খ্রি.।
৫. যাঁর খলীফা সাইয়েদ আবদুল্লাহ শাহ সাহেব (মৃ. ১৩৮৪ হি.) যুজাযাতু'ল-মাসাবীহ্র লেখক, দীর্ঘকাল ধরে হায়দারাবাদে আপন মিশনে কর্মতৎপর থাকেন।
৬. যা পীর আবু আহমদ সাহেব এবং তাঁর ভাগ্যবান পুত্র মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইয়াকূব সাহেব স্ব-স্ব যুগে আবাদ করেছেন।
৭. দুররু'ল-মা'আরিফ, ১২৫ পৃ.।
৮. প্রাগুক্ত, ১৪৪ পৃ.।

মাওলানা খালিদ রূমী (কুর্দী)

ইরাক, শাম ও তুরস্কে হযরত শাহ গুলাম আলী সাহেবের সিলসিলার প্রচার-প্রসারের কাজ আল্লাহ্ তা'আলা একজন কুর্দী মনীষী বুযুর্গ দ্বারা নেন যার নাম মাওলানা খালেদ রূমী যিনি তাঁর দেশে হযরতের ফয়েয ও ইরশাদের আওয়াজ শুনে সার্বক্ষণিক উৎসাহ, আগ্রহ ও অস্থিরতা নিয়ে মনযিলের পর মনযিল অতিক্রম করে এক বছরে দিল্লীতে এসে উপনীত হন এবং আস্তানায় এসে এমন ভাবে হুমড়ী খেয়ে পড়েন যে, সুলূকের পূর্ণ মনযিলগুলো অতিক্রম করে এজাযত ও খেলাফত লাভে ধন্য হন। এ সময় তাঁর ধ্যানমগ্নতা ও একাগ্রতার অবস্থা এমন ছিল যে, দিল্লীর উলামা ও মাশায়েখ যাঁরা তাঁর ফযীলতপূর্ণ মর্যাদা ও কামালিয়াতের খ্যাতির কথা বছর খানেক ধরে শুনে আসছিলেন, সাক্ষাতের জন্য এলে তিনি বলে দিতেন, ফকীর যেই উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে তা অর্জন করা ব্যতিরেকে কোন দিকে মনোনিবেশ করতে পারে না। সে যুগের সমাসীন বিখ্যাত বুযুর্গ সিরাজু'ল হিন্দ হযরত শাহ আবদুল আযীয (মুহাদ্দিছ দেহলভী) এসেছেন। শাহ্ আবু সাঈদ ছাহেব ছিলেন তাঁর প্রিয় ছাত্র। তিনি গিয়ে আরয নিবেদন করেন যে, উস্তাযু'ল হিন্দ আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করবার জন্য এসেছেন। তিনি তখন বলেন, "তাঁকে আমার সালাম বল গিয়ে এবং এও বল যে, উদ্দেশ্য হাসিলের পর আমি নিজেই গিয়ে তাঁর খেদমতে হাযির হব।"

দেশে ফিরতেই আল্লাহপ্রার্থীরা পতঙ্গের ন্যায় ঝাপিয়ে পড়ল এবং মানুষ এমনভাবে তাঁর দিকে ঝুকল যে, মাওলানা শাহ্ রউফ আহমদ সাহেব মুজাদ্দিদী তদীয় "দুররু'ল-মা'আরিফ" নামক গ্রন্থে ১২৩১ হিজরীর ২৪ শে রজব জুমুআর দিনের রোয়েদাদ লিখতে গিয়ে বলেন, "পশ্চিম আফ্রিকার একজন বুযুর্গ তাঁর মুবারক নাম শুনে মনযিলের পর মনযিল অতিক্রম করে বাগদাদে মাওলানা খালিদ রূমীর সঙ্গে মিলিত হতে হাজির হন। তিনি মাওলানার জনপ্রিয়তা এবং কিভাবে মানুষ তাঁর দিকে ধাবিত হচ্ছে সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, প্রায় এক লক্ষ মানুষ তাঁর হাতে বায়'আত হয়েছে এবং তাঁর মুরীদভুক্ত হয়েছে। এক হাজার গভীর পাণ্ডিত্যসম্পন্ন আলিম তাঁর তরীকায় দাখিল হয়ে মাওলানার সামনে বিনয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে।"[১]

স্বয়ং মাওলানা খালিদ হযরত শাহ আবু সাঈদের নামে যেই পত্র লিখেছেন তাতে নি'মতের শুকরিয়া হিসাবে লিখেছেন ঃ

"সমগ্র রোম (তুরস্ক), আরব, হেজায, ইরাক ও কোন কোন অনারব দেশ এবং গোটা কুর্দিস্তান তরীকায়ে আলিয়া নক্শবান্দিয়ার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও জযবা দ্বারা

---

১. দুররু'ল মা'আরিফ, ১৭০ পৃ.।

মাতাল বিহ্বল এবং রাত-দিন সমগ্র মাহফিল ও মজলিস, মসজিদ ও মাদরাসায় হযরত ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ ও মুনাওয়ার আলফেছানীর সৌন্দর্য ও প্রশংসাগীত ছোট-বড় সকলের মুখে এভাবে লেগে রয়েছে যে, কল্পনাও করা যায় না কখনো কোন দেশ ও কোন সময় যুগের কান এমন সঙ্গীতের সুর লহরী শুনতে পেয়েছে অথবা আসমান তার চোখ দিয়ে এমন আবেগ-ঘন দৃশ্য ও এমন সমাবেশ দেখেছে। ... যদিও এ ধরনের বিষয় আলোচনা এক ধরনের ধৃষ্টতা ও আত্ম-প্রশংসার শামিল, এই অধম ফকীর এজন্য লজ্জিতও বটে, তবুও কেবল বন্ধুদের হককে অগ্রগণ্য জেনে সে এই বেয়াদবী করতে সাহসী হয়েছে।"[১]

আল্লামা ইবনে আবেদীন, আল্লামা শামী নামে মশহূর, দুররুল মুখতার -এর শরাহ্ রদ্দুল মুহ্তার-এর প্রণেতা, মাওলানা খালিদ রূমীর প্রশংসায় "সাল্লু'ল-হিসাম আল-হিন্দী লে-নুসরাতি মাওলানা খালিদ আন-নাকশবান্দী" নামে একটি গ্রন্থই লিখে ফেলেন।[২] আসলে এ বইটি আরেকটি বইকে রদ করতে গিয়ে লেখা হয়েছিল যেটি মাওলানা খালিদ রূমীর বিরোধিতা করতে গিয়ে এবং তাঁকে পথভ্রষ্ট প্রমাণ করতে গিয়ে কতকগুলো ঈর্ষাকাতর ও হিংসুটে স্বভাবের লোক লিখেছিল।

গ্রন্থের শেষে সংক্ষিপ্ত জীবনীও লেখা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, মাওলানা খালিদ রূমী সুলায়মানিয়ার নিকটবর্তী কুরাহদাগ নামক কসবা (পল্লী)-য় জন্মগ্রহণ করেন হিজরী ১১৯০ সনে। সে যুগের বিখ্যাত উস্তাদদের কাছে লেখা-পড়া করেন এবং প্রচলিত জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তালিম হাসিল করেন। যুক্তি বিদ্যা, দর্শন গণিত শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি শাখায়ও পূর্ণতা লাভ করেন। এরপর সুলায়মানিয়াতে ফিরে এসে হেকমত, ইলমে কালাম ও বালাগাত শাস্ত্রের উচ্চ মাপের কিতাবাদি পড়াতে থাকেন। ১২২০ হিজরীতে বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ ও যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করেন। মক্কা মুআজ্জমায় থাকতেই তিনি দিল্লী যাবার গায়বী ইশারা প্রাপ্ত হন। প্রথমে সিরিয়ায় ফিরে আসেন। সেখান থেকে জনৈক ভারতীয়ের কাছে হযরত শাহ গুলাম আলীর কথা শুনতে পান। তার ওপর ভিত্তি করে তিনি ১২২৪ হিজরীতে ইরান ও আফগানিস্তান হয়ে এবং সর্বত্র তাঁর জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার স্বীকৃতি আদায় করে লাহোরের পথে পুরো এক বছরে দিল্লীতে এসে উপনীত হন। দিল্লী পৌঁছে তিনি কাসীদায়ে শাওকিয়া লিখেন যার পংক্তিমালা ছিল নিম্নরূপ ঃ

كملت مسافة كعبة الامال

حمدالمن قد من بالاكمال

---

১. মাওলানা আবদুস শাকূর লিখিত مشموله تذكره امام ربانى مجدد الف ثانى নামক নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

২. মাজমূ'আ রাসাইল ইবনে আবিদীন, নতুন সংস্করণ, সোহেল একাডেমী, লাহোর, পাকিস্তান।

এক বছরও পুরো হয় নি, তিনি পাঁচ তরীকায় এজাযত ও খেলাফত লাভে ধন্য হন। এরপর স্বীয় পীর ও মুরশিদের হুকুমে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বাগদাদ পৌঁছে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ ও জনগণের পথ প্রদর্শনের কাজ ধারাবাহিকভাবে শুরু করেন। পাঁচ মাস সেখানে অবস্থান করে দেশে ফিরে আসেন। ১২২৮ হিজরীতে তিনি পুনরায় বাগদাদ প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তাঁর অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা ও তাঁর প্রতি মানুষের প্রচণ্ড স্রোত লক্ষ করে একদল লোক হিংসাকাতর হয়ে পড়ে এবং তাঁর বিরুদ্ধে এক ফেতনা খাড়া করা হয়। বাগদাদের শাসনকর্তা সাঈদ পাশার ইঙ্গিতে কতক উলামায়ে কিরাম তা রদ করার উদ্দেশ্যে মোহরাংকিত অভিমত প্রদানপূর্বক তাঁকে এ থেকে মুক্ত ঘোষণা করেন এবং তাঁর উচ্চ মরতবার অনুকূলে ফতওয়া প্রদান করেন। কুর্দিস্তান ও কিরকূকের লোকেরা, ইরবিল, মাওসিল, ইমাদিয়া, গায়তার, হলব (আলেপো), শাম, মদীনা মুনাওয়ারা, মক্কা মুআজ্জমা ও বাগদাদের হাজার হাজার লোক তাঁর থেকে উপকৃত হয়।

লেখক এরপর তাঁর মহান চরিত্র আলোচনা করেছেন এবং তৎ কর্তৃক লিখিত গ্রন্থের তালিকা পেশ করেছেন। তিনি তাঁর যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি শায়খ উছমান সনদেরও একটি লেখার কথা উল্লেখ করেছেন যা মাওলানা খালিদ-এর জীবনী বিষয়ে লেখা হয়েছে। লেখাটির নাম اصفى الموارد فى ترجمة سيدنا خالد শেষে তিনি সিরিয়াকেই স্থায়ী আবাস হিসাবে গ্রহণ করেন। ১২৩৮ হিজরীতে তিনি আপন খলীফা ও মুরীদদের বিরাট একটি দল নিয়ে সিরিয়া সফর করেন।

অতঃপর গোটা সিরিয়া যেন তাঁর ওপর ভেঙে পড়ে। জনগণের হেদায়েত ও আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশনার সাথে সাথে তিনি ইলমে শরী'আতের প্রচার-প্রসার এবং মসজিদগুলোর পুনরায় আবাদ করার প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন। অবশেষে ১২৪২ হিজরীর ১৪ই যী-কা'দাহ তারিখে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে শাহাদত লাভ করেন এবং কাসিয়ূন-এর পাদদেশে তাঁকে দাফন করা হয়।

মাওলানা বংশগতভাবে ছিলেন উছমানী অর্থাৎ হযরত উছমান (রা)-এর বংশধর। উল্লিখিত গ্রন্থের লেখক তাঁর একটি স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন যে, আমি দেখলাম, সায়্যিদুনা হযরত উছমান (রা) ইবনে আফফানের ইনতিকাল হয়ে গেছে আর আমি তাঁর জানাযা পড়াচ্ছি। স্বপ্নের কথা শুনে তিনি বললেন, এটি আমার চির বিদায়ের ইঙ্গিত। আমি তাঁর সন্তান (বংশধর)। এই স্বপ্ন তিনি মাগরিবের সময় বর্ণনা করেছিলেন এবং মাওলানা খালিদ এশার সালাত আদায় অন্তে ওসিয়ত (অন্তিম উপদেশ) করেন ও স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। এরপর তিনি ঘরে যান এবং সেই রাতেই-প্লেগে আক্রান্ত হন ও ইনতিকাল করেন।[১]

১. সাল্লু'ল-হুসামু'ল হিন্দী, পৃ. ৩১৮-২৫; মাওলানার সিলসিলা সিরিয়া ও তুরস্কে এখনও বর্তমান। আমি দামিশ্ক, হলব ও তুরস্কে এই সিলসিলার অনেক মাশায়েখের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি।

হযরত শাহ্ আহমদ সাঈদ ও তাঁর খলীফাবৃন্দ

হযরত শাহ্ গুলাম আলী (র)-র মূল স্থলাভিষিক্ত এবং তাঁর সিলসিলাকে সমগ্র বিশ্বে যিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি হলেন তাঁর হাতে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুজাদ্দিদী খান্দানের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্য-মণি হযরত শাহ্ আহমদ সাঈদ ইব্‌ন শাহ্ আবু সাঈদ[১] (১২১৭-১২৭৭ হি.) যিনি তাঁর পিতা হযরত শাহ্ আবু সাঈদ-এর ওফাতের পর ১২৫০ হিজরীতে হযরত শাহ্ গুলাম আলী ও হযরত মির্যা মাজহার জানে-জানাঁর আসনকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলেন এবং পূর্ণ ২৩ বছর (১২৫০-১২৭৩ হি.) পর্যন্ত অত্যন্ত জোরে-শোরে মুজাদ্দিদী সিলসিলার প্রচার-প্রসারে তৎপর থাকেন এবং ঐ বছরই (১৮৫৭ খ্রি. সিপাহী বিপ্লবের বছর) বাধ্য হয়ে ভারতবর্ষের পিতা-পিতামহদের প্রতিষ্ঠিত খানকাহকে বিদায় জানান। অতঃপর ১২৭৪ হিজরীর মুহার্রাম মাসে দিল্লী থেকে রওয়ানা হয়ে ৭৪-এর শাওয়াল মাসে মক্কা মুকার্রামায় পৌঁছেন। এরপর মদীনা তায়্যিবায় স্থায়ী আবাস গ্রহণ করেন এবং দু'বছর জীবিত থেকে সেখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত হন। দু' বছরের এই স্বল্প সময়ে শত শত তুর্কী ও আরব তাঁর হাতে বায়'আত হয়। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণণা মুতাবিক, "যদি তাঁর হায়াত তাঁকে আরও কিছু দিন অবকাশ দিত এবং এই সিলসিলা জারী থাকত তাহলে তাঁর মুরীদের সংখ্যা লাখের অংকে গিয়ে পৌঁছুত।"[২]

হযরত শাহ্ আহমদ সাঈদ (র)-এর খলীফার সংখ্যা নিরূপণ করা দুষ্কর। "মানাকিবে আহমাদিয়্যা"[৩] তে আশি জনের নাম উল্লিখিত হয়েছে। ভারতবর্ষে তাঁর সিলসিলার প্রচার একদিকে শায়খ দোস্ত মুহাম্মদ কান্দাহারীর মাধ্যমে হয় যাঁর শ্রেষ্ঠতম খলীফা ছিলেন খাজা উছমান দামানী (মৃ. ১৩১৪ হি.) যিনি ডেরা ইসমাঈল খানের মূসা-যাঈ কসবাতে বসে সেখানকার পরিবেশকে প্রেমের উষ্ণতা ও নক্‌শবান্দিয়া নিসবতের প্রশান্তি দ্বারা উন্মাতাল করে তোলেন। তাঁরই শ্রেষ্ঠতম খলীফা খাজা সিরাজুদ্দীন (মৃ. ১৩৩৩ হি.) এই সিলসিলাকে দূর থেকে দূরতম এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বিরাট প্রভাব দান করেছিলেন এবং তিনি খোদায়ী পথ-নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ, অটুট ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ়তা এবং হাদীছে পাকের প্রতি মগ্ন থেকে সঙ্গে আপন পূর্বপুরুষদের মর্যাদামণ্ডিত আসনকে ধরে রাখেন ও আবাদ করেন। খাজা সিরাজুদ্দীনের খলীফা হন মুফাসসিরে কুরআন ও তাওহীদের দাঈ ওয়াঁ বিছরার[৪] মাওলানা হুসায়ন আলী শাহ (১২৮৩-১৩৬৩ হি.)।

---

১. বিস্তারিত জানতে হলে দ্র. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৭ম খণ্ড; মকামাতে খায়র, মাওলানা শাহ্ আবুল হাসান যায়দ ফারূকী কৃত।

২. মকতূবাতে শাহ্ মুহাম্মদ ওমর ইব্‌ন শাহ্ আহমদ সাঈদ বনাম মাওলানা সাইয়েদ আবদুস সালাম হাসুবী (র.)।

৩. শাহ্ মুহাম্মদ মাজহার লিখিত।

৪. পশ্চিমা পাঞ্জাবের মিয়ানওয়ালী জেলায়।

তাঁর মাধ্যমে বিরাট আকারে আকীদা-বিশ্বাসের সংস্কার সাধিত হয় এবং নির্ভেজাল তাওহীদের আওয়াজ বুলন্দ ও সমুন্নত হয় যার নজীর এ যুগে মেলা ভার।

ঐ যুগেই মুজাদ্দিদিয়া সিলসিলার একজন বড় শায়খ ছিলেন শাহ ইমাম আলী (১২১২-১২৮২ হি.) মকানবী[২] যাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের ধাবমান স্রোত ও জনপ্রিয়তার অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর বাবুর্চি খানায় দৈনিক তিনশ' বকরী যবাহ হত।[৩] তাঁর সিলসিলা হযরত আবদুল আহাদ ওয়াহদাত ওরফে শাহ গুল-এর মাধ্যমে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী পর্যন্ত পৌঁছে।

হযরত শাহ আহমদ সাঈদ-এর একজন জলীলু'ল-কদর খলীফা মাওলানা সাইয়েদ আবদুস সালাম ওয়াসেতী হাসুভী (১২৩৪-১২৯৯ হি.) যিনি খুবই উচ্চ নিসবত ও ছাহেবে ইস্তেকামাত শায়খ ছিলেন যাঁর মাধ্যমে যুক্ত প্রদেশে এই তরীকার প্রচার-প্রসার ঘটে।[৪]

হযরত শাহ আহমদ সাঈদের পুত্র হযরত শাহ আবদুর রশীদ (১২৩৭-১২৮৭ হি.) (যাঁর থেক নওয়াব কালবে আলী খান, রামপুরের শাসক, অধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ লাভ করেন) আপন পিতার পর মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। অবশেষে মক্কা মুকার্রামায় এসে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই আগ্রহী শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দানে লিপ্ত থেকে ইহলোক ত্যাগ করেন। জান্নাতুল মুআল্লাতে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁরই পুত্র শাহ মুহাম্মদ মা'সূম (১২৬৩-১৩৪১ হি.) রামপুর রাজ্যে মা'সূমী খানকাহর বুনিয়াদ রাখেন। ৩২ বছর রামপুরে অবস্থান করেন এবং ১৩৪১ হিজরীতে মক্কা মুআজ্জমায় ইনতিকাল করেন। তৎপুত্র মাওলানা আবু সাঈদ এখনও জীবিত আছেন।[৫]

হযরত শাহ আহমদ সাঈদের দ্বিতীয় পুত্র শাহ মুহাম্মদ মাজহার (১২৪৮-১৩০১ হি.) অত্যন্ত শক্তিশালী নিসবতসম্পন্ন ও কাছীরু'ল-ইরশাদ বুযুর্গ ছিলেন। সমরকন্দ, বুখারা, কাযযান, এরযে রোম, আফগানিস্তান, ইরান, জাযীরাতু'ল-আরব (আরব উপদ্বীপ) ও সিরিয়ার শত শত আল্লাহর পথের পথিক তাঁর ফয়েয লাভে ধন্য হন। ১২৯০ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় খুবই উন্নতমানের তিনতলা খানকাহ নির্মাণ করেন যা রিবাতে মাজহারী নামে মশহূর। এটি মসজিদে নববীর বাবু'ন-নিসা ও জান্নাতুল বাকী'র মাঝে অবস্থিত (মসজিদে নববীর সাম্প্রতিক সম্প্রসারণের পর এর অস্তিত্ব সম্ভবত নেই।-অনুবাদক)।

---

১. মকান শরীফ গুরুদাসপুর জেলার একটি কসবা যার পুরনো নাম রত্তর ছত্তর।

২. বিস্তারিত জানতে দ্র. তাযকিরায়ে বেমিছল রাজগানে রাজোর, মির্যা জাফরুল্লাহ খান, পৃ. ৫০৮-২১।

৩. বিস্তারিত জানতে হলে দ্র. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৭ম খণ্ড।

৪. মূল পুস্তকটির ১৯৮০ সালে প্রকাশিত সংস্করণ থেকে অনূদিত বিধায় লেখক গ্রন্থকার তাঁর বেঁচে থাকার তথ্য দিয়েছিলেন। বর্তমান খবর অজ্ঞাত।—অনুবাদক।

তৃতীয় পুত্র শাখ মুহাম্মদ ওমর (১২৪৪-৯৮)। হযরত শাহ্ আবুল খায়র মুজাদ্দিদী তাঁর পুত্র।

হযরত শাহ্ আবদুল গনী

হযরত শাহ্ আহমদ সাঈদ-এর উচ্চ মর্তবাসম্পন্ন ভ্রাতা বিখ্যাত মুহাদ্দিছ হযরত শাহ্ আবদুল গনী (১২৩৫-৯৬ হি.) যিনি দরসে হাদীছ, সুলূক ও তাসাওউফকে এভাবে একত্র করেন যার নজীর হযরত শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভীকে বাদ দিলে আর কোথাও মেলা ভার। বাতেনী তথা আধ্যাত্মিক সম্পদ ও মুজাদ্দিদী নিসবতের ধারক-বাহক এবং শায়খ-ই কামিল হবার সাথে সাথে তিনি হাদীছের উস্তাদুল হিন্দ ও শায়খ-এ ওয়াক্ত ছিলেন যাঁর হলকায়ে দরসে মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতবী ও মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গূহীর মত বিখ্যাত সব আলিম ছিলেন এবং হাদীছ চর্চার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ অনন্য স্থানের অধিকারী হয়। দেওবন্দ ও সাহারনপুরের মাজাহিরুল উলূম-এর মত বিরাট বিরাট মাদরাসা হাদীছ চর্চার কেন্দ্র হিসাবে অভিহিত হয়। ১৮৫৭ সালের (সিপাহী) বিপ্লবের পর তিনিও তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে হিন্দুস্তান থেকে হিজরত করেন এবং মদীনায়ে তায়্যিবায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। অতঃপর তিনি "কানযু'ল উম্মাল"-এর লেখক আল্লামা শায়খ আলী মুত্তাকীর সুন্নত জীবিত করত হারামায়ন শারীফায়ন-এ দীর্ঘকাল হাদীছের খেদমতে মশগুল থাকেন এবং আরব-অনারব দেশগুলোতে ফয়েয পৌঁছানোর পর বর্তমানে জান্নাতুল বাকীতে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।[১]

শাহ্ আবদুল গনী (র)-র তিনজন নামকরা খলীফা ছিলেন যাঁদের অন্যতম হলেন মাওলানা আবদুল হক এলাহাবাদী মুহাজিরে মাক্কী যিনি সাহিবু'দ-দালাইল বা দালাইল প্রণেতা হিসাবে মশহূর (মৃ. ১৩৩৩ হি.)। দ্বিতীয় জন হলেন শাহ্ আবু আহমদ মুজাদ্দিদী ভূপালী (মৃ. ১৩৪২ হি.) এবং তৃতীয়জন হলেন হযরত শাহ্ রফীউদ্দীন দেওবন্দী, মুহতামিম আওয়াল, দারুল উলূম দেওবন্দ (মৃ. ১৩০৮ হি.) যাঁর থেকে হযরত মুফতী আযীযুর রহমান সাহেব দেওবন্দী (মৃ. ১৩৪৭ হি.) খেলাফত পেয়েছিলেন, তাঁরই খলীফা ও মুজায ছিলেন। হযরত শাহ্ আহমদ সাঈদ এবং হযরত শাহ্ আবদুল গনী (র) ভারতবর্ষ থেকে হিজরত করে যাবার পর এই খানকাহ্ওয়ালা শান যা অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরে আবাদ ছিল, ছিল জনসমাগমপূর্ণ, তা খালি হয়ে যায়।[২] অবশেষে উক্ত খান্দানেরই নয়নমণি ও

---

১. তাঁরই শাগরিদ শায়খ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া ত্রিহুতী তাঁর ও তাঁর মাশায়েখদের জীবন কাহিনী নিয়ে আরবীতে স্বতন্ত্র একটি পুস্তক লিখেছেন যার নাম اليانع الجنى فى اسانيد الشيخ عبد الغنى। এটি একজন ভারতীয় লেখকের আরবী ভাষাজ্ঞান ও রচনাশৈলীর সর্বোত্তম নমুনা।

২. গ্রন্থকার মাওলানা সাইয়েদ আবদুস সালাম হাসুভীর একটি পত্র দেখতে পেয়েছেন যিনি এমন একজনের পত্রের জওয়াবে তা লিখেছিলেন যিনি উল্লিখিত বুযুর্গদ্বয়ের হিজরতের পর খানকাহ বিরান হবার অভিযোগ করেছিলেন। হযরত শাহ আবদুল গনী মদীনা তায়্যিবা থেকে জওয়াব দেন যে, মাওলানা আবদুস সালামকে নিয়ে যাও এবং আমাদের জায়গায় বসিয়ে দাও। এক্ষণে এ জায়গায় বসার সেই সর্বাধিক উপযুক্ত।

আশা-আকাংক্ষার কেন্দ্র বিন্দু এবং উক্ত খান্দানেরই একজন জলীলু'ল কদর শায়খ হযরত শাহ আবুল খায়র মুজাদ্দিদী (১২৭২- ১৩৪১ হি.), যিনি ছিলেন শাহ আহমদ সাঈদ সাহেবের ছাহেবে নিসবত ও কামালিয়াতসম্পন্ন পৌত্র, একে আবাদ করেন এবং সত্বরই এ খানকাহ্ জনসমাগমে পূর্ণ হয়ে ওঠে।[১]

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর খান্দান অধঃস্তন চতুর্থ ও পঞ্চম পুরুষের পর সরহিন্দ থেকে বের হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এতে পূর্বপুরুষদের কবরের সেবায়েত-গিরি থেকে হেফাজত করা ছাড়াও (যার বহু দুঃখজনক খারাবী অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে) হযরত মুজাদ্দিদের তরীকার প্রচার-প্রসার এবং দাওয়াত ও তাবলীগের বহুবিধ কল্যাণ লুক্কায়িত ছিল। অনন্তর একটি শাখা কাবুলে (যার শেষ কেন্দ্র বা মারকায ছিল জাওয়াদ)[২] সম্মান ও মর্যাদা, কল্যাণ ও জনগণের পথ প্রদর্শনের কাজের সঙ্গে অবস্থান করে। হযরত নূরুল মাশায়েখ শায়খ ফযলে ওমর মুজাদ্দিদী ওরফে শের আগা ঐ শাখার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন যাদের মুরীদদের সংখ্যা শত শতের উর্ধ্বে ছিল এবং পাক-ভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।[৩] তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ মুহাম্মদ সাদেক মুজাদ্দিদী মধ্য প্রাচ্যে আফগানিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। আপন ইল্‌ম, কল্যাণকামিতা, তাকওয়া এবং মুসলমানদের নানাবিধ সমস্যা-সংকটের ব্যাপারে গভীর আগ্রহের কারণে তাঁকে আরব দেশগুলোতে সম্মানের চোখে দেখা হতো। জনগণের এই আন্দোলনে এই দুই ভাই কেন্দ্রীয় ও নেতৃসুলভ ভূমিকা পালন করেছিলেন যার পরিণতিতে আমীর আমানুল্লাহ খানকে সিংহাসন থেকে পদত্যাগ করতে হয় এবং নাদির শাহ সিংহাসন আসীন হন।[৪]

সিন্ধুতেও এই খান্দানের একটি অভিজাত শাখা কসবা টেণ্ডু সায়েদাদ, হায়দরাবাদ ও সিন্ধুতে বসবাস করে আসছিল। উক্ত শাখায় খাজা মুহাম্মদ হাসান মুজাদ্দিদী ও তাঁর পুত্র হাফিজ মুহাম্মদ হাশেম জান মুজাদ্দিদী ছিলেন খুবই বিখ্যাত ও বিশিষ্ট। মদীনা তায়্যিবায় ও মক্কা মুকার্রামায়ও মুজাদ্দিদী খান্দানের শাখা বর্তমান। তাঁরা বেশভূষা ও আচার-আচরণে এবং খান্দানী ঐতিহ্য রক্ষার সাথে সাথে জীবিকা

---

১. বিস্তারিত জানতে দ্র. মাকামাতে খায়র, মাওলানা শাহ আবুল হাসান যায়দ ফারূকী, সাজ্জাদানশীন, খানকাহ হযরত শাহ আবুল খায়র (র)।

২. নিতান্তই আফসোস যে, রাশিয়ান ফৌজের আক্রমণ এবং সমাজতন্ত্রী আফগান সরকারের হস্তক্ষেপে এই কেন্দ্রটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং এটি যারা আবাদ রাখতেন সেই সব উলামায়ে কিরাম আজ নির্বাসিত। লেখক ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তান ও ইরান সফর কালে কেন্দ্রটি জন-সমাগমে পূর্ণ দেখেছিল এবং মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম নূরুল মাশায়েখের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটেছিল।

৩. ২৫ শে মুহার্‌রাম, ১৩৭৬ হিজরীতে তাঁর ইনতিকাল হয়। লেখকের মক্কা মুআজ্জমা ও লাহোরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছিল।

৪. দরিয়ায়ে কাবুল ছে দরিয়ায়ে ইয়ারমূক তক, লেখককৃত ৪২-৪৩ পৃ.।

অর্জন ও পারলৌকিক চিন্তা-ভাবনার সৌজন্যমূলক পেশায় নিয়োজিত আছেন ও সুনামের সঙ্গেই আছেন।

আহ্‌সানিয়া সিলসিলা ও তাঁর শ্রেষ্ঠ মাশায়েখবৃন্দ

হযরত সাইয়েদ আদম বান্নূরী (র) যদিও হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর মহান তরীকার ছানা বিশেষ এবং তাঁরই কোলে তিনি লালিত-পালিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, কিন্তু আপন উন্নত সামর্থ্য ও ভাগ্যবান প্রকৃতি বা স্বভাবের কারণে সিলসিলায়ে মুজাদ্দিদিয়া নক্‌শবান্দিয়ার মধ্যেও এক বিশেষ রঙের ধারক-বাহক এবং একটি তরীকার প্রতিষ্ঠাতাও বটেন যা বহু মুজতাহিদসুলভ বিশিষ্টতার কারণে "তরীকায়ে আহসানিয়া" নামে নামকরণ হয়। হিকমতে ইলাহীর অপার নিদর্শনই বলতে হবে যে, যেই শাখার বুনিয়াদ একজন নিরক্ষর লোকের হাতে পড়ল তারই ভাগে ভারতবর্ষের বিশিষ্টতম উলামায়ে কিরাম, মুহাদ্দিছীন, সমকালীন আসাতেযায়ে কিরাম, বই-পুস্তক ও কিতাব সুন্নাহর প্রকাশক, দাঈ ইলাল্লাহ্ ও সংস্কারক বিখ্যাত দীনি মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা এবং লেখক ও গবেষক পড়ল এবং তিনি এ ব্যাপারেও তাঁর মহান পূর্বপুরুষের সুন্নাহ্‌র অনুসারী এবং তাঁর উত্তরাধিকারী। হাকীমুল ইসলাম হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (র), সিরাজুল হিন্দ হযরত শাহ আবদুল আযীয, দা'ঈ ইলাল্লাহ ও মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ্ হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র) ও মাওলানা শাহ্ ইসমাঈল শহীদ, মুসনাদুল হিন্দ হযরত শাহ্ ইসহাক দেহলভী, দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী, আলিমে রব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (র) এই আহ্‌সানিয়া সিলসিলার মহান বুযুর্গ ও শায়খদের মাধ্যমে মুজাদ্দিদিয়া নক্‌শবান্দিয়ায় দাখিল ও এজাযত ও খেলাফত লাভ করেন।

হযরত শাহ্‌ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভীর মত তাসাওউফের তরীকাসমূহের চক্ষুষ্মান পর্যবেক্ষক ও বিভিন্ন নিসবতের সূক্ষ্ম রহস্যবিদ হযরত সাইয়েদ আদম বান্নূরী সম্পর্কে খুবই সমুন্নত ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং তাঁকে সুলূক ও ইহ্সান শাস্ত্রের তথা ইলমে তাসাওউফের মুজতাহিদ ও স্বতন্ত্র সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে গণ্য করেন।

হযরত সাইয়েদ আদম বান্নূরী (র)-র খলীফাদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল এবং তাঁদের সংখ্যা নিরূপণ করা এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে বেশ কঠিন।

---

৩. লেখক ১৯৪৪ সালে হযরত শাহ্ মুহাম্মদ হাসান মুজাদ্দিদীর সঙ্গে তাঁর কসবা ও খানকাহ্য় সাক্ষাত করেন। তিনি বিজ্ঞ আলেম ও গ্রন্থকার ছিলেন, বুযুর্গ ছিলেন। মাওলানা হাফিয হাশিম জান-এর দিল্লীর নিজামুদ্দীনে আসা-যাওয়া ছিল এবং লেখকের জন্মভূমি দায়েরাহ শাহ্ আলামুল্লাহ রায়বেরেলীতেও তিনি একবার তাশরীফ এনেছিলেন। কাবুল ও টেড্ডু সায়েদাদ-এর দুই মুজাদ্দিদী শাখা হযরত শায়খ গুলাম মুহাম্মদ মা'সূম (মা'সূম ছানী বা ২য় মা'সূম নামে মশহূর)-এ গিয়ে মিলে যায় যিনি হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম-এর পৌত্র ছিলেন।

নুযহাতু'ল-খাওয়াতির" নামক গ্রন্থে নিম্নোক্ত নামগুলো এসেছে যাঁদের হযরত সাইয়েদ বান্নুরী (র) থেকে নিসবত প্রাপ্তি ও মুরীদ হওয়া এবং কারুর কারুর এজাযত ও খেলাফত প্রাপ্তি ঘটেছে। নামগুলো নিম্নরূপ ঃ

দেওয়ান খাজা আহমদ নাসীরাবাদী (মৃ. ১০৮৮ হি.), শায়খ বায়েযীদ কাসূরী (মৃ. ১০৯০ হি.), শাহ ফতহুল্লাহ সাহারন পূরী (মৃ. ১১০০ হি.) ও শায়খ সা'দুল্লাহ বিলখারী লাহোরী (মৃ. ১১০৮ হি.)। কিন্তু তাঁর সিলসিলার প্রচার-প্রসার নিম্নোক্ত, চার জন্য খলীফার দ্বারা হয় যা তাঁর মুজতাহিদসুলভ তা'লীম ও তরবিয়তের নমুনা ও স্মৃতিস্বরূপ ঃ (১) হযরত সাইয়েদ শাহ আলামুল্লাহ্ হাসানী (মৃ. ১০৩৩ হি.), (২) হযরত শায়খ সুলতান বালয়াবী, (৩) হযরত হাফিয সাইয়েদ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী ও (৪) শায়খ মুহাম্মদ শরীফ শাহ আবাদী।[১]

হযরত সাইয়েদ শাহ্ আলামুল্লাহ্ ও তাঁর খান্দান

হযরত সাইয়েদ শাহ আলামুল্লাহ[২] সম্পর্কে হযরত সাইয়েদ আদম বান্নুরী হিজরতের সময় বলেছিলেন, "সাইয়েদ! সম্পর্ক মযবুত করে যাও এবং আপন জায়গায় বসে যাও। তোমার মাশায়েখের নিসবত অযোধ্যায় এমন হবে যেমনটি তারকারাজির মাঝে প্রদীপ্ত সূর্যের"। খাজা মুহাম্মদ আমীন বাদাখশী, যিনি হযরত সাইয়েদ আদম বান্নুরীর মুজায ও নিকটজন ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন, "দুনিয়ার গন্ধও তাঁর পাশে ঘেষতে দিতেন না। ভারতবর্ষ এবং আরবেও তাঁর তাকওয়া-পরহেযগারী ও দীনের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা ছিল প্রবাদ বাক্যের মত যা সবার মুখে মুখে ফিরত। অধিকাংশ লোক তাঁকে দেখে বলত, সম্ভবত সাহাবায়ে কিরাম (রা) এমনটিই হয়ে থাকবেন"।[৩] "বাহরে যুখার" প্রণেতা তাঁর তাযকিরায় এই কথা লিখেছেন,

مجاهدا يتكه ازاں يگانه زمانه درباب نفرت دنيا باتباع طريقه نبويه بظهور آمده بعداز صحابه كرام در ديگر اولياء امت متاخرين كم تريافته موشود ـ

১. তাঁর একজন বড় খলীফা আবদুন নবী (শাম জুরাসী, জেলা জলন্ধর) যিনি তাঁর যুগে একজন ওলী আরিফ, শক্তিশালী নিসবতসম্পন্ন শায়খ ছিলেন এবং যাঁর বেলায়েত ও মহান শানের ব্যাপারে সে যুগের লোকেরা একমত ছিল। শাহ ওয়ালী উল্লাহ "ইনতিবাহ্ ফী সালাসিলি আওলিয়াল্লাহ" নামক গ্রন্থে তাঁর একটি সূক্ষ্ম পত্র উদ্ধৃত করেছেন। বিস্তারিত দ্র. নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, ৬ষ্ঠ খণ্ড।

২. বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন মাওলানা গোলাম রসূল মেহের কৃত "সাইয়েদ আহমদ শহীদ," ১ম খণ্ড, বর্তমান লেখককৃত "সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ" ১ম খণ্ড, "তাযকিরায়ে শাহ আলামুল্লাহ" মওলবী মুহাম্মদ আল-হাসানী মরহুম কৃত এবং হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর "আনফাসু'ল-আরিফীন" নামক গ্রন্থেও তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দেখুন ১২ পৃ.।

৩. নাতাইজু'ল-হারামায়ন, শায়খ আবদুল হাকীমের বরাতে:

"তাঁর বক্তব্য হল, (যখন তিনি হজ্জ সফর করেন তখন) মক্কা মুআজজ্জমা ও মদীনা মুনাওয়ারার লোকেরা তাঁর এই কর্মশক্তি, সুন্নতের পূর্ণ অনুসরণ, অটুট ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ় সংকল্প দৃষ্টে বলতেন, هذا كابى ذر অর্থাৎ শাহ্ আলামুল্লাহ্ এ যুগে আবু যর গিফারী (রা)-এর আদর্শ নমুনা এবং এই উক্তি হারামায়ন শারীফায়ন-এ সকলের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। সুন্নতে নববীর এই পরিপূর্ণ অনুসরণেরই পরিণতি ছিল যে, যে রাত্রে তিনি ইনতিকালে করেন সেই রাত্রে সম্রাট আলমগীর (র) স্বপ্ন দেখেন, আজ রাত্রে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইনতিকাল করেছেন। এরূপ স্বপ্নদৃষ্টে সম্রাট খুবই দুশ্চিন্তাযুক্ত হন। উলামায়ে কিরামের কাছে স্বপ্নের তা'বীর (ব্যাখ্যা) জানতে চাইলে তাঁরা বলেন, এই রাত্রে সাইয়েদ শাহ আলামুল্লাহ্র ইনতিকাল হয়ে থাকবে। তিনি সুন্নত অনুসরণের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ পদাংক অনুসারী। সরকারী সুত্রে পরে জানা গিয়েছিল যে, ঐ রাত্রেই তিনি ইনতিকাল করেন"।[১]

তাঁর খান্দানে আহসানিয়া সিলসিলা অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে যাঁর মধ্যে তাঁর ৪র্থ সন্তান হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ (মৃ. ১১৫৬ হি.), তাঁর পুত্র হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ আদল ওরফে শাহ্ লাল (১১৯২), সাবের ইবন সাইয়েদ আয়াতুল্লাহ্ ইবন শাহ্ আলামুল্লাহ্ (মৃ. ১১৬৩ হি.), হযরত শাহ্ আবু সাঈদ ইব্ন সাইয়েদ মুহাম্মদ যিয়া ইবন সাইয়েদ আয়াতুল্লাহ্ ইবন শাহ্ আলামুল্লাহ্ (মৃ. ১১৯৩ হি.), হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ ওয়াযেহ[২] ইবন সাইয়েদ মুহাম্মদ সাবের, মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ জাহির হাসানী (মৃ. ১২৭৮ হি), মাওলানা সাইয়েদ খাজা আহমদ ইবন ইয়াসীন নাসীরাবাদী (মৃ. ১২৮৯ হি.) এবং হযরত শাহ্ যিয়াউন নবী (মৃ. ১৩২৬ হি.) বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন বুযুর্গ ছিলেন, শায়খ ছিলেন যাঁদের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষের ঈমান ও ইহ্সানের মূল্যবান সম্পদ, শরীয়তের ওপর আমল ও সুন্নতের অনুসরণ করার তৌফিক লাভ হয়েছিল।[৩]

শায়খ সুলতান বালিয়াবী

হযরত সাইয়েদ আদম বান্নূরীর দ্বিতীয় খলীফা ছিলেন হযরত শায়খ সুলতান বালিয়াবী।[৪] "নাতাইজু'ল-হারামায়ন" নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তিনি হযরত

১. বাহরে যুখার (শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন আশরাফকৃত) এ বিস্তারিত এবং "দুররু'ল-মা'আরিফে" (হযরত শাহ গুলাম আলী (র)-এ বাণী সংকলন (মলফূযাত); হযরত শাহ রউফ আহমদ মুজাদ্দিদী সংকলিত, পৃ. ৪৬ সংক্ষেপে স্বপ্নের কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. তাঁর ওফাত হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকে।

৩. দ্র. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ড;।

৩. বালিয়া বিহার প্রদেশের গঙ্গা নদীর ধারে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে জায়গাটি লাখমিনা (জেলা বেগো সরাঈ) নামে মশহুর। মুঙ্গের-এর সামনাসামনি নদীর অপর পাড়ে অবস্থিত।

সাইয়েদ আদম-এর বড় খলীফাদের মধ্যে ছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর নাম হযরত সাইয়েদ শাহ্ 'আলামুল্লাহ্ (র)-র সঙ্গে উচ্চারিত হয়।[১]

হযরত হাফিয সাইয়েদ আবদুল্লাহ্ আকবরাবাদী এবং ওয়ালীউল্লাহ্ সিলসিলা

হযরত সাইয়েদ আদম বান্নুরীর তৃতীয় খলীফা হলেন হাফিয সাইয়েদ আবদুল্লাহ্ আকবরাবাদী যাঁর মাধ্যমে তাঁর সিলসিলার সর্বাধিক প্রচার ও প্রসার ঘটে। হাকীমুল ইসলাম হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভীর পিতা হযরত শাহ্ আবদুর রহীম ফারূকী (মৃ. ১১৩১ হি.) তাঁরই খলীফা এবং তৎকর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন।[২] হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ এবং শাহ্ আবদুল আযীয-এর সিলসিলা যার ভেতর হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র), এরপর তাঁর মাধ্যমে হযরত হাজী আবদুর রহীম শহীদ বেলায়েতী, মিঞাজী নূর মুহাম্মদ ঝিনঝিনাভী এবং তাঁর মাধ্যমে শায়খুল আরব ওয়া'ল-আজম হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মাক্কী এবং তাঁর খলীফা মাওলানা কাসেম নানুতবী, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গূহী, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, অতঃপর মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গূহীর মাধ্যমে হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী, হযরত শাহ্ আবদুর রহীম রায়পূরী, হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারনপুরী ও মাওলানা সাইয়েদ হুসায়ন আহমদ মাদানী; হযরত শাহ্ আবদুর রহীম রায়পূরীর খলীফাদের মধ্যে হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পূরী এবং মাওলানা খলীল আহমদ সাহারন পূরীর খলীফাদের মধ্যে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস কানদেহলভী, তাবলীগি সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা এবং হযরত শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেব মুজাদ্দিদিয়া আহসানিয়া সিলসিলার সঙ্গে নিসবতযুক্ত এবং তাঁরা সকলেই এই তরীকায় এজাযতপ্রাপ্ত ও ছাহেবে ইরশাদ ছিলেন।

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ এবং শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভী সম্পর্কে এই অধ্যায়ে কিছু লেখা সম্ভব নয়। কেননা "এই উত্তাল সমুদ্র অতিক্রম করতে হলে বিশালাকার জাহাজ দরকার।"

---

১. আফসোস যে, তাঁর জীবন-কাহিনী ও মলফূযাত সংরক্ষিত নয়। এখন এই কসবায় তাঁর খান্দান বসবাস করছে।

২. হাফিয সাইয়েদ আবদুল্লাহ্ আকবরাবাদীর মর্যাদা ও প্রশংসনীয় গুণাবলী সম্পর্কে জানতে হলে দ্র. আনফাসু'ল-আরিফীন" পৃ. ৬-১৫। হযরত শাহ্ আবদুর রহীম-এর জীবন-কাহিনী ও কামালিয়াত সম্পর্কে হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্' আনফাসু'ল-আরেফীন" লিখেছিলেন এবং বিস্তারিতভাবে তাঁর ও তাঁর খান্দান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এটি ১৩৩৫ হিজরীতে মুজতাবাঈ প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। দেখুন ১৫-৮৭ পৃ.।

তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করতে চাইলে এই সিরিজের একটি পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র খণ্ড আবশ্যক যা সম্ভবত এই সিরিজের পঞ্চম খণ্ড হবে। হযরত মির্যা মাজহার জানে-জানাঁ সম্পর্কে হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভীর সাক্ষ্য ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী সম্পর্কে হযরত শাহ্ গুলাম আলী "মকামাতে মাজহারী" তে মির্যা সাহেবের নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।

"শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেব এক নতুন তরীকা স্পষ্ট করে বিবৃত করেছেন। হাকীকত ও মা'রিফাতের গুঢ় রহস্যসমূহ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম ও গুপ্তভেদ বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর একটি বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। উলামায়ে কিরামের মধ্যে তিনি "রব্বানী" (স্বর্গীয়) উপাধি পাবার হকদার। সেই সব তত্ত্বজ্ঞ সূফীদের মধ্যেও যাঁরা জাহিরী ও বাতেনী ইলমের সমন্বয়ক ছিলেন, এ ধরনের লোক হাতে গোনার যোগ্য যাঁরা তাঁর মত নতুন ইল্‌ম ও বিষয় সম্পর্কে মুখ খুলেছেন"।[১]

ইমামে মা'কূলাত তথা বোধগম্য বস্তুনিচয়সমূহের ইল্‌মের ইমাম আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী যখন শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী লিখিত "ইযালাতু'ল-খাফা" দেখলেন তখন তিনি তাঁর ছাত্রদের সামনে প্রকাশ্যে বললেন, "এই গ্রন্থের লেখক এক গভীর সমুদ্র যার কুল-কিনারা চোখে পড়ে না।" বিখ্যাত আলিম মুফতী এনায়েত আহমদ কাকূরভী বলেন, "শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেবের উপমা 'তূবা' বৃক্ষের ন্যায় যার শেকড় তাঁর ঘরে এবং এর শাখা-প্রশাখা প্রতিটি মুসলমানের ঘরে বিস্তৃত।"[২]

হযরত শাহ্ আবদুল আযীয সাহেব সম্পর্কে যতটুকু বলা যায় তাহল এই যে, তাঁর সামগ্রিকতা, যুক্তি ও দর্শনশাস্ত্রীয় বিষয়, কুরআন-হাদীছ সম্পর্কিত বিষয়াদি ও সাহিত্য বিষয়ে একই রূপ দক্ষতা, পাঠদান শক্তি, ইলমে হাদীছের প্রচার-প্রসার, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ, রচনাশক্তি, কথার মিষ্টতা, উদার চরিত্র, ভারতবর্ষের মুসলিম মিল্লাতের জন্য দিলের ব্যথা ও অন্তর্জ্বালা ও ব্যাপক অবদানের ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।[৩]

হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও তাঁর জামা'আত

হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ সম্পর্কে যা বলা যায় তাহল, তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল মুজাদ্দিদিয়া আহসানিয়া সিলসিলার সঙ্গে। তাঁর জীবন-কাহিনী নিয়ে বিরাট ভলিউম আকারের গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। এসব গ্রন্থের মধ্যে মাওলানা গোলাম রসূল মেহের লিখিত ৪ খণ্ডে সমাপ্ত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র) এবং বর্তমান লেখক

---

১. মকামাতে মাজহারী, মাতবায়ে আহমদী সং. ৬০-৬১ পৃ.।
২. বিস্তারিত দ্র. নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, ৬ষ্ঠ খণ্ড;
৩. কিছুটা বিস্তারিত জানতে চাইলে দ্র. নুযহাতুল-খাওয়াতির, ৭ম খণ্ড;

কর্তৃক লিখিত ২খণ্ডে সমাপ্ত "সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ" (র) অধ্যয়ন যথেষ্ট বিবেচিত হবে।[১] সে যুগেও ভারতবর্ষের ইতিহাসের ওপর যেই গভীর প্রভাব পড়ে এবং তাঁর থেকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলের হেদায়েত তথা পথ-প্রদর্শন, ইসলামের প্রচার-প্রসার ও সংরক্ষণের যেই বিশাল কাজ নিয়েছেন সে সম্পর্কে কয়েকটি সাক্ষ্যই যথেষ্ট মনে করছি।

সে যুগের একজন দৃষ্টিসম্পন্ন আলিম মওলভী আবদুল আহাদ সাহেব লিখেছেন ঃ

"হযরত সাইয়েদ সাহেবের হাতের ওপর চল্লিশ হাজারের অধিক হিন্দু ও অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হন এবং তিরিশ লক্ষ মুসলমান তাঁর হাতে বায়আত হয় এবং বায়আতের যেই সিলসিলা তাঁর খলীফা ও খলীফাদের খলীফাগণের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে অব্যাহতভাবে চলছে সেই সিলসিলায় কোটি কোটি মানুষ তাঁর বায়'আতের অন্তর্ভুক্ত।"[২]

মশহুর আলিমে রব্বানী আল্লাহ্র পথের মুজাহিদ মাওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদী (মৃ. ১২৬৯ হি.) বলেন,

"হাজার হাজার মানুষ নিজেদের ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং হাজার হাজার মানুষ বাতিল মাযহাব তথা মিথ্যা ধর্ম ত্যাগ করে তওবা করেছে। পাঁচ ছয় বছরের স্বল্পতম সময়ে হিন্দুস্তানের তিরিশ লক্ষ মানুষ হযরতের কাছে বায়আত হয়েছে এবং হজ্জ সফরে প্রায় লক্ষ মানুষ বায়'আত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছে।"[৩]

হিন্দুস্তানের খ্যাতিমান লেখক ও গ্রন্থকার নওয়াব সাইয়েদ সিদ্দীক হাসান খান (ভূপালের শাসনকর্তা, মৃ ১৩০৭ হি.) যিনি তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া নিজের চোখে দেখেছিলেন এবং যারা দেখেছিলেন তাদের একটি বড় দলের যুগকেও পেয়েছিলেন, "তাকসার জুয়ূদু'ল-আহরার" নামক গ্রন্থে লিখছেনঃ

"আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের পথ প্রদর্শন এবং আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহ্র এক নিদর্শন ছিলেন। এক বিপুল সংখ্যক মানুষ এবং এক বিশাল জগত তাঁর কলবী ও জিসমানী তথা আত্মিক ও দৈহিক তাওয়াজ্জুহ দ্বারা ওলীর দর্জায় উপনীত হয়। তাঁর খলীফাদের ওয়াজ-নসীহত ভারতভূমিকে শির্ক ও বিদ'আতের

---

১. লেখক কর্তৃক লিখিত تحقیق وانصاف کی عدالت میں ایک مظلوم مصلح کا مقدمہ-পাঠ করা উপকারী হবে।

২. সওয়ানিহ্ আহমদী;

৩. রিসালা দাওয়াতে মাশমূলা মাজমূ'আয়ে রাসায়েলে তিস'আ, মওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদীকৃত, প ৬ ৫ ।

জঞ্জাল ও আবর্জনা থেকে মুক্ত করে দেয় এবং কুরআন ও সুন্নাহর রাজপথে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। এখন পর্যন্ত তাঁদের ওয়াজ-নসীহতের বরকত অব্যাহত রয়েছে।"

সামনে অগ্রসর হয়ে লিখছেন ঃ

"সংক্ষিপ্ত কথা হল এই যে, এই যুগে দুনিয়ার কোন দেশে এমন কামালিয়াতসম্পন্ন বুযুর্গের নাম শোনা যায় নি এবং যেই ফয়েয এই সত্যপথের পথিক দলটি থেকে মানুষ পেয়েছে তার দশ ভাগের এক ভাগও এ যুগের কোন আলিম-উলামা ও পীর-মাশায়েখ থেকে পায়নি।"

যেমনটি এর আগেই লেখা হয়েছে, সাইয়েদ সাহেবের মাধ্যমেই দেওবন্দের মহান শ্রদ্ধাভাজন সন্তানেরা এবং সাদিকপুরের[১] বুযুর্গ মনীষিগণ মুজাদ্দিদিয়া নকশবান্দিয়া সিলসিলায় দাখিল, এজাযত ও খেলাফত লাভে ধন্য হয়েছেন। ঐ সব হযরতের দ্বারা এই উপমহাদেশে দীনি ইল্‌মের প্রচার-প্রসার, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা এবং দাওয়াত ও ইসলাহ্‌র যেই বিশাল কাজ সম্পাদিত হয়েছে যা কোন ইনসাফ প্রিয় ও ন্যায়পরায়ণ মানুষ অস্বীকার করতে পারে না। আর এসবই হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র তাজদীদ ও ইসলাহ তথা সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক কর্মের ফল-ফসল এবং তাঁরই বরকতময় প্রয়াসের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তিনিই হিজরী একাদশ শতাব্দীর কোলাহলপূর্ণ যুগের সূচনায় এর জন্য রাস্তা সমতল করেন, এর জন্য অনুকূল ক্ষেত্র ও পরিবেশ সৃষ্টি করেন, দিলের মধ্যে এর জন্য আবেগদীপ্ত প্রেরণা ও উৎসাহ জাগিয়ে তোলেন এবং এমন একটি দল স্মৃতি-স্মারক হিসেবে রেখে যান যারা নিজেদের অন্তর্জ্বালা ও অভ্যন্তরীণ (বাতেনী) নূরের সাহায্যে ধর্মের এই প্রদীপ শিখাকে আলোকদীপ্ত ও উজ্জ্বল রাখেন। এরপর এক প্রদীপ থেকে আরেক প্রদীপ জ্বলতে থাকে এবং এদেশ থেকে কুফর ও অজ্ঞতা এবং শির্ক ও বিদ'আতের অন্ধকার সেভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে নি যেভাবে হিজরী দশম শতাব্দীর শেষভাগে দর্শকের চোখে ভাসছিল। এর সঙ্গে সরাসরি সম্বন্ধযুক্ত কিংবা কোন মাধ্যমে সম্পর্ক রক্ষাকারী জামা'আতের একথা বলার অধিকার জন্মায় যে,

---

১. সাদিক পুর বিহার প্রদেশের রাজধানী পাটনার এক মশহুর মহল্লা যা সাইয়েদ সাহেবের জিহাদ ও সংস্কার আন্দোলনের সবচে' বড় কেন্দ্র ছিল এবং যাঁরা এই কাজকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত রাখেন এবং এক্ষেত্রে সবচে' বেশি কুরবানী দেন তাঁরা হযরত মাওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদী, মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী, মওলানা আহমাদুল্লাহ, মাওলানা এনায়েত আলী গাযী, জামাআতে মুজাহিদীনের আমীর মাওলানা আবদুল্লাহ (চামারকান্দ) এবং আবদুর রহীম সাদিকপুরী এর বিশিষ্ট সদস্য। "মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে; ওদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের অঙ্গীকারে পরিবর্তন করে নাই।" (আল-কুরআন)

اغشه ایم برسر خارے بخون دل

قانون باغبانی صحرا نوشته ایم

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র রচনাবলী

পরিশেষে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র রচনাবলীর তালিকা পেশ করার মাধ্যমে আমরা গ্রন্থের ইতি টানতে চাই। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে আমরা পাঠককে মাওলানা সাইয়েদ যেওয়ার হুসায়ন শাহ লিখিত "হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী" গ্রন্থের "হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর মহান রচনাবলী"[১] শিরোনামযুক্ত অধ্যায়টি পড়বার জন্য পরামর্শ দেব যেখানে বিজ্ঞ গ্রন্থকার তাঁর রচনাসমূহের প্রত্যেকটির বিস্তারিত পরিচিতি পেশ করেছেন এবং সে সম্পর্কে মূল্যবান উপকরণ একত্র করে দিয়েছেন।

১. ইছবাতু'ন-নুবূওয়া (আরবী) ঃ হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, মুজাদ্দিদী খান্দানের পারিবারিক লাইব্রেরী ও খানকাহগুলোতে সুরক্ষিত অবস্থায় চলে আসছিল। কুতুবখানা ইদারায়ে মুজাদ্দিদিয়া, নাযিমাবাদ, করাচী ১৩৮৩ হিজরীতে আসল আরবী মতন (মূলপাঠ) ও উর্দূ তরজমাসহ প্রকাশ করে। এরপর ইদারায়ে সা'দিয়া মুজাদ্দিদিয়া লাহোর ১৩৮৫ হিজরীতে অন্যান্য পুস্তিকার সঙ্গে আসল মতন ছাড়াই উর্দূ অনুবাদ প্রকাশ করে।

২. রদ্দে রওয়াফিয ঃ পুস্তিকাটি কতক ইরানী শী'আ আলিম লিখিত পুস্তিকার জওয়াবে লিখিত। এটি সম্ভবত ১০০১ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে লিখিত। পুস্তিকার কিছু কিছু নিবন্ধ দফতর আওয়াল, মকতূব নং ১৮০ ও ২০২-এও পাওয়া যায়। পুস্তিকার ফারসী মতন মকতূবাত শরীফ ফারসীর শেষে বহু প্রকাশক প্রকাশ করেছেন। হাশমত আলী খান ১৩৮৪ হিজরীতে রামপুর থেকে এর ফারসী মতন প্রফেসর ড. গোলাম মোস্তফা খানের উর্দূ তরজমাসহ প্রকাশ করেন। অতঃপর ইদারিয়া সা'দিয়া মুজাদ্দিদিয়া লাহোর ফারসী মতন পৃথক এবং উর্দূ তরজমা পৃথক প্রকাশ করে। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী এই পুস্তিকার শরাহ লিখেছেন যা প্রকাশিত হয় নি।

৩. রিসালায়ে তাহলীলিয়া (আরবী) ঃ পুস্তিকাটি হিজরী ১০১০ সনে সংকলিত হয়। এর কেবল হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যেত। ইদারায়ে মুজাদ্দিদিয়া, নাযিমাবাদ, করাচী থেকে ১৩৮৪ হিজরীতে আরবী মতন উর্দূ অনুবাদসহ এবং ইদারিয়া সা'দিয়া মুজাদ্দিদিয়া, লাহোর ১৩৮৫ হিজরীতে কেবল আরবী মতন (মূলপাঠ) অপরাপর পুস্তিকাসহ প্রকাশ করে।

৪. শরহে রুবা'ঈয়াত ঃ এতে হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্র দু'টি রুবা'ঈর হযরত খাজার কলমে ব্যাখ্যা এবং হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কলমে ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা লেখা। ইদারিয়া সা'দিয়া মুজাদ্দিদিয়া লাহোর এবং ইদারায়ে মুজাদ্দিদিয়া নাযিমাবাদ করাচীর পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে ১৩৮৫ হি. ও ১৩৮৬ হিজরীতে প্রকাশিত হয়। এই শরহে রুবাঈয়াত-এর ব্যাখ্যা লিখেছেন হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিছ দেহলভী যা "কাশফু'ল-গায়ন ফী শারহি রুবা'আতায়ন" নামে মাতবা' মুজতাবাঈ দিল্লী থেকে ১৩১০ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

৫. মা'আরিফে লাদুন্নিয়্যা (ফারসী) ঃ এটি হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র বিশেষ মা'আরিফ ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসম্বলিত যা স্বয়ং হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবই বিন্যস্ত করেছিলেন হিজরী ১০১৫ কিংবা ১০১৬ সনে। প্রতিটি নিবন্ধেরই নাম দিয়েছিলেন "মা'রিফাত"। এসব মা'আরিফের সংখ্যা সর্বমোট ৪১ টি। পুস্তিকাটির ফারসী মতন সর্বপ্রথম হাফিজ মুহাম্মদ আলী খান শওক মাতবা' আহমদী, রামপুর থেকে ১৮৯৮ সালে প্রকাশ করেন। এরপর মজলিসে ইলমী ডাভেল, হাকীম আবদুল মজীদ সায়ফী, ইদারিয়া সা'দিয়া মুজাদ্দিদিয়া এবং ইদারায়ে মুজাদ্দিদিয়া নাযিমাবাদ, করাচী লাহোর বিভিন্ন বছরে প্রকাশ করে।

৬. মাবদা ও মা'আদ (ফারসী) ঃ পুস্তিকাটি হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র ইল্ম ও মা'রিফাতের পরিচয় সম্বলিত। এর নিবন্ধগুলো বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি আকারে ছিল যেগুলোকে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর খলীফা মাওলানা সিদ্দীক কাশ্মী হিজরী ১০১৯ সনে সংকলিত ও বিন্যস্ত করেন এবং এর নিবন্ধগুলোকে "মিনহা" শিরোনামে পৃথক করে দেন। সংকলিত নিবন্ধের সংখ্যা ৬১ টি। প্রকাশিত নুসখাগুলোর মধ্যে সবচে' প্রাচীন ফারসী নুসখা মাতবায়ে আনসারী দিল্লী কর্তৃক ১৩০৭ হিজরীতে প্রকাশিত। এরপর আরও কয়েকবার বিভিন্ন সনে প্রকাশিত হয়। শেষ বার ১৩৮৮ হিজরীতে ইদারায়ে মুজাদ্দিদিয়া, নাযিমাবাদ, করাচী ফার্সী মতন সাইয়েদ যেওয়ার হুসায়ন শাহ্র উর্দু তরজমাসহ প্রকাশ করে। এর আরবী তরজমা শায়খ মুরাদ মাক্কীর কলমে মকতূবাত মু'আরবাব মাতবূ'আর হাশিয়ায় বর্তমান।

৭. মুকাশিফাতে আয়নিয়া ঃ এটি হযরত মুজাদ্দিদের এমন পাণ্ডুলিপি সম্বলিত যা কোন কোন খলীফা হেফাজত করেছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ওফাতের পর মাওলানা মুহাম্মদ হাশেম কাশ্মী হি. ১০৫১ সনে এটি বিন্যস্ত করেন। পুস্তিকাটি ১৩৮৪ হিজরীতে প্রথমবার ইদারায়ে মুজাদ্দিদিয়া, নাযিমাবাদ, করাচী, ফারসী মতন উর্দূ অনুবাদসহ প্রকাশ করে।

৮. মকতূবাতে ইমাম রব্বানী (ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ আলফেছানীর পত্র সংকলন) ঃ এটি মুজাদ্দিদ আলফেছানীর সবচে' বড় 'ইলমী, সংস্কার ও

পূনর্জাগরণমূলক স্মারক এবং আল্লাহ্প্রদত্ত কামালিয়াত, মুজতাহিদ ও মুজাদ্দিদসুলভ তাহ্কীক ও মা'রিফাতের মকাম, তাঁর দিলের আবেগ ও হৃদয়ানুভূতির দর্পণস্বরূপ যার ওপর ভিত্তি করে তাঁকে "মুজাদ্দিদ আলফেছানী" তথা দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ উপাধি প্রদান করা হয়। তাঁর জ্ঞানগত মকাম সমুদ্ভাসিত করা এবং হিন্দুস্তানের ফারসী সাহিত্যে (যার গুরুত্বকে "সুবুক হিন্দী"-র বিদ্রূপাত্মক নাম দিয়ে কম করা যায় না) তাঁর স্থান নির্ধারণ করা ও ইল্‌ম ও মা'আরিফ-এর পর্দা উন্মোচন করার জন্য একটি স্বতন্ত্র পুস্তক প্রয়োজন। এই পুস্তকটি ভারতবর্ষের একক রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত যার ওপর বহিঃভারতের উন্নত মানের মনীষী বুযুর্গ ও গভীর পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ পরিপূর্ণ মনোযোগ প্রদান করেছেন। আরবী ও তুর্কী ভাষায় এর তরজমা হয়েছে। 'ইল্‌মী ও রূহানী মারকাযগুলোয় এটি পাঠ্য তালিকাভুক্ত। আলিম-উলামা, জ্ঞানী ও তরীকতপন্থী সূফীরা একে প্রাণ রক্ষাকারী কবচ বানিয়েছেন এবং এর সজীবতার মধ্যে আজ পর্যন্ত কোন পার্থক্য আসে নি।

মকতূবাতের সাকূল্য সংখ্যা ৫৩৬। এটি তিনটি দফতর সম্বলিত। ১ম দফতরে ৩১৩ টি পত্র রয়েছে। এই দফতরকে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানীর ইঙ্গিতে তাঁরই খলীফা হযরত মাওলানা ইয়ার মুহাম্মদ জাদীদ বাদাখশী তালেকানী ১০২৫ হিজরীতে সুবিন্যস্ত করেন। দ্বিতীয় দফতর ৯৯টি পত্র সম্বলিত এবং হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূমের ইঙ্গিতে এটি মাওলানা আবদুল হাই হিসারী শাদমানী ১০২৮ হিজরীতে বিন্যস্ত করেন। তৃতীয় দফতর ১১৪টি পত্র সম্বলিত। এটি তাঁরই বিখ্যাত খলীফা মাওলানা মুহাম্মদ হাশেম কাশ্মী হিজরী ১০৩১ সনে বিন্যস্ত করেন। পরে ১০টি পত্র যা পরবর্তীকালে লেখা হয়েছিল এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে এই দফতরের সাকুল্য পত্র সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১২৪-এ।

মকতূবাতের অনেকগুলো সংস্করণ বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়। ১ম সংস্করণ সম্ভবত লাখনৌর নওল কিশোরের। এরপরে আরও কতকগুলো সংস্করণ ঐ প্রেস থেকেই ছাপা হয়। এরপর মাতবা' আহমদী দিল্লী, মাতবা' মুর্তাযাবী দিল্লী থেকে বারবার প্রকাশিত হয়। ১৩২৯ হিজরীতে মাওলানা নূর আহমদ অমৃতসরী খুবই যত্নসহকারে এর একটি উন্নত সংস্করণ প্রকাশ করেন যা অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের ধারক।

تمت بالخير

সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)

সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস

[হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)
-এর জীবন ও কর্ম]

[৫ম খণ্ড]

অনুবাদ
শাহ আবদুল হালীম হুসাইনী
শিক্ষক, ফতোয়া বিভাগ, আল মাহাদুল ইসলামী, মিরপুর-১, ঢাকা
সহকারী সম্পাদক, পাক্ষিক মুক্ত আওয়াজ

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকের কথা

১৯৯৮ সালের কথা। হাজির হই নদওয়াতুল উলামা লাখনৌতে, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) এর খেদমতে। হৃদয়ের আবেগ আর ভালোবাসা দিয়ে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করি এ কর্মবীর মানুষটিকে। কীভাবে ডাকছেন মানুষকে হেদায়েতের পথে, আলোর পথে। গোটা ইনসানিয়াতের প্রতি তাঁর দরদ আর ভালবাসা, দায়িত্ববোধ তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে অহর্নিশ। সফর করছেন দেশ হতে দেশান্তরে উল্কার বেগে। মুক্তিকামী মানুষদেরকে মুক্তির দিশা দিতে। দিলের উত্তাপ নিংড়ানো বক্তৃতা চলছে অবিরাম। পতনোন্মুখ মুসলিম জাতিকে ঘুরে দাড়াবার সবক দিচ্ছেন। বারবার আহবান করছেন তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে। উম্মাহর চিন্তায় বিভোর এ মর্দে মুমিন শুধু বক্তৃতা করেই ক্ষ্যান্ত হননি। প্রস্তাবনা ও রূপরেখা পেশ করেছেন জাতির সামনে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর কলম লিখে চলছে অবিশ্রান্তভাবে। তাঁর কিছু রচনা গোটা বিশ্বে বেশ সমাদৃত হয়েছে। সেই থেকে আমি তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। তাঁর থেকে দোয়া নিয়ে দেশে এসে তাঁর রচনাবলী বাংলা ভাষা-ভাষীদের কাছে পেশ করার মনস্থ করি। ইতোপূর্বে যদিও তাঁর কিছু লিখনি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় 'তারিখে দাওয়াত ও আযীমত' এর ভাবানুবাদ 'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস' নামে আমরা পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছি। পঞ্চম খণ্ড যা মূলত হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) -এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত; পাঠকমহলের বারবার তাগিদের ফলে অনুবাদ করতে দেই তরুণ আলেম ও লেখক শাহ আবদুল হালীম হুসাইনীকে। তিনি ইতোপূর্বে হযরতের অপর একটি কিতাব 'কারওয়ানে মদীনা' অনুবাদ করে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। যতটুকু পড়েছি আশা করি এতেও তিনি সফল হবেন। আল্লাহ তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

অবশেষে নির্দ্বিধায় বলতে চাই যে, আমরা নির্ভুল করতে সাধ্যাতীত চেষ্টা করেছি। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে কিছু ভুল ত্রুটি ধরা পড়বে জানি। ইনশাআল্লাহ আগামী সংস্করণে আরো সুন্দর ও নির্ভুল করার চেষ্টা করব।

০৯.০৯.০৯ খৃ.　　　　　　　　　　প্রকাশক

অনুবাদকের কথা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) এর বহু বইয়ের প্রকাশক জনাব আবদুর রউফ সাহেবের সাথে দেখা হয় পল্টনের নোয়াখালী হোটেলে। বসে বসে চা পান করছি। কোন এক প্রসঙ্গে তিনি তারিখে দাওয়াত ও আযীমতের ব্যাপারে আলোচনা করেন। বলেন, পাঠক মহল থেকে ৫ম খণ্ড প্রকাশ করার বারবার তাগিদ আসছে। কিন্তু এখনও এর অনুবাদ করাতে পারিনি। আপনি যদি হিম্মত করে অনুবাদ শুরু করতেন। আমি অকপটে রাজি হয়ে যাই, যদিও হযরতের লেখার মানসম্মত অনুবাদ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি ৫ম খণ্ড সংগ্রহ করে পাঠ করি। বারবার এর ভাষা ও বিন্যাস দেখে অভিভূত হই এবং এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, এর অনুবাদ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু জনাব আবদুর রউফ সাহেবের পীড়াপীড়িতে অনুবাদ করতে বাধ্য হই।

সুপ্রিয় পাঠক! মূলতঃ লেখক তারীখে দাওয়াত ও আযীমতের এ সিরিজে সাইয়েদুনা হযরত হাসান বসরী এবং খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র) এর আলোচনা দিয়ে শুরু করেন। এ ধারা প্রথম-দ্বিতীয় শতকের সংস্কারক ও মুজাদ্দিদগণ থেকে নিয়ে সকল স্তরের এবং মুসলিম বিশ্বের স্থান-কাল-ভূখণ্ড ও সীমানা অতিক্রম করে এগার-বার শতকের দুই মহান সংস্কারক ব্যক্তিত্ব হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র) ও হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর পঞ্চম খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) এর জীবন চরিত।

পাঠক বইয়ের ভিতর প্রবেশ করুন। তবেই বুঝতে সক্ষম হবেন তার মুজাদ্দিদানা ও মুজতাহিদানা সংস্কার ও গবেষণাসুলভ কর্মকাণ্ডের পরিধি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জানা ও মানার তাওফীক দান করুন এবং এ সকল নেক বান্দাদের সাথে থাকার সুযোগ দান করুন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষতঃ বন্ধুবর হাফেজ মাওলানা আইয়ুবুর রহমান ও প্রকাশক জনাব আবদুর রউফ সাহেবকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

বিনীত

০৯.০৯.০৯ খৃ. শাহ আবদুল হালীম হুসাইনী

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
হিজরী বারো শতকের মুসলিম বিশ্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়
ভারতবর্ষ

তৃতীয় অধ্যায়
শাহ সাহেব (র)-এর পূর্বপুরুষ ও সম্মানিত পিতা

চতুর্থ অধ্যায়
সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত

পঞ্চম অধ্যায়
শাহ্ সাহেবের সংস্কার কর্ম
আকীদা সংশোধন ও কুরআনের পথে দাওয়াত

ষষ্ঠ অধ্যায়
হাদীস ও সুন্নাতের প্রচার-প্রসার,
ফিকাহ ও হাদীসের মধ্যে সমন্বয় আনার প্রয়াস

সপ্তম অধ্যায়

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার দর্পণে ইসলামী শরীয়তের মজবুত ও প্রামাণ্য ব্যাখ্যা এবং হাদীসের তত্ত্ব-মর্মের পর্দা উন্মোচন

অষ্টম অধ্যায়

খেলাফত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের প্রমাণ এবং তাদের অনুগ্রহ-দান "ইযালাতুল খফা' 'আন খিলাফাতিল খুলাফা" -এর দর্পণে

নবম অধ্যায়
রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং মোঘল শাসনের ক্রান্তিকালে শাহ সাহেবের বীরত্বপূর্ণ ও সাহসী কর্মকাণ্ড

দশম অধ্যায়
উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণীর পরিসংখ্যান এবং তাদেরকে সংস্কার ও বিপ্লবের আহ্বান

একাদশ অধ্যায়
শ্রদ্ধাভাজন পুত্র, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন খলীফা
প্রসিদ্ধ সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব

দ্বাদশ অধ্যায়
শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর রচনাবলী

শুরুর কথা

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد واله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين.

'তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত' -এর পঞ্চম খণ্ড রচনা শেষে ভূমিকার এই লাইনগুলো লেখার সময় গ্রন্থকারের মন হামদ ও শোকরের আবেগে আবেগাপ্লুত। লেখক ও তার কলম আপন স্রষ্টার দরবারে কৃতজ্ঞতায় সিজদাবনত। কেননা তিনিই এ ধারাকে হাকীমুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) এবং তার উত্তরসূরী খলীফাদের ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক নানা খেদমত, তাদের সংস্কারমূলক ও সাহসী কর্মকাণ্ডের ইতিহাস ও ঘটনাবলি পর্যন্ত পৌঁছানোর তাওফীক দান করেছেন।

বলাবাহুল্য, হিজরী ১৩৭২ মহররম মোতাবেক ১৯৫২ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কয়েকটি বক্তৃতায় একটি সংক্ষিপ্ত স্মারককে সামনে রেখে যখন 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমত' রচনার কাজ শুরু করা হয়েছিল; সূচনা করা হয়েছিল, সাইয়িদুনা ইমাম হাসান বসরী (র) এবং খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর আলোচনা দিয়ে, তখন কল্পনা করাও দুরূহ ছিল যে, এই ধারা প্রথম, দ্বিতীয় শতকের সংস্কারক ও মুজাদ্দিদগণ থেকে নিয়ে সকল স্তরের, এমনকি মুসলিম বিশ্বের স্থান, কাল, ভূখণ্ড ও সীমানা অতিক্রম করে এগার-বারো শতকের দু'মহান সংস্কারক ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র) এবং হযরত মাওলানা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। বয়সের ভার, স্বাস্থ্যের উত্থান-পতন, নানা ঘটনাপ্রবাহ, প্রচুর বক্তৃতা, দৃঢ়তা ও সাহসের অভাব, সফরের ধারাবাহিকতা, নিত্যনতুন প্রয়োজনাদি ও সমস্যা, অপরদিকে স্বয়ং লেখকের টানা চৌদ্দ বছর পর্যন্ত যথাযথভাবে মুতালা'আ ও স্বহস্তে লেখার অপারগতা থাকা সত্ত্বেও এই ধারা এতদূর পর্যন্ত এসে পৌঁছবে- কিভাবে ভাবা যেত! এটা শুধুমাত্র কুদরত ও আল্লাহ পাকের কারিশমা। এজন্য আল্লাহর যতই প্রশংসা করা হোক, তা-ও কম। অধম লেখক কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে এই অশেষ শোকরিয়া জ্ঞাপনের ব্যর্থ প্রয়াস চালানো অপেক্ষা বেশি কিছু করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

رب اوزعنى ان اشكر نعمتى التى ان انعمت على وعلى والدى وان اعمل صالحا ترضه وادخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين-

'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে তাওফীক দান করুন! আপনি আমার উপর এবং আমার পিতা-মাতার উপর যে অনুগ্রহ দান করেছেন, আমি যেন তার শোকরিয়া আদায় করতে পারি এবং এমন নেক কাজ করতে পারি যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান আর আমাকে নিজ করুণায় আপনার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।' (সূরা নাহল : ১৯)

হাদীস শরীফে এসেছে,

الحمد لله الذى بعزته وجلالته تتم الصالحات

'সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর, যার মাহাত্ম্য ও বড়ত্বে নেক কাজের তাওফীক ও পরিপূর্ণতা লাভ হয়।'

এ খণ্ডে মূলতঃ বুযুর্গ ও ওয়ালীআল্লাহদের আলোচনার এ ধারাবাহিকতা এবং এই মহৎ কাজের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, যা ছিল হিজরী বারো শতকের সেসব সংস্কারকর্ম ও শুদ্ধি সংগ্রাম সংশ্লিষ্ট, যার বরকতময় প্রভাবসমূহ আজও অক্ষুণ্ণ আছে। কমপক্ষে ভারত উপমহাদেশে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, দ্বীনী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রগুলো, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের চেষ্টা-সংগ্রাম এবং ধর্মীয় শিক্ষামূলক ও লিখনী তৎপরতা প্রভৃতি চেষ্টার কারণে আজও মানুষ উপকৃত হচ্ছে। তারই ছায়ায় অতিক্রম করছে নিজ নিজ পথ । আরও একটি কারণে একথা অবাস্তব নয়। কেননা লেখক 'সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র) -এর জীবন চরিত' (১-২) রচনার মাধ্যমে (যা ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল) তের শতকের শেষ পর্যন্ত (এবং যতদূর পর্যন্ত এশিয়া মহাদেশের সম্পর্ক রয়েছে), চৌদ্দ শতকের কতিপয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, মহান পুরুষ ও দাঈদের বিশেষতঃ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (র) -এর জীবনকর্ম সন্নিবেশিত করে এ ধারাকে নিজের যুগ-সময় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। এভাবে বস্তুতঃ 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত' এর ষষ্ঠ খণ্ড এবং সপ্তম খণ্ডের বিরাট এক অংশও রচিত হয়ে যায়। আর আজ এ কাজ তৎপরবর্তী লেখক-গবেষকদের। তারা হিজরী তের শতকের মুসলিম বিশ্বের দাওয়াত ও সংস্কারের পতাকাবাহী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের খেদমত ও কর্মতৎপরতার উপর কলম ধরবেন, যারা বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে আমৃত্যু ইসলামের দাওয়াত, সংস্কার ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর কাজ আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। এরপর চতুর্দশ শতকের বিশ্বময় সংস্কার, শিক্ষা ও চিন্তাধারা এবং দাওয়াতী কাজের জরিপ নিয়ে তার প্রতিচ্ছবি অংকন করবেন। কেননা 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত' -এর বিষয়বস্তু বিশেষ কোন যুগ ও দেশের সাথে সুনির্দিষ্ট নয়। এর কার্যক্রম দাওয়াতী ও সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা, ইসলামী চিন্তাধারার সংশোধন, ধর্মীয় জ্ঞানের পুনর্জীবন ও প্রসার; সমকালীন বিভ্রান্তি, কুসংস্কার ও

প্রথা-প্রচলণের চাদর বিদীর্ণ করা আর দ্বীনের প্রাণ, বাস্তবতা, নিগূঢ়তা ও অমূল্য রত্নসমূহ উদ্ভাসিত করা। সমকালীন ফেৎনা-ফাসাদ, বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা ও পথভ্রষ্টতা প্রতিরোধ ও বিদূরিত করার এই সংগ্রাম ততদিন পর্যন্ত চলতে থাকবে, যতদিন পর্যন্ত এই দ্বীন বাকী থাকবে এবং এই দুনিয়া টিকে থাকবে। কাজেই কেউই এই বিষয়ের হক আদায় করে ফেলেছেন এবং এই ধারাকে প্রান্তসীমায় পৌঁছাতে পেরেছেন বলে দাবী করতে পারবেন না । হাদীস শরীফে এসেছে,

يحمل هذا العلم عن كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانحال المبطلين وتأويل الجاهلين.

অর্থাৎ– প্রত্যেক প্রজন্মে এমন ন্যায়পরায়ণ ও আল্লাহভীরু লোক এ ইলমের ধারক-বাহক ও উত্তরাধিকারী হবেন, যিনি দ্বীন ধর্ম থেকে ঘাতক অবিশ্বাসী লোকদের রদবদল, বাতিলপন্থী লোকদের দাবী এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যাসমূহ দূর করতে থাকবে। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর সংশোধন ও সংস্কারের পরিধি স্বাভাবিকভাবেই ছিল অনেক ব্যাপক ও বহুমুখি। তাতে শিক্ষা ও চিন্তাগত রূপ ছিল অগ্রগণ্য। সুতরাং হাতে-কলমে শিক্ষাদান, লিখনী, কুরআন-হাদীসের প্রসার, যৌক্তিক ও ঐতিহ্যগত দলীল প্রমাণের মাঝে সমন্বয় সাধন, ফিকহী মাযহাবসমূহের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান, শরীয়তের সূক্ষ্মতা ও উদ্দেশ্যসমূহের বিশ্লেষণ, আসন্ন বৈজ্ঞানিক যুগের গুরুত্ব দান, তরবিয়ত ও ইরশাদাত, ওয়াজ-নসীহত, ভারতে ইসলামী নেতৃত্ব-মূল্যবোধের হেফাজত, রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও ক্রমবর্ধমান শক্তিগুলোর বাস্তবধর্মী তত্ত্বানুসন্ধান এবং তাদের মধ্যে মিল্লাতের নিরাপত্তা ও স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখার সম্ভাব্য সকল কৌশল গ্রহণ, ইসলামী জ্ঞান-বিদ্যায় মুজতাহিদসুলভ চিন্তা-গবেষণা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিজ্ঞাত আলেম শ্রেণীর শরণাপন্ন হওয়ার চেষ্টা-সাধনা সবই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এজন্য এ ব্যাপারে লেখকের যথেষ্ট মুতালা'আ ও চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন ছিল, যা কম আলোচনায় স্থান পেয়েছিল। সেই সাথে অন্যান্য ব্যস্ততা এবং দায়িত্বভারও ছিল কাঁধে। তথাপি আল্লাহর শোকর, এ খণ্ড সম্পন্ন করতে ততটা বিলম্ব হয়নি, ইতোপূর্বে প্রথম দু'খণ্ডে যতটা হয়েছিল।

লেখক তার সেসব প্রিয় বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সহযোগীদের প্রতি নিতান্তই কৃতজ্ঞ, যারা বিষয়বস্তুর সহজতা, কিছু দীর্ঘ ফারসী ও আরবী ইবারতের অনুবাদ, কিতাবের পাণ্ডুলিপি তৈরী, বিন্যাস ও প্রুফে সাহায্য করেছেন। তাছাড়া প্রকাশনা, হস্তলেখা, মুদ্রণ যাচাই-বাছাইয়েও তাদের যথেষ্ট শ্রম

রয়েছে। তাঁদের মধ্যে মাওলানা শামস তাবরীয খান -এজলিসে তাহকীকাত ও নশরিয়্যাতে ইসলাম' -এর সহকর্মী, মাওলানা মুহাম্মদ বুরহানুদ্দীন সাম্ভুলী –উস্তাদ, তাফসীর ও হাদীস বিভাগ দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা, মাওলানা আতীক আহমদ সাহেব –শিক্ষক, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা, মাওলানা আবুল ইরফান সাহেব নদভী –শিক্ষক, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা, মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ মুর্তাযা সাহেব নাকরী –কর্মকর্তা কুতুবখানা নদওয়াতুল উলামা, মাওলানা মুহাম্মদ হারুন –ইনচার্য রেজিস্টার বিভাগ, কুতুবখানা নদওয়াতুল উলামা এবং আমার স্নেহাস্পদ মাওলানা নেছারুল হক নদভী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও কৃতজ্ঞতার দাবীদার। শ্রদ্ধাস্পদ মাওলানা নূরুল হাসান রাশেদ সাহেব কান্দলভী বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতার হকদার। তিনি শাহ সাহেব (র) এর বংশীয় অবস্থা ও বংশধরদের ব্যাপারে যথেষ্ট মূল্যবান তত্ত্ব সংগ্রহ করে দিয়েছেন। কিছু বিষয়বস্তুর রসদও যুগিয়েছেন। আমার স্নেহাস্পদ মাওলানা গুফরান নদভী এবং মাওলানা গিয়াসুদ্দীন নদভী পূর্বের মতই রচনা ও প্রকাশনায় এবং পাণ্ডুলিপি তৈরীর কাজে পরিপূর্ণ দায়িত্বশীলতা ও যত্নসহকারে অংশ নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

সবশেষে লেখকের দু'আ ও আশাবাদ হচ্ছে, এ খণ্ডটি সামান্য হলেও (ঐ সুমহান ও উঁচু ব্যক্তিত্বের মর্যাদাযোগ্য হতে পারে বলার সাহস নেই, যার সম্পর্কে এই গ্রন্থনা) বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে উপকারী, সাহস সঞ্চারকারী, চিন্তা-চেতনা ও বোধোদায়ক, অধিক অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য আন্দোলন সৃষ্টিকারী এবং চেষ্টা সাধনার জন্য অনুপ্রেরণা দানকারী হবে– যাতে এই বিপ্লবের যুগে এবং বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা ও ফেৎনার যুগে বিশেষভাবে দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে।

وما ذلك على الله بعزيز

১২ রবীউস সানী ১৪০৪ হি.
১৬ জানুয়ারী ১৯৮৪ খৃ.
সোমবার

আবুল হাসান আলী নদভী
৯, বে-নযীর বলঢঙ্গ
বাঈকেল্লাহ, বোম্বাই

প্রথম অধ্যায়
হিজরী বারো শতকের মুসলিম বিশ্ব

হিজরী বারো শতকের ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা ও বিপ্লবগুলোর পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা

'তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের প্রারম্ভে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র), হযরত শায়খ আহমদ সরহিন্দী (র) [৯৭১ হি.-১০৩৪ হি.] -এর জীবন বৃত্তান্ত, তাঁদের সমকাল এবং তাঁদের মহান সংস্কারমূলক ও বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সময় হিজরী দশ শতকের (যাতে হযরতের জন্ম এবং তাঁর চিন্তাধারা ও শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল) ইতিহাসভিত্তিক ও গভীর অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনার প্রসঙ্গে এসে গ্রন্থকার লিখেছিলেন, "আমাদেরকে এই ঐতিহাসিক বাস্তবতাকেও স্মরণ রাখতে হবে যে, একটি যুগ এবং সে যুগের পৃথিবী ও মানব সমাজ একটি বহতা নদীর মত, যার প্রতিটি তরঙ্গ আরেকটি তরঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট। এজন্য একটি দেশ বহির্বিশ্ব থেকে যতটাই সম্পর্কহীন ও বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করুক না কেন, তথাপি পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ, বিপ্লব, পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ক্ষমতাধর শক্তি ও আন্দোলন থেকে একেবারেই প্রভাব লেশহীন বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না; বিশেষতঃ যখন সেসব ঘটনা তাদের স্বজাতি, সমমনা এবং একই ধর্মমতের অনুসারী প্রতিবেশি রাষ্ট্রে সংঘটিত হয়। কাজেই এই ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় কেবল ভারতের ভূ-সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা সমীচীন হবে না। আমাদেরকে হিজরী দশম শতকের গোটা মুসলিম বিশ্ব বিশেষতঃ পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলোর প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। যাদের সাথে ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল না বটে। কিন্তু ছিল ধর্ম, শিক্ষা, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক। সেখানে উষ্ণ-শীতল যে বাতাস প্রবাহিত হত, তার ঝাপটা বিরাট দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও ভারত পর্যন্ত এসে পৌঁছাত।"

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) -এর জীবনবৃত্তান্ত এবং তাঁর সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের উপর কলম ধরতে এই ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে সামনে রাখা ও এই নীতি মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি। কেননা তাঁর চিন্তাধারা ও শিক্ষা-দীক্ষায় পবিত্র হিজাযের মৌলিক প্রভাব ছিল। যেখানে তিনি (১১৪৩-

১১৪৪ হি.) এক বছরাধিককাল অবস্থান করেছেন এবং তৎকালীন সময়ের হাদীস শাস্ত্রের প্রাণপুরুষ ও শাস্ত্রীয় ইমাম শায়খ আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম কুরদী মাদিনী (র)-এর কাছে হাদীসের শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। যার হাদীসের সবকে মিসরসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাদীসের ছাত্ররা এসে ভীড় জমাত। হারামাইনের আলেমদের সাথে (যারা ছিল বিভিন্ন মুসলিম দেশ ও আরব দেশের নাগরিক) তাঁর দীর্ঘ সাহচর্য ছিল। সে সময় হিজায ছিল উসমানিয়া খেলাফতের শাসনাধীনে। আর মক্কার সম্ভ্রান্ত অভিজাত শ্রেণী ছিল উসমান পরিবারের সুলতানদের প্রতিনিধি হিসেবে গভর্নর ও শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত। হজ্জ পালন ছাড়াও (যা প্রতি বছর মুসলিম বিশ্বের উঁচু-উত্তম মন-মানসের অধিকারী এবং হারাম শরীফের আলোপ্রিয়াসীদেরকে এক স্থানে একত্রিত করে দিত) সে যুগে হারামাইন শরীফাইন বিশেষতঃ মদীনা মুনাওয়ারা হয়ে গিয়েছিল ইলমে হাদীসের সবচেয়ে বড় ও প্রাণকেন্দ্র। যেখানে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ইলমপিপাসুরা সমবেত হত। সেখানে বসে সহজেই গোটা মুসলিম বিশ্বের আত্মিক, শিক্ষাগত, চারিত্রিক, সভ্যতা-সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ করা যেত। এসব দিক থেকে বিভিন্ন মুসলিম এবং আরব দেশগুলোর উন্নতি-অবনতি ও উত্থান-পতন অনুমান করা যেত অনায়াসে। সেখানকার বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব, মনীষী, সংস্কারমূলক আন্দোলন, দাওয়াতী কর্মকাণ্ড এবং বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী অপতৎপরতা ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যেত। এমনকি মুসলিম বিশ্বের জীবন নাড়ির গতি-স্থিতি ও ইসলামের প্রাণস্পন্দন শোনা যেত। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর মত সচেতন ও দরদী মানুষ, যাকে আল্লাহর অসীম কুদরত সংস্কার ও দ্বীনকে পুনর্জীবিত করার মহান কাজের জন্য তৈরী করেছিলেন, নিশ্চয়ই তিনি এতে উপকৃত ও প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। তিনি এর থেকে নিজ চিন্তাধারার প্রসারতা, দাওয়াত ও দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব-উচ্চতার পুরোপুরি রসদ পেয়ে থাকবেন।

অধিকন্তু ভারত শত শত বছর ধরে মধ্য এশিয়ার তাওরানী ও আফগান বংশের তুর্কি তরুণ যুবরাজদের রেসকোর্স এবং রাজনৈতিক ও শাসনের দিক থেকে তাদের পদানত ছিল। সেখান থেকেই যে কোন সময় তার রাজত্বের প্রভাবাধীন অঙ্গরাজ্যে তেজী-সাহসী বীর শার্দুল আগমন করত এবং তার পতনোন্মুখ রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সামরিক শক্তিতে নতুন চেতনা ও তেজোদীপ্ততা আনয়ন করত। যখন ভারতে দীর্ঘকাল ধরে শাসনকারী গোষ্ঠী বার্ধক্য ও কলুষতার স্তরে নেমে আসত, তখন খয়বর উপত্যকা কিংবা বোলান

উপত্যকার পথে এক তেজী সাহসী সামরিক শক্তি ভারতে আগমন করত এবং এই শাসন ব্যবস্থায়, যাদের ছিল এক ধর্ম ইসলাম, একই মাযহাব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, একই আইন শরীয়তে মুহাম্মাদী, একই ভাষা তুর্কি ও ফার্সী এবং একই সংস্কৃতি (আরবী, ইরানী, তুর্কি ও ভারতীয় প্রভাবের সংমিশ্রণ); তাতে শক্তির একটি ইনজেকশন দিত। দান করত তাকে এক নতুন জীবনের সন্ধান।

আরও মনে রাখতে হবে, সম্রাট বাবরের দেশ অবরোধ এবং মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে আফগানিস্তান ও তার গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ কাবুল-কান্দাহার ছিল বিশাল ভারতীয় মুসলমান সাম্রাজ্যের এক অংশ, তার বহিঃদুর্গ ও ঘাঁটি। ইরান সম্রাট নাদের শাহের ভারত আগমন ও দিল্লী আক্রমণ হয়েছিল শাহ সাহেব (র)-এর যুগে। তার যুগেই কান্দাহারের শাসক আহমদ শাহ্ আবদালী কয়েকবার ভারতের দিকে রওনা হয়েছেন। অবশেষে হিজরী ১১৭৪ মোতাবেক ১৭৬১ খৃস্টাব্দে পানিপতের যুদ্ধে মারাঠীদেরকে পরাজিত করে ইতিহাস ও ঘটনার গতিধারা বদলে দিয়েছেন। মোগল সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা এবং ভারতীয় মুসলিম সমাজ ও ধনিক শ্রেণীকে নতুন ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দিয়েছেন। যা তিনি তার নিছক যোগ্যতায় করতে পারেননি।

এসব ঘটনা কেবল তার যুগেই হয়নি বরং শেষোক্ত ঘটনায় তার দিকনির্দেশনাও ছিল। এ দুই আক্রমণকারী ইরান ও আফগানিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এজন্য শাহ সাহেব (র)-এর যুগ আর হিজরী বারো শতকের পর্যালোচনায় তাদের দু'জনের অবস্থা ও রাজনৈতিক বিপ্লবকে উপেক্ষা করা যায় না।

ভারতের উপর ইরানী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব

ভারতবর্ষ যেভাবে হিজরী পঞ্চম শতক থেকে রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে তুর্কিস্থান ও আফগানিস্তানের কর্তৃত্বাধীন ছিল, তদ্রূপ তার শিক্ষা-সাহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চিন্তাগতভাবে ছিল কমবেশি ইরানের দ্বারা প্রভাবিত। সেখানকার সাহিত্য, কবিত্ব, তাসাওউফের সিলসিলা ও তরীকা এমনকি সেখানকার পাঠ্যসূচী, শিক্ষাব্যবস্থা এবং সেখানকার আলেমে দ্বীন ও শাস্ত্রীয় পণ্ডিতগণের রচনাবলি ভারতবাসীর মন-মানসে ছেয়ে যায়। বিশেষতঃ বাদশা হুমায়ূনের ইরান গমন এবং সেখানকার সাহায্যে ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধারের পর থেকে। অধিকন্তু বাদশা আকবরের শাসনামলে আমীর ফাতহুল্লাহ্ শিরাজী ও হাকীম আলী গায়লানীর আগমনের পর থেকে ভারত তার পাঠ্যতালিকা, শিক্ষাব্যবস্থা, উৎকর্ষতার মান নির্ণয়, যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন

শাস্ত্রে ইরানের পুরোপুরি অনুসারী হয়ে যায়। এক্ষেত্রে মূলতঃ ভারতের উপর ইরানের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমরা এই ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় ইরান এবং সেখানে সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহের প্রতি কিভাবে মনোনিবেশ না করে পারি?

উসমানিয়া রাজত্বের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব

আফগানিস্তান ও ইরানের প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলো ব্যতিত আমরা সেই উসমানিয়া রাজত্ব থেকেও চোখ বন্ধ করতে পারি না, যা দশ শতকের শুরু থেকে রক্ষা করে যাচ্ছিল খেলাফতের মসনদ। যার অবস্থান ভৌগোলিকভাবে ভারত থেকে অনেক দূরে ইউরোপ ও ক্ষুদ্র এশিয়ার মাঝামাঝি ছিল। কিন্তু আরব দেশগুলো (মিসর, সিরিয়া, ইরাক, ইয়ামেন, নজদ, হিজায ও উত্তর আফ্রিকার এক বিরাট অংশ) তার শাসনাধীন ছিল। হেরেম শরীফ ও পবিত্র স্থানগুলোর তত্ত্বাবধায়ক ও মুতাওয়াল্লী ইসলামী খেলাফতের ধারক ও রক্ষক হওয়া, একটি বৃহৎ শক্তি ও রাজত্বের মর্যাদা হিসেবেও এবং পাশ্চাত্য ও ইসলামবিদ্বেষী শক্তিগুলোর দৃষ্টিতে ইসলামী শক্তির নিদর্শন, বহুবিধ ইসলামী স্বার্থ রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী ও কর্ণধার হওয়ার কারণেও তামাম পৃথিবীর মুসলমান একে সম্মানের চোখে দেখত। সেখানকার নিত্যদিনের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে বিশ্ববাসী নিছক আগ্রহই রাখত না বরং বিরাটভাবে প্রভাবিত হত এবং শিক্ষাগ্রহণ করত।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর মত উদার দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, ইসলামের ইতিহাসে যার গভীর দৃষ্টি ছিল, তিনি উসমানিয়া রাজত্ব সম্পর্কে কেবল দৃষ্টিপাতই করতেন না বরং খেলাফতের শরঈ অবস্থান এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল ছিলেন। দ্বীন-ধর্ম, চরিত্র, সমাজ-সংস্কার, সুস্থ সভ্যতা-সাংস্কৃতি ও অর্থনীতির জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র এবং সুস্থধারার ডানপন্থী রাজনৈতিক শক্তিকেও তিনি জরুরী মনে করতেন। মুসলমানদেরকে না কেবল স্বদেশ বরং গোটা বিশ্বে তিনি এক প্রভাবশালী এবং সত্যের আদেশ ও মিথ্যার নিষেধকারী শক্তিরূপে দেখার আশাবাদী ছিলেন না। তিনি মুসলমানদের সর্ববৃহৎ রাজত্বের উত্থান-পতন এবং তার অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ও বিক্ষিপ্ততায় কিভাবে চোখ বন্ধ করে রাখতে পারেন? বিশেষতঃ যখন তিনি এক বছরের বেশি সময় যাবৎ তার অতীব প্রিয়, উৎকৃষ্টতর ও সম্মানিত দেশ হিজাযে চোখ-কান খোলা রেখে, সচেতনতা ও অন্তর্দৃষ্টিসহ অবস্থান করেছিলেন এবং তার বিজিত ও শাসনাধীন রাষ্ট্রসমূহ মিসর, সিরিয়া ও ইরাক থেকে আগত লোকদের মুখে

সেসব প্রতিক্রিয়া শুনেছিলেন, যা উসমান পরিবারের সুলতান, তাদের মন্ত্রীবর্গ, শায়খুল ইসলাম ও তুর্কি আলিমদের চিন্তাধারার প্রভাবে সেসব রাষ্ট্রের শিক্ষা ও ধর্মীয় পরিবেশ ও কেন্দ্রে পড়ছিল। এজন্য আমাদেরকে হিজরী বারো (খৃস্ট আঠার) শতকের উসমানিয়া শাসনের প্রতিবেশি পশ্চিমা খৃস্টদেশগুলোর সাথে তার সম্পর্ক, জয়-পরাজয়, অপসারণ ও সমাসীন এবং রাজনৈতিক শক্তির উত্থান-পতনের উপরও একটি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি দিতে হবে।

মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থা

আমরা এ মুহূর্তে প্রথমে মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থা, রাজত্ব-ক্ষমতা পরিবর্তন, নানা বিপ্লব এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। এরপর মুসলিম বিশ্বের শিক্ষাগত, ধর্মীয়, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিকতার পর্যালোচনা করব।

বারো শতকের উসমানিয়া শাসন

শাহ সাহেব (র) হিজরী ১১১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন আর ইন্তিকাল করেন হিজরী ১১৭৬ সালে। এ সময়ের (৬২ বছর) মধ্যে উসমানিয়া রাজত্বের সিংহাসনে পাঁচজন শাসক দ্বিতীয় মোস্তফা (মৃত্যু ১১১৫ হি.), তৃতীয় আহমদ (মৃত্যু ১১৪৩ হি.), প্রথম মাহমূদ (মৃত্যু ১১৬৭ হি.), তৃতীয় উসমান (মৃত্যু ১১৭১ হি.) এবং তৃতীয় মোস্তফা (১১৭১ হি.-১১৮৭ হি. মোতাবেক ১৭৫৭ খৃ.-১৭৭৪ খৃ.) আসা-যাওয়া করেছেন।

শাহ সাহেবের চিন্তাধারা ও সংস্কারকর্মের যুগে তৃতীয় আহমদ, প্রথম মাহমূদ, তৃতীয় উসমান এবং তৃতীয় মোস্তফা এই মোঘল রাজত্ব ও সিংহাসনের লাগাম সামলে ধরেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সময়; শাহ সাহেবের জীবনের শেষ পাঁচ বছর তৃতীয় মোস্তফার শাসনামলে অতিবাহিত হয়।

তৃতীয় মোস্তফা ষোল বছর আট মাস শাসন করেন। তার যুগে উসমানিয়া রাজত্ব ও রুশদের মাঝে যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে উসমানিয়া রাজত্বের (১৭৬৯ খৃ.) পরাজয় হয়। যেখানে রুশদের কোনও কৃতিত্ব ছিল না। এটা কিছু দুর্ঘটনা ও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার পরিণতি ছিল মাত্র। রুশ জেনারেল আলফানেস্টোন কনস্টান্টিনোপল আক্রমণেরও মনস্থ করেন। কিন্তু তাকে দমন করা হয়। মোস্তফা খান সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং সংস্কারেরও পদক্ষেপ নেন। কিছুটা সামরিক সফলতাও অর্জন করেন। রুশরা সন্ধির জন্য বিভিন্ন শর্ত উপস্থাপন করে, যা ছিল লাঞ্ছনাকর। বোখারসটে ১৩ শাবান ১১৮৬ হিজরী (শাহ সাহেবের ইন্তিকালের দশ বছর পর) মোতাবেক ৯ নভেম্বর

১৭৭২ খৃস্টাব্দে একটি কনফারেন্স হয়। সেখানেও কিছু শর্ত পেশ করা হয়। উসমানিয়া শাসন সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে তুর্কি সৈন্যদেরকে যুদ্ধ শুরু করার নির্দেশ দেয়। পরিণামে রুশবাহিনীর পরাজয় বরণ করতে হয়। রুশদের প্রতিক্রিয়া ছিল এমন যে, উসমানী সৈনিকগণ যখন বাজারজাক (বর্তমান নাম Tobulkhin) দিয়ে অতিক্রম করেন, তখন শহরের সকল মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে চলে যায়। ঐতিহাসিক হোমার লিখেন, 'মুসলমানগণ আগুনে চরানো বহু হাড়ি পেয়েছে, যাতে গোশত ছিল।' ৮ যিলকদ ১১৮৭ হিজরী মোতাবেক ১৭৭৪ খৃস্টাব্দের ১২ জানুয়ারী সুলতান তৃতীয় মোস্তফা ইন্তিকাল করেন। ঐতিহাসিকগণ তার ন্যায়-ইনসাফ ও কল্যাণ কাজের আগ্রহ-উদ্যম ও প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। তিনি তার শাসনামলে অনেক মাদরাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন।

শাহ সাহেব (র)-এর যৌবনকালে উসমানিয়া সাম্রাজ্যে প্রেসের প্রচলন হয়। প্রথম প্রেস প্রতিষ্ঠা হয় কনস্টান্টিনোপলে। সে যুগেই নজদ ও হিজাযে শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব (১১১৫-১২০৫ হি.)-এর আন্দোলন পত্র-পল্লবিত হয়।[১]

তৃতীয় উসমানের যুগে আলী বে (ওরফে শায়খুল বালাদ) মিসরের শাসন ও সরকার ব্যবস্থার উপর পুরোপুরি অস্থির হয়ে ওঠেন। তিনি রোম সাগরে অবস্থানরত রুশ জেনারেলের সাথে আঁতাত করেন। চুক্তি করেন, তিনি তাদেরকে রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবেন। যাতে মিসর স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে যায়। তার সাহায্যে আলী বে গায্যাহ, নাবলুস, কুদস, ইয়াকাহ ও দামেশক দখল করতে সফল হন। তিনি আনাতোলিয়ার সীমান্তের দিকে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে তার অধীনস্থ এক সৈনিক আবুয যাহাব নামে প্রসিদ্ধ মুহাম্মদ বে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উত্তোলন করে। যার ফলে আলী বে-কে মিশরে ফিরে আসতে হয় আর সে হয় পরাজিত। এই গৃহযুদ্ধ ও বিচ্ছিন্নতার ফলে বৈরুতের উপর রুশ জাহাজগুলো অগ্নিসংযোগ করে। এতে প্রায় তিনশ ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। মিসরে মহররম ১১৮৭ হিজরীতে আলী বে এবং মুহাম্মদ বে -এর সৈন্যদের মাঝে লড়াই হয়। আবুয্

---

[১] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য তারীখুত দাওলাহ আলইল্লিয়াতুল উসমানিয়া। পরবর্তীকালে সঊদ ইবনে আবদুল আযীয (১১৬৩-১২২৯ হি.) আমীরে নজদ এই দাওয়াত, মুজাহিদসুলভ চেতনা ও সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ১২১৮ হিজরীতে হিজায ও আরব উপদ্বীপের বিরাট অংশের উপর দখল প্রতিষ্ঠা করে নেন। ১২৩৪ হিজরীতে খদিউ মুহাম্মদ আলী মিসর শাসকের প্রচেষ্টায় এ অংশের উপর পুনরায় তুর্কি রাজত্বের পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠিত হয়। নাজিদী আমীর আবদুল্লাহ ইবনে সঊদ ইবনে আবদুল আযীযকে কনস্টান্টিনোপল পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে তাকে হত্যা করে ফেলা হয়।

যাহার ওরফে মুহাম্মদ বে বিজয় লাভ করে। আর আলী বে বন্দি হয়ে মুমূর্ষ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তার শিরোচ্ছেদ করে চারজন রুশ অফিসারসহ উসমানী গভর্নর খলীল পাশার নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি তাদেরকে কনস্টান্টিনোপল রওনা করে দেন। আর মিসর পুনরায় উসমানিয়া রাজত্বের পুরোপুরি অধীন হয়ে যায়।

হিজাযের অবস্থা

শাহ সাহেব রহ. যখন হিজায সফর করেন এবং হারামাইন শরীফাইনে দীর্ঘ অবস্থান করেন, তখন সুলতান প্রথম মাহমূদ (১১৪৩-১১৬৭ হি.)-এর রাজত্ব ও শাসনকাল ছিল।

সে সময় হিজাযে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি ও নেতা আমীরে হিজায (ওরফে শরীফ) মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে মুহসিন আল-হাসানী (মৃত্যু : ১১৬৯ হি.) ছিলেন হিজাযের শাসক। যিনি আপন পিতার ইন্তিকালের পর ১১৪৩ হিজরীতে হিজাযের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।[২]

তার যুগ ছিল গৃহযুদ্ধ ও নেতৃত্বের মোহে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর গোষ্ঠীগত টানাপোড়েনের যুগ। ১১৪৫ হিজরীতেই তার চাচা মাসউদ ইবনে সাঈদ তাকে পদচ্যুত করে হিজাযের শাসন ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু ১১৪৬ হিজরীতে তিনি পুনরায় সে মসনদ লাভ করেন। এরপর আবার তার চাচা তাকে বরখাস্ত করেন এবং ১১৬৫ হিজরী পর্যন্ত আমরণ তিনি সে পদে অধিষ্ঠিত ও শাসনকর্তা ছিলেন। তার যুগে হিজাযে স্থিতিশীলতা ও শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিকগণ তাকে সচেতন ও রাজনৈতিক দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব বলে মনে করেন।[৩]

হিজরী বারো শতকের মধ্যভাগে পথের নিরাপত্তাহীনতা, যাযাবরদের লুটতরাজ ও অরাজকতার বিভীষিকা ইতিহাসের বই-পুস্তক ও হজ্বের

---

[২] মক্কার আমীরগণের (যারা নির্বাচিত হত হাসানী বংশ থেকে এবং এ কারণে তাদেরকে 'আশরাফ' উপাধিতে ভূষিত করা হত।) ধারাবাহিকতা চতুর্থ হিজরী শতকের প্রথম তৃতীয়াংশ থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রথম শরীফে-মক্কা নিযুক্ত হন আব্বাসী খলীফা আল-মুতী লিল্লাহ (৩৩৪-৩৬৩ হি.) এর যুগে। সুলতান সেলিমের সিরিয়া ও মিসর দখল এবং হারামাইন শরীফাইনকে নিজের করতলে নেওয়ার সময় পর্যন্ত মক্কার শরীফগণ নিযুক্ত হতেন মিসরের অনুগত বংশের শাসকবর্গের পক্ষ থেকে। সুলতান সেলিম তৎকালীন শরীফে-মক্কা সাইয়িদ বারাকাত এবং তার পুত্র সাইয়িদ আবু নামীকে স্বপদে বহাল রাখেন। তিনি যথারীতি মক্কার আমীর থাকেন। তার পরবর্তীতে এই ধারা শরীফ হুসাইনের শাসন পর্যন্ত চালু থাকে। যিনি (জুন ১৯১৬ খৃ.) শাবান ১৩৩৪ হিজরীতে উসমানিয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং জানুয়ারী ১৯২৬ খৃস্টাব্দে সুলতান ইবনে সউদের হাতে হিজাযের ক্ষমতা হারান।

[৩] আল আলাম : ৮/১১১-১১২

ভ্রমণকাহিনীতে আমভাবে পাওয়া যায়। যা রাজত্বের প্রাণকেন্দ্র (কনস্টান্টিনোপল) এর দূরত্ব, তুর্কিদের হিজাযের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে যতদূর সম্ভব হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখার কৌশল, মক্কার শরীফদের (যারা ছিলেন প্রসিদ্ধ হাসানী সাদাতের বংশধর) ব্যাপারে অতিরঞ্জিত নমনীয়তা ও উদারতা, আরবীদের ব্যাপারে সীমাতিরিক্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি ও তাদের বাড়াবাড়ি সম্পর্কে ভ্রুক্ষেপহীনতার রাজনীতি, অধিকন্তু হিজাযের নেতৃত্বে পরিবারতান্ত্রিকতা ও একই বংশে সীমাবদ্ধ হওয়ার অলৌকিক পরিণতি ছিল। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, শাহ সাহেব (র) এসব অরাজক-অস্থিরতাপূর্ণ অবস্থা, নেতৃত্ব ও ক্ষমতার মসনদের জন্য হিংসাত্মক ও বিদ্বেষমূলক দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং আইন-শৃঙ্খলার দুর্বলতাকেও তার অন্তর্দৃষ্টিতে দেখে থাকবেন। ধর্মীয় মূল্যবোধে নিবিষ্ট অন্তর দিয়েও উপলব্ধি করে থাকবেন। সুতরাং চাচা-ভাতিজার মধ্যে ক্ষমতার মসনদের জন্য যে লড়াই ১১৪৫ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে, বিস্ময়ের কিছু নয় তা শাহ সাহেবের হারামাইনে অবস্থানকালেই হয়েছে। আর তিনি এর থেকে সুদূরপ্রসারী ও চারিত্রিক অবনতির সাক্ষ্য-প্রমাণ চয়ন করেছেন।

ইয়ামেন

ইয়ামেনেও প্রায় এ ধরনের শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। সুতরাং রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিকভাবে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের অধীন এবং রাজত্বের পক্ষ থেকে নিযুক্ত তুর্কি গভর্নর থাকা সত্ত্বেও সেখানে নেতৃত্ব (ইমামত) ব্যবস্থা চালু ছিল। যা ইয়ামেনে তৃতীয় হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকে চলে আসছিল। যাতে বংশগতভাবে সাদাত আর মাযহাব হিসেবে যায়দী[৪] ব্যক্তিবর্গ অধিষ্ঠিত ছিল। ইয়ামেনবাসী তাদের হাতে খেলাফতের বায়'আত গ্রহণ করত। তাকে বলা হত ইমাম। উক্ত পদে সমাসীন ব্যক্তির ইজতিহাদের যোগ্য মানসম্পন্ন হওয়া এবং স্বীয় মাযহাবে প্রসিদ্ধ ও বিদগ্ধ আলিম হওয়াকে অনিবার্য মনে করা হত। সম্রাট সুলাইমান কানুনী ইবনে ইয়াযুয সেলিমের শাসনামলে ইয়ামেন

---

[৪] আল্লামা মুহাম্মদ আবু যাহরা স্বরচিত 'তারীখুল মাযহাব আল ইসলামিয়া' গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করে লিখেন, যায়দী শী'আ সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অতি নিকটতর ও ভারসাম্যপূর্ণ একটি দল। তারা ইমামদেরকে নবুওয়াতের স্তরে পৌঁছায়নি; রাসূলুল্লাহ (স) এর পরে কেবল তাদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে। তারা সাহাবায়ে কিরামকে কাফির আখ্যা দেয় না। তারা মনে করে, যে ইমামের অসিয়ত নবী (স) করেছিলেন, নাম ও ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাকে নির্ধারণ করেননি বরং গুণাবলি বর্ণনা করেছিলেন। যা হযরত আলী (রা) এর উপর প্রযোজ্য হয়। আল্লামা আবু যাহরা-এর গবেষণা মতে, এই ফিরকার মুখপাত্র ইমাম যায়েদ ইবনে ইমাম যাইনুল আবেদীন শায়খাইন (হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা) এর খেলাফতের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি তাদের খেলাফতকে সঠিক বলে মানতেন। পৃ : ৪৭-৪৯

ছিল উসমানিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সে সময় ইয়ামেনের ইমামগণের সন্তান ও সহচর সাইয়িদ মুতাহ্হার ইবনে ইমা শরফুদ্দীন ছিলেন (মৃত্যু ৭৮০ হি.) সেখানকার শাসক ও ইমাম। তুর্কি শাসক ও নেতা সিনান পাশা এবং তার মধ্যে যুদ্ধ হয়। অনন্তর ইয়ামেন উসমানিয়া সাম্রাজ্যের পদানত হয়ে যায়।[৫] কিন্তু তুর্কিরা হিজাযের মত এখানেও নেতৃত্ব ও শাসন ব্যবস্থা চালু রাখে এবং এক ধরনের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা দিয়ে দেয়। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) যখন হিজাযে ছিলেন, সে সময় ইয়ামেনে ইমাম মনসুর বিল্লাহ হুসাইন ইবনে মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহু কাসিম ইবনে হুসাইন ইয়ামেনের ইমাম ছিল।

যার নেতৃত্ব ও শাসনকাল চালু ছিল ১১৩৯ হিজরী থেকে ১১৬১ হিজরী পর্যন্ত। যাইদী মতবাদের শাসন ও প্রসারতা সত্ত্বেও অধিকাংশ প্রজা সাধারণ ছিল সুন্নী ও শাফিঈ মতাদর্শের অনুসারী। ইয়ামেন বারো ও তের হিজরী শতকে ইলমে হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। যেখানে বারো শতকে জন্মগ্রহণ করেন 'সুবুলুস সালাম' রচয়িতা মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আলআমীর (মৃত্যু ১১৪২ হি.) আর তের শতকে 'নাইলুল আওতার' প্রণেতা আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আলী শাওকারী (মৃত্যু ১২৫৫ হি.)। হিজায অবস্থানকালে শাহ সাহেব (র) স্থানীয় নৈকট্য বা প্রতিবেশি এলাকা হওয়া এবং শিক্ষাগত সম্পর্কের কারণে ইয়ামেনের আলেমদের রচনাবলি ও তাদের মুহাদ্দিসসুলভ খেদমত সম্পর্কে অবশ্যই জেনে থাকবেন।

ইরান

ইরানে ছফাবী বংশের রাজত্ব চলে দু'বছর। কিন্তু এরপর কুদরতের অমোঘ বিধান অনুসারে তার উপর বার্ধক্য ও জীর্ণতার সেই যুগ এসে গিয়েছিল, যা দার্শনিক ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের ভাষায় 'আসার পরে যাওয়ার নাম নিত না।' إن الهرم اذا نزل بدولة لا يرتفع তথা কোন রাজ্যে যখন বার্ধক্য ছেয়ে যায়, তারপর আর যৌবন ফিরে আসে না। এই অবস্থাদৃষ্টে সমমানের পার্শ্ববর্তী দেশ আফগানিস্তান ফায়দা লুটে নেয় এবং সেখানকার দূরদর্শী অকুতোভয় শাসক মাহমুদ খান গলযাঈর নেতৃত্বের ১১৩৪ হিজরীতে ইরান আক্রমণ করে ইস্পাহান জয় করে নেয়। হুসাইন শাহ বন্দি হন। আফগানীরা বাকী দেশও জয় করার মনস্থ করে। কিন্তু তাদের সংখ্যা এত বেশি ছিল না যে, গোটা দেশ তাদের দখলে রাখতে পারে।

---

[৫] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য- আল্লামা কুতুবুদ্দীন নাহরোয়ানী পাটনী হানফী বিরচিত البرق اليمانى فى الفتح العثمانى।

মাহমুদ খান তিন বছর রাজত্ব করার পর ১১৩৭ হিজরী মোতাবেক ১৭২৪ খৃস্টাব্দে চিরস্থায়ী মুলুকের পথে যাত্রা করেন। তার স্থলবর্তী আশরাফ খানের যুগে দেশে অনিয়ম-বিশৃঙ্খলা ছেয়ে যায়। সে সময় রুশ শাসক পিটার প্রধান ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় জেলাসমূহে আক্রমণ করে। সন্ধির কারণে ইরানকে তার অনেকগুলো শস্য-শ্যামল ও গুরুত্বপূর্ণ জেলা হাতছাড়া করতে হয়। ইরান সম্রাট ছিলেন বন্দি। সৌভাগ্যক্রমে যুবরাজ তুহমাসপ একজন সুযোগ্য, দৃঢ়চিত্ত ও দূরদর্শী নেতা পেয়ে যান, যিনি বংশগতভাবে নগণ্য হলেও নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার কারণে সেই দলভুক্ত ছিলেন, যারা নতুন রাজত্বের ভিত্তি প্রস্তর রাখতে পারে। সে ছিল নাদের শাহ আফশার।

নাদের শাহ আফশার

নাদের তুহমাসপকে তার পৈতৃক মসনদে বসিয়ে দেয়া হয়। তখন ছফাবী রাজত্ব ছিল পতনোন্মুখ। তার দ্বিতীয়বার উত্থানের কোনও লক্ষণ ছিল না। গোটা রাজ্যে বিক্ষিপ্ততা ও অবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছিল। নাদের এ পরিস্থিতি থেকে ফায়দা লুটে নিয়ে একটি নতুন সমরশক্তি সংঘটিত করে। তার বিচক্ষণতা ও সাহসিকতা ইরানীদের মধ্যে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। অন্ধকার পানির মত উথলে উঠে এবং গোটা রাজ্যে ছেয়ে যায়। তিনি ১১৪৩ হিজরী মোতাবেক ১৭৩০ খৃস্টাব্দে আফগানীদেরকে ইরান থেকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করে দেন। আর ১১৪৬ হিজরী মোতাবেক ১৭৩৩ খৃস্টাব্দে রুশবাহিনীকে কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলে গতিরোধ করে সম্মানজনক ও সহনশীল শর্তে সন্ধি স্থাপন করেন। আরবদেরকে দেশের পশ্চিম সীমান্তে প্রতিরোধ করেন। রোম সম্রাটকে দক্ষিণাঞ্চল থেকে পিছপা হতে বাধ্য করেন এবং প্রাচীন ইরান রাজত্বের অঞ্চলগুলো ভিনদেশিদের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করেন। হিজরী ১১৪৮ (১৭৩৫ খৃ.) ইরান সাম্রাজ্য এতটাই বিস্তৃতি লাভ করে যে, তার সীমানা প্রাচীন অবস্থায় ফিরে আসে। ১১৫০ হিজরী মোতাবেক ১৭৩৭ খৃস্টাব্দে ছফাবী বংশের যবনিকাপাত ঘটে যায়। নাদের শাহ আফসার তখন ইরানের একজন সম্রাট ছিলেন। এনসাইক্লোপিডিয়া বিশ্ব ইতিহাস রচয়িতার বর্ণনানুসারে 'নাদের শাহ রাজত্বের সিংহাসন এ শর্তে গ্রহণ করেছিলেন যে, ইরানীরা শী'আ মতবাদ প্রত্যাখ্যান করবে। তিনি স্বয়ং তুর্কি বংশোদ্ভূত ও সুন্নী মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু ইরানীদের সুন্নী মতাদর্শ গ্রহণ করাতে তিনি সফল হতে পারেননি। তার জেনারেলগণ ১৭৩৭ খৃস্টাব্দে বেলুচিস্তান ও বলখ আর ১৭৩৮ খৃস্টাব্দে কান্দাহার দখল করে নেয়। সেখান থেকে ভারত অবরোধের জন্য যাত্রা করে কাবুল, পেশাওয়ার ও লাহোর অবরোধ করে। ১৭৩৯ খৃস্টাব্দে

দিল্লীর নিকটে কিরণালয়ে মোঘল সম্রাটের বিশাল বড় সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে দিল্লী দখল করে নেয় এবং সেখানে নৃশংস গণহত্যা চালায়। নাদের মোঘল সম্রাট থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে নেয়নি। কিন্তু পঞ্চাশ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ আদায় করে। সে সঙ্গে সিন্ধু নদের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল পুরোপুরি তাদের করতলে নিয়ে নেয়। বুখারা ও খেওয়া বা খাওয়ারিজম (১৭৪০ খৃ.) অবরোধ করে। এটা ছিল তাদের দখলকৃত অঞ্চলসমূহের প্রশস্ততার শেষ সীমা। আর এখান থেকেই তার জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয়। তিনি নিঃসন্দেহে অনেক বড় কমান্ডার ছিলেন। কিন্তু তিনি না আসলে কৌশল জানতেন আর না তার মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কোন যোগ্যতা ছিল। শী'আ মতবাদকে ধ্বংস করার জন্য তার সকল প্রচেষ্টার পরিণামে দেশের মধ্যে অস্থিরতা আরও বাড়তে লাগল। আর তিনি তা দমনের জন্য জোর-জুলুম ও শোষণমূলক কাজে অভ্যস্ত হতে থাকেন। পরিশেষে তিনি তার উচ্চাভিলাসী ট্যাক্স ও শোষণমূলক করের মাধ্যমে দেশকে ধ্বংস করে ছাড়েন। ১৭৪৭ খৃস্টাব্দে নাদের শাহ স্বগোত্রীয় জনৈক ব্যক্তির হাতে নিহত হন।

নাদের শাহের মৃত্যুর পর ইরান

নাদের শাহের মৃত্যুর পর ইরানে ব্যাপক অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে। চোর-ডাকাতের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। তার সেনা কমান্ডারের প্রত্যেকেই নিজ নিজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকে। তার মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয় তার ভ্রাতুস্পুত্র আলীকালী আদেল শাহ (১৭৪৭-১৭৪৮ খৃ.)। সে তার বংশধরদের হত্যা করে ফেলে। কেবল যুবরাজ শাহরুখ বেঁচে থাকেন। যার বয়স ছিল তখন চৌদ্দ বছর। আদেল শাহ এক বছরের মধ্যে আপন ভাই ইবরাহীমের হাতে অপসারিত হন। অনন্তর তাকে অন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু ইবরাহীমের সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। সামরিক অফিসারগণ তাকে পরাজিত করে প্রথমে তাকে বন্দি ও পরে হত্যা করে ফেলে। পরে আদেল শাহকেও হত্যা করা হয়। অনন্তর যানদ বংশ ইরানে জয়লাভ করে। আর করীম খান যানদ (১১৬৪-১১৯৩ হিজরী মোতাবেক ১৭৫০-১৭৭৯ খৃ.) উনিশ বছর পর্যন্ত ইরান শাসন করেন। তিনি শীরাজকে তার রাজধানী বানান। তিনি ছিলেন ইনসাফ, উদারতা ও মহানুভবতার গুণের অধিকারী। তিনি ইরানকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহের পর শান্তি ও স্থিতিশীলতার সুযোগ করে দেন। কাজেই তার মৃত্যুতে অনেক শোক প্রকাশ করা হয়। কয়েকজন দুর্বল স্থলাভিষিক্তের পরে লুতফ আলীর যুগে যানদ বংশের পুরোপুরি পতন হয়ে যায়। লুতফ আলী ১২০৯ হিজরী মোতাবেক ১৭৯৪

খৃস্টাব্দে নিহত হন। আর ইরানের সিংহাসন কাচার বংশের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। যেহেতু এ যুগ শাহ সাহেব (র) এর ইন্তিকালের পরের যুগ, তাই আমরা এর থেকেও বিমুখ হতে পারি না।

আফগানিস্তান ও আহমদ শাহ আবদালী

খৃস্ট আঠারো শতক থেকে বৃহত্তর আফগানিস্তানের একাংশ ইরানের অধীনে ছিল। অপর অংশ ভারতের দখলে আর তৃতীয় এক অংশে বুখারার (খান) কর্তারা শাসক ছিল। ১৭০৬ খৃস্টাব্দে কান্দাহার স্বাধীন হয়ে যায়। ১৭৩৭ খৃস্টাব্দে নাদের শাহ আফগানীদেরকে কান্দাহারের শাসন থেকে মুক্ত করে এবং আফগানিস্তান ও পশ্চিম ভারত দখল করে নেয়।

সে সময় আহমদ খান নামে জনৈক ব্যক্তিকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে তার কাছে নিয়ে আসা হয়। নাদের শাহ তার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন এবং তাকে নিজের ব্যক্তিগত সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন। আহমদ খান উত্তরোত্তর উন্নতি করতে থাকেন। দিনে দিনে বাদশার আরও বেশি বিশ্বস্ত হয়ে উঠেন। নাদের শাহ নিহত হওয়ার পর তিনি আফগানিস্তানের প্রদেশগুলোর শাসনক্ষমতা ধরে রাখেন। তিনি ছিলেন আবদালী বংশের দুররানী (সাদুযিঈ) শাখা গোত্রের লোক। তিনি দূররে দাওরা (যুগের মুক্ত) উপাধি ধারণ করেন আর উক্ত সম্পর্কের কারণেই তার বংশকে 'দুররানী' বলা হয়।

আহমদ শাহ দুররানী বংশের শাসন ও দুররানী রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। তার মৃত্যুর পর আফগান রাজত্ব ছিল পূর্ব ইরান (মাশহাদ), গোটা আফগানিস্তান, পূর্ণ বেলুচিস্তান এবং পূর্ব দিকে কাশ্মীর ও পাঞ্জাব নিয়ে গঠিত। তাকে মূলতঃ আঠার শতকের মধ্যভাগের বিশাল রাজত্বের স্থপতি, অভিজ্ঞ লৌহমানব ও উচ্চ সাহসী সমরনায়ক, আল্লাহভীরু ও সৎ-ন্যায়পরায়ণ, নির্ভীক উদারপ্রাণ শাসকদের মধ্যে বিবেচনাযোগ্য আর সামগ্রিকভাবে (অবস্থা-পরিবেশ, প্রাথমিক জীবন ও সহায়-সম্বলহীনতাকে সামনে রেখে) ধীমান (GENIUS) আদর্শপুরুষদের মধ্যে অন্তর্ভুক্তির দাবীদার। ১৭৪৭-১৭৬৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সুলতান মাহমূদ গযনবী (র)-এর মত ভারতবর্ষকে তার তুর্কি অশ্বের মাঠ বানিয়ে রেখেছেন। তার কৌশল, সামরিক অভিজ্ঞতা, ধার্মিকতা, জ্ঞান-পিপাসা ও আত্মিক পবিত্রতার কথা তার একাধিক প্রসিদ্ধ সমসাময়িকগণ স্বীকার করেছেন। যে আফগান অঞ্চল সে সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল, তাকে তিনি বহুকাল পর একটি সুদৃঢ় সুসংহত শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে বিশাল এক পরাশক্তি ক্ষমতাধর রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করে ফেলেন।

আহমদ শাহ্ আবদালীর পরে আফগানিস্তান

আহমদ শাহ আবদালী ১১৮৬ হিজরী মোতাবেক ২৩ অক্টোবর ১৭৭২ খৃস্টাব্দে কান্দাহারে মৃত্যুবরণ করেন। আফসোস হচ্ছে, আলমগীর আযমের মত তার উত্তরসূরীও দুর্বল-অযোগ্য ছিল। (অবশ্য এই মর্মন্তুদ ঘটনা প্রায় সব রাজত্বের মহান স্থপতি, সফল বিজয়ী ও শাসকবর্গের সাথে সংঘটিত হয়েছে।) যে তৈমুর শাহ তার স্থলবর্তী এবং এই নতুন ও বিশাল রাজত্বের উত্তরাধিকারী হল, তার নিজের প্রখ্যাত ও দৃঢ়চিত্ত পিতার সাথে কোনও সম্পর্ক ছিল না। বিশ বছর দুর্বলতার সাথে রাজত্ব করার পর যখন এই যৌবনভরা রাজত্বে পতনের আলামত ফুটে উঠেছিল, এমনই মুহূর্তে ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন। তদীয় পুত্র মাহমূদের রাজত্বকালেই রাজত্ব বারক যঈ বংশে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। তারা আফগানিস্তানের বিপ্লব (১৯৭৫ খৃ.) পর্যন্ত আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে।

মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা ও ধর্মীয় অবস্থা

মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ও শাসন ব্যবস্থা পর্যালোচনার পর এখন আমরা তার শিক্ষা ও ধর্মীয় অবস্থা পর্যালোচনা করছি, শাহ্ সাহেবের জীবন, তার কার্যক্রম, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আগ্রহ-উদ্যম এবং তার সংস্কার ও সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে যার গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

বারো শতকের মহামনীষী

মুসলমানদের শিক্ষা ও চিন্তাধারার ইতিহাস এবং তাদের রচনা ও গবেষণা কর্মের বিশাল ভাণ্ডার অধ্যয়ন করলে জানা যায়, তাদের শিক্ষা ও চিন্তাগত জীবন ও তৎপরতা তাদের রচনাবলি ও গবেষণাকর্ম রাজনৈতিক উত্থান, রাজত্বের উন্নতি ও বিজয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না। যেমনটি অধিকাংশ অমুসলিম জাতি ও রাষ্ট্রের ইতিহাসে দৃষ্টিগোচর হয়। তাদের রাজনৈতিক পতন, রাজত্বের বিপ্লব এবং অনিয়ম-বিশৃঙ্খলার সাথে তাদের শিক্ষাগত পতন ও মনীষী-বুদ্ধিজীবীদের অভাবে পড়তে হয়। রাজত্বের সাহস ও শক্তিবৃদ্ধি, নেতৃত্ব এবং জাতিগুলোর মধ্যে আত্মনির্ভরতা, উচ্চ মানসিকতার অভাব, সেই সাথে তাদের মেধা-চিন্তায় সুপ্ত শুষ্কতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগ্রহে শীতলতা এবং কর্মতৎপরতায় ভাটা পড়ে যায়।

মুসলমানদের অবস্থা এর থেকে ভিন্ন। বরাবরই তাদের রাজনৈতিক পতন এবং আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা-বিক্ষিপ্ততার মুহূর্তেও এমন সুযোগ্য ও স্বকীয়তার অধিকারী ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেছেন, যাদেরকে দেখে পতন ও অবনতির যুগে

জন্মগ্রহণকারী বলে মনে হয় না। সপ্তম শতকের শেষভাগে বাগদাদের পতন এবং তাতারীদের সেসব আক্রমণের পরে, যা পাশ্চাত্যের মুসলিম বিশ্বকে তছনছ করে দিয়েছিল; ধূলির ঝড় বয়ে গিয়েছিল সেসব রাষ্ট্রে, যেগুলো শত শত বছর ধরে ইলম ও জ্ঞানের কেন্দ্রস্থলরূপে সফল ভূমিকা রেখে আসছিল। অষ্টম শতকের প্রথমভাগে শায়খুল ইসলাম তাকিউদ্দীন ইবনে দাকীক আলা-ঈদ (মৃত্যু ৭০৪ হি.)-এর মত মুহাদ্দিস, আল্লামা আলাউদ্দীন আলবাজী (মৃত্যু ৭১৪ হি.)-এর মত বিদগ্ধ উসূলবিদ ও বাগ্মী তার্কিক, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (মৃত্যু ৭২৮ হি.)-এর মত ইমাম ও মুজতাহিদ, আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী (র) (মৃত্যু ৭৪৮ হি.)-এর মত মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক এবং আল্লামা আবু হাইয়ান নাহবী (র) (মৃত্যু ৭৪৫ হি.)-এর মত শাস্ত্রীয় পণ্ডিত আলেম-উলামার প্রদীপ্ত নক্ষত্ররাজি দেখা যায়। তার কারণ, দীন ও ধর্মীয় জ্ঞানে দক্ষতা সৃষ্টি করা এবং তার খেদমত ও প্রসারের কার্যক্রম-প্রেরণা এই উম্মতের ভেতরে সহজাতভাবে পাওয়া যায়। সরকারের নেতৃত্ব পৃষ্ঠপোষকতা ও মূল্যায়নে নয়। আর সে প্রেরণা ও স্পন্দন হচ্ছে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, নবীগণের প্রতিনিধিত্বের সম্মান রক্ষা ও দীন সংরক্ষণের দায়িত্বানুভূতি।

কাজেই এই যুগ যদিও সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার যুগ এবং বড় বড় প্রসিদ্ধ শাসনযন্ত্র এমনকি উসমানিয়া রাজত্বের পতনের আলামত দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল; বিভিন্ন রাষ্ট্র এমনকি ইসলামের কেন্দ্রস্থল হিজাযে পর্যন্ত ক্ষমতা ও নেতৃত্ব লাভের জন্য পরস্পর টানাপোড়েন ও লড়াই চলছিল; কিন্তু মিসর, সিরিয়া, ইরাক, হিজায, ইয়ামেন, ইরান ও ভারতবর্ষে সর্বত্রই পঠন-পাঠনে ব্যস্ত, ইলমপিপাসু-শিক্ষানুরাগী, রচনা ও লেখালেখিতে তৎপর আলেম-উলামা, বিভিন্ন তরীকার মাশায়িখগণ ছিলেন আত্মশুদ্ধি ও তাযকিয়ায়ে নফসে গভীর নিমগ্ন এবং আধ্যাত্মিক যোগ্যতা ও উন্নতিতে সুসজ্জিত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো এমন স্বকীয়তা সৃষ্টি করেছিলেন, তার নযীর নিকট অতীতেও দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

হাদীস শাস্ত্রের কথাই ধরুন। এক্ষেত্রে আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী আলকাবীর মত (মৃত্যু ১১৩৮ হি.)-এর মত মুহাদ্দিসকে পরিলক্ষিত হয়। যিনি দীর্ঘকাল হেরেম শরীফে বসে হাদীসের দরস দিয়েছেন। সিহাহ সিত্তার উপর তার রচিত টীকা 'আল-হাওয়ামিশুস্ সিত্তাহ' নামে প্রসিদ্ধ। মাওলানা মুহাম্মদ হায়াত সিন্ধীও (মৃত্যু ১১৬৩ হি.) এ যুগের গৌরব। সিরিয়ায় শায়খ ইসমাঈল আল আজলূনী ওরফে আল জারাহী ছিলেন উঁচু মাপের মুহাদ্দিস। তার রচিত كشف الخفاء ومزيل الالباس، عما اشتهر من الاحاديث على

السنة গ্রন্থখানা অত্যন্ত উপকারী ও পূর্ণাঙ্গ একটি কিতাব, যা দুর্বল ও জাল হাদীসসমূহের সম্ভবতঃ সবচেয়ে বৃহৎ সংকলন। এই গ্রন্থের মাধ্যমে তার দৃষ্টির প্রশস্ততা ও ন্যায়-নিষ্ঠার অনুমান করা যায়। তাতে দুর্বল ও জাল হাদীসগুলো ছাড়া সেসব হাদীসও রয়েছে, যেগুলো সাধারণের মাঝে প্রসিদ্ধ। অথচ এগুলোর নির্ভরযোগ্য কোনও তাখরীজ (উদ্ধৃতি) পাওয়া যায় না।

হাদীস শাস্ত্রের বড় শিক্ষাকেন্দ্র ছিল হারামাইন শরীফাইন, যেখানে দরস দিতেন আবু তাহের কাওরানী আলকুর্দী ও শায়খ হাসান আল উজাইআ। ইয়ামেনে সুলাইমান ইবনে ইয়াহইয়া আল আহ্দল (মৃত্যু ১১৯৭ হি.) ইয়ামেন শহরের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস এবং সমকালের হাদীসের বিরাট খাদেম ও বিশারদ ছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইস্ফারায়েনী (মৃত্যু ১১৮৮ হি.) ছিলেন হাদীস ও উসূল শাস্ত্রের বিজ্ঞ আলেম এবং الدر المصنوعات فى الأحاديث الموضوعات এর রচয়িতা। ইয়ামেনে আমীর মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-হাসানী আস্-সন'আনী (মৃত্যু ১১৪২ হি.) ছিলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও গবেষক। যার প্রমাণ তার বুলূগুল মারামের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'সুবুলুস সালাম' এবং তানকীহুল আনযারের শরাহ 'তাওযীহুল আফকার'। এই শতাব্দীতেই আল্লামা মুহাম্মদ সাঈদ সুম্বুল (মৃত্যু ১১৭৫ হি.)-এর নামও দৃষ্টিগোচর হয়। যার রচিত 'আওয়ায়েলে কুতুবে হাদীস' -এর উপর হাদীস শাস্ত্রের শায়খ ও পণ্ডিতদের হাদীসের এজাযত বেশিরভাগ নির্ভরশীল। ঐতিহাসিকগণ আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আবুল বাকী আয্-যুরকানী (মৃত্যু ১১২২ হি.) কে মিসরের সর্বশেষ মুহাদ্দিস বলে অভিহিত করেছেন। ইলম ও জ্ঞানের গভীরতা, ব্যাপক শিক্ষাদান ও উপকারিতা এবং প্রচুর রচনা ও সংকলনের দিক থেকে শায়খ আবদুল গণী আন-নাবলূসী উস্তাদুল আযম নামে ভূষিত করা হয়। বর্ণিত আছে, তার রচনাবলির সংখ্যা দুইশত তেইশ। এ যুগেই জন্ম নিয়েছিলেন আল্লামা ইসমাইল হাক্কী (মৃত্যু ১১২৭ হি.), যিনি তাফসীরে কুরআনের উপর 'রূহুল বয়ান' -এর রচয়িতা, যা তাফসীরে হাক্কী নামেও প্রসিদ্ধ। বাগদাদের আলেমদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে হুসাইন আস্-সুদ্দী (মৃত্যু ১১৭৪ হি.) অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

জামি'আ আযহার মিসর, জামি'আ আয্-যাইতূনাহ তিউন্স এবং জামিআতুল কারবীন ফাস প্রভৃতি প্রাচীন মাদরাসাগুলো ছাড়াও দামেস্কের মাদরাসায়ে হাফেজিয়াহ, আল মাদরাসাতুশ শাল্লিয়াহ ও মাদরাসাতুল আযরাবিয়াহর নাম পাওয়া যায়। তরীকার মধ্যে নকশবন্দী, খিলওয়াতী, শাযলী, কাদেরী ও রিফাঈর আলোচনা বারবার উঠে আসে। এসব সিলসিলার মাশায়িখগণকে তুরস্ক থেকে নিয়ে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ছড়ানো ছিটানো দেখা যায়।

মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা-সাহিত্য ও আধ্যাত্মিকতা

এ যুগের শিক্ষিতমহলের বেশি আগ্রহ সাহিত্য, কাব্যচর্চা, শিক্ষা-সেমিনার এবং আক্রমণ ও আমোদ-প্রমোদের। এতেও বড় কোনও শ্রেষ্ঠত্ব ও অভিজাত্য মনে হয় না। ছন্দতাল ও অন্তমিলের প্রাচুর্য আর লৌকিকতা ব্যাপক। শিক্ষা ও সাহিত্য জগতে তুর্কি শাসনের প্রভাবও সুস্পষ্ট। বড় কোনও গবেষক ও দূরদর্শী লোক খুঁজেও পাওয়া যায় না। তবে মুরাদী বিরচিত 'সিলকুদ দুরার' -এর চার খণ্ড কবিতাগুচ্ছ, গজল, নানা পংক্তি ও ছন্দে ভরা। এতে আধ্যাত্মিকতা, সুধারণা, শ্রদ্ধা নিবেদন ও কারামাতের অনেক আলোচনা পাওয়া যায়। উসমানিয়া সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বাধীন দেশসমূহের আলেমগণ এবং বিদ্বান-পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ রাজধানী কনস্টান্টিনোপল গমন করেন। অধিষ্ঠিত হন বিভিন্ন সরকারী পদমর্যাদায়।

গবেষণাকর্ম, গণিত, জ্যামিতি, অলংকার শাস্ত্র, ফিকহ-হাদীসকে পাঠ্যসূচীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিবেচনা তাবীয ও চিত্রকর্ম ইত্যাদির প্রচলন ছিল ব্যাপক। কোনও কোনও আলেম ফিকহের মূল গ্রন্থনা কুদূরী ইত্যাদির কাব্য রচনাও করেছেন। একাধিক আরব পণ্ডিত শিক্ষাবিদ ফার্সী ও তুর্কি ভাষাজ্ঞানও রাখতেন। রাজত্বের ভাষা হওয়ার কারণে তুর্কি ভাষার সাথে (বিশেষতঃ সিরিয়ায়) মানুষের সম্পর্ক ছিল প্রচুর। তুর্কি আলেমদের বিরাট এক অংশ সিরিয়া বাস করতেন। তারা বিশুদ্ধ আরবী বলতেন। দামেশক উমাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে বসাকে অত্যন্ত গৌরবের বিষয় মনে করা হত। কিছু আলেম ও মাশায়িখ সেখানে 'ফুতুহাতে মাক্কিয়াহ' (মক্কা বিজয়সমূহ) আর কোনও কোনও শিক্ষক 'ফছূছুল হিকাম' পড়াতেন। শরহে জামী এবং মুখতাছারুল মা'আনী সিরিয়াতেও পড়ানো হত। তাসাওউফ ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি আগ্রহ-আনন্দ ছিল সাধারণ বিষয়। এমনকি উলামায়ে কিরাম এবং মুহাদ্দিসগণের মধ্যেও শায়খ আবদুল গণী নাবলূসীসহ একাধিক উলামা-মাশায়িখ 'ওয়াহ্‌দাতুল উজুদ' এর প্রবক্তা ছিলেন।

ইরানে যুক্তিবিদ্যার প্রাধান্য এবং সমমনা রাষ্ট্রগুলোর ওপর তার প্রভাব

হিজরী দশ শতকের শুরু ভাগেই ইসমাঈল ছফাবী (৯০৫-৯৩০ হি.) ইরানে ছফাবী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে তিনি শী'আ মতবাদকে রাষ্ট্রধর্ম বানান আর সুন্নী মতাদর্শকে ইরান থেকে প্রায় নির্বাসিত করেন। যে ইরান ইমাম মুসলিম (র), ইমাম আবু দাউদ (র), ইমাম নাসাঈ (র) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (র)-এর মত জগদ্বিখ্যাত শাস্ত্রীয় ইমাম এবং হাদীসের প্রাসাদের চার স্তম্ভ, অপরদিকে উচ্চস্তরের ফকীহ ও জ্ঞানসমুদ্র বিদগ্ধ আলেম আল্লামা আবু ইসহাক সীরাজী, ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী আবদুল

মালেক এবং হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল-গাযালী (র)-এর মত যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব জন্ম দিয়েছে, প্রায় সোয়া দু'শত বছর শোষণ-তোষণের রাজত্বে হাদীস, ফিকাহ ও উপকারী-ফলপ্রসূ জ্ঞান-বিদ্যা থেকে সেই ইরানের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। ইরান সম্রাটদের বেশি আকর্ষণ ছিল দর্শন শাস্ত্রের প্রতি। কাজেই শী'আ মতবাদের শুরু থেকেই মুতাযেলী মতাদর্শ, যুক্তিবিদ্যা, বৈষয়িক জ্ঞান ও দর্শনের সাথে সম্পর্ক ছিল। 'শরহে ইশারাতে ইবনে সীনা বা 'ইবনে সীনার সূত্রাবলির ব্যাখ্যা' -এর রচয়িতা প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও গণিতবিদ খাজা নাসীরুদ্দীন তূসী (মৃত্যু ৬৭২ হি.) স্বয়ং শী'আ ও মুতাযিলী ছিলেন এবং হালাকু খানের বিশেষ উপদেষ্টা ও ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এই রাজকীয় ঘনিষ্ঠতা ও বিশ্বস্ততার কারণে গোটা তাতারী রাজত্বে (যাতে তুর্কিস্তান, ইরান, ইরাক অন্তর্ভুক্ত ছিল) দর্শন, গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রাধান্য বিস্তার করে। ছফাবী শাসনের দ্বিতীয় শাসক তোহমাসফ (মৃত্যু ৯৮৪ হি.) এর আমলেই মীর গিয়াসুদ্দীন মানসূর (মৃত্যু ৯৮৪ হি.)-এর ভাগ্যরবি চমকাতে থাকে, যিনি ছিলেন একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও দার্শনিক এবং শীরাজের মাদরাসায়ে মানসূরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা, শাহ তোহমাসফ ছফাবীর যুগে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সভাপতিত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। ভারতবর্ষ পর্যন্ত তার ছাত্র-শিষ্য এবং শিষ্যের শিষ্য ছড়িয়ে পড়েছে। তারই শিষ্য আমীর ফাতহুল্লাহ শীরাজী (মৃত্যু ৯৯৭ হি.) দশম শতকের শেষ দিকে ভারতবর্ষে আগমন করেন। আকবর তাকে সভাপতির পদমর্যাদা দেন। তিনি ভারতের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষয়িক জ্ঞানের এমন ছাপ লগিয়ে দেন, যা তের হিজরী শতক পর্যন্ত বহাল থাকে। মাওলানা আযাদ বলগারামীর বর্ণনামতে ছদরুদ্দীন শীরাজী, মীর গিয়াসুদ্দীন মানসূর ও ফাযেল মির্জা জান (মৃত্যু ৯৪৪ হি.) এর রচনাবলি তিনিই ভারতে নিয়ে আসেন এবং সেগুলো পাঠ্যভুক্ত করেন।

এগার হিজরী শতকের মধ্যভাগে মীর বাকের (মৃত্যু ১০৪১ হি.)-এর ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। যিনি ইরান থেকে নিয়ে ভারতবর্ষ পর্যন্ত জ্ঞান ও শিক্ষার আসরে নিজের বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, যৌক্তিকতা ও সাহিত্যের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করেন। শাহ আব্বাস ছফাবী (মৃত্যু ১০৩৭ হি.)-এর দরবারে তাকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত। তার রচিত 'উফুকুল মুবীন' গ্রন্থটিকে দরসী শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চমানের রচনা মনে করা হয়। তার পরবর্তীতেই আল্লামা ছদরুদ্দীন শীরাজী (মৃত্যু ১০৫০ হি.)-এর ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়, যিনি ছিলেন বিশিষ্ট গণিতবিদ ও স্বাধীনচেতা দার্শনিক। তার রচিত 'আল আসফারুল আরবিআহ' এবং 'শরহু হিদায়াতুল হিকমাহ' গ্রন্থ দু'টি জ্ঞানীমহল ও বিশ্বময় বিখ্যাত। ইরানের বংশগত যে আগ্রহ শত শত বছর থেকে এক প্রকার

'সরিষার পাহাড়' ও 'কথার দেবালয়' বানাতে অভ্যস্ত ছিল, তা এই যুক্তিবিদ্যাকে পুরোপুরি সাহায্য করে। শাব্দিক সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং কৃত্রিম ও কাল্পনিক বিষয়ের ভুলভ্রান্তি ইরানের পশ্চিম সীমান্ত থেকে নিয়ে ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়, যা ছাই ও খড়ের পাহাড় বানাবার শামিল। দশম শতকের অনারব থেকে বারো শতকের আরব পর্যন্ত শিক্ষা ও লেখালেখির ময়দানে আধিপত্য ছিল দর্শন শাস্ত্রের। সেসব লেখকের ভাষা বুঝা ও সেগুলোর টীকা-টিপ্পনী ব্যতিত যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ বরং আপন প্রতিভা ও মেধার পরিচয় দেওয়ার কোনও উপায় ছিল না। সেসবের উপকারিতা নিয়ে সামান্য প্রশ্নও নিজের মেধাহীনতা ও অজ্ঞতাকেই প্রমাণ করত।

ইরানের প্রভাব কুদরতিভাবে আফগানিস্তান এবং আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর হেরাতের উপর পড়ে। এ শহরের একজন আলেম ক্বারী মুহাম্মদ আসলাম হারবী কাবুলী (মৃত্যু ১০৬১ হি.) ছিলেন যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রে ইরানী শিক্ষকবৃন্দ ও শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের রাষ্ট্রদূত। তার পুত্র যাহেদ ওরফে ক্বারী মুহাম্মদ যাহেদ (মৃত্যু ১১০১ হি.) এই যোগ্যতায় আরও গুণীজন হয়ে ওঠে। তিনি তার জীবনের সিংহভাগ অতিবাহিত করেন ভারতবর্ষে। 'শরহে মাওয়াকিক', 'শরহে তাহযীব' ও 'রিসালায়ে কুতবিয়্যাহ' -এর উপর তার রচিত 'যাওয়াহেদে ছালাছাহ' নামে প্রসিদ্ধ তিনটি টীকা ভারতবর্ষের শিক্ষাঙ্গণে বিরাট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। দর্শন ও যুক্তিবিদ্যায় এই দক্ষতা সত্ত্বেও ফিকাহ, হাদীস এবং অন্যান্য ধর্মীয় শাস্ত্রে তাদের তেমন গভীরতা ছিল না। এমনকি শরহে বেকায়ার মত মধ্যস্তরের ফিকাহগ্রন্থ পঠনেও তাদের পুরোপুরি আত্মবিশ্বাস ছিল না। শাহ আবদুল আযীয (র)-এর মালফুযাতে (রচনাবলিতে) রয়েছে,

امیرے شرح وقایہ می خواند بے حضور جد بزرگوار سبق نمی فرمود

'জনৈক আমীর মীর যাহেদের নিকট শরহে বেকায়া পাঠ করতেন। (কিন্তু ফিকাহ শাস্ত্রে নিজের উপর আস্থা না থাকার কারণে) তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত সবক (পাঠ্য) পড়াতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মুহতারাম দাদা (শাহ আবদুর রহীম সাহেব, যিনি মা'কূলাতে স্বয়ং তার শিষ্য) না আসতেন।'

পক্ষান্তরে মা'কুলী (বৈষয়িক জ্ঞানে) এমন আগ্রহ ছিল যে, তিনি বলেন,

تقریر مرزا جان جان من است۔ ☆ وتقریر اخوند جان جان من است۔

'মীযা জানের লেকচার বা বক্তৃতা তো আমার প্রাণ,
আর ইখওয়ান্দের বক্তৃতা আমার প্রাণের প্রাণ।'

ইরানের এই প্রভাব কেবল আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষেই নয় বরং সিরিয়া-ইরাক পর্যন্ত গিয়ে পড়ে। সেখানেও মা'কূলাতের আলেমদেরকে ইজ্জত ও সম্মানের চোখে দেখা হত। এসব শাস্ত্রের বিরাট প্রভাব ছিল মেধা-মননে। এ জাতীয় বই-পুস্তক সহজেই পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত।

সাধারণ চারিত্রিক, সামাজিক ও আকীদাগত অবস্থা

ইলম ও জ্ঞানের ব্যস্ততা, বহু সংখ্যক সুযোগ্য ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন সিলসিলা ও তরীকার গ্রহণযোগ্যতা, হাদীসে নববীর সাথে সহানুভূতি, অনেক শাসকের ধার্মিকতা এবং সেসব প্রসিদ্ধ শাসনযন্ত্র থাকা সত্ত্বেও যার আকীদা-বিশ্বাস ছিল ইসলামের উপর আর ব্যবহারিক জীবনের অনেক ক্ষেত্রে, পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত আইন-কানুনে আস্থা ছিল শরীয়তের ওপর, সেখানে অনেক মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল। জনসাধারণ ছিল ইসলামপ্রিয়, ধর্মানুরাগী, আলেমদের মূল্যায়নকারী, মাশায়িখ ও বুযুর্গদের প্রতি আত্মবিশ্বাসী এবং দীনের স্তম্ভ ও অনিবার্য পালনীয় ফরযসমূহের উপর আমলকারী। তাদের মন-মানস ইসলামী মূল্যবোধ থেকেও খালি ছিল না।

মুসলিম বিশ্বে সাধারণতঃ উত্থান-পতন লক্ষ্য করা যেত। চরিত্র ও সমাজের বিপর্যয় এসেছিল। এতে ধ্বস নেমেছিল বেশ। অনারব-অমুসলিমদের অনেক প্রথা-প্রচলন, তাদের অভ্যাস ও রীতিনীতি মুসলমানদের মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল। শাসকদের মধ্যে নেতৃত্ব মোহ, আত্মম্ভরিতা এবং রাজত্বগুলোতে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়েছিল। আমীর ও ধনিক শ্রেণী ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের কুপ্রভাবে প্রভাবিত আর কোথাও কোথাও বিজাতিদের আদর্শ ও চিন্তাধারা গ্রহণ করে নিয়েছিল। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীতে অলসতা, উদাসীনতা, বেকারত্ব, সরকারী দরবারের সাথে ঘনিষ্ঠতা, উঠা-বসা ও খোশামোদের অভ্যাস প্রকট হয়ে গিয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে ছিল সন্দেহপ্রবণতার ক্ষীপ্র জোয়ার। সঠিক একত্ববাদের সীমাতিক্রম, আউলিয়ায়ে কিরামের স্তুতি ও সীমাতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন, কবর পূজা এবং কোথাও কোথাও জঘন্য শিরকের চিত্রও পরিলক্ষিত হত। আমেরিকান লেখক ডা. লুফারোপ স্টাডোর্ড তার জগদ্বিখ্যাত 'নিউ ওয়ার্ল্ড অফ ইসলাম (New World of Islam) বা আধুনিক মুসলিম বিশ্ব গ্রন্থে আঠারো খৃস্ট শতকের মুসলিম বিশ্বের চিত্র অঙ্কন করেছেন। যাতে কোথাও কোথাও অতিরঞ্জন ও অমিল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে গ্রন্থখানি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের একেবারে ভুল প্রতিচ্ছবি নয়। তাতে সে সময়কার এমন বহু চিত্র উঠে এসেছে, যা সেখানে অবস্থানরত ও সর্বক্ষণ প্রত্যক্ষকারীদেরও প্রায়ই

দৃষ্টিগোচর হয় না। আর নবাগত ও প্রথমবার প্রত্যক্ষকারীদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করে ফেলে। সে গ্রন্থের বিশুদ্ধতার পুরোপুরি দায়িত্ব গ্রহণ ব্যতিত এখানে তার উদ্ধৃতি টানাও স্থান অনুপযোগী হবে না। তিনি লিখেন, 'আঠারো শতকে মুসলিম বিশ্ব তার দুর্বলতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। সঠিক শক্তির প্রভাব কোথাও দৃষ্টিগোচর হত না। সর্বত্রই স্পষ্ট ছিল অধঃপতন ও স্থবিরতা। সভ্যতা-ভদ্রতা ও চরিত্র ছিল ঘৃণ্য, হতাশাজনক। আরব সভ্যতার শেষ প্রভাবটুকু হারিয়ে এক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী বন্য সভ্যতায় এবং জনসাধারণ পৈশাচিক লাঞ্ছনায় জীবন-যাপন করছিল। শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল মৃতবৎ। আর মুষ্টিমেয় যে ক'টি শিক্ষালয় এমন বিভীষিকাময় পতনেও টিকে ছিল, সেগুলো দীনতা ও নিঃস্বতার কারণে ছিল যায় যায় প্রাণ। রাজ্যসমূহ ছিল লাগামহীন। সেখানে সর্বত্রই ছিল অনিয়ম, দূর্নীতি ও খুন-খারাবীর রমরমা অবস্থা। স্থানে স্থানে বড় কোনও স্বাধীন যেমন তুর্কি শাসক কিংবা ভারতবর্ষের মোঘল সম্রাটগণ কিছু রাজকীয় আড়ম্বরতা তৈরী করেছিল। যদিও প্রাদেশিক শাসকবর্গ তাদের প্রভুদের মত জুলুম-শোষণ ও জোর-জবরদস্তির উপর নির্ভরশীল স্বাধীন রাজত্ব কায়েম করতে খুবই সচেষ্ট ছিল। অনুরূপভাবে আমীর-উমারাগণ (শাসকবর্গ) যথারীতি দাম্ভিক-অহংকারী, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও অরাজকতা সৃষ্টিকারী ডাকাতদলের বিরুদ্ধে ছিল মাথার উপর বর্ষার ফলা। এই বিভীষিকাময় ও বিপর্যস্ত শাসন ব্যবস্থায় প্রজা সাধারণ হত্যা-লুটতরাজ, জুলুম-শোষণে ছিল জর্জরিত। গ্রাম্য ও শহরবাসীদের মধ্যে মেহনত ও পরিশ্রমের চেতনা মুছে গিয়েছিল। কাজেই ব্যবসা ও কৃষি দুটিই এত হ্রাস পেয়েছিল যে, নিছক পেট বাঁচানোর জন্য যৎসামান্যই করা হত।

ধর্মও অন্যান্য বিষয়ের মত অধঃপতিত ছিল। তাসাওউফের শিশুসুলভ ধারণাগুলোর প্রাচুর্য খালেস ইসলামী তাওহীদকে ঢেকে দিয়েছিল। জনসাধারণ ও মূর্খ লোকজন তাবীজ-তুমার, চুড়ি-পৈতা পরিধান ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে নষ্ট-ভ্রষ্ট ফকীর-দরবেশ ও পাগলদের প্রতি বিশ্বাসী ছিল। বুযুর্গদের মাজার যিয়ারতে গমন করত। ধারণা ছিল, আল্লাহ তা'আলা এমনই বড় যে, তারা তার আনুগত্য ও ইবাদত ভায়া বা মাধ্যম ছাড়া করতে পারে না। কুরআনে কারীমের চারিত্রিক ও নৈতিক শিক্ষাকে কেবল পশ্চাতেই ফেলে রাখা হয়নি বরং এর বিরুদ্ধাচরণও করা হত। আফিম ও শরাব (মদ) পান ব্যাপক হয়ে গিয়েছিল। সর্বত্র চলছিল ব্যভিচারীদের দৌরাত্ম্য। নিকৃষ্টতর জঘন্য কাজকর্মও করা হত প্রকাশ্যে, নির্লজ্জভাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতবর্ষ

রাজনৈতিক অবস্থা

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর জন্ম হয় সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর (মৃত্যু ১১১৮ হি.)-এর মৃত্যুর চার বছর পূর্বে হিজরী ১১১৪ সালে। সম্রাট আলমগীর এই উপমহাদেশের আমাদের জানামতে এবং সংরক্ষিত ইতিহাসের আলোকে অশোকের পরে (যদি তার রাজত্বের প্রশস্ততা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হয়) ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় শাসক। তার রাজত্ব ভারতবর্ষের সকল সম্রাটের রাজত্ব অপেক্ষা সর্বাধিক বিস্তৃত ছিল। ক্যামব্রিজ হিস্ট্রোরী রচয়িতা লিখেন– 'তার শাসন গযনী থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং কাশ্মীর থেকে কিরনাটক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।'

অপর ঐতিহাসিক লিখেন, 'প্রাচীন যুগ থেকে ইংরেজ আমল পর্যন্ত ভারতবর্ষের এত দীর্ঘ ও বিস্তৃত শাসন কখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।'

তার যুগেই এবং তারই ইংগিতে মীর জুমলাহ শত শত বছর পরে প্রথমবার আসাম (ভাষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্ম-মত ও বংশে ভারতবর্ষ থেকে পৃথক একটি স্বাধীন ভূ-খন্ড) কে জয় করে মোঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। সকল পশ্চিমা ও অমুসলিম ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের সেসব সমালোচনা ও বিতর্কিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, যার উৎস-প্রেরণা মূলতঃ আওরঙ্গজেব আলমগীরের আত্মসম্ভ্রমবোধ ও ইসলামের সাহায্য-সহযোগিতা: তা সত্ত্বেও তাঁর অতুলনীয় ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ়চিত্ততা, ব্যবস্থাপনা যোগ্যতা, সাধাসিধে বরং দুনিয়াবিমুখ জীবন, বীরত্ব, সাহসিকতা একটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বাস্তবতা।

আওরঙ্গজেব আলমগীর

সম্রাট আওরঙ্গজেব রাজত্বের লাগাম হাতে নেওয়ার পর পূর্ণ মনোযোগিতার সাথে সম্রাট আকবর-যুগের ইসলামবিরোধী নিদর্শনগুলো নিশ্চিহ্ন করা, শী'আ মতবাদের প্রভাব হ্রাস করা (যার প্রাণকেন্দ্র ছিল দক্ষিণাত্য এবং যে কারণে তিনি তার জীবন ও শক্তির বিরাট অংশ দাক্ষিণাত্য অবরোধে ব্যয় করেছেন)। ইরানের সেসব অগ্নিপূজাসুলভ সাংস্কৃতিক প্রভাব, যা আকবরী যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যা ইরানী পঞ্জিকা ও নববর্ষ উৎসবরূপে পাওয়া যেত, সেসব বিষয় বিলুপ্ত

করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। হিসাবরক্ষক-পরিদর্শকের শরঈ পদ কায়েম করেন। যেন তারা সৃষ্টিজীবকে নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয়সমূহ থেকে বিরত রাখেন। তিনি সরকারের বহু শরীয়ত পরিপন্থী আয়ের উৎস বন্ধ করেন। গোটা রাজত্বে শরঈ আইন-কানুন জারি করতঃ বিচারকদের সহায়তার জন্য ফিকহী মাসায়েল সংকলন ও সুবিন্যস্তকরণের কষ্ট স্বীকার করেন। সুতরাং 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী' নামে একটি বিশাল সংকলন তৈরী হয়, যা মিসর-তুরস্কেও (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াহ নামে) ইসলামী আইনের একটি বিশাল ও নির্ভরযোগ্য উৎস মনে করা হয়। কুর্নিশ ও অভিবাদনের অনৈসলামিক ও একত্ববাদবিরোধী প্রথা বিলুপ্ত করেন। তদস্থলে ইসলামী অভিবাদন সালামের সুন্নত চালু করেন। সংক্ষেপে আল্লামা ইকবালের ভাষায়-

شعلۂ توحیدرا پروانہ بود۔ ☆ چو براہیم اندریں بت خانہ بود۔

'একত্ববাদের দ্বীপশিখা জ্বলছে লেলিহান
যখন ইবরাহীম ছিলেন মুর্তিঘরে।'

এসব সংস্কার ও বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড ব্যতিত তিনি যেসব ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তন্মধ্যে সবচেয়ে দ্বীপ্তিমান গুণ হচ্ছে, তার সচেতনতা, দৃঢ়চিত্ততা, কর্তব্যপরায়ণতা এবং রাজত্বের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও আইন-শৃঙ্খলার উপর পুরোপুরি চলার প্রচেষ্টা, যা এই আল্লাহ প্রদত্ত বিশাল রাজত্বের অধিপতির জন্য প্রথম শর্ত। তিনি আপন পিতা সম্রাট শাহজাহানকে এক পত্রে লিখেছিলেন আর ইতিহাসও এর সাক্ষী; তিনি লিখেন, 'আমার বিরুদ্ধে আলস্য, আরামপ্রিয়তা ও বিলাসিতার অভিযোগ উঠতে পারে না।' জনৈক আমীর একবার তাকে পরামর্শ দিয়েছিল, জাহাপনা! রাজ্যের কাজে অতিরিক্ত কষ্ট স্বীকার করবেন না। এতে স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। শরীর খারাপ করতে পারে। তার জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে আল্লাহ তা'আলা অন্যের তরে পরিশ্রম করার জন্যই প্রেরণ করেছেন।' সাথে শায়খ সাদী (র)-এর নিম্নোক্ত ছন্দ আবৃত্তি করেন,

الا تا بغفلت نہ خسپی کہ نوم۔ ☆ حرام است بر چشم سالار قوم۔

রাজত্বের এই প্রশস্ততা সত্ত্বেও এর আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে স্বয়ং অবগত ও পেরেশান হওয়া এমন ব্যক্তিত্বেরই কাজ, যিনি দৃঢ় সংকল্প, ইস্পাতকঠিন দেহ-সৌষ্ঠব, সীমাহীন দায়িত্ব জ্ঞান ও আল্লাহভীতির অধিকারী। বিস্ময়ের ব্যাপার হল রাষ্ট্রীয় মৌলিক বিষয় ও রাজত্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনাদির প্রতি তার দৃষ্টি

যতখানি নিবদ্ধ ছিল, ততখানিই ছিল ছোট-খাট বিষয়েও। তিনি দক্ষিণে থাকতেন, কিন্তু উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল সব দিকেরই খবর রাখতেন। নিজের ব্যক্তিগত তত্ত্বানুসন্ধান ও রিপোর্টারদের সাহায্যে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ যাচাই করতেন। যার ফলে রাষ্ট্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ যেখানেই অবস্থান করত, সচেতন ও তৎপর থাকত। তিনি ছোট ছোট লিখিত প্রতিবেদন স্বয়ং পাঠ করতেন। তার স্বরচিত নিম্নোক্ত ছন্দই তার মনের আকুতিগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা। তার দায়িত্ববোধ ও এর পরিণামে তার বিভিন্ন কষ্ট-যাতনার বাস্তব চিত্র। তিনি প্রায়ই স্বরচিত নিম্নোক্ত পংক্তিটি আবৃত্তি করতেন।

غم عالم فراواں است ومن یک غنچہ دل رارم۔
چساں در شیشہ ساعت کنم ریگ بہاماں را؟

কখনও কখনও আবৃত্তি করতেন নিম্নোক্ত কবিতা। এর উপর তার আমলও ছিল।

من نمی گویم زیاں کن یا بفکر سود باش۔
اے زفرصت بے خبر در ہر چہ باشی زود باش۔

আওরঙ্গজেবের দুর্বল স্থলাভিষিক্ত

কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেবের পর এই বিশাল বিস্তৃত ও গৌরবময় সিংহাসনে (যা দীন বিনাশকারী হওয়ার পরিবর্তে দীনের সাহায্যকারী এবং জাতি ধ্বংসকারী হওয়ার পরিবর্তে জাতির সেবক হয়ে গিয়েছিল) তার বংশধরদের মধ্যে এমন লোক আসে, –মনে হয় যেন তারা শপথ করেছিল, সম্রাট আলমগীরের দ্বারা ইসলামের সাহায্য, রক্ষণাবেক্ষণ, দীনের পুনর্জীবন দান ও সুন্নত চালুর যে 'ভুল' (!) হয়েছিল, তারা এর ক্ষতিপূরণ করবেন। সেই সাথে আলমগীর আযম এই রাজত্বের সীমানায় যে প্রশস্ততা এনেছিলেন, ভারতবর্ষের আইন-শৃঙ্খলাকে নিজের বিচক্ষণতা, সচেতনতা, দৃঢ়চিত্ততা, দক্ষতা ও কর্তব্যপরায়ণতার মাধ্যমে যে স্থিতিশীলতা ও দৃঢ়তা এনে দিয়েছিলেন, জনসাধারণ ও দাঙ্গাবাজ-কুচক্রীদের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তা নিজেদের বিলাসপ্রিয়তা, আলস্য-উদাসীনতা ও অযোগ্যতা, গৃহবিবাদ, আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও টানাপোড়েন, স্বার্থপর ও ক্ষমতালিপ্সু রাজন্যবর্গ ও মন্ত্রীদের উপর পূর্ণ আস্থা এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়ে উদাসীনতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে সেই পাপের (!) কাফফারা আদায় করতে থাকবেন। সুতরাং এই মোঘল সাম্রাজ্যই নয়, মুসলিম উম্মাহই নয় বরং গোটা ভারতবর্ষের

দুর্ভাগ্যক্রমে তার সিংহাসনে একের পর এক দুর্বল ও অযোগ্য শাসক সমাসীন হতে থাকে। ইতিহাসের চরম বিস্ময় এবং আল্লাহ পাকের অমুখাপেক্ষিতা ও বড়ত্বের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা গেল, তার প্রথম উত্তরাধিকারী প্রথম শাহ আলম বাহাদুর শাহ ছিল নিজের স্বনামধন্য পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর যুগে (১১১৪-১১৭৬ হি.) আওরঙ্গজেবের পরে পর্যায়ক্রমে এগারজন মোঘল সম্রাট সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

(১) মুহাম্মদ মু'আযযম বাহাদুর শাহ ওরফে শাহ আলম বাহাদুর শাহ প্রথম, (২) মুইযযুদ্দীন জাহাঁদার শাহ, (৩) ফুররাখ সিয়ার ইবনে আযীমুশ্‌শান (৪) নেকুসিয়ার, (৫) রফীউদ্দারাজাত ইবনে রফীউল কাদর, (৬) রফীউদ্দৌলাহ ইবনে রফীউল কাদর, (৭) মুহাম্মদ শাহ ইবনে জাহান শাহ, (৮) আহমদ শাহ ইবনে মুহাম্মদ শাহ, (৯) আযীযুদ্দীন আলমগীর ইবনে জাহাঁদার শাহ, (১০) মহিউস সুন্নাহ ইবনে কামবখশ ইবনে আলমগীর, (১১) শাহ আলম ইবনে আযীযুদ্দীন।

অর্ধশতকের অন্তবর্তী সময়ে এগারজন সম্রাট সিংহাসনে সমাসীন হয়েছেন। তন্মধ্যে কারও কারও শাসনকাল মাত্র দশ মাস, কারও চার মাস অপেক্ষাও কম, কারও রাজত্ব ছিল নামমাত্র, আবার কারও মাত্র কয়েক দিনের। আমরা এখানে তার প্রথম উত্তরাধিকারী শাহ আলম বাহাদুর শাহ, ফুররাখ সিয়ার ইবনে আযীমুশশান, মুহাম্মাদ শাহ ও শাহ আলমের শাসনামল এবং সেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ও ট্রাজেডি সম্পর্কে পর্যালোচনা করব, যেগুলো ভারতবর্ষের ইতিহাস ও মুসলমানদের ভাগ্য গঠনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

প্রথম শাহ আলম বাহাদুর শাহ

তিনি ছিলেন বাদশা আলমগীরের বড় ছেলে, যে অপর সন্তান মুহাম্মদ আযম শাহকে পরাজিত করে সিংহাসনে আরোহন করেন। আলমগীরের মানসিকতা ও মতাদর্শের সাথে তার বিরোধের সবচেয়ে বড় ও প্রথম প্রমাণ হচ্ছে, তিনি শী'আ মতাদর্শ গ্রহণ করেন, যা শুধু আলমগীরের আকীদা-বিশ্বাস, মানসিকতা ও চেতনার পরিপন্থীই ছিল না বরং পুরো তৈমুরী ধারার রাষ্ট্রপরিচালকদের আকীদা-বিশাস, ধর্ম-পথ ও মতাদর্শের পরিপন্থী ছিল, এই সাম্রাজ্যের কল্যাণ এবং স্বার্থগুলোর বিপরীত ছিল। (যেখানে মুসলিম জনবসতির শতকরা নব্বই-পচানব্বই জন লোক ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্ত বাংলা মুলুক থেকে নিয়ে রাজত্বের পশ্চিম সীমানা কাবুল-কান্দাহার পর্যন্ত সুন্নী মতাদর্শ ও হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিল) ভারতবর্ষে যার সাফল্য ও গ্রহণযোগ্যতার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না।

সিয়ারুল মুতাআখ্‌খিরীন (পরবর্তীদের আদর্শ) গ্রন্থ প্রণেতা গোলাম হুসাইন তবাতবাঈর বর্ণনা মতে (যিনি স্বয়ং ইছনা আশারী মতবাদের বিশ্বাসী ছিলেন এবং যার শী'আ হওয়ার কথা ঐতিহাসিক আলামত দ্বারা প্রমাণিত) বাহাদুর শাহের শী'আ মতাদর্শ গ্রহণ, এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলিমদের সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া, ভাষণ-বক্তৃতায় علی ولی الله وصی رسول الله (আলী আল্লাহর ওয়ালী, রাসূলুল্লাহ প্রতিনিধি) বাক্য সংযোজনের নির্দেশ দানের ফলে বাদশার আবাসভূমি লাহোরে হৈ চৈ পড়ে যায়। বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। উক্ত লেখক স্বয়ং তার প্রথা গ্রহণ না করার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেন, 'সম্রাট এ ব্যাপারে বরাবরই বাড়াবাড়ি করতে থাকেন। শী'আ মতবাদের প্রসার ও শক্তি বৃদ্ধিতে সদা সচেষ্ট ও তৎপর থাকেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আলেমদের সাথে বিতর্কের দ্বার খুলে রাখেন। কিন্তু এতে কোনও লাভ হয়নি।'

এই পরিবর্তনের পরিণাম জনসাধারণ ও সামরিক বাহিনীর মাঝে ভগ্ন হৃদয়, মন কষাকষি বরং কুধারণারূপে প্রকাশ পায়। তাদের মধ্যে সেই ধর্মীয় চেতনা বাকি থাকেনি, যা ছিল বিগত মোগল সম্রাটদের যুগে এক বিরাট শক্তিশালী প্রেরণা। এই বাস্তবতাকে কতিপয় অমুসলিম ঐতিহাসিকও উপলব্ধি করেছেন। ডা. সতীশ চন্দ্র লিখেন, 'রাজত্বের নিয়ম-শৃঙ্খলায় ধর্মের প্রভাব হ্রাস পেয়ে যায়।'

মাওলানা যাকাউল্লাহ সাহেব ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখেন, 'আলমগীরের মৃত্যুর পর রাজত্বের কর্মকাণ্ডে বিরাট ধরনের পরিবর্তন সৃষ্টি সূচিত হয়ে গিয়েছিল। বদলে গিয়েছিল সকল সম্পর্কের চিত্র। মারাঠীদের সাথে তৈমুরিয়া রাজত্বের যে সম্পর্ক ছিল, সম্পূর্ণরূপে তা পাল্টে হয়ে গিয়েছিল। মোঘল সাম্রাজ্য দুর্বল হতে হতে মুমূর্ষপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুশয্যায়ও নিজের দম্ভ-অহংকার ও জাঁকজমক থেকে হস্ত সংকোচন করেননি।'

সেই আলমগীর যিনি আওরঙ্গবাদে থাকলে দিল্লী তো ভাল, বিহার এবং বাংলা মুলুকেও সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর তার প্রভাব বিরাজ করত। তিনি রাজত্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার সম্পর্কেও সজাগ থাকতেন এবং যথাসময় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও যথাযোগ্য নির্দেশ জারি করতে এতটুকু কালবিলম্ব করতেন না। আর তার উত্তরাধিকারীর একি দূরাবস্থা! ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক লিখেন, 'আইনত ও বেআইনীভাবে কার্যক্রম চালুর ব্যাপারে তৎক্ষণাৎ মতানৈক্য হয়। বাদশার দস্তখতের কোনও মূল্য নেই। বাদশা তার সেক্রেটারীকে বলেন, সকল কর্মচারী পরস্পর ঐকমত্য হয়ে গেছে। যা ভাল মনে করে তাই করে। আমাদের কেবল প্রতিমূর্তি আছে। প্রজাসাধারণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ বা স্বার্থরক্ষা ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর নেই।'

তিনি আরও লিখেন, 'কৌতুক সম্রাট লোফার চরিত্র তার ইতিহাস 'উদাসীন সম্রাট' এর আকর বলেছেন। রাত্রিবেলায় জাগ্রত থাকে। দিনের বেলা দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটায়, যার কারণে সফরের দিন সৃষ্টিজীবের কষ্ট হয়। তারা আপন তাবুসমূহের দৃষ্টান্ত খুঁজে পায় না।' তৃতীয়তঃ সে নিজের আইন পরিপন্থী আলেমদের উপর ভর্ৎসনা ও অপবাদের কালিমা লেপন করেছে। স্থানে স্থানে তাদের বন্দি করেছে। অধিকন্তু মন-মানসে হিংস্রতা ও পাগলামী এতটাই প্রবল হয়েছে যে, রাজধানী লাহোরে ৯ মুহররম ১১২৪ হিজরীতে এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে।'

তবাতবাঈও উল্লেখ করেছেন– শাহ আলম বাহাদুর শাহের শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃতি, কুকুরকে মেরে ফেলার নির্দেশ জারি এবং যাদুর ভয় ছিল।

এভাবে আলমগীরের প্রথম উত্তরাধিকারীর যুগেই এবং মাত্র ছয় বছরের রাজত্বকালেই বিশাল মোঘল সাম্রাজ্যের প্রাসাদ হেলে পড়ে। তার সেই বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব বিলীন হয়ে যায়, যা বিরোধী শক্তিসমূহ, কুচক্রীমহল এবং বিশেষ অবিশেষ সর্বশ্রেণীর মানুষের মন-মানসে সম্রাট বাবরের যুগ থেকে বদ্ধমূল হয়েছিল।

ফুররাখ সিয়ার

ফুররাখ সিয়ার (১১২৫-১১৩১ হি.)-এর যুগে হুসাইন আলী খান, আবদুল্লাহ খান (তন্মধ্যে প্রথমজনকে আমীরুল উমারা আর দ্বিতীয়জনকে কুতুবুল মালিক উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল)-এর কর্তৃত্ব স্বয়ং সম্রাট এবং সমগ্র রাজত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ফুররাখ সিয়ার তাদের হাতের খেলনায় পরিণত হয়েছিল। অবশেষে তারা ফুররাখ সিয়ারকে বন্দি করে। অনন্তর তাকে জীবনের বন্দিত্ব থেকেও মুক্ত করে দেয়। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' রচয়িতা লিখেন, মুহাম্মাদ সিয়ার যদিও বিশাল চরিত্র, প্রশস্ত মন ও মূল্যায়নকারী ছিলেন, প্রত্যেকের সেবা ও সংশয়ের জবাবে চাইতেন যথাসম্ভব পদমর্যাদা ও উত্তম সেবা প্রদান করে সমপর্যায়ের লোকদের সম্মান করতে। কিন্তু সে ক্ষমতা তার ছিল না। আর না তিনি বিচক্ষণ যুবক ছিলেন। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে উদাসীন, শৈশবকাল থেকে বাংলা মুলুকে বাপ-দাদা থেকে দূরে বেড়ে উঠেছেন। দৃঢ়চিত্ততা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যও ছিলেন না; অন্যের মতামতের উপর চলতেন। সৌভাগ্যক্রমে রাজমুকুট ও রাজত্ব পেয়েছিলেন বটে। কিন্তু তৈমুর বংশে যে বীরত্বের রত্ন ছিল, তিনি তার বিপরীত সহজাত কাপুরুষতায় হীনমন্য ছিলেন। স্বার্থপর লোকের কথার গভীরে পৌঁছতে পারতেন না। প্রথম থেকেই আপন রাজত্বের পতন ও বিপর্যয়ের উৎস নিজেই হয়ে গিয়েছিলেন।'

বাদশার দরবারে রাজা রতন সিংহ (দেওয়ানে সাইয়িদ আবদুল্লাহ খান) সকল কর্মচারীর কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করত। কারও মৌলিক অধিকার ও সম্মান সে বাকী রাখেনি। বিশেষতঃ ধন-সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলাগুলোতে বাদশার বিলাসিতা, নির্জনাবাস ছাড়াও বোকামী, নিবুর্দ্ধিতা বেড়ে গিয়েছিল অনেক। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আল্লাহর সৃষ্টিজীবের সেবামূলক কাজ।

অবশেষে দুই ভাই (কুতবুল মালিক ও আমীরুল উমারা) মিলে ফুররাখ সিয়ারের চোখে শলাকা ঢুকিয়ে দেয় এবং দুর্গের ভেতর কবর আকৃতির জেলখানায় বাদশাকে বন্দি করে। ছয় বছর চার মাস শাসন করে তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। এসব ঘটনা গোটা সাম্রাজ্যের মোঘল সিংহাসনের উত্তরাধিকারীদের অপমান-লাঞ্ছনা এবং রাজত্বের মূল্যহীনতা উপমা সৃষ্টি করে।

মুহাম্মদ শাহ বাদশা

মুহাম্মদ শাহ উনত্রিশ বছর ছয় মাস রাজত্ব করেন। তার শাসনামল নানা ঘটনাবলি ও ট্রাজেডিতে ভরা। তার শাসনামলেই নাদের শাহ কর্তৃক দিল্লীর উপর ঐতিহাসিক আক্রমণ হয়। কিন্তু সে সময় রাজত্বের উপর প্রভাবশালী ও তার ভালমন্দের মালিক ছিলেন এই দুই সাইয়িদ বংশধর কুতবুল মালিক আবদুল্লাহ খান এবং আমীরুল উমারা হুসাইন। সে সময় দরবারী লোকদের প্রভাব এতই খর্ব হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের দু'জনের চাপের কারণে বাদশা জুম'আর নামায ব্যতিত কোনও বিধান বা নির্দেশ জারী করতে সক্ষম ছিলেন না। এ দুই ভাই ইরান-তুরানের সকল বংশের বেইজ্জতি ও সম্মানহানীতে কোমর বেঁধে নামে। পদত্যাগ ও নির্জনাবাসেও মুক্তি নেই। সকল উত্তরাধিকারী বংশধর এবং কাছের ও দূরের নিবেদিতপ্রাণ নওকরদের মন এই ভেবে অত্যন্ত বিচলিত হচ্ছিল যে, সিংহাসন ও মুকুটের উত্তরাধিকারীগণ আজ অসহায়-পরাধীন। তারা জুম'আর নামায ও শরঈ আহকাম বাস্তবায়নে সক্ষম নন। আগ্রার নিকট থেকে শূর নদীর উপকূল পর্যন্ত হিন্দুরা মন্দির তৈরী করছে। গো হত্যাকে নিষেধ করছে।'

অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়ে রতন চান্দের স্বেচ্ছাচারিতায় –যে সাইয়িদ বংশধর ও কৃষক-ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ব্যতিত কারও প্রতি দয়া করত না, ছোটবড় সকলেই বিতৃষ্ণ ছিল। প্রত্যেক অঞ্চলের অভিজাত সম্ভ্রান্তরা লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় কালাতিপাত করত।

সিয়ারুল মুতাআখখিরিন রচয়িতা তবাতবাঈ লিখেন, 'বাদশা যেহেতু হীনমন্য কাপুরুষ একজন যুবক ছিলেন, ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে কেবল সে কাজেই মনোযোগ দিতেন, যা একান্ত আবশ্যক হত। এ কারণে একটু একটু

করে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আমীর-উমারা ও নেতৃবৃন্দ এবং জনসাধারণের মন-মানস থেকে তার ভয়-ভীতি উঠে যায়। প্রত্যেকেই তার মন-মস্তিষ্কে একটি দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে স্বস্থানে বসে। তারা নিজের স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের শ্বাস গ্রহণ করত।'

সে সময় দরবার ও রাজন্যবর্গের মধ্যে নিযামুল মুলক আসিফ জাহেরই এমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি দৃঢ়চিত্ত ও উচ্চ সাহসী হওয়ার সাথে সাথে ক্ষমতাসীন বাদশার বাধ্যগত, কৃতজ্ঞ, একনিষ্ঠ ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। কিন্তু সাইয়িদ ও ইরানী শক্তি কিছুতেই তার কথা ও নির্দেশ বাস্তবায়িত হতে দিত না। তিনি যখন দেখলেন, তার কৃতজ্ঞতা ও একনিষ্ঠতার কোনও মূল্য নেই। এখানে থাকা মানে সময় নষ্ট করা এবং সর্বদা নিজেকে বিপদাক্রান্ত রাখার নামান্তর, তখন তিনি দক্ষিণাত্যের পথ ধরেন। ফলে দিল্লীর মাঠ স্বার্থপরদের জন্য খালি হয়ে যায়।

এরপর মুহাম্মদ শাহের উপর বিলাসিতা এতই প্রাধান্য পায় যে, তিনি তার পূর্ববর্তী বিলাসপ্রিয়দেরকে ডিঙিয়ে যান এবং তাদের ঘটনাবলিকেও ম্লান করে দেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস রচয়িতাগণ লিখেন,

'সম্রাট মুহাম্মাদ শাহ ধর্ম তো পরিবর্তন করেননি, কিন্তু পানি পানের স্থান বা মতাদর্শ বদলে ফেলেন। কালো মেঘ তার ঘোষক সাব্যস্ত হয়। সাধারণ নির্দেশ ছিল, এদিকে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে সুর উঠবে। মেঘ গর্জন করবে, আমার তাবু মরুপ্রান্তরে রওনা হবে।'

অবশেষে সাইয়িদ বংশধর আমীরুল উমারা সাইয়িদ হুসাইন এবং কুতবুল মালিক নবাব আবদুল্লাহ খান (হাসান আলী খান) -এর নেতৃত্বের পরিসমাপ্তি এবং ভবলীলা সাঙ্গ হয়। কিন্তু এতেও মোঘল সাম্রাজ্যের ভাগ্য বদলায়নি। কারণ, বাদশা শাসনকার্যের যাবতীয় যোগ্যতা ও বিপদ-বিপর্যয় উপলব্ধির ন্যূনতম জ্ঞান থেকেও বঞ্চিত ছিলেন।

সাইয়িদ হাশেমী ফরিদাবাদী 'তারীখে হিন্দ' গ্রন্থে লিখেন, 'বাদশার নিয়ন্ত্রক সাইয়িদ বংশের যবনিকাপাত আর মুহাম্মদ শাহের শক্তি ও স্বাধিকার লাভের ফলে গোটা রাজ্যে ব্যাপকভাবে আনন্দ-উল্লাস করা হয়। কিন্তু এই আনন্দ বাদশা পূজার আগ্রহে ছিল না বরং ভবিষ্যতে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি এবং রাষ্ট্রীয় সুখ-শান্তি ও জনকল্যাণের প্রত্যাশার উপর নির্ভরশীল ছিল। তবে এর বাস্তব পরিণতিও দুঃখ ও হতাশা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কারণ, আকবর ও আওরঙ্গজেবের নতুন উত্তরাধিকারীগণ মূলতঃ তাদের গৌরবময় ও সৌভাগ্যবান পূর্বপুরুষদের বাদশাসুলভ গুণাবলি শূন্য ছিল। ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসের উন্মত্ততার মাঝে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে মনোনিবেশের অবকাশই ছিল না

তাদের। রাজত্বের অবস্থা সম্পর্কে সে রাজমহলের বেগমদের থেকেও অধিক উদাসীন এবং রাজ্যের অনিষ্টতার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন ছিল। এমনকি তার দাদি (শাহ আলম বাহাদুর শাহের রাজরাণী মেহের পরওয়ার) সম্পর্কে জানা যায়, তিনিও তার জ্ঞানশূন্য মাতাল নাতিকে বারবার এই আলস্য ও উদাসনিদ্রা থেকে জাগানোর চেষ্টা করতেন, যার সুস্পষ্ট পরিণতি ছিল পতন ও লাঞ্ছনা।

এখানে আমাদেরকে যদুনাথ সরকারের সেই ভাষ্য লক্ষ্য রাখতে হবে, যা তিনি মুহাম্মদ শাহের দুর্বলতাগুলোর পর্যালোচনায় লিখেছেন। তিনি লিখেন, "মুহাম্মদ শাহ যদিও সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত নন, তবে দয়া পাওয়ার দাবীদার। পরিস্থিতি তাকে এমন পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছিল, যেখানে প্রয়োজন ছিল একজন ধীমান ব্যক্তিত্বের। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ। ঐতিহাসিকগণ তাকে অভিযুক্ত করে বলেন, তিনি রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম আঞ্জাম দেওয়ার পরিবর্তে বিলাসিতায় নিজের সময় ব্যয় করেছেন। কিন্তু অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে, তার মত মানুষ যদি রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে পুরোপুরি মনোযোগও দিতেন, তথাপি তিনি অবস্থার উন্নতি বা পরিস্থিতির মোড় ঘুরাতে পারতেন না। রফীউদ্দারাজাত ও রফীউদ্দৌলাহ্র ন্যায় মানুষ কাঠের পুতুলের মত নিজের ব্যক্তিত্বেও অনুভূতিশূন্য ছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদ শাহের মধ্যে সকল দূরাবস্থা এবং সেসব সংশোধনে নিজের অসহায়ত্ব দুটিরই উপলব্ধি ছিল।"

মোটকথা, যেই রাজত্ব সম্রাট বাবরের বিশ্বজয়ের সংকল্প এবং তার দৃঢ়তা ও পরিশ্রমের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যাকে তার যোগ্য উত্তরসূরীগণ বাদশা আওরঙ্গজেব পর্যন্ত তার বীরত্বের রত্ন ও তৈমুরী মূল্যবোধের সাথে কায়েম রেখেছিলেন, তা এমন চরম ভোগ-বিলাস, উদাসীনতা ও আত্মবিস্মৃতির স্তরে নেমে আসে, যা উত্তরাধিকার লব্ধ ও লাগামহীন রাজত্বের ইতিহাস বরং ভাগ্য হয়ে গিয়েছিল। আল্লামা ইকবাল যথার্থই বলেছেন,

میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے-

شمشیر و سنان اول ، طاؤس و رباب آخر-

'আমি জাতির ভাগ্যের কথা তোমাকে কি শোনাব!
পূর্বপুরুষের বর্শা-তরবারী, পরবর্তীদের ময়ূর-বেহালা।'

অবশেষে পরিণতি তা-ই হয়েছে, যা স্বয়ং মুহাম্মদ শাহ شامت اعمال ما صورت نادر گرفت (পাপের পরিণতি নাদেররূপে পাকড়াও করেছে) বাগ্মীতাপূর্ণ বাক্যে ব্যক্ত করেছেন। হিজরী ১১৫১ সালে নাদের শাহ দিল্লী যাত্রা করেন। তিনি এর পূর্বে মুহাম্মদ শাহকে একাধিক পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকের বর্ণনামতে, 'এখানে সেদিনগুলোতে চলছিল ভোগ-বিলাসের

তোড়জোর উন্মাদনা। মুহাম্মদ শাহ ছিলেন অধিপতি। আরাম-আয়েশ ছাড়া তার কাজের কাজ কিছুই ছিল না। সর্বক্ষণ হাতে ছিল মদ আর বগলের নিচে কুহকিনী। তখন কারই-বা মস্তিষ্ক ছিল চিঠির জবাব লেখার মত!

নাদের শাহের দিল্লী আক্রমণের বিস্তারিত বিবরণ ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থাবলিতে পড়তে পারেন। তবে তার আক্রমণের পর দিল্লীর যে দুরাবস্থা হয়েছে, (উল্লেখ্য যে, সে সময় হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) -এর বয়স ছিল ৩৭ বছর এবং তিনি হিজায সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন) তার প্রতিচ্ছবি 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' রচয়িতার ভাষায় শুনুন-

'নাদের শাহের প্রস্থানের পর গোটা শহর ছিল মরদেহে ভরা আর জীবন্তদের থেকে খালি। ঘর-বাড়িগুলোতে বিরাজ করত ভূতুড়ে পরিবেশ। জনশূন্যতায় খাঁ-খাঁ করত চারদিক। মহল্লার পর মহল্লা ও গ্রামের পর গ্রাম জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল। দুর্গন্ধ বের হত লাশের স্তুপ থেকে। না কেউ ছিল কাউকে কাফন দেওয়ার আর না ছিল কেউ দাফন করার। মরে-পঁচে হিন্দু-মুসলমান একাকার হয়ে যায়। স্তুপে স্তুপে আসবাবপত্র জ্বলে পুড়ে চারিদিক হয়েছে ধূলিমলিন। এ তো ছিল শহরের অবস্থা। দরবারের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়, কিছুদিন তারা গভীর নিদ্রাবিভোর থাকে। আর যখন জেগে ওঠে, তখন তাদের চক্ষুযুগলে এত বেশি কেতুর লেগেছিল যে, দেখলে ঘৃণা হত।

ধনাগারে ছোলা বাদাম পর্যন্ত ছিল না। ট্যাক্স ও করের কোনও খবর ছিল না। ধ্বংস, বিরান ও বিভীষিকাময় অবস্থা ছিল সর্বস্থানে। তাছাড়া মারাঠীদের আতঙ্কও একেবারে দূর হয়নি। যেসব প্রদেশ তাদের দখলে চলে গিয়েছিল, সেগুলো তাদের হাতে ধ্বংস হয়েছিল। এসব বিপদ-আপদেও দরবারীদের বিবাদ মিটেনি। সেখানেই এক গ্রুপ ছিল তাওরানী আমীরদের, যাদের প্রধান ছিল আসিফ জাহ আর কমরুদ্দীন খান ছিল মন্ত্রী। দ্বিতীয় গ্রুপ ছিল সেসব আমীরদের, যারা তাদেরকে বহিষ্কার করতে চাইত। তাদের মধ্যে বাদশাও একজন ছিলেন। মধ্যখানে যদি মারাঠীদের বিবাদ বাঁধা হয়ে না দাঁড়াত, তাহলে সেসব আমীর রাজত্বকে খণ্ড-বিখণ্ড করে কবেই নিজেদের মধ্যে ভাগ-বণ্টন করে নিত! তৈমুর বংশের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত মুছে ফেলত ধরাপৃষ্ঠ হতে।"

নাদের শাহ ভারতবর্ষ থেকে চলে যাওয়ার পর তার প্রথম ধাক্কায় দিল্লীর রাজত্ব থেকে তিনটি সবুজ শ্যামল প্রদেশ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা পৃথক হয়ে যায় এবং সেসব অঞ্চলে আলীবর্দী খানের পৃথক এক রাজত্ব কায়েম হয়ে যায়।

২৬ রবিউস সানী ১১৬১ হিজরী (মোতাবেক এপ্রিল ১৭৪৮ খৃ.) সালে মুহাম্মদ শাহ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। 'ভারতবর্ষের

'ইতিহাস' রচয়িতার ভাষ্যমতে– তিনি ত্রিশ বছর রাজত্ব করে তৈমুর বংশকেই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়ে যান।

দ্বিতীয় শাহ আলম

মুহাম্মদ শাহের শাসনামলেই মোঘল শাসনের চারিত্রিক, নৈতিক ও ব্যবস্থাপনার দিক থেকে পতন হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় সমাজ ও আমীর ধনিক শ্রেণীর মানসিকতা الناس على دين ملوكهم (মানুষ তাদের রাষ্ট্রীয় ধর্মানুসারী হয়) মূলনীতি অনুযায়ী ভোগ-বিলাস, আরামপ্রিয়তা ও কৌতুক-বিনোদনের দিকে দ্রুত ঝুঁকে পড়ে। আর দ্বিতীয় শাহ আলমের শাসনামলে যিনি ১১৭৩ হিজরীতে (১৭৫৯ খৃ.) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, রাজনৈতিকভাবে এ রাজত্ব পতনের শেষ সীমায় পৌঁছে যায়। তিনি তার ৪৭ বছরের শাসনামলে অন্যের হাতের পুতুল হয়ে থাকেন। বক্সারের যুদ্ধে উদের নবাব শুজাউদ্দৌলার মন্ত্রী এবং মীর কাসেম ইংরেজদের হাতে পরাজিত হওয়ার পর ১৭৬৪ খৃস্টাব্দে শাহ আলম ইংরেজদের আনুগত্য স্বীকার করে নেন এবং একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ফেলেন। যার ভিত্তিতে তিনি ইংরেজদের বেতনভোগী হয়ে যান। ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে তিনি ইংরেজদের সাথে আরও একটি চুক্তি করেন। ফলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অর্থ মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব আদায়ের অধিকারসমূহ ও ব্যবস্থাপনা ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে চলে আসে। শাহ আলম নিজেকে মারাঠীদের আশ্রয়ে সমর্পণ করেন। আর এলাহাবাদ ও আযমগড় জেলাসমূহ তাদের কাছে হস্তান্তর করে দেন।

দ্বিতীয় শাহ আলমের অনেক পূর্ব হতেই গোটা দেশ মারাঠী, শিখ আর দিল্লী, আগ্রা ও রাজপুত জাঠদের দয়া-করুণায় টিকে ছিল। যারা প্লাবনের মত আসত এবং গোটা এলাকা লুটতরাজ করে চলে যেত। দেশে কোন শক্তিই শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সক্ষম ছিল না। আহমদ শাহ আবদালী ১৪ জানুয়ারী ১৭৬১ খৃস্টাব্দে পানিপতের ময়দানে মারাঠীদের পরাজিত করে দেশকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। তিনি শাহ আলমকে দিল্লী ডেকে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তার কাছে নিজের লোক পাঠিয়েছেন। বাধ্য হয়ে তার মা নবাব যিনাতমহলকে দিয়েও পত্র লিখিয়েছেন। যদি মোঘল সাম্রাজ্যে সামান্যও প্রাণ আর শাহ আলমের মধ্যে রাজত্ব করার ন্যূনতম যোগ্যতাও থাকত, তাহলে তিনি পানিপতের যুদ্ধ থেকে ফায়দা লুটে ভারতবর্ষে নিজের নেতৃত্ব সুসংহত করে নিতেন। কিন্তু মোঘল রাজত্ব নিষ্প্রাণ তো ছিলই আর বাদশা কেবল ভীরু-কাপুরুষই নয়, আত্মসম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদাবোধ থেকেও শূন্য ছিল। আল্লামা ইকবালের ভাষায়,

حمیت نام ہے جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔

'আত্মসম্ভ্রম যাকে বলে, তৈমুর বংশ থেকে তা বিদায় নিয়েছিল।'

বাদশা পূর্ণ দশ বছর পর (১৭৭১ খৃ.) এলাহাবাদ, দিল্লী ফিরে আসেন। সময় পেরিয়ে গিয়েছিল। কাজেই তিনি পানিপতের এত বড় বিজয় ও মারাঠীদের পরাজয়ে কোনও ফায়দা লাভ করতে পারেননি। এখানে এসে তিনি আরও নতুন নতুন সমস্যা-সংকট, আমীরদের দৌরাত্ম্য, রোহিঙ্গাদের নতুন শক্তি এবং শিখদের আক্রমণে জর্জরিত হয়ে পড়েন। অবশেষে নাজীবুদ্দৌলার নাতি গোলাম কাদের রোহিঙ্গা ১৭৮৮ খৃস্টাব্দে দিল্লী দখল করে নেয়। লুট করে নেয় রাজমহল। রাজকন্যাদের বেত্রাঘাত করে এবং তৈমুরী সাম্রাজ্যের উত্তরসূরী মোঘল সম্রাটের চক্ষু বর্শা-ছুরির মাথা দিয়ে খুঁচিয়ে উপড়ে ফেলে। মোঘল সাম্রাজ্য ও এর উত্তরাধিকারীদের এরূপ বেইজ্জতী ও অসম্মান ইতোপূর্বে আর কখনও হয়নি।

১৭৮৯ খৃস্টাব্দে সিন্ধীয়াহ গোলাম কাদেরকে বড় নৃশংস ও নির্মমভাবে হত্যা করে এবং শাহ আলমকে পুনরায় সিংহাসনে বসায়। তার উপর নয় লাখ রুপি বাৎসরিক ট্যাক্স নির্ধারণ করে। একাধিক যুদ্ধ-বিগ্রহের পর ১৮০৩ খৃস্টাব্দে লর্ড লেক ইংরেজ সৈন্যসহ দিল্লী প্রবেশ করে। বিতাড়িত করে মারাঠীদের। আর বাৎসরিক এক লাখ রুপি বাদশাহর ভাতা নির্ধারণ করে দেয়। শাহ আলম ৪৫ বছর সিংহাসনে আসীন আর ১৮ বছর অন্ধ অবস্থায় কাটিয়ে ১৮০৬ খৃস্টাব্দে অনন্ত পথের যাত্রী হন।

শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতার অবস্থা

রাজনৈতিক বিক্ষিপ্ততা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় ও অধঃপতন সত্ত্বেও এ যুগ ছিল ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা, সাহিত্য ও কাব্যচর্চা, আধ্যাত্মিক ধ্যান-তন্ময়তা, আত্মিক উন্নতি ও আত্মশুদ্ধির যুগ। তখন এমন বহু সুযোগ্য ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব জন্ম নিয়েছেন, যাদের এই বিপর্যস্ত যুগের সাথে কোনও সম্পৃক্ততা ছিল না। যাদের উপর অবস্থা-পরিস্থিতির কারণে হতাশা ও ভীতির কোন ছাপ পরিলক্ষিত হত না। কথিত আছে, শিক্ষা ও সাহিত্য জগতের অসংখ্য অশ্বারোহী এসব ব্যক্তিত্বের সফল চেষ্টা-সাধনার ফসল, যারা ছিল কোন পুরনো রোগে আক্রান্ত কিংবা দুর্বলতা, অসহায়ত্ব ও ভেতরগত মনোকষ্টের শিকার। মনস্তাত্ত্বিকগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এমতাবস্থায় প্রতিরোধ ক্ষমতা ও এই অসহায়ত্বের প্রতিকারের সংকল্প জেগে উঠে আর মানুষ তখন এমন কাজ করে ফেলে, যা সাধারণ অবস্থায় সম্ভব হয় না। ভারতবর্ষের এ যুগের শিক্ষা ও

আধ্যাত্মিকতা এবং এই বিপর্যস্ত যুগে এমন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গের বহিঃপ্রকাশ একটি রুগ্ন ও পতনোন্মুখ সমাজের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ শক্তির স্বাক্ষর এবং ইসলামের মানুষ গড়ার যোগ্যতার প্রমাণ। জ্ঞানের গভীরতা, বুদ্ধিমত্তা, অধ্যাপনা শক্তি ও চমৎকার লিখনীর দিক থেকে আমরা সে যুগে মাওলানা আহমদ ইবনে আবু সাঈদ ওরফে মোল্লা জুয়ূন আমীঠবী (১০৪৭ হি.-১১৩৫ হি.) নূরুল আনওয়ার ও তাফসীরে আহমদী রচয়িতা মোল্লা হামিদুল্লাহ সিন্ধীলবী (মৃত্যু ১১৬০ হি.), শরহে সুল্লাম রচয়িতা ওরফে হামিদুল্লাহ, সুল্লাম রচয়িতা মাওলানা মুহাম্মদ হাসান ওরফে মোল্লা হাসান (মৃত্যু ১৯৯৯ হি.), মাওলানা রুস্তম আলী কনূজী (মৃত্যু ১১৭৮ হি.), শায়খ সিফাতুল্লাহ খায়রাবাদী (মৃত্যু ১১৫৭ হি.), শায়খ আলী আসগর কনূজী (মৃত্যু ১১৪০ হি.) মাওলানা গোলাম আলী আযাদ বলগারামী (১১১০ হি.-১২০০ হি.), মাওলানা গোলাম নকশবন্দী লাখনৌবী (মৃত্যু ১১২৬ হি.) কারী মুহিব্বুল্লাহ বিহারী (মৃত্যু ১১১৯ হি.), সুল্লামুল উলূম ও মুসাল্লামুস সুবূত রচয়িতা (যিনি প্রায় এক শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষের আলেম-উলামা ও অধ্যাপকদেরকে এ দু'টি গ্রন্থের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও টীকা-টিপ্পনীতে ব্যস্ত রেখেছেন এবং যার রচিত গ্রন্থাবলি মিসরীয় আলেম ও আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মনোযোগিতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রয়েছে) কাযি মুবারক গোপামবী (মৃত্যু ১১৬২ হি.), শরহে সুল্লাম রচয়িতা ওরফে কাযি মাওলানা মুহাম্মদ আলা থানবী, কাশ্শাফে ইস্তিলাহাতে কুনূন (শাস্ত্রীয় পরিভাষাসমূহের বিশ্লেষণ) -এর রচয়িতা (যেটি সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর উপমাহীন রচনা) এবং সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ মোল্লা নিযামুদ্দীন লাখনৌবী (মৃত্যু ১১৬১ হি.)। যার নির্বাচিত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাব্যবস্থা ভারতবর্ষ থেকে বুখারা-সমরকন্দ পর্যন্ত চালু ছিল। যাকে 'নুযহাতুল খাওয়াতির' রচয়িতা غيث الأفادة الهتون، العلم بالربع المسكون، استاذ الاساتذة وامام الجهابذة . উপাধিতে ভূষিত করেন। তাদের মত নির্মোহ, বিচক্ষণ, দূরদর্শী, দেশের গৌরব ও যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, অধ্যাপক, লেখক-গবেষক, যথার্থ শিক্ষাগত চেতনা, শিক্ষকতা ও দীক্ষাদানের ময়দানের ত্রাণকর্তা এই শতকেরই মনীষী ও মহাপুরুষদের মধ্যে ছিলেন।

সুলূক ও তরীকত তথা আধ্যাত্মিকতার ময়দানে লক্ষ্য করলে এই শতকে হযরত মির্যা জাঁনে জানা (১১৯১-১১৯৫ হি.) সিলসিলায়ে নকশেবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়ার মত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যার সম্পর্কে স্বয়ং শাহওয়ালীউল্লাহ (র) সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, 'সব যুগে এ ধরনের মহান বুযুর্গ খুব একটা পাওয়া যায় না। আর এমন ফিৎনা-ফাসাদ ও বিপর্যয়ের যুগে পাবে কোথায়?'

কাদেরিয়া সিলসিলার প্রসিদ্ধ বুযুর্গ এবং দরসে নেযামীর প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা নিযামুদ্দীন -এর মুর্শিদ হযরত সাইয়্যিদ আবদুর রায্যাক বাঁসবী (মৃত্যু ১১৩৬ হি.), সিলসিলায়ে চিশতিয়ায়ে নিযামিয়াহর মুজাদ্দিস শাহ কালীমুল্লাহ জাহানাবাদী (মৃত্যু ১১৪০ হি.) এবং এই সিলসিলারই প্রকাশক ও ইমাম শাহ ফখরুদ্দীন ওরফে শাহ ফখরে দিল্লী (মৃত্যু ১১৯৯ হি.), সিলসিলায়ে কাদেরিয়ার প্রসিদ্ধ শায়খ শাহ মুহাম্মদ গাউস কাদেরী লাহোরী (মৃত্যু ১১৫৪ হি.), নকশেবন্দিয়াহ সিলসিলার কামিল শায়খ মুহাম্মদ আবিদ সান্নামী (মৃত্যু ১১৬০ হি.), খাজা মুহাম্মদ নাসির আন্দালিব খাজা মীর দরদ-এর পিতা (মৃত্যু ১১৭২ হি.), শাহ মনীবুল্লাহ বালাপুরী এবং হযরত শাহ নূর মুহাম্মদ বাদায়ূনী (মৃত্যু ১১৩৫ হি.) এ যুগে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব ও ত্রাতা। মোটকথা, এ যুগ ছিল তিন সিলসিলা তথা কাদেরিয়া, চিশতিয়া ও নকশেবন্দিয়ার প্রচার-প্রসারের যুগ। তিন সিলসিলারই বহু কামিল শায়খ বিদ্যমান ছিল সে সময়। হযরত শাহ আবদুল আযীয (র)-এর ভাষ্য হচ্ছে,

'সম্রাট মুহাম্মদ শাহের শাসনামলে বিভিন্ন সিলসিলার পীর-মুর্শিদগণের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী দিল্লীতে বাইশজন মহান বুযুর্গ বিদ্যমান ছিলেন। সাধারণতঃ এমন ঘটনা বিরল।'

চারিত্রিক ও সামাজিক অধঃপতন

কিন্তু এসব বিখ্যাত সুযোগ্য ব্যক্তিত্ব এবং রূহানী চিকিৎসক, কামিল শায়খগণের উপস্থিতি সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজ, বিশেষতঃ রাজত্বের আমীর শ্রেণীর প্রভাব, রাজনৈতিক পতন, সম্পদের প্রাচুর্য এবং ইরানী সভ্যতার প্রভাবে চারিত্রিক অধঃপতন চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এ কারণে সে শ্রেণী ঐ দায়িত্ব পালনে অক্ষম ছিল, প্রত্যেক যুগে রাজত্বের বিপ্লবের সময় আমীর শ্রেণী যা পালন করেছে। এ শ্রেণী থেকেই সেসব ব্যক্তিবর্গ আবির্ভূত হয়েছেন, যারা রাজনৈতিক ও ব্যবস্থাপনার ময়দানে সৃষ্ট ঘাটতি ও শূন্যতাগুলো পূরণ করেছেন। সাইয়্যিদ হাশমী ফরিদাবাদী যথার্থই লিখেছেন, 'ভারতবর্ষের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য স্বয়ং এই আমীর শ্রেণীকে অত্যাধিক বিলাসপ্রিয় ও আরামপ্রিয় বানিয়ে দিয়েছিল। আমরা সেসব আমীরের সকল চেষ্টা ও যোগ্যতা সামান্য স্বার্থের জন্য ষড়যন্ত্র ও শত্রুতায় ক্ষয় হতে দেখতে পাই। রাজত্বের বিপ্লব আর রাজত্ব লাভ তো দূরের ব্যাপার। কোন মুসলমান আমীরের স্ব স্ব স্থানে প্রকাশ্যে স্বাধিকারের ঘোষণা করারও সাহস হত না। আর এ যুগে একদিকে তো আইন-শৃঙ্খলার ভিতরগত ত্রুটি বেড়েই চলেছে। অপরদিকে শাসক শ্রেণীর লোকজন থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা এবং সামাজিক কাজের যোগ্যতাই দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

শাহ আবদুল আযীয (র) বলেন, 'নবাব কামরুদ্দীন খানের ঘরে মহিলারা শেষরাতের গোসল করত গোলাপ পানি দ্বারা। অপর নবাবদের ঘরে প্রতিরাতে তিনশ রুপির ফুল ও পান খরচ হত মহিলাদের জন্য।'

মাওলানা গোলাম আলী আযাদ বলগারামী 'মায়াছারুল কিরাম' গ্রন্থে লিখেছেন, আওরঙ্গবাদের লোকজন সকলেই একবাক্যে বর্ণনা করেন, আমীরুল উমারা (হুসাইন আলী খান)-এর শাসনামলে শহরের অধিকাংশ মানুষ নিজের ঘরে খাবার রান্না করত না। আমীরুল উমারার সরকারী বাবুর্চি তার অংশ বিক্রি করে দিত। আয়েসি পোলাওয়ের এক খাঞ্চা কয়েক পয়সায় মানুষ পেয়ে যেত।

আকীদাগত দুর্বলতা, শিরক-বিদ'আতের জোয়ার

এই সামাজিক ও চারিত্রিক অবক্ষয় থেকে অধিক ভয়াবহ, আল্লাহর নুসরাত থেকে বঞ্চিত এবং প্রকৃত শক্তি থেকে রিক্তকারী ত্রুটি হল, আকীদা-বিশ্বাসগত দুর্বলতা কুরআনে কারীমের ঘোষণা ألا لله الدين الخالص অধিকাংশ মানুষের এর বিপরীত জীবন, মুসলিম সমাজে বিদ'আতের জোয়ার, হিন্দু ও শী'আদের নানা রুসম-রেওয়াজ ও অভ্যাসের অনুকরণ চলছিল। সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য শিরকের এমন একাধিক রূপরেখা বিভিন্ন স্থান ও শ্রেণীমহলে পাওয়া যেত, যেগুলোর বুদ্ধিদীপ্ত বা জ্ঞানগত কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। প্রকাশ্য কবরপূজা, মাশায়িখের জন্য সম্মানের সিজদা, বিভিন্ন মাজার ও তার আশপাশকে হারামাইনের মত সম্মান প্রদর্শন, কবরের উপর চাদর চড়ানো, মান্নত মানা, বুযুর্গদের নামের উপর কুরবানী করা, মাজার তাওয়াফ করা, সেখানে মেলার আসর বসানো, উৎসবের দিন ধার্য করা, নৃত্য-গীত করা আর সংক্ষিপ্ত কথায় এগুলোকে কিবলা কা'বা এবং শেষ আশ্রয় ও ঠিকানা মনে করা ইত্যাদিসহ এমন কোনও ঘটনা ও দৃশ্য ছিল না, যা দেখার জন্য অনেক দূরে যাওয়া ও দীর্ঘ অপেক্ষার প্রয়োজন হত। শায়খ সাদ্দূর বকরী, সাইয়্যেদ আহমদ কবীরের গাভী, গাজী মিয়ার ঝাণ্ডা ও লাঠি, মহররমের তাযিয়া, অনৈসলামিক অনুষ্ঠানগুলো জাঁকজমকের সাথে আয়োজন করা, রোগ-ব্যাধি দূর করার লক্ষ্যে পাপাত্মা ও দেও-দানবের সন্তুষ্টি কামনা ও ভয়, বসন্ত রোগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, নেককার আউলিয়াদের জন্য মান্নত মানা ও কুরবানী করা, ওলী ও নেককার রমনীদের নামে রোযার নিয়ত করা এবং তাদের সাথে নিজের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য পূরণের বিষয়কে জুড়ে দেওয়া; এ ব্যাপারে বিশেষ দিন, বিশেষ খাবার (স্ত্রীর ছেহনাক, মাখদুম সাহেবের পথখরচ ইত্যাদি) এবং তাতে বিশেষ আদবের প্রতি যত্নবান থাকা।

এছাড়া এমনই আরও অনেক বিষয় রয়েছে, যার আওতায় নানা অলীক ধ্যান-ধারণা, ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস, জাহেলী যুগের রুসম-রেওয়াজ এবং নানা বাধ্য-বাধকতা ও আবশ্যকীয়তার এক দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। আলী বখশ, হুসাইন বখশ, পীর বখশ, মাদার বখশ নামগুলো ব্যাপক প্রচলিত ছিল।

এক বিশাল অঞ্চলে একত্ববাদের বিশ্বাস এ অর্থে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলাই আকাশ-যমীন ও গোটা বিশ্বজগতের আসল সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনিই প্রকৃত উপাস্য। বড় বড় কাজ তিনিই আঞ্জাম দেন। কিন্তু তিনি জগতের বাদশাদের মত আপন রাজত্বের অনেক শাখা-প্রশাখা ও বিভাগীয় দায়িত্বভার তার গ্রহণযোগ্য বান্দাদেরকে অর্পণ করেছেন। যারা সেসবের মালিক ও স্বাধীন কর্তা। তারা তার ভাল-মন্দ দেখাশোনা করেন। এখন তাকে সন্তুষ্ট করা এবং তার সাথে সম্পর্ক কায়েম করা ব্যতিত এক্ষেত্রে কোনও সফলতা আসতে পারে না। আর শিরক মানে কেবল আল্লাহ ছাড়া অপর কোনও সত্তাকে এই দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও প্রকৃত মালিক মনে করা। তাদেরকে সরাসরি ইবাদত ও সিজদার (মাধ্যম ও শাফা'আতকারী হিসেবে নয়) উপযুক্ত মনে করা।

মোটকথা, বার শতকের ভারতবর্ষ রাজনৈতিক, আইন-শৃঙ্খলা, চারিত্রিক ও আকীদাগত দিক থেকে চরম অধঃপতন ও বিপর্যয়ের এমন স্তরে নেমে গিয়েছিল, যা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর পতন এবং মুসলিম সমাজের অধঃপতনের ভয়াবহ ও বিভৎস চিত্র। মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান নদভী (র) এই সামগ্রিক অবস্থাচিত্র তার এক প্রবন্ধে অত্যন্ত সারগর্ভ ও উচ্চাঙ্গের ভাষায় তুলে ধরে লিখেন,

'মোঘল সাম্রাজ্যের সূর্য ছিল অস্তাগত। মুসলমানদের মধ্যে রুসম-রেওয়াজ ও বিদ'আতের জোয়ার বইছিল। ভণ্ড-প্রতারক ফকীর-দরবেশ ও মাশায়িখগণ তাদের বুযুর্গদের খানকাগুলোতে আসন পেতেছিল। প্রদীপ জ্বালিয়ে বসেছিল নিজ নিজ পীরদের মাজারে। মাদরাসাগুলোর কোণায় কোণায় যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের হাঙ্গামায় হুলস্থুল কাণ্ড ঘটত। ফিকাহ ও ফাতওয়ার বাহ্যিক অর্চনা প্রত্যেক মুফতীরই অভীষ্ট ছিল। ফিকহী মাসায়েল গবেষণা ও মাযহাবের তত্ত্বানুসন্ধান সবচেয়ে ছিল বড় অপরাধ। আওয়াম তো আওয়ামই, বিশিষ্ট লোকজন পর্যন্ত কুরআনে কারীমের অর্থ-মর্ম এবং হাদীসের বিধি-বিধান ও ইংগিতসমূহ এবং ফিকহের সূক্ষ্মতা ও উপকারিতা সম্পর্কে ছিল বেখবর।'

তৃতীয় অধ্যায়

শাহ্ সাহেব (র)-এর পূর্বপুরুষ ও সম্মানিত পিতা

শাহ্ সাহেব (র)-এর পূর্বপুরুষ

শাহ সাহেব (র)-এর পূর্বপুরুষগণের যুগ (যারা শায়খ শামসুদ্দীন মুফতীর যুগ থেকে রুহিতক শহরে অবস্থানরত) ভারতবর্ষের শিক্ষা ও লিখনী-সাহিত্যে ইতিহাসের সেই যুগ, যখন এখানে স্মারক রচনা, জীবনী লেখা ও ভাষান্তরের যুগ ব্যাপকভাবে শুরু হয়নি। অধিকাংশই ছিল বিখ্যাত মাশায়িখে তরীকতের ব্যক্তিগত স্মারক। তন্মধ্যে মাহবুবে এলাহী সুলতানুল মাশায়িখ খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়ার স্মারক আমীর খোর্দ রচিত 'সিয়ারে আউলিয়া' বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ। নতুবা ছিল সমসাময়িক সালেহীন ও মাশায়িখে কিরামের মিশ্রিত সংকলন। তন্মধ্যে দুটি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি শাহ মুহাম্মদ ইবনে হাসান গাউসী মান্দবীর 'গোলজারে আবরার', যাতে বেশিরভাগ আলোচনা রয়েছে তরমাগু ও মালোহ এলাকার সালেহীন ও মাশায়িখদের। দ্বিতীয়তঃ হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর 'আখবারুল আখইয়ার'। এমন সুযোগ্য ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের স্মারক গ্রন্থের অভাব ছিল, যাতে থাকবে বিভিন্ন বংশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কিংবা কোনও অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের পরিচিতি ও আলোচনা (যারা কোন সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা বা তার গুরুত্বপূর্ণ কোনও ব্যক্তি ছিলেন না)। এসব স্মারকেও অলৌকিকভাবে কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক রাজধানী ও তার আশপাশ এবং ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ও ঐতিহাসিক শহরগুলোর প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের আলোচনা বেশি রয়েছে। যাদের অবস্থাবলি ও যোগ্যতা সম্পর্কে জানা সহজলভ্য ছিল। শাহ সাহেবের বংশ শায়খ শামসুদ্দীন মুফতীর সময় থেকে বুযুর্গ দাদা শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন পর্যন্ত রুহিতক বসবাস করেন। যার এই কেন্দ্রীয়তা ও গুরুত্ব ছিল না। এজন্য সেসব স্মারক ও জীবনীগ্রন্থে তাদের অবস্থা ও ঘটনাবলি ব্যাপক আকারে পাওয়া যায় না।

এ অধ্যায় সম্পূর্ণ তৃষ্ণার্ত এবং শাহ সাহেব (র)-এর জীবনী লেখক কিংবা তার বংশের ইতিহাস রচয়িতাদের কঠিন সমস্যায় পড়তে হত, যদি স্বয়ং শাহ সাহেব তার পূর্বপুরুষগণের জীবন সম্পর্কে 'ইমদাদ ফী মা'আছারিল আজদাদ' নামে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা রচনা না করতেন। তাতেও প্রবীণ পূর্বপুরুষদের আলোচনা ও জীবনী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ততার সাথে এবং পিতামহ শায়খ

ওয়াজীহুদ্দীনের (সময়ের নিকটবর্তিতা ও মাধ্যম স্বল্পতার দরুণ) আলোচনা অপেক্ষাকৃত ব্যাখ্যা করেছেন। সেসব ইশারা-ইংগিতকে সামনে রেখে 'হায়াতে ওয়ালী' -এর লেখক মাওলানা হাফিজ মুহাম্মদ রহীম বখশ দেহলভী স্বকীয় রচনাশৈলীতে তার দক্ষ হাতে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যা গ্রন্থটির ১১৩ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত হয়েছে। তিনি শাহ সাহেবের এই মৌলিক জীবনালেখ্য (যা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাপূর্ণ উৎস) অন্যান্য সমকালীন ইতিহাস ও বইপুস্তক থেকে যেসব বিষয়বস্তু বৃদ্ধি করেছেন, সেখানে পৃষ্ঠাগুলো ছিল ভিন্ন; কিতাব এবং রচয়িতার নামও কোথাও ছিল না। এজন্য আমরা কেবল 'মা'আছারুল আজদাদ' এর উপরই নির্ভর করব।

বংশ পরিক্রমা

শাহ সাহেব ছিলেন ফারুকী বংশের। উক্ত পুস্তিকার শুরুতে তিনি তার বংশ পরিক্রমাকে হযরত উমর (রা) পর্যন্ত লিখেছেন। শামসুদ্দীন মুফতী এই বংশের মধ্যে সর্বপ্রথম রুহিতক এসে বসতি স্থাপন করেন। তার এক ভাই ছিল সালার (সৈনিক) হিসামুদ্দীন। তার সন্তানদের মধ্যে শাহ আরযানী বাদায়ূনী নামে একজন বুযুর্গ ছিলেন। তার বংশতালিকা থেকেও এর সত্যতা পাওয়া যায়। এখানে সেই বংশপরিক্রমা হুবহু লিখা হচ্ছে–

শাহ ওয়ালীউল্লাহ ইবনে শায়খ আবদুর রহীম ইবনে শহীদ ওয়াজীহুদ্দীন ইবনে মু'আযযম ইবনে মানসুর ইবনে আহমদ ইবনে মাহমূদ ইবনে কিওয়ামুদ্দীন ওরফে কাযী কাযিন ইবনে কাযী কাসেম ইবনে কাযী কবীর ওরফে কাযী বুদ্দাহ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে কুতুবুদ্দীন ইবনে কামালুদ্দীন ইবনে শামসুদ্দীন মুফতী ইবনে শের মালিক ইবনে মুহাম্মাদ আতা মালিক ইবনে আবুল ফাতাহ মালিক ইবনে উমর হাকিম মালিক ইবনে আদিল মালিক ইবনে ফারুক ইবনে জারজীস ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ শাহরিয়ার ইবনে উসমান ইবনে মাহান ইবনে হুমায়ূন ইবনে কুরাইশ ইবনে সুলাইমান ইবনে আফফান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)।

এই বংশ তালিকায় কারও নামের সাথে 'মালিক' উপাধি এসেছে। শাহ সাহেব লিখেন, প্রাচীন যুগে এটি সম্মানসূচক উপাধি ছিল। যেমন আমাদের যুগে 'খান'।

এ বংশের ভারতবর্ষ আগমন

শাহ সাহেবের বর্ণনা মতে তার বংশের প্রথম যে বুযুর্গ ব্যক্তি রুহিতক এসে বসতি স্থান করেছেন, (আর সম্ভবতঃ তিনিই ভারতবর্ষে প্রথম আগমন

করেছেন) তিনি শামসুদ্দীন মুফতী। এসব মাধ্যম ও অধঃস্তন পুরুষের সংখ্যা এবং তাদের জন্মগত ও আনুমানিক বয়সের হিসাব থেকে বুঝা যায়, শায়খ শামসুদ্দীন মুফতী সপ্তম হিজরী শতকের শেষে অষ্টম শতকের প্রথমভাগে ভারতবর্ষে আগমন করে, যখন তাতারীদের আক্রমণে মুসলিম বিশ্বের পূর্বাঞ্চল তছনছ, বংশ-পরিবারগুলোর ইজ্জত-সম্মান ভূলুণ্ঠিত, তাদের শিক্ষাগত অর্জন লুটপাট এবং ইরান ও তুর্কিস্থানের বিখ্যাত শহর লুটতরাজ ও দেউলিয়া হচ্ছিল।

তারীখে ফিরোজ শাহী এবং অন্যান্য ইতিহাস থেকে জানা যায়, এ যুগেই ইরাক-ইরান ও তুর্কিস্থানের অভিজাত-সম্ভ্রান্ত পরিবার এবং জ্ঞানী-গুণী সম্প্রদায়গুলো ব্যাপক হারে ভারতবর্ষে আগমন করে। যেখানে ছিল তুর্কি বংশোদ্ভূত মুসলিম সম্প্রদায়ের শাসন। যারা হিংস্র তাতারীদেরকে 'তুর্কির সাথে তুর্কি জবাব' দিয়ে ভারতবর্ষের সীমান্ত থেকে পিছপা হতে বাধ্য করেন। তারা এই দেশকে না শুধু তাদের লুটতরাজ থেকে রক্ষা করেছেন বরং নিজের ধর্ম পরিপালন ও জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য দারুল উলূম ও একটি বিশ্বমানের প্রশস্ত মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে আরো ছিল স্থানে স্থানে শিক্ষানিকেতন, আল্লাহর স্মরণ ও আত্মশুদ্ধির কেন্দ্র এবং কলম সৈনিক ও গবেষকদের জন্য স্বস্তি ও প্রশান্তির সাথে কাজ করার পর্যাপ্ত সুযোগ।

রুহিতক অবস্থান

ধারণা করা হয় এবং শাহ সাহেবের বর্ণনা দ্বারাও এটা প্রকাশ পায় যে, রুহিতক সে সময়কার নতুন ইসলামী রাজত্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর এবং পশ্চিমা দেশ থেকে দিল্লী আগমনকারী ইসলামী সেনাবাহিনী, মুজাহিদ, ইসলামের দাঈগণ, মাশায়িখ ও উলামায়ে কিরামের দিল্লীর পথে গুরুত্বপূর্ণ একটি মনযিল ও বিশ্রামস্থল ছিল।

শাহ সাহেব (র) বলেন, কুরাইশ বংশোদ্ভূত যে ব্যক্তিত্ব ও মহান বুযুর্গ প্রথম এই শহরে আগমন করেন এবং যার কারণে ইসলামী নিদর্শনের বিজয় আর কুফর ও বর্বরতার পতন হয়, তিনি ছিলেন শায়খ শামসুদ্দীন মুফতী। শাহ সাহেব তার কিছু কারামতের কথাও বর্ণনা করেছেন, যা তাঁর বুযুর্গী ও সে যুগের অবস্থা-প্রেক্ষিতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। সে যুগে যেসব জ্ঞানী-গুণী ও ব্যক্তিত্ববান মুসলমান এ শহরে বসবাস করতেন, তাদের কাঁধে বিচার ও হিসাবরক্ষণের পদ এবং শহরের আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হত। কিন্তু সে যুগে তাদেরকে বিচারক এবং হিসাবরক্ষক বলে ডাকা হত না।

শায়খ শামসুদ্দীন থেকে শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন

শায়খ শামসুদ্দীন মুফতীর ইন্তিকালের পর তার সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন কামালুদ্দীন মুফতী। তারপরে তার পুত্র কুতুবুদ্দীন, তার পরে তদীয় পুত্র আবদুল মালিক সেসব মর্যাদার আসনে সমাসীন হন এবং সেসব দায়িত্বভার পূর্ণ করে যান। এসব হযরতের পরে এ বংশেই বিচারক নিয়োগ হতে থাকে। শায়খ আবদুল মালিকের পুত্র কাযী বুদ্দাহ স্বীয় বংশের এই ধারাবাহিকতা ও পদমর্যাদা বজায় রাখেন। তার দুই সন্তান থেকে তার বংশধারা চালু থাকে। এ বংশের বিবাহ হয় রুহিতকের সিদ্দীক এবং সোনাপতের সাইয়িদ বংশে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব (র) -এর পঞ্চম পূর্বপুরুষ এবং বিচারকের পদে থেকে রাজত্বের মসনদ রক্ষাকারী শায়খ মাহমূদের বিয়ে হয় সোনাপতের সাইয়িদ বংশে। যার ঘরে জন্ম নেয় এক পুত্র শায়খ আহমদ। তিনি শৈশবকালেই রুহিতক ত্যাগ করেন এবং শায়খ আবদুল গণী ইবনে শায়খ আবদুল হাকীমের সঙ্গে সোনাপতে বসবাস করতে থাকেন। শায়খ আবদুল গণী (র) তার সঙ্গে নিজ কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দেন এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের লালন-পালন করেন। এরপর তিনি রুহিতক প্রত্যাবর্তন করেন। ঘর তৈরী করেন দূর্গের বাইরে। সমবেত করেন শুভাকাঙ্ক্ষী প্রিয়জনদের। তার পুত্র শায়খ মানসুর ছিলেন বীরত্বের মর্যাদা ও শাসকের গুণের অধিকারী। তার প্রথম বিয়ে হয় শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে শায়খ আবদুল গণী (র)-এর কন্যার সাথে। তার পুত্র শায়খ মু'আযযম ছিলেন বিখ্যাত, প্রভাবশালী ও সম্মানিত বুযুর্গ। বীরত্বের মহান রত্নের অধিকারী। তার থেকে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে।

শাহ সাহেব (র) স্বীয় পিতা শাহ আবদুর রহীম (র)-এর ভাষ্য বর্ণনা করে লিখেন, জনৈক রাজার সঙ্গে শায়খ মানসূরের যুদ্ধ হয়। সৈন্যবাহিনীর ডান অংশ শায়খ মু'আযযমের নেতৃত্বে অর্পণ করা হয়। সে সময় তার বয়স ছিল বার বছর। কঠিন যুদ্ধ হয়। উভয়পক্ষের অনেক লোক মৃত্যুবরণ করে। ইত্যবসরে শায়খ মু'আযযমের কাছে এসে কেউ একজন বলেন, তার পিতা শায়খ মানসুরপুরী শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন এবং ইসলামী সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়েছে। এ কথা শুনে তার ইসলামী মূল্যবোধ এবং ফারুকী চেতনায় নাড়া দিয়ে ওঠে। তিনি নির্ভীকভাবে শত্রুসেনাদের ভিতরে ঢুকে পড়েন। কাতারের পর কাতার তছনছ করে অত্যন্ত কষ্টের পরে রাজার হাতি পর্যন্ত পৌঁছে যান। একজন শক্তিধর শত্রু সেনাপতি সম্মুখে এগিয়ে আসে। তিনি তরবারীর এক আঘাতে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেন। তার

সঙ্গীরা শায়খ মু'আযযমকে তার ঘোড়া থেকে নিচে নামিয়ে ফেলে। লোকজন ঘিরে ফেলে তাকে। রাজা সবাইকে ধমকান এবং নিবৃত করেন। বলেন, এমন একজন তরুণ এত বড় বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখালো, এতো যুগের মহাবিস্ময়! রাজা তাঁর দু'হাত টেনে চুমু খান এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে ছেড়ে দেন। জানতে চান, এত রাগ কেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি জানতে পেরেছি আমার মুহতারাম পিতা শহীদ হয়ে গেছেন। আমি মনস্থ করেছি, আক্রমণ করব এবং শত্রুপক্ষের সেনাপতিকে বধ না করা পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলব না। আমি শপথ করেছিলাম, হয়ত হত্যা করব, না হয় শাহাদাত বরণ করব। রাজা বললেন, যে তোমাকে এই সংবাদ দিয়েছে, সে মিথ্যা বলেছে। তোমার পিতা জীবিত আছেন। ঐ তো তার ঝাণ্ডা দেখা যাচ্ছে। তখন রাজা কাউকে শায়খ মানসুরের কাছে বলে পাঠাল, আমরা এই ছেলের খাতিরে সন্ধি করব। সুতরাং যা কিছু প্রস্তাব করা হয়, সবই তারা মেনে নেয় এবং ফিরে যায়।

শাহ সাহেব (র) তার মুহতারাম পিতার উদ্ধৃত শেকওয়াপুর (যেখানে শায়খ মু'আযযম (র) -এর আত্মীয়তা ছিল)-এর একটি জীবন্ত ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। একবার ত্রিশজন ডাকাত এ গ্রামের বকরীর পাল লুট করে নিয়ে যায়। তখন সেখানে শায়খ মু'আযযম একা ছিলেন। তার আত্মীয়-স্বজন ও সন্তানদের কেউ সেখানে ছিল না। তিনি যখন এ ঘটনা জানতে পারেন, তখন সামনে বিছানো ছিল দস্তরখানা। খাবারও দেওয়া হয়েছিল। তিনি কোনও প্রকার তাড়াহুড়ো ও অস্থিরতা প্রকাশ করেননি। পুরোপুরি স্বস্তির সাথে যথারীতি খাবার খেয়ে শেষ করে হাত ধুয়ে নেন। এরপর বলেন, আমার হাতিয়ার ও ঘোড়া নিয়ে এসো। যখন অশ্বারোহণ করেন, তখন জামিনদারদের কেউ কেউ অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সঙ্গে যেতে চাইলেন। তিনি সকলকে বাঁধা দিয়ে বলেন, আমি এত দ্রুততার সাথে যাব, তোমার আমার ঘোড়ার আশপাশেও যেতে পারবে না। অবশ্য এই ঘটনার বর্ণনাকারী, যিনি দৌঁড়ানোয় ঘোড়ার সমতূল্য ছিলেন, তাকে সঙ্গে নিয়ে যান। যেন তিনি ঘটনার বিবরণ দিতে পারেন। এরপর দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে সেসব ডাকাতকে ঘেরাও করেন, তারা কয়েক মনযিল অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাদের উত্তেজিত করে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ করেন এবং তীর নিক্ষেপ শুরু করেন। তার নিক্ষেপণ শক্তি ও তীর নিক্ষেপণ দেখে ঐ ডাকাতদলের উপর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ডাকাতদল আবেদন করে, আমরা তাওবা করছি। আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। শায়খ বলেন, তোমাদের তাওবা হচ্ছে, তোমরা তোমাদের অস্ত্র ত্যাগ কর। প্রত্যেকেই একে অন্যের হাত ধর। এভাবেই বকরী পাল, অস্ত্রশস্ত্র ও হাতকড়া পরিহিত অবস্থায় ডাকাতদেরকে ঐ গ্রাম পর্যন্ত নিয়ে আসেন।

তাদের ধর্মানুসারে তাদের থেকে শপথ নেন– এ গ্রামের প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করবে না। তারা এ শর্ত পুরোপুরি রক্ষা করে।

শায়খ মু'আযযমের ঘরে সাইয়িদ নূরুল জাব্বার সোনাপতির কন্যা থেকে তিন পুত্র জন্ম নেয়। শায়খ জামাল, শায়খ ফিরুজ ও শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন, যিনি শাহ সাহেবের প্রকৃত দাদা ছিলেন।

শাহ্ সাহেবের দাদা শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন শহীদ

শাহ সাহেব তার আপন দাদা শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন শহীদ (র)-এর অবস্থা কিছুটা বিশদভাবে লিখেছেন। তিনি বলেন, তার মধ্যে তাকওয়া ও বীরত্ব উভয় গুণই বিদ্যমান ছিল। মুহতারাম পিতা (শাহ আবদুর রহীম) বলেছেন, আমার পিতা (শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন) রাতদিনে কুরআনে কারীমের দুই পারা পড়ার ওযীফা নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। সফরে-বাড়িতে (ঘরে-বাইরে) এবং চৈতন্য-ক্লান্তি সর্বাবস্থায় তা পূর্ণ করতেন; কখনই পরিত্যাগ করতেন না। যখন বয়স বেড়ে যায় এবং দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়, তখন বড় ছাপার একটি কুরআনে কারীম সঙ্গে রাখতেন। সফরেও সেটি নিজের কাছ থেকে পৃথক করতেন না। তিনি আরও বলেন, তিনি কখনও নিজের ঘোড়াকে অন্যের খেত-খামারে প্রবেশ করতে দিতেন না। চাই সকল সৈন্য ফসলের ক্ষেতে ঘোড়া দৌড়াক। অনেক সময় এ কারণে সচরাচর রাস্তা ছেড়ে কষ্ট করে চলতেন।

তিনি আরও বলেন, কোনও যুদ্ধে যদি রসদপত্র কম হয়ে যেত এবং পানাহার সামগ্রীর ব্যবস্থা না হত, তাহলে সঙ্গীরা গ্রামের বকরী পাল জোর করে ধরে তার দ্বারা নিজের খাবারের ব্যবস্থা করত। কিন্তু তিনি এ কাজ থেকে বেঁচে থাকতেন। যখন দু'তিন দিন অনাহারে কেটে যেত এবং আহার্যের প্রার্থনা করা হত, তখন প্রকৃত রাযযাক রিযিকের ব্যবস্থা করে দিতেন। অনেক সময় তিনি চিন্তামগ্ন থাকতেন। মাটিতে বেত্রাঘাত করতেন। সেখান থেকে কিছু খাবার বেরিয়ে আসত। তিনি তা ধুয়ে মুছে পবিত্র করে ভিজিয়ে আহার করতেন। শাহ আব্দুর রহীম বলতেন, আমার পিতা তার সহকর্মী এবং ভূষিবিক্রেতার সাথেও এমন নম্র-ভদ্র ও ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করতেন, বড় বড় মুত্তাকীদের মধ্যেও এরূপ কম দেখা গেছে। তিনি আরও বলতেন, এক সফরে তিনি কতিপয় আছারে বেলায়েত তথা অলীত্বের নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন, বায়'আত করেছেন এবং ওয়ালীসুলভ ব্যস্ততায় নিমগ্ন ছিলেন। কম কথা বলা ও কম ঘুমানোকে (যা বিশিষ্ট সুফীদের নিদর্শন) নিজের আদর্শ বানিয়ে নেন এবং তা এমনভাবে মেনে চলেন, যা তৎকালীন সুফীদের মাঝেও কম পাওয়া যায়।

শাহ সাহেব বলেন, আব্বাজান তার বীরত্বের কথা প্রায়ই বলতেন। এ স্থানে শাহ সাহেব তার আব্বাজানের উদ্ধৃতি দিয়ে তার উজ্জ্বল বীরত্ব ও নির্ভীকতার একাধিক ঘটনা লিখেছেন। অনেক সময় তিনি একাই পুরো শত্রুদলের মোকাবেলা করেছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় সৈনিক হিসেবে মালূহ পর্যন্ত চলে যেতেন। তিনি সমকালের ভালো ভালো অশ্বারোহী ও রক্তখেকোদের মোকাবেলা করেছেন। অনেক সময় নিজের সঙ্গীসাথী ও অফিসারদের, যারা শত্রুকবলিত হয়ে পড়ত, তাদেরকে সম্মুখ বিপদ বা সাক্ষাৎ মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছেন। একবার তিনি তিন যুদ্ধবাজ বেপরোয়া জঙ্গীকে পদদলিত করেন। তিনি সমর কৌশল ও নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্বে স্বকীয়তার অধিকারী ছিলেন।

সমরসঙ্গী হিসেবে তিনি বাদশাহ আলমগীরের সহচর ছিলেন। যখন শাহ সুজা বাংলা আগমন করেন, তখন তিনি আলমগীরের সৈন্য ছিলেন। তিনি তখন বিরাট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। অনুগ্রহকারীর সাথে পুরোপুরি কৃতজ্ঞ ও দৃঢ়তার প্রমাণ দেন। তার বীরত্বে উক্ত যুদ্ধে আলমগীরের বিজয় হয়। বাদশা এই জয়লাভের পর তার পদোন্নতি দানের মনস্থ করেন। তিনি অমুখাপেক্ষিতার দৃষ্টিতে তা গ্রহণ করেননি। মাঝে মধ্যে তিনি তার খাস শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু ও প্রিয়জনদের সঙ্গে নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতার দাবী পূরণ করতেন। স্বয়ং দুঃখ-যাতনা নিয়ে তাদের সাহায্য করতেন। শাহ আবদুর রহীম সাহেব (র) তার আত্মিক শক্তি, উচ্চ সাহস, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বহু ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সেই সাথে তার মহানুভবতা, উদারতা, মনজয় এবং দুঃস্থ-অসহায়দের পৃষ্ঠপোষকতার ঘটনাও লিখেছেন।

শায়খ ওয়াজীহুদ্দীনের বিয়ে হয় শায়খ রফীউদ্দীন মুহাম্মদের বোন নেক আখতারের সঙ্গে। শায়খ রফীউদ্দীন ছিলেন কুতুবুল আলমের সন্তান। তিনি হলেন শায়খ আবদুল আযীয শোকরবারের সন্তান। (যিনি ছিলেন প্রবীণ মাশায়িখে চিশতিয়ার একজন। শায়খ কাযী খান যাফর আবাদী ও শায়খ তাজ মাহমূদ জৈনপুরী থেকে চিশতিয়া তরীকার অনুমতিপ্রাপ্ত। বিনয়-নম্রতার আদর্শ প্রতীক। উচ্চ গুণাবলি ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী। ওহদাতুল উজুদের রহস্যবৃত্তা। চিঠিপত্রে নিজের নামের সঙ্গে 'যাররায়ে নাচীজ' বা তুচ্ছ অনু লিখতেন।) তার ঔরষে তিন পুত্রের জন্ম হয়। শায়খ আবুর রযা মুহাম্মদ, শায়খ আবদুর রহীম এবং শায়খ আবদুল হাকীম।

শায়খ আবদুর রহীম সাহেব বলেন, আমার আব্বাজান (শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন) এক রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়ছিলেন। এক সিজদায় এত দীর্ঘসময় কপাল মাটিতে লুটিয়ে রাখেন যে, মনে হল হয়ত তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। এরপর যখন তিনি মাথা উঠালেন, তখন তার কাছে এত

দীর্ঘসময় নিশ্চুপ সিজদাবনত হয়ে পড়ে থাকার ব্যাপারে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন, গাইবূবাত (অদৃশ্যতা)-এর অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তাতে শহীদের মর্যাদা ও প্রতিদানের অবস্থা জেনেছি। আমি মহান আল্লাহর কাছে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করেছি। এ ব্যাপারে এত অনুনয়-বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করেছি যে, তা কবুল হওয়ার সুস্পষ্ট আভাস পেয়েছি। দক্ষিণ দিক থেকে ইরশাদ হয়েছে, সেটিই হবে শাহাদাতের স্থান।

মুহতারাম আব্বাজান বলেন, এই ঘটনার পর যদিও তিনি সৈনিকের চাকুরী ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং এই পেশার সাথে মানসিক বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, তথাপি তিনি নতুন করে সফরের আয়োজন করেন। তিনি ঘোড়া ক্রয় করেন এবং দক্ষিণের পথে যাত্রা করেন। তার ধারণা ছিল, এ ঘটনা সেওয়ারায় সংঘটিত হবে, যা তৎকালীন ইসলামী রাজত্বের সীমানার বাইরে ছিল। সেখানকার শাসক মুসলমানদের বিচারকের সাথে নেহায়েতই দুর্ব্যবহার করে। কিন্তু বোরহানপুর পৌঁছে বুঝতে পারলেন, শাহাদাতের স্থান পিছনে ফেলে এসেছেন। সেখান থেকেই ফিরে আসতে চাইলেন। পথিমধ্যে কিছু বণিক সহযাত্রী হয়, তাদেরকে দেখে নেককার আল্লাহভীরু মনে হচ্ছিল। ক্ষুদ্র শহর হিণ্ডিয়া থেকে ভারতে ফিরে আসতে চাচ্ছিলেন তিনি। একদিন বর্ষিয়ান এক ব্যক্তিকে আছড়ে পড়ে পালিয়ে যেতে দেখলেন। তার অবস্থাদৃষ্টে আমার আব্বাজানের মনে দয়া হল। তিনি তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, আমি দিল্লী যেতে চাই। সে আরও বলল, দৈনিক তিন পয়সায় আমাকে কর্মচারী হিসেবে নিয়ে নিন। ঐ বৃদ্ধ আসলে কাফিরদের গুপ্তচর ছিল। যখন নওবাযিয়ার সরাইখানায় পৌঁছেন, তখন সেই গুপ্তচর তার দোসরদের খবর দেয় বণিকদের কাফেলা সেখানে অবস্থান করছে। বড় একদল ডাকাত উক্ত সরাইখানায় আসে। শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন সে সময় কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে দু'তিনজন লোক এগিয়ে এসে বলে, ওয়াজীহুদ্দীন কে? তিনি বলেন, আমি। তারা বলল, তোমাকে দিয়ে আমাদের কোনও কাজ নেই। আমরা জানি, তোমার কাছে কোনও ধন-রত্ন নেই। তাছাড়া আমাদের দলের একজনের উপর তোমার নিমকের হকও আছে। কিন্তু এসব বণিককে আমরা ছাড়ব না। তাদের কাছে ধন-সম্পদ আছে। যেহেতু আব্বাজানের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল এ সফর দ্বারা শাহাদাত লাভ করা, তাই তিনি তাদের সঙ্গ ছাড়তে রাজি হলেন না। আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তিনি বাইশটি আঘাত খান। শেষ আঘাতে দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত মুখে তাকবীর চলতে থাকে। কিছু সময় কাফিরদের ধাওয়াও করেন। অবশেষে

এক স্থানে গিয়ে নিথর হয়ে পড়ে যান এবং প্রাণবায়ু উড়ে যায়। সমাহিত হন সেখানেই। আল্লাহ তা'আলা শাহ আবদুর রহীম সাহেবকে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করান। তিনি দেখলেন, শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন তার ক্ষতস্থান দেখাচ্ছেন। শাহ সাহেব পবিত্র দেহকে স্থানান্তরিত করার মনস্থও করেন। কিন্তু অদৃশ্য ইংগিত তাদের এ কাজ থেকে বিরত রাখে।

শাহ্ সাহেবের নানা শায়খ মুহাম্মদ ফুলতী

শাহ সাহেবের নানা ছিলেন শায়খ মুহাম্মদ ফুলতী (র)। তার বংশের প্রথম বাসস্থান ছিল সাদধূর। সুলতান সিকান্দার লোদীর শাসনামলে এই বংশ ফুলত-এ স্থানান্তরিত হয়। তার মুহতারাম পিতার নাম শায়খ মুহাম্মদ আকেল। তিনি শৈশব থেকে ছিলেন অত্যন্ত নেককার এবং সম-সাময়িক বুযুর্গানে দীন ও সুহৃদ ব্যক্তিদের দৃষ্টিনন্দিত। হযরত সাইয়িদ আদম বানূরীর খলীফা শায়খ জালাল তার শুভজন্মের প্রেক্ষিতে তার উচ্চমর্যাদার সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি প্রথমে শিক্ষাগ্রহণ করেন শাহ সাহেবের চাচা শায়খ আবুর রযা মুহাম্মদ ইবনে শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন থেকে। তারপর শায়খ আবদুর রহীম সাহেবের কাছে গমন করেন। তার সাথে তার বিরাট সাদৃশ্যতা মনে হয়েছে। সেখান থেকে ইলম অর্জন করে পুনরায় ফুলত-এ ফিরে আসেন। খরচ ও বদান্যতা, আত্মত্যাগ ও দুনিয়া বিমুখতায় ছিলেন তিনি উচ্চপর্যায়ে। তীক্ষ্ম প্রভাব ও ইরশাদের অধিকারী ছিলেন। শাহ সাহেব তার আপন পিতা ও উস্তাদ শাহ আবদুর রহীম সাহেবের সঙ্গে তার আনুগত্য, আস্থা-বিশ্বাস, অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টির একাধিক ঘটনা লিখেছেন। তিনি শাহ সাহেব থেকে ইযাযতও পেয়েছেন। তার পুত্র ছিলেন শায়খ উবায়দুল্লাহ। যিনি শাহ সাহেবের মামা ও শ্বশুর এবং শাহ্ সাহেবের শীর্ষ খলিফা হযরত শায়খ মুহাম্মদ আশেক ফুলতী (র)-এর সম্মানিত পিতা। শাহ সাহেব হযরত শায়খ মুহাম্মদ ফুলতী (র)-এর তাছীর ও প্রভাবশক্তি, উপকারিতা, ফয়েয-বরকতের বহু ঘটনা লিখেছেন। শায়খ মুহাম্মদ (র)-এর ইন্তিকাল হয় ৮ জমাদিউস সানী ১১২৫ হিজরী সালে।

শাহ্ সাহেবের সম্মানিত চাচা শায়খ আবুর রযা মুহাম্মাদ

হযরত শায়খ আবুর রযা মুহাম্মাদ হযরত শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন (র)-এর বড় ছেলে ও শাহ্ সাহেবের বড় চাচা। শাহ সাহেব 'আনফাসুল আরেফীন' গ্রন্থে স্বীয় মুহতারাম পিতার পরে তার পৃথক আলোচনা করেছেন। ভূষিত করেছেন তাকে 'ইমামুত তরীকত ওয়াল হাকীকত' -এর মত উচ্চাঙ্গের উপাধিতে। (যদিও তিনি সমসাময়িক উস্তাদদের থেকে শিক্ষা লাভ

করেছিলেন তথাপি) শাহ সাহেবের মতে তার সিংহভাগ জ্ঞান-বিদ্যা ছিল আল্লাহ প্রদত্ত। তিনি আপন পিতার অনুমতি ও ইংগিত পেয়ে এক আমীরের দরবারে যাতায়াত শুরু করেছিলেন। হঠাৎ আল্লাহর অনুগ্রহের সূক্ষ্মশক্তি তাকে এ কাজ হতে বিরত রাখে। তিনি তাজরীদে তাম (পুরোপুরি দুনিয়াবিমুখতা)' পূর্ণাঙ্গ তাওয়াক্কুল এবং সুন্নাতের অনুসরণকে নিজের আদর্শ বানিয়ে নেন। পুণ্যবতী স্ত্রীকেও إن كنتم تردن الحيوة الدنيا وزينتها এর আমল করতঃ স্বাধিকার দেন যে, যদি অভাব-অনটন সইতে পার, তবে আমার সাথে থাক। নতুবা বাপের বাড়ি চলে যেতে পার। তিনিও (অর্থাৎ তার স্ত্রীও) পুণ্যবতী রমণী উম্মাহাতুল মুমিনীনের সুন্নাতের উপর আমল করতঃ দারিদ্র ও দৈন্যতাকেই প্রাধান্য দেন। ত্যাগ করেননি বুযুর্গ স্বামীর সাহচর্য। অনাহারে তাদের প্রায়ই কেটে যেত দু'তিনদিন। সাইয়িদুনা আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর সাথে ছিল তার বিশেষ সম্পর্ক। সাইয়িদুনা আলী মুর্তাযা (রা)-এর প্রতি ছিল অকৃত্রিম মহব্বত ও বিশেষ হৃদ্যতা। বাদশা আলমগীর একাধিকবার তার যিয়ারতের মনস্থ করেন। কিন্তু তিনি অনুমতি দেননি। ধনিক শ্রেণী ও রাজন্যবর্গের প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ ছিল না তার। তবে মুচি, জুতা প্রস্তুতকারক, পেষণকারী এবং এ জাতীয় পেশাজীবীদের প্রতি বেশ লক্ষ্য রাখতেন। তাদের কেউ যদি চার-পাঁচ রুপিয়া হাদিয়া হিসাবে দিত, তা অত্যন্ত সানন্দে গ্রহণ করতেন।

শাহ সাহেব তার পরিচিতিতে قوى العلم، فصيح اللسان، عظيم الورع و سيع المعرفة তথা বিজ্ঞ জ্ঞানী, প্রাঞ্জলভাষী, বাগ্মী, বিরাট সংযমী ও সুবিখ্যাত প্রভৃতি শব্দ চয়ন করেছেন। তিনি ছিলেন সুদর্শন, দীর্ঘকায়, বাদামী রঙের, হালকা শ্মশ্রুমণ্ডিত ও মিষ্টভাষী। সাধারণতঃ জুমু'আর নামাযের পর ওয়াজ-নসীহত করতেন। তিনটি মৌলিক হাদীস শোনাতেন। এরপর ফার্সীতে আর তারপর হিন্দীতে সেগুলোর তরজমা করতেন। হাদীসগুলোর মর্মার্থ নিয়ে আলোচনা করতেন। তবে মিতাচার ও সংক্ষিপ্ততার সাথে। প্রথমে সকল শাস্ত্রের একটি করে কিতাব পড়াতেন। তার আলোচনা শোনার জন্য অনেক মানুষ সমবেত হয়ে যেত। সবশেষে দু'টি পাঠ সম্পন্ন হতো। একটি বাইযাবী শরীফের; অপরটি মেশকাত শরীফের। তিনি ছিলেন ওয়াহদাতুল উজূদের প্রবক্তা এবং এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। সূফীদের সম্পর্কিত মালফূযাতের চমৎকার ব্যাখ্যা দিতেন। মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ ছিলেন। তার যে কোন দু'আ কবুল হত। শাহ সাহেব তার খোদাপ্রেম ও স্বকীয়তার অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অত্যধিক যত্নবান ছিলেন সুন্নাত পরিপালনে। আরেফসুলভ বা

এশকের দু'টি হিন্দি কবিতা মাঝে মধ্যেই পড়তেন। শাহ সাহেব তার কাশ্ফ ও কারামতের একাধিক ঘটনাও লিখেছেন। তার 'মালফূযাত' বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত বিশদভাবে। যেগুলো বুঝা এবং তা থেকে উপকৃত হওয়াও এ যুগে কঠিন কাজ। এজন্য সেগুলো বর্জন করা হয়েছে। শেষ সময়ে তার বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ-ষাটের মাঝামাঝি। ১৭ মহররম ১১০১ হিজরী সালে আসর নামাযের পর তিনি পরপারে যাত্রা করেন।

সম্মানিত পিতা হযরত শাহ আবদুর রহীম

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত শাহ আবদুর রহীম সাহেবের অবস্থা, যোগ্যতা-পূর্ণতা ও কারামত সম্পর্কে একটি দীর্ঘ গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার আরবী নাম 'বাওয়ারিকুর ওলাইয়াহ' আর প্রসিদ্ধ নাম 'আনফাসুল আরেফীন'। একজন সুযোগ্য পুত্রের কলমে আরেক সুযোগ্য পিতার জীবন-চরিত নিয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ এবং দায়িত্বশীলতার সাথে পৃথক একটি গ্রন্থ রচনার খুব একটা দৃষ্টান্ত ইসলামের শিক্ষা-ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী (র) স্বরচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'তবাকাতুশ শাফি'আতিল কুরবা'তে আপন মুহতারাম পিতা আল্লামা শায়খ তাকীউদ্দীন সুবকী (র)-এর বিশদ জীবন-চরিত আর পরবর্তীদের গৌরব আবুল হাসান মাওলানা আবদুল হাই সাহেব ফিরিঙ্গী মহল্লী বিরচিত তার সম্মানিত পিতা মাওলানা আবদুল হালীম লাখনৌবীর অবস্থা সম্পর্কে স্বতন্ত্র পুস্তিকা 'হাছরাতুল আলম বি-ওফাতি মারজাইল আলেম' কে উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করা যায়।

এ গ্রন্থে বেশিরভাগ সেসব অবস্থা ও ঘটনাবলি চয়ন করা হয়, যাতে তার ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। যেগুলোর দ্বারা তার শিক্ষাগত, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উচ্চতার কিছুটা অনুমান করা যায়। স্বয়ং শাহ সাহেবের জীবন, দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা ও রুচি গঠনে তিনি যে মৌলিক কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কাশফ-কারামত, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞতা ও উন্নতির (যার সাথে সেই খাছ যুগ এবং স্মারক রচয়িতার বিশেষ সম্পর্ক ছিল) তত বেশি আলোচনা করা হবে না। কেননা সেসব বুঝা ও অনুধাবন করা এ যুগের মানুষের জন্য কষ্টসাধ্য। এর জন্য মূলগ্রন্থের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। এখানে কেবলমাত্র সংক্ষেপে এতটুকু লিখা জরুরী যে, শাহ সাহেবের জীবন-চরিত এক সুউচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তি এবং জন্মগত ও বাতেনি যোগ্যতা প্রমাণ করে। স্মরণ করিয়ে দেয় প্রবীণ ওয়ালীআল্লাহগণের কথা— যাদের যোগ্যতা অত্যন্ত শক্তিশালী, সময় খুবই সহায়ক আর পরিবেশ শুধু মনোহারীই নয় বরং তা ছিল আগ্রহ-উদ্যম ও প্রেরণা সৃষ্টিকারী;

كل يوم هو فى شان

আয়াতে কারীমা অনুযায়ী এ ময়দানের আল্লাহ তা'আলার কুদরত, তার শিক্ষাদীক্ষা ও তার তাজাল্লীর বহিঃপ্রকাশ এবং

كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا

(এদের ও তাদের সকলকে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহদানে পরিপূর্ণ করে দেই। আর তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ-দান কারও উপর থেকে অবরুদ্ধ নয়) এর ব্যাখ্যা।

শাহ আবদুর রহীম সাহেবের নানা (যিনি স্বয়ং উচ্চ স্তরের বুযুর্গ ছিলেন) শায়খ রফীউদ্দীন (র) তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে নিজের ধন-সম্পদ আপন ওয়ারিছদের মাঝে বণ্টন করে দেন। নিজের সন্তানদের মধ্যে প্রত্যেককে তার অবস্থা অনুযায়ী সম্পদ দেন। শাহ আবদুর রহীম সাহেব (র)-এর আম্মা ছিলেন তার সর্বকনিষ্ঠা সন্তান। তার পালা এলে তাকে তরীকতের ফাওয়ায়েদ, অযীফা ও মাশায়িখদের শাজারা (বংশতালিকা) দান করলেন। শাহ রফীউদ্দীন সাহেবের মুহতারামা সহধর্মিনী বলেন, তখনও এই কিশোরীর বিয়ে হয়নি। তাকে জাহীয (উপহার) এর দ্রব্যসামগ্রী দেওয়ার প্রয়োজন ছিল; এসব কাগজপত্র নয়। তিনি বলেন, এসব কাগজপত্র আমি আমার বড়দের থেকে মিরাছ হিসেবে পেয়েছি। এই কিশোরীর একটি পুত্র সন্তান হবে, যে আমাদের এই বাতেনী ও আধ্যাত্মিক মিরাছের উপযুক্ত প্রমাণিত হবে। আর জাহীয ও বিবাহ সামগ্রীর ব্যাপার? আল্লাহ তা'আলাই এসবের ব্যবস্থা করবেন। এ নিয়ে আমার ভাবনা নেই। শাহ আবদুর রহীম সাহেব বলেন, আমি জন্মগ্রহণের পর যখন কিছুটা সেয়ানা হলাম, তখন আমার নানী এই সম্পদ আমাকে হস্তান্তর করেছিলেন। আমি এর দ্বারা উপকৃত হয়েছি। শাহ আবদুর রহীম সাহেবের জন্ম সন সুস্পষ্টভাবে কোথাও পাওয়া যায় না। তবে যেহেতু তিনি ১১৩১ হি. সনে ইন্তিকাল করেছেন এবং বয়স ৭৭ বছর হয়েছিল, তাই বুঝা যায় তার জন্ম সন ১০৫৪ হিজরীই হবে। শাহ আবদুর রহীম সাহেবরা ছিলেন তিন ভাই। শায়খ আবদুর রযা মুহাম্মদ, শায়খ আবদুল হাকীম এবং শাহ আবদুর রহীম। তিনি বলেন, আমি শৈশবকালেই মাথায় পাগড়ি বেঁধে নম্রভাবে বসতাম। আমার মামা শায়খ আবদুল হাই, যিনি স্বয়ং বুযুর্গ মানুষ ছিলেন, তিনি এটা দেখে খুশি হতেন এবং বলতেন, তাকে দেখে সত্যি মনে হয়, পূর্বপুরুষের এই রত্ন আমাদের বংশে অটুট থাকবে। পৌত্ররা না পেল তাতে কি? দৌহিত্র তো তার ধারক ও রক্ষক হবে।

শাহ আবদুর রহীম সাহেবের মন-মানসিকতা শৈশব থেকেই দীনের প্রতি আকৃষ্ট এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সম্মান থেকে বিমুখ ছিল। যদি কোন বুযুর্গ এমন কোন অযীফা বলে দিতে চাইতেন, যার দ্বারা দুনিয়ার কোনও উদ্দেশ্য অর্জিত হয়, সেদিকে তিনি কর্ণপাত করতেন না। বলতেন, আমার এসবের প্রয়োজন নেই। নকশেবন্দি এক বুযুর্গ খাজা হাশেম। তিনি বুখারা থেকে এসে শাহ সাহেবের এলাকায় বসবাস করতেন। তিনি তার এই মানসিকতা দেখে তাকে ইস্তিকতাবের তরীকা তালকীন করেন (অর্থাৎ মাশায়িখগণ হৃদয়-মানসপটে আল্লাহর নাম অঙ্কিত করার জন্য কাগজের উপর ইসমে যাত আল্লাহ শব্দটি প্রচুর পরিমাণে লেখাতেন। যেন তা মস্তিষ্কে গেঁথে যায়। এটি আল্লাহ তা'আলার স্মরণের জন্য একটি চিকিৎসা পদ্ধতি)। শাহ সাহেব বলেন, আমার উপর এটি এতই প্রভাব বিস্তার করে যে, আমি মোল্লা আবদুল হাকীম রচিত (শরহে আকয়েদ সম্পর্কিত) হাশিয়ার অনুলিপি তৈরী শুরু করেছিলাম। পূর্ণ এক খণ্ডে ইসমে যাত লিখে ফেলেছি। অথচ আমার কোনও খেয়ালই হয়নি।

শাহ সাহেব হযরত বাকী বিল্লাহর পুত্র শায়খ আবদুল্লাহ ওরফে খাজা খোর্দ -এর খেদমতে হাজির হতেন। তিনি অনেক বড় আরেফ ছিলেন। কতিপয় অদৃশ্য ইংগিত এবং আধ্যাত্মিক সুসংবাদের ভিত্তিতে তিনি তার কাছে বায়'আতের দরখাস্ত করেন। তিনি হিতাকাঙ্ক্ষীসুলভ পরামর্শ দিলেন, সাইয়িদ আদম বিনূরী (র)-এর খলীফাদের মধ্য হতে কোনও শায়খ, যিনি শরীয়ত পরিপালন, দুনিয়াবিমুখতা ও আত্মশুদ্ধিতে দৃঢ়পদ রয়েছেন, তার হাতে বায়'আত হয়ে যাও। আমি বললাম, আমাদের পাশেই হযরতের খলীফাদের মধ্যে হাফিয সাইয়িদ আবদুল্লাহ তাশরীফ রাখেন। তিনি বললেন, বিরাট গণিমত! শীঘ্রই তার কাছে বায়'আত হয়ে যাও। আমি তার খেদমতে হাজির হলাম। অবশ্য তখন তার উপর আত্মহারা, আত্মবিস্মৃতি ও গোপনীয়তার অবস্থা প্রাধান্য ছিল। তিনি প্রথম আবেদনেই বায়'আত করে নেন। আমি খাজা খোর্দ এবং সাইয়িদ আবদুল্লাহ -এর খেদমতে হাজির হতে থাকি। তার সংশ্রবের বরকতে উপকৃত হই। হাফিয সাইয়িদ আবদুল্লাহ (র)-এর দৃষ্টি ও আল্লাহর অদৃশ্য ইংগিত শাহ আবদুর রহীম সাহেবের প্রতি ছিল। একবার তিনি বলেন, তুমি বাচ্চা শিশু ছিলে আর শিশুদের সাথেই খেলা করছিলে। আমার মন তোমার প্রতি নিবিষ্ট হয়। আমি দু'আ করলাম, 'হে আল্লাহ! তুমি এই শিশুকে ওয়ালীদের অন্তর্ভুক্ত করো। তার কামাল ও পূর্ণতা আমার হাতে যেন প্রকাশ পায়।' আলহামদুলিল্লাহ! সেই দু'আর সুফল প্রকাশ পেয়েছে।

শিক্ষা

শাহ আবদুর রহীম সাহেব ছোট বই-পুস্তক থেকে নিয়ে শরহে আকাইদ ও হাশিয়া খিয়ালী পর্যন্ত আপন বড় ভাই আবুর রযা মুহাম্মদের কাছে পড়েছেন। বাকী কিতাবাদি অধ্যয়ন করেছেন মির্যা যাহেদ হারবী ওরফে মির্যা যাহেদের কাছে। তিনি বলতেন, আমি 'শরহে মাওয়াকিফ' এবং উসূলের সকল কিতাব মির্যা যাহেদের কাছে পড়েছি। আমার প্রতি তার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এমনকি আমি যদি বলতাম, আজ আমি মুতালা'আ করিনি। তখন বলতেন, দু'এক লাইন পড়ে নাও। যেন বাদ না যায়। হাশিয়া খিয়ালী ইত্যাদির কঠিন স্থানগুলোতে খাজা খোর্দের শরণাপন্ন হয়েছি এবং ভালভাবে তা হৃদয়াঙ্গম হয়েছে। অনেক সময় এমন হয়েছে, কোন কিতাবের প্রথমাংশ পড়েছেন আর শেষ পর্যন্ত তার দরস দিয়েছেন। খাজা খোর্দ ছিলেন শাহ আবদুর রহীম সাহেবের নানা শায়খ রফীউদ্দীন (র)-এর শিষ্য। খাজা খোর্দ তার থেকে শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতা উভয় ধরনের উপকারিতা লাভ করেছেন। তাই তিনি তার সাথে বিশেষ সম্মানজনক আচরণ করতেন।

হাফিয সাইয়িদ আবদুল্লাহ্ ইন্তিকালের পর শাহ আবদুর রহীম সাহেব 'আবুল আলাইয়্যাহ ইহরাবিয়্যাহ' সিলসিলার এক সুউচ্চ বুযুর্গ খলীফা শায়খ আবুল কাসেম আকবরাবাদীর শরণাপন্ন হন। আমীর নূর আল আলার কাছ থেকেও উপকৃত হন। খলীফা আবুল কাসিম শাহ সাহেবকে এজাযতও দেন। খলীফা সাহেব শাহ আবদুর রহীম সাহেবের সম্মান এবং তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন আরেকটি কারণেও। তা হল, শাহ আবদুর রহীম সাহেবের নানা শায়খ আবদুল আযীয শোকরাবাদীর সাথেও তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

শাহ সাহেব 'আনফাসুল আরেফীন' গ্রন্থে শাহ আবদুর রহীম সাহেবের সমকালের মাশায়িখ, আউলিয়া ও আত্মহারাদের সাথে সাক্ষাৎ, তাদের খাস দৃষ্টির অনেক ঘটনা লিখেছেন। সে যুগ যেন আত্মবিস্মৃতি, আধ্যাত্মিকতা, সূলুক, আল্লাহর তলব, আল্লাহ প্রেম ও দরবেশীর বসন্তকাল ছিল। এমন সব মহান ব্যক্তিত্বের প্রাচুর্য ছিল, যারা ছিলেন তজ্জন্য অধীর আগ্রহী; আত্মিক ও বাতেনী কামালাতে (পূর্ণাঙ্গতায়) সুশোভিত। তিনি শাহ সাহেবের উপর খাছ দৃষ্টি দেন। তার সাথে ছিল শাহ সাহেবের সুসম্পর্ক। শাহ সাহেব হযরত শাহ আবদুর রহীম সাহেবের 'কাশফে আরওয়াহ' (রূহ উন্মোচন) ইত্যাদির বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। যার দ্বারা তার বাতেনী শক্তির অনুমান করা যায়। তদ্রূপভাবে তার সম্মান ও কারামতের ঘটনাবলিও লিখেছেন। অনন্তর তার মালফূযাতের অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এতে তার অন্তদৃষ্টি, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষাগত উচ্চ যোগ্যতা অনুমিত হয়।

শাহ সাহেব বলেন, মুহতারাম আব্বাজানের আমল অধিকাংশ বিষয়ে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ছিল। তবে কোনও কোনও বিষয়ে হাদীস অনুসারে কিংবা নিজের লব্ধ জ্ঞান (উইজদান) থেকে অন্য কোন ফিকহী মাযহাবকেও প্রাধান্য দিতেন। এসব স্বকীয়তা বা ব্যতিক্রমের মধ্যে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ, জানাযার নামাযেও সূরা ফাতিহা পাঠের বিষয়টি রয়েছে।

অল্প বয়স থেকে খাজা খোর্দ সাহেবের দরবারে হাযির হওয়া, তার থেকে আত্মিক ও শিক্ষাগত উপকার লাভ, তার ব্যক্তিত্ব ও বাতেনী কামালাতে (যোগ্যতায়) প্রভাবিত হওয়া এবং খাজা আবুল কাসেম আকবরাবাদী থেকেও আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ ইত্যাদি (বলাবাহুল্য যে, খাজা আবুল কাসেম ছিলেন 'আবুল আলাইয়্যাহ' সিলসিলার ইযাজতপ্রাপ্ত বুযুর্গ। যিনি হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী এবং হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র) -এর মাধ্যম ছাড়াই খাজা উবাইদুল্লাহ আহরার ও নকশেবন্দী সিলসিলার প্রবীণ মাশায়িখদের মধ্যে গণ্য হতেন)। তাছাড়া তিনি আমীর নূরুল আলা ইবনে আমীর আবুল আলা আকবরাবাদী থেকেও উপকৃত হয়েছিলেন। এসব কারণে শাহ সাহেবের উপর 'ওয়াহদাতুশ্ শুহূদ' মতাদর্শে দৃঢ়পদ হযরত সাইয়িদ আদম বিন্নুরীর একান্ত নিসবত (সম্পর্ক) অপেক্ষা হযরত খাজা বাকীবিঁল্লাহ (র)-এর নিসবত প্রবল ছিল, যিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত 'তাওহীদে উজূদী' মতাদর্শের প্রবক্তা ছিলেন। আর একথা বলা মুশকিল যে, কার্যতঃ তার (সাইয়িদ আদম) থেকে একেবারে বিচ্ছিন্নতা ছিল। একথাও ভোলা যাবে না যে, তার নিকটতম মাতৃকুলের মধ্যে হযরত শায়খ আবদুল আযীয শোকরাবারও (মৃত্যু ৯৭৫ হি.) এসেছিলেন, যার উপর 'তাওহীদে উজূদী' এর প্রাধান্য ছিল।

এসব পৈত্রিক, বংশানুক্রমিক ও দীক্ষামূলক কারণে হযরত শাহ আবদুর রহীম সাহেব 'তাওহীদে উজূদ' -এর আগ্রহ এবং শায়খ আকবরের প্রতি শ্রদ্ধা-অনুরাগ আর তার জ্ঞান-গবেষণার ব্যাপারে এমন আকর্ষণ ও আকাঙ্ক্ষা রাখতেন, যা শরীয়তের সীমা ও ইলমের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারত না।

শাহ সাহেব লিখেন, আব্বাজান শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (র)-এর নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে নিতেন। বলতেন, আমি চাইলে 'ফসূসুল হিকাম'-এর মিম্বরে চড়ে বয়ান করতে পারি, এর সকল মাসআলাই আয়াতে কারীমা এবং হাদীস শরীফের প্রমাণ দ্বারা শক্তিশালী করতে পারি এবং এমনভাবে বয়ান করতে পারি, যাতে আর কারও সন্দেহ থাকবে না। কিন্তু আমি ওয়াহদাতুল উজুদ (বা অবিনশ্বরবাদ) এর সুস্পষ্ট বর্ণনা দিতে অক্ষম। কেননা এ যুগে অধিকাংশ মানুষই তা বুঝতে পারবে না; নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহিতার খাদে পড়ে যাবে।

শাহ আবদুর রহীম সাহেব 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী' সংকলক আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা ছিলেন দেশের বিশিষ্ট হানাফী ফিকহের আলিম, বাগ্মী, তর্কবিদ ও ফিকহের অধ্যাপক। এ দলের দিকনির্দেশক ও প্রধান ছিলেন শায়খ নিযামুদ্দীন বোরহানপুরী। সম্রাট আওরঙ্গজেব এ প্রকল্পে দু'লাখ রুপিয়া ব্যয় করেছেন। 'আছ্-ছাকাফাতুল ইসলামিয়াহ ফিল হিন্দ' রচয়িতা গভীর তত্ত্বানুসন্ধান ও গবেষণার পর এসব সংকলকের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় একুশ জনে। হযরত শাহ আবদুর রহীম সাহেবও ছিলেন এ জামাতের অন্যতম সদস্য।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব (র) 'আনফাসুল আরেফীন' গ্রন্থে লিখেন, সে সময় বাদশা আলমগীর উক্ত কিতাব সংকলন ও বিন্যাসে খুবই যত্নবান ছিলেন। মোল্লা নিযাম (সংকলন বোর্ডের চেয়ারম্যান) প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা বাদশার সম্মুখে পড়ে শোনাতেন। একদিন তিনি সে অংশে পড়ে শোনান, যা মোল্লা হামিদের দায়িত্বে ছিল। তিনি একই বিষয়ে দুই কিতাবের পৃথক দুটি বিবরণ উদ্ধৃত করে বিষয়টি পেঁচিয়ে ফেলেন। তার বন্ধু শাহ আবদুর রহীম সাহেবের দৃষ্টি যখন সংশ্লিষ্ট স্থানে পড়ল, তখন বিষয়টি ধরা পড়ল। দেখলেন, মৌল্লা হামিদ দুই কিতাবের পৃথক অর্থের বিবরণ একত্রিত করে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি পাণ্ডুলিপির টীকায় আরবীতে লিখে দিলেন,

من لم يتفقه فی الدين قد خلط فيه هذا غلط وصوابه كذا

"অর্থাৎ দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকার ফলে লেখক থেকে আলোচ্য বিষয়টি এলোমেলো হয়ে গেছে। সঠিক হচ্ছে এরূপ।" মোল্লা নিযাম মূল পাঠের সঙ্গে আবদুর রহীম সাহেব (র)-এর সংযোজিত টীকাও পড়ে ফেলেন। তিনি তো দ্রুত পড়ছিলেন কিন্তু বাদশা শুনছিলেন গভীর মনোযোগ সহকারে। এখানে এসে বাদশার খটকা লেগে গেল। জিজ্ঞাসা করলেন, এই বাক্য কিসের? মোল্লা নিযাম ঘাবড়ে গেলেন। তিনি লেখাটি মুতালা'আ (পূর্বে পাঠ) করেননি। অনন্তর নিজেকে সামলে নিলে বললেন, আমি এ স্থানটি মুতালা'আ করিনি। আগামী দিন বিস্তারিতভাবে এর মর্ম-ব্যাখ্যা পেশ করব। ঘরে এসে মোল্লা হামিদকে অভিযোগ করে বলেন, আমি বিষয়টি আপনার ভরসায় ছেড়ে দিয়েছিলাম। আপনার কারণে আজ আমাকে বাদশার সামনে লজ্জিত হতে হল। মোল্লা হামিদ তাৎক্ষণিক কিছু বললেন না। পরে শাহ সাহেবের কাছে এর অভিযোগ করেন। শাহ সাহেব কিতাব খুলে তাকে দেখালেন, বাক্য চয়নে এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ততার সৃষ্টি হয়ে গেছে। এতে কোন কোন সমসাময়িক ও বন্ধুদের ভেতর হিংসা জন্মে। শাহ সাহেব কিছুদিন এ কাজে অংশ নেওয়ার পর সেখান থেকে সরে পড়েন।

চরিত্র, গুণাবলি ও আমলের নিয়মতান্ত্রিকতা

শাহ সাহেব লিখেন, তিনি ছিলেন প্রশংসিত চরিত্র মাধুরী ও উত্তম গুণাবলির আধার। তার মধ্যে বীরত্ব, সাহসিকতা, অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মমর্যাদাবোধ ছিল উচ্চ ধরনের। পরকালীন জ্ঞানের মত ইহকালীন জ্ঞানও ছিল পূর্ণাঙ্গরূপে। প্রত্যেক কাজে মিতাচার ও ন্যায়ানুগতা পছন্দ করতেন। দুনিয়াবিমুখতা ও ইবাদত-বন্দেগীতে এত নিমগ্ন ছিলেন না, যা সন্ন্যাসবাদ বা বৈরাগ্যতার পর্যায়ে চলে যায়, আবার না এত বেশি উদাসীনতা ও শৈথিল্য ছিল, যা খামখেয়ালী ও আলস্য পর্যন্ত নেমে যায়। পোশাক-আশাকে ছিল না লৌকিকতা। নরম-শক্ত (মোটা-চিকন) যে কাপড়ই পেতেন, ব্যবহার করতেন। তবে এটি ভিন্ন কথা যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সব সময় উন্নত-উৎকৃষ্ট পোশাকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তার সকল প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন। বাজারে গিয়ে কোনও কিছু ক্রয়ের সুযোগ পাওয়াই ছিল কঠিন।

আমীর-উমারা ও ধনাঢ্যদের ঘরে যেতেন না। এ দরজা তিনি একেবারে বন্ধ করে রেখেছিলেন। তবে যদি এ শ্রেণীর কেউ স্বয়ং সাক্ষাৎ করতে আসত, তাহলে তিনি তার সাথে অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বল ও উদারতার সাথে মিলিত হতেন। তাদের যিনি বেশি সম্মানী হতেন, তাকে তদ্রূপ সম্মানই প্রদর্শন করতেন। তারা কেউ উপদেশ শোনার আগ্রহ করলে অত্যন্ত নম্রভাবে উপদেশ দিতেন। 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ'-এর গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন। সর্বদা ইলম ও উলামায়ে কিরামের সম্মান করতেন। মূর্খতা ও মূর্খদের থেকে দূরে থাকতেন।

সর্বাবস্থায় সুন্নাতে নববীর অনুসরণ করতেন। সুখের কথা হচ্ছে, গোটা জীবনে সমস্যা ছাড়া অকারণে কখনও জামাতে নামায ছুটেনি। শৈশব-কৈশোর ও যৌবনে কখনও নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি ধাবিত হননি। প্রয়োজনীয় ব্যাপার থেকে দূরে থাকতেন না। আধুনিক আলেমদের লৌকিকতাপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠানের অনুকরণ করতেন না। স্বাধীন ফকীর-দরবেশ ও সূফীদের যেন তেন পোশাক পরতেন না। অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন। অকারণে ও অপ্রয়োজনে ঋণ নিতে পছন্দ করতেন না। যারা আড়ম্বরতা ও বিলাসিতার জন্য ঋণ নিত, তাদের অপছন্দ করতেন। ভর্ৎসনা করতেন। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণেও তিনি আগ্রহী ছিলেন।

প্রতিদিন এক হাজার বার দরূদ শরীফ, এক হাজার বার নফী-ইছবাতের যিকির– কিছু উচ্চস্বরে আর কিছু ক্ষীণস্বরে, বার হাজার বার ইসমে যাত (আল্লাহ) পাঠের নিয়মিত আমল ছিল। আপন ভাই আবুর রযা মুহাম্মদ -এর

ইন্তিকালের পর মিশকাত, তাম্বীহুল গাফেলীন, গুনিয়াতুত তালেবীন সামনে রেখে ওয়ায-নসীহত করতেন। শেষ জীবনে তাফসীরের ধারাবাহিক আলোচনা শুরু করেছিলেন। তখন মাত্র সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরানের তাফসীর শেষ করেছিলেন। ইতোমধ্যে শারীরিক দুর্বলতা প্রবল হয়ে যায় এবং এই ধারাবাহিকতা স্থগিত হয়ে যায়।

ইসলামী মূল্যবোধ

হযরত শাহ আবদুর রহীম (র)-এর মধ্যেও তার বংশীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এবং মুহতারাম পিতা শহীদ শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন (র)-এর উত্তরাধিকার সূত্রে মুজাহিদসুলভ অকুতোভয় প্রেরণা প্রজন্মের পর প্রজন্ম জিহাদ ও সাফল্যের ধারাবাহিকতা কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। আত্মমর্যাদাবোধ ও সাহসিকতা তিনি নিজের বংশীয় উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। যদিও ব্যক্তিগতভাবে ও সশরীরে কোনও জিহাদে তার অংশগ্রহণের বর্ণনা পাওয়া যায় না। কিন্তু 'আনফাসুল আরেফীন' গ্রন্থে উদ্ধৃত ঘটনাবলি থেকে তার উচ্চ সাহসিকতা, কার্যতঃ দৃঢ়তা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রকাশ পায়। আর এই অমূল্য সম্পদই তার সন্তানদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়।

দাম্পত্য জীবন

শাহ আবদুর রহীম সাহেবের প্রথম বিবাহ হয়েছিল আপন পিতার জীবদ্দশায়। যার গর্ভে তার এক পুত্র সালাহুদ্দীনের জন্ম হয়। তিনি একটু বড় হয়ে ওপারে চলে যান। (বর্ণনান্তরে যৌবনকালে তার ইন্তিকাল হয়।) এ স্ত্রী দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব (র)-এর বিবাহের পর ১১২৮/২৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন পৌঢ় বয়সে অদৃশ্য ইংগিত ও সুসংবাদের ভিত্তিতে শায়খ মুহাম্মদ ফুলতী সিদ্দিকীর কন্যাকে। তার গর্ভে দুই পুত্রের জন্ম হয়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ এবং শাহ আহলুল্লাহ।

ইন্তিকাল

৭৭ বছর বয়সে তিনি শেষবারের মত রমযানের রোযা রাখেন। এরপর শাওয়াল মাসেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ক্রমেই তাঁর বাঁচার আশা ক্ষীণ হয়ে যায়। কিন্তু এরপর আবার সুস্থ হয়ে ওঠেন। সফর মাসের শুরুতে পুনরায় অসুস্থতা বেড়ে যায়। সুবহে সাদিকের পূর্বে প্রকাশ পায় মৃত্যুর আলামত। তখন তার পূর্ণ মনোযোগ ছিল, ফজর নামায যেন ছুটে না যায়। এই মুমূর্ষ অবস্থায় কয়েকবার জিজ্ঞাসা করেন, সকাল হয়েছে কি না? উপস্থিত লোকজন বলেন, না। এখনো হয়নি। যখন অন্তিম সময় একেবারে সন্নিকটে

চলে আসে, তখন সেসব জবাবদাতাকে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে বলেন, তোমাদের নামাযের সময় না হলেও আমার নামাযের সময় হয়ে গেছে। পরক্ষণেই বললেন, আমাকে কিবলামুখী করে দাও। তখন তিনি ইশারায় নামায আদায় করেন। অথচ সময় নিয়ে তখনো সংশয় ছিল। এরপর ইসমে যাতের যিকিরে মশগুল হয়ে পড়েন এবং জীবনদাতাকে ক্ষণিকের এ জীবন সঁপে দেন। এই ঘটনা বৃহস্পতিবার ১২ সফর ১১৩১ হিজরীর। তখন ছিল সম্রাট ফুররাখ সিয়ারের শাসনামলের শেষ সময়। তার ইন্তিকালের পর ফুররাখ সিয়ার পঞ্চাশ দিন বন্দি অবস্থায় কাটান। শহরে চরম বিশৃঙ্খলা ও দুরাবস্থা দেখা দেয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

শাহ সাহেবের দৃষ্টিতে শাহ আবদুর রহীম

হযরত শাহ আবদুর রহীম সাহেব (র)-এর শিক্ষা ও জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশ পায় এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ রচনা (একটি পুস্তিকা ব্যতিত) অবশ্য পাওয়া যায় না। তার খ্যাতির বেশিরভাগই তার সুযোগ্য ও মহান সন্তানের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। তিনিই তার পরিচয় 'আনফাসুল আরেফীন'-এর মাধ্যমে করিয়েছেন। যতদূর জানা যায়, তার জীবনকর্ম সম্পর্কে তার আর কোনও নির্ভরযোগ্য কিতাব নেই। তবে শাহ সাহেব (র)-এর রচনাবলি, বিশেষতঃ 'আনফাসুল আরেফীন' থেকে জানা যায়– তিনি তাঁর উচ্চ মর্যাদা, আধ্যাত্মিক শক্তি, আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা এবং ইলম-জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতায় তার উঁচু স্থানের প্রতি আন্তরিকভাবে তদপেক্ষা বেশি শ্রদ্ধাশীল ও প্রভাবিত ছিলেন, যতখানি এক সৌভাগ্যশীল সন্তান আমভাবে নিজের সুযোগ্য পিতার যোগ্যতা, কামালত ও অনুগ্রহ দানের স্বীকৃতিদাতা ও প্রশংসাকারী হয়ে থাকে। শাহ সাহেবের কাছে তার আধ্যাত্মিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে অকাট্য বিশ্বাস, জ্ঞানগত অবস্থা এবং তার জীবনকর্মে এক ধরনের উন্মত্ততা ও ব্যাকুলতা অনুভূত হয়। মনে হয় যেন শাহ সাহেবের শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান ও বাতেনী যোগ্যতা লাভ, ইলম ও আধ্যাত্মিকতায় নেতৃত্ব এবং ইজতিহাদের মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছতে মুহতারাম পিতার বাতেনী সম্পর্ক, প্রতিক্রিয়া শক্তি, স্নেহ-প্রীতি ও অফুরন্ত দু'আর বিরাট দখল রয়েছে।

ভারতের আরব বংশোদ্ভূত গোত্র ও তাদের বৈশিষ্ট্য

বক্ষমান গ্রন্থে শাহ সাহেবের মহান পূর্বপুরুষদের যে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করা হয়েছে, তাতে অনুমিত হয় যে, তাদের মাঝে সাধারণতঃ তিনটি গুণ সমানভাবে পাওয়া যেত।

প্রথমতঃ ইলম ও দীন, তাকওয়া-পরহেযগারী, বিচার ও ফাতওয়ার সাথে ব্যাপক সম্পৃক্ততা, যা ইলম ও দীনের সাথে বংশগত সম্পর্ক, দৃঢ়চিত্ততা ও উচ্চ সাহসিকতার ভিত্তিতে (যাতে বংশীয় বৃত্তান্ত, ধারাবাহিকতা, ঘটনাবলি, একনিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্ব এবং মুরব্বীদের শিক্ষা-দীক্ষার খোরাক যোগাত।) অযৌক্তিক কিছু নয়। পূর্বপুরুষদের কৃতিত্ব, তাদের যোগ্যতা, বুযুর্গী ও আল্লাহভীরুতার কারণে আল্লাহ তা'আলা অনেক বংশকে রক্ষা করেছেন এবং দীনের দৌলত সংরক্ষণের ব্যবস্থা তাদের মধ্যে এমনভাবে করেছেন– যেভাবে ঐ দুই ইয়াতীম শিশুর দেয়াল তার এক মাকবূল বান্দার মাধ্যমে ধ্বসে পড়া থেকে রক্ষা এবং সুদৃঢ় করেছেন, যাদের পিতা ছিল বুযুর্গ ও দীনদার। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, وكان ابوهما صالحا (তাদের দু'জনার পিতা ছিল সৎকর্মশীল)। ভারতবর্ষের বিশটি গোত্রের ইতিহাস এই ধারাবাহিকতা, রক্ষণাবেক্ষণ ও আল্লাহর সাহায্যের সাক্ষ্য দেয়। যাদের মধ্যে শত শত বছর পর্যন্ত ইলম ও দীন, বিচার ও ফাতওয়া, শিক্ষাদান ও রচনা এবং ইরশাদ ও হেদায়াতের ক্রমধারা চালু থেকেছে।

দ্বিতীয়তঃ বংশ সংরক্ষণ, বংশতালিকা বিন্যাস, তত্ত্বাবধায়ন ও অভিভাবকত্বের সেই স্বকীয়তা ও গুরুত্ব, আরব দেশ এবং প্রাচীন ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতেও যা ছিল না। সম্ভবতঃ এর কারণ অনারব ভূখণ্ডে নিজের এই বংশ সংরক্ষণের প্রেরণা (যা এই বংশ আরব দেশ থেকে নিয়ে এসেছিল) এবং স্বয়ং ভারতবর্ষের শ্রেণীগত আইন-কানুন এবং বংশগত গৌরবের প্রভাবও এর কারণ ছিল। অথচ শরীয়ত এই গুরুত্বারোপের নির্দেশ করেনি। এতে পরবর্তী শতাব্দী ও অনারব দেশগুলোতে ত্রুটির সৃষ্টির হয়। তবে সেই সাথে এর উল্লেখযোগ্য সুফল অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, শত শত বছর পর্যন্ত এসব গোত্রে বংশীয় বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান ছিল। অনারব ও অমুসলিম সমাজ ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে একাকার হয়ে যায়নি।

তৃতীয়তঃ মাহাত্ম্য ও বীরত্বের গুণ আর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য। আরবীতে যাকে 'অশ্বারোহন ও পৌরুষ' (فتوة ও فروسية) শব্দে ব্যক্ত করা হয়, যা আরব জাতি ও কুরাইশ গোত্রের বংশগত ও পৈত্রিক বৈশিষ্ট্য, যার দৃষ্টান্ত শায়খ মু'আযযম ও শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন (র)-এর জীবনকর্মে সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আর এর পূর্ণাঙ্গ বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখা গেছে স্বয়ং শাহ সাহেবের পৌত্র মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসমাইল শহীদ (র)-এর জীবনে।

এসব সমুজ্জ্বল গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ ও বংশানুক্রমিকতার মনস্তাত্ত্বিক এবং যৌক্তিক কারণও আছে। যেসব আরব বংশোদ্ভূত গোত্র ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে

হিজায, ইরাক, ইরান ও তুর্কিস্থান থেকে ভারতবর্ষে আগমন করেছে, তাদের অধিকাংশেরই হিযরত এবং ভারতবর্ষে বসবাসের কারণ ছিল হয়ত নিজ দীন ও ঈমান সংরক্ষণ কিংবা ইজ্জত-সম্মান বাঁচানোর আঁকুতি। কেননা তারা তাতারীদের আক্রমণের আশঙ্কায় পড়ে গিয়েছিল। এই বিষয়টি পরবর্তী কয়েক প্রজন্মের লোকদের স্মরণ ছিল। তাদেরও এ লজ্জা ছিল। আল্লাহ তা'আলাও এর বরকতে তাদের দীনী অবস্থার উন্নতি দান করেছেন। তারা ছিলেন

فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا.

(সূরা আলে ইমরান - ১৮৫) আয়াতে কারীমা-এর উজ্জ্বল নমুনা।

অথবা ছিল আল্লাহর রাহে জিহাদ এবং আল্লাহর পথে দাওয়াতের আগ্রহ। সে সময় (সপ্তম হিজরী শতকের পৃথিবীতে) যার সবচেয়ে বড় কার্যক্ষেত্র ছিল ভারতবর্ষ। এই বিশাল রাজ্যে যাকে উপমহাদেশ বলাই যথার্থ, অনেক অঞ্চল তখনও ইসলামী সাম্রাজ্যের পদানত হয়নি। সেখানে কোথাও কোথাও চলছিল বিভিন্ন শাসক ও রাজাদের শাসন। কখনও কখনও শরীয়তের হুকুম পালন এবং ইসলামী আদর্শ-নিদর্শন প্রকাশেও বাঁধার সৃষ্টি হত। তাদের কেউ কেউ সময় সময় বিদ্রোহও করে বসত। সব জায়গায় রাষ্ট্রীয় সৈন্য পৌঁছাও ছিল কঠিন ব্যাপার। ভারতে বহিরাগত সেসব অভিজাত, সম্ভ্রান্ত, সচেতন, সাহসী এবং যুদ্ধ-জিহাদ পিয়াসী আরবী বংশোদ্ভূত গোত্রগুলো এবং তাদের নেতৃত্বাধীন লোকদের জন্য সেসব অঞ্চল জয় করে কেন্দ্রীয় রাজত্বে সমর্পণ করা তাঁদের চেতনা ও সাহসিকতা উপশমের খোরাকও ছিল। ধর্মীয় চেতনায় পরিতৃপ্তির মাধ্যম এবং পার্থিব সম্মান ও নেতৃত্ব লাভের উপায়ও ছিল বটে। তাদের সেসব অঞ্চলে ক্ষমতাসীন করে দেওয়া হত। তাদের লোকজনকে বিচারক ও নবাবীর পদে অধিষ্ঠিত করা হত। সুতরাং সেসব আরবী-ইরানী বংশোদ্ভূত গোত্রগুলোর ইতিহাসে অনেক এরূপ ঘটনা পাওয়া যায়, তাদের নেতৃবর্গ ভারতবর্ষের এমন অনেক দূরাঞ্চল এবং অপরিচিত ও গুরুত্বহীন জনপদ জয় করেছেন, যেগুলো সাধারণভাবে সংরক্ষিত রাষ্ট্রসমূহে অন্তর্ভুক্ত হতে পারত না।[৬]

---

[৬] এর একটি উপমা প্রধান আমীর সাইয়িদ কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ আল নাদানী (মৃত্যু ৬৭৭ হি.)। যিনি উধ বংশ কুতবী হাসানী গোত্রের স্থপতি এবং সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র) এর সম্মানিত পিতামহ। তিনি গজনী থেকে সপ্তম হিজরী শতকের শুরুতে শুভাকাঙ্ক্ষী, প্রিয়জন, পরিবারবর্গ এবং গজনীর অভিজাত সম্ভ্রান্ত নেতৃবৃন্দ ও মুজাহিদদের বিশাল এক জামাত নিয়ে দিল্লী শুভাগমন করেন। দিল্লী থেকে ইউরোপ যাওয়ার মনস্থ করেন। প্রথমে কুনূজ এরপর মাঙ্গপুর ও কাড়হ (যা তৎকালীন সময়ে পৃথক একটি রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থল ছিল) আক্রমণ করেন এবং তার সমস্ত অঞ্চল জয় করে ইসলামী রাজত্বে অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

সেসব গোত্র উপলব্ধি করত, আমরা এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতবর্ষে আগমন করেছিলাম। আমাদের দীন-ধর্ম, আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আমাদের সৌভাগ্যের উৎসমূল ইসলামের কেন্দ্রস্থল আরব উপদ্বীপ এবং পবিত্র হিজায। আমাদের সেই মহান উৎসসমূহ থেকেও কখনও বিচ্ছিন্ন না হওয়া উচিত। আমাদের বংশীয়, ধর্মীয়, সভ্যতা-সাংস্কৃতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ যে কোনও মূল্যে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। তবেই আমরা পৃথিবীর এই ক্রান্তিলগ্নে অপরিচিত এক সভ্যতা ও পরিবেশে, যার সত্ত্বায় নিবিষ্ট আছে এমন পৃথকীকরণ শক্তি ও এক ধরনের এসিড, যা বহিরাগত জাতি ও বংশগুলোকে নিজের মধ্যে পুরোপুরি আকর্ষিত এবং তাদের স্বকীয়তাকে বিলীন ও জ্বালিয়ে দিয়েছে, সেখানে নিরাপদ ও সসম্মানে থাকতে পারি। এই অনুভূতি তাদের মধ্যে ধর্মীয় ও বংশীয় সম্ভ্রমবোধ এবং বহির্শক্তির প্রভাবের বিপরীতে অসাধারণ প্রতিরোধ শক্তি জন্ম দেয়। ফলে তাদের ব্যক্তিগত স্বকীয়তা, ভাবমর্যাদা বহুলাংশে নিরাপদ এবং তাদের বৈশিষ্ট্যাবলি শত শত বছর পর্যন্ত প্রজন্মের পর প্রজন্মে স্থানান্তরিত হতে থাকে।

এই বাস্তবতা বিরাটভাবে প্রকাশ পেয়েছে স্বয়ং হযরত শাহ সাহেব (র)-এর অসীয়তনামায়, যা তিনি المقالة الوضيه فى النصيحة والوصية নামে গ্রন্থনা করেছেন। যাতে সর্বপ্রথম তিনি তার বংশের লোকদেরকে সম্বোধন করেছেন। এরপর সম্বোধন করেছেন সকল শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু ও ভারতীয় মুসলিম উম্মাহকে। শাহ সাহেব (র) লিখেন, 'আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা পরদেশী লোক। আমাদের পূর্বপুরুষগণ ভারতে হিজরত করেছেন। বংশ ও ভাষায় আরবী হওয়া আমাদের জন্য দু'টি গর্বের বিষয়। এটাই আমাদেরকে সর্বোত্তম দিশারী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, জগৎ সৃষ্টির গৌরব মুহাম্মদ (স)-এর নিকটতর করে দেয়। এই মহান নেয়ামতের শোকরিয়ার দাবী হচ্ছে, আমরা যেন যথাসম্ভব সেসব প্রবীণ আরবদের অভ্যাস-আদর্শ ও রীতিনীতি থেকে একেবারে সরে না যাই, যার মধ্যে রাসূলে কারীম (স)-এর লালন-পালন ও বিকাশ হয়েছিল। আর যেন অনারবদের রুসম-রেওয়াজ, আচার-অনুষ্ঠান, অপসংস্কৃতি ও হিন্দুদের রীতিনীতিকে নিজেদের মধ্যে বিস্তার ঘটতে না দেই।'

অনন্তর তিনি আরো লিখেন, 'আমাদের মধ্যে ভাগ্যবান সে-ই, আরবী ভাষায় যার কিছুটা দখল আছে। নাহু-ছরফ ও আদবে (আরবী সাহিত্যে) অভিজ্ঞতা আছে এবং কুরআন-হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। আমাদেরকে হারামাইন শরীফাইনেও (মক্কা-মদীনা) হাজিরা দিতে হবে। তার সাথে থাকতে হবে আন্তরিক ভালবাসা। এতেই রয়েছে আমাদের সৌভাগ্যের রহস্য। আর এর থেকে বিতৃষ্ণা ও বিমুখতায় রয়েছে দুর্ভাগ্য ও বঞ্চনা।'

আরব বংশোদ্ভূত ও অভিজাত বংশ হওয়া ছাড়াও এই বংশের ফারূকী হওয়ার গৌরব ছিল। অনারব বিশ্বে এই বংশের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বহুবার দীনের হেফাজত, ইসলামের শি'আর ও নিদর্শনের সমুন্নতি এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ কাজ নিয়েছেন। যেখানে ফারুকী আত্মমর্যাদাবোধও দাখিল ছিল। আবার এখানে হয়ত ফারুকে আযম (রা)-এর সাথে বংশীয় সম্পৃক্ততার অনুভূতি এবং গৌরবও কাজ করেছে– যা ছিল এক শক্তিশালী আত্মিক চেতনা। দশম হিজরী শতকে এই বংশেরই ভূতপূর্ব ব্যক্তিত্ব আকবরী ফিৎনার মূলোৎপাটন করেন। ভারতবর্ষকে কুফর-শিরক, বহু ধর্মের সংমিশ্রণে এক অলীক ধর্ম আবিষ্কারের ফিৎনা, নতুন যুগ, নতুন আইন, নতুন সহস্রাব্দ, নতুন নেতৃত্ব ইত্যাদির ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের ছোবল থেকে রক্ষা করেন। হযরত শায়খ আহমদ ফারুকী (মুজাদ্দিদে আলফেসানী)-এর এই বংশসম্পর্ক নিয়ে গৌরব ছিল। তিনি এই ধর্মীয় মূল্যবোধকে এর দাবী ও কুদরতী ফসল মনে করতেন। বৃহত্তর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত ও ইসলামী আকীদার বিরুদ্ধে জনৈক প্রসিদ্ধ আরেফ ও শাইখের একটি গবেষণা শুনে তার কলম থেকে অনিচ্ছায় নিম্নোক্ত বাক্য বেরিয়ে আসে, 'আমার বন্ধুগণ! এই অধমের এরূপ কথাবার্তা শোনার শক্তি নেই। অনিচ্ছায় আমার ফারুকী ধমনী শিহরিয়ে উঠে।'

অনুরূপভাবে সামানাহ প্রদেশে একবার জনৈক খতীব জুম'আর খুতবায় ইচ্ছাকৃত খোলাফায়ে রাশেদীনের আলোচনা ছেড়ে দেয়। তিনি বলেন, 'যখন এই লোমহর্ষক সংবাদ শুনে মন-মানসে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে এবং আমার ফারুকী ধমনীকে নাড়া দিয়েছে, তখন এই কয়েকটি শব্দ আমার কলম থেকে বেরিয়ে গেল।'

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর সংস্কার আন্দোলন এবং দ্বীন পুনর্জীবিত করার ব্যাপক ও বহুমুখী কর্মকাণ্ডে (যেমন, আকীদা-বিশ্বাস সংশোধন, শিরক-বিদ'আত দমন, কুরআন-সুন্নাহর প্রসার, হাদীস শাস্ত্রের প্রচলন, খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফত প্রমাণিতকরণ এবং রাফেযী ও শী'আ মতবাদ প্রত্যাখ্যান প্রভৃতিতে) নিশ্চিতভাবে এই বংশ সম্পর্ক, তার মর্যাদা ও দায়িত্বানুভূতিরও দখল ছিল। যা মনস্তত্ত্ব, জীবন জ্ঞান, বংশীয় নিয়মনীতি ও অভিজ্ঞতার আলোকে সব দিক থেকে যুক্তিযুক্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত (যার দৃষ্টান্ত প্রজন্ম ও বংশধরদের ইতিহাসে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়)। হাদীস শরীফে এসেছে,

الناس معاد كمعادن الذهب والفضة، خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام إذا فقهوا.

'মানুষ স্বর্ণ-রৌপ্যের খনির মত। তাদের মধ্যে অজ্ঞতার যুগের উত্তম ব্যক্তি ইসলামের যুগেও উত্তম, যদি তারা জ্ঞান লাভ করে।'

চতুর্থ অধ্যায়

সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত

জন্ম

শাহ সাহেব (র)-এর জন্ম হয়েছে ৪ শাওয়াল ১১১৪ হিজরী সালে সূর্যোদয়ের সময় আপন নানীবাড়ি ছোট গ্রাম ফুলতে (বর্তমান মুযাফফর নগরে)। জন্ম তারিখ আযীমুদ্দীন (আল-জুযউল লাতীফ : ২) থেকে চয়িত। শাহ সাহেবের জন্মের সময় তার সম্মানিত পিতা হযরত শাহ আবদুর রহীম সাহেব (র)-এর বয়স হয়েছিল ষাট বছর। শাহ আবদুর রহীম সাহেবের অনেক শুভসংবাদ লাভ হয়েছিল তাঁর এই পূণ্যবান সন্তান জন্মের পূর্বে। শাহ আবদুর রহীম সাহেব ষাট বছর বয়সে প্রথম সহধর্মিনী শায়খ সালাউদ্দীনের মাতার উপস্থিতিতে দ্বিতীয় বিয়ের মনস্থ করেন। এতে অনেক অদৃশ্য ইংগিত ও সুসংবাদ অন্তর্নিহিত ছিল। যখন শায়খ মুহাম্মদ ফুলতী বিষয়টি অবগত হলেন, তখন নিজ কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। হিজরী ১১১৪ এর শুরুতে এই পুণ্যময় আকদ সম্পন্ন হয়।

'আল-কাওলুল জামীল' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তার সম্মানিত মায়ের নাম ছিল ফখরুননিসা। তিনি ধর্মীয় জ্ঞানে এত গভীরতার অধিকারী ছিলেন, যার সুযোগ-সৌভাগ্য ও গৌরব খুব কম নারীরই হয়ে থাকে। উক্ত গ্রন্থকার শায়খ মুহাম্মদ আশেক ফুলতী, যিনি তার সহোদর ভ্রাতুষ্পুত্র। আর ঘরের মালিক ঘরের মধ্যকার বিষয় সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। সুতরাং তিনি লিখেন, 'শাহ সাহেবের আম্মা তাফসীর-হাদীসের মত শরঈ ইলম ও জ্ঞানের বিদগ্ধ আলিমা, তরীকতের নিয়ম-শৃঙ্খলার সুদীক্ষাপ্রাপ্ত, হাকীকতের রহস্য জ্ঞানের অধিকারী প্রভৃতি সব কারণে বাস্তবেই নারী জাতির জন্য গৌরবের কারণ ও স্বনামে স্বার্থক ছিলেন।

জন্মের পূর্বে তার পিতা শাহ আবদুর রহীম স্বপ্নযোগে খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র)-এর যিয়ারত লাভ করেন। তিনি তাকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেন এবং বলেন, তার নাম আমার নামে কুতুবুদ্দীন আহমদ রাখবেন। শাহ সাহেব বলেন, আমার জন্মের পর আব্বাজানের একথা স্মরণ ছিল না। তিনি আমার নাম রাখেন ওয়ালীউল্লাহ। কিছুদিন পর উক্ত ঘটনা স্মরণ হলে আমার দ্বিতীয় নাম রাখেন কুতুবুদ্দীন আহমদ।

শাহ্ সাহেবের বয়স যখন সাত বছর, পিতামাতার সঙ্গে তাহাজ্জুদ নামাযে শরীক হোন। আর দু'আ করার মুহূর্তে নিজের হাত তাদের দু'জনার হাতে রাখেন। এভাবে সে স্বপ্ন পূর্ণ হয়, যা তার সম্মানিত পিতা তার জন্মের পূর্বে দেখেছিলেন।

শিক্ষা

শাহ্ সাহেবের বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন তাঁকে মক্তবে ভর্তি করা হয়। সাত বছর বয়সে সুন্নাতে ইবরাহীমী তথা খতনা সম্পন্ন করা হয়। সে বয়স থেকেই তার নামায আদায়ের অভ্যাস গড়ে তোলা হয়। এ বছর শেষে তিনি কুরআনে কারীমের হিফজ শেষ করেন। এরপর তিনি ফার্সী কিতাবাদি ও আরবীর ছোট ছোট কিতাবাদি পড়তে শুরু করেন। সেই সাথে কাফিয়াও সমাপ্ত করেন। দশ বছর বয়সে শরহে জামী শুরু করেন। তিনি স্বয়ং বলেন, আমার মধ্যে সামগ্রিকভাবে মুতালা'আর যোগ্যতা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। চৌদ্দ বছর বয়সে বায়যাবী শরীফের একাংশ পড়েন। পনের বছর বয়সে ভারতবর্ষে প্রচলিত শিক্ষাকোর্স সম্পন্ন করেন। মুহতারাম পিতা এ উপলক্ষে বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং আড়ম্বরপূর্ণ ভোজের ব্যবস্থা করেন। সেখানে আম-খাছ সকলেই শরীক ছিল।

পনের বছর বয়সে তিনি সম্মানিত পিতার কাছে মিশকাত শরীফের সবক নেন। যার মাত্র কিছু অংশ (কিতাবুল বুযূ থেকে আদাব পর্যন্ত) বাকী ছিল। কিতাবের ইবারত পড়তেন তার অপর এক সাথী। অবশিষ্ট অংশেরও অনুমতি পেয়েছিলেন পিতার কাছ থেকে। পিতার কাছেই সহীহ্ বুখারীর কিতাবুত তাহারাত পর্যন্ত, শামায়েলে তিরমিযী পূর্ণ, তাফসীরে মাদারেক ও বায়যাবীর কিছু অংশ পড়েছেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ্র বিরাট এক নেয়ামত হল, মুহতারাম আব্বাজানের কুরআনের সবকে কয়েকবার শরীক হয়েছি। যাতে কুরআনিক মর্মের অপার এক দরজা খুলে গিয়েছে।'

শাহ্ সাহেবের পঠিত পাঠ্যসূচী

শাহ্ সাহেব 'আল-জযউল লাতীফ' গ্রন্থে তার পঠিত পাঠ্যসূচীর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। ফিকহ শাস্ত্রে শরহে বেকায়া ও হেদায়া (কিছু অংশ বাদে), উসূলে ফিকহ শাস্ত্রে হুসামী এবং তাওযী ও তালওয়ীহের বিরাট এক অংশ, মানতিক শাস্ত্রে 'শরহে শামসিয়া' পূর্ণ, 'শরতে মাতালে'-এর এক অংশ, শরহে মাওয়াকিফের কিছু অংশ পড়েছেন। আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে 'আওয়ারিফ ও রসায়েলে নকশেবন্দিয়া ইত্যাদির একাংশ, হাকীকত প্রসঙ্গে মাওলানা জামীর শরহে রুবাঈয়্যাত ও লাওয়াইহ্, মুকাদ্দামায়ে শরহে লাম'আত, মুকাদ্দামায়ে

নক্‌দুল নসূছ, খাওয়াছে আসমা ও আয়াত সম্পর্কে সে রচনাসমগ্র, যা এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং আল ফাওয়ায়িদুল মিয়াহ ইত্যাদি। মুহতারাম আব্বাজান কয়েকবার এসব খাওয়াছ ও ফাওয়ায়েদের অনুমতি দেন।

চিকিৎসা শাস্ত্রে মুজিয, দর্শন শাস্ত্রে শরহে হিদায়াতুল হিকমাহ প্রভৃতি, মা'আনী শাস্ত্রে মুতাওয়ালের সিংহভাগ, মুখতাছারুল মা'আনীর মোল্লা যাদাহ রচিত টীকা সংযুক্ত অংশ। আর গণিত শাস্ত্রে কিছু ক্ষুদ্র পুস্তিকা।

শাহ সাহেবের এসব পাঠ্যসূচীতে তার সম্মানিত পিতা ও প্রকৃত উস্তাদ শাহ আবদুর রহীম সাহেবের ইজতিহাদ এবং নির্বাচনেরও দখল ছিল। সপ্তম হিজরী থেকে ভারতবর্ষে সে পাঠ্যসূচী প্রচলিত ছিল, যার মধ্যে নবম হিজরী শতকের শেষভাগে শায়খ আবদুল্লাহ ও শায়খ আযীযুল্লাহ মুলতান থেকে দিল্লী আগমনের প্রেক্ষিতে ইলমে কালাম, বালাগাত ও মাকূলাতের কিছু কিতাবাদি বৃদ্ধি করা হয়। এরপর দশম হিজরী শতকে আমীর ফাতহুল্লাহর ভারত আগমনের প্রেক্ষাপটে ইরানের অনুজ উলামায়ে কিরাম, উদ্ভ্রান্ত গবেষক মীর ছদরুদ্দীন সিরাজী, গিয়াসুদ্দীন মানসূর ও মির্যা জানের রচনাবলি পাঠ্যভুক্ত করা হয়।

সম্ভবতঃ শাহ আবদুর রহীম সাহেবের বাস্তবপ্রিয়তা এবং নিজের সন্তানের মেধা-মনন অনুপাতে তন্মধ্য থেকে কিছু কিতাবাদি (যার মধ্যে অধিকাংশই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি ছিল) পরিত্যাগ করা হয়। যেমন– নাহব শাস্ত্রে মিসবাহ, লুব্বুল আলবাব (কাযী বায়যাবী বিরচিত)। কাযী শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদীর 'ইরশাদ' এর স্থলে ছরফে কাফিয়া ও শরহে জামী পড়ানো হয়। উসূলে ফিকাহ শাস্ত্রে মানার ও তার শরাহ এবং উসূলে বাযদবীর পরিবর্তে হুসামী, তাওযীহ ও তালবীহের কিছু অংশ, তাফসীর শাস্ত্রে কাশশাফ পরিত্যাগ করা হয়। হাদীস শাস্ত্রে 'মাশারিকুল আনওয়ার' অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আরবী সাহিত্যে মাকামাতে হারীরীর ব্যাপক প্রচলন ছিল। কোনও কোনও বুযুর্গের মুখস্থ করার কথাও পাওয়া যায়। কিন্তু শাহ সাহেবের পাঠ্যসূচীতে তা পরিলক্ষিত হয় না। সম্ভবতঃ তন্মধ্যে অনেক কিতাবাদিই বারো শতকের শুরু পর্যন্ত অনেক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিত্যক্ত হয়ে গেছে।

বলাবাহুল্য যে, বারো হিজরী শতকে উস্তাদুল উলামা মোল্লা নিযামুদ্দীন সিহালবী ফিরিঙ্গী মহল্লী, যিনি ছিলেন শাহ সাহেবের বয়োজ্যেষ্ঠ, সমসাময়িক এবং যিনি শাহ সাহেবের পনের বছর পূর্বে ইন্তিকাল করেছেন –এই পাঠ্যসূচীতে অনেক বড় পরিবর্তন আনেন। বিশেষতঃ ছরফ, নাহব, তর্কবিদ্যা, দর্শন, গণিত, বালাগাত এবং কালাম শাস্ত্রে বহু সংখ্যক কিতাবাদি বৃদ্ধি করেন। যাতে আরও কিছু পরিবর্ধনের পর (যা তার ছাত্র এবং ছাত্রের ছাত্রদের

যুগে কোনও প্রকার পরিকল্পনা ছাড়াই হয়েছে) এই পাঠ্যসূচী দরসে নেযামীর সেই শেষরূপ ধারণ করে, যা অধ্যবধি প্রাচীন মাদরাসাগুলোতে চালু আছে।

শাহ্ সাহেবের বর্ণিত পাঠ্যসূচীতে আরবী সাহিত্যের কোনও কিতাব দৃষ্টিগোচর হয় না। অথচ শাহ্ সাহেবের আরবী রচনাবলি বিশেষতঃ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁর আরবী ভাষা এবং আরবীতে লিখনী ও রচনার শুধু প্রতিভূ ক্ষমতাই ছিল না বরং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তিনি এক্ষেত্রে এমন এক ধারা ও রচনাশৈলীর উদ্ভাবক, যা শিক্ষামূলক প্রতিপাদ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনার জন্য অতীব ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি, যেখানে আল্লামা ইবনে খালদুনের পরে তার সমতুল্য ও সমপর্যায়ের দ্বিতীয় কাউকে দেখা যায় না। এতে বুঝা যায়, শাহ্ সাহেব নিজ হাতেই আরবী সাহিত্য ও গদ্য-পদ্যের সেসব প্রাচীন উচ্চাঙ্গের কিতাবাদি অধ্যয়ন করেছেন। যা ছিল বাগ্মীতা ও মধুরতার নমুনা, অনারব আরবী শব্দ থেকে অনেকটাই সংরক্ষিত। হিজায অবস্থানকালে তিনি বিশেষভাবে আরবীতে এই বিশাল লিখনী কাজের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, যা আল্লাহ্র কৌশল-প্রজ্ঞা শাহ্ সাহেবের জন্যই নির্ধারিত করে রেখেছিল। মাকামাতে হারীরীর উল্লেখ যদি ভুলক্রমে ছুটে গিয়ে না থাকে, তাহলে এই কিতাব শাহ্ সাহেবের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত না থাকার কারণে ক্ষতির স্থলে উপকারই হয়ে থাকবে। কেননা পরবর্তীগণ আমভাবে এর আঘাত খেয়েছেন। আর এর কারণে ছন্দ ও অন্তর্মিলের এমন অনুবর্তী লোক, যে অনায়াসে অকপটে মর্মকথা ও মনের ভাব ব্যক্ত করতে সাধারণতঃ অক্ষম দেখা যায়। হারীরীর পরে যে লেখকই কোনও বিষয়ে কলম ধরেছেন হারীরীর কলম দ্বারাই লিখেছেন, যার নিব পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। চিঠিপত্র, কিতাবাদির অভিমত এমনকি ফাতওয়ার দীর্ঘ বিবরণও হারীরীর এই প্রভাব থেকে মুক্ত নয়।

শাহ্ সাহেব বলেন, শিক্ষাজীবনেই উচ্চাঙ্গের বিষয়বস্তু মাথায় আসত। যাতে বরাবরই অগ্রগতি অনুভূত হত। মুহতারাম আব্বাজানের ইন্তিকালের পর ১২ বছর পর্যন্ত ধর্মীয় কিতাবাদি যৌক্তিক জ্ঞান-বিদ্যার বই-পুস্তক পড়ানোর পাবন্দী করেছি এবং তখনই প্রত্যেক বিষয় ও শাস্ত্রে চিন্তা-গবেষণা ও মনোনিবেশের সুযোগ হয়েছে।

পিতার স্নেহ, প্রশিক্ষণ, অনুমতি ও খেলাফত

শাহ্ সাহেব বলেন, সম্মানিত পিতার স্নেহ আমার উপর এমনই ছিল যে, তা খুব কমই হয় কোন পিতার আপন সন্তানের প্রতি, কোন উস্তাদের শাগরেদের প্রতি এবং কোন শায়খের তার মুরীদের প্রতি। হযরত শাহ্ আবদুর

রহীম সাহেবের তরবিয়ত, দীক্ষাদান ও প্রশিক্ষণের ধরনও ছিল বড় প্রজ্ঞাপূর্ণ। শাহ সাহেব বলেন, শৈশবে একবার বন্ধু ও প্রিয়জনদের এক জামাতের সাথে একটি বাগান ভ্রমণে চলে গেলাম। ফিলে এলে আব্বাজান বললেন, ওয়ালীউল্লাহ! তুমি এই দিনরাত্রিতে তা কি অর্জন করেছ, যা বাকী থাকছে? আমি এই সময়ের মধ্যে এতবার দরূদ পড়েছি। শাহ সাহেব বলেন, একথা শুনে বাগানবিলাস ও আনন্দভ্রমণ থেকে আমার মন একেবারে উঠে গেল। এরপর আর কখনও সে আগ্রহ জাগেনি। শাহ সাহেব বলেন, আব্বাজন আমাকে কর্মকৌশল, মজলিসের শিষ্টাচার, সভ্যতা-ভদ্রতা ও বিচক্ষণতার অনেক বিষয়ই শেখাতেন। প্রায়ই নিম্নোক্ত পংক্তি আবৃত্তি করতেন,

آسائش دو گیتی تفسیر ایں دو حرف است۔

با دوستاں تلطف با دشمناں مدارا۔

বলতেন- আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যারা মর্যাদায় ছোট, তাদের সাথে সর্বদা সালামের ব্যাপারে অগ্রসর থাকবে। তাদের সঙ্গে সবসময় উত্তমভাবে মিলিত হবে। তাদের ভালমন্দ ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করবে আর তাদেরকে সাধারণ বা তুচ্ছ বিষয় বুঝাবে না।

صد ملک دل بہ نیم نگہ می تواں خرید۔

خوباں دریں معاملہ تقصیری کنند۔

আরও বলতেন, কেউ কেউ বিশেষ কোনও পোশাক কিংবা অভ্যাসের অনুবর্তী হয়ে যায়। কেউ কোনও তাকিয়ে কালাম (কথার ফাঁকে ফাঁকে একই কথা বারবার বলে দম নেওয়া) নির্ধারণ করে নেয়। কেউ কোনও খাবারের ব্যাপারে এতই বিতৃষ্ণ-নিরাসক্ত হয়ে যায় যে, তার কাছে সেটি ঘৃণিত হয়ে যায়। এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে। নিজের কোনও ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে যেন নিছক স্বাদ আস্বাদন উদ্দেশ্য না হয়। এতে কোন প্রয়োজন পূরণ, কোনও মর্যাদা লাভ কিংবা সুন্নাত আদায়ের উদ্দেশ্য থাকা উচিৎ। চাল-চলন, উঠাবসায় কোনওভাবেই যেন দুর্বলতা কিংবা আলস্য প্রকাশ না পায়। শাহ সাহেবের বর্ণনা মতে শাহ আবদুর রহীম সাহেব বীরত্ব, সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা, সুব্যবস্থাপনা ও আত্মসম্ভ্রমবোধ ইত্যাদি উচ্চ গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। জাগতিক জ্ঞানেও ছিলেন পারলৌকিক জ্ঞানের মত সুদক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ। সকল বিষয়ে মিতাচারকে পছন্দ করতেন। শাহ সাহেবের জীবন-চরিতের মাঝে সেসব বিষয় ছিল পর্যাপ্ত।

শাহ সাহেব তাঁর মুহতারাম পিতার কাছেই চৌদ্দ বছর বয়সে বায়'আত হন এবং আধ্যাত্মিকতায় আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষতঃ নকশেবন্দিয়া মাশায়িখের তরীকায় অর্জন করেন তাওয়াজ্জুহ ও তালকীন। পিতাই তাঁকে আদাবে তরীকতের একাংশ শিক্ষা দেন এবং বুযুর্গির খিরকা (বিশেষ পোশাক) পরিধান করান। শাহ সাহেবের বয়স যখন সতের বছর, তখন হযরত আবদুর রহীম সাহেব এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তিনি মৃত্যুশয্যায় তাকে বায়'আত ও ইরশাদের অনুমতি দেন। বারবার বলেন, يده كيدى 'তার হাত আমার হাতেরই মত'।

বিবাহ

শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) এর বয়স তখন চৌদ্দ বছর। তার সম্মানিত পিতা তার বিবাহ পড়িয়ে দেন তার মামা শায়খ উবাইদুল্লাহ সিদ্দিকী ফুলতীর কন্যার সঙ্গে। শ্বশুরবাড়ির লোকজন সুযোগ চাইলে শাহ আবদুর রহীম সাহেব অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, এতেই মঙ্গল আছে। আর পরবর্তীকালের একের পর এক বংশীয় ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সে সময় যদি বিয়ে সম্পন্ন না হত, তাহলে এই বিয়ে দীর্ঘদিনের জন্য স্থগিত রাখতে হত। এই স্ত্রীর গর্ভেই তাঁর বড় ছেলে শায়খ মুহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। যিনি স্বয়ং তার কাছে শিক্ষা লাভ করেন। শাহ সাহেব তার জন্য একটি প্রাথমিক পুস্তিকাও রচনা করেছিলেন। শায়খ মুহাম্মদ ছিলেন কারী এবং শামায়েলে তিরমিযীর সবকে শাহ আবদুল আযীয (র)-এর সহপাঠী।

শাহ সাহেবের মৃত্যুর পর তিনি বড়হানা গ্রামে স্থানান্তরিত হয়ে যান। দীর্ঘদিন সেখানেই অবস্থান করে ১২০৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাকে গ্রামের জামে মসজিদের বারান্দায় দাফন করা হয়। শাহ সাহেবকে আবু মুহাম্মদ উপনামে ডাকা হত এ কারণেই। শায়খ মুহাম্মদের দুই পুত্রের বর্ণনা মাকালাতে তরীকতের আলোচনায় পাওয়া যায়, যারা তার সঙ্গেই সমাহিত হয়েছেন। কিন্তু বই-পুস্তকে তাদেরকে منقطع العقب (নিঃসন্তান) লেখা হয়েছে। হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) হযরত শাহ আবু সাঈদ রায়বেরেলীর নামে তিনটি পত্রে বুযুর্গ ভাই শায়খ মুহাম্মদ ইবনে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) কে সালাম জানিয়েছেন। তাতে কোথাও 'বুযুর্গ ভাই শায়খ মুহাম্মদ সাহেব' আবার কোন চিঠিতে 'শায়খে কাবীর মুহাম্মদ' নামে সালাম জানিয়েছেন। এসব চিঠিতে ভাইদের পরস্পর হৃদ্যতা ও সুসম্পর্কের অনুমান করা যায়।

দ্বিতীয় বিবাহ

শাহ সাহেবের দ্বিতীয় বিয়ে হয় প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর সাইয়িদ সানাউল্লাহ সোনাপতীর কন্যা বিবি ইরাদতের সঙ্গে। যিনি ছিলেন সোনাপতের বাসিন্দা সাইয়িদ নাসিরুদ্দীন শহীদ সোনাপতীর বংশধর। এই স্ত্রীর উদরে শাহ সাহেবের খ্যাতিমান চার পুত্র হযরত শাহ আবদুল আযীয (র), শাহ রফীউদ্দীন (র), শাহ আবদুল কাদির (র) ও শাহ আবদুল গণী (র) জন্মগ্রহণ করেন। যারা ছিলেন ভারতবর্ষে দীন-ধর্মের পুনর্জাগরণের 'চার সদস্য'। আমাতুল আযীয নামে এক কন্যাও জন্মগ্রহণ করেন। তার বিয়ে হয় মাওলানা মুহাম্মদ ফাইক ইবনে মাওলানা মুহাম্মদ আশেক ফুলতীর সঙ্গে। তিনি ছিলেন কয়েক সন্তানের জনক। তার থেকে বংশধারা চালু থাকে।

হজ্জে গমন

শাহ সাহেবের জ্ঞান-গবেষণা, শিক্ষা, চিন্তা-চেতনা, দাওয়াতী ও সংস্কারমূলক জীবনে পবিত্র হিজাযের সফর ও অবস্থান এক ঐতিহাসিক ঘটনা এবং তার জীবন গ্রন্থের এক নতুন অধ্যায় ও প্রভেদ সীমা। হিজাযের এই এক বছরাধিক সময় অবস্থানকালে তার চিন্তাগত ও শিক্ষামূলক শক্তি উন্নতির সেসব আসন অতিক্রম করে, যা বাহ্যতঃ ভারতে সম্ভব ছিল না। তজ্জন্য প্রয়োজন ছিল হারামাইন শরীফাইনের মত কেন্দ্রীয় বিশ্বময় স্থানই। এ সফরেই তিনি ইলমে হাদীসের ব্যাপক ও গভীর মুতালা'আ করেছেন। হাদীস শাস্ত্রের যেসব কামিল শায়খগণ বিভিন্ন শহর-নগর থেকে এসে সেখানে সমবেত হয়েছিলেন, তাদের কাছে এই পবিত্র শাস্ত্রের অধ্যয়ন সম্পন্ন করেছেন, যা ছিল তার সংস্কার-সংশোধনের সুউচ্চ প্রাসাদে মুক্তার পাথর সমতূল্য। যার মাধ্যমে তিনি জ্ঞান-গবেষণা ও ইজহিতাদের সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, যেখানে এই শেষ শতকগুলোতে খুব কম লোক (এবং যতদূর শরীয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও রহস্যভেদ এবং ফিকাহ ও হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্যতা বিধানের সম্পর্ক রয়েছে) পৌঁছুতে পেরেছে।

হজ্জের সফরকালে শাহ সাহেবের বয়স ছিল ত্রিশ বছর। সে সময়কার রাজনৈতিক অবস্থা, পথঘাটের নিরাপত্তা পরিস্থিতি, কিছু বিদেশী শক্তির আগ্রাসন, স্থল ও সমুদ্রপথের নানা বিপদাশঙ্কা ও লুটতরাজ-ডাকাতির পরিপ্রেক্ষিতে এই সফর তার উচ্চ সাহস, ইলম পিপাসা এবং হারামাইন শরীফাইনের সাথে তার ঐকান্তিক হৃদ্যতারই জ্বলন্ত প্রমাণ। সেই সাথে তার ইসলামী মূল্যবোধ, দূরদর্শীতা, উঁচু দৃষ্টিভঙ্গিও প্রমাণ করে। কেননা, ভারতবর্ষে দীনের হেফাযত এবং ভারতীয় মুসলমানদের উন্নতি ও স্বকীয়তার

জন্য তাঁর দৃষ্টি কেবল ভারতের অবস্থা-পরিস্থিতি অনুধাবন এবং সেখানেই তার সংস্কার প্রচেষ্টা ও প্রতিকার অনুসন্ধানে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি কুরআনে কারীমের বালাগাতপূর্ণ ইংগিত يشهدوا منافع لهم এর উপর আমল করে এই প্রাণ (নবুওয়াতী জ্ঞানের) কেন্দ্রস্থল এবং বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত ইসলামের প্রতিনিধিদল আর আল্লাহর মেহমানদের ইলম ও মা'আরিফ, জ্ঞান-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা-গবেষণা ও চেষ্টা দ্বারা উপকৃত হতে চাইতেন।

সে সময় সূর্ত ছিল ভারতের বন্দর ও মক্কার দরজা। পথের স্থানগুলো বিশেষতঃ মালুহ ও গুজরাট ছিল মারাঠীদের লুটতরাজ ও দস্যুতার কেন্দ্রস্থল। উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত এই দীর্ঘপথ সে সময় যানবাহন, অশ্বারোহণ, এক্কাগাড়ি ইত্যাদির মাধ্যমে অতিক্রম করা সহজ ব্যাপার ছিল না। ভারত সাগর এবং ভারত মহাসাগরের আরব-আফ্রিকার মধ্যবর্তী অংশের গোটা উপকূল তখন পর্তুগীজ ও নেদারল্যান্ডের দস্যুদল এবং ফ্রান্স ও বৃটেনের আধিপত্যবাদীদের সামুদ্রিক আক্রমণের আশঙ্কা থেকেও নিরাপদ ছিল না। হাজীদের এসব বিপদাপদ ও দুর্ঘটনাসমূহের বিবরণ সে সময়কার ভ্রমণকাহিনীগুলোতে (যা খুব কমই লিখিত ও সংরক্ষিত রয়েছে) দেখা যেতে পারে। স্বয়ং ভারতের পথঘাটের অবস্থা ছিল এমন যে, রাতে যদি কোনও ব্যক্তি কোন গ্রামে বা জনবসতিতে হারিয়ে যেত, তবে শাহ সাহেব কিংবা বদীউল আজায়েব বা মহান সৃষ্টিকর্তার ওযীফা পাঠ শুরু করে দিত।

তিনি সূর্ত থেকে জিদ্দা পৌঁছেন ৪৫ দিনে। ১৫ যিলকদ মক্কা শরীফে প্রবেশ করেন। উলামায়ে কিরাম ও তালেবে ইলমদের আবেদনের প্রেক্ষিতে মসজিদে হারামে মুসাল্লায়ে হানফীর পাশে দরস শুরু করেন। যেখানে অনেক ভীড় জমে যায়।

শাহ সাহেব 'আল-জুযউল লাতীফ' গ্রন্থে লিখেন, ১১৪৩ হিজরীতে হারামাইন শরীফাইন যিয়ারতের আগ্রহ প্রবল হয়ে যায়। ১১৪৩ হিজরীর শেষ দিকে (যিলহজ্জ মাসে) হজ্জ পালনের সৌভাগ্য হয়। ১১৪৪ হিজরী পর্যন্ত তিনি বাইতুল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন। অনন্তর মদীনা শরীফ যিয়ারতে ধন্য হন। শায়খ আবু তাহের মাদানী এবং অন্যান্য মাশায়িখে হারামাইন থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। উলামায়ে হারামাইনের সঙ্গে উঠাবসা করেন। শায়খ আবু তাহের খিরকা পরিধান করান, যা ছিল প্রায় সূফীগণের সকল খিরকার সমন্বয়ে। এ বছর শেষে ১১৪৪ হিজরীতে পুনরায় তিনি হজ্জব্রত পালন করেন। ১১৪৫ হিজরীর প্রথম দিকে ভারত রওয়ানা হন এবং ১০ রজব ১১৪৫ হিজরী শুক্রবার সুস্থ ও নিরাপদে নিজের আবাসস্থল দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

শাহ্ সাহেবের হারামাইন শরীফের উস্তাদ ও মাশায়িখ

শাহ্ সাহেব হারামাইন শরীফের মাশায়িখ ও উস্তাদগণের পরিচিতি ও জীবনী সম্পর্কে পৃথক একটি পুস্তিকা 'ইনসানুল আইন ফী মাশায়িখিল হারামাইন' নামে রচনা করেন। উক্ত পুস্তিকায় তিনি তার খাছ্ শায়খ, ত্রাতা ও প্রিয় উস্তাদ শায়খ আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল-কুর্দী আল মাদানীর বিস্তারিত পরিচিতি তুলে ধরেছেন। খাছ্ উস্তাদ ও মাশায়িখদের উচ্চ যোগ্যতায় যেহেতু ছাত্র-শিষ্যের উপর গভীর ছোঁয়া লাগে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনা ও গবেষণার বৈপ্লবিক প্রভাব পড়ে, এজন্য তাঁদের আলোচনা কিছুটা বিশদভাবেই করা উচিৎ।

শাহ সাহেব লিখেন, শায়খ আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইলমে হাদীস অর্জন করেছেন তাঁর পিতা শায়খ ইবরাহীম আল-কুর্দী থেকে। এরপর শায়খ হাসান উজাইমা থেকে বেশিরভাগ ফায়দা লাভ করেছেন। এরপর আহমদ নাখলী, শায়খ আবদুল্লাহ বাছারীর নিকট দুই মাসের কম সময়ে শামায়েলে নববী (স), মুসনাদে ইমাম আহমদ পড়েছেন। এ সময়ে তিনি হারামাইন শরীফে আগত উলামায়ে কিরাম থেকে উপকৃত হতে থাকেন। শায়খ আবদুল্লাহ লাহোরী থেকে আবদুল হাকীম শিয়ালকুটী ও শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভীর কিতাবাদি রিওয়ায়াত করার অনুমতি লাভ করেন। শায়খ সাঈদ কোকানীর কাছে কিছু আরবী কিতাব এবং ফাতহুল বারীর একাংশ পড়েন।

'اليانع الجنى' গ্রন্থে আল্লামা মহসিন ইবনে ইয়াহ্ইয়া তারাহ্ লিখেছেন, শায়খ আবু তাহের বলতেন, শায়খ ওয়ালীউল্লাহ আমার থেকে শব্দের সনদ গ্রহণ করেন আর আমি তার থেকে হাদীসের মর্মার্থ অনুধাবনে লাভবান হই। এরূপই লিখেছেন তার অনুমতিপত্রেও।

শায়খ আবু তাহের বড় মাপের মুহাদ্দিস হওয়ার সাথে সাথে সূফীগণের প্রতি বড় শ্রদ্ধাশীল এবং তাদের সমালোচনা করা থেকে বিরত ছিলেন। শাহ সাহেব বলতেন, আমি শায়খ আবু তাহেরের কাছে বিদায় নিতে গেলে তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন–

نسيت كل طريق كنت أعرفه # الاطريقا يؤينى لربعكم

'আমি ভুলে গিয়েছি সব পথ একটি পথ বিনে,
যে পথ আমায় নিয়ে যায় তোমার দুয়ারে টেনে।

এ জবাবই ছিল শাহ সাহেবেরও। শাহ আবদুল আযীয সাহেব বলেন, আমার আব্বাজান মদীনা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে স্বীয় উস্তাদের কাছে এ

বিষয়টি আরয করলে তিনি একথা শুনে বিরাট খুশি হলেন যে, আমি ইলমে দীন ও হাদীস ছাড়া যা কিছু পড়েছি সব ভুলে গিয়েছি।

শাহ সাহেবের পরবর্তী জীবন ও কর্মকাণ্ডে (যার বিশদ বিবরণ অত্যাসন্ন) এর পূর্ণ সত্যায়ন করে। তিনি যা কিছু বলেছিলেন, তা বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. (سورة احزاب : ٢٣)

১১৪৫ হিজরী রমযান মাসে শায়খ আবু তাহের এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমান। সম্ভবতঃ শাহ সাহেবের মদীনা শরীফ থেকে প্রস্থান এবং তার দিল্লী পৌঁছার দেড়-দুই মাস পর তার ইন্তিকাল হয়েছে। আর শাহ সাহেবের ভারত প্রত্যাবর্তনের পর তার ইফাদাহ ও তরবিয়ত লাভের খুব কম সময় পেয়েছেন। وذلك تقدير العزيز العليم.

তার জীবনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, তার সম্মানিত পিতা শায়খ ইবরাহীম কাওরানী ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর পক্ষ থেকে জবাব দিতেন। আল্লামা সাইয়্যিদ নুমান খয়রুদ্দীন আলূসী বাগদাদী তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'জালাউল আইনাইন ফী মুহাকামাতিল আহমদাইন' -এর মধ্যে লিখেছেন, তিনি ছিলেন প্রবীণদের আকীদায় বিশ্বাসী। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার পক্ষ থেকে জবাব দিতেন। অনুরূপভাবে সূফীদের সেসব শব্দের ব্যাখ্যা দিতেন, যার দ্বারা বাহ্যিকভাবে অনুপ্রবেশ, একতা কিংবা আইনিয়ত (স্বাধিষ্ঠতা) প্রকাশ পেত।

সুতরাং এ সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যায় যে, শায়খুল ইসলামের কিতাবাদি থেকে পরিচয়, তার সাহায্য ও প্রতিরক্ষা বা জবাবদানের যে বর্ণনা শাহ সাহেবের রচনাবলিতে পাওয়া যায়, তাছাড়া শাহ সাহেবের বংশগত ধারাবাহিকতা ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই সামঞ্জস্যপূর্ণ চিন্তাধারায় শায়খ আবু তাহেরের কথাবার্তারও প্রভাব ও দখল থাকতে পারে, যার আগ্রহ-ঝোঁক তিনি তার সম্মানিত পিতা ইবরাহীম কাওরানী থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকবেন।

শাহ সাহেবের দ্বিতীয় শায়খ, যার থেকে তিনি ইজাযত (অনুমতি) পেয়েছিলেন, তিনি হলেন শায়খ তাজুদ্দীন কলঈ হানফী মুফতীয়ে মক্কা। হাদীস শাস্ত্রে সিংহভাগ শিক্ষা লাভ করেন শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে সালেম মিসরীর কাছে। সহীহাইন পড়েছেন শায়খ উজাইমির নিকট। তার থেকে নিঃশর্ত ইজাযতও লাভ করেন। তার শায়খ আহমদ নাখলী থেকেও ইজাযত রয়েছে। শাহ সাহেব তিনদিন তার বুখারীর সবকে অংশগ্রহণ করেছেন। সিহাহ সিত্তাহর বিভিন্ন অংশ, মুয়াত্তার একাংশ, মুসনাদে দারেমী, ইমাম

মুহাম্মদ (র)-এর 'কিতাবুল আছার' ও মুয়াত্তা তার থেকে শ্রবণ করেন। শায়খ এসব কিতাবের সবকে উপস্থিত সকলকে ইজাযত দেন। শাহ সাহেবও এতে শরীক ছিলেন। শাহ সাহেব হাদীসে মুসালসাল বিল আউয়্যালিয়্যাহও তার কাছ থেকে শ্রবণ করেন।

শাহ সাহেব হাফিযে হাদীস, বহুমুখী প্রতিভা ও যোগ্যতার অধিকারী শায়খ মুহাম্মদ বিনে মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান আল-মাগরিবী (যিনি ছিলেন নুসখায়ে বানূনিয়াহর সত্ত্বাধিকারী। তিনি এটি হারামাইন শরীফে নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি ছিলেন হারামাইনের লোকদের উস্তাদ) -এর পুত্র শায়খ মুহাম্মদ ওফদুল্লাহ থেকে আপন পিতার সকল বর্ণনার ইজাযত লাভ করেন। এছাড়া তার কাছে মুয়াত্তায়ে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া পুরোটাই পড়েন ও ইজাযত নেন।

শাহ সাহেব তার শিক্ষাজীবনে ভারতে হাদীস শাস্ত্রের তৎকালীন ইমাম শায়খ মুহাম্মদ আফযাল শিয়ালকুটীর সবকেও অংশ নিয়েছিলেন। যিনি হাদীসের সনদ হাসিল করেছিলেন শায়খ সালেম ইবনে আবদুল্লাহ বসরী থেকে এবং তার কাছে হাদীস পড়েছিলেন। তিনি শায়খ আবদুল আহাদ ইবনে খাজা মুহাম্মদ সাঈদ সরহিন্দীরও শাগরেদ। তিনি হাদীসের দরস দিতেন দিল্লীর গাজী আদ-দীন খানের মাদরাসা। হযরত মির্যা জানে জাঁনা রহ. হাদীস ও সুলূকে তার থেকে উপকৃত হন।

এই সফরে শাহ সাহেবের মামা উবাইদুল্লাহ বারাহবী ও তার মামাতো ভাই শায়খ মুহাম্মদ আশেক ফুলতীও (القول الجلى রচয়িতা) সঙ্গে ছিলেন। শাহ সাহেব তার সম্মানিত পিতার মৃত্যু সংবাদ এই সফর থেকে প্রস্থানকালে মক্কা শরীফে শুনেছেন।

শাহ সাহেবের জন্য হাদীস শাস্ত্রের বিশেষ আগ্রহ-আকর্ষণ, হারামাইন শরীফে এর পাঠদান ও প্রসারের সহজ সুযোগ, সেখানে বসে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত তালেবে ইলম ও উলামায়ে কিরামকে উপকৃত করার অবকাশ, অধিকন্তু বাইতুল্লাহর সান্নিধ্য, নবীজীর নৈকট্যের বরকত ও সৌভাগ্য, ভারতবর্ষের অনিশ্চিত অবস্থা-পরিস্থিতি, ইসলামী রাজত্ব ধ্বংসের পদক্ষেপ এবং বহির্শক্তির ক্রমবর্ধমান আগ্রসানের উপলব্ধি হিজাযে স্বকীয় অবস্থান ও হিজরতের ইচ্ছাকে শক্তিশালী করার কারণ ও প্রেরণা ছিল। আর না তা কেবল তার বৈধতার দলীল-প্রমাণ বরং ধর্মীয় ও শিক্ষাগত কল্যাণের সমর্থনও যোগাত। কিন্তু তিনি ভারত প্রত্যাবর্তনের সেই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিলেন, যার মধ্যে মহান আল্লাহ তা'আলা এমন সব কল্যাণ অন্তর্নিহিত

রেখেছিলেন, তার সংস্কার, ইজতিহাদ ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বাস্তবায়িত হয়েছে সেই নববী সুসংবাদ, যা তিনি মদীনা তাইয়িবায় অবস্থানকালে লাভ করেছিলেন।

إن مراد الحق فيك ان يجمع شملا من شمل الأمة المرحومة بك.

'আল্লাহর ইচ্ছা হল, তোমার দ্বারা মৃতপ্রায় জাতির বিশেষ এক ঐক্য-সংহতির কাজ নিবেন।'

শাহ সাহেবের নিছক নিজের ব্যাপারেই নয় বরং তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী-সাথীদের ব্যাপারেও চিন্তা-ভাবনা ছিল, তারা ভারতকে আপন কর্মতৎপরতা এবং শিক্ষামূলক ও ধর্মীয় খেদমতের কেন্দ্রস্থল বানাবেন। যে দেশে তাদের পূর্বপুরুষগণ নিজেদের উত্তমতর শিক্ষা ও ধর্মীয় যোগ্যতা-দক্ষতাগুলো ব্যয় করেছেন। যা প্রত্যেক যুগেই তৈরী করেছে গবেষক, পণ্ডিত ও আরেফ বিল্লাহ। এই ভারত অদূর ভবিষ্যতে ইলমে হাদীস এবং অন্যান্য জ্ঞানের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হওয়ার ফায়সালা ছিল। সুতরাং তাঁর এক খাছ শাগরেদ মঈনুদ্দীন সিন্ধী হিজায গিয়ে যখন সেখানেই থেকে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন শাহ সাহেব তাকে এ থেকে বারণ করে পত্র লিখেন– স্বদেশে না ফেরার ইচ্ছা তোমার যতদূর, তাতে এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করো না, যাবৎ না আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কিংবা তোমার ঘনিষ্ঠ কাউকে আশ্বস্ত করেন।

শাহ সাহেবের হাদীসের দরস

শাহ সাহেব হিজায থেকে ফিরে আসার পর স্বীয় পিতার মাদরাসায়ে রহীমিয়ায় শিক্ষকতা শুরু করেন, যা সে সময় পুরোনো দিল্লীতে সেই মহল্লায় অবস্থিত ছিল (বর্তমান যা বিলীন হয়ে গেছে)। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে দিক-দিগন্ত থেকে তালিবে ইলমগণ দলে দলে আসতে থাকে। তখন সেখানে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। আল্লাহ তা'আলা এই সৌভাগ্য (অনেক দুর্বলতা ও অসহায়ত্বসহ) সম্রাট মুহাম্মদ শাহের ভাগ্যে লিখেছিলেন। তিনি শাহ সাহেবকে শহরে এক বিশাল ভবন দিয়ে তাকে শহরে নিয়ে আসেন। তিনি সেখানে দরসদান শুরু করেন। মৌলভী বশীরুদ্দীন লিখেন, কোন এককালে এই ভবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় ও আলীশান ছিল। বড় শিক্ষাকেন্দ্র ও দারুল উলূম মনে করা হত। বিদ্রোহ পর্যন্ত এই মাদরাসা তার আসল অবস্থায় বহাল ছিল। বিদ্রোহের মধ্যে ভবনগুলো লুটতরাজ করা হয়। কাঠ-কড়া পর্যন্ত মানুষ লুট করে নিয়ে যায়।

মাওলানা আরও লিখেন- আজ বিভিন্ন লোকের ঘর-দুয়ার এখানে তৈরী হয়েছে। কিন্তু মহল্লাকে আজও শাহ আবদুল আযীয (র)-এর মাদরাসার নামে ডাকা হয়।

শাহ আবদুল আযীয সাহেবের মালফূযাতের এক স্থানে এই মাদরাসা-মসজিদের কথা উল্লেখ আছে। শাহ সাহেব বলেন, '(আমার জন্মের সময়) অনেক বুযুর্গ-ওয়ালীআল্লাহ, যারা আব্বাজানের প্রিয়ভাজন ও ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যেমন- মুহাম্মাদ আশেক ও মাওলানা নূর মুহাম্মদ প্রমুখ এই মসজিদে অবস্থান করতেন।'

'নুযহাতুল খাওয়াতির' রচয়িতা মাওলানা হাকীম সাইয়িদ আবদুল হাই সাহেব (১৩১২ হি./১৮৯৪ খৃ.) দিল্লী ও তার আশপাশ সফর করেন। ২৬ রজবের কর্ম-তালিকায় তিনি লিখেন, 'মিয়া সাইয়িদ নযীর হুসাইন সাহেবের দরসে থেকে আসার পর আমি মনস্থ করলাম, হযরত মাওলানা ও সকলের অভিভাবক, বিজ্ঞমহলের নেতা শাহ আবদুল আযীয রূহুল্লাহর মাদরাসা যিয়ারত করব, যেখানে আমাদের বুযুর্গগণ একের পর এক উপকার লাভ করেছেন। গৌরব ও সৌভাগ্যময় মনে করেছেন যার পুণ্যভূমিকে। সেখান থেকে জামে মসজিদ ও তার সম্মুখে বিচিত্র রঙের কবর পর্যন্ত গেলেন। এই কবর থেকে দু'টি পথ চলে গেছে। একটি ডান পাশে সোজা (শাহ গোলাম আলীর) খানকার দিকে। অপরটি বাম দিকে। এ পথ ধরে তিনি অনেক দূর চলে গেলেন। সামনে এগিয়ে বাম দিকে ফূলাদ খান মহল্লার সড়ক। সেটি সোজা চলে গেছে কুলামহল পর্যন্ত। কুলামহলে আছে আমাদের শায়খুল মাশায়িখ মাওলানা ও আমাদের অনুসৃত মুর্শিদের মাদরাসা। এর অবস্থাদৃষ্টে স্মরণ হয়ে যায় আল্লাহর বাণী-

خاوية على عروشها. قال انى يحى هذه الله بعد موتها

আল্লাহু আকবার। মহান আল্লাহর অপার কুদরতের কি বিস্ময়কর কারিশমা। একদিন আরব-অনারবের লোকজন এ মাদরাসায় তনুমনে পড়ে থাকত এবং ফায়দা হাসিল করত। আর আজ তা পড়ে আছে বিরান-পরিত্যক্ত। থাকার কেউ নেই এখানে।'

অনন্তর এ বংশেরই এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব মাওলানা সাইয়িদ যহীরুদ্দীন আহমদ সাহেবের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করেন, যে মুনহাদীউতে এসব হযরতের মাজার রয়েছে, সেখানে মাদরাসাও ছিল। শাহ আবদুর রহীম সাহেবের পরে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) নতুন শহরে আসেন। এই মাদরাসা তাকে দেওয়া হয়। তিনি সেখানেই থেকে যান।

হযরত আবদুল আযীয (র) -এর ভাষায় শাহ সাহেবের কিছু বৈশিষ্ট্য

আক্ষেপ! শত আক্ষেপ! সমকালীন কোনও স্মারক, ভ্রমণকাহিনী কিংবা রোজনামচা সম্মুখে নেই, যার দ্বারা শাহ সাহেবের গুণাবলি, বৈশিষ্ট্য, কর্মকাণ্ড-মামুলাত, সময়ানুবর্তিতা ও উঠা-বসার অবস্থা বিস্তারিতভাবে জানা যায়। হযরত আবদুল আযীয (র)-এর মালফুযাতে (ফার্সীতে) কোথাও কোথাও কিছু ইংগিত এসেছে।

তিনি বলেন, আমি আমার আব্বাজানের মত প্রখর ধীমান স্মরণশক্তির অধিকারী কাউকে দেখিনি। শোনার কথা তো অস্বীকার করতে পারি না, তবে চাক্ষুষ আমি দেখিনি। জ্ঞান-বিদ্যা ও নানামুখী যোগ্যতা ছাড়া সময়ানুবর্তিতায়ও তার তুলনা ছিল না। ইশরাকের পর যেভাবে বসতেন, দুপুর পর্যন্ত না পা বদলাতেন; না চুলকাতেন আর না থুথু ফেলতেন। প্রত্যেক শাস্ত্রে একেকজন লোক তৈরী করে দিয়েছিলেন। সে শাস্ত্রের ছাত্রদেরকে তার হাতেই ন্যস্ত করতেন। আর স্বয়ং তিনি হাকীকত-মারেফত বর্ণনা এবং সেসব সংকলন রচনায় ব্যস্ত থাকতেন। হাদীস মুতালা'আ ও দরস দিতেন। যে বিষয় বিকশিত হয়ে যেত, তা লিখে নিতেন। অসুস্থ হতেন খুব কম। মহান দাদা ও মুহতারাম চাচা (যিনি চিকিৎসক ছিলেন) মানুষের চিকিৎসা করতেন। আব্বাজান এই পেশাকে স্থগিত রাখেন। তবে চিকিৎসা সম্পর্কিত বই-পুস্তক মুতালা'আ করতেন। শৈশব থেকেই মন-মানসে স্বচ্ছতা, পরিচ্ছন্নতা ও নমনীয়তা ছিল। সূফী ধরনের ছন্দ-কবিতা কম পড়তেন। তবে মাঝে মধ্যে কোনও কোনও কবিতা পড়তেন।

ইন্তিকাল

অবশেষে এই অমূল্য বরকতময় জীবনের– যার এক একটি মুহূর্ত ছিল অতি মূল্যবান, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে নিবেদিত, সুন্নাতে রাসূলের পুনর্জীবন দান, কুরআন-হাদীসের প্রচার-প্রসার, তালীম-তরবিয়ত, আল্লাহর স্মরণ ও ইলায়ে কালিমাতিল্লাহর চিন্তায় বিভোর, তার শুভ সমাপ্তির দিন এসে পড়ে। যার ছোবল থেকে كل نفس ذائقة الموت (প্রত্যেক প্রাণীই মরণশীল) -এর ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি অনুসারে না কোনও নবী-রাসূল মুক্ত, না কোনও ওয়ালীআল্লাহ, না কোন মুজাদ্দিদ, না কোনও মুজাহিদ। ১১৭৬ হিজরীর শুরু লগ্ন। মুহররমের শেষ দিন, সেই প্রতিশ্রুত সময় এসে পড়ে।

হযরত শাহ সাহেব সাময়িক অসুস্থতার পর ষাট বছর বয়সে এই নশ্বর পৃথিবীকে বিদায় জানান এবং নিজের প্রাণকে তার স্রষ্টার কুদরতে সমর্পণ করেন।

چیست ازیں خوب تر در ہمہ آفاق کار۔

دوست رسد نزد دوست یار بہ نزدیک یار۔

কোনও স্মারক গ্রন্থে তাঁর এ অসুস্থতা ও মৃত্যুর ঘটনার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। অধম লেখকের জন্য বড় গৌরব ও কৃতজ্ঞের বিষয় হল, এ ব্যাপারে যতখানি ধারণা ও বিবরণ পাওয়া যায়, তার একমাত্র মাধ্যম রায়বেরেলীর সাদাত হাসানী কুতবী এবং আলামুল্লাহ বংশেরই এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সাইয়িদ মুহাম্মদ নুমান হাসানীর রচনাবলি, যা এ বংশেরই অপর এক বুযুর্গ ও বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হযরত শাহ সাইয়িদ আবু সাঈদ (র)-এর নামে শাহ সাহেবের ইন্তিকালের পরপরই দিল্লী থেকে লিখেছিলেন। লেখক হযরত সাইয়িদ নুমান ছিলেন মহান মুজাহিদ হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র)-এর আপন চাচা। যার উদ্দেশ্যে লেখা, তিনি (হযরত শাহ সাইয়িদ আবু সাইদ (র)) ছিলেন হযরত সাইয়িদ সাহেবের আপন নানা। আর হযরত শাহ আবু সাঈদ (র) ছিলেন শাহ সাহেবের খাছ সঙ্গী ও মুরীদগণের একজন। যার নামে স্বয়ং শাহ সাহেবের একাধিক চিঠিপত্র রয়েছে। উক্ত চিঠিপত্র হুবহু পত্রসমগ্র 'মাকতুবুল মা'আরিফ' থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

'বিসমিহী সুবহানাহু তা'আলা!

সকল প্রশংসা আল্লাহর, তার অফুরন্ত নেয়ামতরাজি ও নিয়তির উপর সন্তুষ্ট থাকার এবং সকল বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণের তাওফীক লাভের ওপর। অসংখ্য দরূদ-সালাম বর্ষিত হোক শোকরগুযারদের সরদার, অনন্য সন্তুষ্ট চিত্ত, ধৈর্যশীলদের দিশারী, পাপীদের সুপারিশকারী এবং উভয় জগতের রহমত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স) এবং তার পুতঃপবিত্র সঙ্গী-সাথীদের প্রতি আর তার উত্তরাধিকারী মজবুত উলামায়ে কিরাম ও মুর্শিদ ওয়ালীআল্লাহর উপর কিয়ামত পর্যন্ত।

পরকথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম, কারামাতওয়ালাদের অনুসৃত নেতা, সমকালীন আরিফদের পথপ্রদর্শক, বিশ্ব আউলিয়াদের শিরোমণি, যুগশ্রেষ্ঠ কুতুব, বিজ্ঞজনদের প্রিয়পাত্র, আমাদের সরদার ও মুর্শিদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ ফারুকী বারো শতকের মুজাদ্দিদ (রা)-এর অন্তিম যাত্রার বিবরণ যদি যুগের ডায়েরীতে মুদ্রিত হয়, তাহলে আমরা নিঃস্ব অসহায়দের মত হয়ে যাব।

[illegible] ☆ [illegible]

আক্ষেপ! আল্লাহ পাকের কি বিস্ময়কর অমুখাপেক্ষীতা! এমন অনুসৃত দিশারীর আত্মাকে মাত্র বাষট্টি বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে ارجعى إلى ربك راضية مرضية (সূরা ফাজর : ২৮)-এর আহবান শুনিয়ে দেওয়া হল। বিদ'আতী ও গোমরাহ-পথভ্রষ্টদেরকে খুশি আর দীনদার-ধর্মপ্রাণদেরকে ব্যথিত করা হল অর্থাৎ মুহররমের শেষ দিন ১১৭৬ হিজরী শনিবার দ্বিপ্রহরের সময় আল্লাহ্ পাকের হুকুমে হযরতের পুণ্যময় আত্মা মাটির দেহ ছেড়ে জান্নাতের উচ্চাসনে নিজের বাসস্থান বানিয়ে নিয়েছে।

সকল সঙ্গী-সাথী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের অবস্থা হযরতের বিদায়-বিরহে এতটাই বিধ্বস্ত ও ক্ষত-বিক্ষত ছিল যে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার উপর এবং তার সহযোগীদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার অপার অনুগ্রহ এবং রাসূলে কারীম (স)-এর দয়ায় স্বয়ং হযরতের চেষ্টা-সংগ্রাম নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। যিলকদ মাসে বড়হান গিয়ে হস্তচুম্বনের সৌভাগ্য লাভ করেছি। ধন্য হয়েছি মহান এই বুযুর্গের সাহচর্য লাভে। নিজের অবস্থায় প্রভূত উন্নতি লক্ষ্য করেছি হযরতের তাওয়াজ্জুহ ও অন্তর্দৃষ্টিতে। সেখান থেকে হযরত চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ৯ যিলহজ্জ দিল্লীতে বাবা ফযলুল্লাহর বাড়িতে রওশন দৌলাহ মসজিদের আঙ্গিনায় (যা সাদুল্লাহ খান চত্ত্বরে অবস্থিত) তাশরীফ রাখেন। সুযোগ্য পুত্রদের মধ্য থেকে মিয়াঁ মুহাম্মদ সাহেব, মিয়াঁ আবদুল আযীয ও মিয়া রফীউদ্দীন আর মুরীদ ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে মিয়াঁ মুহাম্মদ আশেক, মিয়াঁ মুহাম্মদ ফায়েক, মিয়াঁ মুহাম্মদ জাওয়াদ এবং খাজা মুহাম্মদ আমীন প্রমুখ ঘনিষ্ঠজন খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। এই খাদেম এবং মীর মুহাম্মদ আতীক ও মীর কাসেম আলী (যারা হযরতের কাছে তার জীবন সায়াহ্নে বায়'আত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন) প্রতিদিন হাজিরা দেওয়া ও খেদমত করার খোশনসীব অর্জন করেছিল। আমার স্নেহাস্পদ! এই শেষ মজলিস ছিল অত্যন্ত বরকতপূর্ণ ও কল্যাণকর। ফিরিশতা ও পুণ্যাত্মাদের অবতরণ বরাবরই অনুভূত হত। বৃষ্টির মত বর্ষিত হত তাঁর ভালবাসা ও রহমতের নিঃশ্বাস আর কল্যাণ ও বরকতের বারিধারা। প্রায় আহলে নিসবত শুভাকাঙ্ক্ষীগণ তাদের সঠিক জ্ঞান দিয়ে তা উপলব্ধি করতেন।

বড় আক্ষেপ! আহলুল্লাহ ও আরেফ বিল্লাহ্ তো সর্বকালেই হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহর এমন খাঁটি প্রিয় বান্দা, যিনি ছিলেন একদিকে বহু প্রশংসিত গুণাবলির অধিকারী; অপরদিকে কুরআন-সুন্নাহর ইলম-জ্ঞানে মুজতাহিদে

মুতলাক-এর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, হাকায়েক ও মা'আরিফের উত্তাল সমুদ্র এবং অন্যান্য জ্ঞানের খরস্রোতা সাগর কোন্ শতকে জন্ম নিয়েছেন?

[illegible]

[illegible]

বন্ধুদের উচিৎ সবর ও ধৈর্যশীলতা অবলম্বন করা, শায়খের সাহচর্যকে পুরোপুরি সাহসিকতার সাথে অনুভবে রেখে নির্দিষ্ট মুরাকাবায় নিমগ্ন হওয়া। ইনশাআল্লাহ সাহচর্য ও সংশ্রবের কল্যাণের ধারা জারি থাকবে। যেমনটি জানা যায় হযরতের কোনও কোনও পুস্তিকা থেকে।

আলহামদুলিল্লাহ! আপনার প্রতি হযরতের সন্তুষ্টি এবং আপনার প্রতি হযরতের উচ্চ অন্তর্দৃষ্টি বর্ণনার উর্ধ্বে পেয়েছি। প্রায় সময় আপনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করতেন। আউলিয়ায়ে কিরামের যুদ্ধ এবং আপনার রণাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছা আর ফিৎনার আগুন থেকে আপনার পবিত্র কদম মুক্ত হয়ে যাওয়ার ঘটনা চমৎকার ভাষায় বর্ণনা করতেন। সম্ভবঃ হযরতের অন্তরে আপনার সাথে শেষ সাক্ষাতের বাসনা ছিল। কেননা, একবার বলেছিলেন, 'মীর আবু সাঈদ সাক্ষাতে আসার ইচ্ছা পোষণ করে। শীঘ্রই এলে ভাল হত।'

বন্ধু! হযরতের প্রকাশ্য সংস্পর্শ থেকে তো আজ বঞ্চিত। তবে হযরতের রচনাবলির সংখ্যা নব্বই বরং তদপেক্ষাও বেশি। ধর্মীয় জ্ঞান অর্থাৎ তাফসীর ও উসূল, ফিকাহ ও কালাম এবং হাদীস সম্পর্কে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, আসরারে ফিকাহ, মানসূর (উদ্দেশ্য অজ্ঞাত একটি কিতাব), ইযালাতুল খফা আন খেলাফাতিল খুলাফা ও তরজমায়ে কুরআন -তন্মধ্যে প্রত্যেকটিরই কলেবর আশি/নব্বই খণ্ড হবে। হাকায়েক ও মা'আরেফ সম্পর্কে অন্যান্য পুস্তিকা যেমন– আলতাফুল কুদস, হামআতু ফুয়ুযিল হারামাইন, আনফাসুল আরেফীন প্রভৃতি, যেগুলো হযরতের সাহচর্য ও বরকতের ইংগিত করে। এসবের ব্যাপারে আপনি সাহস সঞ্চয় করুন যে, এগুলোকে লিখে ছাপিয়ে প্রচার করবেন। এ কাজ সামান্য মনোযোগিতার দ্বারাই বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন, ইসলামের ইতিহাসে এরূপ কিতাবাদি রচিত হয়েছে কি না? যেমনটি অভিজ্ঞ মহল স্বীকার করেন। হযরত যে বিষয়েই কলম ধরেছেন, তা মূলনীতির মর্যাদা রাখে।

এ অধম, শায়খ পুত্রগণ এবং হযরতের প্রিয়ভাজনদের (হযরতের সাথে আপনার অশেষ সম্পর্কদৃষ্টে) বিশ্বাস যে, আপনি এই প্রলয়ঙ্করী দুর্ঘটনার সংবাদ শোনামাত্র ফাতিহা পাঠ ও পবিত্র কবর যিয়ারতের লক্ষ্যে দিল্লীর পথে

রওয়ানা হয়ে যাবেন। এজন্য অপেক্ষায় থাকব। যদি শীঘ্রই আসেন, তবে মনিবের মহান সাক্ষাতে আমিও তাৎক্ষণিক খুশী হব। যদি আসতে বিলম্ব হয়, তবে অবহিত করবেন। কারণ, আমি অধমও স্বদেশে ফেরার ইচ্ছা করছি।

দ্বিতীয় কথা হল, মিয়াঁ মুহাম্মদ আশেক সাহেব সালামান্তে বলেন, মীর আবু সাঈদকে লিখে দিন, আপনার নামে হযরতের যতগুলো পত্র আছে, তার প্রতিলিপি অবশ্যই পাঠাবেন। যাতে করে সেগুলোকে 'পত্র সমগ্রে' সন্নিবেশিত করা যায়। হযরত মিয়াঁ আহলুল্লাহ সাহেব অন্যান্য বন্ধু-আহবাব, শুভাকাঙ্ক্ষী ও পুত্রদের পক্ষ থেকে নাম ধরে সালাম পৌঁছাবেন। ভাই মুহাম্মদ মঈনের অন্তিম যাত্রা বিয়োগান্ত অবস্থা আমি হযরতের খেদমতে বড়হানায় আরয করেছিলাম। হযরত তার মাগফিরাত কামনায় সওয়াব রেছানী করেছিলেন এবং শোক প্রকাশ করেছিলেন।'

শাহ সাহেবের ইন্তিকাল হয়েছে ২৯ মহররম ১১৭৬ হিজরী শনিবার দিন দ্বিপ্রহরের সময় (২১ আগস্ট ১৭৬২ খৃ.)। যেমনটা উল্লেখিত পত্র থেকে জানা গেছে। শাহ আবদুল আযীয সাহেব (র) এর মালফূযে রয়েছে,

'(শাহ সাহেব) ২৯ মহররম ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর মৃত্যু তারিখ 'উ-বূদ ইমাম আযমে দীন' এবং 'হায় দিলে রোযেগারে রফত' থেকে বের হয়। ২৯ মহররম দ্বিপ্রহরে তার মৃত্যুদিবস ও সময় ছিল।

দাফন

তাকে দাফন করা হয়েছে দিল্লী তোরণের বামদিকে সেই স্থানে, যাকে মুনহাদিয়া বলা হত। যেখানে এই কবরস্থান অবস্থিত, সেখানে কোন এক সময় হযরত শাহ আবদুর রহীম (র)-এর নানা শায়খ আবদুল আযীয শোকরবারের খানকাহ ছিল। আজও তার কেন্দ্রস্থল অনতিদূরেই রয়েছে। পরবর্তীতে শায়খ রফীউদ্দীন সাহেব এখানেই অবস্থান নেন। ওয়ালীউল্লাহ বংশের বাসস্থানও ছিল এখানেই। শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব এখানে বসবাস ছেড়ে দিয়ে শাহজাহানাবাদে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। এই মুনহাদীর কবরস্থানেই শাহ সাহেবের চার পুত্র স্বয়ং শাহ সাহেবের সম্মানিত পিতা শাহ আবদুর রহীম সাহেবের কবর অবস্থিত, যার উপর শিলালিপি স্থাপিত আছে। তাতে লিখা আছে তাদের মৃত্যুর সন-তারিখ। সেখানে এসব হযরত ছাড়াও তাদের বংশের অন্যান্য লোকজন ও নারী-পুরুষের কবর রয়েছে। পাশেই মসজিদ। যার আশপাশে ছড়িয়ে আছে অনেক উলামায়ে কিরাম, নেককার বুযুর্গ এবং ওয়ালীউল্লাহ বংশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষের বহু কবর। দিন দিন তা বেড়েই চলেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

শাহ সাহেবের সংস্কার কর্ম

আকীদা সংশোধন ও কুরআনের পথে দাওয়াত

শাহ সাহেবের সংস্কারকর্মের প্রশস্ততা

শাহ সাহেবের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সংস্কার ও জাতির সংশোধন, দীনের সঠিক জ্ঞানের পুনর্জীবন, নববী জ্ঞানের প্রচার-প্রসার এবং তৎকালীন সময় ও জাতির চিন্তাধারায় এক নবজীবন ও সজীবতা সৃষ্টির যে মহান কাজ নিয়েছেন, তার পরিধি এত ব্যাপক-বিস্তৃত, তার শাখা-প্রশাখা এত ব্যাপৃত, যার নযীর কেবল সমকালই নয় বরং পূর্বকালের প্রবীণ উলামায়ে কিরাম ও লেখকদের মধ্যেও কম দেখা যায়। এর কারণ অবশ্য (আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ও অদৃশ্য সিদ্ধান্ত ব্যতিত) এই যুগের অবস্থা-পরিস্থিতির চাহিদাও হতে পারে, যা শাহ সাহেবের সময়কালে দেখা দিয়েছে সেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা, উচ্চ সাহস ও বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষাও হতে পারে, যা ছিল শাহ সাহেবের খোদাপ্রদত্ত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এসব কারণে শাহ সাহেব ইলম-আমলের এতগুলো ময়দানে সংস্কার ও সংশোধনমূলক কার্যক্রম আঞ্জাম দিয়েছেন যে, তার জীবনী রচয়িতা এবং ইসলামের দাওয়াত ও সংহতির ইতিহাসের উপর যারা কলম ধরেছেন, তাদের জন্য সেসব পরিবেষ্টন ও সেসবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা চালানো বিরাট কঠিন অনুভূত হয়েছে। আর যে এরূপ ইচ্ছা করবে, তার অনিচ্ছায়, অজান্তে নিম্নোক্ত ফার্সী কবিতার সাথে অনুযোগই উচ্চকিত হবে–

কবি বলেন,

[illegible]

[illegible]

আমরা যদি সেগুলোকে পৃথক পৃথক শিরোনামে বর্ণনা করি, তাহলে নিম্নরূপ হবে।

১. আকীদা সংশোধন ও কুরআনের পথে দাওয়াত।

২. হাদীস ও সুন্নাতের প্রচার-প্রসার। ফিকহ ও হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস।

৩. ইসলামী শরীয়তের মজবুত ও স্বপ্রমাণ বিশ্লেষণ। হাদীস ও সুন্নাতের তত্ত্ব-রহস্য ও উদ্দেশ্যের পর্দাচ্ছেদ।

৪. ইসলামে খেলাফতের আসনের ব্যাখ্যা। খেলাফতে রাশেদার বৈশিষ্ট্যাবলি ও তার প্রমাণ। বিদ'আত প্রতিরোধ।

৫. রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও মোঘল শাসনামলে শাহ সাহেবের মুজাহিদ ও নেতাসুলভ কৃতিত্ব।

৬. উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণীর পরিসংখ্যান এবং তাদেরকে সংস্কার-সংশোধন ও বিপ্লবের দাওয়াত প্রদান।

৭. বিদগ্ধ উলামায়ে কিরাম ও সিংহপুরুষদের শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান, যারা তার পরবর্তীতে জাতির সংশোধন ও দীন প্রচারের কাজ চালু রাখবে।

আমরা সর্বপ্রথম 'আকীদা সংশোধন ও কুরআনের পথে দাওয়াত' শিরোনামটি আলোচনায় নিচ্ছি। কেননা দীন সংরক্ষণ ও সংস্কার এবং উম্মতের সংশোধনের কাজ যে যুগে আর যে দেশেই শুরু করা হোক, তা প্রথম স্তরের প্রয়োজন বলে স্বীকৃত হবে। অন্যথায় একে বাদ দিয়ে দীন-ধর্ম ও জাতির পুনর্জাগরণের যে কোন প্রচেষ্টাই চালানো হবে, সবই জলছবি ও ভিত্তিহীন প্রাসাদ গণ্য হবে। কুরআন মজীদ আম্বিয়ায়ে কিরামের ঘটনাবলি ও কথোপকথন দ্বারা এবং নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নবী-রাসূলগণের প্রতিনিধি ও হক্কানী উলামায়ে কিরামের শিক্ষা-দীক্ষা কার্যক্রম ও কর্মকৌশল দ্বারা একথাই প্রমাণ করেছে। আর তা কিয়ামত পর্যন্ত সেসব সংস্কার ও সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ডের অনুসৃত আদর্শ (কর্মনীতি) হয়ে থাকবে, যার চেতনা হবে নববী আর নেযাম (ব্যবস্থাপনা) হবে কুরআনী।

আকাইদের গুরুত্ব

গ্রন্থকার এ প্রসঙ্গে তার পুরোনো একটি রচনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে ক্ষ্যান্ত হবেন।

'এই ধর্মের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশ্য নিদর্শন হল, আকীদার উপর জোর ও কড়াকড়ি আরোপ আর সর্বপ্রথম এ বিষয়টি অনুধাবন ও বুঝে নেওয়ার তাগিদ আছে। হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল (ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত) একটি সুনির্দিষ্ট আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দিতেন এবং এর দাবী করতেন। এর বিরোধিতায় কোন প্রকার পশ্চাদগামিতা ও ছাড়দানে প্রস্তুত হননি। তাদের নিকট উত্তম থেকে উত্তমতর আদর্শ জীবন এবং উন্নত থেকে উন্নততর ইসলামী কৃতিত্বের

ধারক, সৎকাজ, কল্যাণ, নিরাপত্তা ও যৌক্তিকতার জীবন্ত ছবি ও আদর্শ মানব– চাই তার দ্বারা কোনও উন্নত রাজত্ব প্রতিষ্ঠা, কোনও আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ ও কোনও ফলপ্রসূ বিপ্লব সংঘটিত হয়ে থাক– ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোনও মর্যাদা ও মূল্য নেই, যাবৎ না তার আনীত আকীদাগুলো মেনে চলবে, যার দাওয়াত তার জীবনের মুখ্য বিষয়। অদ্রুপ যাবৎ না তার এ সকল চেষ্টা-সংগ্রাম কেবল সেই আকীদার ভিত্তিতেই হবে। এটাই সেই পার্থক্যকারী সীমানা, সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল দাগ-খতিয়ান, যা আম্বিয়ায়ে কিরামের দাওয়াত এবং জাতীয় দিক-নির্দেশক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিপ্লবী নেতা আর প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির মাঝে টেনে দেওয়া হয়েছে, যার চিন্তাধারা ও জ্ঞান-গবেষণার উৎস আম্বিয়ায়ে কিরামের শিক্ষা ও তাদের জীবনাদর্শের বদলে অন্য কিছু হবে।'

বস্তুতঃ আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমে যে ইলম-জ্ঞান ও মা'আরিফ মানবজাতির কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে উঁচু, জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ ইলম হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার যাত, সিফাত (সত্ত্বা ও গুণাবলি), তার কাজকর্মের জ্ঞান এবং সেই বিশেষ সম্পর্ক নির্ণয় করা, যা এক স্রষ্টা ও সৃষ্টি আর এক বান্দা ও উপাস্য মাবুদের মাঝে থাকতে হয়। এই ইলম সবচেয়ে বড় ও উৎকৃষ্টতর। কেননা এর উপর মানব জাতির সৌভাগ্য, পার্থিব কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নির্ভরশীল। এটাই আকাইদ, আমলসমূহ, চরিত্র ও সভ্যতার ভিত্তি। এর মাধ্যমেই মানুষ তার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে। বিশ্বজগতের ব্যাপৃতি ও জীবনের রহস্য বুঝে। এর দ্বারাই মানুষ এ জগতে নিজের অবস্থান নির্ণয় করে। এরই ভিত্তিতে নিজের স্বজাতি ও সমমনাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। আপন জীবনের গন্তব্য ও মতাদর্শের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পূর্ণ আস্থা-বিশ্বাস, দূরদর্শিতা ও বিশ্লেষণের সাথে নিজের লক্ষ্য স্থির করে। (দস্তুরে হায়াত -৬০ গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দলীল প্রমাণ দেওয়া হয়েছে।)

বিশেষতঃ এই উম্মতের সাথে মহান আল্লাহ তা'আলার যে বিশেষ সম্পর্ক, সমর্থন, সাহায্য, সন্তুষ্টি, ভালবাসা, বিজয় ও ইজ্জতের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা কেবল সঠিক আকীদা-বিশ্বাস, ঈমানী চেতনা ও গুণাবলি বিশেষভাবে খালেছ ও নিষ্কলুষ আকীদায়ে তাওহীদ (একত্ববাদের বিশ্বাস)-এর উপর ভিত্তিশীল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

'আর তোমরা নিরাশ হয়ো না, কোন চিন্তাও করো না। তোমরাই বিজয়ী হবে যদি (খাঁটি) মুমিন হও।' (সূরা আলে ইমরান : ১৩৯)

সেই সাথে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে,

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننى لا يشركون فى شيئا. ومن كفر بعد ذلك فالئك هم الفاسقون.

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করবে এবং সৎকর্ম করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন যে, তাদেরকে ধরাপৃষ্ঠে রাষ্ট্রশাসক বানাবেন, যেমন বানিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তী লোকদের। আর তাদের দীনকে করবেন সুদৃঢ়-মজবুত, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন। ভয়-ভীতির পর তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার উপাসনা করবে; আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। অনন্তর যারা কুফরী করবে, তারাই হবে পাপাচারী-ফাসিক।' (সূরা আন-নূর : ৫৫)

আম্বিয়ায়ে কিরামের সত্যবাদী নায়েব ও প্রতিনিধি এবং হক্কানী আলেমগণ, যারা আল্লাহর দীনের স্বভাব-চাহিদা সর্ম্পকে জ্ঞাত থাকেন, তারা একে কোথাও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রথমে সেখানকার মাটিকে সম্পূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন ও সমতল করেন। তারা শিরক ও অজ্ঞতার শেকড় ও মূলগুলো (চাই প্রাচীন পৌত্তলিকতার নতুন সংস্করণ হোক কিংবা জাতীয় ও স্থানীয় প্রভাবের পরিণতিই হোক) খুঁজে খুঁজে বের করেন এবং তার এক একটি খুঁড়ে খুঁড়ে উপড়ে ফেলেন। সেই সাথে মাটিকে সম্পূর্ণরূপে ওলটপালট করে দেন। এ কাজে তাদের যতই বিলম্ব হোক এবং যত কষ্ট-যাতনা ভোগ করতে হোক না কেন। তারা সে ফসল ঘরে তুলতে কখনও তড়িঘড়ি ও অধৈর্যের সঙ্গে কাজ করেন না।

শিরক (নানা রূপে) মানব জাতির সবচেয়ে ভয়াবহ ও পুরনো রোগ। তা আল্লাহর কুদরতের আত্মমর্যাদাবোধ এবং ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত করা ছাড়াও বান্দাদের আত্মিক, চারিত্রিক, সভ্যতা-সাংস্কৃতিক উন্নতির পথে বিরাট বড় অন্তরায়। এই শিরক মানুষের শক্তি-ক্ষমতার গলা টিপে ধরে। তাদের যোগ্যতাসমূহকে খুন করে। একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ তা'আলার উপর তার আস্থা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মপরিচয়ের যবনিকাপাত ঘটায়। সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ, সর্বোত্তম দয়ালু ও দাতা, মার্জনাকারী ও মহব্বতকারী আল্লাহর নিরাপদ ও কঠোর নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে বের করে দেয়। তার অফুরন্ত গুণাবলি, অবিনশ্বর ধনভাণ্ডারের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে। আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করে দুর্বল-অক্ষম, নিঃস্ব-অসহায়, দৈন্য-নগণ্য সৃষ্টিজীবের ছায়াতলে। যাদের ঝোলায় কিছুই নেই।

নতুন করে তাওহীদের দাওয়াত ও প্রচারের প্রয়োজনীয়তা

গ্রন্থকার শায়খুল ইসলাম হাফিয ইবনে তাইমিয়া রহ. সম্পর্কে রচিত তারীখে দাওয়াত ও আযীমতের দ্বিতীয় খণ্ডে "ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর যুগে শিরকী আকীদা-বিশ্বাস ও রুসম-রেওয়াজ" শিরোনামে নিম্নোক্ত আলোচনা উদ্ধৃত করেছেন।

'অমুসলিম ও অনারব জাতিসমূহের সংমিশ্রণ, ইসমাঈলী এবং বাতেনী রাজত্ব বিস্তার ও প্রভাব, পাশাপাশি জাহেল, মূর্খ ও গোমরাহ সূফীদের শিক্ষা-দীক্ষা ও আমলের দ্বারা সাধারণ মুসলমানদের মাঝে শিরকী আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও রীতিনীতির প্রচলন বেড়ে চলছিল। অনেক মুসলমান তাদের ধর্মীয় দিশারী, পথপ্রদর্শক, তরীকতের মাশায়িখ, আউলিয়ায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দীনের ব্যাপারে এমন ধরনের উচ্চ পর্যায়ের আর শিরকী ধ্যান-ধারণা ও আকীদা পোষণ করছিল, যেমনটি ইয়াহুদী-খৃস্টানরা হযরত ঈসা আ., হযরত উযায়ের আ. এবং পোপ-পাদ্রীদের ব্যাপারে বিশ্বাস রাখত। বুযুর্গানে দীনের মাজারে যেসব অপকর্ম চলত, তা ছিল সেসব রুসম-রেওয়াজের এক স্বার্থক প্রতিফলন, যা চলত অমুসলিমদের উপাসনালয়ে এবং পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গের কবরে। কবরবাসীদের কাছে প্রকাশ্যে সরাসরি সাহায্য-প্রার্থনার কাজ চলত। তাদের কাছে নানা আবেদন-নিবেদন, ফরিয়াদ, তাদের দেখা দেওয়া, মনোবাঞ্ছা পূরণের আরাধনার প্রচলন হয়ে গিয়েছিল। তাদের কবরের উপর বড় বড় মসজিদ নির্মাণ, তাদের কবরকে সিজদার স্থান বানানো, সেখানে প্রতিবছর মেলার আয়োজন করা এবং দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে সেখানে আগমনের প্রথা চালু হয়েছিল। প্রকাশ্যে কবর পূজা, আল্লাহর প্রতি অভয় আর মাজারওয়ালার প্রতি ভয়ভীতি, আল্লাহ এবং খোদায়ী নিদর্শনের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রুপ, ভ্রুক্ষেপহীনতা, দাম্ভিকতা, বুযুর্গদের প্রতি প্রভুত্বের পর্যায়ে বিশ্বাস, বিভিন্ন মাজারে হজ্ব পালন, আবার মাঝে মধ্যে একে বাইতুল্লাহর হজ্জের উপর প্রাধান্য দান, কোথাও কোথাও মসজিদসমূহের বিলুপ্তি, ব্যক্তি পূজা, দরগাহ ও মাজারের সাজ-সজ্জার প্রতি গুরুত্ব দান ইত্যাদি এই যুগের (নব্য) জাহেলী জীবনের সেই রূপরেখা ছিল, যা দেখার জন্য অনেক দূরে যাওয়া এবং খুব বেশি চিন্তা-ভাবনার সাথে কাজ করার প্রয়োজন হত না।'

এ ছিল মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের মত দেশগুলোর অবস্থা, যা সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাদের বরকতময় হাতে জয় করেছিলেন, যা ছিল ইসলামের কেন্দ্র, অহী অবতরণস্থল এবং রাসূলে কারীম (স)-এর বাসস্থানের সন্নিকটে ও সম্পৃক্ত। যেখানের ভাষা ছিল আরবী। যেখানে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

যেখানে এক দিনের জন্যও কুরআন-হাদীসের পাঠদান স্থগিত হয়নি, যেখানে রচিত হয়েছে উলূমে হাদীস ও শরহে হাদীসের বিশাল বিশাল গ্রন্থাবলি।

পক্ষান্তরে সেই (বারো হিজরী শতকের) ভারতবর্ষের অনুমান করাও কঠিন নয়, যেখানে শাশ্বত ইসলাম এসে পৌঁছেছে তুর্কিস্তান, ইরান ও আফগানিস্তানের সীমানা পেরিয়ে এবং নিজের বিরাট সজীবতা ও শক্তিক্ষমতা হারিয়ে সেসব লোকের মাধ্যমে, যারা সরাসরি নবুওয়াতের আলোকরশ্মি ও বরকতে উপকৃত হয়নি। যাদের অনেকেই তার বংশগত ও সাম্প্রদায়িক প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি। তাছাড়া ভারতবর্ষে হাজার বছর ধরে এমন এক ধর্মমত, দর্শন ও সভ্যতা রাজত্ব করছিল, যাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সক্রিয় বিরাজমান ছিল পৌত্তলিকতা ও শিরক। যারা এই শেষ শতকগুলোতে হয়ে গিয়েছিল পৌত্তলিকতার সবচেয়ে বড় নেতা, প্রাচীন বর্বরতার রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক। সেখানে ভারতবর্ষের মুসলিম জনবসতির বিরাট এক অংশ বারহামানিয়া মতাদর্শ ও অন্যান্য মুশরিকসুলভ পরিবেশ থেকে বের হয়ে ইসলামের ছায়াতলে দীক্ষিত হয়েছিল। অধিকন্তু মনে রাখতে হবে, (সুদীর্ঘ সময় ধরে) কুরআন-হাদীসের সাথে সরাসরি সেই সম্পৃক্ততা ছিল না এদেশের, যা ছিল ইরানের প্রভাবে হিকমত ও ইউনানী দর্শনের সাথে। ধর্মীয় জ্ঞান-বিদ্যায় যদি তার শিক্ষামূলক ও আক্ষরিকভাবে সম্পৃক্ততা থেকেও থাকে, তথাপি ফিকহ, উসূলে ফিকহ ও ইলমে কালামের সাথে, যার বিষয়বস্তু ও আলোচনার ক্ষেত্র মাসাইল ও জুযিয়্যাত এবং মাসাইল উদ্ভাবনের মূলনীতি ও আকাঈদের উপর দার্শনিক আলোচনার সাথে আকীদা সংশোধন ও একত্ববাদের প্রাথমিক দাওয়াত নেই।

ভারতবর্ষের ধর্মমত, দর্শন এবং এখানকার রুসম-রেওয়াজ ও স্বভাব-রীতির যে প্রভাব পড়েছিল দশ হিজরী শতকে মুসলিম সমাজের ওপর, তার অনুমান করা যায় হযরত মুজাদ্দিসে আলফেসানী (র)-এর পত্র থেকে, যা তিনি এক পুণ্যবতী মহিয়সী নারীর নামে লিখেছেন। যার দ্বারা শিরকী রুসম-রেওয়াজের সম্মান, গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা ও প্রয়োজন পূরণের প্রত্যাশা, কাফিরদের উৎসবের দিনের সম্মান ও তাদের রীতিনীতির অনুকরণ, বুযুর্গদের উদ্দেশ্যে জীবজন্তু মান্নত ও যবাহকরণ, পীর ও তার বিবিদের উদ্দেশ্যে রোযা রাখা, বসন্ত রোগকে ভয় ও তার সম্মান প্রদর্শন (যাকে বসন্ত রোগের দায়িত্বশীল দেবতা মনে করা হত) এর হিন্দুয়ানা মানসিকতা ও সন্দেহ প্রবণতার ধারণা হয়। যা প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল মুসলমানদের ঘরে ঘরে। এ যুগে এবং শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর, কুরআন-হাদীসের সাথে সরাসরি মজবুত ও ব্যাপক সম্পর্ক তৈরী না হওয়ার কারণে ঈমান-

আকীদার যে ত্রুটি এবং অনৈসলামিক বরং ইসলামবিদ্বেষী, আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের যে প্রভাব ভাল ভাল পরিবারের উপর পড়েছে, তার অনুমান করা তেমন কঠিন নয়।

শাহ সাহেবের যুগে অমুসলিমদের প্রভাব, কুরআন-হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতা, দূরত্ব ও পরিণতি, ভয়াবহতা এবং জনসাধারণের পছন্দ-অপছন্দ থেকে চোখ বন্ধ করে প্রভাবময় চেষ্টা-সংগ্রামের দীর্ঘ শূন্যতা ভারতে যে অবস্থা-পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল এবং পবিত্র ধর্মের (যাতে শিরকের কোন সংমিশ্রণের অবকাশ ছিল না) সমান্তরাল যে আকীদার ব্যবস্থা আর মুসলিম সমাজের জীবনযাত্রায় জাহিলিয়াত ও অজ্ঞতার যে মনগড়া নীলকণ্ঠ জন্ম নিয়েছিল, তার খানিকটা ধারণা স্বয়ং শাহ সাহেবের রচিত গ্রন্থাবলির উদ্ধৃতি থেকে হতে পারে। শাহ সাহেব 'তাফহীমাত' -এর এক স্থানে লিখেছেন–

'রাসূলে কারীম (স)-এর হাদীসে আছে, তোমরা মুসলমানগণও অবশেষে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মতাদর্শ গ্রহণ করে নিবে। যেখানে যেখানে তারা পা রেখেছে, তোমরাও সেখানে সেখানে পা রাখবে (পদস্খলিত হবে)। এমনকি কেউ যদি গুইসাপের গর্তে ঢুকে থাকে, তবে তোমরাও তাদের পিছু নেবে, পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। সাহাবায়ে কিরাম (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, পূর্ববর্তী উম্মত বলে কি আপনার উদ্দেশ্য ইয়াহুদী খৃস্টান? রাসূলে কারীম (স) বললেন, 'নতুবা আর কে?' এই হাদীসখানা ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) রিওয়ায়াত করেছেন।

সত্যই বলেছেন আল্লাহর রাসূল (স)। আমরা স্বচক্ষে সেসব দুর্বল ঈমানের মুসলমান দেখেছি, যারা নেককার-সৎকর্মশীলদেরকে 'আরবাবে মিন দূনিল্লাহ' তথা খোদাদ্রোহী বানিয়ে দিয়েছে। ইয়াহুদী-খৃস্টানদের মত স্বীয় আউলিয়ায়ে কিরামের কবরগুলোকে সিজদাস্থল (উপসনালয়) বানিয়ে রেখেছে। আমরা এমন লোকও দেখেছি, যারা শরীয়ত প্রণেতার কথায় রদবদল করে। রাসূলে কারীম (স)-এর সাথে সম্পৃক্ত করে বলে, 'নেককার লোক আল্লাহর জন্য আর গুনাহগার আমার জন্য'। এটা সে ধরনের উদ্ভট উক্তি, যেমন ইয়াহুদীরা বলত, لن تمسنا النار إلا أياما معدودة তথা আমরা জাহান্নামে গেলেও মাত্র কয়েকদিনের জন্য যাব। (সূরা বাকারা ৪০) সত্য বলতে গেলে আজ প্রত্যেক দলের মধ্যে দীন-ধর্মের বিকৃতি ছড়িয়ে আছে। সূফীদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখবে, তাদের মধ্যে এমন সব কথা মুখে মুখে প্রচলিত, কুরআন-হাদীসের সাথে যার কোনও মিল নেই। বিশেষতঃ তাওহীদের বিষয়ে মনে হয় যেন তাদের মোটেও শরীয়তের তোয়াক্কা নেই।'

আর জগদ্বিখ্যাত 'আল-ফাওযুল কাবীর' গ্রন্থে লিখেছেন, 'আপনাদের যদি (জাহেলী যুগের) মুশরিকদের আকীদা ও কর্মকাণ্ডের প্রাগুক্ত বিবরণের সত্যতা মেনে নিতে সংশয় থাকে, তাহলে এ যুগের তাহরীফকারীদের (দীন বিকৃতিকারী) বিশেষতঃ যারা মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের দিক-দিগন্তে বসবাস করে, তাদের দেখুন। তারা বেলায়েত (অলীত্ব) সম্পর্কে কী ধারা নিয়ে বসেছে! যদিও তারা পূর্বযুগের অলীদের বেলায়েত স্বীকার করে, তথাপি এ যুগে আউলিয়ায়ে কিরামের অস্তিত্বকে একেবারে অসম্ভব মনে করে। ঘুরে বেড়ায় কবরস্থান ও আস্তানায়। নানা ধরনের শিরক-বিদ'আতে তারা লিপ্ত। তাহরীফ ও তাশবীহ (বিকৃত ও সাদৃশ্য) তাদের মধ্যে এমনভাবে চালু রয়েছে যে, বিশুদ্ধ হাদীস لتتبعن سنن من كان قبلكم (তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে) এর আলোকে এমন কোন বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা নেই, যাতে আজ মুসলিম উম্মাহর কোনও না কোনও দল আক্রান্ত এবং তদানুরূপ কোনও বিষয়ে বিশ্বাসী নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এসব থেকে হেফাযত করুন।

রোগের চিকিৎসা ও অবস্থা সংশোধনের কার্যকর পন্থা

কুরআনের প্রচার-প্রসার

শাহ সাহেব এই রোগ বরং গণবিপদের চিকিৎসার জন্য কুরআন মাজীদ মুতালা'আ, গবেষণা ও এর বুঝ-জ্ঞানকে সবচেয়ে কার্যকরী চিকিৎসা মনে করেছেন। আর এ বিষয়টি নিছক চিন্তাধারা, অধ্যয়ন শক্তি ও যৌক্তিকতার উপরই নির্ভরশীল ছিল না বরং এমন একটি সুস্পষ্ট বাস্তবতা ছিল, যার উপর স্বয়ং কুরআনে কারীম সাক্ষ্য। আর না কেবল আবির্ভাবের সময়কার ইতিহাস বরং ইসলামের পূর্ণ তারীখে দাওয়াত (দাওয়াতের ইতিহাস) এবং সংস্কার ও শুদ্ধি তৎপরতা সাক্ষ্য। বিশেষতঃ তাওহীদের নিগুঢ়তা আর শিরকের বাস্তবতা প্রকাশের জন্য এর চেয়ে বেশি সুস্পষ্ট, এর চেয়ে শক্তিশালী ও হৃদয়গ্রাহী মাধ্যম কল্পনা করা যায় না। কুরআনের অনুবাদক শাহ আবদুল কাদির সাহেব (র) রচিত موضح القران-এর ভূমিকায় যতখানি সহজ-প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এই বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন, তার চেয়ে বেশি বলা মুশকিল। তিনি লিখেন, 'যে যত উত্তম বলবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে স্বয়ং বলেছেন, তদ্রূপ আর কেউ বলতে পারে না। আর আল্লাহর বাণীতে যেমন প্রভাব ও পথনির্দেশনা রয়েছে, তদ্রূপ কারও কথায় নেই।'

পবিত্র হিজাযে অবস্থানকালে শাহ সাহেবের ভারতের এই ধর্মীয় অবস্থাচিত্র, এখানকার মানুষের কুরআন ও ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরত্ব ও

বৈরিতার উপলব্ধি আরও প্রবলভাবে সৃষ্টি হয়। আর সেখানের আলোকময়, আধ্যাত্মিক ও কুরআনী পরিবেশে যেখান থেকে তাওহীদের সুরতরঙ্গ প্রথমবার উচ্চকিত হয়েছিল, শাহ সাহেবের সদা জাগ্রত সচেতন অন্তকরণে তার এ আহবান তথা ভারতের বুকে কুরআনে কারীমের দৌলতকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার আকাঙ্খা এমন সুস্পষ্ট ও তীব্রভাবেই হয়ত জন্মেছে, যাকে সেই ইলহাম ও অদৃশ্য ইংগিত নামে ব্যাখ্যা করা যায়, যা প্রত্যেক যুগে কোনও পুণ্যাত্মার উপর কোনও জরুরী ধর্মীয় প্রয়োজন ও কার্যক্রম পূর্ণতা দানের জন্য অবতীর্ণ হয়ে থাকে। যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যার উপর জয়লাভ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই আমরা দেখি, শাহ সাহেব কুরআন মাজীদের ফার্সী অনুবাদের কাজ শুরু করেছেন হিজায থেকে প্রত্যাবর্তনের পর, যা 'ফাতহুর রহমান' নামে পূর্ণতা লাভ করেছে।

সে সময় ভারত ছিল প্রায় অনারব রাষ্ট্র, তুর্কিস্তান, ইরান ও আফগানিস্তান ছিল যার নিকটতম প্রতিবেশি দেশ এবং সেসব দেশের চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, পেশা, রীতিনীতি, আগ্রহ-উদ্যম আর চিরাচরিত বাস্তবতার ছায়া ভারতের শিক্ষা ও ধর্মীয় অঙ্গণে পতিত হত, সেখানে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, কুরআনে কারীম একান্ত বিশেষ শ্রেণীর মুতালা'আ, চিন্তা-গবেষণা ও বুঝা-বুঝানোর কিতাব, যার জ্ঞান এক ডজন বিদ্যার উপর নির্ভরশীল –একে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়ে আসা, আম মানুষকে সোজাসুজি এর মর্মার্থ সম্পর্কে অবহিত করা এবং এর থেকে হিদায়াত ও আলোকরশ্মি অর্জনের দাওয়াত দেওয়া ছিল মারাত্মক ভয়ঙ্কর, এক বিরাট গোমরাহী ও ফিৎনার পথ উন্মোচনের নামান্তর। সেই সঙ্গে জনসাধারণের মানসিক ও চিন্তাগত বিক্ষিপ্ততা, স্বেচ্ছাচারিতা ও উলামায়ে কিরামের প্রতি অমুখাপেক্ষিতা বরং বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার আহবান। এ ধরনের চিন্তাধারা ও দলীল-প্রমাণকে সংক্ষিপ্ত একটি পুস্তিকা 'তুহফাতুল মুওয়াহহিদীন'-এর মধ্যে অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে।

'কিছু লোক বলে থাকে– কুরআনে কারীম ও হাদীস শরীফ কেবল সেই অনুধাবন করতে পারে, যে অনেক শাস্ত্র ও বই-পুস্তক পড়েছে এবং সমকালের আল্লামা (গভীর জ্ঞানী) হবে। তাদের জবাবে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم أيته ويزكيهم

ويعلمهم الكتب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلل مبين.

তিনিই আল্লাহ, যিনি নিরক্ষরদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের পড়ে শোনান আল্লাহর আয়াতসমূহ। আর তাদের পাপের কালিমা পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিখান। ..... (সূরা জুমু'আ : ২)

অর্থাৎ রাসূলে কারীম (স) স্বয়ং এবং তার মহান সঙ্গীসাথীগণও নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ (স) তার সাহাবাদের সামনে কুরআনে কারীমের আয়াত তিলাওয়াত করেছেন, তখন তারা সে আয়াত শ্রবণ করে যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা ও অন্যায়-অপরাধ থেকে পবিত্র হয়ে গেছেণ। সুতরাং অশিক্ষিত বা না পড়া লোকজন যদি কুরআন হাদীস না বুঝত এবং তা বুঝার যোগ্যতা না রাখত, তাহলে সাহাবায়ে কিরাম মন্দতা ও দোষ-ত্রুটি থেকে কিভাবে পবিত্র হয়ে গেলেন।

এ জাতির উপর বড় আক্ষেপ! যারা صدره (ছদরাহ) বুঝা এবং কামূস (শব্দ ভাণ্ডার) জানার দাবী করে। কিন্তু কুরআন হাদীস বুঝার বেলায় স্বয়ং নিজেকে একান্ত অজ্ঞ প্রকাশ করে। আবার কেউ কেউ বলে– আমরা শেষকালের লোক। রাসূলে কারীম (স)-এর যুগের বরকত এবং সাহাবায়ে কিরামের মনের শক্তি-নিরাপত্তা কোত্থেকে আনব, যাতে কুরআন-হাদীসের অর্থ-মর্ম উত্তমরূপে বুঝতে পারি? তাদের জবাবে (সূরা জুমু'আ-৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم

অর্থাৎ পরবর্তী লোকজন শিক্ষিত হোক কিংবা অশিক্ষিত, কিন্তু যখন সে মুসলমান হবে এবং সাহাবায়ে কিরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার ইচ্ছা করবে আর কুরআন-হাদীস শ্রবণ করবে, তখন তাদেরকেও পবিত্র করার জন্য এই কুরআন-হাদীসই যথেষ্ট হতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

ولقد يسرنا القران لكذكر فهل من مدكر

অবশ্য আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং উপদেশগ্রহণকারী কেউ আছে কি? (সূরা কমার-২২)

এটা কি করে সহজ হতে পারে যে, 'কাফিয়া' পড়ুয়া ও 'শাফিয়া' জানা লোক এর (কুরআনের) অর্থ-মর্ম বুঝার ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করবে আর আরবের বেদুঈন-জংলী লোকজন এর হাকীকত ও গভীরতা সম্পর্কে উদ্যমী হয়ে যায়। এছাড়া আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

أفلا يتدبرون القران

কেন তোমরা কুরআনের উপর চিন্তা-গবেষণা কর না! (সূরা মুহাম্মদ : ২৪)

সুতরাং কুরআন যদি সহজ না হয় তবে তাতে চিন্তা-গবেষণা কিভাবে করা যাবে!

أم على قلوب اقفالها

না কি তাদের অন্তকরণে তালা লাগানো! (সূরা মুহাম্মদ : ২৪)

অর্থাৎ অন্তরে তালা ঝুলানো না থাকা সত্ত্বেও। সুতরাং কত বড় গোমরাহী! এতদসত্ত্বেও কুরআনে কারীমের চিন্তা-গবেষণায় জোর দেওয়া হয় না।' কিন্তু কবির ভাষায়–

[illegible]

[illegible]

শাহ সাহেব এই নিরাসক্তি, অসহায়ত্ব ও বিপদাশঙ্কা দেখে, যার সীমানা

ويصدون عن سبيل الله

যারা আল্লাহর পথে বাঁধার সৃষ্টি করে ..।' (সূরা আরাফ : ১৪৫)

-এর সাথে মিলে যায়, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, কুরআনে কারীমের অনুবাদ করবেন এমন শুদ্ধ ফার্সীতে, যা ছিল ভারতবর্ষে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাষ্ট্রের দাপ্তরিক, শিক্ষা, লিখনী এবং চিঠিপত্রের ভাষা। আর প্রত্যেক শিক্ষিত ও লেখাপড়া জানা মুসলমান যদিও এ ভাষায় লিখতে বলতে পারত না, তথাপি সকলে বুঝত নিশ্চিত। ভারতে ফার্সী ভাষায় এই দীর্ঘ কার্যক্রমে, যার মেয়াদ প্রায় সাত শতাব্দীর কম ছিল না, যদি কুরআনে কারীমের ফার্সী তরজমা এক ডজনও হত, তবু বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কিন্তু হাসান ইবনে মুহাম্মদ আলকমা ওরফে নিযাম নিশাপুরী অনন্তর দৌলতাবাদীর তরজমার পূর্বে (যিনি ছিলেন অষ্টম হিজরী শতকের উলামায়ে কিরামের একজন) কোনও ফার্সী তরজমা কুরআনের খোঁজ পাওয়া যায় না। নীশাপুরীর এই ফার্সী তরজমা তার আরবী তাফসীর গারাইবুল কুরআনে অন্তর্ভুক্ত।

ভারতে শায়খ সাদী (র)-এর নামে একটি তরজমা প্রসিদ্ধ ছিল। অবশ্য সেটি শায়খের বিশ্ব নন্দিত রচনা গুলিস্তা ও বুস্তার মত প্রচলিত ও সমাদৃত ছিল না। তথাপি কোথাও কোথাও এটি পাওয়া যেত। তবে বিশুদ্ধ তথ্যমতে একে শায়খ সাদীর সাথে সম্পৃক্ত করা ঠিক নয়। বস্তুতঃ উক্ত তরজমাখানা আল্লামা সাইয়িদ শরীফ আল জুরজানী (মৃত্যু ৮১৬ হি.) কর্তৃক রচিত হতে

পারে। তাফসীরে হাক্কানী সংকলক মাওলানা আবদুল হক হাক্কানীর প্রত্যক্ষ বিবরণ হচ্ছে, আজকাল অজ্ঞ লোকজন যাকে সাদীর তরজমা বলে থাকে, সেটি মূলতঃ সাইয়িদ শরীফের তরজমা। প্রকাশক আমার সামনে তরজমাটি প্রসারের উদ্দেশ্যে সাদীর সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন।'

মোটকথা, শাহ সাহেব হিজায সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পাঁচ বছর পর (সম্ভবতঃ আকীদা সংশোধনের সেসব চেষ্টা-সংগ্রামের ফলাফল লক্ষ্য করে, যা বিশেষ পঠন-পাঠন, রচনা ও ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে হচ্ছিল) সিদ্ধান্ত নিলেন– ব্যাপক হিদায়াত, আকীদা সংরক্ষণ ও সংশোধন এবং আল্লাহ পাকের সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কুরআনে কারীমের পথনির্দেশনা, হেদায়াত ও শিক্ষাকে সরাসরি প্রচার-প্রসার করার চেয়ে ফলপ্রসূ কোন পথ-প্রক্রিয়া হতে পারে না। আর তার পন্থা একটিই। সেটি হচ্ছে, কুরআনে কারীমের ফার্সী অনুবাদ ও তার প্রচার-প্রসার। স্বয়ং শাহ সাহেবের ভাষায় এর অনুপ্রেরণা, কারণসমূহ এবং এই পদক্ষেপের ইতিহাস শুনে নিন। তার তাফসীর গ্রন্থ 'ফাতহুর রহমান'-এর মুখবন্ধে তিনি লিখেন–

'এই যে যুগে আমরা বিদ্যমান এবং এই যে দেশে আমরা বাস করছি। এখন এদেশে মুসলমানদের হিতাকাঙ্খার দাবী হচ্ছে, তরজমা কুরআন সহজ-শুদ্ধ ও ফার্সী পরিভাষায় ভাষার উৎকর্ষতা ও সূক্ষ্মতা প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উল্লেখ ছাড়া করা, যাতে আম-খাছ নির্বিশেষে সকলেই সমান বুঝে। ছোট-বড় সকলেই কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারে। কাজেই এ কাজের গুরুত্ব এই অধমের অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়েছে এবং সেজন্য বাধ্য করা হয়েছে।

প্রথমে বিভিন্ন তরজমার উপর চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। যাতে করে যে তরজমা উদ্দেশ্য মাফিক পাওয়া যাবে, তার প্রসার করা যায়। আর যেন এই তরজমা যথাসম্ভব সমকালীন মানুষের আগ্রহ ও চাহিদা অনুযায়ী হয়। কিন্তু সেসব তরজমায় দেখলাম, হয়ত সীমাহীন দীর্ঘতা রয়েছে কিংবা সমস্যাপূর্ণ সংক্ষিপ্ততা ও সংকোচন রয়েছে। ইতোমধ্যে সূরা বাকারা ও নিসার তরজমা হয়ে যাওয়ার পর হারামাইন সফরের সুযোগ হয়ে গেলে সেই ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। কয়েক বছর পর জনৈক স্নেহভাজন তরজমা কুরআন পড়তে লাগলেন। আর তা পূর্বের মনোবাসনার প্রেরণা হয়ে গেল। সিদ্ধান্ত নিলাম, সবকের পরিমাণ তরজমা লিখে নেব। যখন এক-তৃতীয়াংশ কুরআনে কারীম তরজমা হয়ে গেল, তখন উক্ত স্নেহভাজনের আকস্মিক সফর এসে যাওয়ায় এই কার্যক্রম পুনরায় স্থগিত হয়ে যায়। দীর্ঘদিন পর একটি সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং পুনরায় সেই পুরোনো মনোবাসনা জেগে ওঠে। আর দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তরজমা হয়ে যায়।

এরপর কতিপয় বন্ধুকে পাণ্ডুলিপি সাজানোর করার জন্য বলা হয়। সেই সাথে কুরআনের মূল পাঠও লিখে দিতে বলা হয়। যেন স্বতন্ত্র সংস্করণ তৈরী হয়ে যায়। সেসব ভাগ্যবান বন্ধুগণ পবিত্র ঈদুল আযহা ১১৫০ হিজরী থেকে কাজ শুরু করেন। এরপর পুনরায় সে ইচ্ছা সংকল্প আন্দোলিত হয়। অবশেষে তরজমার কাজ সুসম্পন্ন হয়। পাণ্ডুলিপি তৈরীর কাজ শেষ হয় শাবান মাসের শুরুর দিকে। ১১৫১ হিজরীতে পাণ্ডুলিপির সম্পাদনাও হয়ে যায়। আর ১১৫৬ হিজরীতে দীনী ভাই সুপ্রিয় খাজা মুহাম্মদ আলীম (আল্লাহ তাকে সম্মানিত করুন)-এর সক্রিয় প্রচেষ্টায় এই গ্রন্থখানা প্রকাশিত হয় এবং এর দরস শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে তৈরী হয় এর একাধিক অনুলিপি। সমসাময়িকগণ এর প্রতি মনোযোগী হন।

[illegible]

[illegible]

শাহ সাহেব কুরআন তরজমা ও তাফসীর 'ফাতহুর রহমান' ছাড়া উসূলে তরজমার উপর একটি ভূমিকাও লিখেছেন, যা সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত দূরদর্শীতাসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। সূচনাতে লিখেন, 'এ অধম ওয়ালীউল্লাহ ইবনে আবদুর রহীম দয়াময় আল্লাহর দরবারে আরয করছে যে, এ পুস্তিকাটি তরজমার মূলনীতি প্রসঙ্গে, যার নাম المقدمة فى قوانين الترجمة রেখেছি। অর্থাৎ যে নীতির উপর তরজমা কুরআন রচনার সময় যথারীতি কলম চলেছে।'

মনে হয় যেন, তরজমা ও কুরআনে কারীমের ব্যাপক প্রচার-প্রসারের পথে বিস্তীর্ণ মরুচর জেগে উঠেছিল। শাহ সাহেবের মত ক্ষুরধার কলম শক্তিধর ব্যক্তিত্বের (যার জ্ঞানের সমুদ্রোপম গভীরতা, স্বয়ংসম্পূর্ণতা, আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও ইখলাস সম্পর্কে সমকালের সুস্থ চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞ মহলের বিস্ময়ের অন্ত ছিল না।) এই পদক্ষেপে উক্ত মরুময় শূন্যতা দূরীভূত হয়ে যায়। পরিস্কার হয়ে যায় বন্ধুর পথ। ইসলামের ইতিহাসে বরাবরই কোন সর্বজন শ্রদ্ধেবরেণ্য ও উঁচু ব্যক্তিত্বের কোনও কাজ সূচনা করার দ্বারা ভুল বুঝাবুঝি ও কুধারণার মেঘ কেটে গেছে। খুলে গেছে উন্মুক্ত বিশ্বরোড। আবুল হাসান আশ'আরীর বাগ্মীতাপূর্ণ বিতর্কে অংশগ্রহণ ও যৌক্তিক দলিল-প্রমাণ দিয়ে কাজ আঞ্জাম দেওয়া, হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (র)-এর দর্শন পাঠ, তার খণ্ডন ও জবাব দানসহ তার যুগ-সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী ইসলামের সুরক্ষা কিংবা প্রতিরোধমূলকভাবে গৃহিত এমন সব অগ্রণী ভূমিকা তারই নানা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শাহ্ সাহেবের পরে উর্দু অনুবাদ

শাহ সাহেবের ফার্সী তরজমার পরে অনেক দ্রুত উর্দু ভাষায় কুরআনের তরজমার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। বারো হিজরী শতকের শেষ দিকেই ফার্সীর স্থান উর্দু দখল করতে শুরু করেছিল। শুরু হয়ে গিয়েছিল উর্দুতে রচনা ও সংকলনের কাজ। এই প্রয়োজনীয়তা ও পট-পরিবর্তনকে সর্বপ্রথম স্বয়ং শাহ সাহেবের সুযোগ্য পুত্র হযরত শাহ আবদুল কাদির সাহেব দেহলভী (র) (মৃত্যু ১২৩০ হি.) অনুভব করেন এবং ১২০৪-০৫ হিজরীতে শাহ সাহেবের তরজমার প্রায় পঞ্চাশ বছর পর তিনি উর্দু ভাষায় এর এমন এক অনুবাদ রচনা করেন, যার সম্পর্কে বলা যায়, কুরআনে কারীমের এমন সফল ও প্রস্ফুটিত তরজমা, যাতে কোনও অনারবী ভাষায় প্রচুর কুরআনিক শব্দের প্রাণ এসেছে– আজও জানা মতে দ্বিতীয়টি নেই। শাহ সাহেব তার তরজমার ভূমিকায় লিখেছেন,

'এই দুর্বল বান্দা আবদুল কাদিরের মনে খেয়াল হল, আমাদের আব্বাজান যেভাবে বিরাট বড় মনীষী শাহ ওয়ালীউল্লাহ আবদুর রহীম (র)-এর সুযোগ্য পুত্র, সকল হাদীস সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, ভারতের অধিবাসী চাইতেন, কুরআনের অর্থ সহজ করে ফার্সী ভাষায় লিখবেন, আলহামদুলিল্লাহ এই প্রত্যাশা ১২০৫ হিজরী মোতাবেক ১৭৯০ খৃস্টাব্দে পূরণ হয়েছে।'

শাহ আবদুল কাদির (র)-এর পরে তাঁরই বড় ভাই শাহ রফীউদ্দীন (মৃত্যু ১২৩৩ হি.) কুরআনে কারীমের শব্দে শব্দে তরজমা করেছেন। যা তার সতর্কতা এবং লেখকের জ্ঞানের গভীরতা ও ইখলাসের কারণে খুবই সমাদৃত হয়েছে। কোনও কোনও শিক্ষিতমহলে শাহ আবদুল কাদির (র)-এর পারিভাষিক তরজমা আর কোথাও কোথাও শাহ রফীউদ্দীন (র)-এর শব্দে শব্দে তরজমা প্রচলিত ও প্রাধান্যযোগ্য স্বীকৃত হয়েছে।

এতদুভয় তরজমাই মুসলমানদের ঘরে ঘরে এমন ব্যাপকতা এবং কুরআনে কারীম তিলাওয়াতের সাথে সাথে তা পাঠ করার এমন প্রচলন হয়েছে, যার নযীর অন্য কোনও ধর্মীয় বই-পুস্তকের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। আকীদা সংশোধন ও তাওহীদের বিশ্বাসের প্রসারতা সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তাতে উক্ত তরজমা দু'টি থেকে উপকৃত লোকদের কোনও সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না, হয়ত তার সংখ্যা লক্ষকে অতিক্রম করবে। বস্তুতঃ কোনও ইসলামী রাজত্ব বা সরকারও তার উপায়-উপকরণসহ দাওয়াত ও সংস্কারের এত বড় কাজ আঞ্জাম দিতে পারত না, যা আঞ্জাম দিয়েছে উক্ত তরজমা তিনটি, যা একই বৃক্ষের পুণ্যময় শাখা।

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে খুশি তা দান করেন।

এর পর দু'টি তরজমায়ে কুরআনের এক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। যার ব্যাপকতা নির্ণয় করা এক দুরূহ কাজ এবং পৃথক গবেষণার দাবীদার।

দরসে কুরআন

কুরআনে কারীমের উক্ত উর্দু অনুবাদ ছিল এই সম্ভ্রান্ত বংশের দুই মহামনীষী হযরত শাহ আবদুল কাদির দেহলভী (র) ও হযরত শাহ রফীউদ্দীন দেহলভী (র)-এর অনূদিত। ভারতের যেখানে যেখানে উর্দুতে কথা বলা হত, সেখানে ঘরে ঘরে তা পাঠ করা হত। এছাড়া কুরআনে কারীমের মাধ্যমে আকীদার পরিচ্ছন্নতা এবং আমল ও চরিত্র সংশোধনের সবচেয়ে দীর্ঘ, বিচক্ষণ ও গভীর, ফলপ্রসূ ও সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা হয়েছে। ওয়ালীউল্লাহী বংশের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তিত্ব এবং হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের কর্মকাণ্ডের পূর্ণতা ও ব্যাপকতা দানের সৌভাগ্য অর্জনকারী মহাপুরুষ হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) (মৃত্যু ১২৩৯ হি.)-এর মাধ্যমে। তিনি প্রায় ৬২/৬৩ বছর পর্যন্ত দিল্লীর মত কেন্দ্রীয় শহরে এবং হিজরী তের শতকের মত গুরুত্বপূর্ণ যুগে দরসে কুরআনের কার্যক্রম চালু রাখেন। জনসাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের মাঝে এর যে গ্রহণযোগ্যতা ও সাড়া পড়েছে এবং এর দ্বারা আকীদা সংশোধনের যে বিশাল কাজ সম্পাদিত হয়েছে, আমাদের জানা মতে এর কোনও তুলনা নেই।

আল ফাওযুল কাবীর

কুরআনের দাওয়াত, বিশেষ ও জ্ঞানী মহলে কুরআনের চিন্তা-গবেষণার যোগ্যতা সৃষ্টি করা এবং এর মাধ্যমে উম্মতের আত্মশুদ্ধি ও সংশোধনের আগ্রহ-প্রেরণা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে শাহ সাহেবের অনন্য একটি সংস্কার কর্ম ও বৈপ্লবিক খেদমত 'আল ফাওযুল কাবীর'। যা তার বিষয়বস্তুর বিচারে (আমাদের জানা মতে গোটা ইলমী গ্রন্থাগারে) অদ্বিতীয় একটি গ্রন্থনা।

উসূলে তাফসীর সম্পর্কে ব্যাপকভাবে কিছু পাওয়া যায় না। কেবল তাফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় নগণ্য কয়েকটি মূলনীতি কিংবা নিজের রচনাপদ্ধতি বর্ণনার লক্ষ্যে কোনও লেখক কয়েক লাইন লিখে দেন। অবশ্য শাহ সাহেবের 'আল-ফাওযুল কাবীর' পুস্তিকাটিও সংক্ষিপ্ত। কিন্তু পূর্ণ পুস্তিকাই সরাসরি তত্ত্ব ও মূলনীতিতে ভরা। বস্তুতঃ এটি কুরআনিক জ্ঞানের সমস্যাগুলোর জ্ঞানগত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন বিশিষ্ট আলেমের এক অমূল্য ও বিরল উপহার।

এর মূল্য সে ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারে, যাকে সেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিছু কিছু মূলনীতি স্বয়ং শাহ সাহেব নিজস্ব চিন্তা, গবেষণা ও কুরআনিক জ্ঞানের ভিত্তিতে লিখেছেন। অন্যান্য কিতাবাদির হাজার হাজার পৃষ্ঠা মুতালা'আর দ্বারাও সেগুলো পাওয়া যাবে না। এ পুস্তিকার ভূমিকায় শাহ সাহেব যথার্থই লিখেছেন–

'দীন ওয়ালীউল্লাহ ইবনে আবদুর রহীম (আল্লাহ্ পাক তার সঙ্গে অপার দয়া ও করুণার ব্যবহার করুন) বলছে, যখন আল্লাহ তা'আলা এই অধমের প্রতি কিতাবুল্লাহর জ্ঞানের দুয়ার খুলে দিলেন, তখন কিছু উপকারী তত্ত্বকণিকা (যার দ্বারা মানুষ কুরআনের জ্ঞান-গবেষণায় উপকৃত হবে) সংক্ষিপ্ত একটি পুস্তিকায় লিখে দেওয়ার আগ্রহ হল। আল্লাহর অফুরন্ত রহমতের ভাণ্ডারে আশা রাখি যে, ছাত্রদের জন্য এসব মূলনীতি জানার পর কুরআনিক মর্ম অনুধাবনের এমন প্রশস্ত পথ খুলে যাবে যে, যদি অসংখ্য তাফসীর গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং মুফাসসিরীনে কিরামের (বর্তমানে যাদের সংখ্যা খুবই কম) সংশ্রব ও শরণাপন্ন হয়ে একটি জীবনও কেটে যায়, তবু কুরআনিক জ্ঞানের সঙ্গে এরূপ সম্পর্ক ও নিবিড়তা সৃষ্টি করতে পারবে না।'

কুরআনের বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, এর বাচনভঙ্গি ও বর্ণনাশৈলীর বিশেষত্ব এবং মানবীয় রচনাবলি বিশেষতঃ পূর্ববর্তী পাঠ্যপুস্তক থেকে এর মতদ্বৈততা, স্বকীয়তা ও শানে নুযূল সম্পর্কে কয়েক শব্দে যা কিছু লিখেছেন, আজ তাতে কোনও স্বল্পতা-অপূর্ণতা অনুভূত না হওয়া সম্ভব। কিন্তু বারো হিজরী শতকে এটা ছিল সম্পূর্ণ নতুন চিন্তা। আর আজও কত মহলে সে চিন্তাধারা অচেনা-অপরিচিত! শানে নুযূলের বিবরণের আধিক্য ও এর গুরুত্বের প্রতি বেশি জোর দেওয়ার কারণে (যা শেষ যুগের অভ্যাস-রীতি হয়ে গিয়েছিল) বস্তুতঃ কুরআনে কারীমের বিষয়বস্তু, ঘটনাবলি, উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা প্রত্যেক যুগে যে উপকারিতা লাভ এবং স্ব-স্ব যুগ ও অবস্থা প্রেক্ষিতের উপর যেভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত, তাতে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। শাহ সাহেবের এই গবেষণা ও পর্যালোচনা দ্বারা সেই পর্দা দূরীভূত এবং কুরআনে কারীমের বিশ্বনন্দন সৌন্দর্য প্রস্ফূটিত হয়ে ওঠে। আল-ফাওযুল কাবীর-এর প্রথম পাঠে শাহ সাহেব লিখেন,

'সাধারণ মুফাস্সিরগণ প্রত্যেক আয়াতে কারীমাকে চাই সেটি মাসাইল সম্পর্কিত হোক কিংবা হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত; একটি ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। আর সেই ঘটনাকে উক্ত আয়াতে কারীমার 'অবতীর্ণের কারণ' হিসেবে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে, কুরআন

অবতীর্ণের প্রকৃত উদ্দেশ্য মূলতঃ মানব সত্ত্বার সভ্যতা-শৃঙ্খলা এবং তার ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও ন্যাক্কারজনক গর্হিত কাজগুলো প্রত্যাখ্যান করা। কাজেই প্রশ্নোত্তর বা বিতর্কের আয়াতে কারীমাগুলো অবতরণের জন্য মুতাকাল্লিমদের মাঝে ভ্রান্ত আকীদার অস্তিত্ব আর আহকাম সম্পর্কিত আয়াতে কারীমার জন্য তাদের মধ্যে পাপাচার ও অন্যায়-অপরাধের ব্যাপকতা এবং যিকির-আযকার সম্পর্কিত আয়াতে কারীমা অবতীর্ণের জন্য তাদের আল্লাহর নিদর্শন, আল্লাহর দিবসের স্মরণ এবং মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনাবলি প্রকাশিত না হওয়া- প্রকৃত কারণ হয়েছে। যেসব বিশেষ ঘটনা উদ্ধৃতকরণের কষ্ট সাধারণ মুফাসসিরগণ স্বীকার করেছেন, শানে নুযূলের ক্ষেত্রে সেসবের ন্যূনতম দখলও নেই। অবশ্য তন্মধ্যে কিছু আয়াতে কারীমায় এমন কোনও বিশেষ ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যা রাসূলে কারীম (স)-এর যুগে কিংবা তার অনেক পূর্বে সংঘটিত হয়েছে।

কুরআনে কারীম যেসব দল ও গোষ্ঠীকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের মূল চিন্তাধারা, আকীদা-বিশ্বাস এবং দুর্বলতাগুলোর বিবরণ, তাদের গোমরাহী-পথভ্রষ্টতা ও ভুল বুঝাবুঝির প্রকৃত কারণ এবং তার ইতিহাস, নেফাকী ও কপটতার ব্যাখ্যা, মুসলিম উম্মাহর কোনও সম্প্রদায় ও দলের উপর সেসবের প্রয়োগে কুরআনিক জ্ঞানের ভিত্তি, যা সংক্ষিপ্ততা সত্ত্বেও এমন সুস্পষ্টতার সাথে কোনও বড় থেকে বড় তাফসীর গ্রন্থে পাওয়া যাবে না।

কোনও আয়াত নসখ বা রহিতকরণে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যকার পারিভাষিক পার্থক্যের ব্যাখ্যা, রহিত ও রহিতকারী আয়াতে কারীমার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনদের তাফসীরমূলক মতভেদগুলোর সমাধানে এটি শাহ সাহেবের অনন্য গবেষণাকর্ম।

কোনও কোনও আয়াতে কারীমার সাথে নাহু শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ ও প্রকাশ্য মূলনীতির বাহ্যিক অমিলের যে ব্যাখ্যা শাহ সাহেব (র) দিয়েছেন, এর মূল্যায়ন তারাই করতে পারে, যারা নাহব সংকলনের ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং বসরা ও কুফার মাদরাসার মতবিরোধগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখেন। উক্ত পুস্তিকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি পাঠ করে প্রাচীন ধর্মমত, ভ্রান্ত সম্প্রদায় এবং জাতি ও গোষ্ঠীসমূহের পুরোনো রোগ ও দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত হয়, কুরআনের আয়নায় মুসলমান প্রজন্মগুলোর এবং স্ব স্ব যুগের মুসলিম সমাজ ও জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর আপন চেহারা দেখার তাওফীক হয়। সেই সাথে চিন্তা-ফিকির করা যায় যেন ধর্ম-মাযহাব ও সম্প্রদায়ের পুরোনো রোগ-ব্যাধি ও দুর্বলতাগুলো অবশেষে তাদের ভেতর প্রবিষ্ট না হয়ে যায়।

لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، افلا يعقلون.

'আমি তোমাদের নিকট এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমাদের বৃত্তান্ত রয়েছে। তোমরা কি বোঝ না?' (সূরা আম্বিয়া : ১০)

তাওহীদের উপর জ্ঞানগত তত্ত্ব-গবেষণা

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) আকীদা সংশোধন ও খাঁটি তাওহীদের দাওয়াতের ধারাবাহিকতায় কুরআনে কারীমের তরজমা ও দরসে কুরআন (কুরআনের অনুবাদ ও পাঠদান) পর্যন্তই থেমে থাকেননি বরং একজন আলেম গবেষকের মত এর নিগুঢ় তত্ত্বানুসন্ধান ও পর্যালোচনা করেছেন। তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন মিল্লাতে ইবরাহীমীর সবচেয়ে বড় নিদর্শন। হযরত ইবরাহীম (আ) এর দাওয়াত ও চেষ্টা-সংগ্রামের সবচেয়ে বৃহৎ উদ্দেশ্য আর সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স)-এর দাওয়াতের ভিত্তি এবং শুরু ও শেষ। গোটা কুরআন ও হাদীসের ভাণ্ডার ও সীরাতে নববী (স) এর উপর সাক্ষী। তিনি তাওহীদ ও শিরকের মাঝে এমন প্রভেদকারী প্রাচীর দাঁড় করিয়েছেন, তাওহীদের নিগুঢ়তা ও বাস্তবতাকে এমনভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন, শিরকের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংশয়-সংমিশ্রণ ও এর হালকা থেকে হালকা বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে এমন জিহাদ করেছেন, উম্মতের আকীদা-বিশ্বাসে শিরকের অনুপ্রবেশ এবং আকাইদে দোষ-ত্রুটি সৃষ্টি হওয়ার উপাদানগুলোর এমন কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন, যার থেকে বেশি কল্পনা করা সম্ভব নয়। এসব তত্ত্ব-বাস্তবতা এতটাই মুতাওয়াতির ও সুস্পষ্ট, যার দলীল-প্রমাণ ও উদাহরণের প্রয়োজন নেই। কুরআন-হাদীসের উপর যার সামান্য দৃষ্টিও আছে, সে তা স্বীকার না করে পারে না।

তদুপরি এই উম্মতের মধ্যে ধনৈশ্বর্যের যুগ অতিবাহিত হওয়া, নতুন নতুন দেশ-অঞ্চল বিজিত হওয়া, সেখানকার মানুষের ইসলাম গ্রহণ, অমুসলিম সম্প্রদায় ও জাতির সঙ্গে মেলামেশা ও বসবাস এবং কাল পরিক্রমার প্রভাবে জনসাধারণের বড় এক শ্রেণীর মাঝে শিরকী আকীদা-বিশ্বাস ও কাজকর্ম কোত্থেকে প্রবিষ্ট হয়ে গেল, তাদের একত্ববাদের অনেক নিদর্শন ও শে'আর এর সঙ্গে মুসলিম সমাজে স্বস্থান তৈরী করে নেওয়ার কেমন সুযোগ হয়ে গেল, প্রচুর পাণিপ্রার্থী বিদ্যাকে তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং সেগুলোকে পছন্দনীয় ও জায়েয সাব্যস্ত করার সাহস কিভাবে হল আর অসংখ্য শিক্ষিত মুসলমান কিভাবে এই ভুল-ভ্রান্তির শিকার হয়ে গেল?

শাহ সাহেবের মতে এর কারণ তাওহীদের বাস্তবতা, জাহেলী যুগের মুশরিক ও আরববাসীদের মহান আল্লাহর 'বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা এবং বড় বড় সকল বিষয়ের ব্যবস্থাপক হওয়া'র ব্যাপারে আকীদাকে সঠিকভাবে না

বুঝা। জনসাধারণের বড় একটি শ্রেণী মনে করেছে, শিরকের বাস্তবতা হচ্ছে, কোনও সত্তাকে (সে জীবিত হোক চাই মৃত) একেবারে আল্লাহর সমকক্ষ ও সমতূল্য বানিয়ে নেওয়া, আল্লাহর প্রত্যেক গুণাবলি ও কাজকর্মকে তার সাথে সম্পৃক্ত করা। বাস্তবিক ও মৌলিকভাবে তাকেই সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা মনে করা। তবে আল্লাহর কোনও কোনও গুণকে তার কোনও প্রিয় বান্দার সাথে সম্পৃক্ত করা এবং কোনও কোনও কাজকর্ম (যা আল্লাহর সঙ্গে নির্দিষ্ট) তার থেকে প্রকাশ পায় বলে মানা, কুদরতের কোনও কোনও বিষয় তাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া আবার আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক স্বেচ্ছায় তার কিছু খোদায়ী অধিকার তাদের উপর ন্যস্ত করা ইত্যাদি তাওহীদের পরিপন্থী এবং শিরকের নামান্তর নয়। এভাবে নিছক আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও আল্লাহর দরবারে শাফা'আত পাওয়ার প্রত্যাশায় কারও এতধিক সম্মান প্রদর্শন করা, তার সঙ্গে এমন সব কাজকর্ম ও আচরণ করা, যা ইবাদতের (উপাসনার) গণ্ডিভুক্ত – তা-ও শিরকের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এসব কেবল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের একটি উপায় এবং ঐ 'কী ও কেন মুক্ত দরবার' পর্যন্ত পৌঁছার (যেখানে সাধারণ মানুষ পৌঁছাতে পারে না) একটি ফলপ্রসূ ও কার্যকর পন্থা মাত্র। আরবের কাফিররা বলত,

ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى

আমরা তাদের পুজা কেবল এজন্যই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটতর করে দেবে। (সূরা যুমার : ৩)

এ ছিল সেই ধোঁকা ও অন্ধতা, যার কারণে এই উম্মতের অসংখ্য লোকজন শিরকের নিষিদ্ধ ভূমিতে গিয়ে পতিত হয়েছিল। আর এই প্রাচীনত্বের সীমানা এফোঁড়-ওফোঁড় করে গিয়েছিল, যা তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্য বিধানকারী। (Line of Demarcation) এজন্য সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জানার বিষয় ছিল– এ বর্বর যুগের লোকজন ও আরবের মুশরিকদের আকীদা আল্লাহর তা'আলার ব্যাপারে কি ছিল, তারা আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে কি বিষয়ের দাবীদার ছিল, আল্লাহ তা'আলাকে জগৎস্বামী, আকাশ-যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং মুতলাক কাদের (একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী) মনে করা সত্ত্বেও কি কারণে রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে মুশরিক দল বলেছেন কুরআনে কারীম তাদের মুশরিক হওয়ার ঘোষণা করেছেন?

শাহ সাহেব তার অতুলনীয় কিতাব 'আল ফাওযুল কাবীর' -এ লিখেছেন– শিরক হচ্ছে, মা-সিওয়াল্লাহর (আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারও) জন্য এরূপ গুণাবলি সাব্যস্ত করা, যা আল্লাহর সাথে সুনির্দিষ্ট। যেমন– বিশ্বজগতে

تصرفات ارادى বা স্বেচ্ছা কর্মক্রিয়া, যাকে كن فيكون (কুন-ফাইয়াকুন) দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয় কিংবা আল্লাহর সত্ত্বাগত জ্ঞান, যা না অর্জিত হয় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, না বিবেক-বুদ্ধির জোরে আর না স্বপ্নযোগে ও ইলহাম ইত্যাদির মাধ্যমে। রুগ্নদের আরোগ্য দান কিংবা কারও উপর অভিশম্পাত করা ও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া, যার কারণে তাকে দৈন্যদশা, রোগ-ব্যাধি ও দুর্ভাগ্য ঘিরে ধরে অথবা রহমত প্রেরণ করা, যার ফলে তার স্বচ্ছলতা, সুস্থতা ও সৌভাগ্য হাসিল হবে।'

মুশরিকরাও জাওহার (পরমাণু) ও বিশাল কর্মসৃজনে কাউকে আল্লাহ তা'আলার শরীক মানত না। তাদের বিশ্বাস ছিল, যখন আল্লাহ তা'আলা কোনও কাজ করার ইচ্ছা করে ফেলেন, তখন কারও মধ্যেই তাকে নিবৃত্ত করার শক্তি নেই। তাদের শিরক কেবল এমন সব বিষয়ে ছিল, যেগুলো কতিপয় বান্দার সাথে খাস ছিল। তাদের ধারণা ছিল, যেভাবে মহামান্য সম্রাট তার একান্ত কাছের লোকদেরকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করেন এবং কিছু বিশেষ ব্যাপার মীমাংসায় (যতক্ষণ না সরকারী কোনও সুস্পষ্ট নির্দেশ আসে) তাদেরকে স্বাধিকার দিয়ে দেন। নিজ প্রজাসাধারণের ছোট ছোট বিষয়ের ব্যবস্থাপনা স্বয়ং করেন না; বরং সেগুলো ঐ শাসকবর্গের দায়িত্বে ন্যস্ত করেন। আর সেসব শাসকবর্গের সুপারিশ তাদের অধীনস্থ আমলা-কর্মচারীদের ব্যাপারে গ্রহণ করা হয়। অনুরূপভাবে নিখিল বিশ্ব চরাচরের রাজাধিরাজ (মহান আল্লাহ তা'আলা) তার বিশেষ বান্দাদেরকে প্রভুত্বের মর্যাদার চাদরে সম্মানিত করেছেন। এমন ব্যক্তিবর্গের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি অন্যান্য বান্দাদের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াশীল। এজন্য তারা সেসব খাছ বান্দাদের নৈকট্য লাভকে জরুরী মনে করত। যেন আসল বাদশাহর দরবারে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার উপযোগিতা সৃষ্টি হয়ে যায়। আর বিনিময় দিবসে তাদের পক্ষে সুপারিশ গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করে। এসব কাল্পনিক প্রয়োজনাদির প্রতি লক্ষ্য করে তাদেরকে সিজদা করা, তাদের জন্য কুরবানী করা, তাদের নামে কসম খাওয়া, এমনকি জরুরী বিষয়ে তাদের কুন-ফাইয়াকুন শক্তির সাহায্য নেওয়া জায়েয মনে করত। তারা পাথর, তামা, সীসা ইতাদি মূর্তি বানিয়ে সেসব খাছ বান্দাদের আত্মার প্রতি ধ্যানমগ্ন হওয়ার একটি মাধ্যম সাব্যস্ত করেছিল। কিন্তু কালক্রমে জাহেল-মূর্খরা সেসব পাথরকেই নিজেদের আসল মাবুদ ও উপাস্য বুঝতে শুরু করে। আর মহাভুলের সংমিশ্রণ হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে শাহ সাহেব 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থে আরও লিখেন– শিরকের বাস্তবতা হচ্ছে, মানুষ এমন কোনও ব্যক্তি, সমাজে যাকে

সম্মানযোগ্য মনে করা হয়, তার ব্যাপারে এরূপ বিশ্বাস ও আকীদা পোষণ করল যে, তার থেকে যেসব অসাধারণ কাজকর্ম ও ঘটনাবলি প্রকাশ পায়, তার কারণ সে সিফাতে কামাল (পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি) থেকে এমন কোনও সিফাত বা গুণে গুণান্বিত, মানব জাতির কারও মধ্যে যার দেখা মিলেনি। সেই সিফাত অপরিহার্য সত্ত্বার সাথে খাছ। তিনি ছাড়া অপর কারও মাঝে তা পাওয়া যায় না। এর একাধিক রূপরেখা হতে পারে। প্রথমতঃ সেই অপরিহার্য সত্ত্বা তার কোনও সৃষ্টিকে প্রভুত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন কিংবা ঐ মাখলুক আল্লাহর যাতের মধ্যে লীন বা আত্মবিস্তৃত হয়ে গিয়ে বাকীবিল্লাহর রূপ নেবে অথবা এই আকীদা পোষণকারীর নিজের পক্ষ থেকে আবিস্কৃত কোনও রূপ ধারণ করবে। হাদীস শরীফে মুশরিকদের পঠিত তালবিয়া (লাব্বাইক ....) এর যে শব্দাবলি উদ্ধৃত হয়েছে, তা এ আকীদার একটি নমুনা ও উদাহরণ। হাদীস শরীফে এসেছে, আরবের মুশরিকরা (জাহেলী যুগে ইসলাম আসার পূর্বে) নিম্নোক্ত শব্দে তালবিয়া পাঠ করত,

لبيك لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه و ما ملك-

'ওহে প্রভু! আমি হাজির। আমি হাজির। তোমার কোনও শরীক নেই, একমাত্র তোমার খাছ বান্দা ছাড়া, তুমি তারও মালিক এবং তার মালিকানাধীন বিষয়-আশয়েরও মালিক।'

সে মতে এই আকীদায় বিশ্বাসী লোক উক্ত মহাপুরুষের সামনে (যাকে সে আল্লাহর বিভিন্ন গুণের অধিকারী এবং প্রভুত্বের পোশাকে সম্মানিত মনে করে) নিজের চরম দীনতা-হীনতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করে। অধিকন্তু তার সঙ্গে এরূপ আচরণ করে, যেমনটি করা উচিত বান্দাদের আল্লাহ তা'আলার সাথে।

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' -এর অপর এক স্থানে মুশরিকদের শিরকের বাস্তবতা কি ছিল, মহান আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে তাদের এবং (বিশুদ্ধ আকীদার অধিকারী) মুসলমানদের মাঝে কয়টি বিষয়ে ঐকমত্য ছিল– এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বস্তুতঃ মুশরিকরা আল্লাহর অস্তিত্ব, তার একত্ব ও সর্বশক্তিমান হওয়াকে অস্বীকার করত না। কেবলমাত্র কিছু গুণাবলি ও অধিকারের ব্যাপারে তারা (আল্লাহ পাকেরই সন্তুষ্টি ও ইচ্ছানুযায়ী) তার কতিপয় নৈকট্যশীল প্রিয় বান্দাদেরকে অংশীদার ও স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী মনে করত আর তাই তাদের সঙ্গে উপাস্য ও দাসত্বের আচরণ করত ইত্যাদি বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'তাওহীদ অধ্যায়' শিরোনামে তিনি লিখেন, 'মুশরিকরা এক্ষেত্রে মুসলমানদের মতই চিন্তাধারা ও আকীদা পোষণ করত যে, বড় বড় কাজ আঞ্জাম দেওয়া এবং যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা চূড়ান্ত

সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন এবং তার ইচ্ছা চূড়ান্ত হয়ে যায়, তাতে অন্য কারও অধিকার বাকী থাকে না। অবশ্য অন্যান্য বিষয়ে তারা মুসলমানদের থেকে পৃথক মতাদর্শ অনুসরণ করেছিল। তাদের ধারণা ছিল, প্রাচীন যুগের নেককার-বুযুর্গগণ প্রচুর ইবাদত-বন্দেগী করেছেন এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রভুত্বের পোশাক দান করেছেন। এজন্য তারা আল্লাহ্র অন্যান্য বান্দাদের উপাসনা পাওয়ার যোগ্য হয়ে গেছেন। যেমন– বাদশার কোনও চাকর যদি উক্ত বাদশার সেবার হক পুরোপুরি আদায় করে, তবে বাদশা তাকে রাজকীয় পোশাক দান করেন এবং নিজের রাজত্বের কোনও এলাকার শাসনভার তার উপর ন্যস্ত করেন। তখন সে ঐ এলাকাবাসীর দাবী-দাওয়া শোনা ও পূরণের অধিকারী হয়ে যায়। কাজেই তারা বলত, আল্লাহ্র দাসত্ব ও ইবাদত তখনই কবুল হতে পারে, যখন তাতে এমন গ্রহণযোগ্য ও প্রিয় বান্দাদের দাসত্বও শামিল থাকবে। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষদের থেকে এত বেশি উঁচু ও বড় যে, সরাসরি তার ইবাদত আদৌ ফলপ্রসূ হতে ও তার দরবারে পৌঁছুতে পারে না। তাই দরবারে এলাহীর সেসব প্রিয়পাত্রগণ দেখেন, শোনেন এবং স্বীয় বান্দাদের জন্য সুপারিশ করেন। তাদের কাজ কারবারের ব্যবস্থা করেন। তাদের সাহায্য করেন। তারা তাদের নামে পাথর খোদাই করে এবং তাদেরকে নিজেদের মনোযোগিতার কেন্দ্রবিন্দু ও কিবলা বানিয়ে নেয়। পরবর্তী এমন লোক এসেছে, যারা ঐ মূর্তিগুলো এবং যাদের নামে এসব মূর্তি তৈরী করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেনি। তারা স্বয়ং এগুলোকে উপাস্য মনে করে বসে।

অন্যত্র আরও লিখেন, 'আরবের মুশরিকরা দাবী করত, আল্লাহ তা'আলার আকাশ-মাটি সৃজনে কেউ অংশীদার নেই। তদ্রূপ এতদুভয়ের মধ্যে যেসব অণু-পরমাণু রয়েছে, সেগুলোর সৃষ্টিতেও কেউ তার অংশীদার নেই। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি ও কাজকর্ম সমাধানেও কেউ তার অংশীদার নেই। তার সিদ্ধান্তকে রহিত বা স্থগিতকারী চূড়ান্ত নির্দেশ প্রতিহতকারীও কেউ নেই। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন,

ولئن سألتهم من خلق السموت والأرض ليقولن الله.

'তোমরা যদি সেসব মুশরিকদের জিজ্ঞেস করো, আকাশ-মাটি কে সৃষ্টি করেছে? তাহলে তারা অবশ্য অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।' (সূরা লোকমান : ২৫)

কুরআনে কারীম স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছে, এসব মুশরিক আল্লাহ তা'আলাকে মানত। তার কাছে প্রার্থনাও করত।

بل اياه تدعون

'বরং তার কাছেই প্রার্থনা করত।' (সূরা আন'আম : ৪১)

ضل من تدعون الا اياه.

'একমাত্র তার কাছেই দু'আ করলে কাজে আসে। অন্যের কাছে দু'আ প্রার্থনা বৃথা (নিষ্ফল) যায়।' (সূরা ইসরা : ৬৭)

বস্তুতঃ এসব মুশরিকের ভ্রষ্টতা ও অধর্ম ছিল এই যে, তাদের বিশ্বাস ছিল, কিছু ফিরিশতা ও পুণ্যাত্মা আছেন– যারা (বড় কাজগুলো বাদ দিয়ে) স্বীয় প্রভুর সেসব ছোট-খাট, ক্ষুদ্র ও পরোক্ষ বিষয় আঞ্জাম দেন এবং তার কাজ সমাধান করে দেন, যেগুলোর সম্পর্ক তার সত্ত্বা, সন্তানাদি, ধন-সম্পদ ও অধীনস্থদের সাথে। তাদের মতে তাদের সাথে প্রভুর এমনই সম্পর্ক রয়েছে, যেমনটি বাদশার সাথে কোনও রাজকীয় গোলামের থাকে এবং কোন দূত, সুপারিশিকারী ও প্রিয়পাত্রদের হয়ে থাকে ক্ষমতাধর সম্রাটের সাথে। আল্লাহর শরীয়তে যেখানেই আলোচিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা কিছু কাজ তার কিছু ফিরিশতাদের দায়িত্বে ন্যস্ত করেছেন কিংবা প্রিয়পাত্রদের দু'আ প্রার্থনাগুলো কবুল করা হয়, মূর্খ লোকজন সেসবকে ভিত্তি করে তাদেরকে এমন ক্ষমতাধর ও শক্তিমান বুঝে নিয়েছে, যেমন স্বয়ং বাদশা স্বাধীন সর্বেসর্বা হয়ে থাকে। অথচ এটা ছিল বাস্তবের উপর অদৃশ্য জগতকে অনুমান করা আর এর দ্বারাই সকল কলুষতা ও পাপাচার সৃষ্টি হয়েছে।

এভাবেই শাহ সাহেব সর্বসাধারণ এবং সাধারণদের মত বিশেষ মহলের লোকদের অসংখ্য শিরকী আকীদা ও কাজকর্মের মূলোৎপাটন করেন। বিদীর্ণ করেন, সেই ধোঁকার পর্দা, যার কারণে অনেক জাহেল-মূর্খ ও জ্ঞানের দাবীদাররা যেসব কাজকর্ম, রুসম-রেওয়াজ, শিরকী নিদর্শন, গাইরুল্লাহর নামে মান্নত ও যবাই করা, বুযুর্গদের নামে রোযা রাখা, ওয়ালী-বুযুর্গদের কাছে দু'আ প্রার্থনা, ভয় ও আশা, সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা, তাদের সাথে সম্পৃক্ত বস্তুসমূহকে হেরেম শরীফ ও বাইতুল্লাহর মত সম্মান প্রদর্শন, তাদের জন্য তদ্রূপ সম্মানের প্রতি যত্নবান থাকা, বিশ্বজগতে তাদের ছোট ছোট কার্যক্রম, মানুষের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, অসুস্থতা ও সুস্থতা, রিযিকের স্বচ্ছলতা ও দৈন্যদশায় ক্রিয়াশীল হওয়ার শিরকী আকীদায় আক্রান্ত আর فاعبد الله مخلصا له الدين এর উপর আমল করা, তাওবা-ইস্তিগফার, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ইত্যাদির অমূল্য সম্পদ থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। যাদের কোনও কোনও অবস্থা শুনে ও আমল দেখে অজান্তেই মনে পড়ে যায় কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত-

وما يؤمن من اكثرهم بالله الا وهم شركون.

'আর এরা অধিকাংশই আল্লাহর উপর ঈমান রাখে না, তবে সেই সাথে তারা শিরক করে।' (সূরা ইউসুফ : ১০৬)

শাহ সাহেব এবং তার উত্তরসূরীদের যদি এই তাওহীদের আকীদা-সংস্কার, এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, প্রচার-প্রসার ও এ সংক্রান্ত ভুল তথ্য-জ্ঞান দূরীভূত করা ছাড়া অন্য কোন কৃতিত্ব না-ও থাকত, তবু এই একটিমাত্র কৃতিত্বই তাকে উম্মতের মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) বলে গণ্য করতে যথেষ্ট ছিল। অন্যান্য কৃতিত্ব তো আরও উর্ধ্বে; যার বিবরণ অত্যাসন্ন।

আকাইদের তত্ত্ব-জ্ঞান

কুরআন সুন্নাহর আলোকে, সাহাবা ও তাবেঈনে কিরামের মতানুসারে

শাহ সাহেব (র) এর বুনিয়াদী সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড ছাড়া, যার সম্পর্ক ছিল সাধারণ মুসলমান ও গোটা মুসলিম সমাজের সাথে, যা ছাড়া হেদায়াত ও জটিলতা মুক্ত এবং আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা ছিল অসম্ভব– তাঁর আরেকটি পরোক্ষ শিক্ষা ও সংস্কারমূলক কীর্তি ছিল, তিনি আকাইদের তত্ত্ব-জ্ঞানের কাজ কুরআন-সুন্নাহের আলোকে আঞ্জাম দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈগণের মতাদর্শ ও চিন্তাধারা অনুযায়ী কাজ করার দাওয়াত দিয়েছেন। আর নিজে এর উপর আমল করে পেশ করেছেন এর শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা জগতে যুগ যুগ ধরে এমন যুগশ্রেষ্ঠ অসাধারণ ধীমান চিন্তাবিদ ও নছসমূহের অনুবর্তী মুজাহিদের প্রয়োজন ছিল অপরিসীম। যিনি দর্শন ও দার্শনিকদের চিন্তাধারার সঙ্গে (স্বয়ং যাদের ইলমে কালামের উপর পূর্ণ প্রভাব পড়েছিল) চক্ষু মিলিয়ে কথা বলবেন। কুরআনের উপর যার ঈমান হবে এমন, যেভাবে তা অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি ও কর্মক্রিয়াসমূহ তিনি কোন প্রকার রদবদল ও ব্যাখ্যা টানা ছাড়া তদ্রূপই মেনে চলবেন, যেরূপ তিনি স্বয়ং তার সম্পর্কে বলে থাকেন। এসব বাস্তবতার এমন তাফসীর (ব্যাখ্যা) করবেন, যাকে একদিকে জ্ঞান ও শরয়ী দলীল-প্রমাণ শক্তিশালী করে, অপরদিকে বিবেক এবং যুক্তিও একে স্বীকার করে অকুণ্ঠচিত্তে। এরূপ মহাপুরুষ কুরআনিক জ্ঞানের সাগর ও নববী ইলমের পাঠশালা থেকে ফয়েয ও বরকতপ্রাপ্ত হকপন্থী উলামায়ে কিরামই হতে পারেন। যিনি ছিলেন দর্শন শাস্ত্র ও মুতাকাল্লিমসুলভ সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাইদে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে মুতাওয়াতিরের অনুগত। আল্লাহ তা'আলার উপর সেসব গুণবৈশিষ্ট্যসহ ঈমান ও বিশ্বাস রাখতেন, যা তিনি তার কিতাবে (কুরআনে কারীমে) বর্ণনা

করেছেন। একটি হাদীসে উলামায়ে হকের যে পরিচয় বর্ণিত হয়েছে, তাঁর উপর পুরোপুরিভাবে তা প্রযোজ্য হত।

ينفقون عن هذه الدين تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين.

'তিনি উগ্রবাদীদের বিকৃতি-রদবদল, মিথ্যাপূজারীদের ভুল সম্পর্ক এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে দীনকে সংরক্ষণ করেন।'

এসব উলামায়ে কিরাম থেকে কোনও যুগ শূন্য ছিল না। এই মহাপুরুষদের মধ্যে ৮ম হিজরী শতকের বিশিষ্ট আলেম শায়খুল ইসলাম হাফেয ইবেন তাইমিয়া হাররানী (র) (মৃত্যু ৭২৮ হি.) তারপরে তার বিশিষ্ট শিষ্য আল্লামা ইবনে কাইয়িম জযিয়া 'যাদুল মা'আদ' রচয়িতা (মৃত্যু ৭৯১ হি.) এবং এই মতাদর্শে বিশ্বাসী অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট উলামায়ে কিরাম রয়েছেন, যাদের তালিকা তেমন দীর্ঘ নয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর পরে যদি এক্ষেত্রে পূর্ণ আস্থার সাথে কারও নাম নেওয়া যায় এবং তার কর্মতৎপরতা আলেম-উলামাদের সম্মুখে থাকে, তাহলে তিনি হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ (র)। যিনি আকাইদের তত্ত্ব-জ্ঞান এবং একে পূর্বসূরী তাবিঈন ও তাবে-তাবেঈদের জ্ঞান ও মতাদর্শ অনুযায়ী পেশ করার পূর্ণ যোগ্যতা রাখতেন। কেননা একদিকে তিনি ইউনানী দর্শন ব্যাপক ও গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। ইলমে কালামের পূর্ণ ভাণ্ডার তার চোখের সামনে বরং তার আয়ত্বাধীন ছিল। অপরদিকে তিনি ছিলেন কুরআনে কারীমের দূরদর্শী মুফাসসির, ইলমে হাদীসের বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং শরীয়তের সূক্ষ্মতা ও উদ্দেশ্যের তত্ত্বজ্ঞানী। এজন্য তিনি ছিলেন 'শাব্দিকতা' ও 'ব্যাখ্যা' এর মাঝে ভারসাম্য রক্ষাকারী। তার রচিত 'العقيدة الحسنة' (আল-আকীদাতুল হাসানাহ) মর্মের গভীরতা এবং ভাষার মধুরতা ও গতিশালতা দু'টিরই সম্পূরক ছিল। এ গ্রন্থটি ইলমে তাওহীদ তথা ইলমে কালামের এমন একটি মতন (মেরুদণ্ড), যার মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা-বিশ্বাসের সেই মগজ ও সারনির্যাস এসে গেছে, যার সম্পর্কে প্রত্যেক শিক্ষিত-জ্ঞানী মুসলমানের অবগত হওয়া উচিত; যে নিজেকে আহলে সুন্নাতের দলভুক্ত বলে পরিচয় দেয় এবং তাদের আকীদা-বিশ্বাসকে নিজের শে'আর ও আদর্শ বানাতে চায়।

শাহ সাহেব তার স্বরচিত ফার্সী পুস্তিকা 'ওছায়া'তে লিখেন, এই অধমের প্রথম অসীয়ত হচ্ছে, ঈমান ও আমলে কুরআন-সুন্নাহকে দৃঢ় হস্তে আকড়ে

ধরতে হবে। সর্বদা এর উপর আমল করতে হবে। আকীদা-বিশ্বাসে মুতাকাদ্দিমীন (প্রবীণ) আহলে সুন্নাতের মতাদর্শ গ্রহণ করতে হবে। আর সিফাত ও আয়াতে মুতাশাবিহাত (সাদৃশ্যপূর্ণ বা অস্পষ্ট আয়াতসমূহ) -এর ব্যাপারে সালফগণ (প্রবীণ উলামায়ে কিরাম) যেসব স্থানে ব্যাখ্যা ও তত্ত্বানসন্ধানের মাধ্যমে কাজ নেননি, তা থেকে বিরত থাকতে হবে। কাঁচা তার্কিকের কাল্পনিক চিত্রকলার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না।

'আসমা ও সিফাত' সম্পর্কে শাহ্ সাহেবের চিন্তাধারা ও মতাদর্শ কিছুটা অনুমান করা যাবে পরবর্তী উদ্ধৃতি থেকে। তিনি লিখেন– 'আল্লাহ্ তদপেক্ষা মহান ও উঁচু যে, তিনি বিবেক-বুদ্ধি কিংবা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাচাই-বাছাই হবেন অথবা তার মধ্যে সিফাতগুলো এমনভাবে বিদ্যমান হবে, যেভাবে অণুগুলো পরমাণুর মধ্যস্থতায় অস্তিত্ব লাভ করে অথবা তিনি এমন হবেন যাকে সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি উপলব্ধি করতে পারে বা প্রচলিত শব্দে তাকে ব্যক্ত করতে পারে। সেই সাথে মানুষদেরকে বলে দেওয়াও জরুরী, যাতে যথাসম্ভব মানবতার পূর্ণতা এসে যায়। এমতাবস্থায় উক্ত সিফাতগুলোর ব্যবহার সেসব অর্থে করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, যাতে সেগুলোর ফলাফল ও আবশ্যকীয়তা বুঝে নেওয়া যায়। যেমন, আমরা আল্লাহ্র জন্য 'রহমত' সাব্যস্ত করি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য অনুগ্রহ-অনুকম্পার বিশাল দান; মনের বিশেষ অবস্থা নয়। (যাকে মূলতঃ রহমত বলা হয়।) এ পন্থায় আল্লাহ্র কুদরতের ব্যাপকতা প্রকাশের জন্য বাধ্য হয়ে আমাদেরকে ইস্তি'আরা (রূপক) হিসেবে সেসব শব্দ ব্যবহার করতে হবে, যেগুলো মানবীয় শক্তি-ক্ষমতার জন্য ব্যবহার করা হয়। কারণ, সেসব অর্থ ব্যক্ত করার জন্য আমাদের কাছে এর চেয়ে উত্তম কোনও শব্দমালা নেই। এরূপভাবে উদাহরণস্বরূপ অনেক শব্দ ব্যবহার করতে হবে। তবে শর্ত হল, তার দ্বারা যেন প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য না হয় বরং যেসব অর্থ আল্লাহ্র জন্য সত্ত্বার মুনাসিব ও উপযোগী, সকল আসমানী ধর্মের ঐকমত্যে সে পদ্ধতিতেই সিফাতসমূহ ব্যক্ত করতে হবে। উক্ত শব্দগুলো এভাবেই উদ্ধৃত হবে। এছাড়া অন্য কোনও আলোচনা ও অনুসন্ধান করা হবে না। এ মতাদর্শ বা মাযহাবই সেকালে ছিল। যার কল্যাণ ও বরকতের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। (অর্থাৎ তাবে তাবেঈনের যুগ পর্যন্ত)। এরপর এমন কিছু লোক মুসলমানদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে, যারা কোনও অকাট্য নছ ও সুদৃঢ় দলীল-প্রমাণ ব্যতিত এসব মাসয়ালায় চিন্তা-গবেষণা শুরু করে দিয়েছে।'

শত শত বছর ধরে মুসলিম বিশ্বে বিশেষতঃ সেসব রাষ্ট্রে যেগুলো শিক্ষা, জ্ঞান-গবেষণা, চিন্তাধারা ও পাঠ্যক্রম হিসেবে ইরানের পদানত ছিল, যেসব দার্শনিক সূক্ষ্মদর্শিতা, সিফাতসমূহের সুদূরপ্রসারী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ– যার

ফলশ্রুতিতে সে বেকার ও অর্থহীন হয়ে পড়ে আর ইউনানী দর্শনের মানসিক গোলামী পর্যন্ত প্রভাবিত হওয়ার যুগ ছিল। সালফ বা প্রবীণদের সম্পর্কে তাদের ধারণা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, যারা অত্যন্ত সতর্কতা ও ইনসাফের সাথে কাজ করতেন। তারা বলতেন مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم তথা সালফদের মতাদর্শে সতর্কতা আর খালফ বা পরবর্তীদের গবেষণায় আছে তত্ত্ব-জ্ঞান। সুতরাং এই প্রেক্ষাপটে শাহ সাহেবের এই খেদমত ও সাহসিকতা এক মুজতাহিদ ও মুজাদ্দিদসুলভ কৃতিত্ব বৈ কি?

আসমা ও সিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলি) সম্পর্কে প্রবীণদের মাযহাবের সমর্থন, মুতাকাল্লিমীন (বাগ্মী) দার্শনিকদের সঙ্গে (যারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাজ নিয়েছেন এবং তাদের আকওয়ালে সিফাত বা সিফাত সম্পর্কিত অভিব্যক্তি সম্পর্কে অনেক সময় এদেরকে নিরর্থকতা ও সিফাতসমূহ নাকচ করার স্তরে যেতেও দেখা যায়) সম্পর্কহীনতা এবং হাদীস ও সুন্নাতের আকর্ষণ, ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন তাকে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর পক্ষ থেকে (জবাবদান) ও তার উচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতিদানে উৎসাহিত করেছেন। যার ব্যক্তিত্ব এ শেষ শতকগুলোতে বড় বিতর্কিত বরং ভর্ৎসনা, অভিশাপ ও সংশয়ের লক্ষ্যস্থল হয়ে গিয়েছিল। শাহ সাহেব অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের ভাষায় তার পরিচয় দিয়েছেন এবং তার পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করেছেন। তিনি 'তাফহীমাতে এলাহিয়্যাহ' গ্রন্থে লিখেন, 'শায়খুল ইসলামের কথাবার্তায় এমন কোনও বিষয় নেই, যার পক্ষে তার কাছে কুরআন-হাদীস ও আছারে সলফ (পূর্বসূরীদের আমল)-এর মধ্য হতে কোন তত্ত্ব-প্রমাণ নেই। এমন আলেমে দীন পৃথিবীর বুকে (আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি) সুপাংক্তেয়। কে সে ব্যক্তি, যে রচনা ও বর্ণনায় তার মর্যাদায় পৌঁছার সক্ষমতা বা যোগ্যতা রাখে? আর যারা তার বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ-আপত্তি ছুড়ে মেরেছে, তাদের ভাগ্যে তার যোগ্যতাসমূহের দশভাগের একভাগও নসীব হয়নি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হাদীস ও সুন্নাতের প্রচার-প্রসার, ফিকাহ্ ও হাদীসের মধ্যে সমন্বয় আনার প্রয়াস

হাদীসের গুরুত্ব এবং প্রত্যেক দেশ ও যুগে এর প্রয়োজনীয়তা

ভারত উপমহাদেশে শেষযুগে (তথা বারো হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকে অদ্যাবধি) শাহ সাহেব হাদীসের প্রচার-প্রসার, দরসে হাদীসের পুনর্জীবন দান, হাদীস শাস্ত্রের সঙ্গে মহানুভবতা এবং এই শাস্ত্রে তাঁর বিজ্ঞতা ও গবেষণামূলক রচনাবলির মাধ্যমে এমন বিশাল সংস্কারকর্ম আঞ্জাম দিয়েছেন, যা তার সংস্কার প্রবন্ধ ও জীবনগ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আলোকোজ্জ্বল অধ্যায়। তার অন্যান্য জ্ঞানগত যোগ্যতা ও ধর্মীয় খেদমতের উপর যা এতখানি প্রবল হয়ে গেছে যে, 'মুহাদ্দিসে দেহলভী' তার নামের অংশ ও তার পরিচিতির শিরোনাম হয়ে গেছে। আর মানুষের মুখে মুখে ও লিখনীতে 'হযরত শাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী' প্রচলিত হয়ে গেছে।

কিন্তু এই কৃতিত্বের ইতিহাস ও ব্যাখ্যা প্রদানের পূর্বে এর গুরুত্ব-মাহাত্ম্য বুঝার জন্য প্রথমে জেনে নিতে হবে, দীনী শরীয়তের নেযাম, ইসলামকে তার সঠিকরূপে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা-সংগ্রাম, ইসলামী ভাবধারা ও পরিবেশ তৈরী এবং সংরক্ষণে হাদীস কিরূপ মর্যাদা রাখে? প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক দেশে (যেখানে মুসলমান আছে) এর প্রসার ও সংরক্ষণের প্রয়োজন কেন? এর প্রতি উদাসীনতা, অজ্ঞতা বা অস্বীকৃতি কতটা ভয়াবহ এবং কত বড় বিপর্যয় ডেকে আনে? কোনও যুগ বা দেশ থেকে এই শাস্ত্র বিলীন বা বিস্মৃত হয়ে যাওয়া কত বড় শূন্যতা সৃষ্টি করে, যা অন্য কোনও পন্থায় বা উপাদানে পূরণ হতে পারে না? এর ব্যাখ্যার জন্য লেখক তার স্বরচিত একটি পুস্তিকার একটি উদ্ধৃতি পেশ করছে। যেখানে এই বাস্তবতাকে পুরোপুরিভাবে প্রতিভাত ও প্রমাণ করার চেষ্টা চালানো হয়েছে।

হাদীস উম্মতের জন্য সঠিক মানদণ্ড

'হাদীসে নববী (স)' এমন একটি যথোপযুক্ত মানদণ্ড, যাতে প্রত্যেক যুগের সৎকর্মশীল ও সংস্কারক-মুজাদ্দিদগণ এ উম্মতের ঈমান-আমল ও আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিগুলো পরিমাপ করতে পারে। অবগত

হতে পারে উম্মতের দীর্ঘ ঐতিহাসিক ও বিশ্বময় সংঘটিত বিপ্লব ও পরিবর্তন সম্পর্কে। আখলাক-চরিত্র ও আমলে ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য আসতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন-হাদীসকে একই সাথে সামনে না রাখা হবে। যদি হাদীসে নববী (স)-এর সেই ভাণ্ডার না হত, যা সংযত, পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের সঠিক পথপ্রদর্শন করে, যদি সেই প্রজ্ঞাপূর্ণ নববী শিক্ষা আর এই আহকাম না হত, যার আনুগত্য, রাসূলে কারীম (স) মুসলিম সমাজকে করিয়েছেন, তাহলে এই উম্মত ইফরাত-তাফরীত তথা অতিরঞ্জন-বাড়াবাড়ি ও শিথিলতার শিকার হয়ে যেত। অক্ষুণ্ন থাকত না তার ভারসাম্য। সেই আমলী ও বাস্তব দৃষ্টান্ত অস্তিত্ব লাভ করত না, যার অনুসরণ করার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমায় উপমা দিয়েছেন

لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة

'নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলে কারীম (স)-এর সত্তায় রয়েছে উত্তম আদর্শ।' (সূরা আহযাব-২১)

আর সে আনুগত্যের দাওয়াত দিয়েছেন নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমায়–

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم.

'আপনি বলে দিন! তোমরা যদি আল্লাহর ভালবাসা পেতে চাও, তবে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিবেন।' (সূরা আলে ইমরান ৩১)

এটি এমন একটি বাস্তবিক দৃষ্টান্ত, যার প্রয়োজন সকল মানুষের। যার দ্বারা সে পারে সফল জীবন লাভ এবং শক্তি ও আস্থা-নির্ভরতা অর্জন করতে। নিশ্চিত হতে পারে যে, ব্যবহারিক জীবনে ধর্মীয় বিধি-বিধান কার্যকর করা নিছক সহজই নয় বরং একটি বাস্তবতা।

হাদীসে নববী (স) জীবনী, শক্তি ও প্রভাবশক্তিতে ভরপুর। সর্বদা তা সংশোধন-সংস্কার কার্যক্রম, বিপর্যয়, কলুষতা ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে কাতারবন্দি ও যুদ্ধোন্মুখ হওয়া এবং সমাজের হিসাব নেওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। আর এর প্রভাবে প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক দেশে এমন ব্যক্তিবর্গ তৈরী হতে থাকে, যারা সংস্কার-সংশোধনের ঝাণ্ডা সমুন্নত করেছেন। কাফন পরে রণাঙ্গণে এসেছেন। প্রকাশ্য যুদ্ধ করেছেন বিদ'আত, গোমরাহী, কুসংস্কার ও বর্বর তার বিরুদ্ধে। দাওয়াত দিয়েছেন খাঁটি দীন ও সঠিক ইসলামের। কাজেই মুসলিম উম্মাহর জন্য হাদীসে নববী একটি অকাট্য অবিচ্ছেদ্য

বাস্তবতা এবং তার অস্তিত্বের জন্য আবশ্যকীয় শর্ত। এর সংরক্ষণ, বিন্যাস ও সংকলন, নিরাপত্তা ও প্রচার-প্রসার ব্যতীত উম্মতের এই ধর্মীয়, চিন্তাগত, বাস্তবিক ও চারিত্রিক স্থায়িত্ব আর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকত না।

ইসলামের ইতিহাসে সংস্কার আন্দোলন হাদীস শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত

হাদীসে নববী ও সুন্নাতে নববী (স)-এর ভাণ্ডার সর্বদা সংশোধন-সংস্কার ও মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সঠিক ইসলামী চিন্তাধারার উৎস ছিল। এর থেকেই সংস্কারের ঝাণ্ডা উত্তোলনকারীগণ ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে বিশুদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞান ও সঠিক ইসলামী চিন্তাধারা সংগ্রহ করেছেন। সেসব হাদীস দ্বারাই তারা দলীল-প্রমাণ দিয়েছেন। দীন ও ইসলামের দাওয়াতে এটাই ছিল তাদের সনদ, তাদের হাতিয়ার ও ঢাল। ফিৎনা-ফাসাদ, বিপদ-বিপর্যয় ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে এটাই ছিল তাদের প্রেরণা ও প্রতিরোধশক্তি। আজও যে ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহকে সত্য দীন ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামের পথে ফিরে আসার দাওয়াত দিতে চায়, তার এবং নববী জীবন ও আদর্শের মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা রাখে আর যাকেই প্রয়োজন ও যুগের পরিবর্তন নতুন আহকাম উদ্ভাবনে বাধ্য করে, তিনি এই উৎসমূল থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারেন না।

এ বাস্তবতার পক্ষে ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস সাক্ষ্য– যখনই হাদীস ও সুন্নাতের কিতাবাদির সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক ও জ্ঞানে ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে আর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই ঘাটতি অব্যাহত রয়েছে, তখন দাঈগণ এবং চারিত্রিক দীক্ষা ও আত্মশুদ্ধির আধ্যাত্মিক মুরব্বীদের আধিক্য, পৃথিবীতে যুহদ অবলম্বনকারীদের উপস্থিতি এক ধরনের সুন্নাতের অনুসরণ সত্ত্বেও এই মুসলিম সমাজ, যা ইসলামী শাস্ত্র-জ্ঞানে সুদক্ষ, দর্শন-প্রজ্ঞার শাস্ত্রীয় পণ্ডিত ও কবি সাহিত্যিকে পরিপূর্ণ ছিল; ইসলামের শক্তি ও বিজয় আর মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থায় কালাতিপাত করছিল, সেখানে নিত্যনতুন বিদ'আত, কুসংস্কার, অনারব রুসম-রেওয়াজ এবং অচেনা পরিবেশের প্রভাব তার আধিপত্য বিস্তার করে ফেলে। এমনকি পূর্বের সেই বর্বর সমাজের নতুন সংস্করণ এবং তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হতে থাকে। অক্ষরে অক্ষরে রাসূলে কারীম (স)-এর নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও হাদীস প্রতিফলিত হয়।

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع.

'তোমরা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ববর্তী উম্মতদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে।' তখন সংস্কারের শ্লোগান স্তব্ধ এবং জ্ঞানের প্রদীপ নিষ্প্রভ হতে থাকে।

দশম হিজরী শতকে ভারতবর্ষের ধর্মীয় অবস্থাসমূহ এবং মুসলমানদের জীবন পর্যালোচনা করুন, যখন ভারত উপমহাদেশের শিক্ষা ও ধর্মীয় কেন্দ্রগুলোর হাদীস শরীফ ও সুন্নাতে নববী (স)-এর খাঁটি উৎসস্থল ও প্রাণকেন্দ্রের সাথে সম্পর্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ইলমে দীনের কেন্দ্রসমূহ এবং হিজায, ইয়ামেন ও মিসর ও সিরিয়ার সেসব মাদরাসার সঙ্গে যেখানে হাদীস শরীফের দরস হত- কোনও সম্পর্ক ছিল না। ফিকাহ্, উসূল ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ এবং ফিকহী সূক্ষ্মতা ও দূরদর্শীতা, আর দর্শন-প্রজ্ঞার বই-পুস্তকের ব্যাপক প্রচলন ছিল। অনায়াসেই দেখা যেত, কিভাবে বিদ'আতীদের দৌরাত্ম্য চলছে। অপকর্ম সাধারণ হয়ে গিয়েছিল। ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের কত শত নতুন রূপরেখা ও পথ-পন্থা আবিস্কার করে নিয়েছিল মানুষ। লেখক 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমত' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে হিজরী দশ শতকের এক বিখ্যাত ও মকবূল শায়খে তরীকত শায়খ মুহাম্মদ গাউস গোয়ালিয়ারী (র) বিরচিত 'জাওয়াহিরে খামসা'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন,

'গুজরাটে, যেখানে উলামায়ে আরবের শুভাগমন ও হারামাইন শরীফাইনে আসা-যাওয়ার কারণে হাদীসের ব্যাপক প্রসার হয়ে গিয়েছিল, জন্ম নিয়েছিলেন আল্লামা আলী মুত্তাকী বুরহানপুরী ও তার বিখ্যাত শাগরেদ মুহাম্মদ তাহের পাটনী (দশ হিজরী শতকে)। ভারতবর্ষ তখন সিহাহ সিত্তাহ এবং সেসব লেখকদের কিতাবাদি সম্পর্কে অপরিচিত ছিল, যারা হাদীস সংকলন ও বিদ'আত-কুসংস্কার প্রতিরোধের কাজ করেছেন, বিশুদ্ধ সুন্নাত ও প্রামাণ্য হাদীসসমূহের আলোকে জীবনের কর্ম পদ্ধতি পেশ করেছেন। ভারতবর্ষের সেসব স্থানীয় পুণ্যময় আধ্যাত্মিক দর্শন ও অভিজ্ঞতাসমূহের প্রভাব সমকালের প্রসিদ্ধ ও মাকবূল শাত্তারী বুযুর্গ শায়খ মুহাম্মদ গাউছ গোয়ালিয়ারী (র) -এর নন্দিত কিতাব 'জাওয়াহিরে খামসা' এর মধ্যে দেখা যেতে পারে। যার উৎস বেশিরভাগ বুযুর্গদের উক্তি ও অভিজ্ঞতা। মনে হয় যেন বিশুদ্ধ হাদীসমূহ প্রমাণিত হওয়া কিংবা নির্ভরযোগ্য শামায়েল ও সীরাতগ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করাকে জরুরী জ্ঞান করা হয়নি। এতে রয়েছে নামাযে আহযাব (যুদ্ধকালীন নামায), আশেকদের নামায, কবরকে আলোকিত করার নামায এবং বিভিন্ন মাসের বিশেষ নামায ও দু'আসমূহ। হাদীস ও সুন্নাতের আলোকে যার কোনও অস্তিত্ব নেই।

এটা কেবল 'জাওয়াহেরে খামসা'-এরই বৈশিষ্ট্য নয়। বুযুর্গদের মালফূযাতের অনির্ভরযোগ্য সংকলনে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মাশায়িখের জন্য সম্মানসূচক সিজদার ব্যাপক প্রচলন ছিল। কবরসমূহকে প্রকাশ্যে সিজদাস্থল বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এর উপর প্রদীপ জ্বালানো

হত। চাদর চড়ানো হত। মক্কার হারাম শরীফের মত তার চারপাশে ঘুরে সম্মান প্রদর্শন করা হত। ওরস ও ফাতিহা পাঠের নানা ধরনের জশনে জুলূস করা হত। যেখানে থাকত বিপুল সংখ্যক নারী। নামাযে গাউছিয়া, নামাযে মা'কুছ (প্রতিবিম্ব নামায), গাইরুল্লাহর নামে মান্নত, ওয়ালীআল্লাহ ও বুযুর্গদের নামে এবং তাদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পশু যবাহ ও কুরবানী, গাইরুল্লাহর নামে রোযা রাখাসহ আরও বহু ধরনের (শিরক সমতূল্য) বিদ'আত-কুসংস্কার সর্বসাধারণের কাছে সমাদৃত ছিল। পীর-আউলিয়াদের জন্মদিন ও মৃত্যুদিবসে মাহফিল করা হত, নানা মেলা বসত।

উলামায়ে কিরামের হাতে যদি হাদীসের গ্রন্থাবলি না হত এবং সুন্নাত ও বিদ'আতের মাঝে প্রভেদ ও পার্থক্য সৃষ্টির এই নির্ভরযোগ্য ও সহজপন্থা না হত, তাহলে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র) (মৃত্যু ৭২৮ হিঃ)-এর যুগ থেকে হাকীমুল ইসলাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব (র) (মৃত্যু ১১৭৬ হি.)-এর যুগ পর্যন্ত উম্মতের সংস্কারক এবং দীনের খাঁটি-একনিষ্ঠ মুবাল্লিগ-ধর্মপ্রচারকগণের এই ধারাবাহিকতা অস্তিত্ব লাভ করত না। দৃষ্টিগোচর হত না যুগশ্রেষ্ঠ সংস্কারক এবং আকাইদ ও কুপ্রথা সংশোধনের নিবেদিতপ্রাণ অপরাজেয় ঝাণ্ডাবাহীদের।

হিজরী দশ ও এগার শতকের আফগানিস্তান (কাবুল, হেরাত ও গজনী) -এর উলামায়ে কিরামের অবস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণ করুন। তাদের রচনাবলি দেখুন। সুন্নাত সংরক্ষণ, কুসংস্কার-বিদ'আত প্রতিরোধ, জ্ঞানগর্ভ গবেষণা ও মাসায়েল বিশ্লেষণের চিত্র খুব কম দৃষ্টিগোচর হবে। অকস্মাৎ মোল্লা আলী কারী (র) (আলী ইবনে সুলতান মুহাম্মদ হারবী, মৃত্যু : ১০১৪ হি.)-এর মত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়। যিনি হিজায গমন করে সেখানকার বড় বড় মুহাদ্দিস ও উস্তাদদের থেকে হাদীসের সবক গ্রহণ করেন। তাতে অর্জন করেন দক্ষতা ও ব্যুৎপত্তি। হাদীস ও ফিকাহ গ্রন্থাবলির ব্যাখ্যা, বিভিন্ন মাসয়ালাকে প্রাধান্য দান এবং সমকালীন কিছু বিদ'আত নির্দ্বিধায় প্রতিরোধে তার এই সংস্কার ও গবেষণামূলক চিত্র সুস্পষ্ট দীপ্তিমান। তাকে তার অধ্যয়ন, জ্ঞান-গবেষণা, সততা-সত্যবাদিতা ও ন্যায়ানুগতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে দেয় যে, তিনি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর সহায়তা করেন। সাক্ষ্য দেন, তিনি (শায়খুল ইসলাম) ছিলেন আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকাবির (প্রবীণ আলেম) এবং উম্মতের পীর-আউলিয়াদের অন্তর্ভুক্ত। একই অবস্থা ছিল বহু আরব রাষ্ট্র ইরাক, সিরিয়া, মিসর, তাইওয়ান্স, আল-জাযায়ের ও মারাকাশ প্রভৃতির।

ইলমে হাদীস ও আরব

ইসলামের ইতিহাস-দর্শনের তত্ত্ব হল, যেসব দেশে ইসলাম আরবজাতির মাধ্যমে পৌঁছেছে, সেখানে হাদীসের ইলমও ইসলামের সাথে বিস্তার লাভ করেছে এবং সমৃদ্ধশালী হয়েছে অর্থাৎ সেখানকার মানুষের মধ্যে আরবীদের মানসিকতা, তাদের ধীশক্তি, তাদের কর্মশক্তি, বাস্তববাদিতা এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রতি গভীর হৃদ্যতার সাথে বিশেষ যোগসূত্র ছিল। তারা যেখানে গিয়েছেন, নিজের সঙ্গে ইলমে হাদীসও নিয়ে গেছেন। তাদের নেতৃত্বের যুগ এবং প্রভাব ও কার্যকারিতার পরিসরে এর সঙ্গে পুরোপুরি সহায়তা করা হয়েছে। এর দরস (শিক্ষাদান) এবং এর বিভিন্ন দিক নিয়ে গ্রন্থনা ও সংকলনের ধারা পূর্ণ তৎপরতার সঙ্গে চালু ছিল। ইয়ামেন, হাযরামাউত, মিসর, সিরিয়া, ইরাক, উত্তর আফ্রিকা ও উন্দুলুস (স্পেন) এর মত রাষ্ট্রগুলোর অবস্থাই ছিল এমন। স্বয়ং ভারতের গুজরাট প্রদেশে এর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, শায়খ আলী মুত্তাকী বুরহানপুরী (কানযুল উম্মাল রচয়িতা (মৃত্যু ৯৭৫ হি.) এবং শায়খ মুহাম্মদ তাহের পাটনী (মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার রচয়িতা (মৃত্যু ৯৮৬ হি.)-এর মত উঁচু মাপের মুহাদ্দিস জন্ম দিয়েছে। এর কারণ সেটিই, ইতোপূর্বে যা আমরা বর্ণনা করেছি অর্থাৎ হিজাযের সঙ্গে গুজরাটের সম্পর্ক অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বেশি ছিল। সেখানে আরবী উলামা-মাশায়িখের আসা-যাওয়া যথারীতি অব্যাহত ছিল।

কিন্তু যেসব দেশে অনারব লোকদের মাধ্যমে ইসলাম পৌঁছেছে, সেখানের অবস্থা এরূপ নয়। ভারতবর্ষে তুর্কি কিংবা আফগান বংশধরগণ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর সেসব মাশায়িখ ও ইসলামের দাঈগণের মাধ্যমে (এখানে) ইসলামের প্রচার-প্রসার হয়েছে, যাদের সিংহভাগ অনারব বংশোদ্ভূত ও ইরান-তুরস্কের বাসিন্দা ছিলেন। পরবর্তীতে যখন ভারতবর্ষে দরস-তাদরীস (শিক্ষাদান ও লিখনী), মাদরাসা প্রতিষ্ঠা এবং পাঠ্যক্রম তৈরীর যুগ এল, তখন এর উপর অনারব বিদ্বান, পণ্ডিত ও ইরানী চিন্তাবিদদের পূর্ণ প্রভাব পড়েছিল। প্রথম অধ্যায়ে বলে এসেছি, ইরানে ছফাবী শাসন প্রতিষ্ঠা এবং শী'আ মতাদর্শ রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হওয়ার পর (হিজরী দশ শতকের প্রথম দিকের ঘটনা) ইরানের (যে হাদীসের প্রাসাদের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ নির্মাতা) হাদীসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

কাজেই তার দ্বারা ভারতবর্ষে হাদীস শাস্ত্রের প্রসার, এর গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। পক্ষান্তরে ভারতের শিক্ষাজগতে তার প্রভাব যত গভীর হতে থাকে, ততই হাদীসের সঙ্গে দূরত্ব ও অবজ্ঞা বেড়ে

যাচ্ছিল, বারো হিজরী শতকে যখন শাহ সাহেবের আবির্ভাব হয়, তখন এর তোড়জোড় অবস্থা ছিল।

ভারতবর্ষে ইলমে হাদীসের উত্থান-পতন

ভারতবর্ষে ইলমে হাদীসের উত্থান-পতনের পরিসংখ্যান নেওয়ার জন্য আমরা এখানে মাওলানা হাকীম সাইয়্যিদ আবদুল হাই সাহেব (র) বিরচিত الثقافة الاسلامية فى الهند এর একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি, যাতে শত সহস্র পৃষ্ঠা মুতালা'আর সারসংক্ষেপ এসে গেছে। তিনি লিখেন–

'যখন সিন্ধুতে আরবদের শাসন বিলুপ্ত হয়ে গেল। তাদের পরিবর্তে গযনবী ও ঘোরী শাসকবর্গ সিন্ধু দখল করে নিল, আর খোরাসান ও মাওরাউন্নাহার থেকে উলামায়ে কিরাম সিন্ধুতে আসেন, তখন ইলমে হাদীস এ অঞ্চলে হ্রাস পেতে থাকে। এমনকি বিলুপ্ত হয়ে যায়। মানুষের মাঝে কবিতা-কবিত্ব, জ্যোতিষ শাস্ত্র, গণিত শাস্ত্র আর ধর্মীয় শাস্ত্রের মধ্যে ফিকহ ও উসূলে ফিকহের প্রচলন বেড়ে যায়। এই অবস্থা দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকে। এমনকি ভারতীয় আলেমদের একান্ত ব্যস্ততা হয়ে দাঁড়ায় ইউনানী দর্শন চর্চা। আর উদাসীনতা বেড়ে যায় ইলমে তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রে। ফিকহী মাসায়েল সম্পর্কে সামান্য কিছু যে আলোচনা কুরআন সুন্নাহতে এসে যেত, তাতেই তারা পরিতৃপ্ত থাকত। হাদীস শাস্ত্রে প্রচলিত ছিল ইমাম ছাগানীর মাশারিকুল আনওয়ার। কেউ যদি এ শাস্ত্রে আরও বেশি অগ্রগতি লাভ করত, তাহলে ইমাম বগভী (র)-এর 'মাছাবীহুস সুন্নাহ' বা মিশকাত শরীফ পড়ে নিত। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা করা হত, তিনি মুহাদ্দিস হয়ে গেছেন। এসবের একমাত্র কারণ ছিল, মানুষ সাধারণতঃ ভারতে এ শাস্ত্রের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও মর্যাদা সম্পর্কে ছিল অজ্ঞ। সেসব মানুষ এ শাস্ত্র সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। না তারা এ শাস্ত্রের ইমামদের সম্পর্কে জানত আর না তাদের মধ্যে এ শাস্ত্রের কোনও চর্চা ছিল। কেবল বরকতস্বরূপ তারা মিশকাত শরীফ পড়ে নিত। তাদের জন্য সবচেয়ে বড় পুঁজি ছিল ইলমে ফিকহ শিক্ষা করা আর তা-ও অনুকরণ হিসেবে; গবেষণা বা তত্ত্বানুসন্ধান হিসেবে নয়। এ কারণেই সে যুগে ফাতওয়া প্রদান ও ফিকহী রিওয়ায়েতের প্রচলন বেড়ে গিয়েছিল। নছূছ ও মুহকামাত (সরাসরি কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি) পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল ফিকহী মাসায়েলের বিশুদ্ধতা কুরআন-হাদীসের আলোকে যাচাই করা এবং ফিকহী ইজতিহাদগুলোকে হাদীসে নববীর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের পদ্ধতি।

তারপর এমন এক যুগ আসল, আল্লাহ তা'আলা ভারতবর্ষে এই ইলমের (হাদীস শাস্ত্রের) প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা করলেন। হিজরী দশম শতকে

অনেক উলামায়ে কিরাম ভারতে শুভাগমন করেন। তাদের মাধ্যমে ভারতবর্ষে এই শাস্ত্র ব্যাপক প্রসার লাভ করে। যেমন,

১. শায়খ আবদুল মু'তী মাক্কী ইবনে আবদুল্লাহ বাকছীর (মৃত্যু ৯৮৯ হি. আহমদাবাদ)।
২. শায়খ শিহাব আহমদ মিসরী ইবনে বদরুদ্দীন (মৃত্যু ৯৯২ হি. আহমদাবাদ)।
৩. শায়খ মুহাম্মদ ফাকেহী হাম্বলী ইবনে আহমদ ইবনে আলী (মৃত্যু ৯৯২ হি. আহমদাবাদ)।
৪. শায়খ মুহাম্মদ মালেকী মিসরী ইবনে মুহাম্মদ আবদুর রহমান (মৃত্যু ৯১৯ হি. আহমদাবাদ)।
৫. শায়খ রফীউদ্দীন চিশতী শীরাজী (মৃত্যু ৯৫৪ হি. আকবরাবাদ)।
৬. শায়খ ইবরাহীম বাগদাদী ইবনে আহমদ ইবনে হাসান।
৭. শায়খ যিয়াউদ্দীন মাদানী (লাখনৌ জেলার কাকোরীতে সমাহিত)।
৮. শায়খ বাহলূল ব-দখশী, খাজা মীর কাঁলা হারবী (মৃত্যু ৯৮১ হি. আকবরাবাদ)।

এছাড়া আরও অনেক উলামায়ে কিরাম।

ভারতবর্ষের কিছু উলামায়ে কিরাম হারামাইন শরীফাইন সফর করেন। সেখানে তারা হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং এ শাস্ত্র নিয়ে ভারত প্রত্যাবর্তন করেন। গুজরাটে হাদীসের দরস দিতে থাকেন দীর্ঘকাল পর্যন্ত। এরপর পুনরায় হিজায হিজরত করেন শায়খ ইয়াকুব ইবনে হাসান কাশ্মিরী (মৃত্যু ১০০৩ হি.), শায়খ জওহার কাশ্মিরী (মৃত্যু ১০২৬ হি.), শায়খ আবদুন নবী গাঙ্গুহী ইবনে আহমদ, শায়খ আবদুল্লাহ সুলতানপুরী ইবনে শামছুদ্দীন, শায়খ কুতুবুদ্দীন আব্বাসী গুজরাটী, শায়খ আহমদ ইবনে ইসমাইল মাণ্ডবী, শায়খ রাজেই ইবনে দাউদ গুজরাটী, শায়খ আলীমুদ্দীন মাণ্ডবী, শায়খ মু'আম্মার ইবরাহীম ইবনে দাউদ মনীপুরী (যাকে দাফন করা হয় আকবরাবাদ), মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার রচয়িতা শায়খ মুহাম্মদ ইবনে তাহের ইবনে আলী পাটনী ও সাইয়িদ আবদুল আউয়াল হুসাইনী ইবনে আলী ইবনুল আলা হুসাইনীসহ অন্যান্য উলামায়ে কিরাম।

الثقافة الاسلامية فى الهند রচয়িতা আরেকটু সামনে এগিয়ে লিখেন-

শায়খ আবদুল হক দেহলবী (র) এর কৃতিত্ব

এরপর হাদীস শাস্ত্রের প্রচার-প্রসারের জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) ইবনে সাইফুদ্দীন বুখারী (মৃত্যু ১০৫২ হি.)

কে মনোনীত করেন। তার দ্বারা হাদীস শাস্ত্র প্রচার-প্রসারের বিরাট কাজ হয়েছে। তিনি রাজধানী দিল্লীতে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি নিজের সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা ও যোগ্যতাগুলো ব্যয় করেছেন এ শাস্ত্রের প্রচার-প্রসারে। তার শিক্ষার মজলিস থেকে অনেক উলামায়ে কিরাম হাদীস শাস্ত্র সম্পন্ন করেন এবং হাদীস শাস্ত্রে প্রচুর কিতাবাদি রচনা করেন। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী এ শাস্ত্রের প্রচার-প্রসারে অক্লান্ত চেষ্টা-সংগ্রাম চালিয়ে যান। তার ব্যক্তিত্ব ও ইলম দ্বারা আল্লাহর অনেক বান্দার প্রভূত কল্যাণ লাভ হয়। হাদীস শাস্ত্রে তার এই চেষ্টা-সংগ্রাম তার পূর্বসূরীদের থেকে এত বেশি উজ্জ্বল ও বৈশিষ্ট্যময় ছিল যে, লোকজন এক পর্যায়ে বলে ফেলে হাদীস শাস্ত্রকে সর্বপ্রথম নিয়ে এসেছেন এই শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)। অথচ ঐতিহাসিক দিক থেকে ইতোপূর্বে আমি যেমন বলেছি, একথা সঠিক নয়।

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর পরে তার সুযোগ্য পুত্র শায়খ নূরুল হক (মৃত্যু ১০৭৩ হি.) এ শাস্ত্রের খেদমত ও প্রচার-প্রসারের ঝাণ্ডা উত্তোলন করেন। তার কিছু শিষ্য এবং সন্তানও এ শাস্ত্রের খেদমত করেছেন। যেমন শায়খুল ইসলাম শারেহে বুখারী এবং শায়খ নূরুল হক (র)-এর পুত্র মাওলানা সালামুল্লাহ, যিনি 'মুহল্লা' ও 'কামালাইন' রচয়িতা।

অধ্যাপক খালীক আহমদ নিযামী যথার্থই লিখেছেন, 'মোটকথা, শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) যে সময় শিক্ষার আসন বিছিয়েছিলেন, তখন উত্তর ভারতে হাদীস শাস্ত্র বিলুপ্ত প্রায় হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেই সংকীর্ণ ও অন্ধকার পরিবেশে ধর্মীয় জ্ঞান-প্রজ্ঞার এমন প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেছেন, যার ফলে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে সেখানে সমবেত হতে থাকে। উত্তর ভারতে দরসে হাদীস (হাদীস শিক্ষা)-এর এক নতুন দিগন্ত খুলে যায়। ধর্মীয় জ্ঞান-বিদ্যা বিশেষতঃ হাদীস শাস্ত্রের তৎকালীন প্রাণকেন্দ্র গুজরাট থেকে স্থানান্তরিত হয়ে দিল্লী চলে আসে।'

একজন মুজাদ্দিদের প্রয়োজনীয়তা

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর সততা, একনিষ্ঠতা ও আধ্যাত্মিক বরকতে হাদীসের প্রতি মনোযোগিতা শুরু হয়। তিনি হাদীস শেখা-শেখানো, সংকলন-রচনা এবং ব্যাখ্যা-টীকা (সংযোজন)-এর এক নতুন আগ্রহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে দেন। তার যেসব উত্তরসূরী ও বংশধরগণ স্ব-স্ব স্থানে এক একজন মুহাদ্দিস, মুদাররিস ও লেখক ছিলেন, আশা ছিল তারা এই খেদমতের ধারাকে এমনভাবে চালু রাখবেন, যার ফলে ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান ও লেখালেখি তৎপরতায় এ শাস্ত্র

উচ্চাসন লাভ করবে। স্বয়ং তার সম্মানিত পুত্র আল্লামা মুফতী নূরুল হক দেহলভী (র) (মৃত্যু ১০৭৩ হি.) যিনি ফার্সীতে ছয় খণ্ডে সহীহ বুখারীর শরাহ এবং শামায়েলে তিরমিযীর উপরও একটি শরাহ রচয়িতা– তিনি এক্ষেত্রে তাঁর (শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী) শুরু করা কাজগুলোর পূর্ণতা দিতে পারতেন। কিন্তু প্রায় সময় আকবরাবাদ (আগ্রা)-এর মত কেন্দ্রীয় শহরে বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত থাকার কারণে তার দরস-তাদরীস (শিক্ষাদান ও লেখালেখি) ও ইলমে হাদীস প্রসারের খুব একটা সুযোগ হয়নি। তার নাতি মাওলানা শায়খুল ইসলাম দেহলভী (র)ও বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। সহীহ বুখারীর উপর তারও ফার্সীতে সংক্ষিপ্ত শরাহ রয়েছে। কিন্তু কিছু জ্ঞাত আর কিছু অজ্ঞাত কারণে এসব হযরতের ব্যক্তিগত চেষ্টা-সংগ্রাম ভারতে হাদীসের প্রতি সেই গণজোয়ার এবং তার প্রসার, শিক্ষাদান ও লেখালেখিতে সেই আগ্রহ-উদ্যম ও তৎপরতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি, যার আশা করা হয়েছিল। সম্ভবতঃ এর একটি কারণ হল সেসব মহাপুরুষের উপর হাদীসের মাধ্যমে হানাফী মাযহাবের সমর্থনের প্রেরণা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রবল ছিল। দ্বিতীয় আরেকটি কারণ ছিল, বারো হিজরী শতকের মাঝামাঝিই শিক্ষা-দীক্ষার প্রাণকেন্দ্র দিল্লী থেকে লাখনৌতে স্থানান্তরিত হচ্ছিল। আর সেখানে বহু উলামায়ে কিরামের উস্তাদ মোল্লা নিযামুদ্দীন সাহলভী (মৃত্যু ১১৬১ হি.)-এর বরকতপূর্ণ ও শক্তিশালী হাতে নতুন পাঠ্যক্রম তৈরী হচ্ছিল। এই পাঠ্যসূচী প্রণেতা ও লেখকদের শিক্ষাগত সম্পর্ক হারামাইন শরীফাইন এবং সেসব স্থানের সঙ্গে কায়েম হতে পারেনি, যা ছিল হাদীসের পঠন-পাঠন, লেখালেখি, খেদমত ও প্রচারের কেন্দ্রস্থল। তাদের উপর (যেমনটি প্রকাশ পায় দরসে নেযামীর ইতিহাস, জীবনী ও স্মারকগ্রন্থ থেকে) দর্শন শাস্ত্র ও দীনী শাস্ত্রগুলোর মধ্য হতে উসূলে ফিকহর প্রভাব ছিল বেশি।

মোটকথা, ভারতবর্ষের শিক্ষা ও ধর্মীয় কেন্দ্র এমন এক ব্যক্তিত্বের জন্য অপেক্ষমান ও মুখাপেক্ষী ছিল, যিনি হাদীসের সাথে ইশক ও হৃদ্যতার সম্পর্কের অধিকারী হবেন এবং এর প্রচার-প্রসারকে তিনি তার জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য স্থির করবেন। ভারত সেই ব্যক্তিত্ব হিজরী বারো শতকের মাঝামাঝিতে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীর সত্ত্বারূপে লাভ করে, যিনি যথার্থরূপে নিম্নোক্ত কবিতার উপর আমল করেছেন–

[illegible] ☆ [illegible]

‘আছ-ছাকাফাতুল ইসলামিয়া ফিল হিন্দ’ রচয়িতা সেসব মহাপুরুষ, যারা এগার ও বারো শতকের প্রথম দিকে ভারতবর্ষে ইলমে হাদীসের প্রচার-প্রসারে

অংশ নিয়েছেন এবং স্বীয় দরস-তাদরীস (শিক্ষাদান ও লেখালেখি)-এর দ্বারা ব্যাপকভাবে উপকৃত করেছেন, তাদের আলোচনার পর হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব (র)-এর হাদীসের খেদমতের বৃত্তান্ত দিয়েছেন। যা কেবল এদেশেই নয়, এই শেষ যুগে সংস্কারমূলক ও ইজাতিহাদী বৈশিষ্ট্য ও জীবনদানের রূপে ছিল এবং যার ফলে এদেশে হাদীসের মুদ্রা প্রচলিত সময়ের মত সচল হয়ে যায়। সেই পাঠ্যসূচী দরসের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও সম্মানের মানদণ্ড সাব্যস্ত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় দরসে হাদীসের পৃথক কেন্দ্র। মাদরাসাগুলোতে সিহাহ সিত্তাহর পাঠদান বিশেষতঃ চার কিতাব; বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও আবু দাউদ শরীফ তত্ত্বানুসন্ধানের সাথে পড়ানোর প্রচলন হয় (যা আজ আরব দেশেও বিলুপ্ত হয়ে গেছে)। হাদীসের শরাহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) রচনার যুগ শুরু হয়। আর দেখতে দেখতেই এর উপর বিশাল-বিস্তৃত এক গ্রন্থাগার তৈরী হয়ে যায়। আরব দেশগুলোতেও যার নযীর পাওয়া যায় না। হাদীস গ্রন্থসমূহের অনুবাদ হয়। এর দ্বারা সাধারণ মুসলমান এবং আরবী না জানা লোকদের সাথে সাথে মুসলিম মহিলাদেরও বিরাট উপকার হয়। আমলের প্রেরণা এবং ইত্তিবায়ে সুন্নাতের আগ্রহ জন্মে। হাদীসের এজাযত ও সনদের আকুলতা সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি ভারত এই পুণ্যময় শাস্ত্রের এমন এক কেন্দ্রে পরিণত হয়ে যায়, যার পরিপ্রেক্ষিতে মিসরের বিখ্যাত আলেম আল্লামা সাইয়িদ রশীদ রেযা 'আল-মানার' সম্পাদকের কলম থেকে বেরিয়ে আসে নিম্নোক্ত বাক্য–

'আমাদের ভাই ভারতের উলামায়ে কিরাম যদি এ যুগে উলূমে হাদীস (হাদীস শাস্ত্র)-এর সাথে সহানুভূতি পোষণ না করতেন, তাহলে প্রাচ্যদেশগুলোতে তার বিলুপ্তি চূড়ান্ত হয়ে যেত। কেননা মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও হিজাযে হিজরী দশ শতক থেকেই এতে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আর এই হিজরী চৌদ্দ শতকের প্রথমভাগে এ শাস্ত্র তার চরম অবস্থায় পৌঁছে গেছে।'

হাদীস সম্পর্কে শাহ সাহেবের চিন্তাধারা ও আগ্রহ

শাহ সাহেবের জন্য কোন্ আগ্রহ এই শাস্ত্রের সঙ্গে এত নিবিড়তা, এর প্রচার-প্রসারের তৎপরতা এবং এর জন্য নিজের জীবন ও যোগ্যতা-ক্ষমতাকে ওয়াক্ফ করে দেওয়ার প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল, তা জানার জন্য স্বয়ং শাহ সাহেব (র)-এরই রচনাবলির শরণাপন্ন হওয়া উচিৎ। কারণ, এটা তার চিন্তাধারায় সঠিক দর্পণ। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'-এর প্রথম পৃষ্ঠাতেই লিখেছেন– 'তাওহীদ ও ঈমানের জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য মূলধন ও শিরোমণি এবং ধর্মীয় শাস্ত্রের মূল ও ভিত্তি ইলমে হাদীস। যাতে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী (স) এর

কথা-কাজ কিংবা কোনও বিষয়ে তার নীরবতা ও সন্তুষ্টি বা মৌন সম্মতির কল্যাণময় বর্ণনা রয়েছে। কাজেই এই হাদীসভাণ্ডার অন্ধকারে আলোর প্রদীপ, রুশদ ও হেদায়াতের মাইলফলক এবং পূর্ণিমা চাঁদের মতই দীপ্তিমান। যে ব্যক্তি এসবের উপর আমল করবে এবং এর সংরক্ষণ করে, সে হেদায়াতপ্রাপ্ত ও অফুরন্ত কল্যাণের অধিকারী হয়। আর যে হতভাগা এর থেকে বিমুখ হয় এবং ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে, সে পথভ্রষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যায়। নিজেরই বিরাট ক্ষতি করে। কেননা রাসূলে কারীম (স)-এর জীবন আদেশ-নিষেধ, ভীতি প্রদর্শন ও সুসংবাদ প্রদান, ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশ প্রদানে পরিপূর্ণ। তাঁর হাদীসসমূহে এসব বিষয় (পরিমাণের দিক থেকে) কুরআনের মতই কিংবা তদপেক্ষা আরও বেশি আছে।'

অন্যত্র বলেন– 'প্রথমতঃ যে বিষয়টিকে বিবেক নিজের উপর আবশ্যক সাব্যস্ত করে, তা হল, রাসূলে কারীম (স)-এর জীবনচরিত ও ইরশাদ তথা কথা ও কাজে তত্ত্বানুসন্ধান চালাতে হবে, তিনি আল্লাহর বিধান সম্পর্কে কি বলেছেন এবং কিভাবে তার উপর আমল করেছেন? এরপর তনুমনে কর্মে সেসব কথা ও অবস্থার অনুকরণ-আনুগত্য করতে হবে। কারণ, আমাদের কথা সেই মহান ব্যক্তি সম্পর্কে, বস্তুতঃ যিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে স্বীয় বিধি-নিষেধের আজ্ঞাবহ বানিয়েছেন। আর তিনি শরয়ী আদেশের এই দায়িত্ব মুক্ত হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছেন।

ভারতে ইলমে হাদীসের সাথে নির্দয়তার অভিযোগ

শাহ সাহেব (র)-এর জন্য ভারতে ইলমে হাদীসের পুনর্জীবন দান ও প্রচার-প্রসারের দ্বিতীয় প্রেরণা ছিল ভারতের সেই অবস্থা-পরিস্থিতি, যা বক্ষমান কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ধর্মীয় মহলে বিদ'আত-কুসংস্কার, বর্বর অজ্ঞতার যুগের রুসম-রেওয়াজ, অমুসলিমদের অনুসরণ এবং অনৈসলামিক রীতিনীতি অবলম্বনের ধোঁয়া ছেয়ে গিয়েছিল সর্বত্র, যার ভেতর থেকে প্রকৃত ইসলামের অনুপম আকৃতির দর্শন পাওয়া ছিল দুরূহ। শিক্ষালয় ও বিদ্যাপীঠগুলোতে গ্রীস থেকে আগত গ্রীক দর্শন বিদ্যা, যাকে তারা 'বুদ্ধিমত্তা বা দর্শন শাস্ত্র' বলত এবং উলূমে আলিয়া (কারিগরি বিদ্যা), বালাগাত শাস্ত্র ও ইলমে কালামের প্রাধান্য ছিল। আর উভয় মহলেই শরয়ী জ্ঞান বিশেষতঃ ইলমে হাদীস স্থানই পেত না। ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হলেও ইলমে ফিকহ ও উসূলে ফিকহ চর্চা ও এর সূক্ষ্মদৃষ্টি থেকে ব্যাপারখানা সামনে অগ্রসর হত না। এ অবস্থা দেখে শাহ সাহেব সীমাহীন প্রভাবিত ও প্রচণ্ড আক্ষেপে লিখেন–

'আমি সেসব শিক্ষার্থীদেরকে বলি, যারা নিজেদেরকে আলেম-উলামা বলেন, হে আল্লাহর বান্দা! তোমরা গ্রীক দর্শনের ভেল্কি আর নাহব-ছরফ ও মা'আনীর দ্বন্দ্বে ফেঁসে গিয়েছ। তোমরা মনে করেছ, এরই নাম জ্ঞান। অথচ তোমাদের বুঝা প্রয়োজন ছিল কিতাবুল্লাহর আয়াতে মুহকাম কিংবা রাসূলে কারীম (স) এর প্রমাণিত সুন্নাতই জ্ঞান। যেন তোমাদের স্মরণ থাকে, রাসূলুল্লাহ (স) কিভাবে অযু করতেন, কিভাবে নামায পড়তেন, প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতেন কিভাবে, রোযা রাখতেন কিভাবে, হজ্জ করতে কিভাবে, জিহাদ করতেন কিভাবে? তার কথা বলার ধরন বা বাচনভঙ্গি কেমন ছিল? ভাষা আয়ত্বের পদ্ধতি কী ছিল? কেমন ছিল তার উন্নত চরিত্র মাধুরী? তোমরা তার আদর্শের উপর চলবে। তার সুন্নাতের উপর আমল করবে। কারণ, এটাই তোমাদের জন্য তার জীবনাদর্শ ও সুন্নাতে নববী (স)। এ হিসেবে নয় যে, তা ফরয কিংবা ওয়াজিব। তোমাদের কর্তব্য ছিল, তোমরা দীনের বিধি-বিধান, মাসায়েল শিখবে। আর জীবন চরিত এবং সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈদের যেসব ঘটনা পরকালীন ভাবনা ও আগ্রহ সৃষ্টি করে, সেগুলো একটি সম্পূরক ও অতিরিক্ত বিষয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কর্মব্যস্ততা এবং যেসব বিষয়ে তোমরা পূর্ণ মনোযোগিতা নিয়োজিত করছ, সেগুলো পরকালের জ্ঞান নয়; জাগতিক জ্ঞান।

তোমরা তোমাদের পূববর্তী ফকীহগণের দান-অনুকম্পা ও তাদের মাসআলা উদ্ভাবনী শক্তিতে ডুব দাও। অথচ জানো না যে, হুকুম সেটিই, যা আল্লাহ ও তার রাসূল (স) দিবেন। তোমাদের মধ্যে কত লোক আছে, যখন তাদের কাছে রাসূলে কারীম (স)-এর কোন হাদীস পৌঁছে, তারা এর উপর আমল করে না। বলে– আমরা তো অমুকের মাযহাবের (মতাদর্শের) অনুসারী; হাদীসের নয়।

অধিকন্তু তোমরা মনে করেছ, হাদীসের জ্ঞান এবং তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান যোগ্য ও অভিজ্ঞজনদের কাজ। মহান ইমামগণের কাছে এ হাদীস অস্পষ্ট থাকতে পারে না। এরপরও যদি তারা একে বর্জন করে, তাহলে নিশ্চয় তা এমন কোন কারণে, যা তাদের কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে। যেমন, রহিতকরণ বা প্রাধান্য না দেওয়া।

স্মরণ রাখবে, দীনের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। তোমাদের যদি আপন নবীর উপর ঈমান থাকে, তবে তার আনুগত্য করো। সেটি তোমাদের মাযহাবের অনুকূল হোক চাই বিপরীত। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা তো ছিল, তোমরা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (র)-এর সাথে প্রথম থেকে মগ্ন

থাকবে। যদি এতদুভয়ের উপর আমল করা তোমাদের জন্য সহজ হয়, তাহলে কি বলার আছে। আর যদি তোমাদের জ্ঞান এক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ হয়, তবে পূর্বেকার উলামায়ে কিরামের ইজতিহাদ থেকে সাহায্য নাও। এরপর যেটাকে অধিক বিশুদ্ধ, সুস্পষ্ট এবং সুন্নাতের অনুকূল পাও, তা-ই অবলম্বন করো। উলূমে আলিয়া বা কারিগরি বিদ্যাতে এই দৃষ্টিতে আত্মনিয়োজিত হও যে, তা যন্ত্র-হাতিয়ার ও উপকরণ; এর বিশেষ গুরুত্ব, মর্যাদা ও লক্ষ্যবস্তু হওয়ার সুযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলা কি তোমাদের উপর ওয়াজিব করেননি যে, তোমরা জ্ঞানের প্রসার করবে, যাবৎ না মুসলমানদের দেশে ইসলামী নিদর্শন ও আদর্শ প্রকাশিত ও বিজয়ী হয়। তোমরা তো সেসব নিদর্শন প্রকাশ করনি। মানুষকে নিরর্থক বিষয়ে নিয়োজিত করেছ।'

শাহ সাহেবের হাদীসের আলোচনায় যে উন্মত্ততার অবস্থা এবং হাদীসের ইমামগণের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যে গভীর শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ছিল, তার খানিকটা নমুনা পাওয়া যায় তার সেই অমূল্য পত্রে, যা তিনি ইমাম বুখারী (র)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে আপন এক শিষ্যকে লিখেছিলেন।

হাদীসের খেদমত ও প্রসারের তৎপরতা

ইতোপূর্বে বলে এসেছি, শাহ সাহেব যখন তার উস্তাদ ও শায়খ আবু তাহের মাদানী থেকে বিদায় নেন, তখন তিনি (শায়খ) নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন,

نسيت كل طريق كنت أعرفه # إلا طريقا يؤدينى لربكم.

'আমি ভুলে গেছি চলার সব পথ, বিনে সেই পথ,
যে পথ মোরে পৌঁছে দেয় তোমার দুয়ারে।'

শাহ সাহেবও তখন প্রস্থানের মুহূর্তে বলেন, 'আমি যা কিছু পড়েছি, ইলমে হাদীস ছাড়া ভুলে গিয়েছি সব।'

শাহ সাহেবের গোটা জীবনই সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি হাদীস শাস্ত্রেরই পঠন-পাঠন, অধ্যয়ন-শিক্ষাদান, লেখালেখি ও প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োজিত ছিলেন। কবির ভাষায়–

[illegible] ☆ [illegible]

'তুমি বিনে যে বলত ওগো
বাঁচার আশা ক্ষীণ,
তাই সে শপথ করছি পূরণ
আমরা অধম হীন।

ভারত প্রত্যাবর্তনের পরপরই তিনি হাদীসের প্রচার-প্রসারে যেন কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। অতি দ্রুত তার 'মাদরাসা রহীমিয়া' ভারতের মাটিতে হাদীসের সর্ববৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। যেখানে ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ইলমে হাদীস পিপাসুগণ পতঙ্গের মত ভীড় জমায়। তন্মধ্যে সিন্ধু-কাশ্মীরের মত দূরাঞ্চলও ছিল। দিল্লী ও তার আশপাশ এবং উত্তর ভারতের কথা তো বলাই বাহুল্য।

হযরত শাহ আবদুল আযীয (র), যিনি শাহ সাহেবের ভাগ্যবান সুযোগ্য পুত্র এবং শাহ সাহেবের কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ ও পূর্ণতাদানকারী, তিনি ছাড়া এই দরসে হাদীস থেকে উপকৃত হয়েছেন ভারতের গর্ব আল্লামা সাইয়িদ মুর্তাযা বলগারামী ওরফে যুবাইদী (র) (১১৪৫-১২০৫ হি.), কামূসের শরাহ 'তাজুল উরূস' এবং এহইয়াউল উলূমিদ্দীনের শরাহ 'ইত্তিহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন' রচয়িতা, যার জ্ঞানের গভীরতা ও হাদীস বর্ণনার রব পড়ে যায় আরব বিশ্বে, কাহেরার মজলিসে শাসকদের দরবার থেকে যার বিরোধিতা করা হত। সেসব শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন তাফসীরে মাযহারী ও মালাবুদ্দা মিনহু রচয়িতা কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতি (র) (মৃত্যু ১২২৫ হি.)-এর সৌভাগ্যবান খলীফা মির্যা মাযহার জানে জানাঁ (র)ও। (এছাড়াও ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ মঈন, খাজা মুহাম্মদ আমীন কাশ্মীরী প্রমুখ খাছ শাগরেদগণ।)

এভাবে ভারতে শত শত বছর পর (সম্ভবতঃ প্রথমবার) ইলমে হাদীসের এরূপ চর্চা ও তার প্রতি এতোধিক মনোনিবেশ হয়, ফলে ভারত ইয়ামেনের সমতুল্য হয়ে যায়। তার আকুল আগ্রহ স্বয়ং হিজাযের মাটিতেও পৌঁছতে থাকে। নবাব সাইয়িদ সিদ্দীক হাসান খান শাহ সাহেবের হাদীসের খেদমত ও প্রচার-প্রসারের তৎপরতার আলোচনা করতে গিয়ে উচ্চাঙ্গের দুটি পংক্তি চয়ন করেন, যা প্রকৃত অবস্থার বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

من زاد بابك لم تبرح جوارحه # تروى أحاديث ما أوليت من منن.

فالعين عن قرة، والكف عن صلة # والقلب عن جابر، والسمع عن حسن.

'যে তোমার দুয়ারে এসেছে,
তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমার অনুগ্রহ-দানের হাদীস বর্ণনায় লিপ্ত হয়ে গেছে।'
'চক্ষু বলছে, কুররাহ থেকে আমি শীতলতা পেয়েছি,
হাত বলছে ছিলাহ থেকে আমি ধনবান হয়েছি।

আর বর্ণনাকারীর মন বলছে,

সে (জাবেরের মাধ্যমে) প্রশান্তির নেয়ামত লাভ করেছে।

কান বলছে,

সে (হাসানের মাধ্যমে) চমৎকার বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছে।'

মজার ব্যাপার হল, এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যেসব অনুগ্রহ-দানের বর্ণনা দিয়েছে আর সেই সঙ্গে যেসব অনুগ্রহদাতার নাম নিয়েছে, তারা সকলেই হাদীসের রাবী এবং কামিল শায়খ। যেমন কুররাহ ইবনে খালেদ আস-সুদূসী, ছিলাহ ইবনে আশীম আদবী, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) ও ইমাম হাসান বসরী (র)।

শাহ্ সাহেবের লেখনী খেদমত

শাহ্ সাহেব হাদীস ও উসূলে হাদীসের উপর যে রচনাবলী জাতিকে উপহার দিয়েছেন, সেগুলো নিম্নরূপ।

১. মুস্তফা। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক (র) এর ফার্সী ব্যাখ্যাগ্রন্থ।)

২. মুসাওয়া (মুয়াত্তার আরবী শরাহ্)।

শাহ্ সাহেব হাদীসের ব্যুৎপত্তি ও শিক্ষাদানের যে পদ্ধতি চালু করতে চাচ্ছিলেন, এ দুটি কিতাবই তার প্রতিচ্ছবি। এর থেকে শাহ্ সাহেবের হাদীসের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্বে গবেষক ও মুজতাহিদসুলভ ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তিনি মুয়াত্তাকে সিহাহ সিত্তাহর মধ্যে প্রথম স্তরে রাখতেন। একে সিহাহ সিত্তাহ গণনায় 'ইবনে মাজাহ'র স্থলে হিসেব করতেন। তিনি মুয়াত্তার সীমাহীন সমীহকারী, এর সাথে সহানুভূতিশীল এবং একে দরসে হাদীসে প্রথম স্তরে রাখার আগ্রহী দাবীদার ও প্রচারক ছিলেন। তিনি তার অসীয়তনামায় লিখেন, যখন আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জিত হয়ে যাবে, তখন ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া মাহমূদীর রিওয়ায়েতকৃত মুয়াত্তার সংস্করণটি পড়াবেন। কখনও এ ব্যাপারে গাফলতী করবেন না। কেননা এটি ইলমে হাদীসের আসল। এটি পড়া অত্যন্ত বরকতময়। আমি ধারাবাহিক সনদে মুয়াত্তা শুনেছি।

৩. শরহে তারাজিমে আবওয়াব সহীহ বুখারী। বুখারী শরীফের শিরোনাম ও অধ্যায়গুলোকে প্রত্যেক যুগে বুখারীর সবকে রীতিমত অতি সূক্ষ্ম মনে করা হয়েছে। আর প্রত্যেক যুগেই বুখারীর শারেহ ও উস্তাদগণ এতে নিজের বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা ও সূক্ষ্ম প্রজ্ঞার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এ পুস্তিকাটি আরবী ভাষায় রচিত। প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে ১৩২৩ হিজরীতে দায়েরাতুল মা'আরিফ হায়দারাবাদ থেকে। এরপর সংশোধিত সংস্করণ 'আসাহহুল মাতাবে দিল্লী' -এর ছাপা সহীহ বুখারীর শুরুতে ভূমিকাস্বরূপ সংযোজন করে দেওয়া হয়েছে।

৪. মজমূ'আয়ে রাসায়েলে আরবা'আ তথা চারটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকার একত্রিত সংকলন। যাতে ارشاد إلى مهمات الإسناد এবং তারাজিমুল বুখারী (শরহে তারাজিমে আবওয়াবে বুখারী ভিন্ন এক পৃষ্ঠাব্যাপী একটি শরাহ) শাহ সাহেবের লিখা।

৫. ক. الفضل المبين فى المسلسل من حديث النبى الأمين

খ. النوادر من حديث سيد الأوائل والأواخر

গ. আরবাঈন।

শাহ সাহেব সেসব মর্যাদা লাভের প্রত্যাশায় এই পুস্তিকা রচনা করেছেন, যা চল্লিশ হাদীস সংকলনের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে এবং বিভিন্ন যুগে উলামায়ে কিরাম এর উপর আমল করেছেন। এসব হাদীস সাধারণতঃ খুবই সংক্ষিপ্ত। শব্দ কম; কিন্তু অর্থ ব্যাপক। পুস্তিকাটি মুখস্ত করে নেওয়া এবং পাঠ্যভুক্ত করে নেওয়ার দাবীদার।

৬. মুসালসালাত : যেসব কিতাব সরাসরি হাদীস শাস্ত্রের উপর নয়। কিন্তু পরোক্ষভাবে হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত এবং যেগুলোকে ইলমে হাদীসের ভূমিকাস্বরূপ পড়া উচিৎ। এগুলো থেকে শাহ সাহেবের হাদীস শাস্ত্রের উপর গভীর জ্ঞান-প্রজ্ঞা, ফিকহ ও হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন, মাযহাব সংক্রান্ত বিতর্কে ইনসাফ ও প্রশস্ত মানসিকতা, মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও হাদীস গ্রন্থাবলির শ্রেণীবিন্যাসে তার উদার দৃষ্টি এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে ভারসাম্য ও ন্যায়ানুগতা দান করেছিলেন, তার ধারণা পাওয়া যায়। সেসব কিতাব নিম্নরূপ-

১. الإنصاف فى بيان اسباب الإختلاف : 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে 'তাতিম্মাহ' বা 'যবনিকা' নামে কয়েকটি শিরোনাম ও বিষয়বস্তু নিয়ে ১৪০-১৬২ পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত একটি রচনা। এই তাতিম্মাহ চার অনুচ্ছেদে বিভক্ত। প্রকাশকের গবেষণামতে উক্ত তাতিম্মাহ কেবল একটি সংস্করণেই পাওয়া গেছে। এই অনুচ্ছেদের শেষে শাহ সাহেব লিখেন, 'আমি স্বতন্ত্র একটি বই লিখার চূড়ান্ত মনস্থির করেছি। যার নাম রাখব الإنصاف فى بيان اسباب الإختلاف (মতানৈক্যের কারণ বর্ণনায় চূড়ান্ত ন্যায়ানুগতা)। এতে বিস্তারিতভাবে মতানৈক্যের কারণসমূহ এবং তার প্রামাণ্য দলীল ও উদাহরণ পেশ করব। কিন্তু আজও সে কাজের জন্য সুযোগ হয়নি। যখন এই গ্রন্থে (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা) এ প্রসঙ্গ পর্যন্ত আলোচনা চলে এসেছে, তাই এই মুহূর্তে (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে) যা কিছু মাথায় আছে, তা লিখে দেওয়া যথোপযুক্ত মনে করলাম। আর তা লিখে দেওয়া সহজ।'

মনে হয়, পরবর্তীতে শাহ সাহেবের সে সুযোগ হয়েছে। তিনি হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা থেকে এই বিষয়বস্তু নিয়ে আরও কিছু বাড়িয়ে পৃথক একটি পুস্তিকায় 'আল-ইনসাফ ফী বয়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ' নামে পূর্ণ করে দেন। কাজেই এই পুস্তিকা এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা এর তাতিম্মায়ে দোয়ম (দ্বিতীয় যবনিকা) এর মধ্যে কোথাও কোথাও বিরোধ ও সামান্য পরিবর্তন-পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হয়।

এই পুস্তিকা 'আল-ইনসাফ' (যা তার বিষয়বস্তুতে স্বতন্ত্র) ভারত এবং ভারতের বাইরে কয়েকবার ছাপা হয়েছে। যার মধ্যে কোথাও কোথাও বিরোধ পরিলক্ষিত হত। ১৩২৭ হিজরীতে 'শিরকাতুল মাতবু'আতিল আলামিয়্যাহ, মিসর' -এর পক্ষ থেকে প্রথমবার আর 'মাকতাবাতুল মান্‌সূরার পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বার আরবী বর্ণাক্ষরে ছাপা হয়। বর্তমানে আমাদের সামনে দারুন নাফায়েস, বৈরুতের উন্নত বর্ণাক্ষরে ছাপা সংস্করণ রয়েছে, যা ছোট আকারে একশ এগার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। সমকালীন বিখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ এর সম্পাদনা ও সংশোধনের কাজ আঞ্জাম দেন এবং তার উপর টীকা সংযোজন করেন।

২. عقد الجيد فى احكام الإجتهاد و التقليد

৩. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার সপ্তম অধ্যায়।

বস্তুত হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার প্রথম অংশের القسم الثانى فى بيان اسرار ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم تفضيلا থেকে নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ অংশ الفتن و المناقب পর্যন্ত হাদীসেরই প্রজ্ঞাপূর্ণ ও বিজ্ঞোচিত ব্যাখ্যা, এর তত্ত্বও ও হুকুম এবং এর বাস্তব সমন্বয়ের সেই মুজতাহিদসুলভ প্রচেষ্টা, যা ছিল শাহ সাহেবেরই বৈশিষ্ট্য, যাতে তার প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আক্ষেপ হচ্ছে, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার পাঠক-শিক্ষকও (যদিও সংখ্যায় তারা নগণ্য) এ অংশকে অপ্রয়োজনীয় বা গুরুত্বহীন ভেবে উপেক্ষা করে থাকে।

ফিকহ ও হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন

যুগ যুগ ধরে মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-গবেষণা, শিক্ষা ও লিখনী জগতে ফিকহ ও হাদীসের মাঝে দুটি ভারসাম্যপূর্ণ ধারা চলে আসছে, যার মধ্যে প্রত্যেকটিই (চালু হওয়ার সময় থেকে) স্বস্থানে অপরটি থেকে অমুখাপেক্ষী ও স্বনির্ভর হয়ে আপন গন্তব্যে এগিয়ে চলছে। আর অধিকাংশ সময় একটি অপরটি থেকে পৃথক হয়ে এরপর আর কোন তত্ত্ব-উপাত্তে গিয়ে সমন্বয় হত না। অনেক ফিকহী মতাদর্শে হাদীস তখনই আলোচনায় আসত, যখন মাসআলা সমর্থন এবং অপর মাযহাবের দিশারীদের সেই আপত্তি খণ্ডন করার

প্রয়োজন পড়ত— এ মাসআলাটি কি হাদীসের বিপরীত! অথবা অন্য মাযহাবের উপর তার প্রাধান্য প্রমাণ করতে হত। সিহাহ সিত্তাহর সবকে হয়ত সেসব হাদীসের ব্যাখ্যা দেওয়া হত যেগুলো আপন মাযহাবের বিপরীত মনে হত অথবা অন্যান্য কিতাবের সেসব হাদীস পেশ করা হত, যেগুলো স্বীয় মাযহাবের সমর্থনে পাওয়া যেত। যদি কোন ফিকহী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ও উচ্চ মাপের কিতাবে হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয়ে থাকে, তাহলে অনেক সময় উক্ত মাযহাবের সেসব উলামায়ে কিরাম যাদের হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ও প্রশস্ত দৃষ্টি এবং মুহাদ্দিসসুলভ আগ্রহ ছিল, তারা সেসব হাদীসের তাখরীজ (উদ্ধৃতি) বের করার চেষ্টা করেছেন। সেগুলোর উপর মুহাদ্দিসসুলভ আলোচনা করেছেন। যার দ্বারা উক্ত গ্রন্থে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। সুতরাং এই প্রশংসিত প্রচেষ্টাও ছিল উক্ত ফিকহী মাযহাবের সমর্থন-সাহায্য এবং তাকে হাদীসের অনুকূল প্রমাণ করার একটি পদ্ধতি আর সেই মাযহাবের বিজ্ঞোচিত ও গবেষকসুলভ খেদমত, যা অতি মূল্যবান ও কৃতজ্ঞতাযোগ্য; তবে এতে মূল মাসআলায় পুনর্দৃষ্টি দান এবং ফিকহ ও হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা ছিল না।

ফিকহী মাযহাবগুলো কিছুটা এমন লৌহজাত বাক্স হয়ে গিয়েছিল, যা ভেঙ্গে যাওয়া তো সম্ভব ছিল, তবে প্রসারিত হওয়া ছিল অসম্ভব। প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারীই নিজের মাযহাব সম্পর্কে ধারণা রাখত, তার মাযহাব একশতভাগ বিশুদ্ধ হওয়াই প্রকৃত কথা। তবে মানবিক কারণে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। কেউ এই চিন্তাধারাকে অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের বাক্যে নিম্নরূপে ব্যক্ত করেন—

مذهبنا صواب يحتمل الخطاء ومذهب غيرنا خطاء يحتمل الصواب.

'আমাদের মাযহাব প্রকৃতপক্ষে তো সঠিক এবং সত্য, ভুলের সম্ভাবনাও আছে। আর অন্যদের মাযহাব মূলতঃ ভুল; কদাচিৎ শুদ্ধতার সম্ভাবনা আছে।'

এই চিন্তাধারার পরিণতি ছিল, মাযহাব চতুষ্টয় তথা হানাফী, মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলী মাযহাবের মধ্যে (উম্মত যেগুলোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সার্টিফিকেট প্রদান করেছে এবং যেসব মাযহাব সম্পর্কে হকপন্থী ও জ্ঞানী মহলের মধ্যে প্রথম থেকেই নীতিগতভাবে স্বীকার করা হত যে, সত্য এগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এগুলোর প্রতিষ্ঠাতা ও স্থপতিগণ ছিলেন হিদায়াতের ইমাম ও উম্মতের দিশারী। আর এ মাযহাবগুলো সত্য) মতবিরোধের উপসাগর দিন দিন গভীর ও সম্প্রসারিত হচ্ছিল। এসবের অনুসারীদের মাঝে মতবিরোধ, ঘৃণা-ভৎর্সনা আর তর্ক-বিতর্ক অনেক সময়

বিবাদ ও যুদ্ধ পর্যন্ত গড়িয়ে যেত। এর চেয়ে কঠিন আচরণ সেসব জ্ঞানী-বিদ্বানদের সাথে হত, যারা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে ইবাদত-বন্দেগীতে হাদীসের উপর আমল শুরু করে দিত। এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সেই বারো শতকের এক প্রবীণ আলেম ও মুহাদ্দিস শায়খ মুহাম্মদ ফাখের যায়েরে এলাহাবাদী (১১২০-১১৬৪ হি.)। যিনি (কোনও কোনও লেখকের বর্ণনামতে) তার ইত্তিবায়ে হাদীস বা হাদীসের অনুসরণ ও প্রবীণতার কারণে জনসাধারণের গণরোষের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন।

শাহ সাহেবের সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটি সাফল্য, হাদীসের খেদমত ও সুন্নাতের সাহায্যের মুক্তামালারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফিকহ ও হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন। অধিকন্তু তিনি মাযহাব চতুষ্টয় সম্পর্কে যে সংকলন ও কলমযুদ্ধের চেষ্টা চালিয়েছেন, তা থেকে নবী করীম (স)-এর সেই শুভসংবাদেরই সত্যতা প্রমাণিত হয়, যাতে বলা হয়েছিল, 'তোমাদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের ঐক্য-সংহতির এক বিশেষ প্রকারের কাজ নিবেন।' ভারত উপমহাদেশ সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তাতে এই চিন্তাধারা, সংকলন ও সমন্বয় সাধনের সেই প্রচেষ্টার আলামত পাওয়া যায় না। আর এর ঐতিহাসিক ও শিক্ষণীয় বহু কারণও আছে। এই উপমহাদেশ প্রথম থেকেই সেসব দিগ্বীজয়ী ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠাতাদের পদানত ছিল, যারা ছিল তুর্কি কিংবা আফগান বংশোদ্ভুত লোক। এতদুভয় জাতিই প্রায় তাদের ইসলাম গ্রহণের সময় থেকে হানাফী মাযহাবের অনুসারী বরং তার সাহায্য-সহযোগিতা ও প্রচার-প্রসারে তৎপর ও উৎসাহী থাকে। এখানে প্রায় আটশ বছর পর্যন্ত মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের পা রাখারই সুযোগ হয়নি। শাফিঈ মাযহাব সীমান্ত-উপকূল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে কিংবা দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ এবং উত্তর প্রদেশ (বর্তমান কিরণাটেক) এর কিছু অংশ ভাটকল প্রভৃতি ও কেরালায়ে সীমাবদ্ধ থাকে। তন্মধ্যেও মালাবার (প্রাচীন আলমা'বার শহর) বাদ দিয়ে, যেখানে বেশির ভাগ শাফিঈ মতাবলম্বী ইসলামের দাঈগণ, ব্যবসায়ী, মাশায়িখ, ফকীহ, আলেম ও জ্ঞানী-বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ এসেছেন। শায়খ মাখদূম, ফকীহ আলী মাহাইমী (মৃত্যু ৮৩৫ হি.) যিনি তাবছিরাতুর রহমান ও তাইসীরুল মান্নান রচয়িতা, মালাবার শায়খ মাখদূম ইসমাঈল ফকীহ সুক্কারী সিদ্দিকী (মৃত্যু ৯৪৯ হি.) এবং শায়খ মাখদূম যাইনুদ্দীন ইয়ালীবারী (মৃত্যু ৯২৮ হি.) ছাড়া আমাদের ক্ষুদ্রজ্ঞানে এ ধরনের শাফিঈ ফকীহ ও মুহাদ্দিস জন্ম নেয়নি। যারা ভারতে বিশেষতঃ উত্তর ভারতের শিক্ষাজগতে বিরাট প্রভাব ফেলতেন, হানাফী উলামায়ে কিরামকে শাফিঈ ফিকহের উপর গভীর পর্যবেক্ষণ, অন্তর্দৃষ্টি দান এবং এর দ্বারা উপকৃত হতে

উৎসাহিত করতেন। ভারত থেকে যেসব উলামায়ে কিরাম ও ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ অনুসন্ধিৎসু হিজায গমন করতেন (যা ছিল তুর্কি রাজত্বের শাসনাধীন আর তুর্কিরা প্রত্যেক যুগে শতভাগ সুন্নী ও হানাফী ছিল) তারাও বেশিরভাগ নিজ মাযহাবেরই উলামায়ে কিরাম এবং বিশেষভাবে নিজের স্বদেশী আসাতিযায়ে ফিকহ ও হাদীসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। যারা সেখানে ভারত কিংবা আফগানিস্তান থেকে হিযরত করে চলে গিয়েছেন। তাদের শিষ্যদের বিরাট মজলিস ছিল।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব প্রথম ব্যক্তি ছিলেন, যিনি হারামাইন শরীফাইনে মৌলিক শিক্ষা ও উপকারিতা লাভ করেছেন এক বিশিষ্ট শাফিঈ মুহাদ্দিস শায়খ আবু তাহের কুর্দী মাদানীর কাছ থেকে তিনি তার (কুর্দীর) জ্ঞান-প্রজ্ঞা, তার ব্যক্তিত্ব, তার বাতেনী (আধ্যাত্মিক) যোগ্যতাসমূহ, উদার দৃষ্টি ও উদার প্রাণের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। শাহ সাহেব 'ইনসানুল আইন' গ্রন্থে তার যেসব মাশায়িখে হারামাইনের পরিচয় পেশ করেছেন, সেখানে কেবল একজন শায়খ তাজুদ্দীন কালঈ ছিলেন হানাফী আলেম ও মুহাদ্দিস। তন্মধ্যে শায়খ মুহাম্মদ ওফদুল্লাহ ইবনে শায়খ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান ছিলেন মালেকী মতাবলম্বী। শাহ্ সাহেব হারামাইন শরীফে অবস্থানের যুগে হিজাযের জ্ঞানগত নেতৃত্ব, শিক্ষা ও লিখনী ময়দানে বিশেষতঃ হাদীস শাস্ত্রের নেতৃত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতার লাগাম ছিল ইয়ামেনের আলেম ও মুহাদ্দিস অথবা কুর্দী বংশোদ্ভূত উলামায়ে কিরামের হাতে। আর তারা সাধারণতঃ শাফিঈ মতাবলম্বী ছিলেন। এসব কারণে শাহ্ সাহেবের শাফিঈ ফিকহের মূলনীতি ও নিয়ম-পদ্ধতি, তার বৈশিষ্ট্যাবলী এবং কিছু ব্যতিক্রমধর্মী বিষয় সম্পর্কে অবগতি লাভের পূর্ণ সুযোগ হয়েছে। এভাবে তিনি মালেকী ফিকহ এবং হাম্বলী ফিকহ সম্পর্কেও অবগত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। ভারতীয় আলেমদের জন্য দীর্ঘকাল ধরে (ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সভ্যতা-সাংস্কৃতিক কারণে) যার ব্যবস্থা হচ্ছিল না। এভাবে মাযহাব চতুষ্টয়ের তুলনামূলক বা বিপরীতধর্মী ফিকহী ব্যুৎপত্তি তার জন্য সহজসাধ্য হয়েছে। যা ছিল সেসব উলামায়ে কিরামের জন্য কঠিন, যাদের এ সুযোগ হয়নি।

শাহ্ সাহেব প্রায় বার বছর ভারতে শিক্ষাদান করার পর, হিজরী ১১৪৩ সালে ত্রিশ বছর বয়সে হিজায গমনের মনস্থ করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার মন-মানসে জন্মগতভাবেই যে সামগ্রিকতা, দৃষ্টি ও অন্তরে প্রশস্ততা, জন্মগত সমন্বয় আগ্রহ এবং আরেফ রুমী (র)-এর অসীয়তের উপর আমল করার স্বভাবগত আকর্ষণ ও ব্যাকুলতা সৃষ্টি করেছিলেন, কবির ভাষায়-

সে কারণে হিজায সফরের পূর্বেই তার মধ্যে ফিকহ ও হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনের আগ্রহ-উদ্যম, মুহাদ্দিস ফকীহগণের মতাদর্শকে প্রাধান্য দান এবং একে আপন জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য বানানোর সংকল্প সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। 'আল-জুযউল লাতীফ' গ্রন্থে শাহ সাহেব স্বয়ং লিখেছেন, 'মাযহাব চতুষ্টয় ও তাদের উসূলে ফিকহের কিতাবাদি অধ্যয়ন এবং যেসব হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার পর মন-মানসে মুহাদ্দিস ফকীহগণের চমকপ্রদ পছন্দনীয়তা বদ্ধমূল হয়। এতে অদৃশ্য আলোকবর্তিকার সাহায্যও ছিল।

শাহ সাহেব কট্টরপন্থী ফকীহগণ (যারা তাদের মাযহাব থেকে চুল পরিমাণ সরে আসতে প্রস্তুত নয়) এবং যাহেরিয়াহ ফিরকা (যারা সুস্পষ্ট ফিকহ অস্বীকারকারী এবং সেসব ফকীহগণের উপর কটুক্তি করে, যারা আলেম-উলামা ও জ্ঞানী মহলের শিরোমণি এবং আহলে দীনের ইমাম ও নেতা) এর রীতিনীতির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাদের জালিয়াতি ও চরমপন্থাকে ঘৃণা করেছেন। পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন, ان الحق امر بين بين 'প্রত্যেক ব্যাপারে নিঃসন্দেহে মিতাচারই সঠিক।' না প্রথম পক্ষ একশতভাগ সত্যের উপর আছে, আর না দ্বিতীয় পক্ষ।

শাহ সাহেব (র) তার জগদ্বিখ্যাত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে লিখেছেন, একদিকে কালামে ফিকহের উপর তাখরীজ অপরদিকে হাদীসসমূহের শব্দাবলীর তত্ত্বানুসন্ধান। ধর্মে দু'টিরই সুদৃঢ় ভিত্তি রয়েছে। প্রত্যেক যুগেরই উভয়েরই গবেষক উলামায়ে কিরাম এতদুভয়ের মূলনীতির উপর আমল করে গেছেন। কেউ কেউ এমন, তাখরীজ সম্পর্কে যারা পিছপা আর হাদীসের শব্দাবলীর তত্ত্বানসন্ধানে অগ্রণী। আবার কেউ কেউ এর বিপরীত। তন্মধ্যে কোনও একটি মূলনীতিকে মোটেও উপেক্ষা করা অনুচিত। যেমনটি দু'পক্ষেরই সাধারণ রীতি। এক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চালানোই কার্যকরী পথ। আর একটির ঘাটতি অপরটি দ্বারা পূর্ণ করতে হবে। এটাই ইমাম হাসান বসরী (র)-এর অভিমত।'

শাহ সাহেব তার ফার্সী অসীয়তনামায় লিখেন– 'শাখা মাসআলায় এমন মুহাদ্দিস উলামায়ে কিরামের অনুসরণ করা উচিৎ, যিনি ফিকহ ও হাদীস উভয় শাস্ত্রের (সমান অভীজ্ঞা) আলেম। ফিকহী মাসআলাগুলোকে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের সাথে মিলিয়ে নেওয়া কর্তব্য।'

আরেকটু সামনে গিয়ে লিখেন– 'উম্মতের জন্য যৌক্তিক মাসআলাগুলো কুরআন-হাদীসের সাথে পরিমাপ করা জরুরী। এক্ষেত্রে আদৌ অমুখাপেক্ষিতা আসতে পারে না।'

শাহ সাহেব (র)-এর সময়ে শিক্ষাগত উন্নতি-সমৃদ্ধি হয়েছিল হানাফী ফিকহ্ ও উসূলে ফিকহে হানাফীর পরিবেশে। তিনি হানাফী মাযহাবের বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে এতটাই ওয়াকিফহাল এবং এর এত বেশি প্রবক্তা ছিলেন, যতখানি হতে পারেন বড় কোন হানাফী আলেম। তিনি এ বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন এবং স্থানে স্থানে তার প্রকাশ করতেন যে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক, শিক্ষাগত, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে হানাফী ফিকহ্ (শাফিঈ ফিকহ্সহ) এর যতদূর খেদমত হয়েছে এবং এর চেহারার সুষমাবর্ধন তথা এর খুঁটিনাটি ঠিক করা হয়েছে আর এর মতনগুলো (মূল পাঠ) এর ব্যাখ্যা ও মূলনীতিগুলোর বিশ্লেষণ করা হয়েছে, অপর কোনও মাযহাবের ক্ষেত্রে এমনটি করা হয়নি। তিনি ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে লিখেন, 'ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মর্যাদা ইবরাহীম নাখঈ এবং তার সমপর্যায়ের উলামায়ে কিরামের মাযহাবের উপর ইজতিহাদ-ইস্তিম্বাত (মাসআলা উৎসারণ)-এর ব্যাপারে অনেক উর্ধ্বে ছিল। সেসব তাখরীজ (উদ্ভাবন-উদ্ধৃতি)-এর নানা দিক ও আপত্তি সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত গভীর দৃষ্টি রাখতেন। শাখা মাসআলাগুলো উদ্ভাবনে ছিল তার অসাধারণ গভীরতা।'

কিন্তু সেসঙ্গে তিনি ইমাম মালেক (র) এর বড়ত্ব, বিশেষতঃ মুয়াত্তার বিশুদ্ধতা, তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তার বরকতের নিছক প্রবক্তাই নন বরং দাবীদার এবং একে হাদীসের বুনিয়াদী (ভিত্তিমূলক) কিতাবাদির মধ্যে গণ্য করতেন। অপরদিকে শাফিঈ মাযহাবের পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও হাদীসের সঙ্গে নিকটতর হওয়ার আলোচনা করতেন বলিষ্ঠ কণ্ঠে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর দূরদর্শীতা ও বিচক্ষণতার বড় প্রবক্তা ছিলেন। অনন্তর সেসঙ্গে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর জীবনালেখ্য বর্ণনা করতে গিয়ে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় লিখেন, "সেসব ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, অধিক বর্ণনাকারী, হাদীস সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং ফিকহী জ্ঞানের তীক্ষ্মদৃষ্টির অধিকারী ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র), এরপর ইমাম ইসহাক ইবনে রাওয়ায়েহ।"

উক্ত চার ইমামের উচ্চ মর্যাদা, জ্ঞানের প্রশস্ততা, তীক্ষ্মদৃষ্টি এবং উম্মতের উপর ইহসান-অনুগ্রহ সম্পর্কে (সেসব কিতাব, ইতিহাস ও অনুবাদের মাধ্যমে) সরাসরি অবগতি লাভ ও তাদের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-ভালবাসার কারণে শাহ সাহেবের মধ্যে সেই সামগ্রিকতা, স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং ফিকহ ও

হাদীসের তুলনামূলক মুতালা'আয় এমন ভারসাম্য ও মিতাচার সৃষ্টি হয়ে যায়, যার প্রত্যাশা কুদরতীভাবে সেসব আলেম ও লেখকদের নিকট থেকে করা যায় না, যাদের জ্ঞান-গবেষণা ও চিন্তাধারার সম্পর্ক নিছক একই ফিকহী মাযহাব ও তার প্রবর্তক-স্থপতির সঙ্গে ছিল। আর তাদের সেই সীমানা থেকে বেরিয়ে আসার (নানাবিধ মানসিক ও ব্যক্তিগত কারণে) সুযোগ হয়নি।'

ইজতিহাদ ও তাকলীদের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা

হযরতের শাহ সাহেবের সেসব ভূতপূর্ব যোগ্যতা ও সংস্কারমূলক বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন, তা হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়ানুগ মতাদর্শ ও মিতাচারের পদ্ধতি, যা তিনি ইজতিহাদ ও তাকলীদ তথা অনুকরণের মাঝে অবলম্বন করেছেন, যা তার সুস্থ মানসিকতা, সঠিক আগ্রহ ও বাস্তবদর্শীতার উত্তম বহিঃপ্রকাশ। একদিকে ছিল সেসব লোক, যারা প্রত্যেক মুসলমানকে চাই সে সাধারণ কিংবা বিশিষ্ট ব্যক্তিই হোক, সরাসরি কিতাব ও সুন্নাতের উপর আমল করা এবং প্রত্যেক বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধান গ্রহণে আদিষ্ট সাব্যস্ত করত। আর কারও অনুকরণকে বলত সম্পূর্ণরূপে হারাম। তাদের কথাবার্তায় এর সুস্পষ্টতা না পাওয়া গেলেও তাদের কর্মপদ্ধতি ও তাদের রচনাবলি থেকে অলৌকিকভাবে এই ফলাফল বের করা যায়। এ দলে প্রবীণদের মধ্য হতে আল্লামা ইবনে হাযাম (র) কে আগে আগে দেখা যায়। কিন্তু এটা পুরোপুরি অমূলক কথা। আর প্রত্যেক মুসলমানকে এর জন্য আদিষ্ট সাব্যস্ত করা অসাধ্য সাধন বা অসম্ভব বিষয়ের আদেশ দেওয়ার নামান্তর।

অপরদিকে আরেকটি দল ছিল, যারা তাকলীদ (অনুকরণ)কে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব সাব্যস্ত করত এবং তা পরিত্যাগকারীকে কঠিন ফিকহী হুকুম 'ফাসিক' ও 'গোমরাহ' বলে অভিহিত করত। যেমনটি বলত প্রথম দল অনুকরণকারীদের এবং কোন বিশেষ ফিকহী মাযহাবের অনুসারীদেরকে। এ দল সেই বাস্তবতাকে ভুলে যেত যে, অনুকরণ মূলতঃ সাধারণ মানুষকে প্রবৃত্তির তাড়না ও আত্মপূজা, বিলাসিতা ও অহংকার থেকে বাঁচানো, মুসলিম সমাজকে বিচ্ছিন্নতা ও লাগামহীনতা থেকে নিরাপদ রাখা, ধর্মীয় জীবনে ঐক্য-সংহতি ও শৃঙ্খলা তৈরী করা এবং শরয়ী আহকামের উপর সহজে আমল করার সুযোগ দানের একটি ব্যবস্থামূলক কৌশল। কিন্তু তারা এই ব্যবস্থামূলক কাজকে শরয়ী আমলের মর্যাদা দিয়ে দেয় এবং এর উপর এত কঠোরভাবে বাড়াবাড়ি করে, যা তাকে একটি ফিকহী মাযহাব ও ইজতিহাদী মাসআলার স্থলে মানছুছ, অকাট্য আমল এবং স্বতন্ত্র দীনের মর্যাদা দিয়ে দেয়।

শাহ সাহেব এক্ষেত্রে যে মতাদর্শ অবলম্বন করেছেন এবং তার যে ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করেছেন, তা শরীয়তের উৎস-প্রাণের নিকটতর, প্রথম শতাব্দীর আমলের সঙ্গে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ, মানবীয় স্বভাবের সাথে বেশি অনুকূল এবং বাস্তব জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে শাহ সাহেব চতুর্থ হিজরী শতকের পূববর্তী কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করেন। বলেন– 'মানুষ তার ধর্মীয় জীবনে ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন ও আচার-অনুষ্ঠানে নিত্য-নতুন যেসব সমস্যা-সংকটের মুখোমুখি হত, তারা সেসব কিভাবে সমাধান করত, তারা সেক্ষেত্রে কী পন্থা অবলম্বন করত, তা হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় 'হিজরী চতুর্থ শতকের পূর্বাপর ধর্মীয় বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান ও আমলের ব্যাপারে মানুষ কী পন্থা অবলম্বন করত?'– শিরোনামে বর্ণনা করেন। যা নিম্নরূপ–

প্রথম শতকে মুসলমানদের কর্মপন্থা

উল্লেখ্য যে, চতুর্থ হিজরী শতকের পূর্বে মানুষ নির্দিষ্ট কোনও মাযহাবের অনুসরণ ও তার পূর্ণ আনুগত্যের উপর ঐক্যবদ্ধ ছিল না। আবু তালেব মাক্কী (তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ) 'কূতুল কুলূব'-এ লিখেছেন, সংকলন বা রচনামূলক কিতাবাদি (ও ফিকহী-মাসআলা সমগ্র) সে যুগের পরের কথা। মানুষের বর্ণিত কথাবার্তা বলা, কোন একটি মাযহাবের উপর ফাতওয়া প্রদান, তার কথাকে আইন বা কর্মনীতি বানিয়ে নেওয়া এবং তা-ই অনুলিখন বা নকল করা, সে মাযহাবেরই মূলনীতি ও উৎসগুলোর পাণ্ডিত্য অর্জনের রীতি প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে বিদ্যমান ছিল না।

আমি তাতে বাড়িয়ে বলি, প্রথম দুই শতকের পর তাখরীজ (কুরআন-হাদীসের আলোকে মাসআলা উৎসারণ) -এর ধারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে শুরু হয়। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ যে, চতুর্থ হিজরী শতকের মানুষ একই মাযহাবের গণ্ডিতে থেকে বিশেষ অনুকরণের প্রতি আনুগত্যশীল, তদনুযায়ী মাসায়েল ও আহকাম সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন এবং সে মাযহাবেরই গবেষণা ও ইজতিহাদগুলো অনুলিখন ও বর্ণনায় অভ্যস্ত ছিল না। যেমনটি তত্ত্বানুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায়।

উম্মতের মধ্যে (ও মুসলিম সমাজে) দু'টি শ্রেণী ছিল। একটি উলামায়ে কিরামের; অপরটি সাধারণ মানুষের। তন্মধ্যে সাধারণ মানুষ সেসব যৌথ বিষয় ও সম্মিলিত মাসআলাগুলোতে কেবল শরীয়ত প্রণেতার অনুসরণ করত, যেগুলোতে মুসলমানগণ কিংবা জমহূর মুজতাহিদগণের মাঝে কোনও মতবিরোধ নেই। তারা অযু-গোসল করা এবং নামায-যাকাত আদায় করার পদ্ধতি এবং এ জাতীয় ইবাদত-বন্দেগী ও ফরযসমূহের জ্ঞান আপন

পিতামাতা কিংবা নিজ শহরের উস্তাদ ও আলেমদের থেকে আহরণ করত আর তদনুযায়ীই আমল করত। নতুন কোনও বিষয়ের মুখোমুখি হলে বা নতুন কোন মাসআলা সামনে এলে, সে ব্যাপারে কোনও মুফতীর শরণাপন্ন হত ঠিক। কিন্তু কোন মাযহাব নির্ধারণ করা ছাড়াই প্রয়োজন সেরে নিত এবং তার কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করত।

আর খাছ শ্রেণী বা বিশেষ মহল সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তাতে দেখা যায়, তাদের মধ্যে যাদের প্রতিপাদ্য এ বিষয়বস্তু ছিল হাদীস শরীফ, তারা হাদীস নিয়েই ব্যস্ত থাকত। তারা হাদীসে নববী (স) ও আছারে সাহাবা (রা)-এর এত বড় ভাণ্ডার পেয়ে যেত, যার উপস্থিতিতে তাদের সংশ্লিষ্ট মাসআলা অন্য কোনও কিছুর প্রয়োজন পড়ত না। তাদের কাছে কোনও না কোনও এমন হাদীস বিদ্যমান ছিল, যা প্রসিদ্ধি, ব্যাপকতা কিংবা বিশুদ্ধতার স্তরে উন্নীত হত অথবা বিশুদ্ধ হাদীস হত, যার উপর ফকীহগণ ও বড় বড় উলামায়ে কিরামের কেউ না কেউ আমল করত। আবার কারও কাছে সেটি প্রত্যাখ্যানের যুক্তিগ্রাহ্য কোন ওজর-আপত্তিও থাকত না। অথবা জমহূর সাহাবা (রা) ও তাবেঈদের ক্রমান্বয়ে একে অপরকে সমর্থন জানানোর অভিমত তাদের নিকট থাকত। যার সম্পর্কে মতবিরোধ করার কোনও সুযোগ হত না। যদি তাদের কারও কোনও মাসআলায় এমন কোনও বিষয় না মিলত, যাতে তার মন পরিতৃপ্ত বা প্রশান্ত হয় -অনুলিপির বৈপরিত্য কিংবা প্রাধান্য দানের কারণগুলোর অস্পষ্টতার দরুণ অথবা অন্য কোনও যৌক্তিক কারণে, তাহলে তারা তাদের পূর্ববর্তী ফকীহ ও উলামায়ে কিরামের কথা ও অভিমতের প্রতি লক্ষ্য করত। এক্ষেত্রে যদি তারা দু'টি উক্তি পেত, তবে তন্মধ্যে তারা অধিক শক্তিশালী ও প্রামাণ্যনির্ভর উক্তিটিই গ্রহণ করত। চাই সে উক্তি বা মতটি মদীনার আলেমদের হোক কিংবা কূফার আলেমদের।

আর যারা তাখরীজ (ইজতিহাদ ও ইস্তিম্বাত) এর যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল, তারা যেসব মাসআলায় সুস্পষ্ট কোনও বিধান না পেত, সে মাসআলায় তাখরীজ ও ইজতিহাদের মাধ্যমে কাজ নিত। এসব লোককে তাদের উস্তাদ কিংবা দলের প্রধানের প্রতি সম্পৃক্ত করা হত। যেমন বলা হত, অমুক শাফিঈ। অমুক হানাফী। হাদীসের আলেমদের মধ্যেও যিনি কোনও মাযহাবের অনুসরণ বেশি করতেন, তাকে তার সাথেই সম্বন্ধিত করা হত। যেমন, ইমাম নাসাঈ ও বায়হাকীর সম্বন্ধ করা হত ইমাম শাফিঈ (র)-এর সাথে। সে যুগে বিচার ও ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তাকেই স্বীকৃতি দেওয়া হত, যার মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকত। ফকীহও তাকে বলা হত, যিনি

মুজতাহিদ হতেন। এর কয়েকশত বছর পর এমন লোকের জন্ম হয়, যারা নীরবতা ও সততার পথ অবলম্বন করেন।'

তাকলীদের বৈধ ও সৃষ্টিগত রূপরেখা

শাহ্ সাহেব অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠা ও বাস্তবদর্শীতার ভিত্তিতে কাজ করতেন। সেমতে তিনি এমন ব্যক্তিকে তাকলীদের (অনুকরণের) ব্যাপারে অক্ষম মনে করতেন, যে অবশ্যই কোন ফিকহী মাযহাব কিংবা নির্দিষ্ট ইমামের অনুসারী। তবে তার নিয়ত হচ্ছে, কেবল শরীয়ত প্রণেতার আনুগত্য ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণ। কিন্তু তার মধ্যে এমন যোগ্যতা নেই যে, সে শরয়ী হুকুম এবং কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত বিষয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এর একাধিক কারণ হতে পারে। যেমন– সে অতি সাধারণ মানুষ অথবা তার হাতে সরাসরি তত্ত্বানুসন্ধান ও গবেষণার জন্য সময়-সুযোগ নেই অথবা এমন উপাদান (জ্ঞান-গবেষণা) অর্জিত নেই, যার দ্বারা সে স্বয়ং নুছূছ বা অকাট্য প্রমাণ্যের তত্ত্বানুসন্ধান চালাতে পারে কিংবা সেখান থেকে মাসআলা বের করে নিতে পারে। শাহ্ সাহেব (র) আল্লামা ইবনে হাযম (র)-এর "তাকলীদ তথা অনুকরণ হারাম। কোনও মুসলমানের জন্য বিনা দলীলে আল্লাহ্ রাসূল (স) ছাড়া অন্য কারও কথা বা মতামত গ্রহণ করা জায়েয নয়।" উক্তিটি উদ্ধৃত করার পর লিখেন–

'ইবনে হাযম (র)-এর (উপরিল্লিখিত) উক্তির পাত্র সে ব্যক্তি নয়, যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা/মতামত ব্যতিত অন্য কাউকে নিজের জন্য ওয়াজিবুল ইতাআত বা অনিবার্য অনুসৃত মনে করে না। সে সেটিকেই হালাল জ্ঞান করে, যাকে আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূল (স) হালাল করেছেন। আর তাকেই হারাম বলে মানে, যাকে আল্লাহ্-আল্লাহর রাসূল (সা) হারাম সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তার যেহেতু সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ ও মতামতের জ্ঞান নেই, সে নবীজীর বিভিন্ন উক্তি ও কথার মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের যোগ্যতা এবং তাঁর বাণী থেকে মাসআলা বের করার ক্ষমতা রাখে না, তাই সে কোনও আল্লাহভীরু আলেমের আঁচল আকড়ে ধরে বসে। মনে করে, তিনি সঠিক কথা বলেন। আর যদি সে কোনও মাসআলা বর্ণনা করে তবে তাতে নিছক সুন্নাতে নববীর অনুসৃত ও ব্যাখ্যাতা হয় সে। যখনই সে জানতে পারে, তার এই ধারণা সঠিক ছিল না, তৎক্ষণাৎ সে কোন প্রকার টানাপোড়েন ও বাড়াবাড়ি ছাড়া তার আঁচল ছেড়ে দেয়। সুতরাং এমন ব্যক্তিকে কিভাবে কেউ ভৎর্সনা করবে এবং তাকে সুন্নাত ও শরীয়তের বিরোধী সাব্যস্ত করবে?

সকলেই জানেন, ফাতওয়া গ্রহণ ও ফাতওয়া প্রদানের ধারা নববী যুগ থেকে নিয়ে অব্যাহতভাবে চলে আসছে। আর সেই দু'ব্যক্তির মাঝে কী তফাৎ, যাদের একজন সবসময় অন্যের থেকে ফাতওয়া গ্রহণ করে। কখনও একজন থেকে, কখনও আরেকজন থেকে। কিন্তু তার মেধা স্বচ্ছ। তার নিয়ত সঠিক। আর সে নিছক ইত্তিবায়ে শরীয়ত তথা শরীয়তের অনুসরণ চায়। এটা কিভাবে নাজায়েয? অথচ কোনও ফকীহ্ সম্পর্কে আমাদের এই বিশ্বাস ও ঈমান নেই যে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর আকাশ থেকে ফিকহ্ অবতীর্ণ করেছেন এবং আমাদের উপর তার আনুগত্য ফরয করেছেন। আর তিনি নিষ্পাপ। সুতরাং আমরা যদি সেসব ফকীহ্ ও ইমামগণের মধ্য হতে কারও অনুসরণ করি, তবে তা নিছক এ কারণে যে, আমরা জানি, তিনি কুরআন-সুন্নাহর আলেম, তার অভিমত (ফাতওয়া) দু'অবস্থার এক অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়ত সেটি কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট কোনও হুকুমের উপর নির্ভরশীল অথবা স্বতঃসিদ্ধ কোনও মূলনীতির আলোকে তা কুরআন-হাদীস থেকে উৎসারিত। অথবা তিনি বিভিন্ন নিদর্শন থেকে ধারণা করেছেন, হুকুমটি অমুক ইল্লতের সাথে সম্পৃক্ত। (এখানেও সে ইল্লাত বিদ্যমান) আর তার মন এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে। কারণ, তিনি গাইরে মানছূছ (অকাট্য প্রামাণ্য নছশূন্য বিষয়কে) মানছূছের (অকাট্য প্রামাণ্যনির্ভর বিষয়ের) উপর কিয়াস (পরিমাপ) করেছেন। যেন তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছেন– আমি বুঝি, রাসূলে কারীম (স) বলেছেন– যেখানে এই ইল্লত বা কারণ পাওয়া যাবে, সেখানে এই হুকুম হবে। আর এই যৌক্তিক মাসআলা উক্ত ব্যাপকতা ও মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত।

অনুরূপভাবে এই হুকুম সম্বন্ধ রাসূলে কারীম (স)-এর প্রতিও করা যায়। কিন্তু তা ধারণাগতভাবে। যদি অবস্থা-প্রেক্ষিত এমন না হত, তাহলে কোনও ঈমানদার কোনও মুজতাহিদের অনুসরণ করত না। যদি আমাদের নিকট নিষ্পাপ রাসূলে কারীম (স)-এর কোনও হাদীস নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌঁছে, যার আনুগত্য আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর ফরয করেছেন, যে হাদীসখানা ঐ মুজতাহিদ অথবা ইমামের ফাতওয়া ও অভিমতের বিপরীত আর আমরা সে হাদীসখানা ছেড়ে দেই এবং ঐ যন্নী বা সংশয়পূর্ণ পন্থা অনুসরণ করি, তাহলে আমাদের অপেক্ষা বেশি অর্থহীন পদ্ধতি অবলম্বনকারী আর কে হবে? আগামী দিনে আল্লাহর সামনে কী অজুহাত থাকবে আমাদের?'

মাযহাব চতুষ্টয়ের বৈশিষ্ট্যাবলি

এই ন্যায়ানুগ ও গবেষণামূলক পর্যালোচনার পর শাহ সাহেব উক্ত চার মাযহাব তথা হানাফী, মালেকী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবের ব্যাপারে মুসলিম

বিশ্বে সাধারণতঃ যার উপর আমল করা হয়, সে সম্পর্কে রচিত 'কলেবরে ক্ষুদ্র; মূল্যমানে উৎকৃষ্ট' গ্রন্থ عقد الجيد فى احكام الاجتهاد و التقليد এর মধ্যে লিখেছেন,

'স্মরণ রাখবেন, উক্ত মাযহাব চতুষ্টয় গ্রহণ করার মধ্যে বিরাট উপকারিতা রয়েছে। আর এই চারটি মাযহাবকেই একেবারে উপেক্ষা করার মাঝে রয়েছে বিরাট অকল্যাণ ও বিপর্যয়। এর কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে যে, শরয়ী জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তারা প্রবীণ পূর্বসূরী উলামায়ে কিরামের উপর নির্ভর করেছেন। তাবেঈগণ এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের উপর নির্ভর করেছেন আর তাবে তাবেঈগণ নির্ভর করেছেন তাবেঈগণের ওপর। এভাবেই প্রত্যেক যুগের উলামায়ে কিরাম তাদের পূর্বসূরী দিশারীদের উপর নির্ভর করেছেন। যৌক্তিকভাবেও তাদের ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত। কেননা শরয়ী জ্ঞানের উৎস নকল (কুরআন-হাদীস) ও ইস্তিম্বাত (তথা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মাসআলা উৎসারণ)। আর নকল (বা অনুলিখন) তখনই সম্ভব, যখন প্রত্যেক শ্রেণী তাদের নিকটবর্তী পূর্বপুরুষদের থেকে বিষয়টি চয়ন করবেন। ইস্তিম্বাতেও পূর্ববর্তী বা প্রবীণদের মাযহাব জানা জরুরী, যাতে তাদের অভিমতের সীমানা থেকে বেরিয়ে ঐক্য বিদীর্ণ না হয়ে যায়। কাজেই সেসব অভিমত জানা এবং পূর্ববর্তীদের থেকে সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। অন্যান্য ইলম, শাস্ত্র, গুণাবলি ও পেশারও একই অবস্থা। নাহব, ছরফ, কবিত্ব, কাব্যচর্চা, কামারী, রাজের কাজ ও পেইন্টিং সবকিছু তখনই অর্জিত হতে পারে, যখন সেসব বিদ্যার উস্তাদ এবং এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সংশ্রব গ্রহণ করা হবে। এগুলো ছাড়াই দক্ষতা অর্জন হয়ে যাচ্ছে– এমনটি খুব কম দেখা যায়। অবশ্য যৌক্তিকভাবে এমনটি সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে হয় না।

যখন চূড়ান্ত হয়ে গেল, প্রবীণদের অভিমত ও জ্ঞান-গবেষণার উপর নির্ভর করা জরুরী, তখন সেই অভিমতগুলোও বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত এবং প্রসিদ্ধ কিতাবাদিতে সংকলিত থাকাও জরুরী হয়ে গেল। সেসবের উপর এমন আলোচনা-পর্যালোচনা হতে হবে, যেন তাতে রাজেহ (প্রাধান্যপ্রাপ্ত) ও মারজুহ (যার উপর প্রাধান্য দেওয়া হল) এবং আম-খাছ তথা বিশেষ-অবিশেষের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় সহজ হয়। যেখানে ইতলাক বা (শর্তমুক্ত হওয়া) পাওয়া যায়, সেখানে জানতে হবে– এতে মুকাইয়াদ (বা শর্তযুক্ত বিষয়টি) কী? বিভিন্ন অভিমতের মাঝে ইতোমধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। হুকুমসমূহের ইল্লত ও কারণ সম্পর্কে লেখালেখি হয়েছে। অন্যথায়

এমন সব মাযহাব ও ইজতিহাদের উপর নির্ভর করা শুদ্ধ হবে না। সেই পূর্বযুগগুলোতে এমন কোনও ফিকহী মাযহাব নেই, যার মধ্যে এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় এবং এসব শর্ত উক্ত চার মাযহাব ছাড়া পূর্ণ হয়।'

এভাবে শাহ সাহেব ইজতিহাদ ও তাকলীদের মাঝে সেই মিতাচার ও সাম্যনীতি রক্ষা করেছেন, যা শরীয়তের উদ্দেশ্য, মানবীয় বৈশিষ্ট্য এবং ঘটনাবহুল পৃথিবীর সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল। তারা তাকলীদের সঙ্গে শর্ত জুড়ে দিয়েছেন– এ ব্যাপারে মেধা-মনন পরিস্কার এবং নিয়ত পরিশুদ্ধ হতে হবে। কেননা লক্ষ্য তো শরীয়ত প্রণেতার অনুকরণ এবং কুরআন-সুন্নাহর আনুগত্য। আর আমরা যাকে মাধ্যম বানাচ্ছি, তিনি কুরআন-সুন্নাহর আলেম এবং ইসলামী শরীয়তের একজন পথপ্রদর্শক ও ব্যাখ্যাতা মাত্র। যখন নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, আসল ব্যাপার ভিন্ন। সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হুকুম আরেকটি, তখন একজন ঈমানদারের জন্য আরেকটি রূপরেখা গ্রহণ করতে কখনও সংশয় বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব হবে না। মানসিকভাবে সেজন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। চাই সে অবস্থা-সুযোগ বহুদিনেই হোক। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.

'তোমাদের প্রতিপালকের শপথ! মানুষ যাবৎ না তাদের পারস্পরিক বিবাদে তোমাকে মীমাংসাকারী বিচারক না বানাবে আর এরপর তুমি যে ফায়সালা করবে, সে সম্পর্কে নিজের মনে কোনও বক্রতা বা সংকীর্ণতা না পাবে বরং সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুমিন (পূর্ণাঙ্গভাবে) হবে না।' (সূরা নিসা : ৬৫)

প্রত্যেক যুগের ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা

শাহ সাহেব মাযহার চতুষ্টয়ের বৈশিষ্ট্যাবলি এবং মুহাদ্দিস ফকীহগণের খেদমত ও তাদের মর্যাদার পূর্ণ স্বীকৃতি দেন। এই ফিকহ ও হাদীসের ভাণ্ডারকে তিনি সাব্যস্ত করেন অতি মূল্যবান ও কল্যাণকর রত্ন হিসেবে। এর থেকে বৈরিতা ও অমুখাপেক্ষিতাকে মনে করেন বিরাট ক্ষতি ও বঞ্চনার কারণ। অধিকন্তু তিনি বলেন, ইজতিহাদ (তার শর্তাবলি, জরুরী নীতিমালা ও সতর্কতাসহ) প্রত্যেক যুগের প্রয়োজনীয়তা, মানব জীবন, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সমাজের পট পরিবর্তন, উন্নতি-অগ্রগতির যোগ্যতা, মানবীয় প্রয়োজনাদি, নানা ঘটনাপ্রবাহ ও পরিবর্তনের যথারীতি স্বভাবগত চাহিদা, ইসলামী শরীয়তের প্রশস্ততা, এটি 'মিন জানিবিল্লাহ' তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়া

এবং কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির দিকনির্দেশনা দান ও সমাজের জায়েয চাহিদাগুলো পূরণের যোগ্যতার অধিকারী হওয়ার জন্য প্রয়োজন রয়েছে, যার বহিঃপ্রকাশ ও প্রমাণ দান প্রত্যেক যুগে জরুরী; শরীয়তের ধারক-বাহকদের উপর ফরয কর্তব্য। 'মুস্তফা' -এর ভূমিকায় তিনি লিখেন, 'ইজতিহাদ প্রত্যেক যুগে ফরযে কিফায়া। এখানে ইজতিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য বিশেষ ইজতিহাদ/স্বতন্ত্র ইজতিহাদ নয়। যেমন ছিল ইমাম শাফিঈ (র) এর ইজতিহাদ। যিনি জরাহ ও তাদীল (সমালোচনা), ভাষাজ্ঞান ইত্যাদিতে অন্য কারও মুখাপেক্ষী ছিলেন না। এভাবে তিনি তার মুজতাহিদসুলভ জ্ঞান-বুদ্ধিতে (তার সকল শাখায়) অপরের অনুসারী ছিলেন না। মূল উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় ইজতিহাদ। আর তা হচ্ছে, শরঈ আহকামগুলোকে তার বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে জানা এবং মুজতাহিদগণের নিয়মানুসারে শাখা-মাসআলা উৎসারণ ও আহকাম বিন্যাস করা; চাই তা কোনও মাযহাব প্রণেতার দিকনির্দেশনায় ও তত্ত্বাবধানে হোক।'

আমরা যে বলি, এ যুগে ইজতিহাদ ফরয অর্থাৎ অনিবার্য। (আর এটি গবেষক আহলে ইলমদের ঐকমত্যপূর্ণ মাসআলা)। এর কারণ হচ্ছে, মাসআলা অসংখ্য। যার সীমাবদ্ধতা অসম্ভব। সে সবের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম জানা ওয়াজিব। আর লেখা ও সংকলনে যতটুকু এসেছে, তা অপর্যাপ্ত। এসবের ব্যাপারেও যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। সেগুলো সমাধান করা দলীল-প্রমাণের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া সম্ভব নয়। আইম্মায়ে মাসায়েল থেকে যেসব রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে, তার সিংহভাগেই বিচ্ছিন্নতা আছে। মন সেসবের উপর প্রশান্তির সাথে নির্ভর করতে পারে না। কাজেই সেগুলোকে ইজতিহাদের নীতিমালায় যাচাই করা ও গবেষণা করা ছাড়া তা আমলযোগ্য হতে পারে না।

সপ্তম অধ্যায়

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার দর্পণে ইসলামী শরীয়তের মজবুত ও প্রামাণ্য ব্যাখ্যা এবং হাদীসের তত্ত্ব-মর্মের পর্দা উন্মোচন

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার বৈশিষ্ট্য

শাহ সাহেবের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ ও জ্ঞানগত কৃতিত্ব 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'। যার মধ্যে ইসলামী শরীয়তের এমন এক মজবুত, সামগ্রিক ও প্রামাণ্য চিত্র পেশ করা হয়েছে, যেখানে আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন, আচার-অনুষ্ঠান, আখলাক-চরিত্র, সামাজিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ইহসান (অনুগ্রহ-দান) কে এমন এক যোগসূত্র ও সঠিক সামঞ্জস্যের সঙ্গে পেশ করা হয়েছে, মনে হয় যেন তা একই মালার মুক্তা ও একই শিকলের অসংখ্য কড়া। তাতে আসল ও শাখা-প্রশাখা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও উপায়-উপকরণ এবং সার্বক্ষণিক ও সাময়িকের পার্থক্য দৃষ্টির আড়াল হতে পারে না। এ তো সেসব রচনাবলি ও গবেষণাকর্মের পুরোনো দুর্বলতা, যা কোনও বাড়াবাড়ি ও অন্যায়, বে-ইনসাফী প্রত্যাখ্যান কিংবা কোনও আবেগ-আগ্রহ নিয়ে রচিত হয়েছে। এই যোগসূত্রতা ও সামঞ্জস্যের কারণ (শাহ সাহেবের জন্মগত মানসিক ও চিন্তাগত সুস্থতা ও মিতাচার ব্যতিত) তার হাদীস শাস্ত্রের গভীর ও ব্যাপক অধ্যয়ন এবং সেই বিশেষ মানসিকতা ও আকর্ষণ, যা হাদীস ও সীরাতের নিমগ্নতা কিংবা নববী মেজায ও আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল কোনও 'আলেমে রব্বানী' (বুযুর্গ আলেম)-এর সংস্পর্শ ও তরবিয়ত-তত্ত্বাবধানে সৃষ্টি হয়। ইসলামের এই মজবুত ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা, যা হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পরিলক্ষিত হয়, তা খুব কম ধর্মীয় বই-পুস্তক ও রচনাবলিতেই দৃষ্টিগোচর হবে। এভাবে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা সেই যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের যুগে এক নতুন ইলমে কালাম হয়ে গেছে, যার মধ্যে রয়েছে হকপন্থী ও সুস্থ মনের মানুষের জন্য (যার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্তদৃষ্টিও কিছুটা আছে) প্রশান্তি ও স্বস্তির পর্যাপ্ত খোরাক। আমার জানামতে কোনও মাযহাবের সমর্থনে এবং তার প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে (আমাদের পরিজ্ঞাত ভাষায়) এই মানের গ্রন্থ রচনা করা হয়নি। আর রচিত হয়ে থাকলেও বর্তমান সময়ে তা শিক্ষাজগতের সামনে নেই।

বারো হিজরী শতকের সামান্য পরেই ভারতবর্ষ এবং গোটা মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান-গবেষণামূলক নানা কারণে এক বিশেষ ধরনের 'দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা' -এর যে যুগ শুরু হতে যাচ্ছিল এবং শরীয়তের আহকামের তত্ত্বাবলি ও উপকারিতা অনুসন্ধানের যে গণজোয়ার সৃষ্টি হচ্ছিল, সে কারণে অনেক মেধা-মনন বিভ্রান্ত হওয়া এবং বহু কলম বিপথে চালিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। বিশেষতঃ হাদীস ও সুন্নাহ (বিশেষ কারণে) নানা আপত্তি-অভিযোগ ও সংশয়-সন্দেহের সবচেয়ে বেশি লক্ষ্যস্থলে পরিণত হচ্ছিল। এসব নতুন চাহিদার কারণে সঠিকভাবে সে ব্যক্তিই কর্তব্য পালন করতে পারত, যিনি কুরআন-সুন্নাহ, দর্শন ও হিকমত শাস্ত্র, কালাম শাস্ত্র, চারিত্রিক জ্ঞান, জীববিদ্যা, (সমকালীন গণ্ডিতে) ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে জ্ঞাত। সেই সাথে ইহসান ও আত্মশুদ্ধির রত্ন ও বাস্তবতা সম্পর্কে শুধু জ্ঞাতই নয় বরং এক্ষেত্রে ইজতিহাদের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবেন। চাহিদা ছিল, সে যুগ শুরু হওয়ার পূর্বে হিজরী বারো শতকের ইমামের কলমে এমন গ্রন্থ রচিত হয়ে যাবে, যা এই প্রয়োজনীয়তা এমন পর্যাপ্তভাবে পূর্ণ করবে, যা এরূপ কোনও মানুষের কলম দ্বারাই সম্ভব, যিনি একজন মানুষ মাত্র। না তিনি নিষ্পাপ; না তার জ্ঞান প্রত্যেক যুগ, স্থান ও শাস্ত্রসমূহের উপর পরিব্যাপ্ত। তার উপর সমকালের (ন্যূনতম পর্যায়ে) স্পর্শ এবং সেই শিক্ষাব্যবস্থা ও তরবিয়তের প্রভাবও আছে, যেখানে তিনি বেড়ে উঠেছেন। অধিকন্তু তাকে মূলতঃ কুরআনিক শিক্ষাকেন্দ্র, হাদীস ও সুন্নাহর বিদ্যাপীঠের বরকত ও সংশ্রবপ্রাপ্ত এবং মুখপাত্র বলেই পরিলক্ষিত হয়।

শাহ সাহেব উক্ত গ্রন্থ রচনার উৎসাহ-প্রেরণার কারণ সম্পর্কে লিখেন, 'উলূমে হাদীসের মধ্যে সবচেয়ে জটিল, সূক্ষ্ম ও গভীর, উঁচু ও নতুন শাস্ত্র হল, দীনের তত্ত্ব-রহস্যের সেই জ্ঞান, যাতে আহকাম ও বিধি-নিষেধের হিকমত, তার শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ বিশেষ আমলগুলোর সূক্ষ্মতা ও তত্ত্ব বর্ণনা করা হবে। যার মাধ্যমে মানুষ শরীয়তের আনীত বিষয়গুলোর ব্যাপারে অন্ত দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে যায় এবং ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকে।

বিষয়বস্তুর কমনীয়তা

ধর্মীয় গভীরতা ও শরয়ী আহকামের রহস্য, উপকারিতাসমূহ, কারণ ও ইল্লতগুলো বর্ণনা করার বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। সামান্য অসতর্কতা-পক্ষপাতিত্ব, বিশেষ কোনও দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য কিংবা যুগের প্রভাবে পাঠকবর্গের মেধা-মনন আসমানী শরীয়ত ও নববী শিক্ষার সেই ফলক-যেখানে মূল লক্ষ্য বলা হয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, নৈকট্য ও পারলৌকিক মুক্তি,

সেখান থেকে নেমে এসে বস্তুবাদী জীবনোপকরণগুলোর সুব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক কল্যাণ কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের ফাঁদে পড়ে যায়। আর চেষ্টা-সংগ্রামের পূর্ণ ক্রমধারা থেকে ঈমান ও হিসাব প্রস্তুতির প্রাণ হয়ত সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে যায় অথবা অত্যন্ত দুর্বল ও আহত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ নামাযের রহস্য ও উপকারিতা প্রসঙ্গে বলা যায়, তা এক ধরনের সামরিক প্যারেড। এর দ্বারা শৃঙ্খলা, আমীরের আনুগত্য ও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য পাওয়া যায়। রোযা সুস্থতার জন্য ফলপ্রসূ পদ্ধতি। যাকাত ধনাঢ্যদের উপর গরীব-অসহায়দের প্রাপ্য ট্যাক্স। হজ্জ একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী কনফারেন্স। যেখানে জাতীয় স্বার্থে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শ করা হয়।

সেসব সমস্যা-সংকটে অবস্থার প্রেক্ষিতে (যেগুলো সম্ভাবনা ও আশঙ্কা থেকে অগ্রসর হয়ে ঘটনাবলি ও বাস্তব দৃষ্টান্তের স্থান দখল করে নিয়েছে) এ বিষয়ে সঠিকভাবে সে আলেমই দায়িত্ব পালন করতে পারেন, যার হাতে থাকবে দীন ও শরীয়তের আসল সংবিধান, যিনি আল্লাহর শরীয়ত অবতরণ এবং নবী-রাসূল (স) প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে হবেন সম্যক অবগত। যার শিরা-উপশিরায় বিস্তৃত থাকবে ঈমান ও হিসাব প্রস্তুতির প্রাণ। যার চিন্তাধারা ও জ্ঞানগত উন্নতি হবে কুরআন-সুন্নাহ, ঈমান ও হিসাব প্রস্তুতির পরিবেশে এবং তার ছায়াতলে। আর শাহ সাহেব (র) ছিলেন (যেমনটি তার জীবনকর্ম থেকে জানা যায়) এই স্পর্শকাতর জটিল বিষয়ে কলম ধরার জন্য উচ্চ মাপের ব্যক্তিত্ব।

পৃথক সংকলনের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রবীণ আলেমদের প্রাথমিক চেষ্টা

শাহ সাহেব (র) এ বিষয়ে প্রবীণদের সংক্ষিপ্ত চেষ্টা-সাধনার বর্ণনা দিয়ে লিখেন– 'পূর্বসূরীগণ সেসব উপকারিতার পর্দা উন্মোচন করেছেন, শরয়ী অধ্যায়গুলোতে যার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। পরবর্তী গবেষকগণ কতিপয় অতি মূল্যবান তত্ত্বও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার পরিমাণ এতটুকু যে, আজ এ বিষয়ের সমালোচনা ঐক্য বিনষ্টকারী হয়নি। কেউ এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেনি। এর মূলনীতি ও শাখামূলক বিষয়গুলো কেউ পুরোপুরি বিন্যাস করেননি।'

এ প্রসঙ্গে শাহ সাহেব (র) ইমাম গাযালী (র), আল্লামা খাত্তাবী ও শায়খুল ইসলাম ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যাদের গ্রন্থাবলি ও রচনাবলিতে অল্প অল্প এমন সব বিষয়বস্তু ও ইংগিত পাওয়া যায়, শাহ সাহেব (র) "শরয়ী আহকাম উপকারিতা নির্ভর নয় এবং

আসল ও প্রতিদানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা তেমন একটা জরুরী নয়।" এই দাবী প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে সেসব আয়াতে কারীমা ও হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, যেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন আমল এবং তার পরিণতির মাঝে সম্পৃক্ততার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কোনও কোনও বিধি-বিধানের ইল্লত এবং উপকারিতাও বর্ণনা করা হয়েছে। আবার সেসব হাদীসও উল্লেখ করেছেন, যেগুলো কোনও ইবাদত-বন্দেগী অথবা কোনও আমল শরীয়ত-নির্দেশিত হওয়ার কারণ এবং নিরূপণের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। আবার কোনও কোনও নিষেধাজ্ঞার সেসব কারণ ও রহস্যের বিভিন্ন উদাহরণও দিয়েছেন, যা হযরত উমর (রা) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত আছে। আর প্রত্যাখ্যান করেছেন সেসব চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেসবের জবাবও দিয়েছেন, যারা এই জটিল বিষয়ের সংকলনকে অসম্ভব কিংবা নিরর্থক বা অভিনব কাজ বলতেন। তাছাড়া এ বিষয়ে সে সময় পূর্ণ মনোযোগিতা না থাকার কী কারণ ছিল, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এ শাস্ত্র সংকলনের প্রয়োজনীয়তা ও রহস্য বর্ণনা করতঃ শাহ সাহেব লিখেন, এমন কিছু হাদীস বাহ্যতঃ যেগুলোকে পুরোপুরি কিয়াসবিরোধী মনে হত, কোনও কোনও ফকীহ সেগুলোকে অযৌক্তিক বলে প্রত্যাখ্যান করাকে বৈধ জ্ঞান করতেন। এ কারণেও হাদীসসমূহের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণীর বিরোধপূর্ণ কর্মপদ্ধতি, কারও কারও যুক্তি ও বিবেক থেকে একেবারে চোখ বন্ধ করে নেওয়া, কারও কারও অলীক ব্যাখ্যা দান এবং এহেন অবস্থায় 'صرف عن الظاهر' (বাহ্যিকতা বিমুখ হওয়া)-এর উপর নির্দ্বিধায় আমল করা, যেখানে হাদীসসমূহ যৌক্তিক নীতিমালার পরিপন্থী দেখা যায় এবং এ ব্যাপারে অসংখ্য দলের সীমালঙ্ঘন শাহ সাহেবের নিকট এ শাস্ত্রের নতুন সংকলনকে না কেবল বৈধ ও উপকারী সাব্যস্ত করে বরং একে দীনের বিরাট বড় খেদমত এবং সময়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন বলেই প্রমাণ করে।

প্রয়োজনীয়তার এই অনুভূতি, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সময়ের চাহিদাগুলো ছাড়া শাহ সাহেব এই মহান কাজের পূর্ণতা দানের জন্য কিছু গাইবী (অদৃশ্য) সুসংবাদ এবং নবুওয়াতের দরবার থেকে এমন একটি ইংগিতও পেয়েছেন– যাতে অনুমিত হয়, দীনের নতুন একটি বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য। শাহ সাহেব (র) বলেন, 'আমি অন্তরে এমন একটি আলোকবর্তিকা পেলাম, যা বরাবরই বৃদ্ধি পেতে থাকে। মক্কা শরীফে অবস্থানকালে আমি একবার ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (রা) কে স্বপ্নে দেখলাম। তারা আমাকে কলম দান করলেন আর বললেন, এটা আমাদের নানা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কলম।'

শাহ সাহেবের শিষ্য ও সঙ্গীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্নেহের ছাত্র তার মামাতো ভাই, শ্যালক, ঘর-বাইরের বন্ধু শায়খ মুহাম্মদ আশেক ফুলতী (র)-এর সবচেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষা ও পীড়াপীড়ি ছিল এ কাজের পূর্ণতা দানের পেছনে। যিনি শাহ সাহেবের মন-মানস সম্পর্কে সবচেয়ে অভিজ্ঞ, তার জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও যোগ্যতা সম্পর্কে সর্বাধিক ওয়াকিফহাল ছিলেন। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা শাহ সাহেবকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুসম্পন্ন করার তাওফীক দান করেন আর তার কলম দ্বারা এই অমূল্য গ্রন্থ রচিত হয়ে জ্ঞানী মহলের হাতে পৌঁছে যায়।

ভূমিকা, মৌলিক বিষয়সমূহ, আদেশ দান, পুরস্কার ও শাস্তি

কিতাবের প্রথমভাগে শাহ সাহেব ভূমিকাস্বরূপ সেসব আলোচনা সন্নিবেশিত করেছেন, যার দ্বারা সৃষ্টিকর্তার হেদায়াত, আসমানী শিক্ষা, নবী-রাসূল প্রেরণ ও তাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতীয়মান হয়। তাতে অত্যন্ত মৌলিক ও ভিত্তিমূলক আলোচনাটি তিনি باب سر التكليف শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করেছেন। যেখানে তিনি প্রমাণ করেছেন, 'তাকলীফ বা আদেশ দান' মানবজাতির জন্মগত চাহিদাগুলোর একটি। মানুষ তার যোগ্যতার ভাষায় আবেদন করে– আল্লাহ তা'আলা যেন তার উপর এমন জিনিস ওয়াজিব করেন, যা ফিরিশতাসুলভ শক্তিতুল্য। এরপর তার বিনিময়ে যেন সওয়াব দেন। আর তার উপর (তার মধ্যে সুপ্ত) পশুবৃত্তি বা পাশবিকতায় নিমজ্জিত হওয়াকে হারাম করেন এবং তাকে শাস্তি দেন। এ ব্যাপারে শাহ সাহেবের প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ এবং মানব জাতির উপর ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান-গবেষণার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সাথে সাথে মনস্তত্ত্ব, চিকিৎসা ও বনাজী সম্পর্কে অবগতিও প্রকাশ পায়। শাহ সাহেব যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করেছেন, মানুষের প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিৎজগতের সাথে যে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে এবং তার ভেতর যেসব যোগ্যতা ও জন্মগত প্রত্যাশা-চাহিদা সুপ্ত রাখা হয়েছে, তা বস্তুতঃ শরয়ী তাকলীফ (আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে সম্বোধন করে কোনও বিধি-নিষেধ পালনের আদেশ দান) এবং মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার হেদায়াত প্রত্যাশা করে। শাহ সাহেব একে 'التكفف الحالى' (প্রকৃতির ভাষায় ভিক্ষে চাওয়া ও হাত পাতা) -এর মত উচ্চাঙ্গের শব্দে ব্যক্ত করেছেন। সেসঙ্গে 'التكفف العلمى' (জ্ঞানের ভিক্ষাবৃত্তি) শব্দ বৃদ্ধি করেন।

তাঁর মতে মানুষের মধ্যে (বিবেক-বুদ্ধি ও বাকশক্তি ছাড়াও) আরও দুটি বিষয় রয়েছে। زيادة القوة العقلية ও براعة القوة العملية এতে মানুষের মধ্যে কেবল বিবেকবুদ্ধি ও কর্মশক্তির অস্তিত্বই নয় বরং সেসবের উন্নতি, সাহসিকতা,

পূর্ণতা কামনা, অতৃপ্তিও তার জন্মগত স্বভাব। শাহ সাহেবের মতে ফিরিশতাগণের সৃষ্টি, বড় বড় ঘটনাবলি ও নবী-রাসূল প্রেরণ এরই ফলাফল। প্রকারান্তরে ঐ অনুগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার বিস্ময়-কমনীয়তা, যা গোটা মানবজাতির মাঝে ব্যাপৃত। এসব খোদায়িত্ব ও আল্লাহর রহমতের ঝলক। তার মতে ইবাদত-বন্দেগী ও শরীয়ত পরিপালন মানব জাতির এমন এক জাতিগত চাহিদা, যেমন– হিংস্র প্রাণীর গোশত ভক্ষণ, চতুষ্পদ জন্তুর ঘাসে বিচরণ, মৌমাছির স্বীয় নেতা (রাণী) -এর প্রতি আনুগত্য-প্রদর্শন। তবে প্রাণীজগতের জ্ঞান প্রাকৃতিক প্রত্যাদেশের সাথে সম্পৃক্ত, আর মানবীয় জ্ঞান, কাজকর্ম ও জীবিকার্জন দেখা বা অহী কিংবা অনুসরণ-অনুকরণের সাথে সম্পৃক্ত।

এরপর শাহ সাহেব মাজাযাত (প্রতিদান ও শাস্তি) কে শরয়ী তাকলীফের কুদরতী চাহিদা বলেন। তার নিকট এর কারণ চারটি। ১. শ্রেণীগত চাহিদা। ২. উর্ধ্বজগতের প্রভাব। ৩. শরীয়তের চাহিদা। ৪. নবী প্রেরণের ফল ও চাহিদা। আল্লাহ তা'আলার কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা ও সাহায্যের ফায়সালার আবশ্যকীয়তা। তারপর মানুষের মধ্যে নিজের স্বভাব-প্রকৃতিতে পার্থক্যের কারণে চরিত্র, কাজকর্ম ও যোগ্যতার স্তরেও পার্থক্য হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে শাহ সাহেব মালাকিয়্যাত ও রাহীমিয়্যাত (ফিরিশতাসুলভ ও পশুসুলভ অবস্থা-গুণ)-এর সহাবস্থান, এগুলোর প্রবলতা ও দুর্বলতার সাদৃশ্য আর এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকারভেদের (যেগুলোকে তিনি 'আকর্ষণ' ও 'পরিভাষা' শব্দে ব্যক্ত করেন) আটটি রূপ এবং সেগুলোর বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে যেগুলো প্রাধান্যপ্রাপ্ত, সেগুলো উল্লেখ করেছেন। এই আলোচনা ও বিশ্লেষণ শাহ সাহেবের ধীশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন এবং কিতাবেরই একটি বৈশিষ্ট্য। এতে মানুষের অবস্থা ও স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান-গবেষণা জানা যায়।

আমলের গুরুত্ব ও তার প্রভাব

শাহ সাহেব আমলের গুরুত্ব, মানবীয় বৈশিষ্ট্য-গুণের উপর তার প্রভাব এবং দুনিয়া-আখেরাতে তার প্রতিক্রিয়ার রূপরেখা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একটি সময় এমন আসে, যখন আমলসমূহে (উর্ধ্বজগতের পছন্দ-অপছন্দের কারণে) এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যা হয়ে থাকে সেসব তাবীয ও নকশায়, যেগুলো সবিশেষ গঠন-বৈশিষ্ট্যসহ প্রবীণদের থেকে বর্ণিত।

এভাবে বইটির এ প্রারম্ভিক আলোচনা অধ্যয়নকারীদের মেধা-মননকে সামনের সেসব আলোচনার জন্য প্রস্তুত করে দেয়, যার ভিত্তিই হল, মানুষের শ্রেণীগত চাহিদাসমূহ উপলব্ধি করা, শরয়ী তাকলীফের কারণগুলো ও তার

উপর আরোপিত সাজা ও পুরস্কার, খোদায়িত্ব ও রহমতের দাবীসমূহ, আমলসমূহের রূপরেখা এবং সেগুলোর মানুষের সামাজিক পদ্ধতি, মানবজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা এবং সেসব অদৃশ্য আলামত ও জিনিসগুলোর অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়ার উপর সীমাবদ্ধ।

ইরতিফাকাত বা আশ্রয় গ্রহণ

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা পাঠ করলে মনে হয়, শাহ সাহেবের দূরদৃষ্টি ও পরিবর্তনশীল অবস্থা-পরিস্থিতিগুলোর গভীর ও বাস্তবদর্শী পর্যবেক্ষণ (আল্লাহর সমর্থনের সাহায্যে) বুঝে নিয়েছিল যে, শীঘ্রই এমন যুগ আসবে, যাতে একদিকে মানুষ শরীয়তের আহকামে বিশেষতঃ হাদীস ও সুন্নাহর শিক্ষা আর নবীজীর পবিত্র বাণীসমূহের রহস্যভেদগুলো বুঝার জন্য সচেষ্ট হবে। এসবের সভ্যতা-সাংস্কৃতিক, সম্মিলিত, সামাজিক ও বাস্তবিক উপকারিতাগুলো জানতে চাইবে। অপরদিকে সে দীন-ধর্ম ও জীবনের মধ্যকার সম্পর্ক উপলব্ধি করবে। ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষা ও আসমানী হেদায়াতকে জীবনের বিস্তৃত পরিমণ্ডল এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, উপকরণ ও ফলাফলের মধ্যকার সম্পর্কের নিরিখে বুঝা এবং এসবের উপকারিতা উপলব্ধির চেষ্টা করবে।

এজন্য শাহ সাহেব যে 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' কে মূলতঃ শরীয়তের রহস্যভেদ এবং হাদীস ও সুন্নাহর যৌক্তিক ব্যাখ্যাস্বরূপ লেখা হয়েছে, সে গ্রন্থখানা 'শরীয়া ব্যবস্থা' থেকে শুরু করার কারণে– যার শুরুভাগে সেসব আদেশ-নিষেধ বর্ণিত হয়েছে, যার মৌলিক সম্পর্ক প্রতিদান ও শাস্তি, পারলৌকিক মুক্তি আর শাহ সাহেবের পরিভাষায় 'مبحث البر والاثم' (পাপ-পুণ্য অধ্যায়) এর সাথে, প্রথমে সেসব আলোচনা দ্বারা শুরু করেছেন, যার সম্পর্ক বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টিগত ব্যবস্থা ও মানব জীবনের সাথে। যার অনুসরণে একটি সুস্থ সামাজিক রূপরেখা ও একটি সুস্থ সভ্যতা অস্তিত্ব লাভ করে। শাহ সাহেব এক্ষেত্রে 'ইরতিফাকাত' পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। যা আমাদের জানামতে ইতোপূর্বে মুসলমান দার্শনিক-মুতাকাল্লিম, প্রজ্ঞাবান চিন্তাবিদ ও আলেম শ্রেণী (অন্তত এতটুকু সুস্পষ্ট ও ধারাবাহিকভাবে) ব্যবহার করেননি।

ইরতিফাকাতের গুরুত্ব

ইরতিফাকাত বলে শাহ সাহেবের উদ্দেশ্য, মানুষের পারস্পরিক বৈধ হিতাকাঙ্ক্ষা, সাহায্য-সহযোগিতা, সামাজিক সম্মিলিত কর্মকাণ্ড, ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ নাগরিক জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য 'হিতকর ব্যবস্থাপনা'।

এভাবে শাহ সাহেব মানবীয় উৎকর্ষতার ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় দিক এবং ইহ ও পারলৌকিক উভয় জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শাহ সাহেবের মতে এই নেযামে তাকবীনী তথা সৃজনশীল ব্যবস্থাপনা কেবল নবীগণের আনীত শরয়ী ব্যবস্থাপনার অনুকূল হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং তার জন্য সাহায্য-সহযোগিতাকারী ও তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের খাদেম হয়ে থাকা উচিৎ। তিনি চরিত্র-সভ্যতার আলেম ও অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের মাঝে প্রথমবার চারিত্রিক জ্ঞানের সাথে অর্থনীতি ও জীবিকা নির্বাহ জ্ঞানের গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। শাহ সাহেবের মতে যখন এই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তখন অর্থনীতি ও চরিত্র-নৈতিকতা দুটিই চরম মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হয়। যার প্রভাব ধর্ম, চরিত্র, স্থিতিশীল শান্তিপূর্ণ জীবন, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির উপর পতিত হয়। তার মতে মানুষের সামাজিক অবকাঠামো তখনই একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়, যখন কোনও কঠোরতা আরোপের মাধ্যমে তাদেরকে অর্থনৈতিক সংকটে বাধ্য করা হয়। সে সময় এই মানুষ (যাদের ভেতর আল্লাহ তা'আলা উচ্চস্তরের আত্মিক যোগ্যতা, আধ্যাত্মিক শক্তি ও উন্নতির অপার সম্ভাবনা সুপ্ত রেখেছেন, তারা) এক টুকরো রুটির জন্য গাধা ও বলদের মত বাধ্যগত হয়ে থাকে এবং সব ধরনের উন্নতি-সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য থেকে হয়ে যায় বঞ্চিত।

নাগরিক ও সামাজিক জীবনের গুরুত্ব ও তার রূপরেখা

শাহ সাহেব নাগরিক ও সামাজিক জীবনের পরিচয় (যার কেন্দ্রস্থলকে المدينة -রাজধানী শব্দে ব্যক্ত করে) এমন জ্ঞানগর্ভ ভাষায় পেশ করেন, যার চেয়ে উৎকৃষ্ট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত (লেখক-দার্শনিকদের মাঝে) করা হয়নি। তিনি باب سياسة المدينة (শহরের রাজনীতি অনুচ্ছেদ) শিরোনামে লিখেছেন– 'শহর বলে আমার উদ্দেশ্য মানুষের সে দল, যাতে কোনও শ্রেণীর ঘনিষ্ঠতা থাকবে এবং তাদের মধ্যে লেনদেন ও আচার-অনুষ্ঠানে থাকবে অংশীদারিত্ব। অবশ্য তারা বসবাস করবে বিভিন্ন স্থানে।

তিনি নগর ব্যবস্থা-এর সংজ্ঞায় বলেন, 'নগর ব্যবস্থা' দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হল এমন কৌশল, যা এই নাগরিক জীবনের মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করে।

অনন্তর তিনি এই সভ্যজীবন বা শহরের সংজ্ঞায় আরেকটু অগ্রসর হয়ে বলেন, 'শহরকে তার অধিবাসী বা নাগরিকদের মাঝে বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে একক ব্যক্তি মনে করা উচিৎ, যা বিভিন্ন অঞ্চল ও সামাজিক রূপরেখায় গঠিত হয়েছে।'

তার মতে "ইরতিফাক" (মৌলিক অধিকার) দুই প্রকার। ১. প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয়। যা গ্রাম্যলোকদেরও আছে। ২. সামাজিক বা উন্নত, যা শহরবাসীর (শহুরে ও সভ্য লোকজনের) রয়েছে। এছাড়া তৃতীয় আরেকটি প্রকারও আছে। সেটি হচ্ছে, রাজনীতি ও ব্যবস্থাপনা। অধিকন্তু এর ফলে চতুর্থ আরেক প্রকার বেরিয়েছে– গণপ্রতিনিধিত্ব। শাহ সাহেব চতুর্থ ইরতিফাকে দেশবাসী (বিভিন্ন রাষ্ট্র ও দূরাঞ্চলগুলো) -এর পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার উপর জোর দেন। এই সম্পর্ক (বিভিন্ন অঞ্চলের মাঝে) এতই জরুরী, যেমন ছিল একই শহরের নাগরিকদের মাঝে প্রাথমিক ও নির্দিষ্ট অবস্থায়।'

কর্মক্ষেত্র ও জীবিকা নির্বাহের প্রশংসিত ও ঘৃণিত রূপরেখা

ইরতিফাকাত প্রসঙ্গে জীবিকা নির্বাহের উপায় বর্ণনা করতে গিয়ে শাহ সাহেব অস্বাভাবিক ও অনৈতিক জীবনোপকরণ বা জীবিকা নির্বাহের পথগুলো উল্লেখ করতে ভুলেননি। তিনি বলেন, 'অনেকের মন-মানসিকতা এমন হয়ে থাকে, যাদের বৈধ পন্থায় জীবিকা নির্বাহ কঠিন মনে হয়। তখন তারা জীবিকা নির্বাহের এমন সব পথে অগ্রসর হয়, যা নাগরিক ও সামাজিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। যেমন– চুরি, জুয়া, লুটতরাজ, ভিক্ষাবৃত্তি এবং বেআইনী ও অনৈতিক কাজ-কারবার।'

এই 'ইরতিফাকাত' সম্পর্কিত আলোচনায় শাহ সাহেবের কলম থেকে এমন কিছু তত্ত্বকণিকা বেরিয়ে এসেছে, যার দ্বারা সভ্যতা, সমাজ ও মানবতার উত্থান-পতনের ইতিহাস সম্পর্কে তার গভীর-জ্ঞান-প্রজ্ঞাই প্রমাণ করে। তিনি বলেন, 'যখন মন-মানসে অস্বাভাবিক স্পর্শকাতরতা, ভারসাম্যহীনতা, সীমাতিরিক্ত স্বাদ-আহ্লাদ, বাড়াবাড়ি পর্যায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শঙ্কামুক্ত নিরাপত্তা এসে যায়, তখন জীবিকা নির্বাহের স্পর্শকাতর-মসৃণ ও জঘন্য নীচু পথ সৃষ্টি হয় আর প্রত্যেক ব্যক্তি একটি বিশেষ জীবনোপকরণ বা উৎপাদন প্রক্রিয়ার ঠিকাদার হয়ে যায়।'

শাহ সাহেব নাগরিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর বিষয়গুলোর মধ্যে আরও উল্লেখ করেছেন, সকল নাগরিকের একই আয়ের পথ বেছে নেয়া। যেমন, সকলেই ব্যবসা শুরু করল, কৃষিকাজ ছেড়ে দিল অথবা যুদ্ধের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের পথ অবলম্বন করল। তাঁর মতে কৃষি খাদ্যের পর্যায়ে আর কারিগরি, শিল্প, ব্যবসা ও আইন-শৃঙ্খলা লবণের পর্যায়ে। এ প্রসঙ্গেই শাহ সাহেব বিরাট এক তাত্ত্বিক কথা লিখেছেন। বলেছেন, 'এ যুগে দেশ ধ্বংসের বড় দুটি কারণ রয়েছে।

১. বিনা পরিশ্রমে সরকারী তহবিলের উপর বোঝা হওয়া।

২. কৃষক, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী ও বিভিন্ন কর্মজীবীদের উপর ভারী ভারী ট্যাক্স চাপিয়ে দেওয়া। শেষাংশে বলেন– আমাদের যুগের লোকদের এই তাত্ত্বিক বাস্তবতা বুঝে নেওয়া এবং সচেতন হয়ে যাওয়া উচিত।'

সভ্যতা ও সামাজিক বিপর্যয় ও অবক্ষয় সৃষ্টিকারী কারণগুলোর মধ্যে শাহ সাহেব অতিরিক্ত আনন্দ-বিনোদনকেও গণ্য করেন। এতে জীবনোপকরণ ও পরকাল উভয়ই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তন্মধ্যে দাবা খেলায় বিভোর-মত্ততা, শিকারের ব্যাপকতা ও কবুতর পালনকে অন্তর্ভুক্ত করেন। এভাবে চারিত্রিক অপরাধসমূহ ও এমন সব কাজকর্মকে মেনে নেওয়া, সাধারণতঃ যেগুলোকে কোনও সুস্থ-বিবেকবান মানুষ নিজের সত্ত্বার জন্য মেনে নিতে পারে না। সেগুলোকে সভ্যতার জন্য ক্ষতিকর মনে করে। তার মতে এসব কারণে রাজত্বের পতন দেখা দেয়।

সৌভাগ্য ও তার চার উৎস

কিতাবের চতুর্থ অনুচ্ছেদ مبحث السعادة (বা সৌভাগ্যের সোপান) প্রসঙ্গে। তাতে বলা হয়েছে, সৌভাগ্য অর্জন করা মানুষের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর তা আত্মশুদ্ধি এবং পশুবৃত্তিকে ফিরিশতাসুলভ শক্তির অনুগত বানানোর দ্বারা অর্জিত হয়।

শাহ্ সাহেবের মতে সৌভাগ্য লাভের মূল উৎস চারটি। যার জন্য নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। আর এর ব্যাখ্যা আসমানী শরীয়ত। এটা বস্তুতঃ ধর্ম ও শরীয়তসমূহের মৌলিক শাখাগুলোর সামগ্রিক শিরোনাম এবং নবী-রাসূল (স) প্রেরণের উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণতা দানের কার্যকরী মাধ্যম।

১. পবিত্রতা (তথা শারীরিক পবিত্রতা, যা মানুষকে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রস্তুত করে)।
২. আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতা (তথা তাওবা ও অক্ষমতা প্রকাশ, অনুতাপ-অনুশোচনা, আল্লাহর প্রতি মনযোগিতা এবং বিনয়-নম্রতা)।
৩. সততা, উন্নত চরিত্র ও উঁচু স্তরের কাজকর্ম।
৪. দীনদারী ও ন্যায়নিষ্ঠা (তথা এমন আত্মিক যোগ্যতা, যার প্রতিক্রিয়ায় দেশ ও জাতির শৃঙ্খলা সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়)।

এভাবে শাহ সাহেব মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠন, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং একটি সুস্থ ও পরস্পর সহমর্মী সমাজ বিনির্মাণের মূলনীতিগুলো তুলে ধরেছেন, যা আসমানী শরীয়ত ও নবী-রাসূল প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এরপর উক্ত চারটি গুণ অর্জনের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। অতঃপর সেসব প্রতিবন্ধকতা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো স্বভাবজাত আদর্শ বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায়। তন্মধ্যে তিন প্রকার গ্রহণ করেছেন।

১. হিজাবুত তবা (তথা মানবিক ও মানসিক চাহিদাগুলোর প্রাধান্য)।
২. হিজাবুর্ রুসম (বাইরের অবস্থা ও পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব)।
৩. হিজাবু সূইল মা'রিফা (তথা ভ্রান্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রচলিত ভ্রান্ত আকীদাসমূহের প্রভাব)।

এরপর তিনি এসবের প্রতিকার বর্ণনা করেছেন।

আকীদা ও ইবাদত

কিতাবের মূখ্য বিষয় শুরু হয়েছে পঞ্চম অধ্যায় مبحث البر والاثم তথা পাপ-পুণ্য অনুচ্ছেদ থেকে। বস্তুতঃ কিতাবের আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য এটিই। 'بر' বা পুণ্যের মূলনীতি হিসেবে শাহ সাহেব সর্বপ্রথম তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কারণ, এর উপরই মুখাপেক্ষিতা, অক্ষমতা, অনুতাপ-অনুযোগ প্রকাশ সীমাবদ্ধ, যা সৌভাগ্য লাভের সবচেয়ে বড় উপায়। এক্ষেত্রে শাহ সাহেব তাওহীদের চারটি স্তর বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে আরবের মুশরিকদের শিরকের বাস্তবতা উন্মোচন করেছেন। তাওহীদের পর আল্লাহ পাকের গুণাবলির উপর ঈমান আনয়ন, ভাগ্যলিপির উপর ঈমান আনয়ন এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন (যেমন- শাহ সাহেবের মতে কুরআন, কা'বা, নবী এবং নামায সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন)। এর আলোচনা করতঃ শাহ সাহেব ইবাদত-আনুগত্য ও ফরযসমূহের প্রসঙ্গ শুরু করেছেন এবং সংক্ষেপে অযু-গোসলের রহস্য, নামাযের রহস্য, যাকাতের রহস্য, রোযার রহস্য ও হজ্জের রহস্য সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন। এসব আলোচনা যদিও মৌলিক ও সংক্ষিপ্ত, তথাপি তাতে এমন এমন তত্ত্ব ও তথ্য রয়েছে, যা অন্য কোথাও পাওয়া কঠিন।

যেমন 'নামাযের রহস্য' অনুচ্ছেদে শাহ সাহেব লিখেন, ইবাদতের এই পদ্ধতি তিনটি শারীরিক অবস্থা তথা কিয়াম (দণ্ডায়মান হওয়া), রুকু (মাথা অর্ধনমিত করে ঝুঁকে থাকার অবস্থা) ও সিজদা (কপাল মাটিতে মিলানো অবস্থা) এর সমন্বয়। এখানে বড় থেকে ছোট দিকে অবনমিত হওয়ার স্থলে নিচ থেকে বড় দিকে (কিয়াম থেকে রুকু; রুকু থেকে সিজদার দিকে) উন্নীত হওয়ার নিয়ম রাখা হয়েছে। আর এটাই যুক্তি ও স্বভাবসম্মত। এরপর শাহ সাহেব ইবাদত প্রসঙ্গে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব-মাহাত্ম্য চিন্তাভাবনা, ধ্যান-মগ্নতা ও অব্যাহত যিকির-এর উপর আলোচনা সংক্ষিপ্ত না করার (যা ছিল প্রাচ্যবিদ, দার্শনিক ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের রীতি আবার কোনও কোনও লাগামহীন সূফী দরবেশও এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল) কারণ বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, এই চিন্তা-গবেষণা ও ধ্যান-তন্ময়তা সেসব লোকদের

জন্য সম্ভব ও উপকারী ছিল, যাদের মন-মানস সেসবের সাথে সামঞ্জস্য রাখত। তারা এর মাধ্যমে উন্নতি করতে পারত। নামায হচ্ছে চিন্তা-গবেষণা ও কাজ, মানসিক আকর্ষণ ও শারীরিক কর্মব্যস্ততার অবলেহ সমন্বয়। নামায সর্বশ্রেণীর জন্য উপকারী ও বিরাট প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষেধক। কুসংস্কারের বিষবাষ্প (পরিবেশের বিরূপ প্রভাব) থেকে পরিত্রাণ লাভ এবং মন-মানস বিবেকের অনুগত হওয়ার প্রশিক্ষণের জন্য নামায অপেক্ষা বড় কোনও ফলপ্রসূ ও কার্যকরী পদ্ধতি নেই।

রোযা ও হজ্জের সম্পর্ক যতদূর, সে সম্পর্কেও এ আলোচনায় কিছুটা ইংগিত প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডে এসবের উদ্দেশ্য, রহস্য ও তত্ত্বাবলি সম্পর্কে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার উপমা ইতোপূর্বে কোনও গ্রন্থে দৃষ্টিগোচর হয়নি। তার বিবরণ সামনে যথাস্থানে দেওয়া হবে।

জাতীয় রাজনীতি ও নবী-রাসূলের প্রয়োজনীয়তা

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম مبحث السياسات الملية বা জাতীয় রাজনীতি প্রসঙ্গ। এটি কিতাবের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এর প্রথম অনুচ্ছেদে শাহ সাহেব অত্যন্ত বিচক্ষণতা, দূরদর্শীতা ও বাস্তবধর্মীতার সাথে বলেছেন, মানবজাতির জন্য সত্যের পথপ্রদর্শক ও জাতির সংস্কারক-সংগঠক (তথা নবী-রাসূল)-এর প্রয়োজন কেন হয়েছে? এর জন্য তাদের সুস্থ স্বভাবজাত জ্ঞান ও সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি কেন যথেষ্ট ছিল না? এরপর তিনি এ দলের গুণাবলি ও প্রয়োজনীয় শর্তাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আরও লিখেছেন, তিনি কখন, কিভাবে আপন উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারেন এবং তাতে সাফল্য লাভ করতে পারেন। এ অনুচ্ছেদটি কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে বর্ণিত, 'নবুওয়াত প্রমাণের সাধারণ আলোচনা' থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম মনে হয়। এতে সুস্থ জ্ঞান-বিবেককে আশ্বস্ত করার মত এমন উপাদান রয়েছে, যা কালাম শাস্ত্র ও আকাইদের কিতাবাদিতে সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। এ আলোচনায় নবুওয়াতের পদমর্যাদা ও এর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে যে অনুচ্ছেদ রয়েছে, তা শাহ সাহেবের শরীয়তের প্রাণ ও নবুওয়াতের মেজাযের বাস্তবতা সম্পর্কে বিজ্ঞতা, মানবাত্মা সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন এবং চরিত্রের আভ্যন্তরীণ উৎস সম্পর্কে সচেতনতার প্রতি ইংগিত করে। এ অধ্যায়ে নবী-রাসূল প্রেরণের কারণসমূহের ব্যাপারে স্ববিস্তার আলোচনা করা হয়েছে।

সমসাময়িক দূতপ্রেরণ

শাহ সাহেব লিখেন, সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ নবুওয়াত বা রিসালাত সেই নবী-রাসূলেরই হয়ে থাকে, যার প্রেরণ 'মাকরূন' (বা যৌথ) হয় অর্থাৎ তার

নবুওয়াতির সাথে গোটা এক জাতি তাবলীগ ও দাওয়াতের জন্য আদিষ্ট এবং তার সংস্পর্শের বরকতে তৈরী হয়ে অন্যান্য মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যম হয়। নবীর আবির্ভাব হয় মৌলিকভাবে (আর একে নবুওয়াত বলা হয়); উম্মতের স্থলাভিষিক্ততা ও খেদমতের দায়িত্ব অর্পণ হয় মধ্যস্থতা ও প্রতিনিধিত্ব হিসেবে। রাসূলে কারীম (স) -এর আবির্ভাব এমনই পূর্ণাঙ্গ ছিল, যার সাথে পুরো এক উম্মতকে তাঁর নবুওয়াতের পদমর্যাদার খেদমত ও প্রসারের জন্য হাতিয়ার ও অস্ত্র বানানো হয়েছে। আর এর জন্য দূতপ্রেরণ ও সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.

'যত উম্মত সৃষ্টি হয়েছে, তন্মধ্যে তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত। তোমাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে, যাতে তোমরা লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ কর আর নিষেধ কর অসৎকাজ থেকে। (সূরা আলে ইমরান : ১১০)

হাদীস শরীফে (বা'ছাত) 'দূত প্রেরণ' শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে বলেন,

فانما بعثتم ميسرين ولم تعثوا معسرين.

'তোমাদেরকে সহজতার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে; কঠিনতার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি।'

এ অনুচ্ছেদের বিশেষ প্রতিপাদ্য হচ্ছে সেটি, যাতে নবী-রাসূলগণের সীরাত (জীবন চরিত), তাদের আগ্রহ-চেতনা, মন-মানসিকতা, তাদের দাওয়াত-তাবলীগের পদ্ধতি, তাদের সম্বোধন ভঙ্গি ও শিক্ষাধারা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে শাহ সাহেবের দূরদর্শীতা, বিচক্ষণতা, নবুওয়াত ও আম্বিয়ায়ে কিরামের বৈশিষ্ট্যাবলির গভীর অধ্যয়ন এবং কুরআনে কারীমের অগাধ ব্যুৎপত্তি অনুমান করা যায়।

ইরান ও রোম সভ্যতায় চারিত্রিক ও ঈমানী মূল্যবোধের বিভৎসতা এবং মানবতার দুরাবস্থা

বর্বরতার যুগ যদিও আরবের সাথে সুনির্দিষ্ট ছিল না। তা ছিল বিশ্বময় বিস্ত ত আকীদাগত, চারিত্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এক বিপর্যয়, যা গোটা পৃথিবীকে গ্রাস করে নিয়েছিল। কিন্তু ইরানী ও রোমীরা ছিল এর নেতা ও আসল কর্ণধার। তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকেই সে সময় পৃথিবীতে মানদণ্ড মনে করা হত। তারই (অন্ধ) অনুকরণ করা হত সর্বত্র। তাদের দেশগুলো, কেন্দ্রীয় শহর ও সমাজ সবচেয়ে বেশি এর আক্রমণে ছিল।

এই অবস্থা-পরিস্থিতির যে চিত্র শাহ সাহেব অংকণ করেছেন এবং এর যেসব কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন, এর উত্তম চিত্র প্রাচীন জীবনচরিত ও ইতিহাসের কোনও কিতাবে এবং ইতিহাসে-দর্শন ও সামাজিক জ্ঞানের কোনও পণ্ডিতের কলমে রচিত হতে দেখা যায়নি। এখানে এসে শাহ সাহেবের কলম তার পূর্ণ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। তার লিখনী শক্তি ও রচনাশৈলী আপন উৎকর্ষতায় দেখা যায়। সে আলোচনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

এর দ্বারা সাহেবের ইতিহাসের গভীর জ্ঞান, বাস্তবতা পর্যন্ত পৌঁছার যোগ্যতা ও প্রকৃত অবস্থাচিত্র পর্যবেক্ষণের আল্লাহর প্রদত্ত যোগ্যতা উপলব্ধি করা যায়। শাহ সাহেব লিখেন, 'শত শত বছর ধরে স্বাধীন রাজত্ব করতে করতে আর দুনিয়ার নানা স্বাদ আস্বাদনে নিমজ্জিত থেকে, পরকালকে একেবারে ভুলে যাওয়া ও শয়তানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে যাওয়ার কারণে ইরানী ও রোমীরা জীবনের সহজতা-অনাড়ম্বরতা ও সুখ-শান্তির উপকরণে বিরাট জটিলতা ও স্পর্শকাতর চিন্তাধারা সৃষ্টি করে নিয়েছিল। এতে সর্বপ্রকার উন্নতি ও উৎকৃষ্টতায় একে অন্যের থেকে অগ্রগামী হওয়া এবং গর্ব করার চেষ্টা চালাত। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসব কেন্দ্রস্থলে বড় বড় শিল্পী-কারিগর, পেশাজীবী ও দক্ষ লোকজন এসে জড়ো হয়েছিল। যারা আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির উপকরণে জটিলতা সৃষ্টি করত। নতুন নতুন সাজগোজ-প্রসাধন বের করত। তার উপর তাৎক্ষণিক আমল শুরু হয়ে যেত। তাতে যথারীতি পরিবর্ধন ও চমক থাকত। এসব নিয়ে গর্বও করা হত। জীবনযাত্রা এত উঁচু হয়ে গিয়েছিল যে, আমীরদের কারও জন্য এক লাখ দিরহামের কমমূল্যের পাগড়ী বাঁধা ও মুকুট পরা ছিল চরম দোষণীয়। কারও নিকট যদি বিলাসবহুল প্রাসাদ, ফোয়ারা, গোসলখানা, বাগ-বাগিচা, আয়েশী খাবার, প্রশিক্ষিত জীবজন্তু, সুদর্শন যুবক ও গোলাম না থাকত, খাবারে বিলাসিতা ও আড়ম্বরতা আর পোশাক-পরিচ্ছদে বৈচিত্র্য না হত, তাহলে সম-সাময়িকদের মাঝে তার কোনও সম্মান থাকত না। এ বিবরণ অনেক দীর্ঘ। স্বদেশের রাজা-বাদশাদের যে অবস্থা দেখছেন, তা এর সঙ্গে অনুমান করতে পারেন।

এসব বিলাসিতা তাদের জীবন ও সমাজের (অবিচ্ছেদ্য) অংশ হয়ে গিয়েছিল। তাদের মনের ভেতর এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, কোনভাবেই বের করা যেত না। এ কারণে এমন এক দূরারোগ্য ব্যাধি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, যা তাদের সভ্যতায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এ ছিল এক মহাবিপদ। যার থেকে সাধারণ-অসাধারণ, ধনী-দরিদ্র কেউই নিরাপদ ছিল না। প্রত্যেক নাগরিকের উপর এই বিলাসিতা ও আমীরানা জীবনধারা এমনভাবে চেপে বসেছিল, যা তাদেরকে (সহজ) জীবন থেকে অক্ষম করে

দিয়েছিল। তাদের মাথার উপর প্রতিনিয়ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার এক পাহাড় পড়ে থাকত।

কথা হল, এই বিলাসিতা বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা ছাড়া লাভ করা যেত না আর এই অর্থ ও অঢেল ধন-সম্পদ কৃষক, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশাজীবীদের উপর কর ও ট্যাক্স বাড়ানো এবং তাদের উপর শোষণ চালানো ছাড়া হস্তগত হত না। তারা যদি এসব দাবী পূরণ করতে অস্বীকৃতি জানাত, তবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হত। তাদেরকে নানা ধরনের শাস্তি দেওয়া হত। আর তারা যদি মেনে নিত, তবে তাদেরকে খাটানো হত গাধা ও বলদের মত। যাদের দ্বারা পানি উত্তোলন ও কৃষিকাজে সাহায্য নেওয়া হত। কেবল সেবার জন্যই তাদের লালন-পালন করা হত। তারা কখনও কষ্ট-পরিশ্রম থেকে নিষ্কৃতি পেত না।

এই কষ্টপূর্ণ ও পশুসুলভ (মানবেতর) জীবনের পরিণামে কখনও তাদের মাথা উঠানো এবং পরকালীন সৌভাগ্য লাভের কল্পনা করারও সময়-সুযোগ হত না। অনেক সময় গোটা দেশেও এমন কোনও মানব সন্তান পাওয়া যেত না, যার মধ্যে নিজ ধর্মের চিন্তা-ভাবনা ও গুরুত্ব রয়েছে।'

আরও কিছু উপকারী কথা

এর পরের বিষয়বস্তু 'ধর্মের আসল/উৎস একটি।' আর শরীয়তের রাস্তায় বিশেষ কোনও যুগ ও জাতির পক্ষাবলম্বনের কারণে মতবিরোধ হয়। তারপর এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, দীন-ধর্মের একটি উৎস হওয়া সত্ত্বেও সেসব পথে কেন জবাবদিহি করা হয়?

সহজিকরণ, উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের তত্ত্ব ইত্যাদির অধীন বিষয়গুলো আলোচনার পর শাহ সাহেব এমন ধর্মের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছেন, যা সকল ধর্ম বিলুপ্তকারী হবে। তাছাড়া ধর্মকে কিভাবে বিকৃতির ছোবল থেকে রক্ষা করা যায়, বিকৃতি-পরিবর্তন কোন কোন পথে ও ছিদ্র দিয়ে ধর্মে অনুপ্রবেশ করে, কী কী রূপে তা বিকশিত হয়? আর কী কী রঙ-রূপ ধারণ করে? শরীয়ত সেসবের প্রতিকার হিসেবে কী পন্থা অবলম্বন করেছে এবং কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে? এরপর বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, নবুওয়াতের যুগে জাহেলী যুগের কী অবস্থা ছিল, রাসূলে কারীম (স) যার সংস্কার করেছেন।

হাদীস ও সুন্নাহর মর্যাদা এবং এ ব্যাপারে উম্মতের কর্মপদ্ধতি

সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম 'مبحث الشرائع من حديث النبى صلى الله عليه وسلم' তথা হাদীসে নববী সম্পর্কে শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি। এতে সেসব

আলোচনা স্থান পেয়েছে, যেগুলো সরাসরি হাদীস ও সুন্নাহর জ্ঞান, তা থেকে মাসায়েল উৎসারণ, উলূমে নববী (স)-এর শ্রেণীভাগ, নবী (স) থেকে শরীয়ত আহরণের অবস্থা-পদ্ধতি, হাদীস গ্রন্থাবলির শ্রেণীবিন্যাস, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শরয়ী উদ্দেশ্যসমূহ উদঘাটনের পদ্ধতি ও বিভিন্ন হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন কিংবা প্রাধান্য দানের বিষয়। এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার সাথে শাহ সাহেব শাখামূলক আলোচনায় সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈদের মতানৈক্যের কারণগুলো বর্ণনা করেন। সেসবের উদাহরণ উদ্ধৃত করার পর ফকীহগণের মতাদর্শে মতবিরোধ এবং হাদীস বিশারদ ও চিন্তাবিদগণের মতানৈক্যের পার্থক্য বর্ণনা করেন। চতুর্থ হিজরী শতকের পূর্বাপর মানুষের মাসআলা জিজ্ঞাসা ও এর উপর আমল করা এবং এক্ষেত্রে বিশেষ-অবিশেষ মহলের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল? এসবের সবিস্তর ব্যাখ্যা দেন, যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গভীর আলোচনা সমৃদ্ধ এবং যা কালাম কিংবা উসূলে ফিকহ শাস্ত্রের কোনও কিতাবে পাওয়া দুষ্কর।

ফরযসমূহ ও রুকনগুলোর তত্ত্ব-রহস্য

শাহ সাহেব আকাইদ থেকে নিয়ে ইবাদত-আনুগত্য, লেনদেন, আচার-অনুষ্ঠান, ইহসান-অনুগ্রহ, আত্মশুদ্ধি, আইন-শৃঙ্খলা, অবস্থা-পরিস্থিতি, জীবনোপকরণ বা জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতি, দান ও সাহায্য-সহযোগিতা, পরিবার ব্যবস্থা, খেলাফত ও শাসন ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, যুদ্ধ-জিহাদ, পানাহারের শিষ্টাচার, বন্ধুত্ব নীতি, সামাজিকতা আর সবশেষে ফিতান, পরকালীন ঘটনাপ্রবাহ ও কিয়ামতের আলামত পর্যন্ত হাদীসের আলোকে আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে সীরাতে নববী (স)-এর সারমর্মও পেশ করেছেন। সেসব অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য-রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, এসব বিষয়ের সম্পর্ক জীবন, সভ্যতা, চরিত্র-নৈতিকতা থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। বস্তুতঃ এটিই কিতাবের কেন্দ্রীয় বা মূল প্রতিপাদ্য। শাহ সাহেবের ইচ্ছা ছিল, হাদীস শিক্ষাদান যেন সেসব তত্ত্ব-রহস্যের আলোকে আমল ও চরিত্র-নৈতিকতা, সভ্যতা-সামাজিকতা, মানবীয় সাফল্য ও পারস্পরিক সম্পর্কের সঙ্গে হয়। যেন সেসবের পূর্ণ প্রভাব পড়ে জীবন, আমল-আখলাক, সভ্যতা ও সামাজিকতার ওপর। সামঞ্জস্য বিধান হয় ঐতিহ্যগত ও যৌক্তিক দলীল-প্রমাণের মাঝে, বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে এসবের উপর আপত্তি উত্থাপন, হাদীস ও সুন্নাতের মূল্য, উপকারিতা এবং তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা (যাকে শাহ সাহেবের দূরদর্শী ও সূক্ষ্মদৃষ্টি দেখে নিয়েছিল) ও মানসিক বিক্ষিপ্ত সৃষ্টির সুযোগ না হয়। আমলী আরকান ও চার

ফরয সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন, তা এরই অংশ এবং 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' -এর একটি বৈশিষ্ট্য। এখানে উদাহরণস্বরূপ কেবল রোযা ও হজ্জের উদ্দেশ্যভেদ এবং এগুলোর ইসলামী ও শরয়ী রূপরেখার সূক্ষ্মতার উপর শাহ সাহেব যা কিছু লিখেছেন, তা উল্লেখ করা হচ্ছে। রোযা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তার পরিমাণ ও রোযার সংখ্যা নির্ধারণের রহস্য (যা ইসলামী শরীয়তের সাথে নির্দিষ্ট) এবং এর শরয়ী বিধানের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি লিখেন, 'রোযার মধ্যে (সময়, সংখ্যা ও পরিমাণের) স্বেচ্ছাধিকার দিয়ে দেওয়া হলে অপব্যাখ্যা ও পলায়নের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। রুদ্ধ হয়ে যাবে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ-এর পথ। বিরাট উদাসীনতার শিকার হয়ে যাবে ইসলামের এই সবচেয়ে বড় আনুগত্য-ইবাদত।

এরপর রোযার পরিমাণ ও সংখ্যা প্রসঙ্গে লিখেন, 'এর নির্ধারণেরও প্রয়োজন ছিল। যেন তাতে বাড়াবাড়ি ও উদাসীনতার না থাকে। নতুবা কেউ কেউ এর উপর এতটুকু আমল করত, যার দ্বারা কোনও কল্যাণ হত না আর না কোন প্রভাব পড়ত। আবার কেউ কেউ এত বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করত যে, তার অক্ষমতা ও দুর্বলতার সীমায় পৌঁছে যেত। আর সে হয়ে যেত মৃতপ্রায়/অর্ধমৃত। মূলতঃ রোযা একটি প্রতিষেধক। প্রবৃত্তির বিষ নামানোর জন্য যার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই এতে প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়।

তারপর রোযার উভয় শ্রেণী (তথা প্রথমতঃ সেই রোযা, যাতে পানাহারসহ রোযার পরিপন্থী সকল প্রকার কাজকর্ম থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকতে হয়। দ্বিতীয়তঃ সেই রোযা যাতে কতিপয় বিষয় থেকে বাঁচতে হয়। আর কতিপয় বিষয় থেকে বাঁচতে হয় না -এর মাঝে তুলনা করে প্রথমোক্ত রোযাকে প্রাধান্য দেন। সাথে সাথে অভিজ্ঞতা, জ্ঞানের গভীরতা ও আধ্যাত্মিকতার আলোকে এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতঃ লিখেন, 'আহার কমানোর দুটি পদ্ধতি। এক. খাবারের পরিমাণ হ্রাস করে দেওয়া। দুই. আহারের মধ্যে এত দীর্ঘ বিলম্ব রাখা, যাতে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়। শরীয়তে এই দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। কেননা এতে ক্ষুৎ-পিপাসার সঠিক ধারণা জন্মে। পাশবিক কামনায় আঘাত লাগে। বাস্তবেই এতে হ্রাস পেতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে প্রথম পদ্ধতিতে মানুষের উপর বিশেষ কোনও প্রভাব পড়ার পূর্বে তা সৃষ্টি হয় না। কেননা যথারীতি পানাহার চালিয়ে যাওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রথম পদ্ধতির জন্য কোনও সাধারণ নীতিমালা প্রণয়ন করা কঠিন। কারণ, মানুষের অবস্থা বিভিন্ন ধরনের। কেউ এক পোয়া খায় আবার কেউ

খায় আধা সের। সুতরাং এ পদ্ধতি নির্ধারণের ফলে যদি একজনের কল্যাণ হয়, তবে অন্যজনের ক্ষতি হবে।'

তিনি আরও বলেন, এই সুনির্দিষ্টতা ও সময়ের বাধ্যবাধকতায় ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন। তিনি লিখেন, 'এটাও জরুরী ছিল যে, এ সময় যেন অসাধ্য সাধন বা সাধ্যাতীত হুকুম পালনে আক্রান্তকারী না হয়। যেমন, তিনদিন তিনরাত। কেননা এটা শরীয়তের আলোচ্য বিষয়ের বাইরে এবং তার উদ্দেশ্য পরিপন্থী। সাধারণতঃ এর উপর আমল করাও অসম্ভব।'

হজ্জ প্রসঙ্গে তার আলোচনা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তিনি সেখানে লিখেন–

'(হজ্জের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে) সেই উত্তরাধিকার সত্ত্ব সংরক্ষণও আছে, যা আমাদের জাতির পিতা ইবরাহীম (আ) ও আমাদের নেতা ইসমাইল (আ) আমাদের জন্য রেখে গেছেন। কারণ, এ দুজনই মিল্লাতে হানীফার (পবিত্র উম্মাহর) ইমাম এবং আরবে তার প্রতিষ্ঠাতা ও স্থপতি বলা যেতে পারে। রাসূলে কারীম (স)-এর শুভাগমনও এজন্য হয়েছিল, যেন মিল্লাতে হানীফা তার মাধ্যমে পৃথিবীতে জয়লাভ করে এবং তার ঝাণ্ডা সমুন্নত হয়।'

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ملة أبيكم ابراهيم

তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ) এর ধর্ম।

কাজেই এই ধর্মের ইমামের (দিশারীর) পক্ষ থেকে যেসব বিষয় আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, যেমন– স্বভাবজাত গুণাবলি, হজ্জব্রত পালন ইত্যাদি আমাদের সংরক্ষণ করা জরুরী। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন–

قفوا على مشاعركم فانكم على أرث من إرث أبيكم.

'আপন নিদর্শন/স্থানসমূহে অবস্থান করো। কেননা তোমরা আপন পিতার একই উত্তরাধিকার সত্ত্বের উত্তরাধিকারী।'

এছাড়া তিনি আরেকটি তত্ত্ব-দর্শন বর্ণনা করে লিখেন– 'যেভাবে সরকারের কিছুদিন পরপর একটি গণজরিপ ও পরিদর্শনের প্রয়োজন হয়, যেন সে জানাতে পারে– কে কৃতজ্ঞ? কে বিদ্রোহী? কে কর্তব্য পরায়ণ, দায়িত্বশীল আর কে কামচোরা প্রতারক? সাথে সাথে এর মাধ্যমে তার সততা, বিশ্বস্ততার সুখ্যাতি ও সুনাম হয়। তার শ্রমিক, কর্মচারী-কর্মকর্তা ও নাগরিকগণ একে অন্যের সাথে পরিচিত হয়। অনুরূপভাবে জাতির জন্য হজ্জ প্রয়োজন। যাতে মুনাফিক-অমুনাফিক (কপট-অকপট)-এর মাঝে পার্থক্য

নির্ণয় হয়। আল্লাহ পাকের নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহ পাকের দরবারে আবেগ-উচ্ছাস নিয়ে দলে দলে লোকজন হাজির হয়। মানুষ পরস্পর পরিচয় লাভ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা তার কাছে নেই, সে বিষয়ে অন্যের থেকে উপকার লাভ করে। কেননা উত্তমতর ও সুন্দর আনন্দদায়ক বিষয়গুলো সাধারণতঃ সংস্পর্শ ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে এবং একে অপরকে দেখে-শুনেই অর্জিত হয়।'

তিনি আরও লিখেন, 'হজ্জ যেহেতু এমন একটি মুহূর্ত, যেখানে সকলেই সমবেত হয়, তাই এটি বিভ্রান্তিকর রুসম-রেওয়াজ থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্য খুবই ফলপ্রসূ। জাতির মধ্যে তাঁদের ইমাম ও দিশারীদের স্মৃতিচারণ এবং মনের মণিকোঠায় তাদের আনুগত্য ও অনুকরণের আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য কোনও কিছু এ পর্যায়ের নেই, যা তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।'

অন্যত্র লিখেন, 'হজ্জের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে আরেকটি বিষয় হল, যার জন্য সরকার-প্রশাসন কোনও প্রদর্শনী কিংবা সরকারী উৎসবের আয়োজন করে। আর তা দেখার জন্য কাছে-দূরের সকল স্থান থেকে মানুষ এসে সমবেত হয়। মিলিত হয় একে অন্যের সাথে। নিজের শাসন ব্যবস্থা ও জাতির শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে অবগতি লাভ করে। তার পবিত্র ও পুণ্যময় স্থানগুলোর সম্মান রক্ষা করে। অনুরূপভাবে হজ্জ মুসলমানদের একটি জাতীয় প্রদর্শনী কিংবা রাজকীয় অনুষ্ঠান। যেখানে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রকাশ পায়। তাদের শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়। তাদের জাতির নাম উজ্জ্বল হয়।' আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন— '

وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا.

'আর (স্মরণ করো সে সময়ের কথা) আমি কাবাকে করেছি মানুষের জন্য প্রত্যাবর্তনস্থল ও নিরাপদ শান্তির স্থান।'

কিতাবের স্বয়ংসম্পূর্ণতা

এ গ্রন্থের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, ফিক্হ, হাদীস, আকাইদ, ইবাদত, লেনদেন ও আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত অধ্যায় ও অনুচ্ছেদগুলো ব্যতিত এতে পরিবারব্যবস্থা, পারিবারিক শৃঙ্খলা বিধান, খেলাফত (গণপ্রতিনিধিত্ব) ও বিচারব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অধ্যায় এবং সাহচর্যের শিষ্টাচারসমূহের আলোচনাও রয়েছে। যা চরিত্র, নৈতিকতা, সামাজিকতা, সভ্যতা ও জীবনোপায়ের সাথে সম্পৃক্ত। সাধারণতঃ কোনও ফিকহী কিংবা দর্শন শাস্ত্রের বই-পুস্তকে এসবের আশা করা যায় না।

অনুগ্রহ ও আত্মশুদ্ধি

অধিকন্তু এ গ্রন্থে শাহ সাহেব হাদীস ও জীবন-চরিতের আলোকে বিন্যস্ত অনুগ্রহ ও আত্মশুদ্ধির এমন নীতিমালা উপস্থাপন করেছেন, যার উপর চলে মানুষ আল্লাহর নৈকট্যের উঁচু থেকে উঁচু সিঁড়িগুলো, বেলায়েতের স্তরসমূহ, মর্যাদার আসন ও অবস্থাসমূহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। ইহ্সান সম্পর্কিত এই অনুচ্ছেদটি কিতাবের ৬৬-১০১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অনুচ্ছেদে শাহ সাহেব সেসব উপাদানসমূহ নিয়ে আলোকপাত করেছেন, যেগুলো বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে শুধুমাত্র হাজির করা, ইচ্ছা-সংকল্প এবং শারীরিক ও বাতেনী অবস্থাসমূহের সঙ্গে আত্মার প্রতি মনোনিবেশ করার উপর জোর দিয়েছেন। সেসঙ্গে ক্রমাগত দুঃখ-ব্যথা ও রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা, ঐ শরীয়তসম্মত পন্থা, ফরয, ইবাদত ও যিকির-আযকারের মাধ্যমে নির্বাচন করেছেন। সাথে সাথে বদঅভ্যাস ও নীচুতার প্রতিষেধক চিকিৎসা এবং উত্তম-উন্নত স্বভাব-চরিত্র অর্জনের পন্থাও শরীয়ত ও সুন্নাতের সুস্পষ্ট নির্দেশনায় বর্ণনা করেছেন।

এ অধ্যায়ে তিনি বর্ণিত যিকিরসমূহ, শরীয়তসম্মত দু'আসমূহ এবং ইস্তিগফার-তাওবার গুরুত্বপূর্ণ শব্দাবলীও সন্নিবেশিত করেছেন। কার্যকরী মাকবূল দু'আর পদ্ধতি এবং তার শর্তাবলীও বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মানবিক চাহিদা, জীবনের প্রয়োজনাদি ও ধর্মীয় আমলগুলো নিয়তের পরিচ্ছন্নতার সাথে আদায় করার প্রতি তাগিদ করেছেন। এসবের প্রভাব-ক্রিয়া ও অবস্থাবলি ব্যতিক্রম হওয়ার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'ভালোভাবে হৃদয়াঙ্গম করে নিন, নিয়ত হচ্ছে (সবকিছুর) প্রাণ-আত্মা। আর ইবাদত হল দেহ। আত্মা ছাড়া শরীর/দেহ বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আত্মা দেহ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পরও জীবিত থাকে। কিন্তু জীবন/বেঁচে থাকার প্রতিক্রিয়া দেহ ছাড়া পুরোপুরিভাবে প্রকাশ পায় না। কাজেই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لن ينال الله لحمها و لا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم'.

'আল্লাহ পাকের এসব কুরবানীর (পশুর) গোশত ও রক্ত পৌঁছে না। সেখানে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া বা আল্লাহভীরুতা। (সূরা হজ্জ : ৩৭)

আর রাসূলে কারীম (স) ইরশাদ করেছেন,

إنما الاعمال بالنيات

'সকল আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়তের উপর নির্ভরশীল।'

অনন্তর শাহ সাহেব নিম্নোক্ত ভাষায় 'নিয়ত'-এর সংজ্ঞা পেশ করেন। 'নিয়ত বলে আমাদের উদ্দেশ্য তাসদীক তথা সত্যায়ন ও বিশ্বাসের সেই মানসিক অবস্থা, যা তাকে সে কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আনুগত্যকারীদের প্রতিদান আর অবাধ্যদেরকে শাস্তি দেওয়ার যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন, তা এই হুকুম পালন এবং এই পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার কারণ –এ বিশ্বাস করা।'

আলোচ্য অনুচ্ছেদের শেষে শাহ সাহেব উন্নত চরিত্র গঠন, সৃষ্টিজীবের অধিকার সংরক্ষণ ও উত্তম আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস বাছাই করে লিখে দিয়েছেন। যার উপর আমল করলে মানুষ কল্যাণ ও পবিত্রতার উচ্চস্তরে পৌঁছে যেতে পারে। এরপর সেসব মর্যাদা ও অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন, যেগুলো উপকার ও পবিত্রতার সুফলে অর্জিত হয়; যা বাতেনী নূর, অন্তরের সচেতনতা, আত্মার পরিচ্ছন্নতা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও উর্ধ্বজগতের সাহায্য-সমর্থনের সুফল।

জিহাদ

উক্ত গ্রন্থে জিহাদ সম্পর্কেও একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। আর তা শাহ সাহেব এক তথ্যবহুল ও বিস্ময়কর শব্দমালা দিয়ে শুরু করেছেন। যা সকল ধর্ম ও জাতির পুরো ইতিহাস, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যসমূহ ও সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টার উদ্দিষ্ট ব্যবস্থার উপর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কোনও জ্ঞানী পণ্ডিতই লিখতে পারেন। শাহ সাহেব লিখেন, 'স্মরণ রাখুন! সার্বিকভাবে পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত এবং তার স্বয়ংসম্পূর্ণ সংবিধান হচ্ছে সেই শরীয়ত, যাতে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

মোটকথা, এই গ্রন্থখানা তার স্বয়ংসম্পূর্ণতা, তাত্ত্বিকতা, দীন ও শরীয়তের ব্যাপক-প্রশস্ত, মজবুত নিবিড় ব্যাখ্যা এবং কিতাবের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছড়ানো ছিটানো শত-সহস্র অমূল্য তথ্য-কণিকা ও সূক্ষ্ম গবেষণার ভিত্তিতে ইসলামী গ্রন্থশালায় বহুদিক থেকে সম্পূর্ণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এক কথায় 'كم ترك الاول للاخر' 'কত কী রেখে গেলেন প্রবীণগণ পরবর্তীদের জন্য'-এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মাওলানা শিবলী (র) তার বিখ্যাত 'ইলমুল কালাম' গ্রন্থে লিখেছেন– 'আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) ও ইবনে রুশদ -এর পরে বরং স্বয়ং তাদের যুগেই মুসলমানদের মধ্যে চিন্তাধারার যে অধঃপতন শুরু হয়, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এ আশা ছিল না যে, ফের কোনও (মুসলিম) চিন্তাবিদ, সূক্ষ্মদর্শী ও গবেষক জন্ম নিবে। কিন্তু মহান কুদরতের আপন যাদুর শক্তি দেখানোর ইচ্ছা ছিল। শেষ যুগে যখন ইসলামের প্রাণ ওষ্ঠাগত, ঠিক তখন শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর মত ব্যক্তিত্বের শুভজন্ম হয়, যার

বিচক্ষণতার সামনে ইমাম গাযালী (র), রাযী (র) ইবনে রুশদ (প্রমুখ ব্যক্তিত্ব) -এর কৃতিত্বও ম্লান হয়ে যায়।

আরেকটু সামনে লিখেন– 'শাহ সাহেব ইলমে কালাম বা দর্শন শাস্ত্রের শিরোনামে কোনও রচনা লিখেননি। সে দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে দার্শনিকদের কাতারে শামিল করা বাহ্যতঃ উচিত নয়। কিন্তু তার রচিত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা', যাতে তিনি শরীয়তের তত্ত্বভেদ বর্ণনা করেছেন, বস্তুতঃ কালাম শাস্ত্রের উজ্জ্বল প্রাণ।'

সমকালীন চিন্তাবিদ মাওলানা আবদুল হক হক্কানী (তাফসীরে হাক্কানী ও আকাইদুল ইসলাম রচয়িতা) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা -এর অনুবাদ গ্রন্থ নি'মাতুল্লাহিস সাবিগাহ -এর ভূমিকায় লিখেন– 'যে শাস্ত্রে এই গ্রন্থনা, তাঁর (শাহ সাহেব) পূর্বে একত্রে কেউ তা সন্নিবেশিত করেনি। এ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু শরীয়তে মুহাম্মদী (স)-এর ব্যবস্থাপনা 'من حيث المصلحة و المفيدة' (উপকারী সংস্কারের দৃষ্টিকোণে)। আর তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ যেন স্পষ্ট জেনে নেয়- আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর হুকুম-আহকামের মধ্যে কোন সংকীর্ণতা নেই; আর না তা সুস্থ স্বভাবরীতির পরিপন্থী। যেন সেগুলোর উপর মানুষের পরিপূর্ণ আস্থা জন্মে। সেগুলোকে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল জ্ঞান করে মন সেদিকে আকৃষ্ট হয়। কোনও সন্দিগ্ধতার অজুহাতে মনের মধ্যে সংশয় না জাগে। এর সংজ্ঞা হচ্ছে- এটি সেই ইলম, যাতে ধর্মীয় আইন-কানুন ও শরয়ী আহকামের সূক্ষ্মতা-প্রজ্ঞা জানা যায় আর এর উৎস তার সকল ইলম।'

অষ্টম অধ্যায়

খেলাফত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের প্রমাণ এবং তাদের অনুগ্রহ-দান "ইযালাতুল খফা' 'আন খিলাফাতিল খুলাফা" -এর দর্পণে

'ইযালাতুল খফা' গ্রন্থের গুরুত্ব ও স্বকীয়তা

'ইযালাতুল খফা' শাহ সাহেবের (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা-এর পর) আরেকটি বিশ্বনন্দিত রচনা এবং নিজের বহুমুখী অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের বিচারে আপন বিষয়বস্তুতে একক ও স্বতন্ত্র কিতাব। পূর্ণ কিতাবটিই উন্মত্ততা ও উদ্যম সৃষ্টিকারী জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও আনন্দদায়ক তথ্যকণিকায় ভরা। বিশেষতঃ শাহ সাহেবের কুরআনে কারীমের উপর দীর্ঘ গবেষণা, বিস্ময়কর সম্পৃক্ততা, তার গভীর ও তীক্ষ্ম জ্ঞান, আয়াতের ইংগিত ও সূক্ষ্মতার প্রতি আত্মিক আকর্ষণ, মাসআলা উদঘাটনের গভীরতা এবং মেধার প্রখরতা ইত্যাদির এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যার ফলে একজন ইনসাফপ্রিয় ও সুস্থ বিবেকবান মানুষ নিজে নিজেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে যে, এই জ্ঞান-প্রজ্ঞা নিছক পুঁথিগত ও অর্জিত নয়। এ কিতাবের লেখক সমকালের প্রচলিত পাঠ্য বই, তাফসীর গ্রন্থাবলি, উসূলে ফিকহ ও কালাম শাস্ত্রের সাজানো রঙিন মোড়ক এবং সেসবের বর্জ্য ও উচ্ছিষ্ট চয়নকারী নন; তার এই জ্ঞান-প্রজ্ঞার সম্পর্ক মহান স্রষ্টার দান ও খোদায়ী অনুকম্পার সঙ্গে। স্বয়ং শাহ সাহেবের কলম থেকেই অনিচ্ছায় গ্রন্থের সূচনাতেই বেরিয়ে এসেছে নিম্নোক্ত শব্দমালা।

'ঘটনা হল, আল্লাহর তাওফীকের নূর এই অধম বান্দার অন্তরে (স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্রকে) এত ব্যাপক-বিস্তৃত আকারে প্রক্ষিপ্ত করেছে যে, অকাট্যভাবে প্রশান্তির সাথে তার জ্ঞান হয়ে গেছে- সেসব মহাপুরুষগণের (খোলাফায়ে রাশেদীনের) খিলাফতের সত্যতা ও প্রমাণ উসূলে দীন তথা ধর্মীয় উৎসসমূহের মধ্য থেকে একটি বিশাল উৎস। যতক্ষণ পর্যন্ত এই উৎসকে পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে স্বীকার না করা হবে, শরীয়তের কোনও মাসআলাই অকাট্য সাব্যস্ত হবে না।'

যেসব সুযোগ্য উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন মাসআলায় শাহ সাহেবের সঙ্গে মতবিরোধ ছিল এবং যাদের যুক্তিবিদ্যায় ব্যাপৃতি বরং নেতৃত্বের আসন অর্জিত ছিল– এ কিতাবের প্রতি যখন তাদেরও দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, তখন তারা লেখকের জ্ঞানের গভীরতা ও অতলদর্শিতার মূল্য না দিয়ে পারেননি।

মাওলানা মহসিন ইবনে ইয়াহইয়া তারহতী 'اليانع الجنى' রচয়িতা বলেন, 'আমি আপন উস্তাদ মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী (মৃত্যু ১২৭৮ হি.) কে দেখেছি, একটু সময়-সুযোগ পেলেই কোন না কোন কিতাব মুতালা'আয় ধ্যানমগ্ন ও নিমজ্জিত হয়ে যেতেন। আমরা অভ্যাসের পরিপন্থী তার এই ধ্যানমগ্নতা দেখে বিস্মিত হলাম। কৌতূহল জাগল, এটা কী কিতাব? কার রচিত? তিনি নিজেই বলেন, 'এ কিতাবের লেখক জ্ঞানের এমন অথৈ সমুদ্র, যার কোনও কূল-কিনারা নেই।' জানলাম, এটি শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) বিরচিত 'ইযালাতুল খফা'; যার একটি সংস্করণ হযরতের হাতে।

শেষকালের গৌরব মাওলানা আবুল হাসানাত আবদুল হাই ফিরিঙ্গি মহল্লী (মৃত্যু ১৩০৪ হি.), যার জ্ঞানের গভীরতা, যুগের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও দূরদর্শিতা প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত– তিনি তার সুপ্রসিদ্ধ 'التعليق الممجد على مؤطا الامام محمد' গ্রন্থে 'ইযালাতুল খফা' র আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেন– كتبا عديم النظير فى بابه তথা এটি এমন একটি গ্রন্থ যা তার বিষয়বস্তুতে বিরল ও ভূতপূর্ব।

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' ও 'ইযালাতুল খফা'-এর পারস্পরিক সম্পর্ক

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' রচনার পর, যাতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ও সুবিন্যস্ত নেযাম এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে জীবন, সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে ইসলামের নিবিড়তা ও সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হয়। পরিষ্কার হয়ে যায়, ইসলাম নির্দেশিত আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী ও সামাজিক জীবনের বিধি-বিধানের উপর যথাযথ আমল করা ব্যতিত কোনও সুস্থ সমাজ, পরিচ্ছন্ন সভ্যতা, ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিকতার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণ ও পূর্ণতা দান এবং এই মঞ্জিলের বিজ্ঞচিত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সাথে (যাতে অদূর ভবিষ্যতে আগত বৈপ্লবিক যুগের যুক্তিপ্রিয় মন-মানসের প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির খোরাক ছিল) খোদ ইসলামের সমাজব্যবস্থার চাহিদা, বৈশিষ্ট্যাবলি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের পরিধির ওপর এবং তার বিশ্বব্যাপী ও স্থায়ী, সুস্পষ্ট ও অকাট্য খিলাফতের দপ্তরের উপর সেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, ঐতিহ্যগত প্রমাণ ও যৌক্তিকতার সাহায্য, ইতিহাসের সাক্ষ্য এবং কুরআন-হাদীসের আলোকে কলম ধরার খুব বেশি প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া সেসব ভুল ধারণা ও পথভ্রষ্টতার পর্দা বিদীর্ণ করারও প্রয়োজন ছিল, যা এক্ষেত্রে প্রাচীনকাল থেকে প্রকাশ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সেসবের ভিত্তিতে বিরাট এক ফিরকার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। যে ফিরকা বিশেষতঃ শাহ সাহেবের যুগে ইরানী শক্তির বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তাধারার এমন এক বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি করে দিয়েছে, যার প্রভাব আকীদা-বিশ্বাস ও কাজকর্মের সীমানা পেরিয়ে সরকার ব্যবস্থা এবং ভারতবর্ষে

মুসলমানদের শীর্ষ নেতৃত্বের উপরও পড়েছিল। সন্দিগ্ধ ও এলোমেলো করে দিয়েছিল এদেশের মুসলমানদের ভবিষ্যত।

এর অবস্থান (সেসব লোকের দৃষ্টিতে, যারা এ ধর্মের ইতিহাস তার মৌলিক আকীদাসমূহ ও তার ধর্মের অনুভূতি-জ্ঞান সম্পর্কে অবগত ছিল এবং যারা সরাসরি এর নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলি ও মৌলিক উৎসের মুতালা'আ করেছিল) নিছক একটি ইজতিহাদী (উদ্ঘাটনমূলক) মতবিরোধ কিংবা শরীয়তের আওতার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ফিরকার মত ছিল না বরং তা ছিল ঐ ধর্মীয় জ্ঞানের সমতূল্য, যার ভিত্তি কুরআন-হাদীস, নবুওয়াতের পদমর্যাদার সম্মান ও খতমে নবুওয়াতের আকীদার ওপর –এর থেকে ভিন্ন একটি স্বতন্ত্র চিন্তাধারা ও ধর্মীয় অনুভূতি। এর কিছুটা ধারণা হতে পারে ইছনা আশারিয়াহ ফিরকার ইমামতের (নেতৃত্বের) আকীদা থেকে। যাদের মতে ইমামত (নেতৃত্ব) নবুওয়াতের সমতুল্য বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তদপেক্ষা উর্ধ্বে।

শাহ সাহেব উক্ত গ্রন্থ রচনার প্রাথমিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেন– 'নগণ্য দীন ওয়ালীউল্লাহ (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন) বলেন, এ যুগে শী'আ ধর্মমত গ্রহণের বিদ'আত (কুপ্রথা) চালু হয়েছে। সর্বসাধারণের মন-মানসিকতা তাদের সৃষ্ট সংশয়-সন্দেহে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকের মনে খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের নিশ্চয়তার ব্যাপারে নানা ধরনের সন্দেহ ও প্রশ্নের সৃষ্টি হয়ে গেছে।'

শাহ সাহেবের দৃষ্টি এই সন্দিগ্ধকরণ ফিৎনার বাহ্যিক মোড়কের উপরই ছিল না; এর পরতে পরতে যে গভীর ষড়যন্ত্র কাজ করছিল এবং এর যে সুদূরপ্রসারী পরিণতি প্রকাশিতব্য ছিল (যেমন– ইসলামের প্রথম ও সোনালী যুগে ব্যর্থ প্রমাণিত হওয়া, নবীজীর সাহচর্য ও শিক্ষাদীক্ষার নিষ্ক্রিয়তা, সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে সোনালী যুগে কুরআন সংরক্ষণ, সুন্নাতের প্রচার-প্রসার এবং যেসব বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে, সেসবের উপর আস্থাহীনতা ও অবিশ্বাস ইত্যাদি।)– তা-ও দেখতে পাচ্ছিলেন। সুতরাং শাহ সাহেব লিখেন, 'যে ব্যক্তিই খেলাফতে রাশেদার সত্যতা বা শুদ্ধতার নীতিমালা ভেঙে ফেলার অপচেষ্টা করে এবং দীনের এই মৌলিকতাকে অস্বীকার করে, বস্তুতঃ সে যাবতীয় ধর্মীয় জ্ঞানকে ধ্বংস করতে চায়।'

আরেকটু সামনে গিয়ে লিখেন, 'খোলাফায়ে রাশেদীন হলেন রাসূলে কারীম (স) এবং তাঁর উম্মতের মাঝে কুরআনে কারীমের জ্ঞান-গবেষণা প্রাপ্তিতে মাধ্যম বা সেতুবন্ধন।'

এরপর তিনি এ আওতায় সেসব শাস্ত্র ও শাখা-প্রশাখাকেও অন্তর্ভুক্ত করেন, যার দৌলত খোলাফায়ে রাশেদীনের মাধ্যমেই উম্মত লাভ করেছে।

যেমন— ইলমে হাদীস, ইলমে ফিকহ। আরেকটু সামনে গিয়ে উদ্ভাবিত মাসায়েলে বিশেষ কোন রূপরেখায় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা ও উম্মতের মতবিরোধের যবনিকাপাত, সেসঙ্গে ইলমে ইহ্‌সান (পরবর্তী যুগে যাকে ইলমে সুলূক বা আধ্যাত্মিকতা নামে অভিহিত করা হয়), এরপর বর্ণনা করেছেন, দর্শন শাস্ত্রের মর্যাদা, উত্তম চরিত্র এবং হীন চরিত্রের ব্যাখ্যা ও পার্থক্য বিধান, পরিবার ব্যবস্থা বা পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা ও দেশের রাজনীতি ইত্যাদি। শাহ সাহেবের মতে এসব জ্ঞান-বিদ্যা ও যোগ্যতা উম্মত খোলাফায়ে রাশেদীনের শিক্ষা ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমেই পেয়েছে।

এজন্য হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, যা কেমন যেন ইসলামের শিক্ষা ও চিন্তাগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ –এর পরে এটাই দেখানো যথোপযুক্ত ছিল যে, ঘটনাবহুল পৃথিবীতে নবুওয়াত পরবর্তী যুগে কিভাবে সফলতার সাথে সেসব মূলনীতি ও শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দেওয়া হয়েছে? জীবনের উপর কত সুচারুরূপে সেসব প্রয়োগ হয়েছে? মানব সমাজের উপর তার কী কী প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে? দু'টি প্রাচীন পরাশক্তি ও ক্ষমতাধর সভ্যতা (যারা সভ্য দুনিয়াকে পরস্পর ভাগ করে নিয়েছিল এবং যাদের ইতিহাস ছিল শত শত বছরের পুরোনো) যে যে সাম্রাজ্যের (সাসানী রাজত্ব ও রোম সাম্রাজ্য) আশ্রয়ে এবং তাদের নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় পত্র-পল্লবিত হচ্ছিল আর মানব জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করছিল, তা কিভাবে ধূলিস্যাৎ হয়েছে?

কতিপয় প্রাচীন রচনা

ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও এর কর্মপরিধির উপর (মান ও ধরনের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে কেবল সংখ্যা ও পরিমাণের দিক থেকে) আমরা প্রাচীন গ্রন্থভাণ্ডারে খুব কম কিতাবাদিই পাই। এ বিষয়ে ইমাম আবু ইউসূফ (র) (১১৩-১৮২ হি.), যিনি ছিলেন ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ ও খেলাফতে আব্বাসিয়ার প্রধান বিচারপতি। তার রচিত 'কিতাবুল খিরাজ' উৎসমূলের মর্যাদা রাখে। কিন্তু এর আলোচনার পরিধি ইসলামী রাজত্বের আয়ের উৎস, মূলধন ও রাজস্ব ব্যবস্থা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

এ বিষয়ে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রধান বিচারপতি আল্লামা আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবীব মাওয়ারদী (৩৬৪-৪৫০ হি.) বিরচিত 'الأحكام السلطانية والولايات الدينية'। এ গ্রন্থখানা মাঝারি আকারের ২৫৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। এর প্রধান বিষয়বস্তু ইমামত এবং এর শরয়ী বিধান, শর্তাবলী, প্রতিষ্ঠার রূপরেখা, এর নির্বাচিত পদসমূহ, ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান)-এর ফরয-ওয়াজিবসমূহ (আবশ্যকীয় দায়িত্ব-কর্তব্য), বিচারক

নিয়োগের নীতিমালা, নেতৃত্ব, দান-সদকার তত্ত্বাবধায়ন এবং রাজস্ব ও কর উসূল ইত্যাদির বিধি-বিধান, দণ্ডবিধি ও হিসাব প্রস্তুতি ইত্যাদির বিবরণ। খেলাফতে রাশেদার শুদ্ধতা ও প্রমাণ, তাদের মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতিত্ব সম্পর্কে এতে কোনও বর্ণনা নেই।

এই বিষয়বস্তুর উপর সবচেয়ে বড় কিতাব 'আল-গিয়াছী'-এর পূর্ণ নাম 'غياث الامم فى التياث الظلم'। কিতাবখানার রচয়িতা ইমাম গাযালী (র)-এর স্বনামধন্য উস্তাদ এবং সমকালীন উস্তাদগণের উস্তাদ ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী আবদুল মালিক আল জুওয়াইনী (৪১৯-৪৭৮ হি.)। এটি মূলতঃ সালজুকী সাম্রাজ্যের বিখ্যাত বিচক্ষণ উযীর নিযামুল মুলক তূসী (৪০৮-৪৮৫ হি.) (যিনি মাদরাসায়ে নিযামিয়া বাগদাদ ও নিশাপুর)-এর পরামর্শ ও পর্যালোচনার জন্য লিখা হয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা যথারীতি মুলুকে আলফে আরসালান ও মালিক শাহ সালজুকীর উযীর এবং রাজত্বের সেনাপ্রধান ছিলেন আর প্রকৃতপক্ষে ছিলেন এই বিশাল সাম্রাজ্যের বরং রাজত্বের প্রধান কর্তা। উক্ত কিতাবখানা বস্তুতঃ ইমামতের শরয়ী বিধান, গুণ- বৈশিষ্ট্যসমূহ ও দায়িত্ব-কতর্ব্য সম্পর্কিত। এ প্রথম অংশে ইমাম ও নেতৃবর্গ, জনপ্রতিনিধি ও বিচারকদের গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া কদাচ কোনকালে যদি কোনও ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) না থাকে, তখন কী করতে হবে, তা-ও আলোচনা করা হয়েছে। সেসঙ্গে মুফতী ও শাসকবর্গের গুণাবলি ও মর্যাদার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাদের অনুপস্থিতিতে উম্মতের দায়িত্ব-কর্তব্য কী হবে? যদি নেতৃত্বের আসনে অযোগ্য কেউ অস্ত্রের জোরে চড়ে বসে, তাহলে মুসলমানদের কী করা উচিৎ? সময়কাল যদি মুফতীশূন্য হয় (বা কোন সময় যদি দেশে ফাতওয়া প্রদানকারী লোকজন না পাওয়া যায়) তখন উম্মতের কী কর্তব্য? ইমাম শূন্যতার কারণগুলো কী কী? এরপর বিস্তারিতভাবে সেসব ফিকহী মাসায়েল বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলা মুফতীগণ না থাকাবস্থায় উম্মতের জন্য জানা ও তার উপর আমল করা প্রয়োজন। এখানে কিতাবখানা (শাফিঈ) ফিকহের কিতাব হয়ে যায়। তাতে খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের শুদ্ধতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা নেই। সেটি মূলতঃ ইমামতের শরয়ী বিধান, গুণাবলি ও দায়িত্ব-কর্তব্যের উপর লিখিত। কিতাবটিতে জায়গায় জায়গায় মাওয়ারদী বিরচিত 'আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ' এর প্রতি কটাক্ষ আর এর লেখকের বিরুদ্ধে নানা প্রশ্ন-আপত্তিও রয়েছে।

তৃতীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র) (৬৬১-৭২৮ হি.) বিরচিত السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية নামক কিতাবখানা। এই বিজ্ঞ লেখক কিতাবের ভূমিকায় সরাসরি বলে দিয়েছেন,

এটি একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব; যার মধ্যে খোদায়ী রাষ্ট্রনীতি ও নববী প্রতিনিধিত্বের এমন কতিপয় নীতিমালা বর্ণনা করা হবে, যার থেকে রাজা-প্রজা (শাসক ও অধীনস্থ) কেউই অমুখাপেক্ষী নয়। কিতাবটি মূলতঃ নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমার তাফসীর ও ব্যাখ্যা। যাতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إن الله يـامركم أن تـؤدوا الامنـت إلـى أهلهـا واذا حكمـتم بـين النـاس أن تحكموا بالعدل، .... ذلك خير واحسن تاويلا.

'আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতগুলো আমানতদাতাদের কাছে অর্পণ করে দাও আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে (কোন বিষয়ে) মীমাংসা করো, তখন ন্যায়ানুগভাবে (ইনসাফের সাথে) মীমাংসা করবে।........ এটাই অতি মঙ্গলজনক। আর কতই না উত্তম তার প্রত্যাবর্তনস্থল। (সূরা নিসা : ৫৮-৫৯)

কিতাবের প্রথম অংশে প্রথম অনুচ্ছেদের শিরোনাম 'আল-ওয়ালানাত' দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শিরোনাম 'আল-আমওয়াল'। আর দ্বিতীয় অংশে প্রথমে হুদুদুল্লাহ ও হুকূকুল্লাহ সম্পর্কে, এরপর হুকূকুল ইবাদ (বান্দার অধিকার) সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিতাবখানা কলেবরে মধ্যম আকারের ১৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত। এতেও খেলাফতে রাশেদাহ ও খোলাফায়ে রাশেদীন সম্পর্কে মৌলিক, যৌক্তিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ে কোনও প্রতিবাদ করা হয়নি। যার ব্যাপারে কিতাবের স্বনামধন্য লেখক সনদ ও ইমামের মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি যদি এদিকে মনোনিবেশ করতেন, তাহলে সেটি হত ইসলামের গবেষণামূলক গ্রন্থ ভাণ্ডার ও আলোচ্য বিষয়ে বিরাট অমূল্য সমৃদ্ধি। এ বিষয়ে তার অগাধ জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও লিখনী শক্তি 'মিনহাজুস্ সুন্নাহ'র পাতায় পাতায় তার আসল কৃতিত্ব দেখিয়েছে। সেখানে তার জ্ঞানসমুদ্রের তরঙ্গমালা ও তীক্ষ্ম কলমের তেজস্বিতার যাদু পরিলক্ষিত হয়।

ইসলামে খেলাফতের মর্যাদা ও অবস্থান

কুরআনে কারীম ও হাদীসে নববীতে ইসলামী দাওয়াত দীনে মুহাম্মাদী (স) গ্রহণ এবং এর প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারীদের চিন্তা-ভাবনা একটি সুশৃঙ্খল ও ঐক্যবদ্ধ দল হিসেবেই করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে উম্মত, মিল্লাত, জামাআত ইত্যাদি যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো সবই এ বাস্তবতার প্রতি ইংগিত করে। বিচক্ষণ চিন্তাবিদগণ জানেন, এ শব্দগুলো কুরআন-হাদীসের অভিধান ও পরিভাষায় 'নিছক সংখ্যার আধিক্য ও মানুষের ভীড়'-এর মত বাহ্যিক অর্থ ও মর্মের জন্য ব্যবহার করা হয়নি। বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির

ইতিহাসে এবং গোষ্ঠী ও সভ্যতার ক্ষেত্রেও যার কোনও মূল্য ও প্রভাব নেই, বরং গোটা কুরআনে কারীমে কোথাও প্রাচীন উম্মতসমূহের ঘটনাবলির ধারাবাহিকতায় আবার কোথাও শক্তি-দুর্বলতা ও জয়-পরাজয়ের কারণগুলো বর্ণনায় সংখ্যাধিক্যের নিষ্ক্রিয়তা, মানবীয় ভীড়ের মূল্যহীনতা, পুণ্যবান কত ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে বিপদ-বিপর্যয়ের প্রাচুর্য, মানুষের নিষ্ঠুরতা-নির্মমতা এবং সত্যধর্মের পরাভবের আলোচনায় ভরা। যাতে মনে হয়, ন্যায়-ইনসাফের মানদণ্ড ও বিবেকের মানদণ্ড উভয়ভাবে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন জনসংখ্যার (গণনায় যত বেশিই হোক) তেমন কোনও গুরুত্ব ও উপকারিতা নেই।

ইসলামের দৃষ্টিতে যেসব মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রয়েছে, তন্মধ্যে দাস ও প্রভুর মধ্যকার সম্পর্কের সংশোধন, শৃঙ্খলা বিন্যাস, এর উন্নতি ও ব্যাপৃতি, মানব জীবনকে তার ছাঁচে ঢেলে সাজানোর প্রচেষ্টা, জামাতের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়ন, পরিচ্ছন্নতা এবং মনোহারিতাও রয়েছে। এমন এক সুশৃঙ্খল, সুসজ্জিত নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য রয়েছে পরিবেশ সমতল করার বিষয়টিও। যেখানে সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত ফরযসমূহ (অবশ্য পালনীয় নির্দেশসমূহ) ও সৃষ্টিজীবের অধিকার দু'টিই আদায় করার পূর্ণ সুযোগ এবং সেসব যোগ্যতা-পূর্ণতা ও উচ্চাসনে পৌঁছার পুরোপুরি অবকাশ পাওয়া যায়, যার যোগ্যতা মানব সত্ত্বায় গচ্ছিত রাখা হয়েছে। সে চেষ্টা করেছে, তার কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা যেন সেসব বিপদ-আশঙ্কার মোকাবেলা করা, সেসব ক্ষয়ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা ও সেসব বিপর্যয়-বিশৃঙ্খল বিদূরিতকরণে বিনষ্ট না হয়, যা কখনো বিশৃঙ্খল জীবন থেকে জন্ম নেয়, কখনো মনগড়া আইন-কানুন থেকে, কখনও লাগামহীনতা থেকে, সম্মান ও নেতৃত্বের মোহ থেকে। সেজন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ একটি আইন/সংবিধান, আসমানী শরীয়ত, আল্লাহ পাকের প্রভুত্ব ও প্রজ্ঞায় বিশ্বাসী একটি খেলাফত ও শাসন ব্যবস্থা জরুরী। খোদায়ী শরীয়তের সম্পর্ক যতদূর, তার আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, ভুল-ত্রুটি মুক্ত, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও স্বার্থসমূহ, সাম্প্রদায়িকতা ও পক্ষপাতিত্ব থেকে অনেক উর্ধ্বে হওয়ার বিশ্বাস থাকা জরুরী। আর খেলাফত ও শাসন যতদূর বিস্তৃত তা এই শরীয়তের সঠিক ব্যাখ্যাতা ও মুখপাত্র। আর মানবীয় শক্তি ও ইচ্ছার শেষ পর্যন্ত অপাত্রে সাহায্য-সহযোগিতা ও সাম্প্রদায়িকতা, খোশামোদ এবং অসাম্য থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

এসব মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও তার সুফল প্রকাশের জন্য প্রথম থেকেই শরীয়তপ্রণেতা (মুহাম্মদ স.) এমন সব হুকুম-আহকাম, হেদায়াত ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, যার বিদ্যমানতায় মুসলমান এমন এক অসাধারণ সুশৃঙ্খল ও সুসংহত জনগোষ্ঠীর রূপ ধারণ করতে বাধ্য হয়। যা এমন এক

ব্যক্তিসত্ত্বার হুকুম ও ব্যবস্থার অনুগত– যিনি বহুবিধ বৈশিষ্ট্যে তাদের থেকে স্বকীয়তার অধিকারী। তাদের কল্যাণ, স্বার্থ ও প্রয়োজনাদির ব্যবস্থাপক। তিনি একে মনোনীত করেছেন শরীয়তের প্রশস্ত ও লাবণ্যময় দিকনির্দেশনা ও মূলনীতির আলোকে। তিনি যদি ইমামতে কুবরার আসনে তথা রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তবে তাকে খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন বা শাসক বলা হবে। আর যদি তিনি তার প্রতিনিধি বা তার বিশেষ দূত হন কিংবা শরীয়তের বিধি-বিধান কার্যকর করা, মামলা-মোকাদ্দমা নিষ্পত্তি ও সুশৃঙ্খল ধর্মীয় জীবন-যাপনের জন্য মুসলমানগণ তাকে (ছোটখাট বিষয়ে ও স্থানীয়ভাবে) মনোনীত করে, তবে তাকে আমল বলা হবে।

খলীফা নির্বাচন করা মূলতঃ এমন একটি দীনী ও ধর্মীয় কর্তব্য, যার ফলে সবচেয়ে বড় আশেকে রাসূল (স) নিবেদিতপ্রাণ বন্ধু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং সবচেয়ে বড় প্রেমিক ও প্রাণউৎসর্গকারী সাহাবায়ে কিরাম (রা) (মহান আহলে বাইতসহ) এ বিষয়টির সমাধান তথা খলীফাতুল মুসলিমীন নির্বাচনকে নবীজীর পূতঃপবিত্র ও পুণ্যময় নূরানী দেহ সমাহিত করার পূর্বে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর সম্ভবতঃ প্রত্যেক খলীফার ইন্তিকালের পর এ নীতিই কার্যকর ছিল। হযরত আবু বকর (রা)-এর নির্বাচন দশ হিজরী থেকে নিয়ে খলীফা মুস্তাকিম বিল্লাহ আব্বাসীর শাহাদাত (৬৫৬ হি.) পর্যন্ত মুসলিম বিশ্ব কখনও ইসলামী খলীফা থেকে বঞ্চিত ছিল না। শুধুমাত্র খলীফা মুস্তারশাদ বিল্লাহ, যিনি সুলতান (শাসক) মাসউদ সালজুকীর হাতে ১০ রমযান ৫২৯ হিজরীতে বন্দি হয়েছিলেন, তার অনুপস্থিতি ও বন্দিদশার কিছুদিন তথা প্রায় তিন মাস সাতদিন মুসলিম বিশ্ব ইসলামী খলীফা শূন্য ছিল। কিন্তু এটি মুসলিম বিশ্বের জন্য এমন বিরল বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ও মর্মন্তুদ ঘটনা ছিল, যার কারণে সে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিভৎস আর বাগদাদ ধ্বংস-বিরান হয়ে গিয়েছিল। আল্লামা ইবনে কাছীর (র)-এর ভাষায়, 'বাগদাদের অধিবাসীদের মাঝে প্রকাশ্য-পরোক্ষ সবদিক থেকে এক ধরনের ভূমিকম্প ছেয়ে যায়। সর্বসাধারণগণ মসজিদের মিম্বরগুলো পর্যন্ত ভেঙে ফেলে। জামাতে অংশগ্রহণও ছেড়ে দেয়। মহিলারা মাথা থেকে দোপাট্টা-উড়না সরিয়ে মাতম করতে করতে বাইরে বেরিয়ে আসে। খলীফার গ্রেফতারী এবং পেরেশানী-অস্থিরতা ও তার বিপদ-বিপর্যয়ে শোক করতে থাকে। অন্যান্য অঞ্চলও বাগদাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে। এরপর এই বিপর্যয় এত বেড়ে যায় যে, কমবেশি সব এলাকাই এতে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। বাদশা সানজর এই অবস্থাদৃষ্টে তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে উদ্ভূত অবস্থা-পরিস্থিতির স্পর্শকাতরতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত এবং সচেতন করেন।

তাকে নির্দেশ দেন, খলীফাকে পুনর্বহাল করার জন্য। বাদশা মাসউদ তার এ নির্দেশ পালন করেন।'

খলীফা মুস্তা'ছিম বিল্লাহর শাহাদাতের প্রেক্ষিতে শায়খ সাদী (র), যিনি খেলাফতের কেন্দ্রস্থল থেকে বহুদূরে শীরাজ নগরীতে বসবাস করতেন, তিনি যে হৃদয়বিদারক ও জ্বালাময়ী মর্সিয়া গেয়েছেন, তার সারমর্ম–

[illegible] ☆ [illegible]

এর দ্বারা অনুভূত হয়, মুসলমান খেলাফত ও খলীফাকে কী দৃষ্টিতে দেখত আর মুসলিম বিশ্ব তাদের হারালে কী অনুভূতি ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করত!

খেলাফতের স্বয়ংসম্পূর্ণতা

শাহ সাহেব (র) কুরআন-সুন্নাহ, ফিক্হ আকাঈদ, ইলমে কালাম-দর্শন, জীবনচরিত ও ইতিহাসের উপর যার প্রশস্ত ও গভীর দৃষ্টি ছিল এবং শরীয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহের সূক্ষ্মতা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত ছিলেন। তিনি খেলাফতের এমন পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দিয়েছেন, যার থেকে উৎকৃষ্টতর সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। এ সংজ্ঞার প্রতিটি শব্দে তার অর্থ, মর্ম ও উদাহরণের এক অমূল্য সম্পদ গচ্ছিত রয়েছে। তিনি লিখেন, 'খেলাফত ঐ জনপ্রতিনিধিত্ব ও সাধারণ রাজনীতির নাম, যা 'দীন প্রতিষ্ঠা' এর কার্যক্রমের পূর্ণতা দানের জন্য অস্তিত্ব লাভ করে। এই দীন প্রতিষ্ঠার কর্মপরিধিতে ধর্মীয় জ্ঞান-বিদ্যাগুলো পুনর্জীবিত করা, ইসলামের স্তম্ভগুলো প্রতিষ্ঠা করা, জিহাদ ও তার আনুসঙ্গিক ব্যবস্থাপনা, যেমন– সৈন্যদেরকে সুসজ্জিতকরণ, যুদ্ধ-জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের অংশসমূহ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদে (বা মালে গণীমতে) তাদের অধিকার প্রদান, বিচারব্যবস্থা কার্যকর করা, দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা, জুলুম-শোষণ ও অভিযোগ নিরসন, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করা ইত্যাদি কর্তব্য পালন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর এসব রাসূলে কারীম (স)-এর প্রতিনিধিত্ব ও দিকনির্দেশনায় হতে হবে।'

তারপর দীন প্রতিষ্ঠার আরও ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা দিয়ে লিখেন, 'আমরা যখন সমস্যাগুলো আপেক্ষিক দৃষ্টিতে দেখি, ছোটখাট বিষয়গুলো থেকে বড় বড় বিষয় আর বড় বড় বিষয়গুলো থেকে শুধু সকলের উপর ব্যাপৃত একটি মৌলিক বিষয়ের দিকে ধাবিত হই, তখন এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, সেসব বিষয়-সমস্যা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌথ সমস্যাবলি, উঁচু ধরনের বহু মৌলিক সমস্যার (যেন সবচেয়ে প্রধান সমস্যা/বিষয়) এমন একটি বাস্তবতা, যার নাম 'দীন প্রতিষ্ঠা।' যার আওতায় আরও অন্যান্য বহু প্রকার ও শ্রেণী রয়েছে। যেমন,

ধর্মীয় জ্ঞান-বিদ্যাগুলোকে পুনর্জীবিত করা। যার মধ্যে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষাদান, ওয়ায-নসীহতও রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم ايته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفى ضلل مبين.

'আপনি সেই সত্ত্বা, যিনি উম্মীদের (নিরক্ষরদের) মধ্যে তাদের থেকেই একজন (মুহাম্মদ স.) কে নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের সম্মুখে আপনার আয়াত (নিদর্শন)সমূহ পড়ে শোনায় আর তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদের (আল্লাহর) কিতাব (তথা কুরআন) ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়। আর ইতোপূর্বে তো এসব লোক সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিল।' (সূরা জুম'আ-২)

খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের পক্ষে কুরআনিক প্রমাণ

কিতাবের সবচেয়ে বিস্ময়কর জ্ঞানগর্ভ অংশ সেটি, যাতে শাহ্ সাহেব (র) কুরআনে কারীমের একাধিক আয়াতের মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের অকাট্যতা এবং তাদের খোলাফায়ে রাশেদ (নববী খেলাফতের পথিকৃৎ) হওয়া, তাদের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের ইচ্ছার পূর্ণতা দান ও সৃষ্টিগত বিষয়ের বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রমাণ পেশ করেছেন। আয়াতে কারীমাগুলোর এমন এমন সূক্ষ্মতা বরং সুস্পষ্ট ইংগিতসমূহের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, যার দ্বারা অস্পষ্টভাবে (বরং কোথাও কোথাও গাণিতিকভাবে) প্রতীয়মান হয় যে, এসব মহামানব ছাড়া সংশ্লিষ্ট আয়াতে কারীমাগুলোর উদ্দেশ্য আর কেউ হতে পারে না; সেসব ভবিষ্যদ্বাণী তাদের সত্ত্বা ছাড়া আর কারও উপর প্রযোজ্য হতে এবং প্রতিশ্রুতিগুলোর বাস্তবায়ন তাদের খেলাফতকাল ছাড়া কোনও যুগে হতে দেখা যায়নি। যদি এসব ব্যক্তিত্ব ও তাদের খেলাফতকে মূলসহ উপড়ে ফেলা হয়, তাহলে ঐ গুণাবলি কোনও পাত্রবিহীন আর ঐ প্রতিশ্রুতিগুলো অপূর্ণই থেকে যাবে।

শাহ সাহেবের উদ্ধৃত আয়াতে কারীমাগুলোর এখানে উপমাস্বরূপ মাত্র দু'টি আয়াত চয়ন করছি। তন্মধ্যে একটি সূরা নূরের ৫৫ নং আয়াত। সেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبد لنهم من بعد خوفهم أمن، يعبدوننى لايشركو بى شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.

'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন, তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য। (সূরা নূর : ৫৫)

শাহ সাহেব বলেন, এই অঙ্গীকার (তথা শাসন কর্তৃত্ব দান, পৃথিবীতে শক্তিশালীকরণ ও ভীতির পর নিরাপত্তা দান) সেসব লোকদের সঙ্গে করা হয়েছে, যারা সূরা নূর অবতীর্ণ হওয়ার সময় বিদ্যমান, ইসলাম ও নবীজীর সাহচর্যে ধন্য এবং দীন-ধর্মের সাহায্য ও ক্ষমতায়নে অংশীদার ছিলেন। শাহ সাহেব স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, এই অঙ্গীকার হযরত মু'আবিয়া (রা), বনূ উমাইয়াহ ও বনূ আব্বাসের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়, যারা সে সময় ইসলামে দীক্ষিত হয়নি অথবা মদীনায় উপস্থিত ছিল না।

এরপর লিখেন, মুসলিম উম্মাহর এই পূর্ণ জামাতকে পৃথিবীর শাসনকর্তৃত্বের সম্মানে ভূষিত করা এবং তাদের সকলেই একই খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়া না সম্ভব আর না যুক্তিগ্রাহ্য। এর দ্বারা কতিপয় বিশেষ ব্যক্তিই উদ্দেশ্য নেওয়া যেতে পারে। শাহ বলেন, ليستخلفنهم তথা ليستخلفن جمعا منهم অর্থাৎ তাদের মধ্যে থেকে একদলকে খলীফা (শাসনকর্তা) বানাব আর এর জন্য বশ্যতা ও আনুগত্য শর্ত। এরপর যখন সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হবে, তখন দীন-ধর্ম সর্বোত্তমরূপে প্রকাশ পাবে এবং তার পূর্ণ শক্তি-ক্ষমতা ও স্বাধীনতা লাভ হবে। এমন নয়, যেমনটি ইছনা আশারী লোকজন বলে অর্থাৎ আল্লাহর কাছে যে দীন পছন্দনীয়, সর্বদা সেটি গোপন ও লুকায়িত থাকে। এ কারণেই আহলে বাইতের ইমামগণ সবসময় গোপন বাসনার সাথে কাজ করেছেন। তাদের কখনও প্রকাশ্যে নিজ ধর্মের ঘোষণা দেওয়ার শক্তি-সাহস হয়নি।

وليمكن لهم دينهم الذى ارتض لهم

আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য এই দীনের শক্তি ও বিজয় দান করবেন, যাকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন।

এর দ্বারা বুঝা যায়, সেই ধর্ম আল্লাহর পছন্দনীয় ও মনোনীত ধর্ম নয়, এই খিলাফতের যুগে যার ঘোষণা ও প্রকাশ করা যাবে না।

অনুরূপভাবে বলেছেন, 'وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا' তথা এই খেলাফতকালে (শাসনামলে) আল্লাহ তা'আলা ভয়-ভীতির পরিবেশের স্থলে

শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ তৈরী করে দিবেন। এতেও প্রমাণিত হয়, এসব শাসনকর্তা ও অন্যান্য মুসলমানগণ এই অঙ্গীকারে পূর্ণতা দানের সময় শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে থাকবে। না তাদের বিজাতীয় কাফিরদের কোনও ভয় থাকবে আর না অন্য দল, গোষ্ঠী বা শক্তির আশঙ্কা হবে। পক্ষান্তরে ফিরকায় ইমামিয়ার লোকজন বলে, আহলে বাইতের ইমামগণ সবসময় ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। তারা তাকিয়া বা গোপন বাসনার মাধ্যমে কাজ করেছেন। তাদের এবং তাদের সঙ্গী-সাথীদের সব সময় মুসলমানদের দেওয়া কষ্ট-যাতনা ভোগ করতে হয়েছে। আর তারা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করে গেছেন। আবার কখনও তাদের সমর্থক-সাহায্যকারী ছিল না। শাসনকর্তৃত্ব দান ও পৃথিবীতে শক্তিশালী করার অঙ্গীকার পূর্ণতা পেয়েছে সেসব প্রথম স্তরের মুজাহিদ এবং শাসন কর্তৃত্ব দান সম্পর্কিত আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হওয়ার সময় বিদ্যমান মহাপুরুষগণের মাধ্যমে। তারা যদি খলীফাই না হয়ে থাকেন, তাহলে উক্ত অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন বা বহিঃপ্রকাশ হয়নি। মহান আল্লাহ এসব (সংশয়-সন্দেহ) থেকে অনেক অনেক উর্ধ্বে।

দ্বিতীয় আয়াতখানা 'قل للمخلفين من الاعراب' সূরা আল ফাতহর আয়াত ১৬ থেকে চয়িত। শাহ সাহেব এ আয়াতের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ–

রাসূলে কারীম (স) ৬ষ্ঠ হিজরীতে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর এক বিশাল জামাতসহ তার একটি স্বপ্নের প্রেক্ষিতে উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমার দিকে যাত্রা করলেন। ঘটনার গুরুত্ব, মক্কার অবস্থা-পরিস্থিতি ও কুরাইশ শত্রুদের বিরোধিতার আশঙ্কায় সাহাবায়ে কিরাম (রা) বিশাল জনসংখ্যায় তাঁর সহযাত্রী হলেন। কিন্তু গ্রাম্য লোকজন ভয় ও কপটতার কারণে সঙ্গে গেল না। হুদাইবিয়া নামক স্থানে সংকল্প প্রত্যাহার ও কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তির সেই ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়, যা হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে বিশদভাবে বিদ্যমান। সেখানেই ঐতিহাসিক বাই'আতে রিযওয়ান হয়েছে, যাতে অংশগ্রহণকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা তার সন্তুষ্টির বিশেষ সনদ দান করেছেন এবং অদূর ভবিষ্যতের বিজয়ের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। অধিকন্তু এই সূরা ফাতহেই আরও ঘোষণা দিয়েছেন, এই নিকটতর (ভবিষ্যত) বিষয়ে তথা (মহররম, সপ্তম হিজরীতে সংঘটিত খায়বার বিজয়ে) সেসব গ্রাম্য বেদুঈনদের সঙ্গে নেওয়া হবে না, যারা হুদাইবিয়ার মুহূর্তে উপস্থিত ছিল না এবং যারা এই বিশাল ও ভয়াবহ অভিযানে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সঙ্গ ত্যাগ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

سيقول المخلفين اذا انطلقتم إلى مغانم لتـخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون ان يبدلوا كلم الله، قل لن تتبعونا كذا لكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تخسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.

'তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে, আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে চায়। বলুন, তোমরা কখনও আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। আল্লাহ পূর্ব থেকেই এরূপ বলে দিয়েছেন। তারা বলবে, বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। অধিকন্তু তারা সামান্যই বোঝে।' (সূরা ফাতহ : ১৫)

কিন্তু পরক্ষণেই সেসব পশ্চাদপন্থীদের সম্পর্কে বলেছেন, এই নিকট ভবিষ্যতের বিজয়ে (খায়বার বিজয়ে) তো তোমাদের অংশগ্রহণ এবং এর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি নেই। তবে শীঘ্রই তোমাদেরকে এমন লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আহবান করা হবে, প্রথমতঃ তারা হবে বিরাট বীরত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। দ্বিতীয়তঃ তাদের সঙ্গে হয়ত যুদ্ধ করা হবে অথবা তারা ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যাবে। মাঝামাঝি কোনও বিষয় (ট্যাক্স) নেই। আর এই যুদ্ধের আহবান আল্লাহর নিকট এত প্রিয় এবং এর আহবানকারী এমন নির্ভরযোগ্য ও অনিবার্য অনুসৃত হবে, যদি তোমরা তার ডাকে সাড়া দাও, দাওয়াত কবুল করো এবং তার হুকুম পুরোপুরি পালন করো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদানে সম্মানিত করবেন। আর যদি পূর্বের মতই মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে মর্মন্তুদ আযাবে লিপ্ত করবেন।' আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قل للمخلفين من الاعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما.

'গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদের বলে দিন, আগামীতে তোমরা এক প্রবল শক্তিধর জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহুত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দিবেন। আর যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর, যেমন ইতোপূর্বে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছ, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন।' (সূরা ফাতহ : ১৬)

শাহ সাহেব বলেন, 'ستدعون' (শীঘ্রই তোমরা আহুত হবে) এর চাহিদা অনুসারে প্রতীয়মান হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে এমন কোনও আহবানকারী হবে, যিনি বেদুঈন মরুচারীদেরকে (গ্রামে বসবাসকারী যে লোকজন হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে ইসলামী সেনাবাহিনীর সাথে না গিয়ে পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল) এমন এক জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আহবান করবে, যাদের জন্য দু'টি পথই খোলা থাকবে। হয়ত যুদ্ধ; নয়ত ইসলাম। (যার মিছদাক আরবের মুরতাদ বা ধর্মান্তরিত গোত্রসমূহই হতে পারে, যাদের থেকে ট্যাক্স গ্রহণ জায়েয ছিল না; হয়ত তারা যুদ্ধে মারা পড়বে নতুবা ইসলাম গ্রহণ করবে) আর এ চিত্র একমাত্র হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে দেখা গেছে, যিনি আরবের মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। তাদের ক্ষেত্রে শরয়ী বিধান এটাই ছিল। এর দ্বারা না রোমবাসী উদ্দেশ্য হতে পারে আর না পারস্যবাসীরা, যাদের জন্য ছিল তিনটি পথ। যুদ্ধ, ইসলাম ও কর প্রদান। কাজেই এর দ্বারা সরাসরি হযরত আবু বকর (রা) -এর খেলাফত প্রমাণিত হয়। যিনি মুরতাদদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)-এর তত্ত্বাবধানে সৈন্য প্রেরণ করেছেন আর মরুচারী বেদুঈনদেরকে যুদ্ধ অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। অধিকন্তু এই আহবানে সাড়া দেওয়ার ফলে পুরস্কার পাওয়া আর সাড়া না দেওয়ার কারণে শাস্তিযোগ্য হওয়া একজন খলীফায়ে রাশেদরই বৈশিষ্ট্য ও পদমর্যাদা হতে পারে।

কিতাবের আরেকটি মূল্যবান বিষয়বস্তু

গ্রন্থটিতে খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের অকাট্যতা ও বিশুদ্ধতার দলীল-প্রমাণ, চার খলীফার বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা, তাদের শাসনামলের কৃতিত্বসমূহ এবং তাদের অসংখ্য অমূল্য বাণী ও উক্তি ছাড়াও আরও মূল্যবান উপকারিতা, দূর্লভ জ্ঞান-গবেষণা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু রয়েছে, যেগুলো সাধারণতঃ না আকাইদ ও কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে পাওয়া যায় আর না কোনও ইতিহাস ও জীবনচরিত গ্রন্থে। তন্মধ্যে একটি হল, কুরুনে ছালাছাহ (তিন যুগ)-এর ব্যাখ্যা, খেলাফত আর রাজত্বের পার্থক্য ও তার বিশ্লেষণ, অকার্যকর রাষ্ট্র ও লাগামহীন শাসন ব্যবস্থার ব্যাখ্যা এবং বনী উমাইয়ার রাজত্ব ও লাগামহীন শাসন খেলাফত না হওয়ার সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। তার মতে খেলাফতে রাশেদাহ যদিও হযরত আলী মুর্তাযা (রা) -এর (শাহাদাতের) মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেছে, তদুপরি তিনি হযরত মু'আবিয়া (রা) সম্পর্কে (তার সম্পর্কে বর্ণিত মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে) কুধারণা, ভর্ৎসনা ও অভিসম্পাত করা বেঁচে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু এরপর

বনী মারওয়ানের শাসকদের সম্পর্কে পরিষ্কার ভাষায় লিখেন- 'যখন আব্দুল মালেক (ইবনে মারওয়ান) শাসন কর্তৃত্ব লাভ করে, তখন বিশৃঙ্খলা ও বিক্ষিপ্তাবস্থা খতম হয়ে যায়। আর যে স্বৈরশাসন সম্পর্কে রাসূলে কারীম (স) একাধিক হাদীসে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তা নিত্যদিনের চিত্র হয়ে যায়।'

এ কিতাবের একটি বৈশিষ্ট্য ফারুকে আযম (রা) এর মতাদর্শ, তার ফাতওয়া ও আহকাম সম্পর্কিত তথ্য-প্রমাণ, যেগুলো উক্ত কিতাবে একত্রিক করে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে পূর্ণাঙ্গ একটি ফিকহে ফারুকী হাতে এসে গেছে।

ফিকহে ফারুকীকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উপস্থাপন এবং হযরত উমর (রা) এর ইজতিহাজদ ও ফাতওয়াসমূহ গ্রন্থিত করার সম্ভবতঃ এটাই প্রথম পদক্ষেপ ছিল। যাতে শাহ সাহেব দ্বিতীয় পর্যায়ে সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন। এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোনও পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়নি। বর্তমান (নিকট অতীত ১৪০১ হিজরী মোতাবেক ১৯৮১ খৃ.) কালে ড. মুহাম্মদ রাওয়াস ফাল'আজী 'মওসূ'আয়ে ফিকহে উমর ইবনুল খাত্তাব' (হযরত উমর (রা) এর ফিকহের জ্ঞানের পরিধি, ইনসাইক্লোপিডিয়া) নামে একটি বিশাল বিস্তৃত গ্রন্থ সংকলন করেছেন। যা মাকতাবাতুল ফালাহ বা আল-ফালাহ প্রকাশনী, কুয়েত এর পক্ষ থেকে ছাপা হয়েছে। এ গ্রন্থ কলেবরে বড় সাইজের ৬৮৭ পৃষ্ঠায় সংকলিত।

খোলাফায়ে ছালাছাহ (রা)-এর খেলাফতের প্রমাণ, তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব, কৃতিত্ব ও খেদমতসমূহের আলোচনা এমন বিস্তারিতভাবে, যার মধ্যে শাহ সাহেবের চিন্তাধারা ও আগ্রহ-চেতনা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় এবং যা সেই প্রয়োজনীয়তাকে পূরণ করেছে, যা এ যুগের চাহিদা ও কিতাব রচনার আসল প্রেরণা। তার আমীরুল মুমিনীন আলী মুর্তাযা (রা) -এর কৃতিত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাসমূহের বিবরণে বিচক্ষণতা ও সাবধানতার সাথে কাজ করেনি। তিনি তার প্রতিও পূর্ণ শ্রদ্ধা-ভক্তি, তাঁর মর্যাদা-অধিকারের স্বীকৃতি এবং সম্মানিত আহলে বাইতের সঙ্গে হৃদ্যতা-ভালবাসার আকুলতা ও পূর্ণ উদারতার সাথে বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত আলী (রা)-এর বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বের আলোচনা নিম্নোক্ত শব্দে শুরু করেন–

ما ثر امير المؤمنين وامام الاشجعين اسد الله الغالب على بن ابى طالب رضى الله عنه.

অর্থাৎ 'আমীরুল মুমিনীন, বড় বড় বীর বাহাদুরের নেতা, আল্লাহর শক্তিশালী সিংহ আলী ইবনে আবী তালিব (রা)।' অনুরূপভাবে হযরত হাসান-হুসাইন বিশেষতঃ বড় দৌহিত্র সাইয়িদুনা হাসান মুজতবা (রা)-এর

আলোচনা পূর্ণ শ্রদ্ধা ও মুহাব্বতের সাথে করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পরে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির মধ্যে হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতকে প্রথম বিপর্যয় গণ্য করেছেন। আর দ্বিতীয় বিপর্যয় হিসেবে রাসূলে কারীম (স)-এর কলিজার টুকরা হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতকে ধরেছেন এবং মিশকাত শরীফের এমন এমন (বাইহাকী শরীফ থেকে চয়িত) রিওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন, যার দ্বারা বুঝা যায়, ইমাম হুসাইন (রা)-এর রাসূলে কারীম (স)-এর সাথে সেই সম্পর্ক রয়েছে, যা হয় দেহের সাথে একটি গোশত পিণ্ডের। নবী করীম (সা.) তাকে সংবাদ দিয়েছিলেন, উম্মত তাকে (ইমাম হুসাইন (রা) কে) শহীদ করে দিবে। এই বিপর্যয়ের মধ্যে হাররার ভয়াবহ ঘটনাকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেখানে ইয়াযীদের শাসনামলে তার সেনাবাহিনীর হাতে পবিত্র মদীনায় হত্যা-লুণ্ঠনের নির্লজ্জ ঘটনা ঘটেছে। চরম অসম্মানী হয়েছে মদীনা নগরী ও মদীনাবাসীদের। শাহ সাহেব বনী উমাইয়াদের ব্যাপারে স্থানে স্থানে প্রকাশ্য সমালোচনা করেছেন। এভাবে গ্রন্থটিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিদর্শন ও গৌরবময় ভারসাম্য এবং ন্যায়ানুগতাও পুরোপুরি বিদ্যমান।

নবীজীর ইন্তিকাল পরবর্তী পরিবর্তন ও বিপর্যয়সমূহ সনাক্তকরণ

এ কিতাবের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে ইসলামের ধর্মীয় ইতিহাস, চিন্তাধারা ও ধর্মীয় বিপ্লব ও পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত একটি প্রকাশ্য চিত্রও উঠে এসেছে। ইসলামের রাজনৈতিক শিক্ষামূলক ইতিহাস তো অসংখ্য-অগণিত। কিন্তু এমন ইতিহাস কোথাও পাওয়া যায় না, যেখানে ইসলামের রাজনৈতিক ও সভ্যতা-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্রমধারায় নতুন চিন্তাধারা ও শিক্ষামূলক এবং চারিত্রিক পরিবর্তন ও বিপ্লবসমূহের চিহ্ন দেখা গেছে (চাই তা এতই হালকা ও সাদামাঠা হোক, যা সঠিক ইসলামী ভাবধারার জ্ঞানের কষ্টিপাথর ছাড়া দৃষ্টিগোচর হয় না)। বিভিন্ন কিতাবে সামান্য ভিন্ন বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। কিন্তু কেউ তা নিজ আলোচনার শিরোনাম নির্ধারণ করেননি। শাহ সাহেব খায়রুল কুরূনের সাথে মিলিত পরবর্তী সময়ের ফিতনা, খায়রুল কুরূন ও শাররুল কুরূনের বিধি-বিধানের পার্থক্য এবং মৌলিক পরিবর্তনের আড়ালে সেসব পরোক্ষ ও চিন্তাগত পরিবর্তনসমূহের আলোচনা করেছেন, যা নবুওয়াতের এবং তৎপরবর্তী খায়রুল কুরূনের পরে দেখা দিয়েছে। শাহ সাহেবের ভাষায় সেসব আলোচনার শিরোনাম নিম্নরূপ-

মিথ্যার প্রকাশ। তাজবীদে কুরআনের ধ্যানমগ্নতা ও অতিরঞ্জন। পড়া ও তিলাওয়াতের ওপর যথেষ্ট করা আর কুরআনের প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তিতে ঘাটতি।

ফিকহী মাসায়েলে সূক্ষ্মদৃষ্টি আর মাসআলার কাল্পনিক যে রূপরেখা এখনও অস্তিত্ব লাভ করেনি, তা নিয়ে পূর্ব থেকেই তর্ক-বিতর্ক। মুতাশাবিহাতে কুরআন (সূক্ষ্ম আয়াতে কারীমা)-এর ব্যাখ্যা দান এবং তাতে দূরবর্তী সম্পৃক্ততা আনয়ন। আকাইদ ও খোদায়িত্বের মাঝে নতুন নতুন প্রশ্ন সৃষ্টি করা। আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়তে নতুন নতুন দু'আ-দরূদ ও নানা দল আবিষ্কার, যা বর্ণিত সুন্নাতের উপর বৃদ্ধি করে। মুস্তাহাবসমূহের এমন অনুকরণ ও আবশ্যকীয়করণ, যেমনটি হওয়া উচিৎ ওয়াজিবসমূহের। ফাতওয়া দানের ব্যাপারে সামাজিক পরামর্শ আর বুযুর্গ উলামায়ে কিরামের শরণাপন্ন হওয়ার ধারাবাহিকতার বিলুপ্তি। নতুন নতুন ফিরকা- কাদরিয়া, মারজিয়া ইত্যাদির আত্মপ্রকাশ। মুসলমানদের পারস্পরিক বিশ্বাস ও নিরাপত্তা উঠে যাওয়া। শাসন ক্ষমতায় এমন লোকজন অধিষ্ঠিত হওয়া, যারা শুরু থেকেই শাসন কর্তৃত্বের অযোগ্য কিংবা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর লোক। আরকানে ইসলাম বা ইসলামের স্তম্ভসমূহ বাস্তবায়নে অলসতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়া।

কিতাবের মুদ্রণ ও পরিবেশন

'ইযালাতুল খফা' গ্রন্থখানা প্রথমবার মৌলভী মুহাম্মদ হাসান সিদ্দীকী (র)-এর তত্ত্বাবধানে মুন্সী জামালুদ্দীন খান সাহেবের আদেশ ও দিক নির্দেশনায় ১২৮৬ হিজরী সনে বেরেলীতে সিদ্দিকী প্রকাশনীর অধীনে ছাপা হয়। এ সময় তিনটি সংস্করণের ব্যবস্থা হতে পারে। যার দ্বারা সংশোধন ও তুলনার কাজ করা হয়েছে। একটি মুন্সী সাহেবের ভূপালী সংস্করণ, দ্বিতীয়টি মাওলানা আহমদ হাসান আমরোহীর সংস্করণ, তৃতীয়টি মাওলানা নূরুল হাসান কান্ধলভীর। মনে হয় বিজ্ঞ গ্রন্থকার কিতাবের উপর পুনঃদৃষ্টিদান বা সম্পাদনার সুযোগ পাননি।

কিতাবের দ্বিতীয় মুদ্রণ ছাপা হয়েছে সুহাইল একাডেমী লাহোর, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ১৯৭৬ খৃ. মোতাবেক ১৩৯৬ হিজরী সনে, যা প্রথম মুদ্রণের অফসেট। কিতাবটির আরবী অনুবাদ তৈরী হয়েছে 'আল-মজলিসুল ইলমী ঢাবীল'-এর তত্ত্বাবধানে। কিন্তু আরব বিশ্বে সেটি যথাযথভাবে প্রকাশিত হতে পারেনি। ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা আবদুশ শাকুর ফারূকী লাখনৌভীর (র) এর উর্দু অনুবাদ করেন, যা কিতাবের প্রথম অনুচ্ছেদ থেকে পঞ্চম অনুচ্ছেদ (১৫৫ পৃষ্ঠা) পর্যন্ত সন্নিবেশিত হয়েছে। এর নাম 'كشف الغطاء عن السنة البيضاء' রাখা হয়েছে। প্রকাশিত এ খণ্ডের কলেবর ৩৩৬ পৃষ্ঠা। ১৩২৯ হিজরীতে 'উমদাতুল মাতাবে' লাখনৌ থেকে তা প্রকাশিত হয়েছে।

নবম অধ্যায়

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং মোঘল শাসনের ক্রান্তিকালে শাহ সাহেবের বীরত্বপূর্ণ ও সাহসী কর্মকাণ্ড

তিনটি অনভিজ্ঞ যুদ্ধবাজ শক্তি

বক্ষমান কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি বলে এসেছি, হিজরী বার শতকের ভারতবর্ষ রাজনৈতিক, শাসনব্যবস্থা ও চারিত্রিক দিক থেকে বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা, অধঃপতন-অনিয়ম, অরাজকতা, লুটতরাজ, বিক্ষিপ্তাবস্থা ও অক্ষমতার এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল, যাকে কোনও সমাজ, জাতি ও শাসনব্যবস্থার মুমূর্ষাবস্থা কিংবা নাভিশ্বাস বলা যেতে পারে। মোঘল সাম্রাজ্য একটি মুসলিম শাসকবংশের সুদীর্ঘ ও ক্ষমতাধর নেতৃত্বের স্মৃতিফলক (Symbol বা নমুনা) হয়ে বেঁচেছিল। যার পিছনে না ছিল কোনও শক্তি-ক্ষমতা, না সম্ভ্রমবোধ আর না উৎসাহ-হিম্মত। বাহ্যতঃ সে সময় মোঘল সাম্রাজ্যই নয় বরং গোটা রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারণকারী ছিল তিনটি অনভিজ্ঞ যুদ্ধবাজ শক্তি। এগুলো যথাক্রমে মারাঠী, শিখ ও জাঠ।

মারাঠী

যাদের তৎপরতা প্রথমে দক্ষিণাত্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এদের গুরুত্ব একটি নিয়মতান্ত্রিক সাংবিধানিক সরকারের বিরুদ্ধে এক 'বিদ্রোহী গ্রুপ' (AGITATORS) ও গুপ্তচোরা গেরিলাশক্তি অপেক্ষা বেশি ছিল না। সেই মারাঠীরা কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা, ভাগ্যপরখকারী যুদ্ধবাজ নেতাদের পারস্পরিক শক্তিপরীক্ষা এবং রাজত্বের আমীর-উমারাদের অদূরদর্শিতার কারণে (যারা প্রতিপক্ষকে অপমান করা কিংবা পরাজিত করার অভিপ্রায়ে মারাঠীদের দ্বারা কাজ নিত) ভারতব্যাপী এমন একটি বৃহৎ শক্তি হয়ে যায়, যে দিল্লীর সিংহাসন দখল এবং সেই শূন্যতা পূরণ করার স্বপ্ন দেখতে থাকে, যা মোঘল শাসকদের সামরিক শক্তির দুর্বলতা ও ব্যবস্থাপনার অযোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

১৭৫৬ খৃস্টাব্দে (১১৭০ হি.) মালিহার রাও হাওলাকর ও রঘুনাথ রাও উত্তর ভারতে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয় এবং জাঠদের সাহায্যে ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে (১১৭১ হি.) দিল্লী আক্রমণ করে বসে। নাজীবুদ্দৌলাহকে বাধ্য হয়ে

সন্ধি করতে হয়। এরপর তারা পাঞ্জাবের পথ ধরে। যা ছিল ঐ গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধকবলিত এলাকার প্রবেশপথ, যেখান দিয়ে বিজেতা ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে থাকেন এবং তখন পর্যন্ত যে অঞ্চল কোনও অনৈসলামিক শক্তির পদানত হয়নি। তারা ১৭৫৮ খৃস্টাব্দে লাহোর দখল করে নেয় এবং আদীনাহ বেগকে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঞ্জাবের গভর্নর নিযুক্ত করে। আদীনাহ বেগের মৃত্যুর পর তারা সবাজী সিন্ধীকে পাঞ্জাবের গভর্নর নিযুক্ত করে।

সফদার জঙ্গের ইশারা ও মদদে মারাঠীরা প্রথমে (দিল্লীর শোভা বৈচিত্র্য, উলামা-মাশায়েখের কেন্দ্রস্থল) দোয়াবাতে প্রবেশ করে। এবার দাতাজী সিন্ধী ১৭৫১ খৃস্টাব্দে দক্ষিণাত্য থেকে এসে গোটা হিন্দুস্তানে জয়ের ঝাণ্ডা উত্তোলন করে। প্রথমে রোহিলাখণ্ড ১৭৫৮ খৃস্টাব্দে ও উধ যাত্রা করে এবং সে ইচ্ছায় যমুনা অতিক্রম করে। ১৭৫৯ খৃস্টাব্দ মোতাবেক ১১৭২ হিজরীতে যখন সমুদ্র অতিক্রমণের যোগ্য হয়, সেখান দিয়ে গোবিন্দ রায় বন্দিলাকে বিশ হাজার সৈন্যসহ রোহিলাখণ্ডে নামিয়ে দেয়। সে রাম গঙ্গা থেকে নেমে এসে দিল্লীর অনতিদূরে আমরোহা পর্যন্ত অঞ্চল লুট করে নেয়।

২৪ জুন ১৭৬০ খৃস্টাব্দে (৯ যিলহজ্জ ১১৭৩ হি.) মারাঠীরা রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করে। দূর্গরক্ষী ইয়াকুব আলী খান দূর্গকে তাদের হাতে ছেড়ে দেয়। ভাও দূর্গের দায়িত্বভার শঙ্কর রাওয়ের কাছে ন্যস্ত করে। সে রাজকীয় খাছ বিচারালয়ের রৌপ্য নির্মিত বৈচিত্র্যময় ছাদ নামিয়ে ফেলে এবং টাকশালে পাঠিয়ে দেয়। কুদাম শরীফ ও হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার দরবারে সোনা-রূপার যত আসবাবপত্র ছিল, সবই হাতিয়ে নেয়। ১০ নভেম্বর ১৭৬০ খৃস্টাব্দ (১১৭৪ হি.) দ্বিতীয় শাহজাহানকে অপসারণ করে শাহ আলম আলী গোহার -এর যোগ্য উত্তরসূরী মির্যা জোয়ানবখতকে সিংহাসনে বসায়। সে স্বয়ং তৈমুরী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করত। আর সে তা করতেও পারত। কিন্তু তার বিচক্ষণ সেনারা তাকে এ ইচ্ছা থেকে বিরত রেখেছিল। কেননা এতে সারা দেশে হৈ চৈ পড়ে যেত। আর প্রজা সাধারণ বাবরী সিংহাসনে কোনও মারাঠী নেতাকে উপবিষ্ট দেখে সহজে মেনে নিতে পারত না। সে সময় মারাঠীদের দৌরাত্ম্য ও আস্ফালন যে বিস্তৃতি লাভ করেছিল, তা না ইতোপূর্বে কখনও হয়েছিল আর না পরবর্তী কোনও সময়ে। এর উত্তর সীমান্ত ছিল প্রতিরুদ্ধ ও হিমালয় পাহাড়। দক্ষিণ দিকে উদীয়মান উপদ্বীপ দাক্ষিণাত্যের পিছনের অংশ অর্থাৎ সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যেসব অঞ্চল এই সীমানার মধ্যে স্বাধীন ছিল, সে তার ট্যাক্স আদায়কারী ছিল। তাদের কাছে অভিজ্ঞ সেনা কর্মকর্তা ছিল। ইউরোপের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দশ হাজার সৈন্যও ছিল তাদের নিকট। পানিপতের যুদ্ধে

তাদের নিকট পঞ্চান্ন হাজার অশ্বারোহী পনের হাজার পদাতিক, দুইশ' কামান (দূর্গ ধ্বংসকারী কামান ছাড়া) সঙ্গে ছিল। রাজপুতদের সৈন্যও তাদের সঙ্গ নিয়েছিল। এভাবে সব মিলিয়ে তিন লাখ যোদ্ধা তাদের পতাকাতলে ও নেতৃত্বাধীন ছিল। অধিকন্তু মারাঠীদের মানসিকতা বাদশাসুলভ ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন ছিল না। ভারতবর্ষের এক ঐতিহাসিকের ভাষায় 'তারা ছিল খানিক বাদশা; খানিক লুটেরা।' জনগণের সেবা, সৃষ্টিজীবের সহমর্মিতা, মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু হেফাজতের প্রাচীন ও উত্তরাধিকারমূলক ধারাবাহিকতা, (যা জাঁকজমক ও বিলাসিতার মুহূর্তগুলোতেও স্বাধীন রাজা-বাদশা ও শাসকদেরকে এক পর্যায়ে হেফাজত করত এবং লাগাম টেনে ধরত) সেসঙ্গে গৌরবোজ্জল ঐতিহাসিক পটভূমি (Back Ground) না থাকা এবং সুউচ্চ ও স্বচ্ছ সৃজনশীল, গঠনমূলক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে, তদুপরি পৌত্তলিকতা, হিন্দু ধর্মমত ও সংস্কৃতি (Hindu Revivalism) পুনর্জীবিত করার আগ্রহ-উদ্যম তাদের মধ্যে আগ্রাসন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বা মীমাংসায় তড়িঘড়ি ও অসহিষ্ণুতার বদস্বভাব জন্ম দিয়েছিল। লুণ্ঠিত সম্পদ ও এর মোহ ছিল তাদের জাতীয় দুর্বলতা।

মারাঠীদের যুদ্ধবাজিতে হিন্দু-মুসলমান সকলেই প্রভাবিত হয়ে পড়ত। গ্রামগুলোকে নির্বিচারে লুণ্ঠন করা, মানুষের হাত-পা, নাক-কান কেটে নেওয়া তাদের জন্য অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। আক্রমণকারীদের লালসার শিকার হত জাতি-ধর্মের পার্থক্যবিহীন গোটা নারী সমাজ। এখানেও সব ধরনের সীমালঙ্ঘন করে পাশবিকতা ও হিংস্র বর্বরতার প্রদর্শনী চলতে থাকে। বাংলা মুলুকের প্রসিদ্ধ কবি গঙ্গারাম বাঙালীদের উপর তাদের নানা আক্রমণের পর্যালোচনা করে এসব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

পর্তুগালের লেখকগণও মারাঠীদের চরিত্র-বিধ্বংসী লোমহর্ষক কর্মকাণ্ডের উপর নিজেদের বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। মারাঠীদের কর্তৃত্ব-শক্তির বিরাট অর্থনৈতিক প্রভাব পড়ে জনসাধারণের উপর। মাওলানা গোলাম আলী আযাদ বলঘারামীর উক্তি মতে– 'তাদের ইচ্ছা ছিল, যতদূর তাদের সাধ্য-ক্ষমতায় কুলায়, তারা সৃষ্টিজীবের অর্থনৈতিক পথগুলো অবরুদ্ধ করে নিজেদের করায়ত্বে নিয়ে নিবে।' মারাঠীরা মোঘল সাম্রাজ্যের সেসব দূর্দশাগ্রস্থ এলাকা থেকে এক-চতুর্থাংশ খাজনা উসূল করত, যারা ছিল তাদের দয়া ও করুণাভিখারী।

মারাঠীদের আক্রমণ কেবল সামরিক স্থাপনা ও জনসাধারণের শোষণেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তারা হিন্দু ধর্মমত ও সংস্কৃতির 'পুনর্জীবন দান' (Revivalism) এর উপরও ভিত্তিশীল ছিল। এই আন্দোলনের প্রধান

নেতা শীবাজী সম্পর্কে মাউন্ট রেস্টওয়াট এলফানেস্টন (বোম্বাই গভর্নর) তার ভারত ইতিহাসে লিখেন, 'তাদের মানসিকতা হিন্দু (পৌত্তলিক) উগ্রবাদের দীক্ষা পেয়েছিল। .... এই মানসিকতায় বাধ্য হওয়ার কারণে তারা মুসলমান ও তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি -এর প্রতি চরম ঘৃণা-বিদ্বেষ আর হিন্দু সম্প্রদায় ও তাদের রীতিনীতির প্রতি গভীর আকর্ষণ রাখত। এই উন্নতি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাদের এই মানসিকতা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এত সুদৃঢ় হয়ে গিয়েছিল যে, তারা দেবদেবীর মূর্তি বানাল এবং অবতারদের অলৌকিকতা-কারামত ও দেবতাদের সাহায্যের দাবী করল।'

পানিপতের যুদ্ধে শেষ ফায়সালা হওয়ার পূর্বে এবং অবস্থা-পরিস্থিতির স্পর্শকাতরতা ভেবে তারা নবাব শুজাউদ্দৌলাহর মাধ্যমে (ইতোপূর্বে যার মনে মারাঠীদের ব্যাপারে নমনীয়তা ছিল) শাহ আবদালীর সঙ্গে আপস মীমাংসার চেষ্টা করল। শুজাউদ্দৌলাহ ক্রমাগত এসব অভিজ্ঞতা ও নিগুঢ় বাস্তবতার ভিত্তিতে তাদেরকে যে জবাব দিয়েছেন, তাতে মারাঠীদের জাতীয় চেতনা, মানসিকতা এবং তাদের বিজয়-সাফল্যের প্রভাব ও ফলাফলের চমৎকার এক চিত্র অঙ্কিত হয়। নবাব শুজাউদ্দৌলাহ বলেন, 'দক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ দীর্ঘকাল ধরে ভারতের উপর আধিপত্য কায়েম করে আছে। তাদের মাথায় লোভ-লালসার উগ্রতা এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ ও কথার লাগামহীনতার কারণে এই দুঃখ-কষ্ট এসেছে দুররানী সম্রাটদের। এমন লোকদের সঙ্গে কেউ কি সন্ধি করবে, যারা কারও ইজ্জত-আব্রু ও সুখ-শান্তির, আরাম-আয়েশ সহ্য করতে পারে না, সব জিনিসকেই যারা নিজের এবং স্বজাতির জন্য মনে করে? অবশেষে সবাই তাদের হাতে এমন অক্ষম হয়েছে, যার ফলে তারা নিজের সাফল্য-সম্মান, ইজ্জত রক্ষা, জনকল্যাণ ও সৃষ্টিসেবার জন্য শাহ আবদালীকে মিনতি করে রাজত্বসহ আহবান করেছেন। আর এর শোকাশ্রুপাতকে মারাঠীদের দূর্ভোগ থেকে সহজ মনে করেছে।'

অবশেষে ১৪ জানুয়ারী ১৭৬১ খৃস্টাব্দে (১১৭৪ হি.) পানিপতের যুদ্ধে আহমদ শাহ আবদালীর আফগান সামরিক বাহিনী, নবাব নাজীবুদ্দৌলাহর রোহিলা সৈন্য এবং নবাব শুজাউদ্দৌলাহর সৈন্যের সম্মিলিত শক্তির হাতে মারাঠীদের শোচনীয় পরাজয় হয়। জনৈক ঐতিহাসিকের ভাষায়, 'মারাঠীদের শক্তি চোখের পলকে তুলার মত উড়ে যায়।' আহমদ শাহ আবদালীর আগমনের কারণ ও প্রেক্ষাপট এবং তার চূড়ান্ত যুদ্ধ, যা ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, এর আরও বিশদ বিবরণ শাহ সাহেবের নেতৃত্বপূর্ণ কৃতিত্বের বর্ণনায় সামনে অত্যাসন্ন।

শিখ

শিখ পাঞ্জাবের একটি সাধক ধর্মীয় সম্প্রদায়। যাদের উত্থান হয়েছে পনের খৃস্ট শতকে গুরু বাবা নানক (১৪৬৯-১৫৩৯ খৃ.)-এর হাতে। সে প্রবৃত্তি দমনের সাধনা, চারিত্রিক জ্ঞান ও সততার শিক্ষা দিত। 'সিয়ারুল মুতাআখখিরীন' -এর বর্ণনা মতে বাবা নানক ফার্সী ও ধর্মজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেছিল বুযুর্গ সাইয়িদ হাসান থেকে। বাবা নানকের উপর তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তৃতীয় গুরু ইমর দাস শিখদের ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ নেয়। বাদশা আকবরও তার আস্তানায় তার সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছেন এবং তাকে একটি বিরাট জায়গীর দান করেন। সে আচার-ব্যবহার ও চারিত্রিক শিক্ষায় গুরু নানকের শিক্ষার প্রাণ অক্ষুণ্ণ রাখে। আর হিন্দুদের অলীক কল্পনা পূজা বিশেষতঃ সতীদাহ প্রথার প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন এবং বিধবা বিবাহের বিধান চালু করেন। আকবর ১৫৭৭ খৃস্টাব্দে তাকে এক বিস্তৃর্ণ ভূ-খণ্ড দান করেন। তার যুগেই ইমর তেসার-এর উত্থান হয়। এভাবে শিখদের জাতীয় জীবনের জন্য একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্র তৈরী হয়ে যায়।

১৫১৮ খৃস্টাব্দে গুরু আরজন স্বীয় পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়। সে শিখদেরকে একটি জাতির মর্যাদায় সুশৃঙ্খল করার আরও অধিক প্রচেষ্টা চালায় এবং গ্রন্থ সংকলনের ধারাবাহিকতা চালু করে। গুরু আরজন স্বয়ং নিজেকে 'সৎ বাদশা' নামে অভিহিত করে। যা তার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খার ইংগিত দেয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নির্দেশে তাকে লাহোরে বন্দি করা হয়। কেননা সে তার বিদ্রোহী যুবরাজ খসরুকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছিল। সেখানে তাকে হত্যা করা হয়। তার স্থলাভিষিক্ত হরগোবিন্দ মামুলী প্রতিরোধ ও বাঁধা দানের কর্মনীতি গ্রহণ করে, যার দ্বারা শিখদের সামরিক জীবনের সূচনা হয়। তারা দ্রুত রাজকীয় পদ গ্রহণ করে ফেলে। সে সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করত এবং স্বীয় পিতার মৃত্যুর দায়ভার তার উপর চাপাত। তারা হরগোবিন্দপুরে একটি মজবুত দূর্গ বানায়। সেখান থেকে দলে দলে বেরিয়ে এসে চিহ্নিত অঞ্চলগুলোতে লুঠতরাজ করত। জাহাঙ্গীর তাকে গোয়ালিয়র দূর্গে নজরবন্দি করে রাখেন। কিন্তু কিছুদিন পর মুক্ত করে দেন এবং তাকে বিরাট সম্মান দেন। শাহজাহান সিংহাসনে আরোহন করার সাথে সাথে তার মতিগতি পাল্টে যায় এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। অবশেষে সে পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে চলে যায় এবং ১৬৪৫ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করে।

১৬৬৪ খৃস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে হরগোবিন্দের পুত্র তেগ বাহাদুর গুরু নির্বাচিত হয়। সে অন্যান্য ফেরারী ও বিদ্রোহীদের আশ্রয় দেয়। তার নেতৃত্ব দেশের উন্নতির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রীয় সৈন্যরা তার উপর আক্রমণ করে এবং তাকে বন্দি করে দিল্লী নিয়ে আসে। সেখানে তাকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে ১৬৭৫ খৃস্টাব্দে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র গোবিন্দ রায়কে গুরু নিযুক্তি দেওয়া হয়। সে এই শিখদেরকে, যারা প্রথমে নিছক একটি ধর্মীয় গুণকীর্তনকারী দল ছিল, তাদেরকে একটি যুদ্ধবাজ জাতি বানিয়ে দেয়। সে শিখদের মধ্যে গণতান্ত্রিক সাম্যের আবেগ-অনুভূতি উস্কে দেয় এবং তাদেরকে একটি জাতিরূপে সংঘবদ্ধ করার তৎপরতা চালায়। আওরঙ্গজেবের ইন্তিকাল পর্যন্ত সে বেঁচে ছিল। এরপর সে আওরঙ্গজেবের উত্তরসূরী বাহাদুর শাহ গুরুর সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করে এবং তাকে দক্ষিণাত্যের সামরিক কামান দান করে দেয়। কিন্তু সে অক্টোবর ১৭০৮ খৃস্টাব্দে জনৈক আফগান সৈনিকের আঘাতে মুমূর্ষু অবস্থায় মারা যায়। কাউকে সে তার স্থলাভিষিক্ত করে যায়নি। তার অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিয়ে যায়, যেন তারা গ্রন্থকে তাদের ভবিষ্যৎ গুরু এবং স্রষ্টাকে নিজেদের একমাত্র রক্ষাকারী জ্ঞান করে।

হরগোবিন্দের স্থলাভিষিক্ত হয় দাস বৈরাগী। যে শিখদের সেনা কমান্ডার ছিল। (প্রকৃতপক্ষে সে ছিল একজন কাশ্মীরী রাজপুত্তুর, যে শিখ মতবাদ গ্রহণ করেছি) সে পাঞ্জাবে ব্যাপকাকারে লুটতরাজ শুরু করে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোঘল সাম্রাজ্যে অতি দ্রুত পতন আসতে শুরু করে। তার পুত্র ও পৌত্রদের মাঝে ক্ষমতা দখলের জন্য অব্যাহত যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয়ে যায়। যার ফলে শিখরা প্রকাশ্যে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে বসে। দাস বৈরাগী হাজার হাজার মুসলমানাকে নির্বিচারে হত্যা করে এবং গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করতে করতে একেবারে দিল্লীর সন্নিকটে গিয়ে পৌঁছে। সে ১৭১০ খৃস্টাব্দে গোটা ভারতে বেপরোয়া আক্রমণ শুরু করে। হত্যা-লুটতরাজের জন্য উন্মুক্তভাবে তার জাতিকে ছেড়ে দেয়। গ্রামের মানুষের উপর (বয়স ও জাতির পার্থক্য ছাড়া) নির্বিশেষে ভয়াবহ জুলুম-নিপীড়ন চালাতে থাকে। বাহাদুর শাহ পাঞ্জাব যাত্রা করেন। সরকারী সৈন্যরা দাসকে পরাজিত করে দেয়। কিন্তু দাস পাহাড়ী অঞ্চলে চলে যায়। ফুররাখ সিয়ার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও রাজবংশের অন্তর্দ্বন্দ্বে ফায়দা লুটে দাস বৈরাগী পুনরায় ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে কাজ করতে শুরু করে। অবশেষে ১৭১৬ খৃস্টাব্দে তাকে দিল্লীতে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়।

শিখদের কাছেও সে কোনও শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিল না। সে শিখ ধর্মের আকীদা-বিশ্বাস এবং আরাধনা-উপাসনায়ও কিছুটা রদবদল করেছিল। তার নেতৃত্বে শিখ একটি সামরিক শক্তি হয়ে যায়। ফুররাখ সিয়ারের শাসনামলে পাঞ্জাবের মোঘল গভর্নর মঈনুল মালিক (যিনি মীর মনু নামে অধিক প্রসিদ্ধ) ফুররাখ সিয়ারের শাস্তির কৌশল চালু রাখেন। কিন্তু মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের গতি দ্রুততর হয়ে গিয়েছিল। পাঞ্জাবের শাসনব্যবস্থা আহমদ শাহ আবদালীর অব্যাহত আক্রমণের কারণে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। শিখদের পুনরুত্থানের সুযোগ হয়ে যায়। তারা না কেবল আহমদ শাহ দুররানীর পুত্র যুবরাজকে উৎখাত করতে সক্ষম হয় (যিনি পাঞ্জাবের শাসক ছিলেন এবং মির তেসারের উপর আক্রমণ করে সকল মন্দির ধ্বংস এবং ধর্মীয় জলাশয়কে খড়কুটোয় ভরে দিয়েছিলেন) বরং লাহোরের উপর অস্থায়ী দখলও প্রতিষ্ঠা করেছিল। আর তার সেনা কমান্ডার জাসশা সিং কেলাল নিজ নামে মুদ্রাও চালু করে বসে। কিন্তু ব্যাপক ত্রাসের মধ্য দিয়ে মারাঠীদের আগমনে (১৭৫৮ খৃ.) সে লাহোর থেকে পালিয়ে যায়। আহমদ শাহ পঞ্চমবার পাঞ্জাব যাত্রা করেন। পানিপতের প্রসিদ্ধ সেই যুদ্ধ, যা মারাঠা শক্তির কোমর ভেঙে দেয়, এর পরে তিনি পাঞ্জাব ত্যাগ করেন। শিখরা পুনরায় ফিরে আসে এবং তারা তাদের হারানো রাজত্ব পুনরুদ্ধার করে নেয়। আহমদ শাহ আবার ফিরে আসেন এবং লোধিয়ানায় ১৭৬২ খৃস্টাব্দে তিনি তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাভূত করেন। কিন্তু চলে যাওয়ার পর ১৭৬৩ খৃস্টাব্দে শিখরা সমগ্র ভারতকে লুটতরাজ করে বিরান করে দেয় এবং আরেকবার লাহোর দখল করে স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা করে বসে। এরপর শিখ একাধিক রাজত্ব ও দলে-উপদলে (যাদেরকে সাজাপ্রাপ্ত বলা হয়) বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের কোনও প্রধান শাসক নির্দিষ্ট ছিল না এবং ধর্মমত ছাড়া তাদের মাঝে কোনও ব্যাপারে মিলও ছিল না। ত্রিশ বছরের এই অপরিবর্তিত অবস্থাচিত্রের পর পাঞ্জাবে রঞ্জিত সিংহের ভাগ্যরবি চমকে উঠে। সে ঐ বিচ্ছিন্ন দলগুলোকে একটি শক্তিশালী রাজত্বরূপে ঐক্যবদ্ধ করে।

শিখ ধর্মের মূল অবকাঠামো ছিল হিন্দুদের ধর্মীয় আকীদাগুলোর পরিশোধক রূপমাত্র। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, বাবা নানক ইসলামী শিক্ষায় প্রভাবিত ছিল। কাজেই তার তাওহীদের আকীদা, মানবজাতির সাম্য এবং মূর্তিপূজা থেকে বেঁচে থাকা ইত্যাদি ছিল ইসলামের প্রভাবের ফল।

শিখদের ধর্মীয় সাহিত্যের ভাষায় ফার্সীর বিরাট প্রভাব রয়েছে। বিশেষতঃ আদি গ্রন্থে ফার্সী ও ইসলামী, ধর্মীয় এবং সূফীসুলভ শব্দাবলির ব্যাপক সংমিশ্রণ রয়েছে।

খুবই সম্ভাবনা ছিল, এই সংস্কার আন্দোলন (যদি তারা স্বীয় মূলনীতিতে কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকত এবং হিন্দুধর্ম ও সভ্যতায় প্রবিষ্ট না হয়ে যেত) ভারতীয় সমাজে কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে এবং হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি ভিন্ন গোষ্ঠী হবে, যার মূল ভিত্তি হবে তাওহীদ (একত্ববাদ) ও সাম্য। আর এভাবে তারা মুসলমানদের রূপে শিখ জাতির আত্মপ্রকাশ ধর্মীয় দল বলে স্বীকৃত হত। কিন্তু সমকালীন শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সংঘর্ষ এবং রাজনৈতিক প্রভাব ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার নির্দয় ঘূর্ণিপাক, ধর্মীয় ও চারিত্রিক পরিণতি সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে বরাবরই তারা সময়ের চাহিদা ও দলীয় স্বার্থ পূরণের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে । আর তা-ই শিখদেরকে মুসলিম শাসন ব্যবস্থাই নয় বরং সাধারণ মুসলমানদের থেকে দূরে, বিদ্বেষী ও ঘৃণাকারী এবং তাদের সঙ্গে মাথার উপর বর্শার ফলা (দা-কুমড়া) অবস্থা বানিয়ে দিয়েছে। বিশেষতঃ হিজরী বার শতক আর খৃস্ট আঠার শতকের মধ্যভাবে তাদেরকে ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্নবাদী শক্তিগুলোকে আরও এক ধাপ বৃদ্ধি এবং বড় বড় শহরের নিরাপদ শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের জন্য একটি ভয়ঙ্কর ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টিকারী শক্তি পরিণত করে দেয়। তাদের শাসনামলে প্রায় আর মহারাজা রঞ্জিত সিংয়ের শাসমলে বিশেষভাবে মসজিদ ও কবরস্থানগুলোর অসম্মান হয়েছে। ইবাদত-বন্দেগীতে বাঁধা দেওয়া হয়েছে। এমন সব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, যার বিবরণ আল্লামা ইকবাল নিম্নোক্ত পংক্তিতে দিয়েছেন,

خالصہ شمشیر و قرآں را ببرد

اندراں کشور مسلمانی بمرد

শিখসেনা নিয়ে গেছে কুরআন তরবারী,
মরেছে এদেশের মুসলমানিত্ব ও ঈমানদারী।

উদ্ভূত এই অবস্থা-পরিস্থিতির বিরুদ্ধে হিজরী তের শতকের প্রায় মধ্যভাগে আর উনিশ খৃস্ট শতকের প্রথম তৃতীয় দশকে হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র) (১২৪৬ হি./১৮৩০ খৃ.) এবং মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (র) (১২৪৬ হি./১৮৩০ খৃ.) যারা শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর মহা বিদ্যাপীঠের শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং তার বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আবদুল আযীয (র)-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত -এই দু'জন রঞ্জিত সিংয়ের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝাণ্ডা উত্তোলন করেন। আর এর মধ্য দিয়ে সেই সুদূরপ্রসারী গভীর পরিকল্পনা এবং যুদ্ধের সূচনা করেন, যা ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসন (ও

পরাধীনতার শৃঙ্খল) থেকে স্বাধীনতা অর্জন, শরয়ী শাসন প্রতিষ্ঠা, মুসলিম সমাজের সংস্কার, সংশোধন ও পরিশুদ্ধি এবং দীনকে পুনর্জীবিত করার জন্য শুরু করেছিলেন।

জাঠ

জাঠ মারাঠীদের মত না সুশৃঙ্খল কোন গোষ্ঠী ছিল আর না শিখদের মত কোনও ধর্মীয় দল ছিল। কিন্তু মোঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং সাধারণ জনপদগুলোর নিয়ন্ত্রণহীনতার অনুভূতি তাদের মধ্যে এক ধরনের প্রত্যাখ্যানমূলক ও আক্রমণাত্মক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। আর তারা কালক্রমে একটি নাশকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী শক্তি হয়ে উঠছিল। যাদের উদ্দেশ্য রাজত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কোনও রাজনৈতিক বিপ্লব ছিল না; শুধুমাত্র গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে সাময়িক ফায়দা হাসিল করা। শোষণ ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণ করা ছিল লক্ষ্য।

প্রফেসর খলীক আহমদ নিযামী তার 'শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (র) কে 'রাজনৈতিক পত্রাবলি' গ্রন্থে লিখেন, 'যমুনার দক্ষিণাঞ্চল আগ্রা থেকে দিল্লী পর্যন্ত জাঠরা বসবাস করত। তাদের পূর্ব সীমানা ছিল মালতী এলাকা। এ অঞ্চলে তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের অবস্থা এমন ছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিরাপত্তা ব্যবস্থার নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। সরকারের উক্তিমতে দিল্লী ও আগ্রার সড়কের উপর এমন কাটা সহ্য করা যেত না। (Fall, Vol-1, P- 369)

দিল্লী থেকে আগ্রা যাতায়াতে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হত। আজমীর হয়ে দক্ষিণাত্যে যেসব সৈন্য যেত, তাদের এই অঞ্চল দিয়েই যেতে হত।

বাহাদুর শাহের যুগে এই সড়কের ভয়াবহ অবস্থার ধারণা 'দস্তুরুল ইনশা' পাঠ করলে উপলব্ধি করা যায়। (দেখুন, ১৩০ পৃ.)

১৭১২ খৃস্টাব্দে যখন ডাচ নেতৃবৃন্দ এই অঞ্চল দিয়ে গমন করেন, তখন তারাও এই যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখেছেন। (Later Mughas, T. P. 321)

জন ম্যার ম্যান (John Surman) জুন ১৭১৫ খৃস্টাব্দে এ অঞ্চল দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন। তিনি জাঠদের শান্তিবিনাশী কর্মকাণ্ডের আলোচনা নিজ ডায়েরীতে লিখেছেন। (Orme Collections, p : 1694)

শাহ জাহানের যুগে জাঠরা একবার মারাত্মক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। ১০৪৭ হি. মোতাবেক ১৬৩৭ খৃস্টাব্দে মথুরার সেনানায়ক মুর্শিদ কুলী খান মারা গিয়েছিল তার সঙ্গে যুদ্ধ করে।

স্যার যদুনাথ সরকার তারীখে আওরঙ্গযেব পঞ্চম খণ্ড ২৯৬ পৃষ্ঠায় লিখেন, আওরঙ্গজেব দক্ষিণ ভারতে না থাকার সুযোগ নেয় দুই নতুন জাঠ নেতা রাজা রাম এবং রাম চেহারাহ। রাজা রামের বেআইনী শান্তিবিনাশী কর্মকাণ্ডকে আগ্রার গভর্নর খাফী খানও দমন করতে পারেনি। জাঠরা সব রাস্তা বন্ধ করে দেয়। অনেক এলাকা লুটতরাজ করে। আকবরের কবর লুণ্ঠন করার জন্য সেকান্দারাহ যাত্রা করে। কিন্তু সেখানকার সেনাপ্রধান ছিলেন মীর আবুল ফযল। তিনি বীরত্বের সাথে লড়াই করেন এবং বিদ্রোহীদের সামনে অগ্রসর হতে বাধা প্রদান করেন। রাজা রাম প্রসিদ্ধ তাওরানী অফিসার আসগর খানের সকল জিনিসপত্র লুণ্ঠন করে। অনন্তর আসগর খান জাঠদের সঙ্গে লড়াই করে মারা যান।

'চাহার গোলজারে শুজাঈ' বা 'চার বীরের গাঁথা' রচয়িতা হরিচরণ দাসের বর্ণনামতে জাঠরা পুরান দিল্লী লুণ্ঠন শুরু করে। তখন দিল্লীর অধিবাসীরা আতঙ্ক ও পেরেশানীতে ঘর থেকে বেরিয়ে উন্মাদ হয়ে অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াত। ঠিক তদ্রূপ, যেমন কোনও বিদীর্ণ জাহাজ নিষ্ঠুর তরঙ্গমালায় দয়া করুণার উপর থাকে। প্রত্যেককেই পাগলের মত বিষণ্ন, ভীত-সন্ত্রস্ত দেখা যেত। (হস্তলিখিত সংস্করণ : ৪১০ পৃ.)

মৌলভী যাকাউল্লাহ সাহেব ১৭৬৫ খৃস্টাব্দের ঘটনাবলিতে লিখেন, 'আগ্রার দূর্গে জাঠদের দখলদারিত্ব ছিল। দিল্লী থেকে একশত মাইল পর্যন্ত জাঠদের রাজত্ব ছিল। রাজা সুরুজমল ছিল অত্যন্ত সচেতন, সেনাভিযানে সুপরিচিত ও দেশ জয়ে দক্ষ । সে আগ্রা থেকে মারাঠী নেতাকে বের করে দেয় এবং মেওয়াত দখল করে নেয়। সে খুবই মজবুত চারটি দূর্গ বানায়। সে দিল্লীর প্রশাসনের কাছে এমন এমন আবেদন শুরু করে, ফলে রাজত্বের নামচিহ্নও না থাকে। নাজীবুদ্দৌলাহ তার নিপুণ কর্মকৌশল আর বেলুচীদের সাহায্যে জাঠদের উপর জয়লাভ করেন। রাজা সুরুজমল নাজীবুদ্দৌল্লাহর লড়াইয়ে দিল্লীর কাছেই মারা যায়। এরপর জাঠদের রাজত্বে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে। সুরুজমলের দুই পুত্র মারা পড়ে। তৃতীয় পুত্র রঞ্জিত সিংহ রাজা হয়। তার যুগে জাঠ রাজত্বের বিরাট উন্নতি হয়। যে দেশে সে শাসন করত, তার উত্তর পশ্চিমে ছিল আলবর আর দক্ষিণ পূর্বে আগ্রা। তার মাসিক আয় ছিল দুই কোটি রুপি। ষাট হাজার সৈন্য তার নিকট ছিল।

দিল্লীর অবস্থা

মারাঠী, শিখ ও জাঠদের নিত্যনৈমিত্তিক আক্রমণসমূহের কারণে দিল্লী তার নিরাপত্তা আর প্রতিরোধের সব ধরনের শক্তি ও যোগ্যতা হারিয়ে এমন

ফলবিহীন ও অরক্ষিত বৃক্ষ হয়ে গিয়েছিল, যার উপর চতুর্দিক থেকে হিংস্র বন্যরা আক্রমণ করত এবং একে পত্রপল্লব থেকে বঞ্চিত করে দিত। দিল্লীর অধিবাসীগণ যাদেরকে গোটা সাম্রাজ্যে না শুধু ইজ্জত-সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হত বরং শিক্ষা, ভাষা, সভ্যতা, ভদ্রতা, আভিজাত্য, স্বভাব-চরিত্র এবং রীতিনীতিতেও কষ্টিপাথর মনে করা হত, তারা আজ আক্রমণকারীদের জন্য লুটের মালের দস্তরখান হয়ে গিয়েছিল। এ যুগের উলামা-মাশায়িখের (যাদের নিদর্শন আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কহীনতা ও ভাগ্যের উপর সন্তুষ্টি) চিঠিপত্র থেকেও, যা তারা তাদের ভক্ত-অনুসারী ও প্রিয়জনদেরকে লিখেছেন, এই নিরাপত্তাহীনতা, অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাসের অনুমান করা যায়। এখানে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর প্রসিদ্ধ সমসাময়িক এবং সিলসিলায়ে নকশেবন্দিয়ায়ে মুজাদ্দেদিয়ার শিরোমণি হযরত মির্যা মাযহার জানে জানা (১১১১-১১৯৫ হি.) এর চিঠিপত্রের কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে। তিনি একটি চিঠিতে লিখেন, 'দিল্লীর নিত্যকার যুদ্ধ-বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তায় ভারী বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।'

অপর একটি পত্রে লিখেন, 'চতুর্দিক থেকে বিপদ-বিপর্যয় দিল্লীর দিকে ধেয়ে আসছে।'

আরেকটি পত্রে রাজধানী দিল্লীর নিরাপত্তাহীনতা এবং শহরবাসীর শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা দিয়ে লিখেন, 'ব্যাপক রোগ-ব্যাধি ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে শহরবাসীর পেরেশানী-দুরাবস্থার কথা কতদূর লেখা যায়। আল্লাহ তা'আলা এ শহর থেকে, যা খোদায়ী ক্রোধ অবতরণের স্থান হয়ে যাচ্ছে- বাইরে বের করে নিন। কেননা রাজত্বের কাজকর্মে কোনও আইন-শৃঙ্খলা টিকে নেই। আল্লাহ তার অনুগ্রহ করুন।'

নাদের শাহের আক্রমণ

শাহ সাহেব ১১৫৪ হিজরীতে হজ্জের সফর থেকে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। মাত্র পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল, ১১৫১ হি./১৭৩৮ খৃস্টাব্দে নাদের শাহ দিল্লী আক্রমণ করেন। এ আক্রমণ মোঘল সাম্রাজ্যের সুস্থ সঠিক চূড়াগুলো বাকিয়ে দেয় এবং দিল্লীর মাটি উড়িয়ে দেয়। এই আক্রমণ দিল্লীর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন শহরবাসী ও সম্ভ্রান্ত বংশগুলোর মন-মগজে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, তারা জীবন থেকে বিতৃষ্ণ, লজ্জিত এবং নিজ হাতে নিজের মৃত্যুর ব্যবস্থা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। শাহ আবদুল আযীয (র)-এর উপদেশবাণীতে রয়েছে, তিনি এ অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 'সেই গণহত্যা, মান-সম্মানের মূলোৎপাটনের সময় পুরোনো দিল্লীর অভিজাত শ্রেণী, প্রবীণ রাজপুতদের রীতি অনুযায়ী 'জোহার' (তথা অভিজাত

রাজপুতদের শোচনীয় অবস্থায় পরিবার-পরিজনদেরকে তরবারীর নিচে রেখে স্বয়ং জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়া) এর অকাট্যভাবে মনস্থির করে নিয়েছিল। এহেন পরিস্থিতিতে মুহতারাম আব্বাজান (শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) মুসলমানদেরকে 'কারবালার ঘটনা এবং সাইয়্যিদুনা হুসাইন (রা)-এর কষ্ট-যাতনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই ইচ্ছা থেকে বিরত রাখেন। ফলে তারা সেসব লোমহর্ষক ও কল্পনাতীত কষ্ট-যাতনা সত্ত্বেও ধৈর্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ গ্রহণ করে। পরিত্যাগ করে ধূলি ধূসরিত হওয়া, আত্মহত্যা ও আত্মহননের ইচ্ছা।'

প্রতিকূল ও লোমহর্ষক অবস্থায় শিক্ষাদান ও গ্রন্থ রচনায় একাগ্রতা

মারাঠী, জাঠ, শিখ এবং নাদেরী আক্রমণের হৃদয়বিদারক দুঃখ-দূর্দশা ও টলটলায়মান অবস্থায় মধ্যে, যা দিল্লীকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল এবং যখন মাঝে-মধ্যেই বাড়িঘর স্থানান্তরিত করতে হয়েছে। 'আল কাওলুল জলী' থেকে জানা যায়, ১১৭৩ হিজরীতে দুররানী ফিৎনাকালে শাহ সাহেব (র) তার ভুক্ত-অনুসারী-খাদেমদের আবেদনে প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে সপরিবার ও শুভাকাঙ্খীগণ স্থানান্তরিত হয়ে বড়হানায় তাশরীফ রাখেন। রমাযান মাস চলে এলে পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী এক চিল্লার ইতিকাফও করেন। শাহ সাহেব (র) শিক্ষাদান, গ্রন্থ রচনা, আল্লাহর রাহে দাওয়াত, আত্মশুদ্ধি ও সালেকের তরবিয়ত প্রদানের কাজ সেই সামগ্রিকতা, সার্বজনীনতা, গুরুত্ব ও যত্নের সাথে করতে থাকেন, যাতে মনে হয় দিল্লীই নয়, গোটা ভারতবর্ষে ভারসাম্য ও শান্তিপূর্ণ অবস্থা রয়েছে। আর তিনি এক নিরাপদ স্থানে বসে জ্ঞান-গবেষণা, চিন্তাগত দিকনির্দেশনা, চারিত্রিক দীক্ষা দান ও জাতির পুনর্জাগরণের কাজে আপদমস্তক নিয়োজিত রয়েছেন। মাওলানা সাইয়্যিদ সুলাইমান নদভী (র) অত্যন্ত চমৎকার সাহিত্যালঙ্কারে এই বাস্তবতার প্রতি ইংগিত করেছেন। তিনি লিখেন, 'এরূপ কম লেখকই অতিবাহিত হয়েছেন, যাদের রচনাবলিতে তার যুগের প্রাণ (বাস্তব অবস্থা) নেই কিংবা তাতে স্থান-কালের প্রতিচ্ছবি আর অন্ততঃ নিজ যুগের শিক্ষাগত অবমূল্যায়ন ও দুরাবস্থাসমূহের বর্ণনা নেই। তবে শাহ সাহেবের রচনাবলির বৈশিষ্ট্য এমন যে, তার স্থান-কালের সীমাবদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সংকীর্ণতা ও অভিযোগ, বর্ণ ও গল্প-কাহিনী থেকে একেবারে অমুখাপেক্ষী। আদৌ মনে হয় না যে, এসব কিতাবাদি সে যুগে লিখা হয়েছে, যখন শান্তি-নিরাপত্তা এদেশ থেকে ভুল অক্ষরের মতে মুছে গিয়েছিল। গোটা দেশ চুরি-ডাকাতি, গৃহবিবাদ, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং সব ধরনের বিপদ-বিপর্যয়ে আক্রান্ত

ছিল। দিল্লীর রাজনৈতিক কেন্দ্রীয়তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেক অস্ত্রধারী যোদ্ধা তার রাজত্বের স্বপ্ন দেখছিল। একদিকে শিখ, আরেকদিকে মারাঠী, অপরদিকে জাঠ আর রোহিলা চতুর্দিকে। দেশের মধ্যে সর্বত্রই গোলযোগ-বিদ্রোহ চলছিল। নাদের শাহ ও আহমদ শাহের মত সাহসী সেনা কমান্ডার খায়বারের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে যখনই ইচ্ছা হত অন্ধের মত চলে আসত। আর প্লাবনের মত বেরিয়ে যেত। এরই মাঝে আল্লাহ মালুম দিল্লী কতবার লুণ্ঠিত হয়েছে আর কতবার পুনর্গঠিত হয়েছে। দিল্লীর জ্ঞানের মুকুটধারীর কি যে শান্তি ও নিরাপত্তা, এই সব কিছুই তার সামনে হতে থাকে। কিন্তু তার না আছে মনে কোনও দুর্ভাবনা-চাঞ্চল্য, না চিন্তায় বিক্ষিপ্ততা, না কলমে জবরদস্তি, না ভাষায় যুগের চাপ, না কলম দ্বারা অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ। মনে হয়, উচ্চতার যে আকাশ কিংবা ধৈর্য ও সন্তুষ্টির যে অসম্ভাব্যতায় ছিলেন, সে পর্যন্ত মাটির অন্ধকার পৌঁছতে পারে না। এতে বুঝা যায়, প্রকৃত আহলে ইলমের অবস্থা কত উঁচু এবং আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টি কামনাকারীদের মর্যাদা কত উপরে থাকে।

الا بذكر الله تطمئن القلوب

'হ্যাঁ, আল্লাহর স্মরণে মন-প্রাণ প্রশান্তি লাভ করে। (সূরা রাদ : ২৮)

সঠিক ইলম-জ্ঞানের সঠিক খেদমতও যিকরুল্লাহ তথা আল্লাহকে স্মরণের আরেকটি রূপরেখা। কাজেই সেও যদি মনে প্রশান্তি ও আত্মায় সুখ-স্থিরতা অনুভব করে, তাহলে আশ্চর্যের কিছু নয়। শাহ সাহেবের রচনাবলির হাজার হাজার পৃষ্ঠা পড়লেও আপনাদের এতটুকু অনুভূত হবে না যে, তা হিজরী বার শতকের বিপর্যস্ত সময়ের ফসল। যখন প্রতিটি জিনিস অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার শিকার ছিল। কেবল মনে হবে, (তা) জ্ঞান-প্রজ্ঞার এক অথৈ সমুদ্র, যা নির্বিঘ্নে শান্তি সুখের কলকল ধ্বনিতে বয়ে চলেছে, যা স্থান-কালের ময়লা-আবর্জনা থেকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন।

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং মোঘল রাজত্বের শাসনামলে মুজাহিদ ও বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড

শুধু এতটুকুই নয় যে, শাহ সাহেব বিপদ-আপদ ও দুঃখজনক ঘটনাপ্রবাহের এই ধূলিবালি বরং সেসবের মুষলধারা বৃষ্টির মাঝে খোলা আকাশের নিচে বসে রচনা ও গবেষণা এবং শিক্ষা-দীক্ষা দানে এমনভাবে ডুবে ছিলেন, না বাতাসের তীব্র ঝাপটায় রচনাধীন কিতাবের কোনও পৃষ্ঠা উল্টে যেত, বৃষ্টির কোনও ফোঁটা তার কোন নকশাচিত্র মুছে দিত বরং তিনি সেসব

অবস্থা পরিবর্তন করা, এদেশে মুসলমানদের শাসন ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং একজন কর্তব্যপরায়ণ, বাস্তবপ্রিয়, শরীয়তের আহকামের উপর আমলকারী, সাধারণ মানুষের ইজ্জত-সম্মান রক্ষাকারী, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টিকারী শক্তিগুলো ধ্বংসকারী, সুদৃঢ় ও স্বচ্ছল-শান্তিপূর্ণ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যও সচেষ্ট তৎপর ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি এমনই নেতৃত্ব ও বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন, যা বড় থেকে বড় রাজনৈতিক চিন্তাবিদ আঞ্জাম দিতে পারত, যার রচনা-সংকলন, শিক্ষাদান ও জ্ঞান-গবেষণার সাথে ন্যূনতম সম্পৃক্ততা এবং সামান্য পরিমাণ সুযোগ না হয়।

মুজাদ্দিদ ও ইসলামের দাঈগণ, গবেষক ও লেখকগণের মধ্যে যদি কারও জীবনে এই দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর জীবনে যিনি ৭০০ হিজরীতে সিরিয়ার মুসলমানদেরকে রক্তখেকো তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দাওয়াত দিয়েছেন এবং তাদের নড়বড়ে পাগুলো অটল ও সুদৃঢ় করেন। এরপর যখন সুলতানে মিসর মুহাম্মদ বিন কালাওয়ূঁ সিরিয়া এসে তাতারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা মুলতবী করেন। আর সিরিয়াবাসীর মধ্যে চরম বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে, তখন তিনি স্বয়ং মিসর গমন করেন এবং সুলতানকে সিরিয়া রাষ্ট্রের হেফাযত ও তাতারীদের সাথে লড়াই করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। জিহাদে অংশগ্রহণ করেন সুলতানের সঙ্গে। ফলাফলে তাতারীদের এমন শোচনীয় পরাজয় হয়, যার নযীর তাদের অতীত ইতিহাসে পাওয়া দুরূহ।

শাহ সাহেব (র) তার শিক্ষামূলক কর্মব্যস্ত, জীবনদান ও সংস্কারের প্রচেষ্টার সাথে এমন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, এমন বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে কাজ আঞ্জাম দেন, যদি মোঘলদের মধ্যে কোনও রকম যোগ্যতা কিংবা রাজন্যবর্গের মাঝে সাহস, রাজনৈতিক চেতনা থাকত, তবে ভারতবর্ষ না কেবল সংকীর্ণমনা ও বিশৃঙ্খলাপ্রিয় রাষ্ট্রীয় কুচক্রী দুঃসাহসীদের থেকে নিরাপদ হয়ে যেত বরং ইংরেজদের সেই দখলদারিত্ব থেকেও মুক্ত হয়ে যেত, যেখানে খৃস্ট উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতবর্ষকে দুর্বল ও শূন্য ময়দান পেয়ে নিজেদের পা সুদৃঢ় করে নিয়েছে। আর একে তারা না কেবল বৃটেন সাম্রাজ্যভুক্ত করেছে বরং এর দ্বারা এমন শক্তি ও উপকরণ লাভ করেছে, যা পুরো বিশ্ব-রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে। প্রতিষ্ঠা করে মুসলমান ও আরব দেশগুলোয় নিজের কর্তৃত্ব। শাহ সাহেবের এই চিন্তাহীনতা, সাহস ও অবিচলতা, উচ্চ দৃষ্টি ও দৃঢ় চিত্ততা এবং এর বিপরীতে দেশের লোমহর্ষক পরিস্থিতি দেখে (যার মধ্যে না কোনও বুদ্ধিমত্তা, অন্তর্দৃষ্টি ও ধারাবাহিক

কর্মব্যস্ততার অবকাশ অনুভূত হয় আর না কোনও বৈপ্লবিক অবস্থা ও পতনের উত্থানের আশা করা যায়।) আল্লামা ইকবালের নিম্নোক্ত কবিতা এই বাস্তব অবস্থার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি বলেই মনে হয়।

[illegible]

[illegible]

'বাতাস যেন তীব্র গতিশীল; কিন্তু প্রদীপ আপন জ্বালায় নিশিদিন;
সেই মহাপুরুষ আল্লাহ য্যাকে দিলেন এই মহাবিপর্যয় অনুভূতি জ্ঞান।'

শাহ্ সাহেবের অনুভূতি ও চাঞ্চল্য

শাহ সাহেব যিনি শৈশবের উপলব্ধির বয়সে আওরঙ্গজেব আলমগীরের রাজকীয় জাঁকজমক এবং রাজত্বের সৌভাগ্যের প্রভাব দেখেছিলেন এবং তৎপূর্ববর্তী (যখন মোঘল সাম্রাজ্যের ভাগ্যরবি উন্নত এবং দাপট ও সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল) ঘটনাবলি দিল্লীর বুযুর্গগণ ও বংশের সম্ভ্রান্ত লোকজনের মুখে শুনেছিলেন। যার কলম থেকে খেলাফত রাশেদার কীর্তিগুলো ও ইসলামের ইতিহাসের সোনালী যুগের আলোকোজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি, ইসলামী রাজত্বের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং তার সাথে আল্লাহর মদদ ও সাহায্যে বিশদ বিবরণ, 'ইযালাতুল খফা' -এর পাতায় পাতায় প্রমাণিত হয়েছিল, তার চোখে মোঘল সাম্রাজ্যের পতনকাল, ফুররাখ সিয়ার ও মুহাম্মদ শাহ -এর শাসনামলের বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, চুরি-ডাকাতি, পথঘাটের নিরাপত্তাহীনতা, ধর্ম-জাতির বিনা পার্থক্যে রাষ্ট্রের লোকজনের জানমাল ও ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তাহীনতা, মানুষের রক্তের মূল্যহীনতা, ইসলামী শে'আর ও নিদর্শনগুলোর অবমাননা এবং মুসলমানদের (যারা ছয়শ বছর ধরে এদেশে রাজত্ব করে আসছিল) অক্ষমতা-অসহায়ত্বের দৃশ্যাবলি দেখেছেন, তখন তার সচেতন অনুভূতিপরায়ণ ও ব্যথাভারাক্রান্ত মন রক্তাশ্রু প্রবাহিত করে।

আর এই রক্তাশ্রুগুলো তার ক্ষুরধার কলম দ্বারা সেসব চিঠিপত্রের পাতায় ঝরে পড়ে, যেগুলো তিনি সমকালের কোনও কোনও সুহৃদ আস্থাভাজন লোকজনকে লিখেছেন। এখানে তার কয়েকটি নমুনা পেশ করা হচ্ছে। সমকালীন এক বাদশার নামে সুরুজমল জাঠের শাসনকাল ও ইসলামের দেশছাড়া অবস্থার বিবরণ দিয়ে একটি পত্রে লিখেন, 'তারপর থেকে সুরুজমলের দাপট বেড়ে গেছে। দিল্লীর দুই মাইল দূর থেকে নিয়ে আগ্রার শেষ পর্যন্ত প্রস্থে আর মিওয়াতের সীমান্ত থেকে ফিরোজাবাদ ও শিকওয়াবাদ

পর্যন্ত প্রস্থে সুরুজমল দখল করে নিয়েছে। কারও সাধ্য নেই যে, সেখানে আযান ও নামায চালু করে।'

এ চিঠিতেই একটি আবাদ ও জনবহুল শহর 'বিয়ানাহ'-এর পৌঢ়ত্ব-পেরেশানীর উল্লেখ করে লিখেন, 'যে বিয়ানাহ শহর ছিল ইসলামের প্রাচীন নগরী, যেখানে উলামা-মাশায়িখ সাতশত বছর ধরে বসবাস করে আসছিলেন, সে শহরের উপর শক্তিবলে দখল কায়েম করে মুসলমানদেরকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সাথে সেখান থেকে বের করে দিয়েছে।'

লক্ষাধিক রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের শোচনীয়বস্থার বর্ণনা দিয়ে লিখেন, 'যখন বাদশার কোষাগার রইল না, বেতন-ভাতাও স্থগিত হয়ে গেল। অবশেষে সব কর্মচারী বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। হাতে তুলে নিল ভিক্ষার ঝুলি। সাম্রাজ্যের নাম ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।'

মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা লিখতে গিয়ে তার কলম থেকে প্রভাবময় এ বাক্য বেরিয়ে আসে, 'সর্বোপরি, মুসলিম উম্মাহ করুণার পাত্র।'

নবাব নাজীবুদ্দৌলাহর নামে একটি পত্রে লিখেন, 'ভারতের মুসলমান চাই সে দিল্লীর হোক কিংবা অন্য কোনও অঞ্চলেরই হোক, বহু দুঃখ-শোক দেখেছে। অনেকবার লুটতরাজের শিকার হয়েছে। চাকু অস্থিমজ্জা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তারা বড়ই করুণার পাত্র।'

শাহ সাহেব বাস্তব প্রকৃতি, ঘটনাবলি এবং প্রভাবময় ও শক্তিশালী কারণসমূহের উপর দৃষ্টি দিয়ে নিশ্চিত পরিণতি ও অদূর ভবিষ্যতের ভবিষ্যদ্বাণী এমনভাবে করতেন, যাতে যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার দখল নেই, নিছক অবস্থা-পরিস্থিতির নিরপেক্ষ ও বাস্তবধর্মী তত্ত্বানুসন্ধান।

'আল্লাহ না করুন, কাফির-বিজাতীয়দের অগ্রগতি যদি এভাবে চলতে থাকে, তবে মুসলমান ইসলামকে বিস্মৃত করে দিবে (ভুলে যাবে)। আর মাত্র কিছুদিনের ব্যবধানে এই মুসলিম জাতি এমন এক জাতিতে পরিণত হবে যে, ইসলাম ও অনৈসলামের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না।

মোঘল সম্রাট ও রাজন্যবর্গকে উপদেশ ও পরামর্শ

শাহ সাহেব মোঘল বংশের শাসকবর্গের উত্থান-পতন ও তার কারণসমূহ সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। যেমন, সপ্তম অধ্যায়ে 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' থেকে উদ্ধৃত বিষয়বস্তু দ্বারা প্রকাশ পায়। মোঘল সাম্রাজ্য ছাড়াও তিনি অন্যান্য ইসলামী সাম্রাজ্যের ইতিহাসও গভীর দৃষ্টিতে পড়েছিলেন। আর তা থেকে তিনি সেই বিজ্ঞচিত ফলাফল বের করেছিলেন, যা কুরআনে কারীমের এমন ধারক বাহক আলেমই করতে পারেন, যিনি

আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় আইন-কানুন এবং আল্লাহর নীতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন, এ বংশের স্বভাব-চরিত্র দীর্ঘ পৈত্রিক রাজত্ব, ভোগ-বিলাসের উপায়-উপকরণের সহজলভ্যতা, ব্যক্তিস্বার্থ, অনুচর ও সাম্রাজ্যের উপদেষ্টাদের অদূরদর্শীতার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাদের দেহে শিকড় ছড়িয়ে বসেছিল নানা রোগ-জীবাণু। তিনি আরব দার্শনিক ঐতিহাসিক ইবনে খালদূনের নিম্নোক্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি সম্পর্কেও বেখবর ছিলেন না। ইবনে খালদূন বলেছিলেন, إن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع

যখন কোনও সাম্রাজ্য বার্ধক্যে এসে উপনীত হয়, তখন সাধারণতঃ নতুন করে যৌবনে পদার্পণ করা তথা জেগে উঠা সম্ভব হয় না।

কিন্তু সঠিক চিন্তাভাবনা, খাঁটি আকাঙ্খা ও হৃদয়স্পর্শী কথা মানুষকে এমন স্থানেও ভাগ্যপরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে, যেখানে সফলতার আশা ক্ষীণ। যে পথিকের পিপাসা প্রকট হয়ে যায়, প্রাণ হয় ওষ্ঠাগত– জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি-অভিজ্ঞতা পর্যাপ্ত থাকা সত্ত্বেও পানির আশায় তার পদযুগল মরীচিকার তরঙ্গের দিকে অনিচ্ছায় এগিয়ে যায়। যেন বুদ্ধি-বিবেকের আত্মবিস্মৃত খাঁটি পিপাসার নিদর্শন। কবি উরফী কত চমৎকার কথা বলেছেন,

ز نقص تشنه لبی دان بعقل خویش مناز
دلت فریب گر از جلوهٔ سراب نخورد

খাঁটি পিপাসার ঘাটতিকে এর কারণ ভেব!
নিজের বুদ্ধি-জ্ঞানের উপর গৌরব কর না।
যদি তোমার মন জেনে বুঝেও
মরীচিকার বাহ্যিক চাকচিক্যে ধোঁকা না খায়।

কিন্তু একে তো মানুষ, এরপর এমন এক বংশের ব্যাপার, যারা শত শত বছর সম্মান ও দাপটের সঙ্গে শাসন করেছিল, এক নিষ্প্রাণ ও স্থির মরীচিকার সঙ্গে সর্বাবস্থায় বিরোধী। আর তার থেকে এ আশা করা অবান্তর নয় যে, তাদের মধ্যে ফের এমন কোন আত্মমর্যাদার অধিকারী দৃঢ়চিত্ত ও রণবীর জন্ম নিতে পারে, যিনি অবস্থার মোড় ঘুরিয়ে দিবেন এবং মুমূর্ষুপ্রায় রাজত্বের জীবনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবেন। শাহ সাহেব (র) ছিলেন তার যুগের কুরআনে কারীমের বড় মর্মজ্ঞ ও ডুবুরী। তার সম্মুখে ছিল কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত,

تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل، وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى، وترزق من تشاء بغير حساب.

'আপনিই রাতকে দিনে প্রবিষ্ট করান আর দিনকে করান রাতে এবং আপনি নিষ্প্রাণ-মৃত থেকে প্রাণী আর প্রাণী থেকে নিষ্প্রাণ সৃষ্টি করেন। আর আপনি যাকে খুশি বিনা হিসেবে (অফুরন্ত) রিযিক দান করেন।' (সূরা আলে ইমরান- ২৭)

সে মতে শাহ সাহেব (র) মুআলা দুর্গের অবস্থাবলি ভালভাবে জানার পরও সমকালীন এক মোঘল সম্রাটকে পত্র লিখেন। উক্ত পত্রে তাকে অবস্থার সংশোধন, উন্নতি, সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি এবং আল্লাহর রহমত ও সাহায্যকে নিজের প্রতি ধাবিত করার জন্য এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ ও বিজ্ঞচিত পরামর্শ প্রদান করেন, যা তাঁর উচ্চস্তরের ধর্মীয় কল্যাণ, ইতিহাস, রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার গভীর ও প্রশস্ত অধ্যাবসায়ের প্রমাণ। শুরুতেই লিখেছেন, 'মহান আল্লাহর অনুগ্রহ-অনুকম্পায় আমল করুন, তাহলে রাজত্বের কর্মকাণ্ডের শক্তি, শাসন কর্তৃত্বে স্থায়িত্ব এবং ইজ্জত সম্মানের উন্নতি প্রকাশ পাবে। জনৈক কবি বলেন,

در پس آئینه طوطی صفتم داشته اند ☆ آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم

'অর্থাৎ আমাকে আয়নার পিছনে তোতা পাখির মতো রেখেছেন। অনাদি শিক্ষক যা কিছু বলেন, আমি তা-ই বলি।'

তৎকালীন সম্রাট, তার মন্ত্রী ও রাজন্যবর্গের উদ্দেশ্যে লিখিত সে পত্রে এমন কিছু বিজ্ঞচিত রাজনৈতিক ও ব্যবস্থাপনামূলক পরামর্শ, যা ছাড়া রাজত্বের স্থায়িত্ব, প্রজাদের ব্যাপক কল্যাণ এবং মানুষের আস্থা-বিশ্বাস বহাল থাকতে পারে না প্রভৃতি জরুরী বিষয় উদ্ধৃত করার পর অবশেষে আরও লিখেন, বিচারক ও হিসাবরক্ষক এমন লোককে বানাতে হবে, যার উপর ঘুষ গ্রহণের অপবাদ লাগেনি এবং সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী। তাছাড়া মসজিদের ইমামদেরকে উত্তমরূপে বেতন-ভাতা দিতে হবে। নামায যথারীতি জামাতে পড়ার তাগিদ দিতে হবে। পূর্ণ গুরুত্বের সাথে ঘোষণা করে দিতে হবে, যেন রমযান মাসের অবমাননা না হয়। শেষ কথা হল, ইসলামের বাদশা ও সম্মানিত শাসকবর্গ যেন নাজায়েয, অবৈধ ভোগ-বিলাসে লিপ্ত না হোন। অতীতের গুনাহগুলোর জন্য খাঁটি মনে তাওবা করবেন এবং ভবিষ্যতে সকল গুনাহ ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকবেন। যদি এসব কথার উপর আমল করা হয়, তবে আমার বিশ্বাস, সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব, গাইবী সাহায্য-শক্তি এবং আল্লাহর মদদ সহজলভ্য হবে। وما توفيق الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

এভাবে শাহ্ সাহেব সেই সুমহান কর্তব্য পালন করে ফেলেন, যা একজন উত্তম আলেমে দীন, কুরআন ও হাদীস বিশারদ এবং সময়ের মুজাদ্দিদ ও সংস্কারকের করা উচিৎ। যিনি তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন এবং সেসব বিপদাশঙ্কা সম্পর্কে জ্ঞাত, যা কেবল শাসক গোষ্ঠীর মাথার উপরই নয়; সমগ্র দেশবাসীর কাঁধে উপর উন্মুক্ত তরবারীর মত ঝুলছিল। শাহ্ সাহেব তার পূর্বসূরীদের অনুসরণ এবং উম্মতের বুযুর্গদের রীতি অনুযায়ী রাজদরবারের সঙ্গে সরাসরি কোনও সম্পর্ক রাখেননি। নিজের দারিদ্রের চাটাইয়ের উপর থাকতেই স্বাদ পেতেন। কিন্তু খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া এবং উত্তরসূরী হযরত সাইয়িদ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিহলী (র)-এর মত তার অন্তর সমকালীন রাজত্ব ও এর সঠিক নেতৃত্বের জন্য দু'আয় মগ্ন ছিল। আর যারা এই শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তিনি তাদেরকে মুখে-কলমে সঠিক পরামর্শ দানের কোনও প্রকার কৃপণতা ও সাবধানতার সঙ্গে কাজ করতেন না। দু' একবার এমনও হয়েছে যে, বাদশা স্বয়ং আকস্মিক শাহ্ সাহেবের খেদমতে এসে হাযির হন এবং দু'আর দরখাস্ত করেন। শাহ্ সাহেব তার প্রিয়ভাজন ও বিশ্বস্ত, ইরশাদের অধিকারী মুরীদ এবং আত্মীয় ভাই শাহ্ মুহম্মদ আশেক ফুলতী (র) কে একটি পত্রে লিখেন, 'বৃহস্পতিবার দিন বাদশা হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া এবং অন্যান্য মাশায়িখের মাজার যিয়ারতের জন্য সওয়ার হয়ে গমন করেছিলেন। আমাকে পূর্ব থেকে জানানো ছাড়াই কাবুলী দরজা দিয়ে সাদাসিধে আসনে চড়ে গরীবখানায় এসে উপস্থিত হন। অধমের মোটেও জানা ছিল না। মসজিদে চাটাইগুলোর উপর এসে বসে পড়লেন। বাদশাকে অন্তত এতটুকু সম্মান জানানো আবশ্যক হয়ে পড়েছিল, অধম যে জায়নামাযে বসে এবং নামায আদায় কর, সেটিকে এমনভাবে বিছিয়ে দেওয়া হয় তার এক প্রান্তে অধম বসে আর অপর প্রান্তে বসেন বাদশা। বাদশা প্রথমে অত্যন্ত সম্মানের সাথে মুসাফাহা করলেন। এরপর বললেন, আমি দীর্ঘদিন থেকে আপনার সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষী ছিলাম। কিন্তু আজ এই যুবকের রাহবরীতে এখানে এসে পৌঁছেছি। ইংগিত করলেন উযীরের প্রতি। এরপর বললেন, কুফরের প্রবলতা আর প্রজাদের বিচ্ছিন্নতা-বিক্ষিপ্ততা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যা সকলেই অবগত। কাজেই আমার তো নিদ্রা, পানাহার কঠিন ও তিক্ত হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আপনার কাছে দু'আর দরখাস্ত। আমি বললাম, ইতোপূর্বেও আমি দু'আ করতাম। আর এখন তো ইনশাআল্লাহ আরও বেশি দু'আয় মগ্ন থাকব।

ইত্যাবসরে উযীর আমাকে বললেন, হযরত! বাদশা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই অত্যন্ত যত্নসহকারে আদায় করেন। আমি বললাম, আলহামদুলিল্লাহ! এটা এমন একটি কথা, যা দীর্ঘকাল পর শোনা যাচ্ছে। নতুবা নিকট অতীতের বাদশাগণের কারও মধ্যে এ নামাযের গুরুত্ব ও যত্ন ছিল বলে শোনা যায়নি।'

অবশেষে শাহ সাহেব বাদশাকে হযরত আবু বকর (রা)-এর সেই অসীয়ত শোনান, যা তিনি হযরত উমর (রা) কে খলীফা বানানোর সময় বলেছিলেন, 'খলীফাকেও আশ্চর্য আশ্চর্য সমস্যাবলির সম্মুখীন হতে হয়। কখনও দীনের শত্রুদের পক্ষ থেকে আবার কখনও সমর্থক-সহযোগীদের পক্ষ থেকেও। এসব সমস্যা সমাধান কেবল একটিই অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টিকে নিজের মূখ্য উদ্দেশ্য বানিয়ে মহান আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে; আর এর অন্যথা থেকে দৃষ্টি সম্পূর্ণ সরিয়ে নিতে হবে।'

শায়খ মুহাম্মদ আশেক (র)-এর নামে আরেকটি পত্রে লিখেন, 'বাদশা ও তার মাতা এসেছিলেন। বাদশাহর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল, অকৃত্রিমভাবে কিছুক্ষণ অবস্থান করা। প্রায় তিন চার ঘণ্টা তিনি সেখানে বসেন। আহারও করেন। তার বেশিরভাগ কথা আল্লাহর সৃষ্টিজীবের মঙ্গলজনক কাজকর্মে সাহায্য চাওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল।

কিন্তু বলাবাহুল্য যে, শাসক গোষ্ঠীর পতন, সুদীর্ঘ পৈতৃক রাজত্বের প্রভাব এবং বাইরের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, কোনও বড় থেকে বড় সংকল্পচিত্ত আওরঙ্গ উত্তরসূরীও একাকী এই পতনকে নবজাগরণে, দুর্বলতাকে নতুন শক্তি ও ক্ষমতায় বদলে দিয়ে গোটা রাজ্যের সবক্ষেত্রে বিপ্লব আনতে পারত না। ইতিহাস সাক্ষ্য, যখন কোনও সাম্রাজ্যের পতন তার চরম সীমায় পৌঁছে যায় এবং নানা বিদ্রোহ, বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্রের সুরঙ্গ সাম্রাজ্যকে বারুদের মত উড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন বড় থেকে বড় দৃঢ়চিত্ত, পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু এবং যোগ্যতাসম্পন্ন বাদশাও সাম্রাজ্যের ভগ্ন দেহে নতুন করে প্রাণ সঞ্চারে ব্যর্থ হয়ে পড়ত। একাধিকবার এমন হয়েছে, শাসকগোষ্ঠীর শেষ ব্যক্তি তার পূর্বপুরুষদের থেকে উত্তম ছিলেন। আর তিনি সাম্রাজ্যকে পতন থেকে রক্ষা করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু সফলকাম হতে পারেননি।

মারওয়ান বংশের এবং বনী উমাইয়ার সাম্রাজ্যের শেষকালে মারওয়ান বিন মুহাম্মদ ওরফে মারওয়ান আল হিমার (মৃত্যু ১৩২ হি.), আব্বাসীয় খলীফাদের বংশের শেষ শাসক মুস্তাছিম বিল্লাহ (মৃত্যু ৬৫৬ হি.) আর এক সময়ের তৈমুর বংশের শেষ শাসক আবু যুফার বাহাদুর শাহ (মৃত্যু ১২৭৯

হি./১৮৬২ খৃ.) এরই কয়েকটি উপমা। কাজেই শাহ সাহেবের মত অন্ত র্দৃষ্টিসম্পন্ন সংস্কারক, দূরদর্শী ঐতিহাসিক ও ঈমানী শক্তির ধারকের জন্য নামসর্বস্ব মোঘল শাসকগোষ্ঠী ও তাদের রাজন্যবর্গের সাথে সম্পর্ক তৈরী, তাদের ভেতর জাতীয় মূল্যবোধ ও ধর্মীয় আত্মসম্ভ্রমবোধ জাগ্রত করা, বিপর্যস্ত অবস্থা-পরিস্থিতি আর বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী শক্তিগুলোর সাথে পাঞ্জা লড়ার উৎসাহ দান ও প্রস্তুত করার উপর না থামা জরুরী ছিল। শাহ সাহেব (র) দরবারী উমারাদের সংকীর্ণ পরিষদ থেকে বাইরে বেরিয়ে সেসব আমীর-উমারা, যুদ্ধাংদেহী সেনা কমান্ডার এবং উচ্চ সাহসী নেতৃবৃন্দের কাছে চিঠিপত্র প্রেরণ করেন, যাদের ভূমিতে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও জাতীয় সম্মানের কোনও চাপা দেওয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তন্মধ্যে এসব রাজন্যবর্গ ও নেতৃবৃন্দ ছিলেন– উযীর মামলাকাত আসিফ জাহ, নবাব ফিরায জঙ্গ নিযামুল মালিক আহমদ শাহী, ইমাদুল মালিক উযীর, তাজ মুহাম্মদ খান বেলচী, নবাব মাজদুদ্দৌলাহ বাহাদুর, নবাব উবায়দুল্লাহ খান কাশ্মীরী, মিয়া নিয়াযগুল খান, সাইয়িদ আহমদ রোহীলাহ।

কিন্তু শাহ সাহেব (র)-এর (ঈমানী শক্তি ও ইলহামে রব্বানী সম্পৃক্ত) সন্ধানী ও তীক্ষ্মদৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, সে যুগের দুই মহান ব্যক্তির ওপর। যাদের একজন ছিলেন ভারতেরই ব্যক্তিত্ব আর অপরজন বাইরের। আমাদের উদ্দেশ্য আমীরুল উমারা নাজীবুদ্দৌলাহ ও আহমদ শাহ আবদালী, যিনি আফগানিস্তানের একজন শাসক।

নবাব নাজীবুদ্দৌলাহ

নবাব নাজীবুদ্দৌলাহর মধ্যে সেসব গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ পাওয়া যেত, সেগুলো প্রাচীন যুগে সাম্রাজ্যস্থপতিগণের বৈশিষ্ট্য ছিল, যারা নিজস্ব সাম্রাজ্য ও বংশের উত্থান ও নেতৃত্বের যুগে (যখন সৈন্য বাহিনী গঠনের সহজলভ্যতাই বিজয় ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট ছিল) গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন এবং তাদের হাতে কোন বিজয়-সাফল্যের কোন কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে, তাদের মধ্যে স্বীয় অভিভাবকত্বের নেয়ামতসহ কৃতজ্ঞতার রত্ন, স্বীয় সঙ্গীসাথী ও অধীনস্তদের সাথে ভদ্রতা ও সদাচরণ, সেনানায়কের রত্ন ও বীরত্ব এবং নেতাসুলভ যোগ্যতা কানায় কানায় ভরেছিল। তবে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা হল, এসব বৈশিষ্ট্য, গুণ-যোগ্যতা সামরিক শক্তিসমূহকে পরাভূত করা এবং রাজ্যজয়ে তো সফলতা লাভ করে। কিন্তু যে অবস্থা পরিবেশে গাদ্দারী, নিমকহারামী ও বিশ্বাসঘাতকতাকে আদর্শিক শাস্ত্রের (!?) মর্যাদা দেওয়া হয়; আইন ভঙ্গ, নীতিহীনতা ও অকার্যকারিতাকে

উচ্চস্তরে রাজনীতি মনে করা হয়, সুযোগে স্বার্থ উদ্ধারকে বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা ভাবা হয়, সেখানে অধিকাংশই উপকারী-ফলপ্রসূ হওয়ার পরিবর্তে সাফল্যের পথে অন্তরায় এবং নানা জটিলতা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দুর্ভাগ্যক্রমে নাজীবুদ্দৌলাহ ও আসিফ জাহ নিযামুল মালিকের এমনই বিপর্যস্ত পরিবেশ নসীব হয়েছিল– ঐতিহাসিকগণ তার উঁচু কৃতিত্ব, সামরিক ও নেতাসুলভ যোগ্যতার প্রশংসায় একমত। স্যার যদুনাথ সরকার লিখেন– 'একজন ঐতিহাসিকের বোধগম্য হয় না যে, কি গুণের কারণে সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করবে। রণাঙ্গণে তার বিস্ময়কর নেতৃত্বের, না সমস্যাবলিতে তার তীক্ষ্মদৃষ্টি কিংবা সঠিক সিদ্ধান্তের, নাকি তার সেসব স্বভাবগত যোগ্যতাসমূহের, যা তাকে বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় এমন পথ দেখাত, যদ্দরুণ ফলাফল তার পক্ষেই বেরিয়ে আসত।'

মৌলভী যাকাউল্লাহ দেহলভী (র) 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেন– 'নাজীবুদ্দৌলাহ এমন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, সচেতন ও বিচক্ষণ ছিলেন, খুব কমই তেমন হয়ে থাকে। আমানত রক্ষা, বিশ্বস্ততা তো সে সময় তার উপর শেষ ছিল। তিনি তার প্রবীণ মনিব নবাব দাবিন্দে খান রোহিলা এবং নবাব শুজাউদ্দৌলাহর আনুগত্য করে চলতেন। মলিহার রাও হাওলাকরের সঙ্গেও তার সামান-খেলোয়ার চলে যেত। হয়ত স্মরণ আছে, এই মারাঠা পানিপতের যুদ্ধ থেকে স্বদেশবাসীদেরকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। মোটকথা, এই সাহসী তরুণ ঐ খণ্ডবিখণ্ড রাজত্বকে পুনর্গঠিত করেছিল।'

শাহ আবদুল আযীয (র) বলেন, 'নাজীবুদ্দৌলাহর ওখানে নয়শত আলেম ছিল। যাদের মধ্যে সবচেয়ে নিচু পর্যায়ের আলেম পাঁচ রুপি আর সর্বোচ্চ পর্যায়ের আলেমদের পাঁচশ রুপি লাভ হত।'

অধ্যাপক খলীক আহমদ নিযামীর উক্তি মতে '১৭৬১ খৃস্টাব্দ থেকে ১৭৭০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি দিল্লীর সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সকল রাজনীতি তার পাশে আবর্তিত হত। তিনি গোটা শাসনব্যবস্থা নিজের কাঁধের উপর চাপিয়ে নিয়েছিলেন।

শাহ সাহেবকে আল্লাহ তা'আলা মানবতাবোধ ও বাস্তবদর্শিতার এমন যোগ্যতা দান করেছিলেন, যা সেসব লোকদের দান করা হয়, যারা ইসলাহ ও সংস্কারের ইতিহাস, মানুষ গঠন ও সমাজ বিনির্মাণে বিরাট কোনও ভূমিকা রাখেন। মহান পুরুষের এই দুর্দিনে, যা সাহসী, সচেতন ও শক্তি পরখকারীদের দ্বারা ভরেছিল, শাহ সাহেব স্বীয় কাজের পূর্ণতা দান ও সাহায্য গ্রহণের জন্য নাজীবুদ্দৌলাহকে বেছে নেন। শাহ সাহেবের দূরদর্শী ও

সূক্ষ্মদর্শী চোখ এই যোগ্য রত্ন ও তার ভেতরে ধর্মীয় মূল্যবোধকে দেখে ফেলেন। শাহ সাহেব তার সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদান শুরু করেন। আর সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলো প্রজ্জ্বলিত করার চেষ্টা চালান, যা ভস্ম ছাইয়ের ভেতর চাপা পড়েছিল। শাহ সাহেব তার নামে একটি পত্রে লিখেন, 'মহান আল্লাহ তা'আলা আমীরুল মুজাহিদীনকে প্রকাশ্য সাহায্য ও সুস্পষ্ট সমর্থনের সাথে সম্মানিত করুন। আর এই আমলকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদায় পৌঁছিয়ে বিরাট বিরাট বরকত ও রহমত তার উপর অর্পিত করুন।

ফকীর ওয়ালীউল্লাহ (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন)-এর পক্ষ থেকে ঐকান্তিক মহব্বতের সালামের পর প্রকাশ থাকে যে, মুসলমানদের সাহায্যার্থে এখানে দু'আ করা হচ্ছে এবং অদৃশ্য শক্তি থেকে উপকারিতা গ্রহণ অনুভূত হচ্ছে। আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলা আপনার হাতে ধর্মীয় চেষ্টা-সংগ্রাম ও জিহাদকে জীবিত করে তার অফুরন্ত বরকত এই দুনিয়া ও পরকালে দান করবেন। إنه هو قريب مجيب. 'নিশ্চয় তিনি সন্নিকটে এবং দু'আ কবুলকারী।'

অপর একটি পত্রে তাকে 'আমীরুল গুযাত' এবং 'রঈসুল মুজাহিদীন' উপাধিতে সম্বোধন করেছেন। অন্য একটি পত্রে লিখেন, 'মনে হয় এ যুগে মুসলিম উম্মাহর শক্তি বৃদ্ধি ও মৃতপ্রায় উম্মতের সাহায্য দানের কাজ আপনার মাধ্যমেই সম্পাদিত হবে, যিনি এই উত্তম ও কল্যাণ কাজের উৎস ও মাধ্যম। আপনি মনের মধ্যে কোনও ধরনের প্রবঞ্চণা ও সংশয় জমতে দিবেন না। ইনশাআল্লাহ সব কাজ বন্ধুদের সন্তুষ্টি ও প্রত্যাশা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে।

শাহ সাহেব নবাব নাজীবুদ্দৌলাহর নামে প্রেরিত চিঠিপত্রে দু'আ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উপরই যথেষ্ট করতেন না, তাকে অনেক উপকারী মৌলিক পরামর্শও দিতেন। সতর্ক ও বিরত থাকার উৎসাহও দিতেন সেসব ভুলভ্রান্তি ও ঘটনাবলির পুনরাবৃত্তি থেকে, যা ইতোপূর্বে আক্রমণকারী ও মুসলমান সৈন্যদের থেকে প্রকাশ পেয়েছে এবং যা আল্লাহর সাহায্য-সহায়তা আসার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে যায়। এক পত্রে হযরত শাহ সাহেব লিখেন, 'যখন শাহী ফৌজের দিল্লী আগমন ঘটবে, তখন এ ব্যাপারে পূর্ণ যত্ন ও শৃঙ্খলা থাকতে হবে, যেন শহর আগের মত অন্যায়-জুলুমে পদদলিত না হয়। দিল্লীবাসী অনেকবার হত্যা-লুণ্ঠন, ইজ্জত হরণ ও লাঞ্ছনার তামাশা দেখেছে। আর তা-ই উদ্দেশ্য হাসিল ও ইচ্ছায় বিলম্ব হচ্ছে। সবশেষ কথা, মজলুমদের 'আহ!' ধ্বনিতেও প্রভাব আছে। এখন যদি আপনি চান, আপনার বহু প্রত্যাশিত কাজটি সম্পন্ন হয়ে যাক, তাহলে যথারীতি পূর্ণ গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখতে

হবে, যে কোনও সৈনিক দিল্লীর মুসলমানগণ এবং যেসব অমুসলিমদের সঙ্গে (যারা যিম্মির মর্যাদায় বসবাস করে) প্রতিবাদ করবে না।'

শাহ সাহেব একাধিক চিঠিপত্রে ভারতের সেই তিন (এ অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখিত) বিচ্ছিন্নবাদী ও যুদ্ধবাজ শক্তিগুলোর ত্রাস এবং তাদের আক্রমণ থেকে দেশকে নিরাপদ করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি বারবার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। অন্যথায় দেশে আইন-শৃঙ্খলা, শান্তি-নিরাপত্তা, ধর্মীয় নিদর্শনাবলি ও ইবাদতখানাগুলো সংরক্ষণ এবং সাম্য-ন্যায়ের আদর্শে সুষম সাধারণ জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়। এদের কারণে গোটা দেশ বিশেষভাবে যুদ্ধাবস্থা ও সামরিক শাসনের মধ্যে জীবন যাপন করছে।

নবাব নাজীবুদ্দৌলাহর সঙ্গে শাহ সাহেবের এমনই হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয়। তিনি তার থেকে বিরাট আশা রাখতেন, কাজেই তাকে বারবার তাগিদ দিয়ে বলেছেন, যখন তিনি সে লক্ষ্যে সংকল্পের সাথে ঝাণ্ডা উত্তোলন করবেন, তখন যেন অবশ্যই শাহ সাহেবকে অবহিত করেন। এমনকি শাহ সাহেব তাকে এ ব্যাপারে বিজয়-সফলতার আশাবাদ শোনান এবং বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। শাহ সাহেব লিখেন,

فقیر کو اس بارے کوئی شک وشبہ نہیں۔

'অধমের এ ব্যাপারে কোনও সংশয়-সন্দেহ নেই।'

শাহ সাহেব নবাব নাজীবুদ্দৌলাহকেই একান্ত মাধ্যম বানান আহমদ শাহ আবদালীকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসার জন্য। তার নামে সরাসরি পত্র (সামনে আসন্ন) লিখা ছাড়া তার (নাজীব) দ্বারাও চিঠিপত্র লেখান এবং তাকে বরাবরই তাগিদ দেন। নবাব নাজীবুদ্দৌলাহ শাহ সাহেবের ইন্তিকালের আট বছর পর রজব ১১৮৪ হি./৩১ অক্টোবর ১৭৭০ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। অধ্যাপক খালীক আহমদ নিযামী লিখেন, তার অনুপম ন্যায়পরায়ণতা, সচেতনতা ও দূরদর্শিতার এই ঘটনা ইতিহাসে সর্বদা জীবন্ত হয়ে থাকবে। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন, তখনও তিনি তার সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেন, গঙ্গার মেলায় যাতায়াতকারী হিন্দু তীর্থযাত্রীদের জান-মালের পূর্ণ হেফাযত করতে হবে।'

আহমদ শাহ আবদালী

শাহ সাহেব তার সচেতনতা সৃষ্টি, ভারতবর্ষের অবস্থা-পরিস্থিতির বাস্তবধর্মী পর্যবেক্ষণ, শাসনকর্তা ও দরবারী আমলা-উমারাদের নিষ্ক্রিয়তা এবং শাসক গোষ্ঠীর ক্রমাগত ব্যর্থতা-অযোগ্যতার ফলে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট

দু'টি বাস্তব বিষয় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। প্রথম প্রয়োজন দেশের এই নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলা দূর করা, যার হাতে না দেশবাসীর জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু নিরাপদ, না কোনও গঠনমূলক কাজ ও সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলার অবকাশ আছে। যেমন পিছনে বলে এসেছি। এই অরাজকতা, পেরেশানী, অবিশ্বাস ও আতঙ্কের স্থায়ী পরিস্থিতির দায়-দায়িত্ব ছিল ঐ তিন বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধবাজ দলের ওপর, যারা না এমন কোনও দেশে শাসনকার্যের অভিজ্ঞতা রাখত, যেখানে বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও সভ্যতা শত শত বছর ধরে বিদ্যমান ছিল এবং যার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনের জন্য উঁচু ধরনের দায়িত্ববোধ, সংরক্ষণ ও ধৈর্যশক্তি, প্রশস্ত দৃষ্টি ও উদার মনের প্রয়োজন ছিল। না তাদের নিকট দেশকে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা দান, দেশবাসীর আস্থা অক্ষুণ্ন রাখা, আইন-শৃঙ্খলার উন্নতির জন্য কোনও পরিকল্পনা ছিল আর না ছিল কোনও চিন্তা-ভাবনা। এজন্য প্রথম কাজ ছিল, উক্ত তিন শক্তিকে বিশেষতঃ মারাঠীদের অগ্রযাত্রা ও দৌরাত্ম্য থেকে দেশকে নিরাপত্তা দান। যাদের কারণে ভারতবর্ষের ঐ কেন্দ্রীয় অংশ, যা রাজত্বের স্থায়িত্ব ছিল অর্থাৎ লাহোর থেকে দিল্লী এবং সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলো পর্যন্ত এলাকার কখনও শান্তি ছিল না, যে কোনও সময় কখন ময়দান রণাঙ্গণে পরিবর্তন এবং ফলের বাগান ও সুদর্শন শহর একটি উন্মুক্ত স্বাধীন শিকার অরণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। যেখানে শিকারীদের শান্তিপূর্ণ শহরবাসীদেরকে পশুপাখির মত হত্যার অনুমতি থাকবে। আর তাদের পূর্বপুরুষ ও বংশধরদের সঞ্চয় দেখতে দেখতে লুটতরাজ হয়ে যাবে। এর দ্বারা দ্বিতীয়তঃ আশঙ্কা ছিল, শিখ ও জাঠদের আদলে সভ্যতা-সংস্কৃতি, সম্পদ ও প্রাচুর্যের কেন্দ্রগুলোতে আকস্মিক বিপদরূপে উপস্থিত হবে।

দ্বিতীয় বাস্তবতা ছিল, এই বিপদ-আশঙ্কা দূর করার জন্য প্রয়োজন তেমন কোনও অভিজ্ঞ কর্মধ্যক্ষ সামরিক নেতা ও কৌশলী সেনা নায়কের, যিনি আধুনিক সমরশক্তিতে সমৃদ্ধশালী হবেন ঠিক, কিন্তু মাতাল আত্মহারা হবেন না। তার মধ্যে সমর কৌশল, সৈন্যবিন্যাস ইত্যাদির যোগ্যতা, বীরত্ব, সাহসিকতা ছাড়াও ঈমানী ও ধর্মীয় মূল্যবোধ থাকবে। সাথে সাথে তিনি ভিতরগত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, গৃহবিবাদ এবং পুরোনো শত্রুতা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হবেন, যা দিল্লীর রাজপ্রাসাদ ও দেশের রাজনীতিবিদদেরকে ঘুণের মত কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল এবং যেসবের উপস্থিতিতে এমন কোনও উঁচুতর উদ্দেশ্য পূরণের আশা করা যেত না, যাতে বংশগত শক্তি, ধর্মীয় সম্প্রদায় কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল ছাড়া মিল্লাত ও জাতির কোনও কল্যাণ, ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি এবং দেশ রক্ষার উদ্দেশ্য সম্মুখে থাকবে।

শাহ্ সাহেবের দৃষ্টিতে একটি মাধ্যম ও অবলম্বন হিসেবে তো আমীরুল উমারা নবাব নাজীবুদ্দৌলাহ্‌র (যেমন পূর্বে বলা হয়েছে) প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা ছিল। কিন্তু অবস্থা-পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও বিভীষিকাময়তার প্রেক্ষিতে তিনি একা যথেষ্ট ছিলেন না। তার একার দ্বারা সেসব অপশক্তির দৌরাত্ম্য বন্ধ করা সম্ভব ছিল না, যারা তাদের সামরিক শক্তি এত সমৃদ্ধ করে নিয়েছিল যে, রাষ্ট্রের কোনও একক সামরিক শক্তির পক্ষে তাদেরকে পরাজিত করা ছিল অসম্ভব। এজন্য একটি চৌকস পরদেশী সেনানায়কের প্রয়োজন ছিল। যিনি এদেশের জন্য সম্পূর্ণ অচেনা-অপরিচিত কেউ হবে না বরং অবগত হবেন এদেশের উন্নতি-অবনতি, দেশের অধিবাসীদের রীতিনীতি এবং এখানকার শত্রু ও সৈনিকদলের মানসিকতা আর দুর্বলতাগুলো সম্পর্কে। যার সাহস-ইচ্ছা হল, এদেশকে সেসব সামরিক বিপর্যয়সমূহ থেকে মুক্ত করে রাজত্বে বাগডোর এখানকার পুরোনো শাসক বংশের কোনও যোগ্য সুদক্ষ ব্যক্তিত্ব, কৃতজ্ঞ ও কর্মনিষ্ঠ আমীর কিংবা উযীরকে সোপর্দ করে ফিরে যাবেন। কেননা এটিই বাস্তবপ্রিয়তা, জাতীয় স্বার্থ ও স্বদেশপ্রেমের দাবী।

এই স্পর্শকাতর ও কঠিক কাজের জন্য (যাতে বরাবরের মতই লাভ-লোকসানের দিক ছিল) শাহ সাহেবের সন্ধানী দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হয়ে কান্দাহারের শাসনকর্তা (১১৩৬-১১৮৬ হি./১৭২৩-১৭৭২ খৃ.) আহমদ শাহ দুররানীর ওপর। যিনি ভারতবর্ষের জন্য অচেনা-অজানা নতুন কেউ ছিলেন না। তিনি জন্মগ্রহণ করে ছিলেন মুলতানে। সেখানে আজও একটি সড়কের নাম আবদালী সড়ক। তিনি বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য নিয়ে ১৭৪৭ খৃ.-১৭৬৯ খৃ. এর মধ্যে নয়বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। শাহ্ সাহেব এবং নবাব নাজীবুদ্দৌলাহ্‌র আহবান আর পানিপতের যুদ্ধের পূর্বে তিনি ছয়বার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি অবগত ছিলেন রাষ্ট্রের উন্নতি-অবনতি, যুদ্ধপদ্ধতি, সামরিক শক্তির পছন্দ-অপছন্দ এবং আমীর-উমারা ও রাজন্যবর্গ-শাসকদের চিন্তাধারা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে। তিনি খৃস্টীয় আঠার শতক আর হিজরী বার শতকের মধ্যভাগের সেসব বিশিষ্ট সেনানায়কদের একজন ছিলেন, যারা বহুকাল পরপর জন্মগ্রহণ করেন এবং পৃথক স্বাধীন রাজত্বের ভিত্তিপ্রস্তর রাখেন। তিনি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সাফল্যের সাথে বিক্ষিপ্ত আফগানদেরকে সংঘবদ্ধ করেন। ন্যায়ানুগ আইনকানুন চালু করেন। হিসাব বিভাগ বা পরিসংখ্যান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন সৈন্য প্রশিক্ষক, উন্নত চরিত্র ও আত্মিক পবিত্রতার গুণাবলির আধার। শিক্ষা ও সাহিত্যানুরাগী। প্রভাব-প্রতিপত্তির সঙ্গে স্বজাতির কাছে সুপ্রিয় এবং আস্থাভাজন। ধার্মিক, মাযহাবের অনুগত, উলামা-মাশায়িখের সংশ্রব

প্রত্যাশী। সাইয়িদগণ এবং মাশায়িখের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নিজের ধর্মীয় জ্ঞান-প্রত্যয় সমৃদ্ধি এবং শিক্ষামূলক বিতর্ক বা চিন্তাভাবনা আদান-প্রদানে আগ্রহী, কোমলপ্রাণ, মহানুভব, সাম্য ও ধর্মীয় কমনীয়তার উপর আমলকারী।

তিনি এমন কিছু সুন্নত যিন্দা করেছেন, আফগানের অবস্থা পরিবেশে যার নাম নেওয়াও কঠিন ছিল। যেমন, বিধবাদের দ্বিতীয় বিয়ে। তিনি নিজেও শিক্ষিত এবং লেখক ছিলেন। নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির তীব্র বাসনা রাখতেন। ঐতিহাসিক ফেরির লিখেন, 'প্রাচ্যদেশগুলোর অনেক দুরাবস্থা (ও ক্ষয়ক্ষতি) থেকে আহমদ শাহ ছিলেন পবিত্র। মদ্যপান, আফিম ইত্যাদি সেবন থেকে বেঁচে থাকতেন পুরোপুরি। মোহগ্রস্থতা-লালসা ও কপট আচরণ থেকে ছিলেন পবিত্র। ছিলেন ধর্মের কঠোর অনুসারী। তার সাদাসিধে কিন্তু প্রভাবময় অভ্যাসগুলো তাকে প্রত্যেকের প্রিয়পাত্র বানিয়ে দিত। তার সাথে সাক্ষাৎ সহজ ছিল। তিনি ইনসাফের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। কখনও কেউ তার ফায়সালার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেনি।'

আহমদ শাহ দুররানী শাহ সাহেবের যুগে ছয়বার ভারতবর্ষে এসে স্থানীয় ও সময়ের প্রয়োজনগুলো পূরণ করে ফিরে গিয়েছিলেন। সেসব আক্রমণে নিজের সামরিক শক্তির প্রদর্শনী এবং সময়ের প্রয়োজন পূরণ করা ছাড়া তিনি অন্য কোনও জনহিতকর কাজ আঞ্জাম দেননি। তার সৈন্যদল সেসব ইসলামী শিক্ষা ও শিষ্টাচারের আনুগত্যও করেনি, শরীয়তের অনুগত একজন মুসলমানের কাছে যার আশা করা হয়। তার কোনও কোনও আক্রমণে শাহ সাহেব এবং শুভাকাঙ্খীদেরও বিভিন্ন পেরেশানী ও দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল।

কিন্তু সেসব দুর্বলতা ও তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একটি আশার আলোক, যা সে অন্ধকার আকাশে ঝলমলে দৃষ্টিগোচর হত। মাওলানা আশেক মুহাম্মদ ফুলতী (র)-এর বর্ণনা মতে এরপরও শাহ সাহেব বলতেন, 'এ অঞ্চলে তারই জয় হবে।'

একবার বাহাদুর খানা বেল্লুচের প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'এ দেশের উপর তার পূর্ণ বিজয় হবে।

একবার তার মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়ে। তখন শায়খ মুহাম্মদ আশেকের জিজ্ঞাসার জবাবে বলেন, 'যা মনে হচ্ছে, তা হল, আহমদ শাহ দুররানী এদেশে আবার আসবেন এবং সেসব কাফিরদের ধ্বংস করে দিবেন তাদের জুলুম-অবিচার সত্ত্বেও । তাকে আল্লাহ তা'আলা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন।'

শাহ সাহেবের আশা ছিল, আল্লাহ তা'আলা শাহ আবদালী এ অবস্থার সংশোধন করবেন এবং তার দ্বারা এমন কাজ নিবেন, যা বাহ্যতঃ কোনও আমীর বা নেতার পক্ষে সম্ভব নয়। হাকীম আবুল ওফা কাশ্মীরীকে একবার

বলেন, আবদালীর উদ্দেশ্য হাসিলে যেসব বাঁধা-বিঘ্ন ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তা ঐ জুলুম-অবিচারের পরিণতি। যা তিনি (পূর্বের আক্রমণগুলোতে) ভারতের শহরগুলোর উপর করেছেন। পরবর্তী তার অবস্থার সংশোধন হয়ে যাবে।

শাহ সাহেব আহমদ আবদালী দ্বারা দেশকে এই অনিশ্চিত অবস্থা-পরিস্থিতি ও পেরেশানী থেকে নিরাপদ করা এবং রাজত্বকে রাজবংশের তুলনামূলক কোনও যোগ্য ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করার কাজ নিতে চাইতেন। শাহ সাহেব তার আগমনের পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন, আবদালী এখানে এসে অবস্থান করবেন না বরং এদেশের কোনও সন্তানের হাতে রাজত্বভার সোপর্দ করে ফিরে যাবেন।

অবশেষে শাহ সাহেব (র) আহমদ শাহ আবদালীকে নবাব নাজীবুদ্দৌলাহর দ্বারা চিঠিপত্র লেখান। এরপর সরাসরি একটি জোরাল ও প্রভাবময় চিঠি লিখেন। পত্রটি শাহ সাহেবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, চারিত্রিক উৎকর্ষতা, সাহসিকতা ও রচনাশক্তির দর্পণ। উক্ত পত্রে ভারতবর্ষের উদ্ভূত অবস্থা পরিস্থিতি, এর প্রাচীন শাসনপদ্ধতি, এর বিভিন্ন প্রদেশের আইন-শৃঙ্খলা, দেশের বিভিন্ন বংশধর ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর সংখ্যা ও সাদৃশ্য, তাদের ব্যাপারে মুসলিম বাদশাদের রাজনৈতিক ভুলভ্রান্তি, সংকীর্ণ দৃষ্টি, তাদের ধারাবাহিকভাবে শক্তি সঞ্চয় ও নেতৃত্ব লাভের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এক্ষেত্রে মারাঠী ও জাঠদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অংকন করা হয়েছে তার নেতৃত্বে, বারবার আক্রমণের কারণে ইসলামের দৈন্যদশা ও মুসলমানদের নির্যাতিত হওয়ার হৃদয়বিদারক চিত্র। আর সেই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মুসলমান নেতা, যিনি এ সময় ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে ইরান পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সুদক্ষ সুশৃঙ্খল সামরিক শক্তিধর ছিলেন, তাকে এই অবস্থা-পরিস্থিতি মোকাবেলা করা, মোঘল সাম্রাজ্যকে স্বপদে উঠে দাঁড়ানো ও দেশের দায়িত্বভার রক্ষা করার সুযোগ দানের জন্য উৎসাহিত করা হয়। পরিস্কারভাবে লিখা হয়, 'এ যুগে শক্তি ক্ষমতার অধিকারী, বিরুদ্ধাচারী সৈন্যকে পরাভূত করতে সক্ষম, দূরদর্শী ও যুদ্ধে অভিজ্ঞ কোনও শাসক আপনি ছাড়া আর কেউ বিদ্যমান নেই।'

আমরা আল্লাহর বান্দাগণ হযরত রাসূলে কারীম (স) কে সুপারিশকারী বানাচ্ছি এবং মহান আল্লাহর নামে প্রার্থনা করছি, যেন আপনি পুণ্যময় সাহসিকতাকে এদিকে নিবিষ্ট করে বিরুদ্ধাচারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, যাতে আল্লাহ পাকের কাছে বিরাট সাওয়াব জনাবের আমলনামায় লেখা হয় এবং আল্লাহর পথের মুজাহিদগণের তালিকায় আপনার নাম লিখে দেওয়া হয়। দুনিয়ার অশেষ গণীমত লাভ হয়। আর মুসলমান কাফিরদের হাত থেকে মুক্তি পায়।'

উক্ত চিঠিতে একই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অবস্থা-পরিস্থিতির গভীর উপলব্ধির ভিত্তিতে ভারতের সেসব নবউত্থিত শক্তিগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিয়েছেন, যাদের বিপরীতে কোন সুশৃঙ্খল শক্তি না থাকার কারণে তাদের বীরত্ব ক্ষমতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদেরকে মনে করা হত অপরাজেয়। আর এরূপ ধারণা একজন অভিজ্ঞ নেতা এবং রাজনৈতিক সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিই পেশ করতে পারেন। মারাঠীদের সম্পর্কে লিখেন, 'মারাঠা জাতিকে পরাজিত করা সহজ ব্যাপার। তবে ইসলামের গাজী-যোদ্ধাদেরকে সাহসের সাথে কোমর বাঁধতে হবে। বস্তুতঃ মারাঠা জাতি সংখ্যালঘু। কিন্তু তাদের সঙ্গে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মিলিত হয়েছ। যদি এ দলের একটি কাতারও ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া যায়, তবে এ জাতি বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। আর এই পরাজয়ে আসল জাতি ভেঙ্গে পড়বে। কেননা এ জাতি শক্তিধর নয়। এজন্য তাদের সকল যোগ্যতা এমন বিশাল সৈন্যদল গঠন করা, যারা পিপড়া ও ফড়িং থেকেও বেশি হবে, বীরত্ব ও যুদ্ধোপকরণের ঘাটতির কোন অপবাদ তাদের মধ্যে নেই।'

শাহ সাহেব (র) -এর হেদায়াত মোতাবেক নাজীবুদ্দৌলাহ আহমদ শাহ আবদালীকে যে পত্রাবলি লিখেন, এরপর স্বয়ং শাহ সাহেব যে সুদীর্ঘ প্রভাবময় পত্র সরাসরি লিখেন, (সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি প্রাগুক্ত) তা প্রতিক্রিয়াহীন নিষ্ফল পড়ে থাকেনি। আহমদ শাহ আবদালী ১১৭৩ হি. মোতাবেক ১৭৫৯ খৃ. মারাঠীদের শক্তি ভেঙ্গে দেওয়া এবং নাজীবুদ্দৌলাহ ও শুজাউদ্দৌলাহকে সাহায্য করার জন্য (যারা সে সময় রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ইসলামী ঐক্য-সংহতির প্রমাণ দিয়েছিলেন) ভারত অভিযানের মনস্থ করেন। এক বছর কেটে যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড যুদ্ধ-লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। অবশেষে ১১৭৪ হি. মোতাবেক ১৪ জানুয়ারী ১৭৬১ খৃস্টাব্দে পানিপতের রণাঙ্গনে মারাঠী এবং আফগানী ও ভারতীয় ইসলামী যৌথ শক্তির মধ্যে ঐতিহাসিক সেই চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণী যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা ভারতবর্ষের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আর মারাঠীদেরকে ভারতে নতুন উত্থানমুখী রাজনৈতিক চিত্র থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে। উক্ত যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত অবস্থাচিত্র ও ফলাফল মৌলভী যাকাউল্লাহ সাহেব 'তারীখে হিন্দুস্তান' রচয়িতার ভাষায় লিখা হচ্ছে, 'তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু তখনও মারাঠীদের পাল্লা ভারী ছিল। আহমদ শাহ তার পলাতক সৈন্যদেরকে আবদ্ধ করে হত্যার নির্দেশ দিলেন আর বলে দিলেন, যে পলায়ন করবে, সে মারা পড়বে। এরপর তিনি তার কাতারকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। এক সৈন্যকে নিজের বাম দিকে শত্রুর বাহুতে আক্রমণ করার হুকুম দিলেন। এই কৌশলে তীর যথার্থ

লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পড়ে। বিপক্ষ সৈন্যের ভাও ও বিশ্বাস রাও অশ্বারোহণ করে যোদ্ধাদের লড়াই পরিচালনা করছিল। বর্শা-তরবারীর বাজি চলছিল। হঠাৎ আল্লাহ জানেন, কী হয়ে গেল। মারাঠী সৈন্যদের পা উঠে গেল রণাঙ্গণ থেকে। পদস্খলন মাত্রই তাদের মরদেহে রণাঙ্গণ ভরে গেল। ইসলামী সৈন্যদল অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে চতুর্দিকে পনের-বিশ মাইল পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করে। মারাঠীদের মেরে মেরে লাশের স্তূপ বানিয়ে দেয়। আর যেসব মারাঠী এই শত্রুদের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল, তাদেরকে গ্রাম্য বুদ্ধুরা মেরে ফেলে। বিশ্বাস রাও ও ভাও মারা পড়ে। যেই সিন্ধীকে কোনও দুররানী লুকিয়ে রেখেছিল, তাকেও খুঁজে বের করা হয় এবং ধরে এনে হত্যা করা হয়। ইবরাহীম খান গার্দীও বন্দি হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু তার ক্ষতস্থানগুলোতেও পট্টি লাগায়। শামশীর বাহাদুরও পলায়নরত অবস্থায় মারা পড়ে। মালূহ-এর মধ্যে মিলহার রাও জান বাঁচিয়ে পালিয়ে যায়। আপাজী সিন্ধীও ল্যাংড়া হয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছে। এই দুই নেতা ব্যতিত প্রসিদ্ধ আর কোনও নেতা প্রাণে বাঁচেনি। মারাঠীদের এমন পরাজয় ইতোপূর্বে কখনও হয়নি। আর না এমন বিপর্যয় হয়েছিল। ফলে গোটা জাতির মন মৃতপ্রায় ও নিরস হয়ে গেল। এই শোকে বালাজীও কয়েকদিন পরে মারা যায়। পরাজয়ের সংবাদ শোনার পর থেকেই একটি মন্দিরে বসে সংস্কৃতি পাঠে সে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল।'

জনৈক ঐতিহাসিকের মতে 'মারাঠীদের শক্তি চোখের পলকে তুলার মত উড়ে গেল।' স্যার যদুনাথ সরকার লিখেন, মহরা শহরে কোনও পরিবার এমন ছিল না, যাদের মধ্যে শোকের আবহ তৈরী হয়নি। নেতাদের পূর্ণ বংশধর এই যুদ্ধে গায়েব হয়ে যায়।'

শাহ সাহেব (র) -এর ছক অনুযায়ী আহমদ শাহ আবদালী সময়ের এই প্রয়োজনীয় কাজ আঞ্জাম দিয়ে কান্দাহারের পথে রওয়ানা হন। মৌলভী যাকাউল্লাহ লিখেন, 'এই বিজয়ের পর আহমদ শাহ আবদালী পানিপত থেকে দিল্লীর উপকূলে আসেন এবং কয়েকদিন অবস্থান করেন। ভারতের বাদশা নিযুক্ত করেন যুবরাজ আলী গওহার তথা শাহ আলমকে এবং বাদশাকে সুপারিশ করেন যেন শুজাউদ্দৌলাহ ও নাজীবুদ্দৌলাকে আমীরুল উমারা নিয়োগ করা হয়। শাহ আলম তখন দিল্লীতে ছিলেন না। এজন্য তার পুত্র জোয়া বখতকে বাদশার নায়েব হিসেবে দিল্লীতে নিযুক্ত করেন। নাজীবুদ্দৌলাহকে নিযুক্ত করেন দিল্লীর শাসক আর শুজাউদ্দৌলাহকে শাহী পোশাক দিয়ে উধহ ও এলাহাবাদ প্রদেশে পাঠিয়ে দেন। স্বয়ং চলে যান কান্দাহার।'

প্রফেসর খালিক আহমদ নিযামী লিখেন, 'পানিপতের যুদ্ধের পর আহমদ শাহ্ আবদালী শাহ্ আলমকে দিল্লী ডেকে আনার সীমাহীন চেষ্টা করেছেন। নিজের লোক পাঠিয়েছেন। যখন তিনি আসলেন না, তখন আহমদ শাহ আবদালী শাহ্ আলমের মাতা নবাব জিনাত মহলের দ্বারাও পত্র লেখান। শাহ্ আলমকে ডেকে আনার চেষ্টা আহমদ শাহ্ এজন্য করেছিলেন, যেন তিনি ইংরেজদের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসেন এবং দিল্লী এসে আহমদ শাহের উপস্থিতিতে নিজের শক্তিকে সুদৃঢ় করেন।'

খালীক সাহেব লিখেন, 'মারাঠী, জাঠ, শিখরা কোনও যুদ্ধে এত ব্যাপক ও প্রশস্ত ছিল না যে, তারা ভারতের কেন্দ্রীয়তা ও অখণ্ডতা অক্ষুণ্ন রাখার চিন্তা-ভাবনা করবে। শাহ্ সাহেব (র) তার নির্বাচিত ব্যবস্থায় আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের শাসনামলের কেন্দ্রীয়তা এবং ভারত সাম্রাজ্যের উচ্চ শক্তিকে বহাল দেখতে চাইতেন। তবে সেই সাথে কামনা করতেন লাগামহীন বাদশাদের স্থলে যেন ইনসাফের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়।

তখন যদি রাজত্বের ভেতর সামান্য প্রাণচাঞ্চল্যও থাকত, তবে সে পানিপতের যুদ্ধ থেকে ফায়দা লুটে নিজের শাসনক্ষমতাকে ভারতবর্ষে আবার কিছুকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মোঘল সাম্রাজ্য তখন নিস্প্রাণ দেহের মত ছিল। পানিপতের যুদ্ধের প্রকৃত ফায়দা হাসিল করে পলাশী যুদ্ধের বিজয়ীগণ।'

শাহ্ আলম তার কাপুরুষতা, হীনমন্যতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টির কারণে এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করে ফেলে। আর সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং স্বয়ং আপন মাতা যিনাত মহলের স্নেহপূর্ণ চিঠি সত্ত্বেও পূর্ণ দশ বছর পর ১৭৭১ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর ১৭৭১ খৃস্টাব্দে তিনি দুর্গে প্রবেশ করেন। এরপর তার সঙ্গে এবং তার সহচরদের সঙ্গে যা কিছু করা হয়েছে, তা ইতিহাসের পাতায় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এর চরম পরিণতি হচ্ছে, (Climax) ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের রাজত্বের বিপ্লব তথা রাজত্ব হাতছাড়া হওয়া। (অবশ্য নামসর্বস্ব রাজত্ব ছিল), যা হয়েছে ইংরেজদের হাতে। যারা নিজেদের বিচক্ষণতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দ্বারা ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য বিস্তার ও দখল প্রতিষ্ঠার কোনও সুযোগ হাতছাড়া করেনি।

শাহ্ সাহেবের পরে তার যোগ্য উত্তরসূরী, জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং ধর্মীয় আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্ভ্রমবোধের উত্তরাধিকারী তার সম্মানিত পুত্র সিরাজে হিন্দ হযরত শাহ্ আবদুল আযীয (র) স্বীয় মহান পিতার শুরু করা কাজকে কেবল চালুই রাখেননি বরং তার ব্যাপকতা ও পূর্ণতা দানের চেষ্টা করেছেন

এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনসহ নিজের মনোযোগিতা তখনকার রাজনৈতিক ময়দানের আসল শত্রু ও প্রকৃত শক্তি (ইংরেজ শক্তি) এর দিকে ঘুরিয়ে দেন। যারা তখন 'আশঙ্কা' থেকে অগ্রসর হয়ে (যা দেখার জন্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রয়োজন হয়) বাস্তবরূপ ধারণ করে নিয়েছিল। যা দেখার জন্য দৃষ্টিশক্তি থাকাও যথেষ্ট।

শাহ আবদুল আযীয (র)-এর পরে তারই শিক্ষালয়ের দুই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দৃঢ়চিত্ত দাঈ ও সংস্কারক হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র) এবং শাহ ইসমাঈল শহীদ (র) হযরত শাহ সাহেবের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও নকশায় (যা তিনি চিন্তা-দর্শনরূপে 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' ও 'ইযালাতুল খফা' -এর পাতায় পাতায় ও জ্ঞান-প্রজ্ঞায় উপস্থাপন করেছিলেন) রঙ লাগানোর চেষ্টা করেন। একে নবুওয়াতের আদর্শিক খেলাফতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের জীবন বাজি রাখেন। তারা হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাঁর দেওয়া আলোকবর্তিকা দ্বারা কতটুকু উপকৃত হয়েছিলেন, তাদের ইচ্ছা শক্তি কত উঁচু! তাদের দৃষ্টি কত দূরদর্শী! তাদের মন ছিল কত প্রশস্ত ও উদার! তারা পাঞ্জাবের মুসলমানাদের উপর থেকে শিখদের সামরিক শাসনের বিপদ-আপদ থেকে বাঁচানোর পর (যেভাবে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) মারাঠী ও জাঠদের নিত্যদিনের হত্যা-লুণ্ঠন থেকে সমকালীন পরিবেশ ও সমাজকে রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়েছেন) এবং যে ইংরেজদেরকে তারা 'অচেনা ভিনদেশী ও বণিক গোষ্ঠী' বলে অভিহিত করেন, সে ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করে ভারতবর্ষকে কিভাবে স্বাধীন এবং ইসলামের সাম্য-ন্যায় ও ইনসাফের নীতিমালায় এর আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন, এর অনুমান তাদের চিঠিপত্র থেকে পাওয়া যাবে, যেগুলো তারা সমকালের শাসক, আমীর-উমারা, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মুসলমান এবং সচেতন রাষ্ট্রপরিচালকগণকে লিখেছেন। এভাবে এ ধারার আহলে দাওয়াত ও আযীমত বাস্তবিকই বলতে পারেন,

آغشتہ ایم سر خارے بخون دل۔
قانون باغبانی صحرا نوشتہ ایم۔

'করেছি একাকার মোরা সব কণ্টকের চূড়া,
বুকের তপ্ত খুনে লিখেছি মোরা
মরুদ্যান কার্যের সংবিধান।'

দশম অধ্যায়

উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণীর পরিসংখ্যান এবং তাদেরকে সংস্কার ও বিপ্লবের আহ্বান

শাহ্ সাহেবের স্বকীয়তা

সাধারণতঃ যেসব আকাবিরে উলামায়ে কিরামের শিক্ষা জ্ঞান-গবেষণা ও সাহিত্যমূলক হয়, যাদের দান করা হয় বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার পূর্ণাঙ্গ অংশ, তারা সাধারণতঃ বিভিন্ন বই-পুস্তক পাঠ, শিক্ষামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধের উপর গবেষণা, পর্যালোচনা কিংবা লেখালেখি ও সাহিত্যচর্চায় আপাদমস্তক ধ্যান-তন্ময় হয়ে ডুবে থাকেন। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও সাধারণ মুসলমানদের দুর্বলতা ও রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে হয়ত তারা উদাসীন-বেখবর থাকেন অথবা তাদের পক্ষে এই সাধারণ পর্যায়ে পৌঁছা এবং এ শিক্ষাগত উঁচু দৃষ্টি থেকে (যার মধ্যে পৃথিবীর সকল প্রকার স্বাদ-মিষ্টতার উর্ধ্বে এক ভিন্ন স্বাদ ও মিষ্টতা থাকে) নেমে আসা কঠিন হয়।

প্রবীণ উলামায়ে কিরামের মধ্য হতে এক্ষেত্রে দুই ব্যক্তিকে পরিষ্কারভাবে ব্যতিক্রমভুক্ত করা যায়। প্রথমতঃ হুজ্জাতুল্লাহিল ইসলাম ইমাম গাযালী (র) (মৃত্যু ৫০৫ হি.)। যিনি তার জগদ্বিখ্যাত অমর গ্রন্থ 'এহইয়াউল উলূমিদ্দীন'-এর মধ্যে সমকালীন মুসলিম সমাজ ও মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের রোগ-ব্যাধি ও দুর্বলতাগুলো এমনভাবে চিহ্নিত করেছেন, যাতে পরিষ্কার মনে হয়, তিনি সমকালের সাধারণ জীবনযাত্রা ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে, উলামায়ে কিরামের শিক্ষার আসর ও মাশায়িখের যিকির-ফিকিরের মজলিস থেকে নিয়ে খলীফা ও শাসকবর্গের দরবারসমূহ, আমীর-উমারা ও গভর্নরদের প্রাসাদসমূহ, নেতৃবৃন্দের আনন্দমহল পর্যন্ত আর সেসব রঙমহল থেকে নিয়ে পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীদের দোকান এবং বাজার-বন্দরের কোলাহল ও উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থা-পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। জানতেন নফস (প্রবৃত্তি) ও শয়তান কী কী পন্থায় উলামা ও নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন আর সাধারণ ও বিশেষ লোকদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে ধোঁকা দিচ্ছে? ধর্মীয় জ্ঞান-গবেষণা কিভাবে বদলে গেছে? আর তারা আসল অভীষ্ট (আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সাফল্য) সম্পর্কে কত উদাসীন।

একই অবস্থা (সংক্ষিপ্ততা ও ব্যাখ্যা, রচনাশৈলী ও ভাবধারার পার্থক্যসহ) আল্লামা ইবনে জাওযী (র) (মৃত্যু ৫৯৭ হি.) এর রচিত 'তালবীসে ইবলীস' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। এ গ্রন্থে তিনি সমকালের গোটা মুসলিম অবস্থাবলি পর্যালোচনা করেছেন। মুসলমানদের প্রত্যেক শ্রেণী ও দলকে সুন্নাহ ও শরীয়তের মানদণ্ডে যাচাই করেছেন। চিহ্নিত করেছেন তাদের দুর্বলতা, ভারসাম্যহীনতা, সীমালঙ্ঘন ও ভুলভ্রান্তিগুলো। এ ব্যাপারে তিনি কোনও শ্রেণীর পক্ষপাতিত্ব করেননি। উলামায়ে কিরাম, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহায়ে কিরাম, ওয়ায়েযীন, কবি-সাহিত্যিক, রাজা-বাদশা ও শাসকবর্গ, আবেদ-যাহেদ, আহলে দীনের সূফীগণ এবং সর্বসাধারণ নির্বিশেষে সকলেরই পর্যালোচনা করেছেন। উন্মোচন করেছেন তাদের ভুল-ভ্রান্তিগুলোর পর্দা।

কিন্তু (তালবীসে ইবলীসের সম্পর্ক যতদূর জানা যায়, তাতে দেখা যায়) ঐ সমালোচনা ও পরিসংখ্যান বেশিরভাগ নেতিবাচক ও অস্বীকারমূলক ভাবধারার। সেই সাথে অবস্থার উন্নয়ন ও সংশোধনের বিস্তারিত ও শক্তিশালী ইতিবাচক আহবান নেই। আর যদি থেকেও থাকে, তবে পরিমাণ ও প্রতিক্রিয়ায় সে পর্যায়ের নয়। সম্ভবতঃ এর কারণ, উক্ত কিতাবের আলোচ্য বিষয়ে তার চেয়ে বেশি আলোচনার অবকাশ ছিল না।

উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতি বিশেষ সম্বোধন

এই দুই বিশ্বনন্দিত আলেম, দীনের দাঈ (ধর্ম প্রচারক) ও চরিত্র-আদর্শের শিক্ষক মহোদয়ের পরে (যারা নিজ নিজ সংশোধন ও দীক্ষামূলক মর্যাদার সঙ্গে উচ্চস্তরের আলেম এবং লেখক ছিলেন) আমাদের (নিজের সীমিত জ্ঞান-গবেষণামতে) এক্ষেত্রে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান পরিলক্ষিত হয়। তিনি ইসলামের শাসকবর্গ, আমীর-উমারা, নেতৃবৃন্দ ও রাজন্যবর্গ, সামরিক সদস্য, বিভিন্ন শিল্প-কারিগরি পেশাজীবী, মাশায়িখের পুত্রগণ (পীরজাদাগণ), বিপথগামী উলামা-দরবেশ ও ভোজনবিলাসী ওয়ায়েজীন, দুনিয়াবিমুখ ও নির্জনতা অবলম্বনকারী সাধক ব্যক্তিবর্গকে পৃথক পৃথক সম্বোধন করেছেন। তাদের ব্যথাভরা শিরা-উপশিরায় অঙ্গুলী রেখেছেন। চিহ্নিত করেছেন তাদের আসল রোগ-ব্যাধি ও আত্মপ্রবঞ্চণাগুলো। তাছাড়া মুসলিম উম্মাহর প্রতি সাধারণ ও পরিপূর্ণ সম্বোধন করেছেন। তাদের রোগগুলোও নিরূপণ করেছেন। বাতলে দিয়েছেন সেসবের চিকিৎসা। এসব একান্ত সম্বোধনে শাহ সাহেবের মনোব্যথা, ইসলামী মূল্যবোধের চেতনা, দাওয়াতের আগ্রহ ও কলমের জোর এমন উচ্চশিখরে পৌঁছেছে, যার উপমা পূর্বোক্ত সংস্কারক ও নিরীক্ষক এবং

তাদের উপরিউক্ত কিতাবাদিতে পাওয়া কঠিন। শাহ সাহেবের রচিত 'আত্-তাফহীতুল এলাহিয়্যাহ' (খণ্ড ১-৩) থেকে চয়িত। বিভিন্ন উদ্ধৃতি নিম্নে পেশ করা হচ্ছে, যাতে তিনি তার যুগের বিভিন্ন বিশিষ্ট মহলের নেতৃবৃন্দের প্রতি সম্বোধন করেছেন। সেসব বিশেষ সম্বোধন থেকে শাহ সাহেবের গভীর দৃষ্টি, দাওয়াতের কৌশল-প্রজ্ঞা, চারিত্রিক বীরত্ব এবং সাধারণ ও অসাধারণ ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার এমন বহিঃপ্রকাশ হয়, যা দেখে ইতিহাসের এমন এক জ্ঞানপিপাসু, যে এ যুগ ও সমাজের দুরাবস্থা, বিদ্বান-জ্ঞানী ও কলমসৈনিকের কল্যাণকামিতা এবং দাঈ ও সংস্কারকদের অবস্থার সংশোধন ও সংস্কারের ব্যাপারে নৈরাশ্য সম্পর্কে অবগত। সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় আর অজান্তে অনিচ্ছায় বলে উঠে–

'হে আল্লাহ! এমন স্ফুলিঙ্গও ছিল তোমার ভস্ম ছাইয়ে!'

মুসলিম সম্রাটদেরকে সম্বোধন

'হে সম্রাটগণ! এ যুগে রাজাধিরাজ (মহান আল্লাহর) সন্তুষ্টি অন্তর্নিহিত হচ্ছে এর মধ্যে যে, তোমরা তরবারী কোষমুক্ত করে নিবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তা কোষাবদ্ধ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলমান মুশরিকদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। কাফির, ফাসিক-পাপিষ্ঠদের অহংকারী নেতা দুর্বলদের দলে গিয়ে শামিল না হয়ে যায়। অধিকন্তু তাদের হাতে যেন এরপর এমন কিছু না থাকে, যার বদৌলতে তারা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله.

অর্থাৎ তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যাবৎ না ফিৎনা নির্মূল হয়ে যায়। আর দীন কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

অনন্তর যখন কুফর ও ইসলামের মাঝে এরূপ প্রকাশ্য-সুস্পষ্ট পার্থক্য তৈরী হয়ে যাবে, তখন তোমাদের কতর্ব্য, প্রত্যেক তিন/চারদিনের দূরত্বের এলাকাসমূহে নিজেদের পক্ষ থেকে একজন শাসক নিযুক্ত করা। এমন শাসক, যে হবে ন্যায়-নিষ্ঠার আদর্শ পথিকৃৎ ও শক্তিশালী। যিনি জালেম-অত্যাচারী থেকে অত্যাচারিতের অধিকার আদায় করতে পারেন, আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এরপর তৎপর থাকবেন যেন মানুষের মাঝে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার অনুভূতি জাগ্রত না হয়। আর না ধর্মান্তরিত হওয়ার কোনও অবকাশ বাকী থাকে; না কারও কোনও কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পরিস্থিতি উদ্ভব হয়। ইসলামের ঘোষণা প্রকাশ্যে করা যায়। খোলাখুলি প্রকাশ করা যায়

ইসলামের নিদর্শনগুলো। প্রত্যেকেই তার নিজ দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে আদায় করে। প্রত্যেক শহরের শাসককে নিজের হাতে এতটুকু শক্তি রাখতে হবে, যার দ্বারা তিনি তার সংশ্লিষ্ট এলাকার সংশোধন-সংস্কার করতে পারেন। কিন্তু তাকে এতটুকু শক্তি অর্জনের অবকাশ দেওয়া যাবে না, যার উপর ভিত্তি করে সে স্বয়ং স্বার্থবাদী হওয়ার কৌশল খুঁজতে থাকে এবং রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্যত হয়ে যায়।

নিজের সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বড় বড় অঞ্চল ও ভূ-খণ্ডে এমন আমীর বা শাসক নিযুক্ত করা উচিৎ, যিনি যুদ্ধাভিযানেরও সক্ষমতা রাখেন। এমন শাসকের অধীনে বার হাজার সৈন্যসমাগম রাখা যায়। তবে এই বাহিনী যেন এমন লোকদের দ্বারা পূরণ হয়, যাদের অন্তরে জিহাদের তামান্না আছে। আল্লাহর পথে যারা কারও ভর্ৎসনায় ভীত-সন্ত্রস্ত নয়। যে কোনও অবাধ্য-অহংকারী বিদ্রোহীর সাথে লড়াই ও যুদ্ধ করার শক্তি-ক্ষমতা তাদের মধ্যে আছে। হে বাদশাগণ! তোমরা যখন এ কাজগুলো করে ফেলবে, তখন রাজাধিরাজের সন্তুষ্টির প্রত্যাশা হবে, যেন তোমরা মানুষের পারিবারিক, বৈবাহিক ও বংশীয় জীবনের প্রতি মনোযোগ দাও। তাদের পারস্পরিক লেনদেন আচার-ব্যবহার পরিশুদ্ধ করে দাও এবং এমন বানিয়ে দাও যেন এরপর আর কোন ব্যাপার এমন না ঘটে বা না থাকে, যা শরয়ী আইন ও নিয়মনীতির অনুকূল নয়। এমনটি করার পরেই মানুষ শান্তি-নিরাপত্তার সঠিক আনন্দ-স্বাদে অভিভূত হতে পারে।'

শাসক ও রাজন্যবর্গের প্রতি সম্বোধন

ওহে শাসকবর্গ! দেখ, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না? দুনিয়ার ভঙ্গুর ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসে তোমরা ডুবে যাচ্ছ? আর যেসব লোকের ব্যবস্থাপনা তোমাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছ, যেন তারা একে অপরকে গ্রাস করতে ও শোষণ করতে থাকে। তোমরা কি প্রকাশ্যে মদ্যপান কর না? এরপর তোমাদের এ কাজকে তোমরা পাপও মনে কর না। তোমরা কি দেখ না, কত লোক উঁচু উঁচু মহল নির্মাণ করেছে? যেন সেখানে ব্যাভিচার করা যায়, মদ্যপান করা যায়, জুয়া খেলা যায়। কিন্তু তোমরা সেখানে হস্তক্ষেপ কর না। সে অবস্থার পরিবর্তন (সংশোধন) কর না। কী অবস্থা সেসব বড় বড় শহরের, যেখানে ছয়শ বছর ধরে কারও উপর শরয়ী দণ্ডবিধি কার্যকর করা হয়নি। যখন দুর্বল কাউকে পাওয়া যায়, তাকে ধরে এনে বন্দি কর আর যখন সবল কেউ হয়, তাকে ছেড়ে দাও। তোমাদের সকল চিন্তাশক্তি কেবল এ কাজেই ব্যয় হচ্ছে, যাতে তোমরা নানা সুস্বাদু

খাবারের আইটেম রান্না করাতে থাক, নরম কোমল কমনীয় নারীদের সাথে আমোদ কর, দামী দামী পোশাক আর উঁচু উঁচু বিলাসবহুল প্রাসাদ ছাড়া আর কোথাও তোমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। তোমরা কি তোমাদের মাথা কখনও আল্লাহর সামনে নত করবে? আল্লাহর নাম তোমাদের কাছে নিছক নিজেদের স্মৃতিচারণ আর কিসসা-কাহিনীতে এ নামকে ব্যবহারের জন্যই রয়ে গেছে। মনে হয়, যেন আল্লাহ শব্দের দ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্য যুগের পরিবর্তন। কেননা তোমরা প্রায়ই বল, আল্লাহ এরূপ করতে ক্ষমতাবান। অর্থাৎ যুগের পরিবর্তনের এ ব্যাখ্যা।'

সামরিক কমান্ডোদের প্রতি সম্বোধন

'ওহে সেনানায়ক! হে সৈনিকসকল! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে জিহাদের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহর বাণী সমুন্নত হবে। আল্লাহর কালিমা উঁচু হবে। শিরক ও তার শেকড়গুলো তোমরা পৃথিবী থেকে উপড়ে ফেলবে। কিন্তু যে কাজের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তোমরা তা ছেড়ে দিয়েছ। এখন তোমরা যে অশ্ব পালন কর, অস্ত্র মজুদ কর, এর উদ্দেশ্য কেবল এতটুকুই যে, তোমরা এর দ্বারা নিছক তোমাদের রাজ্য সম্প্রসারণ করবে। এক্ষেত্রে জিহাদের নিয়ত তোমাদের মোটেও নেই। তোমরা মদ্যপান কর। পেয়ালায় পেয়ালায় ভাং পান কর। দাড়ি মুণ্ডন কর। গোঁফ লম্বা কর। সর্বসাধারণের উপর বাড়াবাড়ি ও জুলুম কর। অথচ তাদের যা কিছু নিয়ে খাও, তার মূল্য তাদের পর্যন্ত পৌঁছে না। আল্লাহর শপথ! শীঘ্রই তোমরা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। এরপর তিনিই তোমাদেরকে বলবেন, তোমরা কী কী করতে?

আল্লাহ চান তোমরা উত্তম পবিত্র নেককার যোদ্ধা-গাজীদের পোশাক এবং তাদের আদর্শ গ্রহণ কর। যেন দাড়ি লম্বা কর। গোঁফ ছোট কর। পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথ আদায় কর জনসাধারণের সম্পদ হরণ থেকে বেঁচে থাক। যুদ্ধ ও রণাঙ্গণে দৃঢ়পদ থাক। তোমাদের উচিৎ সফর ও যুদ্ধ ইত্যাদি অবস্থায় নামাযের ব্যাপারে যে সব সহজতা ও ছাড় রাখা হয়েছে, সেগুলো শিখে নেওয়া। যেমন— নামায সংক্ষেপ করা, একত্রিত করা, সুন্নত ছেড়ে দেওয়ার অনুমোদন প্রভৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া। এরপর নামাযকে অত্যন্ত মজবুতির সাথে আঁকড়ে ধরবে। নিজের নিয়তকে পাকা দুরস্ত করে নিবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সম্মান ও পদমর্যাদায় বরকত (কল্যাণ) দিবেন। শত্রুদের উপর তোমাদের দান করবেন বিজয় গৌরব।'

শিল্প-কারিগরি ও পেশাজীবীদের প্রতি সম্বোধন

'পেশাজীবীগণ! দেখ, আমানতের আগ্রহ তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে। তোমরা আপন প্রতিপালকের ইবাদত-আনুগত্য থেকে একদম চিন্তামুক্ত-উদাসীন হয়ে গিয়েছ। তোমরা নিজেদের মনগড়া উপাস্যদেরকে কুরবানী-নযরানা উৎসর্গ কর। তোমরা মাদার (শাহ বদীউদ্দীন) এবং কমান্ডার (সেনাপতি মাসউদ গাজী) এর হজ্জ কর। তোমাদের জ্যোতিষ, টোটকা, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি পেশা অবলম্বন করেছে। এটাই তাদের সম্পদ। এটাই তাদের বৈশিষ্ট্য। ওরা বিশেষ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে। বিশেষ খাবার খায়। তাদের মধ্যে যার আয় কম হয়, সে তার স্ত্রী-সন্তানদের অধিকারের তোয়াক্কা করে না। তোমাদের কেউ কেউ কেবল জঘন্য মদকে পেশা বানিয়ে নিয়েছে। তোমাদেরই কোনও কোনও লোক স্ত্রীদেরকে ভাড়ায় খাটিয়ে পেট পালে। সে লোক কত জঘন্য হতভাগ্য! নিজের ইহকাল-পরকাল উভয়টিই ধ্বংস করছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের পেশা ও কামাই রোজগারের পথ খুলে রেখেছেন। যা তোমাদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদের প্রয়োজনাদির জন্য যথেষ্ট হতে পারত। তবে তোমাদেরকে খরচের ক্ষেত্রে মিতাচারিতা অবলম্বন করতে হবে। আর এতটুকু জীবিকার উপর পরিতৃপ্ত থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ ও প্রস্তুত হতে হবে, যা তোমাদেরকে সহজে পরকালীন সফলতা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। কিন্তু তোমরা আল্লাহর অকৃতজ্ঞতা করেছ। বেছে নিয়েছ জীবিকা নির্বাহের ভ্রান্ত পথ। তোমরা কি জাহান্নামের আযাবকে ভয় কর না, যা চরম নিকৃষ্ট ঠিকানা?

দেখ, তোমরা তোমাদের সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর স্মরণে কাটাবে, আর দিনের সিংহভাগ নিজ পেশায় ব্যয় করবে। রাত্রিযাপন কর নিজ স্ত্রীদের সঙ্গে। নিজের খরচকে নিজের আয় অপেক্ষা কম রাখ। এরপর যা কিছু বেঁচে থাকে, তা দিয়ে পথিক, মুসাফির, অভাবী-ভিক্ষুকদের সাহায্য করো। আর কিছু নিজের আকস্মিক বিপদাপদ ও প্রয়োজনাদির জন্য সঞ্চিত রাখবে। তোমরা যদি এ পথ অবলম্বন না করে থাক, তবে তোমরা ভুল পথে যাচ্ছ। তোমাদের ব্যবস্থাপনা যথার্থ নয়।'

মাশায়িখপুত্রদের প্রতি সম্বোধন

তারপর মাশায়িখের সন্তান, সে যুগের ইলম পিপাসু এবং দুনিয়া বিরাগী সাধক ওয়ায়েজীনদেরকেও তিনি বিশেষভাবে আহ্বান করেছেন। যেমন, মাশায়িখপুত্রদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেন,

'ওহে সেসব লোক, যারা পূর্বপুরুষদের রুসমকে কোন প্রকার অধিকার ছাড়া আঁকড়ে আছ অর্থাৎ প্রবীণ বুযুর্গদের কারও পুত্র! তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন, তোমাদের কী হল যে, বিভিন্ন খণ্ডে খণ্ডে, দলে দলে তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়েছ? প্রত্যেকেই নিজ নিজ গান নিজ নিজ সীমানায় গেয়ে যাচ্ছ। আর যে তরীকা ও আদর্শকে আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাধ্যমে প্রেরণ করেছিলেন, তা পরিত্যাগ করে তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন স্বতন্ত্র দিশারী হয়ে গিয়েছ এবং লোকজনকে সেদিকেই আহবান করছ। স্বস্থানে নিজেকে সত্যপন্থী ও পথপ্রদর্শক বানিয়ে নিয়েছ। অথচ মূলতঃ তা স্বয়ং ভ্রষ্টতার পথ এবং অন্যদেরকে বিভ্রান্তকারী। আমরা কখনও এ প্রকৃতির লোকদেরকে মোটেও পছন্দ করি না, যারা মানুষকে নিছক এ উদ্দেশ্যে মুরিদ করে, যাতে তাদের থেকে অর্থকড়ি হাতিয়ে নিতে পারে। তারা একটি মহান ইলম শিখে দুনিয়া সঞ্চয় করে। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত আহলে দীন ধর্মভীরুদের রূপ, সাদৃশ্য ও ভাবধারা গ্রহণ না করবে, দুনিয়া উপার্জন হতে পারে না।

আর না আমরা সেসব লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট, যারা আল্লাহ ও রাসূল (স) কে বাদ দিয়ে স্বয়ং নিজের দিকে মানুষদেরকে ডাকে এবং লোকদেরকে তার মর্জির আনুগত্য করার হুকুম দেয়। এরা বাটপার ও লুটেরা। এদের স্থান প্রতারক, চরম মিথ্যাবাদী, দাঙ্গাবাজ এবং সেসব লোকদের সঙ্গে, যারা স্বয়ং বিপর্যয় ও পরীক্ষার শিকার।

সাবধান! সাবধান!! কখনও তার অনুসরণ করবে না, যে আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল (স)-এর প্রতি আহবান করে না। নিজের দিকে আহ্বান করে। হেঁয়ালী স্বভাবের সূফীদের ইশারা-ইংগিত সম্পর্কে খোলা মজলিসে আলোচনা করা অনুচিৎ। কারণ, উদ্দেশ্য তো (আধ্যাত্মিকতা দ্বারা) কেবল মানুষের অনুগ্রহ-কল্যাণের মাকাম লাভ করা। দেখ! তোমাদের জন্য কি আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে কোনও শিক্ষা নেই?

وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه، ولا بيبعوا السبيل فتفرق بكم من سبيله.

'এটি আমার সরল-সঠিক পথ, তোমরা তা অনুসরণ করো। আর বিভিন্ন পথের পিছনে পড়ো না। সেসব তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। (সূরা আন'আম–১৫৩)

বিপথগামী উলামাদের প্রতি

এরপর তিনি এ যুগের ছাত্র-শিক্ষকের উদ্দেশ্যে বলেন,

'আরে নির্বোধের দল! যারা নিজেদের নাম 'আলেম-উলামা' রেখে নিয়েছ, তোমরা গ্রীক দর্শনে ডুবে আছ, মজে আছ নাহব-সরফ ও মা'আনী (বা অলংকার) শাস্ত্রে আর মনে করছ, এটাই ইলম-জ্ঞান। স্মরণ রেখো, ইলম হয়ত কুরআনের কোনও হুকুম সম্বলিত আয়াতের নাম কিংবা প্রমাণিত প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত।

তোমাদের উচিৎ কুরআনে কারীম শিক্ষা করা। প্রথমে এর বিরল শব্দাবলি সমাধান (শাব্দিক তথ্যজ্ঞানার্জন) করবে। এরপর শানে নুযূল বা কুরআন অবতীর্ণের কারণ অনুসন্ধান কর এবং এর জটিল স্থানগুলোর মর্ম উদ্ধার করো। এভাবে যে হাদীস রাসূলে কারীম থেকে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে, তা সংরক্ষণ কর। অর্থাৎ রাসূলে কারীম (স) নামায কিভাবে পড়তেন, নবীজীর অযু করার পদ্ধতি কী ছিল, নিজের জরুরত পূরণের জন্য কিভাবে যেতেন (কিভাবে প্রস্রাব-পায়খানা করতেন)? কিভাবে হজ্জ আদায় করতেন? তার জিহাদের নীতিমালা কী ছিল? বাচনভঙ্গি বা কথা বলার ধরন কিরূপ ছিল? নিজের যবানকে কিভাবে হেফাজত করতেন? রাসূলে কারীম (স)-এর পুরো জীবনাদর্শের আনুগত্য কর এবং সুন্নাতের উপর আমল কর। তবে এখানেও মনে রাখতে হবে, যেটি সুন্নাত, তাকে সুন্নাতই জ্ঞান করবে; তাকে ফরযের মর্যাদা দিবে না। অনুরূপভাবে তোমাদের উপর যেসব ফরয কর্তব্য রয়েছে, সেগুলো তোমাদের শিখা উচিৎ। যেমন, অযুর ফরযগুলো কী? নামাযের ফরযগুলো কী? যাকাতের নেসাব (ফরয হওয়ার পরিমাণ) কী? ওয়াজিব পরিমাণ কী? মাইয়েতের অংশগুলোর পরিমাণ কী? এরপর রাসূলে কারীম (স)-এর সাধারণ জীবন চরিত পাঠ করবে, যাতে পরকালের আগ্রহ-চিন্তা জন্মে। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনের জীবনকর্ম পাঠ করবে। আর এসব বিষয় ফরযসমূহ থেকে বাড়তি ও অতিরিক্ত। কিন্তু আজ তোমরা যেসব বিষয়ে জড়িত রয়েছ, যাতে মাথা ঘামাচ্ছ, পরকালীন ইলম-জ্ঞানের সাথে এর কী সম্পর্ক; এসব জাগতিক জ্ঞান বিদ্যা।'

এরপর সেসব শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যেই বলেন–

'যেসব বিদ্যার বৈশিষ্ট্য কেবল উপাদান-উপকরণের মত (যেমন, নাহব-ছরফ ইত্যাদি), সেগুলোকে সে অবস্থানেই থাকতে দাও। স্বয়ং সেগুলোকে স্বতন্ত্র শাস্ত্র বানিয়ে ফেল না। ইলম-জ্ঞান শিক্ষা করা ওয়াজিব তো এজন্য যে, তা শিখে মুসলমান এলাকাসমূহে ইসলামের শে'আর ও নিদর্শনসমূহ চালু

করবে। কিন্তু তোমরা ধর্মীয় নিদর্শন ও এর আহ্‌কাম তো প্রসার করনি। আবার মানুষদেরকে প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয়ের পরামর্শ দিচ্ছ।

তোমরা নিজেদের অবস্থাগুলোর দ্বারা সাধারণ মুসলমানদেরকে বিশ্বাস করিয়েছ যে, উলামাদের সংখ্যা অনেক হয়ে গেছে। অথচ এখনও কত বড় বড় এলাকা রয়েছে, যেখানে আলেম-উলামা নেই। আর যেখানে আলেম-উলামা পাওয়া যায়, সেখানেও ধর্মীয় নিদর্শনসমূহ প্রাধান্য লাভ করেনি।'

দীনের মধ্যে সংকীর্ণতা সৃষ্টিকারী নির্জনোপবেশনকারী সাধকদের প্রতি

এরপর তিনি সেসব লোককেও সম্বোধন করেছেন, যারা নিজেদের প্রবঞ্চনাগুলোর নাম রেখেছে দীন-ধার্মিকতা। আর যে তাদের প্রবঞ্চনামূলক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ না হয়, সে যেন দীন থেকে খারেজ (বা ধর্মচ্যুত) হয়ে গেল। এ দলে বেশিরভাগ সন্ন্যাসী সাধক, আবেদ এবং ওয়ায়েজ বক্তাগণই সে যুগে আক্রান্ত ছিল। সেজন্য শিরোনামের সূচনা তাদের দ্বারাই করা হয়েছে। শাহ সাহেব বলেন–

'দীনের মধ্যে শীর্ণতা ও কঠোরতার পথ অবলম্বনকারীদের কাছে আমি জিজ্ঞাসা করি এবং উপদেশদাতা, আবেদ ও সেসব নির্জনাবাসকারীদের কাছে প্রশ্ন, যারা খানকাগুলোতে বসে আছে, বাধ্যতামূলক নিজের উপর দীনকে আরোপকারীরা! তোমাদের কী অবস্থা, যে কোনও ভাল-মন্দ বিষয়, প্রত্যেক শুষ্ক-তরলের উপর তোমাদের আস্থা-বিশ্বাস রয়েছে, মানুষকে তোমরা জাল ও কৃত্রিম হাদীসগুলোর উপদেশ শোনাও, আল্লাহর সৃষ্টিজীবের উপর তোমরা জীবন সংকীর্ণ করে ছেড়েছ। অথচ (হে উম্মতে মুহাম্মাদিয়া) তোমরা তো এজন্য সৃষ্টি হয়েছিলে যে, তোমরা মানুষকে পরস্পরে সহজতা পৌঁছাবে। তাদেরকে কাঠিন্য-জটিলতায় লিপ্ত করবে না। তোমরা এমন লোকদের কথাগুলো প্রামাণ্য উদ্ধৃতিতে পেশ কর, যে অসহায় পর্যদুস্ত ছিল। আল্লাহর প্রেম-ভালবাসায় বিবেকবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিল। অথচ প্রকৃত আশেক আল্লাহ ওয়ালাদের কথাগুলো যেনতেনভাবে ফেলে রাখা হয়, সেগুলোর চর্চা হয় না। তোমরা প্রবঞ্চনাকে নিজেদের জন্য পছন্দ করে নিয়েছ। আর এর নাম রেখেছ 'সতর্কতা'। অথচ তোমাদের কেবল উচিৎ ছিল, বিশ্বাস ও কার্যতঃভাবে ইহসান ও কল্যাণের মাকামের জন্য যেসব বিষয় জরুরী, নিছক সেগুলোই শিখে নিবে। কিন্তু যে অসহায় ব্যক্তি নিজ নিজ বিশেষ অবস্থায় পর্যুদস্ত-আত্মহারা ছিল। খামোখা তাদের কথাগুলোর উপকার সাধন, বিশেষ বিশেষ গোজামিল দেবার প্রয়োজন ছিল না। আর না তাতে কাশফের অধিকারী লোকবলের বিষয়গুলো সংমিশ্রিত করার প্রয়োজন ছিল! তোমাদের

উচিৎ মানুষকে মাকামে ইহসান ও কল্যাণের পথে আহবান করা। প্রথমে তা নিজে শিখে নিবে। এরপর অন্যদেরকে দাওয়াত দাও। তোমরা কি এতটুকুও বুঝ না যে, আল্লাহর সবচেয়ে বড় রহমত এবং সবচেয়ে বড় করুণা সেটিই, যা রাসূলে কারীম (স) পৌঁছিয়েছেন। কেবল তাঁর হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত। এরপর তোমরা কি বলতে পার, তোমরা যেসব কাজ করছ, তা রাসূলে কারীম (স) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা) করতেন?'

সাধারণ মুসলিম উম্মাহর প্রতি সামগ্রিক সম্বোধন; বিভিন্ন রোগ নিরূপণ ও তার চিকিৎসা পত্র

অবশেষে একটি আম সম্বোধন করেছেন সাধারণ মুসলমানদের প্রতি, যেখানে বিশেষ কোন শ্রেণীর সুনির্দিষ্টতা নেই। শাহ সাহেব বলেন–

'আমি এবার সাধারণ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলি, হে আদম সন্তানেরা! দেখ, তোমাদের চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। তোমাদের উপর অন্যায়-লালসার ভূত সওয়ার হয়ে গেছে। তোমাদের উপর শয়তান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। নারীরা পুরুষদের মাথায় উঠে গেছে। আর পুরুষ করছে নারীদের অধিকার হরণ। হারামকে তোমরা নিজেদের জন্য সুস্বাদু বানিয়ে নিয়েছ। আর হালাল হয়ে গেছে তোমাদের জন্য বিস্বাদ-তেতো। সুতরাং আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা আদৌ কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজের আদেশ দেননি। তোমাদের উচিৎ নিজেদের যৌনচাহিদাগুলো বিবাহের পবিত্র পন্থায় পূরণ করা! চাই তাতে একাধিক বিবাহই করতে হোক না কেন। নিজের ব্যয় হ্রাস বৃদ্ধিতে তোমরা লৌকিকতা করো না। সে পরিমাণই খরচ কর, তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ আছে।

স্মরণ রেখ, একজনের বোঝা অন্যজন বহন করে না। নিজের উপর খামোকা সংকীর্ণতা করো না। যদি তোমরা এমন কর, তাহলে তোমাদের তনু-মন অবশেষে পাপাচার পর্যন্ত পৌঁছে যাব। আল্লাহ তা'আলা চান তার বান্দা যেন তার সহজতাগুলো দ্বারা উপকৃত হয়; যেভাবে তিনি আরও পছন্দ করেন যে, কেউ ইচ্ছা করলে অতি উত্তমরূপে আহকামের আনুগত্যও করতে পারে। নিজের পেটের চাহিদাগুলো খাদ্যদ্রব্য দ্বারা পূর্ণ কর এবং এতটুকু উপার্জনের চেষ্টা কর, যার দ্বারা তোমাদের প্রয়োজনাদি পূরণ হয়। অন্যদের বোঝা হওয়ার ধান্ধা করো না যে, তার কাছ ভিক্ষা করে খাবে, তোমরা তাদের কাছে হাত পাতবে আর তারা দিবে। অনুরূপভাবে তোমরা বেচারা রাজা-বাদশা ও শাসকবর্গের উপরও বোঝা হয়ে দাঁড়িও না। তোমাদের জন্য নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়াই উত্তম। তোমরা যদি এরূপ করো, তাহলে

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জীবিকারও সুব্যবস্থা করে দিবেন, যা হবে তোমাদের জন্য পর্যাপ্ত।

হে আদম সন্তান! আল্লাহ তা'আলা যাকে শান্তির নিবাস দিয়েছেন, যাতে সে আরাম পেতে পারে; এতটুকু পানি, যাতে সে পরিতৃপ্ত হতে পারে; এতটুকু খাবার, যাতে জীবন কেটে যায়; এতটুকু পোশাক, যার দ্বারা শরীর ঢেকে যায়; এমন স্ত্রী, যে তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করতে পারে এবং জীবন সংগ্রামে সাহায্য করতে পারে। তাহলে স্মরণ রেখ, দুনিয়া তার পুরোপুরিভাবে হাসিল হয়ে গেছে। সে যেন আল্লাহর শোকর করে।

মোটকথা, মানুষকে আয়-রোজগারের যে কোন পথ অবলম্বন করতে হবে। সেই সাথে আত্মতুষ্টিকে নিজের জীবনের নিয়ামক বানাতে হবে। জীবন যাপনে মিতাচারের পথ গ্রহণ করতে হবে। আর আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার যে সময়-সুযোগ পাওয়া যাবে, তাকে গণীমত মনে করতে হবে। অন্তত তিনবেলা সকাল-সন্ধ্যা ও শেষরাত্রের যিকিরের লক্ষ্য রাখতে হবে বিশেষভাবে। আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করবে তার তাসবীহ-তাহলীল ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে। রাসূলে কারীম (স)-এর হাদীস শুনবে এবং যিকিরের মজলিসে হাযির হবে।

হে আদম সন্তান! তোমরা এমন সব বিকৃত রীতিনীতি গ্রহণ করে নিয়েছ, যার ফলে দীনের আসল রূপরেখা বদলে গেছে। তোমরা আশুরার দিন মিথ্যে আচার-অনুষ্ঠানে একত্রিত হও। তদ্রূপ শবেবরাতে খেলাধুলায় লিপ্ত হও আর মৃত ব্যক্তিদের জন্য খাবার রান্না করে ভক্ষণ করাকে পুণ্য মনে কর। তোমরা সত্যবাদী হলে এর প্রমাণ পেশ কর।

এভাবে তোমাদের মধ্যে আরও খারাপ খারাপ প্রথা চালু আছে। যেগুলো তোমাদের জীবন সংকীর্ণ করে দিয়েছে। যেমন– উৎসব-অনুষ্ঠানগুলোতে তোমরা সীমাতিরিক্ত লৌকিকতা শুরু করে দিয়েছ। তদ্রূপ আরেকটি কুপ্রথা হল, যত কিছুই হয়ে যাক, তথাপি তালাককে যেন তোমরা নাজায়েয সাব্যস্ত করে নিয়েছ। এভাবে বিধবা বিয়ে থেকে তোমরা বিরত থাকছ। এসব পালনে তোমরা নিজেদের সম্পদ নষ্ট করছ। সময় নষ্ট করছ। আর যত ফলপ্রসূ রীতিনীতি ছিল, সেগুলো ছেড়ে দিয়েছ।

তোমরা তোমাদের নামাযকে বরবাদ করে দিয়েছ। তোমাদের কিছু লোক দুনিয়া উপার্জন ও নিজ ধান্ধায় এতটা ফেঁসে গেছে যে, তাদের নামাযের সময়ই মিলে না। কেউ কেউ কিসসা-কাহিনী শুনে সময় নষ্ট করে। যাহোক, এরপরও যদি মানুষ এমন মাহফিল মসজিদের সন্নিকটে কোনও স্থানে আয়োজন করত, তাহলে হয়ত তাদের নামায নষ্ট হত না। তোমরা

যাকাত দেওয়াও পরিত্যাগ করেছ। অথচ এমন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি নেই, যার নিকটাত্মীয় ও আপনজনদের মাঝে অভাবী-দরিদ্রলোক নেই। ধনাঢ্যরা যদি সেসব লোককে সাহায্য করে এবং তাদেরকে পানাহার করায় আর যাকাত প্রদানের নিয়ত করে, তবে এটাও তাদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

তোমরা অনেকেই রোযা ছেড়ে দিয়েছ। বিশেষতঃ সামরিক কর্মকর্তারা বলে, তারা রোযা রাখতে সক্ষম নয়। অর্থাৎ তাদের যে পরিশ্রম করতে হয়, যে কষ্ট সহ্য করতে হয়, তার সাথে রোযা রাখা যায় না। তোমাদের জানা উচিৎ, তোমরা পথ ভুল করে ফেলেছ। তোমরা সরকারের মাথায় বোঝা হয়ে গেছ। সম্রাট (শাসক) যখন তার কোষাগারে (ত্রাণ তহবিলে) এতটুকু সুযোগ না পান, যার দ্বারা তোমাদের ভাতা দিবেন, তখন তোমরা জনসাধারণের জীবন দূর্বিষহ করে তোল। সৈনিকগণ! এটা তোমাদের কেমন বদঅভ্যাস! কিছু লোক এমনও আছে, যারা রোযা রাখে বটে। কিন্তু সাহরী খায় না। রমাযান সেসব কঠিন কাজকর্ম পরিহার করে না, যার কারণে রোযা তাদের উপর ভারী হয়ে যায়।'

অবশেষে শাহ সাহেব বলেন, 'মহান রাজাধিরাজ আল্লাহর পক্ষ থেকে সংস্কারমূলক উদ্দেশ্যসমূহের এ যুগে যেসব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট চাহিদা হচ্ছে, তা একটি দীর্ঘ অধ্যায়। কিন্তু পিছনের দরজা দিয়ে মানুষ চুপিসারে বিরাট কল্যাণ দেখতে পাবে। আর বোকাদের জন্য তার নমুনা যথেষ্ট।'

রীতিনীতির সুস্থতা ও সমাজশুদ্ধি

শাহ সাহেব উক্ত বিশেষ শ্রেণীগুলোর প্রতি একান্ত সম্বোধনের উপরই ক্ষান্ত হননি বরং তৎকালীন মুসলিম সমাজে শত শত বছর ধরে হিন্দুদের মাঝে বসবাস, হাদীস ও সুন্নাতের প্রচার-প্রসার না হওয়া, ধর্মীয় উলামায়ে কিরামের উদাসীনতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ইসলামী সাম্রাজ্যের দায়িত্ব-অজ্ঞতা এবং ধর্মীয় হিসাব প্রস্তুতি না থাকার কারণে হিন্দু ধর্মীয় যেসব রীতিনীতি, বিদ'আত, কুসংস্কার ও অনৈসলামিক নিদর্শনাবলি প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল আর মুসলমানরা সেগুলো মেনে চলত, সে সম্পর্কে শাহ সাহেব কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। সেসব ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস, সংশয়-সন্দেহ এবং অমুসলিমদের অনুকরণের নিন্দা করেছেন। সাধারণতঃ যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের সম্পৃক্ত যেসব আলেম-উলামা ছিলেন, তারা উক্ত অভ্যাস ও রীতিনীতিগুলোকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কিংবা এই বিক্ষিপ্ততা ও গণবিরোধিতার কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এগুলো উপেক্ষা করত।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র), যিনি স্বরচিত একাধিক বই-পুস্তকে সেসব শিরকী আকীদা-বিশ্বাস, জাহেলিয়াতের নিদর্শন ও ভ্রান্ত রীতিনীতির

নিন্দাবাদ ও প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁর পরে ইসলাহে রুসুম বা রীতিনীতির সংশোধন ও সমাজশুদ্ধির কাজ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর মাধ্যমে শুরু হয়েছে। যার পূর্ণতা দান করেছেন তার সম্মানিত পুত্রগণ এবং তারই বংশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুছলিহীনে উম্মত (বা জাতির সংশোধনকারী) হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ (র), শাহ আবদুল আযীয (র), হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (র) (যিনি শাহ সাহেবের নাতি)। নিম্নে 'তাফহীমাত' ও 'অসীয়তনামা' (ফার্সী)-এর একটি উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে।

'হিন্দুদের নিকৃষ্ট স্বভাবগুলোর মধ্যে একটি হল, যখন কোনও স্ত্রীর স্বামী মারা যায়, তাকে তখন দ্বিতীয় বিয়ে করতে দেয় না। এ স্বভাবরীতি মোটেও ছিল না আরবদের মধ্যে। না রাসূলে কারীম (স) পূর্বে, না তার যুগে, আর না তার পরে। আল্লাহর তা'আলা তার উপর রহমত করুন, যে এই কুপ্রথাকে বিলীন করবে। যদি জনসাধারণের দ্বারা এই কুপ্রথার বিলুপ্তি সম্ভব না হয়, তাহলে স্বগোত্রেই আরবদের রীতিকে চালু করা উচিৎ। আর যদি তা-ও সম্ভব না হয়, তাহলে ঐ রীতিকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করবে এবং মন থেকে এর বিদ্বেষ রাখবে। কেননা এটাই ঘৃণার সর্বনিম্ন পর্যায়।

আমাদের দ্বিতীয় বদঅভ্যাস হল, আমরা অনেক বড় অংকের মোহর ধার্য করি। রাসূল কারীম (স) (যিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানব, যার সঙ্গে আমাদের ইজ্জত-সম্মান জড়িত) তাঁর সহধর্মীনীদের মোহর সাড়ে বার উকিয়া নির্ধারণ করে ছিলেন, যার পরিমাণ দাঁড়ায় পাঁচশ দিরহাম।

আমাদের আরেকটি বদঅভ্যাস অপব্যয়ের। কাজেই বিভিন্ন আনন্দ-উৎসব ও রুসম-রেওয়াজে আমরা প্রচুর খরচ করি। রাসূলে কারীম (স) থেকে বিয়ে-শাদীতে কেবল অলীমা ও আকীকার বিষয়টি প্রমাণিত আছে। সুতরাং এতদুভয় বিষয়ের আনুগত্য করা উচিৎ। আর এর অন্যথা থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ কিংবা সেসবের তেমন গুরুত্ব না দেওয়া উচিৎ।

আমাদের বদঅভ্যাসগুলোর মধ্যে দুঃখ-শোকের মুহূর্তগুলো রজত (তিযা, চতুর্থিয়া), চল্লিশা, ষান্মাসিক, ফাতিহা ও বার্ষিকী নামেও অপব্যয় রয়েছে। অথচ এসবের কোনটিরই প্রাচীন আরবে প্রচলন ছিল না। উত্তম হল, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের প্রতি তিনদিন সমবেদনা প্রকাশ এবং একদিন এক রাত খাবারের ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন রেওয়াজ পালন করবে না। তিনদিন পর বংশের নারীগণ সমবেত হয়ে মৃত ব্যক্তির মহিলাদের কাপড়ে সুগন্ধি মাখাবে। আর যদি মৃতব্যক্তির স্ত্রী জীবিত থাকে, তবে ইদ্দতকাল অতিবাহিত হয়ে শোক পালনের ক্রমধারা সমাপ্ত করে দিবে।'

মাওলানা সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী তার রচনা 'মানসাবে তাজদীদ কী হাকীকত' এবং 'তারীখে তাজদীদ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মাকাল' (আল ফুরকান-ওয়ালীউল্লাহ সংখ্যা) এর মধ্যে 'ইযালাতুল খফা' ও 'তাফহীমাত' এর বিভিন্ন উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত করার পর যথার্থই লিখেছেন, 'এসব উদ্ধৃতি থেকে যথেষ্ট অনুমিত হয় যে, শাহ সাহেব মুসলমানদের অতীত-বর্তমানের কী পরিমাণ বিস্তারিত তদন্ত করেছেন এবং কী পরিমাণ সামগ্রিকতার সাথে সেসবের সমালোচনা করেছেন? এ ধরনের সমালোচনার আবশ্যকীয় ফলাফল দাঁড়ায়– সমাজে যতগুলো সৎ উপাদান বিদ্যমান থাকে, যাদের অন্তর ও বিশ্বাসে সতেজতা, যাদের হৃদয়ে ভালমন্দের পার্থক্য থাকে, তাদেরকে শোচনীয় অবস্থা-পরিস্থিতির অনুভূতি চরমভাবে ব্যথিত করে। তাদের ইসলামী মূল্যবোধ বিরাট তীক্ষ্ম হয়ে যায়। এমনকি তাদের আশপাশের জীবনযাত্রায় প্রচলিত জাহেলিয়াতের (অন্ধকার যুগের) প্রত্যেক প্রভাব তাদেরকে পীড়িত-ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে। তাদের পার্থক্যশক্তি এত বেড়ে যায় যে, তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের সংমিশ্রণকে উপলব্ধি করতে থাকেন। তাদের ঈমানী শক্তি এত বেশি সজাগ-সচেতন হয়ে যায়, যার ফলে মর্মন্তুদ জাহেলিয়াতের প্রতিটি অশনি সংকেত তাদেরকে সংশোধনের জন্য ব্যাকুল করে দেয়। এরপর একজন মুজাদ্দিদ (সংস্কারক)-এর জন্য তাদের সম্মুখে নতুন সংস্কারের একটি নকশা সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপন করা জরুরী হয়ে পড়ে। যেন বিদ্যমান অবস্থাকে যে রূপরেখায় পরিবর্তন করা উদ্দেশ্য, তার উপর লোকজন আপন দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে। সে দিকেই নিয়োজিত করে দেয় নিজেদের সকল প্রচেষ্টা ও কার্যক্রমকে । এই সংস্কার ও গঠনমূলক কাজও শাহ সাহেব সেই মাধুর্য ও পূর্ণাঙ্গতার সাথে আঞ্জাম দিয়েছেন, যা তার সমালোচনামূলক কর্মে আপনারা ইতোপূর্বে লক্ষ্য করেছেন।'

একাদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাভাজন পুত্র, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন খলীফা প্রসিদ্ধ সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব

সুযোগ্য পুত্র ও উত্তরসূরীগণ

উম্মতের সংশোধনকারী ও ইসলামের সংস্কারকগণের মধ্যে হাকীমুল উম্মত হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র)-এর উপর আল্লাহ তা'আলার যে বিশেষ নেয়ামতরাজি আর আহলে দাওয়াত ও আযীমতের মধ্যে তার যত স্বকীয়তা রয়েছে, তন্মধ্যে একটি ঐতিহাসিক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর সাথে আল্লাহ পাকের বিশেষ একটি ব্যাপার ছিল, আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন পুত্র ও উত্তরসূরী দান করেছেন, যার ফলে অকুণ্ঠচিত্তে বলতে হয় نعم الخلق لنعم السلف তথা সুযোগ্য পূর্বসূরীর যোগ্য উত্তরসূরী। যারা শাহ সাহেবের জ্বেলে যাওয়া প্রদীপ নিছক প্রজ্জ্বলিত ও দীপ্তিমানই রাখেননি বরং এর দ্বারা শত-সহস্র প্রদীপ জ্বালিয়েছেন। তারপর ঐ প্রদীপগুলোর মধ্যে সে প্রদীপ জ্বলতে থাকে, যার দ্বারা গোটা ভারত উপমহাদেশ এবং এর বাইরেও কুরআন-হাদীস, বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস, নিখুঁত একত্ববাদের প্রসার, শিরক-বিদ'আতের খণ্ডন, রীতিনীতির সংশোধন, আত্মশুদ্ধি, ইহসান ও কল্যাণের মর্যাদা লাভ, এলায়ে কালিমাতিল্লাহ, আল্লাহর আইন সমুন্নত করা, আল্লাহর রাহে জিহাদ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিদ্যাপীঠ ও শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, সঠিক ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাখ্যা ও তাবলীগের (প্রচারের) জন্য সংকলন ও গ্রন্থ রচনা, কুরআন-হাদীস, ফিকহের কিতাবাদির অনুবাদ, তাফসীরুল কুরআনের বরকতময় ধারাবাহিকতা সেকাল থেকে আজ পর্যন্ত চালু রয়েছে। যদি সেই পুণ্যময় পদক্ষেপ ও প্রচেষ্টাগুলোর ইতিহাস লক্ষ্য করা হয় আর কল্যাণ ও বরকতের সেসব কেন্দ্র ও সিলসিলাগুলোর 'শাজারায়ে নসব' (বংশ তালিকা)-এর পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে অনুভূত হবে যে, এক চেরাগ থেকে আরেকটি চেরাগ জ্বলছিল যথারীতি। আর এসব চেরাগ দীপ্তিমান হয়েছে সেই চেরাগ দ্বারা, যা হিজরী বার শতকের মাঝামাঝি হাকীমুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র) নানা অন্ধকারের ঝড়ের মধ্যে জ্বালিয়েছিলেন। এ পর্যায়ে অনিচ্ছাতেই নিম্নোক্ত ফার্সী কবিতা মুখে চলে আসে-

ایک چراغیست درایں خانہ کہ از پرتو آں-
ہر کجامی نگرم انجمنے ساختہ اندو-

বিস্ময়কর সাদৃশ্য

সুযোগ্য পুত্রগণ এবং তাদের দ্বারা শাহ সাহেবের বিশেষ দাওয়াত ও এই সিলসিলার প্রচার-প্রসারে (যা অন্যান্য সহস্র গুণাবলি সত্ত্বেও জীবন চরিত ও স্মারক গ্রন্থাবলিতে উল্লেখিত একটি বিরল ও দুর্লভ বৈশিষ্ট্য) তার (শাহ সাহেবের) স্বয়ং আপন সিলসিলায়ে নকশেবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও শায়খুল মাশায়িখ হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র)-এর সঙ্গে বিস্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে। হযরত মুজাদ্দিস (র) এর সুযোগ্য চারপুত্র কামালাতের স্তরে পৌঁছে। খাজা মুহাম্মদ সাদিক, খাজা মুহাম্মদ সাঈদ, খাজা মুহাম্মদ মা'ছূম ও খাজা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া (র)। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত বুযুর্গ খাজা মুহাম্মদ সাদিকের ২৫ বছর বয়সে ১০২৫ হিজরীতে ইন্তিকাল হয়ে যায়। হযরত মুজাদ্দিদ (র) থেকে তার ব্যাপারে উচ্চাঙ্গের বাক্য বর্ণিত আছে। এই সিলসিলায়ে মুজাদ্দেদিয়ার প্রসার ঘটে শেষোক্ত সম্মানিত তিন পুত্রের মাধ্যমে। আর হযরত সাইয়িদ আদম বিন্নুরী (র) কে বাদ দিয়ে (যার সম্পর্ক হযরতের সঙ্গে বংশের পরিবর্তে আত্মীয়তার ছিল। আর এই আত্মীয়তার সম্পর্ক এত শক্তিশালী ও মাকবূল ছিল যে, তারই বংশ পরম্পরায় জন্ম নিয়েছেন হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র), হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র), হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র) এবং তার প্রসিদ্ধ খলীফাগণ ও বড় বড় উলামায়ে কিরাম।) এই উঁচু সিলসিলার প্রচার-প্রসার এবং হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর শুরু করা সংস্কার কর্ম ও বিপ্লবের পূর্ণতা লাভ করেছে উক্ত মহান তিন পুত্রের মাধ্যমে। এরপর উক্ত তিন বুযুর্গের মধ্যে হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'ছূম (র) ছিলেন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তার মাধ্যমে এই সিলসিলা তুর্কিস্তান, আরব এবং তুরস্কবাসী পর্যন্ত পৌঁছেছে। জনৈক কবি যথার্থই বলেছেন–

چراغ ہفت کشور خواجہ معصوم-
منور از فروغش ہند تا روم-

'খাজা সপ্ত বিশ্বের প্রদীপ। ভারত থেকে রোম পর্যন্ত তার আলো আভায় উজ্জ্বল দীপ্তিমান।'

অনন্তর তারই (মুজাদ্দিদ র. -এর) অদৃশ্য হাত এবং বাতেনী তাওয়াজ্জুহ -এর বরকতে আকাবিরের সিংহাসনে দুই পুরুষ পরই সেই

আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, মুজাহিদ ও গাজী, শরীয়তের অনুবর্তী, ধর্মভীরু ফকীহ শাসক অধিষ্ঠিত হন, যিনি দীন বিলুপ্তকারী হওয়ার পরিবর্তে দীনের সাহায্যকারী এবং জাতির ধ্বংসকারী হওয়ার পরিবর্তে জাতির সেবক স্বীকৃতি পান। যাকে হযরত খাজা প্রথম থেকেই তাঁর চিঠিপত্রে 'দীনের আশ্রয় বাদশা মহোদয়!' লিখে এই মহান কাজের জন্য প্রস্তুত করছিলেন।

ঠিক তদ্রুপভাবে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) রেখে যান চারজন সুযোগ্য উত্তরসূরী পুত্র। হযরত শাহ সাহেবের সম্মানিত পুত্রদেরও একই অবস্থা ছিল। তার চার পুত্রের মধ্যে শাহ আবদুল গণী (র) (যিনি তার ভাইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন) এর আপন ভাইদের সবার আগে (১২২৭ হি.) ইন্তিকাল হয়ে গেল। শাহ সাহেবের শিক্ষাদীক্ষা তার জ্ঞান-প্রজ্ঞার প্রচার-প্রসার, মহাপুরুষদের তরবিয়ত ও পূর্ণতা দান এবং সংকলন ও রচনার সেই বিশেষ ভাবধারা, যাতে শাহ সাহেবের আগ্রহ-চেতনা এবং ইজতিহাদ ও সংস্কারের রঙ চমকাত, উক্ত তিন পুত্রের মাধ্যমে চালু থাকে। এরপর এই তিন বুযুর্গের মাঝে 'সিরাজুল হিন্দ' (ভারতের সূর্য) হযরত শাহ আবদুল আযীয (র)-এর আপন ভাইদের মধ্যে সেই মর্যাদা হাসিল হয়, যা হাসিল হয়েছিল হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর পুত্রদের মধ্যে হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'ছূম (র)-এর। আর তার (শাহ আবদুল আযীয র.-এর) মাধ্যমে শাহ সাহেব (র)-এর সিলসিলা এবং তার জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও শিক্ষাদীক্ষার বিশ্বব্যাপী প্রসার হয়। কোনও কোনও শাখার তো এমনভাবে সম্প্রসারণ ও পূর্ণতা দেওয়া হয় যে, বিনয়ের সাথে বলতে হয়, 'পিতা যদিও (সম্পন্ন করতে) পারেনি; পুত্র পূর্ণতা দান করেছেন।'

আমরা শাহ সাহেবের শুরু করা (হাতে নেওয়া) কাজকর্মগুলোর এই পূর্ণতা দান, সম্প্রসারণ ও উন্নতি দান, যা শাহ আবদুল আযীয (র) এর হাতে বাস্তবায়িত হয়েছে- এর আলোচনার পূর্বে তার (শাহ আবদুল আযীয র.-এর) সংক্ষিপ্ত জীবনকর্ম, জীবনচরিত ও পরিচিতি পেশ করছি। এ প্রসঙ্গে আমরা মাওলানা হাকীম সাইয়িদ আবদুল হাই হাসানী (র) রচিত 'নুযহাতুল খাওয়াতির' গ্রন্থের সপ্তম খণ্ড থেকে সংগৃহিত তার আলোচনা উদ্ধৃত করার উপরই যথেষ্ট করব, যা বস্তুনিষ্ঠ প্রামাণ্য হতে পারে।

হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) দেহলভী

আলেমদের নেতা, বিজ্ঞজনদের মাথা মুহাদ্দিসুল আল্লাম শাহ আবদুল আযীয ইবনে শাহ ওয়ালীউল্লাহ ইবনে শাহ আবদুর রহীম উমারী দেহলভী (র) খোদ সমকালের আলেমগণের সর্দার এবং আলেমদের শিরোমণি, সকলের নয়ন ও প্রদীপ, কেউ কেউ তাকে 'সিরাজুল হিন্দ' আর কেউ

'হুজ্জাতুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তিনি বৃহস্পতিবার রাত ২৫ রমযান ১০৫৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। যেমনটি তার ঐতিহাসিক নাম 'গোলাম হালীম' থেকে জানা যায়। তিনি কুরআনে কারীম হিফয করা থেকে অবসর হয়ে স্বীয় পিতার কাছে শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেন। তিনি তার কাছে পাঠ-শ্রবণ উভয়ভাবে পূর্ণ তত্ত্বানুসন্ধান, প্রামাণ্যভাবে ও মনোযোগিতার সাথে ইলম হাসিল করেন। যার ফলে তার বিভিন্ন শাস্ত্র ও বিদ্যায় প্রদীপ্ত জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায়। যখন তার বয়স ষোল বছর, তখন তার সম্মানিত পিতা ইন্তিকাল করেন। এরপর তিনি শায়খ নূরুল্লাহ বড়হানবী, শায়খ মুহাম্মদ আমীন কাশ্মীরী থেকে উপকৃত হন। তিনি শিক্ষাগত ইযাযত লাভ করেন শাহ মুহাম্মদ আশেক ইবনে উবাইদুল্লাহ ফুলতী থেকে। যিনি তার সম্মানিত পিতার সংশ্রবপ্রাপ্ত ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সেসব বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গ থেকে এমন সব শাস্ত্র জ্ঞানে উপকার ও পূর্ণতা লাভ করেন, যা পিতার ইন্তিকালে পূর্ণতার জন্য তৃষ্ণার্ত ছিল। স্বয়ং তিনি স্বরচিত একটি গ্রন্থে স্বীয় পিতা এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরাম থেকে উপকৃত হওয়ার বিশদ বিবরণ পেশ করেছেন। যার দ্বারা বুঝা যায়, তিনি হাদীস গ্রন্থাবলির মধ্যে পূর্ণ মুয়াত্তা মুসাওয়াসহ এবং মিশকাতুল মাসাবীহ স্বীয় পিতার কাছে পড়েছেন। হিসনে হাসীন ও শামায়েলে তিরমিযীর সবক পিতার সামনে তিনি শ্রবণ করেছেন আর পাঠ করেছেন তারই আপনভাই শায়খ মুহাম্মদ (র)। সহীহ বুখারী হজ্জ পূর্ব পর্যন্ত শ্রবণ করেছেন সাইয়িদ গোলাম হুসাইন মক্কীর পাঠ। জামে তিরমিযী, সুনানে আবী দাউদ শ্রবণ করেন মাওলানা যহূরুল্লাহ মুরাদাবাদীর পাঠ আর মুকাদ্দামায়ে সহীহ মুসলিম ও এর কতিপয় হাদীস এবং সুনানে ইবনে মাজাহ -এর কিয়দাংশ শ্রবণ করেন মুহাম্মদ জাওয়াদ ফুলতীর কিরাত (পঠন)। মুসালসালাত ও মাকছিদে জামেউল উসূলের কিয়দাংশ শ্রবণ করেন মাওলানা জারুল্লাহ নুযাইলে মক্কা (মক্কার অতিথি) থেকে। সুনানে নাসায়ীর কিছু অংশ শ্রবণ করেন আপন পিতার সবকের মজলিস থেকে। সিহাহ সিত্তাহর অবশিষ্ট অন্যান্য অধ্যায়গুলো শ্রবণ করেন আপন পিতার খলীফাগণ থেকে। যেমন– শায়খ নূরুল্লাহ ও খাজা মুহাম্মদ আমীন থেকে শ্রবণ করেছেন। এছাড়া অন্যান্য কিতাবাদির আম ইযাযত লাভ করেন আপন পিতার একান্ত খলীফা ও মামাতো ভাই শাহ মুহাম্মদ আশেক ফুলতী এবং খাজা মুহাম্মদ আমীন থেকে। আর এই দুই বুযুর্গের জন্য তার আব্বাজানের ইযাযতনামা 'তাফহীমাত' ও 'শিফাউল আলীল'-এর মধ্যে বিদ্যমান আছে। সেসব বুযুর্গ তার পিতার কাছে পড়েছেন। আর শাহ মুহাম্মদ আশেক তার

পিতা শায়খ আবু তাহের মাদানীর খিদমতে পঠন-শ্রবণ এবং তার থেকে ইযাযতেও শরীক ছিলেন। তার সনদগুলো তারই রচিত, 'আল-ইরশাদ ফী মুহিম্মাতিল ইসনাদ' ইত্যাদি পুস্তকসমূহে উল্লেখ আছে।

তিনি দীর্ঘদেহী, ক্ষীণকায়, বাদামী বর্ণের, প্রশস্ত চোখের অধিকারী ছিলেন। দাঁড়ি ছিল ঘন। খত্তে নসখ ও রুকআ খুবই চমৎকারভাবে লিখতেন। তীর নিক্ষেপণ, অশ্বারোহণ ও সংগীতেও দক্ষতা রাখতেন। তার থেকে সবক নেন তার ভ্রাতাগণ- শাহ আবদুল কাদের, শাহ রফীউদ্দীন, শাহ আবদুল গণী এবং তার জামাতা মাওলানা আবদুল হাই ইবনে হেবাতুল্লাহ বড়হানবী। মুফতী এলাহী বখশ কান্ধলবী ও সাইয়িদ কামরুদ্দীন সোনাপতি তার কাছে পঠন ও শ্রবণে তার ভাইদের সঙ্গে ছিলেন। হযরত শাহ গোলাম আলী মুজাদ্দেদী (র) (খলীফা– হযরত মিযা মাযহার জানে জানা র.) তার কাছে সহীহ বুখারী পড়েন। মাওলানা সাইয়িদ কুতুবুল হুদা ইবনে মাওলানা মুহাম্মদ ওয়াযেহ (র) রায়বেরেলী তার কাছে সিহাহ সিত্তাহর সবক নেন।

তার অন্যান্য সঙ্গীসাথী তার ভাইদের কাছে পড়েছেন আর সনদ নিয়েছেন তার কাছ থেকে। তার সবকে হাযির থাকেন। তার দরসে কুরআন শ্রবণ করেন। তার থেকে যথাসাধ্য উপকার লাভ করেন। তার এখানে কারী ছিলেন তারই দৌহিত্র শাহ মুহাম্মদ ইসহাক ইবনে আফল উমারী, যিনি প্রতিদিন কুরআনে কারীমের এক রুকু তিলাওয়াত করতেন। শাহ সাহেব তার তাফসীর করতেন। এটাই ছিল তার মহান পিতা শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর নীতি। শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর শেষ দরসে কুরআন 'اعدلوا قف هو اقرب للتقوى' আয়াতখানা পর্যন্ত তাফসীর হয়েছিল। সেখান থেকে শাহ আবদুল আযীয (র) তার সবক (পাঠদান) শুরু করেন। তার শেষ সবক 'إن اكرمكم عند الله اتقاكم' আয়াত পর্যন্ত হয়েছিল। সেখান থেকে তার দৌহিত্র শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (র) তার সবক শুরু করেন। যেমনটি 'মাকালাতে তরীকত' -এ রয়েছে। তিনি নিজের জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বুদ্ধি-মেধা ও তীক্ষ্ম মুখস্থ শক্তিতে যুগশ্রেষ্ঠ ছিলেন। পনের বছর বয়সেই তিনি পাঠদান ও ইফাদাহ (উপকার করা) -এর ধারাবাহিকতা শুরু করেন। আর তার থেকে অনেক বড় বড় জ্ঞানীজনেরা উপকার লাভ করেন। প্রায়ই দিক-দিগন্তের শিক্ষার্থীরা তার খেদমতে এমন আবেগ-উচ্ছ্বাস নিয়ে হাযির হয়, যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তি পানির উপর ঝাপিয়ে পড়ে।

পঞ্চান্ন বছর বয়স থেকে নানা যন্ত্রণাদায়ক রোগ-ব্যাধি ঘিরে ধরে। ফলে তিনি মস্তিষ্ক বিকৃতি, ধবল ও কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। দৃষ্টিশক্তিও হ্রাস পায়।

কোনও কোনও জীবনী লেখক তার চৌদ্দটি যন্ত্রণাদায়ক রোগের কথা উল্লেখ করেছেন। এ কারণে তিনি তার লেখালেখির দায়িত্বভার অর্পণ করেন আপন দুই ভাই শাহ রফীউদ্দীন ও শাহ আবদুল কাদির (র)-এর ওপর। তবে তিনি নিজে দরস দিতেন। লেখালেখি, ফাতওয়া প্রদান এবং ওয়াজ-নসীহতের ধারাবাহিকতাও চালু রেখেছিলেন। প্রত্যেক মঙ্গলবার তার সাপ্তাহিক বয়ান ও কুরআনে কারীমের তাফসীরের জন্য ধার্য ছিল। শেষ জীবনে তিনি মজলিসে সামান্য সময়ও বসতে পারতেন না। এজন্য তিনি নতুন-পুরাতন মাদরাসাগুলো পরিদর্শন করে বেড়াতেন আর অসংখ্য মানুষ এ অবস্থায়ও তার থেকে উপকৃত হত। তার পাঠদান, ফাতওয়া ও বয়ান চলত। এভাবে আসর ও মাগরিবের মাঝামাঝি সময় দু'জন লোকের সাহায্যে মাদরাসা ও জামে মসজিদের মাঝের সড়কে বের হতেন। মানুষ পথিমধ্যে তার অপেক্ষায় থাকত এবং নিজ নিজ সমস্যাগুলো সমাধান করে নিত।

সেসব রোগ-ব্যাধির মধ্যে খাবারে অরুচি এত বেড়ে গিয়েছিল যে, কয়েকদিন পর্যন্ত খাবার মুখে দেওয়ার আগ্রহ হত না। মাঝে মধ্যে জ্বরও আসত। তিনি 'মানাকেবে হায়দারিয়া' এর অভিমতে লিখেন,

'এই অভিমতের অপূর্ণাঙ্গতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। তা হয়েছে অপারগতা ও রোগ-ব্যাধির কারণে। যদ্দরুন ক্ষুধা একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। জ্বরের মতই খাবারের পালা আসে। সম্ভবতঃ এটা পিত্তের আধিক্যের কারণে। শক্তি অন্তর্হিত হয়ে গেছে। ইন্দ্রিয় জ্ঞান লোপ পেয়েছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল হয়ে গেছে। দুর্বল হয়ে গেছে অস্থি-মজ্জাও।'

আমীর হায়দার ইবনে নূরুল হুসাইন বলঘারামীকে পত্রে লিখেন, 'আপনি যদি আপনার প্রিয়জনের অবস্থা জানতে চান, তবে সে খুবই খারাপ আছে। সকাল-সন্ধ্যা তা বৃদ্ধি পায়। তাকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নানা রোগ-ব্যাধি ঘিরে ধরেছে। হারিয়ে গেছে স্বস্থি ও শান্তি। বেড়ে গেছে কষ্ট-যাতনা। আর এসব এমন রোগ-ব্যাধির কারণে, যার একটিই মানুষকে অস্থির-চিন্তিত করার জন্য যথেষ্ট। যেমন, অর্শ্বরোগ, পাকস্থলী ও নাড়িতে গ্যাস সমস্যা। এত বেশি অরুচি, যদ্দরুণ কয়েক দিনরাত পর্যন্ত খাবারের সুযোগ হয় না, ক্ষুধামন্দা। জ্বরতাপ যখন বুকের দিকে উঠে, তখন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। যখন মস্তিষ্কের দিকে উঠে, তখন যন্ত্রণাদায়ক মাথাব্যথা শুরু হয়ে যায়। মনে হয় যেন হামানদিস্তার পিটুনী। 'وإلى الله المشتكى وهو المستعان' এই অবস্থা একটি শব্দও ব্যক্ত করার অনুমতি দেয় না, কোনও গ্রন্থ রচনা কিংবা বার্তা লিখা তো দূরের কথা।'

আপনারা শুনে বিস্মিত হবেন যে, তিনি এতসব যন্ত্রণাদায়ক রোগ-ব্যাধি থাকা সত্ত্বেও সচেতন, প্রত্যুৎপন্নমতি ও মিষ্টভাষী ছিলেন। বিনয়-নম্রতা, ভদ্রতা-প্রফুল্লতা, স্নেহ-ভালবাসা তেমনই ছিল, যেমন ছিল শুরু থেকে। তার সংশ্রব মেধা-চিন্তাকে শানিত করত। সেসব সংশ্রব-সান্নিধ্য বিস্ময়কর খবরাদি, নির্বাচিত শের-আশ'আর (কবিতা), দূর-দূরান্তের দেশসমূহ এবং সেখানকার অধিবাসী ও সেখানকার আশ্চর্যগুলোর বয়ান এমনভাবে হত, শ্রোতাদের মনে হত যেন তিনি নিজের প্রত্যক্ষ দেখা বিষয়গুলো বর্ণনা করছেন। অথচ তিনি কলকাতা ছাড়া আর কোনও শহর দেখেননি। তবে তিনি ছিলেন অসাধারণ ধীমান ও অনুসন্ধিৎসু স্বভাবের লোক। বই-পুস্তক থেকে (যেগুলোর গভীর অধ্যয়নে পর্যবেক্ষণ অবস্থা তৈরী হত) এই তত্ত্ব-জ্ঞান নিজের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত করে নিয়েছিলেন।

মানুষ তার কাছে শিক্ষামূলক উপকারিতা লাভের জন্য হাযির হত। কবি-সাহিত্যিকগণ আসতেন সাহিত্য উপকার ও নিজের রচনা দেখানোর জন্য। অভাবী-দরিদ্র লোকজন আসত ধনিক-শাসকদের কাছে সুপারিশ করানো এবং তার থেকে যথাসাধ্য সাহায্য পাওয়ার জন্য। কারণ, তাঁর অনুপম চরিত্রের খ্যাতি ছিল চারদিকে। এভাবে রুগ্নরা চিকিৎসা-পথ্যের জন্য হাযির হত। সূফী-সাধক সালেকগণ আসতেন আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উপকারিতা লাভের উদ্দেশ্যে। বিদেশী-বিভূঁইয়ের উলামা-মাশায়িখকে তিনি নিজের কাছে থাকতে দিতেন; তাদের প্রয়োজনাদি পূরণ করতেন। যদি তার কাছে কোনও বিরুদ্ধবাদী কিংবা এমন ব্যক্তি বসত, যার ধর্মীয় বিষয়াদিতে মতানৈক্য রয়েছে, তবে তিনি নিজের যাদুময় বর্ণনাশৈলীতে আগুন-পানি ও পরস্পর বিরোধী বিষয়গুলোর মধ্যে এমন অভিন্নতা সৃষ্টি করে দিতেন, সে তার সঙ্গে ঐকমত্য হয়ে প্রস্থান করত।

শায়খ মুহসিন 'اليانع الجنى' গ্রন্থে লিখেন, 'তিনি জ্ঞান, পরাকাষ্ঠা, খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতার এমন উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যার ফলে গোটা ভারতের লোকজন তার সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক বরং তার ছাত্র-শিষ্য অপেক্ষাও নগণ্য সম্পর্কের উপর গর্ববোধ করত। তার সেসব পরাকাষ্ঠা, যাতে তার সমসাময়িকদের কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্য ছিল না, এর মধ্যে উপস্থিত বুদ্ধি এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও ছিল। যার কারণে বিতর্কে তারই জয় হত। শ্রোতাকে করে দিতেন নিরুত্তর । তন্মধ্যে আরও ছিল তার বাগ্মীতা, যাদুময় বাচনভঙ্গী ও চমৎকার রচনাশৈলী, যাতে বিজ্ঞমহল তাকে সবার চেয়ে অগ্রগামী স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তার এ ধরনের পূর্ণাঙ্গতার মধ্যে আরও ছিল তার

অন্তর্দৃষ্টি, যার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যাদানের স্বতন্ত্র যোগ্যতা দান করেছিলেন। তিনি স্বপ্নের এমন ব্যাখ্যা দিতেন, যা পূর্ণ হত এবং তার প্রত্যক্ষ বাস্তবতা মনে হত। এই যোগ্যতা অত্যন্ত পুণ্যাত্মা মানুষেরই নসীব হয়। এছাড়াও তার অনেক পূর্ণাঙ্গতা ও পরাকাষ্ঠা রয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, আল্লাহ তা'আলা তার সত্ত্বায় নানা ধরনের এবং বহুমুখী প্রতিভা ও শ্রেষ্ঠত্ব একত্রিত করে দিয়েছিলেন, যা সমকালীন লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। যদি নিম্নোক্ত কবিতা রচয়িতা দেখত, তবে তার সুস্পষ্ট মনে হত, তার এ আতিশয্যও অপর্যাপ্ত, অক্ষম। কবি বলেন,

ولم أر أمثال الرجال تفاوتا # لدى المجد حتى عد الف بواحد

'আমি মানুষদের মত মর্যাদাসমূহের পার্থক্য দেখিনি
যদ্দরুণ সহস্র মানুষ একজনের সমান গণ্য হয়।'

এ অবস্থায় তার গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বগুলো কে গণনা করতে পারে? শাহ আবদুল আযীয (র)-এর সকল রচনা-গ্রন্থনাকে উলামায়ে কিরামের মহলে সাধারণতঃ সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতার নযরে দেখা হয়। সেসবের দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয়। তার রচনাশৈলীতে এমন শক্তি, প্রাঞ্জলতা ও বাগ্মীতা রয়েছে, যাতে কান আনন্দ পায়। মন স্বাদ অনুভব করে। তার কথায় এতই প্রভাব ও বশীকরণ শক্তি রয়েছে, তাতে প্রভাবিত ও একমত না হওয়া কঠিন। তিনি কোনও দুর্বল ও আপত্তিকর রচনা দেখলে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে তার জবাব লিখতেন। দার্শনিক বিষয়ে শী'আ ধর্মমত গ্রহণ তার আলোচনা-সমালোচনার বিশেষ প্রতিপাদ্য ছিল। তিনি এমন বিজ্ঞচিত ও দার্শনিক ভঙ্গিতে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, আজও যার যথাযথ জবাব লিখা সম্ভব হয়নি।

তার রচিত কিতাবাদির মধ্যে রয়েছে, তাফসীরে কুরআন যেটি 'ফাতহুল আযীয' নামে প্রসিদ্ধ এবং যা তিনি কঠিন রোগ ও দুর্বল অবস্থায় লিখিয়েছিলেন। এটি ছিল কয়েকটি বৃহৎ খণ্ডে রচিত, যার বড় অংশ সাতান্ন খৃস্টাব্দের গোলযোগে বিলীন হয়ে যায়। কেবল শুরু ও শেষের দুই খণ্ড রক্ষা পায়। *তন্মধ্যে একটি 'আল-ফাতওয়া ফিল মাসাইলিল মুশকিলাহ'। এটি কলেবরে অনেক বড় ছিল। কিন্তু আজ কেবলএর সারাংশ দু'খণ্ডে পাওয়া যায়। *তুহফায়ে ইছনা আশারিয়াহ'। এটি শী'আ মতাদর্শের সমালোচনা ও খণ্ডন প্রসঙ্গে একটি অতুলনীয় কিতাব। অন্যান্য কিতাবাদির মধ্যে রয়েছে ১. বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন। এটি হাদীস গ্রন্থাবলি ও মুহাদ্দিসগণের বিস্তারিত নামতালিকা ও জীবনালেখ্য, যা অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়। ২. العجالة النفية -এটি উসূলে হাদীস সম্পর্কিত একটি ফার্সী পুস্তিকা। হাদীসের ছাত্রদের মুখস্থ

করার জন্যও একটি পুস্তিকা রয়েছে। ৩. মীযানুল বালাগাহ। এটি বালাগাত শাস্ত্রের একটি উন্নততর মতন (মূলপাঠ)। ৪. তদ্রুপ মীযানুল কালাম দর্শন শাস্ত্রের একটি মতন। ৫. একটি পুস্তিকা المر الجليل فى مسئلة التفضيل, যাতে খোলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদাগত পার্থক্যের বিবরণ রয়েছে। ৬. একটি পুস্তিকা 'সিররুশ শাহাদাতাইন', যা হযরত হুসাইন (রা)-এর বর্ণনায় একটি উত্তম পুস্তিকা। আরেকটি পুস্তিকা আছে বংশ সম্পর্কে। একটি পুস্তিকা আছে 'স্বপ্নের ব্যাখ্যার ওপর। এছাড়াও আরও অনেক বই-পুস্তক রয়েছে। যুক্তি ও দর্শন শাস্ত্রে 'মীর যাহেদ রিসালাহ, মীর যাহেদ মোল্লা জালাল, মীর জাহেদ শরহে মাওয়াকফ'-এর উপর তার একাধিক টীকা-টিপ্পনী রয়েছে। হাশিয়ায়ে মোল্লা কোসাজ -এর উপর 'আযীযিয়্যাহ' নামে তার রচিত হাশিয়াহ। সদরে শীরাজীর 'শরহে হেদায়াতুল হিকমাহ' -এর উপরও তার টীকা রয়েছে। 'আরজুয়ায়ে আছমাঈ'-এর শরাহও লিখেছেন। আলেম-উলামা ও সাহিত্যিকদের নামে অনেক চিঠিপত্রও আছে। স্বীয় মুহতারাম পিতার 'বা' ও 'হামযা' বর্ণে রচিত কবিতাগুলোর চমৎকার তাখমীসও (পাঁচ পংক্তিতে তৈরী কবিতা) লিখেছেন। গদ্য-পদ্য, লিখনী শক্তি, রচনাশৈলী, বর্ণনায়াদুতে তিনি নিজেই নিজের উপমা ছিলেন। তার রচনাবলি সময়োপযোগিতা, দ্ব্যর্থহীনতা, কলমের তীক্ষ্মতা ও বাকপটুতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ফজর নামাযের পর রবিবার ৭ শাওয়াল ১২৩৯ হিজরী আশি বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তার কবর দিল্লীতে শহরের বাইরে তার সম্মানিত পিতার পাশে অবস্থিত।

শাহ সাহেবের বিশেষ কর্মকাণ্ডের প্রসারতা ও পূর্ণতা দান

শাহ সাহেবের সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডগুলোকে আমরা পাঁচটি শাখায় বিভক্ত করতে পারি। যথা,

১. কুরআনে কারীমের ভাষান্তর। মুসলমানদের মাঝে কুরআনের শিক্ষা-দীক্ষা ও বিষয়বস্তুগুলোর ব্যাপক প্রসার। এর মাধ্যমে আকীদা-বিশ্বাসগুলোর সংশোধন এবং শাশ্বত ধর্মের সাথে সর্বসাধারণের সরাসরি সুসম্পর্ক তৈরীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

২. হাদীসের প্রচার-প্রসার। এর পাঠদান ও ইযাযতের ক্রমধারার জীবন দান। শিক্ষার আসর চালু করা এবং হাদীসের শিক্ষক ও হাদীস গ্রন্থাবলির শারেহগণের পৃষ্ঠপোষকতা।

৩. রাফেজী ও শী'আ ফিতনার মোকাবেলা। সাহাবায়ে কিরাম (রা) এবং কুরআনে কারীমকে আহত (বিতর্কিত) ও সংশয়পূর্ণ বানানোর অপতৎপরতায় লিপ্ত ও কুচক্রীদের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া।

৪. জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহকে পুনর্জীবিত করা। ভারতে ইসলামী শক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি ও চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা।

৫. সেসব মহাপুরুষদের প্রতিপালন ও পৃষ্ঠপোষকতা, যারা অবস্থা-পরিস্থিতি, সময়ের চাহিদা ও দীনের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মাফিক দাওয়াত ও সংস্কারকর্ম আঞ্জাম দেন।

কুরআনের প্রচার-প্রসার

সাধারণ মানুষদের কাছে কুরআন পৌঁছানো এবং এর মাধ্যমে বাতিল আকীদা-বিশ্বাস ও ভ্রান্ত রীতিনীতির সংস্কার-সংশোধন, আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টির প্রচেষ্টার ব্যাপারে যতদূর জানা যায়, তাতে হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) তার সম্মানিত পিতার এই মহান কাজকে অনেক অগ্রগতি দান করেন। শাহ সাহেবের দরসে কুরআন সূরা নিসার 'إعدلوا هو اقرب للتقوى' আয়াতখানা পর্যন্ত পৌঁছে ছিল। ইত্যাবসরে তার ইন্তিকাল হয়ে গেল। শাহ আবদুল আযীয (র) এখান থেকেই দরস শুরু করেন। তিনি সূরা হুজুরাতের 'إن اكرمكم عند الله اتقاكم' আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। তার ইন্তিকালের পর তার দৌহিত্র (কন্যার পুত্র, যিনি ছিলেন পুরোপুরিভাবে তারই সাহচর্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং খাঁটি উত্তরসূরী) শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (র) দরস শুরু করেন।

হযরত শাহ আবদুল আযীয (র)-এর দরসে কুরআন প্রতি সপ্তাহে বুধ ও শুক্রবার হত। যেখানে বিশিষ্ট লোকজন বিশেষভাবে আর সাধারণ মানুষ অত্যন্ত আগ্রহ-উচ্ছ্বাস নিয়ে অংশগ্রহণ করত। এই দরসে তার মানসিকতা নিজের পূর্ণ উদ্যমে আর বিষয়বস্তুর আগমন অবারিত প্লাবনের মত হতে থাকত। এ দরসের দ্বারা রাজধানী দিল্লীতে (যা ছিল তখনকার উলামা-মাশায়িখ ও বিজ্ঞজনদের কেন্দ্রস্থল) কুরআনের আগ্রহ ব্যাপক বেড়ে যায়। আকীদা সংশোধনের এক শক্তিশালী ক্রমধারা চলে। কুরআন অনুবাদ ও দরসে তাফসীরের সেই মুবারক সিলসিলা শুরু হয়, যা আজও পর্যন্ত এই উপমহাদেশে চালু আছে। যার দ্বারা লাখ লাখ মানুষের সংশোধন হয়েছে। তাদের মন-মস্তিষ্ক তাওহীদের মিষ্টতা ও কুরআনিক স্বাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। খোদ আরবী মাদরাসাগুলোতে এই দরসেরই ফয়েজ-বরকত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উলামায়ে কিরামের প্রভাবে মতনে কুরআনের দরস ও তত্ত্ব-জ্ঞান বুঝা-বুঝানোর ধারাবাহিকতা শুরু হয়। যাকে পাঠ্যসূচীতে বরকতস্বরূপ স্থান দেওয়া হয়েছিল সংক্ষিপ্ত তাফসীররূপে। আর দুনিয়ালোভী আলেমদের ছড়ানো এই ধাঁধাঁ ভেঙে দেন যে, সর্বসাধারণের মাঝে কুরআনের প্রসার

বিরাট বড় ধর্মীয় হুমকী বরং পথভ্রষ্টতার অগ্রণী পদক্ষেপ। এখানে এই গোপন মনোভীতি কাজ করছিল যে, সাধারণ মানুষ এসব পেশাদার-ব্যবসায়ী আলেমদের হাত থেকে বের হয়ে যাবে। যারা কুরআনকে বানিয়ে রেখেছিল জটিল-কুহেলিকাময়। চালিয়েছিল সর্বসাধারণকে এর থেকে দূরে সরিয়ে রাখার অপচেষ্টা।

হযরত শাহ সাহেবের শিক্ষা ও সংস্কারমূলক দ্বিতীয় কৃতিত্ব 'ফাতহুল আযীয' তাফসীর গ্রন্থ। যাকে 'তাফসীরে আযীযী' এবং 'বুস্তানুত তাফসীর'ও বলা হয়। এটি শাহ সাহেবের যথারীতি লিখিত স্বতন্ত্র রচনা। খোদ শাহ সাহেবের স্পষ্ট বর্ণনা মাফিক এতে সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারা এরপর সূরা মুলক্ থেকে কুরআনের শেষ পর্যন্ত তাফসীর রয়েছে। তবে সূরা বাকারা পরিপূর্ণ হয়নি। (যার কারণ জানা যায়নি)। শুধুমাত্র দ্বিতীয় পারার এক-চতুর্থাংশের কাছাকাছি 'ان تصوموا خيرا لكم' পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। মূল ফার্সী তাফসীরের একাধিক মুদ্রণ ছাপা হয়েছে। কিতাবটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ড সূরা ফাতিহা থেকে নিয়ে দ্বিতীয় পারার এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত, দ্বিতীয় খণ্ড ২৯ পারার সূরা মুলক্ থেকে নিয়ে সূরা মুরসালাতের শেষ পর্যন্ত আর তৃতীয় খণ্ড সূরা নাবা 'عم يتسائلون' থেকে নিয়ে কুরআনের শেষ তথা সূরা নাস-এর শেষ পর্যন্ত রয়েছে।

শাহ সাহেবের পরে তার একান্ত শাগরেদ আল্লামা হায়দার আলী ফয়যাবাদী (মৃত্যু ১২৯৯ হি.) 'মুনতাহাল কালাম' রচয়িতা এর পরিশিষ্ট লিখেন। 'মাকালাতে তরীকত' গ্রন্থকার লিখেন, 'এ অধম (লেখক) দেখেছেন, মাওলানা হায়দার আলী 'মুনতাহাল কালাম' গ্রন্থকার ভূপালের শাসক সেকান্দর বেগমের প্রত্যাশানুযায়ী 'ফাতহুল আযীয' তাফসীরখানার ২৭ খণ্ডে পরিশিষ্ট লিখেছেন। উক্ত পরিশিষ্ট কেবল পাঁচ পারার শেষ পর্যন্ত নদওয়াতুল উলামার কুতুবখানায় সংরক্ষিত পাওয়া যায়। তবে প্রথমাংশের দু'এক পৃষ্ঠা নেই।

আরেকটি কিতাব পাওয়া যায়, মাতবায়ে আনসারী দিল্লীর ছাপা 'ওয়াজে আযীয' নামে খ্যাত 'তাফসীর আযীযী'-এর উর্দূ সংস্করণ। যাতে তার বিন্যস্ত আবুল ফরীদ মুহাম্মদ ইমামুদ্দীন সাহেবের সুস্পষ্ট ভাষ্য অনুযায়ী শাহ সাহেবের দরসে কুরআন ও হাদীস (যা প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার হত) লিখিতভাবে পেশ করা হয়। এটি ১২৫৯ হিজরীর রচনা এবং সূরা মুমিমূন থেকে সূরা আছ-ছাফফাত পর্যন্ত সন্নিবেশিত।

কিন্তু এই অপূর্ণতা সত্ত্বেও এ তাফসীর গ্রন্থে অনেক এমন এমন তত্ত্ব ও গবেষণা রয়েছে, যা অনেক প্রসিদ্ধ তাফসীরসমূহেও পাওয়া যায় না। শাহ

সাহেবের দরসে তাফসীর এবং তার রচিত ফাতহুল আযীয কিতাবে সেসব ব্যাপারে বিশেষভাবে গবেষণামূলক আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে তখনকার আলেমগণ তত্ত্ব-গবেষণা ও দ্ব্যর্থহীনতার সাথে কাজ করেননি। এ কারণে জনসাধারণের একটি বিরাট সংখ্যা ভ্রান্ত আকীদা ও শিরকী কাজে পর্যন্ত লিপ্ত ছিল। যেমন 'وما أهل به لغيرالله' আয়াতে কারীমার তাফসীর, যা উক্ত কিতাবের বিশেষ স্থানের একটি। এভাবে যাদুর আলোচনা (وما كفر سليمان ... الخ আয়াতের আওতায়) এবং অন্যান্য আরও কতিপয় আয়াতের অধীনে দুর্লভ তত্ত্ব-গবেষণার আলোচনা, উক্ত কিতাবে বৈশিষ্ট্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

হাদীস সংকলন ও সম্প্রসারণ

তার দরসে হাদীস ও এর প্রচার-প্রসার সম্পর্কে যতখানি জানা যায়, তাতে ভারতে শিক্ষা ও ধর্মীয় ইতিহাসে তার উদাহরণ খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাঁর দরসে হাদীসের মেয়াদ প্রায় চৌষট্টি বছর। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি না কেবল সিহাহ সিত্তার দরস দিয়েছেন এবং বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, العجالة النافعة এর মত উপকারী কিতাবাদি রচনা করেছেন, যা হাদীসের যথার্থ সঠিক আগ্রহ, তবাকাতে হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান এবং মূলনীতি সম্পর্কে অবগত করায় আর যার বিবরণে লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠার সুগন্ধি এসে গেছে। তিনি হাদীস শাস্ত্রের এমন এমন সুযোগ্য-সুবিজ্ঞ শিক্ষক ও একান্ত শাগরেদ তৈরী করেছেন, যারা ভারতবর্ষই নয়, সুদূর হিজাযে পর্যন্তদরসে হাদীসের কল্যাণের ধারা প্রসারিত করেছেন এবং কল্যাণময় এক বিশ্ব গড়েছেন। তার সুযোগ্য শাগরেদগণের সংখ্যা, যাদের জীবনালেখ্য কেবল 'নুযহাতুল খাওয়াতির' গ্রন্থে বিদ্যমান। তারা চল্লিশের উর্ধ্বে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত মহাপুরুষগণ রয়েছেন, যাদের দ্বারা হাদীস শাস্ত্রের শিক্ষা মজলিস কায়েম হয়েছে এবং যারা হাদীস শাস্ত্রের অন্যান্য শায়খ ও শিক্ষকদের জন্ম দিয়েছেন–

- মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলভী (র)।
- মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব দেহলভী (র)।
- মাওলানা হুসাইন আহমদ, মুহাদ্দিস মালীহাবাদী (র)।
- মাওলানা হায়দর আলী ট্রাঙ্কী (র)।
- মাওলানা খুররাম আলী বলহাওরী (র)।
- মুফতী এলাহী বখশ কান্ধলভী (র)।
- মাওলানা সাইয়িদ আওলাদ হাসান কানুজী (র)।
- মির্যা হাসান আলী শাফিঈ লাখনৌবী (র)।

- মুফতী ছদরুদ্দীন দেহলভী (র)।
- মাওলানা মুফতী আলী আকবর মিছলী শহরী (র)।
- মাওলানা সাইয়িদ কুতুবুল হুদা হাসানী রায়বেরেলী (র)।

এছাড়া যারা তার কাছ থেকে হাদীস শাস্ত্রের সনদ নিয়েছেন, তাদের তালিকা এত দীর্ঘ যে, তাদের নাম পেশ করা কঠিন। এখানে কতিপয় বুযুর্গের নাম লিখে দেওয়া হচ্ছে, যারা নিজেদের অন্যান্য যোগ্যতা-দক্ষতা কিংবা সিলসিলায়ে তরীকাত কিংবা খ্যাতির দিক থেকে ছিলেন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। যেমন,

- হযরত শাহ গোলাম আলী দেহলভী, প্রধান খলীফা হযরত মির্যা মাযহার জানে জানা (র)।
- হযরত শাহ আবু সাঈদ দেহলভী, খলীফা হযরত শাহ গোলাম আলী (র)।
- হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী (র), খলীফা শাহ মুহাম্মদ আফাক দেহলভী (র)।
- মাওলানা বুযুর্গ আলী মারাহবী, শিক্ষক– মুফতী এনায়েত আহমদ দাকুরবী।
- শাহ বাশারতুল্লাহ বাহরায়েজী, মুজাদ্দেদী সিলসিলার বড় এক শায়খ।
- শাহ পানাহ আতা সালওনবী সিলসিলায়ে চিশতিয়ায়ে নেযামিয়ার বড় এক শায়খ, যার লিখিতভাবে এযাজত ছিল।
- শাহ যহূরুল হক ফালওয়ারবী।

এত হাদীসের ছাত্র এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শায়খগণের মধ্যে হাদীসের সবচেয়ে প্রসার হয় হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (র)-এর মাধ্যমে। যিনি ১২৫৮ হিজরীতে মক্কায় হিজরত করেন। আর তার থেকে হিজাযের বিশিষ্ট আলেমগণ হাদীসের সনদ নেন।

তার ছাত্রদের মধ্যে মাওলানা সাইয়িদ নযীর হুসাইন মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) ওরফে মিয়া সাহেব, কারী আবদুর রহমান পানিপতি (র), মাওলানা সাইয়িদ আলম আলী মুরাদাবাদী, মাওলানা আবদুল কাইয়ূম ইবনে মাওলানা আবদুল হাই বড়হানবী (বিশিষ্ট খলীফা, হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ র.), হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী (র), নবাব কুতুবুদ্দীন দেহলভী (মাযাহেরে হক রচয়িতা), মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী (সহীহ বুখারীর টীকাকার ও প্রকাশক) মুফতী এনায়েত আহমদ কাকুরবী (শিক্ষক, উস্তাদুল উলামা মাওলানা লুৎফুল্লাহ আলীগড়ী) সহ আরও অনেক

উলামায়ে কিরাম রয়েছেন, যাদের তালিকা অতি দীর্ঘ। 'নুযহাতুল খাওয়াতির' রচয়িতার ভাষ্যমতে ভারতে এই সনদে হাদীসই অবশিষ্ট থাকে।

হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব (র)-এর ছাত্রদের মধ্যে কেবল মাওলানা সাইয়িদ নযীর হুসাইন সাহেব মুহাদ্দিসে দেহলভী (মৃত্যু ১৩২০ হি.) দিল্লীতে বহু বছর হাদীসের দরস দেন। তার দরস থেকে হাদীস শাস্ত্রের অনেক বিশিষ্ট প্রকাশক ও ব্যাখ্যাকার জন্ম নিয়েছে। তন্মধ্যে মাওলানা আবদুল মান্নান উযীরাবাদী (যার অসংখ্য ছাত্র-শিষ্য পাঞ্জাবে দরস ও ইফাদায় নিয়োজিত ছিলেন), আরিফ বিল্লাহ সাইয়িদ আবদুল্লাহ গজনবী অমৃতাসরী এবং তার বড় ছেলে মাওলানা সাইয়িদ আবদুল জাব্বার গযনবী অমৃতাসরী (মাওলানা সাইয়িদ দাউদ গযনবীর মুহতারাম পিতা), মাওলানা শামসুল হক ডিয়ানবী 'গায়াতুল মাকছূদ' রচয়িতা, মাওলানা মুহাম্মদ বটালবী, মাওলানা গোলাম রাসূল কালঙ্গ, মাওলানা মুহাম্মদ বশীর সাহসোয়ানী, মাওলানা হাফেয আবদুল্লাহ গাজীপুরী, আবু মুহাম্মদ মাওলানা ইবরাহীম আরবী 'তরীকুন নাজাত' রচয়িতা, মাওলানা সাইয়িদ আমীর আলী মালীহাবাদী, মাওলানা আবদুর রহমান মুবারকপুরী 'তুহফাতুল আহওয়াযী' রচয়িতা, (আর আরব আলেমদের মধ্যে) শায়খ নাসের নজদী, শায়খ সা'দ বিন আহমদ বিন আতীক নজদী প্রমুখের নাম এই দরসের প্রশস্ততা ও কল্যাণধারা উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট।

হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসহাকের ছাত্রদের মধ্যে হযরত শাহ আবদুল গণী মুহাজিরে মাদানী (র) (মৃত্যু ১২৯৫ হি.)ও গণ্য। যার থেকে ভারতবর্ষের বড় বড় আলেম-উলামা ও হাদীসের শিক্ষকগণের শিষ্যত্বের গৌরব অর্জিত হয়েছে। তার মাধ্যমে গোটা ভারতবর্ষ হাদীসের নূরে নূরান্বিত ও পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সে সময়কার সকল শিক্ষাকেন্দ্র ও আরবী মাদরাসাগুলো তার সঙ্গে গৌরবময় সম্পর্ক রাখত। হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র) এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (র) (দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা) তারই প্রসিদ্ধ শাগরেদ। হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর বিশিষ্ট শাগরেদদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া কান্ধলবী (র) ও হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (র) (বযলুল মাজহুদ রচয়িতা)-এর নামই যথেষ্ট। মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (র)-এর ছাত্রদের মধ্য শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলবী, 'আওজাযুল মাসালিক' রচয়িতা প্রমুখের নাম যথেষ্ট। মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম সাহেব (র) ছাত্রদের মধ্যে মাওলানা সাইয়িদ আহমদ হাসান আমরূহী ও শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী আর তার ছাত্রদের মধ্যে মাওলানা সাইয়িদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী ও মাওলানা

সাইয়িদ হুসাইন আহমদ মাদানী (র)-এর নাম ও কৃতিত্ব বলার অপেক্ষা রাখে না। শাহ সাহেব (র)-এর সনদের উচ্চতা, ব্যাপক ফয়েয ও উঁচু মর্যাদার জন্য তার একান্ত শাগরেদ মাওলানা মুহসিন ইবনে ইয়াহইয়া তারহতী (র)-এর বিখ্যাত 'اليانع الجنى فى اسانيد الشيخ عبد الغنى' গ্রন্থখানা অধ্যয়নে জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি বিরাটভাবে সমৃদ্ধ হয়।

সুন্নাতের সাহায্য ও শী'আ মতবাদর প্রত্যাখ্যান

রাফেযী ও শী'আ মতবাদের প্রতিরোধ ও এর প্রভাব থেকে আহলে সুন্নাতকে সংরক্ষিত রাখার কৃতিত্বের পরিধি যতদূর এবং যার সূচনা করেছিলেন হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) তার ভূতপূর্ব কিতাব 'ইযালাতুল খফা'-এর মাধ্যমে, এর পূর্ণাঙ্গতা ও শক্তি দান করেন হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) তার যুগের বিরল রচনা 'ইছনা আশারিয়াহ'-এর মাধ্যমে। যাকে একটি যুগান্তকারী কিতাব বলা যায়। যেভাবে মোল্লা মুহিব্বুল্লাহ বিহারী রচিত 'সুল্লামুল উলূম' ও 'মুসাল্লামুস সুবূত' গ্রন্থ দু'টি প্রায় শত বছর পর্যন্ত ভারতে আলেমদেরকে তার শরাহ ও টীকা-টিপ্পনী রচনায় ব্যস্ত রেখেছে। নিবিষ্ট করে রেখেছে তাদের উৎকৃষ্টতর বিচক্ষণতা ও মেধাশক্তিকে। অনুরূপভাবে এ কিতাবের জবাব বিশিষ্ট বিশিষ্ট শী'আ আলেমদেরকে বিভিন্ন লিখনী ও সংকলনে ব্যস্ত রেখেছে। কেবল 'আবকাত' যার পূর্ণ নাম 'عبقات الأنوار فى إمامة الأئمة الاطهار' এবং যার লেখক মৌলভী সাইয়িদ হামিদ হুসাইন কানতূরী (মৃত্যু ১৩০৬ হি.)– আট খণ্ডে লিখিত। এ কিতাবের স্থূলতা অনুমিত হয় এর প্রথম খণ্ডের কলেবর ১২৫১ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খণ্ড ৯৭৭ পৃষ্ঠা, তৃতীয় ৬০৯ পৃষ্ঠা, চতুর্থ ৩৯৯ পৃষ্ঠা, পঞ্চম ৭৪৫ পৃষ্ঠা, ষষ্ঠ ৭০৪ পৃষ্ঠা বাকীগুলোও এরূপ সংখ্যক পৃষ্ঠায় রচিত হওয়ার অবস্থা দেখে। পূর্ণ কিতাবটি এরকম ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত। লেখকের পুত্র মাওলানা সাইয়িদ নাসির হুসাইন কিতাবটি সমাপ্ত করেন। নজমুস সামা গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মাওলানা সাইয়িদ হামিদ হুসাইন সাহেব ছাড়া মাওলানা দিলদার আলী সাহেব মুজতাহিদে আউয়াল, হাকীম মির্যা মুহাম্মদ কামেল দেহলবী, মুফতী মুহাম্মদ কুলী খান কানতূরী এবং সুলতানুল উলামা সাইয়িদ মুহাম্মদ সাহেবও এই কিতাবের জবাবে এবং এর প্রভাবকে দূর করার জন্য মোটা মোটা কিতাবপত্র লিখেছেন। এই ধারাবাহিকতা মির্যা হাদী রিসওয়া লাখনৌবী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। যিনি ছিলেন সাহিত্য ও দর্শন জগতের মানুষ। কিন্তু তিনি একাজে অংশ নেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

লিখনী ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা, দরসে তাফসীর ও হাদীস, কুরআন সুন্নাহর প্রচার-প্রসার, বায়'আত ও ইরশাদ, মুরীদগণের তরবিয়ত-প্রশিক্ষণ দান,

ফাতওয়া প্রদান, বিবাদ-বিসম্বাদ মীমাংসা, সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম এবং বিভিন্ন ধরনের টানাপোড়েন ও রোগ-ব্যাধি সত্ত্বেও শাহ সাহেবের এ বিষয়টির প্রতি আপাদমস্তক নিবিষ্ট হওয়ার চিন্তা এবং এরূপ একটি গ্রন্থ রচনার সুযোগ কিভাবে হল, যার জন্য বিশোর্ধ্ব কিতাবাদি ও শত-সহস্র পৃষ্ঠা অধ্যয়ন, মানসিক একাগ্রতা ও পূর্ণ মনোযোগিতার প্রয়োজন ছিল? এর ধারণা ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত হিজরী বার শতকের মধ্য ও শেষভাগ (আঠার খৃস্ট শতকের শেষার্ধ) এর ভারতবর্ষ বিশেষতঃ উত্তর ভারত, দিল্লী ও তার আশপাশের এলাকা, উড়িষ্যা, বিহার ও বাংলা মুলুকের মুসলিম সমাজ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উপর গভীর দৃষ্টি না হবে এবং এই চিন্তাগত বিক্ষিপ্ততা, ধর্মীয় সংশয় ও মুসলিম বংশগুলো বিশেষতঃ অভিজাত, শাসক শ্রেণী ও প্রভাবশালী মহলের উপর শী'আ মতাদর্শ গ্রহণের প্রতিক্রিয়া, এর আগ্রাসী ও আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সম্যক অবগত না হবে। এর উপলব্ধি সে লোক করতে পারে না, যে হুমায়ূনের ইরান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ফুররাখ সিয়ার ও তার পরবর্তী সময়কার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন, বিপ্লবসমূহ, ইরান বংশোদ্ভূত শাসক ও আলেমদের প্রভাব-প্রতিপত্তি, দুই সাইয়িদ ভ্রাতা (হাসান আলী খান ও হুসাইন আলী খান) এর দিল্লীর রাজদরবারে দাপট ও প্রভাব, এরপর দিল্লীতে নবাব নাজিফ আলী খানের আগ্রাসনের বিশদ বিবরণ, অপরদিকে উড়িষ্যায় নবাব আবুল মানসূর খান সফদর জং নীশাপুরীর বংশধরদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং শুজাউদ্দৌলাহর পর থেকে শী'আ মতবাদের দৌরাত্ম্য ও প্রভাবের জরিপ না নিয়ে থাকেন। এর খানিক ধারণা আসে শাহ আবদুল আযীয (র)-এর সেই ভাষ্য থেকে, যা তার 'তোহফাহ' -এর ভূমিকায় সতর্ক শাণিত কলম থেকে বের হয়েছে।

তিনি বলেন, 'এদেশে আমরা যেখানে বসবাস করছি আর এই যুগে আমরা যা পেয়েছি, এখানে 'ইছনা-আশারিয়্যাহ' মতবাদের প্রচার-প্রসার ও প্রচলন এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যে, (সুন্নীদের) খুব কম ঘরই এমন পাওয়া যাবে, যে ঘরের দু'একজন এ মতবাদের অনুসারী ও এই আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি আসক্ত-অনুরাগী নেই। তাদের অধিকাংশ লোকই ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞ এবং আপন পূর্বপুরুষদের জীবনালেখ্য ও নীতিমালা সম্পর্কে উদাসীন-বেখবর পরিলক্ষিত হয়। যখন বিভিন্ন বৈঠক ও মাহফিলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তখন গোলমেলে বক্রকথা ও অপ্রাসঙ্গিক কথায় কাজ সারতে চেষ্টা করে। সে লক্ষ্যে আল্লাহর ভরসায় এই পুস্তিকা রচনা করা হয়েছে, যাতে তর্ক-বিতর্কের সময় এ মাযহাবের আনুগত্য ও প্রাচীন ফলক থেকে সরে আসতে না পারে; স্বয়ং

নিজের মূলনীতি অস্বীকারকারী না হয় আর যেসব বিষয় বাস্তবতার উপর নির্ভরশীল, তাতে সংশয়-সন্দেহের অবকাশ না দেয়।

শাহ সাহেব এ গ্রন্থে সেসব তর্ক ও দার্শনিকসুলভ কিতাবাদি ও নীতিমালার অনুসরণ করেননি, যা লিখা হয় কোনও বিরোধীপক্ষের প্রত্যাখ্যান ও জবাবে এবং তাদের বিশেষ বাগধারা অনুসারে। প্রথমতঃ এ গ্রন্থে শী'আ মতবাদের উত্থান এবং তাদের দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। তদ্রুপভাবে শী'আ মতবাদের প্রবীণ আলেম ও তাদের রচনাবলির পরিচিতি রয়েছে। এরপর খেলাফতের আলোচনা এবং সাহাবায়ে কিরামের উপর নানা অভিসম্পাত ও ভৎর্সনার বিবরণ এবং তার জবাবসমূহের উপর ক্ষ্যান্ত করার স্থলে মৌলিক মাসায়েল, খোদায়িত্ব, নবুওয়াত, পরকাল ও ইমামত (শাসনব্যবস্থা)-এর উপর স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ রচনা করা হয়েছে। তিন খলীফা, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের উপর শী'আ মতাবলম্বীদের পক্ষ থেকে যেসব আপত্তি-অভিযোগ ও বিষেদাগার করা হয়েছে, সেগুলোর বিস্তারিত জবাব দেওয়া হয়েছে। তারপর শী'আ মতবাদের বৈশিষ্ট্য, তাদের সংশয়-সন্দেহ ও উগ্রতার সমালোচনা করা হয়েছে। তাদের ভুল-ভ্রান্তি ও কুধারণাগুলোর পর্যালোচনাও রয়েছে। শেষ অনুচ্ছেদ (১২তম অনুচ্ছেদ) মহব্বত ও ঘৃণা প্রসঙ্গে। যা দশটি মুকাদ্দমায় বিন্যস্ত। গ্রন্থখানা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ছাপায় চারশত পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভাষার মাধুর্য, প্রাঞ্জলতা ও বস্তুনিষ্ঠতা; যা ভারত ও ইরানের অনেক শী'আ আলেমও স্বীকার করেছে। খোদ নাম থেকেও এই চিন্তাধারা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বহিঃপ্রকাশ হয়, যা এ গ্রন্থ রচনার প্রেরণা হয়েছে। এর বিপরীতে যেসব কিতাবাদি লিখা হয়েছে, সেগুলোর নাম থেকে অধিকাংশই বিদ্বেষ ও উত্তেজনা প্রকাশ পায় এবং তরবারী ও বর্শার ঝলক দেখা যায়। যেমন– কিতাবের 'صوارم الالهيات' একটির নাম 'হুসামুল ইসলাম', একটির নাম 'সাইফে নাসেরী', অপর একটির নাম 'যুলফাকার' প্রভৃতি।

এ যুগের তার কল্পনাও করাও কঠিন যে, উক্ত সময়োপযোগী গ্রন্থ রচনা কত কি উপকার বয়ে এনেছে? অধম লেখক নবাব 'ইয়ারে জং' (যুদ্ধপ্রিয়দের) প্রধান মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শারওয়ানী সাবেক 'আছ ছুদূর উমূরে মাযহাবী (ধর্মীয় বিষয়সমূহের সংরক্ষণ সংস্থা) হায়দারাবাদ জেলার প্রধান (যার বংশ হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) ও তার খলীফাগণের সাথে সম্পৃক্ত) -এর মুখে স্বয়ং শুনেছি, 'এ গ্রন্থ রচনার শী'আ মতবাদের ক্রমবর্ধমান প্লাবন প্রতিরোধে একটি মজবুত বাঁধের কাজ করেছে।' এ গ্রন্থখানা শাহ সাহেবের জীবদ্দশায়ই

১২১৫ হিজরীতে ছাপা হয়ে ব্যাপক সমাদর লাভ করেছিল এবং এর নানা জবাব প্রদানের ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিল। শাহ সাহেবের এক বিজ্ঞ শাগরেদ মাওলানা আসলামী মাদ্রাজী এর আরবী অনুবাদ করেন। লেখক এই অনুবাদ গ্রন্থটি বাবে জিবরীলে মদীনা তাইয়্যিবায় অবস্থিত শায়খুল ইসলাম আরেফে হেকমত বে -এর কুতুবখানায় দেখেছে।

ইংরেজ শক্তি বিরোধিতা ও মুসলমানদের জাতীয় নিরাপত্তা

ভারতবর্ষে ইসলামী শক্তির নিরাপত্তা এবং মুসলমানদের স্বাধীনতার পথে আসন্ন হুমকি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার পরিধি যতদূর, এক্ষেত্রে শাহ সাহেব অবস্থা-পরিস্থিতির সেই বাস্তবধর্মী পর্যবেক্ষণ, সচেতনতা, দূরদর্শিতা ও বিস্ময়কর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, যা একজন বিচক্ষণ তীক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন আলেমে দীন, দাঈ ও সংস্কারক এবং সমকালের ধর্মীয় দিশারীর একান্ত বৈশিষ্ট্য। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর যুগে সময়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল মারাঠীদের আক্রমণ এবং তাদের সেই সামরিক অভিযান ও লুটতরাজ দমন করা, যা একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যার কারণে একদিকে মোঘল সাম্রাজ্য নিরুপায়, শক্তিহীন, অকার্যকর ও অপদস্ত হচ্ছিল। অপরদিকে মুসলমানদের ইজ্জত-আব্রু নিরাপদ ছিল না। শহরের অধিবাসীদের সাধারণ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অক্ষুণ্ন ছিল না। সে সময় এই হুমকি দূর করা ও একে দমন করার জন্য কোনও সম্ভাব্য সাহায্য লাভ করা এমনই ব্যাপার ছিল, যেমন কোনও ঘর কিংবা মহল্লায় আগুন লাগার সময় আগুন নিভানোর জন্য কোনও দমকলবাহিনী খোঁজা হয়। শাহ সাহেবের দৃষ্টিতে আহমদ শাহ আবদালী ও তার সৈন্যবাহিনীর বাস্তবতা এটাই ছিল। আর তাদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল যে, এ আগুন নিভানোর পর তারা স্বদেশে ফিরে যাবে। শাহ সাহেবের দৃষ্টিতে মোঘল সাম্রাজ্য রক্ষার সুযোগ দান এবং কোনও সুব্যবস্থা-সুশাসন সে স্থান দখলের জন্য (যদি এছাড়া উপায় না থাকে) এটি একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা ও কৌশলের পর্যায়ভুক্ত ব্যাপার ছিল, যা তৎকালীন মোঘল সম্রাট শাহ আলমের কাপুরুষতা ও অদূরদর্শিতার কারণে সফলতার মুখ দেখতে পারেনি। তখন পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারতবর্ষের নেতৃত্বের লাগাম টেনে ধরা, তারপর এই বিশাল রাজ্যে সাত সমুদ্রের ওপারের একটি দেশের শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সেই প্রভাব প্রকাশ পায়নি, যা শাহ সাহেবের তীক্ষ্মদৃষ্টিকে পুরোপুরি এদিকে নিবিষ্ট করত।

কিন্তু শাহ সাহেবের ইন্তিকালের পর ভারতবর্ষের অবস্থা চিত্র অতি দ্রুত বদলে যায়। ১৭৬৫ খৃস্টাব্দ মোতাবেক ১১৭৯ হিজরীতে (শাহ ওয়ালীউল্লাহ

(র)-এর ইন্তিকালের তিন বছর পর) বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা তিনটি প্রদেশের বন্দোবস্ত অন্য কারও অংশীদারিত্ববিহীন রাজকীয় পুরস্কার বা দানস্বরূপ বন্দোবস্ত সনদ হিসেবে সরকার ঐ কোম্পানীকে দিয়ে দিয়েছিল। আশ্রয়দাতা সরকার এবং গাজীপুর জায়গীর হিসেবে কোম্পানী পেয়ে গিয়েছিল। এখন তৈমুর বংশের অধঃস্তন সম্রাট শাহ্ আলমের হাতে রাজ্যের মাত্র একটি প্রদেশ (এলাহাবাদ) ছিল। আর আয়ের মধ্যে ছিল সেসব অর্থকড়ি, যা তাকে ইংরেজরা দিত। ৮ মার্চ ১৭৮৭ খৃস্টাব্দে (১২০২ হি.) কলকাতা গেজেটে প্রকাশ করা হয়, 'মুসলমানদের রাজত্ব তো নিতান্তই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হয়ে গেছে, হিন্দুদের নিয়ে আমাদের কোনও উদ্বেগ-আশংকা নেই।' ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে ইংরেজরা পলাশীর ময়দানে সিরাজুদ্দৌলাহকে আর ২৩ অক্টোবর ১৭৬৪ খৃস্টাব্দে (১১৭৮ হি.) বকসারের ময়দানে শুজাউদ্দৌলাহকে পরাজিত করে। ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে (১২১৪ হি.) শহীদ টিপু সুলতান পাটন ময়দানে শাহাদাত বরণ করেন। যেন তখন ভারতবর্ষে মুসলমানদের শাসন ক্ষমতার ললাটে সীলগালা লেগে গিয়েছিল। সুলতান শহীদের লাশ দেখে জেনারেল হ্যারিস তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেছিল, 'আজ ভারতবর্ষ আমাদের।'

শাহ্ আবদুল আযীয (র), যিনি দিল্লীতে দরস-তাদরীসে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু তার বাস্তবদর্শী দৃষ্টি গোটা ভারতের উপর ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাকে অসাধারণ বাস্তবদর্শী মেধা, আত্মমর্যাদাবোধ ও দৃঢ়চিত্ততা দান করেছিলেন। তিনি এই পরিবর্তনের পূর্ণ জরিপ নেন এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এ সময়টি শিশু-কিশোর, ইসলামী নেতৃত্ব-শাসন ও এদেশে মুসলমানদের ভবিষ্যতের জন্য বিপদজনক। তার একটি আরবী কবিতায় এই বাস্তবতার পূর্ণ চিত্র ফুটে উঠে। যার থেকে অনুমিত হয়, তিনি ইংরেজদের প্রভাবকে ভারতবর্ষ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ মনে করতেন না; একে আরও ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী মনে করতেন। তিনি বলেন.

وإنى أرى الافرنج أصحاب ثروة # لقد أفسدوا ما بين دهلى وكابل

'আমি দেখেছি, এই যে ইংরেজরা ধন-সম্পদের মালিক,
এরা দিল্লী ও কাবুলে মাঝে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে।'

আমাদের জানামতে তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ঐ মুহূর্তে ভারতকে 'দারুল হরব' (শত্রু কবলিত রাষ্ট্র) আখ্যা দেওয়ার দুঃসাহস করেছেন। সেই সাথে উদ্ভুত পরিস্থিতির বাস্তবধর্মী জরিপ নিয়ে ফিকাহ ও উসূলে ফিকাহের আলোকে সমস্যার এমন পর্যালোচনা করেছেন, যার দ্বারা তার অন্তর্দৃষ্টিরও বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং চারিত্রিক-নৈতিক ও ধর্মীয় সাহসিকতারও। ফাতওয়ায়ে আযিযিয়্যার প্রথম খণ্ডে

নিম্নোক্ত প্রশ্ন অর্থাৎ 'দারুল ইসলাম দারুল হরব হতে পারে কি না?' এর জবাবে 'দুররে মুখতার' -এর দীর্ঘ এক উদ্ধৃতি চয়ন করার পর তিনি লিখেন–

'এ শহরে (দিল্লীতে) মুসলমানদের শাসকের হুকুম মূলতঃ কার্যকর নেই। খৃস্টান শাসকদের হুকুম অতিমাত্রায় চালু রয়েছে, ফকীহগণ যাকে কাফিরের আহকাম বাস্তবায়ন বা কুফরী শাসন বলেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, প্রজাসাধারণের বন্দোবস্ত, ট্যাক্স-কর, ব্যবসার সম্পদের এক-দশমাংশ উসূল করা, চোর-ডাকাতদের শাস্তি বিধান, বিচারকার্য ও অপরাধ দমনে কাফির গোষ্ঠী ব্যক্তিগতভাবে শাসক ও স্বাধীন। যদি কোনও কোনও ইসলামী বিধান পরিপালন যেমন, জুমআ, দুই ঈদ, আযান ও গরু কুরবানী ইত্যাদিতে তারা আপত্তি নাও করে, তথাপি মূলকথা এটাই যে, এসব বিষয় তাদের দয়া-করুণার উপরই হচ্ছে। আমরা দেখেছি, তারা মসজিদগুলো নির্বিচারে ধ্বংস করছে। কোনও মুসলমান কিংবা (অমুসলিম) যিম্মি তাদের অনুমতি ছাড়া এই শহর ও এর উপকূলে প্রবেশ করতে পারে না। নিজেদের স্বার্থে তারা বহিরাগত মুসাফির ও বণিকদের নিষিদ্ধ করে না। কিন্তু অন্যান্য পদমর্যাদার অধিকারী লোক যেমন শুজাউল মালিক, বেলায়েতী বেগম প্রমুখ তাদের অনুমতি ছাড়া এসব শহরে প্রবেশ করতে পারে না। এই দিল্লী শহর থেকে কলকাতা পর্যন্ত খৃস্টানদের শাসনকর্তৃত্ব বিস্তৃত। তবে ডানে বামে যেমন– হায়দারাবাদ, লাখনৌ ও রামপুরে তারা তাদের হুকুম জারি করেনি। কোথাও তো নিজেদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে আর কোথাও সেসব রাজ্যের শাসনকর্তা তাদের আনুগত্য স্বীকার করে নেওয়ার কারণে।'

হযরত শাহ সাহেবের চিন্তাধারা এবং ইংরেজদের সম্পর্কে তার যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায় তার বিশিষ্ট খলীফা ও সংশ্রবপ্রাপ্ত দাঈ ও সংস্কারক হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র)-এর মধ্যে। যার সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তার চিঠিপত্রগুলোতে পরিলক্ষিত হয়। যেগুলো তিনি সেসময় ভারতের কতিপয় প্রভাবশালী ও শাসনকর্তা নেতৃবৃন্দ এবং কোনও কোনও বিদেশী মুসলমান শাসকবর্গকে লিখেছিলেন। চিত্রালের শাসক শাহ সুলাইমানকে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'নিয়তির সিদ্ধান্তে কয়েক বছর ধরে ভারতবর্ষের রাজত্ব ও শাসনের অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, খৃস্টান ও মুশরিকরা ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চলে বিজয় পেয়ে গেছে এবং শুরু করে দিয়েছে জুলুম-শোষণ ও দখলের রাজত্ব।'

এর চেয়ে আরও সুস্পষ্ট ভাষায় হিন্দু রাজপুত উযীর গবালিয়া..কে লিখেন, 'জনাব খুব ভালভাবেই জানেন যে, এই ভিনদেশী সমুদ্র উপকূলবাসী,

বিশ্বময় বণিক এবং এই সওদাগররা রাজত্বের কর্তা (শাসক) হয়ে গেছে। বড় বড় শাসকদের রাজত্ব এবং তাদের ইজ্জত-সম্মানকে ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে।'

গবালিয়ার এক সামরিক অফিসার গোলাম হায়দার খানের নামে লিখেন, 'ভারত সাম্রাজ্যের বিরাট অংশ বিদেশীদের দখলে চলে গেছে। তারা সর্বত্রই জুলুম-শোষণ ও নিপীড়নের জন্য কোমর বেঁধে নিয়েছে। ভারতের শাসকদের রাজত্ব ধ্বংস হয়ে গেছে।'

সাইয়িদ সাহেবের রাজপুত্র ও শাসকবর্গের নামে লিখিত এসব চিঠিপত্র থেকে পরিষ্কার মনে হয়, এই জিহাদের দ্বারা তার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষ, যা ক্রমান্বয়ে ইংরেজদের দখলে চলে যাচ্ছিল। চিঠিতে তিনি লিখেন, 'এই যুদ্ধ (সীমান্ত ও পাঞ্জাব) থেকে অবসর হওয়ার পর এই অধম পুণ্যবান মুজাহিদগণের সঙ্গে কুফর ও দাম্ভিকতার মূলোৎপাটনের নিয়তে ভারতের প্রতি মনোযোগী হবে। কেননা এটাই মূল লক্ষ্য।

এ ধারণাজ্ঞান এ থেকেও হতে পারে যে, সাইয়িদ সাহেব ১২১৭ হিজরীতে (শাহ আবদুল আযীয র.-এর ইন্তিকালের বার বছর পূর্বে) আমীর খানের সেনাবাহিনীতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, যা সে সময় ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তাদের সঙ্গে ছিল ভারতবর্ষের উন্নততর সামরিক শক্তি, মুসলমানদের দুর্নিবার সাহসী পুরুষ, লৌহমানব, ভারতের বিজয়ী শক্তির দুর্ভেদ্য পুঁজি এবং সময়ের অনেক সিংহশাবক অশ্বারোহী। এটা ছিল ভারতের একটি বর্ধিষ্ণু স্বাধীন শক্তি। যাকে সমকালের কোনও তীক্ষ্মদৃষ্টি উপেক্ষা করতে পারত না। যাকে স্বার্থক ও সুশৃঙ্খল বানিয়ে ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান শক্তির মোকাবেলায় এনে দাঁড় করানো যেত। কেননা বিভিন্ন দেশ ও জাতির ইতিহাসে এমন সুযোগ্য শক্তিগুলো স্বীয় জনবল ও অস্ত্রশস্ত্রের দুর্বলতা সত্ত্বেও অবস্থার গতিধারা বদলে দিয়েছে। এর কোনও লিখিত প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি যে, হযরত সাইয়িদ (র) হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও আদেশে নবাব আমীম খান এর সৈন্যদলে তাশরীফ নিয়ে গিয়ে ছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন ইশারা-ইংগিত অবশ্যই পাওয়া যায়। যাতে অনুমিত হয়, এ পদক্ষেপ হযরত শাহ সাহেবের ইংগিতে কিংবা ন্যূনপক্ষে তার সমর্থন ও পছন্দ হয়েছে। কেননা ১২২৩ হিজরীতে যখন নবাব সাহেব ইংরেজদের সঙ্গে আপোস রফা করে নেন। রাজপোতানা ও মালের কতিপয় বিক্ষিপ্ত ও গুরুত্বহীন অঞ্চল পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে (একত্রে যাকে টোঙ্গ জেলা বলা হত) ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করা থেকে দূরে সরে আসেন আর সাইয়িদ সাহেব

এরপর সেখানে আরও বেশি অবস্থান করাকে অনর্থক মনে করেন। তখন তিনি পৃথক হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং শাহ আবদুল আযীয (র) কে একটি পত্র লিখেন, যার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ,

'অধম পদচুম্বনের জন্য হাযির হচ্ছে। এখানে সৈন্যদের কর্মকাণ্ড উলট-পালট হয়ে গেছে। নবাব সাহেব ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। এরপর এখানে থাকার কোনও অবস্থা নেই।'

উক্ত উদ্ধৃতি থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, এ সফর শাহ সাহেবের ইংগিত ও পরামর্শে হয়েছিল। এজন্য প্রত্যাবর্তনকালে তাকে এ সংবাদ জানানোর প্রয়োজন ছিল।

এভাবে শাহ সাহেব তৎকালীন মুসলমান ও ভারতের উপর অত্যাসন্ন বিপদাশঙ্কা উপলব্ধি করায় আল্লাহ প্রদত্ত বিচক্ষণতা ও মুমিনসুলভ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা কাজ করেছেন। এর জন্য তিনি তার যুগে যে চেষ্টা-সংগ্রাম করতে পারতেন, তাতে কোনও ত্রুটি করেননি। তার এই অন্তর্দৃষ্টি ও চেতনা তার সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী মুজাহিদ দল (যার নেতৃত্ব হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ র. ও শাহ সাহেবের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ র. দিচ্ছিলেন) -এর মধ্যে পুরোপুরি সক্রিয় ছিল এবং যার পূর্ণ প্রদর্শনী মাওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদী, মাওলানা ইয়াহইয়া আলী সাদেকপুরী, মাওলানা আহমদুল্লাহ ও মাওলানা আবদুল্লাহ সাহেবের ইংরেজদের বিরুদ্ধে সীমান্ত যুদ্ধগুলো এবং সাদেকপুরের মহান কুরবানীগুলোতে দীপ্তিমান– যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

এরপর এই চেতনা এ দল থেকে সেসব আলেম ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের দিকে স্থানান্তরিত হয়, যারা ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে এর জন্য জীবনের শেষ রক্তবিন্দু বাজী রেখেছেন। তন্মধ্যে মাওলানা আহমদুল্লাহ শাহ মাদ্রাজী (র), মাওলানা লিয়াকত আলী এলাহাবাদী (র), হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ থানবী (র) এবং হযরত হাফেয যামেন শহীদ (র)-এর নাম সুপ্রসিদ্ধ। এরপর সেসব উলামায়ে কিরামের প্রতি, যারা এই অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত রেখেছেন এবং ১৯৪৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই ধারা কোনও না কোনওভাবে সতেজ রেখেছেন। কবির ভাষায়– 'আল্লাহ তা'আলা এসব পুণ্যাত্মা আশেকদের উপর রহম করুন।'

মহাপুরুষদের পৃষ্ঠপোষকতা

যতদূর এসব মহাপুরুষদের তরবিয়ত ও পৃষ্ঠপোষকতার পরিধি, যারা অবস্থা-পরিস্থিতি ও সময়ের চাহিদাসমূহ এবং দীনের মৌলিক অভীষ্ট অনুযায়ী দাওয়াত ও সংস্কারকর্ম আঞ্জাম দিয়েছেন, সংগ্রাম ও জিহাদের ঝাণ্ডা উত্তোলন

করেছেন, এক্ষেত্রে মহান আল্লাহ পাকের কুদরত ও প্রজ্ঞার নিদর্শন মতে হযরত শাহ আবদুল আযীয (র)-এর অংশ তার অনেক মাশায়িখ ও পূর্বসূরী এবং কতিপয় এমন ব্যক্তিত্ব অপেক্ষাও বেশি, যাদের মর্যাদা সম্ভবতঃ (আর বিভিন্ন আলামত তা প্রমাণ করে) আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের অপেক্ষা বেশি রয়েছে। শাহ সাহেবের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এমন কতিপয় উচ্চ যোগ্যতা, সাহসিকতা ও বিস্ময়কর ইচ্ছাশক্তির অধিকারী আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের পৃষ্ঠপোষকতার কাজ নিয়েছেন, যারা হাজার হাজার মানুষের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং এক পূর্ণ শতক সামলে রেখেছেন। শাহ সাহেব (র)-এর জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও জীবন-সমুদ্রে ছিল স্থিতিশীলতা। তবে আল্লামা ইকবালের ভাষায়,

اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی-

نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا-

হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র)

এই দাবীর সত্যতার জন্য কেবল তার একান্ত খলীফা সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র) (১২০১-১২৪৬ হি.)-এর নাম নেওয়াই যথেষ্ট। যিনি এই উপমহাদেশে এই মহান ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, যার স্বয়ংসম্পূর্ণতা, প্রভাব শক্তি এবং ইসলামের সুমহান দাওয়াত, নববী আদর্শের নৈকট্য ও সাদৃশ্যতায় না কেবল এই তের হিজরী শতকে দৃষ্টিগোচর হয় বরং বিগত কয়েক শতকেও এ ধরনের ঈমানী চেতনা সৃষ্টিকারী আন্দোলন এবং নেককার বুযুর্গদের এমন সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল জামাতের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না। তিনি আকাইদ ও আমলের সংশোধন, মানুষের তরবিয়ত, ওয়াজ-নসীহত, তাবলীগে দীন, জিহাদ ও নির্ভীকতার বিশাল বিস্তৃত রণাঙ্গণে যেভাবে কর্মতৎপর ছিলেন, এর প্রভাব কেবল তার কর্মময় স্থান ও তার সমসাময়িক বংশধর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা ভবিষ্যত প্রজন্ম, তৎপরবর্তীকালে আগত আহলে হক, দীনের দাঈ, ঝাণ্ডাবাহী ও খাদেমদের উপর গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে, ক্রমবর্ধমান ইংরেজ শক্তির মোকাবেলায় ভারতবর্ষ ও তার প্রতিবেশি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর হেফাজত, খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-সংগ্রামের সূচনাও তিনিই করেছেন। এই আন্দোলন ও চেষ্টা-সংগ্রামের নেতৃত্বের লাগাম ভারতে প্রথম প্রথম এই শ্রেণীর উলামায়ে কিরাম ও নেতৃবৃন্দের হাতে থাকে. ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় কিতাবাদি রচনা ও সংকলন, অনুবাদ ও

প্রচার-প্রসারের আধুনিক আন্দোলন (যা সাধারণ মুসলমান এবং সঠিক ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও কুরআন-সুন্নাহর মাঝে বিদ্যমান প্রশস্ত-গভীর ঘাটতি পূরণ করেছে) তারই চেষ্টা-সংগ্রামেরই অবদান, মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জাগরণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই দাওয়াত ও আন্দোলনেরই ফলাফল ও সাফল্য। এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া, শিক্ষা-সাহিত্য, ইসলামী চিন্তাধারা, ভাষা ও বাচনভঙ্গি বর্ণনায়ও পড়েছিল। এ আন্দোলন সমাজ সংস্কার, জাহেলী রীতিনীতির ভ্রান্ততা প্রমাণ, হিন্দু ধর্মের প্রভাব দূরীভূত করা এবং সঠিক ইসলামী জীবনের প্রতি প্রত্যাবর্তনের মহান কাজ আঞ্জাম দিয়েছে। সাইয়িদ আহমদ (র) এবং তার দাওয়াত ও তরবিয়তের প্রভাবের ব্যাপকতা, শক্তি ও গভীরতা-কার্যকারিতা অনুমান করার জন্য এখানে আমরা কতিপয় চিন্তাবিদের রচনাবলি থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি।

ভারতবর্ষের বিখ্যাত লেখক ও ঐতিহাসিক নবাব সিদ্দীক হাসান খান, গভর্নর, ভূপাল (মৃত্যু ১৩০৭ হি.), যিনি সাইয়িদ (র)-এর শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তাকে প্রত্যক্ষকারীদের এক বিরাট দলের যুগ পেয়েছিলেন, তিনি 'تقصار جيود الاحرار' গ্রন্থে লিখেন, 'সৃষ্টিজীবের পথপ্রদর্শন এবং আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনা ও প্রত্যার্পণে তিনি ছিলেন আল্লাহর একটি নিদর্শন। এক বিরাট মানবগোষ্ঠী ও এক পৃথিবী তার আত্মিক ও শারীরিক তাওয়াজ্জুহে বেলায়েতের মর্যাদায় পৌঁছে গেছে। তার খলীফাগণ ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে ভারতের মাটিকে শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারের খড়কুটো থেকে পবিত্র করে দিয়েছে, কুরআন-সুন্নাহর বিশ্বরোডে এনে দাঁড় করিয়েছে। আজও তাদেও ওয়াজ-নসীহতের বরকত যথারীতি চালু আছে।'

আরেকটু সামনে এগিয়ে লিখেছেন, 'মোটকথা এ যুগে পৃথিবীর কোনও রাষ্ট্রে এমন সুযোগ্য ব্যক্তিত্বের কথা শোনা যায়নি, যে ফয়েয-বরকত এই হকপন্থী দলের মাধ্যমে সৃষ্টিজীবের হয়েছে, তার দশ ভাগের একভাগও এ যুগের উলামা-মাশায়িখের দ্বারা হয়নি।

যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, উস্তাদের উস্তাদ, হযরত মাওলানা হায়দার আলী রামপুরী টোঙ্কী (মৃত্যু ১২৭৩ হি.) শাগরেদ হযরত শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (র) 'صيانة الناس' গ্রন্থে লিখেছেন, 'তার হেদায়াতের নূর সূর্যের মত পূর্ণ ক্ষিপ্রতার সাথে বিভিন্ন শহর-নগর ও মানুষের অন্তরে উদ্ভাসিত হয়। চতুর্দিক থেকে ভাগ্যবান লোকজন পরকালের প্রতি মনোযোগী হয়ে শিরক-বিদ'আত ইত্যাদির নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে (রীতিমত যুগ যাতে অভ্যস্ত ছিল) তাওবা করে তাওহীদ ও সুন্নাতের শাশ্বত পথ অবলম্বন করতে থাকে। আর প্রায়ই হযরতের পুণ্যাত্মা খলীফাগণ নানা স্থান সফর করে করে লাখ

লাখ মানুষকে দীনে মুহাম্মাদীর সরল সঠিক পথ বাতলে দেন। যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল এবং আল্লাহর অনুগহ যাদের সাহায্য করেছে, তারা এই পুণ্যের পথে চলেন।'

ভারতের এক বিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য আলেমে দীন মাওলানা আবদুল আহাদ সাহেব, যিনি এই মুবারক জামাতের অনেক সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন, যারা সময়কাল সাইয়িদ (র)-এর নিকটতর ছিল, তিনি লিখেন, 'হযরত সাইয়িদ সাহেব (র)-এর হাতে চল্লিশ হাজারের অধিক হিন্দু প্রমুখ কাফির মুসলমান হয়েছে। ত্রিশ লাখ মুসলমান তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছেন। আর বায়'আতের যে ক্রমধারা তার খলীফাগণের খলীফাদের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে চালু রয়েছে, এই সিলসিলায় তো কোটি কোটি মানুষ তার বায়'আতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।'

এই বিশাল সংস্কার ও সংশোধনমূলক কৃতিত্বের কারণে প্রায় সকল চিন্তাবিদ ও ইনসাফপ্রিয় লোক তাকে তের শতকের মুজাদ্দিদ বলে স্বীকার করেন।

মাওলানা আবদুল হাই বড়হানবী ও মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ (র)

শাহ আবদুল আযীয (র) শিক্ষা-দীক্ষার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত তার দুই একান্ত ছাত্র ও অত্যন্ত স্নেহভাজন মাওলানা আবদুল হাই বড়হানবী (র) ও মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (র)। শাহ আবদুল আযীয (র) স্বয়ং এ দুই বুযুর্গের শিক্ষাগত মর্যাদা ও জ্ঞানের অথৈ গভীরতার স্বীকৃতি দিতেন। তিনি এক পত্রে এ দুই বুযুর্গকে 'মুফাসসিরগণের মুকুট, মুহাদ্দিসগণের গৌরব গবেষক উলামায়ে কিরামের শিরোমণি' লিখেছেন এবং বলেছেন, 'দুই হযরত তাফসীর ও হাদীস, ফিকহ্ ও উসূলে ফিকহ্, মানতিক ইত্যাদি শাস্ত্রে এ অধম থেকে কম নয়। মহান আল্লাহর যে সাহায্য এই দুই বুযুর্গের সাথে রয়েছে, তার কৃতজ্ঞতা আমার দ্বারা আদায় হতে পারে না। এই দু'জনকে আল্লাহওয়ালা আলেমদের মধ্যে হিসেব করো। আর যেসব প্রশ্ন-সমস্যা সমাধান না হয়, তার সামনে উপস্থাপন করো।'

মাওলানা আবদুল হাই সাহেব (র)-এর মর্যাদা বিজ্ঞমহলের নিকট প্রচলিত শাস্ত্র-জ্ঞানে অনেক উর্ধ্বে ছিল। আর তাফসীর শাস্ত্রে খোদ শাহ সাহেব মাওলানাকে নিজের সকল ছাত্র-শিষ্যের উপর সম্মান দিতেন। বলতেন, সে আমার মতই। 'শায়খুল ইসলাম' উপাধি, যা ইসলামের বিশেষ বিশেষ আলেমকে দেওয়া হয়েছে, শাহ সাহেব স্বয়ং এক চিঠিতে মাওলানাকে তা লিখে দেন।

শিক্ষাগত জ্ঞানের গভীরতা ও মেধাগত যোগ্যতাগুলোর উপরেও যে বিষয়টি অগ্রগণ্য, তা হচ্ছে, তার লিল্লাহিয়াত ও ইখলাছ (অর্থাৎ সব কিছুই একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়তে করা); যা এই জ্ঞান-প্রজ্ঞার সঙ্গে সাইয়িদ সাহেব (র)-এর প্রতি নিবিষ্ট হয়। বয়সে যিনি তার থেকে কয়েক বছর ছোট আর ইলম-জ্ঞানে তার শিষ্যত্বের মর্যাদার অধিকারী। বায়'আত হওয়া মাত্র তিনি সাইয়িদ সাহেবের রঙে রঙিন হয়ে গেলেন। নিজের সমস্ত জ্ঞান-প্রজ্ঞাকে তার উপর ব্যবহার করেছেন। আর দাওয়াত ও জিহাদের কাজের দৃঢ়তা, কলমশক্তি, ভাষা ও আল্লাহ প্রদত্ত প্রত্যেক শক্তি ও যোগ্যতাকে সত্যের প্রসার ও সাহায্যের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন। ঘরে-বাইরে ও জিহাদেই এই জীবনকে জীবনস্রষ্টার জন্য সোপর্দ করেন।

মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ (র) এর সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তাতে সুস্পষ্ট যে, তিনি ছিলেন বহু শতক পর জন্ম নেওয়া দৃঢ়চিত্ত, উচ্চ সাহসী, ধীমান, বিচক্ষণ ও অসাধারণ ব্যক্তিদের একজন। তিনি ছিলেন মুজতাহিদসুলভ মেধার অধিকারী। তার মধ্যে অনেক শাস্ত্র জ্ঞান নতুনভাবে সংকলনের ক্ষমতা ও যোগ্যতা ছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) একটি পত্রে তাকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তার রচনাবলি ও জ্ঞানে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর ভাবধারা লক্ষ্য করা গেছে বিরাটভাবে। ছিল সেই জ্ঞানের সতেজতা, প্রমাণ দানের সূক্ষ্মতা, তাত্ত্বিকতা, সুস্থ রুচিশীলতা, কুরআন-হাদীসের বিশেষ ব্যুৎপত্তি এবং উপস্থিত বুদ্ধি ও বাগ্মীতা।

শাহ সাহেবের বড় বৈশিষ্ট্য হল, তিনি শিক্ষানবীশ উলামায়ে কিরাম, মেধাবী-ধীমান লোকদের ঐ গণ্ডি থেকে বাইরে ও উর্ধ্বে পদক্ষেপ নিয়েছেন, যা বছরের পর বছর বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ শ্রেণীর জন্য সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি ব্যাপক ইছলাহ ও ইরশাদ, জিহাদ ও দৃঢ় সংকল্পের গণ্ডিতে কেবল অগ্রণী ভূমিকাই রাখেননি বরং আঞ্জাম দিয়েছেন এ জগতে নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব। তার নিছক 'তাকবিয়াতুল ঈমান'-এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর এমন কল্যাণ এবং আকীদা-বিশ্বাসের সংশোধন হয়েছে, যা হয়ত কোনও সরকারের সুচারু-সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টায়ও মুশকিল হত। হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র) বলেন, 'মৌলভী ইসমাঈল সাহেব (র)-এর জীবদ্দশায়ই আড়াই লাখ মানুষ সংশোধন হয়ে গিয়েছিল। আর তার পরে যে কল্যাণ হয়েছে, তার তো কোনও ধারণাই করা যায় না।'

ব্যাপক দাওয়াত ও ইছলাহের জন্য নিজেকে তিনি পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত করেন। সাইয়িদ সাহেব (র)-এর (যার হাতে তিনি সুলূক ও জিহাদের বায়'আত

গ্রহণ করেছিলেন) না কেবল সহকর্মী ও বন্ধুত্বের হকই তিনি আদায় করেছেন বরং এ মহান কাজে তার অবস্থান ছিল আন্দোলনের একজন নেতা এবং শাসকের উযীর ও নায়েবের পর্যায়ে। অনন্তর তিনি এ মহান কাজে নিজের জীবন সত্ত্বাকে উৎসর্গ করে দেন। শাহাদাতের মর্যাদা লাভে ধন্য হন বালাকোটের ময়দানে। আল্লামা ইকবাল এমন মহাপুরুষ সম্পর্কেই বলেছেন,

تکیہ بر حجت و اعجاز بیاں نیر کنند۔ ☆ کار حق گاہ بشمشیر و سنان نیز کنند۔

گاہ باشد کہ نہ خرقہ زرہ می پوشند۔ ☆ عاشقاں بندۂ حال اند و چناں نیر کنند۔

মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (র) ও শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব (র)

শাহ সাহেবের একান্ত রুচি-অভিপ্রায়, দরসে হাদীস, এযাযত ও ইসনাদ এবং ধর্মীয় জ্ঞান-বিদ্যার প্রচার-প্রসারে তার উত্তরসূরী ছিলেন তারই দুই দৌহিত্র হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (র) (১১৯৭-১২৬২ হি.) আর শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব (র) (১২০০-১২৮২ হি.)– যিনি ছিলেন শাহ মুহাম্মদ আফযাল (র)-এর সুযোগ্য পুত্র। হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (র) কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন। তাকেই দান করে দেন নিজের কিতাবাদি, বাড়িঘর ইত্যাদি। তিনি শাহ সাহেবের ইন্তিকালের পর তার দরসের মসনদে (শিক্ষকতার আসনে) বসেন এবং ১২৩৯ হিজরী থেকে নিয়ে ১২৫৮ হিজরী পর্যন্ত দিল্লীতে আর ১২৫৮ হিজরী থেকে (মক্কায় হিজরতকালে) ১২৬২ হিজরী পর্যন্ত পবিত্র হিজাযে হাদীসের শিক্ষাদান ও খেদমতে নিমগ্ন ও ডুবে থাকেন আপাদমস্তক। ভারতবর্ষের শত শত উলামায়ে কিরাম তার থেকে হাদীসের দরস (শিক্ষা) নেন। বিভিন্ন শহর-নগর থেকে এসে তার কাছে ইস্তিফাদাহ ও উপকার লাভ করেন বড় বড় আলেম-উলামা ও হাদীসের শিক্ষকগণ। গ্রহণ করেন হাদীসের সনদ। যার মধ্যে রয়েছেন শায়খ আবদুল্লাহ সিরাজ মক্কীসহ অন্যান্য অনেক বড় বড় আলেম-উলামা। হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) আল্লাহর শুকরিয়া করতেন যে, তাকে শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল (ভ্রাতুষ্পুত্র) এবং শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (দৌহিত্র) রূপে দুটি বাহুশক্তি ও বার্ধক্যের যষ্ঠি দান করা হয়েছে। প্রায় তিনি এই আয়াতে কারীমা পড়তেন–

الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسمعيل و اسحاق.

সোমবার দিন ২৭ রজব ১২৬২ হিজরীতে পবিত্র মক্কায় তিনি ইন্তিকাল করেন। তাকে দাফন করা হয় জান্নাতুল মুতাল্লায় হযরত খাদীজা (রা)-এর কবরের পাশে।

শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব (র)ও দিল্লীতে এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অধ্যাপনা ও কল্যাণের ধারা চালু রাখেন। এরপর আপন বড় ভাই শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (র)-এর সঙ্গে ১২৫৮ হিজরীতে পবিত্র মক্কায় হিজরত করেন এবং সেখানেই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। তাঁর কাছে নবাব সাইয়িদ সিদ্দক হাসান খান কনূজী (গভর্নর, ভূপাল), হযরত মাওলানা সাইয়িদ খাজা আহমদ হাসানী নাসিরাবাদী (র)সহ বিরাট সংখ্যক মানুষ উপকার লাভ করেন। শুক্রবার দিন ২৭ যিলকদ ১২৮২ হিজরীতে পবিত্র মক্কায় তিনি ইন্তিকাল করেন এবং জান্নাতুল মু'আল্লায় সমাহিত হন।

বিশিষ্ট আলেম ও বড় বড় অধ্যাপক

হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) এর দরস, তরবিয়ত ও সোহবত থেকে যেসব উলামায়ে কিরাম ফায়দা লাভ করেছেন আর অনন্তর স্বয়ং শিক্ষা মজলিস কায়েম করে গোটা ভারতবর্ষে সুনাম কুড়িয়েছেন, ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় জীবনের এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছেন। এরপর খোদ সে শিক্ষাকেন্দ্রের ফয়েয-বরকতে অসংখ্য বিজ্ঞ আলেম-উলামা তরী হয়ে বেরিয়েছেন। তন্মধ্যে এখানে কতিপয় নাম উল্লেখ করা হচ্ছে, যারা ছিলেন নিজের অধ্যাপনা শক্তি ও যোগ্যতা, কুরআন-হাদীস ও যৌক্তিকতার সমন্বয় এবং গভীর জ্ঞান-প্রজ্ঞায় প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত। যারা ছিলেন স্ব স্ব স্থানে স্বয়ং একটি মাদরাসা ও বিদ্যাপীঠ।

১. মাওলানা মুফতী এলাহী বখশ কান্ধলভী (র)।
২. মাওলানা ইমামুদ্দীন দেহলভী (র)।
৩. মাওলানা হায়দার আলী রামপুরী টোঙ্কী (র)।
৪. মাওলানা হায়দার আলী ফয়যাবাদী (র), 'মুনতাহাল কালাম' রচয়িতা।
৫. মাওলানা রশীদুদ্দীন দেহলভী (র)।
৬. মাওলানা মুফতী ছদরুদ্দীন দেহলভী (র)।

এসব বিদ্বান ও শাস্ত্রীয় পণ্ডিত, প্রবীণ অধ্যাপক এবং এছাড়া আরও যেসব আহলে দাওয়াত ও আযীমত, ইছলাহ ও সংস্কার আন্দোলন এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ -এর নেতৃবৃন্দের নাম এসেছে, যারা শাহ সাহেবের সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও বাতেনী কল্যাণ লাভের সম্পর্ক রাখতেন, তাদের কারণে বলা যায়, হিজরী তের শতক ছিল হযরত শাহ আবদুল আযীয (র)-এর শিক্ষা-দীক্ষা, ইরশাদ ও মানুষ গড়ার শতাব্দী। আর এটা মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء।

শাহ সাহেবের জীবনালেখ্য, যা ওয়ালীউল্লাহী সিলসিলার বহুমুখী মৌলিক চিন্তাধারা এবং তার সুযোগ্য উত্তরসূরী পুত্র ও শিষ্যদের জ্যোতির্মালায় দুর্লভ মুক্তাতুল্য -এর বিবরণ থেকে অবসর হওয়ার পর আমরা সাহেবের অপর দুই পুত্র হযরত রফীউদ্দীন (র) ও হযরত আবদুল কাদির (র) এবং শাহ সাহেবের তিন প্রধান খলীফা হযরত শাহ মুহাম্মদ আশেক ফুলতী (র), খাজা মুহাম্মদ আমীন কাশ্মীরী (র) ও সাইয়িদ শাহ আবু সাঈদ হাসানী রায়বেরেলী (র)-এর জীবনালেখ্য পেশ করব, যা চয়িত ও উদ্ধৃত করা হচ্ছে 'নুযহাতুল খাওয়াতির' সপ্তম খণ্ড থেকে।

শাহ রফীউদ্দীন দেহলভী (র)

শায়খে ইমাম, প্রবীণ আলেম আল্লামা রফীউদ্দীন আবদুল ওয়াহ্হাব বিন ওয়ালীউল্লাহ বিন আবদুর রহীম উমারী দেহলভী (র) ছিলেন সমকালের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, দার্শনিক, উসূলবিদ, সময়ের নির্ভরযোগ্য, অনন্য বিরল ব্যক্তিত্ব। তার জন্ম ও ক্রমবিকাশ হয় দিল্লীতে। তিনি ইলম হাসিল করেন আপন বড় ভাই শাহ আবদুল আযীয (র)-এর কাছে। এক সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত তার সঙ্গে কাটান। তরীকতে শাহ মুহাম্মদ আশেক ইবনে উবাইদুল্লাহ ফুলতী (র) থেকে ফায়দা লাভ করেন। বিশ বছর বয়সেই জ্ঞান-প্রজ্ঞা, ফাতওয়া প্রদান ও অধ্যাপনায় স্বকীয়তা ও খ্যাতি লাভ করেন। পূর্বোক্ত আপন ভাইয়ের জীবদ্দশায়ই তিনি লেখালেখি ও গ্রন্থ রচনার কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছিলেন এবং আকাবিরে উলামাদের মধ্যে গণ্য হতেন। শাহ সাহেবের দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়ে গেলে তিনিই শিক্ষা ও অধ্যাপনার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখেন। শিক্ষার্থীদের ভীড় জমে যায় তার দরসে এবং তারা তার জ্ঞানের গভীর বারিধারা থেকে উপকৃত হন যথাযোগ্যভাবে। বিশ্বের বড় বড় উলামায়ে কিরাম তার জ্ঞান-প্রজ্ঞার স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিরাট গ্রহণযোগ্যতা, সমাদর ও প্রসিদ্ধি লাভ করে তার রচনাবলি।

তার বড় ভাই শাহ আবদুল আযীয (র) শায়খ আহমদ বিন মুহাম্মদ শারওয়ানী (র) কে শাহ রফীউদ্দীন সাহেব (র) সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'এখন প্রিয় ভাই ও সময়ের সুজনের যুগ। যিনি সম্পর্কে আমার সহোদর ভাই। শাস্ত্রীয় জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও সাহিত্যে (মানুষ আমার সাথে যেসবের সম্বন্ধ করে) আমার অংশীদার। সে বয়সে আমার থেকে সামান্য ছোট। কিন্তু জ্ঞান-প্রজ্ঞায় আমার সমান। আল্লাহ তা'আলা নিজ মেহেরবাণীতে তার লালন-পালন করেছেন আমার হাতে। আর তার পূর্ণাঙ্গতার মাধ্যম আমাকে বানিয়ে অনুগ্রহ করেছেন আমার ওপর। সে কয়েকদিনের সফর থেকে ফিরে এসে আমাকে

একটি সংক্ষিপ্ত তবে অতি মূল্যবান পুস্তিকা উপহার দিয়েছে। সেটি এমন তত্ত্ব-উপাত্তে ভরা, যাতে সে অদ্বিতীয়। তার পূর্বে সেগুলো কেউ লিখেনি। তার এই স্বকীয়তা আয়াতে নূরের তাফসীর ও তাতে সুপ্ত মর্মগুলোর প্রকাশ্য উন্মোচন। আমি পূর্ণ আস্থার সঙ্গে বলছি, এ অধ্যায়ে তার বিবরণগুলো এমনই বিস্ময়কর, যার মাধ্যমে সে বাণীর মূলবস্তু প্রকাশ করে দিয়েছে। আলোময় করে দিয়েছে সমূহ আত্মার প্রদীপ। নিজের স্বকীয় রচনাশৈলীতে ভাগ্যবানদের করেছে প্রাণবন্ত।'

শায়খ মুহসিন ইবনে ইয়াহইয়া তারহতী 'اليانع الجنى' গ্রন্থে লিখেন, 'সেসব প্রচলিত শাস্ত্র-বিদ্যা ছাড়া শাহ সাহেবের প্রাথমিক জ্ঞান-বিদ্যায়ও তার পরিপূর্ণ দক্ষতা ছিল, যা তার মত অনেক কম বিদ্বানের দখলে থাকে। তার রচনাবলি খুবই উন্নত ও মূল্যবান। আমি তার কয়েকটি কিতাব পড়ে দেখেছি। তাতে হযরতের জ্ঞানগত ও শাস্ত্রীয় ভাষায় এমন তথ্য-উপাত্ত দেখতে পেয়েছি, যে রকম সূক্ষ্ম জ্ঞান খুব কমই হয়ে থাকে। অল্প শব্দে তিনি অনেক বিষয় একত্রিত করে দিয়েছেন। যাতে তার জ্ঞানের গভীরতা ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার ধারণা হয়। তার রচিত 'دمغ الباطل' গ্রন্থটি তাত্ত্বিক কিছু কঠিন বিষয়ের উপর লিখিত। শাস্ত্রীয় পণ্ডিতগণ যার প্রশংসা করেছেন। তার আরও একটি সংক্ষিপ্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ পুস্তিকা রয়েছে। যাতে তিনি প্রত্যেক বিষয়ে মহব্বতের কার্যকারিতা দেখিয়েছেন ও তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর নাম 'আসরারুল মুহাব্বত'। এমন কম লোকই পাওয়া যাবে, যারা এ বিষয়ের উপর অভিমত প্রকাশ করেছেন। আমার ধারণামতে এ বিষয়ের উপর তার পূর্বে কেবল দু'জন দার্শনিক আবু নছর ফারাবী ও বু আলী ইবনে সীনা কলম ধরেছেন। যেমনটি জানা যায় নাসীরুদ্দীন তূসীর কোনও কোনও গ্রন্থ থেকে।'

শায়খ মুহসিন এর উল্লেখিত কিতাবাদি ছাড়াও তার আরও বিভিন্ন কিতাব রয়েছে। তন্মধ্যে ছন্দ-জ্ঞানের উপর একটি পুস্তিকা, মুকাদ্দামায়ে ইলম, ইতিহাস, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার প্রমাণ, দার্শনিকদের মূলনীতির উপর দার্শনিক প্রামাণ্যের ভ্রান্ততা, তাহকীকে আলওয়ান (রং নিয়ে গবেষণা), কিয়ামতের আলামত, পর্দা, বুরহানে তামানু (বিপরীতমুখী প্রমাণ), আকদে আনামিল (দশ আঙ্গুলের সাহায্যে বিশেষ গণনা), আরবাইনে কাফফাতের শরাহ, মানতিকসহ সাধারণ নানা বিষয়েও তার পুস্তিকা রয়েছে। রিসালায়ে মীর যাহেদ এর উপর টীকাও লিখেছেন।

তার রচনাবলির মধ্যে 'تكميل الصناعة' এমন একটি বিস্ময়কর কিতাব। অনেক কম লেখকেরই এরূপ গ্রন্থ রচনার সৌভাগ্য হয়েছে।।

এছাড়াও তার একাধিক উঁচু মাপের কিতাব রয়েছে। আপন পিতার কোনও কোনও আরবী কবিতার তাখলীসও লিখেছেন। তার আরবী কবিতার একটি নমুনা নিম্নরূপ।

يا احمد المختار يا زين الورى # يا خاتما للرسل ما اعلاكا

يا كاشف الضراء من مستنجد # يا منجيا فى الحشر من والاكا

هل كان غيرك فى الأنام من استوى # فوق البراث وجاوز الافلا كا... الخ

তার একটি আরও ফসীহ-বলীগ কবিতা রয়েছে। যার দ্বারা যুক্তিবিদ্যায় তার উচ্চতা ও আরবীতে দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি এতে বূ আলী সীনার কবিতা 'আইনিয়াহ'-এর জবাব লিখেছেন, যাকে 'قصيدة الروح' বলা হয়। যার সূচনা-

هبت إليك من المحل الارفع # ورقاء ذات تعزيز وتمنع.

এই কবিতায় ইবনে সীনার আরবী ভাষার উপর দক্ষতা, একই সঙ্গে মাধুর্য, প্রাঞ্জলতা ও বাগ্মীতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এর জবাব দেওয়া যে কোনও সাধারণ মানুষের কাজ ছিল না। হযরত শাহ রফীউদ্দীন (র) এর জবাব লিখেছেন। যার দ্বারা বাকপটুতা ও আরবী ভাষাজ্ঞান প্রকাশ পায়। তার কবিতার শুরু হচ্ছে,

عجبا لشيخ فيلسوف ألمعى # خفيت لعينية منارة مشرع.

তিনি আপন বড় ভাই শাহ আবদুল আযীয (র) এর জীবদ্দশায়ই ৬ শাওয়াল ১২৩৩ হিজরী সনে দিল্লীতে ইন্তিকাল করেন। শহরের বাইরে সম্মানিত পিতা ও পিতামহের পাশে তিনি সমাহিত হন।

শাহ আবদুল কাদির দেহলভী (র)

শায়খে ইমাম বিশিষ্ট আলেম, বিখ্যাত আরেফ শাহ আবদুল কাদির ইবনে শাহ ওয়ালীউল্লাহ ইবনে আবদুর রহীম উমারী দেহলভী ছিলেন খোদায়ী জ্ঞানের প্রবীণ উলামায়ে কিরামের একজন। তার বেলায়েত ও মাহাত্ম্যের উপর মানুষের বরাবরই বিস্ময় রয়েছে। কেননা তার শৈশবেই তার সম্মানিত পিতার ইন্তিকাল হয়ে যায়। তিনি আপন বড় ভাই শাহ আবদুল আযীয (র)-এর কাছে ইলম হাসিল করেন। তরীকতের দীক্ষা লাভ করেন শাহ আবদুল আদল দেহলভী থেকে। লাভ করেন ইলম-আমল, যুহদ-তাকওয়া (দুনিয়াবিমুখতা-আল্লাহভীরুতা) বিনয়-নম্রতা ও সুলূকের সৌন্দর্যে

স্বকীয় মর্যাদা। এসব মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তার শ্রদ্ধা-মহব্বত সৃষ্টি করে দেন তার বান্দাদের অন্তরে। তিনি নিজ শহরে গণআশ্রয়স্থল হয়ে যান। ইলম-রিওয়ায়েত, দিরায়াত (জ্ঞান-বিদ্যা, প্রামাণ্য দলীল) আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণে মানুষ তার শরণাপন্ন হতে শুরু করে দলে দলে।

তিনি ব্যস্ত থাকতেন দরস ও ইফাদা নিয়ে। অবস্থান করতেন দিল্লীর আকবরাবাদী মসজিদে। তার থেকে মাওলানা আবদুল হাই বিন হেবাতুল্লাহ বড়হানবী, মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল বিন শাহ আবদুল গণী দেহলভী (র), মাওলানা ফযলে বিন ফযলে ইমাম খায়রাবাদী, মির্যা হাসান আলী শাফিঈ লাখনৌভী (র), শাহ ইসহাক ইবনে শাহ আফযল উমারী দেহলভী (মক্কায় সমাহিত), মাওলানা সাইয়িদ মাহবুব আলী জাফরী, মাওলানা সাইয়িদ ইসহাক ইবনে ইরফান রায়বেরেলী (হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ র.-এর বড় ভাই) সহ আরও অনেক উলামায়ে কিরাম উপকার লাভ করেন।

তার উপর আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে অনুগ্রহ ছিল এই যে, তিনি ভারতীয় ভাষায় কুরআনে কারীমে অনুবাদ ও তাফসীর লেখার তাওফীক পেয়েছেন। উলামায়ে কিরাম একে যথেষ্ট মূল্যায়ন করেন এবং একটি নববী মুজিযা বলে স্বীকৃতি দেন। মুহতারাম আব্বাজান (র) 'মহরে জাহাতাব' গ্রন্থে লিখেছেন, 'শাহ আবদুল কাদির (র) উক্ত তরজমা লিখার পূর্বে স্বপ্নে দেখেন, তার উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি এ স্বপ্ন বড় ভাই শাহ আবদুল আযীয (র)-এর কাছে খুলে বলেন। তখন তিনি জবাবে বললেন, এটি সত্য স্বপ্ন। কিন্তু যেহেতু রাসূলে কারীম (র)-এর তিরোধানের পর থেকে অহী অবতীর্ণের ধারাবাহিকতা স্থগিত হয়ে গেছে, তাই এখন এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা তোমার দ্বারা কুরআনে কারীমের ভূতপূর্ব খেদমত নিবেন।' সুতরাং এই ভবিষ্যদ্বাণী 'موضع القران' রূপে পূর্ণতা পেয়েছে।

তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি সাধারণ ভাষার বিপরীতে এমন কথ্যভাষা অবলম্বন করেছেন, যাতে সাধারণ, অসাধারণ, শর্তমুক্ত ও শর্তযুক্ত এবং ব্যবহারিক স্থানের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রেখেছেন। এটি আল্লাহর এমন এক অনুগ্রহ, যার জন্য এরূপ কিছু মানুষকেই তিনি মনোনীত করেন।

আমি 'মূযিহুল কুরআন' শ্রবণ ও রিওয়ায়েত করেছি আপন নানী সাহেবা সাইয়িদাহ হুমাইরা বিনতে শাহ আলম আল-হুদা হাসানী নাসিরাবাদী থেকে। তিনি শাহ আবদুল কাদির সাহেব (র)-এর কন্যা থেকে রিওয়ায়েত করেন। তিনি রিওয়ায়েত করতেন তার সম্মানিত পিতা থেকে। তার ইন্তিকাল হয় ১৯

রজব ১২৩০ হিজরীতে আর সমাহিত হন স্বীয় পিতার পাশে। সে সময় বড় ভাই শাহ আবদুল আযীয (র) ও শাহ রফীউদ্দীন (র) জীবিত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এটা তাদের জন্য একটি কষ্টের বিষয় ছিল। তারা ছোটভাইকে দাফন করার সময় বারবার বলছিলেন, 'আমরা একজন মানুষকে নয় বরং ইলম ও ইরফানের আপাদমস্তক দাফন করছি।'

এটিও যুগের একটি বিস্ময় যে, শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর উক্ত চার পুত্র জন্ম নিয়েছিলেন ইরাদত খাতুন বিনতে সাইয়িদ ছানাউল্লাহ (র)-এর উদরে। যাদের মধ্যে সকলের বড় ছিলেন শাহ আবদুল আযীয (র), এরপর শাহ রফীউদ্দীন (র), তারপর শাহ আবদুল কাদির (র) আর সর্বকনিষ্ঠ শাহ আবদুল গণী (র) (যিনি ছিলেন ইসমাঈল শহীদ (র)-এর পিতা। কিন্তু সর্বপ্রথম ছোট ভাই শাহ আবদুল গণী (র) এর ইন্তিকাল হয়ে যায়। এরপর শাহ আবদুল কাদির (র)-এর, তারপর শাহ রফীউদ্দীন (র)-এর, আর সবার পরে ইন্তিকাল হয় শাহ আবদুল আযীয (র)-এর। এই প্রত্যেক ভাই ইলম-আমল, ইফাদা ও ফয়েজ রেসানীতে (উপকার ও কল্যাণ পৌঁছানোতে) সমকালীন উলামা-বুযুর্গানে দীনের মাঝে (শাহ আবদুল গণী (র) ব্যতীত, কেননা তিনি যৌবনের শুরুতেই ওপরে চলে গিয়েছিলেন) স্বকীয় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। শাহ আবদুল গণী (র)-এর সম্মানিত পুত্র হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (র) কে আল্লাহ তা'আলা এমন তাওফীক দান করেছিলেন, যার বদৌলতে তিনি তার মুহতারাম পিতার পক্ষ থেকে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করে দেন।

শাহ মুহাম্মদ আশেক ফুলতী (র)

বিজ্ঞ আলেম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আশেক ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ সিদ্দীকী ফুলতী ছিলেন প্রবীণ মাশায়িখদের মধ্যে অন্যতম। তার বংশপরম্পরা একুশ পূর্বপুরুষের মধ্য দিয়ে হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। শৈশব থেকেই তিনি ইলম অর্জনে নিয়োজিত হন। গ্রহণ করেন মহান শায়খ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র)-এর সাহচর্য (যিনি ছিলেন তার ফুফাতো ভাই)। তার থেকে তিনি ইলম ও মারিফত হাসিল করেন। তার সঙ্গে ১১৪৩ হিজরীতে তিনি হারামাইন শরীফাইনের সফরও করেন। ধন্য হন পবিত্র মক্কা-মদীনা যিয়ারত ও মহান হজ্জ পালন করে। হারামাইন শরীফাইনের বিশিষ্ট উলামায়ে কিরাম থেকে জ্ঞান আহরণ ও উপকারিতা লাভে তার সঙ্গে শরীক থাকেন। যার মধ্যে শায়খ আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম কুর্দী মাদানী বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। শায়খ মাদানী তাকে ইজাযতও দিয়েছেন।

শায়খ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর সঙ্গীসাথীদের মধ্যে তিনি ইলম-জ্ঞান ও মারেফাতের দিক থেকে সকলের শীর্ষে ছিলেন। এভাবে তিনি শাহ সাহেব দেহলভী (র)-এর মুহরিমে আসরার (জ্ঞানের রহস্যভেদ) হয়ে গেলেন। যেমন শায়খ আবু তাহের (র) তার ইজাযত নামায় (অনুমতিপত্রে) তার সম্পর্কে লিখেছেন, 'এ লোক তাঁর (শাহ ওয়ালীউল্লাহ র.-এর) কামালাতের (যোগ্যতা-পূর্ণাঙ্গতার) দর্পণ এবং উন্নত গুণাবলির নমুনা।' তার উস্তাদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) তাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন,

يحدثنى نفسى بأنك واصل # إلى نقطة قصراء وسط المراكز

وأنك فى تيك الابلاد مفخم # بكفيك يوما كل شيخ وناهز.

'আমার মন বলছে, তুমি শিক্ষাকেন্দ্র ও বিদ্যাপীঠগুলোর উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হবে। সেসব শহরে তুমি হবে বিরাট সম্মানের পাত্র। তোমার অনুগত হবে ছোট বড় সকলেই।'

অন্যত্র বলেন,

وإن يك حقاما علمت فانه # سيلقى إليك الأمر لا بد سابغا

سياتيك أمر لا يطاق بهاءه # إلى كل سر لا محال بالغا

وثلج ويرد يجمعان شتاتكم # يريحان هما فى فوادك لاذعا.

'যদি আমার বিশ্বাস সত্য হয়, তবে সম্পর্কে গোপন শক্তি তোমার হস্তগত হবে। তোমর এমন জ্যোতির্ময় আলো হাসিল হবে, যা তোমার অন্তর্চক্ষু খুলে দিবে এবং সকল রহস্যভেদ উন্মোচন করে দিবে। আর পরিপূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা এমন আত্মতৃপ্তি লাভ হবে, যা তোমার কষ্ট-ক্লেশ বিদূরিত করে দিবে।

শরহে দু'আয়ে ই'তিছাম -এর অভিমতে শাহ সাহেব (র) লিখেন,

ليهنك ما أوفيت ذروة حقه # من الفحص والتفتيش والفهم والفكر

وبحثك عن طى العلوم ونشرها # ونظمك اصناف الجواهر والدر

وحفظك للرمز الخفى مكانه # وخوضك بحراز خرا ايما يجر

فلله ما اوتيت من حلل المتى # ولله ما أعطيت من عظم الفخر

'জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও চিন্তা-গবেষণার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হওয়া বরকতময় হোক। জ্ঞান-বিদ্যার গভীরতা, প্রসার ও জ্ঞানের মনিমুক্তারা শৃঙ্খলা-বিন্যাসও পুণ্যময় হোক। সেই সাথে আছে গোপন তত্ত্বভেদ সংরক্ষণ এবং ইলম-

আমলের অথৈ সমুদ্রে সন্তরণ ও ডুব দান। তোমার এই সাফল্য লাভ হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই। আর গৌরবময় পুঁজিও আল্লাহ্‌রই দান।'

তার থেকে শাহ আবদুল আযীয (র) ও তার ভাই শাহ রফীউদ্দীন (র), সাইয়িদ আবু সাঈদ রায়বেরেলী (র) সহ এক মানবগোষ্ঠী উপকার লাভ করেছে। তার রচনাবলির মধ্যে ১. 'সাবীলুর রাশাদ' ফার্সীতে তাসাওউফের উপর বিস্তৃত একটি গ্রন্থ। ২. আরেকটি কিতাব 'القول الجلى فى مناقب الولى'-এটি তার শায়খ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর জীবনকর্ম সম্পর্কিত। ৩. 'দু'আয়ে ই'তিছাম' এটি শাহ সাহেবের হাকায়েক ও মা'আরেফ সম্পর্কিত কিতাবাদির শরাহ। ৪. তার সবচেয়ে বৃহৎ রচনা 'তাবঈযুল মুছফফা শরহুল মুয়াত্তা', যা শাহ সাহেব (র)-এর রচিত 'মুছফফা' কিতাবের সাথে সম্পর্কিত। তিনি ১১৮৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। যেমনটি জানা যায়, সাইয়িদ আবু সাঈদ রায়বেরেলী (র)-এর নামে হযরত শাহ আবদুল আযীয (র)-এর লিখিত 'গারামীনামাহ' থেকে।

খাজা মুহাম্মদ আমীন কাশ্মীরী ওয়ালীউল্লাহী

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর যে চার খলীফা ও একান্ত সাহচর্যধন্য শাগরেদদের মাধ্যমে তার শিক্ষা-দীক্ষা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সিলসিলার প্রচার-প্রসার হয়েছে, তাদের মধ্যে বিশিষ্ট এক শাগরেদ ছিলেন খলীফা খাজা মুহাম্মদ আমীন কাশ্মীরী (র)। মাওলানা হাকীম সাইয়িদ আবদুল হাই (র) 'নুযহাতুল খাওয়াতির' গ্রন্থে তার জীবনালোচনা করতঃ লিখেন, 'তিনি মূলতঃ কাশ্মীরের লোক ছিলেন। বসবাস করতেন দিল্লীতে। তিনি শাহ সাহেবের বিশিষ্ট প্রবীণ শাগরেদদের অন্যতম। নিজেকে আপন শায়খের প্রতি সম্বন্ধিত করতেন। আর 'ওয়ালীউল্লাহী' লিখতেন এবং বলতেন। তার স্বকীয়তা ও সম্মানের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, শাহ আবদুল আযীয (র) মুহতারাম পিতা শাহ সাহেবের ইন্তিকালের পর তার থেকে বিভিন্ন শাস্ত্র-জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করেন। যেমনটি স্বয়ং আবদুল আযীয (র) তার 'উজালায়ে নাফি'আহ' পুস্তিকায় পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন। তার মর্যাদা ও স্বকীয়তার দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে, হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) তার জন্য বিশেষভাবে বিভিন্ন পুস্তিকা রচনা করেছেন।

হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) কর্তৃক হযরত শাহ আবু সাঈদ রায়বেরেলী (র) এর নামে লিখিত ও প্রেরিত 'গারামীনামাহ' থেকে জানা যায়, তার ইন্তিকাল ১১৮৭ হিজরী অথবা এর কাছাকাছি কোন সময় হয়েছে। কেননা হযরত সাইয়িদ শাহ আবু সাঈদ (র) রবীউল আউয়াল ১১৮৭ হিজরীতে হজ্জের

উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন। আর প্রত্যাবর্তন করেছিলেন ১১৮৮ হিজরীতে। শাহ সাহেবের এই চিঠি হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হস্তগত হয়।

খাজা মুহাম্মদ আমীন কাশ্মীরী (র) স্বকীয় মর্যাদা এ থেকেও বুঝা যায় যে, 'কালিমাতে তাইয়িবাত' গ্রন্থে তার নামে শাহ সাহেবের লিখিত গুরুত্বপূর্ণ চারটি পত্র রয়েছে। যেগুলো হাকায়েক ও মা'আরেফের সূক্ষ্মতা সম্পর্কিত।

উক্ত চার মহান খলীফা (১. শাহ মুহাম্মদ আশেক ফুলতী, ২. শাহ মুহাম্মদ আমীন কাশ্মীরী, ৩. শাহ নূরুল্লাহ বড়হানবী ও ৪. শাহ আবু সাঈদ বেরলভী) ছাড়াও শাহ সাহেবের অন্যান্য আরও খলীফা ছিলেন, যাদের জীবনকর্ম বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায় না। তন্মধ্যে অনন্য একজন ছিলেন হাফেয আবদুন নবী ওরফে আবদুর রহমান, যার সঙ্গে শাহ সাহেবের একান্ত সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়।

শাহ আবু সাঈদ হাসানী রায়বেরলভী

সাইয়িদ আবু সাঈদ বিন মুহাম্মদ জিয়া বিন আয়াতুল্লাহ বিন শায়খে আযল আলামুল্লাহ নকশেবন্দি বেরলভী (র) ছিলেন অনন্য এক আল্লাহওয়ালা আলেম। রায়বেরেলীতে তার জন্ম ও ক্রমবিকাশ হয়। শিক্ষা লাভ করেন মোল্লা আবদুল্লাহ আমিঠাবী (র)-এর কাছে। এরপর আপন চাচা সাইয়িদ মুহাম্মদ সাবের বিন আয়াতুল্লাহ নকশেবন্দী (র)-এর কাছে বাই'আত হন এবং আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা-দীক্ষায় এক সুদীর্ঘ সময় আত্মনিয়োজিত থাকেন। এরপর দিল্লী এসে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র)-এর কাছে থেকে উপকার লাভ করেন। আর তার মৃত্যুর পর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে শাহ সাহেবের বিশিষ্ট শাগরেদ শায়খ মুহাম্মদ আশেক উবাইদুল্লাহ ফুলতি থেকেও ইস্তেফাদা লাভ করেন। শাহ মুহাম্মদ আশেক (র) তার অনুমতিপত্রে লিখেন, 'সাইয়িদে তাকী ও নকী (খোদাভীরু পুণ্যাত্মাদের সরদার), আরেফ বিল্লাহ, প্রশংসাযোগ্য ওয়ালী মীর আবু সাঈদ আমাদের শায়খ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর সঙ্গে থেকেছেন। তার কাছ থেকে তরীকতের কতিপয় নিয়মনীতি জেনে নিয়ে সেগুলোর উপর অটল থেকেছেন। এমনকি তার উপর শায়খের তাওয়াজ্জুহ (অন্তর্দৃষ্টি)-এর বরকতে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য তথ্য-উপাত্ত ও রহস্যভেদের পথ খুলে যায়। তার ব্যক্তিত্বে আধ্যাত্মিকতার অবস্থা ও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং তার সেই শুহূদ হাসিল হয়, যা আধ্যাত্মিকতার মৌলিক উদ্দেশ্য।'

অন্যস্থানে লিখেন, 'এরপর যখন হযরত শায়খ (র) দারে রিযওয়ানে ইন্তিকাল করেন, তখন তার খেয়াল হল, নকশেবন্দিয়াহ, কাদেরিয়াহ, চিশতিয়াহ প্রভৃতি সিলসিলার অবশিষ্ট নিয়মনীতি অধম থেকে হাসিল করবেন

এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতিক্রিয়াশীল তরীকায় দাখিল হবেন। আমি তার পিপাসা দেখে হাদীসে 'ইলজাম'-এর ভয়ে উদ্দেশ্য হাসিলে তাকে সাহায্য করি এবং সেসব নিয়ম-নীতির উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ দেই। আর যখন তার মধ্যে সেসবের আলামত, প্রতিক্রিয়া ও অবারিত আলো প্রত্যক্ষ করি এবং তার পরিপক্কতার পরিমাপ করে ফেলি, তখন ইস্তিখারার পর তাকে জ্ঞানপিপাসু ও সালেকীনের পথপ্রদর্শনের ইজাযত দেই। তিনি সকল তরীকায় বায়'আত গ্রহণ করেন। তাকে স্থলাভিষিক্ততা ও ইজাযরতরূপে 'গৌরবময় বুযুর্গীর বিশেষ পোশাক' পরিধান করিয়েছি। যেভাবে আমাদের শায়খ আমাদেরকে পরিধান করিয়েছিলেন এবং তার ইজাযত দিয়েছিলেন; যেভাবে শায়খ উবাইদুল্লাহ আমাদেরকে আপন পূর্বপুরুষ ও মাশায়িখে কিরামের মাধ্যমে হাসিলযোগ্য পোশাক ও ইজাযতে ভূষিত করেছিলেন। সেই সাথে আমি তাকে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও তাসাওউফের শিক্ষাদান (মুতালা'আ ও শরাহসমূহের আশ্রয় নেওয়ার শর্তে) এবং নাহব-ছরফ শাস্ত্রের অধ্যাপনার অনুমতি দিয়েছি। জায়েয প্রয়োজনাদির সময় তাবীয এবং মাশায়িখের আমল গ্রহণের অনুমতিও দিয়েছি। 'القول الجميل فى بيان سواء السبيل' এবং 'الإنتباه فى سلاسل اولياء الله'-এর মধ্যে উল্লেখিত সকল আমল ও নিয়মনীতি গ্রহণের ইজাযত দিয়েছি।'

সাইয়িদ শাহ আবু সাঈদ (র) ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত পুণ্যবান, অতি দয়াবান, অতিথিপরায়ণ, গরীবের বন্ধু ও আল্লাহভীরু ব্যক্তি। আপনজনদের সঙ্গে তিনি হিজায সফর করেন। মক্কা শরীফে গিয়ে পৌঁছেন ২৮ রবিউল আউয়াল ১১৮৭ হিজরী সনে। পবিত্র হজ্জ পালন শেষে মদীনা মুনাওয়ারায় হাযির হন এবং সেখানে ছয় মাস অবস্থান করেন। শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী-এর কাছে 'মাছাবীহ' শ্রবণ করেন। সহসা দেখলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বরকতময় হুজরা থেকে বাইরে তাশরীফ রাখছেন। প্রথমে নবীজীর পবিত্র স্কন্ধের ঝলক প্রকাশিত হয়। এরপর পবিত্র দেহ প্রকাশ পায় এবং সম্মুখে তাশরীফ নিয়ে তিনি মুচকি হাসেন। তার (শায়খ আবু সাঈদ র. এর) মুরীদ ও মাজায (যোগ্য উত্তরসূরী) শায়খ আমীন ইবনে হুমাইদ উলওয়া কাকুরবী স্বরচিত পুস্তিকায় লিখেন, 'শায়খ আবু সাঈদ (র) বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ (র) কে পবিত্র মদীনায় স্বপ্নে আপাদমস্তক দেখেছি।'

তারপর মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং শায়খ মুহাম্মদ মীর দাদ আনসারীর কাছে 'জাযরিয়্যাহ' পড়েন। এরপর তায়েফ হয়ে ভারত আসেন এবং মাদ্রাজে প্রবেশ করেন। সেখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন এবং

গ্রহণযোগ্যতা ও আস্থা অর্জন করেন। আর তার থেকে অনেক মানুষ উপকৃত হন। তন্মধ্যে আলহাজ্জ আমীনুদ্দীন ইবনে হুমাইদুদ্দীন কাকূরবী, মাওলানা আবদুল কাদির খান খালেছপুরী, মীর আবদুস সালাম বদোখশী, শায়খ মীর দাদ আনসারী মক্কী, মাওলানা জামালুদ্দীন বিন মুহাম্মদ সিদ্দীক কুতুব, মাওলানা আবদুল্লাহ আকনুদী ও শায়খ আবদুল লতীফ হুসাইনী মিসরীসহ আরও অনেক লোক ছিলেন। তিনি ৯ রমাযান ১১৯৩ হিজরীতে রায়বেরেলীতে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন।

বিখ্যাত এক সমসাময়িক ও সংস্কারক শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (র)

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর বিখ্যাত এক সমসাময়িক ও মহান সংস্কারক নজদের এক বিশিষ্ট আলেম এবং দৃঢ়চিত্ত দাঈ ও শুদ্ধিকারক হলেন শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব বিন সুলাইমান তামীমী হাম্বলী (১১১৫-১২০৬ হিজরী মোতাবেক ১৭০৩-১৭৯২ খৃ.)। তিনি জন্মতারিখ হিসেবে শাহ সাহেবের কাছাকাছি বয়সের (এক বছরের বড়) আর মৃত্যুতারিখ হিসেবে তার চেয়ে ত্রিশ বছর পরের। সমসাময়িক হওয়া এবং একাধিক বিষয়ে উভয়ে পরিস্কার মিল থাকা সত্ত্বেও তাদের কখনও সাক্ষাত তো দূরের কথা খোদ একজন সম্পর্কে অন্যজনের জানাশোনারও অদ্যাবধি কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। হযরত শাহ সাহেব (র) ১১৪৩ হিজরীতে হজ্জের জন্য গমন করেন এবং এক বছরের কিছু অধিক সময় হিজাযে অবস্থান করেন। এটা সে সময়ের কথা, যখন শায়খ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব (র)-এর দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন নজদের সীমিত কিছু অঞ্চল উইয়াইনা, দুরাইয়াহ প্রভৃতি এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। আমীর মুহাম্মদ ইবনে সাউদ তখন পর্যন্ত শায়খের হাতে বায়'আত হননি। আর না তাদের দুজনের মধ্যে (দাওয়াতের প্রচার-প্রসার এবং তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও এর সমর্থন দানের) কোনও চুক্তি ও সমঝোতা হয়েছিল। পরবর্তীতে এই সন্ধিচুক্তি হয় ১১৫৮ হিজরীতে। যার ফলে দুরাইয়াহ দাওয়াতের কেন্দ্রস্থল ও একটি ধর্মীয় রাজধানী হয়ে যায়। হিজাযে শায়খের দাওয়াতের পরিচিতি, প্রভাব ও কার্যকারিতা সৃষ্টি হয় সে সময়, যখন ১২১৮ হিজরীতে (শায়খের ইন্তিকালের ১২ বছর আর শাহ সাহেবের ইন্তিকালের বিয়াল্লিশ বছর পরে) মক্কা শরীফের উপর সউদ পরিবারের দখল প্রতিষ্ঠা হয়।

শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (র)-এর দাওয়াত ও চেষ্টা-সংগ্রামের মূল পরিধি ছিল খালেছ তাওহীদের দাওয়াত ও তাবলীগ, শিরক

প্রতিরোধ, জাহেলিয়াতের রীতিনীতির মূলোৎপাটন (যার কিছু দৃশ্য ও নিদর্শন সময়ের দূরত্ব, মূর্খতা ও উলামায়ে কিরামের উদাসীনতার কারণে আরব উপদ্বীপের পশ্চিমাঞ্চলের কোনও কোনও এলাকা ও গোত্রে ছড়িয়ে পড়েছিল), তাওহীদে উলূহিয়্যাহ ও তাওহীদের রুবূবিয়্যাতের (তথা খোদায়িত্বের ও প্রভুত্বের একত্ববাদের) পার্থক্য, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বান্দাদের প্রতি যে একত্ববাদের দাবী এবং কুরআনে কারীমে যার সুস্পষ্ট আহ্বান রয়েছে, তার বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান। এক্ষেত্রে শায়খ যে সফলতা লাভ করেন, অতীত যুগের সংস্কারকদের মধ্যে এর নযীর পাওয়া কঠিন। অবশ্য ড. আহমদ আমীনের ভাষ্যমতে এর ভিত্তিতে একটি শাসনব্যবস্থা (সউদিয়াহ শাসন) প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং তার উক্ত দাওয়াত গ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষকতা দানের পেছনে বিরাট দখল রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শায়খ এক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক সংস্কারের কৃতিত্ব স্থাপন করেছেন। আর যদি তার চিন্তাধারা, দাওয়াত প্রদানের অবস্থা-প্রকৃতি ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে কোনও বিজ্ঞজনের শতভাগ ঐকমত্য না-ও হয়, তথাপি এই দাওয়াতের উপকারিতা, প্রভাব-প্রতিক্রিয়া, ফলপ্রসূতা এবং বিশেষ অবস্থা-প্রেক্ষিতে এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

একত্ববাদের আকীদা-বিশ্বাসের সুস্পষ্টতা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, কুরআনের আলোকে এর সত্যতা প্রমাণ এবং তাওহীদে উলূহিয়্যাত ও তাওহীদে রুবূবিয়্যাতের মধ্যে পার্থক্যের পরিধি যতদূর, তাতে শাহ সাহেব (র) এবং শায়খ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব (র)-এর চিন্তাধারা ও জ্ঞান-গবেষণায় বিরাট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, যা কুরআনে কারীমের গভীর ও যথার্থ মুতালা'আ, চেষ্টা-সাধনা এবং কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে অগাধ ব্যুৎপত্তির ফসল, যা তৎকালীন সময়ে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (র) এবং নিজ নিজ যুগে অন্যান্য গবেষক ও সংস্কারকদেরকে তদ্রূপ সাফল্য পৌঁছিয়েছে এবং তাদেরকে প্রকাশ্য ও দু'গণ্ড দাওয়াতে তাওহীদের প্রচার-প্রসারে উদ্বুদ্ধ করেছে।

কিন্তু শাহ সাহেবের কর্মপরিধি এবং তার ইসলাহ ও সংস্কারকর্মের সীমানা এর চেয়ে আরও অনেক বেশি বিস্তৃত। তাতে ইসলামী জ্ঞান-প্রজ্ঞার পুনর্জীবন দান, ইসলামী চিন্তাধারার সংস্কার, শরীয়তের উদ্দেশ্য ও রহস্যভেদের পর্দা উন্মোচন, শরীয়ত ও ইসলামী শিক্ষাকে সুবিন্যস্ত ও পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপনের বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষাগত স্থিরতা ও ফিকহী মাযহাবগুলোর কট্টরতা সংশোধন, যৌক্তিক ও নকলী দলীলের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান, ফিকহী মাযহাবগুলোর মধ্যে আল্লাহর করুণা মুজতাহিদসুলভ কাজ, ভারতবর্ষে

ইসলামী শক্তি ও নেতৃত্ব রক্ষার প্রচেষ্টা, হাদীসের সূক্ষ্ম মুতালা'আ ও এর প্রচার-প্রসারের সংস্কারকসুলভ চেষ্টা, আত্মশুদ্ধি, ইহসান-অনুগ্রহের মর্যাদা হাসিলের দাওয়াত ও এর শিক্ষা দান এবং মহাপুরুষদের তরবিয়ত ও পৃষ্ঠপোষকতা দানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেই সাথে শাহ সাহেবের ওখানে (আল্লামা ইকবালের ভাষা) 'হিজাযী রেগযার' তথা খাঁটি তাওহীদের পুণ্যভূমিতে যমযমের মধুর প্রস্রবণও (ইশক-প্রেম ও হৃদ্যতার মধুর ধারা বা পাহাড় খোদাই করে তৈরী ঐতিহাসিক এক নদী) ছিল, যা শাহ সাহেবের খাছ পরিবেশ, তরবিয়ত এবং তাসাওউফ ও সুলূকের সুফল। যার নমুনা তার স্তুতিমূলক গজল ও আবেগময় ছন্দ-কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। এদিক থেকে তার এবং শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব (র) (যার সংগ্রাম সর্বাবস্থায় গৌরবময়)-এর তুলনামূলক অধ্যয়ন এবং তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও সমন্বয় সৃষ্টির তত্ত্বানুসন্ধান অপেক্ষা শাহ সাহেব এবং শায়খুল ইসলাম হাফেয ইবনে তাইমিয়া (র)-এর তুলনামূলক আলোচনা এবং তাদের ঐকমত্য ও মতবিরোধের তত্ত্বানুসন্ধান করা অধিক উপযোগী। কারণ, দুজনই জ্ঞানের গভীরতা, কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান-গবেষণায় ইমাম ও ইজতিহাদের মর্যাদায় পৌঁছে যাওয়া দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা ও প্রশস্ততা, ইসলাম ও সংস্কারকর্মে বৈচিত্র, ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব ও বুদ্ধি-মেধায় অধিক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। (আর এ কিতাবের স্থানে স্থানে এদিকে ইংগিত করে এসেছি) সেই ভিন্নতা সত্ত্বেও যা তালীম-তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার পরিবেশ, স্থান ও কালের পার্থক্য এবং সুলূক ও বাতেনী তরবিয়ত (আধ্যাত্মিক দীক্ষা) -এর সফল পরিণতি।

দ্বাদশ অধ্যায়

শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর রচনাবলী

গ্রন্থ ও পুস্তকসমূহ

এখানে শাহ সাহেবের ছোট-বড়, আরবী-ফার্সী রচনাবলির আরবী বর্ণমালা হিসেবে তালিকা দেওয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদির সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও পেশ করা হচ্ছে। হস্তলিখিত, মুদ্রিত এবং ভাষাও চিহ্নিতকরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

(الف)

১. الأربعين : এটি চল্লিশ হাদীসের আরবী সংকলন এবং সেসব সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ হাদীস সম্পর্কিত, যেগুলোকে جوامع الكلم (বাগ্মীতা) বলা হয়। মাত্‌বায়ে আনোয়ার মুহাম্মদী লাখনৌ থেকে ১৩১৯ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছে। ১২৫৪ হিজরীতে এর উর্দু অনুবাদ হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র)-এর খলীফা সাইয়িদ আবদুল্লাহ (র) মাতবায়ে আহমদী কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। এরপর এর একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী ১৩৮৩ হি./১৯৬৭ খৃস্টাব্দে এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেছেন, যা ভারত ও পাকিস্তানে 'চেহেল হাদীস ওয়ালীউল্লাহী' ও 'আরবাইনে ওয়ালীউল্লাহী' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

২. الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد : এটি আরবী এবং মুদ্রিত পুস্তিকা। এতে শাহ সাহেব আপন উস্তাদ এবং হিজাযের শায়খগণের বিবরণ পেশ করেছেন।

৩. إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء : এটি ফার্সীতে রচিত। বিষয়বস্তু, কলেবর, প্রকাশন এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলোর সারসংক্ষেপ ইতোপূর্বে কিতাবটির পরিচিতিতে বলে এসেছি।

৪. أطيب النغم فى مدح سيد العرب والعجم : এটি আরবী কিতাব। শাহ সাহেবের স্তুতিমূলক কাব্যসমগ্র। যার দ্বারা শাহ সাহেবের বাক্পটুতা ও ইশকে নববী (স)-এর ধারণা পাওয়া যায়। মাতবায়ে মুজতবাঈ দিল্লী থেকে ১৩০৮ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছে।

৫. الإمداد فی مأثر الاجداد : এটি সংক্ষিপ্ত একটি ফার্সী পুস্তিকা। এতে শাহ সাহেব (র) তার এতে নিজের বংশ তালিকাও লিখেছেন। 'আনফাসুল আরেফীন' এর সাথে এটিও সংযুক্ত। তাছাড়া মাতবায়ে আহমদী দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত 'শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র) পাঁচটি পুস্তিকা সমগ্র' এর মধ্যেও সন্নিবেশিত আছে।

৬. الطاف القدس : এটি ফার্সীতে রচিত লাতায়েফে বাতেনীর ব্যাখ্যা এবং তাসাওউফের মৌলিক মাসায়েলের বিশ্লেষণ সম্পর্কে রচিত। সাইয়িদ যহীরুদ্দীন সাহেবের তত্ত্বাবধানে মাতবায়ে আহমদী থেকে প্রকাশিত।

৭. الإنتباه فی سلاسل اولیاء الله : এটি ফার্সীতে রচিত তাসাওউফের বিভিন্ন সিলসিলার ইতিহাস ও তাদের শিক্ষা-দীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ১৩১১ হিজরীতে সাইয়িদ যহীরুদ্দীন সাহেবের তত্ত্বাবধানে উর্দু তরজমাসহ মাতবায়ে আহমদী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

৮. إنسان العین فی مشائخ الحرمین : এটি একটি ফার্সী পুস্তিকা শাহ সাহেবের জীবনালেখ্যের বর্ণনায় এর পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। 'আনফাসুল আরেফীন'-এর একটি অংশ এটি। মাতবায়ে আহমদী থেকে প্রকাশিত 'মাজমূআয়ে খামসাহ রাসায়েলে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)'-এর সাথে সন্নিবেশিত।

৯. الإنصاف فی بیان اسباب الإختلاف : এটি একটি আরবী পুস্তিকা। এর পরিচিতি সম্পর্কিত বিবরণে বইটির গুরুত্ব, প্রকাশন ও বিভিন্ন সংস্করণের বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

১০. إنفاس العارفین : এটি ফার্সীতে রচিত। এর পরিচিতি পিছনে শাহ সাহেবের জীবনালেখ্যে বর্ণিত হয়েছে। ১৩৩৫ হি. ১৯১৭ খৃস্টাব্দে মাতবায়ে মুজতবাঈ দিল্লী থেকে প্রকাশিত। এ গ্রন্থখানা মূলতঃ নিম্নোক্ত সাতটি পুস্তি কার যৌথ নাম। যথা–

(١) بوارق الولایة (٢) شوارق المعرفة (٣) الإمداد فی مأثر الأجداد (٤) النبذة الابریزیة فی اللطیف العزیزیة (٥) العطیة الصمدیة فی نفاس المحمدیة (٦) انفاس العین فی مشائخ الحرمین (٧) الجزء اللطیف فی ترجمة العبد الضعیف.

এর মধ্যে প্রায় পুস্তিকাই পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

(ب)

১১. البدور البازغة : এটি ধর্মীয় দর্শন সম্পর্কিত আরবী কিতাব। কিন্তু এতে দর্শনের স্বভাবগত পরিভাষাসমূহ, মানবিক গঠনপ্রণালী, শ্রেণী-গোষ্ঠী

এবং ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্রের দার্শনিক ও প্রাচ্যবিদের রঙে বিবরণ দেওয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক বিদ্যা ও চারিত্রিক জ্ঞানের আলোচনাও সংমিশ্রিত আছে। ইরতিফাকাতের (আশ্রয় অবলম্বনের) আলোচনা বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। মানব গোষ্ঠীর সঠিক শৃঙ্খলা, খেলাফত ও নেতৃত্বের আহকাম, শিষ্টাচারও বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর আল্লাহর মারেফাত, নামসমূহ ও গুণাবলির পর্দা উন্মোচন করা হয়েছে। ইহসানের স্তরসমূহ ও এর পর্দা আচ্ছাদনগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। শিরকের ব্যাধি, তার প্রকার ও শ্রেণীগুলোরও উল্লেখ আছে। ফিতান (বিপর্যয়-বিপদ) ও কিয়ামতের প্রমাণও রয়েছে। আলমে বরযখ (কবর জগৎ) ও হাশর (পুনরুত্থান) এর ঘাটিসমূহ, ফাযায়েলে আ'মাল (বা বিভিন্ন আমলের উপকারিতা, মর্যাদা) ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা, নবুওয়াতের প্রমাণ, নবী-রাসূলগণের প্রকার এবং অহীর ধরন-প্রকৃতির বিশদ বিবরণ রয়েছে। জাতির মূলতত্ত্ব, তার আত্মপ্রকাশের শ্রেণীভাগ, প্রথম জাহেলিয়াতের আলোচনা এবং পূর্বেকার উম্মত ও জাতিসমূহের পরিচিতিও দেওয়া হয়েছে। এরপর এই উম্মতের শরীয়ত, তার দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ, শরীয়তের জ্ঞান ও শরীয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহের বর্ণনা বিস্তারিতভাবে রয়েছে। আরকানে আরবাআ বা রুকন চতুষ্টয়ের রহস্য ও হুকুম সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এ গ্রন্থে 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' এর তুলনায় বিষয়বস্তুর আধিক্য ও এর শ্রেণীভাগ বেশি রয়েছে। এতে এমন কিছু 'খোদায়িত্বের বিতর্ক' ও দার্শনিক বিষয়ও এসে গেছে, যেগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ মুতাকাল্লিমীন ও উম্মতের দার্শনিকগণ বর্ণনা করেননি। কিন্তু 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' বিষয়বস্তুর অতলতা, জ্ঞান ও দৃষ্টির পরিপক্কতা, চিন্তাধারা ও দার্শনিক উচ্চতা, বিজ্ঞান ও মূলতত্ত্বসমূহকে শরীয়ত ও সুন্নাহর ভাষায় এবং আরও বেশি শক্তিশালী আরবী বাগধারায় বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। সাহিত্য পরিষদ ডাভীল (মজলিসে ইলমী, ডাভীল) ১৩৫৪ হিজরীতে মদীনা প্রেস বাজনূর থেকে এটি প্রকাশ করেছে।

১২. بوارق الولاية : এ পুস্তিকাটি ফার্সী এবং 'আনফাসুল আরেফীন' এর অংশবিশেষ। এতে আপন পিতা শাহ আবদুর রহীম (র)-এর অভিমত, অবস্থা ও ঘটনাবলি, কার্যক্রম ও জীবনকর্ম আলোচনা করেছেন।

(ت)

১৩. تاويل الأحاديث : এটি আরবী রচনা। এতে কুরআনে কারীমে বর্ণিত আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর সেসব ঘটনাবলি, সূক্ষ্মতা ও তত্ত্বাবলি এবং

সেসব থেকে উৎসারিত অনেক শরয়ী মূলনীতির বর্ণনা রয়েছে। সংক্ষিপ্ততা সত্ত্বেও কিতাবটিতে বেশি কিছু মূল্যবান ইংগিত এবং কুরআনে কারীমের অতল জ্ঞানের নমুনাও রয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ একাডেমী হায়দারাবাদ (পাকিস্তান)-এর পক্ষ থেকে কিতাবটি প্রকাশিত হয়েছে।

১৪. تحفة الموحدين : এটি তাওহীদের আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শাহ সাহেবের ফার্সী ভাষায় সংক্ষিপ্ত একটি পুস্তিকা। যার মূলপাঠ 'আফযালুল মাতাবে', দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ রহীমবখশ দেহলভী 'হায়াতে ওয়ালী' রচয়িতা এর উর্দু তরজমা করেছেন। ১৩৮১ হিজরী/১৯৬২ খৃস্টাব্দে এই উর্দু তরজমা প্রকাশিত হয়েছে 'মাকতাবায়ে সালফিয়া শীশমহল রোড, লাহোর -এর পক্ষ থেকে। শাহ সাহেবের রচনাবলির মধ্যে সাধারণতঃ এই পুস্তিকার আলোচনা হয় না। পুস্তিকাটির মৌলিক বিষয়বস্তু যদিও শাহ সাহেবের অন্যান্য রচনাবলির মতই, কিন্তু কোনও কোনও বিষয়বস্তুর কারণে এটিকে শাহ সাহেবের প্রতি সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে কোনও কোনও জ্ঞানীজনের সংশয় রয়েছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

১৫. تراجم ابواب البخارى : এটি আরবী। এতে মৌলিক এমন কতিপয় নিয়মনীতি বর্ণনা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে তারজিমে বুখারী তথা বুখারী শরীফের অধ্যায়-অনুচ্ছেদগুলোর শিরোনামের মর্মোদ্ধারে সাহায্য পাওয়া যায়। 'মাজমূ'আয়ে রাসায়েলে আরবা'আসহ মুসালসালাতে মাতবূআহ মাতবায়ে নূরুল আনওয়ার আরাহ -এর শেষে ছাপা হয়েছে।

১৬. التفهمات الالهية : এটি আরবী ও ফার্সী। এতে রয়েছে শাহ সাহেবের কলবী বা আত্মিক বিপত্তি ও জ্ঞানলব্ধ বিষয়বস্তুসমূহ। যার বেশিরভাগ আরবী আর কিছু অংশ ফার্সী। এর মর্যাদা এমন একটি কাব্যগ্রন্থের মত, যাতে মানুষ তার অভিব্যক্তি ও প্রত্যক্ষ বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করে থাকে। আর তা সুবিন্যস্ত করা হয় একান্ত বন্ধুমহল ও ছাত্রদের পাঠের জন্য। অনেক কাব্যকার তার উন্মুক্ত প্রকাশকে পছন্দ করেন না। একে সাহিত্য পরিষদ ডাভীল ১৩৫৫ হি./১৯৩৬ খৃস্টাব্দে মদীনা প্রেস বাজনূর থেকে ছাপিয়েছে। এ কিতাবে শাহ সাহেব মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার লোকজনের প্রতি বিশেষভাবে সম্বোধন করে উপদেশ দিয়েছেন। যা কিতাবটির সর্বাধিক প্রভাবময় ও ফলপ্রসূ অংশ। কিতাবটি দু'খণ্ডে রচিত।

(জ)

১৭. الجزء اللطيف فى ترجمة العبد الضعيف : এটি তার ফার্সী একটি পুস্তিকা। তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, স্মৃতিচারণ ও

জীবনালেখ্যের বর্ণনায় এর পরিচিতি পেশ করে এসেছি। 'আনফাসুল আরেফীন'-এর একটি অংশ এটি। আবার পৃথকভাবেও তা প্রকাশিত হয়েছে।

(ح)

১৮. حجة الله البالغة : এটি আরবী। কিতাবের পরিচিতি, এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু ও এর প্রকাশনের বর্ণনা সপ্তম অধ্যায়ে করে এসেছি।

১৯. حسن العقيدة : এটি আরবী কিতাব। এতে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসগুলো আহলে সুন্নাতের মতাদর্শ ও কুরআন-হাদীসের আলোকে পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পুস্তিকার পরিচিতি, প্রকাশন ও মুদ্রণের বিবরণ পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লেখ হয়েছে। পুস্তিকাটি العقيدة الحسنة নামেও প্রসিদ্ধ। মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ আবীস সাহেব নেগরানী নদভী العقيدة الحسنة নামে এর ব্যাখ্যা লিখেছেন, যা মাকতাবায়ে নদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশিত এবং দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার পাঠভূক্ত।

(خ)

২০. الخير الكثير : এটি আরবীতে রচিত একটি ধর্মীয় দর্শনের কিতাব। এতে সত্ত্বার পরিচয়, খোদায়ী নামসমূহের মূলতত্ত্ব, অহীর বাস্তবতা, কালামে এলাহী ইত্যাদির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ওয়াহদাতুল উজুদ (খোদায়িত্বের একত্ব) সম্পর্কেও দার্শনিক ভঙ্গিতে আলোচনা করা হয়েছে। আরশ, মাটি, স্থান-কাল, নভোমণ্ডল ও পরমাণু, খণিজ, উদ্ভিদ ও প্রাণী, প্রমাণিত স্বাধিষ্টবস্তু, সাদৃশ্য জগৎ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিতাবটির الخزانة الخامسة অধ্যায়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ। যাতে নবী প্রেরণ, নবুওয়াতের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ও আম্বিয়াগণের (র) শ্রেণী ইত্যাদির বর্ণনা আছে। কিতাবটি দর্শন, প্রাকৃতিক তত্ত্ব, তাসাওউফ, সূর্যোদয়ের রহস্য সবক'টির সমষ্টি। খাযানায়ে ছালেছাতে দূত প্রেরণ বলে প্রথমে রাসূলে কারীম (স)-এর গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। খাযানায়ে ছামিনাতে (অষ্টম ভাণ্ডারে) শরীয়তের ক্রমবিকাশ ও এর উন্নতি সম্পর্কে, খাযানায়ে তাসিয়াতে পরকালের অবস্থাসমূহ ও স্তর সম্পর্কে আর খাযানাতে আশেরাতে বিভিন্ন উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। কিতাবটি প্রকাশিত হয়েছে ১৩৫২ হিজরীতে সাহিত্য পরিষদ ডাভীল থেকে।

(د)

২১. الدر الثمين فى مبشرات النبى الأمين : এটি আরবী পুস্তিকা। রাসূলে কারীম (স)-এর প্রদত্ত 'সুসংবাদ সমগ্র' একটি সংকলন, যা স্বয়ং শাহ

সাহেব র. কিংবা বুযুর্গদের সাথে সম্পৃক্ত। পুস্তিকা 'মুসালসালাত' ও 'আন নাওয়াদির' -এর সাথে ১৩৯১ হি./১৯৭০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। আবার ইয়াহইয়া প্রকাশনী সাহারানপুর থেকেও প্রকাশিত হয়েছে।

২২. ديوان الشعار : একটি আরবী সংকলন, যা শাহ আবদুল আযীয (র) একত্রিত করেছেন আর বিন্যাস করেছেন শাহ রফীউদ্দীন (র)। এতে শাহ সাহেবের বিভিন্ন কবিতা সংকলিত হয়েছে। এটা কুতুবখানায়ে নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ-এর হস্তলিখিত একটি কিতাব।

(ر)

২৩. 'রিসালাহ' : এটি হযরত খাজা খুর্দ শায়খ আবদুল্লাহ বিন আবদুল বাকীর জবাবে নিজের কাশফ অনুযায়ী লিখিত একটি পুস্তিকা।

২৪. 'রিসালায়ে দানেশমন্দী : এটি ফার্সীতে রচিত অধ্যাপনার মূলনীতি ও শিক্ষকদের জন্য অমূল্য দিকনির্দেশনা সম্বলিত একটি বুদ্ধিদীপ্ত, তাত্ত্বিক ও কার্যকরী পুস্তিকা। এর উর্দু অনুবাদ 'আর-রহীম' সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে হায়দারাবাদ সিন্ধু থেকে প্রফেসর মুহাম্মদ সুরূর প্রকাশ করেছেন। আর এর আরবী অনুবাদ 'البعث الاسلامى' চতুর্থ বর্ষ ২৭ সংখ্যা মহররম ১৪০৩ হিজরীতে মুহাম্মদ আকরাম নদভী -এর কলম থেকে ' أصول الدراسة التعليم' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

(ز)

২৫. زهراوين : এটি সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে ইমরানের তাফসীর।

(س)

২৬. سطعات : এটি ফার্সী কিতাব। খোদায়ী কুদরতের যাদু প্রসঙ্গে অর্থাৎ নিছক একত্ব, প্রত্যক্ষ জগত, ইন্দ্রিয় ও এর প্রভাবসমূহের বর্ণনা সম্পর্কে।

কিতাবটিকে বুঝতে হবে খোদায়ী দর্শনে। যাতে দার্শকি ও সূফীসুলভ পরিভাষা এবং ওয়াহদাতুল উজূদের বাচনভঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে। বস্তুতঃ এতে 'প্রাচীনের সঙ্গে নশ্বরের সম্পর্ক' (ربط الحادث بالقديم)-এর জটিলতা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। কিতাবখানা কেবল একান্ত বিশেষ মহলের পাঠ উপযোগী, যারা প্রাচীন দর্শনের তত্ত্ব পুরোপুরি জ্ঞাত এবং ওয়াহদাতুল উজূদের সমর্থন ও প্রত্যাখ্যানমূলক আলোচনার সরুপথ সম্পর্কে সম্যক অবগত; ব্যাপক প্রসার ও দাওয়াতের বিষয় নয়। দর্শন ও প্রাকৃতিক তত্ত্বের

বিষয়বস্তুও আলোচনাভুক্ত রয়েছে। সেসব মূলনীতির আওতায় কতিপয় আয়াতের সূক্ষ্ম তাফসীরও আছে। কোথাও কোথাও নিজ গবেষণায় দার্শনিক এবং মুতাকাল্লিমীন উভয়ের সাথে মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন। খোদায়ী শিক্ষার ধরন সবিস্তর বর্ণনা করেছেন এবং তার চিত্র ও রূপরেখা তুলে ধরেছেন। স্থানে স্থানে ব্যবহার করেছেন 'শখছে আকবর' (প্রধান ব্যক্তিত্ব) পরিভাষাটি। বর্ণনা দিয়েছেন আল্লাহর হেদায়াত ও নবী-রাসূল প্রেরণ সম্পর্কে। তাছাড়া তারা কোন কোন পরিবেশে আবির্ভূত হন, খোদায়ী নূরের ঝলক, তার শ্রেণী ও বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। পূর্ণ পুস্তিকাটি ২৪ পৃষ্ঠায় রচিত। পুস্তিকাটি মাতবায়ে আহমদী (বা আহমদিয়াহ লাইব্রেরী) থেকে সাইয়িদ যহীরুদ্দীন সাহেবের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে মৌলভী ফযলে আহমদ 'বাইতুল হিকমাত করাচী' থেকে এবং ১৯৬২ খৃস্টাব্দে মাওলানা গোলাম মুস্তফা কাসেমী 'শাহ ওয়ালীউল্লাহ একাডেমী' থেকেও প্রকাশ করেছেন।

২৭. سرور المحزون : এটি ফার্সী ভাষায় রচিত ইবনে সাইয়িদুন নাস-এর জীবনকর্মের উপর প্রসিদ্ধ কিতাব। نور العين فى سير الامين المامون -এর সারসংক্ষেপ। তার বিখ্যাত সমসাময়িক এবং মুজাদ্দেদিয়াহ সিলসিলার প্রবীণ শায়খ হযরত মির্যা মাযহার জানে জানা (র)-এর নির্দেশে রচনা করেন। উর্দুতে এর একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

(ش)

২৮. شرح تراجم ابواب صحيح البخارى : এটি সহীহ বুখারীর তারাজিম, শিরোনাম এবং হাদীস অনুযায়ী বিভিন্ন সূক্ষ্ম-তত্ত্ব, রহস্য সম্বলিত একটি আরবী গ্রন্থ। ১৩২৩ হিজরীতে দাকায়েকুল মাআরিফ হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত। এর শুরুতে বুখারী শরীফের শিরোনামগুলোও উল্লেখ আছে।

২৯. شفاء القلوب : এটি হাকায়েক ও মাআরেফ সম্পর্কিত একটি ফার্সী পুস্তিকা।

৩০. شوارق المعرفة : এটি শাহ সাহেবের চাচা শায়খ আবুর রযা (র)-এর জীবনকর্মের উপর একটি ফার্সী রচনা। আনফানুল আরেফীনের একটি অংশ।

(ع)

৩১. العطية الصمدية فى انفاس المحمدية : এটি শায়খ মুহাম্মদ ফুলতী (র) জীবনকর্মের উপর সংক্ষিপ্ত একটি ফার্সী পুস্তিকা। যিনি ছিলেন শাহ

সাহেবের মামা। এটি আনফাসুল আরেফীন -এর একটি অংশ। পাঁচ পুস্তিকা সমগ্র -এর সাথেও সন্নিবেশিত আছে।

৩২. عقيد الجيد فى احكام الاجتهاد و التقليد : এটি আরবী পুস্তিকা। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এর পরিচিতি বর্ণিত হয়েছে। আরেকটি পুস্তিকা العقيدة الحسنة যার অপর নাম حسن العقيدة – সেখানে দ্রষ্টব্য।

(ف)

৩৩. فتح الرحمن : কুরআনে কারীমের ফার্সী অনুবাদ। পঞ্চম অধ্যায়ে এর পরিচিতি ও বিবরণ উদ্ধৃত হয়েছে। মাতবায়ে ফারুকী দিল্লী থেকে ১২৯৪ হিজরীতে শাহ সাহেবের ফার্সী জ্ঞাতব্য টীকাসমূহ এবং শাহ আবদুল কাদির (র)-এর উর্দু অনুবাদ ও মুযিহুল কুরআনের ফাওয়ায়িদসহ সঙ্গে প্রকাশিত হয়, যা কলকাতার প্রকাশিত সংস্করণের অনুলিখন।

৩৪. فتح الخبير : এটি কুরআনে কারীমের জটিল শব্দাবলির আরবী ব্যাখ্যা। এ পুস্তিকাটি 'الفوز الكبير' এর পরিশিষ্টরূপে সন্নিবেশিত আছে।

৩৫. فتح الورود لمعرفة الجنود : এর প্রকাশনা লেখকের দৃষ্টিগোচর হয়নি। মাওলানা আবদুর রহীমবখশ 'হায়াতে ওয়ালী'-এর মধ্যে এটিকে চরিত্র ও তাসাওউফ সম্পর্কিত কিতাব বলে লিখেছেন। কিন্তু নামের দ্বারা সেকথা সুস্পষ্ট হয় না।

৩৬. الفضل المبين فى المسلسل من حديث الامين : এটি আরবী প্রকাশনা। মুসালসালাত নামে পরিচিত ও হাদীস শাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি পুস্তিকা।

৩৭. الفوز الكبير : এটি ফার্সী পুস্তিকা। আলোচনা পরিচিতি পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

৩৮. فيوض الحرمين : এ কিতাবখানা আরবী। এর বেশিরভাগ অংশ হিজায অবস্থানকালে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, বাতেনী মূলতত্ত্ব, দার্শনিক বিষয়াবলি এবং তাসাওউফ সংক্রান্ত। এটিও বিশেষ মহলের পাঠ্য আর যারা দর্শন ও তাসাওউফের ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান রাখে না, তাদের ক্ষমতার অনেক উর্ধ্বে।

৩৯. قرة العينين فى تفضيل الشيخين : এটি হযরত শায়খাইন (র)-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ সম্পর্কে একটি ফার্সী কিতাব। এর একাধিক সংস্করণ ছাপা হয়েছে।

৪০. القول الجميل فى بيان سواء السبيل : এটি আরবী পুস্তিকা। এতে বাই'আতের প্রমাণ, বাই'আতের সুন্নত হওয়া, কোনও কোনও যুগের শুরুতে

এর প্রচলন ও আনুগত্য না হওয়ার কারণ, বাই'আতের হেকমত, মুর্শিদ ও মুরীদের শর্তাবলী, সূফীগণের বাই'আতের প্রকার, বাই'আতের পুনরাবৃত্তির হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আরও বর্ণনা করা হয়েছে তরবিয়াতের (প্রশিক্ষণ দানের) পদ্ধতি, মুরীদের শিক্ষাদান, আল্লাহওয়ালা আলেমের গুণাবলি এবং ওয়ায-নসীহতের শিষ্টাচার। এরপর লিখেছেন সিলসিলায়ে কাদিরিয়াহ, চিশতিয়াহ, নকশেবন্দিয়ার নিয়ম-নীতির পরিশিষ্ট, পরিভাষাসমূহের ব্যাখ্যা। শাহ সাহেব এতে তার বংশগত কার্যক্রম, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ-অভিজ্ঞতাও লিখে দিয়েছেন। যেগুলো বিভিন্ন অবস্থা-প্রেক্ষিত ও প্রয়োজনাদিতে পরীক্ষিত। মোটকথা, কিতাবখানা সেসব জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীর কর্মপদ্ধতি, দিকনির্দেশনা ও হেদায়াতনামার পর্যায়ভুক্ত, যারা উক্ত তিন সিলসিলায় কারও সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর তাদের বিশুদ্ধ সুন্নতের গুরুত্ব, দাওয়াত ও ইছলাহেরও আগ্রহ রয়েছে।

এ কিতাবের কোথাও কোথাও শাহ সাহেবের সেই মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদসুলভ রঙ পাঠকবর্গের দৃষ্টিগোচর হবে না, যা তার গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ কিতাবাদির বৈশিষ্ট্য। এমনকি এ কিতাবের কোনও কোনও প্রতিপাদ্য তাওহীদের ব্যাপারে শাহ সাহেবের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞচিত ও সংস্কারমূলক মতাদর্শের সঙ্গে খাঁপ খায় না। যেমন, আসহাবে কাহফের নামের ব্যাপারে তিনি লিখেছেন, اسماء أصحاب الكهف امان من الغرق الحرق والنهب الشرق এরপর তাদের নাম লিখেছেন। অথচ এসব নামও কোনও বিশুদ্ধ হাদীস কিংবা অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত নয়।

এর কারণ সম্ভবতঃ এ কিতাবখানা হারামাইন সফরের (১১৪৩-১১৪৫ হি.) অনেক পূর্বের লেখা। এর একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে, কিতাবখানার যে অংশে আপন মাশায়িখে তাসাওউফ, তাদের এযাযত ও বিশেষ পোশাকের আলোচনা করেছেন, সেখানে তার মাহবূব ও মুরব্বী উস্তাদ শায়খ আবু তাহের মাদানী (র)-এর কথা উল্লেখ নেই। অথচ الجزء اللطيف এর মধ্যে তার সুস্পষ্ট আলোচনা বিদ্যমান। শাহ সাহেব লিখেন–

ولبست الخرقة الصوفية عن الشيخ ابو طاهر المدنى رحمة الله ولعلها حاوية لخرق الصوفية كلها.

হাদীসের সনদসমূহ এবং শায়খগণের মধ্যেও সম্মানিত পিতা (শাহ আবদুর রহীম) ও হাজী মুহাম্মদ আফযাল (র)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। শায়খ আবু তাহের (র) এবং হিজাযী শায়খগণের কারও কথা উল্লেখ নেই। অথচ এক্ষেত্রে এটা জরুরী ও যৌক্তিক ছিল। তদুপরি এ কিতাবে শাহ

সাহেবের ইছলাহী ও সংস্কারমূলক রঙ প্রকাশ পেয়েছে। সূফীগণের ইবাদত-বন্দেগীর কোনও কোনও পদ্ধতি যেমন, সালাতে মা'কূস (বিপরীত নামায) এর বর্ণনা দেননি। কেননা হাদীস ও ফকীহগণের উক্তি দ্বারা এর প্রমাণ নেই। তদ্রুপ কুরআনে কারীমকে সামনে-পিছনে, ডানে-বামে রেখে যরব (বিশেষ আঘাত) লাগানো সম্পর্কে মতানৈক্য করেছেন এবং বেয়াদবী (শিষ্টাচার পরিপন্থী) সাব্যস্ত করেছেন। কোনও কোনও হাদীস যেগুলো সেসব সিলসিলায় রাসূলে কারীম (স্র) থেকে সুলূকের (বিশেষ চাল-চলন ও বিশেষ রীতিনীতির) উৎসাহ দান প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, তার উপর মুহাদ্দিসসুলভ আলোচনা করেছেন। শাহ সাহেবের মতাদর্শ ও প্রকৃত রুচি নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে প্রতিভাত হয়ে যায়।

'এটি আমার অসীয়ত যে, সংশ্রব-সাহচর্য গ্রহণ করবে না মূর্খ সূফীদের আর না সুন্নাত ইবাদত অজ্ঞাত বেয়াদবদের, না এমন ফকীহদের যারা ভণ্ড-প্রতারক, না বাহ্যিক মুহাদ্দিসদের যারা ফিকহের প্রতি বিদ্বেষ রাখে আর না যুক্তিবিদ ও দার্শনিকদের, যারা নকলী দলীলগুলোকে নিকৃষ্ট মনে করে যৌক্তিক প্রমাণ দানে বাড়াবাড়ি করে বরং খাঁটি তালেব (অনুসন্ধিৎসু) এর উচিৎ যেন সে আলেম সূফী সাধক হয় দুনিয়াবিমুখ, প্রতিনিয়ত আল্লাহর ধ্যানে উচ্চাবস্থায় নিমজ্জিত, নববী আদর্শ ও সুন্নতে আসক্ত, হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের আমলগুলোর অনুসন্ধিৎসু-অনুরাগী, হাদীস ও আছারসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সন্ধান করে সেসব গবেষক পণ্ডিত ফকীহগণের ভাষ্য থেকে, যারা যুক্তি অপেক্ষা হাদীসের প্রতি অধিক অনুরাগী এবং সেসব আকাইদ শাস্ত্রবিদগণের উক্তি থেকে, যাদের আকীদা-বিশ্বাস সংগৃহীত হয়েছে সুন্নত থেকে– যারা যৌক্তিক প্রমাণাদিতে চিন্তা করেন নিঃস্বার্থ ও অনাবশ্যকীয় পন্থায়। আর সেসব আহলে সুলূক (আধ্যাত্মিকতার পথিক) এর দর্শন থেকে, যারা ইলম ও তাসাওউফের সমন্বয়কারী; কঠোরতা আরোপকারী নয় নিজের আত্মার ওপর আর না সুন্নতে নববী (স)-এর উপর বাড়িয়ে সূক্ষ্ম চিন্তায় কাজ হাসিলকারী।'

এ কিতাবে শাহ সাহেবের সামঞ্জস্য বিধানের (উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এবং তার স্বভাবগত আকর্ষণের) মানসিকতা ফুটে উঠেছে। তিনি ফিকহী মাযহাবগুলোর মধ্যে একটিকে অপরটিকে উপর প্রাধান্য দানকে অপছন্দ করেছেন। তার মতে যথোচিত হচ্ছে, সেগুলোকে মৌলিকভাবে গ্রহণযোগ্যতার দৃষ্টিতে দেখবে আর যেটি সুস্পষ্ট এবং মশহূর সুন্নাতের অনুকূলে তা মনেপ্রাণে মেনে চলবে।

ভারতের হস্তলিখিত সংস্করণ ছাড়াও এ পুস্তিকাটি মাওলানা মুহাম্মদ সাদেক মাদ্রাজীর সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ও ব্যাখ্যাসহ ১২৯০ হিজরীতে আলহাজ্ব মনসূর মুহাম্মদের প্রকাশনায় (আল-জামালিয়া মিসর-এ) আবদুল আল আহমদের হস্তলিখিত বর্ণাক্ষরে ছাপা হয়েছে। সংস্করণটি নদওয়াতুল উলামার কুতুবখানায়ও বিদ্যমান আছে। কিতাবটির অনুবাদ মাওলানা খুররাম আলী বলহাওরী (মৃত্যু ১২৭১ হি.) ১২৬০ হিজরীতে উর্দু ভাষায় করেছেন। তিনি লিখেন, 'যে টীকা মহান লেখক ও তার সুযোগ্য উত্তরসূরী যুগশ্রেষ্ঠ ও সময়ের নির্ভরযোগ্য আলেম মাওলানা শাহ আবদুল আযীয (র) কর্তৃক এ কিতাবের উপর লিখিত বিশুদ্ধ পর্যায়ের পেয়েছি, অতিরিক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ফাওয়াইদ (উপকারিতাসমূহ) সহ তার অনুবাদও সংশ্লিষ্ট ফাওয়ায়েদের আওতায় লিখে দিয়েছি। এই অনুবাদ প্রথমবার ১২৭৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৬১ খৃস্টাব্দে মাতবায়ে দুরাখশা-তে এবং দ্বিতীয়বার ১৩০৭ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে মাতবায়ে নিযামী কানপুর থেকে ছাপা হয়।

(ك)

৪১. كشف الغين عن شرح الرباعيتين : এটি খাজা বাকীবিল্লাহ (র)-এর দুটি রুবাঈ (চার পংক্তির দু'টি কবিতা)-এর ব্যাখ্যার ফার্সী ব্যাখ্যা। প্রথমে খাজা সাহেব রুবাঈ দুটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এরপর শাহ সাহেব উক্ত ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ করেছেন ফার্সী ভাষায়। এটি মাতবায়ে মুজতবাঈ দিল্লী থেকে ১৩১০ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছে।

৪২. لمعات : এটি ফার্সীতে রচিত। বিষয়বস্তু ইলমে তাসাওউফের সাথে সংশ্লিষ্ট।

৪৩. المقالة الوضعية فى النصيحة والوصية : এটা ফার্সীতে রচিত। 'অসীয়তনামা' নামে একাধিকবার ছাপা হয়েছে। মাতবায়ে মতীউর রহমান থেকে কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতি (র)-এর শরাহসহ ১২৬৮ হিজরীতে দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কাযী সাহেবের ব্যাখ্যাসমূহ তার প্রসিদ্ধ পুস্তিকা 'ইরশাদুত তালেবীন' থেকে সংগৃহীত।

৪৪. المقدمة السنية فى الانتصار الفرقة السنية : এটি আরবীতে রচিত। মুজাদ্দিদ (র)-এর পুস্তিকা 'রদ্দে রাওয়াফিয' এর টোঙ্ক ও ভূপালের কুতুবখানাগুলোতে এর হস্তলিখিত সংস্করণ বিদ্যমান। মাওলানা আবুল হাসান যায়েদ মুজাদ্দেদী এর তত্ত্বাবধানে দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়েছে

৪৫. المقدمة فى قوانين الترجمة : এটি ফার্সী সংস্করণ। ফাতহুর রাহমানের শুরুতেও সন্নিবেশিত হয়েছে।

৪৬. المسوى من احاديث المؤطا : এটি মুয়াত্তার আরবী শরাহ। দিল্লী থেকে দু'বার আর মক্কা শরীফ থেকে একবার প্রকাশিত হয়েছে।

৪৭. مصفى : এটি মুয়াত্তা ইমাম মালেক (র)-এর ফার্সী শরাহ। যা অনেক ফাওয়ায়েদ ও তত্ত্ব-গবেষণা সমৃদ্ধ এবং শাহ সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদির একটি। প্রথম খণ্ড মাতবায়ে ফারুকী দিল্লী আর দ্বিতীয় খণ্ড মুর্তাযা প্রকাশনী দিল্লী থেকে ১২৯৩ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছে।

৪৮. المكتوب المدنى : (আরবী সংস্করণ) এটি ওয়াহদাতুল উজূদ ও ওয়াহদাতুশ শহূদ এর মুখোমুখি আলোচনায় লিখিত একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র। যা শায়খ ইসমাঈল ইবনে আবদুল্লাহ রোমীর নামে লিখিত হয়েছে। এটি التفهيمات الإلهية-এর অন্তর্ভুক্ত। আবার পৃথকভাবেও অন্যান্য পুস্তিকার সঙ্গে ছাপা হয়েছে।

৪৯. مكتوبات مع مناقب امام بخارى وفضيلت ابن تيميه رح : এটি ফার্সী রচনা। মৌলভী আবদুর রউফ সাহেব সত্ত্বাধিকারী কুতুবখানায়ে নযীরিয়াহ এটি প্রকাশ করেছে। এটা স্বতন্ত্র কোনও রচনা নয়; কালিমাতে তাইয়িবাতের একটি অংশ। যা ইমাম বুখারী (র)-এর মর্যাদা-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখেছিলেন। আরেকটি রচনা হাফেয ইবনে তাইমিয়া (র)-এর জবাবে লিখা হয়েছে। সেখান থেকে এনে দুটিকে একত্রিত করে দিয়েছেন।

৫০. النبذة الإبريزية فى اللطيفة العزيزية : এটি ফার্সী কিতাব। এতে শাহ আবদুর রহীম (র) এর মাতৃকুলের উর্ধ্বতন পুরুষ শায়খ আবদুল আযীয দেহলভী (র) এবং তার পূর্বপুরুষ ও উত্তরসূরীদের জীবনালেখ্য বর্ণিত হয়েছে। এটিও আনফাসুল আরেফীনের অংশবিশেষ। মাতবায়ে আহমদীর প্রকাশনা 'মাজমূআয়ে খমসাহ রসায়েল'-এর মধ্যেও যুক্ত রয়েছে।

৫১. النوادر من أحاديث سيد الأوائل والأواخر : এটি আরবী কিতাব। প্রকাশিত মুসালসালাতের সাথে মুদ্রিত।

(৫)

৫২. همعات : এটি ফার্সী কিতাব। কলেবর ৬০ পৃষ্ঠা। মাঝারী সাইজের বই। তোহফায়ে মুহাম্মদিয়ার একটি প্রকাশনা। 'আল্লাহর সাথে সম্পর্ক' এর উপর লিখিত। ভূমিকায় বলা হয়েছে, 'আল্লাহ পাক যখন দীনে মুহাম্মদীর হেফাযতের দায়িত্ব নিলেন এবং সকল ধর্মের উপর তা প্রাধান্য লাভ করে, তখন আরব-অনারব জাতিগুলোর হিংস্র সভ্যতা এবং তাদের মাঝে বিরাজমান জুলুম-অন্ধকার, সবই ভাবনাতীতভাবে চমৎকাররূপে দূরীভূত হয়ে যায়। আর যেহেতু দীনে মুহাম্মদীর রয়েছে একটি প্রকাশ্য দিক; আরেকটি

রয়েছে অপ্রকাশ্য-বাতেনী দিক। তন্মধ্যে প্রকাশ্য দিক বা যাহেরের সম্পর্ক হল, আকার-আকৃতি ও বাহ্যিক অবস্থা, সময় নির্ধারণ, প্রচলন ও সংখ্যার সাথে। আর এর পূর্ণ যত্ন নেওয়া হয়েছে। রুদ্ধ করা হয়েছে বিকৃতির সকল পথ। অপরদিকে বাতেনের সম্পর্ক ইবাদত-বন্দেগীর নূর ও ক্রিয়াশীলতা অর্জনের সঙ্গে। আবার এর সম্পর্ক দুটি বিষয়ের সাথে। যাহেরের ধারক নবীর উত্তরসূরীগণ। যারা প্রকাশ্য শরীয়ত সংরক্ষণ করেছেন। তাদের মধ্যে ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুজাহিদ ও কারীগণও অন্তর্ভুক্ত। আর বাতেন এহসানের ধারক সেসব ইবাদতের জ্যোতির্ময় আলো, মধুরতার অনুভূতি, উন্নত চারিত্রিক গুণাবলির আধার এবং সুন্নাতী জীবনাদর্শের ধারক সুফিয়ায়ে কিরাম। তাদের উপর প্রত্যেক যুগে সেসব দু'আ-দরূদ ও নিয়মনীতি প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, যা ছিল সমকালীন মানুষের স্বভাবরীতির উপযোগী। তাদের কথা ও সাহচর্যে আল্লাহ তা'আলা এক বিশেষ আকর্ষণ ও প্রতিক্রিয়া শক্তি দান করেছেন। তাদেরকে ভূষিত করেছেন কারামত ও বাতেনী নূরে। প্রত্যেক সিলসিলায় বিশেষ নিয়ম-নীতি ও ওযীফা, দু'আ-দরূদ নির্দিষ্ট হয়েছে। আর মানুষ সেসবের আনুগত্য করে আরোহণ করেছে সাফল্যের চূড়ায়। প্রত্যেক যুগে এক পরিবারের সাথে সম্পর্কিত লোকজন নিজ পরিবারকে অন্যান্য পরিবারসমূহের উপর প্রাধান্য দেয়। এটা একদিক থেকে সঠিক। আবার কোনও কোনও দিক থেকে পার্থক্য হয়। কিন্তু সীমাবদ্ধকরণ শুদ্ধ নয়।

এরপর শাহ সাহেব সেসব পরিবার (সূফীগণের বংশপরিক্রমা) এবং সে পরিবারগুলো থেকে নির্গত শাখা-প্রশাখা এবং সেগুলোর প্রতিষ্ঠাতাগণের আলোচনা করেছেন। এরপর শাহ সাহেব সেসব মৌলিক পরিবর্তনসমূহের বর্ণনা দিয়েছেন, যা তাসাওউফের তরীকায় ঘটে থাকে। নবুওয়াতের যুগের পর কালের আবর্তন-বিবর্তনের কারণে এহসানের মর্যাদা লাভের যে পথ-পদ্ধতি ও চিকিৎসা-পথ্য নির্বাচন করা হয়েছে, সেসব বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে শাহ সাহেব যে সূক্ষ্মদৃষ্টি, দূরদর্শিতা ও গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কাজ করেছেন, তা একান্ত তাঁরই বৈশিষ্ট্য। 'শায়খে আকবর' এবং وحدة الوجود (ওয়াহদাতুল উজূদ) মতাদর্শের বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কেও বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সাইয়িদুত তাইফাহ হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র) হলেন মাসলাকে তাসাওউফ (আধ্যাত্মিক দর্শন)-এর সবচেয়ে বড় আইনজ্ঞ ও সংকলক। এরপর তার মতে এর জন্য যেসব শর্ত ও মৌলিক স্তম্ভ রয়েছে, তা উল্লেখ করেছেন। তারপর যুগে যুগে যেসব মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) ও মুজতাহিদ সমকালীন মানুষের যোগ্যতা ও মেধা-মনন অনুযায়ী এর যে পাঠ্য ও কর্মপদ্ধতি বিন্যাস করেছেন,

তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। অনন্তর শাহ্ সাহেব (র) তার যুগের সালেক (আধ্যাত্মিক পথের পথিক) এর জন্য যে নেসাব (পাঠ্য ও কর্মপদ্ধতি) হওয়া প্রয়োজন, তা বর্ণনা করেছেন। আরও বর্ণনা করেছেন, কোন কোন বিষয়ের প্রতি একজন সালেকের মনোনিবেশ করা উচিৎ। এরপর এ পথের অন্তরায় বাঁধা ও ক্ষতিকর বিষয় এবং কারণগুলো উল্লেখপূর্বক সেসবের চিকিৎসাপদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন। এ পথে আগত মনযিল ও ঘাটিগুলোর প্রতিও দিকেও ইংগিত দিয়েছেন। এরপর উল্লেখ করেছেন সংযোগ-সম্বন্ধগুলো। এক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম (রা), তাবেঈন এবং জমহূরে ওয়ালীআল্লাহ-সালেহীনের সম্বন্ধ বর্ণনা করেছেন। একে নাম দিয়েছেন এহসান। অনন্তর এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। এরপর বিভিন্ন মানুষের যোগ্যতা-দক্ষতাসমূহের আলোচনা করেছেন। আবার সূক্ষ্ম তথ্যকণিকাও বর্ণনা করেছেন। পূর্ণ কিতাবখানা জটিল বিষয়বস্তুসহ সূক্ষ্ম তত্ত্ব-উপাত্ত এবং সত্ত্বাগত জ্ঞান-গবেষণায় এমনভাবে পরিপূর্ণ, মনে হয় যেন কোনও বিজ্ঞ উস্তাদ আর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনও চিকিৎসক মানবিক, দেহমন ও সুস্থতা-অসুস্থতার কারণসমূহ এবং সেসবের চিকিৎসা-পথ্য বাতলে দিচ্ছেন।

৫৩. هوامع شرح حزب البحر: শাহ্ সাহেবের আরেকটি কিতাব। এটি ফার্সীতে মুদ্রিত।

সমাপ্ত

সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস [৫ম খণ্ড]
[হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর জীবন ও কর্ম]

মূল ঃ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)
অনুবাদ ঃ শাহ আবদুল হালীম হুসাইনী

প্রকাশক
মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১২৫৪৮১, ০১১৯০-৫২৯৪১১

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং

মুদ্রণে
মেসার্স তাওয়াক্কুল প্রেস
৬৬/১, নয়া পল্টন
ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৮৩১২১০৫

মূল্য
২০০.০০ টাকা মাত্র।

ISBN : 984-622-001-9

Shangrami Shadhakder Itihash : (History of Saviors of Islamic Spirit) written by Syed Abul Hasan Ali Nadavi in Urdu and translated by Shah Abdul Halim Hossainy into Bengali and published by Muhammad Abdur Rouf. Muhammad Brothers, 38, Banglabazar, Dhaka-1100; Bangladesh. Phone : 7125481, September, 2008. Price- Tk. 200.00 only. U.S. Dollar : 5.00 only.

হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ
মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.-এর

জীবন ও কর্ম
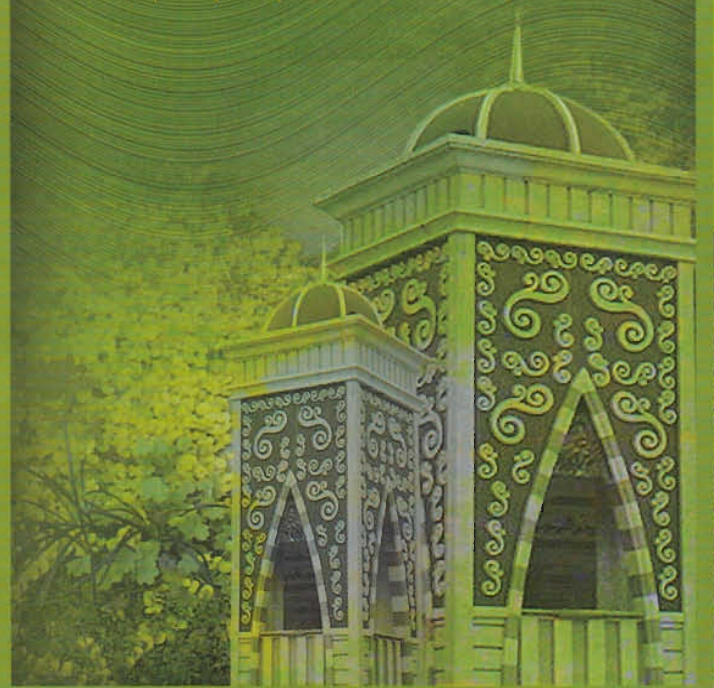
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র.

গ্রন্থাকার

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) সেই যে ত্রিশের দশকে তাঁর পূর্বপুরুষ বালাকোটের শহীদ আমীরুল-মু'মিনীন হযরত সাইয়েদ আহমেদ বেরলভী (র)-এর অনুপম চরিত গ্রন্থ "সীরাত সাইয়েদ আহমদ শহীদ" লিখে তারুণ্যদীপ্ত বয়সেই উর্দু সাহিত্যের আসরে নিজের একটি উল্লেখযোগ্য আসন করে নিলেন, তারপর বিগত প্রায় পৌণে এক শতাব্দী ধরে তাঁর কলম অবিশ্রান্তভাবে লিখে গেছে মুসলিম ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়গুলোর ইতিবৃত্ত। পাঁচ খণ্ডে রচিত তারিখে দাওয়াত ও আযীমত-এর ভাবানুবাদ 'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস' তার এমনি একটি অমূল্য গ্রন্থ। সীরাত থেকে ইতিহাস, ইতিহাস থেকে দর্শন ও সাহিত্য পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর অবাধ গতি। তাঁর "মা যা খাসিরাল আলামু বিন্ হিতাতিল-মুসলিমীন" এর বঙ্গানুবাদ "মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?" একখানি চিন্তাসমৃদ্ধ অনবদ্য আরবী গ্রন্থ যার অনুবাদ পৃথিবীর অনেক ভাষায় হয়েছে। নবীয়ে রহমত ছাড়াও তাঁর রচিত আল-মুরতাযা শীর্ষক হযরত আলী (রা)-এর জীবনী গ্রন্থখানা আরবী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় প্রভূত সুনাম অর্জন করেছে। হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়া (র.) তাঁর একটি অনবদ্য রচনা। **"হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী র. -এর জীবন ও কর্ম"** তাঁর লিখিত তারিখে দাওয়াত ও আযীমত পঞ্চম খণ্ডের অনুবাদ।

সমসাময়িক বিশ্বে তাঁর চাইতে অধিকতর খ্যাতিমান ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অন্য কোনও আলেম জন্মেছেন কি না এবং থাকলেও তাঁর মত এত অধিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন কিনা সন্দেহ রয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রায় সকল জনপদে যেমন তিনি আমন্ত্রিত হয়ে সে সব দেশ সফর করেছেন, তেমনি নোবেল পুরস্কার তুল্য মুসলিম বিশ্বের সব চাইতে মূল্যবান 'বাদশা ফয়সাল' পুরস্কারেও তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন। তিনি একাধারে রাবেতায়ে আলমে ইসলামী এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, লখনৌর বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'দারুল উলূম নদওয়াতুল-উলামা' এর রেক্টর ভারতীয় মুসলমাদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম মুসলিম পারসনাল 'ল বোর্ড' এর সভাপতি ছিলেন। তাঁর অস্তিত্ব কেবল ভারতীয় মুসলমাদের জন্যই নয়, গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যই এক বিরাট নিয়ামত ছিলেন। তাঁর বেশ কটি বই ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। একাধিকবার তিনি বাংলাদেশ সফর করেছেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ এ পর্যন্ত সাত খণ্ডে প্রকাশিত কারওয়ানে যিন্দেগী শুধু তাঁর আত্মজীবনী মূলক নয়, এটা সমসাময়িক বিশ্বের অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও ব্যক্তির এক অপূর্ব আলেখ্যও বটে। তাঁর রচনায় আল্লামা শিবলীর অনবদ্যতা, আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর সূক্ষ্মদর্শিতা, মাওলানা মানাযির আহসান গিলানীর সতর্কতা, মাওলানা আশরাফ আলীর থানবীর তাকওয়া, সর্বোপরি তাঁর পূর্বপুরুষ সাইয়েদ আহমদ বেরলভী (র)-এর দরদ প্রতিফলিত হয়েছে। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (র), হযরত মাওলানা মনযূর নোমানী (র) ও রঈসুত-তাবলীগ মাওলানা ইউসুফ (র)-এর অনেক মূল্যবান গ্রন্থে তাঁর লিখিত সারগর্ভ ভূমিকাগুলো পড়বার মতো। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (র) এবং হযরত মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী (র)-এর খলীফা। বিগত হিজরী ১৪২১ সনের ২২ রমযান জুম'আর পূর্বে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াতরত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। রায়বেরেলীর পারিবারিক করবস্থানে রওযায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ্য় তাঁকে দাফন করা হয়।

cover design : najmul ▫ shaj creation

গ্রন্থকার ঃ

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) সেই যে ত্রিশের দশকে তাঁর পূর্বপুরুষ বালাকোটের শহীদ আমীরু'ল-মু'মিনীন হযরত সাইয়েদ আহমদ বেরলভী (র)-এর অনুপম চরিত গ্রন্থ "সীরাত সাইয়েদ আহমদ শহীদ" লিখে তারুণ্যদীপ্ত বয়সেই উর্দূ সাহিত্যের আসরে নিজের একটি উল্লেখযোগ্য আসন করে নিলেন তারপর বিগত প্রায় পৌণে এক শতাব্দী ধরে তাঁর কলম অবিশ্রান্তভাবে লিখে গেছে মুসলিম ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়গুলোর ইতিবৃত্ত। পাঁচ খণ্ডে রচিত 'তারিখে দাওয়াত ও আযীমত'-এর ভাবানুবাদ **'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস'** তাঁর এমনি একটি অমূল্য গ্রন্থ। সীরাত থেকে ইতিহাস, ইতিহাস থেকে দর্শন ও সাহিত্য পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর অবাধ গতি। তাঁর "মা-যা খাসিরা'ল-আলামু বিনহিতাতি'ল-মুসলিমীন" **Islam and the World**-এর বঙ্গানুবাদ 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?' একখানি চিন্তাসমৃদ্ধ অনবদ্য আরবী গ্রন্থ যার অনুবাদ পৃথিবীর অনেক ভাষায় হয়েছে। 'নবীয়ে রহমত' ছাড়াও তাঁর রচিত "আল-মুরতাযা" শীর্ষক হযরত আলী (রা)-এর জীবনী গ্রন্থখানা আরবী, উর্দূ ও ইংরেজী ভাষায় প্রভূত সুনাম অর্জন করেছে। সমসাময়িক বিশ্বে তাঁর চাইতে অধিকতর খ্যাতিমান ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অন্য কোনও আলেম জন্মেছেন কি না এবং থাকলেও তাঁর মত এত অধিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন কিনা সন্দেহ রয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রায় সকল জনপদে যেমন তিনি আমন্ত্রিত হয়ে সে সব দেশ সফর করেছেন, তেমনি নোবেল পুরস্কার তুল্য মুসলিম বিশ্বের সব চাইতে মূল্যবান 'বাদশা ফয়সাল' পুরস্কারে তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন। তিনি একাধারে রাবেতায়ে আলমে ইসলামী-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, লখনৌর বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম নদওয়াতুল-উলামা-এর রেকটর, ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম মুসলিম পার্সোন্যাল ল' বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। তাঁর অস্তিত্ব কেবল ভারতীয় মুসলমানদের জন্যই নয়, গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যই এক বিরাট নেয়ামত ছিলেন। তাঁর বেশ কটি বই ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। একাধিকবার তিনি বাংলাদেশ সফরও করেছেন। তাঁর আত্মজীবিনীমূলক গ্রন্থ এ পর্যন্ত ৭ খন্ডে প্রকাশিত 'কারওয়ানে যিন্দেগী' শুধু তাঁর আত্মজীবনীমূলক নয়, এটা সমসাময়িক বিশ্বের অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও ব্যক্তির এক অপূর্ব আলেখ্যও বটে। তাঁর রচনায় আল্লামা শিবলীর অনবদ্যতা, আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর সূক্ষ্মদর্শিতা, মাওলানা মানাযির আহসান গিলানীর সতর্কতা, মাওলানা আশরাফ আলীর থানবীর তাক্ওয়া, সর্বোপরি তাঁর পূর্বপুরুষ সাইয়েদ আহমদ বেরলভী (র)-এর দরদ প্রতিফলিত হয়েছে। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (র), মাওলানা মনযূর নোমানী (র), ও রঈসুত-তাবলীগ মাওলানা ইউসুফ (র)-এর অনেক মুল্যবান গ্রন্থে তাঁর লিখিত সারগর্ভ ভূমিকাগুলো পড়বার মতো। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (র) এবং মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী (র)-এর খলীফা। বিগত হিজরী ১৪২১ সনের ২২ রমযান জুম'আর পূর্বে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াতরত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। রায়বেরেলীর পারিবারিক কবরস্থানে রওযায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ্য় তাঁকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ ব্রাদার্স-ঢাকা